২৫শ বর্ষ] ১৩৫৩ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত [২য় খণ্ড

কবিতা :

উপন্যাস :

[শিল্পী—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ

[শিল্পী—অবনী সেন

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৫শ বর্ষ, কার্ত্তিক, ১৩৫৩]   [দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংখ্যা

"যদি কেহ এরূপ কল্পনা করেন যে অন্যান্য ধর্ম্মের বিনাশ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মই অপর সকলকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকিবে,—তিনি বাস্তবিকই কৃপাপাত্র তাঁহার জন্য আমি বড়ই দুঃখিত; তাঁহাকে আমি স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছি যে, তাঁহার ন্যায় লোকেরা বাধা দিলেও অনতিবিলম্বে প্রতি ধর্ম্মের পতাকার উপরই ইহাই লেখা থাকিবে যে—"বিবাদ করিও না—পরস্পর সহায়তা কর; পরস্পরকে বিনাশের চেষ্টা না করিয়া পরস্পরের ভাব গ্রহণ করিয়া ধারণা কর; কলহ ছাড়িয়া মৈত্রী ও শান্তি আশ্রয় কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। মালব দেশের এক সম্রান্ত ব্রাহ্মণ-পরিবারের তিনি বংশধর। চারি শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ মালব ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদে আসিয়া বসবাস করেন। তাঁহার পিতা পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ ছিলেন সেকালের এক বিখ্যাত পণ্ডিত। মদনমোহন পিতার তৃতীয় পুত্র। পণ্ডিত ব্রজেন্দ্রনাথ ধনী ছিলেন না বটে, কিন্তু সন্তানদের শিক্ষার ব্যাপারে তিনি ছিলেন মুক্তহস্ত। তাঁহারই প্রভাবে মদনমোহন আজ স্বনামধন্য।

মদনমোহনের প্রথম শিক্ষা সংস্কৃত পাঠশালাতে। পরে ইংরেজী স্কুলে অধ্যয়ন করেন কিন্তু বিদেশী শিক্ষা তাঁহার মনে কোন প্রভাব বিস্তার করে নাই। তিনি কেবল এই শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার কথাই ভাবিয়াছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ জিলা-স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া তিনি ম্যুর সেন্ট্রাল কলেজে ভর্ত্তি হন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এফ-এ ও ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বি-এ পাশ করেন। তখনকার দিনে এলাহাবাদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এম-এ ক্লাসেও তিনি ভর্ত্তি হইয়াছিলেন কিন্তু পরীক্ষা দেন নাই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি আইন পরীক্ষা পাশ করিয়া আদালতে যোগদান করেন।

ধর্ম্ম এবং শিক্ষার উন্নতি ও প্রসারণ ছিল তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র। সেই জন্য তিনি বি-এ পাশের পর এলাহাবাদে গবর্ণমেণ্ট হাই-স্কুলে তিন বৎসর শিক্ষকতা করিয়াছিলেন। বেতন হইয়াছিল পঞ্চাশ হইতে পঁচাত্তর। তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট।

সে সময় সরকারী চাকুরীয়ারা রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করিতে পারিত। মদনমোহন রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন স্কুলে চাকুরী করিবার কালেই। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন যুক্তপ্রদেশের প্রতিনিধি হিসাবে। জাতীয় কংগ্রেসের উহা দ্বিতীয় অধিবেশন। সভাপতি শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী। অনেকে বক্তৃতা করিলেন। মদনমোহনেরও ইচ্ছা হইল কিছু বলিবার। পূর্ব্ব হইতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু নিজের মধ্যে এমন একটা প্রেরণা অনুভব করিলেন যে, শেষ পর্য্যন্ত বক্তৃতা করিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সে এক অপূর্ব্ব বক্তৃতা। মিষ্টার হিউম বলেন—"But perhaps the speech that was most enthusiastically received was one made by Pandit Madan Mohan Malaviya, a high caste Brahman, whose fair complexion and delicately chiselled features, instinct with intellectuality, at once impressed every eye, and who suddenly jumping upon a chair besides the President poured forth manifestly imprompt speech with an energy and eloquence that carried everything before them."

পর-বৎসর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় মাদ্রাজে। সেবারে তিনি যা বক্তৃতা করেন আজও তাহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে। সেই হইতে তিনি কংগ্রেসের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট হন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে বিরোধিতার ফলে যখন কংগ্রেস-সভা প্রায় বন্ধ হইবার উপক্রম, তখন একমাত্র তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টায় অধিবেশন সম্ভবপর হইয়াছিল। তাঁহার সাহস ও কর্ম্মনিষ্ঠা ছিল অসাধারণ।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে কালাকঙ্করের রাজা রামপাল সিংহ, তাঁহার পত্রিকা 'হিন্দুস্থান'এর সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করিবার জন্য মদনমোহনকে অনুরোধ করেন। প্রথমটা তিনি একটু দ্বিধা প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে যখন বুঝিলেন যে, শিক্ষা-প্রচারের ইহা একটি প্রধান বাহন, তখন হইতে মনপ্রাণ দিয়া সাংবাদিকের কাজে লাগিয়া গেলেন। মাত্র দুই শত টাকা বেতনে তিনি আড়াই বৎসর কাল উক্ত পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ইহার পর তিনি 'ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ান' পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। মধ্যে তিনি নিজে 'অভ্যুদয়' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেন। প্রগতির নামে বিলাতী সমাজের অনুকরণে যে স্বেচ্ছাচারিতা আমাদের সমাজকে গ্রাস করিতেছিল ইহার বিরুদ্ধে তিনি উঠিয়া-পড়িয়া লাগেন নিজের কাগজে প্রবন্ধাদি লিখিয়া। 'লীডার' পত্রিকার আবির্ভাবের পিছনেও ছিল তাঁহার উদ্যম ও উৎসাহ।

তাঁহার নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বন্ধুদের একান্ত অনুরোধে তিনি ওকালতী করিতে রাজী হ'ন। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে আইন পরীক্ষা পাশ করেন ও ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তিনি হাইকোর্টে যোগদান করেন। অনেকে ভীত হইয়াছিলেন যে, বুঝি ওকালতী করিতে গিয়া তিনি দেশের সেবা করিবার সময় পাইবেন না, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গেল তিনি অধিকতর উৎসাহের সহিত দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন।

পণ্ডিত মদনমোহন বহু বৎসর এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। বার দুই ভাইস-চেয়ারম্যানও হইয়াছিলেন। তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে তিনি ব্যবস্থাপক সভার

সদস্য হ'ন। পরে ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলেরও সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি চারি বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হন (১৯০৯, ১৯১৮, ১৯৩২ ও ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে)। ১৯৩১-৩৩ খৃষ্টাব্দে সরকার যখন কংগ্রেসকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করেন, ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য যখন কারারুদ্ধ, তখন তিনি একাই অগ্রসর হইলেন জাতীয় অপমানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য। দিল্লীতে তিনি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন আহ্বান করিলেন। দিল্লী যাইবার পথে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইল কিন্তু সরকার তাঁহার উদ্দেশ্য বিফল করিতে পারিলেন না। অধিবেশন যথারীতি অনুষ্ঠিত হইল করাচীর শ্রীযুক্ত রণছোড়লালের সভাপতিত্বে। ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দেও ঐ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন কলিকাতায়। মালব্যজী প্রেসিডেণ্ট। শ্রীযুক্ত আনে'র সহিত কলিকাতাভিমুখে আসিতেছেন। পথিমধ্যে আসানসোলে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। কিন্তু তবুও অধিবেশন বন্ধ হইল না। সেবার সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্ত।

সারা জীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তিনি কাশীতে যে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, ভারতের হিন্দু সমাজ সে জন্য চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে। হিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতিকে তিনি মনে-প্রাণে ভাল বাসিতেন। হিন্দুর উন্নতির জন্য তাহার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের জন্য তাঁহার এই অমর কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে প্রতিটি হিন্দুর মনে-প্রাণে। কিছু কাল তিনি হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলরও ছিলেন।

জাতীয়তাবাদী হইলেও কোন দিন নিজেকে হিন্দু বলিয়া গর্ব্ব অনুভব করিতে তিনি বিরত হন নাই। মালব্যজী ছিলেন দৃঢ়চেতা পুরুষসিংহ; যাহা তিনি সত্য বলিয়া মনে-প্রাণে বিশ্বাস করিতেন, তাহার সহিত কোন মিথ্যার খাদ মিশাইতে তিনি শিখেন নাই। তাই কংগ্রেস যখন জাতীয়তার নামে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মানিয়া লইল, যখন হিন্দু-মুসলমান মিলনের নাম করিয়া কংগ্রেস প্রকৃত জাতীয়তাবাদের পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইল, তখন মালব্যজী কংগ্রেস হইতে সরিয়া আসিয়া "কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল" গঠন করিয়া জাতীয়তাবাদকে মালিন্যের স্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন নির্ভীক চিত্তে।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে পাকিস্থান সম্পর্কে তিনি যাহা বলেন তাহা প্রণিধানযোগ্য: "আমি সম্পূর্ণ ভাবে পাকিস্থান-নীতির বিরোধী। হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় যে ভাবে প্রতিবেশীর মত বাস করে, তাহা মনে রাখিলে প্রস্তাবটি অকার্য্যকরী বলিয়াই মনে হইবে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের দিক হইতেও উহা ক্ষতির কারণ হইবে। সমগ্র ভাবে সারা দেশই উহার বিরোধিতা করিতেছে। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হইলে দেশের রাজনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হইবে এবং প্রতিবেশী শক্তিশালী রাষ্ট্রের পক্ষে এই দেশ আক্রমণের পথ সহজ হইবে। ধর্ম্মের দিক দিয়া যাহারা সংখ্যালঘু তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে গিয়া দেশের এক বৃহৎ অংশ ছাড়িয়া দিবার অনুরোধ করার মধ্যে যে কি যুক্তি থাকিতে পারে, তাহা দেখান হয় নাই। প্রস্তাবটি কার্য্যে পরিণত করা হইলে স্বাধীন দেশ হিসাবে ভারতবর্ষ ধ্বংস হইবে।"

শেষ দিন পর্য্যন্ত এই মনীষী দেশের মঙ্গল-চিন্তা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ, দেশের উন্নতির বিরুদ্ধে চতুর্দ্দিক হইতে আজ যে বর্ব্বরতার অভিযান আরম্ভ হইয়াছে, তাহার চিন্তাই মালব্যজীর পক্ষে মারাত্মক হইয়াছিল। নোয়াখালীর অকল্পনীয় বিভীষিকা তাঁহাকে যে মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়াছিল, সে আঘাত তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত শোকাচ্ছন্ন করিয়া চিরকালের জন্য এই ক্ষণজন্মা পুরুষ আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইয়াছেন। তবু শোকে বিমূঢ় হইয়া থাকিবার দিন এ নয়। মৃত্যুশয্যার উপর হইতেও মালব্যজী দেশবাসীর নিকট আহ্বান জানাইয়া গিয়াছেন: "আজ মানবতার সর্ব্বনাশ সমুপস্থিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে। হিন্দুধর্ম্ম ও সংস্কৃতি আজ বিপদাপন্ন। এখন এমন এক সময় আসিয়াছে, যখন হিন্দুকে আত্মরক্ষার জন্য, নিজেদের দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সাহায্য লইয়া আগাইয়া আসিবার জন্য একতাবদ্ধ হইতে হইবে।......হিন্দু নেতৃবৃন্দের যেমন তাঁহাদের মাতৃভূমির প্রতি কর্ত্তব্য আছে, তেমনি নিজেদের ধর্ম্ম, সংস্কৃতি ও সমধর্ম্মাবলম্বীদের প্রতিও কর্ত্তব্য আছে। হিন্দুদের যখন সঙ্ঘবদ্ধ হওয়া, এক মন-প্রাণ হইয়া কাজ করা, একমাত্র সেবার লক্ষ্য লইয়া এক দল নিঃস্বার্থ ও দেশপ্রাণ কর্ম্মী গঠন করা, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও বর্ণের মধ্যে ভেদাভেদ বিস্মৃত হওয়া এবং নিজেদের আদর্শ ও সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আবশ্যক।" বর্ব্বরতার অমানিশায় ভারতের আকাশ আজ যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন, সাম্প্রদায়িক ভেদের বীভৎসতা আজ যখন মানবতাকে গ্রাস করিতে উদ্যত, তখন প্রার্থনা করি, পরলোকগত মহামানবের এই শেষ বাণী আমাদের নূতন আলোকের সন্ধান দিক্‌, মন বলদৃপ্ত করিয়া তুলুক, প্রাণে নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার করুক। মালব্যজীর আহ্বানকে কার্য্যে পরিণত করাই তাঁহার অমর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের প্রকৃত পথ।

লু স্যুন

অনুবাদক—পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

চীনদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় লো চিঙ-এর পানশালাগুলি একটু স্বতন্ত্র ধরণের। যেমন, প্রত্যেক পানশালাতেই একটি সমকোণ কাউণ্টারের ভিতরের দিকে মদ গরম করবার জন্তে সব সময়েই গরম জলের সুব্যবস্থা আছে। দুপুরে সন্ধ্যায় কারখানার লোকেরা ছুটি পেলেই এই সকল পানশালায় গিয়ে এক-আধ পাত্র মদ্য পান করে। বিশ বছর আগে এক পাত্রের দাম ছিল চার পয়সা, যদিও আজকাল তার দাম হয়েছে দশ পয়সা—তাও কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়িয়েই গরম গরম গিলতে হবে। চাটের ব্যবস্থা আছে: এক পয়সায় কিছুটা নুনমাখা বাঁশের কোঁড়া, নয়ত মসলাযুক্ত কড়াই-শুঁটি। আর দশ পয়সায় যে-কোন রকমের মাংস এক পাত্র পাওয়া যায়; খদ্দেরদের বেশীর ভাগই খাটো-জামা (খাটো জামা—সাধারণ গরীব শ্রেণী) শ্রেণীর, কাজেই তাদের কাছে পয়সা কখনই বেশী থাকে না। কেবল মাত্র জনকয়েক লম্বা-জামা (ভদ্রলোক) শ্রেণীর লোক কাউণ্টারের ভিতরে ঢুকতে পারে এবং পাশের ছোট ছোট কামরায় বসে মদ-মাংস দু'ই ধীরে আস্তে আরাম করে উপভোগ করে।

আমার বয়স যখন বার, তখন লো চিঙ-এর কোন একটি পানশালায় পরিচারকের কাজ পাই। দোকানটির নাম 'সর্বমঙ্গলা'—ঠিক শহরের প্রবেশ-মুখে। মালিক আমার চেহারা দেখে স্থির করলেন যে, লম্বা-জামাওয়ালাদের নিয়ে আমি সামাল দিতে পারব না; কাজেই আমাকে কাউণ্টারের ভিতরে কাজ দেওয়া হল। খাটো জামাওয়ালাদের সামলানো অপেক্ষাকৃত সহজ, কিন্তু তারা অতিমাত্রায় হৈ-চৈ করে; তা ছাড়া, নোংরামি ছেঁচড়ামিতেও সিদ্ধহস্ত। কাউণ্টারের ও-পাশে যখন পিপে থেকে খদ্দেরদের জন্তে মদ ঢেলে দেওয়া হয়, তখন তারা কাউণ্টারের উপর ঝুঁকে পড়ে নিজের চোখে দেখে নেয় সে-পাত্রে সত্যি খাঁটি মদ দেওয়া হচ্ছে, না, তলায় কিছুটা জল রাখা হয়েছে। পিপে থেকে মদ ঢেলে সেটা গরম জলে বসানো পর্য্যন্ত ভেজাল সম্পর্কে তারা অত্যন্ত সতর্ক-দৃষ্টি রাখে। এ রকম কড়া তদারকের মুখে মদের সঙ্গে জল মিশিয়ে দেওয়া দুষ্কর,—দুঃসাধ্য বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাজেই দিন কয়েকের মধ্যেই পানশালার মালিক স্থির বুঝে নিলেন যে, এ কাজে আমি নেহাৎ আনাড়ী। অপর পক্ষে আমার অযোগ্যতা সত্ত্বেও দোকানী আমাকে ছাড়িয়ে দিতে পারল না। কেন না, সৌভাগ্যক্রমে যে ব্যক্তির সুপারিশে আমি কাজে বহাল হয়েছি, [illegible] তার যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই ঠিক হল, আমাকে রাখতেই হবে, তবে [illegible] কাজের ভার আমাকে [illegible]ওয়া হল সেটা সত্যি বড় বিরক্তিকর। এ[illegible]রে পেলাম মদ গরম করবার কাজ।

সারা দিন কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়িয়ে থেকে কাজ করতে হত এ কাজে মুনিব খুশী হল বটে, কিন্তু সারা দিন অবিশ্রান্ত ভাবে ঠায় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এক এক সময় ভারী একঘেয়ে লাগত। দোকানী লোকটি ছিল অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির, আর খদ্দেররা নির্জীব, তাদের কণ্ঠস্বর কর্কশ ও বিরক্তিকর। এদের নিয়ে হাসি-খুশী থাকা এক রকম অসম্ভব। একমাত্র কুঙ ই-চি যখন মদ্যপান করতে আসত, তখনই যা-হোক একটু আমোদ পেতাম, আর সেই কারণেই হয়ত কুঙ ই-চির কথা আমায় এখনও মনে আছে।

কুঙ ই-চিই শুধু একমাত্র লম্বা-জামাওয়ালা—যে কাউণ্টারের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মদ্যপান করত। লোকটি আকৃতিতে লম্বা, সব মিলিয়ে দেখতে বৃহৎ। মুখখানি আশ্চর্য রকমে বিবর্ণ, এখানে সেখানে মেছেতা; বলিরেখাগুলোর পাশে পাশে কাটা ও আঘাতের দাগ। চিবুকে লম্বা পাকা দাড়ি যেন ছিটকে এসে ঝুলে পড়েছে। গায়ের কোটটি সত্যি লম্বা, কিন্তু বেশ ছেঁড়া, ময়লা; দেখে মনে হয়, বছর দশেক তা ধোয়া বা মেরামত হয়নি। কথা বলতে গেলেই

সে মাঝে মাঝে এমন সব শব্দ প্রয়োগ করত যে, সেগুলো সাধারণত শিক্ষিত ভদ্রলোকদের মধ্যে রেওয়াজ ছিল, জনসাধারণের কাছে তা সম্পূর্ণ অবোধ্য। সে যখনই পানশালায় আসত তখন প্রত্যেকেই তার দিকে চেয়ে অবজ্ঞার সঙ্গে মুখ টিপে হাসত। কেউ হয়ত বলে উঠত, 'এই যে কুঙ ই-চি, তোমার মুখে আঘাতের নতুন চিহ্ন [illegible]'

সে যেন কথাটা শুনেও শুনতো না। কাউণ্টারের দিকে ফিরে চেয়ে [illegible]—'দু'পাত্তর গরম কর, আর এক রেকাবি কড়াই-শুটি!' সঙ্গে সঙ্গে [illegible] পয়সা গুণে সে কাউণ্টারে থাক দিয়ে রাখত।

'আবার নিশ্চয়ই চুরি করেছ!' কে এক জন অনাবশ্যক উচ্চ-কণ্ঠে বলে ওঠে।

'কেমন করে এক জনের চরিত্র সম্বন্ধে খামকা সন্দেহ প্রকাশ করছ?' চোখ দু'টি বিস্ফারিত করে সে জবাব দেয়।

'কি, চরিত্রের কথা বলছ? হো-দের বাড়ী থেকে বই চুরি করার দায়ে কি সে-দিন তোমাকে মারতে দেখিনি বলতে চাও?'

কুঙ ই-চির মুখ বিকৃত হল, কপালের নীল শিরাগুলি বেরিয়ে পড়ল, সে জবাব দিল,—'বই চুরি করাকে কেউ কখনও চুরি আখ্যা দেয় না! বই চুরি নিছক পণ্ডিতদের কাজ—তাকেই কি না তুমি বলতে চাও চুরি?' তার পর সে ক্রমাগত বাজে উদ্ধৃতি করে করে বলতে লাগল,—'সত্যিকার যে মানুষ সে শত অভাবে অনটনেও আপন মনে খুশীই থাকে।' পরে সঙ্গে সঙ্গে তার সে সাধু ভাষার শব্দবৃষ্টি সুরু হয়ে গেল। উপস্থিত সকলেই হো-হো করে হাসতে লাগল এবং প্রত্যেকেই বেশ খুশী বলেই মনে হল।

অবশ্য কুঙ ই-চির অসাক্ষাতে সকলেই বলাবলি করত যে, লোকটা এক সময় ভাল করে লেখাপড়া শেখবার চেষ্টা করেছে। নিজের আবশ্যক ব্যয়নির্বাহের জন্যে উপার্জনের কোন সুযোগই তার ছিল না। ক্রমে সে অভাবের এমন স্তরে এসে পৌঁছল যে, ভিক্ষা ছাড়া আর কোন উপায়ই তার রইল না। তবে তার একটি মাত্র সদ্গুণ ছিল, সেটি হচ্ছে তার হস্তাক্ষর। অনুলিপির কাজ সে প্রচুর করতে পারত এবং তার থেকে তার জীবিকার্জন অনায়াসেই চলতে পারত। কিন্তু মদ্যপানে আত্যন্তিক অনুরাগ, কাজে অতিমাত্রায় আলস্য এবং কাজ হাতে নিয়ে দু'দিন কাজ করতে না করতেই বই, কাগজপত্র ও লেখার সরঞ্জাম সহ হঠাৎ তার অন্তর্ধান ইত্যাদি ঘটনা বারংবার ঘটায় তার পক্ষে শেষটায় কাজ পাওয়াই হয়ে ওঠে অসম্ভব এবং অন্য কোন কাজের যোগ্যতা না থাকায় সে মধ্যে মধ্যে এক-আধটুকু চুরি করতে বাধ্য হল।

আমাদের পানশালায় কিন্তু তার ব্যবহার, বলতে গেলে, একেবারে অনুকরণযোগ্য। ধার পরিশোধে সে কখনও ত্রুটি করত না, যদিও সময় সময় ধার থেকে যেতে এবং দোকানের খাতকদের নামের যে তালিকা ও ধারের পরিমাণ দেয়ালে সাদা বোর্ডে লটকিয়ে দেওয়া হত, সেখানে তার নামও সময় সময় থাকত। কিন্তু প্রতিবারেই সে তার ঋণ পরিশোধ করত।

পূর্বে যে ঘটনার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সে দিন পাত্রের আধাটা মদ্য পান করার পর আস্তে আস্তে তার মুখের স্বাভাবিক পাণ্ডুরতা ফিরে এল এবং কে এক জন তাকে জিজ্ঞাসা করল,—'আচ্ছা, তুমি সত্য সত্যই লেখাপড়া জান?' প্রশ্নটা শুনে সে প্রশ্নকারীর দিকে উদাস দৃষ্টিতে একবার তাকাল। লোকটার বলা তখনও শেষ হয়নি, সে বললে,—যদি সত্য সত্যই তুমি লেখাপড়া জান ত উপাধি পাওনি কেন?'

সঙ্গে সঙ্গেই কুঙ ই-চি ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়ল। তার কালশিরা-ওঠা মুখখানি হঠাৎ সাদা হয়ে গেল। কি যেন সে বিড়-বিড় করে বলল, কিন্তু তার এক বর্ণও বোঝা গেল না। আবার তারা উচ্চস্বরে হেসে উঠল এবং আবহাওয়াটাই দেখতে দেখতে হাসি-তামাসায় মসগুল হয়ে উঠল।

এ রকম হাসি-তামাসার ব্যাপারে সকলের সঙ্গে আমার যোগদানে দোকানীর যে বিশেষ আপত্তি ছিল না তার প্রমাণ, সে কখনও আমাকে এর জন্যে তিরস্কার করেনি। খদ্দেরদের খুশী রাখার দিকে অবশ্য তার যথেষ্ট সতর্ক-দৃষ্টি ছিল। এমন কি, তাদের হাসি-তামাসায় মসগুল রাখবার জন্যে কুঙ ই-চিকেও সময় সময় অনুরোধ করত। কিন্তু কুঙ ই-চি খদ্দেরদের সঙ্গে আলাপ করতে ঘৃণা

বোধ করত ; বরং সে সময় পেলে ও খেয়াল হলে পল্লীর ছোট ছোট শিশুদের সঙ্গে ছুটাছুটি খেলত।

এক দিন আমাকে সে জিজ্ঞাসা করল যে, আমি লেখাপড়া জানি কি না, কোন বই পড়েছি কি না ? মাথা নেড়ে আমি সম্মতি জানালাম।

'তাই না কি ?' সে বললে,—'তুমি যখন বই পড়েছ বলছ, তখন এক দিন তোমার পরীক্ষা নিতে হবে। আচ্ছা, বল ত, মসলাযুক্ত কড়াইশুঁটি লিখতে যে 'ওয়েই' বর্ণটি আছে সেটি কেমন করে লিখতে হয় ?'

মনে মনে ভাবলাম,—'এই ভিকিরীর মত লোকটা কি আমার পরীক্ষা নেওয়ার যোগ্য ?' এবং কথাটা ভেবেই তাকে এক রকম উপেক্ষা করেই মুখ ফেরালুম।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে, আবার একান্ত আগ্রহ নিয়ে সে বলল : 'তা হলে এইটেই কি বুঝব যে, তুমি ওই অক্ষরটা লিখতে জান না, তাই কি ? এসো শিখিয়ে দিচ্ছি। মনে রেখো, এ রকম শব্দ মনে করে রাখতে হবে। তুমি যখন এক দিন নিজেই এ রকম দোকানী হবে তখন তোমাকে হিসেব রাখতে গিয়ে এই শব্দগুলি বার বার লিখতে হবে।'

আপন মনেই বলে উঠলাম, আমার পক্ষে দোকানী হওয়ার সম্ভাবনা সুদূরপরাহত। তাছাড়া, হিসেব লিখতে গিয়ে কখনও "মশলাযুক্ত কড়াইশুঁটি' খাতায় লিখতে আমার মুনিবকে দেখিনি। কিন্তু তবু কৌতূহল ও বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিলাম : 'শেখাতে তোমাকে কে মাথার দিব্যি দিয়েছে ? 'ঘাস' লিখতেও ওই অক্ষরটার প্রয়োজন হয় না কি ?'

কুঙ ই-চি কথাটা শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল এবং খুশীর আতিশয্যে সে তার লম্বা লম্বা দু'টো আঙুলের নখ দিয়ে কাউণ্টারের উপর ঠোকর মারল।

"ঠিক, ঠিক !' আবেগে সে চীৎকার করে উঠল। 'কিন্তু ওই অক্ষরটি ভিন্ন ভিন্ন চার রকমে লেখা যায়। আচ্ছা, তুমি সব কয়টাই জান ত ?'

আমি অতঃপর বিরক্তিবোধ না করে পারলাম না। মুখ ভ্যাংচিয়ে সেখান থেকে সরে এলাম। কুঙ ই-চি তার লম্বা নখগুলো মদের মধ্যে চুবিয়ে দিয়ে কাউণ্টারের উপর সেই নখ দিয়ে অক্ষরটা লেখবার চেষ্টা করল, কিন্তু আমি উৎসাহিত নই দেখে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে চোখ দু'টিতে একটা করুণ বেদনার ছায়া দেখা দিল।

সময় সময় সে যখন দোকানে আসত মদ্যপান করবার জন্যে, তখন সঙ্গে করে নিয়ে আসত একটা হাসি-খুশীর ভাব। এমনি এক দিনের কথা বলছি। কুঙ ই-চি এল, দেখতে দেখতে পল্লীর ছেলে-মেয়েরাও এসে জুটল এবং তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ সুরু করে দিল। প্রত্যেককে একটি করে কড়াইশুঁটি দিল এবং তারা খেয়ে নিয়ে আরও পাওয়ার আশায় তার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পাত্রের অবশিষ্ট কড়াইশুঁটিগুলোর দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। তাদের খ্যাপাবার মতলবে সে কড়াইশুঁটিগুলোর দিকে আঙুল প্রসারিত করে হেঁট হয়ে তাদের কানে কানে বলল, গোটা-কয়েক মাত্র আছে, আমার ত খুব বেশী ছিল না।' তার পর আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে আপন মনেই বলে উঠল, 'কি করব ! বেশী না, বেশী না। বেশী হুংসাই !' বলতে বলতে আবার শুদ্ধ ভাষার বাছা-বাছা শব্দগুলি আওড়াতে সুরু করে দিল, আর ছেলেরা সে সব শুনে হাসতে হাসতে চারি দিকে ছড়িয়ে পড়ল।

শারদোৎসবের প্রাক্কালে এক দিন আমার মুনিব হিসেব মেলাতে গিয়ে সাদা বোর্ডটা নিয়ে হাতে লিখল, 'কুঙ ই-চির অনেক দিন দেখা নেই। তার কাছে উনিশ পয়সা পাওনা আছে।'

সে যে অনেক দিন আসেনি এটা আমারও খেয়াল হয়নি।

'আসবে কেমন করে ? খুব মার খেয়েছে। দু'টো পা-ই ভেঙে গেছে।' কে এক জন খদ্দের টিপ্পনী কাটল।

'তাই না কি !'

'হাঁ, আবার চুরি করে ধরা পড়েছিল। লোকটা একেবারে অসীম সাহসী, পাগল বললেও হয়। কর্, ত কর্, একেবারে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট তিঙ্, এর বাড়ীতেই কি না চুরি করতে গেল ! পড়তেই হবে। পড়লও।'

'তার পর কি হল ?'

'তার পর কি হল !—কেন, প্রথমে অপরাধ স্বীকার ক'রে মুচলেকা লিখে দিতে হল, তার সুরু হল মার ; সে মার বলে মার ! চার-পাঁচ ঘণ্টা ধরে চলল। ফলে দু'টো পা-ই গুঁড়িয়ে গেছে।'

'তার পর ?'

'সে এখন খোঁড়া !'

'এখন কেমন আছে ?'

'কে জানে ? হয় ত অক্কা পেয়েছে।'

দোকানী আর কিছু জিজ্ঞাসা করল না, হিসেবের ঠিক দিতে সুরু করল।

শারদোৎসব শেষ হয়ে গেছে। ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে সুরু করেছে। শীত এসে পড়ল। সারা দিন আমাকে চুল্লীর সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হলেও বালাপোষের জামা পরতে হচ্ছে। এক দিন বিকেলে দোকানে তখন একটিও খদ্দের নেই। শরীরটা ক্লান্ত। চুপ করে চোখ দু'টো বুজে বসেছিলাম।

'এক পাত্তর গরম কর।'

চমকে উঠে চোখ মেলে তাকালাম। গলার স্বর খুব দুর্বল, তাহলেও পরিচিত বলেই মনে হল। চার দিক তাকিয়ে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই ! তখন উঠে দাঁড়িয়ে কাউণ্টারের উপর ঝুঁকে পড়লাম। দেখি—কুঙ ই-চি মেঝেতে বসে দেহলীর দিকে চেয়ে রয়েছে। মুখখানি শীর্ণ ও কালো হয়ে গেছে, তার উপর দিয়ে যেন দুর্দশার ঝড় বয়ে গেছে। গায়ে একটা ছেঁড়া তোয়া-কাটা কোট, খোঁড়া পায়ের উপর বসে আছে, পা দু'খানি আড়াআড়ি ভাবে রয়েছে। পাশেই রয়েছে একটি খড়ের টুকরি, খড়ের পাকানো দড়ি দিয়ে তার গলায় ঝুলানো। আমাকে দেখেই সে নীচু গলায় আবার বলে উঠল, 'এক পাত্তর।'

দোকানী মাথা তুলে কাউণ্টারের উপর দিয়ে উঁকি মেরে তাকে দেখতে পেয়ে বলল, 'এই যে কুঙ ই চি, তোমার কাছে কিছু পাওনা আছে—উনিশ পয়সা।'

নির্জীবের মত মাথাটা তুলে বিড়-বিড় করে বলল, 'হাঁ, মনে আছে। আর বারে দিয়ে যাবো, আজ নয়। তবে আজকের পয়সা নগদই দিচ্ছি। জিনিসটা যেন ভাল হয়।'

শিল্পী—কানু মুখোপাধ্যায়

কথাটা শুনে দোকানী যথারীতি মুচকি হাসল, পরে মন্তব্য করল, 'আবারও চুরি ?'

প্রতিবাদ বা অস্বীকার কিছুই সে করল না, কেবল সংক্ষেপে জবাব দিল, 'ঠাট্টা রাখো।'

'ঠাট্টা ? চুরি না হয় ত এ সব কি ? পা দু'টো ভেঙে খোঁড়া হয়ে গেছে কেন বলো ত ?'

'ভাঙা ?' ক্ষীণস্বরে সে বলল, 'কেন, পড়ে গিয়ে ভেঙেছে,··· পড়ে গেছলাম।' তার দৃষ্টি যেন বলছিল, দোহাই তোমার, আলোচনাটা বন্ধ রাখো।

এমন সময় জন কয়েক খদ্দের এসে হাজির হল। এবং তারা ওকে দেখেই ব্যাপার বুঝতে পেরে মুনিবের সঙ্গে হাসা-হাসিতে যোগ দিল। আমি মদ গরম করে নিয়ে কুঙ্ ই-চিকে ধরে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেও পকেট হাতড়ে চারিটি পয়সা আমার হাতে দিল। তার প্রসারিত হাতখানির দিকে নজর পড়তেই দেখলাম—কাদা মাখা। বুঝতে বিলম্ব হল না যে, সারাটা পথ সে হাতে ভর দিয়েই হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে এসেছে। অন্য দিনের তুলনায় সেদিন সে মদ্যপানে বেশ একটু সময় নিল। ইতিমধ্যে দোকানে ভিড় জমে গেছে, পানাহার হুল্লোড়ে গম্-গম্ করছে। আমরা কুঙ্ ই-চির দিকে আর নজর রাখতে পারিনি। কখন যে সে আবার হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে চলে গেল, জানতেও পারিনি।

তার পর অনেক দিন আর তাকে দেখা গেল না। বছর শেষে দোকানী হিসেব মেলাতে গিয়ে সাদা বোর্ডখানি নামিয়ে নিয়ে পড়ে বললে, 'কুঙ্ ই-চির পয়সা এখনও পাওয়া যায়নি। উনিশ পয়সা।' পরের বছরও দোকানী ওই কথাই বলল। শারদোৎসবের সময় আর উল্লেখও করল না।

তার পর থেকে আজও তার কোন খবর পাইনি। এবারে হয় ত সত্যি সে মারা গেছে।
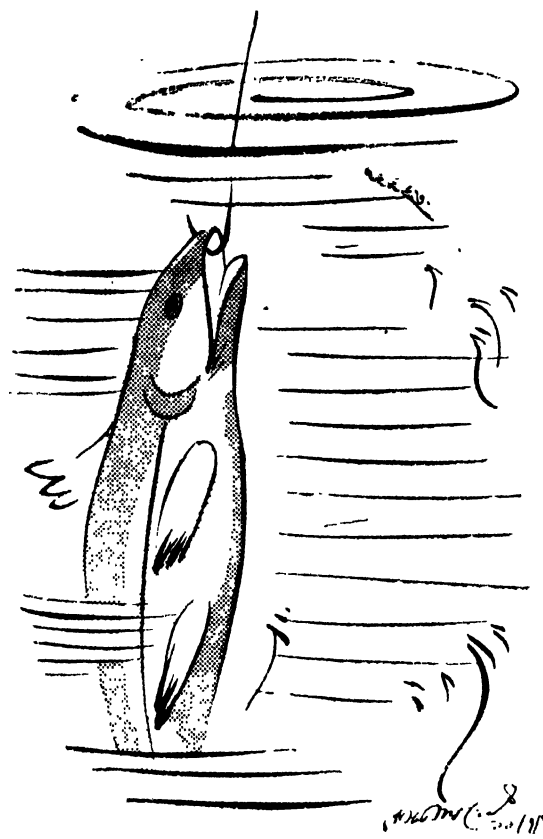
শিল্পী—গোপাল ঘোষ

শিল্পী—চিত্তরঞ্জন দাশ

শ্রীযামিনীকান্ত সোম

(পৌরাণিক গল্প)
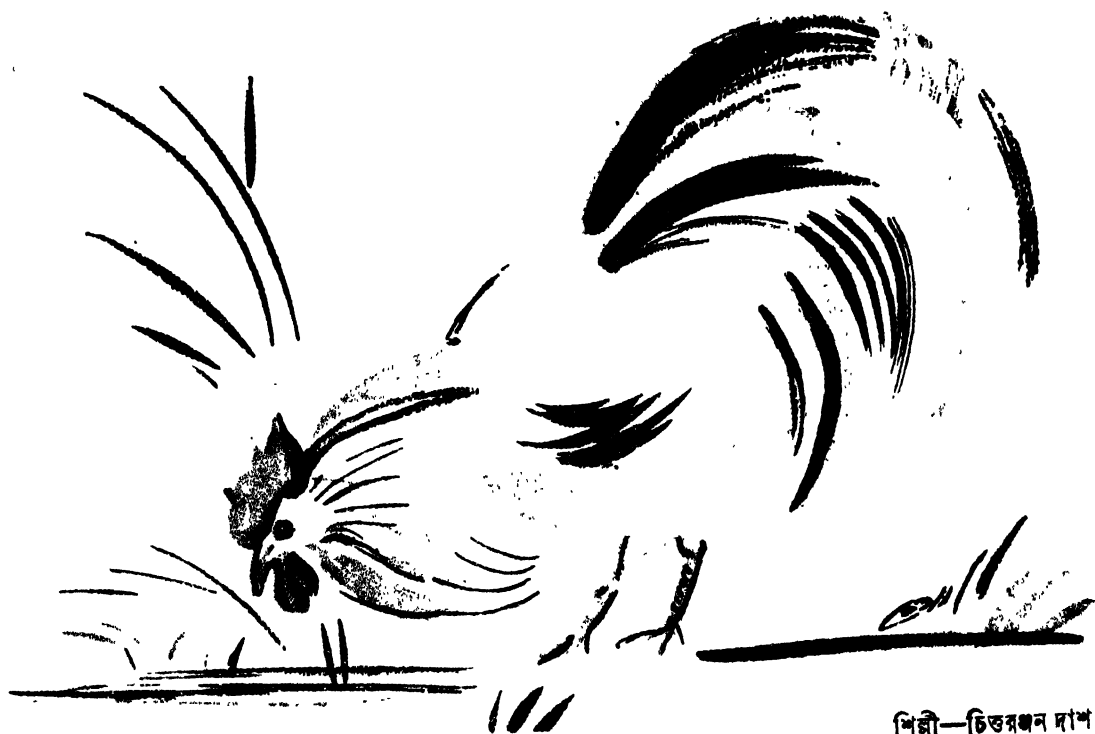
অসুরদের সঙ্গে দেবতাদের ঝগড়া-বিবাদ যুদ্ধ চলে আসছে, আবহমান কাল থেকেই। অসুর বা অসুর-মনোভাব পৃথিবীর মানুষের মধ্যে সব কালেই আছে। এখনো রয়েছে। এই যে এত বড় যুদ্ধটা হয়ে গেল পৃথিবীর বুকের উপর এত দিন ধরে, এ অসুর-লীলা নয় তো কি। এখনো কি এ লীলার বিরাম আছে! অসুর-শক্তিকে বিনাশ করতে হলে চাই দেব-শক্তি। এর এক চমৎকার দৃষ্টান্ত তো রয়েছে আমাদেরই ঘরে, আমাদের এই দুর্গাপূজার ভেতর। দুর্গার যে মূর্তিটি প্রতি বৎসর আমরা পূজা করি, সেটি হোল দুর্দান্ত অসুর মহিষাসুরকে বধ করবার ব্যাপার নিয়ে। মহিষাসুর বধের গল্পটি পুরানো হলেও শুনতে হয়তো মন্দ লাগবে না। গল্পটি এই :

দেবতাদের রাজা ইন্দ্র থাকেন অমরাবতীতে। অমরাবতী হোল স্বর্গের রাজধানী। স্বর্গ এখন মানুষের অজানা দেশ। কেউ সেখানে যেতে পারে না। দেহটাকে মর্ত্যে ফেলে রেখে তবে স্বর্গে যেতে হয়। পুরানো কালে কিন্তু এ রকম ছিল না। তখন অনেক মানুষ স্বর্গে যাওয়া-আসা করতো এই আস্ত দেহটা নিয়েই। সুমেরু পর্বতের নাম শোনা আছে অনেকের। এই সুমেরু পর্বত যেখানে, সেইখানেই ছিল স্বর্গ। ভারতের উত্তরে হিমালয়। হিমালয় পর্বত ছাড়িয়ে আরো উত্তরে, আরো দূরে সুমেরু পর্বতের স্থান। এখানেই ছিল স্বর্গরাজ্য। এখন এই অঞ্চল বারো মাস থাকে বরফে ঢাকা—এগোয় কার সাধ্য। তখনকার দিনে কিন্তু এত বরফ-টরফ পড়তো না—তাই বিস্তর প্রাণী সেখানে বাস করতো।

তখনকার কালে দেবতা, মানুষ আর অসুর সবাই এক জায়গায় থাকতো—এই সুমেরু অঞ্চলে। তার কারণ, পুরাণে বলে যে, দেবতা, অসুর আর মানুষ এরা একই পিতা অর্থাৎ কশ্যপ ঋষির সন্তান, এদের মা শুধু ভিন্ন ভিন্ন। বহু কাল ধরে এক জায়গায় থাকবার পরে শেষে স্থান সংকুলন না হওয়াতে মানুষেরা পর্বত অঞ্চল ছেড়ে দিয়ে নীচের দিকে চলে আসে। স্বর্গে বাস করতে থাকে কেবল দেবতা আর অসুর। কিন্তু দেবতারা শান্ত আর অসুররা দুর্দান্ত। সে জন্ত এদের বনিবনাও ছিল না আদবেই। খিটির-খিটির লেগেই থাকতো—লড়াই-যুদ্ধ লেগেই থাকতো। শেষটায় অসুরদেরই স্বর্গ ছেড়ে পালাতে হোল। স্বর্গের রাজ্যপাট দেবতাদের হোল। ইন্দ্র বসলেন সিংহাসনে।

অসুররা পালিয়ে গেছে বটে, কিন্তু তাদের আক্রোশ গেল না মোটেই। কি উপায়ে আবার স্বর্গ দখল করবে তারা, সেই চেষ্টাতেই থাকে। তার পরে তাদের ভেতর মহিষাসুর যখন পরাক্রমশালী হয়ে উঠলো, তার সঙ্গে যত সব অসুর চললো স্বর্গ আক্রমণ করতে। মহিষাসুরের মহা বিক্রম। সে এমন প্রচণ্ড ভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করলে যে, স্বর্গের রাজা ইন্দ্র তাঁর দেব-সৈন্ত নিয়ে কিছুতেই পেরে উঠলেন না মহিষাসুরের সঙ্গে। যুদ্ধে তিনি হেরে গেলেন। শুধু হেরে যাওয়া নয়, মহিষাসুর তাঁকে ও অন্ত সব দেবতাদের স্বর্গ থেকে একেবারে তাড়িয়েই দিলেন। মহিষাসুর ইন্দ্রের সিংহাসন দখল করে বসে, অসুরদের নিয়ে স্বর্গের সুখ ভোগ করতে লাগলেন।

অসুরের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে গিয়ে ইন্দ্রের সে কি লজ্জা! শুধুই কি লজ্জা! মহিষাসুরের ভয়ে তিনি লুকিয়ে রইলেন আর পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু পালিয়েই বা কত কাল থাকবেন। কি উপায় তা হলে করা যায়! কিছু ঠিক করতে না পেরে বায়ু বরুণ অগ্নি প্রভৃতি দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার কাছে উপস্থিত হলেন। স্বর্গরাজ্য কেড়ে নিয়েছে শুনে ব্রহ্মার চারটি মাথা রাগে নড়ে উঠলো। বললেন, "অসুরটার দেখছি বড্ড বেশী বাড় হয়েছে। তা হবেই তো! ও এখন মায়ার বলে বলবান কি না! কিন্তু একা আমি কি করতে পারি! চলো যাই বাড়োদের কাছে।" এই বলে তিনি এঁদের নিয়ে শিব আর বিষ্ণুর কাছে হাজির হলেন আর বলে যেতে লাগলেন এঁদের দুর্দশার কাহিনী। অসুররা এসে কেড়ে নিয়েছে স্বর্গ-রাজ্য—তাড়িয়ে দিয়েছে দেবতাদের স্বর্গ থেকে—অমরাবতীর সিংহাসন দখল করে বসেছে একটা অসুর—এই সকল কথা শুনতে শুনতে শিব আর বিষ্ণুর দারুণ রাগ হোল। সেই রাগ বাড়তে বাড়তে এমন হোল যে বিষ্ণু, শিব আর ব্রহ্মার মুখ থেকে ভয়ানক তেজ বেরুতে লাগলো। আর সেই সঙ্গে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণের শরীর থেকেও তেজ ফুটে বেরিয়ে আসতে লাগলো। শেষে এই সমস্ত দেবতার তেজ একসঙ্গে মিলে গিয়ে এমন এক ভয়ঙ্কর শক্তির রূপ নিলে যে, তা দেখে দেবতারা নিজেরাই স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। এই মিলিত মহাশক্তি এবার অপূর্ব মনোহর এক দেবীমূর্তি হয়ে জলন্ত রূপের ছটায় দশ দিক আলো করে দাঁড়ালেন। এই মূর্তি দেখে দেবগণের মন থেকে মহিষাসুরের ভয়

একেবারেই চলে গেল। কারণ, এই শক্তিরূপিণী দেবীই এবার অসুর-বংশ ধ্বংস করবেন। এই শক্তিই তো দশভুজা দুর্গা।

এইবার বিষ্ণু, শিব ও ব্রহ্মা নিজের নিজের অস্ত্রের অনুরূপ এক একটি অস্ত্র এই দেবীর হাতে দিলেন। ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবগণও যে যার অস্ত্রের অনুরূপ অস্ত্র-শস্ত্র দেবীকে দিতে লাগলেন। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অস্ত্র-শস্ত্রে দেবী সজ্জিত হলেন। তার পর দেবতারা সুন্দর বসন-ভূষণ, রত্ন অলঙ্কার দিয়ে সাজিয়ে দিলেন দেবীকে অতি অপরূপ করে। সাজিয়ে দিয়ে বললেন,—"দেবী, তোমার জয় হোক্।" দেবী তখন একটা সিংহের উপর চড়ে বসলেন। সিংহটা আপনা হতেই উপস্থিত হয়েছিল। সিংহের উপর চ'ড়ে দেবী এমন জোরে হাসলেন যে, সেই হাসির চোটে সারা বিশ্ব কেঁপে উঠলো।

দেবী চললেন এবার মহিষাসুরকে বধ করতে। দেবীর অট্ট-হাসির শব্দ মহিষাসুরেরও কানে পৌছেছিল। সে গোঁফ ফুলিয়ে, চোখ পাকিয়ে বললে,—"কিসের ওই বিকট আওয়াজ শুনছি। আমি হলুম স্বর্গের রাজা, আমার কানের কাছে এ রকম শব্দ! কার এত সাহস, দেখ তো!"

এক জন অসুর ছুটে এসে খবর দিলে,—"মহারাজ, এক অপূর্ব্ব সুন্দরী রমণী, ভয়ঙ্কর এক সিংহের পিঠে চড়ে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে হাজির হয়েছে। সে আপনারই সঙ্গে যুদ্ধ করতে চায়।" মহিষাসুর রাগে গন্ গন্ করে উঠলো। হুকুম দিল সিংহবাহিনীকে ধরে আনতে।

এক দল অসুর-সেনা ছুট্‌লো অমনি হুকুম তামিল করতে। কিন্তু দেবীকে ধরা মোটেই সহজ হোল না। যারা গেল, দেবীর খড়্‌গের ঘায় তাদের মাথা কাটা গেল চোখের নিমেষে। এবার দলে দলে ছুট্‌লো অসুর-সেনা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। অসুর-সেনারা গিয়ে চার দিক থেকে দেবীকে ঘিরে ফেললে। দেবীর দশ হাতে নানা রকমের ভীষণ ভীষণ অস্ত্র। মুখে তাঁর সে কি তেজ, কি জ্যোতি! সিংহের পিঠে চড়ে অবাধ গতিতে ঘুরে-ফিরে তিনি অতি সহজে অসুরদের বধ করতে লাগলেন। অসুররা কিন্তু জানে অনেক রকমের মায়া। অনেক অসুরের মাথা কচ্‌কচ্‌ করে কেটে পড়তে লাগলো বটে দেবীর কৃপাণের ঘায়, কিন্তু আশ্চর্য! এই মুণ্ড-কাটা অসুরগুলো মুণ্ডহীন হয়েও যুদ্ধ করতে লাগলো। এগুলোকে বলে কবন্ধ। দেবীর কাছে কিন্তু অসুরদের মায়া খাটলো না বেশীক্ষণ। কেন না তিনি নিজেই যে মহামায়া। মায়াবলে নিজের নিশ্বাস থেকে সৃষ্টি করতে লাগলেন বিস্তর সৈন্য-সামন্ত। তারা সব মার মার শব্দে অসুর বধ করতে লেগে গেল। দেবীও দশ হাতে অসুর বিনাশ করতে লাগলেন। অসুর-সেনার রক্তে নদী বয়ে চললো। দেখতে দেখতে সমস্ত অসুর মরে গেল। দেবী আবার [illegible]লেন।

মহিষাসুর দূরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যুদ্ধ দেখছিল। তার সমস্ত সেনা মরে গেল দেখে সে রাগে ফুলতে ফুলতে [illegible] মহিষের মূর্ত্তি ধরে বেগে ছুটে এলো যুদ্ধ করতে। মহিষ তো নয়, ঠিক যেন বড় একটা কালো পাহাড়! আর কি তার দাপট! গজ্‌রাচ্ছে ঠিক যেন মেঘ ডাকৃছে। নিশ্বাস ছাড়ছে যেন আগুনের হল্কা। লাফাচ্ছে ঠিক যেন পাহাড় গড়িয়ে পড়ছে। মহিষরূপী অসুরটা মাথা নীচু করে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দুটো শিং উঁচিয়ে দেবীকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করলো। মহিষটার এই মূর্ত্তি দেখে দেবীর সিংহও ভয়ানক গর্জ্জন করে উঠলো। দেবী চোখের পলকে এই মাহষের বিরাট মাথাটা তার দেহ থেকে আলাদা করে দিলেন। কিন্তু তবু সেটা মরলো না। এই মহিষাসুর মায়া-বিদ্যায় মহা ওস্তাদ। কাটা মহিষটার শরীর থেকে চট্ করে বেরিয়ে এলো প্রকাণ্ড এক অসুর। অসুরটাকেও দেবী এক কোপে কেটে ফেললেন। সে তখন হয়ে গেল মস্ত বড় একটা হাতী। হাতীটা শুঁড় দিয়ে দেবীর সিংহকে জড়িয়ে ধরলো। পলকের ভেতর দেবী এই হাতীটাকেও দু' টুক্‌রো করে ফেললেন। সে অমনি আবার একটা মাহিষ হয়ে গেল। মহিষটাকে দেবী খড়্‌গের এক ঘায় দু' ফাঁক করে দিলেন। কিন্তু তার মুখের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলো আর একটা জীব। এটা বেরিয়ে পড়তে না পড়তেই দেবী সেটাকে চট্‌ করে কেটে ফেলে দিলেন। অসুরটা এবার আর কোন মায়া ধরতে পারলে না। তার মায়ার খেলা এতক্ষণ পরে শেষ হলো। মহিষাসুর তখন ছট্‌ফট্ করতে করতে মরে গেল।

মায়াবী মহিষাসুর ম'লো। ইন্দ্র আবার তাঁর অমরাবতীর সিংহাসনে গিয়ে বসলেন।

শিল্পী—সুনীল পাল

অধিকারীর অধিকার বা ইম্প্রেসারিও

শ্রীহরেন ঘোষ

কলকারখানা, ট্রাম, বাস, ট্রেণ, করপোরেশন, মিল, রাজমিস্ত্রী, ড্রাইভার, দর্জ্জী, বাড়ীর চাকর, বামুন ও [illegible]দের পর্য্যন্ত ইউনিয়ন বা এসোসিয়েশন হয়ে গেছে, কিন্তু গাইয়ে, নাচিয়ে, বাজিয়ে ও সিনেমা-থিয়েটারের অভিনেতা ও গ্রামোফোন রেকর্ডের আর্টিষ্টদের জন্ত আজ পর্য্যন্ত কিছু করা গেল না—এর কারণ কি শুধু এই যে আর্টিষ্টরা বড় গরীব, [illegible] বড় ঠকে, আর্টিষ্টরা বড় ভাল মানুষ। য়ুরোপে এই সব আর্টিষ্টদের এসোসিয়েশন আছে এবং তা ছাড়া এদের সাহায্য করে বড় করে তোলবার ভাল উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। যাঁদের ওপর সে ভার তাঁদের নামকরণ হয়েছে— Impresario.

ইম্প্রেসারিও শব্দটি ইতালীয়ন কথা। সারা য়ুরোপে এই কথাটির খুব প্রচলন আছে। য়ুরোপের সব চেয়ে প্রধান প্রধান ইম্প্রেসারিও যুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত থাকতেন ফরাসীর প্যারী সহরে। আমেরিকার নিউইয়র্ক সহরেও বিশিষ্ট কয়েক জন ইম্প্রেসারিওর অফিস।

আমাদের দেশেও এমনি ধারা একটি কথা আছে এবং আধুনিক যুগের রীতি ও নীতি অনুযায়ী তাঁরা আমোদ-আহ্লাদের তেমন ব্যবস্থা করতে পারেন না বলেই তাঁদের পসার এখন বড় কম। যাত্রা-দলের অধিকারীকে দেখা গেছে গ্রামের উলঙ্গ গরীব ছেলেকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে রাধিকা সাজিয়েছে এবং ২।১ বছর ভাল করে নাচ-গান-অভিনয় শিখিয়ে এমন রাধাই তৈরী করেছে যাকে দেখে পণ্ডিত, রসগ্রাহী, দার্শনিক পর্য্যন্ত অশ্রু সম্বরণ করতে পারেননি। সামান্ত আর্টিষ্টকে জনসাধারণের কাছে যে বড় করে তুলে ধরতে পারে, সাধুজনের বক্তৃতা, বিভিন্ন কলাবিদের কলাকুশলতাকে যিনি রূপ দিয়ে সুন্দর করে সাজাতে পারেন এবং বর্ত্তমান যুগের মনোমত উপযুক্ত ব্যাপারের আইন-কানুনে যিনি অভিজ্ঞ, তাঁকেই বলে ও-দেশে আজ ইম্প্রেসারিও। তাঁর কাজ হচ্ছে ভাল শিক্ষাপ্রদ আমোদ-প্রমোদ ধনি-ইতর-নির্ব্বিশেষে সকলকে পরিবেশন করা। সাধারণের মধ্যে আর্ট ও কলারস-প্রীতির প্রচার করা।

ইম্প্রেসারিও কারো অধীনে কাজ করে না—সে নিজেই এক জন Principal; কাকে কতটুকু কি ভাবে বড় করা দরকার, কার জন্ত কি ভাবের publicity, propaganda আবশ্যক, কোন সময়ে কি আমোদ-প্রমোদ সাধারণের কাছে ভাল লাগবে বা কি আমোদ-প্রমোদে দশ ও দেশের উপকার হতে পারে—এমন কি দেশের ভাগ্যবিধাতারাও ইম্প্রেসারিওর সঙ্গে পরামর্শ করেই তা স্থির করেন। আমাদের দেশনায়কদের কাছে আমোদ-প্রমোদের মূল্য কম, য়ুনিভার্সিটির কোলে তার স্থান নেই, সুতরাং গভর্ণমেণ্ট যদি আজকের দিনে কলকাতার মত সহরেও একটি আপ-টু-ডেট নাচঘর সাধারণের জন্ত না তৈরী করেন, নালিশ করব কার কাছে?

ও-দেশে ইম্প্রেসারিওর সঙ্গে নাচঘর মালিকদের সম্প্রীতি বেশী। এখানে নাচগানের আসর কম, থিয়েটার একমাত্র কলকাতা ছাড়া কোথাও নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সহরে যে ২।৪টি করে নাচঘর বর্ত্তমান অবস্থায় দেখা যায়, সেগুলি সিনেমা কোম্পানীর সঙ্গে এমনই কণ্ট্রাক্টে বাঁধা যে ইম্প্রেসারিওর আবশ্যক মত কোন নাচঘরই কোন দিন কোন বিশিষ্ট আমোদ-প্রমোদের জন্ত পাওয়া সুকঠিন। সিনেমা কোম্পানীর নিত্যনূতন ছবি আসে, তাই দেখেই আমাদের দেশের কাছে অন্ত কোন 'আর্ট-শো' পরিবেশন করার উপায় নেই এইটেই সত্য কথা।

সিনেমা টেক্‌নিকের ভাল-মন্দ বিচার করতে গিয়ে এমন অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়েছি যে, যে কোন আর্ট-শোএর ব্যবস্থা করতে গেলেই পয়সা-দেনেওয়ালারা প্রশ্ন করে বসেন—সুশ্রী মেয়ে আছে ত? কারণ তাঁদের ছবি-দেখা-মন ভাল কিছুর অর্থে ঐ এক কথা বুঝতে পারেন —অগ্রগতি এবং নারী।

তানুজোরের দু'জন বয়োজ্যেষ্ঠা অতিশয় গুণী নৃত্যশিল্পী (বরোদ ষ্টেটের তাঁরা বেতনভোগী, স্থায়িভাবে আছেন—বিশেষ কোন অতিথি এলে ষ্টেট থেকে এঁদের নাচ দেখিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করা হয়), মালাবারের কবি বালাতোলের দলে ২।৩ জন মালাবারী যুবক যাঁদের কথাকলি নৃত্যনিপুণতায় যে কোন বিদেশীয় আর্টিষ্ট বিস্মিত হয়ে যাবেন, জোর গলায় বলতে পারি—উদয়শঙ্করের নৃত্যগুরু নম্বুদ্রী যাঁর মুদ্রাভিনয়ে ও বলিষ্ঠ দেহসম্ভার থাকা সত্ত্বেও যাঁর ব্যকরণমূলক হিন্দু-নৃত্যকুশলতা দেখে কয়েক জন ইংরাজ ক্রিটিক ভাবে গদগদ হয়ে উঠেছিলেন ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন কাগজের পাতায় সে কথা স্পষ্ট করে লিখে,—বিহার অঞ্চলের এক গহন বনে কয়েকটি সাঁওতালী যুবক তাদের অপরূপ সাঁওতালী নাচ দেখিয়ে উদয়শঙ্করের মত শিল্পীকে, এক নিশীথ রাত্রে, এমনই স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন যা কোন দিন ভুলতে পারব না—উড়িষ্যার সেরাইকেলা ছউ নৃত্যে ৩।৪ জন অল্পবয়স্ক কিশোর ও এক জন বয়স্ক বৃদ্ধের সামান্ত ঢাক ও ঘণ্টার সঙ্গে যে অপূর্ব্ব মনোরম ধারণাতীত কঠিন ও শুদ্ধ নাচের পরিচয় পেয়েছি ও য়ুরোপের ক্রিটিক দল যে ভাষায় তাদের প্রশংসাবাণী প্রচার করেছেন, ইতিহাস তা মনে রাখবে—বাংলার উত্তরে মণিপুর রাজ্যে যে বহু পুরাতন নাচের রেওয়াজ আছে সেখানে গিয়ে এক পাহাড়ী গাঁয়ে একটি ছেলে আমায় গৌরাঙ্গের নবরস নেচে দেখিয়েছিল—তখনো ভোর হয়নি ভাল করে—একখানি ছোট হলদে কাপড় পরে শুধু গায়ে, ছেলেটি আমায় তুষ্ট করবে ভেবেই লুকিয়ে নাচ দেখালে, সে প্রাতঃকাল প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে থাকবে, আমার জীবনে—বর্ম্মার পোয়ে নৃত্য নিয়ে যখন ভারতের নানা সহর পরিভ্রমণ করি, যে মিয়াতানচীর কমনীয় দেহলতা ভঙ্গিমায় ও আশৈশব শিক্ষাকৌশলের জটিল ও ধারণাতীত অঙ্গভঙ্গী কোন কোন স্বনামধন্ত চিত্রশিল্পীকে বিমুগ্ধ করে দিয়েছিল, তা কি ভোলা যায়,—ক্যাণ্ডী সহরের বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীকে নাচতে দেখে মনে হয়েছিল রুশ দেশের প্রধান নর্ত্তকের কাছেই বুঝি সে নৃত্যশিক্ষায় শিক্ষানবিশী করেছে। এই সমস্ত মনীষী নৃত্যনট ও নৃত্যনটীদের দলবদ্ধ করে যদি ভারতের সহরে সহরে প্রদর্শনীর জন্ত বিরাট আয়োজন করি—জনসাধারণ সম্বন্ধে আমার এই ধারণা হয়েছে যে, সে প্রদর্শনীর আর্থিক ব্যয়ভারও আমি দর্শক-মণ্ডলীর কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারব না।

আমি যে অর্থ সংগ্রহ করব সে আমার প্রচারকলারই বিনিময়ে—গুণীর আদর এ দেশে এমনই ভাবে কমে গেছে। ইম্প্রেসারিও কাজের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে এই প্রচারকলা।

রঙ্গমঞ্চের ওপর যে অভিনয়, যে নৃত্য, যে সঙ্গীত, যে যন্ত্রবাদ্যের ব্যবস্থা করলে রঙ্গমহলের দর্শকবৃন্দ পুলকিত হন, আনন্দ পান এবং যাতে করে রসগ্রাহীদের মনে রসসঞ্চার হয়, এমন কিছুর পরিবেশন করাই ইম্প্রেসারিওর কর্ত্তব্য। তবে পৃথিবীর নানা স্থানে এখনও দেখা গেছে যে, আর্টিষ্টের শো—ব্যকরণশুদ্ধ নৃত্যগীত বা বিশেষ কোন লোকনৃত্য, লোকগীতির আয়োজন করতে হলে আয়-ব্যয়

এমনই অসামঞ্জস্য হয়ে পড়েছে যে, অধিকারীকে কিছু দিনের জন্ত বাণিজ্যের হাটে আর দেখা যায়নি। সংবাদপত্রে ঘোষিত হয়েছে—অধিকারী 'ফেল'। আবার সেই অধিকারী ২।১ বছরের ভিতর নিজের বুদ্ধির বিনিময়েই এমন এক দল সুরসিক নটরাজ বা সুরসিকা নটীর সন্ধান পেয়েছেন যাঁকে কেন্দ্র করে যাঁর রূপলাবণ্য কলাকৌশলের তালিকা প্রকাশ করে নব বাণী-বিন্যাসে তাঁকে তদানীন্তন জনসাধারণের সামনে এমনই এক পৃথিবীর অষ্টমাশ্চর্য্যরূপে প্রতিপন্ন করলেন যে পৃথিবী তাঁর অতীত গেল ভুলে—মানুষ তাঁর বর্ত্তমানকে করলে পূজা—মঞ্চের আলোকপাতে সুন্দরীর ভ্রুকুটী ও কটাক্ষে স্খলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের লীলায়িত ছন্দে পূর্ব্বের কালো মুছে গিয়ে দেখা দিল আলো। আকাশে বাতাসে সহরে গ্রামে আবার সেই অধিকারীর নাম হল প্রকাশ যেমন Columbus discovered America; তেমনি ইম্প্রেসারিও আনলেন এক নতুন শিল্পী—যেন তাকে মাটী দিয়ে গড়লেন—সাজ দিয়ে সাজালেন—প্রাণ দিয়ে খেটে তাকে অনুপ্রাণিত করলেন শিল্পীর মন্ত্রে। দর্শকমণ্ডলী তার কলা-রূপে মুগ্ধ হলেন, যশোগাথায় মুখরিত হয়ে উঠলো শিল্পী পিছনে বসে রইলেন স্রষ্টা ইম্প্রেসারিও—অধিকারী।

নূতন বা পুরাতন বাড়ী তৈরী বা মেরামত করার সময় ভারা বাঁধা হয় কাজে সুবিধার জন্ত কিম্বা এ-ও বলা যেতে পারে ভারা না বাঁধলে ভাঙ্গা গড়া সাজান কিছুই হবে না বাড়ীর। যেই মুহূর্ত্তে মেরামতি কাজ শেষ হয়ে যায়, ভারার অবস্থা তার অসহনীয় হয়ে পড়ে, দৃষ্টিকটুও হয়, ভারাকে ভেঙ্গে ফেলা ছাড়া অন্য উপায় থাকে না। অধিকারীর কাজে প্রায়ই দেখা যায় এই ছবিটি: নাকে সিকনী, হাতে পাঁচড়া, পায়ে হাজা, পেটে পিলে—এ সব ব্যায়রাম সেরে গেলে নিতাই যেদিন চন্দ্রাবলীর পাঠ করে গোঁসাইদের তাক লাগিয়ে দিলে তার স্পষ্ট উচ্চারণে, বিশিষ্ট অভিনয়-কুশলতায় ও সুরের কালোয়াতিতে—গ্রামশুদ্ধ লোক হতভম্ব। জমিদারের বড় ছেলে নিতাইকে ডাকিয়ে ফরাসডাঙ্গার নতুন ধুতিখানা আর পুজার কেনা পমস্থ জোড়া ও খশুরালয়ের একখানা চাদর একদমে দান করে বসলেন—নিতাইয়ের 'হুজুরে হাজির আছি' বলা ছাড়া উপায় রইল না। অধিকারী তাকে দিলেন দশ টাকা, এখানে সে ফাউ পেয়ে বসলো বিশের ওপর—বেতনের কথা নাই বা বললাম।

শিল্পী যদি নারী হয়, তার চাহিদা শুধু জমিদারের কাছেই নয়। একতারা বাজাও—ঢাক বা ঢোল—কল্কিতে ফুঁ দাও—সবে বাপ মারা গেছেন 'উইল'-এর স্বত্ব এসেছে হাতে—নয়ত অধিকারীর বন্ধু ছেলে বা মাস-মাইনেতে থাকবে আবশ্যক মত সঙ্গে যেতে এমন হলেও চলে। অধিকারী যে কান ফুটিয়ে মাকড়ী পরিয়েছে, নিজের হাতে চুল বেঁধে মুখে রং মাখিয়ে চোখের দু'কোণ টেনে কালিন্দী মাসীকে ঘষে-পিটে পাঁচ জনের পাতে দেবার মত করে তুলছেন, কত খেটে, কত বকে, কত রাগ করে, পাঞ্জাব থেকে পাঞ্জাবী আনিয়ে, মণিপুর থেকে মণিপুরী, ঢাকা থেকে ঢাকী আর ট্যাকশাল থেকে টাকা। মেয়ে-শিল্পীর কাছে এ সব কিছু নয়। কোন সাঁজে কার ওপর দৃষ্টি পড়েছে—হোক না সে একটু মাতাল, হোনই বা স্বল্প চেনা—বলেছে ত ছাই অধিকারীর চেয়ে বাসবে ভাল—রাখবে আরো যত্নে? এ সব ছাড়াও দেখা গেছে, শিল্পী যশোগাথায় ভূষিত হলেই অলঙ্কারের ভারে তার প্রথম নষ্ট হয় কান, তার পর নষ্ট হয় মনের প্রসারতা, শেষ পর্য্যন্ত অতীতের প্রেয়সীদের মোটেই ভাল লাগে না যেমন একটা বিস্মৃতির মোহে অভিভূত হয়ে পড়ে। এর কোনটাই অধিকারীর চোখ এড়িয়ে যায় না। অধিকারী হয় স্পষ্ট বক্তা—একটু নেশা-ভাঙ, চরিত্রে একটু ভালবাসা দোষ,—দীনে দয়া, সুকণ্ঠের প্রতি প্রীতি, সুশ্রীতে অর্পণ, গুণীর প্রেম বিহ্বল, ভবিষ্যৎ বোঝার স্পর্শকাতি, মা কালে অবজ্ঞা, মিষ্টভাষী, সাহিত্যে [illegible] রঙিন হওয়াই তার সাজে। তাকে কঠিন হতে হবে শিল্পী তার গণ্ডী ছাড়িয়ে গেলে—তাকে দরদী হতে হয় গুণী যদি [illegible] অপেক্ষা না করে। তার সামর্থ্য থাকা দরকার [illegible] অর্থই অধিকারীর চলতি জীবনের মাপকাঠী। আর্টিষ্টের চাওয়ার অন্ত নেই, অধিকারী চাল-চলনে কমা, সেমি-কোলন ও দাড়ীর আধিক্য। শিল্পীর স্বপ্ন প্রতি প্রভাতেই যে বৃহৎ হ'তে বৃহত্তর হয়ে উঠছে—অধিকারী ভাবছে সে বুঝি তারই তৈরী থারমমিটার। আর্টিষ্ট জানে না কোথায় থামবে—পথ কোথায় বেঁধেছে। যে ক'দিন অধিকারীর সাথে থাকে পথ চলায় বাধা পড়ে না; মতটা বদলে ফেলে, বন্ধুর অভাব ঘটে না সত্য কিন্তু অন্তরে অভাব ঘটে—আঘাত পায়—সত্যকে যতই চায় লুকোতে মিথ্যার প্রকোপ ততই চেপে ধরে—নেশা করে—ভাঙ খায়—তাল হারিয়ে ফেলে শিল্পী। পুরাতনের সাথে যে বিনিময়, যে দেনা-পাওনা যে লাভ-লোকসান—নতুনের সাথে তা গড়ে উঠতে বিলম্ব হয়। বড় বড় দলের শিল্পী-বাজ্যে দেখা যায় দল ছেড়ে অর্থের লোভে যখনই কোন আর্টিষ্ট দলভ্রষ্ট হয়েছে—হয় সে হারিয়েছে ইজ্জৎ নয় ত ঘুচিয়েছে সম্মান। আজকের দিনে আর যে কেউ অর্থাভাবে কষ্ট পাক, আর্টিষ্টরা দু'টো টাকার মুখ দেখেছে এ কথা বলতেই হবে। বেহালা বাজিয়ে আর তবলার মাষ্টারী করে সংসার চালান এমন লোকের সংখ্যা কম নয়। এম-এ, পাশ করা ভাল ছেলেকে একশ' টাকার বেতনে বাহাল করা যে পরিমাণ কষ্টসাধ্য, নাচ-গান আর বাজনার স্কুলে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলে তাকে মাসিক ১৫০৲ টাকার কম offer করা অসম্ভব—চাই কি অভদ্রতা।

দরদী শিল্পী সত্যই ভদ্র, সত্যই অমায়িক, সত্যই আপনভোলা। তার কাছে মূল্যের বালাই নেই,—সে চায় কাজ, সে চায় বাঁচতে আর গড়তে। সে না দেয় ব্যথা—ব্যথা পেলেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ভাল দেখে অপরকে—আপনাকে মনে রাখে ছোট বলে; তাই প্রকৃতির কণ্ঠে বাজে তার খ্যাতি—পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে মৃগনাভির গন্ধ—অধিকারী যাকে জঙ্গল থেকে নিয়ে আসে মানুষের সমাজে।

অধিকারীকে এতটুকু কষ্ট করতে হয়নি এমন অনেক শিল্পী আছে যারা নিজেই ভেসে এসেছে জোয়ারের টানে—উঠেছে সেই বাঁধা ঘাটে—যেখানে থেকে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হয়েছে তাদের অধিকারীর সামান্ত সংবুদ্ধির আওতায়।

আর প্রবঞ্চনার কথা বলতে হলে বলতেই হবে যে, কোন কোন শিল্পী অতি বুদ্ধিমান অধিকারীর হাতে পড়ে হয়ত বা দু'চার-দশ টাকা কম পেয়েছেন কিন্তু একেবারে টাকা পাননি এমন স্বল্পবুদ্ধি শিল্পীর নাম শুনিনি বললেও অন্যায় হবে না। এই প্রসঙ্গে বরং এ কথাই বলা যায় যে, অধিকারীর অন্ন ধ্বংস করে এবং যৎকিঞ্চিৎ অর্থদণ্ড করিয়ে শিল্পি-মহলের বেশ কয়েক জন অধিকারীকে অত্যন্ত হীন উপায়ে অপদস্থ করার নানা প্রচেষ্টা করেছে। শিল্পিমনের বদান্যতার প্রমাণ পাইনি।

শুভেন্দু ঘোষ

জর্মন দার্শনিক শপেনহাওয়ের বলেছেন, পড়া হচ্ছে অন্যের চিন্তার উপর মন বুলানো। অর্থাৎ পড়া ব্যাপারের সঙ্গে সক্রিয় মননের কোনো অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ নাই। পড়া মানেই মাথা খাটানো নয়, হয়তো বা একটু চোখ খাটানো।

বেচারী আমরা, অনেক পড়েছি ভেবে একটু আত্মপ্রসাদ ভোগ করব, তাতেও বাধা। বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করি, পড়াটাই কি একটা ভাল কাজ নয়? নাই বা থাকল তার সঙ্গে মননের যোগ।

পড়াটাই ভাল কাজ কি না সে সম্বন্ধে মতবিরোধ আছে।

সবাই কিছু একই উদ্দেশ্যে পড়ে না। ছেলেবেলায় শুনতাম ;—

লেখাপড়া করে যে
গাড়ী-ঘোড়া চড়ে সে।

ঠিক গাড়ী-ঘোড়ায় চড়ার আশায় না হোক, দু'টো অন্নসংস্থানের জন্যে আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের বাপ-মায়েরা তাঁদের ছেলেদের পাঠে প্রবৃত্তি দেবার চেষ্টা করেন এই বলে—'না পড়লে খাবি কি?' যে পরিবারের অন্নচিন্তা নাই সেখানে বলা হয়—'না পড়লে ভদ্রসমাজে মিশবি কি করে?' অর্থাৎ পেটের দায়ে, ভবিষ্যতে কলম পিষে খাওয়ার যোগ্যতা অর্জনের তাগিদে অথবা ভদ্রসমাজে চলবার জন্যে অনেককে পড়তে হয়। পেটের দায়ে পরীক্ষা উৎরোবার জন্যে আমাদের অনেককে আর কিছু না হোক্ পাঠ্য বইগুলো পড়তে হয়েছে—সে হল এক রকমের পড়া। এ ছাড়া, আরও কয়েক রকমের পড়া আছে, যেমন, আড্ডা জমিয়ে রাখার জন্যে খবরের কাগজ পড়া, ঘুমের অষুধ হিসেবে দু'-একখান নাটক-নভেল পড়া। একটু বয়স্কদের মধ্যে এই ধরণের পড়ার বেশ ব্যাপক প্রচলন আছে। নিছক সময় কাটানোর জন্যে পড়াও এই শ্রেণীতে পড়ে।

এই সব মামুলী ধরণের পড়া ছাড়াও দু'-একটা বিশেষ ধরণের পড়া আছে। যেমন, পড়ুয়া বলে পরিচিত হবার জন্যে পড়া। অমুক বই পড়েছি, তমুক বই পড়েছি—বলতে আমরা বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করি। শ্রোতাদের চোখে একটা সপ্রশংস, সশ্রদ্ধ দৃষ্টি ফুটিয়ে তোলার লোভে আমরা এমন অনেক বই পড়ে ফেলি যা পড়তে গিয়ে আমরা গভযন্ত্রণা ভোগ করি—সেটা বইয়ের দোষেও হতে পারে, ভাল-না-লাগার দরুণও হতে পারে। যখন যে ধরণের বই পড়া ফ্যাশান্ তখন তা পড়া না থাকা যে লজ্জার কথা—য়ুরোপীয় সাহিত্য বিশেষ করে রুশ সাহিত্য, না পড়লে যে নিজকে শিক্ষিত বলেই পরিচয় দেওয়া যায় না, হোক না তা ইংরিজি ভাষার মারফৎ পড়া, নাই থাকল ইংরিজি সাহিত্যের সঙ্গে ভাল করে পরিচয়!

এ-কথা অবশ্য সত্যি যে বড় পড়ুয়া বলে নিজেকে জাহির করার জন্যে চালাক লোকের পক্ষে বেশী কিছু পড়ার দরকার করে না। এ যুগ হচ্ছে চালাক লোকের যুগ, কাজেই সব কিছুর শর্টকাট আছে। সাহিত্যের কোন ভাল ইতিহাস পড়া থাকলে মূল বই-এর সঙ্গে কোনো পরিচয় না রাখলেও চলে—দু'-চারখানা বই থেকে দু-চারটে উদ্ধৃতি কণ্ঠস্থ করে রাখতে পারলে তো সোনায় সোহাগা। তাক্ বুঝে দু'-চারটে ঝাড়তে পারলে দেখে কে?

সাহিত্যের ইতিহাসে কিন্তু একেবারে হাল আমলের লেখকদের বইয়ের কথা পাওয়া যায় না। এই এক মুস্কিল! তার জন্যে বিধান হচ্ছে: সাময়িক পত্রগুলোর পুস্তক-পরিচয় বিভাগটা মন দিয়ে পড়ে রাখতে হবে। সাহিত্য সমালোচনার নিত্যি নূতন চটকদার বুকনিগুলো আয়ত্ত থাকলে বই না পড়েও বেশ বিজ্ঞের মত তার সমালোচনা করা যায়। এ সব অতি-চালাকির অবশ্য বিপদ আছে। শোনা যায়, এক ভদ্রলোক বড়াই করতেন, তিনি ইংরিজি উপন্যাস সবই পড়ে ফেলেছেন। এক দিন এক জন তাঁকে জিজ্ঞেস করে বললেন, আপনি স্কটের সব উপন্যাস পড়েছেন?

প্রশ্নকর্ত্তা স্কটের নভেলগুলোর নাম করে গেলেন, একটার পর একটা। উত্তর এল, হাঁ, সবই পড়া হয়ে গিয়েছে। প্রশ্নকর্ত্তা মরীয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, স্কটের 'ইমাল্‌সন্'খানা পড়েছেন? তারও জবাব হল, হাঁ!!!

স্কট বলে একটা কোম্পানীর ঐ ওষুধটার নাম তখন প্রায় প্রত্যেকটা খবরের কাগজে বিজ্ঞাপিত হত। অতি চালাক পড়ুয়া বেচারা সাহিত্যের ইতিহাসে (অথবা হয়তো তালিকায়) না আর কোথাও ও-নামটা পড়েছেন স্মরণ করতে না পেরেই বোধ হয় এই বিপত্তিতে পড়ে গিয়েছিলেন।

আমরা প্রসঙ্গান্তরে এসে পড়েছি। আমরা আলোচনা করছিলাম পড়ার প্রকারভেদ সম্বন্ধে। দু'রকমের পড়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া আরও দু'রকমের পড়ার কথা বলব। এক হচ্ছে, গা-ভাসিয়ে পড়া; আর একটা হচ্ছে, সার্থক পড়া।

আগেই বলেছি, পড়া হল অন্যের চিন্তার স্রোতে গা-ভাসানো—নিজস্ব সক্রিয় চিন্তার অবকাশ সেখানে খুব কম। তা যদি না হত, ঘুমের ওষুধ হিসেবে কেউ বই পড়ত না; চিন্তাশ্রান্ত হয়ে বই-এর শরণাপন্ন হত না। পড়া আর অন্যের কথা শোনা প্রায় এক রকম ব্যাপার—সে কথায় মন সক্রিয় অংশ নেবে কি না নেবে তা নির্ভর করে মেজাজের ওপর। তাছাড়া, নিজের খুসী মত আমরা অন্যকে বকাতে পারি না—সে বকুনি একঘেঁয়ে লাগতেও পারে। অথচ বই পড়া যায় ইচ্ছামত—যখন যে বইটা ভাল লাগল তুলে নিলাম। এ যেন একেবারে নিজের আয়ত্তের মধ্যে মনের মত বকার লোক পাওয়া। ইংরেজ কবি সাদি তাঁর একটা কবিতায় বইয়ের এই গুণটার খুব তারিফ করেছেন। কিন্তু একটা কথা আমাদের ভুললে চলবে না যে, নিজস্ব চিন্তার দায় এড়াবার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে বই পড়া। সুতরাং দিন-রাত বইয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার অনিবার্য্য ফল হয় এই যে, নিজস্ব চিন্তা করার দায় এড়ানোটাই ধীরে ধীরে পাঠকের অভ্যাস হয়ে যায়—তার চিন্তাশক্তিও ব্যায়ামের অভাবে পঙ্গু হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়। আমরা যখন পড়ি, লেখকের চিন্তা আমাদের মনের ওপর যথেচ্ছ বিহার করে। নিজস্ব চিন্তাপদ্ধতির দ্বারা অন্যের চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে, অনেক পড়ার ফল হয় এই যে, বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন চিন্তার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না—তারা পাঠকের মনে বিশৃঙ্খল ভাবে হুটোপুটি খায়। সবটাই পাঠকের গয়হজম হয়; মনের বা আত্মার কোনো রকম পুষ্টি তো হয়ই না, উপরন্তু মনের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

মোট কথা, মন যদি খুব বেশী সবল সতেজ না হয়, তাহলে বেশী পড়ায় বিপদ অনিবার্য্য। গ্রন্থকীটের কাছ থেকে মৌলিক চিন্তা আশা করা বাতুলতা। স্মৃতিশক্তির জোরে নানা রকম তথ্য আয়ত্ত করা সম্ভব হলেও, গ্রন্থকীট তার ভারবাহী মাত্র হয়ে থাকে।

চিন্তাশক্তি পঙ্গু হয়ে যাওয়ার ফলে সেগুলোর সদ্ব্যবহার করার সামর্থ্য তার থাকে না।

এ পর্য্যন্ত যে সব পড়ার কথা আলোচনা করা হল সেগুলোর কোনটাকেই ঠিক সার্থক বলা চলে না। সার্থক পড়া হল সেই পড়া যার সাহায্যে অন্যের অভিজ্ঞতাকে আত্মস্থ করে নেওয়া যায়, যে পড়ার মন সক্রিয় থাকে, যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মন-প্রক্রিয়ার দ্বারা লেখকের অভিজ্ঞতার কতটুকু গ্রহণ বা বর্জ্জন করা হবে তা বাছাই হয়ে যায়, যে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজস্ব চিন্তা সজীব ভাবে চলতে থাকে।

মজা হচ্ছে এই যে, ইচ্ছে করলেই সার্থক ভাবে পড়া যায় না। প্রাণের ভিতর থেকে তাগিদ আসা চাই—সত্যিকার আগ্রহ থাকা চাই। পড়ার মূলে থাকা চাই জীবন-জিজ্ঞাসা—যেন প্রাণের দায়ে; জান্‌বার দুরন্ত কামনা। অবশ্য, জীবন-জিজ্ঞাসা উদ্বোধিত করা সম্ভব।

যারা সত্যিই মহৎ লেখক তাঁদের বইয়ে আমরা তাঁদের আত্মার স্পর্শ পাই—বড় লেখকরা যে তাঁদের নিজেদের জীবন-জিজ্ঞাসাকে ঘিরেই সৃষ্টি করেন তাঁদের সাহিত্য, তাঁদের দর্শন, তাঁদের কাব্য। এখন, এই বড় লেখকদের জিজ্ঞাসার খেইটা মনের মধ্যে ভাল করে ধরতে পারলে আমরা নিজেদের জীবন-জিজ্ঞাসার একটা হদিস পেতে পারি। আমরা এমন কথা বলছি না যে, বড় লেখকদের জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসার মিল থাকবে। এক জনের জীবন-জিজ্ঞাসার সঙ্গে আর এক জনের জীবন-জিজ্ঞাসার হুবহু মিল হওয়াই অস্বাভাবিক। কিন্তু একথা মনে রাখতে হবে যে, আমরা যখন কোনো বড় লেখকের বই পড়ি তখন তাঁর নিবিড় সান্নিধ্য পাই; পড়া যেন ঘনিষ্ঠ আলাপ-আলোচনা। এই আলাপ-আলোচনার মধ্যে কোন্ ফাঁকে যে আমাদের নিজেদের জীবনের মৌলিক প্রশ্নের সন্ধান আমরা মনের মধ্যে পেয়ে যাই তা আমরা বুঝতেও পারি না। কথাই আছে—'কথায় কথা টানে।'

বড় লেখকদের বই পড়া প্রায় সব ক্ষেত্রেই সার্থক পড়া, কারণ তা থেকে আমাদের প্রাণের মূলে রস সেচন হতে পারে। এই ধরণের বইয়ে ফাঁকি নাই, তাই সেগুলো পড়তে গিয়ে আমরা নিজেদের ফাঁকি দিতে পারি না। মহৎ বই আমাদের মনকে মুক্তির আস্বাদ দিতে পারে বলেই আনন্দদায়ক;—ঐ মুক্তির আনন্দ আমরা পাই বই পড়ে আমাদের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তর পাই বলে। এমন কথাও অবশ্য বলা যায় যে, যে বই পড়ে আমরা নির্মল আনন্দ পাই সে বই পড়া সার্থক।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ছে, বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক রোম্যাঁ রোলাঁ তাঁর জীবন-কাহিনীতে লিখেছেন—স্পিনোজার একখানা দর্শন পড়তে পড়তে তিনি স্পিনোজার নিবিড় সান্নিধ্য অনুভব করলেন, স্পিনোজার বাণী তিনি যেন স্পষ্ট শুনলেন, 'বিশ্বের সঙ্গে এক হয়ে যাও।' আর অমনি রোলাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের দুঃসহতম সঙ্কট কেটে গেল।

এই রকম পড়া হচ্ছে সার্থক পড়া! অন্য রকমের পড়া মাত্রই যে ব্যর্থ একথা অবশ্য বলা হচ্ছে না। তবে সেগুলোর মধ্যে তো খাদ আছে।

পোল

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

কোনো শাওন রাত্রে
কেউ বা হঠাৎ ব'লে ছিলো কানে কানে:
'বর্ষা যে গেল—'।
কেউ শুধু অবিশ্রান্ত বিদ্যুতে
জ্বালাতে চেয়েছিলো একটা মাত্রও প্রাণ কণা।
রুখে দাঁড়িয়ে ছিলো বা কেউ
গাঢ় অবরোধে,
সাপের মত ফুঁসে
আক্রোশে আর ক্ষোভে।

জ্ব'লেও উঠেছিলাম হয়ত'
তবু পুড়িনি।
পুড়েও ছিলাম বুঝি বা
জ্ব'লে যাইনি তবু।
সবুজ বৃষ্টি এসে
তার পর তাজা ক'রে তুলেছে কখন—
সে অনেক পর।

এই সংগেই মনে পড়ে এক গল্প।
একদিন ঘুম ভাঙলো ভারি কোলাহলে।
লোকজনে আর লোহা-লক্কড়ে
জম-জমাট জাহাজ ঘাট।
বুঝলাম:
একটা কুচকাওয়াজ—
নদীর সংগে লড়ায়ের একটা মহড়া।

দেখলাম আরেক দিন
এক পোল—
কালের রামধনু উঠেছে সেখেনে জাঁকিয়ে।
একটা আঁচড়ে
কেটে ফেলেছে আকাশ।

তবু হাসি পেলো:
ঢাকতে পারেনি ওরা দিগন্ত—
মারতে পারেনি ওরা জলস্রোত:
অফুরন্ত!
দুর্দাম!!

শিল্পী—বাণীনাথ ঘোষ
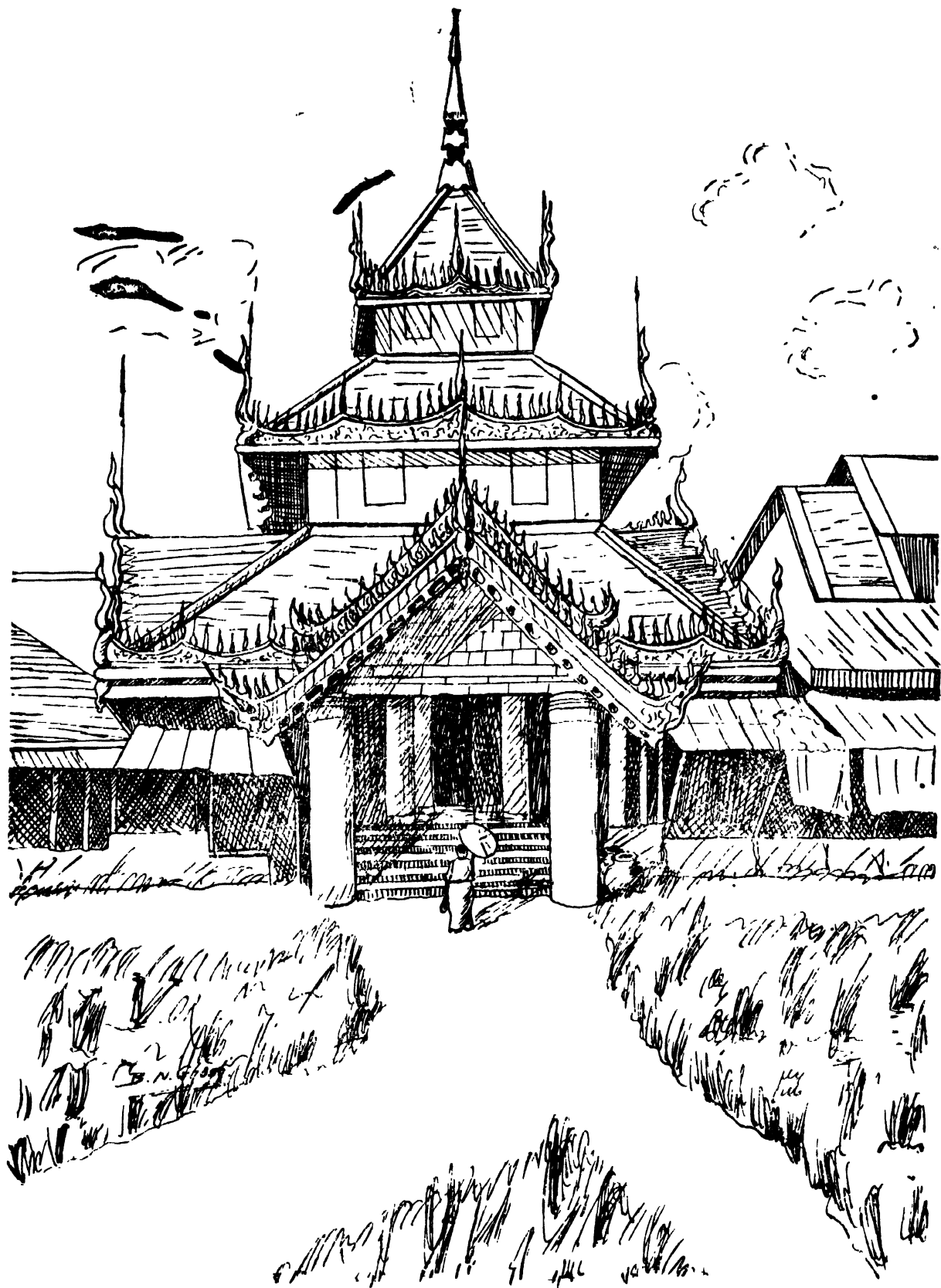
পণ্ডিত নসীরামের দরবার

গত সংখ্যায় 'নবীন লেখকদের প্রতি বার্ণার্ড শ'য়ের উপদেশ' পড়ে কেউ যদি ভেবে থাকেন নবীন লেখকের সঙ্গে রসিকতা করা শুধু বিদেশী সাহিত্যিকদেরই একচেটিয়া অধিকার, তবে তিনি ভুল করেছেন। সর্বকালের নবীন কবি, সাহিত্যিক, চিন্তাশীল এবং শিল্পীরা প্রবীণদের ঠাট্টার পাত্র এবং পরবর্তী কালে, তাঁদের সময়ে তাঁরাই তখনকার নবীনদের বিদ্রূপ করে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান তাঁরাও একদিন নবীন ছিলেন, এই রকম শ্লেষ ও মর্মান্তিক উপহাসে একদা তাঁদের নিজেদের কি অবস্থা হয়েছে। কিম্বা এই উপহাস, এই ঠাট্টা-বিদ্রূপই হয়ত শক্তিমান স্রষ্টিধরদের অগ্নিপরীক্ষা— প্রবীণ সিদ্ধকামদের সতর্কবাণী, হয়ত বা তাঁদের স্বভাবসুলভ আশীর্বনচও।

লেখক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে শরৎচন্দ্রের কষ্ট হয়নি, কিন্তু লেখক-জীবনের ভিত্তি গড়তে দেশে বিদেশে বহু নাজেহাল হতে হয়েছে।

শরৎ-জয়ন্তী তখন হয়ে গেছে। জনৈক নবীন লেখক—এখন অবশ্য তিনি নবীনও নন, লেখকও নন—নাম মনে করুন ধরণীনাথ রায়, শরৎচন্দ্রকে প্রত্যহ খাবার-দাবার নানা কিছু উপঢৌকন দেন এবং অবশেষে একদিন তার লেখা এক মহাকাব্যের পাণ্ডুলিপি বের করে তাঁকে পড়ে শোনাবার প্রস্তাব করলেন।

ধরণীনাথের চেহারা ভদ্রলোকের মতই কিন্তু চেহারা দেখে যে মানুষ চনা যায় না, অত-বড় ঔপন্যাসিক হয়েও শরৎচন্দ্র সেটা ভুলে গেলেন। নির্ভয়ে তিনি তার ভক্তিমান উপঢৌকন গ্রহণ করেছেন—কখনও তাঁর ধরণীনাথকে সাহিত্যিক বলে সন্দেহ হয়নি, কেন না, কবি-যশপ্রার্থী ভক্তদের তিনি সযত্নে পরিহার করতেন। অর্জুনের মতই ধরণীনাথের সাহিত্যিকরূপ দেখে তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। তার পর বহু কষ্টে বিহ্বল-ভাব কাটিয়ে উঠলেন, "সত্যিকার সাহিত্য কি হট্টগোলে কেউ পড়ে শোনালে—স্বয়ং লেখকও পড়ে শোনালে—তার রস পাওয়া যায়? ধরণী, তুমি ওটা রেখে যাও, আমি নির্জনে পড়ে রাখব।"

মহাকাব্য রেখে ধরণীনাথ চলে গেলেন। কলকাতার বাইরে তাঁর কর্মস্থলে—তাঁর ছুটি ফুরিয়ে এসেছিল। গিয়েই কিছু দিনের মধ্যেই আবার ছুটি নিয়ে তিনি ফিরে এলেন এবং শরৎচন্দ্রের কাছে হাজির হলেন যথারীতি খাদ্যাদি উপহার নিয়ে।

"আমার লেখাটা পড়েছেন? কেমন লাগল?"

"খাসা লিখেছ! কিন্তু ঐ মেয়েটি···কি যেন নাম···?" মনে করেও যেন শরৎচন্দ্র নামটা মুখে আনতে পারছেন না।

ব্যস্। শরৎচন্দ্রকে আর কিছু বলতে হল না।

"মালতীর কথা বলছেন?" ধরণীনাথ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন, "হ্যাঁ, ঐ চরিত্রটি আমিও একটু বদলাব ভেবেছি—আপনি যোগেনকে ঘর থেকে বের করে দেওয়ার কথা বলছেন ত'..."

শরৎচন্দ্র স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ভাবলেন এ যাত্রা বেঁচে গেলেন—ভবিষ্যতে ভক্তদের সম্বন্ধে এবার থেকে তাঁকে আরও সাবধান হতে হবে।

কিন্তু এ যাত্রার বিপদও তখনও তাঁর কাটেনি। খাসা লিখেছে বটে ধরণীনাথ কিন্তু সে কথা শুধু শরৎচন্দ্র জানলেই ত' চলবে না। কোন প্রকাশককে—এবং বিখ্যাত এক প্রকাশক যাঁরা শরৎচন্দ্রের বই প্রকাশ করেন—সম্ভব হলে তাঁদেরই কাছে শরৎচন্দ্রকে ধরণীনাথের লেখার সুখ্যাতি করতে হবে এবং মাস খানেকের ঐকান্তিক চেষ্টার পর ধরে-বেঁধে, নিরবচ্ছিন্ন বহু রকম অসুস্থতা এবং বাধা-বিপত্তির হাত এড়িয়ে মোটরে করে ধরণীনাথ একদিন শরৎচন্দ্রকে প্রকাশকদের দোকানে এনে উপস্থিত করলেন। প্রকাশকেরা বিনা নোটিশে শরৎচন্দ্রকে সশরীরে দেখে তটস্থ হয়ে পড়লেন।

প্রকাশকদের দোকানে পৌঁছে শরৎচন্দ্র গল্প-গুজবে এমন মত্ত হলেন যে বাধ্য হয়ে ধরণীনাথকে তার লেখার কথা তাঁকে আবার মনে করিয়ে দিতে হল।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, কি বলছিলাম—" শরৎচন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে অবহিত হয়ে ওঠেন, "আচ্ছা, এই ভদ্রলোকের লেখা তোমরা ছাপো না কেন? খাসা লেখে এ। আমি পড়েছি। এর লেখা একখানা বই ছাপো না!..."

ধরণীনাথ তখন পুলকিত-প্রাণ। দিব্যদৃষ্টিতে তিনি তাঁর মহাকাব্যের পঞ্চম সংস্করণের পাঁচ হাজার পাঁচশো কপির ক্রমক্ষয়িষ্ণু স্তূপ দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর যশোমাল্য গাঁথাও প্রায় শেষ। দেশের লোকের অভিনন্দনে তিনি ব্যতিব্যস্ত। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের প্রশ্নে তাঁর চমক ভাঙল।

"কি যেন নাম তোমার?"

"আজ্ঞে ধরণীনাথ—" ব্যাপারটা তখনও ধরণীনাথ বুঝে উঠতে পারেননি। শরৎচন্দ্রের প্রশ্নটা তাঁর কেমন খাপছাড়া লাগল। প্রকাশকদের মুখে এক অস্বাভাবিক অমায়িক হাসি দেখে ব্যাপারটা ধরণীনাথের ক্রমে বোধ-গম্য হল। কান লাল হয়ে ধরণীনাথের তখন প্রায় দ্বিধাগ্রস্ত অবস্থা।

* * * *

'পথের দাবী' প্রকাশিত হবার পর ভক্তদের মারফৎ শরৎচন্দ্রের কানে খবর গেল রবীন্দ্রনাথ 'পথের দাবী' সম্বন্ধে মোটেই উচ্ছ্বসিত নন।

শরৎচন্দ্র অনেকক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন। তার পর আস্তে আস্তে তাঁকে বলতে শোনা গেল:

"নাঃ, আমার কোনো দুঃখু নেই—সে জন্য কোনো দুঃখুই নেই আমার। রবীন্দ্রনাথের সাথে আমি ধরণী রায়ের আলাপ করিয়ে দিয়েছি···"

ম—২৫শে ডিসেম্বর, ১৮৬১　　　　মৃত্যু—১২ই নভেম্বর, ১৯৪৬

"দীর্ঘকাল যাবৎ মহাত্মা গান্ধী বলিয়া আসিতেছেন যে, এমন কি ব্যক্তিগত ভাবে আত্মরক্ষার জন্যও হিংসার আশ্রয় লওয়া সঙ্গত নহে। এই বিষয়ে তাঁহার সহিত আমার আগাগোড়াই মতবিরোধ রহিয়াছে। বহু যুগ পূর্বেই শ্রেষ্ঠ সংহিতাকার মনু ও বেদব্যাস এই বিধান দিয়া গিয়াছেন যে, হিংসার হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য মানুষ হিংসার আশ্রয় লইতে পারে। ভারতীয় দণ্ডবিধিতেও এই বিধান রহিয়াছে যে, আত্মরক্ষার জন্য আততায়ীর বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের ন্যায়সঙ্গত অধিকার মানুষের অবশ্যই আছে।"

—পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য

বীথি সরকার
(নিউ দিল্লী)

নিউ ইয়র্ক যাত্রাকালে
বিজয়লক্ষ্মী

সুর — ইউনিভার্সাল আর্ট গ্যালারী, কলিকাতা

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

শিকার

শিশিরকুমার চৌধুরী
(প্রথম পুরস্কার)
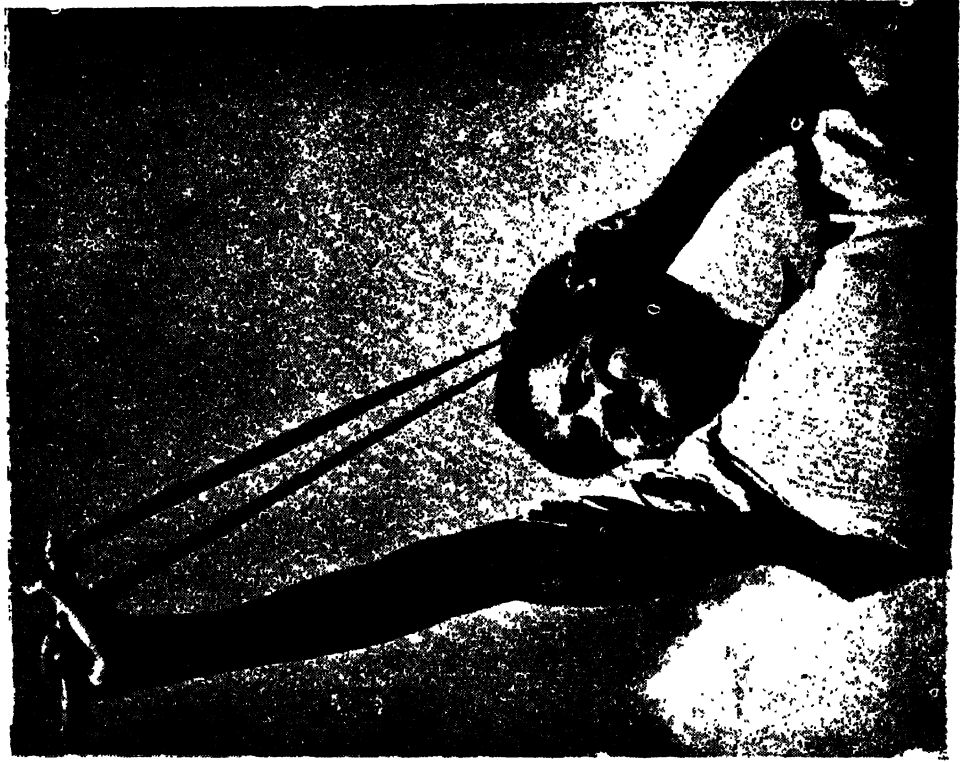
শিকারী

বীথি সরকার
(তৃতীয় পুরস্কার)
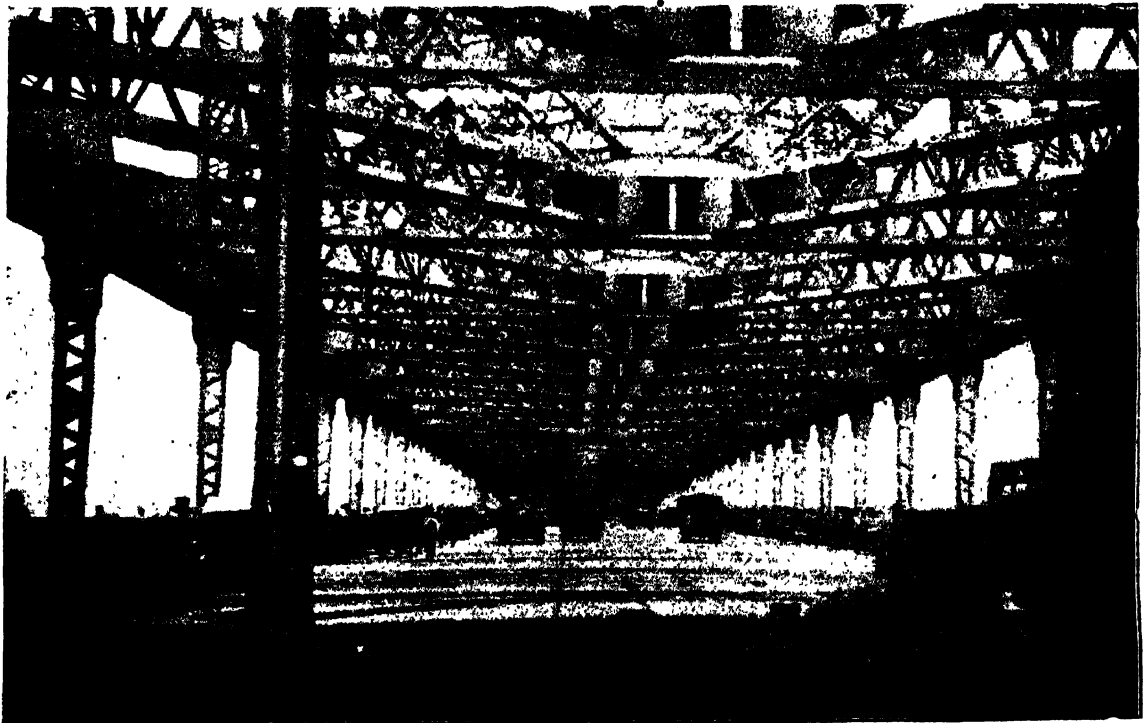
হাওড়া ব্রীজ
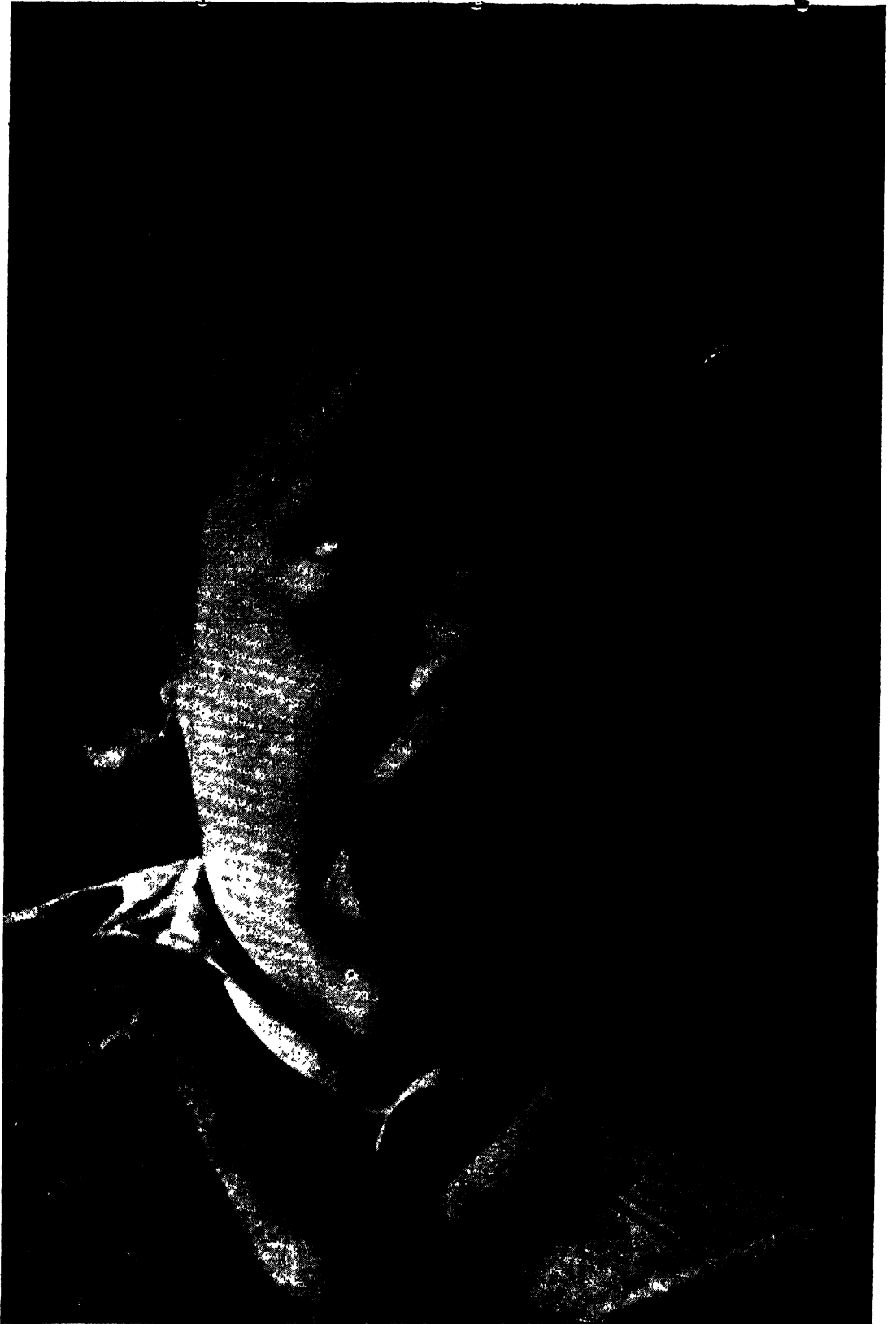
শশাঙ্কশেখর দাস

মা—আ—আ— শিল্পী—রামকিঙ্কর সিংহ

বাবা—আ—আ—

কামাখ্যা ভট্টাচার্য্য

ঘরামি

মৃদুলা গোস্বামী
(দ্বিতীয় পুরস্কার)

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৫
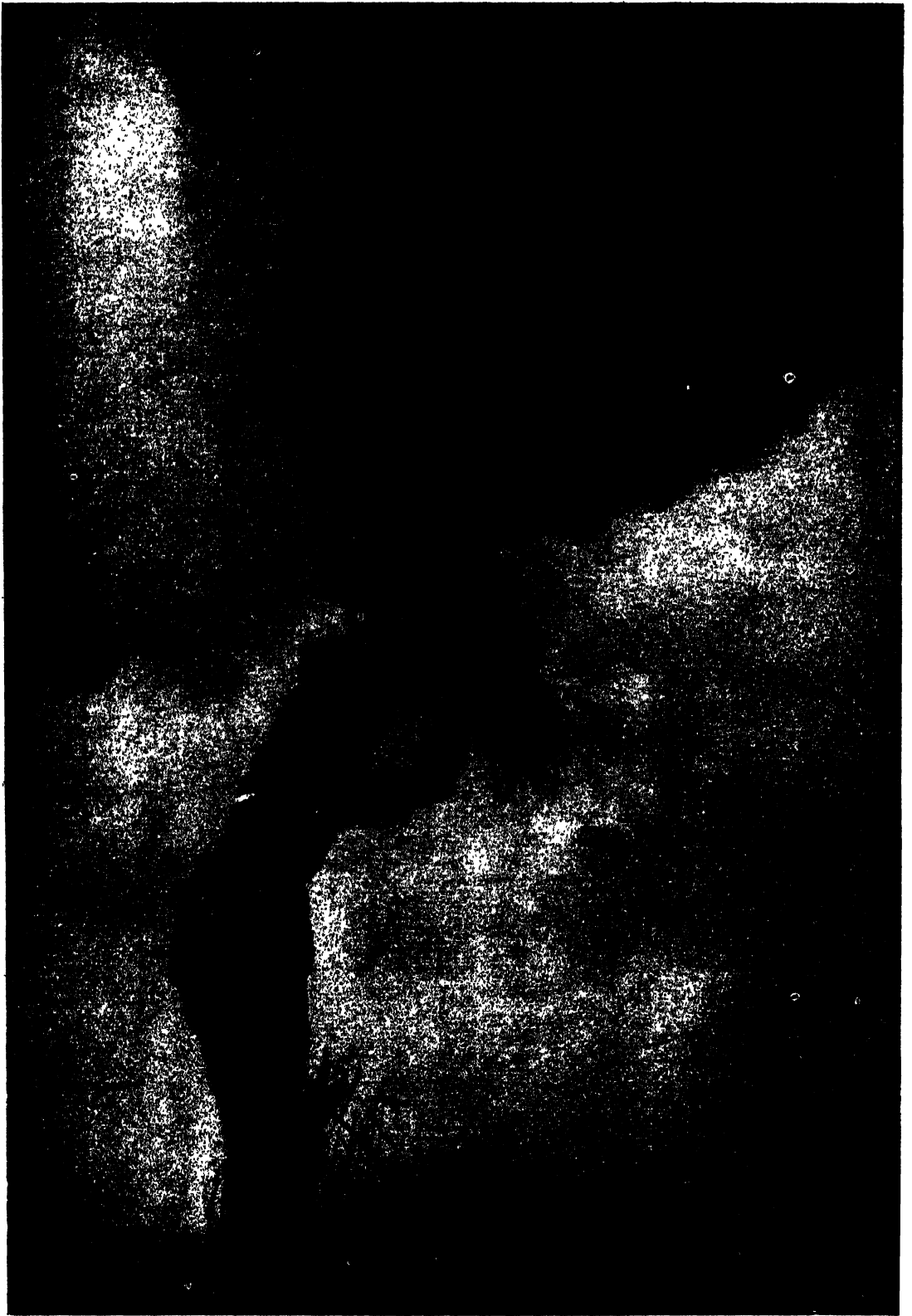
শ্রীধর আশের বৈঠকখানার পাশ দিয়ে পথ। পথ সরু বলে বৈঠকখানার গা ঘেঁষে যেতে হয়। শ্রীধরও বিত্তবান্। জাতিতে মোদক। পূর্ব্বপুরুষের সঞ্চিত অর্থ কলকাতায় খাটাচ্ছেন নানান্ ব্যবসায়ে ; চাল, চিনি, মশলা, নুণ-তেল—ওসবের বড় আড়তদার তিনি! তাঁর আড়তে বহু লোক কাজ করে। অধিকাংশ লোকই দেশের—তাঁর আত্মীয়-গোষ্ঠী থেকে বাছাই করা। আত্মীয়-গোষ্ঠীভুক্ত লোকমাত্রই যে বিশ্বাসী—এ ধারণা বহুবার ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবু শ্রীধর বলেন, তা হোক—দু'-এক হাজার টাকার তবিল ভাঙ্গলে আমি কিছু দেউলে হ'য়ে যাব না। আত্মীয়ের জন্ম কত লোকে যে কত ব্যয় করছে—তার কি!

আসল কথা তা নয়। বাইরের লোক তহবিল ভাঙ্গলে হাজার টাকার একটি টাকাও আদায় হওয়া কঠিন। মামলা করে জেল খাটিয়ে তাকে জব্দ করতেও আরো অনেকগুলি টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু আত্মীয় যদি এ কাজ করে, সঙ্গে সঙ্গে টাকাটার সুরাহা তো হয়ই—অনর্থক আদালতের হাঙ্গামাও পোহাতে হয় না। এ ক্ষেত্রে ঔদার্য্যের সঙ্গে ধৈর্য্য ও ধর্ম্মভীতি অনেক কাজ দেয়। যে তহবিল ভাঙ্গে—তাকে ধরতে না পারলেও তার নিকট-আত্মীয়েরা রাজভয়ে বা ধর্ম্মভয়ে অধিকাংশ স্থলেই ক্ষতিটা পূরণ করে দেয়। ব্যবসায়ীর পক্ষে টাকা আনা পাইয়ের হিসেবই হলো সব—দুষ্কৃত দমনের আনন্দটা লোক-দেখানো ছাড়া আর কি! লোকে বলে, শ্রীধর কৃপণ বলেই আর সব কিছুর চেয়ে টাকাটাকেই চেনে ভাল। শ্রীধর বলেন, না চিনলে ব্যবসা করা আমার বিড়ম্বনা! ন্যায্য খরচে আমি পিছপাও নই।

সম্প্রতি তা দেখা যাচ্ছে। বয়স বাড়ছে বলে শ্রীধরের হাতের মুঠো আলগা হচ্ছে এ কথাও বলে কেউ কেউ। কিন্তু স্বর্গের আসনে কায়েম হয়ে বসবার বাসনা শ্রীধরের মনে যত না হোক মর্ত্ত্যের উপরে খানিকটা চিহ্ন রেখে যাবার সঙ্কল্প উনি করেছেন। ছেলেরা লেখাপড়া শিখে অন্ত ধরণের হচ্ছে বলেই ওঁর ভাবনা। ইমারৎটা পাকা করবার উদ্যোগে তাই উঠে-পড়ে লেগেছেন।

দাতব্য চিকিৎসালয় ও বিনায়ক-মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উনি লাইব্রেরি খুলছেন না। গ্রামের লোকের কৃতজ্ঞতা ভাল জিনিস, তার চেয়ে উঁচু জিনিস সরকারী কৃপাকণা। ওঁর পারিষদেরা বলেছে, কোন গতিকে একটা সরকারী খেতাব নামের আগে জুড়তে পারলে পুরুষানুক্রমে ব্যবসার আর মার নেই। তাই রাজভক্তির নমুনা উনি যথাসাধ্য দিতে কসুর করছেন না।

দুঃস্থ স্বজাতীয়দের জন্ম একটা সমিতি বহু দিন থেকে আছে। কিন্তু পরের দুঃখকে বড় করে দেখার হৃদয়,—তা যত বড় লোকই হোন না, কারও ছিল না। তাই সমিতিটা নামে থাকলেও কাজে কিছু হতো না। সম্প্রতি যুদ্ধের মরশুমে অনেকেরই আঙুল ফুলে কলাগাছ হয়েছে। টাকার সঙ্গে স্বজাতি বা স্বদেশ-হিতৈষণা যে বৃদ্ধি পায়…এ ধারণা ভুল হ'লেও আত্মপ্রচারে অত্যন্ত কৃপণেরও মাঝে মাঝে ব্যগ্রতা দেখা যায়। সেই ব্যগ্রতার ফলে সমিতিটা উঠেছে গা-ঝাড়া দিয়ে। শ্রীধর হ'য়েছেন তার কর্ণধার অর্থাৎ সম্পাদক।

কিছু দিন আগেও শশীকান্ত ছিলেন ধনিকদের অগ্রগামী। সেই সময়ে দাতব্য চিকিৎসালয়ের উৎপত্তি। কিন্তু কোটচাঁদপুরের চিনির কারখানা—চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই জাভার প্রতিযোগিতায় হটতে সুরু করে—এখন নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে। যুদ্ধের আঘাতে জাভাও আজ ধরাশায়ী, কিন্তু দেশী চিনির কারখানা আর মাথা তুলতে পারেনি। এখন যুক্তপ্রদেশ এ ব্যবসায়ে হয়েছে অগ্রণী। বাংলার বুকে প্রবাসী মাড়োয়ারীরা খুলেছে চিনির কল—সেভাবগঞ্জ, বেলডাঙ্গা, গোপালপুর মিলে কোটচাঁদপুরকে কালের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছে।…তবু কিছু দিন আর পাঁচটা জিনিস নিয়ে বেলগাছিয়ায় আড়ত খুলে শশীকান্ত দাঁড়াবার চেষ্টা করেছেন। আর যে কিছু হয়নি তা নয়, কিন্তু রেশন চালু হওয়ার ফলে নুণ, চিনি, চাল হাতছাড়া হয়ে যা থাকলো, তাতে অত বড় আড়ত রাখা পোষালো না। ডাল আর মশলাপাতি নিয়ে সঙ্কীর্ণ ঘরে জন চারেক লোক নিয়ে সঙ্কীর্ণতর হলো ব্যবসা। কাজেই সমাজের পুরোভাগ থেকে ধীরে ধীরে সরে এলেন তিনি। ডিফেন্স বণ্ড কিনলেন মাত্র পাঁচশো টাকার এবং বন্দুক রাখার সেলামীস্বরূপ ডিফেন্স ফাণ্ডে একশো টাকা চাঁদা পড়বে জেনে নতুন করে লাইসেন্স নিলেন না বন্দুকের।

শশীকান্তর জায়গায় শ্রীধর এলেন এগিয়ে। ডিফেন্স বণ্ড কিনলেন হাজার দশেক টাকার—বন্দুক নিলেন দু'শো টাকা চাঁদা দিয়ে। এস-ডি ও তাঁর পিঠ চাপড়ে খাতির করলেন এবং আশ্বাস দিলেন আসছে নতুন বছরে কিংবা রাজার জন্মদিনে তাঁর নাম অনারস্-লিষ্টে উঠবেই। এ তো গেল রাজভক্তির উপচার, জনহিতকর কাজও কিছু দেখাতে পারলে খেতাব প্রাপ্তির পথট সুগম হবে জেনে তিনি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছেন। আরও একটা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানকে তিনি কর্ণধার হয়েই সাহায্য করেছেন। দেশের উচ্চ ইংরেজি ইস্কুলটির অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হয়ে আসছিল—হয়তো আর কিছু দিন পরে বন্ধই হ'য়ে যেত। ভাগ্যে যুদ্ধ বেধেছিল আর শ্রীধর ধনধান্যে-পুষ্পে ভরা বসুন্ধরার মতই ফেঁপে উঠেছিলেন।

শ্রীধরের বৈঠকখানা ঘর সরগরম।…ওখানেও টাটকা ফুলের মালা এসেছে কলকাতা থেকে—অভিনন্দন-পত্র ছাপা হয়েছে ভাল আর্ট পেপারে—রূপালী হরপে। রূপার একটা তালা-চাবি সমেত রয়েছে মীনার কাজ-করা সুদৃশ্য মোরাদাবাদী ট্রেতে। দ্বারোদ্ঘাটনের উৎসবে এ সবই উদ্ঘাটনকারীর সম্মানস্বরূপ তাঁকে প্রদত্ত হবে। সমুদ্রের ঢেউ তার বুকের জিনিস হ'লেও কূলে ফিরে আসে অধিকতর শ্রীমান হয়ে, একথাও বলছেন শ্রীধরের বিরুদ্ধবাদীরা।

পুরন্দরকে দেখতে পেয়ে এক জন ডাকলে, ওহে, শোন শোন। এ দিকে এসো তো একবার।

ঘরে এসে পুরন্দর দেখলে আরও বহুতর আয়োজনে ঘর থই-থই করছে। কলকাতা থেকে সন্দেশ এসেছে ভীম নাগের, রসগোল্লা এসেছে নবীনের, কেক এসেছে কোন বিখ্যাত বিলাতী হোটেল থেকে আরও নানান ফল-ফুলারির মিশ্র গন্ধে রসনা উত্তেজিত হয়ে ওঠে।

শ্রীধর বললেন, শুনলাম, তুমি কবিতা লিখতে পার। শুনেছ বোধ হয় আজ জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেট আসছেন আমাদের লাইব্রেরির ফাংশনে। একটা ভাল মত কবিতা লিখে দাও দেখি।

শ্রীধরের শ্যালক ফটিক বললে, সে কবিতাতে সায়েবের গুণগান তো থাকবেই, দাদাবাবুর যে যে ভাল ভাল কাজ আছে তারও কথা দিও।

অনুকূল বললে, আর আমাদের গ্রামের সুখ্যাতিও—

পুরন্দর বললে, কলেজে পড়বার সময় দু'-একটা বিয়ের কবিতা লিখতাম বটে, তা সে সব কলেজ ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়েছে।

ফটিক হ্যা হ্যা করে হেসে উঠলো, আরে যে একবার সাঁতার শেখে সে কখন জীবনে জলে ডোবে? না একবার আখর চিনলে তা ভুলে যায়?

পুরন্দর মাথা নেড়ে বললে,, ভোলে বৈ কি।

অনুকূল উষ্ণ হয়ে উঠলো। বললে, পারবে না তাই বল—অত ধানাই পানাই কেন!

পুরন্দর বললে, বেশ তাই।

ফটিক বললে, কি—দেবে না?

পুরন্দর হেসে বললে, ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েব তো কবিতা শুনতে আসচেন না, আর শুনলেও তা বুঝতে পারবেন না।

মানে! শ্রীধর বললেন, জান না বুঝি, উনি চমৎকার বাংলা জানেন।

জানি। বাংলা ভাষার পরীক্ষায় পাশ না হ'লে আর বাংলার জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট হয়েছেন! তবে আমি বলছি কি, কবিতা ওঁকে শোনানো মিথ্যে। উনি কানে শুনবেন এক—আর চোখে দেখবেন আর···তাও তো ভাল নয়।

মানে?

মানে—আমাদের দেশটা যা, মানুষগুলো যা, তা কবিতায় বলা চলবে না। আমাদের অভাবের কথাও নয়।

অভাবের কথা বলবার জন্তে তো ওঁকে ডেকে আনা হচ্ছে না। শ্রীধর গম্ভীর স্বরে বললেন।

হ'চ্ছে বৈ কি। বলেই দ্রুতপদে পুরন্দর বাইরে চলে এলো। হাতে তার অনেক কাজ—কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই।

দক্ষিণপাড়া যেতে হ'ল মাঝের পাড়াটা বাদ দেবার উপায় নেই। যে পথে মিত্রদের বিনায়ক-মন্দির আর দাতব্য চিকিৎসালয় সে পথ ছাড়াও আর একটা কাঁচা রাস্তা আছে। সেটা মুসলমান-পাড়ার ভিতর দিয়ে। তবে মিত্রদের বাড়ীটাকে পাশ কাটাবার জো নেই।

বাইরের বারান্দায় বেঞ্চিতে বসেছিলেন মিত্রদের মেজ বাবু। বেঞ্চির ওপর একটা গড়গড়া বসানো রয়েছে, হাতে রয়েছে তার নলটা। মাঝে মাঝে শব্দ হ'চ্ছে ভুড়ুক্ করে কিন্তু ধোঁয়া উঠছে না তেমন। তিনি ভাবনায় ডুবে আছেন। তা বলে অন্যমনস্ক নয়। পুরন্দরকে দেখতে পেয়েই ডাকলেন, কে কালো না? শোন তো বাবা

বনিয়াদি বংশ—চালে-চলনে সর্ব্বদাই শিষ্টতা ঝরে পড়ছে। স্নেহভাজনদের তুই বলে ডাকলেও সে ডাক কত মিষ্ট শোনায়। পুরুষানুক্রমিক মর্য্যাদায়—অবস্থা খারাপ হওয়া সত্ত্বেও—সব সময়েই অটল হ'য়ে আছেন।

পুরন্দর বারান্দায় আসতেই তিনি নলটা মুখ থেকে নামিয়ে বেঞ্চির ওপর থেকে একটা রুপালি বর্ডার দেওয়া চিঠি তুলে নিলেন। মৃদু হেসে বললেন, শ্রীধর পাঠিয়েছেন। রাজার প্রতিভূকে নিয়ে আসচেন তারই নিমন্ত্রণ।

এ কথা তাকে শোনাবার আবশ্যক কি, পুরন্দর বুঝতে পারলে না। তাকে অবাক হ'য়ে চাইতে দেখে তিনি বললেন, শ্রীধর হয়তো জানেন না, আমার প্রপিতামহ—আমার পিতা ঠাকুর—এমন কি বড় দাদা পর্য্যন্ত রাজ-অনুগ্রহকে এড়িয়ে চলেছেন চিরদিন। আমাদের ঘরে গড সেভ দি কিং-এর ছবি একখানা নেই। বলে একটু উচ্চ শব্দ করে তিনি হাসলেন।

তাহলে যাবেন না?

গিয়ে লাভ তো নেই। ও সব ভালও লাগে না আমার। যাঁকে কোন কালে জানি না, তাঁর গুণগান করবো বুদ্ধিহীনের মত, কেন বল তো? রাজ-সেবার টিকিট কিনে দেশসেবায় ভড়ং করব না—বাবা।

পুরন্দরের মনে শ্রদ্ধায় উদয় হ'লো এ কথা শুনে। বললে, আমাদের একটা মিটিং আছে আজ বেলা দশটায়। সভাপতি হবেন আপনি?

মেজ বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, বেশ বলেছ বাবা, চিরদিন সভাকে এড়িয়ে চললে যে, সে হবে সভাপতি?

না না—আপনাকে পেলে আমাদের উৎসাহ বাড়বে। আসুন না। আগ্রহে সে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠলো।

হাসি থামিয়ে নল টেনে নিলেন মেজ বাবু। সজোরে টান দিলেন। আগুন অনেকক্ষণ নিবে গিয়েছিল—কলকে থেকে ছাই উড়ে পড়লো শুধু। নলটা নামিয়ে রেখে তিনি বললেন, ওঁদের সভায় যে জন্য যাব না—তোমাদের সভাতেও না যাবার কারণ তাই। আমি রাজভক্তিও বুঝি না—স্বদেশীও না।

কিন্তু এ তো এমন শক্ত জিনিস কিছু নয়—

তোমাদের কাছে শক্ত নয় বাবা, আমার কাছে অর্থহীন। দেখলাম তো কতই। স্বদেশী বলে যে কাপড় পরেছিল তোমার কাকা তা ছুঁতেও সাহস হয়নি আমার। বিলিতী কাপড় পোড়ানোর ঘটা—বিলাতী চিনি বর্জ্জন—সায়েব মারা—জেল—দ্বীপান্তর—কত আসছে যাচ্ছে। এ গ্রামের তাতে একটুও ক্ষতি বা লাভ হয়নি।

এ গ্রামের কথা বাদ দিন।

তা কি করে দিই বাবা। এ গ্রাম য আমার জন্মভূমি কর্ম্মভূমি—এক কথায় আমার জীবন। যাক, তারা—তারা! হঠাৎ তিনি হুঙ্কার দিয়ে প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তন করলেন।

আজ শ্রীধর অর্থবান হ'য়েছেন—কীর্ত্তিমান্ হবার চেষ্টা করছেন। করুন। আমারও এক সময়ে কীর্ত্তিমান হবার সাধ হ'য়েছিল। ফলে ঐ বিনায়ক-মন্দির। কিন্তু মানুষের কীর্ত্তি দেবতাও বাঁচাতে পারেন না—মানুষও পারে না। কথা শেষে মনে হ'লো তিনি দীর্ঘ-নিশ্বাস চাপলেন।

পুরন্দর বললে, তবু মানুষ কীর্ত্তির জন্য পাগল—

মেজ বাবু বললেন, তুমি জান না বাবা, মুছে যায়—ভুলে যায় বলেই মনে রাখার চেষ্টা।···ও চেষ্টা জন্মগত। বকরূপী ধর্ম্ম যে চারটি প্রশ্ন করেছিলেন যুধিষ্ঠিরকে—তার মধ্যে ওটি ছিল প্রধান।

পুরন্দর কথা কইলে না। সে ভাবছিল, যে মানুষ নিজের ত্রুটি বুঝতে পারে, সে মানুষ কেন ভুল পথেই চলে! উনি বলছেন—রাজতোষণে ওঁর স্পৃহা নেই—অথচ দেশ-ভক্তিতেও গদগদ্ হয়ে উঠলেন না। তবে কি নিজেকে এবং বংশের মর্যাদাকে উনি সব চেয়ে বড় মনে করেন? প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন?

মেজ বাবু বললেন, যাও বাবা। তোমাকে ডাকলাম এই জন্য যে, ওদের বলে দিও—ও-সব কাজে যাবার উৎসাহ আমার নেই।

একটি মেয়ে এসে দাঁড়ালো দরজায়। ষোল-সতেরো বয়স হবে মেয়েটির। গোল-গাল চেহারা—বয়সের চেয়ে অনেকখানি বড় দেখায়। মেয়েটি মেজ বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

পুরন্দরকে উদ্দেশ করে মেজ বাবুকে সে বললে, জান মেজকা, এই মাস্তর পুরুত ঠাকুর এসে বললেন—আজ যে ফুল দেওয়া হ'য়েছে তাতে ঠাকুরপূজো হবে না।

সে কি রে? ফুল তো দেয়—, বলে তিনি পুরন্দরের পানে চাইলেন।

পুরন্দর বললে, আজ 'আমিই ফুল দিয়েছি। কিন্তু গোলটা হ'লো কিসে?

মেয়েটি বললে, মোড়কে সবই জবাফুল—সাদা ফুল একটিও নেই।

পুরন্দর বুঝলে—অনেকগুলি মোড়ক ছিল ডালাতে। তাড়াতাড়িতে গণেশের মোড়কের বদলে সিদ্ধেশ্বরী'র মোড়কটা সে তুলে নিয়েছে।

বললে, আচ্ছা, আমি ফুল নিয়ে আসছি।

না—আপনাকে আর আনতে হবে না—আমি বাড়ির ভেতর থেকে কুঁদ ফুল তুলে এই মাস্তর পাঠিয়ে দিলাম। কাল থেকে ফুল দেবেন ভাল করে দেখে।

আশ্চর্য! অতটুকু মেয়েও কেমন আদেশের সুরে কথা বললে!

পথে এসে পুরন্দর ভাবলে, মানুষের মত দেবতারও জাত-বিচার আছে না কি? এক ফুলে আর দেবতার পূজা হয় না কেন? এ বিধান কার? দেবতাদের মধ্যে যখন এত ভেদ তখন মানুষ জাত নিয়ে—ধর্ম নিয়ে মারা-মারি কাটাকাটি করবে ত আর বিচিত্র কি?

পরে এ কথা সে লিখেছিল ইন্দ্রজিৎ বসুকে।

তিনি উত্তর দিয়েছিলেন: দেবতা মানুষকে সৃষ্টি করেননি, মানুষই সৃষ্টি করেছে দেবতাকে।

৬

মুসলমানপাড়ার মধ্য দিয়ে পথ। বড় ঘরের মুসলমান নয় এরা—দরিদ্র জন-মজুর সব। কেউ করে রাজমিস্ত্রির কাজ, কেউ ঘরামির। করাতীও আছে কয়েকঘর। কুঁড়ে ঘরগুলি খড়ের ছাওয়া, দেওয়াল মাটির। বাড়িতে পাঁচীল নেই—বাঁশচিতা ও বচার বেড়া। পাট-কাঠি দিয়েও কেউ কেউ বাড়ির আব্রু রাখবার চেষ্টা করেছে। সরু পথে হাঁটু-ভোর ধুলো, দলে দলে মুরগী চরছে সেই ধুলোর ওপরে। ছাগল বেড়ার পাশে লতা পাতা খাবার জন্য যতটা সম্ভব উঁচু হয়ে দাঁড়িয়েছে, গোটা দুই কুকুর বালির উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে আছে। রোদে পিঠ দিয়ে বসে গল্প করছে মিস্ত্রী-যোগাড়ের দল। ওদের পান্তা ভাত খাওয়া শেষ হয়েছে। হাতে কর্ণিক পাটা ওলন-দড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কেউ কেউ—করাতে শাণ দিচ্ছে কোন করাতী। সবাই এক হয়নি বলে ওরা অপেক্ষা করছে।

পুরন্দরকে দেখে এক জন বুড়ো মত মিস্ত্রি বললে, কি বাবু, কোথায় যাচ্ছেন?

দক্ষিণপাড়ায়। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুরন্দর ফিরে এসে বললে, আচ্ছা পাঁচু, তোমরা সভায় যাও না কেন?

পাঁচু বললে, আমরা মুরুখ্যু মানুষ, কি-ই বা বুঝি বাবু।

কেন, পরণে তোমাদের কাপড় নেই, পেটে নেই ভাত, এ-ও তো বুঝতে পার।

পাঁচু বললে, আমরা বুঝলে বাবুরা বোঝে কই। ছ' আনা থেকে বারো আনা রোজ হয়েছে বলে তেনারা ঠাট্টা করে—কি রে, তোদেরও যুদ্ধ বাধলো না কি।

পুরন্দর বললে, বলতে পার না—চালের দর কত?

সে দর বাবু ওনাদের বেলা। বলে—এত দর দিয়ে চাল কিনে এত রোজ দিয়ে কি মিস্ত্রী খাটাতে পারি?

তা বটে! আর এক জন মিস্ত্রি হাসলে। আমাদের দানাপানি আসমান থেকে আসে—ওনাদের কিনতে হয় কি না!

পুরন্দর বললে, তোমাদের কাজ শেষ হলে এক দিনে যেও সন্ধ্যে বেলা আমাদের বাড়িতে—অনেক কথা আছে।

পাঁচু উৎফুল্ল হ'য়ে বললে, ঘর হবে না দালান হবে বাবু?

পুরন্দর হেসে হাত নেড়ে বললে, বলবো।

কাঁচা রাস্তা শেষ হ'লো—পাকা রাস্তায় এসে পড়লো পুরন্দর। এ রাস্তার খানিকটা মুসলমানপাড়া—তার পর দক্ষিণপাড়ার সীমানা আরম্ভ হ'য়েছে। এ পাড়ায় মুসলমানেরা জন-মজুর নয়। পাকা ঘর-বাড়ি—ইটের দেওয়াল, সিমেন্টের মেঝে, কাজ-করা মোটা মোটা থাম বারান্দার—বাহারী কার্নিস। কোন বাড়িটা এক তলা, কোনটা বা দু'-তিন তলা। সুপ্রাচীন ঝুরি নামানো বটতলায় পাথর বাঁধানো দরগা। তার চবুতরায় সকাল দুপুর সন্ধ্যায় ফর্সি গড়গড়া হুঁকো বা বিড়ি সিগারেট নিয়ে মজলিস বসায় পাড়ায় যুবক ও বুড়োরা। এঁদের অধিকাংশেরই শালের দোকান আছে কলকাতায়। হাওড়ার হাটে তাঁতে-বোনা কাপড়ও বিক্রী করেন মঙ্গল বারের হাটে। দু'টি কাজেই মোটা লাভ। এ ছাড়া শাল আলোয়ান রিফু করা—অন্য জায়গা থেকে খেলো তাঁতের কাপড় আনিয়ে তার ওপর ফুল তুলিয়ে কাচিয়ে যোগান দেন কলকাতার দোকানে। কাপড়ে ফুল তোলার কাজে এ গাঁয়ের মেয়েরা মাসে মাসে কিছু উপার্জন করে। আগে সূচের কাজের কারিগরি ছিল—মজুরিও ছিল বেশি। ফুল তুলতে সুতো ওরা দিত, তা থেকে কিছু বাঁচলে হ'তো উপরি লাভ। সেই জমানো লাল নীল সবুজ বেগুনে সুতো দিয়ে মায়েরা তৈরী করতো কাঁথা। আজকাল সুতো বাঁচে না মজুরিও কমে গেছে। ঘন ফুল বা সূক্ষ্ম কাজের কদর নেই। তবু অবসর মুহূর্তে পাঁচ জন মেয়ে কোন বাড়ির রোয়াকে জড়ো হয়ে দেওয়ালে পিঁড়ি ঠেস দিয়ে বসে গল্প করতে করতে ঘণ্টা দুই ধরে প্রত্যহ এই কাজ করে। মাসে দু'-তিন টাকা করে উপায় হয়—তাই বা দেয় কে? এই সব মুসলমান শালের দোকানদারেরা কলকাতার বড় দোকান থেকে নিয়ে আসে ছক-কাটা এই সব খেলো কাপড়। তাদের কাছ থেকে বাড়ির বর্ষীয়সী মেয়েরা সেই কাপড় নিয়ে সারা গাঁয়ে

হিন্দু-মুসলমানের বাড়ি বিলি করে আসে। যেগুলোয় ফুল তোলা হয়েছে সেগুলো নিয়ে আসে আদায় করে। যেগুলো হয়নি সেগুলোর জন্য তাগাদা দেয় আর নতুনগুলো শীঘ্র শেষ করবার অনুরোধ জানায়। ফুল তোলা হ'লে কাপড় কাচাবার জন্য যায় ধোপা-বাড়ি। সেখান থেকে এলে বস্তাবন্দী হয়ে চালান হয় কলকাতায়। এর দৌলতে অনেকগুলি লোক প্রতিপালিত হয়।

এই সব কারণে এ পাড়ার মুসলমানরা বর্দ্ধিষ্ণু। এ পাড়ার বাড়ি-ঘরে-দরজায়-মসজেদে সম্পদের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়।

দরগায় বসে এক জন চেঁচিয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল, বাকি সকলে শুনছিল আর মন্তব্য করছিল।

পুরন্দরকে দেখে এক জন বললে, কি ভাইজান, এত সকালে চলেছ কোথায় ?

হাত উঠিয়ে পুরন্দর বললো, ঐ পাড়ায়।

তা দেশের হাল-চাল কি ?

তোমাদের কলকাতার হাল-চাল বল আগে। পুরন্দর হেসে বলে।

ছেলেটি পুরন্দরের বয়সী। ইস্কুলে একসঙ্গে পড়েছে তিন-চার ক্লাস অবধি। মেধাবী নয়—সাধারণ ছেলে; লেগে থাকলে হয়তো পাশ করতে পারতো ম্যাট্রিকটা। কিন্তু ওর চাচা হঠাৎ মারা যাওয়ায় কলকাতার শালের দোকান দেখা-শোনার অজুহাতে ইস্কুল ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন ওর বাবা। সে জন্য সিরাজ খুব দুঃখিত হয়নি। পড়াটা যে চাকরির প্রস্তুতি সেই ধারণা অধিকাংশ ছেলের মত ওরও ছিল। আর ওদের তো চাকরির কোন দরকারই নেই। তবে কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে হলে ব্যবসাকে চালু রাখতে কিছু ইংরেজি শেখা দরকার। বিদ্যে না থাক্ [illegible] কিছু আয়ত্ত হ'লে—যাঁরা শাল আলোয়ান গরম স্যুট কাচাতে দেন দোকানে তাঁরা খুসী হন—বিশ্বাসও করেন। সিরাজ দরগার চবুতরা থেকে নেমে এসে দাঁড়াল পুরন্দরের পাশে। তার কাঁধে ডান হাত চাপিয়ে একটু দোলা দিয়ে বললে, চল, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে খানিকটা যাই।

খানিক দূর এসে বললো, তোমরা না কি আজ শোভাযাত্রা বার করছো ?

শোভাযাত্রা ? না—তেমন কিছু নয়।···সামান্য একটু বাজনা বাজিয়ে—

সিরাজ বললে, বল কি ? এই পথ দিয়ে যাবে না কি ?

পুরন্দর হেসে বললে, তা ছাড়া আর পথ কোথায় ?

না, না। স্বর নামিয়ে সিরাজ বললে, আর যাই কর, ওই মসজেদের সামনে বাজনাটা বাজিও না।

পুরন্দর সবিস্ময়ে সিরাজের পানে চেয়ে বললে, তোমারও এই মত না কি ?

সিরাজ বললে, আমরা ছেলেমানুষ, আমাদের আবার মত কি। বাপ-চাচারা যা বলবেন তাই। তা তাঁরাও যে আপত্তি করচেন তা নয়। এত কাল বিয়ে—ঠাকুর বিসর্জ্জনে এই পথে কত বাজনা বাজিয়ে গেছে সবাই—আপত্তি করেছে কেউ ?

তবে ?

তবে দিন-কাল খারাপ—তাই বললাম। তোমরা যদি বাজাও বাজনা—হবে না কিছু। তবু কাজ কি মন-কষাকষিতে।

পুরন্দর বললে, না ভাই—বাজনা বাজবে না। এ পথে নয়—কোন পথেই নয়।

সিরাজ তার হাতখানা টেনে নিয়ে বললে, সত্যি ? মনে কিছু করলে না তো ?

তারা ততক্ষণে মসজেদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিত্ত-শালীদের পাড়ার মসজেদ—নক্সায়-ফুলে কারুকার্য্যে যতটা সমৃদ্ধ করা সম্ভব তা হ'য়েছে। সুপ্রশস্ত চত্বর—আট পল কাটা থামের মাথায় সুদৃশ্য খিলানে চওড়া দালান। ছাদ থেকে ঝুলছে রং-বেরঙের বেলোয়ারি ঝাড়। জুম্মা বারে ও পর্ব্বদিনের সন্ধ্যা বেলায় ঐ সব ঝাড়ে তখন মোমবাতি জ্বেলে দেওয়া হয়···

মসজেদের পানে তাকিয়ে সে সিরাজের হাতটা টেনে নিয়ে তাতে অন্তরঙ্গতার চাপ দিলে। দু'জনে দু'জনের পানে চেয়ে হাসলো।

দক্ষিণপাড়াটাকে তাঁতীপাড়া বললে অত্যুক্তি হয় না। তার পরের সংখ্যাগরিষ্ঠ বসিন্দা হচ্ছে ময়রারা। ধোপা ও কলুরা আসে তার পর। অন্যান্য জাতের মধ্যে ব্রাহ্মণ, শৌণ্ডিক, গোয়ালা, নাপিত প্রভৃতিও আছে। তবে এদের মধ্যে জাতের ব্যবধান থাকলেও বৃত্তির ব্যবধান খুব অল্পই। পাড়া দিয়ে চলতে চলতে দু'ধারে ঠকাঠক শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। জ্যাকার্ড তাঁতের উচ্চ শব্দ পাড়াটাকে মুখরিত করে রেখেছে। প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে তাঁত বসেছে—প্রত্যেক গলিতে তাঁতের জন্য সুতোর টানা দেওয়া হচ্ছে, দক্তিতে জড়ানো হচ্ছে সুতো—প্রত্যেক রোয়াকে চলছে লাটাই। সেই সুতো ভর্ত্তি করা হচ্ছে নলিতে। যুদ্ধের বাজারে কাপড়ের মজুরি দিন দিন বাড়ছে। অন্য বৃত্তি ছেড়ে লোকেও ঝুঁকেছে তাঁতের দিকে। তবে তাঁত-শিল্পের অতীত গৌরব আর নেই। হাতে-বোনা তাঁতে যে সূক্ষ্ম একশো চল্লিশ দেড়শো নম্বরের সুতোর ভার সইতো—তৈরী হতো মসলিনের মত পাতলা কাপড়—জ্যাকার্ড কলে তা সম্ভব নয়। টেনে-টুনে আশী থেকে একশো নম্বরের সুতোর কাজ চলে—তাও সন্তর্পণে। তখন এক হাতে মাকু ঠেলে অন্য হাতে দক্তি দিয়ে বুননটাকে ঠাস করে দেওয়া হ'তো। দু'পাশে ঝুলানো থাকতো ছোট বড় মাঝারি ইট—ভারকেন্দ্র ঠিক রাখবার জন্য। মাকু তাঁতের মধ্যে দিয়ে ঠেলবার সময় সরু সুতো ছিঁড়ে যেত বার বার। আবার তা ঠিক করে মাকু চালাতে সময় যেত অনেকখানি। একখানি কাপড় তাঁত থেকে নামাতে সময় লাগতো বেশি। আজকাল পায়ের জোরে চলছে কল—হাতের কৌশল বিশেষ প্রয়োজনে আসে না। মোটা সুতো তত ঘন ঘন ছেঁড়ে না আর মোটা নলিতে জড়ানো থাকে অনেক সুতো—শীগ্‌গির ফুরিয়েও যায় না। চেষ্টা করলে দেড় দিনে একখানা কাপড় নামানো যায়। একখানা কাপড়ের মজুরি চার থেকে সাত টাকা। এ বাজারে বাঁচতে হ'লে তাঁত না চালিয়ে উপায় কি !

এ পাড়ায় আলস্য কম।···টাকার নেশা লেগে গেছে কর্ম্মীর মনে। খাওয়া-শোওয়ার সময়টুকু বাদ দিয়ে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত এ পাড়ায় শব্দ চলছেই ঠকা-ঠক—ঠকা-ঠক। ওদিকে কলকাতায় ব্ল্যাক মার্কেট চলছে পুরো দমে। দেশে পাওয়া যাচ্ছে না কাপড়। ছ' টাকা জোড়া শাড়ির দাম উঠেছে ছত্রিশে। বারো আনার মজুরি দাঁড়িয়েছে পাঁচ টাকায়। আশা আছে, আরও উঠবে। মানুষ

না খেয়ে এক দিন থাকতে পারে—উলঙ্গ হ'য়ে থাকতে পারে না এক দণ্ডও। সভ্যতার এ এক বালাই!

তেরশো পঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। বাংলার যে প্রান্তে আগুন জ্বলেছিল—এ গ্রাম তার থেকে বহু দূরে। এ গ্রামের তাঁতীরা করেছে উপার্জ্জন। চালার বদলে তুলেছে পাকা ইমারৎ! কুচো চিংড়ির বদলে খাচ্ছে রুই মাছ। পানের ছোপে ওদের পুষ্ট ঠোঁট জবা-লাঞ্ছিত, মাথার চুল তৈল-নিষিক্ত এবং তামাকের সঙ্গে চলছে দামী সিগারেট। পঞ্চাশ সালে মারীরূপে ব্যঙ্গ করে গেছে যে সব দেশে—সরকারী রিপোর্টে দশ—বেসরকারী অভিজ্ঞতায় পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোকের অনশন-মৃত্যুর খবর এরা কাগজে পড়ে অবশ্য হায় হায় করেছে, কিন্তু সেই দেশের দুঃখ-মোচনের জন্য একটি পয়সাও ব্যয় করেনি এরা। ব্ল্যাক মার্কেট কে প্রথম চালু করে, এরা জানে না অথচ আইন কড়া হলেও তাকে বুড়ো আঙুল দেখাবার কৌশল কি করে আয়ত্ত করতে হয় তা এরা বোঝে। ফলে যারা দুর্ভিক্ষে মরেছে তাদের জন্য অশ্রু ফেললও নিজেদের আয় বাড়িয়ে নিতে এরা কসুর করছে না। জীবন-যুদ্ধটাই হ'লো এই যুদ্ধের মূলসূত্র।

তাঁত চলছে ঠকা-ঠক। পুরন্দরের আবেদন সেই কাজে ডুবে গেল। মঙ্গলবারে হাওড়ার হাট—আজ একখানা শাড়ি অন্তত তাঁত থেকে নামাতে পারলে কড়কড়ে টাকা মিলবে অনেকগুলি। চালাও পা—।

পুরন্দর বুঝলে দক্ষিণপাড়া নিজেকে বুঝেছে, দেশকে বোঝাতে গেলেও বুঝবে না।

হতাশ হয়ে ফিরছে এমন সময় গলির মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকটি ছেলে। বাঁশের খুঁটি পুঁতে টানা ঠিক করছিল, তারা পুরন্দরকে দেখতে পেয়ে কাছে এলো।

তার এক ক্লাশ নীচে পড়তো অবনী। ওর কাকা অত্যন্ত গরিব ছিল বলে মাষ্টার রাখতে পারেনি—অবনী দক্ষিণপাড়া থেকে প্রায়ই আসতে পুরন্দরদের বাড়ি পড়া বলে নিতে। ময়লা কাপড়-পরা কুণ্ঠিত একটি ছেলে···কিন্তু অতীত মুছে গেছে বহু কাল। অবনী পাশ করেনি—কিন্তু লক্ষ্মীর কৃপা লাভ করেছে। ওর পরনের ধুতি ময়লা নয়—গায়ে হাত কাটা জাল-গেঞ্জি ফুটে বেরুচ্ছে শ্যাম বর্ণের চিকণ আভা—চক্ষুতে বুদ্ধির দীপ্তি—চুলে সাচ্ছল্যের দশ আনা ছ' আনা ছাঁট। কাছে এসে হাত তুলে একটা নমস্কার করলে—স্বরে কিন্তু কুণ্ঠার এতটুকু অস্পষ্টতা নেই।

বললে, সন্ধ্যের পর আপনার তো কোন কাজ নেই—একবার আসবেন এ'দিকে ?

সেই অবনী যে কোন রকমে মাথা নীচু করে বলতো, দয়া করে আমার পড়াটা একটু বলে দেবেন ? যদি বলেন তো সন্ধ্যের পর যাব।

পুরন্দর বললে, তুমি কি প্রাইভেটে ম্যাট্রিক দেবে ?

অবনীর সঙ্গীরা হেসে উঠলো। অবনী একটুও অপ্রস্তুত না হ'য়ে হেসে বললে, না, ও-সব কিছু নয়। ম্যাট্রিক পাশ করে কতই আর রোজগার করতাম বলুন! তাঁতে উপায় হচ্ছে তার চার-পাঁচ গুণ। তা নয়, হ'য়েছে কি জানেন—সারা দিন পরিশ্রম করে শরীর-মন এমন হ'য়ে থাকে যে একটু রিক্রিয়েশন না হ'লে—

একটু থেমে ভূমিকা না বাড়িয়ে বললে, যাত্রার আখড়া বসাচ্ছি··· খাঁ কর্ত্তাদের (উপাধি) বৈঠকখানায়। আপনি যদি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন।

পুরন্দর তো স্তম্ভিত! এমন অদ্ভুত প্রস্তাব যে তাকে কেউ করবে কোন দিন—সে স্বপ্নেও ভাবেনি। কিন্তু যুদ্ধ চলছে দ্রুত—জগৎ চলছে সেই তালে।

পুরন্দরের স্তম্ভিত ভাব দেখে অবনী বললে, ভাবছেন আপনাকে কেন বলছি ? বলছি এই জন্য যে আপনি চমৎকার বলতে পারেন। আপনার বক্তৃতা আমরা শুনেছি।

আরও দুই-এক জন ছেলে বলে উঠলো, চমৎকার বলেন আপনি। ঠিক যেন অ্যাক্টিং করেন।

প্রশংসার কথা—পুরন্দর কিন্তু খুসী হলো না। স্বদেশ সেবা ব্রত তার এভাবে পুরস্কৃত হবে জানলে সে সভাক্ষেত্রে যথাসম্ভব কম কথা বলতো।

অবনীর ধৃষ্টতায় সে রাগ করলে না ; মিষ্ট স্বরে বললে, অ্যাক্টিং করবো বলে বক্তৃতা করিনি! ভাই তবু স্বীকার করছি, আমি ওর যোগ্য নই।

না না, আপনি না হলে—অবনী এগিয়ে এসে পুরন্দরের হাত চেপে ধরলে।

আর সহ্য হলো না, এতক্ষণের জমা-করা ক্ষোভ গ্লানি অবনীর করস্পর্শে নিদারুণ অভিমানের উত্তাপে টক্ হয়ে উঠলো। পুরন্দর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে গম্ভীর স্বরে বললে, তোমাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। না খেতে পেয়ে দেশের লোক মরচে আর তোমরা সখ করে বসাচ্ছ যাত্রার দল ? ছিঃ! সেখানে আর সে দাঁড়াতে পারলে না।

কানে এলো—অবনীর সঙ্গীরা বলছে, আমরা তো না খেতে পেয়ে যাত্রার দল বসাচ্ছি না। কোথায় কে মরলো—আমাদের কি!

উত্তরের বাতাস পথের ধুলো উড়িয়ে পুরন্দরকে বিদ্রূপ করলে যেন···

আমাদের কি—আমাদের কি! বার বার প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো অন্তরের মধ্যে।

[ক্রমশঃ।

শ্রীশক্তিপদ রাজগুরু

কত মাইল পথ সে হেঁটেছে হিসেব রাখেনি, কাঁকরে পায়ের পাতা দুটো ছিঁড়ে গেছে, হাঁটুর কাছে কোথায় যেন চোট খেয়ে রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে, পরনের কাপড়ের খুঁটটা ছিঁড়ে পটিটা জোর করে বেঁধে আবার চলতে থাকে, কোন্ দিকে জানে না, তবু চলে। সরু সরু শালগাছের জঙ্গল, নীচেটায় বইচি-আটাড়ি গুল্মের ঘন আলিঙ্গন, কাঁকুরে নুড়ি পথটা ধরে চলেছে ভূপেশ। সেই রাত্রি ভোর থেকে ক্রমাগত হেঁটে এসেছে, দুপুরের রোদ হলদে হয়ে, বনভূমির মাথায় রঙ লাগিয়েছে, কুরুবক বনমালতীর মাতাল গন্ধ বাতাস ভারি করে তুলেছে—এখন থামবার অবসর নাই তার, নাড়ী-ভুঁড়িগুলো জট পাকাচ্ছে পেটের মধ্যে মাজা-ভাঙ্গা গোখরো সাপের মত, আধ পাকা কসটে বইচি কতকগুলো মুখে পুরে চলেছে!

এ অবস্থা তার কাছে নূতন নয়, কত বার এমনি করেই তাকে চলতে হয়েছে, আসামের সীমান্তে পাহাড়-পর্ব্বতসঙ্কুল বনানী—পাটকই নাগা পাহাড়ের নীচু দিয়ে তিব্বতের সানুদেশের বাসিন্দাদিগের সঙ্গে লেন-দেন, বর্ম্মার উত্তরে নন্দান শান্ ষ্টেটস-এর শেষ সীমান্তে লুগিং ষ্টেশন থেকে পঞ্চান্ন মাইল দূরে পাহাড় পার হয়ে আরও বাহাত্তর মাইল নোমানসুল্যাণ্ড ছাড়িয়ে, সারি সারি মিউল ট্রাকে পশম-রেশম-তুঁতের সঙ্গে আসত কত ভীষণ ভীষণ মাল-মসলা, কত বিনিদ্র রজনী কেটেছে খচ্চরের পিঠে, না হয় পথের ধারে কোন পার্ব্বত্য গুহায়। আজকের পলায়ন তার চেয়ে বেশী কিছু নয়, কিন্তু সেদিন মেরুদণ্ড ছিল ঋজু সবল, আজ অনেকেই তাদের দলের জেলে, অগ্নিমন্ত্রের উপাসক হয়েও অনেকে আজ গভর্ণমেন্ট-এপ্রুভার, পালান ছাড়া তাই আজ কোন গত্যন্তর নাই। দূরে নীলাভ ধোঁয়াটে আকাশ-সীমা, পরেশনাথ রেঞ্জই হবে, চুপিসাড়ে বনের মধ্যে নির্জ্জন রাস্তাটা চারি দিকে চেয়ে নিয়ে পার হয়ে আবার চলতে থাকে।

বনের পশ্চিম দিগন্ত রাঙ্গা হয়ে আসে, সূর্য্যের নিশানা পাওয়া যায় না, বন্ধ্যা প্রান্তরের মাঝে কালো পাথরের স্তূপের দিকে চেয়ে থাকে, রাত্রির অন্ধকার বনের থেকে বার হয়ে আসে ধীরে ধীরে, সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা, হাঁটুটা ফুলে উঠেছে, গা বেশ গরম, জ্বরই হবে বোধ হয়, কোন রকমে সামনের দিকে চলে।

ছোট্ট গাঁখানা পাহাড়ের ঘেরা দেওয়া, তোপচাচী থেকে গোমো অবধি একটা ছোট বাস লাইনের থেকেও প্রায় সাত মাইল দূরে এর ভৌগোলিক অবস্থান নিয়ে কেউ কোন দিনই মাথা ঘামায়নি, নিচলগাঁওয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের সম্বন্ধ মাত্র কামতাপ্রসাদের গদিতে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিকের কাগজখানার সঙ্গে! পাটনায় অপিস থেকে কত ছাপ বুকে নিয়ে অর্দ্ধ-সাপ্তাহিক 'দেশবন্ধু' পাঁচ দিন পর এসে হাজির হন! কামতাপ্রসাদের গদির বাইরে লোহার জালের জাফরি দেওয়া রকে কেরাসিনের কুপীর ম্লান আলোয় বাইরের অন্ধকার ঘোরালো হয়ে ওঠে, আগ্রহে শুনে চলেছে সকলে, বুড়ো জয়রাম পণ্ডিতজী পড়ে চলেছে,—আগষ্ট মাসের প্রারম্ভ, বাংলায় এখন থেকেই এক মুঠো দানা নেই, শত শত লোক অনাহারে মরে রাজপথে প্রান্তরে; শোলাপুর, বোম্বাই, মাদ্রাজ, কলকাতা আরও কত জায়গায় ঝড় বইতে সুরু হয়েছে; শত শত যুবক আত্মবলি দিলে, কত গেল কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, তারও হিসাব রাখেনি কেউ; বিষণপুর, ভাগলপুর, সাসারাম, মেদনীপুরে গুলী চলছে,—আরও কত খবর! সমস্ত দেশনেতাই আবার হয়েছেন কারারুদ্ধ, বাইরে কেউ নেই যে প্রকৃত পথের সন্ধান দেবে।

...জয়রাম তার মুখ থমথমে হয়ে যায়, পণ্ডিতজী ধীরে ধীরে কাগজখানা নামিয়ে দড়ি-বাঁধা চশমাটার পাক খুলতে থাকেন কান থেকে। নিস্পন্দ অন্ধকারে ভেসে আসে মেয়েলি কণ্ঠের গানের সুর, কার ডাগর বচপন। তারই মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সুরু হয়েছে, বাইরের জগতে আজ মৃত্যুর বিভীষিকার মাঝে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, শহীদের আত্মত্যাগে রাজপথ রাঙা হয়ে গেল, রক্ত-পিছল পথে চিরসারথীর রথচক্রে রাত্রিদিন নির্ঘোষিত করে আসবেই আসবে!

কামতাপ্রসাদ মাথার পাগড়ীটা ঠিক করে নিয়ে কোমরের ঘুনসী

থেকে বড় চাবির গোছাটা দিয়ে এক একটা বিশাল তালা বন্ধ করতে থাকে, মুখ ফিরে প্রশ্ন করে—"চাবল আউর কাপড়াভি মিলতা নেই বাংলামে—হ্যা, আউর সোনেকা ক্যা ভাউ পণ্ডিতজী ?"

জয়রাম কথা বলে না, ধীরে ধীরে অন্ধকার রাস্তাটায় নেমে বাইরের দিকে চলতে থাকে, গাঁয়ের বাইরে ছোট পাহাড়ী নদীটা যেখানে মধরোপাহাড়ীর গায়ে বাঁক খেয়ে ছোট্ট ঝিলটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে তারই উঁচু চড়িটার গায়ে পণ্ডিতজীর আস্তানা। পাথরের উঁচু ধাপ বেয়ে অভ্যস্ত পদে উঠতে থাকে জয়রাম, সারাটা মন তার কেমন যেন উদাস হয়ে গেছে। তারই চোখের সামনে ভেসে ওঠে আগেকার দিনগুলো, চৌরচৌরা হয়ে গেছে, গান্ধীজী জেলে, সারা ভারতে আন্দোলন চলছে, বল্লভভাই প্যাটেল—বাংলার দেশবন্ধুজীই তখন সেই বহ্নিশিখা প্রদীপ্ত রেখেছিলেন, সেই সময়ই তাঁরও জেল হয়েছিল। গয়ার জেলের দিনগুলো—সেই তেরঙ্গা পতাকা হাতে করে—

ওঃ, কি দিনই গেছে সে সব, আজ বৃদ্ধ স্থবির বয়সে দুর্গম গিরি-কন্দরে ছোট গাঁয়ে কি করে সে বাস করে আছে মাত্র ক'টা টাকার মোহে সে-ই জানে না, ভাবতে গেলে শিরায় রক্তপ্রবাহ অচল হয়ে আসবার উপক্রম হয়।

পায়ের শব্দ শুনে যমুনা লণ্ঠনটা হাতে করে এগিয়ে আসে। কেওয়াড়িটা বন্ধ করে ভিতরে গিয়েই পণ্ডিতজী অবাক হয়ে যায়, চারপাইএর উপর কে যেন শুয়ে রয়েছে, রক্তাক্ত পাগড়ীর পাশে একটা বেশালিতে করে গরম জল আর ফরসা খানিকটা ন্যাকড়া! লোকটা ঘুমুচ্ছে না, অচেতন হয়ে রয়েছে ঠিক বোঝা যায় না উস্কো-খুস্কো মলিন ধূলিধূসর চেহারা। এক-মুখ গোঁফ-দাড়ির জঙ্গল ভেদ করেও ক্লান্তির রেখা প্রকটিত হয়ে উঠেছে। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে যমুনার দিকে চেয়ে থাকে জয়রাম,—ঝিলের ওদিকটা এসে না কি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল,—কোন রকমে জল-টল দিয়ে একটু ঠিক করে তাকে এনেছে ঘরে, এর বেশী পরিচয় কিছুই জানে না সে। জয়রাম তার গায়ে হাত দিয়ে অনুভব করলে বেশই তাপ রয়েছে। রীতিমত জ্বর এসে

…চলেছে ভূপেশ, রাত্রির অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে, বনভূমির মাথায় মাথায় আঁধারের ঘন আলিঙ্গন, গাছের পাতায় পাতায় কত গোপন মর্ম্মর ধ্বনি, স্তব্ধ বনমর্ম্মরে আজ সর্ব্বহারার ব্যথা!· যেন তাকে বলে ওঠে রজনীর নীরবতার সুরে সুরে—কোন অশরীরীর কণ্ঠস্বর—পালাও, পালাও, যত দূরে পার—মানুষের সীমানার বাইরে! গুরুতর তোমার অপরাধ! মাটি আর মানুষকে ভাঙবে সহজে এ অপরাধের রক্ষা নেই!…সহসা বড় রাস্তাটার ওদিক থেকে একটা সন্ধানী তীব্র আলোয় ঝকমক করে ওঠে সারা বন! দু'হাত দিয়ে আলোকিত মুখখানা ঢেকে ফেলে দ্রুতবেগে বনের মধ্যে নেমে ছুটতে থাকে,—পিছু-পিছু অনেকগুলো সচকিত পদশব্দ!

তার পর, যেন স্বপ্নের মত অস্পষ্ট, বিহারের বন্ধুর পার্ব্বত্য ভূমি পার হয়ে ধূলিধূসর রাস্তাটা এঁকে-বেঁকে নিয়ে চলেছে তাকে সহরের দিকে। পুলিশ ভ্যান—সশস্ত্র প্রহরীর পাশে বসে চলেছে সে। জনাকীর্ণ সহরের রাস্তাটা পার হয়ে পুলিশ ষ্টেশনের দিকে,…সব আশা কল্পনা কোন্ দিকে মিলিয়ে গেল, আবার সেই চিরপরিচিত কারা-প্রাচীর, সান্ত্রীর ছন্দবদ্ধ ভারি বুটের শব্দ, চার হাত টুকরো সেলের অস্পষ্ট অন্ধকার, রোমশ কম্বলটার মধ্যে ক্ষণিকের আত্মগোপন!

চোখ মেলে চাইতেই কেমন সব যেন গুলিয়ে যায়। রঙ-বেরঙএর দড়ির তৈরী সিকে, ছক-কাটা কলসী আর ছাপা সাড়ীর আবেষ্টনী দেওয়া ছোট্ট সংসার—কেমন যেন সব ওলট পালট ঠেকে!…জেলের আবহাওয়া কি বদলে গেল, ওয়ার্ডারের রোষ-কষায়িত চোখের বদলে সামনে দেখা দেয় এক জোড়া কালো ডাগর আঁখিতারা! আজ চার দিনের মধ্যে কি একটা কাণ্ড ঘটে গেছে! পাশ ফিরবার চেষ্টা করে কিন্তু দু'মণী পাথর যেন ওর উপর চাপান, নড়াবার ক্ষমতা নাই, ভূপেশের। যমুনাও এগিয়ে গিয়ে নিষেধ করে!

বড় বাটিতে করে এক বাটি হালুয়া এনে নামায় পাশে, অবলীলাক্রমে তার মাথাটা তুলে সোজা করে বসিয়ে ঘাড়ের কাছে কয়েকটা পাশ-বালিশ দিয়ে ঠেস দিয়ে বসিয়ে দেয়, বেশ যেন খানিকটা আরাম পায় ভূপেশ, চোখ বুজে আসে, আজকের জীবন সত্যি অনেক দিন পায়নি সে।

কি অন্ধকারের মাঝে আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরত সেই জানে, চাটগাঁ মণিপুর-পাটকই-সিকিম-গ্যাংটক—আরও কত জায়গায় পার্টির আদেশে তাকে ঘুরতে হয়েছে, কোমরের পাশে রিভলবারটার হিমশীতল স্পর্শ আজও সে অনুভব করে, দুর্দ্দিনের বন্ধু।

সেদিন যমুনার কথায় না হেসে পারেনি সে, একেবারে ছেলেমানুষ! বলে কি না একমুখ গোঁফ-দাড়ি এই উস্কো খুস্কো সন্ন্যাসীর মত চুলের রাশ—সব কেটে ফেলতে হবে। একটু একটু করে সেরে উঠছে ভূপেশ!

নির্জ্জন গাঁয়ের বাইরে বাঁধ-ঘেরা ঝিলটার ধারে একটা কেঁদ গাছের ছায়ায় বসে থাকে সে…কোন স্বপ্নপুরীতে যেন এসে পড়েছে সে! ওদিককার ঘাটে যমুনা স্নান করতে নেমেছে, চাপটা কলসটাই তাকে ~~আজ বাংলার কথা~~ মনে করিয়ে দেয়,—বাড়ীর কথা—যেখানে আপন বলতে কেউ নাই!

আজ বন্ধুর পর্ব্বতসঙ্কুল পথে কোন গৃহহারা ক্ষণিকের অবসরে খেলা-ঘর পেতে বসে নদী-বেলায়—যাযাবর হাঁস যেন চলতি আকাশের বুকে থেমে গিয়ে নেমে আসে নীপবনে কোন বনহংসীর প্রেমের মাদকতায়!…নিটোল স্বাস্থ্য যৌবনের ভরা নদী বাঁধভাঙ্গা ঢেউএর মত তার দেহ-যমুনার কূলে কূলে ঘা দিয়ে যায়, মনের দরজায় গান শোনায় ঘুম-ভাঙ্গানী সুরে। ভূপেশের অবচেতন মনের বেদীমূলে আজ যেন প্রথম আঘাত আসে,—জাগরণের ডাক। মুগ্ধ বিস্মিত নয়নে চেয়ে থাকে তার দিকে। পরক্ষণেই আবিষ্কার করে যমুনা এক জোড়া সন্ধানী চোখ তার দিকে নিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। শশব্যস্তে গলা অবধি ডুবিয়ে দেয়! পোড়া হাসি তবু মন ছেয়ে মুখে জেগে ওঠে—সলজ্জ ভাবে সবটাই জলের তলে ডুবিয়ে নেয়! ভূপেশ যেন ফিরে আসে মাটির পৃথিবীতে, সরে যায় সেখান থেকে।

শাল কাঠের কুচো দিয়ে চারা তৈরী করে উনুন ধরিয়ে যমুনা চাপাটি করতে ব্যস্ত। কানা-উঁচু পিতলের গামেশ্বরীতে আটার পাট করতে সুরু করেছে, অদূরে বসে ভূপেশ কয়েক সপ্তাহের পুরোনো খবরের কাগজগুলো দেখে চলেছে। পার্টির কাজে হিন্দুস্থানী ভাষাটা কিছুটা শিখতে হয়েছিল—তাতেই কায চালিয়ে নেয় কোন মতে।

বেশ ছিল,—পথের মানুষ পথের বাইরে থেকে ঘরের মাঝে এসে পথকে ভুলেছিল; আজ আবার বাইরের জগতের একটুকু সাড়া পেয়েই মনের সক্রিয় ভাবটা ঘুমভাঙ্গা পশুর মত গা-ঝাড়া দিয়ে ওঠে, যেতে হবে তাকে।

শহরের রাস্তাগুলো মনের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, সারা ভারতের গণ-আন্দোলন, যা চেয়েছিল তারা বহু দিন আগে থেকে—আজ সেই দিন এসেছে। লোহা তপ্ত লালাভ হয়ে উঠেছে, এখন চাই হাতুড়ীর প্রবলতম আঘাত—যা দিয়ে তৈরী হবে কোদাল গাঁইতি, মৃত্তিকার বুক চিরে ফুঁড়ে আনবে নোতুন ফসলের ইঙ্গিত—বাঁচবার মন্ত্র! নতুবা টুকরো টুকরো শিকল্ট তৈরী হয়ে যাবে কোন কুচক্রীর তীক্ষ্ণ ছেনি-বাটালীর ঘায়ে—যা তা'দিকে নিবিড়তম করে বন্ধনই দিতে পারবে, বাঁচবার আশা আনবে না! যেতে হবে! এই চরম মুহূর্ত্তে কত সন্ধানী চোখ তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে—ধরা পড়লে জেল হয়ত—হয়ত আরও কিছু? হোক।···তবু সে অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, তাকে আজ মায়ের ডাকে সাড়া দিতেই হবে!

উনুনের লালাভ ম্লান আলোয় তার দিকে চেয়ে চমকে ওঠে যমুনা; চোখের উজ্জ্বল দৃষ্টি কোন সুদূর-প্রসারী, মুখের রেখাগুলো দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে প্রকটিত হয়ে ওঠে, অযত্ন-বর্দ্ধিত দাড়ি-গোঁফের অন্তরালে কোন অনির্বাণ অগ্নিশিখা জ্বলছে!

হাত থেকে কাগজখানা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে সরিয়ে দেয় যমুনা। কি সব বাজে কথা ভাবছে! বাড়ীর কথা বুঝি!—বাড়ী?

বাড়ী তার নাই, কবে কোন্ রাত্রে-দেখা দুঃস্বপ্নের তলে তা বিলীন হয়ে গেছে। তার ঘরের সীমা ছাড়িয়ে পড়েছে সব ঠাঁই—সর্ব্বত্রই!

আজ খেতে বসে কেমন যেন আনমনা হয়ে থাকে ভূপেশ! জয়রামজী চাপাটির টুকরোগুলো অড়হর ডালের বাটি থেকে তুলতে তুলতে গল্প করেন—আজ তিন দিন না কি ভাগলপুরের কোন খবর আসেনি, পাটনা-গয়া রোডের বাসও [illegible] লাইনও তুলে দিয়েছে—

হঠাৎ মুখ তুলেই ভূপেশের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে যান, সে আজ যেন খাওয়া ভুলে গেছে। যমুনাও বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে তার দিকে। সারা সন্ধ্যা কাগজখানা পড়া থেকেই সে যেন বদলে গেছে!

চারপাইএ বিছানাটা পাততে পাততে মুখ তোলে যমুনা, ভূপেশের কথা—আমাকে যেতে হবে।

—"সে কি? এখনও হাঁটতে পার না একটু ভাল করে—"

—"হোক। তবুও যেতে হবে যে কোন রকমে।"

এগিয়ে আসে যমুনা—"বন্ধুর জন্যে মন খারাপ করছে, না?"

মলিন ভাবে হাসে ভূপেশ তার উত্তরটা বিশ্বাস করতে পারে না যমুনা, বাঙ্গালী বাবুর আবার না কি সাদী না হয়! কে জানে—হবেও হয়ত! সারা মনে মনে এই অদ্ভুত প্রকৃতির লোকটিকে এক বিচিত্র রূপে রূপায়িত করেছে. সব কিছুই যেন এর আলাদা. কথা-বার্ত্তাও কম কম নিজের চারি দিকে একটা আবরণ দিয়ে রেখেছে,—যা সহজে ভেদ করাও যায় না, অথচ অবহেলা করে ফিরে আসবার ক্ষমতা নাই।

রাত্রে ঘুম আসে না ভূপেশের। স্তব্ধ পৃথিবী—মৌনী আকাশের ঝিকিমিকির নীচে নিদ্রাতুর সুষুপ্ত গ্রাম, জয়রামজীর তুলসীদাসী দোঁহা শেষ হয়ে গেছে, তার ঘরও নীরব, বাইরের ইঁদারার পাশে কাদের কণ্ঠস্বর শুনে চমকে ওঠে। অন্ধকারের মাঝে অভ্যাসবশেই হাত দিয়ে অনুভব করে নেয় কোমরের কাছে বিশ্বস্ত বন্ধুর হিমশীতল স্পর্শ। খোঁড়া পাটাও যেন সোজা হয়ে গেছে, শরীরের প্রতিটি রোমকূপ সচকিত হয়ে যায়, কেউ হয়ত এসে পড়েছে! বিপ্লবী ভূপেশ সেন এত দিন ফিরে এসেছে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে, এবার হবে তার বিচার, এত দিনের সঞ্চিত অপরাধের বোঝা দুঃসহ হয়ে আসছে!

সন্তর্পণে দরজাটা খুলে বাইরে এসে খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়। যমুনার কণ্ঠস্বর, কাছে তার কে যেন দাঁড়িয়ে. না, ভয়ের কিছু নাই। ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসে উত্তেজনার আবেগ।

কামতাপ্রসাদ এগিয়ে যায় যমুনার দিকে। চিরদিনই সে বিদ্রোহিনী। অর্থপিশাচ কামতাপ্রসাদকে সে ঘৃণা করে,—অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করে. বহু দিনের আবেদন, উপহার সব কিছু সে দর্পিতার মতই প্রত্যাখ্যান করেছে, আজও তাকে দূর করে দিতে কিছুমাত্র বাধবে না। কামতাপ্রসাদ যেন কেঁচো বনে যায়। কামতাপ্রসাদ কি যেন বলবার চেষ্টা করে।

যমুনা ততক্ষণ উঠে এসেছে দাওয়ায়, বলে ওঠে, "রাত অনেক হয়েছে, তুমি যাও. ফের যদি কোন দিন যখন তখন এখানে আসবে, শাল কাঠের খুন্তির অভাব নাই এখানে, আস্ত ফিরে যেতে দোব না—"

হতাশ হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে কামতাপ্রসাদ মনে মনে গজরাতে গজরাতে ফিরে যায় বস্তীর দিকে। উমর্‌রাত থাকে সারা মনটা তার, সশব্দে দরজাটা বন্ধ করে যমুনা ঘরে ঢোকে, তার খিল দেওয়ার শব্দ কানে আসে ভূপেশের. হাসিও পায়। বেচারী কামতাপ্রসাদ!

সেদিন কাগজখানা আসতেই কামতাপ্রসাদ একটা ছুতো খুঁজে পায় পণ্ডিতজীর বাড়ী আসবার কি একটা না কি জোর খবর, সেদিন জয়রামজীও তখনও স্কুল থেকে ফেরেনান, কি একটা কাজে আটকে পড়েছিলেন। কাগজখানা নাড়াচাড়া করতে করতে এগিয়ে আসে কামতাপ্রসাদ। পণ্ডিতজীর বাড়ীর কাছে এসে কেমন যেন খটকা লাগে মনে, ঠিক এমনিই একখানি ছবি ছাপান হয়েছে কাগজটায়, ···সরকার থেকে হুলিয়া বার করা হয়েছে তার নামে! ধরে দিতে পারলে বেশ মোটা রকমের একটা পুরস্কার, তা ছাড়া সরকারের দপ্তরে খাতির—সম্মান, চাই কি খেতাবও মিলে যাবে। মনে মনে আঁচ করে—যদি একবার সামনে পায়—বেশ বিনা পুঁজিতে একটা দাঁও মেরে দিতে পারে।

থমকে দাঁড়ায় কামতাপ্রসাদ, দাড়ি-গোঁফে মুখ ঢাকা লোকটা বসে রয়েছে, কাছে গিয়েই বার বার ভাল করে তার দিকে চাইবার চেষ্টা করে, সন্ধানী দৃষ্টি মনের অতলে চমক খেলে যায় ভূপেশের; চমকিত হয়ে সে উঠে পড়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যায়. এমন করে বাইরে বসে থাকাটা ঠিক হয়নি।

ইতিমধ্যে যমুনাও এগিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কামতাপ্রসাদ সন্দিগ্ধ ভাবে প্রশ্ন করে, কে ও?

যমুনা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, "তোমার কি দরকার? বাবা এখন নাই, এলে পাঠিয়ে দোব।" দরজাটা বন্ধ করে দেয় সশব্দে যমুনা। কামতাপ্রসাদ মনে মনে কি প্যাঁচ কসতে কসতে বার হয়ে যায়। শয়তানী চোখ দুটো অজানা আশায় ধক্-ধক্ করে ওঠে।

যমুনা কাগজখানার দিকে ভাল করে চেয়ে অবাক হয়ে যায়। ভূপেশের দিকে নিবিষ্ট চোখে বার বার চাইবার চেষ্টা করে, এ কি

সত্যি। সত্যিই যাকে সে আশ্রয় দিয়েছে সে কি এই শ্রেণীরই মানুষ?

বিশ্বাসই করতে পারে না।···আজ ভূপেশও যমুনার বার বার প্রশ্নে মিথ্যা কথা বলতে পারে না, কোথায় যেন বাধে। আভাসে ইঙ্গিতে তার খানিকটা পরিচয় দিয়ে দেয়। শুনে যায় যমুনা তার ভ্রাম্যমান জীবনের খানিকটা ইতিহাস।

অবাক হয়ে শুনে যায় যমুনা।—এত দিন বাবার মুখে শুনেছিল দেশের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাদের প্রতিটি শিরায় দেশের মৃত্তিকার রক্তকণিকা,···সারা পর্ব্বত বনানী আকাশ বাতাস তাদের কাছে দেশ-মাতৃকার স্নিগ্ধ স্পর্শ, তাদেরই এক জনকে সে আতিথ্য দিয়ে বাঁচিয়ে তুলেছে—কি[illegible]।

থেমে যায় তার চিন্তাধারা, ওর জন্ত [illegible] কাগজে হুলিয়া, ওর জন্ত কত সন্ধানী চোখ, কত টাকার লোভে ঘুরে বেড়া[illegible] তাদের হাত থেকে কি পারবে ওকে বাঁচাতে? পারবে কি তাদের চোখ থেকে আড়াল করে রাখতে? চোখের সা[illegible]ন ভেসে ওঠে কামতাপ্রসাদের কপিশ চোখ দুটো, হয়ত আগত [illegible] সম্মান-লালসায় ধক্ ধক্ করছে। সামনের আকাশ-সীমায় কো[illegible] গা[illegible]ছর বনে বড়ো হাওয়ার আনাগোনা, জাফরাণী রঙ-এর মেঘে[illegible] ভেলায় বিদায়ী সূর্যের শেষ রক্তিমাভা [illegible] দূরে মা[illegible]ষের নাগালের বাইরে যদি ওকে পাঠাতে পারে—[illegible]

ভূপেশ অবাক হয়ে চেয়ে থাকে যমুনার [illegible]কে। [illegible]া বাইরের দরজায় কার সবল করাঘাত শুনে তার চেতনা ফিরে আ[illegible] পাশের ঘরের মধ্যে চলে যায়।

যমুনা দরজা খুলেই অবাক হয়ে যায়, সামনে তার কাম[illegible]প্রসাদ, চকচকে চোখ দুটো শাণানো গালের মাংসপিণ্ডের ফাঁক দিয়ে [illegible]ল-জ্বল করে, সন্ধানী দৃষ্টিতে এদিক ওদিক চেয়ে ঘরের দিক এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই যমুনা কেমন যেন হয়ে যায়, সব বাধা-বিপত্তি ভে[illegible] করে আজ যেন যমুনা নোতুন করে তৈরী হয়ে যায়, তার [illegible]াতটা চেপে ধরে···

সর্পাহতের মত চমকে ওঠে কামতাপ্রসাদ, কোমল শীতল স্পর্শ, এতদিন প্রতিটি মনের প্রত্যন্তে যা সে কল্পনা করে আসছে! আজ কি স্বপ্ন দেখছে কামতাপ্রসাদ!

ওকে যেতে দাও! তোমার ঋণ আমি জীবনে শোধ [illegible]রতে পারব না, শুধু তুমি কাউকে বলবে না ওর কথা, এত বড় শত্র[illegible]হয়ো না! ভগবান কোন দিনই তোমায় মাপ করবেন না—

কামতাপ্রসাদের চোখের সামনে ভাসে টাকা, কত বড়[illegible]ম্মান, কত লোক-লস্কর! অন্ত দিকে নীচল গাঁওএর খেতি জমির প্রান্তে সাদা কুঠীতে ছোট স্বপ্ন-নীড়, সে আর—আর একজন যাকে সে মনের প্রত্যন্ত দিয়ে কামনা করে এসেছে, আজ কার মুখ দেখে উঠেছে কামতাপ্রসাদ!

আর তার ওর প্রতি কোনই ক্ষোভ নাই, ভূপেশ যা[illegible] আসামী হোক না কেন, কামতাপ্রসাদ আর যাবে না, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে। তার সব কিছু চাওয়া আজ শেষ হয়ে গেছে!

জানলার ওপাশে দাঁড়িয়ে ভূপেশ সবই শোনে যমুনার কথাগুলো, এক একবার কোমরের পাশে অনুভব করে তার চির-সাথীর কঠিন শীতল স্পর্শ, এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই ওই অর্থগৃধ্নু পিশাচটার রক্তাক্ত দেহ লুটিয়ে পড়বে, যমুনার এত বড় সর্ব্বনাশ করতে সে দেবে না, কেন তার জন্ত যমুনা এ আত্মহত্যা করতে যাবে?

কিন্তু তার পর! আর ভাবতে পারে না ভূপেশ। যমুনার কোন কথায় ভ্রূক্ষেপ করে না, ভূপেশ ত চিরকাল নীচল গাঁওএ থাকবে না, যমুনার ভবিষ্যৎ যমুনা নিজেই বোঝে ভাল; তাকে বোঝাবার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় ভূপেশের। হাসবার চেষ্টা করে যমুনা, হাসি তার কান্নার রাগে রঞ্জিত হয়ে ওঠে।

তারায় তারায় কানাকানি, নৈশ বাতাসের তীব্র প্রহরার অন্তরালে চলে সপ্তর্ষি কালপুরুষের অবৈধ মিতালী, নীলাম্বরীর আঁচল-তলে যুবতীর নিচোলের স্বপ্ন দেখে সুষুপ্ত মখরোপাহাড়ীর পর্ব্বতশিলা! ঝিলের ওপারে স্তব্ধ বনানীর মর্ম্মর গুঞ্জনে বার হয়ে আসে মৃত্তিকার বুক-ভাঙ্গা দীর্ঘশ্বাস। কোথাও চলেছে মানুষের স্বার্থের হানাহানি, অত্যাচারীর তীক্ষ্ণ খড়্গাতলে কার রক্ত ফিনকি দিয়ে উঠল, কার ভ্রকুটি-কুটিল তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে জগৎ-জোড়া শান্তি পুড়ে ছারখার হয়ে গেল, সে খবর নীচল গাঁওএ পৌঁছবে না, জাপানী বোমারুর বোমায় ভয় এদের স্বাধীন জীবন ব্যাহত করবে না, এমনি করে দিনের পর রাত্রি রাত্রির পর দিনের মালা পরে পর্ব্বতসানু স্বপ্ন দেখবে বাঁচবার, মারামারি করে ভাইএর রক্তে হাত রাঙায়ে নয়—মাটির বুকে সদ্যোজাত শিশুর মত সহজ সরল সৌন্দর্য্যের মাঝে, সুখে থাক এরা!

ভূপেশ আবার বার হয়েছে পথে, এদের মাঝে তার ঠাঁই নাই। সুন্দরের রাজ্য থেকে সে নির্ব্বাসিত। আসবার সময়কার কথাটা বার বার মনে পড়ে, কামতাপ্রসাদ শেষ অবধি বাপন করতেই রাজী [illegible]। যমুনার কি সর্ব্বনাশ সে করে গেল। ওই ভোঁদা পশুটাকে ও [illegible] রাজী হল যমুনা, সে যাতে পুলিশের চোখে ধরিয়ে না দেয় ওকে। কিন্তু ওই বর্ব্বরকে স্বামী বলে মেনে নিতে পারবে কি যমুনা?

অথচ ভূপেশ কেমন স্বার্থপরের মত পালিয়ে এল, আর তার পালাবার পথ সুগম করে দিলে অজ্ঞাতপরিচিতা কোন রমণী। কামতাপ্রসাদের বাড়ীতে রীতিমত ধূমধাম শুরু হয়েছে। সানাই রসনচৌকীও বাদ যায়নি এরই মধ্যে। হাজার হোক বিয়ের পূর্ব্ব অনুষ্ঠান ত

আসবার সময় যমুনার দু'চোখ চাপিয়ে জল এসেছিল। প্রণাম করে তাড়াতাড়ি সে সরে যায়।

কার জন্ত এত-বড় ত্যাগ করলে যমুনা। ভূপেশের জন্ত? তা নয়। যার জন্ত ভূপেশ সব ত্যাগ করে পথে নেমেছে, ঠিক সেই কারণেই নিজের অত বড় সর্ব্বনাশ সে করতে পেরেছে। অথচ ওকে কেহই কোন দিন জানবে না, চিনবে না!

রাত্রির অন্ধকারে পা চালায় ভূপেশ, বাইরের জগতের মানুষ আবার বাইরেই আসে। নীচল গাঁওএর সানাই আর শোনা যায় না—মিলিয়ে গেছে রাতের অন্ধকারের স্তব্ধ বনমর্ম্মরে।

• • • •

এ কি! স্বপ্ন দেখছে সে!

না ত! পথ কোথায়? রোমশ কম্বলটার স্পর্শ অনুভব করে শক্ত মেজেতে! স্থির হয়ে বসে থাকে ভূপেশ। ডাক আসতে দেরী নাই বোধ হয়। জীবনের শেষ রাত্রি, আর কোন দিন কোন রাত্রি আসবে না তার চোখের সামনে, কোন প্রভাতের নবারুণ তার

ঝঞ্ঝাট

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

আলোক হইতে আঁধারে যেতেছি
সাধনা হইতে হুজুগে,
পাঁচশো বছর পিছাইয়া গেল
সভ্যতা এক হুজুগে।
গঠনের কথা ভুলিয়াছে সবে,
ভাঙার পরিধি মাপিছে নীরবে,
সকল জাতির মিলনের কথা
বিদ্রোহ-বাণী এ যুগে।

ইতিহাস হলো হৃত-গৌরব
স্মৃতিরও নাহিক মূল্য,
নব ইতিহাস হতেছে রচিত
চিত্ত তাতেই ফুল্ল।
বোমার বহর ভারী বেশী কার,
তাই লয়ে করি ঘোর চীৎকার,
ককেসাস্ নয় বুঝি বা যমের
দখিণ দুয়ার খুললো।

রাখো অভিধান সকল শব্দ
নিপাতনে আজ সিদ্ধ,
ঝাঁকে ঝাঁকে সব বোমারু বিমান
হয়ে পড়ে গুলী-বিদ্ধ।
সৈন্যক্ষয়ের বাড়িতেছে হার
খাতা খতিয়ানে ধরে নাক আর,
টিমোশাঙ্কি ও ভন ব'ক খোঁজে
পরস্পরের ছিদ্র।

ডন্ বাঁক হতে এলুইসিয়ান,
সলোমন হতে মাল্টা,
ধাক্কা এবং ধাপ্পার জোরে
লড়াই চলিছে পাল্টা।
খপরের আর নাহিক আদর,
মোরা পড়ে পড়ে নেহাৎ কাতর,
চাউল চিনি ও কেরোসিন লয়ে
বৃথায় কাটিছে কাল্‌টা।

[illegible]-কুলো ঘানি ও গো-গাড়ী
লকড়ি ও লোটা তৈল,
[illegible]ানদিস্তা বেড়ী শিল নোড়া
হুঁকা কলকেই রইলো।
[illegible]মে চলে যায় সৌখীন সব
[illegible]র মতন হয় দুর্লভ,
হায় স[illegible]তা চারু-চিক্কণ
[illegible] বিফল [illegible]
[illegible]

যে [illegible] সুনীল জলধি হইতে
উঠিল ভারতবর্ষ
সে দিন হইতে ক্রমেই কমিয়া
আসিছে জাতির হর্ষ।
অন্নগত এ বাঙালীর প্রাণ
শান্তির লাগি করে আনচান,
লৌহ এবার বার বার চায়
চিন্তামণির স্পর্শ।

আঁখিলোকে রাঙিয়ে দেবে না, রাতের বাতাস ভুলে যাবে তাকে আশীর্ব্বাদ জানিয়ে যেতে। আজ তার শেষ রাত্রি! পৃথিবীর সঙ্গে শেষ সম্বন্ধ!

প্রায় তিন মাস ধরা পড়েছে। বিচারে হয়েছে ফাঁসীর আদেশ।

সকলের কথা ছাপিয়ে বার বার আজ যমুনার কথাই মনে পড়ে, সেদিন জেলে জয়রামজী দেখা করতে এসেছিলেন, বুড়ো চোখে আর দেখতেই পায় না ভাল করে, তার মুখে কথাটা শুনে চমকে ওঠে ভুপেশ।

যমুনা আর নাই, বচপনের দিন কয়েক পরই বিয়ের আগে মথুরোপাহাড়ীর ঝিলের জলে ভেসে উঠেছিল তার প্রাণহীন দেহটা, আত্মহত্যার বাকী অধ্যায়টুকু শেষ করেছিল নিজেই।

জীবনে কারুর কাছে কোন ঋণ নাই ভুপেশের, ভালবাসা— প্রেম প্রীতি কারুর কাছে সে পায়নি, কিন্তু যমুনা?

জীবনের শেষ রাত্রে তাকে বার বার মনে পড়ে, পার্টিওয়ার্ক, কর্ম্মবহুল জীবন কোন দিনই বার মাঝে কাজ ছাড়া সে নিশ্বাস ফেলেনি—সেই যাযাবর জীবনবৃত্তির মাঝেও কেমন যেন ক্ষণিকের পূর্ণচ্ছেদ!

[illegible]র পৃথিবীকে শেষ নমস্কার জানায় সে,—শ্যামল প্রান্তর— কাশবন[illegible]র শুভ্র অমলিন বাংলা মায়ের হাসি—আলো আকাশ সব জেগে [illegible], অতল অন্ধকারের মাঝে সুরহারা বাঁশীর ক্রন্দন পথছাড়া করে নি; যাক্ তাকে মরণপুরীর দেশে, দুঃখ নাই—তবু যেটুকু নিয়ে গেল সে [illegible] করে—সেই তার জীবনপথের পাথেয়—মহাপ্রস্থানের পথে! [illegible]

শক্ত[illegible] পাথরের বুকে শান্ত্রীর ভারি বুটের শব্দ স্পষ্টতর হয়ে আসে।

বিপ্লবী ভুপেশ সেন জীবনের শেষ রাত্রে চমকে ওঠে—গালের কাছে কি [illegible]নিকটা শীতল স্পর্শ পেয়ে! তার চোখেও জল আসে।

—[illegible]ক! দু'চোখ ছেয়ে জল নেমে আসুক! ধুয়ে যাক— মুছে যাক [illegible] আবিলতা—কঠিন মৃত্তিকায় মাথা নামিয়ে শেষ প্রণতি জানায় সকলকে,—যা'দিকে সে দেখেছে,—যা'দিকে দেখে নাই, চেনে না, তা'দিকেও।

ছোটদের আসর

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তি

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

অলোকসামান্য প্রতিভাশালী মহাপুরুষদের মনের গহনে ভাবুকতা ছাড়াও তাঁদের পরিচিত ছোট-বড়-মাঝারী অনেক মানুষের ছবি আঁকা থাকে। তার মধ্যে বিশিষ্ট ছবিগুলো মনকে স্পর্শ করে বলে তাঁদের উপর মনের স্থায়ী রেখা আঁকে, কিন্তু অনেক তুচ্ছ ব্যক্তি সেখান থেকে একেবারেই মিলিয়ে যায়। এটা খুবই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কত ছোট-বড়-মাঝারী লোকের পরিচয় ছিল তার আন্দাজ করাও সম্ভব নয়। তাঁর স্মরণশক্তির প্রখরতারও বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না; কখন কার সঙ্গে কতটুকু মিশেছেন, তাঁর স্মৃতির মন্দিরে কে কতটুকু রেখাপাত করেছিল—বলা খুব কঠিন। তাঁর অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির একটা সত্য কাহিনী আজ বলব।

কেতু ঢালী ছিলো ঠাকুরবাবুদের শি[illegible] কাছারীর বরকন্দাজ। ঢাল-সড়কীতে সে ছিল ওস্তাদ। তাই তার [illegible] বেশ একটু সম্ভ্রমের ছাপ দেয় প্রত্যেকের মনেই। সে মহর্ষিদেবের আমলে বহাল হয়েছিল এবং জমিদার রবীন্দ্রনাথের যৌবনে তাঁকে সড়কীর খেলা দেখিয়েছিল, তাঁর বোটে খাস বরকন্দাজ হিসেবে তাঁর সঙ্গে মিশেছিল, সেবা করেছিল, নানা জায়গায় তাঁর সঙ্গে ঘুরেছিল। সে আন্দাজ ১২৯৮ থেকে ১৩০০ সালের মধ্যে। অবশ্য কেতু ঢালীর বিশেষত্ব ছিল প্রচু[illegible] হিসাবে এবং [illegible] ভক্ত পাইক হিসাবে। কিন্তু যতই তার বিশেষত্ব থা[illegible] নিম্ন[illegible] চাকর, শিক্ষাদীক্ষাহীন, জাতিতে ভুঁইমালী। সুদী[illegible] ৩০।৩২ বছর পরেই ঐ মানুষটিকে রবীন্দ্রনাথ কেমন করে চিনলেন সেটা আশ্চর্য্যের বিষয়।

নোবেল প্রাইজ পেয়ে সম্মানের উঁচু শিখরে বসে, সা[illegible] পৃথিবীর কত শত বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে মিশে, কত বড় বড় কাজের মধ্যে আপনাকে ডুবিয়ে দিয়েও ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগের পরিচিত এক জন সামান্য নগণ্য বরকন্দাজকে তিনি কেমন অদ্ভুত ভাবে চিনতে পারলেন তা অদ্ভুত বৈ কি। সে ঘটনাটা আমার প্রত্যক্ষ দেখা।

১৩৩০ সালের শীত কালে রবীন্দ্রনাথ দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শেষ বার শিলাইদহ দেখতে যান। ঐ সময়ে তিনি সুরেন্দ্রনাথের অনেক জমিদারী কাজেরও পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু বোধ হয় তাঁর যৌবনের "শিলাইদহের সেই আনন্দ রূপ" আবার ভাল করে দেখবার ইচ্ছাও খুব হয়েছিল, কারণ তাঁর সেকালের গ্রাম ও মাঠ ভ্রমণের অভ্যাস তখনও বিশেষ কম ছিল বলে আমার মনে হল না।

এক দিন তিনি সন্ধ্যার একটু আগে যথারীতি এণ্ড্রুজ ও সুরেন্দ্রনাথের সাথে শিলাইদহের গোপীনাথদেবের মন্দির দেখে কুঠীবাড়ীতে ফিরছেন। গোপীনাথ-মন্দির থেকে বেরিয়েই সামনে পড়ে গোপীনাথ দীঘি আর বাজার। রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীদের নিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছেন, সামনেই দীঘি, একটু দূরে বাজার বসেছে। তাঁর অনুচরদের মধ্যে আমিও আছি। এক জন বেঁটে গৌরবর্ণ রোগজীর্ণ-বৃদ্ধ দীঘি থেকে হাত-পা ধুয়ে তার পানের বোঝা, লাঠী আর দুধ কিনবার ঘটি নিয়ে বাজারে যাবে, ঠিক এমনি সময়ে তার ঠিক সামনে এসে রবীন্দ্রনাথ স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, তার মুখের দিকে অবাক হয়ে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

সামনে পড়ে বৃদ্ধ বেঁটে লোকটি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল। সে জানে তাদের রবীন্দ্রনাথ বহু কাল পরে তাদের গ্রামে এসেছেন, তবে সে সব পুরোনো স্মৃতি তিনি নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন। সে একটু হাসলো, তবুও রবীন্দ্রনাথ তার মুখের দিকেই চেয়ে রয়েছেন দেখে বৃদ্ধটি আর আত্মসম্বরণ না করতে পেরে কেঁদে ফেললো। রবীন্দ্রনাথ বললেন,—"তোমার নাম কি?—তোমার নাম কি—কেতু?—না যাদব ঢালী—জন্মেজয় ঢালী? তুমি কি—?"

বৃদ্ধটি উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে বললো—"আমি হুজুর কেতু ঢালী, আজও বেঁচে রয়েছি"—বলে রবীন্দ্রনাথের পায়ে গড় হয়ে প্রণাম করলে!

রবীন্দ্রনাথ আনন্দে বলে উঠলেন—"হাঁ, চিনেছি—তুমি কেতু—কেতু ঢালী। তোমার বাবা ছিল যাদব ঢালী না জন্মেজয় ঢালী। তুমি আমাদের সেই কেতু? এ্যাতো বুড়ো হয়েছ—এমন শরীর হয়েছে তোমার?"

কেতু ঢালীর সেই দিনের বীরের মত চেহারা, তার সড়কী খেলা মনে করেই তিনি এ কথা বললেন বোধ হয়। কেতু বললো, "যাদব ঢালী আমার বাবা,—জন্মেজয় আমার কাকা। তারা আর নাই,—আ[illegible] মত।"

"তোমার এমন শরীর হয়েছে? খুব ভুগছো? পেন্‌সান পাও তো?" স্নেহার্দ্র স্বরে বললেন রবীন্দ্রনাথ।

কেতু ঢালী আবার কেঁদে ফেললো, বললো—"বাতে পঙ্গু হয়ে গেছি হুজুর। সংসারে আমার কেউ নাই। পেন্‌সান পাচ্ছি ষ্টেট থেকে, তাই এখন সম্বল। বাজারে পান বেচি। বাড়ীতে পানের 'বরোজ' আছে। হাঁপও ধরেছে—বড় কষ্ট পাচ্ছি।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"বয়েস হয়েছে, সাবধানে থেকো। তোমায় দেখে বড় আনন্দ হ'ল। অনেক দিন পরে দেখলুম; বেশ—বেশ।" এই বলে তিনি এণ্ড্রুজ সাহেবকে ইংরেজীতে কেতু ঢালীর যৌবনের সাহস ও বিক্রমের গল্প বলতে লাগলেন। তাঁর মুখে কেতু ঢালীর যৌবনের বৃত্তান্ত শুনলুম, সেই সোনার অতীতের কী সুন্দর বৈচিত্র্য-পূর্ণ বর্ণনা!

কেতু আবার তাঁকে প্রণাম ক'রে চলে গেল—তবু রবীন্দ্রনাথ তার দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন।

দেবতার রোষ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

আঙ্কোর বা ওঙ্কার-পুরীতে আজ উৎসবের শেষ নেই। এত বড় নগরী, সমস্ত পৃথিবীতে যার তুলনা মেলে না, ঐশ্বর্য্যে ও বিপুলত্বে যা বহু দিন থেকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শহর বলে গণ্য—তার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত আলো আর ফুলের মালায় সাজানো হয়েছে। সমস্ত নাগরিকের পরিধানে নতুন কাপড়, নাগরিকারা নতুন নতুন অলঙ্কারে সেজেছেন। রাজ্যের সমস্ত প্রত্যন্ত ভাগ থেকেই ফুল এসেছে, সোনার ফুলেরও অভাব নেই, তবু না কি আজ এক-একটি ফুলের মালা আট-দশ টাকায় বিক্রী হচ্ছে। বাজারে কোথাও কোন মিষ্টি খাবার নেই—সব রাজবাড়ী থেকে কিনে নিয়ে গেছে—প্রজা-সাধারণকে প্রজাধিনায়কের তরফ থেকে জলযোগ করানো হবে।

অবশ্য এ আনন্দের কারণ আছে বৈ কি! সম্রাট্ বিষ্ণুবর্ম্মণ আবার কম্বোজের লুপ্ত-গৌরব ফিরিয়ে আনতে পেরেছেন। তাঁর পূর্ব্বপুরুষরা, জয়বর্ম্মণ, যশোবর্ম্মণ, ইন্দ্রবর্ম্মণ—এঁরা একে একে যে ভাবে কম্বোজের সাম্রাজ্য-সীমা বিস্তৃত ক'রে তার শক্তিকে সার্ব্বভৌম করে রেখে গিয়েছিলেন, পরবর্ত্তী সম্রাট্‌রা সে কীর্ত্তির কিছুমাত্র মর্য্যাদা রাখতে পারেননি। সুবর্ণ দ্বীপের শৈলেন্দ্র সম্রাট্‌রা এবং মাজাপাহিতের (যবদ্বীপ) সিংহশ্রী নৃপতিরা উপর্য্যুপরি আক্রমণে আঙ্কোরের বিপুল শক্তির মূলদেশ পর্য্যন্ত টলিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, এত দিন পরে মনে হচ্ছে কম্বোজের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আবার মুখ তুলে চেয়েছেন। বিষ্ণুবর্ম্মণ সিংহশ্রীদের একটি যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছেন। চার হাজারের ওপর মাজাপাহিত সৈন্যদের বন্দী করেছেন এবং ওদের বাণিজ্য-তরী এনে নিজেদের বন্দরে আটক রেখেছেন। এর বেশী আনন্দ-সংবাদ আর ওঙ্কার পুরীর নাগরিকদের কাছে কী হ'তে পারে? আজ তাই নগরের বালক-বৃদ্ধ নারীনির্ব্বিশেষে আনন্দে মেতে উঠেছে।

সম্রাট্ বিষ্ণুবর্ম্মণের মন্ত্রী নিজে এ উৎসবের পুরোধা। তিনিই কর্ম্মসূচী তৈরী করে দিয়েছেন। সকালে নাগরিক ও নাগরিকারা স্নান করে, নতুন কাপড় পরে, নৃত্য-গীত সহকারে শোভাযাত্রা ক'রে যাবে ওঙ্কার বট মন্দিরে। সেখানে অনন্তনাগের পূজা শেষ ক'রে প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে এসে সম্রাট্‌কে দর্শন করবে এবং প্রসাদ হিসাবে কিছু মিষ্টান্ন জলযোগ ক'রে যে যার বাড়ী ফিরে যাবে। তার পর সন্ধ্যায় নিজের নিজের বাড়ীতে আলো জ্বেলে যাবে নদীতীরে—সেখানে নৌকায় বাচ্-খেলা হবে এবং নৌকার ওপরই পোড়ান হবে আতসবাজী। এ বস্তুটি একেবারে নতুন, চীন থেকে নাকি কে এক ওস্তাদ ঐন্দ্রজালিক এসেছে—সে স্বয়ং অগ্নিদেবকে করেছে করতল-গত। এই বাজী দেখার জন্যই আরো—সমস্ত নাগরিকরা অধীর হয়ে প্রতীক্ষা করছে, সুদূর গ্রাম-প্রান্ত থেকেও বিস্তর লোক এসে পৌঁচেছে।

এ-হেন উৎসবের [illegible]সা এক বিঘ্ন উপস্থিত হ'ল।

সম্রাট্ [illegible] শেষ ক'রে প্রজাদের দর্শন দিতে যাবার আগে মন্ত্রীকে প্রশ্ন করলেন, 'সঞ্জয়, গুরুদেবকে দেখছি না কেন? তিনি কোথায়? তাঁকে প্রণাম করব যে!'

সঞ্জয় মাথা [illegible] করে জবাব দিলে, 'সে প্রশ্ন আমাকে করবেন না মহারাজ, আ[illegible] দিনে ও-কথা থাক।'

'সে কি! আজকে[illegible] দিনেই যে তাঁকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।'

'তিনি [illegible] সবেন না [illegible]'

'আসবেন না? কেন [illegible] এ জাতীয় বিজয়ে কি তিনি খুশী হননি [illegible]'

'না। [illegible] তিনি [illegible], যুদ্ধ যুদ্ধই—একটা বিজয়, আর একটা পরাজয়[illegible] সূচনা[illegible] যদি না সমস্তটা মনুষ্যত্বের দিক্ দিয়ে বিবেচনা করা হয়। তিনি বলেছেন যে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সম্রাট্‌রা অকারণে বহু দেশ আক্রমণ করেছেন, বহু লোকের প্রাণক্ষয়ের কারণ হয়েছেন শুধু নিজেদের গৌরব ও ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্য। সাম্রাজ্য বাড়িয়েছেন কিন্তু বিজিত দেশগুলিকে নিজের দেশের অংশ বলে গ্রহণ করতে পারেননি। তাদের শোষণ করেছেন—শাসন করেননি। তারই ফলে তারা যদি আজ শক্তি সঞ্চয় করে আপনাদের বার বার আক্রমণ এবং ক্ষতি করে ত সে নির্য্যাতন আপনাদেরই প্রাপ্য। এমনি ভাবে পরস্পর পরস্পরকে যদি শুধুই বিজেতা ও বিজিতের মনোভাবে দেখে ত মানুষের কল্যাণ কোন দিনই হবে না। তিনি এই জয়লাভের ফল না কি প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছেন ভবিষ্যতে কাম্বোজের শোচনীয় পরাজয় এবং বহু লোকক্ষয়। সেই জন্যই তিনি ব্যথিত এবং আনন্দ উৎসবে যোগদানে অক্ষম।'

সম্রাটের মুখ রাগে ও অপমানে লাল হয়ে উঠল। তবু তিনি আত্মসংবরণ ক'রে বললেন, 'তিনি কি করতে বলেন?'

'তিনি বলেন যে, যে-সব মাজাপাহিতের নাগরিকদের বন্দী করে এনেছেন তাদের সসম্মানে ছেড়ে দিতে এবং নিজেদের ব্যয়ে তাদের দেশে পৌঁছে দিয়ে আসতে। তিনি আরও বলেন যে, ওদের বণিকদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে বাণিজ্য-তরীগুলিও ফেরৎ পাঠান উচিত এবং সিংহশ্রী সম্রাটদের কাছে আমাদের আচরণের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত।'

'কিন্তু' ব্যঙ্গের সুরে সম্রাট বললেন, 'কিন্তু উদার-হৃদয় গুরুদেব কি ভুলে গেছেন যে, আক্রমণ ওরাই আগে করেছিল, আমরা করিনি! ক্ষমা প্রার্থনা, ক্ষতিপূরণ যা কিছু ওদেরই করা উচিত, আমাদের নয়।'

'সে কথাও তাঁকে বলেছিলাম, সম্রাট্। তার উত্তরে তিনি

বললেন যে, অন্যায়ের প্রতিকার অন্যায়ে হয় না। তারা আমাদের প্রজাদের প্রতি অসৎ ব্যবহার করেছিল বলেই তোমরা যদি তার প্রতিশোধ নাও তাহলে বৃহত্তর প্রতিহিংসার জন্যই প্রস্তুত থাকতে হবে। বুদ্ধিমানের রাজনীতি হ'ল বিজিতের প্রতি ভদ্র ব্যবহার করা, হিংসা দিয়ে হিংসাকে জাগ্রত করা নয়। একটা অন্যায় আর একটাকেই ডেকে আনে।'

রাজাধিরাজ আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, সঞ্জয়, তুমি সেই বৃদ্ধকে বুঝিয়ে দাও গে যে, রাজনীতিটা সন্ন্যাসীর জন্য নয়। তা ছাড়া ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম যুদ্ধ করা, সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা, হার-জিত যুদ্ধের অঙ্গ, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা ক'রে লাভ নেই। বর্ত্তমানে জয়লাভ করেছি এইটুকুই যথেষ্ট। তিনি গুরু হ'তে পারেন কিন্তু তিনি ভুলে যাচ্ছেন যে তিনি আমার প্রজা। তাঁকে আমার আদেশ [illegible] বলো গে যে দ্বিপ্রহরের মধ্যে তাঁকে রাজপুরীতে আসতে হবে।

সঞ্জয় তখনই যাত্রা করলেন। দূত পাঠাতে ভরসা হ'ল না। গুরুদেব তখন নদীতীরে তাঁর আশ্রমে বসে গভীর শান্তির মধ্যে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করছিলেন। সঞ্জয়কে দেখে আশীর্ব্বাদ ক'রে বললেন, 'কী সংবাদ বৎস?'

সঞ্জয় রাজার আদেশ জানালেন। গুরুদেব সব শুনেও এতটুকু রাগ করলেন না, তাঁর মুখের প্রশান্তি এতটুকু ম্লান হ'ল না। বরং হেসেই বললেন, তাঁকে [illegible] দিয়ে বলো যে, অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা ক'রে কাজ করাই রাজধর্ম্ম, মানুষ মাত্রই স্বাধীন, এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করে এটা ঈশ্বরের নিয়ম নয়। তারা তোমাদের দেশ আক্রমণ করেছিল বটে কিন্তু তারা [illegible] করেছে বহু বার। তারা তোমাদের সৈন্য বন্দী ক'রে অত্যাচার করেছিল বলেই আজ তোমরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছ, কিন্তু তাই বলে আবার তোমরা যদি সেই অত্যাচারই করো ত তারাও এমনি করে সেই কথা মনে করে রাখবে। এমন করেই পৃথিবীতে হিংসা ও যুদ্ধ বেড়ে যাচ্ছে। কিন্তু এতে মানুষের কোন কল্যাণ নেই। তুমি বিষ্ণু-বর্দ্ধনকে বলো গে যে যতক্ষণ না যবদ্বীপের সৈন্যগুলিকে অতিথি হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে, ততক্ষণ এ উৎসবে আমি যোগদান করতে পারব না।'

'কিন্তু তাঁর আদেশ অত্যন্ত কঠিন গুরুদেব।'

'আমার বিবেকবুদ্ধি আরও কঠিন বৎস। বিষ্ণুবর্দ্ধন আমার ঐহিক সম্পত্তিরই অধীশ্বর, মনের নন। বিচার ও বিবেক-বুদ্ধি আমি ঈশ্বরকেই অর্পণ করেছি। আরও বলো যে তিনি যেন বলপ্রয়োগ না করেন, তাতে তাঁর দুর্ব্বলতাই প্রকাশ পাবে।'

সঞ্জয় ফিরে এসে সংবাদ দিতে বিষ্ণুবর্দ্ধন নিষ্ঠুর মোঙ্গল সৈন্যদের ডেকে পাঠালেন। এদের সাহায্যেই তিনি এবারের যুদ্ধ জিতেছেন, এই বিদেশীদের সৈন্যদলে ভর্ত্তি করার বুদ্ধি তাঁর, সেজন্য তিনি রীতিমত গর্ব্ব অনুভব ক'রে থাকেন। এই মোঙ্গল সৈন্যদের নিয়ে বিষ্ণুবর্দ্ধন নিজে চললেন সন্ন্যাসী গুরুদেবকে শাসন করতে।

তিনি তখনও তেমনি শান্ত মনে বসে পুঁথি পড়ে যাচ্ছেন। সম্রাট তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এই শেষ বার আদেশ জানাচ্ছি আপনাকে, এখনই গিয়ে আপনাকে উৎসবে যোগ দিতে হবে।'

গুরুদেব স্মিত হাস্য করে বললেন, 'বৎস, তুমি তোমার ব্যবহারে এই জাতি ও দেশকে শাসন করবার যোগ্যতা হারিয়েছ। সুতরাং গুরুর পদবী ছেড়ে দিলেও প্রজা হিসাবে আমাকে আদেশ করবার অধিকার তোমার নেই।'

ক্রোধে জ্ঞান হারিয়ে বিষ্ণুবর্দ্ধন বললেন, 'এ দেশের রাজা আমি, এখানে আমার ইচ্ছাই ন্যায়। কোন অন্যায় আমি করি না, আমার অধিকার মানুষের শুধু দেহ নয়—ইচ্ছার উপর, মনের ওপরেও, আপনাকে যেতেই হবে।'

গুরুদেব বললেন, 'হায় অন্ধ! দেশের রাজা বলে তোমার এত অহঙ্কার। এই নদীটাও ত দেশের অন্তর্ভুক্ত, একে কি তোমার আদেশ পালন করাতে পারো। তুমি কত অসহায়, ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ—কোনটার ওপরই ত তোমার হাত নেই। এই সকলের যিনি রাজা আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরকেই আমার অধীশ্বর বলে মনে করি। তুমি যাও তোমার আদেশ আমার ওপর প্রযুক্ত্য নয়।'

রাজা ইঙ্গিত করলেন মোঙ্গল সৈন্যদের। নিমেষে তারা সেই সন্ন্যাসীকে বন্দী করল—একটু পরেই সেই নির্লোভ শান্ত অহিংসা-পরায়ণ পরম তপস্বীর শোণিতধারা মেকং নদীর সলিলধারায় গিয়ে মিশল! তার দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ নিয়ে তারা উল্লাস করতে করতে রাজধানীতে ফিরে গেল। রাজাদেশ অবহেলার ফল কি তা প্রজারা প্রত্যক্ষ দেখুক; ঈশ্বর অদৃশ্য, তাঁকে মানতে গিয়ে যিনি সশরীরে বিদ্যমান সেই রাজাকে যারা অবহেলা করে, সে নির্ব্বোধদের এমনিই হয়। সবাই দেখুক, রাজা বড় কি ঈশ্বর বড়।

কিন্তু সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে, রাজা যখন মহার্ঘ্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে নৈশ উৎসবে যাত্রা করছেন, হঠাৎ তাঁর কানে খুব দূরাগত একটা গর্জ্জন এসে পৌঁছল। মেঘের ডাকের মত কিংবা জলের গর্জ্জনের মত। [illegible] শুনছেন এমন সময় বিবর্ণ মুখে সঞ্জয় এসে সংবাদ দিলে, 'রাজাধিরাজ সর্ব্বনাশ হয়েছে, নদীর উৎসব বন্ধ রাখতে হবে, নদীতে বন্যা আসছে।'

'বন্যা আসছে? এমন অসময়ে? সে কি?'

'হাঁ প্রভু। আর এমন প্রলয়ঙ্কর বন্যা আমরা কখনও দেখিনি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে জল বাড়ছে। ঐ শুনুন প্রজাদের আর্ত্তনাদ—উৎসবের আনন্দ-কোলাহল ক্রন্দন-রোলে পরিণত হয়েছে।'

সম্রাট ছুটে অলিন্দে এসে দাঁড়ালেন। সঞ্জয়ের কথা সত্য, এমন বন্যা কেউ কখনও দেখেনি। যেন মনে হচ্ছে মেকং নদী হঠাৎ পথ বদলে একেবারে রাজধানীর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। চারি দিক জল-প্লাবিত, তখনও গর্জ্জন করতে করতে পাহাড়ের মত ঢেউ ভেঙে জল ছুটে আসছে। আসছে ত আসছেই—এত-বড় বিশাল পুরীর আর কিছু বোধ হয় জেগে থাকবে না।

বিষ্ণুবর্দ্ধন পাগলের মত ছুটলেন আত্মরক্ষার জন্য। উৎসবের জন্য যে নৌকা প্রস্তুত ছিল তারই একটাতে গিয়ে বসলেন কিন্তু তখন সবাই নিজের প্রাণ বাঁচাতে ব্যস্ত—রাজা বলে কেউ খাতির করল না। তিনি যে নৌকাতে ছিলেন তাতে আরও বহু লোক এসে আশ্রয় নিলে। ধমক, ভয়-দেখানো কিছুতেই কিছু হল না। শেষে এত ভারী হয়ে উঠল নৌকা যে, বন্যার জলের একটা ঢেউ এসে লাগতেই নৌকো উল্টে গেল। বিষ্ণুবর্দ্ধন সাঁতার জানতেন কিন্তু সে স্রোতে সাঁতার কাটাও অসম্ভব। শেষে কী একটা ভাসতে ভাসতে যাচ্ছে দেখে প্রাণপণে গিয়ে সেইটেই আঁকড়ে ধরলেন।

যেটা আঁকড়ে ধরলেন—একটু পরেই বোঝা গেল—সেটা গুরুদেবেরই দ্বিখণ্ডিত মৃতদেহ!

সেই যে বন্যার জল এল সে জল আর গেল না। দিন গেল, মাস গেল, বৎসর গেল, শতাব্দী গেল—বন্যা আর সরল না। ধীরে ধীরে শহরের চতুর্দ্দিক্ জলা আর জঙ্গলে ভরে গেল, নিবিড় অরণ্যে ঢেকে গেল সেই বিপুল শহর আর সেই বিরাট মন্দির। এত বড় ঐশ্বর্য্য এবং শক্তির কোন চিহ্ন রইল না।

এর বহু শতাব্দী পরে এক ওলন্দাজ ভদ্রলোক জলা-জঙ্গলের মধ্যে শিকার করতে গিয়ে হঠাৎ ওঙ্কার বট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখতে গিয়ে চমকে উঠেছিলেন। এত বড় দীর্ঘায়তন মন্দির জঙ্গলের মধ্যে, নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে চামচিকা বাদুড় আর সাপের বাসা হয়ে। আশ্চর্য্য! ক্রমে মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে শহরটাও আবিষ্কৃত হ'ল। সবাই অবাক্ হয়ে গেল এই ভেবে যে, এত বড় শহর কবে এমন ভাবে জঙ্গলে ঢেকে গেল, আর এমন ক'রে এ শহর ছেড়ে দেশের লোক পালালই বা কেন! শহর পুরোনো হ'লে এক সময়ে মাটির নীচে ঢাকা পড়ে কিন্তু এর বাড়ী-ঘর যে এখনও ঠিক রয়েছে, এমন কি কতক বাড়ী তৈরী হ'তে হ'তে সেই অর্দ্ধ-সমাপ্ত অবস্থাতেই থেকে গেছে যে!

কেন এমন হ'ল—কী ক'রে এমন হ'ল?—এই প্রশ্নই সবাই আজও করছে। কিন্তু জবাব কেউ পায় না!

গল্প হলেও সত্যি

অশোককুমার বসু

১৯৪২ শতকের প্রায় শেষ অধ্যায়···নূতন অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত ভারতের জনগণ।

শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে, পথে পথে বিপ্লবের বাণী। এলো ১৯৪২এর আগষ্ট। এলো গ্রেপ্তারের পালা। মুক্তিকামী ভারতের জনগণের সূচনা হোলো নূতন অধ্যায়···নূতন ইতিহাস।

এলো প্রাণে নব জাগরণ···জাগ্রত ভারত।

মনে আশা, বুকে ভরসা, হৃদয়ে দৃঢ়তা···ভারতের জনগণ।

গাড়ী ছোটে নেতাদের নিয়ে···সশস্ত্র প্রহরী বেষ্টিত।

মুক্তিসাধক মঙ্গলকামী ভারতের এক নেতা···ট্রেনে বসে··· পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, চিন্তামগ্ন।

ঝু ঝু শব্দে গাড়ী ছোটে।

বিরাট ষ্টেশন···বোম্বে···বিরাট ছাত্র-সমাবেশ। গাড়ী থামে। চারি দিকে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি···সবাই চায় একবার দর্শন।

হঠাৎ লাঠি এসে পড়ে নিরপরাধ ছাত্রদের উপর···বৃটিশরাজের লাঠি। ক্রোধে, দুঃখে, অপমানে অস্থির হয়ে পড়েন তিনি।

ভবিষ্যৎ ভারতের নিয়ন্তা, শান্ত নিরপরাধ ছাত্রদের উপর লাঠি চার্জ?

ঝাঁপিয়ে পড়েন ট্রেনের জানালা দিয়ে···

বজ্রমুষ্টি হাতে এগিয়ে যান··· জনতার মধ্যে

প্রচণ্ড এক ঘুসি লাগিয়ে দেন এক প্রহরীকে। অন্যায়ের প্রতিবাদ।

উনি কে জান?

পরাধীন ভারতের স্বাধীনতাকামী বিপ্লবী নেতা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু।

উৎসর্গ

মনোজিৎ বসু

জীবন দিয়ে জীবন দান, সে কি সহজ কথা?

সহজ না হ'লেও, মনুষ্যত্বই মানুষকে এই প্রেরণা জোগায়। মানুষ তখন ভুলে যায় নিজের অস্তিত্ব, ঝাঁপিয়ে পড়ে অন্যকে রক্ষা করতে।

এই ক'লকাতার-ই [illegible]তোলা অঞ্চলের এক তরুণ এটর্ণী। নাম তাঁর যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। পরের জন্য নিজের জীবনকে উৎসর্গ ক'রে তিনি [illegible] হৃদয়ে অমরত্ব লাভ করেছেন। কিন্তু ক'জনা তোমরা এ [illegible] দান? কেই বা লিখে রেখেছে এই মহৎ প্রাণের কথা?

তিনি এক দিন গঙ্গার ঘাটে নাইতে [illegible] বেজায় ভিড় হয়েছে সেখানে, [illegible] নদী তখন কানায়-কানায় [illegible] উঠেছে স্রোত চলেছে তীব্র বেগে বাধাবন্ধহীন পথে।

[illegible] নজরে পড়লো কে এক জন স্নান করতে গিয়ে অগাধ জলে প'ড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে। কখনো ডুবছে কখনো উঠছে—আর অসহায় ভাবে কাতর কণ্ঠে চীৎকার করছে। "গেল, গেল, ডুবে গেল, [illegible]—যাঃ।" চকিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন যোগেন্দ্রনাথ। জল ঠেলে ছুটে চললেন সেই মরণ-পথযাত্রী লোকটির দিকে। তীরের লোক তখন বিস্ময় দৃষ্টিতে সেই দৃশ্য দেখছে।

লোকটা তখন ডুবতে ডুবতে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে পড়েছিল। যোগেন বারবার তাকে ধ'রে একবার তোলেন, আবার সে ডুবে যায়। আবার তোলেন, আবার ডোবে। এমনি ক'রে স্রোতের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে বিপন্ন লোকটিকে তিনি বাঁচাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তিনিও হাঁপিয়ে ওঠেন।

ঠিক সেই সময়, একখানা নৌকা এসে পড়ে তাঁদের কাছে, তাঁদের দু'জনের জীবনরক্ষা করতে। যোগেন বাবু তখনও সেই লোকটিকে কোনো রকমে জলের ওপর তুলে ধ'রে আছেন। নৌকার লোকেরা ও বক তুলে নিয়ে যেই যোগেন বাবুকে তুলতে যাবে, সেই মুহূর্ত্তে প্রপ্রবল স্রোত এসে অবসন্ন যোগেন বাবুকে টেনে নিয়ে যায় অগাধ জলে।

গঙ্গার অতল-গহ্বরে তাঁর সমাধি হয়ে যায়।

অনেক চেষ্টা ক'রেও কেউ আর তার সন্ধান পায় না।

স্নানার্থী নর-নারীর চোখ থেকে হয় তো কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝ'রে পড়ে।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

[illegible]ইশ

জলগ টিকটিকি [illegible]

গভীর রাত্রে জয়ন্ত হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে ঘুম ভাঙিয়ে দিলে মাণিকের।

মাণিক ধড়্‌মড়্‌ ক'রে বিছানার উপরে উঠে ব'সে বললে, "ব্যাপার কি জয়? আবার কোন বিপদ ঘটল না কি?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "বিপদ নয় মাণিক, বিপদ নয়। শোনো—" [illegible]

শোনা গেল, খানিক দূর থেকে কে আবৃত্তি করছে—

"আরনাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বুড়ো বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা,
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।"

মাণিক বললে, "ঐ তো পলাতক ভুবো পাগ্‌লার গলা।"

জয়ন্ত বললে, "হ্যাঁ, ভুবো যে এখানকার মাটি ছেড়ে নড়তে পারবে না, সেটা আমি আগেই আন্দাজ করেছিলুম। মাণিক, তোমার শরীর এখন সুস্থ হয়েছে?"

"—হ্যাঁ। কিন্তু এ কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?"

—"খুব সম্ভব ভুবো বাগানের পুকুর-পাড়েই আছে। আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখতে চাই সেখানে সে কি করছে। তুমিও কি আমার সঙ্গে আসবে?"

এক লাফে নীচে নেমে মাণিক বললে, "সে কথা আবার বলতে!"

তাড়াতাড়ি জামা প'রে দুজনে বেরিয়ে পড়ল।

আকাশে একাদশীর চাঁদ। রাত্রেও মানুষের দৃষ্টি অন্ধ নয়।

জয়ন্তের অনুমান সত্য। পুকুরের দক্ষিণ পাড়ে ঠিক বটগাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল একটা মানুষের মূর্ত্তি। নিশ্চয়ই ভুবো পাগলা।

মিনিট কয়েক সে নীরবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার পর হঠাৎ বট গাছের পশ্চিম দিক্ ধ'রে হন্ হন্ করে এগিয়ে যেতে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "আজ আর ভুবোর সঙ্গ ছাড়া হবে না। ও কোথায় যায়, দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে।"

—"কেন বল দেখি?"

—আমি ভুবোকে সাধারণ পাগল ব'লে মনে করি না। আমার বিশ্বাস, ও অকারণে পাগ্‌লামির ঝোঁকে ওদিকে যাচ্ছে না, ওর ঐ পথ-চলার ভিতরে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।"

—"জয়ন্ত, তোমার এই সন্দেহের কারণ আমি বুঝতে পারছি না।"

জয়ন্ত জবাব না দিয়ে অগ্রসর হ'তে লাগল। খানিকক্ষণ কেটে গেল।

মাণিক বললে, "আমরা বোধ হয় আধ ঘণ্টা ধ'রে পথ চলছি। এই ভাবেই আজকের রাতটা পুইয়ে যাবে না কি?"

জয়ন্ত বললে, "যেতে পারে। মাণিক, একটা বিষয় লক্ষ্য করেছ?"

—"কি?"

—"ভুবো মাঠ ভেঙে এগিয়ে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একবারও বাঁয়ে কি ডাইনে ফিরছে না, সুব্রত বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে সে অগ্রসর হয়েছে একেবারে সোজাসুজি।"

—"তার দ্বারা কি প্রমাণিত হয়?"

—"একটু পরেই বুঝতে পারব।"

আরো খানিকক্ষণ গেল। মাণিক বললে, "ক্ষ্যাপার পাল্লায় প'ড়ে আমরাও ক্ষেপে গেলুম না কি?"

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "না মাণিক, না! ঐ দেখ, ভুবো দাঁড়িয়ে পড়ল! আমরা আজ এক ক্রোশ এক পোয়া পথ পার হয়েছি।"

—"এতটা নিশ্চিত হ'লে কি ক'রে?"

—"কারণ ভুবো পাগলা এইখানে এসে থেমেছে।"

—"এ কি রকম হেঁয়ালি?"

—"হেঁয়ালি নয় হে, হেঁয়ালি নয়!

"হেঁয়ালির ভিতরে আমি পেয়েছি অর্থের সন্ধান! দেখ, দেখ, ভুবোর রকম দেখ!"

ভুবো এইবারে সত্যসত্যই পাগলের মত চারি দিকে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াতে লাগল—পূর্ব্বে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে!

মাণিক একটা গাছের আড়াল থেকে উঁকি মেরে সবিস্ময়ে বললে, ভুবোর হাব-ভাব দেখে মনে হচ্ছে, ও যেন কি খুঁজছে, কিন্তু খুঁজে পাচ্ছে না।"

—"কিন্তু কি খুঁজছে?"

—"ভগবান জানেন। হয়তো পাগলটা ভেবেছিল এইখানেই ফলে সোণার আনারস!"

—"আমিও তো ঐ রকমই একটা অসম্ভব আশা করেছিলুম!"

—"যাও, যাও, বাজে বোকো না!"

—"বাজে নয়, সত্যি বলছি। আমার দৃঢ় ধারণা, সুব্রত বাবুর বাড়ী থেকে বেরিয়ে ভুবো প্রায়ই এই পর্য্যন্ত আসে। কিন্তু যা পাবার আশায় এত দূর আসে তা আর খুঁজে পায় না। 'ক্ষ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ-পাথর।' কিন্তু কোথায় পরশ-পাথর? সেই দুঃখেই বোধ হয় ওর মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে।"

মাণিক একটু ভেবে বললে, "কিন্তু কথা হচ্ছে, ভুবো এতখানি পথ পার হয়ে ঠিক এইখানেই বা এসে থামল কেন?"

মাণিকের পিঠ চাপড়ে জয়ন্ত বললে, "ঠিক বলেছ! তোমার

এই প্রশ্ন হচ্ছে একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন। এবারে ঐ প্রশ্নেরই উত্তর খুঁজতে হবে।"

—"কার কাছে উত্তর খুঁজবে? ভুবোকে কিছু জিজ্ঞাসা করা মিছে, কারণ নিজেই সে কোন উত্তর খুঁজে পায়নি।"

—"ভায়া, উত্তর খুঁজব আমার নিজের মনের ভিতরেই। ভুবোর মুখ চেয়ে তো আমরা এখানে আসিনি।"

হঠাৎ ছুটোছুটি থামিয়ে ভুবো দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পর ধীরে ধীরে আউড়ে গেল—

"পশ্চিমাতে পঙ্ক পোয়া,
    পুষি-মামার ঝিকমিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
    খেলছে জগৎ টিকটিকি।—

হায় রে হায়, সব গুলিয়ে গেল, সব গুলিয়ে গেল। ওরে বাবা টিকটিকি, কোথায় আছিস্ তুই, কে তোকে তাড়িয়ে দিলে বাপধন?"

ঠিক সেই সময়ে কাছের একটা ঝোপে ঠেলে বেরিয়ে এল আর এক মনুষ্য-মূর্ত্তি। সে খুব সন্তর্পণে পা টিপে টিপে পিছন থেকে ভুবোর দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

জয়ন্ত বললে, "প্রশান্ত চৌধুরীর চর এখনো ভুবোর পিছনে লেগে আছে? নিশ্চয়ই ওকে আবার ধ'রে নিয়ে যেতে চায়? চল মাণিক, আমরাই ওকে গ্রেপ্তার করি।"

জয়ন্ত ও মাণিক গাছের আড়াল ছেড়ে বেগে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু লোকটা যেমন সাবধানী, তেমনি চটপটে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে তাদের দেখে ফেললে। পরমুহূর্ত্তেই সে একটা জঙ্গলের দিকে দৌড় মারলে তীরের মত।

তার পা লক্ষ্য ক'রে জয়ন্ত ছুঁড়লে রিভলভার। কিন্তু রাত্রের ঝাপসা আলোয় লক্ষ্য ভেদ করতে পারলে না। লোকটা জঙ্গলের ভিতরে অদৃশ্য হ'ল।

জয়ন্ত ও মাণিক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকল, কিন্তু পলাতকের কোন পাত্তাই মিলল না, দেখলে খালি চাঁদের আলো-ফিতে-গাঁথা অন্ধকারকে।

তারা বাইরে বেরিয়ে এল। সেখানে ভুবো পাগলাকেও দেখতে পেলে না।

মাণিক বললে, "পাগলা ভয় পেয়ে আবার পালিয়েছে। এখন কি করবে?"

—"অতঃপর ভাবতে ভাবতে বাসায় ফিরব। তার পর ঘুমিয়ে পড়ব। তার পর সকালে উঠে সুব্রত বাবুকে দু'-একটা কথা জিজ্ঞাসা করব। তার পর দলবলে আবার এখানে আগমন করব।"

—"আবার এখানে আসবে?"

—"নিশ্চয়, নিশ্চয়।"

—"কেন?"

—"জগৎ টিকটিকি প্রভৃতি আরো অনেক কিছুর সন্ধানে।"

—"ভুবোর সঙ্গে তুমিও টিকটিকি নিয়ে মাথা ঘামাতে চাও না কি?"

—"মাথা না ঘামিয়ে উপায় নেই।"

—"বুঝেছি জয়। তুমি একটা কোন হদিস্ পেয়েছ।"

—"রহস্যের সিংহদ্বার খোলবার জন্যে একটা চাবিকাটি কুড়িয়ে পেয়েছি। কিন্তু অনেক কালের পুরানো মর্চ্চে-পড়া চাবি, এখনো কুলুপে ভালো ক'রে লাগছে না। অপূর্ব্ব এই সোনার আনারসের ছড়া। এর প্রত্যেক কথাটির অর্থ যে কোন শ্রেষ্ঠ কবিতারও চেয়ে গভীর। কিন্তু জেনে রাখো, এ মামলার কিনারা হ'তে দেরি নেই।"

[ক্রমশঃ

নেমন্তন্ন!

শ্রী[illegible] চক্রবর্ত্তী

"বিনি, কী [illegible]বি বল্? তাহলে জমাট নি'।
ডেকে তো[illegible] মোরে, গেছে জোর হাঁটনি।
[illegible] বিনি-খর্চায়,
[illegible] খাব যতো ধড় চায়।
এক [illegible]
[illegible]
"কেন [illegible]ই খাই রে"
বিনি বলে, "ভাই রে,
[illegible]খেছি যা একখানা—নাম তার চাটনি।
[illegible]লে আর ভুলবা না, খায় তাহা লাট নি।
কেন করো ছট্‌ফট্?"

"আন্ তবে চট্‌পট্
[illegible]ড়ো দেখে এক pot, চাটনির চাট নি'।"

[illegible]নি বলে, "আনব তো, খেতে হবে সাঁটনি।"

[illegible]আরে, এ কী রেঁধেছিস্, উচ্ছের ঘাঁটনি?
[illegible]য়ে তাতে গুচ্ছের লঙ্কার বাঁটনি?
[illegible]তো মুখ জ্বলে যায়—এই তোর চাটনি?"

"[illegible]নো না কি, পাক-প্রণালীর আমি পাঠ নি'?
শুন্‌বে না বারতালা
খেতে হবে চার থালা,
চেটে পুঁছে চেটে পুটে, চলবে না ছাঁটনি।
বিস্তর ঘেঁটে ঘুঁটে
রেঁধেছি যা খেটে খুটে—"

"আমারো কি খেতে হায়, হবে কম খাটনি।"

শ্রীরবিনর্ত্তক

২০

নিপুণককে বিদায় দিয়ে কৌটিল্য হাঁক দিলেন—'শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব!'

যে শিষ্যটি সদরে পাহারায় ছিলেন, তিনি তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন—'প্রভু! কি আদেশ'?

কৌটিল্য—'বৎস! দোয়াতকলম ও পত্র নিয়ে এস'। শিষ্য চোখের পলক না ফেলতে সব এনে হাজির করলেন।

চাণক্য কলম হাতে আপন মনে ভাবতে লাগলেন—'এই এক চিঠির চালে রাক্ষসকে মাত করতে হবে'। এমন সময় রাজবাড়ীর প্রতিহারী শোণোত্তরা 'আর্যের জয় হোক' বলে সাম্‌নে এসে প্রণাম ক'রে দাঁড়াল। চাণক্য বুঝলেন প্রতিহারী তাঁর মনের ভাব টেনে 'জয়' শব্দ উচ্চারণ যখন করেছে তখন এ ... জয় নিশ্চিত হবে। মুখে বললেন—'কি ... শোণোত্তরা! কি খবর'? শোণোত্তরা জোড়হাতে বললে—প্রভু! মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপনার শ্রীচরণে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন—আজ পর্ব্বতেশ্বরের শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তিনি ম্লেচ্ছরাজের ... গয়নাগুলি ব্রাহ্মণদের দান করতে চান। প্রভু! যদি ব্যবস্থা করে দেন, তিনি কৃতার্থ হবেন। ... ভাল কথা। পর্ব্বতেশ্বর আমাদের বড় বন্ধু ছিলেন। ... গয়না ত ... ব্রাহ্মণকে দেওয়া ভাল দেখায় না—বেশ পণ্ডিত ও ... ব্রাহ্মণদেরই সে সব দামী গয়না দেওয়া উচিত। শোণোত্তরা, তুমি মহারাজকে গিয়ে বল যে আমি এক দণ্ডের মধ্যেই দান নেবার উপযুক্ত পাত্র ব্রাহ্মণ তাঁর কাছে পাঠাচ্ছি'। শোণোত্তরা প্রণাম করে চলে গেল। চাণক্য তখন শার্ঙ্গরবকে বললেন—'বিশ্বাবসু ও তাঁর দুই ভাইকে আমার নাম ক'রে ব'লে এস—যেন রাজার কাছ থেকে তারা এখনই অলঙ্কার দান নিয়ে আসে—আর ফেরবার পথে যেন আমার সঙ্গে দেখা ক'রে যায়।' শিষ্যও গুরুর আদেশ পালন করতে বেরিয়ে গেলেন।

চাণক্য আবার ভাবতে বসলেন—'চিঠির শেষ দিকে যা লেখা হবে, তার ব্যবস্থা ত হ'ল। এখন গোড়াটায় কি লেখা যায়? ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর মনে হ'ল—ঠিক হয়েছে! ম্লেচ্ছরাজের সামন্তদের মধ্যে পাঁচ জন রাক্ষসের খুব বন্ধু আছেন—কুলুতের সামন্ত চিত্রবর্ম্মা, মহাবীর মলয়পতি সিংহনাদ, কাশ্মীররাজ পুষ্করাক্ষ, সিন্ধুপতি সিন্ধুষেণ ও পারসীকরাজ মেঘ। এদের নাম নিয়ে একখানা চিঠি লেখা যাক্'। একটু পরেই আবার কি ভেবে ঠিক করলেন যে, না, কোন লিখে কাজ নেই—তাতে সন্দেহ হ'তে পারে। তাই তিনি তাঁর শিষ্য শার্ঙ্গরবকে ডেকে বললেন—'বৎস! বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের হাতের লেখা প্রায়ই হ'য়ে থাকে খুব অস্পষ্ট। বিশেষ ক'রে আমার নিজের লেখা ত আমি ছাড়া আর কেউই পড়তে পারে না। তাই আমার নাম ক'রে আমার চর সিদ্ধার্থককে গিয়ে বল যে—এই মর্ম্মে একখানা চিঠি যেন কায়স্থ শকটদাসকে দিয়ে লিখিয়ে নেয়। যাকে চিঠি লেখা হচ্ছে বা যার নামে লেখা হচ্ছে—সে দু'জনের কারুরই নাম এ চিঠিতে থাকবে না'। এই বলে তিনি শিষ্যের কাণে কাণে চুপি-চুপি চিঠির মর্ম্ম জানিয়ে দিলেন। (এখন এ চিঠির মর্ম্ম পাঠকদের কাছে গোপন থাক—যথাসময়ে তা জানা যাবে।) শিষ্যবর ত 'যে আজ্ঞা' ব'লে বেরিয়ে গেলেন।

দণ্ডখানেকের মধ্যেই সিদ্ধার্থক চিঠি নিয়ে এসে হাজির করল। চমৎকার হাতের লেখা শকটদাসের—যেন মুক্তা সাজান। চাণক্য ত দেখে মুগ্ধ হ'য়ে পড়লেন। সিদ্ধার্থক তাঁর আদেশে রাক্ষসের নামওয়ালা আংটিটি দিয়ে চিঠিখানি শীলমোহর করে দিলে।

এর পর চাণক্য সিদ্ধার্থকের উপর দু'টি কাজের ভার চাপালেন। প্রথম—একটু বাদেই যেতে হবে সিদ্ধার্থককে শ্মশানে। সেখানে গিয়ে সিদ্ধার্থক দেখবে যে কায়স্থ শকটদাসকে শূলে দেওয়া হচ্ছে। সিদ্ধার্থক তলোয়ার ঘুরিয়ে চেঁচামেচি করলেই ঘাতকেরা ভয়ে পালিয়ে যাবে—এই ভাবের শিক্ষা তাদের অবশ্যই আগে থাকতে দেওয়া থাকবে। তারা পালালেই সিদ্ধার্থক শকটদাসের হাত-পায়ের বাঁধন খুলে তাকে সঙ্গে নিয়ে পালিয়ে উঠবে একেবারে রাক্ষসের আড্ডায়। শকটদাস নিশ্চিত তার প্রাণরক্ষার জন্যে সিদ্ধার্থককে পারিতোষিক দিতে চাইবে। সিদ্ধার্থক তা নিলেও কোন ক্ষতি হবে না বরং নেওয়াই ভাল। রাক্ষসের ওখানে সিদ্ধার্থক কিছু কাল থেকে রাক্ষসের সব কাজ করবে—যতটা পারে রাক্ষসের বিশ্বাস জন্মাবার চেষ্টা করবে। এই হ'ল প্রথম কাজ। তার পর দ্বিতীয় কাজটি যখন সময় হবে তখন করবে। সে কাজটি চাণক্য সিদ্ধার্থকের কাণে কাণে ব'লে দিলেন। (সেও এখন পাঠকদের জানবার দরকার নেই। ঠিক সময়ে সব জানা যাবে)।

এর পর চাণক্য আবার শার্ঙ্গরবকে ডেকে বললেন, 'বৎস! গিয়ে বল নগরের কোটাল দু'জনকে যে—'মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আদেশ দিচ্ছেন যে, জৈন সন্ন্যাসী ক্ষপণক জীবসিদ্ধিকে যেন তারা এখনই গাধার পিঠে চাপিয়ে নগর থেকে বার ক'রে দেয়। নগরের লোকেদের সেই সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে যে—এ লোকটা রাক্ষসের গুপ্তচর—এই রাক্ষসের পাঠানো বিষকন্যা দিয়ে আমাদের পরম বন্ধু পর্ব্বতককে মেরে ফেলেছে। তার ... দণ্ডপাশিকের উপর আর একটা ভার দেওয়া গেল যে এখনই যেন তারা কায়স্থ শকটদাসকে ধরে এনে শ্মশানে শূলে দেবার ব্যবস্থা করে—জন দুই খুব পাকা ঘাতক যেন এ কাজে লাগায়—তবে খুব হুঁসিয়ার কেউ যেন তাদের হাত থেকে শকটদাসকে ছিনিয়ে নিতে না পারে—কারণ শকটদাসেরও পৃষ্ঠপোষক রাক্ষস নিজে'।—এই পর্য্যন্ত ব'লে চুপি চুপি শিষ্যকে বললেন—'কোটালদের বোলো যে ঘাতকদের যেন শেখানো থাকে যে কেউ তলোয়ার নিয়ে শ্মশানে গিয়ে পড়লে তারা যেন প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালাচ্ছে এই ভাব দেখায়. অবশ্য কথাটা খুব গোপনীয়—কেন প্রকাশ না পায়'।

শিষ্য একটু হেসে বললেন—'যে আজ্ঞা. প্রভু'!

সঙ্গে সঙ্গে চাণক্য গম্ভীর হ'য়ে বললেন—'সাবধান শার্ঙ্গরব! এ হাসির ব্যাপার নয়। চাণক্য তোমায় কোন কথা খুলে বলেছেন—এ যেন তোমার হাসিতে না বেরিয়ে পড়ে। যেন, তা হ'লে চাণক্যের ক্ষমা পাবে না। যাও'। শিষ্যের মুখ ভয়ে শুকিয়ে গেল। তিনি তাড়াতাড়ি প্রণাম ক'রে পালালেন আচার্য্যের সাম্‌নে থেকে ছুটে।

এইবার সিদ্ধার্থকের হাতে সেই শীলমোহর করা শকটদাসকে দিয়ে লেখান চিঠিখানি দিয়ে বললেন—'সিদ্ধার্থক! খুব সাবধানে চিঠিটা লুকিয়ে রেখো, সময় মত এর ব্যবহার কোরো। এখন শ্মশানে যাও—শকটদাসকে বাঁচাবার অভিনয় করো গে। যাও, তোমার কার্য্যসিদ্ধি হোক্'।

অর্দ্ধ দণ্ড বাদে শার্ঙ্গরব ফিরে এলেন—'প্রভু! কালপাশিক দণ্ডপাশিক—দুই কোটাল দুই কাজে চ'লে গেছেন দেখে এসেছি'। চাণক্য—'বেশ কথা। এখন মণিকার শ্রেষ্ঠী চন্দনদাসকে একবার

ডেকে আন ত—বল যে আমি এখনই তার সঙ্গে দেখা করতে চাই'। শিষ্য আবার ছুটলেন প্রভুর কাজে।

চাণক্যের ডাক—শুনেই ত চন্দনদাসের আত্মারাম খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড়। তিনি ভাবতে ভাবতে আসছিলেন শার্ঙ্গরবের সঙ্গে—'চাণক্য ডাকলে নির্দোষ লোকেরও ভয়ে পিলে চমকে ওঠে—আর আমি ত দোষী—রাক্ষসের স্ত্রী-পুত্রকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছি—আমার ত কথাই নেই'।

চাণক্যের সামনে এসে শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস ত সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ক'রে জোড়হাতে দাঁড়ালেন। চাণক্য মৃদু হেসে বললেন—'এসো, শ্রেষ্ঠী, ব'স এই আসনে'। চন্দনদাস তখন আপন মনেই ভাবছেন—'বাবা! চাণক্যের মুখে হাসি—আবার এত আদর। না জানি বরাতে আজ কি আছে'! মুখ ফুটে বললেন—'প্রভু! আপনার সামনে বসবার ধৃষ্টতা আমার নেই—এই মাটিতেই বসছি'। চাণক্য—'না, না, তা কি হয়, তুমি যে অতিথি'। চন্দনদাস ভাবলেন—'দেখছি বড়ই বেগতিক'। মুখে 'যে আজ্ঞে' ব'লে বসলেন আসনে।

চাণক্য প্রথমেই বাড়ীর সকলে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। তার পর ব্যবসাতে লাভ কি রকম হচ্ছে—এই সব কথা আরম্ভ করলেন। চন্দনদাস শুকনো মুখে কোন রকমে জবাব দিচ্ছেন আর ভাবছেন—'এত আদর ত ভাল নয়'!

ধীরে ধীরে চাণক্য কথা পাড়লেন—'আচ্ছা, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যে যে সব অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে তা দেখে প্রজারা বোধ হয় পুরানো নন্দরাজাদের জন্যে খুব আক্ষেপ করে—কি বল চন্দনদাস'?

চন্দনদাস—'সে কি কথা, প্রভু! চন্দ্রগুপ্ত যে শরতের পূর্ণচ[illegible] এঁতে কি কোন দোষ আছে'!

চাণক্য—'তাই না কি। তা হ'লে তোমরা সবাই চন্দ্রগুপ্তকে ভালবাস'?

চন্দনদাস—'নিশ্চিত'।

চাণক্য—'তবে তাঁর প্রিয় কাজ করা ত তোমাদের উচিত—কি বল'?

চন্দনদাস—'নিশ্চয়। অপ্রিয় ত কিছু করিনি'।

চাণক্য—'করেছ বৈ কি'!

চন্দনদাস—'দোহাই প্রভু! ও কথা বলবেন না। আগুনের সঙ্গে কি কখন খড়ের গাদার বিরোধ হ'তে পারে'?

চাণক্য—'বেশ। তাই যদি বোঝ, তবে রাক্ষসের পরিবার তোমার বাড়ী লুকিয়ে রেখেছ কেন'?

চন্দনদাস—'প্রভু! এ মিথ্যা খবর। কেউ নিশ্চয় আমার সঙ্গে শত্রুতা করবার উদ্দেশ্যে মিছে ক'রে আপনার কাছে লাগিয়েছে'।

চাণক্য—'আহা! উত্তেজিত হোয়ো না। অনেক সময় এমন হয় যে, আগের রাজার মন্ত্রীরা ভয়ে তাড়াতাড়ি পালাবার সময় নিজেদের পরিবারবর্গ কোন বন্ধুর বাড়ীতে রেখে গেলেন। সেটি খুবই স্বাভাবিক। তবে সে কথাটা লুকিয়ে রাখা ঠিক নয়'।

চন্দনদাস—'হাঁ প্রভু! রাক্ষস তাঁর পরিবারবর্গ আমার বাড়ী রেখে গিয়েছিলেন বটে'।

চাণক্য—'তবে যে একটু আগেই বললে—সব মিছে কথা'!

চন্দনদাস ধরা প'ড়ে গেছেন। কি আর উত্তর দেবেন—চুপ

চাণক্য—'রাক্ষসের পরিবারবর্গকে আমার হাতে দিয়ে দাও। আমি তোমার কাছে শপথ করছি—আমি তাদের উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়ে আমার বাড়ীতে রাখব। কারুর কোন সম্ভ্রমহানি হবে না—বা জীবনের আশঙ্কাও নেই'।

চন্দনদাস—'প্রভু! আমি ত বললুম—রাক্ষস আমার বাড়ীতে রেখে গিয়েছিলেন তাঁদের। এখন তাঁরা নেই কেউ'।

চাণক্য—'কোথায় গেলেন সব'?

চন্দনদাস—'তা ত জানি না'।

চাণক্য—'জান না, বটে! চাণক্যকে চেনোনি—শ্রেষ্ঠী চন্দনদাস! নন্দবংশের চাণক্য কি ভাবে—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন। আবার বললেন—'তোমাদের [illegible] ধারণা যে মন্ত্রী রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তকে হটি[illegible]? জেনো—সেক্ষমতা তাঁর নেই। এই চাণক্য য[illegible] দিন [illegible] তদিন রাক্ষসের কোন জারিজুরিই খাটবে না'।

চন্দনদাস [illegible] ভাবছিলেন—'চাণক্য ত সত্যিই কোন বৃথা বাগাড়ম্বর করেন নি'।

এমন সময় [illegible] গণ্ডগোল শোনা গেল। [ক্রমশঃ।

ব্যথা

শ্রী[illegible]টক বন্দ্যোপাধ্যায়

চুপ ক'রে বসেছিল কাননের পাশে
একে একে ফুটছিল ফুল
ফুলের গন্ধ বয়ে হাওয়া ধেয়ে আসে
ওড়ে ওর ফুরফুরে চুল।
ভাবছে কি নিজ মনে জানে না তা কেউ
মুখপানে যবে চেয়ে রয়।
মাঠে মাঠে বয়ে যায় সবুজের ঢেউ
আকাশেতে কারা কথা কয়।
শেলেট রয়েছে পড়ে'—আর খোলা বই
পড়াতে নেইক তার মন।
নীল আঁখি পাখী ডাকে—ফুল-শাখে তাই
সুরে সুরে কাঁপে সারা বন।
কারো ত ভাবনা নেই সবে আছে সুখে
হাসাহাসি আর দোলা দুলে।
ও কেন একলা?—ওর কি ভাবনা বুকে?
পড়ে' আছে কেন খেলা ভুলে?
পায়নি কি মার চুমা—দিদির আদর!
দাদা কি বকেছে আজ ভোরে?
সারা মুখে ছায়া খেলে বেদন বাদর
দুটি আঁখি ভরে' যায় লোরে।
তিন মাস পুষেছিল—খাঁচাতে যে পাখী
হঠাৎ সে গেছে আজি উড়ে।
আকাশে বাতাসে মন ফেরে তারে ডাকি
ব্যথাতে গিয়েছে বুক জুড়ে।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

ঘরে-বাইরে

বন্দনা দাশগুপ্ত

আমাদের দেশের বর্ত্তমান অবস্থার মধ্যে যে জিনিসটা প্রকট হয়ে চোখে ধরা পড়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের এই দেশ-জোড়া দারিদ্র্য। আমাদের পরাধীনতা এই দারিদ্র্যের জন্য বহুল পরিমাণে দায়ী হলেও আমাদের প্রচলিত সামাজিক নিয়ম-কানুনও এতে কম সাহায্য করেনি।

আমাদের দেশে শুধু এক জন কি দু'জনের আয়ের ওপরই সমস্ত পরিবার নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর ক'রে থাকে; ফলে সমস্ত পরিবারের ভাল ভাবে ভরণপোষণ হওয়া কষ্টকর হ'য়ে দাঁড়ায়, বিশেষ ক'রে আজকের পরিস্থিতিতে। আমাদের পরিবার গঠনের নিয়ম এমনই যে, অপরের আয়ের ওপর নির্ভর যাদের করতে হয়, তাদের বেশীর ভাগই স্ত্রীলোক। যে কোনো পরিবারের মহিলারা সংসার চালানোটুকু ছাড়া অর্থকরী কোনো কাজই করে না, এমন কি অনেকেই শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী হওয়ার উপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কর্ম্মজগতে আসতে পারে না আমাদের সমাজের নিয়মানুসারে। মেয়েরা ছেলেদের সঙ্গে কাজ করবে, এ কথা আজও আমাদের বহু ভাই, বহু স্বামী মেনে নিতে পারে না। তাদের সংস্কার—বাইরে ছেলেদের সঙ্গে কাজ করায় মেয়েদের সম্মান নেই—শ্লীলতা নেই।

আমাদের সমাজ—আমাদের শিক্ষিত পুরুষ জাতি বরাবর মেয়েদের ঘরের মধ্যেই আটকে রেখেছে এবং মেয়েদের স্থান, প্রতিষ্ঠা ও সম্মান চিরদিনই ঐ অন্তঃপুরের মাঝেই দেখে এসেছে ও দেখতে চেয়েছে। তাই অভাব, অনটন, নানা অশান্তির মাঝেও তারা মেয়েদের বাইরে বার হ'তে দেয়নি। যে দিন আমাদের মা, দিদি-মাদের অক্ষর-পরিচয় হয়নি, যে দিন তাদের ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা হয়নি—সে দিন পুরুষরা যে ভাবে তাদের মিথ্যা চাটুবাক্যে ও নানা

শাসনের বেড়া-জালে দাবিয়ে রেখেছিলো, সে সম্বন্ধে নালিশ থাকলেও, মেনে নেওয়া যায় যে—সে দিন আমাদের নারী-জাগরণ আসেনি, সে দিন তারা অজ্ঞ ছিল। কিন্তু আজকে যে সব মেয়েরা শিক্ষা পাচ্ছে, যারা তাদের দায়িত্ব বুঝতে পারছে—তাদেরও ওপর যখন সেই যুগের একই চলতি নিয়ম-কানুনের প্রয়োগ দেখি, তখনই প্রশ্ন জাগে—আজকের নারী-জাগরণের যুগে তাদের সেই যুগের একই মিথ্যা স্তোক-বাক্যে ভুলিয়ে রাখলে চলবে কেন? যেখানে অন্যান্য সব দেশ এগিয়ে চলেছে দিনের পর দিন উন্নতির দিকে—সেখানে ভারতবর্ষ যদি আজও তার কুসংস্কারকে আঁকড়ে ধরে রাখে—তার পরিবর্ত্তনে মনোযোগী না হয়, তাহ'লে যুগের দাবী আমরা কোনো দিনই মেটাতে পারব না।

অবশ্য এ কথা স্বীকার ক'রে নিতে হবে যে, অতি-আধুনিক পুরুষরা নিজেদের তৈরী এই বেড়া-জাল ভাঙবার অধিকার মেয়েদের দিচ্ছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দ্দশার চাপে যখন দু'বেলা খেতে দেবার চিন্তায় আমাদের পরিবারের পুরুষদের বিব্রত ক'রে তুলেছে, এবং যখন শিক্ষিত নারী-সমাজে বাইরে বেরিয়ে এসে কাজ করার জন্য আন্দোলন দেখা দিয়েছে, তখনই পুরুষদের passive সম্মতি কিছু কিছু পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু এর সংখ্যা এত মুষ্টিমেয় যে শুধু এদের সম্মতি দিয়ে প্রকৃত পক্ষে নারী জাতির প্রতি অত্যাচারের কোনো প্রতিকার করাই সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ—যুদ্ধের কালো-বাজার, আর ১৯৪৩ সনের মন্বন্তরে যখন সমস্ত ভারতবর্ষ বিপর্য্যস্ত—কেবলমাত্র তখনই আজকের কর্ম্মরতা মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে কাজের মাঝে—বেঁচে থাকার ..., আসন্ন মৃত্যু থেকে ধ্বংসোন্মুখ পরিবারকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য। এই সাহসী কয়েকটি মেয়ের জন্য দুর্ভিক্ষ ও মহামারী থেকে বহু পরিবার বেঁচেছে, কিন্তু এই মেয়েরা—এরা কী সমাজের কাছ থেকে যে-কোনো কর্ম্মীর প্রাপ্য সম্মান পেয়েছে? ট্রামে, বাসে, পথে—নানা জায়গায় যে কথা শুনি, যে ব্যবহার পাই, তাতে অত্যন্ত লজ্জার সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে, আমাদের পুরুষরা আমাদের উপযুক্ত সম্মান দিতে ভুলে গেছে।

এ কথা সত্যি, এত দিন অন্তঃপুরের মধ্যে আবদ্ধ থাকার পর হঠাৎ দুর্ভিক্ষ—মহামারীর স্রোতের মুখে যে মেয়েরা বাইরে এসেছে, তারাও কম দিশেহারা হ'য়ে পড়েনি বাইরের কোলাহলের মাঝে। স্বাধীনতার রূপের সংজ্ঞা তাদের পরিষ্কার ছিল না—অন্তঃপুরের আবদ্ধ আবহাওয়ার পর হঠাৎ ছাড়া পেয়েই তাই স্বেচ্ছাচারকেই স্বাধীনতা ভেবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। এই যে আজ চারি দিকে ভারতীয় W A C (1) বোনেদের হাহাকার উঠেছে—তার জন্য দায়ী কারা? কোনো কোনো মেয়ের দোষ আছে স্বীকার করি, কিন্তু তাদের অপরাধ ক্ষমার যোগ্য; কারণ তারা বাইরের জগৎ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। কিন্তু পুরুষ—যারা মেয়েদের বহু আগে শিক্ষা পেয়েছে, যারা বহু আগে বাইরের জগতের ভাল-মন্দের সাথে জড়িয়ে আছে, তাদের তো এ ধরণের অপরাধ ক্ষমা করা যায় না।

সমস্ত দেশেই পরিবর্ত্তনের যুগে যাঁরা ছিলেন অগ্রদূত তাঁরা বরাবরই নানা ভাবে অত্যাচারিত, অপমানিত হয়ে এসেছেন। তাই ধরে নিচ্ছি, আজ ভারতীয় কর্ম্মী মেয়েদের দুঃখ, অসম্মান—সবই পুরোনো ও নতুন যুগের মধ্যে সংঘর্ষের প্রতিফল। কিন্তু ভবিষ্যতে এ ধরণের পুনরাবৃত্তি যাতে আর না হয়, তার কথা ভাবনার ও তা নিবারণের জন্য যথেষ্ট সচেষ্ট হবার আজ সময় এসেছে।

আজ ভারতীয় মেয়েদের সম্মান ও অধিকার নিয়ে যে সমস্যা, যে দুর্দ্দশা—প্রায় ৫০ বছর আগে অন্যান্য সব স্বাধীন ও উন্নত দেশে এ নিয়ে বহু আন্দোলন হ'য়ে গেছে ও তার সুচিন্তিত মীমাংসাও হ'য়ে গেছে। ফলে রাশিয়া, আমেরিকা ও ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি সমস্ত উন্নত দেশে মেয়েরা সম্মানের সঙ্গেই তাদের প্রতিষ্ঠা ঘরে-বাইরে অক্ষুণ্ণ ভাবে বজায় রেখে চলছে।

এ সম্বন্ধে রাশিয়ার দৃষ্টান্ত সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য। ১৯১৭ সালের পূর্ব্বের রাশিয়া আর আজকের ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারায় ... মিল বিস্ময়কর। সে-দিনকার রাশিয়াতে মেয়েদের ... আমাদের দেশের মেয়েদেরই মত ছিল। কোনো সামাজিক ... অর্থনৈতিক অধিকার তাদের ছিল না; অজ্ঞতার অন্ধকারে, পদে পদে অবমাননায় আর লাঞ্ছনায় তাদের দিন কাটত আ...দেরই মত।

তার পর ... বিপ্লব ১৯১৭ সালে। যে আমূল পরিবর্ত্তন এল সামাজিক জীবনের প্রত্যেক স্তরে—তা থেকে নারীরাও বঞ্চিত হ'ল না। ... নেতারা ... যদি সমাজের প্রত্যেক স্তরে পুরুষদের ... ও স্থান নারীরা না পায়, তাহ'লে বিপ্লব হবে অর্থহীন।

... সেই দূর... নেতাদের স্বপ্ন সফল। রাশিয়ার নারী জাতির হয়েছে ... প্রতিষ্ঠা। শিক্ষায়, দীক্ষায়, বিজ্ঞানে, শিল্পে সাধারণ কাজ কর্ম্মে, মেয়েরা পুরুষদের সমকক্ষতা অর্জ্জন করেছে।

১৯৩৫ সালেই দেখা যায় যে, রাশিয়ার সমস্ত চিকিৎসক ও শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে অর্দ্ধেক নারী। অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রেও নারীরা পুরুষদের সঙ্গে সমতালে কাজ ক'রছে। রাজনীতি ও সমাজ পরিচালনায়, দেশের ভবিষ্যৎ গঠনে পুরুষদের মতই বিস্তৃত তাদের প্রভাব ও শক্তি। তাদের দান পুরুষদের দান অপেক্ষা কোনো অংশে কম নয়, অথচ এদের ঘরের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্যও পূর্ণভাবে সার্থক। প্রশ্ন হচ্ছে, মেয়েদের স্থান যে শুধু ঘরেই নয়—বাইরেও তাদের প্রয়োজনীয়তা আছে, এ-কথাটা যখন সব উন্নত দেশ মানছে তখন আমাদের দেশ কেন তা মানবে না?

আমাদের সমাজ,—আমাদের পুরুষ জাতি চিরকালই মেয়েদের সম্পত্তির মত দেখে এসেছে—দেখে এসেছে ভোগের বস্তু হিসাবে। তাদেরও যে মন ব'লে পদার্থ আছে, তাদেরও যে চেতনা আছে, এ কথাটা কখন তারা স্বীকার করেনি। পদদলিত নারী জাতির অপমান, অসম্মান সম্বন্ধে আজও তারা তাই নির্ব্বিকার। কোন রকম পরিবর্ত্তনে তাই আজও পুরুষরা খুব খুশী নয়। সেই জন্য আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও আমাদের দেশে বহু নিরক্ষর মেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশ পিছিয়ে থাকার নানা কারণের মধ্যে মস্ত-বড় কারণ হচ্ছে যে, আজও আমাদের দেশে নারী-সমাজ পদদলিত, অশিক্ষিত—তাই দেশের কাজে, দশের স্বার্থে আজও তারা সাড়া দিতে পারছে না। পৃথিবীর কোনো দেশ শুধু পুরুষ জাতিকে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেনি—ভারতবর্ষও পারবে না, যত দিন ভারতীয় নারী জাতি পুরুষদের সমান পর্য্যায়ে না

। আমাদের সমাজ কখনও কী ভেবে দেখেছে—এই যে কোটি কোটি অশিক্ষিত নারী—এদের উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার অভাবে কত শত-শত মেধা প্রস্ফুটিত হতে পারছে না?

ঘরকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করবার জন্য, সন্তানকে সত্যিকারের মানুষ ক'রে গ'ড়ে তুলবার জন্য, জীবনকে সহজ সুন্দর ভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, স্বামীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে তাকে প্রেরণা দেবার জন্য নারী-মনের যে প্রসারতা, যে ধৈর্য্য ও কর্ম্মনিষ্ঠার প্রয়োজন, তা বাইরের কর্ম্মজগতে পৃথিবীর আরও দশ জনের নানা সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত না হ'লে কিছুতেই সম্ভব নয়। তাছাড়া, ছেলে-মেয়েনির্ব্বিশেষে উপযুক্ত সম্মান পেতে হ'লে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার মস্ত বড় মূল্য আছে। নিজের ক্ষমতা মত কাজ ক'রে তার মূল্য নেওয়া—[illegible] মানুষের স্বভাবজাত ধর্ম্ম, কাজেই তাকে অস্বীকার কোনো ভাবে[illegible] না। অবশ্য এ কথা কোনো মতেই বলা যায় না [illegible] অর্থই একমাত্র সম্মান পাবার মূল কথা। কিন্তু জীবনের অ[illegible] সব-কিছু খুঁটি-নাটি প্রয়োজনের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার[illegible] যে মস্ত বড় স্থান আছে, সে কথাটাই বলা উদ্দেশ্য।

তাছাড়া, আজকের যুগের দাবী—মেয়েদে[illegible] শুধু ঘরে বসে থাকলেই চল[illegible] না। আজকের [illegible] স্ত্রীকে শুধু সহধর্ম্মিণীরূপেই দেখতে চায় না—তাদের [illegible] নিজেদে[illegible] সহকর্ম্মিণীরূপে, সুখে-দুঃখে প্রেরণার উৎসরূপে। যে[illegible] যুগের দাবী মত অন্য সমস্ত উন্নত দেশের মেয়েরা ছেলেদের [illegible] দাবী মিটিয়ে আসছে, সেখানে আজ আমাদের দেশের মেয়েরা যদি [illegible] মেটাতে না পারে, সেটা শুধু আমাদের মেয়েদে[illegible] লজ্জা ও অপমান নয়—আমাদের দেশের সমগ্র পুরুষ জা[illegible]রও লজ্জা ও ক্ষতি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েদের কাজের গণ্ডী নিয়ে। অধুনা যে অল্পসংখ্যক পুরুষ মেয়েদের বাইরে কাজ করার সম[illegible]ক, তারাও মেয়েদের কাজ করাটাকে পুরোপুরি ভাবে উদার মনে [illegible]নে নিতে পারেনি। তারা তাই মেয়েদের কাজের গণ্ডীর ছক টেনে দিয়েছেন বিবাহের আগে পর্য্যন্ত। এদের ধারণা—বিবাহের পর বাইরের কর্ম্মজগৎ নিয়ে মেয়েরা ব্যস্ত থাকলে ঘরের প্রতি তারা উপযুক্ত নজরও দিতে পারে না, ফলে সংসারের কর্ত্তব্য অবহেলিত হবে। শুধু তাই নয়, বিবাহের পর স্ত্রীকে বাইরে বেরিয়ে কাজ ক[illegible]তে দেওয়ার মধ্যে পুরুষদের মিথ্যা সম্মান-বোধও জড়িত আছে। পুরু[illegible]দের ধারণা, বিবাহের পর মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জন,—স্বামীদের শুধু [illegible]কেই খর্ব্ব করে না, নিজেদের অর্থাভাবকেই বেশী ক'রে প্র[illegible]শিত করে। বিবাহের মূল কথাই যেখানে সুখে-দুঃখে স্বামি-স্ত্রী পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করবে—সেই আদর্শের কাছে তো ঐ ধরণের বা[illegible] সম্মানবোধের প্রশ্ন ওঠা উচিত নয়, এ-কথাটা আজও কেন আমাদে[illegible] দেশের স্বামীরা মেনে নিতে পারছে না? খুবই সত্যি কথা যে, মেয়ে[illegible] ঘরের দায়িত্ব সব চেয়ে বড়, কিন্তু তা ব'লে ঘরের দায়িত্বের স[illegible] বাইরের কর্ম্ম-জগতের সামঞ্জস্য রক্ষায় আপত্তি কেন? প্রত্যেকে[illegible] জীবনে বিবাহের মস্ত-বড় প্রয়োজন আছে, এ সত্যকে কিছুতেই [illegible]স্বীকার করা চলে না—তাই কাজের জন্য বিবাহকে অস্বীকার বা [illegible]বিবাহের খাতিরে কাজকে অগ্রাহ্য করার কোনো অর্থ নেই।

বিবাহ ও কাজ এই দুই-ই যে সুন্দর ভাবে চলতে পারে, তার উদাহরণ আমাদের দেশ ছাড়া বাইরে যে কোনো উন্নত দেশের মেয়েদের জীবন দেখলেই দেখতে পাওয়া যায়। আমাদের মেয়েদের এই সামঞ্জস্য-বোধকে উন্নত করতে হবে ও তার পরিপূর্ণ বিকাশ প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে দিয়ে প্রমাণ করতে হবে।

মেয়েদের দৈহিক গঠনের স্বাতন্ত্র্যের জন্য তাদের মানসিক চিন্তাধারার গতি প্রকৃতি অন্যান্য সমস্তই পুরুষদের থেকে খানিকটা স্বতন্ত্র। স্বীকার করতে লজ্জা নেই যে, পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা অনেক কোমল, ছেলেদের মত তাই তারা ঘরকে অগ্রাহ্য করতে পারে না। ঘরকে অগ্রাহ্য ক'রে শুধু বাইরের জগৎ নিয়ে ছেলেদের পক্ষে প্রতিষ্ঠা ও সুনাম অর্জ্জন করা ও রক্ষা করা যতখানি সম্ভব, মেয়েদের পক্ষে কোনো মতেই তা সম্ভব নয়; যদি না ঘরের মাধুর্য্য, ঘরের আদর্শ সেই সঙ্গে তার বজায় থাকে। মোট কথা, ছেলেদের প্রতিভা শুধু বহির্ম্মুখী হ'লেও চলে, কিন্তু মেয়েদের মন অন্তর্ম্মুখী। ভিতরকে মুখ্য রেখে তার সাথে বাইরের জগতের সামঞ্জস্য তাদের রক্ষা করতেই হবে—না হ'লে তাদের ধর্ম্ম, তাদের আদর্শ কোনো মতেই বজায় থাকবে না বা থাকতে পারে না।

এখন কথা হচ্ছে, মেয়েদের কাজ করার প্রয়োজনীয়তা আছে ব'লেই যে প্রত্যেককে ১০টা থেকে ৫টা পর্য্যন্ত অফিসে কাজ করতে হবে তার কোনো মানে নেই। যাদের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী তাদের শুধু ৮ ঘণ্টা কেন তার চাইতে বেশীক্ষণ কাজ করাতে আপত্তি নেই ঠিকই; কিন্তু তা ব'লে এটাই যেন কাজের উদাহরণ না হ'য়ে দাঁড়ায়। ঘরকন্না প্রভৃতি কেন্দ্রীভূত স্বার্থ ছাড়া দিনে কতটুকু অন্য দশ জনের জন্য কাজ করা যেতে পারে সেটাই আমাদের মেয়েদের ভাবতে হবে। এই যে ম[illegible]—এই যে অপরের জন্য নিজেদের সাধ্যমত সাহায্য করার ইচ্ছা, তা যত সামান্যই হোক না কেন, এর আসল মূল্য ও সার্থকতা নিজেদের কাজের একাগ্রতার মাঝে ও সামান্য এক জনেরও উপকারের মাঝে। এই কাজ প্রয়োজনবোধে বাইরে বেরিয়েও হ'তে পারে বা ঘরে বসেও হ'তে পারে। আসল কথা, নিজেদের ছোট সংসারের গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখাই উদ্দেশ্য। সকলের চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, প্রয়োজনের গুরুত্ববোধে তার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেওয়া। যেখানে সন্তান এত ছোট যে তাকে যত্ন নেওয়াই মায়ের প্রধান কর্ত্তব্য-সেখানে ঘরের কর্ত্তব্যই বড় ও প্রধান হওয়া উচিত, সেখানে বাইরের কর্ত্তব্য ও কাজকে ছোট করতে হবে। আবার যেখানে অর্থাভাব এত বেশী যে, দু'বেলা খেতে দেওয়াই সমস্যা, সেখানে ঘরের সমস্ত কর্ত্তব্যের চাইতে বাইরে বেরিয়ে অর্থ উপার্জ্জনের সমস্যা ও কর্ত্তব্য অনেক বড়—সন্তানকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য।

মেয়েদের কাজ করাকে অপরিহার্য্য বলে ধরে নিতে হ'লে তাদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা ও প্রয়োজনের জন্য, অন্যান্য সমস্ত স্বাধীন ও উন্নত দেশের মত নির্দ্দিষ্ট ছুটির বন্দোবস্ত করতে হবে। তা'হলে বিবাহের পরও কাজ করা আমাদের দেশের মেয়েদের পক্ষে সহজ হয়ে ওঠে এবং ঘরের কর্ত্তব্য ও আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করার জটিলতাও অনেকখানি কমে যায়।

আল্পনা — শিল্পী—শেফালী দাস

মেয়েদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা বাইরে কাজ করার উদ্দেশ্য শুধু মাত্র বেঁচে থাকবার জন্যই নয়—নিজেদের মনের প্রসারতা, পৃথিবীর নানা সমস্যার সাথে জড়িত থেকে সে বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করা, নিজের ভিতরের সুপ্ত ক্ষমতাকে জাগিয়ে তোলা ইত্যাদিও এর অন্তর্গত। কাজেই যার খাওয়া-পরার ভাবনা নেই—তারও বাইরের সঙ্গে কাজের সম্পর্ক রাখতে হবে বই কি।

আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিবাহের আগের সমস্ত কার্য্যকলাপ বিবাহের পরের কার্য্যকলাপের সাথে মেলে না। এর জন্য শুধু পুরুষরাই যে দায়ী তা নয়, মেয়েরা নিজেরাও তার জন্য কম দায়ী নয়। বিবাহের পর শুধু স্বামি-পুত্রের খাওয়া-পরার তত্ত্বাবধান ক'রেই স্ত্রীরাও যেমন তৃপ্ত থাকে—স্বামীরাও নিজেদের খাওয়া-পরার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েই খুসী হয়। অথচ সংসারের এই খুঁটিনাটি কাজ করা ছাড়াও প্রচুর সময় থাকে, তখন প্রত্যেক মেয়েই তাদের নিজেদের সংস্কার ও কৃষ্টির প্রতি মনোযোগ দিতে পারে। মেয়েদের আত্মপ্রকাশ কোনো দিনই আমাদের দেশের পুরুষরা মেয়েদের কাছ থেকে আশা করেনি, ফলে পদদলিত স্ত্রীজাতি শুধু সংসারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থার মাঝেই নিজের সমস্ত জগৎ ও কর্ত্তব্যকে দেখে এসেছে। এই ভাবে তিলে তিলে কত প্রতিভা আমাদের প্রতি ঘরে ঘরে নষ্ট হয়েছে ও এখনও হচ্ছে, তার ইয়ত্তা নেই।

আজ এই বিংশ শতাব্দীতেও কী এ সব কথা আমাদের সমাজ এবং সমগ্র ভাবে পুরুষ ও নারী জাতির ভাববার সময় হয়নি? আজ প্রত্যেক ঘরে ঘরে ব্যক্তিগত ভাবে প্রতিটি পুরুষ ও নারীর কি এখনও অতীতের সংস্কারকে মুড়ে ফেলে সাম্যের দাবী এবং দেশ ও দশের উন্নতির মাঝে [illegible] কর্তব্য পালনে মনোযোগী হওয়ার সময় আসেনি? ঘর ও বাইরের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য রক্ষার কথা ও তার জন্য সচেষ্ট হওয়া কি এখনও তাদের [illegible]

[illegible]র সমাজ—আমাদের সমগ্র পুরুষ এবং নারী জাতির কাছে এটাই আজ মস্ত বড় জিজ্ঞাসা।

আত্মঘাতীর জাত

কল্যাণী দেবী

বাঁচাব বলিয়া যারা ছোরা ধরে
বল তারা কোন্ জাত?
ভগবান বলে সেই হাতে আমি
আপনি বাড়াই হাত।
মারিব বলিয়া যারা ছোরা ধরে
বল তারা কোন্ জাত?
ভগবান বলে মোর বুকে হানে
আত্মঘাতীর জাত॥
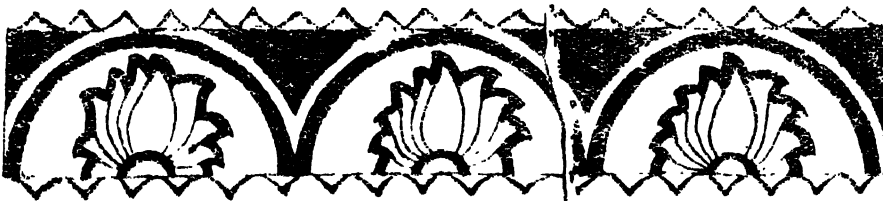
আল্পনা — শিল্পী—আশীষকুমার দাস

আও নাগা

শ্রীমতী প্রমীলা ভট্টাচার্য্য

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

আওদের কোনও গ্রামে যেতে হ'লে অনেকখানি উঁচুতে উঠতে হয়। ওরা পাহাড়ের চূড়োয় থাকে। একটা পথ পাহাড়ের নীচে থেকে উঠে গ্রামের মধ্য দিয়ে আবার নেমে গিয়েছে। গ্রামে পৌঁছবার কিছু আগে পথের পাশে একটি বিশ্রাম-ঘর থাকে, এটি একটি চার দিকে খোলা চালা-ঘর। প্রায় গ্রামে ঢুকবার ও বেরুবার পথে খুব ভারী ও মজবুত গেট দেওয়া আছে। এই গেট দিয়ে ছাড়া গ্রামে পৌঁছানো সহজসাধ্য নয়। গ্রামে ঢুকেই নজরে পড়ে সারি সারি গোলা-ঘর। গোলা-ঘরের [illegible] পাওয়া যায় আওদের কুটীর। আওদের [illegible] বাঁশের মাচার ওপর ছ্যাঁচা দি[illegible] খড় বা তাল-পাতার মত এক রকম পাতার ছাউনি, দ[illegible] বেত ও বাঁশের সরু কঞ্চি। ঘরের সামনে থাকে সরু বারান্দা। এখানে থাকে হাত-বোনা তাঁত। একটি মাত্র দরজা, ঘরে ঢুকতেই পড়ে একখানা সরু কোঠা, তার পর একটা প্রকাণ্ড কোঠা ও [illegible] পর একটা চওড়া বারান্দা। সরু কোঠাতে ধান, কুলো, উ[illegible] টুক[illegible] ইত্যাদি থাকে। বড় কোঠার ঠিক মাঝখানে মাটি দিয়ে [illegible]ধানো, [illegible] ওপর তিনটে পাথর দিয়ে উনুন [illegible] দের মত উনুন করে না। পাথর তিনটে এমন ভাবে সাজায় যাতে [illegible]ন দিকেই [illegible] দেওয়া যায়; উনুনের ওপর ছোট ঝোলানো মাচা থাকে, সেখানে কাঠ, কাঁচা মাংস ও লঙ্কা রাখে। জিনিষগুলি শুকোবার জন্যেই এ ভাবে [illegible] কোঠাই এদের রান্না, খাওয়া ও শোওয়ার জন্যে ব্যবহার করা হয়। শীতকালে সকলে উনুন ঘিরে বসে গল্প করে। এ কোঠায় থাকে জল আনার ও রাখার জন্যে ব্যবহৃত মোটা বাঁশের চোঙা, বাঁশের গেলাস, হাতল দেওয়া বাঁশের পেয়ালা, বাঁশের চামচ, মধু আর ভাড়ি ছাঁকবার জন্যে বাঁশের ছাঁকনি, এক জাতীয় লাউয়ের খোলার হাতা, কাঠের খুরো লাগানো থালা, বাঁশের খোলার থালা, মাটির হাঁড়ি ও এলুমিনিয়ামের ডেকচি। এ তো গেল রান্নার জিনিষ, এ ছাড়া থাকে পিপের ধরণের ঢাকনা-দেওয়া বাঁশের চুবড়ি, দা, নাচের সাজ-সরঞ্জাম, কাঠের বাক্স, কাঠের পিঁড়ি ও টুল। ব্যস, কি ছোট কি বড় সবারই এই সম্পত্তি। কেবল মানী লোকদের ঘরের চাল একটু অন্য ধরণের হয়, এবং বাইরে, ঘরের বেড়ায় মিথুন, হরিণ ইত্যাদি শীকার করা ও বলি দেওয়া পশুর শিং টাঙানো থাকে। ঘরগুলো গায়ে গায়ে লাগানো বলে আগুন লাগলে একসঙ্গে শত শত ঘর পুড়ে যায়। আগুন লাগা এদের সাধারণ ঘটনা, সেটা এরা বিশেষ গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না, তার কারণ নাগা পাহাড়ে প্রচুর বাঁশ হয় এবং আগের মত ঘর ও আসবাব-পত্র করতে মাসখানেকও লাগে না। এদের গ্রাম অত উঁচুতে হওয়ার জন্যে সেখানে বিশেষ তরি-তরকারী হয় না, জলও অনেক নীচে থেকে আনতে হয়।

প্রত্যেক গ্রামে বেরুবার পথের কাছে একটি [illegible] দিক খোলা চালা-ঘর আছে। সে ঘরে আছে একটা প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি, তার এক দিকে ড্রাগনের মুখের মত খোদাই করা। সে গুঁড়িটার এক পাশে কেটে ভেতরের কাঠ এমন ভাবে বার করে নেওয়া হয়েছে যাতে সেটাতে ঘা মারলে ফাঁপা জিনিষে ঘা দেওয়ার মত আওয়াজ হয়। এর ভেতরে থাকে ছোট ছোট কাঠের হাতুড়ী ও বড় বড় কাঠের মুগুর। আগে এই গুঁড়িতে হাতুড়ী ও মুগুরের সাহায্যে আওয়াজ ক'রে বিপদের সঙ্কেত জানিয়ে সকলকে সাবধান করা হত, নিরাপদের সঙ্কেতও এরই সাহায্যে জানানো হ'ত। অর্থাৎ এটা এদের সাইরেনের কাজ করে এসেছে। এর শব্দ প্রায় দু'মাইল দূর থেকে শোনা যায়। এর কাছেই অবিবাহিত ছেলেদের থাকার ঘর শিকিদম। এদের এত সতর্ক থাকার কারণ, আগে এক গ্রামের লোকেরা অন্য গ্রামে হঠাৎ চড়াও হয়ে আক্রমণ করত। লুঠপাট ও কর আদায়ের ব্যবস্থা তো করতই তার ওপর নরমুণ্ড সংগ্রহ করত। যে যত মুণ্ড সংগ্রহ করতে পারত সেই বেশী বীর বলে গণ্য হত। এই বীরেরা খুব সম্মান পেত এবং বিশেষ ধরণের কারুকার্য্য করা চাদর গায়ে দেবার অধিকারী হত।

গ্রাম থেকে বেরুলেই পথের পাশে কবরখানা। কখনো কখনো দু'টো কবরখানা থাকে, ঢোকার আগে ও পরে। সহরের কাছাকাছি আওদের সব গ্রামগুলিতে আজকাল কবর দেয়। কিন্তু কিছু দিন আগে কেবল খৃশ্চানরাই কবর দিত। অ-খৃশ্চানরা কেউ মারা গেলে তাকে ছোট কোঠার মধ্যে মাচার ওপর রেখে দিত, তার নীচে একটা বড় পাত্র রেখে দিত। মৃত ব্যক্তি নারী হলে পাঁচ দিন, পুরুষ হলে সাত দিন সেই মাচার ওপর রাখা থাকত। মৃতদেহটিতে পোকা লেগে যেত, তার থেকে পচা রস পাত্রটিতে পড়তে থাকত। আর সবাই দুর্গন্ধে-ভরা বড় কোঠাতে থাকত, খেত ও ঘুমোত। তার পর এরা দেহটাকে এখন যেখানে কবরখানা আছে সেখানে একটা মাচার ওপর রেখে দিত, তার সঙ্গে মানুষের প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র দিত। মৃতদেহটার বাকি সৎকার বন্য জন্তুতে করত এবং মাচাটা বর্ষার সময় মাটিতে মিশিয়ে যেত। এখনও ওরা মানুষের প্রিয় ও প্রয়োজনীয় জিনিষ মৃত ব্যক্তির সমাধির ওপর রাখে।

নাগাদের ঘরের মাচার নীচে শুয়োর ও মুরগী থাকে। এদের ক্ষেত গ্রাম থেকে ৫।৬ মাইল দূরে হয়। এরা ধান, নাগা ডাল, নাগা পেঁয়াজ, লঙ্কা ও অল্প-সল্প তরি-তরকারীর আবাদ করে। খুব ঝাল খায়, শুয়োরের মাংস ও শুকনো মাছ এদের খুব প্রিয় খাদ্য। নাগাপাহাড়ের জায়গায় জায়গায় ছোট-ছোট জলাশয় আছে, তার জল নোণা। নাগারা সেই জলের সঙ্গে ছাই মিশিয়ে থিতোতে দেয় তার পর ওপরের জল নিয়ে শুকোয়, শুকোলে ঠিক একটা শক্ত পাথরের মত হয়। এই পাথরটাই নাগাদের লবণ। এখনও দূরের নাগারা এই লবণ ব্যবহার করে। অনেকে এই লবণ ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করে, এতে না কি শরীরের গ্লানি দূর হয়।

নাগারা বাইরের জিনিষের ওপর নির্ভরশীল নয়। এরা নিজে তকলী দিয়ে সুতো কেটে হাতে-বোনা তাঁত দিয়ে কাপড় বোনে। এ কাপড় এক হাতের চেয়ে কম চওড়া হয়, ওরা দু'-তিনটে জোড়া দিয়ে চাদর তৈরী করে। পুরুষের পোষাক চাদর ও কৌপীন। মেয়েরা ছোট চাদর পরে ও বড় চাদর গায়ে দেয়। মেয়েদের কানের গহনা এত বড় ও ভারী হয় যে, কান কেটে যায়। তারা গলায় ও মাথায় অদ্ভুত রকমের ভারী গহনা পরে, হাতে কোনও গহনা পরে না। মেয়েদের কপালে, চিবুকে ও পায়ে উল্কী দিয়ে লম্বা লম্বা দাগ করা হয়। পুরুষের কানের মাঝখানে ও মাকড়ি পরার জায়গায় মস্ত ফুটো করা হয় যাতে পাখীর পালক ও গহনা পরতে পারে। এরা মাথার চুল গোল করে কাটে, নেপালীদের ভোজালীর মত সর্ব্বদা পেছনে কাঠের খাপে দা রাখে। আওরা নীল রং খুব পছন্দ করে। ফুল ও গান এদের খুব প্রিয়। গানের সুরের চমৎকার অনুকরণ করতে পারে এবং গলার স্বর বেশ ভাল।

আওরা খুব অতিথিপরায়ণ। এদের গ্রামে কোনও লোক এলে খুব যত্ন করে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী কলা, ডিম, মুরগী ইত্যাদি উপহার দেয়, কিছু না দিতে পারলে এরা অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হয়। আগে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকের সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের বংশপরম্পরায় শত্রুতা চলে আসত। এই রকম দুই গ্রামের লোকের সঙ্গে দেখা হলেই বিনা কারণেই কাটাকাটি পড়ে যেত। কিন্তু কোনও গ্রামের লোক যদি শত্রু-গ্রামে আতিথ্য গ্রহণ করত, তখন গ্রামবাসীরা কিছু বলতো না এবং সাধ্যমত সেবা করত। তার পর তার যাবার সময় গ্রামের সীমানায় নিয়ে গিয়ে বলতো, "এই আমাদের গ্রামের সীমানা, এর ওপারে কিন্তু সাবধান অর্থাৎ তোমার মুণ্ডপাতের চেষ্টা করা হবে।"

আওদের গ্রামগুলি শাসনের সুবিধার জন্যে লোকসংখ্যা অনুযায়ী দু'-তিন ভাগ করা। প্রতি ভাগ আলাদা পঞ্চায়েত দ্বারা শাসিত হয়। পঞ্চায়েতের মোড়লদের ব্যবস্থা সকলে মেনে নেয়। গ্রামের শৃঙ্খলা-ভঙ্গকারীদের জরিমানা করা হয়। চুরি বা এই ধরণের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত—মাথা নেড়া করা। প্রতি গ্রামে গির্জা ও স্কুল আছে। স্কুল গ্রামবাসীদের চাঁদায় চলে। আজকাল অনেক গ্রামে নিয়ম করেছে যে সাত বছর পূর্ণ হলেই ছেলেকে স্কুলে দিতে হবে।

আগে আওদের একমাত্র জাতীয় পরব "মৎসচঢ়" প্রতি গ্রামের খেয়াল ও সুবিধে মত হত। কিন্তু এবার থেকে ওরা সাব্যস্ত করেছে যে, আওদের সব গ্রামে এই পরব ১লা মে থেকে ৬ই মে পর্য্যন্ত চলবে। এ ক'দিন স্কুল ও ক্ষেতের কাজ বন্ধ থাকবে। এই পরব ছাড়া মানৎ, গৃহপ্রবেশ, মিথুনপুজো উপলক্ষে তাদের উৎসব হয়ে থাকে। উৎসবের সময় এরা পশু ও মুরগী বলি দেয়, প্রচুর তাড়ি খায় ও নাচ-গান করে। প্রতি গ্রামের [illegible] ধরণ ও সাজ আলাদা। এদের নাচের সাজ বিচিত্র রকমের। পুরুষের সাজে থাকে হাড়ের তাগা ও মালা, কড়ি-লাগানো কৌপীন, মানুষের চুল বা পশুর লোম ঝোলানো পোষাক, পাখীর পালকের মুকুট, বল্লম, খাপের মধ্যে দা ইত্যাদি। মেয়েরা গলায় নানা রকমের গহনা ও পালকের মুকুট পরে।

গেল বছর আওদের একটি গ্রামে এই উৎসব দেখতে গিয়েছিলাম। গ্রামবাসীরা খুব যত্ন করল এবং ওদের নাচ দেখাল। একটা নাচে দেখলাম, মেয়েরা সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে নাচছে ও তার সঙ্গে গাইছে,—"শত্রু এসেছে, তোমরা শীগ্‌গির যাও, যুদ্ধ কর, আমাদের ও শিশুদের রক্ষা কর, আমাদের ঘর-বাড়ী শত্রুর হাত থেকে বাঁচাও! তোমাদের বাপ-পিতামহ যেমন করে শত্রুকে পরাজিত করেছে, তোমরা তাই কর।" এর কাছেই পুরুষরা বল্লম হাতে নিয়ে নাচছিল। থেকে থেকে তাদের বল্লমটা ওপরে তুলে লাফিয়ে উঠছিল ও হুঙ্কার ছাড়ছিল। সে চীৎকার এত ভয়ঙ্কর যে আমাদের মত শত্রু হ'লে তাতেই চম্পট দিত, যুদ্ধের প্রয়োজন হত না। তাদের গানের মানে ছিল, "শত্রুকে আমরা পরাজিত করবো, তোমরা নিশ্চিন্ত হও ইত্যাদি।" এ ছাড়া আরও নাচ দেখাল। এই উৎসবে এদের "টাগ অব ওয়ার" খেলা হয়, এক দিকে পুরুষ ও অন্য দিকে মেয়েরা থাকে। একটা মোটা লম্বা বুনো লতা দড়ির পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। আগে নিয়ম ছিল, যে পক্ষের লোকেরা হারবে তারা অপর পক্ষের লোকদের তাড়ি খাওয়াবে। পুরুষরা চিরকাল সুবিধাবাদী, তাই পরে নিয়ম দাঁড়িয়েছে মেয়েরা জিতুক বা হারুক পুরুষদের তাড়ি খাওয়াবে। আজকাল আওদের বেশীর ভাগ খৃশ্চান হয়ে যাওয়ার জন্যে অধিকাংশ গ্রামে এই উৎসব ম্রিয়মাণ হয়ে গিয়েছে। যে গ্রামে সংসারী মানুষ অর্থাৎ অ-খৃশ্চান বেশী, সেখানে নাচ ভাল হয়। খৃষ্টানেরা এই পরবে ও অন্যান্য পূজোয় যোগ দেয় না এবং উৎসর্গ করা মাংস খায় না। খৃশ্চান পুরুষের মধ্যে অনেকে সাহেবী পোষাক পরে, এবং খৃশ্চান মেয়েরা মেখলা, ব্লাউজ ও চাদর পরে, উল্কীর ছাপ দেয় না এবং এদের জাতীয় গহনা পরে না। সাধারণ আসামী মেয়েদের মত সাজ-পোষাক করে কিন্তু হাতে চুড়ি পরে না।

আমেরিকান মিশনারীর উদ্যোগে ও সাহায্যে আওদের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন হয়েছে। অনেক ছেলে-মেয়ে মিশনারীর টাকায় উচ্চশিক্ষা লাভ করেছে। এক জনের কাছে শুনেছি, তার পড়ার খরচ [illegible] আমেরিকান আমেরিকা থেকে নিয়মিত ভাবে পাঠিয়ে এ[illegible] এখানে যখন আমেরিকান সৈনিকরা ছিল, আওরা তাদের সঙ্গে [illegible] বাধে মেলামেশা করত। সৈনিকেরা এদের সঙ্গে এদের খাবার [illegible] ও তাড়ি খেত, হৈ-চৈ করত, নাচত ও গাইত, যেন এদের সমাজের [illegible]ক। আমাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সাহেব দেখলে ভয়ে ও সঙ্কোচে আড়ষ্ট হয়ে যায় কিন্তু আও ছেলে-মেয়েরা তার উ[illegible]। তারা [illegible]মেরিকানদের [illegible] হৈ-চৈ করত, আব্দার করে এ[illegible]টা নিয়ে [illegible]। এক জন আমেরিকান সৈনিক এখানকার এক ভদ্র[illegible]কের মেয়েকে বিয়ে করেছিল।

শুধু আমেরিকানই নয়, আওরা ব্রিটিশদেরও খুব প্রীতির চোখে দেখে। এরা সাদা চামড়ার লোকদের খুব হিতৈষী মনে করে এবং তাদের সঙ্গে অকুণ্ঠ চিত্তে মেলামেশা করে। আওরা প্লেনের লোকদের মনের সঙ্গে গ্রহণ করতে পারে না, তারা যে এদের মঙ্গলকামী হতে পারে সে সম্বন্ধে এরা নিঃসন্দেহ নয়। প্লেনের লোকেদের সম্বন্ধে সমস্ত নাগাদেরই মনে একটা বিদ্বেষ ভাব জমতে সুরু করেছে। এরা আজকাল বলতে শুরু করেছে "যুগ-যুগান্তর ধরে আমরা তোমাদের পাশে আছি কিন্তু কোনও মঙ্গল করা দূরের কথা তোমরা চিরকাল আমাদের ঘৃণা করে এসেছ। অথচ কত দূর থেকে সাহেবরা এসে আমাদের সঙ্গে কত ভাল ব্যবহার করে। ওরা নিজের খরচে আমাদের লেখাপড়া, চিকিৎসা ও অন্যান্য সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে যেটা তোমাদের করা উচিত ছিল। কিন্তু তোমরা তাতে লজ্জিত তো নওই উল্টে নাগাদের কত বেশী অস্পৃশ্যের মত ব্যবহার কর, তাই নিয়ে গর্ব কর। অথচ আশা কর, আমরা তোমাদের সাহেবদের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করবো এবং বেশী আপনার মনে করবো।"

অনেকে মনে করেন যে একটা ধুয়ো উঠেছে, আসাম ও বাংলার পর্ব্বতশ্রেণী নিয়ে সীমান্ত প্রদেশ করা এ বুঝি ব্রিটিশের কারসাজি। ব্রিটিশের কারসাজি কতটুকু জানি না, তবে অদূর ভবিষ্যতে পার্ব্বত্য জাতিরা যে আলাদা হতে চাইবে, তা নাগাদের মনোভাব দেখলে বোঝা যায়। এদের পৃথক্ প্রদেশ করার কল্পনায় সম্পূর্ণ সায় আছে এবং এ কথা পর্য্যন্ত বলে যে, প্লেনের সঙ্গে থেকে নাগাদের কি লাভ হয়েছে যে তা হারাবার ভয়ে পৃথক্ হতে চাইবে না? মনে হয়, এখন থেকে যদি প্লেনের লোকেরা সাবধান না হ'ন তাহলে কয়েক বছরের মধ্যে আর একটা পাকিস্থান সমস্যার আবির্ভাব হবে।

পূজার কাপড়

শ্রীঅমলা দেবী

১

নগেন মজুমদার বাড়ীর বারান্দায় একটা মাদুরে বসিয়া কাপড় সেলাই করিতেছিল। চোখে নিকেলের ফ্রেমওয়ালা পুরু চসমা। ছিন্ন অংশটি বাম হাতে ধরিয়া, একেবারে ঝুঁকিয়া ডান হাত দিয়া সূচ চালাইয়া চালাইয়া রিপু করিতেছিল। পাশে আরও খান-দুই ধুতি ও সাড়ী জড় করা রহিয়াছে। সেগুলির অবস্থাও সঙ্গীন—অবিলম্বে মেরামত না করিলেই নয়।

নগেন মজুমদারের বয়স চল্লিশ পার হইয়াছে। রোগা, কাহিল দেহ, রং ফর্সাই—তবে গ্রামে থাকার জন্য তামাটে হইয়া উঠিয়াছে। মুখের চেহারা আগে ভাল ছিল—এখন সঙ্কটময় সংসারযাত্রার পেষণে অকাল-বার্দ্ধক্যের নখর-চিহ্ন পড়িতে শুরু করিয়াছে। চওড়া কপালে সমান্তরাল বঙ্কিম বলী রেখা; মাথায় কয়টা পাতলা বিশৃঙ্খল চুল। চুলে কিঞ্চিৎ পাক ধরিতে শুরু করিয়াছে।

নগেন মজুমদারের বাড়ী এ গ্রামে নয়। এ গ্রামের জামাই সে। বৎসর পঁচিশ আগে এ গ্রামের মনোহর গাঙ্গুলীর একমাত্র কন্যা সুরধুনীর সঙ্গে তাহার বিবাহ হয়। তখন হইতেই গৃহ-জামাতারূপে শ্বশুর-গৃহে বাস করিতে শুরু করে। অবশ্য বরাবর এখানে সে বাস করে নাই। পূর্ব্বে রেলে চাকরী করিত। রেলের চাকরীতে ছুটী কম, কাজেই তখন গ্রামে আসিবার সুযোগ কম হইত। বৎসর কয়েক আগে চাকরী হইতে তাহাকে অবসর লইতে হইয়াছে। তার পর হইতে সপরিবারে এখানে বাস করিতেছে সে। চাকরী-জীবনে আয় মন্দ ছিল না; মাহিনা অল্প হইলেও নানা রকমে উপরি-রোজগার ছিল। কাজেই সুখে-স্বচ্ছন্দে সংসার চলিয়া যাইত। সংসারও খুব বড় নয়; নিজে, স্ত্রী ও দুটি মেয়ে। চাকরী-জীবনেই বড় মেয়েটির বিবাহ দিয়াছিল। ভাল ঘরেই দিয়াছিল। কিন্তু মেয়েটির অদৃষ্ট মন্দ। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই বিধবা হয়। তখন হইতে মেয়েটি তাহার কাছেই আছে। রেলের চাকরীতে পেন্সন নাই; প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের দরুণ কয়েক হাজার টাকা পাইয়াছিল সে। তাহার অর্দ্ধেক ছোট মেয়ের বিবাহে খরচ হইয়াছে। বাকী টাকার কিছু পোষ্টাফিসে জমা আছে, কিছু সুদে খাটিতেছে। তা'ছাড়া শ্বশুর-দত্ত জমি-জমার আয় কিছু হয়। সব জোড়া-তাড়া দিয়া কোন রকমে সংসার চলিতেছে—অর্থাৎ মাছ, মাংস, দুধ, ঘি না জুটিলেও দুই বেলা ভাত-ডাল জুটিতেছে। যুদ্ধের বাজারে এমন কি দুর্ভিক্ষের বৎসরেও কাহারও কাছে হাত পাতিতে হয় নাই তাহাকে।

নগেন মজুমদার নিরীহ, নির্ব্বিরোধী ব্যক্তি। গ্রামে বাস করে বটে, কিন্তু গ্রাম্য-দলাদলিতে কোন পক্ষেই যোগ দেয় না। দিন-রাত নিজের বাড়ীতেই থাকে, সেলাই-ফোঁড়া প্রভৃতি কাজে বেশ পারদর্শী বলিয়া বসিয়া বসিয়া নিজেদের ও প্রতিবেশীদের যত পুরাতন জামা-কাপড় রিপু করে; না হয় পড়ে—রামায়ণ, মহাভারত, বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের প্রকাশিত সস্তা গ্রন্থাবলী, সংগ্রহ করিতে পারিলে—খবরের কাগজ। ফলে গ্রামের দুই দলই তাহাকে পাত্তা দেয় না। চিনি, কেরোসিন আসিলে দুই দলের পাণ্ডারা ভাগাভাগি করিয়া লয়, নগেনের কথা কাহারও মনে থাকে না। তবে নগেনের স্ত্রী সুরধুনী গ্রামের মেয়ে, ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারদের অনেকেরই ভগিনীস্থানীয়া। সে-ই বলিয়া-কহিয়া কিছু সংগ্রহ করিয়া আনে। তা' না হইলে অসুবিধার অন্ত থাকিত না।

যা'ই হোক, যুদ্ধের কয়েক বৎসর কোন প্রকারে কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইবার পরেই অবস্থা সঙ্গীন হইয়া উঠিয়াছে। চিনি, কেরোসিন যেমন-তেমন করিয়া মিলিতেছে বটে, কিন্তু কাপড় একেবারে দুষ্প্রাপ্য। সরকার সারা বাংলা দেশের লোকদের জন্য (অবশ্য কলিকাতা ছাড়া) মাথা-পিছু দুগজ মাত্র কাপড় বরাদ্দ করিয়াছে; কিন্তু পাড়াগাঁয়ের লোক সারা বৎসরে মাথা-পিছু একখানা করিয়া কাপড়ও পায় নাই। গ্রামের ফুড-কমিটীর হাতে জেলা সহর হইতে বার-দুই কাপড়

আসিয়াছিল। প্রথম বার খবরটা গ্রামে চাউর হইবার পূর্ব্বেই ফুড কমিটীর মেম্বাররা নিজেরাই সব ভাগ করিয়া লইয়াছিল। অন্য সকলের ভাগ্যে মাথা-পিছু একখানা করিয়া গামছাও জুটে নাই। দ্বিতীয় বারও সুরধুনী চেষ্টা না করিলে নগেনদের ভাগ্যে তাহাই ঘটিত। ফুড-কমিটীর প্রেসিডেণ্ট পরাণ গাঙ্গুলীর বৈঠকখানায় বসিয়া গ্রামের মাতব্বরেরা কাহাকে কাহাকে কাপড় দেওয়া হইবে তাহার তালিকা প্রস্তুত করিতেছিল, এমন সময়ে সুরধুনী ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে বৈঠকখানার সামনে থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়াই সকলের মুখ ভারী হইয়া উঠিল। সুরধুনী গ্রাহ্য না করিয়া কহিল—"হ্যাঁ দাদা, কি হচ্ছে তোমাদের ?"

জবাব দিল রাধানাথ গাঙ্গুলী ; সুরধুনীর কণ্ঠস্বর নকল করিয়া কহিল—"কেন বল দেখি ? পুরুষমানুষরা কোথায় কি করছে, মেয়েমানুষ হয়ে তোর তা জানার কি দরকার ?"

তাহার কথায় কান না দিয়া সুরধুনী কহিল—"শুনলাম না কি কাপড় এসেছে। আর-বার তো নিজেরাই সব ভাগ করে নিলে,—এবারেও তাই কচ্ছ না কি ?"

এবার পরাণ গাঙ্গুলী বা অন্য কেহ জবাব দিল না, দিল রাধানাথ,—কড়া গলায় কহিল—"হাঁ হাঁ, তাই নিচ্ছি—যা কর্তে পারিস্ কর গে।"

খনখনে করিয়া সুরধুনী কহিল—"কেন নেবে শুনি ! মগের মুলুক পেয়েছ না কি ? গাঁয়ে কি মরদ নেই ভেবেছ—যা ইচ্ছে তা'ই করবে ?"

রাধানাথ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিল—"আছে বৈ কি। যা ডেকে আন গে তাকে—"

পরাণ গাঙ্গুলী এতক্ষণে মুখ খুলিল, কহিল—"কেন মিছামিছি গোলমাল করছিস্ বল্ দেখি। সরকারী কাজে একটু ভুলচুক হয়ে গেলেই সর্ব্বনাশ !"

সুরধুনী কহিল—ভুল কেন হবে ? যারা তোমাদের পেটোয়া—তাদের নাম তো তোমাদের মুখস্ত। শুধু আমাদের নাম তোমাদের মনে পড়ে না।"

পরাণ কহিল—"তোদের কাপড়ের দরকার থাকলে মনে পড়তো। ঘরে কাপড় বোঝাই করে রেখেছিস্, তবু তোদের সাধ মিটছে না ?"

সুরধুনী কহিল—"ঘরে আমাদের ক'খানা কাপড় আছে গিয়ে দেখলেই পার। নিজে গাঁয়ের মেয়ে বলে ছেঁড়া সাড়ী পরেই ঘুরে বেড়াচ্ছি ; কিন্তু অত বড় মেয়ে আমার—সে যে কাপড়ের অভাবে ঘরের বার হতে পাচ্ছে না।"

কে—এক জন জবাব দিল—"তোদের যেমন স্বভাব ! না পরে জমিয়ে রাখিস তো কে কি করবে ?"

সুরধুনী রাগে ফাটিয়া পড়িয়া গলা ছাড়িয়া কহিল—"ভগবান জানেন, কি আছে, কি না আছে। আর কারা পরের নাম করে কাপড় নিয়ে নিজেদের ঘর ঠাসাই করছে—তাও জানেন। আমাদের কেউ নাই ভেবেই তোমরা আমাদের এত শাস্তি করছ। কিন্তু এর সাজা তোমরা পাবে, এ জন্মায় আর বেশী দিন চলবে না।"

রাধানাথ মুখ ভেচাইয়া কহিল—"অন্যায় ! অন্যায়ই করছে সবাই, আর তোরা ন্যায়ের অবতার ! এত দিন তোর স্বামী রেলে চাকরী করেছে, চুরি করে রেল কোম্পানীকে ফতুর করে দিয়ে এসেছে, তোদের ঘরে কাপড় নাই ! যা যা, মেলা বকিস নে, ঘরে যা।"

সুরধুনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরাণের উদ্দেশে কহিল—"হ্যাঁ দাদা, তোমারও কি ঐ কথা ? কিছুই পাব না আমরা ?"

পরাণ কহিল—"হবে—হবে—যা, যাদের একেবারে চলছে না তাদের তো আগে দি, যদি বাড়ে তো পাবি একখানা—"

পাইয়াছিল—পাঁচ গজ মার্কিণ। তাহাতে মেয়ের একখানি কাপড় হইল। নগেন পাশের গ্রামে গিয়া তাঁতীদের কাছ হইতে ন্যায্য মূল্যের তিন গুণ দাম দিয়া নিজের ও স্ত্রীর জন্য একখানি ধুতি ও একখানি সাড়ী কিনিয়া আনিয়াছিল।

সুরধুনী স্নান করিতে গিয়াছিল। কাপড় ছাড়িয়া আসিয়া স্বামীর সামনে দাঁড়াইয়া কহিল—"হ্যাঁ গা, ভাঙ্গা চালে উঁড়ি দিয়ে আর কত দিন চলবে ?"

নগেন পুরু চসমা-[illegible]ড়া চোখ দুটি স্ত্রীর দিকে তুলিয়া চাহিল।

সুরধুনী কহিল—"ছেঁড়া কাপড় সেলাই করে করে তো সারা বছর চলছে। হাতে-হাতে পূজো, নূতন কাপড় তো কিছু চাই। নিজেদের না হয় না হবে কিন্তু মেয়েকে একখানা সাড়ী, জামাইকে একখানা ধুতি তো দিতে হবে ! নতুন কুটুম ! না দিলে বলবে কি ?"

নগেন সূচটি কাপড়ে ফুঁড়িয়া রাখিয়া ঘাড়ের পাশটা চুলকাইতে-চুলকাইতে কহিল—"সত্যি ! কিন্তু কি করব বল ? পূজোতে না কি কাপড় দেবে না।"

[illegible] রাল সু[illegible] কহিল—দেবে না কেন ? যারা বড়লোক তাদের দিচ্ছে ! তেলা-মাথায় তেল দেওয়াই তো সরকারের রীত !"

নগেন চুপ করিয়া রহিল—কিন্তু মনে মনে সায় দিল। সরকার ও সাহেব তাহার কাছে অভিন্ন—অবশ্য দেশী কালা সাহেব নয়, খাঁটি গোরা সাহেব। ভারতের চল্লিশ কোটি লোকের প্রকৃত ভাগ্যনিয়ন্তা ইহারাই। চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সুখ-সৌভাগ্য, দুঃখ-দুর্ভাগ্য ইহাদেরই মর্জ্জির উপর নির্ভর করে। নিজের কথা মনে পড়ে নগেনের। ভাল ষ্টেশন পাইয়াছিল, টিকিয়া থাকিতে পারিলে আখের গুছাইয়া লইতে পারিত। কিন্তু কেমন করিয়া জানে না—সাহেবের বিষ-নজরে পড়িল। চোখ খারাপ বলিয়া চাকরীটি গেল তাহার। কাঁদিয়া-কাটিয়া, পায়ে ধরিয়াও সাহেবের মন গলাইতে পারে নাই। অথচ তাহারই এক সহকর্ম্মী সুবোধ বাবুর ডিউটীর সময়ে একটা মালগাড়ী 'ডিরেল্‌ড' হইয়া গেল অথচ সাহেবের প্রিয়পাত্র বলিয়া কিছুই হইল না তাহার। একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল নগেনের।

সুরধুনী বলিতে লাগিল—"পরেশ গাঙ্গুলীর বৌ-এর বাপের বাড়ী জেলা সহরে, গিয়েছিল মাসখানেক আগে ; কাল ফিরেছে। গিয়েছিলাম বৌকে দেখতে। দেখি—এক রাশ কাপড় এনেছে—ধুতি-সাড়ী-টুট—আরও কত কি। ওর ভাই না কি কণ্ট্রাক্টার। চাল-কাপড়ের সাহেবের সঙ্গে খুব খাতির। কুলিদের নাম করে এক গাঁট কাপড় পেয়েছে। তা' কুলীদের দেবে তো ভারী ! নিজেরা নিচ্ছে—আত্মীয়-স্বজনদের দিচ্ছে—"

নগেন কহিল—"কি করতে বল তুমি ?"

সুরধুনী কহিল—"এক বার সহরে গিয়ে চেষ্টা-চরিত্তির কর না।"

—"চেষ্টা ?" বলিয়া নগেন হাসিল ; কহিল—"চেষ্টা করলেই কি কিছু হয় ?"

হয় না—দু'-জনেই জানে। চেষ্টা করিলেই যদি সাফল্য লাভ হইত তাহা হইলে যুদ্ধের বাজারে চাকরী খোয়াইয়া নগেনকে ঘরে বসিয়া থাকিতে হইত না। নগেন কহিল—"মায়াকে একটু তামাক দিতে বল না।"

সুরধুনী হাঁক দিল—"মায়া !"

মায়া সাড়া দিল "যাই মা !"

সুরধুনী কহিল—"তোর বাবাকে তামাক সেজে দে।" তার পর বলিতে লাগিল—"তা' হলেও চেষ্টা করতে হবে তো। যেমন করেই হোক কাপড় কিছু যোগাড় করতে হবেই। না হলে মান-সম্ভ্রম আর থাকবে না। ভাগ্যে আগে তোমার কাপড় অনেকগুলো ছিল তাই এত দিন চলল। আর কি চলে ? আমি না হয় গাঁয়ের মেয়ে, বয়স হয়েছে, লজ্জা করবার এমন কেউ নাই, ছেঁড়া হোক্ খাটো হোক, যেমন তেমন করে গা-ঢেকে রাস্তায় বেরোতে পারি। কিন্তু মায়া সমর্থ বয়সের মেয়ে—ও কি তা' পারে ? তা ছাড়া কমলাকে, জামাইকে এক-একখানা করে কাপড় তো দিতেই হবে। ওদেরও খুব কাপড়ের কষ্ট। বার বার করে লিখেছে—মা, আর কিছু পাঠাও আর না-ই পাঠাও, কাপড় একখানা করে পাঠিও মা, তোমার জামাই গামছা পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে !"

মায়া—যোগমায়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে বাহিরে আসিল। বয়স কুড়ি কি একুশ। ছিপছিপে গঠন—গায়ের রং, [illegible] নগেনের মতই। পরণে মার্কিণের থান, পাতলা ছির্ ছিরে খাটো। তাই ভাল করিয়া গায়ে জড়াইয়াছে, তবু কেমন যেন অস্বস্তির ভাব !

সুরধুনী মেয়ের মুখের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া কহিল—"মায়ারও একখানা কাপড় চাই। এই পরে ভদ্রঘরের মেয়েরা থাকতে পারে ?"

দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিল—"মুখপোড়ারা বলে—যক্তে কাপড় ঠাসাই আমাদের ; ইচ্ছে করে এই সব কাপড় পরছি।" বলেছি তো কত বার—এসে দেখে যাও কত ধুতি-সাড়ী বাক্স-প্যাটরা ভরে রেখেছি আমরা। তা' আসবেও না, বলতেও ছাড়বে না।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"আর দেখেই বা কি হবে ! চোখ কি আছে কারও ? রতনের বড় মেয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে পরনের কাপড়খানা দশ যায়গায় ছেঁড়া—উলঙ্গের বেহদ্দ ! ষোল-সতের বছরের সমর্থ মেয়ে ঐ পরেই ঘাট-ঘর করছে। মেজ খুড়ী দিনের বেলায় ঘর থেকে বেরোতে পারে না—একখানি গামছা মাত্র সম্বল। মুখুজ্জেদের মেজবৌ ঘাটে বাসন মাজছে—পরনে পুরোনো একখানা গায়ের কাপড়। গাঁয়ের অর্দ্ধেক লোকের ঐ অবস্থা। অথচ কাপড়ের কর্ত্তাদের বাড়ীর মেয়েরা মটমটে নতুন সাড়ী পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে ; ওদের বাড়ীর ঝি-কামিনরা যা' সাড়ী পরছে তা' অনেক দিন কেউ চোখে পর্য্যন্ত দেখে নি। এমন করে কত দিন চলবে বাপু ? যুদ্ধ তো শেষ হয়েছে শুনছি তবু আমাদের কষ্ট যাচ্ছে না কেন ?"

নগেন চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিল। তাহার মনেও ঐ প্রশ্ন—কবে এই কষ্ট ঘুচিবে ? শুধু তাহার নয়—সারা দেশের লোকের মনে—বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোকদের মনে ঐ একই প্রশ্ন—কবে আবার আগের সেই দিন ফিরিয়া আসিবে ? চারি টাকা চালের মণ, আট আনা সের মাছ, তিন-চার টাকা জোড়া ধুতি ও সাড়ী ! জোঁকের দল রক্ত চুসিয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে—রক্তের লোণা আস্বাদের লোভ কি তাহারা সহজে ভুলিতে পারিবে ? সারা জাতিটার দেহের রক্ত শেষবিন্দু পর্য্যন্ত শোষণ না করিয়া কি তাহারা ছাড়িবে ?

সুরধুনী কহিল—"এর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল, বাপু ? ঠাকুর নাম নাই—গুরু নাম নাই—দিন-রাত কেবল খাওয়া-পরার চিন্তা ! সারা দেশের লোকগুলোকে কুকুর-বেড়ালের সামিল করে তুলেছে মুখপোড়ারা।"

—"জামাই রয়েছ না কি হে ?" বাহির দরজা হইতে ডাক আসিল।

নগেন হাঁকিয়া কহিল—"আছি, আসুন কাকা !"

এক ব্যক্তি ঘরে ঢুকিল—ঢ্যাঙা, কাহিল, কালো রং, নগেনেরই সমবয়সী ; পরনে মার্কিণ থান লুঙ্গীর মত করিয়া পরা ; হাতে হুঁকা।

সুরধুনী কহিল—"আসুন কাকা, বসুন।"

কাকা কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, বার-দুই হুঁকায় মুখ দিয়া টানিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন—"কি হচ্ছে ?"

নগেন কহিল—"ছেঁড়া কাপড় জোড়া দিচ্ছি—ঐ তো কাজ এখন।"

কাকা কহিলেন—"ও আমি ছেড়ে দিয়েছি, বাবাজী, আর চলছে না—"

নগেন কহিল—"বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?"

কাকা উঠিয়া মাদুরের একধারে বসিলেন।

সুরধুনী কহিল—"আর তো চলে না, কাকা !"

কাকা কহিলেন—"কি করে চলবে বল। অনন্ত মুখুজ্জের ভাই কলকাতা থেকে এল, বলছে—ওখানে মাথা-পিছু ত্রিশ গজ করে কাপড় দিচ্ছে। কলকাতার সব লিখিয়ে-পড়িয়ে-বলিয়ে-কইয়ে লোক, কিছু হলে হৈ-চৈ করে বেশী। কাজেই ওদের আগে ঠাণ্ডা করছে সরকার। কলকাতার লোকের অভাব মিটিয়ে যা থাকছে জেলায় জেলায় পাঠাচ্ছে। জেলার মধ্যে জেলা সহর হ'ল মুখপাত, সারা জেলার শিক্ষিত লোকদের ওখানেই বস-বাস। কাজেই জেলার যা বরাদ্দ তার অর্দ্ধেক সহরের লোককে দিচ্ছে। তার পর যা' সামান্য থাকছে, পাড়াগাঁয়ের হাবা-গোবাদের জন্যে পাঠাচ্ছে। তা'ও যদি ন্যায্য ভাবে দেওয়া হোত তো বছরে ঘর-পিছু একখানা করেও পাওয়া যেত। কিন্তু মাঝ-পথে শকুনিরা ছোঁ মেরে তুলে নিচ্ছে।"

সুরধুনী খন্ খন্ করিয়া বলিয়া উঠিল—"কেন নিচ্ছে ? তোমরা সব আছ কি করতে ?"

বাম হাত চিৎ করিয়া দিয়া কাকা কহিলেন—"আমরা কি করব বল ? গায়ে ক্ষমতা নাই, হাতে পয়সা নাই। যা' বলছে, মুখ বুজে শুনছি—যা করছে সহ্য করছি। এই দেখ না—দু'-দুবার কাপড় এল, পেয়েছি মাত্র একখানা ন-হাতি সাড়ী আর তিন গজ মার্কিন। তোর খুড়ী তো লম্বা-চওড়া মানুষ, বরাবর এগার হাত আটচল্লিশ ইঞ্চি কাপড় কিনে দিয়েছি ; তাতেও খুঁৎ খুঁৎ করত। ন'-হাতি সাড়ী এক-পাক বেড় দিতেই কাবার ! ঘোমটা দেওয়া উঠে গেছে। আর আমার তো দেখছিস—কাছা-কোঁচা বাদ দিয়ে

বৈরাগী সেজেছি। যে রকম ব্যাপার দেখছি এর পর কৌপীন ধরতে হবে। সারা দেশের লোককে নাগা-সন্ন্যাসী বানাবার মতলব করেছে সরকার।"

সুরধুনী কহিল—"আমাদেরও ঐ অবস্থা কাকা। তার উপর হাতে-হাতে পূজো আসছে। তাই বলছিলাম ওকে—একবার সহরে যেতে,—কাপড়-চোপড় যদি কিছু পাওয়া যায়।"

কলিকাটি হুঁকার মাথা হইতে মেজেতে নামাইয়া রাখিয়া কাকা কহিলেন—"দেখি, জামাই, তোমার কলকেটা; এটা একেবারে ঠকঠকে হয়ে গেছে—"

নগেন কলিকাটি হাতে দিতেই কাকা সেটিকে হুঁকার মাথায় বসাইয়া, বার-দুই হুঁকায় টান দিয়া ধুঁয়া ছাড়িয়া টানের গলায় কহিলেন—"যেতে চায় যাক্—সুবিধে কিছু হবে না।"

নগেনও ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল।

সুরধুনী কহিল—"কেন বলুন দেখি?"

কাকা কহিলেন—"কাপড়ের বড় সাহেব না কি বেজায় জাঁদরেল লোক, পেল্লায় চেহারা, বেয়াড়া মেজাজ; কাউকে দেখলেই গোঁফ ফরকে গাঁক্ করে উঠে, রাগলে লাফিয়ে এসে ঘাড়ে পড়ে। এক জনকে না কি তুলে রেলিং পার করে ফেলে দিয়েছে—লোকটা রাস্তায় পড়ে অজ্ঞান!"

নগেন ও সুরধুনী, দুই জনেরই মুখ শুকাইল। সুরধুনী ঢোঁক গিলিয়া আমতা-আমতা করিয়া কহিল—"সাহেবদের অমন মেজাজ হয় বটে! ঠাণ্ডা দেশের লোক কি না, গরম দেশে মগজ বিগড়ে যায়। তা' উনি তো অনেক সাহেবের কাছে কাজ করেছেন, সামলাতে পারবেন বোধ হয়।"—নগেনের উদ্দেশে কহিল—"হ্যাঁ গা, পারবে না?"

নগেন অত্যন্ত অনিচ্ছার সহিত ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—পারিবে।

সুরধুনী সাহস দিয়া কহিল—"না পারলে চলবে কেন? যেতে তো হবে! কত লোক কত শক্ত-শক্ত কাজ করছে। যতই হোক—পুরুষমানুষ তো! তা' ছাড়া লোকে যতটা বলে ততটা নয় হয় তো!"

কাকা কিছুক্ষণ তামাক টানিয়া-টানিয়া মুখের এ-পাশে ও-পাশে ধোঁয়া বাহির করিলেন, তার পর একটা লম্বা টান দিয়া মুখ ও নাক দিয়া প্রচুর ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিলেন—"এক কাজ করতে পার। বড় সাহেবের কাছে যাবার দরকার নাই, ছোট সাহেবের কাছে যাও। সাহেব নয় বাঙ্গালী—অবিশ্যি হিন্দু নয় চাটগেঁয়ে মুসলমান, বেঁটে—সিড়িঙ্গে চেহারা, তবে ধানি লঙ্কার মত না কি মেজাজ! তা হলেও লম্ফ-ঝম্প কম, যা বলে মুখেই বলে—গায়ে লাফিয়ে পড়ে না। আর যদি ওখানেও সুবিধে না হয়, কালো-বাজারে ঢুকে পোড়ো। শুনেছি না কি পাওয়া যায়।" কণ্ঠস্বর নামাইয়া কহিলেন—"এখানেও পাওয়া যায়। রাধানাথের কাছে। সে দিন পাশের গাঁয়ে গেছলাম। এক জন এক জোড়া কাপড় কিনে নিয়ে গেল এখান থেকে। কুড়ি টাকা জোড়া। তবে আমাকে-তোমাকে তো দেবে না—"

সুরধুনী কহিল—"এত টাকা কোথায় আমাদের কাকা! মেয়ের বিয়ে, দুর্ভিক্ষের বছরে সারা বছর চাল কেনা, আর এই দুর্মূল্যের বাজারে সংসার চালান! কলসীর জল গড়াতে গড়াতে কত দিন থাকে? তা'ও কত দিন এমন লেবে কে জানে! কি যে হবে—ভেবে রেতে ঘুম হয় না আমাদের—" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। নগেনও ফেলিল। কাকা তামাক টানিতে লাগিলেন।

দিন কয়েক পরে, সুরধুনীর ক্রমাগত তাগিদের ফলে নগেনকে জেলা সহরে যাইতে হইল। হাতে টাকা ছিল না! এক জোড়া কানের ফুল স্যাকরার দোকানে বিক্রয় করিয়া সুরধুনী টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিল।

২

বাসে অত্যন্ত ভিড়। সকলেই সহরের যাত্রী, উদ্দেশ্য একই—পূজার জন্য কাপড়, কেরোসিন, চিনি। নগেনদের গ্রাম হইতে পাকা রাস্তা পর্য্যন্ত এক ক্রোশ হাঁটিয়া আসিয়া বাস ধরিতে হয়। নদীর ঘাট হইতে বাস ছাড়ে। এখান পর্য্যন্ত আসিতে-আসিতে যাত্রীতে ভরিয়া যায়। কাজেই নগেনকে দরজার পাশেই কোন মতে একটু যায়গা করিয়া বসিতে হইল। সকলেই বিরক্ত হইয়া উঠিল তাহার উপর, বিশেষ করিয়া তাহার একেবারে পাশের লোকটি, ঝাঁকড়া ভ্রূ দুইটা কুঁচকাইয়া মাঝে-মাঝে রুষ্ট কটাক্ষ হানিতে লাগিল এবং কনুই দিয়া গুঁতা মারিয়া ধমকাইতে লাগিল—"ভারী ঠেলছেন মশায়! ঠিক হয়ে বসুন না, অত হাত-পা মেলে বসবার সখ তো আগে আসতে হয়। যত সব—"

নিজেকে যত দূর সম্ভব সঙ্কুচিত করিয়াও নগেন নিষ্কৃতি পাইল না।

যাত্রীদের মধ্যে আলোচনা চলিতে লাগিল। আলোচ্য বিষয়—কাপড়, কেরোসিন, চিনি ও চাল। প্রত্যেক গাঁয়ে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই রাত্রি দ্বিপ্রহর; নুণ দিয়া চা খাইতে হয়—পোড়া অভ্যাস ছাড়া যায় না কিছুতেই; দেশশুদ্ধ লোক অর্দ্ধ-উলঙ্গ, চালও দুষ্প্রাপ্য, তার উপর এ বৎসর অনাবৃষ্টি, আগামী বৎসর দুর্ভিক্ষ সুনিশ্চিত। আবার কত লোক মারা যাইবে কে জানে! এমন করিয়া তিলে তিলে দগ্ধাইয়া না মারিয়া সরকার যদি বোমা ফেলিয়া ফেলিয়া এক দিনে সারা দেশের লোককে মারিয়া দেয় তো ভাল হয়।

এক জন কহিল—"আমরা তো কুকুর-বিড়ালের সামিল, আমাদের মারতে পয়সা খরচ করবে কেন মশায়! না হ'লে এমন বোমা তৈরী করেছে যে গোটা কয়েক ফেলে দিলেই সারা দেশ মরুভূমি হয়ে যাবে! জাপানের মত এত বড় জাতটাকে এক জোড়াতেই কাবু করে দিলে মশায়!

আর এক জন কহিল—"কুকুর-বিড়ালের অধম আমরা। ওরাও মার খেলে চেঁচায়; দাঁত বার করে কামড়াতে আসে; আর আমরা? একেবারে মৌনী বাবা! মারুক, ধরুক, দু'-পায়ে কাদার মত থেঁতলাক্—সাড়াটি পর্য্যন্ত নাই। না হলে দেশের গুদামে গুদামে চাল পচছে, ময়দা পচছে কাপড়ে উই ধরছে, আর দেশের লোক না খেতে পেয়ে নির্ব্বিবাদে মরছে, নেংটি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

আর এক জন কহিল—"যেমন অদেষ্ট আমাদের! পোড়া বাংলা দেশে জন্মেছি। রাহু রাজা, কেতু মন্ত্রী! বাংলার বাইরে এত কষ্ট নাই—"

এক জন ভদ্র লোক—লম্বা, দোহারা চেহারা, কালো রং, মাথার চুল ছোট করিয়া ছাঁটা, গোঁফ দাড়ী পরিষ্কার করিয়া কামানো, চোখে

চসমা, পরনে খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী, পায়ে কাবলী স্যাণ্ডাল—এতক্ষণ কোন আলোচনায় যোগ না দিয়া নীরবে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, মুখ তুলিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"হবে না কেন বলুন? ভাণ্ডারী যাদের ভাণ্ডধারী তাদের দুঃখ কি কোন দিন ঘুচে মশায়! আমাদের সরকারী বরাদ্দ একে কম, তার উপর যাদের হাত দিয়ে তা' আসছে, তারা নিজেদের ভাঁড় আগে ভর্ত্তি করছে, আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু-বান্ধবদের ভাঁড়েও কিছু-কিছুটা ঢালছে, তার পর ধুলো-গুঁড়ো যা' বাড়ছে সবাইকার সামনে হাত ঝেড়ে দিচ্ছে। তাই-ই পাবার জন্যে আমরা পরস্পর ঠেলাঠেলি মারামারি করছি, কারও ভাগ্যে কিছু জুটলে নিজেদের কৃতার্থ মনে করছি আর না জুটলে অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়ে বাড়ী ফিরছি।"

সকলে সমস্বরে কহিল—"সত্যি মশায়, ঠিক বলেছেন।"

ভদ্রলোক কহিলেন—"দেখুন না! আমাদের মহকুমার কথা। পাঁচ ছ' লাখ লোকের বাস; এদের জন্যে সরকার থেকে পাঠাল হয় তো বিশ হাজার মাত্র ধুতি-সাড়ী। রাস্তার হরেক রকমের ঝঞ্ঝাট কাটিয়ে ভালয় ভালয় ষ্টেশনে এসেও পৌঁছিল। কিন্তু সরকারী গুদামে ঢোকবার আগেই রাস্তা থেকে দু'-তিন হাজার কাপড় ব্যবসায়ীদের কবলে চলে গেল—"

দু'-তিন জন বলিয়া উঠিল—"কি করে?"

ভদ্রলোক কহিলেন—"কি করে?" মুচকি হাসিয়া কহিলেন—"সে অনেক কথা—শুনে কাজ নাই। যাক্, বাকী যা' এসে পৌঁছল তার মোটা অংশ দেওয়া হোল সহরের লোকদের জন্য। তার পর যা' থাকল—তার কতকটা বড় সাহেব রাখলেন নিজের হাতে—নিজের খেয়াল ও খুসী মত বিলি করবার জন্যে। এর পর থাকল সামান্যই—তা অবশ্য দেওয়া হোল পাড়াগাঁয়ের লোকদের জন্যে—ফুড-কমিটির মেম্বারদের হাতে! তারা সেগুলো নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলে।"

এক জন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—"ভাঁড়ের গুড় পিঁপড়েতেই মেরে দিচ্ছে, মশায়! আমাদের ভাগ্যে ঠক্‌ঠক্ নবডঙ্কা—"

নগেন এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিল; ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করিল—"বড় সাহেবের হাতে কাপড় আছে বললেন—গেলে কিছু দেবে?"

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিলেন—"আপনাকে দেবে কেন? সাহেবের ব্যবহারের জন্যে চব্বিশ ঘণ্টা দামী মোটর মোতায়েন রাখেন, না—যখন-তখন ডালি পাঠান?"

এক জন কহিল—"তা ছাড়া জঙ্গী মেজাজ! গেলে তেড়ে মারতে আসে—ভদ্র-অভদ্র বিচার করে না। সে দিন স্কুলের এক জন মাষ্টারকে আফিস থেকে অপমান করে বার করে দিয়েছে—"

আর এক জন কহিল—"সরকারী চাকরদেরই অপমান করে তো। স্কুলমাষ্টার! স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব পর্য্যন্ত ওকে ভয় করে।"

এই সব খবর শুনিয়া নগেনের বুক যেন দশ হাত বসিয়া গেল। সুরধুনী আজ সাত-আট দিন ক্রমাগত উৎসাহ ও উত্তেজনার উত্তাপ দিয়া তাহার মনের মধ্যে যতটুকু সাহসের বাষ্প সঞ্চয় করিয়াছিল, বাস হইতে যখন নামিল তখন তাহার বিন্দুমাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

বাস হইতে নামিয়া নগেন ভদ্রলোককে কহিল—"মশায়, আমার কয়েকখানা কাপড়ের অত্যন্ত দরকার—কোথায় যাব বলতে পারেন?"

ভদ্রলোক কহিলেন—"সাপ্লাই অফিসেই যেতে হবে। তবে সেখানে খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। তা'র আগে বরং সহরের ফুড-কমিটির আফিসে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। ওদের হাতে এমনই ষ্ট্যাণ্ডার্ড ক্লথ থাকে অনেক, দয়া হলে দিতে পারে।"

নগেন কহিল—"দু'-একখানা ভাল কাপড় দরকার।"

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন—"ও-সব ওখানে সুবিধে হবে না, তবে দেখুন চেষ্টা করে।"

নগেন জিজ্ঞাসা করিল—"ফুড-কমিটির আফিসটা কোথায়?"

ভদ্রলোক হাত বাড়াইয়া কহিলেন—"ঐ যে সামনেই—আচ্ছা—নমস্কার—" বলিয়া চলিয়া গেলেন।

ফুড-কমিটির আফিসের সামনে অত্যন্ত ভিড়। গেট হইতে আফিস-ঘরের দরজা পর্য্যন্ত লোকে ঠাসাঠাসি হইয়া গিয়াছে। সকলেরই চেষ্টা ভিতরে যাইবার। কিন্তু উপায় নাই। যাহারা আগাইয়া দাঁড়াইয়া আছে, তাহারা মাটি আঁকড়াইয়া আছে, ইঞ্চি-মাত্র স্থানচ্যুতি সহ্য করিতেছে না; এই জমাট জনতার মধ্য দিয়া মাঝে-মাঝে দু'-এক জন অতি-কষ্টে পথ কাটিয়া বাহিরে আসিতেছে। জনতাও এক বিঘৎ অগ্রসর হইতেছে। কিছু দূরে জনকয়েক প্রৌঢ়া বিধবা আফিসে ঢুকিবার আশায় অসহায় মুখে দাঁড়াইয়া আছে।

নগেন এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। এই ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতে সাহসে কুলাইল না। অদূরে মেয়েগুলি, খুব সম্ভব তাহার এই আচরণ দেখিয়া নিজেদের মধ্যে মৃদু হাস্য সহকারে আলোচনা করিতে লাগিল।

এক ব্যক্তি ঠেলাঠেলি করিয়া ভিড় হইতে বাহির হইয়া আসিল; যেন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইল—এমনই বিপর্য্যস্ত অবস্থা। নগেন কাছে যাইতেই হাত তুলিয়া কহিল—"দাঁড়ান, মহাশয়! সামলাই আগে—" কিছুক্ষণ হাঁপাইয়া কহিল—"কি জিজ্ঞাসা করছেন বলুন দেখি?"

নগেন কহিল—"কিছু পেলেন?"

লোকটি মাথা নাড়িয়া কহিল—না, পাড়াগাঁয়ের লোকদের দেবে না এরা; সহরের ফুড-কমিটি সহরের লোককেই দেবে; মিথ্যে গুঁতোগুঁতি খাওয়াই সার হ'ল!"

"নগেনকে জিজ্ঞাসা করিল—আপনার বাড়ী কোথায়?"

নগেন কহিল—"পাড়াগাঁয়ে—"

লোকটি কহিল—"তবে আর মিথ্যে দাঁড়িয়ে না থেকে খসে পড়ুন—সাপ্লাই আফিস ছাড়া উপায় নাই।"

নগেন কহিল—"সেখানে শুনেছি—"

লোকটা মাথাটা ঝাঁকাইয়া কহিল—"কঠিন ব্যাপার! সিংহের গহ্বরেও ঢোকা যায়, কিন্তু সাহেবের ঘরে ঢোকা শক্ত! হাঁক ছাড়ে যেন বাজের শব্দ! আপনার মত পিট্‌পিটে লোককে থাবড়ে চ্যাপ্টা করে দিতে পারে। দম লইয়া কহিল—"সেই জন্যেই তো এখানে এসেছিলাম, মশায়! যাই হোক্, দেশী লোক। তা অনেক হাতে-পায়ে ধরলাম, কিন্তু—" মুখ কুঁচকাইয়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"নাঃ—কিছুতেই দিলে না—" হঠাৎ থামিয়া,

দুই পকেটে হাত ঢুকাইয়া, চোখ দুইটা গোল করিয়া তুলিয়া ত্রস্ত উৎকণ্ঠার সহিত কহিল—"মশায়, আমার টাকা! কেউ তুলে নিলে না কি?" পকেট দুইটা টানিয়া বাহির করিয়া, বুকপকেটে হাত ঢুকাইয়া, সভয়ে কহিল—"নাই তো, কে নিলে মশায়! আপনিই তো কাছ ঘেঁসে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—"

"নগেন ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল—"সে কি, মশায়! আমি বরাবর আপনার সামনে দাঁড়িয়ে যে—" দেখুন আর কোথাও রাখেননি তো।"

"লোকটা পটাপট, কামিজের বোতাম খুলিয়া, সামনের ফাঁক দিয়া হাত ঢুকাইয়া, নীচে ফতুয়ার পকেটে হাত দিয়াই হাসিয়া ফেলিল—" আছে, মশয়!—সাবধানে রেখেছি—কারও মারবার যো কি! পাড়াগাঁয়ের লোক হলে কি হয়, হামেসা সহরে আসা-যাওয়া; সহরের লোকের চেয়েও চালাক। তা' কাপড় না নিয়ে নড়ছি না আমি। পাঁচ-পাঁচ জোড়া ছেলে-মেয়ে মশায়! সবাইকে কাপড় লাগবে পূজোতে। সারা বছরে একটি বার মায়ের পূজো, এক-একখানা করে কাপড় না দিলে কি চলে, মশায়! আর বছর কে বাঁচে কে মরে! গিন্নীকে এক জোড়া দিতে পারলে ভাল হয়—সেদিন একখানা, সম্বৎসর একখানাও দিতে পারিনি; এবারে না দিলে ভদ্রস্থতা থাকবে না—" ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"দে দিক বেটারা, আমি খোদ বড় সাহেবের কাছ থেকেই আদায় করব।"

নগেন ঔৎসুক্য সহকারে কহিল—"কি করে?"

ভদ্রলোক চোখ টিপিয়া মুচকি হাসিয়া কহিল—"উপায় আছে, মশায়! সিংহও তো পোষ মানে। সহরে এমন লোক আছে যাদের কাছে ঐ সিংহই পোষা কুকুর,—কাছে গেলেই গা চাটে—লেজ নাড়ে—"

নগেন সাগ্রহে কহিল—"কে, মশায়?"

লোকটি গম্ভীর হইয়া উঠিয়া কহিল—"তা' আপনার জেনে কি হবে? আপনার সঙ্গে তো আলাপ নাই। আমি হলাম পুরোনো খাতক,—আসলের দুনো সুদ খাইয়েছি, আসল খালাসের জন্যে এক-চকে দশ বিঘে সোনা জমি কবলা করে দিয়েছি।"

নগেন আন্দাজ করিয়া কহিল—"কোন মাড়ওয়ারী?"

লোকটা বাধা দিয়া কহিল—"কি করে জানলেন মশায়! যদি জানেনই তো বলেই দিই—চন্দনলাল মাড়ওয়ারী। এ তল্লাটের এক-চেটে ঘিএর কারবারী, দুর্ভিক্ষের বছর থেকে চালও ধরেছে; খুব খাতির সাহেবের সঙ্গে; মাসে মাসে অনেক খাওয়ায় সাহেবকে। হাতে-পায়ে ধরে একটা চিঠি যদি নিয়ে যেতে পারি সাহেবের কাছে—কাপড় দিতে পথ পাবে না সাহেব।"

নগেন অনুনয়ের সুরে কহিল—"মশায়, আমাকেও একটা চিঠি যদি—"

কথাটা শেষ করিতে না করিতেই লোকটি হাত নাড়িয়া কহিল—"না মশায়! ওটি বলবেন না। অনেক তেল খরচ করতে হবে একটা চিঠির জন্যে; দু'-জন গেলে চটে যাবে—দিতে চাইবে না; আমারও হবে না, আপনারও হবে না। আপনি বরং আর কাউকে ধরুন গে—"

নগেন কহিল—"কারও সঙ্গে যে আলাপ নাই আমার"

—"তবে আর কি করবেন! আচ্ছা—চলি তা'হলে—" বলিয়া পা চালাইয়া দিল লোকটা। নগেনও পিছু-পিছু চলিল। লোকটা কিছু দূর গিয়া, ঘাড় বাঁকাইয়া নগেনকে আসিতে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল; পিছন ফিরিয়া কহিল—"ও মশায়! পিছু নিয়েছেন না কি? ও কাজটি করবেন না বলছি—ভাল হবে না—" বলিয়াই লম্বা চালে চলিতে সুরু করিল।

কতকটা গিয়া পাশেই একটা চা-এর দোকান। এক কাপ চা খাইবার জন্য নগেন সেখানে ঢুকিল। ঘরটি নেহাৎ ছোট—পাঁচ হাত লম্বা চার হাত চওড়া, রাস্তা হইতে সিঁড়ি দিয়া উঠিলেই এক টুকরা রোয়াক তার পর দুই পাশে দুইটা দরজা। বাম দিকের দরজা দিয়া ক্রেতাদের ঘরে ঢুকিতে হয়। ডান দিকের দরজার সামনেই একটি কেরোসিন কাঠের টেবিলের উপরে পান ও সিগারেট বিক্রয়ের ব্যবস্থা। ঘরের বাম দিকের ও সামনের দেওয়াল ঘেঁসিয়া দুইটা বেঞ্চি—প্রত্যেকটার সামনে দেড় হাত চওড়া উঁচু টেবিল। সামনের দেওয়ালের ডান পাশে একটি ছোট দরজা। সেই দরজা দিয়া পিছনে আর একটা ঘরে যাওয়া যায়। এই ঘরটাতেই চা ও খাবার তৈয়ারীর ব্যবস্থা।

বাম দিকের বেঞ্চিতে জন তিনেক ছোকরা চা খাইতেছিল। পরিধানে ঢিলে-হাতা পাঞ্জাবী ও পাজামা, পায়ে কাবলী চটি; মাথায় লম্বা উল্টান চুল; চোখে চসমা; কেশে ও বেশে পারিপাট্যের অভাব; প্রত্যেকের হাতেই জ্বলন্ত ধূমায়মান সিগারেট; চা ও সিগারেট পান একসঙ্গেই চলিতেছে।

সামনের বেঞ্চিতে ছোকরাগুলির কাছ ঘেঁসিয়া এক ব্যক্তি বসিয়া আছে; রং বেশ ফর্সা; গোঁফ-দাড়ি-নির্মুক্ত মুখ; মাথায় বাবরী চুল; পরিধানে মিহি ধুতি ও গিলা-করা আদ্দির পাঞ্জাবী, টেবিলে রক্ষিত বাম হাতে মাথাটি রাখিয়া মুদ্রিত নয়নে সিগারেট টানিতেছে।

সামনের বেঞ্চির আর এক প্রান্তে নগেন বসিল। একটা ছোট ছেলে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"খাবার টাবার দেব, না, শুধু চা?"

নগেন কহিল—"শুধু চা।"

ছোকরাগুলি নগেনের দিকে একবার তাকাইয়া নিজেদের আলোচনায় নিবিষ্ট হইল। নগেন চা খাইতে খাইতে তাহাদের আলোচনা শুনিতে লাগিল।

সিগারেটে লম্বা টান দিয়া এক জন কহিল—"দেশের দুঃখ আর সহ্য হয় না, মাইরি—"

বাকী ছোকরা দুই জন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, তাহাদেরও হয় না।

ভদ্রলোক চোখ খুলিয়া কহিল—"কি হ'ল হে তোমাদের?"

ছোকরাগুলির ঠোঁট বাঁকা হাসিতে কুঁচকিয়া উঠিল। এক জন বিদ্রূপের সুরে কহিল—"আপনি আর কি বুঝবেন বলুন! মামার ঘাড়ের রক্ত চুষে-চুষে ফুলে উঠছেন দিন দিন!"

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিল—"সে তো তোমাদেরই কাজ করছি হে! তোমরা চুষছ মাসে দু'বার চার বার আর আমি দিন-রাত সারাক্ষণ,—একটা ক্যাপিটালিষ্টকেও যদি কাবু করতে পারি—তাতে তোমাদেরই কাজ হালকা হবে। ও কথা যাক্—তোমাদের দুঃখটা আজ হঠাৎ অসহ্য হয়ে উঠল কেন?"

উত্তর দিল আর এক জন—"কেন? আজ দেখেননি—কত বড় একটা ক্ষুধার মার্চ হয়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে—ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীর কম্পাউণ্ডে তিল ফেলবার যায়গা নাই!"

ভদ্রলোক সিগারেটে টান দিয়া এক রাশ ধোঁয়া ছাড়িয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"হাঁ, আজকার শোটা তোমাদের মন্দ হয়নি! এর জন্য যে তোমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হয়েছে তা তোমাদের

চেহারার জৌলুস আর ক্ষিদের বহর দেখেই বুঝা যাচ্ছে। বসতে না বসতেই তিন টাকার চপ-ক্যাটলেট তো উড়ে গেল!"

এক জন প্রতিবাদের সুরে করিল—"কি বলছেন আপনি? লো! লো নয়, মশায়, জাগ্রত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত্ত অভিযান—বুঝতে পারবেন শীগ্‌গির।"

আর এক জন কহিল—"যে শক্তি কণা-কণা হয়ে ছড়িয়েছিল, যা' দুর্দ্দিনের ঝাপটায় একসঙ্গে জড় হয়েছে অত্যাচার আর উৎপীড়নের দাহনে গলে সংহত হয়েছে, নিরাশার হিমে জমাট বেঁধে কঠিন হয়ে উঠেছে—তাকে পিটে, শাণ দিয়ে আমরা ক্ষুরধার করে তুলছি—এর আঘাতে অত্যাচারীর দানবীয় শক্তি খান-খান হয়ে যাবে—"

ভদ্রলোক দুই চোখ ডাগর করিয়া কহিল—"সাংঘাতিক ব্যাপার তো? লুঠপাট করবে না কি হে?"

আর এক জন জবাব দিল—"না, তাদের ন্যায্য দাবী জানাবে তারা। তারা যে মানুষ, পশু নয়, মানুষের মত বাঁচবার জন্যে তাদের খাদ্য চাই, বস্ত্র চাই, ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে সমবেত দৃঢ়কণ্ঠে তা তারা জানিয়ে দেবে।"

ভদ্রলোক কহিল—"ম্যাজিষ্ট্রেট যদি না শোনে তাদের কথা?"

উত্তর হইল—"তারা চীৎকার করবে—"

ভদ্রলোক কহিল—"ম্যাজিষ্ট্রেট যদি ঘরে খিল দিয়ে কানে তুলো এঁটে বসে থাকে?"

জবাব হইল—"তারা এমন চীৎকার করতে সুরু করবে, যাতে সহরের লোকদের কানে তালা লাগবে। তখন সহরে গণ্য মান্য ব্যক্তিরা ম্যাজিষ্ট্রেটকে টেনে বার করে কানের তুলো খসিয়ে শোনাবে।"

—"বেশ, ম্যাজিষ্ট্রেট যদি সব শুনে মাথা-পিছু দিন দু-মুঠোর ব্যবস্থা করে দেয়?"

—"তারা ফিরে যাবে; সাফল্যের আস্বাদ পেয়ে তাদের উজ্জীবিত প্রাণশক্তি পরিতৃপ্ত হবে।"

ভদ্রলোক কহিলেন—"ওতেই ওদের দুঃখ ঘুচবে তো? খাবার দুঃখ—পরবার দুঃখ—মানুষের মত না বাঁচতে পারার দুঃখ?"

নগেন এতক্ষণ ইহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"মশায় আমাদেরও তো খাবার দুঃখ,পরবার দুঃখ! আমাদের জন্যে—"

ভদ্রলোক বাধা দিয়া কহিল—"থামুন, মশায়! মেলা বকবেন না। আপনারা, মধ্যবিত্তরা, ওদের জন-হিতসাধনী সমিতির এলাকার বাইরে।"

ছোকরাদের এক জন ব্যঙ্গের সুরে কহিল—"খেয়েছেন পরেছেন তো অনেক দিন, দিনকতক উপোস দিন না, উলঙ্গ থাকুন না!"

নগেন ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল—"ও কি কথা, মশায়! ভদ্রলোকের মেয়ে-পুরুষ উলঙ্গ থাকবে!—"

ভদ্রলোক জোর-গলায় কহিল—"একশ' বার থাকবে। কি বল হে তোমরা এদের? পেতি বুর্জ্জোয়া, প্যারাসাইট—মানে—" নগেনের দিকে তাকাইয়া কহিল—"জোঁক, ছারপোকা আপনারা—"

এক জন ছোকরা কহিল—"দেশের সমস্ত জন-মজুর জেগে উঠলে কোথায় থাকবেন, ভাবুন গে বসে বসে; পায়ের তলায় গুঁড়ো হয়ে ধুলো হয়ে যাবেন—"

এই সময়ে জন কয়েক লোক ঘরে ঢুকিতেই দোকানদার কহিল—"আপনারা কি উঠবেন?"

—হ্যাঁ হ্যাঁ, উঠছি আমরা—"বলিয়া ছোকরাগুলি উঠিয়া দাঁড়াইল। ভদ্রলোককে কহিল—"আচ্ছা আসি আমরা, দেখি গে ওদের—" বলিয়া চলিয়া গেল।

তার পর ভদ্রলোক নগেনকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোথায় বাড়ী আপনার?"

নগেন গ্রামের নাম করিল।

ভদ্রলোক প্রশ্ন করিল—"কি জন্যে সহরে এসেছেন?"

নগেন কহিল—"খান কয়েক কাপড় কেনবার জন্যে।"

ভদ্রলোক কহিল—এমনই কাপড় তো পাবেন না। ওপর-ওয়ালাদের সঙ্গে খাতির-টাতির না থাকলে কাপড় পাওয়া যায় না—" কণ্ঠস্বর নীচু পর্দ্দায় নামাইয়া কহিল—"তবে ব্ল্যাকে কিনলে পেতে পারেন।" চোখের ইঙ্গিতে দোকানদারকে নির্দ্দেশ করিয়া কহিল—"ওর কাছে আছে কাপড়, চায়ের দোকানটা ওর লোক-দেখানো; আসলে ও কাপড়ের কালো কারবারী; বিস্তর কাপড় আছে ওর ঘরে; আমরা তো ওর কাছেই কিনি: আমাকে বিশেষ করে খুব—দরকার হলে বলে দিতে পারি ওকে।"

নগেন কহিল—"কত দর?"

ভদ্রলোক কহিল—"দরটা একটু অবশ্য বেশীই।

তা' কি করবেন? কোথাও পাবেন না তো? তাঁতের ধুতি-সাড়ী কিনতে পারেন অবশ্য—তবে তার দরও বেশী, টেঁকেও না।"

নগেন কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল—"বেশ তো, ওকে বলেই একবার দেখুন না।"

ভদ্রলোক উঠিয়া দোকানদারের কাছে গিয়া, তাহাকে ডাকিয়া পিছনের ঘরে লইয়া গেল এবং তাহার সহিত কথা-বার্ত্তা কহিয়া কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল।

নগেন কহিল—"কি বলছে?"

ভদ্রলোক কহিল—"দিতে চাইছিল না। পূজোর বাজারে খদ্দেরের ভিড় কি না। দু'বেলা কত লোক একখানা কাপড়ের জন্যে ওর পায়ের তলায় গড়াগড়ি দিচ্ছে। আমি অনেক করে বলতে রাজী হয়েছে; তবে দর বেশী—বুঝতেই তো পারছেন—যেমন চাহিদা তেমনই দাম—"

নগেন ভয়ে ভয়ে কহিল—"কত?"

ভদ্রলোক জবাব দিল—"ধুতি বিশ টাকা জোড়া, সাড়ী—পঁচিশ—"

নগেন দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিল—"ওরে বাবা!"

ভদ্রলোক কহিল—"মশায়! কালো-বাজার নামই তো ঐ জন্যে। দাম শুনেই দু'-চোখে কালো আঁধার নেমে আসে। তা দেখুন—সুবিধে না হয় তো কি করবেন। তবে পাবেন না কোথাও বলে দিচ্ছি। সবাই ছুটছে সাপ্লাই অফিস—সাহেবের কাছে ধমক অপমান খেয়ে ফিরে এসে এই কালো-বাজারেই কিনছে।"

নগেন কহিল—"একবার চেষ্টা করে দেখি—না হয় তো তাই করতে হবে।"

ভদ্রলোক কহিল—"তাই করুন গে, না হয় তো আসবেন—থাকি তো ব্যবস্থা করে দেব। আর দেখুন, এ কথা পাঁচ-কান করবেন না; আপনার ভালর জন্যেই বলছি, ওর কিছু হবে না; আপনি মিথ্যে পুলিশের টানা-হেঁচড়ায় পড়ে যাবেন।

[ক্রমশঃ

স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

৬

মৃত্যুর দিক্ থেকে মুখ ফিরাইয়া লইল বটে, সে কিন্তু [illegible] সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; মা কেমন আছেন?—এই দুই বৎসরের বিচ্ছেদের মত আশঙ্কা এক মুহূর্ত্তে তার পুঞ্জীভূত তীব্রতায় শৈলেনকে অভিভূত করিয়া ফেলিল। আর ঐ একটি প্রশ্ন আশ্রয় করিয়া মৃত্যু যেন শত শত রূপে, শত বিভীষিকায় জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মা কি রকম আছেন?···আছেন তো? যদি না থাকেন!··· সর্ব্বনাশ, এ কি হইয়া গেল!···দুই বৎসরের মধ্যে শৈলেন এত অসম্ভব কথা সব ভাবিয়াছে—এত অসম্ভব আশা, এত অসম্ভব কল্পনা—আর এই সব চেয়ে বড় সম্ভাবনার কথাটাই ভাবে নাই!

গতিটা আপনিই দ্রুত হইয়া উঠিয়াছে, যেন এখনই পৌঁছিতে হইবে, এমনও তো হইতে পারে যে, এই আজ পর্য্যন্ত ছিলেন মা, কিম্বা আর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিবেন, তার পর···

শৈলেন এর পরে আর নিজেকে ভাবিতে দেয় না, জোর করিয়া চিন্তার গতি রোধ করিয়া রাখে। সেই রুদ্ধ বেগই যেন পায়ে আসে নামিয়া, পদক্ষেপ আরও যায় ক্ষিপ্র হইয়া। মনটা বেশ প্রকৃতিস্থ নাই-ই আজ, এক সময় মাত্র একটি চিন্তাই মনকে চাপিয়া ধরিতে চায়, এই একটু আগে ছিল যাইতে হইবে, এইবার দাঁড়াইয়াছে ফিরিতে হইবে; স্থান, কাল, অবস্থার চেতনা সব গেছে মন থেকে মুছিয়া।

সেটা ফিরিয়া আসিল ষ্টেশনে আসিয়া। মা আর তাহার মাঝে এখনও সে বহু দূরের ব্যবধান! আপাততঃ সম্বল ষ্টীমার, তাহার এখনও অন্তত দুই ঘণ্টা দেরি!

শৈলেন জলে নামিয়া বেশ ভালো করিয়া মুখ-হাত ধুইল; বেশ গুছাইয়া ভাবিবার ক্ষমতাটা অল্পে অল্পে ফিরিয়া আসিতেছে। আজ সমস্ত দিনের ঘটনাগুলা আদ্যোপান্ত একবার ভাবিয়া দেখিল। গঙ্গার দ'য়ে আসিয়া চিন্তাটা যেন এক জায়গায় দাঁড়াইয়া রহিল—অনেকক্ষণ: সেই কেন্দ্রমুখী আবর্ত্ত, তাহার উপর গাঢ় অন্ধকার নামিয়াছে এখন। মৃত্যু যেন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া জীবন-স্রোত থেকে সন্দেহলেশহীনদের নিজের গহ্বরে টানিয়া টানিয়া লইতেছে—কুটাকুটি, সবুজ ডাল, সবুজ শস্য, জীয়ন্ত গাছ; কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপ!···কোথায়?···শৈলেন এতক্ষণে—কত আগেই না সে-প্রশ্নের উত্তর পাইয়া যাইত! মনটি বিষণ্ণ হইয়া আসে। জীবনে আবার প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মৃত্যু সম্বন্ধে প্রাণের স্বভাবত যে আতঙ্ক সেটা কি আবার ফিরিয়া আসিতেছে?

রাত বারোটার সময় শৈলেন দ্বারভাঙ্গায় পৌঁছিল। নিতান্ত নিরুপায় হওয়ার জন্যই মা-লইয়া যে উদ্বেগটা কতক চাপা ছিল সেটা আবার উগ্র হইয়া উঠিয়াছে, কি দেখিতে হইবে?—কি শুনিবে?··· কাছেই বাড়ি, কিন্তু ঐটুকুতেই পা যেন শিথিল হইয়া আসিয়াছে। বাড়ির কাছে আসিয়া আর যেন উঠিতে চায় না।

বাহিরে কেহ নাই, শুধু শশাঙ্ক একখানি ডেক-চেয়ারে গা ঢালিয়া খাদের ধারে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। একটা গুমট গরম যাইতেছে, এদিকে গাঢ় অন্ধকার।

কে আসিতেছে দেখিয়া শশাঙ্ক সোজা হইয়া বসিলেন। শৈলেন পায়ের ধূলা লইয়া ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল, প্রশ্ন করিতে সাহস হইতেছে না, গলাও গেছে শুকাইয়া।

শশাঙ্কই প্রথমে কথা কহিলেন, উঠিতে উঠিতে বলিলেন—"শৈলেন?"

"হ্যাঁ দাদা; মা কি রকম···মার কোন রকম···মানে, মার···"

শশাঙ্ক বলিলেন—"ভালোই আছেন মা—আর সবাইও; যাক্, ভেতরে চল্।"

মেয়েদের এই একটু আগে খাওয়া-দাওয়া শেষ হইয়াছে, গিরিবালা শয়ন করিতে যাইতেছিলেন, শশাঙ্ক ডাকিয়া বলিলেন—"মা, শৈলেন এসেছে।"

"কে?"—বলিয়া গিরিবালা চকিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে আসিয়া বারান্দার ধারে দাঁড়াইলেন; শৈলেন গিয়া প্রণাম করিল।

আশীর্বাদ করিতে গিরিবালার একটু সময় লাগে; কপালের মাঝখানে চারিটি আঙুল বুলাইয়া বুলাইয়া একটু কি বলেন মনে মনে, হাজার তাড়া-হুড়া আবেগ-উদ্বেগের মধ্যেও এই শান্তিটুকু তাঁহার অবিচলিত থাকেই। বাড়িতেও সবার অভ্যাস, আশীর্বাদ গ্রহণের এই সময়টুকু স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। শেষ হইলে প্রশ্ন করিলেন—"এই গাড়িতে এলি?"

শৈলেন উত্তর করিল—"হ্যাঁ, এই বারোটার গাড়িতে।"

গিরিবালা এক দৃষ্টিতেই শৈলেনের সমস্তখানি যেন দেখিতেছেন, তবে তাহাতে না আছে চেষ্টা, না আছে চাঞ্চল্য। প্রশ্ন করিলেন—"খাওয়া হয়নি নিশ্চয়?"

ছেলেদের যাহারা জাগিয়াছিল উঠিয়া আসিয়াছে, দুইটি পুত্র-বধূও আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়াছে। শৈলেনকে প্রশ্ন করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া এক জন বৌকে খাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিয়া দিলেন, কতকটা আত্মগত ভাবে বলিলেন—"ওকে তো কত দিন খাওয়া হয়নি তাই জিগ্যেস করলেই ভালো হয়।"

প্রবাস লইয়া কিন্তু অনুযোগের কথা আর কিছু বলিলেন না। আসার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই প্রশ্নে প্রশ্নে বোঝাই করিয়া দেয়, এটা শশাঙ্কেরও মনঃপূত নয়, এদিক্‌-ওদিক্‌ দু'-একটা কথাবার্ত্তার পর বলিলেন—"আর কাউকে তুলে কাজ নেই এখন, বাবাকেও না। তুইও কাপড়-চোপড় ছেড়ে খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়গে যা শৈলেন; বেশ ক্লান্ত হয়ে রয়েছিস্।"

বোধ হয় আর সবাইকে উদাহরণ দেখানো হিসাবেই নিজেও শয়ন করিতে চলিয়া গেলেন।

সবাই চলিয়া গেলে মুখ-হাত ধুইয়া শৈলেন বলিল—"চলো মা, ছাতে গিয়ে একটু বসা যাক চলো, বড্ড গরম, আর গাড়িতে যা ভিড় ছিল···"

ছাতে গিয়া বসিয়াছে, ছোট বোন লীনা আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রণাম করিয়া মায়ের পাশে বসিতে বসিতে বলিল—"বেশ যা হোক! ধন্যি!"

বোধ হয় অশ্রু গোপন করিবার জন্য মুখটা ফিরাইয়া লইল। এই জিনিসটাকেই অনেক কষ্টে এতক্ষণ বিচক্ষণতার সহিত ঠেলিয়া রাখা হইয়াছে, আর বোধ হয় সম্ভব হইত না, কিন্তু এই সময় শশাঙ্কর মেয়েটি ছুটিয়া ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কাকার প্রিয় বলিয়া তাহার মা-ই বোধ হয় উঠাইয়া দিয়াছে—বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে টপ করিয়া একটা ফাঁস পরাইয়া দেওয়াই নিরাপদ। "মেজকা'!"—বলিয়াই কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িল, তাহার পর মুখটা একটু সরাইয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—"আমার জন্যে কি এনেচ?"

"এই যাঃ, ভুলে গেছি! দাঁড়া আবার যাই।"—বলিয়া শৈলেন তাড়াতাড়ি উঠিবার ভাণ করিতেই সে অত্যন্ত ভীত ভাবে হাঁটু দুইটা জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—"না—না—না, তুমি বড্ড পালাও!"

তিন জনের মধ্যে হাসি পড়িয়া গিয়া উদ্গত অশ্রুটা চাপাই পড়িয়া গেল। এর পরে প্রবাসের কথাটাই সহজে আসিয়া পড়িল। লীনা প্রশ্ন করিয়া মাঝে-মাঝে মন্তব্য গুঁজিয়া দিয়া কাহিনীটি বাহির করিয়া লইতে লাগিল—কোথায় কোথায় গেল শৈলেন, কি কি করিল।···"মা গোঃ, চিঠিও দিতে হয়—দু'-দুটো বচ্ছর! সত্যি তোমায় ধন্যি বলতে হয় মেজদা'।···নয় কি মা?"

গিরিবালার গলায় উত্তরটা একটু আটকাইয়া গেল, ঢোঁক গিলিয়া বলিলেন—"জানছি, যেখানে আছে, ভালোই আছে···"

একটু ভয়ও হয়, অথচ এ-সব কথা তুলিতে লীনাকে সোজাসুজি বারণও করিতে পারেন না; কতকটা যেন শৈলেনেরই পক্ষ লইয়া বলিলেন—"আর, চিঠিপত্র, মারাও যায় বড্ড আজ-কাল, এই তো সেদিন খুকি লিখলে দু'-দুখানাও চিঠি দিয়েছিল অথচ···"

"আমি কিন্তু একখানাও চিঠি দিইনি মা"—বলিয়া শৈলেন হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এঁরা দুই জনেও হাসিয়া উঠিলেন, লীনা আরও বাড়াইয়া দিল হাসিটা, বলিল—"ঐ নাও, আসামীর সঙ্গেই তার উকিলের মিল নেই।"

সেজবৌ লুচি ভাজিয়া লইয়া আসিল; শৈলেন রেকাবিটা টানিয়া লইয়া বলিল—"এবার এখানকার কথা বলো মা, আমার গল্প এত মিষ্টি নয় যে লুচির সঙ্গে চালাতে পারব, কি বল্ লীনা?"

লীনা হাসিয়া বলিল—"ফিরে এসেছ, এখন মন্দ লাগছে না; কাহিনীতে দাঁড়িয়েছে কি না!"

গিরিবালা বলিলেন—"আর কাহিনীতে কাজ নেই বাবা, রক্ষে করো।···এখানকার খবর?—ও! তোকে আসল খবরটাই বলা হয়নি—মোনুর চাকরি হয়েছে—ঐ দুলারমনের বর এখন যা তাই আর কি।"

যে পরিবারকে একেবারেই নিচে থেকে আরম্ভ করিতে হইয়াছে, তাহার পক্ষে খবরটা বেশই বড়, শৈলেন মুখে হাত তুলিতেছিল, অনুচ্ছ্বসিত হইবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"ডেপুটিগিরি?"

উত্তরটা লীনাই দিল, মায়ের মুখ থেকে এক রকম কাড়িয়াই, একটু আবেগের সহিতই বলিল—"হ্যাঁ, ডেপুটিগিরি। আর সেই কথাটা মা—বলো না।"

মাকে অবসর না দিয়া নিজেই বলিল—"এখানকার জজ সাহেবের মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছে বাড়' দা'র।"

শৈলেন হাসিমুখে একটু বিস্ময়ের সহিত মায়ের মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"হ্যাঁ মা?"

ভিতরের আনন্দে গিরিবালার মুখটা একটু রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, স্বভাবসিদ্ধ শান্ত কণ্ঠেই বলিলেন—"হ্যাঁ, তাঁর বৌয়ের মোনুকে না কি বড্ড পছন্দ হয়েছে। এদিকে আবার মুন্সেফ বাবুর বোনের সঙ্গে অবুর বিয়ের কথা হচ্ছে, শশাঙ্ককে ধরেছেন তিনি। আমি কিন্তু ভয় পাচ্ছি বাবা, সত্যি কথা বলতে কি। সব নিজেদের অবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে গেরস্ত-ঘরের মেয়ে এনেছি, বেশ মিশ খেয়েছে, এর মধ্যে বড়-লোকের মেয়ে এনে ফেলা—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু যাঁদের নিয়ে আমার ভয়, সেই বৌমারাই আবার জিদ ধরে বসেছেন; একটু উভয়-সঙ্কট নয়?"

লীনা তর্ক জুড়িয়া দিল—"বাঃ, এই তো সেজ বৌদিও বড় এক জন উকিলের মেয়ে, মিশ খায়নি?"

গিরিবালা বলিলেন—"কি জানি বাছা, আমার তো মনে হয় উকিলরা, ডাক্তাররা যেন আমাদেরই দলের—হাজারই বড় হোক; বড় চাকরিওলা হলেই মনে হয় যেন আলাদা।"

লীনা বলিল—"তা ওঁর বাবা তো উকিল থেকেই জজ হয়েছেন।"

গিরিবালা হাসিয়া উঠিলেন, শৈলেনের পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঐ শোন্, এই সব তর্ক সবার মুখে মুখে ঘুরছে—বৌমাদেরও। তা বেশ তো বাছা, তোদের সবার মুখ চেয়েই তো বলা, তোদের মনে হয় বেমানান হবে না, মিলে-মিশে থাকতে পারবি, আমি আপত্তি করতে যাব কেন?···আসল কথা শৈল, বংশটি ভালো হওয়া দরকার,

গরীবও বুঝি না, বড়-মানুষও বুঝি না, সং-বংশের মেয়ে যেখানে যাবে মানিয়ে নেবে। তবে কথা হচ্ছে অবস্থার খুব বেশি তারতম্য থাকলে বংশের পরিচয়টা পাওয়াও একটু মুশকিল হয়…"

লীনা উৎসুক ভাবে মায়ের মুখের পানে চাহিয়া আছে, চেষ্টা, একটু সংশয়জনক হইলেই মতটা তাড়াতাড়ি নিজেদের দিকে ফিরাইয়া লওয়া। বলিল—"আর ওরাও আট ভাই, দুই বোন, মেজ দা', ঠিক আমাদেরই মতন…"

গিরিবালা এবার জোরেই হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"ঐ নে, আর একটা তর্কের নমুনা! কী জ্বালা বাবা! এই রকম সব ঘটকী হলেই হয়েছে!…আর যদি এর পরে ওদের আবার ভাই-বোন হয়?…"

লীনা বলিল—"বয়ে গেল, তখন তো কাজ হয়ে গেছে…"

আদাড়ে তর্কে এবার শৈলেন পর্যন্ত হাসিয়া উঠিল, বলিল—"ওরা ছাড়বে না মা, তোমায় রাজি করাবেই…"

আসিয়া অবধিই শৈলেনের মনটা সমস্ত হাসি-গল্পের মধ্যে একটি জিনিস খুঁজিতেছে, অবশ্য খুব সূক্ষ্মভাবেই—তাহার এই দীর্ঘ প্রবাসটা মায়ের দেহে-মনে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে; এদিকে গল্পটা মা আর লীনা চালাইয়া যাওয়ায় লক্ষ্য করিবার একটু সুবিধাও হইয়াছে। শুনিতেছে, হাসিতেছে, মন্তব্যও করিতেছে এক-আধটা, কিন্তু চিন্তার একটি অন্তঃস্রোত একেবারেই অন্য পথে প্রবাহিত হইতেছে। গিরিবালা শরীরে যে একটু শুকাইয়া গেছেন তাহা অতি সামান্যই, যে-কোন কারণেই তাহা হইতে পারে, মনের প্রফুল্লতাও যে নষ্ট হইয়াছিল তাহারও বেশি প্রমাণ কোথায়? অবশ্য আজ—এই এখন যে প্রফুল্লতা সেটা শৈলেনের ফিরিয়া আসার জন্যই; কিন্তু মা যে এর আগে বিষণ্ণই ছিলেন তাহার প্রমাণ কৈ? যে-মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিষণ্ণ থাকে, বিষাদের কারণটা অপসৃত হইলে সে একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে না?—বিশেষ করিয়া সেই অপসারণ যখন এত আকস্মিক।…গিরিবালার কিন্তু এতটুকু উচ্ছ্বাস নাই, প্রশ্ন করিলেন যেন—দুই বৎসর নয়, এই দু'দিন আগে শৈলেন কোথায় গিয়াছিল, এই গাড়িতে নামিয়াছে।

কিন্তু মায়ের সন্তান সম্বন্ধে যেমন একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে, সন্তানেরও মায়ের সম্বন্ধে ঠিক তেমনই একটা সূক্ষ্ম দৃষ্টি আছে—মা আর সন্তান একটা বিষয়েরই দুই দিক্ তো? সন্তান যেমন মাকে প্রবঞ্চনা করিতে পারে না, মায়েরও তেমনি সন্তানের কাছে প্রবঞ্চনা খাটে না। মায়ের অমন প্রফুল্লতার মধ্যে কোথায় যে খাদ মিশিয়াছে শৈলেনের সেটা দৃষ্টি এড়াইল না। মনের গভীর নিভৃতে একটা অপরিসীম ক্লান্তি আসিয়াছে মায়ের,—সেটা চোখের দৃষ্টি, ঠোঁটের হাসি, মুখের কথা—সবেতেই অতি সূক্ষ্ম একটা প্রবঞ্চনার সঙ্গে মিশিয়া আছে। বেদনা যেখানে যেখানে স্পষ্ট সেখানে এটা হয় না, সেখানে হাসির জায়গায় হাসি থাকে, অশ্রুর জায়গায় অশ্রু। তাহার মানে এই দীর্ঘ দুই বৎসর ধরিয়া মা প্রফুল্লতার প্রলেপে বিষাদটাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন—যাহারা আছে তাহাদের মুখ চাহিয়া। দুইটি বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত মাকে এই অভিনয় করিয়া আসিতে হইয়াছে—ভিতরে ভয়, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা; বাহিরে যেন এমন কিছুই হয় নাই, শৈলেনের ওটা নিরুদ্দেশ হওয়া নয়, চিঠি না পাওয়ার উদ্বেগ আর অপমানটা প্রতিনিয়তই উঁহাকে যেন শেলের মতই বিদ্ধ করিতেছে না। ঢাকা দিবার অমানুষিক চেষ্টায় গিরিবালা বুঝিতেই পারেন নাই কখন যে তাঁহার প্রসন্নতার মধ্যে বিষাদের বিষ অল্পে অল্পে গেছে মিশিয়া। এখনও সেই অভিনয়ই চলিতেছে। কী করিল শৈলেন!—মায়ের সেই রূপ আবার কবে ফিরিয়া পাইবে?—কখনও আর পাইবে কি?

ওদিকে গল্প চলিয়াছে। শৈলেনের কথায় গিরিবালা বলিলেন—"ছাড়াছাড়ির কথা তো নয়, ভেবে দেখবার কথা। রাজি হব না এমনও তো ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসিনি আমি, না আমার বড়-মানুষের সঙ্গে শত্রুতা আছে, সেটা তো হিংসে শৈল। আমি চাই বিয়ের ব্যাপার যেখানে, সেখানে যেন মিলটা ভালো হয়।"

লীনা বলিল—"জজের জামাই ডেপুটি—মন্দ মিল হোল?"

গিরিবালা বলিলেন—"কিন্তু সেই ডেপুটি যে গরীবের ছেলে—সেটা দেখতে হবে না?"

লীনার মুখটা একটু মলিন হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, অপ্রাসঙ্গিক ভাবেই বলিয়া উঠিল—"হ্যাঁ, বেশ একটা কথা মনে পড়ে গেল,—বড়দা সেদিন বলছিলেন আমরা দশটি ভাই-বোনে মার পায়ের দশটি আঙুল…"

গিরিবালা একেবারে খিল-খিল করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন—"নাও, তর্কে এঁটে উঠতে পারলে না, শেষকালে খোসামোদ।"

তাহার পর কন্যাকে একটু সমস্যায় ফেলিবার জন্যই হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করিলেন—"বেশ বুঝলাম—দশটা আঙুল; তা কি হয়েছে?"

লীনা একটু হকচকিয়ে গেল, তার পর ভাবিবার জন্য দু'-এক বার এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া লইয়া বলিল—"বাঃ, দশটি আঙুল তোমায় যেদিকে নিয়ে যেতে চাইবে সেদিকে যেতে হবে না তোমায়—মানে, সমস্ত শরীরটাকে?…"

খোসামোদকে এরকম জবরদস্তিতে পরিণত হইতে দেখিয়া শৈলেন সুদ্ধ হাসিয়া উঠিল। রাত অনেকখানি হইয়াছে, শৈলেনেরও খাওয়া হইয়া গিয়াছিল, এক সময় সবাই নিচে চলিয়া গেলেন।

৭

শয্যা যেন শৈলেনের কাছে কণ্টক হইয়া উঠিয়াছে। যে চিন্তাটাই আরম্ভ করিতেছে সেইটাই কেমন করিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া মায়ের হাসির পিছনে যে ক্লান্তি সেইখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া পড়িতেছে। অনেকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া এক সময় উঠিয়া পড়িল। কৃষ্ণপক্ষের শেষের দিক্ এটা, সরু হাঁসুলির মতো চাঁদ উঠিল। সেটা রাস্তার ওধারে আমগাছগুলার উপর আসিয়া দাঁড়াইতে খুব একটা পাৎলা জ্যোৎস্নায় চারি দিক্ ছাইয়া গেল। শৈলেন ঘরের বাহিরে আসিল।

তখন অন্ধকার ছিল বলিয়া দেখিতে পায় নাই, অল্প হইলেও জ্যোৎস্নার জন্য এইবার সমস্ত বাড়িটার একটা আবছায়া মূর্তি চোখে পড়িল। বাড়িটাতে বেশ খানিকটা উন্নতি হইয়াছে; ছিল একতলা এখন উপরে কয়েকখানা ঘর, টানা রেলিং-দেওয়া বারান্দা, তাহার মাথায় নূতন ফ্যাসানে কংক্রিটের ঢালাই জাফরি। হঠাৎ চোখে পড়ার জন্যই যেন ভালো করিয়া বিশ্বাস করা যাইতেছে না, মনে হইতেছে

যেন একটা স্বপ্নপুরী। অন্যত্রও খানিকটা খানিকটা করিয়া পরিবর্ত্তন হইয়াছে, এরই সঙ্গে ছন্দ মিশাইয়া। বিপিনবিহারীর বাগানের পথ, বাড়িরের উঠানের পাশে খানিকটা জায়গা লইয়া একটা বাগানের আদল দেখা যায়, খুব মৃদু হাসনাহানার গন্ধ বাতাসের সঙ্গে মিশিয়া আছে। শৈলেন উঠান, বারান্দা, ছাত সব ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাড়িটা দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল—কোথায় আগে কি রকমটা ছিল, এখন কি রকম হইয়াছে, সব মিলাইয়া মিলাইয়া। যেন একটা অভিশপ্ত প্রেতাত্মা, মায়ার আকর্ষণে মাটির সঙ্গে লিপ্ত হইয়া ঘুরিতেছে। এক সময় আস্তে আস্তে দুয়ারটা খুলিয়া বাহিরে আসিল।

চাঁদটা আরও খানিকটা উঠিয়া আসায় জ্যোৎস্না আরও একটু স্বচ্ছ হইয়াছে। খালটা পার হইয়া রাস্তা পর্যন্ত গেল। সেখান থেকে সমস্ত বাড়িটি বড় অপূর্ব দেখাইতেছে। বাহিরের হাওয়ায় শরীরের গ্লানির সঙ্গে সঙ্গে মনের গ্লানিও অনেকটা কাটিয়া গেছে, শৈলেন আসিয়া বাগানে প্রবেশ করিল। গেটের উপর একটা জেস্মিনের ঝাড়, প্রবেশ করিতে তাহার গন্ধের খানিকটা যেন সর্বাঙ্গে লেপিয়া গেল।

আবেষ্টনীর প্রভাবে মাঝে মাঝে যে একটি স্নিগ্ধতার ভাব আসিতেছে, সেটা কিন্তু স্থায়ী হইতে পারিতেছে না। কেবলই মা'র মুখটি মনে পড়িতেছে; আশ্চর্য, হাসির দিক্‌টা যেন চোখেই পড়িতেছে না, চোখে পড়িতেছে শুধু বেদনার দিকটা।

—এই প্রায় দু'টি বৎসর মায়ের জীবনকে একটি নবতর সার্থকতায় পূর্ণ করিয়া তুলিবার কথা। মায়ের জীবনের বিকাশে যে কয়টি ধাপ—মায়ের মুখে শোনা গল্প থেকেই শৈলেন যা করিয়া নির্ণয় লইয়াছে—সিমুরের প্রথম জীবন, তাহার পর সাঁতরার গঙ্গাতীর, তাহার পর পাণ্ডুলের প্রথম জীবন—শশাঙ্ক—বড় সমাজের মধ্যে দ্বারভাঙ্গার প্রথম জীবন—এই সবের সুরে সুর মেলানো মায়ের জীবনের এই দুইটি বৎসরও। অনেক দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অনটনের পর বড় ছেলের চাকরির সঙ্গে যে সচ্ছলতার সূত্রপাত হইয়াছিল, এই দুই বৎসরে যে সেটুকু সমৃদ্ধিতে পরিণত হইয়াছে চারিদিকেই তাহার প্রমাণ সুস্ফুট। এটুকুকেও আবার পূর্ণতা দিয়াছে ঐ দু'টি বিবাহের প্রস্তাব। মা যাহাই বলুন, অন্তরে অন্তরে তিনি এ যোগাযোগের বিপক্ষে নহেন। ব্যাপারটা নিশ্চয় খুব এমন বিরাট কিছু নয়, তবুও আকাঙ্ক্ষার যোগ্য; আর, গৌরবের বৈ কি,—বাবা-মা তো এর জন্য প্রার্থী হইয়া দাঁড়ান নাই, প্রস্তাব ওদিক থেকেই। সন্তানের মধ্যে দিয়া এও তো জীবনের একটা পরিণতি, মায়ের জীবন আরও সন্তানাশ্রয়ী বলিয়া তাঁহার জীবনে এ একটা বড় সার্থকতা। মনে মনে মা যে হৃষ্ট, এটা বেশ বোঝা যায়,—আশা করিয়া আছেন যেন বংশের দিক্ দিয়াও বেশ মিল হয়।

—এই এমন দুইটি বৎসরের আনন্দ মলিন করিয়া রাখিয়াছে শৈলেন। শশাঙ্কর পর তাহারই উপর আশা।···চিঠি পর্যন্ত না দিল কেন?

অত ক্লান্তির পর সমস্ত রাত ঘুম নাই, তাহার পর অক্টোপাসের মতো এই অপরাধের চিন্তাটা মনকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। মাথাটা ঝিম-ঝিম করিতেছে। শৈলেন আবার উঠিয়া খালের ওধারে দ্বীপের মতো জমিটুকুর এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইল।···চাঁদটা অনেক উঠিয়া গেছে, আমগাছের মাথার ঠিক উপরে শুকতারাটা দপ-দপ করিতেছে। অন্যমনস্ক ভাবে অনেকক্ষণ ঐটুকু জমির উপর পায়চারি করিল।···শুকতারাটা নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছে। নিচে, দিক্‌রেখার উপর একটা খুব হালকা আলোর আভাস—দিনের প্রথম সূচনা। সমস্ত রাত্রিটি নিদ্রাহীন কাটিল; দুই বৎসর আগে যখন বাড়ি ছাড়িয়া যায় তখনও ঠিক এই রকম একটি রাত্রি,—বিনিদ্র, অপরাধ-ক্লিষ্ট।···হে ভগবান, জীবনে আর কত এমন অভিশপ্ত রজনী আসিবে?

উষার বিকাশটি ভালো লাগিতেছে, শৈলেন সামনে চাহিয়া রহিল। নিপুণ হাতে কে যেন খুব হালকা এক-একটা তুলির টান দিয়া যাইতেছে—একটু আলো, তাহার পর আর একটু, তাহার পর আরও একটু···

এইবার একটু পরে বাবা উঠিবেন, তাঁহার সঙ্গে প্রথমেই এই ভাবে দেখা হওয়াটা ঠিক হইবে না। শৈলেন ঘুরিয়া বাড়ির দিকে পা বাড়াইল।

সঙ্গে সঙ্গে বাবার ঘরের বাইরের বারান্দায় নজর পড়িতে দাঁড়াইয়া পড়িল। দেখে, পূব দিকে মুখ করিয়া বারান্দার রেলিং ধরিয়া মা দাঁড়াইয়া আছেন। ইঁদারার কাছে একটা কামিনী ফুলের গাছ, তাহাতে একটা অপরাজিতার লতা উঠিয়াছে, শৈলেন এদের হালকা জাফরির আড়ালে ছিল, তাহা ভিন্ন বেশ খানিকটা দূরেও,—মা দেখিতে পান নাই। শৈলেন আবার সেই জাফরির আড়ালে সরিয়া গেল।

মা অনেকক্ষণ এক ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন, চোখ দুইটি পূব আকাশের দিকে একটু তোলা, মুখে এই উষার মতোই একটি সুগভীর শান্তি। শৈলেনের মনে হইল, কালকের রাত্রের সেই যে ক্লান্তির ছায়া তাহার লেশমাত্রও কোথাও নাই আর,—যে-দীপ্তিতে মুখটি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে—বেশ বোঝা যায় বাইরে এই নূতন দিনের আলোর চেয়ে অন্তরের আলোই তাহাতে বেশি। একটি রাত্রির শান্তিতে একটা মস্ত বড় পরিবর্তন হইয়াছে মায়ের মধ্যে, মা শুধু নিরাময় হন নাই, যেন পূর্ণতর হইয়াছেন। যাকে সুখে-দুঃখে কত রূপেই দেখিল, সবই মহিমময়—কিন্তু আজ মনে হইতেছে তিনি যেন আরও কিছু—একটি পরম রহস্য। সমস্ত আবেষ্টনীর সঙ্গে শৈলেন তাঁকে মিলাইয়া দেখিল—মনে হয় এই নূতন উষা, ঐ শুকতারা, আর মা—রহস্যময়ী এই এয়ী, রজনী-শেষের এই নিবিড় প্রশান্তির মধ্যে কোন্ এক শাশ্বত অসীমের সামনা-সামনি হইয়া বিনম্র স্তব্ধতায় দাঁড়াইয়া আছেন।

দেখিয়া দেখিয়া শৈলেনের মনটা উদ্বেল হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল গিয়া একটি প্রণাম করে,—তাহা হইলেই পুঞ্জীভূত অপরাধের বোঝা হালকা হইয়া যাইবে; এই উপযুক্ত সময়। কিন্তু প্রকৃতিটাই এই রকম যে নিজের অনুভূতির প্রকাশে অল্প কিছু আড়ম্বর আনিয়া ফেলিতে বাধে।···আড়ালে থাকিয়া বাহির হইতেছে এই রকম যাহাতে মনে না হয় সেই জন্য অল্প একটু ঘুরিয়া ধীরে ধীরে মায়ের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। গিরিবালা একটু বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"এত ভোরে উঠেছিস্ যে?—ঘুম হয়নি রাত্তিরে?"

শৈলেন আর নিজেকে সামলাইয়া রাখিতে পারিতেছে না; গলায় কি ঠেলিয়া আসিতেছে, রগ দুইটা টন-টন করিতেছে, চোখ দুইটাও আর শুষ্ক রাখা যায় না! এগুলাকে চাপিবার জন্যই

মুখে একটু হাসি টানিয়া আনিয়া বলিল—"কি করে ঘুম আর আসবে মা ?"

"কেন ?"—বলিয়াই গিরিবালা থামিয়া গেলেন ; হাসির মধ্যেই শৈলেনের চোখ ছল-ছল করিয়া উঠিয়াছে। একটু মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া গিরিবালা কি যেন একটা বুঝিবার চেষ্টা করিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ও !"

শৈলেন সিঁড়ির এক ধাপ নিচে ছিল, গিরিবালা একটু সরিয়া আসিয়া তাহার কাঁধে একটা হাত দিলেন, বলিলেন—"কি এমন দোষ করেছিস্ শৈল যে…"

শৈলেন গলাটাকে সহজ করিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—"দোষের মধ্যে যেগুলো বড় সেগুলোর কথা ছেড়ে দিই মা, যেটা দেখতে সব চেয়ে ছোট সেটার ভারও আমি সইতে পারছি না। তোমার কষ্ট…"

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া সামনের দিকে চাহিয়া রহিলেন, স্নেহের অভ্যাসবশেই হাতটি ধীরে ধীরে শৈলেনের কাঁধে সঞ্চারিত হইতেছে। একটু পরে বলিলেন—"আমাদের সব চেয়ে বড় কষ্ট তোদের জন্তে ভাবনা, তা এসেই তো গেছিস্। আর দোষের কথা—এই ক'টা মাসে আমি ওটা ভেবে দেখেছি শৈলেন ; তুই যেটাকে দোষ বলছিস্ সেটা কি আমাদের ভুলেরও একটা দিক্ নয় ? এই কথাটাই আমি ভেবেছি এই কটা মাস। আমার মনে হয়েছে নিজের কথা ভেবে আমরা তোদের জীবন নষ্ট করতে বসি এক এক সময়। এই ধর, আজকের দিনটি,—সব দিক দিয়েই তো কালকের মতন ; কিন্তু অন্তত এইখানে তো তফাৎ যে কালকের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে ? তোদের যুগ, তোদের জীবনও তেমনি ; তোরা যে নতুন করে গড়বি তোদের জীবন তার জন্তে তোদের ইচ্ছামত চলতে দেওয়া দরকার তো ? একটা সময় ছিল যখন যত ইচ্ছে বিয়ে করে কত মেয়ের জীবন বিষ করে তুলত। এখন কেউ যদি কোন উদ্দেশ্য নিয়ে নাই চায় বিয়ে করতে তো কোন দোষই হয় না তার। তবে হ্যাঁ, একটা উদ্দেশ্য থাকা চাই। আমি ভগবানকে সেই কথা বলি—তুই যদি এমনি থাকিস্ তো তার মধ্যে যেন একটা সৎ উদ্দেশ্য থাকে—তা'হলে আর আমাদের কোন আপশোষই থাকবে না।"

চুপ করিলেন, হাতটা অভ্যাসের বশে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতেছে।

খুব বড় কথা একটু অস্বস্তি জাগায়ই মনে। একটু হাল্কা ভাব আনিয়া ফেলিবার জন্তই শৈলেন একটু হাসিয়া বলিল—"ক্ষমা করবার জন্তেই তুমি যেন কথাগুলো ভেবে ভেবে সাজিয়ে রেখেছ মা। আমি জানতাম ক্ষমা চাইবার দায়িত্বটাই বেশি—ছেলের দিক্ থেকে ; তোমার দিক্ থেকে ক্ষমা করবার দায়িত্বটাকে তুমি যেন তার চেয়ে বড় করে তুলেছ।"

একটু অপ্রতিভ ভাবেই গিরিবালার মুখে একটা হাসি ফুটিল, কি একটা উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় বিপিনবিহারী শয্যা ত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিলেন।

শৈলেন দুই জনকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইতে প্রশ্ন করিলেন—"ভোরের গাড়িতে এলে ?"

"আজ্ঞে না, রাত্তিরের গাড়িতে।"

বিপিনবিহারীর স্বভাবের মধ্যে কি আছে, এক যুগের গ্লানি এক মুহূর্তে কাটিয়া গিয়া মনটা উৎসাহদীপ্ত হইয়া ওঠে, যদিও বাহিরে আরও বেশি সংযতই থাকেন। গিরিবালার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"তুললে না কেন ? এত কি ঘুম-কাতুরে আমি ?"

[ক্রমশঃ।

নীল লণ্ঠন

সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাঙা নীল লণ্ঠনে
জীবনের ছায়াপাত ;
এখানে ঘুমের রাত
স্তব্ধ জমাট সাদা দেয়ালেও শান্ত।
তাহার ক্লান্তি ছেদে
ছায়া কেঁপে যায়—তোমার বিরাট ছায়া
গভীর রাতের অনেক ঝিল্লীস্বরে
এখানে জীবন সমাধি পায় না
রাত ঝরে পড়ে জীবনদেবের বুকে ;
মূক লণ্ঠন নিথর হয়ে যে থাকে,
জানলার পাশে ছায়ানটাদের দল
ঘিরে থাকে এই নীল পলিতার শিখা।
হঠাৎ অচেনা এলোমেলো—হাওয়া লেগে
বেঁকে যায় নীল শিখা
ছায়া কেঁপে ওঠে তোমার আবছা মুখ :

কালকে এখানে হয়ত' বা ছিল
কোনো দেউলের মায়া,
আজকে জাগছে নীল লণ্ঠনে
নিষ্প্রভ নীলচর।
কোনো অতীতের চূর্ণিত প্রস্তর
সজল মাটির গন্ধে—
শংখচিলের ডানায় তীব্র আর্তনাদ।
আজকে রাতের মত
সেদিনও কি তুমি সারারাত ধরে
নীল লণ্ঠন পাশে
লতিয়ে দিয়েছো তোমার ঝাপ্‌সা ছায়া ;
আজকে রাতের ঘুম ভেঙে গেছে,
তোমার ঘরেতে এখনো সে নীল আলো
জ্বেলে রেখে গেছে
আমার পেছনে ঝাপ সা আমারই ছায়া।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা আন্দোলন

শ্রীহরকিঙ্কর ভট্টাচার্য্য

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হ'লেও এশিয়ার পরাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদের পরমায়ু শেষ হ'য়ে এলেও একে বাঁচিয়ে রাখার জন্ম সাম্রাজ্যবাদীদের চেষ্টার অন্ত নেই। কিন্তু এশিয়ার পরাধীন দেশগুলিও আজও সচেতন হ'য়ে উঠেছে; তারা সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদসাধনের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ ক'রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হ'য়েছে ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশগুলির দিকে দৃষ্টিপাত ক'রলেই তা বুঝতে পারা যায়। পরাধীন দেশের স্বাধীনতা-স্পৃহাকে দমন করার কোন কৌশলই আর কাজে লাগছে না।

প্রচারকার্য্য দ্বারা ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-সংগ্রামকে বিকৃত রূপ দানের চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। ইন্দোচীন সম্বন্ধেও এর ব্যতিক্রম হয়নি। আজও সেখানের স্বাধীনতা-সংগ্রামকে চূর্ণ করবার জন্ম সাম্রাজ্যবাদীদের অভিযান চ'লেছে।

ইন্দোচীনের অধিবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা অন্যান্য পরাধীন রাষ্ট্রের অধিবাসীদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ইন্দোচীন সম্বন্ধে অনেকের হয়ত' বিশেষ কোন ধারণা নেই বা উপেক্ষাভরে একে আমলে আনতে চান না—কিন্তু এ কথা স্মরণ রাখা দরকার যে, ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতে কংগ্রেসের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অপেক্ষা পুরাতন। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ তাদের সম্বন্ধে কোন কথা জানতে না চাইলেও তারা ৮০ বছর ধরে তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে।

ভৌগোলিক পরিচয়

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় দুইটি উপদ্বীপ। বৃহত্তর উপদ্বীপে থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন এবং ক্ষুদ্রতরটির নাম মালয়। ইন্দোচীন ও মালয়ের মাঝে শ্যাম উপসাগর এবং ইন্দোচীনের অপর পার্শ্বে চীন-সাগর। এখানকার জল-বায়ু ভারতবর্ষের ন্যায়। কোচিন চীন, আনাম, টংকিং, কাম্বোডিয়া ও দেশীয় রাজ্য লেয়স লইয়া ইন্দোচীন গঠিত।

আনামের আয়তন ৫৮ হাজার বর্গ-মাইল এবং লোক-সংখ্যা ৫৬ লক্ষ ৬০ হাজার (১৯৩৩)। চাউল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ১৯৩৭ সালের হিসাব অনুসারে আমদানী ও রপ্তানী পণ্যের মূল্য যথাক্রমে ৪ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪০ হাজার ফ্রাঙ্ক ও ১১ কোটি ২৮ লক্ষ ৬০ হাজার ফ্রাঙ্ক। আনামের রাজধানীর নাম হুয়ে। লোকসংখ্যা ৪০ হাজার। ১৮৮৪ সালে ইহা ফরাসী-অধিকারে আসে।

টংকিংএর আয়তন ৪৩ হাজার বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ৮০ লক্ষ (১৯৩১)। প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চাউল। রাজধানী হ্যানয়। ১৮৮৩ সালে ইহা ফরাসী অধিকারে আসে। কাম্বোডিয়ার আয়তন ৬৮ হাজার বর্গ-মাইল, লোকসংখ্যা ২৫ লক্ষ; রাজার নাম মিহানৌকন। রাজধানী নমপেন।

লেয়সের আয়তন ১ লক্ষ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ১০ লক্ষ (১৯৩৬)। রাজধানী ভিয়েন টিয়েন।

কোচিন চীনের আয়তন ২২ হাজার বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ৪৪ লক্ষ; আনামের রাজা ১৮৬৮ সালে ইহা ফ্রান্সকে প্রদান করেন। রাজধানী সাইগণ। সমগ্র ইন্দোচীনের রাজধানী হ্যানয়।

ইন্দোচীনের মধ্য দিয়া মেকং নদী প্রবাহিত। মেকং নদীর বদ্বীপে প্রচুর ধান, ইক্ষু, তুলা ও মশলা উৎপন্ন হয়। সাইগণ বন্দর হইতে প্রচুর পরিমাণে চাউল রপ্তানী হয়।

আন্দোলনের প্রথম অবস্থা

ইন্দোচীনের অধিবাসীদের স্বাধীনতা-স্পৃহা নূতন নয়। প্রাচীন কাল থেকে তারা চীনের সামন্ত নৃপতিবৃন্দের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা ক'রে এসেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে প্রথম বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয় ফরাসী-অধিকারের পর থেকে। যে বছর ইন্দোচীন ফরাসীদের অধিকারে যায়, সেই বছর থেকেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ শুরু হয়। তাদের বৈপ্লবিক আন্দোলন নানা রূপ পরিগ্রহ ক'রেছে। কখনো তারা ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ন্যায় শান্তিপূর্ণ ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন ক'রেছে—কখনো বা ফরাসী বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ ক'রেছে। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্ম যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়, তার অনেক আগে থেকেই আনামীরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদের জন্ম তৈরী হ'তে আরম্ভ করে। কিন্তু ১৯২০ সালের আগে তাদের মধ্যে কোন সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন দেখা যায়নি। ১৯২০ সালের পর তাদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় এবং গোপনে প্রচারকার্য্য চালান হ'তে থাকে। এই আন্দোলনের নেতাদের মধ্যে ফান বোই চান অন্যতম। ১৯২৪ সালে ফরাসীরা তাঁকে চীনে গ্রেপ্তার করে এবং তিনি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ফলে আনামে প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হয় এবং ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ তাঁকে ফ্রান্স থেকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে বাধ্য হন। পরে সাইগণে ফান বোই চানের মৃত্যু হয়। সমগ্র দেশবাসী তাঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে। সমগ্র দেশে সাড়া পড়ে যায়, ছাত্ররা ধর্ম্মঘট করে, দেশব্যাপী বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় "নূতন আনাম দল" (New Annam Party) এবং তরুণ আনামী বিপ্লবী সমিতি (Association of Young Annamite Revolutionaries) গঠিত হয়। বিপ্লবীরা ক্যাণ্টনে গভর্ণর জেনারেল মার্লিনকে হত্যার চেষ্টা করে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ১৯২৭ সালে আনামী জাতীয়তাবাদী দল গঠিত হয়। ১৯২৮-২৯ সালে শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে ভীষণ অশান্তি দেখা দেয়। দেশের সর্ব্বত্র কৃষকগণ বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকে। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে যায়। ফলে আনামীদের উপর শ্বেতাঙ্গ শাসকের রুদ্র তাণ্ডব শুরু হয়, অত্যাচার ও উৎপীড়নে আনামীরা জর্জ্জরিত হয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে সাইগণে বৈধ বৈপ্লবিক আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিপ্লবীরা সাইগণে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলে নির্ব্বাচিত হন। কেবল সাইগণেই নহে, হ্যানয়, টঙ্কিন প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবীরা মিউনিসিপ্যালিটি প্রভৃতিতে নির্ব্বাচিত হ'বার সুবিধা লাভ করেন। কিন্তু আনামের অধিবাসীরা বেশী দিন এই সুবিধা ভোগ করতে পারেন নাই। ফ্রান্স দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগদানের পর দেশবাসী সকল সুবিধা হইতে বঞ্চিত হয় এবং আবার দমন-নীতির প্রকোপ দেখা দেয়। ফলে আবার গোপন আন্দোলন শুরু হয়।

ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন

এই সময় সমগ্র ইন্দোচীনের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্ম বিপ্লবী দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হ'তে আরম্ভ করেন। ১৯৪১ সালে বিভিন্ন বিপ্লবী দল ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতা-সঙ্ঘ (Indo China League of Independence) গঠন করেন। নিম্নলিখিত দলগুলিকে লইয়া এই সঙ্ঘ গঠিত হয় :—

আনাম ন্যাশনালিষ্ট পার্টি, নিউ আনাম পার্টি, এসোসিয়েশন অফ ইয়ং রেভোলিউশ্যানারীজ, ইন্দোচাইনিজ কমুনিষ্ট পার্টি, অর্গ্যানিজেসন অফ পেজ্যাণ্টস ফর ন্যাশনাল লিবারেশন, অর্গ্যানিজেশন অফ ওয়ার্কার্স ফর ন্যাশনাল লিবারেশন, অর্গ্যানিজেসন অফ দি ইয়ুথ ফর ন্যাশনাল লিবারেশন মুভমেণ্ট, অর্গ্যানিজেসন অফ আনামাইট ফেলেজ্যার্স ফর অফিসার্স ফর ন্যাশনাল লিবারেশন, উইমেনস অর্গ্যানিজেশন ফর ন্যাশনাল লিবারেশন এবং ইন্দোচাইনিজ সেকসন অফ দি ইণ্টারন্যাশনাল লীগ এগেন্সট এগ্রেসন।

এই সকল প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সম্মেলনে নিম্নলিখিত রাজনৈতিক কার্য্যতালিকা গৃহীত হয় :

রাজনৈতিক কার্য্যতালিকা

(১) পূর্ণবয়স্কদের সার্ব্বভৌম ভোটাধিকারের ভিত্তিতে একটি প্রতিনিধি-পরিষদ গঠন। এই পরিষদ এমন একটি শাসনতন্ত্র রচনা করবে, যার ফলে গণতান্ত্রিক নীতির ভিত্তিতে সরকার প্রতিষ্ঠিত হ'বে।

(২) ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার, সম্পত্তির উপর অধিকার, প্রতিষ্ঠান গঠনের স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, জনসমাবেশের স্বাধীনতা, বিশ্বাস ও অভিমতের স্বাধীনতা, ধর্ম্মঘট করবার অধিকার ও প্রচারকার্য্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা।

(৩) জাতীয় বাহিনী গঠন।

(৪) ফরাসী, জাপানী ও ইন্দোচীনের ফ্যাসিষ্টদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করণ।

(৫) সকল আটক বন্দীকে মুক্তিদান।

(৬) সকল বিষয়ে নরনারীর সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা।

(৭) সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার।

অর্থনৈতিক পরিকল্পনা

(১) বৈদেশিক শাসনকালে ধার্য্য সকল প্রকার কর রহিত।

(২) ফ্যাশিষ্টদের সকল ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করণ এবং ইন্দোচীনের একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা।

(৩) শিল্প, বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ়করণ।

(৪) সেচ ব্যবস্থা, পতিত জমি চাষ ও কৃষিকার্য্যে সাহায্য।

(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

(৬) শুল্ক সম্বন্ধে স্বাধীনতা।

শিক্ষা ব্যবস্থা

(১) জাতীয় শিক্ষার উন্নতি সাধন।

(২) বিভিন্ন সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও অন্যান্য উচ্চশিক্ষায় সাহায্য।

(৩) সকল শ্রেণীর স্কুল, টেকনিক্যাল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

সামাজিক উন্নতি

(১) শ্রমিক সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের ব্যবস্থা এবং ন্যূনতম বেতন নির্দ্ধারণ।

(২) বড় বড় পরিবারগুলিকে সাহায্য।

(৩) হাসপাতাল ও প্রসূতি-সদনের বন্দোবস্ত।

(৪) থিয়েটার, সিনেমা ও ক্লাবের ব্যবস্থা।

(৫) সামাজিক দুর্নীতি নিবারণ।

আন্তর্জ্জাতিক সম্বন্ধ

(১) অন্যান্য দেশের সহিত ইন্দোচীনের যে পুরাতন চুক্তি আছে, সেগুলি বাতিল করণ।

(২) আন্তর্জ্জাতিক শান্তি বজায় রাখার জন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির সহিত মৈত্রী।

(৩) সকল নির্য্যাতিত জাতির সহিত সৌহার্দ্দ্য।

(৪) বাহির হইতে সকল প্রকার আক্রমণ প্রতিরোধ।

হো চি মিন

উপরোক্ত পরিকল্পনা অনুসারে আনামীদের সংগ্রাম চলতে থাকে কমুনিষ্ট নেতা হো চি মিনের নেতৃত্বে এক বিশাল গেরিলা বাহিনী গড়ে উঠে। এই বাহিনী জাপ ও ফরাসী-শাসনের উচ্ছেদের জন্য সক্রিয় কর্ম্মপন্থা অবলম্বন করে। এই গেরিলা বাহিনী ব্যতীত হাজার হাজার জাতীয়তাবাদী আনামী হো চি মিনের নেতৃত্বাধীনে সংগ্রাম চালাতে থাকেন।

জাতীয় গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা

জাপানীরা আত্মসমর্পণ করলে পর ইন্দোচীন দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। চীনা বাহিনী উত্তর-ইন্দোচীনে জাপানীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। এখন চীনা কর্তৃপক্ষ ফরাসী বাহিনী আসিয়া না পৌছান পর্য্যন্ত উত্তরাংশ দখল করে থাকতে সম্মত হলেন। এই সুযোগে হো চি মিন এক সাময়িক জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করলেন। চীনা বাহিনী এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলে না। ইন্দোচীনের সর্ব্বত্র জাতীয়তাবাদী আনামীদের সহিত ফরাসীদের খণ্ডযুদ্ধ চলতে লাগল। ফরাসী কর্ত্তারা বেগতিক দেখে ভিতরে ভিতরে জাতীয়তাবাদীদের সহিত মিটমাটের চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু নূতন আনাম গভর্ণমেণ্টের প্রেসিডেণ্ট হো চি মিন বলে পাঠালেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত তিনি কোন সর্ত্তেই মিটমাট করতে রাজী হবেন না। ফরাসী কর্তৃপক্ষ স্বায়ত্ত-শাসনের কিছু অধিকার দিতে চাইলেও পূর্ণ স্বাধীনতায় সম্মত হলেন না। সজ্বর্ষ চলতে লাগল। ফরাসীরা চীনাদের সহিত এইরূপ চুক্তি করল, অধিক সংখ্যক ফরাসী সৈন্য ইন্দোচীনে এসে পৌছিলেই চীনা বাহিনী উত্তর ইন্দোচীন ত্যাগ করবে। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চুংকিংএ এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ফরাসী-আনামী চুক্তি

এদিকে জাতীয়তাবাদীদের ক্রমবর্দ্ধমান চাপের ফলে ফরাসী কর্তৃপক্ষ আনামের জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেণ্টকে স্বীকার করতে বাধ্য

হলেন। ১৯৪৬ সালের ৬ই মার্চ টংকিংএর রাজধানী হ্যানয়ে আনামীদের সহিত ফরাসীদের এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হ'ল। এই চুক্তি অনুসারে ফ্রান্স ভিয়েটনাম রিপাবলিক (জাতীয়তাবাদী আনামীদের গভর্ণমেন্টকে) স্বীকার করে নিলেন। স্থির হ'ল যে, ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্র ইন্দোচীন ফেডারেশনের অংশ বলে গণ্য হ'বে এবং ইহার শাসন-ক্ষমতা ও সৈন্যবাহিনী থাকবে। অর্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারেও জাতীয়তাবাদী গভর্ণমেন্ট কর্ত্তৃত্ব করতে পারবেন। ইন্দোচীনের পাঁচটি রাজ্য (কোচিন চীন, আনাম, টংকিং, কাম্বোডিয়া ও লেয়স) নিয়ে ইন্দোচীন ফেডারেশন হ'বে। এই ফেডারেশনে উপরোক্ত পাঁচটি রাজ্যের প্রতিনিধিদের একটি রাষ্ট্রীয় পরিষদ থাকবে এবং এক জন ফেডারেল গভর্ণর জেনারেল থাকবেন। তিনি বৈদেশিক বিষয় এবং অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তি নিয়ন্ত্রণ করবেন।

কোচিন চীন

আনামীরা কিন্তু এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হ'তে পারল না। এই চুক্তির ফলে তাহারা চীন, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের সহিত বাণিজ্যের অধিকার হ'তে বঞ্চিত হ'ল। কোচিন চীনকে ভিয়েটনাম রিপাবলিকের বহির্ভূত করায় তাঁদের অসন্তোষ আরও বর্দ্ধিত হ'ল, তারা বলতে লাগল যে, কোচিন চীনের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৮০ জনই আনামী। তা' ছাড়া কোচিন চীন চাউল ও রবারে সমৃদ্ধ। এই চাউল ও রবার না পেলে ভিয়েটনামের বেঁচে থাকা দায় হবে। কিন্তু ফরাসী গভর্ণমেন্ট বললেন যে, কোচিন চীন ইন্দোচীন ফেডারেশনের একটি অংশ এবং এখানে স্বাধীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কাজেই একে ভিয়েটনামের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না! কাজেই ভিয়েটনাম রিপাবলিক উত্তর-আনাম ও টংকিংয়েই সীমাবদ্ধ রইল।

সমস্যার সমাধান হ'ল না। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ কিছুতেই আনামীদের পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদানে রাজী হ'লেন না। কোচিন চীন নিয়ে গণ্ডগোল বাধল। ৬ই মার্চের চুক্তি অনুসারে উভয় পক্ষে যুদ্ধ-বিরতি হয়েছিল বটে, কিন্তু ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ নিজেদের কর্ত্তৃত্ব বজায় রাখবার জন্য সৈন্য আমদানী করায় সমস্যা বেড়ে গেল এবং আবার মাঝে মাঝে সঙ্ঘর্ষ চলতে লাগল!

আনামীরা ঠিক ভারতীয়দের মত নয়। তাঁদের প্রকৃতি একটু ভিন্ন রকমের। তাঁ'রা আলোচনাও চালায় আবার হাত-বোমা চালাতেও খুব পটু। এই দুই রকম পদ্ধতি অনুসারেই তাঁদের কাজ চলছে। আজ তাঁদের ৮০ বৎসরব্যাপী আন্দোলন সাফল্যের মুখে উপনীত। কোন বাধাই তাঁ'রা আজ আর মানতে রাজী নয়। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের সাম্রাজ্যবাদী কৌশল তাঁদের কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারবে না।

হো চি মিনের সহিত সাক্ষাৎ

ফরাসী গভর্ণমেন্টের সঙ্গে শেষ বুঝাপড়ার জন্য ভিয়েটনামের প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের নেতৃত্বে এক আনামী প্রতিনিধি দল ফ্রান্সে গিয়েছিলেন! যাবার পথে তাঁ'রা কলকাতা হয়ে যান। "স্বাধীনতা" অফিসে প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎ হয়। দেখলাম, অতি সাদাসিদা মানুষ। কথাবার্ত্তায় বুঝলাম, দেশের স্বাধীনতার স্বপ্ন তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত সুখের কথা ভুলিয়ে দিয়েছে। বললেন যে, ফ্রান্সের সহিত বা ফরাসীদের সহিত তিনি বিবাদ চাহেন না। স্বাধীন ফ্রান্সের সহিত স্বাধীন ইন্দোচীনের মৈত্রীই তাঁ'র কাম্য। 'স্বাধীনতা' অফিস থেকে তাঁ'র হোটেল পর্য্যন্ত হেঁটেই চলে গেলেন। মোটর দেবার কথায় বললেন, দরকার নাই।

ফ্রান্সে আলোচনা

আনামী প্রতিনিধি দল ফ্রান্সে গিয়ে 'ফন্তেব্লোতে ফরাসী প্রতিনিধি দলের সঙ্গে আলোচনা চালিয়েছেন। উভয় পক্ষে একটা চুক্তি হয়েছে বলেও শুনা যাচ্ছে। সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এই চুক্তি সম্পন্ন হয়। এই চুক্তি সম্বন্ধে ভিয়েটনাম রিপাবলিকের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ডাঃ ভ্যানগুয়েন গুয়াপ (হো চি মিনের অনুপস্থিতিতে ইনিই কাজ চালাচ্ছেন) এই মন্তব্য করেছেন যে, চুক্তিতে দুইটি প্রধান সমস্যা অর্থাৎ কোচিন চীনকে ভিয়েটনামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রশ্ন এবং ইন্দোচীন ফেডারেশনের মধ্যে ভিয়েটনামের স্বাধীনতার প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। কিন্তু এ সত্বেও ইন্দোচীনের অধিবাসীরা হো চি মিনের প্রতি আস্থা হারায়নি। হো চি মিন বর্ত্তমানে ইন্দোচীনে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। ভিয়েটনাম প্রতিনিধি দলের অন্যতম নেতা ফাম ভ্যান ডং ফন্তেব্লো সম্মেলনের কাজ শেষ করে হ্যানয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। তিনি বলেছেন যে, ফন্তেব্লো সম্মেলনে ফরাসী প্রতিনিধি দল স্বীকার করেছেন, ভিয়েটনাম রিপাবলিক সম্মিলিত রাষ্ট্রসংসদে আপনার প্রতিনিধি দল প্রেরণের অধিকারী। মাঝে খবর এসেছিল যে, ফরাসী ও আনামীদের মধ্যে মীমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। কিন্তু সংবাদটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। মোটামুটি মীমাংসা একটা হ'য়েছে। কিন্তু কোচিন চীনকে ভিয়েটনামের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবতঃ কোচিন চীনে গণ-ভোটের সাহায্যে সমস্যাটির সমাধানের চেষ্টা হ'বে।

ইন্দোচীনের বর্ত্তমান আভ্যন্তরীণ অবস্থা

উত্তর-ইন্দোচীনে ভিয়েটনাম রিপাবলিকের রাজধানী হ্যানয়ে কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। সরকারী ভবনগুলির চতুর্দ্দিকে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হ'য়েছে এবং সৈন্যরা ভবনগুলি পাহারা দিচ্ছে। ভাব দেখে মনে হয়, ফ্রান্সে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে মীমাংসার আলোচনা ব্যর্থ হ'লে হয়ত আবার উভয় পক্ষে যুদ্ধ বেধে যাবে। অন্ততঃ ভিয়েটনাম কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আশঙ্কা করেন বলে মনে হয়। ইন্দোচীনে ফরাসী সেনা অবস্থিত থাকায় এই আশঙ্কা অমূলক বলে মনে হয় না। গত মার্চ মাসে আনামে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর থেকে ফরাসীরা ভিয়েটনামের সম্মতি অনুসারে রিপাবলিকের ৮টি সহরে ১৫ হাজার সৈন্য মোতায়েন রেখেছে। এই সকল সৈন্যদের কাজ—ফরাসী সম্পত্তি রক্ষা এবং টংকিং হইতে ২০ হাজার ফরাসীর মধ্যে অবশিষ্ট ৭ হাজার ফরাসীকে স্থানান্তরিত করা। এ পর্য্যন্ত দুইটি গভর্ণমেন্ট ২।১টি দুর্ঘটনা ব্যতীত শান্তিতেই কাজ চালিয়ে আসছেন।

ভিয়েটমিন দলই গভর্ণমেন্টের নীতি নির্দ্ধারণ করে। গভর্ণমেন্ট বর্ত্তমানে দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য চাউল, আলু ও ভুট্টা উৎপাদন বৃদ্ধির চেষ্টা ক'রছেন, গ্রামাঞ্চলে শান্তিরক্ষা ক'রছেন এবং নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছেন। এই সকল কাজে তাঁ'রা কতকটা সাফল্যও লাভ ক'রছেন বলে জানা গেছে। ১৫।১০।৪৬

ধর্ম-সঙ্কট

শ্রীভারতচন্দ্র মজুমদার

সাধক যোগী, সন্ন্যাসী বা সাধু-সন্তদের প্রায় অধিকাংশের মধ্যেই দেখা যায় তাঁদের আধ্যাত্মিক বুদ্ধিবিচারের গোড়াতেই ভগবানকে অবলম্বন করা হয় স্বতঃসিদ্ধ ভাবে। তার পরে যুক্তি-চিন্তা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আনুসঙ্গিক ভাবে ধর্মতত্ত্বের কতকগুলি বদ্ধমূল গতানুগতিক ধারণাকে উপলক্ষ করে স্বীয় স্বীয় জ্ঞানগত বক্তব্যকে পল্লবিত করে তুলবার প্রয়াস পান। বহু সহস্র বছর ধরে মানব-মনে এ চিন্তাসংস্কার ও দর্শনের ব্যাখ্যার ধারা চালু হয়ে এসেছে। এতে হয়ত বা নিরঙ্কুশ মনস্তুষ্টির মনগড়া একটা দিক্ থাকতে পারে কিন্তু গোড়া থেকেই সত্যানুসন্ধিৎসাতে অনুরাগশূন্য প্রচ্ছন্ন পূর্বাপর অনুকরণ-প্রবৃত্তির সংস্কারান্ধতা এর পিছনে অনেকটা কার্যকরী হয় বলেই মনে হয়।

ভগবৎ-বুদ্ধি সকলের এক প্রকার নয়। অনুভূতির দৃষ্টিতে যে যে ভাবে দেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করছে সে সেভাবেই ওঁর ব্যাখ্যায় তৎপর হয়েছে এরূপ ধর্ম যাজনে সমাজে ভগবানের নামে মানুষকে কতকগুলি অভ্যাসের দাস করবার বুদ্ধি-বিস্তার ছাড়া ওর মধ্যে ভগবৎ-ভাবের সত্যকার বিশেষ কিছু আছে কি না সন্দেহ। ব্যক্তি বা সমাজ গঠনের প্রয়োজনে স্থলবিশেষে কতকগুলি এরূপ অভ্যাসের দাস হওয়া মানুষের পক্ষে হয়ত কতকটা হিতকারী হতে পারে কিন্তু ওকে ভগবানের নামে চালু করবার প্রয়োজনীয়তা কি ?

ভগবানের জাতি নাই, সমাজ নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, মা নাই, বাপ নাই। আছে কেবল অবিরাম যদৃচ্ছ প্রকাশের লীলা। মানুষের সন্ন্যাস আছে, বৈরাগ্য আছে, মিলন আছে, বিরহ আছে, কান্না আছে, হাসি আছে। তাঁর এ সব কিছুই নাই অথচ সবার মধ্যে ওঁর ছোঁয়া রয়েছে। মানুষ দেখে-শুনে বিচার-বিতর্ক করে, সভা-সমিতি বা মেলা-উৎসব করে। তিনি কারও কথা শুনেন না, কারও পানে চেয়েও দেখেন না। তিনি আপনার প্রকাশে আপনি অবিরাম অনবসর। সেই প্রকাশের স্রোতে মানুষের চাওয়ার মত ও পাওয়ার মত কত কিছু হয়ত ঘটনাবর্তে এসে জুটে যায়। মানুষ তাকে কৃতকর্ম বলে তাতে সাময়িক হয়ত সুখী হয়, তিনি তাতে নির্বিকার।

এ ভাগবৎ-ধর্ম যে যেভাবে বুঝতে পারছে, সে সেভাবে তদ্‌গত হয়ে যাচ্ছে। এ ভাবনা সখ করে করা চলে না। সমিতি করে সম্যক্ বোঝানো যায় না। চালাকি করে করতে গেলে বিপদ আছে। তাতে ভগবানের নামে মানুষই মানুষের পীড়ার কারণ হয়।

ভগবানের যদৃচ্ছা প্রকাশ ধারা থেকেই এ জগতে অবিরাম লক্ষ লক্ষ ঘটনাবর্ত এসে পড়ছে। সে স্রোত ফেরাবার কারও সাধ্য নাই। ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধির মানুষ এ ঘটনাবর্তের সবটাকে সম্যক্ সন্তুষ্টির সহিত গ্রহণ করতে পারছে না। তাই এর কতক অংশকে শুভ ও কতক অংশকে অশুভ আখ্যায় অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

অশুভের জটিলতা থেকে বাঁচবার জন্যে মানুষ বুদ্ধিবলে নানা উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টায় ছোটাছুটি ও নানা ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি করে কাল খোয়াচ্ছে, সুখে থাকবার অবসর পাচ্ছে না। এর উপর যদি মানুষের স্বকৃত চালাকিতে কেবল আরও নূতন নূতন অশুভ ঘটনা সৃষ্টির উৎপাত বেড়ে চলতে থাকে, তা'হলে মানুষের দুর্ভোগের শোচনীয়তার বোঝা এত অসহনীয় হয় যে, তার ভারে সমাজ বা লোক-স্থিতি ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়।

মানুষের কৃত অশুভ সৃষ্টির জন্য মানুষই দায়ী। প্রাকৃতিক ঘটনা স্রোতের তৌল বিধানে উহার শোধন হতে বহু কাল লেগে যায়। বৈজ্ঞানিক যুগে মানুষের লোভসেবী মারাত্মক চালাকির আবিষ্কারে যত অশুভ সৃষ্টি পুঞ্জিত হয়ে উঠেছে প্রাকৃতিক ঘটনাবর্তের অশুভও যে দিন যেখানে এর সঙ্গে ঘটনা-স্রোতে এসে যুক্ত হয়ে যায়, সে দিন সেখানকার নিরুপায় মানুষের ধ্বংসের মর্মন্তুদ আর্তনাদ রোধ করা কি মানুষের দ্বারা সহজে সম্ভব হয় ?

এক দিকে ঐহিকের ক্ষেত্রে মানুষের বেহিসাবী চালাকিতে জীবনযাত্রার স্থূল বিপর্যয় ঘটনা যেমন অসহনীয় হয়, অপর দিকে আধ্যাত্মিকের ক্ষেত্রেও মানুষের সৃষ্টির কৌতূহল মানুষকে ভগবানের বা ধর্মের নামে কত কিছু আড়ম্বর বা সাজ করে অস্বাভাবিক পথে চলতে দেখা যায়। অলৌকিক ও অবাস্তবের দিকে মানুষের মনকে সম্মোহিত করে বিভ্রান্ত করবার কত প্রক্রিয়া! এ প্রক্রিয়ার বৈদগ্ধতায় মানুষ মানুষকে নিয়ে ধর্ম-জগতে একটি প্রহেলিকা সৃষ্টি করে খেলা চালাচ্ছে। মানুষ মানুষকে সংসার-বিরাগী করে তুলছে, সন্ন্যাসী সাজিয়ে দিচ্ছে। যোগী, ঋষি, দেবতা, ভগবান আরও কত কিছু করে ভদ্রবেশী মানুষের গায়ে এক একটা অভিনব সাজ-পোষাক তুলে দিয়ে বিশ্বরঙ্গমঞ্চে মানুষের চোখে চমক লাগাচ্ছে। কত লক্ষ লক্ষ লোক এ সাজের পিছনে চলেছে কোন পরমার্থ লাভের জন্যে।

অস্বাভাবিকতা সাধারণতঃ মানুষের চোখে বিস্ময় জাগায়। তাই চলতি জীবনের চেয়ে কোন কিছু অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার ধরণ-ধারণ যদি ধর্মের নামে চালু হয়, সাধারণ মানুষ অমনি ধর্মের পিপাসায় ওদিকে ঢলে পড়তে ইতস্ততঃ করে না। এ থেকে আমরা স্বতঃই বুঝতে পারি, মানুষের চিন্তা-জগতে ধর্ম ও ভগবান সম্বন্ধে বহু পুরুষের স্বতঃসিদ্ধ সংস্কারান্ধতা প্রায় এক ভাবেই পোষাক বদল করে সেই এক কথাই বলে বেড়াচ্ছে। যারা এ নিয়ে থাকতে চায় থাকুক। ওদের সুখে বাধা দিতে গেলে হয়ত তারা হয়ে উঠবে অশান্ত ও ক্ষিপ্ত। তাদের এ সুখ-কিশলয় একটুতে হয়ত নেতিয়ে পড়তে পারে। তাই তারা এ সুখ রক্ষার জন্য চার দিকে যে কাঁটার বেড়া রচনা করে তুলছে, হিংসা ও উগ্রতার বিষে সে কণ্টক আপ্লুত। এ শ্রেণীর ভগবৎ-পন্থী ধার্মিক যারা তারা সাধনমার্গে ভগবানকে তৈরী করে নেয় আপনার মনের মত করে, কিম্বা আপনার খুসী মত তৈরী ভগবান অপর কারও ব্যাখ্যার কারখানায় পাওয়া গেলে উহাকেই নেয় আপনার করে।

যারা ভগবানকে তৈরী করে তাঁকে নিয়ে দিন কাটাবার উৎসাহ পায়, তারা এক ভাবে নেশার আমেজের মত কথঞ্চিৎ সুখাশ্রয়ে থাকতে পারে না' যে এমন নয়। কিন্তু তাদের এ গড়া ভগবানকে অন্যের কাছে এনে হাজির করতে হলেই প্রয়োজন হয় রীতিমত জ্ঞান-বুদ্ধির বিচারসহ সত্য প্রমাণের উজ্জ্বলতা। সে ক্ষেত্রে গোড়ামীর স্থান নাই।

অতএব ভক্তিমার্গের অন্ধ বিশ্বাসের অংশ যেটুকু, তা' হয়ত কোন ব্যক্তি-জীবনকে নেশা লাগিয়ে রঞ্জিত, মধুর ও ভাবাকুল করতে পারে। হয়ত এমন ব্যক্তি-জীবনের মধ্যেও জ্ঞানীর জ্ঞাতব্য অনেক কিছু থাকা অসম্ভব নয়, কিন্তু সমাজ বা সমষ্টি-জীবনে তার আরোপ করতে গেলেই সমাজ হয়ে পড়ে অনেকটা

কিনবে তা' বলে কাব্য-ছাই ?

শ্রীবাস্তব

●

মেয়ে বলে : বাবা, পয়সা চাই।
লিখতে বসেছি কবিতা তাই।
বসে আছে পাশে দু-হাত পেতে ;
কী দেব সে-হাতে ?—পয়সা নাই।

পুষি' পরিবার পিষে কলম ;
পেট ভরে না ক'—মাইনে কম।
পুরাই কমতি কাব্য করি ;
পেটের তাগিদ জোর গরম।

জীবনে করেছি কলম সার।
সংসার-বৈতরণী পার
করে দেবে সেই—ভরসা রাখি
ধরিনি অন্য কিছুই আর।

গুরুমশায়ের পাঠশালায়
দিল যে মন্ত্র ছোটবেলায়,
বিশ্বাস করি সরল মনে
জপেছি যত্নে জপমালায়।

"লেখাপড়া করে যতনে যেই
গাড়ী ঘোড়া চড়ে রতনে সেই।"
লেখনী-লক্ষ্মী,—বলেছে সবে,
"সার্থক বীজ-মন্ত্র এ-ই।"

তাইতো ভেবেছি হব না মুটে,
শিখিনি কি করে দেয় যে ঘুঁটে,
হাতুড়ি-কাস্তে ধরিনি হাতে—
পাছে কলমের গরিমা ছুটে।

তাই মেয়ে আজ পেতে দু'-হাত
পয়সা চাইতে তৎক্ষণাৎ
ধরেছি কলম মরীয়া-হাতে—
করব কাগজে লেখনী-ঘাত।

যা ফুটে কাব্য—রক্তদল
কবির সদ্য হৃৎ-কমল—
তা' নিয়ে সম্পাদকের দ্বারে
দেবই ধন্না, অচঞ্চল।

হাত পেতে বসে মেয়েটা। তাই,
গরীব কবির পয়সা চাই।
নগদ কড়িতে সম্পাদক
কিনবে তা' বলে কাব্য-ছাই ?

পাগলা-গারদের সামিল। ধর্মের নামে জোর-জুলুম ও নানা অন্যায় উৎপাত ভাবাতিশয্যের তাড়নায় এসে দেখা দেয়। এবম্বিধ ভক্তি ও বিশ্বাসের গণ্ডী ব্যক্তি-সীমামধ্যে থাকাই উচিত। আপনা থেকে বিনা চেষ্টায় সমষ্টি মধ্যে যদি এর কোন মধুর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে ত পড়ুক—তাতে ক্ষতি নাই।

বহুর মধ্যে ইচ্ছা করে কোন ভাব প্রয়োগ করাতে চাইবেন যিনি, তাঁকে যুক্তি ও জ্ঞানের দীপ্ত শিখা সঙ্গে করে বেরুতে হবে। সেখানে কত বিচার-বিশ্লেষণ ও যুক্তি-তর্কের মধ্য দিয়ে সত্যকে যাচাই করে নিতে হয়। কোন একটা বিশেষ কেন্দ্রের দিকে জ্ঞানগত ভক্তি বা শ্রদ্ধার একাগ্রতা ওর মধ্যেও যথেষ্ট আছে। যুক্তির মধ্যে যুক্ত হবার বা ঐক্যসাধনার উপায় রয়েছে। সত্যের দিকে লক্ষ্য ও শ্রদ্ধা নিয়ে যুক্তির অবতারণায় সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করতে হয়।

অন্ধ বিশ্বাসের উৎপাত যেমন সমষ্টির পক্ষে অকল্যাণের, শ্রদ্ধাহীন পাণ্ডিত্যের কচকচিও তেমন অনিষ্টকর। জ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক সময় এ জাতীয় পাণ্ডিত্য এসে মানুষের চোখে ধাঁধাঁ লাগিয়ে যায়।

অতএব সংসারের অন্ধ কুম্ভীপাক থেকে আত্মরক্ষা করে রত্ন উদ্ধার করবার উপায় অত সহজ নয়। সহজ লোকযাত্রা দেখে মোহাচ্ছন্ন হবার কিছু নাই। মানুষের ঐহিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে সর্বত্রই জলে কুমীর, ডাঙায় বাঘ ওৎ পেতে আছে। উভয়ের সীমাতীত মধ্যপথ দিয়ে তৌলরক্ষা করে চলতে পারলে উভয়ের উৎপাত থেকেই আত্মরক্ষা করা চলতে পারে ও সাধনার পথে পতনের ভয় কম থাকে।

ভগবানকে বারোয়ারী-মেলায় সঙ্ সাজানো চলে না। প্রত্যেকের মধ্যেই তিনিই আছেন। ইচ্ছা করলে কেউ তা খুঁজে বের করবার চেষ্টা করতে পারেন। এ সাধনা তাঁর নিজস্ব। নির্বিচারে কিছুতে নিবিষ্ট হওয়া রূপ পাওয়াও তাঁর নিজস্ব। ওতে যদি কিছু উপকার হয় তাও তাঁর নিজস্ব। প্রকৃত সত্য জ্ঞানের পথ যেটা তাতে পূর্ব্ব থেকে অলৌকিক কোন কিছুকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করে সাধনায় প্রবৃত্ত হতে হয় না। শুধু নিজের অস্তিত্বের মূল অনুসন্ধান করতে করতে বিশ্বপ্রকৃতি বা আরও বহু ব্যাপকতার মূলীভূত অস্তিত্বের যোগাযোগে চিন্তা-সম্প্রসারণ করা ও যুক্তি-বিচারে জটিলতার মীমাংসা করে সামঞ্জস্যের পথে আত্মনিয়ন্ত্রণ করবার কৌশল অবলম্বন করা ছাড়া আর বিশেষ কি হতে পারে ?

মানুষের প্রধান আধ্যাত্মিক কর্ত্তব্যই হচ্ছে ভগবানের প্রকৃতি-গত যদৃচ্ছ ব্যবস্থাপনার মধ্যে কল্যাণের নিগূঢ় সত্যসূত্র কি নিহিত রয়েছে তা বুদ্ধি-বিবেচনায় ও দর্শন-বিজ্ঞানে আবিষ্কার করে তাঁর ভগ্যবস্থাকে বুঝবার চেষ্টা করা। শ্রদ্ধায় ও জ্ঞানে তাঁর সঙ্গে আপনার যোগরক্ষার উপায় উদ্ভাবন করা।

এ সাধনার পথ শিক্ষাকেন্দ্রে, মন্দিরে, ময়দানে, কোণে, বনে, আচার-অনুষ্ঠানে, আলাপের ক্ষেত্রে জীবনের ব্যবহারিক প্রত্যেক বিভাগেই প্রশস্ত রয়েছে।

দৈনন্দিন আনুষ্ঠানিক ধর্মাঙ্গের প্রয়োগ প্রকাররূপে কিছু করতে হলে ব্যক্তিগত নিজস্ব তৃপ্তিপ্রদ যে অনুষ্ঠান তা' নিজের ঘরেই নিরালা সম্পাদন করা শ্রেয়ঃ। আর দশের মধ্যে সমবেত ভাবে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজ নিজ নীরব প্রার্থনা বা উপাসনার ব্যবস্থা থাকতে পারে। এ ছাড়া নির্বিরোধ, প্রশান্ত, উদার ও মহান্ ভাবসৃষ্টির অনুকূলে কোন নিষ্কলুষ কণ্ঠ-সঙ্গীতালাপ চলা অন্যায় বলে মনে হয় না।

অবরোধ

বিজন ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় অঙ্ক

২য় দৃশ্য

[মিঃ সেনের ভেতর-বাড়ীর ড্রইং-রুম। হাল-ফ্যাসনের আসবাব-পত্র যেন সুশৃঙ্খল ভাবে ছিটিয়ে রাখা হ'য়েছে সারা ঘরখানার মধ্যে। সুচিত্রা যে এক জন আর্টিষ্ট, এই ঘরখানার ভেতরে ঢুকলে টের পাওয়া যায়। সত্যি সত্যিই সুচিত্রা ছবি আঁকে। ড্রইং-রুমের এক কোণে রং তুলি ফ্রেম ছবি ইত্যাদি নিয়ে সুচিত্রা বেশ একটা ছোট-খাটো ছিমছাম ষ্টুডিও তৈরী করে নিয়েছে। সুচিত্রার হাতে আঁকা ছবির নমুনাগুলো দৃষ্টিটাকে যেন অনিবার্য্য ভাবে সম্রস্ত করে তোলে। সম্প্রতি একখানা পোর্ট্রেটে হাত দিয়েছে সুচিত্রা—ছবিখানা স্বয়ং মিঃ সেনের। পর্দা সরে যেতেই দেখা যায় সুচিত্রা নিবিষ্ট মনে ছবি আঁকছে। আর মিঃ সেন ড্রইং-রুমের অন্য কোণে একটা সোফায় হেলান দিয়ে বসে কি একখানা বই পড়ছে। সন্ধ্যেটা বোধ হয় সবে মাত্র পার হ'য়ে গিয়েছে। মিঃ সেনের পরনে গাউন, দামী একটা সাদা সিল্কের পায়জামা আর পাতলা একটা গাউন। সুচিত্রা খুব সতর্ক ভাবে তুলি চালাচ্ছে। ছবিটার মাথার দিকটা যদিও বা একটু বোঝা যাচ্ছে, তবু মুখটুখগুলো একেবারেই বোঝা যাচ্ছে না। সুচিত্রার কিন্তু ক্লান্তি নেই। সতর্ক ভাবে গভীর মনোযোগের সঙ্গে সে শুধু তুলি বুলিয়ে যাচ্ছে; আর মিঃ সেন তন্ময় হয়ে একখানা বই প'ড়ছেন। দু'জনেই আপন আপন কাজে এত অদ্ভুত ভাবে ব্যস্ত যে দেখলে মনে হয় যেন ওদের দু'জনের মধ্যে এতটুকু আলাপ-পরিচয় নেই।]

মিঃ সেন। (হঠাৎ বই থেকে মুখ তুলে) সব কিছুরই একটা limit আছে।···মেয়েদের অভিমানটুকু ভা'ল লাগে ঠিক ততক্ষণই, যতক্ষণ সেটা অভিমানের মাত্রা পেরিয়ে ঔদ্ধত্যে গিয়ে না পৌঁছয়।

(সুচিত্রার তুলি মন্থর হয়ে আসে)

সুচিত্রা। পুরুষের লাম্পট্যকে পৌরুষ ব'লে স্বীকার ক'রে না নিলেই মেয়েরা হয় উদ্ধত। এ যুক্তি তোমার নতুন নয় ···অভিমানটুকু ভাল লাগে, আশ্চর্য্য।

(জোর জোর আঁচড় টানে তুলি দিয়ে সুচিত্রা)

মিঃ সেন। তুমি আশ্চর্য্য হ'লে কি আর অমনি পুরুষের সমস্ত পৌরুষ লাম্পট্য হ'য়ে গেল।

সুচিত্রা। আমি জানি কথা তবু তুমি বলবেই।

মিঃ সেন। হ্যাঁ এইবার কাঁদো। ঐ একটি অস্ত্রই আছে।···

সুচিত্রা। চুপ করো তুমি।···আমি আত্মসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে চাই।

(খস খস করে কয়েকটা আঁচড়ে অদ্ভুত চরিত্র ফুটে ওঠে ক্যানভাসের ওপর—মিঃ সেনের চরিত্রের একটা কার্টুন)

মিঃ সেন। তোমার মর্য্যাদা কেউ দিতে পারবে না। কেউ না। মনের মধ্যে পুষে রেখেছো একটা দুঃখবাদের পাহাড়···

সুচিত্রা। তুমি আবার এ-হেন দানব যে সেই পাহাড়ও আজ তোমাকে আর মানুষের চোখের আড়ালে রাখতে পারছে না। সমস্ত বীভৎসতা নিয়ে আজ তুমি তাকে ছাপিয়ে উঠে গেছ। ···মর্য্যাদা দেবে তুমি! সে আশা আমার বহু দিন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

(ক্যানভাসের ওপর মিঃ সেন যেন সত্যই দৈত্যাকারে ফুটে ওঠে কালো রেখায়)

মিঃ সেন। চুরমার হয়েছে একটা স্ত্রীলোকের কামনা-বাসনার স্বার্থের ঢিপি। স্বর্ণ-সৌধও নয় বা কোন একটা মহৎ গৌরবেরও কিছুই নয়। সুতরাং অনুশোচনা করবার মত এমন কিছুই ঘটেনি।

সুচিত্রা। (তুলির যথেচ্ছ আঁচড়ে ছবিটা নষ্ট হয়ে যায়) অনুশোচনা আসবে তোমার! আমি কি পাগল হ'য়ে গেছি যে সেই আশা করবো।

মিঃ সেন। সেই তো তোমার জ্বালা। সেই জ্বালায়ই তো তুমি জিভ দিয়ে বিষ ছিটোচ্ছো। আবার বড় বড় কথা বলছো কি।

সুচিত্রা। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই না।

মিঃ সেন। কথা বলতে চাই না। সামান্য স্বার্থের মহত্তর ব্যাখ্যা অমন সকলেই দেয়। আমার কারখানার প্রত্যেকটা মজুর পর্য্যন্ত আজ ঐ কথাই বলে।

সুচিত্রা। তাদের প্রত্যেকে আজ তোমায় চাইতে অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। ধারণা কি তোমার তাদের সম্বন্ধে।

মিঃ সেন। বাঃ, চমৎকার। আর কি চাই। তো যাও, এবার হাত মেলাও গে।

সুচিত্রা। মেলাবই তো।

মিঃ সেন। Shut up! Shut up!

সুচিত্রা। চেঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে তুমি আর আমার মুখ বন্ধ করতে পারবে না। (ছবিখানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়ায়) You cant terrorise me that way. তুমি জানবে আমি সাবিত্রী নই।

মিঃ সেন। তুমি কি করতে চাও?

সুচিত্রা। সে কৈফিয়ৎ আমি তোমাকে দিতে বাধ্য নই।

মিঃ সেন। সুচিত্রা!

সুচিত্রা। সরে যাও তুমি আমার সামনে থেকে। ভীরু কাপুরুষ যেন কোথাকার। সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে তোমার লজ্জা করছে না!

মিঃ সেন। সহ্যের সীমা আছে সুচিত্রা!

সুচিত্রা। আমারও। তোমার এক পা কারখানার মজুরদের বুকের ওপর—সেটা বাইরে, আর এক পা তুমি তুলে দিয়েছ আমার বুকে—সহ্যের সীমা তুমি বহু আগেই অতিক্রম করে গেছ। মানুষের ক্ষমা অনেক, তাই আজও তোমায় নির্ব্বিবাদে সহ্য করে যাচ্ছে।

মিঃ সেন। তুমি চুপ করবে কি না আমি জানতে চাই।

সুচিত্রা। (কেঁদে ফেলে) চুপ করবো! আগুন জালিয়েছে কে? কে আজ তচ্‌নচ্‌ ক'রে দিয়েছে আমার সমস্ত জীবন?

মিঃ সেন। রাত হয়েছে। মিথ্যে চেঁচিয়ে সতীপনার জাঁক দেখিও না। কলঙ্ক বই ওতে গৌরব কিছু বাড়বে না তোমার।

সুচিত্রা। রাজ্যের কলঙ্ক মাথায় নিয়ে অগৌরবের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাচ্ছো? জানুক না লোকে। এসে দেখুক। আমি প্রমাণ ক'রে দেবো তুমি কত ছোট, কত হীন; সামান্য স্বার্থের খাতিরে তুমি কতখানি নীচে নেমে যেতে পারো। কলঙ্কের ভয় তুমি আমাকে কি দেখাচ্ছো?

মিঃ সেন। চুপ করিয়ে দিতে আমি তবে বাধ্য হলুম। (লাফিয়ে উঠে দেওয়ালে ঝুলন্ত চাবুকটা পেড়ে আনে)

সুচিত্রা। কলঙ্ক! তোমার চরিত্র গড়তে গিয়ে আজ পৃথিবীর সবটুকু কলঙ্ক ফুরিয়ে গেছে। সামান্য একটা কীট পতঙ্গও আজ তোমার চাইতে বেশী শুভ্র।

(উদ্যত চাবুকখানা কবি ত্রস্তে তুলে ধরে ফেলে)

কবি। কি হ'চ্ছে কি মিঃ সেন!

মিঃ সেন। কে, কবি!

কবি। হ্যাঁ আমি, চাবুক ছেড়ে দাও।

মিঃ সেন। কে তোমাকে এখানে আসতে বলেছে?

কবি। কেউ বলেনি, আমি নিজেই এসেছি।

মিঃ সেন। Leave the room at once, এক্ষুনি বেরিয়ে যাও।

কবি। No no. You know I hate the process, কেন খামকা চ'লে যেতে ব'লছো।

মিঃ সেন। চাবুক ছেড়ে দাও কবি। (ধস্তাধস্তি)

কবি। না চাবুক ছেড়ে দিলে যে তুমি মারবে সুচিত্রাকে।

মিঃ সেন। কবি, I warn you for the last time.

কবি। চাবুক আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না মিঃ সেন। You snatched away Sabitri from me, I did not protest. You have made a slave of myself and of my muse chained to your golden charriot; unwillingly I succumbed for reasons I know not. I have done things which even today I can't rationalise and so I brood and bleed. Now a wretch, I have nothing left to exchange but the soul which I am determined to save.

(অবস্থা বুঝে সুচিত্রা আগে থেকেই ড্রয়ারটা খুলে রিভলবারটা বার ক'রে নিয়ে স'রে দাঁড়িয়েছে)

মিঃ সেন। (হঠাৎ চাবুক ছেড়ে দিয়ে) Well then save your soul. (ছুটে গিয়ে ড্রয়ার হাতড়ায়) আমার রিভলবারটা কই?

কবি। That can't even pierce the soul Mr. Sen. calm down, please calm down.

মিঃ সেন। (কবিকে) Shut up you scoundrel, (সুচিত্রাকে) আমার রিভলবারটা কোথায় রেখেছো?

সুচিত্রা। কেন?

মিঃ সেন। কোথায় রেখেছো আমার রিভলবার?

সুচিত্রা। আমার কাছে আছে।...(টিপ'য়ের ওপর রেখে দিল) নিতে পারো।

মিঃ সেন। নিতে পারো! মহত্বের curbuncle সব। দূর হ'য়ে যাও আমার সামনে থেকে। (কবিকে) You leave my house at once.

(সুচিত্রা গুমরে গুমরে কাঁদছে)

কবি। চলে যেতে ব'লছ?

মিঃ সেন। Yes, at once. Renigade যেন কোথাকার! (রিভলবারটা হাতে নিল) Get out.

কবি। যাচ্ছি। (দূর থেকে হাঁটু গেড়ে ব'সে কুর্ণিশ করার ভঙ্গীতে সুচিত্রাকে অভিবাদন জানালো) I bow down, not to you but to the suffering humanity in your person.

মিঃ সেন। (কবিকে) Get out I say,

[ডান দিক দিয়ে কবির প্রস্থান।

(মিঃ সেন সুচিত্রার দিকে এক নজর তাকিয়েই রিভলবারটা বাঁ দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড একটা বিস্ফোরণ হলো। ধোঁয়ায় ভ'রে গেল ঘরটা। কিন্তু মিঃ সেন ভ্রূক্ষেপ না ক'রে বেরিয়ে গেল বাঁ দিক দিয়েই।

সামনের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কেবল সুচিত্রা। চোখ দিয়ে তার অবিরাম ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে—তবু স্থির অচঞ্চল।)

(অন্ধকার)

চতুর্থ অঙ্ক

১ম দৃশ্য

কুলি-বস্তি। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই রাত ঘনায়মান হ'য়ে উঠেছে বস্তিটার ওপর। কোন ঘরে লণ্ঠন, কোন ঘরে টেমী কেরোসিনের লাল শিখার প্রভায় পরিবেশটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে। বস্তির ভেতরে কোথাও যেন ঝগড়া হচ্ছে মনে হচ্ছে। আর মাঝে মাঝে কোন একটা বুড়ী মায়ের আর্ত্ত কণ্ঠ ভেসে আসছে কানে। পাশেই চায়ের দোকান—বেঞ্চের ওপর ভিড়টা এখনও ঠিক জমেনি, তবে চায়ের দোকানের ভেতরে লোক ঘুর-ঘুর করছে দেখা যাচ্ছে। অদূরে খোলা বারান্দায় খাটিয়ার ওপর চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে যেন বেতালা কাওয়ালী সুর ভাঁজছে। শ্রমের অবসাদ ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে পড়ছে সুরের রেশ ধ'রে। চায়ের দোকানের সামনে অল্প আলোয় বেঞ্চের ওপর বসে বিড়ি ফুঁকছে বুধাই।

বুধাই। (চায়ের দোকানের ভেতরের লোকদের কথার প্রত্যুত্তরে বুধাই ঝাপটা মেরে বলে ওঠে) কে বলেছে ঠুক তোকে শুয়েছিল? শুয়েছিল! শালা আমার চোখের সামনে ঘটল আর আমি জানি না। বাজে বাত বলছিস্ কেন!···কে, সাত জুতোর বাড়ি খাব যদি শালা মিথ্যে হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ খাব।

(চায়ের দোকানের ভেতরে একটু হল্লা হচ্ছে। কে যেন ভেতরে থেকে উত্তর করে)

জনৈক শ্রমিক। (নেপথ্য থেকে) খাবি?

বুধাই। আলবৎ খাব।···জানে না শোনে না, বাজে রোয়াবী ছাড়ছে।···এ বাবা, জানো মাইরী এমন হারামীর বাচ্ছা শালা··· এ বাবা, বলছে কাজ ছেড়ে দিয়ে পা জুড়োবার আর জায়গা পেলে না! কারখানা কি আরাম করবার জায়গা···শালা এই বলতে না ব'লতে মেরেছে শালা ঠোক্কর। ইচ্ছে হচ্ছিল দিই শালাকে মেসিনে চাপিয়ে—সিক-কাবাব হ'য়ে বেরিয়ে আসুক।··· দেখছিস্ শালা আঙুলে পটি জড়িয়ে ছটফট করছে আর চেঁচাচ্ছে···শেষ কালে ঠোক্কর মেরেও যখন গায়ের জ্বালা গেল না তখন দিলে শালা ছেঁটে, লাও!···নাঃ, আবার বাধলে গোলমাল বুঝলে! এবার এ বাবা শালা এস্পার ওস্পার—জানলে!

(পাতলা অন্ধকারে চার-পাঁচ জন লোকের একটা জটলা গড়িয়ে আসে বেঞ্চিটার দিকে)

নগিন। কি চেঁচাচ্ছিস্ রে?

বুধাই। কেমন দিয়েছে আজ।

নগিন। কে?

বুধাই। শুনিসনি।

নগিন। কি, বংশীর ব্যাপার তো? হুঁ, আরে ও তো বাসি খবর, এ বেলার খবর জানো?

বুধাই। এ বেলার আবার খবর কি রে?

গিটু। আরে খবর তো এ বেলাকার। হপ্তা নিতে যাস্‌নি।

বুধাই। না।

গিটু। তো কাল গিয়ে দেখবি।

বুধাই। আরে বল না শালা।

নগিন। দু' শিফটে ক ঘণ্টা কাজ করিছিলি গেল হপ্তা?

বুধাই। কেন, সবাই যা করেছিল।

নগিন। মরোছো···তিন দিনের মাইনে শালা বিলকুল কেটে নিয়েছে মাইরী, ম্যানেজার শালা বললে কি না বাইশ ঘণ্টা পুরো কাজ হয়নি।

বুধাই। তার পর?

নগিন। তার পর কেউ হপ্তা নেয়নি, সব চলে এয়েছে রাগ করে। রাত্তিরের শিফটে কাজ ছিল যাদের—তাদেরও ঐ অবস্থা··· শালা মাইনে নিতে গিয়ে হাঁ হ'য়ে গেছে সব।

গিটু। শালা ছাঁটাই করবার আগে এই সব পাঁয়তারা ক'সছে ম্যানেজার। শালা শুয়ার কি বাচ্ছা তেরি···আর শালা এমন ত্যাঁদোড় মাইরী যে কোন দিন শালা কারখানায় ঢুকে পর হাজ্‌রের খাতায় নাম তুলতে দেবে না—বলে কি না যাও না কাজে যাও—পুরো দু' শিফট কাজ করে এসো—খাতায় নাম তুলো, এই রকম বেইমানী।

বুধাই। তা শালা পীয়ারির দল হাঁ হয়ে কি কাজে গেল শেষমেশ দেখলি?

নগিন। কি জানি, গিটু জানে হয় তো, গিটু!···হ্যা রে পিয়ারীর দল কি কাজে যাবে বললে রাত্তিরে বেলা?

গিটু। কি জানি, বসে তো পড়ল সব দেখলাম। বোধ হয় যাবে না কাজে।···পণ্ডিত তো র'য়ে গেল দেখলাম।

(ওসমানের প্রবেশ)

কে এলো রে, পণ্ডিত না কি?

নগিন। ওসমান শালা আসছে।

গিটু। ওসমান এসেছে তো ডাক, ওর কাছ থেকে টাটকা খবর পাওয়া যাবে।

নগিন। ওসমান! এই ও ওসমান, শালা কালা না কি রে মাইরী, এই ওসমান!

ওসমান। কি রে।

নগিন। শোন না! ডাকছি এত করে শুনছিস্!

ওসমান। বোল।

নগিন। কারখানা থেকে ফিরছিস্?

ওসমান। হাঁ কেন?

নগিন। পিয়ারীরা কি ব'সেই আছে না শেষমেশ কাজে গেছে, খবর রাখিস্?

ওসমান। ফিটার মিস্ত্রীর ডিপার্টে তালা বন্ধ করে দিয়েছে জানিস না?

নগিন। না!···একদম সটাসট্ তালাচাবি? তার পর···

ওসমান। তার পর শুধু সঙ্গে একটা নোটিশ ঝুলিয়ে দিয়েছে এই বলে যে, ডিপার্ট আজ থেকে বন্ধ থাকলো।

নগিন। ব্যাস্, শালা কেন বন্ধ. কিসের বন্ধ, কত দিনের জন্ত বন্ধ—এ সব কথা কিচ্ছু নেই?

ওসমান। কৈফিয়ৎ আর দেবে না, হুঃ। শুধু ঐটুকু—আজ থেকে ডিপার্ট বন্ধ রইল।

গিটু। শালা বিলকুল হারামী মাইরী।

বুধাই। যা শালা, যেটুকু বাকি ছিল তাও হ'য়ে গেল। (হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে) ই—ন—কিলাব।

[চায়ের দোকানের ভেতর থেকে সমস্বরে ধ্বনি ওঠে জিন্দাবাদ]

(সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতের নেতৃত্বে আরও অনেক মজুর এসে প্রবেশ করে)

পণ্ডিত। ব্যাপারটা কি, এখন কেন বোনাস দেয় না কোম্পানী। এখন কেন মুখের কথাটা পর্য্যন্ত বলে না যে, যা হোক বাবা মানিয়ে গুছিয়ে কাজ কর, সময় আসলেই তোমাদের দাবী-দাওয়াগুলো বিবেচনা করা হবে। কেন? না তা হ'লে তো আমরা ধর্ম্মঘট এখন নাও ক'রতে পারি, কিম্বা দু' দিন পরে করতে পারি। কিন্তু তাতে ক'রে মালিক মজুর ছাঁটাই'এর ছুতো পায় না, না ব'লে না ক'য়ে ঝট্‌পট্ কতকগুলো ডিপার্ট বন্ধ ক'রে দিতে পারে না—এই হয় মালিকের অসুবিধা। অবিশ্যি ছাঁটাই মালিক ক'রছেই,—একটা কোন ছুতো ধরেই সাফ ব'লে দিচ্ছে কাল থেকে আর তুমি কাজে এসো না। কিন্তু তেমন একটা বড় ছুতো না পেলে বেশী মজুরকে একসঙ্গে জবাব দিতেও কোম্পানী দুনোমনা ক'রছে। কিন্তু ধর্ম্মঘট ক'রলে কোম্পানীর আর কোন খুচরো ছুতোর দরকার হয় না, আর এই মওকায় মালিক পাঁচ-সাত শ' মজুর অনায়াসে ছেঁটে ফেলতে পারে। তাই আজ দেখি মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের মুখে পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটের কথা। এত দিন ধর্ম্মঘট যারা বান্‌চাল ক'রেছে, আজ তারাই মজুরদের মধ্যে 'ধর্ম্মঘট করো' 'ধর্ম্মঘট করো' ব'লে উস্কানি দিচ্ছে। এটা ভেবে দেখা দরকার।

ওস্‌মান। কিন্তু পণ্ডিতজী ধর্ম্মঘট ছাড়া এখন উপায়ই বা কি?

বুধাই। হাতিয়ার তো বাবা ঐ একই হ্যায়।

পণ্ডিত। ও তো ঠিক কথা। ধর্ম্মঘটই করতে হবে। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে যে এবারে যেন আমাদের মধ্যে কোন ভাগাভাগি না হয়। দু' হাজার মজুরের মধ্যে এবার দু' হাজার মজুরকেই ধর্ম্মঘট ক'রতে হবে। কিছু মজুর ছাঁটাই ক'রে কিছু মজুর দরকার মত রেখে দিয়ে কারখানা চালু রাখার যে প্ল্যান কোম্পানী ক'রছে—এই প্ল্যান বান্‌চাল ক'রতে হবে। তবেই মালিকের কারসাজি বরবাদ হ'য়ে যাবে—ধর্ম্মঘট করে কিছু ফয়দা ভি মজুরের হ'তে পারে—ছাঁটাই বন্ধ হবে।

(ধ্বনি ওঠে—ঠিক বাত, ঠিক কথা, সাচই হ্যায়)

এখন তহবিল। টাকা চাই, চাল চাই, ডাল চাই—মজুর ইউনিয়নের ষ্ট্রাইক ফণ্ড খুব জোরদার করে তুলতে হবে, কারণ বিশ দিন, কি পঁচিশ দিন, কি মাস কি এক দু'-মাস এই ধর্ম্মঘট চালাতে হবে, তার কোন ঠিক নেই।

ওস্‌মান। এখানে আমার একটা কথা আছে।

পণ্ডিত। বল।

ওস্‌মান। কথাটা এই যে, এখনও আমি আমাদের লোকের মুখে এই কথাটা শুনতে পাই যে, ইউনিয়নে ভিড়ে খামখা ধর্ম্মঘট করে কি হবে। আগে মাইনে বাড়ুক তার পর ইউনিয়নে যোগ দেব—ইউনিয়নের কথা শুনবো। এটা কিন্তু খুব ভুল কথা—ভুল কথা এই জন্যে যে, বাইরে থেকে শুধু ইউনিয়ন মাইনে বাড়িয়ে দিক বল্লেই মাইনে বাড়তে পারে না। মাইনে বাড়াতে হ'লে, মজুরদের ওপর মালিকের খুসীমত হামলা বন্ধ করতে হলে, ইউনিয়নকে জোরদার ক'রে তুলতে হবে। ইউনিয়ন তো বাইরের একটা জিনিষ নয়, নিজেদের জান-প্রাণ বাঁচাবার জন্যে মজুররাই মিলে-মিশে এটা ক'রেছে। ইউনিয়ন বলতে মজুরদেরই একটা জোট, বোঝায়—মজুর আছে তো ইউনিয়ন আছে, মজুর নেই তো ইউনিয়নও নেই। সেই জন্যে ইউনিয়ন অমুক করে দিক্ তবে ইউনিয়নের কথা শুনবো—এটা কোন কথা হতে পারে না। আমার কথা এই যে, ধর্ম্মঘট করবার আগে এটা যেন সকলেই ভাল করে বুঝে নেয়। এখন ইউনিয়নকে দাও, দিলে তো পাবার আশা ক'রতে পারো—দু' হাতে দিয়ে ষ্ট্রাইক ফণ্ড জোরদার করে তোল—নিজেদের ন্যায্য দাবীর কথা বুঝিয়ে বলে পাব্লিকের কাছ থেকে চাঁদা চেয়ে নাও —সাচ্চা কাজে সাচ্চা মানুষের মন পাও, যে হাঁ এদের দাবী ঠিক —ভাল কাজের জন্যে এরা লড়ছে—তবেই ধর্ম্মঘট করে জিত্ হবে—মাইনে বাড়বে। এখন দিয়ে যাও—দু'হাত ভ'রে দিয়ে যাও—ইউনিয়নকে বাঁচাও, দেখবে ইউনিয়নও তোমাদের বাঁচাবে।

(শ্লোগান) ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ
মজদুরোঁকা দাবী কায়েম কর।

এই সময় বাঁ দিকের উইংস্ দিয়ে চায়ের দোকানের ধার ঘেঁসে কয়েক জন শ্রমিক চাদর ধ'রে ষ্ট্রাইক ফণ্ড সংগ্রহ ক'রতে থাকে এবং গান ক'রতে ক'রতে এগিয়ে আসে :

ইয়ে ঝাণ্ডা তুঝ্‌সে কহতা হ্যায়
দিনরাত জুলুম কেঁও সহতা হ্যায়
খামোস সদা কেঁও রহতা হ্যায়
উঠ হোসমে আবেদার হো যা।

এই সময় বস্তির ভিতর থেকে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা এসে চাদরে যে যার সাধ্যমত টাকা পয়সা ও গহনা দিয়ে দেয় খুসী হ'য়ে। একটি যুবতী মেয়ে স্মিত হেসে রূপোর কঙ্কন খুলে দেয় হাতের।

(পটক্ষেপ)

[ক্রমশঃ।

দি গুড্ আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

ও

জয়কুমার ভাদুড়ী

২৫

ওয়াঙ মনে মনে ভাবছিল এইবার বাড়ীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এমনি একদিন মাঠ থেকে ফিরে আসতেই বড় ছেলে বললে তাকে—'বাবা আমাকে যদি পণ্ডিত হতে হয় তবে সহরের ঐ বুড়ো আর আমাকে কিছু শেখাতে পারবে না।'

ওয়াঙ তখন রান্নাঘরের কড়াই থেকে এক পাত্র ফুটন্ত জল তুলে তাতে তোয়ালে ভিজিয়ে মুখ ঘসছিল। সে জিজ্ঞাসা করল—'কি বলছ?'

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করে বলতে লাগল—'যদি আরো লেখাপড়া শিখতে হয় তাহলে আমাকে দক্ষিণের সহরে যেতে হবে—বড় স্কুলে ভর্তি হ'তে হবে। সেখানে অনেক বিত্তে শিখতে পারব।'

তোয়ালে দিয়ে চোখের কোণ, কানের পাশ ভাল করে রগড়ে বাষ্পিত মুখে জবাব দিল ছেলের কথার. মাঠে খেটে আসার দরুণ তখনও তার শরীর ক্লান্ত—তাই তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাপ বললে—কি বাজে বকছ? আমি বলছি যাওয়া চলবে না। এর জন্য আমাকে আর বিরক্ত করো না!। অনেক বিত্তে হয়েছে।' আবার তোয়ালে জলে ভিজিয়ে গা রগড়াতে লাগল ওয়াঙ।

কিন্তু ছেলেটি সেখানে দাঁড়িয়ে বাপের দিকে ঘৃণা মেশান দৃষ্টি দিয়ে বিড়-বিড় করে কি যেন বলতে লাগল। ওয়াঙ তা শুনতে না পেয়ে দারুণ চটে গর্জে উঠল ছেলের প্রতি—'জোরে বল কি বলবার আছে?'

ছেলেটিও বাপের কণ্ঠে জ্বলে ওঠে দপ্ করে—'দক্ষিণে আমি যাবই। বোকাদের বাড়িতে ছোট ছেলের মত সতর্ক পাহারায় দিন কাটাতে পারব না। থাকতে পারব না এই গাঁয়ের মত হতচ্ছাড়া শহরে। বাইরে আমি যাবই—আরো শিখতে হবে আমাকে—দেশ বিদেশ দেখতে হবে।'

ওয়াঙ ছেলের দিকে তাকাল আর তাকাল নিজের দিকে। সামনে দাঁড়িয়ে তার ছেলে। রূপালী ধূসর, পাতলা দীর্ঘ সুতীর পোষাক তার পরনে, চেহারা একটু ফ্যাকাশে কিন্তু পুরুষত্বের রেখা দেখা দিয়েছে গোঁফে—দেহের ত্বক হয়েছে মসৃণ আর সোনালী। দীর্ঘ আস্তিন ঢাকা নরম হাত দু'টি মেয়েদের মতই। তার পর তাকাল ওয়াঙ নিজের দিকে। কাটখোট্টা তার চেহারা। মাটিতে মলিন। পরনে হাঁটু অবধি দীর্ঘ একটি নীল তুলোর কোর্তা। কোমর থেকে দেহের উপরাংশ সম্পূর্ণ উলঙ্গ। অপরিচিত কেউ দেখলে বলবে সে তার বাপ নয়—তার চাকর। এই চিন্তায় পুত্রের দীর্ঘোন্নত সুশ্রী চেহারা ঘৃণায় ভরে দিল তার মন। হিংস্র রুক্ষ হয়ে উঠল ওয়াঙ। চেঁচিয়ে বললে সে—'যাও, মাঠে গিয়ে একটু মাটি মেখে নাও গায়ে। লোকে দেখলে বলবে যে মেয়েমানুষ। যে-অন্ন গিলছ তার জন্য একটু খাট।'

ওয়াঙ ভুলে গেল যে ছেলের লেখাপড়ার দৌড়ে এত দিন সে কত গর্ব বোধ করেছিল। খালি পা মাটিতে ঠুকতে ঠুকতে সশব্দে সে দাপাতে লাগল। অভদ্রের মত থুতু ফেলল ঘরের মেঝেতে। ছেলের সংস্কৃতি-শ্রী ক্রোধান্ধ করে তুলল তাকে।

রাত্রে ওয়াঙ যখন অন্দর মহলে গিয়ে বসল কমলিনীর পাশে তখন কমলিনী বিছানায় শুয়ে আছে—কোকিলা বাতাস করছে। কমলিনী তাকে কথায় কথায় জিজ্ঞেস করল—'তোমার বড় ছেলেটি যে শুকিয়ে যাচ্ছে। ও বাইরে যেতে চায়।'

ছেলের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের কথা মনে পড়ে যাওয়ায় তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াঙ—'তাতে তোমার কি? তার বয়সে তাকে এ রকম জায়গায় কিছুতেই ঢুকতে দেব না আমি।'

কমলিনী তাড়াতাড়ি বলল—'না, না। কোকিলা বলছিল এ কথা।' কোকিলাও তাড়াতাড়ি জুড়ে দিল—'যে কেউ দেখলেই বলবে সে কথা। চমৎকার ছেলে। তবে মন উড়ু উড়ু হবার মত ঢের বয়স হয়েছে তার।'

এ কথায় ওয়াঙ একটু মুশড়ে গেল। সে শুধু ছেলের বিরুদ্ধে নিজের রাগের কথাই ভাবছিল। বললে—'না, তার যাওয়া হ'বে না। মিছি মিছি টাকা গলে যেতে দেব না আমি।'

এ সম্বন্ধে আর আলোচনা চালাতে নারাজ হল ওয়াঙ। কমলিনী দেখলে ওয়াঙ কোন কারণে খিটখিটে হয়ে উঠছে। তাই সে কোকিলাকে সরিয়ে দিল ঘর থেকে। ওয়াঙের রুক্ষ মেজাজ সে একাই দেখতে চাইল।

তার পর আর অনেক দিন এ সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠেনি। ছেলেটি হঠাৎ কেমন স্তিমিত হয়ে এসেছে। সে আর স্কুলে যেতে রাজী হোল না। ওয়াঙ তাতে সম্মতি দিল। ছেলেটির বয়স হোল প্রায় আঠারোর কাছাকাছি। মায়ের মতই তার দেহের গড়ন—হাড়গুলো বেশ বড় বড়। নিজের ঘরেই পড়ে সে। ওয়াঙ দেখে খুশী হয়। মনে মনে ভাবে—'এ ওর যৌবনের একটা খেয়াল মাত্র। কি চায় নিজেই ও তা জানে না। বিয়ের মাত্র আর তিন বছর বাকি। কিছু বেশী খরচা করলে দু'বছরের মাথাতেই হতে পারে আর রূপোর পরিমাণটা যদি বেশ প্রচুর হয় চাই কি বছর ফিরতেই লাগিয়ে দেওয়া যাবে। ভালয় ভালয় ফসল ঘরে উঠুক—শীতের গম রোপন করা হ'ল আর কড়াইশুঁটির জন্য জমি তৈরী শেষ হলে দেখব ভেবে এ সম্বন্ধে।'

এর পর ওয়াঙ এক দম ভুলেই গেল ছেলের কথা। পঙ্গপালের দল যা নষ্ট করেছে তা ছাড়া মাঠের ফসল ভালই হয়েছে। কমলিনীর পিছনে যত টাকা খরচ করেছে এর মধ্যেই সে তা উপায় করে ফেলেছে। আবার সোনা-রূপো তার কাছে অমূল্য হয়ে উঠেছে। সময় সময় সে গোপনে বসে সবিস্ময়ে ভাবে—মেয়েদের পেছনে কেমন করে সে দরাজ হাতে ঢেলেছে এত টাকা!

তবুও মাঝে মাঝে কমলিনী তার মনে মধুর উত্তেজনা সৃষ্টি করে। সত্যি বটে এ উত্তেজনা আর আগের মত তত উগ্র নয় তবুও তাকে অধিকারের গর্বে ভ'রে থাকে ওয়াঙের মন। খুড়িমা যা বলেছেন তাই সত্যি—কমলিনী দেখতে ছোটখাটটি হলেও বয়সে তেমন কাঁচা নয়। কখনও সে সন্তানও গর্ভে ধারণ করেনি। কিন্তু এর জন্ম ওয়াঙ একটুও মাথা ঘামায় না—কারণ ছেলে-মেয়ে তার আছে। কমলিনী তাকে যে আনন্দ উপহার দেয় তার জন্যই তাকে সে রাখবে।

এদিকে বয়স যতই বাড়ছে কমলিনী ততই সুন্দর হয়ে উঠছে। আগে তার যদি কোন দোষ থেকে থাকে সে হচ্ছে তার পাখীর মত কৃশতা যার জন্য তার তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব তীক্ষ্ণতর দেখাত—কপালের খাঁজ আরো গভীরতর মনে হোত। কিন্তু এখন কোকিলার রান্না খেয়ে এবং একটি মাত্র পুরুষের সঙ্গে কর্মবিমুখ জীবনের অলসতায় তার মধ্যে এসেছে কোমলতা—দেহ হয়েছে গোলগাল, মুখ ভরে উঠেছে আর কপোলে এসেছে স্নিগ্ধতা। ছোট মুখ আর বড় চোখে তাকে দেখায় ঠিক গোলগাল একটি বেড়ালের মত। কমলিনী খায় দায় ঘুমোয়—শরীরে এসেছে মেদ ও মসৃণতা। পদ্মকুঁড়ি না যদি হয় সে বিকশিত পুষ্পের লাবণ্য তার অঙ্গে। কিশোরী না হলেও প্রৌঢ়া তাকে দেখায় না একটুও। প্রথম যৌবন আর বার্ধক্য দুই-ই তার থেকে সমান দূরে।

সংসারে আবার শান্তি এসেছে ফিরে—ছেলেটিও ঠাণ্ডা হয়েছে। ওয়াঙ হয়ত পরম সন্তোষেই দিন কাটাতে পারত। কিন্তু একদিন রাত্রে একাকী সে ঘরে বসে আঙুল গুণে দেখছিল গম আর চাল বেচে কত লাভ হবে, এমন সময় ওলান লঘু পায়ে ঢুকল ঘরে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে ওলান শীর্ণ হয়ে পড়েছে—মুখের হাড়গুলো বেরিয়ে পড়েছে—চোখ দু'টো ঢুকেছে গর্তে। কেউ যদি তাকে কুশল প্রশ্ন ক'রে সে শুধু এক কথাই বলে—'আমার পেটের ভিতরটা কেমন জ্বলে খাক হয়ে যাচ্ছে।'

বছর তিন হোল পেটে ছেলে থাকলে যেমন দেখায় তেমনি বড় দেখতে হয়েছে ওলানের পেট। কিন্তু আর ছেলেপুলে হয়নি তার। নিত্য খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে সে কাজকর্ম করে। টেবিল বা চেয়ার বা উঠোনের গাছকে যে ভাবে দেখে তেমনি চোখেই ওয়াঙ বৌকে দেখে। এমন কি কোন বলদ ঘাড় গুঁজে বসে পড়লে অথবা কোন শূকরছানা না খেলে যেমন তীক্ষ্ণ নজর দেয় তাদের দিকে সেটুকু দরদও নেই তার বৌয়ের প্রতি। ওলান একাকী তার কাজ করে যায়—ওয়াঙের কাকীর সঙ্গে যেটুকু কথা না বললেই নয় তাই বলে। আর কোকিলার সঙ্গে এক দমই সে কথা কয় না। কোন দিন অন্দর মহলেও ঢোকেনি সে। আর কচিৎ কখনো কমলিনী যদি তার মহল ছেড়ে বাইরে একটু বেড়াতে আসে ওলান তক্ষুনি ঢুকে যায় নিজের ঘরে এবং যতক্ষণ না কেউ এসে তার চলে যাওয়ার খবর দেয় ততক্ষণ বের হয় না ঘর থেকে। মুখে কোন রা নেই। কিন্তু রান্না-বান্না রোজই করে সে—কাপড় কাচে পুকুরে। এমন কি ভরা শীতেও যখন জল শুকিয়ে কঠিন বরফে পরিণত হয়। কিন্তু ওয়াঙের একদিনও মনে হয়নি যে বলে ওলানকে—'আচ্ছা, একটা চাকর রাখ না কেন, বা কোন ক্রীতদাসী।'

এর যে প্রয়োজন আছে সে কথাও কোন দিন মনে হয়নি তার। অথচ ওয়াঙ ক্ষেতের জন্য জন মজুর খাটায়, গরু গাধা শুয়োরদের দেখা-শুনার জন্য লোক রাখে—গ্রীষ্মে নদীগুলি যখন প্লাবিত হয়ে যায় তখন রাজহাঁস আর পাতিহাঁসগুলো চরান'র জন্যও ঠিকা লোক বহাল করে।

আজ সন্ধ্যায় যখন সে মোমবাতীদানীতে লাল মোমবাতী জ্বালিয়ে একা বসেছিল ওলান এসে নিঃশব্দে দাঁড়াল তার সম্মুখে—এদিক ওদিক তাকিয়ে শেষে বলল—'একটা কথা বলার আছে।'

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে ওয়াঙ তাকাল ওলানের দিকে, বলল—'বেশ, বল।'

তেমনি পলকহীন দৃষ্টিতেই তাকিয়ে রইল সে ওলানের দিকে—

তার ছায়া-ঘন গালের গর্ত্তের দিকে। কেমন করে দিনে দিনে ওলান নিজের সব সৌন্দর্য হারিয়ে ফেলেছে—কত দিন হোল তাকে কাছে পেতে একটুও ইচ্ছা হয়নি। এমনি নানা কথা ভাবতে লাগল ওয়াঙ।

মৃদু কর্কশ কণ্ঠে বলল ওলান—'বড় ছেলে প্রায়ই অন্দর মহলে যায়। আমরা কেউ যখন থাকি না তখন।'

বৌয়ের ফিস-ফিস কথা প্রথমটা ওয়াঙ বুঝলে না। সে হাঁ করে সামনে ঝুঁকে এল—প্রশ্ন করল—'কোন্ মেয়েছেলের কাছে?'

নিঃশব্দে ছেলের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে অন্দর মহলের দরজার দিকে শুষ্ক ঠোঁট ফেরাল ওলান। কিন্তু ওয়াঙ নিমেষহীন চোখে শুধু তাকিয়ে রইল তার দিকে। একটুও বিশ্বাস হয়নি কথাগুলো।

—'তুমি স্বপ্ন দেখেছ'—শেষে বলল।

এ কথায় ওলান মাথা নাড়ল। একটা কঠিন কথা এসে আটকে গেল ঠোঁটে। সে শুধু বলল—'একদিন আচমকা বাড়ী এস।' তার পর একটু নিঃশব্দের পর আবার বলল—'ছেলেকে বাইরে পাঠানই ভাল—এমন কি দক্ষিণেও।'

টেবিলের কাছে গিয়ে চায়ের বাটি তুলে নিয়ে ওলান ঠাণ্ডা চাটা ইটের দেয়ালের গায়ে ফেলে দিয়ে আবার গরম চা ভরে দিল তাতে। তার পর যেমন এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল। ওয়াঙ হাঁ হয়ে বসে রইল। ওয়াঙের মনে হোল, ওলান নিশ্চয়ই হিংসা করে কমলিনীকে। এ নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। ছেলেটা ত বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—প্রাতদিন নিজের ঘরে বসে পড়ে। উঠে দাঁড়িয়ে ওয়াঙ আপন মনেই হাসতে লাগল—দূরে সরিয়ে দিল কথাটা মন থেকে। মেয়েদের ছোট ছোট ব্যাপারে হাসি পেল তার।

রাত্রে ওয়াঙ কমলিনীর সঙ্গে ঘুমুতে গেল—কমলিনীর দিকে পাশ ফিরতেই সে ওয়াঙকে ঠেলে সরিয়ে দিল রূঢ় হাতে। বললে—'বড্ড গরম হচ্ছে। তোমার গায়ে এমন গন্ধ। দেখ, আমার কাছে শুতে আসার আগে ভাল করে গা ধুয়ে আসবে রোজ।'

বলেই উঠে বসল সে। রুক্ষ ভাবে মুখ থেকে চুল সরিয়ে দিল। ওয়াঙ তাকে কাছে টানতে এলে সে কাঁধ সরিয়ে নিলে। আজ ওয়াঙের আদরে কিছুতেই ধরা দেবে না সে। ওয়াঙ তখন চুপচাপ শুয়ে রইল। ওর মনে হোতে লাগল, কিছু দিন হোল কমলিনী যেন অনিচ্ছাসত্বেই তার অংকশায়িনী হচ্ছে। সে ভাবত এ বুঝি বা তার একটা খেয়াল। গতপ্রায় গ্রীষ্মের গুমট গরম হয়ত তার মনের স্ফূর্তি নষ্ট করে দিয়েছে। কিন্তু এখন ওলানের কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে তার চোখের সামনে কাঁটার মত ভেসে উঠল। সে রুক্ষ ভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বলল—'বেশ—একাই থাক। আর আমার গলায় ছুরী চালাও।'

ওয়াঙ লাফ মেরে ঘরের বাইরে চলে গেল। নিজের ঘরে এসে দু'টো চেয়ার পাশাপাশি রেখে এলিয়ে দিল নিজেকে তার উপর। কিন্তু একটুও ঘুম এল না চোখে। তখন উঠে সে বাইরে এল। বাড়ীর দেয়ালের ধার-ঘেঁশা বাঁশ-ঝাড়ের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাতের বাতাস শীতল প্রলেপ বুলিয়ে দিল তার উত্তপ্ত গায়ে। বাতাসে আসন্ন শীতের ঠাণ্ডা আমেজ!

ওয়াঙের মনে পড়ে গেল—কমলিনী তার ছেলের বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা আগে থেকেই জানতে পেরেছিল। কিন্তু কেমন করে জানল সে? ছেলেটিও আর কিছু দিন হোল বাইরে যাওয়ার নাম করে না, বেশ খুশীতেই আছে। তার এ খুশীর কারণ কি? ওয়াঙ হিংস্র ভাবে আপন মনে বলল—'দেখতে হবে ব্যাপারটা কি?'

তার ক্ষেতের দূর-দিগন্তে কুহেলীর আস্তরণ ভেদ করে রক্ত প্রত্যুষের উদয় হচ্ছে লক্ষ্য করতে লাগল সে। প্রভাত হলে এবং ক্ষেতের দিগন্তরেখায় সোনার থালার মত সূর্য দেখা দিলে ওয়াঙ ঘুরে ঢুকল এবং খেয়ে-দেয়ে ফসল তোলা আর শস্য রোপণের সময় যেমন যেত তেমনি ক্ষেতে এল কুলী-কামিনদের কাজ তদারক করতে। মাঠের চারি দিক ঘুরে দেখতে লাগল সে—তার পর এমন চীৎকার করে বলল যাতে বাড়ীর কোন না কোন লোক শুনতে পায়—'আমি সহরের জলার ধারের জমিতে যাচ্ছি—ফিরতে দেরী হবে। সে সহরের দিকে মুখ করে ফিরে দাঁড়াল।

কিন্তু অর্ধেকটা পথ গিয়ে ছোট মন্দিরের কাছে এসে ওয়াঙ রাস্তার ধারের একটা ঘাসের টিলার উপর বসল। এটা একটা পুরানো কবর কিন্তু লোক ভুলে গেছে এর কথা। সামনে ক্ষুদে দেবমূর্ত্তিগুলো। তারা যেন ওর দিকে নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। আগে সে কত ভয় করত কিন্তু এখন অবহেলা করে তাদের। এখন সে টাকার মালিক—দেবতাদের প্রতি তাই উদাসীনতা। কদাচিৎ সে দেখতে আসে তাদের। ভিতরে ভিতরে সে বার বার ভাবতে লাগল—'ফিরে যাব কি?'

তখন হঠাৎ গতরাত্রে কমলিনী যে তাকে বিমুখ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল সে কথা মনে পড়ে গেল ওয়াঙের। তার রাগ হয়েছিল, কারণ সে কমলিনীর জন্য এত করেছে। মনে মনে বললে—'চায়ের দোকানে তার আর বেশী দিন থাকা চলত না আমি জানতাম, কিন্তু এখানে সে রাজার হালে আছে।'

রাগের মাথায় ওয়াঙ উঠে দাঁড়াল—উল্টো পথে ফিরে এল বাড়ীতে। গোপনে বাড়ী ঢুকে একেবারে অন্দর মহলে যাবার পর্দার পিছনে এসে দাঁড়াল সে। কান পেতে পুরুষ-কণ্ঠের গুঞ্জরণ পেল। এ তার ছেলের গলা।

তখন ওয়াঙের রাগ এল মনে। এমন বর্বর রাগ সারা জীবনে যার সে কখনো পরিচয় পায়নি। অবস্থা ভাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে তাকে যেমন ধনী বলতে সুরু করেছে তেমনি তার আগেকার গ্রাম্য চাষীর ভয়-ভয় ভাবও কেটে গেছে। এখন ছোট ছোট হঠাৎ দপ্ করে জ্বলে-ওঠা ক্রোধে মন ভরে থাকে। সহরেও সে যথেষ্ট গর্বিত বোধ করে নিজেকে। কিন্তু এ রাগ এমন একজনের বিরুদ্ধে যে তার ভালবাসার জনকে হরণ করেছে। যখন ভাবল ওয়াঙ যে তার প্রতিদ্বন্দ্বী তারই ছেলে তখন তার মন একটা নক্কারজনক অসুস্থতায় ভরে গেল।

ওয়াঙ দাঁতে দাঁত চেপে বাইরে এসে বাঁশ-ঝাড় থেকে একটা পাতলা সরু বাঁশের ছড়ি বেছে নিয়ে তার ডালপালা ছেঁটে ফেলল—শুধু মাথায় রইল কয়েকটি পাতা। দড়ির মত সরু শক্ত সেই ছড়ি। নিঃশব্দে দ্বারের কাছে গিয়ে হঠাৎ পর্দা সরিয়ে ভিতরে ঢুকল ওয়াঙ। হ্যাঁ, তারই ছেলে দাঁড়িয়ে আছে কমলিনীর দিকে চেয়ে আর কমলিনী

লাগল তার মনে। সুতরাং ওয়াঙ গা ধুয়ে সিল্কের কোট পরে মাঠের আঙিনার দীঘির পাশে একটি টুলের উপর বসে। কমলিনীর গায়ে পীচ রংয়ের সিল্কের জামা। সকালের আলোয় এ রকম সাজে ওয়াঙ কখনও দেখেনি কমলিনীকে।

তারা দু'টিতে গল্প করছে। কমলিনী আড়চোখে ছেলেটির দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। দু'জনের কেউই ওয়াঙের উপস্থিতি একটুও জানতে পারেনি। নিষ্পলক চোখে ওয়াঙ তাদের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখ শাদা হয়ে গেছে—ঠোঁট কাঁপছে—স্তিমিত গর্জন করে দৃঢ়মুঠিতে সে চেপে ধরেছে ছড়িটা। তখনও দু'টিতে ওয়াঙের উপস্থিতি জানতে পারেনি। জানতে পারত না যদি না কোকিলা সেই মুহূর্তে বেরিয়ে আসত এবং ওয়াঙকে ঐ অবস্থায় দেখে চেঁচিয়ে উঠত। চকিতে ফিরেই দু'জনেই দেখতে পেল ওয়াঙকে।

ওয়াঙ ছেলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে আঘাতের উপর আঘাত করতে লাগল। ছেলেটি বাপের চেয়ে লম্বা হলেও মাঠের পরিশ্রম আর পরিণত বয়সের দরুণ বাপ ছেলের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী। ওয়াঙ ছেলেকে মারতে লাগল যতক্ষণ না তার গা বেয়ে রক্তের স্রোত বহে যেতে লাগল। কমলিনী আর্তনাদ করে উঠল। সে ওয়াঙের হাত ধরে তাকে টেনে আনতে চেষ্টা করল কিন্তু সে তাকে ঝেড়ে ফেলে দিল দূরে। তা সত্ত্বেও সে চেঁচাতে লাগল দেখে ওয়াঙ তাকেও মারতে লাগল। কমলিনী ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল। ওয়াঙ তখন ছেলেকে আবার প্রহার করতে লাগল যতক্ষণ না সে ক্ষতবিক্ষত হাতে মুখ ঢেকে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেল।

তার পর থামল ওয়াঙ। তখন তার মুখ দিয়ে সশব্দ নিশ্বাস পড়ছে। গা দিয়ে দরদর ধারে ঘাম ঝরছে। যেন দারুণ অসুস্থতায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছে সে। সেই অবস্থায় ছড়িটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল—'যাও, নিজের ঘরে যাও। যতক্ষণ না এখান থেকে সরাচ্ছি তোমায় ঘর থেকে বেরিয়ো না। তা হলে মেরে ফেলব।'

কোন উত্তর না দিয়ে ছেলেটি বেরিয়ে গেল।

কমলিনী যে আসনে বসেছিল ওয়াঙ এসে বসল তার উপর। হাতে মাথা ঢেকে চোখ বন্ধ করে বসে রইল। থেকে থেকে বুক থেকে গভীর দীর্ঘশ্বাস বের হয়ে আসতে লাগল। কেউ ঘেঁসল না তার কাছে। যতক্ষণ না তার রাগ পড়ে এল ততক্ষণ ওয়াঙ সেই ভাবেই বসে রইল একাকী।

তার পর শ্রান্ত ভাবে উঠে সে ঘরের ভিতরে গেল। কমলিনী বিছানায় শুয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। সে কাছে গিয়ে তার মুখ ফেরাল নিজের দিকে। কমলিনী তার দিকে তাকিয়ে কাঁদতে লাগল। তার গালে ছড়ির কালশিরা পড়ে গেছে। গভীর ক্ষোভের সঙ্গে সে বলল কমলিনীকে—'চিরকাল বেশ্যাই থাকবে। শেষে আমার ছেলের সঙ্গে বেশ্যাপনা!'

এ কথায় কমলিনী আরো জোরে কাঁদতে লাগল। প্রতিবাদ করে বলল—'কখনও না। ছেলেটা নিঃসঙ্গ বোধ করে—তাই ভিতরে আসে। কোকিলাকে তুমি জিজ্ঞাসা করতে পার, আজকে তাকে আমার যত কাছে দেখেছিলে তার চেয়ে আরো কাছে সে আমার বিছানার ধার ঘেঁসেছে কি না কখনো।'

আবার সে শংকিত করুণ চোখে তাকাল ওয়াঙের দিকে। হাত বাড়িয়ে তার হাত টেনে নিয়ে মুখের কালশিরার উপর রেখে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল—'দেখ, কি করেছ তোমার সাধের কমলিনীর। তুমি ছাড়া পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কোন পুরুষ নেই। তোমার ছেলে বলেই ত সে এসেছিল। তা ছাড়া আমার কে সে?'

কমলিনী মুখ তুলে তাকাল ওয়াঙের দিকে। তার সুন্দর চোখ স্বচ্ছ বারিকণায় সজল। ওয়াঙ আর্তনাদ করে উঠল। এই নারীর সৌন্দর্য তার কল্পনার অতীত। যখন তার ভালবাসা উচিত নয় তখনই ওয়াঙ ভালবেসেছে তাকে। হঠাৎ তার মনে হোল তাদের দু'টির মধ্যে যা ঘটেছে তা সে সহ্য করতে পারবে না। আবার সে আর্তনাদ করে উঠল। বের হয়ে গেল ঘর থেকে। ছেলের ঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় সে ঘরে না ঢুকেই ছেলেকে ডেকে বলল—'একটা বাক্সে জিনিষপত্র গুছিয়ে নাও। আগামী কাল দক্ষিণে যাবে—আর যত দিন না আসতে লিখি তত দিন বাড়ীমুখো হয়ো না।'—বলে চলে গেল ওয়াঙ।

ওলান বসে ওয়াঙের একটা জামা সেলাই করছিল। সে যদি প্রহার আর আর্তনাদের শব্দ শুনে থাকে সে জানার কোন ইংগিতই দেখাল না। সে বাড়ী ছেড়ে মাঠে এল—দ্বিপ্রহরের দারুণ রোদেও। সারা দিনের খাটুনির শ্রান্তিতে যেন তার শরীর ভেঙ্গে পড়েছে।

২৬

বড় ছেলে যাবার পর ওয়াঙের মনে হোল যেন এ বাড়ীর গুমোট অনেকখানি কমল। ভাবতে মনে স্বস্তি বোধ করলে ওয়াঙ। জোয়ান ছেলে যে বাইরে গেল এ এক রকম ভালই, এবার সে অন্যগুলির দিকে নজর দিতে পারবে। নিজের শত অশান্তি, জমিতে বীজ বোনা আর ফসল তোলার ব্যবস্থা করা, এর ফাঁকে সে একটুও সময় পায়নি ছোটগুলির দিকে দেখবার। মেজ ছেলেটিকে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি স্কুল ছাড়িয়ে কোন ব্যবসায় শিক্ষানবীশ করে দেবে সে ঠিক করলে। যৌবন বয়সের নেশায় সে যে আবার সংসারে অশান্তির সৃষ্টি করবে বড় ভাইয়ের মত তা হতে দেবে না ওয়াঙ।

ওয়াঙের মেজ ছেলেটি কিন্তু বড় ভাইয়ের সম্পূর্ণ বিপরীত। বড়টি মায়ের ধরণের। উত্তর-প্রদেশের মানুষদের মত তার গড়ন লম্বা, হাড় চওড়া—মুখে রুক্ষতা। কিন্তু মেজটির চেহারা খাটো, চিকণ—তার গায়ের রঙ হলুদ। নিজের বাপের কথাই মনে হয় ওয়াঙের এই ছেলেটির দিকে চেয়ে। চতুর চঞ্চল চাউনি তার চোখের—হাস্যময়। কিন্তু সে চাউনিতে ঈর্ষ্যাও আনাগোনা করে। ভাবে ওয়াঙ—'এ ছেলে বড় মহাজন হবেই। স্কুল ছাড়িয়ে একে চালের বাজারে শিক্ষানবিশী করতে পাঠাবার চেষ্টা করব। যে বাজারে আমার বেচা-কেনা, সেখানে নিজের ছেলে থাকলে মাপের একটু সুবিধে হবেই।'

এই সব ভেবে এক দিন সে কোকিলাকে বললে—'আমার বড় ছেলের বাগদত্তার বাপকে গিয়ে খবর দাও যে আমি তার সঙ্গে কথা কইতে চাই। আমাদের দুই পরিবারের রক্ত এক হবে, দু'জনে একসঙ্গে বসে এক দিন মদ খাওয়া আমাদের উচিত।'

কোকিলা ফিরে এসে খবর দিল—'আপনার যখন সুবিধা তারও তখন সুবিধা। যদি ইচ্ছা করেন আজকেই দুপুরে হতে পারে তার ওখানে—কিংবা তিনিও আসতে পারেন এখানে।'

কিন্তু সহরের মহাজন তার বাড়ীতে এসে পড়ে এ ভাল বুঝলে না ওয়াঙ—সে ক্ষেত্রে এটা-ওটা গুছিয়ে নিতে হবে ভাবতেই শংকা

পথে নেমে পড়ল। কোকিলার নির্দেশ মত ব্রীজ ষ্ট্রীটে গিয়ে সে গেটের ফলক দেখে থামল। বাড়ীটা সে গুণে চিনে নিলে আর ফলকে লেখা গৃহস্বামীর নামটা এক জন পথচারীকে দিয়ে পড়িয়ে নিলে। কাঠের তৈরী সম্রান্ত ফটকটির উপর হাতের তালু দিয়ে শব্দ করল ওয়াঙ।

এ্যাপরনে ভিজে হাত মুছতে মুছতে এক জন দাসী তখুনি এসে দরজা খুলে তার পরিচয় প্রশ্ন করলে। ওয়াঙ তার নাম বলতেই দাসী তাকে ভালো করে নিরীক্ষণ করে বাড়ীর সদর মহলের এক ঘরে নিয়ে গিয়ে বসতে অনুনয় করলে। এই লোকটিই তার কর্তার বেয়াই হবেন। দ্রুতপায়ে সে কর্তাকে ডাকতে গেল।

ওয়াঙ চারি দিক পর্যবেক্ষণ করলে। দরজার পর্দায় হাত দিয়ে দেখলে, কাঠের আসবাবগুলি লক্ষ্য করলে। এই বোধে খুশী হোল যে এখানে যদিও স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার পরিচয় আছে কিন্তু প্রাচুর্যের সমারোহ নেই। ধনী ঘরের মেয়েকে ওয়াঙ পুত্রবধূ করতে চায় না, সে মেয়ে উদ্ধত হবে, আনুগত্যের অভাবে সে স্বামীর মনকে বাপ-মার দিক থেকে ফিরিয়ে নিবে। বসে বসে ওয়াঙ অপেক্ষা করতে লাগল।

তক্ষুনি ভারী পায়ের শব্দ হোল। স্থূল প্রৌঢ় এক জন ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে অভিবাদন করলেন। পরস্পরকে গোপনে লক্ষ্য করতে করতে দু'টি মানুষ পরস্পরকে পছন্দ করলেন। সমৃদ্ধিসম্পন্ন দু'টি মানুষ শ্রদ্ধাবান হলেন দু'জনের প্রতি। মুখোমুখী বসে আলাপ হতে লাগল। এ বছরে যদি সুফসল হয় দাম কেমন হবে তা নিয়ে কথা হোল। শেষে ওয়াঙ বললে—'আমি একটা কথা বলার জন্য এসেছি, অবশ্য আপনি যদি না পছন্দ করেন তা হলে সে কথা আমি না-ই বললাম। আমি বলছিলাম, আপনার অত বড় চালের গদির জন্যে যদি লোকের প্রয়োজন হয় আমার মেজ ছেলেটি আছে—দিব্যি চালাক ছোকরা। অবশ্য আপনি যদি সে কথা না আলোচনা করতে চান—তা হলে অন্য কথা।'

ব্যবসায়ী প্রসন্ন কণ্ঠে বললেন—'লেখাপড়া জানা একটি চালাক ছোকরার আমার খুবই প্রয়োজন।'

বেশ গর্বের সঙ্গে ওয়াঙ বললে—'আমার ছেলেরা লেখাপড়ায় তুখোড়। কোথায় অক্ষর ভুল লেখা হয়েছে খপ্ করে ধরে দেয়।'

—'সে ত খুব ভাল। তার যখন খুশী তাকে আসতে বলবেন। অবশ্য কাজ যত দিন না শিখছে তত দিন শুধু খাওয়া পাবে। বছর খানেক পরে প্রতি মাসে পাবে এক রূপো। তিন বছর পরে তিন রূপো। তার পর আর শিক্ষানবিশী করতে হবে না—যেমন শিখবে তেমনি বড় হবে। মাইনে ছাড়া বেচা-কেনার সময় খদ্দেরের কাছ থেকেও কিছু কিছু আদায় পাবে। তা ভিন্ন আমাদের দুই পরিবারের মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক হচ্ছে—সেই কারণে আমি কোন জামীনের টাকা চাইছি না।'

খুশী হয়ে ওয়াঙ উঠে দাঁড়িয়ে বললে—'আজ থেকে আমরা বন্ধু হলুম। আমার মেজ মেয়ের উপযুক্ত ছেলে আপনার আছে।'

মেদবহুল শরীর দুলিয়ে ব্যবসায়ী বললেন—'মেজ ছেলেটি আমার বছর দশেকের। তার বিয়ের কথা আজো কোথাও পাকা করিনি। আপনার মেয়ের বয়স কত ?'

—'এইবার দশে পড়বে। ফুলের মত মেয়েটি আমার।'

দু'জনে আবার হাসলেন। ব্যবসায়ী বললেন—'জোড়া দড়ি দিয়ে বাঁধা পড়ব দু'জনে।'

মুখোমুখী এর চেয়ে আর বেশী দূর কথা চলে না দেখে ওয়াঙ আর জবাব দিল না। অভিবাদন করে চলে আসবার পর মনে মনে বললে সে—'হলেও হ'তে পারে।' বাড়ী ফিরে মেয়েটির দিকে চেয়ে দেখলে ওয়াঙ। মা ছোট বেলায় পা বেঁধে দিয়েছিলেন। ছোট ছোট পা ফেলে ফুলের মত মেয়েটি চারু ছন্দে বেড়ায়।

কিন্তু কাছে গিয়ে দেখলে ওয়াঙ মেয়েটির গালে কান্নার দাগ। বয়সের অনুপাতে যেন তার মুখ বেশী ফ্যাকাশে—বেশী গম্ভীর। কাছে টেনে নিয়ে ওয়াঙ বললে—'কেঁদেছ কেন লক্ষ্মী মেয়ে ?'

বাপের জামার বোতাম নিয়ে খেলতে খেলতে মেয়েটি লজ্জায় মাথা নামিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে—'এত জোরে রোজ মা আমার পা বেঁধে দেন—আমি রাত্রে ঘুমুতে পারি না।'

অবাক হয়ে ওয়াঙ বললে—'আমি ত কোন দিন তোর কান্না শুনিনি।'

মেয়েটি সহজ কণ্ঠে বললে—'না, মা আমাকে চেঁচিয়ে কাঁদতে বারণ করেছেন। বলেছেন, আপনি কান্না সহ্য করতে পারেন না। হয়ত আমার পা বাঁধতে দেবেন না। তা হলে শ্বশুরবাড়ীতে বর আমায় ভালবাসবেন না।'

কথা কেড়ে নিয়ে ওয়াঙ বললে 'আজ তোমার জন্যে একটি রাঙা বর ঠিক করেছি। কোকিলা কেমন ঘটকালি করে দেখা যাক্।' শুনেই মেয়েটি লজ্জায় মাথা নামাল। সে আর শিশু রইল না—হোল কিশোরী। সেই দিন সন্ধ্যায় ভিতর মহলে গিয়ে ওয়াঙ কোকিলাকে বললে—'ঘটকালি করে দেখো হয় কি না।'

সেদিন রাত্রে কমলিনীর পাশে শুয়ে ওয়াঙ অস্বস্তিতে জেগে উঠল। মনে পড়ল তার ফেলে আসা জীবনের কথা। মনে পড়ল ওলানই তার জীবনের প্রথম নারী—যে সেবায়, আনুগত্যে তার নিত্য সহচরী। মেয়েটির কথা মনে পড়তেই ব্যথায় তার মন ভরে উঠল। ওলান যতই নিষ্প্রভ হোক ওয়াঙকে সেই সব চেয়ে ভাল করে জেনেছে।

যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি ওয়াঙ মেজ ছেলেটিকে গদীতে পাঠিয়ে দিলে। দরকারী কাগজপত্র সই করল। মেয়েটির বিয়ের বাগদান হোল। অলংকার, বরাভরণ ও পণ স্থির হোল। এ সব সমাধা করে ওয়াঙ বিশ্রাম নিল। মনে মনে ভাবল সে—'সব ক'টি ছেলে-মেয়ের ব্যবস্থা এক রকম করেছি। হাবা মেয়েটি রোদে বসে টুকরো কাপড় নিয়ে খেলা ছাড়া আর কিছুই করতে পারবে না। ছোট ছেলেটিকে আমি জমির কাজেই লাগাব। বড় দু'ভাই লেখাপড়া জানে—এর আর তা প্রয়োজন নেই।'

তিন ছেলে তার, এক জন বিদ্বান, এক জন ব্যবসায়ী, এক জন কৃষক—ভাবলে ওয়াঙের বুক ভরে যায়। আর কিছু তার করার নেই ভেবে সন্তোষ লাভ করল ওয়াঙ। তবু সন্তোষের শেষে তার মনে এল একটি মানুষের কথা—যে তার গর্ভে ওয়াঙের সন্তান ধরেছে।

ওলানের সঙ্গে তার গার্হস্থ্য জীবনের এতগুলি বছরের পর আজ ওয়াঙ তার কথা ভাবলে। প্রথম যেদিন ওলান এসেছিল—প্রথম নারী তার জীবনে—সেদিনও তার সত্তার খোঁজ করেনি ওয়াঙ। আজ তার চারি পাশে পরিবেশ শান্ত—ছেলে-মেয়েদের ব্যবস্থা হয়েছে—জমির কাজ চলছে সুচারু ভাবে—কমলিনীর সঙ্গে তার দিন-যাপনে আর সেই উজ্জ্বলতা নেই, এখন কমলিনী অনুগত হয়েছে—আজ ভাবনার অবকাশ এল ওলানকে ঘিরে।

ওলানের দিকে তাকিয়ে দেখলে সে। শুধু নারী বলে নয়—নয় তার হলুদ রঙের শরীরের কুশ্রীতার জন্যে। একটা আশ্চর্য বেদনার সঙ্গে তাকিয়ে দেখলে ওয়াঙ, ওলান কত রোগা হয়ে গেছে—হলুদ হয়েছে গায়ের রঙ। ওলানের রঙ কোন দিনই গৌর নয়—বিশেষ করে যখন সে মাঠে খাটত তার ত্বক ছিল রুক্ষ বাদামী রঙের। তবু ফসল কাটার সময় ছাড়া অন্য সময় ওলান মাঠে যায়নি ক'বছর। তা ছাড়া গত দু'বছর মোটেই যায়নি মাঠে—ওয়াঙ পছন্দও করত না তার যাওয়া প'ছে লোকে বলে—'তুমি এত বড়লোক, তবু তোমার পরিবার মাঠে খাটে।'

এত দিন সে কখনো ভেবে দেখেনি কেন ওলান এ বাড়ীতেই থাকা মনস্থ করেছিল। কেন সে আজকাল আস্তে আস্তে হাঁটে। আজ ভাবনা তার মনে করিয়ে দিলে—সকালে কখনো কখনো ওলান গোঁঙায় বিছানা থেকে উঠতে—গোঁঙায় যখন উনুনে আগুন দেয়। যত বার ওয়াঙ প্রশ্ন করেছে—'কি হয়েছে তোমার ?' ওলান নিমেষে থেমে গেছে। আজ চেয়ে দেখলে সে ওলানের শরীরে কি একটা ফুলে উঠেছে। অকারণেই মর্ম্মবেদনায় পীড়িত হয়ে উঠল তার মন। নিজেকে সান্ত্বনা দিলে ওয়াঙ—'উপপত্নীকে যত ভালবাসি বৌকে যে তত ভালবাসিনি সে ত আমার অপরাধ নয়। মানুষ ত তা করেও না। আমি ত কখনো ওকে মার-ধর করিনি—যখনই সে টাকা চেয়েছে তাকে দিতে কার্পণ্য করিনি।'

কিন্তু মেয়েটির কথা তার মন থেকে মোছে না। মনে পড়লেই যেন বৃশ্চিক দংশন হয়। তবু নিজেকে সে বোঝায়—স্বামী হিসেবে সে কোন দিনই খারাপ নয়—অধিকাংশ পুরুষের চেয়েই ভাল।

এই চিন্তা মন থেকে যায় না বলে আজকাল ওয়াঙ সব সময় ওলানকে লক্ষ্য করে। যখন সে খাবার দিতে আসে,—যখন সে মেঝে পরিষ্কার করে—যখন সে আনাগোনা করে। এক দিন আহারের পর ওলান যখন নীচু হয়ে মেঝে পরিষ্কার করছে—ওয়াঙ দেখলে কি একটা ভিতরের ব্যথায় ওলানের মুখ পাংশু হয়ে গেছে—তার নিশ্বাস পড়ছে দ্রুত। পেটে হাত দিয়ে তেমনি নত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওলান। ক্ষিপ্র কণ্ঠে ওয়াঙ জিজ্ঞাসা করলে—'কি হল ?'

মুখ ফিরিয়ে নিয়ে নিস্তেজ কণ্ঠে বললে ওলান—'পেটের সেই পুরানো ব্যথাটা।'

ছোট মেয়েটিকে বললে ওয়াঙ—'তোর মা'র অসুখ। ঝাঁটাটা নিয়ে ঘর ঝাঁট দে।' তার পর বহু বছর পরে প্রীতিসিক্ত কণ্ঠে বৌকে বললে ওয়াঙ—'ঘরে গিয়ে শুয়ে পড় গে। ও তোমায় গরম জল দিয়ে আসছে। উঠো না, জেনো।'

নিঃশব্দে স্বামীর আদেশ পালন করলে ওলান। ওয়াঙ শুনতে পেলে নিজের শরীরকে টেনে নিয়ে গিয়ে ওলান বিছানায় শুয়ে হাঁফাচ্ছে। বসে বসে অনেকক্ষণ শুনলে ওয়াঙ সেই হাঁফানি—তার পর যখন অসহ্য বোধ হোল তখন সহরে ডাক্তারের খোঁজে গেল সে।

চালের গদির এক জন কেরাণীর নির্দেশ মত সে ডাক্তারখানায় এল। ডাক্তার তখন চায়ের কাপ সামনে নিয়ে আলস্যে বসেছিলেন। বৃদ্ধ ডাক্তারের চোখে পেঁচার চোখের মত বড় বড় চশমা—গায়ে ধূসর রঙের ময়লা পোষাক। ওয়াঙ তাকে বৌয়ের অসুখের কথা বলতেই ডাক্তার ঠোঁট কামড়ে টেবিলের ড্রয়ার খুলে কালো কাপড় মোড়া একটা বাণ্ডিল নিয়ে বললেন—'চলুন যাচ্ছি।'

ওলানের বিছানার ধারে যখন এসে দু'জনে দাঁড়াল তখন সে আলতো ঘুমে অচেতন হয়েছে। কপালে আর উপরের ঠোঁটে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে রয়েছে। দেখে ডাক্তার বাবু মাথা নাড়লেন। বাঁদরের হাতের মত শুকনো হলুদ হাত বার করে ডাক্তার ওলানের নাড়ী পরীক্ষা করলেন অনেকক্ষণ ধরে—তার পর গম্ভীর ভাবে মাথা দুলিয়ে বললেন—'প্লীহা বেড়েছে—লিভারেও রোগ ধরেছে। মানুষের মাথার মত বড় পাথর হয়েছে গর্ভস্থলীতে—এ ছাড়াও পেটেরও নানা গোলমাল। হৃদ্‌যন্ত্র নড়ছে কোন মতে—নিশ্চয়ই তাতে বীজাণু বাসা বেঁধেছে।'

ডাক্তারের কথা শুনে ওয়াঙের নিজের হৃৎস্পন্দন থামল। আতংকগ্রস্ত হয়ে সে রাগ করে বললে—'যা হোক—ওষুধ ত আপনি দিন।'

স্বামীর কথা শুনে ওলান চোখ খুলে দু'জনের দিকে চাইলে। ব্যথায় অবশ তার মন কিছুই ধরতে পারলে না।

বৃদ্ধ ডাক্তার বললে—'বড় জটিল কেস। যদি সারার নিশ্চয়তা না চান তাহলে দশ টাকা ফি নেবো আমি। ওষুধ লিখে দিচ্ছি—কতকগুলো লতা-পাতা। একটা বাঘের হৃৎপিণ্ড তাইতে শুকিয়ে নেবেন। তার পর কুকুরের দাঁত সমেত সবটা ফুটিয়ে তারই নির্য্যাস খেতে দিন রোগিণীকে। তবে যদি রোগমুক্তি চান পাঁচশ' টাকা নেবো।'

পাঁচশ' টাকার কথা শুনে ওলান সেই আবল্য ভাবে ধীরে ধীরে বললে—'না, না। আমার জীবনের দাম অত টাকা নয়। ঐ টাকায় অনেকখানি জমি কেনা যায়।'

ওলানের এই কথা শুনে পুরানো অনুশোচনায় মরে গেল ওয়াঙ। রাগ করে বললে সে—'আমার বাড়ীতে আমি মরতে দিতে পারি না। আমি টাকা খরচ করব।'

'টাকা খরচ করব' শুনেই ডাক্তারের দু'টি চোখ লোভে চকচক করে উঠল। তা ছাড়া যদি রোগিণী সেরে না ওঠে তাহলে আইনের কাছে আসামী হবে সে—ভেবে ডাক্তার বিমর্ষ ভাবে বললেন—'রুগীর চোখে শাদা রঙ দেখে আমার মনে হচ্ছে আমার ভুল হয়েছে। অন্ততঃ পাঁচ হাজার না হলে আমি নীরোগ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দিতে পারি না।'

নীরবে নিঃশব্দ আক্রোশে তাকিয়ে রইল ওয়াঙ ডাক্তারের দিকে। জমি বিক্রী ছাড়া অত কাঁচা টাকা তার হাতে নেই। কিন্তু জমি বেচলেও যে কোন ফল হবে না, এ বুঝলে ওয়াঙ। ডাক্তার যা যা বলছেন তার সোজা অর্থ—'রুগী বাঁচবে না।'

ডাক্তারকে দশ টাকা ফি দিয়ে বিদায় করলে ওয়াঙ। তার পর রান্নাঘরে যেখানে ওলান তার জীবনের অধিকাংশ ক্ষণ কাটিয়েছে, যেখানে তাকে কেউ দেখতে পাবে না—সেইখানে কালো দেওয়ালের দিকে চেয়ে হাউ-হাউ করে কাঁদতে লাগল।

[ক্রমশঃ]

(কথা চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২২

অশোক চৌধুরীর লেখার প্রশংসা করে সীতা কলকাতা থেকেই মাকে চিঠি লিখেছিল। বউরাণীও এহেন সম্মানিত পণ্ডিত ব্যক্তির আদর-আপ্যায়নের ত্রুটি করেন'নি। দোতলার একখানি ভালো ঘর তার জন্যে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এক জন বেয়ারা তার পরিচর্যার জন্যে প্রতীক্ষা করছিল। খাতির দেখে চৌধুরীর মাথা গরম হয়ে গেলো, ভাবলে, এখানে সকলকে দাবিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে তাকে বিশেষ বেগ পেতে হবে না, সেই সংগে আরো একটা আশা তার মনের মধ্যে দানা বাঁধতে লাগলো।

সীতা মাকে চৌধুরীর সম্বন্ধে বললো: একে ত নামকরা অধ্যাপক তার উপর খুব বড় লেখক ইনি। কি সুন্দর কবিতা লেখেন! এঁরই লেখা ছোট একখানি গীতিনাট্য আমরা কলেজে অভিনয় করেছিলুম, তাতেই আলাপ হয়। এর পর যে নাটকখানি নতুন লিখেছেন, সেইখানিই আমাদের দলে খোলবার ব্যবস্থা করেছি। নাটকের নামটিও বেশ—মদনের কারসাজি।

বউরাণী বললেন: বেশ ত, শুনলেই বুঝতে পারা যাবে। ভালো হলে নোব বৈ কি। কিন্তু ও নাম ত যাত্রায় চলবে না—পাল্টাতে হবে।

সীতা বললো: সে যা হয় হবে। কিন্তু আমি যখন এঁর কথা লিখেছি, আবার আর এক লিখিয়েকে ডেকে আনবার কি দরকার ছিল?

বউরাণী মৃদু হেসে বললেন: তাতে কি হয়েছে। পালা এখন উপরি উপরি দু'-তিনখানা খুলতে হবে। পালার জন্যে দল মার খাচ্ছে। পুরোনো জিনিস ভাঙিয়ে আর চলছে না। তা ছাড়া, ম্যানেজার বাবুই ওঁকে এনেছেন, তিনি ত জানতেন না যে তুমি কলকাতা থেকে নামী এক জন লিখিয়েকে ধরে আনছ পালা শুদ্ধ।

একটা দিন ঠিক করে প্রথমেই অশোক চৌধুরীর 'মদনের কারসাজি' শোনবার ব্যবস্থা করা হোল বউরাণীর ঘরে। অন্যান্য শ্রোতাদের সংগে মৃগেনকেও বউরাণী ডাকালেন নতুন পালাটি শোনবার জন্যে। বললেন: আপনিও যখন পালা লিখেছেন, এ পালাও আপনার শোনা উচিত।

এক ঘর লোকের সামনে নতুন পালা পড়বার ব্যবস্থা হয়েছে—বরাবরই এমনি ব্যবস্থাই হয়ে থাকে। দলের বাছা বাছা গুণী ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন। পালা পড়া শেষ হলে পালা সম্বন্ধে প্রত্যেকের অভিমত নেওয়া হয়। ম্যানেজার বসন্ত রায়ও উপস্থিত থাকেন, আর তিনিই হচ্ছেন বিশিষ্ট শ্রোতা।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভঙ্গির অনুকরণ করে অশোক চৌধুরী তার নাটকখানি ঘণ্টা আড়াইএর মধ্যেই পড়ে শেষ করলে। সীতার চোখ দু'টো চক-চক করে উঠলো; এরই মধ্যে মৃগেনের দিকে আড় চোখে একটি বার তাকিয়ে তার মুখভঙ্গিটাও সে দেখে নিতে ভোলেনি। মৃগেন নির্বিকার, মুখ দেখে তার মনোভাব বোঝবার উপায় নেই।

বউরাণী বললেন: এবার আলোচনা হোক। রায় মশাই, আপনিই আগে আপনার কি মত বলুন।

ম্যানেজার বসন্ত রায় বিনা ভূমিকাতে খুব সংক্ষেপে বললেন: পড়ার সুরটা কানে মন্দ লাগলো না, কিন্তু কিছুই বুঝলাম না!

জুড়ি গাইয়েদের যিনি মুখপাত্র তিনি বললেন: যতটুকু বুঝেছি—আদি রসকে ঘোরালো করে পাক করা হয়েছে, ভক্তি বা করুণ রস কিছুই নেই। একটি বারও চোখ মুছতে হোল না।

অভিনেতারা প্রায় একবাক্যেই মত প্রকাশ করলেন: লেখা যত ভালোই হোক, পালা বাঁধবার কায়দা এঁর জানা নেই—এ বই চলবে না।

আলোচনার সময় মতবিরুদ্ধ মন্তব্য শুনে সীতা উত্তেজিত হয়ে প্রতিবাদ করতে চায়, বউরাণী তাকে থামিয়ে চাপা গলায় বলেন: আলোচনার মাঝে কথা বলতে নেই, ওঁদের আগে বলতে দে; সকলের বলা হয়ে গেলে তখন তোর যা খুসি বলিস্।

আর সকলের বক্তব্য শেষ হলে বউরাণী মৃগেনের অভিমত জিজ্ঞাসা করতে, সে যা বললে তা একেবারে অন্য রকম। মৃগেন বললে: লেখায় পাণ্ডিত্য আছে খুব, কিন্তু ভাব নেই। যাত্রার জন্যে যে বই লেখা হবে, তাতে ভাব না থাকলে লোকে নেয় না। ওঁরা যা বললেন, খুব সত্যি কথা; পালা শুনে লোকের চোখ দিয়ে যদি জল না ঝরে, তা হলে তার সুযশ হয় না তা সে যত ভালো লেখাই হোক।

সীতা এই সময় ঝংকার দিয়ে বললো: তা হলে যাত্রা শুনতে বসে ধানি লংকা সংগে করে আনতে হয় বলুন চোখে গুঁজে দেবার জন্যে খুব জল তখন ঝরবে।

মৃগেন মুখখানা নিচু করে বললো: আমি ত তা বলিনি, চোখ দিয়ে জল ঝরা বলতে—পালা শুনে লোকে কেঁদে ফেলবে আপনি আপনি, এই কথাই বলছি।

সীতা বললো: আচ্ছা, কাল ত আপনার পালা শোনা যাবে, দেখব তখন কি করে কাঁদান।

মৃগেনের কথার সমর্থন করে বউরাণী বললেন: ঠিক বলেছেন উনি। 'ওরা এমনি গেয়েছে যে সবাইকে কাঁদিয়ে দিয়ে গেছে'—এইটিই হচ্ছে দলের খ্যাতির জয়-পতাকা। তাই যে পালায় কান্না নেই—যাত্রায় তা জমে না। তা ছাড়া, এই পালাটি'র ঘটনাগুলো কেমন যেনো খাপছাড়া—যাত্রার যারা শ্রোতা, বুঝবে না।

মৃগেন এই সময় সহসা বলে ফেললো: বইখানি খাপছাড়া লাগছে এই জন্যে যে, উনি ভাবা ঠিক মেলাতে পারেননি।

অশোক চৌধুরী এতক্ষণ গম্ভীর ভাবে চুপ করেই ছিল, মৃগেনের এ কথা শুনেই চোখ দু'টো পাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল: তার মানে?

মৃগেন বললো: কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকখানি আমি পড়েছি কি না, তাই এ কথা বলছি। সেখানি ঘুরিয়েই ত আপনি এই বই লিখেছেন।

ক্ষিপ্তের মতন অস্থির হয়ে অশোক চৌধুরী বলে উঠলো: কি বললেন আপনি—আমি রবি ঠাকুরের লেখা চুরি করেছি?

মৃদু হেসে মৃগেন উত্তর করলো: আমি ত চুরি করার কথা বলিনি—ঘুরিয়ে লিখেছেন এ কথা বলেছি। আচ্ছা, আপনার পালার পয়লা নম্বরের ছড়াটা পড়ুন ত দয়া করে—

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে অশোক চৌধুরী জিজ্ঞাসা করল: পয়লা নম্বর মানে?

বউরাণী বললেন: ইনি দেখছি যাত্রার ধরণ-ধারণ জানেন। পয়লা নম্বর মানে হচ্ছে—মদন আসরে এসেই প্রথমেই যে কথা বলবে—পাটের সেইটে।

'ও!' বলে অশোক চৌধুরী খাতাখানা খুলে পড়লে;

মদন আমার নাম—কে না মোরে জানে।
খেলা মম নিখিলের নর-নারী হৃদয়ের
সনে। চুপে চুপে চোরের মতন
টানিয়া আনিয়া হিয়া—দিই তাহে
মোহের বন্ধন।

পরক্ষণে মৃগেন বললো: আর কবি রবীন্দ্রনাথের মদন বলছেন—

আমি সেই মনসিজ,
নিখিলের নর-নারী হিয়া টেনে আনি
বেদনা বন্ধনে।

ইনি গুটিকয়েক কথায় যা বলেছেন, আপনি সেই কথাগুলির ওপর নিজের কথা বসিয়ে এত বড়ো করেছেন। আমার কথার মানে এখন বুঝলেন?

অশোক চৌধুরীর সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে উঠলো। সীতা এই সময় তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো: আমি ভেবেছিলুম, আপনিই এমন চমৎকার করে মদনের কারসাজিতে চিত্রাঙ্গদাকে ফেলেছেন।

অশোক চৌধুরী রুক্ষ স্বরে জবাব দিল: তাঁর চিত্রাঙ্গদা আমি দেখিনি।

মৃগেনও বলে উঠলো: আমারও দেখবার সৌভাগ্য হোত না—কিন্তু ঐ বইখানা আমি স্কুলে 'প্রাইজ' পেয়েছিলুম।

সীতা জিজ্ঞাসা করলো: তাহলে আপনার পালাতেও চিত্রাঙ্গদার পিণ্ডি চটকেছেন বলুন?

মন্দ্র কণ্ঠে মৃগেন উত্তর করলো: এ-রকম লেখা সারা জীবন ধরে চেষ্টা করলেও আমার কলম দিয়ে বেরুবে না। আমি পাড়া-গাঁয়ের স্কুলে পড়ে কোন রকমে 'এন্‌ট্রেন্স' পাস করেছি—যে সব ভাবুক কবির লেখা গ্রামের লোকে ভালোবাসে, তাই পড়েছি। আমি যা লিখেছি নিজের মন আর তার ভিতরের ভাব থেকে—বিশ্বের সংগে এর কোন সম্বন্ধ নেই।

শ্লেষের সুরে সীতা বললো: তবু নাটক লিখতে হবে! আপনি দেখছি খুব সাহসী পুরুষ।

ক্ষণিকের মত মৃগেনের মুখখানা যেনো কালো হয়ে গেলো। কিন্তু পরক্ষণে অসীম মনোবলে সে ভাব কাটিয়ে সপ্রতিভ কণ্ঠে সে বলে উঠলো: আপনি ঠিকই বলেছেন, সাহসই নতুন লেখকদের মস্ত মূলধন; নৈলে আপনাদের সামনে এসে দাঁড়াই। কিন্তু তাই বলে—পরের লেখা ভাঙিয়ে নিজের বলে চালাবার দুঃসাহস আমার নেই!

এক নিশ্বেসে কথাগুলি বলেই সে উঠে গেলো। অশোক চৌধুরী কিন্তু তিড়বিড় করে উঠলো শেষের কথাগুলো শুনে; উত্তেজিত কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো: রাস্কেল কোথাকার—আমাকে মীন করেই ও-কথা বলে গেলো। আমি ওর জীভ ছিঁড়ে ফেলবো—শুয়োর, রাস্কেল, সন্ অফ্ এ···

সীতা তাড়াতাড়ি তার মুখখানা হাত দিয়ে চেপে পরের কথাটাকে বন্ধ করে দিল: সংগে সংগে অস্ফুট কণ্ঠে বললো: কি করছেন!

বউরাণীও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন, তথাপি এই অশিষ্ট পণ্ডিত ব্যক্তিটিকে প্রবোধ দিলেন, দলের সকলে অতি কষ্টে মুখের হাসি চেপে একে একে উঠে গেলো।

ভারাক্রান্ত মনে মৃগেন চূর্ণীর তীর লক্ষ্য করে চলেছে। সহর-প্রান্তের এই ক্ষীণকায়া নদীর নির্জন তীরভূমি এখানে তার একমাত্র প্রিয় স্থান। পরিচিত স্থানটি তাকে বুঝি আকর্ষণ করছিল। তাল গাছের গুঁড়ি কেটে এখানে সারিবন্দী পৈঠে করা হয়েছে, সাধারণতঃ চাষীরাই জল তুলতে আসে এই পৈঠে বেয়ে। একটু তফাতে বাসীন্দাদের ব্যবহারযোগ্য আলাদা একটি ঘাট আছে, সেখানে জন-সমাগম প্রচুর। নির্জন স্থানটিই মৃগেনের প্রীতিপ্রদ—মনের চিন্তা এখানে নানারূপে বিকসিত হয়, অতীতের কতো স্মৃতি প্রেরণা জাগায়। ঘাটের পাশে বড়ো জামরুল গাছটিই এখানে মৃগেনের প্রধান আকর্ষণ, এর দিকে তাকালে তার মনে জেগে ওঠে—স্বগ্রামের ভূতের বাগানে গাছের ডালে বসে মায়ার সংগে জামরুল ভাগাভাগি করে খাওয়ার বেদনাময় স্মৃতি।

আজও মন তার ভারাক্রান্ত। যে পালাটি নিয়ে ভাগ্যপরীক্ষায় এত দূরে তাকে আসতে হয়েছে, তাতে বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে কর্ত্রীর আদরিণী কন্যা সীতা, আর তার কলকাতার বন্ধু অশোক চৌধুরী। এ ক্ষেত্রে সুবিধা করা তার পক্ষে কি সম্ভব হবে?

হঠাৎ দূরে একটা খস্‌-খস্ শব্দ শুনে পিছনে আঁকা-বাঁকা সংকীর্ণ রাস্তাটির পানে সে তাকালো। অমনি তার নজরে পড়লো—বাঁকের মুখে তার চিন্তায় মানুষ দু'টি হাত-ধরাধরি করে নদীর দিকেই আসছে। একটু আগে যাদের সংগে কথা-কাটাকাটি ও মন-কষাকষি হয়ে গেছে, তাদের সামনে মুখ তুলে দাঁড়াতে তার মনে কেমন একটা সংকোচ এলো, অমনি উপস্থিত বুদ্ধির আলোকে নিষ্কৃতির একটা রাস্তাও ফুটে উঠলো চোখের সামনে। তাড়াতাড়ি জলের পৈঠের পাশ কাটিয়ে জামরুল গাছটির গুঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেল সে, তার পর অত্যন্ত কৌশলে গাছের পত্রময় পল্লবগুলির মধ্যে আত্মগোপন করলো। আর এক দিনের এমনি লুকোচুরির স্মৃতিও মনটিকে বুঝি বেদনায় ক্লিষ্ট করে তুললো—ঠিক এই ভাবে কানাইকে দেখে ভূতের বাগানে গাছের আগডালে উঠে আত্মগোপন করতে হয়েছিল তাকে।

সীতা ও অশোক আস্তে আস্তে এসে জলের পৈঠের উপরে পাশাপাশি বসলো। সামনে শীর্ণ নদীটি সর্পিল গতিতে বয়ে চলেছে, ওপারে খানিকটা খোলা মাঠ, তার পরে দিগদিগন্তে কৃষক-পল্লীর দৃশ্যটি অস্তমিত সূর্যালোকে ঝিক-ঝিক করছে।

জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে অশোক চৌধুরী বললো: ডেকে এনে এ ভাবে আমাকে অপমান করাটা কি অন্যায় নয়?

সান্ত্বনার সুরে সীতা জানালো: না-ই বা আপনার বই এরা নিলে, আপনি কলকাতার থিয়েটারে দেবেন, ঢের বেশী নাম হবে। আর, আপনার যা ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে দেওয়া হবে এ আপনি ঠিক জানবেন। এখানে বই না নিলেও, এই বই ছাপার খরচ

আপনি পাবেন। মাঝ থেকে এই নতুন জায়গাটা দেখা হোল, আমাদের সংগে ঘনিষ্ঠ ভাবে মেলা-মেশার সুযোগ ঘটলো, এগুলো লাভ নয় বলতে চান?

অশোক চৌধুরী গম্ভীর ভাবে বললো: আমার মনে বেশী আঘাত দিয়েছে ঐ গেঁয়ো ভূতটার কথা—এনট্রেন্স পর্যন্ত বিদ্যের যার দৌড়, সে আসে আমার লেখার খুঁত ধরতে! তোমরা রুখলে তাই, নৈলে দিতুম আজ আচ্ছা করে চাবকে।

সীতা বললো: ও-কথা ছেড়ে দিন অশোক বাবু! আপনার নাম যখন অশোক, তুচ্ছ কথা নিয়ে শোক করা কি ঠিক?—কথার সংগে খিল-খিল করে হেসে উঠলো সে।

সীতার সে হাসি বুঝি অশোকের দুই চোখে ধাঁধা লাগিয়ে দিল। লুব্ধ দৃষ্টিতে সীতার মুখের উপর চেয়ে সে বললো: শোক-ফাক কিছুই হোত না, আফশোষও থাকতো না—যদি তুমি অন্তত আমার প্রতি সদয় হতে!

অশোকের মুখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে সন্দিগ্ধ কণ্ঠে সীতা জিজ্ঞাসা করলো: তার মানে?

অশোক বললো: সেই ভাগ্যবান কবির কথা তোমাদের পাঠ্য গ্রন্থে পড়নি? রাজসভায় সবাই কবির লেখা উপেক্ষা করলো দেখে কবি যখন মৃত্যুবরণে উদ্যত, সেই সময় তার বাঞ্ছিতা প্রিয়া রাজকন্যা কুটীরে এসে নিজের গলার হার কবির গলায় পরিয়ে দিয়ে বলেছিল—আমার বিচারে তুমিই জয়ী, এই তোমার জয়মাল্য কবি! তুমিও সীতা দেবী, যদি সেই রাজকন্যার মত—

আরক্ত মুখখানা বিকৃত করে সীতা ঝংকার দিল: যান্—আপনি ভারি—

পরক্ষণেই অশোক এক কাণ্ড করে বসলো। সহসা নিজের দেহটাকে পার্শ্ববর্তিনী সংগিনীর দেহের সংগে মিশিয়ে অসতর্ক সীতাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে তার ওষ্ঠের দিকে মুখখানা নামিয়ে বলে উঠলো: ভারি···কি বল ত? সাহসী এবং প্রেমিক?

সীতা বুঝি মুহূর্তের জন্য হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ অশোকের বাহুপাশ থেকে সবলে নিজেকে মুক্ত করে সবেগে সোজা হয়ে উঠে কম্পিত দেহে কম্পিত কণ্ঠে বললো: এ কিন্তু আপনার ভারি অন্যায় অশোক বাবু! আপনি একেবারে···ছি!

অশোক চৌধুরীও সংগে সংগে উঠে হাসতে হাসতে বললো: গোল্লায় যাক্ আমার লেখা, তুমিই আজ আমার মনের পাতায় সাফল্যের রেখা ফুটিয়ে দিলে সীতা! লক্ষ্মীটি, রাগ ক'র না; আর যদি অন্যায় ভেবে রাগই করে থাক, তাহলে বল, আমি এখান থেকেই ষ্টেশনের পথে পাড়ি দিই।

অভিমানক্ষুব্ধ স্বরে সীতা বললো: আমি কি বলছি যে আপনি চলে যান! কিন্তু পথে-ঘাটে এ রকম করে যা-তা করা—

গলার স্বরে জোর দিয়ে অশোক বলে উঠলো: কিছুমাত্র অন্যায় নয়; কারণ, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবির কথাই এর নজীর—নথিং ইজ আন্‌ফেয়ার ইন্ লাভ্ য়্যাণ্ড ওয়ার!

কথার পরেই পুনরায় সে সীতার হাতখানা সজোরে ধরে তাকে বুকের দিকে আকর্ষণ করলো।

ঠিক এই সময় নদীর বুকে ছোট একখানি পানসী থেকে এক জেলের কণ্ঠসংগীত শোনা গেল:

"কিসের লাইগ্যা কইন্যা তোমার মন্‌ডা মুই গো পাইল্লা?
বাজার হুদ্দা কিন্না আইন্যা ঢাইল্যা দিছি পায়
তোমার লাগে কেমতে পারুম কৈয়া উঠ্‌ছে দায়
কৈয়্যা দ্যাও আমায় কইন্যা—মন্‌ডা কেনে পাইল্যা?

"কি হোচ্ছে—দেখতে পাচ্ছেন না!" বলেই এক ঝটকায় হাতখানা মুক্ত ক'রে সীতা রাস্তার দিকে ছুটলো।

অশোক চৌধুরীও বুঝতে পারলো, সত্যিই সে সীমার মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। ম্লান মুখে সে-ও সীতার পিছু নিল।

আর মৃগেন বেচারী গাছের পত্রপল্লবের অন্তরালে বসে শহরের এই শিক্ষিত পণ্ডিতটির প্রবৃত্তির পরিণতি দেখে শিউরে উঠছিল।

২৪

ঠিক এই সময় পীতাম্বরের বাড়ীতে মায়া আর কানাইকে নিয়ে হুলস্থুল কাণ্ড উপস্থিত।···

মায়া রাঁধতে বসেছিল। রাঁধতে রাঁধতে কান্নায় তার সারা বুকখানা উথলে উঠেছিল—উনানের হাঁড়িতে চাপানো ফুটন্ত ডালের মতনই। বাষ্প যেন অশ্রু হয়ে মুখখানা ভাসিয়ে দিচ্ছিল। কানায়ের চিঠির কথাগুলো তার মনে যেনো সূচের মতন ফুটছিল।

এমন সময় পা টিপে-টিপে কানাই এসে রান্নাঘরের দরজাটির সামনে দাঁড়িয়ে বলল: চিঠিখানার জবাব কিন্তু এখুনি চাই মায়ারাণী, লিখে পাঠাবে না মুখে জানাবে?

'এই যে হাতে-হাতেই দিচ্ছি' বলে হাঁড়ি থেকে এক হাতা ফুটন্ত ডাল তুলে তার প্রসারিত হাতে চকিতের মধ্যে ঢেলে দিল মায়া।

"বাবা রে পুড়িয়ে মারলে রে" বলতে বলতে বাড়ী মাথায় করে উঠানে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ল কানাই।

একটু আগে সারদা ও-ঘরে দুধটুকু ঢেলে দিয়ে করুণার কাছে বিয়ের কথাটি পেড়েছিল, আর করুণা তার উত্তরে বলছিল: যাঁর মেয়ে তিনি আগে ফিরে আসুন, তখন কথা হবে।

কথাটা মনে না লাগায় সারদা জানায়: কি দরকার তাতে ছেলেরা যখন রয়েছে? কই, বড় ছেলে কই···

করুণা বলে: শুয়ে আছেন—মাথা ঘুরছে, শরীর ভাল নেই।

এমনি সময় ছেলের চীৎকার গেল কানে: বাবা রে পুড়িয়ে মারলে রে!

সবাই উঠানে ছুটে এসে জানতে চাইল—হোল কি? কানাই সরোদনে জানালো: মা গোকুলদার জন্যে দুধ এনেছে, তাড়াতাড়ি ডাল দেবার কথা বলতে যেতেই গোকুলদার ঐ ধিঙ্গি বোন গরম ডাল দিয়েছে হাতে ঢেলে···বাবা রে···

সারদা চেঁচিয়ে উঠলো: ওরে আমার ছেলেকে মেরে ফেলেছে রে! কি খাণ্ডাত মেয়ে রে বাবা—

মায়াও তখন মরিয়া হয়ে উঠেছে—চিঠির কথা তুলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল তখনি। চিঠিখানি দেখিয়ে বলল: কোন মেয়ে এত বড় অপমান সহ্য করতে পারে শুনি? হাতে লিখেছে বলে হাত পুড়িয়ে দিয়েছি, এর পর মুখখানাও পুড়িয়ে দোব—ফের যদি আমার সঙ্গে কথা বলে।

গোকুলও বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছিল। তারও মাথায় খুন

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে চা-রসিক বলে' যাদের খ্যাতি ছিল ডক্টর জনসন্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। চা না হলে' কখনই তিনি কোন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে সাহিত্য-সাধনায় শান্ত ও সমাহিত করবার জন্যে এই মধুগন্ধী সুস্বাদু পানীয়টিই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর। আর শুধু তিনিই ন'ন, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন তাঁরা চা-কে পানীয় মাত্র বলেই মনে করতেন না,—চা ছিল তাঁদের কাছে অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। সুকবি কুপারের তো কথাই নেই, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে "চায়ের আসরের কবি" বলেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যিকদের সঙ্গে চায়ের এই যোগাযোগ আজ আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের চা-প্রীতির নিদর্শন এখন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উদীয়মান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:
"লেখার সময় স্তব্ধ অন্তর্লোকবাসী মনের ধ্যানযোগে চা শুধু তৃষ্ণাহরা পানীয়ই নয়, প্রেরণাময় সঙ্গীও বটে। ক্লান্তিতে যখন কল্পনায় অবসাদ আসে তখন চা আমাকে সতেজ করে তোলে নূতন প্রেরণায়। এ সময় চা আমার পক্ষে অপরিহার্য।"
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কথা-শিল্পী হিসেবে তিনি অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর লেখা 'কালিন্দী', 'ধাত্রী দেবতা' আর 'দুই পুরুষ' ইতিমধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। বাংলার সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনার প্রতি তারাশঙ্করের একনিষ্ঠ সহানুভূতি তাঁর সমস্ত রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রতিভাবান দরদী শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনায় যে বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।
প্রেরণার উৎস—চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 266

ভোর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

আনন্দের গান গাও
সুন্দরের গানে
ভ'রে নাও তোমার বীণাও।

তাকাও পূবের দিকে
যেখানে আকাশে
রাত্রির আঁধার গাঢ়
ফিকে হয়ে আসে
আবীরের রঙে সূর্যোদয়
জ্যোতির্ময়।

কণ্ঠ হ'তে উৎসারিত হোক
জবাকুসুমের বর্ণে
সূর্যের সে ধ্যান-মন্ত্র-শ্লোক
আলোকে ভাস্বর দুই চোখ
সেই চোখে বন্দনা জানাও।

পথে পথে ভিড়
সদ্য জেগে-ওঠা যত
পুরুষ-নারীর।
ভোরের সোনার রাঙা রোদ
তামসী রাত্রির ঋণ-শোধ।

সে রোদের গুঁড়ো উড়ে পড়ে
কাঁখের কলসে ঘাটে
যেখানে মেয়েরা জল ভরে,
কাঁধে নিয়ে হাল
আর যেথা সারে সারে
চলেছে রাখাল।

কাঠে আর ইঁটে
সে রঙের ছিটে
বালুমাখা ঝিনুকের এ-পিঠে ও-পিঠে।

কুড়াও কুড়াও সে রঙ
যত পারো নাও
সুন্দরের গানে আজ
ভরে তোল তোমার বীণাও।

চেপে গেল, চীৎকার করে বলল: নিকালো আমার বাড়ী থেকে পাজী ছুঁচো নচ্ছার—

সঙ্গে সঙ্গে সারদাও অমনি মুখোসখানা যেন জোর করে খুলে আসল রূপটি তার দেখিয়ে দিলে। রণচণ্ডীর মত নাচতে নাচতে—এ পর্যন্ত যা যা দিয়েছে যা কিছু করেছে—সব বাক্ত করে কড়ায় গণ্ডায় দেনা মিটিয়ে দিতে বললে। অতুল ও সারদা কানায়ের মাকেই সমর্থন করলে। এখন জানা গেল—নিত্য দু'বেলা রুগ্ন গোকুলকে আধ সের করে যে দুধ সারদা বরাবর যুগিয়ে আসছে সেটা মাগ্‌না নয়, পাঁচ সেরের দরে হাত-নাগাদ তার দাম চাই।

গোকুল এ সব জানতো না—সে যেন আকাশ থেকে পড়লো; সঙ্গে সঙ্গে ভীমি যাবার মতন হোল তার অবস্থা। মায়া তখন ছুটে গিয়ে কানায়ের মায়ের পা দু'খানি জড়িয়ে ধরে বলল আমাকে ক্ষমা কর মা, সব দোষ আমার, যা তোমরা হুকুম করবে তাই আমি করবো, আমার দাদাকে বাঁচতে দাও!

ইতিমধ্যে করুণা ছুটে এসে কানায়ের পোড়া হাতে খানিকটা মধু মাখিয়ে দিয়েছিল। দাহ-যাতনা যেনো জল হয়ে গেলো মায়ার কথা শুনে। সে তখন মাকে বোঝালো: ভুল ওর ভেঙে গেছে মা, চাকার লোক ভালমানুষ ত, মাপ কর মা ওকে,—বড় বৌদি হাতে সর-মধু মেখে দিতে জ্বালা আমার কমে গেছে—

প্রসাদীও অমনি এগিয়ে এসে বলল: তাই ত, ঘরের লক্ষ্মী করবে বলে ঠিক করে রেখেছ যাকে, তার ওপর কি রাগ করতে আছে?

আঁচোলে মুখখানা গুঁজে দিল মায়া, কোন প্রতিবাদ করল না।

[ক্রমশঃ।

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলন—

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তন হইয়া ঘটনা-স্থল প্যারী নগরী হইতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নগরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থানের পরিবর্ত্তন হওয়ায় আলোচনার গতিও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ এখন পর্য্যন্তও দেখা যাইতেছে না। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম শেষ হওয়ার এক বৎসর পরেই তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রামের সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোচনা চলিতেছে। যুদ্ধের আশঙ্কা বিলোপ করিবার জন্ত যতই উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করা হইতেছে, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মধ্যে ততই আশঙ্কা জাগিতেছে, শেষ পর্য্যন্ত তৃতীয় মহাসমর বুঝি অপরিহার্য্যই হইয়া উঠিবে। প্যারী নগরীর শান্তি-সম্মেলন যে সাফল্যমণ্ডিত হয় নাই, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হয় না। শান্তি-সম্মেলনে সামান্ত যাহা কিছু সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে, নিউইয়র্কে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে তাহা আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে। কিন্তু ইটালীর সহিত সন্ধির সর্ত্ত লইয়া মলটভের সহিত আবার বার্ণেস এবং বেভিনের মতভেদ দেখা দিয়াছে। ত্রিয়েস্তের ব্যাপার লইয়া বৃহৎ শক্তি-চতুষ্টয়ের মধ্যে মতভেদটা তেমন প্রবল আকার ধারণ না করিলেও শেষ মীমাংসায় পৌছান এখনও সম্ভব হয় নাই।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ—

পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনের সহিত নিউইয়র্ক নগরে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদেরও অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। সেখানেও সমস্তার যেমন অন্ত নাই তেমনি মীমাংসার সম্ভাবনার কথা ভাবিয়া হতাশ হইতে হয়। জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে 'ভেটো' লইয়া তর্ক-বিতর্ক এবং মতানৈক্য বেশ বড় হইয়া সৃষ্টি হইয়াছে। সহজে যে মীমাংসা হইবে তাহার লক্ষণ দেখা যায় না। স্পেনের সমস্তা, ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিল গঠনের সমস্তা প্রভৃতি বিভিন্ন সমস্তা লইয়া আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক শুধু বাড়িয়াই চলিয়াছে। ট্রাষ্টিশিপের ব্যাপার লইয়া যে সমস্তা দেখা দিয়াছে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। বৃটিশ ঔপনিবেশিক অফিস টাঙ্গানাইকা, টোগোল্যাণ্ড এবং ক্যামেরুন্সের অছিগিরি সম্পর্কে যে সকল সর্ত্ত দিয়াছেন সেইগুলি প্রকৃত পক্ষে ঐ দেশগুলিকে নিজের কুক্ষিগত করিবার প্রচেষ্টা মাত্র। দক্ষিণ-আফ্রিকার পক্ষ হইতে ফিল্ড-মার্শাল স্মাট ম্যাণ্ডেটারী রাষ্ট্র দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্গীভূত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে উহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরাও কিন্তু মার্শাল স্মাটের দাবী সমর্থন করেন না।

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয় সমস্তা—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের উপর অত্যাচারের কথা উত্থাপন করিয়াছেন। বৃটিশ প্রতিনিধিদের পক্ষ হইতে উহাকে ধামাচাপা দেওয়ার একটা চেষ্টা চলিয়াছিল। কিন্তু উহা ব্যর্থ হইয়াছে। আলোচনার জন্ত কোন বিষয় উপস্থাপিত হইলেই শুধু হয় না, সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ এ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করেন, তাহাই বড় কথা। বস্তুতঃ, এইখানেই সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের প্রকৃত শক্তি ও মর্য্যাদার পরীক্ষা হইবে। দক্ষিণ-আফ্রিকার গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের জন্ত যে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা করিয়াছেন, ফিল্ড-মার্শাল স্মাট তাহাকে তাঁহাদের ঘরোয়া ব্যাপার বলিয়া সমর্থন করিতে লজ্জিত হন নাই। এমন কি, ভারতীয়দের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভেদ থাকার অজুহাত পর্য্যন্ত তুলিয়াছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় বহু জাতির লোকের বাস। কাজেই ভারতীয়দের সাম্প্রদায়িক কলহ যাহাতে দক্ষিণ-আফ্রিকাতেও সংক্রামিত না হয় তাহার জন্যই ঘেটোবিল রচিত হইয়াছে। যুক্তি যে চমৎকার তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ফিল্ড-মার্শাল স্মাটের এই যুক্তি গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিবেন কি না, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু উহার কার্য্যপ্রণালী যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে কত দিনে যে এই দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্তার সমাধান হইবে, তাহার কোন ভরসা আমরা করিতে পারিতেছি না। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ যদি এই সাধারণ সমস্তারও সমাধান করিতে না পারেন, তাহা হইলে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার আশা তাঁহারা কিরূপে করিতে পারেন? দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে যদি যথার্থ মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিবার দাবীকে তাঁহারা উপেক্ষা করেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, শ্বেতকায়দের কায়েমী স্বার্থরক্ষা করা ব্যতীত তাঁহাদের আর কোন কর্ত্তব্য নাই।

যুক্তরাষ্ট্র কংগ্রেসের নির্ব্বাচন—

মার্কিণ কংগ্রেসের সাম্প্রতিক নির্ব্বাচনে রিপাবলিকান দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া জয়লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সিনেটে

৫১টি এবং প্রতিনিধি-পরিষদে ২৪৫টি আসন অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। রিপাবলিকান দলের এই জয়লাভ যে নানা দিক্ দিয়াই গুরুত্বপূর্ণ, তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। শাসনতান্ত্রিক দিক্ হইতে প্রথমেই ইহা উল্লেখযোগ্য যে, প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান ডেমোক্রাটিক দলভুক্ত বলিয়া সিনেট এবং প্রতিনিধি-পরিষদ উভয় পরিষদেই তাঁহার দল সংখ্যা-লঘু হইয়া পড়িল। ইতিপূর্ব্বে কতকটা অনুরূপ অবস্থা হইয়াছিল প্রেসিডেণ্ট উইলসনের দ্বিতীয় দফা প্রেসিডেণ্টশিপের শেষ ভাগে। কিন্তু তখনও কংগ্রেসের উভয় পরিষদে প্রেসিডেণ্টের বিরোধী দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে নাই, প্রেসিডেণ্ট উইলসন সিনেটে কোন রকমে নিজের দলের সংখ্যা-গরিষ্ঠতা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র অনুসারে দুই বৎসর অন্তর প্রতিনিধি-পরিষদের সমস্ত সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। সিনেটের আয়ুষ্কাল ৬ বৎসর বটে, কিন্তু প্রতি দুই বৎসর অন্তর এক-তৃতীয়াংশ সদস্য অবসর গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের স্থানে নূতন সদস্য নির্ব্বাচন হয়। প্রেসিডেণ্ট ৪ বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকেন। কাজেই প্রত্যেক প্রেসিডেণ্টের শাসন-কালের মধ্যে দুই বার কংগ্রেসের নির্ব্বাচন হইয়া থাকে। প্রথম নির্ব্বাচনকে বলা হয় 'অফ ইয়ার' (off year) নির্ব্বাচন। কারণ, এই নির্ব্বাচনে কংগ্রেসে প্রেসিডেণ্টের নিজের দল সংখ্যালঘু হওয়ার আশঙ্কা বড় থাকে না। মার্কিণ কংগ্রেসের আলোচ্য নির্ব্বাচনটি 'অফ ইয়ার' নির্ব্বাচন হইলেও কংগ্রেসের উভয় পরিষদে এই সর্ব্বপ্রথম প্রেসিডেণ্টের বিরোধী দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিলেন। মার্কিণ কংগ্রেসের নির্ব্বাচনের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর কখনও হইয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

কংগ্রেসের উভয় পরিষদে প্রেসিডেণ্টের নিজের দল সংখ্যালঘু হওয়ায় এবং তাহার রাজনৈতিক বিরোধী দল সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করায় শাসনতান্ত্রিক অচল অবস্থা উদ্ভব হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তবে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান নিজেকে কোন দলের লোক বলিয়া দাবী করেন না। কাজেই তিনি রিপাবলিকান দলের নীতিই অনুসরণ করিয়া চলিবেন, ইহাই সকলের ধারণা। আরও একটা কথা এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'অফ ইয়ার' নির্ব্বাচনে প্রেসিডেণ্ট যদি কংগ্রেসের উপর ক্ষমতা হারাইয়া ফেলেন, তাহা হইলে দুই বৎসর পরে প্রেসিডেণ্টের পদও তাঁহাকে হারাইতে হয়।

দীর্ঘ পনর বৎসর পর রিপাবলিকান দল কংগ্রেসে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করিলেন। প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট বাঁচিয়া থাকিলে নির্ব্বাচনের ফল অনুরূপ হইত কি না, তাহা আলোচনা করিয়া কোন লাভ নাই। রুজভেল্টের ব্যক্তিত্ব যে অনন্যসাধারণ ছিল তাহা সকলেরই স্বীকৃত। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব কিছুই নাই, ইহাও জানা কথা। তিনি অত্যন্ত সাধারণ ব্যক্তি বলিয়াই ভোটদাতাদের অনুরাগ রিপাবলিকান দলের উপর পড়িয়াছে কি না, তাহা অনুমান করাও সহজ নয়। রিপাবলিকান দলের এই জয়লাভ আকস্মিক ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করা হইলেও, ইহাকে সত্যই আকস্মিক বলা যায় না। দুই মাস পূর্ব্বে অনেক ওয়াকিবহাল ব্যক্তি রিপাবলিকান দলের জয়ের সম্ভাবনার কথা বলিয়াছিলেন। রিপাবলিকান দল আমেরিকায় 'ওয়াল ষ্ট্রীট পার্টি' নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ওয়াল ষ্ট্রীট কলিকাতার ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মতই মার্কিণ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের অফিস-মহল। রিপাবলিকান দলের জয়লাভের অর্থ মার্কিণ জাতি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা তুলিয়া দিয়া অবাধ শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্ত্তনের পক্ষে ভোট দিয়াছে। এই দল অবাধ ধনতন্ত্র এবং লাভ করিবার অপ্রতিহত স্বাধীনতার পক্ষপাতী। নিগ্রোদের প্রতি বৈষম্য-মূলক ব্যবহারই তাঁহারা সমর্থন করেন। এই দলকে বিচ্ছিন্নতাকামী (Isolationist) বলিয়া অভিহিত করা হইলেও, বর্ত্তমানে তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকার নীতি পরিত্যাগ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, কি ডেমোক্রাট দল, কি রিপাবলিকান দল কোন দলই প্রকৃত পক্ষে বিচ্ছিন্নতাকামী ছিলেন না। দুই মহাযুদ্ধের অন্তর্ব্বর্ত্তী কালে উভয় দলের শাসন-সময়েই জার্ম্মাণীর প্রতি তাঁহাদের গৃহীত নীতির মধ্যে তাহার পরিচয় আমরা পাইয়াছি। দ্বিতীয় মহাসমর হইতে আমেরিকা সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাষ্ট্র হইয়া বাহির হইয়াছে। সুতরাং উভয় দলই বুঝিয়াছেন, বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিলেই তাঁহাদের ক্ষতি। রাশিয়ার সম্বন্ধে রিপাবলিকান দলের মনোভাব সুস্পষ্ট। তাঁহাদের পরিচালিত সংবাদপত্রগুলি রাশিয়া আণবিক বোমা আবিষ্কার করিবার পূর্ব্বেই রাশিয়ার বিরুদ্ধে আণবিক যুদ্ধ চালাইবার প্রচারকার্য্য করিয়া আসিতেছে। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে রিপাবলিকান দল রাজনৈতিক অর্থনৈতিক, কি নীতি অনুসরণ করিবেন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

ফ্রান্সের সাধারণ নির্ব্বাচন—

সম্প্রতি ফ্রান্সের যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়া গেল, তন্নাধিক এক বৎসরের মধ্যে উহা তৃতীয় সাধারণ নির্ব্বাচন। পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি সাধারণ নির্ব্বাচন হইয়াছিল গণ-পরিষদ গঠনের জন্য। প্রথম সাধারণ নির্ব্বাচনের পর গণ-পরিষদ যে শাসনযন্ত্র রচনা করিয়াছিলেন, ফ্রান্সের সাধারণ নির্ব্বাচকমণ্ডলী তাহা বাতিল করিয়াছেন। দ্বিতীয় সাধারণ নির্ব্বাচনের পর গণ পরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করেন, জেনারেল দ গল তাহার নিন্দা করিলেও উহা ফরাসী জাতির অনুমোদন লাভ করে। সুতরাং সম্প্রতি যে সাধারণ নির্ব্বাচন হইল তাহা ফ্রান্সের 'নেশন্যাল এসেম্বলী' গঠনের জন্য। নেশন্যাল এসেম্বলীর আয়ুষ্কাল পাঁচ বৎসর। ফ্রান্সের নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত নেশন্যাল এসেম্বলীকে চতুর্থ রিপাবলিক বলিয়া অভিহিত করা যায়। তৃতীয় রিপাবলিকের পরিসমাপ্তি হয় ১৯৪০ সালের ১৩ই অক্টোবর।

উল্লিখিত পর পর তিনটি সাধারণ নির্ব্বাচনে ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টিকে আমরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হইয়া উঠিতে দেখিতে পাই। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টিই প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। কম্যুনিষ্ট পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠ না হইলেও বর্ত্তমান নির্ব্বাচনে বিভিন্ন দলের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মন্ত্রিসভা গঠন করিবার দায়িত্ব গ্রহণের অধিকারী তাঁহারা হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা একক দেশ-শাসন করিতে পারিবেন না। সোশ্যালিষ্ট ভোট যে হ্রাস পাইবে তাহা পূর্ব্বে অনুমান করা কঠিন ছিল না। সোশ্যালিষ্ট পার্টির বামপন্থীরা কম্যুনিষ্ট-দিগকে, আর দক্ষিণপন্থীরা এম-আর-পি (The Mouvement Republicain Populaire) অথবা রেডিক্যালদিগকে সমর্থন করিয়া থাকেন। এই জন্য একাধিক বার সোশ্যালিষ্ট পার্টিকে ভাঙ্গন ধরিবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল।

সোশ্যালিষ্ট পার্টি কম্যুনিষ্ট পার্টিকে সমর্থন করিবে, ইহা আশা করা কঠিন। আর সমর্থন করিলেও সোশ্যালিষ্ট পার্টির সহযোগিতায় কম্যুনিষ্ট পার্টির পক্ষে মন্ত্রিসভা গঠন করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং কম্যুনিষ্ট পার্টিকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে হইলে এম-আর-পির সহিত কোয়ালিশন করিতে হইবে।

সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক হইতে এম-আর-পির স্থান কম্যুনিষ্ট পার্টির পরেই। কেথলিক ধর্ম্মাবলম্বী কৃষক, নিম্নবিত্ত মধ্যশ্রেণী এবং খৃষ্টান ট্রেড ইউনিয়নের শ্রমিকরাই এই দলের প্রাণশক্তি। সংখ্যার দিক হইতে বিবেচনা করিলে এম-আর-পি, রেডিক্যাল এবং পি-আর-এল (Parti Republican de la Liberte) এই তিন দলের কোয়ালিশন অবশ্য সম্ভবপর হইতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক দিক্ হইতে তাহা সম্ভবপর নহে। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, এম-আর-পিকে প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণপন্থী বলিয়াই অভিহিত করা হইয়া থাকে। ফ্রান্সে রাজনৈতিক দলের সংখ্যাধিক্যের জন্য কোন দলের পক্ষেই একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া কঠিন। ফ্রান্সের ইহাই চিরন্তন রাজনৈতিক ভাগ্য।

ফ্রান্সের বর্ত্তমান সাধারণ নির্ব্বাচনের আর একটি প্রধান কথা এই যে, প্রায় শতকরা ২৫ জন ভোটার ভোট দেন নাই। কোন রাজনৈতিক কারণ না থাকিলেও ভোটারদের এক-চতুর্থ অংশই ভোট দিতে বিরত ছিলেন ইহা অনুমান করা কঠিন। বর্ত্তমান নির্ব্বাচনের প্রাক্কালে জেনারেল দ্য গল ভোটদাতাদিগকে স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, নূতন শাসনতন্ত্র তাঁহার পছন্দমত রচিত হয় নাই। ইহাই তাঁহাদের ভোট দিতে বিরত থাকার কারণ কি না তাহা অনুমান করা কঠিন। কিন্তু ভোট-প্রদান কেন্দ্রে এক-চতুর্থাংশ ভোটারের অনুপস্থিতি ফ্রান্সের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সম্মুখে একটা বড় চ্যালেঞ্জ উপস্থিত করিয়াছে মনে করিলে ভুল হইবে না। কম্যুনিষ্ট পার্টির দূরদৃষ্টি এবং রাজনৈতিক কৌশলই চ্যালেঞ্জের যথার্থ উত্তর দিতে সমর্থ। এম-আর-পি দল সর্ব্বাপেক্ষা কম অনিষ্টকারী, কম্যুনিষ্ট পার্টি তাহা উপলব্ধি করিলে এই সকল অনুপস্থিত ভোটারদের স্বতন্ত্র একটি দল গঠনের সম্ভাবনা দূরীভূত করিতে পারিবেন।

ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র—

এত দিন পরে ইন্দোনেশিয়া-সমস্যার একটা সমাধান সম্ভবপর হইয়াছে। ডাচ এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রতিনিধিদের মধ্যে যে খসড়া চুক্তি হইয়াছে তাহা ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকান গবর্ণমেণ্ট জাভা, সুমাত্রা এবং মাদুরার উপর কার্য্যত: শাসনকার্য্য পরিচালন করিতেছেন বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই চুক্তি অনুসারে সমগ্র ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ অঞ্চল লইয়া একটি ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে এবং ফেডারেল ভিত্তিতে গঠিত যুক্তরাষ্ট্র এই সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে। নেদারল্যাণ্ডের সহিত এই ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের যে সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে তাহাতে দেখা যায়, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র নেদারল্যাণ্ডস্ ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়নের একটি অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে। ডাচ রাজতন্ত্রের অধীনে সমান অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নেদারল্যাণ্ড রাজ্য এবং ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাজ্য লইয়া গঠিত নেদারল্যাণ্ডস্-ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়ন।

নেদারল্যাণ্ডস্ এবং ইন্দোনেশিয়ান প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৭টি দফা-সম্বলিত যে চুক্তি হইয়াছে তাহার বিস্তৃত বিবরণ এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। আমরা এখানে প্রধান কয়েকটি দফার উল্লেখ মাত্র করিব। প্রথমত: তিনটি রাষ্ট্র লইয়া ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইবে। এই তিনটি রাষ্ট্র (১) রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া (২) বর্ণিও এবং (৩) গ্রেট ইষ্ট অর্থাৎ বালীদ্বীপ, নিউগিনি, মালাক্কাস এবং লেসারসাণ্ডাস। জাভা, মাদুরা এবং সুমাত্রা লইয়া রিপাবলিক অব্ ইন্দোনেশিয়া গঠিত। দ্বিতীয়ত:, দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং সাধারণ অর্থনৈতিক ব্যাপার ইউনিয়নের অধিকারে থাকিবে এবং ইউনিয়নের প্রত্যেক অংশ নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কর্ত্তৃত্ব করিবে। তৃতীয়ত:, দুই বৎসরের মধ্যে ইউনিয়নের গঠনকার্য্য সম্পন্ন করা হইবে। অতঃপর ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাজ্যকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সভ্য করিবার জন্য প্রস্তাব করা হইবে। পঞ্চমত:, ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বর্ণিও এবং গ্রেট ইষ্ট স্বয়ং-শাসিত রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ দুইটি রাষ্ট্র ইন্দোনেশিয়ান রিপাবলিকে যোগদান করিবে কি না তাহা পরে স্থির হইবে। ডাচ শাসনতন্ত্রের পরিবর্ত্তন করিতে এবং ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আইনসঙ্গত বিধি-ব্যবস্থা করিতে দুই বৎসর সময় লাগিবে, তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ১৯৪৯ সালের জানুয়ারীর মধ্যে এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই অন্তর্ব্বর্ত্তী সময়ের মধ্যে রিপাবলিক অব ইন্দোনেশিয়া ব্যতীত অন্যান্য দ্বীপগুলির উপর হল্যাণ্ডেরই সার্ব্বভৌম অধিকার থাকিবে।

আপাত দৃষ্টিতে হল্যাণ্ড এবং ইন্দোনেশিয়ার মধ্যে এই চুক্তিকে ডাচ ঔপনিবেশিক শাসনের বিলোপ অথচ ডাচ সাম্রাজ্যকে বাহাল রাখিবার অতি উত্তম ব্যবস্থা বলিয়াই মনে হয়। রাষ্ট্রনৈতিক দিক হইতে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ার অধিবাসীদিগকে নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া না ভাবিয়া হয়ত পারিবে না। কিন্তু ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের প্রধান কথা অর্থনৈতিক শোষণ। যে চুক্তি হইয়াছে তাহাতে ইন্দোনেশিয়ার ডাচদের অর্থনৈতিক কোন ক্ষতি হইবে না। শুধু তাই নয়, ইন্দোনেশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত যে কোন বৈদেশিক শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের উপর কোন বৈষম্যমূলক শুল্ক ধার্য্য করা চলিবে না। নেদারল্যাণ্ডস্-ইন্দোনেশিয়ান ইউনিয়নে ইন্দোনেশিয়া কতটুকু প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে তাহাও উপেক্ষার বিষয় নহে। কারণ, এই ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের হাতেই থাকিবে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র-নীতি এবং সাধারণ অর্থনৈতিক বিষয়ের ক্ষমতা। মোটের উপর এই ব্যবস্থা সাম্রাজ্যরক্ষার নূতন একটি উপায় ছাড়া আর কিছু নয়।

বৃটিশ পররাষ্ট্রনীতি—

প্যারীর শান্তি-সম্মেলন হইতে ফিরিয়া আসিয়া বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন বলিয়াছিলেন যে, অন্যান্য দেশে যাহাতে কোনরূপ সন্দেহ সৃষ্টি না হয়, অথবা তাহাদের কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিতে তিনি বিশেষ ভাবে যত্নবান্। অভিপ্রায় যে অত্যন্ত শুভ তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের পররাষ্ট্র-নীতি কি এবং তাঁহার শুভ ইচ্ছার সহিত এই নীতির যতটুকু মিল আছে তাহা অবশ্যই বিবেচনার বিষয়। পররাষ্ট্র-সচিবের পদে নিযুক্ত হওয়ার পরেই তিনি বলিয়াছিলেন, "Britain's foreign policy will not be altered in any way under the Labour Government." 'শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের হাতে বৃটেনের পররাষ্ট্র-নীতির কোন পরিবর্ত্তন হইবে না।' যে সকল

দেশে প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করা বৃটেনের সাম্রাজ্য রক্ষার পক্ষে অনুকূল. সেই সকল অঞ্চলে প্রভাব-প্রতিপত্তি রক্ষা করাই মিঃ বেভিনের দৃষ্টিতে বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য একান্ত ভাবে অপরিহার্য্য। এই দিক্ দিয়া মধ্য-প্রাচীর গুরুত্ব বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। মধ্য-প্রাচীতে বৃটিশ প্রভাব-প্রতিপত্তি কিছুতেই তিনি ক্ষুণ্ণ হইতে দিতে পারেন না। কিন্তু মধ্য-প্রাচীতে আমেরিকা এবং রাশিয়া উভয়েই প্রভাব-বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছে। রাশিয়ার সহিত বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার তিনটি অঞ্চলের কথা আমরা শুনিয়াছি :— (১) জার্ম্মাণী, (২) চীন এবং (৩) মধ্যপ্রাচী। তন্মধ্যে মধ্য-প্রাচীতে বিবাদ বাধিবার আশঙ্কাই খুব বেশী প্রবল।

প্যালেষ্টাইন সমস্যা মধ্য-প্রাচীর সমস্যারই অঙ্গীভূত। মাস তিনেক পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটেন যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছে তাহা এখন পর্য্যন্ত কার্য্যকরী হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটি পরিকল্পনার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছে, এই তৃতীয় পরিকল্পনার ভাগ্যেও তাহা ঘটিবার আশঙ্কা আছে। অথচ প্যালেষ্টাইনকে ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের হাতে ছাড়িয়া দিতেও বৃটেন রাজী নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে রাশিয়া মন্তব্য করিয়াছে যে, প্যালেষ্টাইনকে ট্রাষ্টিশিপ কাউন্সিলের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। রাশিয়ার এই অভিমত কার্য্যকরী হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না।

মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্র-নীতির আর এক দিক্ ফ্রাঙ্কোর স্পেন সম্বন্ধে বলডুইন-চেম্বারলেনের হস্তক্ষেপ না করার নীতি অনুসরণ। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস, ফ্রাঙ্কোকে যদি অপসারিত করা যায়, তাহা হইলে স্পেনের কম্যুনিষ্ট পার্টি ক্ষমতা অধিকার করিয়া বসিবে। বিশ্ব-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের স্বার্থের দিক হইতে মিঃ বেভিন স্পেনে কম্যুনিষ্ট গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা ফ্রাঙ্কোর শাসনই শ্রেয় বলিয়া মনে করেন। ইরাণ, মিশর এবং সমগ্র মধ্য-প্রাচীতে কম্যুনিজমই বৃটেনের শত্রু বলিয়া তাঁহার ধারণা। বস্তুতঃ, বৃটেনে সোশ্যালিষ্ট গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইলেও সোশ্যালিষ্ট পর-রাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হয় নাই। ইহা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে, সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে ফ্রাঙ্কোর স্পেন, গ্রীস, রাশিয়া এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে মিঃ বেভিনের পররাষ্ট্র-নীতির কঠোর নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতেই যে মিঃ বেভিন তাঁহার পররাষ্ট্র-নীতির পরিবর্ত্তন করিবেন তাহা মনে করিবার কোন কারণ নাই। তবে পার্লামেণ্টের শ্রমিক সদস্য ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের দ্বারা প্রভাবিত হইয়া চাপ দিলে মিঃ বেভিনকে হয়ত পদত্যাগ করিতে হইবে। যদি এরূপ সম্ভাবনা কখনও ঘটে, তাহা হইলে মিঃ ডাল্টন হইবেন বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব।

মিঃ চার্চ্চিলের অভিযোগ—

তৃতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম কে প্রথম আরম্ভ করিবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে একটা প্রচারকার্য্য চলিতেছে তাহা কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিলের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ইউরোপে রাশিয়া ২ শত ডিভিশন সৈন্য রাখিয়াছে। ২ শত ডিভিশনে সৈন্যের সংখ্যা ২৪ লক্ষ। ষ্ট্যালিন প্রতিবাদ করিয়া জানাইয়াছেন যে, ইউরোপে মাত্র ৬০ ডিভিশন সৈন্য রাশিয়া রাখিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিলের উক্তিই যদি সত্য হয়, তাহা হইলেও বৃটেন এবং আমেরিকা কি পরিমাণ সৈন্য ইউরোপে রাখিয়াছে তাহাও বিবেচনা করা আবশ্যক নয় কি? গত জুন মাসে ইউরোপে ২২,৫৭,০০০ বৃটিশ সৈন্য ছিল এবং গত সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিণ সৈন্য ছিল ২৩,০২ ৪৫২। মিঃ চার্চ্চিলের উক্তি সত্য হইলে বৃটিশ ও মার্কিণ ৪৫,৫৯,৪৫২ সৈন্যের স্থানে রাশিয়ার সৈন্য মাত্র ২৪,০০,০০০। ইহাও জানা থাকা প্রয়োজন যে, রাশিয়া তাহার মোট রাজস্বের শতকরা ২৪ ভাগ মাত্র দেশরক্ষার প্রয়োজনে ব্যয় করে। আর বৃটেন ব্যয় করে শতকরা ৩০ ভাগ এবং আমেরিকা ব্যয় করে শতকরা ৩৩ ভাগ।

কবি-স্ত্রীর উক্তি

শ্রীসুধাংশুকুমার সান্যাল

মুখ ভার ভার, কথা নেই মুখে, পাশ কেটে যাও চ'লে,
হাসির দামও কি চড়ে গেল না কি যুদ্ধ লেগেছে ব'লে?
কবিতা শুনিনি তাই রাগ বুঝি,
শুনব ব'লেই সময় তো খুঁজি,
খুঁটি-নাটি কাজ সারা দিন লেগে, শুনব কেমন ক'রে?
তোমার কবিতা খুব ভাল হয়—করব কি আর প'ড়ে?

আমার বোতাম ছিঁড়েছে দেখ না—আসবে যে ধোপা আজ।
আচার করা যা ঝকমারি বাপু, বড়ই কঠিন কাজ।
এক মাস হ'ল চিঠি একখানা,
লিখে মার খোঁজ হয়নিক' জানা,
একা একা আর কত দিক্ দেখি—হিম্‌-সিম্‌ খেয়ে যাই,
বল দেখি আমি কবিতা শোনার সময় কখন্ পাই?

বুঝতে পার না, কেন যে কেবল শুধু শুধু রাগ কর,
তোমাকেই খুশী করার জন্যে খাটি যে এমনতর,
তবু তো তোমার পাই না ক' মন,
ঘর-সংসারে নেই প্রয়োজন?—
কবিতা শুনলে খুশী যদি হও তাই নয় করা যাবে,
কিছুই বুঝি না, জানি না তবুও শুনিয়ে কি সুখ পাবে?

বোঝার আমার নেই প্রয়োজন—শুনলেই শুধু হবে,
বেশ তাই হোক্, তোমার আদেশ না শুনেছি আমি কবে?
তবে শোন আমি বলছি পষ্ট,
শুনলে কবিতা হয় যে কষ্ট,
মনে হয় তুমি অন্য কাউকে ভালবাস নিশ্চয়,
লেখার মধ্যে যত গুণ গাও সে গুণ আমার নয়।

এম, ডি, ভি

অষ্ট্রেলিয়ায় এম, সি, সি, দল ঃ—

ভ্রাম্যমান এম, সি, সি, দল আরও চারটি খেলায় যোগদান করিয়াছে। দুইটি খেলায় তাহাদের সহজ সাফল্যের পরিচয়ে ক্রীড়ামোদিগণের মধ্যে আশার সঞ্চার হইয়াছে যে, হয়ত এম, সি, সি, দল এবার 'এ্যাসেস্' লইয়া ঘরে ফিরিতে পারিবে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার সমালোচকরা নিজেদের দেশের সাফল্য সম্বন্ধে সুনিশ্চিত। তাঁহাদের মতে ইংলণ্ডের ব্যাটিংসম্ভার শক্তিসম্পন্ন হইলেও বোলিংয়ে অষ্ট্রেলিয়ার নবীন উদীয়মান প্রতিভাদের কোন মতেই তাহারা ম্লান করিতে পারিবে না। মেলী, গ্রিমেট ও ওরিলীর দেশে বোলার সকল সময়েই অবিচল থাকিবে ইহাই তাঁহাদের দৃঢ়বিশ্বাস। যাহাই হউক, আসন্ন সংগ্রামে উভয় দেশেরই শক্তির সন্ধান পাওয়া যাইবে।

চতুর্থ খেলা—পোর্ট পিরীতে অনুষ্ঠিত এই খেলায় দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশবাসী একাদশ এক ইনিংস ও ৩০৮ রাণে পরাজিত হয়। বিজিত পক্ষে কোনও নামজাদা খেলোয়াড়কে দেখা যায় নাই। এম, সি, সির পক্ষে কম্পটনের সাবলীল ক্রীড়াভঙ্গী এবং তাহার ও হাটনের শতাধিক রাণ উল্লেখযোগ্য।

রাণ সংখ্যা—

এম, সি, সি—৬ উইকেটে ৪৮৭। (হাটন ১৬৪, কম্পটন ১০০, ফিসলক ১৮, হার্ডষ্টাফ নট্ আউট ৬৭, ম্যাকক্লীন ৪৪ রাণে ২টি)

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া প্রদেশবাসী একাদশ—১ম ইনিংস—৮৭। (হোয়াইট ৩২, স্মিথ ১৬ রাণে ৫টি ও রাইট ৪০ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—৯২ (টাক ৩০, হোয়াইট, ২৫, রাইট ৩৮ রাণে ৩টি, স্মিথ ২৭ রাণে ৩টি ও ল্যাংগ্রীজ ১৭ রাণে ৪টি)

এম, সি, সি, এক ইনিংস ও ৩০৮ রাণে জয়ী হয়।

পঞ্চম খেলা—দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া সম্মিলিত দল এডিলেডে 'ফলো অন' করিয়া এম, সি, সির বিরুদ্ধে পরাজয়ের গ্লানি হইতে আত্মরক্ষা করে। এম, সি, সি দলের প্রথম জুটির হাটন ও ওয়াসব্রুক যথাক্রমে ১৩৬ ও ১১৩ রাণ করে। স্থানীয় পক্ষে ক্রেগ দ্বিতীয় দফায় ১০১ রাণ করে। প্রথম ইনিংসে স্মিথের বল সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যকরী হয়। ব্রাডম্যান প্রথম আত্মপ্রকাশে দৃঢ়তার পরিচয় দেয়।

রাণ সংখ্যা—

এম, সি, সি—১ম ইনিংস ৫ উইকেটে ৩০৬ (হাটন ১৩৬, ওয়াসব্রুক ১১৩, ডুল্যাণ্ড ১৪২ রাণে ৩টি)

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—২৬৬ (ব্রাডম্যান ১৭, জেমস্ ৫৮, বোইড্রিংস ৫৭, স্মিথ ১৩ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ২১৬ (ক্রেগ ১০১, ম্যান নট্ আউট ৬২, পোলার্ড ২৩ রাণে ২টি ও ল্যাংগ্রীজ ৪২ রাণে ২টি)

খেলা অমীমাংসিত থাকে।

ষষ্ঠ খেলা—মেলবোর্ণে ভিক্টোরিয়ার বিরুদ্ধে ২৪৪ রাণে জয়ী হইয়া এম সি সি, দল আলোচ্য সফরে প্রথম শ্রেণীর দলের বিরুদ্ধে এই প্রথম জয়ের গৌরব অর্জন করে। প্রথম ইনিংসে কম্পটন ১৪৩ ও হাটন দ্বিতীয় ইনিংসে ১৫১ রাণ করিয়া নট্ আউট থাকে। হাটন পর পর তিনটি খেলাতেই শত রাণ করার গৌরব অর্জন করে। ভিক্টোরিয়া দল প্রথম ইনিংসে মোট ১৮৯ রাণ করে। একমাত্র হ্যাসেট্ (৫৭) ব্যতীত আর কেহই দাঁড়াইতে পারে নাই। রাইট ও ভোস প্রত্যেকে সাত রাণ দিয়া যথাক্রমে ৬টি ও ৩টি করিয়া উইকেট দখল করে।

রাণ সংখ্যা—

এম, সি, সি—১ম ইনিংস ৩৫৮ (কম্পটন ১৪৩, ঈকীন নট্ আউট্ ৮১, ইয়ার্ডলী ৭০, ট্রাইব ৮৮ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ২৭১ (হাটন্ নট্ আউট্ ১৫১, জনসন ৩৬ রাণে ৪টি, রিং ৫২ রাণে ২টি)।

ভিক্টোরিয়া—১ম ইনিংস—১৮৯ (হ্যাসেট্ ৫৭, রাইট ৭ রাণে ৬টি ও ভোস ৭ রাণে ৩টি)।

২য় ইনিংস—২০৪ (হার্ভে ৫৭, হ্যাসেট ৫৭, রাইট ৭৩ রাণে ৪টি ও বেডসার ৪০ রাণে ৩টি)।

এম, সি, সি, ২৪৪ রাণে জয়ী।

সপ্তম খেলা—মেলবোর্ণে সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে চার দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের প্রথম দিন বৃষ্টির জন্ত খেলা স্থগিত থাকে। উভয় পক্ষের খেলোয়াড়গণকে অনুশীলনের এবং পরস্পরের মধ্যে পরিচয়ের সুযোগের জন্ত খেলা পঞ্চম দিনে ধার্য্য হয়। কিন্তু দৈব-দুর্ব্বিপাক এমনই যে তৃতীয় দিন আবার খেলার গতি আবহাওয়ার জন্ত ব্যাহত হয়। এই খেলায় হামণ্ডের স্তায় ধুরন্ধর খেলোয়াড়কে ৫১ রাণ করিতে বহুক্ষণ ধীর ভাবে ও সংযমের সহিত খেলিতে হয়। ইহাতেও ম্যাককুলের বোলিংএর হার দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার বোলিং-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। টেষ্ট খেলার প্রাক্কালে ব্র্যাডম্যানের দৃঢ়তাপূর্ণ ব্যাটিং সকলের মনে আশার সঞ্চার করে। তাহার খেলায় পুরাতন প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট পাওয়া যায়। নবাগত তরুণ মরিসের ন্যাটা হাতের খেলায় কায়দা বাউসলী ও লেল্যাণ্ডের কৃতিত্ব স্মরণ করাইয়া দেয়।

রাণ সংখ্যা—

এম, সি, সি—১ম ইনিংস ৩১৪ (হাটন ৭১, ওয়াসব্রুক ৫৭, হ্যামণ্ড ৫১, ম্যাককুল ১০৬ রাণে ৭টি)।

সম্মিলিত অষ্ট্রেলিয়া একাদশ—১ম ইনিংস ৫ উইকেটে ৩২৭ (মরিস ১১৫, ব্র্যাডম্যান ১০৬)।

খেলা অমীমাংসিত থাকে।

নোয়াখালীর অবস্থা

নোয়াখালী, চাঁদপুর, ত্রিপুরা ইত্যাদি পূর্ব্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে লীগ গুণ্ডাদের পাশবিক তাণ্ডব, পৈশাচিক ব্যবহার, নৃশংস ঘটনাবলী আজ সর্ব্বজনবিদিত। চারি ধারে জননী-ভগিনীর আর্ত্তনাদ। গৃহহারাদের আকুল ক্রন্দন। নারীত্বের অবমাননা, হিন্দুধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাতের প্রচেষ্টা। ৫০ সহস্র হিন্দুর ধর্ম্মান্তরকরণ, সহস্র সহস্র হিন্দু নারী অপহরণ। মৃত্যুসংখ্যা গোণা যায় না। কত হিন্দু গৃহ যে লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত তাহার ইয়ত্তা নাই। লীগ-প্রণোদিত এই বীভৎস আচরণে শুধু বাঙ্গালা নহে, সমগ্র ভারত ব্যথিত। মানবতার প্রেরণায় প্রত্যেক সুস্থ-মস্তিষ্ক ব্যক্তিরই ধমনীতে রুদ্রতালে প্রতিটি রক্ত-বিন্দু চঞ্চল। কিন্তু বাঙ্গালার গভর্ণর ও প্রধান মন্ত্রীর এখনও চেষ্টা চলিতেছে এই ভীষণ নারকীয় তাণ্ডবলীলাকে লোকচক্ষে অতিশয় লঘু প্রতিপন্ন করিবার। কলিকাতার হাঙ্গামার সময় বড়লাট কলিকাতা পরিদর্শন করিয়া গেলেন, কিন্তু সে সম্পর্কে কোন কথাও বলিলেন না, কোন প্রতিবিধানেরও ব্যবস্থা করিলেন না। নোয়াখালী ও ত্রিপুরার ব্যাপারেও সেই পূর্ব্বেকার তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। এদিকে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া বাঙ্গালার গভর্ণর বিমানযোগে উপদ্রুত অঞ্চল সমূহ দেখিয়া আসিলেন। প্রধান মন্ত্রী বিবৃতি দিলেন ভারতবর্ষে আর গভর্ণর রিপোর্ট পাঠাইলেন বৃটিশ পার্লামেণ্টে। ইঁহাদের উভয়ের মতেই ব্যাপার বিশেষ কিছুই নহে। অরাজকতা সামান্য, মোটেই ব্যাপক বলা চলে না। অপহৃতা নারীর সংখ্যা এক শতেরও কম। এই রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়াই সে দিন বৃটিশ পার্লামেণ্টে আলোচনা হইয়া গেল। সত্যকারের ব্যাপার জানিবার জন্ত কেহই উৎসুক হইলেন না। বড়লাট এই সম্পর্কে কোন কথাই বলিলেন না। অপপ্রচার অবাধে চলিল ও এখনও চলিতেছে।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দের প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন আইনের জোরেই ইহা সম্ভব হইয়াছে। প্রাদেশিক ব্যাপারে একমাত্র বড়লাটই হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন। তিনি নির্ব্বাক্ থাকিলেন। গভর্ণর সোজাসুজি বৃটিশ পার্লামেণ্টের সহিত বোঝাপড়া করিলেন। তাহা হইলে অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্যদের ক্ষমতা কি এবং কতটুকু? কেন্দ্রের সদস্যদের প্রাদেশিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু বড়লাটের তো সে ক্ষমতা আছে। তবু তিনি সে ক্ষমতা ব্যবহার করিলেন না কেন? জনসাধারণের মনে সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে, বৃটিশের শান্তিপূর্ণ ভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের ফিকির, স্রেফ খল-কপটতা-প্রণোদিত। আন্তরিকতা তাহাতে একেবারেই নাই।

বাঙ্গালার গভর্ণর তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন—"হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলিমদের ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে নাই। কয়েকটি গুণ্ডা প্রকৃতির লোক সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের সুযোগ লইয়া এই হাঙ্গামা বাধাইয়াছে এবং পল্লী অঞ্চল দিয়া অতিক্রম করিবার সময় তাহাদের সহিত প্রত্যেক এলাকার বিদ্রোহী মুসলমান অস্থায়িভাবে যোগ দিয়াছে।" তিনি আরও বলিয়াছেন যে, নিহতের সংখ্যা এক শতেরও কম। ধর্ম্মান্তরকরণ, নারীহরণ, এ সকল গুজব মাত্র। কানে আসিয়াছে কিন্তু প্রমাণ নাই। তাঁহার মিথ্যা ভাষণের জন্ত, হিন্দু পত্রিকার কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম, য়ুরোপীয়ানদের মুখপত্র 'ষ্টেটসম্যান' পর্যন্ত নিন্দা করিয়াছে। সকল সংবাদ বিলাতে পৌছায় না, কারণ পৌঁছিতে দেওয়া হয় না। ভারতীয় জনমতের দাম বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা কোন দিনই দেয় নাই। এখনই যে দিবে তাহা আশা করা যায় না। বৃটিশ পার্লামেণ্ট এখনও আমাদের কর্ত্তা—আমাদের ভাগ্যনিয়ন্তা।

আণ্ডার-সেক্রেটারী হেণ্ডারসন নিয়মতান্ত্রিক দায়িত্ব সম্পর্কে বলিয়াছেন যে, আইন শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব প্রদেশের; অতএব বাঙ্গালার মন্ত্রিসভা ও আইন-পরিষদের উপর প্রাথমিক দায়িত্ব রহিয়াছে। অর্থাৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের কিছু নাই। বড়লাটের ও গভর্ণরেরও কার্য্যতঃ কিছু নাই। তবে প্রদেশের শান্তি-শৃঙ্খলার উপর যদি সাক্ষাৎ আঘাত আসে, কেবল তখনই গভর্ণরের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের কারণ ঘটে।

তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহাদের মতে বাঙ্গালায় এমন কিছু বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই যে জন্ত গভর্ণর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতঃ বাঙ্গালার মন্ত্রিসভার অবসান ঘটাইয়া সেকশন ৯৩ জারী করিতে পারিতেন। অথচ লীগ গুণ্ডাদের কবলে পড়িয়া বাঙ্গালা শ্মশান হইয়া গেল। ইহাতেই মনে হয় না কি যে বাঙ্গালার হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অছিলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের বিদ্বেষাগ্নিতে আহুতির জন্ত ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিয়মতন্ত্রের প্রতি এরূপ ভক্তি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তি যেন উথলাইয়া পড়িতেছে। কিন্তু ভারত-বাসীরা একেবারে নির্ব্বোধ, এ কথা তাঁহারা কেন ধরিয়া লইয়াছেন বুঝি না। লীগ ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মিলনে বাধা দিবার জন্ত দেশে লোকের অভাব হইবে না। লীগ বৃটিশকে প্রভু করিয়া রাখিতে চায় এবং প্রভু-ভৃত্যে মিলিয়া স্বাধীনতাকে ঠেকাইয়া রাখিবার উদ্দেশ্যেই এই প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

নোয়াখালী ও ত্রিপুরার অবস্থা সম্পর্কে কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য্য কৃপালনীর বিবৃতি ও ইষ্টার্ণ কম্যাণ্ডের জেনারাল অফিসার কম্যাণ্ডিং লেঃ জেনারেল বুচারের বিবৃতির মধ্যে বিশেষ পার্থক্য সাধারণ পাঠকের দৃষ্টিতেও সুস্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত না হইয়া পারিবে না। আচার্য্য কৃপালনীর বর্ণনা নানা দিক দিয়াই নোয়াখালী ও ত্রিপুরার নৃশংস ঘটনাবলীকে সুস্পষ্ট করিয়াই শুধু তোলে নাই, উহার মূল রহস্যকেও সকলের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে। কিন্তু লেঃ জেনারেল বুচার

বাঙ্গালার গভর্ণরের মতই সমগ্র ব্যাপারটাকে লঘু করিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। শুনিয়াছিলাম, সামরিক কর্ম্মচারীরা পক্ষপাতদুষ্ট হন না। কিন্তু এই ঘটনার পর অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাদের মত বদলাইতে হইয়াছে।

আচার্য্য কৃপালনী উপদ্রুত অঞ্চল দুই বার পরিদর্শন করিয়াছেন এবং স্থানীয় সাক্ষ্য-প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, মুসলিম লীগের প্রচার-কার্য্যের ফলেই এই নৃশংস অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং বিশিষ্ট লীগ-নেতাদের এই ব্যাপারে যথেষ্ট হাত আছে। বিপদের আশঙ্কা পূর্ব্বাহ্নেই প্রথমে মৌখিক এবং পরে লিখিত ভাবে কর্ত্তৃপক্ষকে জানান সত্ত্বেও প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা হয় নাই। হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিলে গভর্ণমেণ্ট বাধা অথবা শাস্তি দিবে না, মুসলমানদের মধ্যে বিনা কারণে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হইতে পারে না। আক্রমণের যে আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছিল তাহার সহিত কয়েক জন মুসলমান সরকারী কর্ম্মচারীও জড়িত ছিলেন। লুঠতরাজ অগ্নিপ্রদান ইত্যাদি চলিবার সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল, আত্মরক্ষার প্রয়োজন ব্যতীত গুলী করিতে তাহাদিগকে নিষেধ করা হইয়াছিল। এই সকল ঘটনা শুধু পূর্ব্ব পরিকল্পনার অস্তিত্বই প্রমাণ করে না, আরও গভীরতর রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটিত করে। অথচ লে: জেনারেল বুচার মন্তব্য করেন যে, এক সম্প্রদায়ের লোকেদের পক্ষ হইতে অপর সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ বিদ্রোহ হইয়াছিল এইরূপ উক্তি সত্য নহে। ইহা কি তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত অসত্য ভাষণ নহে?

কতকগুলি কথা অবশ্য তিনিও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। দুর্বৃত্ত দলের কথা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাহারা কোন সম্প্রদায়ের, সে বিষয়ে তিনি কিছু বলেন নাই। বিশেষ উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হইয়া দুর্বৃত্তেরা লুণ্ঠন করিয়াছে, গৃহদাহ করিয়াছে এবং তাহাতেও ক্ষান্ত হয় নাই, জোর করিয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছে। হিন্দু নারীদেরও মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করা হইয়াছে এবং অনেকগুলি বিবাহ বলপূর্ব্বক হইয়াছে বলিয়া আচার্য্য কৃপালনী জানাইয়াছেন। এই অত্যাচারের মূলে পরিকল্পনার অস্তিত্ব লে: জেনারেল বুচারও অস্বীকার করিতে পারেন নাই। আচার্য্য কৃপালনী যাহা বলিয়াছেন তাহা যে অতিরঞ্জিত এ কথা বলিবার অধিকার জি ও সি'র নাই। কারণ তিনি ঘটনাস্থলে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু আচার্য্য কৃপালনী গিয়াছিলেন। সুতরাং সংখ্যা সম্পর্কে জি ও সি বিশেষ কিছু বলিতে পারেন না, তবে ঘটনার অস্তিত্ব তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে।

এই সকল অশান্তি কেবলমাত্র সাম্প্রদায়িক নহে, ইহা প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলবিশেষ নিজেদের ঘৃণ্য স্বার্থ ও দুরভিসন্ধি সিদ্ধ করিবার জন্য সাম্প্রদায়িক অন্ধ উত্তেজনায় কৌশল পূর্ব্বক ইন্ধন জোগাইতেছে। সেই জন্য আগুন জ্বলিয়া উঠিবার পূর্ব্বে বার বার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াও কোন ফল হয় নাই। কারণ, প্রধান মন্ত্রী যে দলভুক্ত, সেই দলের স্বার্থ জড়িত আছে ওতপ্রোত ভাবে এই দাঙ্গার সহিত। তিনি এবং তাঁহার অধীনস্থ দলের লোক যাঁহারা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, তাঁহারা সকলেই বাজে অভিযোগ বলিয়া তুড়ি বাজাইয়া সকল ব্যাপার উড়াইয়া দিয়াছেন। উদ্দেশ্য গুণ্ডাদলকে প্রশ্রয় দেওয়া এবং আগুন প্রচণ্ডতর এবং ব্যাপক করিয়া তোলা। ওদিকে নোয়াখালী, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলে গুণ্ডাদের বীভৎস লীলা চলিতেছে, এদিকে প্রধান মন্ত্রী ঘোষণা করিতেছেন—'অল কোয়াইট অন নোয়াখালী ফ্রণ্ট'। লীগদলীয় সংবাদপত্রে লীগ সচিবসঙ্ঘের কার্য্যের ভূয়সী প্রশংসা বাহির হইয়াছে। কিন্তু 'ষ্টেট্‌সম্যান' পত্রিকার ষ্টাফ রিপোর্টার বলিয়াছেন, গভর্ণমেণ্ট নোয়াখালী ও ত্রিপুরার অরাজকতা দমন সম্পর্কে অসমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাকে কোন বিধ্বস্ত অঞ্চলের এক জন নেতৃস্থানীয় লীগদলীয় মুসলমান বলিয়াছেন, "সমস্ত অশান্তি ও অরাজকতা দমন করিবার একমাত্র উপায় ঐ দুইটি জেলার শাসন-ভার সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের উপর ছাড়িয়া দেওয়া। তবেই গুণ্ডা ও তাহাদের সমর্থকরা যে সম্প্রদায়ের ক্ষতি করিয়া তাহাদের নিদারুণ অবস্থার মধ্যে ফেলিয়াছে, তাহাদের বিশ্বাস ফিরিয়া আসিতে পারে।" মিষ্টার সুরাবর্দ্দী ইহার কোন উত্তর দেন নাই। কারণ উত্তর দিবার মত তাঁহার কিছুই সম্বল নাই। তবে সেই ব্যক্তির নাম নিশ্চয়ই লীগ-তালিকায় 'এনিমি নম্বর ওয়ান' হইয়া গিয়াছে।

অশান্তি দমন ইচ্ছা করিয়াই করা হয় নাই; কারণ এই দাঙ্গা প্রত্যক্ষ সংগ্রামেরই জের, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র-বিশেষ। সমগ্র সামরিক শক্তি হাতে থাকিতে গুণ্ডা দমন সম্ভব হয় না, এ কথা কে বিশ্বাস করিবে? পথ-ঘাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে বলিয়া প্রধান মন্ত্রী যে ওজর দেখাইয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ অছিলা মাত্র। ইচ্ছা থাকিলে বিমানপথে উপদ্রুত অঞ্চলে যাইয়া, গুলী চালাইয়া দুই দিনেই দুর্বৃত্তদের পৈশাচিক কার্য্যকলাপ ও পশু-পিপাসা মিটাইয়া দেওয়া যাইত। আসল কথা ইচ্ছার অভাব। লীগ ও সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ টোরী দল হাত মিলাইয়া চলিয়াছে। উভয়ের মিলিত পরামর্শে এই অশান্তি, দাঙ্গা। সাম্প্রদায়িক কথাটা রাজনৈতিক কূট চালের মুখোস মাত্র। বাঙ্গালার দুই দলের দুই প্রধান—মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আর সার ফ্রেডারিক বারোজ একত্রে তাই বলিয়া চলিয়াছেন ব্যাপারটা বিশেষ কিছুই নয়।

—

কলিকাতার অবস্থা

কলিকাতার জের নোয়াখালী; নোয়াখালীর জের কলিকাতা। এ ঠিক যেন 'ভিশ্যাস সার্কেল'।

গত ১৬ই আগষ্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস হইতে বাঙ্গালায় যে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে আজও তাহার শেষ হইল না। রক্ষক ভক্ষক হইলে এইরূপই হইয়া থাকে। আইন ও শৃঙ্খলার রক্ষকরা যদি দলীয় প্রীতি আধিক্য বশতঃ গুণ্ডাদের অপকর্ম্মকে লঘু বলিয়া উড়াইয়া দেন, তাহা হইলে তাহাদের প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। এই অতি-প্রশ্রয়ের ফলেই নোয়াখালীতে লীগ-গুণ্ডারা বলিতে সাহস করিয়াছে যে, শরিয়তের বিধান প্রবর্ত্তিত করিতে তাহারা অবতীর্ণ হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়কে হয় তাহাদের আইন মানিয়া চলিতে হইবে, নতুবা তাহারা রক্ষা পাইবে না। অথচ মহামান্য প্রধান মন্ত্রী অথবা গভর্ণর 'স্পীক টি নট' করিয়া রহিলেন।

কার্ত্তিকের গোড়ার দিকে কলিকাতায় আবার নূতন করিয়া হাঙ্গামা আত্মপ্রকাশ করিল। ৯ই কার্ত্তিক শনিবার হইতে তাহা ভীষণ রূপ ধারণ করিল। আবার এসিড নিক্ষেপ, অবাধ লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নরহত্যা চলিতে লাগিল। গুণ্ডাদের সায়েস্তা করিবার

কোন চেষ্টাই সরকার করিলেন না, উপরন্তু তাহাদের হাত হইতে নিরীহ নাগরিকদের রক্ষা করিবার জন্য যে সকল মহৎপ্রাণ ব্যক্তি আগাইয়া গেলেন পুলিশের দৃষ্টি তাঁহাদের উপরই বিশেষ ভাবে পড়িল। সহরতলী হইতে হিন্দুগণ বিপন্ন হইয়া কলিকাতার অভ্যন্তরে পলাইয়া আসিল। সহরে ১৪৪ ধারা, সান্ধ্য আইন সবই বলবৎ। কিন্তু গুণ্ডাদের প্রতি তাহা প্রয়োগ করা হইল না, আত্মরক্ষার পথেই প্রবল বাধাস্বরূপ হইয়া রহিল। সচিবসঙ্ঘ নিজেদের অকর্ম্মণ্যতা ঢাকিবার জন্য গুণ্ডা-শাসন পরিবর্ত্তে সহরে পাইকারী জরিমানা ধার্য্য করিয়া দিলেন। আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম তাহাই ঘটিল। জরিমানার বেশীর ভাগ অংশ পড়িল হিন্দুদের ঘাড়ে! অত্যাচারিতদের উপরই অত্যাচার হয়, ইহাই সংসারের নিয়ম!

সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে গভর্ণমেণ্ট। তাহাদের সরাইবার কোন উপায় নাই। গভর্ণর তাহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রবর্ত্তন করিতে নারাজ। অথচ প্রাণ-মান-ধন কিছুরই আজ মূল্য নাই লীগ সচিবসঙ্ঘের অনুগ্রহে। এই অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য কলিকাতার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এক সভায় স্থির হয় যে, ৪ঠা নভেম্বর হইতে ১৬ই নভেম্বর পর্য্যন্ত নগরের যান-বাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কলিকাতা ও সহরতলীর কারখানাগুলির কাজ বন্ধ রাখা হইবে।

বাঙ্গালার লীগ গভর্ণমেণ্ট ইহাতে একটু বিচলিত হইয়া পড়েন। অর্থসচিব মিঃ মহম্মদ আলি 'মর্ণিং নিউজে'র প্রতিনিধিকে বলিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট নেতাদের এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার সমুচিত উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন, এই প্রকার বে-আইনী ও শান্তিভঙ্গকারী কর্ম্মসূচী দ্বারা শাসনযন্ত্র বিকল করিবার প্রয়াসকে তাঁহারা কঠোর হস্তে দমন করিবেন। যোগ্য কথাই বলিয়াছেন। লীগ-গুণ্ডামী তো বে-আইনী অথবা শান্তিভঙ্গকারী নহে, তাই সরকার তাহা দমন করা প্রয়োজন মনে করে নাই। কিন্তু গুণ্ডামীতে বাধা দেওয়া অথবা কোন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে তাহার প্রতিবাদ ঘোরতর বে-আইনী কার্য্য; অতএব তাঁহারা তাহা কঠোর হস্তে দমন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। নোয়াখালী, ত্রিপুরা তো গভর্ণমেণ্টের শান্তি-শৃঙ্খলার চরম পরিচয় দিয়াছে। আর কেন? প্রকৃত নিদ্রা ভঙ্গ করা যায়, কিন্তু যে নিদ্রার ভাণ করিয়া পড়িয়া থাকে তাহাকে জাগান অসম্ভব। সরকার কিছু বোঝেন না এ কথা তো সত্য নহে। ইচ্ছা করিয়াই তাঁহারা লীগ-গুণ্ডাদের অপকীর্ত্তি দেখিতে চাহেন না। আমাদের কোন কথাই তাঁহাদের কর্ণে পশিবে না। উপায় কি? দেশের চরম দুর্ভাগ্য না হইলে এমন সচিব-সঙ্ঘ প্রভুত্ব করিতে পারে? ইঁহাদের কর্ত্তব্যবোধ, চক্ষুলজ্জা কিছুই কি নাই?

এই হাঙ্গামায় য়ুরোপীয় শাসকগোষ্ঠী ও বণিক-সমাজ কিন্তু মহা খুসী। তাঁহাদের শ্রীঅঙ্গে আঁচড় পর্য্যন্ত লাগে নাই। "হিন্দু মুসলমানরা মারামারি করিয়া মরুক. আমরা পৃথিবীর সামনে বলিতে পারি— আমাদের থাকা একান্ত দরকার"। এই নূতন প্রেরণা লইয়া তাঁহারা আবার নবোদ্যমে মিলিত হইয়াছেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ মরে নাই। চার্চ্চিল আজও সশরীরে বিদ্যমান। বৃটিশ শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট চার্চ্চিলের নিকট শিশু মাত্র। এই দাঙ্গা তাঁহারই কূট বুদ্ধি-প্রণোদিত। লীগ তাঁহার যন্ত্রস্বরূপ। লীগ দল নিজ স্বার্থের জন্য তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া দেশের স্বাধীনতা প্রচেষ্টাকে পঙ্গু করিতেছে। আজ বুঝিবার সময় আসিয়াছে যে সাম্প্রদায়িকতার অন্তরালে লুকাইয়া রহিয়াছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নখর ও দন্ত। আমরা আশা করি, দেশবাসী এই মায়াজাল ছিন্ন করিয়া যথাযোগ্য উত্তর দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না। স্বাধীনতার পথে যাহারা বাধা, তাহারা দেশী হউক অথবা বিদেশী হউক, তাহারা আমাদের শত্রু। মির্জাফররা চিরকালই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বংশকাঠি। তাহাদের ক্ষমা করে চলে না।

কৃপালনীর জবাব

কংগ্রেসের নব-নির্ব্বাচিত সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সমালোচনার যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা ঠিক 'মুখের মত জবাব' না হইলেও কংগ্রেসের ইতিহাসে ইহা একটা নূতন ঘটনা বলিয়াই মনে হইবে। আচার্য্য কৃপালনী নোয়াখালীর উপদ্রুত অঞ্চল পরিভ্রমণ করিয়া যে কয়েকটি বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্বীকৃত মতই তিক্ততা বৃদ্ধির আশঙ্কায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের উল্লেখ করা হয় নাই। তাহা সত্ত্বেও তিনি যেটুকু বলিয়াছেন, তাহাতেই সত্য গোপন রাখিতে লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর সুদৃঢ় প্রচেষ্টা অনেকখানি ব্যর্থ হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলিম লীগের কাছে যে ইহা মনঃপূত হইবে না, ইহা তো জানা কথা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রস্তাবে তাহার বিবৃতিকে শুধু নিন্দনীয় বলিয়াই অভিহিত করা হয় নাই, বঙ্গীয় মুসলিম লীগের দৃষ্টিতে উহা কংগ্রেসের সভাপতির পক্ষে দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচায়ক বলিয়াই প্রতিভাত হইয়াছে। তাহা না হইয়া আর উপায় কি? সত্য প্রকাশ করার মত নিন্দনীয় কার্য্য আর নাই, অবশ্য যদি উহার দ্বারা লীগ-পন্থীদের দুষ্কার্য্য প্রকাশিত হয়। এই যুক্তিতেই যে উহা মুসলিম লীগের দৃষ্টিতে কংগ্রেস সভাপতির দায়িত্বহীনতার পরিচায়ক হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি? কাজেই উহা পক্ষপাতদুষ্ট এবং প্ররোচনামূলক বলিয়া মুসলিম লীগ প্রচার করিবে, ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছুই নাই। বাঙ্গালায় মুসলিম লীগ কলিকাতায় ও অপরাপর স্থানে হাঙ্গামার জন্য আচার্য্য কৃপালনীর বিবৃতিকেই দায়ী করিবার যে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছেন তাহার মধ্যে কতখানি মিথ্যা এবং কতখানি অস্পষ্টতা রহিয়াছে, আচার্য্য কৃপালনীর বিবৃতিতে তাহা চোখে আঙ্গুল দিয়াই দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কলিকাতার দাঙ্গা-পরিস্থিতি ২৬শে অক্টোবর হইতেই অধিকতর শোচনীয় হইতে আরম্ভ করে। ২৭শে অক্টোবর প্রাতঃকালে আচার্য্য কৃপালনীর যে বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়, তাহা অতীত কালে কিরূপে প্ররোচনা যোগাইয়াছিল এই সহজ কথাটা যে স্বীকার করিবে না, তাহাকে বুঝান অসম্ভব। অবশ্য নেকড়ে বাঘ ও মেষ-শাবকের একটা গল্প আছে বটে। নেকড়ে বাঘ জল খাইতেছিল নদীর উজানে আর মেষ-শাবক নদীর ভাটিতে জল খাইতেছিল। তথাপি নেকড়ে বাঘ মেষ-শাবকের উপর জল ঘোলা করিবার দোষারোপ করিতে ত্রুটি করে নাই। কিন্তু মুসলিম লীগও নেকড়ে বাঘ নয়, আচার্য্য কৃপালনীও মেষ-শাবক নন, একথা বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের জানিয়া রাখা উচিত। 'অপরাপর স্থান' বলিয়া অনির্দ্দেশ্য ভাবে অভিযোগ উপস্থিত করা কতখানি দায়িত্বজ্ঞানের

পরিচয়, আচার্য্য কৃপালনী সে কথা তাঁহার বিবৃতিতে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতে পারিতেন।

আচার্য্য কৃপালনীর বিবৃতি পক্ষপাতদুষ্ট হইল কিরূপে? নোয়াখালীতে যে নরহত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণ, বলপূর্ব্বক বিবাহ ইত্যাদি হইয়াছে, ইহা কাহাদের কার্য্য? কাহারা এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিয়াছিল? বঙ্গীয় মুসলিম লীগ কি বলিতে চান, ঐ অঞ্চলের সংখ্যালঘু হিন্দুরা ঐ সকল কার্য্যে উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়াছিল? ১০ই অক্টোবর হইতে অনেক দিন ধরিয়া ঐ সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু আচার্য্য কৃপালনী প্রকাশ্যভাবেই জানাইয়াছেন যে, ২৫শে অক্টোবরের পূর্ব্বে কি চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার, কি সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের কেহ ব্যাপকভাবে উপদ্রুত অঞ্চলের অভ্যন্তর ভাগে পরিভ্রমণ করেন নাই? ২৫শে অক্টোবর নোয়াখালীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট কোন মতে ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আচার্য্য কৃপালনীর উক্তির প্রতিবাদ হইতে আমরা শুনি নাই। ২৫শে অক্টোবরের পূর্ব্বে কোন সরকারী কর্ম্মচারী উপদ্রুত অঞ্চলের ভিতরে প্রবেশ করেন নাই। এই ঘটনা দ্বারা কাহাদের কার্য্যাবলীকে পক্ষপাতদুষ্ট বলিয়া মনে হয়? সরকারী কর্ম্মচারীদের কার্য্য মুসলিম লীগের অনুকূল হইয়াছে, কাজেই উহা পক্ষপাতহীন, আর আচার্য্য কৃপালনীর বিবৃতি নোয়াখালীতে যাহা ঘটিয়াছে তাহা প্রকাশ করিয়া মুসলিম লীগের স্বরূপ উদ্ঘাটন করিয়াছে বলিয়া উহা পক্ষপাতদুষ্ট. ইহা যে পাকিস্থানী ন্যায়শাস্ত্র তাহাতে আর সন্দেহ কি? নোয়াখালীর ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট কিরূপ ভাবে মুসলিম লীগের অনুকূল বিবৃতি দিয়াছেন, তাহার উল্লেখও আচার্য্য কৃপালনী করিয়াছেন। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রীর চেষ্টায় উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বলপূর্ব্বক অন্য ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত বিবাহিতা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের একটি বালিকাকে উদ্ধার করেন। মিঃ শামসুদ্দিন আহম্মদ পর্য্যন্ত কুমিল্লা সার্কিট হাউসে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সম্মুখে বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, ব্যাপক ধর্ম্মান্তরিতকরণ, বহু ক্ষেত্রে ধর্ষণ এবং বলপূর্ব্বক বিবাহের অনেক ঘটনা আছে অথচ নোয়াখালীর ইউরোপীয় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের এমনি একনিষ্ঠ লীগপ্রীতি যে, সেদিন তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন, "পাশবিক অত্যাচার, ধর্ষণ, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণের ঘটনা বিশেষ ঘটে নাই এবং এরূপ কোন ঘটনা আমার গোচরীভূত হয় নাই।" সুতরাং নোয়াখালীতে যে কিরূপ পক্ষপাতশূন্য অবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার জন্য যুক্তি-তর্কের প্রয়োজন হয় না। মুসলিম লীগ যে কিরূপ অপক্ষপাত কথা ও কার্য্য চাহেন, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি এবং বুঝিতেছি। কলিকাতায় এবং নোয়াখালীতে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা যে কেবল পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ীই হইয়াছে তাহা নহে, সরকারপক্ষের ঔদাসীন্য হইতে উহার মূল যে বহুদূরপ্রসারী, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও মুসলিম লীগের ষড়যন্ত্রের ফল। এক দিন হয়ত এই সত্য উদ্ঘাটিত হইবেই. কিন্তু বর্ত্তমানে আমাদের কর্ত্তব্য কি?

আচার্য্য কৃপালনী স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়াছেন, "আমার মনে হয়, যদি কোন দিন নিরপেক্ষ ট্রাইবুন্যালের নিকট স্থানীয় ব্যক্তিগণ স্বাধীন ভাবে সাক্ষ্য দেয়, তাহা হইলে আমার বিবৃতি সমর্থিত হইবে। তবে যাহারা সাক্ষ্য দিবে, তাহাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিতে হইবে।" কিন্তু আচার্য্য কৃপালনী হয়ত জানেন যে, চুণ খাইয়া মুখ পুড়িলে দৈ দেখিলেও ভয় করে। কোন ট্রাইবুন্যালের নিরপেক্ষতা সম্বন্ধে আজ আর নিশ্চিন্ত হওয়ার উপায় নাই ইংরেজ জাতি পক্ষপাতহীন বলিয়া এদেশে এক দিন সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আজ ভারতে তথা বাঙ্গলায় যাহা আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে তাহাদের উপর কোন ভরসা স্থাপন করা সম্ভব নয়। নিরাপত্তার আশ্বাসই বা দিবে কে? নোয়াখালীতে এই সকল অত্যাচার ও নিপীড়ন যাঁহারা ঘটিতে দিলেন, অর্থাৎ রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিলেন না, তাঁহারা যদি নিরাপত্তার আশ্বাস দেনই, তাহা হইলেও উহার উপর কতখানি ভরসা স্থাপন করা চলিবে? নিরপেক্ষ তদন্ত হইয়া প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে, এরূপ আশা করিবার মত কিছুই আমরা দেখিতেছি না। বাঙ্গালার হিন্দু যে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হইবে, তাহারই কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে কি? কেহ কেহ এই ব্যাপক নৃশংস ঘটনাবলীর সুযোগে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করা যায় কি না, ভাবিয়া দেখিতেছেন; কিন্তু নোয়াখালীর প্রকৃত অবস্থা জানা সত্ত্বেও ইঁহাদের মনোভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত না হইয়া পারি নাই। কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া বাঙ্গালার হিন্দুকে কিরূপে রক্ষা করা সম্ভব, নোয়াখালীর ঘটনার প্রতিকারই বা সম্ভব কিরূপে, সে কথা তাঁহারা আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিবেন কি?

ওঁ শান্তি

বাঙ্গালা দেশে শান্তি স্থাপনার জন্য সবাই উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। চারি ধারে শান্তির বাণীর ছড়াছড়ি। জাতীয় সরকারের সভাপতি লর্ড-ওয়াভেল, সহ-সভাপতি পণ্ডিত নেহরু, সর্দ্দার প্যাটেল, মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ, মিঃ রব নিস্তার প্রভৃতি কেহই বাঙ্গালার অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে কসুর করেন নাই। স্বয়ং গান্ধীজী বাংলায় আসিয়া নোয়াখালীতে আস্তানা গাড়িয়াছেন। দেশরক্ষা-সচিব সর্দ্দার বলদেব সিং পর্য্যন্ত বাদ যান নাই। বাঙ্গালার অশেষ সৌভাগ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাঙ্গালার বুকে যখন লীগ-গুণ্ডাদের পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার ও বর্ব্বরতম অত্যাচারের অগ্নিশিখা দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল, তখন এক লর্ড ওয়াভেল ছাড়া আর কাহারও সাক্ষাৎ মিলে নাই। বড়লাট আসিলেন, বেড়াইলেন, চলিয়া গেলেন। ব্যস, এই পর্য্যন্তই। কার্য্যতঃ তিনি কিছুই করেন নাই। এমন কি একটি মুখের কথাও খসান নাই। ইঁহাদের আসা-যাওয়াতে অবস্থা যে বিশেষ উন্নত হইয়াছে এমন মনে করিবার কোন কারণ এখন পর্য্যন্ত ঘটে নাই। মৌখিক শান্তিজল অবশ্যই ছিটাইয়াছেন কিন্তু তাহাতে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয় নাই। বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী কখনও কঠোর, কখনও কোমল, কখনও বীর রসে, কখনও গদগদ ভাবে শান্তির জন্য যুগপৎ আবেদন ও গর্জ্জন করিয়াছেন, কিন্তু দুষ্টের দমন করিয়া শান্তি স্থাপনের কোন উদ্যোগ করা প্রয়োজন মনে করেন নাই।

আজ তাঁহাদের বক্তব্যের মূল কথা, কাহার দোষে এ সকল গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইয়াছে, সে সমস্ত তর্কের মধ্যে এখন তাঁহারা

যাইবেন না। আপাততঃ কেবল কলিকাতা বা বাঙ্গালা দেশের নহে, সারা ভারতের জন-সাধারণের নিকট তাঁহারা আবেদন প্রচার করিতে থাকিবেন। আমাদের জিজ্ঞাস্য, শ্রেফ আবেদন প্রচারে কি ফল ফলিবে? কলিকাতার দাঙ্গার পরে সরকারী ও বেসরকারী তরফ হইতে সহস্র সহস্র সদুপদেশ সত্ত্বেও নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চাঁদপুর, ঢাকা ইত্যাদিতে এই সাম্প্রদায়িক বর্ব্বরতম অত্যাচার তো অনুষ্ঠিত হইল। শুধু বুলি আওড়াইয়া শান্তি স্থাপন যে সম্ভব হইতে পারে, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। মারিলে মার খাও, মার খাইয়া মরিয়া যাও, সতীত্ব ধর্ম্মে আঘাত লাগিলে বিষ খাইয়া আত্মহত্যা কর কিন্তু আঘাত হানিও না, ইত্যাদি পাঠ্য পুস্তকের উত্তুঙ্গ বাণী শুনিতে ভাল কিন্তু কার্য্যকরী নহে। জন-সাধারণের কানে ইহা বিদ্রূপের মত শোনায়।

এই দাঙ্গা স্বতঃস্ফূর্ত্ত নহে, দল-বিশেষের রাজনৈতিক স্বার্থ-প্রণোদিত। সেই দলই বাঙ্গালার শাসনতন্ত্রের কর্ণধার। তাঁহারা মুখে শান্তির বুলি আওড়াইতেছেন কিন্তু ভিতরে ভিতরে অশান্তির কলকাঠি টিপিতেছেন। তাঁহাদের দলের অনুষ্ঠিত এই অত্যাচার তাঁহারাই বন্ধ করিতে পারিতেছেন না, ইহাই কি বিশ্বাস করিতে হইবে? প্রকৃত পক্ষে এত দিন বাঙ্গালার সরকারী কর্ত্তারা কেবল নিজেদের অপদার্থতা ঢাকিবার চেষ্টাই করিয়াছেন, অত্যাচার, নিপীড়ন বন্ধ করিবার জন্য কিছুই করেন নাই। কথাটা অপ্রিয়, কিন্তু খাঁটি সত্য। বর্ত্তমান সচিবসঙ্ঘ থাকিতে বাঙ্গালার শান্তির আশা বৃথা, প্রতিটি হিন্দু আজ তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছেন। ৯৩ ধারায় যে বিশেষ কোন উপায় হইবে তাহাও মনে হয় না। গভর্ণর যতই নিয়মতান্ত্রিকতার অভিনয় করুন না কেন, তাঁহার মনোভাব যে কোন্ দল-ঘেঁষা তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের কূটনীতির জন্য এই দাঙ্গা। সুতরাং গভর্ণরের হাতে শাসন ছাড়িয়া দিলে যাহা চলিতেছে তাহাই চলিতে থাকিবে। বাকী রহিল কোয়ালিশন। একযোগে কাজ করিবার মত সুস্থ মনোভাব না থাকিলে তাহা একেবারে একটা হাস্যকর ব্যাপারে পরিণত হইবে। ইহার প্রমাণ কেন্দ্রেই সুস্পষ্ট। কংগ্রেস চাহে স্বাধীনতা নিজের স্বার্থ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিয়া, আর লীগ চাহে সাম্রাজ্যবাদের গোলামী, সেই সঙ্গে কিছুটা স্বার্থ পূরণ। একেবারে বিপরীত চিন্তাধারা লইয়া একত্র কাজ করা অসম্ভব। বাঙ্গালা দেশে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যার পার্থক্য খুব বেশী নয়, অথচ পরিষদে মুসলমানগণ হিন্দুদের অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী। ফলে বাঙ্গালায় কোয়ালিশন গঠিত হইলেও এই সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান সদস্যদের মনঃপূত না হইলে সর্ব্বদাই কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং প্রকৃত শান্তিও স্থাপিত হইবে না।

বাঙ্গালার কংগ্রেসী নেতা শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায় এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কোয়ালিশন গভর্ণমেন্টের পক্ষে। উভয়েরই মত—লীগের সঙ্গে হিন্দুদের মিলন। আমাদের ইহাতে আপত্তি আছে। বহু মুসলমান আছেন যাঁহারা লীগের সভ্য নন। লীগকে আমরা সমগ্র ভারতের মুসলমানদের মুখপাত্র বলিয়া স্বীকার করি না। এই ধরণের কোয়ালিশনে জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা বাদ পড়িবেন! তাঁহাদের দাবীর প্রতি দৃষ্টি রাখা দেশবাসীর কর্ত্তব্য। লীগদলীয় মন্ত্রিসভা অযোগ্যতার চূড়ান্ত দেখাইয়াছেন। আবার তাঁহাদের লইয়া কোয়ালিশন গঠন করিলে জনসাধারণের মনে যে বিশেষ আস্থা জন্মাইবে এমন তো মনে হয় না। লীগ দলের মন্ত্রিসভার ব্যক্তিগুলিকে বাদ না দিলে সে কোয়ালিশন জনগণের বিশ্বাসলাভ করিতে পারিবে না। লীগ নেতারা কি তাহাতে রাজী হইবেন?

কোয়ালিশন সম্পর্কে আর একটা বক্তব্য রহিয়াছে। ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, লীগ দল যদি প্রধান মন্ত্রী ঠিক করিয়া কোয়ালিশনের জন্য তাঁহাদের আহ্বান করেন তবে তিনি নিজ দলের লোক পাঠাইবেন। যে লীগ দল অরাজকতা দমনে এই চূড়ান্ত অযোগ্যতার নিদর্শন দিয়াছে আবার তাঁহারাই প্রধান মন্ত্রী নির্ব্বাচন করিবেন! এবং সেই দলে কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভা গিয়া ভিড়িবেন! কথাটা কেমন যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। হয় তাঁহার নিজের উপর আস্থার অভাব, না হয় আমাদেরই শুনিবার ভুল। আর এই লোক পাঠানোর ব্যাপারটাও ভারী গোলমেলে। জিন্না সাহেব কেন্দ্রে নিজে যান নাই, দলীয় লোক পাঠাইয়াছেন। বাহির হইতে অপকর্ম্মের সুবিধার জন্য এইরূপ করা হইয়াছে। কিন্তু ডাক্তার মুখোপাধ্যায়ের মত ব্যক্তিত্বশালী এক জন সভ্য পাইলে কোয়ালিশন সভা যতটা কাজ করিতে পারিবে, তাঁহার 'নমিনী' ঠিক ততটা পারিবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। কোয়ালিশন মন্দের ভাল, এইটুকুই আমরা বলিতে পারি কিন্তু ভাল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। যত দিন হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা অনুপাতে পরিষদে হিন্দু ও মুসলমান সদস্যগণ আসন না পাইবেন তত দিন কোয়ালিশনের সত্যকার ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

পাকিস্থানী জেনারেল ও ব্যাটম্যান

দিল্লীতে তপশীল ফেডারেশনের সভায় অন্তর্বর্ত্তী সরকারের দুই জন সভ্য যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রণিধানযোগ্য। পাকিস্থানী জেনারেল মিঃ গজনফর আলি প্রাণের আবেগে বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মুসলমানই চায় যে, অপর সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করুক। প্রকৃত পক্ষে, ভারতের চল্লিশ কোটি লোক স্বেচ্ছায় মুসলমান হইয়া যাক, ইহাই তাঁহাদের প্রাণের কথা।" ইহাই হইল লীগের প্রকৃত মনোভাব। বেফাঁস সত্য কথা তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। লীগের অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদানও এই একই উদ্দেশ্যে। বড়কর্ত্তা জিন্না সাহেব নিজেই বলিয়াছেন যে, লীগের সদস্যরা সেখানে 'ওয়াচ ডগে'র কার্য্য করিবেন। তাঁহাদের যন্ত্র করিয়া এই যন্ত্রী পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পথে অগ্রসর হইবেন। তবুও কংগ্রেসী নেতারা আশা করেন, লীগের সহিত মিটমাট করিয়া হাত মিলাইয়া স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। আশাবাদী হওয়া ভাল, কিন্তু তাহারও একটা সীমা আছে। সীমা অতিক্রম করিলে তাহা পাগলামীতে রূপান্তরিত হয়। মিঃ গজনফর আলির উক্তির 'স্বেচ্ছায়' কথাটা নেহাত চক্ষুলজ্জার খাতিরে। আসলে বলিবার ইচ্ছা ছিল 'স্বেচ্ছায়' না হয় অনিচ্ছায়, বলপূর্ব্বক। নমুনাস্বরূপ নোয়াখালী, ত্রিপুরা, চাঁদপুর, সন্দীপ। কত আর নাম করিব।

প্রত্যেক অফিসারের ব্যক্তিগত ফাই-ফরমাশ খাটিবার জন্ত এক জন লোক থাকে। সামরিক ভাষায় তাহাকে বলে 'ব্যাটম্যান'। লীগ-কর্ত্তাদের ব্যাটম্যান তপশীলী নেতা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। লীগের কল্যাণে তিনি আজ অন্তর্বর্ত্তী সরকারের সদস্য। নুণ খাইয়া গুণগান না করিলে চাকুরী যাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। সুতরাং তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন যে, জিন্না সাহেব কেবল লীগের নহেন—সমগ্র ভারতের তিনি নেতা। সমস্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তিনি ত্রাণকর্ত্তা। লীগের সহিত কেন তিনি হাত মিলাইয়াছেন বুঝাইতে গিয়া বলিয়াছেন যে, লীগ চায় পাকিস্থান এবং পাকিস্থানে সকলের সমান অধিকার থাকিবে। অতএব তপশীলীদের আর কোন দুঃখ কষ্ট থাকিবে না। কথাগুলি যে সত্য এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। নোয়াখালীই তাহার প্রমাণ। লীগের অনুগ্রহে কত তপশীলী প্রাণ দিল, কত তপশীল রমণীর ধর্ম্মনষ্ট হইল তাহার ইয়ত্তা নাই। আর সেই জাতির 'গাঁয়ে না মানে, আপনি মোড়ল' নেতা অম্লান বদনে এইরূপ মিথ্যা কথা প্রকাশ্য সভায় উচ্চারণ করিতে পারিলেন! লজ্জা, ধিক্কার কিছুই কি তাঁহার নাই? এই সকল মনুষ্যত্বহীন ব্যক্তিদের লইয়া জাতীয় সরকার গঠিত! আমরা কি আশা করিব!

——

বিহার ও বাঙ্গালা

বাঙ্গালার সাম্প্রদায়িক দাবানল বিহারেও ছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু হাঙ্গামা বাধিবার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রায় সমস্ত কংগ্রেস নেতারা সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ও সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল মুসলিম লীগের দুই জন সদস্য সহ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বাঙ্গালার ব্যাপারের জন্ত নহে। পূর্ব্ববঙ্গ প্রদর্শনের সময় পর্য্যন্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহারা ছুটিয়া গেলেন বিহারে। মহাত্মা গান্ধী তো বলিয়াই বসিলেন যে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিহারে হাঙ্গামা না থামিলে তিনি অনশনে মৃত্যু-বরণ করিবেন। ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নিজে গিয়া সেই অমূল্য বাণী বিহারে শুনাইলেন। পণ্ডিত নেহরু বলিলেন—'কোন মুসলমানকে হত্যা করিবার পূর্ব্বে আমাকে হত্যা কর।' সেই সঙ্গে আবার হুমকী দিয়াছিলেন—সৈনিকরা গুলী চালাইবে, প্রয়োজন হইলে বোমা বর্ষণ করিবে। গুলী চালান হইয়াছিল। বোমাবর্ষণে হত্যার প্রয়োজন হয় নাই।

বিহারে এই হাঙ্গামা বাঙ্গালার হিন্দুদের প্রতি অত্যাচারেরই প্রতিক্রিয়া। বিহারের অন্যতম সচিব শ্রীযুক্ত অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ বলিয়াছেন—"বিহারের ঘটনা বিচ্ছিন্ন ভাবে বিবেচনা করিলে তাহা অসঙ্গত হইবে, কারণ তাহা সমগ্র ভারতবর্ষের ব্যাপারের সহিত সংশ্লিষ্ট। আবার বাঙ্গালায়, বিশেষ কলিকাতায় যাহারা নিহত হইয়াছিল বিহারে তাহাদিগের অনেকের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা তখনও সংযত ছিলেন এবং পরে নোয়াখালীতে হিন্দুর প্রতি অত্যাচারে তাঁহাদের সংযম-বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে।"

কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ ও অন্তর্বর্ত্তী সরকার গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিতে লাগিলেন। বাঙ্গালা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া বিহারকে লইয়া মাতামাতি শুরু করিলেন। তাঁহাদের আচরণের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বিহারে দাঙ্গা থামাইবার চেষ্টাকে আমরা প্রশংসা করি কিন্তু বাঙ্গালা সম্পর্কে এই শৈথিল্য আমাদের সকল শ্রদ্ধা হরণ করিয়াছে। শুনিয়াছিলাম, প্রাদেশিক শাসনকার্য্যে অন্তর্বর্ত্তী সরকার হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। বাঙ্গালার প্রতি প্রযোজ্য এই নিয়মতান্ত্রিকতা বিহারের সময় কোথায় উঠিয়া গেল। যখন বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে দুর্ব্বৃত্ত বর্ব্বরের দল সজ্ঘবদ্ধ ভাবে হিন্দু নারীদের উপর অত্যাচার করিতেছিল, যখন বাঙ্গালী মেয়ের মাথার সিন্দুর পিশাচেরা পায়ে করিয়া মুছিয়া দিয়াছিল, তখন কি বোমা বর্ষণের কারণ ঘটে নাই? সে সময় মহাত্মাজী বিষপানে আত্মহত্যার পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু বিহারের ব্যাপারে এ নিষ্ক্রিয়তা, এ জাড্য তাঁহারা ত্যাগ করিয়া হঠাৎ 'উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত' মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উঠিলেন। এ পার্থক্য কেন? উত্তর মিলিবার আশা বৃথা। তাই আশঙ্কা হয়, শান্তি স্থাপনের চেষ্টা অপেক্ষা মুসলিম-তোষণের চেষ্টাই নেতৃবৃন্দের অধিক। হিন্দুর অপেক্ষা মুসলমানদের প্রাণ, মান, ধনের মূল্য তাঁহাদের নিকট বেশী। পণ্ডিত জওহরলালের উক্তি ও তাঁহার গৃহীত কঠোর ব্যবস্থায় বিহারের তরুণ সম্প্রদায় এতই বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে যে, পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহে তিনি যখন বক্তৃতা করিতে যাইতে-ছিলেন, তখন তাঁহাকে "নিরীহ গ্রামবাসীদের হত্যাকারী" বলিয়া সম্বোধন করে, এমন কি তাঁহাকে প্রহার পর্য্যন্ত করিয়াছিল। অপমানিত হইলেও তিনি উপেক্ষার ভাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরদিনই বিহার ত্যাগে তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই পার্থক্যপূর্ণ ব্যবহারে আমরা মর্ম্মাহত হইয়াছি। জাতীয় সরকার স্থাপনের পথে আমরা অগ্রসর হইতেছি। পণ্ডিত জওহরলাল আমাদের নেতা। তাঁহার কার্য্যকলাপের এই অসঙ্গতির কোন উত্তরই নাই। মুসলিম-তোষণ হয়ত প্রয়োজন কিন্তু যদি হিন্দুদের জবাই হইতে দেখিলেও নিষ্ক্রিয় থাকিতে হয়, পাছে মুসলমানরা চটিয়া যায়, সেই তোষণ-নীতি আত্মহত্যারই নামান্তর। মহাত্মাজীর বড় বড় কথা আমাদের হৃদয়ে 'অমৃতের প্রলেপ সম' কার্য্য করে না। বাঙ্গালার হিন্দুরা যখন মরিতেছে তখন তিনি একটি বাণী দিলেন—তাহারা সকলে মরিয়া গেলেও ক্ষতি নাই, কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা ধ্বংস হইবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিবেন না। ইহা বিদ্রূপ ব্যতীত আর কি!

ওদিকে কায়েদে আজমের বাণী—"প্রেরণা আসিলেই বিহারে যাইব। তার আগে তোমাদের ঘর সামলাও। যেখানে যাই সেইখানেই শুনি,—কায়েদে আজম, আমরা আপনার হুকুমের জন্য অপেক্ষা করিতেছি। কিন্তু জানিয়া রাখো, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না বুঝিব যে, তোমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত ততক্ষণ আমি হুকুম দিব না।" ইহার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। আজ মুসলমানরা কি ভাবে এই বাণী গ্রহণ করিবে তাহা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না! তবুও কংগ্রেস আশা করিতেছে যে, মুসলিম-তোষণের দ্বারা শান্তি আসিবে। মুসলমানদের সন্তুষ্ট করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভারতের হিন্দুদের অনেক ক্ষতি করিয়াছেন, এখনও এ বিষয়ে তাঁহাদের মোহান্ধতা ঘুচে নাই, ইহাই আশ্চর্য্য!

——

পূর্ব্ববঙ্গের অবস্থা

পূর্ব্ববঙ্গের উপদ্রুত স্থানসমূহ প্রদর্শন করিয়া ডক্টর শ্রীমতী মৈত্রেয়ী বসু বলিয়াছেন,—প্রধানতঃ দুই কারণে নারীর উপর অত্যাচারের বিবরণ পাওয়া দুষ্কর—

(১) লোকলজ্জায় প্রকৃত কথা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করে;

(২) অনেক পরিবার নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—অত্যাচারের বিবরণ বিবৃত করিবার কেহ নাই।

কুমারী মুরিয়েল লিষ্টার নির্য্যাতিতদের নিকট হইতে প্রকৃত কাহিনী শুনিয়া বিবৃতি দিয়াছেন—এমনও হইয়াছে যে, স্ত্রীর সম্মুখে স্বামীকে নিহত করিয়া বিধবাকে স্বামীর হত্যাকারীর সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। পশুরাও এত নিষ্ঠুর হইতে পারে না। নারীদের দৃষ্টির মধ্যে জীবনীশক্তি নাই; অত্যাচারের আধিক্যে তাহাদের চোখে মৃতের চাউনি। বিশেষ ভাবে পূর্ব্বে পরিকল্পনা করিয়া যে এই বর্ব্বরতম অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণের উল্লেখও তিনি করিয়াছেন।

ডক্টর অমিয় চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববঙ্গের উপদ্রুত এলাকার সফর হইতে ফিরিয়া আসিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন, যে সকল হিন্দুনারী অপহৃতা হইয়া এখনও দুর্ব্বিষহ যাতনা ভোগ করিতেছেন তাঁহাদের উদ্ধার-সাধনই আজ আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। আমরা যে জীবিত থাকিয়াও তাঁহাদের উদ্ধার-সাধন করিতে পারিতেছি না, এই অবস্থা অসহ্য।

শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী অপহৃতা হিন্দু নারীদের উদ্ধার-সাধন কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলিয়াছেন—সরকারের কর্ত্তব্য পালন চেষ্টার শৈথিল্য শোচনীয়; এখনও বহুসংখ্যক দুর্ব্বৃত্তকে গ্রেপ্তার করা হয় নাই এবং তাহারা এখনও উপদ্রব করিতেছে। তাহারা এখনও হিন্দুদের অবরুদ্ধ রাখিয়া তাহাদের নিকট অর্থ আদায় করিতেছে; উদ্ধারকারী সরকারী কর্ম্মচারীদেরও আক্রমণ করিতেছে, পুলিশের লোককেও হত্যা করিতেছে। এখনও লোকের ধন-প্রাণ-মান নিরাপদ করা সরকারের দ্বারা সম্ভব হয় নাই।

ত্রিপুরা জেলায় উপদ্রবে ক্ষতি ও অত্যাচারের হিসাব সংগ্রহ করিবার জন্য নিযুক্ত মিষ্টার সিম্পসন বলিয়াছেন—একটি অঞ্চলে তিন শত ও আর একটিতে চারি শত নারী ধর্ষিতা হইয়াছে।

এক জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট পঞ্চাশ বৎসর বয়স্কা প্রায় চল্লিশ জন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে তাহাদের উপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নোয়াখালীর জন্য নিযুক্ত মিষ্টার আর গুপ্তের রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নাই, কিন্তু তাঁহার সংগ্রহ-কার্য্যে বাধা দিবার জন্য লীগ-গুণ্ডারা তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল।

এই তো প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কয়েক জন নিরপেক্ষ ব্যক্তির বিবৃতি। অথচ বাঙ্গালার প্রধান-সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বলিতেছেন—"নোয়াখালীর অবস্থা শান্ত।" স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচারের কথা তিনি ও বাঙ্গালার গভর্ণর উভয়েই উড়াইয়া দিয়াছেন। বৃটিশ পার্লামেণ্টে গভর্ণর যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন তাহাতে লীগগুণ্ডা কর্ত্তৃক নারীধর্ষণের কোন উল্লেখই নাই। নিয়মতান্ত্রিক গভর্ণর এবং লীগভক্ত প্রধান-সচিব উভয়েই লীগের অপকার্য্য সম্বন্ধে অন্ধ। এই বীভৎস নারকীয় লীলা প্রত্যেকেই চাক্ষুষ দেখিতে পাইতেছেন, অথচ তাঁহারা কোন প্রমাণই পাইতেছেন না। এই ধরণের অন্ধের চোখ কোন দিনই ফুটিবে না।

কায়েদে আজমের আসল কথা

জিন্না সাহেব সব কথা আবার ভারতবাসীদের শোনান না। বৈদেশিক সংবাদপত্রের উদ্দেশে তিনি যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, 'লণ্ডন টাইমস' পত্রিকায় তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে প্রকাশ, যে, মিষ্টার জিন্না বর্ত্তমান অন্তর্বর্ত্তী সরকারকে কোন মতেই কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন এবং লীগ গণ-পরিষদ বর্জ্জনের যে সিদ্ধান্ত করে, তাহা বাতিল করা হইবে কি না, সে সম্বন্ধেও তিনি কিছু বলিতে ইচ্ছুক নহেন। তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধু, 'সানডে টাইমস' পত্রিকার দিল্লীস্থ প্রতিনিধি মিঃ হেনেসিকে তিনি নিজের মনোভাব কিছু কিছু জানাইয়াছেন। মিঃ হেনেসি জানাইতেছেন—"মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদানের মূল্যস্বরূপ সমস্ত প্রদেশেই 'কোয়ালিশন' মন্ত্রিসভা দাবী করিতেছে। যদি এই দাবী পূর্ণ না হয় তবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতে থাকিবে বলিয়া প্রচ্ছন্ন ভয় দেখান হইয়াছে।"

ইহার অধিক স্পষ্ট ভাষায় আর কি জানাইবেন? বাঙ্গালার লীগ মন্ত্রিসভার ষড়যন্ত্র আজ কেবল ভারতে নহে সমগ্র জগতে বিদিত। সকলেই একবাক্যে ইহার নিন্দা করিয়াছেন এবং লীগ মন্ত্রিসভার অবসান ঘটাইয়া কোয়ালিশন গভর্ণমেণ্ট স্থাপনের দাবী জানাইয়াছেন। হয়ত জনমতের চাপে শেষ অবধি লীগ মন্ত্রিসভাকে পাততাড়ি গুটাইতে হইবে। সেই আক্রোশে তিনি সর্ব্ব-প্রদেশে কোয়ালিশন সরকার গঠনের দাবী করিতেছেন। তাহা হইলে বাঙ্গালার অবস্থা খুব বিসদৃশ দেখাইবে না। কূটনীতিজ্ঞ মিষ্টার জিন্নাকে সন্তুষ্ট করা কংগ্রেসের কর্ম্ম নহে। যতই দেওয়া যাক, খাঁই কোন দিনই মিটিবে না। তাহার কারণ তাঁহার পিছনে রহিয়াছে সর্ব্বগ্রাসী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ। বাঙ্গালায় যে সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার পালা লীগ-দল অভিনয় করিল, তাহার প্রযোজক প্রধান-মন্ত্রী মিষ্টার সুরাবর্দ্দী। তাঁহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন লীগ-দলের প্রধান অধিকারী মিষ্টার জিন্না। আর সেই অধিকারীকে চালনা করিতেছেন জমীদার বৃটিশ টোরী পার্টির ধুরন্ধর মিষ্টার চার্চ্চিল স্বয়ং। সুতরাং ইহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, লীগ-তোষণ মানে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে শোষণের সুবিধা করিয়া দেওয়া।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

বাঙলা—১৩৫৩ —সুভো ঠাকুর

বাঙলা—১৩৫৩

মাসিক বসুমতী
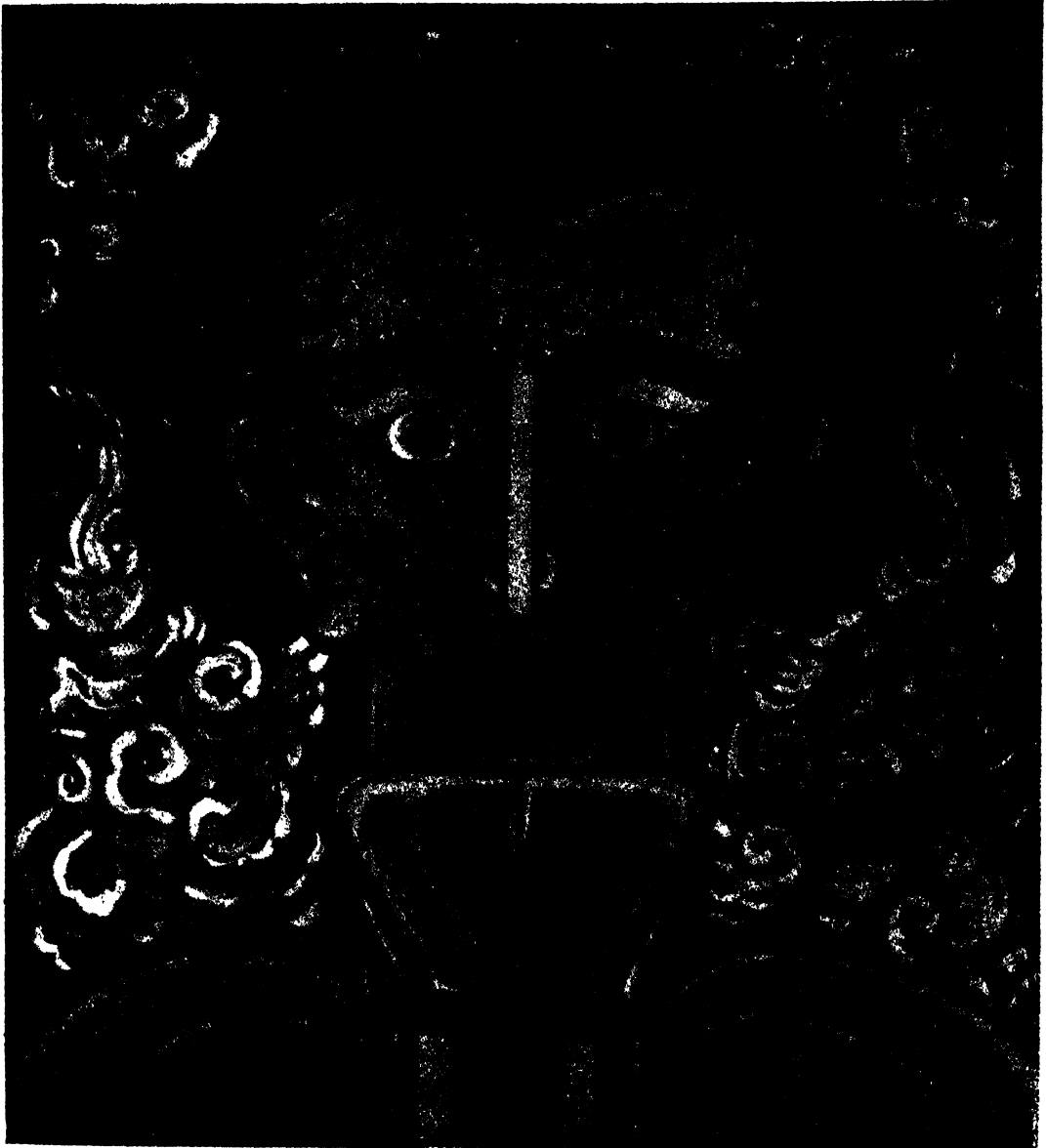
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৫শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩] [দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা

"এই গৃহবিবাদের মূলে একটা ভুল ধারণা আছে। দু'পক্ষই মনে করছেন যে, তাঁরা কে কি বলেন, তার উপরই ভারতবর্ষের সমস্ত ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এ হচ্ছে একটি প্রকাণ্ড ভ্রান্তি! ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষের স্থান যে কোথায়, সে সমস্যা আজ শুধু ঘরের সমস্যা নয়—বাইরেরও সমস্যা এবং এ সমস্যার মীমাংসায় ঘরের চাইতে বাইরের হাত বেশি থাকবে। কেন না, যে-সকল পলিটিক্যাল-কূপ-মণ্ডুকদের দৃষ্টি ঘরের দেওয়ালেই আবদ্ধ, তাঁদের কাকলীও ঘরের বাইরে যায় না। ভারতবর্ষের ভাগ্য যে প্রসন্ন হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই; কিন্তু তার ভিতর বিধাতার হাত আছে। ধর্ম্মের ঢাক আকাশে বাজে, কিন্তু সংসারের হট্টগোলে তার আওয়াজ আমরা বারো মাস শুনতে পাই নে। আজকের দিনে আকাশ জুড়ে ধর্ম্মের জয়ঢাক বেজে উঠেছে এবং তার ধ্বনি বিশ্বমানবের কানে এসে পৌঁচেছে—এমন কি, কোটি কোটি ভারতবাসীরাও তা শুনতে পেয়েছে, কেন না, তারা মূক হ'লেও বধির নয়। এই হচ্ছে একমাত্র আশার কথা। জাতীয় জীবনের একটি বিরাট পর্ব্ব তখনই রচিত হয়, যখন জাতির মনে একটি নূতন সত্যের আবির্ভাব হয়। এ ক্ষেত্রে বিশ্বমানব যে সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করেছে, সে হচ্ছে এই যে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আসল সম্পর্কটা হচ্ছে ভাই-ভায়ের সম্পর্ক, দাস ও প্রভুর নয়। এই সত্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই হচ্ছে নবযুগের ধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মের সাধনায় সকলকেই চাই, অথচ কাউকেও চাই নে;—অতএব সকলে এক হও, একলা সকল হ'তে চেষ্টা করো না।"

—প্রমথনাথ চৌধুরী

রুচি-বিকার

শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১

এ বয়সে আর কল্পনাকে নিয়ে মাথা ঘামানো কেনো? তিনিও আর কাছে ঘেঁসেন না—বিদায় নিয়েছেন। তোমরা বিশ্বাস কর না—লিখতে বলো। তাই নিজের "দেখা-বিষয়" লেখবার চেষ্টা পাই। তার কিন্তু একটা মস্ত বড় দোষও আছে—সে বাড়তে চায় না, না বাড়লে "কাগজও" পোরে না।

সকল গ্রামেই ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে দুয়েক জন গাইয়ে থাকে। গাইয়ে কে নয়,—কেউ মনে মনে ভাঁজেন কেহ বা গলা ছাড়েন। শেখা বিদ্যে কা'রো নয়, সুকণ্ঠ হলেই আমরা গাইয়ে বলি বা খুশী হই।

আমাদের মধ্যে হরিপদ ভায়াই ছিলেন গাইয়ে। তাঁকে নিয়েই আমাদের ও-অভাবটা মিট্‌তো। শখের 'অপেরায়' কি 'পাঁচালী'তে তিনিই ছিলেন আমাদের ওস্তাদ বা প্রধান। শেখা বিদ্যা না হলেও সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর বিশেষত্ব ছিল অনেকগুলি। বাদ্যযন্ত্রাদির সুর মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা ছিল আশ্চর্য্য রকমের। অভিজ্ঞেরা কোনো দিন "বে-সুরো" বলতে পারেননি। জলভরা বাটিতে ঘা মেরে বলে দিতে পারতেন আওয়াজটা 'পা' বললে কি 'ধা' বললে। আবার বাটির জল কমিয়ে বাড়িয়ে 'সা' বলছে কি 'নি' বলছে, বলে দিতেন।

আমাদের কাছে সবই সমান ছিল, ওস্তাদেরাই বুঝতেন, অবাক্ হতেন। ভাবতেন—এ 'কান্' সে কোথায় পেলে! হরিপদর গলাও ছিল যেমন জোর 'ভল্যুমের' তেমনি ভরাট। অর্থাৎ বড় গাইয়ের সব গুণই তার ছিল। লেখাপড়া বড় করলে না, সুরেতেই তার শখ,—সুর নিয়েই রইলো। কিন্তু কাজকর্ম্ম করাও তো চাই—পেট তো সঙ্গেই আছে, পরিবারও আছেন।

২

তখন সেটা লালচাঁদ বড়াল মশায়ের যুগ। তিনিই বঙ্গ-বিখ্যাত গাইয়ে। সঙ্গীতের প্রসঙ্গ মাত্রে তাঁর নামই প্রধানের মধ্যে স্থান পেত বা প্রথম স্থান নিত।

দক্ষিণেশ্বরের "দক্ষযজ্ঞ" অপেরা তখন কলকেতার ক্ষেতু মল্লিক মশায়ের বাড়ী হয়ে গিয়েছে ও প্রশংসা পেয়েছে। পুরুষদের ধ্রুপদ ও মেয়েদের খেয়াল গান ছিল ও তা সুন্দর ভাবে গীত হয়েছিল। এ কথা বন্ধু-বান্ধবদের কাছে শুনে লালচাঁদ বড়াল মশায়ের শোনবার শখ হয়।

এক শনিবার প্রকাণ্ড জুড়ি হাঁকিয়ে, কয়েকটি বন্ধু-বান্ধব সঙ্গে, তিনি আমাদের রিহার্সেল শুনতে আসেন। অভাবনীয় হলেও, প্রায় ঘণ্টা তিনেক থাকেন। শেষ, ভদ্রোচিত ভাবে অনুরোধ জানিয়ে যান ও আগামী ৺জগদ্ধাত্রী পূজার রাত্রে তাঁদের বাড়ীতে 'দক্ষযজ্ঞ' অভিনয়ের প্রস্তাব পাকা করে তবে ওঠেন। যতক্ষণ ছিলেন, আমাদের হরিপদর দিকেই তাঁর চিত্ত আবদ্ধ ছিল। তার সুর বাঁধা থেকেই তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনেছিলেন। পরে কথা-বার্ত্তা, পরিচয় সবই হয়ে যায়। খুশী হয়েই বিদায় নেন।

হরিপদ সুরজ্ঞ ছিল, গানই বুঝতো। অতিরিক্ত মৌখিক ভদ্রতার বালাই তার ছিল না। বিখ্যাত বড়াল মশাই স্বয়ং এসেছেন, তদুপযুক্ত সম্মানের সহিত তাঁর সঙ্গে আলাপ করা যে কর্ত্তব্য, তার সে সব ছিল না, জানতও না। অথচ অহংকারের লেশমাত্র তার মধ্যে ছিল না। আমরা ভেবে মরি, সামলাবার চেষ্টা পাই। তাকে সে সব কথা বলেও ফল ছিল না।

৺জগদ্ধাত্রী পূজা এসে গেল। বড়াল মশাইর বাড়িতে আসর; কলকেতার যত গুণী গাইয়ে-বাজিয়ে উপস্থিত। আমরা ভয়ে আড়ষ্ট। আখড়াই গান হয়ে গেল, মায়ের কৃপায় ভালই হয়ে গেল।

পাশের এক বাড়িতেও পূজা ছিল। সেখানেও বাগবাজারের সুপ্রসিদ্ধ "অভিমন্যুবধের" অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। দেখি সে আসর ছেড়ে অনেকগুলি ভদ্রলোক বড়াল মশায়ের বাড়িতে হাজির হলেন, মায় বিখ্যাত বাজিয়ে নিতাই চক্রবর্ত্তী মশাইও। তিনি এসেই আমাদের বাজিয়ের হাত থেকে মৃদঙ্গ নিয়ে স্বেচ্ছায় বাজাতে বসে গেলেন। সকলে নির্ব্বাক্। কারণ তিনি ছিলেন পেশাদার বাজিয়ে। আমার ঠিক স্মরণ নাই—১৬ কি ৩২ টাকার কমে ঢোলে হাত দিতেন না। আসর আগুন হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিন—অনেক বেলায় অভিনয় শেষ হলে ভিড় ভাঙে। যে কারণেই হউক—অভিনয়াদি আশাতীত জমে গিয়েছিল,—আমরা সুনাম নিয়েই ফিরি।

সকলেই আশা করি, বড়াল মশায়ের সাহায্যে হরিপদর কাজকর্ম্মের একটা উপায় হয়ে যেতে পারে। এই স্বার্থ চিন্তাটা আমার মধ্যেই বেশী রকম ঘুরছিল। হরিপদর অকপট ভাব আমাকে আনন্দ দিত। আমার জব্বলপুরে বদলি হবার পরও তাকে দু'-তিন বার সেখানে নিয়ে যাই। তার তরে একটা কাজকর্ম্মের চিন্তা সর্ব্বদাই থাকতো।

৩

কলকেতার কয়েকটি শৌখিন লোক হরিপদর গান শুনতে চাওয়ায় আমি তাঁদের সমাদরে আহ্বান করে

আনি। সেটা ছিল রবিবার—আমাদের আখড়া-ঘর সরগরম। তাকে বললুম—"যাঁরা এসেছেন, সব বড়লোকের ছেলে, গান-বাজনা নিয়েই থাকেন। ওদের এক জন নূতন রঙ্গমঞ্চ খুলবেন, তোমার নাম শুনে, কষ্ট করে এসেছেন। তাঁদের খুশী করে দেওয়া চাই ভাই। একটি এমন গান ধোরো—যাতে এক গানেই মাত্ হয়ে যান।"

সে বললে—"গান বোঝেন তো?"

বললুম—"তা না হলে আর কষ্ট করে এসেছেন!"

বললে—"বেশ, তাই হবে কেদার।"

আমি নিশ্চিন্ত। সকলেই প্রত্যাশাপন্ন। সে সুর মেলাতে ব্যস্ত।

এখানে একটা বিশেষ দরকারি কথা বলতে হচ্ছে—যা না বললে নয়। গান ও তার সুর জিনিসটি মস্ত বড় art, তার মধ্যে সাহিত্যও গোপনে কাজ করে—রচনা-বিন্যাস কম সাহায্য করে না,—তার দেহসৌষ্ঠব লালিত্য যোগায়। তাতেই রুচির কথা আসে, অথচ সুর ও রুচি এক বস্তু নয়,—স্বতন্ত্র। সেটা যে একটা বড় দিক্, হরিপদ সে দিক্‌টা কোনো দিন বোধ হয় ভাবেনি, তার ধাতে তা ছিলও না।—"গীতের আবার নির্ব্বাচন কি, কতকগুলা কথা বই তো নয়,—ধ্রুপদী কি খেয়ালীরা কথার তক্কা রাখে না, আঁ্যা উঁ ক'রে কেবল সুর বজায় রেখে যায়, তাতে কোন্ ক্ষতি হয়?—যাক্ সুর ঠিক থাকলেই হ'ল।"—ইত্যাদি বলতো।

সকলেই উদ্‌গ্রীব। হরিপদ ভাবা-চিন্তা নেই, সে গান ধরলে। কোথা থেকে যে সহসা সকলকে চমকে দিয়ে আরম্ভ করলে জানি না—

* * "তোর ভঙ্গী দেখে ভয় করে।"

সর্ব্বনাশ! আর কি গান ছিল না? আর কেউ ভয় পেয়েছিল কি না জানি না, আমি তো ভয়ে আড়ষ্ট কথায় না ছিল রস, না লালিত্য, আরম্ভেই শ্রুতিকটু লাগলো। কারো পানে চাইতে পারি না,—এই অবস্থা দাঁড়ালো।

আগন্তুক কয়টি "সিগারেট খেয়ে আসি" বলে বাইরে গেলেন। বুঝতে বাকি রইলো না—tolal failure.

তাঁদের ভদ্রতায়ও প্রশংসা করতে পারি না কিন্তু উপায় কি?—তবু সেটা রবীন্দ্রনাথের যুগ নয়। তাহলে যে আমার দশা কি হত, ভাবলে ভয় হয় তাঁর "দুঃখের পূজা" আমাকেই সমাপন করতে হত।

কথার গুণ যে কতো আজ তা ছেলে-মেয়েদেরও বুঝতে বাকি নেই। হরিপদ তা বোঝেনি, সে সুরই বুঝতো—সুরের গোঁড়াই ছিল। পরে আমাকে বলেছিল—"তুমি যাকে তাকে গান শোনাতে বলো কেনো যারা সা রে গা মা বোঝে না? তুমি বললে 'বোঝে,' তাই আমি এমন গান ধরেছিলুম যাতে সাতটি পরদার সূক্ষ্ম স্পর্শ সঙ্গীতজ্ঞেরা মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করতে পারেন। যাদের এনেছিলে ওরা 'আয় লো অলি' শোনবার লোক। আর এনো না।"

বললুম—"তোমাকে সে কথা আর বলতে হবে না ভাই, আমারি অপরাধ হয়েছে।"

—"না না, তুমি ও-কথা ভেব না,—সকলেই কি সমঝদার হয়?"

ভায়া খুব সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাই রক্ষা। তার ভুল হয়নি, ভুল হয়েছিল আমার। তাই রুচি সম্বন্ধে কিছু বলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল। যুগ অনেক এগিয়ে এসেছে, এখন আর তার আবশ্যক দেখি না। থাক্, আমাদের রুচিরাজ রবীন্দ্রনাথ যে রুচির খনি রেখে গেছেন তাই যথেষ্ট। তা—

"যেন' ভুলে না যাই, বেদনা পাই
শয়নে স্বপনে।"

যে যা নিয়ে আসে তার সে প্রকৃতিকে বদলানো অত্যন্ত কঠিন,—মনে হয় অসম্ভব। সে যা করতো—সেখানে তার কাছে ভুল থাকতো না, সে কেবল desencyর আবরণ দিতে জানতো না। সেটিও সে বড় বিশ্রে, সে তা স্বীকার করতো না। বলতো—"তোমরা খাঁটি জিনিসের কদর দিতে এতো কুণ্ঠিত হও কেনো? সুন্দর করে' বলতে পারলেই কি একটা ঝুটো জিনিসকে সুন্দর করা যায়? আমি তা'তে অভ্যস্ত নই—পারবও না ভাই।"—তাই, আমাদের চেষ্টা সত্ত্বেও সে তার যোগ্য স্থান পায়নি,—কষ্টেই কাটিয়ে গেছে।

আমাদের গ্রামের রায় বাহাদুর ৺প্রসন্নকুমার বন্দ্যোর বাড়ী, বিখ্যাত গাইয়ে ছুন্নিখাঁর গান হয়। গোটা তিনেক গানের পর তিনি বলেন—"আমি বড় ক্লান্ত, এখানে কি কেউ গাইয়ে নেই, আমাকে একটু সাহায্য করুন না! একা আসর রাখা যায় না।" তা'তে হরিপদ ভায়া তাঁর পায়ের ধুলো আর অনুমতি নিয়ে একটি গান করে। ছুন্নিখাঁ আরো একটি শুনতে চান। শুনে খুব খুশী হন ও তার পিঠ চাপড়ে বলেন—"বেটা, তুম হামারে সাথ চলো"—ইত্যাদি। সংসারে আর কেউ না থাকায়, সে তা পারেনি। দুঃখের সংসারে তাই হয়। ছুন্নিখাঁর সেই পিঠ চাপড় নিয়েই সে চলে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত তাই ছিল তার আনন্দের সম্বল।

মা শিল্পী—মুকুন্দ মজুমদার

গ্রাম শিল্পী—সুপ্রভাত নন্দন

নারী

শিল্পী—সূর্য্য রায়
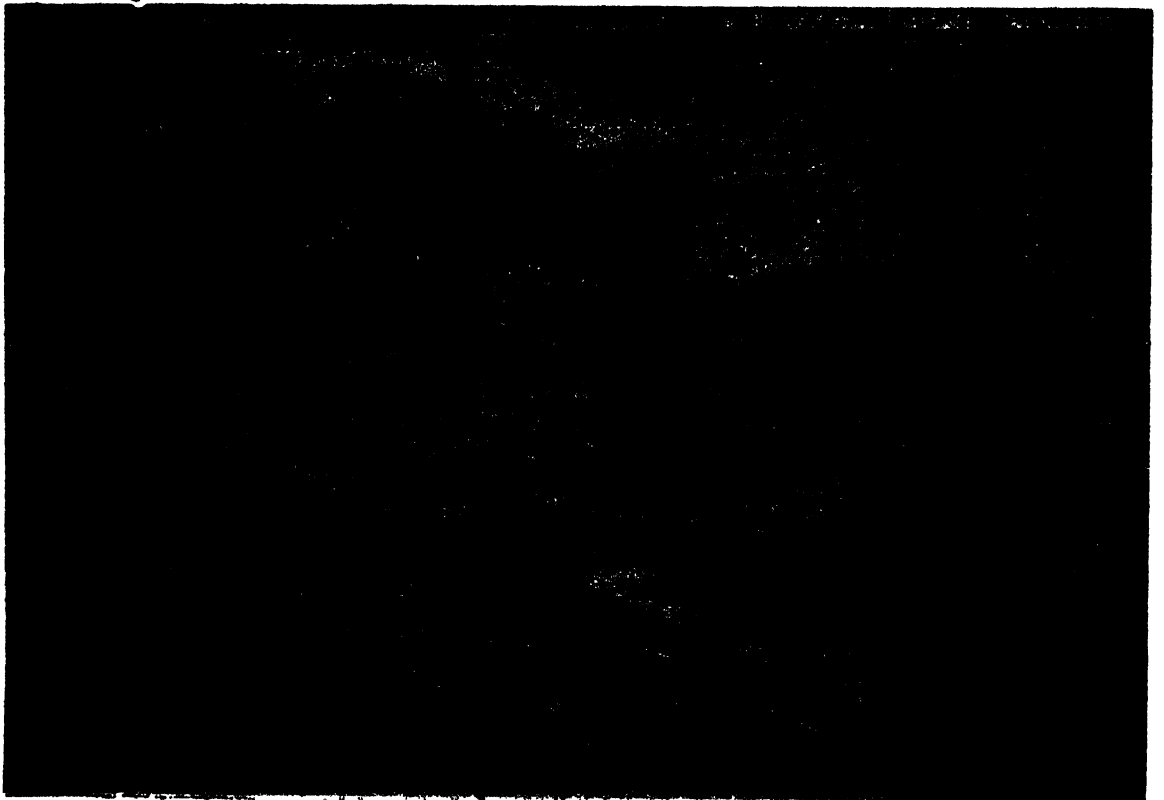
একটি কবিতা

বিষ্ণু দে

প্রকৃতির মায়া
আহা বনরাজিনীলা!
হে তমাল-তালীবন!
সমুদ্র-বীজনস্নিগ্ধ সফেন কল্লোল!
বালিয়াড়ি হীরা জলে, ছোটো ছোটো টিলা,
শান্ত মৃদু খাড়ি—যেন তনুকায়া—
অষ্টাদশী! প্রকৃতির মায়া—
জীবনে-মরণে গাঁথা জীবনের আয়ুষ্মান্ রূপে
কাটে না এবার ছুটি
স্বচ্ছল ভূস্বর্গ সুখে—কবে চুপে চুপে
হয়ে গেছে জীবনের হার—
আজকে সবাই প্রতিবেশী ভাই, হে প্রকৃতি ভুলে যাই
জীবনের মরণের হারে বাঁধা জীবনের ছবি
আজ শুধু মারি, মরি, পুড়ি ও পোড়াই, ক্ষেপি আর লুঠি।
এ মরণে প্রাণ নেই, এ তো নেশা উন্মাদের
শক্তিমদমত্ত অন্ধ পাগলের অপ্রাকৃত আঁধি!
হে প্রকৃতি, আমরা মানুষ, এই মরণস্বাদের কবি
মদিরায় আমরাই, নয় তালীবন
সমুদ্র-বীজনস্নিগ্ধ ঢেউয়ের জীবন নয়,—ছায়া-ঢাকা খাড়ি
নয়, হীরাজ্বালা বালিয়াড়ি নয়, হে প্রকৃতি,
আমরাই মরি আজ আপন পাশার ছকে
তবু স্থির জানি, তবু মন দৃঢ় সত্যে বাঁধি
এই রোগে এ মরণে প্রাণ নেই, প্রাণ ন্যায়ে, সমান সুযোগে
নিকটে সুদূরে কাশ্মীরে ও ত্রিবাঙ্কুরে, রক্তাক্ত গোল্ডেন রকে
অনেক হাসানাবাদে প্রাণের আবাদে,
নয় বনিয়াদী হত অপঘাতে
হে প্রকৃতি আমরা মানুষ, নই বনরাজিনীল
তালীবন তটরেখা নই—
আমাদেরই কর্মে-লেখা আমাদের দুর্গত জীবন
আমাদেরই ভবিষ্য ও স্মৃতি।

বাজার

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফুটপাথে থেমে আমি এক মনে খুঁজি ফাঁকা ট্রাম
হকারের হাঁক শুনি : তাজা খবর, অসংখ্য গ্রাম
পুড়ে-পুড়ে ছাই হোলো। এক আনা দাম !—তার পর
হেমন্তের সন্ধ্যা দেখি, আকাশের প্রশান্ত প্রহর।
এ-সৌন্দর্য সত্যি না কি ? কেনই বা সত্যি এটা নয় ?
পকেটের পোড়া বিড়ি, নীল সন্ধ্যা : অপূর্ব বিস্ময়।
আপেলেতে মাছি বসে, চুলের জরির শাদা ফিতে
মারাঠি মেয়েটি থামে, নীচু হয় সেটা তুলে নিতে।
উঁচু বাড়িটার পাশে ক্ষণিকের এই নীল মায়া
ধোঁয়াটে গ্রামের পাশে মরা মুখ আর আবছায়া।

পা যে চায় না চলতে, কাকে খুঁজি, পাই কি না পাই !
বাজারের জনতায় আবার হারিয়ে বুঝি যাই।
দেহের নীচের মনে, মনের নীচের অন্ধকারে
এলোমেলো বহু শব্দ ভেসে-ভেসে আসে বারে বারে
তারা ছিলো একদিন, তারা ছিলো একদিন পাশে
তাদের চোখের দৃষ্টি ধরা পড়ে সন্ধ্যার আকাশে।
এই নীল মৌন গানে তাদের স্পন্দন শোনা যায়
কেউ মাটি, কেউ ছাই, আলো হায় কেউ বা মিলায়।

তারা ছিলো একদিন। স্মৃতিখানি ক্ষীণতর হয়ে
উড়ে যায় ভেসে যায় মেঘের মিনার দিয়ে দিয়ে।
তবু তো যায় না তারা ! আমাদেরি পাশে জেগে থাকে,
কিংবা থাকে না কেউই ; সময়ের শিল্পী শুধু আঁকে :
শিশুর গভীর মায়া, সায়াহ্নের নীল ছায়াখানি
কখনো রঙীন পটে ছবি হয়ে মুছে যায় জানি।

আমি ক্লান্ত অভাজন ধীরে-ধীরে চলি ঘরে ফিরে
মনের দেয়ালে আঁকি অসংখ্য মুখের ছবি
নোখ দিয়ে চিরে।
স্মৃতির ভাণ্ডারে শুধু পুরু হয়ে ধুলো পড়ে থাকে
সেখানে হারাই পথ চলেছে হাজার রথ
খুঁজি তবু কাকে ?

নোয়াখালিতে কৃপালনী

শিল্পী—বিমল রায়

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ভোরে আজ চারি দিক্ ঢেকে গেছে ঘন কুয়াশায়। অল্প দূরেও নজর চলে না। এমনি কুয়াশায় রাত্রি শেষ হয় আজকাল, আবার হিম হিম কুয়াশার যেন আভাষ মেলে সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে। কুয়াশা কাটতে বেলা হবে, তখন দেখা যাবে চারি দিকে মাটি ঢেকে গেছে আগামী ফসলের তরুণ সবুজ চারায়। ছড়ানো বীজ থেকে এলো-মেলো ভাবে ছড়িয়ে জন্মেছিল শিশু, গোছায় গোছায় সাজিয়ে রোপণ করেছে চাষী। সারা দিন কাঁচা সবুজ শীষগুলি বাতাসে দোলে। নবাগত উত্তুরে বাতাস এখনো খেয়ালী, চপল। থেকে থেকে হঠাৎ থেমে যায়, বায়ু বয় পূব থেকে, তা-ও আবার হঠাৎ দিক্ পরিবর্ত্তন করে বইতে সুরু করে দখিণা হয়ে। ধানের শীষ টিপলে এখন দুধ বেরোয়, মা'র স্তনের দুধের চেয়ে ঘন, বুঝি বা মিষ্টিও। চাষীরা বলে যে তা হবে না কেন, মানুষ-মায়ের বুকে দুধ তো আসে মাটি-মায়ের দানা-বাঁধা এই দুধ খেয়েই।

বাপ রে, কি কুয়াশা! ভুঁই ফুঁড়ে মেঘ উঠেছে মনে করে যেন। ভূষণ বলে রসিক আর তোরাব আলিকে। দাওয়ায় বসে চেনা যাচ্ছে না বিশ-পঁচিশ হাত দূরে মাটির রাস্তায় কে হেঁটে যাচ্ছে, এদিকের ডোবা থেকে উঠে আসছে কোন বাড়ীর বৌ।

রসিক বলে, ধরণী ব্যাটা ঘুমোবে বেলা তক্। একটু দেরী করেই রওনা দি' মোরা, না কি বল মিঞা ?

রসিক ভূষণের বোনাই, পাড়াতেই খানিক তফাতে তার ঘর। তোরাব এক রকম প্রতিবেশী ভূষণের, দু'জনের বাড়ীর মধ্যে ব্যবধান শুধু একটা বাঁশ-ঝাড় আর কয়েকটা কুল গাছের।

দেরী হয়ে যাবে না ? ছুতা করে আজ যদি কর্জ্জ না দেয় ? তোরাব বলে একটু উদ্বেগের সঙ্গে। ধরণী তরফদার ধান কর্জ্জ না দিলে কাল-পরশু ওদের দু'জনের ঘরেও উপোস সুরু হয়ে যাবে কিন্তু তোরাব আলির ঘরে কাল থেকে এক দানা চাল নেই।

ভূষণ বলে, দেবার মতলব না থাকলে রাত থাকতে গিয়ে ধন্না দিলেও দেবে না। মতলব থাকলে যখনি যাও মিলবে।

সে কথা ঠিক। আগেকার দিনে ধরণীর কাছে কর্জ্জ চাইতে যেতে হলে এরাই হয়তো এক জন চুপি-চুপি আরেক জনের আগে গিয়ে নিজের জন্য কর্জ্জটা আগে-ভাগে বাগিয়ে নেবার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ চাষীরা প্রায় সকলেই টের পেয়েছে ওতে কোন ফল নেই, কে আগে এল তোষামুদে কথা কইল বা কান্নাকাটি করল সে সব বিচার করে না ধরণী তরফদার। যাকে না দেবার তাকে কিছুতেই দেয় না, যাকে দেবার তাকে দেয়, সমান বাঁধনে বাঁধে। ভাণ্ডারও তার অফুরন্ত, মন্বন্তরের রিলিফখানার খয়রাত নয় যে আগে গিয়ে মারামারি কামড়াকামড়ি না করলে ফুরিয়ে যাবার ভয়। তবে কি না আজও না খেয়ে থাকতে হলে মুস্কিল, বৌটা তোরাবের আসন্ন-প্রসবা, বড় কমজোরী হয়ে পড়েছে শরীরটা তার এমনিতেই। সব জেনে-বুঝেও উদ্বিগ্ন মনটা ধৈর্য্য মানে না।

দেড় ভাগি চাপাবে ঠিক। না তো দেবে না মনে করে।

তা মানবো না মোরা।

না, তা মানবো না, আল্লার কিরে। এক মুহূর্ত্তে তোরাব যেন ভয়-ভাবনা-উদ্বেগ ভুলে যায়, হাঁটুতে জোর চাপড় মেরে বলে, পোয়া সুদের এক কুণো বাড়তি মানব না, না দেয় কর্জ্জ না দেবে।

গত বছর ফসল কাটার দশ-বার দিন আগে বিপদে পড়ে দেড় ভাগি সর্ত্তে ধান নিতে হয়েছিল তোরাবকে ফজলু মিঞার কাছে, সে জ্বালা আজও সে ভোলেনি। বর্ষাকালে ধান কর্জ্জ মেলে দেড় ভাগিতে, ফসল ঘরে উঠলে দেড় গুণ শোধ, ফসল কাটতে আর মাসখানেকও বাকী নেই পুরো, আজ ও-সর্ত্ত চাপাতে চাওয়া তো দিনে ডাকাতি।

চলো মিঞা দেখি অদেষ্টে কি আছে। গরজ তো মোদের, ও ব্যাটার কি? রসিক বলে কলকেতে সুপারির মত একগুলি তামাক দিয়ে হাতের তালুতে নারকেল ছোবড়া পাকাতে পাকাতে।

বটে না কি? ভুবণ বলে ব্যঙ্গের সুরে, ও ব্যাটার কি? কর্জ্জ না দিলে তো ঘরের ধান ঘরে রইবে, বাড়বে এক দানা? উয়ার কারবার এই, কর্জ্জ দেবার গরজ কিছু কম নয়।

ঠিক, ওঁৎ পেতে বসে থাকে মোদের খেলাতে, তোরাব বলে, মোরা হার মানি, নয় তো—

কুয়াশা নড়ে না, হাল্কা হয় না। চালা থেকে টপ-টপ জল পড়ছে। হাত বদল করে তারা কল্কেতে কয়েকটা ছোট-ছাট আর একটা বড় টান দিয়ে তামাক খায়, চিন্তিত ভাবে তাকিয়ে থাকে বাইরের দিকে। বাসন ঠোকার আওয়াজে অন্দর থেকে ডাক আসে ভুবণের। ছেলেটার জ্বর এসেছিল পরশু, কাল রাত্রে খুব বেড়েছিল জ্বরটা, গা যেন তপ্ত খোলার মত পুড়ে যাচ্ছিল। এখন খুব ঘাম দিয়ে তাড়াতাড়ি জ্বরটা ছেড়ে যাচ্ছে, ছেলেটা ছটফট করছে গোঙিয়ে গোঙিয়ে। ছেলের কাছে একটু বসে উঠে আসে ভুবণ।

হাসপাতালে যাবে না একবার? তার বৌ শুধোয়।

হাঁ, হাসপাতাল হয়ে ফিরব।

সে ছাড়া বাড়ীতে দ্বিতীয় পুরুষ নেই ভুবণের, পাঁচটি স্ত্রীলোক। সব ঝঞ্ঝাট সব হাঙ্গামা পোয়াতে হয় একা তাকে।

বাইরে এসে সেই এবার গরজ করে বলে, চলো রওনা দি', বসে থেকে কি লাভ?

এই সোনামাটি গাঁয়েরই দীঘিপাড়ায় ধরণী তরফদারের টিনের ঘর আর দালান-কোঠায় মেশান বাড়ী, ভুবণের বাড়ী থেকে আধ ক্রোশের বেশী দূর। রাস্তায় তারা নাগাল ধরে পিনাক সামন্তের, সেও কুয়াশা ভেদ করে গুটি-গুটি হেঁটে চলেছে তরফদারের বাড়ীর উদ্দেশে। মানুষটার বয়স খুব বেশী হয়নি, অকালে বুড়িয়ে জীর্ণ আর বাঁকা হয়ে গেছে সত্তর বছরের বুড়োর মত। তরফদারের কাছে তার প্রয়োজন ধানের কর্জ্জ নয়, বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এক চোরাগোপ্তা একতরফা মামলায় জমি নীলামের নোটিশের প্রতিবাদে কাকুতি-মিনতি করা। তার ছেলে কৈলাস গেছে বিদেশে খাটতে, ফসল কাটার সময় আরও নিকট হলে ফিরবে, কি করবে ভেবে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পিনাক।

বলে, মরণ হলে হাড় জুড়োত, অদেষ্টে মরণ নাই। সেই যে গোল বাধালে কৈলেস, নাখুর হয়ে সাক্ষী দিলে ঘর জ্বালানোর মামলায়, সে রাগটা ঝাড়লে তরফদার। মরণ হলে হাড় জুড়োত, অদেষ্টে মরণ নাই।

সবাই জানে সব, বোঝেও সব। আস্তে পা ফেলে পিনাকের সাথে গতি মিলিয়ে তারা হাঁটে। গিয়ে ধরে পড়লে যে কিছু হবে না এ জানা কথা। তারা জীর্ণ শরীর নিয়ে ছুটোছুটি করে পিনাককেই ঠেকাতে হবে নীলাম, লড়তে হবে মিথ্যে মামলা ফাঁস করতে, অবশ্য যদি লড়ে, লড়তে পারে। কৈলাস এসে কেঁদে-কেটে মাপ চেয়ে নাকে খত দিলে বড় জোর আপোষ হবে একটা, দয়া করে কিছু কমে সমে রেহাই দেবে ধরণী। নয় তো যাবে জমি নীলাম হয়ে।

ভুবণ শুধায়, কৈলেসের শ্বশুর না মর-মর হয়েছিল?

মরল কৈ? পিনাক বলে দারুণ হতাশে, যে মরলে ভাল সে কি মরে? উয়ার মরণ নাই, মোর মরণ নাই, মোর চিরজীবি হয়ে রইব।

কৈলাসের শ্বশুরের দু'টি মাত্র মেয়ে, সে মরলে তার জমি-জমা ঘর-দুয়ার ভাগাভাগি করে মেয়েরা পাবে। তার অসুখ-বিসুখের খবর পেলেই জামাই দু'জন ছুটে যায় দেখতে, এমনিও যায় যখন তখন দেখতে। পূজার পর কঠিন রোগে পেড়ে ফেলেছিল, কিন্তু বুড়ো আবার বেঁচে উঠেছে।

পিনাকের সঙ্গে হেঁটে দীঘিপাড়ায় পৌঁছতে পৌঁছতে কুয়াশা খানিকটা হাল্কা হয়ে আসে, এবার তাড়াতাড়ি কেটে যাবে। দীঘিপাড়ায় ঘন বসতি, টিন বা খড়ের চালার বাড়ীই বেশী, দালানও আছে কয়েকটা। সোনামাটির এই দীঘিপাড়া ও কুয়াতলাতেই গাঁয়ের অধিকাংশ স্বচ্ছল, সম্পন্ন এবং গরীব ভদ্র গৃহস্থের বাস। দীঘিপাড়াতে বড় জোতদার আছে আরও দু'জন, তবে ধরণীর মত জবর কেউ নয়, দু'জনের মিলিয়ে যত হবে তার চেয়ে বেশী মাটি ও বেশী চাষীর সে ভাগ্যবিধাতা। পশ্চিমে কিছু তফাতে বুড়ো বটগাছটা ঘেঁষে ইন্দ্র শাসমলের বাড়ীর সামনেও কর্জ্জপ্রার্থী চাষী কয়েক জন জমা হয়েছে এখান থেকে দেখা যায়। আশু পট্টনায়কের বাড়ীটা আড়ালে।

ধরণী এখনো দর্শন দান করেনি, তবে আর খুব বেশী দেরী যে তার হবে না অন্দর থেকে সদরে আসতে তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। তক্তপোষের ফরাস ঝেড়ে বাঁধানো হুঁকোটা রেখে গেছে কানাই, বুড়ো লোচন সরকার চোখে চশমা এঁটে খেরো-বাঁধানো খাতা খুলে বসেছে, ধরণীর ভায়ে আচমকা এসে উঁকি দিয়ে গেছে।

তারা ছাড়াও আরো অনেকে মেঝেতে উবু হয়ে বসে আগে থেকে অপেক্ষা করছিল, ইতিমধ্যেই আরও দু'জন এল। রাজেন দাসকে দেখে একটু অবাক লাগে সকলের, তার অবস্থা ভাল বলেই জানত সকলে, বছরের কোন সময়ে ভাতের অভাব হয় না। ধান কর্জ্জ চাইতে এসেছে রাজেন দাস, না টাকা? অথবা অন্য কাজে এসেছে? যেমন বিপন্ন ভাব তার, কারো দিকে না তাকিয়ে যে ভাবে এক পাশে দাঁড়িয়ে চোখ পেতে রেখেছে বরাম গাছটায়, অনভ্যাসের কাজ অনুগ্রহই বুঝি চাইতে এসেছে। বাসু আর ফকিরই বা কেন এসেছে কে জানে? নিঃস্ব পথের ভিখারী হয়ে গেছে দু'জনেই ভিটে-মাটি থেকে উৎখাত হয়ে, এক কাহন খড়ও নেই যে ওদের কোন দয়া করে ধরণী প্রত্যাশা করতে পারবে।

পরস্পরের মধ্যে কথা চলতে থাকে ধীরে ধীরে, নতুন কিছু জানার বা বলার থাকলে জিজ্ঞাসা ও জবাব, দু'-একটি শব্দে আপশোষ বা সমবেদনা প্রকাশ। চিরকালের স্থায়ী দুঃখ-দুর্দশার কথা কেউ বলাবলি করে না, কারো অজানা নেই কার কি দায় বা দুর্ভোগের জের চলছে তো চলছেই, সে হিসাবে সবাই তারা সমান দুর্ভাগা, কম-বেশী যদি হয়তো সেটা সাময়িক, জোয়ার-ভাঁটার খেলা মাত্র। রাজেন দাস পোড় খায়নি, তার লজ্জা করতে পারে, ঘরে অন্ন না থাকাটা দশ জনের জেনে ফেলার মধ্যে যে লজ্জার কিছু থাকতে পারে, অপৌরুষের বা অপদার্থতার প্রমাণ সেটা, অন্যেরা তা বহু কাল আগেই ভুলে গেছে।

ভুবণের জিজ্ঞাসার জবাবে রাজেন দাস একটু কাঁচু-মাচু হয়েই বলে, একটু কাজে এয়েছি। দরকার আছে একটা।

কিন্তু শ্রীনাথ মাইতি বলে, আর দাদা, কপাল। কের মল-জোড়া বাঁধা দিতে এয়েছি, ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ।

বলাবলি যা হয় সব চাষাড়ে কথা। হাটে-হাটে ধান-চালের লাটসাহেবী দর, কেমন হবে এবারের ফসল, ভাগ, আবোয়াব আদায়, জুলুম ইত্যাদির কথা। আর সেদিন রামপুরে পত্তনিদার মদন শাসমলের লোকের সঙ্গে চাষীদের যে মারামারিটা হয়ে গেল সেই আলোচনা। রাখাল একটা নতুন খবর দিয়েছে আজ, মদন শাসমলের ভাইপো না কি জখম হয়েছিল দাঙ্গায়, হাসপাতালে মারা গেছে। তার চেয়েও জবর একটা খবর শুনে এসেছে তিনু, সত্য কি মিথ্যা জানে না। হাঙ্গামার পর পুলিশ এসে রামপুরে ধর-পাকড়-জুলুম চালাচ্ছিল, হঠাৎ না কি পুলিশ চলে গেছে গাঁ ছেড়ে। একেবারে হঠাৎ, সকালেও দলকে দল পুলিশ হাজির ছিল, বেলা খানিক বাড়তে না বাড়তে মার্চ্চ করে চলে গেল ষ্টেশন রোডের দিকে। তিনু এসেছে সকলের পরে এই অদ্ভুত কাহিনী নিয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবাই যে জিজ্ঞেস করবে এক কথা দশ বার করে ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করার দারুণ আগ্রহে, তার সময়ও বেশী পাওয়া গেল না। ধরণী এল বৈঠকখানায়।

বলল, বেশ, বেশ। তোমরা এয়েছ দেখছি। তা বেশ, তা বেশ। জয় দুর্গা শ্রীহরি। তামাক আনতে বুড়ো হলি শালার পুত, ?

ঘরের মধ্যেই ভেতরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কানাই কল্কেতে ফুঁ দিচ্ছিল, নজর পড়ায় ধরণী বলল, এই যে এনেছিস।

একেবারে যে মোটা গোল-গাল তা নয়, নাদুস-নুদুস চেহারা ধরণী তরফদারের, বেঁটে বলে মোটা দেখায় বেশী। টানা চোখ, মুখখানা থ্যাবড়া না হলে অপরূপ মানাত, আর যদি ভুরু না হত দামাল মোচের মত ঘন। টানা চোখে একবার সে তাকিয়ে নেয় সবার দিকে, কে কে এসেছে, কেন এসেছে, মোটা-মুটি আন্দাজ করে নিতে। দিন-কাল বড় খারাপ পড়েছে, এক দিন সকালে বৈঠকখানায় নেমে যদি দ্যাখে যে এক দল আশিয়ায় হাতিয়ার নিয়ে অপেক্ষা করছে, মোটেই সে আশ্চর্য্য হবে না। ব্যবস্থা অবশ্য সে করে রেখেছে আত্মরক্ষার। দু'নলা বন্দুকে ছর্‌রা টোটা ভরে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ভেতরের দরজার ওপাশে, রামদা' নিয়ে আছে রঘু আর বিষ্ণু। তাছাড়া, লোক-জন সকলকে বলাই আছে যে, বৈঠকখানায় একটু হট্টগোল শোনামাত্র যে যেখানে থাকে ছুটে আসবে দা' লাঠি যা পায় হাতের কাছে তাই নিয়ে।

তবু, বলা তো যায় না। যা দিন-কাল পড়েছে।

রাজেন যে ? খবর কি ? রাজেনের দিকে তাকিয়েই কিছুক্ষণ হুঁকো টেনে বলে ধরণী।

একটু দরকার ছিল।

বোসো। জয় দুর্গা শ্রীহরি। হাই তুলে তুড়ি দেয় ধরণী, শরীরটা ভাল নেই।

হুঁকো টেনে যায় ধরণী, আর্দ্ধেক চোখ বুজে, চুপচাপ। বিষয়-কর্ম্মে তার যেন মন নেই, এতগুলি লোক কেন তার কাছে এসেছে সে যেন জানতেও চায় না, পরম গভীর কোন এক অপার্থিব চিন্তায় সে যেন ডুবে গেছে। নিজে থেকে সে কিছু বলবে না, তার গরজ নেই, এ জানা কথা। তোরাব একটু সামনে এগিয়ে বলে, মোরা কর্জ্জের জন্ত এয়েছিলাম কত্তা।

কর্জ্জ ? তা বেশ। ফজলু মিঞার খবর কি ?

তেনা ভাল আছেন। তা, তেনা কাত্তিকে দেড় ভাগি আপোষ চান তাই আপনার কাছে এয়েছি।

বটে ? তা বেশ। কাত্তিকে দেড় ভাগি অন্তায় জুলুম বটে। —ধরণী যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে আছে হঠাৎ, মুখটা দেখায় গম্ভীর। লোচন, ধান কি আছে কর্জ্জ দেবার মত ?

কিছু আছে। অল্প-স্বল্প দেয়া যায়।

তখন ধরণী বলে, শোন বলি, কাত্তিকে দেড় ভাগি চাইব না আমি, আমার বাপু বিবেক আছে। ও-সব গোলমালে কাজ নেই। ধানের বাজার-দরে ধান দেব, টাকায় সুদ ধরব—ধরণী গলা খাঁকরায়, সুদখোর মহাজন হলে চার আনা ধরত, আমায় দু'আনা দিও, তাই ঢের।

শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। সকলে মরিয়া হয়ে প্রাণপণে নাড়া-চাড়া করে প্রস্তাবটা মনে মনে, বোকা চাষা-ভুষো মানুষ, কথাটার যে মানে বুঝেছে তা হয়তো ভুল, অন্য মানে আছে।

তোরাব বলে, কত্তা ?

রাজেন দাস বলে, এটা কি বলছেন ?

কেন ? ধরণী যেন আশ্চর্য্য হয়ে যায়, দেড় ভাগিতে মণে আধ মণ সুদ দিতে হত তোমাদের, টাকায় আট আনা। আমি কি চামার, মাসে আট আনা সুদ চাইব ? চলতি দরের হিসেবে টাকার খতে ধান নাও, দু'আনা সুদ দেবে, টাকায় বা ধানে যা তোমাদের খুসী।

ধানে শোধ দিলে— ? সংশয়ভরে প্রশ্ন করে এক জন।

ধানেই দিও, নির্ব্বিকার ভাবে বলে ধরণী, টাকায় দু' আনা সুদ ধরে দর হিসেবে ধানেই দিও।

এবার জ্বালা বোধ করে, সকলে। এতই বোকা ঠাউরেছে তাদের ধরণী তরফদার ? আজ ধানের দর কোথায় ফসল ওঠার আগে, ফসল উঠলে তা কোথায় নেমে যাবে। দু'আনা সুদ !—বিনা সুদে এই কড়ারে ধান কর্জ্জ না নিলে দেড় ভাগি হিসাবেরও অনেক গুণ বেশী ফিরিয়ে দিতে হবে ধরণীকে। ব্যাটা ধড়িবাজ ডাকাত !

ভূষণ বলে, আজকের চোরাবাজারি দরে মোরা ধান নিতে পারি কত্তা ?

তবে দেড় ভাগি হিসেবে নাও।

পুলিন জানা যেন হাঁফ ছাড়ে, ধরণীর চলতি দরের হিসাবে কর্জ্জ দেবার প্রস্তাব শুনে তার মাথা ঘুরে গিয়েছিল।

তাই দেন কত্তা, তাই দেন।

রও দাদা, রও। তড়বিও না অত !—তোরাব বলে ধমক দিয়ে, দেড়া ভাগির কর্জ্জ মোরা ছোঁব না কেউ।

[ক্রমশঃ

সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের নানা দিক্

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

স্বাধীনতার সিংহদ্বারে উপস্থিত হয়েছি, এই ধারণা আমাদের জনসাধারণের মনে ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়েছিল মন্ত্রী মিশনের পদধূলি দানের পর। আজ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কঠোর আঘাতে এবং গোল টেবিল বৈঠকের পুনরাবৃত্তি দেখে সেই স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গিয়েছে। ক'দিন আগে কাঁসর-ঘণ্টা-শাঁক বাজিয়ে, জাতীয় পতাকা উড়িয়ে, দীপমালা সাজিয়ে যাঁরা স্বরাজের আগমন-বার্ত্তা ঘোষণা করতে চেষ্টা করেছিলেন, আজও সেই মরীচিকা তাঁদের সামনে আছে কি না জানি না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁদের স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে দিচ্ছে, এই রকম ধারণা করার কারণ রয়েছে। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের মায়ায় ভুলে, আজ আমরা হিন্দুরা ভাবছি যে, মুসলমানরাই আমাদের প্রধান শত্রু, আর মুসলমানরা ভাবছে হিন্দুরাই তাদের পথের কাঁটা। দু'পক্ষই আমরা আসল শত্রু তৃতীয় পক্ষকে ভুলতে বসেছি। এই ভ্রান্তির মূলে রয়েছে আমাদের চিন্তাধারার মূলে যুক্তির অভাব এবং অনুসন্ধিৎসার অভাব। আমাদের বিভ্রান্তিকে বিপথে যেতে আরো সাহায্য করছে 'আজাদ' 'হিন্দুস্থান' ধরণের পত্রিকাগুলো। এক পক্ষ নোয়াখালির ব্যাপারটাকে 'কিছু না' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিহারের ব্যাপারকে নিয়ে মড়-কান্নায় নাক-চোখ ফুলিয়ে ফেলছে। অপর পক্ষ নোয়াখালিকে নিয়ে বাড়াবাড়ি করছে, অথচ বিহারের ব্যাপারটা খাটো করার চেষ্টা করছে। কোন পক্ষই দু'টি জায়গার দুর্ঘটনার মধ্যেও যে ক'টি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির উদাহরণ আছে, সেগুলো প্রচার করছে না। কিন্তু যে পথে আজ ভারতবর্ষ চলেছে তাতে হিন্দুরা কি অখণ্ড হিন্দুস্থান পাবে, না কি মুসলমানরা পাকিস্থান পাবে? চাবিকাঠি তো এখনো তৃতীয় পক্ষের হাতে। অপর পক্ষের নৃশংসতার কাহিনী ভাঙ্গিয়ে ব্যবসা করা ছাড়া আমাদের জাতীয় পত্রিকাগুলো আর কি করছে? দস্যুবৃত্তির মূলধন নিয়ে তারা ব্যবসা করে।

জাতীয় সংবাদপত্রের দেশসেবা?

আজ আমাদের দেশের কাগজগুলো ব্রিটিশ-বিরোধী সংগ্রামকে তাদের পাতায় ছাপতে ইচ্ছে করে ভুলে যাচ্ছে। কই? কাশ্মীরে, ত্রিবাংকুরে, হায়দরাবাদে, যে বিরাট গণ-সংগ্রাম মাথা চাড়া দিয়েছে, তার কোন উল্লেখই তো দেখতে পাই না। সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে, ব্রিটিশসিংহের ভাবী প্রধান ঘাঁটিগুলোর বিরুদ্ধে নিপীড়িত মানবের এই যে পবিত্র সংগ্রাম, শের-ই-কাশ্মীর শেখ আবদুল্লার বিরাট আত্মত্যাগী, নির্ভীক প্রগতিপন্থী নেতৃত্ব কেন মুছে গেল এগুলো আজ "জাতীয়তাবাদী" পত্রিকাগুলোর পৃষ্ঠা থেকে? শেখ আবদুল্লা, আর মহিউদ্দীন দু'টি উজ্জ্বল তারকার কাশ্মীরের যুগসঞ্চিত শোষণের আঁধার গগনে আজ জ্যোতি ঠিকরে পড়ছে। তাঁরা মুসলমান, তাঁদের জাতীয় সংগ্রামীরাও মুসলমান; তাঁদের যুদ্ধ হিন্দুরাজার বিরুদ্ধে। কিন্তু কই পাকিস্থানী পত্রিকায় তো তাঁদের সম্পর্কে প্রশস্তি তো দূরের কথা একটি কথাও দেখা যায় না? হায়দরাবাদের নিজাম মুসলমান। তাঁর প্রজারা অধিকাংশই হিন্দু। কই আজ সেই হিন্দু শোষিত জনগণের মুসলমান রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের কথা তো অখণ্ড হিন্দুস্থানী কাগজে স্থান পায় না? এই সব পত্রিকাগুলোর প্রতিনিধিরা আবার গর্ব করে সেদিন জানিয়েছিলেন যে, জনসাধারণকে রাজনীতির সৎপথে পরিচালিত করার মহৎ কর্ত্তব্যের তাগিদে তাঁরা বাংলার প্রধান-মন্ত্রীর অপমানসূচক সংবাদ-নিয়ন্ত্রণ আদেশ হজম করেও পত্রিকা প্রকাশ করছেন। জনগণের সেবার জন্যে যাঁরা নির্বিবাদে অপমান গলাধঃকরণ করে কাগজ বার করলেন, আজ তাঁদেরই এক জনের আফিসে ধর্ম্মঘট। পুলিশের সাহায্যে কাঠি চালাতেও তিনি পেছ-পা হননি, এমনই তাঁর গণপ্রেম! অন্যান্য কাগজগুলোও জঘন্য ব্যাপারটি সম্পর্কে টুঁ-শব্দটি করে না, কারণ সবাই একই গোয়ালের গরু। উপদলীয় রাজনীতির বেসাতি নিয়ে তাঁরা এ ওর গায়ে থুতু দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু মূলতঃ তাঁদের কোন ঝগড়া নেই। নৈতিক এবং অর্থনৈতিক পথ তাঁদের সকলেরই এক। বিশ্বপ্রেম, মানবপ্রেম প্রচার করো কিন্তু নিজের অধীনে যারা কাজ করে, তাদের শ্রম ভাঙ্গিয়ে নিজের সিন্দুক ভারী করো এবং পয়সার জন্য রাজনীতি এবং সর্বপ্রকার রীতি-নীতি, দেশপ্রেম-বোধের বাজার খুলে কেনা-বেচা করো, যা বিশ্বাস করো না, তাই প্রচার করো অর্থাৎ চিন্তাধারা নিয়ে বেশ্যাবৃত্তি করো। সুতরাং এক জন দুর্ভিক্ষের দুর্দিনে কর্মচারীদের চাল নিয়ে চোরা কারবারী করলে, বা আর এক জন ধর্মঘটকারী কর্মচারীদের পুলিশ ডেকে মারপিট করলে, অন্য সবাই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলবে চুপ, চুপ। দরকার কি বাবা খবরটা ছাপিয়ে, কোন দিন আমার নিজেরই কিছু একটা ঘটলে তখন ও-ব্যাটা সব যদি ফাঁস করে দেয়! অতএব চেপে যাও। কথা হচ্ছে, এই সব "স্বাধীনতা সাম্য, মৈত্র, আর গণতন্ত্র" ধ্বজা-ধারী কাগজপত্রগুলো আমাদের চিন্তাধারাকে যে দিকে নিয়ে যেতে চায়, আমরা সেই দিকে যাবো, না কি নিজেরা বিচার করে প্রত্যেকটি ব্যাপার দেখবো, যাচাই করে নেবো? এই সব ভণ্ড কাগজগুলো আমাদের হয়ে ভেবে দেবে, না কি আমরা নিজেরা ভাবতে শিখবো? জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ভাঙ্গিয়ে লক্ষপতি হওয়া যাদের নীতি তাদের আমাদের হয়ে ভাবতে দেবো কেন? কলকাতার এবং এলাহাবাদের 'অমৃতবাজার' আফিসে তুষারকান্তির নিজামত্ব চলে, 'আজাদে'র আফিসে আক্রম খাঁর শাহানশাহী চলে। সুতরাং হায়দরাবাদের নিজাম-বিরোধী, বা কাশ্মীরের রামচন্দ্র কাক বিরোধী গণ-সংগ্রামকে সমর্থন করায় বিপদ আছে বৈ কি! কারণ ভারতময় স্বৈর-শাসনের প্রতীক নিজাম-শাসন বা কাক-শাসন যদি ঘুচে যায়, তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই ঘুচে যায়—যার জের যে আনন্দ চাটার্জি লেন এবং লোয়ার সার্কুলার রোডেও এসে পৌঁছাবে। তাই বলছি, এই সব নিজাম, গাইকোয়াড়দের ক্ষুদ্র সংস্করণদের দেশাত্মবোধে বিশ্বাস না করে, নিজের বিচার-বুদ্ধির উপর নির্ভর করাই ভাল।

কয়েকটি প্রশ্ন

সাধারণ মুসলমানরা লীগের অনুগামী হয়ে নোয়াখালিতে নৃশংস ব্যাপার করেছে সত্যি কথা। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, খালি ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়েই কি তাদের লীগনেতারা এই কাজ করাতে পেরেছেন? শুধু "ইসলাম বিপন্ন" ধ্বনিই কি তাদের সংঘবদ্ধ করতে পেরেছে? শুধু হিন্দুর ওপর আক্রোশই কি তাদের এই কাজ করিয়েছে? না কি অন্য কারণ আছে? এত দিনকার নিরীহ মুসলিম চাষীরা কি করে আজ এ রকম অমানুষিক বর্বরতা করতে পারলে? ধর্মান্ধতাই কি তার একমাত্র কারণ? অধিকাংশ মুসলমানই লীগের সদস্য, তাই

বলে কি তারা প্রত্যেকেই সজ্ঞানে দাঙ্গার জন্তে দায়ী? গোটা মুসলিম সম্প্রদায়কে কি দোষী করা চলে?

লীগের মূলধন কি

প্রথম কথা, আজকের বৈজ্ঞানিক যুগে "জাতিগত উচ্চতা" বা "জাতিগত নীচতা" বলে কোন কিছুতে বিশ্বাস করা চলে না। হিন্দু মাত্রই ভাল বা মুসলিম মাত্রই খারাপ, এ কথা সম্পূর্ণ অজ্ঞ বা ফ্যাসিষ্টদের পক্ষেই বলা সম্ভব। আসল কথা, সাধারণ মানুষের যত দিন কোন একটি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বের উপর বিশ্বাস থাকে তত দিন সেই নেতারা সেই সাধারণ মানুষদের নিয়ে ইচ্ছে করলে যেমন খুসী সুপথে অথবা বিপথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। ধন-তান্ত্রিক অর্থলিপ্সু শক্তিমত্ত "সভ্যতায়" (?) সাধারণ মানুষকে নেতারা তাঁদের শক্তির খেলার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেন। মুসলমানদের পাকিস্থান কামনার পিছনে অর্থনৈতিক কারণ আছে, এ কথা ঠিক। সাধারণ মানুষ আন্দোলন করে, যুদ্ধ করে এই ভেবে যে, সফল হলে তাদের খাওয়া-পরার ভাবনা থাকবে না। প্রত্যেক স্বাধীনতা-সংগ্রামের মূলে আসল প্রেরণাই হোল খাওয়া-পরার নিরাপত্তার আশা। মুসলমান সম্প্রদায় হিন্দুর তুলনায় অনেক গরীব এবং দুঃস্থ। লেখা-পড়া, বিত্তাবুদ্ধি সব দিক থেকেই ভারতে হিন্দুরা অনেক বেশী সমৃদ্ধ। জাতীয় সম্পদের অধিকাংশ রয়েছে তাদের হাতে, তাই সব দিক দিয়ে সুযোগ তাদের বেশী। মুসলমানরা তাই ভাবে যে, হিন্দুদের থেকে আলাদা হয়ে যেতে না পারলে আমরা কোন সুযোগ-সুবিধা পাবো না; অতএব আমরা আলাদা হয়ে যাই, আমাদের ন্যায্য পাওনা-গণ্ডা হিন্দুরা চুকিয়ে দিক। বাংলার মুসলিম চাষী দেখে যে, হিন্দু জমিদার তাকে শুষে খাচ্ছে; কলকারখানার মুসলিম মজুর দেখে যে, হিন্দু মালিক তাদের পায়ে দলছে। দেশের গরীব মুসলমানরা দেখে, চারি দিকে হিন্দুদের জন্য স্কুল, কলেজ, লাইব্রেরী, আরো কত কি, অথচ তাদের ছেলেমেয়েদের জন্তে মাত্র কয়েকটি শিক্ষাগার। আর্থিক জগতে এবং সাংস্কৃতিক জগতে তারা দেখে যে হিন্দু সম্প্রদায় তাদের গ্রাস করতে বসেছে, কারণ তারা আত্মবিকাশের সুযোগ পাচ্ছে না। হিন্দুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে তারা পাল্লা দিতে পারবে বলে ভরসা করে না। তার ওপর দেখে, এই সব হিন্দু জমিদার আর মালিকদের সব দিক্ দিয়ে ব্রিটিশরাজ সাহায্য করছে, তাদের হয়ে পুলিশ মিলিটারী এসে প্রজা আর মজুরদের উপর লাঠি আর গুলী চালাচ্ছে। সুতরাং তারা চায় আলাদা হতে। ভারতবর্ষের অগণিত নিরক্ষর জনগণ ধর্মান্ধ এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। তাই ধর্মকে তারা নিজেদের জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে এক করে দেখে।

ওপরে মিল নীচে অমিল

ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি মিলিয়ে খিচুড়ী খাওয়াতে মুসলিমরা অভ্যস্ত। তাই তারা মনে করে মুসলিম রাজ্য হলেই তাদের সব দুঃখ ঘুচে যাবে। শাসন ব্যাপারের সঙ্গে ধর্মের যে কোন সম্পর্ক নেই এটা তারা সাম্প্রদায়িক নির্বাচন-ব্যবস্থার কল্যাণে এখনো জানে না। তারা জানে না যে, জমিদার হিন্দু বলে মুসলিম প্রজার ওপর অত্যাচার করে না, বা মিল-মালিক হিন্দু হিসেবে মুসলিম মজুরকে শোষণ করে না। জমিদার অত্যাচার করে জমিদার হিসেবে, মিল-মালিক শোষণ করে পুঁজিপতি হিসেবে। আর ব্রিটিশরাজের কোটাল হিসেবে দু'জনেই তারা লুঠের মাল ব্রিটিশের হাতে তুলে দেয়। তাদের অজ্ঞতার ফলে তারা বোঝে না যে "সিংহ মার্কা" সাম্রাজ্যবাদই তাদের দুর্দশার জন্তে আসলে দায়ী। কোথাও হিন্দুদের মাথায় মুসলিম কর্তা বসিয়ে, কোথাও মুসলিমের মাথায় হিন্দু কর্তা খাড়া করে তারা এত বড় দেশে আত্মকলহের বিষবৃক্ষকে বাড়িয়ে তুলেছে নিজেরা রাজত্ব করবার জন্ত। মুসলিম চাষী-মজুর জানেও না কি ভাবে তাদের অলক্ষ্যে ব্রিটিশ গোটা দেশটার মাথায় বসে কলকাঠি নাড়ছে। তারা দেখে, হিন্দু জমিদার তাদের মেরে-ধরে খাজনা আদায় করছে, মনে করে হিন্দুই তার দুর্দশার মূল, হিন্দু মিল-মালিক তাকে শুষে খাচ্ছে, অতএব হিন্দুই তার কষ্টের কারণ। তারা তো আর জানে না যে, মধ্যবর্তী সরকার গড়ায় কংগ্রেস-লীগের নেতাদের সমস্ত ঝগড়ার দানা ষ্টার্লিং-ব্যালান্সের প্রশ্নে এক নিমেষে কি ভাবে গলে জল হয়ে গেল—তারা এ-ও জানে না যে টাটা, বিড়লা, ইস্পাহানী, নলিনী সরকার, জিন্না ইত্যাদি ব্যবসার ক্ষেত্রে কি ভাবে সব ঝগড় ভুলে হাত মেলান, টাটা কোম্পানীতে জিন্না সাহেব মোটা অংশীদার হন, বা ইস্পাহানী কেমিক্যালে নলিনী বাবু পরিচালক-মণ্ডলীতে বসেন এবং সেখানে তাঁর টাকা খাটে। এমন কি, টাটায় ধর্মঘট হলে টাটা এবং জিন্না একসঙ্গে বসে হিন্দু এবং মুসলমান মজুরদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার জন্তে শলা-পরামর্শ করেন। প্রথমতঃ, তারা রাজনীতির দাবা খেলা বোঝে না, দ্বিতীয়তঃ, তারা কাগজ পড়তে জানে না, কারণ নিরক্ষর, তৃতীয়তঃ, যদি বা কাগজ পড়তে জানতো তাহলে এই ধরণের খবরগুলো হিন্দুস্থানী বা পাকিস্থানী কাগজে তারা খুঁজে পেত না। পত্রিকা-ব্যবসায়ী পুঁজিপতিরা এই "লোভনীয়" "কাম্য" "হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের" (ওপর তলার ঐক্য) খবরগুলো বেমালুম হজম করে যান। এমনই শোনা যায়, কিরণ বাবুর বাড়ীর উৎসবে সোহরাবর্দী সাহেব ধুতি-চাদর পরে অতিথি অভ্যর্থনার নেতৃত্ব করে থাকেন।

উপরের তলায় দরকার মত ঐক্য হতে বাধা নেই কিন্তু নীচের তলায় সাধারণ হিন্দু-মুসলমান কলকাতার রাজপথে যেদিন আজাদ হিন্দ বন্দীদের মুক্তি আন্দোলনে একসঙ্গে নিজেদের পতাকা বেঁধে নিয়ে গুলীর সামনে বুক পেতে দিল, সেদিন আমাদের আজাদ হিন্দ দলের শরৎবাবু সেই আন্দোলনকে সমর্থন না করে বললেন, কম্যুনিষ্টদের উস্কানী। আর জিন্না সাহেব তাঁর অনুগামীদের বললেন যে, তারা যাই করুক পাকিস্থানের দাবী যেন না ভোলে। অথচ একমাত্র সেই ব্রিটিশ-বিরোধী মুক্তি আন্দোলনের পথেই হিন্দু আর মুসলমান তাদের নিজেদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারত। এ থেকে কি এই বোঝায় না যে, এই সব নেতারা সাম্প্রদায়িক বিরোধকে মূলধন করে নিজেদের নাম-যশ টাকা-কড়ি বাগাতে চান? অনেক হিন্দু নেতাই যখন অখণ্ড হিন্দুস্থানের কথা বলেন তখন তাঁদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকে ব্রিটিশ-বিদায়ের পর ভারতে অখণ্ড হিন্দু-শাসনের বাসনা। জিন্না সাহেব যখন পাকিস্থানের কথা বলেন তাঁর মনে লুকিয়ে থাকে তাঁর এবং তাঁর চেলা চামুণ্ডাদের বাদশাহ হবার ইচ্ছা। কোন পক্ষই আসলে গণতান্ত্রিক উপায়ে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারতের কথা আন্তরিক

ভাবে চিন্তা করেন না। সেই ভাবে চিন্তা করলে জিন্না সাহেব ব্রিটিশের কাছে পাকিস্থান ভিক্ষা করতেন না। সেই ভাবে চিন্তা এবং কাজ করলে কংগ্রেসকে আজ মুসলমান ভারতবাসীকে হারাতে হোত না। কারণ, তাহলে মুসলমানরা অখণ্ড হিন্দুস্থানের নামে আঁৎকে উঠতো না এই ভেবে যে হিন্দুরা আমাদের গ্রাস করতে চায়। ফলে লীগ-নীতির কংগ্রেসের কাছে হার হোত এবং মুসলমানরা কংগ্রেসেই থাকতো।

চীনেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা ছিল

চীনেও দুই কোটি মুসলমান আছে। সুতরাং সাম্প্রদায়িক সমস্যাও ছিল। চীনা মুসলমানদের ভয় ছিল চীনা সভ্যতা তাদের গ্রাস করে ফেলবে। ফলে প্রায়ই সেখানে দাঙ্গা হোত। ১১২৮ সালে উত্তর-পশ্চিম চীনে একটি ভয়াবহ মুসলিম বিদ্রোহ হয় বেং মাবে এক চীনা সামন্ত নৃপতির বিরুদ্ধে। ভানকিং সরকার বরাবর মুসলমানদের সংস্কৃতিগত স্বাধীনতাকে নষ্ট করতে চেষ্টা করে আসছিলেন। ঠিক ভারতের কংগ্রেসের মতই চিয়াং কাইশেক সরকার মনে করেন, সেখানকার মুসলিমরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় (ধর্ম্মগত) মাত্র, তারা সংখ্যালঘু জাতি নয়। যদিও চীনা আচার-বিচার রীতি-নীতির সঙ্গে তারা অনেক বিষয়ে খাপ খাইয়ে চললেও বৈশিষ্ট্যও যথেষ্ট আছে। গোঁড়ামি কুসংস্কার তাদের খুবই বেশী। মোল্লা মৌলবী ইত্যাদির অখণ্ড প্রতাপ ছিল তাদের উপর। সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনীতির সঙ্গে তাদের ইসলাম ধর্ম জড়িত। চীনের চেয়ে তারা তুরস্ককেই মাতৃভূমি বলতে ভালোবাসতো। অখণ্ড চীনের চেয়ে অখণ্ড ইসলামের প্রতি তাদের প্রীতি ছিল বেশী। অবশ্য চীনা ভাষাতেই তারা কথা কয়, যদিও ২।৪টি উর্দ্দু বুলিও তাদের জানা আছে। তারা অত্যন্ত গরীব ছিল, নানা রকম খাজনায় তাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত। চীনের এই দুই কোটি মুসলমানকে আজ সেখানকার কম্যুনিষ্টরা মানুষ করে তুলেছে কি ভাবে, তার পরিচয় পাওয়া যায় এডগার স্নোর "রেড ষ্টার ওভার চায়না" বইখানিতে। চীনা মুসলিমরা আজ চীনা বা মুসলিম সব জমিদারের উপর চটা। আজ তারা পরিষ্কার বলে—"চীনা ও মুসলমান ভাই ভাই; আমাদের মধ্যেও চীনা রক্ত বইছে; আমরা দুই ভাই-ই মহাচীনের সন্তান, তবে কেন আমরা নিজেরা মারামারি, কাটাকাটি করবো? আমাদের দু'জনেরই শত্রু হচ্ছে জমিদার পুঁজিপতি, মহাজন, অত্যাচারী রাজা, আর জাপানী। আমাদের দু'জনেরই লক্ষ্য বিপ্লব।"—(স্নো সাহেবের সঙ্গে এক মুসলমানের আলাপ)। আজ তারা সকল শত্রুর বিরুদ্ধে হুই—হান্ (চীনা-মুসলিম) ফ্রন্ট গড়েছে। গড়েছে লাল পল্টন-বাহিনী। কম্যুনিষ্টদের এই সাফল্যের মূলে রয়েছে তাদের নীচের অঙ্গীকারগুলো:—(১) সব রকম অন্যায় খাজনা তুলে দেওয়া; (২) মুসলিমদের স্বরাজ দেওয়া; (৩) বাধ্যতামূলক সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ করা; (৪) পুরাতন ঋণ বাতিল করা; (৫) মুসলিম সংস্কৃতিকে রক্ষা করা; (৬) প্রত্যেককে পূর্ণ ধর্মগত স্বাধীনতা দেওয়া, (৭) জাপবিরোধী মুসলিম লাল পল্টন বাহিনী গঠন করা।

[ক্রমশঃ

✡

ভবিষ্যৎ

এ, কে, জয়নাল আবেদীন

মদে মেতেছে যাহারা আজিকে অন্ধ-বিবেক বশে,
ভ্রাতৃ-অঙ্গে আঘাত হানিতে যাদের কৃপাণ খসে।
তাদের বিবেক বিকাশ লভিবে বুঝিবে আপন ভুল,
শহীদগন্ধে তারাই ফুটাবে বসরা গোলাপ ফুল,
পোড়া ভিটে তারা করিবেক খাড়া নোতুন হর্ম্যরাজি,
মহামিলনের মধু-সঙ্গীত কণ্ঠে উঠিবে বাজি'।
তাদের মিলিত শক্তি সমুখে র'বে না দাঁড়াতে কেউ,
পদ্মা মেঘনা এক সাথে মিশে তুলিবে তুঙ্গ ঢেউ।
মিথ্যার মোহে ঘুরিছে যাহারা শাণিত অস্ত্র হাতে,
অযুত লক্ষ সত্য সেনানী ঘুরিবে তাদের সাথে।
এ মোহনিদ্রা টুটিবে তাদের অরুণ উদয়ে কাল,
শক্ত হস্তে ছিন্ন করিবে মায়ার ইন্দ্রজাল।
হৃদয়ে হইবে বিবেক উদয় ফিরে পাবে সম্বিৎ,
উপাড়ি ফেলিবে পাল্টা আঘাতে রাজ্যতন্ত্রী-ভিৎ।
আজিও যাদের কান্না-লহরী পাষে প্রতিহত হয়,
প্রতি দিনে দিনে তারাই করিবে কলের বাঁধন লয়।
বাজিবে তাদের হৃদয়-বীণায় প্রীতি ও সখ্য সুর
ভুলিবে বিভেদ হিংসা-দ্বন্দ্ব-বিদ্বেষ হবে দূর,
দিব্যচক্ষে দেখিতেছি আমি সে দিনের দেরী নাই,
জালিমের দল কবরে পচিবে শ্মশানে হইবে ছাই।
যে আগুন আজ জ্বালায়ে তুলিছে তাহারি তীব্র তেজ
ভস্ম করিবে দপ্তরখানা দলিল-দস্তাবেজ।
"অউটরাম" আর "অকটারলোনী" আঘাতে হইবে লয়,
সেথায় শোভিবে শহীদের স্মৃতি সেদিন সুদূর নয়।
ক্লাইভের নামে থাকিবে না পথ কর্মীর নামে হবে
বঙ্গপ্রদেশে এ ভারতভূমে বাঙালীর স্মৃতি রবে।
বাঙালীর ত্যাগ, বাঙালীর দান, বাঙালীর কোরবান,
রক্তের পথ এনে দিবে তারে শাশ্বত কল্যাণ।
অহেতুক রোষে প্রতিবেশীদের মেরেছে যে সব লোক,
গোবরার গোর, নিমতলা ঘাট, তাদের খোলাবে চোখ।
চির বিপন্ন, বিপদগ্রস্ত সর্ব্বহারার দল,
এবার লড়িবে সত্যের লাগি মুছে নিয়ে আঁখি-জল।
বিধুর মাতার বিরহী নারীর করুণ কান্না-ধ্বনি
জাগায়ে তুলিবে তাদের ভিতর জীবনের জাগরণী।
বৃশ্চিক-জ্বালা জ্বালায় তাদের পশ্চাৎ অনুতাপ,
নিরীহ নরের রক্তে ধৌত হয়ে গেছে সব পাপ।
কলুষ-মুক্ত নির্ম্মল হৃদি সকল ভারতবাসী,
সিরাজের সাথে পলাশীর মাঠে আবার দাঁড়াবে আসি।'
সে দিনের নাই দেরী,
মিলিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিবে আবার বিজয়-ভেরী।
মোহনলালের সঙ্গে থাকিবে লক্ষ সেনানী কাল,
চেয়ে দেখ ঐ পূর্ব-দিগন্তে উঠিছে অরুণ লাল।

পণ্ডিত নসীরামের দরবার

শীতপ্রধান দেশ বলে ইউরোপে নিরামিষাশীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এবং সেখানকার নিরামিষ আহারে ডিমের বারণ নেই।

যে দু'জন নিরামিষ-ভক্তকে নিয়ে ইউরোপে সবচেয়ে বেশী আলোচনা হয়, তাদের এক জন অকাল-বৈরাগ্যে কিছু দিন হল সংসার-ত্যাগ করেছেন। বর্তমানে বেঁচে আছেন কি না বলা শক্ত। অন্য জন নব্বুই পেরিয়ে বহাল তবিয়তে সংসারেই আছেন। এক জন অ্যাডলফ হিটলার অন্য জন জর্জ বার্নার্ড শ'।

পঁচিশ বছর বয়সে শ' প্রথম নিরামিষাশী হলেন এবং আমিষভক্তদের নরখাদক বলে গাল দিতে লাগলেন। চল্লিশ পেরোবার আগে থেকেই, বিশেষ করে কোন অসুখে পড়লে, শুভানুধ্যায়ীরা শ'কে সাবধান করতে লাগলেন, "যদি বাঁচতে চাও, অকাল-মৃত্যু এড়াতে চাও তবে এখনও আমিষ ধরো!"

শুনে অসুস্থ অবস্থাতেই শ' উত্তর করলেন, "যে সব জীবকে না খেয়ে রেখে গেলাম, তারা অন্ততঃ আমার শবযাত্রায় যোগ দেবে!"

শ'য়ের সাহিত্যিক-সমসাময়িক বিখ্যাত গিলবার্ট কীথ চেষ্টারটন সে কথা শুনে বললেন যে, "শ'য়ের শবযাত্রায় লোকের অভাব হবে না এবং জীবদের সেই শোভাযাত্রায় তিনি স্বয়ং একটি হাতির স্থান পূরণ করতে রাজী!"

* * * *

চেষ্টারটন আয়তনে প্রায় ছোট-খাট একটি হাতিই ছিলেন এবং খাওয়া সম্বন্ধে তাঁর বাছবিচার ছিল না। শ' হচ্ছেন ঠিক উল্টো। চেহারা চিরকালই রোগা খিটখিটে, খাওয়া সম্বন্ধেও ভয়ানক সাবধান এবং বিধি-নিষেধ। এ নিয়ে দু'জনের মধ্যে এক দিন 'কবির লড়াই'ও হয়ে গেল।

চেষ্টারটন শ'কে বললেন, "তোমার চেহারা দেখে সবাই জানবে আমাদের দেশের লোক খেতে পায় না—"

শ' উত্তর দিলেন, "কেন পায় না জানবে, অবিশ্যি, তোমার চেহারা দেখে—"

* * *

বছর ত্রিশেক আগে শ'য়ের পিগম্যালিয়ন নাটকের মহলার সময় সুন্দরী অভিনেত্রী মিসেস ক্যাম্পবেল শ'-সম্বন্ধে বিশেষ আশঙ্কা প্রকাশ করলেন এবং শেষ পর্যন্ত বলে বসলেন, "শেষমেষ এক দিন কিছু মাংস গলাধঃকরণ করে আপনি আমাদের মেয়েদের জ্বালাতন করে মারবেন দেখছি!"

তার পর অবিশ্যি নির্বিঘ্নেই ত্রিশ বছর কেটে গেছে।

* * * *

আমেরিকান লেখক আলেকজেণ্ডার উলকট শ'য়ের মতন নির্দয় রসিকতা ও বিদ্রূপের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ'য়ের বয়স যখন বাহাত্তর তখন তাঁর সঙ্গে উলকটের প্রথম আলাপ হয়। তার পর তের বছর বাদে, গত যুদ্ধের মাঝে যখন তিনি আবার বিলেতে এলেন তখন একই দিনে শ' এবং হার্বার্ট জর্জ ওয়েলস তাঁকে যথাক্রমে বিকেলে চা এবং রাত্রে খাবার নেমন্তন্ন করেন।

বিকেলে চা খেতে গিয়ে শ'কে দেখে উলকট ত তাজ্জব। তের বছরে শ' সমানই আছেন। খালি মাথায়, কোটছাড়া ঠাণ্ডার মধ্যে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। শ'য়ের চায়ের নেমন্তন্ন সেরে বেরোবার আগেই উলকট বদ্ধপরিকর হয়ে গেলেন—এবার থেকে তিনিও নিরামিষাশী হবেন।

ওয়েলসএর সঙ্গে রাত্রে খাবার সময় উলকট ওয়েলসকে তাঁর অভিপ্রায়ের কথা জানালেন।

শুনে ওয়েলস বললেন, "বন্ধু-বান্ধবের বিরুদ্ধে কিছু বলা উচিত নয়, তা না হলে—"

"না হলে কি?" উলকট উৎসুক হয়ে উঠলেন।

"শ' বড় মিথ্যে বলে আর ধাপ্পা মারে—"

"কি রকম?"

"প্রত্যহ শ' লিভার-এক্সট্রাক্ট খায় আর বলে সেগুলি না কি ওষুধ—"

* * * *

হে রূপকথার কন্যা…!

বিমলচন্দ্র ঘোষ

"আমার কথাটি ফুরুলো"—কিন্তু ফুরুলো না।
উচ্ছ্বাসের অযুত কাহিনী জুড়ুলো না,
তোমারি যুগের কত ভাঙা-সেতু
পড়েনি নজরে জানি তার হেতু
জীবনে জীবনে কত কান্নার বাঁধ-ভাঙা বাণীবন্যা,
ছায়ার ছায়ায় মিশে যেতো কত জানতে কি রাজকন্যা?

কত শঙ্কিত চাঁদেরা গহন বনতলে
কুসুম ফোটাতো রজনীর কালো কুন্তলে
তুমি তো ঘুমাতে পালঙ্কে শুয়ে
কোমল চরণ পড়তো না ভুঁয়ে
বাঁদীরা ঢুলাতো ব্যজনী চামর কৃপা-কণিকায় ধন্যা,
বনচারী চাঁদ ডুবে যেতো বনে তুমি কি জানতে কন্যা?

তোমার কথাই সারা ইতিহাস পাতা জুড়ে
লিখে গেছে তাই না-বলা কথারা মাথা খুঁড়ে—
মরেছে অন্ধ কালের পাষাণে
নীরব প্রাণের রূঢ় অবসানে
কথার অশ্রু-সাগরে মিশেছে অশ্রুত বাণীবন্যা,
কত যে না-বলা কথা মরে গেছে, হে রূপকথার কন্যা!

তোমার প্রাসাদে পড়তো কত কি শুক সারী,
মানে অভিমানে কথায় কথায় মুখ ভারী—
যখনি ক'রতে, যারা প্রাণপণে
হাসিটি তোমার ফোটাতো যতনে
খোঁপার একটি ফুল ফেলে দিয়ে যা'দের করতে ধন্যা,
তাদের কথার শেষ ছিলো নাকো জানতে কি রাজকন্যা?

তোমার বাসর-জাগানীরা তবু আশে-পাশে
করুণার মতো মানবী-ধরার ইতিহাসে
অকথিত কত কথার বাঁধনে
গোঙাতো রজনী নিভৃত কাঁদনে
তোমার কথাটি ফুরুবার আগে তাদের কথার বন্যা
বহে যেতো কালো-যবনিকাতলে হে রূপকথার কন্যা!

হায়রে জীবনে ঘুঁটে-কুড়ুনীরা বনে বনে
পরশ-মাণিক খুঁজে সারা হ'ত মনে মনে
হয়তো হঠাৎ ক্রূর দাবানলে
তাপ লেগে জলা ছিন্ন আঁচলে
গেরো দিতে দিতে মণিহারা মনে দু'চোখে বইতো বন্যা
কথারা কখনো ফুরুতো না তাই হে রূপকথার কন্যা!

বিয়ের আগের এবং পরের কাব্য
শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্তী

বোদলেয়রের ফরাসী থেকে

অরুণ মিত্র

যখন আকাশখানা চেপে থাকে ঢাকনির মতো
বহু কাল বিতৃষ্ণায় রুগ্ন ক্ষুব্ধ মনের উপর
যখন নিবিড় চক্র দিগ্বলয় থেকে কালো দিন
ঝরায় সে নিশীথের চেয়ে আরও বিষণ্ন বিনত,

যখন পৃথিবী এক আঁধার গুহার রূপ ধরে
যেখানে মনের আশা চামচিকের মতো ঘুরে ঘুরে
ঘা খায় দেয়ালে তার ভীরু ডানা মেলে বার বার
ঘুরে ঘুরে বার বার পচা ছাদে মাথা ঠুকে মরে,

যখন অঝোর বৃষ্টি মেলে দিলে দীর্ঘ তার ধারা
মনে হয় যেন এক অতিকায় কারার গরাদে
যখন কুৎসিত সব মাকড়সার দল এসে জোটে
নিঃশব্দে মগজ জুড়ে হিজিবিজি জাল বোনে তারা,

তখন সমস্ত ঘণ্টা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বাজে
ক্ষিপ্ত হ'য়ে, অন্তরীক্ষে তোলে তারা বিষম চীৎকার
তেমনই যেমন ক'রে দিশাহারা গৃহহারা কেউ
দিনরাত ক্রমাগত গোঙায় এ পৃথিবীর মাঝে

আর ধীরে অতি ধীরে আমার হৃদয়-মরুভূতে
বাদ্যহীন গীতহীন দীর্ঘ সব শোকযাত্রা চলে
পরাজিত আশা কাঁদে, নিষ্ঠুর যন্ত্রণা স্বৈরাচারী
আমার মাথায় তার কালো সে-নিশান দেয় পুঁতে।

অস্তাচলে

—নীরোদ রায়

নিমীলিত

—এ, গোস্বামী, এ-আর-পি-এস

উন্মীলিত

(প্রথম পুরস্কার)
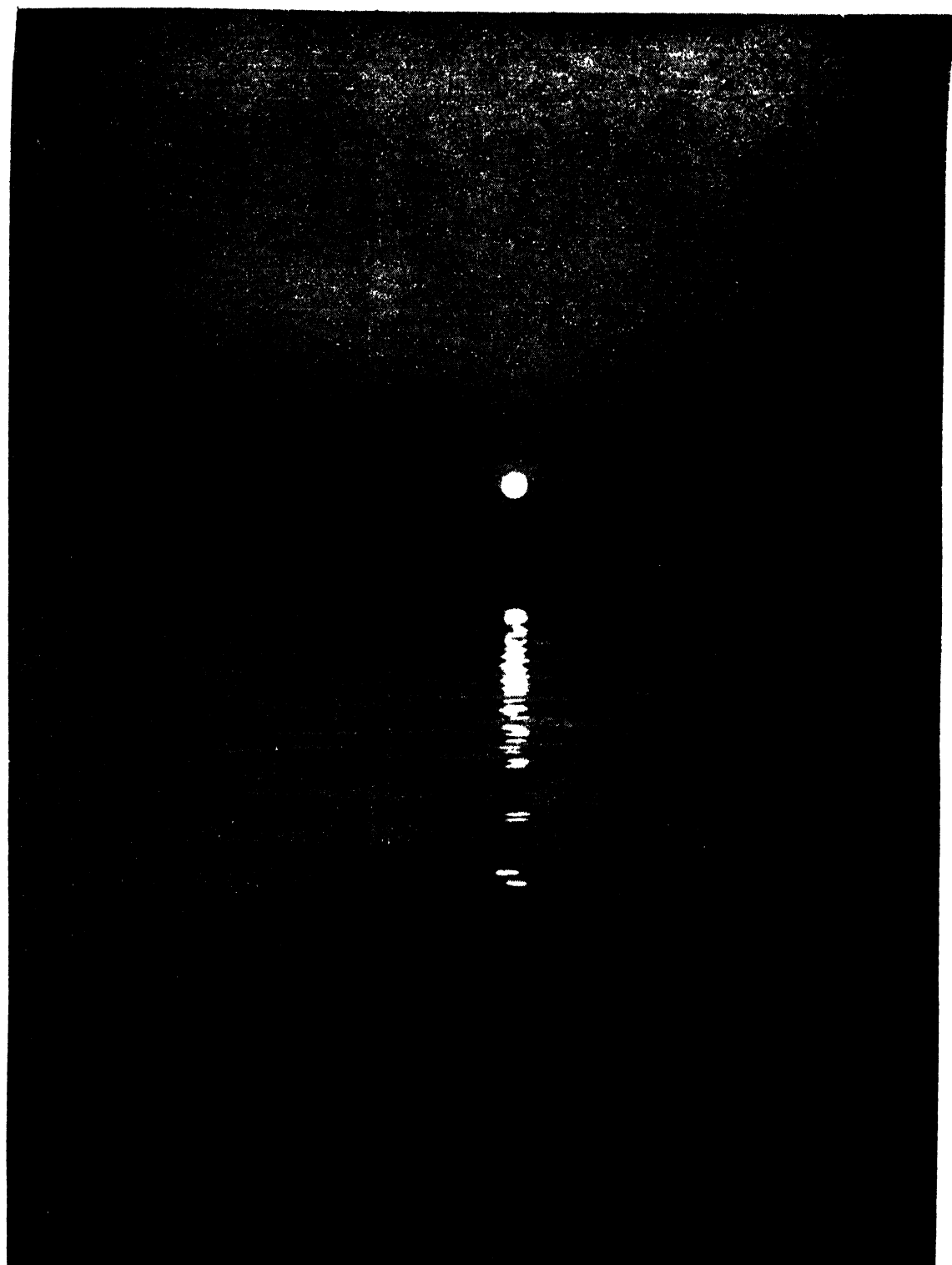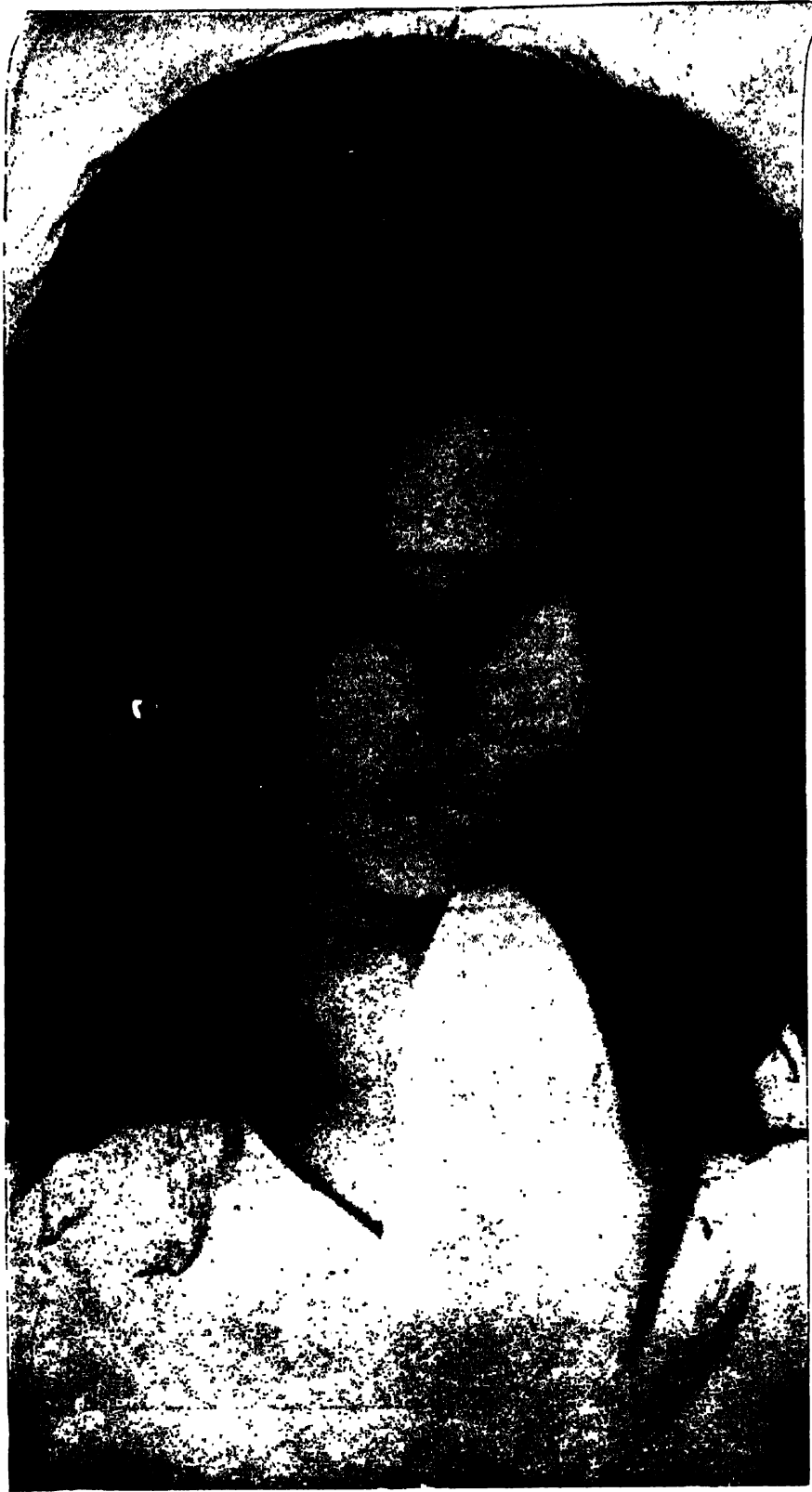
সুনীল দত্ত

বিদেশী — বিভাস মিত্র

(দ্বিতীয় পুরস্কার)

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা: ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

স্বদেশী

দিলীপ পাল

জলে —ননী পাত্র

পাহারা (তৃতীয় পুরস্কার) —রজনী দত্ত

এভিন্যু

—দুর্গেশচন্দ্র নিয়োগী

অন্ধের যষ্টী

মনোবীণা রায়

শ্রীসুধাংশুকুমার গুপ্ত

"দেখো টৌনিক, এ হল নিছক অভিজ্ঞতার ব্যাপার।" পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট মেটস্ বললেন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে উদ্দেশ করে,—"কোন রকম ছল-ছুতো বা কৈফিয়তে বিশ্বাস করি না আমি—আসামী বা সাক্ষী কা'রও কথায় কোন দিন আস্থা স্থাপন করি না। সব মানুষই মিথ্যাবাদী, মিথ্যা বলার ইচ্ছে না থাকলেও মিথ্যাকে এড়াতে পারে না কিছুতেই। সাক্ষী হয়তো হলপ করে বলছে, আসামীর বিরুদ্ধে আর কোন শত্রুতার ভাব নেই অথচ সে জানে না যে তার মনের নিগূঢ় প্রদেশে অর্থাৎ কি না অবচেতন মনে সে তার অনিষ্ট কামনা করছে নিরুদ্ধ ঘৃণা বা ঈর্ষার বশে। আসামী যা বলে সবই অসত্য এবং পূর্ব্বাহ্ণে তৈরী করা, আর সাক্ষী যা বলে তার পশ্চাতে রয়েছে আসামীকে সাহায্য করার অথবা বিপন্ন করার সজ্ঞান কিংবা নিজ্ঞান ইচ্ছা। সাধারণ লোকের কাছে এ সমস্ত তথ্য অজানা থাকলেও আমার কাছে একেবারে জলের মতো পরিষ্কার। মানুষ একান্ত ভণ্ড ও অসাধু—সততাকে সে চিরদিন পরিহার করেই চলে। তুমি হয়তো বলবে, তাই যদি হয়, তবে অপরাধীকে ধরবার উপায় কী? তার একমাত্র উপায় হচ্ছে দৈবের উপর নির্ভর করা অর্থাৎ কি না মানুষ অজান্তে যে-সব কাজ করে বা অসাবধানে যে-সব কথা বলে ফেলে—যা বোধ করা তার পক্ষে একান্ত অসম্ভব—সে দিকে বিশেষ নজর রাখা। সবই ভণ্ডামির আবরণে ঢাকা দেওয়া যেতে পারে, সবই অবশ্য ভুয়ো কিংবা কোন গোপন উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রণোদিত, কিন্তু দৈব সম্বন্ধে ও-কথা বলা চলে না।···আমার পদ্ধতি হচ্ছে এই: আমি বসে থাকি চুপ চাপ, যে যা বলবে বলে তৈরী হয়ে এসেছে, বলতে দিই তাকে, তাদের কথা যে আমি বিশ্বাস করছি এমনি ভাণ করতে থাকি, বস্তুতঃ, তাদের আমি উৎসাহই দিই বলবার জন্য যাতে তারা নিজেদের বক্তব্য সাড়ম্বরে জানাতে কুণ্ঠাবোধ না করে, তার পর আমি ওৎ পেতে থাকি সুবিধা মতো ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়বার জন্য অর্থাৎ কি না অপেক্ষা করি কখন্ ওদের মুখ দিয়ে ফস্ করে এমন একটা কথা বেরিয়ে পড়বে যা বলা ওদের অভিপ্রেত নয়। অবশ্য এ কাজটি সুষ্ঠু ভাবে সম্পন্ন করতে হলে তোমাকে মনস্তত্ত্ববিদ্ হতে হবে। কোন কোন ম্যাজিস্ট্রেটের রীতি হচ্ছে অন্য রকম। তাঁরা গোড়া থেকেই চেষ্টা করেন আসামীকে ঘাবড়ে দিতে—আসামী যখন দাঁড়ায় জবানবন্দী দিতে, অমনি তাঁরা অজস্র প্রশ্নবাণে তাকে জর্জ্জরিত করে তোলেন এবং এমন বেকায়দায় তাকে ফেলে দেন যে বেচারা শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার না করে পারে না যে সে—ধরো গিয়ে—সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথের হত্যাকারী। আমি চাই নিজের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে একেবারে নির্ভুল হতে, তাই আমি সহিষ্ণু ভাবে অপেক্ষা করি যতক্ষণ না আসামীর সুসংবদ্ধ মিথ্যা ভাষণের মধ্যে সত্যের একটুখানি আলো ঝলসে ওঠে। দেখো, এই ধাপ্পাবাজি ভরা দুনিয়ায় সত্যের নাগাল পাওয়া এক রকম অসম্ভব, যদি না অপরাধী অসতর্ক মুহূর্ত্তে ধরা দেয় তার কাজে বা কথায়।

"দেখো টৌনিক, আজ পর্য্যন্ত তোমার কাছে কিছুই গোপন করিনি আমি। ছোটবেলা থেকেই আমরা বন্ধু আর সে বন্ধুত্ব আজও সেই আগেকার মতো গভীর ও অকৃত্রিম। মনে পড়ে একবার জানলার কাচ ভেঙেছিলাম আমি আর আমার অপরাধে শাস্তি পেয়েছিলে তুমি?···কথাটা আমার প্রকাশ করতে ইচ্ছে হয় না বটে, কিন্তু নিজের আচরণে আমি এত লজ্জিত যে প্রকাশ না করেও স্বস্তি পাচ্ছি না···মনে হচ্ছে কথাটা বলে ফেলতে পারলে যেন একটা বোঝা নেমে যায় বুক থেকে। সত্যি, কোন কিছুই বেশি দিন গোপন করা চলে না—গোপন করার চেষ্টা শুধু যাতনা বাড়ায়। আমি যে-পদ্ধতির কথা এইমাত্র বললাম, তা যে আমার নিজের ব্যক্তিগত জীবনে কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে সে কথা বলতে চাই তোমাকে। সবটা শুনে তুমি অবশ্য আমায় বলবে—বলাটা খুবই স্বাভাবিক—যে আমি নিতান্ত আহাম্মক ও বেয়াদব। আর সত্যি বলতে কি, এ ক্ষেত্রে তিরস্কারটা আমার প্রাপ্য।

"দেখো বন্ধু, আমি আমার স্ত্রী মার্থাকে সন্দেহ করেছিলাম। বলতে কি, ঈর্ষায় একেবারে জ্ঞানশূন্য হয়েছিলাম আমি। আমার কেমন ধারণা হয়েছিল, মার্থা গোপনে প্রেম করেছে ঐ ছোকরাটার সঙ্গে—কি নামটা যেন ওর···ঐ···ঐ···ধরো আর্থারের সঙ্গে। আমার মনে হয়, ওকে তুমি চেনো—নামটা না বললেও কিছু অসুবিধা হবে না। আমি অবশ্য অবুঝ নই···আমি যদি নিঃসংশয়ে জানতাম মার্থা ভালোবাসে তাকে, আমি রাগ না করে বলতাম, 'মার্থা, তোমার যা ভাল লাগে তাই কর, আমি বাধা দিতে চাই না।' কিন্তু মুস্কিল এই যে, ব্যাপারটা সঠিক জানতে পারিনি··· টৌনিক, এই সংশয়টা যে কী বেদনাদায়ক তা তোমার ধারণা নেই। বলতে কি, একটা বছর আমার কেটেছে যেন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের ভিতর দিয়ে।···সন্দিগ্ধ স্বামী সচরাচর যে-সব বেয়াড়া কৌশল অবলম্বন করে তা তোমার নিশ্চয়ই অজানা নয়···স্ত্রীর গতিবিধি সে লক্ষ্য করে অলক্ষ্যে, চাকর-বাকরদের প্রশ্ন ক'রে হয়রাণ করে তোলে, কখনও বা প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করে অনর্থক চেঁচামেচি ক'রে। তা'ছাড়া এটাও ভুললে চলবে না যে, আমি আবার ফৌজদারি আদালতের ম্যাজিস্ট্রেট, সওয়াল করাটা আমার এক রকম মজ্জাগত হয়ে গেছে। বিশ্বাস করো বন্ধু, গত বছরটা আমার পারিবারিক জীবনের সবটাই কেটেছে একটানা সওয়াল-জবাবের মধ্যে···সব সময়ই সওয়াল চলেছে পুরোদমে, সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে শোবার সময় পর্য্যন্ত।

"আসামী অর্থাৎ কি না আমার স্ত্রী মার্থা—তুমি হয়তো আশ্চর্য্য হবে শুনে—আমার এই বেপরোয়া সওয়ালে ঘাবড়ায়নি এতটুকু। কখনও সে কেঁদে ফেলেছে অভিমানে, কখনও রাগ করে জবাব দেয়নি আমার কথায়, আবার কখনও বা দীর্ঘ কৈফিয়ত দিয়েছে সারা দিন বাড়ী ছিল না বলে, কিন্তু যখনই সে কথা কয়েছে, সে বেশ সাবধানেই প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, তার কথার মধ্যে এমন কোন গলদ ধরা পড়েনি যাতে তাকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যেতে পারে। অবশ্য অনেক সময় সে মিথ্যে কথা বলতো···মিথ্যে না বলেই বা করে কি··· ওটা হচ্ছে মেয়েদের স্বভাব। কোনো মেয়েই তোমায় সোজাসুজি বলবে না, দু'ঘণ্টা সে ছিল দর্জ্জির দোকানে পোষাকের অর্ডার দিতে গিয়ে—মিথ্যে সে বানাবেই—বলবে, সে গিয়েছিল ডেন্টিষ্টের কাছে কিংবা গোরস্থানে মায়ের কবরটা একবার দেখে আসতে। যতই আমি জেরা করে মার্থাকে অস্থির করে তুলতাম—জানোই তো

সন্দিগ্ধ স্বামী ক্ষিপ্ত কুকুরের চেয়েও মারাত্মক—যতই তাকে কাবু করবার চেষ্টা করতাম তর্জ্জন-গর্জ্জন করে, ততই আমি যেন চিন্তার খেই হারিয়ে ফেলতাম। তার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি অছিলা আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করতাম, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তার মধ্যে আমি পূর্ব্ব-পরিকল্পিত অর্দ্ধ-সত্য ও অর্দ্ধ-মিথ্যা ছাড়া আর কিছুই আবিষ্কার করতে পারতাম না। ঐ সব ছলনার মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই, কারণ মানুষের স্বাভাবিক সম্পর্ক, বিশেষ করে স্বামি-স্ত্রীর সম্পর্ক যে ঐগুলোকেই অবলম্বন করে গড়ে ওঠে এ অস্বীকার করবার উপায় নেই।···আমার যে কী দুর্ভোগ গেছে তা আমি জানি, কিন্তু যখন ভাবি বেচারী মার্থা ভুগেছে আমার চেয়ে বহু গুণ বেশি তখন···তখন আত্মগ্লানিতে মুষড়ে পড়ে মনটা।

"এ বছর মার্থা গিয়েছিল ফ্রাঞ্জেন্সবাড্‌এ হাওয়া বদল করতে। জানোই তো মেয়েদের অসুখ লেগেই থাকে বারো মাস, শরীর ভাল আছে এ কথা কখনও শুনবে না ওদের মুখে···তবে হ্যাঁ, সত্যের খাতিরে আমি বলতে বাধ্য, ইদানীং মার্থার স্বাস্থ্যের জৌলুসটা একটু যেন কমে গিয়েছিল। বলাই বাহুল্য, ওখানেও যাতে ওর গতিবিধি সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করা হয় সে ব্যবস্থা করতে ভুলিনি আমি। টাকা দিয়ে এক জন লোক রেখেছিলাম ঐ কাজটি করবার জন্ত, সে অবশ্য বিশেষ কিছুই করেনি, শুধু বার-কতক মার্থার হোটেলের সামনে ঘোরাঘুরি করেই কর্ত্তব্য শেষ করেছে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পথে যদি সামান্ত এতটুকু অস্বাচ্ছন্দ্য এসে দেখা দেয়, তাহলে সমস্ত জীবনটাই যেন বিষাক্ত হয়ে ওঠে। দেহের এক জায়গায় যদি একটু ময়লা লেগে থাকে তাহলে মনে হয় না কি যেন সারা দেহটাই নোংরা হয়ে গেছে?

"মার্থার কাছ থেকে চিঠি পেতাম মাঝে মাঝে। ভাসা-ভাসা চিঠি—যেন খুব সংযত ভাবে লেখা—মনের নাগাল পাওয়া শক্ত। অবশ্য আমি তার চিঠিগুলো তন্ন-তন্ন করে পড়তাম, কোথাও কোন রহস্যের আভাস আছে কি না পরীক্ষা করতাম বিশেষ মনোযোগের সঙ্গে। তার পর এক দিন এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। মার্থার কাছ থেকে চিঠি এল একটা—খামের উপরে লেখা: ফ্রান্টিসেক্ মেটস্, পুলিস ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি, কিন্তু ভাই, খামের ভিতর থেকে চিঠিখানা বের করে যখন পড়তে শুরু করলাম, দেখি গোড়াতেই লেখা—'প্রিয় আর্থার'।

"তখন আমার অবস্থাটা কী হল বুঝতেই পারছ। আমার হাত ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল—অ্যাঁ! যা সন্দেহ করেছি তাই।··· ব্যাপারটা আসলে মোটেই আশ্চর্য্য নয়—এমনটা হয়ে থাকে প্রায়ই। খানকতক চিঠি লেখার পর তুমি যখন চিঠিগুলো খামে ভরছ তখন এক জনের চিঠি আরেক জনের খামে ভরে দেওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। একেই বলে দৈবের খেলা। তবে মার্থার জন্তে দুঃখ যে না হল তা নয়, বেচারী শেষটা এমন করে ধরা দিলে নিজেকে!

"আমার সম্বন্ধে অবিচার করো না, বন্ধু—সত্যি বলছি, প্রথমটা ভেবেছিলাম আর্থারের উদ্দেশে লেখা চিঠিখানা পড়বো না আমি, ফেরত পাঠিয়ে দেবো মার্থাকে···তা আমি দিতামও, কিন্তু ঈর্ষা মানুষের সাধু সঙ্কল্পকে ব্যর্থ করে দেয়, হীন কাজে প্ররোচনা দেয় মানুষকে। মোট কথা, চিঠিখানা আমি পড়লাম এবং সেই চিঠি তোমায় এখন দেখাতেও পারি, কারণ সেটা সঙ্গেই আছে।···এই দেখো সেই চিঠি··· আমি পড়ছি, শোন মন দিয়ে—

'প্রিয় আর্থার,

তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়েছে বলে রাগ করো না আমার ওপর। আমার মনটা ভারী খারাপ, ফ্রান্‌সির কাছ থেকে—ফ্রান্‌সি অবশ্য আমি—চিঠিপত্র পাইনি অনেক দিন। আমি জানি, সর্ব্বদা সে কাজে ভয়ানক ব্যস্ত, ফুরসৎ নেই একটুও—কিন্তু এত দিন স্বামীর কোন খবর না পেয়ে আমি একেবারে জীবন্মৃত হয়ে আছি। তোমরা পুরুষমানুষ, মেয়েদের এ ব্যথা ঠিক বুঝতে পারবে না। ফ্রান্‌সি আস্‌চে মাসে আসবে এখানে, তুমিও তখন আসতে পারো অনায়াসে। ফ্রান্‌সি লিখেছে, এখন তার হাতে একটা জটিল কেস্ রয়েছে। কেস্‌টা যে কী তা সে লেখেনি, তবে আমার মনে হয় হিউগো মুলার সম্প্রতি যে খুন করেছে কেস্‌টা সেই সম্পর্কেই। ব্যাপারটা জানবার জন্ত আমারও কৌতূহল আছে যথেষ্ট। ইদানীং ফ্রান্‌সির সঙ্গে তোমার দেখা-সাক্ষাৎ কমে গেছে কেন বুঝতে পারি না। ফ্রান্‌সি সব সময় কাজে ব্যস্ত থাকে বলেই কি আসো না তুমি? তোমাদের দু'জনের বন্ধুত্ব যদি আগেকার মতো গাঢ় থাকতো তাহলে হয়তো তুমি জোর করেই ফ্রান্‌সিকে টেনে নিয়ে যেতে মোটরে করে কোথাও বেড়িয়ে আসবার জন্ত, নয়তো বাড়ীতে বসেই দু'দণ্ড গল্প করতে বন্ধুকে খুশি করবার উদ্দেশ্যে। বরাবরই তুমি অন্তরঙ্গ ভাবে মিশেছ আমাদের সঙ্গে এবং এখনও যে আমাদের ভুলে যাওনি এ বিশ্বাস আমার আছে, যদিও তোমার ভাবান্তর লক্ষ্য করছি কিছু দিন থেকে। ফ্রান্‌সি একটু অদ্ভুত ধরণের মানুষ—পাঁচ জনের সঙ্গে মেলামেশা করতে সে কেমন সঙ্কোচ বোধ করে। তোমার স্ত্রী কেমন আছে তা তুমি লেখোনি কেন? ফ্রান্‌সি লিখেছে প্রাগ্‌এ গরম পড়েছে বেজায়, দিনকতক তাই এখানে এসে থাকবে বলে মনস্থ করেছে—কিন্তু চিঠিতে যাই লিখুক না কেন, শরীরের সম্বন্ধে চিরদিনই সে উদাসীন। এখনও হয়তো অনেক রাত পর্য্যন্ত আফিসেই থাকে—বাড়ী ফেরার কথা মনেই থাকে না। সমুদ্রতীরে যাচ্ছ

করবে? আশা করি, স্ত্রীকে সঙ্গে নিতে ভুলবে না। স্বামীকে ছেড়ে থাকতে মেয়েদের যে কী কষ্ট তা তোমরা বুঝবে না।　　　ইতি

শুভার্থিনী

মার্থা মেট্‌সোভা'

"বল তো টোনিক, এই চিঠিখানার সম্বন্ধে কী তোমার অভিমত? আমি জানি, এ চিঠি নিতান্ত নীরস ও মামুলী—না আছে ভাষার জৌলুস, না আছে ভাবের বৈচিত্র্য। কিন্তু মার্থার চরিত্র—অর্থাৎ কি না ঐ হতভাগা আর্থারের প্রতি মার্থার মনোভাব—বুঝতে এ চিঠি যে কতখানি সাহায্য করেছে তা বলা যায় না। মার্থা যদি অকপটে সব কথা বলতো আমার কাছে, তাহলে আমি নিশ্চয় বিশ্বাস করতাম না তাকে—কিন্তু নিতান্ত আকস্মিক ভাবে যা হাতে এসে পড়ল তার গুরুত্ব অগ্রাহ্য করি কি করে? ইচ্ছে ক'রে মার্থা এটা করেনি, নিছক অসাবধানতায় ঘটে গেছে ব্যাপারটা। কাজেই দেখতে পাচ্ছ, সত্য—সরল অবিমিশ্র সত্য—প্রকাশ হয় শুধু দৈবের কারসাজিতে, মানুষের বুদ্ধি-কৌশলে নয়। আনন্দে আমার চীৎকার করতে ইচ্ছে হচ্ছিল—তবে ঐ আনন্দের অন্তরালে লজ্জা ও গ্লানি যে না ছিল তা নয়—কী বোকার মতোই না স্ত্রীকে সন্দেহ করে এসেছি এত কাল!

তার পর কী করলাম আমি? হিউগো মুলার হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত নথিপত্র ফিতে দিয়ে বেশ করে বেঁধে ড্রয়ারে চাবিবন্ধ করলাম এবং পরের দিনই উপস্থিত হলাম ফ্রাঞ্জেন্সবাড্‌এ। মার্থা আমায় দেখে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল অনূঢ়া কিশোরীর মতো, কথা কইতে গিয়ে বার কতক জড়িয়ে গেল কথা। ঐ অবস্থায় কেউ যদি তাকে দেখতো তবে সে নিশ্চয়ই ভাবতো, একটা মস্ত বড় অন্যায় সে করেছে। আমি দিব্যি সপ্রতিভ ভাবে তাকিয়ে রইলাম। খানিক পরে মার্থা বললে,—'ফ্রান্‌সি, আমার চিঠি পেয়েছিলে তো?'

'কোন্ চিঠি?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বললাম আমি—'চিঠিপত্র তুমি তো লেখো খুব কমই।'

মার্থা চকিত দৃষ্টিতে একবার তাকাল আমার পানে, তার পর লম্বা একটা নিশ্বাস ছাড়লে—মনে হল যেন একটা বোঝা নেমে গেল তার বুক থেকে।

'তাহলে নিশ্চয়ই চিঠিখানা ডাকে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম', মার্থা বললে এবং ব্যাগের মধ্যে খুঁজতে খুঁজতে ভাঁজ-করা একখানা চিঠি বের করলে। চিঠিখানা এই রকম: 'প্রিয় ফ্রান্‌সি, ভারী একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। তোমার চিঠি ভুল করে ভরে দিয়েছি মিষ্টার আর্থারের নাম-লেখা খামে। আশা করি, সে চিঠি মিষ্টার আর্থার তোমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন ফেরত ডাকে।'

"তার পর ঐ সম্বন্ধে আর একটিও কথা হল না! আমি অবশ্য হিউগো মুলারের অনুষ্ঠিত লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের কাহিনী সবিস্তারে বলতে সুরু করলাম এবং মার্থাও শুনতে লাগল পরম আগ্রহের সঙ্গে। আমার বিশ্বাস, আজও সে মনে করে ঐ চিঠিখানা আমার হাতে পৌঁছয়নি।

"ব্যাপারটা আগাগোড়াই বললাম। ঐ ঘটনার পর থেকে আর কিছু না হোক, সংসারে শান্তিটা ফিরে এসেছে। বল তো ভাই, স্ত্রীর সম্বন্ধে অহেতুক সন্দেহ পোষণ ক'রে আমি কি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিইনি? কিন্তু অতীতে যে অন্যায় করেছি, এখন তার প্রায়শ্চিত্ত করতে আমি প্রস্তুত। মার্থাকে সব দিক দিয়ে সুখী করাই এখন আমার একমাত্র লক্ষ্য। ওর ঐ চিঠিখানা পড়বার আগে আমি ধারণাই করতে পারিনি আমায় ও অত ভালোবাসে।...যাক, এখন আমার মন থেকে ঐ সন্দেহের মেঘ সরে গিয়েছে—আমি এখন সহজ ভাবে নিশ্বাস নিতে পারছি। পাপ করলে মানুষের যতটা আত্মগ্লানি হয়, বোকার মতো কাজ করলে লজ্জাটা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি।

যাত্রা যাদের সহি দুখ ক্লেশ,
আধেক পথেই হয়ে যায় শেষ,
মধ্য-আকাশে আসে না সূর্য্য
উদয়ের পথে অস্ত হয়,
তাদের জীবন ব্যর্থ নয়।

যে সব বালক-বালিকার দল
সজীব অস্ফুট স্বর্ণ-কমল,
মরিল—জানে না কিসের লাগিয়া
স্মৃতি যাহাদের অশ্রুময়,
তাদের জীবন ব্যর্থ নয়।

রাষ্ট্র যা'দিকে রক্ষিতে'নারে,
দস্যু যা'দিকে লাঞ্ছিয়া মারে,
অভাবে যাদের মানব-সমাজ
রিক্ত এবং নিঃস্ব রয়,
তাদের জীবন ব্যর্থ নয়।

জ্যোতিঃপুঞ্জ যে বীর-হৃদয়,
বিপর্য্যয়েতে শঙ্কিত নয়,
করালো যাদেরে মরণ বরণ
দম্ভী শত্রু কি নির্দ্দয়!
তাদের জীবন ব্যর্থ নয়

☆

☆

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

তারা ধরা-বুকে ফিরে যে আবার,
অমিত প্রতাপ, গতি দুর্ব্বার,
দলিত মথিত করি অরাতিরে
চলে তাহাদের দিগ্বিজয়।
তাদের জীবন ব্যর্থ নয়।

ভূতল গগনে তারা বাঁধে সেতু,
করাল ভয়াল আসে ধূমকেতু—
তাদেরি ব্যথায় প্রলয় এবং
উপপ্লবের অভ্যুদয়।
তাদের জীবন ব্যর্থ নয়।

সেই মৃতেরাই দেয় হেথা আনি
অভয়ের কথা, অমৃতের বাণী
নূতন ধরার স্রষ্টা তারাই
আসে যায় তারা জানে না ক্ষয়।
জীবন তাদের ব্যর্থ নয়।

"সে যাই হোক, দৈবের সাহায্যে কেমন করে একটা বিষয় নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয় তার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পেলে তো?"

* * * *

উপরে বর্ণিত দুই বন্ধুর বাক্যালাপের দিন-কয়েক পরে সেই যুবকটি—যাকে এখানে আর্থার নামে অভিহিত করা হয়েছে—মার্থাকে উদ্দেশ করে বললে, "ওটায় কোন কাজ হল, প্রিয়ে?"

"কিসের কথা বলছ, প্রিয়তম?"

"যে চিঠিটা ভুল করে পাঠিয়েছিলে মেটস্‌এর কাছে।"

"আমার মনে হয় কাজ ওতে ভালই হয়েছে", জবাব দিলে মার্থা। তার পর এক মুহূর্ত্ত কি ভেবে বললে, "এখন ও আমায় যে রকম বিশ্বাস করে তাতে আমি ভারী লজ্জা পাই মনে মনে। সেই চিঠি পাওয়ার পর থেকে ওর ব্যবহারটা বদলে গেছে একেবারে—আমায় খুশি করবার জন্ত ওর এখন কী ব্যগ্রতা! তুমি শুনলে আশ্চর্য্য হবে, আমার সেই চিঠিখানা সব সময়েই ও সঙ্গে নিয়ে ঘুরছে—চিঠিখানা রাখে আবার বুকের ঠিক কাছটিতে।...আমি ওকে যে ভাবে প্রতারণা করছি তা হয়তো সঙ্গত নয় মোটেই—কী বল তুমি?" একটু যেন কেঁপে উঠল মার্থা।

মিঃ আর্থার কিন্তু মার্থার কথায় সায় দিলে না,—সে বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বললে, "ওতে সঙ্কুচিত হবার কিছুমাত্র কারণ নেই।"*

---

* চেকোস্লোভাকিয়ার বিখ্যাত কথাশিল্পী Karel Capek-এর Proof Positive গল্পের অনুবাদ।

মনোরঞ্জন হাজরা

কি একটা কাজে মিনু ঘরের বাইরে গিয়েছিল। তখনও ঘরে সেলাই-কলটা খোলা। ঘরে ঢুকেই কলটার কাছে সে ঝপ্ ক'রে বসে পড়ল। বসেই কাটা-ছিটের টুকরো দিয়ে সেটা মুছতে লাগল। তার মনে হ'ল যেন সে অনেকক্ষণ বাইরে গিয়েছিল, আর সেই ফাঁকে কত ধুলো পড়েছে কলটায়।

কলটা মিনুর প্রাণ। ওর সঙ্গে দাদার স্মৃতি জড়িয়ে। শুধু তাই নয়, ওটা হচ্ছে জীবনযুদ্ধে একটা ভদ্র পরিবারকে টিঁকিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে দাদার মনের সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রতীক। ওটাকে দেখলে মিনুর দুঃখ হয়, যেমন দেখলে দুঃখ হয় মাতৃহীন শিশুকে। অবশ্য কলটার ওপর আবার যেন রাগও কম নয়। দফায় দফায় টাকা দেয়া হবে বলে ওটা কেনা হয়েছিল। প্রতি মাসের শেষে এর দফার টাকা যোগাতে গিয়ে মাসের পর মাস দাদা টিফিন খায়নি, ট্রামে না গিয়ে হেঁটে অফিস করেছে—ফলে দাদার বুকে বাসা বেঁধেছে যক্ষ্মার বীজাণু। দাদা মারা গেছে। মাঝে মাঝে তার মনে হয় কলটাই যেন দাদার মৃত্যুর জন্য দায়ী।

কলটা মুছতে মুছতে অবাক হয়ে মিনু যন্ত্রটার মধ্যে যেন কি দেখে। প্রসূতির মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আসে যে জীবিত সন্তান, মানুষ কি তার ওপর রাগ করে, না তাকে ভালবাসে? চোখ দিয়ে মিনুর জল গড়িয়ে পড়ল কিন্তু সে উপুড় হয়ে কলটাকে বুকে চেপে ধরল।

বাইরে থেকে মা ডাকলেন, মিনু?

মিনু উত্তর দিলে না। ফেলে-রাখা একটা ব্লাউজের বাকী সেলাইটুকুতে হাত দিলে। কল চল্‌ল ঘর্ঘর ক'রে। সম্ভবতঃ এই ভাবেই মা মেয়ের সাড়া পেলেন।

কিন্তু মায়ের তাগাদা জরুরী। গজ্-গজ্ ক'রতে ক'রতে তিনি ঘরের দিকেই এগিয়ে এলেন। তার পর দরজার সামনে এসে বল্‌লেন, আবার এই এত বেলায় বসলি মেসিন নিয়ে? একটা কথা যদি তুই শুনিস্ বাবু। সেই কখন থেকে বলছি, ও-বাড়ীর বউমা কেন ডাক্‌ল—একবার যা শুনে আয়, তা তোর গেরাহ্যি হ'ল না।

গেরাহ্যি ক'রে করবে কি,—একটু ঝাঁঝালো সুরেই মিনু বল্‌লে, দেখছ হাতের সামনে কত কাজ। কথা দেয়া আছে এগুলো কালকের মধ্যে শেষ ক'রে দিতেই হবে। লোক রোজ তাগাদা দিয়ে দিয়ে হায়রাণ হয়ে যাচ্ছে। তারা আমাকে সামনে পায় না, মন্টুকে যা-তা বলে। তারা কেউ কেউ এমনও বলেছে যে মন্টুকে এর পর আর কাজ দেবে না। আমার গাফিলতিতে মন্টু রোজ রোজ লোকের কাছে কথা শুনতে যাবে কেন, বল্‌তে পারো?

সে কথা তো আমি বলিনি, ব'লে মা নিজের স্বপক্ষেই যুক্তি দিতে লাগলেন, তাছাড়া ও-বাড়ীর ওরাও তো আমাদের কাছে যা তা নয়। অনিলের অসুখের সময় সুশোভন কি কম করেছে? কোথায় ওষুধ রে, পথ্য রে, ডাক্তার আর হাসপাতাল রে—সবি তো করেছে।

মেসিনের ছুঁচের নিচে ব্লাউজের কোঁচ ফেলে চেপে ধরে মিনু বল্‌লে, তবু পঁয়তাল্লিশ টাকার ওপর দশ টাকা মাইনে বাড়ায়নি নিজের ব্যাঙ্কের চাকুরের।

ও-কথা বলিস্‌নি—ও-কথা বলিস্‌নি, মা বল্‌লেন, কি সে বাকীটা রেখেছিল কি? আজো যে সে আমাদের টানে এর চেয়ে কি দশ টাকাটাই খুব বেশি হ'ত?

রেখে দাও তোমার টানা, মুখ বেঁকিয়ে ব'সে মিনু কাজে মন দেবার চেষ্টা করল। মা বল্‌লেন, তবু যাস্ না বাপু—কেন ডেকেছে বৌমা, একবার শুনে আসিস্ না!

তোমার বউমা দু'দণ্ড অপেক্ষা করলে কিছু যাবে-আসবে না, মিনু বল্‌লে, কিন্তু এ কাজগুলো পড়ে থাকলে আমার মন্টু ভাইকে অনেক কথা শুনতে হবে। তা ছাড়া মন্টুই কি আমাদের কাছে কম। সে তো সম্পর্কে আমাদের কেউই নয়। শুধু আমি তার দিদির সঙ্গে দেশের স্কুলে একসঙ্গে পড়েছি এই যা—

মা এবার নরম হয়ে বললেন, তা তার কথাও ভাবতে হবে বৈ কি। তবে যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না?

নিশ্চয়ই, ভ্রূ বাঁকিয়ে ব'লে মিনু যেন প্রাণপণে মেসিন চালাতে সুরু করল। বেলা গড়িয়ে এসেছে। আরেকটু বাদেই মন্টু তার ব্যাঙ্কের চাকরী সেরে ফিরবে। ফেরবার সময় কাজগুলো নিয়ে যাবে। কিন্তু কে জানে—হয় তো তার আগেই এসে হাজির হবে সুশোভন। আসে আসুবে। মিনুর যেন নিশ্বাস ফেলবার সময় নেই, এমন ভাবে সে মেসিন চালাতে লাগল।

মিনুর অনুমানই ঠিক। খানিক পরে ব্যাঙ্ক-ফেরতা সুশোভনের বুইক কারখানা একটা হর্ণ দিয়ে এসে থেমে গেল মিনুদের বাড়ীর সামনে। গাড়ীটার সামনেই একটা তেরঙ্গা ঝাণ্ডা আঁটা। ওটা আজকালকার ষ্টাইল—পথের বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে ওটা। শুধু কি পথেরই বিপদ, আরো কত কি।

মা ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে ছুটে মিনুর কাছে এসে বললেন, ওরে সুশোভন আসছে।

মিনুও তা বুঝতে পেরেছে। তাই কল চালাতে চালাতে সে ব'লে উঠল, হুঁ।

হুঁ কি রে, মা মেয়ের বেয়াকুবি দেখে বললেন, তৈরী হয়ে নে।

হ্যাঁ, সে তৈরী হয়েই নেবে।

···সকাল নেই বিকাল নেই—তেরঙ্গা ঝাণ্ডা লটকানো বুইক কারখানা হাঁকিয়ে সুশোভন মিনুদের বাড়ীতে আসে। গাড়ী থেকে নেমেই সজোরে দরজাটা ঠেলে দিয়ে গট-গট ক'রে সে একেবারে এসে পড়ে বাড়ীর ভিতরে। মাথা থেকে সোলার হ্যাটটা নামিয়ে ডাকে, কাকিমা?

মা ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলে ওঠেন, ওরে মিনু, সুশোভন এসেছে।

এমন ভাবে মা বলেন যেন সুশোভন এ-বাড়ীতে এলেই মিনুকে তার কাছে এগিয়ে যেতে হবে। অবশ্য মিনু এগিয়েই যায়। সুশোভন এ-বাড়ীতে এলেই মিনুকে যে এগিয়ে যেতে হবে, সে রকম কোন নিয়ম নেই। তবে সুশোভন তাই আশা করে। আর কৃতজ্ঞ হিসাবে—যেহেতু একদা সুশোভন দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার ব্যাঙ্কে চাকরী দিয়েছিল। দাদার অসুখের সময়ে অনেক রকমে দেখা-শোনা করেছিল—সেই হেতু কৃতজ্ঞতা দেখাতেও মিনুকে এগিয়ে যেতে হয়। এক কথায় সুশোভনের আসা ও মিনুদের কৃতজ্ঞতা, এই দু'য়ে মিলে এটা একটা সাধারণ ভদ্রতা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মিনু এগিয়ে এলেই সুশোভন বলে ওঠে, নাও, তৈরী হয়ে নাও—গাড়ী নিয়ে এসেছি। মিনু আপত্তি করতে পারে না, মা-ও কিছু বলেন না, সোজা সে বেরিয়ে পড়ে সুশোভনের সঙ্গে। তার পর এ আড্ডায় সে আড্ডায়—হাওড়া থেকে আরম্ভ ক'রে বালিগঞ্জ, হিন্দুস্থান পার্ক পর্য্যন্ত বহু বাড়ীতে চলে ঢুঁ-মারা। কি অসংখ্য পরিচয় এই সুশোভনের। তবে তার ছেলে-বন্ধুর থেকে মেয়ে-বন্ধুর সংখ্যাই যেন বেশি। স্কুল-টিচার, নার্স, টেলিফোনের মেয়ে, নৃত্য-শিল্পী, এমেচার গায়িকা—এমনিতরো সব বহু মেয়ে। কিছু কাল যাবৎ মিনু সুশোভনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়িয়ে প্রায় এদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে।

মিনু নিজের সম্বন্ধে খুব সচেতন। সে গরীব-ঘরের মেয়ে। বাহুল্য তার নেই কিন্তু রূপ আছে। আড্ডায় আড্ডায় যখন সে যায় তার সাদাসিধে বেশভূষা, দু'হাতে দু'টি সোনার সরু বালা ও কানে ছোট্ট দু'টি দুল ছাড়া এক রকম প্রায় নিরাভরণ অঙ্গই থাকে। ফল হয় কি, মিনতি যেন লোকের চোখে ভাল খোলে। শিস্ দেয়া চাবুকের লকলকে ডগার মত সে অপরের চোখে ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে আর এই জন্যেই সুশোভনের সমস্ত বান্ধবীর কাছে—এমন কি তার স্ত্রী সুলেখার কাছেও সে যেন এক অসম্ভব দাহিকা-শক্তিসম্পন্না মেয়ে।

সুশোভনের সঙ্গে এই ভাবে ভদ্রতা রক্ষা যেমনই হোক্ তবু মাঝে মাঝে মন্দ লাগে না। সুপুরুষ চেহারা সুশোভনের। বয়স ছত্রিশের কাছাকাছি। দীর্ঘ ঋজু দেহ, মাথায় সামান্য টাক, চোখে জার্ম্মাণ শেল ফ্রেমের চশমা। অধিকাংশ সময় স্যুট পরে থাকে। আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে সিগারেট। চুরি ক'রে দেখতে মন্দ লাগে না। সামনে এলেও যে খারাপ লাগে তা নয়। বেশ সহজ একটা মিষ্টি সুর কোথা থেকে এসে যেন তাদের ঘিরে ধরে।

এমনি ক'রে একটা-আধটা বছর নয়, সুশোভনের সঙ্গে প্রায় দশটা বছর কেটে গেছে। আজ বয়স তার ছাব্বিশ। সেই ষোল বছর বয়সে লোকটার সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়েছে।

আজো মিনুর বিয়ে হয়নি। দাদা নানা রকম ভাবে তাকে পাত্রস্থ করে যাবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আর্থিক স্বচ্ছলতা তার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। আজ দাদা নেই। তাই যেন দাদার ব্যর্থ-চেষ্টার বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেরই এক একবার চেষ্টা করবার প্রেরণা আসে মনে। সেজন্য সময় সময় চাঁদের দিকে হাত বাড়াতে সাধ হয়। কিন্তু কেমন যেন ভয়, সঙ্কোচ, দীনপণা এসে তাকে জড় মাংসপিণ্ডের মত ক'রে তোলে। তখন মনে হয়, কোন কালে তার মধ্যে যেন কোন প্রাণ-প্রবাহ বা কোন রকম স্পন্দন ছিল না। যেন মৃত্যুর হিম-শীতল শিহরণের মধ্যে দিয়ে সে অনুভব করে সমস্ত জগৎ জুড়ে একটা মাত্রই মানুষ চলাফেরা করছে এবং সে মানুষটা হচ্ছে সুলেখা। শোভনলালের স্ত্রী সুলেখা।

সুলেখার ওপর মিনুর কখনো ঈর্ষা হয় না। তা ছাড়া কখন যে ঠিক কি হয়, তাও সে বোঝে না। কিন্তু এই একই কারণে সে চাঁদে দেখতে পায় কলঙ্ক!

ঘরে স্ত্রী আছে। তবু সুশোভন কেন তার মত অনাত্মীয়া মেয়েকে এমন ক'রে কাছে টানে? নিজে সে অধ্যবসায় বলে গড়ে তুলেছে ব্যাঙ্ক, সমস্ত যুদ্ধটা ব্যাঙ্ক-মারফৎ ব্যবসা ক'রে প্রচুর পয়সা করেছে। তার মত মানুষের মিনুর মত এমনিতরো মেয়েকে নিয়ে খেলা করা সাজে না। সে কি পারবে তাকে সুলেখার আসনে বসাতে? না সুলেখা তাকে দেবে তাই করতে? তাই যদি সে না পারে তবে তাদের বাড়ীতে এসেই অমনি ক'রে কেন বলে, চলো মিনু বেড়িয়ে আসি—

মিনুর মন যেতে না চাইলেও তাকে যেতে হয়। দাদাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে নিজের ব্যাঙ্কে চাকরী দিয়েছিল সুশোভন। দাদার অসুখের সময় অনেক রকমে অনেক কিছু করেছে সুশোভন। তা ছাড়া···সুশোভন মিনুর মনে কেমন ক'রে যেন স্বপ্নের বীজ উপ্ত করে দিয়েছে। এসে ডাকলে সে আর স্থির থাকতে পারে না। এমন কি মা-ও সায় দেন।···

সুশোভন সোজা গট্-গট্ ক'রে বাড়ীতে এসে ডাকল, কাকিমা! মিনু বেরিয়ে এল ঘর থেকে। মা বলে উঠলেন, ব্যাঙ্ক থেকে ফিরলে বাবা!

হ্যাঁ কাকিমা, হ্যাটটা বগলে পুরে সুশোভন বললে।

মা বললেন, ওরে মিনু, বসতে জায়গা দে সুশোভনকে।

সুশোভন বললে, না কাকিমা বসব না। তার পর মিনুর দিকে তাকিয়ে বললে, নাও চলো। গাড়ী এনেছি—বাড়ী যাব।

বাড়ী যাবে, মা বললেন, তাহ'লে তো ভালই হয়েছে। এই আমি মিনুকে বলছিলুম—বউমা কেন ডেকেছে একবার ঘুরে আয় দিকি।

তা চলো, সুশোভন মিনুকে বললে, কাকিমার বউমা যখন ডেকেছেন—

হ্যাঁ, ঈষৎ হেসে ও ঘাড় নেড়ে মিনু বললে, চলুন। কিন্তু আমাকে এখুনি ফিরতে হবে।

বেশ, সুশোভন এগিয়ে চলল। পিছন পিছন চলল মিনু। ষ্টীয়ারিং হুইলের সামনে বসে বাঁ হাতে ক'রে বাঁদিক্‌কার দরজাটা খুলে দিলে। মিনু উঠে পড়ল।

গাড়ী চলল ছুটে।

* * * *

অপরাহ্ণ পার হয়ে গোধূলির ছায়া নেমে এসেছে। আকাশে যেন কেমন একটা থমথমে ভাব। পূর্ব দিকে মেঘ করেছে। ঝড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে ইতিমধ্যেই। মিনু হন্ত-দন্ত হয়ে বাড়ী ফিরল। ইতিমধ্যেই মণ্টু এসে গিয়েছিল বাড়ীতে। বছর বাইশ বয়স ছেলেটির, মুখে কৈশোর কালের রঙ লেগে এখনো। সহজ সরল কথাবার্ত্তা। অনেকক্ষণ বসে বসে তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছে, তাই বাইরে রকের ওপর পায়চারী করছে। মিনুকে দেখেই সে রেগে উঠল। রাগত ভাবেই সে বললে, এ মিনুদি কিন্তু তোমার ভারী অন্যায়।

মিনু তার মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প একটু হেসে বললে, চুপ চুপ—তুই ঘরে চ ভাই। আমি যেমন ক'রে পারি এখুনি কাজ-গুলো শেষ ক'রে দোব।

শেষ করে দোব বললেই তো আর হবে না, মণ্টু যেন একটু নরম হয়েই বললে, সময় তো লাগবে।

বেশি সময় লাগবে না, মিনু মণ্টুকে টান দিয়ে বললে, আয় না—আয় তুই ঘরে আয়। তার পর এক রকম টানতে টানতেই মিনু তাকে ঘরে নিয়ে গেল। মা রান্নাঘর থেকে বললেন, বেচারী অনেকক্ষণ থেকে বসে আছে।

তা থাকবে না বসে, মিনু বললে, আমি যে তোমার ও-বাড়ীর বউমার কাছে গিয়েছিলুম।

মা প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ রে, বউমা ডেকেছিল কেন রে?

ঘরে ঢুকেই সেই খোলা মেসিনটার সামনে বসে পড়ে মিনু বললে, আর তোমার বউমার নাম মুখে আনবে না কোন দিন। তার পর মণ্টুর দিকে তাকিয়ে পাশের চৌকিটার দিকে নির্দ্দেশ করে বললে, বস ভাই ওখানে—

কিন্তু এখানে ঘরে বসে থাকলে, মণ্টু বলতে লাগল, আমার যে বড় অসুবিধে হবে মিনুদি। দিদি আসবে বলেছিল যদি ফিরে যায়।

—গীতা আসবে আমাদের বাড়ী?

—বলেছিল তো।

—কোথায় সে?

—সে গেছে মিছিলের সঙ্গে। তাদের টেলিফোনের মেয়েরা যে সব ষ্ট্রাইক ক'রেছে।

—ও!

আচ্ছা তুমি কাজ করো মিনুদি, মণ্টু বললে, আমি বাইরেটায় পায়চারী করি।

সে তো আমাদের বাড়ী চেনে, ব'লে মিনু মুখ তুলতেই মণ্টু দেখতে পেলে যে তার চোখের জল গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। মণ্টু বিস্মিত ভাবে বললে, এ কি মিনুদি, তুমি কাঁদছো কেন?

চুপ কর ভাই মণ্টু, মিনু বললে, মা শুনতে পাবে। পরক্ষণেই মুখে হাসি এনে বললে, কাঁদিনি আমি—চোখে যেন জানি না জল এসে পড়েছিল।

রান্নাঘরে মা আহত হয়েছিলেন মিনুর কথায়। তোমার ও-বাড়ীর বউমার নাম মুখে আনবে না কোন দিন—এত বড় কথাটা মাকে যে মিনুর কাছ থেকে শুনতে হবে কোন দিন তা তিনি ভাবেননি। অথচ কথাটা মিনু কেন বললে মাকে তারও তো একটা কারণ থাকতে পারে। তাই মা এসে দাঁড়ালেন দরজার কাছে। বললেন, হ্যাঁ রে, কি হয়েছে রে?

কিছু হয়নি—কিছু হয়নি মা, মিনু বলে উঠল, তুমি যাও। আমায় কাজ করতে দাও—

মা বিরক্ত হলেন মেয়ের কথায়। তার পর কি ভেবে তিনি যেন একটু কড়া ভাবেই হাঁকলেন, মিনু—'খুকি'?

মিনু ফুঁসে উঠে বললে, হাঁ মিনু খুকি—কিন্তু তোমার কাছে, তাদের কাছে নয়।

মা এবার যেন আরও কি ভাবলেন। তার পর শান্ত ভাবে বললেন, ওরা কি তোকে কিছু বলেছে?

বলেছে মানে, মিনু ফুঁসে উঠে বললে, তোমার ও-বাড়ীর বউমা, তোমার সুশোভনের বউ যা বলেছে তা মুখে আনতেও আমার বাধে।

কি বলেছে বউমা, মা সভয়ে প্রশ্ন করলেন।

মায়ের প্রশ্নে সমস্ত দৃশ্যগুলো একেবারে তার চোখের সামনে যেন জ্বল-জ্বল করতে লাগল। সেই সুশোভনের সঙ্গে মোটরে করে গিয়ে সে তাদের বাড়ীর দরজায় নামল। ওপরে উঠতে না উঠতেই সুলেখা ছুটে এল। এসে বললে এই যে যুগলেই আসা হচ্ছে।

যুগল তো দেখব বৌদি আপনাদের, মিনু বললে।

আর রসিকতা করতে হবে না, সুলেখা মুখ বেঁকিয়ে বললে, খুব হয়েছে। তার পর কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে সুলেখা তাকে আর কোন সুযোগ না দিয়ে হাতটা ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল। মিনু ব্যাপারটা তখনও হাস্য-পরিহাসের সুরেই আছে ভেবেছিল কিন্তু ঘরে গিয়েই তার সে ধারণা দূর হয়ে গেল। মিনু দেখলে সুলেখার চোখে-মুখে কেমন যেন একটা প্রতিহিংসার ছাপ। সুলেখা মিনুর হাতে একটা হেঁচকা টান দিয়ে বললে, আমি পছন্দ করি না তুমি আমার স্বামীর সঙ্গে এতখানি মাখামাখি করো।

রুখে দাঁড়ালো মিনু। মাথায় তার আগুন জ্বলে উঠছিল যেন। সে তাই বললে, তার মানে?

মানে যা হয়, সুলেখা বললে, তাই তোমাদের এই ভদ্র ভাবে জীবনযাত্রার রীতিটা একটু সন্দেহজনক—এই আর কি।

ইঙ্গিতটা অত্যন্ত নীচ। মিনু দরিদ্র হলেও আত্মসম্মান জ্ঞান তার আছে। সে বলে উঠল, একটু সংযত হয়ে কথা বলবেন বৌদি। আপনার বাড়িতে আমি এমনি এমনি আসিনি—আমি এসেছি আপনার স্বামীর সঙ্গে। যদি কিছু বলবার থাকে তবে তাঁকে বলবেন। আমরা গরীব হতে পারি কিন্তু আপনার মত কোন বড় বাড়ীর বউয়ের চোখ-রাঙানি সহ্য করতে প্রস্তুত নই। তার পর মিনু আর সেখানে দাঁড়ায়নি। সোজা সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে একবারে পথে।

মায়ের প্রশ্নের উত্তরে একে একে সে সব কথা বললে। মা অবাক-বিস্ময়ে বলে উঠলেন, বলিস্ কি রে?

মিনুর গাল ছ'টো ভেসে যাচ্ছিলো জলে। মণ্টু বাইরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল নিস্ত নির্ব্বাক্ স্তব্ধতায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সে মিনুর কথাগুলো শুনছিল, বাইরে যেতে পারেনি। মিনু তার দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, হ্যাঁ মা হ্যাঁ—আমি সত্যি কথাই বলছি। আমরা গরীব লোক—আমাদের ভদ্র জীবনযাত্রা ওদের ঈর্ষার বস্তু। এবার তোমার সুশোভন এলে বলে দিও—

ঠিক সেই সময়েই বাইরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল। মা বললেন, চুপ্! চুপ্!

চুপ্ চুপ্ নয় মা, মিনু অশ্রুসিক্ত চোখ ছ'টোর বিস্ফারিত চাহনি মেলে বললে, ভয় নেই, আমি তাঁকে অসম্মান করব না। তবে আর কখনো আমি ওদের ত্রিসীমানায় যাব না।

বাইরে শোনা গেল, কাকিমা!

মা বেরিয়ে গেলেন বাইরে। সুশোভন এসেছে। এসেছে ধুতি আর পাঞ্জাবী চড়িয়ে। স্লিপার ফট্-ফট্ ক'রতে করতে এগিয়ে এসে বললে, মিনু কোথায় কাকিমা?

মেয়ের অপমানিত আত্মা আর তার চোখের জল দেখে মায়ের মনটা কেমন কঠিন হয়ে উঠেছিল। তাঁর সেই কঠিনতা প্রকাশ পেলে তাঁর কথায়ও। তিনি বললেন, মিনু অসুস্থ।

আমি বুঝি কাকিমা, সুশোভন আরও এগিয়ে আসার উদ্দেশ্যে পা ফেললে।

সে বলেছে, মা যেন একটু বেদনাহত ভাবেই বললেন, সে আর কোথাও যাবে না।

ও! সুশোভন থমকে দাঁড়ালো।

মা বললেন, তার খুব লেগেছে।

খুব স্বাভাবিক কাকিমা, আরও কি যেন বলতে গেল সুশোভন। কিন্তু পারল না।

মা ডাকলেন, মিনু?

কিন্তু এইটেই কি তার শেষ কথা কাকিমা? বলে সুশোভন উত্তরের অপেক্ষায় যেন ব্যগ্র হয়ে উঠল। মা মিনুকে আসতে দেখে বললেন, ঐ তো মিনু আসছে, জিজ্ঞেস করো।

জিজ্ঞেস করতে হবে না, মিনু বললে, আমি শুনতে পেয়েছি।

তবে বলো, সিগারেট-কেসটা পকেট থেকে বের করে একটা সিগারেট টেনে নিলে। মিনু আরও এগিয়ে এল। পিছনে পিছনে এল মণ্টুও। সিগারেটটা কেসের ওপর ঠুকে নিয়ে সুশোভন মুখ তুলে তাকালো মিনুর দিকে। মিনুর ওদিকে কার যেন একটা মুখ। বাইরে বুঝি শোনা যাচ্ছে চলমান মিছিলে নবজাগ্রত নর-নারীর কণ্ঠস্বর—'আমাদের দাবী মানতে হবে।' আকাশের পূর্ব-দিকে ঘনীভূত মেঘ ঝড়ের আঘাতে যেন ছিঁড়ে-ছিঁড়ে উড়ে যাচ্ছে। সমস্ত আবহাওয়া জুড়ে যেন এক সঞ্চরমান বিরক্তি। সুশোভন সিগারেটটা ঠোঁটের ফাঁকে রাখল।

মিনু বলে উঠল, আপনি দুঃখ করবেন না—এইটেই আমার শেষ কথা।

ও, সিগারেটটা মুখ থেকে হাতে নিয়ে সুশোভন বললে, বুঝেছি। তার পর মণ্টুর দিকে তাকিয়ে তাকে যেন চিনতে পেরে বললে, ব্যাপার কি—এ বাড়ীতে?

মণ্টু ইতিপূর্ব্বেই সুশোভনকে চিনতে পেরেছিল। সুশোভনের ব্যাঙ্কে ষ্ট্রাইকের ব্যাপার নিয়ে কয়েক দিন আগে লোকটার সঙ্গে তার একটা বচসা হয়ে গিয়েছিল। তাই সেই ঘটনা স্মরণ করে লোকটা তাকে খুব সহজ ভাবে অথচ বেশ ঠোক্কর দিয়ে বলেছে, ব্যাপার কি—এ বাড়ীতে? মণ্টু এ-সব বোঝে। তাই সে-ও ঠিক তেমনি ভাবেই বললে, আপনিও যে উদ্দেশ্যে এসেছেন আমিও সেই উদ্দেশ্যে।

হেঁ হেঁ, সুশোভন সিগারেটটা মুখে তুলল।

কিন্তু বাড়ীর দরজায় সেই মুহূর্ত্তেই পা দিল মণ্টুর দিদি গীতা। গীতা বাড়ী ঢুকেই অভিনয়ের মঞ্চে যেমন এক-একটা দৃশ্যে কতকগুলি কুশীলবকে একত্র দেখতে পাওয়া যায় তেমনি ভাবে সুশোভন, মণ্টু, মিনু ও অদূরে মিনুর মাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কেমন যেন একটু হকচকিয়ে গেল। মিনু গীতাকে দেখতে পেয়ে ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বললে, আয় ভাই গীতা! পিছন ফিরে সুশোভনের দিকে তাকিয়ে গীতা বললে, সুশোভন যে—ব্যাপার কি? তুমি এখানে—নির্ম্মলা ভাদুড়ীর ওখানে যাওনি যে বড়?

মিনু গীতাকে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে যাচ্ছিলো। নির্ম্মলা ভাদুড়ীর নাম শুনে সে থমকে দাঁড়ালো। সেই বিখ্যাত নাচিয়ে মেয়েটা, তার ওখানেও সুশোভন তাকে কয়েক বার নিয়ে গিয়েছিল। সে কথা মনে পড়ায় এবং গীতাও তাকে জানতে পারায় কৌতূহলী হয়ে মিনু প্রশ্ন করল, তুই চিনিস্ না কি নির্ম্মলা ভাদুড়ীকে?

চিনি বৈ কি, গীতা বললে, কত দিন সুশোভন আমাকে নিয়ে গেছে ওর মোটরে চড়িয়ে।

—তাই না কি?

—হুঁ। সে কি আজকের কথা। এক দিন সুশোভনের গাড়ী আমাদের টেলিফোন-হাউসের সামনে দিন-রাত অপেক্ষা করত গীতার জন্তে। আজ আর সে দিন নেই—না সুশোভন?

মিনু গীতাকে একটা ঠেলা দিয়ে চাপা গলায় বললে, পোড়ারমুখি, মণ্টু রয়েছে না?

সুশোভন শুধু বুঝি একবার মুখ তুলে তাকালো গীতার দিকে। তার পর পিছন ফিরল।

আকাশের জমাট মেঘ ছুটে চলেছে তখন ঝড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে, আর তারি ফাঁকে-ফাঁকে আসন্ন সন্ধ্যার ক্রমবর্দ্ধমান অন্ধকারের পটভূমিকা ভেদ ক'রে ঈশাণ কোণে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতের শিখা লক্-লক্ করছে ধারালো তরোয়ালের মত।

মৌলবী [শিল্পী—সুধীর খাস্তগীর

ভারতে হিন্দু-মুসলমান

শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়

আলোচনা-প্রণালীর বৈশিষ্ট্য

দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ জীবনে চলেছে অহর্নিশ ঘাত প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে সমাজ চলেছে এগিয়ে। প্রীতি-বন্ধুত্বের মতো দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও স্বাভাবিক জীবনেরই অংগ। জীবনের গভীরেই রয়েছে দ্বৈত,—ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, সত্য-অসত্য। এদের সংঘর্ষ মানুষকে, সমাজকে ধাপে ধাপে ঠেলে নিয়ে চলেছে বিবর্তনের পথে। তাই দ্বন্দ্বমূলক প্রশ্ন বা সমস্যায় ভীতি-বিহ্বল হওয়া কোনো দিক থেকেই যুক্তিসংগত নয়; যেখানে দ্বন্দ্ব নেই, উন্নতির সম্ভাবনাও সেখানে নিশ্চিহ্ন।

ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজকাল যে কংগ্রেস-লীগ বিরোধের সুর ধ্বনিত, তা সমাজ-চেতনার বিবর্তনেরই ফল। পুরাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ না এলে নতুন সৃষ্টি অসম্ভব। এই বিদ্রোহ যেখানে, দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষও সেখানে অনিবার্য; আর তারই ফলে হয় সমাজের ক্রমবিকাশ। গোড়াকার এই কথাটা মনে রাখলে "ভারতে হিন্দু-মুসলমান" সমস্যার নিরপেক্ষ আলোচনা সহজ হবে। নিজের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা ও বদ্ধ সংস্কারের মাপকাঠিতে সামাজিক সমস্যার স্বরূপ সন্ধান বিজ্ঞানসম্মত পন্থা নয়। বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার অর্থ "Inductive Method"-এর সুপ্রয়োগ। অর্থাৎ নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সর্বপ্রথমে ঘটনা ও তথ্যগুলির পর্য্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ এবং পরিশেষে সেই পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের ফলে সিদ্ধান্ত প্রকাশ। রাষ্ট্রনীতি আলোচনার ক্ষেত্রেও এই "Inductive Method" প্রয়োগের প্রয়োজন আজ এসেছে। উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি না থাকলে সমস্যার যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কার অবাস্তব এবং সমস্যা সম্বন্ধে ধারণাই সেখানে ভ্রান্ত, সঠিক সমাধানের পন্থা-নির্দেশও সেখানে অসম্ভব।

ভারতবর্ষ—বিচিত্র জাতি ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র

ভারতবর্ষ একটি অতি-বিশালায়তন ভূখণ্ড। একে মহাদেশ বললেও অত্যুক্তি হয় না। রাশিয়া ছাড়া সমগ্র ইয়োরোপের আয়তন যা, একমাত্র ভারতের আয়তনই তার অনুরূপ। বিচিত্র জাতির ধারা এসে এখানে মিলিত হয়েছে। আর্যদের ভারত আগমনের সময় থেকে ঐতিহাসিক ভারতের সূচনা (১)। মোহেনজোদাড়ো সভ্যতা আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে আজকাল আবার স্যার জন মার্শাল প্রমুখ পণ্ডিত আর্যপূর্ব দ্রাবিড়দের (২) সময় থেকেই এই মাত্রা টানতে

(১) এ বিষয়ে মত-বিভেদ রয়েছে। বিস্তৃত আলোচনা বর্তমানে অবান্তর। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, সুপ্রচলিত ধারণায় ভারতবর্ষে আর্যরা এসেছিল ভারত-বহির্ভূত কোনো ভূখণ্ড থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ প্যারী-প্রদর্শনী বক্তৃতায় (১৮৯৯-১৯০০) এই মত ভ্রমাত্মক বলে ঘোষণা করেছিলেন। নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও সম্প্রতি তাঁর বিভিন্ন রচনায় প্রচলিত ধারণাকে অনৈতিহাসিক ব'লে দেখিয়েছিলেন। স্বামী শংকরানন্দ প্রণীত "Rig-Vedic Cultute of the Prehistoric Indus" বইয়ের সুদীর্ঘ ভূমিকায় ডক্টর দত্তের অভিমত খোলাই করা আছে।

(২) মোহেনজোদাড়ো সভ্যতা আর্যপূর্ব দ্রাবিড়ের নির্মিত সভ্যতা। স্বামী শংকরানন্দ তাঁর "Rig-Vedic Gulture of the Prehistoric Indus" গ্রন্থে (২ খণ্ড, ১৯৪৩-৪৪) এই মত খণ্ডন করেছেন। তিনি বলেন মোহেনজোদাড়ো সভ্যতার গঠনকর্তারা আর্য ছাড়া কিছুই নয়। যে আর্যরা একদিন ঋগ্বেদ রচনা করেছিল, মোহেনজোদাড়ো সভ্যতাও তাদেরই সৃষ্টি। নরতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করে ডক্টর ভূপেন দত্তও এই মতে সমর্থন জানিয়েছেন।

অভ্যস্ত। যাই হোক, আর্যদের বহু শতাব্দী পরে ভারতবর্ষে প্রবেশ করলো পারসীকগণ (খৃ: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে)। সিন্ধুনদের নিকটস্থ অঞ্চলে অবস্থিত আর্যদের নাম তারা দিল "হিন্দু," কারণ তারা "স"-এর স্থানে "হ" অর্থাৎ "সিন্ধু"র স্থানে "হিন্দু" উচ্চারণে অভ্যস্ত ছিল। "হিন্দু" শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এখানেই। পরবর্তী-কালে অবশ্য 'হিন্দু' শব্দ ব্যাপক অর্থ লাভ করলো এবং পরিশেষে "হিন্দু" বললেই সূচিত হ'তে লাগ্‌লো আর্যভাবাপন্ন ব্যক্তি। পারসীকদের পরে এলো গ্রীকগণ। গ্রীকদের সংস্পর্শে 'হিন্দু' শব্দের প্রচার ও প্রসার ঘট্‌লো আরও অনেক বেশী। গ্রীকদের পরে ক্রমে ক্রমে ভারতে এলো ব্যাক্‌ট্রিয়ান্‌, সাইথিয়ান, পার্থিয়ান ও কুষাণগণ। তার পর এলো হূণ, শক, গুর্জার; প্রতিহার প্রভৃতি মধ্য-এশিয়ার যাযাবর উপজাতিগণ। তার পর এলো পাঠা'ন আফ্‌গান, তুর্কী ও মুসলমানগণ। সর্বশেষে আবির্ভূত হলো পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ প্রভৃতি আধুনিক জাতিগণ।

অতএব সহজেই বুঝা যাচ্ছে যে, ভারতবর্ষ প্রাচীন কাল থেকে হয়ে এসেছে একটা প্রকাণ্ড জাতি ও সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র (Melting Pot of Races and Cultures)। প্রত্যেক জাতিই ভারতে প্রবেশের সময় সংগে করে কম-বেশী নিয়ে এসে'ছ নিজ নিজ সংস্কৃতির ধারা। অহর্নিশ দলে-দলে, জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষ হলেও তারই ভেতর দিয়ে বারে-বারে ভারতভূমিতে ঘট্‌লো বর্ণ সাংকর্য ও সাংস্কৃতিক বিনিময়। একাধিক মানুষ, দল বা জাতি যখন পারস্পরিক যোগাযোগ লাভ করে, তখন সংস্কৃতির বিনিময়, সভ্যতার আদান-প্রদান অতি স্বাভাবিক। সে পথ সরল বা বাঁকা যাই হোক্‌ না কেন। সমাজ-শাস্ত্রে (Sociologyতে) এরই নাম "Acculturation"। বিভিন্ন জাতি-উপজাতির মিলন ও অবদানের ফলে, বহু সহস্র বর্ষের সাধনা ও সংঘর্ষের পরিণতিতে ভারতে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, তারই সাধারণ নাম "ভারতীয় সভ্যতা"। যদিও অনেক সময় "হিন্দু-সভ্যতা" শব্দটাকেই "ভারতীয় সভ্যতা" প্রকাশার্থক প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তথাপি বস্তুনিষ্ঠ বিচারে দুই শব্দ একার্থক নয়, অন্তত বর্তমানে নয়। কারণ, ঐতিহাসিক ভাবে "হিন্দু" শব্দ যে অবস্থায়ই উৎপন্ন হোক্‌ না কেন, আধুনিক কালে "হিন্দু" শব্দে ভারতবাসী মাত্রকেই বুঝি না, বুঝি কতকগুলি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি-সম্পন্ন নরনারীকে অর্থাৎ যারা মোটামুটি ভাবে আর্যধর্ম ও সংস্কৃতি দৈনন্দিন জীবনে মেনে চলে প্রধানত তাদেরকেই। কাজেই "ভারতীয় সভ্যতাকে" "হিন্দু সভ্যতা" আখ্যা দিলে, ভারতীয় সভ্যতার গঠনে "অ-হিন্দু" উপাদানগুলিকে অনেকটা অস্বীকার করা হয়। তাই দেশের নাম অনুসারেই এই ভৌগোলিক সীমারেখার ভেতরে গড়ে-ওঠা সভ্যতার যথার্থ নাম "ভারতীয় সভ্যতা"।

অখণ্ড ভারতরাষ্ট্র বনাম পাকিস্থান

"ভারতবাসী" বলতে আজকাল যাদের বুঝায়, তাদের ভেতর সংখ্যার দিক্‌ থেকে হিন্দুরাই সর্বপ্রধান, তার পর মুসলমানেরা। ভারতীয় রাষ্ট্রীয় চেতনায় বিগত কয়েক যুগ থেকে ছিল ব্রিটিশ-কবল-মুক্ত এক অখণ্ড রাষ্ট্র-গঠনের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে কর্মের ভেতর রূপ দেবার প্রত্যক্ষ সাধনা কংগ্রেস তা'র প্রতিষ্ঠা-যুগ (১৮৮৫ খৃ:) থেকে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে প্রচার করে এসেছে। কিন্তু কিছু কাল যাবৎ (১৯৪০ খৃ: থেকে) "পাকিস্থান" (অর্থাৎ মুসলমানদের পবিত্র স্থান) ভারতের বুকে গঠনের আগ্রহ এক দল মুসলমানের ভেতর দেখা দিয়েছে এবং ক্রমশই এই আগ্রহ একটা প্রচণ্ড শক্তিশালী সংঘরূপে বিবর্তিত হতে চলেছে। গত দুই বৎসরের ভেতর এই সমস্যা আরও গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। সম্প্রতি কলকাতা ও পূর্ববংগে তার প্রকট মূর্তিও দেখা দিয়েছে। এক দিকে ভারতীয় ঐক্যের আদর্শ, অন্য দিকে পাকিস্থান গঠনের স্বপ্ন। এই দুই মনোভাব পরস্পরবিরোধী। সেই বিরোধের সুর আজকাল অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তার বৈজ্ঞানিক কারণ বিশ্লেষণই বর্তমান লেখকের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বলে রাখা প্রয়োজন যে, ভারতের সকল মুসলমান "পাকিস্থানের" পক্ষপাতী নয়। যারা পক্ষপাতী তারা বলেন যে, আচারে-ব্যবহারে, ধর্মে-কৃষ্টিতে মুসলমানগণ হিন্দুগণ হ'তে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কাজেই স্বাতন্ত্র্যশীল রাষ্ট্রগঠন উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়। অতএব যে সকল প্রদেশ মুসলমানপ্রধান, সেখানে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি অনুযায়ী গঠিত হোক্‌ মুসলিম রাষ্ট্র। তাহলে সেই সব অঞ্চলে মুসলমানগণ বিশিষ্ট ধারায় নিজ নিজ সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য বিকাশের সুযোগ পাবে। সেই সকল মুসলমানপ্রধান প্রদেশে খাঁটি ইস্‌লামিক শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হবে। সেই সকল স্থানেই হবে "পাকিস্থান" অর্থাৎ পবিত্র স্থান।

পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুদেশ, ও বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্যের কারণ

সাধারণত বলা হয়, ভারতের চারটি প্রদেশে যেমন পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, সিন্ধুদেশে ও বাংলায় মুসলমান সংখ্যাধিক্য বর্তমান। এখানে একটা বড় প্রশ্ন উঠে, এই সংখ্যাধিক্য কি যথার্থ না কৃত্রিম? "সম্প্রতি এক জন শিখনেতা ইতিহাসের পাতা উন্টাইয়া আমাদের স্মরণ করাইয়া দিতে চাহেন যে, এই সংখ্যাধিক্য যথার্থ নহে, কৃত্রিম। তিনি বলেন, আসল পাঞ্জাবের পশ্চিম সীমানা ঝিলাম নদীর পূর্ব তীর পর্যন্ত বিস্তৃত। উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্‌কালে রণজিৎ সিং ঝিলামের পশ্চিম কূলের প্রদেশটি জয় করিয়া এই স্থানটিকে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন, পুরাতন পাঞ্জাবে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। কিন্তু রণজিৎ সিং কর্তৃক মুসলমান-অধ্যুষিত স্থানসমূহ বিজিত হওয়ায় অর্থাৎ রাওলপিণ্ডি, মুলতান, পেশোয়ার এবং স্বাধীন আফগান জাতিদের দেশসমূহ, যথা আফ্রিদিস্থান, ওয়াজারিস্থান, সোয়াত প্রভৃতি অঞ্চলগুলি রণজিৎ সিং জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। ইহাতেই পাঞ্জাবে মুসলমান সংখ্যাধিক্য হয়। ইহার মধ্যে পেশোয়ারের পশ্চিমে পুস্তভাষীদের প্রদেশগুলি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট পাঞ্জাব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রান্তীয় প্রদেশ (North Western Frontier Province) গঠন করিয়াছেন" (৩)। অবশ্য ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে হয়তো দেখানো যেতেও পারে যে, ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীরস্থ স্থানসমূহও পাঞ্জাবের অন্তর্গত। এই প্রসংগে নৃতত্ত্ববিদ্‌ ভূপেন দত্তের অভিমত উদ্ধৃত করাই

---

(৩) ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের "হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান সমস্যা" ('দেশ', ১৩৫১) প্রবন্ধটি পঠিতব্য।

শ্রেয়। ডক্টর দত্ত মহাশয় লিখেছেন, "ভারতের বর্তমান কালের ইতিহাসের প্রারম্ভে (দশম শতাব্দীতে) আমরা দেখিতে পাই যে কাবুল হইতে হিমালয়স্থিত কাঙাড়া পর্যন্ত উত্তর ভারতের ভূভাগটি ব্রাহ্মণশাহী পাল রাজবংশের অধীন ছিল, পরে গজনীর সুলতানেরা একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রথমত কাবুল, তৎপরে পেশোয়ার এবং সর্বশেষে সমগ্র পাঞ্জাবটি অধিকার করেন। এই সময়কার ইতিহাস হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, ঝিলাম নদীর পশ্চিম তীরস্থ স্থানসমূহ পাঞ্জাবের অন্তর্গত বলিয়া উক্ত হইতেছে, আর উক্ত স্থলের ভাষাও পাঞ্জাবী ভাষার অন্তর্গত। এই স্থলের ভাষা পাঞ্জাবী ভাষারই একটি উপভাষা মাত্র। মুলতানের স্থানীয় ভাষাও তদ্রূপ। পেশোয়ারের স্থানীয় ভাষাকে হিন্দকী বা জাঠকী ভাষা বলা হয় এবং ইহাও ভারতীয় ভাষারই অন্তর্গত। ইহারও পশ্চিমে সোয়াত (প্রাচীন সুবস্তু) ও লঘমন প্রভৃতি পার্বত্য অঞ্চলের ভাষাগুলিও ভারতীয় ভাষার অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত দর্দীস্থান, কাফিরীস্থান (বর্তমান নুরীস্থান), গিলঘিট প্রভৃতি স্থানের ভাষাগুলি প্রাচীন পৈশাচিক প্রাকৃত ভাষা প্রসূত। এই ভাষাসমূহ সংস্কৃত-মূলক। এক্ষণে এই সকল স্থানের লোকসমূহ মুসলমান ধর্মাবলম্বী হইয়াছেন, আর পশ্চিম-পাঞ্জাবের লোকেরা গজনীর সুলতানদের সময় হইতে আওরঙ্গজেবের সময়ের মধ্যে মুসলমান হইয়াছেন এবং এই স্থানে পুস্তভাষী আফগান জাতীয় পাঠানেরাও বাস করিতেছেন। এই সকল কারণ বশত পশ্চিম-পাঞ্জাব মুসলমানপ্রধান হইয়াছে। এই পশ্চিম-পাঞ্জাবে হিন্দুরাও বাস করেন এবং উত্তর-পশ্চিমের পার্বত্য অঞ্চলেও হিন্দুর অভাব নাই।"

সিন্ধু প্রদেশের পুরানো ইতিহাস থেকেও এই একই সত্য প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু-বিজয়ের সময় সিন্ধুদেশে বৌদ্ধের আধিক্য ছিল। বৌদ্ধেরা এবং পতিত "মেদ" (স্মৃতির মদ) ও জাঠগণ ব্রাহ্মণ-রাজার অত্যাচারে অধীর হয়ে আরব-বিজয়ের অনুকূলে সহায়তা দান করে এবং দলে-দলে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়। কারণ, ইস্‌লামের সাম্যবাদের ভেতর তারা সমাজ ও ধর্মক্ষেত্রে খুঁজে পেলো বন্ধন ও অত্যাচার থেকে মুক্তির মন্ত্র। অবশ্য আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কারণও প্রচণ্ড ভাবে বিদ্যমান ছিল। ব্রাহ্মণ-শাসিত সমাজ-ব্যবস্থায় অব্রাহ্মণদের উপর নানা অত্যাচার ও সামাজিক নির্যাতন কি ভাবে মুসলিম ধর্মের প্রসারের স্বপক্ষে শক্তি যুগিয়েছিল, বাংলা দেশের মধ্যযুগীয় ইতিহাসও তার সাক্ষ্য বহন করছে। জনশ্রুতি আছে, সমগ্র সিন্ধুদেশটি ইস্‌লাম-ধর্মী হয়ে যাওয়ার পর আবার নতুন করে হিন্দুরা পাঞ্জাব, গুজরাট, রাজপুতানা প্রভৃতি দেশ থেকে এসে এখানে বসবাস আরম্ভ করে। মোটের উপর অবশ্য বর্তমানে সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা বেশ খানিকটা অধিক।

এবার আমাদের বাংলা দেশের কথা ধরা যাক্। প্রথমেই স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দুদের যে ভারতজয়ী ও বিশ্বজয়ী ভাষা তার নাম "সংস্কৃত" বা "আর্য" ভাষা। কিন্তু প্রাচীন কালে পূর্ব-ভারতের অর্থাৎ বংগ-বিহারের অধিবাসীরা এই দেবভাষা বুঝতো না। তারা পাখীর মতন কিচির-মিচির করে কথা বলতো। তাই তারা অনার্য। এই অনার্য বাংলায় আর্য ধর্ম ও সংস্কৃতি কালক্রমে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে লাগলো এবং বাংলার অধিবাসীরাও ক্রমশ আদিম যুগ-থেকে-বহন-করে-আনা ধর্ম ও সংস্কৃতির অনেকাংশে বর্জন করে নবাগত আর্যধর্মে (ব্রাহ্মণধর্ম এবং বৌদ্ধধর্ম) দীক্ষিত হতে লাগলো। এই নবধর্মে দীক্ষিত লোকদের বর্তমান প্রবন্ধে 'হিন্দু' নামেই চিহ্নিত করা হয়েছে। আজকাল সাধারণতঃ পণ্ডিত-মহলের সুপ্রচলিত অভিমত এই যে, প্রাক্-মুসলমান যুগের সকল বাঙালীই ছিল 'হিন্দু' অর্থাৎ আর্যধর্মভাবাপন্ন ব্যক্তি। সমাজশাস্ত্রের দিক থেকে এই অভিমত ভ্রমাত্মক। ঐতিহাসিক বিচারেও এ ধারণা ভ্রান্ত। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দ্বাদশ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে অনেক অহিন্দু অর্থাৎ অনার্য অধিবাসী ছিল। নৃতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভূপেন দত্ত লিখেছেন; "আজও হিন্দু বলিয়া কথিত অনেক জাতি ধর্মের অনেক আচার ব্যবহার গ্রহণ করেন নাই, এবং কতিপয় জাতির এখনও পর্যন্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিত মিলে নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে উত্তর-বংগের কোচ জাতির রাজা ও উঁহার একাংশ হিন্দু হয় এবং অবশিষ্ট সকলে মুসলমান হয়। কিন্তু যাঁহারা হিন্দু হইয়াছেন, তাঁহারা এখনও হিন্দু সমাজের পুরাপুরি অধিকার প্রাপ্ত হন নাই। এমন কি, কোনো-কোনো ক্ষেত্রে তাঁহারা হিন্দু আইন দ্বারা পরিচালিতও হন নাই।" আসল কথাটি তবে কি? মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বে বাংলার সামাজিক কাঠামো কল্পনা করা যাক্। এই সামাজিক গড়নে আর্যসংস্কৃতিসম্পন্ন "হিন্দুর" পাশাপাশি বহু অনার্য "অ-হিন্দু"ও বর্তমান ছিল। ইস্‌লামের আবির্ভাবের পর আর্য হিন্দুদের ভেতর থেকে যেমন, তেমনি অনার্য অহিন্দুর থেকে দলে-দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করে। অতএব ধর্মান্তর গ্রহণের দ্বিবিধ ধারা চলেছিল। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই সর্বপ্রধান কারণ ছিল নিম্নবর্ণের উপর উচ্চবর্ণের অত্যাচার, ইসলামের সাম্যবাদের নতুন স্বপ্ন এবং আর্থিক-সামাজিক সুযোগ-সুবিধার নব নব প্রলোভন। মোট কথা, বাংলায় হিন্দুরাও উদ্ভূত হলো অনার্যদের ভেতর থেকে, আবার মুসলমানরাও অনেক ক্ষেত্রে উদ্ভূত হলো অনার্য বাঙালীদের ভেতর থেকে। এই কারণে বাংলার তথাকথিত নিম্নশ্রেণীদের (হিন্দু ও মুসলমানদের) আচারে ও ব্যবহারে, ধর্মে ও সংস্কৃতিতে বিস্তর সামঞ্জস্য আজও বিদ্যমান। তাছাড়া, হিন্দুধর্ম থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে যারা সামাজিক নির্যাতনের কারণে ইস্‌লাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের জীবনেও পুরানো হিন্দু সংস্কারের কোনো কোনো চিহ্ন ও ধারা অব্যাহত থাকা সমাজশাস্ত্রের দিক থেকেও অতি স্বাভাবিক ঘটনা। সমাজশাস্ত্রী বিনয় সরকার এই প্রসংগে বলেছেন: "The manners and customs of the Bengali Mussalmans and Bengali Hindus are very often found to be identical, similer or allied. This identity, commonness or affinity is not invariably to be accounted for by the circumstance that Mussalmans are converts from Hinduism. In numerous instances the explanation is to be sought in the fact that ths Mussalmans, like the Hindus, have derived the manners end customs from a common source, namely, the pre-Hindu and pre-Muslim Bengali 'birds, crows and pigeons', or pariahs

of all denominations" (৪)। আশা করি, পাঠকগণ এবার বুঝতে পেরেছেন বাংলায় মুসলমান ধর্ম প্রচারের ঐতিহাসিক স্বরূপটা। এ কথা সত্য, সংখ্যার দিক থেকে বাংলায় আজ মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ অধিক। হিন্দুরা বাংলা দেশে বর্তমানে সংখ্যালঘু কেন, তার কারণ হিন্দু-সমাজ-ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। কোন্ কোন্ কারণে হিন্দুর সংখ্যা এখানে মুসলমান অপেক্ষা কম এবং কোন্ কোন্ পন্থায় হিন্দুর সংখ্যা আশানুরূপ হারে বৃদ্ধি পেতে পারে, সে সবের অতি বিস্তারিত আলোচনা স্বর্গীয় প্রফুল্ল সরকার তাঁর "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" (কলিকাতা, ১৯৪০) গ্রন্থে করেছেন। সমাজ-সংস্কারের দিক্ থেকে সেই সকল নির্দেশের অনেক কিছুই যুক্তিনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্য। তবে. বৈজ্ঞানিক বিচারে "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" নামকরণ সার্থক হয়েছে আদৌ বলা চলে না। কারণ, "ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু" শব্দে বুঝায় হিন্দুরা জাতি হিসাবে ক্রমশ বিলুপ্তির পথে। অথচ ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী থেকে মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির সংগে-সংগে হিন্দুর সংখ্যাও পূর্বেকার চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে আপেক্ষিক বিচারে মুসলমান জনসংখ্যার বৃদ্ধিহার হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি অপেক্ষা কিছু বেশী। এর দ্বারা অন্তত এটুকু প্রমাণিত হয় না যে, হিন্দুরা "ক্ষয়িষ্ণু"। বরং বিপরীত সত্যই প্রমাণিত হয়। মুসলমানেরাও "বর্দ্ধিষ্ণু", হিন্দুরাও "বর্দ্ধিষ্ণু", তবে মুসলমানেরা তুলনায় বেশী (৫)।

হিন্দু-মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও বিভিন্নতা কতখানি

কারণ যাই হোক্, আজকাল পাঞ্জাবে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে, সিন্ধুদেশে ও বাংলায় মুসলমানই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়। অর্থাৎ ঐ সকল অঞ্চলে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা কম। সে জন্যই পাকিস্থান-পন্থীরা ঐ সব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের খাঁটি শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলেছে। অবশ্য মাইনরিটি হিন্দুদের স্বার্থ সুবিধা সংরক্ষণের ব্যবস্থা সেখানে থাকবে (?)। এই পাকিস্থান-গঠনের পিছনে মুসলমানদের আছে জাতি-স্বাতন্ত্র্যের ভিত্তিতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যুক্তি। যেহেতু মুসলমানেরা হিন্দুগণ হ'তে ধর্মে ও সংস্কৃতিতে, ভাবে ও আদর্শে, আচারে ও ব্যবহারে সম্পূর্ণ পৃথক্, অতএব আত্মবিকাশের জন্য উভয়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-গঠন আশু প্রয়োজন। এখানে একটি মস্ত বড় প্রশ্ন আলোচনার দাবী রাখে। ভারতীয় মুসলমানেরা হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ বা এতখানি পৃথক্ কি না যার জন্য ন্যাশান্যালিটি-ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনুযায়ী পাকিস্থান গঠন করা দরকার। বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, হিন্দু মুসলমানের আচারগত ও আদর্শগত পার্থক্য নানা ক্ষেত্রে বিদ্যমান. তবে এই সকল পার্থক্য এত সুগভীর বা এতখানি বেশী নয় যতখানি ভাবপ্রবণতার ঝোঁকে প্রচার করা হয়। প্রথমত, ধর্মের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের যোগাযোগের ফলে ইসলাম ধর্ম এখানে তার কাঠামো বদলাতে বাধ্য হয়েছে। ভারত-বহির্ভূত ইসলাম আর ভারতীয় ইসলাম এক বস্তু নয়; আবার প্রাক্-মুসলমান যুগের হিন্দুধর্ম আর মুসলমান যুগের পরবর্তী হিন্দুধর্মও এক বস্তু নয়। পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত ধর্মপ্রচারকদের ধর্মান্দোলনও এই প্রসংগে স্মরণীয়। ঐ সময় ভারতে যে ধর্মান্দোলনগুলি সুরু হয়েছিল, তাদের চারিত্রগত বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও সর্বপ্রধান লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সাধন। কবীর, নানক দাদু, রামদাস, চৈতন্য প্রভৃতি ধর্মগুরুর জীবনব্যাপী সাধনা হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র যে অনেকখানি প্রশস্ত করেছিলো তা ঐতিহাসিক ঘটনা। এই মিলনমুখী সাধনা মুসলমানযুগে সর্বপ্রথম সুরু হয় দিগ্বিজয়ী ভারতবীর শেরশাহের শাসনকালে। এই আদর্শ আরও বিস্তৃত স্বীকৃতি পেয়েছিল ষোড়শ শতাব্দীতে আকবরের জীবনে ও ধর্মে। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষ কোনো দিনও ধর্মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ছিল না। অশোকের মতো ধর্মানুরাগী সম্রাট্ও ভারতবর্ষকে "Theocratic State"-এ পরিবর্তিত করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেননি। মধ্যযুগে মুসলমান-প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠার যুগে ভারতবর্ষকে Theocratic State-এ রূপ দেবার প্রয়াস মুসলিম রাজাদের অনেকেই করেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ আকবর এই নীতিতে আস্থাবান্ ছিলেন না। তিনি যুগশক্তিকে সমস্ত সত্তা দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, ভারতবর্ষের অ-মুসলমান উপাদানগুলির স্বার্থরক্ষা না করলে ও তাদের সহায়তা না পেলে মোগল সাম্রাজ্যের অবস্থা হ'বে চোরাবালির উপর প্রতিষ্ঠিত সৌধের মত। তিনি জানতেন, শুধু সামরিক শক্তিবলে রাজ্যবিজয় সম্ভব হলেও হতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্র-শাসন একেবারেই অসম্ভব। প্রজাশক্তির নৈতিক সমর্থনও রাষ্ট্রের পিছনে একান্ত প্রয়োজন। রাজনীতির এই গোড়ার কথা আকবর অতি সূক্ষ্ম ভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তাই এক উদারনীতি শাসনতন্ত্রে প্রবর্তিত করে মোগল সাম্রাজ্যের দৃঢ় ভিত্তি তিনি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ শাসনতন্ত্রের পেছনে সামরিক শক্তির সংগে সংগে ছিল মুসলমান ও হিন্দুর সমবেত সমর্থন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার কাছে তিনি প্রসারিত করেছিলেন নাগরিকের সম-সমান অধিকার। "জিজিয়া কর" অপসারণের সময় (১৫৬৪ খৃ) থেকে "দীন ইলাহির" প্রবর্তন (১৫৮২ খৃঃ) পর্যন্ত আকবর যে-সকল মিলনমুখী পন্থা অবলম্বন করেছিলেন, তা সত্যি যেমন বিস্ময়কর, তেমনি শক্তিশালী। রামশর্মা প্রণীত "Religious Policy of the Mughal Emperors" (Oxford, 1940) গ্রন্থে এই সুরের ধ্বনি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

শুধু ধর্মক্ষেত্রে নয়, পরন্তু সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও পারস্পরিক মেলামেশা ও আদান-প্রদান মিলনের পথকে প্রশস্ত করে তুলেছিল। চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, সংগীত ও সাহিত্যের বিচিত্র বিভাগে এই লক্ষণ প্রস্ফুটিত হয়েছিল। জনৈক পণ্ডিত লিখেছেন: "Almost every work in Indo Persian literature contains a large number of words of Indian origin, and thousands of Persian words became naturalised in every Indian vernacular language. This mingling of

(৪) B. K. Sarkar; "Bengali Culture As a System of Mutual Acculturations" (Cal. Review, April, 1941) প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য।

(৫) হরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত "বিনয় সরকারের বৈঠকে" (দ্বিতীয় সংস্করণ, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৪৫, পৃঃ ২৫০) দ্রষ্টব্য।

Persian, Arabic and Turkish words and ideas with languages and concepts of Sanskrit origin is extremely interesting from the philosophical point of view, and this co-ordination resulted in the origin of a beautiful Urdu language. That language itself symbolised the reconciliation of the hitherto irreconcilable and mutually hostile types of civilisation represented by Hinduism and Islam" (৬)।

তাছাড়া, মুসলমান বাদশাগণের রাজনৈতিক পন্থা এ-কথা সুস্পষ্ট ভাবেই নির্দেশ করে যে, ভারত-বিজয়ের পর এ দেশ আর তাদের পক্ষে বিদেশ রইল না। লুণ্ঠন ও জয়ের ক্ষেত্র ধীরে ধীরে হয়ে গেলো তাদের কাছে স্বদেশভূমি। যুগস্রোতের সংগে এই ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে শিকড় গেঁথে বসলো মুসলিম সমাজের চেতনায়। মোগল সম্রাট্‌গণের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত সংরক্ষণ নীতির পর্যালোচনা এই মনোভাবের স্বপক্ষেই শক্তি যোগায়। আর্যগণ ভারতে প্রবেশের পর যেমন ভারতবর্ষকেই স্বদেশ বলে গ্রহণ করে এবং তার পর এখানকার স্থানীয় জল-বায়ু ও নানা পরিস্থিতির সংগে খাপ খাইয়ে নিজেদের সংস্কৃতি বিকাশে ব্রতী হয়, তেমনি মুসলমানগণও এ দেশে প্রবেশের পর নানা কারণে ভারতবর্ষের স্থায়ী অধিবাসীতে পরিণত হয় এবং দেশের বিচিত্র অবস্থাকে স্বীকার করে নিয়ে নিজেদের জীবনযাত্রা বিবর্তিত করতে থাকে। ধর্মগত ও সংস্কৃতিগত হিন্দু-মুসলমানের স্বাতন্ত্র্য থাকলেও সাংসারিক ও সামাজিক নানা প্রয়োজনের মিল, একই রাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকত্বের সমান দাবী, মধ্যযুগীয় ধর্মসংস্কারকদের মিলনমুখী বিপুল সাধনা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মহান্ ঐক্যবোধ সঞ্চার করে। বর্তমান কালে বৃটিশ শাসনের সাধারণ বন্ধন-বেদনা এই ঐক্যবোধ আরও দৃঢ় করেছে। স্থান হতে স্থানান্তরে যাতায়াতের অতিদ্রুত সুযোগ-সুবিধা এবং তার ফলে অহর্নিশ পারস্পরিক সামাজিক মেলামেশা, অর্থনৈতিক স্বার্থের সাধারণ মিল, যুগশিক্ষার নতুন আলো, বিজ্ঞানের প্রসারতা ইত্যাদি বিচিত্র ঘটনা মিলে অভিনব পথে সকল ভারতবাসীকে বিবর্তনের পথে ঠেলে নিয়ে চলেছে। এই বিবর্তন হ'লো জাতীয়তার পথে। সম্প্রদায়গত ও ধর্মগত বৈষম্য সত্ত্বেও প্রগতিশীল ভারতবাসীর অন্তর জাতীয় চেতনায় আজ উজ্জ্বল। এই নবজাগ্রত শক্তির প্রভাব ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীক ও সামাজিক জীবনে বর্তমানে অতি-প্রচণ্ড! এই কথাটা সকলেরই স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

ভারতীয় ঐক্যবোধ বনাম সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতে জাতীয়তাবাদের (Nationalism) উদ্বোধন। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বন্ধনকে ভেঙে ফেলার সঙ্কল্প ও দেশের বুকে এক অখণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্র-গঠনের আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্রের ভেতর পাওয়া যায়। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সংগঠিত হলো "নিখিল" ভারত কংগ্রেস" (৭)। এই কংগ্রেস গঠনে হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই দান রয়েছে। তাদের মিলিত ত্যাগ ও সাধনার জোরেই আজ এই কংগ্রেস ভারতের বুকে বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানরূপে বিবর্তিত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যে দেশের ভেতর একটা খুব বড় শক্তিশালী বুর্জোয়া শ্রেণীও গড়ে উঠেছে। এই বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় সংঘ হলো কংগ্রেস। কংগ্রেসের ভিতর বহু রকমের ও বহু গড়নের উপাদান থাকলেও বুর্জোয়া-কর্তৃত্ব ও পরিচালনাই এর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী অংগ। কাজেই জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসকে বুর্জোয়া সংঘ আখ্যা দিলে আদৌ অসমীচীন হবে না। বিশ্বের ইতিহাস পর্যালোচনা কালে দেখা যায় যে, বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী নীতির সংগে দেশোদ্ভূত বুর্জোয়া শ্রেণীর আর্থিক নীতির বিরোধ অতি প্রচণ্ড। তাই সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন ভাঙার সংকল্প জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া কংগ্রেসের সর্বপ্রধান লক্ষ্য। শ্রমিক আন্দোলন বা কমিউনিজমের আদর্শের মাপকাঠিতে বুর্জোয়া-স্বাধীনতার আন্দোলন নিশ্চয়ই অসম্পূর্ণ বা প্রতিক্রিয়াশীল। তবুও ঐতিহাসিক বিবর্তনের অন্যতম ধাপে (যেমন সামন্ততন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের শৃংখলযুক্ত আবহাওয়ায়) বুর্জোয়া-স্বাধীনতার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও প্রগতিশীল বা বিপ্লবাত্মক। ভারতের রাষ্ট্রীক রংগমঞ্চে বর্তমানে সেই বুর্জোয়া-স্বাধীনতার আন্দোলন চলেছে। এক দিকে সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলনের যেমন অভিযান, তেমনি অপর দিকে আবার সাম্রাজ্যবাদী শৃংখলের বিরুদ্ধেও। আন্দোলনের নেতৃত্ব করছে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান কংগ্রেস। লক্ষ্য হলো ইংরেজের রথচক্র থেকে মুক্ত ভারতবর্ষের সৃষ্টি। জাতীয় স্বাধীনতার সংগে দেশের রাষ্ট্রীক শাসনযন্ত্র বুর্জোয়াদের অধিকারে আসবে এবং সেই অধিকারের ভিতর দিয়ে ঘটবে তাদের আর্থিক সুযোগ-সুবিধার ক্রমবিকাশ ও ক্রমবর্ধমান প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্যই বুর্জোয়া কংগ্রেসের অন্তরে সর্বাপেক্ষা প্রবল উপাদান।

এদিকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ থেকে প্রায় ষাট বছরের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশের ভেতর গড়ে উঠেছে এক প্রচণ্ড সংহতি। আজাদ হিন্দ্ বাহিনীর কাজ-কর্ম ও নেতাজীর তপস্যাপূত: স্মৃতিকে কেন্দ্র ক'রে এই সংহতি আজ আরও প্রবল। শাসিতের এই সংহতি শাসকের পক্ষে গভীর দুশ্চিন্তার কারণ সন্দেহ নেই। তাই শাসক সম্প্রদায়ের সর্বদাই ছলে বলে-কৌশলে প্রয়াস চলেছে স্বাধীনতাকামী ভারতবর্ষের সংঘবদ্ধতাকে বিকল, পংগু ও ব্যর্থ করার দিকে। "Divide and Rule Policy" জাতীয় মারণাস্ত্র সাম্রাজ্যবাদী জাতি মাত্রেই করে থাকে। ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের মর্লি-মিন্টো সংস্কারের যুগ থেকে ১৯৩৫-এর "ভারত-শাসন আইনের" প্রবর্তন পর্যন্ত সময়টুকুর ভেতর জাতীয়তাবিরোধী বিষ ইংরেজ শাসকবৃন্দ ভারতীয় সমাজে উগ্র মাত্রায় সঞ্চারিত করেছে। যৌথ ভোটের পরিবর্তে এ দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভোটদানের প্রথা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলিকে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের খাতিরেই ইংরেজেরা হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে চল্‌লো উন্নতির পথে নিজেদের রথের চাকায় বেঁধে, তারা চাইলেও, না চাইলেও।

(৬) "The Legacy of India" (Oxford, 1937) গ্রন্থের ২৮৭—৩০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৭) যোগেশচন্দ্র বাগল প্রণীত "মুক্তির সন্ধানে ভারত" (কলিকাতা, ১৩৪০) গ্রন্থখানি এই প্রসংগে পঠিতব্য।

এর ফলে সম্প্রদায়গুলির স্বার্থ-সংরক্ষণের চেয়ে অনেক বেশী রক্ষিত হয়েছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। এক দিকে এর ফলে জাতীয় ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যেমন হয়েছে দুর্বল, তেমনি অন্য দিকে বৃটিশ স্বার্থে পুষ্ট ও উন্নত সম্প্রদায়গুলির কংগ্রেস বিরোধিতা সাম্রাজ্যবাদী শাসনকেই করেছে সুদৃঢ়। সংগ্রাম ক'রে দুঃখের পথে সচেতন যাত্রী হ'য়ে ইংরেজের কাছ থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাদের সুযোগ-সুবিধা অধিকার বলে অর্জন করেনি—তা পেয়েছে উপরওয়ালাদের দানের মারফৎ। তাই দেখা যায়, বিপ্লবের যখন ডাক আসে, তখন প্রগতিশীল শক্তির সাথে তাদের মিতালির পরিবর্তে প্রায়ই চলে প্রতিক্রিয়াশীল বৃটিশ স্বার্থের সাথে মিতালি। তারই পরিণামে দেশের বৃহত্তর সমাজ-জীবনে যে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় আন্দোলন তা হয়েছে পদে-পদে বাধাপ্রাপ্ত ও কণ্টকিত। বর্তমানে কংগ্রেসের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনের সংগে মুসলিম লীগের পাকিস্থানী আন্দোলনের প্রবল বিরোধ মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে। ইতিমধ্যেই জাতীয়তাবাদী হিন্দুশক্তির বিরুদ্ধে বাংলার নানা প্রান্তে সুরু হয়েছে এক দিগন্তব্যাপী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। এ সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরুদ্ধে নয়, দেশের জাগ্রত সমাজের যে সকল অংশ সাম্রাজ্যবাদী বন্ধনকে ভেঙে ফেলার বেদনায় আজ চঞ্চল, তাদেরই বিরুদ্ধে। আপাতদৃষ্টিতে বুঝি মনে হয়, মুসলিম লীগই এই জাতীয়তাবিরোধী সংগ্রামের মূলে আসল প্রেরণা ও নির্দেশ যোগাচ্ছে। কিন্তু রাষ্ট্র-বিজ্ঞানী জানে, ভেদনীতির মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে ভারতের জাতীয়তা-বাদী সংহতিকে ধ্বংস করা এবং সেই ধ্বংসের ভিতর দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শৃংখল কায়েমের কী এক বিপুল আয়োজন ও পরিকল্পনা এর পশ্চাতে নিহিত। যদিও পাকিস্থানী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাংলার পট-ভূমিতে, কিন্তু তার আসল পরিকল্পনা সম্পন্ন হচ্ছে বিলাতের হোয়াইট হলে। সম্প্রতি-প্রকাশিত চার্চিল-জিন্নার চিঠিপত্র, ভারত-সেক্রেটারী পেথিক্ লরেন্স, বড়লাট ওয়াভেল ও গভর্ণর ব্যারোজের অপরাধমূলক ঔদাসীন্য দেখার পর এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, কংগ্রেস-লীগ বিরোধের মূলে রয়েছে বৃটিশ শাসকদের এক অতি-বড় চক্রান্ত। সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের দিক্ থেকে এই গুপ্ত চক্রান্তের প্রয়োজন অস্বীকার করবে কে? এই কঠিন সত্য আমাদের কিছুতেই বিস্মৃত হওয়া চলে না। তবে কংগ্রেস-লীগ বিরোধের ভেতর সাম্রাজ্যবাদী ভেদনীতিই যে একমাত্র শক্তি নয়, এ কথাটাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকদের সংগে মুসলিম্ লীগের সর্বনেশে সহযোগিতার দায়িত্বও বর্তমান পরিস্থিতিতে অস্বীকার করা চলে না। মুসলিম লীগের গড়ন বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় যে, এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও বহু রকমের উদ্দেশ্য ও আদর্শ-স্রোত রয়েছে। এর ভেতর এক দিকে যেমন বুর্জোয়া উপাদান রয়েছে, তেমনি আবার অন্য দিকে গণ-আন্দোলনের অংশও বিদ্যমান। তবে বুর্জোয়া উপাদান বর্তমান আবহাওয়ায় অত্যন্ত দুর্বল; অজ্ঞ ও ধর্মান্ধ মুসলিম জনসাধারণ দৈন্য ও দুর্দশায় পিষ্ট ও উত্যক্ত অথচ নিজ-নিজ অধিকার সম্বন্ধে অচেতন। তাদের নেতৃত্ব পরিচালনার গুরুভার গ্রহণ করেছে লীগের অন্তর্ভুক্ত সামন্ত স্বার্থের সংরক্ষকগণ। এই সামন্ত বা ফিউড্যাল শক্তির প্রতিনিধিরাই লীগের সর্বপ্রধান পরিচালক। তাদের স্বার্থই শাসিত করছে মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে। তাই যদি লীগকে কেউ ফিউড্যাল বা সামন্ত প্রতিষ্ঠানরূপে চিহ্নিত করে, তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অসংগত হবে না। লীগ নেতৃবৃন্দের অধিকাংশই নবাব ও জমিদারগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত এবং একালে অচল অথচ মধ্যযুগ থেকে বহন-করে-আনা সামন্ত শক্তির প্রতিনিধি। বর্তমানকালীন বিশ্বজগতের গণতান্ত্রিক পথে অতিদ্রুত অগ্রগতি, এবং ভারতের পটভূমিকায় তারই দিগন্তব্যাপী অভিযান সামন্ত শক্তিকে টলটলায়মান করে তুলেছে। সেই সন্ত্রস্ত ও ভীতিবিহ্বল ফিউড্যাল শক্তি মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে লীগের মধ্যে। এর অবচেতন মনের অদম্য আগ্রহ হলো আসন্ন ধ্বংসের মুখ থেকে জীর্ণ সামন্ত ব্যবস্থাকে বাঁচানো। ভারতের বুকে কংগ্রেস-চালিত বুর্জোয়া স্বাধীনতার জাতীয় আন্দোলনের দ্বিবিধ আক্রমণের লক্ষ্যের ভেতর একটা হলো (ক) সামন্ত প্রথা, আর অন্য একটা (খ) সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন। সাম্রাজ্যবাদের কারাগার থেকে ভারতের স্বাধীনতা যেমন কংগ্রেসের একান্ত কাম্য, তেমনি দেশের ভেতর সামন্তশক্তির সর্বশেষ চিহ্নটুকুও ধ্বংস করা কংগ্রেসের লক্ষ্য। অর্থাৎ সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সাম্রাজ্যবাদী বন্ধন উভয়ই হলো কংগ্রেসের বিচারে প্রতিক্রিয়াশীল এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শত্রু। তাই উভয়কেই আঘাত করা ও ধ্বংস করা বুর্জোয়া কংগ্রেসের স্বধর্ম। সাম্যবাদী সোভিয়েট রাশিয়ার অভূতপূর্ব শক্তির বিকাশ ও দেশে-দেশে গণবিক্ষোভ ও শ্রমিক আন্দোলন, অষ্ট্রেলিয়া-ইজিপ্ট-কানাডার ডোমিনিয়ন থেকে ইংরেজের Economic Imperi-alisms-এর অপসারণ ইত্যাদি ঘটনা যুদ্ধের ভেতর নুইয়ে-পড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবস্থা প্রকম্পিত করে তুলেছে। আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আওতায় পুষ্ট ভারতের সামন্তশক্তিও বুর্জোয়া কংগ্রেসের চাপে একেবারে টলটলায়মান হয়ে উঠেছে। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রগতিশীল শক্তির চাপে বিধ্বস্ত ও বিদীর্ণ হ'তে থাকলে সর্বদাই চেষ্টা করে সংঘবদ্ধ হয়ে জীবনের নতুন মেয়াদ লাভের জন্য। সোসালিজিমের ধাক্কা খেয়ে ধনতন্ত্রবাদ যেমন ফ্যাসিবাদের দিকে গড়ন নেয় এবং গণতান্ত্রিক বৃটেন ফাশিষ্ট জার্মানীর সহযোগিতায় সাম্যবাদী সোভিয়েটকে ধ্বংস করার কাজে ব্রতী হয়, ভারতবর্ষেও প্রায় তদনুরূপ প্রতিক্রিয়ার নীতিতে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেনের সংগে ফিউড্যাল লীগ হাত মিলিয়েছে। এ মিলনের উদ্দেশ্য হলো সাম্যবাদ বা শ্রমিক আন্দোলন ধ্বংস করা নয়—লক্ষ্য হলো বুর্জোয়া কংগ্রেস-চালিত জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে বিকল ও পংগু করার দিকে। এতে ব্যথিত হবার কারণ থাকলেও, ঐতিহাসিক বিচারে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই।

উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার বাবু

শ্রীবারেশচন্দ্র শর্মাচার্য

'বাবু' শব্দটি প্রথম কাহার মুখ হইতে উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। ইহার উৎপত্তি সম্বন্ধে কিংবা ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সম্বন্ধেও মতভেদ আছে। কোম্পানীর আমলে সাহেবেরা কি অর্থে এদেশীয় ভদ্রব্যক্তিদের 'বাবু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাহাও কেহ সঠিক বলিতে পারেন না। অবশ্য কেহ কেহ বিদ্রূপ করিয়া ইংরেজী Baboon (বানরজাতীয় জীব) শব্দ হইতে 'বাবু' শব্দের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়া থাকেন। যে অর্থেই ইহা ব্যবহৃত হউক না কেন, বর্তমানে শব্দটি লোভনীয় আকারে দশ ছাইয়া ফেলিয়াছে; হিন্দু ভদ্রলোকের নামের সহিত 'বাবু' শব্দটি সম্ভ্রমার্থে উপাধিরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সকলেই বাবু,—বঙ্কিমবাবু, রবিবাবু, রামবাবু, শ্যামবাবু, জমিদার-বাবু, ম্যানেজারবাবু, আবার কেরাণীবাবু, মাষ্টারবাবু, ডাক্তারবাবু, উকীলবাবু, বড়বাবু, মেজোবাবু, সেজোবাবু ও ছোটবাবু। আফিসের কর্তাও বাবু, আবার পরিবারের কর্তাও বাবু; আবার সৌখীন বা বিলাসী অর্থেও বাবু।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার 'লোক-রহস্যে' সবিস্তারে বাবুর মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন,—"বাবু শব্দটি নানার্থ হইবে। যাঁহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাঁহাদিগের নিকট 'বাবু' অর্থে কেরাণী বা বাজার-সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকটে 'বাবু' শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট 'বাবু' অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্ কেবল বাবু-জন্মনির্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য জন্মিবেন।" এই "বাবু জন্ম-নির্বাহাভিলাষী কতকগুলিন মনুষ্য"-সম্বন্ধে যে সকল তৎকালীন চিত্র আমরা পাইতেছি, তাহার ব্যতিক্রম আজ পর্যন্ত হয় নাই।

সেকালের বাবুদিগের সম্বন্ধে 'হুতোম প্যাঁচার নকশায়' আছে—"আজকাল সহরের ইংরাজি কেতার বাবুরা দুটি দল হয়েচেন, প্রথম দল উঁচুকেতা সাহেবের গর্ব্ব। দ্বিতীয় ফিরিঙ্গীর জঘন্য প্রতিরূপ।" প্রথম দলের সকলি ইংরাজি কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিশ, পেয়ালা করা চা, চুরুট, জগে করা জল, ডিকান্টরে ব্রাণ্ডী ও কাচের গ্লাসে সোলার ঢাকনি, সালু-মোড়া,—হরকরা ইংলিশম্যান ও ফিনিক্স সামনে থাকে, পোলিটিক্স ও বেষ্ট নিউস অব দি ডে নিয়েই সর্বদা আন্দোলন। টেবিলে খান......এরাই ওল্ড ক্লাস। দ্বিতীয়ের মধ্যে ব'গাম্বর মিত্র প্রভৃতি, সাপ হতেও ভয়ানক, বাঘের চেয়ে হিংস্র; বলতে গেলে এঁরা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার.......পরের মাথায় কাঁটাল ভেঙ্গে আপনার গোঁপে তেল দেওয়াই এঁদের পলিসী, এঁদের কাছে দাতব্য দূর পরিহার—চার আনার বেশী দান নাই।"

আমাদের লক্ষ্য কিন্তু উপরি-উক্ত দুই শ্রেণীর বাবু নহেন। আমরা "বাবু-জন্ম-নির্বাহাভিলাষী" নব্য বাবুদের চিত্রের প্রতিরূপই লইতেছি। দেখা যায়, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব কালে বহুব্যক্তি নানা প্রকারে ইংরাজ বণিকদিগকে সাহায্য করিয়া ধনবান্ হইয়াছিলেন। কলিকাতারূপ "কমলালয়" এইরূপে বহু লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন। এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ত হইয়...কিঞ্চিৎ অর্থসঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন। ইহারা...বিদ্যাযুত শ্রীযুত বাবুজনগণ সন্নিধানে স্ব স্ব নাম সম্ভ্রমাভিলাষী হইয়া প্রথমত পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক বালকবাবুদিগের শিক্ষাকারণ গুরু মহাশয় নিকটে নিযুক্ত করিয়া থাকেন।"—নববাবুবিলাস।

বাবুরূপ বৃক্ষের অঙ্কুরস্বরূপ 'নববাবুবিলাসের' উপরি উক্ত উক্তির সমর্থন তৎকালীন সংবাদপত্রেও আছে। হঠাৎ ধনবান্ অশিক্ষিত বড়লোকের আদুরে ছেলেরাই আমাদের তথাকথিত নববাবুর দল। তৎকালীন কলিকাতার এই সকল অশিক্ষিত ভদ্রসন্তানদের চিত্র 'নববাবুবিলাসে'র বাবুর চিত্রে, 'সমাচারদর্পণে'র 'বাবুর উপাখ্যানে' ও 'আলালের ঘরের দুলালে'র মতিলালের চরিত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'হুতোম প্যাঁচার নকশা' প্রকৃত পক্ষে এই সকল বাবুদের ও ধন-বিলাসী লোকদিগের প্রকৃষ্ট চিত্র। ধনমদে মত্ত পিতামাতার প্রশ্রয় পাইয়াই বহু ভদ্রসন্তান দুর্নীতির চরম সীমায় পৌঁছাইত।

"দেওয়ান ঐশ্বর্য থাকিতে পুত্রকে বিদ্যাভ্যাস করাইলেন না; কহেন ব্রাহ্মণের ছেল্যা গায়ত্রী শিখিলেই হয়, কপালে থাকে বিদ্যা হবে, আমি যাহা রাখিয়া যাইব, যদি রক্ষা করিয়া খাইতে পারেন, কখন দুঃখ পাইবেন না।"—সমাচারদর্পণ ১৮২১,২৪ ফেব্রুয়ারি।

'আলালের ঘরের দুলালে'ও ঠিক অনুরূপ চিত্র আছে।—"বালকটা পিতামাতার নিকট আস্কারা পাইয়া পাঠশালায় যাইবার নামও করিত না। যিনি বাটীর সরকার তাঁহার উপর শিক্ষা করাইবার ভার ছিল। * * * কেবল গুরুমারা বিদ্যাই শিখিল তবে এমত শিষ্যের হাত হইতে ত্বরায় মুক্ত হওয়া কর্তব্য, কিন্তু কর্তা ছাড়েন না অতএব কৌশল করিতে হইল।"—তার পর মুর্খ পুজারি ব্রাহ্মণের নিকট সংস্কৃত শিক্ষার ভার পড়িল। উভয় গুরুই ভয়ে প্রভুপুত্রের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির সার্টিফিকেট দিলেন। তার পর ফারসী শিখাইতে আসিয়া এক মুসলমান দর্জির দুর্গতির সীমা রহিল না। অর্থের অভাব নাই, তথাপি যাহাতে অল্প খরচে শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তাহার দিকে ধনী পিতার দৃষ্টি। এই অবিবেচনার ফলই ফলে। বিলাস ব্যসনে, চাটুকার পোষণে ব্যয়ের অন্ত নাই, অথচ পুত্রের শিক্ষার জন্য মাসিক পঁচিশ টাকা খরচ করিতেও এই সকল পিতা পশ্চাদ্পদ হন। সাধারণত নাম স্বাক্ষর করিতে পারিলে ও শতকিয়ার অঙ্কগুলি লিখিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল বলিয়া মনে করা হইত। যে সকল বালক কয়েকটা চলনসই ইংরেজী শব্দ বা কথা শিখিতে পারিত, তাহাদের মাতাপিতা পুত্রগৌরবে নিজেকে ধন্য মনে করিতেন।

"বিদ্যাভ্যাসানন্তরে শিক্ষাকার (শিক্ষক) বাবুদিগের নিজ সমভিব্যাহারে লইয়া কর্তা মহাশয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন আর কহিলেন, মহাশয় আপন স্বেচ্ছাপূর্বক নাম অঙ্কাদি জিজ্ঞাসা করিয়া বাবুদিগের বিদ্যার পরিচয় লউন। কর্তা কহিলেন, আপন আপন নাম লেখ। প্রথম বড়বাবু আপন নাম লিখিতেছেন—উচ্চৈঃস্বরে শ্রী লেখ জ লেখ গ লেখ ত লেখ দ লেখ ল লেখ র লেখ ইহাই

লিখিয়া পাঠ করিলেন শ্রীরূগন্দর্ভ। তৎপরে মধ্যমবাবু ঐ প্রকার শ্রীরাদা বলদ অর্থাৎ শ্রীরাধাবল্লভ নাম হইল…!"—নববাবুবিলাস।

তার পর ইংরেজী শিক্ষা আরম্ভ হইত। "গোটাকতক বিলাতী অক্ষর লিখিতে শিখেন আর ইংরেজী কথা প্রায় দুই তিন শত শিখেন। নোটের নাম লোট, বডিগার্ডের নাম বেনিগারদ, লৌরি সাহেবকে বলেন নৌরি সাহেব। এই প্রকার ইংরেজী শিখিয়া সর্ব্বদাই হুট, গোটেহেল (Go to hell) ডোনকের (Do not care) ইত্যাদি বাক্য ব্যবহার করা আছে, আর বাঙ্গালা ভাষা প্রায় বলেন না। এবং বাঙ্গালি পত্রও লিখেন না; সকলেই ইংরেজী চিঠি লিখেন; তাহার অর্থ তাঁহারাই বুঝেন। কোন বিদ্বান্ বাঙ্গালি কিম্বা সাহেব লোকের সাধ্য নহে যে সে চিঠি বুঝিতে পারেন।"—সমাচারদর্পণ, ১৮২১, ১৫ সেপ্টেম্বর।

'আলালের ঘরের দুলালে' দেখিতে পাই, মতিলাল দুরন্তপনা করিয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে। "ধুমধামে সর্ব্বদাই ব্যস্ত, বাটীতে তিলার্ধ থাকে না। কখন বনভোজনে ব্যস্ত—কখন যাত্রার দলে আখড়া দিতে আসক্ত—কখন পাঁচালির দল করিতেছে—কখন সখের দলের কবিওয়ালাদিগের সঙ্গে দেওরা করিয়া চেঁচাইতেছে—কখন বারওয়ারি পূজার জন্য দৌড়াদৌড়ি করিতেছে—কখন খেমটার নাচ দেখিতে বসিয়া গিয়াছে * * * * বাবুরা সকলেই সর্ব্বদা ফিট্‌ফাট্—মাথায় ঝাঁকড়া চুল—দাঁতে মিসি—সিপাই পেড়ে ঢাকাই ধুতি পরা—বুটোদার একলাই ও গাজের মেরজাই গায়—মাথায় জরির তাজ—হাতে আতরে ভুরভুরে রেশমের রুমাল ও এক এক ছড়ি।"

এই সকল নববাবু চাটুকার ও ইয়ার-বন্ধুতে পরিবৃত হইয়া নিত্য নূতন আমোদে উন্মত্ত থাকেন। নববাবুবিলাসের মতে—"মনিয়া বুলবুল আখড়াই গান, খোষ পোষাকী যশমী দান, আড়িঘুড়ি কাননভোজন, এই নবধা বাবুর লক্ষণ।" বাবুরা অভিভাবক বা পিতামাতার অজ্ঞাতে হ্যাণ্ডনোট কাটিয়া ধার করেন। পাঁচ শত টাকা লইয়া হাজার টাকা লিখিয়া দেন। "নানা জাতি প্রমোদিনী বিবিধ বিলাসিনী"-সংসর্গে নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করেন। এই সকল বাবুদেরও বিবাহ হয়। বড়ঘরের ছেলে; এই সতী-সাবিত্রীর দেশে পতিদেবতারূপে ইঁহারা বিরাজ করেন।

"বাবুরা যানে বাহনে আরোহণ করিয়া কখন মাহেশের স্নানযাত্রা সন্দর্শনে যান, কখন কুঠী গিয়া থাকেন, কখন নিলাম ঘরে, কখন চিনাবাজারে, কখন আদালতের ঘরে, কখন মেং ডেবিড হের সাহেবের দোকানঘরে গমনাগমন করেন। বাটী আসিয়া বৈঠকখানায় বসিয়া শাল ও কাপড় খরিদ করেন। পাঁচ শত টাকার শাল যোড়া খরিদ করিয়া আড়াই শত টাকায় বিক্রয় করেন এবং নিলামে এক হাজার টাকার গাড়ি ক্রয় করিয়া চারি শত টাকায় বিক্রয় করেন। * * * দোকানদার মহাজনের পুঞ্জ পুঞ্জ টাকা দেন হইলেন। মহাজন লোকেও আর দেয় না, দিলেও পায় না। সর্বদা তাহারা বাবুর নিকটে যাতায়াত করে, তাহারদিগকে টালমাটাল করিয়া সাবেন…কিন্তু কি করেন শেষে নিজপত্নীর গায়ের অলঙ্কারাদি অপহরণ করিবার মনস্থ করিয়া এক দিবস শয়নস্থলে বাটীর মধ্যে যাইবেন সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি (অর্থাৎ বাবুর স্ত্রী) এই সংবাদ পাইয়া তৎক্ষণাৎ দাঁড়া গুয়াপান দিয়া পাঁচ এও লইয়া সুবচনী পূজা দিলেন, কারণ নববধ্বাগমনের পর স্বামীর মুখসন্দর্শন করেন নাই, রাত্রিতে বাটীর মধ্যে বাবু শয়নার্থ গমন করিলেন, তাহাকে অনেক বিনয় বাক্যেতে সন্তুষ্ট করিয়া দুই চারিখানি স্বর্ণগহনা তাহার স্থানে লইলেন, কহিলেন, উত্তম করিয়া গড়াইয়া দিব, প্রভাতে বৈঠকখানায় আসিয়া লোকদ্বারা বাজারে পাঠাইয়া বিক্রয় করিয়া আনাইলেন, তাহাতে পাঁচ সাত রোজ খরচপত্র চলিল……"—নববাবুবিলাস।

বাবুদিগের পিতা যত দিন জীবিত থাকেন, তত দিন বাধ্য হইয়াই পুত্রের ঋণ শোধ করেন। অনেক সময় মহাজনেরা জেলে আটক করিতেও ছাড়ে না; কিন্তু "বাবুর পিতা কর্ত্তা মহাশয় নোটের বেবাক টাকা ও খরচা দিয়া বাবুকে খালাস করিলেন, তৎপরে বাবু বাজারে যাহার যাহার দেনা ছিলেন, তাহারাও বাবুর নামে নালিশ করিয়া কর্ত্তার স্থানে বেবাক টাকা পাইলেক।" বাবুদিগের পিতা স্বর্গত হইলে তাহাদিগকে আর পায় কে? "রাতদিন খেলাধুলা, গোলমাল, গাওনা বাজনা, হো হো হাসি খুসি, আমোদ প্রমোদ, মোয়াযেল, চোহেল, স্রোতের ন্যায় অবিশ্রান্ত চলিতে আরম্ভ করে।" ক্রমে নগদ টাকাকড়ি, স্থাবর অস্থাবর বিষয়-সম্পত্তি, আত্মীয়-স্বজন সকলকেই বিদায় লইতে হয়। কিছু যদি কাহারও ভাগ্যে অবশিষ্ট থাকে, তাহাও কন্যার বিবাহে শেষ হইয়া যায়। নববাবুর পরিণামে "বিবাহ না দিলে জাতিরক্ষা হয় না ক্রমে পাঁচ কন্যার বিবাহ দিলেন, ধনের শেষ হইল, পরিবার প্রতিপালনার্থ দায়গ্রস্ত হইলেন, শেষে বাটীর পাট্টা বন্ধক কর্জ্জ সুদসমেত অনেক টাকা দেনা হইলেন, মহাজনে বাটী বিক্রয় করিয়া লইলেক। আখেরে টালার বাগানে কোন ভাগ্যবানের অধিকারে বাস করিয়া কোনরূপে দিনপাত করেন এবং পরিবার প্রতিপালনে বহু ক্লেশান্বিত হইয়া বাবুগিরি ও সংসারের উপরি বিরক্ত হইয়া খেদ করেন।"

বাবুদিগের বিড়ম্বনাময় ইতিবৃত্ত এইরূপ শোচনীয় ভাবেই শেষ হয়; ঊনবিংশ শতাব্দীর সে ধারা আজিও প্রবাহিত। ধনের আভিজাত্যই এইরূপ শোচনীয় নৈতিক অবনতি ঘটায়। অবশ্য বর্ত্তমান যুগ মানুষকে অনেকটা সতর্ক করিয়াছে। তবুও 'বাবু'রূপ মানুষের অভাব নেই। ধনের আভিজাত্য ও অতিরিক্ত বাৎসল্য অনেক সময় মানুষ গড়িতে গিয়া বানর গড়িয়া তুলে। আবার অসতর্ক পিতামাতার অজ্ঞাতেই পুত্রের বাবুত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে যে সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত অধিকাংশ লোকেরই নৈতিক ভিত্তি আলোড়িত হইয়াছিল। তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যাঁহার বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে, তিনিই বাবু। যাঁহার ইষ্টদেবতা ইংরাজ, গুরু ব্রাহ্মধর্মবেত্তা, বেদ দেশী সংবাদপত্র এবং তীর্থ ন্যাশনেল থিয়েটার, তিনিই বাবু। যিনি মিশনরির নিকট খ্রীষ্টীয়ান, কেশবচন্দ্রের নিকট ব্রাহ্ম, পিতার নিকট হিন্দু, এবং ভিক্ষুক ব্রাহ্মণের নিকট নাস্তিক, তিনিই বাবু।"

রাঢ় ও বঙ্গ

(ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পটভূমিকা)

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

স্বাতন্ত্র্যের দাবী

বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করে লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর জাতীয়তা-বোধকে গভীর ভাবে আলোড়িত করেছিলেন। এ কথা ভাবতে আশ্চর্য্য হতে হয় যে, এই দ্বিখণ্ডিত বাংলাকে একীভূত করতে সে দিন যাঁরা যে-কোন নির্য্যাতন বরণ বা আত্মত্যাগ করতে দ্বিধাবোধ করেননি, তাঁদেরই কেউ কেউ আজ আবার নিজেরাই বাংলাকে দ্বিধা-বিভক্ত করবার প্রস্তাব করছেন। যে গভীর মর্ম্মবেদনা এবং বাস্তববোধ থেকে আজকে এই প্রস্তাবের উদ্ভব হয়েছে তাকে অনেকে জনকয়েক কল্পনাবিলাসী বা উগ্র সাম্প্রদায়িকতাপন্থীর চিৎকার বলে মনে করলেও আত্মরক্ষাকামী ও শান্তিপ্রয়াসী হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই এই প্রস্তাবের যুক্তি এবং সারবত্তা গভীর ভাবে চিন্তা করে দেখা উচিত।

বাংলা দেশকে দুইটি প্রদেশে পরিণত করবার যে সকল যুক্তি রয়েছে, সংস্কৃতির ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার যুক্তিই তাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। বর্ত্তমান আকারে সাম্প্রদায়িকতার জন্মকাল থেকেই বাংলার হিন্দু-সম্প্রদায় নানারূপ বিড়ম্বনা এবং উৎপীড়নের লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ, জাতীয় জাগরণের জন্ম দিয়ে এবং নবচেতনার উদ্বোধনকল্পে অসীম পীড়ন বরণ করে বাংলার হিন্দু এক দিকে যেমন সমগ্র ভারতে স্বাধীন ভাব-কল্পনার উদ্বোধন করেছিল, অন্ত দিকে রাজরোষও বাংলার হিন্দুকে হতচেতন করবার চেষ্টার ত্রুটি করেনি। এ কথা অস্বীকার করে আজ আর কোন লাভ নেই যে, সাম্রাজ্যবাদের গুরু-চক্রের পেষণে সম্প্রদায় হিসাবে বাংলার হিন্দু শুধু পরাভূত হয়নি, বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার দাখিল হয়ে পড়েছে। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বাংলার হিন্দু আজ হতশ্রী, পদদলিত; রাজনীতি বা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তার স্থান সকলের পশ্চাতে। অন্ত দিকে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষানল বাংলার হিন্দুকে সকল দিক থেকে আবেষ্টন করে তার শিক্ষা, সংস্কৃতি এমন কি অস্তিত্বকে পর্য্যন্ত গ্রাস করবার উপক্রম করেছে। চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই জানেন, এই সাম্প্রদায়িকতাও সাম্রাজ্যবাদেরই আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে আজ এই রূপগ্রহণ করেছে। এই সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে সংগ্রাম সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সংগ্রামেরই অংশবিশেষ, তবে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আঘাত দৃশ্যত আপনার প্রতিবেশীর দিকেই উদ্যত হলেও এই প্রতিবেশী সাম্রাজ্যবাদের হাতে যত দিন ক্রীড়নক হয়ে থাকবে তত দিন তার সঙ্গে সংগ্রাম ভিন্ন অন্ত কোন গতি আছে বলে মনে হয় না।

রাজনীতি ক্ষেত্রে স্বার্থাসিদ্ধিরূপ আদর্শের যে দুর্ব্বুদ্ধি সম্প্রদায়-বিশেষকে রণনৃত্যে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে তাকে সংহত করতে হলে ভাববিলাস পরিত্যাগ করে কঠিন বাস্তববোধের উপর আপনার কর্ম্মপন্থা নির্দিষ্ট করবার প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, যে সমস্যার ধুয়া তুলে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবৃন্দ আজ দেশব্যাপী কাণ্ডকাণ্ড আরম্ভ করেছেন, সেই সমস্যার তূণীর থেকে অস্ত্র আহরণ করে উপযুক্ত ভাবে তা ব্যবহার করতে পারলে তবেই তাকে সংযত করা সম্ভবপর হতে পারে। এই সমস্যাটির নাম সংখ্যা-লঘিষ্ঠের সমস্যা। আজকে ভারতবর্ষের সকল অধিবাসী যদি নিজেকে মাত্র ভারতবাসিরূপে কল্পনা করতে পারত, তবে এই সমস্যা কখনই উঠত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য-বশত তা হয়নি, মুসলমান-সম্প্রদায়ের অধিকাংশই আজ নিজেকে ভারতবাসী না ভেবে মুসলমান হিসাবে স্বাতন্ত্র্যের দাবী উপস্থিত করেছেন। চক্রে পড়ে এই দাবীর অনেকটা আজ মেনেও নেওয়া হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। উত্তর-পশ্চিমের প্রদেশমণ্ডলীর সংখ্যালঘিষ্ঠ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায় কার্য্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাবের মুসলমান-সম্প্রদায়ের অধীন হয়ে পড়বে। সংস্কৃতির দিক থেকে সিন্ধু এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মুসলমানগণ পাঞ্জাবের মুসলমানগণের অধীনতা কি ভাবে পরিপাক করেন ভবিষ্যৎ তার সাক্ষ্য দেবে।

কিন্তু পূর্ব্বের প্রদেশমণ্ডলী গঠনের মূলে কোন স্বাতন্ত্র্যের আদর্শ কাজ করছে। মুসলমান সম্প্রদায় যদি মনে করে থাকেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের অধীনতা থেকে মুক্ত হয়ে আপন সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্যই তাঁরা স্বাতন্ত্র্য কামনা করছেন, তবে কোন্ যুক্তির বলে তাঁরা আসাম এবং পশ্চিম-বঙ্গের উপর আধিপত্য করেন? সংস্কৃতির দিক থেকে এই দুই অঞ্চলের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করা যায় কি? না, তা যায় না। তা সত্ত্বেও এই দুই অঞ্চলের উপর মুসলমানেরা প্রভুত্ব কামনা করে কিসের জোরে? চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রই এই ক্ষমতার উৎস কোথায় তা জানেন। তা জেনেও কি তার উত্তর তাঁরা দেবেন না?

সংখ্যালঘিষ্ঠ সমস্যার মূলে সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের কথাটাই মুখ্য। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে, এই সংস্কৃতির দিক থেকে বাংলার সমস্ত হিন্দু পরস্পরের সঙ্গে যে নৈকট্য বোধ করে, ভাষার দিক থেকে এক হলেও প্রতিবেশী মুসলমান-সম্প্রদায়ের সঙ্গে তা করে না। দীর্ঘকাল প্রতিবেশিরূপে বাস করার ফলে এবং একই রক্ত-সমুদ্ভূত হওয়ায় বাংলার হিন্দু-মুসলমানে ধর্ম্মে উগ্র বৈষম্য সত্ত্বেও যে নৈকট্য এবং আত্মীয়তাবোধ জাগ্রত হয়েছিল দুর্ভাগ্যক্রমে তা আজ প্রায় সম্পূর্ণ ভেঙ্গে পড়েছে। বহু দূরদেশের ঊষর ও বিভীষিকাময় মরুপ্রান্তরে উদ্ভূত ধর্ম্মাদর্শের বাহক এই সংস্কৃতি যে দেশেই গেছে প্রায় সব দেশের সকল সংস্কৃতিকেই বিচূর্ণ করে সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে। সমগ্র উত্তর-আফ্রিকা, এসিয়া মাইনর এবং পারস্য, আফগানিস্থান সম্বলিত সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, মালয় এবং বৃহত্তর ভারতের দ্বীপপুঞ্জে ঐসলামিক সংস্কৃতির ইতিহাস এক। আঘাতের পর আঘাতের দ্বারা স্থানীয় সংস্কৃতিকে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করে ইসলাম তার জয়-কেতন স্থাপন করেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপে প্রবলতর খৃষ্টীয় শক্তির সঙ্গে বারংবার সে পাঞ্জা কষেছে, মাত্র সেইখানেই সে হটেছে, সেখানে প্রবলতর শক্তি তাকে পরাভূত করতে পেরেছে। দুর্ব্বল কখনও তার কাছে ত্রাণ পায়নি। সময় এবং সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলে এই শক্তির উগ্রতা আজ কিছুৎ পরিমাণে সংহত হলেও ভারতে এই শক্তি আজ সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হয়ে আবার পুরাতন দংষ্ট্রা বিকাশ করছে।

একমাত্র ভারতবর্ষের হিন্দুই দীর্ঘকাল ঐসলামিক রাজত্বের অধীনে থেকেও তার প্রাণশক্তি বিসর্জ্জন দেয়নি। মুসলমান যখন দেশের অধিপতি ছিল তখন সে যা করতে পারেনি, আজকে হিন্দুর দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলে সে তাই করতে চায়। বিংশ শতাব্দীর অগ্রগমনশীল বৈজ্ঞানিক যুগে মধ্যযুগীয় আদর্শে সে এই সকল অঞ্চলে ধর্ম্মীয় রাজপ্রতিষ্ঠা করতে চায়। সে আশ্বাস দিয়েছে, সরিয়তের বিধান

অনুসারে যখন এই সকল অঞ্চল শাসিত হবে তখন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় তাদের সংস্কৃতি বাঁচিয়ে পরম সুখে সেই স্বর্গরাজ্যে বাস করবে। সরিয়তের শাসন অন্যান্য মুসলমান-অধ্যুষিত দেশে কিরূপ স্বর্গরাজ্যের প্রবর্ত্তন করেছিল তা পূর্ব্বে দেখিয়েছি। আসাম এবং বাংলার হিন্দু যদি স্বেচ্ছায় সে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ না করে তবে—প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। এবং এই দাবী সে করছে কোন যুক্তির বলে—সংখ্যালঘিষ্ঠের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা। ভারতে মুসলমান সংখ্যালঘু, তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা যদি যুক্তিযুক্ত বা প্রয়োজন বলে আজ স্বীকার করা হয়ে থাকে, তবে বাংলায় যে হিন্দু সংখ্যালঘিষ্ঠ তার আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হবে না কোন্ যুক্তিতে? অবশ্যই সম্প্রদায়বিশেষ যে যুক্তির বলে এই দাবী অস্বীকার করতে চান, এবং স্বসম্প্রদায়ের স্বার্থবোধ থেকে এই অস্বীকৃতি নিতান্তই স্বাভাবিক, তা হচ্ছে পশ্চাদ্দেশ থেকে ছুরিকাঘাতের যুক্তি—তাঁরা স্বকীয় সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করে এই যুক্তিকে আরও শক্তিশালী করে তুলবার জন্য কোন শক্তিই প্রয়োগ করতে বাকী রাখবে না। এবং মনে রাখতে হবে, তাদের করতলধৃত রাজশক্তি এবং প্রচ্ছন্ন সাম্রাজ্যবাদের শক্তিও সর্ব্বতোভাবেই তাদের সহায়তা করবে।

বাংলায় আজ যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে বাংলা কার্য্যত আজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের বিপদ অত্যন্ত গুরুতর। অধিকতর দুর্ব্বল এবং দ্বিধাসম্পন্ন জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা স্বভাবতই আত্মরক্ষার তাগিদে স্বসম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরু দলে ভিড়ে পড়ছেন। তাঁদের সংস্কৃতি আজ বিপদগ্রস্ত নয়। কিন্তু জাতীয়তাবাদী হিন্দু কি করবেন? যেখানে প্রতি পদে-পদে আপনার অধিকার, সংস্কৃতি, ধনসম্পদ, নারীর মর্য্যাদা এবং জীবন বিপদগ্রস্ত হবে সরিয়ত-শাসিত সেই ঐক্যবদ্ধ বাংলায় বাস করবেন। এখানে নেতারা হয়ত কিছু সংখ্যায় প্রতিনিধি-সভায় যাবেন, এবং ক্ষমতাহীন দুর্ব্বলের ন্যায় অনাস্থা প্রস্তাবের পর ছাঁটাই প্রস্তাব এনে যথারীতি ভোটের জোরে পরাজিত হয়ে দিনের পর দিন প্রহসনের অভিনয় করবেন, কিন্তু সম্প্রদায়ের এই অপমান বা ধনপ্রাণ-মর্য্যাদা রক্ষার কোন উপায় করতে পারবেন না। কিম্বা ভাবালুতা বা কায়েমি স্বার্থের জন্য কোন যুক্তিযুক্ত সমাধানের উপায় বাৎলাতে পারবেন না।

এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায়—এই সম্প্রদায়ের জন্য স্বাতন্ত্র্যসম্পন্ন আত্মনিয়ন্ত্রণশীল প্রদেশ দাবী করা। সংস্কৃতির ভিত্তিতে এইরূপ দাবী যে বিন্দুমাত্রও অন্যায্য নয়, তা প্রমাণ করা কিছু কঠিন নয়।

সামগ্রীক বাংলার ঐতিহাসিক পটভূমিকা

বাঙ্গালী কে? আজ এই সমগ্র প্রদেশ ঐক্যবদ্ধ ভাবে বাঙ্গালা নামে পরিচিত হলেও চিরকালই কি এই প্রদেশ এমনি অখণ্ড ছিল? কার্জ্জনই কি প্রথম এই প্রদেশকে দ্বিধাখণ্ডিত করে একত্র থাকবার এই ঐশ্বরিক বিধানকে বিনষ্ট করেছিলেন? বোধ হয় তা নয়। অবশ্য কার্জ্জনের কৃতকর্ম্মের মধ্যে প্রাচীন কোন বিধানকে পুনরুজ্জীবিত করবার সদিচ্ছার পরিবর্ত্তে পূর্ব্ববঙ্গের অগ্রসর হিন্দু সমাজকে মুসলমানের অধীন এবং পশ্চিমের বাঙ্গালীকে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিহার ও উড়িষ্যার অধিবাসিগণের কৃপার পাত্র করে তুলবার প্রয়াসই মুখ্য হয়ে থাকলেও কার্জ্জনের বঙ্গভঙ্গের মধ্যে একটা সুপ্রাচীন সংস্থারই আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস দেখা যায়। ১১০৫ সালে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞান খুব বেশী ছিল না। সে যুগের বিশিষ্ট লেখকেরা বাঙ্গালীকে এক আত্মবিস্মৃত জাতিরূপেই অভিহিত করে গেছেন। তার পর অনেক ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এই সকল তথ্য পর্য্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, পশ্চিম এবং পূর্ব্ববঙ্গের বর্ত্তমান সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এবং বিশিষ্টতা আজকের নূতন নয়। রাজনৈতিক দিক থেকেও বাংলা অতীতে অপেক্ষাকৃত অল্প কাল যাবৎই আজকের এই একীভূত রূপ নিয়েছে। মূলত বাংলার ইতিহাস অনুধাবন করলে এই প্রদেশকে একাধিক বিশিষ্ট অংশের একত্রিত রূপ না বলে পারা যায় না।

খুব প্রাচীন কালে অধুনা বাংলা নামে পরিচিত ভূখণ্ডে প্রত্যক্ষ ভাবে মোটামুটি তিনটি পৃথক্ অংশে বিভক্ত ছিল বলে দেখতে পাওয়া যায়। উত্তরে বর্ত্তমান রাজসাহী বিভাগ মোটামুটি পুণ্ড্রবর্দ্ধন নামে, পশ্চিমে বর্দ্ধমান বিভাগ সুহ্ম নামে এবং এতদতিরিক্ত জনবসতিপূর্ণ পূর্ব্বাঞ্চলই মাত্র বঙ্গনামে পরিচিত ছিল। এই বঙ্গ নাম থেকেই উত্তর কালে বাঙ্গলা বা বাংলা নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই তিনটি নাম মুখ্যত তিনটি জাতির নাম থেকে এসেছে, কিংবা বলা যেতে পারে একই জাতির তিনটি শাখার নাম থেকে। পুরাণে পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গদের বলী নামক অসুরের বংশধর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এক সময়ে মধ্যদেশবাসী সভ্য ভারতীয়রা এই সব লোকেদের খুব প্রীতির চক্ষে দেখতেন না, নিজেদের সভ্যতাকে তারা এদের চেয়ে অনেক উচ্চ স্তরের বলে মনে করতেন। প্রাচীন জৈন গ্রন্থপাঠেও মোটামুটি মনে হয় যে, এদের সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে মধ্যদেশীয়দের সংস্কৃতির কিছুটা তারতম্য ছিল। মধ্যদেশীয়দের সংস্কৃতি এ দেশে চলিত না থাকলেও সভ্যতায় এরা কিছু ন্যূন ছিল না। খৃষ্টের জন্মের ৩৪ শ' বছর আগেও পুণ্ড্রদের রাজধানীতে দুর্ভিক্ষের সময় লোকদের সাহায্য করবার জন্য রাজকীয় শস্যাগার থেকে জনগণের শস্য ঋণ দেবার ব্যবস্থা ছিল। এ ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত সরকার এবং সভ্যতার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০ বছর পরে বাঁকুড়া জেলার পোখরণাতে (প্রাচীন নাম পুষ্করণা) চন্দ্রবর্ম্মা নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। এর কিছু কাল পরে উত্তর-বাংলার কোন কোন জায়গায় ব্রাহ্মণরা বসবাস করতেন বলে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। মনে হয়, ঐ সময়ের মধ্যেই পশ্চিম-বাংলা এবং উত্তর-বাংলায় মধ্যদেশীয় সংস্কৃতির অনেক কিছু বৈশিষ্ট্যই বিস্তার লাভ করেছিল। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, শিলালেখ তাম্রপত্র ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপাদান থেকে যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে এই সকল অঞ্চলে বিশেষ করে পশ্চিম-বাংলায় বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাবই ছিল মুখ্য। এই অঞ্চল এরই মধ্যে কোন এক সময়ে সুহ্ম নামের পরিবর্ত্তে রাঢ় এই নাম ধারণ করে। সমগ্র পুণ্ড্রবর্দ্ধন এবং এই রাঢ় দেশও সম্ভবত পুরোপুরিই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী গুপ্ত সম্রাটদের অধীনে এসেছিল। তাঁদের রাজ্যকালের প্রায় প্রথমাবধিই কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের আমলে সমতট নামে পরিচিত দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের স্বতন্ত্র সত্তা ছিল। সমতট বলতে বোধ হয় এ সময়ে সমগ্র বঙ্গ অঞ্চলকেও বোঝাত। ৭ম শতাব্দীতে ভয়েন সাং ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থ সমগ্র

অঞ্চলকেই মোটামুটি সমতট নামে অভিহিত করেছেন। এই অঞ্চলের প্রাচীনতম ঐতিহাসিক পরিচয় পাওয়া যায় ৫০১ খৃঃ অঃ সম্পাদিত এবং ত্রিপুরা জেলার গুণাইগড়ে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন থেকে। এই তাম্রশাসন থেকে মনে হয় যে, এরই মধ্যে কোন সময়ে এই অঞ্চল গুপ্ত সম্রাটগণের শাসনাধীনে এসেছিল, কিন্তু গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিতরে দূরবর্তী অঞ্চলগুলি যেমন সামন্তরাজগণের অধীনে একটা স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য ভোগ করত এই অঞ্চলেরও তেমনি একটা স্বাতন্ত্র্য ছিল; আর সংস্কৃতির দিক থেকে এই অঞ্চলে এরই মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়।

এর পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে রাঢ় দেশের উত্তরাঞ্চলে বর্ত্তমান মুর্শিদাবাদের অদূরে গঙ্গার কূলে অবস্থিত রাঙ্গামাটীতে (প্রাচীন কর্ণসুবর্ণ) শশাঙ্ক নামে এক পরাক্রমশালী সম্রাটের আবির্ভাব হয়। শশাঙ্কের বিজয়বাহিনী সুদূর কনৌজ পর্য্যন্ত অভিযান করেছিল; উড়িষ্যার দক্ষিণে গঞ্জাম পর্য্যন্ত ছিল শশাঙ্কের সাম্রাজ্যের বিস্তার। বাংলার এই দিগ্বিজয়ী রাজা ইতিহাসে গৌড় জাতির নায়ক বলে উল্লিখিত হয়েছেন। রাঙ্গামাটিতে যাদের রাজধানী, সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত যাদের দেশ, সেই গৌড় জাতি যে সুহ্ম এবং রাঢ় জাতির সঙ্গে অভিন্ন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শশাঙ্ক ছিলেন পরম শৈব, বৌদ্ধেরা তাঁকে বৌদ্ধবিদ্বেষী বলে পরিচিত করেছেন। রাজনৈতিক কারণে প্রতিবেশী বৌদ্ধ রাজন্যগণের সঙ্গে তাঁর বৈরতা ছিল, কিন্তু তিনি বৌদ্ধধর্ম্মদ্বেষী ছিলেন বলে কোন প্রমাণ অবৌদ্ধ কোন ঐতিহাসিক উপাদান থেকে পাওয়া যায় না। বরং মনে হয়, গৌড়দের তথা শশাঙ্ককে বৌদ্ধদ্বেষী বলবার মূলে তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের কথাই মূলত স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে—যে সংস্কৃতি ছিল বৌদ্ধ সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র।

এদিকে বঙ্গ বা সমতট অঞ্চলে শশাঙ্কের কিছু কাল পরে খড়্গরা এবং তাদের পরে যে বর্ম্ম রাজবংশ রাজত্ব করেন তাঁরা ছিলেন গভীর আস্থাসম্পন্ন বৌদ্ধ। তাঁদের আমলে যে সব লিপি ইত্যাদি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে ব্রাহ্মণাদির নাম প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ থাকলেও এ কথা পরিষ্কারই বুঝতে পারা যায় যে, ঐ অঞ্চলটি ছিল মুখ্যত বৌদ্ধধর্ম্মেরই একটি সক্রিয় কেন্দ্র, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিশেষ প্রভাব ওখানে ছিল না। রাঢ় বা গৌড়ের সঙ্গে বঙ্গ বা সমতটের এই সাংস্কৃতিক তারতম্য সমসাময়িক চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাংএর বিবরণ থেকেও অনেকটা বুঝতে পারা যায়। তিনি সমতটে যে সময়ে ৩০টি বৌদ্ধসঙ্ঘের অস্তিত্বের কথা উল্লেখ করেছেন সেই সময়ে কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধসঙ্ঘের অস্তিত্ব ছিল মোট দশটি। আবার এখানে এমন এক শ্রেণীর বৌদ্ধের প্রভাব ছিল (তাদের নাম দিল সম্মতীয়) বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে যাদের প্রভাব একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য বলে অভিহিত করা যেতে পারে।

এর পরের অধ্যায় গৌড়ের ইতিহাসে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। পর পর বহুসংখ্যক বৈদেশিক আক্রমণে গৌড়ের রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে, দেখা দেয় মাৎস্যন্যায়। কল্হনের রাজতরঙ্গিণীতে জনৈক গৌড়রাজের কাশ্মীরে নিহত হওয়ার কথার উল্লেখ আছে। এমনি কোন দুর্বিপাকে গৌড়ের সিংহাসন শূন্য হ'লে রাজ্যের প্রধানেরা মিলে গোপালদেব নামক জনৈক ব্যক্তিকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। পালরা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় শুধু গৌড়ে নয়, বিহারেও বহু বৌদ্ধ-বিহার মন্দির সঙ্ঘাদি গড়ে ওঠে। কিন্তু তাঁদের আমলে উত্তর ও পশ্চিম-বাংলা থেকে যে সকল তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে এ কথাই প্রমাণ হচ্ছে যে, বৌদ্ধ হলেও পাল সম্রাটদের ধর্ম্মের কোন গোড়ামি ত ছিলই না বরং তাঁরা ব্রাহ্মণদের এবং তাতে করে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যথেষ্ট সমাদর করতেন। এদিকে পালরা বৌদ্ধ হলেও বৌদ্ধপ্রধান বঙ্গ বা সমতট তাঁদের শাসনকালেও গৌড়ের সঙ্গে এক হয়ে সমগ্র বাংলা অখণ্ড সাম্রাজ্যে পরিণত হতে পারেনি। সমগ্র বিহার এবং কোন কোন সময় বারাণসী এমন কি কনৌজ পর্য্যন্ত পালদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়ে থাকলেও পূর্ব্ববঙ্গ তাঁদের সময়েও আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলে—বরং সুযোগ পেলে উত্তর-বঙ্গ অধিকার করতেও চেষ্টা করে। পাল-রাজবংশের দুর্দ্দিনে বিদ্রোহী কৈবর্ত্তেরা যখন উত্তর-বঙ্গ (প্রাচীন পুণ্ড্র, তৎকালীন বারেন্দ্রী) দখল করেছিল তখন বঙ্গদেশের বর্ম্মবংশীয় জনৈক রাজা উত্তর-বঙ্গ দখল করতে চেষ্টা করেন।

এই বর্ম্মেরাই বঙ্গের প্রথম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী রাজবংশ। এঁদের পূর্ব্ববর্ত্তী চন্দ্রদের মতই এঁরাও নিজেদের পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির (অর্থাৎ উত্তর-বঙ্গের) ও অধিকারী বলে মনে করতেন। এই বর্ম্মদের আমলেই প্রথম রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণকে দানস্বরূপ ভূমি গ্রহণ করে বঙ্গে আগমন করতে দেখতে পাই (ভোজবর্ম্ম দেবের বেলাব লিপি)। এর পর রাঢ় দেশের সামন্ত নৃপতি সেন রাজবংশ ক্রমে শক্তি অর্জ্জন করে প্রথমত হয়ত পূর্ব্ববঙ্গ এবং পরে উত্তরাঞ্চল থেকে পালদের বিহারে বিতাড়ন করে সমগ্র বাংলা দেশ অধিকার করেন। এই স্পষ্টত সর্ব্বপ্রথম সমগ্র বঙ্গদেশ রাঢ় বঙ্গ এবং বরেন্দ্রী একীভূত হয়ে এক শাসনাধীনে এল। পূর্ব্ববঙ্গের শ্রীবিক্রমপুর চন্দ্ররাজাদের আমল থেকেই বঙ্গ অঞ্চলের রাজধানীর মর্য্যাদা লাভ করেছিল। এই শ্রীবিক্রমপুর সেনদেরও অন্যতম রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। বহু রাঢ়দেশীয় ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক সেনদের আনুকূল্য পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ করে বিক্রমপুর অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। আজকে পূর্ব্ববঙ্গ অঞ্চলে যে সব ব্রাহ্মণদের দেখা যায় এরা সবাই প্রায় এই সকল উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণদেরই বংশধর। রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ভিন্ন কয়েক ঘর বারেন্দ্র এবং বৈদিক ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে থাকলেও এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, পূর্ব্ববঙ্গের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মূলত সেন এবং সেনরাজগণ এবং তার পরবর্ত্তী কালে রাঢ় দেশ থেকে আগত ব্রাহ্মণদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত এবং লালিত হয়ে আসছে।

সেনরাজগণের আমলেই বাংলা সর্ব্বপ্রথম এক সামগ্রিক শাসনের অধীনে এসে থাকলেও এই ব্যবস্থা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। যশোহীন সেন-সম্রাট লক্ষ্মণসেনের আমলে ইখ্‌তিয়ারউদ্দীন মহম্মদ খিলজি নদীয়া তথা সমগ্র পশ্চিম বাংলা (গৌড়) অধিকার করে নিলে বৃদ্ধ সম্রাট পশ্চিম অঞ্চলের অধিকার ত্যাগ করে শ্রীবিক্রমপুরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইতিহাস বলে, এর পরেও বহু দিন বাংলার পূর্ব্বাঞ্চল মুসলমান-আধিপত্য থেকে আপনার স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। অবশেষে চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে দিল্লীর তুঘলক সম্রাটগণ সমগ্র বাংলা দেশ অধিকার করেন; বাংলা অধিকৃত হলেও সেই প্রাচীন ভৌগোলিক বিধান অনুসারেই মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত হয়। উত্তরে লক্ষ্মণাবতী (মোটামুটি প্রাচীন বারেন্দ্রী), সাতগাঁও

(মোটামুটি প্রাচীন রাঢ়) এবং সোনারগাঁ (মোটামুটি প্রাচীন বঙ্গ বা সমতট) এই তিন অংশের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়। উত্তর-বঙ্গের রাজধানী পরে পাণ্ডুয়াতে স্থানান্তরিত হয়। সামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ সোনারগাঁ অধিকার করলে (১৩৫২ খৃঃ) আবার বাংলার উভয় অঞ্চল একত্রিত হলেও উত্তর ও পূর্ব্বাঞ্চলের দ্বন্দ্ব মুসলমান সার্ব্বভৌমত্বের আমলেও দূর হয় নাই। দিল্লীর সুলতান-শাসনের আমলে বার বার এই দুই অঞ্চল একত্রিত করা হলেও পুনরায় এরা এই দুই রাজনৈতিক অংশে বিভক্ত হয়ে যেত; সমগ্র প্রদেশের এক নাম ঐ আমলে কখনই প্রচলিত হয়নি। পশ্চিমাঞ্চল সাধারণত গৌড় নামে এবং পূর্ব্বাঞ্চল সোনারগাঁ নামেই পরিচিত হত। অবশেষে সম্রাট্ আকবর বাংলার পাঠান নৃপতিকে পরাজিত করে রাজমহল থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত বাংলাকে এক শাসনকর্ত্তার অধীনে একটি সুবায় পরিণত করেন। এই সর্ব্বপ্রথম সমগ্র অঞ্চল বাংলা নামে পরিচিত হল।

মুঘল-শাসনের অপেক্ষাকৃত শান্তিপূর্ণ দিনগুলিতে বাংলার এই পরস্পরবিরোধী অঞ্চল দুইটিকে আর দ্বন্দ্বে রত হতে দেখা যায় না। কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ভূম্যধিকারীদের সামন্ততান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি অঞ্চলই যথেষ্ট পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য ভোগ করত। কাজে কাজেই পশ্চিম থেকে পূর্ব্বাঞ্চল পৃথক্ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। ক্রমে ধীর কিন্তু সুনিশ্চিত পদক্ষেপে ইংরেজ মুঘল শাসন-ব্যবস্থার স্থান জুড়ে বসল। আর ষোড়শ শতাব্দী থেকে রাজনৈতিক ঐক্য থাকায় উভয় অঞ্চলের একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যও গড়ে উঠল; যার ফলে আজ বাংলা বলতে রাজমহল থেকে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমগ্র অঞ্চলকে বোঝালেও পূর্ব্ব এবং পশ্চিম-বাংলার বর্ত্তমান স্বাতন্ত্রীক রূপের এই হল ঐতিহাসিক পটভূমিকা।

বাংলার সাংস্কৃতিক রূপ

শাসনতান্ত্রিক দিক্ থেকে বাংলা দেশ আজ এক হলেও সংস্কৃতির দিক্ থেকে আজও এক কি না, এই বিষয়ের মীমাংসার উপরেই স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার দাবীর যুক্তিযুক্ততা নির্ভর করছে। রাঢ়, বারেন্দ্র এবং বঙ্গ এই তিন অঞ্চলের রাজনৈতিক সত্তার কথা বলতে গিয়ে পূর্ব্বেই এই অঞ্চলত্রয়ের সাংস্কৃতিক কাঠামোরও কিছু আভাষ দেওয়া হয়েছে। প্রাক্-ঐস্লামিক যুগে পশ্চিম এবং পূর্ব্বাঞ্চল দুইটি স্বতন্ত্র আদর্শ এবং সেই স্বতন্ত্র আদর্শানুযায়ী জীবন-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল এ কথা বোধ হয় অস্বীকার করা যায় না। পশ্চিমে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রাধান্য ইতিহাসের প্রায় শুরু থেকেই সুস্পষ্ট। রাঢ়ের চন্দ্রবর্ম্মণ (পোখরণা, বাঁকুড়া—আনুমানিক ৪র্থ শতাব্দী) বিষ্ণুর উপাসনা করতেন। সেই যুগ থেকেই এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিম অঞ্চলে আবিষ্কৃত তাম্রপট্টাদিতে সুপ্রাচীন যুগ থেকেই রাঢ়ে ব্রাহ্মণ বসবাসের পরিচয় পাওয়া যায়। শৈব মতে প্রগাঢ় আস্থাবান গৌড়রাজ শশাঙ্কের আনুকূল্যে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং সমাজ-ব্যবস্থা রাঢ় অঞ্চলে গভীর ভাবে আপনার প্রভাব বিস্তার করেছিল। পাল সম্রাট্গণ ধর্ম্মে বৌদ্ধ হলেও এই অঞ্চলের ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং সমাজ-ব্যবস্থাকে শ্রদ্ধা এবং পরিপোষণ করতেন তার অসংখ্য পরিচয় তাঁদের তাম্রশাসন-গুলিতে রয়েছে। তাঁদের মন্ত্রীকুল ছিলেন ব্রাহ্মণ। সেনরাজগণের আমলে নব ব্রাহ্মণ্য রাঢ় অঞ্চলে নূতনরূপে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। দৃঢ়বদ্ধ সমাজ-ব্যবস্থা, ব্রাহ্মণের প্রতি আনুগত্য এবং সামাজিক মর্য্যাদাবোধই ছিল এই সংস্কৃতির মূল। সেন-আমলে এই সংস্কৃতি অধিকতর সংহত রূপ ধারণ করে। সমাজের অভ্যন্তরে শ্রেণীবিভাগ এবং সামাজিক মর্য্যাদাবোধ অধিকতর ব্যাপক হয়ে ওঠে। ওদিকে জয়দেব, ধোয়ী উমাপতি ধরের কাব্য-সাহিত্যে সরস মাধুর্য্যে এক নূতন জীবনাদর্শের আবির্ভাব দেখা দেয়। এই জটিল সামাজিক বন্ধন এবং মধুর জীবনদর্শন নিয়ে পশ্চিম-বাংলা মুসলমান শাসনের অধীনে আসে। মুসলমান শাসনেও তার এই জটিল সমাজ-ব্যবস্থা লোপ পায় নাই, বরং উত্তরোত্তর আরও জটিল হয়েছে আত্ম-সাধন এবং আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই। জয়দেব ধোয়ীর জীবনদর্শনের অনুপ্রেরণায় বৈষ্ণব উত্তরসাধকেরা এক নূতন কল্পলোকের সৃষ্টি করেছিলেন; এই কল্পলোককে অবলম্বন করে চলেছে পশ্চিম-বাংলার জীবন-প্রবাহ। বিধর্ম্মী রাজসভায়ও এই কল্পাদর্শের মর্য্যাদা দেখতে পাই। জটিল এবং অনমনীয় সমাজ-ব্যবস্থা নিয়েও পশ্চিম-বাংলা মুসলমান রাজসভায় সমবেত হয়েছে, মুসলমান শাসকের মনে ব্রাহ্মণ-রচিত রামায়ণ মহাভারতের উপর দরদ জন্মিয়েছে। দীর্ঘকাল মুসলমান শাসনের অধীনে থেকেও তাই দেখি রাঢ়ের সমাজ-ব্যবস্থার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই। লক্ষ্মণাবতীর গড়প্রান্তে এক দিন মুসলমানের আবির্ভাব হলে রাঢ়ের অধিবাসীরা সেই যে দুর্ভেদ্য নির্ম্মোকের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল প্রায় সেই নির্ম্মোকের মধ্যেই আজও সে আত্মরক্ষা করে আসছিল—রাজনৈতিক বিপ্লব তাকে বিশেষ স্পর্শ করে নাই—তার ভেঙ্গে যায়নি সামাজিক কাঠামো।

অন্য দিকে বঙ্গে সাংস্কৃতিক ইতিহাস হচ্ছে সম্পূর্ণ ভিন্ন। গঙ্গা, করতোয়া, ব্রহ্মপুত্রের স্রোতোবাহী পলিতে এই অঞ্চল ক্রমে গড়ে উঠেছে—নূতন নূতন মানুষ নূতন সাহসে ভর করে ঝড়-ঝঞ্ঝা-প্লাবনকে অগ্রাহ্য করে ক্রমে এই নূতন ভূখণ্ডে ছড়িয়ে পড়েছে। কোন দৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থা এদের ধরে রাখতে পারেনি, বাঁধতে পারেনি কোন সীমায়িত আদর্শ। এ দেশের সংস্কৃতির প্রাচীনতম পরিচয় পাই মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে (গুণাইগড় তাম্রশাসন—৫০৮ খৃঃ অঃ)। বহু দিন মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মই ছিল এই অঞ্চলের রাজধর্ম্ম। ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত দৃঢ় সমাজ-ব্যবস্থা এ অঞ্চলে কোন দিনই বিশেষ শিকড় গাড়তে পারেনি। ব্রাহ্মণ ছিল কি ?—অনুমান করা যায় কিন্তু প্রমাণ নাই। বর্ম্মেরা জমিদান করবার জন্য রাঢ় থেকে ব্রাহ্মণ আনিয়েছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে উচ্চবর্ণের বিশেষ করে ব্রাহ্মণের হার আজও অত্যন্ত স্বল্প। উপনিবিষ্ট ব্রাহ্মণেরা সমাজে আসন এবং মর্য্যাদা পেলেও সমাজ শাসন করতে পারেননি, পশ্চিমের মত সমাজকে দৃঢ় ভাবে বাঁধতে পারেননি। তাই প্রত্যক্ষ রাজশক্তি গৌড় এবং সাতগাঁওয়ে রাজত্ব করলেও সে অঞ্চলে হিন্দুসাধারণ মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হয়েছে কম আর পূর্ব্বে সোনারগাঁয়ে সামান্য এক শত বৎসর মুসলমান শাসনের প্রত্যক্ষ কেন্দ্র থাকলেও সে অঞ্চলে মুসলমান ধর্ম্ম অধিকতর সংখ্যায় স্থানীয় অধিবাসীকে আপন আশ্রয়ে আনতে পেরেছিল।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে উচ্চবর্ণের হিন্দু বিশেষ করে ব্রাহ্মণের উপনিবেশগুলি বহু দূরে দূরে—পরস্পরবিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত। মোটামুটি

এদের প্রাধান্য দেখি বিক্রমপুরে এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলে—সেখানে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁরা এসে বসবাস স্থাপন করেছিলেন। ময়মনসিংহ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রামে আগন্তুক ব্রাহ্মণের বসবাস খুব বেশী দিনের ঘটনা নয়। শিথিল সমাজ-ব্যবস্থা এখানে বৈদ্য এবং কায়স্থে সামাজিক আদান-প্রদান স্বীকার করে আজও, নিম্নশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে পশ্চিম অঞ্চলের মত বৃত্তিগত এত বিভাগ আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। নিম্নতর অবিভক্ত সমাজ বহু বহু দিন এ অঞ্চলে ব্রাহ্মণের প্রত্যক্ষ শাসনের বাইরে বেড়ে আসছিল—বৌদ্ধ সংস্কৃতি ছিল প্রবল, সমাজ ব্যবস্থা ছিল শিথিল। দূরে দূরান্তরে নদীস্রোতকে অবলম্বন করে এরা এগিয়ে গেছে—আরাকান থেকে মগ দস্যুরা, চট্টগ্রাম থেকে উপনিবিষ্ট আরবরা নরম জমিতে ইসলামের জয়ধ্বজা স্থাপন করেছে। এই সামাজিক শিথিলতার রূপ সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও দেখি—বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে, ময়মনসিংহের মহুয়া মহুয়ার কাহিনীতে। এই সকল সাহিত্য পশ্চিমের বৈষ্ণব পদাবলীর মত মানুষের ভাবাবেগজনিত রূপকে প্রকাশিত ব্যথা-বেদনার কাহিনী নয়—সত্যিকারের মানুষের নিত্যকার সুখ-দুঃখের সবল প্রকাশে—ব্রাহ্মণেরা এই প্রকাশ কখনও প্রীতির চক্ষে না দেখলেও তাদের শাসন অস্বীকার করেই সমাজে এই সাহিত্যের সমাদর হয়েছে। পরবর্ত্তী যুগেও দেখি, পশ্চিমে চাঁদ সদাগর এবং ফুল্লরার কাহিনীতে এবং ভারতচন্দ্রের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ-প্রবর্ত্তিত শাসন-ব্যবস্থার স্বীকৃতি—অন্য দিকে পূর্ব্বে—জনসংস্কৃতির অভ্যুত্থান। তার পর ইসলামের প্রবর্ত্তনে সেই শিথিল সমাজ-ব্যবস্থা ইসলামের আশ্রয়ে নূতন রূপ গ্রহণ করল। এক দিকে রইল—যারা প্রাচীন পথকে পরিত্যাগ করল না তারা, অন্য দিকে মুসলমান। কিন্তু এই ইসলাম সরিয়তের পবিত্র এবং অবিমিশ্র ইসলাম নয়। ভারতে ইসলামের অবিমিশ্রতা কোন দিন ছিল কি না বলা যায় না—তবে সুফি মতবাদ এবং পীর ও দরবেশের প্রাধান্য ইসলামের কাঠিন্যকে বহুল পরিমাণে নমনীয় করে তুলেছিল গোড়া থেকেই। মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে ফকীরের আস্তানা এবং পীরের স্থান নাই এমন স্থান বিরল। অনৈস্‌লামিক সমাজে যেমন ব্রাহ্মণের শাসনের কোন জোর ছিল না, ঐস্‌লামিক সমাজের গোঁড়া মোল্লাদের প্রভাবও তেমনি আশানুরূপ হয়নি। পীরের দরগায় সিন্নী দিয়ে এবং এমনি আরও বহুবিধ অনৈস্‌লামিক সংস্কার গ্রহণ করে বাংলার নরম জমির স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য মুসলমানরাও স্বীকার করে নিয়েছিল। পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসীদের শতকরা ৭০ জন আজ এই সংস্কৃতি থেকে গোঁড়া ঐস্‌লামিক সংস্কৃতিতে ফিরে যেতে চাইছে। ফলে সংঘর্ষ বেধেছে প্রাতিবেশীর সঙ্গে। সংস্কৃতির এই পটভূমিকায় তাঁরা অন্য ৩০ জন থেকে ভিন্ন; তারা স্বাতন্ত্র্য পেয়েছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতার বলে সামগ্রীক বাংলার সকল অংশের উপরই আজ আধিপত্য বিস্তার করেছে।

বর্ত্তমান অবস্থা

সংস্কৃতির পটভূমিকায় বাংলার পশ্চিম এবং পূর্ব্বাঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির কথা মোটামুটি এই ভাবেই প্রকাশ করা গেল। আকবরের আমল থেকে একত্রিত বাংলা একটা যৌথ সংস্কৃতি যে না গড়ে তুলবার চেষ্টা করছিল তা নয়। এই সংস্কৃতি উভয় অঞ্চলের সমাজ-ব্যবস্থা থেকেই প্রয়োজনের তাগিদে বেরিয়ে আসছিল। আঞ্চলিক স্বাধীনতার লোপের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন স্বাতন্ত্র্যবোধও বহুল পরিমাণে খর্ব্ব হয়ে পড়েছিল। দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদের অধীনের উভয় অঞ্চলের সমস্যাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল এক। সামন্ততান্ত্রিক ভূম্যধিকারীরা সুবাদারের হয়ে দেশ শাসন করত, এরা অধিকাংশই ছিল হিন্দু এবং উচ্চবর্ণের। এদের অধীনে সাধারণের সমস্যা ইসলাম বা হিন্দুয়ানী রক্ষার চেয়েও হয়ে দাঁড়িয়েছিল অর্থনৈতিক। আর একটা জিনিষ এসেছিল—সম্ভবত আকবরের আদর্শ থেকেই—সহনশীলতা। হিন্দু এবং মুসলমানের পরস্পরের ধর্ম্মাচরণের উপর বিদ্বেষ এবং আক্রমণের কথা এ যুগে বিশেষ শুনতে পাওয়া যায় না। বরং গোঁড়া হিন্দুরাও মুসলমানদের উৎসবাদিতে যোগ দিত, মেয়ে-পুরুষ পীরের দরগায় মানত করত এবং পূজা দিতে দ্বিধা করত না। অন্য দিকে মুসলমানেরাও তাঁদের ধর্ম্মের কঠিন অনুশাসনকে বহুল পরিমাণে অস্বীকার করে পীরের দরগায় হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হত এবং হিন্দুদের বিভিন্ন পূজা-স্থানেও সমবেত হতে বা হিন্দুর রামায়ণ মহাভারত বা পুরাণ-কাহিনী থেকে গৃহীত যাত্রা, কথকতা, পাঁচালী ইত্যাদিতে যোগ দিতে দ্বিধা করত না। বীরভূমের মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী চিত্রকরেরা পট দেখিয়ে বেড়াত, দক্ষিণের মুসলমানেরা ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়কে, গাজী কালুর কাহিনীর ভিতর দিয়ে আত্মস্থ করে নিয়েছিলেন। সর্ব্বশেষ এসেছিল সত্যপীর; এই সত্যপীর এক দিন বাংলার হিন্দু-মুসলমানের উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের শ্রেষ্ঠ সেতুরূপে পরিগণিত হয়েছিল, তার পাঁচালী, তার পূজা-পদ্ধতিতে বাংলার যৌথ সংস্কৃতির যে রূপ নিয়েছিল একমাত্র বাংলার মাটিতেই বোধ হয় তা সম্ভব।

এই সত্যপীর—'কংশকেশীমথনে কেশব মোর নাম,
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যায় রাম'

রূপে বন্দিত হতেন এবং তাঁর অপক্ক দুগ্ধ-শর্করাজাত সিন্নী উভয় সম্প্রদায়ের গৃহেই উভয়ের গ্রহণের উপযুক্ত রূপে গণ্য হত। এই সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী ছড়া এবং পালায় দেশ ছেয়ে গিয়েছিল এবং পরস্পরের মধ্যে অর্থনৈতিক সম্বন্ধের অচ্ছেদ্যতার মধ্য দিয়ে, প্রতিবেশীর ধর্ম্ম এবং বিশ্বাসের প্রতি উদারতা, সহনশীলতা এবং মর্য্যাদার মধ্য দিয়ে বাংলা নিজস্ব সংস্কৃতির এক যৌথ সম্পদ গড়ে তুলেছিল। কিন্তু প্রতিক্রিয়াপন্থীর অভাব পৃথিবীতে বড় কোথাও হয় না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ এবং মোল্লারা এই সত্যপীরকে কখনই মর্য্যাদার চক্ষে দেখেননি—পরিশেষে ওহাবী আন্দোলনকারীরা মুসলমানের ঐস্‌লামিক চেতনাকে জাগ্রত করে এই যৌথ সংস্কৃতির উপর কুঠারাঘাত করল। বাংলার মুসলমানকে পুনরায় গোঁড়া ইসলামপন্থী করে তোলা এবং বাংলার এই যৌথ সম্পদকে চূর্ণ করে দেওয়াই যাদের অন্যতম কৃতিত্ব, নিষ্ফল মর্য্যাদাবোধ এবং পরাজিতের মনোভাব সঞ্জাত সেই ওহাবী আন্দোলনও আজ কতিপয় প্রগতিপন্থীর প্রশংসার সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখলে আশ্চর্য্য হতে হয়।

সেই ওহাবী আন্দোলনের আমল থেকেই মুসলমান-সম্প্রদায় আপনার ধর্ম্মগত চেতনায় গভীর ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠতে থাকে। এ কথা ঠিক যে, কঠিন ভাবে পালিত ঐস্‌লামিক আদর্শ কঠিন ভাবে পালিত ব্রাহ্মণ্য আদর্শের সঙ্গে কিছুতেই নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে না। পরস্পরের

মনে হয় কখনো-কখনো
আমাদের পাখা নাই কোনো,
প্রজাপতি, পাখীর প্রণয়
দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে বিশ্ব-সঞ্চরণ,
আমাদের নয়।
নভোচারী মরালের পাখা কাঁপে,
দিগন্তের সিঁড়ি বেয়ে শূন্য নীলে সে অকুতোভয়
সন্ধ্যাকাশে সোজা তারে উড়ে যেতে দেখে
মনে হয় যদি হই পাখা,
যদি হ'তো পাখীর প্রণয়!

কতো দিন পরমায়ু কতো দিন নিঃশেষিত তার
তলিয়ে দেখিনি কোনো দিন,
মনের পাহাড়ে শুধু ঘন বাসনার
গাঢ় অন্ধকার
চেতনার গর্ভে থাকে লীন।
লাল রক্ত হ'লো ফিকে নিষ্পেষিত স্নায়ু,
সংসারের এলোমেলো ভীড়ে
ঢেউ লাগে দ্বীপে-দ্বীপে বাত্যাহত ছিন্ন-ভিন্ন নীড়ে,—
খতিয়ে দেখিনি কোনো দিন
সময় জোয়ার ঠেলে পদক্ষেপ ফেলে
যেতে হবে কোন্ তীরে কতো কাল আছে পরমায়ু।

মনে হয়

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

সর্ব্বদা সতর্ক তবু কোন্ প্রান্ত থেকে
বাষ্পাচ্ছন্ন মেঘে-মেঘে সংসারের শূন্য তলদেশ
শরবিদ্ধ ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে
সঙ্কীর্ণ পথের মোড়ে-মোড়ে
গুপ্ত অন্ধকার থেকে কৃষ্ণ সর্প আসে এঁকে-বেঁকে
ছাড়ে উষ্ণ শ্বাস তীব্র বিষ জোরে-জোরে।
তীব্রতম প্রতিক্রিয়া সম্মিলিত মানুষের মুক্তি-যজ্ঞে দেখি
অবিরাম বজ্রাঘাত হানে,
পথে-পথে অসংখ্য শহীদ, মৃত্তিকা রক্তাক্ত আত্মদানে।
খতিয়ে দেখিনি কোনো দিন
সময় জোয়ার ঠেলে পদক্ষেপ ফেলে
যেতে হবে কোন্ তীরে মরুপথে চলি কোন্ টানে।

সন্ধ্যার আকাশে পাখী উড়ে যায় পাখা কাঁপে তার,
দিগন্তের সিঁড়ি ভেঙে বিশ্ব-সঞ্চরণ,—সে অকুতোভয়,
মুক্ত নীলে সোজা তারে উড়ে যেতে দেখে
মনে হয় যদি হই পাখী,
যদি হ'তো পাখার প্রণয়!

সংস্কৃতি আজ তাই পরস্পরকে দুই বিপরীত দিকে ঠেলছে। একমাত্র মিলন-স্থল হচ্ছে পণ্য-বিপণী অর্থাৎ অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থা। আজ যদি বাংলার সংখ্যায় মুষ্টিমেয় গরিষ্ঠতা নিয়ে এক সম্প্রদায় আপনার সাংস্কৃতিক মর্য্যাদাবোধের দরুণ সর্ব্বদা প্রতিবেশীর পাল-পার্ব্বণ, পূজা-উপাসনা তথা সামাজিক জীবনযাত্রাকে প্রতি পদে ব্যাহত করতে থাকে তবে নিজের স্বাতন্ত্র্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা ভিন্ন হিন্দুর আর কোন গতি আছে বলে মনে হয় না। মোগল আমল থেকে দিল্লীর সাম্রাজ্যিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে বাংলার উভয় সম্প্রদায়ই ছিল পরাধীন। তাই পরস্পর পরস্পরের সংস্কৃতির উপর আঘাত হানা বন্ধ রেখেছিল। আজ পুনরায় কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা বিলুপ্ত হতে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাত্র সংখ্যা গরিষ্ঠতার বলেই এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের উপর আপন প্রাধান্য স্থাপনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়ে উঠেছেন। এ ক্ষেত্রে পুনরায় আপনার সাংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখবার জন্যই সংস্কৃতির ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দাবী উঠেছে। বাংলাকে পুনরায় রাঢ় এবং বঙ্গ এই দুই সাংস্কৃতিক অঞ্চলে ভাগ করবার এবং প্রত্যেককে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্বতন্ত্র ভাবে পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া ভিন্ন আর গত্যন্তর আছে বলে মনে হয় না।

—নূতন উপন্যাস

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

৭

একই দিনে দু'টো সভা হ'লো গাঁয়ে। সকালে অর্থাৎ বেলা দশটায় স্বাধীনতা-দিবস পালন, বৈকালে লাইব্রেরির দ্বারোদ্‌ঘাটন।

পুরন্দর ভেবেছিল সকালে কেউ আসবে না কিন্তু অনেকেই এলো। মজা দেখতে আসাটাও মানুষের মজ্জাগত প্রেরণা। সব পাড়া থেকেই কিছু কিছু লোক এসে বারোয়ারি-তলা ভরিয়ে ফেললে। যারা বাজারে যাচ্ছিল তারাও বাজারের থলি ও মাছের খালুই হাতে দাঁড়িয়ে গেল—, মোট মাথায় দাঁড়ালো ফিরিওয়ালা,—কাঠ-বোঝাই গাড়ি থামিয়ে দাঁড়ালো গাড়োয়ান—ঘোল ও খেজুর রস বেচতে এসে দাঁড়ালো গোয়ালা আর শিউলি। বাঁশের আগালীতে খদ্দরের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকাটা বেঁধে মাথার ওপরে খাড়া করলে পুরন্দর। —তার সহকর্মীরা চীৎকার করে উঠলো—বন্দে মাতরম্।

গোটা দুই শাঁক বাজলো ভোঁ ভোঁ করে। মুচিরা বিয়ের বায়নায় দূরান্তরে গেছে বলে ঢাকের বাদ্যি শোনা গেল না।

জনতা মূঢ়ের মত—মূকের মত দাঁড়িয়ে রইলো—বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে সুর মেলালে না। গান শেষ হলো; পুরন্দর কাগজে লেখা প্রতিজ্ঞা পাঠ করতে উঠলো।

এই পরিবেশ—তবু তার কণ্ঠে নামলো উৎসাহের জোয়ার। বারোয়ারি-তলার যত লোক জমা হ'য়েছিল সবারই বুকে এসে লাগলো সে জোয়ার। পুরন্দরের সঙ্গে সবাওই চক্ষু হ'লো অশ্রু-সজল। সমস্ত জায়গাটা প্রতিজ্ঞা পাঠের পর থম থম করতে লাগলো।

এক মিনিট কাল মাত্র। তার পর কোথা থেকে উঠলো করতালির ধ্বনি—একটি মাত্র হাতে—সে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হলো বহু করের চটাচট শব্দে। শব্দ চলেছে অবিরাম—থামবার কোন লক্ষণ নেই। দুষ্টবুদ্ধির ছেলেরা সঙ্গে সঙ্গে হাতের আঙুলে ঠোঁট চেপে তীব্র হুইস্লের ধ্বনি বার করলে—চাপা হিস্ হিস্ শব্দও উঠলো।

গোয়ালা ও কৈবর্ত্তদের দু' জন যুবক বংশদণ্ড-গ্রথিত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা নিয়ে মঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছিল—পুরন্দর দু' হাতে দু' জনের পতাকার দণ্ড চেপে ধরলো। করতালি ও হুইস্লে দ্বিগুণ হয়ে উঠলো।

মিটিং ভাঙলে শশীপদ বললে, আমাদের ধরলে কেন কালু দা। ওদের মুখ গুঁড়িয়ে—হাতগুলো মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়ে এর সাজা দিতাম।

পুরন্দর ম্লান হাসি হেসে বললে, তাতে আর আমাদের লাভ কতটুকু হ'তো!

শশীপদ বললে, যাই বল কালু দা—এ ভাবে সভা করে আরাম হ'লো না।

তবে কি করবে?

কি করবে খানিক ভেবে নিয়ে শশীপদ উত্তর দিলে, সব বাড়িতে নিশেন তুলে দেব আমরা।

এত নিশেন পাবি কোথায় রে? তার চেয়ে এক কাজ কর—যে সব সাধারণের প্রতিষ্ঠান আছে সেইখানে বরং নিশেন দে।

বারোয়ারি-ঘরে দেব?

পুরন্দর বললে, হাই স্কুলে—বালিকা বিদ্যালয়ে—দাতব্য হাসপাতালে—শিবের মন্দিরে—

শশীপদ চীৎকার করে উঠলো, বন্দে মাতরম্।

বিকেলের মিটিঙে জন-সমাগম হ'লো বেশি। বাজারে যাবার পথে সভায় হাজিরার ব্যাপার দেওয়া নয়। রূপালী বর্ডার দেওয়া কার্ডখানা পকেটে ফেলে যথাসম্ভব বাবু-সাজে সেজে এসেছেন নিমন্ত্রিতের দল। রবাহূতের দলও ভিড় জমিয়েছে প্রমোদ-সূচির লোভে। একটু পরে এক জন সত্যিকারের সায়েব এসে রূপোর তালা খুলবেন; ছেলেরা বাজাবে কনসার্ট; আবৃত্তি করবে কবিতা; মেয়েরা গাইবে গান; বাছা বাছা লোকেরা করবেন বক্তৃতা। কৌতূহলে ও মজা-দেখার আনন্দে মিশে লোকের মনে প্রত্যাশা জাগিয়েছে অত্যাশ্চর্য্য এক বস্তুর আবির্ভাব যা দৃষ্টিকে ও শ্রুতিকে সমান ভাবেই সার্থক করবে।

কিন্তু এত বড় আয়োজনও পণ্ড হ'য়ে গেল দৈব-নির্দ্দেশে। ম্যাজিস্ট্রেট দুয়োর খুললেন; কিন্তু দুয়োরের মাথায় অনেকখানি উঁচুতে কার্নিশের পানে চেয়ে মুখ তাঁর গম্ভীর হয়ে উঠলো। পাশে ছিলেন জোড়হস্ত সুবেশ শ্রীধর। তাঁর পানে কটমট্ করে চেয়ে সায়েব কঠিন কণ্ঠে বললেন, হোয়াট ইজ দিস বাবু?

হোয়াট—হোয়াট স্যার? থতমত খেয়ে শ্রীধর কাকুতি করলেন।

লুক হিয়ার। বলে সায়েব তর্জ্জনী উঁচিয়ে ধরলেন—কার্নিশের দিকে।

সেদিকে চেয়ে শ্রীধরের সর্ব্ব অঙ্গ পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীর মত অসাড় হয়ে গেল। ছোট একটি নিরীহ তিনরঙা পতাকা যে কাল সর্পের চেয়ে ভয়ঙ্কর হতে পারে, তা কি কোন দিন কল্পনা করতে পেরেছেন তিনি? উতুরে বাতাসে যাথারি-বাহিত পতাকা পত্ পত্ করে উড়ছে। কল্পনায় পুরন্দরের মাথাটা চুলের ঝুঁটি ধরে টেনে আনলেন তিনি—কল্পনায় দোনলা বন্দুকটা বার করে ওর বুক লক্ষ্য করেছেন; কিন্তু বন্দুক-নির্ঘোষের মতই সাহেবের কণ্ঠস্বর কানে এলো।

শ্রীধর কেঁদে ফেলে বাংলা, ইংরেজি হিন্দী মিশিয়ে যা বললেন তার অর্থ এই—আমায় মাপ করুন সাহেব। কোন শত্রু আমায় অপদস্থ করবার জন্য এই কাজ করেছে। আপনি যদি অনুমতি দেন, তাকে ধরে শাস্তি দেবার ব্যবস্থা করতে পারি। আপনি দয়াময়—আপনি বিরূপ হলে—ইত্যাদি। সঙ্গের ভদ্র লোকেরাও এগিয়ে এসে শ্রীধরের হয়ে ক্ষমা চাইলেন ও সভায় যোগ দিয়ে গ্রামকে ধন্য করতে অনুরোধ করলেন।

অবশেষে সায়েব রাজী হলেন। সায়েবের প্রসন্নতা অর্জ্জনে যে সময়টুকু নষ্ট হ'লো, তা' প্রমোদ-সূচির উপর দিয়েই গেল। একটা গান হওয়ার পরই সায়েব দু' মিনিটে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়ে গণ্যমান্যদের করমর্দ্দন করে মোটরে গিয়ে উঠলেন। শ্রীধরের শ্যালক ফটিক—গোড়ের মালা আর খাবারের চ্যাঙারিটা

মোটরে উঠিয়ে দিয়ে সেলামের নামে প্রায় মাটি ছুঁয়ে গোটা দুই কুর্ণিশ জানালে।

উৎসবটা পণ্ড হ'লো বৈ কি!

যতক্ষণ মোটর ধোঁয়া ও ধুলোর মধ্যে মিশিয়ে না গেল ততক্ষণ পর্য্যন্ত পরম বশম্বদের মত শ্রীধর দলবল নিয়ে চেয়ে রইলেন সেই দিকে। ধুলো ও ধোঁয়া পাতলা হবা মাত্র জনতা দেখলে শ্রীধরের অন্য মূর্ত্তি।

দাঁতে দাঁত চেপে তিনি গর্জ্জন করে উঠলেন, আচ্ছা।

ভিড় ঠেলে লাইব্রেরি-ঘরে এসে বসেছেন—হন্তদন্ত হ'য়ে একটি ফুটফুটে দশ-বারো বছরের ছেলে ছুটে এলো তাঁর কাছে।

বাবা—বাবা! কথা বলতে না পেরে ছেলেটি হাঁপাতে লাগলো।

শ্রীধর ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কি রে সুধীর, তোর শরীর খারাপ হয়েছে বলে তোকে না আসতে মানা করেছিলাম।

সুধীর বললে, বউদিদির হার চুরি হয়েছে। মা বললে—

শ্রীধর উত্তেজনা দমন করে বললেন, ভাল করে খুঁজে দেখতে বল্ গে—কোথায় রাখতে কোথায় রেখেছে হয়তো।

সুধীর বললে, অনেকক্ষণ ধরে সবাই তো খুঁজলে।

শ্রীধর বিরক্ত হয়ে উঠলেন, ভাল যা হোক, একটা-না-একটা ব্যাপার আছেই লেগে। একটু পরে গেলে মহাভারত কি অশুদ্ধ হ'য়ে যাবে?

তাড়া খেয়ে ছেলেটি সরে গেল।

শ্রীধর ফটিককে ডেকে বললেন, বাড়িতে গিয়ে ব্যাপারটা কি দেখ তো।

ফটিক বললে, অনেক জিনিস-পত্র এখানে ছড়ানো রইলো, গুছিয়ে গাড়ী বোঝাই করতে হবে না?

শ্রীধর পাশের ভদ্রলোকের পানে চেয়ে বললেন, বাড়ির সব ক'টি হ'য়েছে অপদার্থ—বুঝলেন ইন্দির মশায়! আমার অবর্ত্তমানে এদের কি দশা যে হবে তাই ভাবি!

ইন্দ্র মহাশয় বিজ্ঞজনোচিত হাসির সঙ্গে বললেন, একালের ছেলেরা ও-সব বিষয় থোড়াই কেয়ার করে। দেখ না, কলকাতার কারবারটা আমার যাবার দাখিল হয়েছে।

যথাসম্ভব সত্বর জলযোগ সেরে শ্রীধর উঠলেন। ঘরের বাইরে এসে দেখলেন ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকাটা এখনও কার্ণিশের ওপর পত্ পত্ করে উড়ছে। ওটা দেখেই তাঁর মন আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। বজ্র-গম্ভীর স্বরে ডাক দিলেন, ফটিক!

দু'জন আধাবয়সী আত্মীয় সারদা ও শম্ভু সভার জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখছিল। ডাক শুনে তারা ছুটে এসে একসঙ্গে বললে, আজ্ঞে, তাকে তো আপনি বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন।

শ্রীধর পতাকার দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, তোমরা আধবুড়ো মদ্দ রয়েছ তো—দেখলে ম্যাজিষ্ট্রেট সায়েব রাগে গর-গর করছেন অথচ ওটা নামাবার বুদ্ধিটুকু মাথায় এলো না।

সারদা ও শম্ভু তাড়াতাড়ি এর বিহিত করতে গেল কিন্তু সাধ্যে তাদের কুলোলো না। কাছে মই নেই—দেয়ালে খাঁজকাটা থাকলেও বা তাতে পা দিয়ে ছাদে ওঠা যেত। তার ওপর এক জন ভুগছে বাতে আর এক জনের বেড়েছে হাঁপানী। তাঁদের আসবার কথা নয়—কিংবা এলেও কাজ করার সামর্থ্য কম। তবু যে কাজে লেগেছে—সে কেবল বড়লোক আত্মীয়কে সন্তুষ্ট করবার জন্য।

একটা ঘড়েঞ্চে টুল ঘরের মধ্যে ছিল, টেনে নিয়ে এলো দু'জনে। এইটুকু পরিশ্রমে শম্ভুর পাঁজর কামারের হাপরের মত টানতে লাগলো, সারদার হাত হয়ে উঠলো আড়ষ্ট। তবু সেই ঠেলে-ঠুলে উঠলো টুলের ওপর। সেখান থেকে হাত বাড়িয়েও দেখলে পতাকা নাগালের বাইরে। অসহায় দৃষ্টিতে সে নীচের দিকে চাইলে।

উঠোনে অনেকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য উপভোগ করছিল—কেউ এগিয়ে এলো না। তারা ওবেলা স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা-পাঠ শুনেছে। তাতে যোগ দিতে না পারুক, তাকে অবহেলা করতেও সাহস নেই। ঠিক ঠাকুর-দেবতার মত না হোক, এই রকম একটা কিছু পবিত্র জিনিস এই পতাকার সঙ্গে রয়েছে—এই ধারণা তাদের মনে বদ্ধমূল হয়েছে, ও-বেলাকার অনুষ্ঠান দেখে।...কে পতাকা নামিয়ে পাপের ভাগী হবে!

সুধীরও এগিয়ে এলো না। সে ইস্কুলে পড়ে—সে এর অর্থ বোঝে।

শ্রীধর ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে উঠলেন। পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন ইন্দ্র মশায়—তার রূপা-বাঁধানো ছড়িটা আচম্বিতে টেনে নিয়ে হুঙ্কার দিলেন, নেমে এসো—নেমে এসো—ওয়ার্থলেস কোথাকার!

সারদা কাঁপতে কাঁপতে নেমে এলো—প্রায় লাফিয়ে শ্রীধর উঠলেন টুলে। উঁচু করে ধরলেন ছড়ি, নাগালের মধ্যে এলো পতাকা। তার পর পতাকার দণ্ডে ছড়ির বাঁকানো দিকটা আঁকশীর মত বাধিয়ে দেহের সমস্ত শক্তি নিয়ে দিলেন টান। পতাকা অবনমিত হ'লো।

৮

পুরন্দর অপরাহ্ণের সভায় যায়নি। ও-বেলাকার অনুষ্ঠানটি গ্রামের লোকে ঠিক মত নিলে না বলে মন তার অবসন্ন। তার ওপর আর একটা ঘটনা ঘটেছে। সেটা কৌতুককর হ'লেও পুরন্দর হাল্কা ভাবে নিতে পারেনি।

ও-বেলা সভার শেষে পরিশ্রান্ত হ'য়ে সে যখন বাড়ি ফিরল, তখন পিসিমা খুব এক-চোট বকলেন, হ্যাঁ রে, তোর জন্যে কি আমাদেরও নাওয়া-খাওয়া বন্ধ করতে হ'বে। এমন অনাছিষ্টি কাণ্ড তো দেখিনি বাপু। যত হাড়ি-মুচির সঙ্গে মিশে স্বদেশী করে বেড়ালেই পেট ভরবে বুঝি?

হাতের পতাকা দেওয়ালে ঠেসিয়ে রেখে, জামাটা খুলে দড়ির আলনায় টাঙিয়ে পুরন্দর বললে, তেল দাও, নেয়ে আসি।

পিসিমা বললেন, আর এত বেলায় পুকুরে যেতে হবে না, আমি কুয়ো থেকে জল তুলে দিচ্ছি—

পুরন্দর বললে, জোয়ান ছেলেকে জল তুলে দেবে তুমি?

পিসিমা স্নেহ-মেশানো ধমক দিয়ে বললেন, আহা, শক্তি তো দেহে থই-থই করছে—পালোয়ান সিং!

পুরন্দর সে কথা শুনলে না। বললে, যাব আর আসব।

এলোও তাই। কাপড় ছেড়ে দাওয়ায় পিঁড়ির ওপর এসে বসলো সে। মা থালায় ভাত বেড়ে পুরন্দরের সামনে এসে বললেন, জলের গেলাসটা দিয়ো তো ঠাকুরঝি!

পুরন্দর বললে, আমি নিচ্ছি।

থালা নামিয়ে দিয়ে মা বললেন, একটু সকাল সকাল যদি আসতিস্ বাবা! কাল ঠাকুরঝির একাদশীর উপোস গেছে কি না।

…মার পানে চাইলে পুরন্দর। দৃষ্টিতে তাঁর অনুযোগ নেই—কথায়ও নয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি শত প্রাকৃতিক বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও যেমন স্থির ভাবে চলে তেমনি নিরুদ্বিগ্ন ওঁর বাইরেটা। কথাও তিনি কম বলেন।

পুরন্দর অপরাধীর মত বললে, তোমারও তো উপোস গেছে।

মা বললেন, আমার বয়স আর ওঁর বয়স! তা ছাড়া রাত্তিরে জল খাই আমি।

পুরন্দর তাড়াতাড়ি ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে লাগলো।

মা বললেন, অত তাড়া কিসের—দু'-পাঁচ মিনিটে সত্যিই তোর পিত্তির ভূচ্‌কুনি লাগবে না। আস্তে খা।

আর কিছু চাইনে, তোমরা খেয়ে নাও গে।

খেতে খেতে পুরন্দর অনেক কথা ভাবলে। এই সংসারের কথা। বাবা যখন মারা যান তখন পুরন্দরের কতই বা বয়স? সাত কি আট হবে। সেই ছিল প্রথম সন্তান, কাজেই বিধবা হবার সময় তার মায়ের বয়স খুব বেশি ছিল না। মালীর ঘরে সচরাচর কেউ নিরম্বু উপবাসে একাদশী পালন করে না। তার পিসিমা অবশ্য নিরম্বু উপবাস দিতেন এবং আতপ চালের অন্ন একবেলা মাত্র খেতেন। সে অভ্যাস তাঁর জন্মেছিল বামেন্দ্রপাড়ায় আচার-পরায়ণা বিধবাদের দেখে। নইলে তাদের ঘরে মাছ ইত্যাদি সবই চলে। মা-ও পিসিমার মত আচার নিয়ম পালন করবেন জিদ্ ধরলেন। পিসিমা আপত্তি তুললেন। গুরুজনের কথা সম্পূর্ণ অমান্য না করে মা শুধু একাদশীর রাত্রিতে একটু গুড় মুখে দিয়ে এক ঘটি গঙ্গাজল খেতে রাজী হলেন। তিনি একাদশীর দিন জল না খেলে পিসিমা কেঁদে-কেটে ভয় দেখালেন যে, তাহলে এ-বাড়ীর অন্ন তিনি আর মুখেই তুলবেন না। তা ছাড়া আতপ চাল—একাহার—সবই বজায় রইলো।

খাওয়া শেষ হলে পুরন্দর বাইরের দাওয়ায় এসে বসল। হঠাৎ মনে হ'লো বড্ড ভুল হয়ে গেছে তো। বারোয়ারিতলায় পতাকা তুলে বক্তৃতা দিয়ে এসেছে অথচ তার নিজের বাড়িতে উৎসবের কোন চিহ্ন নেই! দেয়াল-ঠেসানো পতাকাটা নিতে গিয়ে দেখলে—পতাকা নেই। পিসিমা হয়তো ঘরের মধ্যে তুলে রেখেছেন ভেবে ঘরের মধ্যে এসে খুঁজলে—পতাকা পাওয়া গেল না।

বাড়ির মধ্যে এসে সে বললে, নিশেনটা কোথায় রাখলে পিসিমা?

পিসিমা অবাক্ হ'য়ে বললেন, আমি আবার রাখবো কোথায়? নেয়ে ধুয়ে—তোমার ওই শত্তিংশ জাত-ছোঁয়া নিশেন ঘাঁটবো আমি!

তবে গেল কোথায়! আপন মনে উচ্চারণ করে পুরন্দর বাইরে আসছিল।

পিসিমা চেঁচিয়ে বললেন, দেখ তো গোঁসাইবাড়িতে। তুই নাইতে গেলে আশু গোঁসাইয়ের ধিঙ্গি মেয়েটা—ওই যে রমা—এসেছিল একবার। ওরই কাজ তাহলে।

খান-পাঁচেক বাড়ির পরেই আশু গোঁসাইএর বাড়ি।—গোঁসাই যাজনিক ব্রাহ্মণ—শিষ্য-সেবকও কিছু আছে। তাদেরই বাড়ির পাল-পার্ব্বণ অন্নপ্রাশন বিবাহ শ্রাদ্ধ ইত্যাদির কল্যাণে সংসার তাঁর ভাল ভাবেই চলে। খান-তিনেক কোঠাঘর আছে বাড়িতে। সামনের দিকে খাটো প্রাচীর-ঘেরা একটু জমি। তাতে চাঁপা কুঁদ মল্লিকা ও একপাটি টগরের গাছ আছে। প্রাচীরের কোণে একটা চাঁপা-গাছ আর উত্তর দিকে একটা পঞ্চমুখী জবা-গাছ। বাগানের মাঝখানে বেদি বাঁধানো ঝাঁকড়া তুলসী গাছটা মঞ্জরী ও পাতায় ঠাসা। গৃহদেবতা নারায়ণ-শিলার জন্য প্রত্যহ তুলসীপাতার দরকার হয়। বাগানের দিকে চাইলেই প্রথমেই নজরে পড়ে ওই স্বাস্থ্যপুষ্ট গাছটির দিকে—বেদিটা উঁচু এবং খানিকটা কারুকার্য্য-মণ্ডিত।…বেদির উপরে গ্রীষ্মকালে জলের ঝারি দেওয়ার জন্য দু'টো লোহার ডাণ্ডা পোঁতা আছে।

গোঁসাইজীকে আর ডাকতে হ'লো না। পুরন্দর সবিস্ময়ে দেখলে সেই লৌহদণ্ডে সংযুক্ত হ'য়ে তার ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা পত্-পত্ করে উড়ছে! কাজটা গোঁসাইজীর মেয়ে রমারই বটে!

ভালই লাগলো। আবার মনটাও খুঁৎ-খুঁৎ করতে লাগলো। কাজটা রমা খেলার ছলেই করেছে। সে জানে না এই তিন-রঙা নিশানের জন্মকথা—জানে না বিশেষ করে আজকের দিনেই এই পতাকা' উঁচু করে তুলবার তাৎপর্য্য কি। হরি-মন্দিরে যেমন লাল নিশান টাঙিয়ে ভক্তের আনন্দ লাভ হয়, তেমন অহেতুক কৌতূহলে আবিষ্ট হয়ে রমা এ কাজ করেছে।…সে ওর মর্য্যাদা বোঝেনি তবু মনে হ'চ্ছে, স্বাস্থ্যপুষ্ট তুলসীমঞ্চের লৌহদণ্ডে গ্রথিত হয়ে ওটির সৌন্দর্য্য ও মর্য্যাদা অনেকখানি বেড়েছে।

তন্ময় হয়ে পুরন্দর সেই শোভা দেখছে, আশু গোঁসাই যজমানবাড়ি থেকে ফিরে এলেন। পুরন্দরের পতাকা উত্তোলনের বৃত্তান্ত লোকের মুখে-মুখে অতিরঞ্জিত হয়ে গ্রামের কারও শুনতে বাকি নেই। এই পতাকার সঙ্গে মানুষের লাঞ্ছনার কথাও সকলের সুবিদিত। যে ছেলেরা এই সব কাজ করে বেড়ায় তাদের ডানপিটে বা সাদা কথায় বাউণ্ডুলে ছাড়া আর কি-ই বা বলা যেতে পারে।…এ সব লক্ষ্মীছাড়া ছেলেদের দু'চক্ষে দেখতে পারেন না গোঁসাই। পুরন্দরকেও তিনি ভাল চোখে দেখতেন না।

কি রে কালো, দুপুর রদ্দুরে হাঁ করে কি দেখছিস্? বলতে বলতে কঞ্চির আগড়টা ঠেলে তিনি বাগানের মধ্যে ঢুকলেন। ঢুকেই নজরে পড়লো তুলসীমঞ্চে। আর যায় কোথা! মধ্যাহ্ন রৌদ্রের যত তাপ ব্রাহ্মণের মাথায় এসে আশ্রয় নিলে। গলা ছেড়ে তিনি বললেন, বলি, এ সব কি কাণ্ড…লক্ষ্মীছাড়ার দল! ঠাকুর নিয়ে ইয়ারকি! আমি যদি সত্যিকারের ব্রাহ্মণ হই—অভিশাপের ভঙ্গিতে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে পৈতা জড়িয়ে ডান হাতখানি উঁচিয়ে ধরলেন।

অভিশাপ দিয়ে তাঁকে ভারগ্রস্ত হতে হ'লো না, দুয়োর খুলে রমা বেরিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ডাকলো, বাবা!

মেয়েকে দেখে তাঁর রোষ এবং ক্ষোভ দুই-ই চরমে উঠলো। গলা ছেড়ে বললেন, দেখ্ দিকি মা কাণ্ড! আমার তুলসীমঞ্চে কোথাকার কি ন্যাকড়া—

রমা বললে, কোথাকার কি নয়—ভাল ন্যাকড়া। ওতে তোমার তুলসীগাছ নষ্ট হবে না বাবা!

নাঃ, হবে না। মুখ খিঁচিয়ে তিনি বললেন, ভারি তো জানিস্! ওই নরাধম ছেলেগুলো—

ওরা নয়, আমিই ওখানে নিশান দিয়েছি বাবা!

তুই!

রমা দৃঢ় স্বরে বললে, হাঁ, আমি। যে জিনিষ পুজোয় লাগে

তা কখনো অশুদ্ধ হয়? আমি কাচা কাপড় পরে তবে ওটা ছুঁয়েছি—এখন ভাতও খাইনি।

আশু গোঁসাই বললেন, তবে আর কি কেতাত্ত করেছে! এই সব হতভাগা ছেলে-মেয়ে নিয়ে আমি কি গলায় দড়ি দেব না পুকুরে ডুবে মরবো! নাকে কাঁদতে কাঁদতে তিনি বাড়ির মধ্যে চলে গেলেন।

রমা এগিয়ে এসে পুরন্দরকে বললে, কিছু মনে করো না। বাবার রকমই ওই।

পুরন্দর রাগ করেনি বরং গোঁসাইয়ের কাণ্ড দেখে তার হাসি আসছিল। কাপুরুষ না হ'লে লোক ভয়ে এমন আত্মহারা হয়? এরা কি! নিজের ঘর নিজে চেনে না—নিজের পবিত্রতা নিজে বোঝে না—নিজেকেই বা চিনলো কই? কত দুর্লভ মুহূর্ত্ত আসে আর চলে যায়। যেমন চলে মশালের আলো অন্ধকার পথের বুক চিরে। পথের মাঝখানে আলোটা জ্বলে দপ্-দপ্ করে—সামনে অন্ধকার—পিছনেও অন্ধকার। কিন্তু সেই মাঝখানের আলোই কি পথ চেনাতে পারে? সে কেবল চোখ ধাঁধায়। গোঁসাইয়ের দোষ নাই।

পুরন্দরকে চুপ করে থাকতে দেখে রমা বললে, কাজটা আমার অন্যায় হয়েছে, কিন্তু অন্যায়ই বা কি? তোমায় কত দিন বলিনি, হরি ঠাকুরের জন্যে একটা নিশান তৈরী করে দাও।

পুরন্দর বললে, এ নিশানে কি সে নিশানের কাজ হয়?

খুব হয়, শুধু লাল রঙের চেয়ে ত ভাল। বেশ তিন-রঙা। আর বড়ও।

বারো বছরের মেয়ের কাছে এর চেয়ে ভাল যুক্তি আশা করতে পারে না পুরন্দর। সে হেসে বললে, এ নিশান শত্যিক জাত-ছোঁয়া, তা বোধ হয় জান না?

হোক্ গে। তুলসী-গাছ যদি মানুষ হ'তো তো তোমার কথা ফলতো। তুমি দিলেও না হয় কথা ছিল। আমি বামুনের মেয়ে—যা ছোঁব তাই শুদ্ধ হবে। বলে খিল-খিল করে হেসে উঠলো সে।

বেশ, ও নিশান তোমার হরি ঠাকুরকেই দিলাম।

পুরন্দর পিছন ফিরতেই রমা একটু গলা চড়িয়ে বললে, দিলাম মানে! ভিক্ষে না কি?

পুরন্দর হাসিমুখে উত্তর দিলে, না—না—উপহার।

রমা চীৎকার করে কি বললে—পুরন্দর তখন অনেকখানি এগিয়ে গেছে। শব্দটা কানে এলো—অর্থ তার স্পষ্ট হ'লো না।

৯

দুপুরে বসে বসে পুরন্দর নানান্ বই থেকে নানা লোকের বাণী সংগ্রহ করলে। বিকেল বেলা যারা আসবে তাদের সামনে এগুলি পড়ে শোনাবে সে। সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাইবে—'বন্দে মাতরম্' আর 'জন-গণ-মন-অধিনায়ক হে'—গান। গীতা থেকে আবৃত্তি করবে কয়েকটি শ্লোক। নাই বা দেখলে সাধারণ লোকে, নাই বা পড়লো করতালির ধ্বনি।

বিকেলে কেউ এলো না। সন্ধ্যার মুখে শশীপদ ক'জন সঙ্গী নিয়ে এলো।

হাসতে হাসতে বললো শশীপদ,—জান কাল্দা', কি মজাটাই না হ'লো মিছিয়ে। কোথায় লাগে তোমার মানভঞ্জনের পালা। কথার সঙ্গে সঙ্গে হাসিতে সে ফেটে পড়লো। হাসির বেগ মন্দীভূত হলে ব্যাপারটা জানা গেল। কিন্তু পুরন্দর হাসলে না, গম্ভীর মুখে বললে, কাজটা তোমাদের ভাল হয়নি শশী!

শশী বললে, কেন?

গম্ভীর মুখে পুরন্দর বললে, জাতীয় পতাকা ছেলে-খেলার জিনিষ নয়। যারা ওর মর্য্যাদা বোঝে না তাদের হাতে ও-জিনিষ দেওয়াই আমার ভুল হ'য়েছে।

শশী এ কথায় চটে উঠলো। বললে, কেন তুমি কি বলনি?

বলেছিলাম। কিন্তু একবার যেখানে ও-জিনিষ টাঙিয়েছ—সে জিনিষ তোমাদের চোখের সামনে দিলে নামিয়ে—আর সে কথা বলছো দিব্যি হেসে-হেসে—যেন কি-না-কি হ'য়েছে! এই অসৎ শিক্ষা নিশ্চয়ই তোমাদের দিইনি!

পুরন্দরের শ্লেষে শশীপদ জর্জ্জরিত হয়ে ফুঁসতে লাগলো। পৌরুষ তার আহত হ'লো এই ব্যঙ্গ-ভাষণে,—কোন কথাই সে বলতে পারলে না।

তার সঙ্গী নিতাই বললে, ওরা নামিয়ে দিলে ফ্লাগ—আমরা বাধা দিলে মারামারি বাধতো।

ক্ষতি কি। গর্জ্জন করে উঠলো পুরন্দর।

কিন্তু তুমিই তো বলেছ—মহাত্মা গান্ধীর নিষেধ—

পতাকা বুকে জড়িয়ে ধরে মার খেতে পারলে না? মার খেয়ে-খেয়ে মরেও যেতে যদি,—অশ্রুতে তার স্বর বন্ধ হয়ে গেল। পুরন্দর [illegible] হয়ে একখানা বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে আত্মসম্বরণ করলে।

অদ্ভুত গাম্ভীর্য্যে জায়গাটা থম-থম করতে লাগলো। আমগাছে রাত্রিচর একটা পাখী বিশ্রী স্বরে ডেকে উঠলো। আমের বোলের মিষ্ট গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল এই নিস্তব্ধতার মধ্যে। বিকেল বেলার সব কল্পনাই পাখা মেললে আকাশের দিকে। না গান না গীতা, না কোন পাঠ—ছাব্বিশে জানুয়ারি যেমন অলক্ষিতে এসেছিল সকালে তেমনি নিঃশব্দে চলে গেল রাত্রির ঊর্দ্ধলোকে—স্বপ্নপুরীতে।

পুরন্দর মৃদু স্বরে বললে,—বাড়ি যাও তোমরা।

নিঃশব্দে সকলে উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু ছাব্বিশে জানুয়ারি যাই-যাই করেও যেতে পারেনি। গভীর রাত্রিতে আবার কোলাহলের মধ্যে সে বুঝি ফিরে এলো।

বাইরে শোনা গেল অনেক পায়ের শব্দ। আলোর তীব্র ছটা বাঁশের আগড় ঠেলে ফাটা দুয়োরের পথে ঘরের মধ্যে সুতীক্ষ্ণ তীর হানলে—, লাথির ঘায়ে ঝন্-ঝন্ করে আর্ত্তনাদ করে উঠলো দুয়োর।

পুরন্দরের জ্ঞাতি-কাকা মাধব দুয়োর খুললে। আলোয় ভরে গেল ঘর।

গ্রামের অনেক লোক—সঙ্গে লাল-পাগড়ী দু' জন। রাত খুব বেশি হয়নি। সারা দিনের ক্লান্তিতে দেহ-মন দুই-ই ছিল অবসন্ন; গভীর ঘুমের মধ্যে মনে হ'চ্ছিল রাত্রিও গভীর হয়েছে।

তোমার নাম পুরন্দর মালাকার?

যে প্রশ্ন করলে সে পুরন্দরের চেয়ে বছর দুয়েকের বড় হবে। নতুন এসেছে ফাঁড়িতে এ-এস-আই হয়ে। চাকরিতে হয়তো পাকা হয়নি, যদিও চাল-চলনে পাকাটে ভাব যথেষ্ট। এই অভদ্রোচিত সম্বোধনে সে মুখে কোন জবাব না দিয়ে স্থিরদৃষ্টিতে তার মুখের পানে চাইলে। সে দৃষ্টিতে হয়তো ধিক্কার ছিল—হয়তো ছিল

তাচ্ছীল্য। এ-এস-আই মুখ ফিরিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, জবাব দাও না কেন?

সুস্পষ্ট কণ্ঠে পুরন্দর বললে, অনেক লোকই তো রয়েছেন সনাক্ত করার—আমার জবাব দেওয়া বাহুল্য মাত্র।

বটে! কলেজে কত দূর পড়া হ'য়েছিল?

চাকরির উমেদার হ'লে এ কথার জবাব দিতাম।

ওর ব্যঙ্গোক্তিতে দুই-এক জন মুখ টিপে হাসলে। এ-এস-আই উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, আচ্ছা—আচ্ছা। তোমার বাড়ি আমরা সার্চ করবো।

ওয়ারেণ্ট থাকে অনায়াসে করতে পারেন।

এ-এস-আই দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে বললে, সাধারণ ভদ্রতা-জ্ঞানটুকু জান না অথচ দেশের কাজ কর তোমরা!

পুরন্দর বললে, আপনারা ভদ্রতা শিখবার সুবিধা দিলেন কই যে শিখব!

আমার সঙ্গে আসতে হবে।

কোথায়?

আশেদের বাড়ি। সেখানে চুরির কেস ধরা পড়েছে। তোমার দলের লোকের কাজ।

আমি যাব না। পুরন্দর বিছানার ওপর গিয়ে বসলো।

এ-এস-আই মনে মনে দমে গেল কিন্তু মুখে আস্ফালন করে বললে, চুরির কেসে ডায়ারি হবে—তুমি সাক্ষ্য দিতে বাধ্য।

দেব সাক্ষ্য। তার জন্ত যা লিখে নেবার নিতে পারেন।

আচ্ছা। বলে পেন্সিল ও নোট-বই বার করলে এ-এস-আই। তাকে বসবার জন্ত কেউ অনুরোধ করলে না। ঘরে টুল বা মোড়া ছিল না যে কেউ এগিয়ে দেবে।

পুরন্দর বললে, একটা কথা। কে চুরি করেছে?

এ-এস-আই হেসে বললো, শশীপদ হাজরা। তাকে নিশ্চয় চেনেন আপনি!

ওর বিদ্রূপে কান না দিয়ে পুরন্দর আর্ত্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, কবে—কোথায়?

আসুন না আমার সঙ্গে—সব জিনিষ পরিষ্কার হবে। অবশ্য আপনার কষ্ট না হয় যদি।

ওর বিদ্রূপ পুরন্দরের শ্রুতি স্পর্শ করলে, সে অত্যন্ত ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো। শশীপদ করলে চুরি? এই রাত্রিতে? দড়ির আলনা থেকে চাদরখানা টেনে নিয়ে বললে, চলুন।

পিসিমা পইঠার নীচেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলেন, এই রাত্রিরে ওকে কোথায় নিয়ে চললে বাবা—

পুরন্দর তাঁর সামনে এসে বললে ভয় নেই, এখনি আসচি ফিরে।

ওরা চলে গেলে পিসিমা চীৎকার করে কেঁদে উঠলেন। পাড়ার অনেকগুলি মেয়ে-পুরুষ এসে জুটেছিল সেই রাত্তিরে।

তাদের মধ্যে বর্ষীয়সী গোছের এক জন বললে, কাঁদছো কেন কালোর পিসি, নিদ্দুষীকে আটকে রাখে এমন আইন রাজার নয়। হরির লুট মানত কর—কালো তোমার ফিরে আসবে।

আর এক জন বললে, একটু দোষ না পেলে পুলিসে কিছু ধরে নিয়ে যায় না। তা ভাল করে মানত কর মা কালীকে—যেন দোষটুকু কাটিয়ে দেন।

পুরন্দরের পিসি এই কথায় জ্বলে উঠলেন, কি, কালো আমার দুষী! ও-ছেলে তোমার পাত্তিরে গঙ্গাজল। চাঁদে কলঙ্ক আছে তো আমার ছেলেতে কলঙ্ক নেই! যে চোখখাগিরা এ কথা বলে—

পুরন্দরের মা আধ-ঘোমটা টেনে—তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে হাত ধরে বললেন, আঃ, কি বকছো ঠাকুরঝি, বাড়ির মধ্যে এস।

মজা জমলো না—প্রতিবেশীরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে নানা মন্তব্য করতে করতে ফিরে গেল।

বাড়ির মধ্যে এসে পুরন্দরের মা বললেন, ঠাকুরপোকে একবার মেজ বাবুর কাছে পাঠাও।

পুরন্দরের পিসি বললেন, কাকে—মোদোকে? ও যাবে মেজ বাবুর কাছে?

মা বললেন, আমরা মেয়েমানুষ—এ সব কি-ই বা বুঝি। উনি না দাঁড়ালে কি থেকে কি হবে—

পিসিমাকে ডাকতে হলো না—মাধব বাড়ির মধ্যেই ছিল মাধবের বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি কিন্তু দেখায় ষাটের ওপর। শরীর ওর এত শীঘ্র অপটু হয়েছে অনেকটা অপরিপুষ্ট বুদ্ধির জন্ত। ছেলেবেলা থেকে ও পিতৃ-হীন। পুরন্দরের বাবার অনুগত ছিল বলে তিনিই ওকে পরিবারভুক্ত করে নিয়েছিলেন। কাজের মধ্যে বাগানটা ও দেখতে পারতো ভাল। নইলে কিছু কিনতে দিলে বা কোন কাজে পাঠালে একটা-না-একটা গোল ও বাধাতোই। তা ছাড়া পাড়ার ছেলেরাও ওকে পথে দেখলেই ক্ষেপাতো। একবার বাড়ীতে কুটুম এলে পিসিমা ওকে দু'আনার কাঁচাগোল্লা আনতে দেন ময়রা-দোকান থেকে। ও সটান চলে গিয়েছিল বাজারে আর এনেছিল এক ছড়া কাঁচা কলা। রাগ করে পিসিমা বলেছিলেন,—তোর ঘটে কি একরত্তি বুদ্ধি নেই মোদো। তোকে আর ভাই বলবো না—বলবো বুন।

পাড়ার ছেলেমেয়েরা খেলা করছিল উঠোনে। শুনতে পেয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো—মোদো বুন—মোদো বুন!

…একে রোদ থেকে ঘুরে এসেছে—তার ওপর দিদির ভর্ৎসনা। মাধব মনে মনে গরম হয়ে উঠছিল। ছেলেরা হাততালি দিয়ে চেঁচাতেই ও কাঠের চ্যালা উঠিয়ে ধেড়ে গেল তাদের দিকে, তবে রে শালারা—তোদের খুন করব আজ!

নবাগত কুটুম্ব ও দিদি অনেক কষ্টে ওকে থামালেন। কিন্তু সেই থেকে পথে বার হওয়া ওর বন্ধ হয়ে গেল। বেরোলেই—'ও বুন'—'ও বুন' বলে সবাই ক্ষেপাতো।

পিসিমা বললেন, আমার সঙ্গে মিত্তির-বাড়ি একবার চ' তো ভাই।

মাধব বললে, আমি পথে বেরুলে—হারামজাদারা—

পিসিমা বললেন, রাত্তির হ'য়েছে, পথে কেউ নেই। কেউ থাকবেই যদি পথে তো তোকে নেবার কি দরকার ছিল আমার? আমি কি এ গাঁয়ের পথ-ঘাট চিনি নে, না একা যেতে ভয় পাই?

পুরন্দরের মা বললেন, বাসু কোথায় ঠাকুরঝি?

মাধব বললে, সে তো পুলিশের সঙ্গে গেল।

পিসিমা বললেন, দুয়োরটায় খিল দাও বউ। আমরা না ডাকলে দোর খুলো না। তিন বার ডাকলে তবে দোর খুলবে।

কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে পিসিমা চললেন আগে আগে—মাধবও তাঁর পিছনে। [ক্রমশঃ

কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন

শ্রীপরিতোষকুমার চন্দ্র

ক্রমোন্নতিশীল বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আজ পর্যন্ত যে সামান্য ক'টি প্রকৃতিগত বিধানের ওপর খোদকারি ক'রে তাদের রূপান্তর করতে পেরেছে, কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন সেগুলির একটি। ভারতবর্ষে এর প্রচলন খুবই সাম্প্রতিক হলেও, কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন-প্রচেষ্টা একেবারেই নতুন নয়। এ বিষয়ে আজ পর্যন্ত যে সব ঐতিহাসিক তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাতে জানা যায় যে, আরব দেশের অধিবাসীরাই সেই মধ্যযুগে তাদের দেশের বিশ্ববিখ্যাত অশ্বের প্রজনন কাজে সর্বপ্রথমে এর প্রচলন করে, তবে তাদের পদ্ধতি বর্তমান কালের মতো বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। স্পালাঞ্জানী (Spallanzani) নামে এক জন ইটালিয়ান ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির বৈজ্ঞানিক রূপ দেন এবং এর ফলাফল পরীক্ষা করবার জন্য যেটুকু কাজ তিনি করেন তা কেবলমাত্র কুকুর নিয়েই। অন্যান্য পশুর ক্ষেত্রে এর ফলাফল পরীক্ষা, এর প্রয়োগের উপকারিতা বা কার্যকারিতা এবং অন্যান্য অনেক কিছু নিয়ে নানা দেশে নানারূপ গবেষণা হবার পর গত শতাব্দীর শেষভাগেই এটা নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগ সব রকম পশুর ক্ষেত্রেই সম্ভব এবং তার কার্যকারিতাও অসামান্য; কিন্তু কার্যতঃ এর ব্যাপক প্রয়োগ সর্বপ্রথমে রাশিয়াতেই হয় এবং তার উপকারিতা আশাতিরিক্ত হবার ফলে আজ সে দেশে হাজার হাজার কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। রাশিয়ার পরেই এই ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের নাম করা যেতে পারে। ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে একটিমাত্র কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে—মাত্র ছ' বছরের মধ্যে সে দেশে কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় নিরানব্বুইটিতে। যুদ্ধ-পূর্বকালে যুক্তরাজ্যে এই নিয়ে নানাবিধ গবেষণা ও পরীক্ষা করা হলেও, পাকাপাকি ভাবে প্রথম কাজ আরম্ভ হয় ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে এবং আজ সে দেশের এই কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন কেন্দ্রের সংখ্যা প্রায় আটটি। ইউরোপ ও আমেরিকার অন্যান্য দেশে এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার অনেক দেশে এই নিয়ে এখনও নানারূপ গবেষণা চলছে এবং অনেক স্থানে কেন্দ্র স্থাপিত হয়ে কাজও চলছে বলে জানা গেছে

ভারতবর্ষে এই নিয়ে প্রথম গবেষণা সুরু হয় ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু তা খাপছাড়া ভাবে। পূর্ণ উদ্যমে আসল কাজ শুরু হয় মাত্র তিন বছর আগে এবং এর জন্য ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন ইজ্জত নগরের ইম্পিরিয়াল ভেটারিনারি রিসার্চ ইনষ্টিট্যুটের বিশেষজ্ঞেরা গৌরব দাবী করতে পারেন; কারণ, তাঁদের গবেষণার ফলেই জানা যায় যে, এ দেশেও এই পদ্ধতির প্রয়োগ অন্যান্য দেশের মতোই ফলপ্রসূ হবে এবং এর ব্যাপক প্রয়োগও সম্ভব হবে। পরীক্ষাচ্ছলে নানা জাতীয় পশুর ওপর এই কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করে আজ পর্যন্ত যে ফল পাওয়া গেছে তা খুবই আশাপ্রদ। গাভী, ছাগী ও ভেড়ী মিলিয়ে যতগুলি স্ত্রীপশুর ওপরে এই বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে আজ পর্যন্ত শতকরা হিসাবে যথাক্রমে তার উনআশি, আশি ও এক শ'টি ক্ষেত্রে সুফল পাওয়া গেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রের বাইরে জনসাধারণের পশুর ওপরেও এর প্রয়োগ-ফল ঠিক অনুরূপ হবে বলে খুবই আশা করা যায় এবং সেটা পরীক্ষা করবার উদ্দেশ্যেই এই ইনষ্টিট্যুটের তত্ত্বাবধানে ভারতবর্ষে চারটি প্রাদেশিক কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এরই একটি গত ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোলকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে বেঙ্গল ভেটারিনারি কলেজে স্থাপিত হয়েছে এবং এই ক'মাসেই এই কেন্দ্রে কয়েক শ' গরুর ওপর এই বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। ইজ্জত নগরের ভেটারিনারি ইনষ্টিট্যুটের নির্দিষ্ট প্রণালী অনুযায়ীই যখন এটা করা হয়েছে, তখন এর ফলাফল সম্বন্ধে কোন সংখ্যা উল্লেখের সময় না হলেও এর ফল পূর্বানুরূপই হবে বলে আশা করা যায়।

বেলগাছিয়ার ভেটারিনারি কলেজে আগে ষাঁড় দিয়ে প্রজননের যে স্বাভাবিক ব্যবস্থা ছিল, এই নতুন কেন্দ্র স্থাপিত হবার পর সে প্রথা এখন একেবারেই উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার বদলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এই কৃত্রিম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হচ্ছে। আগে ষাঁড়ের দর্শনী হিসাবে যে 'ফী' নেবার প্রথা ছিল তা উঠিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও এই কৃত্রিম পদ্ধতি চালু হবার পর থেকেই সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যে বেশ একটু আন্দোলন পড়ে গেছে। তার পর 'অমৃতবাজার পত্রিকা' 'যুগান্তর' প্রভৃতি দৈনিক কাগজে এই নতুন পদ্ধতি নিয়ে কিছুটা আলোচনা হওয়াতে সেই আন্দোলনের সাড়া অসংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে;—ফলে ভেটারিনারি কলেজের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের এই নতুন পদ্ধতিজনিত জনসাধারণের কৌতূহলের নিবৃত্তি করতে ব্যতিব্যস্ত হতে হচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য গরুর মালিকের কাছ থেকে অভিযোগও আসছে। কিছু দিন আগে কলিকাতা-প্রবাসী রাজপুতানাবাসী জনৈক ব্যবসায়ী তাঁর চাকরকে দিয়ে একটি গরু কলেজে পাঠিয়েছিলেন। সেই গরুটির ওপর এই নতুন পদ্ধতি প্রয়োগের যাবতীয় কাজ চাকরটির সামনেই অনুষ্ঠিত হয়। বাড়ী ফিরে চাকরটি নিশ্চয়ই তার মনিবকে কলেজে অনুষ্ঠিত ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়েছিল কেন না, সে গরু নিয়ে চলে যাবার কয়েক ঘণ্টা পরেই তার মনিব সশরীরে কলেজে এসে হাজির হন এবং ষাঁড়ের বদলে তার গরুর অঙ্গবিশেষে নল চালনার জন্য অভিযোগ করেন। এর জন্য তাঁর গরু জখম হয়েছে বলেও তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেন। তার পর অবশ্য তাঁকে এই বিষয়ে জানবার যা কিছু ছিল, তা বুঝিয়ে দেবার পর তিনি ঠাণ্ডা হন, কিন্তু তবু এ ব্যাপারে তাঁর মনে যে বিস্ময় জন্মেছিল তারই বিকাশ হিসাবে তিনি চলে যাবার আগে কপালে হাত ঠেকিয়ে বলেছিলেন—'কেয়া তাজ্জব কি বাৎ!'

পুং ও স্ত্রী-পশুর মিলনের ফলেই গর্ভসঞ্চার হবে—এটাই হলো প্রকৃতির নির্দেশ ও চিরন্তন রীতি। পুং-পশুর সংস্পর্শহীন ভাবে কি ক'রে যে গর্ভসঞ্চার সম্ভব হতে পারে, এ নিয়ে জনসাধারণের মনে প্রশ্ন বা কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক এবং বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাদের কাছে এটা চিরকালই অসম্ভাবনীয় থেকে

যাবে। কৃত্রিম উপায়ে কি ক'রে গর্ভসঞ্চার সম্ভবপর হয় তা বোঝাবার উদ্দেশ্যেই এখানে সে বিষয়ে মোটামুটি ভাবে কিছু আলোচনা করলুম।

স্ত্রী-পশুর কামোত্তেজনার সময়, অর্থাৎ সোজা কথায় গরমের সময় তার অণ্ডাশয় বা ডিম্বকোষ (ovary) থেকে যে ডিম্বাণু (ovum) নিঃসৃত হয়, পুং-বীজ দ্বারা তা নিষিক্ত (fertilized) হলেই ভবিষ্যৎ জীবদেহ গঠনের গোড়াপত্তন হয়। এইটুকুই প্রজননের মূল বা মুখ্য উদ্দেশ্য। পুং-পশুর সঙ্গে মিলনের ফলে স্ত্রী-পশুর শরীরে পুং-বীজের সঞ্চার প্রকৃতির নির্দেশ হলেও তা গৌণ অংশ, কেন না, অন্য উপায়ে পুং-বীজ স্ত্রী-পশুর শরীরে যথাসময়ে সঞ্চারিত করলেও ঠিক একই ফল পাওয়া যায়, অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী-পশুর মিলনের যে মুখ্য উদ্দেশ্য তা সাধিত হয়। যন্ত্রের সাহায্যে পুং-বীজ আহরণ ক'রে তার অতি সামান্য অংশই আবার যন্ত্রের সাহায্যেই স্ত্রী-পশুর শরীরে সঞ্চার ক'রে যে গর্ভাধান তাই হলো কৃত্রিম উপায়ে পশু-প্রজনন পদ্ধতির মূল উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে কেবলমাত্র এইটুকুই কৃত্রিম এবং এটুকু ছাড়া প্রজননের আগু-পাছু বাকি যা কিছু তা সবই প্রকৃতির নির্দেশ অনুযায়ীই ঘটে।

পুং-বীজ আহরণ করবার জন্য যে ক'টি বিশেষ প্রথার চলন আছে তার মধ্যে নকল স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ের (artificial vagina) সাহায্যে আহরণই সহজ ও প্রশস্ত। পশুর শ্রেণীভেদে এই যন্ত্রটির কিছুটা পার্থক্য থাকে এবং সেগুলির আকারও ছোট-বড় হয়। এ দেশে ষাঁড়ের জন্য যে যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে কেবল মাত্র সেইটিরই বর্ণনা নীচে দেওয়া হলো এবং এ ব্যাপারে যা কিছু আলোচনা তা ষাঁড় ও গরু নিয়েই করা হলো।

কুড়ি ইঞ্চি লম্বা ও আড়াই ইঞ্চি ব্যাসের মোটা শক্ত রবারের একটা চোঙ্গার মধ্যে পাতলা রবারের আর একটি নল লম্বালম্বি ভাবে ফিট করা থাকে। বাইরেকার চোঙ্গার চেয়ে ভেতরের পাতলা রবারের নলটা কিছুটা বড় থাকে এবং সেই বাড়তি অংশটুকু দু'দিক্ থেকে টেনে বাইরেকার শক্ত চোঙ্গার দু' মাথায় উলটিয়ে আট্‌কে দেওয়া থাকে। পুং-বীজ স্খলন হবার পর তা সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে এই যন্ত্রটির এক মাথায় অন্য একটা রবারের নলের সাহায্যে একটা কাচের পাত্র লাগানো থাকে। যন্ত্রটি'কে কাজে লাগাবার ঠিক পূর্বমুহূর্তে এর বাইরেকার চোঙ্গা ও ভেতরকার পাতলা রবারের নলের মধ্যকার ফাঁকে গরম জল ভ'রে দেওয়া হয়, এর জন্য বাইরেকার চোঙ্গার গায়ে লণ্ঠনে তেল ভরবার ফুটোর মতো একটা ফুটো থাকে এবং সেটা বন্ধ করবারও ব্যবস্থা থাকে। উত্তেজনার সময়কার স্ত্রী-অঙ্গের স্বাভাবিক উত্তাপের অনুকরণে এই যন্ত্রে উত্তাপ সৃষ্টি করার জন্যই গরম জল ভরা হয়।

এই ভাবে যন্ত্রটিকে কার্যোপযোগী ও বিশেষ প্রক্রিয়ায় নির্বীজ (aseptic) ক'রে নেবার পর ষাঁড় ও গরুকে একত্র করা হয়, কিন্তু তাদের আঙ্গিক মিলনের ঠিক পূর্বমুহূর্তেই এই যন্ত্রটি ষাঁড়ের সামনে ধ'রে তাতেই পুং-বীজ সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত হবার পরই পুং-বীজ অণুবীক্ষণ যন্ত্রের (microscope) সাহায্যে পরীক্ষা করা হয় এবং উপযুক্ত ব'লে প্রমাণিত হ'লে তাতে—এক ভাগে তিন ভাগ হিসাবে—এক বিশেষ ভাবে তৈরী ঘন পদার্থ মিশিয়ে তার পরিমাণ বাড়ানো হয়। আঠারো ইঞ্চি লম্বা ইবোনাইটের (ebonite) একটা নল লাগানো কাচের সিরিঞ্জে ক'রে এই পুং-বীজের খুব সামান্য একটু নিয়ে প্রসারণী যন্ত্রের (speculum) সাহায্যে গরুর যোনিরন্ধ্র প্রসারিত ক'রে গর্ভ কাষের ভেতরে তা ইঞ্জেক্‌শন্ ক'রে দেওয়া হয়। যথেষ্ট সংখ্যায় গরু হাজির না থাকার জন্য পুং-বীজের সবটাই যদি তখন খরচ না হয়, তবে সেটা বিশেষ প্রথায় 'রেফ্রিজারেটার' বা 'থার্মোফ্লাস্কে' পাঁচ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ বা একচল্লিশ ডিগ্রী ফারেনহাইট্ তাপমান অনুযায়ী ঠাণ্ডায় সংরক্ষিত করা হয়। এই ভাবে সংরক্ষিত পুং-বীজের জীবনীশক্তির ক্রমহ্রস্বমান মাত্রায় অবনতি ঘটলেও অনেক দিন পর্যন্ত তা অবিকৃত থাকে, তবে ছ'-সাত দিনের পর তার ব্যবহারিক মূল্য অনেকটা কমে যায় বলে সাধারণতঃ উক্ত সময়ের পর তা ব্যবহার করা হয় না।

প্রজননই যদি লক্ষ্য হয়, তবে প্রকৃতিগত ব্যবস্থা থাকতে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্য কি?—এবার সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো এবং সেটাই এই প্রবন্ধ লেখার আসল উদ্দেশ্য।

যুদ্ধের আগে ভারতবর্ষে গরুর যে মোট সংখ্যা ছিল তা গোটা পৃথিবীর সমস্ত গরুর তিন-ভাগের এক ভাগ। সেই সময়েই এই সব গরু থেকে আমরা যে পরিমাণ দুধ পেতুম, পাশ্চাত্যের যে কোনও দেশে এ দেশের গরুর সংখ্যার এক-সপ্তমাংশ বা তার সামান্য কিছু বেশী সংখ্যার গরু থেকে সে দেশের লোকেরা প্রায় সেই পরিমাণ দুধই পেতো; কেন না, সে সব দেশের প্রত্যেকটি গরু যেখানে প্রতি-বিয়ানে গড়ে পঞ্চাশ মণ ক'রে দুধ দেয়, সেখানে আমাদের ভারতবর্ষের গরু দুধ দেয় প্রতি-বিয়ানে গড়ে মাত্র সাড়ে সাত মণ। সে সময়ে এ দেশে যতটুকু দুধ হতো, এ দেশের জনসংখ্যার অনুপাতে তা বিতরণ করলে দৈনিক এক জনের ভাগ্যে জুটতো মাত্র তিন ছটাক বা তার সামান্য কিছু বেশী, অথচ পুষ্টিতত্ত্ববিদ্‌দের হিসাব মতো প্রত্যেকের অন্ততঃ এক সের ক'রে দুধ খাওয়া উচিত।

আগের অনুচ্ছেদে যে আনুপাতিক হিসাব দিয়েছি সেটা অবশ্য নিখিল ভারতের হিসাব অনুযায়ী। আলাদা ভাবে বিভিন্ন প্রদেশের গো-সংখ্যা অনুযায়ী এই হিসাব করলে,—পাঞ্জাব, সিন্ধু বোম্বাই ও মাদ্রাজ,—এই প্রদেশ ক'টি ছাড়া অন্য সব প্রদেশেই দুধের এই আনুপাতিক পরিমাণ ঢের কম হবে। আর এই ব্যাপারে বোধ হয় বাংলা দেশ দাঁড়াবে 'লাষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট'। কেন না, বাংলা দেশের গরু এত দূর নিকৃষ্ট যে, অন্য কোন প্রদেশেরই গরুর সঙ্গে তাদের তুলনা করা যায় না। অন্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশের গরুর সংখ্যা যুদ্ধের আগে বেশী ছিল, অথচ দুধের বেলায় সেই পরিমাণ সে সব দেশের তুলনায় ঢের কম ছিল। অন্য প্রদেশের গরু যেখানে প্রতি-বিয়ানে গড়ে পাঁচ থেকে সাত মণ দুধ দেয়, সেখানে বাংলার গরু দেয় প্রতি-বিয়ানে গড়ে মাত্র আড়াই মণ। যুদ্ধের আগে বাংলা দেশের গরু ও মহিষ থেকে যে পরিমাণ দুধ পাওয়া যেতো, তাতে এ দেশের লোকদের, নিখিল ভারতের সংখ্যা অনুপাতে মাথা-পিছু কিছু বেশী যে তিন ছটাক দুধ পাবার কথা বলেছি, তাও জুটতো না। তখন এ দেশের গরু ও মহিষ থেকে কিছু কম পাঁচ কোটি মণ দুধ পাওয়া যেতো, অথচ মাথা-পিছু তিন ছটাক ক'রে ধ'রে হিসাব করলে দরকার হতো কিছু বেশী দশ কোটি মণ, সুতরাং সেই সময়েই এ দেশে কিছু কম ছ'কোটি মণ দুধের ঘাটতি ছিল। তার পর যুদ্ধের সময় নানাবিধ চাহিদা মেটাতে ও অন্যান্য অনেক

কারণে গবাদি পশুর সংখ্যা সাংঘাতিক রকমে কমে যাওয়াতে এখন দুধের সেই ঘাটতি কতখানি যে বেড়ে গেছে এবং এখন এ দেশের *লোকেরা মাথা-পিছু দৈনিক কতটুকু ক'রে যে দুধ পাচ্ছে তা সহজেই* অনুমেয়। আজকাল এ দেশে, বিশেষ ক'রে কোলকাতায় ন্যূনতম পরিমাণেও দুধের যোগান বন্দোবস্ত করতে আমাদের যা বেগ পেতে হচ্ছে এবং খাঁটি দুধের বদলে দুধ-নামধারী এক অদ্ভুত ও অপূর্ব তরল পদার্থ কিনতে আমাদের যা দাম দিতে হচ্ছে, তা থেকেই আমরা এ দেশের দুধের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার কথা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারছি।

এ দেশের দুধের বর্তমান সরবরাহ অবস্থার উন্নতি করতে গেলে প্রথমেই উন্নতি করতে হবে তাদের, যারা এই দুধের উৎস, অর্থাৎ গো-জাতি। এটা কয়েক প্রকারে করা যেতে পারে। এর মধ্যে প্রথমটি হলো পাঞ্জাব বা অন্য কোন প্রদেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যায় উন্নত জাতের ষাঁড় আনিয়ে এ দেশের বাছাই-করা গরুর সঙ্গে তাদের মিলন ঘটিয়ে সমগ্র ভাবে গো-জাতির উন্নতি করা। কিন্তু এ দেশের বর্তমান আর্থিক অবস্থার জন্য এটা কতখানি সম্ভবপর তা বিচার্য, কেন না, এ দেশের গরুর সংখ্যার অনুপাতে প্রথমেই যে অসংখ্য উন্নত জাতের ষাঁড় প্রয়োজন, এখনকার দ্রব্য-মূল্যের উচ্চ মানের জন্য তা কেনা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ ; এর ওপরে ভিন্ন দেশ থেকে তাদের আনতে একটা খরচ তো আছেই। এ দু'টো অবশ্য এককালীন খরচা এ দু'টো ছাড়াও এই সব উন্নত জাতের ষাঁড়দের জন্য উন্নত ধরণের আহার ও আবাসের ব্যবস্থা বাবদ একটা পৌনঃপুনিক মোটা খরচ আছে।

ওপরে যে উপায়টির কথা বললুম সেটা সম্ভব না হ'লে তার বদলে অত্যধিক মাত্রায় দুগ্ধদানের খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট বংশের বাছাই করা অল্প কয়েকটি ষাঁড় আনিয়ে তাদের সাহায্যেও গোজাতির উন্নতি করা যেতে পারে। ব্যয়, পরিশ্রম ও অন্যান্য হাঙ্গামার দিক্ থেকে এটা প্রথমটির চেয়ে অনেকটা সহজসাধ্য এবং সব দিক্ দিয়ে বিবেচনা করলে এটাই সব চেয়ে ভাল উপায়। যদি আর্থিক বা অন্য কোন কারণে এই সামান্য ক'টি ষাঁড়ও কেনা সম্ভব না হয়, তবে ভিন্ন দেশ থেকে নিয়ে-আসা যে ক'টি উন্নত জাতের ষাঁড় আগে থেকেই এ দেশে আছে সেগুলির এবং এ দেশেরই নিজস্ব সব চেয়ে ভাল ষাঁড়গুলির সাহায্যেই এই ব্যাপারে কিছুটা উন্নতি করা যেতে পারবে।

প্রথম ব্যবস্থা অনুযায়ী কাজ হ'লে কোন প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু দ্বিতীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী ভিন্ন দেশ থেকে সামান্য ক'টি উন্নত জাতের ষাঁড় কিনে এনে বা তৃতীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী এ দেশেরই ভাল ক'টি ষাঁড়ের সাহায্যে কি ক'রে যে সমগ্র দেশের গোজাতির উন্নতি করা যেতে পারবে, এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এইখানেই হলো খোদার ওপর খোদকারি কাজে বিজ্ঞানীদের কেরামতি, অর্থাৎ প্রকৃতির সীমাবদ্ধ ক্ষমতার ওপর এক ধাপ অগ্রগতি, আর বিজ্ঞানীদের আবিষ্কৃত কৃত্রিম উপায়ে পশু প্রজনন-পদ্ধতির এইখানেই বাহাদুরি।

স্বাভাবিক মিলনের সময় একটা ষাঁড় থেকে একবারে যে পরিমাণ পুং-বীজ ক্ষরিত হয় তা কেবলমাত্র একটি গরুর ক্ষেত্রেই ব্যয়িত হয়। ষাঁড়ের আকার, বয়স প্রভৃতির তারতম্যে এই পুং-বীজের পরিমাণ কম বেশী হ'লেও কৃত্রিম উপায়ে তা সংগ্রহ করলে একেবারের ক্ষরিত পুং-বীজ দিয়ে সেই জায়গায় ন্যূনপক্ষে পনেরোটি থেকে পঁচিশটি পর্যন্ত গরুর গর্ভসঞ্চার করা যায়। এই সুবিধার *জন্যই সামান্য ক'টি বাছাই-করা ষাঁড় থেকে পুং-বীজ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ* ক'রে এ দেশের চার দিকে ছড়ানো ওর মধ্যে ভাল দেখে বাছাই-করা গরুর শরীরে পূর্ব অনুপাতে সঞ্চার ক'রে বছরে হাজার হাজার বৎস উৎপাদন সম্ভব হবে এবং এই ভাবেই ক্রমোন্নত ক্রম-প্রজননের দ্বারা এ দেশের গোজাতির সমগ্র ভাবে উন্নতিও সম্ভব হবে।

যান্ত্রিক সাহায্যে সংগৃহীত পুং-বীজ বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছ'-সাত দিন পর্যন্ত কাজের উপযোগী রাখতে পারার দরুণ যে সুবিধার কথা আগে বলেছি, তা ছাড়াও আর একটি বিশেষ সুবিধা আছে এবং সেটা হলো এই যে, সংগ্রহের স্থান থেকে সংরক্ষিত পুং-বীজ থার্মোফ্লাস্কে ক'রে মফঃস্বলেও পাঠানো যেতে পারবে। গ্রীষ্মকালে থার্মোফ্লাস্কের শৈত্য চব্বিশ ঘণ্টার বেশী প্রয়োজনীয় নিম্ন মানে রাখা যায় না বলে তাতে ক'রে পুং-বীজ বেশী দূরের দেশে পাঠানো যায় না। এই অসুবিধাটুকুও দূর করবার জন্য ইজ্জত নগরের ইন্‌ষ্টিট্যুটের বিশেষজ্ঞেরা ভারতবর্ষের আবহাওয়ার উপযোগী এমন এক বিশেষ ধরণের আধার তৈরী করেছেন—যাতে রাখলে সংরক্ষিত পুং-বীজের জীবনীশক্তি বা কর্মশক্তি গবেষণাগারের বাইরের আবহাওয়াতেও তিন দিন পর্য্যন্ত অটুট থাকে এবং এতে ক'রে পুং-বীজ-সংগ্রহ-কেন্দ্র থেকে তিন দিনের দূরের রাস্তায় পাঠানো যাবে।

বর্তমানে এ দেশে ভাল ষাঁড়ের অভাবে বা তাদের সংখ্যাল্পতার জন্য খর্বাকার, দুর্বল, রুগ্ন বা অপরিণত বয়স্ক ষাঁড়ের দ্বারা যে প্রজনন চলছে এবং যেটা এ দেশের গোজাতির অবনতির মুখ্য কারণ, এই পদ্ধতির ব্যাপক প্রয়োগে তা যে বন্ধ হবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। এটি ছাড়াও এই কৃত্রিম উপায়ে গর্ভসঞ্চারের ছোট-খাটো আরও কয়েকটি উপকারিতা আছে। কোন কোন গরুর এমন এক বিশেষ ধরণের বন্ধ্যাত্ব হয় যাতে স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় তাদের গর্ভসঞ্চার করানো যায় না। এই সব গরুর শরীরে কৃত্রিম উপায়ে পুং-বীজ সঞ্চার করে গর্ভসঞ্চার করা সম্ভব হবে। গবাদি পশুর কয়েকটি রোগ—যা স্বাভাবিক মিলনের ফলেই পশু হতে পশুতে সংক্রামিত হয়, এই পদ্ধতিতে গর্ভসঞ্চারের ফলে সে-গুলোর হাত থেকেও নিস্তার পাওয়া যাবে। বয়সোচিত শৈথিল্য বা অঙ্গবৈকল্যের জন্য অথবা অপরিমিত প্রজনন-কাজের ফলে স্বাভাবিক তৎপরতা নষ্ট হয়ে গেলে যে সব ষাঁড় অকেজো বলে বাতিল করে দেওয়া হয়, তাদের ভেতরে ভাল জাতের ষাঁড় থাকলে, অন্য এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় তাদের থেকেও পুং-বীজ সংগ্রহ করে গরুর গর্ভসঞ্চারের কাজে ব্যবহার করা যাবে। তার পর ষাঁড় ও গরুর আকারগত পার্থক্য খুব বেশী হওয়ার জন্য যেখানে তাদের স্বাভাবিক মিলন অসঙ্গত বলে মনে হয়, অথবা মনোবিকার বা অন্য কোন কারণে যেখানে গরু ষাঁড়কে প্রত্যাখ্যান করে, সে সব ক্ষেত্রেও একমাত্র এই কৃত্রিম উপায়েই গর্ভসঞ্চার সম্ভবপর হবে। এই কৃত্রিম পদ্ধতির প্রয়োগ দ্বারা এই সব বহুমুখী সম্ভাবনার কথা বুঝেই ভারত সরকার তাঁদের যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার তালিকায় এটিকে একটি বিশেষ পরিকল্পনা হিসাবে স্থান দিয়েছেন।

গবেষণাগারের ভেতরে এই কৃত্রিম পদ্ধতির প্রয়োগে যে পরিমাণ সুফল পাওয়া গেছে, গবেষণাগারের বাইরেও এর প্রয়োগে সেই

জীবন কি ?

লেখক : জে, বি, এস, হ্যালডেন এফ, আর, এস

অনুবাদক : প্রদ্যোৎ গুহ

[লেখক জে, বি, এস হ্যালডেন আমাদের দেশের সুধী মহলে যথেষ্ট সুপরিচিত। তিনি বিলাতের সর্বাগ্রগণ্য জীবতত্ত্ববিৎ (Biologist)।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেননি। ঘরে বসে পড়াশুনো করেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের আসন অলংকৃত করেছেন। বিলাতের বিশ্ববিখ্যাত রয়েল সোসাইটির তিনি এক জন স্বনামধন্য সদস্য।

তিনি কঠিন জিনিষ সহজ করে বলার অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী। বর্ত্তমান প্রবন্ধেই পাঠক তার কিছুটা পরিচয় পাবেন। —অনুবাদক]

এই প্রশ্নের উত্তর আমি দেব না। বলতে কি, এই প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দেওয়া সম্ভব বলেই আমি মনে করি না। আমরা জানি বেঁচে থাকতে কেমন লাগে ; যেমন জানি ভালোবাসা কি, ব্যথা বা চেষ্টা কি। কিন্তু এটুকু ছাড়া আর কোন ভাবেই এই অনুভূতিগুলির প্রকাশ সম্ভব নয়।

কিন্তু তাহলেও প্রশ্ন অবান্তর নয়। কারণ আমরা তো অনেক সময়ই জানতে চাই মানুষটি বেঁচে আছে কি না। অথবা ধরুন, রোগ-বীজাণুর কথা—আমরা জানি ব্যাক্টিরিয়া জীবন্ত কিন্তু হাম বা বসন্তের বীজাণু জীবন্ত কি না সে সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কোন ধারণা নাই।

সুতরাং অন্ত কিছুর নিরিখে আমাদের জীবনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে। যদিও এই ভাবে একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিরূপণ সম্ভব নয়। আপাততঃ 'বস্তুর ওপর আত্মার প্রতিক্রিয়া' এই ধরণের একটা সংজ্ঞা দেওয়া যাক। কিন্তু একাধিক কারণে বেশীর ভাগ লোকের কাছেই এ ধরণের সংজ্ঞা হবে নিরর্থক।

কেন না, যদি ধরে নেন, মানুষ এমন কি কুকুরেরও আত্মা আছে তাহ'লেও ঝিনুক বা আলুর মধ্যে আত্মা আছে এ কথা বিশ্বাস করা অনেকের পক্ষেই শক্ত হয়ে উঠবে। আর একটি কারণ : এ সংজ্ঞা অত্যন্ত ব্যাপক। শিল্পকার্য্য এবং সাহিত্যও এর আওতায় পড়বে। কারণ এইগুলির মধ্যে শিল্পী বা সাহিত্যিকের মনের পরিচয় পাওয়া যায়। লেখকের মৃত্যুর পরও তার রচনা পাঠকের মনে প্রভাব বিস্তার করে।

তেমনি, প্রাণশক্তি দিয়ে জীবনকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়াও ফলপ্রসূ হবে না। শ' এবং অধ্যাপক জোয়াড মনে করেন, প্রতিটি জীবন্ত বস্তুর মধ্যেই একটি প্রাণশক্তি আছে। এই কথার আদৌ কোন অর্থ আছে কি না, সে বিষয়ে আমার যথেষ্টই সন্দেহ আছে। অর্থ আছে, এ কথা মেনে নিলেও বস্তুর ওপর প্রতিক্রিয়া ছাড়া জীবজন্তু বা গাছ-পালার প্রাণশক্তি নির্ধারণ সম্ভব নয়।

সুতরাং জীবনের সংজ্ঞা নিরূপণ করতে হবে বস্তুর মাপ কাঠিতে। সাধারণত একটি বস্তুর আকৃতি এবং গঠনপ্রণালী দিয়ে আমরা বস্তুটির প্রাণ আছে কি না বুঝে থাকি। কিন্তু মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত এগুলির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। স্তন্যপায়ী জীব বা পাখীর বেলায় ঠাণ্ডা হয়ে গেছে দেখলেই বোঝা যায় তারা মৃত। কিন্তু ব্যাং বা শামুকের বেলায় তো এ পরীক্ষা খাটবে না। ছুঁলেও যদি না নড়ে তাহ'লে আমরা ধরে নি, এগুলো মৃত।

কিন্তু গাছপালার বেলা একমাত্র পরীক্ষা হচ্ছে সেগুলি বাড়ে কি না। অনেক সময় এদের মধ্যে মৃত্যুর লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠতে মাসাধিক কালও লাগতে পারে। সবগুলি পরীক্ষা থেকে একটা বিষয় কিন্তু স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে গতি বা পরিবর্ত্তনই হচ্ছে জীবন। কারণ, পরমাণুর ইতস্তত অনিয়মিত গতিই হচ্ছে উত্তাপের উৎস। রাসায়নিক পরীক্ষা থেকে অবস্থাগত পরীক্ষাতেই এটা ধরা পড়ে বেশী। কিন্তু তবু আমি মনে করি, পদার্থ-বিজ্ঞানের থেকে রসায়নের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই জীবন সংবন্ধে অনেক বেশী জ্ঞান আহরণ করা যাবে।

তার মানে এই নয় যে, রসায়নের ভাষাতেই জীবনকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়। আসল কথা জীবন শুধু কতকগুলি সাধারণ ঘটনার সমষ্টি নয়, কতগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ারও সমষ্টি। একটা উদাহরণ দিলে হয়তো বক্তব্য কিছুটা পরিষ্কার হবে। ধরুন এক জন অন্ধ আর এক জন বধির একসঙ্গে ম্যাকবেথ আর আলেকজাণ্ডার

পরিমাণ সুফলই পাওয়া যাবে বলে বিশেষজ্ঞেরা খুবই আশা করেন, অবশ্য যদি এর প্রয়োগ সম্ভব হয়। এই কাজের উদ্যোক্তাদের সদিচ্ছা ও কর্মপটুতা সম্বন্ধে অবশ্য কিছুই বলবার নেই, এখন কথা হচ্ছে এই যে, জনসাধারণ এটা কি ভাবে নেবে এবং যদি নেয় তবে কতখানি। কেন না, বর্ত্তমান সময়োচিত বিজ্ঞানের এই অপূর্ব্ব দানের ব্যাপক প্রয়োগ সাফল্যমণ্ডিত এবং এর পেছনে যে উদ্দেশ্য তা সাধন করতে গেলে সর্বাগ্রে দরকার সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের আন্তরিক আগ্রহ ও উদ্যোক্তাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা এবং সবার উপরে দরকার এই পদ্ধতিতে নিজ নিজ গোধনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশের গোজাতির উন্নতিবিধানের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প।

আমাদের এই বাংলা দেশের অবনতি কেবলমাত্র গোজাতির অবনতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়,—অন্য প্রদেশের অগ্রগতির অনুপাতে এ দেশ আজও অনেক ব্যাপারে অবনত ও পশ্চাৎপদ। এখনও এ দেশে এমন লোক ঢের আছে, যারা সেকেলে রীতি-নীতি বা বিধি-ব্যবস্থা বর্তমানে অচল হওয়া সত্ত্বেও আজও প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে। এ দেশে এমন লোক এখনও দেখতে পাওয়া যায়, যারা ধর্মবিগর্হিত কাজ মনে করে তাদের গরুর ওপর আজও কোনরূপ অপারেশন্ করতে দিতে চায় না,—এমন কি, মড়কে তাদের বাড়ীর গোবংশ নির্বংশ হয়ে গেলেও বিজ্ঞানের আধুনিকতম বিধান অনুযায়ী প্রতিষেধক ইঞ্জেকসন্ দিতে নিজেরা তো রাজী হয়ই না, উল্টে ভয় দেখিয়ে বা ভৎর্সনা ক'রে প্রতিবেশীদেরও দলে টানতে চেষ্টা করে। এ দেশের লোকের মনোবৃত্তি সম্বন্ধে এই যা মন্তব্য করলুম তা মোটেই মনগড়া নয়, আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ অমিশ্র সত্য। এ দেশের সংশ্লিষ্ট লোকের এই সঙ্কীর্ণ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোভাব শিক্ষামূলক প্রচারকার্যের দ্বারা দূর না করা পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন কিছুরই প্রত্যাশা করা যাবে না এবং অনেক কিছুর সঙ্গেই এ দেশের গোজাতির উন্নতিও কোন দিনই হবে না; ফলে এ দেশ 'যে তিমিরে সেই তিমিরে'ই থেকে যাবে।

নেভস্কি * দেখতে গেল। বধির লোকটি ম্যাকবেথের বিশেষ কিছুই বুঝতে পারবে না। কে ডানকানকে হত্যা করলো তা জানা তো দূরে থাক, ডানকানকে যে হত্যা করা হোল তাই সে জানতে পারবে না।

অন্ধ লোকটি কিন্তু অনেকটাই বুঝতে পারবে। সেক্সপীয়ারের নাটকের প্রাণই হোল তার সংলাপ। ফিল্মের বেলা কিন্তু আবার ঠিক উল্টো ব্যাপার হবে।

জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ জিনিষ হোল রাসায়নিক প্রক্রিয়া। বিভিন্ন জীবদেহে এই প্রক্রিয়ার সামঞ্জস্য খুব বেশী। তাই আমরা বলতে পারি, জীবন প্রধানত কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি। তবু প্রত্যেকটি জীবন্ত বস্তুরই একটা বিশিষ্ট গঠন আছে, প্রায় প্রত্যেকেরই গতির একটা বিশিষ্ট ভংগী আবার অনেকের মধ্যে অনুভূতি এবং উদ্দেশ্যও আছে।

আবার বিভিন্ন জীবদেহের রাসায়নিক উপাদানও এক নয়। গাছের উপাদান হোল কাঠ। মানুষের দেহের উপাদানের সংগে এর সামঞ্জস্য খুবই কম। যদিও আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রধান উপাদান গ্লাইকোজেন এবং কাঠের প্রধান উপাদান অনেকটা একই ধরণের। কিন্তু গাছের পাতা, ছাল এবং শিকড়, বিশেষ করে শিকড়ের মধ্যে যে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দেখা যায়, তার সংগে মানব-ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তনের বিশেষ সামঞ্জস্য আছে।

মানুষেরই মত শিকড়েরও অক্সিজেন প্রয়োজন হয়। কুকুরের বেলা যেমন দেখেই বলে দেওয়া যায় জীবিত কি মৃত, শিকড়ের বেলাও ঠিক তেমনি ভাবে প্রাণ আছে কি না বলা যায় প্রতি মিনিটে গৃহীত অক্সিজেনের পরিমাপ করে। এখানে কিন্তু একই ধরণের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেনের প্রয়োজন হোল। ধরা যাক, এ প্রক্রিয়া হোল অল্প ও নিয়ন্ত্রিত উত্তাপে খাদ্য-বস্তু ঝলসানো।

সাধারণ ভাবে চিনির সংগে অক্সিজেনের কোন সংমিশ্রণ না হলেও, উত্তাপ দিলে এই মিশ্রণ সম্ভব। তেমনি 'এনজাইমের' সহযোগিতায় সমস্ত জীবিত পদার্থের সংগেই অক্সিজেন মিশ্রিত হয়।

প্রধানত যে অক্সিজেন আমরা গ্রহণ করি তা প্রথমত এই 'এনজাইমের' সংগে মিশ্রিত হয়। এই 'এনজাইমের' প্রধান উপাদান হোল প্রোটিন, তা ছাড়া কিছু লৌহ জাতীয় জিনিষও আছে। ১৯২৪ সালে ওয়ারবার্গ ইয়েষ্টে এই জিনিষটি লক্ষ্য করেন। ১৯২৬ সালে আমি কতগুলি পরীক্ষা করেছিলাম, তাতেও প্রায় একই জিনিষ ধরা পড়ে। এ পরীক্ষায় দেখা যায়, সবুজ গাছপালা, এক ধরণের পতঙ্গ আর ইঁদুরের এনজাইম একই। তার পর অনেক জীবিত বস্তুর মধ্যেই এ জিনিষটা লক্ষ্য করা গেছে। অন্যান্য প্রক্রিয়া সম্পর্কেও এই এক কথাই প্রযোজ্য।

আলু চিনিকে ষ্টার্চে পরিণত করে এবং যকৃৎ চিনিকে পরিণত করে গ্লাইকোজেনে—এ দু'টি প্রক্রিয়াই কিন্তু একই ধরণের। চিনি গাঁজিয়ে মদ তৈরী করার সময় যেমন ধাপে-ধাপে চিনির পরিবর্ত্তন হয়, মানবদেহে পেশীর ক্রিয়ায়ও তেমনি চিনি বিশ্লিষ্ট হয়। এই দুইটি ক্ষেত্রে প্রক্রিয়া দুটির পরিণতি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা।

একটা বন্দুক তৈরীর কারখানাকে খুব বেশী একটা না বদলেই সেলাইয়ের কল বা সাইকেল তৈরীর কারখানায় পরিণত করা যায়। তেমনি পতঙ্গের ত্বক বা শামুকের ভেতরের থলথলে জিনিষটির গঠনের রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনেকটা একই রকমের। যদিও উপাদানের তারতম্য যথেষ্ট।

বস্তুত জীবন মাত্রই রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি হলেও তাদের মধ্যে তারতম্যও যথেষ্ট আছে। বেশীর ভাগ প্রাণীই যে আহার্য গ্রহণ করে উদ্ভিদ্ তার জন্মদাতা। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই গঠন এবং ভাঙন প্রায় একই সংগে চলছে। এই ভাঙা-গড়ার অন্তর কিন্তু এক নয়।

এঙ্গেলস্ বলেছিলেন, জীবন প্রোটিনের বিভিন্ন ভাবে অবস্থানের রূপ। প্রোটিন এবং এনজাইম যতখানি এক, এ উক্তি ততখানিই সত্য। সমস্ত জীবিত বস্তুর মধ্যে যতখানি রাসায়নিক উপাদানের সামঞ্জস্য আছে কথাটা ততখানিই সত্য। 'এনজাইম' এবং অন্যান্য প্রোটিন পরিশোধন করে কাচের বোতলে রাখলেও তা সমান ক্রিয়াশীল থাকে। কিন্তু তবু কোন রাসায়নিকই তাকে জীবিত বলবেন না।

তেমনি সেক্সপীয়রের নাটক শব্দসমষ্টি-গঠিত, আবার আইসেনষ্টাইনের * ফিল্মে শব্দের স্থান গৌণ। জীবন যে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি জ্ঞান যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন নাটক শব্দ-সমষ্টি-গঠিত তাও জেনে রাখা দরকার। কিন্তু এখানে শব্দটা গৌণ, মুখ্য হচ্ছে কি ভাবে তা সাজান। তেমনি জীবন এতগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি, ফলত মুখ্য হচ্ছে কি ভাবে সে রাসায়নিক প্রক্রিয়া রূপ পেয়েছে।

অগ্নিশিখাও কতকগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি কিন্তু সে প্রক্রিয়া নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে এই রাসায়নিক প্রক্রিয়া একটি সুনিয়ন্ত্রিত প্রবাহ। এ ছাড়া অবশ্য আরও অনেক বৈশিষ্ট আছে। তাই জীবন কতগুলি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি ব'লে আমরা একটি অতি সত্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছি।

কথাটার সত্যই বিশেষ গুরুত্ব আছে। কেন না, এর অনেকগুলি প্রক্রিয়াকেই আজ আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়েছি। আর এই আবিষ্কারের প্রথম ফল—সালফোনামাইড, পেনিসিলিন, ষ্ট্রেপ্টোমিসিন প্রভৃতি।

কিন্তু শুধু এই ভাবেই জীবনকে ব্যাখ্যা করতে যাওয়া ভুল হবে, তা ছাড়া, তা সম্ভবও নয়। আবার জীবন রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সমষ্টি, এ সত্য অস্বীকার করাও ভুল এবং অসত্য। যেমন অসত্য কবিতা শব্দনিচয় তা অস্বীকার করা।

* ষ্টালিন-পুরস্কারপ্রাপ্ত বিখ্যাত ফিল্ম।

* বিখ্যাত সোভিয়েট সিনেমা-পরিচালক ও আলেকজাণ্ডার নেভস্কির নির্মাতা।

অবরোধ

বিজন ভট্টাচার্য্য
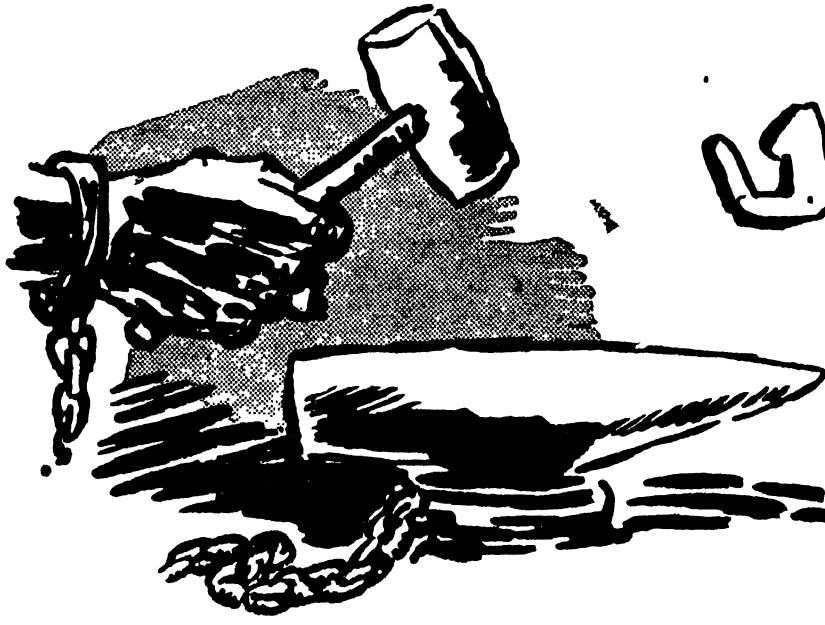
৪র্থ অঙ্ক

২য় দৃশ্য

মিঃ সেনের অফিস-ঘর। মিঃ সেনের পরনে লঙ্কস, হাতকাটা গেঞ্জি. বাঁ কপালে সরু ছুঁফালি প্লাষ্টার গুণ-চিহ্নের মত ক'রে আঁটা। মিঃ সেন রেবতীবাবু ও মিঃ মুখার্জ্জির সঙ্গে মুখে কথা কইছেন আর হাতে কাজ ক'রছেন।

মিঃ সেন। অত কথা বলতে হবে না, অত কথা বলতে হয় না। কাজের রীতি বোঝেন না আপনারা তার···প্লান একটা ঠিক ক'রে নিয়ে চটাপট অর্ডারগুলো সব dispose of ক'রে দিন। এত unsteady হ'লে হয়?···হেড অফিসে ব'সে আপনারাই যদি এই রকম bungling করেন তো আর সব ব্রাঞ্চ অফিস-গুলোর কাজ চলে কি ক'রে বলুন তো? জানি time is bad, market is dull, still you have got to rise up to the occasion না কি বলুন না?

রেবতীবাবু। না সে তো বটেই।

মিঃ সেন। তো তবে। আর এ সব ব্যাপারে কোন রকম delicacy ক'রবেন না। Company'র মধ্যে hangers-on দেখলেই straight away chuck them out, এর ভেতরে আর কোন কথা নেই।

মিঃ মুখার্জ্জি। Hangers-on সে আবার কি ধরণের সব, কয়লার ঘাটতির জন্তে মেশিন বন্ধ হ'লো তো এক এক জন দশ-প'নেরো দিন ধরে বসে আছে।

মিঃ সেন। হুঁ, তা sack ক'রতে হবে। বসিয়ে বসিয়ে কোম্পানী থ.মকা হপ্তা গুণতে পারবে না।

রেবতীবাবু। না, তারা বলে যে কয়লা নেই তার আমরা কি করবো—মেসিন চালু রাখার সরঞ্জাম জোগাবে তো কোম্পানী।

মিঃ সেন। Oh ho, no argument please এখানে কয়লা কে যোগাবে আর না যোগাবে সে কথাই উঠছে না। কি বলছেন আপনি? এই সব argument করতে গিয়েই তো মুস্কিল বাধান আপনারা। দরকার কি এত কথায়···সোজা-সুজি কয়লা নেই, মেশিন বন্ধ, সুতরাং কাজও বন্ধ—no job ব্যস finish···আপনি কি ভাবছেন কয়লা না থাকার ব্যাপারটা ওদের বুঝিয়ে ব'ল্লেই হাঙ্গামা থেকে রেহাই পাবেন আপনি!···ছঃ, তা কি হয়, না হ'য়েছে কখনও—silly idea.

রেবতীবাবু। না, আমিও তাই বলছি—তারা বললেই বা আমরা শুনবো কেন!

মিঃ সেন। না, 'বললেই বা শুনবো কেন না', আমি বলছি যে তাদের সেটুকু বলার opportunityই বা আপনি দেন কেন; বুঝতে পারলেন না?

রেবতীবাবু। হুঁ, বুঝিছি।

মিঃ সেন। Postwar time-এ accommodate যখন আপনি তাদের ক'রতেই পারছেন না, got that, so no talk, straight action—dismiss···মুখুজ্জ্যে বুঝতে পারলে আমার পয়েন্টটা···

মুখুজ্জ্যে। আমি তো এই কথাই বলে এসেছি বরাবর। তা আপনি আবার মাঝে unnecessary provocation দেওয়া হচ্ছে বলে এক দিন খুব চটাচটি করলেন, তার পর থেকে আমি আর···

মিঃ সেন। ও-সব ব্যাপারে এক রকম মাথাই ঘামাই না, কেমন?

মুখুজ্জ্যে। না, মাথা ঘামাই না নয়, করি সব, তবে করবার আগে ব্যাপারগুলোর সম্বন্ধে আমি হয় আপনি নয় রেবতীবাবুর কাছে একবার refer করি।

মিঃ সেন। তা সে তুমি করো বেশ করো, সম্পূর্ণ নিজের বুদ্ধিতে ঝট্ করে একটা কাজ করবার আগে আর পাঁচটা লোকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নেওয়া ভালই। তাতে risk-ও কম; কিন্তু তাই বলে নিজের initiative-টার এই রকম গলা টিপে হত্যা করবার কি কোন মানে হয়! দ্যাখ মুখুজ্জ্যে, Dont be sentimental শুনবে না, বুঝতে চেষ্টা ক'রবে না, মাঝখান থেকে সামান্ত একটা ব্যাপারে চট ক'রে react ক'রে গেলে। আমি জানি, দ্যাখো মুখুজ্জ্যে, আমার কাছে লুকোতে চেষ্টা ক'রো না, পারবে না এই ব'লে

দিচ্ছি। যে দিন তোমায় ঐ কথা ব'লছি আমি ঠিক তার পরদিন থেকেই তুমি আমার সঙ্গে hide and seek play করতে আরম্ভ ক'রেছো—আমি এদিক দিয়ে ঢুকি তো তুমি ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও, আবার ওদিক দিয়ে ঢুকি তো এদিক দিয়ে বেরিয়ে যাও—না ডেকে পাঠালে দেখাটি করবার পর্য্যন্ত তোমার সময় হয় না। বল ঠিক ব'লছি কি না। তোমার অভিমান—আমি তোমায় শুধু সতর্ক ক'রে দিয়েছিলুম যে মজুরদের যেন কোন মতেই unnecessary provocation দেওয়া না হয়। এখন তুমিই যে সেই provocataur এমন কথাও আমি বলিনি। যা হোক তখন বলিছিলাম কেন? ষোলো লাখ টাকা contract'এর খাঁড়া তখন তোমার মাথার ওপর ঝুলছে। মজুরদের তখন তোমায় ঠাণ্ডা রাখতেই হবে, যে করেই হোক। কিন্তু আজ!···আজকের অবস্থা ঠিক তার উল্টো। অবিশ্যি তাই ব'লে আমি এ কথা বলছি না যে মুখুজ্জ্যে এইবার তুমি ধরে ধরে সব মজুর ঠেঙ্গাও। শুধু জিনিষটা একবার বুঝে ছাখো। আজ এই পড়তির বাজারে এত লোক তুমি কারখানায় কখনই পুষতে পারো না। কোথাকার রেভিন্যু আজ কোথায় নেমে গেছে য়্যাঁ। বললেই তো আর হ'ল না, পারবে কি ক'রে কোম্পানী! সুতরাং আজকের দিনে তাদের provoke ক'রছে কে?—না provoke করেছে post-war crisis—which has already set in. সুতরাং willy nilly তোমায় ছেঁটে ফেলতেই হবে। আগেকার scale'এ কোম্পানীর ঠাট তুমি তো আর কিছুতেই বজায় রাখতে পারো না। সুতরাং এখন, অবিশ্যি provoke করতে আমি বলছি না। এখন যদি কোন কারণে কারখানায় ধর্ম্মঘট হয় তো হোক safely ছেঁটে ফেলতে পারা যাবে।

নেপথ্যে— মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো!
আট ঘণ্টা টাইম কায়েম করো!
ইন্‌কেলাব জিন্দাবাদ!

মিঃ সেন। ইউনিয়নের লোকেরা বুঝি?

রেবতীবাবু। হ্যাঁ।

মিঃ সেন। বেটাদের বড্ড তেজ হয়েছে। সকাল নেই দুপুর নেই রাত দিন চিল্লাচিল্লি আর গলাবাজী···দাঁড়ান না, আর দু'টো দিন যেতে দিন! আবার মন্বন্তর আস ছ না। শালারা ক'টা মজুর আর চাষীর প্রাণ বাঁচাতে পারে দেখে নেবেন।

মুখুজ্জ্যে। রক্তবীজের জাত শালারা মরেও মরে না।

রেবতীবাবু। যা বলেছেন, একেবারে ছারপোকার গুষ্টি!—ঐ যে আমাদের শাস্ত্রে আছে না এক ফোঁটা অসুরের রক্ত মাটিতে প'ড়ল আর অমনি সেখান থেকে লক্ষ লক্ষ অসুর উঠে দাঁড়া'লো! তা এদের দেখি···

মিঃ সেন। কিচ্ছু না কিচ্ছু না, বেটাদের ধ'রে ধ'রে সব খোঁয়াড়ে পুরতে হবে।···দাঁড়ান না, National Governmentটা আগে কায়েম হ'য়ে যাক, তখন এই মালিক আর জমিদারের পেছনে লাগা বেরিয়ে যাবে।···বেশী না, দু'টো দিন সবুর করুন।

রেবতীবাবু। তবু বেটাদের জান্ আছে ব'লতে হবে।

মুখুজ্জ্যে। হ্যাঁ, তা আছে। দেখলেন তো, এক নাগাড়ি প'নেরো দিন অন্ধকার ঘরে বেটাদের আটকে রাখলুম, খাবার না দাবার না, আর দরজা খুলতেই দেখি কি না উবি শালা—ব্যাটারা সব একেবারে সে আপনার হৈ হৈ করে উঠে দাঁড়িয়েছে, তাজ্জব ব্যাপার! আমি তো বিলকুল বোকা ব'নে গেছি।···তা জান্ আছে, একেবারে কচ্ছপের জান্।

মিঃ সেন। যাক, তা হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে বেটারা না খেয়েও বেঁচে থাকতে পারে, কি বল মুখুজ্জ্যে?

মুখুজ্জ্যে। দেখলুম তো তাই।

মিঃ সেন। ভালই হ'লো, পরকালের দায় থেকেও রেহাই পাবার গ্যারাণ্টি থাকলো। এখন শুধু ইহকাল···তা ও আমি সামলে নিতে পারবো।···কিন্তু কই, নকড়ির তো পাত্তা নেই। আর সে লোকও এলো না এখনও···

(নকড়ির প্রবেশ)

(গলাখাঁকারি দিয়ে) এই যে আছেন দেখছি। (ব্যস্ত ভাবে চেয়ারের দিকে এগিয়ে যায়)

রেবতীবাবু। ব'লতে ব'লতে এসে পড়েছে।

মিঃ মুখার্জ্জি। অনেক দিন বাঁচবে।

নকড়ি। তাই কামনা করুন, তাই কামনা করুন। মরতে আমার দারুণ ভয়। সে একেবারে···এই যে মাঝে মাঝে লোক মরে সব দেখি এদিকে ওদিকে, আমার একেবারে···কি বলছেন!

মিঃ সেন। তার পর আমার সে লোকের কি ক'রলে নকড়ি?

নকড়ি। লোকের!···কি আবার করবো, নিয়ে এইছি একেবারে সঙ্গে করজা ক'রে।

মিঃ সেন এনেছো তো কই সে লোক কই?

নকড়ি। বাইরে বসিয়ে রেখে এইছি, ডাকবো বলছেন?

মিঃ সেন। আচ্ছা দাঁড়াও···রেবতীবাবু কি বলেন, মুখুজ্জ্যে কথা ব'লে দেখবে না কি এখনই!

নকড়ি। হ্যাঁ, সে দেখুন আপনারা বিবেচনা করে। আমার লোক আনার কথা···

মিঃ মুখার্জ্জি। লোক আনার কথা এনে ফেলেছি, কেমন? ও করলে চলবে না, regular দায়িত্ব নিতে হবে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, সে তুমি লোক এনে দিলেই যে তোমার দায়িত্ব চুকে গেল···

নকড়ি। আহা কি আশ্চর্য্য, আমি কি বলিছি সে কথা?

মিঃ সেন। তো বল সে কথা। শেষকালে যে ব'লবে পেলুম না মজুর···

নকড়ি। তা সে গ্যারাণ্টি তো আমিই রইলুম, বলছিই তো।

মিঃ সেন। হ্যাঁ···তা হ'লে এখানেই ডেকে পাঠানো যাক, কি বলো মুখুজ্জ্যে!

রেবতীবাবু। আপনার কথা বলবার দরকার হবে কি? ব'লছিলাম···

মিঃ সেন। না, Personally লোকটিকে আমি একটুখানি দেখতে চাই···আসুক না!

রেবতীবাবু। তা আসুক, আসুক···

মিঃ সেন। কথা-বার্ত্তা যা in details'এ বলবার, সে আপনি আর

মুখুজ্জেই ব'লবেন তাকে আলাদা ভাবে, নকড়িও থাকবে সেখানে···আমি শুধু এখন দু' চারটে কথা ব'লেই···

রেবতীবাবু। তা বেশ তো ডাকুন না!

মিঃ সেন। উঁ, তা হ'লে নিয়ে এসো নকড়ি তোমার লোককে একবার···

নকড়ি। হ্যাঁ, দু'-চারটে কথা বলেই দেখুন না।···বেশ নাম করা ঠিকেদার, কম সে কম বিশ-ত্রিশ হাজার জন-মজুরের ওপর তো রেখেছে এক্তিয়ার!···চাড্ডিখানি কথা হ'লো না!

মিঃ সেন। বেশ বেশ ডাকো, ডাকো!

নকড়ি। উঁ··· [নকড়ির প্রস্থান।

মিঃ সেন। Deadlock আমি কিছুতেই হ'তে দেবো না কারখানায়। শেষকালে যে ধর্ম্মঘটের ভয় দেখিয়ে আমার কারখানার কাজ বন্ধ কর'বে, সে আমি হ'তে দেবো না, কিছুতেই না।

মুখুজ্জ্যে। আর হ'লেও তো সে আপনার সমস্ত মজুর ব'সে যাচ্ছে না। মঙ্গল মিস্ত্রীর দল তো রয়েছে!

মিঃ সেন। হ্যাঁ রয়েছে, কিন্তু এই তো সে দিন তুমি আমায় বললে যে মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের লোকেরাই না কি শেষকালে মঙ্গল মিস্ত্রীকে ধরে ঠেঙ্গিয়েছে!

মুখুজ্জ্যে। তো সে ঠেঙ্গালেও দল তো যা হয় একটা আছে তার!

রেবতীবাবু। না, সে থাকলেও মঙ্গল মিস্ত্রীর দলের ওপর entirely নির্ভর করা চলে না।

মিঃ সেন। কি বললেন, চলে কি?

রেবতীবাবু। না সে আমার তো ঠিক মনে হয় না।

মুখুজ্জ্যে। Entirely নির্ভর ক'রবেন কেন সে কে বলছে? আমি বলছি কিছুটা তো আন্দাজ···

রেবতীবাবু। হ্যাঁ, তা চ'লতে পারে, সে পারা যায়।

মুখুজ্জে। সেই কথাই তো ব'লছি আমি···রেবতীবাবু আপনি একটু বসুন, আমি দেখি, মঙ্গল মিস্ত্রীটা এখনও এলো না!···

রেবতীবাবু। উঠছেন, আপনি থাকলে ভাল হ'তো না?

মুখুজ্জ্যে। Primarily তো কথা আমি বলিছি···আর···

রেবতীবাবু। আচ্ছা দেখুন আপনি তাহ'লে ওদিকে···

মিঃ সেন। হ্যাঁ তাই যাও, তাই যাও···

(নকড়ির প্রবেশ, সঙ্গে ঠিকেদার। ধুতি সার্ট পরা বাবু-গোছের লোক। কথা বলে ভাঙ্গা-বাংলায়)

এসো, ভেতরে চ'লে এসো। খোলাখুলি ভাবে কথা ব'লে নাও একবার সাহেবের সঙ্গে।···ঐ যে ব'সে আছেন···

ঠিকাদার। (হেসে) প্রণাম।

মিঃ সেন। বসুন আপনি।

রেবতীবাবু। বসুন আপনি ওখানে, বসুন!

নকড়ি। হ্যাঁ মুখোমুখি একবার মুকোবালা একটা হ'য়ে গেলে তুমিও নিশ্চিন্দি, আমাদেরও ঝামেলা খানকটা কম হয়।

ঠিকাদার। সে তো ঠিকই বলিয়েছেন।

মিঃ সেন। মোটামুটি আপনি তো সব শুনেছেনই। এখন দরকার হ'লে লোক ঠিক মত আমায় দিতে পারবেন তো?

ঠিকাদার। হাঁ, সে আপনি যখনই বলিয়ে দেবেন তখনই লোক আসিয়ে যাবে। এ কথা তো আমি বলিয়েই দিছি; ইয়ার ভিতর আর···

মিঃ সেন। মোটামুটি ভাবে machineগুলো handle করবার মত অন্ততঃ কিছু লোক আমার হয় তো দরকার হবে।

ঠিকাদার। সে ভি পাবেন, মেকানিক তো আছে অনেক, আর এ মিসিনে কাজ করিয়েছে এমন লোকও আমার হাতে আছে।

রেবতীবাবু। অবিশ্যি সবগুলো machine আমরা চালাব না। নেহাৎ যে ক'টা না হ'লে নয় তা'ই চ'লবে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, সব কটা চালু হবে না।

ঠিকাদার। সে আপনারা এখন যে রকম বলেন। চারটে মিসিন চালু করেন তো চার চার ষোল জন, তাহ'লে দু'-শিফ্‌টে প'ড়বে গিয়ে আপনার বত্রিশ জন···গড়পড়তা এই চল্লিশ জন মেকানিক হলেই আপনার কাজ চলিয়ে যাবে।

মিঃ সেন। না, এখন আমরা একটা শিফ্‌টেই কাজ চালাব।

ঠিকাদার। বেশ তো তাই হবে, ঐ ষোল জনা হ'লেই কাজ চলিয়ে যাবে।

মিঃ সেন। এই গেল আপনার মেসিনম্যান, আর এমনি মজুর লোক!

ঠিকাদার। মজুর লোকের সম্বন্ধে কোন হরজা হ'বে না। সে ঠিক হইয়ে যাবে।···একটা শিফ্‌ট তো চালাবেন?

মিঃ সেন। হ্যাঁ, একটা শিফ্‌ট।

ঠিকাদার। তো ঠিক আছে। কোন গোলমাল হবে না।···এখন কথা হইছে যে আমার লোকের উপর যেন কোন হামলা না হয় এইটা আপনাকে একটু দেখতে হ'বে। ব্যেপার হইছে যে এবার সব জায়গাতেই গণ্ডগোলটা একটু বেশী রকম হইছে, অনেক জাগা মারিয়েও দিছে আমার লোকরে··

মিঃ সেন। না না, এখানে সে ভয় নেই। হামলা-টামলার ভয় ক'রবেন না। আমি কমিশনার সাহেবকে বলেও রেখেছি ব্যাপারটা। দরকার হ'লে ব্যবস্থা সব হ'য়ে যাবে; চাই কি এমন তেমন হ'লে ফৌজের সাহায্যও আমি পাব। সে আশ্বাসও পেয়েছি।

ঠিকাদার। বেশ বেশ ভাল! না আমিও বলিয়ে রাখলাম আপনার কাছে; মানে অনেক জাগা আবার কোন কিছুর জোগাড় থাকে না, কাজের সময় নানান গোলমাল হয়। তা সে আপনার এখানে সে রকম অসুবিধা কিছু হবে না বলিয়ে আমার মনে হইছে···তো ব্যস, আর কিছু না এই কথাই থাকলো!

মিঃ সেন। হ্যাঁ এই কথা, আর যদি কিছু বলবার থাকে তো আপনি এঁদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করবেন দরকার হলেই। আর নকড়ি রইল। ওর সঙ্গেও আপনি কথাবার্ত্তা ব'লতে পারেন।···আসল কথা, আমার কারখানা চালু রাখতে হবে।

ঠিকাদার। সে আমি রাখিয়ে দেবো, কিছু ভাববেন না।

মিঃ সেন। ব্যস, তা হ'লেই হ'লো।

ঠিকাদার। আচ্ছা, এখন তা হ'লে আমি উঠিয়ে পড়ি।

মিঃ সেন। আচ্ছা, আসুন তা হ'লে।

নকড়ি। আজকেই তো আবার আপনাকে রওনা হ'তে হবে।

ঠিকাদার। হ্যাঁ, মানে এখন যাব পানিহাটি, সেখানে দু'দিন থাকিয়ে কটক রওনা হব।

নকড়ি। কটক রওনা হবেন? অ···আজগে যাচ্ছেন পানিহাটি! তা বেশ, এদিকে কথাবার্ত্তাও আমাদের পাকাপাকি হ'য়ে থাকলো।

ঠিকাদার। হ্যাঁ, আর ও তো হইয়েই ছিল উন্নার জন্তে আর কি। তবে দেখাটা করিয়ে গেলাম একবার বাবুর সঙ্গ···আচ্ছা তো নমস্তে, নমস্তে।

মিঃ সেন। নমস্তে।

রেবতীবাবু ও মুখুজ্জ্যে। নমস্তে। নমস্তে।

নকড়ি। আমিও চললুম তা হ'লে।

মিঃ সেন। চললে!

নকড়ি। আর···

মিঃ সেন। আচ্ছা এসো।

[নকড়ি ও ঠিকাদারের প্রস্থান।

(বেয়ারার প্রবেশ। স্লিপ দিল)

মিঃ সেন। সেলাম দেও।

[বেয়ারার প্রস্থান।

(সাহেবী পোষাক পরা জনৈক এজেন্টের প্রবেশ। হাতে পোর্টফোলিও)

মিঃ সেন। এই যে আসুন আসুন, বসুন।

এজেন্ট। ভাল আছেন?

মিঃ সেন। এই, তার পর বম্বে থেকে ফিরলেন কবে?

এজেন্ট। পরশু, আবার দিল্লী যেতে হ'লো।

মিঃ সেন। আবার দিল্লী কেন?

এজেন্ট। গোলমাল তো এখনও মেটেনি।

মিঃ সেন। এখনও চলছে গোলমাল?

এজেন্ট। এবারে মিটবে মনে হয়। Deputy Director of Taxation অফিসে খুব তো একচোট হৈ-চৈ করে এলাম। আশা করি হ'য়ে যাবে এবার।···আর হ'য়েছেই সব গদাই লস্করী ব্যাপার!

মিঃ সেন। তা যা বলেছেন।

এজেন্ট। (কতগুলো টাইপ-করা ও ছাপা কাগজ এগিয়ে দিল) দেখেছেন না কি?

মিঃ সেন। কি ব্যাপার?···(কাগজগুলো দেখে) এ তো আমি নিইছি already.

এজেন্ট। নিয়েছেন! বেশ ভাল।···একেবারে নতুন স্কীম।

মিঃ সেন। হ্যাঁ, আর experiment না ক'রলে চলবেই বা কি ক'রে এখন। ঐ জন্তেই তো নিলুম। তা সন্না বাবু আবার এখন আমায় ডিরেক্টরস্ বোর্ডে যেতে বলেছেন···ঐটেই আমার ইচ্ছে নেই।

এজেন্ট। কেন ঢুকে পড়ুন না। আপনারা না ঢুকলে···

মিঃ সেন। বুঝি, কিন্তু সময় ক'রে উঠতে পারবো কি? আপনি তো জানেন নাম-কো-য়াস্তে আমি ডিরেক্টরস্ বোর্ডে থাকতে পারবো না, থাকলে ভীষণ হৈ-চৈ ক'রবো। এখন এদিক ওদিক সব সামলে আবার নতুন একটা ব্যাপারে মাথা গলাব—পেরে উঠবো কি? সেই কথাই ভাবছি।

এজেন্ট। ও খুব পারবেন, খুব হবে। তেমন একটা কিছু ক'রতে না পারেন অন্ততঃ মিটিংগুলোতে attend ক'রলেও তো জিনিষটা হাতে থাকে; নয় তো সব এ ভাটিয়া পারসী আর সিন্ধিয়াদের হাতে চ'লে গেল; বুঝতে পারছেন না?

মিঃ সেন। তা ঠিক। আচ্ছা দেখি কি করি এখনও ঠিক ক'রে ব'লতে পারি না কিছু।

এজেন্ট। (উঠে পড়ে) ঢুকুন ঢুকুন। আপনারা পাঁচ জন ঢুকলে দেশেরও একটা ভবিষ্যৎ থাকে···

মিঃ সেন। আপনি উঠছেন?

এজেন্ট। হ্যাঁ, একটু ঘোরাঘুরি আছে। ঐ জন্তই এসেছিলাম, ভাবছিলুম···তা already নিয়ে ফেলেছেন, বেশ ভালই করেছেন।

মিঃ সেন। হ্যাঁ নিলুম···

এজেন্ট। না, ভাল কাজ ক'রেছেন···দর দেখেছেন এর মধ্যেই।

মিঃ সেন। বেশ ভাল দর উঠছে।

এজেন্ট। আচ্ছা:

মিঃ সেন। আচ্ছা···তার পর চুনের খবর কি? আপনার চুন?

এজেন্ট। চুন···নিশ্চয়ই দেখে থাকবেন।

মিঃ সেন। Fifty-two. I mean Fifty-two, two.

এজেন্ট। আজকের দর?

মিঃ সেন। আজকের দর।

এজেন্ট। একটু একটু করে আবার উঠতে আরম্ভ ক'রেছে।

মিঃ সেন। হ্যাঁ তা উঠছে কিন্তু সে আপনার কোথায় সেভেনটি-টু আর কোথায় ফিফটি-টু—Heaven and hell difference.

এজেন্ট। হ্যাঁ, সে দর উঠতে এখন আপনার···সন্নাবাবু তো হাত কামড়াচ্ছেন!

মিঃ সেন। তা···কামড়াতেই পারেন। তবু বাঙ্গালী brain তাই এখনও চুপ-চাপ আছেন। পাটকেলওয়ালা তো হ'ন্যে শ্যালের মত ছুটে বেড়াচ্ছে সহরময়। এসেছিল কাল আমার এখেনে··· বলে কি না বাবুজী আপ সব লে লিজিয়ে···বুঝুন কাণ্ড হুঁ, আর সন্না বাবু তো···বহুৎ জবরদস্ত লোক বলতে হবে সন্নাবাবু।

এজেন্ট। ওঃ, বহুৎ খুব। উঁ···আচ্ছা চলি।

মিঃ সেন। আচ্ছা ভাই।

(রেবতীবাবু এতক্ষণ কথার ফাঁকে সুবিধে মত মিঃ সেন সাহেবকে দিয়ে কোম্পানীর যাবতীয় কাগজ-পত্রে নাম সই করিয়ে নিচ্ছিলেন! এতক্ষণে কাজ-কর্ম্ম সেরে ফাইল-পত্তর বগলে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন রেবতী বাবু)

(মুখুজ্জ্যের প্রবেশ)

মিঃ মুখার্জ্জি। মঙ্গল মিস্ত্রীর সঙ্গে দেখা হলো।

মিঃ সেন। হুঁ, কি বলে!

মুখুজ্জ্যে। এখনও এলো না এখনও এলো না করছিলাম না, তা সে ব্যাটা দেখি ঠিক এয়েছে। এসে চুপটি ক'রে সিঁড়ির ওপর

গালে হাত দিয়ে ব'সে আছে। আমি তো দেখেই বুঝিছি, ব্যাপার সুবিধে নয়।

মিঃ সেন। তার পর তার পর?

রেবতীবাবু। একেবারে দল-ছাড়া হ'য়ে গেছে বুঝি?

মুখুজ্জ্যে। হ্যাঁ, আমরা যে রকম আন্দাজ করেছিলাম অনেকটা ঐ রকমই। তবে কিছু লোক ভেঙ্গে চ'লে গেছে পণ্ডিতের দলে।

মিঃ সেন। সে তো এক রকম জানাই ছিল। ও মার যে দিন খেয়েছে সেই দিনই আমি বুঝিছি। যা হোক···

মুখুজ্জ্যে। এই তো ব্যাপার, এখন···

মিঃ সেন। কুচ পরোয়া নেই, অত ভাবতে হবে না। ব্যবস্থা যা সে তো আমরা এদিকে মোটামুটি করেই ফেলছি। তুমি বরং নকড়িকে আর একবার খবর করো।

(নেপথ্যে ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। শোনা যায়—মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো, আট ঘণ্টা টাইম কায়েম করো, পুরা রেশনিং চালু কর ইত্যাদি)

মিঃ সেন। আবার গণ্ডগোল কিসের?

রেবতীবাবু। পণ্ডিতের দল ব'লেই মনে হ'চ্ছে।

মিঃ সেন। পণ্ডিতের দল! কারখানার ভেতরে ওদের ঢুকতে দিলে কে?

মুখুজ্জ্যে। ঠিক্ ভেতরে ঢোকেনি, এখনও ফটকের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

মিঃ সেন। কারখানার ভেতরে যেন ওদের কোন মতেই ঢুকতে না দেওয়া হয়। তুমি যাও দারোয়ান আর শান্ত্রীদের গেট আগলাতে বলো। রেবতীবাবু আপনি দেখুন, দাঁড়িয়ে থাকবেন না। কারখানার ভেতরে কোন রকম হাঙ্গামা আমি কোন মতেই বরদাস্ত ক'রতে রাজী নই, কিছুতেই না।

[রেবতীবাবু ও মুখুজ্জ্যের প্রস্থান।

(মিঃ সেন হন্তদন্ত ভাবে টেলিফোনটা মুখের কাছে তুলে নিয়েই কি একটা নম্বর ব'লে যেন চেঁচিয়ে উঠলেন। তার পর হঠাৎ আবার কি মনে করে রিসিভারটা চেপে ধ'রে ফোনটা নামিয়ে রাখলেন)

Hallo, give me Regent 53890, Yes Regent 53890.···(হঠাৎ রিসিভারটা চেপে ধ'রে) Perhaps not yet, not yet, O. K. Let see.

(চারদিক থেকে আওয়াজ ওঠে—ইন্‌কিলাব, জিন্দাবাদ। মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো। আট ঘণ্টা টাইম চালু করো, পুরা রেশনিং দেনে হোগা)

মিঃ সেন। দেনে হোগা! What an idea.

(মুখুজ্জ্যের প্রবেশ)

মুখুজ্জ্যে। ওরা আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চাইছে।

মিঃ সেন। ওরা, কারা ওরা যে আমায় ওদের সঙ্গে কথা বলতে হবে? কে ওদের ফ্যাক্টরী-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকতে permission দিলে!···Cheek.

মুখুজ্জ্যে। ফ্যাক্টরী-কম্পাউণ্ডের মধ্যে ওরা বাধা দেবার আগেই ঢুকে প'ড়েছিল; আর তা ছাড়া···

মিঃ সেন। রেবতীবাবু গেলেন কোথায়?

মুখুজ্জ্যে। রেবতীবাবু ওদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ক'রছেন।

মিঃ সেন। বেশ তো, তাঁকেই কোম্পানীর পক্ষ থেকে আলাপ-আলোচনা ক'রতে বলো না।

মুখুজ্জ্যে। সে কি ক'রে সম্ভব হয়! তারা আপনার সঙ্গে দেখা ক'রতে চায়। কি সব বক্তব্য আছে···

মিঃ সেন। বেশ তো নিয়ে এসো। তবে দু'-তিন জনের বেশী লোককে যেন ঢুকতে দিও না ভেতরে।

মুখুজ্জ্যে। না, ঐ দু'-তিন জনাই দেখা ক'রবে; পণ্ডিত আছে আর অন্য তিনেক ইউনিয়নের লোক।

মিঃ সেন। পণ্ডিতও আছে না কি? উঁ!···বেশ ডাকো।

[মুখুজ্জ্যের প্রস্থান।

দুধ কলা দিয়ে সাপ পুষে এসেছি এত দিন···

(বাইরে ভীষণ হট্টগোল। রেবতীবাবু, মুখুজ্জ্যে ও অন্য কয়েক উচ্চপদস্থ কর্মচারীর প্রবেশ। পেছনে পণ্ডিত ও কয়েক জন শ্রমিক-প্রতিনিধি)

রেবতীবাবু। আপনাদের ভেতরে কথা বলবেন কে?

পণ্ডিত। কথা—আমি বলতে পারি।

মিঃ সেন। বলতে পারি না, যে পারে সে এগিয়ে আসুক।

(পণ্ডিত এগিয়ে যায়)

কি বলতে চাও?

পণ্ডিত। বলবার বিষয়বস্তু যা তা এই চিঠির ভেতরেই পরিষ্কার ক'রে বলা আছে। মৌখিক শুধু এই কথাটাই শ্রমিকদের পক্ষ থেকে আমার আপনার কাছে বলবার আছে, অবিশ্যি এ বিষয়েও যথারীতি উল্লেখ করা হ'য়েছে চিঠির মধ্যে—তবু বলছি যে ছাঁটাই যদি বন্ধ হয় তা হ'লে আমরা এখনও আগেকার মত কাজ করতে রাজী আছি। আর—

মিঃ সেন। যাক্ গে, চিঠিতে যখন mention করাই আছে তখন এ কথা আর নতুন ক'রে বলবার কোন প্রয়োজন নেই। আর ছাঁটাই বন্ধ হ'লে কাজ আরম্ভ করবো—এটা কোন সর্ত্ত হ'তে পারে না।···আর কিছু বক্তব্য আছে!···(চিঠি দেখে) মাত্তর চল্লিশ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সদুত্তর চাওয়া হ'য়েছে, উত্তরটা সৎ নাও হ'তে পারে। কারণ এই সামান্য সময়ের মধ্যে ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মিটিং বল করা এক রকম অসম্ভব।

পণ্ডিত। দু' দিনে চব্বিশ চব্বিশ আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে গেছে। সাত-আট শ' মজুর তা হ'লে আর কত ঘণ্টা উপোষ ক'রে থাকলে আপনার ডিরেক্টরস্ বোর্ডের মিটিং হ'তে পারে?

মিঃ সেন। না খেয়ে আমি থাকতে বলিনি।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, বলেননি কিন্তু ঘটিয়েছেন।

মিঃ সেন। আমি তর্ক ক'রতে চাই না।···আর কোন বক্তব্য আছে?

পণ্ডিত। না।

মিঃ সেন। তোমরা যেতে পারো।

(শ্রমিক-প্রতিনিধি দল গমনোদ্যত)

নেপথ্যে—ইনকিলাব জিন্দাবাদ, মজুর ছাঁটাই বন্ধ কর ইত্যাদি

(পটক্ষেপ)

৪র্থ অঙ্ক

তৃতীয় দৃশ্য

মিঃ সেনের নিজ বাড়ী। সামনে বাগান। বাড়ীর নাম **Reverie.** দোতলার খোলা গাড়ী-বারান্দার উপর সুচিত্রাকে পায়চারী ক'রতে দেখা যাচ্ছে আপন মনে। চুল রুক্ষ, দৃষ্টি উধাও—মনের ঝড় এত দিনে যেন সারা মুখখানিতে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে।

পর্দ্দা ওঠবার পর থেকে নেপথ্যে যে চাপা একটা গোলমাল শোনা যাচ্ছিল, এখন সেটা তুমুল হট্টগোল হ'য়ে উঠলো। সেন সাহেবের স্বপ্ন-সৌধকে চার দিক থেকে কারা যেন অবরোধ ক'রছে মনে হ'লো। ক্রমে সব ব্যাপারটাই পরিষ্কার হ'য়ে উঠলো। ধর্ম্মঘটী শ্রমিকরা সব বিক্ষুব্ধ ঘেঁটিয়ে এসে সেন সাহেবের বাড়ীর চার দিকে বিক্ষোভ ক'রছে। শ্লোগান উঠছে, মজুর ছাঁটাই বন্ধ করো। মিল-গেট, খোল দেও। মজদুরোঁকো দাবী কায়েম করো, ইনকিলাব জিন্দাবাদ ইত্যাদি। একটু পরেই দেখা যায় জন-কয়েক শ্রমিক-প্রতিনিধি পণ্ডিতের নেতৃত্বে সেন সাহেবের বাড়ীর আঙ্গিনায় ঢুকে স্বয়ং সেন সাহেবের তলব ক'রছে। দরোয়ান অবিশ্যি বাধা দিয়েছিল কিন্তু সুচিত্রা দেবীর উপস্থিতির দরুণ দরোয়ান গেট ছেড়ে স'রে দাঁড়িয়েছে।

সুচিত্রা। কে, কারা?

(এক ছুটে ওপর থেকে বাগানে নেমে এলো)

এই দরোয়ান, গেট খুলে দাও।···আসুন আপনারা, ভেতরে আসুন।

(মঞ্চের বাঁ দিক থেকে কেয়ারি-করা পথ ধ'রে পণ্ডিত ও জনাকয়েক শ্রমিক-প্রতিনিধির প্রবেশ)

পণ্ডিত। নমস্কার।

সুচিত্রা। নমস্কার। বলুন, আপনারা কি চান বলুন?

পণ্ডিত। লেবার ইউনিয়নের পক্ষ থেকে আমরা একটা ডেপুটেশনে আসছি।

সুচিত্রা। ও, তা উদ্দেশ্যটা জিজ্ঞাসা ক'রতে পারি কি?

পণ্ডিত। উদ্দেশ্য সেন সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করা।

সুচিত্রা। কারখানায় ধর্ম্মঘটের নোটীশ কি আপনারাই দিয়েছেন?

পণ্ডিত। আজ্ঞে হ্যাঁ।

সুচিত্রা। তা বেশ তো ধর্ম্মঘটের নোটীশ দিয়েছেন—ধর্ম্মঘট ক'রবেন। সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কি আছে।···বলুন না আমায়। আমি হয় তো···আপনাদের কাজে কিছু সাহায্য ক'রতে পারি। আমার দুর্ভাগ্য—সেন সাহেব আমার স্বামী।··· যা হোক, দেখা ক'রতে চাইছেন কেন?

পণ্ডিত। চাইছি কেন মানে, দেখা করে একটা ফয়শালা না হলে কারখানায় হয় তো একটা ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হতে পারে।

সুচিত্রা। কেন, সংক্ষেপে তাড়াতাড়ি বলুন!

পণ্ডিত। মানে এখন ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে ধর্ম্মঘট যারা ক'রেছে···ক'রেছে, কিন্তু কোম্পানী এখন সেই ধর্ম্মঘট ভেঙ্গে দেবার জন্তে অন্য দেশ থেকে নতুন মজুর আনিয়ে কারখানা চালু ক'রছে। ফলে আমাদের মধ্যে ভীষণ অসন্তোষের সৃষ্টি হ'য়েছে। এবং এই রকম অবস্থা আর দু'-এক দিন চলতে থাকলে দু' দলে সম্ভবতঃ একটা ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামা হ'তে পারে।···আমাদের এখন সাহেবের কাছে বক্তব্য এই যে, কারখানা লক্ আউট করে কোম্পানী ভেতরে ভেতরে যে কারখানা চালু রাখবার সংকল্প করেছে, সেটা পলিসির দিক থেকে অত্যন্ত ভুল হবে। কেন না, লক্ আউট আজ হোক কাল হোক আমাদের ভেঙ্গে ফেলতেই হবে, নইলে এই ধর্ম্মঘটের ফলে আমাদের বিলকুল শ্রমিক রুজী-রোজগার হারিয়ে না খেতে পেয়ে মরতে বসবে। সে কিছুতেই হতে পারে না। অন্য দিকে লক্ আউট ভাঙ্গতে গেলেই গণ্ডগোলের সৃষ্টি হবে; উভয় পক্ষে অনর্থক কতগুলি লোক খুন-জখম হবে। তাই সাহেবের সঙ্গে দেখা করে জিনিষটা যদি আপোষে মিটিয়ে ফেলা যায় তা হলে আর কোন হাঙ্গামাই হয় না। অন্ততঃ পক্ষে মিলের ভেতর থেকে যে সমস্ত মজুরভাই আমাদের বেরিয়ে আসতে চাইছে, তাদেরও যদি ছেড়ে দেওয়া হয় তা হলেও অবস্থার খানিকটা উন্নতি হবে। নয় তো আমরা ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলছি। আপনি বুঝবেন কি না জানি না—এই ধর্ম্মঘট বানচাল হয়ে গেলে আমরা প্রায় দু' হাজার মজুর বিপন্ন হবো। সামনে দুর্ভিক্ষ, প্রত্যেকেরই ছেলেপুলে পরিবার আছে, সুতরাং এ সমস্যা আমাদের জীবন-মরণ সমস্যা। তাই সেন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার এত প্রয়োজন। আপনি··· আপনি একটু সহানুভূতি প্রকাশ ক'রলেন বলেই আপনার কাছে এত কথা বলে গেলাম—দোষ-ত্রুটি হলে মার্জ্জনা করবেন। এখন···

সুচিত্রা। আমি আপনাদের দাবীর সবটাই সমর্থন করি। কিন্তু প্রত্যক্ষ ভাবে আমি আর আপনাদের কাজে কতটুকু সাহায্য করতে পারি বলুন! সেন সাহেবের সঙ্গে আপনারা দেখা করবেনই বলছেন, কিন্তু উনি কি দেখা করবেন? আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি একটু চেষ্টা করে দেখি! আমি ডেকে পাঠালে আপনারা···

(হঠাৎ দোতালার গাড়ী-বারান্দার ওপর থেকে সেন সাহেবের গলা ফেটে পড়ে)

মিঃ সেন। সুচিত্রা, সুচিত্রা!

সুচিত্রা। (উদ্‌ভ্রান্তের মত) ঐ যে সেন সাহেব, যান, যান আপনারা ওপরে যান। এক্ষুনি হয় তো পালিয়ে যাবে। যান উঠে যান আপনারা ঐ সামনের সিঁড়ি দিয়ে।

মিঃ সেন। কি করছো কি সুচিত্রা?

(পণ্ডিতের দল একটু হকচকিয়ে এগিয়ে যায়)

সুচিত্রা। যান, দেরী করছেন কেন আপনারা? এক্ষুনি হয় তো পালিয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে সোজা উঠে গিয়ে ধ'রে ফেলুন আপনারা ওকে। এক্ষুনি পালিয়ে যাবে কিন্তু। যান!···এসো, কই তোমরা সব ভেতরে এসো। যাও চ'লে যাও তোমরা ওপরে, আমি বলছি।

(চীৎকার ক'রে শ্লোগান দিতে দিতে এসে শ্রমিকরা সব সেন সাহেবের বাড়ীর আঙ্গিনায় জড়ো হয়। এমন সময় বাড়ীর ভেতর থেকে জনা কয়েক দরোয়ান-গোছের লোক ভিড় সামলাতে এগিয়ে আসে লাঠি হাতে)

দরোয়ান। (চার জনই সমস্বরে) হট হট, যাইয়ে, হট, যাইয়ে,

ইধার কেঁও' যাও, ভাগ। পাগলী কিধার গিয়া, পাগলী কাঁহা! পাগলী! যাও হটো। ফটকসে বাহার নিকলো সব। যাও ভাগ। যাও পিছে বাত হোগা। যাও, নিকলো।

(চলতে চলতে দরোয়ানদের দু'জন সুচিত্রাকে সেন সাহেবের নির্দেশ মত পিছ-মোড়া হাত ক'রে বেঁধে টানতে টানতে ভেতরে নিয়ে যায়)

সুচিত্রা। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমায় তোমরা! ছেড়ে দাও!

মিঃ সেন। নতুন ক'রে ইউনিয়নের কোন ডেপুটেসনের সঙ্গেই আমি আর কথা বলতে রাজী নই। আমি আমার শেষ কথা জানিয়ে দিয়েছি। অপনারা এক্ষুনি আমার বাড়ীর সামনে থেকে স'রে যান; নইলে আত্মরক্ষার জন্যে আমি পুলিসের সাহায্য নিতে বাধ্য হবো।

সুচিত্রা। ছেড়ে দাও তোমরা আমায়। আমি পাগল নই। আমি পাগল নই।

[দৃশ্যপটের মাঝখানে কাটা দরজার পথে দু'জন দরোয়ান ও সুচিত্রার প্রস্থান।

দরোয়ানরা এতক্ষণে মজুরদের সবাইকে বাগানের বাইরে ক'রে দিয়েছে। নেপথ্য থেকে শুধু মজুরদের শ্লোগানগুলোই শোনা যেতে থাকে।

(পটক্ষেপ)

৪র্থ অঙ্ক

চতুর্থ দৃশ্য

প্রথম দৃশ্যের সাজ-সরঞ্জাম। ওপরে নীচে কাটা টীনের পাল্লার নীচ দিয়ে দেখা যাচ্ছে ফুলকি উড়ছে আগুনের আর সশব্দে বেজে চ'লেছে যান্ত্রিক অর্কেষ্ট্রা—ঘট ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট—ঘট ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট, ঘট ঘট্টাং ঘট্টাং ঘট। একটা শিফ্‌টেই কারখানার কাজ চালু রাখা হয়েছে। চুক্তি অনুযায়ী ঠিকাদার যথাসময়ে মজুর ও মেকানিক যোগ দিয়েছে। মঞ্চের ডান দিকে লোহার গেটের সামনে জনা-চারেক সশস্ত্র সান্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে। লিফ্‌টের ধার ঘেঁসে পাক দিয়ে ওপরে ওঠবার সিঁড়ি উঠে গেছে। সিঁড়ির রেলিং'এর গায়ে একটা লাউডস্পীকারের চোঙ্গা লাগানো রয়েছে। মালিক মিঃ সেনের গলা মাঝে মাঝে ফেটে পড়ছে স্পীকারের মারফৎ। বাঁ দিকে দু'টো বিরাট লোহার গরাদওয়ালা গেটের পাল্লার কাছে শত শত মজুর জমায়েৎ হ'য়ে শ্লোগান দিচ্ছে। করিডরের সামনে গজানন অস্থির ভাবে পায়চারি ক'রছে। সিঁড়ির ওপরেও কয়েক জন সশস্ত্র প্রহরীকে দেখা যাচ্ছে। পাথরের মূর্ত্তির মত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। ডান দিকের লোহার গেটটা সামনে পেছনে দুলে-দুলে উঠছে বড়া-পরা পাঞ্জার চাপ খেয়ে।

গজানন। খোল দু' গেট! লেকিন ইয়ে ক্যায়সে বন্ধ! নেমক্-হারামীকা কাম তো নেহি হোগা! লেকিন যো দেখতা হুঁ ওয়াভি তো ঠিক নেহি হ্যায়। উচিত মঙ্গোকে লিয়ে হামারেহি জাতি-ভাই তো লড়াই কর রহে হৈঁ। উনকা ইসমে অন্যায় হি কেয়া হ্যায়। ইনকো তো বহুৎ হ্যায়, লেক্ কেঁও নেহি! যিন লোগোনে ইস্ বড়ে কারখানাকো চালু কিয়া হ্যায়, উনকা কেয়া মুনাফেমে কৈ অধিকার নেহি হ্যায়! এত্তি আদমিয়োঁকি মাঙ্গ কেয়া ঝুট হ্যায়। ইনকো জিনেকা কেয়া অধিকার নেহি হ্যায়! কিন্তু…কিন্তু, তব ম্যাঁয় কেয়া করু…কেয়া করু তব ম্যাঁয়…

(সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—মিল গেট খোল দেও! মজুরোঁকো দাবী কায়েম কর। সরমায়াদারকো জুলুম বন্ধ করো। ইত্যাদি)

মিঃ সেন। (লাউড স্পীকার মারফৎ) আপনারা সব চ'লে যান। অনর্থক মিল গেটের কাছে ভিড় ক'রবেন না। চ'লে যান আপনারা সব। অনর্থক গোলমাল ক'রবেন না।

(জুতো আর ঢিলের বাড়ি লেগে সশব্দে ন'ড়ে উঠলো স্পীকারের চোঙ্গাটা।)

আপনারা ফিরে যান। কারখানায় হামলা ক'রলে কোনই লাভ হবে না। ফিরে যান আপনারা। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই রকম গোলমাল চলতে থাকলে অবস্থা একদম আমাদের আয়ত্তের বাইরে চ'লে যাবে। তখন অনর্থক কতকগুলো প্রাণ বিপন্ন হবে। এখনও ফিরে যান। মিল গেটের কাছে হামলা ক'রবেন না।

(ভীষণ গণ্ডগোলের মাঝখানে আরও কিছু ইঁট পাটকেল চোঙ্গার ওপর পড়তে থাকে। আক্রোশে কে যেন থুথু ছিটোতে থাকে চোঙ্গাটাকে লক্ষ্য করে।)

মিল গেটের দরজার কাছে ভিড় করবেন না। আপনারা মিল-এলাকার বাইরে চলে যান। নইলে অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে।

ভাইয়োঁ, আপ লোগ সব লৌট যাইয়ে। কারখানে পর হামলা মত কিজিয়ে। লৌট যাইয়ে আপ লোগ। এইসে গোলমাল হোনেসে হাম লোগোঁকে হাতসে অবস্থা নিকাল যায়েগী। তব ব্যর্থমে কুচ জিউ মুস্কিলমে পড়েঙ্গে। আভিভি লৌট যাইয়ে। মিল গেটপর হামলা মত করিয়ে। লৌট যাইয়ে…

গজানন। কেয়া খোল দেগা। খোল দেগা ফাটক।

(সমস্বরে ধ্বনি ওঠে—মিল গেট খোল দেও। মজদুরোঁকো দাবী কায়েম কর।)

(বুড়ো গজানন হঠাৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি থেকে শান্ত্রীগুলো ছুটে বেরিয়ে যায় বাঁ দিকের উইংস দিয়ে। নীচের কারখানা থেকে কয়েক জন স্টপরা কর্ম্মচারী দৌড়ে উঠে যায় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে)

জনৈক কর্ম্মচারী। (হন্তদন্ত ভাবে) চ'লে আসুন আপনারা, ওখানে দাঁড়াবেন না। চ'লে আসুন!

[সিঁড়ি-পথে প্রস্থান।

স্পীকার। মিল গেট ছেড়ে দিন। আপনারা সব স'রে যান। অবস্থা আমাদের আয়ত্তের বাইরে চ'লে গেলে অনর্থক কতক-গুলো লোকের প্রাণ যাবে, আপনারা সরে যান মিল গেট থেকে। (নেপথ্যে ভীষণ হট্টগোল শোনা যায়। সেন সাহেবকে চকিতে এক-নজর দোতলার সিঁড়ির মুখে দেখা যায়। কয়েক জন দরোয়ান দোতলা থেকে ছুটে নেমে যায় কারখানার ভেতরে। হট্টগোল চরমে ওঠে। একটু পরেই আহত গজাননকে ধরাধরি করে পণ্ডিত ও জনকয়েক শ্রমিক বাঁ দিকের উইংস দিয়ে বেগে

আকাশকে টুকরো টুকরো কোরে দেখার লোভ

আমার এখনো গেল না—

এখনো আমি জানলার খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে

অনেকগুলো আকাশ দেখি—

আর মনে মনে গুণতে থাকি
'এক, দুই, তিন, চার···'
মাঝে মাঝে ভুলে যাই—জাগি কখন্ আবার।
মাঝে মাঝে পাখি যায়—চিল-শকুন ওড়ে—তাদের ক্ষুদ্র-বিরাট কায়
খড়খড়ির ছোট ছিদ্রে আকাশটা আরো ছিঁড়ে যায়—
আর আমি গুণে চলি
'পাঁচ, ছয়, সাত···'—
এম্‌নি কোরে ভ'রে ওঠে কখন্ দুটি হাত।

• • • •

তবু এ কী মায়া এ নেশা আমার!
এ ঘোরে বিভোর আর কত কাল আমি!
অখণ্ড আকাশের বুক ছিঁড়ে ছিঁড়ে সাধের সৌধ গড়া—
এ কী-এ ভ্রমের ভ্রম!
এ কী-এ বদ্ধ ঘরে অন্তহীন রাত
আগলে-দেয়ালে-চাপা কঠিন বরাত!

★

আকাশ-লীলা

লোকনাথ ভট্টাচার্য

জানি জানি
এ-আগল এ দেয়ালে ও-আকাশ ধরে না।
তাই তো ফাঁকের ফাঁকে যেটুকু চোখে ভাসে,
তাই নিয়ে অন্ত না কল্পনা সার
গুণে চলা বুনে চলা মোলায়েম মেলে ধরা
দুধ-কলা দিয়ে পোষা ভুরি মিথ্যার
ভাবনার ভার।

• • • •

আকাশকে টুকরো টুকরো কোরে দেখার লোভ

আমার এখনো গেল না—

এখনো আমি অনেকগুলো আকাশ দেখি চিল-শকুনের পাখায়
আর খড়খড়ির ফাঁকে ফাঁকে—
আর মনে মনে গুণে চলি
'এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত···'।

তবু জানি এক দিন—অদূরে সে-দিন—কাটবে আমার রাত,
অনাগত মিছিলের অগণ-চরণ-ঘায় সাধের সৌধ আমার
হোয়ে যাবে চুর;
উষার প্রান্তদেশে বিলীন স্বপ্ন-রেশে আমি অনিকেত—
সূর্যপ্রতিম এক অনন্ত আকাশ-লীলায়
শত হংসীর বর্ণালী দেখে
ফিরি মোহ-বিস্ময়ে।

স্থি
পবি

এসে ঢুকলো। পেছনে পেছনে তুমুল হট্টগোলের মধ্যে বহু মজুর ট্রেঞ্জের ওপর দিয়ে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে লাগল। হাতে তাদের আজ কঠিন আবেদনের পরোয়ানা।

(গজাননকে কেন্দ্র করে ঘিরে ব'সল পণ্ডিত ও আরও জনকয়েক মজুর।)

গজানন। (চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে) পচ্চিশ বরষ—পচ্চিশ বরষ ম্যায়নে ইস্ কারখানেকি সেওয়া কী হায়।···আমাথা এক কিশোর হো কর···বচপন গয়া···যৌবন বিতা···ঔর আজ যা রাহাহুঁ বহুৎ বুঢ়া হোকর। হিসাব করনে পর দিয়া হায় তো বহুৎ; লেকিন মিলা কেয়া! কেয়া মিলা!···পণ্ডিতজী, তুম তো বহুৎ ভালে আদমী হো; দুখিওঁকে লিয়ে তুম লড়াই করতে হো, তুম ইসকো সমঝ লেনা। তুম ইসকো সমঝ লেনা।

(জবানবন্দী শেষ ক'রে গজানন এলিয়ে পড়ে। চাদর ঢাকা মৃত-দেহটা তখন তুলে ধরে পণ্ডিত ও আর কয়েক জন মজুর হাতে হাতে। অনেক মজুর ইতিমধ্যেই শবাধারের পেছনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে।

কপুরেখায়িত সিঁড়ি-পথ বেয়ে শ্রমিকদের আরোহণ-পর্ব্ব কিন্তু তখনও থেমে যায়নি।

যবনিকা

পূজার কাপড়

শ্রীঅমলা দেবী

৩

নগেন সাপ্লাই আফিসের দিকে চলিল। সহরের এক প্রান্তে সাপ্লাই আফিস। আগে সহরের মধ্যেই আফিস ছিল। সহরের লোকদের আসা-যাওয়ার সুবিধা ছিল। বড়সাহেবের তাহা সহ্য হয় নাই। তিনি আসিয়াই আফিস তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন।

রাস্তার ধারেই ফুড-কমিটীর আফিসে ভিড় চার গুণ বাড়িয়া উঠিয়াছে, তেমনই ঠেলাঠেলি মারামারি। সেই মেয়েগুলি এখনও এক পাশে দাঁড়াইয়া আছে। ফুড-কমিটীর আফিস পার হইলেই একটা বিস্তৃত পোড়ো জমি। তাহার উপরে কয়েকটা বিরাট আকারের সরকারী গুদাম-ঘর। সরকারী চালের কন্‌ট্রাক্টার হাজার হাজার মণ চাল এখানে জমা করিয়া রাখে। বেশী দামের লোভে চাষী চাল বিক্রয় করে। ব্যবসায়ী মোটা লাভে সেই চাল জনসাধারণকে বিক্রয় করে। চাষীর দারিদ্র্য ঘুচে না, দুর্মূল্যের বাজারে জীবনযাত্রার অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কিনিতে লব্ধ অর্থ দু'দিনে ফুরাইয়া গিয়া মহাজনের কাছে ঋণ করিতে হয়; ব্যবসায়ীর টাকা ব্যাঙ্কে ফাঁপিয়া উঠিতে থাকে; আগেকার দামের পাঁচ-গুণ দাম দিয়া চাল কিনিতে কিনিতে জনসাধারণের জিভ্ বাহির হইয়া আসে। যাহাদের কিনিবার সামর্থ্য নাই, তাহারা ভিক্ষা করে, ভিক্ষা না জুটিলে না খাইয়া মরে।

আরও কিছু দূর গিয়া পাশেই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কুঠী। প্রায় পঞ্চাশ বিঘা জমি জুড়িয়া কম্পাউণ্ড—মাঝখানে প্রকাণ্ড বাড়ী। কম্পাউণ্ডে বিস্তর লোক জমা হইয়া কলরব করিতেছে। জন-কয়েক প্যাণ্টলুনধারী যুবক তাহাদের শান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। ছোকরাগুলির কথা মনে পড়িল নগেনের—জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অভিযান। জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কালসার চেহারা সকলেরই;—পরনে মলিন ছিন্ন বস্ত্রখণ্ড। পরিধেয়ের প্রয়োজন পার হইয়া পশুত্বের স্তরে নামিয়াছে ইহারা। এক মুঠা খাদ্য পাইলেই পরিতৃপ্তি মানিবে।

নিজের কথা ভাবিল নগেন। সে ও তাহার মত হাজার হাজার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ দ্রুত এই অবস্থার দিকে নামিতেছে। দেশের অবস্থা বৎসর কয়েক এই ভাবে চলিলে বিস্তর মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হইবে। জীবনের যত আশা, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও কল্পনা কোথায় মিলাইয়া যাইবে; মান-মর্য্যাদা, বহু পুরুষ ধরিয়া আয়ত্ত হৃদয়ের সদ্‌বৃত্তি ও সংস্কৃতি জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডের মত টুক্‌রা-টুক্‌রা হইয়া খসিয়া পড়িবে, এক মুঠা অন্ন জুটিলেই জীবন ধন্য মানিবে।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নগেন চলিতে লাগিল। রাস্তায় বহু লোক চলিয়াছে—প্রায় সকলেই পদব্রজে, অনেকে রিক্সায় ও সাইকেলে, দু'-চার জন মোটরে। সকলেই এক যায়গার যাত্রী; চলিতে চলিতে সকলেরই এক আলোচনা,—কাপড় চাই, চিনি চাই, কেরোসিন চাই। সকলেরই সন্দেহ—পাওয়া যাইবে কি? সকলেরই কথাবার্ত্তায় বড়সাহেব-ভীতি প্রকাশ পাইতেছে।

নগেনেরও ভয় কম হইতেছে না। লোকটার আকৃতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছে, তাহাতে সে যে ভালয়-ভালয় তাহার কবল হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে, সে ভরসা নাই। অপমান, গালাগালি করিয়া ছাড়িয়া দেয় তো ভাল—এ বয়সে মার-ধর সহিবে না। শবদাহের সময় দাহকারীরা দেহটাকে চিতার আগুনে দগ্ধ করিয়াই নিশ্চিন্ত হয় না, দ্রুত নিঃশেষ দাহনের জন্য লগুড়াঘাত করে। সারা দেশের লোককে চিতাশয্যায় তুলিয়া দিয়াও তেমনই সরকারের সোয়াস্তি নাই; দেশী ও বিদেশী রাজকর্ম্মচারীদের হাতে লাঞ্ছনার লগুড়াঘাতের ব্যবস্থা করিয়াছে। না হইলে যে লোকগুলা বিদেশী, বিজাতীয়, বাঙ্গালার জাতি বলিয়া যাহাদের ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধার সীমা নাই, বাঙ্গালীর নাম করিলে যাহাদের নাসিকা কুঞ্চিত হয়, বাঙ্গালীর, বিশেষ করিয়া মধ্যবিত্ত বাঙ্গালীর জীবনযাত্রার মান যাহাদের কাছে অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত এবং তাহাদের সামাজিক মর্য্যাদা, স্ত্রী-কন্যার সম্ভ্রম যাহাদের কাছে উপহাসের বিষয়, দেশের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ নিয়ন্ত্রণের ভার তাহাদের হাতে দেওয়া হইয়াছে কেন? দেশের লোকের দুঃখ-দুর্দ্দশা ঘুচাইবার সাধ্য এক ভগবান ছাড়া আর কাহারও নাই, তবু কর্ত্তৃপক্ষের কাছে একটুখানি সততা ও সহৃদয়তা পাইবার দাবীও কি দেশের লোকের নাই?

সাপ্লাই আফিস চিনিতে কষ্ট হইল না। রাস্তার ধারে এক সুবিস্তৃত কম্পাউণ্ডের মধ্যে দোতলা বাড়ীতে আফিস। সামনে রাস্তায় সারি-সারি রিক্সা ও মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। কম্পাউণ্ডের মধ্যে লোকে লোকারণ্য। গাড়ী-বারান্দায় একটা দামী ঝকঝকে কালো মোটর দাঁড়াইয়া। দোতলায় উঠিবার দরজার সামনেই এক জন উর্দ্দি ও চাপরাশ-আঁটা আর্দ্দালী খাড়া দাঁড়াইয়া আছে।

এত লোক-সমাগম, কিন্তু লেশমাত্র গোলমাল নাই। সকলেই ফিস-ফিস করিয়া কথাবার্ত্তা বলিতেছে। অসাবধানে কাহারও কণ্ঠস্বর ক্ষীণমাত্র শুনা যাইলে সকলে সতর্ক করিবার জন্য বলিয়া উঠিতেছে—চুপ, চুপ—বড়সাহেব—! চারি দিকে এই সন্ত্রস্ত স্তব্ধতার মধ্যে নগেনের বুক দমিতে লাগিল। একবার মনে হইল—এখান হইতে চলিয়া গিয়া কালোবাজারে চেষ্টা করাই ভাল। পরক্ষণেই নিজের শীর্ণ সম্বলের কথা স্মরণ করিয়া মনকে সাহস দিল—ভয় কি? এত লোক আসিয়াছে, দিক আর নাই দিক চেষ্টা করিয়া দেখাই তো উচিত।

ইতস্ততঃ ঘুরিতে ঘুরিতে এক যায়গায় আসিয়া নগেন দেখিল—একটা গাছের নীচে এক জন লোক শতরঞ্চী পাতিয়া বসিয়া আছে এবং তাহাকে চারি ধারে ঘেরিয়া অনেক লোক কেহ বসিয়া, কেহ দাঁড়াইয়া; অধিকাংশই পাড়াগেঁয়ে চাষী-বাসী নিরক্ষর লোক—ঐ লোকটাকে দিয়া দরখাস্ত লেখাইতেছে। নগেন নিজের বুক-পকেটে হাত দিয়া তাহার দরখাস্তখানি যথাস্থানে নিরাপদে আছে কি না দেখিয়া লইল। এক জন লোককে জিজ্ঞাসা করিল—"বড়সাহেবের সঙ্গে দেখা করে কি দরখাস্ত দিতে হবে?"

লোকটা ভ্রূ তুলিয়া, চোখ বড় করিয়া, জিভ কাটিয়া কহিল—"সর্ব্বনাশ! ও কাজ করবেন না। বড়সাহেবের কাছে যাওয়া কি যার তার সাধ্য!"

নগেন ঢোক গিলিয়া কহিল—"তবে?"

লোকটি কহিল—"আপনাদের গাঁয়ের 'পণ্ডা' কে?"

নগেন সবিস্ময়ে কহিল—"সে আবার কে?"

লোকটা মুচকি হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"হবেই হয়েছে

আপনার। কোথায় বাড়ী—উত্তরে না দক্ষিণে ?"—বলিয়া ডান হাতটা প্রথমে উত্তর দিকে, পরে দক্ষিণ দিকে বাড়াইল।

নগেন কহিল—"উত্তরে।"

লোকটা কহিল—"ওদিকের পণ্ডা কে তা' তো জানি না—তবে আমাদের"—ডান হাত বাড়াইয়া কহিল—"ঐ যে—মুনসী মশায়ের পাশে বসে লেখাচ্ছে। আমাদের গাঁয়ের পাশের গাঁয়ে ঘর—নাম গগন মিত্তির, ভারী চালাক; লেখাপড়া জানে, ইঞ্জিরী বলতে পারে, লিখতে পারে; আমাদের সব কাজ করে দেয়; ফিং লাগে—যার যত টাকার জিনিষের দরখাস্ত তার তেমনই ফিং—" হাসিয়া কহিল—"আমরা পণ্ডা বলি ওনাকে—তিত্থির থানে যেমন পণ্ডা থাকে না তেমনই আর কি? এখানটা তো আজ কাল লোকের তিত্থিস্থান হয়ে দাঁড়িয়েছে,—সাহেবরা হোল দেবতা; দেবতা দর্শন তো পণ্ডা ছাড়া হয় না, পুণ্যিলাভও হয় না।"

নগেন কহিল—"আমাদের ওদিকের ও-রকম কোন লোক আছে কি না জানি না তো।"

লোকটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"আছে বৈ কি। নিশ্চয় আছে, খুঁজে দেখুন ভাল করে—"

নগেন পাণ্ডা খুঁজিবার জন্য চলিল। দু'-চার জনের সঙ্গে দেখা হইল—যাহারা নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নহে, শুদ্ধ পরচিন্তায় আসিয়াছে বলিয়া মনে হইল। চোখ ও মুখ চাতুর্য্যে চকচক্ করিতেছে। কিন্তু কি ভাবে তাহাদের সহিত আলাপ করিতে হইবে, নগেন বুঝিতে পারিল না। গাড়ী-বারান্দার ডান পাশটায় হাজির হইল নগেন। দেওয়ালে আঁটা পাশাপাশি কতকগুলা কাঠের বাক্স,—বিভিন্ন বাক্সের মাথায় বিভিন্ন জিনিষের নাম লেখা, দরখাস্ত বাক্সের মধ্যে ফেলিয়া দিতে হয়। নগেনের মনে হইল, সাহেবের সহিত সরাসরি দেখা না করিয়া দরখাস্ত বাক্সে ফেলিয়া দেওয়াই ভাল, তার পর যা হইবার হইবে। কিন্তু দরখাস্ত যে সাহেবের কাছে পৌছাইবে, তাহার স্থিরতা কি? পৌছায় না বলিয়াই তো লোকে পাণ্ডার শরণাপন্ন হয়। হঠাৎ দেখিতে পাইল, বড় সাহেবের আর্দ্দালী বুক চিতাইয়া দাঁড়াইয়া মিলিটারী কায়দায় কুর্নিশ করিতেছে; সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলেন বড় সাহেব—লম্ব-চওড়া দেহ; একটি বর্গক্ষেত্রের নীচে একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ বসাইয়া, ত্রিভুজের শীর্ষদেশ গোল করিয়া কাটিয়া লইলে যেমন দেখায়, মুখের গঠন অনেকটা তেমনি, খাড়া নাক, পরিপুষ্ট গোঁফ—গোঁফের প্রান্তদ্বয় ক্রমাগত তা' দেওয়ার ফলে সূক্ষ্মাগ্র, পরিধানে খাকীর সার্ট, গাঢ় নীল রংএর শার্টের উপরে পাঁশুটে রংএর কোট, খয়ের রংএর শাদা ডোরা-ওয়ালা টাই, পায়ে ব্রাউন রংএর ডবল মোজা ও জুতা। তার পিছনে এক জন মারওয়াড়ী ব্যবসায়ী, বেঁটে, মোটা—পরিধানে ধুতি, গায়ে মটকার লম্বা কোট, মাথায় পাগড়ী, পায়ে পাম্প-শু। তার পিছনে এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক—বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ, দীর্ঘ দোহারা চেহারা, গায়ের রং ফর্সা, মুখের গঠন লম্বাটে, গোঁফ-দাড়ী পরিষ্কার করিয়া কামান, মুখের ভাবে বড়-মানুষী, অহমিকা সুপ্রকট। পরিধানে—দেশী মিহি ধুতি, গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী, পায়ে পেটেণ্ট লেদারের গ্রীসিয়ান স্লিপার, লম্বা পরিপাটী করিয়া কুচি দেওয়া কোঁচার প্রান্তভাগ ডান হাতে ধরা।

সকলে মোটরে আসিয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ মোটর ছাড়িয়া দিল।

সাহেবকে যাইতে দেখিয়া নগেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল। যাক্, বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে না। মুসলমান হোক, ছোট সাহেব বাঙ্গালী, বুঝাইয়া বলিলে বুঝিবে।

বড় সাহেবের গাড়ী ফটক হইতে বাহির হইতেই খাস আর্দ্দালী টুলের উপর জাঁকিয়া বসিয়াছে। মুখের ভাব নিরতিশয় গম্ভীর। সে যে এখানে এক জন 'কেউ কেটা' নয় হাবে-ভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।

নগেন ধীরপদে আর্দ্দালীর সামনে গিয়া হাজির হইল। বার কয়েক ঢোক গিলিয়া কহিল—"আদাব আর্দ্দালী সাহেব!" আর্দ্দালী মুখ ফিরাইল; পদমর্য্যাদার প্রাখর্য্য বিন্দুমাত্র স্তিমিত হইল না। নগেন কহিল—"একবার ভিতরে যেতে চাই।"

আর্দ্দালী ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"না, হুকুম নাই"—বলিয়াই মুখ ফিরাইয়া লইল। নগেন বুক-পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিয়া, একটি সিকি লইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল—"এই সামান্য কিছু পান খাবার জন্যে—"

আর্দ্দালী আড় চোখে দেখিয়া লইল, তারপর নগেনের দিকে মুখ ফিরাইয়া, ভ্রূকুটি করিয়া কড়া গলায় কহিল—"কি মনে করছেন আমাকে—ঝাড়ুদার, মেথর?"

নগেন ভীত হইয়া উঠিয়া কহিল—"ছি: ছি:, তা কি মনে করতে পারি? আমি নূতন এসেছি, রেট-টেট কিছু জানি না—" বলিয়া সিকিটি ঢুকাইয়া একটি আধুলি বাহির করিতেই আর্দ্দালী কহিল—"তাই মালুম হচ্ছে বটে! না হলে তামাম লোক জানে কার কি রেট,—আমার আট আনা, ছোট সাহেবের আর্দ্দালী খলিলের চার আনা।" আধুলিটি পকেটে পুরিয়া কহিল—"ঐ দোতলায় যাবার সিঁড়ি—সোজা চলে যান; উঠেই বাঁ দিককার ঘরের সামনে খলিল আছে, আমার নাম করে বলবেন দেখা করিয়ে দেবে।"

দোতলায় ছোট সাহেবের কামরার সামনে খলিল দাঁড়াইয়াছিল, নগেনকে দেখিয়া কহিল—"কি চান?"

নগেন কহিল—"ছোট সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

খলিল বলিল—"দেখা করে কি হবে? দরখাস্ত এনেছেন তো বাক্সে ফেলে যান গে।"

নগেন কহিল—"ঘরে কাপড়-চোপড় কিছুই নাই বুঝিয়ে বলতে চাই সাহেবকে।"

খলিল কহিল—"ওতে কিছু ফয়দা হবে না, সাহেব উল্টো গোসা করবেন; এখনই যা' পেতেন তা-ও পাবেন না।"

নগেন সানুনয়ে কহিল—"যেমন করেই হোক একবারটি দেখা করিয়ে দিতে হবে, ভাই সাহেব!"

খলিল ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তা' আমি পারব না, আমার উপরে কড়া হুকুম, কাউকে যেন ঢুকতে দেওয়া না হয়।"

পরদার ফাঁক দিয়া নগেন দেখিল—ঘরের ভিতরে জন-কয়েক লোক বসিয়া ও দাঁড়াইয়া আছে। কহিল—"ভিতরে তো লোক রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।"

খলিল বিরক্তির সহিত কহিল—"থাকবেন না কেন? সাহেবের হুকুম নিয়ে ঢুকেছে সব।"

নগেন সিকিটি বাহির করিয়া খলিলকে দিবে কি না চিন্তা করিতে

লাগিল। খলিল কহিল—"আপনি এখানে দাঁড়িয়ে থাকবেন না, সাহেব দেখতে পেলে বহুত হাঙ্গামা করবে—"

নগেন সিকিটি বাহির করিয়া খলিলের হাতে দিতেই—সে সেটি পকেটে পুরিয়া কহিল—"আপনি নেহাৎ ছাড়বেন না দেখছি, তা এক কাজ করুন, আমি সরে যাচ্ছি—আপনি ঢুকে পড়ুন। যদি জিজ্ঞাসা করে—আমি বাইরে আছি কি না; বলবেন—না।"—বলিয়া খলিল সরিয়া পড়িল।

নগেন ঘরে ঢুকিল। ঘরটি বেশ বড়, আশে-পাশে শাসি-খড়খড়িওয়ালা বড় বড় জানালা। সামনের দেওয়াল ঘেঁসিয়া ছোট সাহেব বসিয়া, সামনে সেক্রেটারিয়েট টেবিল, তাহার উপরে আফিস-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র ও সাজ-সরঞ্জাম। ছোট সাহেব বেঁটে, কাহিল, গায়ের রং ফর্সাই, মাথার চুল ঈষৎ কোঁকড়ান—ছোট ছোট করিয়া ছাঁটা—তাহাতেই বাঁকা তেরী; দাড়ী পরিষ্কার করিয়া কামানো—শুধু নাকের নীচে গোঁফের সূক্ষ্ম ডবল ব্র্যাকেট; চোখে চসমা; পরিধানে খাঁকী রং-এর পুরা প্যাণ্টলুন, গায়ে ঐ রংএরই মিলিটারী কোট। টেবিলের ডাইনে ও বামে বসিয়া আছে দুই জন লোক—চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া অ-বাঙ্গালী বলিয়া মনে হয়; সামনে চেয়ারে বসিয়া এক জন সাহেবী পোষাক-পরা বাঙ্গালী যুবক সিগারেট টানিতেছে। যুবকটির পিছনে কতকটা দূরে দুই জন লোক করজোড়ে ত্রস্তমুখে দাঁড়াইয়া আছে।

ছোট সাহেব অতি মোলায়েম কণ্ঠে বাঙ্গালী যুবকটিকে বলিতেছেন—"কত দরকার বলুন দেখি?"

যুবকটি এক চোখ বুজিয়া সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়িয়া কহিল—"ত্রিশ গজের কম তো হবে না—বাবা-মণির জন্যেই তো চাই কুড়ি গজ। আচ্ছা, আপনাদের সেলুলা আছে, সিল্ক টুইল? পপলিন? দিন না দশ গজ করে; ছোট দি-মণির জন্যে আদ্দিও চাই কতকটা।"

ছোট সাহেব মৃদু হাসিয়া কহিলেন—"জানি, আমাকে বলেছিলেন সেদিন; আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি দোকানে—" বলিয়া ফস করিয়া একটা কাগজ টানিয়া খচ্‌খচ্‌ করিয়া লিখিয়া যুবকটির হাতে দিয়া কহিলেন—"এই চিঠিটা নিয়ে দোকানে গিয়ে যা' যা' দরকার নিন গে।"

যুবকটি কহিল—"পারমিট?"

ছোট সাহেব চোখ কুঁচকাইয়া, মাথায় ঈষৎ ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন—"হবে এখন, ওর জন্যে চিন্তা নাই।"

—"থ্যাঙ্কস্‌! চাল তা'হলে, এখন; সন্ধ্যেয় যাচ্ছেন নিশ্চয়, গুড বাই!" বলিয়া যুবকটি উঠিয়া বাহির হইয়া যাইতেই যে লোক দুইটা এতক্ষণ দূরে দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা একটু কাছে সরিয়া দাঁড়াইল। ছোট সাহেব বড়া গলায় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি চাই তোমাদের?"

লোক দুইটা একে একে যেমন করিয়া লোকে শিবের মাথায় জল ঢালে ঠিক তেমনি ভাবে, প্রসারিত ডান হাতের কনুইএর নীচে বাম করতল ঠেকাইয়া, সসম্ভ্রমে ও সন্তর্পণে তাহাদের পারমিট দুইটা টেবিলের উপরে রাখিল। এক জন কহিল—"হুজুর, দু'খানা সাড়ি একখানা ধুতি চেয়েছিলাম—তিন গজ মশারির কাপড় দিয়েছেন।"

ছোট সাহেব তাহার পারমিটটা পড়িয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"তা' আমি কি করব? যা' পেয়েছ নিয়ে নাও গে।"

লোকটা কহিল—"হুজুর, মেয়েরা ল্যাংটো ঘুরে বেড়াচ্ছে, মশারির কাপড় নিয়ে কি করব?"

ছোট সাহেব রসিকতা করিয়া কহিলেন—"মশারি টাঙিয়ে শুয়ে থাকবে সবাই মিলে।"—বলিয়া অবাঙ্গালী লোক দুইটার দিকে তাকাইয়া হাসিলেন। তাহাদের এক জন হ্যা-হ্যা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—"আচ্ছা বলিয়েছেন!" আর এক জন কহিল—"তিন গজে তো মশারি হয় না, তা' ছাড়া চাল—"

ছোট সাহেব লোকটার দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"তা' হলে বোরখা করগে তিনটে—তোমার একটা আর মেয়েদের দু'টো।"

বেয়াকুব লোকটা ছোট সাহেবের রসিকতার রসোপলব্ধি করিতে পারিল না, সখেদে কহিল—"হুজুর হিন্দুর মেয়ে বোরখা পরবে?"

সাহেব অবজ্ঞার সুরে কহিলেন—"অভাবের সময়ে হিন্দু-মুসলমান তফাৎ নাই; যা পাবে পরতে হবে, না হলে উলঙ্গ থাকতে হবে।"

লোকটা ব্যাকুল কণ্ঠে কহিল—"হুজুর, এক ছিলে গোটা কাপড় নাই ঘরে, বউ, মেয়ে ঘর হতে বার হতে পারছে না, গামছা পরে আছে।"

ছোট সাহেব সিগারেট খাইবার জন্য পকেট হইতে সিগারেট-কেশ বাহির করিবার উপক্রম করিতেই অ-বাঙ্গালী লোক দুইটা হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, এক জন ঝটিতি পকেট হইতে রূপার সিগারেট-কেশ বাহির করিয়া, খুলিয়া, সসম্ভ্রমে ছোট সাহেবের সামনে ধরিল; আর এক জন তাহার লম্বা-কোটের পকেট হইতে বাহির করিল একটা আনকোরা সিগারেটের টিন। ছোট সাহেব সিগারেটের কেশ হইতে একটি সিগারেট লইয়া, ধরাইয়া, একটা টান দিলেন তার পর সিগারেট-টিনটি হাত দিয়া তুলিয়া দেখিয়া কহিলেন—"আরে! এ যে ষ্টেট এক্সপ্রেস—কোথায় যোগাড় করলেন?"

টিনের মালিক কহিল—"আজ্ঞে কলকাতা গিয়েছিলাম, পেয়ে গেলাম এক টিন, নিয়ে নিলাম আপনার জন্যেই, না হলে আমি তো ও-সব খাই না।"

"তাই না কি! থ্যাঙ্কস্‌!"—বলিয়া টিনটি টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকাইলেন। যাহার টিন—তাহার মুখ কৃতার্থমন্যতার হাসিতে ভরিয়া উঠিল; যাহার নয়—তাহার মুখে ফুটিল ঈর্ষার কুটিল হাসি।

সামনের লোকটা নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করিল—"মেয়ে-বৌ ঘর থেকে বার হতে পারছে না, হুজুর!"

ছোট সাহেব ঠোঁট বাঁকাইয়া হাসিয়া কহিলেন—"নাই বা পারল, ঘরে থাকাই তো ভাল মেয়েদের!"

লোকটা সবিনয়ে কহিল—"হুজুর, আমাদের মেয়েদের ঘরে থাকলে কি চলে? পুকুরে চান করতে যেতে হয়, জল আনতে যেতে হয়, বাসন-কোসন মাজতে যেতে হয়।"

ছোট সাহেব হাত দিয়া পারমিটটা সরাইয়া দিয়া কহিলেন—"বড় সাহেবের হুকুমের উপর আমার কলম চালানো চলবে না, যাও।"

লোকটা মিনতি করিয়া কহিল—"হাতে-পায়ে ধরছি হুজুর, একখানা করে সাড়ি না পেলে মেয়েদের ইজ্জত রাখা দায় হবে। হাতে-হাতে পুজো—কুটুম-জন আসবে ঘরে।"

ছোট সাহেব কহিলেন—"তা আমি কি করব?" ভারী গলায় কহিলেন—"বিরক্ত কোরো না, যাও।"

লোকটার মুখে মিনতির মোলায়েম ভাব ক্রমে মিলাইয়া রুক্ষ ভাব ফুটিয়া উঠিল, নীরস কণ্ঠে কহিল—"আপনার নিজেরও মা-বোন আছে হুজুর।"

ছোট সাহেব রাগিয়া উঠিয়া ধমকের সুরে কহিলেন—"তুমি অত্যন্ত বেশী বাজে বকছ। চলে যাও এখান থেকে, না হলে ভাল হবে না বলছি।"

অ-বাঙ্গালীদের এক জন কহিল—"আরে চলে যাও না, কেন বাজে সাহেবকে ব্যাজার করছ? উঁহাদের কাপড় কেন গে, যাও।"

লোকটা সক্ষোভে কহিল—"এত টাকা খরচ করবার কি সাধ্যি আছে আমাদের? তা হলে আর ছুটে আসতাম না।"

ছোট সাহেব দ্বিতীয় লোকটাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি?"

সে একটু আগাইয়া আসিয়া যুক্তহস্তে কহিল—"আমার পারমিটটা বদলে দিতে হবে, হুজুর! দু'খানা সাড়ি চেয়েছিলাম, দিয়েছে পাঁচ গজ মার্কিণ, ওতে কি করে হবে হুজুর!"

ছোট সাহেব কহিলেন—হবে না কেন? দিব্যি পায়জামা হবে দু'খানা।"

লোকটা দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন—"হিন্দুর মেয়ে, পাজামা কি পরা চলে, হুজুর।"

—"চলবে না কেন? চালালেই চলবে।"

—"তা' কি হয়, হুজুর! পাড়াগেঁয়ে লোক আমরা, পাজামা আমরা পুরুষরাই কোন দিন পরিনি।"

—"না পরেছ পর গে, উলঙ্গ থাকার চেয়ে তো ভাল। যাও যাও, কিছু করতে পারব না আমি।"

—"হুজুর, ওটা তা'হলে আপনার কাছেই থাক, মার্কিণ আমার চাই না।"

ছোট সাহেব সক্রোধে কহিলেন—"আমার কাছে থাকবে কেন? না চাও, ছিঁড়ে ফেলে দাও গে—" বলিয়া পারমিটটা লোকটার গায়ে ছুঁড়িয়া দিলেন। তার পর নগেনের দিকে তাকাইয়া কহিলেন—"আপনার কি চাই?"

নগেন আগাইয়া গিয়া দরখাস্তটি বাড়াইয়া দিতেই ছোট সাহেব হাত নাড়িয়া কহিলেন—"দরখাস্ত এখানে নয়, বাক্সে ফেলে দিন গে।"

নগেন কহিল—"বাক্সে দেওয়ার ফল তো দেখতে পাচ্ছি—কাপড়ের বদলে মার্কিণ বা মশারির থান। আমার কিন্তু তাতে চলবে না মশায়!"

—"যা আছে তাই তো পাবেন। আমাদের হাতে তো কাপড়ের কল নাই যে আপনার চাহিদা মত কাপড় তৈরী করে দেব। কলকাতা থেকে যা' আসবে তা'ই বিলি করবার ভার আমাদের।"

—"তা' তো জানি, স্যার। কিন্তু ন্যায্য ভাবে—"

ছোট সাহেব বাধা দিয়া তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিলেন—"অন্যায় কোথায় দেখলেন আপনি? আর যদি আমরা অন্যায়ই করছি, এসেছেন কেন আমাদের কাছে?"

ছোট সাহেব চটিয়া উঠিতেছেন দেখিয়া, তাঁহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য নগেন কহিল—"আপনাদের কথা তো বলছি না, স্যার, এই দেখুন না, আমাদের পাড়াগাঁয়ে প্রেসিডেন্ট বাবুরা—"

ছোট সাহেব কড়া গলায় বলিয়া উঠিলেন—"বেশ নাম করুন, কিন্তু প্রমাণ যদি করতে না পারেন তো জেলে যাবেন।"

নগেন ঘাবড়াইয়া গিয়া কহিল—"থাক স্যার ও-সব কথা, আমার দরখাস্তটা দয়া করে দেখুন।"

ছোট সাহেব মাথার ঝাঁকানি দিয়া কহিলেন—"না, আমি কোন দরখাস্ত দেখতে পারব না; বাক্সে ফেলে দিন গে—" বলিয়া একটা ফাইল টানিয়া লইয়া তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

নগেন সবিনয়ে কহিল—"একটু দয়া করুন, স্যার! আমাকে আজই বাড়ী ফিরতে হবে।"

ছোট সাহেব জবাব দিলেন না।

নগেন কহিল—"ভদ্রলোক হয়ে যদি ভদ্রলোকের দুঃখ না বুঝেন—"

ছোট সাহেব ধমক দিয়া কহিলেন—"অনেকক্ষণ থেকে বক্‌বক্ করছেন আপনি। ভদ্রলোক বলে মাথা কিনে রেখেছেন না কি আমাদের? আমাদের কাছে ভদ্র-অভদ্র কোন ভেদ নাই।"

রাগ হইল নগেনের; ধারাল কণ্ঠে কহিল—"তফাৎ একটু আছে বৈ কি, স্যার! না হলে ঐ ভদ্রলোক দু'টিকে চেয়ারে বসতে দিয়েছেন কেন? অথচ—"

ছোট সাহেব ক্রোধে লাফাইয়া উঠিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"বেরিয়ে যান—বেরিয়ে যান বলছি।" হাঁক দিলেন—"আর্দালী!" খলিল ঘরে ঢুকিতেই কহিলেন—"কেন এদের ঢুকতে দিয়েছ? বার-বার তোমাকে নিষেধ করে দিয়েছি না? যাও, বের করে দাও এদের।"

খলিল মাথা চুলকাইয়া কহিল—"আমি ছিলাম না, হুজুর! বাইরে গেছলাম একটি বার, তখন ঢুকে গেছে সব।" নগেন ও অন্য দু'টির দিকে তাকাইয়া কহিল—"চল সব, বাইরে চল।"

লোক দু'টি নিজের নিজের পারমিট কুড়াইয়া লইয়া বাইরে চলিয়া গেল; নগেনও চোখ-মুখ লাল করিয়া তাহাদের পশ্চাদনুসরণ করিল।

বাহিরে আসিতেই খলিল অনুযোগের সুরে কহিল—"বললাম বার-বার যাবেন না, কিছুতেই শুনলেন না আপনারা; যত সব হাঙ্গামা! আমার চাকরী থাকবে না বেশী দিন।"

মার্কিণ-পাওয়া লোকটা কহিল—"চার গণ্ডা পয়সা দিয়েছি; মিনি পয়সায় তো ঢুকিনি।"

মশারি-পাওয়া লোকটা কহিল—"আমিও।"

নগেন কহিল—"আমিও তো দিয়েছি।"

খলিল সন্ত্রস্ত ভাবে চাপা সুরে কহিল—"অত চিল্লাচ্ছেন কেন? কে বলছে দেননি! কিন্তু এই যে ধমক খেলাম সে তো আপনাদেরই জন্যে! তার দাম দেবে কে?" নগেনের দিকে তাকাইয়া কহিল—"বলুন! লেখাপড়া জানা লোক আপনি, বোঝেন তো সব!"

নগেন কহিল—"বুঝি তো; কিন্তু কাজ তো আমাদের কিছু হল না—হলেও বা—"

খলিল বাধা দিয়া কহিল—"আচ্ছা, একটা উপায় বাৎলে দিচ্ছি—করতে পারলে কাজ হবে।"

মার্কিণ ও মশারি-পাওয়া দুই জন খলিলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইয়া কহিল—"বলে কেন মিঞা, সুরাহা হলে যা' চাইবে দেব।"

খলিল নগেনের কাঁধ ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া সিঁড়ির মাথায় দাঁড়াইয়া কহিল—"হুজুর মিঞাকে ধরুন গে—" ডান হাতটা তুলিয়া মাথার উপরে এক পাক ঘুরাইয়া কহিল—"এই তামাম আপিসের মধ্যে সেই একমাত্র আদমী, যে 'হাঁ'কে বিলকুল 'না'— 'না'কে বিলকুল 'হাঁ' করে দিতে পারে।"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"কে তিনি?"

খলিল কহিল—"আপিসের বড় বাবু;" বুকে হাত ঠুকিয়া কহিল,—"আমার গাঁয়ের লোক, দোস্ত, একই মক্তবে একই মৌলবীর সামনে বসে উর্দু লিখা-পড়া শিখেছিলাম আমরা—" বলিয়া আত্মপ্রসাদে মুখ ভারী করিয়া তুলিল।

লোক দুইটা খলিলের একটা হাত জাপটাইয়া ধরিয়া কহিল—"দোহাই মিঞা, সাহেবের কাছে নিয়ে চল আমাদের।"

খলিল হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিল—"আরে পাগল না কি? আমার যাওয়া কি চলে? সাহেব জানতে পারলে নকরী খতম্ করে দেবে।"

লোক দুইটা হতাশ ভাবে কহিল—"তাহলে—"

খলিল চোখ ঠারিয়া কহিল—"উপায় আছে—" মুখটা সকলের মুখের কাছে আনিয়া কহিল—"কাদের সাহেবকে চেন?" মুখ সরাইয়া লইয়া, ভ্রূ নাচাইয়া কহিল—"ওকে ধরলে কাজ হাসিল হবে—হুজুর সাহেবের আলাপী লোক।"

মশারি ও মার্কিণ-পাওয়া কহিল—"কোথায় পাব তাকে? চিনবই বা কেমন করে?"

খলিল কহিল—"আফিসের সামনেই আছে কোথাও। বেঁটে-খাটো গোলগাল চেহারা—" চোখ বুজিয়া মাথায় ঝাঁকানি দিয়া কহিল—"ভারী ইলেম! তাজ্জব কেরামতী! খোদ বড় সাহেবের সামনে যেয়েও কাজ হাসিল করে আসে।"

লোক দুইটা মিনতির সুরে কহিল—"ভাই সাহেব একটি বার যেয়ে আমাদের দেখিয়ে দাও।"

খলিল প্রবল বেগে মাথা নাড়িয়া কহিল—"আরে না-না, তা হয় না! সাহেব ডেকে না পেলে সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, মেজাজ তো দেখলেন। তা' তোমরা এই বাবুর সঙ্গে চলে যাও; লেখাপড়া জানা লোক, খুঁজে বার করতে পারবেন"—নগেনকে কহিল—"আফিসের আশে-পাশেই পাবেন তাকে; আমার নাম করবেন।"—সকলের উদ্দেশ্যে কহিল—"আমাকে যা' দেবেন, কাদেরকে দিলেই পেয়ে যাব আমি, আমার ও আলাপী লোক।"

নগেন বাহিরে আসিল। ছোট সাহেবের ব্যবহারে মনটা জ্বালা করিতেছে। এক জন ভদ্র বাঙ্গালী আর এক জন ভদ্র বাঙ্গালীর সহিত এ রকম ব্যবহার করিতে পারে! খুব সম্ভব মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে, আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষাপ্রাপ্ত তবু পদমর্য্যাদার উচ্চ মঞ্চে চড়িয়া এমন আত্মবিস্মৃত হইয়া উঠিয়াছে যে নিজের দেশের লোকের সঙ্গে রূঢ় অভদ্র আচরণ করিতে বাধে না! নিজের কথা মনে পড়িল নগেনের; চাকুরী-জীবনে সে-ও অনেক সময়ে অনেক লোকের সঙ্গে দুর্ব্ব্যবহার করিত; ইহাতে যে লোকে মনে আঘাত পাইতে পারে, এ কথা ভাবিতেই পারিত না। ইহাই দাস-মনোবৃত্তি—প্রবল উৎসাহে প্রভু-পদ-লেহন, এবং প্রবলতর উৎসাহে পরপীড়ন।

কাদেরের খোঁজে চলিল নগেন। কোথায় কাদের? কম্পাউণ্ডের মধ্যে জনতা আরও বাড়িয়া উঠিয়াছে, কোলাহলও শুরু হইয়াছে। বড় সাহেবের অনুপস্থিতি সকলের মনের রাশ আলগা করিয়া দিয়াছে। ইহাই আমাদের স্বভাব। বিলাতী, নেংটে হইলেও আমাদের ভয় ও ভক্তির পাত্র; অথচ বাঘা দেশীকেও তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া আমাদের কাছে স্বীয় মহিমা প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।

আফিস-ঘরের সামনে একটা লিচু গাছের নীচে দাঁড়াইয়া একটি লোক অর্দ্ধ-মুদ্রিত চক্ষে সিগারেট টানিতেছিল। চেহারা খলিল যেমনটি বলিয়াছে তেমনই গোলগাল বেঁটে-খাটো। মিশমিশে কালো রং, মুখে গোঁফ-দাড়ি কম; মাথায় কোঁকড়া চুলে বাঁকা তেড়ি। পরনে আদ্দির চুড়িদার পাঞ্জাবী, পায়ে পাম্প-শু; প্রথম দেখিলেই নিরীহ ভাল লোক বলিয়া মনে হয়; কিন্তু চোখাচোখী হইলেই সে যে গুণী ব্যক্তি, এ সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

নগেন কাছে গিয়া কহিল—"আদাব!"

সে লোক দু'টি নগেনের সঙ্গ ছাড়ে নাই। যাই হোক ভদ্রলোক, লেখা-পড়া জানে; সাহেবের কাছে পাত্তা করিতে না পারিলেও কাদেরকে কাবু করিতে পারিবে। তাহারা ভূমিষ্ঠপ্রায় হইয়া করজোড়ে নমস্কার করিল।

কাদের চোখ খুলিয়া গম্ভীর মুখে কহিল—"আদাব! কি চাই আপনাদের?"

নগেন কহিল—"আপনার নাম কি গোলাম কাদের?"

কাদের গম্ভীর মুখেই জবাব দিল—"জী হাঁ, কিন্তু আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?"

খলিলের নাম চাপিয়া রাখিয়া নগেন কহিল—"অনেকের কাছে. আপনি একটু সাহায্য করলে না কি এখানে অনেক সুবিধে হয়।"

নগেনের আপাদ-মস্তকে দৃষ্টি বুলাইয়া, ভ্রূ কুঁচকাইয়া কাদের কহিল—"ভুল শুনেছেন! আমার কি সাধ্যি আছে সাহায্য করবার!" হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"আমিই দু'খানা কাপড়ের জন্যে সাত দিন আনাগোনা করছি এখানে।"

নগেন কহিল—"ভারী বিপদে পড়ে এসেছি আপনার কাছে।"

লোক দুইটা কহিল—"আমরাও।"—বলিয়া নিজের নিজের পারমিটগুলি বাহির করিয়া কাদেরের হাতে দিতে উদ্যত হইল।

কাদের তাহাদের হাত ঠেলিয়া দিয়া কহিল—"আরে! আমাকে দিচ্ছ কেন? ঐখানে বাক্স আছে—সেখানে ফেলে দাও গে।"

নগেন কহিল—"দরখাস্ত ফেলে দিলে যে কাজ হয় না! এরাই, দেখুন না, চেয়েছিল কাপড়—পেয়েছে মার্কিণ আর মশারির থান! সেই জন্যেই তো ছোট সাহেবের চাপরাশী খলিল বললে আপনার কাছে আসতে।"

খলিলের নাম মন্ত্রবৎ কাজ করিল, কাদের এক মুহূর্ত্তে নরম হইয়া উঠিয়া, মোলায়েম কণ্ঠে কহিল—ওঃ, খলিল পাঠিয়েছে বুঝি? আগে বলতে হয়! তা আসুন এদিকে—"বলিয়া কতকটা দূরে গিয়া কহিল—"কই দান আপনার দরখাস্ত আর ম'শিকে পয়সা—বড় বাবুর নজরানা এক টাকা, আমার ফি এক টাকা, আর খলিলের বকশিশ, চার আনা।"

পারমিট বাহির করিতেই তিন টাকা খরচ করা যুক্তিযুক্ত কি না স্থির করিতে না পারিয়া নগেন একটু ইতস্ততঃ করিতেছিল, কাদের তাগিদ দিয়া কহিল—"বার করুন শীগ্‌গির বড় বাবু আফিসেই আছে, এখনই কাজ হয়ে যাবে।" নগেন বাধ্য হইয়া টাকা বাহির করিয়া কাদেরের হাতে দিল। কাদের কহিল—"মিনিটের পরে ঠিক এইখানে এসে দেখা করবেন, আমি পারামিট করিয়ে রাখব।"

লোক দুইটা বলিয়া উঠিল—"আর আমাদের ?"

কাদের হাত নাড়িয়া কহিল—"তোমাদের হওয়া শক্ত বাপু! সাহেবের অর্ডার হয়ে গেছে, ও কী আর নাকচ করা যায়?"

নগেনকে কহিল—"আচ্ছা, আপনি আসুন তা'হলে—আদাব!"

নগেন বুঝিল, কাদের লোক দুইটাকে খেলাইয়া মোটা কিছু আদায় করিতে চায়। কাজেই নমস্কার করিয়া বিদায় লইল।

গেটের ঠিক সামনে, এক জন কোট-প্যান্টধারী বাঙ্গালী ভদ্রলোক ও এক জন মাড়োয়াড়ী ব্যবসাদার কথাবার্তা বলিতেছিল। ভদ্রলোকটি ঢ্যাঙ্গা, কাহিল; কালো রং, ঘোড়ার মত মুখ, চওড়া নাক, নাকের নীচেই প্রজাপতি মাকা গোঁফ, পরিধানে সস্তা ছিটের কোট-পাৎলুন—গায়ে আঁট হইয়া বসিয়া আছে, পায়ের জুতা জোড়াটিও অতি প্রাচীন, দেখিয়া-শুনিয়া কোন উকীল বা মোক্তার বলিয়া মনে হয়। সঙ্গের মাড়োয়ারীটির মেদবহুল চকচকে চেহারা, মেটে গায়ের রং, পরিধানে তসরের লম্বা কোট, মাথায় বাসন্তী রং-এর পাগড়ী, গোলপানা মুখ, বড়-বড় গোঁফ, ছোট ছোট চোখের উপরে মোটা জ্র, মুখ-চোখ নাড়িয়া বাঙ্গালী ভদ্রলোকটির সঙ্গে কি পরামর্শ আঁটিতেছিল।

নগেন কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশায়! কাছে-পিঠে কোথাও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা আছে কি?"

বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি পান চিবাইতেছিল, মাড়োয়ারীর কাছ হইতে দোক্তার কৌটা লইয়া, এক চিমটি দোক্তা মুখে পুরিয়া কহিল—"আছে বৈ কি! তবে শ্বশুর মশায় অনুপস্থিত, খুড়-শ্বশুর অবশ্যি আছেন, তাঁকেই জিজ্ঞাসা করুন গে।"

নগেন অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কোন হোটেল-টোটেল—"

ভদ্রলোক জ্র নাচাইয়া কহিল—"ওঃ, তাই বলুন। আমি ভাবি আপনি বুঝি—তা আছে—এগিয়ে যান।"

রাস্তায় সারি-বন্দী রিক্সা ও মোটর গাড়ী দাঁড়াইয়া; সাইকেলে চাপিয়া লোক আসিতেছে, যাইতেছে। এক জন রিক্সাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিল নগেন—"হ্যাঁ রে, বাছে কোথাও হোটেল আছে?"

রিক্সাওয়ালা কহিল—"আজ্ঞে ই—আছে বৈ কি!" হাত বাড়াইয়া কহিল—"এই ইদিকে—ঠিক নদীর পাড়েই—পোয়াখানেকও লয়—চাপতে চাপতেই পৌঁছিয়ে দিব—" বলিয়াই রিক্সার ডাণ্ডা ধরিয়া তুলিবার উপক্রম করিতেই নগেন কহিল—"আমি হেঁটেই যাচ্ছি বেশী দূর নয় বলছিস্ তো!"

লোকটা একটু অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"তা' যান, এজ্ঞে! বেশী দূর লয়, যেতে পারবেন খুব, তবে ভারী রোদ্দর তেজ! গা' যেন পুড়িয়ে দিচ্ছে—"

'তা' হোক' বলিয়া নগেন চলিয়া গেল।

[ক্রমশঃ

ভাবী সঙ্কটের মুখে ভারত

ললিত হাজরা

যুদ্ধের সময়ে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করা হ'য়েছিল এই আশা নিয়ে যে, যুদ্ধ খতম হবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত সাধারণ লোকের দুঃখ-কষ্টের লাঘব হবে, কিন্তু আজ যুদ্ধ শেষ হবার এক বৎসর পরেও দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দুর্দ্দশার মোচন হওয়া ত' দূরের কথা, দিনের পর দিন দুঃখের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েই চ'লেছে। দিনের খোরাকীর জন্যে বরাদ্দ হ'য়েছে মাথা-পিছু ৩ ছটাক চাল; পরিধেয় বস্ত্র আর কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য হ'য়ে উঠেছে। সরকারী প্রচেষ্টায় "অধিক খাদ্য ফলাও" আন্দোলনের বিজ্ঞাপন বেড়েই চ'লেছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খাদ্য অধিক ফলানোর চেয়ে সরকারী ফাইলের সংখ্যা ও আকার বৃদ্ধি পাচ্ছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষি বিভাগের সেক্রেটারী স্যার ফিরোজ খারেগাট মন্তব্য করেছেন: "বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে ১১ কোটি টাকা এবং খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করিতে সাড়ে পনর কোটি ব্যয় করিতে হইবে। কিন্তু ফসল বাড়ানোর জন্য এত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে কি?"—সরকারী কর্ম্মচারীর মন্তব্য যখন এই, তখন আমাদের আর বলবার কি আছে? আমাদের উদ্বৃত্ত ষ্টার্লিং-এর পরিমাণ পর্ব্বত-প্রমাণ হ'য়ে উঠেছে আর অন্য দিকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নোট ছাপানোর পরিমাণ এত বেশী বৃদ্ধি করতে লেগে গেছে যে, জিনিষের দর আর কিছুতেই মন্দার দিকে যেতে চাইছে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের দর ত' কল্পনাতীত বেড়েই চ'লেছে। ফলে সারা দেশে আর্থিক অবস্থার মধ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক থেকে আরম্ভ করে সাধারণ শ্রমিক পর্য্যন্ত ধর্ম্মঘটে জড়িয়ে পড়ছে। আজ আর আমাদের মত লোকের পক্ষে মাস-মাহিনা যা পাচ্ছি তা'তে ক'রে সংসার চালানো একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। যে করে দিনের পর দিন নিত্য প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক জিনিষের দাম বৃদ্ধি পেয়ে চ'লেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে আমাদের মাসিক রোজগার চলতে পারছে না। মাসিক রোজগার ও জিনিষের দামের মধ্যে এত বেশী বিরোধ বেধে গেছে যে, আমরা ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে গেছি। এর শেষ পরিণতি কোথায়? এই সর্ব্বনাশা আর্থিক নীতি আর সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতির শেষ না হ'লে আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য।

মুদ্রাস্ফীতি

আমাদের দুর্দ্দশার জন্যে দায়ী সরকারী মহলের কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত নোট ছাপানো নীতি। এই ক্রমবর্দ্ধমান হারে নোট ছাপানোর ফলেই আমাদের দুর্দ্দশা আরম্ভ হ'য়েছে। • মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করার দিকে লক্ষ্য নাই কিন্তু লক্ষ্য প'ড়েছে গরীবের ও মধ্যবিত্তের বেতন নিয়ন্ত্রণ করার উপরে। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত হিসাব দিলে আমরা বুঝতে পারব—কি হারে আজও নোট ছাপানো চলছে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত ভারতের বাজারে ১৭২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা মূল্যের কাগজী মুদ্রা চালু ছিল; ১৯৪৫ সালের ৩০শে মার্চ্চ তারিখে ভারতীয় বাজারে চালু কাগজী মুদ্রার পরিমাণ দাঁড়ায়—১২১৮ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা মূল্যের আর ১৯৪৬ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে দাঁড়িয়েছে ১২৫১,০৭, ৭৭০০০ টাকা মূল্যের। মোটের উপর দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৩৯

সালের চালু কাগজী মুদ্রার শতকরা ৬০০ ভাগেরও অধিক এখন দাঁড়িয়েছে। অবস্থা যে ভয়াবহ তা' বেশ বুঝতেই পারা যাচ্ছে। "রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এ্যাক্ট" অনুসারে বলা হয়েছে যে, এক শত টাকার নোট বাজারে ছাড়বার আগে সরকারী তহবিলে শতকরা ৪০ ভাগ মূল্যের স্বর্ণ অথবা ষ্টার্লিং সিকিউরিটি রাখা হবে। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দেখা যায় যে, এক শত টাকা মূল্যের কাগজী মুদ্রার খাতে শতকরা মাত্র ৩৫ ভাগ রৌপ্যমুদ্রা ২০ ভাগ স্বর্ণ, ২৮ ভাগ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি ও ১৭ ভাগ টাকা সিকিউরিটি জমা রাখা হয়েছিল। ১৯৪৬ সালে দেখা যায় যে, এই খাতে জমা রাখা হচ্ছে শতকরা ৫·৬ রৌপ্যমুদ্রা, (অবশ্য এর মধ্যে এক টাকার নোটও আছে) শতকরা ৪·৪ ভাগ স্বর্ণ, ৪·৮ ভাগ টাকা সিকিউরিটি আর শতকরা ৮৮·৫ ভাগ ষ্টার্লিং সিকিউরিটি জমা রাখা হয়। এ হ'তে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে আমাদের কারেন্সী প্রথা কত শোচনীয় অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। নোট ছাপানোর সাথে ষ্টার্লিংএর যোগাযোগ স্থাপন ক'রে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট প্রতারণার এমন এক ফন্দি বের ক'রেছে যে, আমাদের দেশে সম্পদকে শোষণ করতে তাদের বেগ পেতে হ'চ্ছে না। ভারত সরকার যুদ্ধের বাজারে এত বেশী কাগজী মুদ্রা ছাড়লেন যার ফলে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের নিজের ও মিত্রশক্তির পক্ষে ভারতের জনগণের ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে কোন দ্রব্য কিনতে বেগ পেতে হ'লো না। ফলে হ'লো সমাজদ্রোহীদের রাজত্ব, দুর্ভিক্ষ, মহামারী আর আজকের এই অসহায় অবস্থা। এমন কি, আজও বৃটেন ভারতে কোন অত্যাবশ্যকীয় মেসিনারী অথবা কনজিউমার্স দ্রব্যাদি পাঠাতে রাজী হ'চ্ছে না।

এই সর্ব্বনাশা মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ ক'রে জনগণের দারিদ্র্য মোচন করার অন্যতম উপায় হ'লো উৎপাদন বৃদ্ধি করা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ক্রমবর্দ্ধমান নোট চালু করার সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন-বৃদ্ধি করার কোনরূপ প্রচেষ্টাই ভারত গভর্ণমেন্ট করেন নাই। অথচ যুদ্ধের বাজারে বৃটেনে উৎপাদন বৃদ্ধির উপর বৃটিশ গভর্ণমেন্ট অযথা গুরুত্ব আরোপ ক'রেছিলেন এবং সাফল্য লাভও করেছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৮-৩৯ সাল হ'তে ১৯৪৩-৪৪ পর্য্যন্ত ভারতীয় শিল্পের উৎপাদনের হার ব্যাহত হ'য়েছিল যথাক্রমে শতকরা ১১১·১ ও ১০৯·৪ হারে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটের মুখপত্র "ক্যাপিটল" পর্য্যন্ত স্বীকার ক'রে দেখিয়ে দিয়েছে :—

সাল		উৎপাদনের হার কত কমে আসছে
১৯৩৮—৩৯	...	১১১·১
১৯৩৯—৪০	...	১১৪·০
১৯৪০—৪১	...	১১৭·৩
১৯৪১—৪২	...	১২২·৭
১৯৪২—৪৩	...	১০৮·৪
১৯৪৩—৪৪	...	১০৯·৪

("ক্যাপিটল"—১৪ই এপ্রেল ১৯৪৪)

উল্লিখিত তালিকা অনেকে অতিরঞ্জিত ব'লে মনে করতে পারেন। হয়ত' অনেকে বিশ্বাসই করবেন না। বক্তব্য যে সত্য তা' দেখাব কয়েকটি বিশেষ শিল্পের যুদ্ধের বাজারের অবস্থা থেকে। প্রথমেই ধরা যাক—লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের কথা। অর্থনীতিবিশারদ ও ব্যবসায়ীদের একটা বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধের বাজারে লৌহ ও ইস্পাত-শিল্পের উৎপাদন-হারের প্রভূত উন্নতি হ'য়েছে। মুনাফার দিক দিয়ে যথেষ্ট হ'য়েছে এ কথা স্বীকার ক'রেও বলতে বাধ্য যে, উৎপাদনের হার কিছু মাত্র বৃদ্ধি পায় নাই। যুদ্ধের সময় সামরিক কারণে উৎপাদনের পরিমাণ জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এখন যুদ্ধ শেষ হ'য়ে গিয়েছে। সুতরাং এখন নির্ভয়ে ১৯৩৯—১৯৪৬ সাল পর্য্যন্ত এই শিল্পের উৎপাদনের হার প্রকাশ করা যেতে পারে। নিম্ন অপরিস্রুত লৌহ ও ইস্পাতের বাটের উৎপাদনের মোট পরিমাণের তালিকা হ'তে বোঝা যাবে যে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে না কমেছে।

	অপরিস্রুত লৌহ (টন হিসাবে)	ইস্পাতের বাট (টন হিসাবে)
১৯৩৯—৪০	১১,৪০,০০০	১০,১৮,০০০
১৯৪৪—৪৫	৮,৬০,০০০	৯,৫৪,০০০
১৯৪৫—৪৬	১০,০৬,০০০	১০,১৪ ৪০০

এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'লো যুদ্ধের সময় লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহারের পরিমাণের অত্যধিক হ্রাস। মাত্র ১৯৩৯ সালেই দেখা যায় যে, ১৯১৪ সালের তুলনায় লৌহ ও ইস্পাতের ব্যবহার শতকরা ২৫ ভাগ হ্রাস পেয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বস্ত্রশিল্পের কথা আলোচনা করা যাক্। পূর্ব্ব-বর্ণিত মন্তব্য বস্ত্রশিল্প সম্পর্কেও প্রযোজ্য। সরকারী হিসাবের কথাই যদি আমরা বিশ্বাস করি, তাহ'লে দেখব যে, মাত্র ১৯৪৩-৪৪ সালে বস্ত্রের উৎপাদন শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও ক্রমাগত উৎপাদনের পরিমাণ কমতির দিকে ঝুঁকে চ'লেছে। অন্য দিকে সূতার অভাবে তাঁত-শিল্পের উৎপাদনের পরিমাণ শোচনীয়রূপে হ্রাস পেয়েছে ও পেয়ে যাচ্ছে। এই অবস্থা আর দু'-এক বৎসর চলতে থাকলে তাঁত-শিল্প লোপ পেয়ে যাবে। যাই হোক, যুদ্ধের সময়ে আমাদের দেশে বস্ত্র রপ্তানি করা হয় নাই কিন্তু দেশের লোকের প্রয়োজনের দিকে দৃকপাত না ক'রে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন দেশে বস্ত্র চালান দিয়েছেন। এর ফলে আমাদের মিল-মালিকদের লাভের অঙ্ক যে কমেছে তা' নয়। লাভের অঙ্ক যথেষ্ট পরিমাণেই বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে কি হ্রাস পেয়েছে, তা' পাঠকদের অবগতির জন্যে একটা তালিকা দিলাম :—

	উৎপাদনের পরিমাণ (১০ লক্ষ গজ হিসাবে)
১৯৩৮—৩৯	৪২৬৯
১৯৩৯—৪০	৪০১৩
১৯৪০—৪১	৪২৭০
১৯৪১—৪২	৪৪৯৪
১৯৪২—৪৩	৪১০৯
১৯৪৩—৪৪	৪৮৪২
১৯৪৪—৪৫	৪৫০০
১৯৪৫—৪৬	৪২০০ (আন্দাজ)

তৃতীয়তঃ চিনির কথা। ভারত সরকার এই শিল্পটিকে কঠোর হস্তে নিয়ন্ত্রণ করেছেন। প্রাদেশিক সরকারও উৎপাদনের পরিমাণ

হ্রাস করার দিকে কম নজর রাখেন নাই। ১১৩৮ সালে বিহার ও যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেন্ট "চিনি নিয়ন্ত্রণ আইন" (Sugar Control Act) নামে এক আইন জারী ক'রে উৎপাদনের হার নির্দ্দিষ্ট ক'রে দিলেন এবং কারখানায় ইক্ষু চালান দেবার লাইসেন্সও নিয়ন্ত্রণ করলেন। অবশ্য এখানে আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, তৎকালে এই ব্যবস্থা বিশেষ প্রয়োজনীয় হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু ১১৪০-৪১ ও ১১৪১-৪২ সালে এই আইন যে অকেজো হ'য়ে দাঁড়ায় এ বুদ্ধি সরকারী কর্ত্তাদের মগজে জুটে নাই। উৎপাদনের হার কিরূপ কমছে তার হিসাব নিয়ে দিলাম :—

কারখানার চিনি উৎপাদনের হার

(টন হিসাবে)

১১৪৩-৪৪	...	১২,১৬৪০০
১১৪৪-৪৫	...	১,৮৫,০০০
১১৪৫-৪৬	...	১,৪৮,০০০

এই ত গেল নিত্য প্রয়োজনীয় অপরিহার্য্য দ্রব্যাদির উৎপাদনের অবস্থা। তার পর বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে বণ্টন-ব্যবস্থার মধ্যে যে গলদ দেখা দিয়েছে, তাহার অবস্থা আরও শোচনীয়। বিশেষ ক'রে বাংলা দেশের সিভিল সাপ্লাই বিভাগে বণ্টন-ব্যবস্থার যে দুর্নীতি দেখা দিয়েছে, তা' পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন।

মূল্যহার

১১৩১ সালে যুদ্ধ বাধার সঙ্গে সঙ্গে এক দল মুনাফাখোর মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে ফাট্‌কা খেলতে আরম্ভ করে এবং এর ফলে হঠাৎ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পায়। ১১৪১ সালে জাপানের যুদ্ধে নামার পরে ধীরে ধীরে প্রত্যেক জিনিষেরই মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ১১৪২ সালের শেষের দিক্‌ থেকে ১৯৪৩ সালের শেষ নাগাদ এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা দাঁড়ায়, যার জের আজও মিটল না। চাল, আটা ও বস্ত্রের মূল্য কি ভাবে বৃদ্ধি পেল ১১৩১ সাল থেকে ১১৪৩ সাল পর্য্যন্ত তার একটা হিসাব দিলেই বক্তব্য সহজ হবে।

১১৩৮ সালের মূল্যের উপর শতকরা
কত ভাগ বৃদ্ধি

সাল	চাল	গম	বস্ত্র
১১৩১	১১১	১১৭	১০৫
১১৪১	১৭২	২১২	১১৮
১১৪২	২১৮	২৮২	৪ ৪
১১৪৩	৯৫১	৬৪৬	৪১৬

("ফুড্‌ গ্রেনস্‌ পলিসি কমিটি"র রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত)

অবস্থা আয়ত্তের বাহিরে চ'লে যাবার পর ভারত সরকারের টনক নড়ল। কিছুটা জড়তা কাটিয়ে মূল্য নিয়ন্ত্রণের দিকে নজর দিলেন। উৎপাদন বাড়ানোর বালাই নাই, কিন্তু নিয়ন্ত্রণের কড়াকড়ির ঠেলায় পরিকল্পনা বানচাল হ'য়ে যেতে লাগল। নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকারী আমলাদের অনেকেই বেশ কিছু রোজগার করে ফেলল। চোরা কারবারীদের সঙ্গে দুর্নীতিপরায়ণ আমলারা লুঠের একটা বখরা নির্দ্দিষ্ট ক'রে অবস্থা ঘোরালো হ'য়ে চলতে লাগল।

১১১১ সালের মত ১১৪৬ সালে আমরা আকস্মিক মূল্যবৃদ্ধির চাপে পিষে মরছি। জীবনযাত্রার খরচের সূচক-সংখ্যাও ঊর্দ্ধমুখী হয়ে উঠেছে। ভারত গভর্ণমেন্টের অর্থনীতি উপদেষ্টার মূল্যস্তরের সূচক-সংখ্যায় দেখা যায় ১১৩১ সাল থেকে আরম্ভ ক'রে ১১৪৬ সাল পর্য্যন্ত কিরূপ আকার ধারণ ক'রেছে। তাঁর তালিকায় দেখা যায় :—

(১১৩১ = ১০০)

সাল		সূচক-সংখ্যা
১১৩১—৪০	—	১২৫.৬
১১৪০—৪১	—	১১৪,৩
১১৪১—৪২	—	১৩৭,০
১১৪২—৪৩	—	১৭১.০
১১৪৩—৪৪	—	২৩৬,০
১১৪৪—৪৫	—	২৪৪.১
১১৪৬ (মার্চ্চ পর্য্যন্ত)	—	২৫৩,২
১১৪৬ (মে পর্য্যন্ত)	—	২৫৫.০

খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাধারণ সূচক-সংখ্যাও কিরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে তারও একটা তালিকা দেওয়া গেল :—

(১১৩১ = ১০০)

সাল	সূচক-সংখ্যা
১১৪৫ (এপ্রিল)	২২৬
১১৪৬ (ঐ)	২৪৮

আমাদের আর্থিক অবস্থা এবং দৈনিক জীবনযাত্রায় পরিণতি কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় তবে এই মাত্র বলতে পারি যে, মুদ্রাস্ফীতি বন্ধ না করলে এবং আর্থিক বনিয়াদের আমূল পরিবর্ত্তন না ঘটালে আমরা এক ভয়াবহ সঙ্কটের মধ্যে ঘুরপাক খাবো। অবশ্য তারও একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে।

দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত,
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
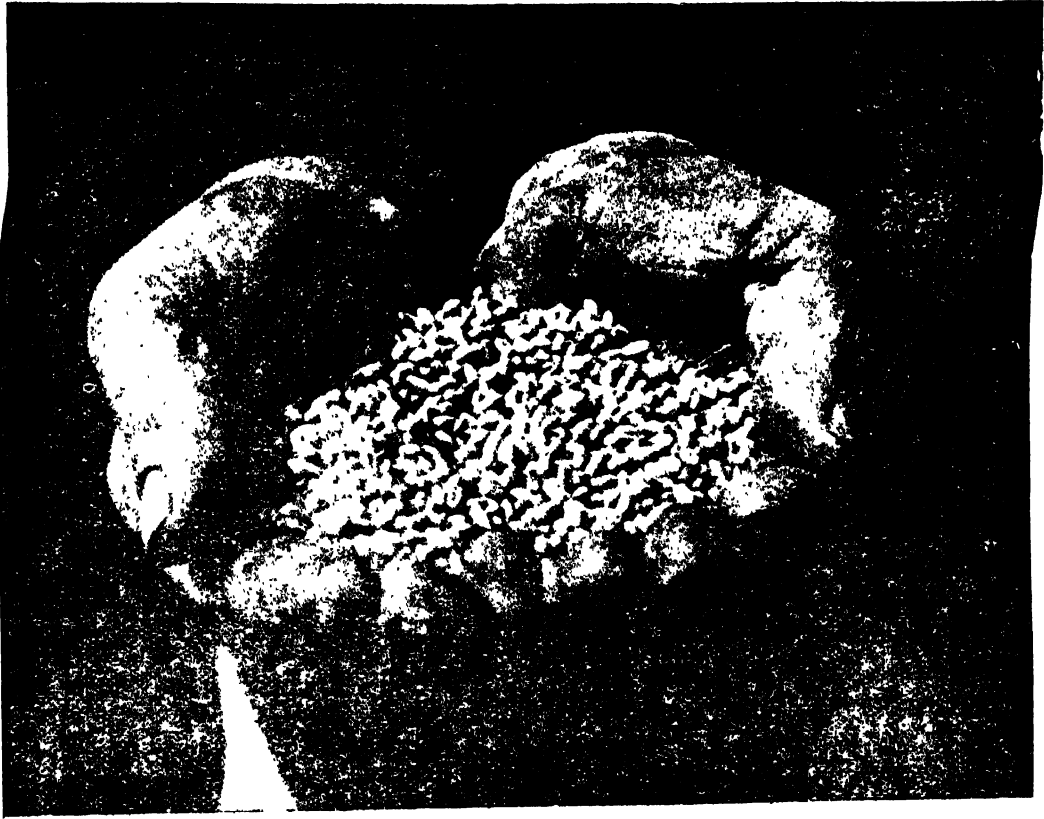
ওলানের শরীর মৃত্যু সহসা দখল করতে পারলে না। জীবনের ভর-দুপুরে দেহাশ্রিত প্রাণ সহজে যেতে চায় না—তাই অনেকগুলি মাস রুগ্নশয্যায় কাটালে ওলান। শীতের দীর্ঘ মাসগুলিতে ওলানকে শয্যালীন দেখে ওয়াঙ আর ছেলে-মেয়েগুলি অনুভব করতে পারলে, এ-সংসারের কতখানি ছিল ওলান। তারা কোন দিন জানতেও পারেনি তাদের আরামের জন্য ওলান কি করত।

রান্নাঘরের কাজ কেউ জানে না এই প্রথম চোখে পড়ল সবার। ঘাস জেলে কেমন করে উনুন ধরাতে হয়—কেমন করে উনুনে আঁচ রাখতে হয়! এক পিঠ না পুড়িয়ে অথব না ভেঙে ফেলে আস্ত মাছ কেমন আশ্চর্য উপায়ে দু'পিঠ ভাজা যায়। কোন্ আনাজ রান্নার জন্যে তিলের তেল প্রয়োজন—এ সবের কোন খবরই এ সংসারে কেউ রাখে না। খাওয়ার পর উচ্ছিষ্ট টেবিলের নীচে পড়ে থাকে, কেউ সরায় না। যখন দুর্গন্ধে ওয়াঙ অস্বস্তি বোধ করে তখন সে হয় উঠোনের কুকুর ডেকে তাকে দিয়ে সব খাওয়ায় নয় ত ছোট মেয়েকে ভর্ৎসনা করে বলে সেগুল কুড়িয়ে বাইরে ফেলে দিতে।

ওয়াঙের ছোট ছেলেটি মায়ের হয়ে দাদুর টুকিটাকি কাজ করে। বৃদ্ধ এখন অথর্ব হয়ে পড়েছেন—হয়েছেন শিশুর মত অসহায়। আগেকার মত তার কাছে গরম চা বা গরম জল নিয়ে কেন আসবে না ওলান—কেন তার ওঠা-বসায় সাহায্য করবে না—তা ওয়াঙ বৃদ্ধকে বোঝাতে পারে না। ডেকে সাড়া পান না বলে বৃদ্ধ রুষ্ট হয়ে ওঠেন—খিটখিটে শিশুর মত চায়ের পাত্র ছুঁড়ে ফেলেন মাটিতে।

অবশেষে এক দিন বাপকে ওয়াঙ মৃত্যুপথযাত্রীর ঘরে নিয়ে গেল, দেখালে রুগ্নশয্যায় শুয়ে থাকা পুত্রবধূকে। ছানি-পড়া অন্ধপ্রায় চোখে বাপ চেয়ে দেখলেন। ঠোঁটের ফাঁকে অস্ফুট বিড়-বিড় করতে করতে তিনি আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। ঝাপসা চোখে এটুকু তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কোথাও কিছু অস্বাভাবিক ঘটেছে।

সবাই জানল শুধু বোকা মেয়েটি ছাড়া। সে বসে বসে হাসে আর হাসতে হাসতে ছোট কাপড়ের ফালি আঙুলে জড়ায়। তবু তার দিকেও নজর রাখবার মানুষের প্রয়োজন। তাকে শোয়ানর জন্য—তাকে খাওনার জন্য—রোদে বসিয়ে দেওয়ার জন্য—বৃষ্টি হলে তাকে ঘরে নিয়ে আসার জন্য। এই মেয়েটির কথাও কারুর স্মরণ রাখা প্রয়োজন। ওয়াঙ নিজেও ভুলে যায় এর কথা। এক দিন সকলের বিস্মরণে মেয়েটি সারা রাত্রি বাইরের ঠাণ্ডায় হিমে পড়ে রইল। ভোরের হী-হী করা শীতে মেয়েটির কান্না শুনে ওয়াঙ গিয়ে দেখল তাকে। কটু ভাষায় গালাগা'ল করলে, অভিশাপ দিলে ছেলে-মেয়েদের, যারা তাদের এই অভাগী বোনটির এমন অবহেলা করছে। ছেলেমেয়েগুলি সংসারে মায়ের শূন্য আসন পূর্ণ করতে চেষ্টা করছে কিন্তু তারাও অনভিজ্ঞ। চেষ্টা সত্ত্বেও তারা অপারগ হচ্ছে দেখে ওয়াঙ মুখ বুজে রইল। সেদিন থেকে ওয়াঙ এই মেয়েটিকে সকালে আর রাত্রে নিজেই তদারক করতে লাগল। যেদিন বৃষ্টি হয়, বরফ পড়ে—যেদিন তীক্ষ্ণ শীতের হাওয়া চলে সেদিন ওয়াঙ মেয়েটিকে হাত ধরে ঘরে নিয়ে যায়। রান্নাঘরের উনুনের পাশে যেখানে ছাই জমে সেখানে তাকে সস্নেহে বসিয়ে রাখে।

আঁধার শীতের মাসগুলিতে যত দিন ওলান তার মৃত্যুশয্যায় শুয়ে রইল ওয়াঙ একবারও জমির কথা ভাবলে না। শীতের কাজ কর্ম আর মজুরদের ভার চীংয়ের হাতে সে তুলে দিল। একান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে চীং তার কর্তব্য করতে লাগল। শুধু প্রতিদিন সাঁঝ-সকালে ওলানের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে চীং কর্ত্রীর খবর নেয়—তিনি কেমন বোধ করছেন। শেষে এক দিন ওয়াঙের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙল। রোজ সকালে সন্ধ্যায় সেই একই রকম কথা সে আর বলতে পারে না।

'আজ একটু মুরগীর ঝোল খেয়েছে'—'আজ ভাতের পাতলা একটু ফ্যান খেয়েছে।'

সেই কারণে এক দিন চীংকে বললে ওয়াঙ তার আর খবর নেবার দরকার নেই। সে যদি বিশ্বাসের সঙ্গে কাজ করে যায় তাহলেই ওয়াঙ খুশী হবে।

শীতের ঠাণ্ডা মাসগুলিতে ওলানের বিছানার পাশে বসে কাটায় ওয়াঙ অনেক সময়। যদি ওলানের শীত করে মাটীর ভাঁড়ে কাঠ-কয়লা জ্বালিয়ে বিছানার পাশে রেখে দেয় সে—ওলানের গায়ে তাপ লাগাতে দেয়। প্রতিবার ওলান ফিস-ফিস করে বলে—'এত খরচ করছ কেন?'

এ কথা ওয়াঙ শুনে শুনে আর থাকতে পারে না—এক দিন সে ফেটে পড়ে।

'ও কথা আমি সইতে পারি না। তোমায় সারিয়ে তুলতে দরকার হলে আমি সব জমি বেচে দেব।'

এ কথায় ওলান ছোট করে হাসল। ছোট ছোট হাঁফ নিতে নিতে সে বললে—'তা আমি তোমায় করতে দেবো না। আমি ত এক দিন মরবই। কিন্তু জমি আমার পরেও ত থাকবে।'

মৃত্যু নিয়ে কথা কইতে চায় না ওয়াঙ। ওলানের কথা শুনে সে ঘর থেকে সরে গেল।

ওলান যে বাঁচবে না, এ বিশ্বাস দৃঢ় হওয়ায় নিজের কর্ত্তব্য স্মরণ করে এক দিন ওয়াঙ সহরের কফিন-কারবারীর দোকানে গেল। বিক্রীর জন্ত তৈরী প্রত্যেকটি কফিন পরিদর্শন করলে ওয়াঙ—তার পর ভারী মজবুত কাঠের একটি কালো রঙের কফিন নির্ব্বাচন করলে। দোকানদার তার পছন্দ হওয়ার পর বললে চাতুরীর সঙ্গে—'দুটো যদি একসঙ্গে নেন ভাও পড়বে কম। নিজের জন্ত একটা কিনে রাখতে পারেন—জানবেন নিজের পথ তৈরী হয়ে আছে।'

'সে আমার ছেলেরা ঠিক করবে'—বললে ওয়াঙ। কিন্তু তখনি বৃদ্ধ বাপের কথা তার মনে পড়ল—দোকানীর কথায় তার চমক ভাঙল। সে বললে—'হাঁ, বুড়ো বাবার জন্ত আমি একটা নিতে পারি। পায়ে জোর কমে গেছে—বধির আর অন্ধপ্রায় হয়ে গেছেন তিনি—তাঁরও দিন শীঘ্রই ফুরিয়ে আসছে।'

দোকানী কফিন দু'টিকে ভালো কালো রঙ করে ওয়াঙের বাড়ীতে পাঠাবার কথা বললে। বাড়ী ফিরে ওয়াঙ বৌকে সে-কথা জানাতে ওলান এইতে খুব খুশী হোল যে, স্বামী তারই জন্ত এতখানি করেছেন—তার সমাধির এমন চারু ব্যবস্থা করেছেন।

দিনের অনেক প্রহর ওলানের শয্যার পাশে বসে কাটায় ওয়াঙ। কথা হয় কম, কেন না ওলান বড় দুর্ব্বল। তাদের মধ্যে কোন দিনই খুব কথা হয়নি। ঘরের শান্ত আবহাওয়ায় স্বামী যখন নির্ব্বাক্ বসে থাকেন ওলানের কখনো কখ'না বিস্মরণ হয়। ওলান নিজের শিশুকালের কথা বিড়-বিড় করে বলে। আর সেই প্রথম বিচ্ছিন্ন টুকরো কথাগুলির ভিতর দিয়ে ওয়াঙ জানতে পারলে ওলানের সত্তার অন্তরালের অচেনা মানুষটিকে।

—'শুধু দরজা অবধি পৌঁছে দেব মা,—আমি যে কুৎসিত তা আমি জানি—আমি ত বড়কর্তার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারি না।' শ্বাস নিয়ে ওলান বলে—'মেরো না, মেরো না আমায়—আর কখনো ও খাবার খাবো না···' 'মা—মা—বাবা গো'—বার বার করে সে বলতে থাকে—'আমি কুৎসিত, আমায় ত ভালবাসা যায় না।'

ওলান যখন এ সব প্রলাপ বকে ওয়াঙ অধীর হয়। ওলানের কর্কশ মস্ত হাত নিজের করতলের মধ্যে নিয়ে সে তাকে সান্ত্বনা দেয়। নিজের মনের আচরণে ক্ষুব্ধ হয় ওয়াঙ এই কারণে যে, যখন সে ওলানের হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মনে-প্রাণে চায় যে স্বামীর স্নিগ্ধ ভালবাসা অনুভব করতে থাকুক ওলান, তখন নিজের শুষ্ক অনুভূতির কথায় লজ্জিত না হয়ে পারে না সে। কমলিনী যখন ঠোঁট ফোলায় তখন নিজের চিত্তের যে উচ্ছ্বসিত আবেগ হয় তেমন যেন এখানে কিছুতেই হয় না। এই মেয়েটির মৃতের মত শুষ্ক হাত তার ভালবাসাকে জাগাতে পারে না—হৃদয়ের কারুণ্যও যেন মুখ ফেরাতে চায়।

শুধু এই কারণে ওয়াঙ সেবায় অকৃপণ হয়ে ওঠে। ভালো পথ্য কিনে আনে সে—ওলানের জন্ত ভাল মাছ আর কচি কফির ঝোল তৈরী করিয়ে নেয়। দীর্ঘায়িত মৃত্যুর যন্ত্রণাকর পরিবেশে অবসন্ন মন যখন কমলিনীর কাছে সুখ নিতে যায় তখন ওলান মনের দিগন্তে জেগে থাকে। কমলিনীকে বাহুর মধ্যে ধরে নিয়েও ওয়াঙ তার বন্ধন শ্লথ করে দেয়। ওলানের কথা মনে পড়ে।

এক-এক দিন ওলান যেন আচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠে—সংসারের দিকে তাকিয়ে দেখে। এক দিন কোকিলাকে ডাকল ওলান। অবাক্ হয়ে ওয়াঙ কোকিলাকে ডেকে পাঠাল, নিজের কৃশ বাহুর উপর ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে ওলান সহজ কণ্ঠে বললে,—'বড়-বাড়ীর কর্তাদের অন্দর মহলের মানুষ ছিলে তুমি, তোমাকে লোকে সুন্দরী বলত। কিন্তু আমি এক জন লোকের বৌ—তার ছেলে-মেয়ের মা। তুমি আজও দাসীই রয়ে গেছ।'

কটু ভাষায় কোকিলা এর জবাব দিতে যাচ্ছিল—অনুনয় করে ওয়াঙ তাকে বাইরে নিয়ে গেল—বললে—'এ মানুষটার কথা আর ধরো না।'

ওয়াঙ যখন ঘরে ফিরে গেল, তখনো ওলান তেমনি ভাবে রয়েছে। স্বামীকে দেখে সে বললে—'আমি মরে গেলে ঐ দাসীটা কিংবা তার গিন্নী কেউ যেন এ ঘরে না ঢোকে—কোন জিনিষ না ছোঁয়। তা যদি করে তাহলে এ বাড়ীর ওপর অভিশাপ দিতে পাঠাব আমার আত্মাকে।' কথার পর ওলানের মাথা ঝুঁকে পড়ল বিছানায়—আবার আচ্ছন্ন ঘুমে অচেতন হল সে।

নিবে যাবার আগে প্রদীপের উজ্জ্বলতার মত নতুন বছরের ঠিক আগেই এক দিন ওলান অনেক সুস্থ বোধ করল। সে দিন সে বিছানায় উঠে বসল—নিজেই চুল বাঁধলে—চায়ের জন্ত তাগিদ দিল। স্বামী আসতেই সে বললে—'নতুন বছর এসে পড়ল। ঘরে ত পিঠে মাংস কিছুই তৈরী নেই—তাই একটা কথা

ভাবছিলাম। রান্নাঘরে ও দাসীটাকে আমি নেবো না—তোমার বড় ছেলের বাক্যি-দেওয়া বৌকে আমি নিয়ে আসব। তাকে আজও দেখিনি' আমি কিন্তু সে এলে তাকে আমি সব বলে দেব।'

ওলানের সুস্থতা দেখে খুসী হোল ওয়াঙ। এ বছরের উৎসবের জন্য যদিও তার কোন তাগিদ ছিল না, তবু কোকিলাকে ডেকে সে হুকুম দিলে, চালের কারবারী লিউকে গিয়ে অনুরোধ করতে একটি মুমূর্ষু স্ত্রীলোকের শেষ ইচ্ছায় তাঁর মেয়েকে এ বাড়ীতে পাঠাতে। তার বেয়ান হয়ত শীত পার করতে পারবেন না আর তার মেয়েরও ষোল পার হয়েছে—যে বয়সে অনেক মেয়েই শ্বশুর-ঘর করতে যায়—এই সব ভেবে লিউ সম্মত হলেন।

কিন্তু ওলানের কারণে কোন উৎসব হোল না। নিঃশব্দে কুমারী মেয়েটি সিডান চেয়ারে বসে এ বাড়ীতে প্রবেশ করল। তার মা আর একটি দাসী এল সঙ্গে। মেয়েকে বেয়ানের হাতে তুলে দিয়ে মেয়ের মা বিদায় নিলেন—শুধু দাসী রয়ে গেল মেয়েটির সেবার জন্যে।

ছেলে-মেয়েদের অন্য ঘরে সরিয়ে তাদের শোবার ঘর নতুন বধূকে দেওয়া হোল। পুত্রবধূকে ওয়াঙ সুনজরে দেখলে। যদিও প্রথা-মত তার কথা কওয়া চলে না পুত্রবধূর সঙ্গে তবু মেয়েটি যখন মাথা নামিয়ে তাকে নমস্কার করলে সে-ও গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে মাথা নাড়লে। মেয়েটি নিজের কর্তব্য বোঝে—মাটীর দিকে চোখ নামিয়ে সে নিঃশব্দে ঘুরে বেড়ায় বাড়ীময়। স্নিগ্ধ সুন্দরী মেয়েটি—নিজের সৌন্দর্যে দর্পিতা নয় মোটেই। নিখুঁত ভাবে সে কাজ করতে জানে। ওলানের ঘরে যায় সে—তাকে সেবা যত্ন করে। ওয়াঙের বুক থেকে পাথর নেমে যায়। সে নিশ্চিন্ত হয় এই কারণে যে, স্ত্রীর রুগ্নশয্যার পাশে একটি সেবাব্রতা মেয়ে আছে—যাকে নিয়ে ওলান খুসী।

তিন দিন কেটে যাবার পর ওলান আবার কি ভাবল। সকালে কুশলতার খোঁজ নিতে এলেন যখন স্বামী, ওলান তাকে বললে—'মরার আগে আর একটা জিনিষ আমি করতে চাই।'

রাগত কণ্ঠে জবাব দিলে ওয়াঙ—'মরার কথা শুনলে আমি সুখী হই না জান ত।'

ওলানের মুখে মৃদু হাসি দেখা গেল। সেই পুরাতন হাসি যা চোখের কোণে পৌঁছেই অদৃশ্য হয়। সে বললে—'মরতেই হবে আমাকে। বুকের ভেতর মরার যন্ত্রণা বেশ বুঝতে পারি আমি। কিন্তু তবু বড় ছেলে ফিরে এসে একে বিয়ে না করা অবধি মরব না। কি চমৎকার মেয়ে আমার বৌমা—কি নিপুণ হাতে আমার সেবা করে আমার রোগের কষ্ট কমিয়ে দেয়। বড় ছেলে আসুক—এসে একে বিয়ে করুক—জানি যে তোমার নাতি আসছে—বাবার নাতকুড় হচ্ছে। তবে ত হাল্কা মনে মরতে পারব আমি।'

অসুস্থ হওয়া অবধি এত বেশী কথা কখনো বলেনি ওলান—আর তার বলা উচিত নয়। কিন্তু যে রকম জেদের সঙ্গে নিজের মনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে ওলান—তাতে স্ত্রীর ভিতরের জোর বাড়তে দেখে ওয়াঙ আনন্দিত হোল। যদিও বড় ছেলের বিয়ের উৎসব সমারোহের সঙ্গে করার জন্য আরো সময় চাইছিল ওয়াঙ, তবু স্ত্রীর উপর সে বিরূপ হ'তে পারলে না। উৎসাহিত কণ্ঠে বললে—'সেই ভালো। আজই আমি দক্ষিণ দেশে লোক পাঠাব। সে গিয়ে ছেলেকে খুঁজে বাড়ী আনবে। তার পর বিয়ে হবে। কিন্তু তুমি শপথ করো যে শিগ্‌গীর সেরে উঠবে—মরার কথা আর বলবে না মুখে। তুমি বাড়ীতে না থাকলে সে বাড়ী জন্তু-জানোয়ারের আড্ডার মত লাগে।'

স্ত্রীকে সুখী করার জন্যেই ওয়াঙ বললে এ কথা। ওলান সুখীও হোল, নিরুত্তরে সে বিছানার উপর গা এলিয়ে দিলে। চোখ বুঁজে স্নিগ্ধ হাসিতে ভরিয়ে দিলে মুখ।

ওয়াঙ লোক পাঠালে দক্ষিণে। তাকে বলে দিলে—'ছোট কর্তাকে বলবে যে তার মা মৃত্যুশয্যায়। তাকে বাড়ীতে না দেখে—তার বিয়ে না দিয়ে তিনি স্বস্তিতে মরতে পারছেন না। যদি মা, বাবা আর সংসারের কিছু দাম থাকে তার কাছে—এক নিশ্বাসে সে যেন চলে আসে বাড়ীতে। পরশু দিন আমি বিয়ের সব আয়োজন করে রাখব। ভোজেরও সব ব্যবস্থা করব।'

কোকিলাকে ডেকে ওয়াঙ হুকুম দিলে, উৎকৃষ্ট ভোজের বন্দোবস্ত করতে। সহরের চায়ের দোকান থেকে লোক এনে তার সঙ্গে রান্নাঘরের কাজ করার জন্যে কোকিলার হাতে টাকা দিয়ে সে বললে—'বড় প্রাসাদে যেমন হোত তেমনি হওয়া চাই। টাকার দরকার হলে আরো পাবে।'

গ্রামের প্রত্যেকটি মেয়ে-পুরুষকে সে নিমন্ত্রণ করলো। সহরের বাজারে চায়ের দোকানে যেখানে যত পরিচিত ছিল সবাইকে সে বললে। কাকাকে গিয়ে সে অনুরোধ করলে—'আপনার চেনা লোকদের সব নিমন্ত্রণ করবেন আমার ছেলের বিয়েতে।'

তার কাকা যে কোন্ শ্রেণীর মানুষ তা স্মরণ করেই ওয়াঙ বললে এ কথা। এ বাড়ীতে সম্মানিত অতিথির মত সে তাকে রেখেছে যে দিন থেকে সে জেনেছে তার কাকা কোন্ সম্প্রদায়ের।

বিয়ের আগের দিন রাত্রে বড় ছেলে বাড়ী এল। ঘরের ভিতর এল যখন সে ওয়াঙ ভুলেই গেল যে এই ছেলে বাড়ীতে থাকার সময় তাকে দুঃখ দিয়েছিল। গত দু'বছর ছেলেকে দেখেনি ওয়াঙ। এখন আর সে কিশোর নেই—হয়েছে পূর্ণ যুবক। দীর্ঘ সুঠাম হয়েছে তার শরীর—পুরন্ত হয়েছে গাল—কালো চুলে তৈলসিক্ত চিক্কণতা। ঘন লাল রঙের সাটিনের লম্বা গাউন গায়ে দিয়েছে সে—ভেলভেটের হাতকাটা জ্যাকেট পরেছে। ছেলেকে দেখে গর্বে ওয়াঙের বুক ভরে ওঠে। সে তাকে ওলানের ঘরে নিয়ে যায়।

ছেলেটি মায়ের বিছানার পাশে গিয়ে বসল। মায়ের শরীরের অবস্থা দেখে চোখে অশ্রু উচ্ছল হয়ে উঠল বটে কিন্তু সে মাকে খুসী করা ছাড়া অন্য কথা বললে না। 'লোকে যেমন বলাবলি করছিল তার চেয়ে তোমায় অনেক সুস্থ দেখাচ্ছে। মরতে তোমার অনেক দেরী আছে মা।'

ওলান ছেলেকে বললে—'তোর বিয়ে হোক্ আমি দেখে মরি।'

কনেকে বর দেখবে না বলে কমলিনী মেয়েটিকে ভিতর মহলে নিয়ে গেল তাকে বধূর বেশে সাজিয়ে দিতে। এ বাড়ীতে কমলিনীর কোকিলা আর ওয়াঙের খুড়ীই প্রসাধনের কাজে সব থেকে দক্ষ। বিয়ের দিনে সকালে মেয়েটির সারা দেহ মার্জ্জনা করল তারা। নতুন মোজা পরিয়ে তার উপর সাদা কাপড়ের জুতা পরিয়ে দিলে। নিজের থেকে সুগন্ধি বাদাম-তেল মেয়েটির সর্বাঙ্গে ঘসে দিলে কমলিনী। বাপের বাড়ী থেকে আনা তার জামা-কাপড়ে সাজিয়ে তুললে তাকে। মেয়েটির কুমারী তনু ঢাকল ফুলকাটা সাদা সিল্কের

অন্তর্বাসে। তার উপর মেয়েটি পরল দামী পশমের হাল্কা কোট, সর্ব্বশেষে লাল সাটিনের বধূ-সজ্জা। কপালের উপর চুল ঘসে তারা একটি ফিতে টান-টান করে বেঁধে কুশলী হাতে মেয়েটির কুমারী-লক্ষণের চুলগুলিকে নামিয়ে দিলে ভুরুর উপান্তে। আসন্ন মহিমার উপযুক্ত করে তার কপাল উন্নত আর মসৃণ করে দিলে তারা। তার পর পাউডার আর লাল রঙ দিয়ে তারা কনের মুখ সাজালে। চিকণ তুলি দিয়ে ভুরু দু'টিকে দীর্ঘায়ত করে মুখের প্রসাধন শেষ হোল। কনের মাথায় উঠল সীঁথি মৌর আর বুটিবসানো গুণ্ঠন। আঙ্গুলের নখে রঙ দিয়ে হাতের তালুতে সুবাসিত তেল মাখিয়ে তারা কনেকে বিয়ের আসরের জন্ত তৈরী করলে। মেয়েটি এ সবেতেই অভ্যস্ত, শুধু কনের যোগ্য লজ্জা আর অনিচ্ছায় সে প্রসাধনে মন্থরতা দেখালে।

মাঝের ঘরে ওয়াঙ, বৃদ্ধ বাপ, খুড়ো আর অভ্যাগতদের নিয়ে প্রতীক্ষা করছিল। এক দিকে দাসী অন্য দিকে খুড়ী দু'জনের উপর ভর দিয়ে মেয়েটি এল আসরে। এল মাথা নামিয়ে, এল ব্রীড়ানম্র হয়ে। বিয়েতে যেন সে অনিচ্ছুক এবং সেই কারণে সে নির্ভর চায় এমন বেপথু ভঙ্গীতে সে এসে দাঁড়াল। কনের প্রতিটি চরণক্ষেপে এমন লজ্জিত ভাব প্রকাশ পেল যে ওয়াঙ খুশী হয়ে ভাবলে, এই তার উপযুক্ত পুত্রবধূ।

তার পর ওয়াঙের বড় ছেলে এল বরসাজে। গায়ে লাল বিয়ের সাজ, চুলগুলি পরিপাটী করে আঁচড়ান, মুখে সন্ত কামানোর স্নিগ্ধ শ্রী। বরের পিছনে এল বরের দুই ভাই। তার সুঠাম তিনটি ছেলেকে দেখে ওয়াঙ গর্বে ফুলে উঠল। এরা তিনটিতে তার বংশের ধারা বজায় রাখবে। উচ্চকণ্ঠ চীৎকারে যৎটুকু শুনতে পাচ্ছিলেন তা ছাড়া বৃদ্ধ বাপ আর কিছু বুঝতে পারছিলেন না এতক্ষণ, তিনি সহসা হা-হা করে হেসে উঠলেন, যেন সব বুঝে ফেলেছেন। তীক্ষ্ণ সরু গলায় তিনি বার বার করে বলতে লাগলেন—'তাই বল বিয়ে হচ্ছে। বিয়ে হচ্ছে মানেই ছেলে-মেয়ে হচ্ছে—' নাতি-নাতনী আসছে ঘরে।'

বৃদ্ধের এই পুলকিত হাসিতে নিমন্ত্রিতরা সবাই যোগ দিল। ওয়াঙ শুধু ভাবতে লাগল, আজ যদি ওলান রুগ্ন-শয্যা ছেড়ে আসতে পারত আরো কত আনন্দ হোত।

ওয়াঙ সর্ব্বক্ষণ ছেলের দিকে সতর্ক নজর রেখেছে—সে বধূর দিকে তাকায় কি না। ছেলেটি যে চুরী করে চোখের কোণ দিয়ে দেখছে এইতে খুশী হোল ওয়াঙ—পুলকিত হোল তার সতর্ক অথচ কৌতূহলী তাকানো দেখে। গর্বিত হোল ওয়াঙ এই ভেবে—'ওর মনোমত বৌ-ই আমি পছন্দ করেছি।'

বর-বধূ প্রথমে বৃদ্ধকে অভিবাদন করলে। তার পর ওয়াঙকে অভিবাদন করে তারা ওলানের ঘরের দিকে গেল। সে দিন ওলান তার সর্ব্বোত্তম সাজ পরেছে, বর-কনে আসতেই সে বিছানায় উঠে বসল। ওয়াঙ চেয়ে দেখলে ওলানের মুখের দু'পাশে ভাটার মত লাল হয়ে উঠেছে। সে ভাবল ওলান বুঝি স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে—তাই সে উচ্চকণ্ঠে বললে—'এবার তুমি আরো সেরে উঠবে।'

বর কনে তার বিছানার ধারে গিয়ে তাকে অভিবাদন করলে। ওলান বিছানা চাপড়ে বললে—'এইখানে দু'টিতে বসে মদ আর বিয়ে-ভাত খাও, আমি দেখব। আর এই খাটে তোমাদের বৌভাত হবে। আমি ত এবার মরব,—আমায় ওরা টেনে নিয়ে যাবে।'

এ কথায় কেউই জবাব দিলে না। দু'টিতে লজ্জা-রাঙা হয়ে নিরুত্তর মুখে বসল পাশাপাশি। খুড়ী এলেন দু'টি পাত্রে তপ্ত মদ নিয়ে। দু'জনে পৃথক্ ভাবে পান করলে—তার পর মদ একত্রে মেশান হোল—তা থেকে দু'জনে পান করলে। দুটি প্রাণ এক হোল। তার পর ভাত এল। ঐ ভাবেই ভাত মিশিয়ে দু'জনে মুখে দিলে। দু'টি জীবন এক হোল। বিয়ের মঙ্গলাচরণ শেষ হোল। তার পর বাপ-মাকে প্রণাম করে দু'টিতে হল-ঘরে গিয়ে অভ্যাগতদের অভিবাদন করলে।

সুরু হোল ভোজ। ঘরে ঘরে উঠোনে টেবিল পাতা হোল—হাসি উঠল কলরোলে—সুপাক আহার্যের সুরভি চারি দিক্ আমোদিত করলে। অভ্যাগতরা এসেছে দূর দূর থেকে। কাউকে ওয়াঙ চেনে—কাউকে চেনে না। ওয়াঙ ধনী, সুতরাং ধনীর ঘরে উৎসব উপলক্ষে আহার্যে কৃপণতা হবে না জেনে অনেক অপরিচিত অনাহূতও এসেছে। সহরের দোকান থেকে যে সব পাচক এনেছিল কোকিলা তারা ভারী ভারী খাবারের বাক্স নিয়ে এসেছে সঙ্গে। সে সব উপাদেয় আহার্যের আয়োজন চাষীর ঘরে সম্ভব নয়। খাবার যা এসেছে শুধু গরম করা হোল এখানে। পাচকরা সাদা এ্যাপরন পরে চারি দিকে হৈ-চৈ করে বেড়াতে লাগল। সবাই সাধ্যের অতিরিক্ত খেলে—পান করলে সাধ্যাতীত। আনন্দের বাঁধ ভাঙ্গল।

ওলানের আদেশে সব দরজা খোলা হোল—পর্দা সরানো হোল। বিছানায় বসে বসে সে শুনবে কোলাহল—হাসি-ঠাট্টা। গন্ধ পাবে ভোজের। যত বার ওয়াঙ তাকে দেখতে আসছে সে উৎসাহের সঙ্গে বলছে স্বামীকে—'সবাই মদ পেয়েছে ত? মিষ্টি ভাত গরম দেওয়া হয়েছে সবাইকে? অষ্ট ফল আর বেশী করে চিনি চর্বি দেওয়া হয়েছে ত ভাতে?'

স্বামীর কথায় আশ্বস্ত হয়ে ওলান পরিতৃপ্তির সঙ্গে আবার শুয়ে শুয়ে শুনতে লাগল। রাত্রি হোল। অতিথি-সজ্জনরা বিদায় নিলেন। সারা বাড়ীতে আবার নিঃশব্দ নামল। আনন্দের উচ্ছ্বাসে যত ভাঁটা পড়তে লাগল ওলানের দেহ থেকে শক্তিও যেন কমতে লাগল। নিজেকে কেমন ক্লান্ত আর অবশ বোধ করে ওলান ছেলে-বৌকে ডেকে পাঠালে। তারা এলে সে বললে—'আমি খুব সুখী হয়েছি। আর কিছু আমি চাইনি। বাবা, তোমার দাদুকে—বাপকে তুমি দেখো। আর মা, তুমি স্বামীকে, শ্বশুরকে, দাদাশ্বশুরকে সেবা কোরো। আর ঐ অভাগী মেয়েটিকে যত্ন করো তুমি—তার কেউ নেই। এদের সেবা-যত্ন করাই তোমার কাজ। আর কারুর প্রতি তোমার কোন কর্তব্য নেই।'

শেষ কথা ক'টি ওলান কমলিনীকে উদ্দেশ্য করে বললে—যার সঙ্গে সে কখনো কথা কয়নি। কথার শেষে ওলান যেন আচ্ছন্ন ঘুমে আবার অচেতন হোল। এরা দু'টিতে মায়ের আরো কথার প্রতীক্ষায় ছিল। মা আবার কি বলতে উঠলেন। কিন্তু তখন তার পরিবেশ ভুল হয়ে গেছে—কাকে বলছেন তাও যেন তার বোধের মধ্যে নেই। চোখ দু'টি বুজে মাথা নাড়তে নাড়তে তিনি বিড়-বিড় করছেন—'আমি কুৎসিত কিন্তু আমি ত তোমার ছেলের

মা। আমি দাসী বটে কিন্তু ঘরে আমার নিজের ছেলে আছে।' তার পর চকিত কণ্ঠে বললে সে—'আমি যেমন করি ও তেমন সেবা-যত্ন করবে কি করে? রূপ ত মেয়েমানুষের পেটে ছেলে জানবে না।'

সব ভুলে গিয়ে ওলান আপন মনে বিড়-বিড় করে। ওয়াঙ ছেলেটাকে যেতে আদেশ দিয়ে নিজে স্ত্রীর শয্যার পাশে বসল। ওলানের ঘুম আচমকা ভাঙছে। ওলানের পুরু বেগুনী ঠোঁট দু'টি দাঁতের দু পাশে ফাঁক হচ্ছে, এ দৃশ্য তার চোখে এখনো কুৎসিত ঠেকছে। যখন স্ত্রী মৃতপ্রায়—এ অনুভূতি ওয়াঙকে আত্মঘৃণায় জর্জর করে। তার পর এক সময় ওলান চোখ খুললো বড় করে—মনে হোল ওয়াঙের সে-চোখ যেন কি এক আশ্চর্য কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে। ওলান তার দিকে একবার সম্পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালে, তারপর সে বিস্মিত চাউনি ঘুরে-ঘুরে আবার স্বামীর উপর এসে পড়ল। ওলান যেন তাকে দেখে অবাক হচ্ছে—কে এ মানুষটি? আচমকা ওলানের মাথাটি সুডৌল বালিশ থেকে পড়ে গেল। সর্বাঙ্গে একবার কাঁপুনি লাগল। ওলান মারা গেল।

স্ত্রীর গতপ্রাণ দেহটির কাছে থাকা ওয়াঙ সইতে পারল না। খুড়ীকে ডেকে সে বললে—মৃতার দেহকে কবরের জন্ম ধুইয়ে দিতে। সে কাজ সারা হলেও ওয়াঙ সেখানে গেল না; খুড়ী, বড় ছেলে আর ছেলের বৌকে বললে—বিছানা থেকে নামিয়ে কফিনের ভিতর দেহটি রাখতে। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার জন্ম ওয়াঙ সহরে ছুটল কফিন আচার মত বন্ধ করার লোক জোগাড় করতে। জানা গেল, তিন মাসের আগে আর ভাল দিন নেই—সুতরাং ওয়াঙ গেল সহরের মন্দিরে। সেখানকার পুরোহিতের কাছে সে কফিনটি তিন মাসের জন্ম সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে এল। ঐ বাড়ীতে তার চোখের সামনে সে ওলানের কফিন দেখতে পারবে না, এই কারণে কফিনটি সে মন্দিরে এনে রাখল। কবরের দিন অবধি মৃত এখানেই বিশ্রাম করবে।

এর পর অশৌচ পালনের বিধি নিয়মের সঙ্গে যাতে পালিত হয় তার সংসারে সেদিকে দৃষ্টি দিলে ওয়াঙ। নিজের ও ছেলে-মেয়েদের জন্ম অশৌচ পালনের ব্যবস্থা করল সে। অশৌচের সময় যেমন বিধি তেমনি ভাবে সবলের পায়ে সাদা মোটা কাপড়ের জুতা দেওয়া হোল। গোড়ালীতে সাদা কাপড়ের ফিতা বাঁধা হোল। মেয়েরা চুলে সাদা ফিতা বাঁধল।

যে-ঘরে ওলান মারা গেছে সে-ঘরে ওয়াঙ আর ঘুমোতে পারল না। নিজের প্রয়োজনীয় আসবাব পোষাক নিয়ে ওয়াঙ অন্দর মহলে কমলিনীর কাছে সরে গেল। বড় ছেলেকে ডেকে সে বললে—'বৌমাকে নিয়ে তোমার মার ঘরে গিয়ে থাক। সেইখানে তোমারও ছেলেমেয়ে হোক—যেখানে তোমার মা তোমায় পেয়েছিলেন।'

ছেলে-বৌ বাপের আদেশ মান্য করল। তারা স্বস্তি পেল সেখানে।

যে সংসারে মৃত্যু এসে প্রবেশ পায় সে স্থান সে সহজে ছাড়তে চায় না। পুত্রবধূর মৃতদেহ কফিনে দেবার সময় থেকেই বৃদ্ধ বাপ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এক দিন রাত্রে তিনি ঘুমুতে গেলেন। সকালে সেজ মেয়েটি দাদুকে চা দিতে গিয়ে দেখলে তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন—তার দাড়ী শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে—মৃত্যুর ধাক্কায় মাথাটি পিছনে টলে পড়েছে।

সে-দৃশ্যে মেয়েটি চীৎকার করে বাপের কাছে ছুটে গেল। ওয়াঙ এসে দেখলে তাকে। বৃদ্ধের লঘু জীর্ণ শরীর শুষ্ক হিম হয়ে গেছে, শোবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি হয়ত মারা গেছেন। ওয়াঙ নিজের হাতে বাপের শরীর ধুইয়ে দিলে—আলতো হাতে দেহটি কফিনের মধ্যে রেখে সেটি বন্ধ করলে। মুখে বললে—'এ সংসারের দু'টি প্রাণীকেই এক দিনে আমি কবর দেবো। পাহাড়ী জমির অনেকখানি নিয়ে এদের সেখানে আমি একত্র রাখব আর আমি যখন মরব আমিও ঐখানে থাকব।'

সেই মতই কাজ হোল। মাঝের ঘরে দু'টি বেঞ্চির উপর কফিনটি সেই নির্ধারিত দিনের অপেক্ষায় রইল। ওয়াঙ ভাবল মনে, বাপের আত্মা এই বাড়ীতেই শান্তিতে থাকবে। বাপ কাফনের ভিতর শুয়ে আছেন, তবু ওয়াঙ যেন তাকে কাছে পায়। বাপের মৃত্যুতে সে শোকগ্রস্ত নয়—কেন না, বহুবর্ষ ধরে তিনি অর্ধমৃত হয়ে আছেন কিন্তু বাপের জন্ম তার মন শোকার্ত হয়ে রইল। তার পর সেই শুভদিন এল বসন্তের মাঝামাঝি এক সময়।

অনুষ্ঠানের উপলক্ষে তাও মন্দির থেকে পুরোহিত এলেন। হলদে পোষাক তাদের, চুল মাথার উপর চূড়া করে বাঁধা। এলেন বুদ্ধ মন্দিরের উপাসকরা—তাদের সাজ দীর্ঘ ধূসর রঙের আলখাল্লা। মাথা কামান—সাতটি পূত মন্ত্রের দাগ সেখানে। সারা রাত্রি এরা ভজন আর মন্ত্র পাঠ করলেন। যত বার তারা বিশ্রাম নিলেন ওয়াঙ তাদের হাতে রূপো দিলে—নিশ্বাস নিয়ে তারা আবার সুরু করলেন। এমনি অখণ্ড ভজনে রাত্রি প্রভাত হোল।

পাহাড়ী জমির একটি মনোমত এলাকায় ওয়াঙ সমাধির স্থান নির্বাচন করেছিল খেজুর গাছের নীচে। চিং সেখানে কবর খুঁড়ে ভিতরে মাটীর দেয়াল নির্মাণ করিয়ে প্রশস্ত চত্বর করে রেখেছিল। বৃদ্ধ বাপ ও ওয়াঙ দম্পতির জন্যই নয়—ওয়াঙের ছেলেদের এবং তার বংশধরদেরও উপযুক্ত স্থান সংকুলান ছিল তার ভিতরে। যদিও এই উঁচু জমি গম ফসলের পক্ষে অনুকূল তবু ওয়াঙ এইটুকুর জন্ম কোন আফশোষ রাখল না মনে। তাদের নিজের জমিতে তাদের পরিবারের সকলে জীবনে-মরণে শান্তি পাবে এই আশ্বাসই বড়।

পুরোহিতদের ভজন শেষ হলে ওয়াঙ পরল চটের সাদা পোষাক। পরিবারের সকলেই সেই ভাবে সাজল। সহর থেকে চেয়ার আনানো হোল তাদের কবর-স্থানে নিয়ে যাওয়ার জন্ম। তারা ত আর গরীব নয়—হেঁটে যাওয়া আর তাদের শোভা পায় না। ওলানের কফিনের পিছু-পিছু সেই প্রথম ওয়াঙ মানুষের কাঁধে বসে গেল। বৃদ্ধের কফিনের পিছনের মিছিলে খুড়োই গেলেন প্রথম। যার জীবদ্দশায় কমলিনী কখনো সম্মুখে আসতে পারেনি এ সংসারের সেই প্রথম ঘরণীর প্রতি সম্মান দেখানোর জন্ম কমলিনী অবধি চেয়ারে শব অনুগমন করলে।

শোকের কান্না কাঁদতে কাঁদতে সবাই কবর-স্থানে উপস্থিত হোল। কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওয়াঙ। মন্দির থেকে আনা ওলানের কফিন বৃদ্ধের সমাধির অনুগমনের প্রতীক্ষায় রাখা হোল। চারি পাশের উথল কান্না আর শোকগ্রস্ততার মধ্যে ওয়াঙ শুধু নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। তার বুকের জমাট দুঃখ অশ্রুজলে গলে

শল্পী—সুপভাত নন্দন

পড়ল না। সে ত জানে যা হবার তা হবেই—মানুষের করণীয় যথাসাধ্য সে ত করছেই।

কবর মাটী দিয়ে ঢাকা হোল। উপরের জমি মসৃণ করা হোল দেখে ওয়াঙ তেমনি নির্বাক্ মুখে সরে এল—তার পর চেয়ার যেতে বলে দিয়ে একাকী সে পদব্রজে বাড়ীর দিকে রওনা হোল। বুকের জগদ্দল চাপের মধ্যে—একটি স্বচ্ছ বেদনাকর চিন্তা তার মনে এল। যেদিন ওলান পুকুরে কাপড় কাচছিল সেদিন সে যদি তার কাছ থেকে মুক্তো দু'টি না নিয়ে নিত, তবে কত ভালো হোত। কমলিনী যে সে দু'টি কানে পরছে এ আর দু'চোখে দেখতে পারবে না ওয়াঙ।

নিজের মনে সে বললে—'আমার ঐ নিজের জমির নীচে আমার জীবনের সোনালী অর্ধেকের বেশী মাটী চাপা পড়ল। ও যেন আমারই সত্তার অর্ধেক। এর পর আমার ঘরে আর এক ভিন্ন জীবনের স্রোত চালু হোল!

হঠাৎ দু'চোখে কান্না ঠেলে এল। ছোট ছেলের মতই সেটুকু ওয়াঙ হাতের পিঠে মুছে নিলে।

মধ্য-ভারতে সাতটি দিন

শ্রীভবদেব শর্ম্মা

দুই বৎসর পূর্ব্বেকার ভ্রমণের সঙ্কল্প যখন সত্যই কার্য্যে পরিণত হইবার মত হইল তখন মনে মনে একটু আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেছিলাম। জীবনটা কূপমণ্ডুকের মত কি এক অনাদৃত কর্ম্মগণ্ডীর মধ্যে একরসতার ফিকে রঙে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে—একটু আধটু ঘরের বাহিরে যাহা যাইতে হইয়াছে, তাহা আধিব্যাধির তাড়নায়, কর্ম্ম-জগন্নাথের রথনেমির নির্ম্মম নিষ্পেষণে, খুব জোর ত' কাহারও 'উপসর্গ' বা 'লেজুড়' হইয়া। এবার যেন ভাগ্যবিধাতা স্বাতন্ত্র্যের ফাঁকের সন্ধান দিতেছিলেন। 'অতঃপরং কিং ভবিষ্যতি'র ভাবনাটা পিছনে রাখা যাইতে পারে জানিয়া মনে একটু বল আসিতেছিল। সংসারচক্রে প্রতিনিয়ত ভ্রাম্যমাণ হইলেও 'চলতি চাকতি'র বাজারে ভ্রাম্যমাণের কোঠায় কোন দিন পড়িতে হয় নাই। ভ্রমণ পেশা নহে, অনেক নেশার মত ভ্রমণের নেশাটাকেও বরদাস্ত করিতে শিখিয়াছি' তবে এ ভ্রমণ নিছক ভ্রমণ নহে, তীর্থযাত্রা, বিদ্বৎসম্মেলন, সংস্কৃতির প্রসার-পথের হদিস অপরের নিকট আবিষ্কার—এমনতর কত-কি উৎকট আজগুবি জল্পনা কল্পনা মনে বাসা বাঁধিতেছিল। এমন অবস্থায় বর্ত্তমান ভারতের 'মুক্তি-ফৌজে'র অনেকমুখী সেনার মত সংখ্যায় বহুবচন হইলেও গন্তব্য যখন এক, তখন অর্দ্ধ পথে কর্ম্মক্ষেত্রে মিতাচীর ভাসা-ভাসা ভরসা লইয়া হাসিমুখে যখন আমরা সেদিন হাওড়া ষ্টেশন হইতে রওনা হইলাম সেই সময়ে শান্ত নিবৃত্তি না আসিলেও একটা স্বচ্ছন্দ নিশ্চিন্ততা যে মনের কোণে আসন জুড়িয়াছিল তাহার অপলাপ করিতে পারি না। আশা-আকাঙ্ক্ষা লইয়াই মানুষকে বাঁচিতে হয়—আতঙ্ক-আলস্যকে চাপা দিয়া কল্পনার রঙীন চিত্রে মশগুল হইয়া আমরা থাকিতে ভালবাসি—ইহার নামই জীবনলীলা।

২৬শে আশ্বিন রবিবার ই আই আর বোম্বাই মেলে আমরা রওনা হই। পরদিন প্রাতে অভ্যস্ত দৈনন্দিন কর্ম্মতালিকার পরিবর্ত্তনের জেরস্বরূপ যখন সুপ্তি ও অবসাদের ঝোঁক দেখা দিতেছিল, তখন এলাহাবাদ—চেওকি পার হইয়া জি আই পি রেল দিয়া আমাদের গাড়ী দক্ষিণ-মুখে চলিতে থাকিল। এই পথে এই আমার প্রথম আসা—শরীরের গ্লানিকে সরাইয়া রাখিয়া সহসা সজাগ মন তখন আপনাকে প্রকট করিতে চাহিতেছে। দুই পার্শ্বের শ্যামল (বিশেষ সুজল নহে) শস্যক্ষেত্র ও দূরে শৈলমালার অস্পষ্ট রেখা দিকচক্রবালের অনন্ত প্রান্তে লিপ্ত দেখিতে দেখিতে আমরা মাণিকপুর জংসন-ষ্টেশনে পৌঁছিলাম। ইহার পরে বান্দা জিলা পিছনে রাখিয়া যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য-প্রদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিলেই আমরা মধ্য-ভারতে ('মধ্য প্রান্তে') হাজির হইব। কিছু দূরে মাণিকপুরের শাখা-লাইনে শান্তরসাস্পদ হিন্দুর সাধনাধন্য আদিকবির 'সুভগ গিরিরাজ সম গিরি, চিত্রকূটের পরিমণ্ডল—যাহার প্রতিটি শাখ-গিরি, নদ, নদী, কানন, কন্দর, 'দশবদনলক্ষ্মীবিভ্রম-বিরাম' শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্য স্মৃতিতে যেখানে এখনও সংসারসুখবিমুখ বীতস্পৃহ রামায়েৎ বৈরাগীর দল কুটীরে আশ্রম বাঁধিয়া পার্ব্বত্য-প্রস্রবণের নির্ম্মল জলে পিপাসা দূর করে এবং নিকটস্থ বৃক্ষরাজির ফল-মূলে দিনপাত করিয়া—

'সুরমন্দির তরুমূলনিবাসঃ শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥'

এই মোহমুদ্গার মন্ত্রের কার্য্যতঃ সাধন করিয়া থাকে এবং যাহার দিগন্ত-বিস্তৃত সীমান্তের মনঃপ্রাণবিনোদন আত্মারাম প্রাকৃতিক দৃশ্যের সুষমায় মানুষের সকল পাপ তাপ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব শুনিয়া থাকি। বর্ত্তমানের ইতিহাস-রস-রসিক সুধীবর্গের নিকটও ইহার প্রান্ত, উপান্ত ও অপরান্তের মালব মহারাষ্ট্র, মহা-কোশল (দক্ষিণ), বিদর্ভ রাজ্যের এবং কুণ্ডিনপুর, বুন্দেল, প্রতিষ্ঠান, বিদিশা (ভিলসা), সাঁচী প্রভৃতি পুরী ও জনপদের কীর্ত্তি-কলাপে মুখর উপল-বিষম বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণ, পুণ্যতোয়া নর্ম্মদার সলিলে সিক্ত গিরিমালা-কিরীটী এই ভূভাগের আকর্ষণ স্বল্প নহে।

ঘনায়মান সন্ধ্যার ছায়ায় আনমনে যখন কখনও বিরস-বিহ্বল ভাবে কখনও সমস্তকে মিশাইয়া চিত্ত যখন আপনাকে দোল দিতেছিল, তখন গাড়ীখানি মৃদু-মন্থর গমনে জব্বলপুর ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করিল। নিজ জব্বলপুর এক অনতিবৃহৎ আধুনিক সহর, দক্ষিণে বামে রেল-কর্ম্মচারীর উপনিবেশ ও কলকারখানা শিল্প-সরঞ্জামের আবহাওয়ায় বাড়িয়া উঠিয়াছে। বিস্তৃত ধূলিবহুল রাজপথের মধ্য দিয়া আমাদের টোঙা যখন অলস-লালস আবেশ-অবশ ভাবে আমাদের অনির্দ্দিষ্ট ডেরার সন্ধানে চলিতেছিল, তখন কোথায়ও উৎসাহ-সম্পন্ন তরুণ পেশোয়ারী যুবকের অবিচ্ছিন্ন অবিরাম (non-stop) তিন দিন ব্যাপিয়া সাইকেল চালানর কৌশল কসরতে আমোদরত সমবেত সহরবাসীর অফুরন্ত কৌতুকের অংশ গ্রহণ করিতে করিতে, কোথাও বা আমাদের অভাগ্যক্রমে অতিবিরল-দর্শন বাঙ্গালী বাবুর সকাশে (পরে আমরা শুনিলাম নানান ব্যপদেশে মধ্য-প্রদেশের এই সহরে প্রবাসী-বাঙ্গালীর সংখ্যা দুই হাজারের কম নহে ও সহরের নাগরিক শাসনে বাঙ্গালী এক গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া আছেন) কৃপাভিক্ষুকবেশে আশ্রয়-সন্ধানের সংবাদ লইতে লইতে প্রহরাধিক রাত্রিতে আমরা চমৎকার বাঙ্গলো ছাঁচের এক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আশ্রয়ে আসিয়া পৌঁছিলাম। দীর্ঘ জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম্মফলে কুটিল কাল-পথের যাত্রী যাযাবর মানুষ জাতি তাহার তথাকথিত 'ঘর' ও 'বাহিরে'র মধ্যে কতটুকু সূক্ষ্ম ব্যবধানের প্রত্যয় রাখে তাহা এমন অবস্থায় বেশ প্রতিভাত হয়। চব্বিশ ঘণ্টার পথশ্রমকে নিমেষের মধ্যে অপসারিত করিতে চাহিয়া স্বচ্ছ-চিত্তে ও উদার-কৃতজ্ঞ মনে অপরের অভিপ্রায়-অভিসন্ধি, দ্বন্দ্ব-ধন্দের তোয়াক্কা না রাখিয়া যখন I to my own cabin repair গোছের ভাবনায় বিছানার কোমল কমনীয় অঙ্কে স্থান লইলাম, তখন বারেকের তরেও আমরা নিজে কতখানি সুখ-সুবিধার প্রয়াসী স্বরাজ্যবাসী স্বার্থপর জীব সে কথা অন্তরের অন্তস্তলেও দেখা দিল না।

পরদিন প্রাতে সহরের উপকণ্ঠের একটু আধটু দেখ-শুনা পদব্রজে সারিয়া ও যথারীতি নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া যখন জানিতে পারিলাম আমাদের নর্ম্মদার জলপ্রপাত ও মর্ম্মরশিলা (marble-rocks) দর্শনের সমস্ত সুব্যবস্থা হইয়াছে। মধ্যাহ্নেই আমরা ট্যাক্সিযোগে সেখানে রওনা হইতেছি তখন মনটা উল্লসিত হইল, কেন না, সাধারণ ভাবে এই যাত্রায় ঐটুকু ছিল প্রবল আকর্ষণ 'রথ দেখা আর কলা বেচা') যাহা হউক একটা। সমগ্র ভারতে অনুসন্ধিৎসু বহু দর্শকের কাছে যাহার দর্শন একটা স্পৃহণীয় বস্তু, ভারতের বাহিরকার সমঝদার বিদেশী দর্শকও যাহার জন্য উৎসুক, সেই নর্ম্মদা-জলপ্রপাত জব্বলপুর সহর হইতে চৌদ্দ মাইল দূরে অবস্থিত—রেলপথে

এলাহাবাদ-ইটার্সি শাখার ভেরাঘাট ষ্টেশন হইতে তিন মাইলের মধ্যে। মধ্যপথে জব্বলপুর সহর হইতে তিন ক্রোশ ব্যবধানে প্রাচীন চেদি ও মধ্যযুগের কলচুরি রাজবংশের বিশ্রুত রাজধানী ত্রিপুরী ইতিহাসে প্রথিত ত্রিগর্ত্ত বা ত্রিকলিঙ্গ জনপদের মত নিজ নামের বিষয়ে কৌতূহল জাগাইয়া দেবালয়, চত্বর, অলিন্দ, প্রাসাদ ও প্রাকার-মালার ভগ্নাবশেষ লইয়া বিরাজিত। মেকলকন্যকা নর্মদার বীচিবিক্ষোভমুখর যে ত্রিপুরীর বর্ণনা আমরা সাহিত্যে পাইয়া থাকি তাহা এই পুরী হইলে ইহা সহজই অনুমেয় যে, ইহার পরিমণ্ডল সুদূর-বিস্তৃত ছিল, অথবা প্রাচীন পাটলিপুত্রের গাত্রবাহী শোণ নদের মত নর্মদা নদীর স্রোতোরেখা বর্ত্তমানে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। প্রত্নতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক ও ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের গবেষণায় ইহা পরিষ্কার হইতে পারে। ত্রিপুরী এখনকার তিউরী বা তেউর। সিধা সড়ক ছাড়িয়া একটু ভিতর দিকে যাইলে এই দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দীর রাজধানীর আসনে প্রতিষ্ঠিত নগরের জীর্ণ সীমানায় পৌঁছান যায়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এইখানেই ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের এক স্মরণীয় অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। মহাভারত বা পুরাণের প্রাগৈতিহাসিক যুগে শিশুপাল আদি চেদি ভূপালগণের চন্দ্রপ্রতিষ্ঠ পুরী মাহিষ্মতী (যাহাকে জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী এবং নর্মদার তীরবর্ত্তী বলিয়াও অনুমান করা অসঙ্গত মনে হয় না) অথবা পরবর্ত্তী কালের কল্পনাবিলাসী বিলাসিগণের মধ্যমণি দশার্ণপুরী—ইহাদের সহিত এই পুরী বা তাহার উপকণ্ঠের সম্বন্ধও পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের আলোচ্য। প্রায় এক ঘণ্টা কাল মোটর-যানে আমরা কাঁচা পথে আসিয়া গ্রাম্য পথ দিয়া যখন পদব্রজে চলিতেছিলাম তখন নর্মদার গম্ভীর স্তব্ধ জলস্রোতের শব্দ কাণে আসিতেছিল (১)। নর্মদাদর্শনে পুণ্যার্জ্জন করিলাম। দিনান্তের শান্তিকে অভিভূত করিয়া নদীর ক্ষিপ্রমন্থর আঁকা-বাঁকা ধারা ও উপরের গিরিমালাজটিল বিশাল নভোনীলপটে বাঁধা প্রকৃতির নিবাতনিষ্পন্দ লীলা সাধারণ দর্শকের মনকে বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে। তথাপি ইহা স্বীকার্য্য যে, এই জলপ্রপাতের পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্যরস আস্বাদ করিবার মত সময়, সুযোগ ও চিত্তবৃত্তি সহজলভ্য নহে—শাস্ত্রে যোগসমাধির অনুকূল অবস্থাসংহতির প্রসঙ্গে স্বচ্ছন্দ মন্দ জলধারার উল্লেখ পাই। দর্শকের সংখ্যা তখন অধিক ছিল না, আমাদের স্বয়ংবৃত স্থানীয় প্রদর্শক (guide) চারি দিকের পাথরের কার্য্যে ব্যাপৃত জনকয়েক অবসর-বিনোদন-নিপুণ গ্রামবাসীদের কারুকার্য্য দেখাইতে লাগিল, নর্মদার উৎপত্তিস্থান এইখান হইতে ন্যূনকল্পে শতাধিক ক্রোশ দূরে বিন্ধ্যগিরির শাখা-শিখর অমরকূট বা অমরকণ্টকের উল্লেখ করিতেছিল যাহার অপর পার্শ্ব হইতে এখনকার স্বাস্থ্যকামী ও রোগীর পরিচিত পেণ্ড্রা রোডের কিছু দূরে উত্তর-ভারতের ক্ষিপ্ত নদ শোণ প্রবাহিত। অল্প কয়েক দিন পরে নৌকা চলিবে, সাহেব লোক ও বাবুরা আসিয়া বাঙ্গালো-(Bungalow)এ আস্তানা স্থাপন করিবেন। কার্ত্তিকী পূর্ণিমার মেলায় প্রচুর জনসমাগমে ক্ষুদ্র পল্লী সরগরম হইবার কথা এবং বর্ত্তমান দুর্দিনের খাদ্যসংগ্রহের নির্বন্ধে নিজেদের কষ্টকর সহরযাত্রার কাহিনীও সে সবিস্তরে বিবৃত করিতে ভুলিল না। এই অন্যমনস্কতার মধ্যে আমাদেরও ব্যাক্ষিপ্ততার ফলে এই দৃশ্য উপভোগ করিবার জন্য যে স্থিরচিত্ততার একান্ত প্রয়োজন তাহা সমূলে উৎপাটিত হইতেছিল বলিয়াই হউক, অথবা ভাগ্যদোষে দিব্য সূক্ষ্ম দৃষ্টির অভাবে এই সর্বজনধন্য 'ধূম্রধারার' ধূম্রতায় চক্ষুষ্মান্ স্পর্শ ব্যতিরিক্ত অন্তরের স্পন্দনটুকু বিশেষ অনুভব করিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া মনে হয় না (২)।

ত্বরিতপদে যখন টিলার উপরে অর্দ্ধ কণ্টকবৃতিচ্ছন্ন পাণ্ডুরাকৃতি বনগুল্মরাজি পার হইয়া উপরে হরগৌরীর মন্দিরে আসিয়া হাজির হইলাম, তখন অবচেতন মনে অন্তরাত্মার অন্তস্তলে একটা চাপা ব্যর্থতার হা-হুতাশ রহিয়া রহিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। প্রাকার-বেষ্টিত গিরিদুর্গের মত পর্ব্বত-প্রাচীর-মণ্ডিত এই যুগলমূর্ত্তির মন্দির তাহার কালকল্মিত ধূসর বর্ণে বিশ্বজয়ী মহাকালের স্নিগ্ধ শ্যাম-উজ্জ্বল মধুর তেজো-দীপ্তিতে উদ্ভাসিত—প্রাচীরগাত্রে বৃত্তাকারে একাদিক্রমে সাজান তন্ত্র-সাহিত্যে সুপরিচিত চতুঃষষ্টি যোগিনীগণের বালুকাপ্রস্তরে (Sandstone) খোদিত বাহনপরিকর-পরিবৃত রূপ। কালধর্ম্মের অপরিহার্য্য লীলায় ধ্বংসের পথে আগুয়ান হইলেও অথবা কোন মোহমত্ত ধর্ম্মান্ধ বিজেতার দাম্ভিক নির্বন্ধে বিকলবিক্ষুব্ধ হইলেও এখনও ইহারা তাহাদের তন্ত্রোল্লাসী রমণীর সংগঠন হারায় নাই। ইহাদের এখানকার নাম-ধাম বসন-ভূষণ আয়ুধ-বাহন প্রাচ্য ভারতখণ্ডে প্রচলিত মূর্ত্তি হইতে বিভিন্ন বলিয়া লক্ষিত হইল। মন্দিরের প্রাচীর-বেষ্টনীর বাহিরে সমুচ্চ ভৃগুপতনের ভঙ্গীতে অবস্থিত সমতল কুণ্ডকে ভৃগুমুনির যজ্ঞকুণ্ড বা ভৃগুক্ষেত্র বলিয়া আমাদের প্রদর্শক নির্দেশ করিল পুরাণবর্ণিত বা ঐতিহ্য কল্পিত মহর্ষি ভৃগুর আশ্রম অবশ্য নর্মদা নদীর সাগরসঙ্গমপ্রান্তে অবস্থিত বলিয়া বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহার এই নির্দেশ—ইহার নিকটে 'দত্তাত্রেয় প্রভৃতি মূর্ত্তির সমাবেশ'ও এই কথারই সূচনা করিতেছে। একই দেবস্থানে সকল দেবতা ও তাঁহাদের বিভূতি-বৈভবকে সংস্কৃত করিবার লৌকিক সহজবোধ্য প্রথার উপর নির্ভর করিতেছে (৩)। এই চতুরস্র অনাবৃত বিস্তৃত ভূক্ষেত্র হইতে ইহাদের বেষ্টন করিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে প্রবাহিত নর্মদা ও স্তরে স্তরে অবনত শস্যশ্যামল সমতল তৃণশাদ্বল ভূখণ্ডের দৃশ্য প্রকৃতই নয়নবিনোদন ও মনোরম—ইহার কতকটা অনুরূপ ছবি কামরূপে ব্রহ্মপুত্র নদপার্শ্ববর্ত্তী দেবী কামাখ্যার মন্দিরের প্রান্তস্থ কালী পাহাড় নামে আখ্যাত টিলাখণ্ড হইতে পাওয়া যায়। তবে এ স্থানের গাম্ভীর্য্য ও সৌকুমার্য্যের তুলনা অল্পই মিলে।

---

(১) ইহার মাহাত্ম্য পুরাণে পাইয়া থাকি—
ত্রিভিঃ সারস্বতং তোয়ং সপ্তাহেন তু যামুনম্।
সদ্যঃ পুনাতি গাঙ্গেয়ং দর্শনাদেব নার্ম্মদম্॥
—মৎস্যপুরাণ ১৮৬।১১।

(২) এই প্রসঙ্গে চিন্তাশীল লেখক Sir Martin Conwayএর 'Crowd in Peace and War' গ্রন্থের এ কয়টি পঙক্তি মনে আসিতেছিল—"While all crowds are moral, none are religious. Even a church cannot be collectively religious."

(৩) রামটেকের তীর্থ-পরিক্রমার মধ্যে অবস্থিত কতক আনুষঙ্গিক দেবদেবীর মন্দিরের মত এখানকার মূল মন্দির সাম্প্রদায়িক শিল্প ও বাস্তু শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট (জীর্ণোদ্ধার) শ্রেণীর সংস্কারকার্য্যের অন্তর্ভুক্ত কি না তাহা প্রত্নতাত্ত্বিকগণের বিচার্য্য।

দনান্তের রক্তরবি অস্তশিখরে ঢলিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আমরা এখান হইতে অবরোহণ করিয়া জীর্ণ জড় মনের রসায়নতুল্য যথেষ্ট রসদ আহরণ করিতে করিতে প্রসন্ন ভাবে মোটরে নিজেদের নির্দ্দিষ্ট আসনটি অধিকার করিলাম। সারা চৌদ্দ মাইল পথ তাহারই ভোগরাগ, উপভোগ, অনুযোগ, পোষণ ও রোমন্থনে ব্যাপৃত হইয়া আত্মভোলার মত রাত্রির প্রথম প্রহরে নিজেদের ডেরায় শুষ্ক সবল সচেতন বৃত্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম। জব্বলপুরে যাত্রার 'সুফল' বরণ করিয়া পরদিনই আমাদের লক্ষ্যস্থল নাগপুরের পথের অবশিষ্ট ও অবিশিষ্ট শ্রান্তি-ক্লান্তির জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। জীবনসন্ধ্যায় ছিন্ন-ভিন্ন-ভগ্ন কুলায়ে এতখানি সিদ্ধ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আনন্দের তৃণপর্ণ রূপরস-বর্ণের কতটা মূল্য, তাহা নিজের গৌরবদীপ্ত অন্তরের মর্ম্মস্থলে উপলব্ধি করিতেছিলাম।

পরদিন জব্বলপুর ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে প্রাতের দিকে একবার আজকালকার পর্য্যটকগণের রীতিতে সহরের বিভিন্ন অংশ মোটরযোগে চক্র দিয়া আসিলাম। অপরাহ্ণে ইটার্সি হইয়া যে প্যাসেঞ্জার গাড়ী সরাসরি নাগপুরে যায় তাহাতে আশ্রয় লওয়া গেল। ইটার্সি মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে এক বড় জংশন-ষ্টেশন (যেখানে চৌমোহানির মত চারি দিক দিয়া কলিকাতা, বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও দিল্লীর রেল গাড়ী আসিয়া মিলিত হয়।) পরে আমরা নাগপুর হইতে বেঙ্গল নাগপুর লাইন দিয়া কলিকাতায় ফিরি। এই প্রকারে রেলপথে সারা মধ্যপ্রদেশের অন্তর্বর্ত্তী অর্দ্ধেকের উপর 'জমীন' আমাদের ভ্রমণ-চক্রের মধ্যে পড়িয়া যায়। এই সমগ্র ভূভাগেই সামান্য উন্নতানত কঙ্কর-রুক্ষ স্থলভূমি বাদ দিলে (এখানে ওখানে অতি ক্বচিৎ প্রায়োচ্চ শিলাদেশ, কোথায়ও এক-আধটা ছোটখাট সুড়ঙ্গ) আমাদের বাঙ্গালার মত সমতল ক্ষেত্রে ভরা। অনুন্নিস্তর স্বল্পপরিসর নদ-নদী দ্বারা বিভক্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আকর আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের অনুপম বাহন গৌড়ীয় রীতির উদ্ভবক্ষেত্র মগধ-গৌড়-বঙ্গের মত দর্শনীয় মহারাষ্ট্র-বিদর্ভ বাণিজ্য বৈদর্ভী রীতির প্রভবপ্রাপ্ত মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত সাহিত্যের উপাদান-সম্ভারে সমৃদ্ধ ইতিহাস-বিশ্রুত ইহা এক জনবহুল জনপদ। প্রভাতে সূর্য্যোদয় দর্শনে যে স্নিগ্ধ-সান্দ্র পুলকপ্রবাহ ধমনীর ভিতর দিয়া বহিয়াছিল তাহার পরিমাপ করিতে গিয়া প্রবুদ্ধ মন আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কৈশোরে আমার প্রথম দেশ-ভ্রমণ-পর্ব্বে বি এন্ ডব্লিউ রেলপথে বিহারের এক অজ্ঞাত-নামা জনপদের প্রান্তে শ্রান্ত-ক্লান্ত নয়ন-মনের পরিতর্পণ সূর্য্যোদয়ের মোহন দৃশ্যের কথা সহসা উদ্ঘাটিত করিল। সেদিনের স্থিতিস্থাপকতা, সজীবতা ও সরলতার পুনরুপলব্ধি সম্ভবপর ব্যাপার নহে। 'তে হি নো দিবসা গতাঃ।' আনন্দের শ্রেণীবিভাগ অপ্রাকৃতীয়, লাঞ্ছনকও নহে—তাই বৈদিক ঋষির ভাষায় হিরণ্ময় রথে দেব সবিতা যখন অন্ধকারের আবছায়ায় অর্দ্ধধূসর লোককে আবর্ত্তিত করিতে করিতে অমৃত ও মর্ত্ত্যকে স্বকর্ম্মে নিবেশিত করিয়া ত্রিভুবন-পরিদর্শনে নিষ্ক্রান্ত হইলেন, তখন অসাড় নিস্পন্দ হিমচতুষ্প্রভ জীবনধারায় সঞ্জীবন তড়িৎপ্রবাহ, আলোক ও উত্তাপের অমিত আকর, উদয়-গিরি-শিখরে আরূঢ় নিখিল ভুবনেত্র তাঁহারই উদ্দেশে 'পুনাতু মাং তৎ সবিতুর্বরেণ্যম্' এই কান্ত-কাতর আর্ত্তিহর মিনতি ভক্ত স্তোত্রকার মনীষী কবির বাণী মুখ হইতে উৎসারিত হইল। কিছুক্ষণ পরে যথাসময়ে আমাদের গাড়ী নাগপুর ষ্টেশনে আসিয়া হাজির হইল। সেখানে আমাদের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তত্ত্বাবধায়কবর্গের প্রতিনিধিদ্বয়কে আদর-আপ্যায়নে স্বাগত-সম্ভাষণ করিবার জন্য উপস্থিত দেখিয়া বিশেষ আশ্বস্ত হইলাম।

রেলওয়ে ষ্টেশনের অনতিদূরে পরিচ্ছন্ন প্রবাত পরিসরে আদর্শ আবহাওয়ার মধ্যে ধানতলীতে শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম অবস্থিত। সেখানেই আমাদের নাগপুর প্রবাসের পাঁচটি স্বস্তির দিন কাটিয়াছিল। ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধার প্রতি দৃষ্টি ও সর্ব্ববিধ শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ্যের উপযুক্ত সেবা-শুশ্রূষার দিক দিয়া এই প্রতিষ্ঠান সমগ্র ভারতে অনন্য-সাধারণ। ব্যক্তিগত ভাবে মত ও পথের তারতম্য থাকিলেও এই প্রতিষ্ঠানের স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ, ব্রহ্মচারী ছাত্র আশ্রিত সকলের প্রতিই সদ্ভাব ও আন্তরিক কৃতজ্ঞতা লইয়াই আমি ফিরিয়াছি। প্রকৃত প্রস্তাবে উচ্চ-অঙ্গের প্রশংসা তাঁহাদের প্রত্যেকেরই প্রাপ্য আমার অন্তরের অভিজ্ঞতা এই কথারই সাক্ষ্য দিয়াছে। পথশ্রম দূর হইলে নিত্যকৃত্যসমাপনান্তে অপরাহ্ণে সুস্থ সমাহিত ভাবে নাগপুর পরিক্রমার জন্য বাহির হওয়া গেল। সঙ্গে আশ্রমের এক জন স্বামীজি, বিনায়ক—সাক্ষাৎ সিদ্ধিদাতা। অখিল ভারতীয় প্রাচ্য সম্মেলনের (All India Oriental Conference) সচিবগণের সময়োপযোগী মূল্যবান্ পরদিন প্রাতে প্রাপ্ত পুস্তিকাখণ্ড (৪) ও অতঃপর পরিচিত প্রবাসী বাঙ্গালী সজ্জন কয়েক জনের প্রদত্ত বিবরণে যাহা কিছু সহরের উল্লেখযোগ্য ও দর্শনীয় প্রায় সমস্তই তিন ঘণ্টার মধ্যে এই নাগপুর-পরিক্রমায় আমরা দেখিয়া লইলাম, কি জানি পরে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃততায় ও সময়াভাবে দেখা হইবে না এই আশঙ্কায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের নাগপুর সহরের বিচিত্র কাহিনী পুরাতত্ত্বশিক্ষার্থীর-জ্ঞেয়। বর্ত্তমানের নাগপুর সহর আমাদের কলিকাতা সহরের মত দুই শত বৎসরের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছে। বেরার ও মধ্যপ্রান্তে তাঁহাদের নিজেদের উচ্ছ্রাবিত বুথাত চৌথ কর আদায় করিবার জন্য 'অধিকৃত' মহারাষ্ট্র জননায়ক ছত্রপতি শিবাজীর সুশাসন ও শৃঙ্খলার আদর্শ অনুসরণ করিয়া পেশোয়াগণের অন্যতম উত্তরাধিকারী ভোঁসলা পরিবারের বরেণ্য রাঘবজী ভোঁসলা খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই অঞ্চলের পূর্ব্বস্বামী গণ্ডনায়কগণকে বিধ্বস্ত করিয়া উত্তরে নর্ম্মদা হইতে দক্ষিণে গোদাবরী, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর হইতে পশ্চিমে অজন্তা শৈলোপান্ত পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রপ্রতাপ বিস্তৃত করেন। এখনকার সহরে এই মহারাষ্ট্র-প্রভাব সুস্পষ্ট। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে স্বপরিবারের মধ্যে গৃহবিবাদের ফল যখন প্রতাপশালী কূটনীতিজ্ঞ ইংরেজগণের সহিত সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় তখন ইঁহাদেরই এক জন সহরের ব্রিটিশ রেসিডেণ্টকে আক্রমণ করায় সহরের কেন্দ্রস্থ টিলার উপরকার সীতাবল্ডী দুর্গের নিকট ভাগে তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হন। কয়েক বৎসর পরে তাঁহাদের রাজ্য ইংরেজ-অধিকারে আসে। ফলে নাগপুর সহর সম্প্রতি অনেক কিছুর দিক্ দিয়া ব্রিটিশ-ভারতের এক গণ্যমান্য প্রদেশের রাজধানী। বর্ত্তমান লোকসংখ্যা তিন লক্ষের উপর—ইহার মধ্যে শতকরা এক জন বাঙ্গালী। সহরে মধ্যযুগের নিদর্শন যমুনা দরওয়াজা প্রভৃতি তোরণ, যমুনা অম্বাঝরী প্রভৃতি বিস্তৃত জলাশয় এবং মহারাজবাগ প্রভৃতি মানারম উদ্যান ভোঁসলাগণের

(৪) Nagpur Past and Present.

উদ্ভাবনীশক্তি ও শিল্পকলাপটুতার সাক্ষ্য দিতেছে। এইগুলিই বর্ত্তমান যুগের জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসারে ও আনুষঙ্গিক যুগোপযোগী রুচিকর আবহাওয়ায় শিল্পকলা কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতির অর্থকরী কার্য্যে ব্যবহৃত হইতেছে। সহরের পুরাতন অংশের প্রান্তভাগে রামমন্দির এবং তাহার সুললিত ভজন মহারাষ্ট্রীয় চরিত্রে পরিপাটী-পরিচ্ছন্নতায় ও ভগবদ্ভক্তি-পরায়ণতার সূচনা করে। বর্ত্তমান শিল্পসর্বস্ব ও বাণিজ্যবিত্ত যুগের বার্ত্তা এম্প্রেস্ মিল প্রভৃতি কাপড়ের কল এবং সহরের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তের এতওয়ারী বাজার (রবিবাসরীয় বাণিজ্যকেন্দ্র) কর্ত্তৃক দেশবিদেশে গৃহে গৃহে উদ্ঘোষিত হইতেছে। রেল-লাইনের উত্তর-পশ্চিম অংশে সরকারী দপ্তরখানা, আইন পরিষদ-গৃহ ও হাইকোর্ট প্রভৃতি—দক্ষিণাংশে (কলিকাতারই অনুকরণে) ধানতলী গ্রামকে কেন্দ্র করিয়া সহরের নূতন উপকণ্ঠ গড়িয়া উঠিয়াছে। চাহিদার ক্রম-বর্দ্ধমান দাবী মিটাইতে এখানেও এক Improvement Trust সংগঠিত হইয়াছে যাহা আধুনিক যুগের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য ও পারিপাট্যের প্রতি সচেতন হইবার জন্য সতত সচেষ্ট। যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনায় নাগপুরের ভাবী শ্রীবৃদ্ধি ভারতের বর্ত্তমানের চারিটি 'ধাম'—দিল্লী, করাচী, বোম্বাই ও কলিকাতা সহরগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট বিমানবর্ত্মে ও অন্য নানাবিধ প্রতিষ্ঠানে প্রকট।

উচ্চশিক্ষার বিস্তারে এখানকার বিশ্ববিদ্যালয় মাত্র ইহার বিংশ বৎসরের জীবনকালে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছে—আর্টস্, বিজ্ঞান (Science), শিক্ষকতা (Teacher's Training), আইন, কৃষি, বাণিজ্য (Commerce) প্রভৃতি বহু শাখার (Faculty) প্রসারে এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যেই সমৃদ্ধ। অদূর ভবিষ্যতে চিকিৎসা (Medicine) ও Engineering কলেজ সহরের শোভাবর্দ্ধন করিবে আশা করা যায়। সহর হইতে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে মধ্যযুগের স্বনামধন্য বরদা নদী (যাহা কোন এক প্রাচীন যুগের বিদর্ভ ও মালব রাজ্যকে বিভক্ত করিয়াছিল) অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমানের Wardha (ওয়ার্দ্ধা) উপনিবেশ যেখানকার বাণিজ্যশিল্পালয় (Commerce College) (যাহার ছাঁচে নিজ নাগপুর সহরে এই প্রদেশের দ্বিতীয় বাণিজ্যশিল্পালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে) মহারাষ্ট্রীয় জাতীয় প্রতিভার লক্ষ্মী-সরস্বতী উভয়ে সম্প্রীতি সূত্রে বা প্রাচীন অর্থ-নৈতিকের ভাষায় 'বৈবাহ্যের' স্পৃহনীয় গৌরবে বর্ত্তমান। এই ওয়ার্দ্ধা যুগাবতার মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ শিক্ষার কেন্দ্র বা রাষ্ট্রীয় আশ্রম—যাহা দেখিয়া আসিবার সৌভাগ্য আমাদের ঘটে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়-গৃহাবলীর অনতিদূরে কিছু উঁচু জমিতে মাত্র চারি বৎসর হইল প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মীনারায়ণ কারুকলাগার (Institute of Technology), রসায়নীয় ইঞ্জিনিয়ারিং (Chemical Engeenering) ও নানাবিধ তৈল প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিক্ষার ব্যাপারের নূতন সাজ সরঞ্জামে নূতনতর কল্পনায় বিজ্ঞান, শিল্পগবেষণা ও আনুষঙ্গিক অনুষ্ঠানের নবতম যুগ সূচনা করিতেছে। সহরে এক দিন ভারতীয় জাতীয় সেনার (I. N. A.) লেঃ কর্ণেল শাহ নওয়াজের আগমনোৎসবোপলক্ষে রাজকীয় চলতি পথে সাধারণ গাড়ী-চলাচল বন্ধ হওয়ার ফলে অন্য পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমরা এখানকার সেবাসদন ও তৎসংলগ্ন বালিকাগণের শিক্ষালয়ের (H. E. School) গৃহ দেখি—শুনিলাম, এ অঞ্চলে স্ত্রীশিক্ষার বহুল প্রচলন আছে, সহরের এক মহিলা-কলেজে চারি শত ছাত্রী পড়াশুনা করেন। এখানকার আধুনিক অর্থকরী শিক্ষাদীক্ষার ও জনসেবার আদর্শ প্রচারে প্রবাসী বাঙ্গালীর দান নগণ্য নহে। বলিতে কি, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্ভাব্যতায় ও নাগরিক চেতনার উদ্বোধে ৺স্যার বিপিনকৃষ্ণ বসু (৫) প্রমুখ প্রাতঃস্মরণীয় বাঙ্গালীর অক্লান্ত চেষ্টার সাফল্যই সূচিত হইয়াছে। এখনও এই সহরে সাধারণতঃ সর্বত্র আর প্রধানতঃ বিচার ও শিল্পবিভাগের কর্মকুশলতায় বাঙ্গালীর স্থান বিশেষ গৌরবান্বিত।

অন্য দিকে ভোঁসলা বেদশাস্ত্র মহাবিদ্যালয় ও নাগপুর সংস্কৃত কলেজ প্রাচীন প্রাচ্যশিক্ষাপদ্ধতিকে একেবারে মুছিয়া যাইতে দেয় নাই। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত পরীক্ষা-প্রণালী অন্য প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণযোগ্য। স্থানীয় বাঙ্গালিগণ (যাঁহাদের অনেকের উপনিবেশ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কালের হইবে) মূল জাতির সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ ও অকপট প্রীতির নিদর্শন প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনের বাঙ্গালী প্রতিনিধিবর্গের সাদর অভিনন্দনের সুযোগ লইয়া তাঁহাদের সুচিন্তিত কর্মসূচীর বিশেষতঃ তাঁহাদের অনুষ্ঠিত বার্ষিক দুর্গোৎসবের এবং তৎসংশ্লিষ্ট শিল্পপ্রদর্শনী হইতে উদ্বৃত্ত অর্থের যে বিবরণ উপস্থাপিত করেন (৬) তাহা হইতে তাঁহাদের উৎসাহ, স্বজাতিবোধ ও সদাশয়তায় যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল। বাঙ্গালী-প্রবর্ত্তিত ও বাঙ্গালী স্বামীজী কর্ত্তৃক পরিচালিত শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের শাখা প্রতিষ্ঠান—যাহা এখনও 'সাবালক' হয় নাই— দেশবিশ্রুত Servants of India Societyর শাখাসজ্ঘ,—যাহা প্রায় ত্রিশ বৎসর হইল এই সহরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং যাহার তত্ত্বাবধানে নাগপুরের অন্যতম শক্তিশালী ইংরেজী দৈনিকপত্র 'হিতবাদ' প্রকাশিত হয়; এবং পঞ্চাশ বৎসরের প্রবীণ মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত রাজারাম লাইব্রেরী নামক পাঠাগার এই সহরে সুশিক্ষাবিস্তারের সহায়তা করিয়া জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। ইহাদের কিছু দেখিয়া, কিছুর সম্মুখীন হইয়া, কিছু-কিছুর বা বিবরণ শুনিয়া রাত্রির প্রথম প্রহরে আমরা সেদিনকার ভ্রমণ-অভিযান শেষ করিলাম। অবসরবিনোদন, উৎসাহবর্দ্ধন ও অনাবিল আনন্দার্জনের দিক দিয়া সেদিনকার অনুষ্ঠানের সাফল্যের কৃতিত্ব অনেকটা বিনায়কজীর প্রাপ্য।

[ক্রমশঃ।

---

(৫) ইঁহার আত্মজীবনী Stray Incidents in my Life গ্রন্থে (G. Natesan & Co. Madras) লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

(৬) কাগজে দেখিতেছি নাগপুরের বাঙ্গালী সমিতি বাঙ্গালায় বর্ত্তমান দাঙ্গা-হাঙ্গামা ব্যাপারে সাহায্যার্থে এক দফায় দুই হাজার টাকা দান করিয়াছেন। ইহা ছাড়া তাঁহাদের দুর্গাপূজায় উদ্বৃত্ত যথাশক্তি গত তিন বৎসর তাঁহারা যথাক্রমে তিন হাজার ও দুই হাজার টাকা এইরূপ সদ্ব্যয়ের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বেতার

খগেন্দ্রনাথ সেন

ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটি কাঠের বাক্স। তোমরা সব তার আশে-পাশে বসে কত রকমের কণ্ঠস্বর শুনতে পাচ্ছ, সেই বাক্সটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে। মনে হচ্ছে যারা কথা বলছে তারা নিশ্চয় ঐ বাক্সটার মধ্যে লুকিয়ে আছে। কিন্তু যদি বাক্সটা খোলো, দেখবে তার ভিতর কেউ তো নেই-ই, আছে কতকগুলো কল-কব্জা। দেখবে বাক্সের পিছন দিকে দু'টো তার জোড়া রয়েছে, সেই তার দু'টো দেয়ালের গা বেয়ে জানলার বাইরে দিয়ে চলে গেছে।

তাহলে লোকগুলো?

আচ্ছা দেখা যাক্ ছাতে গিয়ে···

না, সেখানেও তো কেউ নেই, দু'টো লম্বা বাঁশ বিচ্ছিরী খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথা দু'টো তার দিয়ে বাঁধা এবং এরই এক ধার দিয়ে কাঠের বাক্সর তার দু'টো নেমে এসেছে।

তাহলে?

যদি একটু চেষ্টা করো, রেডিও-ষ্টেশনে গিয়ে দেখবে, যাঁরা কথা বলেন তাঁরা দিব্যি আরামে বসে বসে গল্প বা বক্তব্য বিষয় বলে যাচ্ছেন, একটা ঘরে একেবারে আলাদা, সামনে রয়েছে একটা মাইক্রোফোন। পঞ্চাশ বছর আগেও যদি কোনো লোককে এই রকম ভাবে নিজের মনে একলা কথা বলতে দেখা যেতো বা শোনা যেতো, তাহলে কী বলতো জানো? বলতো: আহা! বেচারী মনের দুঃখে পাগল হয়ে গেছে, রাঁচিতে পাঠিয়ে দে। নয়তো বলতো, কাছে যাস্‌নি, দেখছিস্ নে পেঁচোয় পেয়েছে, ঘাড়ে ভূত চেপেছে,—শ, শ, শ,···

তোমরা, আজকের দিনের ছেলে-মেয়েরা, হাসবে, বলবে, দূর, ওতো মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলছে।

এই মাইক্রোফোন আছে বলেই এই সব কণ্ঠস্বর তোমরা দূর-দূরান্তর থেকে শুনতে পাচ্ছ। শুনতে পাচ্ছ কত বিশ্ববিখ্যাত লোকের কণ্ঠস্বর, কত বিখ্যাত গাইয়েদের গান কত সুন্দর সুন্দর আলোচনা, দেশ-বিদেশের খবরাখবর ইত্যাদি। দিব্যি বাড়ীতে বসে আরাম করে শুনছো। সমস্ত পৃথিবী তোমার ঘরের লোক হয়ে উঠেছে।

এই মাইক্রোফোন থেকেই বেতার-রহস্যের সুরু।

এই রহস্যের মূল কথা এই যে, আমরা যে কথা বলি তাতে শূন্যের ভিতর একটা তরঙ্গ বা ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। তোমরা যদি লক্ষ্য করে থাকো, ঢেউ মাত্রেরই দু'টো বিশেষত্ব আছে। একটা হচ্ছে এর বিস্তৃতি অর্থাৎ ঢেউএর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্য্যন্ত এর দৈর্ঘ্য, আর একটা হচ্ছে এর ওঠা-নামার হার। এই ওঠা-নামারও একটা বিস্তৃতি আছে অর্থাৎ বড় ঢেউতে ওঠা নামায় বিস্তার বেশী আর ছোট ঢেউর বিস্তার কম। অর্থাৎ ঢেউর বিস্তার দু'ভাবে মাপা যায়, এক হচ্ছে এর দৈর্ঘ্যের বিস্তার, আর এক হচ্ছে এর উঁচু-নীচু বা ওঠা-নামার বিস্তার। আর ওঠা-নামার যে হার বা দ্রুতি তাকে বলা যায় স্পন্দন বা Frequency.

এখন ব্যাপার এই যে, মাইক্রোফোনের সামনে যখন আমরা কথা বলি তখন এক প্রকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে তাপ, আলো, বেতার-তরঙ্গ, এ সবই এক প্রকার বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। দেখা গেছে, এই তরঙ্গের গতিবেগ এক সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কোটি মিটার বা ১৮৬০০০ মাইল। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে স্পন্দন-সংখ্যা গুণ করলেই এই গতিবেগ পাওয়া যায়। বেতারে যে শব্দ-তরঙ্গ প্রচারিত হয় তার দৈর্ঘ্য হচ্ছে সিকি মিলিমিটার থেকে ৫০,০০০ মিটার পর্য্যন্ত, আর তার স্পন্দন-সংখ্যা ১২০০০ কোটি থেকে ৬০০০ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গুণ করলে ৩০ কোটি হয়। বেতার-তরঙ্গই হলো সর্ব্বাপেক্ষা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। এই দৈর্ঘ্য লেখা হয় মিটারে আর স্পন্দন-সংখ্যা লেখা হয় মেগা সাইকেলে অথবা কিলো সাইকেলে। অবশ্য তরঙ্গের দৈর্ঘ্য বা ধ্বনি-বিস্তার বেতার-যন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করা যায়। আচ্ছা, এইবার ধরা যাক্ কোনো লোক মাইক্রোফোনের সামনে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। মাইক্রোফোন একটা বৈদ্যুতিক যন্ত্র। শব্দের ঢেউ এসে এই যন্ত্রে লাগে, শব্দের জোর অনুসারে মাইক্রোফোনে বিদ্যুতের স্পন্দন সুরু হয়। এই যে বিদ্যুতের স্পন্দন, এর হার খুব কম, এই স্পন্দনে ভালভের সাহায্যে অনেক গুণ বাড়িয়ে টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে ট্রান্সমিটিং ষ্টেশনে প্রেরক-যন্ত্রে পাঠানো হয়। কিন্তু তাতেও হয় না। এই বিবর্দ্ধিত বৈদ্যুতিক স্পন্দন প্রেরক-যন্ত্র বা Transmitterএ আসবার পর তাকে আবার প্রেরক-যন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দনের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। তার পর সেই মিশ্র স্পন্দন-প্রেরক যন্ত্রের এরিয়েলে পৌঁছায়, তাতে শূন্যেও অনুরূপ মিশ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয়।

এখন, এই মিশ্র বৈদ্যুতিক তরঙ্গ চার ধারে ছড়িয়ে পড়েছে—যেমন জলে যদি ঢিল ফেলো, তাহলে ঢিল ফেলার দরুণ যে ঢেউএর সৃষ্টি হয় তা বৃত্তাকারে চার ধারে ছড়িয়ে পড়ে। এই তরঙ্গ চলতে চলতে যখন কোনো এরিয়েলের তারে এসে ধাক্কা খায় তাহলে সেই এরিয়েলের তারেও মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন আরম্ভ হয়। এবং এই তারটি যদি কোনো বেতার গ্রাহক-যন্ত্রে বা Radio Receiving Setএর সঙ্গে লাগানো থাকে তাহলে গ্রাহক-যন্ত্রের বোতামগুলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এই মিশ্র তরঙ্গের উচ্চহার স্পন্দনের সঙ্গে 'টিউন' (tune) বা সুর সঙ্গত করলেই বেতারের বক্তা বা গায়কদের কণ্ঠ শুনতে পাবে। এই যে বেতার গ্রাহক-যন্ত্র—এর কাজ কি জানো? এর কাজ হচ্ছে, প্রেরক-যন্ত্র বা Transmitter থেকে মিশ্র বিদ্যুৎ-স্পন্দন-জাত যে তরঙ্গ এসে গ্রাহক-যন্ত্রে পৌঁছচ্ছে, তার থেকে শব্দের —অর্থাৎ বক্তাদের কথার বিদ্যুৎ-স্পন্দনকে মুক্ত করে দেওয়া। অর্থাৎ প্রেরক-যন্ত্রের উচ্চহার বিদ্যুৎ-স্পন্দন থেকে ষ্টুডিওর মাইক্রোফোনের নিম্নহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনকে মুক্ত করে দেওয়া। তার পর এই বিদ্যুৎ স্পন্দন লাউড স্পীকারে প্রতিফলিত হলে তোমরা শুনতে পাও।

আচ্ছা তাহলে দেখা যাক, বেতার প্রেরক-যন্ত্রের কাজ কি। প্রথম কাজ হচ্ছে উঁচুহারের বিদ্যুৎ-স্পন্দন উৎপাদন। দ্বিতীয় কাজ হচ্ছে গান বা কথার নিম্নহারের স্পন্দনকে অনুরূপ হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনে রূপান্তরিত করা। এবং তৃতীয় কাজ হচ্ছে, এই দুই হারের বিদ্যুৎ-স্পন্দনকে যথাযথ সংমিশ্রণ করা এবং এই মিশ্র স্পন্দন এরিয়েলে পৌঁছে দিয়ে মিশ্র বা বিকৃত বা modulated বিদ্যুৎতরঙ্গের উৎপাদন।

ছোটদের আসর

নন্দীর ফন্দি!

শ্রীসুনির্ম্মল বসু

চুপি-চুপি পথে চলে গুপীনাথ নন্দী,
আঁধারে গা ঢেকে তার, মনে এঁটে ফন্দি;
ও-পাড়ায় ধোপাদের বস্তির পার্শ্বে,
আছে বড় লিচু গাছ, কেয়া মজাদার সে।

থলো-থলো লিচু হয়, মিঠে রসে ভর্ত্তি,
গন্ধেতে পাড়া-মাৎ, জানে গুপী সত্যি।
লিচুর বাহার দেখে মেতে ওঠে চিত্ত,
ধোপারা সে লিচু বেচে চড়া দামে নিত্য।

দিনের বেলায় তারা গাছ রাখে আগ্‌লে,
তেড়ে আসে লাঠি নিয়ে লিচু কেউ মাগ্‌লে।
তাই চলে গুপীনাথ রাত্তিরে অন্ত,
কিছু লিচু বাগিয়ে সে আনবেই সন্ত।

আঁধারেতে গুপীনাথ সাবধানে তাই তো,
চলেছে পা টিপে-টিপে, ভয়-ডর নাই তো!
তাল-পুকুরের খাল হয়ে অতিক্রান্ত,
ও-পাড়ায় ধোপা-পাড়া, গুপী সেটা জানত।

ঘুটঘুটে আঁধিয়ারে চারি ধার ঢাক্‌লো,
দূরে দূরে কাল-প্যাঁচা 'ক্যাঁচ-ক্যাঁচ' ডাক্‌লো।
ঝিরি-ঝিরি হাওয়া বয়, আকাশটা মেঘ্‌লা,
মেঠো-পথে হেঁটে চলে গুপীনাথ এক্‌লা।

ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে লিচু গাছ ঝাঁক্‌ড়া,
ঝগ্‌ড়া জুড়েছে সেথা যত দাঁড়-কাক্‌রা।
ধোপাদের সাড়া নেই, সারা-পাড়া স্তব্ধ,
গুপীনাথ মনে ভাবে, হবে তারা জব্দ।

গাছে উঠে তাড়াতাড়ি কাঁড়ি-কাড়ি ফল্ সে,
পেট ভরে' ভোকা করে' খাবে অবিরল্ সে।
তার পর চুপে চুপে সটকে সে পড়বে,
আঁধারের মাঝখানে কে তাহারে ধরবে?

পার হয়ে খানা-ডোবা সাবধানে আস্তে,
গাছতলে এসে গুপী সুরু করে হাসতে।
কেয়া মজা, কেউ তারে করেনি কো সন্দ',
ধোপারা ঘুমায় ভোকা,—দ্বারগুলো বন্ধ;

মস্ত সুযোগ এই, পারবে কে ধরতে?
গাছে যেই গুপী গেল গুঁড়ি বেয়ে চড়তে
কার সাথে আঁধারেতে লেগে গেল ধাক্কা!
কে ছিল গোড়ায় বসে, বে-রসিক পাকা?

হঠাৎ কে চিল্লায়, উঠ্‌লো কে গর্জ্জে?
গুপীনাথ নন্দী সে কাঁপে থর্‌থর্ যে।
গর্জ্জনে চিৎকারে সারা পাড়া কাঁপছে,
ধোপাদের গাধা সেটা, দেয় জোর লাফ্ যে।

বাঁধা ছিল লিচু গাছে, পড়ে নাই চক্ষে—
গুপীনাথ মনে ভাবে—আর নাই রক্ষে!
ছুটে এলো ধোপা যত, চেহারাটা হোৎকা,
তেড়ে এলো দলে দলে হাতে লাঠি-কোৎকা।

লিচু খাওয়া ছেড়ে গুপী পড়ে চোঁ-চোঁ সট্‌কে,
ধোপারা নাগাল পেলে ঘাড় দেবে মটকে।
তখনো চেঁচায় গাধা—দড়ি দিয়ে বন্দী,
পড়ি-মরি করে ছোটে গুপীনাথ নন্দী।

তার পর যাওয়া যাক ষ্টুডিওয়। বক্তার সামনে যে মাইক্রোফোন রয়েছে, কথার ধ্বনি গিয়ে তাতে লাগছে আর সঙ্গে সঙ্গে তাতে আরম্ভ হচ্ছে বৈদ্যুতিকস্পন্দন। তার পর ঘরটির নির্ম্মাণ-কৌশল দেখ। বাইরে থেকে কোনো শব্দ এসে যাতে ঘরটিতে না পৌঁছয় তার জন্য কত না ব্যবস্থা করা হয়েছে! এমন কি, ঘরের ভিতর যিনি কথা বলছেন, তার ধ্বনি যাতে ঘরের দেওয়ালে লেগে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি না করে বা অন্য ভাবে বিকৃত না হয়ে পড়ে তার জন্য শব্দশোষক বিশেষ বস্তু দিয়ে এই ঘরের অর্থাৎ ষ্টুডিও-ঘরের দেওয়াল, দরজা, ছাত ইত্যাদি তৈরী করা হয়।

তার পর চলো কন্ট্রোল-ঘরে। অবশ্য এখানে বাইরেকার লোকদের আসতে দেওয়া হয় না। কারণ, ঘরটি যন্ত্রপাতিতে পরিপূর্ণ এবং দেখবে, কানে হেডফোন লাগিয়ে সারি সারি বেতার-কর্ম্মীরা বসে আছেন, তাঁদের কাজ হচ্ছে কথা বা গানের বিবর্দ্ধিত বিদ্যুৎ-স্পন্দনের সমতা আনা। এই সমতাপন্ন বিদ্যুৎ-স্পন্দনই টেলিগ্রাফের তার বা land lineএর সাহায্যে প্রেরক-যন্ত্রে বা কাশীপুরের Transmitting Stationএ পাঠানো হয় সেখানে এই বিবর্দ্ধিত স্পন্দনকে আরও বাড়িয়ে নিয়ে শূন্যে ছেড়ে দেওয়া, এ কথা আগেই জানিয়েছি।

এবার বেতার গ্রাহক-যন্ত্র বা Receiving Set সম্বন্ধে দু'-একটি কথা বলি। প্রত্যেক গ্রাহক-যন্ত্রের প্রধান গুণ হওয়া উচিত শব্দগ্রাহিতা। যাতে কথাগুলি বেশ সুস্পষ্ট ভাবে শোনা যায়। এর দ্বিতীয় গুণ, তরঙ্গ-নির্ব্বাচনশীলতা। অর্থাৎ ঠিক যে তরঙ্গ বা wave length এর শব্দ আমি শুনতে চাই, আমার সেটটিকে হাতল ঘুরিয়ে সেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সঙ্গতি করে নিলেই সুস্পষ্ট ভাবে শুনতে পাবো। অন্য কোনো wave length শব্দের সঙ্গে সে শব্দ জড়িয়ে যাবে না। গ্রাহক-যন্ত্রের আর একটা গুণ থাকা উচিত, সেটা হচ্ছে মূল স্বরের সংরক্ষণ।

যখন রেডিও সেট কিনবে, দেখে নেবে তোমার সেটের এই গুণগুলি আছে কি না।

দাঁত-চুরি

শ্রীপ্রশান্তকুমার চৌধুরী

দু'-চোখ বুজে হাত দু'টোকে জোড় কোরে কি করছে বাব্‌লু ওখানে? বিড়-বিড় কোরে কী বক্‌ছে ও? সকাল বেলা ভাঁড়ার-ঘরের ঘুপ্‌সি অন্ধকারেই বা ও অমন কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি করতে?

কুট্‌নোর থালাটা নিতে এসে দিদিমা বাব্‌লুর রকম-সকম দেখে একটু থমকে দাঁড়ান। তার পর পা টিপে-টিপে এগিয়ে যান ওর ঠিক পেছনটিতে। শুনতে পান, বাব্‌লু এক মনে বিড়-বিড় কোরে বলে চলেছে,—'ইঁদুর মামা, ইঁদুর মামা, এই বড়ো দাঁতটি নাও, তোমার ছোট দাঁতটি দাও।'

বার-কতক ঐ ইঁদুর মামার মন্তরটা বলেই বাব্‌লু তার হাতের মুঠো থেকে একটি দাঁত বের কোরে অতি সন্তর্পণে রেখে দিল ভাঁড়ার-ঘরের দেওয়ালের কোণের ছোট্ট একটি গর্তের মধ্যে।—

কাণ্ডকারখানা দেখে দিদিমা তো অবাক্! বললেন,—ওমা, কি ঘেন্নার কথা গো! কালে কালে হচ্ছে কি? হ্যাঁ রে বাব্‌লু, তোর এরি মধ্যে দাঁত পড়লো? বলিস্ কি রে, অ্যাঁ? নাঃ বাপু, কি যে হচ্ছে দিন দিন সব! কবেই বা তোর দাঁত গজালো বাপু যে এরি মধ্যে···

বাব্‌লু বললে,—'ও দিদিমা, আচ্ছাই লোক তো তুমি যা হোক্। আমার দাঁত পড়তে যাবে কেন গো? এই দ্যাখো, এই দ্যাখো,—ই-ই-ই—আমার সব দাঁত রয়েছে। আমার দাঁত নয় গো, দাদুর, দাদুর, দাদুর দাঁত পড়ে গেছে। দাদু দাঁতটাকে জানলা গলিয়ে রাস্তায় ফেলে দিতে যাচ্ছিল দিদিমা, আমি তাড়াতাড়ি দাদুর হাত থেকে দাঁতটা নিয়ে ইঁদুরের গর্তয় ফেলে দিলুম এই মাত্তর। রাস্তায় দাঁত ফেললেই হয়েছিল আর কি দিদিমা।—ইয়া বড়ো বড়ো কোদাল-কোদাল দাঁত বেরোত দাদুর।—তখন কী বিচ্ছিরি দেখতে হোতো বলতো?

এতো কথা দিদিমা শুনলেন কি না তিনিই জানেন। শুধু বললেন,—আবার আজ তোর দাদুর দাঁত পড়েছে? কখন্ পড়লো? আমায় তো বলেনি কিছু তোর দাদু। রোসো দেখাচ্ছি আমি মজা।

এর পরেই দিদিমাকে দেখা গেল দাদুর ঘরে। দাদু খবরের কাগজ পড়ছিলেন বসে বসে; এমন সময় দিদিমা এসে হাজির। বললেন—হ্যাঁ গা, বলি এই নিয়ে কটা দাঁত হোল?

আম্‌তা-আম্‌তা কোরে দাদু বললেন,—সাতটা।

—এবারে তাহলে কি তোমার দাঁত বাঁধাবে? না কি এখনো ফোগ্‌লা সেজে বেড়াবে?

দাদু বললেন,—বলে দিয়েছি তো তোমায়; আর তো ক'টা দাঁতই বা বাকি আছে,—সবগুলো পড়লেই একসঙ্গে দু'-পাটি দাঁত বাঁধিয়ে নেবো একেবারে। নৈলে মিছিমিছি কতকগুলো টাকা বাজে খরচ।

দিন যায়। একটি একটি কোরে দাদুর সব দাঁতগুলোই একে একে খসে পড়ে। বাকি থাকে কেবল একটি। সেটি আর কিছুতেই পড়তে চায় না। একেবারে বজ্র-আঁটন্ আঁটকে থাকে দাদুর মাড়ির সঙ্গে।—সেই 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদি-গড়'—পড়েছ তো? ঠিক সেই গোছের অবস্থা আর কি।

দিদিমা তো রেগেই অস্থির। বলেন,—হ্যাঁ গা, তোমার ঐ হতচ্ছাড়া দাঁতটা কি পড়বে না?

দাদু বলেন,—কি জানি; তাই তো দেখছি।

দিদিমা বলেন,—তাহলে না হয় ওটাকে বাদ দিয়েই দাঁত বাঁধাও তুমি। মা গো, মুখটা কি কুচ্ছিৎ যে দেখাচ্ছে তোমার!

ফোগ্‌লা-দাঁতে তোবড়ানো গাল নিয়ে দাদু ঘুরে বেড়ান, এটা দিদিমা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারেন না। তাই তাড়াতাড়ি দাঁত বাঁধানোর জন্যে ক্রমাগত তাগাদা লাগান দাদুকে।

দাদু বলেন,—এত তাড়া কিসের? এই দাঁতটাকে পড়তে দাও, তার পর একসঙ্গে দু'-পাটি দাঁত বাঁধাবো, বলেছিই তো।

দাদু সময় নেন ক্রমাগত। দন্তহীন দু'-পাটি মাড়ির ওপর তাঁর কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গেছে। ঐ মাড়ির সাহায্যেই তিনি দিব্যি ডাঁটা চিবুচ্ছেন, মাছ খাচ্ছেন, সুপুরি-দেওয়া পান খেতেও অসুবিধে হয়নি কোন দিন। এমন প্রভুভক্ত মাড়ির ওপর নকল দু'-পাটি দাঁত বসাতে তাঁর মোটেই মন চায় না।—কোথাও কিছু নেই, দিন-রাত মুখের মধ্যে ঘোড়ার লাগামের লোহার রিং-এর মতো দু'-পাটি নকল দাঁত নিয়ে ঘুরে বেড়ানো কি কম কষ্ট!—সুতরাং দাদু এক-মনে রোজ ভগবানকে ডাকেন,—'হে কাঙালের ঠাকুর, আমার এই শিবরাত্তিরের সলতে, এই অন্ধের নড়ি, সবে-ধন-নীলমণি-টিকে কেড়ে নিও না ঠাকুর। ওটা গেলেই গিন্নীর ঠেলায় দাঁত বাঁধাতে হবে যে প্রভু!'

কিন্তু দাদুর এ প্রার্থনা ভগবান কেন যে শুনলেন না কে জানে! বোধ হয় ফোগ্‌লা হওয়ার দরুণ দাদামশায়ের উচ্চারণটা একটু গোলমেলে হওয়ায় ভগবান দাদুর কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারেননি।

—যাই হোক, দাদুর সেই শেষতম দাঁতটিও এক দিন পড়লো—সত্যিই পড়লো। আগেকার একত্রিশটা দাঁতের মতোই সম্পূর্ণ নিঃসাড়েই সরে পড়লো এক দিন দাঁতটা শক্ত মাড়ির কোলাকুলির ভেতর থেকে! দাদু সেদিন হলেন একেবারে নিখুঁৎ ফোগ্‌লা!

তার পর?

দিদিমার ক্রমাগত তাগাদা;—বাধ্য হয়েই দাদুর চীনে-ডেন্টিষ্টের ডাক্তারখানায় পদার্পণ;—এবং কয়েক দিন হাঁটাহাঁটির পর দু'-পাটি নকল দাঁতের অসহ্য বোঝা (অবশ্য দাদুর পক্ষেই) নিয়ে দাদুর গৃহ-প্রত্যাগমন।

সেই থেকেই দাদুর মন-মেজাজ খারাপ। দু'-পাটি দাঁত দাদুকে কী কষ্টেই যে ফেলেছে!—বাঁধানো দাঁত এঁটে দাদুর গালের তোবড়ানো ভাবটা ঘুচেছে অবশ্য; কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা নতুন বিপদ এসে জুটেছে—দু'টো ঠোঁট দাদু আজ-কাল কিছুতেই আর এক করতে পারেন না।

দিদিমার কাছে দাদু অনেক অনুনয়-বিনয় কোরেও কোন ফল পাননি। দিদিমা বলেন,—এখন কষ্ট হচ্ছে, দু'দিন বাদে সব সহ্য হয়ে যাবে।

বাব্‌লুও দিদিমার দলে হয়েছে। সে-ও এই সেদিন তার ইস্কুলের বাংলা বইটা দাদুর কাছে নিয়ে গিয়ে বললে,—'এইখানটা পড়ো তো দাদু চেঁচিয়ে।'

দাদু পড়লেন,—'পাঁচ জনে পারে যাহা, তুমিও পারিবে তাহা, পারো কি না পারো করো পরখ তাহার।—পারিব না এ কথাটি বলিও না আর।'

কি কোরে যে দাদু এই দু'-পাটি বাঁধানো দাঁতের হাত থেকে রেহাই পাবেন, সেই কথা ভেবে ভেবে দাদুর মাথায় যে-কটা পাকা চুল ছিল, সবগুলোই প্রায় উঠে যাবার উপক্রম হয়েছে। দাদু আর পারেন না। 'দাঁত থাকতে লোক দাঁতের মর্য্যাদা বোঝে না'—বোলে একটা কথা আছে না? দাদু সেটাকে একটু ঘুরিয়ে বলেন,—'হায়, মাড়ি থাক্‌তে লোকে মাড়ির মর্য্যাদা বোঝে না গা।'

দাঁত থাকতে দাদুকে দাঁতের যন্ত্রণায় ভুগতে হয়েছে অনেক। দাঁত গিয়েও তার রেহাই নেই। নকল দাঁতের যন্ত্রণাটা আসল দাঁতের চেয়ে কিছু কম নয়। বাব্‌বা!

নকল দাঁতের এ-হেন অসহ্য কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে দাদু নানা রকম ফন্দী-ফিকির খাটালেন। দুঃখের বিষয়, কোনটাই তেমন কাজে লাগলো না।

দিন কতক ইচ্ছে কোরেই দাদু দু'-পাটি দাঁত খুলে তাকের ধারে সামনের দিকে রেখে দিতে লাগলেন। বড়ো আশা করেছিলেন, ডানপিটে নাতি-নাতনীর দল হৈ-হৈ করতে করতে তাকের ওপর থেকে কোন একটা জিনিষ পাড়তে গিয়ে নিশ্চয়ই এক সময় অসাবধানে ফেলে দেবে দাঁত-দু'পাটিকে।—ব্যাস্, তার পরেই একেবারে দেদার মজা!

কিন্তু হায়! দাদুর নাতি-নাতনীর দলের কারুর হাত লেগে কোন দিন দাঁত-দু'পাটি ভুলেও তাকের ওপর থেকে মেঝের ডিগ্‌বাজী খেলো না—বরং পাছে কারুর হাত লেগে পড়ে ভেঙে যায়, এই জন্যে নাতি-নাতনির দল দাঁত-দু'পাটিকে যত্ন কোরে তাকের পেছন দিকে ভাল কোরে সরিয়ে রাখতে লাগলো।

তার পর দাদু ধরলেন অন্য একটা নতুন রাস্তা। নকল দাঁতগুলো যে লাল রঙের নকল মাড়ির সঙ্গে আটকানো থাকে, সেগুলো নরম রাখবার জন্যে নতুন অবস্থায় বাঁধানো দাঁতগুলোকে মাঝে মাঝে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়।—ঐ মাঝে-মাঝের জায়গায় দাদু তাঁর দাঁত-দু'পাটিকে বেশ একটু ঘন ঘনই ভিজিয়ে রাখতে লাগলেন। গেলাসের জলে তাঁর দু'পাটি দাঁত ডুবিয়ে রেখে তিনি গেলাসটিকে রাখতে লাগলেন এমন জায়গায়, যেখানে জল খেয়ে সকলে গেলাস রাখে। মনে মনে তাঁর বড়ো আশা ছিল যে, গেলাসের জলটাকে নর্দ্দামায় ফেলে দিয়ে নতুন কোরে জল গড়িয়ে খেতে গিয়ে কেউ-না-কেউ কোন দিন নিশ্চয় তাঁর ঐ দাঁত-ডোবানো গেলাসের জলটাকে অন্যমনস্ক ভাবে নর্দ্দামায় ফেলে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে দাঁত-দু'পাটি ছিট্‌কে পড়ে একেবারে ভেঙে চুরমার! ওঃ, ভাবতেও আনন্দ!

কিন্তু তাতেও কোন ফল হোলো না। ভুল কোরে কেউ কোন দিন দাঁত-ডোবানো গেলাসটার জল ওল্টালে না।

যেখানে নাতি-নাতনিরা ছুটোপাটি করছে, সেইখানেই দাঁত-দু'পাটি ইচ্ছে করেই মেঝের ওপর ফেলে রাখা;—রান্নাঘরের পিঁড়ির পাশে, কল-ঘরের চৌবাচ্চার পাড়ে, ঠাকুর-ঘরের চৌকাঠের কোণে—ইত্যাদি যাবতীয় বাছা-বাছা জায়গায় দাঁত-দু'পাটিকে ফেলে রেখেও কোন ফল হোলো না। বাধ্য হয়েই দাদু শেষটায় হাল ছেড়ে দিলেন একেবারে।

সেই থেকেই কেমন যেন মনমরা হয়েই দিন কাটান দাদু। আর আগেকার মতো সেই হাসিখুশী ভাব নেই। নাতি-নাতনীদের সঙ্গে আগেকার মতো আর সন্ধ্যেবেলা গল্পের আসর জাঁকিয়ে বসেন না। দাদু আজ-কাল সদা-বিষণ্ণ। খিট্‌খিটেও হয়ে উঠেছেন আজ-কাল। নাতি-নাতনীরা আজ-কাল তাই প্রায় দাদুকে এড়িয়ে-এড়িয়েই চলে।

হঠাৎ—হ্যাঁ হঠাৎ-ই, সেদিন সন্ধ্যেবেলা দাদু বেড়িয়ে বাড়ী ফিরলেন সম্পূর্ণ ভিন্নমূর্ত্তিতে।—এ কী কাণ্ড রে বাবা! দাদু গান গাইছেন!—হ্যাঁ, গাইছেনই তো। গুন্‌-গুন্ কোরে দিব্যি গান গাইতে গাইতে ঐ তো ঢুকছেন গেটের মধ্যে দিয়ে!—তাই তো!—দাদুর হাতে ওটা আবার কি ঝুল্‌ছে? ওঃ হরি, চার-চারটে টাট্‌কা গঙ্গার ইলিস্!

গেট পেরিয়ে বাড়ীর উঠোনে পা দিয়েই মাছ চারটেকে উঠোনের ওপর ধড়াস্ কোরে ফেলে দিয়ে দাদু হাঁক দিলেন,—বাব্‌লু, মান্টু, গাব্‌লু, নন্তে, বুলটু, তোতো, তুতুমণি!'

নাতি-নাতনীর দল দাদুর হাঁক শুনেই ছুটে আসে দাদুর কাছে। ওঃ, প্রায় দিন পনেরো দাদু এমন আদর কোরে ডাকেননি তাঁর নাতি-নাতনীদের।—দাদুকে ঘিরে ধোরে ওরা বলে,—'কি বোলছো দাদু? কি বলছো?'

পকেট থেকে এক-এক প্যাকেট চকোলেট বের কোরে এক-এক জনের হাতে দিতে দিতে দাদু বলেন,—'সবাই দোতলার বারান্দায় মাদুর দু'টো পেতে লক্ষ্মী হয়ে বোসো; কাপড়-জামা ছেড়ে -এক্ষুনি যাচ্ছি আমি। আজ সেই হাতী মামার গল্পটা হবে।'

নাতি-নাতনীর দল হিপ্-হিপ্-হুর্‌রে, করতে করতে হুড়োহুড়িয়ে ওপরে উঠে যায়। মাছের হাতটা কলের জলে ধুতে ধুতে দাদু গুন্‌-গুন্ কোরে গান ধরেন,—

—'আমি বনফুল গো, ছন্দে ছন্দে দুলি আনন্দে'···

হঠাৎ ঘটনাস্থলে এসে হাজির হন দিদিমা। বলেন,—বলি হ্যাঁ গা, শুনলুম না কি তুমি চার-চারটে ইলিস্ মাছ কিনে এনেছ? মাছের বাজারটা আর একটু নরম হলে আনলে চলতো না? বলি পয়সাগুলো কি তোমার কামড়ায়?

মুখখানা যথাসম্ভব করুণ কোরে, প্রকাণ্ড একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে, কাঁদো-কাঁদো গলায় দাদু বলেন,—'কামড়াবার যে ছিলো, সে তো আজ আমাকে ফাঁকী দিয়ে চলে গেছে গিন্নি,—কে আর কামড়াবে বলো?'—আবার একটা প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে দাদুর বুক ঠেলে।

দাদুর উত্তর শুনে রীতিমতো ঘাবড়ে ওঠেন দিদিমা, ঠিক তোমাদেরই মতো। মাথাটা দাদুর খারাপ হয়ে গেল না কি একেবারে! নৈলে হঠাৎ এমন খুশী খুশী ভাব, গুন্-গুন্ কোরে এমন গান গাওয়া; কারণ কি এর?

কারণটা দাদুই বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেন। কথায় নয়, ইসারায়। নিজের জামার তলার দিকের পাশ-পকেটটা তুলে ধরেন দিদিমার চোখের সামনে। দিদিমা সবিস্ময়ে দেখেন, দাদুর পকেটের তলার অংশটা কে যেন ধারালো কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়েছে একেবারে। ভ্যাবা-গঙ্গারামের মতো যেন মুখ ফেঁচকে থাকে পকেটটা!

দিদিমাকে ব্যাপারটা আরো ভাল কোরে বুঝিয়ে দেবার জন্যে দাদু একটা হাত ঢুকিয়ে দেন সেই কাটা-পকেটটার ভেতরে। সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বিবাদেই হাতটা বেরিয়ে আসে বাইরে। বাইরে এসে উঁকি-ঝুঁকি মারে হাতটা!

এত কাণ্ডের পরেও দিদিমা কিন্তু দাদুর উত্তরটার কোন অর্থই খুঁজে পান না। 'কামড়াবার যে ছিলো, সে আজ আমাকে ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে!'—এ কথার সঙ্গে কাটা-পকেট দেখানোর কী মানে থাকতে পারে?

অগত্যা দাদুকে ইসারা ছেড়ে হাত-মুখ নেড়ে দস্তুরমতো চিৎকার কোরে বুঝিয়ে দিতে হয় ব্যাপারটা। কাঁদো-কাঁদো গলায়, তিন বার ঢোঁক গিলে, চার বার কোঁচায় খুঁটে চোখ মুছে তিনি যা বলেন, তার সারমর্ম হোলো—

'পার্ক থেকে বেড়িয়ে ফিরছিলেন দাদু। আসতে আসতে দেখেন এক জায়গায় বাঁদর-নাচ হচ্ছে। বেশ ভিড় জমেছে। দাদু দাঁড়িয়ে পড়েন সেই ভিড়ের মধ্যে। খেলা শেষ হতে, ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পকেটে হাত দিয়েই দেখেন,—ঐ যাঃ, পকেটটা কে কেটে নিয়েছে বেমালুম!'

সর্ব্বনাশ —দিদিমা গালে হাত দিয়ে বলে উঠেন;—ওই পকেটেই টাকার ব্যাগটা ছিল তো তোমার?

'উঁহু, টাকার ব্যাগ তো আমার বুক-পকেটেই থাকে। আহা, তা নৈলে এই সব ইলিস্ মাছ কিনলুম কি কোরে বল?'

তবে?—তবে কি ছিল ঐ পকেটে তোমার?

দাঁত।—ঐ দু'পাটি বাঁধানো দাঁত ছিল পকেটে!—বলতে গিয়ে দাদু প্রায় ফুঁপিয়ে ওঠেন যেন!

দাঁত?—দাঁত-দু'পাটি খুলে রেখেছিলে পকেটে?—কেন? কেন?

—এমনি, এমনিই রেখেছিলুম। কোনো দিন রাখি না, ঠিক আজই রেখেছিলুম খুলে। যখন যাবার হয়, তখন এমনি কোরেই জিনিষ হারায় গো,—এমনি কোরেই যায়!

—দাঁতটাকে হারিয়ে খুবই কষ্ট হচ্ছে তো তোমার?

—হচ্ছে না আবার? আহা, দু'পাটি দাঁত নিয়ে কী আরামেই যে ছিলুম!—যা আক্রার বাজার, এখনি আবার যে দু'পাটি দাঁত করাবো, তারও উপায় নেই। অন্ততঃ দু'-তিন মাস এখন এমনি ফোগ্‌লা সেজেই বেড়াতে হবে। সে যে কী কষ্ট, সে আর তুমি কি বুঝবে গিন্নী!

—কে পকেটটা কাটলে, কখন কাটলে—কিছুই টের পেলে না তুমি?

—আহা, তাই যদি টের পেতুম, তাহ'লে কি আর আস্ত রাখতুম তাকে।

—কি করতে?

—ঠেঙিয়ে আধ মরা করে দিতুম একেবারে।

—পারতে?

—নিশ্চয়! মার কাকে বলে একেবারে···

দাদুর কথাটা শেষ হবার আগেই দিদিমা হঠাৎ তাঁর আঁচলের গেরোটা খুলে ফেলেন। তার পর আঁচলের ভেতর থেকে একটা সাদা কাপড়ের ছোট্ট টুকরো বের কোরে দাদুর চোখের সামনে মেলে ধরেন।

কী ওটা?—আরে আরে,—ওটা যে দাদুর ঐ কাটা-পকেটেরই হারিয়ে-যাওয়া অংশটা!—হ্যাঁ, হ্যাঁ,—তাই তো! ঐ তো কাঁচি দিয়ে কাটার চিহ্ন!—কী কোরে এল ওটা এখানে?—দিদিমার হাতে দাদুর কাটা-পকেটের টুকরো!—পকেটটা তো রাস্তায় কাটা গেছলো!—অন্তত দাদু তো এইমাত্র সেই কথাই বললেন।—তবে? তবে?

দিদিমার হাতে কাটা-পকেটের টুকরোটা দেখে দাদুর মুখটা একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে উঠলো। পকেটের টুকরোটাকে দাদুর গায়ের ওপর সজোরে ছুঁড়ে দিয়ে দিদিমা বলে উঠলেন,—'বাঁধানো দাঁত তোমাকে আর পরতে হবে না—হবে না—হবে না। দাঁত পরতে তোমার কষ্ট হয়, সেটা ভাল কোরে আমার বুঝিয়ে বললেই তো হোত। তার জন্যে এতগুলো মিথ্যে কথা বানিয়ে বলবার কি দরকারটা ছিল বল তো?—পকেটটা তো নিজেই কাঁচি দিয়ে কেটেছো বাড়ীতে বসে। তাও যদি মনে কোরে পকেটের টুকরোটা রাস্তায় ফেলে দিতে, তাহলে হয়তো বা তোমার এই দাঁত-চুরির গল্পটা সত্যি বলে বিশ্বাস করতুম। কিন্তু কাঁচি দিয়ে পকেট কেটে পকেটের টুকরোটা যে খাটের পাশেই মেজের ওপর ফেলে গেছলে, সে হুঁশ্ তো আর নেই তোমার।'

দাদু একেবারে ভয়ে কাঠ!

দিদিমা আবার বললেন,—'দাঁত-দু'পাটি কোথায় লুকিয়ে রেখেছ বল তো এবার?'

দাদু ভয়ে-ভয়ে অস্ফুট স্বরে বলেন,—'ওষুধের আলমারীর তলায় তাকে পাথরের ফুলদানি'র ভেতরে কাগজে মুড়ে রেখেছি।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

১

ভোরবেলার অদ্ভুত লাগছিল—কোলকাতার এই চেহারা এর আগে আর সাগরের চোখে পড়েনি। তখন সূর্য্য ওঠেনি। উঠলেও কুয়াসার দুর্ভেদ্য দুর্গ ভেদ করে তার আলো এসে পৌঁছয়নি তখনও। চমৎকার লাগে সাগরের। বাড়ীগুলোকে অস্পষ্ট লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাস্তায় জল দিয়ে যায় নি। মাঝে মাঝে দু'-একটা মোটর গাড়ী ভালো করে চোখে পড়বার আগেই চোখের বাইরে চলে যাচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাড়ে-হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। রিক্সার ঠুং-ঠুং আওয়াজ কানে বাজছে এক এক বার। একটার পর একটা গ্যাসের বাতিগুলো নিবে যাচ্ছে। দু'-চার জন লোকের পায়ের আওয়াজও—পথের এদিকে ওদিকে পাওয়া যাচ্ছে। স্বপ্নের মত পথ পেরুতে পেরুতে সাগর এতক্ষণ তার নানান ভাবনাগুলো ভুলে এসেছিল প্রায়।

আস্তে আস্তে দেখা দিলো সূর্য্যের আলো। বাড়ীর মাথার ওপর আলো জ্বলে উঠলো। এই আলোর একটা মধুর স্নিগ্ধতা আছে,—যা আর খানিকক্ষণ বাদে তেতে উঠে আর থাকবে না। এই সময়টুকুই সারা দিনের মধ্যে সব চেয়ে ভালো। আলোয় অন্ধকারে সমস্ত সহরটার চেহারা যেন বদলে যায়। মনটা খুসী হয়ে ওঠে অকারণে। আর ইচ্ছে করে—কি যে ইচ্ছে করে তা সাগরও বলতে পারে না ভালো করে—ইচ্ছে করে যত কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করতে।

কিন্তু এই মুহূর্ত্ত শুধু—এর পরে আছে খাওয়া আর থাকার ভাবনা।

অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে সাগর। ম্লান হয়ে ওঠে সাগরের মুখ। কিছু দূর আসতেই সামনে একটা পার্কের দেখা পেলে সে।

সামনের গেট দিয়ে ঢুকে পড়ল। দু'-চার জন লোক ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে ওখানে। বসে বসে নানান ভাবনা তার মাথায় এলো।

পকেটে গেলো দিনের একটা খবরের কাগজ ছিল। সেটা আস্তে আস্তে বার করল সে। বিজ্ঞাপনগুলোর ওপর চোখ বুলোতে বুলোতে একটার দিকে নজর পড়ে গেলো তার। দৈনিক পত্রিকার জন্যে এজেন্ট চায়—এটা লাগলেও লেগে যেতে পারে। একবার চেষ্টা করে দেখতে কি দোষ ?

উঠে পড়ল সাগর। দশটার সময় যেতে লিখেছে। তার আগে কিছু খেয়ে নিতে হবে। একটা খাবারের দোকান পেল মোড়ে এসে। সেখানেই ঢুকে পড়ল।

খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে এসে এবার ভালো করে ঠিকানাটা আর একবার দেখে নিলো সাগর। তার পর রয়ে পড়ল দৈনিক পত্রিকার অফিসের দি ।

সেখানে গিয়ে সাগর যখন পৌঁছল, তখন দশটা বেজে গেছে। ভীড় হতে সুরু করেছে কেবল। সাগর দেখল সবাই তার চেয়ে বড়। সাগর মুষড়ে পড়ল। এত বড় বড় লোককে বাদ দিয়ে তার মত ছেলেকে কি নেবে ?

সাগরের ডাক যখন এলো—তখন বাজে একটা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দু'টো ধরে গেছে তার। তবু সেদিকে তার নজর নেই। কোন রকমে গিয়ে দাঁড়াল সে।

খদ্দর-পরা এক জন ভদ্রলোক লোক বেছে নিচ্ছেন। সাগর দেখল তাঁর মুখ প্রসন্ন। একটু ভরসা পেল সে। ভদ্রলোকটি তার নাম-ধাম জিজ্ঞেস করলেন। সাগর সমস্তই অল্প পরিচয় দিল। এখানেও বলল—তার নাম 'রঞ্জন'—যেমন বলেছিল আগের মেস্-ম্যানেজারকে।

সাগরকে তাঁর পছন্দ হয়ে গেলো। মনে মনে ভগবানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে যখন সাগর, তখন হঠাৎ ভদ্রলোক তাকে বললেন, 'কিছু টাকা জমা রাখতে হবে যে, এনেছ কি সঙ্গে ?'

ম্লান মুখে সাগর বললে—'টাকা ত' আমার নেই।'

ভদ্রলোকটি তখন বললেন—'আচ্ছা দাঁড়াও, দেখি কি করতে পারি তোমার জন্যে ?' তার পর একটু বাদে ফিরে এসে বললেন—'তোমার জমা না দিলেও চলবে। আমি জামিন দাঁড়ালাম তোমার জন্যে। তুমি নিশ্চয়ই পালাবে না কাগজ নিয়ে, আমি জানি।'

সাগর চুপ করে রইল।

'তোমার ত থাকার জায়গাও নেই—থাকবে কোথায় ?'—ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেন। সাগরকে নিরুত্তরে থাকতে দেখে বলেন—'আচ্ছা এখন আমার ওখানেই থাক তার পর দেখা যাবে। আমার বাড়ীতে বেশী লোক নেই—তোমার কোন ভয় নেই।'

মনে মনে ভগবানকে বার বার ধন্যবাদ জানাল সাগর।

২

এবারে ভদ্রলোকটির পরিচয় ভালো জানতে পারলো সাগর। ভদ্রলোকটি দৈনিক পত্রিকা অফিসের ম্যানেজার,—নাম জীবন বাবু। তাঁর ওখানেই থেকে গেলো সাগর।

চমৎকার লোক জীবন বাবু। সাগরকে জীবন বাবু ছেলের মত ভালোবাসে। জীবন বাবুর একটি মাত্র মেয়ে—বয়স বছর ছয়েকের বেশী নয়—দুষ্টুমিতে কিন্তু পাড়া মাতায়। নাম দীপালী, তার মা রেখেছেন। দীপালীর মা-ও সাগরকে ভালোবাসেন খুব।

দীপালী কিন্তু সাগরের ওপর খুসী নয় একটুও। এত দিন এ বাড়ীতে একা তারই আদর ছিল—এখন যেন তার ভাগে কম পড়তে সুরু করেছে। যদিও সাগর তার চেয়ে অনেক বড় আর সাগরও তাকে আদর করে খুব, তাহলেও দীপালী এরই মধ্যে রাগ করতে শিখেছে আর কোথা থেকে বলতে শিখেছে কে জানে,—সাগরকে বলে—'দুষ্টু দাদা'।

জীবন বাবুর বাড়ীটি ভারী ভালো লাগল সাগরের। বাড়ীটা সহরের এক প্রান্তে—একদম একলা দাঁড়িয়ে। ঘরগুলো বড় বড়। পেছনে অল্প একটু বাগান। গাড়ী-বারান্দাওয়ালা এই বাড়ীটা সকলেরই চোখে পড়ে দেখবা মাত্র। বাড়ীতে আরও এক জন ছিল—যার পরিচয় এখনও দেওয়া হয়নি। তার নাম টোগ—বিলিতি পোষা কুকুর এ বাড়ীর—জাতে স্প্যানিয়েল। সাগরের সঙ্গে তার পরিচয়ই হোল সব চেয়ে বেশী।

সাগরের এখন কাজ অনেক। ভোরে উঠে সাগরকে বাড়ী-বাড়ী কাগজ দিয়ে আসতে হয়। সাইকেলে করে সাগর খুব সকালে এই কাজগুলো সেরে আসে। তার পর বাড়ী থেকে বেশ খানিকটা দূরে ট্রাম-রাস্তার ওপর কাগজ বিক্রীর একটা ষ্টল্ খুলে বসেছে; নানান রকম দেশী বিদেশী কাগজ—অল্প দামী বইও রাখে সেখানে, কাজেই সাতটায় দোকান খুলতে হয়। তার পর বারোটায় ফিরে আবার তিনটেয় বেরোয় সে। দুপুর বেলায় নিজের ঘরে বসে ছবি আঁকে সাগর।

জীবন বাবু তাকে এ সব কাজ করতে বারণ করেছিলেন। কিন্তু সাগর শোনেনি, চুপ করে বসে থাকার ছেলে সে নয়। অনেক রাত্তির জেগে সে নানা রকম বই পড়ে। জীবন বাবুর বাড়ীতে অনেক বই। বইয়ের নেশায় তাকে পেয়ে বসেছে।

বেশীর ভাগ সময়েই সে পড়ে জীবনী। নেপোলিয়নের কথা পড়ে কিন্তু ভালো লাগে না। অত কষ্ট, অত ধৈর্য্য নিয়ে ওই রকম একটা মানুষ শেষকালে মানুষের রক্তের জন্যে পাগল হয়ে গেলো। মানুষকে পায়ের তলায় গুঁড়িয়ে দেবার দুঃসাহসকে সম্মান দিল মানুষেই।

এর চেয়ে অনেক ভালো জীবন ছিল লিওনার্দোর, মাইকেল এঞ্জেলোর, রেমব্রাণ্টের। জীবনকে তারা ভালো বেসেছিল তাই তাকে নষ্ট করেনি। আর ভাবে নিজের কথা। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে সে-ও পথে পথে ঘুরল, কখন খেতে পেল, কখন পেল না। সেও তাদের মত চেষ্টা করল বড় হবার—কিন্তু বড় সে কোন দিন হবে কি? ভাবতে ভাবতে সাগর যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন অনেক রাত।

আজ-কাল জীবন বাবুর সঙ্গে তার অনেক কথা হয়।

দেশের কথা, শিল্পের কথা, সাহিত্যের কথা আরও অনেক কথা বলেন জীবন বাবু। সাগরও আজ কাল আর কম কথা বলে না। এই এক-ঘেয়ে জীবন তার আর ভালো লাগে না। সে চায় দিগ্‌বিদিকে ছিটকে পড়তে—দেশ-বিদেশের সব কিছুকে মুঠোর মধ্যে পেতে।

জীবন বাবুর বাড়ীতে সাগরের আর বেশী দিন থাকা চল্‌ল না। অপ্রত্যাশিত এক দুঃসংবাদ পেয়ে অভাবনীয় এক দুর্ঘটনায়, সাগরকে আবার বেরিয়ে পড়তে হোল।

দিনটা সাগরের মনে থাকবে। শীতের কুয়াসায় ম্লান সেদিনকার সকাল। ঘুম থেকে উঠতে একটু দেরীই হয়েছিল সাগরের। অল্প-অল্প আলো দেখা দিয়েছে আকাশে। কোন রকমে এক কাপ চা শেষ করে সে ছুটলো কাগজের অফিসে।

সেখানে পৌঁছে সাগর অবাক্ হয়ে গেলো। সারা বাড়ীটাতে পুলিশের ভীড়! কাগজ নেবার জন্যে অফিসে ঢুকে শুনলো আজকের কাগজ বাইরে বেচা চলবে না—পুলিশের হুকুম। জীবন বাবু এবং আরো দু'জনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সাগর ভাবল, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন গোলমাল হয়েছে বোধ হয়। তবে ভালো করে বুঝতে পারলো না ব্যাপারটা।

ব্যাপারটা ভালো করে না বুঝলেও এটা সাগর সহজেই বুঝতে পারলো যে, এখানে থাকা আর তার চলবে না। জীবন বাবু আটকে থাকলে, তাঁর বাড়ীতে থাকাও সম্ভব নয় আর কাগজ এর পরে যদি থাকেও ত তাকে রাখবে না নিশ্চয়ই। এক বছর ধরে এই কাজ করে করে আর ভালো লাগছে না। এবার পালাতে হবে তাকে। যাক, না বলে পালাতে হবে না, এমনই ছুটি জুটে গেলো।

জীবন বাবুর বাড়ীতে একবার ফেরা দরকার। অনেক জিনিষ আছে তার।

জীবন বাবুর বাড়ীতে কি করে এই খবরটা দেবে সে ভাবলো। এক-বার তার মনে হলো—সেখানে ফিরে গিয়ে আর দরকার নেই। আর একবার মনে পড়ল তার ছবিগুলোর কথা। কাজেই ফিরতে হোল।

বাড়ী গিয়ে দেখল, নীচে তার ঘরে কেউ নেই। নিজের প্রায় সব জিনিষই তার সুটকেশে ছিল, যে ক'টা বাইরে পড়ে ছিল সেগুলোকে বাক্সর মধ্যে গুছিয়ে নিতে সাগরের বেশী দেরী হোল না।

একবার ওপরে যাবে কি না, ভাবলে। তার পর ভাবলে, না থাক, দরকার নেই। আর বেশী দেরী করলে কেউ এসে পড়বে। সাগর নিঃশব্দে বেরিয়ে এলো।

বেরিয়ে আসতে আসতে মনে পড়ল দীপালীর কথা—তার দুষ্টু দাদাকে কি সে আবার খুঁজবে কোন দিন?

গল্প হইলেও সত্যি?

প্রভাত বসু

বৃটিশের তৈরি জেলখানা!

সেখানে দয়ার লেশমাত্র নেই। লোহার দরজাগুলোর মতই কঠিন কর্তৃপক্ষদের প্রাণ।

লম্বা-চওড়া বলিষ্ঠ এক রাজনৈতিক পাঠান বন্দীকে সেখানে রোজ ১৫।২০ সের করে ডাল ভাঙ্‌তে হয়। তাঁর পরনে খাটো পাজামা, হাতে-পায়ে দেড়ী, আর ওপর গলায় এক ভারী লোহার হাঁসুলি। তবু তাঁর মুখে হাসি লেগেই আছে। জেল কর্তৃপক্ষের নির্মম অত্যাচার তিনি নীরবে সহ্য করেন।

একবার তাঁর পায়ে পরবার জন্য এক জোড়া লোহার বেড়ী আনা হল। সেগুলি এই বিরাটকায় পাঠানের পক্ষে অত্যন্ত ছোট। তবু হুকুম হল—এই বেড়ী জোড়াই বন্দীকে পরাতে হবে। দেশ-প্রাণ বন্দীর পায়ের গাঁট কেটে ঝর-ঝর করে রক্ত পড়তে লাগল। নিষ্ঠুর জেল-সুপারিনটেণ্ডেণ্ট বলে উঠলেন—'ও কিছুই নয়, ক্রমে সয়ে যাবে।' পাঠানের মুখে তীব্র বেদনার একটি রেখাও ফুটে উঠল না। তিনি অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ভারতের এই বীর-সন্তান কে বল তো?

সর্বজনপূজ্য "সীমান্ত গান্ধী"—আবদুল গফুর খাঁ।
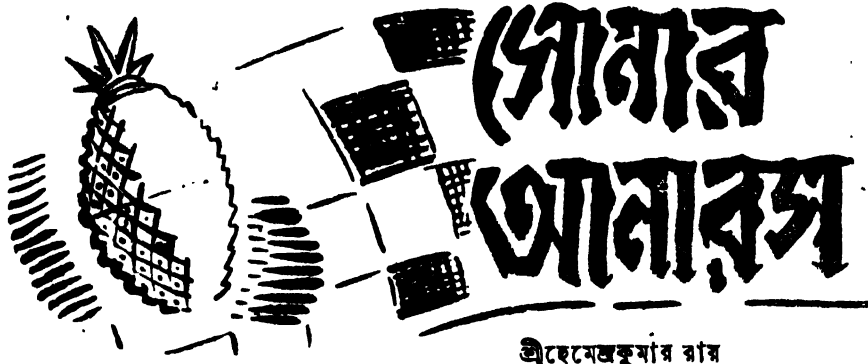
শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

নবম

মরা নদীর শুক্‌নো খাত

প্রভাত। জানলার বাইরে দুলছে নতুন রোদের স্বচ্ছ সোনার আঁচল এবং তারই ভিতর দিয়ে ফুটে উঠছে সবুজের দোলনায় ঢুলঢুলে ফুলশিশুদের হাসি-রঙীন মিষ্ট মুখগুলি।

প্রভাতী চায়ের পেয়ালায় প্রথম চুমুক দিয়েই জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সুব্রত বাবু, এ দেশে কখনো বাঘরাজা বলে কেউ ছিলেন কি?"

সুব্রত বললে, "বাঘরাজা……বাঘরাজা? হ্যাঁ, বাবার মুখে শুনেছি, অনেক কাল আগে এ-অঞ্চলে এক প্রতাপশালী রাজবংশ ছিল, তাদের উপাধি 'বাঘ'।"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্! বাঘ আবার মানুষের উপাধি হয় না কি?"

জয়ন্ত বললে, "হয় সুন্দর বাবু, হয়। আমার পরিচিতদের মধ্যেই 'বাঘ' উপাধিধারী লোক আছেন। হয়তো তাঁর পূর্ব্বপুরুষদের কেউ একাই কোন ব্যাঘ্র বধ করেছিলেন, আর তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে দিয়েছিল ঐ উপাধি। পরে তাঁর বংশধররাও ঐ 'বাঘ' বলেই পরিচিত হয়। কেবল 'বাঘ' নয়, বাংলা দেশে 'হাতী' উপাধিধারী লোকও আছে। কিন্তু যাক্ ও-কথা। সুব্রত বাবু, আপনার কথায় আমার কৌতূহল প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। আপনি ঐ বাঘরাজাদের সম্বন্ধে আর কিছু বলতে পারেন কি?"

সুব্রত বললে, "আমি বিশেষ কিছু জানি না, আর আমার পক্ষে জানবার কথাও নয়। কারণ, বাঘরাজাদের বংশ না কি পলাশীর যুদ্ধের আগেই লুপ্ত হয়ে যায়। তবে শুনেছি, আমার প্রপিতামহেরও আগে আমাদেরই কোন পূর্ব্বপুরুষ কোন্ এক বাঘরাজার দেওয়ানের পদ লাভ করেছিলেন।"

—"বাঘরাজাদের কোন চিহ্নই কি এ-অঞ্চলে বর্ত্তমান নেই?"

—"কিছু না। আমার পিতামহ বলতেন, যেখানে বাঘরাজাদের রাজধানী ছিল এখন সেখানে বিরাজ করছে নিবিড় জঙ্গল।"

—"সে জায়গাটা কোথায়?"

—"তা-ও আমি জানি না।"

জয়ন্ত কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তার পর আবার জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা সুব্রত বাবু, আপনাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোন নদী-টদি আছে কি?"

—"কেন বলুন দেখি?"

—"আমি এই রকম একটি নদী খুঁজছি, কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না।"

সুব্রত একটু বিস্মিত স্বরে বললে, "জয়ন্ত বাবু, আপনার প্রত্যেক প্রশ্নই কেমন রহস্যময়! হঠাৎ নদীর কথা কেন আপনার মনে উঠল?"

—"সে কথা পরে বলব। আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন।"

—"না, আমাদের গ্রামের পশ্চিম দিকে কোন নদী নেই।"

জয়ন্ত হতাশ ভাবে বললে, "নেই! তাহ'লে কি আমি মিছাই এত জল্পনা-কল্পনা ক'রে মলুম? সোনার আনারসের ছড়াটা কি একেবারেই বাজে?"

সুব্রত প্রায় আধ মিনিট ধরে জয়ন্তের মুখের পানে তাকিয়ে রইল বিস্ময়চকিত চোখে! তার পর থেমে থেমে বললে, "সোনার আনারসের ছড়া? তার সঙ্গে নদীর সম্পর্ক কি?"

—"সম্পর্ক একটা আছে ব'লেই অনুমান করেছিলুম। কিন্তু এখন দেখছি আমার অনুমান সত্য নয়।"

সুব্রত বললে, "দেখুন জয়ন্ত বাবু, আমাদের গ্রাম থেকে কিছু দূরে আগে একটা নদী ছিল বটে।"

জয়ন্ত উৎসাহিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "ছিল না কি?"

—"আজ্ঞে হ্যাঁ। এ-অঞ্চলে আগে একটা নদী ছিল, কিন্তু এখন সেটা শুকিয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে দেখা যায় তার শুক্‌নো খাত।"

—"তার পর, তার পর?"

—"এখনো বর্ষাকালে সেই খাত কিছু দিনের জন্যে জলে ভ'রে যায়। কিন্তু সেটা তো গ্রামের পশ্চিমে নয়—এখান থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে মাইল তিন কি আরো কিছু বেশী পথ পেরিয়ে গেলে তবে সেই খাতটা পাওয়া যায়।"

জয়ন্ত যেন নিজের মনেই বিড়-বিড় ক'রে বললে, 'উত্তর-পশ্চিম দিকে! তাহ'লে আবার যে আমার হিসাব গুলিয়ে যাচ্ছে!" অল্পক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইল। তার পর বললে, "সুব্রত বাবু, যদিও আমি খেই খুঁজে পাচ্ছি না, তবু একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখতে চাই।"

—"মানে?"

—"সেই মরা নদীর শুক্‌নো খাতটা স্বচক্ষে একবার দর্শন করব। এখনি চলুন!"

সুন্দর বাবু বললেন, "আরে ধেৎ! খামখেয়ালের একটা মাত্রা থাকা উচিত। কোন মরা নদীর শুক্‌নো খাত দেখে আমাদের কী ইষ্টলাভ হবে? তার চেয়ে সুব্রত বাবু যদি আরো এক পেয়ালা চা, আরো এক প্লেট চিঁড়ে-আলুভাজা আর বেগুনী-ফুলুরির ব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে সেটা হবে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "মাণিক, তোমারও কি এই মত?"

মাণিক এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে জয়ন্ত ও সুব্রতের কথাবার্ত্তা শ্রবণ করছিল। সে মুখ তুলে বললে, "ভাই জয়ন্ত, তোমাদের কথা শোনবার পর আমিও গভীর আঁধারে যেন কিঞ্চিৎ আলোর ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি! হুঁ, 'মায়ের পায়ে যায় কত না, খেলছে জলদ টিক্‌টিকি!' এটি একটি মূল্যবান সঙ্কেত। কিন্তু 'পশ্চিমাতে

পক্ক পোরা, সূয্যিমামার ঝিকমিকি'—এ লাইনটির কোনই সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি না যে?"

—"আগে তো উত্তর-পশ্চিম দিকে যাত্রা করা যাক্, তার পর দেখা যাবে কত ধানে কত চাল্।"

—"উত্তম। আমি প্রস্তুত। সুন্দর বাবু আপাতত চা এবং চিঁড়ে-আলুভাজা এবং বেগুনী-ফুলুরি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকুন, আমরা ততক্ষণে খানিকটা 'মর্নিং-ওয়াক্' ক'রে আসি।"

সুন্দর বাবু তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আমি যদি এখ্নি তোমাদের সঙ্গে এই চায়ের আসর ত্যাগ না করি, তাহ'লে এর পরে মাণিকের দুষ্ট জিহ্বা যে কতখানি অসংযত হয়ে উঠবে তা কি আমি জানি না? হুম্, আমি আর চা-টা খেতে চাই না, আমিও সকলের সঙ্গে যেতে চাই।"

ইতিমধ্যে দারোগা বাবু এসে হাজির। জয়ন্ত দলে টেনে নিলে তাঁকেও।

দশম

রহস্যের চাবিকাঠি

সুব্রত বললে, "এই সেই মরা নদীর শুকনো খাত।"

জয়ন্ত বললে, "সরস্বতী নদীও শুকিয়ে গিয়ে বাংলা দেশের নানা জায়গায় ঠিক এই রকমই খাত সৃষ্টি করেছে। এই মরা নদীটাও দেখাচ্ছে আকারে আগে সরস্বতীর মতই ছিল।"

খাতটা চওড়ায় কলকাতার আদিগঙ্গার চেয়ে বড় হবে না। দক্ষিণ থেকে বরাবর উত্তর দিকে চ'লে গিয়েছে। খাতটা মাঝে মাঝে ভরাট হয়ে আছে এবং তার উপরে দেখা যাচ্ছে ছোট-বড় ঝোপ-ঝাপ ও জঙ্গল।

দক্ষিণ দিকে খাতটা যেখানে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে সেইখানে দাঁড়িয়ে নীরবে কি ভাবতে লাগল জয়ন্ত। তার পর ধীরে ধীরে বললে, "মাণিক, খাতটা অর্থাৎ নদীটা বোধ হয় দক্ষিণ দিকেও এগিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তা আর দেখা যাচ্ছে না, কারণ, তা একেবারে ভরাট হয়ে সমতল মাঠের সঙ্গে মিশিয়ে আছে।"

মাণিক বললে, "তোমার এ অনুমান অসঙ্গত নয়।"

দারোগা বাবু বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, "একটা খাত নিয়ে এমন গভীর গবেষণার কারণ কিছু বুঝছি না।"

সুন্দর বাবু মাথা নেড়ে বললেন, "আমারও ঐ মত। আমি বাসায় ফিরে যেতে চাই।"

সুব্রতও বললে, "জয়ন্ত বাবু, আপনার কি উদ্দেশ্য বলুন দেখি?"

জয়ন্ত কারুর কোন কথার জবাব না দিয়েই হঠাৎ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ব'লে উঠল, "হয়েছে মাণিক, হয়েছে! আমি চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছি!"

দারোগা বাবু সবিস্ময়ে বললেন, "চাবিকাঠি? কিসের চাবিকাঠি মশাই?

—"রহস্যের।"

—"রহস্য আবার কি?"

—"যদি জানতে চান, আমার সঙ্গে আসুন। এস মাণিক!"

জয়ন্ত দ্রুতপদে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হ'তে লাগল।

সুন্দর বাবু খানিকটা এগিয়েই হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ও জয়ন্ত, একটু আস্তে চল ভাই, তোমার সঙ্গে আমি পাল্লা দিতে পারব কেন—আমার বপুখানি দেখছ তো?"

জয়ন্ত গতিও কমালে না, কোন উত্তরও দিলে না—সমান এগিয়ে চলল।

দারোগা বাবু বললেন, "এ যেন বুনো হাঁসের পিছনে ছোটা হচ্ছে!"

সুব্রত বললে, "সোনার আনারসের ভিতরে যে ছড়াটা ছিল, জয়ন্ত বাবু বোধ হয় তার মানে খুঁজে পেয়েছেন।"

দারোগা বাবু তপ্ত স্বরে বললেন, "ঐ ছড়াটার কথা শুনে শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গেল। ভুবো হচ্ছে আস্ত পাগল, একটা বাজে ছেলেভুলনো ছড়া নিয়ে তার সঙ্গে মেতে থাকা আমাদের কি শোভা পায়? ছড়া হচ্ছে ছড়া। তার মধ্যে কোন অর্থই থাকে না।"

সুব্রত বললে, "আমারও তো ঐ বিশ্বাস ছিল, কিন্তু জয়ন্ত বাবুর বিশ্বাস অন্য রকম।"

—"নিজের বিশ্বাস নিয়ে নিজেই থাকুন, কিন্তু তিনি আমাদের নিয়ে টানাটানি করছেন কেন? ঘাড়ে পড়েছে খুনের মামলা, এখন তার কিনারা করব, না ছড়ার অর্থ খুঁজে মরব? আরে ছিঃ, এ যে দস্তুর মত ছেলেমানুষি!"

আরো বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দাঁড়িয়ে প'ড়ে জয়ন্ত বললে, "মাণিক, কাল রাত্রে ভুবো ঠিক এইখানে এসেই চারি দিকে ছুটোছুটি ক'রেছিল না?"

মাণিক এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, "হাঁ জয়ন্ত।"

—"পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে তাকিয়ে দেখ।"

—"ওদিকে তো দেখছি মাঠের পরে রয়েছে একটা নিবিড় অরণ্য।"

—"সোনার আনারসের জয় হোক্। এইবারে আমরা ঐ বনের ভিতরে প্রবেশ করব। পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিক্ ধ'রেই এগিয়ে চলব—কিন্তু তাড়াতাড়ি নয়, আমাদের পদ-চালনা করতে হবে স্বাভাবিক ভাবেই। কতক্ষণ অগ্রসর হ'তে হবে জানো? ঠিক এক প্রহর।"

সুন্দর বাবু চোখ পাকিয়ে বললেন, "অর্থাৎ আরো তিন ঘণ্টা ধ'রে আমাদের বনে বনে ঘুরতে হবে? ওরে বাবা!"

দারোগা বাবু বললেন, "আরে তিন ঘণ্টা কি বলছেন মশাই? তিন ঘণ্টা লাগবে তো খালি এগিয়ে যেতেই, ফিরতেও তো লাগবে আরো তিন ঘণ্টা! তার মানে কোদালপুরে ফিরব আমরা রাতের অন্ধকারে।"

—"হুম্, তাই না কি? সারা দিন খালি তবে পথই হাঁটব, দানা-পানি কিছুই জুটবে না?"

—"তা ছাড়া আর কি?"

—"আমি কি পাগল? আমাকে কি ভীমরতিতে ধরেছে? আমি পারব না—ব্যাস্, এক কথা।"

জয়ন্ত কোন রকমে হাসি চেপে বললে, "ভয় নেই সুন্দর বাবু, আপনাকে উপোস করতে হবে না।"

—"উপোস করতে হবে না কি-রকম? নিবিড় অরণ্যের মধ্যে হোটেল পাওয়া যায় না কি?"

—"সুন্দর বাবু, আমি প্রস্তুত হয়েই এসেছি। মাণিকের কাঁধে

ঐ যে ব্যাগটি ঝুলছে, ওর ভেতরে খুঁজলে খাবার-টাবারও পাওয়া যাবে।"

প্রবল মস্তক আন্দোলন ক'রে সুন্দর বাবু বললেন, "ডবল খাবারের লোভেও আমি আরো ছয়-সাত ঘণ্টা ধরে হাঁটতে পারব না। এখনি আমার জিভ বেরিয়ে পড়তে চাইছে—হুম্!"

দারোগা বাবু বললেন, "আমিও সুন্দর বাবুর দলে। আমি খুনের মামলার আসামী খুঁজছি—সোনার আনারসের ছড়া নিয়ে আমার কি লাভ হবে?"

জয়ন্ত বললে, "কি লাভ হবে? আপনি কি জানেন, ঐ খুনের মামলার আসামী প্রতাপ চৌধুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়ানো আছে এই সোনার আনারসের রহস্য?"

—"কি সেই রহস্য?"

—"যদি জানতে চান, আসুন আমার সঙ্গে। আমাদের আর অপেক্ষা করা চলবে না। প্রতাপ চৌধুরীও এই রহস্যের চাবিকাঠি খুঁজছে, কিন্তু আমরা কার্য্যোদ্ধার করতে চাই তার আগেই। আমার কথায় অবিশ্বাস করবেন না—আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আজ আপনারা দেখতে পাবেন একটা কল্পনাতীত দৃশ্য।"

[ক্রমশঃ

—গ্রহ কয়টি হে?
—দশটি। নবগ্রহ ত আছেই,
তার পরেরটি হ'ল সত্যাগ্রহ।

শিল্পী—শ্রীশৈল চক্রবর্ত্তী

পশু আর পাখীতে মিলে দশটি ছিল। দেখা যাচ্ছে নয়টি। বাকি একটি কি? কোথায় এবং কি ভাবে আছে?

নির্য্যাতিত হওয়ার কারণ

বিভাবতী বসু

যে কোন রোগের বাইরের কতগুলি লক্ষণ দেখিয়া ঔষধ দিলে রোগমুক্ত হইতে পারে না, মূল কারণ দূরীভূত করিতে পারিলেই রোগমুক্ত হওয়া যায়। তাই আজ যারা মর্ম্মাহত—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামাতে নারী-অপহরণ, বলপূর্ব্বক বিবাহ, ধর্ষণ ঘটনা শুনে বা প্রত্যক্ষ দেখে; তাদেরকে চিন্তা করে দেখতে বলি—নারী নির্য্যাতিত হওয়ার কারণ কি? গুণ্ডাদের কামনার লোলুপ দৃষ্টি কেন নারীর উপর? কারণ না জানলে ত প্রতিকার সম্ভবপর নয়। বর্ত্তমান সামাজিক ব্যবস্থায় নারী দাসী (servitude)। ভোগের সামগ্রী বলিয়াই নারী আজ অত্যাচারিত, অপমানিত। পুরুষ-পরিচালিত সমাজের আইন-কানুনের ফলে নারী অধিকার হতে বঞ্চিতা, আত্মরক্ষায় অসমর্থা—অন্যের করুণার উপর তার জীবন—সমাজ কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা—তাহারা যেন পুরুষের আনন্দ বর্দ্ধন ও সুবিধা বিধানের জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছে। গুণ্ডা হচ্ছে পুরুষ। তাই গুণ্ডা-প্রকৃতি লোকের নারীর উপর অমানুষিক ও পাশবিক অত্যাচার। আমাদের সর্ব্বপ্রথম জানা দরকার—যে সমাজে যে নারী নির্য্যাতন হয় এর জন্যে দায়ী কে? সমাজ নয় কি? সমাজের ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্ত এক জন মানুষের যে অধিকার পাওয়া উচিত সেই অধিকার নারী পায় না। মোটা ভাত, মোটা কাপড় অতি তুচ্ছ অতি নগণ্য দাবী তারই জন্ত তাকে পুরুষের উপর নির্ভর করতে হয়। এই হল আর্থিক পরাধীনতা—অশিক্ষা। আর একটি প্রণিধানযোগ্য "physical power has a tendency to corrupt" সমাজে প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার-পদ্ধতির ফলে নারী অপরের অপরাধের ফলে চরম দণ্ড ভোগ করে। সমাজ তাকে সমাজের বাইরে বের করে দেয় এমনি কাজের জন্ত, যে কাজের জন্ত নারী মোটেই দোষী নয়—দায়ী নয়। যাহারা দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া পাপকার্য্য করিতে বাধ্য হয়, সমাজের উচিত তাদেরকে সগৌরবে পূর্ব্বের সম্মানে বাস করিতে দেওয়া। অত্যাচারীকে দণ্ড দিলেই শুধু হবে না—নির্য্যাতিতাদের সমাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। কিন্তু বর্ত্তমান সমাজে পুরুষ ভুল করলে তার প্রায়শ্চিত্ত আছে, কিন্তু নারীর যদি একবার পদস্খলন হয় তার আর মাফ নেই। তাই আমাদের যদি বাঁচতে হয় তাহলে নূতন জনমত গঠন করতে হবে—যাতে নির্য্যাতিতাদের সম্পূর্ণ ভার সমাজ নেয়।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, সমাজে যখন হতেই নারী দাসী (spoils) হয়ে উঠল, তখন হতেই নারীর উপর অত্যাচার অবিচার চলে আসছে। শক্তিমান্ দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করবেই; যে সময় হতেই শক্তিশালী দল দুর্ব্বলদের আক্রমণ করে তাদেরকে যুদ্ধে পরাজিত করে তাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করত—লুণ্ঠিত দ্রব্যের তালিকার মধ্যে নারীও ছিল—সেই নারীদের উপভোগ করত বিজয়ী দলের লোকেরা—সেই হতে পুরুষের হার-জিতের খেলা নারীকে নিয়ে সুরু হয়েছে।

প্রায় প্রত্যেক দেশের শাস্ত্র নারীদের উপর অবিচার করেছে—তাদেরকে খাটো করে দিয়েছে, তাদের যথার্থ মূল্য দিতে অস্বীকার করেছে। এই সমস্ত ব্যবস্থার ফলে পুরুষ তার ক্ষুধা দিয়ে নারীর মূল্য নিরূপণ করে। সে জন্ত দেখা যায় যে, পুরুষে যে নারীকে এক দিন মাথায় করে রেখেছিল আবার তাকেই পথের ধুলায় ফেলে চলে গেছে। আর নারী, সে-ও আত্মবিস্মৃত থাকতে থাকতে নিজের দাবি পর্য্যন্ত করতে আজ ভয় পায়; ফলে পরের দাবী মেটাতেই তার জীবন কাটছে। নারী-জীবনের উপর জোর করে বিধি-নিষেধ আরোপ করে দেওয়া হয়েছে—তাকে স্বভাব-নিয়মে বাড়তে দেওয়া হয়নি—ফলে সে পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি—তাই সে দুর্ব্বল, অবলা। সমাজই তাকে অবলা করেছে আর দুর্ব্বল পেয়ে পুরুষ করছে তার উপর অন্যায় অবিচার। সমাজ নারীকে পরাধীন করেছে—আর এই পরাধীনতা নারীকে করে তুলেছে হীন, অকর্ম্মণ্য। আর তার ফল এই যে, তাদেরকে বুঝাতে গেলে তারা দাসসুলভ সংস্কার পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই তারা নিজেদের আত্মরক্ষা করতে নিজেরা অক্ষম। অক্ষমতাই সমাজ এনে দিয়েছে, তারই সুযোগ নিয়ে গুণ্ডারা করছে তাদের উপর অত্যাচার।
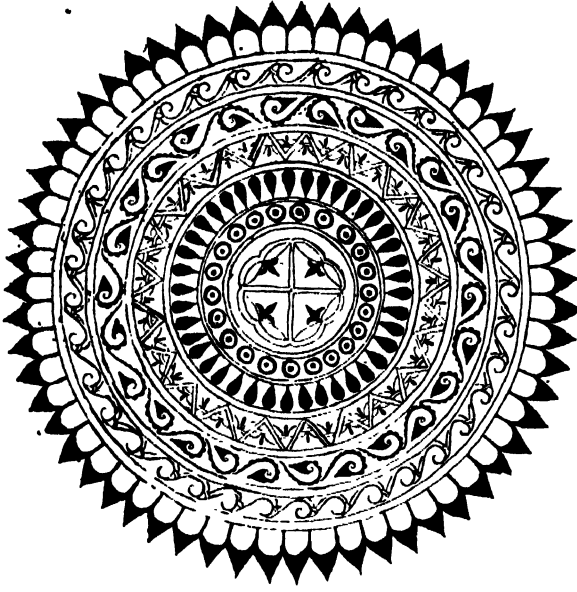
আলপনা

গীতি দেবী

প্রাচীন কাল থেকেই বাংলা দেশে বিভিন্ন ব্রত, পূজাপার্বণ, বিবাহ ইত্যাদি প্রায় সব মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আলপনা দেওয়ার প্রথা চলে আসছে। ধর্ম-জীবন ছাড়া আমাদের সামাজিক জীবনেও আলপনার একটি বিশেষ স্থান আছে। আলপনাতে আমরা একটি সুন্দর, সহজ ও শ্রীমণ্ডিত পবিত্র আনন্দানুভূতি লাভ করে থাকি। আমাদের মনের সঙ্গে আলপনার সুন্দর গতির একটি আনন্দময় যোগাযোগ আছে।

পূজা প্রভৃতি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে আলপনা দেওয়ার রীতি থাকলেও পল্লী অঞ্চলে ঘরের দেওয়ালে বা মেঝেতে আলপনা চিত্রণ করে বাড়ীর শোভা বর্দ্ধন করা হয়। মাটির উপর আলপন-চিত্রণ খুব সুন্দর ও মনোহর দেখতে হয়। আজ-কাল সহরের অনেক বাড়ীতে জন্ম-তিথি বা বিশেষ কোন উৎসব অনুষ্ঠান এবং অনেক সভা-সমিতি উপলক্ষেও ঘরের মেঝেতে আলপনা দেওয়া হয়ে থাকে। এতে বাংলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যটি ফুটে ওঠে এবং এতে গৃহস্বামীর বা সভা-সমিতির উদ্যোক্তাদের শিল্পবোধ ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ধরণের আলপনাগুলিতে বিশেষ কোন চিত্র অঙ্কনের বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। এসব আলপনা যিনি দেন, তাঁর পছন্দ ও রুচি অনুযায়ী তিনি দেন। ছোট ছোট মাটির ঘট ও বাটির মত পাত্রে রঙীন আলপনা দিয়ে ঘরে রাখলে বা প্রয়োজন হলে ফুলদানী হিসাবে ব্যবহার করলে বেশ সুন্দর দেখায়।

আলপনার বিষয়ে একটি কথা সব সময়েই মনে রাখা প্রয়োজন। আলপনা অঙ্কনে অনেকে চিত্রাঙ্কনের রীতি অনুসরণ করেন। ইহা অত্যন্ত ভুল। এতে আলপনার বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট ক্ষুন্ন হয়। আলপনার নিজস্ব গতি ও প্রকাশভঙ্গী ব্যতিরেকে যে কোন আলপনাই শ্রীহীন হয়ে পড়ে। আলপনার নিজস্ব গতিতেই এর বৈশিষ্ট্য। প্রত্যেক জিনিষকেই সুন্দর ও লোভনীয় করে তোলার আকাঙ্ক্ষা মানুষের স্বভাবজাত। যা ভাল লাগে অপরের চোখে সেটা ভাল লাগানর ইচ্ছা সকলের মনে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিরাজ করছে। পূজা-পার্বণের পবিত্র সুন্দর ভাবকে আলপনার মধ্য দিয়ে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তোলার রীতি চলে আসছে। আমরা, মেয়েরা যদি আলপনাকে নানা কাজে ব্যবহার করি, তাহলে এর দ্বারা আমরা নিজেদের সিসৃক্ষা ও সৌন্দর্য-পিপাসাকে খানিকটা সার্থক করে তুলতে পারি। দেশজ জিনিষ ও শিল্পকলা আমরা আজ হারাতে বসেছি। অনুশীলনের ফলে আবার তার পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে।

আদর্শ স্বামী

দশ বছরের মেয়ে পড়ছে—"রাম আদর্শ স্বামী ছিলেন," "রাম আদর্শ স্বামী ছিলেন"— পড়তে পড়তে থেমে বাপকে প্রশ্ন করলে—"বাবা আদর্শ স্বামী কাকে বলে?"

বাপ কিছুক্ষণ মাথা চুলকে উত্তর দিলেন—"যে স্বামী, স্ত্রী যে রেটে খরচ করে তার চেয়ে বেশী রেটে অর্থোপার্জ্জন করতে পারে, সেই আদর্শ স্বামী।"

শিল্পী—কণিকা সেন
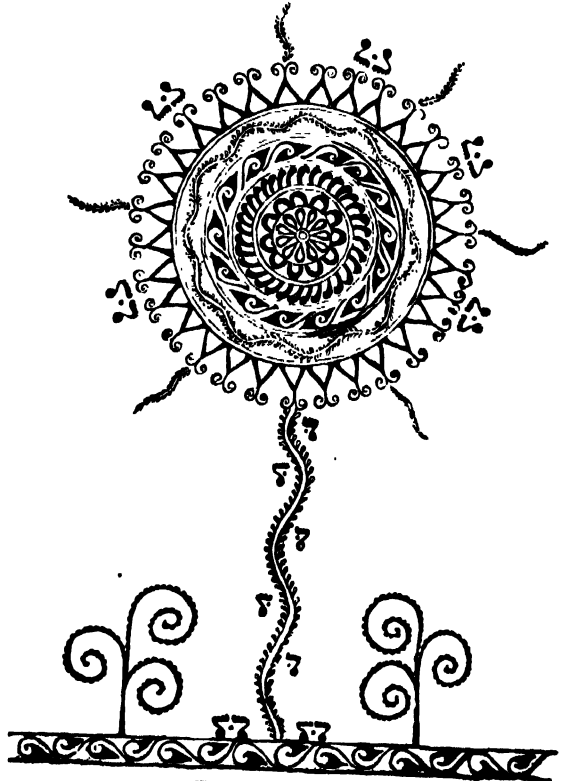
বধূ-জীবন

শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্তা

"বেলা যে পড়ে এল জলকে চল্
পুরানো সেই সুরে কে যেন ডাকে দূরে
বেলা যে পড়ে এল জলকে চল।"

দরদী কবির প্রাণে বেজেছিল এক দিন গ্রাম্য বালিকার বধূ-জীবনের ব্যথা। কবি কাব্যে গেঁথেছেন শুধু গ্রাম্য বালিকারই মনোবেদনার কথা, কিন্তু বধূ-জীবনের ব্যথা শুধু গ্রাম্য বালিকারই একার নয়, এ ব্যথা বোধ হয় বাঙলার ঘরে ঘরে প্রতি বধূর অন্তরের ব্যথা। স্পষ্ট ভাষায় বলতে গেলে, আমাদের সমাজের কি শিক্ষিতা, কি অশিক্ষিতা, কি ধনী, কি দরিদ্র সকল শ্রেণীর কথাই বলছি, বিবাহের পরে প্রথম বধূ-জীবনে কয় জন বালিকা যে সুখী হয় সে কথা বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে আমার প্রবন্ধে আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের কথাই বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।

আমরা আমাদের মা, দিদিমা, ঠাকুমাদের মুখে শুনেছি তাঁদের বধূ-জীবনের কথা। কত লাঞ্ছনা, কত গঞ্জনা, কত ভর্ৎসনাই না তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। তাঁদের পরে দু'-তিন পুরুষ পার হয়ে গেছে, কিন্তু এখনও দেখি, এখনও শুনি, ঘরে ঘরে সেই বধূদের—"বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে গভীর মরম-বেদনা।"

তবে কালের গতিতে বধূদের যন্ত্রণার প্রকার-ভেদ হয়েছে এই মাত্র। হয়তো আমাদের মা-ঠাকুমাদের অদৃষ্টে জুটত 'ঠোনা,' ঝাঁটা, লাথি, অপূর্ব্ব বাক্য-যন্ত্রণা, আর আমাদের অদৃষ্টে জুটেছে সুন্দর, সভ্যমাফিক, কেতাদুরস্ত দুর্ব্যবহার। কিন্তু ব্যাপারটা 'একশ' বছর আগেও যা ছিল, এখনও তাই। সবার চেয়ে লক্ষ্য করবার বস্তু হচ্ছে এই যে, মেয়েদের জীবনের এত যে দুঃখ-কষ্ট-ব্যথা এর মূল কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেয়েরাই। আমরা পুরুষের দরবারে বড় বড় দরখাস্ত পেশ করি, "তোমরা আমাদের অধিকার দাও, আমাদের আর অবরোধ করে রেখ না, আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করতে দাও, পুরুষের অত্যাচারে আমরা জর্জ্জরিতা…।" কিন্তু আজও আমরা জানি না আমাদের দুঃখের মূল কারণ কোথায়। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মূল গলদ কোথায়। একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারব এর প্রতিকার করতে পুরুষ পারবে না, এর প্রতিকার আমরা নিজেরাই করতে পারব, যেদিন আমাদের সত্যকার মানসিক উন্নতি হবে।

বর্ত্তমান যুগে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন হয়েছে। আমরা শিক্ষিতা বলে মনে মনে গর্ব্ব অনুভব করি, আর করব না-ই বা কেন? পুরুষের সাথে সমান ভাবে ডিগ্রী পাচ্ছি, সমান তালে পা ফেলে চলছি, একা একা সিনেমা দেখি, ট্রামে-বাসে ঘুরি, (ট্রেনে যাতায়াতও করছিলাম—বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িকতার চাপে পড়ে বন্ধ আছে), তর্ক করি, খেলা-ধূলা করি। সবই করি। কিন্তু তবুও আমি বলব, আমরা 'যে তিমিরে, সে তিমিরে'ই আছি। হয়তো আমার শিক্ষিতা ভগিনীরা আমার উপর খুবই অসন্তুষ্ট হচ্ছেন, আমি তাঁদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এইটুকুই জিজ্ঞাসা করছি, তাঁদের মধ্যে দু'-এক জনের কথা বাদ দিয়ে আমাদের সকলের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, দৈনন্দিন মানসিকতা, দৈনন্দিন চিন্তাধারা কি সুন্দর, সুশ্রী ও সুশৃঙ্খল বলা চলে? যদি তাই-ই হ'ত, তাহলে ঘরে ঘরে মেয়েদের মধ্যে এত অশান্তির বহ্নি দেখা দিত না। অশিক্ষিতা মেয়েদের মতন আমরা কোমরে কাপড় বেঁধে, ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঝগড়া করি না সত্য, কিন্তু মনে মনে বিষ পুষে রাখি, অশান্তির বাসা বাঁধি। মুখে যদিও আমরা খুবই ভদ্র।

অবতারণা করতে গিয়ে, আলোচ্য বস্তু হ'তে কিছুটা সরে এসেছি। 'বধূ-জীবন' কথাটাতেই কত মাধুর্য্য। প্রত্যেক বালিকার অন্তরের নিভৃততম কোণে এই নিয়ে কত আশা, কত কল্পনা, কত কি। কিন্তু এক দিন গভীর হতাশায় সব কল্পনাই রূঢ় বাস্তবের আঘাতে চুরমার হয়ে ভেঙ্গে যায়। কিশোরী বা তরুণী প্রথম যেদিন তার স্বামিগৃহে পা দেয় তাকে কেন্দ্র করে চলে সপ্তাহব্যাপী কত উৎসব, কত আনন্দ। সে নিজেও এই নতুন জীবনের আস্বাদনে, নূতন পরিবেশের মধ্যে কিছু দিনের জন্য আত্মহারা হয়ে পড়ে। নূতন আত্মীয়-পরিজনের প্রথম মিষ্ট ব্যবহারে বধূও নিজেকে সুখী মনে করে। পরে ধীরে ধীরে সব স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। দিন চলে যায়, সাংসারিক রূপও তার কাছে পরিবর্ত্তিত হয়। তাকে ঘিরে যে উৎসব, তারও হয় অবসান। আত্মীয়-পরিজনের সব অত্যধিক আদর সাধারণ অবস্থায় এসে দাঁড়ায়।

কিন্তু বধূর তখন নিজের হাতে নূতন সংসার পাতবার জন্য, গৃহিণী-পদ লাভ করবার জন্য কিশোরী-মন ব্যাকুল হয়ে উঠে। এই রকম অবস্থায় সে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করে যেখানেই, সেখানেই দেখে সে অপ্রয়োজনীয়, তার চেয়ে অন্য সকলের দাবী বড়, সকলের শেষে তার দাবী, সবার শেষে তার অধিকার, সে যে 'বাড়ীর বউ'। সে শুধু সকলের আজ্ঞাবাহী মাত্র। সকল কাজই হয়তো সে করতে পারে, কিন্তু নিজের ইচ্ছামত নয়, অন্যের অনুমতিক্রমে। শ্বশুর-বাড়ীতে আর যে সকল মহিলারা থাকেন, সকলেই সমালোচনা করতে বিশেষ পটু, সমবেদনার চোখে কেউ-ই দেখেন না। নতুন বধূ তার পরিচিত আত্মীয়-স্বজন, মা, বাবা সকলকে ছেড়ে এসে এই নূতন সংসারে যে প্রবেশ করতে এসেছে, এর জন্য তার কাছে প্রয়োজন পথ চলবার পাথেয়স্বরূপ প্রচুর স্নেহ, সমবেদনা ও সহানুভূতি। ঠিক যে'টি তার প্রয়োজন, সেটিই সে পায় না, স্বামী হয়তো তার খুবই ভাল, যথেষ্ট স্নেহ করেন, কিন্তু সাংসারিক খুঁটী-নাটী কথা কোনও বুদ্ধিমতী মেয়েই স্বামীর কাছে প্রকাশ করে স্বামীর মন বিষিয়ে তুলতে চায় না, চায় না তাদের একান্ত ভাবে সম্পূর্ণ নিজস্ব প্রণয়-বিধুর রাত্রিগুলি মসীলিপ্ত করতে। এই রকম ভাবে দিনে দিনে পুঞ্জীভূত হতে থাকে তার মনে ব্যথার স্তূপ। ব্যথার ব্যথীর দেখা কোনও দিনই পায় না শ্বশুরবাড়ীতে, এই ভাবেই চলে তার প্রথম বধূ-জীবন।

অনেকে হয়তো বলতে পারেন যে, মেয়েমানুষের জন্মই তো শ্বশুরবাড়ীর সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলবার জন্য, নিজেকে পরের জন্য বিলিয়ে দিতেই তো তার আনন্দ, নারী-জীবনের সার্থকতা··· ইত্যাদি। কিন্তু এই যে দেওয়া-নেওয়ার ব্যাপার, এটা কি সম্পূর্ণই একতরফা? তার কি এ সংসারে কিছুই অধিকার নাই? সে নিজের হাতে অধিকার পেলে, নিজে গৃহিণী হ'লে, তখনই পারে সংসারের প্রত্যেকের জন্য নিজের সকল স্বার্থ ত্যাগ করতে। আবার এমনও অনেক শাশুড়ী-ননদ আছেন দেখা যায়, যাঁরা বউকে সংসারের কিছুই করতে দেন না, সব কাজ নিজেরাই করেন। বধূ যেন জোর করে তাদের সংসারে প্রবেশ করেছে এই রকম একটা ভাব। এ সব ক্ষেত্রে নূতন বধূর কি বিড়ম্বনা! সে কোনও মতেই পারে না তাদের সুখ-দুঃখের অংশ নিয়ে নিজেকে সেই সংসারের সমান অংশীদার করে তুলতে। মানুষের জীবনের যে সময়টা সবচেয়ে সুখের, সেই সময়টা সে বেচারী শুধু দুঃখে ও কষ্টে মনের ভিতর গুমরে গুমরে দিন কাটায়।

এর মূল কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে মনোবিজ্ঞানীরা এই কথাই হয়তো বলবেন যে, শাশুড়ী তাঁর বধূ-জীবনের নিজের অভিজ্ঞতা ভুলতে পারেন না বলেই তিনি তাঁর পুত্রবধূর উপর নিজের আক্রোশটা মিটাতে চান। কিন্তু এটা তো আমাদের মানসিক উৎকর্ষের পরিচায়ক নয়? সেই কথাই বলছিলাম যে, দু'খানা ইংরাজী কেতাব পড়তে পারলে এবং ছেলেদের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারলেও মনের দিক্ হতে আমরা ছেলেদের চেয়ে অনেক পিছিয়ে আছি।

বধূ যে দিন প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে আসে, সে দিন শাশুড়ীই হ'ন, জা'ই হ'ন, বা ননদই হ'ন, যিনি বা যে সকল মহিলারা থাকেন তাঁদের কর্ত্তব্য শুধু বধূকে বরণ করলেই শেষ হয় না, তাকে সত্যিকার বরণ করে নিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব তাঁদেরই। বধূ যদি সংসারে সুখী না হয়, তবে সে দোষ তাঁদেরই। প্রথম দিনই তাঁদের বধূকে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত যে, এ সংসার তারই, তারই দায়িত্বে, তারই কথায়, তারই ইচ্ছায় এ সংসার চালিত হবে। এই কথাগুলি শুধু মুখের কথাই যেন না হয়, ধীরে ধীরে সংসারের সকল কাজে তাকে ডেকে আনতে হবে, তাকে সাথে নিয়ে সব কাজ করতে হবে, সংসারের সকল খুঁটী-নাটী ব্যাপার তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে। যাতে করে প্রথম হতেই সে বোঝে এ সংসার তারই, সে না হলে এ সংসার চলবে না। তা ছাড়া বস্তুতঃ তারই সংসার, তাকে ছলনা করে অন্যের কর্ত্রীত্ব করা শোভাও পায় না। আমার মনে হয়, প্রতিটি বাঙালী বধূরই তরুণ মনে এই রকম একটি দায়িত্বপূর্ণ পদ লাভ করবার সুন্দর কল্পনা গড়ে ওঠে, এবং সেই সংসারের সাম্রাজ্ঞী হতে চায় নিজেকে।

কার্য্যতঃ ঠিক এমনটি হয় না, তার কারণ শাশুড়ী, জা' বা ননদ যিনি এত কাল ধরে সংসার চালিয়ে এসেছেন, তিনি চান না নিজের কর্ত্রীত্ব এত সহজে অপরকে বিলিয়ে দিতে। এই জন্য অনেক সময়ে অশান্তির সৃষ্টি হয়। কিন্তু প্রত্যেকেরই কর্ত্রী হবার সময় আছে, প্রত্যেকেরই অধিকার আছে পরে পরে, সুতরাং চিরদিনই যেমন পুরাতনের পর নূতনের অভিষেক হয়ে থাকে, এখানেও তা হবে না কেন? শুধু বাহিরে নয়, মনের দিক্ হতেও যে দিন আমাদের সমাজের মেয়েরা শিক্ষিতা হয়ে উঠবে, সে দিন তারা আর নূতন বধূকে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়েই দেখবে না। তার প্রতি পদে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক, সে সম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে, সেখানে তা'র সব কিছুই নূতন, সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা সে। কাজেই তার সব কিছু ভুল-ত্রুটি স্বীকার করে নিয়ে, তাকে নিজেদের মতন করে গড়ে তুলতে হবে। একটু সহানুভূতি ও স্নেহ পেলেই সে নিজেই নূতন সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। বিশেষ করে সংসারের এই সব ছোট ছোট খুঁটী-নাটী ব্যাপারগুলি এতই সূক্ষ্ম যে, যত দিন আমরা মেয়েরা নিজেরা নিজেদের গলদ বুঝতে পেরে, মনের দিক্ থেকে নিজেদের উন্নতির চেষ্টা না করব, তত দিন আমা'দের দৈনন্দিন জীবনের দীনতা ঘুচবে না। মনের দৈন্য, মনের কুটিলতা ও হিংসা যে দিন আমাদের দূর হবে, সেই দিনই আমরা পারব 'নূতন বধূ'কে আমাদের মধ্যে সত্যকার বরণ করে নিতে, আমা'দের মেয়ের মতন, বোনের মতন করে, সেই দিন বাঙলার ঘরে ঘরে বধূ-জীবন আর এত দুর্ব্বহ হয়ে উঠবে না।

সমাহিত ভাব

কোন কিছুতেই ভদ্রলোক চটেন না। এক জন পরিচিত ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন—"আচ্ছা, আপনি মেজাজ ঠাণ্ডা রাখেন কি করে?"

ভদ্রলোক হেসে উত্তর দিলেন—"বাড়ীতে হিস্টিরিয়া স্ত্রী, কলেজে-পড়া পাঁচ মেয়ে, তিন ছেলে দু'টো বিলিতি কুকুর, আর সেকেণ্ড হ্যাণ্ড সিগারেট লাইটার। সব সময়েই বিগড়ে আছে, তাই অভ্যাস হয়ে গেছে না চটা।"

শিল্পী—রমা বসু

প্রথম ফুলে

বিভা সরকার
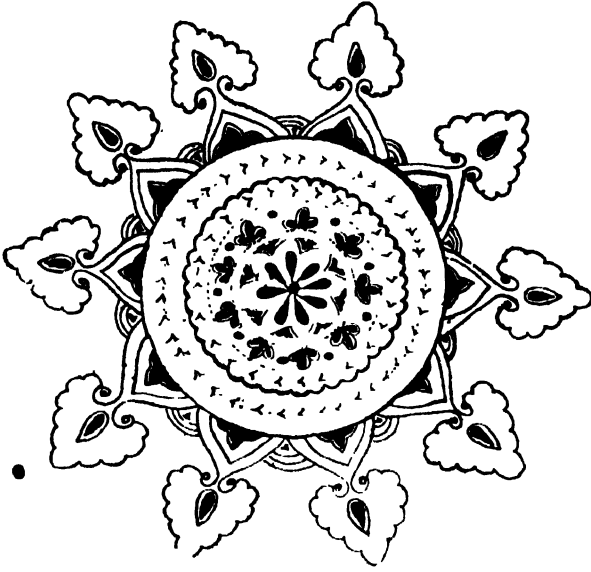
ফাল্গুনেরই প্রথম ফুলের
জড়িয়ে সুবাস এলোচুলে
আনল বাতাস অনেক দূরের সুর,
কদম-কেয়ার গন্ধে ভিজে
তোমার লাগি এনেছি যে
একটি সুখের স্বপন সুমধুর
মদির বাতাস মত্ত মনে
কল্প-কুহক আলিঙ্গনে
বাবলা বনের বার্ত্তা রটালো,
কাজলা রাতের শেষের বাঁকে
ফুল্ল উষা আজ সে ডাকে
মত্ত বকুল মুকুল ফোটালো।
আজ নিখিলের বনে বনে
দোল খেলে যায় ক্ষণে ক্ষণে
কোন্ সুদূরের কিন্নরীদের দল!
সরষে ফুলের শুভ্র ক্ষেতে
কোন ক্ষ্যাপা সে উঠছে মেতে
কে বিরহের বার্ত্তা রটায় বল?
কার পরশের দুভস রসে
রং ধরেছে আজ পলাশে
শূন্যে ভাসে কোন্ গজলের সুর,
ইন্দ্রসভার নর্ত্তকীরা
ক'রল কি পান আজ মদিরা
জগৎ রবে আপন বিভোল স্বপ্ন-সুমধুর।

হঠাৎ

অভিনেত্রীদের কার্য্য-কলাপের হিসেব রাখা ভার। তার চেয়ে শক্ত তাদের প্রেমের খবরাখবর রাখা। এক ভদ্রলোক এক অভিনেত্রীর প্রেমে পড়ে- তাকে বিয়ে করবেন ঠিক করেছিলেন। বিয়ের আগের দিন রাত্রে হঠাৎ সেই মেয়েটি টেলিফোনে জানাল—"আমাদের বিয়ে হতে পারে না।"

ভদ্রলোক চমকে প্রশ্ন করলেন—"কেন আমাকে আর ভালবাস না?" অভিনেত্রী উত্তর দিল—"ভালবাসার কথা হচ্ছে না। আমি যে হঠাৎ আর এক জনকে আজ দুপুরে রেজিষ্ট্রী করে বিয়ে করে ফেলেছি।"

নামকরণ

বাপ পণ্ডিত। মেয়ে পড়েছে শ্যামের প্রেমে। বাপ চান বিয়ে দিতে রামের সঙ্গে। পণ্ডিত নিম-বেগুন খেতে ভালবাসেন। রাম রোজ নিম-পাতা এনে দেয়। তিনি আদর করে রামকে ডাকেন নিমাই বলে। মেয়ে পরামর্শ দিলে শ্যামকে—"তুমি রোজ বাবাকে জাম এনে দিও খেতে।" প্রেয়সীর কথা-মত শ্যাম জাম সরবরাহ করতে লাগল। এক দিন শ্যামের সামনেই মেয়ে বাপকে প্রশ্ন করলে—"বাবা, রাম বাবু নিম-পাতা এনে দিয়ে হলেন নিমাই। শ্যাম বাবু জাম এনে দিয়ে কি হলেন?"

তার পর—অলমতি বিস্তরেণ!

চারি দিকে দুর্য্যোগের কালো-ছায়া। অর্থাভাব, অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব। তাই অঙ্গন ও প্রাঙ্গণে আমরা কিছু অর্থকরী বিদ্যার আলোচনা করতে চাই। বেশীর ভাগ নারীই অন্তঃপুরবাসিনী। জীবন-শিল্প তাঁদের সকলেরই কাজে লাগবে নিশ্চয়ই। আপনাদের কাছ থেকে আমরা সেলাই ও কাট সম্পর্কে সচিত্র রচনা আশা করতে পারি কি?

শিল্পী—হাসি দে

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫

"অশোক চৌধুরীর বই শোনার দু'দিন পরে বউরাণীর ঘরে সেদিনের মত সমঝদার শ্রোতাদের সামনে মৃগেনের বই শোনবার ব্যবস্থা হয়েছে। এ দিন শ্রোতৃদল আরো ভারি—সম্প্রদায়ের কতিপয় প্রিয়দর্শন তরুণ অভিনেতা—সাধারণত স্ত্রী-ভূমিকার অভিনয়ে যাদের বিশেষ খ্যাতি আছে—কৌতূহলী হয়ে এ দিন বড়োদের পিছনে স্থান গ্রহণ করেছে।

বউরাণীই প্রথমে প্রশ্ন করলেন: আপনার পালার কি নাম?

যাত্রা-সম্প্রদায়ে বই বা নাটক 'পালা' নামে পরিচিত। অশোক চৌধুরীর পক্ষে এই শব্দটি অভিনব হলেও আবাল্য যাত্রার পালা শোনায় অভ্যস্ত মৃগেনের কাছে এটা নূতন নয়। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করল: ছিন্নমস্তা।

নামটা শুনেই চমকে উঠল ঘরশুদ্ধ সকলেই। অশোক চৌধুরীর ঠোঁটের দু'টো কোণে বিদ্যুতের রেখার মত বিদ্রূপের ক্ষীণ আভা ফুটে উঠল; আর সীতার চোখ দু'টিও বড়ো হয়ে কপালের সীমারেখা স্পর্শ করল। বউরাণী জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি তাহলে পুরাণের দশমহাবিদ্যার ছিন্নমস্তা দেবীর কথা নিয়ে পালা বেঁধেছেন বলুন?

সহজ কণ্ঠে মৃগেন বলল: না। পুরাণের ছিন্নমস্তার বৃত্তান্ত আমার পালার বিষয়বস্তু নয়। আমার দেশভূমির এক মানবী ছিন্নমস্তার বাস্তব রূপই আমি এ পালায় এঁকেছি। অবিশ্যি, এ নাম বদলাতেও পারা যায়, আমিও আগে এই পালাটির আর এক নাম রেখেছিলুম। উপস্থিত এই নামটাই ভেবে-চিন্তে ঠিক করেছি। পালাটি শেষ পর্য্যন্ত শুনলেই আপনারাও বলবেন যে নামটি অসঙ্গত হয়নি।

বউরাণী মৃদু হেসে বললেন: বেশ, আপনি পড়ুন।

মৃগেন তখন সর্বসমক্ষে অসংকোচে ভাবার্দ্র কণ্ঠে বাগ্‌দেবীর বন্দনা করে তার পালার পাঠ শুরু করল। পড়ার আগে এই গ্রাম্য লেখকের দেবী-বন্দনা অশোক চৌধুরী এবং সীতা দেবীর চোখে-মুখে কৌতুকের রেখা ফুটিয়ে তুলল।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পরেই এ দিন পালা শোনার ব্যবস্থা হয়েছিল। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত পড়ে মৃগেন যখন খাতাখানি মুড়ে পুনরায় বাগ্‌দেবীর উদ্দেশে প্রণতি জানাল, তখন সন্ধ্যা অতীত হয়েছে; ভৃত্য এসে ঘরের আলোগুলি জেলে দিয়ে গেছে—সমস্ত ঘরখানা যেন থম-থম করছে। বাষ্পাচ্ছন্ন চোখ দু'টি জোর করে বিস্ফারিত করে মৃগেন চেয়ে দেখল—একই ভাবে শ্রোতারা বসে আছে, প্রত্যেকেই যেনো অভিভূত। মনে পড়ে গেলো অমনি—ভুতের বাগানে তার পালা শুনে একমাত্র শ্রোত্রী মায়ার মুখখানির অশ্রুময় অবস্থা। মায়াকে আনন্দ দেবার জন্ত মৃগেন সেখানে যেমন করে অভিনেতাদের মত ভাবোচ্ছ্বাসিত ভঙ্গিতে নাটকীয় পাত্র-পাত্রীদের সংলাপগুলি পড়ত, সংশ্লিষ্ট গানগুলিও নিজের সুরে গেয়ে যেতো, এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর সেই জন্তেই তার পড়াটা এমন উপভোগ্য ও অনবদ্য হয়েছে। উপসংহারে দেশবৎসলা যে মহারাজ্ঞীর চিত্র সে এঁকেছে, তাঁর অবদান যেমন অভূতপূর্ব তেমনি হৃদয়স্পর্শী। দেশপ্রিয় দেশপতি স্বামী দেশের বিশ্বাসঘাতী বিভীষণদের সহায়তাপুষ্ট দুর্ধর্ষ মোগল-শক্তির প্রচণ্ড চাপ থেকে শস্যপূর্ণ অঞ্চল ও কৃষককুলকে রক্ষা করবার সর্তে আত্মসমর্পণ করেছেন। যুদ্ধবন্দিরূপে তাঁকে দণ্ডিত করা হোক দ্বিধা তাতে নই—কিন্তু দেশভূমিকে বিদলিত ও দেশবাসীর কেশাগ্রও স্পর্শিত হবে না—এই তাঁর সর্ত!···সাশ্রুলোচনে রাজ্ঞী বিদায় দিয়েছেন প্রিয়তম স্বামীকে, হতাবশিষ্ট বীরবৃন্দ গুণমুগ্ধ প্রজাগণ তাদের প্রাণসম রাজার সে মহাপ্রস্থান দেখে আর্তক্রন্দনে গগন বিদীর্ণ করেছে!—কিন্তু হায়, সুবিধাবাদী শত্রু সে সর্ত রক্ষা করে নাই; রাজাকে কারারুদ্ধ করেই অবরুদ্ধ রাজ্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দিকে দিকে চলেছে হিংস্র শত্রুবাহিনীর সশস্ত্র আক্রমণ, ক্ষেত্রভূমি বিধ্বস্ত—লুণ্ঠিত হচ্ছে পণ্য সম্পদ্ নারীর মর্য্যাদা। দেশের এই মহা দুর্যোগে সর্তভঙ্গকারী শত্রুর বিরুদ্ধে বাধ্য হয়েই রাণীকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে হয়েছে। অগ্নিময়ী ভাষায় তিনি এক অপূর্ব প্রেরণা জাগিয়েছেন প্রত্যেক সমর্থ পুরুষ ও নারীর প্রাণে: মৃত্যুর মাদল বেজেছে—চলেছে প্রাণের খেলা; প্রাণের পরিপূর্ণ প্রকাশ করে পুরুষ হোক প্রাণত্যাগী, ছিন্নমস্তা হোক নারী। অসুর-বিপ্লবে দেবশক্তি নিঃশেষ হলে মহাদেবী হন ছিন্নমস্তা, ছিন্ন করো আগে আততায়ীর শির, পান করো তার রুধির—বাড়ুক রক্ত-তৃষা, শেষ পর্যন্ত নিজ করে নিজের সকুন্তল মাথা কেটে দাও উপহার—সংহার, সংহার!

রাণীর এই মহাবাণী বহ্নি বিকীর্ণ করেছে দেশে। শপথ করেছে প্রত্যেক পুরুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয়ভরা প্রাণ মৃত্যুর করাল মুখে ডালি দেবার আগে পঞ্চ আততায়ীর ছিন্নমুণ্ডে করা চাই তাঁর অর্চনা···বাণী দিয়েই মহারাণী ক্ষান্ত হননি, তিনি স্বয়ং হয়েছেন আদর্শ। প্রাণোপম এক এক পুত্রকে রাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করে তার কর্ণে দেন প্রাণত্যাগের এই মহামন্ত্র। একে একে তিন পুত্রের অভিযান ও প্রাণত্যাগের অবদান বীরভূমি যশোরের গৌরবকে করল উদ্দীপিত, শত্রু হল চমকিত—ত্রস্ত। সর্বশেষে সর্বহারা রাজ্ঞীর ছিন্নমস্তারূপে মহামৃত্যুর মুখে পূর্ণাহুতি! সমগ্র দেশে লাগল তার মরণদোলা, স্থাবর জঙ্গম হল স্তব্ধ, কেঁপে উঠল সম্রাটের সিংহাসন, আর্ত মুখ দিয়ে নির্গত হল শান্তির বাণী, বইল দেশে নতুন বাতাস, এল নতুন জীবন!

পালার বিষয়-বস্তু এবং রচনার ভঙ্গি ও সুর নূতনতম হলেও প্রত্যেকেরই অন্তর স্পর্শ করল; এমন কি, বিরোধী দলের অশোক চৌধুরী এবং সীতাদেবী পর্যন্ত যে অশ্রু সংবরণ করতে পারেনি, চোখের সঙ্গে হাতের রুমালের অবিরাম সংযোগ দেখেই জানা গেল। বউরাণীর আনন্দই সব চেয়ে বেশী। পুরাণ ছেড়েও যে এ যুগের ঘটনা নিয়ে এমন রসমধুর পালা লেখা যায় তিনি বুঝি এই প্রথম তার পরিচয় পেলেন। শ্রোতাদের পানে তাকিয়ে তিনিই বললেন খাসা পালা হয়েছে, আমার মনে হয়, এ নিয়ে বেশী কিছু আলোচনার এখন দরকার হবে না। তবু যদি কেউ কিছু বলতে চান ত বলুন।

দলের মাতব্বররা একবাক্যেই জানালেন; এ পালার মার

নেই—এর কাছে সব পালাকে হার মানতে হবে। আর পার্টগুলোর প্রত্যেকটি যেন আমাদের দলের ছাঁচে ফেলে ইনি লিখেছেন। একটু-আধটু খুঁত যা আছে, মহলার সময় ঠিক হয়ে যাবে।

অশোক চৌধুরী কিন্তু এত সহজে প্রশংসাপত্র ছাড়তে নারাজ, তিনি নাম করা বড় বড় বিদেশী নাটকের নজীর দেখিয়ে খুঁত বার করতে চাইলেন, কিন্তু তাঁর সে যুক্তি টিকল না, বউরাণী বললেন: যাত্রাগান আপনাদের মতন পণ্ডিতদের জন্যে ত নয়—লেখাপড়ার ধার দিয়েও যারা যায় না, কোন খবরই রাখে না, অথচ তারা আনন্দ চায়। সেই আনন্দ দেওয়াই হচ্ছে যাত্রার কাজ। কাজেই তাদের বোঝাবার মতন করেই যাত্রার পালা লেখা চাই। এই যাত্রা দেশের অনেক বড় কাজ করছে, জানেন ত, এ দেশের পৌনে ষোল আনা লোক অশিক্ষিত, কিন্তু তবুও এরা যে পুরাণ ইতিহাসের কথা জানে, পাপ-পুণ্য ন্যায়-ধর্ম্ম বোঝে, দেহতত্ত্বের মর্ম্মও জানে, সে সব কেবল এই যাত্রার জন্যে। ইতর-ভদ্র, হিন্দু-মুসলমান পাশাপাশি একই আসরে বসে যাত্রা-গান শোনে। পুরাণের অনেক খবর হয়ত আপনারা রাখেন না, কিন্তু সে সব কথা পুরাণ না পড়েও দেশের সাধারণ লোকে বলতে পারে। এর কারণ হচ্ছে—যাত্রা শোনা। শুনে আপনি অবাক্ হবেন—বাংলা দেশের মুসলমান চাষা-ভূষোরা পর্য্যন্ত হিন্দুর পুরাণের মানুষগুলিকে চিনে রেখেছে, এমন কি আপনার করে নিয়েছে। অভিমন্যুর মৃত্যুতে আমাদের মত এরাও কাঁদে, যুধিষ্ঠিরের দুঃখ দেখে ব্যথা পায়। যাত্রা শুনে শুনেই এ দরদ ওদের মনে এসেছে। মৃগেন বাবুর এই পালায় আবার হিন্দু আছে, মুসলমান আছে—তারা বাঙালী, বাঙলার জন্যে বিদেশী মোগলের সঙ্গে লড়ছে। আজকাল আমাদের দেশেও ভেদের সুর শোনা যাচ্ছে, এ সময় এই পালা সত্যিই মিলনের সুর তুলবে। আমরা খুব খরচ করেই এ বই খুলব।

আশ্চর্য্য, কর্ত্রীর সিদ্ধান্তের পরেও অশোক নিরস্ত হতে অনিচ্ছুক। সে সীতার কানের কাছে মুখখানা বাড়িয়ে দিয়ে ফিস্-ফিস্ করে বলল: বিদ্যের দৌড় যার এনট্রেন্স পর্য্যন্ত, তার বই কেউ শুনবে?

সীতা কিন্তু একেবারে বদলে গেছে—পল্লীগ্রামে শিক্ষাপ্রাপ্ত অর্দ্ধশিক্ষিত এই লেখকের অসাধারণ রচনাশক্তি তার মনের মধ্যে এখন এই আলোড়ন তুলেছে যে, এরই প্রতি নিজের আগেকার অশিষ্ট আচরণের জন্যে কি ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে লজ্জার হাত থেকে সে নিস্কৃতি পাবে! কাজেই অশোকের অভদ্র মন্তব্যটি তার কানে যেন সূচের মত বিঁধল, প্রতিবাদের সুরে চাপা গলায় সে জবাব দিল: আর কেউ না শুনুক আমরা সকলেই ত অবাক হয়ে ওঁর বই শুনিছি।

অশোক তথাপি প্রত্যুত্তরে বললে: আমরা না হয় বাধ্য হয়েই শুনিছি, কিন্তু উচ্চশিক্ষার—ইউনিভার্সিটির ডিপ্লোমার ত একটা আলাদা মর্য্যাদা আছে, তাই বলছি···

তার কথায় বাধা দিয়ে সীতা একটু রূঢ় স্বরেই উত্তর করল: একটা কথা আপনি মনে রাখবেন অশোক বাবু, এই মৃগেন বাবু চেষ্টা করলে এক দিন হয়ত পি আর এস হতে পারেন, কিন্তু এক জন পি আর এস সারা জীবন চেষ্টা করলেও এমন করে যাত্রার দলের পালা লিখতে পারবেন না। এ বিদ্যে আলাদা।

মেয়ের কথা শুনে মায়ের মুখখানাও প্রসন্ন হয়ে উঠল, কিন্তু অশোকের মুখখানা যেনো কালো হয়ে গেল। আর মৃগেন স্তব্ধ হয়ে ভাবছিল: এ হল কি?

বউরাণী অতঃপর মৃগেনকে অনুরোধ করলেন: পালাটি খোলা না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে আপনাকে থাকতে হবে। কেন না, মহলার সময় 'অথর' উপস্থিত থাকলে অনেক সুবিধা হয়। কাজেই আমরা আপনার সঙ্গে টাকা-পয়সার সম্বন্ধে কথা পাকা করব।

সীতাও মায়ের কথায় সায় দিয়ে বলল: আমারো ভারি ইচ্ছে হয়েছে মৃগেন বাবু, আমি এখানে থাকতে থাকতেই যাতে পালাটি খোলা হয়—আমি এর 'ওপনিং নাইট' দেখে তবে কলকাতায় ফিরে যাব। ভয় নেই, আপনার লেখার 'ক্রিটিসাইজ' আর করছি নে—তবে যদি দয়া করে আমার দু'-একটা 'সাজেসন' নেন আর আমাকেও আলোচনায় সুযোগ দেন তাহলেই ধন্য হব।

মৃগেন অবাক্-বিস্ময়ে শহরের এই শিক্ষিতা এবং সেদিনের স্পর্দ্ধিতা মেয়েটির পানে একটিবার চেয়েই মুখখানা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়—বলবার মত কোন কথাই সে যেনো খুঁজে পায় না।

[ক্রমশঃ।

ভুলে যাওয়া গানখানি

শ্রীকৃষ্ণ মিত্র

এবার কি তুমি অন্ধ হয়েছ
নূতন আলোর বন্যাতে—
আধো চেনা আমি আবছায়া তব স্মরণে।
সাঁঝের আঁধারে যে মালা গেঁথেছ লুকায়ে
দ্বিধা এসে তারে ঢাকে অচেনায়
দীপ্ত উষার তোরণে।

কাল সন্ধ্যায় তোমার আঁচল ভরি
যে দিয়েছে তার জীবন-স্বপ্নকুঁড়ি
আজ তারি পাশে শঙ্কায় তব বক্ষ উঠিছে কাঁপি
দূরে যেতে চাও চরণে টুটিয়া অতীতের আঁকা ছবি।

মোর পরিচয় জীবনে তোমার
একটি সাঁঝের জানি—
তবু তারে স্মরি তোমায় বীণায়
ঝিল্লিমুখর বনানীর ছায়
এক দিন জেনো উঠিবে রণিয়া
ভুলে যাওয়া গানখানি।

এম, ডি, ডি

অষ্ট্রেলিয়াতে এম সি সি দল :—

নবম খেলা :—সিডনীতে ভ্রাম্যমান এম সি সি দল বনাম নিউ সাউথ ওয়েলসের খেলার কোন নিষ্পত্তি হয় না। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ও প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে কোন খেলা সম্ভব হয় নাই। প্রথম দিনের খেলাও অব্যাহত ভাবে সম্পন্ন হয় নাই। এই দিন নিউ সাউথ ওয়েলস ৪ উইকেটে ১৭ রাণ করে। মোট ৪ উইকেটে ১৬৫ রাণ করিয়া তাহারা চতুর্থ দিনে চা পানের সময় ইনিংস ঘোষণা করিয়া দেয়। প্রত্যুত্তরে এম সি সি দুইটি উইকেটের বিনিময়ে ১৫৬ রাণ করিলে খেলা অমীমাংসিত থাকে।

রাণ-সংখ্যা :—

নিউ সাউথ ওয়েলস্—১ম ইনিংস—৪ উইকেটে ১৬৫ (মরিস নট্ আউট্ ৮১, ক্র্যালী নট্ আউট্ ৪৩, বেডসার ৪৮ রাণে ২টি)

এম সি সি—১ম ইনিংস—১৫৬ (হাটন রাণ আউট্ ১৭)

খেলা অমীমাংসিত।

দশম খেলা :—

কুইন্সল্যাণ্ড ও এম সি সি দলের অমীমাংসিত খেলাতে উভয় পক্ষে যথাক্রমে একটি করিয়া সেঞ্চুরী হয়। ১ম ইনিংসে কুইন্সল্যাণ্ডের প্রথম জুটীর কুক ব্যক্তিগত ১৬১ রাণ করিয়া নট আউট থাকে। রোজার্সের সহযোগিতায় প্রথম জুটীতে কুক এম সি সির বিরুদ্ধে প্রথম শতাধিক রাণ করার ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করে। ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াসব্রুক ১২৪ রাণ করিয়া বর্ত্তমান সফরে দ্বিতীয় বার শতাধিক রাণ করার গৌরব অর্জন করে। ম্যাককুল ও জনষ্টন—এই স্পিন বোলারদ্বয় যথাক্রমে ১০৫ রাণে ৬টি ও ৫৪ রাণে ৫টি উইকেট দখল করে।

রাণ-সংখ্যা :—

কুইন্সল্যাণ্ড—১ম ইনিংস—৪০০ (কুক ১৬১ নট্ আউট, রোজার্স ৬৬, ইয়ার্ডলী ১১ রাণে ৩টি ও বেডসার ৮৩ রাণে ২টি)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ২৩০ (জনষ্টন ৫ স্মিথ ১৩ রাণে ৩টি ও রাইট ৬৮ রাণে ৩টি)।

এম সি সি—১ম ইনিংস—৩১০ (হাটন্ ৪২, ওয়াসব্রুক ৪০, এডরিচ ৬৪ নট আউট, ম্যাককুল ১০৫ রাণে ৬টি ও জনষ্টন ৫৪ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ২৩৮ (ওয়াসব্রুক ১২৪, এডরিচ ৭১)

খেলা অমীমাংসিত।

একাদশ খেলা :—

প্রথম টেষ্ট :—ব্রিসবেনে প্রথম টেষ্ট খেলায় ইংলণ্ড অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক ইনিংস ও ৩৩২ রাণে শোচনীয় ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়। বহু জল্পনা-কল্পনার পরে অনন্যসাধারণ ক্রিকেট-যাদুকর ডন-ব্র্যাডম্যান পুনরায় অষ্ট্রেলিয়া দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এবং এই মাঠে টেষ্ট খেলায় নিজস্ব রাণ-সংখ্যার রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত করে অষ্ট্রেলিয়ার এই বিপুল জয়লাভের মূলে ব্র্যাডম্যানের ব্যক্তিগত অবদান অতুলনীয়। চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে খেলিয়া অষ্ট্রেলিয়া প্রায় আড়াই দিনে ৬৪৫ রাণে প্রথম ইনিংস সমাপ্ত করে। পরে প্রচুর বৃষ্টিপাতের ফলে মাঠের অবস্থার চরম পরিণতি ঘটে। এই খেলায় উল্লেখযোগ্য ব্র্যাডম্যানের ও হ্যাসেটের ব্যাটিং। দলগত দায়িত্ব যৌথ ভাবে তাহারা কৃতিত্বের সহিত পালন করে। মিলার ও ম্যাককুল দৃঢ়তার সহিত ব্যাট করে। মাত্র ৫ রাণের জন্য শত রাণে বঞ্চিত হইয়া শেষোক্ত খেলোয়াড় টেষ্ট খেলায় প্রথম আত্মপ্রকাশে সেঞ্চুরী করার অপূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হইতে পারে নাই। মিলার ও টোস্যাক যথাক্রমে ৭৭ ও ১১ রাণ দিয়া নয়টি করিয়া উইকেট দখল করে। মিলারের ক্ষিপ্রগতির বলে ইংলণ্ডের অনেক খেলোয়াড় আহত হয়। কিন্তু তাহার বোলিংকে কুখ্যাত 'বডী লাইন' পর্য্যায়ভুক্ত করার মত কোন কারণ দেখা যায় নাই। এই খেলায় অন্যূন দুইটি বিভিন্ন রেকর্ডের সৃষ্টি হয়। ব্র্যাডম্যানের নিজস্ব ১৮৭ রাণ ব্রিসবেনে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ব্যাটিং অবদান। হেণ্ড্রেনের ব্যক্তিগত ১৬৯ রাণের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া ব্র্যাডম্যান ব্রিসবেনে ব্যক্তিগত সর্ব্বোচ্চ রাণের অধিকারী হয়। হ্যাসেট ১২৮ রাণ করিয়া টেষ্ট খেলায় এই প্রথম সেঞ্চুরী সম্পাদনের আস্বাদ পায়। ব্র্যাডম্যান-হ্যাসেট, জুটীর ২৭৬ রাণে তৃতীয় উইকেটে জার্ডিন-হ্যামণ্ডের ২৬৩ ও ব্র্যাডম্যান-ম্যাককেবের ২৪৯ রাণের প্রাক্তন রেকর্ড ভঙ্গ হয়। ১৯২৮ সালে চ্যাপম্যানের নেতৃত্বে ইংলণ্ড টেষ্ট খেলায় ব্রিসবেনে মোট ৫২১ রাণের রেকর্ড সৃষ্টি করে। এবারে অষ্ট্রেলিয়ার ৬৪৫ রাণ ব্রিসবেনে তথা অষ্ট্রেলিয়াতে টেষ্ট খেলার সর্ব্বোচ্চ রাণ-সংখ্যার সন্ধান দিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে অষ্ট্রেলিয়া ১৯৩৪-৩৫ সালে মেলবোর্ণে ৬০৪ ও ইংলণ্ড ১৯২৮—২৯ সালের সফরে সিডনীতে মোট ৬৩৬ রাণ করিতে সমর্থ হয়।

রাণ-সংখ্যা :—

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৬৪৫ (ব্রাডম্যান ১৮৭ হ্যাসেট ১২৮, ম্যাককুল ৯৫, মিলার ৭৯, লিণ্ডওয়াল ৩১, রাইট ১৬৭ রাণে ৫টি ও এডরিচ ১০৩ রাণে ৩টি)

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—১৪১ (হ্যামণ্ড ৩২, ইয়ার্ডলী ২৯, মিলার ৬০ রাণে ৭টি ও টোস্যাক ১৭ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—১৭২ (ইকীন ৩২, হ্যামণ্ড ২৩, টোস্যাক ৮২ রাণে ৬টি, মিলার ১৭ রাণে ২টি ও ট্রাইব ৪৮ রাণে ২টি)

ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ৩৩২ রাণে পরাজিত।

দ্বাদশ খেলা :—

কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশ বনাম এম সি সি দলের দুই দিনব্যাপী খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

রাণ-সংখ্যা :—

কুইন্সল্যাণ্ড প্রদেশ—১ম ইনিংস—২০৮ (এলেন ৫৩, জনসন ৪০, ভোস ৩৪ রাণে দুটি ও স্মিথ ৮০ রাণে ৫টি)

(২য় ইনিংস—১ উইকেটে ৩১১

এম সি সি—১ম ইনিংস—২৮২ (ফিসলক ৬২, ল্যাংগ্রীজ ৪২)

খেলা অমীমাংসিত থাকে।

বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের মধ্যে চা-রসিক বলে' যাঁদের খ্যাতি ছিল ডক্টর জন্‌সন্ ছিলেন তাঁদের অগ্রণী। চা না হলে' কখনই তিনি কোন রচনায় মনোনিবেশ করতে পারতেন না। বিক্ষিপ্ত মনকে সাহিত্য-সাধনায় শান্ত ও সমাহিত করবার জন্যে এই মধুগন্ধী সুস্বাদু পানীয়টিই ছিল তাঁর একমাত্র নির্ভর। আর শুধু তিনিই ন'ন, হ্যাজলিট, ল্যাম্ব প্রমুখ প্রখ্যাত মনীষীদের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব অর্জন করে গেছেন তাঁরা চা-কে পানীয় মাত্র বলেই মনে করতেন. না,—চা ছিল তাঁদের কাছে অফুরন্ত আনন্দ ও প্রেরণার উৎস। সুকবি কুপারের তো কথাই নেই, তিনি ইংরেজী সাহিত্যে "চায়ের আসরের কবি" বলেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন।
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্যিকদের সঙ্গে চায়ের এই যোগাযোগ আজ আর শুধু ইংরেজী সাহিত্যেই সীমাবদ্ধ নয়, তাঁদের চা-প্রীতির নিদর্শন এখন পৃথিবীর সমস্ত সাহিত্যেই অল্প-বিস্তর খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলার উদীয়মান কথা-শিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন:
"লেখার সময় স্তব্ধ অন্তর্লোকবাসী মনের ধ্যানযোগে চা শুধু তৃষ্ণাহরা পানীয়ই নয়, প্রেরণাময় সঙ্গীও বটে। ক্লান্তিতে যখন কল্পনায় অবসাদ আসে তখন চা আমাকে সতেজ করে তোলে নূতন প্রেরণায়। এ সময় চা আমার পক্ষে অপরিহার্য।"
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম জেলার লাভপুর গ্রামে ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। কথা-শিল্পী হিসেবে তিনি অনন্য-সাধারণ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন এবং তাঁর লেখা 'কালিন্দী', 'ধাত্রী দেবতা' আর 'দুই পুরুষ' ইতিমধ্যেই সাহিত্য ক্ষেত্রে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। বাংলার সমাজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও দুঃখ-বেদনার প্রতি তারাশঙ্করের একনিষ্ঠ সহানু-ভূতি তাঁর সমস্ত রচনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে। এই প্রতিভাবান দরদী শিল্পীর ঐকান্তিক সাধনায় যে বাংলা সাহিত্য আরো সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে সে সম্বন্ধে দ্বিমত নেই।
প্রেরণার উৎস—চা
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশান্ বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 266

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পররাষ্ট্র-সচিবচতুষ্টয়ের মতৈক্য—

৫ই ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কের পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলনে বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয় প্যারী নগরীর শান্তি-সম্মেলনে গৃহীত ইটালী, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরী এবং ফিনল্যাণ্ডের সহিত সন্ধির খসড়া-প্রস্তাবের প্রধান প্রধান সকল বিষয়েই একমত হইয়াছেন। ইহাকে যে কতকটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় খুব অন্যায় হয় নাই। এগার সপ্তাহব্যাপী আলোচনা, বিতর্ক এবং মাঝে মাঝে অচল অবস্থার ভিতর দিয়া দ্বিতীয় মহাসমরের প্রথম দফা খসড়া সন্ধিপত্র রচিত হইয়া ১৫ই অক্টোবর প্যারী নগরীর শান্তি-সম্মেলন সমাপ্ত হয়। উল্লিখিত পাঁচটি প্রাক্তন শত্রুদেশের নিকট তাহাদের গ্রহণের জন্য ঐ সকল সন্ধি-প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্ব্বে ঐগুলি বৃহৎ রাষ্ট্রচতুষ্টয় কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। নবেম্বর মাসের প্রথম ভাগে নিউ ইয়র্কে পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলনে ঐ সকল সন্ধি-প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। এক মাসব্যাপী আলোচনার মধ্যে পুনঃপুনঃই অচল অবস্থা উপস্থিত হইতে আমরা দেখিতে পাইয়াছি। শেষ পর্য্যন্তই রাশিয়ার জন্য প্রধান প্রধান বিষয়ে মতৈক্য হওয়া সম্ভব হইয়াছে। রাশিয়ার এই মনোভাবকে 'সুবিবেচনা (sweet reasonableness) বলিয়া অভিহিত করার তাৎপর্য্য এই যে, বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাঁহাদের নিজেদের 'কোট' বোল আনাই বজায় রাখিয়াছেন, রাশিয়াকেই নরম হইতে হইয়াছে।

যে সকল প্রধান প্রধান বিষয় লইয়া মতভেদ সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে ত্রিয়েস্ত সম্বন্ধে বিধি-বিধান, দানিয়ুব অঞ্চলে উন্মুক্ত দ্বার-নীতি (open door policy) এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ত্রিয়েস্ত প্রথম মহাসমরের পূর্ব্বে ছিল অষ্ট্রিয়ার। যুদ্ধের পরে উহা ইটালীর অধিকারে আসে। বর্ত্তমান সন্ধিতে ত্রিয়েস্ত হইবে স্বাধীন নগরী, উহার গবর্ণর নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন। ত্রিয়েস্ত হইতে বৈদেশিক সৈন্য অপসারণ সম্বন্ধে যে মতভেদ হইয়াছিল তাহার মীমাংসা হইয়াছে। কিন্তু উহার অর্থনৈতিক ভাগ্য এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই। দানিয়ুব অঞ্চলে ইঙ্গ-আমেরিকার দাবীই রাশিয়া শেষ পর্য্যন্ত মানিয়া লইয়াছে। ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধেও রাশিয়ার জন্যই আপোষ মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে। মতভেদের মীমাংসা হওয়ায় ১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারী নগরীতে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইবে। সব দিক্ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই সন্ধি-প্রস্তাব সাম্রাজ্যবাদী সন্ধি ছাড়া আর কিছুই হয় নাই।

নিউ ইয়র্ক সম্মেলনেই জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির খসড়া-প্রস্তাব রচিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাহা আর সম্ভব হইল না। জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব রচনা কেবল পিছাইয়াই যাইতেছে। ১০ই মার্চ্চ (১৯৪৭) মস্কো সহরে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে।

নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব—

১৪ই ডিসেম্বর নিউ ইয়র্কে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাব আসলে অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করা সম্পর্কে প্রাথমিক প্রস্তাব। এই প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া অস্ত্রশস্ত্র হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সকল রাষ্ট্রই স্বীকার করিলেন। সমরসজ্জা নিয়ন্ত্রণ এবং পরিদর্শনের জন্য বিধি-ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রণয়ন করিতে নিরাপত্তা পরিষদের উপর ভার দেওয়া হইয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদ কর্ত্তৃক বিধি-ব্যবস্থা রচিত হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে আলোচনার জন্য উহা উপস্থাপিত হইবে। সাধারণ পরিষদে ঐ বিধি-ব্যবস্থা গৃহীত হওয়ার পর প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের গবর্ণমেন্টের অনুমোদনের জন্য উহা প্রেরণ করা হইবে। সমর উপকরণের মধ্যে পরমাণবিক বোমাই বর্ত্তমানে প্রধান স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পরমাণবিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র বে-আইনী সাব্যস্ত করিবার ভার অর্পিত রহিয়াছে জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের এটমিক এনার্জি কমিশনের হাতে। যে সকল রাষ্ট্র পরমাণবিক বোমা নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন তাহাদের জন্য রক্ষা-কবচের ব্যবস্থা করিবার কথাও নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবে আছে।

আপাত দৃষ্টিতে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থার সূচনা ভাল ভাবেই আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে অতিমাত্রায় আশান্বিত হওয়ার কোন কারণ নাই। এই প্রস্তাবই যে গোপনে সমরসজ্জা বৃদ্ধি করিবার একটি আবরণ মাত্র হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? পৃথিবীতে যত দিন পরাধীন দেশ থাকিবে তত দিন সাম্রাজ্যলিপ্সা দূর হইবে না। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া বিপুল সমরসজ্জা করা ঠেকাইয়া রাখা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের পক্ষে সম্ভব হইবে কি? অস্ত্রহ্রাসের প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে বটে, কিন্তু সৈন্যসংখ্যার হিসাব দাখিলের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে। অবশ্য সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র সম্পর্কিত প্রশ্ন নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করিবার এবং কি কি হিসাব চাওয়া হইবে, তাহা স্থির করিবার ভার নিরাপত্তা পরিষদের উপর দিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ডিসেম্বর মাসের প্রথম ভাগে বিলাতের কম্যুনিষ্ট পত্রিকা 'ডেলী ওয়ার্কার' বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে শীঘ্রই একটা সুদূরপ্রসারী গোপন সামরিক চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমেরিকার

ইউনাইটেড প্রেসও বৃটেনের উচ্চ সরকারী মহল হইতে জানিয়া লিখিয়াছিলেন, বৃটেন ও আমেরিকার সৈন্যবাহিনীতে একই ধরণের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহৃত হওয়ার নীতি গৃহীত হইয়াছে এবং তদনুযায়ী কার্য্যও সুরু হইয়া গিয়াছে। এই যে ইঙ্গ-মার্কিণ অক্ষ গঠিত হইতে চলিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্য অনুমান করা কঠিন নয়। কমন্স সভার শ্রমিক-দলভুক্ত বহু সদস্য আমেরিকার নিকট বৃটেনের আত্মবিক্রয় পছন্দ করেন না। তাঁহাদের সংখ্যা ১০ হইতে ১২০র মধ্যে। পার্লামেণ্টারী শ্রমিক-দলের এক্সটায়নেল একেয়াস গ্রুপের প্রায় ৪০ জন সদস্যও না কি তাঁহাদের সহিত সম্প্রতি যোগ দিয়াছেন। ইহাতে শ্রমিক গবর্ণমেণ্টের চৈতন্যোদয় না হইলে, বৃটেন ও আমেরিকার সম্মিলিত কৌশলের সম্মুখে নিরস্ত্রীকরণ ব্যবস্থা সাফল্য লাভ করিবে কি?

ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিল—

ভূতপূর্ব্ব জাতিসঙ্ঘের নিকট হইতে মেণ্ডেটারী ক্ষমতা-প্রাপ্ত যে কয়েকটি রাষ্ট্র তাঁহাদের আশ্রিত দেশ সম্বন্ধে ট্রাষ্টীশিপ চুক্তিপত্র দাখিল করিয়াছেন, তাঁহাদের চুক্তিপত্রগুলি গত ১৪ই ডিসেম্বর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। নিম্নে মেণ্ডেটারী ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঐ সকল রাষ্ট্র এবং তাঁহাদের আশ্রিত দেশের নাম প্রদত্ত হইল :

বৃটেন :—টাঙ্গানাইকা, বৃটিশ কেমেরুন, বৃটিশ টোগোল্যাণ্ড ;

বেলজিয়ম :—রোণ্ডা, উরুণ্ডি (বেলজিয়ম কঙ্গো)

ফ্রান্স :—ফরাসী কেমেরুন, ফরাসী টোগোল্যাণ্ড ;

অষ্ট্রেলিয়া :—নিউগিনি।

নিউজীল্যাণ্ড :—পশ্চিম সামোয়া।

অষ্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, নিউজীল্যাণ্ড, বৃটিশ যুক্তরাজ্য, চীন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, মেক্সিকো এবং ইরাক এই কয়েকটি রাষ্ট্র লইয়া ট্রাষ্টীশিপ কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

যে কয়েকটি আশ্রিত দেশ ট্রাষ্টীশিপের অধীনে আসিল সেগুলি প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে সবই ছিল জার্মাণীর উপনিবেশ। যেমন জার্মাণীর অধীনে তেমনি ম্যাণ্ডেটের অধীনে তাহাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। ট্রাষ্টীশিপের অধীনে আসিয়া তাহাদের ভাগ্যের কোন উন্নতি হওয়া তো দূরের কথা, যে-ভাবে চুক্তিপত্র রচিত হইয়াছে তাহা উহাদের চিরকাল অধীন থাকিবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়।

দক্ষিণ-পূর্ব্বআফ্রিকা—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে গত ১৫ই ডিসেম্বর দক্ষিণ-পূর্ব্বআফ্রিকাকে অঙ্গীভূত করিতে দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবী অগ্রাহ্য হইয়াছে এবং দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকাকে আন্তর্জ্জাতিক ট্রাষ্টীশিপের হস্তে অর্পণ করিবার জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকাকে নির্দ্দেশ দিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, এই প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট গ্রহণের সময় বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, নেদারল্যাণ্ড, তুরস্ক এবং গ্রীস এই নয়টি রাষ্ট্র অনুপস্থিত ছিল। ৩৬টি রাষ্ট্র প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়াছে। নয়টি রাষ্ট্র অনুপস্থিত থাকায় বিপক্ষে কোন ভোট হয় নাই।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকা প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর উপনিবেশ ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উহা দক্ষিণ-আফ্রিকার আশ্রিত (mandatory) দেশে পরিণত হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকার স্বর্ণখনির জন্ম সস্তা শ্রমিক সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখাই দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকাকে অঙ্গীভূত করিতে চাওয়ার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। তা ছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব-আফ্রিকাতেও সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। উপজাতীয় প্রথায় দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকার অধিবাসীদের অভিমত গ্রহণ করায় কোন অর্থ হয় না। কারণ, উপজাতীয় সর্দ্দার-ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের তাঁবেদার মাত্র। ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলেই তাঁহাদিগকে অপসারণ করিতে পারেন। বেচুয়ানাল্যাণ্ডে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের প্রত্যক্ষ শাসনের নমুনা হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব আফ্রিকা দক্ষিণ-আফ্রিকার অঙ্গীভূত হওয়ার পরিণাম অনুমান করা কঠিন নয়। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণও ভুক্তভোগী। আফ্রিকাবাসীদের সম্পর্কে ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্টের নীতিতে অসন্তুষ্ট হইয়া নেটিভ রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাউন্সিল অনির্দিষ্ট কালের জন্ম বন্ধ রাখা হইয়াছে। এই সমস্তই দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবীর প্রতিকূলে। দক্ষিণ-আফ্রিকা সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘের নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবে কি না, তাহা অদূর ভবিষ্যতেই হয়ত আমরা দেখিতে পাইব। যদি নির্দ্দেশ প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে জাতিসঙ্ঘকে সত্যিকার শক্তি-পরীক্ষার সম্মুখীন হইতে হইবে।

ভেটো ক্ষমতা—

ভেটো ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তাবই অবশেষে গৃহীত হইয়াছে। ভেটো ক্ষমতার বিরুদ্ধে সমালোচনা এ পর্য্যন্ত কম হয় নাই। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতির উপর উহার প্রতিক্রিয়া কিরূপ হইবে, বাস্তব দৃষ্টি-কেন্দ্র হইতেই তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। ভাবী তৃতীয় মহাযুদ্ধ নিবারণ করিতে হইলে বৃটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স এবং চীন এই বৃহৎ শক্তি-পঞ্চকের মধ্যে মতৈক্য থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভেটোর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় এই মতৈক্যের জন্যই। নিরাপত্তা পরিষদে বৃহৎ শক্তি-পঞ্চক স্থায়ী সদস্য। আর ৬জন সদস্য প্রতি দুই বৎসরের জন্য নির্ব্বাচিত হইয়া থাকে। নিরাপত্তা পরিষদে কোন প্রস্তাবের পক্ষে মোট সাত ভোট হইলেই উহা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদি উক্ত ৫টি স্থায়ী সদস্যও উহার পক্ষে ভোট দেন। স্থায়ী সদস্যদের অর্থাৎ বৃহৎ রাষ্ট্রপঞ্চকের একটি রাষ্ট্র ভোট না দিলেই কোন প্রস্তাব আর গৃহীত হইতে পারে না, প্রস্তাবের পক্ষে যত ভোটই হউক না কেন। ভোট না দিয়া কোন প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিবার এই যে অধিকার বৃহৎ রাষ্ট্র-পঞ্চকের প্রত্যেককে দেওয়া হইয়াছে, ইহারই নাম ভেটো ক্ষমতা। এই ক্ষমতা রাশিয়া শুধু একাই প্রয়োগ করে নাই, বৃটেনও করিয়াছে। ভেটোর ক্ষমতা না থাকিলে বৃটেন এবং আমেরিকা তাহাদের অনুগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সহযোগিতায় যে কোন সিদ্ধান্ত রাশিয়ার ঘাড়ে চাপাইয়া দিতে পারে। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের ২০টি রাষ্ট্র মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহস্বরূপ, বৃটেনের উপগ্রহস্বরূপ অন্ততঃ ১৫টি রাষ্ট্র। রাশিয়ার উপগ্রহ হিসাবে ৫।৬টি রাষ্ট্রের বেশী নাই। আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে কোন নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা বৃটেন, আমেরিকা এবং রাশিয়ারই শুধু আছে। অষ্ট্রেলিয়ার মত ছোট ছোট রাষ্ট্রের কোন নীতি নির্দ্ধারণের ক্ষমতা নাই, তাহারা কোন বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে 'জী হুজুর' বলিতে পারে মাত্র। এই বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের যে কেহ

বিশ্ব-সংগ্রাম সুরু করিয়া দিতে পারে। অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ছোট ছোট রাষ্ট্রের সে ক্ষমতা নাই। বৃহৎ রাষ্ট্র কয়েকটি একমত হইলেই বিশ্বশান্তি রক্ষা করা সম্ভব। কাজেই তাহাদের মধ্যে মতৈক্য থাকা প্রয়োজন। সেই মতৈক্য বিধানের উপায় ভেটো ক্ষমতা। সাম্যবাদী রাশিয়ার সহিত ধনতন্ত্রবাদী বৃটেন ও আমেরিকার আদর্শগত বিরোধ রহিয়াছে। তাহা সত্ত্বেও রাশিয়া ভেটো দিয়া কোন সিদ্ধান্ত বাতিল করিয়া দিতে পারে বলিয়াই আপোষ মীমাংসার চেষ্টা করিতে হয়। ভেটো ক্ষমতা না থাকিলে তাহার কোন প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু তাহাতে মতানৈক্যই প্রবল হইয়া উঠিয়া বিশ্ব-শান্তিকে বিপন্ন করিয়া তুলিবে।

ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকা—

ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরোধ আপোষে মিটাইবার চেষ্টা করিতে এবং আপোষ-প্রচেষ্টার ফলাফল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে পেশ করিতে নির্দ্দেশ দিয়া পরিষদের রাজনৈতিক কমিটি এবং আইন সংক্রান্ত কমিটির যৌথ অধিবেশনে ফ্রান্স এবং মেক্সিকো যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল, গত ৩০শে নবেম্বর ভোটাধিক্যে ঐ প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে হইয়াছিল ২৪ ভোট এবং বিপক্ষে ১১ ভোট হইয়াছিল। বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিয়াছিল। ছয় জন অনুপস্থিত ছিলেন। বিরোধীয় বিষয়ে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ হস্তক্ষেপ করিতে অধিকারী নহে, এই আপত্তি তুলিয়া ফিল্ড মার্শাল স্মাট উহাকে আন্তর্জ্জাতিক আদালতে পেশ করিবার যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন, বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন সত্ত্বেও ঐ প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়া যায়। অতঃপর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ফিল্ড মার্শাল স্মাট রাজনৈতিক কমিটি এবং আইন সংক্রান্ত কমিটির যুক্ত অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরোধীয় বিষয়টি আন্তর্জ্জাতিক আদালতে প্রেরণের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্ত দাবী উপাপন করেন। তাঁহার প্রস্তাবের পক্ষে ২১ ভোট এবং বিরুদ্ধে ৩১ ভোট হওয়ায় উহা অগ্রাহ্য হইয়া যায়। আফগানিস্থান এবং বলিভিয়া কোন পক্ষেই ভোট দেয় নাই। অতঃপর ফ্রান্স-মেক্সিকোর প্রস্তাব দুই-তৃতীয়াংশ অধিক ভোটে গৃহীত হয়। পক্ষে হইয়াছিল ৪১ ভোট এবং বিপক্ষে ১৫ ভোট হইয়াছিল। সাতটি সদস্যরাষ্ট্র ভোট দেয় নাই। তাহাদের মধ্যে ডেনমার্ক, সুইডেন এবং তুরস্ক অন্যতম।

ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরোধ আপোষে মিটাইতে চেষ্টা করিবার জন্ত প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় ভারতবাসীর নৈতিক জয় সূচিত হইয়াছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘে বিষয়টি আলোচিত হওয়ায় দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতকায়গণ অশ্বেতকায়দের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করে বিশ্ববাসী তাহা অবশ্য জানিতে পারিল। কিন্তু বিশ্ববাসী জানিলেও কোন লাভ নাই যদি প্রতিকারের ব্যবস্থা করা সম্ভব না হয়। বিরোধ আপোষে মিটাইবার নির্দ্দেশ শুধু 'অশুভস্য কালহরণম্'এর ব্যবস্থাই নয়, দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাহস ও সামর্থ্যের অভাবও উহার মধ্যে সূচিত রহিয়াছে। আপোষে মিটাইতে চেষ্টার পরিণাম সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করাও কঠিন।

ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকার এই বিরোধ নূতন নয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ-আফ্রিকার বৃটিশ কলোনী নাটালে যখন ভারতীয় শ্রমিক প্রেরিত হয় তখনই এই বিরোধের বীজ উপ্ত হইয়াছে। সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিবার অনেক আশা দিয়াই ভারত হইতে শ্রমিক নেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের ভ্রম দূর হইতে বেশী দেরী হয় নাই। ভারতীয় শ্রমিকদের পরে ভারতীয় অনেক ব্যবসায়ীও দক্ষিণ-আফ্রিকায় যাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন এবং ভারতীয়দের চেষ্টার ফলে দক্ষিণ-আফ্রিকার যথেষ্ট উন্নতি হয়। বুয়র যুদ্ধের সময় প্রবাসী ভারতীয়গণ বৃটেনের পক্ষে যথেষ্ট সহযোগিতাও করিয়াছিল। কিন্তু বুয়র যুদ্ধের পর ইউরোপীয়দের আন্দোলনের ফলে ভারতীয়দের জন্ত বৈষম্যমূলক কতকগুলি আইন প্রণীত হয়। উহার প্রতিবিধান-কল্পে মহাত্মা গান্ধী নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের ফলেই গান্ধী স্মাট চুক্তি হইয়া ভারতীয়দের অভিযোগের কিছু প্রতিকার হয়। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের পর দক্ষিণ-আফ্রিকার ইউরোপীয়গণ আবার এসিয়াবাসী-বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ করেন। উহার ফলে এসিয়াবাসী তথা ভারতবাসীকে পৃথক্ করিয়া রাখিবার নীতি গৃহীত হয়। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রবল আপত্তি করায় প্রস্তাবিত আইন আর বিধিবদ্ধ হয় নাই। ১৯২৭ সালে কেপ-টাউনে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং ১৯৩২ সালে ঐ চুক্তি পুনরায় অনুমোদিত হয়। উহাই কেপটাউন চুক্তি নামে প্রসিদ্ধ। এই চুক্তি বলবৎ থাকা সত্ত্বেও ১৯৪৩ সালে পেগিং এক্ট রচিত হয়। ঐ আইন ছিল অস্থায়ী। অতঃপর ১৯৪৬ সালে ঘেটো আইন প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। আলাপ আলোচনা করিয়া মীমাংসার সাপক্ষে ঐ আইন রচনা স্থগিত রাখিতে ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুরোধ ইউনিয়ন গবর্ণমেণ্ট অগ্রাহ্য করেন। ভারতীয় জনমতের চাপে ভারত গবর্ণমেণ্ট দক্ষিণ-আফ্রিকা হইতে ভারতীয় হাই কমিশনারকে ফিরাইয়া আনিতে এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার সহিত বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে ফল কিছুই হয় নাই। দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়গণ ঘেটো-আইনের প্রতিবাদে কয়েক মাস হইল সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিয়াছেন। এদিকে ভারত গবর্ণমেণ্টও জনমতের চাপে গত ২২শে জুন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নিকটে দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকে এড়াইবার উদ্দেশ্যেই কি আপোষে মিটাইবার নির্দ্দেশ দেন নাই? মার্কিণ প্রতিনিধি মিঃ ফাহে সানফ্রান্সিস্কো সনদের উচ্চ আদর্শের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন—"We must not create new antagonisms—"আমরা অবশ্যই নূতন শত্রুতা সৃষ্টি করিব না।" তাঁহার এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষের অনুকূলে কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা দক্ষিণ-আফ্রিকার অসন্তোষ অর্জ্জন করিতে চান না। তাঁহাদের এই ক্লীবত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘকে কোথায় টানিয়া লইয়া যাইবে কে জানে?

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও স্পেন—

স্পেনের ফ্রাঙ্কো-শাসনের প্রতি বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের দরদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট হইয়াছে। ফ্রাঙ্কো-শাসন শান্তির বিঘ্নসৃষ্টিকারী কি না, তদন্ত করিয়া তৎসম্পর্কে রিপোর্ট প্রদানের জন্ত নিরাপত্তা

পরিষদ কয়েক মাস পূর্ব্বে সাব-কমিটির উপর ভারার্পণ করিয়াছিলেন। সাব-কমিটির রিপোর্টে ফ্রাঙ্কো-শাসনকে সোজাসুজি শান্তির বিঘ্নসৃষ্টিকারী বলিয়া স্বীকৃত না হইলেও ভবিষ্যতে উহা আন্তর্জাতিক শান্তিভঙ্গের কারণ হইতে পারে, এই আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে। সাব-কমিটি ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার সুপারিশ অগ্রাহ্য হয়। উহার পক্ষে ২০ ভোট এবং বিপক্ষেও ২০ ভোট হইয়াছিল। সুপারিশের মুখবন্ধে ফ্রাঙ্কো-শাসনের নিন্দাসূচক বাক্যগুলি বিনা ভোটেই গৃহীত হইয়াছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার সুপারিশ সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনেটর টম কোনালী এক সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। এই সংশোধন প্রস্তাবে স্বাধীন ভাবে নির্ব্বাচন-কার্য্য সম্পন্ন হওয়ার উদ্দেশ্যে একটি অস্থায়ী সরকারের হস্তে ক্ষমতা অর্পণের জন্য ফ্রাঙ্কোকে অনুরোধ করা হইয়াছিল। এই সংশোধন প্রস্তাবও অগ্রাহ্য হয়। সাব-কমিটির সুপারিশের একটি অংশে নূতন এবং সমর্থনযোগ্য গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত স্পেনকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসংঘের সদস্য হইবার অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার প্রস্তাব ছিল। উক্ত প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়।

কূটনৈতিক সম্বন্ধ ছিন্ন করিবার মূল প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিল পোলাণ্ড। উহা অগ্রাহ্য হওয়ার পর বেলজিয়ামের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের দুই অংশ। প্রথম অংশে বলা হইয়াছে যে, ন্যায়সঙ্গত সময়ের মধ্যে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি (ফ্রাঙ্কো সরকারের পতন) না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ প্রতিকারের জন্য যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন। বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অংশ সম্বন্ধে ভোট দেন নাই। প্রস্তাবের দ্বিতীয় অংশে স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থা ন্যায়সঙ্গত সময়ের মধ্যে উন্নতি না হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সংঘের সদস্যগণ মাদ্রিদ হইতে তাঁহাদের দূতদিগকে প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দিবেন। বৃটেন প্রস্তাবের এই অংশ সমর্থন করেন, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোট দেয় নাই। রাজদূত প্রত্যাবর্ত্তনের আদেশ দেওয়ার মধ্যে কোন গুরুত্ব নাই। কারণ উহা ফ্রাঙ্কো-শাসিত স্পেনকে সতর্কীকরণ হিসাবে (by way warning) ব্যবহৃত হইবে না। বিভিন্ন প্রস্তাব, সুদীর্ঘ আলোচনা এবং বিপুল তর্ক-বিতর্কের পর গৃহীত প্রস্তাবের ফল এই দাঁড়াইল যে, অবসানের জন্য বৃটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছুই করিবেন না। ফ্রাঙ্কো-শাসনের অবসান হইলে স্পেনে আবার সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশঙ্কা দ্বারাই তাঁহাদের এই নীতি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। বৃটেন এবং আমেরিকা হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করিলে, অন্যান্য রাষ্ট্রের পক্ষে হস্তক্ষেপ করার নীতি গ্রহণ করা সম্ভব নয়।

ইঙ্গ-মিশর আলোচনা—

ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সংশোধন সম্পর্কে সিদকী-বেভিন খসড়া-প্রস্তাবের জের মিশরের প্রধান মন্ত্রী ইসমাইল সিদকী পাশার পদত্যাগ এবং সাদী দলের নেতা নোকরাশী পাশা কর্ত্তৃক সাদী দল ও উদারনৈতিক দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন পর্য্যন্ত আসিয়া গড়াইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত সমস্যা সমাধানের কোন পথ তাহাতে পাওয়া যায় নাই। ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সংশোধন আলোচনায় সুদানের প্রশ্নই প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। কায়রোতে এই চুক্তি সংশোধন আলোচনায় সুদানের প্রশ্ন লইয়াই অচল অবস্থার উদ্ভব হয় এবং এ সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিনের সঙ্গে আলোচনা করিবার জন্য মিশরের প্রধান মন্ত্রী ইসমাইল সিদকী পাশা গত অক্টোবর মাসের প্রথম ভাগে লণ্ডনে গিয়াছিলেন। সিদকী পাশা এবং মিঃ বেভিন উভয়ের মধ্যে আলোচনার ফলে অক্টোবর মাসের শেষভাগে একটি খসড়া চুক্তি-প্রস্তাব রচিত হয়। উহাই সিদকী-বেভিন খসড়া-প্রস্তাব আখ্যা লাভ করিয়াছে। অতঃপর সিদকী পাশা কায়রোতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ২৬শে অক্টোবর শনিবার রাত্রে রয়টারের প্রতিনিধির নিকট বলেন, "গত মাসে আমি বলিয়াছিলাম, সুদানকে আমি মিশরের মধ্যে লইয়া আসিব। এখন আমি জানাইতেছি যে, মিশরের রাজার অধীনে মিশর এবং সুদানের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।" তাঁহার এই উক্তি মিশরবাসীর মনে আশা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেও বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌দের মধ্যে সৃষ্টি করিয়াছিল গুরুতর চাঞ্চল্য। পার্লামেণ্টে উহা লইয়া আলোচনা হইল। বৃটিশ প্রধান-মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় ঘোষণা করিলেন যে, সিদকী পাশার উক্তি 'অসম্পূর্ণ এবং ভ্রান্তি সৃষ্টিকারক' (partial and misleading)। কমন্স সভাকে আশ্বাস দিয়া তিনি বলিলেন,—"সুদানের সহিত বৃটেন এবং মিশরের সম্পর্ক লইয়া কথাবার্ত্তা হইয়াছে বটে, কিন্তু সুদানের বর্ত্তমান অবস্থা এবং শাসন-ব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন পরিকল্পনা করা হয় নাই।"

কমন্স সভায় আলোচনার ফলে খসড়া-প্রস্তাবের স্বরূপ যখম কতকটা প্রকাশ হইয়া পড়িল, তখন মিশরে দেখা দিল অসন্তোষ। তাহারই অভিব্যক্তি দেখা দিল ছাত্র-মহলের প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে। সিদকী পাশা মন্ত্রিসভার পদত্যাগ এবং খসড়া প্রস্তাব অগ্রাহ্য করাই হইল তাঁহাদের দাবী। এদিকে সিদকী পাশাও চুক্তি-সংশোধন প্রতিনিধি দল ভিঙাইয়া একেবারে মিশর পার্লামেণ্টেই খসড়া-প্রস্তাব পাশ করাইয়া লইতে চাহিলেন। ছাত্রদের বিক্ষোভও দৃঢ়হস্তে দমনের ব্যবস্থা হইল। কিন্তু চুক্তি-সংশোধন প্রতিনিধি দলের ১২ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন সদস্য খসড়া-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া ২৫শে নবেম্বর তাঁহাদের স্বাক্ষরিত এক বিবৃতি সংবাদপত্রে প্রকাশ করায় খসড়া-প্রস্তাবের স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িল। খসড়া-প্রস্তাবের দুইটি বিষয়ই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ—(১) মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ এবং (২) সুদান। উক্ত সাত জন প্রতিনিধি বলিয়াছেন, মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্য অপসারণ করিতে তিন বৎসর লাগিবে, বৃটিশ প্রতিনিধি দলের এই দাবী মিশর প্রতিনিধি দল সর্ব্বসম্মতিক্রমে মানিয়া লইয়াছেন, ইহা সত্য নহে; কারণ আরও কম সময়ে অর্থাৎ ১২ মাসের মধ্যেই সমস্ত সৈন্য অপসারণ করা সম্ভব। পার্শ্ববর্ত্তী দেশে যুদ্ধাশঙ্কা দেখা দিলে নিরাপত্তা পরিষদ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা না করা পর্য্যন্ত বৃটেন এবং মিশর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিবেন, খসড়া-প্রস্তাবের এই সর্ত্তে তাঁহারা সম্মত হইতে পারেন নাই,

কারণ, ইহাতে মিশর পুনরায় বৃটেনের সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা আছে। সুদান সম্পর্কে তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সিদকী পাশার নূতন প্রস্তাবে সুদানকে পৃথক্ হইবার সুযোগ দেওয়া হইয়াছে এবং সুদানের সম্ভাব্য স্বাতন্ত্র্য মিশরবাসীর দ্বারা এখনই স্বীকার করাইয়া লইবার চেষ্টা উহাতে দেখা যায়।

সাত জন সদস্য খসড়া-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করায় রাজা ফারুক প্রতিনিধি দল ভাঙ্গিয়া দিয়া গবর্ণমেণ্টকেই আলোচনা চালাইবার নির্দ্দেশ দিলেন। মিশরের চেম্বার অব ডেপুটিজ সিদকী পাশার প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করিয়া এবং বৃটেনের সহিত পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিয়া প্রস্তাবও গৃহীত হইল। কিন্তু ইতিমধ্যে ঘটিল আর এক ফ্যাসাদ। সুদানের গবর্ণর জেনারেল এক বিবৃতিতে জানাইলেন যে, বৃটেন সুদানীদের মনোমত গবর্ণমেণ্ট গঠনের কার্য্যে তাহাদিগকে প্রস্তুত করিয়া তুলিবার কার্য্য করিয়া যাইবে। ইহাতে সিদকী পাশা ঘোরতর অসন্তুষ্ট হইয়া প্রধান মন্ত্রীর পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার অসন্তুষ্ট হওয়ার কারণ উপলব্ধি করা কঠিন নয়। ১৯৩৬ সালের ইঙ্গ-মিশর চুক্তিতে সুদানের উপর বৃটেন এবং মিশর উভয়েরই যৌথ নিয়ন্ত্রণ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে। এই দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে, সুদানের গভর্ণর জেনারেল বৃটেন এবং মিশর উভয়েরই অধীন। অথচ তিনি বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের হুকুম মত সুদান সম্পর্কে একটা বিবৃতি দিয়া ফেলিলেন, মিশর গবর্ণমেণ্টকে একবার জিজ্ঞাসা করাও প্রয়োজন মনে করিলেন না, ইহাতে সিদকী পাশার রাগ হইবার তো কথা বটেই। সুদানের উপর এই ইঙ্গ-মিশর যৌথ নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার নাম 'কন্‌ডোমিনিয়াম্' (condominium)। কার্য্যতঃ উহা নলচে আড়াল দিয়া তামাক খাওয়ার মতই বৃটিশ-শাসন ছাড়া আর কিছুই নহে। মিশরবাসীরা কোন দিনই এই কন্‌ডোমিনিয়াম ব্যবস্থা পছন্দ করে নাই। কারণ, মিশরের একমাত্র অধিকার এই যে, সুদানে বৃটিশ পতাকার সঙ্গে মিশরীয় পতাকাও উড়িয়া থাকে। সুদানের রক্ষা-ব্যবস্থা এবং শাসন পরিচালনের জন্তও মিশর অর্থব্যয় অবশ্য করিয়াছে। ইহা যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কত বড় একটা সুবিধা তাহা মিঃ এটলী এবং মিঃ চার্চ্চিল উভয়েই বেশ ভাল করিয়া জানেন। তাই সুদানকে স্বায়ত্ত-শাসন দিবার নামে সুদানবাসীর মনে মিশর-বিদ্বেষ সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সুদানে বৃটিশ-শাসনই বজায় রাখিতে চাহেন। সুদানের প্রশ্ন লইয়া ইঙ্গ-মিশর আলোচনায় যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহার পরিণাম অনুমান করা কঠিন। শান্তিপূর্ণ উপায়ে মীমাংসা না হইলে মিশরের সশস্ত্র বিদ্রোহ হয়ত উপেক্ষার বিষয় না-ও হইতে পারে। মিশরের বৃটিশ-বিরোধী মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘ সশস্ত্র বিদ্রোহের আবেদন জানাইয়া ছাত্র ও শ্রমিকদের মধ্যে গোপন ইস্তাহার প্রচার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণ—

২৭শে নবেম্বর আলেকজান্দ্রিয়া এবং কায়রো বৃটিশ সৈন্তদের পক্ষে নিষিদ্ধ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার রাজকীয় নৌবাহিনীর ঘাঁটি হইতে তিন-চারি জন লোক ছাড়া সমগ্র বৃটিশ নৌবাহিনীকে সরাইয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণ-কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় ধরিয়া লওয়া যায়। মিশরে সর্ব্বপ্রথম বৃটিশ সৈন্ত উপস্থিত হয় ১৮৮২ সালে। অতঃপর ১৯২২ সালে মিশরের স্বাধীনতা ঘোষণা না হওয়া পর্য্যন্ত মিশর ছিল বৃটিশের আশ্রিত রাজ্য। গত ৭ই মে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশর হইতে বৃটিশ সৈন্ত অপসারণের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

ইহুদী-সমস্যা ও প্যালেষ্টাইন—

সুইজারল্যাণ্ডের বাস্‌ল (Basle) সহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব 'ইহুদী' কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি ডক্টর উয়েজম্যান তাঁহার অভিভাষণে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদের জাতীয় রাষ্ট্রগঠনের দাবী করিয়াছেন। তিনি হার্ব্বার্ট মরিসনের প্রস্তাবিত স্বায়ত্ত-শাসিত যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। প্যালেষ্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেটারী ক্ষমতা পরিত্যাগের পূর্ব্বে ইহুদীদের জাতীয় আবাসকে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত করিয়া দেওয়া বৃটেনের কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার দাবী। বৃটেন, এমন কি বৃটেন আমেরিকা উভয়ে মিলিয়াও তাঁহার এই দাবী পূরণ করিতে পারিবে কি? পারিলেও তাহা সঙ্গত কি? মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে ইহুদীদের যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে আমরা তাহা অবশ্যই উপলব্ধি করিতেছি। হিটলারের পতন হইলেও তাঁহার প্রচারিত ইহুদী-বিদ্বেষ মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে পূর্ণ মাত্রায়ই বর্ত্তমান রহিয়াছে। প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে তদন্তের জন্ত গঠিত ইঙ্গ-মার্কিণ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে স্বীকার করিয়াছেন যে, উদ্বাস্তু ইহুদীরা তাহাদের সম্পত্তি পুনরায় পাইবার চেষ্টা করিবার ফলে বিদ্বেষ সৃষ্টি হইতেছে এবং মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে ইহুদী-বিদ্বেষ অধিকতর বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই অবস্থার জন্ত ইহুদীরা বিশ্ববাসী সকলেরই সহানুভূতি পাইবার যোগ্য। কিন্তু প্রতিকারের যথার্থ পথ প্যালেষ্টাইন নয়।

দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে প্যালেষ্টাইন ইহুদীদের পৈতৃক বাসভূমি ছিল বটে। কিন্তু গত দুই হাজার বৎসর ধরিয়া উহা আরবদের জাতীয় আবাস। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বৃটেন প্যালেষ্টাইনকে ইহুদীদের জাতীয় আবাসে পরিণত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিরোধের সৃষ্টি করিয়াছে। গত ২০ বৎসরে প্যালেষ্টাইনে ইহুদীর সংখ্যা ৮০ হাজার হইতে ৫ লক্ষে পরিণত হইয়াছে। ইউরোপ হইতে আরও ৫ লক্ষ ইহুদী চলিয়া আসিতে চায়। প্যালেষ্টাইন জনবিরল দেশ নয়। আরবদের ক্ষতি ও অসুবিধা না করিয়া আর সেখানে ইহুদী প্রেরণ করা সম্ভব নয়। আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ-আফ্রিকায় ৫ লক্ষ কেন, উহার পাঁচ গুণ ইহুদীর বাসস্থানের সংস্থান করা সম্ভব। কিন্তু বৃটেন ও আমেরিকা সে দিকে দৃষ্টি দিতেছে না। ইঙ্গ-মার্কিণ কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া বৃটেন অবিলম্বে এক লক্ষ ইহুদী প্যালেষ্টাইনে পাঠাইতে রাজী না হওয়ায় এক দল ইহুদী প্যালেষ্টাইনে সন্ত্রাসবাদ সৃষ্টি করিয়াছে। আরব নেতারা ইহুদীদের সহিত সম্মেলনে মিলিত হইয়া আলোচনা করিতে রাজী নহেন। এই সঙ্কটপূর্ণ অবস্থাকে প্যালেষ্টাইনে বৃটেনের অধিকার রক্ষার উপায়স্বরূপ ব্যবহৃত হইতেছে।

ফ্রান্স ও ইন্দোচীন—

ইন্দোচীনে কি হইতেছে, সে সম্বন্ধে কোন বিস্তৃত বা স্পষ্ট সংবাদ আমরা পাইতেছি না। কিছু দিন পূর্ব্বে 'ভিয়েটনাম রিপাবলিকে'র

সৈন্য এবং ফরাসী সৈন্যের মধ্যে সংঘর্ষের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ফরাসী গবর্ণমেন্ট শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দৃঢ়তা প্রদর্শন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আনামের সঙ্গে ফরাসী গবর্ণমেন্টের চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও কেন এই সংঘর্ষ? ফ্রান্সের দিক হইতে প্রকাশিত সংবাদে আনামের ভিয়েটনাম্ রিপাবলিকের উপরই দোষ দেওয়া হইয়াছে। এই জন্যই আশঙ্কা হয়, চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের মনোভাবের পরিবর্ত্তন হয় নাই। শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে আনামে ফরাসী সাম্রাজ্যকেই তাঁহারা সুদৃঢ় করিতে চান। ভিয়েটনাম রিপাবলিক সৈন্যের সহিত ফরাসী সৈন্যের এই সংঘর্ষেরও পূর্ব্বে নবেম্বর মাসের প্রথমে কম্বোডিয়ার রাজধানী প্নমকোনে একটা বিদ্রোহ ঘটিবার সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল। উহাকে ফরাসী-শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ইন্দোচীনব্যাপী অভ্যুত্থানের পূর্ব্ব-লক্ষণ বলিয়া তৎকালে অভিহিত করা হইয়াছিল। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন সংবাদই আর পাওয়া যায় নাই।

আজেরবাইজান—

১১ই ডিসেম্বরের সংবাদে প্রকাশ, ইরাণ গভর্ণমেন্টের সৈন্যবাহিনীর নিকট ইরাণের স্বায়ত্ত-শাসিত প্রদেশ আজেরবাইজানের রাজধানী তাব্রিজ আত্মসমর্পণ করিয়াছে। এই ঘটনার মধ্যে শুধু ইরাণের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতিরই পরিচয় পাওয়া যায় না, আন্তর্জাতিক শক্তি-সংঘর্ষও উহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে। আজের-বাইজানের সহিত কেন্দ্রীয় ইরাণ গবর্ণমেন্টের একটা সন্তোষজনক মীমাংসা হইয়া গিয়াছে বলিয়াই সকলের মনে হইয়াছিল। ইরাণের প্রধান মন্ত্রী মঃ গভাম এস্ সুলতানে 'তুদে' দলের সাহায্যেই তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী দক্ষিণপন্থী প্রধান মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে পারিয়াছিলেন এবং আজেরবাইজানকে স্বায়ত্ত-শাসন প্রদান করার মধ্যে তাঁহার বামপন্থী মনোভাবেরও পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তৈল সম্পর্কে রাশিয়ার সহিত চুক্তি করিতেও তিনি রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ এমন কি ঘটিল? আপাত দৃষ্টিতে দেখা যায়, আসন্ন সাধারণ নির্ব্বাচন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যেই আজের-বাইজানে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করা হয়। কিন্তু মঃ সুলতানের নিজের ভাষায় উহার আসল উদ্দেশ্য আজেরবাইজানে মঃ পিশেভারীর 'গুণ্ডাশাসনে'র (gansoter regime) অবসান করা। কিন্তু ইহার জন্য হঠাৎ তিনি উদ্যোগী হন নাই। কয়েক মাস পূর্ব্বে ইরাণের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ফার প্রদেশের (Furs) কোয়াশকাই উপজাতিরা বিদ্রোহ করিয়াছিল। এখানে বহু তৈলখনি আছে। এংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানীর স্বার্থ এই বিদ্রোহের ফলে ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল। মঃ সুলতানে ফার প্রদেশের উপজাতিদের সহিত আপোষ করিয়া বৃটিশের তৈল-স্বার্থ রক্ষা করেন এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার গবর্ণমেন্ট বৃটেনের সমর্থন বজায় রাখিতে সমর্থ হয়।

আজেরবাইজান যখন স্বায়ত্ত-শাসন দাবী করিয়াছিল তখন তাহার পিছনে রাশিয়া আছে বলিয়া চারি দিকে রব উঠিয়াছিল। কিন্তু মঃ সুলতানের বর্ত্তমান নীতির পিছনে ইঙ্গ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রভাবের কথা কাহাকেও বলিতে শোনা যায় না। তেহরাণের 'বাশার' পত্রিকার এক সংবাদে প্রকাশ, ২২শে নবেম্বর হইতে মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ ইরাণ সৈন্যবাহিনীর হাতে ৪ ইঞ্জিনযুক্ত ৪৪খানি বোমারু বিমান অর্পণ করিয়াছে। ওয়াশিংটনের পররাষ্ট্র দপ্তরের এক জন মুখপাত্র এই সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন। সত্য হইলেই স্বীকার করিবেন, ইহা প্রত্যাশা করা সম্ভব নয়। জাফর পিশেভারী ১১ই ডিসেম্বর তাব্রিজের বেতারে বলিয়াছেন, "ইরাণের প্রধান-মন্ত্রী গাভাম এস সুলতানে তাঁহার দেশকে আমেরিকার নিকট বিক্রয় করিয়া দিতেছেন।" তাঁহার এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর। কিন্তু অভিযোগ শুনিবার কেহ নাই।

বিশ্ব-বাণিজ্য ও নিয়োগ-সম্মেলন—

যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এ পর্য্যন্ত যে সকল আন্তর্জাতিক সম্মেলন হইয়াছে তন্মধ্যে বিলাতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও নিয়োগ-সম্মেলনের উদ্যোগ কমিটির প্রাথমিক অধিবেশনের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অর্থনৈতিক সামাজিক কাউন্সিলের উদ্যোগে ১৯টি জাতির প্রতিনিধি লইয়া এই সম্মেলন গঠিত হইয়াছে। বৃটেনউড চুক্তি অনুমোদন করায় ভারতও উহার এক জন সদস্য। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করিয়াছেন মিঃ আর, কে নেহরু। সানফ্রান্সিস্কো সনদে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সম্বন্ধে যে বিধান আছে তাহা কতকগুলি দেশের পক্ষে অনুকূল। এই অধিবেশনে আমেরিকা অবাধ বাণিজ্যের যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিল তাহা শুধু কয়েকটি বড় বড় শিল্পপ্রধান দেশের উপযোগী। ভারতীয় এবং চীনা প্রতিনিধিদের চেষ্টায় সমস্ত রকম রক্ষা-শুল্ক তুলিয়া দিবার প্রস্তাব অনেকখানি সংশোধন করা হইয়াছে। সনদে যে নূতন বিধানের প্রস্তাব করা হইয়াছে তাহাতে দুইটি প্রধান বিধি থাকিবে; (১) শিল্পোন্নয়নের জন্য যন্ত্রপাতি, মূলধন প্রভৃতি যে সকল দেশের প্রয়োজন সম্মেলনের সদস্যরা ঐ সকল বিষয় ঐ সকল দেশকে সাহায্য করিবে; (২) কতকগুলি ক্ষেত্রে শিল্পোন্নয়নের জন্য রক্ষা ব্যবস্থা প্রয়োজন আছে। সম্মেলনে পূর্ণ নিয়োগের (full employment) একটি নূতন সংজ্ঞাও গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ক্রমোন্নতিশীল জীবনযাত্রার মান রক্ষার উপযোগী মজুরির ব্যবস্থা না হইলে পূর্ণ নিয়োগের কোন অর্থই হইবে না। শিল্পে অনুন্নত দেশগুলিতেই পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ লোকের বাস। ইহাদের কল্যাণই শিল্প-বাণিজ্যের লক্ষ্য হওয়া উচিত। আগামী এপ্রিল মাসে উদ্যোগ কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন এবং পরে পূর্ণ সম্মেলনের অধিবেশন হইবে বলিয়া প্রকাশ। [১লা পৌষ, ১৩৫৩

লণ্ডন আলোচনার ব্যর্থতা

ভারতের স্বাধীনতাকামী কংগ্রেস বিপ্লব চালাইয়াছে অসহযোগ ও আত্মত্যাগ দ্বারা। নৈতিক বলে দীপ্ত, পাশবিক বলে নহে। তাই মন্ত্রী মিশনের স্বল্প-মেয়াদী প্রস্তাব তাঁহারা গ্রহণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু দীর্ঘ-মেয়াদী প্রস্তাবে ক্ষমতা হস্তান্তরকরণে কোনরূপ হাঙ্গামা হইবার সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা তাহা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য কতকগুলি সর্ত্ত সহিত। সত্যের পথে চলিয়া যে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যায়, পশুবলের দ্বারা তাহা কখনও সম্ভব নহে, সে অনন্ত চিরন্তন সত্যই তাঁহারা জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু সত্য-ন্যায়-ধর্ম্মের পূজারীর জয় অবশ্যম্ভাবী হইলেও অগ্রগতির পথে বাধা-বিঘ্ন অনেক। চৈতন্যকে দেশ ত্যাগ করিতে হইয়াছে, যীশুকে ক্রসে বিদ্ধ করা হইয়াছে। ইহাও জগতের নিয়ম। কংগ্রেসের সত্য ভারতের স্বাধীনতা, তাহার ন্যায় জগত-সভায় অন্যান্য জাতির সহিত ভারতীয়দের সমান আসন ও অধিকার, তাহার ধর্ম্ম মানবতার ধর্ম্ম। ইহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার পঙ্কিলতা নাই, দলাদলির ক্ষুদ্রতা নাই। তবু ঘরে-বাহিরে তাহার শত্রু। তাহার প্রমাণ আগষ্ট আন্দোলনে নিরস্ত্র মুক্তিকামী বীরদের উপর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর গুলীবর্ষণ—যাহাকে হত্যা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, এবং মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের অছিলায় হিন্দু এবং কংগ্রেসী দলের উপর অত্যাচার। লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা, ধর্ম্মান্তরকরণ, এমন কি শিশুহত্যা, নারীধর্ষণ কিছুই তাহারা বাদ দেয় নাই। ইহাকে পাশবিক অত্যাচারের চূড়ান্ত বলিলে বোধ হয় ভুল হইবে না। উভয় ক্ষেত্রেই দেখা গিয়াছে, আক্রমণকারীর বিবেক বলিয়া কিছুই নাই। বিবেক ধর্ম্মশূন্য ব্যক্তিকে প্রত্যেক জাতি ও ধর্ম্ম পশু বলিয়াই অভিহিত করেন।

আজিকার ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিতে হইলে ১৬ই মে'র পরিকল্পনার কয়েকটি প্রস্তাব উল্লেখ করিতে হয়। এইগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই এত গোলযোগ।

(১) Provinces should be free to form Groups with executives and legislatures and each group could determine the Provincial subjects to be taken in common.

(২) As soon as the new constitutional arrangements have come into operation it shall be open to any province to elect to come out of any group in which it has been placed. Such a decision shall be taken by the new legislature of the province after the first general election under the new constitution.

গ্রুপ হইল এইরূপ। (A) মাদ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যা ; (B) পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধু ; (C) বাঙ্গালা ও আসাম।

লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, মাছের ল্যাজা ও মুড়া ওরফে পাকিস্থানই হইল, কারণ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গালা মুসলিম-প্রধান প্রদেশ। তাহাদের সহিত জোর করিয়া হিন্দু-প্রধান এবং কংগ্রেসী মনোভাবাপন্ন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামকে জুড়িয়া দেওয়া হইল। কেবল মাত্র গ্রুপ (A) রহিল পাকিস্থান-বহির্ভূত। কিন্তু মিষ্টার জিন্না ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি পরিষ্কার পাকিস্থান চান। ঘুরাইয়া নাক ধরিবার পক্ষপাতী নহেন। তিনি বলিতে লাগিলেন—তাঁহার ন্যায্য দাবী পাকিস্থান। সরাসরি ভারত খণ্ডিত করিয়া তাঁহার হস্তে পাকিস্থান তুলিয়া না দেওয়া ঘোরতর অন্যায় হইয়াছে। কংগ্রেস যখন দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন, তখন তাঁহারা স্পষ্ট ভাবে জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনার প্রত্যেক দফার তাঁহারা যাহা ন্যায্য অর্থ হইবে তাহাই স্বীকার করিবেন। অর্থ, ভাষা, অথবা প্ল্যান বদলে তাঁহারা রাজী হইবেন না। মুসলিম লীগ দল বলিলেন যে, কংগ্রেস পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করেন নাই, অতএব এই পরিকল্পনা বাতিল করা হউক। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিলেন কংগ্রেসের প্রতি বিষোদ্গার এবং বৃটিশ প্রভুদের প্রতি গদগদ ভাব। জগতের চক্ষে কংগ্রেসকে হীন প্রতিপন্ন করিবার আপ্রাণ চেষ্টা চলিতে লাগিল। কূটরাজনীতিজ্ঞ টোরী দলের নেতা মিষ্টার চার্চ্চিল সোজাসুজি কিছু করিলেন না বটে, কিন্তু ভিতরে লীগ দলকে যথাসম্ভব সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এদিকে ১৬ই জুন মন্ত্রী-মিশন পুনরায় ঘোষণা করিলেন যে, পাকিস্থান প্রস্তাব কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। যখন বেশীর ভাগ ভারতীয় ইহার বিরুদ্ধে তখন ইহা কোনরূপেই ন্যায্য দাবী হইতে পারে না। মিষ্টার জিন্না পূর্ব্ব হইতেই রাগে ফুলিতেছিলেন, এইবার ফাটিয়া পড়িলেন। ক্রমাগত লর্ড ওয়াভেল ও মিষ্টার চার্চ্চিলের সহিত পত্র-বিনিময় চলিতে লাগিল। ২৯শে জুলাই বোম্বাই সহরে লীগের বৈঠকে স্থির হইল যে, পাকিস্থান দাবী মানিয়া না লইলে লীগ গণ-পরিষদ বর্জ্জন করিবে এবং অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগ দিবে না। মিষ্টার জিন্না ভাবিয়াছিলেন, এই হুমকীতে ভীত হইয়া কংগ্রেস আর অগ্রসর হইবে না। কিন্তু কংগ্রেস লীগ কেন, বৃটিশ সরকারকেও ভয় করেন না। কংগ্রেসসেবীরা সমগ্র জীবন কাটাইয়াছেন বৃটিশ অত্যাচারের মধ্য দিয়া। আত্মত্যাগ করিয়াছেন, আত্মবলি দিয়াছেন, কিন্তু নতি-স্বীকার করেন নাই। নির্ভীক চিত্তে তাঁহারা গন্তব্যপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

কংগ্রেস অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত নেহরুকে সরকার গঠন করিতে আহ্বান করিলেন। তাহার প্রতিবাদস্বরূপ মুসলিম লীগের ১৬ই আগষ্টের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলিতে চাহি

না। ঘৃণায় লেখনী বন্ধ হইয়া যায়। তবে এইটুকু বলা প্রয়োজন যে, এই সংগ্রামের পিছনে রক্ত চিত ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নখর ও দন্ত। লীগ-সৃষ্ট এবং টোরী-পুষ্ট এই সংগ্রাম পৃথিবীর ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

কংগ্রেস অন্তর্বর্তী সভা গঠন করিয়া ২রা সেপ্টেম্বর কার্যাভার গ্রহণ করিলেন। প্রতিবাদকল্পে সমগ্র বাঙ্গালা জুড়িয়া লীগের পৈশাচিক লীলা চলিতে থাকিল। বাঙ্গালা লীগ দাঙ্গর মস্ত আশ্রয়, লীগ সচিবমণ্ডলী ইহার কর্ণধার। গভর্ণর বাহ্যতঃ পরোক্ষে তাহাদেরই পক্ষে। সুতরাং অবস্থা হইল চূড়ান্ত। বড়লাট ইচ্ছা করিলেই হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন কিন্তু করিলেন না। কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। লীগকে হাতে রাখিতে হইবে। তিরস্কার পুরস্কারে রূপান্তরিত হইল। লীগ দলকে খে সামোদ করিয়া অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে রাজী করাইলেন। লীগ দল গণ-পরিষদ স্বীকার না করিয়া অন্তর্বর্তী সরকারে প্রবেশ করিল। কি করিয়া তাহা সম্ভব হইল আমরা তাহা বুঝি না। মন্ত্রী মিশনের ঘোষণা অনুসারে যাঁহারা দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবেন, তাঁহারাই স্বল্প-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিতে পারিবেন। মুসলিম লীগ যদি অন্তর্বর্তী সরকারে আদৌ প্রবেশ না করিত তাহা হইলে স্বতন্ত্র কথা ছিল, কিন্তু তাহারা যখন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়াছে অর্থাৎ বর্জ্জন করে নাই, তখন তাহারা গণ-পরিষদেও যোগ দিয়াছে বলিয়া আইনতঃ ধরিয়া লইতে হইবে: একটি গ্রহণ করিলে অপরটি বর্জ্জন করা সম্ভব নয়। গণ-পরিষদ গ্রহণে আপত্তি সত্ত্বেও বড়লাট কি করিয়া লীগকে অন্তর্বর্তী সরকারে গ্রহণ করিলেন, তাহা বুঝিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। মহানুভবতার জন্য কংগ্রেস আপত্তি করেন নাই, বরং তিন জন সদস্যকে সরাইয়া স্থান করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু বড়লাট এবং বৃটিশ সরকারের নিকট হইতেও কিছু পরিমাণ সরলতা আমরা আশা করিয়াছিলাম। সরাসরি বে-আইনী কার্য্য করিবেন এতটা আমরা ভাবি নাই।

এদিকে গণ-পরিষদ বৈঠকের দিন আগাইয়া আসিল। কংগ্রেস সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিলেন যে, ৯ই ডিসেম্বরই সভা আরম্ভ হইবে। কোন শক্তি, কোন বাধাই ইহার অন্যথা করিতে পারিবে না। মিষ্টার জিন্না আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন সভার তারিখ পিছাইয়া দিবার। মিষ্টার চার্চিল ও লর্ড ওয়াভেলের শরণাপন্ন হইলেন সেই উদ্দেশ্যে। বড়লাট মিষ্টার জিন্নাকে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন, উত্তরে মিষ্টার জিন্না লিখিলেন যে, কংগ্রেস মন্ত্রী মিশনের ১৬ই মে'র বিবৃতি স্বীকার করিয়া লয় নাই। অতএব কংগ্রেসের নূতন পরিকল্পনার কোন ন্যায্য স্থান নাই।

২৩শে অক্টোবর মহাত্মাজী এক ঘোষণায় বলেন,—"গণ-পরিষদের ভিত্তি হইল রাষ্ট্রীয় সনদ। সেই সনদে পাকিস্থানকে জিয়াইয়া রাখা হইয়াছে। ইহা গ্রুপ কৌশলের সুপারিশ করিয়াছে। এই গ্রুপ সম্বন্ধে কংগ্রেসের এক ব্যাখ্যা, লীগের এক ব্যাখ্যা এবং মন্ত্রী মিশনের এক ব্যাখ্যা। কোন আইন-রচনাকারীরই তাঁহার নিজ আইনের ব্যাখ্যা দিবার কর্তৃত্ব নাই। ব্যাখ্যা লইয়া কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইলে শাসনতন্ত্র অনুযায়ী গঠিত যে কোন আদালতই তাহার বিচার করিবে।"

এই ঘোষণার উল্লেখ করিয়া মিষ্টার জিন্না লিখেন যে, ১৬ই মে'র বিবৃতিতে উক্ত নথির ব্যাখ্যা করিবার জন্য কোন আদালত গঠনের প্রস্তাব নাই। লীগ আপনার ব্যাখ্যাই স্বীকার করিবে। কংগ্রেস যখন তাহার পূর্ব্ব-নীতি ত্যাগ করিতে চায় না, তখন তাহাদের সঙ্গে আলোচনায় কোন লাভ নাই। আজ বিহারে ও অন্যান্য স্থানে মুসলমানদের যে ভাবে হত্যা করা হইতেছে তাহা কংগ্রেসের অক্ষমতার জন্যই।...শেষ করিয়াছেন এই লিখিয়া—"আমার মতে আপনার উচিত, অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য গণ-পরিষদ স্থগিত রাখা।"

আশ্চর্য্য এই যে, বাঙ্গালায় লীগ-অনুষ্ঠিত নারকীয় লীলার কোন উল্লেখই নাই। অবশ্য মিষ্টার জিন্নার নিকট আমরা ইহার অধিক কিছু আশা করিতে পারি না। লর্ড ওয়াভেল তলে তলে চেষ্টা করিতে লাগিলেন গণ-পরিষদ স্থগিত রাখিবার। কিন্তু কংগ্রেস নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হইতে থাকিল নির্দ্দিষ্ট পথে। স্বরাষ্ট্র-সদস্য সর্দ্দার প্যাটেল ঘোষণা করিলেন—৯ই ডিসেম্বরই গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইবে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ব্যাখ্যার গণ্ডগোলের সুযোগ লইয়া তাঁহারা বৃটিশ সরকারের শরণ লইলেন। বৃটিশ সরকার বিতর্কের সমাধানের জন্য মিষ্টার জিন্না ও পণ্ডিত নেহরু এবং সর্দ্দার বলদেব সিংকে বিলাতে আমন্ত্রণ করিলেন। অবশ্য লর্ড ওয়াভেল সহ। যদি গোলমালে কোনক্রমে গণ-পরিষদ স্থগিত রাখা যায়।

কোন্ কোন্ প্রদেশ লইয়া প্রদেশ-মণ্ডল গঠিত হইবে তাহা স্থির করিবার সময় মন্ত্রী মিশন বিভিন্ন প্রদেশের মতামত লওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। মুসলিম লীগকে তুষ্ট করিবার জন্য তাহাদের কথাই মানিয়া লইয়াছিলেন এবং যে সমস্ত প্রদেশ মুসলিম লীগের মতাবলম্বী নহে, তাহাদিগকেও গায়ের জোরে বি ও সি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই সঙ্গে আবার ইহাও বলিয়াছেন—"Nor can we see any justification for including within a sovereign Pakistan those districts of the Punjab and of Bengal and Assam in which the population is predominantly non-Muslim." তাহা হইলে আমাদের ইহাই ধরিয়া লইতে হয় যে, প্রদেশ-মণ্ডল গঠনের নীতি অযৌক্তিক জানিয়াও বৃটিশ মন্ত্রী মিশন কার্য্যকালে মুসলীম লীগকে তুষ্ট করাই শ্রেয়ঃ বোধ করিলেন। কাজেই এ কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, ভারতে বর্ত্তমানে যে মতভেদ ও গণ্ডগোল দেখা যাইতেছে, তাহার মূল বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব ও তাঁহাদের মুসলিম লীগ তোষণের চেষ্টার মধ্যেই নিহিত। কংগ্রেসের অপরাধ এই যে, কংগ্রেস মুসলিম লীগের অন্যায় আবদার ও বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের পক্ষপাতদুষ্ট ব্যবস্থা মানিয়া লইতে রাজী হন নাই। বৃটিশ মন্ত্রী মিশনের ১৬ই মে'র মূল ঘোষণা ও ২৫শে মে'র সেই ঘোষণার অংশ-বিশেষের ব্যাখ্যা লইয়াই গোল বাধিয়াছে। এই ঘোষণার ১৫ ধারা, যাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে এবং যাহাকে সমগ্র পরিকল্পনার ভিত্তি বলা হইয়াছে, তাহার কোন রদ-বদল করিতে গণ-পরিষদ পর্য্যন্ত সক্ষম নহেন। ইহার উপর নির্ভর করিয়াই কংগ্রেস ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনায় প্রদেশগুলিকে যে তিনটি মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে, তাহাতে যোগদান করা অথবা না করা সম্পূর্ণরূপে প্রদেশের উপর নির্ভর করে এবং যে কোন প্রদেশ

গণ-পরিষদের অধিবেশনের প্রথমেই আপনাদের সে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া মণ্ডলীভুক্ত হইতে অস্বীকার করিতে পারে। মন্ত্রী মিশন ২৫শে মে'র মূল ঘোষণার ১১ ধারার উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন (যাহার উল্লেখ পূর্ব্বে করা হইয়াছে) যে, যে প্রদেশকে যে মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন সে প্রদেশকে আপাততঃ সেই মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হইতেই হইবে। কংগ্রেস ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে ঘোষণার ১৫ ধারা যখন পূর্ব্ববর্ত্তী ও প্রধানতর, তখন সেই নির্দ্দেশই চূড়ান্ত এবং তাহার উপরই নির্ভর করিয়া ১১ ধারার অর্থ করিতে হইবে। ১৫ ধারায় স্পষ্ট রহিয়াছে—"Provinces should be free to form groups." অর্থাৎ প্রদেশের ইচ্ছা মণ্ডলীভুক্ত হওয়া। ইহাতে বাধ্যতামূলক কিছুই নাই। বিলাতে গোল টেবিলে কংগ্রেসের মতবাদ স্বীকৃত হইল না। ব্যাখ্যা মুসলিম লীগের অনুকূল হইল। "ফ্রী" কথাটার নূতন অর্থ তাহারা আবিষ্কার করিলেন—"বাধ্য!"

এই বিতর্কের মীমাংসার জন্য কংগ্রেস বিষয়টিকে ফেডারাল কোর্টে পাঠাইতে রাজী আছেন কিন্তু লীগ তাহাতে রাজী নহেন। তাঁহারা কেবল বৃটিশ প্রভুদের শ্রীমুখ-নির্গত ব্যাখ্যাই গ্রাহ্য করিবেন। এত দিন তাঁহারা ব্যাখ্যা লইয়া এই মতভেদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব রহিলেন। ঠিক গণ-পরিষদ অধিবেশনের প্রারম্ভে তাঁহারা নূতন ব্যাখ্যা উপস্থিত করিলেন। উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। গণ-পরিষদের ও কংগ্রেসের কার্য্য-পথে বাধা সৃষ্টি। কেবল ব্যাখ্যাই নহে, এক্ষণে সেই ব্যাখ্যাকে মূল ঘোষণার অঙ্গীভূত করিয়া বৃটিশ সরকার উহার মৌলিক পরিবর্ত্তন ঘটাইলেন। কিন্তু কংগ্রেস ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য নহেন। দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা সুস্পষ্ট ভাষায় জানাইয়া দিয়াছিলেন যে, নিজ ব্যাখ্যার উপর নির্ভর করিয়াই তাঁহারা ইহা গ্রহণ করিতেছেন। তখন বৃটিশ সরকার আপত্তি করেন নাই। আজ লীগ-তোষণের জন্য তাঁহারা যে অপূর্ব্ব ব্যাখ্যা উপস্থিত করিয়াছেন এবং জোর করিয়া মূল ঘোষণার সহিত তাহাকে জুড়িয়া দিয়া কংগ্রেসের স্কন্ধে চাপাইতেছেন তাহা কপটতা এবং শঠতার চূড়ান্ত। এমন কি, আইনের চক্ষে পর্য্যন্ত তাহা অচল।

বিতর্কের শিক্ষা

কমন্স সভায় দুই দিবসব্যাপী বিতর্কের ফলে এক দিকে বৃটেনের শাসকগোষ্ঠীর বর্ত্তমান মনোভাব যেমন পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে, অন্য দিকে কোন্ খুঁটির জোরে মুসলিম লীগের ম্যাড়া এত দিন লড়িতেছে সে কথা বুঝিতেও কাহারও বাকি নাই। মিঃ চার্চ্চিল এবং রক্ষণশীল দলের অন্যান্য ঝুনা সাম্রাজ্যবাদীদের বক্তৃতা পাঠ করিবার পর ভারতের বর্ত্তমান সাম্প্রদায়িক অশান্তির সহিত টোরীগোষ্ঠীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। মিঃ চার্চ্চিল হইতে সুরু করিয়া সার জন এণ্ডারসন পর্য্যন্ত টোরীপুঙ্গবদের বক্তৃতায় এই কথাটাই প্রমাণ করিবার চেষ্টা হইয়াছে যে, কংগ্রেসকে প্রথমে মধ্যবর্ত্তী সরকার গঠনে আহ্বান করাই হইয়াছিল মারাত্মক ভুল। ইহার জন্যই যত অনর্থ, যত গণ্ডগোল। অতএব এই ভুলের পুনরাবৃত্তি করিয়া যদি লীগকে বাদ দিয়া কেবল কংগ্রেসকে লইয়া গণ-পরিষদের কাজ চালাইতে দেওয়া হয়, তবে ভারতে অনর্থের সীমা থাকিবে না। সেই জন্য চার্চ্চিল সাহেব ফতোয়া দিয়াছেন, বর্ত্তমানে যে গণ-পরিষদ বসিয়াছে তাহা অবৈধ. ভারতের মুসলমান এবং তপশীলী সম্প্রদায়ের দুঃখে রক্ষণশীলগোষ্ঠীর প্রাণ একেবারে আজ হু-হু শব্দে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তথাকথিত বর্ণহিন্দুদের উপর মনের সুখে মিঃ চার্চ্চিল যে ভাবে ঝাল ঝাড়িয়াছেন এবং তাহাদের "অত্যাচারের" হাত হইতে সংখ্যালঘুদের উদ্ধার আহ্বান জানাইয়া বাছা বাছা ইংরাজী বুলির তুবড়ি ছুটাইয়াছেন, তাহাতে মিঃ জিন্না প্রভৃতি কেরামতিতে আনন্দে গদগদ না হইয়া নিশ্চয় পারিবেন না। ঘনামধন্য সার জন এণ্ডারসনও সুদীর্ঘ বক্তৃতায় এই কথাই বুঝাইতেছেন, ভারতকে একেবারে ভাগা-ভাগি করিয়া ফেলা যুক্তিযুক্ত না হইলেও আধা পাকিস্থান অন্ততঃ না করিয়া উপায় থাকিবে না। অবশ্য মন্ত্রী মিশন মণ্ডলী গঠনের দ্বারা যে ভাবে আধা পাকিস্থান কায়েম করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে অসঙ্গতির কথা উল্লেখ করিতে তিনি ত্রুটি করেন নাই। পাঞ্জাবের সমস্যা ঘোরাল হইলেও শিখদের হয়ত কিঞ্চিৎ সুবিধা দিয়া পাকিস্থানের পিঁজরাপোলে তাহাদের পুরিয়া রাখা যাইবে, কিন্তু আসাম এবং পশ্চিম-বঙ্গের হিন্দুদের লইয়া সমস্যাটা যে একটু বিশেষ রকম জটিল হইয়া আছে তাহাও এণ্ডারসন সাহেব স্বীকার না করিয়া পারেন নাই। ভারতকে একেবারে বিভক্ত করিতে সম্মত না হওয়ার অর্থ এমন কিছু দুর্ব্বোধ্য নয়—সামরিক দিক্ হইতেই বৃটেনের পক্ষে তাহা প্রয়োজন। কিন্তু যদি সত্যই কখনও ভারত ত্যাগ করিতে হয়, তবে অন্ততঃ পক্ষে যাহাতে ধড়টি গেলেও ল্যাজা ও মুড়াটুকু হাতের মুঠায় থাকিতে পারে সেই উদ্দেশ্যে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব্ব সীমান্তে আধা পাকিস্থান বলপূর্ব্বক কায়েম করিবার জন্য এই ব্যস্ততা। চার্চ্চিল-এণ্ডারসন-বাটলার প্রভৃতি রক্ষণশীল নেতাদের বক্তব্যের ভিতর দিয়া বৃটেনের ঝুনা শাসকদের মনের কথা একেবারে পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। সাম্রাজ্যের পুরাতন জমিদারীর মায়া এখনও কাটাইয়া উঠিতে তাঁহারা পারেন নাই, পুরাতন প্রথায় মাতব্বরী ও মোড়লী করিবার অভ্যাস ত্যাগ করিতেও তাঁহারা নারাজ। সময় যে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এই সহজ সত্য কিছুতেই তাঁহারা বুঝিবেন না। অজীর্ণ রোগীর যেমন হজম করিবার শক্তি না থাকিলেও খাইবার ইচ্ছা প্রবল থাকে, টোরী-দলেরও তেমনি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যরক্ষা করিবার মত ক্ষমতা না থাকিলেও সাম্রাজ্য-গ্রাসের লালসা পূর্ব্বের ন্যায়ই তীব্র।

আপাত দৃষ্টিতে বৃটিশ শ্রমিক-দলের সহিত রক্ষণশীল দলের নেতাদের বক্তৃতার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন, তাহাতে সন্দেহ নাই। জানাইতেও অনেকে কসুর করেন নাই। দুঃখের মধ্যে, এই দুই দলের পার্থক্য যত গভীর বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক, আসলে উহা তত গভীর নয়। সাম্রাজ্যবাদী ভেদ নীতি চালাইতে টোরীদের অপেক্ষা এই শ্রমিক-কর্ত্তারা কম নিপুণ, আজ তাহাও মনে করিবার হেতু নাই। সার ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন, ভারতের বিভিন্ন দলের মধ্যে সমতা রক্ষা করিবার নীতিই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন। আসলে ইহা যে একেবারেই সত্য নয়, তাহা আমরা ভাল করিয়াই জানি। এ ক্ষেত্রে কেবল একটা কথা উল্লেখ করাই সম্ভবতঃ যথেষ্ট। মন্ত্রী মিশনের ঘোষণার নূতন ব্যাখ্যা করিতে গিয়া শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন, কোন

অংশের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহাদের স্কন্ধে কোন শাসনতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। এই কথার ব্যাখ্যা করিয়া ক্রিপস সাহেব বলিয়াছেন, মুসলিম লীগ যদি গণ-পরিষদে যোগ না দেয়, তবে দেশের যে-সকল অংশে তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সে সকল অংশে গণ-পরিষদ-প্রণীত শাসন খাটিবে না। কিন্তু এই একই নীতির অনুসরণ করিয়া আসাম যদি "সি" বিভাগ হইতে বাহির হইয়া আসে তবে অবস্থা কি দাঁড়াইবে, সে সম্বন্ধে ইঁহারা সম্পূর্ণ নীরব কেন? আসল কথা, সমতা রক্ষার নামে শ্রমিক দলের কর্তারাও যতটুকু সম্ভব লীগের দিকে টলিয়াছেন এবং সব সময় তাঁহারা নিজেদের কোলে ঝোল টানিবার চেষ্টাই করিয়াছেন। টোরী গোষ্ঠীর বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁহারা যে গণ-পরিষদের প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন, তাহার সহিত উদারতার সম্পর্ক নাই। ইহার কারণ মিঃ কোঁড ব্যক্ত করিয়াছেন: "The fact of the matter is that we Britain can not hold India by power." অর্থাৎ জোর করিয়া ভারতবর্ষকে হাতে রাখিবার ক্ষমতা আমাদের নাই। টোরী দলের ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন গোঁয়ার-গোবিন্দের দল এ কথা বুঝিয়া থাকুন বা না থাকুন, শ্রমিক দলের কর্তৃপক্ষ ইহা ভাল করিয়াই জানেন। তাই তাঁহারা সোজাসুজি বলপ্রয়োগের টোরী-নীতি ত্যাগ করিয়া ল্যাজে খেলিবার শ্রমিক-নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। সোজাসুজি গণ-পরিষদকে অগ্রাহ্য না করিয়া এমন সব সর্ত্ত আরোপ করিয়াছেন, যাহাতে গণ-পরিষদ-প্রণীত শাসনতন্ত্র প্রয়োজন মত অস্বীকার করিবার পথ বেশ প্রশস্তই থাকিবে। দেশীয় রাজ্য এবং 'বি' ও 'সি' বিভাগকে পৃথক্ থাকিবার অধিকার দিয়া কার্য্যত: তাহারা টোরী দলের মনস্কামনা পূর্ণ করিতেই চলিয়াছেন।

ভারতের স্বাধীনতা লাভের ব্যাপারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সদিচ্ছার আশায় বসিয়া থাকিলে স্বাধীনতা আমাদের ভাগ্যে কোন দিন যে ঘটিবে না, কমন্স সভার বিতর্কের পর এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। গণ-পরিষদে যে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে, তাহাকে কার্য্যকরী করিতে পারে একমাত্র ভারতীয় জনসাধারণের বাহুবল। এই জনসাধারণ সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া প্রয়োজনের সময় গণ-পরিষদে প্রণীত শাসনতন্ত্রকে কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইবে কি না, তাহার উপরই বস্তুত: গণ-পরিষদের সাফল্য বা অসাফল্য নির্ভর করিবে। দুই দিন পূর্ব্বেই হউক বা দুই দিন পরেই হউক, শেষ এবং চরম শক্তি পরীক্ষা অবশ্যম্ভাবী। গণ-পরিষদে স্বাধীন ভারতের সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্র সম্বন্ধে প্রস্তাব আনিবার সময় এই কথা স্মরণ রাখিয়াই সম্ভবত: পণ্ডিত জওহরলাল বলিয়াছেন, "কোন জিনিষের আইনগত দিক্ যাহাই হউক না কেন, এমন অনেক সময় আসে যখন আইনের উপর তত নির্ভর করা যায় না—বিশেষ করিয়া যখন স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ কোন জাতির সমস্যা লইয়া বিবেচনা করিতে হয়। আমাদের দীর্ঘ দিন স্বাধীনতা-সংগ্রামে অতিবাহিত হইয়াছে। আমরা মৃত্যুর দুর্গম পথ বহু বার ঘুরিয়া আসিয়াছি—প্রয়োজন হইলে আবার যাইব।" ভবিষ্যতের এই প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আজ আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে।

কংগ্রেস অধিবেশন

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে মিরাট নগরে স্বাধীনতার বিপ্লব সংগ্রাম সিপাই বিদ্রোহ হয়। ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে সেই মিরাটে কংগ্রেসের ৫৪তম অধিবেশন হইল। এই অধিবেশন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সরকারের নিষেধাজ্ঞার দরুণ দীর্ঘ ৬ বৎসর কংগ্রেসের কোন অধিবেশন হয় নাই। ১৯৪০ খৃষ্টাব্দের রামগড় কংগ্রেসের পর এই অধিবেশন। মহাত্মা গান্ধী এই অধিবেশনে অনুপস্থিত ছিলেন। আচার্য্য কৃপালনী কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণ সংক্ষেপ এবং সংযমের পরিচায়ক। যুক্তির সারবত্তা, স্পষ্টবাদিতা এবং নির্ভীকতাপূর্ণ। বর্ত্তমান ভারতের প্রকৃত অবস্থা, তাহার বিশ্লেষণ এবং স্বাধীনতা-সংগ্রামের ভবিষ্যৎ নীতি এবং কার্য্য-প্রণালী নির্দ্দেশ দিয়াছেন তিনি অত্যন্ত ধীর স্পষ্ট ভাবে। তাঁহার এই অভিভাষণ ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "আগষ্ট আন্দোলনের ফলেই কংগ্রেস আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভূত ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। আমরা এখনও স্বাধীনতা পাই নাই বটে, কিন্তু তাহা আমাদের দৃষ্টিপথে আসিয়াছে। এখনও জাতিকে অনেক বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে।" মুসলিম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের সহিত হাত মিলাইয়া যে বাধা সৃষ্টি করিয়াছে তাহারই উল্লেখ করিয়া তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতের আভ্যন্তরীণ প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে যোগ দিয়া অধিকতর সক্রিয় হইয়া উঠিতেছে। উদ্দেশ্য কংগ্রেসের শক্তিকে চূর্ণ করিয়া ভারতের পরাধীনতা সুদীর্ঘ করা। তিনি ইহার বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন নির্ভীক চিত্তে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়াই এক মাত্র পথ বলিয়া মত-প্রকাশ করেন। তিনি আশা করেন, "গণতন্ত্র ও জাতীয়তার সমাধির উপর সাম্প্রদায়িকতার সহিত যাহাতে আপোষ মীমাংসা না করিতে হয় সে দিকে আমাদের প্রবীণ ও বহুদর্শী রাজনৈতিকগণ সজাগ থাকিবেন এবং দেশবাসীকে জাতীয় কল্যাণের পথে পরিচালিত করিবেন।" লীগের পৈশাচিক তাণ্ডব প্রসঙ্গে বলেন,—"যাহারা ব্যাপক ধর্ম্মান্তরিতকরণ, বলপূর্ব্বক বিবাহ প্রভৃতির স্বপক্ষে প্রচারকার্য্য করিতেছে, তাহারা আগুন লইয়া খেলা করিতেছে। মুসলমান মোল্লাগণ এই নৃশংস অত্যাচার ও বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিতকরণে সহায়তা করিয়াছে। কেহ হয়ত' মনে করিয়া থাকেন যে, মানুষের জীবনহানিই সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ। কিন্তু সম্মানী লোকদের পক্ষে পিস্তলের গুলীর ভয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করিতে বাধ্য হওয়াই সব চেয়ে বড় বিপদ। যদি বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তরিত সকল ব্যক্তিকে এবং অপহৃতা ও বলপূর্ব্বক বিবাহিতা সকল নারীকে হত্যা করা হইত তাহা হইলেও আমার মতে পশুদলের নিকট তাহাদের আত্মসমর্পণের অপেক্ষা তাহা কম শোচনীয় ব্যাপার হইত।"

বিহারে দাঙ্গার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন—"পূর্ব্ববঙ্গে যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালান হইয়াছিল, বলপূর্ব্বক ধর্ম্মান্তর, নারী-হরণাদি পাপানুষ্ঠানে প্রেরণা দেওয়া হইয়াছিল, বিহারে তাহারই প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মুসলিম লীগের এই ভ্রান্ত নীতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন—"যদি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ

অঞ্চলে কোন হিন্দুর জীবন, ধন-সম্পত্তি ও সম্মান নিরাপদ না হয়, তাহা হইলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাতেও মুসলমানের জীবন ও ধন-সম্পত্তি নিরাপদ থাকিবে না।" মুসলিম লীগের এখনও সতর্ক হইবার সুযোগ রহিয়াছে।

কংগ্রেসের লক্ষ্য সম্পর্কে তিনি বলিয়াছেন, যে পর্য্যন্ত না গণতান্ত্রিক নীতি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করে, যে পর্য্যন্ত না বর্ত্তমানের মত গুরুতর সামাজিক বৈষম্য দূর হয়, সে পর্য্যন্ত জনসাধারণের পক্ষে স্বরাজ বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে না। এ জাতীয় সামাজিক সংস্থায় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সমান সুযোগ এবং প্রত্যেক নাগরিকের আত্মবিকাশের উপযোগী পরিপূর্ণ সুবিধা থাকিবে। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার এবং গণ-পরিষদ সম্পর্কিত আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—"আজ কংগ্রেস রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বহনের জন্য ভারতের জনসাধারণকে সংগঠিত করিয়াছে। আমাদের দেশবাসীরা বহু বৎসর যাবৎ বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারী শাসনের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সংগ্রামে কংগ্রেস কর্ত্তৃক সংগঠিত ও পরিচালিত হইয়াছে। এরূপও হইতে পারে যে, কংগ্রেস একটা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পরিবর্ত্তে পুনরায় স্বাধীনতা-সংগ্রাম আরম্ভ করিতে পারে।...কংগ্রেস কেবল জাতির সেবার জন্য ভারতের জনগণকে সংঘবদ্ধ করিবার প্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে সম্পাদনের জন্য ঐক্য ও শৃঙ্খলা অত্যাবশ্যক।"

কংগ্রেসের কার্য্যকরী

২৮শে নভেম্বর কংগ্রেসের সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী, কংগ্রেসের নব কার্য্যকরী সমিতি নিম্নলিখিত ১৪ জন সদস্য লইয়া গঠন করিয়াছেন।

(১) মৌলানা আবুল কালাম আজাদ (২) পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু (৩) সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল (৪) শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু (৫) ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ (৬) শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু (৭) খাঁন আবদুল গফুর খাঁন (৮) শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী (৯) শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও (১০) শ্রীমতী কমলা দেবী (১১) মিষ্টার রফি আমেদ কিদোয়াই (১২) শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ (১৩) সর্দ্দার প্রতাপ সিংহ (১৪) আচার্য্য যুগলকিশোর।

শ্রীযুক্ত শঙ্কররাও দেও ও আচার্য্য যুগলকিশোর সাধারণ যুগ্ম-সম্পাদক এবং সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল কোষাধ্যক্ষ হইবেন।

গণ-পরিষদের অধিবেশন

নির্দ্দিষ্ট দিনে, ৯ই ডিসেম্বর যথারীতি গণ-পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইল। প্রথম দিনের অধিবেশন বসিল অস্থায়ী সভাপতি ডাক্তার সচ্চিদানন্দ সিংহের সভাপতিত্বে। পরে স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন ডাক্তার রাজেন্দ্রপ্রসাদ। লীগ-সদস্যেরা গণ-পরিষদে যোগদান করেন নাই। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন—"আমি অবগত আছি যে, এই গণ-পরিষদের জন্ম হইতেই কতকগুলি বাধা-নিষেধ দেখা দিয়াছে। পরিষদে আলোচনা প্রসঙ্গে এবং কোন বিষয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে আমরা ঐ সমস্ত বাধা নিষেধ ভুলিতে, উপেক্ষা করিতে বা উড়াইয়া দিতে পারি না। আমি ইহাও অবগত আছি যে, এই সমস্ত বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও পরিষদ একটি স্বতন্ত্র শাসনও আত্মনিয়ন্ত্রণশীল স্বাধীন প্রতিষ্ঠান এবং এই পরিষদের সিদ্ধান্তের বাহিরের কেহ পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতে পারিবে না।" মুসলিম লীগের অনুপস্থিতি সম্পর্কে তিনি আশা করেন যে, শীঘ্রই হয়ত তাঁহারা আসন গ্রহণ করিবেন এবং দেশবাসীর জন্য শাসন রচনার গুরু দায়িত্ব অংশ গ্রহণ করিবেন। তাঁহার বক্তৃতার মধ্যে যে সংযম ও চিন্তাশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সত্যই প্রশংসনীয়। পরিশেষে তিনি বলেন যে, এখন এমন একটি শাসনতন্ত্র রচিত হইতে যাইতেছে যাহাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাতে পর্য্যবসিত হইবে এবং তাহার ফলে প্রত্যেকেই এই বিরাট দেশের অধিবাসী বলিয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিবেন। মণ্ডলী গঠনের বিতর্ক সম্পর্কে তিনি বলেন যে, মীমাংসার জন্য ফেডারাল কোর্টে গেলেও ভিন্ন ফল হইবে না। কোন জাতির রাজনৈতিক ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের অধিকার আদালতের থাকিতে পারে না। একমাত্র জনগণই ভাগ্য নির্দ্ধারণের অধিকারী। আসাম মণ্ডলী গঠন করিলে অথবা মীমাংসার জন্য ফেডারাল কোর্টে যাইলে নারাজ। মহাত্মাজী স্বয়ং বলিয়াছেন—মণ্ডলী গঠনের চেষ্টা হইলে গণ-পরিষদ ত্যাগ করিবে। বাঙ্গালা আসামের উপর কোন ভাবে প্রভুত্ব করিবে, এইরূপ প্রস্তাব করা অসঙ্গত।

গণ-পরিষদের উদ্দেশ্য ঘোষণা সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু নিম্নলিখিত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন:—

এই গণ-পরিষদ ভারতবর্ষকে স্বাধীন সার্ব্বভৌম সাধারণতন্ত্ররূপে ঘোষণা করিবার দৃঢ়সঙ্কল্প প্রকাশ করিতেছেন। এই পরিষদ বৃটিশ ভারত, দেশীয় রাজ্য, বৃটিশ ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের বহির্ভূত অপরাপর অঞ্চল এবং অন্যান্য যে সকল অঞ্চল স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতে অন্তর্ভুক্ত হইতে ইচ্ছুক, তাহাদের লইয়া একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের সঙ্কল্প ঘোষণা করিতেছে।

ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল সমূহ তাহাদের বর্ত্তমান সীমানা সহ অথবা গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত সীমানা সহ অথবা শাসনতন্ত্র-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত সীমানা সহ আত্মকর্ত্তৃত্বশীল অঞ্চল হইবে। উহারা অসংরক্ষিত ক্ষমতার অধিকারী হইবে এবং যুক্তরাষ্ট্রের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হইলে স্বতঃবশতঃই যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য তাহাতে গিয়া বর্ত্তে, সেই সকল ক্ষমতা ব্যতীত অন্যান্য শাসনক্ষমতার অধিকারী হইবে।

স্বাধীন সার্ব্বভৌম ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র, ঐ যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে এবং শাসনযন্ত্রের সমুদয় মূলাধার হইতেছে জনসাধারণ। ঐ যুক্তরাষ্ট্র ও উহার বিভিন্ন অংশে ভারতের জনগণের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সামাজিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার, সমান মর্য্যাদা, সমান সুযোগ ও আইনের চক্ষে সমান ব্যবহার পাইবার অধিকার থাকিবে। বাক্য, ধর্ম্ম, বৃত্তি, উপাসনা, সঙ্ঘ গঠনের স্বাধীনতাও তাহাদের থাকিবে। সংখ্যালঘু, অনুন্নত ও উপজাতি অঞ্চল এবং অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা থাকিবে। ভারতীয় সাধারণতন্ত্রের ভূখণ্ড অখণ্ড থাকিবে এবং সভ্য জাতির আইন-কানুন অনুসারে জল, স্থল ও অন্তরীক্ষে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সার্ব্বভৌম অধিকার থাকিবে। এই প্রাচীন দেশ বিশ্বের দরবারে তাহা ন্যায্য আসন লাভ করিবে এবং বিশ্বশান্তি ও মানব-কল্যাণ সাধনে ব্রতী হইবে।

গণ-পরিষদের উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া মহাত্মা বলেন যে, দেশের

জটিলতাপূর্ণ সমস্যা সমূহ সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতি যাহাতে সুবিচার হয়, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই পণ্ডিত জওহরলাল প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়াছেন। তিনি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত যে, ঐ প্রস্তাব সম্পর্কে অপরে যেরূপ সমালোচনা বা যেরূপ মতই প্রকাশ করুক না কেন, জওহরলালজী ঐ প্রস্তাবে দৃঢ় থাকিবেন।

গণ-পরিষদের অবস্থা আজ অত্যন্ত জটিল। শেষ অবধি কি হইবে বলা কঠিন। সুতরাং এখন এমন কোন মন্তব্য করা উচিত হইবে না, যাহাতে আবহাওয়া দুষ্ট হইয়া সমস্যা-সমাধানের পথে বিপত্তি ঘটে।

—

জওহরলালজীর ভাষণ

বড়লাট লর্ড ওয়েভেল বর্ত্তমানে বিলাতে আছেন বলিয়াই বোধ হয় চিরাচরিত নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের সহকারী সভাপতি হিসাবে পণ্ডিত নেহরু বণিক্ সমিতি-সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইউরোপীয় এবং ভারতীয়দের মধ্যে যে বিপুল ব্যবধান থাকার কথা পণ্ডিত নেহরু তাঁহার অভিভাষণে উল্লেখ করিয়াছেন, বণিক সমিতি-সঙ্ঘের বার্ষিক সভায় বক্তৃতা দিবার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যবধান সামান্যমাত্র হ্রাস হইয়াছে বলিয়া আমরা মনে করি না। পণ্ডিত নেহরু বক্তৃতা করিবেন বলিয়া ভারতীয় সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা এই সভায় উপস্থিত থাকিতে আগ্রহান্বিত হইবেন ইহা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিই এই সভায় প্রবেশ-অধিকার পান নাই। 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রিকা পাইয়াছিলেন এবং আর না কি নিউজ এজেন্সীরা পাইয়াছিলেন। বণিক সমিতি-সঙ্ঘ ইউরোপীয় বণিকদের প্রতিষ্ঠান। তাঁহারা ভারতীয়দের সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন, ইহা তাহার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় সমস্যা সম্বন্ধেই বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিবেন, ভারতীয় সমস্যার দিক হইতে সমস্ত বিষয় দেখিবেন, ইহা খুবই স্বাভাবিক। ভারতবর্ষ বহু দিন তাহার সমস্যা সমাধান করিবার সুযোগ পায় নাই। আজ অতিক্রত তাহাকে সমস্ত সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শ ও মতবাদের মধ্যে বিরোধ চলিতেছে, ভারতেও অনুরূপ বিরোধ থাকার কথা পণ্ডিতজী উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতে এই বিরোধ যে সাম্প্রদায়িক সমস্যার জন্য আরও জটিলতর আকার ধারণ করিয়াছে এবং এই সাম্প্রদায়িক সমস্যা যে বৃটিশ স্বার্থরক্ষার জন্য সৃষ্টি করা হইয়াছে, পণ্ডিতজী তাহাও উল্লেখ করিতে পারিতেন।

পণ্ডিতজী শীঘ্রই নূতন স্বাধীন ভারত গঠিত হওয়ার কথা আশা করিয়াছেন। নূতন স্বাধীন ভারত গঠনের যে প্রচেষ্টা গণ-পরিষদের অধিবেশনে চলিতেছে, তাহা অতিক্রত অগ্রসর হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। পণ্ডিতজীও তাঁহার বক্তৃতায় বিলম্ব হওয়ার বিপদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ কি রূপ গ্রহণ করিবে, তাহা কেহই বলিতে পারে না। নূতন-শক্তির অভ্যুদয় হইয়া ভারতে বিপুল পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করিতে পারে, পণ্ডিতজীর এই আশা আমরা [illegible] বলিয়া মনে করি না। কিন্তু স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজও দ্রুত অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। যাঁহারা দ্রুত অগ্রসর হইতে চান না, তাঁহাদের মধ্যে ইউরোপীয় বণিক-সমাজ অন্যতম। পণ্ডিতজীর বক্তৃতা তাঁহাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিবে কি-না, তাহা অনুমান করা বোধ হয় খুব কঠিন নয়। কিন্তু বিলম্ব করার পরিণাম যে ভাল হইতে পারে না, তাহা ইউরোপীয় বণিকদিগকে তিনি শুনাইয়া দিয়া ভালই করিয়াছেন। বণিক সমিতি-সঙ্ঘের সভাপতির বক্তৃতায় মুদ্রাস্ফীতি, নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এবং ধর্ম্মঘট সম্পর্কে যাহা উল্লেখ করা হইয়াছে, পণ্ডিতজী তাঁহার বক্তৃতায় ভারতীয় দিক হইতেই এই সকল বিষয়ের উত্তর দিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের কথাই আজ বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা প্রয়োজন এবং পণ্ডিতজীও এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত ভাবেই আলোচনা করিয়াছেন—শুধু আন্দোলনকারীদের প্ররোচনাতেই শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করে না। দেশের কি অবস্থা, দেশে কি ঘটিতেছে, ধর্ম্মঘট তাহার একটি সুন্দর চিত্র প্রদান করে, পণ্ডিতজীর এই উক্তি খুবই সত্য। আমাদের সমাজ-ব্যবস্থায়, আমাদের শিল্প-বাণিজ্য কোন না কোন স্থানে ত্রুটি রহিয়াছে। বহুসংখ্যক ধর্ম্মঘট ঐ সকল ত্রুটির প্রতিই অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করে। শ্রমিক ইউনিয়নের মধ্য দিয়া শ্রমিকদের সহিত কাজ-কারবার করার প্রয়োজনীয়তার কথা পণ্ডিতজী যাহা বলিয়াছেন, তাহা মানিয়া চলিলে ধর্ম্মঘট এড়ান বোধ হয় অনেক সহজ হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা যেমন তিনি স্বীকার করিয়াছেন, ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে শিল্প-বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিচালনের যথেষ্ট স্থল আছে বলিয়াও তাঁহার বিশ্বাস। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানা সত্ত্বে যদি শিল্প-বাণিজ্য ব্যবস্থা পরিচালিত হয়, তাহা হইলে শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হইবে কিরূপে, তাহাদের বস্তী-অঞ্চলে বাস করিবার দুর্ভোগই বা কিরূপে দূর হইবে? ভারতের ভাবী শিল্প-বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধে কংগ্রেসের কি আদর্শ, পণ্ডিতজীর এই বক্তৃতায় তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়।

পণ্ডিতজী যথার্থই বলিয়াছেন, ভারতে শিল্পপতি নাই, ভারতে আছে শুধু মূলধন সরবরাহকারী। ভারত শিল্পান্বিত হয় নাই, এ-বিষয়ে সকলেই একমত। ভারতকে শিল্পান্বিত করিবার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জ্জনের পথে প্রধান বাধা বৃটিশ বণিকদের স্বার্থ। বৃটেনের ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সহিত রাজনীতি কিরূপ মিশিয়া রহিয়াছে, পণ্ডিতজী বাঙ্গালার কথা উল্লেখ করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। বাঙ্গালার আইন-সভায় ইউরোপীয় প্রতিনিধি রহিয়াছেন। ইউরোপীয়দের সংখ্যার তুলনায় তাঁহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা বেশী। বাঙ্গালার রাজনীতিতে এই সুযোগে তাঁহারা প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন। মন্ত্রিমণ্ডলী ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে তাঁহাদের যথেষ্ট হাত আছে। এই সকল কথা ইউরোপীয় বণিকদের কাছে শ্রুতিসুখকর হইবে না নিশ্চয়ই। বৃটিশ রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা অন্ততঃ শ্রমিক দলভুক্ত রাষ্ট্রনীতিবিদ্‌রা মুখে বলিতেছেন, ভারতবাসী সকলে মিলিয়া শাসনতন্ত্র রচনা করিলে তাহা তাঁহারা মানিয়া লইবেন। সকল ভারতবাসী একমত হইয়া

যাহাতে শাসনতন্ত্র রচনা করিতে না পারে, তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন ইউরোপীয় বণিকরা ভারতে তাঁহাদের অর্থনৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য।

মার্কিণে ভারতীয় দূত

অন্তর্ব্বর্তী সরকারের রেল বিভাগের সদস্য মিষ্টার আসফ আলি ওয়াশিংটনে ভারতের দূত নিযুক্ত হইয়াছেন। ইহাকে অন্তর্ব্বর্তী সরকারের বিশিষ্ট কার্য্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। অন্তর্ব্বর্তী সরকার অবশিষ্ট যে দুইটি রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিবেন বলিয়া মনে করা যায়, তাহা মস্কো ও চুংকিংএর জন্য। যথাসম্ভব শীঘ্র এই নিয়োগের ব্যবস্থা হইবে। মিষ্টার আসফ আলি সম্ভবতঃ জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে আমেরিকা যাইবেন।

বাঙ্গালার সচিবসঙ্ঘ

মুসলিম লীগ-কর্ণধার মিষ্টার জিন্নার কৃপা-কটাক্ষের জোরে বাঙ্গালা সচিবসঙ্ঘের অন্যতম সচিব মিষ্টার যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল অন্তর্ব্বর্তী সরকারের সদস্য পদে বাহাল হইলেন। বাঙ্গালার গভর্ণর এক জনের স্থান ৪ জন দিয়া পূর্ণ করিলেন! মণ্ডল মহাশয় সত্যই মহাশয় ব্যক্তি। নিশ্চয়ই তাঁহার একার ওজন ৪ জনের সমান! অথবা ইহার পিছনেও লীগ-তোষণ নীতি আছে। এই ফাঁকে লীগ সচিবসঙ্ঘের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। রাজনৈতিক কূট-নীতি মাত্রা ছাড়াইয়া গেলেই ইহার পরিচায়ক হইয়া উঠে। নব নিয়োজিত সচিব-চতুষ্টয়—(১) মিষ্টার ফজলুর রহমান (মুসলমান) (২) মিষ্টার দ্বারকানাথ বারুরী (তপশীলী) (৩) মিষ্টার নগেন্দ্রনাথ রায় (তপশীলী) (৪) মিষ্টার তারকনাথ মুখোপাধ্যায় (?)। শেষোক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-সন্তান বলিয়াই আমাদের ধারণা ছিল। লীগ দলে জুটিলেন কি করিয়া? এ সম্পর্কে কোন মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

'কাব্যলোক'

কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজের বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত কাব্যশাস্ত্রের মৌলিকতত্ত্ব সমূহের বিচার সম্বন্ধীয় গ্রন্থ 'কাব্যলোক' রচনা করিয়া কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিকট হইতে পি, এচ, ডি উপাধি দ্বারা সম্মানিত হইয়াছেন। ভারত-বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ গ্রন্থটিকে 'unique work' বলিয়া মর্য্যাদা দিয়াছেন। 'কাব্যলোক' গ্রন্থটি ইংরেজীতেও অনূদিত হইতেছে।

হেমেন্দ্রনাথ গুহরায়

স্বদেশী যুগের কর্ম্মী শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহরায় মোটরের ধাক্কায় আহত হইয়া গত ৩রা নভেম্বর ১৯৪৬, রাত্রি ১১টায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

তিনি বরিশালের স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্তের নিকট শিক্ষালাভ করেন ও তৎকালীন চরমপন্থী নেতা বিপিনচন্দ্র পাল ও বি, চক্রবর্ত্তীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস গঠনের সময় তিনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সহিত যোগদান করেন। দেশবন্ধু দাশ যখন কলিকাতা কর্পোরেশনের ভার লন তখন তিনি হেমেন্দ্র বাবুকে কর্পোরেশনের প্রধান হিসাব-পরীক্ষকের পদে নিয়োগ করেন। স্বদেশী যুগে দেশের সেবায় তিনি নিজের সকল শক্তি নিয়োজিত করিয়া রত হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, চারি পুত্র ও এক কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। আমরা তাঁহার পরিবারবর্গের এই গভীর শোকে আন্তরিক সহানুভূতি জানাইতেছি। ঈশ্বর তাঁহার মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন।

সত্যনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

গত ২৭শে নভেম্বর, কলিকাতার অবসরপ্রাপ্ত এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনার রায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ পুত্র, কলিকাতা ডিটেকটিভ বিভাগের ইনস্পেক্টার, ও অধুনা কলিকাতা বেলেঘাটা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত সত্যনিরঞ্জন মুখোপাধ্যায় এম-এ মাত্র ৩১ বৎসর বয়সে অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

সত্যনিরঞ্জন বাবুর শিশুসুলভ সারল্য, চরিত্র-মাধুর্য্য ও লোক-

রঞ্জনের ক্ষমতা তাঁহাকে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত সকলেরই প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল। পুলিশ বিভাগে এরূপ অজাত-শত্রু লোক এ কালে বিরল।

কলিকাতায় গত নরমেধযজ্ঞের সময় পল্লীর নিরাপত্তা রক্ষা ও পল্লীবাসীদিগকে বহু প্রকার আসন্ন বিপদের মুখ হইতে রক্ষা করিতে তিনি সর্ব্ব সময় অগ্রণী ও চেষ্টিত ছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি দুইটি শিশু পুত্র, পত্নী, বৃদ্ধ পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগিনী ও বহু আত্মীয়-স্বজন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

—নেতাজী

সঙ্গৎ

—অশোক মুখোপাধ্যায়

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৫শ বর্ষ, পৌষ, ১৩৫৩] [দ্বিতীয় খণ্ড, তৃতীয় সংখ্যা

গীতা বলিলেন, স্বধর্ম্মে নিধনও ভাল, পরধর্ম্ম পাপ। ভারত সেই গভীর বাণী ভুলিয়া দেশকে য়ুরোপ করিয়া গড়িয়া তুলিতে চাহিল। আপন ধর্ম্মে আপনি থাকিয়া যদি মৃত্যুও হয়, তাহাতে আনে নব জন্ম, পরের পথে সিদ্ধির অপর নাম সিদ্ধ আত্মহত্যা। যদি নিজেদের সম্পূর্ণ য়ুরোপীয় করিয়া গড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি, আমাদের সহজাত বুদ্ধিশক্তি, আমাদের জাতির স্থিতিস্থাপকশক্তি, আমাদের আত্মশোধন, আত্মগঠন ও আত্ম-সংশোধনশক্তি চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইত।

…জাতির প্রাণবায়ু এখনও সচল। বাঙ্গালা ও পঞ্জাবের ধর্ম্ম আন্দোলন, মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, এবং বঙ্গের নব সাহিত্য এই প্রাণ-শক্তিরই পরিচয় দেয়। পরদেশী ভাব ও সভ্যতার পেষণে পড়িয়াও এখনও দেখিতেছি, ভারতের প্রাণ-শক্তি, ভারতের বিশিষ্ট প্রকৃতি আত্মরক্ষার চেষ্টা করিতেছে। যত দিন পর্য্যন্ত জাতির বুদ্ধি জাতীয় ধর্ম্মের অনুকূল না হইতেছে, তত দিন ভারতের মুক্তি নাই।

—শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

যুগপ্রবর্ত্তক শ্রীরামকৃষ্ণ

স্বামী ত্যাগীশ্বরানন্দ

আত্মবিস্মৃত জাতির আত্মচেতনার জন্য তার জাতীয় বিশিষ্টতাকে আশ্রয় ক'রে অপর ভাবগুলি পরিপুষ্ট হয়ে, জাতির প্রাণশক্তিকে আরো পুষ্ট ও শক্তিমান ক'রে দেয়। এই ধর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে জাতির নবচেতনার জন্য তার—রাষ্ট্রে ও সমাজে সত্যই জাগরণের সাড়া পড়েছে। ভারতের বিশিষ্ট চিন্তাশীল রাষ্ট্র-নেতাগণ চাচ্ছেন, জাতি আজ ধর্ম্মের বিভেদ ভুলে সবাই ভারতবাসী ব'লে পরিচয় দিবে এবং বহু মত ও পথকে এক ক'রে, একই উদ্দেশ্যসাধনে একমন-প্রাণে সবাই দেশমাতৃকার সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। আবার সমাজহিতৈষিগণ চাচ্ছেন, জাত্যভিমান ভুলে গিয়ে সবার ভিতর ব্রহ্মসত্তা নিহিত রয়েছে, এই ভেবে নারায়ণ জ্ঞানে অথবা বিরাট সমাজের অঙ্গরূপে—যাদের আমরা উপেক্ষায় দূরে রেখেছি—তাদের সেবার আয়োজন করতে। জাতির দুর্ব্বলতা দূর ক'রে দেশের ও সমাজের মঙ্গলার্থে আরো নানাবিধ অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন ক'রে সমাজ-জীবনকে আরো উন্নত ক'রে গ'ড়ে তোলবার জন্য অনেকে আজ স্বেচ্ছায় আত্মনিয়োগ করছেন—এ-ও সেই যুগ-প্রবর্ত্তকেরই শুভ নির্দ্দেশ।

জাতির আত্ম-চেতনা ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে সব দিকেই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনালব্ধ সত্যকে যিনি ভারতের সনাতন আদর্শ ব'লে ঘোষণা ক'রে জগতের সাম্‌নে ভারতের শান্তি, সত্য ও মৈত্রীর বাণী প্রচার করেছিলেন, সেই বীরকেশরী বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণের আদর্শটিকে জাতির সাম্‌নে আবার এমনি সুস্পষ্ট ক'রে ধরলেন—যাতে সেই আদর্শকে অবলম্বন ক'রে সমাজের সব দিকেই কল্যাণ হয়। তাঁর মহান্ ত্যাগ-তপস্যা-পূত জীবন ও বাণীই হ'ল—রামকৃষ্ণ-জীবনের প্রকৃত ভাষ্য। রামকৃষ্ণকে বুঝতে হ'লে বিবেকানন্দকে বাদ দিয়ে বুঝবার চেষ্টা করা ভুল হবে। বিবেকানন্দের জীবন রামকৃষ্ণের আদর্শে গঠিত, শ্রীরামকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদেই বিবেকানন্দের ভিতর তাঁরই পূর্ণ শক্তির বিকাশ হয়েছিল,—জগৎ-শিক্ষার জন্য। বিবেকানন্দের জীবনধারা ও বাণী দ্বারাই ভারতের মৃত প্রাণে নূতন জীবনের স্পন্দন এসে গেল, আজ তাঁর বাণীই নবীন ভারতের বেদ-বাণী। তিনি জাতির বিশিষ্ট ধর্ম্ম-ভাবটিকে জাগিয়ে দিয়ে, আপামর সাধারণকে মনুষ্যত্বের বেদী-মূলে আহ্বান করলেন, সেখানে ছোট বড় উন্নত অবনতের প্রশ্ন নেই—'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এই ছিল সেখানে বিচারের মাপকাঠি। মানুষের ভিতর আত্মসম্মান ও দেশাত্মবোধ জাগিয়ে দিয়ে, আত্মবিশ্বাসের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর জাতিকে জগতের সাম্‌নে মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াতে শিখালেন।

একটু চিন্তা করলেই দেখতে পাই, রামকৃষ্ণের সত্য আদর্শ আজ নবীন ভারতের সকল সমস্যার মীমাংসক ও জগতের শান্তিবিধায়ক।

আজ শুধু মনে হচ্ছে, স্বামীজীর সে বাণীটি—'এ জাত যেমন প'ড়ে গেছে—তেমনই আবার উঠবে'—আবার এ যুগ-মানবের পূত আদর্শ নিয়ে বিশ্বের দরবারে সগৌরবে আপন পরিচয় দিবে।

বর্ণ-বিদ্বেষ

(অপ্রকাশিত)

রসরাজ অমৃতলাল বসু

রেও ভাটের মেয়ে ওটা 'মেও' ব'লে নাম।
সে সব দেশের গন্ধ গায়ে অন্ধ যেথা কাম॥
জানে না ত গঙ্গাতীরে মরে ডরে অনঙ্গ মদন।
অতনু কি ধনু ধরো কেমন করে দেখাবে বদন॥
সিন্ধুপারের নিন্দুকেরা হিন্দুকে দেয় গাল।
সিন্দুক, বন্দুক দু'য়ের গর্ব্বে বেড়ে গেছে চাল॥
ইণ্ডিয়াতে সবাই লেডি সবাই জেণ্টলম্যান।
ষ্টেশনে ষ্টেশনে সাক্ষী তা'র পোর্সিল্যান প্যান।
লেডি-পাড়ার লেডি তাই ছোঁচা মেছোর মেয়ে।
অন্নের তরে অন্যের দোরে ভিক্ষে মাগে ধেয়ে॥
গতর খাটিয়ে পেট ভরাতো আজ হয়েছে অথর।
সাহিত্যের সেৎখানাতে ময়লা-ঘাঁটা মেথর॥
শোন্ রে মার্কিণ কর্ গে বার্কিং ফিলিপাইন ল্যাণ্ডে।
জ্ঞাতি-শত্তুর সাধছে মাত্তর স্বার্থ সেকেণ্ড হ্যাণ্ডে॥
যে বিবেকানন্দে বন্দে খুল্লো অন্ধ চোখের ঠুলি।
তা'র জননী তা'র ভগিনী শুনলে এই নাগিনীর বুলি॥
আদালতে নিত্যি যাদের পত্নী-ত্যাগের লড়াই।
তাদের ঘরের মেয়ে আসেন কর্ত্তে আজ বড়াই॥
আর ইংরেজকুলে চালাতে কালী পিল্চার পরিচয়।
মা-মাগী কি নাইক নিজের ইজের ঢাকার ভয়॥
দেমাকে তো নেমকহারাম কল্কেতার ভাত পেয়ে।
গেছ্লে অধঃপাতে উঠ্লে জাতে বুঝি নারী-নিন্দা গেয়ে॥
শেষে শুধাই ইংরাজ এ কি লাজ আজ তোমার বরাতে।
বড় উজ্জ্বল হচ্ছে রাজার মুকুট ঘষে মার্কিণ করাতে॥
দেখ্লে রূপী খোলো টুপি জানি লোফালুফি বাড়ে।
ভিক্টোরিয়াপুত এ আবার কি ভুত চাপ্লো তোমার ঘাড়ে॥
চৌরঙ্গীর বেঁড়ে সিঙ্গির খিঙ্গি লাফের জোরে।
লক্ষ্মীর পীড়েয় পা ঠেকাচ্ছে মাদী-কুত্তী দেখ্‌ছ ফুর্ত্তি ক'রে॥
পড়ে কার পাল্লায় যাচ্ছ গোল্লায় জানেন নারায়ণ
আর আল্লা।
কিন্তু ইণ্ডিয়া না পিণ্ডি দিলে হবে পণ্ড হুকুম হল্লা॥
জানো জুতোর ফিতেয় চুমো খেয়ে রাখ্‌তে নারীর মান।
একটি মেমের অঙ্গে আঁচ লাগ্‌লে নাও হাজার
লোকের জান॥
কাগজ ছাপিয়ে কেওরা-কাণ্ড কল্লে তোমার ভাই।
বিঁধ্‌লে লক্ষ লক্ষ্মীর বক্ষে শেল নীতির দে' দোহাই॥
তাতে হাই তুল্‌তে লাগ্‌ল ব্যথা খই-মাখানো গালে।
ডান-ভাইনী বেঁচে গেল আইন-বাজির চালে॥
নাইকো আইন কর আইন নইলে কর্ব্বে শেষে রিজাইন।
গডের কাছে যেম্নি তোমার মেয়ে তেম্নি জেনো মাইন॥
তোমার গির্জ্জে আছে বীর্য্য আছে আছে বিদ্যা-বুদ্ধি।
ছেড়ে চাম্‌ড়া নিয়ে কামড়া-কাম্‌ড়ি কর চিত্তশুদ্ধি॥

জয়পুর

চক্র —কালীপদ দাসগুপ্ত
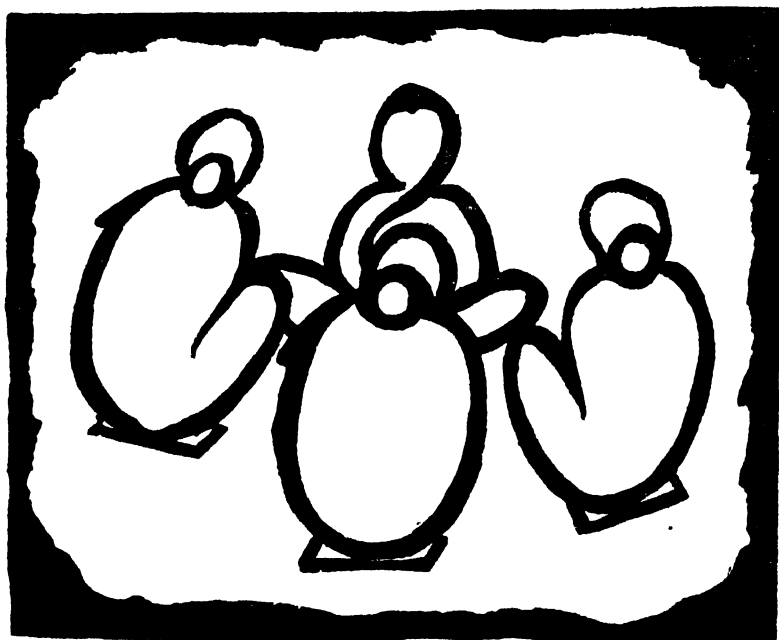
—শ্রীশৈল চক্রবর্তী

চোখে চোখে রাখি হায় রে

আজমীর

—গোপাল ঘোষ

বিচার-প্রহসন

শ্রীঅমিতাভ রায়

[পরিচয় :—বাংলার নির্ভীক বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত'র ফাঁসির সময় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা, বৃটিশ সরকারের পৈশাচিকতার জবাবে যেমন স্ব স্ব পদত্যাগ কোরে কিছু দিনের জন্ম বাংলার শাসনতন্ত্র অচল কোরে দিয়েছিলেন, বর্ত্তমানে বাংলার অবস্থা ঠিক সেই রকম হ'য়েছে। ভারতের পূর্ব্ব সীমান্ত দিয়ে দুর্দ্ধর্ষ আজাদ হিন্দ্ ফৌজ বিজয়ীর বেশে অগ্রসর হওয়ার ফলে বাংলার কৃতী সন্তানেরা, নানা প্রলোভন সত্ত্বেও বৃটিশ সরকারের দায়িত্বপূর্ণ, শাসনতন্ত্রের কার্য্যভার ত্যাগ করছেন! অচল শাসনতন্ত্রকে চালু করবার জন্ম বৃটিশ সরকার ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে বাংলায় অনেকগুলি সামরিক ও বেসামরিক শাসনকর্ত্তা আনিয়েছে! কিন্তু বঙ্গবাসীরা নির্দ্দয় শাসকদের ক্রুর চোখ-রাঙানীতে মোটেই ভীত না হ'য়ে আজাদ্ হিন্দ ফৌজের অভিযান-পথ বাধা-শূন্য ও বৃটিশ সমর-প্রচেষ্টা বিফল করবার জন্ম ধ্বংসমূলক কার্য্যের সাহায্যে বাংলাব্যাপী বিপ্লবের ভীষণ দাবাগ্নি জেলে দিয়েছে। বৃটিশ সরকার-নিযুক্ত শাসকরা বিচারের নামে বাংলাব্যাপী বিভীষিকার যে চরম পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে—তার পরিচয় দেবে বিচার-প্রহসন]

স্থান :—(বাংলার কোনো একটি জেলার সদর। কোর্টের দৃশ্য! বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত বিচারপতি আসীন! কোর্ট-ইন্সপেক্টর, পাব্লিক প্রসিকিউটর, উকিল প্রভৃতি দ্বারা বিচার-গৃহ পূর্ণ! আসামীর কাঠগড়া একটি কৃষক শ্রেণীর লোক দণ্ডায়মান কোর্ট-ইন্সপেক্টর বিচারপতিকে মামলা বুঝিয়ে দিচ্ছে।)

* * * * *

কো-ই। হুজুর, সম্প্রতি মাঝেরহাট গ্রামের নিকট যে ট্রেণ-দুর্ঘটনা ফলে দশ হাজার বৃটিশ সেনা নিহত হয়, এই আসামী সেই মাঝেরহাট গ্রামের মোড়ল! যে সব বিপ্লবীদের ধ্বংসমূলক কাজের ফলে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে, আমরা প্রমাণ পেয়েছি, এই আসামী সেই সব বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল ও প্রশ্রয় দিয়েছিল।

বিচারপতি। তোমার নাম কি?

আসামী। আইজ্ঞা, আল্লাবক্স।

বিচারপতি। দোষী না নির্দ্দোষী?

আসামী। আইজ্ঞা, মুই তো কিছুই জানি না। আমাগো গাঁ রেল লাইন থেকে ৫ কোশ দূরে!

বিচারপতি। কোনো কৈফয়েৎ শুনতে চাই না, দোষী না নির্দ্দোষী!

আল্লাবক্স। আইজ্ঞা;—

বিচারপতি। তোমার গ্রামের নিকট ট্রেণ-দুর্ঘটনা হওয়ায় অতগুলি সেনা নিহত হ'য়েছে—তাদের জীবনের জন্ম তুমিই দায়ী! এই দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তোমাদের গ্রাম থেকে এক মাসের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা পিটুনী কর তুলে দিতে হ'বে! না দিতে পারলে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

আল্লাবক্স। হুজুর মা-বাপ; দুর্ভিক্ষ, বন্যা, ও অনাবৃষ্টিতে আমাদের আশে পাশের ১০।১২খানা গ্রামের লোক এক বেলাও পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না। তাছাড়া, মড়কে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হ'য়ে চলেছে, টাকা দেব কোত্থেকে হুজুর!

বি: পতি। Demn your দুর্ভিক্ষ। টাকা না দিতে পারো, বাড়ী-ঘর-দোর বিক্রী কোরে সে টাকা তো উসুল করা হবেই, পরন্তু তোমায় জেলে গিয়ে পচে মরতে হবে!—যাও—Next—

আল্লাবক্স। হুজুর, গত ৬ মাস থেকে ফসল-টসল কিছু হয়নি—পোলাপান নিয়ে খামু কি হুজুর—

বি:-পতি। ছাই খাও, Get out—Next case নিরঞ্জনকুমার দাস!

(পুলিশের আল্লাবক্সকে নিয়ে প্রস্থান ও আসামীর বেশে ১০।১২ বছরের একটি বালকের প্রবেশ)

পুলিশ। নিরুনজুন আসামী—হাজির, হুজৌর!

কো: ই। হুজুর, মহামান্য বড়লাট বাহাদুর জনসাধারণকে প্রকাশ্য রাজপথে খানাতল্লাসী করবার জন্ম সাধারণ পুলিশকে যে বিশেষ

ক্ষমতা দিয়েছেন, এই ছোকরাটি, রাস্তায় পুলিশের সেই কাজে বাধা দিয়ে পুলিশকে মারপিট করেছিল।

বিচারপতি। তোমার নাম কি?

বালক। তোমার নাম কি!

কোঃ-ইঃ। এই বেয়াদপ—চুপ। হুজুরের কথার জবাব দে।

বালক। আমার যে ক্ষিদে পেয়েছে, কাল রাত থেকে ওরা আমায় কিছু খেতে দেয়নি, খালি মেরেছে, (কোর্টে হাসির রোল)

বিচারপতি। Order—order,—তোমার নাম কি?

বালক। নিরঞ্জনকুমার দাস।

বিচারপতি। তুমি পুলিশকে মেরেছ?

নিরঞ্জন। কোন্ পুলিশ? (পুনরায় কোর্টে হাসির রোল)

কোঃ-ইঃ। এই বেয়াদপ, হুজুরের কথার জবাব দে।

নিরঞ্জন। কে হুজুর?

কোঃ-ই। চুপ—দেখতে পাচ্ছিস্ না (প্রহার)।

নিরঞ্জন!—(ক্রন্দন-জড়িত স্বরে) দেখুন না—আমায় মারছে!

(কোর্টে মৃদু গুঞ্জন ও হাসির শব্দ)

বিঃ-পতি!—তুমি যদি আমার কথার ঠিক ঠিক জবাব দাও তো কেউ তোমায় মারবে না!

নিরঞ্জন!—(সক্রন্দনে) কিন্তু আমার যে ভয়ানক ক্ষিদে পেয়েছে।

বিচারপতি! আমার কথার ঠিক ভাবে জবাব দিলে এখুনি তুমি খেতে পাবে।

নিরঞ্জন। সত্যি! আমায় খেতে দেবেন, তবে বলুন।

বিচারপতি। তুমি পুলিশকে মেরেছিলে?

নিরঞ্জন। মারিনি তো কামড়ে দিয়েছি।

বিচারপতি। হঠাৎ কামড়ে দিলে কেন?

নিরঞ্জন। ওরা রাস্তার লোকগুলোকে ধরে ধরে তাদের পয়সা কেড়ে নিচ্ছিল যে!

বিচারপতি। ওরা রাস্তার লোকের পয়সা কেড়ে নিচ্ছিল তো তুমি কামড়ালে কেন?

নিরঞ্জন। বা রে, আমারও যে বায়স্কোপ দেখবার টাকা কেড়ে নিল।

বিচারপতি। তোমার টাকা কেড়ে নিল কেন?

নিরঞ্জন। তা আমি কি জানি? আমি ওখান দিয়ে যাচ্ছিলাম—আমায় বললে, 'এই ছোঁড়া শোন্'। কাছে যেতেই শক্ত শক্ত অনেক কথা বললে, তা' আমার কিছু মনে নেই। তার পর বললে, 'চল্, তোকে থানায় ধরে নিয়ে যাই—তুই একটা বিচ্ছু বিপ্লবী।' আমি পালিয়ে আসবার চেষ্টা করছিলাম। তখন সে আমায় জোর করে ধরে বললে—'দেখি তোর পকেটে কি আছে' বলেই আমার পকেট থেকে টাকাটা বের করে নিতেই আমি তার হাতে কামড়ে দিই। তখন সে আমায় মারতে মারতে থানায় নিয়ে গেল। আমি কত বললুম, আমার টাকা দাও, আমার টাকা দাও, কিন্তু কেউ আমার কোনো কথাই শুনলে না।

বিচারপতি। তবু তোমার অন্যায়। তুমি মহামান্য সরকার বাহাদুরের কর্ম্মচারীর কাজে বাধা দিয়ে তাকে আঘাত করেছো, সেটাই তোমার মস্ত অপরাধ—ভয়ঙ্কর দোষ। সরকার বাহাদুরের—

নিরঞ্জন। কোন্ সরকার বাহাদুর, আমাদের আজাদ হিন্দ্ সরকার? বাঃ বাঃ, কি মজা, আজাদ হিন্দ্ সরকার এসে গেছে!

বিঃ-পতি। চুপ কর মূর্খ! এ তোমাদের ভুয়ো আজাদ হিন্দ্ সরকার নয়—এ সদাশয় বৃটিশ সরকার। তুমি সেই সরকারের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীকে আঘাত করেছ বোলে তোমায় ২০ ঘা বেত মারবার হুকুম দিলাম।

নিরঞ্জন। তোমাদের সদাশয় সরকার বুঝি ছোট ছেলেদের বেত মারে? তা বেশ, আমার বেত খাওয়া অভ্যেস আছে। কিন্তু আমার খাবার কোথায়, আমার যে বড় ক্ষিদে পায়ছে। (হাসির রোল)

কোঃ-ই। যা—যা—ক্ষিদে পেয়ে থাকে বেত খেগে যা। দরোজা, এ আসামীকো লেযাও।

নিরঞ্জন। (ক্রন্দন-জড়িত স্বরে) বা রে, আমায় আগে খেতে দাও, তার পর যত খুসী বেত মারো, আমার যে বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

[হাসির রোল, তাকে নিয়ে পুলিশের প্রস্থান।

বিচারপতি। Order—Order। Next case কুসুমকলিকা কাঞ্জিলাল।

(এক জন পুলিশের একটি কবি গোছের লোককে নিয়ে প্রবেশ)

পুলিশ। কৌসুম কুলিক গাঞ্জোলাল আসামী হাজির—হুজৌর।

কোঃ-ই। হুজুর! এ আসামী, ভূকৈলাস রোডের সরকারী অস্ত্রাগার ও মালগুদামের কাছাকাছি বিড় বিড় কোরে বকতে বকতে ঘুরে বেড়াবার কারণ জিজ্ঞেস করায়, হঠাৎ সে—'আগুন, আগুন' বোলে—

কুসুম। (সুরে)— আগুন, আগুন!

দিকে দিকে হেরি লেলিহান শিখা, লেগেছে আগুন!

কোঃ-ই। এই বেয়াদপ, চুপ। হুজুর এই ভাবে চিৎকার করায় একটু পরেই ভীষণ বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই মালগুদাম ও অস্ত্রাগারে প্রচণ্ড আগুন লেগে যায়। আমাদের গুপ্তচর বিভাগ খবর পেয়েছে যে বিপ্লবীদের সঙ্গে এই যুবকের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। এই যুবক ঐ ভাবে হঠাৎ আগুন আগুন বোলে ইঙ্গিত করায় বিপ্লবীরা মালগুদামও অস্ত্রাগারে বোমা বর্ষণ করে, তার ফলে বৃটিশ সেনার জন্য কোটি কোটি টাকার যে সব অস্ত্রশস্ত্র, ঔষধ, খাদ্য ও বস্ত্রাদি সংগ্রহ কোরে রাখা হয়েছিল সেগুলি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়েছে।

বিচারপতি। তোমার নাম কি?

যুবক। আমি ভদ্রঘরের ছেলে, একটু ভদ্র ভাবে প্রশ্ন করবেন।

কোঃ-ই। (ব্যঙ্গ সহকারে) চুপ চুপ। উনি আবার ভদ্রলোক ফলাচ্ছেন। হুজুর যা প্রশ্ন করছেন, ঠিক ভাবে জবাব দাও নচেৎ—(রুলের গুঁতো)

যুবক। উঃ, মারছেন কেন? আমার নাম কুসুমকলিকা কাঞ্জিলাল—কবি।

বিচারপতি। বাঃ, তোমার নামের বাহারটি তো চমৎকার। (হাসির রোল) Order—Order—তুমি আগুন, আগুন বলে চিৎকার—

কুসুম। শুনবেন স্যার, বড় চমৎকার কবিতা। আমার নিজের লেখা—(ভাবমুগ্ধ) আগুন, আগুন!

দিকে দিকে হেরি, লেলিহান শিখা লেগেছে আগুন!
কৃষ্ণচূড়ার ডালে ডালে জ্বলে দীপ্ত আগুন,
অশোক করবী,—লালে লাল—হায়—বিরহী ফাগুন।

(কোর্টে হাসির রোল)
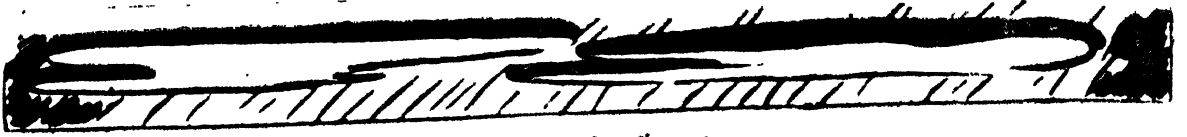
সামাজিক, রাজনৈতিক বা আধ্যাত্মিক মঙ্গলের মূলে ঐ এক কথা—আমি আর আমার ভাই এক, অভিন্ন নই। এই কথা সর্ব্বদেশ, সর্ব্বজাতির পক্ষে সত্য।

—স্বামী বিবেকানন্দ

কোঃ-ই। Order,—Order,—এই বেয়াদপ, চুপ। এটা কোর্ট—তোমার কবিতা আওড়াবার কুঞ্জবন নয়।

বিচারপতি। সরকারী অস্ত্রাগারে কারা বোমা মেরেছিল, তাদের নাম বল।

যুবক। (স্বপ্নোত্থিত) কি বল্‌ছেন?—সরকারী অস্ত্রাগার—

কোঃ-ই। তুমি ওষধ না পেলে ঠিক জবাব দেবে না দেখ্‌ছি! (রুলের গুঁতো)

যুবক। উঃ, কি বলছেন, বলুন।

বিচারপতি। বিপ্লবীদের বিষয় তুমি কি জানো বল।

কুসুম। বিপ্লবী?—আজ্ঞে,—আমি তো কিছুই জানি না আমি কুসুমের মায়ের ছেলে,—কুসুমকলিকা কাঞ্চিলাল—কবি।

কোঃ-ই। না,—তা কি আর জানো।—ভাজা মাছটি পর্য্যন্ত উল্‌টে খেতে জানো না—ডা-ডা—জু-জু! *(বিচারপতি সমেত কোর্টে হাসির রোল)*

বিচারপতি। তা' হ'লে তুমি কোন কথা স্বীকার করতে চাও না?

কুসুম। আজ্ঞে, আমি কিছু জানি না তো স্বীকার করবো কি?

বিচারপতি। বেশ, জানো কি না—দেখা যা'ক্!—এ বিচার আমি মুলতুবী রাখলাম। আরও সন্ধান করা প্রয়োজন।—যাও, একে নিয়ে যাও!—Next case Rajia Begum.

[কুসুমকে নিয়ে প্রস্থান ও রাজিয়াকে নিয়ে প্রবেশ।

পুলিশ। রাজিয়া বেগম আসামী হাজির, হুজৌর!

কোঃ-ই। হুজুর, কয়েক দিন পূর্ব্বে কলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে মকবুল হোসেন নামক যে যুবকটি রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দিয়েছিল, এবং যে বক্তৃতা শুনে জনসাধারণ ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠে পুলিশবাহিনীকে আক্রমণ করে এবং এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাবার জন্ম পুলিশ কমিশনার সাহেব বাধ্য হ'য়ে গুলী চালাবার হুকুম দেওয়ার ফলে,—সেই গুলীর আঘাতে কয়েক জন নাগরিকদের সঙ্গে মকবুলও নিহত হ'য়েছিল। এই মেয়েটি সেই মকবুলের ভগিনী—"রাজিয়া।"

রাজিয়া। হ্যাঁ, আমিই রাজিয়া!—আমার ভাই—যে মকবুল পুলিশের গুলীতে বীরের মত গৌরবের মৃত্যু,—শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে,—আমি তারই বোন—এবং—

কোঃ ই। থাক্—থাক্—আর বক্তৃতা দিয়ে কাজ নেই! হুজুর, বিপ্লবীরা ভূকৈলাস রোডের অস্ত্রাগার ও মালগুদাম ধ্বংস করবার পর কাল যখন বাংলার লাটের চীফ্ সেক্রেটারী, লাট সাহেবের অনুপস্থিতিতে সেই ধ্বংসস্তূপ পরিদর্শন করতে আসেন,—এই মেয়েটি তখন বাংলার লাটের চীফ্ সেক্রেটারীকে গুলী মেরে হত্যা করেছিল।

বিচারপতি। এই মামলা সম্বন্ধে আপনি,—আপনার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ দায়ের হ'য়েছে—তা' ত' শুনলেন! এখন এ সম্বন্ধে আপনার কি বলবার আছে?

রাজিয়া। এ বিচার-প্রহসনে আমার কিছু বলবার নেই!

বিচারপতি। আপনি কেন এ হত্যা করেছিলেন?

রাজিয়া। দেশমাতৃকাকে সেবা করার অপরাধে—অত্যাচারী বৃটিশ সরকারের ভাড়াটে পুলিশরা আমার যে সব ভারতীয় ভাইকে গুলী কোরে নির্ম্মম ভাবে হত্যা করেছে,—সেই সব পিশাচ হত্যাকারীদের পাশবিক হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্ম আমি অস্ত্র গ্রহণ কোরেছিলাম!

বিচারপতি। বাংলার লাটের চীফ্ সেক্রেটারীর সঙ্গে,—সেই সব ভারতীয়দের হত্যার সম্বন্ধ কি?

রাজিয়া। একটু হিসেবে ভুল হ'য়েছিল। আমরা খবর পেয়েছিলাম যে নির্য্যাতনকারী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের তাঁবেদার বাংলার লাট স্বয়ং এই পরিদর্শনে আসবে। কিন্তু, দুরদৃষ্ট বশতঃ চীফ্ সেক্রেটারী আসায় বাংলার লাটের স্বেচ্ছাচারিতার মূল্য হিসাবে তাকেই জীবন দিতে হয়েছে।

বিচারপতি। কিন্তু, এ হত্যার শাস্তি—

রাজিয়া। তা' আমি জানি,—শহীদের গৌরবময় মৃত্যু বরণ করতে আমি মোটেই দ্বিধা করি না! আমি চরম দণ্ডের জন্ম সর্ব্বদা প্রস্তুত।

বিচারপতি। *আপনার দলের অন্যান্য লোকের নাম ও তাঁ'দের ঠিকানা আমাদের বলে দিয়ে আপনি যদি রাজসাক্ষী হন তো মুক্তি পেতে—*

রাজিয়া। চুপ কর পিশাচ। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতক হ'য়ে আমি আমার দেশপ্রেমিক ভাই-বোনেদের,—যাঁরা ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসনতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করবার জন্ম জীবন উৎসর্গ করেছে—তাদের বৃটিশ শাসকদের শাসনের নাগপাশে বলি দেব?

বিচারপতি। খাসা বক্তৃতা দিতে পার যে দেখ্‌ছি, কিন্তু জানো না বোধ হয় যে, তোমাদের মত মেয়েদের কাছ থেকে কথা বের করতে আমাদের বিশেষ বেগ পেতে হয় না?

রাজিয়া। তা' ভাল রকমেই জানি না হয় শাস্তি-কুনীতির মত প্রকাশ্যে বেইজ্জৎ করবে, না হয় চরম নির্য্যাতনের পৈশাচিকতায় তিলে তিলে মেরে ফেলবে, কিন্তু মনে রেখো, সবাই নরেন গোঁসাই নয়—বানাইলালের মত লোকেরও অভাব নেই।

বিচারপতি। তবে, তাই হোক্!

(হঠাৎ একটি মেয়ে দর্শকদের বেঞ্চ থেকে বেরিয়ে এল)

মেয়েটি। তা হবার আগে তুমি নিজেই মৃত্যুকে বরণ কোরে নাও। (উপর্য্যুপরি গুলীর শব্দ, কোর্টে গোলমাল। ম্যাজিষ্ট্রেট, কোঃ-ইঃ, পাঃ-প্রঃ প্রভৃতির ২।৩ জনের আর্ত্তনাদ ও পতন। কোর্টে বিশৃঙ্খলা, গোলমাল।

(ধর,—ধর—পাক্‌ড়ো—পাক্‌ড়ো!)

কোঃ ইঃ। উঃ, আর একটু হ'লে আমাকেও শেষ করেছিল—একটা গুলী শুধু হাতের খানিকটা ছাল ছিঁড়ে নিয়ে গেছে। এ যে দেখ্‌ছি ভীষণ ব্যাপার—হত্যার বিভীষিকা! সামান্য একটা মেয়ে,—প্রকাশ্য দিবালোকে কোর্টের মধ্যে এসে—ম্যাজিষ্ট্রেট ও অন্যান্য অনেককে হত্যা করলো,—আর কেউ তাঁকে বাধা পর্য্যন্ত দিতে পারলে না! ধিক্,—তোমাদের শত ধিক!

নবাগতা। বাধা দেবার দিন আজ শেষ হ'য়েছে।

কোঃ-ইঃ। বেশ, বেশ! এখন চুপ কোরে গারদে গিয়ে বিচারের জন্ম অপেক্ষা কর। এ দরোজা, এ দোনো জেনানা আসামী লোগোঁকো লে যা' ঔর গারদমে রাখ,—আউর এ লাশ উঠানেকে লিয়ে ambulanceমে খবর ভেজ দেও।

(স্বাধীন ভারতের অস্থায়ী সরকারের ব্রহ্মদেশস্থ বেতার কেন্দ্র থেকে অভিনীত)

লেখক—প্রচার বিভাগের সহকারী সম্পাদক

বটে না কি ? মুচকে হাসে ধরণী, তুমি দেখছি নেতা হয়ে উঠেছ তোরাব। তা হম্বিতম্বিটা কজলু মিঞার হোতা করলে হত না ? জাতভাই ছিল, তারিফ করত ?

গরীব চাষার জাতভাই !

তোরাবের এই কথার পিঠে কথা চাপিয়ে খোঁচা দেবার স্পর্দ্ধায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে ধরণী দু'বার গলা-খাঁখারি দিয়ে গম্ভীর মুখে তামাক টানতে থাকে। তার ভাবটা এই যে, এতই যদি তেজ তোমাদের, আমার কাছে এলে কেন বাপু!

এক কাজ কেনে না করেন বাবু, রাজেন দাস বলে মধ্যস্থের ভঙ্গিতে, দু'আনা মেনে নেন। আপনার কথাও থাক, মোদের কথাও থাক।

বাজারে যেন দর করছে জিনিষের !

তোমার কাছে দু'আনা কিছু না রাজেন দাস, রাখাল বলে, তোমার ভাত খায় কে। ওই দু'আনায় মোদের মরণ-বাঁচন।

নিতে আর কি, সোজা কাজ, তিনু বলে, দিতেই যে শ্বাস ওঠে রে দাদা।

পুলিন বলে, কত্তা যদি দয়া করেন—

কচকচিতে কাজ কি ? হাকিমের রায় দেবার সুরে বলে ধরণী, হাট না বাজার পেলে তোমরা এটা জিগ্যেস্ করি ? দরাদরি কোরো না বাপু ধানের দরে টাকার সুদে না তো দেড়ায় নেও তো নেবে, নয় এসো গে ভালয় ভালয়। সোজা কথা।

এর পর আর কথা কি। মুহ্যমানের মত তারা বসে থাকে। তোরাব ভাবে বাহারণের কথা, ভরা মাসের উঁচু পেটে দু'রোজ অন্ন পড়েনি। চেষ্টা করে উচিত সুদে ধান মিলল না। আরও যদি চেষ্টা করে দেখতে চায়, আরও দু'-এক রোজের উপোস কি সইবে বাহারণের ? ওর কিছু হলে তখন বিনা সুদে ধান পেলেই বা কি লাভ হবে তার। ভুবণ ভাবে রোগা ছেলেটার কথা, প্রথম বিয়ানী মেয়েটার কথা, তাকে নিতে কাল জামাই এসে দু'দিন থেকে যাবে, সে কথা। রসিক হিসেবী, সে ভাবে, চার বিঘের বিশ-বাইশ মণের আধা দশ-এগার মণ থেকে আবোয়াব আদায় বাদে থাকবে সাত-আ'ট মণ, আগের কর্জ্জা বাবদ যাবে সাড়ে তিন মণ সুদে আসলে, দু'-এক মাস বাদে ভিটে বাঁধা না দিলে মরণ নির্ঘাৎ—দেড়বাড়িতে আজ ধান কর্জ্জ নিলে নয় আগেই বাঁধা দিতে হবে ভিটেটা, এখন তো বাঁচবে ফসল তোলা তক্। রাখাল ভাবে, বেশী খেটে, খরচা কমিয়ে, কম খেয়ে নয় পুষিয়ে নেবে বাড়তি সুদটা উপায় কি। তিনু ভাবে আচমকা লাফিয়ে উঠে তরফদারের টুঁটিটা যদি কামড়ে ধরে, মরণ-কামড় দেয় একেবারে, নিজে মরবে তবু ছাড়বে না এমনি কামড়, তরফদার কি মরবে, না শুধু তার মরণ-খাটুনিই সার হবে ? সবাই ভাবে এমনি ভাবে, ক্ষোভে হতাশায় জ্বলে যায় সবার বুক, এক সুরে অভিশাপ বাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রাণগুলিতে : মরুক, মরুক তরফদার, শকুনে ছিঁড়ে খাক তাকে।

এতগুলি মানুষের তীব্র প্রচণ্ড হৃদয়াবেগে এতটুকু অদল-বদল এদিক ওদিক হয় না ধরণীর বার কাছারির আদালতী চাল-চলন ঠমক আর কার্য্যপদ্ধতি। আইন ছাড়া এখানে কথা নেই, আইনের মার-প্যাঁচ ছাড়া। ধরণী তরফদারের বার কাছারিতে তার বিধান ছাড়া রীতি নীতি নেই, তার চালবাজি ছাড়া গতি। চাষীরা রাজার আদালতও জানে, জোতদারের কাছারিও জানে—একটু বেশী ঘনিষ্ঠ ভাবে জানে। প্রত্যেকের মনে হয় সে যেন খুনি আসামী। ফাঁসির

মাটী

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্বানুবৃত্তি)

দড়িটা গলায় দবার দিনটা ক'দিন পিছিয়ে দেওয়াই অসীম দয়া হাকিম আর জোতদারের।

ঢিমে তালে কাজ চলে। শ্রীনাথ মাইতি লোচন সরকারের হাতে বৌয়ের মল দু'টি তুলে দিয়ে ঠায় বসে থাকে এক ঘণ্টা, তার পর দয়া করে ক'টা টাকা তাকে দেওয়া হয় দু'মাসের সুদ কেটে রেখে, শতকরা পঁচিশ হিসাবে।

আগের বার আগাম সুদ তো কাটেননি কত্তা ? শ্রীনাথ নিবেদন জানায় সবিনয়ে।

আগের বার জানতাম সুদ দিতে পারবে তাই কাটিনি, ধরণী তাকে বুঝিয়ে দেয়, আসল টাকাটা এবার মারা যাবে কি না খটকা আছে বাপধন !

খানিক চুপ-চাপ মাথা ঘামিয়ে ব্যাপারটা বুঝতে হয় শ্রীনাথের। রূপার মল বাঁধা দিয়েছে, বোধ হয় আধেক দামে। আসল না দিক, সুদ না দিক, রূপার মল দু'টো তো থাকবে ধরণীর। তবে তার লোকসানের ভয়টা কিসের ?

মল তবে ফেরত দেন কর্ত্তা।—এক টাকার নোট ক'টা শ্রীনাথ বাড়িয়ে দেয় লোচনের দিকে, মলটা বেচেই দেব সুধী কামারকে, আর বাঁধা রেখে কাজ নেই।

আর হয় না, লেখা-পড়া হয়ে গেছে, ধরণী বলে গম্ভীর আওয়াজে, বেচে দিলেই পারতে ? গোড়ায় বললেই হত ?

রাজেন দাস বলে, অনভিজ্ঞ বোকার মতই বলে, শ্রীনাথের পক্ষ নিয়ে : ভুল করে বাঁধা দিয়েছে, ছাড়িয়ে নিতে চায়।

নিক। উদাস ভাবে অনুমতি দেয় ধরণী।

মল ছাড়িয়ে নাও না ছিনাথ ? এতো সোজা পথ !—রাজেন উৎসাহিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু তা তো হয় না। মল বাঁধা রেখে এখুনি যে টাকাটা পেয়েছে শ্রীনাথ, সে টাকা দিয়ে তো ছাড়ানো যায় না মল, লেখাপড়া হয়ে গেছে। ছ'মাসের সুদের টাকাটা না দিলে ও আইনসঙ্গত আদালতী লেখাপড়া বাতিল হতে পারে না।

উকিল বাবুকে কি দিলে না ছিনাথ, এমন পেটোয়া পরামর্শ দিল? ওকালতি করলে তোমার ভাল পসার হত বাছেন। ধরণী বলে হাসি-খুসী ভরা ব্যঙ্গে, তার পরেই গর্জে ওঠে, যাক্ যাক্। ছিনাথের দু'টো রূপোর মল নিয়ে আমি রাজা হব! লোচন, মল ফিরিয়ে দাও। লেখো যে সুদ-সমেত কর্জের টাকা পরিশোধ করায় মল ফেরত দেওয়া হইল। টিপ-সই নাও ছিনাথের যে মল ফেরত পেল। আর তোমাকে বলি ছিনাথ, ফের যদি তোমাকে দেখি এখানে, কান ধরে জুতো মেরে দূর করে দেব।

শ্রীনাথ সকাতরে বলে, কত্তা, মাপ করেন। পা-ধোয়া জল খাই, মাপ করেন।

কিন্তু কেউ আর তাকায় না তার দিকে। গর্জ্জন করে যে হুকুম দিয়েছে ধরণী তা পালন করতে চরম গাফিলতি দেখা যায় লোচন সরকারের, অথচ তার সামান্য একটি ইঙ্গিত মানতে পর্য্যন্ত সে কখনো ভুল করে না। মল শ্রীনাথ মাইতির দখলে আর যায় না। অগোচরে কোন ইঙ্গিত বা সঙ্কেতই বুঝি করে থাকবে ধরণী লোচনকে!

অনেকক্ষণ ধৈর্য্য ধরে থেকে শ্রীনাথ তাগিদ দেয়, মলটা দেন? টাকাটা সে বাড়িয়ে দেয়।

খাতার পাতা থেকে চোখ না তুলেই লোচন ফ্যাঁচ করে ওঠে, দাঁড়াও বাবু, মুলো বাড়িও না। দেখছ না ভিড়?

অন্তদের আবেদন-নিবেদনের ফাঁকে কান্নু আর ফকির তাদের প্রার্থনা জানায়, কেউ কান দিচ্ছে মনে হয় না। ধরণী কয়েক মুহূর্ত্ত নির্লিপ্ত ভাবে তাকায় তাদের দিকে, তারা উৎসাহিত হয়ে ওঠে, মনে হয় ধরণী বুঝি শুনছে তাদের কথা। তেমনি নির্লিপ্ত ভাবেই চোখ ফিরিয়ে নেয় ধরণী। পিনাক সাহস করে সামনে এগিয়ে যায়, মোর একটা বিহিত করেন কত্তা, তুমি ধম্মোবাপ। মশাটারে মারতি নীলামের মুটিশ কেনে, ডাকিয়ে এক থাপড় দিতেন। তোমার সাথে বিবাদ করে বুকের পাটা কার?

তুমি কে বটে? তাকে চিনতে পারে না ধরণী!

পিনাক সামন্ত, হুজুর।

তাকে না চেনা হাস্যকর হত অন্য অবস্থায়, এখানে বেশ মানিয়ে যায়, জোতদার রাজার অবজ্ঞা আর চাষী প্রজার হা-হুতাশ ঠাসা এই কাছারি সভায়।

কৈলেসের বাপ—মহেন্দ্র আরও চিনিয়ে দেয়। মহেন্দ্র ধরণীর লোক, বিশেষ কোন দরকার বা দরবার তার নেই, এমনি এসে বসে আছে এক পাশে উবু হয়ে, আনুগত্য জানাতে।

তোমার ও নীলামের ব্যাপার আমি কিছু জানি না সামন্ত। যা বলার অশ্বিনীকে বোলো।

অশ্বিনী সিকদার ধরণীর কর্ম্মচারী। সে যে হাজির নেই লক্ষ্য করেছিল সবাই। এতক্ষণে সকলের খেয়াল হয় যে বেলা হয়ে গেছে অনেক, আবেদন নিবেদন দরবারের ঘটা চলেছে রোজকার মতই কিন্তু কাজ বিশেষ এগোয়নি। যা হয়েছে সাদামাটা কাজ, ঘটি বাটিটা বাঁধা রাখা, সুদ জমা নেওয়া, অনুগ্রহ মঞ্জুর পেয়েও যারা ক'দিন ধরে হাঁটাহাঁটি করছে তাদের দু'-এক জনের নিষ্পত্তি করা। তোরাবদের দেড়বাড়ির আর শ্রীনাথের মল বাঁধার টাকা থেকে আগাম সুদ কেটে রাখার প্রতিবাদ ছাড়া কোন বিশেষ বা নূতন নালিশ প্রার্থনার মীমাংসায় স্পষ্ট রায় দেয়নি ধরণী। সোণার নাকছাবিটি হাতেই আছে নৈমুদ্দীনের। আগামী ফসলের ভাগ বেচে দিয়ে অন্ততঃ নীলমণি চলে যাবে গাঁ ছেড়ে, পড়তো বা দর কিছুই সে জানতে পারেনি এখনো। ধরণীর সর্ত্তেই আপোষ চায় বসে আছে গড়পাড়ার বিষ্টু মাজি আর কান্দুলির সোনামদ্দি সরদার; সর্ত্ত দূরে থাক আপোষ মানবে কি না ধরণী তাও তারা জানে না।

সিকদার মশায় এসেবেন না সরকার মশায়?

এসবে, এসবে।

কুয়াসার চিহ্ন নেই বাইরে, শীতের তাজা চনমনে রোদ। নতুন বাছুরটা থেকে থেকে তড়পাচ্ছে সামনের মাঠে, গায়ে যেন তার সাদা লোমের ফেনা মাখানো। বন্যা বড় মন্বন্তরে চাকা-ভাঙ্গা জীবন-যাত্রার চাষাড়ে যানটি প্রায় অচল হয়েছে শোষণ আর অব্যবস্থার পাথরে ঠেকে, এইখানে যাত্রা শেষ কি না, জানে না কেউ। আঁচড়ে-কামড়ে রক্তাক্ত হয়ে আছে বুকগুলি, সর্ব্বদা জ্বলে। ধরণীর এই কাছারিতে অল্প প্রত্যাশা নিয়ে এসে বসে থাকতে থাকতে সমস্ত আশা-ভরসার লেশটুকু পর্য্যন্ত উপে গিয়েছে ভগবান এবং আল্লাও যেন এই তাজা রোদের উজ্জ্বল সকালে অস্ত গেছেন চির তরে। তবু কাছাকাছি এসে বসেছে যখন, নিজেদের মধ্যে ধীরে-সুস্থে তারা আলাপ করে নিরুত্তেজ শান্ত কণ্ঠে, ধৈর্য্যের যেন তাদের সীমা পরিসীমা নেই। পরস্পরের ঘরোয়া সুখ-দুঃখের কথা। ফসলের কথা।

তার মধ্যে অল্পে অল্পে আলাপের বিষয়টা কেন্দ্রীভূত হতে থাকে রামপুরের ঘটনায়। সকলেই উৎসুক কৌতূহলী হয়ে ছিল ও-ব্যাপারে। অভাব অনটন রোগ শোক দুর্ভাবনার কথা যেন ক্রমে ক্রমে চাপাই পড়ে যায় রামপুরের ঘটনাটার আলোচনায়। ওই নিয়েই বলাবলি করে সকলে। বন্যা বেশী লোণা বয়ে দিতে পারেনি প্রতাপ দীঘির জল। দীঘি বলা হলেও আসলে সেটা প্রকাণ্ড একটা বিল, এক ক্রোশ চওড়া দেড় ক্রোশ লম্বা হবে। কবেকার দীঘি, কোন রাজা বা নবাব বানিয়েছিল অথবা প্রকৃতি নিজেই সৃষ্টি করেছে কেউ জানে না। বিলের চারি দিকে ঘুরলে বোঝাও যায় না মানুষ কোন দিন বাঁধ দিয়েছিল কি না অথবা এমনিই কিছু উঁচু হয়ে আছে বিলের চারি দিকের জমি। বর্ষার জলে থৈ-থৈ করছিল বিল যখন সর্ব্বনাশা লোণা জলের বন্যা এল। প্রায় সমতল হল দিক্-দিগন্তে ছড়ানো অথৈ বন্যা আর বিলের জল, কিছু লোণা জল ঢুকল বিলে, বেশী নয়। পরের বর্ষায় প্রায় কেটে গেল বিলের জলের অল্প লোণা স্বাদটুকু।

ডোবা পুকুর দীঘি ভাসিয়ে সাফ করে নিয়ে গেছে বন্যা। মাছ গিজ-গিজ করছে প্রতাপ বিলে। মানাজোরের রাজার অধীন বুধ-রুলের জমিদারের কাছে বিলটা জমা নিয়েছে মদন দাস। সে আবার বিলটা বিলি করে দিয়েছে জেলেদের কাছে মোটা সেলামী আর চড়া বন্দোবস্তে, নগদ পেয়েছে খুব কম, কারণ জেলেদের তখন আধা পয়সা নগদ দেবার সাধ্য ছিল না কয়েক জন ছাড়া। তাতে ক্ষতি বা আপত্তি ছিল না মদন দাসের—নগদ যে বেশী পায়নি সেটা ভাল করেই পুষিয়ে নিচ্ছে।

এদিকে জলের অভাবে ফসল বাঁচে না চারি দিকের শত শত বিঘায়। আগের বছর উর্ব্বরা ক্ষেতকে বন্যা মেরেছে, পরের বছর মেরেছে নুণের দাপট. এ বছর মারতে চাইছে কৃপণ আকাশ, পক্ষপাতী ইন্দ্র। তা' চাষীরা ভাবে কি, দেবতা এক হাতে বজ্রের কারবার করুক, আরেক হাতে করুক অপ্সরাদের বস্ত্রহরণ, তাদের একটু জল পেলেই হয়। লাখো লাখো সবুজ চারা শীষ বিয়োতে উদ্যোগী হয়েও রসের অভাবে বিবর্ণ হতে হতে বাতাসে দুলছে, শুকিয়ে মরবে না মা হবে কতগুলি জীবন্ত দানার ? বিলের কিছু জল পেলে তারা বাঁচে—বাঁচাতে পারে কয়েক জন মানুষকে।

তাই, চাষীরা চাইল, প্রতাপ বিলের জল কিছু তাদের ক্ষেতে আসুক। মদন দাস বলল, বিল থেকে এক ফোঁটা জল অপচয় হলে হাজার হাজার টাকার মাছ প্রাণত্যাগ করবে। জল দেওয়া চলতে পারে না।

চাষীরা বলল, ধম্মোবাপ। এক হাত দেড় হাত জল নামা হলে কি হবে মাছের ? জলের খাজনা নেন, জল দেন।

কিন্তু বিলের মাছদের প্রতি বড়ই দরদ মদন দাসের, জল কমিয়ে তাদের অসুবিধা ঘটাতে সে রাজী নয়। তার খাস জমিতে আর তার বর্গাদারের জমিতে বিল থেকে জল সেঁচে দেওয়া হচ্ছে, অন্যের জমির ফসল নিয়ে তার মাথা-ব্যথা নেই।

সে বলল, জল কি আমার ? জেলেদের জমা দিয়েছি, ওরা জলের মালিক।

মরিয়া চাষীরা এক দিন পাড় কেটে বার করতে গেল জল। জেলেদের দিক থেকে বিশেষ বাধা এল না, মদনের আদায়ের বহরে মাছ ধরে তাদের বিশেষ সুবিধা হচ্ছিল না। মাছ ধরার সর্ত্ত ব্যবস্থার অদল-বদল চেয়ে বার বার ধর্না দিয়ে ফল পায়নি। মদনের ভাগ্নে বীরেন আর চোপীন জেলের উস্কানিতেও কয়েক জন ছাড়া জেলেরা হাত গুটিয়ে রইল। মারামারি হল এক রকম মদনের লোক আর চাষীদের মধ্যে। কিন্তু সরকারী হিসাবে সেটা দাঁড়াল চাষী ও জেলেদের মধ্যে দাঙ্গা। খবরের কাগজে রিপোর্টও বার হল সেই ভাবে।

এ সব জানা কথা। টাটকা খবর হাসপাতালে আহত বীরেনের মৃত্যু আর বলা নেই কওয়া নেই রামপুর ছেড়ে পুলিশের অন্তর্দ্ধান।

তিনু বলে ভুবণ আর তোরাবকে, বিত্তান্ত শুনি নাই সব। চাষী আর জেলেরা না কি একজোট হয়েছে এই মাত্তর খপর।

ভুবণ বলে জৈনুদ্দীনকে, চাষী আর জেলেরা না কি একজোট হয়ে আপোস-টাপোস কি করে ফেলছে।

জৈনুদ্দীন জানায় বিষ্টুকে, মিট-মাট করিয়েছে বুঝি চাষী জেলেরা একজোট হয়ে—চেপেছে মদনকে। তাই সরে গেছে পুলিশ।

মুখে মুখে জানাজানি হয় যতটুকু জানা গেছে। মুখে মুখে বলাবলি হয় অনুমান।

তা যা বলেছ। গাঁয়ের মানুষকে জোট বাঁধতে দেখলে আর থাকে ?

বাবা, ভোলে নাই তো সে সনের শিক্ষে।

চটপট পালিয়েছে ল্যাজ গুটিয়ে। কি জানি কি হয়।

অনুমানটাই স্পষ্ট রূপ নিতে নিতে প্রায় সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে যায় যে রামপুরের চাষী আর জেলেদের জোট বাঁধতে দেখে পুলিশ ভয়ে সরে পড়েছে গাঁ থেকে।

তার পর আসে অশ্বিনী। গায়ে পুরোনো র‍্যাপার, মাথায় কাণঢাকা গোল উলের টুপি. মোজা-পরা পায়ে ধূলিধূসর চটি জুতো। মানুষটা রোগা, মুখে একটা যাতনা ভরা বিমর্ষতার চিরস্থায়ী ছাপ।

তাকে দেখেই সাগ্রহে শুধায় ধরণী, হল ?

না বাবু।

শুনে বিমর্ষ হয়ে যায় ধরণী।

নিজের যায়গায় বসে অশ্বিনী, ধরণীর ডান পাশে সামনের দিকে অল্প তফাতে, তার দিকে পাশ করে। এ ভাবে বসে কাজের সুবিধা হয়। বাঁয়ে মাথা ঘোরালে ধরণীর সঙ্গে মুখোমুখি হয় অথচ মুখটা প্রায় চোখের আড়াল হয় উপস্থিত লোকদের, ডাইনে মুখ ঘোরালে মুখোমুখি হয় ওদের সঙ্গে। ধীরে-সুস্থে ঢিমে তালে প্রায় যেন ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই সে চটপট কাজ সারে. কোন বিষয়ে তার দ্বিধা সংশয় নেই। মাঝে মাঝে কিছু বলার আগে হয় তো দু'-একটা কথা বলে নেয় ধরণীর সঙ্গে, হয় তো শুধু একবার তাকিয়ে নেয় চোখে চোখে।

নীলমণি মিনতি জানায়, সিকদার মশায়, আইজ বেলাবেলি রওনা না দিলে মারা পড়মু।

অত তাড়া কেন হে বাঙ্গাল, অশ্বিনী বলে টেনে টেনে, বেলা যায় নাই। দেন তো ওর হিসাবটা মিটিয়ে সরকার মশায়। চার দেড়ে ছ'মণ, তিনের দরে আঠার টাকা। কাটাই মাড়াই খরচ-খরচা বাদে চোদ্দ টাকা দেন রসিদ নিয়ে।

ইটা কি কন ? নীলমণি বলে ভড়কে গিয়ে. বিঘায় দেড় মণ ধরলেন আধা ভাগ. পাঁচ-ছয় মণ ফসল হয় ? দর দিলেন তিন টাকা. বার টাকা তের টাকায় ধান বিকায়।

তোমার দেখি মাঠে ফসল গোঁফে তেল। অশ্বিনী বলে, ভগবান না কি তুমি পাকতে পাকতে কিছু হবে না ফসলের জেনে রেখেছ ? দর কি দাঁড়াবে তাও জেনেছ ? ঠিকানা রেখে যাও, ধান বেশী হয়, দর বেশী হয়, পাওনা টাকা মনিঅর্ডারে পাবে।

পাবে কি ? সেই তো ভাবনা নীলমণির।

হাসপাতাল হয়েই বাড়ী যেরে ভুবণ। এক ক্রোশ দূরে বুধদলের হাসপাতাল, একটি পাকা ঘর ও একটু চালা। ওষুধ বা পরামর্শ কিছুই পাওয়া গেল না, সময় পার হয়ে গেছে। আটটার আগে না এলে ও-সব মেলে না।

বেদম অবটা ছাড়ছে ডাক্তার বাবু, বড় বেশী রকম ছটফট করছে—

কাল এসো. কাল।

বাড়ীর কাছাকাছি পৌঁছে ভুবণ মড়া-কান্না শুনতে পেল। কয়েকটি স্ত্রীলোকের গলার মধ্যে তার বৌয়ের গলাটি সব চেয়ে তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট।

[ক্রমশ

প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্য

শুভেন্দু ঘোষ

মাত্র কয়েক বৎসর হল স্বর্গীয় প্রমথ চৌধুরী মশায়ের গল্প-সংগ্রহের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অনেক দিন পর্য্যন্ত দেশ তাঁর সৃষ্টি-শক্তিকে গৌরব দেয়নি সে জন্য আমি বিস্ময় বোধ করেছি।' কবির হয়তো ধারণা হয়েছিল, চৌধুরী মশায়ের রচনার কদর হতে সুরু করেছে। তা যে এখনও হচ্ছে না সেটা বোঝা যায় পাঠক-সমাজে তাঁর বইগুলোর কাটতি দেখে। তবে এ কথা স্বীকার না করেই উপায় নাই যে, আধুনিকরা তাঁর লেখা পড়ুন বা নাই পড়ুন তাকে ফ্যাসন-গৌরব অবশ্যই দেন। হাজার হোক্ তাঁদের কৃষ্টি তো আছে!

শুনতে পাই, এ যুগের পাঠকরা হু হু করে এগিয়ে চলেছে বলেই চৌধুরী মশায়ের মত লেখকরা বাতিল হয়ে যাচ্ছেন। হবেও বা! আমরা ঘণ্টায় আশী মাইল বেগে ছুটে চলেছি বটে কিন্তু কোন্ চুলোয় যাচ্ছি সে কথাটা রয়ে যাচ্ছে অজানা।

যাক্, এ কথা সকলেই মানবেন যে, রবীন্দ্র-যুগের বাংলা সাহিত্যে চৌধুরী মশায়ের যে-দান তার একটা সুস্পষ্ট বিশিষ্টতা আছে। দীর্ঘ জীবন রবীন্দ্র-সান্নিধ্যে কাটিয়েও তিনি তাঁর সমস্ত রচনার ওপর যে ছাপ রেখে গিয়েছেন সেটা একেবারেই তাঁর নিজস্ব। রবীন্দ্র-প্রভাব তাঁর প্রতিভাকে কোন দিনই অভিভূত করতে পারেনি। তাঁর দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গী তাঁরই—আর কারও বলে ভুল হবার কোনো সম্ভাবনাই নাই।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, চৌধুরী মশায়ের বুদ্ধি-প্রদীপ্ত প্রতিভার কথা। তাঁর সমস্ত রচনাতেই খুব বেশী করে চোখে পড়ে একটা সদা-জাগ্রত বুদ্ধির ছাপ—যেমনটা পাওয়া যায় বার্ণার্ড শ'র রচনায়। শ'য়ের মতনই নিপুণ তাঁর যুক্তি প্রয়োগ; তাঁর বাক্‌চাতুরীও প্রতি পদে চমক লাগায়, কৌতূহলকে ঝিমিয়ে পড়তে দেয় না। কিন্তু বুদ্ধির আবেদন তো শুধু বুদ্ধির কাছে—সমস্ত চিত্তকে নাড়া দেওয়ার সামর্থ্য তো তার নাই, তার জন্যে প্রয়োজন আর কিছুর। চৌধুরী মশায়ের রচনায় এই আর কিছু নিশ্চয় আছে, নইলে তা সাহিত্যের গৌরব পাবার যোগ্য হত না। কিন্তু সেটা কি মাত্রায় ছিল সেটার সন্ধান নেওয়া প্রয়োজন।

চৌধুরী মশায় কবিতা লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। সব কিছুতেই ফুটে উঠেছে মননের প্রাধান্য, প্রাণের আবেগ, প্রাণের উষ্ণতার একটা স্বল্পতা।

তার কারণ আছে। সাহিত্যের উপাদান পাওয়া যেতে পারে দু'ভাবে। হয় প্রকৃতির বই পড়ে, জীবনের বই পড়ে, নয় তো কাগজের বই পড়ে। চৌধুরী মশায় তাঁর সাহিত্যিক উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন প্রধানত. বই পড়ে:

"লেখাপড়া মোর পেশা লেখাপড়া মোর নেশা
কাজ আর খেলা।"

প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে মোকাবিলা করে সেই জীবনের বাণী তিনি আমাদের শোনাননি; তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সে জীবন যদি বা কচিৎ প্রবেশ করে থাকে তো সে করেছে স্মৃতির বাতায়ন-পথে—দূরশ্রুত গুঞ্জনের মত। তাই চৌধুরী মশায়ের সাহিত্য আমাদের নিয়ে গিয়ে হাজির করে একটা 'অভিজাত' মজলিশে—প্রাণবেগ কর্মমুখর জগৎ থেকে দূরে। বস্তুতঃ, অবকাশকে আমোদিত করার জন্যেই তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টি, জীবনযাত্রাকে সহজ ও সাবলীল করার জন্য নয়। এ হিসেবে, কৃত্রিম পদ্ধতিতে টবে-বসানো গাছের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে; মাটীর পৃথিবীর বুকে রোদে-হাওয়ায় বেড়ে-ওঠা গাছের মত সহজ স্বাভাবিক রূপ তার নয়। সে গাছেরও অবশ্য একটা প্রয়োজন আছে, সে গাছেরও আছে আনন্দ দেওয়ার একটা শক্তি, তার পুষ্প-পত্রেরও একটা রূপ আছে, একটা সৌরভ আছে।

চৌধুরী মশায়ের গল্প-সাহিত্যের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্যে মিলেছে তাঁর আভিজাত্য মনের অনুভব, গাঁথা হয়েছে ভাষার শিল্পে।' সত্যি কথা বলতে, অভিজ্ঞতার বৈচিত্র্য অথবা গভীরতা চৌধুরী মশায়ের সাহিত্যের জন্যে দাবী করা চলে না; তবে কবিগুরু-কথিত আর দু'টি গুণের কথা অস্বীকার করা একেবারে অসম্ভব। তাঁর মনের আভিজাত্য এবং অনন্যতা শুধু তাঁর গল্পে নয়, তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধেও অত্যন্ত পরিস্ফুট। আর ভাষার কারিগরীর দিক্ থেকে তাঁর সাহিত্যে যে অনবদ্য তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ এই যে, সেটা আজও রসিক জন মাত্রেরই আদরের ধন হয়ে আছে, যত দিন বাংলা সাহিত্য আছে তত দিন বোধ হয় থাকবেও।

চৌধুরী মশায়ের প্রতিভার নিয়ন্তা ছিল তাঁর বুদ্ধি আর সহায়ক ছিল তাঁর মজলিশী মেজাজ। যেহেতু, বুদ্ধি হচ্ছে সত্তার একটা ভগ্নাংশ মাত্র, সেই হেতু সমগ্র সত্তার অনুভূতিতে বিশ্বের যে রস-রূপ ধরা পড়ে তার আস্বাদ চৌধুরী মশায়ের সাহিত্যে খোঁজা বৃথা। তবে তাঁর সাহিত্যে কি রস নাই? আছে, সে রসটাকে বলা যেতে পারে মজলিশী রস। যে রসে আড্ডা জমে সেই রস। সে রস পরিবেষণ ও উপভোগ করার জন্যে দরকার হয় হাওয়া-খেতে-বেরুনো মনের।

চৌধুরী মশায় যে সব কবিতা লিখেছেন সেগুলো হচ্ছে ছন্দোবদ্ধতার দরুণ বড়া রকম সংহত সংযত মজলিশী রসে পাক করা চিন্তা; তাঁর গল্প হচ্ছে খোশগল্প—যদিও এই গল্প করার নেশার রাশ ধরে বসে আছে যুক্তিপ্রবণ মন। তাঁর অধিকাংশ প্রবন্ধও হচ্ছে মজলিশী আলাপ; সে আলাপের বিষয়ও খুব বেশী গভীর হলে চলে না, চাল যাই হোক। বিষয় প্রতিপাদন করার জন্যে যুক্তির অবতারণা থাকলেও সেইটার উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি।

চৌধুরী মশায়ের কল্পনা চিন্তা তথা ভাষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, সেগুলোর মধ্যে কোথাও কিছু আবছা নাই—সবই যেন বুদ্ধির বাটালি দিয়ে চোস্ত করে খোদাই করা। মজলিশ ঘরটার মতই সেগুলোর সুস্পষ্ট রূপ আছে। রূপসীর মত তারা হাতছানি দিয়ে মনকে টানে না—অজানার ইঙ্গিতও নাই তাদের মধ্যে; পঞ্চেন্দ্রিয়ের এলাকার বাইরে তারা এক পা-ও যায় নাই।

এতক্ষণ যা বলা হল তা থেকে কেউ কেউ হয়তো মনে করবেন, আমি চৌধুরী মশায়ের সাহিত্যকে সাহিত্য বলেই স্বীকার করছি না। ঠিক উল্টো কথা। বস্তুতঃ, চৌধুরী মশায়ের সাহিত্যকে সাধারণ কষ্টিপাথরে যাচাই করা চলে না। কারণ, নিছক মজলিশী রস—বিশেষ করে তা অভিজাতও বটে—সকল সাহিত্যেই

সুপ্ত সিংহের প্রতি

নিশিকান্ত

সব সত্তার ভূধর-মর্ম-নিহিত তমিস্রার
গুহা-গহ্বরে সুপ্ত সিংহ! তুমি শুধু একবার
ঘুমে আঁখিমেলা শিশুর মতন
মেলিয়া নয়ন
ক্ষণিকের তরে চাও;
আমাদের এই অগভীর ঘুম জাগরণে ঢেলে দাও
তোমার গভীর জাগ্রত নিদ্রার
দৃষ্টি-নিঝর-ধার;
সে নিঝর-ধারে লভি অভিষেক জাগুক মোদের আঁখি
তব শাশ্বত স্বপনরাজির রঞ্জন-রাগ মাখি'।

একবার শুধু নাড়াও তোমার সোনার কেশরগুলি!
অতল শিথানে সে-শিখর শির যারেক উঠুক দুলি'
ঘুমে-মাথা-নাড়া শিশুর মতন;
সে-হিন্দোলন
তব মহাসুপ্তির—
শ্রম-সঞ্জাত স্বেদবিন্দুর স্বচ্ছ কনক নীর
ঝরাক পলক-প্রপাতে; ধরিত্রীর
পথহারা নিয়তির
গ্রহ-তারা দল ভুক পন্থা কাঞ্চন-ধারা ধরি',
আমাদের গতি প্রতি বিভঙ্গে উঠুক রূপান্তরি'।

পরমানন্দময় সুপ্তির প্রোল্লাসে একবার
তব বিমৌন গুহা-কন্দরে করো তুমি হুঙ্কার;
ঘুমে হেসে-ওঠা শিশুর মতন
সুখের স্বপন
নিরখিতে নিরখিতে
একবার শুধু গর্জন করো, ঝরুক এ-ধরণীতে
নাদ-নির্ঝর নিমেষে করুক লয়
মরণ-শঙ্কাময়
বেদন-আর্ত ক্রন্দনরাশি পৃথ্বী-চেতনা হতে,
ভাসুক জীবন উদার অমরানন্দ সুধা-স্রোতে।

দুর্লভ। এই রস দুর্লভ বলেই এর উপযুক্ত বাচন-ভঙ্গীও দুর্লভ। চৌধুরী মশায়ের চিন্তায় ও কথায় চোস্ত প্যাঁচ ঐ রসেরই অঙ্গ।

চৌধুরী মশায়ের ভাষা সম্বন্ধে আর একটা কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। অনেকে বলেন, তিনি সাহিত্যে কথ্য ভাষা চালিয়েছেন। তাই কি? পণ্ডিতী ভাষায় মজলিশ জমে না, সাধারণ চাষা-মজুরের ভাষাও 'অভিজাত' মজলিশ একেবারেই অচল এবং অস্বাভাবিক। আমরা প্রতিদিন যে ভাষায় কথা বলি সে কি চৌধুরী মশায়ের সাহিত্যের ভাষা? মোটেই নয়। চৌধুরী মশায়ের ভাষা তাঁর অভিজাত সমাজের মজলিশের মতই কৃত্রিম—এই কৃত্রিম মজলিশের পক্ষেই স্বাভাবিক ভাষা। সাধারণ বাঙালীজীবনের স্পন্দন তার মধ্যে অনুভব করা যায় না। বস্তুতঃ, চৌধুরী মশায়ের ভাষা হচ্ছে মজলিশী রসের সাহিত্যের উপযোগী ভাষা—সেটা নিছক সাহিত্যিক ভাষাই।

এই কথটা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে, বঙ্কিম-রবীন্দ্রের সাহিত্যের কাছে আমরা যে জিনিষ পাই, চৌধুরী মশায়ের সাহিত্যের কাছেও তা প্রত্যাশা করা উচিত নয়। ও দু'য়ের কষ্টি-পাথর এক হওয়া উচিত নয়।

হে পৃথিবি, আজ পউষের
আপাণ্ডুর শূন্যে হেরি আমারি মনের
শূন্যতার ছবি।
তুমিও কি শুষ্ক-তৃণ প্রান্তর-সীমান্তে
রক্তবর্ণ রুক্ষ গিরিচূড়ে
বিশীর্ণ ধারার ধারে বালুকা-সৈকতে
এই মতো বসে আছ শূন্য দৃষ্টি রাখি
দূর শূন্যতলে?

তব অধিষ্ঠান-ভূমি এ জড়পিণ্ডের
রবি-পরিক্রমাপথে নিঃশঙ্ক যাত্রার
সেথা কোনো চিহ্ন নাই।
তা ব'লে কি এ ধূলায় তাহাদেরো চিহ্ন নাই, দেবি,
অগণিত সন্তান তোমার
যুগে যুগে যারা চলে গেছে
জীবপ্রভাতের
আনন্দ-উৎসুক পদক্ষেপ
অবশেষে ক্লান্ত অবসাদে
কোনো ক্রমে
অন্তিম মৃত্যুতে টেনে টেনে?
অজ্ঞান-তমিস্র দীর্ণ করি
স্বল্পসংখ্য যে কয়টি প্রাণ
অস্তোদয়পরপারে অতারক অসূর্য আলোকে
যুগে যুগে জেগেছিল ব'লে
এ ধূলার হর্ষ-হুলুধ্বনি
ত্রিদশদেবতাবৃন্দে করেছে চকিত
বারম্বার
বিস্মৃত তাদেরো পুণ্য অভিজ্ঞানগুলি?
ভবিষ্য সমাজ আজ নাই।

কবিতা

কানাই সামন্ত

✡

আজ যারা অতিশয় আছে আর অস্তিত্ব যাদের
মৃত্যু হতে নিষ্ঠুর নির্মম
তাদেরো রোদন-হাস্য শেষে
নির্বাপিত চিতাভস্ম মুঠা মুঠা লয়ে
দিগ্বিদিকে ছিটাইয়া কে কহিবে, হায়,
'মধু জল, মধু স্থল, মধুময় অনল-অনিল'
শূন্য উপহাসে?
ভস্মেরো যে রবে না ঠিকানা।

তবে কেন জীবের জীবন?—
আলো-অন্ধকার-উদ্বেলিত দিবা-নিশা?—
অরণ্যের শ্যামলিমা?—
অম্বরের নীল?
এ অনন্ত আয়োজন
সীমাশূন্য দেশকাল ব্যেপে?

হে পৃথিবি, আজ পউষের
আপাণ্ডুর শূন্যে হেরি আমারি মনের
শূন্যতার ছবি।
মধ্যাহ্নের রৌদ্র-ধূধূ দূর শূন্যতলে
শূন্য দৃষ্টি মেলি
তুমিও নির্লিপ্ত একা
বসে আছ বুঝি?

পণ্ডিত নসীরামের দরবার

মধুসূদন দত্তের ছিল সত্যিকার অদ্বিতীয় প্রতিভা। অদ্বিতীয় প্রতিভা কখনই সামান্য মহাকাব্য লিখে খুশি থাকতে পারে না, অমিত্রাক্ষর-সনেট সৃষ্টি করেও না। অদ্বিতীয় প্রতিভা তাঁর মহৎ ক্ষুধার আবেশে মহৎ মহৎ কার্য করতে থাকে।

কিন্তু একশ' বছরের দূরত্বে বসে এই অদ্বিতীয় প্রতিভার পরিচয় পাওয়া সম্ভব নয়। মধুসূদনের অদ্বিতীয় প্রতিভার সম্যক্ পরিচয় পেতে হলে একশ' বছর পশ্চাদপসরণ করে উপস্থিত হতে হবে যখন মধুসূদনের বয়স মাত্র তেইশ-চব্বিশ—রাজনারায়ণ তাঁর খরচা দেওয়া বন্ধ করেছেন এবং মধুসূদনের অদ্বিতীয় প্রতিভার স্ফুরণ সুরু হয়েছে সেই সময়ে। সেই সময়ে এবং পরবর্তী কালে ত বটেই, যখনই উপস্থিত হওয়া যাবে তখনই তাঁর অদ্বিতীয় প্রতিভার অকুণ্ঠ পরিচয় পাওয়া যাবে। এর জন্য অন্তরঙ্গ হবারও প্রয়োজন হবে না। ধার চাইবার জন্য মধুসূদন অন্তরঙ্গতার অপেক্ষা রাখতেন না।

* * * *

মধুসূদনের জীবনে অর্থাগম হয়েছে প্রচুর। পিতৃ-সম্পত্তি সেই তুলনায় সামান্য। চাকরির রোজগার তারও কম, ব্যারিষ্টারিতেও বেশি নয়, সাহিত্য-সেবায় যৎ-সামান্য। তাঁর আসল রোজগার ধার—যাকে বলে ধারই রোজগার। এই বিষয়ে মধুসূদনই পরবর্তী বহু কবি, শিল্পী ও সাহিত্যিকদের—বা কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকমণ্ডদের ক্ষুরধার জীবনযাত্রা নির্বাহের পথপ্রদর্শক।

মধুসূদনের ঈদৃশ জীবন-দর্শনের পরিচয় পেয়ে তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা বিশেষ চিন্তিত ও দুর্ভাবনায় পতিত হলেন। বিশেষ করে বিদ্যাসাগর। তিনি দয়ার সাগর ছিলেন, অর্থের সাগর ছিলেন না।

"সাদরসম্ভাষণমাবেদনম্,

* * * অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোনক্রমে তাহার অন্যথাভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসান্দগ্ধ চিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয় তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্বলক্ষণ ঘটিয়াছে।

যৎকালে আমি অনুকূল বাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন কারলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানীর কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দি। তাঁহার ধার ত্বরায় পরিশোধ করিব এইরূপ অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয় স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং শ্রীশচন্দ্র ও অনুকূল বাবু সত্বর টাকা না পাইলে বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।

এক্ষণে কিরূপে আমার মানরক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনায় সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রে নিদ্রা হয় না। অতএব আপনার নিকট বিনয় বাক্যে প্রার্থনা এই, সবিশেষ যত্ন ও মনোযোগ করিয়া ত্বরায় আমায় পরিত্রাণ করেন। পীড়াশান্তি ও স্বাস্থ্যলাভের নিমিত্ত পশ্চিমাঞ্চলে যাওয়া এবং অন্ততঃ ছয় মাস কাল তথায় থাকা অপরিহার্য হইয়া উঠিয়াছে। আশ্বিনের প্রথম ভাগে যাইব স্থির করিয়াছি। কিন্তু আপনি নিস্তার না করিলে কোন মতেই যাইতে পারিব না। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া যাহা বিহিত বোধ হয় করিবেন, অধিক আর কি লিখিব, আমি নিজে চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া কার্য শেষ করিয়া লইব, আমার শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে সে প্রত্যাশা করিবেন না। * *

ভবদীয়স্য—

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ

* * * *

মধুসূদনের অদ্বিতীয় প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ অবিশ্যি বন্ধু গৌরদাস বসাকের উপর, বিদ্যাসাগর-সংস্পর্শে সেই প্রতিভা মধ্যাহ্ন-সূর্যের মত প্রখর ও দীপ্যমান, আর তাঁর প্রতিভার শেষ রশ্মি স্পর্শধন্য করল তাঁর মুন্সীকে। আলিপুর জেনারেল হাসপাতালে তখন মধুসূদনের শেষ অবস্থা। মধুসূদন মনমরা হয়ে শুয়ে আছেন। শারীরিক অসুস্থতা তাঁর এই প্রথম নয়, হেনরিয়েটা-বিযুক্তও তিনি আগে বহু বার হয়েছেন। তবে তাঁর মনঃক্ষুণ্ণ হবার কারণ কি?

প্রতিভার প্রকাশ-পথ রুদ্ধ থাকলে কোন্ শিল্পী বা কবি কবে শান্তি পেয়েছেন? হাসপাতালে শুয়ে তাঁর প্রতিভা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ না হলেও অনেকটা সংকীর্ণ। কেবল কয়েক জন ডাক্তার এবং নার্স! শুয়ে শুয়ে মধুসূদন তাদের কারো কাছে ধার চাইবার মতলব আঁটছেন এমন সময় তাঁকে দেখতে তাঁর মুন্শী এসে হাজির। মধুসূদনের কাছে মুন্শীটির বছর-খানেকের মাইনে বকেয়া ছিল—অবিশ্যি সেই তাগাদায় সে মধুসূদনকে দেখতে আসেনি। তাকে দেখে মধুসূদন উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, শিকার দেখে শিকারী যেমন উল্লসিত হয়।

"তোমার কাছে কিছু আছে কি?"

"আজ্ঞে হুইস্কির কথা বলছেন? মুন্সী যথারীতি ভুল করে, বা ভুল করবার চেষ্টা করে, "কোত্থেকে পাব?"

"উঁহু, টাকাকড়ি কিছু আছে?"

"টাকা কড়ি? কই?? কিছু তো???

মুন্শী আমতা-আমতা করতে থাকে। কিন্তু ব্যারিষ্টারের কাছে চললেও অদ্বিতীয় প্রতিভার কাছে আমতা-আমতা করে কোন ফল হয় না, মুন্শীকে হাতিয়ে তৎক্ষণাৎ মধুসূদন এক জন নার্সকে বখশিস্ করে ফেলেন!

তখনকার মত সাময়িক কিছুটা সুস্থ বোধ করতে থাকেন।

যেদিন সকল মুকুল পড়লো ঝরে

পরিমল গোস্বামী

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬"×৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

পাষাণের রূপান্তর

(প্রথম পুরস্কার) —শিশির চৌধুরী

শিল্পী—জয়নারায়ণ সিং কাছোয়া

—বিভাসচন্দ্র মিত্র

পাষাণে

—নারোদ রায়

শিরা—জয়নারায়ণ সিং কাছোয়া

রূপান্তর

—বাথি সরকার

এরা প্রতিবেশী —বসুমতী

জয়ন্তকুমার চৌধুরী

জীবনের বোঝা —হিমানীশ গোস্বামী

(তৃতীয় পুরস্কার) —সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিজয়লক্ষ্মী —বসুমতী

শহর

কে কিং

অনুবাদ : পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়

[শ্রীমতী কে কিং দক্ষিণ-আফ্রিকার হাইভেল্ডে মানুষ হন। পনর বছর বয়সেই তাকে নিজের জীবিকার্জন করতে হয়—লেখিকা হিসাবে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা তার পেশা। তিনি দু'খানি দক্ষিণ-আফ্রিকার খবরের কাগজের লণ্ডন আপিসের প্রতিনিধি। এঁর চারখানি বই প্রকাশিত হয়েছে : রেড রিফ্লেক্স, দি লষ্ট সিটি, দি ব্রডভ্যলেই মিষ্টারী ও বিহাইণ্ড দি এনিমিজ লাইন্স। তা ছাড়া বিভিন্ন মাসিকপত্রে তাঁর বহু ছোট গল্প প্রকাশিত হয়েছে।]

মৃদিনি হেসেছিল।

—'প্রথমত সেটা ছিল রেলগাড়ী শ্বেতাঙ্গদের কল, যা এত জোরে চলতে পারে। এই গাড়ী তার ক্ষুদ্র পল্লী-আবাস—হাইভেল্ড থেকে তাকে দারবানে এনে পৌঁছে দিয়েছিল। সারাটা পথ তার খুব আনন্দে কেটেছিল। শ্বেতাঙ্গদের যাদু বড় চমৎকার! এত দূরের পাল্লা এত অল্প সময়ে অতিক্রম করা! সত্যি বড় চমৎকার। রেল ইষ্টিশনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার বিস্ময়ের অন্ত ছিল না। এর আগে জীবনে সে একসঙ্গে অত লোক দেখেনি। ওর মাথাটা ঘুরে গেল। এতলোক, এত মোটর গাড়ী, ইষ্টিশনের ও-পারের রাস্তাটায় যেন নদীর স্রোত বয়ে যাচ্ছে।

খুড়তুতো ভাই এসে ইষ্টিশনে ওকে অভ্যর্থনা করল। দু'জনে এক-সঙ্গে ব্যারাকে গেল। যে ছোট্ট শহরটিকে তারা ব্যারাক বলে, সেটি প্রথম দেখে তার বড় ভাল লেগেছিল। সেখানে অনেক লোক, সকলেই তার মত কালো এবং দু'দিন যেতে না যেতেই তাদের অনেকের সঙ্গে সে বন্ধুত্ব করে ফেলল। সেখানে তারা গানও গাইত। সব কিছু দেখেই ভাল মনে হত। পরদিন সে তার দাদার সঙ্গে কাজে বেরুলো। সারা সপ্তাহ ধরে কাজ করল। মুনিব ওকে দশ শিলিং মজুরী দিল। ওর মনে হল, এক সপ্তাহ কাজ করে এই টাকাটা নিঃসন্দেহে অনেক বেশী।

ওরা স্থানীয় বাজারে গেল। সেখানে মিউনিসিপ্যাল দোকান থেকে বীয়ার কেনা যায়। ও দেখল, উপার্জ্জিত অর্থ জলের মত পকেট থেকে বেরিয়ে গেল।

তবুও কিন্তু ও সুখীই হল।

তখনও মৃদিনি হাসল।

পাঁচ বছর হয়ে গেল সে শহরে এসেছে। সেই সুখের সপ্তাহটির পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। তার পর এখন তার ছোট ভাই এসে তার সঙ্গে যোগ দিল। তাকে আনবার জন্যে সে ইষ্টিশনে গিয়েছিল এবং নদ্‌লোভুর মুখে বিস্ময় ও উত্তেজনা দেখে খুব হেসেছিল।

'তা হলে তুইও শহরে বাস করবি?'—ভাইয়ের টিনের লাল তোরঙ্গটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিয়ে সে জিজ্ঞাসা করল।

উত্তরে ছোট ভাইটি বলল, "লোকে বলে এখানে না কি পয়সা-কড়ি সব জলের মত। ট্যাক্স দিতে আমাদের ভারী কষ্ট হয়। গরু-বাছুর সবই গেছে, জমি-জমাও যেতে বসেছে। উপত্যকায় মাত্র এক ফালি জমি অবশিষ্ট আছে। নদীর পারের জমির খাজনা আর টানতে পারিনি। তুমি ত বাড়ীতে আর কিছুই পাঠাও না, তাই বুড়ো আমাকে পাঠিয়ে দিলে বেশী করে রোজগার করতে। ও বাবা! এ যে দেখছি মস্ত বড় জায়গা! এত গোলমালে আমার ভয় করছে যে!'

মৃদিনি আবার হাসল। কিন্তু তার সে হাসির শব্দে কিছুমাত্র আনন্দ ছিল না।

'পয়সা-কড়ি এখানে জলের মতই সস্তা, কেমন?' সে আস্তে বললে।

'লোকে কিন্তু তাই বলে, আমাদেরও তাই বিশ্বাস।'

'কথাটা সত্যিই। সহরে প্রচুর পয়সা আছে, কিন্তু তোমার জন্যে নয়। কালো লোকগুলিকে সেই টাকা ধরবার জন্যে চালুনী দেওয়া হয়, তাতে করে টাকা যেমন আসে তেমনই বেরিয়ে যায়। সে টাকা সব সময়ই ওই চালুনীর ফাঁক দিয়ে শ্বেতাঙ্গদের কাছেই ফিরে যায়—ট্যাক্স, খাজনা, বা আরও নানা ভাবে।'

'কিন্তু আমি কাজ করব...' নদ্‌লোভু সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেয়।

ওর দাদা খোঁচা দিয়ে বলে, 'আমার দিকে চেয়ে ছাখ্, আমি কি কাজ করি নে? কি কাপড়-চোপড় আমি পরে থাকি? এ কি মানুষে পরে? সারা দিন রিক্সা টানি, মাঝে মাঝে যখন ভাড়াটে পাই নে, সারা রাত ভাড়ার সন্ধানে ঘুরে বেড়াই। মানুষ এখানে মনুষ্যত্ব হারিয়েছে। ঘোড়ার মত মেহনত করে, পয়সাও বেশ পায়, কিন্তু তার বেশীটাই যায় রিক্সার জমা দিতে, কেন না, রিক্সা কেনার মত শক্তি তার নেই। বাকীটা যায় জনাকীর্ণ ব্যারাকে মাথা গুঁজবার ভাড়া দিতে, খেতে, বীয়ারের দাম জোগাতে আর খাজনা ও জরিমানা দিতে। তুই ঠিকই বলেছিস, কথাটা ঠিক যে, শহরে টাকা জলের মতই। সে কথা থাক, চলে আয় এখন, নইলে পাহারাওলা এসে ধরবে এখানে ঘোরা-ফেরার অজুহাতে। তাতে জরিমানা হবে তোর দশ শিলিং, আমার দশ শিলিং। আর আমার কাছে পয়সা নেই।'

'কিন্তু আমরা ত কোন দোষ করিনি। তুমি ভয় করছ কেন?' নৃদ্‌লোভু বলে উঠল।

'শীগ্‌গিরই সব টের পাবি, এখন চলে আয়।'

ইষ্টিশন থেকে ওরা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। মৃদিনি চারি পাশে কি হচ্ছে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না, নৃদ্‌লোভু সব কিছুর দিকে হাঁ করে তাকাতে লাগল। মনের আবেগে চলতে চলতে এক জন শ্বেতাঙ্গের গায়ে তার ধাক্কা লেগেছিল আর কি! মাপ চাইবার জন্যে সে দাঁড়িয়ে পড়ল। কিন্তু মৃদিনি তাকে হাতে ধরে নিয়ে তাড়াতাড়ি পালিয়ে গেল।

নৃদ্‌লোভু রাগের সঙ্গে বলল, 'তোমার কি হয়েছে বল ত?'

'ও-রকম আর কখনও করো না, বেকুব।' দাদা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল। 'তুই কি এর মধ্যেই জেল খাটতে চাস্?'

নৃদ্‌লোভু তার পিছু-পিছু চলল। এত বছর শহরে থেকে ওর দাদা যেন ওর কাছে আজ অচেনা লোক হয়ে উঠেছে।

যেখানে ওর রিক্সাখানি ছিল মৃদিনি ওকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হল।

'তুমি এটা টানো?' নৃদ্‌লোভু উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠে। এতক্ষণে সে মৃদিনির কাপড়-চোপড় ও কথাগুলোর তাৎপর্য বুঝতে পারল।

ভ্রূ কুঁচকে মৃদিনি মাথা নাড়ল।

'আয়, উঠে পড়্,' হঠাৎ সে বলে, 'এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে।'

ভাইয়ের বাক্সটা সে রিক্সায় তুলে দিল। নৃদ্‌লোভু অগত্যা উঠে পড়ল।

'মনে হচ্ছে, শহরটা তোমার ভাল লাগে না,' নৃদ্‌লোভু আগ্রহের সঙ্গে চেয়ে দেখে মৃদিনি কেমন করে রিক্সাটা তুলে নিয়ে প্রবহমান গাড়ী-ঘোড়ার স্রোতে মিশে যায়।

'আমি যখন এখানে এসেছিলাম তখন দিন-কাল খুব খারাপ ছিল।'

'কিন্তু তুমি ত আর গাঁয়ে ফিরলে না?'

'কেন যাইনি, পরে বুঝতে পারবি,' মৃদিনি তাকে আশ্বাস দিল। 'যখন শহর তোমার গায়ে হাত বাড়াবে, তখন সে হাত দানবের হাতের মতই তোমাকে আঁকড়ে ধরবে; তখন আর তোমার কোন উপায় থাকবে না, তুমি ভেড়া ব'নে যাবে।'

মৃদিনি ঘণ্টি বাজিয়ে সারাটা পথ দৌড়ে চলল। ছোট ভাই রিক্সার দু'পাশ দু'হাতে জড়িয়ে ধরে সোজা বসে বসে মুচকি হাসছিল। এবং কোন নতুন জিনিষের কাছ দিয়ে যেতে যেতে সে চেঁচিয়ে উঠছিল; মৃদিনি রিক্সার হাতল দু'টি ধরে ছুটতে ছুটতে এই মনে করে মুচকি হাসছিল যে, যখন শহরে প্রথম এসেছিল তখন সে-ও সব কিছুই কেমন আশ্চর্য বলে মনে করেছে। সব কিছুই আশ্চর্য মনে হয়েছে, অবাক হয়ে যেত সে!

অন্যান্য রিক্সাওয়ালাকে ওরা পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কেউ মাথাটা নীচ করে আস্তে আস্তে খালি রিক্সা টেনে নিয়ে চলেছে। কেউ বা যাত্রী নিয়ে লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে; যে সব শ্বেতাঙ্গকে ওরা বহন করে নিয়ে চলেছে তাদের আনন্দবিধানের জন্যে নানা রকম কৌশল করে। যখনই কোন রিক্সা ওদের পাশ দিয়ে যায়, মৃদিনি সে রিক্সাওয়ালার সঙ্গে একটু আলাপ করে।

'কেমন চলছে? আজকে কি এই প্রথম ভাড়া?' মৃদিনিকে জিজ্ঞাসা করে।

'না, ভাড়া নয়। আমার ছোট ভাই, গ্রাম থেকে এল, আবার ফিরে যাবে। ও বলে, টাকা না কি শহরে জলের মত! তাই সে কিছু নেবার জন্যে এসেছে।'

ওর কথা শুনে তারা হো-হো করে হেসে ওঠে। 'টাকা জলের মত! শীগ্‌গিরই তা দেখতে পাবে। জলাভাব যে কি জিনিস তা বোধ হয় কেবল মাত্র আমরাই জানি। এখন ও শহরে এসেছে, তাহলে বর্ষা বোধ হয় নামবে।... টাকা জলের মত!'
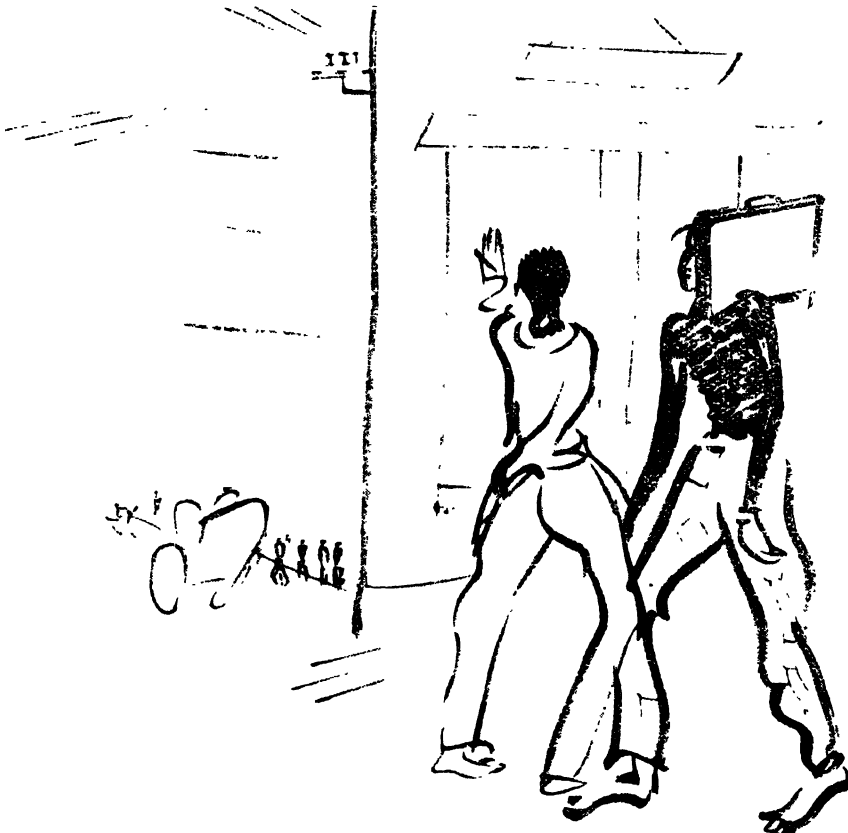
কিংবা কোন ভাগ্যবান মুচকি হেসে মাথাটা ঝাঁকিয়ে আরোহীকে একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখে বলল: 'আজকের দিনটা আমার ভালই। সুদিন।'

ওরা সবাই হেসে ওঠে যখন মৃদিনির মুখে শোনে যে টাকা শহরে জলের মত বয়ে যায়—এ কথা নন্দলোভু বলেছে।

ফলে নন্দলোভু অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে, তার রাগও হয়।

'লোকগুলো হাসে কেন?' সে জানতে চায়।

দাদা জবাবে বলে, 'ওরা হাসে, কারণ, ওরাও যখন শহরে আসে তখন এই কথাই বলেছিল যা তুই এখন বলছিস্।'

'এতে দোষটা কি হল?'

'কথাটা মিথ্যে।'

নন্দলোভু নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল, রাগে তার কণ্ঠ চড়ে গেল। 'কারণ, তাদের কোন মনুষ্যত্ব নেই, পথে পথে লোকদের বয়ে বেড়িয়ে তারা মনে করে যে, সকলেই তাদের মত। আমি তাদের দেখাব। মানুষের মত কাজ করতে আমি কখনও ভয় পাই নে। শীগ্‌গিরই আমার প্রচুর টাকা হবে, তখন কারা হাসে দেখে নেবো।'

মৃদিনি রাগল না, শুধু মাথাটা নেড়ে সে মুচকি হাসল।

রাস্তার এক কোণে ফুটপাথে বসে বসে জন-কয়েক রিক্সাওয়ালা জটলা করছে। রিক্সাগুলো পাশেই পর-পর সাজানো আছে।

মৃদিনি খানিকক্ষণ পরে সেখানে এসে উপস্থিত হল। রিক্সা থামিয়ে সে-ও গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগ দিল। নন্দলোভু রিক্সা থেকে নেমে এক পাশে আড়ষ্ট ভাবে দাঁড়াল।

'কাজ কেমন চলছে?'

'মন্দা খুব মন্দা। আজ খাজনা দেওয়ার মত পয়সাও নেই।' মৃদিনি আর সকলের দিকে ফিরল।

'এটি আমার বাবার সব চেয়ে ছোট ছেলে', নন্দলোভুকে সামনে ঠেলে দিয়ে সে বলল। তার পর দু'জন বন্ধু একটু সরে গিয়ে তাকে জায়গা করে দিতে সে সেখানে বসে পড়ল। 'শহরে নতুন এল। ও মনে করে, টাকা এখানে জলের মত সস্তা। টাকা জলের মত—শুনছ?'

তারা সকলেই একসঙ্গে হেসে ফেটে পড়ল এবং মিটমিটে চোখগুলো যেন নাচতে লাগল। তরুণ যুবক ভারী অসন্তুষ্ট হল কিন্তু চুপ করে রইল। এরা শহুরে লোক; বয়সে ওর চেয়ে বড়, তবু দোষ করছে। ও তাদের দেখিয়ে দেবে। শীঘ্রই ও তাদের দেখাবে।

এক জন রিক্সাচালক নাকে নস্য নিয়ে হাতে হাত ঘষে বলল, 'তাই না কি। আমি যখন শহরে এসেছিলাম তখন আমার মনেও ওই ধারণাই ছিল: অনেক টাকা করব, টাক্স দেবো, আর স্ত্রীকে কানবালা তৈরি করিয়ে দেবো। কাজও বেশ করলাম। সব রকম কাজই করেছি। তার পর এক দিন রাত্রে আমাদের ব্যারাকে হুদ্দাদারের আগমন হল। এদিকে আমার 'পাশ'খানা কে চুরি করে নিয়েছিল। কাজেই তারা আমাকে মাসখানেকের জন্যে আটকে রাখল। তার পর যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন আবার সেই নতুন 'পাশ' কেনার টাকা চাই, তার পর ট্যাক্স, সবার ওপর বেকার অবস্থা। সব সময়েই একটা-না-একটা লেগে আছেই। আর আজ এখানে দিন-রাত্তির সেই অভাবের আগুন আমার বুকটা পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছে। আমি কত স্ত্রীলোককে বইয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছি। একটা-না-একটা খরচ আছেই, বৌকে কানবালা দেবার পয়সা আজও আমার হয়নি। সে হয়ত এর মধ্যে আর কোন লোকের কাছে চলে গেছে, ...টাকা জলের মত! দেখতেই পাবে...'
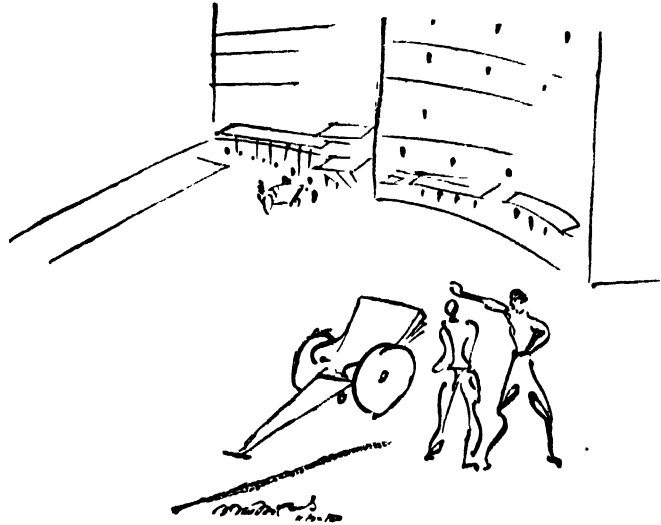
আর এক জন বলছিল: 'এক জন শ্বেতাঙ্গের কাছে মাস-খানেক জোর খাটলাম। সে বলেছিল, মাসের শেষে এক পাউণ্ড দেবে। মাস শেষ হয়ে গেল, তখন বলল যে, আসছে মাসের শেষে এক পাউণ্ডের বদলে দু' পাউণ্ড দেবে। কারণ তার হাতে তখন টাকা ছিল না। দ্বিতীয় মাসও শেষ হ'ল, কিন্তু সে আমার পাওনা টাকা দিল না। কাজেই আমি তাকে প্রহার করলাম। তারা আমাকে তিন মাস কয়েদ রাখল, আর তার সঙ্গে মেরে আমার শরীরের ছয় জায়গায় ঘা করে দিল। এ রকম হলে টাকা জমাবে কেমন করে? শহরে সব সময়ই এ রকম।'

আর সকলেও তাদের আপন আপন কাহিনী বলল। প্রত্যেকেরই কিছু-না-কিছু বলবার আছে। কথা বলতে গিয়ে তাদের মুখ দিয়ে খই ছুটল, আবেগ ও ক্ষোভ ভাষায় ফুটে উঠল এবং সব চেয়ে বাক্‌পটুতা প্রকাশ পেল তাদের হাত ও চোখের খেলায়। তার পর তারা সেই রাস্তার কোণে বসে কেউ পাইপ টানতে লাগল, কেউ কেউ বা নাকে নস্য দিতে লাগল, আর কেউ কেউ বা রাস্তা থেকে পাথরের কুচি কুড়িয়ে এনে বাঘবন্দী খেলা শুরু করল।

এমন সময় এক জন শ্বেতাঙ্গ শিস্ দিয়ে হাতের ইসারা করলে। সকলেই হৈ-চৈ করে লাফিয়ে উঠে রিক্সার হাতল পাকড়ে দামী পোষাক-পরা শ্বেতাঙ্গ লোকটির কাছে ছুটে গেল।

খানিকক্ষণ সে এদের নিয়ে খেলা করল। প্রথম এক জনকে নির্বাচন করল, তার পর মত বদলে আর এক জনকে পছন্দ করল এবং তার পর আবার মত বদলালো। তারা সকলেই নিজ নিজ

তস্কর —সূর্য্য রায়

ঘণ্টি বাজিয়ে আলাদা আলাদা ভঙ্গীতে স্বরে আবেদন জানাল। এবং নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করল। তাদের এক জন বিরক্ত হয়ে ফিরে চলল। লোকটা তখন হেসে তাকেই ফের ডাকল। তার রিক্সায় চড়ে বসল। আর সকলে তখন আবার ষ্ট্যাণ্ডে ফিরে গেল।

মৃদিনি ভাইয়ের দিকে তাকাল।

'চলে আয়,' সে বলল। 'চল, আগে তোকে আমাদের ব্যারাকে নিয়ে যাই। আমার বিছানার পাশেই তোর জন্তে একটা বিছানা জোগাড় করতে হবে। যত দিন না তোর কাজ-কর্মের কোন সুবিধা হয় তত দিন আমার যা আছে তাই দিয়েই চলুক। নে, উঠে বস্।'

নদ্লোভু দাদার হুকুম তামিল করল।

রাস্তা দিয়ে ছুটে চলতে চলতে মৃদিনি একবার পিছন ফিরে ভাইয়ের মুখখানি দেখে নিল। মুখখানি শান্ত, গম্ভীর। উৎসাহ নিবে গেছে এবং চোখ দু'টিতে সন্দেহ এসে ভর করেছে।

মৃদিনি হাসতে হাসতে ছুটে চলল।

তার হাসিতে কোন রকম আনন্দ ছিল না।

ডি ডি টি

শ্রীমোহিনীমোহন রায়

যুদ্ধের সময় বৈজ্ঞানিকগণ নব নব অতি ভয়ানক মারণাস্ত্র আবিষ্কারে যেমন অধিক মনোযোগী হন তেমনি আবার জীবন রক্ষার জন্য নানা ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতির দিকেও দৃষ্টিপাত করেন। শেষোক্ত ব্যবস্থা চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই প্রধানতঃ ঘটিয়া থাকে। যুদ্ধ না আসিলে এই সকল জীবন রক্ষার উন্নত ব্যবস্থা যে একেবারেই হইত না এরূপ নহে; তবে হয়ত এত দ্রুত সম্পূর্ণতা লাভ করিত না।

গত যুদ্ধের সময় এক দেহের রক্ত অপরের শিরায় প্রবেশ করাইয়া জীবন রক্ষার বিষয়ে প্রভূত উন্নতি সাধিত হইয়াছে। রক্তের রস অপরের দেহে প্রবেশ করান এবং রক্ত ও রক্ত রস বহু-দিন অবিকৃত রাখার ব্যবস্থা, রক্ত-রস শুষ্ক করিয়া গুঁড়া দুগ্ধের ন্যায় আবশ্যক মত জল মিশাইয়া ব্যবহার প্রভৃতির বিশেষ উন্নতি হইয়াছে। এই সকল উদ্দেশ্যে Blood Bank (ব্লাড ব্যাঙ্ক) প্রতিষ্ঠার বিষয় সকলেই জানেন।

কিন্তু গত যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ও আশ্চর্য্যজনক দুইটি জীবনরক্ষী পদার্থের আবিষ্কার—(১) পেনিসিলিন ও (২) ডি ডি টি (D D T)। বর্ত্তমান প্রবন্ধে D D T সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিতেছি। পেনিসিলিনের বিষয় বারান্তরে আলোচনা করা যাইবে।

ডি ডি টি একটি কীটধ্বংসী জৈব রাসায়নিক পদার্থ। ইহার রাসায়নিক নাম—dichloro diphenyl trichloroctitoni; ইহারই সংক্ষেপ D D T। পদার্থটি ষ্ট্রাসবুর্গের জনৈক জর্মান রাসায়নিক কর্ত্তৃক ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু ইহার কীট-ধ্বংসী ক্রিয়ার বিষয় ১৯৪০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময়ে সুইজারল্যাণ্ডের J. R. Geigy কোম্পানী কীট বিনাশের জন্য বহু প্রকার রাসায়নিক পদার্থের পরীক্ষা কালে এই বস্তুটিরও ব্যবহার করেন এবং দেখিতে পান যে, গোশালা ও আস্তাবলের মাছি ধ্বংসের পক্ষে ইহা সর্ব্বোত্তম। ঐ বৎসরই এই সুইস কোম্পানী D D T (ডি ডি টি) সংযোগে গেসারল (Gesarol) নাম দিয়া মাছি মারার এক ঔষধ বাহির করেন। ইহার পূর্ব্বে মাছির ন্যায় আপদ নিবারণ জন্য ফ্লাই পেপার (Fly paper) Flit, Markit প্রভৃতি অপেক্ষা অধিকতর কার্য্যকরী কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সুইসগণও মাছির উৎপাত হইতে গৃহপালিত পশুদের ও কোন কোন প্রকার কীট হইতে কোন কোন শস্য রক্ষার অতিরিক্ত মানব সমাজের পরিত্রাণের জন্য ইহার অদ্ভুত কার্য্যকারিতার বিষয় জানিতে পারে নাই।

১৯৪২ খৃঃ অব্দের নবেম্বর মাসে জর্মানদের বিনা বাধায় Geigy কোম্পানীর নিউইয়র্ক শাখা ১০০ পাউণ্ড গেসারল (Gesarol) আমদানি করিতে সমর্থ হয়। গেসারলের সুমহান ভবিষ্যৎ এবং যুদ্ধজয়ে ইহার বিপুল সহায়তার বিষয় বিন্দুমাত্র ধারণা না থাকাই জার্মানদিগের এই রপ্তানীর ব্যাপারে ঔদাসীন্যের কারণ। সুইস কোম্পানী গেসারল পাঠাইয়া দিল, কিন্তু ইহার রাসায়নিক উপাদানাদির বিষয় সম্পূর্ণ গোপন রাখিল।

বৈজ্ঞানিক ভাষায় মাছি, মশা, উকুন, ছারপোকা, sand fly, ইন্দুর-মক্ষি (rat flee) প্রভৃতি ষটপদী জীব arthropod বা গ্রন্থিপদবর্গের কীট বা পতঙ্গ পর্য্যায়ভুক্ত। এই সকল পতঙ্গ জাতীয় জীবই মানুষের দেহে নানা প্রকার ব্যাধির বাহক। মশা ম্যালেরিয়ার বাহক, উকুন টাইফাস জ্বর (typhus fever) নামক কঠিন ব্যাধির বাহক, sand fly কালাজ্বরের ও ইন্দুর-মক্ষি প্লেগের বাহক। এই সকল পতঙ্গের দংশনে উপরি-উক্ত ব্যাধি সকল মানব-দেহে সংক্রামিত হয়। মাছি কলেরা, আমাশয়, টাইফয়েড জ্বর প্রভৃতি রোগের বীজাণু রোগীর মলমূত্রাদি হইতে বহন করিয়া খাদ্য ও পানীয় দূষিত করে।

উকুন তিন জাতীয়; এক জাতি মানুষের দেহে ও পোষাকের ভিতর আশ্রয় গ্রহণ করে, অপর এক শ্রেণীর আশ্রয়স্থল মাথার চুল। তৃতীয় শ্রেণীকে কাঁকড়া-উকুন (crablice) বলা হয়, কারণ ইহার গঠন কাঁকড়ার ন্যায়। দেহ ও পোষাক-আশ্রয়ী উকুনই টাইফাস রোগের (typhus) বাহক। আমাদের দেশের লোক প্রায়ই প্রত্যহ স্নানে অভ্যস্ত ও পোষাকের বাহুল্য না থাকায় এই শ্রেণীর উকুনের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত কম। কিন্তু তবুও টাইফাস জ্বর মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, কারণ উকুন ব্যতীত পিশু (tick) জাতীয় কোন কোন জীবও এক এক প্রকার টাইফাস জ্বর সংক্রামিত করে। আমাদের দেশে টাইফাস জ্বরের প্রকৃত বাহক এখনও নিশ্চিত ভাবে নির্ণীত হয় নাই।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ প্রভৃতির ন্যায় আপৎকালে বহু লোকের একত্র সমাবেশ, উপযুক্ত খাদ্য ও পরিচ্ছদের অব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশের অভাবে টাইফাস ব্যাধি মহামারীরূপে দেখা দেয়। যুদ্ধের সময় এই মহামারী বহু সৈন্য ও যুদ্ধকার্যে নিযুক্ত অপরাপর বহু ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়। বস্তুতঃ, পূর্ব্বে মারণাস্ত্র অপেক্ষা যুদ্ধে ব্যাধি অনেক বেশী সংখ্যক লোকের প্রাণনাশের হেতু হইত। সদ্য-সমাপ্ত মহাযুদ্ধেও মিত্রশক্তির সমর বিভাগে কৃষ্ণসাগর হইতে বাল্টিক সাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র টাইফাস জ্বরের সংবাদ এবং সেই সঙ্গে ধৃত জার্মান সৈন্যগণের নিকট এক প্রকার উকুনধ্বংসী চূর্ণের (powder) পরিচয় পাওয়া যাইতে লাগিল। ঐ চূর্ণ কিন্তু পরীক্ষায় প্রায় অকর্ম্মণ্য প্রমাণিত হইল।

এই জনপদ-বিধ্বংসী টাইফাস রোগের গতিরোধ করিতে না পারিলে যুদ্ধজয়ের আশা সুদূর-পরাহত। সুতরাং তৎকালীন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বস্তু একটি সবিশেষ কার্য্যকরী উকুনধ্বংসী পদার্থের অভাব বিশেষ ভাবে অনুভূত হইতে লাগিল। অতএব আমেরিকার ওরল্যাণ্ডো (Orlando) রসায়নাগারে গেসারল পৌঁছিবা মাত্র ইহা উকুন বিনাশে সমর্থ কি না তাহার পরীক্ষা চলিল। প্রমাণিত হইল ইহা অতি উৎকৃষ্ট উকুনধ্বংসী। তথাকার রাসায়নিকগণ তখন গেসারলের প্রধান উপাদানের সন্ধানে লাগিয়া গেলেন এবং অল্প দিনের মধ্যেই ইহার উকুনধ্বংসী প্রধান উপাদান ডি ডি টি নিষ্কাশণ ও প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। উপযুক্ত সময়ে এই বিশিষ্ট উকুনধ্বংসীর ব্যবহার মিত্রশক্তির যুদ্ধকার্যে ব্যবহৃত হইয়া তাহাদের বিজয়ের পথ সুগম করিয়া দিল। আমেরিকায় সুইস কোম্পানীর গেসারল চূর্ণ পৌঁছিবার ছয় মাসের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে ডি ডি টি প্রস্তুত হইতে লাগিল। স্বাভাবিক সময়ে রসায়নাগারে কোন রাসায়নিক পদার্থ আবিষ্কার হইবার পর তাহার গুণাবলী পরীক্ষিত হইয়া সাধারণের ব্যবহার উপযোগী

হইতে অন্ততঃ তিন বৎসর, কখনও কখনও দশ বৎসর সময়ও লাগিয়া থাকে। যেমন ইংলণ্ডেই গতানুগতিক ধারায় ডি ডি টি গবেষণা চালাইয়া দুই বৎসর পরেও আমেরিকার সহিত তুলনা করা যাইবার মত কোন উৎকৃষ্ট পদার্থ বাহির হয় নাই। আমেরিকায় দ্রুত কার্যকরী বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞান (technique) এবং রাসায়নিক কীট-বিশারদ (entomologist) ও ঔষধ প্রস্তুতকারকগণের সমবেত অধ্যবসায়ে (team work) ইহা সম্ভব হইয়াছিল।

পরীক্ষা কালে ওরল্যাণ্ডো বীক্ষণাগারের গবেষকগণ ডি ডি টির ০'৫ পারসেণ্ট (শতকরা অর্ধ ভাগ) দ্রব জামার আস্তিনে লাগাইয়া দিলেন, জনৈক গবেষক এই আস্তিন পরিধান করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ এই আস্তিনের ভিতর উকুন ছাড়িয়া দেওয়া হইতে লাগিল, প্রতি পরবর্তী প্রাতঃকালেই দেখা যাইতে লাগিল যে, গত দিনের ছাড়া উকুনগুলি সবই মরিয়া গিয়াছে। ৪৫ দিন পরেও দেখা গেল, সেই এক দিন মাত্র লাগান ডি ডি টি, ছাড়িয়া দেওয়া প্রতিটি উকুনই মারিয়া ফেলিতেছে। পরম আশ্চর্যের বিষয় V-E দিবসে ৫৫৩ দিন পরেও সেই একবার লাগান শতকরা অর্ধ ভাগ ডি ডি টি দ্রব সমভাবে উকুন ধ্বংস করিতেছিল।

উকুনের উপর পরীক্ষার পরই ওরল্যাণ্ডোর কীট-বিশারদগণ মক্ষি (flea) মাছি, ছারপোকা, আরশুলা ও মশার উপর ডি ডি টির কার্যকারিতার বিষয় পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯৪৩ খৃঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে একটি বিছানায় ডি ডি টি স্প্রে (spray) করিয়া ছিটাইয়া দেওয়া হইল, এবং প্রতি শনিবার উহাতে কতকগুলি করিয়া ছারপোকা ছাড়া হইতে লাগিল। দেখা গেল, ছারপোকাগুলি সমস্তই মরিয়া যাইতেছে। ষোল মাস পর্যন্ত এই ভাবে পরীক্ষা করিয়া অবশেষে গবেষকগণ উহাতে ছারপোকা জন্মাইবার আশা ছাড়িয়া দিলেন

ঐ বৎসরই বসন্ত কালে নিকটবর্তী শস্যাগারে মাছির উপর পরীক্ষা চলিল। একবার মাত্র ডি ডি টি প্রয়োগে শতকরা ৯৫টি মাছি ধ্বংস হইল এবং সমস্ত গ্রীষ্ম কাল একরূপ প্রায় মাছি-শূন্যই রহিয়া গেল। মক্ষি (flee) ও মশকের উপর পরীক্ষাও অনুরূপ সুফল প্রসব করিল। গবেষণাগারের সহকারী ডাইরেক্টার মহাশয়ের রন্ধনশালা আরশুলার একটি স্থায়ী আশ্রয়স্থল ছিল। ডি ডি টি প্রয়োগে তিনি এই অবাঞ্ছিত অতিথিগণ হইতে তাঁহার গৃহ অচিরে মুক্ত করিতে সমর্থ হইলেন।

প্রাথমিক পরীক্ষাতেই ইহার তিনটি অসাধারণ ধর্মের পরিচয় পাওয়া যায়—(১) ইহার পূর্ব-প্রচলিত যে কোন কীটঘ্ন পদার্থ অপেক্ষা অনেক বেশী প্রকার কীট বিনাশের ক্ষমতা, (২) ইহার কীট বিনাশের শক্তির প্রচণ্ডতা, (৩) ইহার ক্রিয়ার অভূতপূর্ব দীর্ঘস্থায়িত্ব। ইহার অসুবিধা—প্রথমতঃ, ইহা তৎক্ষণাৎ অর্থাৎ প্রয়োগ মাত্র কীটের মৃত্যু ঘটায় না—কীটের শ্রেণী অনুসারে বিনাশে ১৫ মিনিট হইতে কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। ইহা কীটের নার্ভের উপর ক্রিয়া করে বলিয়া বিনাশে বিলম্ব হয়, অন্যান্য কীটঘ্ন শ্বাস-প্রশ্বাস অথবা পরিপাক-যন্ত্রের উপর ক্রিয়া করায় মৃত্যু ঘটে শীঘ্র। ম্যালেরিয়া জীবাণুদুষ্ট মশক ডি ডি টি প্রয়োগের পর মরিবার পূর্বেই দংশন করিয়া জীবাণু মানুষের শরীরে সংক্রামিত করিয়া যাইতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, ইহা কীট-নিরোধক বা বিকর্ষক (repellent নহে অর্থাৎ ইহা লাগাইয়া রাখিলে তাহার ফলে সেখানে কীটের আগমন বন্ধ হয় না যদিও সংস্পর্শে আসিলে মরিয়া যায়। তৃতীয়তঃ, ইহা কীটের ডিম নষ্ট করিতে পারে না ও পিশু (tick) জাতীয় জীবের উপর ইহার কোন ক্রিয়া নাই। পক্ষান্তরে, ইহা অন্য কয়েকটি জীবের উপর অবাঞ্ছিত বিষক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহা পক্ষী, মাছ, সাপ ও ব্যাঙের পক্ষে বিশেষ অনিষ্টকর। মানুষের গাত্রচর্মে ইহার চূর্ণ প্রয়োগে কোন অনিষ্ট হয় না কিন্তু ইহার তৈল দ্রব জন্তুর গাত্রে ব্যবহার করিয়া বিষক্রিয়া লক্ষিত হইয়াছে। এখন পর্যন্ত মানুষের রোগবীজবাহী সর্বপ্রকার কীটের উপর ইহার ক্রিয়া অমোঘ ও অব্যর্থ।

পাইরিথ্রাম পুষ্পের নির্যাস বহু প্রকার কীট আশু বিনাশ করে। ডি ডি টির বিলম্বে কার্যকারিতা দোষ পাইরিথ্রাম পুষ্পের নির্যাস মিশাইয়া দূর করা হইয়াছে। মার্কিট (বেঙ্গল কেমিক্যাল) ফ্লিট প্রভৃতি পূর্ব-প্রচলিত কীটঘ্ন পদার্থগুলি কেরোসিন তৈলের সহিত পাইরিথ্রাম নির্যাস মিশাইয়া প্রস্তুত। এই সকল পদার্থ ঘরগুলি স্প্রে (spray) করিয়া ছিটাইয়া দিলে মশকাদি কীট সঙ্গে সঙ্গেই (১০ মিনিটে) মরিয়া যায়, কিন্তু ইহার ক্রিয়া স্থায়ী না হওয়ায় জানালা খুলিয়া দিবার অল্প কাল পরেই মশকাদি পুনরায় নিরাপদে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ম্যালেরিয়া দূরীকরণ জন্য বহু কাল যাবৎ জল-নিকাশের সুবন্দোবস্ত প্রভৃতি ব্যয়সাধ্য ইঞ্জিনিয়ারিং পরিকল্পনা দ্বারা মশকের জন্ম নিবারণ ও অনেক প্রকার কীটঘ্ন ঔষধ প্রয়োগে মশকের শূক কীট (larva) বিনাশের ব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। পাইরিথ্রাম নির্যাসের পূর্ণবয়স্ক মশক ও অন্যান্য কীট বিনাশের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়ার পর প্রতি সপ্তাহে ম্যালেরিয়াগ্রস্ত অঞ্চলে প্রতি গৃহে দুই-তিন বার ইহার কেরোসিন তৈল দ্রব স্প্রে করিয়া পূর্ণবয়স্ক (adult) মশক মারিয়া ফেলিয়া ম্যালেরিয়া দমন অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হইয়াছিল। ডি ডি টি ইহা আরও সুগম ও সুলভ করিয়া দিয়াছে।

মশা-মাছি প্রভৃতি বিনাশের জন্য প্রচলিত এই স্প্রে করিবার সাধারণ পদার্থগুলির (Markit, Flit প্রভৃতি) মূল উপাদান পাইরিথ্রাম ফুলের শতকরা ৯৫ অংশ জন্মে ফরমোসা দ্বীপ ও চীন দেশের উপকূল অঞ্চলে। যুদ্ধের সময় ঐ সমস্ত দেশ জাপানের অধিকারে থাকায় বিশেষ অসুবিধা ঘটিয়াছিল। যুগোশ্লাভিয়াতেও এ ফুল কিছু জন্মিত কিন্তু তাহাও জার্মানগণ নষ্ট করিয়া দিয়াছিল। আফ্রিকার কেনিয়ায় ইহার চাষ সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে। জাপানী ফুল অপেক্ষা কেনিয়া-জাত ফুলে মূল উপাদান পাইরিথ্রাম (Pyrethrim) বেশী পাওয়া যায়। ভারতবর্ষেরও বহু স্থানে ইহার আবাদ হইতে পারে। ভারত জাত ফুল জাপানী ফুল অপেক্ষা বেশী পাইরিথ্রাম প্রদান করে, যদিও এ বিষয়ে কেনিয়ার ফুল সর্বশ্রেষ্ঠ। সরকারী চেষ্টায় সিনকোনা আবাদের মত ইহারও প্রচুর আবাদের প্রয়োজন আছে। ভারতবর্ষে দেশের প্রয়োজনীয় সমস্ত কুইনিনই সুলভে প্রস্তুত হইতে পারিত। কিন্তু যবদ্বীপের ওলন্দাজ কোম্পানীগুলির স্বার্থের খাতিরে এ দেশের ব্রিটিশ সরকার সিনকোনা আবাদের যথেষ্ট প্রসার হইতে দেয় নাই। অধিকন্তু ওলন্দাজ উৎপাদকগণের প্রতিযোগিতার সুবিধার জন্য সরকারী আবাদে যে কুইনিনের উৎপাদন-ব্যয় পড়িত ৬৲ টাকা তাহাই জনসাধারণের নিকট হইতে বিক্রীত ১৮৲ টাকায়। বর্তমান কালে ম্যালেরিয়ার atobrine (অ্যাটোব্রিন) জাতীয় ঔষধ সুলভ হইবার ফলে কুইনিনের চাহিদা অপেক্ষাকৃত কম হওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু

পাইরিথ্রাম পুষ্পের প্রয়োজন যথেষ্ট। সুতরাং ইহার চাষে অবিলম্বে প্রবল সরকারী প্রয়াস প্রয়োজন।

ডি ডি টির কয়েকটি পরীক্ষা

১৯৪৪ খৃঃ অব্দের মে মাসে ওরল্যাণ্ডো (Orlando) বীক্ষণাগার হইতে অত্যধিক মশক-অধ্যুষিত আরকানসাসের ষ্টাটগার্ট (Stuttgart) অঞ্চলে এক দল কর্মী পাঠান হয়। ইহারা ১৮ বর্গ-মাইল স্থানের প্রত্যেক গৃহে স্প্রে (spray) দ্বারা ডি ডি টি প্রয়োগ করেন। ঐ অঞ্চলে পরীক্ষাধীন স্থানের বাহিরে প্রতিদিন প্রতি গৃহে যখন গড়ে ৩০১টি মশক পাওয়া যাইতেছিল তখন ডি ডি টি প্রযুক্ত গৃহগুলিতে গড়ে মাত্র তিনটি মশা দেখা গেল। একবার মাত্র প্রয়োগে ৫ মাস কাল পরীক্ষাধীন অঞ্চলের গৃহগুলি প্রায় মশকশূন্য রহিল। এই পরীক্ষায় মাত্র ২৩০ পাউণ্ড ডি ডি টির কেরোসিন দ্রব প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে যেখানে কেবল মাত্র গ্রীষ্ম ঋতুতেই মশকের প্রাদুর্ভাব সেখানে বৎসরে একবার ও গ্রীষ্মমণ্ডলে দুই বার প্রয়োগ প্রয়োজন।

১৯৪৪এর এপ্রিল মাসে এক দল কর্মী পানামার জঙ্গলে এরোপ্লেন হইতে ডি ডি টি ছড়াইয়া মশক-ধ্বংসের পরীক্ষায় প্রেরিত হন। পরীক্ষার পূর্বে কর্মী দল দীর্ঘ দুই রাত্রি জঙ্গলে কাটাইয়া দেখিলেন, গড়ে প্রত্যেককে প্রতি মিনিটে ৩৫ বার মশকে দংশন করে। তৃতীয় দিন প্রাতে ৫০ একর পরিমিত স্থানে এরোপ্লেন হইতে ডি ডি টি ছড়ান হইল। তৃতীয় রাত্রি হইতে পরীক্ষার এক সপ্তাহ কাল পর্যন্ত প্রতি রাত্রে গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তিকে ৪ মিনিটে একবার মাত্র মশায় কামড়াইয়াছিল।

কীটের উপদ্রব নিবারণের জন্য বিমানের ব্যবহার প্রথম হয় ১৯২৩ খৃঃ অব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের দক্ষিণ অঞ্চলে। তখন কেবল পতঙ্গের শূককীট (larva) ধ্বংসের কাজেই বিমান ব্যবহৃত হইয়াছিল রোটিনন (Rotenone) পাইরিথ্রাম, প্যারিসগ্রীণ প্রভৃতি কয়েক প্রকার শূক-কীটঘ্ন (larvicide) পদার্থ এই ভাবে ব্যবহার করিয়া আশানুরূপ সুফল না পাওয়ায় তৎকালে বিমান সাহায্যে পূর্ণবয়স্ক মশক ধ্বংস অসম্ভব বিবেচিত হইয়াছিল।

কীটঘ্ন ঔষধ দ্বারা মশক ধ্বংসের ইতিহাস তিন যুগে ভাগ করা যাইতে পারে। প্রথম ১৯০০ হইতে ১৯২৩ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত কেরোসিন তৈল যুগ; ১৯২৩ হইতে ১৯৪৩ পর্যন্ত রোটিনন (Rotenone), প্যারিসগ্রীণ, পাইরিথ্রাম যুগ এবং ১৯৪৩ হইতে ডি ডি টি যুগ। পাইরিথ্রাম ব্যতীত অপর সকল কীটঘ্ন পদার্থ ব্যবহৃত হইত কেবলমাত্র মশার শূক-কীট ধ্বংসের জন্য। পাইরিথ্রাম শূক কীট ও পূর্ণবয়স্ক উভয় প্রকার মশকই ধ্বংস করিতে পারে। এক একর পরিমিত স্থানে স্প্রে করিয়া কেরোসিন ছিটাইতে প্রায় ৩০ হইতে ৫০ গ্যালন তেলের দরকার; এই ভার বিমানে বহন অত্যধিক ব্যয়-সাপেক্ষ। কিন্তু মাত্র দুই বোতল ৫% ডি ডি টি দ্রব এই কার্য্যের জন্য যথেষ্ট।

প্রসঙ্গতঃ মশকের জীবন-ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করা প্রয়োজন মনে করি। মশার জীবনে চারি অধ্যায়—ডিম, শূক-কীট, মূক-কীট ও পূর্ণবয়স্ক অবস্থা। মশকী জলে ডিম পাড়ে, ডিম হইতে বাহির হয় এক প্রকার সরু লম্বা সতত সঞ্চরণশীল পোকা। বর্ষায় সামান্য জল কোন গর্তে অথবা পরিত্যক্ত পাত্রে সঞ্চিত থাকিলে তাহাতে এক প্রকার পোকা জন্মিতে সকলেই দেখিয়াছেন। এই পোকাই মশকের শূক-কীট। কয়েক দিন মধ্যে এই শূক-কীটের গতি বন্ধ হইয়া এবং একটি পাতলা বেষ্টনীর মধ্যে ইহা আবদ্ধ হইয়া পড়ে; খোসার মধ্যে আবদ্ধ এই গতিহীন অবস্থার নাম মূক-কীট। আবরণ-যুক্ত মূক-কীট জলে ভাসিতে থাকে। শেষ অধ্যায়ে পূর্ণবয়স্ক পাখা-যুক্ত মশক মূক-কীটের আবরণ ভেদ করিয়া কিছুক্ষণ ভাসমান খোসার উপর বসিয়া পাখা শুষ্ক করিয়া লয় এবং জন্মস্থান জল ত্যাগ করিয়া উড়িয়া যায়। কেবল মাত্র মশকীই দংশন করে, মশক নিরামিষাশী।

যুদ্ধজয়ে ডি ডি টির ব্যবহার

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উকুন-বাহিত টাইফাস জ্বর যুদ্ধকালে প্রায় জনপদধ্বংসিরূপে দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধে এ রোগে রাশিয়ার প্রায় ৫০ লক্ষ লোক ধ্বংস হয়। ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে নেপল্‌স্ নগরে টাইফাসের প্রাদুর্ভাব হইল।—৮০ জন রোগী ইতিমধ্যেই হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছে এবং দৈনিক প্রায় ৫০০ নূতন আক্রমণের আশঙ্কা করা যাইতেছে। এমন সময় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের টাইফাস কমিশন ডি ডি টি চূর্ণ লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। নেপল্‌সের তিন লক্ষ অধিবাসীর পরিচ্ছদে ডি ডি টি চূর্ণ প্রয়োগ করা হইল। ডি ডি টি অচিরে নেপল্‌সের সমস্ত উকুন ধ্বংস করিয়া টাইফাস মহামারীর গতি-রোধ করিয়া দিল। জগতের ইতিহাসে এই মহামারীর গতিরোধ এই প্রথম।

১৯৪৪ খৃঃ অব্দের আগষ্ট মাসে আমেরিকার সাইপন দ্বীপ আক্রমণের পূর্বে বিমান হইতে ঐ দ্বীপে ডি ডি টি ছড়ান হইল। সেখানে পূর্বে পতঙ্গের এত আধিক্য ছিল যে, তাহাদের ভিতর দিয়া দৃষ্টি চলিত না বলা চলে। স্প্রে করিবার পূর্বে ডেঙ্গু জ্বরবাহী ঈডিস ইজিপটাই (Aedes egypti) জাতীয় মশকের অত্যধিক প্রাদুর্ভাব থাকায় ঐ দ্বীপ ডেঙ্গু জ্বরের আকর ছিল। ডি ডি টি প্রয়োগে সমস্ত কীট ধ্বংস হইয়া দ্বীপ এই সকল রোগশূন্য হইল।

সাইপন দ্বীপের পতঙ্গ ধ্বংসের তিন মাস পরে হাজার হাজার গ্যালন ডি ডি টি দ্রব ব্রহ্ম যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হইল। সামরিক অভিযানের অগ্রে বিমান হইতে ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে ডি ডি টি ছড়াইয়া মশককুল ধ্বংস করা হইল। ফলে অভিযানকারিগণের মধ্যে ম্যালেরিয়া প্রায় দেখা যায় নাই। এই ভাবে ব্রহ্মদেশের জঙ্গল মশকশূন্য করিতে না পারিলে ব্রহ্ম-অভিযান অত্যন্ত লোকক্ষয়কর হইয়া সাফল্য বহু বিলম্বিত হইয়া যাইত।

ডি ডি টি এখন বেসামরিক অধিবাসিগণের মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া জগতের বিশেষতঃ গ্রীষ্মমণ্ডলের বহু প্রকার ব্যাধি নির্মূল করিতে সমর্থ হইবে। মশক ধ্বংসে ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, ডেঙ্গু ও ফাইলেরিয়া; স্যাণ্ডফ্লাই (Sand fly) ধ্বংসে কালাজ্বর; উকুন ধ্বংসে টাইফাস ও relapsing fever এবং ইন্দুর-মক্ষির বিলোপে প্লেগ অদূর ভবিষ্যতে বিদায় গ্রহণ করিবে। মাছির উপদ্রব দূর হইলে কলেরা, টাইফয়েড, আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব বহু পরিমাণে কমিয়া যাইবে।*

* তথ্য প্রধানতঃ United States Information Service প্রচারিত 'The war to save lives, Sec, I' নামক প্রচার-পত্র হইতে গৃহীত।

গাঁয়ের পূজো

১৩৫৩

শ্রীশান্তি পাল

রাতুল চরণে রক্তের ছিটা অপরূপ রূপ মা'র,
গলায় দুলিছে নৃমুণ্ড-মালা গেছে গজমোতি হার।
মায়ের ভয়াল করাল রূপের তুলনা কি দিব ভাই,
রূপের জ্বালায় দিগ্‌ দিগন্ত পুড়িয়া হ'তেছে ছাই।
কোমলে-কঠোরে রুদ্রে-মধুরে অপূর্ব্ব সমাবেশ,
সারাটি আঙিনা ঝলমলে নব জীবনের উন্মেষ!
পূজা-প্রাঙ্গণে জমিয়াছে ভিড়, জুটেছে ছেলের দল,
পূজারী-পাণ্ডা ঢুলী-ঢালী-মালী করিতেছে কোলাহল।
অদূরে বেদীর মূলে—
মঙ্গল-ঘট বসায়ে থ'য়েছে, আম-পল্লব দুলে।
এরি এক কিনারায়,—
পল্লীর কবি বসিয়া বসিয়া মা'র আগমনী গায়।
জাগো রুদ্রাণি জাগো,—
মানুষের এই অপমান আর কত বল স'ব মা গো।
বোধন-শঙ্খ বাজে,—
প্রাণের প্রদীপ জ্বালাও এয়োরা আঁধার ঘরের মাঝে।
অয়ি চণ্ডি দশভুজে করজোড়ে ভক্ত পূজে
ভব-মাঝে এস ভগবতী,
আশ্বিনে বোধন পেয়ে শুভ লগ্ন তিথি যে এ
কেন অন্যরূপা হও সতি?
সিংহেরে বাহন ক'রে কার্ত্তিক-গণেশ ক্রোড়ে
ডানে-বাঁয়ে লক্ষ্মী সরস্বতী
জয়া ও বিজয়া সঙ্গে চামর ঢুলাক রঙ্গে
পদ-নিম্নে থাক দৈত্যপতি।

কুশ-কাশ ফুলে ঘেরা—
পল্লীমায়ের কুটীর আমার রাজপ্রাসাদের সেরা।
শাপ্‌লা ফুটেছে শালুক ফুটেছে ফুটেছে শেফালি ফুল,
শারদ আকাশ থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া সে বেয়াকুল,
আজিকে আশিনে গাঁয়ের মেয়েরা উদাস নয়নে চায়,
শাড়ির আঁচল কাঁকনে বাজিয়া লুটিয়া পড়ে না পায়।
যে দিকে তাকাই শ্মশানের চিতা জ্বলে দাউ-দাউ করে,—
পাঁজর ভেদিয়া ওঠে হাহাকার পল্লীর ঘরে ঘরে।
চারি দিকে বহে রক্তের স্রোত, সতীর আর্ত্তনাদ,
মারী ও অকাল বন্যার কোপ বাদ ও বিসম্বাদ।
নগ্ন আর্ত্ত ক্ষুধিতের শুনি চাপা কান্নার রোল,
তা'রি মাঝে বাজে কাঁসর-ঘণ্টা উদ্দাম ঢাক-ঢোল।
বাসুদেবপুর গাঁয়ে,—
হোগলা-ঘাসের মণ্ডপ-ঘেরা বকুল তলের ছায়ে।
রণরঙ্গিণী সাজে,—
চণ্ডনাশিনী চণ্ডী ব'সেছে ধ্বংসের স্তূপ-মাঝে।

সপ্তমী তিথি আজ,—
অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষা লও গো ফেলিয়া সকল কাজ।
মায়ের ভক্ত যে আছ যেথায় এস এ বেদীর মূলে,
রক্ত জবার মালা দাও গলে, অতসী চাঁচর চুলে।
অষ্টমী নিশি এলে,—
সন্ধিপূজার ক'রো আয়োজন মেদের মশাল জ্বেলে।
ধূপ-চন্দনে ধুনার ধোঁয়ায় ভরিয়া আঙিনা-তল,
মায়ের চরণে নিবেদিয়ো ছিঁড়ি রক্তিম শতদল।
মহানবমীর পরে,—
ভৈরব ভেরী বাজিয়া উঠিল, ভৈঁরোয় তান ধরে।
মা-মেনকা ভাসি' 'নয়নের জলে মৈনাকে ডাকি' কয়,—
'শক্তিশেলের আঘাত হানিয়া শক্তির কর লয়।
বাঁধন ছেঁড়ার সময় এসেছে নিদেশ পেয়েছি মা'র,
আগুনের বুকে ঝাঁপাইয়া পড় ঘুমায়ে থেকো না আর।
শান্তির বাণী শুনিয়া শুনিয়া পচিয়া গিয়াছে কান,
ঝড় ও ঝাপ্‌টা যেথায় বহিছে সেথা হও আগুয়ান।

বিজয়া দশমী ওই এল

উদয় অচলে রবি　　উমার মুখের ছবি

মরমে উদিত তাই ভেল।

কহিলেন শূলপাণি　　কোথা নন্দী? শোন্ বাণী,—

বৃষেরে সাজায়ে হেথা আন্.

মহামায়া যেতে চায়　　মর্ত্ত্যে পূজা হ'ল সায়

তম সব হ'ল অবসান।

সুন্দর মনোহর,—

মাথায় মুকুট পরেছে গৌরী বসন পীতাম্বর।

যাবুক চিহ্ন এঁকেছে দু'পায় নিন্দে রবির করে,

কবচ-কেয়ুর কঙ্কন তাড় প'রেছে বাহুর 'পরে।

দু'হাতে প'রেছে দু'টি রাঙা শাঁখা তা'পরে সোনার বালা,

সীঁথের সিঁদুরে ললাটের টিপে ঠিকরে তড়িৎ জ্বালা।

গজমোতি হার গলায় প'রেছে নাসায় মুকুতা দোলে,

কটিতে মেখলা চরণে উতলা কিঙ্কিণী কত বোলে।

ভুবনমোহন রূপ　　নয়নে অমিয় কূপ

ভ্রমর-ভ্রমরী লোভে ধায়,

হেরি রূপ মনোহর　　ভাবমগ্ন হ'ল হর

শবে যেন প্রাণ ফিরে পায়।

ললাটে চন্দন-বিন্দু　　লজ্জা পেয়ে অর্দ্ধ-ইন্দু

লুকাইতে চায় যেন মেঘে,

সাজনি হয়েছে ভাল　　দশমী লেগেছে কাল

চলে কাল অতি দ্রুতবেগে।

এই কি মা পরিণাম　　কোথা যাস্ ছাড়ি ধাম?

মেনকা মেয়েরে ডেকে বলে,—

কোলে করি তুলে ধরে　　চুমে চাঁদ মুখোপরে

নেত্রযুগে অশ্রু ছলছলে।

দুর্গা দুর্গা করে প্রাণ　　সদা করে আনচান,

কেন বাছা মা'কে ছেড়ে যাস্?

মা বলে মা আয় কোলে　　সব দুঃখ যাক্ চ'লে

একবার চাঁদমুখে হাস্!

মা'র কথা শুনি উমা　　কেঁদে কহে পূর্ণভূমা

আসিব মা পুন হেথা চলে,

গৌরী লয়ে গঙ্গাধর　　উঠে বসে বৃষোপর

ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি ব'লে।

আঁচলের খুঁট নিয়ে—

মায়ের চরণ-ধুলায় মুছিয়া আপন মাথায় দিয়ে;

গাঁয়ের মেয়েরা মাতিয়া উঠিল সিঁদুর-খেলায় সব,

চারি দিকে পড়ে শাঁক ও জোকার, এয়োতীর উৎসব।

আঙুল ঘুরায়ে বরণ করিছে ঘৃতের প্রদীপ জ্বালি,

ললাটে ঠেকায়ে প্রণতি জানায়, খুইয়া অর্ঘ্য-থালি,

আবার এস মা জগত্তারিণি মোদের পল্লী-মাঝে,

শক্তিরূপিণী শক্তি দাও মা মোদের সকল কাজে।

মরণ-জয়ের রঙীন নেশায় পাগল কর মা আজ

তোমার প্রসাদে শক্তিহীনের ঘুচুক বেদনা লাজ।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

গুঞ্জের মত দ্রুতগতিতে রটে গেল খবরটা।

সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠলো। শাড়ীর খসখসানি, কঙ্কণের কাঁপন আর চুড়ির চূর্ণ শব্দে ঘরের বাতাস যেন চমকে উঠলো। প্রসাধিত সুন্দর মুখের ওপর আশা-আশঙ্কার ছাপ পড়লো, চোখে নামলো ঔৎসুক্যের ঔজ্জ্বল্য।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সমীরণ আসবে বলেই আজকের এই বিশিষ্ট পরিচ্ছন্নতা, এই রঙের বৈচিত্র্য, এই আলোর উচ্ছি।

অসংখ্য মেয়ে, আর অজস্র তাদের টুকরো টুকরো মিষ্টি কথালাপের কাকলীতে ঘরের চেরাগও চঞ্চল।

আলোয় আলোকিত সারা ঘর।

ছোট ছোট টেবিল আর চেয়ার পড়েছে অনেকগুলি।

এখানে ওখানে সুগন্ধি এসেন্সের আমেজ।

ঘুট-ঘুট করে উঁচু হিল জুতোর ছন্দ বাজিয়ে চায়ের ট্রে হাতে ঘুরে বেড়ায় এ ও সে। শাড়ীর আঁচল ঠিক্ করে কেউ। রঙিন রুমালে ঘাম মোছে কাঁধ আর বুকের। কসমস নাড়াচাড়া করে। কেউ বা ভ্যানিটি থেকে বের করে ক্ষুদে আয়না আর রাঙের চাকতি। ঠোঁটের লালিমা কি উজ্জ্বল আছে?

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সমীরণ না এলে আজকের এই চায়ের আসর মাটি হয়ে যাবে যে?

সমীরণকে ঘিরেই তো এই অজস্রতা, এই আতিশয্য, এই চঞ্চল উদ্দীপনা। এখানে আর ওখানে আর সেখানে। এ পাড়ায় আর ও-পাড়ায় আর বে-পাড়ায় যত পরিচিত মেয়ের দল এসে জুটেছে আজ এই চায়ের আসরে। শুধু কি মেয়েরাই? না, দু'-চার জন পুরুষও এসেছে তাদের গৃহিণীদের সঙ্গে। এসেছে বন্ধু আর বন্ধু-ভ্রাতার দল। কিন্তু তারা সংখ্যায় অল্প তাই তাদের মুখগুলো চোখে পড়ছে না। সাবানের ফেনার মধ্যে কোথায় দু'-একটা শিশু বুদ্বুদ্। কার চোখে পড়ে?

অনেক মেয়ে, অনেক রঙ, অনেক রঙ্গ।

অনেক অনেক তরুণী-মুখের হাসির হঠকারিতা।

পাখার বাতাসে রেশমী শাড়ীর আঁচল খসে পড়ে। কিন্তু পাখার বাতাস তো ঝড় নয়, রেশমী শাড়ীর আঁচল কি এতই হাল্কা? তবু, রেশমী শাড়ীর আঁচল খসে পড়ে। ক্ষণে ক্ষণে ব্যস্ত-ত্রস্ত হয়ে ওঠে যুবতী মেয়ের দল। শাড়ী সামলায়। ব্লাউজের হাতাটা কি গুটিয়ে গেছে? গলার হারনা কি আঙিয়ার আড়ালে পড়েছে? না, বড্ড জমাট বাতাস, ঘরটা গুমোট গন্ধে অসহ্য হয়ে উঠেছে। মালতী, বাড়িতে তোর কি একটু এসেন্স নেই? এ কি, দিদি? ওটা আবার এসেন্স না কি, তার চেয়ে স্নান করে আসছি আমি, জলটা এনে ছিটিয়ে দে। কোটি নেই? ইভনিং ইন প্যারিস? ফ্যাসেস অফ রোজেজ? গেঁয়ো পিসীমাকে সরা, ভিজে মুড়ির মত চুপসে যাচ্ছিস্ যেন দিনকে দিন। গালে রক্ত না থাক, রুজ তো আছে বাজারে। হাঁ রে প্রশ্মি, ঠোঁট দুটো যে তোর পচা পানের মত ফ্যাকাসে হয়ে যাচ্ছে। লিপ্তির দামটা কি আজ-কাল খুব বেশী মনে হচ্ছে না কি? সুকুমারকে বললেই পারিস। পয়সা খরচ না করে মেয়ের মন পেতে চায় না কি ও?

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সকলেই চঞ্চল হয়ে ওঠে, চকিত চোখে তাকায় দোরের দিকে।

শাড়ী খসখস করে ওঠে, কঙ্কণ ককিয়ে ওঠে, চুড়ির চূর্ণ আওয়াজ দোল খায় ঘরের বাতাসে। উৎসুক চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আলোর ওয়াটটা যেন হঠাৎ বেড়ে যায়। অসংখ্য মেয়ে, আর অজস্র তাদের কথালাপের কাকলীতে মুখর হয়ে ওঠে নিস্তরঙ্গ চায়ের আসর।

পেয়ালা পীরিচে ঠুন-ঠুন আওয়াজ হয়। অধীরতায় পা দোলাতে থাকে কেউ কেউ। ওদিকে কে যেন চামচে দিয়ে চায়ের কাপে জল-তরঙ্গের মিঠে বোল ফোটাবার চেষ্টা করছে।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

সমীরণ না এলে আজকের এই সযত্নে-গড়া চায়ের আসর, অনেক অনেক পরিশ্রমের প্রান্তি ব্যর্থ হয়ে যাবে যে।

কিন্তু, সমীরণকে এরা কেউ দেখেনি। এক মালতী ছাড়া।

মালতীই আজ নিমন্ত্রণ করেছে সকলকে, আর বিশেষ করে সমীরণকে। কারণ, এরা সবাই তো এসেছে সমীরণকে দেখতে।

সমীরণ রায়।

এতগুলি মেয়ের চঞ্চল হবার কি আছে। বয়সে সমীরণের চেয়ে ছোট কেউ আছে না কি? প্রেমে পড়তে বা প্রেম করতে যে বয়স প্রয়োজন সে বয়স কি হয়েছে সমীরণের?

আঠারো বছর বয়স সমীরণের।

তাই না কি? একেবারে শিশু? গোঁফ গজায়নি এখনো।

গজালেও তো শেভ করে আসতে বলতিস্। তা না হ'লে বলতিস্ ইনডিসেন্ট!

কি করে?

কেউ কি জানে সে খবর। কি বা দরকার জানার। হ্যাঁ, দরকার আছে বৈ কী। রেজাল্ট কেমন, কোন্ ইয়ারে।

পড়াশুনোয় ইতি?

রেবার কথা ভাবছিলুম।

পাইলট? সে কি? এত কম বয়সে।

হ্যাঁ, সমীরণ রায় হাওয়াই জাহাজের পাইলট। অদ্ভুত ডাইভ দিতে পারে। না, সিভিল য্যাভিয়েশনে। আজ করাচী কাল লক্ষ্ণৌ। কোলকাতা? কালে-ভদ্রে আসে বৈ কী, এই যেমন আজ এসেছে। আবার কালই না কি যাচ্ছে এলাহাবাদ।

আসতে কি চায়, তিন-তিন বার মালতীকে যেতে হয়েছে, আবার ধরে আনতে পাঠাতে হয়েছে সুশোভনকে।

এই বয়সে অমন একটা সায়েন্স জানলো কি করে? কে জানে। বেনারসে কোন এক সাধুবাবা, না না, বদ্রিকাশ্রমে কালিকমলির চটিতে, দূর্, রামেশ্বরমের শঙ্করাচার্য্যের বর্ত্তমান শিষ্যের কাছে।

মালতী জানে। মালতী, মালতী। না মালতী জানে না। বলতে কি চায়। এত করে জিগ্যেস্ করি বলে না কিছুতেই।

হাত? হাতের রেখা-টেখা নিয়ে কারবার নয় ওর। স্রেফ তোমার কপালের দিকে চেয়ে বলে দেবে। যা খুশী বলবে, বাড়তি একটা কথা জিগ্যেস করো, বলবে না।

সাবধান। লজ্জা-সরম নেই। মুখের সামনে যা-তা বলে বসবে, অবশ্য যা সত্যি তাই। পারফেক্ট্ ক্যারেক্ট টু দি পয়েন্ট। লুকোনো টুকোনো গোপন কিছু দোষ-ত্রুটি যদি থাকে, সরে পড়ো এখনি।

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

চঞ্চল হয়ে উঠলো সকলে। শাড়ী খস-খস করলো, চেয়ারে-টেবিলে ধাক্কা খেলো, পীরিচ ভাঙলো, পেয়ালা গুলটালো।

হর্ণ বেজেছে! সুশোভনের গাড়ী পৌঁছে গেল।

এসেছে, এসেছে।

আসবে বৈ কী। ও না এলে যে এ চায়ের আসর সার্থক হয়ে উঠতে পেত না। এই আলোর আতিশয্য কি মিইয়ে যেত না ও না এলে? অগুরু অডিকোলোনের আমেজ কি থাকতো এতখানি তীব্র? সুন্দরী তরুণীদের কণ্ঠ-কাকলী ম্লান হয়ে যেত না? নিঃশব্দ হত না ওদের চোখের চাকচ-চপল চঞ্চলতা? কয়ে যেত না ভুজিতে টানা ভুরুর রেখা? কথা লাগতো না সিনগেল চায়ের লিকার? পিয়ানোর শব্দটা কি মধুর মনে হত?

সমীরণ আসছে, সমীরণ আসছে।

হ্যাঁ, এবার সত্যিই সমীরণ এসেছে।

উৎসুক আগ্রহে সকলে ছুটলো বারান্দার দিকে। ঐ কি সমীরণ না কি, সুশোভনের পিছনে পিছনে যে নামছে। চেহারাটা তো সুবিধের নয়। বড় রোগা, গায়ের রংটাও কালো দেখছি। তা হোক্, গুণ আছে। ডিসেনসির জ্ঞান নেই কিন্তু একটা খদ্দরের পায়জামার ওপর খাদির পাঞ্জাবী। ইস্ত্রি নেই, ভাঁজ পড়েছে। চোখে চশমা নেই, পুরুষদের চোখে চশমা না থাকলে কি মানায়?

বায়রণের চোখে কি চশমা ছিলো?

সুশোভনের পিছনে পিছনে ঘরে ঢুকলো সমীরণ।

এই যে এই টেবিলে। মালতীই যে হোষ্ট, টেবিলের মাথায় বসতে হবে তাকেই। মিষ্টার দত্ত, এখানেই বসুন। ভিড় করার দরকার নেই। তোদের সকলের মুখই ও দেখবে। এত কষ্ট করে সেজে-গুজে এসেছিস, দেখবে না!

সুস্মি, চায়ের ট্রেটা এদিক্ দিয়েই নিয়ে যা, লজ্জা কিসের।

দু'টো প্যাটিজ আরো দিক্, কেমন?

পেসট্রির প্লেটটা এদিকে সরিয়ে দিন না মিষ্টার রয়।

সমীরণ উঠে দাঁড়ালো। মাপ করবেন, এত সব খেতে পারবো না। আমি যদি ঘুরে-ফিরে এঁদের সব দেখতে দেখতে কেকে কামড় দিই, অভদ্রতা হবে কি? আমি আবার বসে বসে খেতে পারি নে।

বেশ তো? তুমি যা করবে সেইটেই তো হয়ে দাঁড়াবে ভদ্রতা। নতুন ষ্টাইল ভেবে ফ্যাশনেবলদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে।

—আপনিই মিষ্টার রয়? নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারছেন

কেন ? শেয়ারে আপনার কিস্যু হবে না। হাজার কয়েক এ মাসে গেছে, না ? ছেড়ে দিন ও-পথ. যে চাকরীটার অফার পেয়েছেন সেইটেতেই লেগে পড়ুন. উন্নতি হবে।

—আর সমীরণ, এই এর নাম হ'ল বাণী বসু মল্লিক, জাসটিস্—

—বিগিনিং উইন্ড আর এণ্ড এণ্ডিং উইন্ড এ ভাওয়েল। তাই না ? মানে আপনার প্রেমিকের নাম। লম্বা দোহারা চেহারা, আপনার চেয়ে আধ হাতটেক লম্বা। তাঁর ভাই তো গত মাসে লটারিতে কিছু টাকা পেয়েছে।

সমীরণ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না। সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—কে রে বাণী, বলিস্‌নি তো এদ্দিন ?

—নিজের চরখায় তেল দিন, অমন ভাবে দু'জনকে ঘোরাচ্ছেন কেন ? মন ঠিক্ করে ফেলুন এক জনের দিকে।

—এই সুস্মি, এদিকে আয়।

—বাই জোভ. আপনি গত বারে আপনার পড়াশুনায় ইতি করেছেন, মানে শেষ পরীক্ষাটা দিয়েছেন। কি করে ফার্ষ্ট হলেন নিজেই বুঝতে পারেন না, না ? ইন্ড উইল গেট এ ক্লীন লাইফ, বেশ কেটে যাবে। মাস চারেকের মধ্যেই হঠাৎ বিয়ে হবে। হ্যাসবেণ্ড, এ নাইস বয়, বিট ডার্ক কমপ্লেকশন, কিন্তু চমৎকার মানুষ, সুখ পাবেন।

সমীরণ কিন্তু বেশীক্ষণ থাকবে না। সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—মিষ্টা'র ডাট আপনার বরাতটা একটু জেনে নিন ?

—ও: আপনি. ইউ আর গেটিং এ লট্ অফ মানি নেক্সট মান্থ। আচ্ছা. মাস দুই আগে আপনার ওপর দিয়ে একটা স্ক্যাণ্ডাল গেছে, না ? হ্যাঁ, একটা কথা, ও-সব ছেড়ে দিন. সমাজে বাস করে ও-সব ঘৃণ্য ব্যাপার, চাপা থাকে না। কেন মিছেমিছি সে বেচারীর সুখ নষ্ট করছেন ?

—সমীরণ এদিকে এসো।

—এক মিনিট আচ্ছা, শুনুন শুনুন, আপনার নাম কি রেণু বা রেবা বা রেখা বা ঐ ধরণের কিছু ?

—কাছাকাছি এসেছেন, রাবেয়া।

—ও:, তা এবার পরীক্ষাটা দেবেন না, ফেল করবেন নির্ঘাৎ। ভাবছেন অবশ্য প্রিপারেশন খুব ভালো হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত—

সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—এই যে সমীরণ, ইনি হচ্ছেন মলিনা রায়।

—আপনার স্বামী কি এখনো নিরুদ্দেশ ? এই মাসেই তো তাঁর ফিরে আসার কথা ! দু'বছর সাত মাস, কবে গেছেন ?··· তবে, এই মাসেই তো ফেরবার কথা।···না, এবার সংসার-ধর্ম্মের দিকেই মন যাবে, সন্ন্যাসী হবার শখ মিটে গেছে তাঁর।

—এ হ'ল সুষমা।

—ছিঃ। কিছু বলতে চাই না।···আপনার নাম ?

—বাসনা বসু।

—ইউ আর এ লাকি গার্ল। বিয়েটা বছর তিনেক দেরী আছে, কিন্তু টাকার ওপর হেঁটে বেড়াবেন। অজস্র টাকা, এ রীচ হ্যাসবেণ্ড। ভালো, পালাচ্ছেন কেন ?

—গীতিকা, পালাচ্ছিস্ কেন ?

—বলুন।

—বাপ-মাকে বোঝান কাচ বলে. কিন্তু তাঁরা ঠিক্ বোঝেন, কোন্‌টা কাচ, আর কোন্‌টা হীরে। অবশ্য, দোষের কিছু নয়, একটু মিষ্টি হেসে যদি দামী দামী উপহার পাওয়া যায়।

—আমার নাম ভরোথী পাকিট, আমার ভবিষ্যৎটা বলুন তো।

—নমস্কার।···ভবিষ্যৎ ? ডিভোর্সটা গ্র্যাণ্ট হবে। কিন্তু বড় ভুল করছেন। ক্রম ক্রাইং প্যান টু ফায়ার। টাকার টানাটানিতে পড়বেন। আর তা'ছাড়া, ডাক্তারটির, ডাক্তারই তো ?—তাঁর হার্টের ট্রাব্‌ল আছে।

আর সময় নেই সমীরণের। সমীরণ চলে যাবে। সমীরণ চলে যাবে।

—এ হ'ল আমাদের দলের ব্লু জুয়েল, সুষমা।

—আপনার এক বোনের সঙ্গে আপনার ভগ্নীপতির ভাই প্রেম করছে। সাবধান করে দেবেন, মিছেমিছি বদনাম, ম্যাণ্ড ইট উইল এণ্ড ইন এ বাব্‌ল। আমি বড্ড টায়ার্‌ড ফীল করছি।

সমীরণ চলে যাবে।

শাড়ীর খৈত্য চুমকির চমক খায়। পেয়ালা-পিরীচের টুং টাং। বিজলী কণ্ঠনের লোলুপ আলো মৃদু মিইয়ে আসে। কেদারা ক্লান্ত, মেজ্ মনোকল। অকস্মাৎ ধাক্কা, গায়ে গা লাগা। চায়ের কেৎলী ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে। পেষ্ট্রির প্লেট শূন্য।

সমীরণ চলে যাবে, সমীরণ চলে যাবে।

—সে কি এর মধ্যে ?

—হ্যাঁ, মুড নষ্ট হয়ে গেছে, এর পর যা বলবো সব ভুল হবে। চলুন সুশোভনবাবু, পৌঁছে দেবেন।

সমীরণ চলে গেছে। সমীরণ চলে গেছে।

—বোগাস।

—কিন্তু আমার তো ঠিক মিলেছে।

—ব্লাফ।

—কিন্তু, আমি তো সত্যিই বুঝতে পারি না কি করে ফার্ষ্ট হলুম।

—যা-তা।

—কিন্তু, আমার টাকা পাওয়ার কথাটা তো কারেক্ট।

—ননসেন্স।

—কিন্তু, আমি যে ডিভোর্সের জন্য চেষ্টা করছি, তা তো সকলেই জানেন।

সমীরণ চলে গেছে। সমীরণ চলে গেছে।

সমীরণ এসেছিল, সমীরণ চলে গেছে।

শাড়ীর খসখসানি, কঙ্কণের কাঁপন আর চুড়ির চূর্ণ শব্দ। পেয়ালা পিরীচের টুং-টাং আওয়াজ। এসেন্সের আমেজ, সুরের শীর্ণতা, কথালাপের কাকলী। আলোর আতিশয্য, বেশবাসের বৈশিষ্ট্য, প্রসাধনের প্রাচুর্য্য।

সমীরণ চলে গেছে। সমীরণ চলে গেছে।

সমীরণ না এলে যে আজকের এই চায়ের আসরটা মাটি হয়ে যেত।

ডেক

—মাধব দাশগুপ্ত

আশীষ বর্ম্মণ
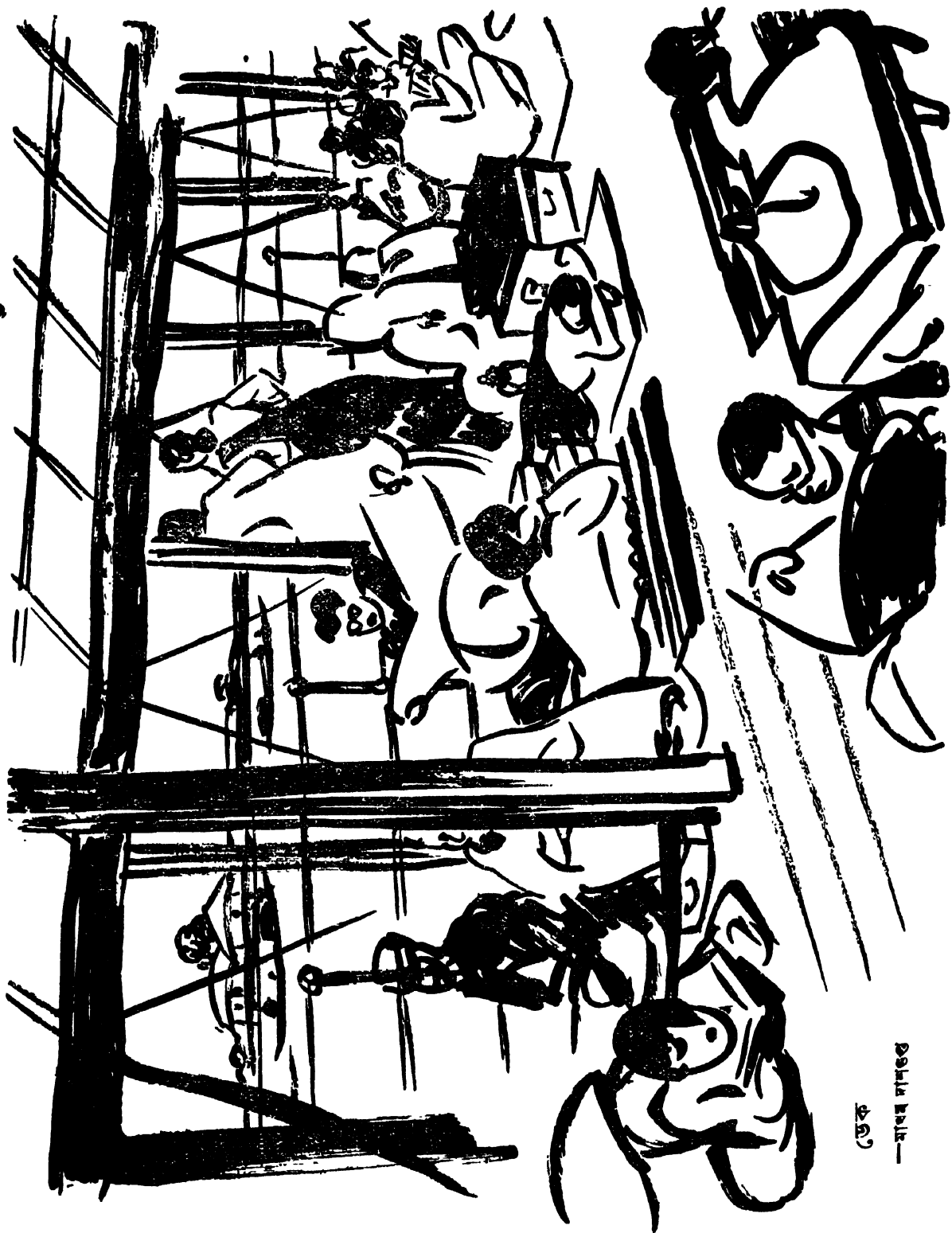
বেণু মোড়টা ঘুরে সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকে। গলিটা থেকে বেরিয়েই মোড়টা, আর মোড় ধরে রাস্তা, আর রাস্তার শেষে বড় রাস্তা। সোজামুখো যেতে হয়। বেণু বড় রাস্তাতেই চলেছিল বেশ চটপট করে, সিনেমায় দেরী হয়ে গেল গোছের ভাব নিয়ে: সবারই তাকে দেখে তাই মনে হত। গলির করালী বাবুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল সেই সময়। দেখা হয়ে গেল নয়, তিনি রাস্তা জুড়ে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—কোথায় যাচ্ছ?

—এই এদিকে।

—এদিকে মানে?

—এমনি একটু বেড়াতে আর কি।

—তা এতো তাড়াহুড়ো করে?

এবার বেণু হেসে ফেলল, হেসে ফেলল কেন না আর কিছু বলার ছিল না। করালী বাবু যখন প্রশ্ন করেন, আর তিনি করবেনই, তখন পরিত্রাণ নেই, কোনো ফাঁক রাখবেন না ফাঁকি দেবার।

—হাসছ যে? ভেবেছিলে যা-তা একটা বলে পার পাবে?

—যা-তা কৈ বললাম?

—বললে না? যাচ্ছ তো ফুটপাতময় বই-কাগজ ঘাঁটতে, তা সেটা এড়াবার জন্যে কত কি-ই না বললে।

বেণু অপরাধী—অপরাধী ঘাড় নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকে।

করালী বাবু পথ ছেড়ে দাঁড়াল, চুপ করে থাকেন বেণু চলতে থাকলেও কিছু দূর পর্য্যন্ত ভারি স্নেহ নিয়ে বেণুর পিঠের দিকে চেয়ে থাকেন। বড় ভালো ছেলে আর ভারি ভালো লাগে করালী বাবুর।

বেণু বড় রাস্তায় এসে থমকে দাঁড়ায়। পকেটের মধ্যে হাতটা ঢুকিয়ে শূন্য পকেটটা নাড়ানাড়ি করে। একটা কি ঠেকল হাতে, বার করে নিয়ে দেখল কবেকার একটা চিনেবাদাম। সেটা দাঁতে করে কট্ করে ভেঙে নিয়ে চিবোতে লাগল অন্যমনস্ক হয়ে। আর শেষ-হয়ে যাওয়া পকেটটায় হাত ঢুকিয়ে নীচের ঠোঁটটা উল্টে দিয়ে কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে রইল। ঢুকোনো হাতটার আঙুলগুলো নড়ন-চড়ন পকেটের মধ্যেই কিছুক্ষণ, তার পর মুঠি বেঁধে পড়ে রইল গুটি মেরে।

কয়েকটা লোক-বোঝাই ট্রাম গেল, বাস গেল, আর বেণু শূন্যদৃষ্টিতে ওগুলোর দিকে ক্ষণকাল চেয়ে থাকল। কেমন এক-একটা ট্রাম চলে গেল, বিরাট বিরাট বাস গেল তার চোখের সামনে দিয়ে তবু যেন কিছুই সে দেখতে পেল না। তার ভাসা-ভাসা দৃষ্টি গিয়ে আটকে রইল ও ধারের ফুটের পানের দোকানের লাল লেমনেডের বোতলটায়। সেটাও যে ঠিক স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিল তা নয়, কেমন কাঁপা-কাঁপা একটা লাল-লাল কি যেন কাঁপতে লাগল খানিকক্ষণ।

শেষে হঠাৎ সচল হল; রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ট্রাম-ষ্টপেজে। কয়েকটা গাড়ী ছেড়ে দিল তার পর যেমন অমানুষিক ভীড়-ভর্ত্তি ট্রাম আসে তেমনি একটা আসতেই হুড়োমুড়ির মধ্যে ছোটো হয়ে গিয়ে সেও কোথায় ঝুলে পড়ল। চলল দূরত্ব অতিক্রম করে সেই ভাবেই। ছোটো হয়েও আরো ছোটো হবার চেষ্টা করতে করতে।

—কি করেন মশাই পা গেল যে। কে যেন বলে।

—তার উপায় কি, ইচ্ছে করে তো আর লাগাইনি।

—একটু দেখে-শুনে চললেই পারেন।

—চলার কি আবার জায়গা আছে না কি, লোকে ঠেলে দিচ্ছে যে দিকে সে দিকেই যাচ্ছি।

—আরে থামুন মশাই ঝগড়া করে কি হবে এমন কি আর কেউ ইচ্ছে করে লাগায়। কয়েক জন থামাতে থাকেন ইতিমধ্যে টিকিটওলা এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ, বেণু একটু একটু দেখতে পাচ্ছে সে এগিয়ে আসছে ভীড় ঠেলে ঠেলে। ঠেলে ঠেলে সে দরজার কাছেই এসে পড়ে।

—টিকিট, টিকিট।

—দেতা হ্যায়।

—নিকালিয়ে, থোড়া জলদি নিকালিয়ে।

—আরে!—ভয়ানক চটে ওঠে বেণু, বলে—বলছি দিচ্ছি তাও জলদি জলদি। তোমায় জলদি দিতে গিয়ে আমি রাস্তায় গড়িয়ে পড়ি আর কি।

তা ঠিক, ছেলেমানুষ এক হাত দিয়ে ধরে কোনো ক্রমে ঝুলছে,—সকলেই তাই বললেন—পরের ষ্টপে নিও'খন; পড়ে যাবে দিতে গেলে।

তাই হল। টিকিটওলা একটু অন্য দিকে চলে গেল আর বেণু নেমে গেল পরের ষ্টপেজে। নেমে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ভীড়ের মধ্যে। অদৃশ্য থেকেই সে লক্ষ্য করে ট্রামটাকে। আর মনে হয় ট্রামের যত লোক সবাই যেন চেষ্টা করছে তাকেই খুঁজে বার করতে। ধীরে ধীরে যখন ট্রামটা চলে যায় তখন তার কেমন জানি তীব্র ভাবে নিজেকে হীন মনে হয়। মনে হয় হতভাগা!

ট্রামে না চড়লেই কি হত না? কি দরকার ছিল? কিন্তু তা নইলে কি করে সে আসবে এত দূর? আর কি করেই বা বাড়ী ফিরবে সন্ধ্যের মধ্যে? বড় মন ভার-ভার হয়ে যায় বণুর।

বেণু ভাবে, ভেবে ভারি ভালো লাগে: সে টক্ করে একটা আনি বার করে দিল, বলল—এস্প্ল্যানেড্। আর কী নিশ্চিন্ত, কী নির্বিকার মন, মুখ। সে হাঁটতে লাগল আস্তে আস্তে অবশেষে। অদূরে হ্যারিসন রোডের মোড়ে যে লোকটি মাসিক সাপ্তাহিক ইত্যাদি নিয়ে বসে তার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বসে, এবং বসে পড়ে দেখতে থাকে মাসিকপত্র।

—কিছু নিবেন? লোকটি জিজ্ঞাসা করে।

—হ্যাঁ, দেখি।

বেণু উৎসাহ আর উৎকণ্ঠা নিয়ে দেখতে থাকে তাড়াতাড়ি। তাড়াতাড়ি করে পড়তে থাকে ধারাবাহিক উপন্যাসের অংশ। ভয়ানক খুশী-খুশী লাগে এক মাস ধৈর্য্য ধ'রে থাকার পর আবার এ অংশটুকু পড়তে। কতো অপেক্ষা আর দিন গোণা আর তারিখ দেখার পর না এক একটা নতুন সংখ্যা। সঙ্গে সঙ্গে ভয় হতে থাকে, বিশ্রী উদ্বেগ হতে থাকে লোকটির অকস্মাৎ তাড়ার আশঙ্কায়।

—কতোক্ষণ দেখবেন খোকাবাবু?

বেণু এতোই তন্ময় তখন, কিছুই সে শুনতে পায় না।

—খোকাবাবু!

বেণু চমকে ওঠে লোকটির হাঁকে, বলে—কি বলছ?

—বই তো লেবেন?

—এটা নয়, এর আগের সংখ্যাটা আছে?

লোকটি অল্পক্ষণ রূঢ় ভাবে চেয়ে থাকে, তার পর ধীরে ধীরে বলে—ওটা নয় তো না পড়ে রেখে দিন। আগের বারেরটা ওদের অফিসে মিলবে, পড়তেও মিলবে।

বেণুর মুখটা লাল হয়ে যায়, শেষে কালো হয়ে আসে। তবু সে চটে উঠে চোটপাট করে না; এ সব আর অপমান হয়ে লাগে না, অভ্যেস হয়ে গেছে; পষ্ট হয় কেবল বাজে মাঝে মাঝে।

সে ট্রামের অপেক্ষায় এসে দাঁড়ায় আবার মাসিকটা রেখে দিয়ে। আর একটা পরিপূর্ণ ট্রাম এলে সেটায় যেমন করে উঠতে হয় তেমন করে উঠে পড়ে। বৌবাজার পর্য্যন্ত মসৃণ ভাবে চলে যায় হাঙ্গামহীন; তার পর নেমে পড়ে হাঁটতে থাকে এস্প্ল্যানেডের দিকে। পথে কোনোখানেই বেণু থমকায় না; চোখ তার আটকায় না কোথাও, এক বই-বিছানো ফুটপাতের দোকান ছাড়া। অনেক লোক তার পাশ ঘেঁসে আর কাঁধ ঠেলে চলে যায় অনেক চিন্তা আর চর্চ্চা করতে করতে। কেউই তাকে টলায় না, টানেও না; সে চলে যায় ধাঁই ধাঁই করে এস্প্ল্যানেড। সেখানে দ্রুতপায়ে এগিয়ে আসে, সেড-এর তলার দোকানীর কাছে। যার কাছে ছড়ানো থাকে একরাশ বই, মাসিক পত্র, সাপ্তাহিক আর অন্য অনেক কিছু। কিছুক্ষণ সে ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে অন্যদের সঙ্গে। দেখতে থাকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। ক্রমে হাঁটু দুটো তার মুড়ে আসে, শরীর নেমে আসে; বসে বসে সে উলটোতে থাকে আর্দ্ধেক শেষ করা মাসিকটা। উপন্যাসের বাকীটুকু তো আর রাখা যায় না।

চাপা একটা উদ্বেগ থাকে বৈ কি মনে কাঁটা হয়ে। একটা ভয়-ভয় আশঙ্কা। অবশ্য এবার তাড়া পাবার আগেই সে শেষ করে রেখে দেয় মাসিকটা। দিয়ে লোকের মধ্যে মানিয়ে নেয় নিজেকে। তবু যখন মনে হয় দোকানী বার বার তার দিকেই চাইছে তখন একটা অস্বস্তির অস্থিরতা নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে অবশেষে সরে আসে। এপাশে ওপাশে একটু টালবাহানা করে বেড়ায়, অপেক্ষায় অপেক্ষায় থাকে। তার পর আবার কখন ওদিকের কোণে গিয়ে জড়ো হয়। আর জড়ো করে নেয় হাতের মধ্যে একটা কবিতার বই; কিন্তু ওই ধুকপুক করা বুকে, সদা সতর্ক থাকা মনে কিছু কি ছাই-পাঁশ যায়?

সব কিছু রেখে দিয়ে শেষে বেণু লোভাতুর চোখ বুলোয় বিছানো সব কটা পত্রিকার উপর। এমন ওর ইচ্ছে করে ওর মধ্যের এতো গুলো নিতে।

আচ্ছা ধর,, ধরই না, যে তোর পকেটে টাকা আছে আর তোর যা-যা নেবার ইচ্ছে তা-তা নিতে পারবি, তাহলে কি-কি নিবি, কতোগুলো নিবি? কতোগুলো কী রে? আমার তো সবগুলোই প্রায় নিতে ইচ্ছে করছে, আর টাকা যদি থাকেই তাহলে নিতেই বা বাধা কৈ? নেই না কিছুই, তাই নি-ও না কিছুই।

বেণুর হঠাৎ বড় ম্লান লাগে ভাবতে, বড় কষ্ট হয় কেন জানি।

ফেরার সময় বেণু ট্রামের দিকে একবার তাকিয়েই আর ট্রামে চড়তে যায়নি। ভীড় কমেছে ট্রামে, ফাঁকা-ফাঁকা বেশ; এর মধ্যে বেণুর যাওয়া সম্ভব নয়। কেবল তাকে দেখতে গিয়ে টিকিট চাইবে আর সে দিতে পারবে না বলেই নয়; সে যদি এমনও জানত যে তার কাছে টিকিট চাওয়া হবে না তবু সে এই অল্প ভীড়ে যেতে পারত না। কি করে সে যাবে, যখন সবাই তার দিকেই চেয়ে থাকবে, যখন সবাই দেখবে তাকেই? এমনিতেই নিজেকে তার ট্রামে চাপলে এমন চোরা-চোরা লাগে; এমন হয় যা সে বাস্তবিক নয়। তাই সে হাঁটতে থাকে ধর্ম্মতলা ধরে। য়ুনিভার্সিটির পর থেকে আর হাঁটতে ক্লেশ হয় না। ক্লান্ত যেটুকু হয়েছিল সেটুকু অন্যমনে অনুভব করে না।

বিস্তর বইয়ের দোকান দু'ধারে—তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ সে আবার চলে। এমনি দাঁড়িয়ে আর এমনি চলে সে ভুলে যায় কতোটা চলছে। অন্তত দশ-পনেরো মিনিট কেটে যায় বেণুর দোকানে দোকানে, অদ্ভুত লাগে তার ঐ কাচের আলমারীর মধ্যের অসংখ্য বই দেখতে।

—কী দেখছো খোকা অত মনোযোগ দিয়ে? একবার তাকে ঠিক এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই একটি অতি বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলেছিলেন।

বেণু একটু হেসে ফেলেছিল, বলছিল—এমনি, বই দেখছি।

—মনে হয় খুব বই ভালোবাস তুমি, তাই না? তিনি বলেন।

বেণু ভয়ানক লজ্জা পেয়েছিল সলজ্জ হাসি ভরে গেছিল মুখময়, কথায় কিছু বলেনি, ঘাড় নেড়ে কেবল স্বীকার করেছিল। তার পর অন্য অন্য দিকে চলে গিয়ে আবার একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়েছিল।

আজও ক্ষণকাল সে একটা বড় দোকানের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মির্নিমেষ চোখে দেখে আর ভাবে, কতো বই সে বইতে পারে কাঁধে। স্তূপীকৃত বই তার চোখের সামনে স্তূপীকৃত মণিমুক্তা হয়ে ওঠে।

অনেকক্ষণ পরে অবশেষে সে দ্বিধা-জড়ানো পায়ে দোকানের ভিতর ঢুকে আসে। দণ্ডায়মান দোকানীকে প্রশ্ন করে—আবোল-তাবোল আছে?

—আছে।

—দেখি।

দেখতে থাকে বেণু হাতে নিয়ে নেড়ে-চেড়ে। সুকুমার রায়ের নামটা দু'-তিন বার পড়ে: কে ছবি এঁকেছে আর ছাপা কেমন সবই দেখে। আলতো ভাবে হাত বুলোয় বইটার উপর দিয়ে। শেষে অল্প নরম হেসে বলে—আচ্ছা দেখুন, কাল নিয়ে যাব, আজ টাকা আনিনি।

বইটা রেখে দিয়ে বেরিয়ে এসে বেণুর কেমন ফাঁকা-ফাঁকা লাগে: কেমন একটা অসহ্য তাড়না তাকে খেয়ে ফেলে। ফিরে ফিরে চায় সে দোকানটার দিকে, দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ।

তার পর সেই মন নিয়েই পাশের দোকানের সিঁড়ি ভেঙ্গে সে ওঠে। উঠে সোজা চলে আসে যে লোকটি সামনে বই বিক্রী করছিল তার পানে।

—কি চাই ভাই?

—আবোল-তাবোল আছে?

মানব

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

কোন্ দূর দেশে যাবে তুমি সদাগর ?
এ কি অগণ্য পণ্য লট-বহর !
কত মণ ভার বহিছে একাই মন
একই তরীতে সাতটা রাজার ধন,
এ ত নয় ঘোরা কেবল সাত সাগর ?

কত রূপ রস গন্ধ কথা ও সুর
সঙ্গে তোমার ? যাত্রা কোন্ সুদূর ?
এ ব্যবসা তব এক জনমের নয়,
কি বিরাট পুঁজি, কি বিরাট সঞ্চয় !
কিছু বুঝি আমি—না হই জাতিস্মর ।

সদাগর তব ভেসেই যাওয়া কি কাজ ?
না, না, তুমি নানা পণ্যের অধিরাজ ।
রস-ভূয়িষ্ঠ, ভাব-ভূয়িষ্ঠ মন—
কি মহাধনের করিছ অন্বেষণ ?
ঘুরিয়া এসেছ তুমি কত বন্দর ?

রেখে যাও আর নিয়ে যাও তুমি যাহা
জানায়ে এসেছ—আবার আসিবে আহা ।
সৃষ্টির মাঝে নাহিক তোমার জুড়ি,
সদা অমৃতের সন্ধানে ফের ঘুরি'
ফিরে-ঘুরে আসে তাই তব মধুকর ।

এই গতায়তি এই যে পর্য্যটন
ওগো সদাগর উদাস করে এ মন ।
এ যাওয়া কেবল ঘুরিয়া আসিতে যাওয়া,
এত নয়নের তাই এত পথ চাওয়া
এত ডোরে বাঁধা তাই তব অন্তর ।

এক খেয়াতেই হ'ত যদি সব শেষ
কেন এ বিপুল পণ্যের সমাবেশ ?
অতীতের লাগি কেন বা এমন কাঁদা ?
ভবিষ্যতের করে কেন রাখী বাঁধা ?
কেন এত লীলা লয়ে অবিনশ্বর ?

ধ্রুবতারা দেখে যাত্রা তোমার জানি,
যত নিয়ে যাও তার বেশী আন টানি ।
যে দেশ হইতে এনে তুমি যাহা দেহ
হয় ত নূতন হয় ত বা অজ্ঞেয়,
তবু চেনা-চেনা দাগ যে তাহার পর ।

এ বারেই শেষ এ কথা কেমনে ভাবি ?
অফুরন্ত ও অনন্ত তব দাবী ।
তুমি চাহ নাক ক্ষণিকের সন্তোষ,
আছে শাশ্বত সনাতন সাথে যোগ,
মার্কণ্ডেয় নহেক তোমার পর ।

—আছে বৈ কি ।

—আর আম-আঁটির ভেঁপু ?

—হ্যাঁ ।

—দেবেন তো ।

—দু'টোই দোব ?

—দু'টোই ।

বই দু'টো হাতে পেয়ে বেণুর মন ভরে যায়, হাত ভরে যাওয়ার মতই । অনেকক্ষণ সে দু'টো দেখাশুনো করে । আর অকস্মাৎ মনের মধ্যে একটা অভিসন্ধি ওকে অস্থির করে যায় । চট করে ও একটা বই জামার তলায় লুকিয়ে নেয় ।

দোকানী তখন অন্য জন নিয়ে ব্যস্ত ।

আর দোকানী লক্ষ্য করার আগেই বেণু সেটা বের করে আবার টেবিলে রেখে দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে আসে বাইরে । পিছনে কে যেন বলে—কী হল ?

বেণু তখন রাস্তায় প্রায় টলছে, দৃষ্টি তার এত ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে যেন রাস্তাও তার সামনে টলছে ।

পূজার কাপড়

শ্রীঅমলা দেব

৪

স্নানাহার সারিয়া ফিরিতে তিনটা বাজিয়া গেল। আফিসের সামনে আসিয়া নগেন দেখিল—কাদের লিচু গাছের নীচে দাঁড়াইয়া দুই ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছে। এক জন উপবীত ও শিখাধারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত; পরিধানে কেটের খাটো কাপড়, কাঁধে চাদর—আর এক জনের রুক্ষ মলিন চেহারা; তৈলহীন বিশৃঙ্খল চুল; পরনে মলিন মার্কিণ গলায় কাছা। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কথাবার্তা শুনিয়া বুঝা গেল—বাড়ীতে দুর্গাপূজা; ধুতি, শাড়ী, চিনি, কেরোসিনের প্রয়োজন দরখাস্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু যাহা মঞ্জুর হইয়াছে তাহা যৎসামান্য, অতএব কাদের সাহেবের কাছে প্রার্থনা—তিনি যদি দয়া করিয়া বড় বাবুকে ধরিয়া একটা ব্যবস্থা করেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি সদ্য পিতৃহীন; পিতৃশ্রাদ্ধের জন্য কাপড়ের প্রার্থী। সাহেবদের কাছে সরাসরি গেলে সুবিধা হইবে না জানিয়া কাদের সাহেবকে মুরুব্বি ধরিয়াছে। কাদের চিন্তাকুল মুখে দাঁড়াইয়া আছে। কেমন করিয়া এই দুই জন বিপন্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবে—তা'ই চিন্তা করিতেছে সম্ভবতঃ। নগেনের দিকে চোখ পড়িতেই কহিল—"আপনার দেরী আছে; খানিক পরে আসবেন।" নগেন সরিয়া আসিয়া একটা গাছের নীচে বসিল।

সামনে বিস্তর লোক ব্যস্ত ভাবে ঘুরা-ফিরা করিতেছে। সকলের মুখেই উদ্বেগের চিহ্ন; দরখাস্ত করা হইয়াছে, উপরওয়ালাদের কাছ হইতে কি মঞ্জুর হইয়া আসিবে কে জানে? দুই-চারি জন মেয়েমানুষও আসিয়াছে; বোধ হয় বাড়ীতে পুরুষ অভিভাবক নাই—বাধ্য হইয়া নিজেদের আসিতে হইয়াছে; এক পাশে শুষ্ক-মুখে দাঁড়াইয়া আছে তাহারা। জেলার প্রায় অর্দ্ধেকটা হইতে লোক আসিয়া জুটিয়াছে; হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র, অবস্থাপন্ন ও দরিদ্র, কোন বিচার নাই; সকলে পাশাপাশি, ঠেসাঠেসি রাজ-ভাণ্ডারীর দরজায় দাঁড়াইয়া এক সুরে, এক ভাষায়, এক ভাবে খাদ্য ও পরিধেয়ের জন্য প্রার্থনা করিতেছে। কাহারও ভাগ্যে মুষ্টিভিক্ষা জুটিতেছে, কাহারও ভাগ্যে শুধু লাঞ্ছনা ও অপমান। দেশে বহু রাজা রাজত্ব করিয়া গিয়াছে, কিন্তু আপামর সাধারণ সারা দেশের লোককে—তাহারা যে কত অসহায়, হতভাগ্য ও পরমুখাপেক্ষী এমন করিয়া কখনও প্রাণে-প্রাণে বুঝিতে হয় নাই; এবং রাজার প্রবল পরুষ হস্ত এমন করিয়া নির্ব্বিচার নির্ম্মম পেষণে সারা দেশের প্রত্যেকটি প্রজার দৈনন্দিন জীবনের কণ্ঠরোধও করে নাই।

ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কাছাধারী ব্যক্তি সামনে দিয়া চলিয়া গেল। নগেন দেখিল, কাদের নিজের যায়গা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। নগেন আফিসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল। কিছুক্ষণ পরে কাদের ফিরিয়া আসিয়া কহিল—"এসেছেন, এই নিন পারমিট।"

নগেন সাগ্রহে পারমিটটা লইল, কিন্তু পড়িয়াই মুখ শুকাইয়া গেল তাহার—একখানি ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধুতি ও একখানি ষ্ট্যাণ্ডার্ড সাড়ি মাত্র মঞ্জুর হইয়াছে। ঢোক গিলিয়া কহিল—"মোটে একখানি ধুতি আর সাড়ি! তাও ষ্ট্যাণ্ডার্ড! এতে হবে কি করে!"

কাদের কড়া-গলায় কহিল—"ঐ যে পেয়েছেন খুব নসীব আপনার; ওর জন্যেই অনেক তদবির করতে হয়েছে, ঐ নিয়েই বাড়ী যান।"

নগেন করুণ কণ্ঠে কহিল—মেয়ে-জামাইকে পূজোয় কাপড় দিতে হবে যে, তা'ছাড়া বিধবা মেয়ে!"

কাদের বিরক্ত হইয়া কহিল—"এই জন্যে ইচ্ছে করে না এসব কাজ করতে! আপনা'দের কিছুতেই খুসী নাই!"

নগেন অপ্রতিভ ভাবে কহিল—"আপনাকে তো কিছু বলছি না, আপনি যথেষ্ট করেছেন, কিন্তু আমার এতে হবে না, সেই ব্লাক মার্কেটেই কিনতে হবে, কত লাগবে কে জানে! টাকা-কড়ি বেশী নাই সঙ্গে।"

"যা' ইচ্ছা হয় করবেন"—বলিয়া কাদের চলিয়া গেল।

গেটে সেই দুই জন লোকের সঙ্গে দেখা হইল। দৌড়িয়ে হাঁপাইতেছে। সহরে বোধ হয় কোন কাজে গিয়াছিল। সারা রাস্তা ঘোড়-দৌড় করিয়া আসিতেছে হয়তো। হাঁপাইতে হাঁপাইতে নগেনকে জিজ্ঞাসা করিল—"পেলেন? আমাদের কি হ'ল বলতে পারেন? মিঞা সাহেব কোথায়?"

নগেন কহিল—"ওখানেই আছে।"

লোক দুইটা কাদেরের উদ্দেশে ছুটিল।

৫

নগেন সহরের দিকে চলিল। মনের অবস্থা ম্রিয়মাণ। ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধুতি ও শাড়ি তাহার নিজের ও গৃহিণীর চলিতে পারে, কিন্তু মেয়ে-জামাইকে দেওয়া চলিবে না। কাজেই চায়ের দোকানের সেই ভদ্রলোকটিকে একবার ধরিতে হইবে। ন্যায্য দামের দুই তিন গুণ দাম দিয়াও যদি একখানা মিহি সাড়ী ও একখানা মিহি ধুতি কিনিতে পাওয়া যায় তো সে কিনিবে। মেয়ে এমন করিয়া লিখিয়াছে, তাহাকে কি নিরাশ করা যায়? মায়ার জন্যও একখানি ধুতি কিনিতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু টাকায় বোধ হয় কুলাইবে না। মায়া মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবে না, জির-জিরে কাপড়খানিতে কোন মতে গা ঢাকিয়া আরও দূরে দূরে সরিয়া থাকিবে। সোনা-দানা নয়, সাধারণ একখানা কাপড়—তা'ও পূজোর সময় ছেলে-মেয়েকে দিতে না পারা, মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী গৃহস্থের পক্ষে যে কত মর্ম্মান্তিক—তা' বিদেশী বড় সাহেব বা পদ-মদ-মত্ত দেশী ছোট সাহেব কি করিয়া বুঝিবে?

সামনে কয়েকটা রিক্সা আসিতেছে। নগেন পাশ কাটাইয়া চলিল। কতকটা গিয়াই শুনিতে পাইল—কে ডাকিতেছে—"ও এজ্ঞে! শুনছেন, থামুন টুকচে দয়া করে—"

নগেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া, মুখ ফিরাইয়া দেখিল—একটা রিক্সা থামিয়া দাঁড়াইয়াছে।

নগেন হাঁকিয়া কহিল—"কাকে? আমাকে?—"

রিক্সাওয়ালা কহিল—"এজ্ঞে ই—আপনকাকেই—আসুন একবার—"

নগেন আশ্চর্য্য হইল—কে তাহাকে এখানে ডাকাডাকি করিতেছে? তাহার পরিচিত এখানে তো কেহ নাই? তাহাদের গ্রামের কেহও তো আসে নাই; আসিলেও তাহার সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিবে, এমন মনোভাব কাহারও আছে বলিয়া তো সে জানে না! দ্বিধা-জড়িত পদে নগেন রিক্সাটার দিকে চলিল।

এক জন ভদ্র-মহিলা রিক্সা হইতে নামিয়া দাঁড়াইল। মহিলার বয়স—ত্রিশ কি বত্রিশ; দোহারা গঠন, রং ফর্সা, মুখশ্রী সুন্দর; মাথায় সিন্দূর নাই; বিধবার বেশ—পরনে চুল-পাড় মিহি ধুতি; মটকার চাদর দিয়া গা ও মাথা ঢাকা; পা খালি। মহিলাটি নগেনের মুখের দিকে তাকাইয়া মৃদু হাসিতে লাগিল। নগেন কাছে যাইতেই জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি নগেন বাবু তো?"

ক্ষীণ-দৃষ্টি নগেন তারা-রন্ধ্র সাধ্যমত প্রসারিত করিয়া দেখিল কিছুক্ষণ—চেনা-চেনা মনে হইল মেয়েটিকে; কিন্তু কোথায়, কখন দেখিয়াছে স্মরণ করিতে পারিল না; বিহ্বল কণ্ঠে কহিল—"আজ্ঞে-হ্যাঁ।"

মেয়েটি হাস্যতরল কণ্ঠে কহিল—"আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি রেণু; সেই যে নাইনীতে—"

মনে পড়িল নগেনের। এলাহাবাদের কাছে নাইনী ষ্টেশন—ষ্টেশন-মাষ্টার রামতারণ বাবুর একমাত্র মেয়ে রেণু,—ফর্সা ছিপছিপে মেয়েটি; চোদ্দ-পনের বৎসর বয়স; রামতারণ বাবু ছেলের মত ভালবাসিতেন তাহাকে; রেণুও তাহাকে দাদা বলিয়া ডাকিত; তাহার কাছে পড়িত সে; ছোট বোনের মত আবদার করিত—নগেনও যথাসাধ্য আবদার রাখিত; সময়ে-অসময়ে তাহাদের বাসাতে গিয়া হাজির হইত, সুরধুনি অনেক সময়ে বিব্রত হইয়া উঠিত; কখনও কখনও বিরক্তিও প্রকাশ করিত—অবশ্য অন্তরালে; প্রকাশ্যে রেণুকে 'সতীন' বলিয়া ঠাট্টা করিত। শুনিয়া, রেণু রাগিয়া উঠিয়া পাঁচ কথা শুনাইয়া দিত সুরধুনিকে।

রেণু নগেনের পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতেই নগেন কহিল—"থাক থাক।" বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল—"তুমি এখানে?"

রেণু কহিল—"বা রে! মনে নেই? আমাদের বাড়ী যে এ জেলায়—এখান থেকে দশ-বারো ক্রোশ দূরে এক গাঁয়ে! বাবা তো রিটায়ার করে গাঁয়ে এসে বাস করছেন। আপনার তো এমন কিছু তাড়া নাই! চলুন না আমার সঙ্গে সাপ্লাই আফিসে।" নগেনের সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া রিক্সাওয়ালাকে কহিল—"ওরে তুই চল—আমরা হেঁটে যাচ্ছি দু'জনে।"

রিক্সায় একটি দশ-বারো বছরের ছেলে বসিয়াছিল। নগেন জিজ্ঞাসা করিল—"ছেলেটি কে?"

রেণু কহিল—"আমাদের এক চাষীর ছেলে—মেয়েমানুষ, নেহাৎ একা আসা ভাল দেখায় না—তা'ই ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছি।"

রিক্সাওয়ালা ছেলেটিকে লইয়া ছুটিতে আরম্ভ করিল। রেণু কহিল—"চলুন।" নগেনকে অগত্যা তাহার সঙ্গে ফিরিতে হইল।

চলিতে চলিতে নগেন কহিল—"তোমার আসবার কি দরকার ছিল? তোমার বাবা এলেই তো পারতেন।"

ম্লান হাসিয়া রেণু কহিল—"বাবা! বাবা তো চোখে দেখতে পান না আজ-কাল; নড়তে-চড়তেও পারেন না! কেমন শরীর ছিল, দেখেছেন তো? কত ক্ষমতা, কত ফূর্ত্তি! উনি যাবার পর থেকে যেন একেবারে ধসকে গেছেন।"

নগেন কহিল—"কখন এমন হ'ল?"

মুখখানি বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়া রেণু কহিল—"তা' চার-পাঁচ বছর হল বৈ কি! উনিও তো রেলে চাকরী করতেন। সে বছর যে মস্ত বড় একটা রেলের কলিশন হোল—একটা মেল গাড়ীর সঙ্গে একটা মাল গাড়ীর—সেই মেল গাড়ীতেই তিনি যাচ্ছিলেন। উনি যে কামরায় ছিলেন, তার একটা লোকও বাঁচেনি।"

রেণু চুপ করিল। দুই জন নীরবে চলিতে লাগিল। রেণুর স্বামীকে মনে পড়িল নগেনের—লম্বা-চওড়া, বলিষ্ঠ দেহ—টকটকে ফর্সা রং; রেণুর সঙ্গে চমৎকার মানাইয়াছিল। বি-এ পাশ, রামতারণ বাবু উপরওয়ালাদের ধরিয়া রেলে বেশ ভাল চাকুরী করিয়া দিয়াছিলেন।

নগেন কহিল—"ছেলে-মেয়ে ক'টি?"

রেণু কহিল—"একটি মাত্র ছেলে, সাত বছর বয়স, দেখতে ঠিক ওঁর মত মুখ, চোখ, নাক—হুবহু ওঁর বসান।" ম্লান হাসিয়া কহিল—"ভগবান বাঁচিয়ে রাখেন তবেই তো! আমার যা অদেষ্ট!"

আবার দুই জনেই চুপ-চাপ। কিছুক্ষণ পরে রেণু কহিল—"একা না এসে উপায় কি? বাড়ীতে অন্য তেমন কোন পুরুষ আত্মীয় তো নাই! বাড়ীতে পুজো। কাপড়, চিনি, কেরোসিন অনেক কিছু চাই! এখানে এক ভদ্রলোক আমাদের আত্মীয় খুব বড় ব্যবসায়ী; এখানের বড় সাহেবের সঙ্গে না কি খাতির আছে; আমাদের বাড়ীতে যান মাঝে-মাঝে; সে দিন গিছলেন, বাবা ওঁকে বলতেই বললেন—এখানে কেউ এলে তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন। কে আর আসবে আমি ছাড়া? কিন্তু এসেও তো কোন কাজ হল না। ষ্টেশন থেকে নেমে ওঁর বাড়ী গেলাম, গিয়ে শুনলাম বাড়ীতে নাই, কোথায় বেরিয়ে গেছেন—" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিতে লাগিল—"রিক্সায় আসতে আসতে ভাবছিলাম—কি করে কি করব, হঠাৎ আপনাকে দেখতে পেয়ে যেন অকূলে কূল পেলাম। সাপ্লাই আফিসে আপনার তো যাওয়া-আসা আছে; আলাপ-টালাপও আছে নিশ্চয়; দরখাস্তটি আপনার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত বসে থাকব, আপনাকেই সব ব্যবস্থা করে দিতে হবে।"

নগেন মনে মনে হাসিল; নিজেরই ব্যবস্থা সে করিতে পারে নাই, অপমানিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে, রেণু আবার তাহাকেই মুরুব্বি ধরিয়াছে! একদা করিত-কর্ম্মা ব্যক্তি বলিয়া রেণু তাহাকে বিশ্বাস করিত; এত দিন পরেও তা' হইলে সে বিশ্বাস তাহার অপহৃত হয় নাই। কাজেই রেণুকে একেবারে নিরাশ করিতে নগেনের ইচ্ছা হইল না। কহিল—"বড় সাহেব 'তো নাই—মফস্বলে গেছে।" অর্থাৎ বড় সাহেবের সঙ্গে নগেনের যথেষ্ট খাতির আছে এবং থাকা স্বাভাবিক; বড় সাহেব থাকিলে রেণুর যা যা দরকার, নগেন অবলীলাক্রমে সব ব্যবস্থা করিয়া দিত। কিন্তু বড় সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাহা সম্ভব হইবে না।

রেণু হতাশা-সূচক ভঙ্গী করিয়া কহিল—"তাই না কি? তা' হলে—"

নগেন গম্ভীর মুখে কহিল—"ছোট সাহেবের সঙ্গেই দেখা করতে হয়। লোকটা ভাল নয়—আমার সঙ্গে আলাপও নাই। দেখ না থান-পাঁচেক ধুতি-শাড়ী চেয়েছিলাম—দিলে একখানা ষ্ট্যাণ্ডার্ড ধুতি আর শাড়ী। এমন ব্যবহার করলে যে আর অনুরোধ করতে ইচ্ছে হ'ল না। অথচ ছোট মেয়ে আর ছোট জামাইয়ের জন্যে একখানা করে ভাল শাড়ী আর ধুতি নেহাৎ দরকার,—শেষ পর্য্যন্ত ব্ল্যাক মার্কেটেই কিনতে হবে দেখছি।"

রেণু অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিতেছিল—জবাব দিল না।

সাপ্লাই অফিসের সামনে হাজির হইল তাহারা। রিক্সাওয়ালা ইতিমধ্যে হাজির হইয়াছে; ছেলেটি রাস্তায় নামিয়া দাঁড়াইয়াছে। রেণু রিক্সাওয়ালাকে ভাড়া দিয়া বিদায় করিল। বোধ হয় তাবা ভাড়ার চেয়ে কিছু বেশী দিল। কারণ, রিক্সাওয়ালা ভক্তিভরে নমস্কার করিয়া কহিল—"এই গাড়ীতেই কি যাবেন, গিন্নিমা! থাকব?"

রেণু কহিল—"আমার তো দেরী হবে, বাবা! কাজ না হলে তো যেতে পারব না; ক্ষতি না হয় থাক।"

কম্পাউণ্ডের মধ্যে ঢুকিয়া রেণু জিজ্ঞাসা করিল—"বড় সাহেব কখন ফিরবেন জিজ্ঞেসা করেছেন?"

নগেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

রেণু কহিল—"ওটা তো জানা দরকার। বড় সাহেব যদি আজ ফিরেন তো অপেক্ষা করব, না ফিরেন বাড়ী ফিরে যাব। ছোট সাহেবের কথা যা' শুনলাম, ওর সঙ্গে দেখা না করাই ভাল।"

নগেন ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল। কিন্তু সংবাদটা সংগ্রহ করিতে যাইবার কোন লক্ষণ প্রকাশ করিল না। কারণ বিনা নজরানায় বড় সাহেবের চাপরাশীর কাছ হইতে একটি কথাও বাহির করা যাইবে না, সে বিষয়ে সে সুনিশ্চিত। নিজের পকেট হইতে আর বাজে পয়সা খরচ করিতে তাহার সামর্থ্যে কুলাইবে না, অথচ রেণুকে সে কথা জানাইতে তাহার বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল।

রেণু কহিল—"বড় সাহেবের তো এক জন চাপরাশী আছেই, ওর কাছে গেলেই, জানা যাবে চলুন—" বলিয়াই চলিতে সুরু করিতেই নগেন তাহার সঙ্গ লইল।

রেণু বেশ সপ্রতিভ ভাবে আফিসের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। চাপরাশী তখনও বসিয়াছিল। রেণুর চাল-চলন, ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সেলাম করিল। রেণু পরিষ্কার উর্দুতে জিজ্ঞাসা করিল—"বড় সাহেব কি আজ ফিরবেন?"

চাপরাশী জানাইল—"নিশ্চয়ই ফিরবেন এবং খুব সম্ভব আধ ঘণ্টার মধ্যেই।"

নগেন ও ছেলেটি অদূরে দাঁড়াইয়াছিল। তাহাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া রেণু কহিল—"তা' হলে একটু অপেক্ষা করাই ভাল—নয়?"

তিন জনে আসিয়া একটা গাছের নীচে বসিল। নগেন লক্ষ্য করিল—আশে-পাশে অনেকেই তাহাদের দিকে উৎসুক নেত্রে তাকাইয়া আছে। রেণুরও তাহা দৃষ্টি এড়াইল না। একটু পিছন ফিরিয়া বসিয়া মাথার ঘোমটা কিঞ্চিৎ টানিয়া দিল।

রেণু কহিল—"কত দিন পরে দেখা! বাবা আপনাদের কথা প্রায়ই বলেন। আপনি বোধ হয় আমাদের ভুলেই বসেছিলেন?"

নগেন জোর করিয়া হাসিয়া কহিল—"পাগল, তা' কি ভোলা যায়! কত দিন একসঙ্গে ছিলাম—" আলাপ-পরিচয়ে নগেনের উৎসাহ নাই, বড় সাহেবের আসন্ন আগমন-বার্ত্তা তাহার মনে দারুণ অস্বস্তি সঞ্চার করিয়াছে। রেণু নিজে যাইবে না নিশ্চয়ই! একা তাহাকেই ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিবে, কিন্তু এ যে অত্যন্ত মুস্কিলের কথা! অথচ রেণু অনুরোধ করিলে না যাইয়া উপায়ও নাই।

রেণু কহিল—"বৌ-দিদি কেমন আছেন?"

নগেন জবাব দিল—"ভালই—তবে ম্যালেরিয়ায় মাঝে মাঝে ভোগে—"

—"মায়া কেমন আছে? কোথায় আছে?"

—"কেমন আর আছে! বিধবা হয়েছে তো! আমার কাছেই আছে।"

বিস্ময়ের স্বরে রেণু কহিল—"তাই না কি!" সহানুভূতিতে কণ্ঠস্বর স্নিগ্ধ করিয়া কহিল—"আহা!"

নগেন চুপ করিয়া রহিল। রেণুও কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—"আপনার ছোট মেয়েটির কি নাম ছিল?"

নগেন কহিল—"কমলা, তারও বিয়ে হয়েছে, হাতে টাকা ছিল না, জামাই ভাল হয়নি। তবে কোন রকমে খেতে-পরতে পায়।"

রেণু প্রশ্ন করিল—"নিজে কি রকম আছেন?"

ম্লান হাসিয়া নগেন কহিল—"নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ। চাকরী খুইয়ে পাড়াগাঁয়ে পড়ে আছি।"

—"আপনার চাকরী গেছে, বাবা বলেছিলেন বটে। কি সব না কি গোলমাল হয়েছিল—"

নগেন কহিল—"সে অনেক কথা, লাইনের বড় সাহেবের বিষ-নজরে পড়ে গেলাম; চোখ-খারাপ, এই অছিলায় চাকরী খেয়ে দিলে—" বলিয়া নগেন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

সান্ত্বনার সুরে রেণু কহিল—"কি করবেন বলুন—অদৃষ্ট! আমার দেখুন না—"

দুই জনে চুপচাপ বসিয়া রহিল।

একটা বড় গাড়ী কম্পাউণ্ডের ভিতর ঢুকিল। নগেনের বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। বড় সাহেব আসিয়াছেন। গাড়ীটা গাড়ী বারান্দার নীচে গিয়া দাঁড়াইল। বড় সাহেব নামিয়া উপরে চলিয়া গেলেন। বাঙ্গালী ভদ্রলোকটি নামিয়া একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন।

নগেন ভয়ে ভয়ে বলিল—"বড় সাহেব এলেন বোধ হয়—"

কিন্তু রেণু তাহার কথায় কর্ণপাত করিল না; বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দিকে তাকাইয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"ঐ যে দেবেন বাবু!" ছেলেটাকে কহিল—"ওরে আয় তো আমার সঙ্গে—" বলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া চলিয়া গেল—ছেলেটাও তাহার পাছু-পাছু চলিল।

রেণুকে দেখিতে পাইয়া ভদ্রলোকও হাসিমুখে আগাইয়া আসিতে আসিতে নমস্কার করিলেন। রেণুও নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেল। দুই জনে কি কথা হইল। তার পর ভদ্রলোকের সঙ্গে রেণু বাড়ীর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। ছেলেটি গাড়ী-বারান্দায় দাঁড়াইয়া রহিল।

নগেন হতভম্বের মত বসিয়া রহিল। ঐ ভদ্রলোক রেণুর আত্মীয়। তবে আর তাহার চিন্তা কিসের? যা' চাহিয়াছে তাহা তো পাইবেই, হয় তো বেশীও পাইতে পারে। ঐ ভদ্রলোকের অনুপস্থিতিতে রেণু যে তাহাকে মুরুব্বি ধরিয়াছিল, ভাবিয়া তাহার হাসি পাইল। রেণু যদি অমন করিয়া হঠাৎ উঠিয়া না চলিয়া যাইত, তাহা হইলে সেই বরং তাহাকে মুরুব্বি ধরিয়া মেয়ে-জামাইয়ের শাড়ী-ধুতির ব্যবস্থা করাইত।

রেণুর ব্যবহারে তাহার মন কিন্তু খুঁতখুঁত করিতে লাগিল। যাইবার সময়ে একটা কথা পর্য্যন্ত বলিয়া গেল না। যতক্ষণ তাহাকে দিয়া স্বার্থসিদ্ধির আশা ছিল ততক্ষণ কত আত্মীয়তা! কিন্তু যেই তাহাকে আর প্রয়োজন রহিল না, অমনই এক মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাঁটিয়া দিল। বিদায়-সম্ভাষণের ভদ্রতাটুকু পর্য্যন্ত করিল না। অথচ সে তো নিজে আসে নাই, সে-ই ডাকিয়া আনিয়াছিল। এবং একদা তাহাদের মধ্যে স্নেহ ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক ছিল বলিয়াই সে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া তাহার সঙ্গে আসিতে দ্বিধা করে নাই। এমন করিয়া তাচ্ছিল্য করিবে জানিলে সে কিছুতেই আসিত না।

সেই ছেলেটি সামনে দিয়া পার হইয়া যাইতেছিল। নগেন তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল—"ওরে শোন্!" ছেলেটি কাছে আসিতেই কহিল—"তোর দিদিমণি কোথায়?"

ছেলেটা বাড়ীটার দিকে হাত বাড়াইয়া কহিল—"ঐখানে।"

—"এল না?"

ছেলেটা ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"এজ্ঞে না। বড় সাহেব খাচ্ছেন। তাই বললেন দেরী হবে, তুই জল-টল খেয়ে আয় গে, আমি তাই যাচ্ছি—"

নগেন কহিল—"আমার কথা কিছু বললে?"

—"এজ্ঞে না তো—" বলিয়া ছেলেটা চলিয়া গেল।

চারটা অনেকক্ষণ বাজিয়া গিয়াছে। নগেন উঠিয়া পড়িল। মন বিরক্তিতে ভরিয়া উঠিয়াছে। মিথ্যা এতক্ষণ সময় নষ্ট হইল। সেই সময়ে সহরে গেলে এতক্ষণ কেনা-কাটা শেষ করিয়া সেই লোকটির কাছে ধুতি-শাড়ীর ব্যবস্থা করিতে পারিত। রাত্রি আটটায় বাস—কাজেই তার আগে তার সব কাজ শেষ করিতেই হইবে।

বাজারের দিকে চলিল নগেন। মনে নানা চিন্তা। ব্ল্যাক মার্কেটে কত টাকা লাগিবে, কে জানে? মায়ার জন্য কাপড় কেনা বোধ হয় হইয়া উঠিবে না। অথচ রেণু যদি ভদ্রলোককে একটি কথা বলিয়া দিত তো তাহাকে এত ভূগিতে হইত না। রেণুকে সে একবার বলিয়াছিল বটে যে, মেয়ে-জামাইয়ের শাড়ী ও ধুতির পারমিট সে পায় নাই। অবশ্য রেণুর এত বড় এক জন আত্মীয় আছে জানিলে যেমন করিয়া বলিত তেমন করিয়া বলে নাই। আর, রেণুও নিজের চিন্তায় এমন বিভোর হইয়াছিল যে তার কথা বোধ হয় তাহার কানে ঢুকে নাই। আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলে বোধ হয় কোন ব্যবস্থা করিয়া দিত। কিন্তু সময় হইল কই? ভদ্রলোককে দেখিবামাত্র রেণু যে মণিহারা ফণীর মত দিশাহারা হইয়া ছুটিল! তাছাড়া স্মরণ করাইয়া দিলেও কি রেণু কোন ব্যবস্থা করিত? আজ-কাল মানুষ অত্যন্ত আত্মপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কাহারও মুখের দিকে তাকায় না, প্রত্যেকে নিজের নিজের লইয়া ব্যস্ত। একখানা কাপড় পাইলে বাপ-ছেলে, মা-মেয়ে টানাটানি করে; নিকটতম আত্মীয়েরও সুখ-দুঃখ, সুবিধা-অসুবিধার প্রতি মানুষ উদাসীন, এক শত জনকে বঞ্চিত করিয়া নিজ প্রয়োজনের এক শত গুণ বেশী খাদ্য-পরিধেয় আত্মসাৎ করিতে লোকে দ্বিধা করে না। কাজেই, রেণুও হয়তো নিজের বোল আনার বায়গায় আঠার আনা পাওনার ব্যবস্থা করিত কিন্তু তাহার কথা একেবারে ভুলিয়া যাইত।

চা'এর দোকানে আসিয়া চাজির হইল নগেন। ইহার মধ্যেই বেশ ভিড় হইয়াছে। সকালের সেই লোকটি ঠিক সেই যায়গায় বসিয়া সিগারেট টানিতে টানিতে গভীর মনোযোগের সহিত খবরের কাগজ পড়িতেছে। নগেন তাহার পাশেই আসিয়া বসিল, উচ্চকণ্ঠে চা'এর জন্য হাঁক দিল। ভদ্রলোকের দৃক্‌পাত নাই। চা খাইতে খাইতে নগেন ভদ্রলোকের হাঁটুতে হাত দিয়া কহিল—"শুনছেন?"

ভদ্রলোক ঝটিতি মুখ ফিরাইয়া, নগেনকে চিনিতে পারিয়াই ভ্রূ নাচাইয়া কহিল—"কি ব্যাপার? হ'ল কিছু?"

নগেন ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—"না।"

ভদ্রলোক কহিল—"তবে?"

নগেন কহিল—"আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে—"

ভদ্রলোক কহিল—"বেশ, চা খেয়ে নিন, পরে হবে—" বলিয়া খবরের কাগজে পুনরায় দৃষ্টি সংযোগ করিল।

চা খাইবার পর নগেন ভদ্রলোককে বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া কহিল—"আমার তা' হলে একখানা ধুতি, একখানা শাড়ীর ব্যবস্থা করে দেন।"

ভদ্রলোক ঘাড় নাড়িয়া কহিল—"তা' দেব; কিন্তু দর তো জানেন?"

নগেন সানুনয়ে কহিল—"কিছু কম-সম করে দেন—নেহাৎ ছাপোষা মানুষ!"

ভদ্রলোক হাসিয়া কহিল—"তা' কি আর হয় মশায়! খদ্দেরের কি অভাব! ওর চেয়ে বেশী দর দিয়ে নেবার জন্য লোক ছুটে আসছে; চা'এর দোকানে যে এত লোক দেখছেন, ওর বেশীর ভাগই আপনার মত কাপড়ের খদ্দের!"

নগেন কিছুক্ষণ ভাবিয়া কহিল—"কখন দিতে পারবেন?"

ভদ্রলোক কহিল—"এখন তো হবে না, রাত্রি দশটার পরে আসবেন।"

নগেন কহিল—"আমার যে আটটায় বাস!"

ভদ্রলোক কিঞ্চিৎ ভাবিয়া কহিল—"আচ্ছা, সন্ধ্যের পরেই আসবেন, ব্যবস্থা করে দেব।"

নির্দ্দিষ্ট দোকানের সামনে আসিয়া নগেন দেখিল অত্যন্ত ভিড়। সকলেরই ঢুকিবার চেষ্টা। যাহারা আগে আসিয়াছে, তাহাদের আগে ঢুকিয়া জিনিষ লইতে দিবার ধৈর্য্য কাহারও নাই। সকলেরই ভয় কাপড় কখন ফুরাইয়া যাইবে, এবং দোকানদার কখন হাত নাড়িয়া দোকান বন্ধ করিয়া দিবে। কাজেই যাহাদের গায়ের জোর বেশী, তাহারাই ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করিয়া ঢুকিয়া পড়িতেছে। ইহার ফলে হয়তো কাপড় ছিঁড়িতেছে, জামা ছিঁড়িতেছে—কিন্তু সে দিকে তাহাদের লক্ষ্য নাই। যাহারা নিরীহ ও নিৰ্জ্জীব, তাহারা দূরে দাঁড়াইয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাকাইয়া আছে। শৃঙ্খলা বিধানের জন্য ও জন-সাধারণকে সাহায্যের জন্য জন-দুই কনষ্টেবল মোতায়েন করা আছে বটে, কিন্তু নিজেদের কর্ত্তব্য সাধনের দিকে তাহাদের বিশেষ লক্ষ্য নাই, বরং কি করিয়া দু'পয়সা পকেটে আসিবে, তাহার জন্যই তাহাদের বেশী চেষ্টিত মনে হইতেছে। জন-কয়েক গুণ্ডা শ্রেণীর লোক আসিয়া জুটিয়াছে। তাহারা পারিশ্রমিকের পরিবর্ত্তে পাঁচ-সাত জন লোকের পারমিট জড় করিয়া ভিতরে ঢুকিয়া কাপড় আনিয়া দিতেছে। ইহাদের সঙ্গে কনষ্টেবল দুইটির যে

ব্যবসাগত সংযোগ ও সম্ভাব আছে তাহা বুঝা যাইতেছে। এই ভিড়ের সুযোগে দুই-চারি জন পকেট-কাটা বেপরোয়া হাত চালাইতেছে। এবং মাঝে মাঝে এখানে সেখানে করুণ আর্ত্তনাদ উঠিয়া তাহাদের হাত-সাফাইয়ের পরিচয় দিতেছে। কনষ্টেবল দুইটি উৎপীড়িত ব্যক্তিদের সাহায্য না করিয়া উল্টা প্রশ্নের পর প্রশ্নের আঘাতে তাহাদের হয়রাণ করিয়া দুঃখের বোঝা বৃদ্ধি করিতেছে।

নগেনও এক পাশে দাঁড়াইল। এই ভিড় ঠেলিয়া যাইবার তাহার সামর্থ্য নাই, সাহসও নাই। গুণ্ডাদের সাহায্য লওয়াও তাহার সাবধানী মন অনুমোদন করিল না। তবে সে লক্ষ্য করিল যে, মাঝে মাঝে দু'-এক জন সহুরে লোক—কোন হাকিম বা কোন পদস্থ ব্যক্তি আসিবামাত্র কনষ্টেবল দুইটি একসঙ্গে আসিয়া লাঠি দিয়া ধাক্কা মারিয়া ভিড়ের মধ্যে তাহাদের জন্য রাস্তা করিয়া দিতেছে। সেই সুযোগে দু'-চারি জন লোক তাহাদের পিছু পিছু ঢুকিয়া পড়িতেছে। নগেনও দুই-একবার এই ভাবে ঢুকিয়া পড়িবার চেষ্টা করিল। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়া নূতন কোন সুযোগের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল।

একটা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। যে গাড়ীতে চড়িয়া বড় সাহেব সফরে গিয়াছিলেন, সেই গাড়ী—দেখিয়া নগেন চিনিতে পারিল। সামনে বসিয়া ভদ্রলোক নিজেই চালাইয়া আনিলেন, ড্রাইভার পাশে বসিয়াছিল। পিছনের সিটে রেণু ও সেই ছেলেটি বসিয়াছিল।

নগেন ভাবিল—ভদ্রলোক শুধু 'পারমিট' সংগ্রহ করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হ'ন নাই; নিজে আসিয়া জিনিষ কিনিয়া দিতেছেন। এমন আত্মীয় আজ-কাল কয় জনের ভাগ্যে জুটে? মনের মধ্যে ঈর্ষার কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করিতে থাকে, তাহার সন্দেহও জাগে,—আত্মীয়তার টান? না আরও কিছুর? দু'জনের যা' বয়স অসম্ভব নয়।

ভদ্রলোক ও ড্রাইভার মোটর হইতে নামিতেই কনষ্টেবলরা সসম্ভ্রমে ছুটিয়া আসিয়া রাস্তা করিয়া দিল নগেন এ সুযোগ ছাড়িল না, কোন মতে ড্রাইভারের পাছু লইল। দোকানে পৌঁছিতেই দোকানের মালিক নিজে ভদ্রলোককে সাদরে ও সাগ্রহে অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ারে বসাইল। ভিড়ের মধ্যে নগেনের বসিবার জায়গা কুলাইল না। এক পাশে দাঁড়াইয়া রহিল।

দোকানের মালিক নিজে ভদ্রলোকের কাপড়ের ব্যবস্থা করিলেন; মিহি ধুতি ও শাড়ী—ছোট-বড় লইয়া প্রায় বিশ জোড়া; লংক্লথ, মলমল, ছিট ইত্যাদি নানা রকমের কাপড়। সব একসঙ্গে যখন বাঁধা হইল, একটি ছোট-খাটো গাঁট হইয়া উঠিল। দেখিয়া নগেনের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। এক জনকেই এত কাপড়! রেণুদের বাড়ীতে কয় জন মাত্র লোক, এত কাপড় লইয়া কি করিবে তাহারা? অথচ সে মেয়ে-জামাইয়ের জন্য এক একখানা কাপড় পর্য্যন্ত পাইল না। এ কী অন্যায় অবিচার! যে দেয় তার—যে নেয় তারও। যে রাজকর্ম্মচারী খাদ্য-পরিধেয় বণ্টনের মত গুরু দায়িত্ব হাতে লইয়া এরূপ অবিচার করে, রাজা তাহার দণ্ড বিধান করুন আর নাই করুন, কিন্তু যে নীচ নির্লজ্জের দল রাজকর্ম্মচারীর দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া এমনই ভাবে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে—জন-সাধারণের দিক হইতে তাহাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত।

ভদ্রলোক দাম মিটাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, ড্রাইভার কাপড়ের গাঁট কাঁধে লইয়া তাহার পশ্চাদনুসরণ করিল। অনেক কাকুতি-মিনতির পর নগেন যখন তাহার ষ্টাণ্ডার্ড ধুতি ও শাড়ী পাইল, এবং ভিড় ঠেলিয়া অর্দ্ধমৃতপ্রায় হইয়া বাহিরে আসিল, তখন সন্ধ্যা হব-হব হইয়াছে।

কিছু দূর আসিয়া নগেন দেখিল, একটা মনোহারী দোকানের সামনে রেণুদের গাড়ী দাঁড়াইয়া আছে। রেণুর উপরে মন তাহার বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল; আর দেখা করিতে ইচ্ছা হইল না। কাজেই পাশ কাটাইয়া চলিল সে। হঠাৎ পিছন হইতে মেয়েলী গলার ডাক শুনিতে পাইল—"নগেন দা! শুনুন—"

নগেন কর্ণপাত না করিয়া আগাইয়া চলিল। মিনিট কয়েক পরে ছেলেটি ছুটিয়া তাহার পাশে আসিয়া কহিল—"শুনছেন! দাঁড়ান একবার; দিদিমণি ডাকছেন আপনাকে—"

নগেন থমকিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"কেন?"

ছেলেটি কহিল—"জানি না।" সানুনয়ে কহিল—"চলুন না—একবারটি।"

নগেনের ইচ্ছা হইল ছেলেটিকে ফিরাইয়া দেয়, কিন্তু তার পর কি ভাবিয়া ছেলেটির সঙ্গে ফিরিয়া চলিল।

নগেন কাছে যাইতেই রেণু অনুযোগের ঝঙ্কার তুলিয়া, কহিল—"না বলে চলে এলেন যে! আমরা খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।"

"নগেন মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল—"তুমি তো কিছু বলে গেলে না—"

রেণু বিস্ময়ের ভঙ্গী সহকারে কহিল—"ও মা! বলে আর কি যেতে হবে! জানি—একবার যখন দেখা হয়েছে, তখন নিশ্চয় আমাকে ফেলে পালিয়ে যাবেন না"—কণ্ঠস্বরে অভিমানের রেশ টানিয়া কহিল—"দূরে গেলে নিজের লোকও পর হয়ে যায়।"

নগেন মুখে কিছু বলিল না—মনে মনে কহিল—"তা'ই বটে।"

নগেনের হাতে কাপড়ের ছোট বাণ্ডিলটি এক চোখ দেখিয়া লইয়া রেণু কহিল—"কখন বাড়ী যাবেন?"

নগেন জবাব দিল—"রাত্রি আটটার বাসে।"

রেণু একটু হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিল—"দেবেন বাবু এই গাড়ীতেই আমাকে বাড়ী পৌঁছে দেবেন বলছেন, চলুন না আমার সঙ্গে, বাবার সঙ্গে দেখা করে আসবেন, বাবা ভারী খুসী হবেন আপনাকে দেখলে।"

নগেন নীরস কণ্ঠে কহিল—"এখন কি করে হয়? বাড়ীতে অনেক কাজ, আজই ফিরতে হবে আমাকে।"

রেণু কহিল—"বেশ! তা'হলে পুজোর পরে যাবেন। বৌ-দিদি, মায়া সবাইকে নিয়ে যাবেন, কেমন?"

দেবেন বাবু ছিলেন না—দোকানে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার পিছনে পিছনে তাঁহার ড্রাইভার আসিল—দুই হাতে, বগলে, জামার পকেটে হরেক রকমের মনোহারী জিনিষ। দেবেন বাবু আসিতেই রেণু সাগ্রহে কহিল—"ইনিই আমার দাদা, এঁর কথাই বলেছিলাম আপনাকে।"

দেবেন বাবু গম্ভীর মুখে নগেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন—"ও:!"—বলিয়াই মোটরের সামনের দিকে উঠিয়া বসিয়া ষ্টীয়ারিং হুইলে হাত দিলেন।

দেবেন বাবুর গর্ব্বিত আচরণ নগেনকে আঘাত করিল; কহিল—"আমি যাই—"

রেণুও অপ্রতিভ হইল একটু; চট্ করিয়া বাঁ হাত দিয়া নগেনের একটা হাত ধরিয়া কহিল—"দাঁড়ান একটু"—ডান হাতে একটি ছোট কাপড়ের বাণ্ডিল লইয়া নগেনের দিকে আগাইয়া দিয়া কহিল—"এই নিন।"

নগেন বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠে বলিল—"ও কি?"

রেণু কহিল—"আপনার কাপড়,—পাননি বলেছিলেন না? দেবেন বাবুকে বলে সাহেবের কাছে 'পারমিট' আদায় করেছিলাম।"

নগেন বাণ্ডিলটি হাতে লইয়া কহিল—"দাম?"

রেণু কহিল—"বলছি"—বলিয়া ভ্রু ও কপাল কুঁচকাইয়া বোধ করি মনে মনে দামের হিসাব করিতে লাগিল। নগেন বাণ্ডিলটি বগলে চাপিয়া জামার নীচে ফতুয়ার বুক-পকেট হইতে টাকা বাহির করিতে ব্যস্ত হইল।

ড্রাইভার জিনিষগুলা মোটরের ভিতর রাখিয়া দেবেন বাবুর পাশে আসিয়া বসিতেই দেবেন বাবু গাড়ীতে ষ্টার্ট দিলেন। নগেন শশব্যস্তে মনিব্যাগ বাহির করিয়া ব্যগ্র কণ্ঠে কহিল—"দামটা কত বল না?"

রেণু মুচকি হাসিয়া কহিল—"বা রে! এত তাড়া দিচ্ছেন কেন? এতগুলো কাপড়ের হিসেব কি এত তাড়াতাড়ি হয়?"

গাড়ী মৃদুগতিতে চলিতে সুরু করিতেই নগেনও গাড়ীর সহিত চলিতে চলিতে কহিল—"অত চুলচেরা হিসেব করতে হবে না—যা' হয় মোটামুটি একটা বলে ফেল—"

গাড়ীর গতি দ্রুততর হইতেই রেণু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কহিল—"আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? ওর আবার দাম কি? মেয়ে-জামাইকে আশীর্ব্বাদী, দাদা-বৌদিদিকে প্রণামী দিয়েছি আমি; ছোট বোনের উপর এখনও একটু স্নেহ যদি থাকে তো দাম দেবার চেষ্টা করে আমাকে অপমান করবেন না।"

বিস্ময়ে নগেনের কথা ফুটিতে চাহিল না, কোন রকমে কহিল—"না—না—তা' কি হয়—"

গাড়ী অনেকটা চলিয়া গেলে রেণু মুখ বাড়াইয়া কহিল—"পূজোর পরে যাবেন নিশ্চয়—সকলকে নিয়ে যাবেন; বাবাকে বলব গিয়ে—"

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অবস্থা কাটাইয়া নগেন যখন কিঞ্চিৎ ধাতস্থ হইল তখন রেণুদের গাড়ী দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিয়া অনেক দূর চলিয়া গেছে।

বাড়ী ফিরিয়া আসিতেই সুরধুনি কাপড় দেখিয়া মহা খুসী। কমলার শাড়ীখানি চমৎকার! যেমন মিহি—তেমনই পাড়ের বাহার! নিজের শাড়ীখানিও বেশ পছন্দ হইল তাহার; হাসিমুখে বিস্ময়ের সুরে কহিল—"হ্যা গা! এত কাপড় দিলে সাহেব?"

নগেন মৃদু হাসিয়া কহিল—"তা দিলে বৈ কি!"

সুরধুনি কহিল—"তুমি বুঝি ইংরিজীতে সব বুঝিয়ে বললে?"

পূর্ব্ববৎ মৃদু হাসিয়া নগেন কহিল—"হুঁ।"

পরদিন সকালে পাড়ার সকলে একে একে আসিয়া হাজির হইল; কাপড় দেখিয়া সকলেই তারিফ করিল এবং মুখ কালো করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কাকা আসিয়া কাপড় দেখিয়া, দুই চোখ কপালে তুলিয়া কহিলেন—"এ যে একেবারে অসাধ্য সাধন করেছ হে!" সামলাইয়া লইয়া কহিলেন—"আমি জানতাম তুমি পারবে; রেলে অনেক সাহেব চরিয়ে এসেছ কি না! সাহেবরা কি জান বাবাজী, ঢোঁড়া গোখরো সাপের জাত! আনাড়ী লোক দেখলেই গর্জ্জায় আর ছোবলায়, কিন্তু ওস্তাদের হাতে পড়লেই তালে তালে খেলতে থাকে।"—দম লইয়া কহিলেন—"এবার কিন্তু, বাবাজী! বাবার সময় আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেও; আমার একটা ব্যবস্থা না করলেই আর নয়—"

একটি মৃদু রহস্যময় হাসি নগেনের দুই ওষ্ঠে যেন আঁটিয়া বসিয়া আছে। কাহারও কোন কথার জবাব দিল না সে, শুধু মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

পাড়ায় 'ধন্য-ধন্য' রব পড়িয়া গেল। নগেনের অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের খবর শুনিয়া ফুড-কমিটির মেম্বাররা মায় পরাণ গাঙ্গুলী ও রাধানাথ পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল এবং নগেনকে আর কমিটির বাহিরে রাখা নিরাপদ কি না—চিন্তা করিতে লাগিল।

মোট কথা, নগেন যে এক জন করিতকর্ম্মা ব্যক্তি, সে সম্বন্ধে পাড়ার কাহারও, এমন কি সুরধুনিরও আর কোন সন্দেহ রহিল না।

সমাপ্ত

রূপ-অরূপ

অমলেন্দু চট্টোপাধ্যায়

তোমায় যে আজ লাগছে আমার ভালো,—
এমনি করেই সামনে এসে দাঁড়িও,
একটু না হয় হলোই রঙটা কালো—
ওই হাতেরই আলগা পরশ দিও।

কুরূপ বলে হচ্ছে তোমার ভয়?
আমার মনে নেইক কোন দ্বন্দ্ব:
রূপ পারে কী প্রেম করতে জয়?
বাড়ায় কেবল নিত্য-নতুন সন্ধ।

নরম মনের গোপন স্বভাব-ধর্ম্ম
আপনি হলেই পরকে দেখায় পথ:
মন বোঝে তাই অরূপ রূপের মর্ম্ম
তোমার দ্বারেই বাঁধলো প্রেমের রথ।

এতেই ভালো লাগছে তোমায় আজ
অলঙ্কারহীন ভ্রমর দেহের সাজ।

সাম্প্রদায়িক দুর্যোগের নানা দিক্

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

তরুণ চট্টোপাধ্যায়

মন্ত্রী মিশনের সাফল্য কোথায়

এই ক'টি অঙ্গীকারকে পালন করে আজ চুই-হ্যান বিরোধকে কম্যুনিষ্টরা চীন থেকে চিরতরে নির্বাসিত করেছে। সমস্যাটা আমাদের দেশেও অবিকল এক রকম। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে অনেক ভাল ভাল কথা আছে বটে, কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের আস্থাভাজন কংগ্রেস হতে পারেনি, কারণ, কর্মসূচীর ভাল কথাগুলো কাগজেই সীমাবদ্ধ রয়ে গিয়েছে। দরিদ্র মুসলিম জনগণের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার কোন উন্নতিই কংগ্রেস আজ পর্যন্ত করতে পারেনি। তারা কোন প্রমাণ পায়নি যে, কংগ্রেস ভারতের সব জাতির, সব সম্প্রদায়ের নিজের প্রতিষ্ঠান।

তার পর এলো মন্ত্রী-মিশন ভারতকে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনতা দেবার জন্যে। শুরু হোল ভারতের জাতীয় আন্দোলনে এক নতুন দুর্লংঘ্য বাধা। কংগ্রেস তার "ভারত ছাড়ো" দাবীকে প্রত্যাহার করলে। লর্ড পেথিক লরেন্স মন্তব্য করলেন, "অখণ্ড ভারতে মুসলিমদের হিন্দুরা গ্রাস করে ফেলতে পারে।" বড়লাট শাসালেন, কোন একটি দল যদি অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিতে না চায়, তাহলে অন্য দলটিকে নিয়েই তিনি সরকার গড়বেন ; কিন্তু দেখা গেল যে তিনি কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে সরকার গড়তে শেষ পর্যন্ত অস্বীকার করলেন, অর্থাৎ তাঁর শাসানির পেছনে কোন আন্তরিকতা ছিল না। তাই দেখে মুসলিম লীগ নেতারা প্রধানতঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে "প্রত্যক্ষ সংগ্রাম" ঘোষণা করলেন। নতুন খোলে পুরে পুরানো Divide and Rule নীতি প্রয়োগ করা হোল এই ভাবে। কংগ্রেসের অনেকে ভাবলেন, লীগকে খুব জব্দ করা গেছে ; লীগ-নেতারাও মনে করলেন সরকারে ঢুকে কংগ্রেসকে খুব প্যাঁচে ফেলা গেছে। আসলে দু'পক্ষই পা দিলেন ব্রিটিশের প্যাঁচে। কংগ্রেস অবশ্য চেষ্টা করেছিল বড়লাটের নাচক শক্তিকে অকেজো করবার। লীগকে যথেষ্ট সুবিধা কংগ্রেস দিয়েছিল, যার চেয়ে বেশী আর দেওয়া যায় না। কিন্তু বড়লাটের অভয় বাণী লাভ করে লীগ বললে, বড়লাটের নাকচ শক্তি থাকবে। বড়লাটের জামা ধরে লীগ সরকারে ঢুকলো। তার আগেই ব্রিটিশ পরিকল্পনার কল্যাণে কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল। সারা দেশ জুড়ে যখন গণবিক্ষোভ মাথা চাড়া দিয়েছিল, তখন লীগ যোগ দিতে অস্বীকার করা সত্ত্বেও, কংগ্রেসকে কিছুটা সুবিধা দিয়ে ব্রিটিশ তাকে অন্তর্বর্তী সরকারে ঢুকিয়ে নিল, কারণ কংগ্রেসের কাছেই তাদের ভয়ের কারণ ছিল গণবিক্ষোভের পর গণবিক্ষোভ দেখা দিল, কংগ্রেসে এত দিনকার সংগ্রামী নেতারা সেই সংগ্রামের ডাকে সাড়া তো দিলেই না, উল্টে আন্দোলনগুলোকে নিন্দা করতে লাগলেন, এমন কি, দমন করতে সাহায্য করলেন। অন্তর্বর্তী সরকার ভারতের জনগণকে নেতৃহারা করলো। ব্রিটিশের প্রথম উদ্দেশ্য ভারতের গণ-বিপ্লবকে অংকুরে বিনষ্ট করা, সফল হোল। তার পর এলো বড়লাটের লীগ-তোষণের পালা। লণ্ডন থেকে 'টাইমস্' পত্রিকা উপদেশ দিলে যে, লীগের সঙ্গে এবং রাজন্যবর্গের সঙ্গে আপোষ না করতে পারলে গণ-পরিষদ চলবে কি করে ? সুতরাং "গ্রুপিং" সম্পর্কে লীগের ইচ্ছে কংগ্রেসের মেনে নেওয়া উচিত। এদিকে জিন্না সাহেব কলকাতার দাঙ্গার উদাহরণ দেখিয়ে শাসালেন যে, লীগের ইচ্ছা অমান্য করলে রক্তপাত বন্ধ করা যাবে না। স্যর সুলতান আহমদ জানালেন, লীগ যোগ না দিলে রাজন্যবর্গও গণ-পরিষদে যোগ দিবেন না। সোজা কথায় ব্যাপারটা দাঁড়ালো কংগ্রেসের পক্ষে এই :—যদি গণ-পরিষদ গঠন করতে চাও (অর্থাৎ অন্তর্বর্তী সরকারকে সফল করতে চাও) তাহলে লীগের প্রগতিবিরোধী দাবীকে মেনে নাও ; আর তা না হলে পুনর্মুষিকো ভব কিম্বা জোর করে গণ-পরিষদ চালু করতে গিয়ে দেশে সাম্প্রদায়িক ভ্রাতৃ-যুদ্ধের আগুনে ঘি ঢালো।

লীগ ঢুকলোও শেষ পর্যন্ত গণ-পরিষদে, বড়লাটের সাহায্য নিয়ে। বড়লাট লীগকে জানালেন যে, তাদের কোন ভয় নেই ; তারা যাতে কোন ব্যাপারে বিপন্ন না হয় তা তিনি দেখবেন। এদিকে রাজন্যবর্গও সন্তুষ্ট হলেন এই ভেবে যে, তাঁদের স্বার্থে দরকার মত তাঁরা লীগকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লাগাতে পারবেন ; সুতরাং তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরাচার বজায় রাখার ব্যবস্থাও হয়ে গেল। পাছে সব ভেস্তে যায় এই ভয়ে কংগ্রেসও দেশীয় রাজ্যে প্রজা-(সামান্য একটু মৌখিক সমর্থন করলেও) আন্দোলনের দিকে পিছন ফিরে রাজন্যদের একটু খুসী করার চেষ্টা করতে লাগল। এই ভাবে ব্রিটিশের সঙ্গে আপোষ করতে গিয়ে সারা ভারতের গণসংগ্রাম থেকে কংগ্রেস-নেতৃত্ব এক দিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল, অন্য দিকে প্রধান জাতীয় প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে নিরুপায় হয়ে পড়ল। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার গিয়ে পড়ল অহিংস কংগ্রেসী-শাসনে, হিংস মিলিটারীর ওপরে। বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা আনতে গিয়ে, রক্তাক্ত ভ্রাতৃযুদ্ধের বাঁধন ব্রিটিশের পায়ে ভারতবর্ষকে আরো শক্ত করে বেঁধে দিল। সমগ্র পরাধীন এশিয়া আর আফ্রিকার নিপীড়িত বিক্ষুব্ধ সংগ্রামী জনসাধারণ—যারা এক দিন আশা করেছিল ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম সমগ্র এশিয়ার পুরোভাগে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব করবে—আজ ভারতের উপর আস্থাহীন হয়ে পড়েছে। তাদের সংগ্রাম আজ ভারতের দোষেই অনেক বেশী কঠিন হয়ে পড়েছে। ভারতের এত দিনকার গৌরবময় মুক্তি-সংগ্রামের এই শোচনীয় পরিণতি কেউ ভাবতে পেরেছিল কি ? অন্তর্বর্তী সরকারের ভার পণ্ডিত নেহরু নেওয়ার পরে উজিরিস্থানে বোমা ফেলা হয়েছে এবং তার পর ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা পাইকারী জরিমানা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সৈন্যের ভারত ত্যাগ এবং সৈন্যবাহিনীর ভারতীয়করণের কোন সম্ভাবনা আপাততঃ দেখা যাচ্ছে না। অচিনলেক পরিষ্কার বলেছেন যে, ভারতবর্ষ ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থাকবে, এটা ধরে নিয়েই ভারতের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে নতুন পরিকল্পনা করা হচ্ছে। কারণ, তাঁর মতে ভারত যদি কমনওয়েলথে না থাকে তাহলে এমন সব অনিশ্চিত ব্যাপারের উদ্ভাবন হতে পারে, যার দরুণ কোন পরিকল্পনা করা কার্যতঃ সম্ভব হওয়া কঠিন। এদিকে ভারতে নিত্য নতুন ব্রিটিশ সৈন্যদল আসছে। এই সেদিন বোম্বাইতে ১৮০০ নতুন ব্রিটিশ সৈন্য আমদানী হয়েছে। এই আমদানীর আগে সর্দার বলদেব সিং আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সেনাদলকে জাতীয়করণের কাজ ঝাঁ-ঝাঁ করে এগিয়ে চলছে। কিন্তু অচিনলেক বলেছেন, সৈন্যদের কর্মদক্ষতা বজায় রাখার জন্য যতটা দরকার জাতীয়করণে দেরী হবে। বলদেব সিং অবিকল সেই উক্তির প্রতিধ্বনি করেছেন এবং অচিনলেক-প্রশস্তি এবং ভারতীয় ব্রিটিশ তাঁবেদার সাম্রাজ্যবাদী ভাড়াটে সেনাদের

"বিগত গৌরব ও ঐতিহ্য" বজায় রাখতে উপদেশ দিয়েছেন। ভারতীয় সেনাদলের "বিগত গৌরব এবং ঐতিহ্যে"র পরিচয় অবশ্য আমরা বহু পেয়েছি ১৯২০ সালে, ১৯৩০ সালে এবং ১৯৪২ সালে। অন্তর্বর্তী সরকারের সেনাদল কি সেই ঐতিহ্য বহন করবে? ১৯৪৭ সালে ভারতে ৪৮০০০০ ভারতীয় সৈনিক থাকবে যাহাদের ওপরে ৮৮০০ জন নায়ক থাকবেন। এই নায়কদের মধ্যে ৫১০০ জন হবেন ব্রিটিশ। ১৫৫ জন ভারতীয় বৈমানিক পাকা চাকরীর জন্ম দরখাস্ত করেন। তাঁদের মধ্যে মাত্র ১০৭ জনকে নেওয়া হয়েছে। ভারতীয় বিমান-বহরের সর্বাধিনায়ক রডেরিক্ কার এক বাণীতে বলেছেন যে, ভারতীয় বিমান-বহরের পক্ষে ভারতের দেশরক্ষার দায়িত্ব নেবার মত কর্মদক্ষ হতে দীর্ঘ সময় লাগবে। এই দীর্ঘ সময় কত দিন তা কে জানে! তার পর এখনো ৪০ হাজার ভারতীয় সৈন্ত মধ্য-প্রাচ্যে, গ্রীসে, এবং সুদূর প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের হয়ে পরাধীনের মুক্তি-আন্দোলনের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। অচিনলেক বলেছেন, "এই সব সৈন্তরা ভারতের পক্ষে উদ্বৃত্ত, তাই তারা ফিরলে তাদের বাহিনীগুলোকে ভেঙ্গে দিতে হবে। সুতরাং ভাবী ভারত সরকারের উচিত তাদের ব্রিটিশ সরকারের হাতে রেখে দেওয়া, অবশ্য ব্রিটিশ সরকার তাদের মাইনে দিতে কার্পণ্য করবে না।" উদ্দেশ্য পরিষ্কার! প্রত্যাগত ভারতীয় সৈন্তদের নিরস্ত্র করা হবে, কারণ তারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। কিন্তু দলে দলে ব্রিটিশ সৈন্ত আমদানি বন্ধ হবে না, কিন্তু ভারতীয় সৈন্তের চাকরী বজায় থাকবে, কিন্তু তাদের কাজ হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলো রক্ষা করা। কি চমৎকার জাতীয়করণ! কি চমৎকার স্বরাজ! ওদিকে দাঙ্গা থামাবার অজুহাতে আমাদেরই খরচে নিত্য-নতুন ব্রিটিশ সৈন্তদল ভারতের মাটিতে শিকড় গাড়বে। এই গেল ভারতজোড়া দাঙ্গা-পরিস্থিতির মৌলিক বিশ্লেষণ।

এইবার আমাদের দেখতে হবে দাঙ্গার উপযুক্ত যে পরিস্থিতি মন্ত্রী মিশন তৈরী করে দিয়েছে, লীগ কি ভাবে তার সুযোগ নিয়েছে। লীগ মুসলিম জনসাধারণকে কি করে সংঘবদ্ধ করতে পারলে।

লীগের রাজনৈতিক রূপ নাই কেন

ইংরেজ মুসলমানের হাত থেকে ভারতবর্ষকে হাতাবার জন্তে প্রথমে হিন্দুর সঙ্গে বেশী দহরম মহরম করেছিল, হিন্দুদের চাকরী-বাকরী দিয়েছিল বেশী। তার পর যেই দেখলে হিন্দুরা চালাক হয়ে উঠেছে অমনি মুসলমানদের চাকরীর ক্ষেত্রে সুবিধা দিতে লাগল উপযুক্ত হিন্দুদের বাদ দিয়ে। ফলে রাজনীতি-সচেতন হিন্দুর সংগ্রাম সুরু হোল ইংরেজের সঙ্গে আর মুসলমানের চাকরীর সংগ্রাম সুরু হোল হিন্দুর সঙ্গে অর্থাৎ হিন্দুর সংগ্রাম হোল রাজনৈতিক আর মুসলমানের সংগ্রাম দাঁড়ালো সাম্প্রদায়িক। সুতরাং লীগের চাকরী লাভের সংগ্রাম কোন দিনই রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রাম হতে পারে না। ভারত হিন্দুর অধীন নয়, ইংরেজের। সুতরাং লীগের হিন্দু-বিরোধী সংগ্রাম দেশের মুক্তি-সংগ্রাম হবে কি করে?

লীগের ফ্যাসিষ্ট পন্থা

লীগ হিন্দুর বিরুদ্ধে কি করে মুসলিমদের নিয়ে গেল, তা দেখতে ফ্যাসিষ্টদের পন্থার সঙ্গে পরিচয় থাকা দরকার। জার্মাণীর কথাই ধরা যাক্। মধ্যযুগীয় ক্যাথলিক চার্চের নীতি—একটা মূঢ়তাকে গায়ের জোরে বজায় রাখা ("defending nonsense by violence"—Gibbon)—ফ্যাসিষ্ট দল এবং লীগ দল দু'য়ের পক্ষেই খাটে। "বীরত্ব" "আত্মত্যাগ" "জাতীয় কর্তব্য" ইত্যাদি নানা বুলি উভয় পক্ষই আউড়ে থাকে ইতালীর ফ্যাসিষ্টরা "সামাজিক খৃষ্টানত্বে" মহিমা প্রচার করেছিল, লীগ সামাজিক মুসলিমত্বের মহিমা প্রচার করে। নাৎসীবাদ বা ফ্যাসিবাদের যেমন কোন নৈতিক (theoretical) ভিত্তি ছিল না, লীগের পাকিস্থানের কোন সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় না। বরং আম্বেদকর পাকিস্থান সম্পর্কে লিখেছেন কিন্তু লীগের তরফ থেকে সে রকম কোন প্রামাণ্য ম্যানিফেষ্টো নেই। ফ্যাসিবাদের নৈতিক ভিত্তি যে ছিল না এবং ফ্যাসিষ্ট দল তৈরীর পর যে একটা নীতি খাড়া করার চেষ্টা হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯২১ সালের মুসোলিনীর বক্তৃতায় এবং মাইনক্যাম্পফের ৭৮ পৃষ্ঠায়।

"এইবারে ইতালীয় ফ্যাসিবাদকে কতকগুলো নীতি আবিষ্কার করতে হবে, তা নাহলে তার মৃত্যু অনিবার্য..."

"কোন একটি বিশ্ব-নীতির বিরুদ্ধে নিজের কোন তৈরী নীতি যদি না থাকে, তাহলে লড়াইয়ে সেই বিশ্ব-নীতিটিকে হারানো যায় না। এই দিক দিয়ে মার্কসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই ব্যর্থ হয়েছিল, বিসমার্কের সমাজতন্ত্রবাদ ব্যর্থ হয়েছিল, কারণ তাঁর কোন নৈতিক রঙ্গমঞ্চ ছিল না। ১৯১৪ সালে সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির বিরুদ্ধে আমাদের দ্বন্দ্ব কতটুকু চালানো যাবে তাতে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল, কারণ সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসির আসনে বসান যায় এমন কোন নীতি আমাদের তৈরী ছিল না।"

এই দু'টি উক্তি থেকেই প্রমাণিত হয় যে, প্রথমে ফ্যাসিষ্ট দল দু'টির কোন নীতির বালাই ছিল না। হিটলারের বক্তব্য এই যে, মার্কসবাদের একটা বিশ্বমুখী রূপ আছে। সুতরাং তাকে ধ্বংস করতে হলে ফ্যাসিষ্টদেরও একটা বিশ্ববাদ তৈরী করা চাই। জিন্নারও তাই, কংগ্রেসের স্বরাজবাদকে ভাঙতে হবে বলে তিনি একটা অদ্ভুত পাকিস্থানবাদ তৈরী করেছেন, যার মধ্যে সামঞ্জস্য কোথাও নেই। "আমরা অহিংসবাদী নই" জিন্নার এই উক্তি হিটলারের শক্তি-প্রশস্তির অক্ষম অনুকরণ। অখণ্ড জার্মানবাদ, আর্যবাদ, শ্রেষ্ঠ জাতিবাদ, এগুলোর প্রতিচ্ছবি আজ অখণ্ড ইসলামবাদ, হিন্দু মাত্রই কাফের, এই সব নীতি।

আজ যেমন যুদ্ধাপরাধের জন্তে সমগ্র জার্মান জাতিকে দায়ী করা অন্তায়, ঠিক তেমনিই দাঙ্গার জন্তে সমগ্র মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী করা চলে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পিছনে প্রধান কারণ ছিল সাম্রাজ্যবাদ, কিন্তু যুদ্ধ সুরু করেছিলেন ফ্যাসিষ্ট নেতারা, তাই প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁদের নিতে হবে বৈ কি। ঠিক তেমনি ভারতের সাম্প্রদায়িক অন্তর্যুদ্ধের মূল কারণ অর্থনৈতিক। কিন্তু মুসলিম জনগণকে বিপথে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে চালিত করার দায়িত্বও লীগকে নিতে হবে বৈ কি; এ ক্ষেত্রেও প্রত্যক্ষ দায়িত্ব তাঁদের। সুতরাং ন্যুরেমবার্গের মত তাঁদের বিচার হওয়া উচিত।

নাৎসীরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ইহুদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেগে তাদের সম্পত্তি হাতিয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহুদীদের মধ্যে চিন্তাশীল মনীষী বেশী থাকায়, তাদের উচ্ছেদে জার্মানীতে অন্ধ ফ্যাসিবাদ

প্রচারের সুবিধা হয়েছিল। যে হিন্দুরা সংখ্যালঘু, অথচ টাকা-কড়ি এবং জ্ঞান-বুদ্ধি তাদেরই ঘরে, সেখানে লীগও তাদের বিরুদ্ধে একই রকম প্রচার চালায়। বলে, হিন্দুরা সব টাকা নিয়ে আমাদের গরীব করে রেখেছে, অতএব তাদের ভিটেমাটি ছাড়া করে পাকিস্থান করতে হবে। নাৎসীদের হেরেনভোক্ লক্ষ্যের জন্তেই তারা বিশ্বযুদ্ধে নেমেছিল। জিন্না এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের বাদশাহী লাভের জন্তেই তাঁদের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

শেষ কথা, প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জার্মানীর আর্থিক দুঃস্থতাকে ভাঙ্গিয়ে জার্মানীর পুঁজিপতিরা তাদের ফ্যাসিবাদের জালে ফেলেছিল তাদের রাজনৈতিক চৈতন্তের অভাবের সুযোগ নিয়ে! সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বিপ্লবী অনুপ্রেরণা ও কর্ম্মসূচীর অভাবে জনসাধারণকে বিপথ থেকে ফেরাতে পারেননি। ভারতেও মুসলিম জনসাধারণের দুর্দশার কোন সুরাহা কংগ্রেস করতে না পারায়, আজ লীগ তাদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে তাদের এতখানি বিপথে নিয়ে যেতে পেরেছে।

নোয়াখালির দুর্দ্দশা

নোয়াখালির দাঙ্গার উদাহরণ নিয়ে বিচার করা যাক, কি ভাবে সাধারণ নিরীহ মুসলমান লীগের ফ্যাসিষ্ট-পন্থার শীকার হয়ে পড়লো। তাছাড়া এত জায়গা থাকতে সংখ্যালঘুর বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, নোয়াখালি জেলাতে আগে হোল কেন? তার প্রথম অন্যতম কারণ বাংলায় নোয়াখালি আজ সব চেয়ে দুর্দ্দশাগ্রস্ত জেলা।

নোয়াখালিতে ২১ লক্ষ লোকের বাস, যাদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জন চাষী, ৮ জন কুটির-শিল্পী, এবং বাকি হোল মধ্যবিত্ত এবং জমিদার, জোতদার, মহাজন ইত্যাদি পরভুক্ শ্রেণী। যুদ্ধের আগে নোয়াখালিতে শতকরা ৩৬ জন ছিল ভূমিহীন ক্ষেত-মজুর। ১৯৪০ থেকে সুরু করে পর পর তিন বছর যখন অজন্মা হোল, তখন লোকে তাদের জমিজমা বেচে খাদ্যের সংস্থান করার চেষ্টা করলে। তার পর ১৬৫ বর্গমাইল ক্ষেত বন্যায় অকেজো হয়ে গেল। এমনিতেই নোয়াখালি বরাবর ঘাটতি জেলা। তার ওপর প্রকৃতির এই অভিশাপ। তার পর এল যুদ্ধ। সরকার গায়ের জোরে নোয়াখালিকে "উদ্বৃত্ত এলাকা" ঘোষণা করলেন এবং চাল আমদানী নিষিদ্ধ করলেন। কিন্তু তার পরই দেখা গেল, চালের দর হু-হু করে বেড়ে চলেছে; ১৯৪২এর ৬ টাকা মণ থেকে ১৯৪৩এর মার্চ্চে দাঁড়ালো ১৫ টাকা। শেষ পর্য্যন্ত আমদানীর উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হোল। ব্যবসায়ীরা ওৎ পেতে বসেছিল। তারা চাল আমদানী করতে লাগল কিন্তু বাজারে ছাড়ল না। চালের দর বাড়তে বাড়তে গিয়ে ঠেকল জুলাই মাসে ৬০৲ টাকায়। সে-বার ফসলও হোল ভাল কিন্তু সে ফসলও সোজা গিয়ে উঠল সরকারী ক্রেতার হাতে বা ঐ সব মজুতদারদের হাতে। নোয়াখালিতে দুর্ভিক্ষের আগুন জ্বলে উঠলো দাউ-দাউ করে। ২১ লক্ষ লোকের মধ্যে ২ লক্ষ অনাহারে প্রাণ দিল, এক লক্ষ ভিটে-মাটি ছেড়ে আসাম ও পশ্চিম-বঙ্গের দিকে পাড়ি দিলে। সরকারের বঞ্চনা-নীতির কল্যাণে আরো ২ লক্ষ যুদ্ধের চাকরী নিয়ে চলে গেল। এদের বাদ দিয়ে যারা রইলো তাদের শতকরা ৭০ জনের জীবনী শক্তির অভাবে নানা কঠিন রোগ দেখা দিল। ২০ হাজার জেলের মধ্যে ১০ হাজার, ২০ হাজার পান-চাষীর মধ্যে ১০ হাজার, এবং তাঁতীদের শতকরা ৩০ জন দুর্ভিক্ষের কালগ্রাস থেকে আত্মরক্ষা করতে পারলে না। গরু-ভেড়ার অর্দ্ধেক মড়কে শেষ হোল। তার পর এল মহামারী, যার কবলে পড়লো ১৫ লক্ষ লোক। ম্যালেরিয়ায় বহু লোক মারা গেল—চোরাবাজারে তখন এক পাউণ্ড কুইনাইনের দর ৪০০৲ টাকা। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে গেল। নিম্ন-মধ্যবিত্তরাও বাদ গেল না।

যুদ্ধোত্তর নোয়াখালির অবস্থা কি? আজ সেখানে ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে শতকরা ৬০জন। চাষ করে তাদের দিন গুজরাণ হয় না। সব কিছুরই দাম বেড়ে গিয়েছে। এক জোড়া বলদের দাম আজ ২০০ টাকার বদলে ৬০০ টাকা এবং দিন-পিছু ভাড়া হচ্ছে আট আনার জায়গায় ২ টাকা। তার পর জোতদারদের খাঁই বেড়েছে অনেক, মজুরীও বেড়েছে চার গুণ। সুতরাং শুধু এক ফালি জমি থাকাও যা না থাকাও তাই। চালের দর ১৬ টাকা থেকে ৫২ টাকা পর্য্যন্ত শোনা যায়! চোরাবাজারে একখানা কাপড়ের দাম ১০।১২ টাকা, চিনি ২ টাকা সের, তেল দেড় টাকা, দুধ আট আনা, গুড় বারো আনা।

নোয়াখালির জেলেরা আজ প্রায় নির্ব্বংশ। নৌকা, জাল, সুতা কোন কিছুই তাদের নেই। কতকগুলো জেলে-গ্রামে আজ পুরুষই নেই। আছে শুধু স্ত্রীলোকেরা। এই সব গ্রামগুলোর একমাত্র জীবিকা আজ দেহ-বিক্রয়।

নোয়াখালির তাঁত-শিল্পের উৎপাদন আজ শতকরা ৬০ ভাগ কমে গিয়েছে। ১২০০০ তাঁত সুতোর এবং কেরোসিনের অভাবে অকেজো হয়ে পড়েছে। চোরাবাজার থেকে সুতো কিনতে গেলে বাঁধা দরের চেয়ে ১০।১৫ টাকা করে বেশী লাগে; কেরোসিনের দর বেড়েছে চার গুণ।

আর্থিক দুর্দশা নৈতিক অধঃপতনকে ডেকে আনে। নোয়াখালিতে যৌথ-পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে ছারখার হয়ে গিয়েছে। আগেকার তুলনায় বেশ্যাবৃত্তি বেড়েছে ১০ গুণ। সঙ্গে সঙ্গে যৌনব্যাধির পসার বেড়েছে দারুণ ভাবে। স্ত্রীলোক কেনা-বেচার খবরও শুনতে পাওয়া যায়। যুদ্ধ-ফেরৎ সৈনিকরা নিত্য-নতুন নিকে করছে, তালাক দিচ্ছে।

১৯৪৬ সালের নোয়াখালির সমাজের কাঁধে বসে আছে মিলিটারী কনট্রাক্টাররা আর মজুতদার, মহাজন, জোতদার ইত্যাদি। তারা দুধ-কলা দিয়ে এক দল বেকার গুণ্ডাকে পুষে আসছিল আজ অনেক দিন ধরে; এই গুণ্ডাগুলো চর অঞ্চলে থাকে আর গুণ্ডামী, লুঠপাট করে। এরা কনট্রাক্টর আর চোরাকারবারীদের অন্যায় কাজে সাহায্য করে, তাদের আগলে রাখে। ঠিক এই রকমের এক দল ভাড়াটে গুণ্ডার দল ময়মনসিংহে ব্রাহ্মণবেড়িয়া অঞ্চলে আছে, যারা ডাকাতি করে, ট্রেণ উল্টে দেয়। এই গুণ্ডার দল আর যুদ্ধ-ফেরৎ বেকার দল নোয়াখালির প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বর্শা-ফলক হয়েছিল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের সাফল্য

এখন আমরা নোয়াখালির অবস্থার দু'টি দিক্ দেখতে পাচ্ছি। দেখছি যে, আজও কিষাণদের জমি অনবরত এই সব পরশ্রমজীবি কনট্রাক্টর, জোতদার, মহাজনদের হাতে চলে যাচ্ছে। তারা কিনছে অতি শস্তা দরে কিন্তু যেদিন বেচবে দাম পাবে অনেক। ছাগলনায়া, ফুলগাজি, গণিপুর, কালিকাপুর, বেগমগঞ্জ ইত্যাদি গ্রামে এই ভূমি-হস্তান্তরের প্রমাণ পাওয়া যাবে রেজিষ্ট্রী আফিসে গেলেই।

এই সব জমির নতুন মালিকেরা নিজেরাও চাষ করবে না, অন্যকেও চাষ করতে দেবে না। গরীব চাষী এবং ক্ষেত-মজুরেরা ক্রমশঃ ক্ষেপে উঠছে সেখানকার পয়সাওয়ালাদের বিরুদ্ধে। অন্য দিকে দেখছি যে এই মুষ্টিমেয় পয়সাওয়ালারা, অর্থাৎ জমিদার, কনট্রাক্টর, মহাজনেরা একমাত্র এরাই দুর্ভিক্ষের, বন্যার, যুদ্ধের বাজারে ক্রমশঃ ফেঁপে উঠেছে জনগণের দুর্দশাকে মূলধন হিসাবে ব্যবহার ক'রে। এখন কথা হচ্ছে, এই দুঃস্থ জনগণের অধিকাংশই মুসলমান; আর এই ফুলে-ফেঁপে ওঠা হঠাৎ-বাবুদের অনেকেই জমীদার এবং হিন্দু। হঠাৎ-বাবুদের মধ্যে যারা মুসলমান, তারাই সেখানকার লীগের চাঁই এবং দরিদ্র মুসলিমদের দৃষ্টি সংখ্যালঘু বিত্তশালী হিন্দুদের দিকে ফিরিয়ে সেই সুযোগে নিজেদের লুঠের মাল ঘরে তুলছে। আর বোকা জনসাধারণ পেটের জ্বালায় তাদের কথা বিশ্বাস করছে আর ভাবছে যে, হিন্দুই তাদের দুর্দশার জন্যে দায়ী। তারা আরো ভেবেছে, "ন্যায়পথে থাকতে গিয়ে যখন আজ আমাদের এই অবস্থা, তখন হিন্দুদের সম্পত্তি অন্যায় ভাবে কেড়ে নিয়েও যদি খেতে-পরতে পাওয়া যায়, তাতে আপত্তি কি? ন্যায়ের ও সততার মূল্য তো আমরা পাইনি।" সুতরাং সংখ্যালঘু, ধনী, জ্ঞানী ইহুদী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযানে হিটলারের ডাকে ক্ষুধার্ত্ত আর্যরক্তধারী জার্মানরা যে ভাবে সাড়া দিয়েছিল আজ বাংলায়, বিশেষ করে নোয়াখালিতে সংখ্যালঘিষ্ঠ অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল, শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ইসলাম-রক্তধারী ক্ষুধার্ত্ত মুসলিমরা ঠিক সেই ভাবেই সাড়া দিয়েছে। জার্মানীতে প্রথম ঘা মেরে সবাইকে প্রেরণা যুগিয়েছিল এস্ এস্ বাহিনীর জল্লাদরা। নোয়াখালিতেও সেই প্রথম ঘা মেরে সবাইকে প্ররোচিত করেছে চরের লীগ-ভাড়াটে গুণ্ডা দল। হিটলারের যেমন একটা অজুহাত ছিল ভার্সাইএর অপমান জিন্নারও সেই রকম অজুহাত মন্ত্রী মিশন কর্ত্তৃক লীগকে অপমান। নোয়াখালিতে লীগের আওয়াজ ছিল, "হিন্দুরাই আমাদের গরীব করে রেখেছে" (নাৎসী আওয়াজ ছিল—ইহুদীরা আমাদের গরীব করে রেখেছে)। "কলকাতার প্রতিশোধ চাই" (নাৎসী ধ্বনি ছিল,—ভার্সাইএর প্রতিশোধ চাই)। "কাফেরকে মুসলমান করা পবিত্র কর্ত্তব্য" (জার্মানকরণ পবিত্র কর্ত্তব্য এই ছিল নাৎসী-বুলি)।

এই ভাবে নোয়াখালির সংখ্যাগুরু (শতকরা ৮১ জন) সম্প্রদায় তাদের নিজেদের নির্বাচিত শাসকমণ্ডলীর অধীনে থেকে এক নৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত করলে। লীগ মন্ত্রিসভা তাদের খেতে-পরতে দেবে এই আশাতেই তারা ভোট দিয়েছিল নিশ্চয়। হ্যাঁ, আপাততঃ দিন কয়েক সেই মন্ত্রিসভার কল্যাণেই তাঁরা পরকে মেরে নিজেদের খাওয়া-পরার ব্যবস্থা করেছে বৈ কি। কিন্তু সেটা টিকবে ক'দিন? লীগ-নেতারা আজ নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন। নাৎসী-পতাকা, নাৎসী-ধ্বনি এবং নাৎসী দলের নামে যে সব অমানুষিক বর্ব্বরতা করা হয়েছে, গোয়েরিং-প্রমুখ নেতারা যতই বলুন সে সব বিষয়ের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না। লীগ-পতাকা ও লীগের ধ্বনি নিয়ে, লীগের নামে যে সব পাশবিকতা করা হয়েছে, তার দায়িত্বও প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণাকারী নেতৃবৃন্দকে নিতে হবে বৈ কি। ইতিহাস তার সাক্ষী থাকবে। বিংশ শতাব্দীতে সামন্তযুগীয় গণ ধর্ষণের এমন উদাহরণ আর মিলবে না।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম-ক্ষেত্র বাংলা

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম এর পরে বাংলা দেশের পূর্বাঞ্চলে অন্য যে কোন জায়গায় আবার সুরু হতে পারে। তার কারণ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিষবৃক্ষ বেড়ে ওঠার উপযুক্ত ভূমি পূর্ববঙ্গ। দুভিক্ষ-কমিশনের বিবৃতিতে দেখা যায়, "১০ লক্ষ থেকে ২০ লক্ষ লোক বাংলায় ৪৩ সালের দুভিক্ষে মারা গিয়েছে। যারা সেই সময় যমের হাত এড়াতে পেরেছিল, অন্য নানা দিক দিয়ে তাদের জীবনযাত্রায় ভাঙ্গন এসে গিয়েছিল।" এই হচ্ছে আমাদের সোনার বাংলা, আর লীগের "পূর্ব-পাকিস্থানের" অবস্থা। প্রায় ৩০ লক্ষ ক্ষেত-মজুর, ১৫ লক্ষ দুঃস্থ কৃষক, ১৫ লক্ষ কুটির-শিল্পী, এবং আড়াই লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকের আজ দুর্গতির একশেষ। প্রদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ২০ জন, কিন্তু চাষের জমিবৃদ্ধির হার শতকরা মাত্র ৫ ভাগ; আর শস্যোৎপাদন বৃদ্ধি একেবারেই নেই। খাদ্যের ঘাটতি বেড়েই চলেছে। দুভিক্ষের সঙ্গে বাঙ্গালী চাষীর পরিচয় আজন্ম।

বাংলায় জমিদার, তালুকদার, জোতদার ইত্যাদি অনুৎপাদক পরশ্রমজীবী পরিবার প্রায় ৫ লক্ষ, যাদের অধিকাংশই হিন্দু। আবার এই ৫ লক্ষের মধ্যে মাত্র ১টি পরিবার (বর্দ্ধমান, কাশিম-বাজার, প্রদ্যোৎ ঠাকুর, নাটোর, ময়মনসিং, দীঘাপতিয়া, পটিয়া এবং মুক্তাগাছা) বাংলা দেশের মোট চাষের জমির এক-তৃতীয়াংশ ভাগ দখলে রেখেছেন। এঁরা সবাই হিন্দু। এঁদের কেউ বা কংগ্রেসের সদস্য, কেউ কংগ্রেসপন্থী, কেউ বা হিন্দু-মহাসভাপন্থী। অবশ্য তার জন্যে তাঁরা মুসলমান প্রজার তুলনায় যে হিন্দু প্রজাকে কম শোষণ করেন তা মোটেই নয়। কি হিন্দু, কি মুসলিম,—ময়মন-সিংহের মহারাজার প্রজাদের গড়পড়তা আয় বছরে ৪৩ টাকা। মহারাজার মোট আয় বছরে ১০ লক্ষ টাকার ওপর (মাথা-পিছু ১৫ হাজার টাকা)। এই আয়ের ৫ ভাগের ১ ভাগ দিতে হয় সরকারকে। বাকি ৪ ভাগ যেমন ইচ্ছা খরচ করা হয়। এদিকে চাষীদের বছরে ৪৩ টাকা থেকে বলদ, লাঙ্গল, সার, খাজনা, এবং অন্য সব-কিছুর ব্যবস্থা করতে হয়। এদের দুর্দশার সুযোগ নিয়ে জমিদার, মহাজন এবং ব্যবসায়ীরা খাদ্যের চোরা কারবার করে ১৫০ কোটি টাকা মুনাফা লুঠেছিল (দুর্ভিক্ষ-কমিশনের বিবৃতি)।

পূর্ব ও পশ্চিম-বঙ্গ

পূর্ব-বঙ্গ এবং পশ্চিম-বঙ্গের একটা তুলনা করতে গেলে দেখা যায় যে, ১৮৭২ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে পূর্ব-বঙ্গে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ১০ জন, এবং পশ্চিম-বঙ্গে ছিল মাত্র ৩৬ জন। পূর্ব-বঙ্গে বহু নদ-নদী থাকায় চাষবাস ভাল হয়, তাই এই লোকবৃদ্ধি। কিন্তু জমি তো আর বাড়ছে না। এদিকে লোক হু-হু করে বেড়ে চলায় জমি নিয়ে ক্রমশঃ টানাটানি বাড়তে লাগলো। তার পর অর্দ্ধেক জমি তো বড়লোকেরা শস্তায় কিনে ফেলে রেখেছে। কিছু জমি বন্যার জলে নষ্ট হয়েছে। তার পর পতিত জমি উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নেই। কাজে-কাজেই বাড়তি লোকেরা (অধিকাংশই মুসলমান) জমির সন্ধানে আসামের দিকে পাড়ি দিতে বাধ্য হোল। এই চাষীদের নিয়েই আজ আসামের বহিরাগত সমস্যা। বল-প্রয়োগ করে এদের তাড়ানোর চেষ্টাকে কিছুতে প্রশংসা করা চলে না। সমস্যাটা সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক এবং কৃষিগত। সমস্যার মূল রয়েছে বাংলার মাটিতে। জমিদারী উচ্ছেদ, পতিত জমি উদ্ধার,

জয়ন্তি

সুধাংশু চৌধুরী

ট্রেণ থেকে তুমি নাম্‌লে,
কিছু চেনা নয়, খানিকটা নেবে সাম্‌লে,
তার পর দ্যাখো পিচে ও পাথরে গাঁথা
পথ চ'লে গেছে—বাঁ দিকে পাহাড় আকাশে তুলেছে মাথা.
কিছু গিয়ে ব্রীজ—বেশি না, অল্প জল,
ডান দিকে জঙ্গল—
মাটিতে এবং বালিতে এবং পাথরে নখের ক্ষত,
দেখা দেয় আর মিলায় কত যে শতাব্দী হ'ল গত,
তবুও আদিম কাল—
অদূরে ভূটান, হিমালয় অই দূর সীমান্তরাল!
কত দূরে গিয়ে ডাইনে পড়বে বাড়ি
রেলিংয়ে ওথায় রঙীন তাঁতের শাড়ি
অদূরে ভূটান, দূরে হিমালয়, তবুও বঙ্গদেশ,
পথিক তোমার পথ তো এখানে শেষ।

অনামিক :—
নরম কোনো নাম হবে সে জায়গাটার,
গ্রাম
মোটরে গিয়ে মাটিতে নামলাম।
বালির শেজ পাতা,
খানিক দূরে পাহাড় তোলে মাথা
সাম্‌নে পিছে ডাইনে বাঁয়ে মানুষ নাই,
থম্‌থমে,
আকাশ আছে সূর্য্য আছে, অরণ্যের দুর্গমে
পায়ের পথ সে-পথে হাঁটলাম
পাহাড়, বন, নদী, তার কিছু নাহি নাম।

নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী :—
নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী—অতএব
এতোটুকু কাল এতটুকু মাটি
চক্ষু গরম কোরো না'
শক্ত মুঠায় কাম্যকে চেপে ধোরো না।
নিরবধি কাল, বিপুলা পৃথ্বী তার পর
একটি সরল রেখার সমান
বলছে তোমার জীবন গৌণ
রক্ত গরম কোরো না
অনন্তিকালের বালির সৌধ গ'ড়ো না।

নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী—
নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী—জল্লাদ—
দিগন্ত তার মুঠি
হাতে নীল শূন্যের তরবার
নিয়ে পৃথিবী যুপ
চ্যাচানি হচ্ছে অবিলম্বেই চুপ!
নিরবধি কাল বিপুলা পৃথ্বী চ্যাচাচ্ছে—
বলছে, আমার গলাটা নরম
তোমার রক্ত বেজায় গরম
শক্ত আঙুলে সত্যিই চেপে ধোরো না,
অতীত কালের অত অপমান কোরো না।

বাঙলো বাড়ি :—
নীলাকাশ ভালো,
অরণ্য ভালো
ভালো সে পাহাড়ী নদী
ছোট একখানি বাঙলো বাড়িতে সুখে থাকো তুমি যদি।
অগণ্য মহীরুহ
তৈরী করেছে ব্যূহ
অভিমন্যুর মতন বাঙলো, নাইকো জয়দ্রথ
এক মাইল দূর রেলোয়ে ষ্টেশন,
খাড়া বাষ্পীয় রথ!
রাত্তিরে ডাকে বাঘ
টাট্‌কা খাবার দাগ
প্রাঙ্গণে মোর পঞ্চ নখর
হাতে মোর বন্দুক
ষ্টীলের সঙ্গে হাতের পেশীর স্পর্শ, সে যে কি সুখ!
ভোরের সূর্য্য লাল
রাতের চন্দ্র নীল
অরণ্য মন সবুজ, নদীর রূপালি তরল ধার
ফাঁকে ফাঁকে মেঘ, কভু বুকে কভু আকাশ অন্ধকার!
নীলাকাশ ভালো
অরণ্য ভালো
ভালো সে পাহাড়ী নদী
ছোট একখানি বাঙলো বাড়িতে সুখে থাকো তুমি যদি!

এবং পশ্চিম-বঙ্গের শুকনো নদীগুলোয় জোয়ার আনা, এই তিনটিই আজ আসামের বহিরাগত সমস্যার সমাধানের চাবিকাঠি। সে দিক্ দিয়ে না গিয়ে যদি আসামের কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলী বলপ্রয়োগের আশ্রয় নেন, তাতে এই দুর্গত মুসলিম চাষীদের মনে কংগ্রেস তথা হিন্দু-বিদ্বেষ আরো ভালো করে জাগিয়ে তোলার সহায় হবেন, এবং আসামে দাঙ্গা-বিস্তারের সম্ভাবনা দেখা দেবে। কৃষি-বিপ্লবই একমাত্র সমাধান সাম্প্রদায়িক সমস্যার।

মুসলিম-প্রধান পূর্ব-বঙ্গের দ্বিতীয় সমস্যা শিল্পের ক্ষেত্রে। কারু-শিল্পের অত্যন্ত অভাব সেখানে। বাংলায় যুদ্ধের আগে মোট ১৬১৪টি কারখানা ছিল; তার মধ্যে মাত্র ৫২০টি ছিল উত্তর আর পূর্ব-বঙ্গ মিলিয়ে। অধিকাংশ শিল্প-সমৃদ্ধি রয়েছে পশ্চিম-বঙ্গে অর্থাৎ হিন্দুপ্রধান পশ্চিমবঙ্গে। সুতরাং শিল্পজাত প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্রের জন্ম মুসলিম-বঙ্গকে হিন্দু-বঙ্গের ওপর নির্ভর করতে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কৃষিপ্রধান মুসলিম-বঙ্গে চাষের জমির মালিক হচ্ছে হিন্দু জমিদার। শিল্প-প্রধান হিন্দু-বঙ্গে শিল্পের মূলধন—তাও রয়েছে ইংরেজ এবং হিন্দুর হাতে। সুতরাং "হিন্দু-কর্তৃত্বের" সাম্প্রদায়িক বুলি দিয়ে অজ্ঞ মুসলিম জনসাধারণকে ভোলানো যাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। "শ্রেণী-সংঘাতের" সঙ্গে যত দিন না মুসলিম জনগণ পরিচিত হবে তত দিন লীগের বেড়াজাল থেকে তারা নিজেদের মুক্ত করতে পারবে না।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১০

আশেদের বৈঠকখানা—সকালের মত রাত্রিতেও জম্ জম্ করছে। এ-পাড়া ও-পাড়া থেকে মাতব্বরেরা এসেছেন। এসেছেন পাড়ার জন কয়েক সাক্ষী। মেয়েরা পূজোর দালানের চিক্-ঘেরা চত্বরে জড়ো হয়ে গোলমাল করছে, কচি ছেলেরাই যাত্রার আসরে যেমন গলা ছেড়ে বায়না ধরে—তেমনি বায়না ধরেছে। প্রয়োজনীয় ব্যক্তিরা আছেন ঘরের মধ্যে। বাইরের পথে, দলিজে, উঠোনেও লোক গিস্-গিস্ করছে। দশ বারো বছরের ছেলেরা জানালার গরাদে বেয়ে উঠে ঘরের মধ্যে উঁকি মারছে। ঘরের মধ্য থেকে কেউ তাড়া দিলে লাফিয়ে পড়ছে পথে—কোলাহলটা বাড়ছে খানিকক্ষণের জন্য। আবার উঠছে গিয়ে জানালায়। দু'জন লাল-পাগড়ির মাঝখানে শশীপদ দাঁড়িয়ে আছে নির্ভীক ভাবে। পুরন্দর ঘরে ঢুকতেই সে মুখখানা ফিরিয়ে মাথা নীচু করলে।

এ-এস-আই চেয়ারে বসে পদমর্য্যাদা অনুযায়ী গম্ভীর হলেন। সরু বেতের ছড়িটা মেঝেয় ঠুকে একবার কাসলেন। দেশলাই বার করে একটা সিগারেট ধরালেন। তার পর কুঞ্চিত দৃষ্টিতে ঘরের কড়িকাঠ থেকে মেঝে পর্য্যন্ত দেখে এক-মুখ ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে বললেন, আসামী স্বীকার করছে ও চুরি করেছে। যে জায়গা থেকে হার পাওয়া গেছে তাতে অস্বীকার করলেও ওর নিস্তার নেই। আমরা শুধু জানতে চাইছি,—বলে পুরন্দরের দিকে ফিরে সে মৃদু হেসে বললে,—এই সব লোক পার্টিতে নিয়ে আপনারা কংগ্রেসের নাম ডোবাচ্ছেন। কত দিনের পরিচয় ওর সঙ্গে?

পুরন্দর কোন উত্তর দিলে না। ক্ষোভে ওর চোখ ফেটে জল আসছে। এমন পবিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শশী করলে কি?

উত্তর দিলে শশীপদ—কংগ্রেসের নাম করবেন না দারোগা বাবু। আমি নিয়েছি, আমার জেল দিন।

সে তো দেবই। কিন্তু যে দলের হ'য়ে তুমি এঁদের বাড়ির চিলে-কোঠার ছাদে ফ্ল্যাগ ওড়াতে গিয়েছিলে, তার কোন সংশ্রব আছে কি না—

খবরদার দারোগা বাবু, দলের নাম করবেন না। শশীপদ গর্জ্জন করে উঠলো।

এ-এস-আই চেয়ারে নড়ে বসলেন একটু। কনষ্টেবল দু'জন ধমক দিলে—চুপ রহো।

শশীর হাতের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছিল, শিথিল হয়ে ঝুলে পড়লো হাত দু'টো—মুখখানাও নামিয়ে নিলে। পুলিশের তাড়া খেয়ে নয়, পুরন্দর ওর পানে চেয়ে আছে।

এ-এস-আই বললে,—আচ্ছা, কবুল করাবার দাওয়াই ফাঁড়িতে গিয়ে দেব। এখন শুনুন আপনারা, ডায়েরির কোথাও ভুল আছে কি না। আপনাদের সই করতে হবে। সে ডায়েরি পড়তে আরম্ভ করবা মাত্র দু'-এক জন মাতব্বর কাসতে কাসতে থুথু ফেলবার জন্য উঠে বাইরে গেলেন। তাঁরা আর ফিরলেন না। আরও অনেক লোক নিঃশব্দে সরে পড়লো। তবে তারা একেবারে গেল না—বাইরের ভিড়ে রইলো মিশে।

ডায়েরির মোটামুটি ঘটনাটা এই:

বেলা ন'টার সময় শশীপদ আশেদের বাড়ির পাঁচীল বেয়ে ছাদে উঠেছিল পতাকা তুলতে। খিড়কির দিকে তখন লোক ছিল না—কেবল একটি বউ শোবার ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে যাচ্ছে—ছাদ থেকে ও দেখতে পেল। রান্নাবাড়িটা এ-বাড়ি থেকে একটু পৃথক্—মাঝখানে ছোট পাঁচীল। পতাকা বেঁধে শশী বড় পাঁচীলের মাথায় নেমে দেখলে যে, শোবার ঘর থেকে বউটি বেরুলো, তার আধখোলা দুয়োর দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা টুল দেখা যাচ্ছে। টুলের ওপর চিক্-চিক করছে একগাছি বিছা-হার।

আশী টাকা ভরি সোনার—শশী বাবু লোভ সামলাতে পারেনি। পাঁচীলের গা বেয়ে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকলে সে। বেরিয়ে আর পাঁচীলের ওপর উঠলে না, খিড়কির দুয়োর খুলে পথে এলো। সামনের বাড়ির দে মশায় কচার ডাল ভেঙ্গে দাঁতন করছিলেন, শশীকে দেখে বললেন—কি রে শশী, সকাল বেলায় এ-পাড়ায় কেন? শশী আম্‌তা আম্‌তা করে কি বললে—ওঁর অবশ্য মনে নেই, কিন্তু ওর মুখ যে শুকিয়ে আম্‌সি হয়ে গিয়েছিল, তা দে মশায় হলপ নিয়ে বলেছেন। তার পর হারের কথা বউটির মনে হয়নি—ভেবেছিল মনের ভুলে বাক্সেই তুলে রেখেছে। বিকেলে গা-ধোয়ার পর হার পরতে গিয়ে তন্ন তন্ন করে ও খুঁজেছে বাক্স, দেরাজ, ট্রাঙ্ক, বালিশের ও তোষকের তলা। তার পর এ-ঘর ও-ঘর, ওপর নীচে—রান্নাবাড়ি—ইঁদারাতলা—কোথাও হার পাওয়া যায়নি। শেষে ও কেঁদে ফেলতেই সবাই জানতে পারে।

এই গেল চুরির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। তার পর হার উদ্ধারের ইতিহাসটা আরও অদ্ভুত। শশীপদ আগে ছিল নামজাদা চোর। থানায় ওর নামে রিপোর্ট আছে, সাজা হওয়ার নজীরও আছে আদালতে। মদে বেশ্যায় জুয়োখেলায় ওর জুড়িদার এ গাঁয়ে নেই। সেই শশী দু'বছর থেকে হঠাৎ কি করে সাধু বনে গেল—সে'ও এক সন্দেহের কারণ! কিন্তু যেহেতু চুরি একটি প্রবল বৃত্তি, যার দ্বারা মানুষ বশীভূত হয়ে আরও অনেক কুকার্য্য করে, তেমনি ওই বৃত্তিকে যদি অন্য কোন প্রবল বৃত্তির দ্বারা অভিভূত করে দেওয়া যায় তা'হলে সাধু কাজেও তার রুচি দেখা যায়। ভাল-মন্দ দু'টি ভিন্নমুখী দিক্—বৃত্তিও ভিন্নমুখী। দু'টিতে মানুষ আসক্ত হয় কেন? না, তার নেশার মত একটা কিছু অবলম্বন করে স্ফূর্ত্তি হতে চায়। ফ্রয়েডির লাইনে মনস্তত্ত্বের এই মন্তব্যটুকুও দারোগা বাবু তাঁর রিপোর্টে জুড়ে দিয়েছেন।

যাই হোক, সং প্রভাব বেশিক্ষণ জাত-অপরাধী যারা তাদের আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে না। সোনা হাতে আসবা মাত্র শশীর মনে জাগলো মদের পিপাসা। আর মদ খেয়েই সে গেল তাদেরই পাড়ায় এক ভ্রষ্টা স্ত্রীলোকের বাড়ি। তার পর মাল শুদ্ধ ধরা পড়েছে সেই বাড়িতেই। হারটাকে কেটে টুকরো টুকরো করেছে, কাল সকালের ট্রেণে কলকাতায় গিয়ে—

পুরন্দর রাস্তা দিয়ে হন্ হন্ করে চলেছে। তার পিছনে তিন-চার জন লোক আসছে ও যেন তা শুনতেই পায়নি। আর

শুনবেই বা কি! জন্ম অপরাধ-প্রবণতা শশীর রক্তের মধ্যে মজ্জার মধ্যে ক্রিয়া করছে। জলের ওপর মাথা ভাসলেই সাঁতারের সার্টিফিকেট নিয়ে চওড়া নদী পার হওয়া যায় না।

কালো বাবু শুনুন। কালো বাবু—

নিতাই, বলাই, যতীন, হরিপদ শশীর সঙ্গীরা ওর সামনে এসে দাঁড়ালো। ওই উত্তরপাড়ার ছেলে ওরা। যুবক, অমিত শক্তি দেহে ওদের। অথচ সে শক্তিতে ঘুণ ধরেছে। ওরাও অপরাধী কি না কে জানে! না হলেও ওই অপরাধ-তত্ত্বের নিয়ম অনুযায়ী—

নিতাই বললে,—আমরাও দোষী। আমরা দল ছেড়ে দিচ্ছি।

পুরন্দর শুষ্ক কণ্ঠে বললে, মানে? তোমরাও চুরি—

না—না—চুরির কথা কেউ জানতাম না আমরা। তবে—, বলে খানিকক্ষণ মাথা নীচু করে রইলো।

হরিপদ বললে, বাপ-পিতমো যা করে গেছে তা ছাড়বো বললেই ছাড়া যায় না কালো বাবু। মদই খাই আর আমোদই করি সেটা বয়সের দোষ, চুরি আমরা করি না আর।

বলাই বললে, তা'হলে ফড়েগিরি করবো কেন বলুন। ভোর বেলায় উঠে কলকাতায় যাই এখানকার মূলো বেগুন পটোল উচ্ছে নিয়ে—ফিরব আমি রাত ন'টায় সেখানকার কপি আলু করলা উচ্ছে নিয়ে।

পুরন্দর বললে, আমি তো তোমাদের সে জন্ম কিছু বলছি না।

হরিপদ বললে, তবু সব কথা পষ্ট বলা ভাল। তরি-তরকারি আনি, সেই সঙ্গে আনি চিনি আটা কেরাসিন তেল—

পুরন্দর বললে, পুলিশে ধরে না?

পুলিশ! হাসলে ওরা চার জনে।

যতীন বললে, জগৎ-জুড়ে ব্লাক মার্কেট চলছে—আর পুলিশ ধরবে আমাদের! আপনি হয় তো বলবেন, এ সব না করে সৎপথে উপার্জ্জন করা ভাল।

হরিপদ বললে, ভাল—সে যুদ্ধের আগে আমরাও জানতাম। কিন্তু সৎপথে থেকে যারা না খেতে পেয়ে মরে গেল—

পুরন্দর বললে, ও সব সাফাই আমি শুনবো না। সৎপথে থেকে যারা মরে তাদের মান নষ্ট হয় না।

যতীন বললে, কলকাতার রাস্তা আপনি দেখেননি কালো বাবু, দেখলে—

পুরন্দর বললে, যাই বল তোমরা, শশীর এই কাজ কি ভাল হ'লো?

যতীন বললো, খুবই খারাপ। ওকে দল থেকে তাড়িয়ে দেয়াই ভাল।

না যতীন—কংগ্রেসের কাজ এ গ্রামে চলবে না। যেখানে সত্য নেই, তেজ নেই—

কার নেই কালো বাবু।

ওদের প্রশ্নে পুরন্দরের চমক ভাঙ্গলো। তাই তো, কার নেই সত্য বলার সাহস? ওদের লজ্জার কথা ওরা অকপটে এইমাত্র বলেছে; ওদের চরিত্রে দুর্ব্বলতার দিক—কিন্তু শিক্ষা যাদের অসম্পূর্ণ তাদের কাছে পবিত্র মনোবল আশা করা কি অন্যায় নয়? দারিদ্র্যের দোষ একটি দিনের প্রতিজ্ঞায় স্খালন করতে যাওয়াও তো ভুল!

পুরন্দর আকাশের পানে চাইলে। কালো আকাশে নক্ষত্র জ্বলছে। আকাশ উদ্ভাসিত হ'য়েছে খানিকটা—নীচের অন্ধকার তেমনি জমাট বাঁধা। একটা পেঁচা ডাকতে ডাকতে মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল। রাত্রি অনেকখানি হয়েছে।

আজ তোমরা যাও। ভেবে দেখি শশীকে কি করে খালাস করা যায়।

আপনি চেষ্টা করবেন? আনন্দে-বিস্ময়ে ওদের স্বর গম্ভীর রাত্রির বুকে থম-থম করতে লাগলো।

করবো।

তারা বাধা মানলে না—হুড়-মুড় ক'রে একসঙ্গে পুরন্দরের পায়ের উপর পড়লো।

১১

আজ রাত্রিতে সহজে নিদ্রা আসবে না। বিচিত্র ঘটনা-সংঘাতে মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে। শুধু বেদনা-নিরাশ্বাস নয়, শুধু আনন্দ নয়—উত্তেজনা নয়—গৌরব বা অগৌরব কোনটাই মুখ্য নয়, আকাশে অযুত তারার তরল প্রবাহের মত অনুভূতির স্রোতে ভাসছে মন। ছবির পর ছবি নিয়ে গ্রাম চলেছে তার সম্মুখ দিয়ে। এই মাত্র যারা মিছিলের পুরোভাগে ছিল, তারা মিশে গেছে জনতার অরণ্যে, যারা ছিল বিন্দু মাত্র, তারা এলো সামনে। বহু দিনের পরিচিত মানুষ ও ঘটনা ক্ষণে ক্ষণে করছে রূপ বদল। ভালর মধ্যে সবই উত্তম নয় মন্দও নিছক ঘৃণা জাগাচ্ছে না। মহতের পাশে অসৎও ফুটছে তার স্বকীয়তা নিয়ে। টাকার এক পিঠে রাজার মুখ—অন্ধ পিঠে লেখা। ষোল আনা মূল্যে দু'টো পিঠই তুল্য-মূল্য হলেও রূপোর দামটা ওর পক্ষে বাহুল্য মাত্র। যে রূপোর দামে ষোল আনা লাভ করতে চাইবে—সেই ঠকবে। ওর পিছনে আছে যে পরিচালনা—যে শৃঙ্খলা, তাই ওর শক্তি—ওর প্রাণ। মানুষও তাই। রূপোয় আর খাদে মেশানো টাকা। যেখানে পরিচালনা সুষ্ঠু, সেইখানেই ও সত্য—ও শক্তিমান্।

রেড়ির তেলের প্রদীপটা উস্কে দিয়ে ও চিঠির তাড়া নিয়ে বসলো। এই যে ইন্দ্রজিৎ বসু লিখছেন:

—দশ বছর পরে আবার এসেছি এ গ্রামে। কালের স্রোত সামনে চলেছে—এই গ্রামখানি আছে তার থেকে দূরে। উনিশশো তিরিশে নতুন করে জাগলো যে ভারত অসহযোগ থেকে আইন অমান্য আন্দোলন—যে আগুন বারদৌলিতে জ্বলেছিল তা ছড়িয়ে পড়লো বাংলায়—হিমালয় থেকে কুমারিকা; এ গ্রাম কি করে ছিট্‌কে পড়লো সেই অগ্নি-বলয়ের বাইরে, তাই ভাবি। এই সালেই ছাব্বিশে জানুয়ারি···ঘোষিত হলো স্বাধীনতা দিবস। কিন্তু গ্রামে যে কোন চিহ্ন রাখতে পারেনি। তবে কি ভাববো, এখানে মানুষ নেই—না তাঁদের প্রাণে নেই জাতীয় চেতনা? পর পর দু'বার এলাম—একত্রিশ সালে।···লবণ-আইন ভঙ্গের জন্ম মহাত্মা উন-আশী জন সহযাত্রী নিয়ে রওনা হয়েছেন ডাণ্ডি অভিমুখে—কাঁথিতে নীলার আন্দোলন প্রবল হয়ে স্বৈর-শাসনকে মুহুর্মুহু কাঁপিয়ে তুলছে—এখানে আমি আশ্চর্য্য হয়ে দেখছি, জীবনযাত্রার দৈনিক ছন্দে সে আগুনের আঁচ একটুও লাগেনি। প্রাতঃস্নানে যাত্রীরা হরিনাম করতে করতে যায় আর ফিরে আসে মাঠ থেকে আনাজ বা নদী থেকে মাছ কিনে। তাঁতিরা তাঁত বুনছে নির্ব্বিকার ভাবে,

ছেলেরা বসিয়েছে থিয়েটারের মহড়া; প্রতি সন্ধ্যার পর চীৎকার ও মন্দিরের কীর্ত্তনের করতাল ও শ্রীখোল সমান উৎসাহে পাল্লা দেয়। দোকানে বিড়ি সিগারেট চা খাচ্ছে অপরিপক্ক বয়সের ছেলেরা—যাদের পূর্ণ-যৌবন তারা উঁচু পানীয়ে উদর ভর্ত্তি করে অশ্লীল গান গেয়ে পথে পথে বাহাদুরি করছে। উৎসাহ কি নেই এদের? এরা কি এক হতে পারে না? উৎসবে ব্যসনে দেখলাম যথেষ্ট একতা আছে। অবশ্য সকলের কথা বলছি না। যাদের প্রকৃতিতে উচ্ছৃঙ্খলতা, তারা শতকরা পনেরো ভাগ হ'লেও তাদের মধ্যে শক্তি কি ভাবে নষ্ট হচ্ছে তাই দেখছি। বাকী পঞ্চাশ ভাগ অত্যন্ত সৎ। তারা বিদেশে করে চাকরি—শনিবারে দেশে আসবার পথে ট্রেণে আলোচনা করে কংগ্রেস নিয়ে—দেশ নিয়ে। রবিবারে দেশের কোলে বসে করে পূর্ণ বিশ্রাম। হাট-বাজার, ক্লাব, বন্ধু-ছেলে মেয়ে, বউ, লোক-লৌকিকতা ইত্যাদিতে যে গভীর জল জমেছে সংসারে তাতে ডুব দেয় জয়কালী বলে। হৃদি-রত্নাকরের অগাধ জল-কল্লোল না কাগজের পাতায় না আলোচনায় একটুও কূলে এসে মর্ম্মর ধ্বনি তোলে না। বাকীর ভাগ যারা তারা কাগজ পড়ে না গল্প শোনে। পরমাশ্চর্য্য ঘটনা—রঙে চড়া বর্ণনায় জ্বালাময়ী—নুণ-ঝাল-অম্ল-কটু-মেশানো মুখরোচক চাটনির মতই কর্ণরোচক। সে গল্প বাড়িতে এসে শোনায় মেয়েদের। মেয়েরাও অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলে, ওমা তাই না কি!

যারা বন্দুক বেয়নেটের সামনে নিরস্ত্র এগিয়ে আসে হাসি-মুখে—যারা গুলী খায়, হাত তোলে না, ছুটে পালায় না, তারাও যে রক্ত-মাংসে গড়া মানুষ এ কথা একবারও কি জাগে না এদের মনে? অথচ উৎসবের হুল্লোড় এদের কত প্রিয়। তুমি কে কল্পনা করতে পার—গাজিমের বিয়ের উৎসবে—যে ঝড় বয়ে যায় তাতে সর্ব্বস্বান্ত হলেও এদের একটুও দৃক্‌পাত নেই। দেহের শক্তি-ক্ষয় করে আনে সুরায়—আর তাণ্ডব নাচে। বাড়িতে নেই চাল, পরনে নেই কাপড়, তবু এরা মাতে সর্ব্বস্বান্ত হবার নেশায়। কেন না, বছরের এই পরম দিন দু'বার আসবে না। আগামী বারে কে থাকবে, কে থাকবে না সে কথা যখন জানা নয়···এটা যুক্তিবাদের ভিত্তি অবশ্য নয়। আর কার্ত্তিকে ঠিক এই দৃশ্য অভিনীত হ'লো জগদ্ধাত্রী পূজোয়। বারোয়ারি প্রতিমা এক দিন বেশী রাখার মানে—এই হুল্লোড়কে ঈষৎ দীর্ঘ করা। যাত্রা, থিয়েটার, বাইনাচ, ঠাকুর-বিজয়ার দিন লাঠালাঠি—এ না কি প্রত্যেক বার হয়ই। সেই সুরার ক্রিয়া। বাজনার তালে গাজিমের সুর—নাচে গাজিমের তাল—ছড়ায় আদিরসাশ্রিত অশ্লীল বাক্য ও ভঙ্গি। তবু সে কি প্রচণ্ড উৎসাহ। শঙ্কর এদের মর্ম্মাশ্রয় করেছেন বলেই বৎসরের এই পরম দিনে সর্ব্বস্ব-খোয়ানোর আনন্দ উপভোগ করে। অথচ পরম দিন আমাদের দাসত্ব মোচনের শুভ লগ্ন বলে ঘোষিত হয়েছে—তা সীমাবদ্ধ রইলো কয়েক জনের মধ্যে। তোমাদের দেশে গণ-চেতনা তাকে স্পর্শ করতে পারছে না। পরমাশ্চর্য্য গল্পের মত সে মুখে মুখে ঘুরছে—সত্যের মত মনে পাচ্ছে না আশ্রয়। যারা ব্যসনে নব খোরাতে পারে, তাদের ত্যাগ—তুমি বলবে হয়তো উত্তেজনা প্রসূত সুলভ ও অসৎ বৃত্তির কণ্ডুয়ন নিবৃত্তি। আমি প্রশ্ন করবো, এই অসৎ উত্তেজনাকে মহৎ উত্তেজনায় রূপান্তরিত করা কি দুঃসাধ্য? তুমি বলবে—একটি দিনের ক্ষতি সহ্য করা, আর দিনের পর দিন দুঃখভোগ করা এক নয়। দুঃখকে সুখের মত করে নিলে হবে না—তাকে দুঃখ জেনেই বরণ করতে হবে। সত্য কথা, কিন্তু এক দিন সত্যের সাধনায় দু'দিন হতে পারে, দশ দিন হতে পারে। শুধু জানা চাই সাধনার মূলমন্ত্র—তার জানানো চাই! আমি জানি না। তবে যা অনুভব করি, অনুভব করে শক্তি পাই, আনন্দ পাই, তাই বলছি। মানুষের সব উৎসাহ সব আনন্দের মূলে রয়েছে তার সংসার। জৈব ধর্ম্মকে পরিপোষণ করে বলেই একে আমরা প্রাণ দিয়ে পালন করি। পাঁচীল দিয়ে ঘেরা বাড়িটা তার বাড়ির মধ্যে পরিজনেরা আমার আনন্দের কেন্দ্রভূমি বা মূল উপকরণ, দিনের দিন ওদের ঘিরেই আমার আশা-আনন্দ-বৃত্তির ফুল ফোটে। কিন্তু মানুষের মনে শুধু নির্ব্বিকার শান্তিই তো আশ্রয় করে নেই। দুর্গম দুস্তর অজানা ক্লেশ ও মৃত্যু তাকে আর এক আনন্দ-পথের সঙ্কেত করছে। যদি এ সমস্ত না মানি, বিস্তার—বিস্তারকে নিশ্চয়ই অস্বীকার করবো না। এক পরিচয় থেকে অন্য পরিচয়ে—এক বৃত্ত থেকে অন্য বৃত্তে—প্রিয়া থেকে পরকীয়াতে যদি আশ্রয় লাভ করে আনন্দ হয়—যদি এক কাঠা বাড়িকে এক বিঘায় বাড়িয়ে—এক তলাকে দোতলায় উঁচু করে—একটি সন্তানের পর পাঁচটি সন্তান আশা করে তৃপ্তি বোধ করি, তবে দেশের গণ্ডীতে কেন বাড়ির গণ্ডি মিশিয়ে দিতে পারবো না? আমার পাড়াটি কেন মিশবে না আমার গ্রামে? আর আমার গ্রাম কেন মিশবে না ভারতবর্ষে? নদী সমুদ্রে মেশে—সে তার ধর্ম্ম। চলা তার ধর্ম্ম বলেই যতক্ষণ না মিশতে পারে ততক্ষণ সে চলে। আর মেশার পরেও সে সর্ব্বস্ব বয়ে আনে সেই মহা মিলনের ক্ষেত্রে। আমরাও সাধনার দ্বারা এই ভাবে বেছে নেব আমাদের মহামিলনের ক্ষেত্র। আমাদের প্রকৃতিতে রয়েছে এই চলার ধর্ম্ম—এই ভাবে বিস্তৃত হবার সঙ্কেত। স্বাধীনতার সমুদ্র দুর্ব্বার আকর্ষণ করছে আমাদের—এসো না ঝাঁপ দিয়ে পড়ি। অসাম্য—অশান্তি—ক্লেশ—ভাবনা সব ডুবে যাবে সেই সমুদ্র-গর্জ্জনে। তুমি শুধু জানাও—জানাও—যেমন করে পার জানাও। সুর ঠিক আছে—তারগুলো শুধু ঢিলে হয়ে গেছে। চেষ্টা কর বাঁধতে টান টান করে। ওদের ঘৃণা করো না কিংবা হতাশ হয়ো না। একটা বছর দশটা বছর অনন্তকালের তুলনায় কতটুকু? স্রোত যদি থামতো উনিশশো একুশের পর কংগ্রেস কোথায় থাকতো? স্বরাজের লক্ষ্য আজ পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছতো না।

আলোর জোর কমে আসছিল—কাঠি দিয়ে সলতেটা বাড়িয়ে দিলে পুরন্দর। তেরো বছর আগে লিখেছেন ইন্দ্রজিৎ; এর মধ্যে কত ভাঙ্গা-গড়ায়—কত হাসি-কান্নায় পৃথিবী দোলা খেয়েছে। সে-দিন দশ বছরের বালক এ লেখার কোন অর্থই বুঝতো না—আজ সে পাচ্ছে পরম সান্ত্বনা। পুরাতন হয় যে জিনিস সে সত্য নয়।

প্রদীপ জ্বলে উঠলো—পুরন্দর আর একখানি পত্রে মনোনিবেশ করলে:

এত বলছি এ দেশ সম্বন্ধে কেন জান? এ দেশ আমার ভাল লেগেছে। এর শক্তির উৎস যিনি আবিষ্কার করবেন তাঁকে ধ্যান-চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। চৈতন্যদেব এক দিন যে পরমা শক্তিকে জাগিয়ে সারা ভারতবর্ষকে অমৃত-সিন্ধুর সন্ধান দিয়েছিলেন—সে শক্তি এর মাটিতে সুপ্ত। উপরে তামসিকতার নানা বর্ণের রঙীন পোষাক দিয়ে ঢাকা সত্যের শুভ্র আধার। মানুষকে ভালবাস—জাতিভেদের গণ্ডী

কেটে সত্যকার শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হও—আচার-প্রথার ক্ষয় হোক—মানুষ আসুক এগিয়ে। মানুষ না জাগলে কে বলবে বন্দে মাতরম্? দুয়ার না ভাঙলে জ্যোতির্ময় আসবেন কেন? যখন এই পুরাতন মাটিতে মাথা তোলে নতুন অঙ্কুর, মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকে তার দিকে। চারি দিকের আবহাওয়ায় অঙ্কুর যা হবার তা হয় না, ধ্যানের মন্ত্র বার বার ভুল হয়ে যায়। তবু পার তো চেয়ে দেখো ওই নতুন শস্যাঙ্কুরের দিকে—ওরাই আমাদের সান্ত্বনা; ওদের দিকে চেয়েই আমরা স্বপ্ন দেখি—আমরা শক্তি পাই।

দেশের তরুণরা—ওরা তো তুচ্ছ নয়। ওদের মধ্যে ভাল ইস্পাত রয়েছে—শক্ত লোহা রয়েছে—ভাল কামারের হাতে পড়লে ওরা না হতে পারে কি! এখানেও দেখলাম, দু'-একটি ছেলে—অত্যন্ত শিশু তা[illegible] তবু আমায় প্রশ্ন করলো—দেশ কাকে বলে? বন্দে মাতরমের মানে কি? যারা মরে তারা কোথায় যায়? আর দেশের জন্য মরলে স্বর্গলাভ হয় কি না?

সব প্রশ্নেরই উত্তর দিলাম অনায়াসে, শেষের প্রশ্ন সম্বন্ধে একটু ভাবলাম। দেশের জন্য হোক, ধর্মের ধব্জই হোক, মানুষ মরে স্বর্গে যায় কি না এর উত্তর সহজে দেওয়া শক্ত নয় কি? ঘুষ নিয়ে মহৎ কাজে প্রবৃত্ত করানোর চেষ্টা—কি বলবো একে? ভাব ত এই স্বর্গবাসের কল্পনায় এর প্রলোভনে আজ অবধি পৃথিবীতে যত মানুষ মরেছে, যত অশান্তি ও গ্লানি জমেছে, তা যে কোন সভ্যতার পক্ষে লজ্জাকর নয় কি? এর সোজা উত্তর যদি চাও, বলবো, স্বর্গ কোথাও নেই। যে উৎসাহে কাজ করবে তার পুরস্কার সঙ্গে সঙ্গেই তো রয়েছে। মন তোমার বলছে না—কোন্‌টা শ্রেয়ঃ? আনন্দ উৎসাহ তোমায় যে রাজ্যের সন্ধান দিচ্ছে তা কি কাল্পনিক স্বর্গের চেয়ে মনোরম নয়? আত্মদানে তোমার বীর্য্য তোমায় পরম সম্পদের সন্ধান দিচ্ছে নইলে বেয়নেটের সামনে বুক পেতে দিতে একটও শিউরে উঠলে না কেন? আমরা হিন্দু—মৃত্যু মানি না, সুতরাং স্বর্গও মানবো না। এই মাটিতে বার বার ফিরে আসার আনন্দ—একে দুঃখের দ্বারা তপস্যার দ্বারা অতিক্রম করে চলবার চেষ্টা নয়—আপন করে নেওয়া—এর চেয়ে স্বর্গ কোথায়? যদি পারলৌকিক অনুভূতিতে মগ্ন হয়ে কোন দিন বৈকুণ্ঠপতির সামীপ্য কামনা করি, এবং সেই কম্পহীন পুণ্যপীঠে অনন্ত কালের আলস্য আমায় নিদ্রা-জাগরণের মাঝামাঝি কোন লোকে নিশ্চল করে রাখে, তাহলে—না, না, তেমন দিন যেন কখনও না আসে। ওদের বললাম, জন্মভূমির চেয়ে বড় স্বর্গ কোনখানে নেই। স্বাধীনতা হ'লো তার সব চেয়ে মূল্যবান সম্পত্তি, মৃত্যুর চেয়েও চড়া মূল্য হচ্ছে আজীবন তা লাভের চেষ্টা। পেয়ে স্থির হওয়ার নাম জীবন নয়—আরও এগিয়ে যাওয়াই যথার্থ জীবন। মৃত্যু—চুপ করে থাকা, সঙ্কীর্ণ হওয়া—শঙ্কায়—পলায়নে। গাছ শুকিয়ে যায়—বীজ নষ্ট হয় না। তোমরা তাজা টাট্‌কা বীজ—তোমরা স্বর্গের প্রশ্ন করো না।

পুরন্দর থামলে। না, আর প্রশ্ন করবে না সে। সে চলবে—আজীবন চলবে। তবে মানুষ থামে কেন? সামনে যখন পথের সমস্যা দেখা দেয় তখনই দ্বিধায় সে গতি শ্লথ করে। সেই সন্ধিক্ষণে আসল চিনে নেওয়া কষ্টকর বলেই পথ-সন্ধানী পথিক পথ সম্বন্ধে শুধায় অভিজ্ঞ জনকে।

আর একখানা পত্র সে বাক্স থেকে বার করলে। কিন্তু আম গাছে একটা দোয়েল পাখী তখন শিষ্‌ দিতে আরম্ভ করেছে। উস্‌কে দেওয়া সত্ত্বেও পিদীমটা মনে হচ্ছে ম্লান। মাথা তুলে সে চার দিকে চাইলে। চালের ফাঁকে আলোর আভাস—দুয়োরের ফাটলে উঁকি মারছে আলো। রাত্রি বুঝি শেষ হয়ে এলো।

[ক্রমশঃ।

আশা

কিংশুক

সমুদ্র-ঢেউয়ের মত অন্তহীন উচ্ছসিত আশা
হৃদয়-সিন্ধুর বুকে অবিরাম মত্ত, আবর্তিত
শ্রান্তিহীন, শেষহীন। যে-চিত্ত সতত
দৈনন্দিন ব্যথা-ক্ষুব্ধ, অমৃত দুর্বাসা

সেই চিত্তে দোলে আশা জীবনের। হিরণ্ময় প্রেম
সেই চিত্তে হানা দেয় ঋতুরাজ বসন্তের মত,
জাগে মধুমাস। দুঃখে যদিও আনত
আশার অমৃত স্বাদে তবু প্রাণ নিকষিত হেম।

এ হৃদয় মহাসিন্ধু: তরঙ্গের আবর্ত-মন্থনে
ভেসে যায় নৈরাশ্যের ফেনপুঞ্জ, ক্ষুদ্র ক্ষয়-ক্ষতি।
ঝড়-ঝঞ্ঝা বুকে নিয়ে আমি আজ দৃঢ় বনস্পতি,
বহু ঝঞ্ঝা-প্রতিঘাতে মর্মর সংগীত বাজে মনে।

প্রাণের সমুদ্রবুকে উজ্জ্বল আলোকস্তম্ভ আশা
আমাকে চালিত করে অন্ধকারে আলো-তীর্থপথে
যেখানে সফল স্বপ্ন বিজয়ের বৈজয়ন্তী-রথে
সার্বত্রিক মুক্তি স্বপ্নে আরক্তিম যেখানে পূর্বাশা।

আশার দীপক রাগে ঝঙ্কৃত এ-হৃদয়ের বীণা:
অন্ধকার চূর্ণ ক'রে তাই আজ দৃপ্ত অভিযানে
চলেছি স্বর্গের পথে, পূর্ণতার উদাত্ত আহ্বানে,
যেখানেতে বসুন্ধরা শস্যশ্যামা, সর্ববিঘ্নহীনা।

বৈদিক সভ্যত

২

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা পূর্ববর্তী প্রবন্ধে দেখিয়াছিলাম যে, পৃথিবীতে প্রাচীন কালে বিভিন্ন দেশে বহু সভ্যতার আবির্ভাব হইয়াছিল, কিন্তু সে সকল প্রাচীন সভ্যতা কালক্রমে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু বৈদিক সভ্যতা পৃথিবীর অন্য সকল সভ্যতা হইতে প্রাচীন হইলেও উহা এখনও জীবিত। এক্ষণে ভারতে যে ধর্ম্ম প্রচলিত আছে তাহা বেদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত—পুরাণে, রামায়ণে ও মহাভারতে বেদের মর্ম্মই প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, বৈদিক ধর্ম্মে এমন কতকগুলি সত্য আবিষ্কার করা হইয়াছে, পৃথিবীর অন্য প্রাচীন বা নবীন ধর্ম্মে যেগুলি আবিষ্কার করা হয় নাই।

জগতে প্রথম বৈদিক ধর্ম্মেই প্রচার করা হইয়াছিল যে, এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সকল জীবকে তাহাদের কর্ম্ম অনুসারে দণ্ডবিধান করেন বা পুরস্কার প্রদান করেন। য়িহুদীদের ধর্ম্মে, খৃষ্টান ধর্ম্মে এবং মুসলমান ধর্ম্মেও এ কথা বলা হইয়াছে বটে, কিন্তু বেদ প্রচার হইবার বহু পরে ঐ সকল ধর্ম্মের আবির্ভাব হইয়াছিল। বৈদিক ধর্ম্ম হইতে এই তত্ত্ব য়িহুদী ধর্ম্মে গ্রহণ করা হইয়াছিল, ইহা সম্ভব বলিয়া মনে হয়। য়িহুদী ধর্ম্ম হইতে খৃষ্ট ধর্ম্ম এই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছিল, খৃষ্ট ধর্ম্ম হইতে মুসলমান ধর্ম্ম। বাইবেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বে পূর্ব্বদেশ হইতে আগত কয়েক জন জ্ঞানী ব্যক্তি (wise men of the East) বলিয়াছিলেন যে, এক জন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিবেন। পূর্ব্বদেশ বা ভারতবর্ষ হইতেই জ্ঞান প্রচারিত হইয়াছিল, ইহা এই আখ্যায়িকা হইতে বুঝিতে পারা যায়। খৃষ্টের জীবনের কয়েক বৎসরের কোনও বিবরণ বাইবেলে পাওয়া যায় না। কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতে খৃষ্ট সেই সময় ভারতবর্ষে আসিয়া যোগ অভ্যাস শিক্ষা করিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, যদিও ঈশ্বরের কথা এই সকল ধর্ম্মেও দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি ঈশ্বরের স্বরূপ কি, এ বিষয়ে ঐ সকল ধর্ম্মে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। ঐ সকল ধর্ম্মে দেখা যায় যে, ঈশ্বর স্বর্গে অবস্থান করেন, তিনি কথা বলেন, সয়তানের সহিত যুদ্ধ করেন। বাইবেলে এরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বরের মূর্ত্তি অনুসারেই মনুষ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল (ক)। ইহা হইতে বোধ হয় যে, ঈশ্বরের হস্তপদাদি আছে। কিন্তু ঐ হস্তপদাদি কি উপাদানে গঠিত? সে উপাদানের ক্ষয় হয় কি না? ঈশ্বরের যদি দেহ থাকে তাহা হইলে তিনি কিরূপে দেহের বাহিরে অবস্থান করেন? এ সকল প্রশ্নের উত্তর হিন্দু ধর্ম্মেই পাওয়া যায়, অন্য ধর্ম্মে পাওয়া যায় না। হিন্দু ধর্ম্ম বলে যে, তিনি জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার প্রকৃত দেহ নাই, কিন্তু তাঁহার ইচ্ছানুসারে তিনি অপ্রাকৃত দেহ ধারণ করিতে পারেন, সে দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রক্তমাংসের নহে, সকলই জ্ঞানস্বরূপ বা চিন্ময়। এই ভাবে ঈশ্বর দেহ ধারণ করিলেও তিনি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকেন।

(ক) "Man was made in the image of God."

ঈশ্বর বিশ্বজগৎ রচনা করিয়াছেন, এ কথা হিন্দু ধর্ম্মে যেমন বলে সেইরূপ অন্য ধর্ম্মেও বলে। কিন্তু কি উপাদান দিয়া ঈশ্বর জগৎ রচনা করিয়াছেন ইহা হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য ধর্ম্মে বলিতে পারে না। অন্য ধর্ম্মের মত এইরূপ মনে হয় যে, ঈশ্বর শূন্য হইতে এই জগৎ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু এই মত যুক্তিযুক্ত নহে। শূন্য হইতে কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না। উপনিষদ্ এই মত বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন (খ)। উপনিষদের মত এই যে, ঈশ্বর হইতেই জগতের উৎপত্তি। অর্থাৎ ঈশ্বরই জগতের উপাদান-কারণ। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। এ বিষয়ে উপনিষদ্ মাকড়সার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মাকড়সা নিজ দেহ হইতেই জাল রচনা করে (গ)। অন্য কোনও উপাদান গ্রহণ করে না। সেইরূপ ঈশ্বরও নিজ দেহ হইতেই জগৎ রচনা করিয়াছেন। জগতের যাবতীয় দ্রব্য ব্রহ্মেরই অংশ। ব্রহ্ম ভিন্ন জগতে কিছুই নাই।

মানবের দেহ ভিন্ন যে একটা আত্মা আছে এবং সে আত্মা যে অমর, ইহা হিন্দু ধর্ম্মের ন্যায় খৃষ্টান ধর্ম্ম প্রভৃতিতেও বলিয়া থাকে। কিন্তু আত্মা যে কেবল অমর নহে, উহা অনাদি ও অমর উভয়রূপই, ইহা কেবল হিন্দু ধর্ম্মেই বলে অন্য ধর্ম্মে বলে না (ঘ)। অন্য ধর্ম্মের মত এই যে, মানবের দেহ-সৃষ্টির সহিত ঈশ্বর তাহার আত্মারও সৃষ্টি করেন। কিন্তু কোনও বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহার ধ্বংসও স্বীকার করিতে হয়। যে কারণের ফলে উৎপত্তি হয় তাহার বিপরীত কারণের ফলে ধ্বংস হইবে। এ জন্য হিন্দু ধর্ম্ম বলিয়াছেন যে, আত্মার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। উহা নিত্য পদার্থ।

যে ব্যক্তি পুণ্যবান সে স্বর্গে যায়, যে পাপী সে নরকে যায়। এ কথা প্রায় সব ধর্ম্মই বলে। কিন্তু স্বর্গে বা নরকে কত দিন থাকিতে হয়? অন্য ধর্ম্মের অভিপ্রায় এইরূপ যে, অনন্ত কাল ধরিয়া স্বর্গে বা নরকে থাকিতে হয়। এ সিদ্ধান্ত কিন্তু যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া মনে হয় না। যে পুণ্য বা পাপের ফলে আত্মা স্বর্গ বা নরকে যায়, সে পুণ্য ও পাপ যখন সান্ত (finite), তখন তাহার ফল অনন্ত (infinite) ইহা সঙ্গত নহে। উপনিষদ্ এই যুক্তি দিয়াছেন (ঙ) এবং বলিয়াছেন যে, স্বর্গ যখন পরিমিত কর্ম্মের ফল তখন অনন্ত কাল স্থায়ী হইতে পারে না। খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মের অনন্ত স্বর্গ ও অনন্ত নরকের কল্পনা মোটেই সন্তোষজনক নহে। অনেকে সঙ্গদোষে পাপপথে চলেন, তাঁহাদিগকে চিরকাল নরকে থাকিতে হইবে, সং

(খ) তদ্ধৈক আহুরসদেব ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সৎ জায়ত ইতি। কুতস্তু খলু সোম্য এবং স্যাদিতি হোবাচ কথম্ অসতঃ সৎ জায়েত ইতি। সৎ তু এব সোম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।—ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৬।২।২

(গ) যথা ঊর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্ণতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃপুরুষাৎ কেশলোমানি এবমক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্।
—মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।৭

(ঘ) ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ নায়ং কুতশ্চন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।
—কঠোপনিষদ ১।২।১৮

(ঙ) পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্য
কৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং।
—মুণ্ডকোপনিষদ্ ১।২।১২

জীবন-যাপনের তাঁহারা আর কোনও সুযোগ পাইবেন না, ইহা কিরূপ ব্যবস্থা ? বিশেষতঃ, কেন যে এক জন সৎসঙ্গ লাভ করেন, এক জন অসৎ সঙ্গে পতিত হন,—অন্য ধর্মে তাহার কোনও হেতু দেখাইতে পারেন না। হিন্দু ধর্ম বলে—এক জন যে সৎসঙ্গ পায়, আর এক জন যে অসৎ সঙ্গ পায়, ইহা অহেতুক নহে—ঈশ্বরের রাজ্যে অহেতুক কিছুই হয় না—পূর্বজন্মের কর্মফল হেতু কেহ সৎসঙ্গ, কেহ অসৎ সঙ্গ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, যে ব্যক্তি যে পরিমাণে পুণ্য বা পাপ করে, তাহার সেই পরিমাণে স্বর্গ বা নরক ভোগ হয় ; স্বর্গ বা নরক ভোগের পর তাহাকে পুনরায় পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, সকল পাপীই দণ্ডভোগ করিবার পরে সৎপথে চলিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইবে। যত দিন না মোক্ষলাভ হয় তত দিন বার বার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মোক্ষলাভ করিবার পর অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেহ যদি বলেন, পরিমিত কর্মের ফল যদি অপরিমিত না হয়, তাহা হইলে মোক্ষলাভ করিলে অনন্ত সুখ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায় ? তাহার উত্তর এই যে মোক্ষলাভ কোনও কর্মের ফল নহে,—ইহা জ্ঞানের ফল,—পূর্ণজ্ঞান লাভ হইলে মানব দেখিতে পায় যে, সে দেহ-ইন্দ্রিয়-মন হইতে একান্ত ভিন্ন বস্তু, সে জ্ঞানস্বরূপ—ব্রহ্মের অনন্ত আনন্দময় স্বরূপও সে উপলব্ধি করে, তাহার ফলে সে অনন্তকাল আনন্দময় জীবন যাপন করে। মোক্ষের এই অনন্ত উদার কল্পনা হিন্দু ধর্ম ভিন্ন অন্য ধর্মে নাই।

অন্য সকল ধর্মে দেহ ও আত্মা এই দুইটি বস্তুরই কল্পনা আছে,—মনকে আত্মার সহিত এক করিয়া ধরা হইয়াছে। হিন্দু ধর্মে আত্মা ও মনের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে। আত্মা চৈতন্যময় বস্তু, মন জড় বস্তু। মনের কার্য্য সংকল্প ও বিকল্প। মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হয়। মনে কোন্ চিন্তার উদয় হইতেছে, মন অনেক সময় এ বিষয়ে সচেতন থাকে না। আত্মা ও মনের মধ্যে যে একটা পার্থক্য আছে, অনেক পাশ্চাত্য দার্শনিক এ বিষয়ে এখনও অনভিজ্ঞ। কত সহস্র বৎসর পূর্বে বেদে এই পার্থক্য সুস্পষ্ট ভাবে নির্দেশ করা হইয়াছে (চ)।

পরলোক সম্বন্ধে খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মের কল্পনা অতিশয় অপরিণত। মৃত ব্যক্তির আত্মা কবরের মধ্যেই দেহের সহিত অবস্থান করে। যখন জগতের ধ্বংস হইবে তখন বিচারের দিন আসিবে (Day of Judgment) তখন পৃথিবীর যাবতীয় আত্মা কবর হইতে উত্থিত হইবে এবং সকলের বিচার হইবে। যে ব্যক্তি পুণ্যবান সে অনন্ত কালের জন্য স্বর্গ লাভ করিবে। যে পাপী সে অনন্ত কালের জন্য নরক পাইবে। বিচারের দিন কত কাল পরে আসিবে তাহার স্থিরতা নাই। পাঁচ হাজার বৎসরের পরেও হইতে পারে, পাঁচ লক্ষ বৎসর পরেও হইতে পারে। এত দীর্ঘকাল ধরিয়া কবরের মধ্যে অপেক্ষা করিবার কল্পনা বড় অদ্ভুত। হিন্দু ধর্মে যাহার যখন মৃত্যু হয়, তখনই তাহার কর্মফলভোগ আরম্ভ হয়। সকল আত্মার যে একসঙ্গে বিচার হইবে, সকলকে একসঙ্গে স্বর্গ বা নরকে যাইতে হইবে ইহার কোনও সার্থকতা নাই।

যে ব্যক্তি যেরূপ কর্ম করে ইহজীবনে বা মৃত্যুর পরে তাহাকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে—সকল ধর্মেই এই কথা আছে। ইহার নাম কর্মফলবাদ। কর্মফলবাদ সকল ধর্মেই স্বীকৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু হিন্দু ধর্মে এই মত যেরূপ সুসঙ্গত ও প্রণালীবদ্ধ ভাবে নির্দিষ্ট হইয়াছে অন্য কোনও ধর্মে সেরূপ হয় নাই। ইহার একটি নিদর্শন আমরা পূর্বে দিয়াছি—পুণ্য ও পাপের তারতম্য অনুসারে স্বর্গ ও নরকে অবস্থানের পরিমিতিরও তারতম্য হওয়া আবশ্যক। ইহা ভিন্ন অন্য কারণেও হিন্দু ধর্মের কর্মফলবাদের বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি হইবে। আমরা এখন যে কর্ম করি তাহার ফল যেমন পরে ভোগ করি, সেইরূপ আমরা এখন যে সুখ-দুঃখ ভোগ করি তাহাও আমাদেরই পূর্বকৃত কর্মের ফল। কেহ দরিদ্রের গৃহে রুগ্নদেহে জন্মগ্রহণ করে, কেহ ধনীর গৃহে সুস্থ শরীরে জন্মগ্রহণ করে। এই পার্থক্যের কারণ কি ? অন্য ধর্ম নীরব। হিন্দু ধর্ম বলে, ইহার কারণ পূর্বজন্মের কর্মফল। পূর্বজন্মের কর্মফলে স্বর্গ ও নরক ভোগ হয় সত্য। কিন্তু স্বর্গ ও নরক ভোগের পরেও কিছু কর্ম অবশিষ্ট থাকে, তাহার ফলে পরজন্মের পরিস্থিতি নির্দিষ্ট হয়। আধুনিক মনোবিজ্ঞানে অবচেতন মন (unconscious mind) সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। আমাদের মনের অনেক সংস্কার আছে যেগুলি আমরা জানি না—কার্য্যকালে তাহাদের অভিব্যক্তি হয়। দুইটি শিশু জন্ম হইতে একরূপেই পালিত হইলেও, বড় হইলে দুই জনের মনোভাব বিভিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণ অন্য ধর্ম দিতে পারে না। হিন্দু ধর্ম বলে, ইহার কারণ পূর্বজন্মের সংস্কার। মানব-জীবনে কোনও কিছুরই হঠাৎ আরম্ভ, বা হঠাৎ শেষ হয় না। প্রত্যেক ঘটনার একটি কারণ থাকে এবং একটি কার্য্য বা ফল থাকে। সে কারণ ও কার্য্য আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই না। ইহারা স্বর্গ ও নরক, পূর্বজন্ম ও পরজন্মের সহিত সংশ্লিষ্ট। মানব-জীবন একটি continuous curve.

সৃষ্টি ও প্রলয়ের কথা সকল ধর্মেই আছে। কিন্তু বর্তমান সৃষ্টির পূর্বেও যে একটা সৃষ্টি ছিল, ভবিষ্যৎ প্রলয়ের পরও যে আবার সৃষ্টি হইবে, ইহা হিন্দু ধর্মেই আছে, অন্য ধর্মে নাই। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে (ছ)। যেমন দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন ফিরিয়া আসে, যেমন গ্রীষ্মের পর শীত, শীতের পর গ্রীষ্ম ফিরিয়া আসে—সেইরূপ সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পর সৃষ্টি আবার ফিরিয়া আসে। ঈশ্বর যে একবার মাত্র জগৎ সৃষ্টি করিবেন তাহা নহে। তিনি অনাদি কাল হইতে জগৎ সৃষ্টি ও ধ্বংস করিয়া আসিতেছেন।

পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ ইহাদের কি আত্মা আছে ? অন্য ধর্মে বলে, নাই। আত্মা কি বস্তু তাহার সুস্পষ্ট ধারণা নাই বলিয়া অন্য ধর্মে

(চ) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরা হ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধি: বুদ্ধেরাত্মা মহান্ পরঃ।
মহতঃ পরমব্যক্তং অব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষাৎ ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।
—কঠোপনিষদ্ ১।৩।১০,১১

(ছ) সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ—(সন্ধ্যাবিধিতে উদ্ধৃত সামবেদের মন্ত্র)।

বলা হয় যে ইহাদের আত্মা নাই। হিন্দুধর্ম বলে—আত্মা জ্ঞান-স্বরূপ, পশু-পক্ষী প্রভৃতির জ্ঞান আছে, অতএব আত্মা আছে। উদ্ভিদেরও জ্ঞান আছে, অতএব আত্মা আছে (জ)। যাঁহারা মনে করেন, পশুর বুদ্ধি নাই তাঁহারা ভ্রান্ত, লাঠি লইয়া তাড়া করিলে পশুও পলাইয়া যায়, তৃণ-হস্তে গেলে পশু অগ্রসর হয়। সে নিশ্চয় চিন্তা করে যে, লাঠি পিঠে পড়িলে সে কষ্ট পাইবে, তৃণ আহার করিয়া তাহার তৃপ্তি হইবে। মনুষ্য অপেক্ষা পশুর বুদ্ধি অবশ্য অল্প। কিন্তু বুদ্ধি নাই ইহা বলা যায় না (ঝ)। মস্তিষ্ক বিকৃত হইলে বুদ্ধি নষ্ট হয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি আত্মা থাকে না?

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে হিন্দু ধর্ম বলে, প্রথমে আকাশ সৃষ্টি হয়, আকাশ হইতে বায়ু, তাহা হইতে জল, তাহা হইতে মৃত্তিকা হয়। কিছু দিন আগে পর্যন্ত রসায়নশাস্ত্র (Chemistry) বলিত, লৌহ, স্বর্ণ প্রভৃতি মৌলিক পদার্থ সকল (element) সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। এখন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক জানিয়াছেন সকল মৌলিক পদার্থ একই উপাদানে গঠিত। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ হিন্দু ধর্মের সত্যতাই ক্রমশঃ উপলব্ধি করিতেছেন। বাইবেল বলেন, খৃষ্টের ৬,০০০ বৎসর পূর্বে জগৎ সৃষ্টি হইয়াছিল। হিন্দুধর্ম প্রায় দুই শত কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্টি হইয়াছিল। আধুনিক বিজ্ঞানেরও সেই মত। সুতরাং আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশঃ হিন্দুশাস্ত্রদৃষ্ট সত্যের নিকটেই অগ্রসর হইতেছে।

এই সকল কথা আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, হিন্দু ধর্মেই পূর্ণ সত্য প্রতিপাদন করা হইয়াছে—আধুনিক জগতে যে দুইটি ধর্ম সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ—খৃষ্টান ধর্ম ও মুসলমান ধর্মে অনেক সত্য উপলব্ধি হয় নাই—প্রাচীন গ্রীস রোম মিশর প্রভৃতিতে যে সকল ধর্ম প্রচলিত ছিল, তাহারা আরও অনেক অল্প পরিমাণে সত্য উপলব্ধি করিয়াছিল। বৈদিক সভ্যতা যে পৃথিবীর অন্যান্য সভ্যতা অপেক্ষা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছে তাহার একটি কারণ আমরা পূর্বের প্রবন্ধে দিয়াছিলাম। তাহার সে কারণ এই যে, বৈদিক সভ্যতার প্রভাবে হিন্দু জনসাধারণ অপর দেশের জনসাধারণ অপেক্ষা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক পরিমাণে লাভ করিয়াছে। বর্তমান প্রবন্ধে আর একটি কারণ দেওয়া হইল—বৈদিক ধর্মে পূর্ণ সত্য উপলব্ধি হইয়াছিল, অন্য কোনও ধর্মে পূর্ণ সত্য উপলব্ধ হয় নাই।

(জ) অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্ত্যেতে সুখদুঃখসমন্বিতাঃ—(মনুসংহিতা)

(ঝ) জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্।
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।—
—চণ্ডী, ১ম মাহাত্ম্য ৪৯।৫০

বাসনা

অমল ঘোষ

বেঁচে থাক এই জীব জগৎ
ওগো মহৎ, হে ঈশ্বর!
বেঁচে থাক ঐ নীল আকাশ
গ্রহ-তারা;
শত সহস্র-রাত্রি-দিন,
পলাতক যত ছায়া-হরিণ!
বারে বারে ডেকে নেয় নিক'
ঊষা সন্ধ্যারা।

এ জীবন চির ধূমধূসর
ছায়া-ঊষর প্রতিযোগীর;
দুর্গম কোনো গুহা, তারে ডেকে
নেয় ত নিক।
ক্ষয়িত ধূসর বাসনা প্রেম
লোহা ইট কাঠ হীরক হেম;
চাই না হে মরু! পড়ে থাক তারা
দিগ্বিদিক্।

ঠুনকো কাচের পেয়ালা প্রাণ,
অপরিমাণ গুরুত্বের,
বোঝা বয়, বোঝা নেমে খসে আজ
শূন্য হোক;
বিস্বাদে বিষে তিক্ততায়,
সন্তাপে চির রিক্ততায়,
ক্লেদময় জীব জোয়ারে ভুগছি
কী দুর্ভোগ!

একটি এ শুধু একটি প্রাণ
কীট সমান হোক না শেষ!
এ জীব-জগৎ সোনা ও হীরক
থাক পড়ে।
ক্রুদ্ধ কী এক কাল হাওয়ার
একা চলি একা ঘোড়সওয়ার,
বিস্ফোরণীর মেঘাগ্নি-জ্বলা
প্রান্তরে।

শ্রীজ্যোতিপ্রসাদ বসু

কে যেন একটা ক্যালেণ্ডার দিয়ে গেছে। ভাল ক্যালেণ্ডার। বড় বড় কাগজে বেশ বড় করে আর স্পষ্ট করে ছাপানো তারিখের হরফগুলো। খুব বেশী মোটা নয়, সুদৃশ্য আধুনিক ছাঁদের টাইপ, জোরালো লাল আর কালো কালিতে বেশ জ্বলজ্বলে করে ছাপা। আপনা হতেই নজরে পড়ে, মাথাটা ঈষৎ তুলতেই। টেবিলের সামনের দেয়ালেই টাঙ্গিয়ে রেখেছি ওটা। প্রয়োজনীয় বস্তু!

লাল আর কালো, তারিখ আর তারকায় খচিত ক্যালেণ্ডারের পাতার আকাশ। ঘরে হাওয়া থাকলে পাতাগুলো ওড়ে। পেছনের মাসের পাতাগুলো অল্প অল্প নজরে আসে। ভাল করে বোঝা যায় না। কেবল মনে হয় একটা লাল-কালোর মিশ্রিত ঝড়।

বড় বিস্মিত বোধ করি। পণ্ডিত নই, জানি না কে এই দিন-পঞ্জীর আবিষ্কারক। কিন্তু তাঁকে ধন্যবাদ দিই মনে মনে, শ্রদ্ধা করি। যে দিনগুলো না কি অফিস-যাওয়ার, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অমানুষিক পরিশ্রমের, সেগুলোকে কেমন কালি দিয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে রেখেছে, চিহ্নিত করেছে কালো দিয়ে। তেমনি যে দিনগুলো ছুটির, যেগুলো কিছু না করে কিংবা খেয়াল-খুশি মত অনেক কিছু করে কাটিয়ে দেওয়ার, সেগুলো কেমন লাল, কেমন উজ্জ্বল, দীপ্ত!

মানুষের মনের আর জীবনের এই বিচিত্র মানচিত্রের দিকে তাকাই আর অভিভূত হই। অনেক ঘটনার কথা মনে পড়ে, যার সঙ্গে আমি হয়ত জড়িত কিংবা যেগুলোকে হয়ত খুব নিবিড় ভাবে দেখেছি সে ঘটনাগুলো ক্যালেণ্ডারের ওড়া-পাতার লাল-কালোর ঝড়ের মত হাসি-অশ্রু বা রোদ আর মেঘের আলো-ছায়া ফেলে খেলা করতে থাকে।···দুঃখের দিনগুলো কেউ বা বেশি বেদনাদায়ক আবার কেউ বা কম, কেউ বা রোববারে বিশ্রামস্নাত সোমবারের নূতন উদ্যমের মত হালকা-কালো, কেউ বা নেহাৎ বুধ বৃহস্পতি শুক্রের মত— ক্লান্ত, অতিক্লান্ত। তেমনি সুখের দিনের কথাও বলি। কেউ বা নেহাৎ অকিঞ্চিৎকর এমপাবার্স-বার্থডে-চৈত্রসংক্রান্তি, কেউ বা দুর্গোৎসব-ঈদ-বড়দিন। এমনি ছোট-বড়, হালকা, গভীর রঙের খেলা, যেমন মনে তেমনই মনের মানচিত্র ঐ ক্যালেণ্ডারে।

জীবনটাই ত একটা ক্যালেণ্ডারের মত। অন্ততঃ আমি ত' তাই দেখি! প্রতি ক্ষেত্রে, প্রতি গৃহে, প্রতি সমাজে ঐ এক দিকে কালো আর এক দিকে লাল। এরাই ঝাঁক বেঁধে আছে এক একটা গণ্ডীতে।···পথে বেরোই—উন্মুক্ত রাজপথে। মানুষের ভীড়, গাড়ীর স্রোত আর দুই পাশে রোদ-ঝলসানো বড় বড় বাড়ী। চেয়ে চেয়ে দেখি বাড়ীগুলোর দিকে, একটার পর একটা পার হয়ে চলি। কেউ বড় কেউ ছোট, কেউ ভাঙ্গা নড়বড়ে কেউ চকচকে ঝরঝরে, কেউ প্রাসাদ কেউ বস্তি, কেউ শোকাচ্ছন্ন কে উৎসব-মুখর, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে পিয়ানোর সুর কোথাও বা মৃত্যুশোক।··· আরও চলি এগিয়ে। পাড়ার পর পাড়া। এক একটা পাড়ায়—যেমন দেখি চৌরঙ্গীর স্বর্গে—কেমন যেন রোববারের মত লাল প্রাণবানতা তার পর সেই পথ ধরে এগিয়ে যদি যাই উত্তরে ক্রমাগতঃ উত্তরে তাহলে সোম থেকে শনি, কালো কালো জীবনের স্বাদ গন্ধহীন পাড়ার দেখা মিলবে।

রাস্তার মানুষগুলো? ওদের মধ্যেও লাল আর কালোর স্পষ্ট স্বাক্ষর। জীবনের আর সমাজের কয়েকটা অতি স্পষ্ট আর অতি কটু সুরের ইতিবৃত্ত। কালো কালো অফিসের তারিখগুলো লোকগুলোর দিকে ছুটির দিনের লাল মার্কা লোকগুলোর কি একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি।

ট্রামে বাসে উঠবেন? সেখানেও ত' ঐ ক্যালেণ্ডার! যারা আমার আপনার আগে এসে উঠেছে তারা আরাম করে দখল করে বসেছে বসবার জায়গাগুলো, ভাল ভাবে দাঁড়াবার জায়গাগুলোও! ওরাই ত' রোববারের দল আমার আপনার মত সোম-শনিদের চোখে। ওরা হয়ত সব চেয়ে আগে নিরাপদ হয়ে বসেছে বন্ধুতে মিলে, কিংবা স্বামি-স্ত্রী, কিংবা আর কেউ, ওরা খেয়াল খুশির গল্পে মেতে আছে, মেতে আছে বক্তৃতায়, পলিটিক্স বিজনেস-টকে···নীল-ধূসর ধোঁয়া উঠছে ওদের সিগারেট থেকে নিশ্চিন্ত সর্পিল ভঙ্গীতে। কিংবা ওরা কেউ কিছু বলছে না শুধু আরাম-ভরা দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়ে আছে রাস্তার দিকে—দেখছে মানুষের আর রঙ রসের শোভাযাত্রা: আর আমি দাঁড়িয়ে আছি ঢোকবার মুখটায় প্রাণটাকে শুধু হাতের মুঠোয় ধরে (অনেক সময়ে হাতের মুঠোয় হ্যাণ্ডলটাও থাকে না, ভীড়ের চাপেই বেশ দাঁড়িয়ে থাকা যায়) আর দেখছি একটা পায়ের বদলে দ্বিতীয়টার কোন রকম স্থান-সংকুলান করা যায় কি না, কিংবা আমার মাথার চুলের মুঠি ধরেই কেউ ঝুলে পড়লো কি না (অপরের জামা ধরে ত' অনেকেই আজকাল ওঠা-নামা করছেন, তাছাড়া নিজের পকেটের দিকে নজর ত' রাখছিই। তাই বলছিলুম, ঐ সামনের ওরা কি ঈদ-বড়দিন-দুর্গোৎসব নয় আমাদের এই সোমবার শুক্রবারদের কাছে? ক্যালেণ্ডারের মানচিত্রটা কি মেলা নেই ট্রামে-বাসে?

আফিসে এলাম। আমার বসবার জায়গাটা দেয়ালের কোণে। আলো নেই, বাতাস নেই, আছে ভ্যাপসা গন্ধ আর মশার কামড়। আপনারটা তবু পাখার নীচে আর এক জনের আবার পার্টিশন করা ও রেলিং দেওয়া খাঁচার মধ্যে।···এমনি করেই আমরা ছড়িয়ে আছি সোম থেকে শনি। এবার একবার সাহেবের ঘরের দিকে দেখুন—

এয়ার-কনডিসন্‌ড্‌, পাখা-আলো-রকিং চেয়ার লাগানো জমজমাট খাঁটি রোববার একটি।

কোথায় যাবেন? সিনেমা-থিয়েটারে, ক্লাবে মাঠে···সর্বত্র ঐ লাল আর কালোর ভীড়। সর্বত্র ঐ ক্যালেণ্ডার, আপনার আমার জীবনের মানচিত্র!

কাজ সেরে বাড়ী এলেন। কিন্তু বাড়ী এসেই যে শান্তি পাবেন, আপনার ক্লান্তি ঘুচবে এমন কথা নেই। সাংসারিক গোলযোগের কথা বাদ দিলাম, তা ছাড়াও আজকালকার, এটা নেই ওটা-নেই'র যুগে কখন যে নির্ঝঞ্ঝাট রোববারের লাল ঔজ্জ্বল্য পাবেন তার কোন স্থিরতা নেই। বেশির ভাগটাই ত' অন্ধকার সোম শনির মত কালো, নিরবচ্ছিন্ন কালো।

ক্যালেণ্ডারের দিকে দেখি আর চেয়ে চেয়ে ভাবি এই লাল কালোর স্রোত কি নিবিড় ভাবে, কত গভীরে গিয়ে স্পর্শ করেছে আমাদেরকে। জীবন আমাদের ক্যালেণ্ডার হয়ে উঠেছে নিছক।

শুধু তাই নয়, অল্পসংখ্যক লাল তারিখগুলোকে কেমন ঘিরে ধরেছে অনেক বেশী সংখ্যার কালো তারিখগুলো। কোণঠাসা করে রেখেছে অনেক সময়ে। আমরাও ত' তাই করছি জীবনে। ওৎ পেতে আছি লাল দিনগুলোর দিকে, লাল মুহূর্তগুলোর দিকে—যারা লাল তাদের দিকে উন্মুখ হয়ে আছি আমরা যারা কালো।

তবে হ্যাঁ, আমরা যারা কালো হয়ে আছি তারাও যে কোন কোন ক্ষেত্রে রোববারের মত লাল, সে কথাটাও স্মরণ করতে হয়। তার আগে একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করি। এটা প্রায়ই মনে পড়ে আমার, বিশেষ করে লাল-কালো ক্যালেণ্ডারের প্রসঙ্গে।

আমাদের পাড়ার বড় মোড়টায় রোজ গিয়ে দাঁড়াতে হয় ট্রাম বা বাসের অপেক্ষায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি বিচিত্র লাল কালো জীবনের শোভাযাত্রা! এত বড় মোড়। দেখবার মত অনেক কিছু থাকবে বই কি!···নানা ধরণের মানুষ এসে দাঁড়ায়। বিবিধ স্তরের মানুষ!···ওদিকে কয়েকটা ফলওলার নির্দিষ্ট আসন আছে। ওরা দৈনিক ফলের ডালা সাজিয়ে বসে। আপেল-লেবু-বেদানা থেকে সবই পাওয়া যায় ওদের কাছে।

থরে থরে সাজানো থাকে রসভরা বিভিন্ন জাতের ফল। কেন জানি না, লাল লাল বেদানার দানার দিকে তাকালে আমার ঐ ক্যালেণ্ডারের কথা মনে হয়। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে ক্যালেণ্ডারের সঙ্গে আর যা যা মনে পড়ে সব কিছুই।···আমরা যারা দাঁড়িয়ে থাকি কিংবা চলাচল করি তারা হয়ত কিছুটা ফল সংগ্রহ করি। যাদের পক্ষে সাধ্য নয় তারা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে।

সেদিন একটা প্রায়-উলঙ্গ ক্যাংলা কালো ছেলেকে অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে থাকতে দেখলুম ফলওলার ঝুড়ির দিকে। প্রচুর বেদানা এনেছিল সেদিন লোকটা। খোলা-ভাঙ্গা লাল-লাল দানা-বার-করা বেদানাগুলো। ছেলেটা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল তার দিকে। হঠাৎ, কি করে জানি না, খানিকটা বেদানা ফলওলার ঝুড়ি থেকে ছিটকে গিয়ে রাস্তার ধারে নর্দমার গায়ে ছড়িয়ে পড়লো। খুব সামান্যই অবশ্য। চক্ষের নিমেষে সেই ছেলেটা ছুটে এসে দানাগুলো কুড়োতে আর মুখে পুরতে লাগলো। তার সেই শীর্ণ আর জীর্ণ কালো-কালো আঙুলের ফাঁকে ফাঁকে লাল লাল বেদানার দিকে তাকিয়ে আমার চোখের সামনে লাল-কালো হরফের ক্যালেণ্ডারটা স্পষ্ট হয়ে ভেসে উঠলো। কয়েকটা কালো কালির মুখে এক একটি রস ভরা লাল কালির রোববার।

তাই বলছিলুম, এমন অনেক সোম-শুক্রের দল আছে যাদের কাছে নেহাৎ আপনি আমিই হয়ত রোববার, এমন কি দুর্গাপুজো-বড়দিন। কথাটা মনে পড়লেই বিব্রত বোধ করি। বিশেষ করে যখন মনে পড়ে কয়েকটা আঙুলে-গোণা লাল সহরের আপনার আমার মত রোববারদের পিছনে বহু কালো-কালো গ্রামের সোম থেকে শনির দলকে। তারা আমাদের লাল স্তরের দিকে ওৎ পেতে আছে কি না জানা নেই, কিন্তু আমরা ছ'টা কালো তারিখের মাথার ওপর অন্ততঃ একটা লাল রোববার পরম নিশ্চিন্তে উজ্জ্বল হয়ে আছি।···এই ত' আজকাল কয়েক বছর ধরে নানা নির্যাতনে আর দুর্যোগে বিধ্বস্ত হয়ে সেই কালোরা আমাদের কাছে এসে হাত পেতে দাঁড়াচ্ছে,—একটা পয়সা দাও বাবু গো, সারা দিন খেতে পাইনি—

এদের সামনে লাল হয়ে দাঁড়াতে বড় বিব্রত বোধ করি। প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়, কেন এই লাল আর কালো? সুস্থ খুশিতে ভরে ওঠা ছুটির দিনের মত সব লাল হয়ে উঠতে পারে না?

কে যেন দিয়ে গেছে এই বড় হরফের ছাপা শোভন ক্যালেণ্ডারটা। ওর দিকে চেয়ে দেখি আর বসে বসে ভাবি। ঘরে কখন খোলা-জানলায় হাওয়া এসে ঢোকে। অনেকগুলো পাতা একসঙ্গে ওড়ে। লাল কালোর ঝড় একটা। কত স্মৃতি আর স্বপ্ন ভীড় করে মনে। তার পর যখন পাতাগুলো স্থির হয়ে আসে তখন স্পষ্ট দেখতে পাই অতি অদ্ভুত এক মানুষের মানচিত্র!

দক্ষিণী-ছড়া

Don West—"Southern Lullaby"

অনুবাদক: নরেন সেনগুপ্ত

দুধ খাও রে পেটটি ভ'রে আমার খোকন সোনা,
শরীর উঠুক শক্ত হয়ে হাড় যাবে না গোণা,
পেশী উঠুক ফুলে' ফুলে' সকল অঙ্গ মেলে
: বাবা তোমার কাটায় দিন কোন সহরের জেলে।
হাসো আমার খোকন-মণি হাসো ধীরে ধীরে
ছোট্ট দু'টি কাজল-চোখে জ্বলে যেন হীরে।
হীরে নয় তো, আগুন যেন—তীব্র যে তার জ্যোতি,
: বাবা তোমার চেয়ে আছে তোমার পথের প্রতি।
ঘুমাও ঘুমাও মাণিক আমার, ঘুমাও গভীর ঘুম
আঁধার-রাতের দখিণ-তারা দিয়ে যাবে চুম্।
শরীর উঠুক শক্ত হয়ে, দেহে আসুক জোর,
: আঘাত দিয়ে ভাঙ্‌তে হবে কারাগারের দোর।
পেট ভরে খাও খোকন-বাবু
দস্যু-দলে করতে কাবু
আমার বুকের গহন-তলে রয়েছে যে লীনা
তোমায় কঠোর হ'তে হবে পান করে সে ঘৃণা।
ঘৃণা করতে শেখো তুমি, মনের গভীর ঘৃণা
আমার মনের ভয় না-যেন পাও।
শিয়রে জাগে মাতা, তুমি গভীর নিদ্রা যাও,
: কাঁদে মাতা সান্ত্বনা তার কেই-বা তুমি বিনা?

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

১

বালিগঞ্জের এক বৃহৎ অট্টালিকার বহিঃকক্ষে বিস্তর লোক জড় হইয়াছে—তরুণ, যুবা, প্রৌঢ়। সংবাদপত্রে এক বিজ্ঞাপন বাহির হইয়াছে, তাই ইহাদের আবির্ভাব। বাড়ীর মালিক মিষ্টার বোস্—বিখ্যাত এক জন এটর্ণী, তাঁহার একমাত্র সন্তান কন্যা, তাহারই আজ 'পাত্র'-নির্ব্বাচন।

নিরূপিত সময় সকাল নয়টা। এখনো আটটা বাজে নাই, কক্ষে লোক আর ধরে না। প্রত্যেকেই ফিট্‌ফাট্, বেশভূষায় প্রত্যেকেরই অঙ্গে চমক—প্রত্যেকেরই মুখে আসন্ন বিজয়ের গর্ব্ব। দেওয়ালের গাত্রে আঁটা ঘড়ি—ঘড়ির পানে চাহিয়া এক-এক জন এক-একবার করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, অস্থির হইয়া মুখ বাড়াইয়া দ্বারদেশে দৃষ্টিক্ষেপ করিতেছে, পরক্ষণেই আবার অবসন্ন হইয়া বসিয়া পড়িতেছে। অগণিত জুতার শব্দ, শব্দে কক্ষটি মুখর—যেন সাহেব-বাড়ীর আস্তাবল।

আর এক জন প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই এক জন প্রার্থী বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল, "আরে! মধু যে—মধু? ক্ষুর-ভাঁড় ফেলে তুমিও যে বাবা, হানা দিয়েছ—"

মধুর বুকটা উড়িয়া গেল। যে-মেসে সে ক্ষৌরকর্ম্ম করে, ওই লোকটি সেই মেসেরই এক জন বাবু! মধু বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিয়া পড়িল।

সঙ্গে সঙ্গে এক কোণ হইতে এক পরিস্ফুট শব্দ উঠিল, "নাপিত?—তোবা, তোবা—"

"এই—কে হে তুমি?"—এক জন প্রৌঢ় প্রার্থী হঠাৎ ফুটবলের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া ওই লোকটার কাছে গিয়া বজ্রকঠিন কণ্ঠে কহিল, "কে বট তুমি—কে বট? মুস্কিল-আসান, না, পীর-প্যাগম্বর?"

"যেই হই না ক্যান্, তোমার নানার কি?"—লোকটা রুখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

মুখে মুখ ঠেকে-ঠেকে! প্রৌঢ় লোকটি তাড়াতাড়ি কোঁচার কাপড়টা মুখে চাপা দিয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইয়া বিকৃত মুখে বলিয়া উঠিল, "একেবারে পেঁয়াজের ক্ষ্যাত্—চট্টগ্রাম!"

দুয়ারের গা ঘেঁষিয়া বাড়ীর দরোয়ান দাঁড়াইয়া ছিল। সে শার্দ্দুলের ন্যায় যেন একটা লাফ মারিয়া উক্ত 'চট্টগ্রামের' হাতটা বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া বলিয়া উঠিল, "কোন্ হ্যায় তোম্—মুসলমান?"

লোকটার অন্তরাত্মা তখন শুকাইয়া গিয়াছে। দরোয়ানজির প্রতি একবার সভয়ে তাকাইয়া কহিল, "বিজ্ঞাপনে হাঁদু-মোসোলমান—কিন্তু হিসাব কইরা ল্যাখা ত নাই!"

দরোয়ানজির চোখে দাবানল উঠিল। তীব্র কণ্ঠে কহিল, "তোম্ বদ্‌মাস্ হ্যায়। হিন্দুকা মোকাম—এহি খেয়াল তেরা নেহি থা?" বলিয়াই তাহার হাতটা একবার নাড়া দিয়া বাহিরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিল, "নিকাল যাও—"

লোকটাও গা-ঢাকা দিতে পারিলে বাঁচে। মুক্তি পাইয়াই সুবোধের ন্যায় বাহিরের দিকে অগ্রসর হইল। দ্বারদেশে গিয়াই সরীসৃপের ন্যায় মুখটা ফিরাইয়া সেই প্রৌঢ় লোকটার প্রতি বজ্রমুষ্টি উঠাইয়া কহিল, "হালার পুত্তি! তুই আয় একবার বাহির হইয়া, আয় হালা—" বলিয়াই পিঠটান দিল।

দরোয়ানজি মুচকি হাসিয়া কহিল, "গুণ্ডা হায়—" বলিয়াই পুনশ্চ স্বস্থানে গিয়া দাঁড়াইল।

এই সময় আর এক জন স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারিতেছিল না—এক উৎকট গর্ব্ব যেন তাহার মুখ-চোখ ফুঁড়িয়া বহির্গত হইতেছিল। হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "যাক্, বাবা! আমি বেঁচে গেছি—আমি স্বজাতি!"

"আমিও—" পার্শ্ব হইতে আর এক জন যোগ দিল।

এক জন লোক বসিয়াছিল উক্ত লোকটির পাশেই, সে আর নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা বুঝি নিরাপদ মনে করিল না। অকস্মাৎ উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আমি বুঝি নই?—আমার বাবার নাম কি জানো—গোবর্দ্ধন, নিবাস মদনপুর! হুঁ—হুঁ—আমিও!"

"আমিও, আমিও—আমিও—" সঙ্গে-সঙ্গে অনেকেই এক-এক করিয়া, এক জনের পর এক জন চীৎকার করিয়া উঠিল।

দরোয়ানের শাসন পড়িল—"হাল্লা মৎ করো—চুপ্!"

চুপ্!—সকলেই আবার নিঃশব্দ। কিন্তু, সে অত্যল্প কাল মাত্র। ক্ষণকাল পরেই আর এক কলরব উঠিল। মেসের সেই বাবুটি আর ওই মধু নাপিত—উভয়ের ভিতর চেহারাটা ভালো ছিল অপেক্ষাকৃত মধুরই। সেই জন্য মেসের বাবুটির মনে বুঝি বা একটু হিংসার উদ্রেক হইয়াছিল। জাতি-বিচারের সুযোগটা সে আর অপব্যয় করিতে পারিল না, এর ওর মুখের দিকে কয়েক বার অকারণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মধু নাপিতের প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "তার পর মধু, তুমিও না কি স্বজাত?—'পাত্রী' যে 'নরসুন্দরী' নয়, তা' বোধ হয়, জানো?"

সেই প্রৌঢ় লোকটির কাণে কথাটা এইবার যেন খট্ করিয়া লাগিল। সে তাড়াতাড়ি চেয়ারখানা টানিতে টানিতে মধুর কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "কি কি—তুমি পরামাণিক?"

মধু নিমেষে তাহার চোখ-মুখের ভাবটা এমনিই কঠিন করিল যেন সে আকাশ হইতে পড়িয়াছে। কহিল, "পরামাণিক?—কে বললে?"

"ওই—উনি!"—প্রৌঢ় লোকটি সেই মেসের বাবুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল।

মধু নাপিত হাসিয়া কহিল, "উনি?—উনি ত বল্‌বেনই! উনি নিজে কি—আগে উনি বলুন দিকিনি?" বলিয়াই পুনশ্চ এক অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া সজোরে নিজের ঘাড়টা একবার নাড়া দিল, তার পর গম্ভীর হইয়া কহিল, "ব্যাপারটা তবে শুনুন, বলি—এক মেসে আমরা থাকি, সেই ঝাউতলার গলিতে, সেই নীচেকার ঘরে—ওর তক্তা এই, আমার তক্তা ওই! জাত্যংশে উনি—কুলীন কৈবর্ত্ত!"

মেসের বাবুটির মুখখানা লাল হইয়া উঠিল।

মধু তাহার দিকে একবার সকৌতুক দৃষ্টিপাত করিয়াই তৎক্ষণাৎ আবার সুরু করিল, "কাজেই, আমি নাপিত, কি ধোপা, কি রুইদাস—এ সব না হ'লে, ওর চলে কি করে! পাছে আমি হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দিই! মুখচাপা, মশাই, একে বলে মুখচাপা—ক্যায়োটি চাল।"

মেসের বাবুটির মুখের দিকে আর চাওয়া যায় না। ক্ষিপ্তের ন্যায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া মুখখানা বিশ্রী করিয়া বলিয়া উঠিল, "ও শালার মিথ্যে কথা—আমি বামুন!" বলিয়াই জামা খুলিয়া পৈতা বাহির করিয়া ফেলিল।

মধুকে তখন আর পায় কে! সে সুনিশ্চিত বিস্ময়ের ভাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "দেখুন, মশাই, দেখুন—কায়স্থর মেয়ের 'বর' হতে এসেছে বামুন!"

"দিনে ডাকাতি—এ্যা!"—সকলেই রুখিয়া আসিয়া লোকটাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল।

মধু নাপিত দিন পাইয়াছে। সে তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলিয়া সরিয়া আসিয়া এক্‌লাসে বক্তৃতা দিবার ভঙ্গীতে বলিতে লাগিল. "তার মানে কি জানেন আপনারা? আসলে ওর জাতেরই ঠিক নেই! মেসের খাতায় এতকাল ছিল ও কৈবত্, আজ হলো কি না —বামুন! দুগ্‌গা, দুগ্‌গা!"

দরোয়ানজির পুনরায় কাজ পড়িয়াছে। সে হুঙ্কার দিয়া সরিয়া আসিয়া কহিল, "ফিন্ কেয়া হাল্লা হ্যায়"—

প্রৌঢ় লোকটি কাতর কণ্ঠে কহিল, "দরোয়ান সায়েব, ও আদ্‌মী গলায়-পৈতে বামুন হ্যায়, আব কনে, যাঁর সাদি হবে—এই যাঁর আমরা 'বর' হোতা হ্যায়—এই যাঁকে আমরা বিয়া করবো—"

দরোয়ান ধমক্ দিল, "কেয়া বল্‌নে মাংতা আপ্?"

ত্রাসে প্রৌঢ় লোকটির মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল। অধিকতঃ কাতর কণ্ঠে কহিল, "এই, এই—ও লোকটা জাতে গড়মিল!"

দরোয়ানজি কথাটা বুঝি বা বেশ মনোযোগ সহকারেই কাণে তুলিল। একটু কি ভাবিয়া কহিল, "হিন্দু, না, মুসলমান?"

"ওই—একটা—"

"কেয়া—একঠো?"

"ওই,—হয় মুসলমান্, নয় হিন্দু! জাতে গড়মিল—"

দরোয়ানজি এবার রাগিয়া উঠিল। কহিল, "ঠিক্‌সে বাত্ বলিয়ে—মুসলমান?"

প্রৌঢ় লোকটি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কহিল, "না, না— তা নয়! তবে ওই যে বল্‌লাম—জাতে গড়মিল!"

এম্‌নিই সময়ে বাহিরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল। দরোয়ানজি ত্রস্ত হইয়া প্রার্থী-মহলকে নিম্ন কণ্ঠে সতর্ক-সঙ্কেত করিয়া কহিল, "চুপ রহিয়ে! দিদিসাব্—"

চোখের পলকে একটি তরুণী আসিয়া দ্বারমুখে দাঁড়াইল, যেন এক ঝলক চন্দ্রালোক আসন্ন এক ঝড়ের পূর্ব্বে তার শেষ গর্ব্ব লইয়া পৃথিবীর উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে! তাহার পরিধানে 'রাইডিঙ্ স্যুট্,' হাতে 'হাণ্টার,' বয়স—উনিশ কি কুড়ি! ভিতরে ওই যে অগণিত লোক, তাহাদের দিকে সে দৃক্‌পাতও করিল না, দরোয়ানের হাতে হাণ্টারটা দিয়াই মুখ ফিরাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

কাহারো মুখে আর শব্দ নাই—নিস্তব্ধ! মিনিট পাঁচেক পরে সেই প্রৌঢ় লোকটি গলা চাপিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করিল, "দরোয়ান সায়েব, উনি কে?"

দরোয়ান গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "দিদিসাব্, দিদিসাব্!"

লোকটির মুখ দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হইল যে, সে বেশ একটু গোলযোগে পড়িয়াছে! কথাটার অর্থ বুঝিবার সবিশেষ চেষ্টা করিতে করিতে আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "দিদি—তার ঘাড়ে সাহেব! মেয়েমানুষ, তার পিঠে পুরুষমানুষ!—তার মানে, খানিকটে মেম্ খানিকটে সাহেব!—ভারি গড়মিল!" হঠাৎ দরোয়ানকে প্রশ্ন করিল," আচ্ছা, উনি কি মিলিটারী মেয়েমানুষ— কোট্ প্যাণ্ট, ডাণ্ডা—"

দরোয়ান ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "উল্লুক বন্ যাইয়ে মৎ! দিদিসাব্—হামারা মনিবকা লড়্‌কী! সাদি তো উন্‌কোই হোগা!"

এমনিই সময়ে আবির্ভাব হইল আর একটি প্রার্থীর। যেন বিশ[illegible]বড় দীন সে, দুঃস্থ [illegible] মূর্ত্ত অন্ধকার। তার পরিধানে অর্দ্ধমলিন বস্ত্র, গাত্রে তালি-দেওয়া জীর্ণ জিনের একটি কোট, পদে ক্যাম্বিসের জুতা। বয়স—তেইশ কি চব্বিশ। কি[illegible]র চেহারায় এমনিই এক বৈশিষ্ট্য যে, চাহিলে চোখ আর নামে না। মূর্ত্তি সৌম্য, গাত্রবর্ণ গোলাপী, মুখটি ছাঁচে ঢালা, চোখে চাঁদের আলো। মুহূর্ত্তেই সমাগত প্রার্থীরা যুগপৎ বিহ্বল ও অভিভূত হইয়া পড়িল—কি রূপ! কিন্তু, সে ওই এক মুহূর্ত্ত। পর-মুহূর্ত্তেই তাহাদের অন্তরে রুখিয়া উঠিল ঈর্ষা—সে যে তাহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী! অতঃপর ছেলেটির রূপ ও মূর্ত্তি তাহাদের দৃষ্টিপথ হইতে সরিয়া গেল, মুহুর্মুহুঃ কেবলই তাহাদের চোখে পড়িতে লাগিল তাহার ওই সব জীর্ণ হীন পরিচ্ছদ—কাপড় ও জামা, জামা ও কাপড়! এবং নগদ মূল্যে তাহাই কাণাকড়ি হইয়া দাঁড়াইবে, এই ভাবিয়া সকলেরই বুক ফুলিয়া উঠিল। উক্ত প্রৌঢ় লোকটি টিপ্পনী কাটিয়া বলিয়া উঠিল—"মোছলমান গেল, এইবার ঢাক-ঢোল নামিয়ে এলেন রুইদাস—স্বয়ং পৃথ্বীরাজ!"

কথাটার অর্থ সব বুঝিতে না পারিলেও দরোয়ানজি এইটুকু বুঝিতে পারিল যে, ওই লোকটা নবাগত লোকটিকে ব্যঙ্গ করিয়া কিছু উচ্চারণ করিয়াছে। তাই সে তৎক্ষণাৎ হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, "এসা বাত্ মৎ বোল্‌না—"

লোকটা থতমত খাইয়া গেল। তাড়াতাড়ি ভয়ে ভয়ে বলিয়া উঠিল, "কসুর হয়ে গেছে, দরোয়ান সাহেব!" একটা ঢোঁক গিলিয়াই পুনশ্চ কহিল, "আমাদের মতন না হোক্—ওর চেহারাটা বিশেষ যে মন্দ, তা নয়!"

দরোয়ান মৃদু হাসিয়া কপালের দিকে আঙুল তুলিয়া কহিল— "নসীব্!"

ইত্যবসরে 'ইলেক্‌ট্রিক 'বেল্' বাজিয়া উঠিল এবং দরোয়ান ত্রস্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। সকলেই ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল— কাঁটায় কাঁটায় নয়টা। তখন কাহারো আর কোনো দিকে দৃক্‌পাত নাই—কেহ বা ঝাঁ করিয়া আর একটু লম্বা করিয়া ফেলিল কোঁচাটা, কেহ বা জামার পকেট হইতে বাহির করিয়া ফেলিয়াছে আয়নার এক টুক্‌রা কাচ, কেহ বা কিরূপ ভঙ্গীতে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইবে তাহারই রিহার্শেল দিয়া ফেলিল বার কয়েক। কেবল স্থির হইয়া বসিয়া রহিল নবাগত ওই ছেলেটি।

মিনিট কয়েক পরেই দরোয়ান ফিরিয়া আসিল। তাহার হাতে রাশীকৃত শাদা কাগজের টুকরা আর একগোছা পেন্সিল। সকলেই ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দরোয়ান সকলেরই হাতে এক-এক টুকরা কাগজ ও একটি করিয়া পেন্সিল দিয়া পিছন হাটিয়া

দ্বারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল কলেজের 'প্রফেসরের' মত। অতঃপর গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—"আপ লোক সব নাম লিখকে দিজীয়ে! এক-এক করকে ডাক্ হোগা—"

তার পর পাঠশালার ছেলেরা যেমন করিয়া গুরুমশায়ের হাতে অঙ্কের স্লেট দেয়, তেম্‌নি করিয়া প্রত্যেকেই ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি করিয়া দরোয়ানের হাতে একে-এ'ক নাম লিখিয়া দিয়া গেল।

বাকী পড়িল এক জন—সেই ছেলেটি। দরোয়ান তাহার কাছে গিয়া বিস্ময়ে কহিল, "আপ ?"

ছেলেটি অস্ফুট কণ্ঠে কহিল, "লিখতে জানি নে!" বলিয়া কাগজের টুকরা ও পেন্সিলটি প্রত্যর্পণ করিল।

দরোয়ান চলিয়া গেল।

অপর প্রার্থীরাও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিল—ছোঁড়াটা নাম পাঠায় নাই, তাহার আর ডাকই হইবে না!

ক্ষণ কাল পরেই দরোয়ানের পুনরাবির্ভাব হইল। সকলের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকাইয়া সে মুচকিয়া হাসিয়া কহিল, "আপ্‌লোককা বিল্‌কুল ছুটি—"

"ছুটি! ছু—টি—" সকলেই চমকিয়া যেন কাঁদ-কাঁদ হইয়া পড়িল!

দরোয়ান একবার চোখ বুজিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া আদালতের হাকিমের মত কহিল, "কাহে না—আপলোক সব লিখা-পড়া জানা আদমী!" বলিয়াই বাহিরের দিকে রাস্তা দেখাইয়া দিল।

যমদূতের নির্দ্দেশ! সকলেই এক-এক করিয়া টলিতে টলিতে বহির্গত হইয়া গেল।

সেই ছেলেটি বসিয়াছিল এক প্রান্তে, অবশেষে সে-ও যেমন বাহির হইবে, দরোয়ান তাহাকে সসম্ভ্রমে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "নেহি, নেহি—আপ, রহিয়ে।" বলিয়াই তাহাকে ভিতরে লইয়া গেল।

ভিতর-বাড়ীর মুখপাত—তাহার শ্রী কি অপূর্ব্ব! বাঁধানো প্রশস্ত অঙ্গন—অপর প্রান্তে ঠাকুর-দালান। অঙ্গনের কিনারায় চারি দিক ঘিরিয়া টব, টবে ফুলগাছ, গাছে ফুল—নানা রঙের, নানা জাতির। শ্রেণীবদ্ধ গাছ, উহারা আকারে এম্‌নিই যে, প্রথম হইতে সুরু হইয়া উভয় পার্শ্ব দিয়া একটির পর একটি অপেক্ষাকৃত বড় হইয়া হঠাৎ যেন একপুটে ওই ঠাকুর-দালানে গিয়া উঠিয়াছে, উঠিয়াই মাথা নোয়াইয়াছে—যেন একটি করিয়া নমস্কার!

এক পাশ দিয়া দ্বিতলে উঠিবার সিঁড়ি। দরোয়ান ছেলেটিকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া উপরে উঠিল। চিত্রিত রঙীন মর্ম্মর প্রস্তর, সেই প্রস্তরে বাঁধানো বারান্দা, তাহারই কোণে কোণে একটির পর একটি কক্ষ। এম্‌নিই কয়েকটি কক্ষ অতিক্রম করিয়া দরোয়ান একটি কক্ষের মুখে পড়িল, পড়িয়াই পর্দা সরাইয়া ছেলেটিকে ভিতরে পাঠাইয়া দিল।

সুসজ্জিত কক্ষ। ভিতরে ঢুকিয়াই ছেলেটির চোখে পড়িল একখানি টেবিল—সুচারু, সুদৃশ্য, সুবৃহৎ। তাহার এক দিকে স্তরে-স্তরে সাজানো বই—আইন-পুস্তক। অপর দিকে দোয়াত আর কলমদানি, মাঝখানে পুষ্পাধারে বৃহৎ এক পুষ্পস্তবক! উহারই সোজাসুজি বসিয়া ঢিলা জামা ও পায়জামা পরিয়া মিষ্টার বোস। বয়স—পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন।

মিষ্টার বোস,—তাঁহার দৃষ্টি একখানি সংবাদপত্রের উপর নিবদ্ধ ছিল। ছেলেটির পদশব্দে তিনি মুখ তুলিলেন, তুলিতেই তাঁর দৃষ্টি ছেলেটির মুখের উপর যেন বিঁধিয়া গেল, যেন এক দুর্লভ সংশয় তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। * * * ক্ষণকাল তেম্‌নিই একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া হাতে ভর দিয়া আর একটু মুখ বাড়াইয়া প্রশ্ন করিলেন, "নাম লিখ্‌তে পারনি—তুমি?"

ছেলেটি ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—হুঁ!

"তোমার নাম?"

"মলিন।"

[ক্রমশঃ।

শিল্পী—মুস্তাফা আজিজ

দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

২৭

মাঘের এই দিনগুলিতে ওয়াঙ এক-বারও ভাবতে সময় পায়নি মাঠের ফসল কেমন হয়েছে। বিবাহ উৎসব আর অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া নিয়ে এত ব্যস্ত ছিল সে।

এক দিন চীং তার কাছে এসে বলল—'হাসিকান্নার দিন ত শেষ হোল—এবার ক্ষেতের কথা শোন।'

'বল'—উত্তর দিল ওয়াঙ—'যে মারা গেল তাকে গোর দেবার জমি ছাড়া আর আমার অন্য জমি আছে কি নেই তা আমার একবারও মনে হয়নি।'

ওয়াঙ যখন এই ধরণের কথা বলে, চীং তখন তার প্রতি সমীহ করে কয়েক মিনিট চুপ করে থাকে। আস্তে আস্তে বললে সে—'ঈশ্বর না করুন, দেখে মনে হচ্চে এ-বছর এমন বান হ'বে যা' আর কখনো হয়নি। এখনও খরা আসেনি অথচ এর মধ্যেই জল ফুলে-ফেঁপে ক্ষেতে ঢুকে পড়েছে। অসময়েই ঘটেছে এ-সব।'

কিন্তু ওয়াঙ দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিল—'স্বর্গের ঐ বুড়োটার কাছ থেকে এ পর্য্যন্ত আমি কোন দিনই ভাল কিছু পেলাম না। পূজো দাও আর না দাও খারাপ করতে চিরদিনই সমান। চল ক্ষেতের অবস্থা দেখিগে।' এই বলে সে উঠে দাঁড়াল।

চীং অত্যন্ত নিরীহ আর ভয়কাতুরে। যতই খারাপ দিন আসুক না কেন, ওয়াঙের মত ভগবানের বিরুদ্ধে নালিশ করার সাহস নেই তার। সে শুধু বলে—'সবই তাঁর ইচ্ছা'। বন্যা আর খরাকে সে সমান সহিষ্ণুতার সঙ্গেই গ্রহণ করে। কিন্তু ওয়াঙের সে ধাত নয়। সে মাঠে গেল—এ-ক্ষেত ও-ক্ষেত ঘুরে দেখল—চীংয়ের কথাই ঠিক। হোয়াং-পরিবারের কাছ থেকে কেনা জলার ধারের ভাল জমিগুলো তলা থেকে জল চুইয়ে ওঠায় ভিজে সপ্‌সপে আর কাদা-কাদা হয়ে উঠেছে। ভাল গমের চারাগুলো রোগা লিক্‌লিকে আর হলুদ বরণ হয়েছে।

জলাটাকে দেখতে হয়েছে ঠিক হ্রদের মত—খাল বিল নদীর আকার নিয়েছে। নদীর বুকে ঢেউ আর স্রোত জেগেছে—জেগেছে ছোট ছোট ঘূর্ণী আর কলকলানি। চিরকেলে বোকা যারা তারাও দেখে বলতে পারে যে, গ্রীষ্মের ধারা বর্ষণের আগেই যখন এই হাল তখন ভীষণ বন্যা হবে এবার—লোক-জন উপোস করে মরবে। ওয়াঙ ক্ষেতময় ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল—চীং নিঃশব্দে ছায়ার মত তার অনুসরণ করতে লাগল। তারা দু'জন মিলে ঠিক করলে কোন্ কোন্ জমিতে ধান রোয়া যাবে আর কোন্ কোন্ জমি অংকুর উদ্গত হবার আগেই জলের নীচে ডুবে যাবে। খালগুলো এর মধ্যেই কানায় কানায় ভরে যেতে দেখে ওয়াঙ শাপ-শাপান্ত করতে লাগল—'এবার স্বর্গের সেই বুড়োটার খুব মজা—নীচু হয়ে দেখবে লোক-জন জলে ডুবে গেছে—অনাহারে মরছে। পাজীদের ধরণই ঐ রকম।'

বেশ চড়া গলায় আর উষ্মার সঙ্গে ওয়াঙ বললে কথাগুলো। চীং ভয়ে কাঁপতে লাগলে। বললে—'তাহ'লেও তিনি আমাদের চেয়ে ঢের বড়। তাঁর সম্বন্ধে ও-রকম কথা আর বল না।'

কিন্তু ওয়াঙের এখন টাকা হয়েছে—তাই সে আর এ-সবের তোয়াক্কা করে না। তার ক্রোধেরও আর সীমা-পরিসীমা নেই। তার ক্ষেতের ফসল ভাসিয়ে জল ফুলে উঠেছে দেখে বিড়-বিড় করতে করতে সে ঘরমুখো হোল।

ওয়াঙ যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা অনুমান করেছিল ঘটলও তাই। উত্তরের নদী বাঁধ ভেঙে ফেলল। প্রথমে সব চেয়ে দূরের বাঁধটা ভাঙল। লোক-জনেরা এখানে-ওখানে ছুটোছুটি করে চাঁদা তুলতে লাগল বাঁধ সারাবার জন্য। প্রত্যেক লোকই দিল সাধ্যমত। নদীকে তার এলাকার গণ্ডীতে বন্দী করে রাখা সবারই স্বার্থ। সংগৃহীত অর্থ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে জমা রাখা হোল। লোকটি এ এলাকায় নতুন। তার অবস্থা ছিল গরীব—এত আগে অত টাকা একসঙ্গে দেখেনি কখনো। পিতার আনুকূল্যে সদ্য চাকুরীতে উন্নতি করেছেন। তার পিতা নিজের যা-কিছু পুঁজিপাটা ছিল আর ধার করে যা পেয়েছেন সব ঢেলেছেন পুত্রের উন্নতির জন্যে—যাতে এর থেকে পরে পরিবারের কিছু [illegible] হয়। আবার [illegible] বাঁধ ভাঙল দেখে লোকেরা হায় হায় করতে করতে ছুটল ম্যাজিষ্ট্রেটের [illegible]কারণ, প্রতিশ্রুতি মত তিনি কাজ করেননি। বাঁধ সারান হয়নি। তিনি পালিয়ে গা-ঢাকা দিলেন। শোনা গল, সে টাকা দিয়ে নিজের বাড়ী কিনেছেন তিনি. এমন কি তিন হাজার রুপো পর্যন্ত খরচ করে ফেলেছেন। লোক-জনরা হৈ-হৈ করে তার বাড়ী চড়াও হয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ল—দাবী জানাতে লাগল তার মাথার জন্য। লোকটি যখন দেখলে নির্ঘাত প্রাণে মারা যাবে, তখন বাড়ী ছেড়ে দৌড় দিল—জলে ঝাঁপিয়ে আত্মঘাতী হোল। তখন লোক-জন শান্ত হোল।

কিন্তু রুপো সব খরচ হয়ে গেছে। আরো একটা বাঁধ ভাঙল,—আরো একটা। যতটুকু এলাকার ক্ষুধা ছিল তা পেয়ে তবে শান্ত হোল নদী। তার পর চারি ধারের দেয়াল ক্রমশ: ধ্বসে গেল—সারা দেশে কোথায় যে বাঁধ ছিল আর তার নিশানা রইল না। সাগরের মত ফুলে-ফেঁপে তেড়ে আসতে লাগল নদী ক্ষেত-খামারের উপর দিয়ে। গম আর ধানের অংকুর নীচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একটার পর একটা গ্রাম দ্বীপে পরিণত হোতে লাগল। গাঁয়ের মানুষ উৎকণ্ঠিত চোখে লক্ষ্য করতে লাগল জলের স্ফীতি। যখন বাড়ীর ফটকের দু'ফুটের মধ্যে বানের জল এল তখন তারা টেবিল চৌকি বেঁধে ফেলল। দরজাগুলো খুলে তার উপর রাখল মাচানের জন্য। তার পর বিছানা-পত্তর জামা-কাপড় জড় করে ছোটদের আর মেয়েদের তুলে দিল সেই মাচানের উপর। মাটির ঘরের ভিতরে জল ঢুকে দেয়াল ধ্বসিয়ে দিল—ঝপ করে সব জলে পড়ে গেল যেন কিছুই ছিল না সেখানে কোন দিন। তার পর পৃথিবীর জল যখন আকাশের জলকে টানতে লাগল তখন এমন বৃষ্টি শুরু হোল যেন সারা পৃথিবীতেই বান ডেকেছে। দিনের পর দিন বৃষ্টির আর বিরাম নেই।

নিজের বাড়ীর সদর ফটকের কাছে বসে ওয়াঙ চেয়ে দেখে জলের স্ফীতি অগ্রগতির দিকে—যে জল তার পাহাড়ে উঁচু টিলার উপর তৈরী বাড়ী থেকে আজো অনেক দূরে। জল তার জমিকে ঢেকে ফেলেছে। ওয়াঙের ভয় হয় হয়ত প্রিয় মানুষটার কবরের জমিটুকুও জল গ্রাস করে বসবে। কিন্তু তা হোল না শুধু জলের উচ্ছল ঢেউ এসে সেগুলির উপর ক্ষুধিত হানা দিতে লাগল।

সে বছর কোন ফসলই হোল না। দেশের সর্বত্র উপোসী মানুষ ভাগ্যের ধিক্কার দিতে লাগল। অনেকে দক্ষিণদেশে চলে গেল। অনেকে নিজেদের ইতিকর্তব্য-ভ্রষ্ট হয়ে গাঁয়ের ডাকাত দলে ভিড়ে পড়ল। সহরবাসীদের বাড়ী চড়াও হবার চেষ্টা হোল—যার ফলে সহরের বাসিন্দারা পশ্চিমের ছোট জেল-ফটক বাদে নগর-প্রাচীরের অন্য সব গেট বন্ধ করে দিল। কিন্তু এক সময় বাপ বৌ আর ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওয়াঙ যেমন কাজ আর ভিক্ষার খোঁজে দক্ষিণ দেশে গিয়েছিল তেমন মানুষ আর ডাকাত দলে যোগ দেওয়া মানুষ ছাড়াও আর যে সব বৃদ্ধ অথর্ব আর নিরীহের দল গাঁয়ে পড়ে রইল—যাদের ঘরে চীংয়ের মত ছেলে নেই, তারা পড়ে পড়ে শুকোতে লাগল। উঁচু জমির ঘাস-পাতা চিবিয়ে খেতে খেতে অনেকে মাঠে জলে মরতে সুরু করলে।

এমন দুর্ভিক্ষ ওয়াঙ আর কখনো দেখেনি। শীতের গম বুনবার সময় এল, কিন্তু জল সরবার লক্ষণ দেখা গেল না দেখে ওয়াঙ বুঝল যে, আগামী বছরের ফসলের আশাও নষ্ট হোল। নিজের সংসারের দিকে নজর দিলে ওয়াঙ—সংসারের খরচের দিকে। এই দুদিনে[illegible] কোকিলা সহর থেকে মাংস কিনে আনছে এই কারণে ওয়াঙ তার সঙ্গে ঝগড়া বাধাল। বন্যার জল স্থিতু হয়ে থাকাতে এক দিকে এই চিন্তায় খুশী হোল ওয়াঙ যে নৌকা না দিলে কোকিলা আর বাজারে যেতে পারবে না। নৌকা সম্বন্ধে কোকিলার শাণিত জিহ্বা গ্রাহ্য করল না ওয়াঙ—শুধু নৌকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে সে উপদেশ দিত নিঃশব্দ চীংকে।

শীতের পর নিজের হুকুম ছাড়া কোন জিনিষ আর বেচা-কেনা করতে দিত না ওয়াঙ। যা-কিছু সঞ্চয় সব কুশলী হাতে নিজে তদারক করত। প্রতিদিন ছেলের বৌয়ের হাতে সে সংসারের নিত্য-প্রয়োজনীয় যোগিয়ে দিত আর মজুরদের খাবার দিত চীংয়ের হাতে। তবু বেকার মজুরদের আহার যোগাতে তার বুক কর কর করে উঠত। তার পর যখন শীতে জল জমে গল, ওয়াঙ মজুরদের বললে, দক্ষিণ দেশে গিয়ে কাজের চেষ্টা করতে অর্থাৎ ভিক্ষা করতে। বসন্ত এলে অবশ্য তারা ফিরতে পারবে। শুধু কমলনীকে সে চিনি আর তেল যুগিয়ে গেল। সে ত অপ্রাচুর্যে অভ্যস্ত নয়। নব বৎসরের দিনেও নিজের পুকুরের মাছ আর খামারের শুয়োর মেরে ওয়াঙ উৎসব যাপন করলে।

ওয়াঙ নিজেকে যত গরীব দেখাতে চায় তত গরীব সে ত নয়। যে ঘরে তার ছেলে বৌকে নিয়ে ঘুমায় সে ঘরের দেয়ালে রুপো লুকানো আছে। তারা অবশ্য জানে না সে কথা। তার বাড়ীর নিকটতম পুকুরের তলায় এক কলসী ভর্তি রুপো, এমন কি কিছু সোনাও পোঁতা আছে। বাঁশ-ঝাড়ের নীচেও আছে কিছু। আগের বছরের ফসল এখনও ঘরেতে মজুত—একটি দানাও সে বাজারে বিক্রী করেনি। তার বাড়ীতে অনশনের কোন আশঙ্কা নেই।

কিন্তু তার চারি ধারে লোকেরা অনশনে রয়েছে। ওয়াঙের মনে পড়ে গেল সেই বিরাট বাড়ীর দ্বারে বুভুক্ষিত নর-নারীর কাতর-ক্রন্দন। এও জানে সে যে অনেকে ঘৃণা করে তাকে, কারণ তার ঘরে খাবার আছে—তার ছেলেমেয়েরা পেট পূরে খেতে পাচ্ছে। কাজেই সে বাড়ীর ফটক বন্ধ করে রেখে দিল—অপরিচিত কোন লোককেও অন্দরে ঢোকা বন্ধ করে দিল। কিন্তু তবুও এই অরাজকতা আর চুরি-ডাকাতির দিনে এতেও সে বাঁচতে পারত না যদি না খুড়ো তার বাড়ীতে থাকতেন। ওয়াঙ ভাল করেই জানে, খুড়ো না থাকলে সোনা-দানা, খাবার আর মেয়ের জন্য তার বাড়ীতেও ডাকাত পড়ত।

সে তাই খুড়ো, খুড়োর বৌ আর ছেলের প্রতি খুব সুজনতা দেখাতে লাগল। তারা যেন এ বাড়ীতে অতিথি—সবার আগে চা পান করে তারা, খাবার সময় তারা সবার আগে প্রথম কাঠি ডোবায় ভাতের বাটিতে।

এরা তিন জন যখন দেখল, ওয়াঙ তাদের ভয় করে চলে অমনি তাদেরও মেজাজ গেল চড়ে। এটা-সেটা দাবী করতে লাগল। যা খায়-দায় তা নিয়ে রাত-দিন অনুযোগ সুরু হোল—বিশেষত খুড়ীমা'র। অন্দর-মহলের সুস্বাদু খাবার আর পেটে যায় না তার। এ নিয়ে স্বামীর কাছে খুড়ী অনুযোগ তুললেন। এরা তিনটি মানুষ ওয়াঙের কাছে অভিযোগ করল।

খুড়ো বুড়ো হয়ে পড়েছেন—আগের চেয়ে হয়েছেন আরো বেশী অলস আর অন্যমনস্ক। একাকী থাকলে হয়ত তিনি এ সব নিয়ে একটুও মাথা ঘামাতেন না কিন্তু ছেলে, বৌ রাত-দিন ত্যক্ত করতে লাগল তাকে। এক দিন ওয়াঙ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শুনতে পেল খুড়োর ছেলেটি বাপকে বলছে—'ওর ত ধান, রূপো, সবই রয়েছে আমরা কিছু রূপো দাবী করি না কেন।' খুড়ো বলছেন—'ওকে এমন বাগে আর কখনও পাওয়া যাবে না। ও ভাল করেই জানে তুমি যদি ওর খুড়ো আর ওর বাপের ভাই না হতে তবে কবে ওর বাড়ীতে ডাকাত পড়ত—সব কেড়ে-কুড়ে নিয়ে বাড়ী লণ্ডভণ্ড করে দিত। লাল-দাড়ির দলের দলপতির ঠিক পরে তোমার মান বলেই ত।'

আড়ালে দাঁড়িয়ে এ-সব কথা শুনতে শুনতে রাগে ওয়াঙের গায়ের চামড়া ফেটে পড়বে বলে মনে হ'তে লাগল। কিন্তু ওয়াঙ অনেক কষ্টে দমন করল নিজেকে। মনে মনে ফন্দী আঁটতে লাগল কি করা যায় এদের তিন জনকে নিয়ে, কিন্তু ভেবে সে কূল-কিনারা পেল না। কাজেই পরের দিন খুড়ো এসে যখন বললেন—'আমার একটা পাইপ আর তামাক কিনবার জন্ত কিছু রূপোর দরকার আর তোমার খুড়ীরও পরনের কাপড় ছিঁড়ে গেছে—নতুন কাপড় চাই'—তখন প্রতিবাদে ওয়াঙের মুখে কোন কথাই জোগাল না—গোপনে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে কোমরের বেল্ট থেকে পাঁচটা রূপো বের করে খুড়োর হাতে দিল সে। ওয়াঙের মনে হোল, আগেও যখন রূপো তার কাছে দুষ্প্রাপ্য ছিল তখনও এত অনিচ্ছাসত্ত্বে সে কখনো রূপো হাত-ছাড়া করেনি।

দু'দিন বাদে আবার খুড়ো এসে রূপো চাইলেন। এবার ওয়াঙ বললে—'আমাদের কি সব উপোস করতে বল?'

খুড়ো শুধু হেসে নিশ্চিন্তের মত বললেন—'তোমার এখন গ্রহ ভাল। এখানে তোমার চেয়ে টাকাওয়ালা লোক আর কে আছে?'

এ-কথা শুনে ওয়াঙের গায়ে ঠাণ্ডা ঘাম দেখা দিল। দ্বিরুক্তি না করে টাকা দিয়ে দিল সে। তারা নিজেরা মাংস না খেলেও এদের তিন জনকে মাংস খাওয়াতে হবেই। ওয়াঙ নিজে কদাচিৎ তামাক খায় কিন্তু খুড়ো অনবরত পাইপ টানতে লাগলেন।

ওয়াঙের বড় ছেলে এত দিন নিজের বিয়ে নিয়েই মশগুল ছিল। কি ঘটছে কদাচিৎ লক্ষ্য করত সে। বৌকে খুড়তোত ভাইয়ের কুদিত দৃষ্টির থেকে সর্বদা আড়াল করে রাখার চেষ্টাই তার। ওরা দু'জন আর আগের মত বন্ধু ত নয়—এখন তারা শত্রু। বিকেলে খুড়তোত ভাইটি বাপের সঙ্গে বাইরে গেলে তবে সে বৌকে ঘরের বার হতে দেয়। সারা দিন বৌকে ঘরে বন্দী করে রাখে। কিন্তু ছেলেটি যখন দেখলে তারা তিন জন তার বাপের সঙ্গে যা-খুশী ব্যবহার সুরু করেছে তখন সে রাগে আগুন হোল। একে এমনই সহজেই রেগে ওঠা তার স্বভাব। বাপকে বললে সে—'তুমি যখন তোমার ছেলে-বৌয়ের চেয়ে ঐ জন্তু তিনটের বেশী আদর করছ তখন আমাদের অন্যত্র ঘর খুঁজতে হবে।'—ওয়াঙ তখন ছেলেকে সব কথা খুলে বলল যা এর আগে আর কাউকে সে কথা কখনো বলেনি।

—'ঐ তিন মূর্ত্তিকে আমি মনে প্রাণে ঘৃণা করি। আমার খুড়ো এক জন ডাকাত-দলের সর্দ্দার। যদি তাকে খাওয়াই, আদর-আপ্যায়ন করি তবেই আমরা নিরাপদ। এদের প্রতি রাগ দেখা'ন চলবে না।'

এ-[illegible]শুনে ছেলে এমন [illegible] তাকাল বাপের দিকে যে, মনে হোল তার চোখ বুঝি ঠিকরে পড়বে মাথা থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা সম্বন্ধে কিছুক্ষণ ভাবার পর সে বললে—'এক কাজ [illegible]ন হয়? এক দিন রাত্রে তিন জনকে ঠেলে জলে ফেলে দি'। চীং মেয়েমানুষটাকে ঠেলে ফেলতে পারবে—ওটা যা মোটা আর অথর্ব্ব। ছেলেটাকে আমি মারব। ওটাকে আমি ভয়ংকর ঘৃণা করি সব সময়, ওটা আমার বৌয়ের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারে। খুড়োকে তুমিই জলে ফেলে দিতে পারবে।'

কিন্তু ওয়াঙ খুন করতে পারবে না। যদিও বজ্জাতটার চেয়ে খুড়োকে মারতে পারলেই বেশী খুশী হোত সে। ঘৃণা করলেও তবুও সে খুড়োকে মারতে পারবে না। ওয়াঙ বলল—'বাপের ভাইকে জলে ঠেলে ফেলে দিতে পারলেও সে কাজ আমি করব না। ডাকাত দল যখন এ খবর জানবে তখন কি হবে? খুড়ো বেঁচে থাকলেই আমরা নিরাপদ। খুড়ো গেলে যাদের কিছু আছে তাদের ভাগ্যেও যা ঘটবে আমাদের ভাগ্যেও তাই ঘটবে। এ সময় আমরা মহা বিপদের মধ্যে আছি।'

দু'জনেই চুপ করে গেল। কি করা কর্ত্তব্য সে সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তা করতে লাগল। ছেলে বুঝলে বাপই ঠিক—এ কাজে শুধু বিপদকেই ডেকে আনা হবে। অবশেষে ওয়াঙ আপশোষ করে বললে—'যদি এমন কোন উপায় থাকত যাতে ওরা এখানেই থাকত অথচ কোন ক্ষতি করতে পারত না! এ রকম যাদুমন্ত্র ত জানা নেই।'

ছেলে হাত ঘষতে ঘষতে বলল—'কি করতে হবে তুমি ত বলেছ। এদের আফিং কিনে দেওয়া যাক—অনেক আফিং! বড়লোকদের মত যত ইচ্ছে আফিং খেতে দাও এদের। ছেলেটার সঙ্গে আবার বন্ধুত্ব পাতাব, ভুলিয়ে-ভালিয়ে সহরের চায়ের দোকানে নিয়ে গিয়ে আফিং খাওয়াব। খুড়ো আর খুড়িমা'র জন্তেও কিনে আনব।'

কিন্তু ওয়াঙ নিজে এ কথাটা ভাবেনি বলে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল—'এতে অনেক খরচ পড়ে যাবে। আফিং প্রায় মণি-মুক্তোর মতই দামী।'

—'কিন্তু এই ভাবে আমাদের শোষণ করে গেলে মুক্তোর চেয়েও যে ঢের বেশী খরচ হবে।' ছেলেটি বাপকে বোঝাতে চেষ্টা করে—'তাছাড়া তাদের মেজাজও হজম করতে হবে। ছোকরাটা রাত-দিন আমার বৌয়ের দিকে উঁকি-ঝুঁকি মারে।'

কিন্তু ওয়াঙ তক্ষুণি রাজী হোল না। খুব সহজ ব্যাপার এ নয়। বেশ কিছু রূপো খরচের ব্যাপার। হয়ত শেষ অবধি এ পথ নেওয়া

হোত অথবা যত দিন ভাল না সরে তত দিন যেমন চলছে হয়ত তেমনই চলত, কিন্তু মাঝে একটা ঘটনা ঘটে গেল।

ওয়াঙের খুড়োর ছেলে এবার ওয়াঙের দ্বিতীয় মেয়ের উপর নজর দিল। সে তার খুড়তোত বোন, রক্তের সম্বন্ধ। ওয়াঙের এই মেয়েটি পরমা সুন্দরী। দ্বিতীয় ছেলে যেটি ব্যবসাদার অনেকটা তার মত দেখতে। তবে আরো ছোট আর লঘু। ভায়ের মত তার গায়ের বরণও হলুদ নয়। তার রং সুশ্রী—ডালিম ফুলের মত ফ্যাকাশে। ছোট নাক, পাতলা ঠোঁট, পা দু'টিও বেশ ছোট।

এক দিন রাত্রে রান্নাঘর থেকে উঠোন দিয়ে যাবার সময় ছেলেটা তাকে জড়িয়ে ধরল, [illegible] হাত দিল [illegible]। মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল। ওয়াঙ দৌড়ে বেরিয়ে এসে ছেলেটার মাথায় [illegible]রতে লাগল। চুরি করা মাংস মুখে কুকুরের মত সে কিছুতেই ছাড়বে না মেয়েটাকে। তাকে জোর করে ছিনিয়ে নিতে হোল ওয়াঙকে। ছেলেটি তখন টেনে টেনে হাসতে হাসতে বলল—'ঠাট্টা করছিলাম। ও ত আমার বোন হয়। কেউ কি বোনের সঙ্গে কুকাজ করতে পারে?' কিন্তু বলার সঙ্গে সঙ্গেই লালসার চোখ দু'টি তার চক্‌চক্‌ করতে লাগল। ওয়াঙ মেয়েটাকে টেনে নিয়ে তার ঘরে পাঠিয়ে দিল।

ওয়াঙ রাত্রে ছেলেকে খুলে বলল কি ঘটেছে। শুনে সে গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—'ওকে সহরে ওর ভাবী শ্বশুরের ওখানে পাঠিয়ে দাও। লিউ যদি বলে বিয়ের পক্ষে এটা দুর্বছর তাহলেও পাঠাতে হবে। না হলে এই ক্ষুধিত বাঘের সামনে ওকে আর কুমারী রাখা যাবে না।'

ওয়াঙও তাই করল পরের দিনই সহরে গিয়ে সে লিউকে বললে—'আমার মেয়ের বয়স এখন তের। আর শিশুটি নয় সে। বিয়ের বয়স হয়েছে তার।'

কিন্তু লিউ ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। বললেন—'বাড়ীতে নতুন সংসার পাতার মত যথেষ্ট লাভ হয়নি এবার।'

ওয়াঙের বলতে লজ্জা হোল—'বাড়ীতে খুড়োর ছেলে আছে—ক্ষুধিত সে।'

সে শুধু বলল—'মেয়ের দেখাশুনার ভার আর আমি নিজের উপর রাখব না। ওর মা মারা গেছে—দেখতে সুন্দরী—সন্তান হবার বয়স হয়েছে। আমার বড় বাড়ী—এ ও-তা' লোকে ভর্তি। সারাক্ষণ ওকে নজরে নজরে রাখা আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। সে যখন আপনারই পরিবারের হবে তার সব ভার আপনিই নিন। বিয়ে এখনই হোক বা পরেই হোক সে আপনার ইচ্ছা।'

লিউয়ের মন বড় কোমল। বললেন তিনি—'তাহলে বৌমা আসুক আমার বাড়ী। ছেলের মাকে বলব। এখানে তার শাশুড়ীর আশ্রয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে সে। ফসল ঘরে ওঠার পর বা ঐ রকম কোন সময়ে বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে।'

এই ভাবে নিষ্পত্তি হোল ব্যাপারটা। খুশী হয়ে ওয়াঙ চলে এল।

চীং যেখানে সহরের গেটের মুখে নৌকা নিয়ে অপেক্ষা করছিল সেখানে ফেরার পথে আফিং আর তামাকের দোকানের পাশ দিয়ে যাবার সময় বিকেলে নিজের হুকোয় খাবার জন্য তামাক কেনার ইচ্ছা হোল ওয়াঙের। দোকানী যখন তামাক ওজন করছিল সে অর্ধ অনিচ্ছার সঙ্গে জিজ্ঞেসা করল তাকে—আচ্ছা, আফিংয়ের দাম কত?'

—'আজ-কাল এ ভাবে আফিং বিক্রী করা বে আইনী। আমরা ও-ভাবে বেচি না। তবে যদি রূপো থাকে আর কিনতে চাও, ঘরের ভিতরে ওজন করে এনে দিতে পারি। প্রতি আউন্স এক রূপো।'

কি করবে এ নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে ওয়াঙ তাড়াতাড়ি বলল—'ছ' আউন্স নেব আমি।'

[ক্রমশঃ

বন্দিনী

অরুণকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

হে রাজকন্যা অবলুণ্ঠিতা কুমারী
রক্ষপুরীর বন্দিনী অপমানিতা,
অবসাদ-ঘন-তন্দ্রা-মথিত মায়াতে
কেন পড়ে আছ মূর্চ্ছা কি না জানি তা।

জেগে ওঠো বৃথা রাত্রি পোহাতে দিও না,
থর নিশীথিনী হোয়ে এলো ঘোর গভীরা,
অসাড় ঘুমেতে হক চেতনায় আহত,
ভয়াবহ পুরী জেগে ওঠে প্রেত-ছবিরা।

রক্ষকুলের নীল জীবনের মায়া ধার
বলো মোরে কোন্ নিতল দীঘির তলাতে।
সংশয় যবে সমাধিতে হবে অবসান
বন্ধুর পথ সহজ হবে যে চলাতে।

নীরব অধরে অপরিতৃপ্ত পিপাসা,
স্পন্দহীন আশ্লেষ আহত ভাঙা বুক,
পুনরুদ্ধারে সমাগত আজ সারথি
জাগো লাঞ্ছিতা অভিমানী তুমি তোলো মুখ।

আসুক প্লাবন তোমাকে যে হবে বাঁচাতে,
মরমী পৃথিবী আবেগে তোমাকে ডেকেছে,
ধ্রুবতারা মোর নিত্য জাগর আকাশে,
ঝড়ো সমুদ্রে অভয়ের বাণী লেখেছে।

ও কি পোড়ে আছে অতি উজ্জ্বল শিয়রে,
সোনার কাঠি যে ভুল হোলো বুঝি ছোঁয়াতে
রক্ষরাজের ঘৃণ্য কপট ষড়যন্ত্রজাল,
তীক্ষ্ণ শপথ অস্ত্রেই হবে খোয়াতে।

ক্ষিতীশ রায়

ছোট্ট মেণ্ডা শহরের দুর্গবাড়ী থেকে রাত দুপুরের ঘণ্টা বাজল। দুর্গোদ্যানের দূর প্রান্তে লম্বা ছাদ-ঘেরা নীচু দেয়াল; সেই দেয়ালের ওপর ঝুঁকে আছে একটি তরুণ ফরাসী অফিসার। দেখে মনে হয়, গভীর চিন্তায় মগ্ন সে। ভাবনা[illegible] বেপরোয়া সামরিক জীবনে এমন ঘটনা বিরল। কিন্তু [illegible]কথা অস্বীকার করবার জো নেই যে, গভীর চিন্তার পক্ষে [illegible]র চেয়ে অনুকূল স্থান, রাত এবং সময় পাওয়া যায় না কখনো।

অফিসারের মাথার ওপরে স্পেনের নিমেঘ আকাশের স্বচ্ছনীল চাঁদোয়া। আর তার পায়ে ছড়ানো তারার ক্ষীণ আলোয় এবং মৃদু জ্যোৎস্নায় আলোকিত উপত্যকার অপূর্ব সৌন্দর্য-সম্ভার। সে চেয়ে আছে সেই শান্ত নিভৃত উপত্যকার দিকে। পুষ্পিত কমলা-লেবুর গাছে ঠেস দিয়ে একশো ফুট নীচে চাইলে চোখে পড়ে মেণ্ডা শহর—উত্তুরে হাওয়ার ভয়ে পাহাড়ের পায়ে আশ্রয় নিয়েছে যেন—সেই পাহাড়ের উপরেই দুর্গবাড়ীটি। সেদিক থেকে ঘাড় ফেরালে চোখে পড়বে তার সমুদ্র—দূর দৃশ্যচিত্র ঘিরে জ্যোৎস্না শুভ্র জলের চওড়া রুপালি ফ্রেমের মতো।

জানালায় জানালায় দীপ; দুর্গবাড়ীটি আলোক-মণ্ডিত। দূরাগত কল্লোল ধ্বনির সঙ্গে মিশে অফিসারের কানে আসছিল—'বল'-নাচের আনন্দ-কোলাহল, বেহালার সুর আর নৃত্যসঙ্গী সহ অফিসারদের কলহাসি। দিনের তাপে অবসন্ন দেহ তার; তাতে একটু সজীবতা সঞ্চার করেছে সেই রাত্রির মধুর স্নিগ্ধতা। আর, ডুবে আছে সে বাগানের ফুল আর সুগন্ধি গাছের সৌরভে সুরভিত হাওয়ায়।

মেণ্ডার দুর্গবাড়ীটি স্পেনের এক জন সম্ভ্রান্ত জমিদারের; তিনি এখন সপরিবারে সেখানে বাস করছেন। সমস্ত সন্ধ্যা ভরে বাড়ীর বড়ো মেয়েটি সেই অফিসারের দিকে এমন করুণ আগ্রহে তাকাচ্ছিল যে, স্পেনের সেই তরুণীর করুণা-বিহ্বল দৃষ্টিতে ফরাসী যুবকের মন স্বপ্নোদ্বেল হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়।

ক্ল্যারা সুন্দরী। আর, যদিও তার তিনটি ভাই এবং একটি বোন আছে, তবু মার্ক্যুইস দ্য লীগানিস-এর বিরাট ভূসম্পত্তি দেখে ভিক্তর-এর ধারণা হয়েছিল যে, এই তরুণী বিয়েতে প্রচুর যৌতুক পাবে। কিন্তু সমগ্র স্পেনের উগ্রতম আভিজাত্য-গর্বী জমিদার যে প্যারিসের একটি মুদীর ছেলের সংগে তাঁর মেয়ের বিয়ে দেবেন—এ কথা সে ভাবে কোন্ সাহসে? তা ছাড়া, ফরাসীদের সবাই ঘৃণা করে। প্রদেশের বর্তমান শাসনকর্তা জেনেরাল গোতিয়ের সন্দেহ করেন যে, মার্ক্যুইস সপ্তম ফার্ডিনাণ্ড-এর পক্ষ হয়ে সারা দেশে বিদ্রোহ সঞ্চারের চেষ্টা করছেন: আর, সেই জন্যই ভিক্টর-এর নায়কত্বে একটি সেনাদল মেণ্ডা শহরে বসানো হয়েছে—যেন মার্ক্যুইস-এর বশবর্তী আশে-পাশের অঞ্চলগুলিকে সংযত রাখা যায়। মার্শাল 'নে'-র কাছ থেকে সম্প্রতি যে জরুরি খবর এসেছে তাতে আশংকা হয়, ইংরাজরা শীঘ্রই স্পেনের কূলে অবতরণ করবে। তাতে এ ইংগিতও আছে যে, মার্ক্যুইস লণ্ডনের মন্ত্রিসভার সঙ্গে এ বিষয়ে পত্রযোগ রাখেন।

কাজেই স্প্যানিয়ার্ডরা তরুণ ফরাসী অফিসার এবং তার সৈন্যদের সাদরে গ্রহণ করলেও সে সর্বদা সতর্ক রইল। তত্ত্বাবধানের ভাব পেয়ে শহর এবং তার আশে-পাশের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য যে-ছাদে সে এসেছে, সেই ছাদে যেতে যেতেই চিন্তা করছিল সে: তার প্রতি মার্ক্যুইস-এর এই স্বচ্ছন্দ বন্ধুতার কী ব্যাখ্যা হতে পারে; আর জেনেরালের অস্বস্তির সংগে দেশটার এই আপাত শান্ত ভা[illegible]? কিন্তু পর-মুহূর্তেই সহজ [illegible]বুদ্ধি এবং নিতান্ত কারণ-সংগত [illegible]ত্বের উদয় হয়ে তার মন থেকে ঐ সব ভাবনা দূর হয়ে গেল। হঠাৎ তার [illegible]ল হল, শহরে যেন অনেক আলো দেখা যাচ্ছে। আজ সেন্ট [illegible]-এর উৎসবের দিন; তবু আজ সকালেই সে হুকুম জারি করেছে যে, তার সামরিক আইন মান্য করে নির্দিষ্ট সময়ে সব আলো নিভিয়ে দিতে হবে; শুধু দুর্গবাড়ীটির বেলা এ হুকুম খাটবে না। নির্দিষ্ট

স্থানে মোতায়েন সৈনিকদের সঙীনের ঝিলিক এখানে-ওখানে পরিষ্কার দেখতে পেল সে। কিন্তু শহরের নীরবতাটা কেমন যেন গুরু-গম্ভীর; আর স্প্যানিয়ার্ডরা যে উৎসবে খুব মেতেছে তারও কোনো লক্ষণ নেই সেখানে। শহরবাসীদের এই আইন-ভঙ্গের কারণ আবিষ্কারের বৃথা চেষ্টা করে রহস্যটা তার কাছে আরো ঘোরালো হয়ে উঠল; কারণ, রাত্রে শহরে শান্তিরক্ষার আর টহল দেবার ব্যবস্থা সে আগেই করে রেখেছিল।

দুর্গবাড়ী থেকে নিকটতম নগর-দ্বারের পাশেই ছোট্ট একটি কাঁড়ি। সে মনে করল, প্রচলিত পথে না যেয়ে পাহাড় বেয়ে নেমে গেলে [illegible]-ঘরে পৌঁছতে [illegible] সময় লাগবে। আর অমনি যৌবনের অধৈর্যবশে দেয়ালের একটা ফাঁক [illegible] যেই সে নীচে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে, অমনি একটি ক্ষীণ শব্দে থেমে গেল সে। তার মনে হল, বাগানের নুড়ি-ছড়ানো পথের ওপর মৃদু পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কিন্তু ফিরে দেখল, কেউ নেই সেখানে; শুধু মুহূর্তের তরে সাগরের অপূর্ব ঔজ্জ্বল্যে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কিন্তু পরক্ষণেই এমন ভয়ানক দৃশ্য চোখে পড়ল তার যে, স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। তার মনে হল, ইন্দ্রিয়গুলি তাকে প্রতারণা করছে। দূর সমুদ্রে চন্দ্রালোকে শাদা শাদা পাল চক্-চক্ করছে—পরিষ্কার দেখতে পেল সে। সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল তার, মনকে সে বোঝাতে চাইল, ও-সব চোখের ধাঁধা—ঢেউয়ের ওপর চাঁদের আলো পড়ে ঐ রকম অদ্ভুত দেখাচ্ছে। এই বিভ্রান্ত অবস্থায় সে শুনতে পেল, কে যেন ভাঙা-গলায় নাম ধরে তাকে ডাকছে। দেয়ালের সেই ফাঁকটার দিকে তাকাল সে; দেখল, একটি সৈনিকের মাথা বেরিয়ে আসছে সেই ফাঁক দিয়ে। এই সৈনিককেই সে তার সাথে সাথে দুর্গবাড়ীতে আসতে বলেছিল।

"কে আপনি? কম্যাণ্ডাণ্ট?"

"হাঁ, কি চাই তোমার?" তরুণ ফরাসী অফিসারটি চাপা গলায় জবাব দিল। একটা ভবিষ্যৎ বিপদের আশঙ্কা যেন সতর্ক করে দিচ্ছিল তাকে।

"ঐ যে নীচে বজ্জাতগুলো পোকার মতো পিল্-পিল্ করে নড়ছে; ছুটে এসেছি আমি; অনুমতি দেন তো বলি কী দেখেছি আমি।"

"বলে যাও," ভিক্টর উত্তর করলেন।

"লণ্ঠন হাতে করে একটি লোক দুর্গবাড়ী থেকে এদিকে এসেছে—আমি তারই অনুসরণ করছিলাম। এই গভীর রাতে আমার এই ক্যাথলিক বন্ধু যে উৎসবে মোমবাতি দিতে যাচ্ছেন তা তো মনে হয় না। আমার ধারণা, ওরা হাড়-মাসশুদ্ধ আমাদের আস্ত গিলে খাবে। তাই তার পিছু নিয়েছিলাম আমি। আর তাকেই দেখতে পেলাম, এখান থেকে মাত্র দু'-তিন কদম দূরে পাথরের পৈঠার ওপরে মস্ত এক গাদা জ্বালানি।"

শহরের বুক চিরে ভীষণ একটা চীৎকার উঠল; আর সংগে সংগে সৈন্যটির কথাও বন্ধ হয়ে গেল। এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ল কম্যাণ্ডাণ্ট-এর মুখের ওপর, আর মাথায় গুলী খেয়ে হতভাগ্য গ্রীনাডিয়ারটি পড়ে গেল নীচে। মাত্র দশ কদম দূরে ঘাস আর শুকনো কাঠে দাউ-দাউ করে আগুন জ্বলে উঠল—দাবদাহের মতো। অমনি গান-বাজনা আর হাসির গররা থেমে গেল 'বল'-নাচের ঘরে। ভোজোৎসবের উল্লাস-কোলাহলের ওপর নেমে এল আর্তনাদ-বিদ্ধ মৃত্যুর নীরবতা। শুভ্র সাগরের বুকে গর্জে উঠল কামান। তরুণ অফিসারের কপাল থেকে ঝরে পড়ল ঠাণ্ডা ঘাম, সে তার তলোয়ার ফেলে এসেছে। সে বুঝতে পেরেছিল যে, তার সৈন্যদের হত্যা করা হয়েছে, আর ইংরাজরাও পারে নামবার উপক্রম করছে। বেঁচে থাকলে তার অবমাননা নিশ্চিত: সামরিক বিচার-সভায় হাজির হবার পরোয়ানা বেরিয়েছে তার নামে—সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। চোখের আন্দাজে মুহূর্তে সে হিসাব করে নিল উপত্যকাটি কত নীচে; তার পর যেই সামনে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে সেই ক্ল্যারা এসে তার হাতখানা ধরে ফেলল।

"পালান আপনি।" বলল সে। "আমার ভাইরা ছুটে আসছে, মেরে ফেলবে আপনাকে। ঐ যে পাহাড়ের তলায় জুয়ানিটোর ঘোড়া রয়েছে। যান জলদি।"

যুবকটি হতবুদ্ধি হয়ে মুহূর্তকাল চেয়ে রইল তার দিকে। ক্ল্যারা ঠেলে দিল তাকে। তখন আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তিবশে পার্ক পার হয়ে ছুটে গেল সে—যেদিকে ক্ল্যারা দেখিয়েছিল সেই দিকে।

আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি অতি সাহসী লোককেও ছাড়ে না কোনো দিন। পাহাড় থেকে পাহাড়ে লাফ দিয়ে যেতে লাগল সে শুনতে পেল ক্ল্যারা চীৎকার করে সৈন্যদের বলছে তার অনুসরণ করতে। শুনতে পেল, আততায়ীদের পদশব্দ। বার বার তার কানের পাশ দিয়ে হুস্-হুস্ করে ছুটে গেল তাদের বন্দুকের গুলী—তাও শুনতে পেল সে। ইতিমধ্যে সে উপত্যকায় পৌঁছে গেল, ঘোড়া পেল সেখানে। পিঠে চেপে বিদ্যুদ্‌বেগে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কয়েক ঘণ্টা পর সেই তরুণ অফিসার জেনেরালের কোয়াটার্স-এ উপস্থিত হল। কর্মচারীদের নিয়ে সবে ডিনার খেতে বসেছেন তিনি।

"শুধু নিজের প্রাণ নিয়ে আপনার কাছে ফিরে এসেছি," মেণ্ডা-ক্লান্ত অবসন্ন কম্যাণ্ডাণ্ট বলল। মুখখানা তার চুপসে গেছে।

একখানা আসনে বসে পড়ে সেই সাংঘাতিক বিনাশের কাহিনী বলে গেল সে। নীরব হয়ে সে খবর শুনল সকলে। অবশেষে সেই ভীষণ জেনেরাল বললেন: "আমার ধারণায়, তোমার দোষের চেয়ে তোমার দুর্ভাগ্যই বেশি। স্প্যানিয়ার্ডদের অপরাধের জন্য তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে না। মার্শাল বিরুদ্ধ রায় না দেন তো আমার বিচারে খালাস তুমি।"

এ কথায় হতভাগ্য অফিসারটি যথার্থ সান্ত্বনা পেল না।

"কিন্তু সম্রাট যখন এ কথা শুনতে পাবেন" বলে উঠল সে।

"তিনি চাইবেন, গুলী করা হোক্ তোমাকে; সে তখন দেখা যাবে। এখন প্রতিশোধের কথা ছাড়া আর কোনো কথাই এ সম্বন্ধে বলব না আমরা।" রূঢ় ভাবে বললেন জেনেরাল, "বর্বরের মতো লড়াই করে যে-দেশের লোক, সে-দেশের ওপর এমন প্রতিশোধ নিতে হবে যে তার ভয়েই তারা সংযত থাকে; তাতেই তাদের মংগল হবে।"

এক ঘণ্টা পর। একটি পুরো পল্টন, এক দল অশ্বারোহী সেনা, কামান গোলা আর গোলন্দাজ সঙ্গে নিয়ে মেণ্ডার পথ ধরল। জেনেরাল এবং ভিক্টর চললেন সেই সেনাদলের পুরোভাগে। সংগীদের হত্যার সংবাদ শুনে সৈন্যরা একেবারে ক্ষেপে ছিল। হেড্-কোয়াটার্স এবং মেণ্ডা শহরের মাঝের পথটা আশ্চর্য ক্ষিপ্রতায় পার হয়ে গেল তারা। জেনেরাল দেখতে পেলেন, পথের ধারে সমস্ত গ্রাম সশস্ত্র; প্রত্যেকটা গ্রাম ঘেরাও করে গ্রামবাসীদের কোতল করা হল।

দৈব দুর্জ্ঞেয়! ইংরাজের জাহাজগুলো পারের দিকে এগোল না, দূর সাগরে দাঁড়িয়ে রইল। কেন, তা বোঝা গেল না। পরে অবশ্য জানা গেল, দল ছাড়া হয়ে আগেই চলে এসেছে এগুলো, আর বয়ে এনেছে শুধু কামান, গোলা। মেণ্ডা শহর অবরুদ্ধ হল; না পেল প্রত্যাশিত ইংরাজের সাহায্য, না পেল রুখবার ও আঘাত হানবার সময়। আতংকে শহরের লোক স্বেচ্ছায় আত্ম-সমর্পণের প্রস্তাব করল। শুরু হল আত্মবলির পালা; এই উপদ্বীপের ইতিহাসে নতুন বা বিরল নয় এটা। ফরাসী সৈন্যের যথার্থ হত্যাকারীরা নিজেদের দোষ স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করতে রাজী হল—শহরটা যদি বা এতে রক্ষা পায়। কারণ, জেনেরালের নিষ্ঠুরতার যে-খ্যাতি আছে, তাতে তারা বুঝেছিল যে, সমস্ত মেণ্ডা শহরে আগুন ধরিয়ে দিয়ে লোকগুলোকে কুচি-কুচি করে কেটে ফেলবেন তিনি। জেনেরাল এই প্রস্তাবে রাজী হলেন—শুধু একটি সর্তে: চাকর থেকে মার্কুইস পর্যন্ত দুর্গবাড়ীর সব লোককে সঁপে দিতে হবে তাঁর হাতে। সর্ত গৃহীত হল; জেনেরাল প্রতিশ্রুতি দিলেন, শহরের বাকী লোকদের ক্ষমা করবেন, সৈন্যদের লুঠতরাজ এবং শহরে আগুন দেওয়া বারণ করবেন। প্রচুর টাকা দাবী করা হল শহর থেকে; চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সে টাকা দিতে হবে; তার জামিনস্বরূপ শহরের বড়ো বড়ো ধনীদের আটকে রাখা হল।

জেনেরাল নিজের পল্টনের নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় সতর্ক ব্যবস্থার অধিকৃত দেশরক্ষার্থ [illegible] করলেন। নাগরিকদের বাড়ীতে সৈন্যদের বাসস্থান নির্দেশ করতে রাজী হলেন না তিনি। বাইরে শিবির স্থাপন করে চললেন তিনি দুর্গবাড়ীর দিকে। প্রবেশ করলেন সেখানে বিজয়ী বীরের মতো। লেগানিস-পরিবার ও তাঁদের দাস-দাসীদের মুখ বেঁধে বড়ো হল-ঘরটায় বন্ধ করে কড়া পাহারা বসানো হ'ল সেখানে। এই ঘরের জানালা দিয়ে সেই লম্বা ছাদটা পরিষ্কার দেখা যায়। পাশের একটা গ্যালারীতে কর্মচারীদের স্থান দেওয়া হল। তার পর জেনেরাল সভা ডেকে বসলেন—ইংরাজের অবতরণ বন্ধ করবার উপায় নির্ধারণ করতে। এক জন এ্যাডি-কং-কে পাঠান হল মার্শাল 'নে'র কাছে সমুদ্রতীরে ব্যাটারী বসাবার হুকুম হল; তার পর কর্মচারীদের নিয়ে জেনেরাল মন দিলেন বন্দীদের বিষয়ে। যে দু'শো স্প্যানিয়ার্ডকে নগরবাসীরা তাঁর হাতে সমর্পণ করেছিল, তাদের তখনই সেই ছাদের ওপর গুলী করা হল। এই সামরিক প্রাণদণ্ড বিধানের পর জেনেরাল হুকুম করলেন: হলঘরে যত জন বন্দী আছে ঐ ছাদেই ততটি ফাঁসির মঞ্চ খাড়া করতে আর শহরের জল্লাদকে ডেকে আনতে। ডিনারের আগে যে সময়টুকু রইল সেই অবসরে ভিক্টর গেল বন্দীদের সঙ্গে দেখা করতে। চট করে ফিরে এল সে জেনেরালের কাছে।

"ছুটে এসেছি আপনার কাছে—একটি ভিক্ষা চাইতে," আবেগ-কম্পিত স্বরে বলল সে।

"তুমি?" তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে বললেন জেনেরাল।

"বড়ো দুঃখের কাজ আমার! মার্কুইস দেখতে পেয়েছেন ছাদে ফাঁসি-কাঠ খাড়া হচ্ছে। তাঁর ইচ্ছা, তাঁর পরিবারের প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থাটা বদলানো হয়। তাদের শিরশ্ছেদের আদেশ হোক, এই তাঁর অনুরোধ।"

"মঞ্জুর।"

"তাঁদের আরেকটা অনুরোধ আছে: মরবার সময় ধর্মের শেষ সান্ত্বনা বাণী যেন তাঁদের শোনানো হয়, আর তাঁদের বাঁধন খুলে দেওয়া হোক্। পালাবেন না—কথা দিচ্ছেন তাঁরা।"

"তাই হবে। কিন্তু তুমি দায়ী থাকবে তাদের জন্য," জেনেরাল জবাব দিলেন।

"বুড়ো মার্কুইস-এর ছোটো ছেলেটিকে যদি ক্ষমা করেন তবে তাঁর যথাসর্বস্ব আপনাকে দেবেন তিনি।"

"বটে?" জেনেরাল চেঁচিয়ে উঠলেন। "তাঁর সব-কিছুই এখন রাজা জোসেফ-এর, তিনি তো বন্দী।" অবজ্ঞায় ভ্রূ কুঞ্চিত হল তাঁর, একটু থেমে আবার তিনি বললেন:

"যা তিনি চান তার চেয়ে বেশিই আমি দেব। তাঁর শেষ

অনুরোধের তাৎপর্যটা ধরতে পেরেছি আমি। বেশ, বেঁচে থাক তাঁর নাম তাঁর বংশ; কিন্তু তাঁর নামোচ্চারণের সংগে সংগে সমস্ত স্পেন-বাসীর মনে পড়তে হবে তাঁর কৃতঘ্নতা আর তার শাস্তির কথা। যে-ছেলে তাঁর জল্লাদের কাজ করবে, তাকে ফিরিয়ে দেব তার পিতৃবিত্ত, ফিরিয়ে দেব তার প্রাণ। যাও, এদের কথা নিয়ে আর এসো না আমার কাছে।"

ডিনার তৈরী ছিল; টেবিলে বসে পড়ল অফিসাররা: দিনের হম্মরানিতে পেটে আগুন জ্বলছিল, তাদের খাবার-টেবিলে অনুপস্থিত মাত্র এক জন—সে ভিক্টর। কিছুক্ষণ দ্বিধায় কাটিয়ে অবশেষে হল ঘরে প্রবেশ করল সে। গর্বিত লীগ্যানিস-পরিবার মৃত্যুর অপেক্ষা করছে সেখানে: বিষণ্ণ নয়নে সে [illegible] সে। গত রাত্রে এই [illegible] তার চোখে আবর্তিত [illegible] নৃত্যপর দু'টি সুন্দরী তরুণী আর তিনটি যু[illegible] আজ একটু বাদে তাদেরই সুন্দর মুখ, সুগঠিত মাথা লুটিয়ে পড়বে ঘাতকের খড়্গের ঘায়ে। ভাবতেই শিউরে উঠল সে। ঐ যে গিলটি করা চেয়ারে বাঁধা—বসে আছেন বাবা, মা তাঁদের তিন ছেলে আর দুই মেয়ে: স্থির, নিশ্চল। তাঁদের সামনে সোজা দাঁড়িয়ে তাঁদেরই আট জন পরিচারক—পিছমোড়া করে বাঁধা। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এই পনরটি বন্দীর দৃষ্টি-বিনিময় চলছে পরস্পরের সংগে: সেই গূঢ় দৃষ্টিতে চিত্তোত্থিত চিন্তার ক্ষীণতম আভাসটুকুও নেই। শুধু তাঁদের মুখচ্ছবিতে ফুটে উঠেছে ব্যর্থ প্রয়াসের দুঃখ আর চরম আত্মোৎসর্গের করুণ ভাব। প্রহরী সৈনিকরাও স্থির হয়ে চেয়ে আছে তাঁদের দিকে—নিষ্ঠুর শত্রুর দুঃসহ বেদনাকে তারাও যেন শ্রদ্ধা করছে। ভিক্টর দেখা দিতেই পরম কৌতূহলের ভাব ফুটে উঠল তাদের সবার মুখে। বন্দীদের বাঁধা খুলে দিতে হুকুম করল ভিক্টর; আর নিজে এগিয়ে গেল ক্লারাকে মুক্ত করতে। তরুণীর বাহুখানি একটু স্পর্শ করবার লোভ সংবরণ করতে পারল না সে; তার কালো চুল আর ক্ষীণ কটি দেখে মুগ্ধ তার মন। স্পেনের মেয়েই বটে; যেমন মিঠে গায়ের রং তেমনি নিবিড় কালো চোখ।

"সফল হল আপনার চেষ্টা?" করুণ হেসে বলল ক্লারা। সে-হাসিতে বালিকা বয়সের স্নিগ্ধ মাধুর্য এখনো যেন লেগে আছে।

অস্পষ্ট আর্তনাদে গুমরে উঠল ভিক্টর। একবার ক্লারা আবার তার তিনটি ভাইর দিকে পর পর চাইল সে। প্রথম, বড়ো ভাই, তার বয়স ত্রিশ বৎসর; বেঁটে খাটো চেহারা—তেমন সুগঠিতও নয়। উদ্ধত, গর্বিত দৃষ্টি তার। কিন্তু তার হাবভাবে অভিজ্ঞতার ছাপ সুস্পষ্ট। আর, যে সূক্ষ্ম রুচিবোধের জন্য স্পেনের অভিজাত-কুল সেকালে খ্যাতি লাভ করেছিল সেই মার্জিত রুচিতে বঞ্চিত নয় সে। তার নাম জুয়ানিটো। দ্বিতীয় ভাই, ফিলিপ; তার বয়স বিশ বছরের কাছাকাছি; দেখতে ক্লারার মতো। ছোটো ভাই আট বছরের বালক ম্যানুয়েলের চেহারায় চিত্রকরের চোখে পড়বে রোমানদের দৃঢ় সংকল্পের ভাব। পলিতকেশ বৃদ্ধ মার্কুইস যেন ম্যুরিলোর আঁকা কোন চিত্রের জীবন্ত প্রতিরূপ। হতাশায় মাথা নাড়ল ভিক্টর: এদের এক জনও কি জেনেরালের প্রস্তাবে স্বীকৃত হবে! তবু সাহস করে ক্লারার কাছে কথাটা প্রকাশ করল সে। স্পেনের মেয়ে হয়েও শিউরে উঠল ক্লারা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিজেকে সামলে নিয়ে বাবার কাছে জানু পেতে বসল।

"জুয়ানিটোর শপথ আদায় করুন, বাবা,—সে আপনার যে-কোনো হুকুম মান্য করবে; তবেই আমরা খুশী, আর কিছু চাই না," বলল ক্লারা। আশায় কেঁপে উঠলেন মার্কুইস-পত্নী। কিন্তু স্বামীর পাশে ঝুঁকে পড়ে তিনি যখন শুনলেন কী ভয়ানক কথা ক্লারা তার বাবার কানে কানে বলছে, তখন তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তিনি যে মা। জুয়ানিটো সবই বুঝল; খাঁচায় পোরা সিংহের মতো লাফিয়ে উঠল সে। মার্কুইস-এর থেকে পূর্ণ বশ্যতার আশ্বাস পেয়ে, ভিক্টর নিজের দায়িত্বে সৈন্যদের বিদায় করে দিল। পরিচারকদের বাইরে নিয়ে জল্লাদের হাতে দেওয়া হল; ফাঁসি হয়ে গেল তাদের। যখন একমাত্র ভিক্টর ছাড়া ঘরে আর কোনো প্রহরী রইল না তখন বুড়ো বাপ উঠে দাঁড়ালেন; ডাকলেন: "জুয়ানিটো"

জুয়ানিটো মুখে জবাব দিল না শুধু মাথা নাড়ল। তার মানে [illegible]সে রাজী নয়। চেয়ারে বসে পড়ে বাবা আর মার দিকে অশ্রুহীন স্থি[illegible]তে চেয়ে রইল সে; অসহ্য সে দৃষ্টি। ক্লারা উঠে গিয়ে তার হাঁ[illegible]র উপরে বসল, হাত দিয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল, আর চুম্বন এঁকে [illegible] তার চোখের পাতায়।

"ভাই জুয়ানিটো!" খুশীর ভাবে বলল সে, "যদি বুঝতে, তোমার হাতে মরতে কী ভালো লাগবে আমার। জল্লাদের ঐ জঘন্য আঙুলের অসহ্য স্পর্শ থেকে রক্ষা পাব আমি এই আসন্ন দুঃখের হাত থেকে বাঁচাও আমাকে···ভাই দাদা আমার, আমি যে পরের হাতে পড়েছি এ ভাবনাটাও তো তুমি সইতে পারনি কোনো দিন,—তবে?" স্নিগ্ধ চোখে অগ্নিময় কটাক্ষ হানল সে ভিক্টরের দিকে; জুয়ানিটোর অন্তরে ফরাসীদের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগিয়ে দিতে চায় যেন সে।

ভাই ফিলিপ বলল: "সাহস সঞ্চয় করো দাদা, নতুবা রাজবংশের সমান ঘর আমাদের লোপ পেয়ে যাবে যে!"

হঠাৎ ক্লারা উঠে পড়ল; জুয়ানিটোকে ঘিরে যারা জড় হয়েছিল সরে গেল তারা। এবার পিতাপুত্রে একেবারে মুখোমুখি; বৃদ্ধ পিতা আর কর্তব্যনিষ্ঠ অবাধ্য পুত্র।

"জুয়ানিটো, আমি আদেশ করছি," গম্ভীর স্বরে বললেন মার্কুইস।

তরুণ কাউন্ট সাড়া দিল না, স্থির হয়ে রইল। বাবা জানু পেতে বসলেন। ক্লারা, ম্যানুয়েল, ফিলিপ—সবাই তাঁর অনুসরণ করল; বংশের ভবিষ্যৎ যার হাতে তার দিকে প্রার্থনার ভংগীতে দু'টি হাত তুলে তারা যেন বাবার কথারই প্রতিধ্বনি করতে লাগল।

"পুত্র আমার, স্প্যানিয়ার্ড-এর দৃঢ়তা তার শৌর্য-বীর্য সবই কি তুমি হারিয়েছ? এ-ও কি হতে পারে? তুমি কি চাও, তোমার সামনে জানু পেতে আমি বসে থাকি? তোমার নিজের জীবন আর তার দুঃখের কথা ভাববার কী অধিকার তোমার আছে?—ম্যাডাম, এ কি আমার ছেলে?" স্ত্রীর দিকে ফিরে মার্কুইস বললেন।

"রাজী—কথা দিল সে" মার অন্তর মথিত করে এই জবাব বেরিয়ে এল। জুয়ানিটোর একটু ভ্রূ কুঞ্চন দেখেছিলেন তিনি; আর মা হয়ে তিনিই বুঝেছিলেন তার মানে।

দ্বিতীয় মেয়ে ম্যারিকটা ক্ষীণ বাহুলতায় মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে জানু পেতে বসল। তপ্ত অশ্রু ঝরতে লাগল তার দুই চোখে। সে কাঁদছে দেখে ছোটো ভাই ম্যানুয়েল তাকে ভর্ৎসনা করতে লাগল। এমন সময়ে বাড়ীর পুরুত এসে উপস্থিত হলেন সেখানে,

পরিবারের সবাই তাঁকে ঘিরে ধরে নিয়ে গেল জুয়ানিটোর কাছে। ভিক্টর এ দৃশ্য আর সহ্য করতে পারল না, ক্ল্যারাকে ইংগিত করে চলে গেল জেনেরালের কাছে—একবার শেষ চেষ্টা করবে সে। যেয়ে দেখতে পেল জেনেরাল ভোজের আনন্দ-কোলাহলে একেবারে মেতে গেছেন; অফিসাররা তখনো ডিনারে বসে মদ খাচ্ছে, নেশার ঝোঁকে মুখ খুলে গেছে তাদের।

এক ঘণ্টা বাদে জেনেরালের হুকুমে মেণ্ডার একশো গণ্যমান্য নাগরিক ছাদে এসে উপস্থিত হল—লীগ্যানিস-পরিবারের প্রাণদণ্ড দেখতে। মার্কুইস-এর পরিচারকরা তখনো যে ফাঁসকাঠ থেকে ঝুলছিল তারই তলায় সার বেঁধে দাঁড়াল তারা; ঐ সব শহীদের পা তাদের মাথায় ঠেকছে যেন। নাগরিকদের সামলাবার জন্য এক দল সেনাও সেখানে মোতায়েন করা হল। ত্রিশ কদম দূরে যূপকাষ্ঠ; তার পাশে চক্‌-চক্ করছিল একখানা খড়্‌গ। যদি শেষ পর্যন্ত জুয়ানিটো রাজী না হয়, তাই জল্লাদও উপস্থিত ছিল সেখানে।

গভীর নীরবতা বিরাজ করছে সেখানে। সেই নীরবতা ভেঙে গেল—এক দল আগন্তুকের পদশব্দে, সৈনিকদের বুটের খট্‌খট্, আর অস্ত্রের ঝনঝনায়। মৃত্যুর আয়োজনের সাক্ষী এই সব বিচিত্র শব্দ অফিসারদের ভোজোৎসবের হাসি-কোলাহলের সংগে মিশে তারই তলায় চাপা পড়ে গেল। গত-রাত্রের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সমস্ত আয়োজনকেও এমনি প্রচ্ছন্ন করে রেখেছিল আরেকটি উৎসবের নাচ-গান আর হাস্য-কলরব।

সকলেই চেয়ে আছে দুর্গবাড়ীর দিকে; দেখছে, সেই অভিজাত জমিদার-পরিবার মৃত্যুর প্রতি পরম ঔদাসীন্যে এগিয়ে আসছে। প্রত্যেকটি মুখে অবিচলিত প্রশান্তির ভাব। শুধু এক জনের মুখ শুষ্ক, বিবর্ণ; পুরুতের ডানায় ভর করে আসছে সে—যেন ভেঙে পড়ছে। বেঁচে থাকতে হবে তাকেই—এই দারুণ দণ্ডে দণ্ডিত সে; তাকেই ধর্মের সান্ত্বনা-বাণী শোনাচ্ছেন পুরুত। দেখে অন্য সবার সংগে জল্লাদও বুঝল, আজ এক দিনের জন্য জুয়ানিটোই জল্লাদের কাজের ভার নিয়েছে। বুড়ো মার্কুইস, তাঁর স্ত্রী, ক্ল্যারা, ম্যারিকিটা, আর তাদের দু'ভাই এসে সেই মৃত্যু-বেদীর কয়েক পা দূরে বসলেন। জুয়ানিটোকে সেখানে নিয়ে এলেন পুরুত। যূপকাষ্ঠের সামনে দাঁড়াতেই মূঢ় জল্লাদ তার জামার হাতা ধরে টেনে একধারে নিয়ে গেল—হয়তো কিছু উপদেশ দেবার জন্যই। পুরুত দণ্ডিতদের এমন ভাবে দাঁড় করালেন যে, তাঁরা কেউ জল্লাদের মুখ না দেখতে পান; কিন্তু খাঁটি স্প্যানিয়ার্ড-এর মতো নির্ভীক চিত্তে সোজা দাঁড়িয়ে রইলেন তাঁরা!

ক্ল্যারাই সবার আগে এগিয়ে গেল ভায়ের সামনে।

"দাদা আমি দুর্বল; দুর্বলের প্রতি একটু সদয় হও। আমাকে দিয়েই শুরু কর" বলল সে।

সংগে সংগে সবাই শুনতে পেল, কে এক জন ছুটে আসছে; ভিক্টর উপস্থিত হল সেই করুণ দৃশ্যের মাঝখানে। ক্ল্যারা ততক্ষণ যূপকাষ্ঠের সামনে জানু পেতে বসেছে, তার নমিত শুভ্র স্কন্ধ যেন আমন্ত্রণ করছে কৃপাণ-ফলককে। মৃত্যুপাণ্ডুর হয়ে গেছে অফিসারের মুখখানা; তবু ছুটে যেয়ে ক্ল্যারার পাশে দাঁড়াবার শক্তিটুকু এখনো অবশিষ্ট আছে হয়তো।

"জেনেরাল তোমার প্রাণভিক্ষা দেবেন—যদি আমাকে বিয়ে করতে রাজী হও তুমি,"—অতি মৃদু স্বরে বলল সে।

[illegible] কন্যা গর্বিত অবজ্ঞা[illegible] একবার চাইল সেই ফরাসী অফিসারের দিকে। তার পর গভীর অর্থপূর্ণ স্বরে জুয়ানিটোকে বলল, "দাদা এইবার।"

অমনি মাথাটা তার গড়িয়ে পড়ল ভিক্টর-এর পায়ের কাছে। শব্দ শুনে মার্কুইস-পত্নীর সর্বাঙ্গ আকুঞ্চিত হল শুধু একবার; যন্ত্রণার আর কোনো লক্ষণ প্রকাশ পেল না।

"দাদা, ঠিক বসেছি তো?" ছোটো ভাই ম্যানুয়েল জিজ্ঞাসা করল জুয়ানিটোকে।

"আঃ ম্যারিকিটা, কাঁদছ তুমি?" জুয়ানিটো তার বোনকে বলল।

"হাঁ, তোমার কথা মনে করেই কাঁদছি আমি। আমরা চলে গেলে কী যে দুঃখ পাবে তুমি!" জবাব দিল সে।

তার পর সামনে এগিয়ে এলেন বৃদ্ধ মার্কুইস। সন্তানদের রক্তে রঞ্জিত সেই যূপকাষ্ঠের দিকে একবার চাইলেন তিনি। তার পর ফিরে দাঁড়ালেন সেই স্থির মৌন দর্শকদের দিকে, আর জুয়ানিটোর দিকে দু'টি হাত বাড়িয়ে দিয়ে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন: "উপস্থিত স্পেনবাসি! বাপ ছেলেকে আশীর্বাদ করছে। মার্কুইস, এবার খড়্‌গ হানো; ভয় নেই তোমার, তুমি নিরপরাধ।"

কিন্তু পুরুতকে আশ্রয় করে মা আসছেন দেখে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল জুয়ানিটো: "ইনি যে স্তন দিয়ে আমাকে পালন করেছেন।"

সেই চীৎকারে জনতার মিলিত কণ্ঠ থেকে আতংকবিহ্বল আর্তধ্বনি বেরিয়ে এল। সেই ভীষণ শব্দে পানমত্ত অফিসারদের হৈ-হুল্লোড় সব তলিয়ে গেল। মার্কুইস বুঝতে পারলেন জুয়ানিটোর শক্তি সাহস নিঃশেষ হয়ে গেছে। এক লাফে দেয়ালে উঠে ঝাঁপিয়ে পড়লেন তিনি; তলায় পাহাড়ে লেগে মাথাটা তাঁর গুঁড়া হয়ে গেল। ধন্য ধন্য করে উঠল দর্শকদল। জুয়ানিটো মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ল!

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৫
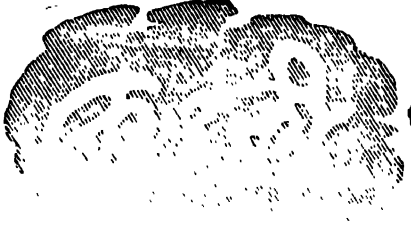
সেদিনের হাঙ্গামা[illegible] [illegible] রীতিমত শক্ত হয়েই ক[illegible] [illegible] করে দিয়েছিল—এর পর যেনো সারদাদের সঙ্গে কোনো রকম [illegible]ই আর না থাকে—দুধের দরুণ ওদের পাওনা টাকাটা হপ্তা খানেকের মধ্যেই সে চুকিয়ে দিয়ে আসবে। করুণাও স্বামীর কথায় সায় দিয়ে জানায়—আবার ওদের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখি! দুধের টাকাটা ফেলে যেদিন দেবো আমি গঙ্গাস্নান করে শুদ্ধ হয়ে আসবো। মা গো মা, কি ঘেন্নার কথা; মুখে এক কাজে আর; মেয়েমানুষের মন যে এমন নিচু হয় তা জানা ছিল না—একবারে তাজ্জব বানিয়ে দিলে!

কিন্তু পরদিন সকালেই কানাই দুধ আর এক ঠোঙ্গা খাবার নিয়ে উপস্থিত। খিড়কির পথ দিয়ে হন্-হন্ করে কানাইকে এ-বাড়ীতে আসতে দেখেই করুণা তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতরে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। মায়াও সেই সময় ঘাটের দিকে যাচ্ছিল, করুণা চাপা গলায় তাকে ডেকে সতর্ক করে দিল: ওদিকে এখন যাসনি মায়া, কানাই পোড়ারমুখো নির্লজ্জের মতন আবার আসছে—শীগ্গির ঘরে যা, ওর সামনে বের হ'সনি যেনো!

কথাটা শুনেই মায়া থমকে দাঁড়ালো ওষ্ঠটি দাঁতে চেপে, সঙ্গে সঙ্গেই শক্ত হয়ে নিজের ঘরের দিকে ছুটলো। পরক্ষণেই উঠানে কানাইয়ের আবির্ভাব এবং তার ক্ষুধিত দৃষ্টির সামনেই মায়ার ঘরের দরজাটি সশব্দে বন্ধ হয়ে গেলো। কানাইয়ের মনে হ'লো—দু'টি কপাটের মাঝে পড়ে তার দ্বিধাগ্রস্ত চিত্তটিও চেপ্টে গেছে! কিন্তু তাই ব'লে কানাই দমে যাবে কিংবা অভিমানে মুখ ফিরিয়ে বাড়ীর পথ ধরবে—সে পাত্রই সে নয়; বরং এ-সব ক্ষেত্রে তার উৎসাহ আরো উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। মায়ার ঘরটির পানে লুব্ধ দৃষ্টিতে মিনিট খানেক চেয়ে থেকেই সে করুণার ঘরের দিকে এগিয়ে গিয়ে ডাকলো: বৌদি, কোথায় গো—

করুণা তখন ঘরের কোণে আশ্রয় নিয়েছে। মায়ার মত ঘরের দরজাটি বন্ধ করে অসহযোগটা এমন খোলাখুলি ভাবে জানাতে তার বধূসুলভ কোমল রুচিতে বাধছিল; অথচ, বাড়ীতে অভ্যাগত এই অবাঞ্ছিত মানুষটির ডাক শুনে কি যে এখন করবে, সেই চিন্তাই তাকে বিব্রত করছিল। এক দিন যাকে আদর করে বসতে আসন পেতে দিয়েছে, আজ কোন্ মুখে তাকে বলবে—তুমি আর এ-বাড়ীতে এসো না কানাই?…করুণা ভেবেছিল, অন্ততঃ কিছু দিন কানাই আর এ-বাড়ীর দরজায় মাথা গলাবে না। কিন্তু অত বড় গুরুতর ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে পুনরায় এ ভাবে তার উপস্থিতি করুণাকেও স্তব্ধ করে দিয়েছে এবং এ ক্ষেত্রে কি করা কর্তব্য তা স্থির করতেও সে যেনো অসমর্থ হয়ে পড়েছে।

কোন সাড়া না পেয়ে কানাই নিজের মনেই একটু হাসলো, তার পর আস্তে আস্তে দাওয়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে রসিকতার সুরে বললো: বলি হ'ল কি—মায়া দেবী ত আমাকে দেখেই দমাস করে দরজা বন্ধ করে দিলে—বৌদিও কি তার দেখাদেখি আড়ি করলে না কি?

ভিতর থেকে করুণার সাড়া পাওয়া গেল না, কিন্তু বাইরের দিকের দরাজা থেকে তীক্ষ্ণ কণ্ঠের তিক্ত স্বরে কানাই চমকে উঠলো:—ওখানে?

মুখ ফিরিয়ে কানাই দেখল—দুই চোখ পাকিয়ে তার পানে চেয়ে এই প্রশ্ন করছে গোকুলদা নিজে। চকিতে মুখের ভাব পালটে একগাল হেসে কানাই বলে উঠল: এই যে গোকুলদা! বাড়ীতে এসেই ডাকাডাকি করছি কিন্তু কাউকে দেখতে পাচ্ছিনে—

মুখখানা শক্ত করে গোকুল জিজ্ঞাসা করলো: ডাকাডাকির কি দর[illegible] শুনি?

কা[illegible]ই উত্তর করলো: নবীন মামা মহালে গেছলেন কি না, আজ সকা[illegible]ফিরেছেন, সেখান থেকে পাত্‌ক্ষীর এনেছেন এক হাঁড়ি—মা পাঠিয়ে দিলেন, আর এই দুধ—

কথাটা শুনতে শুনতেই গোকুলের সর্বাংগ ঘৃণায় রী-রী করে উঠছিল—সে ভেবে ঠিক করতে পারছিল না, কাল এই সময় এই বাড়ীর যে জায়গাটিতে দাঁড়িয়ে সারদা অত বড় কেলেঙ্কারী কাণ্ড করে গিয়েছে, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই কোন্ মুখে সেই বাড়ীতে ছেলেকে পাঠিয়েছে সে এমনি করে 'ভ্রান্তি' জানিয়ে! এদের কি চক্ষুলজ্জা বলেও কিছু নেই! মনটাকে শক্ত করেই গোকুল সহজ ভাবে বলল: তুমি ভাই মিছিমিছি এগুলো কষ্ট করে বয়ে এনেছ; বাজারের পাতক্ষীর আমরা কেউ খাইনে, আর দুধের পাট ত কাল চুকেই গেছে। কাল পর্যন্ত যা পাওনা হয়েছে হিসেব করে আমি শীগ্গীর মিটিয়ে দেব—দুধ আর এখন নোব না।

গোকুলের কথায় কানাই যেনো একেবারে আকাশ থেকে পড়লো, মুখখানার এক বিচিত্র ভংগি করে দুই চোখে বিস্ময় জাগিয়ে সে বলল: সে কি গোকুলদা, কালকের কথাগুলো তুমি এখনো মনে করে রেখেছ না কি? আরে, সে ত চুকে গেলো। আর, আমার মাকে ত তুমি চেনো, রাগলে জ্ঞান থাকে না—হাউ-হাউ করে যা-তা বলে; তার পরেই একেবারে গঙ্গাজল! যেতে যেতে কত দুঃখ করছিলেন—অমন ক্ষেপামি করার জন্যে। যাও, বৌদিকে ডাকো—দুধটা ঢেলে নিক, আর মামা বললেন ক্ষীরটা ঠিক বাজারে নয়, তিনি জানা দোকানে অর্ডার দিয়ে—

গোকুল লোকটি সাধারণত অল্পভাষী এবং এই ধরণের ছেঁদো কথায় চিরদিনই তার বিতৃষ্ণা। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটির নিষ্পত্তি করবার জন্যে সে দৃঢ় স্বরে বলল: সকাল বেলায় আর বাজে কথা বলে গোল কোর না কানাই, তুমি ত আমাকে চেনো—এক কথার মানুষ আমি। তোমাদের ঐ দুধ আর ক্ষীর দু'টোই আমার কাছে—গোরক্ত!

এক নিশ্বেসে কথাগুলি বলেই গোকুল হন্-হন্ করে দাওয়ার ওপরে উঠে গেল—কানাইয়ের দিকে ফিরেও তাকাল না। কানাই খানিকক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার পর মুখখানা বিকৃত করে বললো: ভালো—তাহলে এই কথাই মাকে বলবো। কাজটা কিন্তু ভালো করলে না গোকুলদা!

গোকুলদা তখন ঘরের ভিতরে ঢুকেছে। কথাটা তার কানে বাজতেই জবাব দেবার জন্তে উন্মুখও হোল, কিন্তু কি ভেবে তৎক্ষণাৎ জিভ্‌টাকে সংযত করল।

দুধের ঘটি ও ক্ষীরের ঠোঙা নিয়ে কানাই অতুলের ঘরের দিকে চললো। অতুল বেরিয়েছিল, প্রসাদী রান্নাঘরের জানালার কাছে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। কানাই এদিকে আসতেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল: এই ত ভাই, তর সইল না তোমাদের—ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গিয়ে নাজেহাল হোলে, এখন যে লজ্জায় আমারই মাথা কাটা যাচ্ছে!

হাতের বস্তু দু'টি প্রসাদীর সামনে রেখে কানাই বলল: আমাদের পেটে অত-শত নেই বৌদি, হোল ঝগড়া—তার পর মিটে গেলো, ভাবলুম, শেষে যে কথা হয়েছে তাই থাকবে। সেই জন্তেই ত সকালেই পাঠিয়ে দিলে।

মুচকি হেসে প্রসাদী বলল: মা পাঠিয়েছেন কেন্দ্রা নেড়ে গেরোস্তর মন বুঝতে, তা পাঠাবার কি আর লোক পাননি মা, তোমাকে কি বলে পাঠালেন শুনি? হাতের ঘা এখনো শুকোয়নি, পটি বাঁধা রয়েছে; তবুও তুমি এলে দুধ ক্ষীর নিয়ে—ছি!

কানাই বলল: তুমি ঠিক বলেছ দিদি, আমার আসাটা ভুল হয়েছে। এখন কিন্তু শুনলে মা আগুন হয়ে উঠবে। তা এক কাজ করি, এগুলো আর ফিরিয়ে নিয়ে যাবো না—তোমাদের ভোগেই লাগুক।

প্রসাদী মুখখানা মচকে বললো: না ভাই, সে কি ভালো দেখাবে! মামা ক্ষীর এনেছেন—যারা আপনার জন, তাদের জন্তেই ত এনেছিলে, আমাদের জন্তে ত আর আননি, কোন্ মুখে আমরা ও নোব ভাই—তুমিই বলো?

চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলিয়ে কানাই বলল: ও, এই কথা! তা মা যে ও-বেলা নিজেই আসবেন, তোমাদের ভাগ আগেই তুলে রেখেছেন—এটা হোল বাড়্‌তি। যাক্, আমি এখন যাই বৌদি, এর একটা বিহিত ত করতে হবে।

কথা আর না বাড়িয়ে কানাই তাড়াতাড়ি চলে গেল।

২৬

কুটনো কুটতে কুটতে সারদা ভাইয়ের সংগে গল্প করছিল। অধিকারীর মেয়ে মায়া আর নিজের এক মাত্র ছেলে কানাইকে নিয়েই গল্প। ছেলে যে মেয়েটার জন্তে পাগল হয়ে উঠেছে, আর ছেলের সুখেই তার সুখ, সংসার-ধর্ম সব—কাজেই এ বিয়ে হওয়া চাই-ই। ভাইকে বিনিয়ে বিনিয়ে এই কথাই সে শোনাচ্ছিল। সারদা জানে, তার ভাই নবীনের মত খবিস লোক দুনিয়ায় আর দু'টি নেই—যাকে বলা চলে—বুদ্ধির জাহাজ। তার অসাধ্য কিছুই নেই। সেই জন্তেই অধিকারীর বন্ধকী তমসুকের টাকা সারদা দিলেও, নবীনকেই মহাজন সাজিয়ে খাড়া করেছিল।

সমদ্দার তখনই হেসে বলেছিল: কান টানলেই যেমন মাথা এগিয়ে আসে, তেমনি এই বন্ধকী তমসুক অধিকারীর মেয়েকে এ-বাড়ীতে টেনে আনবে জেনো।

আগের দিনের ঝগড়ার ব্যাপারটা শুনে নবীন সমদ্দার মাথা নেড়ে বলল: কাজটা বোকার মতন করেছ বোন, ও ঠিক হয়নি। কাজ হাসিল করতে হলে নিজের মুখে কি বিষ ঝাড়তে আছে, ওর রাস্তা আলাদা। আমি যদি কাল থাকতুম, তাহলে কালকেই হাতে হাত মিলিয়ে দিয়ে তবে ছাড়তুম।

সারদা বলল: রাগ যে সামলাতে পারলুম না দাদা, মেয়েটার এত বড় আস্পর্দ্ধা! আমি কি ভাবছি জানো, আগে তো দু'হাত কোন রকমে এক করে বাড়ীতে আনি, তার পর উঠতে বসতে খালি ঝাঁটা আর ঝাঁটা!

সমদ্দার জিজ্ঞাসা করল: যেদো রায়ের ছেলের আর কোন খবর পাওয়া গেছে?

সারদা বলল: না, কোন্ চুলোয় যে গেছেন কেউ-ই জানে না। [illegible] ভালো কথা, আমি [illegible] ঐ ছোঁড়ার নামে এক বদনাম রটিয়ে দিয়েছি তোমার নাম করে।

চোখের দৃষ্টি প্রখর করে ভগিনীর মুখের পানে [illegible]দার বলল: বটে! তা ব্যাপারটা শুনি?

সারদা একবার সতর্ক দৃষ্টিটা চারি দিকে বিকীর্ণ করে তার পর সমদ্দারের মুখের ওপর ফেলে আস্তে আস্তে বলতে লাগল: পাড়ায় রটিয়ে দিয়েছি, আমার ভাই মেগাকে ইষ্টিসানে দেখেছে—একটা খেমটাউলীকে নিয়ে কোথায় চলেছে।

কথাটা শুনেই সমদ্দার সোজা হয়ে বসে সোৎসাহে বলে উঠলো: বাঃ! মাথা খেলিয়ে খাসা বুদ্ধি বার করেছ ত। ব্যস—তা হলে ভাবনা কি,—এদিকে দেনার টাকায় মেয়ে ত বাঁধা পড়েছে, ওদিকে ঐ খেমটাউলীর অপবাদে সে ছোঁড়াও বরবাদ হচ্ছে। বাছাধন বেঁচেও যদি থাকেন—সে মরারই সামিল।

ভায়ের মন্তব্যটি সারদার মনঃপূত হল। তার পর মৃদু হেসে বলল: কিন্তু ছোঁড়ার বাপ ঐ যেদো রায় কিছুতেই প্রত্যয় করতে চায় না, বলে—আমার ছেলে গঙ্গাজল, যারা এ কথা রটিয়েছে—মুখ তাদের খসে যাবে।

গম্ভীর মুখে সমদ্দার উত্তর করল: বাপ ত বলবেই, কিন্তু অপবাদ একবার রটলে আর ওঠে না—উল্কীর মত ছাপ রেখে যায়। এর পর দেখবে মজা—এই নিয়ে কি কাণ্ড করি।

এই সময় কানাই এসে মুখখানা ম্লান করে দাঁড়াল। মামার কথাগুলো আড়াল থেকে শুনেও সে আশ্বস্ত হতে পারেনি।

ছেলের মুখ দেখে সারদার বুকখানা ছাঁৎ করে উঠলো। জিজ্ঞাসা করলো; কি বললে রে?

কানাই বলল: নিলে না মা, ফিরিয়ে দিলে।

মুখখানা বিকৃত করে সারদা বলল: বলিস্ কি!

কানাই বলল: গোকুলদা বললে—বাজারে ক্ষীর আমরা খাই না, আর তোদের ও-দুধ আমার কাছে গো-রক্ত।

কথাটা ভ্রাতা ও ভগিনী উভয়কেই স্তব্ধ করে দিল। একটু পরে সমদ্দার কেশবিরল মাথাটি দুলিয়ে মুখখানা গম্ভীর করে বলল: আগেই তো বলেছি, চাকাটা ভুল পথে ঘুরিয়েছ—ফেরাতে একটু বেগ পেতে হবে, এই যা! এসে যখন পড়েছি আর ভাবনা নেই। এখন আমি যা বলবো, ঠিক সেই মত কাজ করতে হবে—মিছি-মিছি লম্ফ-ঝম্প করলে চলবে না। রান্না-বান্নার পাট সেরে নাও, খাওয়া-দাওয়ার পর কথা হবে'খন।

২৭

মায়ার দিন যেন আর কাটে না। অতীতের অসংখ্য স্মৃতি তাকে যেন কণ্টকবিদ্ধ করে। দিনের প্রথম দিকটা কোন রকমে সাংসারিক কাজের ভিতর দিয়ে চলে যায়, কিন্তু তার পর যেনো অসহ্য হয়ে ওঠে। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে দেরীই হয়, কিন্তু তার পরই মনের ওপর ভাসতে থাকে বাগানে বাগানে ঘোরা, নতুন নতুন লেখা শোনা—সেই সঙ্গে স্পষ্ট হয়ে জাগে মৃগেনের দৃপ্ত মুখখানি, তার ভঙ্গি, তার কথা, তার সুর। মায়া ঠিক তেমনি আছে, কিন্তু মৃগেন এখন কোথায়, কেমন আছে, কি কর'ছ—কে জানে!

পুকুরের চাতালটির ওপরে [illegible] এমান [illegible] কি ভাবে। এ সময়টা বাড়ীতে যে[illegible]তে পারে না, তাই বেরিয়ে প[illegible]র বা[illegible]র [illegible] নির্জন স্থানটিতে বসেই অতীতকে স্মরণ করে সে।

এ [illegible]নও বিকেলে ঘাটের চাতালে এসে বসেছিল মায়া—অনেকক্ষণ ধরে বসে বসে অনেক কথাই ভাবছিল। হঠাৎ পিছন থেকে পরিচিত কণ্ঠের ডাকে চিন্তা তার ভেঙ্গে গেল:

মায়া-দি, তোমার নামে চিঠি আছে।

চমকে উঠে চেয়ে দেখে মায়া—পাড়ার পিয়ন দুখীরাম তার হাতের এক গোছা চিঠির ভিতর থেকে একখানি পোষ্টকার্ড বেছে নিয়ে তার কাছে আসছে। মায়ার বুকের ভিতরটা টিপ-টিপ করে উঠলো, হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিয়ে এক-নজরে দেখেই হাসিমুখে বললো: বাবার চিঠি দুখীদা—আঃ! বাঁচলুম।

দুখীরাম বললো: পিয়নগিরি করে আমার যা হয়েছে দিদি, সে আর কি বলবো! গেরাম শুদ্ধ সবাই তাকিয়ে থাকে আমার পানে, আমিও ত বুঝি; তাই কারুর চিঠি এলেই যেনো বর্তে যাই। চিঠিখানা পেয়েই ভাবছি, আহা হাতে পেলে তোমার কত আহ্লাদ হবে!

গ্রাম্য পিয়ন অন্য পথে চললো—এখনো অনেকগুলি চিঠি তাকে বিলি করতে হবে। যেতে যেতে তার মনে আর একটা চিন্তাও জাগছিল, প্রত্যেক চিঠিই যদি সুখবর বহন করে আনতো! কিন্তু তা ত নয়,—বাপের খবর পেয়ে মায়ার মন আনন্দে দুলে উঠেছে, কিন্তু এমন চিঠিও আছে, মালিকের হাতে পড়লেই সে হয় ত ডুকরে কেঁদে উঠবে। উঃ, সে কি সাংঘাতিক! এখানে দুখীরামও যেনো নিজেকে হারিয়ে ফেলে—এ কর্তব্য পালনও তার পক্ষে তখন যেন কঠোর অপরাধের মত নিষ্করুণ হয়ে ওঠে।

চিঠিখানা পড়তে পড়তে মায়া খিড়কীর দরজার কাছে এসেছে, এমন সময় তাদের বাড়ী থেকে একটা কলরব শুনে থমকে দাঁড়াল সে, তার পর ত্রস্ত ভাবে বাড়ীর ভিতরে ছুটলো।

বাইরে চণ্ডীমণ্ডপে তখন সালিসীর মজলিস বসেছে। মহাজন নবীন সমদ্দার একাই একশ' হয়ে সবার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছে। গোকুল, অতুল এবং পাড়ার আরও দু'-চার জন লোক—কানাইদের যারা প্রতিবেশী এবং দহরম মহরম খুব বেশী তারাও এসেছে সমদ্দারের সংগে। চণ্ডীমণ্ডপের যে দরজাটি বাহির ও অন্দরের মধ্যে যোগাযোগ রেখেছে, তারই পাশে দাঁড়িয়ে সারদা দরকারী কথা যোগান দিচ্ছে। ভিতরের দিকে করুণা, প্রসাদী এবং পাড়ার আরও কতিপয় মেয়ে উৎকর্ণ হয়ে বাইরের কথা শুনছে।

সমদ্দারের সংগে গোকুলের এই প্রথম দেখা। বন্ধকী দলিল রেজেষ্টারীর সময় অতুলই উদ্যোগী হয়ে পীতাম্বরের সংগে সদরে গিয়েছিল, গোকুল তখন জমিদারী সেরেস্তায় চাকরী করে—স্বগ্রামে ছিল না। সেই সুযোগেই সরল পীতাম্বরকে ভুলিয়ে অতুলের সাহায্যে সারদা কাজ বাগিয়ে নেয়। তখন শোনা গিয়েছিল, নবীন সমদ্দার সারদার দূর-সম্পর্কের ভাই, এখন সমদ্দার নিজেই জানিয়েছে সারদার সে শুধু আপন ভাই নয়—অভিভাবক এবং মুরুব্বী। তা ছাড়া, তাঁর নিজের যে প্রচুর বিষয়-সম্পত্তি আছে তারও ওয়ারিসান হচ্ছে একমাত্র ভাগনে কানাই।

অতুলই সমদ্দার মশাইকে আদর অভ্যর্থনা করে চণ্ডীমণ্ডপে এনে বসায়, নিজের ঘর থেকেই চা, পান, তামাক এনে মহাজন অতিথিকে আপ্যায়ন করে। পরে খবর পেয়ে বাধ্য হয়ে গোকুলকেও আসতে হয়। কিন্তু এই মহাজনটির প্রকৃত পরিচয় পেয়ে গোকুলের মুখে যেন অন্ধকার নেমে আসে—মনের মধ্যে একটা সন্দেহ গভীর হতে থাকে। বুঝতে তার বিলম্ব হয় না যে, তার অবর্তমানে সেদিন এই যে ভীষণ প্রকৃতির মহাজনটিকে খাড়া করা হয়েছিল, এর মূলে রয়েছে রীতিমত একটা ষড়যন্ত্র এবং তার সংগে ভাই, ভ্রাতৃজায়া, সারদা, কানাই প্রত্যেকেই জড়িত।

শান্ত কণ্ঠেই সে নবীন সমদ্দারকে বোঝাতে চাইল: টাকা যখন নেওয়া হয়েছে—সে টাকা নষ্টই হোক বা উপে যাক, আপনার দেনা শুধতে হবে বৈ কি। এরই দায়ে বাবা এই বয়েসে বিদেশে বেরিয়েছেন উপার্জ্জনের আশায়। দুর্ভাগ্যক্রমে আমিও এখন বেকার, তার ওপর রোগে ভুগছি। আর আপনিও নিজের মুখেই বললেন, বিষয়-সম্পত্তি আপনার প্রচুর, আর ভোগ করতে শুধু এই ভাগনে। তাহলে টাকার জন্যে এত তাড়া নাই-বা এখন দিলেন, মাস তিনেক সময় দিন, তার মধ্যেই আমরা টাকা দিয়ে দলিল ফিরিয়ে নোব।

সমদ্দার উত্তর করল: বললুম ত, কানাইয়ের মা'র কথাতেই টাকা আমি দিয়েছি আর এক টা টাকার জন্যে আমার যে ঘুম হচ্ছে না তাও নয়; তবে কি জানো গোকুল বাবু, কথার খেলাপেই আমাকে আজ শক্ত হতে হয়েছে। যার মুখ চেয়ে একদিন এক কথায় টাকা বা'র করে দিয়েছি, তারই মুখ চেয়ে আজ সেই টাকা ঘরে তোলবার জন্যে এখন শক্ত হয়েছি। মুখের কথা আপনারা যদি ভাঙতে পারেন, আমিই বা তাহলে আপনাদের কথা কেন রাখতে যাবো বলুন ত?

বিস্ময়ের সুরে গোকুল বলল: মুখের কথা আমরা ভেঙেছি—এর মানে?

সমদ্দার হাসতে হাসতে উত্তর করল: মানে কি আপনি জানেন না গোকুল বাবু? আসল কথা কি বলুন ত? আপনার বোনটিকে দেখে আমার বোন একবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করে বসেন যে, ছেলের বৌ করে তাকে ঘরে না এনে ছাড়বে না। শুনে আমিই বরং বলেছিলুম—তোমার ছেলের বিয়ের জন্যে ক'নের অভাব আছে না কি যে মেয়ের বাপের মন রাখতে টাকা ধার দিতে ছুটেছ? তাতে উনি বললেন—কি করি দাদা, কথা দিয়েছি যে, অধিকারী ভারি মুস্কিলে পড়েছে; টাকাটা আমি তার মেয়ের মুখ চেয়েই দোব বলিছি, আর মেয়েটিকে দেখলে তুমিও না বলে পারবে না—হ্যাঁ, এ মেয়ের জন্যে মেয়ের বাপকে টাকা অবিশ্যি দেওয়া যায়।

সমদ্দারের কথা শুনতে শুনতেই গোকুলের মুখখানা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠছিল; কথাটা শেষ হতেই সে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠল:

যথাসর্বস্ব বন্ধক রেখে যেখানে টাকা নেওয়া হয়েছে, আজ এ কথা উঠছে কেন? তাহলে দলিলেই ওটা লিখিয়ে নেননি কেন?

তেমনি মৃদু হেসে সমদ্দার কথাটার উত্তর করল: সেটা ভালো দেখায় না কি না, তাই ঐ ভাবে দলিল করা হয়েছিল। তবে কথা ছিল—ভালয় ভালয় বিয়ে হয়ে গেলেই দলিল ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আপনি ত তখন ছিলেন না—আপনার ভাই সব জানেন; বলুন না অতুল বাবু!

অতুল মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল: আপনি কি মিছে কথা বলছেন সমদ্দার মশাই, যে না বলবো?

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অতুলের মুখের দিকে চেয়ে গোকুল বলল: তাহলে আমার কথার জবাব দে অতুলো, ভিটে-মাটি বাঁধা রেখে বাবা কেন টাকা ধার করেছিলেন? তুই কি জানিস্ নে মায়ার বিয়ের পণের জন্যেই বাবা অস্থির হয়ে ওঠেন আর ঐ বাবদেই টাকা ধার করেন। মায়ার বিয়ের কথা আগে থাকতেই যাদব রায়ের ছেলে মৃগেনের সংগে পাকা হয়েছিল—এ কথা কে না জানে! আর কানাইয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা যদি হয়েই থাকবে, তাহলে এমন করে টাকা কর্জ করবার কি দরকার ছিল—যখন ওঁরা মেয়ের মুখ চেয়ে টাকা দিতেই ব্যস্ত, পণের দাবী মোটেই নেই!

মুখখানা বেঁকিয়ে এবং অন্য দিকে ফিরিয়ে অতুল উত্তর করল: অত শত আমি জানি না বাপু, যাদব রায় ত চামার তার কথা এখানে তুলো না, আর তার ছেলের কীর্তিও ত সবাই শুনেছে। বাবা শেষকালে তিতিবিরক্ত হয়েই এ কাজ করেছিলেন।

কথাটা শুনে এবং অতুলের অবস্থা উপলব্ধি করে গোকুল একটু হাসল; তার পর শ্লেষের সুরে বলল: তুই যে এ কথা বলবি সে জানা কথা, তোকে জিজ্ঞেসা করাই আমার ভুল হয়েছে। কিন্তু কথাটা যে মিছে তোর মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছে—আমার মুখের পানে চেয়ে এত বড় মিথ্যে কথা বলবার শক্তি তোর নেই।

কিন্তু এত বড় কঠোর অনুযোগও গায়ে না মেখে অতুল নির্লজ্জের মত সুর নরম করে বলল: আমি বলি দাদা, কি দরকার এ সব হাঙ্গামের; সমদ্দার মশাই যখন এসেছেন, একটা হেস্তনেস্ত করলেই ত হয়। টাকার তাগাদা—নালিশের ভয়—দেনা-পাওনা—সবই ত এক কথায় মিটে যায়। উনি বলছিলেন—২রা মাঘ ভালো দিন রয়েছে। তার পর শুভ কাজ হয়ে গেলেই দলিল ফিরিয়ে দেবেন আর বিয়ের খরচ-পত্তর যা কিছু উনিই দাঁড়িয়ে করবেন—

এই পর্যন্ত বলে অতুল দাদার অভিপ্রায়টি জানবার জন্যে তার মুখের পানে তাকিয়ে হঠাৎ থেমে গেল। মনে হোল—দাদার চোখ দু'টো যেনো জ্বলছে, এখনি অগ্নি-গোলার মত ঠিকরে বেরিয়ে আসবে। অতুল থামতেই গোকুল সরোষে গর্জন করে উঠল: তোর এ কথার জবাব দিতেও লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে অতুলো—বাবা যদি এখানে থাকতেন এর উত্তরে জুতিয়ে তোর মুখ ছিঁড়ে দিতেন। তুই ঠাওরেছিস্ কি? আমরা কি পেঁটেল—যে টাকা নিয়ে মেয়ে বিক্রী করব? এ কথা বলতেও তোর মুখে বাধল না!

এর পর কি জবাব দেবে অতুল তা ভেবে পেল না; কিন্তু সমদ্দার তার অবস্থা বুঝেই তাড়াতাড়ি বলে উঠল: আহা হা, আপনি অত চটছেন কেন গোকুল বাবু, আর—মেয়ে বিক্রীর কথাই বা এখানে আসছে কেন? ভালো ঘর, ভালো মেয়ে হলেও, পয়সার জন্যে যেখানে পার করা হয় না, সমাজের দিকে চেয়ে কেউ কেউ দাঁড়িয়ে থেকে কন্যাদায়ের সব ঝক্কি যে নিয়ে থাকেন—এমন অনেক দৃষ্টান্ত আপনি পাবেন। আপনাদের ভালোর জন্যেই আমি এসেছিলুম মীমাংসা করতে, তা আপনি যখন শুনবেন না, আমি নাচার—

তিক্ত কণ্ঠে গোকুল বলল: শুনুন সমদ্দার মশাই, আপনি হচ্ছেন আমাদের মহাজন, আর আমরা খাতক—এই আমাদের সম্বন্ধ। এ ছাড়া আর কোন কথা এখানে নেই। এখন আমার কথা হচ্ছে—টাকা শোধবার সময় দেন ভালোই, না হয় নালিশই করবেন—[illegible]তেই আমরা টাকা জমা [illegible]

সমদ্দারও সংগে সংগে শ্লেষের সুরে উত্তর [illegible]: সেই ভালো, তবে মনে রাখবেন—বাঘে ছুঁলেই আঠারো ঘা—শেষে [illegible] হতে হবে।

সারদা এতক্ষণ নীরবেই দু' পক্ষের কথা শুনছিল; পাছে বেফাঁস কথা কিছু বলে বসে তাই সমদ্দার তাকে বরাবর চুপ করে থাকতেই পরামর্শ দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন সে দেখল, অনেক বেয়ে-চেয়েও 'হালে পানি' পাওয়া গেল না, তখন তার পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হোল না, সমদ্দারের কথার পরেই সে চড়া সুরে বলে উঠল: তাহলে আমিও বলি বাপু, সম্পর্ক যখন কাটাতেই চাইছ, আর চক্ষুলজ্জাই বা কেন—আমার এদ্দিক্কার পাওনা-গণ্ডা নিয়ে তবে উঠবো। দাদার টাকা—না হয় নালিশ করে প্যায়দা বসিয়ে আদায় করে নেবে, কিন্তু আমার দুধের টাকা আমি গলায় গামছা দিয়ে বুঝে নিয়ে ছাড়বো—

এই সময় দরজার পাশের ভীড় কাটিয়ে এবং এ-পাশের সারদাকে সরিয়ে দিয়ে অসংকোচে চণ্ডীমণ্ডপে এলো মায়া—হাতে তার চিঠি, সারা মুখখানায় অপূর্ব্ব এক দীপ্তি। এ-ভাবে এ-সময় মায়াকে দেখে চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত সকলেই চমকে উঠল। মায়া সবেগে গোকুলের কাছে গিয়ে তার হাতে চিঠিখানা গুঁজে দিয়ে বলল: বাবা চিঠি লিখেছেন দাদা, টাকা পাঠিয়েছেন মনিঅর্ডার করে—আর আসছে শ্রীপঞ্চমীর পরের দিন ওখান থেকে বেরুবেন। তুমি ওঁকে বল দাদা—পরশু এসে যেন ওঁর দুধের টাকা নিয়ে যান, কালই হয়ত টাকা এসে পৌঁছবে।

এক নিশ্বাসে চিঠিখানা পড়ে গোকুলের বিমর্ষ মুখখানাও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সে সারদাকে লক্ষ্য করে বলল: বাবার চিঠি, ওখান থেকে টাকা পাঠিয়েছেন; আমিও আপনার টাকার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছি; যাই হোক, পরশু এসে—

আশ্চর্য, অমনি সারদার কথার সুর বদলে গেল; কোমল কণ্ঠে বলল: দুধের দামের জন্যে যেন আমার ঘুম হচ্ছে না! তাগাদা কি সত্যি সত্যি টাকার? মেয়েটাকে যে কি নজরে দেখেছি কে তা বুঝবে! দু'হাত এক করবার জন্যে যত চেষ্টাই করছি বাছা, তুমিই ত তা ভেঙ্গে দিচ্ছ! নৈলে—

গোকুল এবার নিজেকে বিপন্ন মনে করে সবিনয়ে বলল: দেখুন, তাহলে বলি—মায়ার বিয়ের ব্যাপারে আমাদের কারুর হাত নেই, বাবা এসে যে ব্যবস্থা করবেন তাই হবে।

এই ভাবে কথাটার উপসংহার করেই মায়াকে নিয়ে গোকুল ভিতরে চলে গেল। সমদ্দার হাতছানি দিয়ে অতুলকে কাছে ডেকে
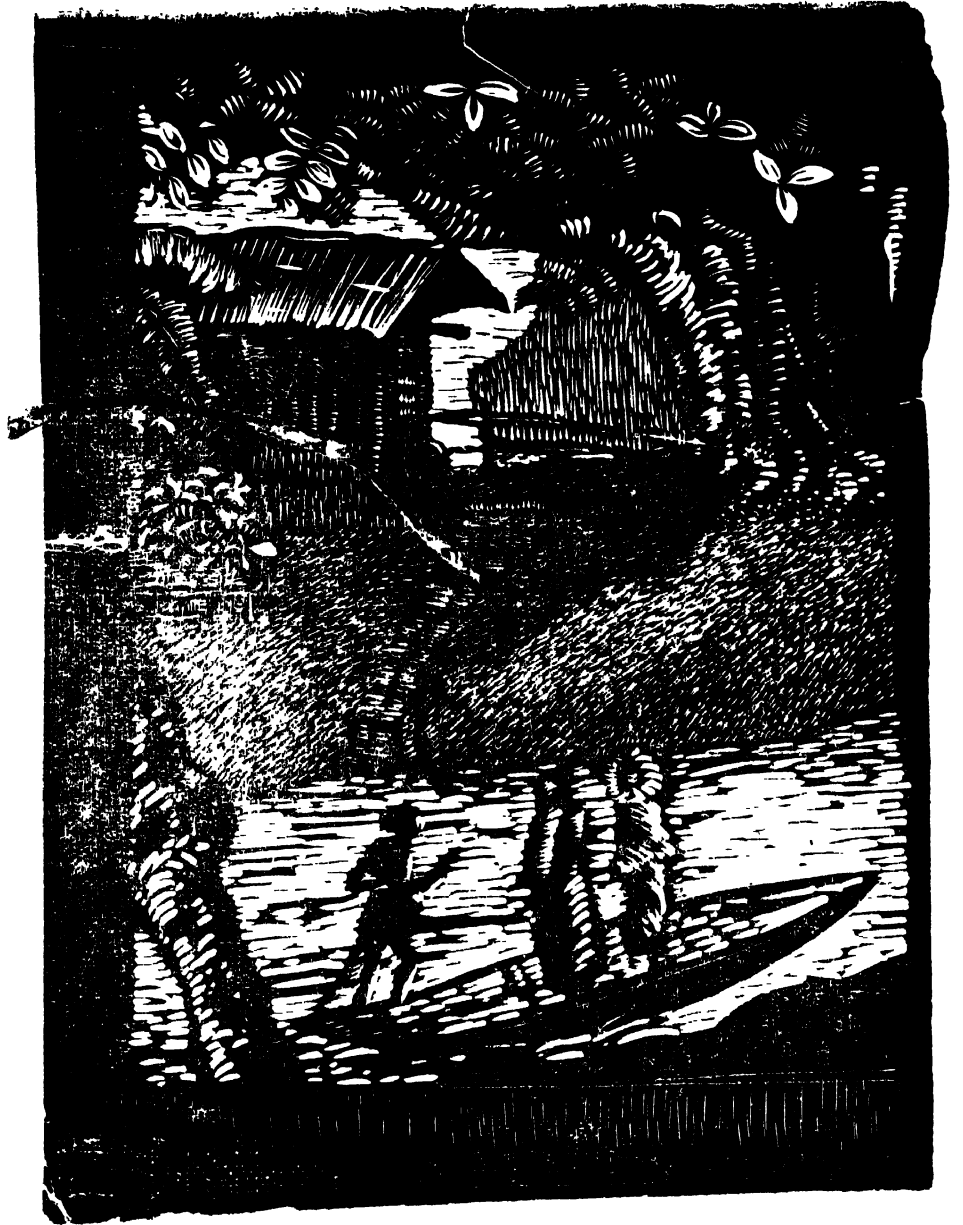
ফেরীঘাট — নিতাই চন্দ্র

চুপি চুপি বলল: কৌশল করে কোন রকমে দাদার কাছ থেকে বাবার ওখানকার ঠিকানাটা আজই জেনে নেওয়া চাই—বুঝলে।

* * * *

সন্ধ্যার পর প্রদীপের আলোয় মায়া পীতাম্বরকে চিঠি লিখতে বসেছে। বিদেশে গিয়েও বাবা যে অষ্টপ্রহরই তার জন্ম ভাবেন সেই সঙ্গে মৃগেনকেও—কেন না তিনি জেনেছেন যে মায়াকে সুখী করতে হলে মৃগেনকেই চাই- বাবার এই অনুভূতিই মায়ার মনটি আনন্দে ভরিয়ে দিয়েছে। কিন্তু তার বাবা ত আজও শোনেননি—মায়া-মৃগের মিলনের জন্তে তিনি অধীর হলেও মৃগ মায়ার বন্ধন ছিঁড়ে কোথায় গেছে কেউ তা জানে না। তাই মায়া তার পত্রে—পীতাম্বরের গৃহত্যাগের পর থেকে মৃগেনের গৃহত্যাগের উপলক্ষগুলি একটি একটি করে চিঠিতে লিখতে থাকে; তার পর মিনতি করে—দেখা হলে সব কথা তাকে খুলে বলবে, সে যেনো ভুল না বোঝে।…চিঠি লিখতে লিখতে মায়ার চোখ দু'টি জলে ভরে ওঠে—চিঠিখানা ভিজে যায়। বার বার আঁচলে অশ্রু মোছে মায়া, আবার লেখে। মনের সংকোচ, লজ্জার আবরণ আজ কলমের মুখে সরিয়ে দিয়েছে, ছিন্ন করেছে—অকপটে নির্ভীক ভাবে সব কথাই সে স্নেহময় বাবাকে লিখতে থাকে। [ক্রমশঃ।

ছোটদের আসর

ভারতের দুর্গম দুর্গ

শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ

মানবের আহার সংগ্রহ যেমন স্বভাব-ধর্ম্ম, আত্মরক্ষাও তেমনই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। খাদ্য সংগ্রহের নিমিত্ত মানবকে বহু শ্রম, কূটবুদ্ধি প্রয়োগ, নানা কৌশল অবলম্বন, কঠিন সংঘর্ষ করিতে হয়। সেই জন্যই মানবে মানবে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে, জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ-বিগ্রহ যুগের পর যুগ চলিয়া আসিতেছে, নিজকে ও দেশকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত মানব নিত্য নব নব কৌশল আবিষ্কার করে।

ভারত যখন স্বাধীন ছিল তখন তাহার বীর ও বীরাঙ্গনারা শৌর্য্য-বীর্য্য রণকৌশলের পরিচয় প্রদান করিত। সেই সমস্ত অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী শিল্পে ও সাহিত্যে এখনও প্রকাশিত আছে।

আদিম যুগে ভারতে যুদ্ধ হইত মানবে মানবে হাতে হাতে সাক্ষাৎ সমরক্ষেত্রে। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুদ্ধ চলিত দলবদ্ধ হইয়া প্রশস্ত রণক্ষেত্রে। দলপতি বা রাজাদের বীরত্ব ও রণকৌশল স্বদেশ, স্বজাতি ও স্বধর্ম রক্ষা করিত। পরস্ব ও পরদার অপহরণ অধর্ম্ম ছিল। মধ্যযুগে দেশ ও আত্মরক্ষার জন্য ভারতবাসী প্রকৃতির অনুকূল সুদৃঢ় স্থানে দুর্গম দুর্গ নির্ম্মাণ করিত। ঐশ্বর্য্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মোগল যুগে ভারতবাসীরা সুদৃঢ় প্রাকার-বেষ্টিত নগর মধ্যে আত্মরক্ষা করিত। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক নানা সমর-উপকরণ আবিষ্কার করিয়া মানব জলে স্থলে অন্তরীক্ষে যুদ্ধ করে।

ভারতের হিমাচল হইতে কুমারিকা, কাবুল হইতে মণিপুর বিস্তৃত ভূখণ্ডে শত-সহস্র দুর্ভেদ্য দুর্গগুলি এখন অপ্রয়োজনীয়, জনশূন্য। দুর্গ-তোরণ রক্ষার জন্য এখন আর কেহ বুক পাতিয়া দেয় না, দুর্গ-প্রাকারের উপর বীরদর্পে আর কেহ পদচারণ করে না, অশ্বারোহীদের অশ্বখুর-ধ্বনিতে গিরিবর্ত্ম আর প্রতিধ্বনিত হয় না, হাতিশালায় করিবৃন্দের সমাবেশ আর গাম্ভীর্য্য প্রকাশ করে না, বিজয় উৎসবের কোলাহলে দুর্গ-প্রাঙ্গণ আর মুখরিত হয় না; তথাপি তাহাদের ইতিহাস, অপূর্ব্ব কাহিনী ও স্থাপত্য স্বাধীন ভারতের গৌরবের পরিচয় প্রদান করে, সুপ্ত স্বাধীনতার বীজ উদ্বুদ্ধ করে, স্বদেশপ্রীতিকে অনুপ্রাণিত করে।

ঝাঁসী, ওর্চ্ছা, চিতোরগড়, সিংহগড়, চুনার, ভরতপুর, সম্বর, যোধপুর, গোয়ালিয়ার, সিরিঙ্গাপট্টম আদি দুর্গরক্ষা ও দুর্গজয়ের কাহিনী ভারতবাসী মাত্রেরই চিত্ত উৎসাহে ও পুলকে ভরিয়া দেয়। তাহাদের শিল্প ও স্থাপত্য জগৎবাসীকে বিস্মিত করিয়া থাকে। কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম, মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ ও বোম্বাইয়ের আলেকজেন্দ্রিয়ার স্থাপত্য ও পূর্ত্ত-কৌশল তাহাদের নিকট অপ্রতুল।

ঝান্সীর কেল্লা

স্বাধীন ভারতের [illegible] নরপতিদের গৈরিক পতাকা এখন [illegible] ঝান্সীর দুর্গশিরোভাগে উড্ডী[illegible]ই। মাত্র নব্বই বৎসর পূর্ব্বে স্বাধীন মহারাষ্ট্র বীরগণের পদভরে যে কেল্লা [illegible] কম্পিত আজ তাহা বিজাতীয় বিধর্ম্মী সৈন্যদের পদরজে ধূসরিত। এই কেল্লাই ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মী বাঈএর লীলাক্ষেত্র ছিল। এখনও সেখানে রাণীর নানা কীর্ত্তি বিরাজিত। এখনও শিবরাত্রিতে 'হর হর বোম্' ধ্বনিতে কেল্লা মুখরিত হয়। সেই দুর্গ দর্শনে, রাণীর বীরত্ব কাহিনী শ্রবণে তরুণ-তরুণীর চিত্তে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হয়, মনে পড়িয়া যায় রাণীর দৃঢ় বাক্য "মেরা ঝান্সী কভি নহি ছোড়েঙ্গা।" সেই রাণীর আদর্শে বর্ত্তমান যুগের স্বাধীন ভারত রাজ-সরকারের নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজে নারী বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন এবং নাম "ঝান্সীর রাণী ব্রিগেড"। ঝান্সীর রাণীর কেল্লা পরম পুণ্যস্থান, ভারতের দুর্গমালার প্রধান মণি।

ঝান্সী ভারতের মধ্যে বিন্দুস্থলে অবস্থিত। নগর-প্রান্তে এক পর্ব্বতের উপর ভারতের মধ্যস্থল বিন্দুর চিহ্নরূপে এক প্রস্তর স্তম্ভ অবস্থিত। তাহার অনতিদূরে সমতল ভূমি হইতে সোজা একটি পাহাড় দণ্ডায়মান, সেই পর্ব্বতশিরে ঝান্সীর কেল্লা গঠিত হইয়াছে। পাহাড়ের গাত্র কাটিয়া একটি পথ ঘুরিয়া ঘুরিয়া দুর্গ-তোরণ পর্য্যন্ত গিয়াছে, পর পর দুইটি তোরণ উত্তীর্ণ হইলে বিস্তৃত প্রাঙ্গণের ডান দিকে প্রাচীন প্রাসাদ, দরবার দালান, খাজনাখানা, অস্ত্রাগার, রাণীমহল অবস্থিত। বাম পার্শ্বে বৃটিশ সৈন্যদের আবাস নির্ম্মিত আছে। মধ্য দিয়া একটি প্রশস্ত পথ শিবালয় পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেখানে অপূর্ব্ব কৌশলে একটি কূপ ও জলাধার নির্ম্মিত আছে, তাহার প্রান্তে শিবালয়ে শিবরাত্রিতে সহস্র সহস্র নর-নারী আগমন করিয়া শিবলিঙ্গের উপর জল ঢালিয়া থাকে। শিবরাত্রির দিনে হিন্দু নর-নারীর এই স্থানে অবাধ গতি ও পূজা করিবার স্বত্ব এখনও আছে।

সিপাই-বিদ্রোহের সময় ঝান্সীর রাণী স্বাধীনতার জন্য স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন বৃটিশ-বাহিনীর সহিত এবং যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন। যৌবনে ঝান্সীর কেল্লাতে বসিয়া যখন রাণী লক্ষ্মী বাঈএর অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়াছিলাম তখন চিত্ত আনন্দে ও আশায় পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, আবার পরিণত বয়সে আজাদ হিন্দ ফৌজের ঝান্সীর রাণী ব্রিগেডের নারী-বাহিনীর সাহস ও শক্তির কথা শুনিলাম; তখন নেতাজীর প্রতি শ্রদ্ধায় মস্তক আনত হইয়া পড়িল। কীর্ত্তিই মানুষকে অমর করে।

ওর্চ্ছার দুর্গ

ঝান্সীর কেল্লাদর্শনের জন্ত যখন জঙ্গী বিভাগের স্থানীয় সেনাপতি জনষ্টন সাহেবের দ্বারস্থ হই, তখন তিনি ওর্চ্ছার দুর্গের শিল্প-ঐশ্বর্য্য, সুদৃঢ় স্থাপত্য, মনোহর দৃশ্যের অজস্র প্রশংসা করেন। বৃটিশ সেনাপতির মুখে ওর্চ্ছার দুর্গের এরূপ প্রশংসা শুনিয়া তাহা দেখিবার জন্ত আগ্রহ হইল। আমি জানি, সৈন্তবিভাগের অনেক ব্যক্তি (জেনারেল কার্ণসন, জেনারেল ক্যানিংহাম, মেজর কিটো প্রভৃতি) ভারতে অনেক লুপ্ত শিল্প-ঐশ্বর্য্য আবিষ্কার করিয়া আমাদের চোখ ফুটাইয়া দিয়াছেন। সেই বিশ্বাসে ঝান্সী হইতে এগার মাইল দূরে ওর্চ্ছার দুর্গ দেখিতে যাই। ঘন গভীর বনানীর [illegible] দুর্গম পাহাড়-বেষ্টিত চেতুয়া নদীর তীরে ওর্চ্ছা[illegible]দৃশ্য দুর্গ-প্রাসাদ অবস্থিত। [illegible] দল বুণ্ডেলা সর্দারগণ প্রবল মোগল সম্রাটদের [illegible] করিয়া যমুনার দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ডে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়া বসবাস করিতেছিল। ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে রুদ্রপ্রতাপ বুণ্ডেলা রাজ্য গঠন করেন এবং গড়কুণ্ডায় রাজধানী পত্তন করেন। পরে ওর্চ্ছার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে আত্মরক্ষার উপযুক্ত স্থান বিবেচনা করিয়া চেতুয়া নদীর গর্ভে দ্বীপখণ্ডের উপর বর্ত্তমান ওর্চ্ছার দুর্গ নির্ম্মাণ তাঁহার পুত্র করেন ৫৩১ খৃষ্টাব্দে। তাঁহার মৃত্যুর পর কয়েক জন বুণ্ডেলা সর্দ্দার এই ওর্চ্ছার দুর্গ পরাক্রান্ত মোগল সম্রাটদের হাত হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। বুণ্ডেলারা গরিলা যুদ্ধে অতি পারদর্শী। রাজা মধুকর সা বুণ্ডেল রাজ্যসীমা বহু বিস্তারিত করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর এই বিস্তৃত রাজ্য তাঁহার আট পুত্রের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়, সেই খণ্ড খণ্ড রাজ্য বর্ত্তমানে রেওয়া, পান্না, অজয়গড়, দেতিয়া, রাজগড়, ছত্তরপুর, ওর্চ্ছা, টিকম্বর নামে বুণ্ডেলখণ্ড প্রদেশ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মধুকরের অষ্টম পুত্রের মধ্যে বীরসিংহ সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও সাহসী ছিলেন। তিনিই ওর্চ্ছার অধিপতি, তাঁহার সময় ওর্চ্ছা রাজ্য পরম পরাক্রমশীল রাজ্যে পরিণত হয়। ওর্চ্ছা নগর ও প্রাসাদ সুন্দর শিল্পকলামণ্ডিত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছিল।

আকবর-পুত্র সেলিম পিতৃ-বিদ্রোহী হইয়া যখন এলাহাবাদের দুর্গে বাস করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি বুণ্ডেলা-সর্দ্দার ওর্চ্ছাপতি বীরসিংহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন এবং তাঁহার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া পিতৃবন্ধু আবুল ফাজলকে এই বুণ্ডেলাদের দ্বারা হত্যা করান। আকবর বাদশাহ বন্ধুর মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার মানসে বিরাট মোগল-বাহিনী বীরসিংহের বিরুদ্ধে দৌলত খাঁর অধীনে বুণ্ডেলখণ্ডে পাঠান। বুণ্ডেলারা পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে লুকাইয়া অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া মোগল- বাহিনীকে বিপর্য্যস্ত করে। যদিও দৌলত খাঁ বীরসিংহকে একবার বন্দী করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীরের কৌশলে ও সাহায্যে বীরসিংহ পলায়ন করিতে সক্ষম হন। আকবরের মৃত্যুর পর সেলিম সম্রাট হন এবং বীরসিংহের সহিত যুদ্ধ বন্ধ করেন এবং তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। চিহ্নস্বরূপ আফজল ফজলের তরবারি বীরসিংহকে পুরস্কার দেন; সেই তরবারি এখনও ওর্চ্ছার রাজ-কোষাগারে রক্ষিত আছে।

জাহাঙ্গীর বাদশাহের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের পর বীরসিংহ রাজ্য-বিস্তার ও শিল্পোন্নতিতে মন দেন। তিনি ওর্চ্ছা নগরকে তিন মাইল বেষ্টন করিয়া দৃঢ় প্রস্তর-প্রাকার দ্বারা সুরক্ষিত করেন। বর্ত্তমানের সুরম্য প্রাসাদ, 'জাহাঙ্গীর মহল', 'চতুর্ভুজ মন্দির', 'ফুলবাগ' আদি সুরম্য হর্ম্যগুলি ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে বীরসিংহের মৃত্যুর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়।

জাহাঙ্গীর বাদসা মাঝে মাঝে বন্ধু বুণ্ডেলা-রাজ বীরসিংহের নিকট আসিয়া বিশ্রাম করিতেন, সেই জন্ত বীরসিংহ একটি পৃথক্ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার নাম 'জাহাঙ্গীর মহল' রাখেন। এই মহলটির শিল্প-ঐশ্বর্য্য ও কারুকার্য্য অতি মনোরম ও সূক্ষ্ম। রাজপুত ও মোগল চিত্রধারায় বহু উচ্চশ্রেণীর প্রাচীর-চিত্র এই জাহাঙ্গীর মহলের দেয়ালের শোভা বর্দ্ধন করিয়া এখনও আছে। এক চিত্রে মোগল বাদসাহের দরবার-চিত্র অঙ্কিত, তদানীন্তন কালের বেশভূষা, আদব-কায়দার পরিচয় পাওয়া যায়। আর একটি চিত্রে মহিলারা ঘোড়ায় চাপিয়া পোলো খেলার ন্যায় ক্রীড়াতে রত দেখা যায়। এতদ্মধ্যে দেওয়ান-ই-খাসের দালানের শ্বেত পাথরের জালি পর্দ্দা, নানা ফল, ফুল, পশু-পক্ষী অঙ্কিত নানা রংএর মসৃণ পারস্য টালী সেই যুগের সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

জাহাঙ্গীর মহলের উত্তরে বৃহৎ 'রামমন্দির' বা রাজ-প্রাসাদ, অভ্যন্তরের বৃহৎ দালানের প্রান্তে শ্বেত পাথরের অতি সূক্ষ্ম কার্য্য-বিশিষ্ট সিংহাসন এখনও স্থাপিত আছে। পূর্ব্ব দিকের মহল খর-স্রোতা চেতুয়া নদী-গর্ভ হইতে প্রায় তিন শত ফুট উঠিয়াছে। ইহার ঝরকায় দাঁড়াইলে প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা উপভোগ করা যায়। দুর্গের এই অংশটি বিলাতের উইণ্ডসর ক্যাসেলের মতন সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য মনে হয়।

দেশ স্বাধীন থাকিলে তাহার শিল্প, সাহিত্য ও ধর্ম্ম উৎকর্ষতা
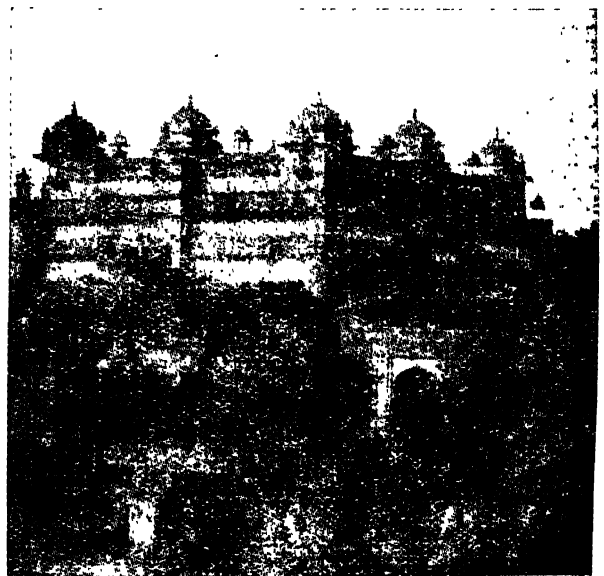
ওর্চ্ছার দুর্গ

লাভ করে ইহার সঠিক প্রমাণ ওর্চ্ছার কেল্লা ও চতুর্ভুজ নারায়ণ মন্দির। মন্দিরটি বিরাট খৃষ্টের ক্রুশের আকারে উচ্চ পোস্তার উপর নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দির পাথর দ্বারা প্রস্তুত। বহু সোপান লঙ্ঘিয়া মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে উঠা যায়। এই স্থানে দুই সহস্র ব্যক্তি বসিতে পারে। মণ্ডপ প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ—উপরে চার কোণে চারটি ও মধ্যে দুইটি চুড়া উঠিয়াছে। গর্ভ মন্দিরের চুড়া প্রায় এক শত ফুট উচ্চ—শিরোপরি নয় মণ ওজনের অষ্টধাতুর কলস শোভা পাইতেছে। মন্দিরের মধ্যে উচ্চ বেদীর উপর চতুর্ভুজ নারায়ণ-মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল, যবন দ্বারা কলুষিত হওয়াতে এই মন্দির এখন পরিত্যক্ত। ইহার গঠন-প্রণালী ও বিশাল আকার দর্শককে বিস্মিত করে।

কেল্লাটির তিন দিকে বেতুয়া নদী ও এক দিকে ২০০ শত ফুট গভীর গড়খাই দ্বারা বেষ্টিত। দুর্গ-তোরণের সম্মুখের পূর্ব পার্শ্বে চতুর্ভুজ মন্দির এবং সম্মুখে রামচন্দ্রজীর মন্দির। এখানে আড়ম্বরের সহিত পূজা-পাঠ হয়। দেবতার ঐশ্বর্য্য রাজ-ঐশ্বর্য্য হইতেও অধিক। সামন্ত রাজার সম্পত্তি বলিয়া এত ঐশ্বর্য্যশালী।

টুকটাক্

শ্রীদিলীপ দে চৌধুরী

এই গাছ—বোবা গাছ শোন্ না—
দেখেছিস্ তুই রাজকন্যা!
চাল তোর হ'য়েছে রে ভারী এ
একা একা সারা দিন দাঁড়িয়ে
এক-দুই-তিন-চার গোণ না!

হাওয়ায় দোলে বকুল ফুল—
খুকুর মাথায় কোঁকড়া চুল,
শাড়ীর আঁচল ছোট্ট তার
ফুল-তোলা নীল নক্সা পাড়
দুই কাণে দুই সোনার দুল!

মেঘে মেঘে একাকার—আকাশটা একাকার
নেই কোন হুঁশ তার—একটুও হুঁশ তার!
আমরা যে মরছি
আমরা যে পড়ছি
সরে গিয়ে আলো ছাড়—সূর্য্যের আলো ছাড়!

দাদা আমার লিখতে পারেন কবিতা—
জানিস্ ওরে ক্যাবলা মেয়ে সবিতা!
মূর্খ যতো কাগজওলা
ও সব কি ছাই বুঝবে কলা
বাধ্য হ'য়েই ফেরৎ পাঠায় সবি—তা!

মিষ্টার মৌমাছি

শ্রীইন্দিরা দেবী

অবেলায় ঘুম ভেঙ্গে গেলো। মিষ্টার মৌমাছি চটে আগুন, রেগে আগুন রাগবার তো কথাই, সত্যি, হঠাৎ যদি কেউ তোমার কাঁচা ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেয়, তোমার খুব রাগ হয় না? রাগে তখন যদি কিছু করতে না পারো তাহলে জিভ ভেঙ্গাও বা অন্য কিছু করে গায়ের ঝাল মেটাও। তাই না? মিষ্টার মৌমাছি আর কি করে, রাগ ভরা চোখে তাকালো বাইরের দিকে। রোদ উঠেছে, শীত [illegible] বাই-যাই করছে, বসন্ত এসে গেছে [illegible] আভাস পাওয়া যায় বাতাসে।

মৌমাছি বিরক্ত হয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, হাত-পাগুলো বেশ ভালো করে ছড়িয়ে আড়ামোড়া ও আলিস্যি ভেঙ্গে উঠে বসলো। কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গালো কে?

কে সে দুষ্টু লোক?

রাগে চীৎকার করে মিষ্টার মৌমাছি বললে: কে রে, কোন্ দুষ্টু লোক আমার এমন ঘুমটা মাটী করে দিলে? হাতের কাছে তাকে পেলে এমন হুল ফুটিয়ে দেবো, মজা টের পাবে তখন।

রাগে গর-গর করছে মিষ্টার মৌমাছি।

চেঁচিয়ে গলা প্রায় ধরিয়ে ফেলেছে, এমন সময় শুনতে পেলে, কে যেন কাঁদছে। বিচ্ছিরী কান্না, কখনও ফুঁপিয়ে, কখনও হুঁ-হুঁ করে—কি বিচ্ছিরী, কি বলবো।

এই বিচ্ছিরী কান্না শুনে অবাক্ হয়ে মিষ্টার মৌমাছি এদিক্ ওদিক্ তাকালো। কই? কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না। নিজের ঘর-বাড়ী তন্ন তন্ন করে খুঁজে হতাশ হয়ে পড়লো···তবু কাউকে পাওয়া যায় না।

তবে কাঁদে কে?

তবে কি এই কান্না শুনেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেলো?

মিষ্টার মৌমাছি ভাবতে লাগলো।

—আঃ, জ্বালালে দেখছি! হুঁ-হুঁ করে কাঁদবে, ডাকলে সাড়া দেবে না, আচ্ছা ছিঁচকাঁদুনে।

এবার মিষ্টার মৌমাছি রেগে চীৎকার করে উঠলো—অসভ্য লোক, হুঁ-হুঁ করে কাঁদবে, ডাকলে সাড়া দেবে না।

কে যেন পরিষ্কার গলায় বললে: আমি ছিঁচকাঁদুনে নই।

চমৎকার মিষ্টি গলা, কেমন যেন চেনা-চেনা লাগছে।

মিষ্টার মৌমাছি তো অবাক্। চারি দিক্ তাকিয়ে সে দেখতেই পেলো না। উত্তরটা এমন মিষ্টি সুরে কে দিলো—তাই রাগ করে বললে: ভীতু কোথাকার! লুকিয়ে কাঁদে, মিনমিনে গলায় কাঁদে, বিচ্ছিরী সুরে কাঁদে—

—বা রে, আমি লুকিয়ে কোথায়—এই তো আমি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, উপর দিকে তাকাও।

—আরে! মিষ্টার মৌমাছি লাফিয়ে উঠলো, গলাটা একটু মিঠে করে বললে, প্রজাপতি দাদা, তুমি?

—হ্যাঁ, আমি।

—তোমাকে দেখতেই পাইনি।

—অথচ আমাকে বাদ দিয়ে সব জায়গা দেখেছ।

—তুমি কাঁদছিলে প্রজাপতি-দাদা? মৌমাছি অবাক্ হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।

—হ্যাঁ, কাঁদছিলাম—প্রজাপতি দুঃখিত হয়ে বললে।

—কিন্তু কেন?···অবাক্ হয়ে মৌমাছি জিজ্ঞাসা করলো।

এমন সুন্দর সকালে, রোদে-রাঙা দিনে ঘন নীল আকাশের দিকে চেয়ে মৌমাছি অবাক্ হয়ে ভাবতে থাকে। প্রজাপতি হঠাৎ কাঁদে কেন? কি তার দুঃখ? প্রজাপতিকে চুপ করে থাকতে দেখে সে আবার বলে: তোমার কি হয়েছে প্রজাপতি দাদা, আমি তো কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না? কি, চুপ করে আছ কেন? বলো—

মুখ কাঁচু-মাচু করে প্রজাপতি বললে—তুমি ভয়ানক অবাক্ হচ্ছ না ভাই মৌমাছি?

—অবাক্ হবো না—তুমি যে ছিঁচকাঁদুনে তা কি জানতুম?

মিষ্টার মৌমাছি খাপ্পা হয়ে ওঠে।

—রাগ করছো কেন ভাই—প্রজাপতি ঠাণ্ডা গলায় বলে।

—না রাগ করবো না—মৌমাছি মশাই চটে-মটে গজ গজ করে উঠলো—এমন সুন্দর সকাল—কোথায় একটু আনন্দ করবে তা নয় কেবল কান্না। শীত-বুড়ো চলে গেছে, বাতাসে বসন্তের আভাস, বনে বনে ফুল ফুটবে—তখন তো আমাদেরই রাজত্ব শুরু হবে—এখন তো আনন্দ করার কথা।

—ঠিক কথা বলেছ মৌমাছি-ভাই, কিন্তু ফুল ফুটবে এ কথা কে বলেছে?

—কেন? বসন্তকাল আসবার কি এখনও দেরী আছে প্রজাপতি-দাদা?

—না।

—তবে ফুল ফুটবে না কেন? মৌমাছি আরো অবাক্ হয়—আরে কি যা-তা বকছো প্রজাপতি দাদা, তোমার কি মাথা-টাথা খারাপ হয়েছে না কি? বসন্তের হাওয়া বইছে অথচ ফুল ফুটবে না, চাঁদ উঠবে অথচ আলো ফুটবে না—মৌমাছি কৌতুক-ভরে হো-হো করে হেসে উঠলো···।

প্রজাপতি চুপ করে তাকিয়ে রইল মৌমাছির দিকে।

মৌমাছির মিষ্টি হাসি বসন্ত বাতাসে ফুর্‌ফুর্ করে ভেসে গেল। অনেকক্ষণ সে চুপ করে থাকার পর প্রজাপতি বললে: শুয়ে কেবল স্বপ্ন দেখলেই আর ঘুমোলেই কি ফুল ফোটে? ওঠো, তাকিয়ে দেখো ঐ পশ্চিম দিকে—

—আরে উঠে কি করবো ছাই। মৌমাছি খিঁচিয়ে উঠলো।

—আহা, ওঠোই না, কথায় তো বিশ্বাস হয় না। তাই বলছি উঠে নিজের চোখে দেখো।

অগত্যা মৌমাছি বেচারা কি আর করে, প্রজাপতির কথায় তার বিছানায় উঠে বসলো। খুব বিরক্ত হয়েছে সে, তার মুখখানা দেখলেই বোঝা যায়। সত্যি বলো তো, কার না রাগ হয়? সকাল-বেলায় দিব্যি শুয়ে-শুয়ে আরাম করছিল মিষ্টার মৌমাছি, আর কোথা থেকে প্রজাপতি-দাদা বিচ্ছিরী নাকি সুরে কান্না জুড়ে দিলো—আচ্ছা ফ্যাচাং।

প্রজাপতি মৌমাছির মনের সব কথাগুলো জানতে পেরেছিল তার মুখের চেহারা দেখে। তাই সে ম্লান হাসি হেসে বললে: তোমার খুব রাগ হয়েছে, তাই না মৌমাছি-ভাই, কিন্তু সত্যি নিজের চোখে তাকিয়ে দেখো ঐ পশ্চিম দিকে···।

—কি দেখবো?

—আহা, দেখই না, তাকাও—তাকাও পশ্চিম দিকে।

প্রজাপতির কথা-মত মৌমাছি বিরক্ত হয়ে তাকালো পশ্চিম দিকে।

—কি, কিছু দেখতে পাচ্ছ?

—কই কিছু না তো—

—ভালো করে দেখো, তাহলে দেখতে পাবে—

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইল মৌমাছি প্রজাপতির কথা-মত পশ্চিম দিকে। তার চোখে পড়লো নীল ঘন আকাশ, তারই সজল শ্যামল ছায়া পড়েছে বনে পথে প্রান্তরে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার দরুণ তার চোখ টন্‌টন্ করতে লাগলো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর তার মনে হলো, কালো ঘন ধোঁয়া অনেক দূরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এ কি সত্যি কালো ধোঁয়া? না অনেক-ক্ষণ তাকিয়ে থাকার দরুণ সে এই রকম দেখছে।

—কালো ধোঁয়া দেখতে পাচ্ছ? প্রজাপতির অস্ফুট কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, কালো ধোঁয়া। কালো ধোঁয়া—মৌমাছি উত্তেজিত হয়ে উঠলো, তার গলার স্বর কাঁপতে লাগলো।

—এত ধোঁয়া! এত ধোঁয়া কোথা থেকে এলো প্রজাপতি-দাদা, কোথাও কি আগুন লেগেছে? ভয় ও চাপা উত্তেজনা তার কণ্ঠে।

প্রজাপতি তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে রইল—তার পর শান্ত গলায় বললে: এই জন্যেই তো কাঁদছিলাম মৌমাছি ভাই, আগুন লেগেছে পশ্চিমে, সেই আগুন ছড়িয়ে পড়েছে সারা পৃথিবীতে। এই আগুনে, এই কালো ধোঁয়ায়—বসন্ত কি আসবার পথ খুঁজে পাবে আমাদের এ দেশে? ফুল কি ফুটবে বাগানে? সব জ্বলে কালো হয়ে যাবে, সেই ভয়েই আমি কাঁদছি মৌমাছি ভাই! সারা দেশ জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে যেতে বসেছে আর তোমরা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছো বসন্ত-বাতাসের, ফুল ফোটার, মধু সঞ্চয়ের, সোনার দেশের। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছো আর দেশ জ্বলে যাচ্ছে, তাই আমি কাঁদছি মৌমাছি-ভাই।

মৌমাছির মুখখানা ভয়ে, দুঃখে, অনুতাপে কি রকম হয়ে গেছে। প্রজাপতির কাছে সরে এসে ব্যাকুল হয়ে বললে: কি করবো আমরা বলো, প্রজাপতি-দাদা বলো কি করবো দেশের এই দুর্দিনে, এই দুঃখে, এই বিপদে—কি করবো বলে দাও প্রজাপতি-দাদা।

—কি করবে? ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখো না, বিপদে অধীর হয়ো না, কাঁদুনি গেয়ো না। ওঠো, ডাকো, দল বাঁধো, যারা আমাদের এ দেশে আগুন জ্বালাচ্ছে, আমাদের দেশে ফুল ফুটতে দিচ্ছে না, দেশে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে আমাদের সোনার দেশ শ্মশান করে দিচ্ছে, তাদের উচ্ছেদ করো, দূর করো, তার পর ফুল ফোটার স্বপ্ন দেখো, এখন ফুল ফোটার স্বপ্ন দেখার সময় নয়!

—কিন্তু কারা এ আগুন জ্বালিয়েছে প্রজাপতি-দাদা?

—কারা? তারা ঐ মানুষ, ঐ স্বার্থপর মানুষরা। আমাদের চাক্-এ মধু জমাই আমরা আর তারা সকলের অলক্ষ্যে সেই মধু

নিয়ে যাচ্ছে—তারা, তারাই সেই স্বার্থপর মানুষেরা নিজেদের সুবিধার জন্তে আগুন জালিয়েছে। আমরা একত্র না হলে এই আগুন নিববে না, দেশ ছারখার হয়ে যাবে।

—চলো প্রজাপতি-দাদা, চলো সবাইকে ডাক দিই।

প্রজাপতি-দাদা আর মৌমাছি-ভাই দু'জনে বেরিয়ে পড়লো এবং উড়ে চললো সেই কালো ঘন ধোঁয়ার দিকে, আগুন যেখানে জ্বলছে।

আমি অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখলাম, সোনার দেশের মৌমাছির আর প্রজাপতির এই নব আয়োজন।

তাদের পাখা কি আগুনে ঝলসে যাবে? তারা কি আগুন নিবিয়ে স্বার্থপর মানুষদের তাড়িয়ে আবার সোনার দেশে বসন্তকে আহ্বান করে আনবে, বনে বনে ফুল ফোটাবে···?

সে কথাই জানা যাবে আগামী বসন্তে।

বিষ্ণুগুপ্ত

শ্রীরবিনর্ত্তক

২১

গোলমাল শুনে চাণক্য ডাকলেন—'শার্ঙ্গরব! শার্ঙ্গরব'! প্রভু!' বলে ছুটে এলেন শিষ্য। 'কিসের গোলমাল উঠেছে বাইরে?' চাণক্যের প্রশ্ন। 'প্রভু! ক্ষপণক জীবসিদ্ধি রাক্ষসের চর ব'লে ধরা পড়েছে। তাই তাকে গাধার পিঠে চাপিয়ে নগর থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই দেখতে লোকের ভিড় হয়েছে'।

চাণক্য গম্ভীর হয়ে বললেন—'শুনলে ত চন্দনদাস! শত্রুর চর হ'লে তার অদৃষ্টে দুঃখ অনিবার্য্য! নেহাত সন্ন্যাসী ব'লেই জীবসিদ্ধির প্রাণটা যায়নি। সাধারণ লোক হ'লে শূলে চাপত'।

চন্দনদাস—'প্রভু! আমি নির্দ্দোষ। আমার বাড়ীতে রাক্ষসের পরিবারবর্গ কেউ নেই'।

আবার বাইরে গোলমাল শোনা যেতে লাগ্‌ল। শার্ঙ্গরবের উপর আবার ভার পড়্‌ল ব্যাপার কি জানবার। এবারও শার্ঙ্গরব ফিরে এলেন আর একটা খারাপ খবর নিয়ে—কায়স্থ শকটদাস রাজদ্রোহী ব'লে ধরা পড়েছেন, বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়েছে. তাঁকে শূলে দিতে নিয়ে যাচ্ছে—তাই দেখ্‌তে যে ভিড় জমেছে তারই ঐ গোলমাল।

চাণক্য গম্ভীর ভাবে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপন মনে বল্‌লেন—'নিজের কর্ম্মফল ভুগুক নিজে—কে তা খণ্ডাতে পারে'! তার পর তাকালেন তিনি একদৃষ্টিতে চন্দনদাসের পানে। তাতে শ্রেষ্ঠীর মনে হ'ল যেন কুটিল দৃষ্টিতে কৌটিল্য তাঁর অন্তরের অন্তর পর্য্যন্ত বেশ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন। ভয়ে তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল—মাথা ঘুরে উঠল—সারা গায়ে বিন্‌-বিন্ ক'রে ফুটে উঠল ঘাম। তিনি চোখ বুজ্‌লেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাণে গেল চাণক্যের পরুষ বাণী—'দেখ চন্দনদাস! আমাদের নতুন রাজা বড় কঠোর দণ্ড দিয়ে থাকেন—তার প্রমাণ ত তুমি হাতে হাতেই পেয়েছ। তুমি যে রাক্ষসের পরিবারবর্গ লুকিয়ে রেখেছ—এ অপরাধের ক্ষমা তুমি রাজার কাছে কিছুতেই পাবে না। তাই বল্‌ছি—ভাল চাও ত এখনও রাক্ষসের পরিবারবর্গকে আমার হাতে সঁপে দিয়ে সপরিবারে নিজের প্রাণ বাঁচাও'।

চন্দনদাস এবার মরিয়া হ'য়ে উঠেছে—বাঁ হাতে কপালের ঘাম মুছে মুখ তুলে নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—'আর্য্য বিষ্ণুগুপ্ত! আপনি কি ভয় আমাকে দেখাচ্ছেন! রাক্ষসের পরিবারবর্গ সত্য আমার বাড়ীতে থাকলেও আপনার হাতে তুলে দিতুম না—এখন ত তাঁরা সত্যই নেই আমার এখানে—তা আর ধরিয়ে দোব কি ক'রে'?

চাণক্য গম্ভীর—নীরস স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—'চন্দনদাস! এই তোমার স্থির সিদ্ধান্ত'?

চন্দনদাস বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই উত্তর দিলেন—'হাঁ! এই স্থির'!

এবার কিন্তু [illegible] মনে মনে চন্দনদাসের তারিফ না ক'রে থাকতে পারলেন না। তবু মুখে ব[illegible] 'ঠিক'?

চন্দনদাস সমান ভাবে উত্তর করলেন—'হাঁ'।

হঠাৎ চাণক্যের শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠ্‌ল। চাপা কর্কশ কণ্ঠে বল্‌লেন—'ওরে দুষ্ট! রাজকোপ এবার ভোগ ক'রে দেখ্'।

চন্দনদাস স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে—চাণক্যের অগ্নিমূর্ত্তিও তাঁকে টলাতে পারল না—শুধু মুখে তাঁর বেরুল—'বেশ! প্রভু! আমি প্রস্তুত। যে শাস্তি ইচ্ছা—দিন'।

চাণক্য হাঁক দিলেন—'শার্ঙ্গরব! নগরের কোটাল দু'জনকে বল গিয়ে—যেন শীগ্‌গির এই দুষ্টটাকে শেষ ক'রে দেওয়া হয়'। তখনই হঠাৎ ধ্যানস্থ হ'য়ে আবার ব'লে উঠ্‌লেন—'আচ্ছা থাক্। দুর্গ খাক্ষ বিজয় পালকে গিয়ে জানাও—তিনি যেন এখনই চন্দনদাসের বাড়ীতে গিয়ে তার পরিবারবর্গকে দুর্গে বন্দী করেন। তার বাড়ী রাজার দখলে থাকবে। আমি একবার রাজাকে সব কথা জানাই। প্রাণদণ্ড রাজারই দেওয়া উচিত হবে—আমি আর দোব না'।

শিষ্য যেতে পা বাড়িয়েছেন, চাণক্য বল্‌লেন—'চন্দনদাসকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বিজয় পালের জিম্মা ক'রে দাও'।

চন্দনদাস হাসিমুখেই বেরিয়ে গেলেন শার্ঙ্গরবের সঙ্গে। সপরিবারে মরণের মুখে গিয়েও যে তিনি তাঁর বন্ধুর পরিবারবর্গকে বাঁচাতে পেরেছেন—এই আনন্দে তাঁর মৃত্যু-ভয় পর্য্যন্ত দূরে গিয়েছিল।

চন্দনদাস নজরের আড়ালে যেতেই চাণক্য আপন মনে ব'লে উঠ্‌লেন—'রাক্ষস! এবার তোমায় পেয়েছি। চন্দনদাস ভাব্‌লে তোমার পরিবারবর্গকে বাঁচালে—কিন্তু ধরিয়ে দিলে আসলে তোমাকেই। তার বিপদ্ শুন্‌লে তুমি ধরা যে দেবেই—তা আমি জানি'।

আবার কোলাহল উঠ্‌ল রাস্তায়। চাণক্য আবার ডাকলেন—'শার্ঙ্গরব! চ'লে গেছ না কি'?

বাইরে থেকেই চন্দনদাস সাড়া দিলেন—'না, প্রভু! তিনি ঘরের দোর বন্ধ করছেন'।

চাণক্য আদেশ করলেন—'এ গোলমালটা আবার কিসের—একবার দেখতে বল ত'।

শার্ঙ্গরব সব ব্যাপার দেখে এসে জানালেন—'শ্মশান থেকে ঘাতকদের হাত ছিনিয়ে শকটদাসকে নিয়ে পালিয়েছে সিদ্ধার্থক।'

চাণক্য মনে মনে হেসে বললেন আপন মনে—'বেশ! সিদ্ধার্থক! কাজ ভাল ভাবেই আরম্ভ করেছ দেখছি'! তার পর

চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি বললে! শকটদাস পালিয়েছে? আচ্ছা, তুমি ভাগুরায়ণকে খবর দাও ত—আসামীকে গিয়ে ধ'রে আনতে'।

শার্ঙ্গরব ফিরে এসে জানালেন—ভাগুরায়ণও সেই সঙ্গে পালিয়েছে।

কৌটিল্যের মনে আনন্দ আর ধ'রে না। তাঁর ছকা কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। মুখে তবু আদেশ দিলেন—'এখনই ভদ্রভট, পুরুষদত্ত, বলগুপ্ত, রাজসেন, রোহিতাক্ষ আর বিজয়বর্ম্মাকে বল যেন তাঁরা নিজের নিজের সেনা-দল নিয়ে পলাতক আসামীদের পিছু ধাওয়া ক'রে তাদের [illegible]নেন'।

শার্ঙ্গরব [illegible]তাশ হ'য়ে ফিরে এসে বললেন—'প্রভু! [illegible] [illegible] ভদ্রভট প্রভৃতি সবাই আজ ভোরে পালিয়েছে—সবাই বিদ্রোহী হ'ল না কি'!

চাণক্যের অধরে বিদ্যুতের মত হাসি খেলে গেল। তিনি শুধু মুখে বললেন—'আচ্ছা, আমি সব ব্যবস্থা করছি, তুমি চন্দনদাসকে নিয়ে যাও'।

[ক্রমশঃ।

আড়ি

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকার সাথে আজ সকালে খুকুর হ'ল আড়ি।
দোতলাতে গেলো খুকু—চ'ল মামার বাড়ী।
রইল পুতুল মেঝের পরে হয় না মালা গাঁথা—
মন দিয়েছে পড়ায় খোকা নিয়ে বই আর খাতা।

খাঁচার থেকে ময়নাটা আজ বলছে না আর কথা।
বড়াই ভরা চড়াইগুলোর থমথম্ নীরবতা।
বকাবকি হাঁকাহাঁকি নেইক দাপাদাপ্ দুপ্ দুপ্।
খুকু-খোকার আড়ি—বাড়ী—একেবারেই চুপ্।

দোতলাতে জানালা খুলে দেখছে খুকু চেয়ে—
বকুল বনে আঁধার করে মিষ্টি এলো ধেয়ে।
বেড়ার ধারে জড়িয়ে ওঠে অপরাজিতা লতা
নীল ফুলেরা বলছে তারে কতই কি যে কথা।

একটি পাতা খুলে বইয়ের—সিঁড়ির দিকে চেয়ে—
কোন্ কথাটি ভাবছে খোকা বন গিয়েছে ছেয়ে—
কদম ফুলে—বাদলা হাওয়া বইছে থেকে থেকে—
ঝড়ের দেশে যাবি ছুটে আয় রে তোরা কে কে!

আমি যাবো—বলে খোকা বাইরে এলো ছুটি,
জল পড়ছে হাওয়ায় গাছের মাথা মাটীর ওপর লুটি।
ঘরে সে আর ফিরবে না ত—পার হবে ওই বন।
তেপান্তরের দেশেই যাবে—খোকার হল' মন।

পিছন থেকে হঠাৎ কে তার হাতটি ধরে টানে।
ঝড়ের মাঝেই এলো খুকু—খোকা তা না জানো।
চোখটি মুছে বলছে খুকু—দাদা আমার শোনো,
দুষ্টু আমি তোমায় আর বলব না কখনো।

এক সত্যিকারের গল্প

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

অনেক দিন আগেকার কথা, লণ্ডনের রাজপথের উপর দিয়ে ছুটে চলছে একখানা ট্রাম। বেশ শীত পড়েছে। বেশী লোকজন নেই তাই পথে। বিশেষ প্রয়োজন যাদের তারাই কেবল বেরিয়ে পড়েছে। ট্রামের ভেতরেও যাত্রীর সংখ্যা বেশ কম। কেবল জনকয়েক যাত্রী বসেছিলেন চুপ-চাপ ভাবে। ট্রামের এক কোণে বসেছিলেন এক জন ইংরেজ ভদ্রলোক। একটা বই পড়ছিলেন তিনি। অন্য দিক থেকে আর এক জন ভদ্রলোক উঠে এলেন, বসে পড়লেন সেই কোণের ভদ্রলোকটির পাশে। নবাগত ভদ্রলোকটি একবার বইটির দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, "ও, হাক্সলির বই পড়ছেন আপনি! হ্যাঁ, লোকটির লেখবার শক্তি আছে।"

বইপড়া ভদ্রলোকটি একবার যেন কৃপার দৃষ্টিতে চাইলেন নবাগত ভদ্রলোকটির দিকে। বললেন, "চেনেন আপনি মিঃ হাক্সলিকে?"

"উঁহু। সে সৌভাগ্য হয়নি এখনো।" বিশেষ দুঃখিত ভাবে বললেন নবাগত ভদ্রলোকটি।

ট্রামের প্রত্যেকের পানে চেয়ে বইমুখো ভদ্রলোকটি বললেন, "আপনারা কেউ চেনেন কি?"

"উঁহু।" ট্রামের সকলে প্রায় সমস্বরে বলে উঠলেন।

"আমিই হাক্সলি।" ট্রামের ভেতর যেন অকস্মাৎ বজ্রপাত হোল বইমুখো ভদ্রলোকটির কথায়। সকলেই প্রায় চঞ্চল হয়ে উঠলেন। বিখ্যাত লেখক হাক্সলি আজ তাঁদের সঙ্গী—এ কি কম গৌরবের কথা? সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন হাক্সলির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য। তৃতীয় এক জনকে এ বিষয়ে সবচেয়ে উৎসাহ প্রকাশ করতে দেখা গেল। কিন্তু বেশীক্ষণ আলাপ করবার সুযোগ পেলেন না তিনি। শীগ্‌গিরই নেমে যেতে হোল তাঁকে। যাওয়ার সময় নিজের নামের কার্ড হাক্সলিকে দিয়ে তিনি বলে গেলেন "সময়মত একবার আমার সঙ্গে দেখা করলে বাধিত হব আমি।"

কার্ডটার দিকে একবার তাকালেন হাক্সলি। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁর হাত কেঁপে উঠলো, কার্ডটা হাত থেকে খসে পড়লো। ব্যাপার কি? কি আছে ওতে? সকলেই প্রায় ঝুঁকে পড়লেন কার্ডটার ওপরে। সবিস্ময়ে দেখলেন তাঁরা কার্ডটায় পরিষ্কার ভাবে ছাপা রয়েছে হাক্সলির নাম। চমকে উঠলেন সকলে। বইমুখো ভদ্রলোকটি তাহলে হাক্সলি নয়। তৃতীয় ভদ্রলোকটিই তাহলে আসল হাক্সলি! সকলে চাইলেন বইমুখো ভদ্রলোকটির দিকে। কিন্তু কোথায় তিনি? বইমুখো ভদ্রলোকটি ততক্ষণে চলন্ত ট্রাম থেকে লাফিয়ে পড়েছেন পথে।

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক হাক্সলির নাম তোমরা জান নিশ্চয়ই। সেই হাক্সলির জীবনেই ঘটেছিল এই ঘটনাটি। ঘটনাটি খুব মজার নয় কি?

সোনার আনারস

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

একাদশ

মাণিকের ব্যাগে অশ্বডিম্ব নেই

গহন বন তো গহন বন। অরণ্যের এমন নিবিড়তা কেউ কল্পনা করেনি। এত বুড়ো বুড়ো গাছ খুব কম বনেই চোখে পড়ে—জন্মেছে তারা কোন্ মান্ধাতার আমলে তাও আন্দাজ করবার যো নেই। কোথাও কোথাও তারা পরস্পরকে এমন জড়াজড়ি করে আছে এবং তাদের উপর দিক্‌টায় লতা-পাতারা এমন ভাবে ঘন জাল বুনে রেখেছে যে, দুপুরের রোদও ভিতরে প্রবেশ করবার পথ পায়নি বললেও চলে।

সর্ব্বত্রই ঝোপ-ঝাপ, কাঁটা জঙ্গল এবং মানুষের মাথা-ছাড়িয়ে-ওঠা আগাছার ভিড়। সেইগুলোকে ঠেলে ঠেলে কোন রকমে পথ ক'রে নিতে হয়। গায়ে পট্-পট্ ক'রে কাঁটা বেঁধে, আশেপাশে কোঁশ্-কোঁশ্ ক'রে ভয়াবহ শব্দ শোনা যায়, মাঝে-মাঝে হোঁচট খেয়ে পথিকদের দেহ হয় পপাত ধরণীতলে, কিন্তু তবু নির্ব্বাপিত হ'ল না জয়ন্তের উৎসাহ-বহ্নি!

সুন্দর বাবু মুখব্যাদান ক'রে বিষম হাঁপাতে-হাঁপাতে বললেন, "দারোগা বাবু, ডানপিটে জয়ন্তটা আজ আমাদের শমন-সদনে প্রেরণ করতে চায় না কি?"

রুদ্ধ ক্রোধে ফুলতে-ফুলতে দারোগা বাবু বললেন, "জানি না। এমন চূড়ান্ত ক্ষ্যাপামি জীবনে আর কখনো দেখিনি।"

—"হুম্। কিন্তু কথা হচ্ছে আমরা কোথায় কোন্ দিকে যাচ্ছি?"

জয়ন্ত বললে, "আমরা যাচ্ছি পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে।"

—তাই না কি? চোখে তো দেখছি খালি ঝোপ-ঝাপ আর অন্ধকার। এর মধ্যে এসে তুমি কি দিক্‌বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে ফেলনি?"

উঁহু!"

—"কেমন ক'রে জানলে?"

হাত তুলে একটা জিনিষ দেখিয়ে জয়ন্ত বললে, "এই আমাদের পথ-প্রদর্শক।"

—"কি ওটা হে? ভালো ক'রে দেখতে পাচ্ছি না।"

—"কম্পাস।"

—"কিন্তু পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধ'রে এগিয়ে তুমি কি পরমার্থ লাভ করবে?"

—"শুনলে বিশ্বাস করবেন না।"

—"বিশ্বাস করব না কি-রকম?"

—"উঁহু, বিশ্বাস করবেন না।"

—"আলবৎ করব, হাজার বার করব। তোমার ল্যাজ ধরতে যখন বাধ্য হয়েছি, তখন সোনার পাথরবাটি দেখেও আমার আর অবিশ্বাস করবার উপায় নেই।"

—'সোনার পাথরবাটি তো একটা অকিঞ্চিৎকর দ্রব্য। এ হচ্ছে তারও চেয়ে অবিশ্বাস্য।"

—"ও বাবা, হাওঁ না কি? [illegible]ই যে আক্কেল গুড়ুম্ হয়ে যাচ্ছে!"

—"তা যাবেই তো!"

—"অত প্যাঁচ কষ্‌ছ কেন ভায়া? আসল ব্যাপারটা খুলেই বল না।"

—"শুনবেন তা'হলে?"

—"শুনব ব'লে তো উভয় কর্ণ খাড়া ক'রে আছি। স্পষ্ট ক'রে বল, পথের শেষে গিয়ে তুমি কি দেখতে চাও?"

—"একটি প্রকাণ্ড, অখণ্ডমণ্ডলাকার, দুগ্ধফেননিভ অশ্বডিম্ব।"

সুন্দর বাবু খানিকক্ষণ অতি গম্ভীর ভাবে অগ্রসর হ'লেন। তার পর আহত কণ্ঠে বললেন, "জয়ন্ত, তুমিও?"

—"মানে?"

—"তুমিও আমার সঙ্গে বাজে ঠাট্টা সুরু করলে মাণিকের মত?"

—"ঠাট্টা নয় সুন্দর বাবু, ঠাট্টা নয়! পথের শেষে গিয়ে যে কি দেখব, তা নিজেই আমি জানি না। কে জানে, আমার সমস্ত জল্পনা-কল্পনা শেষটা অশ্বডিম্বের মতই অলীক ব'লে প্রতিপন্ন হবে কি না!"

দারোগা বাবু ঝাঁঝালো গলায় বললেন, "চমৎকার জয়ন্ত বাবু, চমৎকার! তাহ'লে আপনি আমাদের এই নরক যন্ত্রণা ভোগ করাতে চান কেবল কাদা ঘেঁটে ফিরে আসবার জন্যে?"

জয়ন্ত ঠোঁট টিপে একটুখানি হাসলে, কোন জবাব দেওয়া দরকার মনে করলে না।

দারোগা বাবু দাঁড়িয়ে প'ড়ে চীৎকার ক'রে ডাকলেন, "সুন্দর বাবু!"

—"হুম্, হুম্! বড্ড রেগেছেন দেখছি।"

—"হাঁ, তাই।"

—"কিন্তু—"

—"এখানে আর কিন্তু-টিন্তু নেই।"

—"তবে?"

—"আপনি আর আমি দু'জনেই পুলিসের লোক।"

—"বলা বাহুল্য।"

—"আমরা হচ্ছি কাজের মানুষ!"

—"অত্যন্ত।"

—"আমরা কি পাগলের মত, গাধার মত অশ্বডিম্বের পিছনে ছুটতে পারি?

—"হুম্, হুম্ কিছুতেই না!"

মাণিক এইবারে মুখ খুললে। বললে, "এ কথা আপনি কি ক'রে জানলেন দারোগা বাবু?"

—"কি কথা?"

—"গাধারা আর পাগলরা অশ্বডিম্বের পশ্চাতে ধাবমান হয় ?"

—"মাণিক বাবু, আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। সুন্দর বাবু !"

—"উঁ !"

—"আমাদের এখন কি করা উচিত জানেন ?"

—মোটেই জানি না।"

—"আমাদের এখন উচিত, এইখান থেকেই ধুলো-পায়ে বিদায় নেওয়া।"

—"অর্থাৎ আবার কোদালপুরে ফিরে যাওয়া ?"

—"ঠিক !"

দারোগা বাবুর দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে সুন্দর বাবু করলেন এ[illegible]ন্তের এবং আর-একবার মাণিকের মুখের উপরে দৃষ্টিপাত। তার পর মাথা নেড়ে করুণ স্বরে বললেন, "হুম্, অসম্ভব !"

—"কি অসম্ভব ?"

—"এখন কোদালপুরে ফিরে যাওয়া।"

—"কেন ?"

—"জয়ন্তের পাগলামি আর মাণিকের দুষ্ট রসনাকে আমি সমর্থন করি না বটে, কিন্তু বোধ হয় ওদের আমি কিছু-কিছু—ওর নাম কি—ভালোবাসি। আমার পক্ষে ওদের ছেড়ে চলে যাওয়া অসম্ভব। নিতান্তই যদি যেতে চান তাহ'লে আপনাকে যেতে হবে একলাই।"

দারোগা বাবুর দুই চক্ষে ফুটল তীব্র ভাব। কিন্তু তিনি আর দ্বিরুক্তি না ক'রে অগ্রসর হ'তে লাগলেন সকলের পিছনে পিছনে। বোধ করি তিনি বুঝতে পারলেন যে, একলা এই বন থেকে বেরুবার চেষ্টা করলে পথ হারাবার সম্ভাবনাই হবে বেশী।

জয়ন্ত নিজের হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, "আমরা প্রায় পথের শেষে এসে পড়েছি—আর মিনিট পনেরোর মধ্যেই একটা কিছু হেস্ত-নেস্ত হয়ে যেতে পারে।"

সুন্দর বাবু বললেন, "শুনলেন তো দারোগা বাবু ! এতক্ষণ ধরে এত যমযন্ত্রণাই যখন ভোগ করলুম তখন আর মিনিট পনেরোর জন্যে অশান্তি সৃষ্টি ক'রে লাভ কি ? বিশেষ, উদরে হয়েছে এখন দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার উদয়—আর খোরাক আছে ঐ মাণিকেরই ব্যাগের জঠরে। আমরা এখান থেকে এখনি বিদায় নিতে চাইলে মাণিক কি তার ব্যাগ খুলতে রাজি হবে ?"

জোরে মাথা নাড়া দিয়ে মাণিক বললে, "নিশ্চয়ই নয় !"

—"ওরে বাবা, ব্যাস্ ! এর ওপরে আর কোন কথা বলাই বাতুলতা ! হাতের খোরাক পায়ে ঠেলে উপোস ক'রে ধুঁকতে-ধুঁকতে আমি যাব কোদালপুরে ফিরে ? হুম্, হুম্ হুম্ ! অসম্ভব, অসম্ভব, অসম্ভব ! অন্তত মাণিকের ব্যাগের ভিতরে যে অশ্বডিম্ব নেই, সেটা আমি রীতিমত হৃদয়ঙ্গম করতে পারছি !"

দারোগা বাবু নিরুত্তর হয়েই রইলেন। তার অবস্থা দেখলে মনে হয় একেবারে যাকে বলে—নাচার আর কি !

তার পর খানিকক্ষণ আর কোন কথাবার্তা হ'ল না। অরণ্যের অবস্থা তখনও একই রকম—আধা আলো আধা আঁধার-মাখা রহস্যময় আবহাওয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে অগণ্য বনস্পতি মর্ম্মর-ভাষায় রচনা করছে কোন্ অজানার পূজার মন্ত্র।

মাণিক দাঁড়িয়ে প'ড়ে বললে, "পায়ের তলায় মাটি এখানে ঢালু হয়ে নেমে গিয়েছে কেন ?"

জয়ন্ত এদিকে-ওদিকে তাকিয়ে বললে, "মাণিক, মাটি এদিকে ঢালু হ'য়ে নেমে, ওদিকে আবার উঁচু হয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে। আগে নিশ্চয়ই এখানে একটা জলভরা খাত ছিল।"

সেই শুকনো খাতের অন্য পাড়ের উপরে রয়েছে একটা জঙ্গলময় উঁচু ঢিপি,—যেন একটা ছোট খাটো পাহাড়। ঢিপিটা দখল ক'রে আছে অনেকখানি জায়গা।

ঢিপির উপরে উঠে দেখা গেল তার চারি দিকেই ছড়িয়ে প'ড়ে আছে রাশি রাশি সেকেলে ইট। আর একটা দৃশ্য সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। ওপাশে ঢিপিটা যেখানে নীচের দিকে নেমে শেষ হ'য়ে গিয়েছে, ঠিক সেইখানে রয়েছে প্রকাণ্ড একখানা অট্টালিকার ধ্বংসস্তূপ। একেবারে ধ্বংসস্তূপ বললে ঠিক বলা হয় না, কারণ সর্ব্বাঙ্গে ছোট-বড় অশত্থ-বট-নিম গাছের ভার বহন ক'রে অট্টালিকার একটা অংশ এখনো দাঁড়িয়েছিল মহাকালের বিরুদ্ধে মূর্তিমান প্রতিবাদের মত।

জয়ন্ত উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, "সুন্দর বাবু, আমার কল্পনা দেবী মিথ্যে কথা বলেননি। এই আমাদের পথের শেষ।"

সুন্দর বাবু উৎসাহের লক্ষণ প্রকাশ করলেন না। বললেন, "সমাপ্তিটা আশাপ্রদ ব'লে মনে হচ্ছে না।"

জয়ন্ত বললে, "আরে মশাই, আমরা কোথায় এসেছি বুঝতে পারছেন না ? সুব্রত বাবু, সারা পথটাই আপনি বোবার মতন কাটিয়ে দিয়েছেন। এইবারে মুখ খুলুন। বলুন দেখি, কোথায় এসেছি আমরা ?"

—"আমি কেমন ক'রে বলব ?"

—"তাহ'লে শুনুন। এই যে চারি দিকে খাত-ঘেরা উঁচু ঢিপিটা দেখছেন, এটা হচ্ছে কোন পুরাতন দুর্গের শেষ চিহ্ন। আর ঐ ভাঙা-চোরা অট্টালিকা হচ্ছে সেকালকার কোন রাজার বাড়ী। খুব সম্ভব ঐখানেই বাস করতেন সেই বাঘরাজারা, যাঁদের সম্বন্ধে সোনার আনারসের ছড়ায় বলা হয়েছে—

'বাঘরাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তু-ঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

বুঝলেন ?"

সুব্রত বললে, "আপনি কেমন ক'রে এই সিদ্ধান্তে এসে উপস্থিত হয়েছেন এখনো তা বুঝতে পারছি না।"

—"যথাসময়ে তা বলব ! এতক্ষণ পর্যন্ত ছড়া আমাদের ঠিক পথেই নিয়ে এসেছে। এইবারে দেখতে হবে ছড়ার শেষ দুই পংক্তির অর্থ আবিষ্কার করা যায় কি না। সুব্রত বাবু, অতঃপর হতভম্ব ভাবটা ত্যাগ ক'রে আপনি কিঞ্চিৎ জাগ্রত হবার চেষ্টা করুন।"

—"কেন বলুন দেখি ?"

—"হয়তো আপনার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন।"

সুন্দর বাবু বললেন, "হেঁয়ালি ছেড়ে সাদা ভাষায় কথা কও জয়ন্ত ! তুমি কি করতে চাও ?"

—"ঐ ভাঙা অট্টালিকার ভিতরে ঢুকতে চাই।"

—"কারণ ?"

—"কারণ ছড়ার রচয়িতার হুকুম।"

দারোগা বাবু একটা শ্রান্ত, বিরক্তিজনক মুখভঙ্গি করলেন নির্ব্বাক্ ভাবে।

—

দ্বাদশ

অন্দর-মহলের কূপঘর

অট্টালিকার এ-অংশটাকে বাইরে থেকে যতটা ভাঙা-চোরা ব'লে মনে হচ্ছিল, ভিতরে এসে দেখা গেল তার ততটা দুর্দ্দশা হয়নি।

মস্ত একটা উঠান—তার সর্ব্বত্র আগাছার রাজত্ব। উঠানের চারি দিকেই চকমিলানো ঘর। কোন কোন ঘরের ছাদ বা দেওয়াল ভেঙে পড়েছে এবং কোন কোন ঘরের দরজা বা জানলা নেই বটে, কিন্তু কয়েকটা ঘর এখনো অটুট অবস্থাতেই বিদ্যমান আছে।

এ-ঘর সে-ঘরের মধ্যে বেড়াতে-বেড়াতে জয়ন্ত বললে, "মনে হচ্ছে এ-অংশে ছিল রাজবাড়ীর অন্দর-মহল। মাণিক, এখানকার ভিত আর দরজা-জানলার স্থূলতা দেখ। এ-অংশটাকে বোধ হয় সুদৃঢ় আর সুরক্ষিত করবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হয়েছিল।"

মাণিক বললে, "হয়তো সেই জন্যেই রাজবাড়ীর এদিকটা এখনো ভেঙে পড়েনি।"

—"খুব সম্ভব তাই।"

তখনো ভালো ক'রে সন্ধ্যা নামেনি বটে, কিন্তু বাড়ীর উঠানে হয়েছে আবছায়ার সঞ্চার। এবং নীচেকার ঘরগুলোর ভিতরে ঢুকলে চোখ হয়ে যায় প্রায় অন্ধ।

জয়ন্ত বললে, "আমাদের সঙ্গে একটা পেট্রলের লণ্ঠন আছে। মাণিক, সেটা জেলে ফেল তো, ওদিকের ঘরগুলো এখনো পরীক্ষা করা হয়নি।"

সুন্দর বাবু নীরস কণ্ঠে বললেন, "সন্ধ্যে না হ'তেই বাড়ীখানাকে হানা-বাড়ী ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। এখানে এত পরীক্ষা-টরীক্ষার দরকার কি আছে বাপু? এখানে দেখবার কি আছে?"

—"বলেছি তো আমি এখানে এসেছি অশ্বডিম্বের সন্ধানে। যতক্ষণ-না তা পাই, খুঁজতে হবে বৈ কি।" জয়ন্ত বললে গম্ভীর কণ্ঠে।

মাণিক আলো জ্বালতে জ্বালতে ততোধিক গম্ভীর স্বরে বললে, "অশ্বডিম্বের ওম্‌লেট, অতিশয় সুস্বাদু। সুন্দর বাবু যদি ভক্ষণ করতে রাজি হন, আমি স্বহস্তে প্রস্তুত করতে পারি।"

হাঁ কিংবা না, কিছুই বললেন না সুন্দর বাবু, কেবল মাণিকের দিকে নিক্ষেপ করলেন একটি জ্বলন্ত ক্রোধকটাক্ষ। বোধ করি এই রকম কোন কটাক্ষেরই দ্বারা দেবাদিদেব মহাদেব একদা ভস্ম ক'রে ফেলেছিলেন মদন ঠাকুরকে। ভাগ্যে সুন্দর বাবু মহাদেব নন, এ-যাত্রায় তাই বেঁচে গেল মাণিক।

পেট্রলের প্রদীপ্ত লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে জয়ন্ত একটা ঘরে ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার পর বললে, "মাণিক!"

—"কি?"

—"ঘরের মাঝখানে কি রয়েছে দেখছ?"

—"হ্যাঁ। একটা বড় কূপ।"

—"কিন্তু ঘরের ভিতরে কূপ!"

—"তোমার মতে এদিকটা হচ্ছে রাজবাড়ীর অন্দর-মহল।"

—"হ্যাঁ।"

—"হয়তো এই ঘরটা ছিল রাজবাড়ীর মেয়েদের স্নানাগার। সেকালে তো কলের জল ছিল না, তাই অন্তঃপুরের জন্যে এই কূপ খনন করা হয়েছিল।"

জয়ন্ত অন্যমনস্কের মত বললে, "মাণিক, তোমার অনুমান অসঙ্গত নয়। কিন্তু—কিন্তু—" বলতে বলতে থেমে গিয়ে নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ।

তার পর সে অগ্রসর হ'য়ে [illegible] তীব্র শক্তিসম্পন্ন মস্ত টর্চের আলোক শিখা নিক্ষেপ করলে কূপের মধ্যে।

রীতিমত গভীর কূপ। জল চক্-চক্ ক'রে উঠল [illegible] নীচে।

জয়ন্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবলে। তার পর হঠাৎ ফিরে বললে, "মাণিক, বার কর একগাছা লম্বা আর মোটা দড়ী।"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্। দড়ী কি হবে শুনি?"

—"দড়ী অবলম্বন ক'রে আমি এই কূপের ভিতরে গিয়ে নামব।"

সুন্দর বাবু শিউরে উঠে বললেন, বাপ রে কেন?"

—"হয়তো ঐখানেই পাব অশ্বডিম্বের সন্ধান!"

সুন্দর বাবু দুই চক্ষু রসগোল্লার মতন ক'রে তুলে বললেন, "জয়ন্ত! ভাই জয়ন্ত! মিনতি করি, ক্ষান্ত হও! ছড়ার কথা তুমি সত্যি ব'লে মানো, অথচ ভুলে যাচ্ছ কেন যে, ছড়ায় লেখা আছে এখানে 'ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়'?"

মাণিক বললে "পানাই মানে কি জানেন?"

সুন্দর বাবু ঘাড় নেড়ে বললেন, "না। আর জেনেও দরকার নেই আমার। কারণ ব্রহ্মপিশাচ যখন 'পানাই' বাজায় তখন নিশ্চয়ই সেটা হচ্ছে কোন রকম ভয়ঙ্কর সৃষ্টিছাড়া বাদ্যযন্ত্র—মানুষের পক্ষে যা স্পর্শ করাও অসম্ভব!"

—"মোটেই নয়। 'পানাই' বলতে বোঝায় 'খড়ম'। ব্রহ্মদৈত্যরা পায়ে খড়ম পরে জানেন তো? এ হচ্ছে সেই খড়ম।"

—"হুম্! ব্রহ্মদৈত্যের পায়ের খড়ম! আমরা যেমন হাততালি দি, তারা বুঝি তেমনি পা-তালি না দিয়ে পায়ের খড়ম খুলে খটাখট্ আওয়াজ সৃষ্টি করে? হ'তে পারে—ব্রহ্মদৈত্যদের পক্ষে অসম্ভব কি? ভাই জয়ন্ত, দোহাই তোমার! ও পাতকুয়োর ভেতর ঢোকবার চেষ্টা তুমি কোরো না—হুম্!"

জয়ন্ত হাসতে হাসতে বললে, "সুন্দর বাবু, ও-কথা যাক্। কিন্তু এইবারে আপনিও আমাকে কিঞ্চিৎ সাহায্য করুন দেখি!"

সুন্দর বাবু বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, "এ-রকম ব্যাপারে আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?"

—"দড়ী ধরে আমি যখন কূপের ভিতরে নামব, তখন আর একগাছা দড়ীতে পেট্রলের লণ্ঠনটা বেঁধে ঠিক আমার সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নামিয়ে দিতে হবে। কেমন, এ কাজটা পারবেন তো?"

—"তা কেন পারব না!"

জয়ন্ত দড়ী ধ'রে কূপের গহ্বরে প্রবেশ করলে। পেট্রলের জ্বলন্ত লণ্ঠনটাও চারি দিক্ আলোকে সমুজ্জ্বল করে নীচের দিকে নামতে লাগল তার সঙ্গে সঙ্গে। সেই বহু যুগের পুরাতন ও অব্যবহৃত কূপের

অঠরে আচম্বিতে এই অভাবিত আলোক-সমারোহে বিস্মিত হয়ে নানা ছিদ্র ও ফাটলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসতে লাগল দলে দলে হিল্‌বিলে বৃশ্চিক ও ঊর্দ্ধপুচ্ছ কাঁকড়া-বিছে প্রভৃতি জীব। এক জায়গায় মুহূর্ত্তের জন্যে মুখ বাড়িয়ে দু'টো অগ্নিময় ক্রুদ্ধ চক্ষে তীব্র ঘৃণা বৃষ্টি করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল একটা অন্ধকারেরও চেয়ে কালো সাপ। কোন্ গর্ত্তের মধ্যে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর চীৎকার!

সুন্দর বাবু চম্‌কে ব'লে উঠলেন, "ওরে বাবা, পাতালের ভিতরে ওটা আবার চ্যাঁচায় কে?"

সুব্রত বললে, "তক্ষক।"

কূপের ভিতর থেকে [illegible] জয়ন্ত বললে, "সুন্দর বাবু, এইবারে [illegible]টা আস্তে আস্তে উপরে তুলে নিন।"

[illegible] আবার উপরে এসে দাঁড়াল। তার চোখে-মুখে পরিতৃপ্ত আনন্দের আভাস!

মাণিক সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে, "কি দেখলে জয়ন্ত?"

—"আমার সন্দেহ মিথ্যা নয়।"

—"অর্থাৎ?"

—"অনেক নীচে, কূপের জল থেকে খানিক উপরে দেওয়ালের গায়ে আছে একটা লোহার দরজা।"

—"লোহার দরজা!"

—"হ্যাঁ। বন্ধ দরজা। তার বাইরে রয়েছে মস্ত দু'টো কুলুপ।"

সুব্রত অত্যন্ত উত্তেজিত ভাবে বললে, "এর অর্থ কি জয়ন্ত বাবু?"

—"আমার বিশ্বাস, ঐ দরজার ওপাশেই আছে সোনার আনারসের সমস্ত রহস্য।"

—"সোনার আনারসের রহস্য?"

—"হ্যাঁ সুব্রত বাবু। বাঘরাজাদের গুপ্তধন।"

পর-মুহূর্ত্তেই চারি দিকের স্তব্ধতা চুরমার ক'রে দিয়ে বজ্রস্বরে গর্জ্জে উঠল দু'-দু'টো বন্দুক! দুটো বুলেট এসে লাগল দেওয়ালের উপরে সশব্দে!

জয়ন্ত ব'লে উঠল, "শত্রুরা আসছে আক্রমণ করতে! ঐ দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চল—শীগ্‌গির!"

কূপঘরের ভিতর দিয়েই পাশের ঘরে যাবার দরজা। তার একখানা পাল্লা ভাঙ্গা। সে ঘর থেকেও অন্য ঘরে যাবার আর একটা দরজা। তার পাল্লা আছে বটে, কিন্তু অর্গল নেই। তারও ওদিকে আছে দরজা দিয়ে ও-পাশের ঘরে যাবার পথ—সকলে দ্রুতবেগে সেই তৃতীয় ঘরের ভিতরে এসে পড়ল।

জয়ন্ত ভিতর থেকে দরজায় অর্গল তুলে দিলে।

খানিকক্ষণ কারুর মুখেই কথা নেই। শত্রুরা যে পিছনে আসছে এমন সাড়াও পাওয়া গেল না।

হঠাৎ এ-ঘরের দরজার উপরে খট্ ক'রে একটা শব্দ হ'ল। জয়ন্ত তিক্ত হাসি হেসে বললে, "মাণিক, আমরা বন্দী হলুম। এ ঘরের দরজায় বাইরে থেকে কে শিকল তুলে দিলে। সোনার আনারসের স্বপ্ন বুঝি ফুরিয়ে যায়!"

(আগামী বারে সমাপ্ত)

✡

জহরলালের ছেলেবেলা

জীবেন্দ্র সিংহরায়

বড়ঘরের ছেলে জহর। তার বাবা মতিলাল ছিলেন এলাহাবাদের এক জন নামজাদা লোক। প্রথম জীবনে তিনি বিলাস আর আরামেই দিন কাটিয়েছেন; কারণ টাকার অভাব তাঁর কোন কালেই ছিল না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দেশের ডাকে মতিলাল সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করে জনসাধারণকে সেবা করবার কঠিন ব্রত নিয়েছিলেন। সুখ যেমন তিনি করেছেন, তেমনি দুঃখও তাঁকে সইতে হয়েছে।

জহর মতিলালের একমাত্র ছেলে। যখন তাঁর জন্ম হয়, তখন নেহেরু-পরিবারের অগাধ ঐশ্বর্য। মস্ত বড় বাড়ি—তা'তে লোকজন, দাস-দাসী, আত্মীয়-স্বজন সব সময়েই জমজমাট থাকতো। বিলাস আর জাঁকজমকে মতিলালের বাড়ি রাজপুরী বলে মনে হ'ত। এমনিতর পরিবেশে জহরের জন্ম হয়। তাই সবার কাছে সে হয়ে উঠেছিল একমাত্র আদরের দুলাল।

জহরের ছোট বোনেরা তার চেয়ে অনেক ছোট। তাই তার ছেলেবেলা কেটেছে একাকী নিঃসঙ্গ। তখন সমবয়সী সাথীর অভাব তার প্রাণে অত্যন্ত করুণ হয়ে বাজতো। বড়লোকের ছেলেদের সাধারণতঃ একটু বেশি বয়সেই ইস্কুলে দেওয়া হয়। জহরেরও তাই হয়েছিল। ছেলেবেলায় তার লেখা-পড়ার ভার ছিল গৃহশিক্ষকের ওপর। তাই ইস্কুলের সাথীদের সংগে খেলা-ধূলা করবার সুযোগও তার হয়নি। বাড়িতে যারা ছিল, তাদের সংগে তার বয়সের তফাৎ থাকায় তারা জহরকে কখনো খেলার সাথী করতে চাইতো না। এমনি অবস্থায় কোন খেয়াল বা খেলা নিয়ে একাকী সময় কাটানো ছাড়া তার আর কোন উপায় ছিল না। তোমাদের কা'রো যদি ছেলেবেলা একাকী কেটে থাকে, তবেই বুঝতে পারবে সাথিহীন জহরের শৈশবের ব্যথা।

এত বড়লোকের ছেলের ছেলেবেলা যে অত্যন্ত আরাম ও আদরে কাটবে, তা' তোমরা সহজেই বুঝতে পার। বাবা মায়ের স্নেহ আর জ্যেঠা-জ্যাঠিদের প্রীতি সব সময়েই তাকে ঘিরে উচ্ছল হয়ে উঠতো কিন্তু তার মধ্যে কোন বৈচিত্র্য ছিল না। একঘেয়ে আরাম ও আদরের মধ্য দিয়েই কাটছিল জহরের ছেলেবেলার দিনগুলো।

কিন্তু জহরের ছোটবেলার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য সহজেই আমাদের চোখে পড়ে।

আজ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা জহরলাল ব্রিটিশের শৃঙ্খল থেকে মাতৃভূমিকে মুক্ত করবার জন্যে সংগ্রাম করছেন, কিন্তু তাই বলে তিনি ইংরেজ জাতিকে ঘৃণা করেন না। তার কারণ তিনি বিশ্বপ্রেমিক। বিশ্বপ্রেম কখনো মানুষকে ঘৃণা করতে শেখায় না। জহরলাল ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান চান, কিন্তু ব্রিটিশ জাতির বিনাশ চান না। মনে রেখো, মানুষ মানুষকে কখনও ঘৃণা করতে পারে না, ঘৃণা করতে পারে শুধু তার বিধি-ব্যবস্থাকে। তাই আজ জহরলালের পৃথিবী-জোড়া নাম। ছোট্ট জহরের মধ্যে আমরা এমনিতর মনোভাবের পরিচয় পাই। বাবার বৈঠকখানার আলোচনায় সে শুনতে পেত—এদেশে ইংরেজের উদ্ধত ব্যবহারের

কথা। কোথায় ইংরেজ ভারতবাসীকে নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে, কোথায় কোন রেলে জায়গা থাকা সত্বেও শ্বেতাংগরা তা তাঁদের ঢুকতে দেয়নি, কোথায় কোন পার্কে ইংরেজদের জন্তে আলাদা বেঞ্চি রয়েছে—এ সমস্ত শুনে বালক জহরের মন উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌তো। মনে মনে তক্ষুনি রবিনহুড্ সেজে যে তাদের শাস্তি দেওয়ার সাধ হয়নি—এমন নয়। এ নিয়ে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সংগে এক কিস্তি ঝগড়াও হয়ে যেত। কিন্তু তা'হলেও কোন ব্যক্তিবিশেষ ইংরেজের প্রতি জহরের কোন ঘৃণা ছিল না। নিজের ইংরেজ শিক্ষয়িত্রীকে সে ছেলেবেলায় প্রাণ দিয়েই ভালবেসেছিল। আর বাড়িতে বাবার ইউরোপীয় বন্ধুরা আসতেন—তঁদের অনেককেই জহর ভালবাসতে শ্রদ্ধা করতে দ্বিধাবোধ করেনি। যথার্থ গুণ থাকলে শত্রুকে ভালবাসলেও অপরাধ হয় না—ছোট জহরের কাছ থেকে তোমরা এই শিক্ষাই গ্রহণ করতে পার।

নেহেরু-পরিবারের সবচেয়ে আনন্দের ছিল সেদিন—যেদিন জহরের জন্মোৎসব হত। জহরের নিজের কাছেও ছিল সেটা একটা স্মরণীয় দিন। তার জন্মদিনে তাকে ঘিরেই আনন্দের আয়োজন, তাই তার ছোট বুকখানা গর্বে ভরে উঠ্‌তো। সে উপলক্ষে তুলাদণ্ডে জহরকে ওজন করা হ'ত, আর সেগুলো বিলিয়ে দেওয়া হ'ত গরীব-দুঃখীর মধ্যে। তা'ছাড়া কত লোকজন, কত গাড়ী ঘোড়া, কত নোতুন পোষাক, কত আলো-বাজনার রোশনাই, কত উপহার! তাই জন্মোৎসবের অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে রবি ঠাকুরের শিশুর অনুকরণে জহর ভাব্‌তে—কেন বছরে একটি মাত্র জন্মদিন, কেন জন্মদিন বারে বারে আসে না!

জহরের ছেলেবেলার একটি গল্প বলছি শোন। একদিন জহর তার বাবার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখতে পেল—তিনি লাল রঙের মদ খেয়ে চলেছেন। দেখ্‌তে পেয়ে তার আর ভয়ের অন্ত নেই। তাই ছুটে গিয়ে সে মাকে সাতংঙ্কে বললো: মা, বাবা রক্ত খাচ্ছেন। মদের প্রতি যে বিতৃষ্ণা একদিন ছোট্ট এতটুকু জহরের মধ্যে দেখতে পাই—তা' তাকে সাত্ত্বিকারের মানুষ হওয়ার পথে অবশ্যই এগিয়ে দিয়েছিল।

অনেক ছেলেমেয়েরই ছোটবেলার সাথী হয়ে দাঁড়ায় বাড়ির পুরনো চাকর বা গোমস্তা। জহরেরও শৈশবে এক জন বয়স্ক সাথী ছিল। সে তার বাবার মুন্সী মোবারক আলী। বুড়োর ছিল পাকা দাড়ি, তাকে দেখে জহরের মোগল বাদশাহদের আমলের লোক বলে মনে হত। সেই পাকা দাড়ি নেড়ে তাকে কোলে বসিয়ে সে বলে যেত আরব্যোপন্যাসের গল্প কিংবা সিপাহী-বিদ্রোহের কথা। জহর চোখ বড় বড় করে অবাক-বিস্ময়ে শুনে যেত সেই সব অদ্ভুত কাহিনী, কখনও কখনও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌তো তার সমস্ত শরীর। হয়ত নিজকেই আরব্যোপন্যাস বা সিপাহী-বিদ্রোহের লোক বলে মনে হ'ত তার।

ভারতবর্ষের ছেলেমেয়েদের ওপর রামায়ণ মহাভারতের প্রভাব অনেক। জহরও বাল্যকালে এই সব পৌরাণিক কাহিনী মুগ্ধ হয়ে শুনতো আর সংগে সংগে কত কল্পনার ইন্দ্রজালই বুনে চলতো। হয়ত তার ভাবুক মন রাবণের সাথে সাথে পুষ্পরথে উড়ে চলতো লঙ্কা থেকে পঞ্চবটী বনে, কখনও হয়ত সে মনে মনে বীরত্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠে কুরুবংশ ধ্বংস করে চলতো, আবার হয়ত বা কখনও পাতাল প্রবেশের সময় সীতার দুঃখে চোখের জলে তার বুক ভেসে যেত। এ-সব কাহিনীই বোধ হয় এখনকার জহরলালের অন্তরে প্রেরণা দিয়েছে—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির, স্বাধীনতার জন্তে যুদ্ধ করার অদম্য স্পৃহার আর তাঁর অসামান্য পত্নীপ্রেমের। তাই ছোট জহরের কাছে জ্যোঠিমার পৌরাণিক গল্পের ভাণ্ডার ছিল রীতিমত লোভের বস্তু। তা'তে এক দিকে যেমন তাঁর চরিত্র গঠনের সুবিধা হয়েছিল, তেমনি পৌরাণিক উপন্যাসে জ্ঞান সঞ্চয় করতে পেরেছিল।

জহর সব চেয়ে ভালবাসতো তার বাবাকে। তার ভাবী-জীবনের আদর্শই ছিলেন মতিলাল। ছোটবেলায় জহর তার বাবাকে শক্তি আর বুদ্ধির জলন্ত প্রতীক বলে মনে করতো। পরিণত বয়সেও তার সে ম[illegible]স কোন পরিবর্তন দেখা যায়নি। অনেক সময় হয়ত তাঁর রাজনৈতিক মতবাদকে মেনে নেওয়া জহরলালের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কিন্তু তা'তে [illegible]লের প্রতি তার শ্রদ্ধা একটুও ক্ষুণ্ণ হতে দেখা যেত না। ছোটবেলায় কত দিন চাকরদের প্রতি তাঁর রুক্ষ ব্যবহারে জহর ব্যথা পেয়েছে, তবু সে না ভেবে পারেনি: বড় হলে আমি বাবার মত হব। এমনি করে বালক জহরের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার মূল্যে দেবতা হয়ে উঠেছিলেন মতিলাল।

বাড়িতে পাল-পার্বণ ব্রত-পূজা হলে জহরের আনন্দের সীমা থাকতো না। হোলীর দিনে, দেওয়ালীর রাত্রে, জন্মাষ্টমীতে রক্ষাবন্ধনে, ভাইফোঁটায় সে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে যেত। আত্মীয়-স্বজনের বিয়ে উপলক্ষে বিদেশ ভ্রমণ জহরের কাছে একটা মস্ত উপাদেয় ব্যাপার ছিল। প্রাণ ভরে খেলাধুলা আর স্বচ্ছন্দ ভাবে উপদ্রব করেও যেন তার আশা মিটতো না। এই আনন্দ পাওয়ার জন্তেই ছোটবেলা থেকে জহর ঘোড়ায় চড়তে ভালবাসতো। তার ছিল একটি আরবী ঘোড়া। তা' একদিন একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল শোন। সন্ধ্যাবেলা বেড়াতে গিয়ে জহর ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়েছিল। এদিকে ঘোড়া ত সোজা দৌড়ে বাড়িতে এসে হাজির। বাহন এসেছে, অথচ সোয়ার নেই—সবাই তাই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠ্‌লো। মতিলাল লোকজন নিয়ে জহরকে খুঁজতে বের হলেন। যেন অশ্বমেধের ঘোড়া খোঁজা—এমনিতর একটা ব্যাপার আর কি। তার পর দলবলে জহরকে বের ক'রে এনে মতিলাল সেদিন নিশ্চিন্ত হ'লেন।

নিতান্ত বাল্যকাল থেকেই জহর অন্যায়কে বুঝতে শিখেছিল। কোন দোষ করলে মনে মনে তার জন্তে অনুতাপ করতে সে কুণ্ঠিত হয়নি। একটা উদাহরণ দিলেই তোমরা বুঝতে পারবে। জহরের বয়স তখন বছর ছয়েক হবে। একদিন মতিলালের টেবিলের ওপর দু'টো কলম দেখে তার ভীষণ লোভ হ'ল। বাবার দু'টো কলম ত আর দরকার হয় না—এই ভেবে জহর সেখান থেকে একটি সরিয়ে ফেললো। তার পর বাড়িময় হুলস্থূল। আর শেষে যখন জানা গেল জহরই চুরি করেছে, তখন মতিলাল তাকে ভীষণ মার দিলেন। মার খেয়েও ছয় বছরের জহর ভাবতে দ্বিধা বোধ করেনি—শাস্তিটা ঠিকই হয়েছে। শুধু তাই নয়, যখনই কোন পারিবারিক কলহ ঘটতো, বালক জহরের মনে হ'ত—নিশ্চয়ই কোথাও কিছু অন্যায় ঘটেছে।

এ-সব হ'ল সেদিনের কাহিনী—তখনও জহর দশের কোঠা পেরোয়নি। এ পর্যন্ত দুষ্টুমি আর খেলাধুলা করেই তার দিন কেটেছে।

তখনও বুদ্ধির প্রকাশ ও জ্ঞানের পরিচয় ছেলেমানুষীরই পর্যায়ে পড়তো। কিন্তু দশ বছর বয়সের পর থেকে নোতুন নোতুন বিষয়ের দিকে জহরের মনের বিকাশ দেখা যায়। বিশাল পৃথিবী'কে জানার স্পৃহা যেন তাকে পেয়ে বসেছিল। শুধু ছেলেমানুষী খেয়াল আর খেলা নিয়ে সে আর আনন্দ পেত না। তাই কোন্ সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকায় বুয়োর যুদ্ধ চলেছে—তার প্রতি জহরের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। এই সময়েই সে প্রথম সংবাদপত্র পড়তে আরম্ভ করে। তার ছোট্ট এতটুকু প্রাণে বুয়োরদের জন্যে কত সহানুভূতিই না জমে উঠেছিল! নিপীড়িত জাতির আত্মার প্রতীক আজকের জহরলালের মর্মবেদনা সেদিনের ছোট্ট জহরের মধ্যেও তীব্র না হয়ে পারেনি। পরাধীন মানুষের জন্যে যে ভাবতে শে[illegible]শিখাকে চিরদিনের মত এই সময়েই সে অন্তরে গ্রহণ করেছিল। সেই সহানুভূতির অংকুরই আজ ফুলে-ফলে জহরলালের মধ্যে সার্থক হয়ে উঠেছে।

কিন্তু দুষ্টুমিও যে একেবারে ছিল না, এমন কথা বলা যায় না। জহরের বছর দশেক বয়সের সময়ে মতিলালের বৃহৎ অট্টালিকা 'আনন্দ ভবনে'র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই নোতুন বাড়ির পাশে ছিল একটা বড় পুকুর। সেখানে মনের আনন্দে সাঁতার কাটা যেত। গ্রীষ্মের দিনে জহর অধিকাংশ সময়েই পুকুরে ডুবে থাকতো, সাঁতারটা এই সময়েই সে শিখে ফেলেছিল। বিকেলে যখন মতিলালের বন্ধুরা স্নান করতে আসতেন তখন জহরের মনে নানা দুষ্টুমি খেলে যেত। একবার ভাবত—যারা সাঁতার জানে না, তাদের হঠাৎ টেনে নিয়ে জলে চুবিয়ে দেওয়ার মধ্যে কতই না আনন্দ আছে! জহরের কাছেও এটা নিতান্ত একটা উপভোগ্য ব্যাপার ছিল। তাই সে দাঁড়িয়ে মজা দেখতো—যখন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু কেবলমাত্র আধ হাত জলে বসে থাকতেন, কিংবা মতিলাল কোন মতে দাঁতে দাঁত চেপে কোমর-জল পর্যন্ত নেমে যেতেন।

সকলেরই ছোট ভাই-বোন আছে, কিন্তু আমার নেই—একথা ভেবে জহর মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেত। আশে-পাশের বাড়ির ভাই বোনেরা কেমন স্ফূর্তি করে বেড়ায়, তাদের মিলিত আনন্দের আর সীমা থাকে না। কিন্তু জহরের এমন কেউ নেই—যাকে সে ভালবাসবে, আদর করবে। তাই একদিন যখন তার একটি ছোট্ট ভাই বা বোনের আগমনের সম্ভাবনা হ'ল—জহরের আনন্দ দেখে কে! কিন্তু এই সময়ে একটি ঘটনায় তার মনে খুব ব্যথা লেগেছিল, ছোট বোনের জন্মের দিনে সে অধীর হয়ে বারান্দায় অপেক্ষা করছে, এমনি সময়ে ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন: ওহে, তোমার পক্ষে আনন্দের সংবাদ। বোন হয়েছে, বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাতে পারবে না। এ কথায় কিন্তু জহরের দুঃখ না হয়ে পারেনি। একটি ছোট্ট আদুরে ভাই বা বোনের আগমনের আশায় সে এত কাল উৎফুল্ল হয়ে আছে—তার সম্বন্ধে এমন নীচ স্বার্থপরতার কথা বললে কার মনে না দুঃখ হয় বলো? কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাটির মধ্যে আমরা ছোটবেলা থেকেই জহরের মন যে কত উদার ছিল তার পরিচয় পাই।

জহরের যখন এগারো বছর বয়স—তখন ফার্দিনান্দ ব্রুক্স্ নামে তার এক জন নোতুন শিক্ষক এলেন। তিনি এক জন লেখাপড়া-জানা জ্ঞানী লোক ছিলেন। এই সময়ে এক জন বৃদ্ধ পণ্ডিতও জহরকে সংস্কৃত পড়াতো। কিন্তু ব্যাকরণ মন বসতো না বলে সে সংস্কৃত বেশি শিখতে পারেনি। আসলে নোতুন ভাষা শিখবার নিপুণতা জহরলালের বরাবরই কম! ব্রুক্স্ কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিলেন। শিশু-সাহিত্যের সেরা বইগুলো জহর অল্প দিনের মধ্যেই পড়ে ফেলেছিল। 'ডন কুইকসট' পড়ে সে রোমাঞ্চিত হত, 'ফার্দেষ্ট নর্থ' পড়ে তার মন রহস্যময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে যেত, 'থ্রি মেন ইন এ বোট' পড়ে সে হেসে লুটোপুটি হয়ে পড়তো। এমনি করে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি তার যে অনুরাগ জন্মেছিল—আজ পর্যন্ত তা' অক্ষুন্ন আছে। শুধু যে সাহিত্যের প্রতি সে আকৃষ্ট হয়েছিল তা' নয়, বিজ্ঞানের প্রতিও তার মন ক্রমশঃ ধাবিত হয়েছিল। ব্রুক্স্-এর সহায়তায় অত অল্প বয়সেই জহর নিজস্ব ছোট পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানের পরীক্ষা-কার্য আরম্ভ করে দিয়েছিল। মনে রেখো, জহরলাল বিজ্ঞানের ছাত্র।

যে সময়ে সাধারণ ছেলেমেয়েরা ভাল করে কথা বলতে পারে না, জহর সেই বয়সেই নানা রকম দার্শনিক চিন্তা করতো। সে তখন থিয়োজফির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। থিয়োজফি কাকে বলে—তা' বোধ হয় তোমরা জান না। মোটামুটি জেনে রাখো—ধর্ম ও দেহ-আত্মার কথা, পুনর্জন্ম ও সৃষ্টির রহস্য, পরলোকের চিন্তা প্রভৃতি এই দার্শনিক শাস্ত্রের অন্তর্গত। জহর মাত্র বার বছর বয়সেই এই সব বিষয়ে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল এবং বাবার অনুমতি নিয়ে একটা থিয়োজফিক্যাল সোসাইটির সভ্য হয়ে পড়েছিল। বিখ্যাত দেশনেত্রী অ্যানি বেশান্ত তাকে স্বয়ং দীক্ষা দিয়েছিলেন। এমনি করে এই সময়ে একটা নোতুন ভাবাবেগ জহরের মধ্যে দেখা না দিয়ে পারেনি। কিন্তু একদিন যখন ব্রুক্স্ তাকে ছেড়ে চলে গেলেন—সংগে সংগে থিয়োজফির সংগে তার সম্পর্কও চিরদিনের জন্যে ফুরিয়ে গেল।

এই সময়ে রুশ-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্যে জহরের উৎসাহের অন্ত ছিল না। জাপানের জয়ে সে উৎফুল্ল না হয়ে পারেনি। কারণ, এত কাল ইউরোপই এসিয়াকে পদদলিত করে এসেছে। কিন্তু এবার এসিয়ার একটা জাতির অভ্যুত্থানে সে অতিমাত্রায় খুশি হয়ে পড়েছিল। এমন কি, উৎসাহের আতিশয্যে জহর জাপানের ইতিহাস কিনে এনে পড়তেও আরম্ভ করে দিল। এই সময়েই সে দেশের কথা ভাবতে শেখে, জাতীয়তার প্রেরণা তাকে যেন এক নোতুন শক্তিতে বলীয়ান্ করে তুলে। কোন্ পথে ভারতের মুক্তি আসবে, কিরূপে ইউরোপের অধীনতা-পাশ এসিয়া ছিন্ন করবে—এই ছিল তার একমাত্র চিন্তা। তরবারি নিয়ে সে ভারতের মুক্তি-সংগ্রাম করছে—এই স্বপ্নই যেন সে দিন-রাত দেখতো। স্বাধীনতার সৈনিক জহরলালের এখানেই দীক্ষা হ'ল—আমরা বলতে পারি।

তার পর পনের বছর বয়সে জহর উচ্চশিক্ষার জন্যে মা-বাবার সাথে বিলেত যাত্রা করলো। এর পরের তার জীবনের ইতিহাস আমাদের আলোচনার বাইরে।

শিক্ষয়িত্রী

শ্রীতটিনী বসু

শ্রেণী-কক্ষে গিয়া চেয়ারে বসিলাম, ইচ্ছা ছিল 'নারীশিক্ষা' সম্বন্ধে ছাত্রীদের কিছু বলিব। আমার ছাত্রীরা অধিকাংশই বয়স্কা; কথাটি শুনিলে আশ্চর্য্য মনে হয় বই কি! কিন্তু আমি যে সাধারণ শিক্ষানবিস নহি। আমি ছোট ছোট শিশুদের মনের খোরাক জোগাই না। আমার শিক্ষাদানের কেন্দ্র বয়স্কা শিক্ষয়িত্রী। অতএব আমার সেই দিনকার বক্তব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার বয়স প্রত্যেকেরই হইয়াছে।

বক্তব্য বিষয় সুরু করিবার পূর্ব্বে চতুর্দ্দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলাম। সুধীজনের বড় বড় কথা যাহা বহু পুস্তক পাঠে মনের মধ্যে সঞ্চয় করিয়া আনিয়াছিলাম তাহা যেন ধীরে ধীরে মন হইতে মুছিয়া যাইতেছে। কি বলিব? যাহা বলিতে চাহি মন তাহাতে সায় দেয় কই? বলিতে চাহিয়াছিলাম আমরা নারী, আর অন্ধকারে থাকার দিন আমাদের নাই, শিক্ষায় দীক্ষায় পুরুষের সমকক্ষ আমরা—শক্তিতে এবার শক্তিস্বরূপিণী হইতে হইবে—এ শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে আমাদের প্রকৃত শিক্ষার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। কিন্তু প্রকৃত শিক্ষা কথাটির মধ্যে কোন নির্দিষ্ট পথ-নির্দ্দেশ আছে কি? অতএব সুধীজনের পুস্তক হইতে যে পাণ্ডিত্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম, বলিবার কালে সমস্তই যেন অর্থহীন বলিয়া মনে হইতে লাগিল। প্রথমে শুধু মনে হইল, আমার সম্মুখে যে ভাবী শিক্ষয়িত্রীরা বসিয়া আছেন তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? বৎসরান্তে তাঁহারা যখন চলিয়া যাইবেন তখন মনের মধ্যে [illegible]মাত্র মুখস্থ ক[illegible] বুলিই হইবে পা[illegible]ন-সমস্যা[illegible]ানের উপায় আমরা শিক্ষা দিই কি?

মন বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সুরু করিলাম—আজ তোমাদের তর্ক-বিতর্কের বিষয় ছিল 'নারীশিক্ষা' সম্বন্ধে, কিন্তু প্রসঙ্গ উত্থাপনের পূর্ব্বে আমাদের জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে একটি মাত্র প্রশ্নের জবাব দাও—তোমরা এই শিক্ষয়িত্রীর পদ জীবনের আদর্শ বলিয়া স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছ কি? এবং এই জন্যই তোমরা শতকরা নিরানব্বই জন শ্রেণীতে অবিবাহিত কি? কোন উত্তর নাই, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, এই প্রশ্নের জবাব না পাইলে পাঠ্য বিষয় আজ তোমাদের অগ্রসর হইবে না। যে সমস্যা মনের কোণায় অহোরাত্র সমাধানের পথ খুঁজিয়া ফিরিতেছে তাহারই উত্তর তোমাদের মুখ হইতে শুনিতে চাহি। এক জন ছাত্রী উঠিয়া বলিলেন—"জীবনের আদর্শরূপে সব সময়ে এই পদ আমরা গ্রহণ করি না এবং বিবাহ না করার প্রধান অন্তরায় ইহাই নহে। চতুর্দ্দিকে যখন ক্ষুধিতের করাল মূর্ত্তি ও তাহাদের হাত তুলিয়া হাহাকার করার দৃশ্য মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠে, তখন বিবাহ-স্পৃহা আপনা হইতেই বিলুপ্ত হইয়া যায়—নর-নারীর মিলনের মধুর কল্পনা কেবল মাত্র কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়, বাস্তবে তাহার স্থান কোথায়?"

উত্তর শুনিয়া বুঝিলাম এই সমস্যা তাহার জীবনের একার নহে,—ইহাই বর্ত্তমান শিক্ষিত নারীর জীবনের অন্যতম সমস্যা। জনমত চীৎকার করিতেছে নারীশিক্ষার প্রসার হউক; কিন্তু শিক্ষার যে ধারা আমাদের দেশে প্রচলিত, তাহাতে আমরা মুষ্টিমেয় হৃতস্বাস্থ্য বুভুক্ষু শিক্ষয়িত্রীর সৃষ্টি করিতেছি। ভগবান্ যেন শিক্ষাকেন্দ্রের হর্ত্তাকর্ত্তাদের শিক্ষয়িত্রী সৃষ্টির ভার দিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিপ্রাপ্তির পর শিক্ষিতা নারী প্রতিটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আঙ্গিনায় ভীড় করিয়া দাঁড়াইতেছেন। যাহা তাঁহারা উপার্জ্জন করেন তাহাতে নিজের

কোন ক্রমে চলিয়া যায় বটে, কিন্তু এই কার্য্যে সত্যই কি তাঁহাদের আনন্দ আছে? অধিকাংশ শিক্ষিতা নারী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য জীবনের আদর্শরূপে গ্রহণ করেন না। বাধ্য হইয়াই এই পথ যেন তাঁহাদের বাছিয়া লইতে হইতেছে।

যাঁহাদের স্নেহ-মমতায় ভবিষ্যৎ শিশু মাতারা গড়িয়া উঠিবে তাঁহাদের অন্তরে স্নেহ কোথায়? স্বাভাবিক যৌন স্পৃহা মনকে অজ্ঞাতসারে পীড়া দিতে থাকে। অবচেতন মনের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা তাহার কোমল বৃত্তিগুলিকে গলা টিপিয়া মারিতে থাকে। নিজেকে কেন্দ্র করিয়া অসুখী মন ধীরে ধীরে সংসারের উপর বিদ্রোহী হইয়া ; অন্যের সুখ দেখিলে মন বিদ্বেষে পূর্ণ হয়। মনের কোণায় বেশী আত্মসুখ আকাঙ্ক্ষার স্রোত প্রবাহিত হয়, বাহিরের দিক দিয়া ... ততই কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠে। কাজের মধ্যে আনন্দ তাঁহারা পান না। অধিকন্তু অন্য কোন পথ খোলা না থাকায় বাধ্য হইয়া যে কার্য্য তাঁহাদের গ্রহণ করিতে হয় তাহারই ভারে মন ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে। এ জন্য স্নেহে জননী-স্বরূপিণী শিক্ষয়িত্রী পাওয়া অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

সমাজের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট হইলে নারী-শিক্ষার ধারা কিরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় তাহা স্পষ্ট অনুধাবন করিতে কষ্ট হইবে না। আমরা কেবল চীৎকার করিতেছি—"না জাগিলে সব ভারত-ললনা এ ভারত আর জাগে না জগে না" কিন্তু নারী-জাগরণের যে পথ বাছিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহাতে নারীকে না জানাইয়া কতকগুলি অসার মৃতপ্রায় শিক্ষয়িত্রীর সৃষ্টি করা হইতেছে।

শিক্ষিতা নারীর সন্তান শৌর্য্যে বীর্য্যে শিক্ষায় দীক্ষায় ভবিষ্যৎ সমাজের কর্ণধার হইবে ইত্যাদি—বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিলেও দেখিতে পাই, বর্ত্তমান শিক্ষায় শিক্ষিত নারীর অধিকাংশই মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ঘরের বধূ হইবার উপযুক্ত নহেন। কারণ, চাকরের সাহায্য ব্যতীত নিত্য রান্না, বাসন-মাজা ও যাবতীয় গৃহকর্ম্ম মা-ঠাকুমাদের মত তাঁহারা করিতে অভ্যস্ত না থাকায় হঠাৎ পরিণত বয়সে এত ভার সহ্য করিতে পারেন না। গ্রামের বসত-বাটীতে গ্রাম্য জীবন যাপন করার কল্পনাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। অথচ এদিকে আমাদের অধিকাংশ শিক্ষিত ভদ্র বাঙ্গালী যুবকের মাসিক আয় গড়ে ৩০ টাকার বেশী নহে। এবং আমাদের মনোবৃত্তি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, নামজাদা রাজকর্ম্মচারী অথবা বিত্তশালী না হইলে কোন শিক্ষিত যুবক স্বামী-পদবাচ্য হইবার যোগ্য নহেন। কিন্তু নামজাদা মুষ্টিমেয় রাজকর্ম্মচারীর গৃহিণী হওয়ার সৌভাগ্য কয় জনের হয়? আর যাঁহাদের সে সৌভাগ্য হইয়াছে তাঁহাদের অধিকাংশ শিক্ষার পাশপোর্ট লইয়া এ দাবী করিতে পারেন নাই ; করিয়াছেন ধনবান পিতার জামাতা-ক্রয়ের মূল্যের পরিমাণের উপর। অতএব কলেজ-জীবনের রঙ্গিন স্বপ্ন শতকরা নিরানব্বই জনেরই ভাঙ্গিয়া যায়, ফলে শিক্ষয়িত্রীর পদ গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর আর কি আছে?

কিন্তু ইহার কি কোন মীমাংসাই নাই? মনে হয়, স্বামি-স্ত্রী উভয়েই যদি স্বীয় সংসারের আয় ও ব্যয় ব্যাপারে সমান অংশ গ্রহণ করেন তাহা হইলে হয়তো এই সমস্যার সমাধান কিছুটা হইতে পারে ; কিন্তু বিবাহিত নারীকে কোন অর্থকরী কার্য্য করিতে দেখিলে তাহাকে আমরা সংস্কার বশতঃ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিতা করি না বরং স্বামী বেচারার অক্ষমতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিয়া তুলি। "বিবাহ যদি করিব তবে কাজ করিব কেন?"—ইহাই আমাদের মনোবৃত্তি। কিন্তু আমাদের দেশের কয় জন শিক্ষিত যুবক বর্ত্তমান যুগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বজায় রাখিয়া স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করিতে পারেন? অতএব শিক্ষিতা প্রেমময়ী পত্নী, বধূ ও মাতার কল্পনা চিরদিনই বাঙ্গালীর কল্পনাপ্রবণ মনেরই খোরাক যোগাইবে—বাস্তবে আর ধরা দিবে না।

এই জন্য বলিতেছিলাম, অন্তর ও বাহিরের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া জীবনে একটি সার্বজনীন গতি আনিতে হইলে "বিবাহের পর কাজ করিব কেন?" কিম্বা গ্রামের কথায় নাসিকা কুঞ্চিত করার দিন আমাদের নাই। মনে হয়, শিক্ষিতা মা'রা গ্রামে বসিয়া আনন্দের সহিত স্বীয় সংসারের আর্থিক কষ্ট আংশিক পরিমাণে দূর করিয়া ভবিষ্যৎ শিশু-মাতাদের আনন্দের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিতে পারেন। কারণ সেখানে শিশুর অভাব নাই ; ছোট-ছোট শিশুদের লইয়া এক-একটি শিশুকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া শিক্ষিতা পত্নী স্বামীকে আর্থিক সাহায্য ব্যতীত সমাজ-সেবায়ও অগ্রসর হইতে পারেন। উপরন্তু, স্বাভাবিক উপায়ে যৌন-স্পৃহা চরিতার্থ না হওয়ায় Homo sexulity-রূপ জঘন্য প্রবৃত্তি যে আপনা হইতে কলেজের ছাত্রী-নিবাস ও শিক্ষয়িত্রী নিবাসগুলির পবিত্র ধূলি কলুষিত করিতেছে তাহারও নিবৃত্তি হয়। যাঁহারা এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির সহিত সংশ্লিষ্ট তাঁহাদের এই বিষয়ে বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। নিজে দৈনন্দিন জীবনে যাহা দেখিতেছি, যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতেছি তাহাই সরল ভাষায় ব্যক্ত করিলাম।

কিন্তু এই ত্যাগের বা নৈতিক চরিত্র বজায় রাখার শিক্ষা কি সত্যই দেওয়া হয়? এই জন্য বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান যুগের শিক্ষাব্রতিগণ এই বিষয়ে সচেতন না হইলে ভবিষ্যতে কি হইবে বলা যায় না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর আশু পরিবর্ত্তন না হইলে এ সমস্ত সমস্যার সমাধান কোন দিনই হইবে না।

—মিণ্টু লাহিড়ী

—সুরেখা দেবী

মহারাষ্ট্রের মেয়েলী উৎসব

(তিলগুড় ও হালদকুঙ্কু)

শ্রীঅমিতাকুমারী বসু

মহারাষ্ট্রে আমি তখন সবে নতুন এসেছি। সে দেশের পূজা পার্ব্বণ, নিয়ম-কানুন কিছুই জানি নে। পৌষ-সংক্রান্তি এল, আমি ভাবলুম আমাদের মতই বোধ হয় এদের পিঠে-পার্ব্বণ। কিন্তু সংক্রান্তির দিন দেখলুম, তা নয়। সংক্রান্তির দিন আমার নব মারাঠী বান্ধবী আমার জন্য কয়েকটি তিলের লাড়ু, একটু হলুদ, একটু সিন্দুর পাঠিয়ে আমাকে তাঁর বাড়ীতে "হালদকুঙ্কু" উৎসবে নিমন্ত্রণ করলেন।

তার পর পাড়ার ছেলে-মেয়েরা অনেকেই আসতে লাগলো। তাদের হাতে অতি সুন্দর সুদৃশ্য সাদা ধবধবে চিনির তৈরী ছোট ছোট ফুল। এর কোন কোনটা বা একটু হলদে রং দিয়ে রং করা হয়েছে। সেই চিনির তৈরী ফুলের নাম "তিলগুড়"। তারা আমার হাতে কয়েকটি করে তিলগুড় দিয়ে নমস্কার করে বললে, "তিলগুড় ঘেয়া, গোড় বলা"—মানে, 'তিলগুড় নাও, আর মিষ্টি কথা বলো'। জিজ্ঞেস করে জানলুম, আজকার দিনে তারা আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বাড়ী তিলগুড়, হলুদ, সিন্দুর পাঠিয়ে দেয় নয়ত নিজেরা গিয়ে হাতে তিলগুড় দিয়ে প্রণাম করে আসে।

এই তিলগুড় করতে বেশ পরিশ্রম লাগে। যে মহিলা যত সূক্ষ্ম ও শুভ্র তিলগুড় করতে পারেন তাঁর তত বাহাদুরী। বহু দিন ধরে মেয়েরা চিনি জ্বাল দিয়ে ধীরে ধীরে ফোঁটা ফোঁটা করে ছোট ছোট দানা তৈরী করে রাখেন, তার পর দানাগুলি সংক্রান্তির সময়ে একত্র মিলিয়ে তিলগুড় তৈরী করেন।

তিলগুড় মহারাষ্ট্রে একটি বিশেষ উৎসব। সেদিন সকলে দেব-মন্দিরে যায়। আম্বাবাঈর মন্দির কোলাপুরে দাক্ষিণাত্যের একটি প্রসিদ্ধ দেবালয়। আম্বাবাঈ অর্থাৎ মহালক্ষ্মী কোলাপুরের নগর-দেবী। সেদিন আম্বাবাঈর মন্দিরে খুব ভীড় হয়। সবাই দলে দলে সেজে-গুজে মহালক্ষ্মীর পায়ে তিলগুড় দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছে। ধনী মহিলারা তিলগুড় সংক্রান্তি উপলক্ষে দেবীকে নতুন শাড়ী, নথ, হলুদ, সিন্দুর, তিলগুড় দিয়ে প্রণাম-পর্ব শেষ করেন।

সেদিন রাজবাড়ীতে দরবার বসে। দরবারী পোষাক পরে সম্ভ্রান্ত মহিলারা রাজবাড়ীতে "হালদকুঙ্কু"তে (হলুদ ও সিন্দুর) নিমন্ত্রিত হয়ে মহারাণীকে তিলগুড় দিয়ে প্রণাম করে আসেন। আমিও সে-বার নিমন্ত্রিতা হয়ে রাজবাড়ীতে গিয়েছিলুম।

রাজপ্রাসাদের একটি বিস্তৃত কক্ষ অতি সুন্দররূপে সাজানো। হলের মধ্যভাগে মহিলাদের বসবার জন্য সুদৃশ্য গালিচা পাতা। পাশের একটি ঘরে স্তূপীকৃত নারকেল। এই বিস্তৃত কক্ষে আমরা বসলুম। সুসজ্জিতা মহিলারা ঘুরে ফিরে নিমন্ত্রিতাদের সম্বর্দ্ধনা করতে লাগলেন। অভিজাত গৃহিণীদের বিচিত্র পোষাক বেশ বিস্ময়ের উদ্রেক করছিলো। তাদের পরনে বহু মূল্যবান মিহি রেশমী শাড়ী, পিছনে কাছা দিয়ে পরা, সামনের কোঁচাটা অন্ততপক্ষে এক হাত মাটিতে লুটাচ্ছে। গায়ে রেশমী ব্লাউজের উপর মূল্যবান সাটিনের জ্যাকেট (ওয়েষ্ট কোট), কবরী রূপালী তারে গাঁথা সুদৃশ্য পুষ্পমাল্যে সুশোভিত, মস্তকে নাম মাত্র ঘোমটা, কপালে বড় সিন্দুরের ফোঁটা, নাকে মুক্তো ও চুণি-পান্না বসানো বড় নথ, কাণে বড় বড় পাঁচটি হীরে-বসান দুল, হাতে বড় বড় মুক্তো বসিয়ে গাঁথা এক একটি চুড়ি, গলায় মুক্তোর হার এবং কালো কালো ছোট পুঁতি সোনা দিয়ে গাঁথা সুদৃশ্য লকেট-লাগানো মঙ্গল-সূত্র। এই ধরণের পোষাক শুধু একটি মহিলা পরে এসেছেন তা নয়, অধিকাংশ মহিলাদেরই ঠিক এক রকম গয়না, তবে শাড়ী-কাপড় একটু অদল-বদল। দাসীরা বড় বড় রূপোর থালা ভরে নারকেল এনে হাজির করলে। আর একটি রূপোর থালায় আতর-দান, গোলাবপাশ, একটি রূপোর বাটিতে হলুদের গুঁড়ো, আর সুদৃশ্য সিন্দুরকৌটায় সিন্দুর। এক জন মহিলা সবার গায়ে গোলাপ-জল ছিটাতে লাগলেন, আরেক জন মহিলা সবার বাঁ হাতে আতর লাগিয়ে দিলেন। আর এক জন মহিলা এসে কপালে প্রথম হলুদের ওপরে সিন্দুরের ফোঁটা পরিয়ে দিলেন, তার পর হাতে একটি নারকেল দিয়ে প্রণাম করলেন। এ দেশের প্রণাম-প্রথা আমাদের দেশের প্রথা থেকে ভিন্ন। এ দেশে পা ছোঁয় না। মাথা নুইয়ে দু'হাত মাটিতে ঠেকিয়ে কপালে লাগিয়ে প্রণাম করে। এদেশী প্রথামত আমিও মহারাণীকে তিলগুড় দিয়ে বাড়ী ফিরলুম।

মহারাষ্ট্রে সধবাদের 'সৌভাগ্যবতী' বলে অভিহিতা করা হয়। কোন বিবাহিতা মহিলা সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করতে বা লিখতে হলে "সৌভাগ্যবতী—বাঈ" বলে উল্লেখ করা হয়। এই হালদকুঙ্কু হল মহারাষ্ট্রের সৌভাগ্যবতীদের একটি বিশেষ শুভ মেয়েলী অনুষ্ঠান। সাধারণত তিলগুড় সংক্রান্তি, গণেশ চতুর্থী, বসন্তগৌর ইত্যাদি পূজা উপলক্ষে হালদকুঙ্কুর অনুষ্ঠান হয়। প্রায় প্রত্যেক ধনাঢ্য, মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহিণীরা এই অনুষ্ঠান করে থাকেন। তারা নিজগৃহে পরিচিতা ও আত্মীয় বন্ধু সধবা মহিলাদের নিমন্ত্রণ করেন। সকল মহিলাই যে যার জাঁকালো শাড়ী, ব্লাউজ ও মূল্যবান অলঙ্কার পরে আসেন।

পুরানো প্রথা অনুযায়ী অধিকাংশ মহিলাই আঠারো হাত শাড়ী পরে আসেন, শুভ অনুষ্ঠানে মুক্তা-বসানো নথ পরতেই সবাই নথ পরে আসেন। বিধবাদের শুধু এই অনুষ্ঠানে যোগ দিবার ও নথ পরবার অধিকার নেই। উৎসব-গৃহকে যথাসাধ্য ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো হয়ে থাকে। ধনিগৃহে ঘরের মধ্যে সুদৃশ্য গালিচা বিছানো থাকে এবং বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলাদের বসবার জন্ম তার উপর ছোট ছোট গদি, শুভ্র চাদর দিয়ে আবৃত করে তাকিয়া ইত্যাদি রাখা হয়। সাধারণ গৃহে ফরাস পাতা থাকে। একটি নির্দ্দিষ্ট সময়—সাধারণতঃ বিকাল ৫টা থেকে রাত ৯টা অবধি নিমন্ত্রিতাদের জন্ম নির্দ্দিষ্ট থাকে। নিমন্ত্রিতারা সুবিধামত একে দু'য়ে সুসজ্জিতা হয়ে আসতে থাকেন। ধীরে ধীরে হলঘর মহিলা ও ছোট শিশুতে পূর্ণ হয়ে যায়। তখন গৃহের বধূ ও কন্যারা বস্ত্রালঙ্কারে সুশোভিতা হয়ে প্রত্যেক মহিলাকে গোলাপজল ও আতর দিয়ে সম্বর্দ্ধনা করেন। তার পর প্রত্যেক সধবার কপালে সিন্দুর ও হলুদের কোঁটা দিয়ে হাতে একটু ভিজা ছোলা ও দু'-এক টুকরা আখ নয়ত দু'এক টুকরা শশা দেন। হাতে একটি নারকেল, একটি পান ও সুপারি দিতে হয়। এ সব দিয়ে তারা জোড়হাত মাটিতে ঠেকিয়ে মাথায় লাগিয়ে নমস্কার করেন। সধবা মহিলারাও গুগুলি একটা থলে বা রুমালে নিয়ে আপ্যায়িত হয়ে গৃহে প্রস্থান করেন। এই সামান্য অনুষ্ঠানটিই "হালদকুঙ্কু"। সংক্রান্তির দিন কেউ কেউ সধবাকে দান করা পুণ্য মনে করেন। তাই কোন কোন গৃহিণী নিমন্ত্রিতাদের প্রত্যেককে ছোট ছোট পিতলের বাটি, কেউ বা চীনে-মাটির সুদৃশ্য বাটি, কেউ বা চুল আঁচড়াবার চিরুণী উপহার দিয়ে থাকেন। ও দেশে প্রায় সকল মহিলাই চুলের খোঁপায় সুদৃশ্য মালা পরেন, কেউ কেউ বা সধবাদের ঐ সুদৃশ্য ফুলের মালা পরিয়ে দেন। এই ভাবেই "হালদকুঙ্কু"র পালা শেষ হয়।

ব্যবধান

আশা দেবী

তুমি তো শিল্পী তোমার মনেতে ফুটিতেছে শতদল,
সুদূর-প্রসারী কল্পনা-রথে চলিয়াছ বিহ্বল।
মানস-বিহারে চলেছ মরাল রেবা-শিপ্রার তীরে,
নীড়ের মরালী ভাঙ্গিয়াছে ডানা তিতিছে নয়ন-নীরে।
হেথায় কঠিন বাস্তবে বাঁধা বন্ধ হরিণী আমি,
সোনার শিকল রুমু-ঝুমু বাজে চরণে দিবস-যামি।
ভুলে গেছি কোথা সমীর-স্বনিত ঝাউ বনানীর মায়া,
পাহাড়ী নদীর কুলু-কুলু গান শ্যাম দেবদ্রুমছায়া।
মনে পড়ে না তো গিরিদরী তীরে কারে বাসিয়াছি ভালো
ভুলে গেছি নাম কে দিল আলায়ে প্রথম প্রেমের আলো
বেণু-বেতসের কুঞ্জ-কুটীরে কার ছায়া অঞ্চল,
সে দিনের স্মৃতি ফেলেছি ধুলায় মিশায়ে অশ্রুজল।
তুমি আছ বসে বাতায়ন-তলে নীল নভ পানে চাহি,
স্মৃতিপটে জাগে অনামা নায়িকা প্রেম-নীরে অবগাহি।
রোগ-দাবে-দাহী কঙ্কাল তনু মৃত্যুর পল গণে,
অদেহী কাহারা ডেকে ফিরে যায় নিশীথ পবন-স্বনে।
অর্দ্ধ চেতনে আমি ভাবি মনে পোহাবে না অমা-রাতি!
একেলা শয়নে প্রাণ ইন্ধনে জ্বলিছে বুকের বাতি।
তোমার প্রিয়া কি তমাল কুঞ্জে আসিয়াছে অভিসারে
মুখরিছে তার মণি-মঞ্জীর ঝিল্লীর ঝঙ্কারে।
গভীর রজনী মৃত্যুর মত নিথর নীরব আজ
গড়িয়া উঠিছে ঘোর ব্যবধান তোমার আমার মাঝ
তোমার যাত্রা দূর মেঘলোকে আমি যে মর্ত্ত্যচারী,
আকাশ ধরার মাঝেতে কেবল ভরা শ্রাবণের বারি।

মা

[জাতকের ছায়াবলম্বনে]

সুমেধা মুৎসুদ্দি

শ্রাবস্তি নগরী।...উষার নবোদিত রবির কিরণে ঝলমল করছে নগরী। নগরীর উপকণ্ঠে ক্ষুদ্র এক বনভূমি। তার এক বৃক্ষের স্নিগ্ধ ছায়া-তলে ভগবান্ বুদ্ধদেব উপবিষ্ট। নির্জ্জন, নিস্তব্ধ। চারি দিকের নীরবতা ভঙ্গ করে হঠাৎ কেঁদে ওঠে এক সন্ত সন্তান-হারা জননীর করুণ ক্রন্দন। বুদ্ধদেব পদতলে অর্দ্ধমূর্চ্ছিতা রমণীর পানে করুণ নেত্রে চাইতেই সে কেঁদে ওঠে, "পিতা, দুঃখ আমার কতো তা কথায় বুঝাতে পারবো না। আমার এই একটি মাত্র সন্তান বুকজুড়ানো মাণিক, এর প্রাণ ফিরিয়ে দাও প্রভু! সর্ব্বশক্তিমান্!

বুদ্ধদেব মধুর বচনে বললেন, মৃত পুত্রের প্রাণ কি ফিরান যায়? কিন্তু মায়ের অবুঝ মন যে কিছুতেই বোঝে না, নিরুপায় হয়ে বুদ্ধ বলেন, আচ্ছা যাও মা, একমুঠো শস্য নিয়ে এসো এমন বাড়ী হতে, যে বাড়ীতে মৃতের করাল ছায়া কোন দিন প্রবেশ করেনি। সেই হচ্ছে তোমার ছেলের প্রাণ ফিরে পাবার একমাত্র ঔষধ।

অসীম আশায় গ্রামের পথে অদৃশ্য হয়ে যায় শোকাতুরা রমণী। গ্রামের প্রথম বাড়ীতে গিয়েই চাইলো এক মুঠো শস্য। জিজ্ঞাসা করলে গৃহস্বামিনীকে, মা, এ বাড়ীতে কি পূর্ব্বে কোন লোক মারা গেছে? গৃহস্থ হাহাকার করে ওঠে—তুমি কি বলছ মা, এই হাতে কত সোনার দেহ চিতার আগুনে তুলে দিয়েছি।

প্রতি ঘরেই একই উত্তর।

দীর্ঘ দিনটি সন্ধ্যার অন্ধকারে লুপ্ত হয়। শ্রান্ত রমণী বুদ্ধদেবের চরণতলে লুটিয়ে পড়ে—পিতঃ আমার জ্ঞান হয়েছে, সবই বুঝতে পেরেছি। আমারই মতো কত জননী সন্তান হারিয়েছে। পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু সকলকেই হারিয়েছে। আমি মনে করেছিলাম আমিই একমাত্র সন্তানহীনা জননী!

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা

শ্রীনন্দিতা দাশগুপ্তা
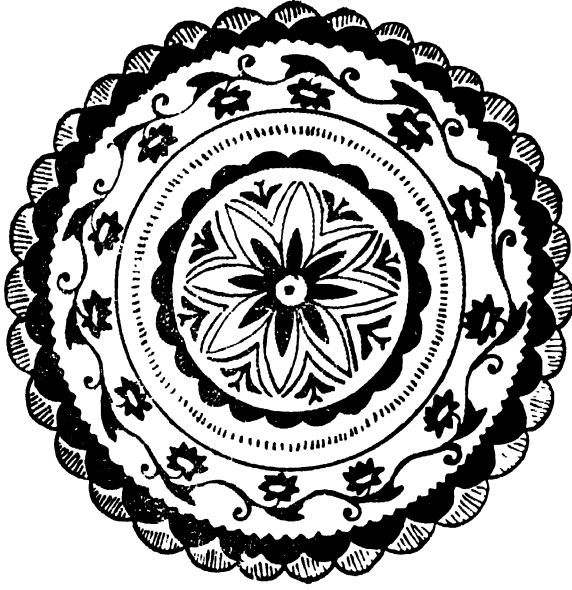
—ললিতা সরকার

নারীর স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে সব আলোচনা চলেছে তার ধারা লক্ষ্য করলে মনে হয় যে, নারীরা আর্থিক স্বাধীনতা না পেলে যেন নারী-স্বাধীনতাটা ঠিক পুরোপুরি কায়েমী হচ্ছে না।

নারীর আর্থিক স্বাধীনতা বলতে যে ঠিক কি বোঝায় তা আমি নিজে বুঝি না, কারণ, একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষে মিলে যে সংসার সৃষ্টি করে তার অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষা করে নারী এবং বহির্জগতের ভার পুরুষের উপরে ন্যস্ত। শুধু আমাদের দেশে বলেই নয়, পাশ্চাত্ত্য জগতেও সংসারে অর্থের অভাব হলেই তবে নারীরা অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় গৃহকোণ ত্যাগ করে। কারণ, তার মূলে রয়েছে নারীর নিজস্ব গৃহপ্রিয়তা, নারীর সংসার-সৃষ্টির বাসনা। একটি সংসারকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে হলে যে ধৈর্য্য দূরদর্শিতা ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন তা পুরুষদের মাঝে বিরল। নিজের অন্তরের দাবীকে স্বীকার করাই হ'ল নারীর সংসার-সৃষ্টির মূল কথা, সুতরাং এটা ভাবা ভুল যে, খাওয়া-পরা-গত গোলামীর বিনিময়ে তারা এই বন্ধনকে মেনে নেয়।

সংসার অচল হলে সেই সংসারকে সচল করার জন্য অথবা স্বামীর আয় সংসারের পক্ষে যথেষ্ট না হলে চাকুরী গ্রহণ করা অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু শুধু মাত্র আর্থিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্য নিয়ে খুব অল্প-সংখ্যক নারীই এই পথে নেমেছেন।

আমাদের দেশে চাকুরীর ক্ষেত্রও সীমাবদ্ধ এবং বধূ-জীবনে চাকরী করা আরও এই জন্যই হয়ে ওঠে না যে, তখন একটি নীড়সৃষ্টির বাসনা তার মনে প্রবল ভাবে বর্ত্তমান থাকে। মনে করুন, আমাদের দেশে যদি উপযুক্ত শিশু-আগার এবং mechanisation of cookingএর প্রণালীতে রন্ধন হবার ব্যবস্থা থাকতো তাহলেও এটা ভাবা ভুল যে, বহুসংখ্যক নারী নিজেদের আর্থিক অধীনতা মোচনের উদ্দেশ্যে চাকরী-জীবনকে বরণ করে নিতেন। সুতরাং নারীর মনোজগতের পরিবর্ত্তন না হলে তার অন্তর্মুখী প্রকৃতি সহজে বাইরের দাবী স্বীকার করে নেবে না এবং "দ্বন্দ্বের মীমাংসা" হওয়াও কঠিন।

বিবাহের পর স্বামীর সংসারকে বা তাঁর অর্থকে যদি আমরা নিজের বলে গ্রহণ করতে না পারি তখনই আসে আর্থিক অধীনতার প্রশ্ন। কিন্তু কয় জন নারী স্বামীর উপর দাবী না জানিয়ে আর্থিক স্বাধীনতার পথ খোঁজেন?

যখন নারী সংসার-রচনা করে তখন সে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দেয় স্বামী ও সংসারের মাঝে—সেই সংসারের সুখ-দুঃখ, উত্থান পতনে তার সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন। এটা নিছক ভাবুকতা বা মনোবিলাসের কথা নয়—এই-ই নারীর চিরন্তন মনোবৃত্তি। নারী যদি সংসারের মাঝে আত্মবিলোপের সাধনায় সমাহিত না থাকতো, তাহলে যে কয়টি মুষ্টিমেয় নারী সংসারে প্রবেশের পূর্ব্বে চাকরী করতেন, সংসারে প্রবেশের পরই তাঁদের অধিকাংশকে চাকরী-জীবন থেকে অবসর গ্রহণ করতে দেখা যেত না। অনেকের হয়তো ধারণা যে, এর মূলে থাকে তাঁর নবার্জ্জিত স্বামি-দেবতাটির অনিচ্ছা, কিন্তু এ ছাড়াও তার মূলে থাকে নারীর বাসনা—সংসারের মাঝে নিজের অস্তিত্বকে গোপনে অনুভব করবার স্পৃহা।

তার পর নারী যখন হয় সন্তানের জননী, তখন তার জীবনে আসে আর এক বিরাট পরিবর্ত্তন। অনেকের মতে উপযুক্ত শিশু-আগারে সন্তানকে রেখে গেলে চাকরীজীবিনী মাতা অনেকাংশে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। অবশ্য যাঁদের সংসার অচল হওয়ার দরুণ চাকরী গ্রহণ করতে হয় তাঁদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু যাঁরা আর্থিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে চাকরী গ্রহণ করেন তাঁরা হয়তো শিশু-আগারে সন্তানকে নির্ব্বাসন দিয়ে কাজে চলে যেতে পারেন, কিন্তু আমার মতে এই ভাবে সন্তানকে মায়ের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রাখায় সন্তানের বিশেষ ক্ষতি করা হয়। কারণ, নিয়মিত সময়ে খাওয়া ও পড়াশুনা ছাড়াও একটা জিনিষ আছে যটা মা ও ছেলের মাঝে সীমাবদ্ধ—সে শিক্ষা সন্তান একমাত্র মা ছাড়া আর কারুর কাছ থেকেই পেতে পারে না। মায়ের শরীর থেকে সন্তানের পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করার পরেই মা ও সন্তানের সম্বন্ধ মিটে গেল—এ ধারণা ভুল। মায়ের সাথে সর্ব্বদা থাকার ফলেও সন্তানের বহু অসমাপ্ত শিক্ষা তাদের উভয়ের অজ্ঞাতে সম্পূর্ণ হয়ে যায়। সন্তান তার জননীকে ভালো ভাবে চিনবার ও জানবার সুযোগ পায়, শেখে তার জননীর মত, রুচি ও ভাবধারাকে সম্মান করতে—অনুসরণ করতে। দশ জনের মাঝে প্রতিপালিত হলে তার গৃহের শিক্ষার বনিয়াদটা বাদ দিয়েই তার জীবন গড়ে ওঠে। আমাদের ভাবী ভারতেরা—সন্তানেরা সর্ব্বপ্রথম শিখবে শ্রদ্ধা করতে তার চতুষ্পার্শ্বের সহোদর এবং সহোদরাকে, যতক্ষণ তার নিজের গৃহ ও শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা না আসছে, তারা যতক্ষণ না শিখছে নিজের পরিমণ্ডলীর প্রকৃত সংজ্ঞা, ততক্ষণ তাদের সব শিক্ষার বনিয়াদই কাঁচা থাকবে। আর এই শিক্ষার ভার আমাদের দেশের জননীদের।

ধর্মের উপর আধুনিক যুগের আক্রমণ

উমা সেন
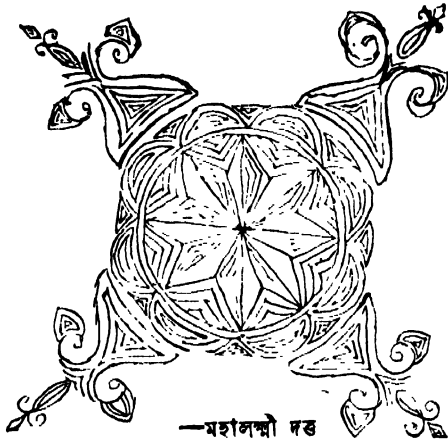
—মহালক্ষ্মী দত্ত

ঐতিহাসিক বিবর্তনের এক যুগ-সন্ধিক্ষণে আমরা সমুপস্থিত। বিদ্রোহ, অতৃপ্তি ও বেদনা সর্বত্র পরিস্ফুট। বিদ্রোহের আঘাতে পৃথিবীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন আজ ক্ষত-বিক্ষত। পুরাতন বিধি-ব্যবস্থায় মানুষ আর পায় না তৃপ্তির সন্ধান। পুরাতন আদর্শে তাহার বিশ্বাস ক্রমশই শিথিল হইয়া পড়িতেছে। তাহার অন্তরে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে ও বিজ্ঞানের প্রসারে অনন্ত সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা জাগিয়াছে। পুরাতনের দিকে উত্তরের আশায় বার-বার তাকাইয়া সে হইতেছে নিরাশ ও ব্যর্থ। এই নৈরাশ্য ও ব্যর্থতা তাহার মনে সৃষ্টি করিতেছে প্রবল অসন্তোষ ও বিদ্রোহের উপাদান। বিদ্রোহী মনে সে পুরাতনকে ভাংগিয়া-চুরিয়া নতুনকে সৃষ্টি করিতে ব্যাকুল। এই সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং সর্বোপরি আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে। নিদারুণ আর্থিক বিশৃঙ্খলা ও সামাজিক দুর্যোগের যুগে গতানুগতিক ধর্মের দিকে প্রেরণা সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ হইয়াছে ব্যর্থ। তাই গতানুগতিক ধর্মের বিধানে সে আজ আস্থাহীন। তাই সে ক্রমশই ধর্মহীন হইয়া নাস্তিকতার পথ গ্রহণ করিতেছে। কারণ, পুরাতন ধর্ম তাহার সুগভীর বাস্তব প্রয়োজনকে পূরণ করিতে আজ অক্ষম সমাজ-প্রচলিত ধর্ম তাহাকে আনন্দ দেয় না, তৃপ্তি দেয় না, জীবন উপভোগের পথও উন্মুক্ত রাখে না। ইহা শুধু মানুষকে পারলৌকিক মিথ্যা স্বপ্ন দেখাইয়া ইহলৌকিক ক্ষেত্রে প্রবল বঞ্চনা করিয়াই চলে। তাই আজ ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষের বিদ্রোহ।

বর্তমান যুগের ধর্মের উপর আক্রমণ আসিতেছে প্রধানত দুইটি কোণ হইতে। প্রথম আক্রমণ বিজ্ঞানীদের পক্ষ হইতে এবং দ্বিতীয় আক্রমণ সমাজ-সংস্কারকগণের দিক্ হইতে। বৈজ্ঞানিকেরা নব নব আবিষ্কার দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই জগৎ কার্য-কারণের অমোঘ নিয়মের দ্বারা পরিচালিত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে খামখেয়ালী গতি বলিয়া কিছু নাই। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে বিচ্ছিন্ন ও খামখেয়ালী বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাও কার্য কারণ-নিয়মাধীন। জড়-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিচিত্র আবিষ্কার দ্বারা এই সত্যটিই প্রমাণিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত খুশী বা খেয়াল অনুসারে প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম কখনও বিচ্যুত হয় না। ইহাই যদি সত্য হয়, তবে ঈশ্বর-উপাসনায় লাভ কী? সকল জ্ঞান, শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রতিভূরূপে আমরা যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ধর্ম-জীবনে স্বীকার করি ও শাস্ত্রে যাঁহার উপাসনার অনুমোদন ও বিধি-বিধান আছে, তাহার সার্থকতা বিজ্ঞানীরা ঘৃণামিশ্রিত করুণায় অস্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরোপাসনার বিরুদ্ধে সাধারণতঃ দুইটি যুক্তি উত্থাপন করেন। বিশ্ববিখ্যাত চিন্তাগুরু স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন "An Idealist View of Life" পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে উহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন।

বিজ্ঞানীরা বলেন যে, ঈশ্বর নামধেয় মূর্তি মানুষের নিছক কল্পনার সৃষ্টি—তাহার anthropomorphic conception মাত্র। মানুষ তাহার দুর্বল মুহূর্তে প্রয়োজন ও অভাব অনুসারে মানসলোকে গড়িয়া তোলে এক অতি-মানব বা দেব-মানবের মূর্তি। কল্পলোক ব্যতীত অন্য কোথাও সেই মূর্তির স্থান নাই। ইহার কোন বাস্তব সত্তাও নাই। কাজেই তাহার নিকট জাগতিক অভাব পূরণের জন্য ব্যর্থ উপাসনায় সময় ব্যয় নির্বুদ্ধিতা মাত্র। "There is no God and we are the instruments of a cold, passionless fate to whom virtue is nothing and vice nothing and from whose grasp we escape to utter darkness." অর্থাৎ ভগবান্ বা ঈশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। আমরা উদাসীন ও নিষ্ঠুর নিয়তির হস্তে যন্ত্রমাত্র। ইহার নিকট পাপ পুণ্যের কোন বালাই নাই, গভীর অন্ধকারের মধ্যে অবলুপ্ত হওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তরও নাই। কাজেই জাগতিক দুঃখ-বেদনা মোচনের উপায়স্বরূপ ঈশ্বরোপাসনা বৃথা, কারণ সেই ঈশ্বরের কোন বাস্তব অস্তিত্বই তো নাই। আর যদি ঈশ্বরের অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত থাকেও, তবুও তো তিনি কার্য কারণ-নিয়মাধীন। খামখেয়ালী ভাবে তাঁহার পক্ষেও কোন কিছু করা সম্ভব হইবে না। কাজেই অক্ষম দেবতার পূজায় সময় ও শক্তি ব্যয় নিরর্থক ও ভ্রান্ত। ইহা ছাড়া, বর্তমান বিজ্ঞান ধর্মের অন্যান্য ভিত্তিগুলিকেও ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়াছে। আত্মার অমরতা ও পুনর্জন্ম পরলোকের অস্তিত্ব, অদৃষ্টবাদ ইত্যাদি মূলগত চিন্তার অসারতা প্রদর্শন করিয়া আধুনিক বিজ্ঞানীরা ধর্মের ভিত্তিকে অত্যন্ত দুর্বল করিয়া তুলিয়াছেন।

ধর্মের উপর আধুনিক যুগে দ্বিতীয় আক্রমণ আসিতেছে সমাজ-বিপ্লবীদের নিকট হইতে। তাহারা বলে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা পরলোকের অস্তিত্ব থাকুক বা নাই থাকুক, তাহা বড় কথা নয়, প্রধান কথা হইল ধর্মের কোন সামাজিক মূল্য বা pragmatic value আছে কি না। ধর্ম যদি সমাজে মংগল আনে, মানুষের যদি জাগতিক অভাব-অভিযোগ পূরণের পথে সহায়তা সৃষ্টি করে, তবেই তাহার মূল্য, নাচেৎ তাহার দাম কানাকড়িও নয়। কিন্তু প্রচলিত ধর্ম মানুষের জাগতিক দুঃখময় জীবনে কোন শান্তিই আনে না—তাহাকে কেবল মিথ্যা স্বপ্নে ভুলাইয়া তাহার কর্মশক্তিকে পংগু করে। যে ধর্ম মানুষকে ইহলোকে কোন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান দিতে পারিল না, সে দিবে পরলোকে মুক্তি! ইহা কী বিশ্বাস্য? আর যদি পরলোকে মুক্তি আসেও, তাহাতে বর্তমানে মাটির পৃথিবীতে তাহার কী মূল্য? ধর্ম যদি বর্মের মতন আঘাত-আক্রমণ হইতে মানুষকে রক্ষা করিতেই না পারিল, তবে তাহা কিসের ধর্ম, জীবনে তাহার প্রয়োজনই বা কোন্‌খানে? বিপ্লবী শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "গৃহদাহ"

উপন্যাসে এই আক্রমণের সুর অতি সুস্পষ্ট। অন্যান্য দিক হইতেও এই বিদ্রোহ প্রমাণ করা যাইতে পারে।

সমাজ-বিপ্লবীদের ভিতর যাহারা অধুনা সাম্যবাদী বা কমিউনিষ্ট বলিয়া পরিচিত, তাহারা আবার ধর্মের উপর আক্রমণে আরও প্রচণ্ড। তাহারা বলে, ধর্ম শুধু যে মানুষের মংগল বিধান করিতেই অক্ষম তাহা নহে পরন্তু সাংসারিক ক্ষেত্রে অশেষ দুঃখ ও বিড়ম্বনার প্রত্যক্ষ কারণ হইয়া আছে। তাহাদের বিচারে ধর্ম হইল বনিয়াদী স্বার্থরক্ষার একটা উপায়স্বরূপ। অধিকারহীন ও ক্ষমতাহীনের বিরুদ্ধে অধিকার-প্রাপ্তের স্বার্থরক্ষা এবং সুযোগ-সুবিধা সংরক্ষণের ব্যাপারে ধর্মের মতন সক্রিয় যন্ত্র খুব অল্পই আছে। ক্ষুধিত বঞ্চিত শোষিত মানুষের নিকট ইহা পারলৌকিক স্বপ্ন তুলিয়া ধরে, ইহলোকে সংযমের নামে আত্মনিগ্রহের ভুয়া মন্ত্র প্রচার করে যাহাতে উৎপীড়িত মানুষের মন সমাজের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিতে না পারে। ধর্মের পালক ও প্রচারকবর্গ সমাজের শোষক ও শাসকশ্রেণীর স্তাবক মাত্র। বনিয়াদী স্বার্থরক্ষার দিকে স্বভাবতই তাহাদের সজাগ দৃষ্টি। নিজেদের শ্রেণিস্বার্থের জন্য এবং তাহাদের সমগোত্রীয় শাসকবর্গের স্বার্থরক্ষার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই তাহাদের বিধি বিধানের সৃষ্টি। ইতিহাস পাঠে এই ধারা সর্বদাই দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পাঠে দেখা যায়, এ দেশে ব্রাহ্মণ পুরোহিতশ্রেণীর প্রথম উদ্ভব হয় ক্ষত্রিয় রাজন্যবর্গের একাংশ হিসাবে।* এই পুরোহিতবর্গ সমাজে ক্ষত্রিয়কুলের স্তাবক ও সমর্থক হিসাবে কাজ করিত, এবং যুদ্ধের সময়ে সর্বপ্রকারে রাজন্যকুলের সহায়তা করিত। তাহারা জনসাধারণের মংগলের অজুহাতে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান ও স্বার্থদুষ্ট শাস্ত্রাদি রচনার দ্বারা তাহাদের মন শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিত। ইহার ফলে জনগণের উপর শাসক ও সংগে সংগে যাজকশ্রেণীর শোষকমূলক শৃঙ্খল দৃঢ়রূপে কায়েম হইত। ইউরোপের মধ্যযুগীয় ইতিহাস পাঠেও দেখা যায় যে, স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের সংগে ক্যাথলিক যাজক শ্রেণীর সহযোগিতা ছিল অত্যন্ত গভীর। বর্তমানে ধনতন্ত্র-বাদের যুগেও পুঁজিপতিদের সংগে দেশে দেশে যাজকশ্রেণীর সজ্ঞানে অজ্ঞানে সহযোগিতা চলিয়াছে। নূতন সমাজ গঠনের পথে বনিয়াদী স্বার্থের দ্বারা চালিত হইয়া যাজকশ্রেণী সর্বত্রই নানা ভাবে কণ্টক সৃষ্টি করিতেছে। অতীত গৌরবের মিথ্যা স্বপ্নে মানুষকে বিভোর করিয়া তুলিয়া statusquoকে অক্ষুণ্ণ রাখিতেই তাহারা ব্রতবদ্ধ। সেই দিক দিয়া তাহারা প্রগতিবাদের শত্রু। কাজেই সমাজের উন্নতির জন্যে ধর্মজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করা আশু প্রয়োজন। তাই আজ ধর্মের বিরুদ্ধে দেশে দেশে সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত নর-নারীর প্রচণ্ড বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিয়াছে। সাম্যবাদী রাশিয়ায় ধনতন্ত্রবাদের অবসানের সংগে সংগে পুরাতন ধর্মেরও অবসান হইয়াছে। শাসক ও শোষকশ্রেণীর স্তাবক হিসাবে যাজকশ্রেণীও বিলুপ্ত হইয়াছে। যাহা কিছু মানুষের ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত, কি সামাজিক, কি রাষ্ট্রিক জীবনের মংগল আনয়ন করে, তাহাই সেখানে ধর্ম, তাহাই মন্ত্র, তাহাই জীবনের আদর্শ।

এইবার সমালোচকের দৃষ্টি লইয়া দেখা যাউক, ধর্ম কী তবে বর্তমান জগতে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য? ইহা কি শুধু মানুষকে শৃঙ্খলিত করিয়াই রাখে? এই সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিবার আগে প্রথমেই ধর্মের আদর্শ ও তাহার সামাজিক পরিণতির দিকে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। আদর্শের সংগে সামাজিক পরিণতির যে সকল সময় নিবিড় যোগ থাকিবেই তাহার কোন অর্থ নাই। আদর্শ মহান্ হইয়াও তাহার সামাজিক প্রকাশ অত্যন্ত কুৎসিত হইতে পারে। ধর্মের বিরুদ্ধে আধুনিক যুগের যে আক্রমণ তাহা কি ধর্মের মূলগত আদর্শের বিরুদ্ধে, না ধর্মের নামে সমাজে যে অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান প্রচলিত তাহার বিরুদ্ধে? অর্থাৎ ধর্মের বিরুদ্ধে না ধর্মতন্ত্রের বিরুদ্ধে? ইহাই হইল বর্তমানে আসল প্রশ্ন। ধর্ম ও ধর্মতন্ত্র এই দুইটি পারিভাষিকের অর্থবিন্যাস এই প্রসংগে প্রয়োজনীয়। রবীন্দ্রনাথকে উদ্ধৃত করিয়া বলা চলে যে, "ধর্ম বলে, মানুষকে যদি শ্রদ্ধা না করো, তবে অপমানিত ও অপমানকারী কারো কল্যাণ হয় না। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, মানুষকে নির্দয় ভাবে অশ্রদ্ধা করিবার বিস্তারিত নিয়মাবলী যদি নিখুঁত করিয়া না মানো, তবে ধর্মভ্রষ্ট হইবে। ধর্ম বলে, জীবকে নিরর্থক কষ্ট যে দেয় সে আত্মাকেই হনন করে। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, যত অসহ্য কষ্টই হোক, বিধবা মেয়ের মুখে যে বাপ-মা বিশেষ তিথিতে অন্নজল তুলিয়া দেয় সে পাপকে লালন করে। ধর্ম বলে, অনুশোচনা ও কল্যাণ কর্মের দ্বারা অন্তরে বাহিরে পাপের শোধন। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বলে, গ্রহণের দিনে বিশেষ জলে ডুব দিলে, কেবল নিজের নয়, চৌদ্দপুরুষের পাপ উদ্ধার। ধর্ম বলে, যে মানুষ যথার্থ মানুষ, সে যে-ঘরেই জন্মাক পূজনীয়। ধর্মতন্ত্র বলে, যে মানুষ ব্রাহ্মণ সে যত বড় অভাজনই হোক, মাথায় পা তুলিবার যোগ্য। অর্থাৎ মুক্তির মন্ত্র পড়ে ধর্ম, আর দাসত্বের মন্ত্র পড়ে ধর্মতন্ত্র।" অর্থাৎ মূল ধর্ম অন্তরের বস্তু,—তাহা ব্যক্তিগত সাধনা-সাপেক্ষ। কিন্তু ধর্মতন্ত্র বহির্জগতের সামগ্রী—ইহাতে যাজক শ্রেণীর প্রাধান্য। অর্থনৈতিক কারণে এই ধর্মতন্ত্র অধিকার-বৈষম্যকে স্বীকার করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তদনুরূপ অধিকার-ভেদ-মূলক শাস্ত্রও রচিত হইয়াছে। কিন্তু আজ সাম্যের যুগ আসিয়াছে। কোটি কোটি নর-নারী সাম্যের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সমাজের ও রাষ্ট্রের সকল অধিকার-বৈষম্য বিলুপ্ত করিতে আজ চঞ্চল। তাই রক্ষণশীল ধর্মের পালক ও প্রচারকবর্গের সহিত প্রগতিবাদী ও বিপ্লবীদের বর্তমানকালীন বিরোধ অতি স্বাভাবিক ও সাংঘাতিক। সমাজ-বিপ্লবীরা মনে করে যে, ধর্ম হইল শোষণ-মূলক পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার অন্যতম বিরাট স্তম্ভস্বরূপ। কাজেই পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থা ভাংগিয়া নূতন সমাজ সুন্দর ভাবে গড়িয়া তুলিতে হইলে যাজক শ্রেণীর এবং সংগে সংগে ধর্মতন্ত্রের উচ্ছেদ একান্ত প্রয়োজন। "Spiritually an external and ceremonial religion is good for nothing; materially it has failed to stop the strong from exploiting his weaker brother; psychologically it has developed traits which are anti-social and anti-scientific.* কাজেই ধর্মজাতীয় সামাজিক অনুষ্ঠান

* ডক্টর ভূপেন দত্ত-প্রণীত "ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি" (প্রথম খণ্ড, ১১৪৫) দ্রষ্টব্য।

* S. Radhakrishnan: An Idealist View of Life, pp. 46-47.

ও প্রতিষ্ঠান সমূলে ধ্বংস করা প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বিপ্লবীদের আসল আক্রমণের লক্ষ্য ধর্মের নামে সুপ্রচলিত ধর্মতন্ত্র। এবং এই দিক্ দিয়া বিষয়টি অবলোকন করিলে তাহাদের আক্রমণ সার্থক ও কল্যাণপ্রদ। কিন্তু এই আক্রমণ যদি ধর্মের উপরেই আসিয়া পড়ে তবে তাহা হইবে মানুষের পক্ষে সর্বনাশা! কারণ, যাজক-শ্রেণী-শাসিত ধর্মতন্ত্রে যত অনাচার ও দৈন্য, কলুষ ও ব্যভিচার থাকুক না কেন, ধর্মের আদর্শ হইল মানব-জীবনের গভীরতম দাবিগুলি পূরণ করিবার পথপ্রদর্শন। মানুষের জাগতিক দাবীগুলির প্রয়োজন চরম ভাবে স্বীকার করিয়াও বলা চলে যে, ইহাই তাহার জীবনের সবটুকু নয়। তাহার অন্তরের গভীরে আছে সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি অনুরাগ, অসীমকে জানিবার ব্যাকুলতা ও অমৃত পিপাসা। ইহাদিগকে অস্বীকার করিলে জীবনের একটা বড় অংশকেই অস্বীকার করা হইবে। উপস্থিত প্রয়োজনের উন্মাদনার মুহূর্তে হয়তো ইহাদের সার্থকতা দৃষ্টিগোচর হয় না, তবুও জীবনের সামগ্রিক বিকাশের আদর্শে যাহারা আস্থাবান, তাহারা ঐ সকল আধ্যাত্মিক মূল্যকে অস্বীকার করিতে পারে না। বস্তুনিচয়ের সঞ্চয়ের দ্বারা আর যাহাই হোক, ভূমার জন্য অন্তরের যে কান্না তাহার অবসান নাই। মানুষের এই গভীরতম প্রয়োজনেই ধর্মের মূল্য। হৃদয়ের এই মৌন আকাঙ্ক্ষা চিরন্তন—রাজ্য ভাংগা গড়ার মধ্য দিয়াও ইহা অপরিবর্তিত। কাজেই ধর্মের প্রয়োজনও চিরন্তন।—দার্শনিক রাধাকৃষ্ণন্ ঠিকই বলিয়াছেন যে, "There is an insistent need in the human soul to come to terms with the unseen reality. So long as man is man, hoping and aspiring and reflecting on the meaning of existence and the responsibilities it entails, there is no fear of the loss of religion. It is only a question of reformulation." (Kalki, p. 55.) প্রকৃত ধর্ম ছাড়া মানুষ কেমন করিয়া সমগ্র ভাবে নিজেকে গড়িয়া তুলিবে? বৃত্তিনিচয়ের সামঞ্জস্য-বিধান ও জগতের প্রত্যেকের সংগে কল্যাণময় সম্বন্ধ স্থাপনের দ্বারাই আত্ম-বিকাশ সম্ভব। এই জন্য অনেক ত্যাগ, তিতিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন। সেই ত্যাগ ও তিতিক্ষার আদর্শ দেয় ধর্ম। ধর্মের মহিমাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "মানুষের ধর্ম" গ্রন্থে ঘোষণা করিয়াছেন। এই ধর্মই যথার্থ মানবধর্ম।—যুগে যুগে ইহার ভিত্তিতেই সমাজ গড়িয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতের সাম্যবাদী সমাজ গঠনের দিনেও এই মানব-ধর্মের প্রয়োজন হইবে। ইহাকে বিসর্জন দিয়া সাময়িক প্রয়োজনের দিকে কেবল দৃষ্টি রাখিয়া ভবিষ্য সমাজ গঠন করিলে তাহা শেষ পর্যন্ত মানুষের জীবনে অভিশাপ হইয়াই থাকিবে। সমাজের পুনর্গঠন তো একটা বৃহত্তর লক্ষ্যের জন্যই। জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশই ইহার লক্ষ্য—সমাজের আর্থিক-রাষ্ট্রিক-সামাজিক অংশগুলির ভিতর শৃঙ্খলা ও ঐক্যস্থাপন উপলক্ষ মাত্র। এই উপলক্ষ যদি লক্ষ্যকে ছাপাইয়া বড় হইয়া জীবনে দেখা দেয়, তবে তাহা মানুষের পক্ষে আর এক দুর্দিনের লক্ষণ নিঃসন্দেহে বিবেচিত হইবে। সেখানে সম্পদের প্রাচুর্য থাকিবে, কিন্তু মন থাকিবে উপবাসী ও আত্মা দীন। জীবন সেখানেও ছন্দহীন, অর্থহীন বলিয়া মনে হইবে। ঐশ্বর্য থাকিবে, জ্ঞান থাকিবে, প্রকৃতির উপর কর্তৃত্বও থাকিবে, কিন্তু জীবনে থাকিবে না "creative joy" অর্থাৎ সৃষ্টিমূলক আনন্দের স্পর্শ। ভবিষ্যতের এই অনাগত অভিশাপের বিষয়ে বিপ্লবীদের বোধ হয় সচেতন হওয়ার প্রয়োজন আজিকার দিনে আসিয়াছে।

বনের দুলাল

নীলিমা দত্ত

শাল-মহুয়ার ছায়া-ঢাকা বনে পাহাড়ের কোল ঘেঁসে
ঘর বেঁধে থাকে সাঁওতালে মিলে নির্জ্জন নদীর দেশে।
কালো গায়ে দোলে গুঞ্জার মালা কাণে লাল জবাফুল
নিকষ পাষাণে কোঁদা যেন দেহ কোথা তার সমতুল।
মহুয়া-বনের স্বাধীন দুলাল স্ফূর্তিতে ভরা প্রাণ
বনে বনে ফেরে নাহি ভয়-ডর হাতেতে ধনুর্বাণ।
কাছাকাছি বাড়ী সাজান পল্লী মাটী দিয়ে রচা ঘর
সুখের বাঁধনে খুসী হ'য়ে থাকে কেহ নহে কারো পর।
পূজা-পার্ব্বণ বিবাহ-লগনে মেতে ওঠে গ্রামখানি
ঘিরে বসে সবে চুল্লির পাশে বন-পশু মারি আনি।
দিন ভোর শুনি চলে নাচ-গান মহুয়ায় ভরপুর
রাতে ভেসে আসে মাদলের সাথে বাঁশীর মেঠুয়া সুর।
জানে না ক' ওরা দুঃখ-বিকার মানে না ক' কোন ক্ষতি
সরল সবল সহজ মানুষ কারে নাহি করে নতি।
ভাগ্যেরে ওরা নাহি দেয় দোষ কারো ধনে নাহি লোভ
সবল দেহের রসে ভরা মন অভাবে জাগে না ক্ষোভ।
শাল-পলাশের বনের মাঝারে অজানা সে পথ-ঘাট
রাজ্য পেতেছে সাঁওতালে মিলে গড়েছে সুখের হাট।

—গীতি দেবী

অখিল ভারতীয় শারীরিক শিক্ষা মহামণ্ডল—

অমরাবতীতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ব্যায়াম-সম্মিলনের উদ্বোধন উৎসবে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের ও 'ল' কলেজের ভারপ্রাপ্ত ব্যায়ামশিক্ষক শ্রীমনোতোষ রায় শ্রেষ্ঠ দেহীর সম্মান লাভ করিয়া বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। এমন এক দিন ছিল, যখন বাঙ্গালীপ্রতিভা ভারতীয় চিন্তাধারার অগ্রদূত ও পথপ্রদর্শক ছিল। আজ দিকে দিকে অধঃপতিত বাঙ্গালীর দুরবস্থার চরম ফুটবল ও হকিতে বাঙ্গলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেষ্ঠত্বের আসন টলমল। ক্রিকেটে আমরা আজও নিদারুণ ভাবে পশ্চাৎপদ। ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা যে জাতির প্রতীকস্বরূপ সেই জাতির মরণোন্মুখ সন্ধিক্ষণে শ্রীযুত রায়ের এই বিরাট সফলতা আন্তঃ-প্রাদেশিক খেলা-মহলে বাঙ্গলার আসন শাশ্বত রাখিয়াছে।

মাত্র আট বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত অনুরূপ এক শরীর-চর্চা উৎসবে বিখ্যাত ব্যায়ামবিদ্ শ্রীযুক্ত বিষ্ণু ঘোষের প্রিয়তম ছাত্র মনোতোষ পরিচালকদের খেয়ালের ফলে উপযুক্ত সম্মানে বঞ্চিত হয়। এই অনাদর যুগপৎ গুরু ও শিষ্যের মনে গভীর রেখাপাত করে। নিয়মিত অনুশীলনে ও উৎকৃষ্ট সাধনের উদগ্র কামনায় কঠিন তপস্যা-রত সাধক আজ সিদ্ধির গৌরবে উদ্ভাসিত। আজ সারা ভারতে শ্রেষ্ঠ শরীর-শিল্পীর সম্মানে মনোতোষ তাঁহার পরম প্রিয় গুরুর প্রতিষ্ঠা বৃদ্ধি করিয়াছে। উৎসবের প্রারম্ভেই শিষ্য-শোর্য্য-গর্ব্বিত শ্রীযুক্ত ঘোষ দর্পভরে সমবেত প্রতিযোগিগণের সম্মুখে ঘোষণা করেন, "আজ আমি আপনাদের এক অনন্যসাধারণ প্রতিভার সন্ধান দিব।" তাঁহার সেই জয়োদ্দীপ্ত ঘোষণা সার্থক হইয়াছে।

পুণার অন্যতম চিকিৎসক ও এই অনুষ্ঠানের পরীক্ষক ডাঃ নাথু বলেন যে, মনোতোষের শরীরের গঠন এত সুন্দর ও পেশীবহুল যে, তাহার অর্দ্ধেক পেশী থাকলেও রায়ের সমকক্ষতা করিবার মত যোগ্যতা কোন প্রতিযোগীর নাই। বস্তুতঃ, মনোতোষের শরীরের গঠন এত চমৎকার যে পরীক্ষকসভা দ্বিতীয় বা তৃতীয় স্থানের উপযোগী কোন প্রতিযোগী খুঁজিয়া পান নাই। আজাদ হিন্দ মুক্তি ফৌজের মেজর জেনারেল শাহ নওয়াজ উচ্ছ্বাসভরে নিজের গলার মালা রায়কে পরাইয়াছেন। ভারতের যোগাসনের গুরু স্বামী কুবলয়ানন্দজী ও নাগপুরের ভাইস চ্যান্সেলার ডাঃ পুরাণিক রায়ের স্বাস্থ্যের সুন্দর সার্টিফিকেট দেন।

মনোতোষ এ যাবৎ চার বার নিখিল ভারতে শ্রেষ্ঠ দেহী আখ্যা লাভ করিয়াছে বিভিন্ন ভারতীয় ও নানা জাতির বৈদেশিক প্রতিযোগী তাহার নিকট পরাভব মানিতে বাধ্য হইয়াছে।

তাহার উদ্দেশ্য ছিল, বাঙ্গালীর দুর্ব্বলতা ও কাপুরুষতার দুর্ণাম দূর করা। তাহার ব্যায়ামের মূলমন্ত্র—আত্মসংযম, আত্মনির্ভরতা, একাগ্রতা ও নিষ্ঠা। মিতব্যয়িতায় শরীর গঠন করা যে সম্ভব তাহাও রায় সপ্রমাণ করিয়াছে। এই দরিদ্র দেশেও যে দেহ গঠন সম্ভব তাহা শ্রীযুক্ত রায়ের খাদ্য-তালিকা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান মনে হয়। সাধারণ বাঙ্গালী গৃহস্থের নিত্য আহার্য্য ব্যতীত সকালে ভাতের ফেনের সঙ্গে পালং, পুঁই পাতা ও ডাঁটা এবং টোম্যাটো একত্রে সিদ্ধ করিয়া একটু গোল-মরিচের গুঁড়া ও প্রয়োজনমত লবণ মিশাইয়া দৈনিক ৮-৩০ মিঃ সময়ে এক সের পরিমাণ পান করিয়া থাকে।

নিখিল ভারত ফুটবল প্রতিযোগিতা—

বাঙ্গালোর হইতে বহু-বিলম্বিত নিখিল ভারত ও আন্তঃ-প্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতার সন্তোষ স্মৃতি ট্রফীর আলোচ্য বৎসরের অনুষ্ঠানে বাঙ্গলা পরাজয়ের গ্লানি লইয়া ফিরিয়াছে। ফুটবলে বাঙ্গলার একাধিপত্যের যুগ বহু দিন চলিয়া গিয়াছে। ভারতীয় ফুটবল-জগতে অগ্রণী বাঙ্গলা আজ শক্তিসজ্জার বৃদ্ধির জন্য সুদূরতম প্রতিবেশী-প্রদেশের দিকে সন্ধানী দৃষ্টি নিক্ষেপ তৎপর। এবারের প্রতিযোগী বাঙ্গলা প্রাদেশিক দলের খেলোয়াড়গণের মধ্যে অর্দ্ধেকের উপর অবাঙ্গালী। বাঙ্গলা দেশের সুনাম ও প্রতিষ্ঠা বজায় রাখার জন্য স্বভাবতঃ তাহাদের মধ্যে বাঙ্গলার মাটিতে ও উপাদানে তৈয়ারী খেলোয়াড়দের ন্যায় উন্মাদনা ও আকুল আগ্রহ থাকা সম্ভব নহে। পেশাদারী খেলোয়াড়দের ন্যায় ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল এই সমস্ত খেলোয়াড় সমন্বয়ে গঠিত দলে সমষ্টি-গত সংহতি ও দলগত একনিষ্ঠার অভাব প্রতি পদে বিদ্যমান। আমাদের মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের পরাজয়ের মূলে এই বিচ্ছিন্নতা বিষক্রিয়ার ন্যায় সংক্রামিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ যেখানে প্রদেশগত প্রতিষ্ঠা বা সুনামের প্রশ্ন উঠে সেখানে প্রদেশবাসী ভাষাভাষী লোকেদের প্রথম সুযোগ দেওয়াই বাঞ্ছনীয়। রাজপুতানাকে অনায়াসে ও হায়দ্রাবাদকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গলা ফাইন্যালে আসিয়া এক দিন অমীমাংসার পরে মহীশূরের নিকট পরাজয় বরণ করে। অবশ্য শোনা যায়, মহীশূরে কোন বহিরাগত দল কখনও স্থানীয় দলের বিরুদ্ধে এ যাবৎ জয়ী হইতে পারে নাই।

ন্যাশানেল টেনিস প্রতিযোগিতা—

কলিকাতা সাউথ ক্লাবের উদ্যোগে পরিচালিত নিখিল ভারত টেনিস প্রতিযোগিতায় উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড় সুমন্ত মিশ্র শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিয়া আলোচ্য বৎসরের জন্য ন্যাশানেল চ্যাম্পিয়ন হইয়াছে। ভারতের ক্রমপর্য্যায়ে শীর্ষস্থানীয় ও বহুদর্শী গউস মহম্মদ দিল্লী প্রতিযোগিতা ও বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নসিপ-বিজয়ী দিলীপ বসুর ন্যায় সুনিপুণ খেলোয়াড়গণকে পরাজিত করিয়া সুমন্ত শেষ পর্য্যায়ে মানমোহনের সম্মুখীন হয়।

ভারতে আমন্ত্রিত চেক্ টেনিস তারকাদ্বয়ের (ড্রবনী ও ক্যাস্কা) মধ্যে অধিকতর খ্যাত উইম্বলডন প্রতিষ্ঠাপন্ন ড্রবনী ইতিপূর্ব্বে মানমোহনের নিকট পরাজিত হয়। স্মরণ থাকিতে পারে, ড্রবনী ক্র্যামের বিরুদ্ধে জয়ী হইলে সারা পৃথিবীর পর্য্যায়ভুক্ত হওয়ার সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়াছিল। তাহাদের এই পরিচয়ে ডেভিস কাপে যোগদানকারী ভারতীয় দল যথেষ্ট অনুপ্রেরণা পাইবে সন্দেহ নাই। আমাদের মনে হয়, বৈদেশিক ও বিভিন্ন জাতীয় টেনিস খেলোয়াড়গণের সহিত খেলার আদান প্রদান হইতে থাকিলে আমাদের খেলোয়াড়েরা আন্তর্জাতিক টেনিস মহলে নিজেদের স্থান করিয়া লইবে। সুমন্ত মিশ্রের কৃতিত্বের প্রধান উৎস তাহার সার্ভিস। তাহার ক্ষিপ্রতা ও তৎপরতায় প্রতিদ্বন্দ্বী খেলোয়াড়েরা প্রত্যেকেই নাস্তানাবুদ হয়।

মনোতোষ রায় —বোর্ণ এণ্ড সেফার্ড

স্বর্গাদপি গরীয়সী
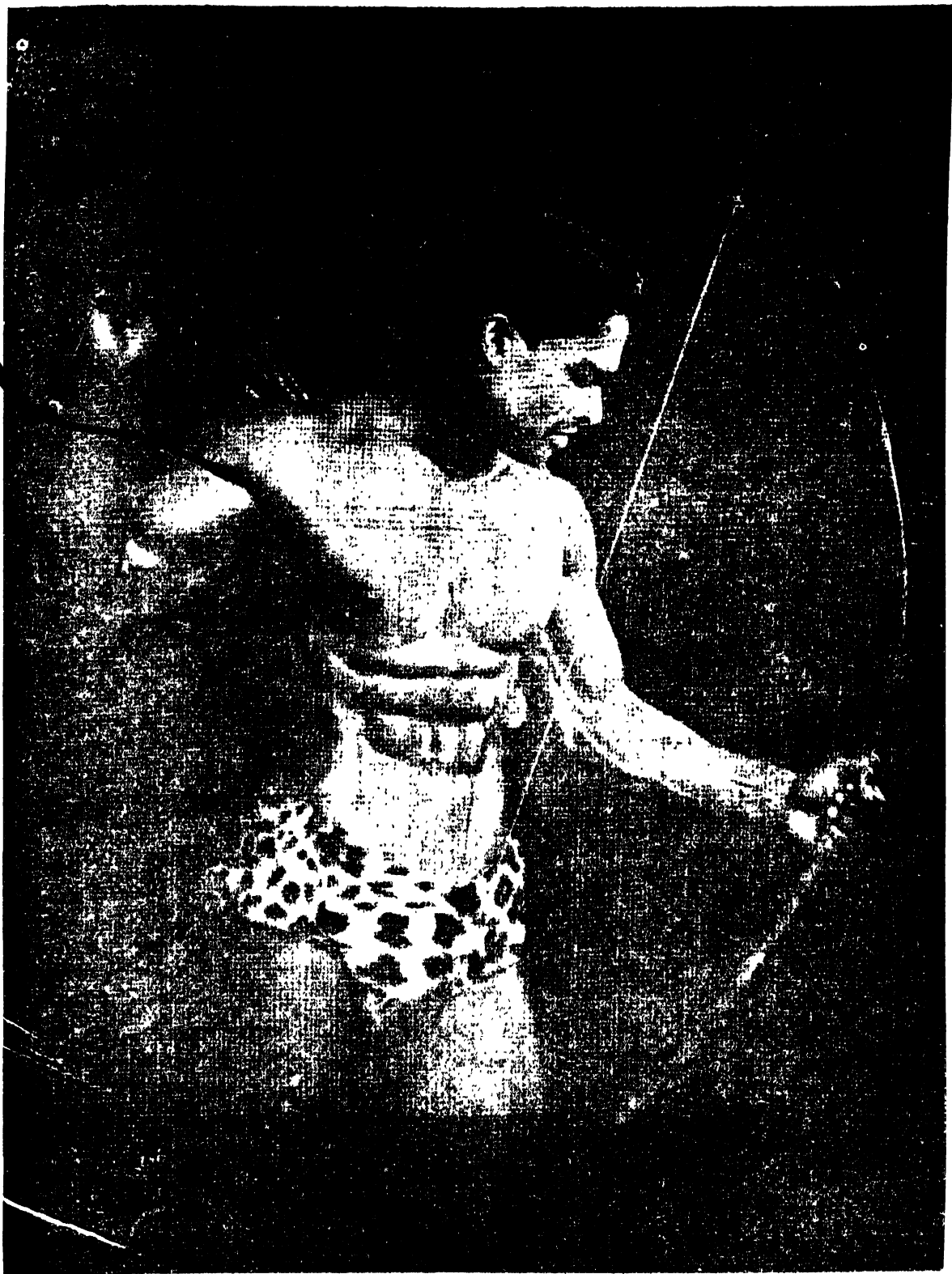
শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শেষ পর্যায়

১

আরও কত বৎসর গেল কাটিয়া।

জীবনের যেটা সৃষ্টির অংশ সেটা ধীরে ধীরে অতীত হইয়া গেল। এখন গিরিবালার এদিক দিয়া ছুটি, বুকের উত্তাপ দিয়া এক দিন যাহা সৃজন করিয়াছেন—সুখে দুঃখে—একটি নিশ্চিন্ত তৃপ্তিতে তাহার মধ্যে বিচরণ করিয়া ফেরা, জীবন মানে এখন এই দাঁড়াইয়াছে। সবার ভাগ্যে এ তৃপ্তিটুকু জোটে না, কেন না, জীবনের এই সন্ধিক্ষণে পুরাতনের পাশে যে নূতন আসিয়া দাঁড়ায় তাহাতে অধিকাংশ স্থলেই ঘটে বিরোধ—পুরাতন মনে করে তাহার অধিকারের মধ্যে নূতনের এটা অনধিকার প্রবেশ। বোধ হয় কবি-পিতার কন্যা বলিয়াই গিরিবালার মনটা এদিক দিয়া একেবারে মুক্ত; সমস্ত জীবনটাকে আলো-ছায়া, নূতন-পুরাতনের বৈচিত্র্যময় সমগ্রতায় দেখিতে অভ্যস্ত। নূতন আচার, নূতন সজ্জা, সমস্ত জীবনটার প্রতিই নূতন দৃষ্টিভঙ্গি—ছেলে-মেয়ে-বধূদের মধ্যে দিয়া পরে আবার নাতি-নাতনিদের মধ্যে দিয়া নূতনকে ছাড়াইয়া আরও নূতন—সমস্তকেই গিরিবালা নিজের পাশটিতে টানিয়া লন।... মেয়ে-স্কুলের অভাবে আজকাল দু'টি নাতনি ভাইয়েদের স্কুলেই যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। মাষ্টার মশাইয়ের নিকট হইতে পড়িয়া আসিয়া তাড়াতাড়ি স্নান সারিয়া মুখে কোন রকমে এক মুঠা ভাত গুঁজিয়া লয়, তাহার পর বব, করিয়া ছাঁটা চুলে তাড়াতাড়ি চিরুনির গোটাকতক টান দিয়া, খাটো ফ্রক আর অল্প গোড়ালি-উঁচু ষ্ট্রাপ সু পরিয়া ক্ষিপ্র-পদে ভাইয়েদের সঙ্গে বাহির হইয়া পড়ে,—চোখে-মুখে রাজ্যের উদ্বেগ। গিরিবালার অনভ্যস্ত চোখে একটু অদ্ভুত লাগে বৈ কি; গিরিবালা মুখে একটু হাসি লইয়া চাহিয়া থাকেন। ঠাট্টা করিবার লোক আছে,—বড় নাতি-নাতনির দল,—বলে—"গিন্নি, তোমায় দেখে মনে হচ্ছে হিংসে হচ্ছে তোমার, মনে মনে বলছ এ-জন্মে তো হোল না, আসছে জন্মে যেন ঐ রকম করে আমিও যেতে পারি ইস্কুলে।"

গিরিবালা হাসিয়া বলেন—"ঠিক হিংসের মতন এমন কিছু না হলেও মন্দ কি?—বেঁচে আছি বলেই তো দেখতে পাচ্ছি। আমাদের কালে এই বয়েসটায় পুণ্যি-পুকুর, সেঁজুতি এই সব নিয়ে থাকতাম, আজ বৌমারা যেমন দেরির জন্যে এদের তাড়া দিচ্ছেন, তখন নাইতে, ফুল তুলে আনতে দেরি হলে মা-জেঠাইমারা আমাদের সেই রকম তাড়া দিতেন..."

ওদের মধ্যে থেকে দুষ্টামির প্রশ্ন হয়—"কোন্‌টা ভালো গিন্নি?"

গিরিবালার দৃষ্টি একটু স্বপ্নালু হইয়া আসে, বলেন—"ভালো মন্দের বিচার করা শক্ত, তবে আমার তো মনে হয়ই যে, আবার যদি জন্মাতেই হয় তো যেন বেলেডেঙ্গাপুরের মতন কোন জায়গায় এই বয়েসটায় পুণ্যি-পুকুর, সেঁজুতি নিয়েই থাকি! সে যে আবার কি ছিল তোদের বোনেরা তো জানতে পারছে না।"

কথাটা মিথ্যা নয়, এমন কি বাড়াইয়াও বলা নয়, কেন না, নিজের অতীতের মতো এত মিষ্ট আর কিছুই লাগে না মানুষের কাছে। কিন্তু এ ধরণের দৃশ্যগুলিও গিরিবালা সম্পূর্ণ প্রীতির চক্ষেই দেখেন। শুধু প্রীতিই নয়, চোখে লাগিয়া থাকে একটা বিস্ময়।...ও-পাড়ায় মিত্তিরদের বড় ছেলের বিবাহ হইল, বউটি বি-এ পাশ। 'বিবি বউ বিবি বউ'—সহরে একটা রব পড়িয়া গেল। এক দিন গিয়া দেখিয়া আসিলেন। আজ-কাল বিয়ের কনের বয়স হইয়া যাইতেছে—গিরিবালার চোখে একটু একটু করিয়া সহিয়া আসিতেছে, তবে ওঁদের সে-যুগের তো কল্পনাতীতই এ-মেয়েটি যেন আরও বড়, বছর কুড়ি তো বটেই। ঘোমটাটা বউয়ের জড়ানে-জড়ানে ভাব অবশ্য মোটেই নেই—ওঠা-বসার [illegible] সব তা'তেই একটা সপ্রতিভ স্বচ্ছন্দতা, কিন্তু [illegible], বেরিয়ানা বলিতে যাহা বোঝায় তাহার ধার দিয়াও তো [illegible] না, বাড়ির মধ্যে তো এতটুকু বে-মানান নয়। বেশই তো লাগিল গিরিবালার, এই নূতন যুগটিই যেন চারি দিক দিয়া ঘিরিয়া রহিয়াছে মেয়েটিকে। তাঁহার সম্ভ্রম এতটুকু নষ্ট করিল না, নিজের হায়ায় এতটুকু অপচয় হইতে দিল না, অথচ দিব্য মানানসই করিয়া তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া গেল. এতটুকু বাচালতা না করিয়া অনেক রকমই গল্প করিল। বেশ অনেক কিছু জানে, তবে জানে যে এটা জানাইবার এতটুকু চেষ্টা নাই। সব চেয়ে গিরিবালার মিষ্ট লাগিল মেয়েটি ওঁর ছেলের লেখা বই পড়িয়াছে; যাহার বই পড়িয়াছে তাহারই মায়ের সঙ্গে বসিয়া গল্প করিতেছে—এর আনন্দটুকুর যেন থৈ পাইতেছে না মেয়েটি, এর বিস্ময়টুকু শেষ পর্য্যন্ত যেন কাটাইয়া উঠিতে পারিল না।

মনে বেশ একটি মিষ্ট স্বাদ লইয়া ফিরিলেন গিরিবালা। বিশেষ করিয়া ছেলের লেখা লইয়া যে ব্যাপারটুকু সেটা লাগিল বড় চমৎকার। মানুষের একটা অহমিকা থাকেই, মেয়েটি বড় কোমল একটি স্পর্শ দিয়াছে তাহাতে; গিরিবালা ভাবেন—এরা শিখিয়াছে, পাঁচ রকম পড়িয়াছে, বোঝে, তাই তো এদের কাছে তাঁহার এই মর্যাদা।... বাড়িতে আসিয়া নিজেই এক সময় ওপর পড়া হইয়া প্রসঙ্গটা তুলিলেন, নিজেদের যুগটাকে একটু খাটো করিয়া দিয়াই বলিলেন—"তা যখনকার যেটা দোষ সেটা বলতে হবে বৈ কি—আগেকার বউ দেখা সে যেন একটা একঘেয়ে কাণ্ড ছিল বাপু এক ক্কাঁটা একটি মেয়ে কলের পুতুলের মতন চোখ বুজে বসে আছে, জবুথবু, ঘোমটাটি তুলিয়ে 'বাঃ, বেশ, দিব্যিটি' বলে গোটা কতক বাঁধা বুলি আওড়ে যাও, না কোন কথা, না কিছু; তার চেয়ে এ একটা মানুষের মতন কাছে এসে বসল, পাঁচটা কথার উত্তর দিলে, নিজেও পাঁচটা ভালো-মন্দ কথা তুললে দিব্যি হাসি-হাসি ভাব, অথচ যে বেহায়াপনা বলব তাও নয়, আমার তো বেশ লাগল বাপু, চমৎকারটি..."

সত্যই বউটি এই নূতন যুগেও যেন একটি নূতন আলোক-সম্পাৎ করিয়াছে। গিরিবালার মনটা চিরদিনই দেশ-কালের সব রকম সঙ্কীর্ণতার ওপরে। কোথাকার মেয়ে, কোথায় বধূ হইয়া আসিলেন, কোথায় আবার জীবনের পরিসমাপ্তি হইতে চলিয়াছে,—এ-ধরণের মানুষ জীবনকে ছোট ছোট গণ্ডী দিয়া মাপিয়া চলিতে শেখে না;

তবুও মেয়েটি এ যুগের ওপর একটা নূতন শ্রদ্ধা আনিয়া দিয়াছে। ভাষা দিয়া ঠিক মতো প্রকাশ করিতে পারেন না, তবে বোঝেন ভাষা এদের এবং প্রসঙ্গ উঠিলে চেষ্টাও করেন নিজের অনুভূতিটাকে গুছাইয়া সামনে ধরিতে। মেয়েদের লেখাপড়ার এই বাড়াবাড়ি লইয়াই এক দিন শশাঙ্ক বলিলেন—"জীবন যদি মাটির ঢেলার মতন এক জায়গায় পড়ে থাকবার জিনিষ হোত তো তোমাদের সময় যা ছিল আজও তাই হোত মা; কিন্তু জীবন যে সচল, চলবার জন্যেই তাকে নতুন সময়ের মতন করে নতুন পথ সৃষ্টি করতে হবে।"

গিরিবালা একটু চুপ করিয়া যেন মনে মনে কি মিলাইয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"সে তো বটেই। আমার এক এক সময় কি মনে হয় জানিস্ ?—রাস্তাটা যাতে শুধু চলবার যুগ্যিই না হয়ে একটা সুন্দরও হয় সেদিকে আজকালকার সবার নজর একটু বেশি। ভুল-ভ্রান্তি যে না হচ্ছে এমন নয়···কিন্তু ভুল ভ্রান্তি তো বড় ক'রে ধ'রে থাকবার জিনিষ নয়···"

নব-যুগের চিন্তাধারার আরও নূতন নূতন গতিপথ আছে :

মুক্তি চাই, স্বাধীনতা চাই। ছেলেবেলায় যে-ইংরাজের অত গুণগান শুনিতেন, পাণ্ডুলের যুগেও যাহারা অপযশের মধ্যেও একটা সম্ভ্রমই জাগাইয়া গেছে, নবযুগের যাচাইয়ে তাহারা হইয়া দাঁড়াইয়াছে শত্রু। দ্বারভাঙ্গ-বাসের প্রথম অংশে বাংলায় যে হাওয়াটা উঠিল সেটা এখন দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছে ···কত আত্মবলি, কত অত্যাচার! অন্তঃপুরে এক-আধটু যা' ঢেউ আসে তাহাতে ভয়ই হয় যদিও হয়তো কৌতূহল-মিশ্রিত একটা প্রশংসাও থাকে। ভয়,—এত কষ্ট করিয়া ছেলেদের মানুষ কর—কখন কাহার গায়ে এ-বাতাসের ঢেউ লাগে কি বলা যায়?···এই সময়ই এক দিন হঠাৎ খবর আসিল হরেন কলেজ ছাড়িয়া দিয়াছে। এম, এস্-সি পড়িতেছিল, বাড়ির মধ্যে এই প্রথম ছেলে যে এম্-এস্-সি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছিল, গিরিবালা মস্ত বড় একটা আশা পোষণ করিয়াছিলেন, খুব রূঢ় আঘাতই পাইলেন। শৈলেনের পর ছেলের কাছ থেকে এই দ্বিতীয় আশাভঙ্গ।···বিপিনবিহারী বাড়ি ছিলেন না, শশাঙ্ক শৈলেনও কর্মস্থান থেকে ফিরিল সন্ধ্যার সময়। তাহাদের ভয় মায়ের জন্যই বেশি; গিরিবালা কিন্তু ততক্ষণে দুঃখ-দুর্ভাবনার পালা শেষ করিয়া ফেলিয়াছেন, শশাঙ্ক প্রসঙ্গটা তুলিলে তাহার মুখের পানে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া একটু সঙ্কুচিত ভাবে বলিলেন—"ভুল করে ফেলেছে ছেলেমানুষ- চাকরি—পড়া-ছাড়ার কেমন একটা ঢো উঠেছে···" একটু হাসিয়া বলিলেন—"তোরা দু'জনে এ ভুল না করলেই হোল।"

শশাঙ্ক বিরক্ত হইয়াছিলেন, কি ভাবে বুকের রক্ত দিয়া গড়া সংসার বাবা-মা'র পর এক তিনিই জানেন, বলিলেন—"আমরা চাকরি ছাড়লে আর ও-বাবুর হুজুগে মাতবার অবসর হবে কোথা থেকে মা?"

এ-কথাটুকু বাহির করা দরকার ছিল, গিরিবালা নিশ্চিন্ত হইলেন; বলিলেন—"কড়া করে কিছু তাবে লিখিস্নি যেন বাবা। উঠেছে একটা হাওয়া, যদি না-ই চায় আর পড়তে ও। আমার মন কি বলছে জানিস্?—ওর ভালো হবে।"

শশাঙ্ক একটু বিস্মিতই হইয়াছেন। তিনি তো এই ধরণের একটা কিছু আশঙ্কাই করিতেছিলেন, মা'রই বরং ভাঙিয়া পড়িবার কথা। বলিলেন—"ভালো হয়, ভালোই। কিন্তু মন তোমার এমন অদ্ভুত কথা বলে কি করে বুঝি না তো মা।···দু'টো মাস গেলে পাশ করে বেরুত ও।"

এত বড় আশার উৎস যে কোথায় সেটা প্রকাশ করিয়া ব'লতে বাধে গিরিবালার; একেবারে মর্মস্থলের বস্তু, গোপনেই রাখিতে ইচ্ছা করে। খবরটুকুর প্রথম আঘাত কাটাইয়া উঠিবার পর থেকেই গিরিবালা বিকাশ দাদার কথাই ভাবিয়াছেন মনে মনে। রাজনীতি, সমাজনীতি অত কিছু না বুঝুন, এটা বুঝিতে পারেন হরেন যাহা করিয়াছে তাহার সঙ্গে বিকাশ দাদার আদর্শের একটা মিল আছে। বিকাশ দাদা সে যুগের বি-এ ছিলেন, ভালো চাকরির সুযোগ আসিয়াছিল কয়েক বারই, কলিকাতার বড় সওদাগরী আফিসে, কিন্তু যান নাই। এক বারকার কথা মনে আছে, বলিলেন—"গিরি, ওরা বেণে হয়ে এসেই যে ধাপ্পাবাজি করে আমাদের দেশটা হাতে করেছে এ আক্রোশ আমার যাবার নয়, আমি বেণে-ইংরেজের গোলামি করতে পারব না।" ওই কথাটাকেই আজ এরা ফলাও করিয়া বলিতেছে—স্কুল-কলেজের নাম দিয়াছে গোলাম তৈয়ার করিবার কারখানা। যদি দিয়াই থাকে ছাড়িয়া হরেন তো এমন কি হইয়াছে তাহাতে?···বিকাশ দাদা উপর থেকে আশীর্বাদ করিবেন।···ভয়ও হয়, হরেন যদি আরও মাতামাতি করে, জেলে যায়! গিরিবালার মনে যে সুরটুকু ধ্বনিত হইয়াছে সেটা অত উদাত্ত হইয়া উঠিতে পারে না, বাঙালী গৃহস্থ-জননীর মনই তো। তবু ভয়টুকু যে একেবারে কাটাইয়া উঠিতে পারেন না এমন নয়, পরিণামটা আরও উর্ধ্বে এক জনের হাতে ছাড়িয়া দেন, মনে মনে বলেন—"যায়, তখন ভগবান আছেন, করছিই বা কি আর?"

এই এখন গিরিবালার জীবন; নিজে আছেন নিজের পুরাতন আসনটিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেখানে থাকিয়াই দুই বাহু প্রসারিত করিয়া নূতনকে গ্রহণ করিয়া গেছেন।···শৈলেন এক দিন লীনাকে চিঠিতে মায়ের কথার প্রসঙ্গে লিখিল—"সব চেয়ে অপূর্ব জিনিষ যা মায়ের মধ্যে এখন দেখছি লীনা, তা এই যে মা আমাদের সবাইকে যে বিস্ময় আর আর আনন্দের মধ্যে বুকে তুলে নিয়েছেন, আজ পরিবর্তিত জগতের যত নূতন আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা সেগুলোকেও ঠিক সেই বিস্ময় আর আনন্দেই মনের মধ্যে গ্রহণ করেছেন। ভেবে কূল পাই না কি করে সম্ভব হোল এটা। মা শিক্ষিতা নন যে-অর্থে তোরা শিক্ষিতা; তাহ'লে কি মায়ের জীবনের গতিরই এইটে স্বাভাবিক পরিণতি? সেই গতির মধ্যেই বা এমন কি বিশেষত্ব ছিল?—মায়ের মধ্যে সব চেয়ে বড় জিনিস যা আমার চোখে পড়েছে তা হচ্ছে তাঁর প্রসন্নতা। তার গভীরতায় এত শক্তিই কি লুকানো থাকতে পারে?

আমি দেখছি যতই দিন যাচ্ছে মা যেন আরও বড় করে মা হয়ে উঠছেন! আগে, জীবনের এক স্তরে ছিলেন মাত্র আমাদের জননী, এখন নতুন আশা, নতুন বিশ্বাস—অর্থাৎ মানুষের মনের যত নব-জাতক—সে সবকেও কোল দিয়ে মা যেন ছোট মাতৃত্ব ছাড়িয়ে আর একটা বড় মাতৃত্বে পরিণত হয়ে চলেছেন। মায়ের যত অণুপ্রেরণা সব বিকাশ মামার কাছ থেকে পাওয়া—তা তুই জানিস্; কিন্তু মনে হয় তিনিও কখন এ-পরিণতি কল্পনায় আনতে পারেননি।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

যুগান্তর বলিতেছেন :—"বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা যাইতেছে, বিভিন্ন স্থানে জনগণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন এবং ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সম্প্রদায়ের ভিতর পান-ভোজন ও মেলামেশার সামাজিক বিধিনিষেধগুলি অপসারিত করিবার কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।" বিশেষ না হইলেও ইহা যে সামান্য আশার কথা তাহা বলা বাহুল্য।

কিন্তু কেবলমাত্র একসঙ্গে পান-ভোজন ও মেলামেশা করিলেই দেশ হইতে অস্পৃশ্যতা-পাপ দূর হইবে কি না বলা শক্ত। ইতিপূর্ব্বে সামাজিক বিধি-নিষেধ থাকা সত্ত্বেও সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা বহু ক্ষেত্রে এবং স্থানে একসঙ্গে 'পান ও ভোজনের' আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে নাই। রোগের চিকিৎসা যদি করিতেই হয়, তাহা হইলে একেবারে গোড়া হইতেই করা প্রয়োজন। রোগের কারণ যদি বিনষ্ট না হয়, তাহা হইলে রোগের আরাম একান্ত সাময়িক ভাবেই হইবে। চিরস্থায়ী কোন ফল তাহাতে লাভ হইবে না।

যুগান্তর ঠিকই বলিয়াছেন; "কিন্তু অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের এই সকল আন্দোলন, তাহার অনুকূলে প্রবন্ধ-বক্তৃতা হাঁকানো, সভা-সমিতি ডাকাইয়া একত্রে সন্দেশ ভক্ষণ, সরবৎ পান, একত্রে পূজা-পার্ব্বণ অনুষ্ঠান, সামাজিক উৎসব-অনুষ্ঠানে একযোগে আহার-বিহার ইত্যাদি দর্শনীয় বা লক্ষণীয় ঘটনা হিসাবে প্রশংসাহ হইলেও প্রকৃত কাজের পথে ইহা কতটা সহায়ক, তাহা লইয়া বাস্তবিকই সন্দেহের অবকাশ আছে।" সন্দেহ যথেষ্টই আছে।

* * * *

বোম্বাই সরকার প্রদেশ হইতে মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ করিবার মনোহর এবং কার্য্যকরী পরিকল্পনা করিয়াছেন। ১৯৪৭-৪৮ সাল হইতেই এই পরিকল্পনা মত কার্য্য আরম্ভ করা হইবে। পরিকল্পনা মত প্রথম তিন বৎসর পরীক্ষামূলক ভাবে মাদক দ্রব্য ব্যবহারের পরিমাণ কমাইয়া—চতুর্থ বৎসরে তাহা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া হবে। রাজস্ব কমিয়া যাওয়ায় সরকার ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, এবম্বিধ বিরূপ সমালোচনার পথও তাঁহারা রাখেন নাই। স্থানাভাবে বোম্বাই সরকারের মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ভাবে দেওয়া সম্ভব হইল না। কিন্তু পরিকল্পনা সম্বন্ধে শুধু এইমাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী হইবার পথে কোন বাধা নাই এবং ইহা সফল হইবে। অবশ্য বোম্বাই প্রদেশে যদি কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের পতন ঘটে, তাহা হইলে অন্য কথা।

* * * *

মাদ্রাজ সরকারও মাদক দ্রব্য ব্যবহার বন্ধ করিবার পরিকল্পনা মত কার্য্য করিতেছেন। একটির পর একটি জেলাতে কার্য্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৪৬ সালের ১লা অক্টোবর হইতে মাদ্রাজে মাদক দ্রব্য ব্যবহার নিবারণ কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে, এবং মাত্র এই কয় মাসেই তাহা আশাতিরিক্ত ফলপ্রসূ হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গলা দেশে আমাদের লীগ সরকার এই বিষয়ে কি করিতেছেন? যত দূর জানা যায়, বাঙ্গলা দেশে আবগারী দোকানের লাইসেন্স কেমন করিয়া এক সম্প্রদায়ের লোকের হাত হইতে অন্য সম্প্রদায়ের লোকের হাতে দেওয়া যায়—কেবল মাত্র সেই মতলব মত কার্য্য ছাড়া তাঁহাদের অন্য কোন পরিকল্পনা নাই। সরকারী খাজনা বৃদ্ধির জন্য গত মাস দুই হইতে বাঙ্গলার মাদক দ্রব্যের ব্যবহারও যেন বেশী হইতেছে বলিয়া মনে হইতেছে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

* * * *

কয়েক দিন পূর্ব্বে কলিকাতায় বাঙ্গালী-সম্মেলন হইয়াছিল। এই সম্মেলনে অন্যান্য বিষয়ের সহিত বাঙ্গলার সমস্ত স্বায়ত্ত-শাসন-মূলক প্রতিষ্ঠানে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তনের জন্য গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। সভাতে এই প্রস্তাব গৃহীত হইলেও বাঙ্গলা সরকার ইহা গ্রহণ করিবেন না ইহা জানা কথা। কারণ, এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলে দেশের হয়ত মঙ্গল হইবে, কিন্তু বর্ত্তমান লীগপন্থীদের যে ক্ষতি হইবে—তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। যাঁহাদের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি বিভেদ এবং বিদ্বেষের উপর, তাঁহাদের নিকট একতা এবং মিলনের প্রস্তাব প্রেরণ করা বাতুলতা ছাড়া আর কি হইতে পারে?

* * * *

'ঢাকা-প্রকাশ' পত্রে নোয়াখালী জিলার শ্রীরামপুরনিবাসী কয়েক জন মুসলমান গান্ধীজী সম্বন্ধে বলেন :—"গান্ধীজী আমাদের এখানে আছেন, এ জন্য আমরা সুখী ও গর্ব্বিত। গান্ধীজীকে আমরা অশেষ ভক্তি করি এবং আমাদের ইচ্ছা যে, তিনি এখানেই থাকুন। কিন্তু গান্ধীজীকে কেন এখানে আসিতে হইল তাহা যখন চিন্তা করি, তখন লজ্জায় মরিয়া যাই।" আশার কথা সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রসঙ্গে বাঙ্গলার লীগ দলের, বিশেষ করিয়া অবাঙ্গালী লীগ সদস্যগণ গান্ধীজীকে নোয়াখালী এবং বাঙ্গলা হইতে বিদায় করিতে পারিলেই যেন বাঁচেন—এ কথা তাঁহারা প্রকাশ করিয়াই বলিতেছেন এবং লীগ পত্রিকাগুলিও তাহা ছাপিতেছেন। গান্ধীজীর আবির্ভাবে নোয়াখালীর মাটিতে হিন্দু-বিদ্বেষের শিকড় গাড়িতে পারিল না বলিয়াই বোধ হয় ইঁহাদের এত মনঃকষ্ট। বহু কষ্ট এবং যত্নে চাষের ফসল ভাল না হইলে দুঃখ হইবারই কথা।

'আসানসোল হিতৈষী' পত্রে প্রকাশ : "গত কয়েক বৎসর যাবৎ আসানসোল মহকুমার পল্লী অঞ্চল সমূহে ম্যালেরিয়ার ভীষণ প্রকোপ দেখা দিয়াছে। এইরূপ ম্যালেরিয়ার তাণ্ডবলীলা যদি বৎসর বৎসর চলিতে থাকে—তাহা হইলে অচিরেই গ্রাম-সমূহ জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইবে। "—কিন্তু বাঙ্গলার লীগ সরকার যে-ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাতে ঐ অঞ্চল জনশূন্য প্রান্তরে পরিণত হইবে না। বিহার হইতে হাজার হাজার তথা-কথিত "দুর্গত" আমদানি করিয়া ঐ স্থানকে জনবহুল অঞ্চল করিয়া রাখা হইবে।—"অধিবাসী সকল বৎসর বৎসর জ্বরে ভুগিয়া কঙ্কালসার, কর্ম্মশক্তিহীন ও উদ্যমশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা অর্দ্ধমৃত অবস্থায় বাঁচিয়া আছে।" ইহা কেবল মাত্র আসানসোল অঞ্চলের কথা নহে, প্রায় সমস্ত বাঙ্গলার কথা। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্টের এ-বিষয়ে কোন দায়িত্ব আছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা এখন বিহারের সমস্যা এবং আসামের আশু প্রত্যক্ষ সংগ্রাম লইয়া ব্যস্ত আছেন। বাঙ্গলার মৃতপ্রায় দুর্গতদের রক্ষার জন্য টাকা খরচ করা অপেক্ষা বিহারের দুর্গতদের জন্য অর্থব্যয় বাঙ্গলার ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয়। মহামান্য লীগ-নায়ক এবং 'হাইকমাণ্ড' বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীকে নিশ্চয়ই এই আদর্শমত কার্য্য করিতে নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন।

* * * *

'শিল্প ও সম্পদ' পত্রিকায় এক জন লেখক বলিতেছেন :—

"পঞ্জিকা আমাদের গার্হস্থ্য জীবনে নিত্যব্যবহার্য্য।...কিন্তু এই পঞ্জিকার বিজ্ঞাপন পৃষ্ঠাগুলির মধ্যে......যৌন রোগের গুপ্ত চিকিৎসার উত্তেজক ... দ্রুত বিবরণ......কোমলমতি বালক, সদ্যোভিন্ন-যৌবন তরুণ-তরুণী, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ—এক কথায় আপামর জনসাধারণ সকলেই অবাধে এই বিজ্ঞাপন-মাধুরী পান করেন।" এই ব্যাপার আজ নূতন নহে. গত ৪০ বৎসর হইতে চলিতেছে। সমাজপতিদের এ-দিকে কোন দৃষ্টি নাই। যে-সকল প... পঞ্জিকা প্রস্তুত করেন, তাঁহারাও এ-বিষয়ে উদাসীন। পৃথিবীর অন্য কোন দেশে যৌন-রোগের চিকিৎসা এবং তাহার ঔষধাদির বিজ্ঞাপন কোন পত্রিকায় প্রকাশ আইনত নিষিদ্ধ। আমাদের দেশে এই প্রকার আইন হালে একটি হইয়াছিল, কিন্তু ঐ আইনের প্রয়োগ এখনও কোথাও চোখে পড়ে নাই। আমাদের দেশের প্রায় সকল পত্রিকাই এই প্রকার বিজ্ঞাপন প্রকাশের পাপে পাপী। কাজেই দোষ দিব কাহাকে ?

* * * *

'পাঞ্চজন্য' বলিতেছেন : "জানা গিয়াছে যে বাঙ্গলা সরকার স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহারা নিখিল ভারত সার্ভিসগুলিতে লোক সংগ্রহ, উহাদের শিক্ষাদান প্রভৃতি বিষয়ে ভারত সরকার যে স্কীম করিয়াছেন, তাহাতে যোগদান করিবেন না, তাঁহারা এই বিষয়ে নিজস্ব একটা স্কীম তৈয়ার করিবেন।" বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে নিজস্ব স্কীম না করিলে কেমন করিয়া চলিবে ? ভারত সরকারের স্কীমে যোগ্যতম ব্যক্তিরাই চাকুরি পাইবে, এবং এই সকল যোগ্যতম ব্যক্তিদের মধ্যে মুসলমান শতকরা ৩০,৩৫এ বেশী না-ও হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গলা সরকারের চাকরির যোগ্যতার মাপকাঠি যাহা, তাহাতে শতকরা ১০ জন মুসলমানই হয়ত বাঙ্গলা সরকারে চাকরি লাভ করিবে। ভারত সরকারের কোন পরিকল্পনায় যোগদান করিতে অস্বীকার করা বাঙ্গলা সরকারের স্বাধীনতার চিহ্ন বলিয়াও ধরা যাইতে পারে।

* * * *

'পল্লীবাসী' পত্রিকার মতে "......ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জনসাধারণকে এক এক অঞ্চলে বাস উঠাইয়া আনিয়া লোকসংখ্যা পরিবর্ত্তন দ্বারা সমস্যা সমাধানকল্পে মিঃ জিন্না যে পরিকল্পনা দিয়াছেন, মুসলমান সমাজেরই বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি তাহা বাতুলতা বলিয়া উপেক্ষা করিয়াছেন। মিঃ জিন্না এবং মুসলিম লীগের নেতৃগণ কিন্তু এই সকল চিন্তাশীল মুসলিমদের উপেক্ষা করেন নাই। নানা প্রকার ইতর-জনোচিত বিশেষণে সম্ভাষিত করিয়া এই সকল জিন্না-পরিকল্পনা-বিরোধি মুসলিম ভদ্রলোকদিগকে মুসলিম লীগকর্ত্তাগণ প্রত্যক্ষ প্রহার এবং নিগ্রহের হুমকি দিয়াছেন। চিন্তা করিয়া কথা বলা এবং কাজ করা লীগ সদস্যদের ধাতে সহ্য হয় না।

* * * *

আধুনিক চিকিৎসা হইতে জানা যায় : "ম্যালেরিয়া বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কল্যাণে নিবার্য্য ব্যাধি। কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে শুধুমাত্র ম্যালেরিয়ায় প্রতি বৎসর যত লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, বিগত মহাযুদ্ধেও তদপেক্ষা অধিক লোক মরে নাই। তার উপর শিশুমৃত্যুর হার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় এত বেশী যে, জন্মের প্রথম দশ বৎসরের মধ্যেই অর্দ্ধেক শিশু কালগ্রাসে পতিত হয়।......প্রতি হাজার জন-পিছু এক জন ডাক্তার, ৪৩.... জন-পিছু এক জন নার্স, ও ৬০,....জন-পিছু এক জন ধাত্রী আছে। ২৫ লক্ষ লোক সর্ব্বদা যক্ষ্মা রোগে ভোগে এবং ৫ লক্ষ প্রতি বৎসর মারা যায়, কিন্তু হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে মাত্র ছয় হাজার জনের। সুদক্ষ চিকিৎসকের (যক্ষ্মা রোগে বিশেষজ্ঞ) সংখ্যা মাত্র ১০৮০ জন। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসা-ব্যবস্থাও প্রায় একইরূপ। তার পর যৌন ব্যাধি—ইহা শুধু রোগ হিসাবেই নয়—গুরুতর সামাজিক সমস্যারূপেই জাতির জীবনে ইহার আত্মপ্রকাশ ঘটিয়াছে।"

* * * *

আশার কথা, ভারত সরকার দেশের সাধারণ স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহিত হইয়াছেন এবং যাহাতে ক্রমে ক্রমে কয়েক বৎসরের মধ্যে দেশে বিবিধ রোগের প্রকোপ ব্যাহত হইয়া অবশেষে একেবারে লোপ পায়, তাহার জন্য ভোর কমিটির পরিকল্পনা মত কার্য্য শুরু করিয়াছেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য জনকল্যাণকর পরিকল্পনার মত এই স্বাস্থ্য-উন্নয়ন পরিকল্পনাকেও বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট হয়ত বিষবৎ পরিত্যাগ

করিবেন। খুব সম্ভবত বাঙ্গলা সরকারের কুশলী মন্ত্রিমণ্ডলী এই বিষয়ে নিজেদের আর একটি মূল্যবান স্কীম প্রস্তুত করিবেন। অবশ্য এই স্কীম মত কার্য্য হইতে কিছু বিলম্ব হইবে, কারণ, বাঙ্গালা দেশে মুসলমান ডাক্তারদের সংখ্যা তাহার পূর্ব্বে বৃদ্ধি করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে মুসলিম নার্স এবং ধাত্রীদেরও সংখ্যা শতকরা ৬০জন করিতে হইবে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য কম পক্ষে ১৫।২০ বৎসর সময় লাগিবে। একটা জাতির ইতিহাসে ইহা এমন কিছু বেশী সময় নহে! ১৫।২০ বৎসরে কমপক্ষে ৪০।৬০ লক্ষ লোক নানা রোগ ভোগে অকালে স্বর্গলাভ করিবে, ইহার বেশী আর কিছু হইবে না?

* * * *

ধানের ট্যাক্স— এ বৎসর সর্ব্বত্রই ভাল ধান হইয়াছে। দূর হইতে ধান্য শহরে আনিতে হইলে প্রতি পাঁচ মণে দুই টাকা ট্যাক্স দিতে হইবে বলিয়া ঢেটরা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া শুনিতেছি। ইহাই কি লোকের সুখ শান্তি দানের চেষ্টা?—মেদিনীপুর হিতৈষী। 'মেদিনীপুর হিতৈষী' বোধ হয় এখনও জানিতে পারেন নাই যে, সুখ-শান্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার জন্য বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট আরো নানা ভাবে খাজনা বৃদ্ধির কথা চিন্তা করিতেছেন। চিন্তার ফলে পাঁচ মণে দু'টাকা খাজনা হয়ত দু'মণে পাঁচ টাকা দাঁড়াইতে পারে। অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বাঙ্গলা সরকারের খাজনা বৃদ্ধি না করিয়া পথ নাই। বিহার হইতে যে ভাবে রাজনৈতিক "দুর্গত" আমদানী করা হইতেছে তাহাদের বসবাস এবং আরাম-ব্যবস্থা বাবদ কত লক্ষ টাকা আমাদের দিতে হইবে, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই।

*

শ্রীযুক্ত হুমায়ুন কবীর বলেন: "……ভারতের হিন্দু-মুসলমানের সম্মুখে আজ দুইটি মাত্র পথ খোলা রহিয়াছে। তাহারা শান্তি ও বন্ধুত্বের সহিত বাস করিয়া পরস্পর উন্নতির সহায়ক হইবে, নচেৎ পরস্পরকে নিশ্চিহ্ন করিয়া দিয়া সহস্র বৎসরের সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা যে সভ্যতার বনিয়াদ গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাকে বিনষ্ট করিবে। শত্রুতা সাধন ও প্রতিশোধ গ্রহণের ঘৃণ্য নীতি গত কয়েক বৎসরব্যাপী এরূপ অবাধ ভাবে প্রচার করা হইতেছে যে, যখনই এক জন মুসলমান কোন হিন্দুকে হত্যা করিতেছে, তখন প্রকারান্তরে ভিন্ন ক্ষেত্রে সে এক জন মুসলমানের মৃত্যুর কারণ হইয়া দাঁড়াইতেছে। অপর পক্ষে এক জন হিন্দু যখন কোন মুসলমানকে হত্যা করিতেছে তখন সে ক্ষেত্রবিশেষে এক জন হিন্দুর মৃত্যুর কারণ হইতেছে।…" কবীর সাহেবের বক্তব্যে আপত্তিকর বা আপত্তি করিবার মত কিছু নাই। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে এই বক্তব্যে চিন্তার বহু খোরাক রহিয়াছে। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গলা দেশে কবীর সাহেবের মতাবলম্বী মুসলমান মাত্র জন কয়েক। বেকায়দায় পড়িয়া হক সাহেবও আজ লীগ দলভুক্ত! কৃষক-প্রজা দলের মঙ্গল চিন্তা আজ হক সাহেবের কাছে এমন কিছু বৃহৎ ব্যাপার নহে! অথচ হিন্দু-মুসলমানের মিলন উৎসবে হক সাহেবই হয়ত আজ প্রধান পুরোহিত হইতে পারিতেন। ভাইএর বুকে ভাইএর ছুরি মারা তিনিই বন্ধ করিতে পারিতেন।

আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

পরমাণবিক বোমা-সমস্যা—

নিউ ইয়র্কের পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলন এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন এবং মার্কিণ প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যানের বক্তৃতায় আমরা যথেষ্ট আশাবাদী মনোভাবেরই প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছি। তাঁহারা এই আশ্বাসের বাণীই [illegible] যে, বৃহৎ রাষ্ট্র-ত্রয়ের মধ্যে অনৈক্যের অবসান হইয়া শান্তি এবং আন্তর্জ্জাতিক বন্ধুত্বের যুগ আরম্ভ হওয়ার সূচনা দেখা যাইতেছে। নিউ ইয়র্কের পররাষ্ট্র-সচিব-সম্মেলনে রাশিয়ার উদার মনোভাবের জন্য মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়াতেই যে তাঁহাদের মনে এইরূপ আশার সঞ্চার হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী ঘটনাবলীর গতি দেখিয়া তাঁহাদের এই আশাকে ক্ষণভঙ্গুর বলিয়াই সকলের মনে হইবে। তাঁহাদের এই মতৈক্যের সম্মুখে যে সকল অগ্নি-পরীক্ষা রহিয়াছে সেগুলির মধ্যে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি অন্যতম সন্দেহ নাই। কিন্তু মতৈক্যের সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা যে পরমাণবিক শক্তি-নিয়ন্ত্রণ সমস্যা এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু গত ৩০শে ডিসেম্বর পরমাণবিক শক্তি-কমিশনের অধিবেশনে পরমাণবিক শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে মার্কিণ পরিকল্পনা গৃহীত হইলেও যে অবস্থাধীনে উহা গৃহীত হইয়াছে তাহাতে উহার কোন সার্থকতা থাকিবে বলিয়া বিশ্বাস করা কঠিন। মার্কিণ পরিকল্পনাটি দশ ভোটে গৃহীত হইয়াছে এবং বিপক্ষে কোন ভোট হয় নাই। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া এবং পোল্যাণ্ডের অনুপস্থিতি মোটেই উপেক্ষার বিষয় নয়।

পরমাণবিক শক্তি কমিশন যে-প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আন্তর্জ্জাতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক পরিষদ গঠন করা হইবে এবং পরমাণবিক শক্তি যাহাতে কেবল শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় তাহার ব্যবস্থা করিবে এই পরিষদ। ভেটো প্রয়োগ করিয়া কিম্বা অন্য ভাবে পরিষদের কার্য্যের বিরোধিতা করিবার অধিকার কোন রাষ্ট্রের থাকিবে না। কিন্তু প্রত্যেক রাষ্ট্রশক্তির সহযোগিতা ব্যতীত আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কর্ত্তৃপক্ষের পক্ষে সাফল্যের সহিত কোন কাজ করা সম্ভব হইবে না। বস্তুতঃ, বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় একমত হইতে না পারিলে পরমাণবিক শক্তি-নিয়ন্ত্রণ সমস্যার সমাধান হওয়া অসম্ভব। কোন বৃহৎ রাষ্ট্রকে যদি পরমাণবিক বোমা তৈয়ার করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হইতে বাধ্য। পরমাণবিক শক্তি-কমিশনের সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে রাশিয়ার মনোভাব অবশ্য এখনও জানা যায় নাই; কিন্তু ভোটের সময় রাশিয়ার অনুপস্থিতিতে অচল অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছে। রাশিয়ার আশঙ্কা এবং সন্দেহ দূর করিতে বৃটেন ও আমেরিকা যদি সমর্থ না হয়, তাহা হইলে এই অচল অবস্থারও সমাধান সম্ভব হইবে না। মিঃ বার্ণার্ড বারুচ উল্লিখিত মার্কিণ প্রস্তাবের রচয়িতা এবং পরমাণবিক শক্তি-কমিশনে মার্কিণ প্রতিনিধিদের দলপতি। তিনি সম্প্রতি প্রতিনিধি পদ পরিত্যাগ করিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিকট যে পদত্যাগ-পত্র দাখিল করিয়াছেন তাহাতে পরমাণবিক বোমা প্রস্তুত-প্রণালী গোপন রাখার উপর জোর দিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক শক্তি নিয়ন্ত্রণ পরিষদ গঠিত না হয় সে পর্য্যন্ত মার্কিণ গবর্ণমেণ্টকে পরমাণবিক বোমা তৈয়ার করিয়া যাওয়ার সুপারিশও ঐ পদত্যাগ-পত্রে করা হইয়াছে।

ইঙ্গ-মার্কিণ সহযোগিতা ও রাশিয়া—

পরমাণবিক শক্তি-নিয়ন্ত্রণ সম্বন্ধে বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয় একমত হইতে না পারায় যেমন একটা আশঙ্কাজনক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি আরও এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়াছে যাহা এই আশঙ্কাকে গভীরতর না করিয়া পারে নাই। যুদ্ধোত্তর অর্থনীতি ও পরিকল্পনা সম্বন্ধে মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের বিশেষ কমিটি তাঁহাদের রিপোর্টে রাশিয়ার বিরুদ্ধে পটসডাম চুক্তিভঙ্গের অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এই অভিযোগ উপস্থিত করিবার প্রধান উদ্দেশ্য, পটসডাম চুক্তিকে বাতিল করিয়া দিবার অজুহাত সৃষ্টি। পটসডাম চুক্তি বাতিল হইলেই রাশিয়ার নিকট জার্ম্মাণী ত্যাগ করিয়া যাওয়ার দাবী উপস্থিত করা চলিতে পারিবে। বস্তুতঃ, উক্ত বিশেষ কমিটি সত্য সত্যই পটসডাম চুক্তি বাতিল করিবার এবং রাশিয়ার সহিত অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিবার জন্য আমেরিকার অধমর্ণ দেশ বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতির উপর চাপ দেওয়ার সুপারিশ করিয়াছেন। এই নীতির পরিণাম বিরূপ বিপজ্জনক হইবে তাহা বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। এই সুপারিশ সম্পর্কে আরও একটি বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। উক্ত বিশেষ কমিটিতে ডেমোক্রাটিক এবং রিপাবলিকান উভয় দলের সদস্যই আছেন এবং রাশিয়া সংক্রান্ত উল্লিখিত সুপারিশে তাঁহারা সকলেই একমত হইয়াছেন। এই সুপারিশ যদি কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী দুইটি অঞ্চলে বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং অর্থনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণের জন্য চলিবে প্রবল প্রতিযোগিতা।

মার্কিণ প্রতিনিধি পরিষদের বিশেষ কমিটির সুপারিশ মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা অনুমানের বিষয় হইলেও পরমাণবিক বোমা সম্বন্ধে ইহা সত্য যে, আন্তর্জ্জাতিক চুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমেরিকা পরমাণবিক বোমা তৈয়ার করা বন্ধ করিবে না।

এই সঙ্গে সামরিক এবং অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য-চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার সংবাদের কথাও বিবেচনা করা প্রয়োজন। সরকারী ভাবে এইরূপ চুক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হইলেও ওয়াশিংটনের ৩১শে ডিসেম্বরের সংবাদে মার্কিণ বিমান-বাহিনী এবং বৃটিশ বিমান-বাহিনীর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার কথা সরকারী ভাবেই ঘোষিত হওয়ার কথা জানা যায়। কর্মচারী নিয়োগ, রণনীতি, অস্ত্রশস্ত্র-সজ্জা ও গবেষণা সম্পর্কে যুদ্ধের সময়ে উভয় বিমান-বাহিনীর মধ্যে যে সহযোগিতা ছিল শান্তির সময়েও উহা বজায় রাখাই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। সামরিক ও অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা চুক্তি হওয়ার প্রয়োজনীয়তা মিঃ চার্চিল তাঁহার কুখ্যাত ফুলটন বক্তৃতায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বিমান-বাহিনীর ক্ষেত্রে যেরূপ চুক্তি হইয়াছে মিঃ চার্চিলের অভিপ্রায় সার্থক করিয়া অন্যান্য সামরিক ক্ষেত্রেও যে ঐরূপ হইবে না, তাহা কে বলিতে পারে? রাশিয়ার 'প্রাভদা' পত্রিকা ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক চুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে একখানি বৃটিশ সংবাদপত্রের মন্তব্য উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বৃটিশ সংবাদপত্র বলিয়াছেন যে, ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক চুক্তিই বিশ্বশান্তির শ্রেষ্ঠ রক্ষাকবচ।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ জেমস এফ বার্ণেসের পদত্যাগ এবং তাঁহার স্থানে জেনারেল জর্জ মার্শালের নিয়োগ যেমন আকস্মিক তেমনি মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতি পুরাপুরি দক্ষিণপন্থী হওয়ারও উহা সূচক। অনেকে মনে করেন যে, পরমাণবিক শক্তি-সমস্যা সম্পর্কে জেনারেল মার্শালের নীতি মিঃ বার্ণেসের মত কঠোর ভাবে আপোষ-বিরোধী হইবে না। এই অভিমত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা এ কথাও স্বীকার করেন যে, কোন মীমাংসা না হওয়া পর্য্যন্ত গোপনে পরমাণবিক বোমা তৈয়ার করিয়া মজুত করিবার নীতি আমেরিকা বর্জ্জন করিবে এরূপ সম্ভাবনাও নাই। সর্ব্বোপরি এ কথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, জেনারেল মার্শাল যুদ্ধের সময় সেনাপতি-মণ্ডলের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার নিয়োগ দ্বারা মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতিকে সামরিকীকরণ করা হইল। ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক চুক্তির কথা যে সময়ে শোনা যাইতেছে সেই সময় এই নিয়োগ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সামরিক দিক হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ অবস্থাকে সুদৃঢ় করিবার ব্যবস্থাই ইহার মধ্যে সূচিত হইতেছে। যুদ্ধ সমাপ্তির পর হইতে বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে অবিশ্বাস ও সন্দেহ ক্রমশঃ ঘোরাল হইয়া উঠার যে-সকল লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে উহার মধ্যে ক্ষীণ আশার আলোক দেখা যায়, ফিল্ড-মার্শাল মণ্টগোমারীর মস্কো গমন। বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়া তিনি যান নাই, এই কথাই অবশ্য শোনা যাইতেছে। তাঁহার এই শুভেচ্ছা মিশনের ফলে বৃটিশ ও রাশিয়ার সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত সহজ হইবে কি না, তাহা অদূর ভবিষ্যতেই আমরা বুঝিতে পারিব।

বৃটেনের পররাষ্ট্র নীতি ও গ্রীস—

বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতির সহিত গ্রীসের সমস্যা ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়। গ্রীসে বর্ত্তমানে যে অশান্তি চলিতেছে গ্রীক গবর্ণমেণ্ট তাহার জন্য গ্রীসের প্রতিবেশী আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়াকে দায়ী করিয়া জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে অভিযোগ করিয়াছিলেন। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ এ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য একটি কমিশন গঠন করিয়াছেন। গ্রীসের প্রতিবেশী রাষ্ট্রত্রয় জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘকে জানাইতেছিলেন যে, গ্রীসের অশান্তির কারণ গ্রীসের অভ্যন্তরেই সন্ধান করা আবশ্যক। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ কমিশনের তদন্ত আরম্ভ হইবার প্রাক্কালে বৃটিশ পার্লামেণ্টারী দলের যে তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে গ্রীসে গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকার মূল কারণ যে গ্রীসেই আবদ্ধ তাহা বুঝিতে পারা যায়। গত আগষ্ট মাসে বৃটিশ পার্লামেণ্টারী দল গ্রীসে যাইয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তদন্ত করিয়াছেন। সাধারণ নির্ব্বাচন এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রয়োজনীয়তার উপর তাঁহাদের রিপোর্টে বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে গ্রীক মন্ত্রিসভার অভিমত জানা না গেলেও, সংবাদে প্রকাশ, কর্ত্তৃপক্ষ মহল মনে করেন, রিপোর্ট রচনায় পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন বামপন্থীদের দ্বারা [illegible] প্রভাবিত হইয়াছেন। গ্রীসের অশান্তি যে গণতান্ত্রিক দলগুলির সহিত দক্ষিণপন্থী দলের বিরোধের ফল, এ কথা উল্লিখিত মন্তব্য হইতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে উহার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বৃটেনের হস্তক্ষেপের ফলেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। বৃটেন এই নীতি পরিত্যাগ করিবে, এরূপ আশা করিবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ইংলণ্ডের রাজকুমারী এলিজাবেথের সহিত গ্রীক রাজকুমারের বিবাহের কথাবার্ত্তা সরকারী ভাবে স্বীকৃত না হইলেও বৃটিশ সংবাদপত্রে উহা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা চলিতেছে। এ সম্পর্কে বিলাতের কম্যুনিষ্ট পত্রিকা 'ডেলি ওয়ার্কার' ৪ঠা জানুয়ারী লিখিয়াছেন, "It may appear to Mr. Bevin a very cunning idea to try and justify a prolongation of British control in Greece by linking the two thrones. The sooner the whole unworthy intrigue is dropped, the better for all concerned." 'দুইটি রাজ-সিংহাসনের মধ্যে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া গ্রীসে বৃটেনের নিয়ন্ত্রণ স্থায়ী করিতে এবং সমর্থন করিতে চেষ্টা করা মিঃ বেভিনের কাছে খুব একটা চাতুর্য্যপূর্ণ কাজ বলিয়া মনে হইতে পারে বটে। এইরূপ অযোগ্য প্রচেষ্টা যত সত্বর পরিত্যক্ত হয় সংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষে ততই কল্যাণকর।

প্যালেষ্টাইন সম্মেলন—

২১শে জানুয়ারী পুনরায় প্যালেষ্টাইন সম্মেলন আরম্ভ হইবে। এই সম্মেলন প্রথম আরম্ভ হয় গত অক্টোবর (১৯৪৬) মাসে। কিন্তু যাঁহারা যোগদান করিলে এই সম্মেলন সার্থক হওয়ার কথা তাঁহারা কেহই ঐ অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। এই জন্যই ডিসেম্বর মাসের জন্য অধিবেশন স্থগিত রাখা হইয়াছিল। কিন্তু ডিসেম্বর মাসেও সম্মেলন হওয়া সম্ভব হইল না। অতঃপর জানুয়ারী মাসে সম্মেলন হওয়া স্থির হয়। আরব হায়ার কমিটির বাহিরের চারি জন বিশিষ্ট আরব না কি সম্মেলনে যোগদানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন। আরব হায়ার কমিটিরও সম্মেলনে যোগদান করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কমিটি প্রথমে দাবী করিয়াছিলেন যে,

কমিটির চেয়ারম্যান গ্রাণ্ড মুফ্‌তিকে আমন্ত্রণ না করিলে তাঁহারা সম্মেলনে যোগদান করিবেন না। কিন্তু বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তাহাতে রাজী হওয়ার সম্ভাবনা নাই। তবে আরব হায়ার কমিটিকে সমগ্র ভাবে আমন্ত্রণ করায় তাঁহারা নিজেদের প্রতিনিধি নিজেরাই স্থির করিবার অধিকার পাইয়াছেন। নীতির দিক হইতে তাঁহাদের জয় হইয়াছে বিবেচনা করিয়া তাঁহারা গ্রাণ্ড মফ্‌তি আর প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবেন না বলিয়া নাকি স্থির করিয়াছেন। ইহুদীরা এই সম্মেলনে যোগদান করিবেন কি না তাহা ঠিক এখনও জানা যায় নাই। বাজেলে ইহুদী কংগ্রেসে প্যালেষ্টাইন সম্মেলন বর্জ্জন করিবার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়। তবে শোনা যায় বৃটেন ইহুদী জাতীয় রাষ্ট্র গঠনে সম্মত হইলে ইহুদীরা সম্মেলনে যোগদান করিতেও পারেন।

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ পরিকল্পনা না কি গোল্ডম্যান পরিকল্পনা এবং সংশোধিত মরিসন পরিকল্পনার মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা হইবে। ১৯৩৭ সালের পীল [illegible] জন্য নির্দ্ধারিত অঞ্চল এবং নেগেভ মরুভূমি লইয়া ইহুদী-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই গোল্ডম্যান পরিকল্পনার লক্ষ্য। ইহাতে ইহুদীদিগকে প্যালেষ্টাইনের শতকরা ৬০ ভাগ অঞ্চল দেওয়া হইবে। সংশোধিত মরিসন পরিকল্পনায় প্রদেশগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার কথা আছে। মোটের উপর, বৃটিশ পরিকল্পনা প্যালেষ্টাইনকে বিভাগ করিবারই পরিকল্পনা ছাড়া আর কিছুই হইবে না। কিন্তু তাহাতে প্যালেষ্টাইন সমস্যার সমাধান হইবে কি?

ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা—

ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইয়াছে। এই আলোচনার জন্য বৃটেন যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে সুদান সমস্যা ভবিষ্যতের জন্য মুলতুবী রাখার কথা আছে। তবে উহাতে বর্ত্তমানে সুদানের শাসন-পরিচালন ব্যাপারে মিশরকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করা হইয়াছে বটে। কিন্তু আরবীয় সংবাদপত্র সমূহ বলিতেছেন যে, এই আলোচনাতেও কোন ফল হইবার সম্ভাবনা নাই। সুদান মিশরের সহিত যুক্ত হউক ইহা যেমন বৃটেন চায় না, তেমনি সুদানকে স্বাধীনতা দিতেও বৃটেনের ইচ্ছা নাই। সুদানকে স্বাধীনতা দিবার নাম করিয়া সুদানীদের মধ্যে মিশর-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টি করা হইয়াছে। এখন মিশরকে লোভ দেখান হইতেছে যে সুদানের শাসন-পরিচালন ব্যাপারে তাহাদিগকে আরও বেশী ক্ষমতা দেওয়া হইবে।

সুদানের প্রশ্ন বাদ দিয়া নূতন প্রস্তাবে আর দুইটি বিষয় আছে: (১) বৃটিশ সৈন্য তিন বৎসরের মধ্যে মিশর ছাড়িয়া যাইবে; (২) সুয়েজ খাল এবং মধ্য-প্রাচী রক্ষার জন্য ইঙ্গ-মিশরীয় যুক্ত ডিফেন্স বোর্ড গঠন। সুতরাং নূতন আলোচনায় প্রকৃত পক্ষে নূতন কোন প্রস্তাব নাই, এক সুদানের সমস্যা মুলতুবী রাখা ছাড়া। কিন্তু মিশর এবং প্যালেষ্টাইন সমস্যার মীমাংসা না হইলে সমগ্র আরব-জগতের সহিত বৃটেনের সম্পর্ক অধিকতর তিক্ত হইয়া উঠিবে এবং আরব-জগতের বামপন্থীরা রাশিয়াকে তাঁহাদের সহায়রূপে পাইতে চেষ্টা করিবেন এইরূপ আশঙ্কা আছে।

পূর্ব্ব-আফ্রিকা—

পূর্ব্ব-আফ্রিকা কেনিয়া, উগাণ্ডা, টাঙ্গানাইকা এবং জাঞ্জিবার এই চারিটি রাজ্য লইয়া গঠিত। এই চারিটি রাজ্যের গবর্ণমেণ্টই সম্প্রতি নিজ নিজ রাজ্যে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আইন পাশ করিবার আয়োজন করিয়াছেন। পূর্ব্ব-আফ্রিকায় বহু ভারতীয় আছেন। কাজেই এই বিল-চতুষ্টয়ের সহিত ভারতীয় স্বার্থ ঘনিষ্ঠ ভাবে জড়িত। ভারত গবর্ণমেণ্ট এ সম্পর্কে তদন্ত করিবার জন্য এক প্রতিনিধি দল পূর্ব্ব-আফ্রিকায় প্রেরণ না করিয়া পারেন নাই। রাজা স্যার মহারাজা সিং, মিঃ কে, সারওয়ার হাসান এবং মিঃ এস, কা এই তিন জনকে লইয়া এই প্রতিনিধি দল গঠিত হইয়াছিল। এই প্রতিনিধি দল শুধু পূর্ব্ব-আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দেরই অভিমত গ্রহণ করেন নাই, চারিটি রাজ্যের গবর্ণমেণ্টের সহিতও এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশ, উক্ত রাজ্যের সকল ভারতীয়গণই বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিলের বিরোধী। তাঁহারা আরও বলিয়াছেন যে, উক্ত চারিটি রাজ্যে ইউরোপ ও এসিয়া হইতে বহু লোক যাইয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করায় স্থানাভাব হওয়ার আশঙ্কা অমূলক। স্থান সঙ্কুলান হইবে না, এরূপ আশঙ্কা এখনও ঘটে নাই। পূর্ব্ব-আফ্রিকার প্রত্যেক রাজ্যেই এত স্থান খালি পড়িয়া রহিয়াছে যে, উহার উন্নতির জন্য আরও বহু লোক পূর্ব্ব-আফ্রিকায় যাওয়া প্রয়োজন। প্রতিনিধি দল ইউরোপীয়, আফ্রিকান্ এবং পূর্ব্ব আফ্রিকাবাসী আরবদের সহিতও আলোচনা করিয়াছেন। আফ্রিকানদের সহিত ভারতীয়দের সম্প্রীতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। যদিও বহিরাগত নিয়ন্ত্রণ বিল চারিটিতে কোন বৈষম্যমূলক বিধান নাই, তথাপি প্রয়োগের সময় ভারতীয়দের প্রতি অবিচার হওয়ার আশঙ্কা মোটেই উপেক্ষার বিষয় নহে। স্বাধীন ভারতকে প্রবাসী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার জন্য দীর্ঘকাল সংগ্রাম না করিলে চলিবে না।

ইঙ্গ-ব্রহ্ম আলোচনা—

লণ্ডনে ইঙ্গ-ব্রহ্ম আলোচনার ফল কি হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন। লণ্ডন বৈঠকে বৃটেনের নিকট ব্রহ্মদেশের দাবী তিনটি: (১) ৩১শে জানুয়ারীর মধ্যে ব্রহ্মদেশের পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা (২) অবিলম্বে ব্রহ্মদেশে পূর্ণ জাতীয় অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠন এবং (৩) স্বাধীন ব্রহ্মের শাসনতন্ত্র প্রণয়নের জন্য অবিলম্বে গণপরিষদ গঠন। ব্রহ্মদেশের নেতারা লণ্ডন আলোচনার সাফল্য সম্বন্ধে মোটেই আশান্বিত নহেন। ব্রহ্মদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা নাই বটে, কিন্তু বৃটেন যে ব্রহ্মদেশকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিবে, সে সম্বন্ধে কোন ভরসা নাই। কমন্স সভায় ব্রহ্ম সম্বন্ধে বিতর্কের সময় প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী বলিয়াছিলেন, "The declaration we have made is not one in which we say to Burma, 'go out of British Commonwealth.' 'আমাদের ঘোষণায় ব্রহ্মদেশকে বৃটিশ কমনওয়েলথের বাহিরে চলিয়া যাইবার জন্য বলি নাই।'

ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা সমস্যা এবং ভারতের স্বাধীনতা সমস্যা অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত মনে করিলে একটুকুও ভুল হইবে না। কাজেই এসিয়ার সমস্ত পরাধীন জাতির স্বাধীনতা প্রশ্নকে এক অখণ্ড প্রশ্নরূপে দেখা কর্ত্তব্য। ব্রহ্মদেশের শাসন পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান জেনারেল আউঙ্ সানও নয়া দিল্লী হইতে বেতার বক্তৃতায় এসিয়ায়

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। পরাধীন দেশগুলির ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরিকল্পনা এই প্রথম। পরাধীন দেশের নেতৃবৃন্দের এই বিষয়টি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র—

মিঃ চার্চ্চিল সম্প্রতি ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে কলম ধরিয়াছেন। এ সম্পর্কে 'কলিয়ার্স ম্যাগাজিনে' (Cellier's Magazine) তিনি একটি প্রবন্ধ লিখিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগর হইতে কৃষ্ণসাগর পর্য্যন্ত ইউরোপের অধিবাসীদিগকে জাগ্রত হইয়া পারস্পরিক সাহায্য এবং আত্মরক্ষার জন্ত এক পরিবারের ন্যায় সঙ্ঘবদ্ধ হইতে আহ্বান করিয়াছেন। ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা নূতন নয়। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের এইরূপ একটি পরিকল্পনা ছিল। ইউরোপীয় যুক্তরাষ্ট্র গঠনই ছিল তাঁহার ইউরোপ বিজয়ের মূল উদ্দেশ্য। হিটলারেরও অনুরূপ উদ্দেশ্য ছিল মনে করিলে ভুল হইবে না। নেপোলিয়ান এবং হিটলার উভয়ের চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিলের চেষ্টায় কি ফল হইবে তাহা আমরা অনুমান করিতে চাই না। তবে তাঁহার উদ্দেশ্য যে, পশ্চিম-ইউরোপে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুকূল রাশিয়া-বিরোধী একটি রাষ্ট্রমণ্ডলী গঠন, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই।

চীনের নূতন শাসনতন্ত্র—

চীন জাতীয় পরিষদের চল্লিশ দিনব্যাপী অধিবেশনের শেষ দিবস গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৪৬) চীন শাসনতন্ত্রের সংশোধিত খসড়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু প্রথমেই এ কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চীন জাতীয় পরিষদের ২০৫০ জন সদস্তের মধ্যে ১৪০০ জন সদস্ত এই অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। যে ৬৫০ জন সদস্ত উপস্থিত হন নাই তাঁহারা যে সকলেই কম্যুনিষ্ট এ কথাও ঠিক নয়। মুসলিম লীগের মত কোন বৈদেশিক শক্তির পরোক্ষ বা অপরোক্ষ প্ররোচনায় চীনকে বিভক্ত করিবার উদ্দেশ্যে এই সকল সদস্ত জাতীয় পরিষদে যোগদান করেন নাই, এ কথা বলিলে সত্যকেই শুধু বিকৃত করা হইবে মাত্র। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে দেশব্যাপী বিপ্লবের মধ্যে ১৯১১ সালের ১০ই অক্টোবর যে চীন প্রজাতন্ত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে, এত দিন পরেও তাহার স্থায়ী শাসনতন্ত্র রচিত হওয়া সম্ভব হইল গৃহবিবাদের কামান গর্জ্জনের মধ্যেই। চীনের এই গৃহবিবাদকে মোটামুটি দুইটি অধ্যায়ে বিভক্ত করা যায়। ১৯১১ সালে মাঞ্চু রাজত্বের অবসান হইতে ১৯২৭ সালে জেনারেল চিয়াং কাইশেক কর্ত্তৃক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন পর্য্যন্ত প্রথম অধ্যায়। এই অধ্যায়ের ঘটনাবলী আজ ইতিহাসে পরিণত হইয়াছে। এখানে তাহার আলোচনা করিবার স্থান আমরা পাইব না। ১৯২৭ সালের মার্চ্চ মাসে জেনারেল চিয়াং কাইশেক কর্ত্তৃক নানকিং-এ জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পর হইতে গৃহবিবাদের দ্বিতীয় অধ্যায় আরম্ভ হইলেও উহার অবসান আজও হয় নাই।

চীনের জনগণকে স্বৈরাচারী রাজশক্তির নিপীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্ত ১৮৯৫ সাল হইতে ডক্টর সান-ইয়াৎ সেন সংগ্রাম পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে পরিচালিত তুং-মেং হুই নামক গুপ্ত সমিতির প্রচেষ্টাতেই ১৯১১ সালের বিপ্লব ঘটিয়াছিল। এই তুং-মেং-হুই নামক গুপ্ত সমিতিই কুয়োমিনটাং দলের ভিত্তিভূমি। বিপ্লবের পর উহাই প্রকাশ্য রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ১৯১১ সালের বিপ্লবের পর আভ্যন্তরীণ বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির ঘাত-প্রতিঘাতে চীন দেশ দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পড়ে। পিকিং এবং সমগ্র উত্তর-চীন সামরিক শাসকদের প্রভাবাধীন হইয়া পড়িল। কুয়োমিনটাংএর নেতা ডক্টর সান-ইয়াৎ সেনও দক্ষিণ-চীনকে সুদৃঢ় করিবার জন্ত সামরিক গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর উত্তর ও দক্ষিণ-চীনের একটা মিলন হইয়াছিল বটে, কিন্তু আবার উত্তর ও দক্ষিণ-চীনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। ১৯২৩ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সান-ইয়াৎ সেন এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তি অনুসারে সোভিয়েট রাশিয়া চীনের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিতে [illegible] হয়। ১৯২৫ সালের ১২ই মার্চ্চ ডক্টর সান-ইয়াৎ সেন পরলোক গমন করিলে জেনারেল [illegible] কুয়োমিনটাং দলের নেতৃপদ লাভ করেন। ১৯২৭ সাল পর্য্যন্ত জাতীয়তা, গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রবাদ ডক্টর সান-ইয়াৎ সেনের এই তিনটি নীতির ভিত্তিতে কুয়োমিনটাং দল এবং কম্যুনিষ্ট দল একই সঙ্গে কাজ করিতেছিল। কিন্তু উত্তর-চীনের বিরুদ্ধে চিয়াং কাইশেকের অভিযানকে সার্থক করিয়া চ্যাং-সো-লিন গবর্ণমেণ্টের যখন পতন হইল তখন হইতেই সুরু হইল কম্যুনিষ্ট দলের সহিত কুয়োমিনটাং দলের বিরোধ। উত্তর চীন দখল করিয়া চিয়াং কাইশেক নানকিংয়ে জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিলেন বটে, কিন্তু কম্যুনিষ্ট পরিচালিত হ্যাঙ্কাও গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার যে সংগ্রাম সুরু হইল তাহার জের চলিতেছে আজ পর্য্যন্তও।

১৯৩৬ সালে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট স্থায়ী শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৯৩৭ সালের নভেম্বর মাসে ঐ খসড়া শাসনতন্ত্র গ্রহণের জন্ত একটি গণ-কংগ্রেস আহ্বানের কথা ছিল। কিন্তু উহার পূর্ব্বেই জুলাই মাসে চীন-জাপান যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ায় গণ-কংগ্রেসের অধিবেশন হইতে পারে নাই। দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রামে জাপানের পতন হওয়ার পর ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে চুংকিংয়ে একটি সর্ব্বদল-সম্মেলন আহূত হয়। এই সম্মেলনে স্থির হইয়াছিল যে, জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে এই শাসনতন্ত্র গৃহীত হইবে এবং উহার অধিবেশন আরম্ভ হইবে ১৯৪৬ সালের মে মাসে। গত ১৭ই নবেম্বর হইতে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক স্থায়ী শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পর ৩১শে ডিসেম্বর জেনারেল চিয়াং কাইশেক নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করিয়া আদেশ-পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। উহা কার্য্যকরী হইবে ১৯৪৭ সালের ২৫শে ডিসেম্বর হইতে। নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হইল বটে, কিন্তু চীনের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল কম্যুনিষ্ট পার্টি জাতীয় পরিষদে যোগদান করেন নাই। ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে অনুষ্ঠিত সর্ব্বদল-সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তে সম্মত হইয়াও তাঁহারা কেন জাতীয় পরিষদ বর্জ্জন করিলেন তাহা চীনের গৃহবিবাদের এক রহস্তময় অধ্যায়।

চীনের গৃহবিবাদ—

কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত কুয়োমিণ্টাং দলের সংগ্রাম যে ১৯২৭ সাল হইতে সুরু হইয়াছে সে-কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

১৯২৭ সাল হইতে ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত চিয়াং কাইশেক অবিচ্ছেদে কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিতে থাকেন। জাপান কর্ত্তৃক মাঞ্চুরিয়া অধিকৃত হইতে দেখিয়াও তাঁহার চৈতন্ত হয় নাই। কিন্তু ১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণে চীনের জাতীয় স্বাধীনতা যখন বিপন্ন হইয়া উঠিল, তখন চিয়াং কাইশেক সিয়ানফুতে চ্যাংসোলিনের হাতে বন্দী হইয়া জাপানকে প্রতিরোধ করিবার জন্ত জাতীয় ফ্রণ্ট গঠনে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। বিরোধের এই অবসান শুধু সাময়িক ব্যাপার মাত্রই ছিল। যুদ্ধের মধ্যেও একাধিক বার কম্যুনিষ্টদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা ব্যতীত জাপানের সহিত জীবন-মরণের সংগ্রামের সময়েও চীনের পাঁচ লক্ষ সৈন্ত জাপানের সহিত যুদ্ধ না করিয়া চীনা-সোভিয়েট [illegible]লের সীমান্ত পাহারা দিয়াছে। বস্তুতঃ, চীনের কম্যুনিষ্ট পার্টির সহি[illegible]চীনা জাতীয় গবর্ণমেণ্টের বিরোধ যুদ্ধের মধ্যেও মিটে নাই এবং যুদ্ধের পরে [illegible]ক্রতর প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর আমেরিকা[illegible] যে ইহা সম্ভব হইয়াছে তাহা মনে করিবার যথেষ্ট [illegible]আছে।

১৯৪৫ সালের আগষ্ট মাসে জাপান যখন আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল তখন কুয়োমিনটাংও অনেকখানি দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কুয়োমিনটাং যুদ্ধের মধ্যেই চীনা জনসাধারণের অপ্রীতিভাজনও হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং আমেরিকা অস্ত্র-শস্ত্র এবং অর্থ দ্বারা কুয়োমিনটাং দলের শক্তি বৃদ্ধি না করিলে যুদ্ধের পরে চীন দেশে গণতান্ত্রিক গভর্ণমেণ্ট গঠন করা খুবই সহজ হইত। আমেরিকার বামপন্থী সাংবাদিক [illegible]নেস স্মেডলি (Agnes Smedly) দুই-তিন মাস পূর্ব্বে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের চীনা-নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া 'নেশ্যান' পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন: "During the war we armed twenty Kuomintang divisions and thousands of Chinese secret police. Within the past year, however, forty Kuomintang divisions have been equipped with our lend-lease. In addition hundreds of bombers and fighters, 231 warships and open and secret loans said to total some four billion dollars have been given to Chiang's dictatorship. Our planes and ships transported Kuomintang armies to battle stations in the heart of communist-held territory on the pretext of disarming Japanese. At the present moment six thousand Japanese troops in Shansi Province and thousands of Japanese espionage agents, some of them in Peking, still operate under the command of the Chinese Government." 'যুদ্ধের সময় আমরা ২০ ডিভিশন কুয়োমিনটাং সৈন্তকে এবং কয়েক হাজার গুপ্ত পুলিশকে অস্ত্র-সজ্জিত করিয়াছিলাম। গত এক বৎসরে আমাদের ঋণ-ইজারা ব্যবস্থা দ্বারা ৪০ ডিভিশন কুয়োমিনটাং সৈন্তকে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত চীয়াংএর একনায়কত্ব রক্ষার জন্ত শত শত বোমারু এবং জঙ্গীবিমান এবং ২৩১টি জাহাজ দেওয়া হইয়াছে এবং প্রকাশ্য ও গোপন ঋণ দেওয়া হয় ৪ বিলিয়ন ডলার। জাপ-সৈন্তকে নিরস্ত্র করিবার অজুহাতে কম্যুনিষ্ট-শাসিত অঞ্চলের মধ্যস্থলে বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে আমাদের বিমান এবং জাহাজে করিয়া কুয়োমিনটাং সৈন্তদিগকে বহন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে শান্সি প্রদেশে ছয় হাজার জাপানী সৈন্ত এবং হাজার হাজার জাপানী চর চীনা সরকারের নির্দ্দেশে কাজ করিতেছে। এই সকল চরদের মধ্যে কতক পিকিংয়ে অবস্থান করিতেছে।'

যুদ্ধের পরেও চীনে যে গৃহবিবাদ চলিতেছে তাহার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের হস্তক্ষেপই যে প্রধানতঃ দায়ী এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আমেরিকার চীনা-নীতির যে কোন পরিবর্ত্তন অদূর ভবিষ্যতে হইবে তাহারও কোন ভরসা পাওয়া যাইতেছে না। ডিসেম্বর মাসের শেষ ভাগে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান তাঁহার বিবৃতিতে আমেরিকার বর্ত্তমান চীনা-নীতিকেই দৃঢ় ভাবে অনুমোদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের ভিত্তি বিস্তৃত করিয়া উহাকে চীন জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক করিবার উদ্দেশ্যেই আমেরিকার চেষ্টা নিয়োজিত রহিয়াছে। কিন্তু চীনের গৃহবিবাদে মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র, মার্কিণ বিমান, মার্কিণ ট্যাঙ্ক যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে তাহাতে এই শুভ ইচ্ছার অন্তরালে চীন-দেশে মার্কিণ প্রভাব ও প্রভুত্ব দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করাই যে আসল উদ্দেশ্য তাহাতে সন্দেহ করিবার অবকাশ নাই। আমেরিকার উপর চীনের সামরিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতাই শুধু বাড়িয়া চলিয়াছে, কিন্তু চীনের কৃষি-শিল্পের উন্নতির জন্ত কোন ব্যবস্থাই হইতেছে না। জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের চীনস্থিত বিশেষ প্রতিনিধি জেনারেল মার্শালকে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থা জানাইবার জন্ত ওয়াশিংটনে ডাকিয়া পাঠান হয়। তিনি এ-কথা স্বীকার করিয়াছেন যে, কুয়োমিনটাং-এর এক দল প্রভাবশালী প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তি তাঁহার কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার প্রায় সকল প্রচেষ্টাকেই বাধা দিয়াছেন। আবার কম্যুনিষ্টদের উপরেও কতকটা দোষ চাপাইতেও তিনি চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি মনে করেন যে, গৃহীত শাসনতন্ত্রে কম্যুনিষ্টদের প্রধান প্রধান দাবীগুলি মিটান হইয়াছে। কম্যুনিষ্টরা মার্কিণ অথবা বৃটিশ গণতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্টের ন্তায় একটি গবর্ণমেণ্টের মধ্য দিয়া সাম্যবাদী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, এই অভিযোগও তিনি করিয়াছেন। জেনারেল মার্শাল কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং কুয়োমিনটাং দল উভয়ের উপরই কিছু কিছু দোষ চাপাইয়া আমেরিকাকে পক্ষপাতিত্বের বহু ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন শক্তিশালী বৈদেশিক শক্তি যখন কোন দুর্ব্বল দেশের আভ্যন্তরীণ বিবাদ মিটাইতে চেষ্টা করে, তখন বিবাদ আরও ঘোরাল হইয়া উঠে, ইহা অভ্রান্ত সত্য। প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে আমেরিকা যত দিন চীনের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে তত দিন চীনের গৃহবিবাদ মিটিবার কোন ভরসা আমরা দেখিতেছি না।

ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম—

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের স্বাধীনতা-সংগ্রাম প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। এক সময়ে মনে হইয়াছিল বটে যে, ইন্দোচীনের স্বাধীনতা অর্জ্জন আলাপ-আলোচনার পথেই

সম্পন্ন হইবে। কিন্তু গত ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি হঠাৎ সংঘর্ষ বাধিয়া উঠিল কেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই ফ্রান্স এই সংঘর্ষ বাধাইবার জন্য নানা রকম অজুহাত সৃষ্টি করিতেছিল। তাহারই পূর্ণ পরিণতি ডিসেম্বর মাসের মধ্যভাগে ফরাসী সৈন্য কর্ত্তৃক হ্যানয়ে ভিয়েটনাম মন্ত্রিসভার আফিস আক্রমণ। পূর্ব্বে যেগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ ছিল অতঃপর তাহাই সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে। কেন এই সংগ্রাম আরম্ভ হইল তাহা বুঝিবার জন্য পূর্ব্ব ইতিহাসও কিছু আলোচনা করা আবশ্যক।

ইন্দোচীন আনাম, কাম্বোডিয়া, টংকিং, লাওস, কোচিন-চায়না এবং কোয়াং চো-ওয়ান এই ছয়টি রাজ্য লইয়া গঠিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে আনাম, কাম্বোডিয়া, টংকিং এবং লাওস ছিল ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য (protectorates) আর কোচিন-চায়না ছিল ফ্রান্সের উপনিবেশ। চীন ১৮১৮ সালে কোয়াং চো-ওয়ানকে ১১ বৎসরের জন্য ফ্রান্সের নিকট ইজারা দেয়। ১৯৪১ সালের ৩০শে জুলাই ফ্রান্সের পেঁতা গবর্ণমেণ্ট জাপানকে ইন্দোচীনে সৈন্য অবতরণ করিতে এবং সামরিক ঘাঁটিগুলিতে জাপ সৈন্য রাখিতে অধিকার প্রদান করেন। ১৯৪২ সালের মার্চ্চ মাসে জাপান ইন্দোচীনে পূর্ণ সামরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া গবর্ণর জেনারেলকে বন্দী করিয়া রাখে। জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে ডক্টর হো-চিন মিন আনামে ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন এবং আনামের সম্রাট্ বাও দাই সিংহাসন ত্যাগ করেন। ফ্রান্স গোড়া হইতেই এই প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পছন্দ করে নাই। জাপ সৈন্যদিগকে নিরস্ত্র করিবার অজুহাতে জেনারেল গ্রেসির পরিচালনায় কয়েক ডিভিশন বৃটিশ সৈন্য ইন্দোচীনে অবতরণ করে এবং ভিয়েটনাম সৈন্যের সহিত কয়েকটি সংঘর্ষের পর তাহারা কতক অঞ্চল দখল করিতে সমর্থ হয়। অতঃপর ফ্রান্স হইতে জেনারেল লে ক্লার্ক ইন্দোচীনে উপস্থিত হন এবং ক্যাথলিক পাদ্রী ড আর্গাঁলিউ ফরাসী নৌবাহিনীর এডমিরাল হইয়া বসেন। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম দমন করিবার জন্য বৃটিশ সৈন্যবাহিনীকে ইন্দোচীন হইতে সরাইয়া লইতে হইল। অতঃপর মঃ বাদইর প্রথম কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার আমলে ১৯৪৬ সালের জানুয়ারী মাসে ভিয়েটনাম রিপাবলিকের সহিত ফ্রান্সের একটা মিটমাট করিবার চেষ্টা হয়। মার্চ্চ মাসে একটা চুক্তিও হ্যানয়ে স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু উহা সামরিক যুদ্ধবিরতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। অতঃপর মীমাংসার জন্য প্যারী নগরীতে এক বৈঠক বসিয়াছিল এবং ডক্টর হো-চিন-মিনের নেতৃত্বে ভিয়েটনাম প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে যোগদান করেন। কিন্তু কয়েক দফা আলোচনার পর আগষ্ট মাসে এই বৈঠক ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। পরে সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দোচীনেই উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল।

প্যারী আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ দুইটি। আনাম এবং টংকিং-এ ভিয়েটনাম রিপাবলিকের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলেও কাম্বোডিয়া লাওস ও কোচিন চায়নার কর্ত্তৃত্ব ত্যাগ করিতে ফ্রান্স রাজী হয় নাই। কাম্বোডিয়া ও লাওস ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য হিসাবে থাকিবে এইটুকু পর্য্যন্ত ভিয়েটনাম প্রতিনিধি দল রাজী হইয়াছিলেন। কিন্তু কোচিন-চায়না সম্বন্ধে তাঁহারা রাজী হইতে পারেন নাই। জাতিতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক দিক্ হইতে কোচিন-চায়নার অধিবাসীদের সহিত আনামীদের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ, ফরাসী নেতারাও তাহা স্বীকার করেন। দ্বিতীয়তঃ কোচিন-চায়না আনামীদের শস্য-ভাণ্ডার বলিয়া খ্যাত। কোচিন-চায়না না থাকিলে আনামীদের অন্নাভাব ঘটিবে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রকে পররাষ্ট্র-নীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার এবং অন্য দেশের সহিত বাণিজ্য-চুক্তিতে আবদ্ধ হইবার অধিকার দিতে ফ্রান্স রাজী নহে।

কোচিন-চায়নার গণভোট গ্রহণ করিতে ফ্রান্স প্রথমে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু ডক্টর হো-চিন-মিন আলাপ-আলোচনার জন্য প্রতিনিধি দল সহ প্যারী যাত্রা করিবার পরই ড আর্গাঁলিউ হঠাৎ এক স্বাধীন কোচিন-চায়না প্রজাতন্ত্র গঠন করিয়া বসেন। আসলে উহা ফরাসী তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। এই গবর্ণমেণ্টের নয় জন মন্ত্রীই গত নবেম্বর মাসে পদত্যাগ করেন। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট আর নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারেন নাই ... অবশেষে তিনিও আত্মহত্যা করেন। ... মার্চ্চ মাসের চুক্তি ভঙ্গ করিয়াছে, ... গবর্ণমেণ্ট ... আগষ্ট মাসেই এই অভিযোগ করিয়াছিলেন। ফরাসী ... এই মর্ম্মে এক আদেশ জারী করেন যে, তাঁহাদের অনুমতিপত্র ব্যতীত ভিয়েটনামে কোন পণ্য প্রেরণ করা চলিবে না। হেইপংয়ে একটি শুল্ক-আফিসও তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জোর করিয়া লেংসন দখল করার এবং হেইপংয়ে এবং কিয়েন এনে অবস্থিত ভিয়েটনাম সৈন্যের উপর বোমা বর্ষণের অভিযোগও ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে করা হইয়াছে। এগুলি ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টকে সশস্ত্র সংঘর্ষে প্রবৃত্ত করাইবার প্ররোচনা মাত্র।

বামপন্থীদের চাপে পড়িয়া ফরাসী গবর্ণমেণ্ট এডমিরাল ড আর্গাঁলিউকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অপসারিত করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। ড-আর্গাঁলিউ ফ্রান্সে রওনা হইয়া যাওয়ার পরই ফরাসী সৈন্য হ্যানয়স্থিত ভিয়েটনাম মন্ত্রিসভার আফিস আক্রমণ করে। ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ড-আর্গাঁলিউকে পুনরায় সাইগনে প্রেরণ করেন। ফ্রান্সের উপনিবেশিক সচিব মঃ মোতেকেও ইন্দোচীনে প্রেরণ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু ফ্রান্স যে ইন্দোচীনকে স্বাধীনতা দিতে প্রস্তুত নয় তাহা বর্ত্তমান প্রবল সংঘর্ষের মধ্যে বেশ ভাল ভাবেই বুঝা যাইতেছে। ফ্রান্স কয়েক দফায় নূতন সৈন্য ইন্দোচীনে পাঠাইয়াছে। ফ্রান্সের সকল দলই মঃ ব্লুমের সাম্রাজ্যবাদী নীতি সমর্থন করিতেছেন। ভিয়েটনাম প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর মিন শান্তিপূর্ণ পথে মীমাংসা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করা সত্ত্বেও ফ্রান্স তাহাতে রাজী হইতেছে না। মঃ মোতে বলিয়াছেন : 'It is now necessary to have a military decision before any negotiation takes place.' 'কোন আলাপ-আলোচনা আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্বে সামরিক নিষ্পত্তি হওয়া প্রয়োজন।' এই উক্তির তাৎপর্য্য বুঝাইয়া বলা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ইন্দোচীনে যে স্বাধীনতার সংগ্রাম চলিতেছে তাহার ফলাফল দ্বারা এশিয়ার অন্যান্য পরাধীন দেশেরও ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হইবে। ইন্দোচীনকে পুনরায় জয় করিবার উদ্দেশ্যেই ফ্রান্সই সর্ব্বপ্রথম আক্রমণ করিয়াছে। ছয় বৎসর ধরিয়া জার্ম্মাণীর অধীনে বাস এবং মিত্রশক্তিবর্গের সাহায্যে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াও ফ্রান্সের চৈতন্য হয় নাই। ফ্রান্সকে সংযত করিবার জন্য সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা উচিত।

★ তিমিরবরণ
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 289

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিহার ও বাঙ্গালা

বাঙ্গালার লীগ সচিব সঙ্ঘের অভূতপূর্ব্ব সুব্যবস্থা এবং অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতার এবং যোগ্যতার কথা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। বিহারে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় তাঁহাদের সততার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মুসলিম হতাহতের সংখ্যা দশ গুণ বাড়াইয়া প্রচার করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদের করুণার মাত্রাও দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে ... লীগভক্ত মুসলিমদের প্রতি। কিন্তু বাঙ্গালার প্রপীড়িত হিন্দুদের উপর সে করুণার এক বিন্দুও ছিটকাইয়া পড়ে নাই। প্রধান-সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী বিবৃতি দিয়াছেন—"বিহার হইতে আমাদিগের যে সকল মুসলমান ভ্রাতা-ভগিনী হত্যা ও অত্যাচার হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য বাঙ্গালায় আসিয়াছে, তাহাদিগকে যে আশ্রয় দিতে পারিয়াছি তাহা আমার সৌভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।" সেই সঙ্গে আমরা সুর মিলাইয়া বলিতে চাহি—"নোয়াখালী, চাঁদপুর, চট্টগ্রাম ইত্যাদি মুসলিম লীগ-গুণ্ডা উপদ্রুত অঞ্চলের হিন্দু অধিবাসীদের সেরূপ কোন সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয় নাই। তাহারা আজ আশ্রয়হীন। সচিবসঙ্ঘের সে ব্যবস্থা করিবার মত যোগ্যতা অথবা হৃদয় নাই। তাঁহাদের অধীনে থাকা আমরা দুর্ভাগ্য বলিয়া বিবেচনা করি।"

কিন্তু আমাদের বলায় বা লেখায় সচিবসঙ্ঘের কিছুই আ..সিয়া যায় না। লোকে কথায় বলে দু'কান কাটা বেহায়া। সচিবসঙ্ঘের সদস্যরা তাহাকেও হার মানাইয়া দেন। ধন্য লীগ ..চিবসঙ্ঘ, জীতা রও! তাহার উপর 'একা রামে রক্ষা ..ই সুগ্রীব সহায়।' লাঙ্গুল গুটাইয়া তিনি উচ্চাসনে বসিয়া কেবল স্মিত হাস্য সহকারে নীরবে লীগ দলের পৃষ্ঠপোষকতা করিতেছেন। তিনি বিদেশী লোক। বাঙ্গালার অথবা ভারতের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিবার বিশেষ কোন কারণ নাই। তাঁহার কাজ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ-কার্য্য অক্ষুন্ন রাখা। সে দিকে তিনি হুঁসিয়ার আছেন। তাঁহার দেশের ভাল হইলেই তিনি সন্তুষ্ট, তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা প্রভুরা সন্তুষ্ট।

সেই সুযোগ লইয়া বাঙ্গালা দেশের বুকে লীগ সচিবসঙ্ঘ এবং তাঁহাদের ভক্ত কর্ম্মচারী ও গুণ্ডার দল তাণ্ডব নৃত্য চালাইতেছেন। আমাদের আবেদন, নিবেদন, সতর্ক বাণী সবই অরণ্যে রোদন মাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। যে বাঙ্গালা মায়ের বুকে হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই ভাবে এত দিন বসবাস করিয়াছে, স্বাধীনতার জন্য একত্র পাশাপাশি দাঁড়াইয়া মৃত্যুবরণ করিয়াছে, আজ স্বাধীনতা লাভের শেষ পর্য্যায়ে এই ভেদাভেদ—এই সাম্প্রদায়িকতা কেন? কারণ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। বৃটিশ বণিক্ জাতি ভীত হইয়া পড়িয়াছে। বুঝিয়াছে যে, হিন্দু-মুসলিম এক হইলে তাহাদের পক্ষে ভারতে বসবাস করা এবং শাসন ও শোষণ করা অসম্ভব। তাই ভেদনীতির কূটমন্ত্রের দ্বারা তাহারা চেষ্টা করিতেছে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার দাবানল জ্বালিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামকে পঙ্গু করা। তাহাদের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারি কিন্তু ভারতীয় মুসলিম লীগ ক্ষুদ্র স্বার্থ পরিতৃপ্তির জন্য যে ... বসিয়া আছেন সেই ডালই কাটিতেছেন কি করিয়া তাহা আ... বুদ্ধির অগোচর। তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য সাম্প্রদায়িকতার ... জর্জ্জরিত। তাঁহারা কি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, বৃটিশ সা..জ্য-বাদীরা লীগকে Cat's paw হিসাবে ব্যবহার করিতেছেন। ...র্য্য-সিদ্ধি হইয়া গেলেই ছেঁড়া জুতার মত ...থের ধারে অবজ্ঞা ভরে ফেলি...দিবে ...।

বিহার হইতে মুস... বাঙ্গালায় স্থান দেওয়া হইয়াছে এবং হইতেছে। খরচ জো...গাইতেছি বাঙ্গালায় দরিদ্র অধিবাসীরা, যাহারা নিজেরাই এক বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না। যে রাজস্ব হইতে এই ব্যয় হইতেছে, তাহা কেবল বাঙ্গালার অধিবাসীদের জন্য, কেবল মাত্র মুসলি...দের জন্য নয়, বিদেশ হইতে আমদানী করা মুসলমানদের জন্য তো ...যে। ব্যয়ের এ...টা হিসাব সরকারী ভাবে দেখান হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা অসম্পূর্ণ। তবে সকল জিলায় বিহারী মুসলমানদের আ...মদানী ...ওয়া হইয়াছে ... র ব্যয়ের জন্য সেখানকার ম্যাজিষ্ট্রেটদের ...নিম্নলিখিত অর্থ ব...ন ... পড়িয়াছে—

বর্দ্ধমান	৩,৪৬,০০০ টাকা
হাওড়া	১,০
বাঁকুড়া	২৫,০০০
দিনাজপুর	১২,০
মেদিনীপুর	১০,০
হুগলী	৫,০
রাজসাহী	৫০০০

এই আশ্রয়প্রার্থীরা এত সুবোধ ও সুশীল যে তাহাদের যখন প্রথম আসানসোলে আনা হয় তখন বাঙ্গালা সরকার কর্তৃক সেখানে সান্ধ্য আইন জারী করিতে ...য়াছিল। বাঁকুড়া হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছিল—"বিষ্ণুপুর (বাঁ...) আশ্রয় শিবিরের সন্নিকটস্থ কয়েকটি গ্রামের হিন্দুরা স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে লইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া যাইতেছে। আশ্রিতগণ না কি লোকের উপর উপদ্রব করিতেছে।" এক আসানসোলেই প্রায় ৪০ হাজার বিহারী মুসলিমদের আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, রাজসাহী, দিনাজপুরেও আরও লোক আনাইয়া রাখিবার বন্দোবস্ত করা হইতেছে। হুগলী ও হাওড়াতেও অনেককে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। বর্দ্ধমান কুসুমগ্রাম অনেক আগত মুসলিমদের জন্য আশ্রয়-শিবিরের বন্দোবস্ত করা হইতেছে। ইহাদের জন্য ব্যয় হইয়াছে কোটি কোটি টাকা। কলিকাতায় বারটি সরকারী আশ্রয়-শিবিরে ১৬৩৬ জন এবং ১১টি বেসরকারী আশ্রয়-শিবিরে আছে ৭৭১৪ জন। আহার জোগান দিতেছেন করুণা-সাগর বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘ বিনামূল্যে অর্থাৎ বাঙ্গালার

অধিবাসীদের ঘাড় ভাঙ্গিয়া। প্রত্যেকের জন্ত দৈনিক বরাদ্দ চাউল ৩ ছটাক আটা ২ ছটাক, ডাল ১ ছটাক। সঙ্গে আবার শুষ্ক তরকারী, মাছ মাংস, ডিম্ব ইত্যাদি তো আছেই। বস্ত্র ইত্যাদির দানসত্র খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পঁচিশ হাজারের উপর কম্বলই বিলি করা হইয়াছে। ধুতি শাড়ী বিলি হইয়াছে পনেরো হাজারের উপর। তাহা ছাড়া শিশুদের পরিধেয়। লুঙ্গী, চাদর ইত্যাদিও বহু খয়রাত করা হইয়াছে। এদিকে যাহাদের বঞ্চিত করিয়া এই দানসাগর চলিতেছে তাহাদের অবস্থা শোচনীয়। অন্নাভাবে, তৈলাভাবে, বস্ত্রাভাবে বাঙ্গালী জর্জ্জরিত। মিষ্টার সুরাবর্দ্দী আগন্তদের বিহারে ফিরিয়া যাইবার কোন নির্দ্দেশ দেন নাই। ফিরিবে কি না তাহাদের মর্জ্জির উপরই নির্ভর করিবে। যদি না ফিরে তবে বাঙ্গালার পোষ্য হিসাবে তাহারা মনের সুখে বসবাস করিবে, খাইবে এবং ঘুমাইবে। কিছু দিন ধরিয়া বিহার আমদানী করা মুসলিম লীগের আশ্রিত মুসলিম দুর্গত ও গুণ্ডারা স্রেফ খাইতেছিল এবং ঘুমাইতেছিল অর্থাৎ ফিট বাবু বনিয়া গিয়াছিল। প্রধান সচিব [illegible] গণিলেন [illegible] লোককে সচিব অথবা পার্লামেণ্টারী পদে [illegible]ব হইবে না বুঝিয়া একটু হালকা কাজের ব্যবস্থা দিয়াছেন। [illegible]স্থ্যের দিকেও তো নজর রাখিতে হইবে! ধন্য দূরদর্শী প্রধান সচিব।

নোয়াখালী, চট্টগ্রামের লীগ গুণ্ডারা এখনও বুক ফুলাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মহাত্মাজীর প্রার্থনা-সভা হইতে ফিরিবার পথে নিরীহ ব্যক্তিদের উপর আক্রমণ চলিতেছে। পণ্ডিত জওহরলালের প্রতি লোষ্ট্রনিক্ষেপ ইত্যাদি এখনও দিব্য চলিতেছে। [illegible]র দুর্গত হিন্দুদের প্রতি করুণা-সাগরের করু[illegible] বহর দেখুন! [illegible]তাহাদের ভয় দেখান হইয়াছে যে আশ্রয়-শিবির [illegible] করিয়া সাত [illegible] মধ্যে স্ব স্ব গ্রামে ফিরিয়া না যাইলে আহার্য্য প্রদান করা হইবে [illegible] আশ্রয়চ্যুত করা হইবে। কি চমৎকার পক্ষপাতিত্বশূন্য ব্যবস্থা! লীগ সচিবসঙ্ঘের ইহাই প্রকৃত পরিচয়!

এদিকে সুরাবর্দ্দী সাহেব গান্ধীজীর নিকট বিহার সরকারের নামে নানাবিধ অভিযোগ আনিয়া সাম্প্রদায়-প্রীতির পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু বিহার সরকারের প্রতিনিধিরা এই বিষয়ে যে সকল তথ্য গান্ধীজীর সমক্ষে পেশ করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালার প্রধান মন্ত্রী মহাশয়ের অভিযোগই শুধু অসত্য প্রমাণিত হয় নাই—আশ্রয়প্রার্থীদের স্বার্থরক্ষার নিমিত্ত বিহারের কংগ্রেস মন্ত্রিসভার প্রশংসনীয় কার্য্যের উপরও যথেষ্ট আলোকপাত করা হইয়াছে। মুসলিম লীগের কর্ম্মীদের, বিশেষতঃ খাজা নাজিমুদ্দীনকে একটি আশ্রয়-শিবিরে প্রবেশ করিতে না দিবার যে অপব্যাখ্যা লীগ মহল করিয়াছিলেন বিহার সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ সে বিষয়ে সকল সন্দেহ দূর করিয়াছেন। খাজা নাজিমুদ্দীনের নিকট অনুমতি-পত্র ছিল না বলিয়াই মুঙ্গেরে দুইটি আশ্রয়-শিবিরে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই—ইহার পশ্চাতে অন্ত কোন দুরভিসন্ধিই ছিল না। বিহারের অধিকাংশ সরকারী আশ্রয়-কেন্দ্রই মুসলিম লীগের কর্ম্মীরা পরিচালনা করিয়াছিল, এ তথ্য স্মরণ রাখিলেই লীগপন্থীদের সাম্প্রদায়িক জিগির ও অসত্য প্রচারের মূল্য কতটুকু তাহা অনুমান করিতে বিলম্ব হয় না। বিহার সরকার দাঙ্গা প্রশমিত করিবার জন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আজ আশ্রয়প্রার্থীদের পুনর্ব্বসতির উদ্দেশ্যে প্রতি বাড়ী নির্ম্মাণের জন্ত বিহার সরকার আড়াই শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন—ছাপরা অঞ্চলে প্রতি বাড়ীর জন্ত পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত দিতে তাঁহারা প্রস্তুত। অল্পমূল্যে গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা গভর্ণমেণ্টই করিবেন। প্রত্যেক পরিবারের জন্ত দুই শত টাকা পুনর্ব্বসতি-ভাতা দেওয়া হইবে—বিনা সুদে ঋণদানের প্রস্তাবও গভর্ণমেণ্ট বিবেচনা করিতেছেন।

এই ব্যবস্থার সহিত তুলনা করিলে নোয়াখালীর জন্ত বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট যাহা করিয়াছেন, তাহা প্রয়োজনের তুলনায় কত অল্প, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থা স্বাভাবিক হইয়া আসিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা রেশন বন্ধ করিয়া আশ্রয়প্রার্থীদের গ্রামে ফিরিতে বাধ্য করিয়াছেন। গ্রামে ফিরিয়া আশ্রয়প্রার্থীরা যে কোথায় মাথা গুঁজিয়া থাকিবে, গভর্ণমেণ্টের সে বিষয়ে বিশেষ মাথাব্যথা নাই। অবশ্য বিহার গভর্ণমেণ্টের মত বাঙ্গালা সরকারও গৃহনির্ম্মাণের জন্ত আড়াই শত টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন; কিন্তু বিহার [illegible] অল্প মূল্যে গৃহনির্ম্মাণের সরঞ্জাম সরবরাহের ব্যবস্থা করিলেও এদিক দিয়া বাঙ্গালার কর্ত্তৃপক্ষেরা কিছুই করেন নাই। এরূপ অবস্থায় গৃহনির্ম্মাণের জন্ত আড়াই শত টাকা মঞ্জুর করা নিতান্ত রসিকতার ন্যায়ই মনে হইবে। কারণ সরকারী সাহায্য ব্যতীত এই সকল সরঞ্জাম সংগ্রহ করাই কষ্টকর এবং করিতে পারিলেও তাহার মূল্য এত বেশী পড়িবে যে, আড়াই শত টাকায় খুব জোর একখানি মাত্র ঘর উঠিতে পারে। সম্প্রতি এক বিবৃতিতে শ্রীযুক্ত এ ভি ঠক্কর বিনা সুদে সরকারী ঋণ দিবার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু সুরাবর্দ্দী সরকার এ বিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ নীরব।

বাঙ্গালা সরকার বিহারের আশ্রয়প্রার্থীদের জন্ত পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন, কিন্তু নোয়াখালীর দুর্গতদের ভাগ্যে অর্দ্ধ লক্ষও জুটে নাই। কেন্দ্রীয় সরকার বাঙ্গালার দুর্গতদের জন্য যে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, তাহাও ঠিকমত ব্যয় করা হয় নাই বলিয়া অনেকে অভিযোগ আনিয়াছেন। কিন্তু নিজ প্রদেশের অধিবাসীদের যাঁহারা রক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই, তাঁহারা অন্য প্রদেশের দুঃখে একেবারে কাতর। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ৬০ হাজার লোক বিহার হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া হাজির হইয়াছে। নোয়াখালীর সংখ্যালঘুদের প্রতি দায়িত্ব পালন করিতে যাঁহারা অপারগ, তাঁহারাই এই সব বিহারবাসী মুসলমানদের খাদ্য, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়াছেন। অথচ এই সব আশ্রয়প্রার্থী মুসলমানদের দুর্গতির মূলে আছে লীগ প্রচারকবৃন্দ। তাহারাই বিনামূল্যে বাঙ্গালায় জমির বন্দোবস্ত করিবার মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া ইহাদের বিহার ত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছে, বিহার গভর্ণমেণ্ট পুনর্ব্বসতির যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহার সুযোগও ইহাদের লইতে দেয় নাই।

বাঙ্গালা সরকার যখন বিহারের দুর্গত মুসলমানদের আশ্রয় দানের ব্যবস্থা করেন প্রায় এক প্রকার গায়ে পড়িয়া, তখন বিহারে দাঙ্গা থামিয়া গিয়াছে। লোকের মনে পুনরায় আস্থা ফিরিয়া আসিতেছে। কতকগুলি নির্জ্জলা মিথ্যার আশ্রয় লইয়া বাঙ্গালার লীগ সচিবসঙ্ঘ-প্রেরিত সরকারী কর্ম্মচারী ও লীগভক্ত নিয়াজ মহম্মদ খাঁকে বিহারে পাঠান হয় আশ্রিতদের জোগাড় করিয়া বাঙ্গালায় আনিবার জন্ত। প্রধান সচিব বলেন যে, বিহার সরকারের মতানুসারেই তাহা করা হইয়াছিল। কিন্তু বিহার সরকার তাহা সরাসরি অস্বীকার করেন।

সুরাবর্দ্দী সাহেব আর 'রা' কাড়িতে পারেন নাই। মহম্মদ খাঁকে বিহার প্রদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই যে জন্ম তাঁহাকে পাঠান হইয়াছিল সে কার্য্য তিনি সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় দলে দলে দুর্গত (?) মুসলিম বাঙ্গালায় আসিতে লাগিল। লীগ সচিবসঙ্ঘের এই অপকর্ম্মের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। প্রথম বিহার সরকারকে হেয় করিবার চেষ্টা এবং জগদ্বাসীকে দেখান কত সংখ্যক মুসলিমদের উপর হিন্দুরা অত্যাচার করিয়াছে। দল ভারী করিবার জন্ম যাহাদের উপর অত্যাচার করা হয় নাই তাহাদেরও সেই সঙ্গে বাঙ্গালায় আনা হইয়াছে। দ্বিতীয়, এই উপায়ে মিষ্টার জিন্নার পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করা হইয়াছে। মুসলিমরা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা ত্যাগ করিয়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকায় চলিয়া আসিয়াছেন। সরাসরি লোক-বিনিময় নীতি চলিতেছে। তৃতীয়, বাঙ্গালায় মুসলিমদের দল ভারী করিবার চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে আসাম গ্রুপে যোগদান করিলে হিন্দুরা যেন মাথা তুলিতে না পারে। আসাম সম্পর্কে লীগের মনোভাব জলের মত স্বচ্ছ। শ্রম-সচিব সামসুদ্দীন সাহেবই এক সভায় বলিয়াছেন, "যদি আসাম সরকার উচ্ছেদ নীতি চালু রাখেন, তবে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের এই সমস্যায় হস্তক্ষেপ করিয়া দরবার হইতে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত।" লীগের ব্যবস্থা যে কি তাহা সকলেই জানে। জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত কলিকাতা, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ইত্যাদি। তাই মনে হয়, প্রধান মন্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত হইতেছেন অর্থাৎ বাঙ্গালায় লীগ গুণ্ডার হেড কোয়ার্টার স্থাপন করিতেছেন।

কংগ্রেসের বিচিত্র মনোভাব

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের নির্দ্দেশ গ্রহণ করিয়া যে প্রস্তাবটি নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নিকট পেশ করিয়াছিলেন, তাহা এ-আই-সি-সি কর্তৃক ৯৯—৫২ ভোটে গৃহীত হইয়াছে শ্রীপুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের সংশোধক প্রস্তাবটি ৫৪—১০২ ভোটে অগ্রাহ্য হইয়াছে। যত গর্জ্জে তত বর্ষায় না।

ঊর্দ্ধতন কংগ্রেস-নেতৃত্ব যে ভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ৬ই ডিসেম্বরের নির্দ্দেশ ঘোষণার পর হইতে বক্তৃতা ইত্যাদির দ্বারা নিজেদের মনোভাব জানাইয়াছিলেন, তাহার পরিণতি এতখানি নতি স্বীকারে ঘটিবে —সে ধারণা অনেকেই করিতে পারে নাই। গণ-পরিষদে সর্দ্দার প্যাটেল যে ভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ সম্বন্ধে দম্ভসূচক বাক্য উচ্চারণ করিয়া উহার প্রত্যাখ্যানেরই ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, তাহা যে নিছক মিথ্যা বাক্যাড়ম্বর ছাড়া আর কিছু নয়—তাহা অনেকেরই কল্পনার অতীত ছিল। পণ্ডিত নেহরুও তাঁহার বহু আলাময়ী বক্তৃতায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের অনধিকার হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে অসন্তোষ প্রকাশ করিতে ত্রুটি করেন নাই।

প্রস্তাবটিতে স্বাধীন ভারতের শাসনতন্ত্র যাহাতে যথাসম্ভব অধিকাংশের ঐক্যের উপর রচিত হয়, তাহারই উপর জোর দেওয়া হইয়াছে। বলা বাহুল্য, এই ঐক্য লীগের গণ-পরিষদে আসা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু এতখানি অপমানসূচক নতি স্বীকারেও লীগ আসিবে না তাহার সম্ভাবনাই বেশী। কংগ্রেস তাহার অতীত ইতিহাসে লীগ-তুষ্টিসাধনে কোন দিন ত্রুটি করে নাই। যে পরিমাণে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লীগ-তুষ্টিসাধনে সাহায্য করিয়াছে, প্রায় ঠিক সেই অনুপাতেই কংগ্রেস লীগকে সন্তুষ্ট করিতে গিয়াছে। লীগ যাহাই বৃটিশের কাছে চাহিয়াছে, কংগ্রেস প্রায় তাহা লীগকে দিতে রাজী হইয়াছে এই আশায় যে, লীগ কংগ্রেসের কাছে তাহা পাইয়া আর বৃটিশের কাছে যাইবে না—নিজেরা পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনার দ্বারা রক্ষা করিয়া লইবে। এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা উভয়ে মিলিয়া বৃটিশের অনিচ্ছুক হস্ত হইতে কাড়িয়া লইবে। কিন্তু কংগ্রেসকে প্রতি পদে লীগ হতাশ করিয়াছে!

এই অতি কঠোর সত্য কংগ্রেস এত দিন স্বীকার করিয়া লয় নাই কেন? হয়ত ভারতের স্বাধীনতা অনেক আগেই আসিয়া যাইত যদি লীগ ও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে একসঙ্গে মিলাইয়া কংগ্রেস তাহার অভিযান চালাইত। তাহাতে গৃহবিরোধ আসিত, বিনা রক্তপাতে হয়ত কিছুই হইত না। কিন্তু ইহা ব্যতীত অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া [illegible] বিশ্বাস করি না।

[illegible] দের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ আসামকে [illegible] করিবে। লীগ এখন হইতে আসামে নানা স্বার্থের কথা [illegible] যেমন উপজাতীয়, পার্ব্বত্য ইত্যাদি— তাহারা আসামের [illegible] মিলনকে প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিতেছে। [illegible] ছে, তাহা কে [illegible] তাহার সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে আসামের শাসনতন্ত্র [illegible] নয়, [illegible] হয়, তবে তাহাকেও তাহারা লীগের পদতলে [illegible] ব্যয়ের এ [illegible]

[illegible] অসম্পূর্ণ। [illegible] নিকলস্ রায় বলেন, "অবস্থা আমাদের নির্ব্বাচন [illegible] সহায়ক হইলে আমরা সেক্‌সনে প্রবেশ [illegible] অবস্থা আমাদের বিরোধী, তাহা হইলে [illegible] সেক্‌সনে যাইব না। আমরা সেক্‌সনে যাইব কি-না, সে বিষয়ে আমরা স্বাধীন। যে পর্য্যন্ত অবস্থার পরিবর্ত্তন না হইবে, সে পর্য্যন্ত আমরা ঐ পথই অনুসরণ করিব।"

গণ-পরিষদের আসামের সদস্যদের প্রতি আসাম ব্যবস্থা পরিষদ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, "আমরা সর্ব্বদাই নীতি অনুসরণ করিয়া চলিব। কারণ, স্বায়ত্ত-শাসনশীল প্রদেশের পক্ষে তাহা করাই উচিত।"

তিনি বলেন, "আসাম সম্পর্কে মসলেম লীগের নীতি কি তাহা আমরা জানি। এখনই বাঙ্গালার মসলেম লীগ আসামে হাজার হাজার লোককে পাঠাইয়া ও আসামের জমি দখল করিতে চাহে। সকলেই তাহা ভয় করে। এইরূপ লোক আমদানীতে পার্ব্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীরাও শঙ্কিত। তাহারা বলে যে, তাহারা ইহার বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিবে। আসামের সমতল অঞ্চলের অধিবাসীরা চাহে না যে, আসাম মুসলমান সংখ্যা-গুরু প্রদেশে পরিণত হউক। আমরা একবার সেক্‌সনে যাইলে আমরা ভুল পথ অবলম্বন করিব। মুসলমানদের দাবী অসঙ্গত এবং আসামে আমাদের দাবী সঙ্গত। আমরা যখন জানি যে, সেক্‌সনে মসলেম লীগের নীতিই কার্য্যকরী হইবে তখন আমরা সেক্‌সনে যাইতে চাহি না।"

নিখিল ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির গৃহীত প্রস্তাবে আসামের প্রতি যে অবিচার করা হইয়াছে, তাহা আসামের প্রধান মন্ত্রীর কথা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছেন—"যে সঙ্ঘের সহিত আমি সংশ্লিষ্ট, তাহার বিরুদ্ধে কোন কথা বলা আমার পক্ষে

শোভন নয়; কাজেই আমার মনের কথা সরল ভাবে প্রকাশ করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি না। জীবনে যাহা কিছু প্রিয়, তাহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলে কেহই সুখ অনুভব করে না।"

শিখেরা সোজা কথা বলিতে অভ্যস্ত। জ্ঞানী কর্ত্তার সিং স্পষ্ট ভাবেই নিজের মত প্রকাশ করিয়াছেন, "প্রদেশমণ্ডল গঠন ব্যাপারে কংগ্রেস আমাদের বিরোধিতা করিয়াছেন।"

পাঞ্জাবের শিখ ও আসামী হিন্দুদের এই মনোভাবের ফলে গণ-পরিষদের পথ কি কুসুমাকীর্ণ হইয়া উঠিবে? যাহারা চিরদিন কংগ্রেসের শত্রুতা করিয়া আসিয়াছে, আজ মোহের বশে তাহাদের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াই কি কংগ্রেস স্বাধীনতা অর্জন করিবে?

বাঙ্গালায় তৈলাভাব

বাঙ্গালার অসামরিক সরবরাহ বিভাগের কমিশনার মিষ্টার এস এন রায় সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যে [illegible] নভেম্বর পর্য্যন্ত ১০.৮ লক্ষ মণ সরিষা [illegible] হওয়ার কথা। তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশ হইতে [illegible]বার কথা ১.২ লক্ষ মণ। কিন্তু যুক্তপ্রদেশের সংকার [illegible] অনুযায়ী তৈল পাঠাইতে অস্বীকার করিয়াছেন। রেশন [illegible]চিব। [illegible] হ্রাস করা হইয়াছে, তৎসত্ত্বেও সপ্তাহে ৬ হাজার ম[illegible]রা এখনও [illegible]ন। হাতে আছে মাত্র এক হাজার মণ। অতএব—[illegible] হইতে ফিরি[illegible]

বাঙ্গালা সরকার তৈলের [illegible] পণ্ডিত জওহ[illegible]শের লোকের প্রতি কর্ত্তব্য পালনের সময় ন[illegible]তেছে। [illegible] যান এবং বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের তোষা[illegible] বহর দে[illegible]ভাজ[illegible]ণে তৈল প্রদান করেন। তাহা ছাড়া [illegible] শা[illegible]কার তৈলদানও করিতে হয়। অতএব বাঙ্গালা দেশে [illegible] হইবে ইহা আর বিচিত্র কি! কিন্তু এদিকে যে আমরা ম[illegible] বসিয়াছি। অবশ্য লীগ সচি[illegible]ত্বের কবলে যখন পড়িয়াছি তখন শেষ অবধি মৃত্যু সুনিশ্চিত [illegible] আমরা জানি, তবু যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। তাঁহাদের সু[illegible]ায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ইত্যাদিতে বাঙ্গালার [জ]নসংখ্যা অর্দ্ধেক হইয়া গিয়াছে। যাহারা এখনও টিকিয়া আছে অন্নবস্ত্রের অভাবে তাহারাও প্রায় ঘাটে গিয়া বসিয়াছে। আহার্য্য ও পরিধেয় জোগাড় করিতে অনেক গৃহস্থেরই টিকিটি পর্য্যন্ত বাঁধা [প]ড়িয়াছে। কিন্তু লীগ সচিবসঙ্ঘ নির্ব্বিকার। সময় থাকিতে কো[নো] চেষ্টাই তাঁহারা করেন নাই। লীগের হাতে পাকিস্থান রা[জ্যে] আমাদের থাকিতে হইবে, কংগ্রেসের নব পরিকল্পনায় তাহাই বুঝায়। সুখের ভবিষ্যৎ কল্পনা করিয়া আমরা আহার-নিদ্রা সকলই বিসর্জ্জন [দি]য়াছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা

মুসলিম লীগ সকল দিক্ দিয়া বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ সাধনে তৎপর হইয়াছে। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ও বিগত দুর্ভিক্ষে জনসাধারণের প্রাণ লইয়াছে, বস্ত্র দুর্ভিক্ষে দেশবাসী লজ্জার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে অসমর্থ। ছিল শিক্ষা ও কৃষ্টি। প্রভুদের সে দিকেও দৃষ্টি পড়িয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দুরা মুসলিম অপেক্ষা অধিক শিক্ষিত, এ গাত্রদাহ লীগের চিরকালই আছে। সম্প্রতি শোনা যাইতেছে, বাঙ্গালা সরকার না কি ইসলামিয়া কলেজের উন্নতি বিধানের জন্য এক কোটির উপর টাকা ব্যয় করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। উদ্দেশ্য কলেজটিকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করিয়া মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা। কিছু জমির ব্যবস্থাও না কি হইয়াছে। কিন্তু এই অর্থ আসিতেছে কাহাদের পকেট হইতে? যদি কেবল মাত্র মুসলিম-প্রদত্ত অর্থে বিশ্ববিদ্যালয় সৃষ্টির চেষ্টা চলিত, আমাদের আপত্তির কিছুই ছিল না। সে চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। হিন্দুর অর্থে, হিন্দুকে ফাঁকি দিয়া এমন একটি প্রতিষ্ঠান গড়িতে চাহিতেছেন, যাহার কোন সুযোগ-সুবিধা হিন্দুরা পাইবে না। শিক্ষাক্ষেত্রে এই ধরণের সাম্প্রদায়িকতা অমার্জ্জনীয়। সরকারী ক্ষমতার এমন জঘন্য অপব্যবহার আর কি হইতে পারে, তাহা আমাদের জানা নাই।

শ্রীযুত শরৎচন্দ্র বসুর পদত্যাগ

কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতি বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের বিবৃতি গ্রহণের জন্য নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতিকে সুপারিশ করায় শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু প্রতিবাদস্বরূপ কংগ্রেস কার্য্যকরী সমিতির সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সূত্রে রাষ্ট্রপতিকে যে তার পাঠাইয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল—"মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা ও বিবৃতি গ্রহণ সম্পর্কে গত মে মাস হইতে সহকর্মীদের সহিত আমার বিশেষ মতানৈক্য হওয়া সত্ত্বেও আমি ওয়ার্কিং কমিটিতে কাজ করিয়াছি, কিন্তু দুঃখের বিষয় আর তাহা সম্ভব নহে। ওয়ার্কিং কমিটি সম্প্রতি যে প্রস্তাবের খসড়া করিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেসের অগ্রগতি রোধ করা হইয়াছে, গণ-পরিষদকে একটি অধীন প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইয়াছে, ভারতের অখণ্ডতা নষ্ট করিয়া প্রদেশগুলিকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রুপিং মানিয়া লইতে বাধ্য করা হইয়াছে এবং প্রদেশগুলিকে মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ব্যাখ্যা ও নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া গণ-পরিষদ [ভা]রতের সার্ব্বভৌম গণতন্ত্রের শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারে না। [আ]মি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করিতেছি।"

[শ]রৎ বাবুর পদত্যাগ আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আমরা কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারি না, নিজেদের নীচু করিয়া এই ভাবে লীগের [তো]ষণের কি সার্থকতা। মুসলিম লীগ বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের [পু]তুল মাত্র। এ নীতি স্বীকার করা হইয়াছে বৃটিশ সরকারের কাছে! অবশ্য কংগ্রেস শাক দিয়া মাছ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের পরাজয় মনোভাব এতই সুস্পষ্ট যে কেহই তাঁহাদের বাগাড়ম্বরে ভুলিতে পারে না। পণ্ডিত নেহরু বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ভাষ্য মানিয়া লওয়ার প্রস্তাবের আলোচনা কালে বলিয়াছেন যে, ওয়ার্কিং কমিটির এইরূপ প্রতিশ্রুতি দাবী করা উচিত যে, বৃটিশ সরকারের নিকট হইতে আর নূতন কোন ভাষ্য আসিবে না অথবা মুসলিম লীগ আর কোন প্রকার বাধা সৃষ্টি করিবে না। কথাটি গুরুত্বপূর্ণ। আচার্য্য কৃপালনী ইহার কোন উত্তর না দিয়া ছেঁদো কথার জাল বুনিয়া ব্যাপারটাকে লঘু করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিতে পারিতেছেন, বৃটিশের দিক্ হইতে আরও অনেক প্রস্তাব আসিবে এবং মুসলিম লীগ আরও অনেকরূপ বাধার সৃষ্টি করিবে জাতীয় স্বাধীনতাকে পিছাইয়া দেওয়াই উভয়ের উদ্দেশ্য। বৃটিশ হিন্দু মুসলমানকে এক হইতে দিবে না এবং যত দিন এই Divide and

Rule নীতি চালাইতে পারিবে তত দিনই তাহারা ভারতে টিকিয়া থাকিতে পারিবে। হিন্দু-মুসলমানগণ যখন এক হইবে তখনই প্রকৃত বিপ্লব আরম্ভ হইবে এবং কেবল তখনই বৃটিশ সরকারকে বিদায় লইতে হইবে। কিন্তু এখনও সেদিন আসে নাই। এখন আমরা বৃটিশ সরকারের শোষণ এবং জাতীয় কংগ্রেসের লীগ-তোষণের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ এবং মান হারাইতে বসিয়াছি। তাই আবার বলি, শরৎচন্দ্র পদত্যাগ করিয়া উচিত কার্য্যই করিয়াছেন।

দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা

জানা গিয়াছে যে, পূর্ত্ত, খনি ও বিদ্যুৎ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মিঃ সি, এইচ ভাবার সভাপতিত্বে ৬ই জানুয়ারী দিল্লীতে যে সম্মেলন হইয়াছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় বিহার ও বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের যে সমস্ত প্রতিনিধি যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা দামোদর বাঁধ পরিকল্পনা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করিয়াছেন। ইহাতে পশ্চিম বাঙ্গালা এবং বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চলের রূপ না কি সম্পূর্ণ বদলাইয়া যাইবে। এ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় পরিষদে শীঘ্রই না কি একটি আইন পাশ করা হইবে যে, যে সমস্ত লোক স্থানচ্যুত হইবে তাহাদিগকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে। বাঙ্গালা হইতে গিয়াছিলেন স্বয়ং প্রধান সচিব মিষ্টার সুরাবর্দ্দী। তিনিও উচ্চকণ্ঠে এই পরিকল্পনার সুখ্যাতি করেন এবং শীঘ্রই ইহা কার্য্যকরী হোক, সেই শুভেচ্ছা প্রকাশ করেন। জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি এই সম্পর্কে বহু দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, এমন কি, ডাক্তার মেঘনাদ সাহা প্ল্যান পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি, শীঘ্রই পরিকল্পনানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হইবে।

রাজকীয় ভূত-নামান

প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে সিভিল ও পুলিশ সার্ভিসের শ্বেতাঙ্গ কর্ত্তাদের বিদায় দিবার প্রস্তাব উঠিয়াছিল। বিলাতের বড় কর্ত্তারা ইহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছেন। বিলাত হইতে সহকারী ভারত-সচিব আর্থার হেণ্ডারসন সদল বলে আসিয়াছেন বিদায় দেওয়া মহাপ্রভুদের একটা সদ্‌গতির ব্যবস্থা করিতে। অন্তর্বর্ত্তী সরকারের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইলে প্রায় হাজার খানেক আই, সি, এস এবং ছয় শত আই, পি, এস কর্ত্তারা বেকার হইয়া পড়িবেন। কিন্তু ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের লোককে বিদায় দিয়া বেকার করিবার পূর্ব্বে যথাযোগ্য সম্মানজনক টাকার তোড়া দিতে হইবে। শুনা যাইতেছে, এই ক্ষতিপূরণের জন্ত প্রায় এক কোটি পাউণ্ড অর্থাৎ পনেরো কোটি টাকা লাগিবে। দিতে হইবে ভারতবাসীকে। কেন? কারণ তাঁহারা শ্বেতাঙ্গ। ইম্পিরিয়াল সার্ভিস সৃষ্টি করা হইয়াছিল বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিষ্টিক (সাম্রাজ্যবাদী) স্বার্থকে অক্ষুণ্ন রাখিবার জন্ত। ভারতবর্ষের উপকারের জন্ত নহে। সে সময় ভারতবাসীদের পরামর্শ লওয়া হয় নাই। আজ তাহাদের বিদায়-বেলার শেষ রাগিণী শুনিয়া রাগ হওয়া অন্যায় নহে। চিরটা কাল ভারতবাসীকে অনাহারে থাকিয়া এই শ্বেতহস্তীদের জন্ত মোটা "হোম চার্জ্জেস" কড়ি যোগাইতে হইয়াছে। এইবার স্কন্ধে চাপিয়াছে ক্ষতিপূরণের বোঝা শুনা যায়, ভূত ঘাড়ে চাপিলে নামিবার পূর্ব্বে ঘাড় মটকাইয়া দিয়া যায়। ব্যাপারটা যে নিছক গল্প নহে তা এখন হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতেছি।

কর্পোরেশনের নির্ব্বাচন

বাঙ্গালা সরকারের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে যে, কলিকাতা কর্পোরেশনের পরবর্ত্তী সাধারণ নির্ব্বাচন আগামী মার্চ্চ মাসে হওয়ার কথা আছে এবং ভোটার-তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলীর ৫ নং ও ১২ নং বিধি অনুসারে এই সম্পর্কে প্রাথমিক ভোটার-তালিকা নভেম্বর মাসের ১৫ই তারিখের পূর্ব্বেই কর্পোরেশন কর্ত্তৃক প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হইয়া থাকে। কলিকাতার সাম্প্রতিক হাঙ্গামার [illegible] লোক দলে দলে ওয়ার্ডে চলিয়া গিয়াছে এবং হাঙ্গামার পরে বিভিন্ন [illegible] অধিবাসিন্দারা তাহাদের নিজ নিজ এলাকায় ফিরিয়া আসিতেছে [illegible] পে ধরিয়া লইয়া কর্পোরেশন কর্ত্তৃক যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা দ্বারা কলিকাতার [illegible], তাহা [illegible] সংখ্যা নির্ণীত হয় নাই। সমস্ত ঘটনা এবং [illegible] নয়, [illegible] বিবেচনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট এই সিদ্ধান্তে [illegible] যে, ইতিমধ্যেই যে প্রাথমিক ভোটার তালিকা [illegible] অসম্পূর্ণ। [illegible] করা হইয়াছে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া [illegible] যুক্তিসঙ্গত হইবে না। গভর্ণমেণ্ট [illegible] কর্পোরেশনের সাধারণ নির্ব্বাচন তদনুসারে এক বৎসরের [illegible] রাখিয়াছেন।

[illegible] ব্যাপারটা আপাত দৃষ্টিতে সরল মনে হইলেও আসলে অত্যন্ত কূটনীতির পরিচায়ক। প্রথম কথা, লোকেরা নিজ নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যাইতেছে না কেন? [illegible] পিছনে রহিয়াছে হয় সরকারী অযোগ্যতা অথবা ইচ্ছা। [illegible] উত্তর জন্ত বাঙ্গালার সরকার কিছু মাত্র চেষ্টা করেন নাই একমাত্র লম্বা-চওড়া বুলি আওড়ান ছাড়া। কয়েক পল্লীতে তাহারা ইচ্ছা করিয়াই মুসলিম আধিক্য রাখিতে চান ইহা সকলেরই জানা আছে। দ্বিতীয় কথা, এক বৎসর সময় দান। ইহার উদ্দেশ্য এই ফাঁকে বিহারাগত মুসলিমদের কলিকাতায় আনাইয়া নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করা। সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়াও এবং কম কর দিয়াও লীগ সচিবসঙ্ঘের দৌলতে কলিকাতা কর্পোরেশনে লীগ দল অনেক বেশী সুযোগ-সুবিধা ও অনেক ধরণের বিশেষ অধিকার ভোগ করে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলে তো অন্যান্য অধিবাসীদের হাতে মাথা কাটিবে। সঙ্গে তাদের প্রভু শ্বেতাঙ্গ বণিক্ সম্প্রদায় তো আছেই। সকল দিক্ দিয়া বাঙ্গালা সরকার (অর্থাৎ মুসলিম লীগ) বাঙ্গালার হিন্দু অধিবাসীদের সর্ব্বনাশ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। আমরা কি চিরকাল মুখ বুজিয়া কেবল অত্যাচার সহ্যই করিব? অন্যায় যে করে এবং অন্যায় যে সহে উভয়েই অপরাধী। আমাদের এই অপরাধ ক্ষালনের—জাড্য ত্যাগের সময় আসিয়াছে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত
১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

স্টাডি

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৫শ বর্ষ, মাঘ, ১৩৫৩] [দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা

* * যে-বাঁধনে দেশকে জড়িয়েছে [illegible] সেটা ছিঁড়তে হয়। প্রত্যেক টানে চোখে [illegible] যায়, কিন্তু এ ছাড়া বন্ধন-মুক্তির অন্য উপায় [illegible] নিজের বাঁধন নিজের হাতেই ছিঁ[illegible] আ[illegible] তরফে বেদনা যথেষ্ট, কিন্তু তার [illegible]কে লোকসান কম নয়। সকলের চেয়ে বড়ো লোকসান এই যে, ব্রিটিশরাজ আপন মান খুইয়েছে। ভীষণের দুর্বৃ[illegible]কে আমরা ভয় করি, সেই ভয়ের মধ্যেও সম্মান আছে, কিন্তু কাপুরুষের দুর্বৃত্ততাকে আমরা ঘৃণা করি। বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা ধিক্কৃত। এই ঘৃণায় আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।

সম্প্রতি রাশিয়া থেকে এসেছি—দেশের গৌরবের পথ যে কত দুর্গম তা অনেকটা স্পষ্ট ক'রে দেখলুম। যে-অসহ্য দুঃখ পেয়েছে সেখানকার সাধকেরা, পুলিসের মার তার তুলনায় পুষ্পবৃষ্টি। দেশের ছেলেদের বোলো এখনও অনেক বাকি আছে—তার কিছুই বাদ যাবে না। অতএব তারা যেন এখনই বলতে সুরু না করে যে বড়ো লাগছে—সে কথা বললেই লাঠিকে অর্ঘ্য দেওয়া হয়।

দেশে বিদেশে ভারতবর্ষ আজ গৌরব লাভ করেছে কেবলমাত্র মারকে স্বীকার না ক'রে—দুঃখকে উপেক্ষা করবার সাধনা আমরা যেন কিছুতে না ছাড়ি। পশুবল কেবলি চেষ্টা করছে আমাদের পশুকে জাগিয়ে তুলতে, যদি সফল [illegible]তে পারে তবেই আমরা হারব। দুঃখ পাচ্ছি সে-জন্যে আমরা দুঃখ করব না। এই আমাদের প্রমাণ করবার অবকাশ এসেছে যে, আমরা মানুষ—পশুর নকল করতে গেলেই এই শুভযোগ নষ্ট হবে। শেষ পর্যন্ত আমাদের বলতে হবে, ভয় করিনে। বাংলা দেশের মাঝে মাঝে ধৈর্য নষ্ট হয়, সেইটেই আমাদের দুর্বলতা। আমরা যখন নখদন্ত মেলতে যাই তখনই তার দ্বারা নখীদন্তীদের সেলাম করা হয়। উপেক্ষা করো, নকল কোরো না। অশ্রুবর্ষণ নৈব নৈব চ।

আমার সব চেয়ে দুঃখ এই, যৌবনের সম্বল নেই। আমি পড়ে আছি গতিহীন হয়ে পান্থশালায়—যারা পথে চলছে তাদের সঙ্গে চলবার সময় চলে গেছে। ইতি ২৮শে অক্টোবর, ১৯৩০। * * *

—রবীন্দ্রনাথ

মহাজন

শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র

মহাজন শব্দের অনেক অর্থ আছে। মহাজন অর্থে যিনি টাকা ধার দেন,—উত্তমর্ণ, আজ এই দারিদ্র্য-পীড়িত যুগে মহাজনের অর্থ কে না জানেন। মৃচ্ছকটিকে নির্ধনতা মহাপাতক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে মহাজনের উল্লেখও আছে।

কিন্তু আমরা কথায় কথায় 'মহাজন' কথাটির উল্লেখ করি তখন, যখন আমাদের বুদ্ধি যুক্তি-তর্কের শেষ সীমা হইতে ফিরিয়া আসে, অর্থাৎ তখন আমরা মহাজনের দোহাই দিয়া পার পাইতে চেষ্টা করি। বলি—

"মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।"

সেই কবে মহারাজ যুধিষ্ঠির বকরূপী ধর্মের প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, মহাজন যে পথে গিয়াছেন সেই প্রকৃত পথ। কিন্তু আমরা তাঁহাতেও পথের সন্ধান পাইলাম কি? অবশ্য প্রশ্নটি যেরূপ জটিল, উত্তরও তেমনি সূক্ষ্ম বিচারপূর্ণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। কিন্তু এখনও পূর্বেরই মতো মানুষ পথের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ভাবের গোলকধাঁধায় পথ খুঁজিয়া পাওয়া বড়ই কঠিন। কোথায় মহাজন? কোন্ পথে তাঁহারা গিয়াছেন? কে বলিয়া দিবে?

যুধিষ্ঠির মহারাজের অর্থ বোধ হয় এই যে, যাঁহারা সাধু, যাঁহারা সমাজের আদর্শ বা যাঁহারা সাধনা বা তপস্যার বলে ধর্মের রহস্য অবগত হইয়াছেন, তাঁহারাই মহাজন। তাঁহাদেরই অনুসরণ করা কল্যাণ হইবে। বহু লোক অর্থে মহাজন শব্দের প্রয়োগ আধুনিক কালসম্মত হইতে পারে, কিন্তু ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের অর্থ ইহা নহে।

কোনও ধর্মে যাঁহারা নিষ্ঠাবান, তাঁহাদের মনে নানা প্রশ্নের আন্দোলন উঠে; তখন ঐ মহাজনের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত উপায় নাই। কারণ—

"বেদা বিভিন্নাঃ স্মৃতয়ো বিভিন্নাঃ
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥"

ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব রহস্যময়। ভগবৎ-তত্ত্ব জানিতে হইলে কাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিব, কে পথ প্রদর্শন করিতে পারে? শাস্ত্র যেখানে সংশয়-জাল ছিন্ন করিতে পারে না, সেখানে গুরু, জ্ঞানী, ধর্মাচার্য বা সদ্‌গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। ইহা শুধু হিন্দু ধর্মের নির্দেশ নহে। সমস্ত ধর্মই এই মহাজনবাদের সাহায্য গ্রহণ করেন। এমন কি, গ্রীকদের মধ্যে গুরু-গম্ভীর দর্শন-পন্থী ষ্টোয়িক (Stoic)গণও জ্ঞানী লোকের আদর্শ (Ideal of the Wiseman) স্থাপন করিয়াছেন। তোমার আমার মতে কি হইবে? জ্ঞানবৃদ্ধ সাধু ব্যক্তির নিকট গমন কর, তোমার সমস্ত সংশয় নিরস্ত হইবে।

বৈষ্ণব-সাহিত্যে মহাজন কথাটির ব্যবহার বোধ হয় সব চেয়ে বেশী। আমরা কয়েক জন বৈষ্ণব-পদকর্তাকে 'মহাজন' বলিয়া গণনা করি। কিন্তু এখানেই আমাদের বড় বেশী গোল ঠেকে। বৈষ্ণব হইলেই মহাজন-পদবাচ্য হন না, কবি হইলেও নয়। কারণ, সকল বৈষ্ণব-কবি মহাজনের সম্মান পান নাই। এখন কথা এই মহাজন কাহারা? শ্রীচৈতন্যের পূর্বে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন; পদকর্তা হিসাবে তাঁহারা প্রসিদ্ধ মহাজন বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে পরিগণিত। শ্রীচৈতন্যের সময়ে বা পরে যে সকল পদকর্তা জন্মিয়াছিলেন, যথা, শ্রীরূপ গোস্বামী, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, লোচন দাস প্রভৃতি, তাঁহারাও বৈষ্ণব-মহাজন বলিয়া কথিত হন। পদকর্তা ব্যতীত মহাজন নামের অধিকারী বড় যায় না।

'পদাবলী' শব্দটি যে আমরা জয়দেব হইতেই লাভ করিয়াছি ইহা সকলেই জানেন। তাঁহার সেই মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলীই বৈষ্ণব-পদাবলী-ধারার যমুনোত্রী।

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
[illegible] [illegible]বলীং
শৃণু ত[illegible] [illegible]সরস্বতীম্॥"
—গীতগোবিন্দ

পাইতে[illegible]

পদাবলী [illegible]পেট ভক্তি[illegible] ভাষার নিজস্ব সম্পদ্। বাঙ্গালী কবি তাঁহার অ[illegible], তাহা কে[illegible] বলার নাম দিলেন পদাবলী। সংস্কৃতে এই শব্দ[illegible]র জন্য নয়, কি[illegible] যায় না। টীকাকার পূজারি গোস্বামী ইহার [illegible]যে[illegible] ব্যয়ের এ[illegible]য়াছেন: মধুর অর্থাৎ শৃঙ্গাররস-প্রধান; কো[illegible] তাহা অসম্পূর্ণ। [illegible] যায়, কান্ত অর্থে গেয় অর্থাৎ যাহা [illegible] গাছে [illegible] [illegible]দিয়ে [illegible] [illegible] আদর্শ [illegible] [illegible]ছোট-বড় বহু বৈষ্ণব-কবি পদাবলীর মালা [illegible] ইষ্টদেবতার উদ্দেশে অর্পণ করিয়াছেন। ইহার ফলে সকল বৈষ্ণব-কবিতাই গীতি এবং এই গীতি-কবিতাগুলির নামই পদাবলী। ইহার প্রত্যেকটি কবিতা সুরে বসানো। সুর আগে কি কথা আগে, তাহা বুঝা যায় না। [illegible] হয়, কথাগুলি যেন সুরেরই আবেগে গলিয়া অন্তর হইতে বাহির হইয়াছে; অথবা সুরেরই আবেদনে কথার ফুলঝুরি ঝরিয়াছে। বস্তুতঃ, কথা ও সুরের এমন অপূর্ব মিলন বিশ্ব-সাহিত্যে আর কোথাও দেখা যায় না—এ কথা এক দিন রবীন্দ্রনাথই বলিয়াছিলেন।

এখানেই বৈষ্ণব-কবিতা lyricএর সীমা ছাড়াইয়া বহু দূর চলিয়া গিয়াছে। লিরিকের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সহিত সঙ্গীতের সংস্রব থাকিলেও এখন আর পাশ্চাত্য সাহিত্যে লিরিক বলিতে গীতই বুঝায় না। এপিক বা নাটকীয় কবিতা যেমন ঘটনা বা চরিত্র বর্ণনায় অথবা আলাপনের জন্য ব্যবহৃত হয়, লিরিক তেমনি কবির মনোগত বেদনের প্রকাশ বুঝায়। মাইকেলের ব্রজাঙ্গনা লিরিকের সুন্দর উদাহরণ। কিন্তু ইহাতে রাধিকার মানসলোকের মর্মভেদী বেদনা থাকিলেও ইহা পদাবলী হইতে পারে নাই এবং মাইকেলও মহাজন বলিয়া গণ্য হন নাই।

'বৌদ্ধ গান ও দোহা' নামে যে কবিতাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাও পদাবলী নামের যোগ্য হইতে পারে না। যদিও বর্তমানে কোনও কোনও পণ্ডিত ইহাকে 'চর্যাপদ' নাম দিয়া কৌশলে পদাবলীর আভিজাত্য দাবী করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে যে সকল

উপকরণ থাকিলে 'পদাবলী' নামের যোগ্যতা লভ্য হয়, তথাকথিত চর্যাপদে তাহার কোনও সন্ধান মিলে না। সুরের উল্লেখ দেখিয়া মনে করা হয় যে, এগুলিও গীতধর্মী সুতরাং পদাবলী। বস্তুতঃ, এই চর্যা কবিতাগুলির প্রধান উপজীব্য কয়েকটি জটিল দার্শনিক তত্ত্ব যাহা বুঝিতে পারা পণ্ডিতদের পক্ষেও দুরূহ। অদ্যাপি দুরূহ সংস্কৃত টীকার সাহায্য ব্যতীত ইহার মধ্যে প্রবেশ করা একান্তই অসম্ভব, টীকার সাহায্যেও সুসাধ্য নহে। কাজেই কি ভাষা, কি ভাব,—কোনও দিক্ হইতে এগুলিকে গীতের কোঠায় ফেলিতে পারা যায় না। খুব সম্ভব, সাধন-ভজনের সুবিধার জন্য ক্ষুদ্র সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে গীতরূপে এগুলির প্রচলন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ :

রাগপটমঞ্জরী

সুজ লাউ সসি লাগেলি তান্তী।
অণহা দাণ্ডী একি কিঅত অবধূতী॥
বাজই অলো সহি [illegible]
সুন তান্তিধনি বিল[illegible]
আলিকালি বেণি সারি [illegible]
গঅবর সমরস-সান্ধি গু[illegible]চিব।
জবে করহা করহকলে চ[illegible] এখনও বু[illegible]
বত্তিশ তান্তিধনি সঅল [illegible] হইতে ফিরিব[illegible]
নাচন্তি বাজিল গান্তি দে[illegible] পণ্ডিত জও[illegible]
বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই [illegible]লিতেছে।

"সূর্য লাউ, চন্দ্র তার (তাঁত), [illegible] বহর দে[illegible] [illegible]রিয়[illegible] মিলিয়া বীণা প্রস্তুত হইয়াছে। সূর্য [illegible] [illegible]দেবারারি[illegible] এই বীণা শূন্যরূপ দণ্ডে বাজাইতেছেন [illegible]বধূতিকা (নৈরাত্মা) [illegible] সখি এই বীণায় 'শ্রীহেরুক' এই শব্দ চ[illegible]য় বাজিতেছে (হেরুক—বৌদ্ধ দেবতা-বিশেষ)। আলিকালি[illegible]রূপ (আভাস দয়া) সারি শুনিয়া, বিশ্বরাজের সমস্ত অসমঞ্জস্য [illegible] করিয়া অঙ্গুলিতে বীণার তার চাপিলে সেই বত্রিশ নাড়ীর [illegible] সমস্ত পরিব্যাপ্ত হইবে। (তখন) সিদ্ধ বীণাপাদাচার্য্য নৃত্য করিতেছেন এবং দেবী (নৈরাত্মা) গান করিতেছেন। বুদ্ধ নাটকের বিশেষরূপ সমাপ্তি হইতেছে।" এরূপ কবিতা বুঝিতে পারা[illegible] কঠিন, গান করার কথা ধারণাতীত।

গানের ভিতর তত্ত্বকথা থাকা কিছু [illegible]য়ের নহে। বাউল গানে অনেক দুরূহ দেহতত্ত্ব ও মুক্তিতত্ত্বের [illegible]থা পাওয়া যায়। সে হেঁয়ালিগুলি সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয় এই জন্য যে তাহার ভাষা অন্ততঃ সহজবোধ্য। এই কবিতাগুলিতে ভাষা যেমন কঠিন, ভাব তদপেক্ষা জটিল এবং সংস্কৃত টীকা জটিলতর। কাজেই এই সকল কবিতাকে বৈষ্ণব-পদাবলীর মর্য্যাদা প্রদান করিতে চেষ্টা করা সাহসের কথা বটে! বরং বলিতে পারা যায় যে বাউল গানের যে শাখা বাংলা গীতের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, উহা চর্যাগুলির দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতি।

এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, বাউল গানের যে প্রাচুর্য বাংলার পল্লী-কবিমানসকে এক দিন আলোড়িত করিয়াছিল এবং যাহার ধারা রবীন্দ্রনাথে আসিয়াও রুদ্ধ হইয়া যায় নাই, সেই বাউল গানও পদাবলীর অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। অথচ এমন বাউল গান বহু আছে যাহা ভক্তিরসের অনাবিলতায় কীর্ত্তন-পদাবলীর সমকক্ষতা দাবী করিতে পারে।

কীর্ত্তন-পদাবলীর বিষয়বস্তু প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণলীলা। বাংলা দেশে আমরা উহাতে ঐ রাধাকৃষ্ণেরই জীবন্ত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকেও স্থান দিয়াছি। অবশ্য উত্তর-পশ্চিমের বৈষ্ণব-কবিদের পদাবলী-শাখায় কেবল রাধাকৃষ্ণেরই প্রেমলীলা গীত হইয়াছে। বাংলা দেশের কীর্ত্তন সুর উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত না থাকিলেও বল্লভাচার্য ও তুলসীদাস নন্দদাস প্রমুখ আচার্য ও কবির প্রভাবে বৈষ্ণব-পদাবলী যে গীত হইত, তাহার প্রমাণ আছে।

ইঁহারাই বৈষ্ণব মহাজন। ইঁহাদের সঙ্গীতই সাধারণতঃ পদাবলী নামে পরিচিত। ইঁহাদিগকে মহাজন বলে—অথবা যাঁহারা মহাজন নামে অভিহিত হন, তাঁহারা বোধ হয় এই জন্য মহাজন যে, তাঁহারাই প্রেমধর্মের বর্তি জ্বালিয়া সর্বসাধারণকে পথ দেখাইয়াছেন। তাঁহারা যে পথে গিয়াছেন, সেই পথই পথ। আমরা যুধিষ্ঠির মহারাজের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া এখানেও বলিতে পারি—'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।' তাঁহারা যে উত্তমর্ণ, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? ইহকাল-পরকালের মঙ্গলের জন্য সকলেই তাঁহাদের নিকট ঋণী। ইহকালের পথ এবং পরকালের পাথেয় এই উভয়ের সন্ধান যাঁহাদের নিকট পাওয়া যায়, তাঁহারা মহাজন বটেই ত! শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলাইয়া যাঁহারা কবিতা রচনা করেন, তাঁহাদের যেমন কবি বলা হয় না, তেমনি বৈষ্ণব-কবি মাত্রকেই মহাজন সংজ্ঞা দেওয়া হয় না। বৈদিক ঋষিরা যেমন মন্ত্রের দ্রষ্টা, বৈষ্ণব-মহাজনরাও [illegible]রূপ দ্রষ্টা বা inspired, তাঁহাদের সত্য-দৃষ্ট ভাবজগতে নূতন প্রেরণা জোগাইয়াছে। জয়দেব তাঁহার কাব্যকে সমসাময়িক কবিদের রচনার সঙ্গে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন যে, তাঁহার কাব্য 'সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং', অর্থাৎ তাঁহার সন্দর্ভ বিশুদ্ধ। এই বিশুদ্ধতার ব্যাখ্যায় পূজারি গোস্বামী বলিয়াছেন যে, ইহাতে ভগবানের গুণ-বর্ণনা আছে। বস্তুতঃ, ভগবানের প্রেমময়ী লীলা প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিয়া যাঁহারা গীতচ্ছন্দে গাঁথিয়াছেন, তাঁহারাই মহাজন।

বৈষ্ণব-মহাজনদের যুগ চলিয়া গিয়াছে! মহাজন আর হয় না। মহাজনদের পদরেণুপূত বঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবির আবির্ভাব এখনও সম্ভব হইতে পারে, হইয়াছেও। কিন্তু মহাজনের পুনরাবির্ভাব আর সম্ভব নহে। প্রেমের সে বল্লোক আর নাই, সে প্রাণ নাই, সে সুরও আর নাই। যে দিন আকাশ-বাতাস গীতি-গন্ধে ভরা ছিল, যে দিন মানুষের প্রাণ প্রেমের পরশে সরস হইয়াছিল, সংসারের শত জ্বালার মধ্যেও পরম সান্ত্বনা ছিল দেবতার করুণায় অবিচল বিশ্বাস, যে দিন পাপের কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিয়া চিত্ত ভাগবতী সাধনার প্রেমাশ্রু-রাশিতে, সে দিন মহাজনদের আবির্ভাবে উত্তর-ভারত উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

প্যাগোডা

—বাণীনাথ ঘোষ

—সুপ্রভাত নন্দন

নরেন্দ্র দেব
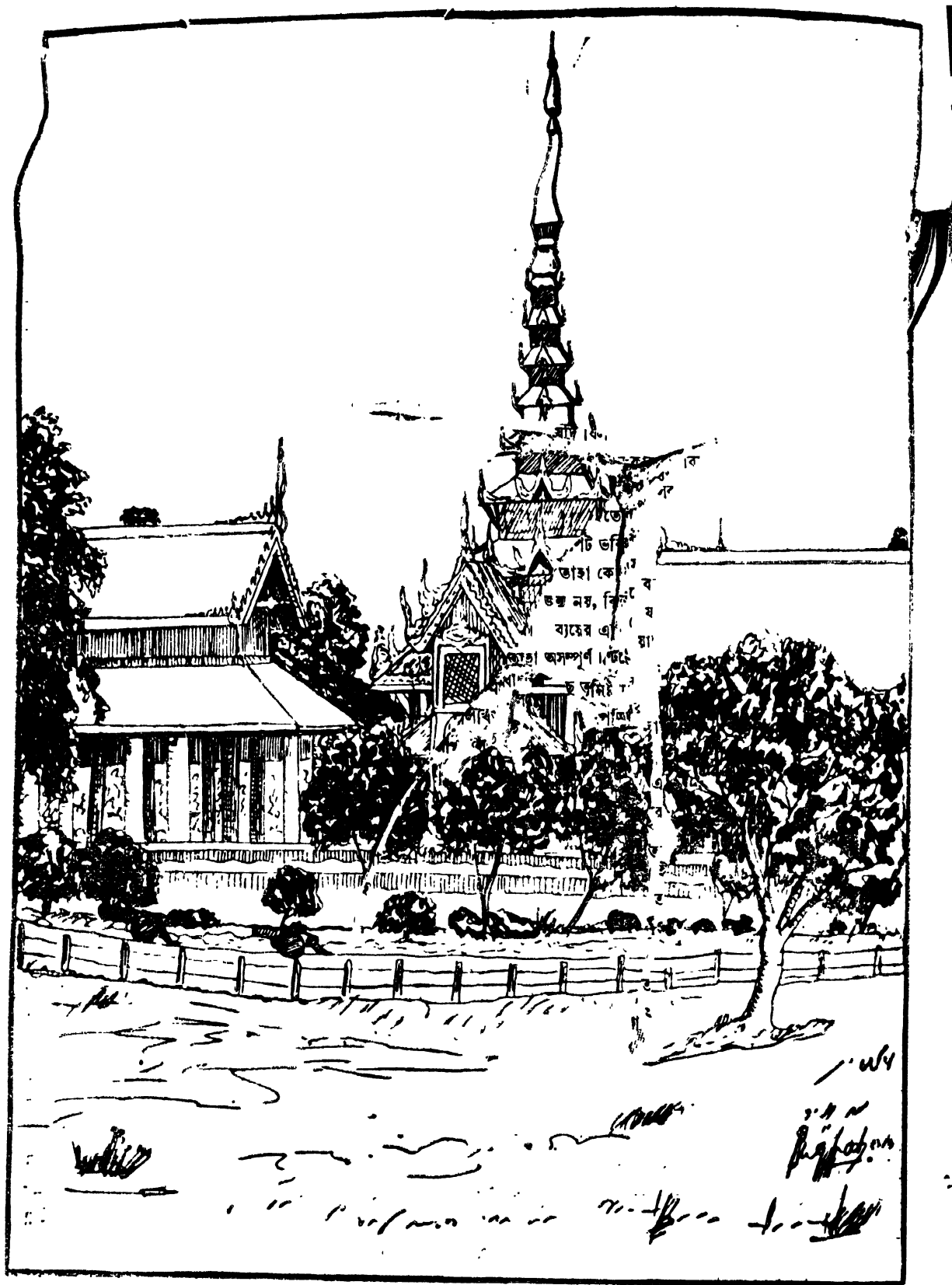
পৈতৃক বাড়ীখানিও পাওনাদারেরা কেড়ে নিলে। ঊর্মিলা আর ছায়াকে নিয়ে রমেন উঠে এলো, শহরের সস্তা পল্লীর একটা ছোট ফ্ল্যাটে।

ছায়া বি-এ পড়ে। অভিজাত বংশের মেয়ে। এত দিন কলেজে যাতায়াত করতো বাপের মোটরে। আজ বাড়ীও নেই। পড়াও ছাড়তে পারলে ভালো হ'ত। কিন্তু ঊর্মিলা বললে— লেখা-পড়া না শেখালে মেয়ে পার করবে কেমন করে?

রমেন খরচ-পত্রের টানাটানির উল্লেখ করতে ঊর্মিলা তাকে বুঝিয়ে দিলে যে, এটা বিয়ের খরচের চেয়ে কম। তা ছাড়া, কিস্তিবন্দীতেই দেওয়া চলবে।

ঊর্মিলার একান্ত ইচ্ছায় ছায়ার কলেজ রইলো। প্রথম দিন-কয়েক ঝী সঙ্গে নিয়ে রিক্সায় যাতায়াত করতো। এখন আসে-যায় একলাই ট্রাম-বাসে। ঝী-চাকর রাখার সঙ্গতি নেই আর।

সংসারের অনেক কাজেই মা'কে সাহায্য করে ছায়া। উচ্চ বংশের মেয়েদের চেহারায় আভিজাত্যের যে একটা ছাপ থাকে সেটা দারিদ্র্যের চাপে তখনও মুছে যায়নি একেবারে। বেশে বেশে প্রসাধনে একটা রুচিসঙ্গত শালীনতা ছিল। ছায়াকে ঠিক রূপসী বলা চলে না বটে, কিন্তু, সর্বাঙ্গে তার এমন একটি শ্যামল শ্রী ছিল যে, কলেজের তরুণ ছাত্রদের অনেকেরই চোখ তাকে কলেজ যাতায়াতের পথে খুঁজে ফিরতো।

এই সময় চলেছিল বাংলা দেশ ছেয়ে সোভিয়েট-প্রীতির প্রবল বন্যা। শুধু বাংলা দেশে কেন, ইউ-এস-এস-আরের সঙ্গে চলেছে তখন সারা ভারতবর্ষেরই একটা স্বাধিকার-প্রমত্ত কমিউনিজমের অন্তরঙ্গ কমিউনিয়ন।

থার্ড ইন্টার ন্যাশানালের মোহগ্রস্ত কলেজের ছেলে-মেয়েরা তাতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। লেনিন-টস্কী-ষ্ট্যালীন-গর্কী—এ সব এক-একটা নাম তাদের বুকের মধ্যে নিয়ে আসতো অসহ্য থ্রিলিং!

চোগোলকুড়ের একটা গলিতে একখানা মেস-বাড়ীর তিন তলাটা অল্প ভাড়ায় বন্দোবস্ত করে নিয়ে ইতিমধ্যেই তারা সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছিল তাদের 'আন্তর্জাতিক সংঘ-সমিতি'।

প্রত্যহ কলেজের ফেরত ছেলে-মেয়েরা জড়ো হয় সেখানে। পার্টি মিটিং চলে। কার্য-পদ্ধতি স্থির হয়। সর্বহারাদের জন্য গর্ব করা যেতে পারে এমন সব ব্যবস্থার আলোচনা হয়।

মজদুর ইউনিয়ন গড়তে লেগে যায় তারা। ধনীদের শোষণ বন্ধ করতে হবে। নিজেদের স্বার্থ সম্বন্ধে আত্ম-সচেতন করে তুলতে হবে এই সব দীন-দরিদ্র মূর্খ শ্রমিকদের। চাই এদের শিক্ষিত করে তোলা। এদের অন্ন-বস্ত্রের প্রয়োজনীয় সংস্থান। বস্তিগুলোর অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়া বদলে দিতে হবে। মনুষ্যের বাসের যোগ্য করে তুলতে হবে এদের নরক তুল্য আবাসস্থলগুলি। পরিচ্ছন্নতা শিখিয়ে সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে হবে এদের। মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি কদভ্যাস থেকে বিরত করতে হবে সকলকে।

সপ্তাহে দু'দিন নিয়মিত তারা এসে সভা করে বস্তি অঞ্চলে। শ্রমিক ও কারিগরদের বোঝায় যে, কারখানার মালিক, দেশের ধনী ও বড়লোকদের গাড়ী বাড়ী বেড়ে উঠছে তোমাদেরই শ্রম-জলে। কারখানার মাল তোমাদেরই দেহের রক্তবিন্দু দিয়ে তৈরি হচ্ছে। তোমাদেরই মুখের খোরাক কেড়ে নিয়ে চলেছে তাদের ঘরে নিত্য ভোজের মহোৎসবে। তাদের কারবারের মূলধন আসলে তোমরাই।

অথচ তাঁরা থাকবে পরম সুখে, আর তোমরা দুঃসহ দুঃখে জীবন কাটাবে—এ অন্যায় জুলুম কিছুতেই চলতে দিও না। চাই গণজাগরণ—চাই শ্রেণী-সংগ্রাম—চাই দেশের সমস্ত কায়িক শ্রমিকদের কায়কল্প বিপ্লব!

এগিয়ে চলছে তাদের কাজ। বস্তির ছেলে-মেয়েদের জন্য খুলে দিয়েছে তারা সান্ধ্য-স্কুল। পর্যায়ক্রমে শুরু করে দিয়েছে তাদের মধ্যে শিক্ষার প্রচার। প্রত্যেক সভ্য অন্তত সপ্তাহে এক দিন বস্তির মধ্যে এই সর্বহারাদের সঙ্গে বাস করে এদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে শুরু করে দিলে।

সে কী কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গেই না চললো ওদের পার্টি-প্রোগ্রামের প্রত্যেকটি কাজের সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাপনা!

ছায়া যে শুধু এদের দলে নাম লিখিয়েই নিশ্চিন্ত হয়েছিল তাই নয়। কলেজে যাওয়া-আসার ফাঁকে ফাঁকে এদের সব ব্যাপারেই এসে রীতিমতো সে যোগ দিত। বাড়ী বাড়ী [illegible] সাম্যবাদের প্রচার-পুস্তিকা নিয়ে। অন্তঃপুর[illegible] মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রাম ও শ্রমিক বিপ্লবের বাণী পৌঁছে [illegible] সংগ্রহ করে আনতো তাদের চাঁদার খাতায় বেশ মোটা অঙ্ক[illegible]চির।

ছায়ার মনে সত্যিই একটা আ[illegible]রা এখনও বু[illegible] ফেরাতে পারত না কেউ তার আবেদন। অন্তঃপুরবাসী ব[illegible] হইতে ফিরিব[illegible]র দল আগ্রহে ছুটে আসতো দলে হবার ব্যগ্রতা নি[illegible] পণ্ডিত জও[illegible] শিখা স্পর্শ করতে পারত না কেউ। দীপের দী[illegible]লিতেছে। [illegible] হয়ে ওঠে যে অন্ধকার, দুর্বলতা সবাকেই হরণ ক[illegible] বছর দে[illegible]

যে ছেলেটিকে প্রায়ই দেখা য[illegible] করিয়[illegible]য়ার [illegible]বাছ, সে নিতান্তই একটি তরুণ বালক [illegible] ছায়ার [illegible]। এই প্রিয়দর্শন ছেলেটি ছিল এক [illegible]নার কনিষ্ঠ। বাপ[illegible] মস্ত বড়ো। আর দুই ভাই। [illegible]র হাতঘড়ি, আংটি, ফাউন্টেন পে[illegible] সবই মূল্য-তালিকার মাথার দিকে। হাত-খরচ যা পায় তাতে থিয়েটার, বায়োস্কোপ, মাঠে খেলা [illegible] এবং রেস্তোঁরায় বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে লাঞ্চ খাওয়ার পরেও পার্টি-[illegible] দেবার মতো বেশ কিছু উদ্বৃত্ত থাকে। তরুণ সাম্যবাদীদের মধ্যে গণ-সঙ্ঘের প্রচারিত লাল লিটারেচার তার চেয়ে বেশী আর কেউ কিনতে পারতো না। সর্বহারা শিক্ষিত সভ্যরা লেটেস্ট সোভিয়েট গ্রন্থ পড়বার লোভে কমরেড নিমাইকে বেশ একটু তোয়াজ করতো।

কিন্তু, এ কথাও ঠিক যে, নিমাইয়ের প্রতি ছায়ার পক্ষপাতিত্ব তাদের লাল বুকগুলোকে আরও [illegible] করে দিত। অথচ কমরেড নিমাইয়ের ঈর্ষা করতে মনে মনে তারা লজ্জিতও হত। ছোকরা একেই ছেলেমানুষ! একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মনকে তারা এই বলে বোঝাতো—বড়লোকের ছেলে বলেই বোধ হয়···

এই ব্যাপার নিয়ে নিজেকে সব চেয়ে বেশী বিপন্ন বোধ করছেন অধ্যাপক ডাঃ অমূল্য সেন। তিনি এসেছিলেন কোন এক মফঃস্বলের স্কুল থেকে একেবারে কলকাতার এই বড় কলেজটির প্রফেসর হয়ে। 'দেশের অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে ধনী ও দরিদ্রের অবস্থা ভেদ' সম্বন্ধে থিসিস্ লিখে কিছু দিন আগে তিনি ডক্টরেট পেয়েছেন। কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সাম্যবাদে দীক্ষা দিয়েছিলেন যাঁরা ডাঃ সেন ছিলেন তাঁদের মধ্যে পায়োনীয়র। তাঁরই মেসের ঘরে প্রথম বৈঠক হয়েছিল এই 'আন্তর্জাতিক সাম্য-সমিতি।' আজ সে সূতিকাগার ছেড়ে বাইরে এসেছে। আত্মনির্ভরশীল হয়েছে। বিস্তৃত করেছে নানা দিকে তার শাখা-প্রশাখা। ছাত্র-ছাত্রী ছাড়াও অনেক শিক্ষিত বিজ্ঞ লোকেরাও যোগ দিয়েছেন এসে এই সমিতির কাজে।

ডাঃ সেন প্রতি শনিবার নিয়মিত সমিতি-গৃহে এসে সভ্যদের মার্ক্স পড়ে শোনাতেন। মার্ক্সের প্রত্যেকটি জটিল থিয়োরী প্রাঞ্জল ভাষায় এমন সরল ভাবে সকলকে বুঝিয়ে দিতেন যে, তিনি হয়ে উঠেছিলেন মার্ক্স সম্বন্ধে এক জন অথরিটি। দলের সকলেই ডাঃ অমূল্য সেনকে গুরুর মতো মানতো। কালেক্টিভ ফার্ম, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, কনজিউমার্স স্টোর্স, শ্রমিকদের অংশীদারিত্বে কল-কারখানা স্থাপন এই সব ছিল এদের স্বপ্ন ও আদর্শ। মার্ক্সের অনুশাসন অনুসরণে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ভিত্তি নূতন করে গড়ে তুলতে না পারলে এ দেশের কৃষক ও জন মজুরের শোষণ যেমন বন্ধ করা যাবে না, তেমনি ধন-সাম্যের প্রতিষ্ঠাও সম্ভব হবে না। মার্ক্সের মন্ত্র সাধনের উপরই একমাত্র এই নব সমাজতন্ত্রের সিদ্ধি নির্ভর করছে।

কিন্তু, মার্ক্সকে বাদ দিয়েও মানুষের জীবনের আরও অনেক সমস্যা আছে যা আন্তর্জাতিক নয় একান্তই অন্তর্জাত।

কলেজের ফোর্থ ইয়ার ক্লাসের ছাত্রী এই ছায়া ডাঃ সেনের চিত্তে অপ্রত্যাশিত ভাবে যে ছায়া ফেললে তা ক্রমেই কায়া নিয়ে একটা রূপ ধরছে বুঝতে পেরে ডাঃ সেনের প্রৌঢ় হৃদয় বিব্রত হয়ে পড়লো।

অনেক চেষ্টা করেও তিনি ছায়াকে যখন কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না, তখন অসহায়ের মতো নিঃশব্দ আত্মসমর্পণে ছেড়ে দিলেন নিজেকে এই নব অনুরাগের ফল্গু-প্রবাহে। অবশ্য সমিতির কোনও জেলাস্ সভ্যেরই অনুসন্ধিৎসু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তা আবিষ্কার করতে পারেনি। এমন কি, তরুণী ছায়ার নারীসুলভ ইনষ্টিংক্ট মাত্র এক-আধ বার এ সম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে উঠলেও ব্যাপারটাকে সত্য বলে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারেনি।

ডাঃ সেন যে তার পিতার সমবয়সী, এ কথা তো তিনি নিজেই বহু বার জানিয়েছেন ছায়াকে। কাজেই ছায়া কাছে এলে প্রীত হয়ে ডাঃ সেন সমিতি-গৃহের সকল সভ্যের চোখের উপরই তাকে সস্নেহে বুকের মধ্যে টেনে নিতেন এবং গদ-গদ কণ্ঠে বলতেন—"এই অসাধারণ মেয়েটির কাছে আমরা অনেক কিছু প্রত্যাশা করি" ছায়া লজ্জারুণ মুখে নত হয়ে তাঁর পদধূলি নিত।

কলেজ-ক্লাশের মধ্যেও ছায়ার প্রতি এই অধ্যাপকের শিক্ষকসুলভ কঠোর দৃষ্টিতে ধরা পড়তো বিশেষ একটু স্নেহাধিক্য। এটা ছায়ার সহপাঠী ও সহপাঠিনীদের দৃষ্টিকে ফাঁকি দিতে পারেনি। কোনও ছোকরা প্রোফেসর হলে এত দিন কলেজে ওদের নিয়ে কানাকানি শুরু হয়ে যেতো। কিন্তু, ডাঃ সেন বয়সে প্রবীণ, তা ছাড়া তিনি এক জন খাঁটি সাম্যবাদী বলে সকলেরই বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। মেয়েরা এই অনূঢ় অধ্যাপকের দুর্বলতাটুকু অন্য চোখেই দেখতো।

তবে, ছায়াকে তারা মাঝে-মাঝে তাদের কৌতুক-সরস রহস্যাঘাতে উত্যক্ত করবার লোভ সম্বরণ করতে পারত না। কেউ বলতো—

লড়াই

—অবনী সেন

ছায়ার মায়ায় এবার বুঝি অধ্যাপক ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়! কেউ কৃত্রিম মিনতি করে বলতো—দেখিস্ ভাই, শেষটা যেন আমাদের গুরুপত্নী সেজে বসিস্ না! দোহাই তোর! কেউ আবার বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলতো—ছায়া ঘরের যে কোনও কোণেই পড়ুক না, সেখানটাকে অন্ধকার না করে ছাড়ে না! নইলে—ডাক্তার সেনের মতো অমন এক জন শুভ্রকেশ প্রবীণ মানুষকে……

ছায়া এ সব কথা কানেই তুলত না। তবে মেয়েরা কোনও দিন খুব বেশী বিরক্ত করলে সে ধীর-শান্ত কণ্ঠে বলতো—ওঁর মতো স্বামী পাওয়া তো ভাগ্যের কথা!

সহপাঠিনীরা হেসে উঠে বলতো—তাই না কি? কিন্তু, বড্ড বেমানান হবে না? বয়সে যে উনি প্রায়—তোমার পিতামহ……

ছায়াও হাসি-মুখে বলতো—তা' হলেনই বা। উমা যে দিন মহেশ্বরের কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছিলেন, শিব সে দিন বয়সে তরুণ ছিলেন না……

অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে-ছেলেটি [illegible] প্রায়ই দেখা যেত ঘ্রবতে, তার সম্বন্ধে মেয়ে[illegible]পূর্ণ উদাসীন! বোধ করি তাকে ওরা পুরুষ বলেই গ্রাহ্য ক[illegible]।

[illegible]চিব।

প্রোফেসর সেন কিন্তু কমরেড [illegible]রা এখনও বু[illegible] ক্রমেই চঞ্চল হয়ে উঠছিলেন। দেখতে ছেলেমানুষ হ[illegible] হইতে ফিরিব[illegible]টি বর্ণ-চোরা! কলেজ ম্যাগাজিনে গেল মাসে ওর যে [illegible] পণ্ডিত জও[illegible]—সেটা খুবই আপত্তিজনক। একটা মেকি দার্শনি[illegible]তেছে। [illegible]রছে বটে, কিন্তু আসলে ওটা প্রেমের কবিতা। [illegible] বছর দে[illegible]

[illegible]রিয়[illegible]

"কে বলেছে—সৃষ্ট[illegible]
দৃষ্টি তার নহেক নির্মল।
চন্দ্র যদি হয় মাত্র আদিত্যের ছায়া,—
জোয়ারে মাতায় কেন সাগরের জল?"

এ ত' স্পষ্টই ছায়াকে উদ্দেশ[illegible] লিখেছে সে। সৃষ্টি যে মায়া, চাঁদের আলো যে সত্য নয়, এ [illegible]র কথা ত' ছায়াই লিখেছিল কলেজ ম্যাগাজিনে তার আগের মা[illegible]।

ডাঃ সেন নিমাইকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন—এত অল্প বয়সে মেয়েদের সঙ্গে মেলা-মেশা ছাত্র-জীবনের পক্ষে ক্ষতিকর নয় কি?

কমরেড নিমাই গম্ভীর ভাবে বললে—নিশ্চয়! শুধু ছাত্র কেন—সার? কোনও জীবনের পক্ষে ওটা হিতকর নয়।

ডাঃ সেন চমকে উঠে বললেন—ত… মানে?

নিমাই বললে—এই দেখুন না সার, ওদের সঙ্গে মেলা-মেশা করতে আপনার—আমার—কার না ভালো লাগে? অথচ স্ত্রীজাতি যে পুরুষ মাত্রেরই পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর—এটা সেই বাইবেলের যুগ থেকেই জেনে আসছি সার!

ডাঃ সেন কতকটা নিশ্চিন্ত হ'লেও, সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হ'তে পারলেন না। প্রশ্ন করলেন—তুমি কি মেয়েদের ঘৃণা করো?

—না সার। কোনো মানুষকেই আমি ঘৃণা করিনি। তবে হ্যাঁ, আমাকে আপনি এক জন 'নারী-বিদ্বেষী' বলতে পারেন।

—তাই বা কেমন করে বলবো? কলেজের আর সব মেয়েদের সম্বন্ধে তুমি যথেষ্ট উদাসীন বটে; কিন্তু……

—ছায়ার কথা বলছেন ত'? ওটা ব্যতিক্রম সার! কারণ, ও ছাড়া কলেজের আর কোনও মেয়েই আমাকে গ্রাহ্য করে না!

—তা'হ'লে—ছায়ার সম্বন্ধে…

—আমার মনোভাব যথেষ্ট মর্য্যাদাপূর্ণ। ওকে সার আমি আমার বোনের মতো ভালবাসি!

—তোমার এ মনোভাব খুবই প্রশংসনীয় বটে, কিন্তু, একটা কথা ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই যে, তুমি তোমার সহোদরাদের নিয়ে ত' কোথাও…কখনো…

—যাই না কেন? এই ত' জানতে চান? তার কারণ—আমি আজন্ম এক জন ব্রহ্মবাদী! আমিই আমার বাপ-মায়ের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সার! কিন্তু,…অনুমতি করেন ত' একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি আমার সম্বন্ধেই এতখানি ইণ্টারেষ্টেড?… না, ছায়ার সম্বন্ধে?

ডাঃ সেন একটু ঢোক গিলে বললেন—না, হ্যাঁ, তোমরা দু'জনেই ইদানিং আমার বেশ একটু দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছো—

—সে ত' বুঝতেই পারছি। তবে, এ নিয়ে আমি আর আপনার মতো এক জন বয়োজ্যেষ্ঠ প্রবীণ অধ্যাপকের সঙ্গে তর্ক করতে চাই না—কিন্তু এ কথা আমি নিশ্চয় বলবো—আপনি আপনার পদমর্য্যাদার সুযোগ নিয়ে আমার ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছেন। কমরেড হিসেবে আমি এ রকম ডিক্টেটারির প্রতিবাদ করছি। এটা নিতান্তই বুর্জোয়া-জনোচিত। কলেজে আপনি আমার প্রোফেসর। কিন্তু কলেজের বাইরে আপনার আর আমার অধিকার আমি সমান বলেই মনে করি। এই যে ছায়াকে আপনি ক্রমাগত সব দামী দামী দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সেট, ফাউণ্টেন পেন, লেডিজ রিষ্ট-ওয়াচ, মেহগিনি বুক্-ষ্ট্যাণ্ড, মরোক্কো রাইটিং কেস, নোটবুক, ডায়েরী, ফটো অ্যালবাম প্রভৃতি অজস্র উপহার পাঠান এ নিয়ে কি আমি কোন দিন আপনাকে প্রশ্ন করতে এসেছি যে ক্লাসের অন্য কোনও ছাত্রীর প্রতি ত' কৈ আপনার এতটা উদার অনুগ্রহ বর্ষিত হ'তে দেখিনি—

ডাঃ সেনের মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। তিনি কি যেন বলবার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু কমরেড নিমাই আবার শুরু করলে—স্বীকার করি যে পড়া-শুনোয় বিশেষ ভাবে মনোযোগী ছাত্রীকে একটু উৎসাহ দেওয়া অধ্যাপকের কর্তব্য। কিন্তু, আমিও জানি, আপনিও জানেন সার, ছায়ার আর যে গুণই থাকুক, পড়া-শুনোয় মন তার আর পাঁচ জন ছাত্রীর চেয়ে এতটুকুও বেশী নয়। তা ছাড়া, কিছু মনে করবেন না সার—এ রকম 'রাজসূয়' উপঢৌকন পাঠানো আমি এক জন প্রোলিটেরিয়েটের পক্ষে ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজ বলেই মনে করি—

ডাঃ সেন অসহায় ভাবে বললেন—কেন? তাতে দোষ কি? কলেজ-ম্যাগাজিনে ছায়ার যে সব কবিতা বেরিয়েছে ক্লাসের আর কোনও ছাত্রীর সাধ্য আছে সে রকম লেখে—? তাকে যদি একটু স্পেশ্যাল………

কমরেড নিমাই হো-হো করে হেসে উঠে বললে—ছায়ার সাধ্য নেই যে কোনও জন্মে সে ও-রকম কবিতা লেখে! ও কবিতাগুলো যে ছায়ার নাম দিয়ে আপনিই লিখছেন, ছায়া আমার কাছে সে গোপন ইতিহাস প্রকাশ করে ফেলেছে!

ডাঃ সেনকে যেন অকস্মাৎ একটা আণবিক বোমার ধাক্কায় একেবারে হিরোশিমোয় উড়িয়ে নিয়ে গেল!

যখন তিনি প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বভূমিতে ফিরে এলেন, কমরেড নিমাই তখন চলে গেছে।

রাত্রি প্রায় বারোটা। রমেন ব্রীজ খেলার আড্ডা থেকে বাড়ী ফিরলো। ব্ল্যাক আউট তখন পূর্ণমাত্রায় চলেছে। কলকাতার অলি-গলি গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সন্ধ্যার পরই শহরের পথ জন-বিরল হয়ে পড়ে। নিতান্ত প্রয়োজনে যারা বাইরে যেতে বাধ্য হয় তারা সাবধানে টর্চ্চ নিয়ে পথ হাটে। বীটের কনষ্টেবল রমেনকে চেনে। কোনো কোনো দিন এর চেয়েও রাত করে ফেরে সে। টর্চ্চ জ্বেলেই পথ চলে। পাহারাওয়ালা দেখে। কিছু বলে না।

রমেনকে আজ আর বাড়ীর দরজায় এসে প্রতিদিনের মতো কড়া নাড়তে হল না। উর্মিলা জানলায় দাঁড়িয়ে অধীর আগ্রহে তার ফেরার প্রতীক্ষা করছিল। টর্চ্চের আলো গলির মুখে দেখেই সে এক রকম ছুটে এসেই দরজা খুলে দাঁড়ালো। রমেন ঢুকতেই [illegible] গলায় বললে—যে ভয়ে কাঁটা হয়েছিলুম তাই বোধ হয় ঘটলো। তোমার কথা না শুনে কেন যে মরতে মেয়েটাকে কলেজে দিলুম। ছায়া বাড়ী থেকে পালিয়েছে।

রমেনের হাতের টর্চ্চের আলো থপ্ করে নিবে গেল। সভয়ে জিজ্ঞাসা করলে—সে কি? পালিয়েছে মানে?

উর্মিলা বললে—পড়া-শুনো সেরে খেয়ে-দেয়ে আজ বরং একটু সকাল সকালই শুয়েছিল। আমি এই একটু আগে ঘরে ঢুকে দেখি, ছায়া নেই। সারা-বাড়ী তন্ন-তন্ন করে খুঁজলুম। কোথাও নেই তোমার মেয়ে।

রমেন যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। উর্মিলার কথার উপর বোধ করি তার নির্ভরতার অভাব ছিল। বললে—অন্য ফ্ল্যাট-গুলোয় খোঁজ করেছিলে? কিন্তু, উর্মিলার উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই টর্চ্চ নিয়ে এ-ঘর ও-ঘর খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিলে। পাওয়া গেল একটা হদিশ। ছায়ার পড়ার টেবিলের উপর একখানা চিঠি।

কম্পিত হাতে টর্চ্চের আলোতেই রমেন চিঠিখানা দমবন্ধ করে পড়ে ফেললে। উর্মিলাকে লিখে রেখে গেছে সে—"মা, তোমরা ভয় পেয়ো না। শীঘ্রই ফিরবো। খোঁজাখুঁজি কোর না—দুর্নাম রটে যেতে পারে। কোথায় যাচ্ছি বলতে এখন বাধা আছে। সম্ভব হ'লেই সেখান থেকে চিঠি লিখে জানাবো। কেউ খোঁজ করলে বোলো মামার বাড়ী গেছে। তোমাদের স্নেহের ছায়া।"

চিঠির বার্তা শুনে রমেনের মুখের দিকে চিন্তিত দৃষ্টি মেলে উর্মিলা জিজ্ঞাসা করলে—এখন আমাদের কি করা উচিত?

চিঠিখানা মুড়ে দুমড়ে ফেলে দিয়ে, গায়ের জামাটা খুলতে খুলতে রমেন্দ্র বললে—তোমার মেয়ের দ্বিতীয় চিঠি না পাওয়া পর্য্যন্ত চুপ করেই থাকতে হবে। এ ছাড়া আর কিছুই করা চলবে না।

'আন্তর্জাতিক সাম্য সমিতির' শনিবারের অধিবেশন চলছিল। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'মার্ক্স ও গণবিপ্লব'। কিন্তু, ডাক্তার সেনের মনের মধ্যে যে অন্তর্বিপ্লব চলছিল তাতে বক্তব্য বিষয় তিনি ভালো করে গুছিয়ে বলতে পারছিলেন না।

আজকের সভা ভালো জমলো না। বক্তৃতার শেষে প্রশ্নোত্তরের সময় কমরেড নিমাই প্রশ্ন করলে—আচ্ছা সার, 'কমিউনিষ্ট ম্যানিফেস্টো'তে মার্ক্স যে বলেছেন 'The history of all hitherto existing society is the history of class struggle.' এটা কেমন করে মেনে নেওয়া যায়? 'শ্রেণীর আত্ম-চেতনা' বলে' ত কিছুই ছিল না প্রাচীন লোক-সমাজে। সুতরাং 'শ্রেণী-সংগ্রাম' সম্ভব হয় কেমন করে? Mass বা classএর মধ্যে কোনো প্রকারের একটু আত্মচেতনার আবির্ভাব ত সামন্ত-তন্ত্রের যুগে খুঁজেই পাই না। বড়র প্রাপ্য অধিকার ছিল সেদিন ছোটর কাছে অতি স্বাভাবিক বিধি-নিয়মের মতই। বরং উচ্চ শ্রেণীদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনা বেশ উগ্র ছিল দেখা যায়। ধনতন্ত্রের প্রত্যন্ত যুগে সাম্যবাদই এনে দিয়েছে প্রোলিটেরিয়েটদের মধ্যে সেই চেতনা—যা আজ তাকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে বিপ্লবের অগ্নি-মন্ত্রে। 'Class struggle'এর জন্ম হয়েছে ত এই হালে!

ডাঃ সেন 'ক্যাপিটাল'খানি মুড়ে রেখে উঠে পড়লেন। বললেন, সে অনেক কথা। আজ আমার শরীরটা ভাল নেই। কাল সন্ধ্যায় আমার সো[illegible] দেব।

কমরেড নিমাই ব[illegible] সকালেই ত সার আপনি দেশে চলে যাচ্ছেন শুনলুম। [illegible] গ্রীষ্মের ছুটিটা গ্রামে কাটাবেন বলেছেন। ছায়া বক্সী[illegible]ক আপনি নিমন্ত্রণ করেছেন—গ্রামের যথার্থ রূপ দেখাবে কে[illegible]। চাষী, মজুর ও প্রজাদের প্রকৃত অবস্থা স্বচক্ষে দেখবার, কি[illegible]র জন্য—

ডাঃ সেনবাবুর এ[illegible]—হ্যাঁ হ্যাঁ, তা, হুঁ, সেই রকম কথা হয়েছে বটে অসম্পূর্ণ।[illegible]

ক[illegible]চ উঠলো—আবার 'কিন্তু' কেন সার? আপ[illegible]তি চলে[illegible]মিও হয়ত' বেড়িয়ে আসতে পারি দু[illegible]র জন্য। [illegible] আমি এ পর্য্যন্ত কখনো দেখিনি। [illegible], ছায়া ফিরে এলে তার মুখে সব শুনে তবেই যাবো। ম্যালেরিয়া নেই বোধ হয় এখন?···আর থাকলেই বা কি হয়েছে। মশারি নিয়ে যাওয়া যাবে. আর [illegible] কুইনিন খাওয়া যাবে। মুস্কিল শুধু খাবার জলের। পুকুরের [illegible]টে জল আমি কিছুতেই গিলতে পারব না। আচ্ছা সার, আপনা[illegible]র গ্রামে ত যথেষ্ট ডাব পাওয়া যায়? অজস্র নারকেল গাছ আছে না? আমি যদি যাই, তবে, জলের বদলে শুধু ডাব খেয়েই থাকবো!

ডাঃ সেন মৃদু হেসে বললেন—আচ্ছা, সে যখন যাবে তখন তার ব্যবস্থা হবে। আমাদের ওখানে টিউব-ওয়েলও আছে।

—আছে?···কমরেড নিমাই আনন্দে লাফ দিয়ে উঠলো। আঃ! বাঁচালেন সার। তবে ত' আমি ছায়ার সঙ্গেই যেতে পারবো।

ডাঃ সেনের কাছে এ প্রস্তাবটা খুব লোভনীয় বলে মনে না হলেও ভদ্রতার খাতিরে বললেন—বেশ ত'। তাই যেয়ো। কিন্তু, তোমরা কলকাতার ছেলে, পাড়াগাঁয়ে গিয়ে টিঁকতে পারবে কি?

—টিঁকতে ত' যাচ্ছি না সার। একবার উঁকি মেরে দেখেই পালিয়ে আসবো!

—বেশ। তাহলে কাল ভোরে সাতটার গাড়ীতে আমার সঙ্গে চলো।

কমরেড নিমাই তার বাঁ হাতের আস্তিনটা তুলে ঘন ঘন ঘড়ি দেখছিল। বললে—মাফ করবেন সার? ঐটি পারবো না। ঘুম থেকে উঠতেই আমার আটটা বাজে!

ডাঃ সেন একটু ভেবে বললেন—তাহলে তুমি নেয়ে-খেয়ে বেলা বারটার গাড়ীতে এসো—

'O-K' বলে আর একবার জামার আস্তিন তুলে ঘড়ি দেখে কমরেড নিমাই ব্যস্ত হয়ে চলে যাচ্ছিল। ডাঃ সেন ডেকে বললেন—শোনো। ছায়ার কোনও খবর জানো? আজ সে সমিতির বৈঠকে আসেনি; কলেজ বন্ধ হয়ে পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া যায়নি। কেমন আছে সে?

কমরেড নিমাই সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বললে—খুব ভালো আছে সার! আজ তো সারা দিন আমার সঙ্গে নিউ মার্কেটে ঘুরেছে 'শপিং' করে।

একেবারে ছুটো করে সিঁড়ি ডিঙিয়ে নেমে কমরেড নিমাই চক্ষের নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অধ্যাপক ডাঃ সেন টর্চ জেলে গোগোলকুড়ের সেই অন্ধকার [illegible] গলিটা পার হয়ে ধীরে ধীরে [illegible] ফিরে [illegible] ঢুকেই দেখেন টেবিলের ওপর একখানা [illegible]। ফিকে আশমানী রঙের সুশ্রী লেফাকা। খামের উপর [illegible]তে তাঁরই নাম লেখা।

ব্যগ্র হাতে চিঠিখানা তুলে চিব। [illegible] পত্রখানিতে কেমন যেন একটা ফুলের সুগন্ধ! া এখনও ব

অবাক্ হয়ে ভাবতে বসলেন— হইতে ফিরিব[illegible]লো কার হৃদয়-বৃন্দাবনের সুরভিত লিপি পণ্ডিত জওহ[illegible]

নারীর সুডৌল হস্তাক্ষর। চি[illegible]লিতেছে। [illegible] জীবনে এ রত্ন লাভ বোধ করি এই প্রথম! বিহ্বল[illegible] বহর দে[illegible] খা[illegible]নির আঘ্রাণ নিলেন। আপন অজ্ঞাতসারে [illegible] স্পর্শ [illegible]। তার পর অতি সন্তর্পণে আবরণী উন্মোচন করে পত্রখানি বার [illegible]

শ্রীচরণেষু—

এই গতানুগতিক শুষ্ক নান্দীপাঠে আপনাকে পত্র লিখতে একটুও ভালো লাগছে না। অনেক কি[illegible] আত্মীয়তার সম্বোধন আপনা থেকেই ভীড় করে আসছে যেন আমা[illegible] কলমের মুখে।

কিন্তু, লিখতে সঙ্কোচ বোধ হয়[illegible] পাছে আপনার অপরিসীম স্নেহের অমর্যাদা করে বসি! আপনার কাছে কুড়িয়ে পাওয়া এই স্নেহের ঋণই যে আমার জীবনের প্রধান ঐশ্বর্য্য। থাক্ ও আমার ভাণ্ডারে অপরিশোধনীয় হয়ে।

আজ আমি আমার এই ভীরু অন্তরের একটি গভীর গোপন কথা আপনার কাছে অকপটে নিবেদন করতে এসেছিলাম। জানি আপনার চেয়ে বড় বন্ধু আমার আর কেউ নেই। কিন্তু, বলা হল না। আপনি বাড়ী নেই। কত দিন বলি-বলি করেও বলতে পারিনি। কোথা থেকে রাজ্যের লজ্জা এসে বাধা দেয়। অথচ, বিশ্বাস করুন, এ এমনিই প্রয়োজনীয় একটা কথা—যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমার ভবিষ্যৎ জীবনের গতি ও মুক্তি।

এমন সময় পেলাম আপনার স্বগ্রামে যাবার সাদর আমন্ত্রণ। বেঁচে গেলাম আমি। যে কথা এই শহরের ভীড়ের মধ্যে জানানো সম্ভব হয়নি, পল্লীর নিস্তব্ধ নির্জ্জনতার শান্ত পরিবেশে আশা করি তা অসঙ্কোচেই আপনাকে জানাতে পারবো। আপনার উপর জানি না কেন একটা অনন্ত নির্ভরতা আমি অনুভব করি আমার অন্তরের মধ্যে একান্ত ভাবে। আপনি ত' শুধু আমার শিক্ষক বা অধ্যাপক নন, আপনি যে আমার ভাব-জগতের পরিচালক—এ কথা ত' আমি কোনো দিনই অস্বীকার করতে পারবো না।

বিশেষ একটু প্রয়োজনে অন্যত্র যেতে হচ্ছে। সমিতির অধিবেশনে আজ যোগ দেওয়া হল না বলে দুঃখিত। আরও বেশী দুঃখিত—আপনি দেশে যাবার আগে আপনার সঙ্গে একটি বার দেখা করে প্রণাম করে আসতে পারলুম না। এ ক্ষোভ মেটাতে চাই একেবারে আপনার শ্যামা জন্মদার কোলের মধ্যে গিয়ে নব জন্ম লাভ করে।

অনেক কথা, অনেক ব্যথা সঞ্চিত হয়ে উঠেছে আমার এই বঞ্চিত ছোট বুকে। সে শুধু সার্থক হ'তে পারে, সুন্দর হ'তে পারে, আপনার পায়ের তলায় নিঃশেষে সব উজাড় করে দিতে পারলে। প্রীতি নমস্কার নিন।

আপনার স্নেহধন্য ছায়া।

অধ্যাপক সেন চিঠিখানি বার বার পড়লেন। মন্বন্তরের দিনে [illegible] করে তার ভিক্ষান্নের নিঃশেষিত পাত্রখানি বার বার লেহন করে।

যৎসামান্য ভোজে সুদীর্ঘ উপবাসীর অতৃপ্ত আত্মার পূর্ণ পরিতৃপ্তি আশা করাও অনুচিত। ছায়ার চিঠি পড়তে পড়তে ডাঃ সেনের প্রৌঢ় হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে অধীর আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠছিল। সর্ব্বাঙ্গে যেন অনুভব করছিলেন তারুণ্যের আনন্দ-শিহরণ। একটা জয়ের—একটা সাফল্যের—প্রচণ্ড উল্লাসে সমস্ত মুখখানি তাঁর যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

ছায়া সুস্পষ্ট ক'রে কিছু বলতে পারুক বা না পারুক, যেটুকু বলেছে তাই যে অনেক! ডাঃ সেনের আশাবাদী চিত্তলোকে এই সত্যটাই পরিস্ফুট হয়ে উঠলো—হৃদয়ের আবেদন কেবল মাত্র যৌবনেরই মুখাপেক্ষী নয়।

পরের দিন ভোর সাতটার গাড়ীতে প্রফুল্ল মনেই তিনি দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

একটু পরেই এক দল লোক হন্তদন্ত হয়ে এলো তাঁর মেসে—নিমাইয়ের খোঁজ করতে। কাল রাত্রে নিমাই না কি বাড়ী ফেরেনি।

ধনী। তার একমাত্র আদরের দুলাল নিমাই নিরুদ্দেশ! হৈ-হৈ শব্দে খোঁজ পড়ে গেছে সারা কলকাতা শহর জুড়ে! দেখতে দেখতে সাত দিন কেটে গেল। নিমাইয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না কোথাও।

দেশের সমস্ত ইংরাজী আর বাংলা সংবাদপত্রে নিমাইয়ের ফটো দিয়ে নিরুদ্দেশের বিজ্ঞপ্তি বেরুলো। যে সন্ধান দিতে পারবে তাকে হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে ঘোষণা করা হল।

রমেন্দ্র যথারীতি রাত বারোটায় ব্রীজের আড্ডা থেকে বাড়ী ফিরে এসে ঊর্মিলাকে বললে—ওগো শুনেছো? রায়েদের একমাত্র ছেলেটা আজ ক'দিন হল নিরুদ্দেশ! বড়লোকের ছেলে উড়তে শিখেছে আর কি! ওদের পাড়ার অনাদি খুড়ো বলছিল বটে, ছেলেটা ভালো, পড়াশুনোয় যেমনি ধারালো, স্বভাব-চরিত্রও না কি তেমনি নির্ম্মল। কিন্তু, আমার তা বিশ্বাস হয় না। তাই যদি হবে—তবে পালাবে কেন? তুমিই বলো না—?

কিন্তু, ঊর্মিলা রমেনের একটি কথারও উত্তর দিলে না। নিঃশব্দে উঠে গিয়ে একখানা চিঠি এনে তার হাতে দিলে।

রমেন জামার পকেট থেকে চশমাখানা বার করে চোখে লাগিয়ে

অন্ধকার থেকে

জীবনানন্দ দাশ

গাঢ় অন্ধকার থেকে আমরা এ পৃথিবীর
আজকের মুহূর্তে এসেছি।

বীজের ভিতর থেকে কি ক'রে অরণ্য জন্ম নেয়,—
জলের কণার থেকে জেগে ওঠে নভো নীল মহান সাগর,
কি ক'রে এ প্রকৃতিতে—পৃথিবীতে, আহা,
ছায়াচ্ছন্ন দৃষ্টি নিয়ে মানব প্রথম এসেছিল,
আমরা জেনেছি সব ;—অনুভব ক'রেছি সকলই।

সূর্য্য জ্বলে,—কল্লোলে সাগর-জল কোথাও
দিগন্তে আছে, তাই
শুভ্র অপলক সব শঙ্খের মতন
আমাদের শরীরের সিন্ধু-তীর।

এই সব ব্যাপ্ত অনুভব থেকে মানুষের স্মরণীয় মন
জেগে ব্যথা বাধা ভয় রক্তফেনশীর্ষ ঘিরে প্রাণে
সঞ্চারিত করে গেছে আশা আর আশা ;
সকল অজ্ঞান কবে জ্ঞান আলো হবে,
সফল লোভের চেয়ে সৎ হবে না কি
সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।

আমরা অনেক যুগ ইতিহাসে সচকিত চোখ মেলে থেকে
দেখেছি আসন্ন সূর্য্য আপনাকে বলয়িত ক'রে নিতে জা[illegible]
নব নব মৃত সূর্য্যে শীতে ;
দেখেছি নির্ঝর নদী বালিয়াড়ি মরুর উঠানে
মরণেরি নামরূপ অবিরল কি যে !

তবুও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন
জেগেছে শালিধান ;
ইতিহাস-ধূলো-বিষ উৎসারিত ক'রে নব নবতর
মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ ক'রে এক তিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কি নীলাভ আকাশ-নির্দ্দেশী !

হয়তো এখোনো তাই ;—তবু
রাত্রি শেষ হ'লে রোজ পতঙ্গ-পালক-পাতা
শিশির-নিঃসৃত শুভ্র ভোরে
আম[illegible] অনেক [illegible]ংসার খেলা অবসান ক'রে ;
অনেক দ্বেষের ক্লা[illegible] [illegible]খে গেছি।

আজো তবু [illegible] কে[illegible]
আজো চে[illegible], বি[illegible] [illegible]ত হয়ে ভাবি :
রক্তনদী[illegible]র এ[illegible] [illegible]র বিভিন্ন জাতির
শোক[illegible]সম্পূর্ণ।[illegible] [illegible] মাছি তোমাদের মৌমাছির নীড়
অ[illegible] [illegible]নী[illegible]
[illegible] প্রেরণা[illegible] [illegible] নির্ঝরিত শ্বাস
[illegible]ত শরীরের মৃত্যু-ম্লান পণ্য ভালোবেসে ;
তবুও হয়তো আজ তোমরা উড্ডীন নব সূর্য্যের উদ্দেশে।

ইতিহাস-সঞ্চারিত হে বি[illegible]ন্ন জাতি, মন, মানব-জীবন,
এই পৃথিবীর মুখ যত বে[illegible] চেনা যায়—চলা যায়
সময়ের পথে,
তত বেশি উত্তরণ সত্য নয় ;—জানি ; তবু জ্ঞানের
বিষন্নলোকী আলো
অধিক নির্ম্মল হ'লে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্য্যের অনুভবে।

পড়লে—গোপালগঞ্জ থেকে খবরের কাগজের একটা কাটিংস্ পাঠিয়ে দিয়ে ছায়া তার মাকে লিখছে—"এঁদেরই এই হারানো ছেলেটি আমার কপালে সিঁদুর দিয়ে—এখানে নিয়ে এসেছে। বাবাকে বোলো আমাদের খবরটা যেন তিনি জামাই-বাড়ী পৌঁছে দিয়ে পত্র পাঠ তাঁর বেহাই ম'শায়ের কাছে হাজার টাকা আদায় করেন। আর দিন পনেরো পরেই, অর্থাৎ, কলেজ খোলবার মুখেই আমার প্রোফেসর ডাঃ সেনের সঙ্গে কলকাতায় ফিরবো। আমাদের ভক্তি-পূর্ণ প্রণাম নাও। আশীর্ব্বাদ করো যেন আমাদের মিলন সার্থক ও সুন্দর হয়।

প্রণতা কন্যা—ছায়া।"

কিতাব দেখে যে-কেউ অনুমান করতে পারবেন সহজে, লেখকের কল্পনাশক্তি ছিল কত গভীর আর কত ব্যাপক! শোনা যায়, সম্রাট আকবরের চিত্ত-বিনোদনের জন্য না কি মোওলানা ফৈজি এই কিস্তাগুলি রচনা করে গেছেন পারস্য ভাষায়। কথাটা কতখানি খাঁটি অবশ্য জানি না। তবে পৃথিবীর আর কোন ভাষায় এমন ধরণের বিপুল আয়তনের স্মরণীয় বই আছে কি না সন্দেহ। এটাকে প্রকৃত পক্ষে একটা বিশ্বকোষ বলা যায়। একটা লোক যদি তিন কুড়ি বছর ধরে এই 'তিলাস্মী হোশ্‌রুবা'র নকল করতে থাকে, তবুও স্বল্প-পরিসর এক জীবনে সমাধা করে যেতে পারবে না সে তার আরব্ধ কাজ! কিতাবটি রচনা করতে তা'হোলে কত যুগ লেগেছিল সহজে অনুমান করা যায়।

সবে তেরো বছরে পা দিয়েছি [illegible] তখনও শিখিনি। উর্দু উপন্যাসের সন্ধান ইতিমধ্যে [illegible]লাম। তখনকার জনপ্রিয় কথাশিল্পী মোওলানা শারার, প[illegible] সারশার, মির্জা রুস্বা আর হরিদ্বারের মৌলবী মহম্মদ [illegible] পড়তাম পরম আগ্রহ সহকারে। তাঁদের কোন ব[illegible] কিছু ভুলে যেতাম। ইস্কুলের যাবার কথা মনে [illegible] আদ্যোপান্ত বইখানা শেষ না করে কিছুতেই নি[illegible]

তখনকার দিনে রেনোল্ডস্‌-এর [illegible] খুব। তাদের অনেক উর্দু অনুবাদও হয়েছিল[illegible] পর স[illegible] করে সেগুলি কাটত বাজারে টাট্‌কা [illegible]ঠার মত। আমিও [illegible] সেগুলো গোগ্রাসে। মনে আছে, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি স্বর্গত হজরৎ রিয়াস্‌ 'হরাম সরা' নামে এক উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন রেনোল্ডস্‌-এর। 'শোখা বা তিলাস্মী ফানুস' নাম দিয়ে রেনোল্ডস্‌-এর আর একখানা উপন্যাস অনুবাদ করেছিলেন। [illegible]র 'আউথ পাঞ্চ' পত্রিকার তখনকার সম্পাদক ভরেতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রস-শিল্পী মোওলানা সাগাদ হুসেন। বইগুলি বেরুতেই আমি পড়ে নিয়েছিলাম। রতননাথ সারশায়ের সব বই শেষ করেও তৃপ্তি পেতাম না আমি। ইচ্ছে হোত, আবার পড়ি।

বাবা তখন থাকতেন গোরক্ষপুরে। ওখানকার মিশনারী ইস্কুলে আমি পড়তাম তৃতীয় মানে, অর্থাৎ, অষ্টম শ্রেণীতে। রেতি-তে এক দোকান ছিল বই-এর। দোকানদারের নাম বোধিলাল। বোধিলালের দোকানে প্রায় গিয়ে আমি নভেল পড়তাম বসে বসে। তার দোকান থেকে ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকের 'মানে বই' নিয়ে ইস্কুলের সহপাঠীদের কাছে বিক্রী করে আসতাম বলে যে সব উপন্যাস বাড়ি আনতে চাইতাম আমি, বোধিলাল বারণ কোরত না। দোকানের সব ক'টা গল্পের বই যখন শেষ হয়ে গেল, আমি তখন শুরু করলাম পুরাণের উর্দু অনুবাদ। অলৌকিক কাহিনী 'তিলাস্মী হোশ্‌রুবা'র খানিকটাও আমি পড়ে ফেললাম। 'তিলাস্মী হোশ-রুবা'র সতেরো খণ্ড তখন সবে মাত্র প্রকাশিত হয়েছে। এক এক খণ্ডে বইখানার প্রায় দু'হাজার পৃষ্ঠার কম ছিল না। এ ছাড়াও এখানে-ওখানে প্রকাশিত তার কিছু-কিছু অংশও পড়ে নিয়েছিলাম। বিপুল কলেবর এই

দূর-সম্পর্কের এক কাকা তখন খুব যাওয়া-আসা করতেন আমাদের বাড়ি। বয়েস তাঁর খুব কম হয়নি। প্রৌঢ়ত্বের কোটায় এসে পড়েছিলেন তিনি। কাকা ছিলেন অবিবাহিত। একখানা বাড়ি ও কিছু জায়গা-জমিও তাঁর ছিল। কিন্তু ও-সবের প্রতি তাঁর কোন টান ছিল না। আত্মীয়দের বাড়িতে তিনি বেশী সময় কাটিয়ে দিতেন। মনে মনে বুঝি এই আশা পোষণ করতেন, পাত্রীর সন্ধান কেউ হয়ত তাঁকে দেবে। একশ' কি দু'শ টাকাও তিনি ঘটকালীর জন্য দিতে রাজী ছিলেন।

তবুও বিয়ে তাঁর হয়নি। দেখতে তিনি খুব খারাপও ছিলেন

না। বলিষ্ঠ, মাঝারি আকারের শরীর; তামাটে রঙ। মুখে ছিল দীর্ঘ এক জোড়া গোঁফ।

কাকা নেশা করতেন গাঁজার। চোখ ছু'টি তাই সব সময় জবা-ফুলের মত ছিল টকটকে লাল। পূজা-আহ্নিকও তিনি করতেন নিয়মিত। প্রত্যহ শিবের মাথায় জল-বিল্বপত্র অর্পণ না করে কাকা কখনও জলস্পর্শ করতেন না। মাছ কি মাংস তিনি ছুঁতেনই না।

অবিবাহিত আর পাঁচটা সাধারণ পুরুষের মত কাকারও এক দিন মতিভ্রম হোল। পঞ্চশরের ফাঁদে তিনি পা বাড়ালেন। নীচু জাতের একটা চামারনী মেয়ে তাঁর বাড়ীতে রোজ আসত কাজ করতে। বলদগুলিকে সে খড় খাইয়ে যেত; গোবর দিয়ে ঘুঁটে দিত বিলিয়ে বাড়ির উঠানে। চম্পা ছিল যুবতী। তাদের জাতের অপরাপর মেয়েদের মত উদ্দাম যৌবন থোকায় থোকায় তার সর্বাঙ্গে। মুখেও তার সব সময় লেগে থাকত চটুল হাসি।

কাকা এবার হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। বুভুক্ষিত, [illegible] হৃদয় এবার বুঝি নাগালের মধ্যে পেয়ে গেল সুশীতল ঝর্ণার সন্ধান!

বাজে অকারণ কথাবার্তার মধ্য দিয়ে তিনি চম্পার মন আকর্ষণ করতে শুরু করলেন। চতুরা চম্পা কাকার গোপন অভিসন্ধি বুঝে নিল সহজে। ছেনালিপনায় সে-ও কম গেল না। কাকাকে সে শুরু করলে খেলাতে। সুবাসিত তেল এবার থেকে সে মাখতে লাগল মাথায় আর সুর্মা পরতে শুরু করলে কালো ছু'টি হরিণ চোখে। গোলাপী ঠোঁট ছু'টিকে আরক্ত করে তুললে রাঙিয়ে। কাকার টনক উঠল নড়ে। কাজেও চম্পা দিতে লাগল ঢিলে। অনেক দিন সে একবার উঁকি মেরেই কাজ-কর্ম সব না করে চলে যেতে লাগল বাড়ী। ফলে কাকাকেই এবার থেকে বলদগুলির তদারক করা থেকে শুরু করে ঘরের সব কাজ-কর্ম উঠাতে হোল। এই গাফিলতির জন্য চম্পাকে ছু'টি কটু কথা কইতে কিছুতেই ম[illegible] সরল না কাকার। চম্পাকে তিনি যে ভালোবেসে ফেলেছেন, নিজেও তিনি টের পেলেন।

হোলির উৎসবে বাড়ির ঝি-চাকরদের কিছু পার্বণী দেওয়া কাকাদের বাড়ির প্রথা ছিল। এবার কিন্তু পার্বণীর বেলায় চম্পার বরাতে দামী একখানা সুন্দর শাড়িই জুটে গেল আর বকশিসও জুটল আর-আর বারের চাইতে চার গুণ অধিক। আজকাল যেন ঝি-ই বাড়ির গিন্নী হয়ে দাঁড়াল।

এদিকে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

চামারেরা নিজেদের পঞ্চায়েৎ ডাকল বস্তিতে। কাকাকে ওরা যে খুব ভয় করে চলত এমন নয়।

তবে কাকার সঙ্গে তাঁর পিতার তুলনা করে ওরা খুব ব্যথা পেল। বাপ-ব্যাটায় কি আকাশ-পাতালই না তফাৎ! বাপ কোন দিন স্ত্রীলোকের প্রতি চোখ তুলে তাকায়নি (কথাটা আদৌ সত্যি নয়), আর তার ব্যাটা কি না আজ অমন! ছোট জাতের বৌ-ঝিরা তার জ্বালায় কি না ঘরের বার হতেই পারে না।

ওরা সবাই তাই ঠিক করলে, অনুনয়-বিনয় করে এ ক্ষেত্রে বিশেষ লাভ হবে না কোন। ফল হবে বরং উল্টো। তার চাইতে লাঠ্যৌষধির আশ্রয় নিয়ে ওকে একটা শিক্ষা দেওয়া উচিত—যা কোন দিন যেন না ভোলে।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা চম্পা আসতেই কাকা এগিয়ে গিয়ে ভিতর-বাড়ির দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন।

চামারেরা অদূরে দাঁড়িয়েছিল ওৎ পেতে। অমন একটা সুযোগ ফসকে যেতে দিল না ওরা। সঙ্গে সঙ্গে ওরাও এসে দরজায় ঘা দিতে লাগল।

কাকা প্রথম ভাবলেন, বুঝি বা তাঁর কোন প্রজা-টজা এসেছে: দরজাটা খুলে না দিলে বুঝি চলেই যাবে। কিন্তু বাইরে বহু লোকের চাপা কথাবার্তা আর ক্রুদ্ধ আস্ফালন শুনে তাঁর চমক ভাঙল। জানালার ছিদ্র-পথ দিয়ে উঁকি মেরে তিনি দেখলেন, বাইরে প্রায় বিশ-পঁচিশ জন ষণ্ডামার্কা লোক দরজাটা ভাঙবার চেষ্টা করছে লাঠি-সোটা নিয়ে।

কাকার চোখ ছু'টি চড়কগাছিতে গিয়ে উঠল। কি করবেন তিনি ভেবে উঠতে পারলেন না। পালাবারও কোন পথ পেলেন না খুঁজে। চম্পাকেই বা তিনি লুকিয়ে রাখেন কোথায়? স্বপ্নেও তিনি ভাবেননি, তাঁর প্রিয়া তাঁকে বিপদে ফেলবেন এমন ধারা। প্রিয়াও তার এদিকে নি[illegible]বারণ করল।

"মুখপোড়া, তো[illegible]র জন্যই অমন হোল।" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মার-মুখো হয়ে চেঁচি[illegible] উঠল চম্পা—"তোমার তো কিছু যাবে না কিন্তু ওরা কি আমা[illegible] আস্ত রাখবে? মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে দিয়ে ঠিক বার করে [illegible] রাস্তায়। তাই তোমার ছু'টি পায়ে পড়ে মাথা কুটে বলেছিলাম[illegible] ওগো, দোরটা দিও না—কেউ বুঝি দেখে ফেলবে। পোড়া [illegible] আমার ক[illegible]ক তখন তুমি শুনলে? কর্মফল এবার ভোগ[illegible]!"

[illegible] কাকা, [illegible] বিপাকে পড়েননি কোন দিন। কি[illegible] কিছু ভেবে না পেয়ে তিনি তাই উঠানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আওড়াতে শুরু করলেন গীতা আর চণ্ডী!

বাইরে এদিকে হল্লা ক্রমশঃ বেড়েই চলল। গাঁ ভেঙে সবাই এল ছুটে—ব্রাহ্মণ, ঠাকুর, কায়স্থ থেকে শুরু করে সবাই। মুখরোচক অমন একটা ব্যাপার হ[illegible]স্বাদ যেতে কেউ কি আর চায়? অপরাধীদের ছু'-এক ঘা বসিয়ে [illegible]তে না পারলে হাত-পা বুঝি নিস্‌পিস্ করতে থাকবে। অমন অপরাধীদের কি গাঁয়ের পাঁচ জন ক্ষমা করতে পারে?

তাই সবাই ছুতোর মিস্ত্রীকে ডেকে পাঠাল। ও এসে দরজা ভাঙতেই কাকাকে খুঁজে পাওয়া গেল খড়ের গাদার মধ্যে আর চম্পা তখন দাঁড়িয়েছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উঠানে। ফাঁকতালে সে পালিয়ে গেল এক সময়। কিন্তু কাকা আর যান কোথায়? হাতের কাছে লোকে যা-কিছু পেল—লাঠি-সোটা, জুতো, ছাতা, কিল-ঘুষি—পালা করে তা দিয়ে চলল তাঁর পিঠের উপর। কাকা অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতেই ওরা তাঁকে রেহাই দিলে, তিনি মরে গেছেন ভেবে।

মুখে-মুখে কাকার এই ছুর্ভোগের কথা আমাদের নিকটও গিয়ে পৌঁচেছিল। কথাটা শুনে আমি কিন্তু খুব আমোদ পেয়েছিলাম। গাঁয়ের লোকেরা মিলে কাকাকে ধরে বেদম প্রহার দিচ্ছে, এই ছবিটা কল্পনা করে আমি বুঝি হাসিতে ফেটে পড়েছিলাম।

সেদিনের সে ঘটনার পর কাকাকে প্রায় এক মাস ধরে শয্যাগত হয়ে থাকতে হয়েছিল। গুড় মিশিয়ে পাচন তাঁকে গিলতে হয়েছিল

শুয়ে শুয়ে তত দিন। একটু চলা-ফেরার সামর্থ্য ফিরে পেয়ে কাকা এক দিন এলেন আমাদের বাড়ী। জানালেন, অনধিকার ভাবে বাড়ি চড়াও করে তাঁকে নৃশংস প্রহার করার জন্য তিনি প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করবেন শহরে।

কৃতকর্মের জন্য তিনি যদি এতটুকু অনুতাপ কিংবা বিনয় প্রকাশ করতেন, আমি হয়তো তাঁর দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ না করে থাকতে পারতাম না। কিন্তু কাকা তা করলেন না। তিনি বরং বুক ফুলিয়ে বড়াই করে চলা-ফেরা করতে লাগলেন। আমি যে লুকিয়ে নাটক-নভেল পড়ি, এ কথা বাবাকে বলে দেবেন বলে এক দিন তিনি শাসালেন আমাকে। তাঁর কাছ থেকে এমনতরো শাসানি আমি আশা করিনি। তাঁর চরিত্রের দুর্বল দিক্‌টা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠল।

কাকার এই কাহিনীটাকে কেন্দ্র করে এক দিন আমি এক নাটক লিখে ফেললাম। নাটকখানি শেষ করে আমি আমার বন্ধুদের পড়ে শুনালাম। দিল খুলে হেসে সবাই উপভোগ করলে লেখাটা। আমার এই প্রথম সাফল্যে আমি উল্লসিত হয়ে উঠলাম। নাটকখানার এক কপি নকল করে আমি কাকার বালিসের নীচে সযত্নে রেখে দিয়ে এক দিন ইস্কুলে চলে গেলাম। কৌতূহল আর আশঙ্কায় বুকটা আমার টিপ-টিপ করতে লাগল। কি জানি, লেখাটা পড়ে কাকা কি ভাববেন হয়ত। পড়ায় তাই আমার মন কিছুতেই বসল না—বাড়ির আনাচে-কানাচে কেবল ঘুরে বেড়াতে লাগল। ইস্কুলে ছুটি হতেই সিধে আমি বাড়ির দিকে রওনা হলাম। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি আসতেই হঠাৎ আমি থমকে দাঁড়ালাম পথের উপর। কি জানি কেন, আমার খুব ভয় হলো, কাকা বুঝি আমায় ভয়ানক প্রহার করবেন। কিন্তু একটু পরেই আমার আবার মনে হোল, কাকা আমায় আর যাই করুন, দু'-একটা চড় কসিয়ে দেওয়া ছাড়া তিনি আমায় আর কিছুই করবেন না, কেন না, তিনি জানেন—তাঁর বালিসের নীচে ও-ধরণের লেখা রেখে দেবার মত দুঃসাহসী ছেলে আমি নই।

কিন্তু আশ্চর্য! কাকাকে তাঁর চির-পরিচিত শয্যায় দেখলাম না। তিনি কি তাহোলে ভিতর-বাড়িতে আছেন? আমি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। শূন্য খাঁ-খাঁ করছে ঘরটা। তাঁর জুতো-জোড়াটার, জামা-চাদরের, এমন কি টুকি-টাকি জিনিষপত্রের পুঁটলিটারও কোথাও সন্ধান পেলাম না। বাড়ির লোকজনের কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, দুপুরের খাওয়া-দাওয়া না করেই বিশেষ জরুরী কাজে কাকা না কি চলে গেছেন তাঁর গাঁয়ের বাড়িতে।

প্রথম রচনা—আমার প্রথম নাটকটির জন্যে আঁতি-পাতি করে ঘরের সর্বত্র খুঁজে বেড়ালাম আমি। কিন্তু কোথাও পেলাম না। কাকা আজ আর নেই। জানি না, তিনি আমার প্রথম রচনাটি নিয়ে কি করলেন? আগুনে কি দিয়ে গেছেন বিসর্জন, না, সেটাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেছেন তাঁর সঙ্গে আজ স্বর্গে!

অনুবাদক: নিখিল সেন।

মুহূর্ত

বি[illegible] সেনগুপ্ত

এক-এক মুহূর্ত্ত আসে যে-মুহূর্ত্তে সব কিছু ফেলে
আমরা স্তম্ভিত হ'য়ে ভাবি:
জীবনের কাছে আর আমাদের কী প্রত্যাশা আছে,
কী রয়েছে দাবী।
বারুদের ঘ্রাণ হতে দূরে সরে' প্রচ্ছন্ন কুটীরে
লতা-পাতা-কুসুমের ভীড়ে
নির্জ্জন নিমেষে মন প্রতিশ্রুত সম্ভাবনা খোঁজে
হৃদয়ের অতল প্রদেশে,
সমুখে অশান্ত ঢেউ ব্যাপ্ত সারা দেশে।

কী আছে আমার? কী আর দেবার বাকী?
জনতার গুঞ্জরণ যেইখানে বজ্র হ'য়ে বাজে,
অসংখ্য ব্যস্ততা নানা কাজে,
নদীতীরে খোলা মাঠে কলঘরে নবাবী মহলে
জীবন যেখানে তীব্র ক্ষিপ্র বেগে চলে,
উদ্যমের পূর্ণ রূপ সেখানে বিরাজে।
কখনো বা ছত্রভঙ্গ মানুষের ভীড়ে
ছায়া নামে ধীরে-ধীরে,
রক্ত-স্নান সেরে নিয়ে অশান্ত সহর
সাড়া আনে রক্তাপ্লুত নীড়ে।

প্রতিদিন শূন্য প্রাণ কেঁদে কেঁদে ওঠে!
লক্ষ প্রশ্ন মনে-মনে ফোটে।
যে আবর্ত্ত পৃথিবীর স্বদেশের রঙ্গমঞ্চ ছেয়ে
ওঠে বেয়ে বেয়ে
তারি দোলা যে মুহূর্ত্তে লাগে এসে মনে
ভাবি সে মুহূর্ত্ত যেন হয় স্থায়ী উজ্জ্বল ভাস্বর
দুরন্ত অগ্নির শিখা দিক জ্বেলে সহস্র যৌবনে
রক্ত-স্নান সেরে নিয়ে অশান্ত সহর॥

পণ্ডিত নসীরামের দরবার

রবীন্দ্রনাথ কবিগুরু ছিলেন, নামকরণে ছিলেন গুরুতর। বাংলা দেশের এত ছেলেমেয়ের নামকরণ তিনি করে গেছেন যে তাদের দিয়ে অক্লেশেই এক রবীন্দ্র-ফৌজ গঠন করা যায়—আর যত গৃহ, ভবন, আবাস ও নিকেতনের তিনি নাম ভেবেছেন এবং দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন তা সব দিয়ে শান্তিনিকেতন ছাড়া অপর এক রবীন্দ্র-নগরও গড়া হয়ত সম্ভব।

রবীন্দ্রনাথের সেই সব নামকরণে অনেক অভিনবত্ব আছে সত্যি—কিন্তু নিজের ছেলেমেয়েদের নামকরণে তিনি যে খুব একটা নতুনত্ব করতে পেরেছেন, এমন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললে এখন কেবল শুধু কবিগুরুর উত্তরাধিকারীকেই বোঝায় না।

নজরুল ইসলামের নামকরণে কিছুটা অভিনবত্ব আছে। তাঁর দুই ছেলে—এক জন সানইয়াৎ, অন্য জন সব্যসাচী।

বঙ্কিমচন্দ্রের ছেলে নেই, তাঁর তিন মেয়ে—শরৎকুমারী, নীলাব্জকুমারী, উৎপলকুমারীর নামে উৎসাহিত হবার কিছু নেই। বরঞ্চ তাঁর মানসকন্যাদের নাম অনেক বেশি লোভনীয়, যেমন, তিলোত্তমা ও আয়েষা, কপালকুণ্ডলা, শ্রী, কুন্দনন্দিনী, ভ্রমর ও রোহিণী, সাগর, ইন্দিরা ইত্যাদি।

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথের নামকরণে বৈচিত্র্যও আছে—তাঁর শিল্পমনের প্রচুর পরিচয়ও পাওয়া যায়। এক ছেলের নাম কোকো,—সে কোকো [illegible] ভালবাসে, অপর জন টোটো—যাকে কখনও বাড়িতে পাওয়া [illegible], আর এক দৌহিত্রী পাউরুটি—সে নামের কারণ জানবার অবি[illegible]মার অবকাশ হয়নি।

[illegible]তীয় প্রতিভা মাইকেল মধুসূদন দত্তের ছেলের নাম ছিল [illegible]বার্ট নেপোলিয়ন দত্ত, বড় মেয়ে শর্মিষ্ঠা, অন্য জন কৃষ্ণকুমারী।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পিতা তাঁর নামকরণে যে রুচির পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের ছেলেমেয়ের নামকরণের সময় প্রেমেন্দ্র মিত্র তার যথাযোগ্য সম্মান রাখতে পারেননি। তাঁর মেয়ের নাম ছিল মৃন্ময় এবং বড় ছেলের নাম মাধব। শুনে তাঁর স্ত্রী, বন্ধুবান্ধব এমন কি পণ্ডিত নসীরাম পর্য্যন্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। সমগ্র ধিক্কারে প্রেমেন্দ্র মিত্র কিছু দিন মুষড়ে রইলেন। তার পর এক দিন তাঁর মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—যেমন একদা উঠেছিল আর্কি-মিডিসের।

মেয়ে এবং ছেলের নাম তিনি বদলে ফেললেন। ছিল মৃন্ময়ী ও মাধব। বদলে হল মাধবী ও মৃণ্ময়।

শরৎচন্দ্রের ছেলেমেয়ে ছিল না। সেজন্য নামকরণের বস্তুর তাঁর কখনও অভাব হয়নি। তাঁর রচনায় শুধু পাত্রপাত্রী নামকরণ করেই তিনি নিবৃত্ত হননি। নামকরণ থেকে মাছ, গরু, বাছুর কারুকেই নিস্তার দেননি, যেমন, কার্তিক-গণেশ ও মহেশ। তাছাড়া তাঁর পাণিত্রাসের বাড়ির দরজায় এক বাছুর বাঁধা থাকত। শরৎচন্দ্র বাছুরকে প্রচুর আদর করতেন এবং সমাগত সবাইকে তাকে দেখতে বাধ্য করতেন।

অনেকের কুকুরের নাম থাকে কিং, রেক্স, চেঙ্গিস বা আলেকজাণ্ডার। শরৎচন্দ্রের বাছুরের নাম ছিল, রবীন্দ্রনাথ।

নাম শুনে অনেকেই চুপ হয়ে যেত।

যারা যেত না, তাদের শরৎচন্দ্র বলতেন, ওর জন্ম রোববারে কি না।

শের আউর কবিশের
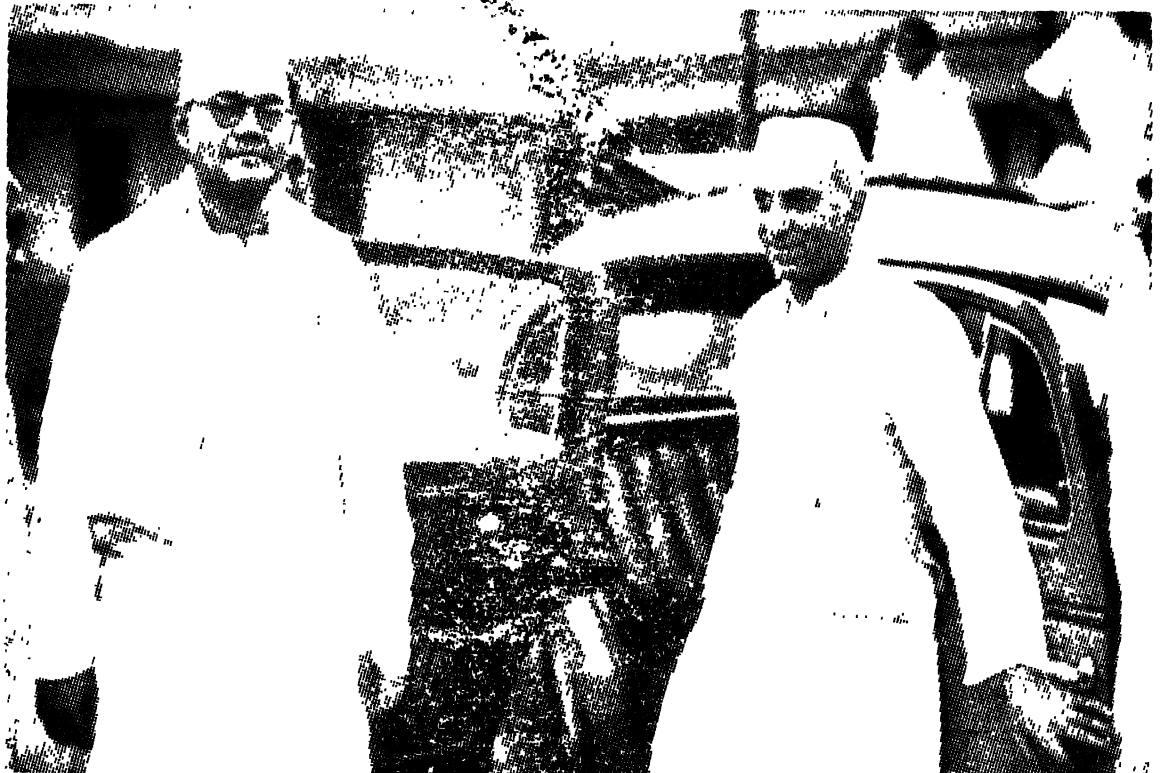
—বসুমতী

চালক কে?

—বসুমতী

ব্রহ্মপুত্র —নীরোদ রায়

বরপুত্র [শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ের সৌজন্যে

অভিমান (তৃতীয় পুরস্কার) —রঞ্জিৎকুমার সেন

আক্ষেপ —মৃনাল জানা

আমি কিছু করি না।

—সমরেন্দ্রনাথ মিত্র
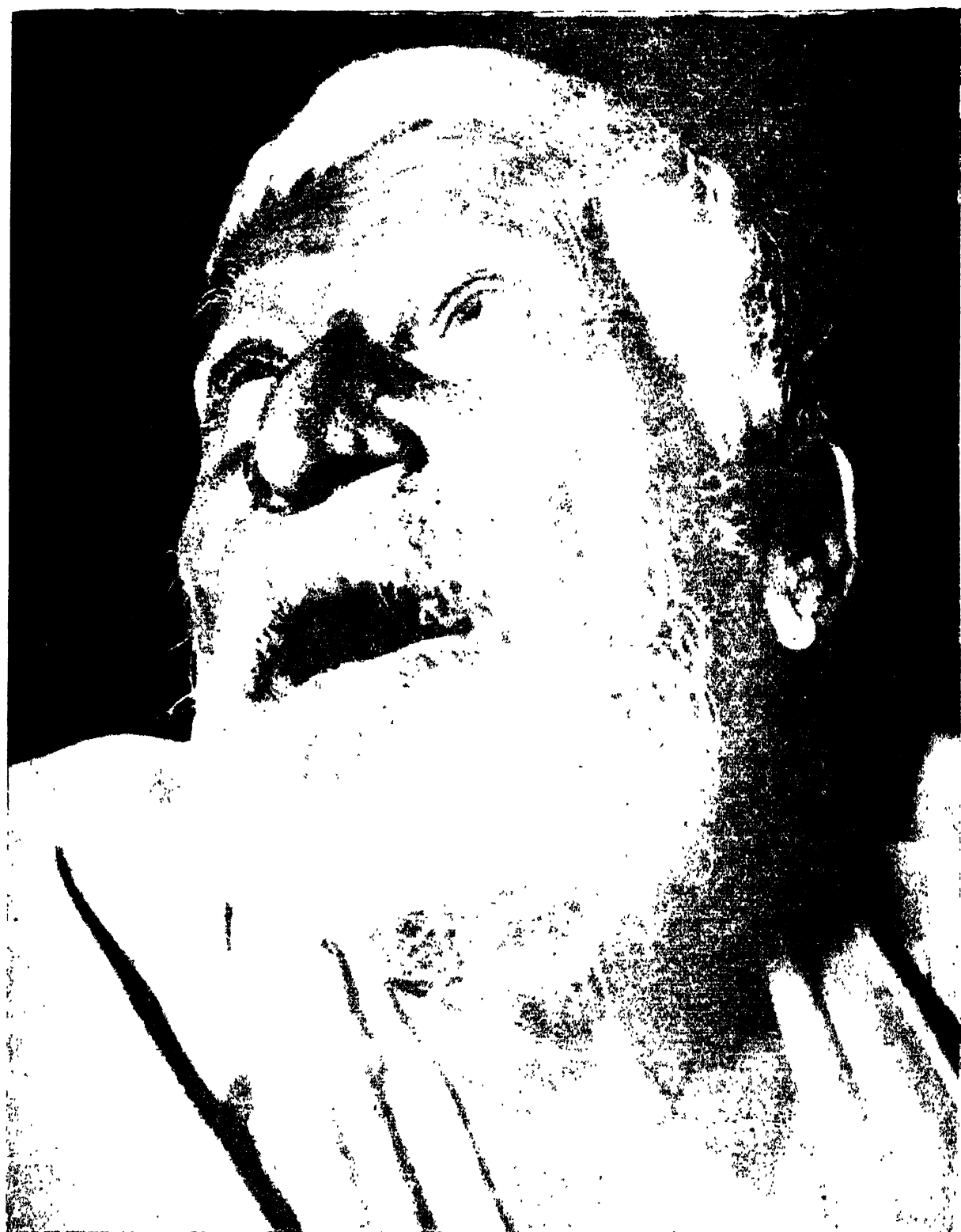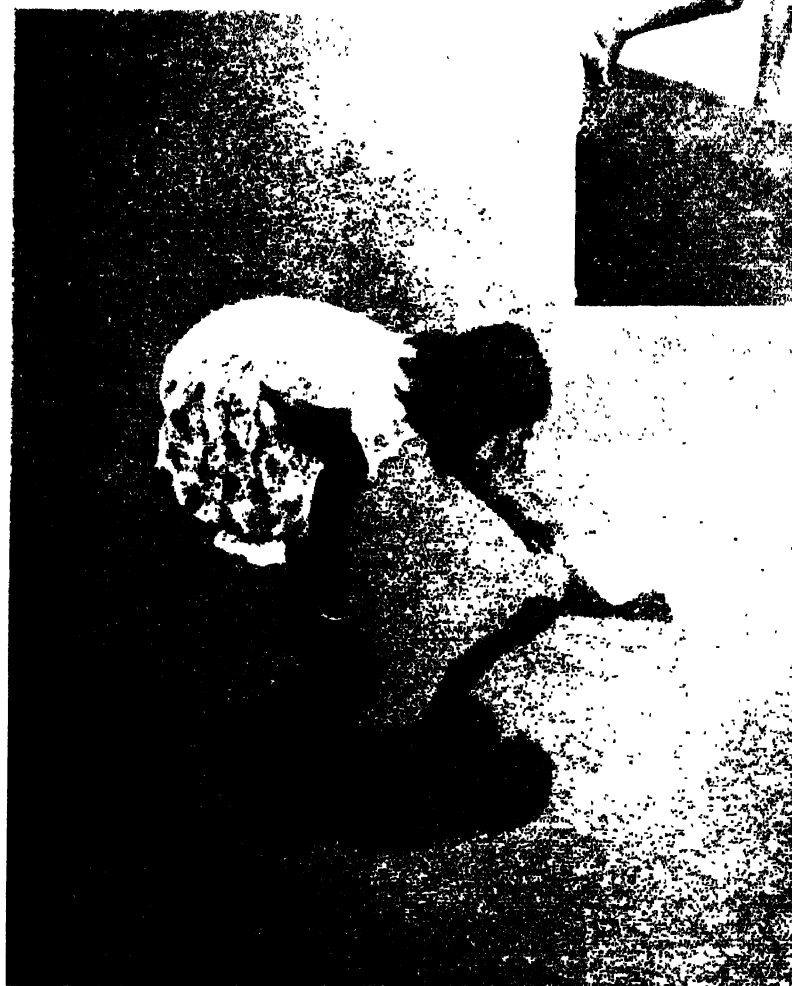
সাফল্য —শৈলেন বসু

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে কেবলমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না. সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের নবপর্য্যায়

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমেরিকা না কি গণতন্ত্রের দেশ,—আমেরিকার স্বাধীনতার দলিলে না কি মানুষের স্বাধীনতা, মানুষের অধিকারের যে আদর্শ গৃহীত হয়েছে, সেটা সমগ্র পৃথিবীর আদর্শস্থানীয়। আমাদের দেশেও দেশীয় নৃপতিদের বেতনভুক্ দেওয়ান থেকে শুরু ক'রে অনেক বড় বড় কংগ্রেস নেতা পর্য্যন্ত "আমেরিকার মতন শাসনতন্ত্র" বলতে গদগদ হয়ে ওঠেন।

কিন্তু এই কোটিপতির দেশ আমেরিকা যারা পৃথিবীর ধনিক-শ্রেণীর আদর্শস্থানীয় হলেও শ্রমজীবী জনগণের কাছে গণতন্ত্রও নয়, মানুষের স্বাধীনতার আদর্শস্থলও নয়;—পরন্তু, বৃটেন ফ্রান্স প্রভৃতি বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির মতনই খাঁটী সাম্রাজ্যবাদী ও জনশোষকের দেশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

এ কথা ঠিক যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আমেরিকার বড় বড় উপনিবেশ ছিল না, এবং আজও নেই;—এ কথাও ঠিক যে, মহাযুদ্ধের আগেও তার প্রত্যক্ষ ভাবে উপনিবেশ দখলের,—পরের দেশে রাজা হয়ে বসার ধান্ধা যেমন ছিল না, আজও তা নেই। আমেরিকার প্রতিষ্ঠা আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে সারা পৃথিবীর মহাজনরূপে; এবং যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ উপলক্ষেই হোক, আর কোন দেশের আর্থিক সংগঠনের উপলক্ষেই হোক, শত শত কোটি টাকার মহাজনী ক'রেই আমেরিকা ছিল সন্তুষ্ট, আর লোকে এই মহাজনী কারবারটাকে "আর্থিক সাম্রাজ্যবাদ" নাম দিয়ে বৃটেন ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সঙ্গে তার একটা পার্থক্যই দেখাতে চাইতো।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম হ'লেই বোঝা যাবে, সাম্রাজ্যবাদ কাণ্ডটাই খাঁটী আর্থিক কাণ্ড এবং আন্তর্জ্জাতিক মহাজনী যদি থাকে তবে তার পেছনে একটা আন্তর্জ্জাতিক রাজদণ্ডও প্রত্যক্ষ ভাবেই হোক আর পরোক্ষ ভাবেই হোক, থাকবেই।

সেই জন্যে চীন দেশটাকে বলা হয় সেমি-কলোনিয়্যাল বা আধা ঔপনিবেশিক দেশ। অর্থাৎ চীন দেশের রাজদণ্ড প্রত্যক্ষ ভাবে চীনের হাতে থাকলেও বিদেশী ধনিক-বণিকদের রাজদণ্ড পরোক্ষ ভাবে সেটাকে নিয়ন্ত্রিত করে।

উপনিবেশ যে আমেরিকার একেবারে ছিল না, তা নয়। ১৮৬৭ সালে রুশিয়ার জারের কাছ থেকে অ্যালাস্কা দেশটাকে আমেরিকা ৭২০০০০০ ডলার মূল্যে কিনে নেয়। ১৮৯৯ সালে আমেরিকা স্পেনের কাছ থেকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ জোর করে আদায় করে। কিন্তু তার পরে ১৮৯৮ সালের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ দখলের মতন ছোট-খাটো সামরিক ঘাঁটী দখল ছাড়া ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষুধা তার বেশী কিছু দেখা যায়নি।

কিন্তু তাতে তার সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি বা পরদেশ শোষণের ব্যবস্থার কোন হানি হয়নি। কথাটা পরিষ্কার বুঝতে হলে সাম্রাজ্যবাদটাকে ভালো করে বুঝতে হবে। উপনিবেশ না থাকলেও যেমন সাম্রাজ্যবাদের আসল কাজের হানি হতেও না পারে, তেমনি সাম্রাজ্য থাকলেও যে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি না থাকতে পারে, তারও অজস্র প্রমাণ ইতিহাসে আছে।

মহাভারতের পাণ্ডবেরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করে' ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নানা দেশের সঙ্গে যুদ্ধ করে দেশ জয় ক'রে রাজচক্রবর্ত্তী উপাধির সম্মান পেলেন; তাঁদের বীরত্ব-গৌরবের প্রবৃত্তি চরিতার্থ হল। সাম্রাজ্য হল, কিন্তু কেউ সেটাকে সাম্রাজ্যবাদী কাণ্ড বলে না; কারণ তার মূল প্রেরণা ব্যক্তিবিশেষের বীরত্ব-গৌরব এবং যুদ্ধজয়েই তার পর্য্যবসান।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমক সাম্রাজ্য, বাইজাণ্টাইন ও পারসীক সাম্রাজ্য, চেঙ্গিস খাঁর দিগ্বিজয়,—এগুলোরও মূল প্রেরণা কোথাও বা দিগ্বিজয়ের প্রবৃত্তি, কোথাও বা জাতিগত অহমিকা, কোথাও বা ধর্ম্মান্ধতার দানবীয় বদখেয়াল। কাজেই এগুলোকেও কেউ সাম্রাজ্য-বাদী কাণ্ড বলে না। পরদেশ লুণ্ঠন, ধ্বংস, এমন কি শোষণ যথেষ্ট হয়েছে, কিন্তু তার মূলে ব্যক্তির খামখেয়ালই ছিল প্রধান কথা; কাজেই সেগুলোও সাম্রাজ্যবাদ নয়।

মানবেতিহাসের বিকাশের পথে সাম্রাজ্যবাদ যখন একটা অপরি-হার্য্য, অবশ্যম্ভাবী পদ্ধতিরূপে দেখা দিয়েছে, তখন থেকেই শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের যুগ। এক দেশের ধনিক-মালিকশ্রেণী কর্ত্তৃক অপর দেশের জনগণের আর্থিক শোষণই হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃত স্বরূপ। ধনবাদের বিকাশের পথে কেমন করে এই অবস্থাটা অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা দেয়, সেটা না বুঝলে সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতি বোঝা যাবে না। এবং সেটা বুঝলেই দেখা যাবে, আমেরিকাও বৃটেন ফ্রান্সের মতই প্রাক্‌যুদ্ধকাল থেকেই পুরোপুরি ভাবেই সাম্রাজ্যবাদী; এবং যুদ্ধোত্তর দুনিয়ায় কেমন করে দিনে দিনে তার বিকট মূর্ত্তি প্রকট হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের উৎপাদন-ব্যবস্থা ছিল দাসপ্রথার ওপর নির্ভরশীল। সেই দাসপ্রথারই আর একটা রকমফের ভূমিদাসপ্রথা (সার্ফ), যে ব্যবস্থায় কৃষকের জীবন ছিল জমির সঙ্গে বাঁধা এবং জমিদারের সম্পত্তি। জমি হস্তান্তরিত হলে তারাও সঙ্গে সঙ্গে হস্তান্তরিত হয়ে যেত। জমিহীন কৃষক এই সব ব্যবস্থারই জের। এই যুগের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান, এবং এই যুগটাকেই ফিউড্যাল যুগ বলা হয়।

এই ফিউড্যাল সমাজের মধ্যেই ব্যবসা-বাণিজ্যের মধ্য দিয়ে এক নতুন আর্থিক শ্রেণী গড়ে উঠেছিল, যাদের হাতে জমে উঠছিল অর্থ। এরাই হ'ল ধনিক-বণিক্-মহাজন; এবং ক্রমে এরা শিল্পেও টাকা খাটাতে শুরু করলে। শিল্পী কারিগরদের ব্যক্তিগত ছোট-ছোট তাঁতশালা, কামারশালার স্থলে দেখা দিলে ধনিকদের ছোট-ছোট কারখানায় কতকগুলো ক'রে কারিগরের একত্র সমাবেশ।

ক্রমে বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির ফলে বড়-বড় মেসিন, বড়-বড় কারখানা, একই জিনিষ তৈরীর বিভিন্ন অংশের কাজে বিভিন্ন কারিগরের নিয়োগ; শ্রম-বিভাগ, কারিগর-শ্রেণীর শ্রমিকে পরিণীতি।

শ্রমশিল্পের দ্রুত প্রসার এবং জমির সঙ্গে কৃষকশ্রেণীর বিচ্ছেদ, এই দুই অবস্থার মিলনে কৃষকশ্রেণীর বহু লোক শ্রমিকে পরিণত হল। শেষ পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতি চরমে উঠলো, এবং অতি অল্প লোকের পরিশ্রমে বড়-বড় স্বয়ংক্রিয় মেসিনের সাহায্যে প্রচুর জিনিষ উৎপন্ন হ'তে লাগলো। একটা প্রাচুর্য্যের যুগ এল। ইতিমধ্যে রাষ্ট্রশক্তিও জমিদারদের হাত থেকে তাদের হাতেই চলে এসেছে অবশ্যম্ভাবীরূপেই।

কিন্তু সমাজের সব চেয়ে বড় অংশে কৃষক-শ্রমিকের জীবনে এই প্রাচুর্য্যের যুগটা নিয়ে এল কর্ম্মহীন বেকারত্ব, এবং অভাবের অপরিসীম তাড়না। জমি এবং কারিগরী ঘুচে গিয়ে যাদের শ্রম-বিক্রয়ই ছিল জীবনযাত্রার একমাত্র উপায়, ধনিক-মালিকের হাতে অটোমেটিক মেসিনে তৈরী হ'তে লাগলো তাদের নতুন দারিদ্র্য। বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক উন্নতির সমস্ত সুফলটুকু জমে উঠতে লাগলো ধনিকশ্রেণীরই শক্তি, সমৃদ্ধি—কোটি কোটি টাকা ব্যাঙ্ক-ব্যালেন্সরূপে

একটি বৃহৎ শিল্প-ব্যবস্থা বিরাট উৎপাদন-বৃদ্ধি এবং সঙ্গে সঙ্গে আর এক দিকে সমাজের সব চেয়ে বড় অংশ কৃষক-শ্রমিকের দারিদ্র্য ও বেকারী,—ধনিকদের মুনাফায় করতে লাগলো আঘাত। যথেষ্ট মুনাফায় প্রচুর মাল দেশে বিক্রয় করা যায় না। তার ওপর নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে।

কাজেই বড় বড় শিল্পপতিদের মধ্যে সংযুক্ত ভাবে শিল্প-ব্যবসায়ের ব্যবস্থা করে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বন্ধ করা হল, এবং এই সংঘবদ্ধ শিল্প-ব্যবসায়ের পদ্ধতি—ট্রাষ্ট-সিণ্ডিকেট প্রভৃতি বড়-বড় মনোপলি একচেটিয়া কারবার ছোট-ছোট প্রতিযোগী ব্যবসায়ী-শ্রেণীরও উচ্ছেদ করতে লাগলো।

কিন্তু তাতে জিনিষের দর চড়িয়ে রাখা যায় বটে, কিন্তু সেই চড়া দরে মাল কেনার ক্ষমতা কৃষক-শ্রমিকের নেই, যারাই দেশের সর্ব্ববৃহৎ জনসমাজ। কাজেই বিদেশের বাজার না পেলে আর চলেই না, যে সব দেশ শিল্পে অনুন্নত।

এমনি অনুন্নত দেশের বাজারে মাল বিক্রীর জন্যে যখন একাধিক শিল্পে-উন্নত দেশ চেষ্টা করে, তখন সেখানেও লাগে প্রতিযোগিতা। দেশে মাল তৈরী করে' ঐ সব অনুন্নত দেশের বাজারে বিক্রী করাতে ক্ষুধা মেটে না বলে' মূলধন চালান দেওয়া, ঐ সব অনুন্নত দেশেই কারখানা খুলে সস্তায় কাঁচা মাল এবং মজুর যাহায্যে প্রচুর মুনাফা তোলা, শেষ পর্য্যন্ত ঐ সব দেশে বড়-বড় রাস্তা-ঘাট, রেল-পুল, খনি প্রভৃতির কনট্রাক্ট-কনশেসনের প্রতিযোগিতা। এই বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় জয়ী হ'তে হলে সেই অনুন্নত দেশের গভর্ণমেণ্টের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে হয়। ধনবাদ এইখানে সাম্রাজ্যবাদে বিকশিত হল।

এই সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতাও আপোষ বন্দোবস্তে ভিন্ন ভিন্ন প্রভাবিত এলাকা নির্দ্দিষ্ট ক'রে কতকটা বন্ধ করা যায়, কিম্বা কিছু কাল বন্ধ থাকতে পারে। কিন্তু নিজ নিজ দেশের মতন সে সব দেশের জনগণের শোষণের ফলে যখন তাদের ক্রয়-শক্তি কমে আসে এবং যথেষ্ট মুনাফার ব্যবসায় আর চলে না, তখন প্রতিযোগী দেশের সঙ্গে গুঁতোগুঁতি বাড়ে এবং শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বাধে। কাজেই ধনবাদের পরিণতি অবশ্যম্ভাবীরূপেই সাম্রাজ্যবাদ এবং যুদ্ধ।

পৃথিবীর বড় বড় অর্থনীতিবিদ্দের মধ্যে মার্কসই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ধনবাদের বিকাশের এই ধারা লক্ষ্য করেন, এবং ধনবাদের পরিপূর্ণ বিকাশ যে সাম্রাজ্যবাদ, এ কথা বলেন। লেনিন সে মতবাদকে যুক্তি সহকারে ব্যাখ্যা করে মার্কসবাদকে পরিপূর্ণ রূপ দেন। তাই লেনিনবাদকে বলা হয়, সাম্রাজ্যবাদের যুগের মার্কসবাদ।

বৃটেনের শিল্প-বিপ্লব হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই, তাই বৃটেনের মত ক্ষুদ্র দেশ শক্তি-সমৃদ্ধিতে হয়ে উঠলো সেরা, এবং বৃটেনই হল সারা দুনিয়ার প্রথম শিল্প-পণ্যের যোগানদার। ক্রমে ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতি দেশেও শিল্পোন্নতি হল, এবং তারা সংরক্ষণ-শুল্ক বসিয়ে বিলাতী মালকে হঠিয়ে দিলে। বিলাত ভারতবর্ষকেই সাম্রাজ্যবাদী শোষণের খাসমহালরূপে গড়ে তোলার ব্যবস্থা করলে। রেলওয়ের বিস্তার ক'রে এক দিকে বিলাতী লৌহ-শিল্পের খোরাক পেল, আর এক দিকে ভারতের সর্ব্বত্র থেকে খাদ্য ও কাঁচা মাল টেনে নেওয়া এবং বিলাতী শিল্প-পণ্য পৌঁছে দেওয়া চলতে লাগলো।

সঙ্গে সঙ্গে আফ্রিকায়ও নানা প্রকার জুয়াচুরি ও বলপ্রয়োগে উপনিবেশ গড়ে তুললো। ক্রমশঃ ফ্রান্স, জার্ম্মাণী প্রভৃতিও সেখানে গিয়ে জুটলো অবশ্যম্ভাবীরূপেই। তাদেরও দেশ ছোট, কাজেই দেশের কৃষক-শ্রমিকদের শোষণ করতে বেশী দিন লাগে না, এবং কাজেই বিদেশী বাজারের প্রয়োজন শীঘ্রই দেখা দেয়।

আমেরিকা স্বাধীন হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, এবং তার শিল্পোন্নতি হয়েছে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর পরে। কিন্তু তার উপনিবেশের প্রয়োজন হতে অনেক দেরী হয়েছে কতকগুলো কারণে।

প্রথমতঃ, আমেরিকা বিরাট দেশ এবং প্রাকৃতিক সম্পদে পূর্ণ। ফলে খাদ্য এবং কাঁচা মাল সংগ্রহও দেশ থেকেই হয়, এবং প্রভূত শিল্পোন্নতি হলেও দেশের বাজারটাই তার অনেকখানি মাল টেনে নিতে পারে। তার আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের পরিমাণ প্রচুর এবং খাদ্যশস্য, কাঁচা মাল এবং শ্রম-শিল্পজাত পণ্যের আদান-প্রদানে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানদণ্ডও খানিকটা উন্নত হয়েছে। এই সব অবস্থা পাকতে অনেক দিন গেছে।

দ্বিতীয়তঃ, 'মনরো নীতি' চালিয়ে দক্ষিণ-আমেরিকার বিশাল বাজারে প্রতিযোগিতায় যথেষ্ট মাল বিক্রির বন্দোবস্ত ক'রে আমেরিকা প্রচুর শিল্পবৃদ্ধির স্থান করে নিয়েছে।

তৃতীয়তঃ, ফিলিপাইন প্রভৃতি কিছু কিছু খাসমহলেও তার অনেক মাল কেটে এসেছে। চীন দেশের বিশাল বাজারের কিছু ভাগ, এবং সারা পৃথিবীর অনুন্নত বাজারগুলোতে কিছু কিছু ভাগ তারা পেয়ে এসেছে।

এমনি ক'রে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত তাদের চলেছে; উপনিবেশের জন্যে গুঁতোগুঁতি তাদের করতে হয়নি।

তার পর প্রথম মহাযুদ্ধের মধ্যে যুযুৎসু দেশগুলো এবং তাদের বাজারগুলো—সর্ব্বত্রই আমেরিকা বাজার পেয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরও কিছু কাল অবধি তার ঐ সব সুযোগ অনেকটা ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের ধ্বংসের পর বিজয়ী মিত্রশক্তি কিছু দিন পর্য্যন্ত সর্ব্বসাধারণের ব্যবহার্য্য শিল্প-পণ্য উৎপাদনের পর যখন বাজারে মাল জমে গেল, যথেষ্ট লাভে যথেষ্ট বিক্রীর মতন খরিদ্দারের অভাবে যখন উৎপাদন সঙ্কোচ করতে হল এবং তার ফলে সারা পৃথিবীতে বেকার বৃদ্ধি এবং আর্থিক সঙ্কটের যুগ এল, তখন আমেরিকায়ও সেই আর্থিক সঙ্কট প্রথম বার দেখা দিলে।

বিলাতের অর্থনৈতিক সঙ্কটে বৃটিশ সরকার সাম্রাজ্যের বিভিন্ন দেশের মধ্যে আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থারূপে ইম্পিরিয়্যাল প্রেফারেন্স পদ্ধতির প্রবর্ত্তন করে' অন্যান্য বিদেশী মালের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সুবিধে করে নিয়ে কষ্টে-সৃষ্টে সঙ্কটকাল উত্তীর্ণ হ'য়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে। মেজর ডগলাসের "সোসিয়্যাল ক্রেডিট থিওরী" কানাডার একটা প্রদেশে পরীক্ষা করা সুরু হল। আমেরিকার রুজভেল্টের "নিউ ডিল" চালু হল "ন্যাশন্যাল রিকভারী অ্যাক্ট" সাহায্যে। কিন্তু কোন ব্যবস্থাই আর্থিক সঙ্কটের প্রকৃষ্ট প্রতিষেধক বলে প্রমাণিত হল না।

লর্ড কিন্‌সের মতন এক দল বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ ধনবাদী অর্থনীতির চলতি নিয়ম-কানুনের কিছু কিছু রদ-বদল করার পরামর্শ দিতে লাগলেন—যাকে লোকে "নিউ ইকনমিকস্" নাম দিলে—ধনবাদের

ফলে জনগণের আর্থিক শোষণ এবং সমস্ত ধন ক্রমশঃই অল্পসংখ্যক বড় বড় ধনিকের হাতে জমে ওঠা। "নিউ ইকনমিক্‌সে" জনগণের জীবনযাত্রার মানদণ্ডের উন্নতি এবং ক্রয়শক্তি বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হল, যেটা ধনবাদী অর্থনীতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গেলে কতকগুলো আধা-সোসিয়্যালিষ্ট ব্যবস্থার আমদানী করতে হয়। কিন্তু তেলে-জলে যেমন মেশে না, তেমনি ধনবাদের শ্রীবৃদ্ধি এবং জনগণের সমৃদ্ধিও একসঙ্গে হয় না।

কিন্তু আমেরিকা আর্থিক সঙ্কটটা কাটিয়ে উঠেছিল একটা অভিনব সুযোগের সাহায্যে। '৩১ সালে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে এবং চীন-জাপানে যুদ্ধ বাধে। আমেরিকার শিল্পপতিরা দুই দেশকেই সমানে যুদ্ধোপকরণ সরবরাহ করেছে। ওদিকে '৩৩ সালে হিটলার জার্ম্মাণ রাষ্ট্র করায়ত্ত করে এবং পুরো দমে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হ'তে থাকে। আমেরিকার শিল্পপতিরাও পুরো দমে হিটলারকে মাল সরবরাহ করে।

তা ছাড়া, সোভিয়েট রাষ্ট্রও পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ক'রে যে বিরাট কৃষি-শিল্প সংগঠনের কাজ সুরু করেছিল, তাতে তারা আমেরিকার আধুনিকতম বড় বড় অটোমেটিক মেসিনের একটা বড় খরিদ্দার হয়ে উঠেছিল। এই সব কারণে আমেরিকা আর্থিক সঙ্কট কাটিয়ে উঠেছিল অপেক্ষাকৃত সহজে এবং এই অবস্থা চলেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্য্যন্ত।

কিন্তু ধ্বংসের জন্যে যে উৎপাদন, তার ওপর নির্ভর করেই যদি একটা জাতের উৎপাদন-ব্যবস্থা দাঁড়িয়ে থাকে, তাহলে সে কত দিন দাঁড়িয়ে থাকতে পারে? শীঘ্রই এমন দিন আসে যখন তাকেও প্রত্যক্ষ ভাবে ঐ ধ্বংসযজ্ঞে জড়িয়ে পড়তে হয়। কাজেই শেষ পর্য্যন্ত যে আমেরিকা বলতো ইউরোপের যুদ্ধের সম্বন্ধে আমেরিকার কোন মাথা-ব্যথাই নেই, সেই আমেরিকাও জার্ম্মাণ-সমর-যন্ত্রের সঙ্গে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হ'তে বাধ্য হল, এবং আমেরিকারই তৈরী কামানের গোলার আঘাতে শত-সহস্র আমেরিকান কৃষক-শ্রমিক ইউরোপের রণক্ষেত্রে প্রাণ দিলে। তার পর প্রশান্ত মহাসাগরের যুদ্ধ তো আমেরিকার নিজের যুদ্ধ, এবং সেখানেও জাপানের হাতে প্রকৃতির প্রতিশোধ হয়ে গেল।

আধুনিক যন্ত্র সাহায্যে অল্প লোক অল্প সময়ে প্রচুর মাল উৎপাদন করতে পারে—কাজেই বহু লোক বেকার থাকেই। ফলে উৎপন্ন মাল কাটানো কঠিন হয়। সুতরাং উৎপাদন সঙ্কোচ করতে হয়। তার ফলে আরো বেকার বৃদ্ধি, আরো বাজার মন্দা, আর্থিক সঙ্কট। তার পরে ধীরে ধীরে জমে ওঠা মাল কেটে গেলে আবার যখন পুরো দমে উৎপাদনের কাজ সুরু হয়, তখন আসে একটা "ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল বুম" বা উৎপাদনের হিড়িক। আর্থিক সঙ্কট কেটে যায়, কিন্তু এ অবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। আবার গুদামে মাল জমে যায়; "ওভার প্রোডাক্‌শন" হয়; আবার উৎপাদন-সঙ্কোচ;—একটা দুষ্টচক্র এমনি করে বারংবার ঘুরে আসে। এই এ যুগের বিকশিত ধনবাদের একমাত্র অপরিহার্য্য রীতি।

এর ব্যতিক্রম হ'তে পারে শুধু ধ্বংসযজ্ঞে। মহাযুদ্ধের আগুনে বেকারগুলোকে আহুতি দাও জোর করে সৈন্য করে,—আর ধ্বংস করা আর ধ্বংস হওয়ার জন্য যুদ্ধের মাল-মশলা, অস্ত্র-শস্ত্র, জাহাজ-এরোপ্লেন যত পার তৈরী ক'রে যাও, চলুক বিশ্বজোড়া ধ্বংসযজ্ঞ,—তোমার বিজ্ঞান ও যন্ত্রশক্তি পুরোপুরি কাজে লাগবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে মুষ্টিমেয় ক্রোড়পতির দল মুনাফার পাহাড়ের ওপর পাহাড় জমিয়ে চলবে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ঠিক এই জিনিষটাই হয়েছে।

কিন্তু যুদ্ধ শেষে এই প্রথম দেখা দিয়েছে আমেরিকার ধনবাদের সব চেয়ে বড় সমস্যা। তার বিরাট শিল্প-ব্যবস্থা এই মহাযুদ্ধেই সর্ব্বপ্রথম দীর্ঘকাল ধ'রে পুরো দমে চলতে পেরেছিল। যুদ্ধ শেষে একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ সৈন্য এবং বিশাল সামরিক উৎপাদনের কলকারখানা বেকার হ'তে চলেছে। কেমন ক'রে তারা এই অভাবনীয় অবস্থা কাটিয়ে উঠবে? সারা পৃথিবীতে বাজারের প্রসার তাব চাই-ই।

যুদ্ধে জার্ম্মাণী ও জাপান অনেকগুলো দেশ সদ্য সদ্য অধিকার করেছিল;—কাজেই সেই সব দেশের মুক্তি-সংগ্রামের ধুয়ো সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ার ফলে সারা পৃথিবীর জনগণের মধ্যে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার রুদ্ধ আবেগ গজ্জে উঠেছে। কাজেই প্রত্যক্ষ ভাবে পর-দেশ দখলের কথাই ওঠে না। বিশেষতঃ, জার্ম্মাণী-জাপানের দস্যুবৃত্তির নিন্দা এবং সারা পৃথিবীর মুক্তির বাণী মহাযুদ্ধের কয়েক বছর ধরে প্রচার করার পর পরদেশ দখল চলে না। অথচ পৃথিবীর সমস্ত অনুন্নত দেশের বাজার হাত করার জন্যে সে দেশগুলোকে পরোক্ষ ভাবে উপনিবেশে পরিণত করতে না পারলেও চলবে না। কাজেই আমেরিকার এই নব পর্য্যায়ের সাম্রাজ্যবাদ একটা অভিনব রূপ নিয়েছে।

যুদ্ধোত্তর জগৎ দু'টো বিরোধী ক্যাম্পে পরিণত হয়েছে। এক দিকে যুদ্ধবিরোধী সোভিয়েট শক্তি এবং সারা দুনিয়ার শান্তি ও স্বাধীনতাকামী জনগণ;—আর এক দিকে ধনবাদী শোষণযন্ত্রের মালিক-শ্রেণীর করায়ত্ত অ্যাংলো-আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র দুটো। অন্যান্য ছোট-বড় রাষ্ট্রগুলোও এই ক্যাম্পের মধ্যে ভাগ হয়ে গেছে। ধনিক-শ্রেণীর হাতেই যেখানে রাষ্ট্রশক্তি রয়েছে, তারা অ্যাংলো-আমেরিকান ক্যাম্পে, আর জনগণের গণতন্ত্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তারা সোভিয়েট ক্যাম্পে।

কিন্তু মুখে স্থায়ী শান্তির বাণী, ন্যায়-বিচার, জনগণের কল্যাণ প্রভৃতি বড় বড় কথা বলতেই হয়। সোভিয়েট বলে, যারা পরের দেশ দখল করে বসে শোষণ করছে, তাদের মুখে এ সব বড় কথা সাজে না। কাজেই বৃটেন ট্রান্সজর্ডনিয়াকে "স্বাধীন" করে দিয়েছে, এবং মিশর ও ভারতকে "স্বাধীনতা" দিচ্ছে। আমেরিকাও ফিলিপাইনকে "স্বাধীন" করে দিয়েছে।

কিন্তু যারা এই সব স্বাধীনতার কথা জানে, তারা জানে এই সব স্বাধীনতা পুকুর-চুরিরই রয়েল এডিসন! এই সব দেশের প্রতিক্রিয়াশীল ধনিকদের হাত করে, তাদের মারফতেই সমস্ত শক্তি নিজেদের হাতে রাখা, এবং তাদের কিছু অংশ দিয়ে জনগণকে শোষণ করার পাকা বন্দোবস্তই এই সব স্বাধীনতার প্রকৃত স্বরূপ। কিন্তু সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায় সোভিয়েটকে ভোটে পরাজিত করে' স্বাধীনতার বড় বড় বুলি অব্যাহত ভাবে চালিয়ে যাওয়ার কাজটা এতে চলে যাবে।

তার পর, সারা পৃথিবীর শোষিত জনগণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার আন্দোলনও দমন করতে হবে। তার ব্যবস্থা, প্রথমতঃ সেই সব দেশের ধনিক সরকারকে সক্রিয় ভাবে সমর্থন করার জন্যে সামরিক ঘাঁটী প্রতিষ্ঠা। আমেরিকা সারা পৃথিবীতে এখন ৪০০ নতুন ঘাঁটী তৈরী করেছে। কিন্তু এর একটা সঙ্গত অজুহাত তো চাই। সেটা হচ্ছে—"সোভিয়েটের কুমতলব।"

দেশে দেশে জনগণের মুক্তি-সংগ্রামকে সোভিয়েট নৈতিক ভাবে সমর্থন করে। আমেরিকা বৃটেন বলে,—সোভিয়েট উস্কানী দিচ্ছে, ষড়যন্ত্র করছে, ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। ভারতেও যে নেহেরু-প্যাটেল গঠিত শাসন পরিষদের মারফৎ রুশিয়া ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে, এমন কথাও সম্প্রতি তারা বলেছে!

যাই হোক, রুশিয়ার এই সব "কুমতলব" থেকে আত্মরক্ষা তো করতে হবে; কাজেই দুনিয়ার ৪০০টা জায়গায় সামরিক ঘাঁটী চাই, অ্যাটম বোমা মুঠোর ভেতর রাখা চাই; কনক্রিপশন ব্যবস্থা '৪৭ সালেও বজায় রাখা চাই; সরকারী আয়ের এক-তৃতীয়াংশ মিলিটারী বাজেটও চাই। যুদ্ধের আগে যেখানে দুই লাখ সৈন্যও ছিল না, সেখানে বর্ত্তমানে ১৬ লক্ষ সৈন্য রাখার ব্যবস্থাও হয়েছে।

কিন্তু সত্যি সত্যি আর একটা মহাযুদ্ধ এখনি আসছে না। তবে এত সামরিক তোড়জোড় রাখার প্রয়োজন কি? শুধু নিজেদের সম্ভাব্য বাজারের জনগণের মুক্তি-আন্দোলন দমন করতে তো এত তোড়জোড় লাগে না।

প্রয়োজন, ধনিক শিল্পপতি, অস্ত্র শিল্পপতিদের মুনাফার কারবারগুলোকে বাঁচিয়ে রাখা। জনগণের কাছ থেকে কোটি কোটি টাকা ট্যাক্স আদায় কর, এবং তাই খরচ করে সারা পৃথিবীতে মিলিটারী ঘাঁটী তৈরী কর, কারখানাগুলো অনেক দিন চলবে। তার পর শেষ পর্য্যন্ত আর একটা ধ্বংসযজ্ঞ না এলেও তো আর্থিক সঙ্কটের হাত এড়ানো যাবে না।

তা ছাড়া, চীনের বিরাট বাজার গৃহযুদ্ধের ফলে আরো বিরাট হয়ে উঠেছে, এবং চিয়াং কাইশেককে সমর্থন করে কোটি কোটি টাকার সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে, তার সঙ্গে নতুন অর্থনৈতিক চুক্তি করে তাকে পরোক্ষ ভাবে আমেরিকার উপনিবেশেই পরিণত করা হচ্ছে।

তার পর, জাপানের সাম্রাজ্যের বাজারের মোটা অংশও হাতে এসেছে, কিন্তু গণ-আন্দোলনগুলো সফল হলে সে বাজার মারা যেতে পারে। সুতরাং সেগুলো দমন উপলক্ষেও অনেক মাল কাটবে, আর তার পরে ধনিক সাম্রাজ্যবাদী "দেশী" মালিকদের সঙ্গে বন্দোবস্তে বাজারটা পাকাপাকি ভাবেই হাতে আসবে।

যুদ্ধের পরেও বৃটেন তার আর্থিক পুনর্গঠনের জন্যে আমেরিকার কাছে ঋণ করতে বাধ্য হয়েছে, এবং তার জন্যে ভারতের বাজারে তার ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স ব্যবস্থা ঢিলে করতে হয়েছে অর্থাৎ ভারতবর্ষেও আমেরিকার বাজার বিস্তৃত হয়েছে। মধ্য-প্রাচ্যের দেশগুলোতেও, ইরাণে এবং সৌদি আরবে আমেরিকা প্রবল বেগে প্রবেশ করছে। বৃটেন সেটা পছন্দ করছে না, একটু-আধটু ঠেকাবার চেষ্টাও করছে, কিন্তু পারছে না।

ইরাণে সম্প্রতি এক দল আমেরিকান ইঞ্জিনিয়ার গেছেন, যাদের পরামর্শ অনুসারে ইরাণের আর্থিক ও শিল্প-সংগঠনের কাজ সুরু হবে, এবং ইরাণ ২৫০ মিলিয়ান ডলার ধার নেবে এবং সে টাকাটা ব্যয়ের ওপর মহাজনদের কর্ত্তৃত্ব থাকবে। অর্থাৎ দক্ষিণ-ইরাণের অ্যাংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানির রাজত্ব ছাড়াও ইরাণে আমেরিকার আর্থিক সাম্রাজ্যের পত্তন হ'তে যাচ্ছে।

সৌদি আরবের নতুন অয়েল কনশেসন আমেরিকা পেয়েছে, এবং বৃটেনের সঙ্গে একযোগে পারস্য উপসাগর থেকে ভূমধ্য সাগর পর্য্যন্ত তেলের পাইপ-লাইন বসাচ্ছে। বস্তুতঃ, বৃটেন হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে আমেরিকার অংশীদার মাত্র।

পূর্ব্ব-ইউরোপ ও বলকানের বাজারটা হাত-ছাড়া হয়ে গেছে; কারণ, সেখানে জমিদার-ধনিকের হাত থেকে রাষ্ট্রশক্তি সরে গিয়েছে জনগণের হাতে। কাজেই সেখানে "রুশিয়ার চক্রান্ত" আবিষ্কার করা এবং জমিদার-ধনিকের শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তন করার চেষ্টা চলছে। পরের দেশে গৃহযুদ্ধ বাধানো, এবং ধনিকশ্রেণীকে সামরিক মাল যোগানো একটা পেশায় পরিণত হয়েছে, এবং তার জন্যে বৈদেশিক দপ্তরটা ক্রমে যোল আনাই সামরিক অফিসারদের হাতে আনা হ'য়েছে। আমেরিকার সাধারণ লোককে আর একটা আসন্ন মহাযুদ্ধের ভয় দেখিয়ে এবং সোভিয়েটের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেই এ সব চালানো হচ্ছে।

কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান সে-দিন কংগ্রেসের কাছে আমেরিকার অর্থ নৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে বলতে গিয়ে যা বলেছেন, তার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে গত ১২ই জানুয়ারী রবিবারের (১৯৪৭) ষ্টেটস্‌ম্যান বলেছেন,—"উনবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে বৃটেনের যে ভূমিকা ছিল, আজ আমেরিকার ভূমিকাও ঠিক সেই রকম। জগতের এবং আমেরিকার মঙ্গলের জন্যে আমেরিকা সে ভূমিকা কিছুতেই ছাড়তে পারে না। কারণ, আমেরিকার বিশাল ও ব্যাপক উৎপাদন-যন্ত্রকে চালু রাখতে হলে তাকে বিদেশে মাল রপ্তানী করতেই হবে, এবং তার জন্যে কিছু আমদানীও করতে হবে, অথবা বিদেশে মূলধন খাটাতে হবে।"

এ সব ঔপনিবেশিক অর্থনীতির কথা। উনবিংশ শতাব্দীর বৃটেনের পথেই আমেরিকা চলতে সুরু করেছে, কিন্তু বর্ত্তমান জগতের পরিস্থিতি জটিল বলে ব্যাপারটা খুব সহজে বা স্পষ্ট ভাবে এক বলে বোঝা যায় না।

'৩২ সালে আমেরিকার সমগ্র শিল্প-ব্যবসায়ের সমস্ত সম্পদের অর্দ্ধেক ছিল ২০০টা কোম্পানির হাতে আর তার ৩/৫ অংশ ছিল মর্গ্যান এবং রকফেলার গোষ্ঠীর হাতে। এরই পাশে রেখে সাধারণ আমেরিকান বেকার কৃষক-শ্রমিকের জীবনযাত্রার মানদণ্ড বিচার করলেই দেখা যাবে ধনবাদের দানবীয় রূপ।

এই ধনিকগোষ্ঠীর মুনাফার যূপকাষ্ঠে আমেরিকান কৃষক-শ্রমিক প্রথম বলি;—আর বর্ত্তমানে সারা পৃথিবীর দেশে দেশে অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষ হ'তে যাচ্ছে তাদের নতুন বলি!

গ্রাম-যমুনা

—ফণিভূষণ দাসগুপ্ত

দরাদরি

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

ছোট বয়স থেকেই শুনে আসছি রূপকথার গল্প—"এক যে ছিল রাজা, আর তার বন্ধু সওদাগর।" রাজা করেন রাজ্যশাসন আর মৃগয়া, কিন্তু সওদাগর ময়ূরপঙ্খী সপ্তডিঙা সাজিয়ে বেরোন বাণিজ্য করতে। দেশ-বিদেশ ঘুরে কত ধনদৌলত সংগ্রহ করে ফেরেন দেশে। আরো একটু বড় হলুম—শুনলুম "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ।" শিখলুম—ব্যবসাতেই সম্পদ, শ্রী আর প্রতিষ্ঠা। কাজেই সওদা জিনিষটা মনের মধ্যে গেঁথে গেছে। আর আজকের দিনে বৈশ্য যুগে বণিক্-সভ্যতার যখন জয়-জয়কার, তখন কারবারী মনোভাব যে আমাদের কায়েমী হয়ে বসবে, এতে বিচিত্র কিছু নেই। এক জোড়া ডিম কেনা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক কূট চাল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই এই দর-কষাকষি। শাক-সবজি আর মাছের বাজারের হট্টগোলটা অবিশ্যি কেউ পছন্দ করেন না। কিন্তু তিন টাকা সেরের জিনিষ ন' সিকেয় সওদা করে ক্রেতা পরিতৃপ্ত মনেই বাড়ী ফেরেন এবং আর পাঁচ জনকে ডেকে শোনান। তেমনি আবার বাদ-বিতণ্ডা, দলাদলির উত্তেজনা অপ্রীতিকর হলেও বহু নেতাই আপন আপন দাবি অক্ষুন্ন রাখতে চান। প্রজারা রাজার কাছ থেকে আর রাজা প্রজাদের কাছ থেকে যে ছলে-বলে-কৌশলে নিজেদের সর্ত্ত আদায় করে নিয়েছেন, ইতিহাসের পাতায় তার প্রচুর সাক্ষ্য মিলবে।

বাস্তবিক পক্ষে, এই দর-কষাকষি আর দাঁও বাগানো কোথায় নেই বলুন? নিজেদের দেশ আর সমাজের কথাটাই আগে ভাবি। আমাদের কর্মে, চিন্তায়, সামাজিক আচরণে কি নিত্যই ফুটে ওঠে না এই কারবারী মনোভাব? শ্রমিক-কৃষকদের যেটুকু স্বার্থবুদ্ধি, তার শত গুণ হল আমাদের। তাদের দরাদরিটা হাটে আর মাঠে, আমাদের বেসাতি বুদ্ধিটা সর্ব্বত্রই। শিক্ষায় আর রুচিতে আমরা অবিশ্যি আরো উন্নত, মার্জ্জিত। কিন্তু কতটুকু কম পেলুম, কি উপায়ে আরো একটু বেশি সুবিধা করে নেওয়া যায়, সেই চিন্তাটাই কি আমাদের চলনে-বলনে ধরা পড়ে না? সমস্ত ক্ষণই যেন আমরা ভাবছি—"ঠকে গেলুম, ও লোকটা জিতে গেল!" এই থেকেই আসছে অবিশ্বাস, সন্দেহ আর ঈর্ষ্যা। ছোট ভাই ভাবছে বড়কে কি করে কাঁসানো যায়। বড় ভাই ভাবছে ছোটকে কি করে ভাসানো যায়। মেয়ের বাপ ভাবছেন কত কমে রেহাই পাওয়া যায়। ছেলের বাপ ভাবছেন কৌশলে আরেকটু দাবির মাত্রা বাড়িয়ে নেওয়া যায় না? এই চুক্তি আর মধ্যস্থতা আমাদের ধাতে যেন বসে গেছে। মাঝখান থেকে, ঘটক আর দালাল উভয় পক্ষের মাঝে পড়ে বেশ দু'পয়সা হাতিয়ে নেয়। বিশ্বব্যাপী যখন ঘটকতা আর দালালি, তখন তার পারিশ্রমিক দিতে হবে বৈ কি? কখনো সেটা "ডীল," কখনো সেটা "আঁতাত," কখনো বা "প্যাক্ট।" মোটের মাথায়, সর্ব্বত্রই জাগ্রত রয়েছে একটি হুঁসিয়ার কারবারী মন। কাজটা সফল হলে নিজের কোলে ঝোলটুকু টেনে নিয়ে তবে আমরা নিশ্চিন্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কিংবা রাজনৈতিক দরবারে যিনি যত কূটনীতি-বিশারদ, তাঁর সম্মান ততই বেশি। কিন্তু বোধ হয়, সব সময়ে নয়। দাবার চালে সিদ্ধহস্ত, পাকা খেলোয়াড়ও অনেক সময়ে ভুল করে ফেলেন। তাই "বারগেন" করতে বসে অতি সূক্ষ্ম চালও বানচাল হয়ে যায়। তখন আর আফশোষের অন্ত থাকে না। অতিবুদ্ধির এই শোচনীয় ব্যর্থতা সাধারণের কাছে উপভোগ্য এবং কৌতুককর।

একটা চলতি কথা আছে—ঝোপ বুঝে কোপ মারো। কাজটি কিন্তু খুব সোজা নয়। এ কাজে পটু তাঁরাই, যাঁরা মানব-চরিত্র বোঝেন এবং সেই মত কাজ করেন। মনে করুন, আপনি ব্যবসায় নামতে চান কিন্তু মূলধন আপনার নেই। এ অবস্থায় আপনি কি করবেন? কোনো পুঁজি-ওলা মহাজন ধরবেন নিশ্চয়ই। কিন্তু কাজের বেলায় দেখবেন, তাঁকে কাজে নামানোই একটা সমস্যা। যাঁরা পাকা ব্যবসাদার, তাঁরা লাভ-লোকসান খতিয়ে না দেখে, মার্কেটের অবস্থা না বুঝে, ঝপ করে টাকাটা আটকাতে নারাজ। যদি বা রাজি হন, নিজের স্বার্থটা ষোল আনা বজায় রেখে, যাতে ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে সেই ভাবে তিনি অগ্রসর হবেন। তখন আপনাকেও হুঁসিয়ার হয়ে চলতে হবে তাঁর মনস্তুষ্টি করে। যাতে তিনি বিগড়ে না যান, তার জন্যে বিস্তর কাঠ-খড় পোড়াতে হবে। তবে সেই সুযোগে হাল না ছেড়ে যদি নিজের স্বত্বটা পাকাপাকি করে নিতে পারেন, দিনে দিনে পক্ষে পার্সেন্টেজটা বাড়িয়ে নিতে পারেন, তাহলে সেটা আপনারই কৃতিত্ব। নইলে আর একজন এসে আপনার জায়গা দখল করে নেবে।

দরাদরি করতে কে না চায়? দরিদ্র কৃষক থেকে সম্পন্ন গৃহস্থ সকলেই এ কাজ নিত্য করে থাকেন এবং ভালোবাসেন। গাঁয়ের ছিদাম মণ্ডল হাটে গিয়ে যদি দু'টো লাউ-কুমড়ো সস্তায় সওদা করে, তাহলে তার যে আনন্দ আর কলকাতার মহাজন বড়-বাজারে মাল গস্ত করতে গিয়ে পাইকারি দরটা যদি দু'চার আনা কম করাতে পারেন, তা হলে তার আনন্দটাও ঐ একই জাতের। বড় কন্‌ট্রাক্টর সাহেব-সুবোর পিছনে ঘোরাঘুরি আর তদ্বির করে যখন চার-পাঁচ লাখ টাকার কাজ পান, তখন তাঁর যে মনোভাব আর শ্যামপুকুরের বাঁড়ুজ্যে মশাই হাতিবাগানে গিয়ে যখন দৈনিক বাজারের অতিরিক্ত সবেস মর্ত্তমান কলা ও পেঁপে সস্তায় কেনেন, তখন তাঁর একই মনোভাব।

আপনারা সকলেই লক্ষ্য করে থাকবেন, বাজার করায় এবং সস্তায় সওদা করার মধ্যে একটি বিশেষ আনন্দ আছে, যা আর কোথাও মিলবে না। বাজার-দরের চেয়ে কিছু কমে কপি আর ভেটকি মাছ কিনে বাঙালী গৃহস্থ বাড়ী ফেরেন দিগ্বিজয়ী হাসি নিয়ে। অনেক গৃহস্থই দেখেছি কাছের বাজার ছেড়ে এক মাইল দূরের বাজারে ছোটেন ভালো জিনিষ সস্তা পাবার আশায়। আমার নিজের অভিজ্ঞতা এ বিষয়ে দুঃখময়। সুপুরি-মশলা আর লোহার কড়া বড়বাজারে সুবিধা দরে পাওয়া যায়, এই শুনে একদা আমি ঐ অঞ্চলে গিয়ে যে দাম দিয়ে এসেছিলুম, তার বিস্তারিত উল্লেখ আমাকে এখনও শুনতে হচ্ছে। তবে যাঁরা অভিজ্ঞ, সাংসারিক ব্যক্তি, তাঁরা জানেন কোথায়, কি ভাবে এবং কখন কি দরে জিনিষ পাওয়া যায়। তাঁদের মুখে যখন লোহাপটি, আলুপটি, পোস্তা, রাধাবাজারের সূক্ষ্ম সংবাদ শুনতে পাই, তখন তো আমার রীতিমত সম্ভ্রম বোধ হয়। ক্ষুদ্র মানুষ এক জীবনে কতটুকুই বা শেখে এবং কাজ করে, এই ভেবে নিজেকে আশ্বস্ত করি।

ফেরিওলার কাছে জিনিষ সওদা করা—সেও একটা নেশা। দোকানে-বাজারে যে আবহাওয়া, বাড়ীর দেউড়িতে তার চেয়ে বেশি আরাম ও অন্তরঙ্গতা। ফেরিওলাকে ডেকে, তার সঙ্গে দু'টো বাজে কথা বলে সস্তায় জিনিষ কেনার ভেতরে একটা পারমার্থিক তৃপ্তি আছে। আমার নিজের বিশ্বাস ও ধারণা যে, এ কাজে মেয়েদেরই বেশি যোগ্যতা। একবার দেখেছিলুম, একখানি শাড়ীর দর ফেরিওলা

থাকলে সাতাশ টাকা। তার উত্তরে মহিলাটি বলে বসলেন বারো টাকা। আমি তো ভেবেছিলুম তিনি অপমানিত হবেন, যেমন বহু ফেরিওলা পুরুষদের করে থাকে। কিন্তু আমি আশ্চর্য্য হলুম যখন এক ঘণ্টা কাল ধস্তাধস্তির ফলে ফেরিওলা চোদ্দ টাকাতেই শাড়ীখানা দিয়ে গেল। আমার এক আত্মীয় বন্ধু আছেন যিনি কিছুতেই বড় দোকানে ঢুকতে চান না। "এক দাম" "বাঁধা দর" প্রভৃতি নিরর্থক কথাগুলোর ওপর তাঁর প্রচুর অবজ্ঞা। তিনি বলেন, "দাম এক বললেই এক হবে? তার নড়ন-চড়ন নেই? বাঁধা দর আবার কি বস্তু? দর যদি না বাড়ল-কমল, দর-কষাকষিটাই না হ'ল, তা হলে আর দর কিসের?" এই জন্যে তিনি নিউ মার্কেট ছাড়া জিনিষ কেনেন না এবং ষোল টাকার জিনিষ যখন তিনি সাত টাকা বারো আনায় রফা করেন, উপরন্তু ক্যাশ-মেমো না লিখিয়ে সেলস্ ট্যাক্সটাও খারিজ করিয়ে নেন, তখন তাঁর কৃতিত্বে বিস্মিত না হয়ে পারি নে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিনি যে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য নিয়ে দোকানদারের সঙ্গে দরাদরি করেন তাতে মনে হয় সময় অপচয় করার মতো আরো অনেক সময় তাঁর হাতে আছে। কিন্তু না—তিনি সত্যিই কাজের মানুষ। এই যে দরাদরি করতে গিয়ে নিউ মার্কেটে সমস্ত দুপুরটা চলে গেল, তাতে তিনি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ নন্। উপরন্তু তিনি বলেন যে, আর পাঁচ জায়গায় ঘুরে মনোমত জিনিষ না পেয়ে যে সময়টার অপব্যয় হ'ত এবং বেশি দাম দিতে হ'ত, তার চেয়ে এক জায়গায় কিছু বেশি সময় দেওয়া মোটের ওপর ভালোই। এই জন্যেই বহু মেয়ে তাঁকে 'শপিং'-এর সময়ে আদর্শ সঙ্গী বলে বিবেচনা করেন। তাঁকে রাস্তায় একলা বড় একটা দেখি নে, সঙ্গে অন্ততঃ এক জন মেয়ে থাকবেনই। দেখা হলেই নিজে থেকে বলেন, "একটু কাজে যাচ্ছি।" তবে পরিতাপের বিষয়—তিনি আদর্শ গৃহস্থ এবং সওদা-নিপুণ হলে কি হয়, বিয়ের বয়েস পেরিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও তিনি আজও অবিবাহিত। তাঁর ভাগনীর সংখ্যা অনেক। কাজেই বন্ধু-বান্ধবী ভাগনীদের তদ্বির আর ফরমাস খাটতেই তাঁর অনেকটা সময় ও উৎসাহ ব্যয় হয়ে যায়। সবাই তাঁকে চায় ও ডাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় "মামা" বলে। আমার নিজের ধারণা হ'ল এই যে, তাঁর মত বৃতী পুরুষকে সব তরুণীই অকপটে বিশ্বাস করেন, কাজের ভার দেন, এমন কি বহু টাকাও তাঁর হাতে ছেড়ে দেন এই আশায় যে, তিনি ভালো বাজার করবেন এবং সুবিধা দরেই। মেয়েদের কাছে তিনি বিশ্বস্ত, প্রিয়, নির্ভরযোগ্য সঙ্গী মাত্র। তাঁর হাতে টাকা দেওয়া যায়, হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়াও যায়, কিন্তু চিরকালের জন্যে হাতখানি ছেড়ে দেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, তিনি যদি কখনো বিয়ে করতে প্রস্তুতও হন, তাহলেও তাঁর মনে হবে, এর চেয়ে ভালো এবং সস্তায় 'বারগেন' করা যায় কি না। আরো দু'-চার জায়গা ঘুরলে হ'ত!

যাই হোক্, সুবিধা বুঝে দাঁও বাগানো—এটা শক্ত আর্ট এবং বহু দিনের সাধনার অপেক্ষা রাখে। অনেক বার জিতেও এক একবার ভয়ানক ঠকে যেতে হয়। কিন্তু তাতে নেশা কমে না, জেদ বেড়ে যায় মাত্র। দু'-এক বার অকৃশ্যানে গিয়ে দেখেছি, কয়েক জন ভদ্রলোক প্রতি রবিবারেই নীলামে যান। প্রথম প্রথম এই যাওয়াটাই হ'ল বড় শিক্ষা। কেন না, তাতে নীলাম-ঘরের হাল-চাল, কেমন করে জিনিষের দর আপনা আপনিই বাড়ানো হয়, এই সব তথ্যগুলো আয়ত্ত হয়। অকৃশ্যানে গিয়ে দর হাঁকবার আগে বেশ কিছু দিন যাতায়াত করা ভালো, যেমন ভালো গাইয়ে হ'তে গেলে ভালো আসরে গিয়ে শ্রুতিটা ঠিক করে নিতে হয়। নইলে আমার এক বন্ধুর মত, খাঁটি রূপো ভেবে দু'টো নিকেলের ফুলদানি চল্লিশ টাকায় কিনে চিরকাল আফশোষ করতে হবে।

যাঁদের পুরানো বই সংগ্রহ করার নেশা আছে, তাঁদেরও 'বারগেন'-প্রীতি লক্ষ্যণীয় বস্তু। অবিশ্যি, জিনিষ বুঝে দাম। কিন্তু যে সব পুরানো বুক-ষ্টলের মালিক বইয়ের আসল দাম জানে না, সেখানেই দাঁও মারার সুবিধা। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, ছোট দোকানে, কলেজ ষ্ট্রীটের রেলিং ও ফুটপাথে অনেক সময় যে সব ভালো লোভনীয় বইয়ের সন্ধান পেয়েছি, তা অন্য কোথাও আর মিলবে না। বারো আনায় কিনেছিলুম ও' হেন্‌রির শ্রেষ্ঠ গল্প-সঙ্কলন আর মাত্র আট আনায় পেয়েছিলুম চেলিনির আত্মজীবনীর একটি মূল্যবান্ পুরাতন সংস্করণ শিয়ালদার পুরানো বাজারে ভাঙা ফার্নিচারের মধ্যে। এগুলো প্রকৃতই "বারগেন"—তাই বহু দিন মনে থাকে।

'বারগেনের' প্রতি আমাদের যে ঝোঁক, তার দু'টি কারণ। প্রথমতঃ, জিনিষটি আমাদের পছন্দসই এবং লোভনীয় আর দ্বিতীয়তঃ, সেটি অল্প মূল্যে অথবা ফন্দি-ফিকিরে হস্তগত করবার ইচ্ছা। অতএব 'বারগেন' করা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি, তা' দু'টো কুচো চিংড়ি ফাউ নেবার বেলাতেই হোক্, আর বহুমূল্য জমি, বাড়ি বা আসবাব কেনবার ক্ষেত্রেই হোক্। তবে দরাদরির কৌশলটা কঠিন। আপনাকে এ রকম নিরাসক্ত ভাব দেখাতে হবে, যেন জিনিষটির প্রতি আপনার কোনো লোভ বা স্পৃহা নেই। সস্তায় দিলে নিতে পারেন, এই পর্য্যন্ত। আপনার বলা দামটা যখন দোকানদার অত্যন্ত কম বলে উড়িয়ে দেবে, তখন আপনিও ব্যাগটি পকেটে ফেলে 'তবে থাক্' বলে বেরিয়ে আসবেন—যেন আপনার কোনো গরজই নেই। পিছন ফিরে কিন্তু তাকাবেন না—কিছুক্ষণ পরেই শুনবেন—"ও বাবু, শুনুন একবার শুনুনই না—কি দিতে পারবেন, ঠিক্ বলুন তো…" তখন ধরে নিতে পারেন যে জিনিষটি আপনার সম্পত্তি হয়ে এসেছে।

সওদা করার মধ্যে একটি বিশেষ ধরণের নেশা আছে সেটা ব্যক্তি ও বস্তু-নিরপেক্ষ। পরের বাজার করতে গিয়ে অথবা পাঁচ পোয়া আলুর জায়গায় আড়াই সের আলু কিনতে গিয়ে যেটুকু লাভ, সেটুকু হয়তো সামান্যই এবং নিজের পকেটেও যায় না। তবু দর করাটা এমনি মজ্জাগত অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, না করে পারা যায় না। ক্ষুদ্র সাংসারিক স্বার্থরক্ষা ও ব্যবসায়িক কেনা-বেচা থেকে আরম্ভ করে বড় বড় ব্যাপারে এবং রাষ্ট্র-সম্পর্কিত ব্যবস্থায় যাঁদের দরাদরির ক্ষমতা প্রসিদ্ধ, লোক তাঁদের কূটনীতি-বিশারদ বলে সমীহ করে চলে। রাজনীতির ভাষায় এঁরা হলেন 'ডিপ্লোম্যাট'। নিপুণ সতর্কতার সঙ্গে এঁরা কাজ করেন, অনেক সূক্ষ্ম ছিদ্র রেখে দেন যাতে নির্গম-পন্থা অদৃশ্য ভাবে কার্য্যকরী হয়। সামাজিক মেলা-মেশায়, দলাদলি অথবা আরো বড় হাঙ্গামায় যাঁরা মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভার-সাম্য-নীতি অনুসরণ করে স্বদলের স্বাতন্ত্র্য এবং ভবিষ্যৎ স্বার্থরক্ষা করতে জানেন, তাঁদের প্রতিষ্ঠা বাড়ে। বেফাঁস কাজ অথবা কথা, কোনটাই তাঁরা

মহেশ্বরী

নিশিকান্ত

শ্বেত-মর্ম্মর-শিখররূপিণী, নির্ম্মম-নিশ্চল
কঠিন-নির্ম্মলতায় গঠিত, শুচিতায় প্রোজ্জ্বল
বিনিস্পন্দ প্রস্তর-শিখা, সে যে
সকল কালের আলোক-আঁধার ইন্ধন সম
জ্বালিয়া তীব্র তেজে !

গ্রহ-তারকার অস্ত-উদয় অচল-সীমার পারে
আপন-ঊর্দ্ধ্ব-অনন্তায়নে রাখিয়াছে আপনারে
স্বয়ম্প্রকাশ-প্রভার প্রশান্তির
বিপুল-বিথারে ; আপন-বিশাল-বিমৌনতায়
সে যে গো সুগম্ভীর !

একচ্ছত্র মহারাজ্ঞীর মহিমায় বিরাজিত।
এত যে সুদূর, এত অমলিন, তবু সে যে আনমিত,
নীলিমার মত ধরার ধূলার 'পরে
দিকে-দিগন্তে চুম্বনলীন ; মলিন-মাটির অন্তরে অন্তরে—

অলক্ষ্যে সে যে সঞ্চিত করে কত মণি-কাঞ্চন !
এত যে কঠোর, এত প্রচণ্ড, তবু তার পরশন
কমল-বনের শিশু-কলিকার দলে
প্রস্ফুট করে পেলব-বিকাশে ; তুঙ্গ-পাষাণ-প্রতিমা,
তবু সে গলে

ধরিত্রীমুখী অনুকম্পার অমৃত-নির্ঝরণে।
বিমৌন, তবু প্রকৃতির প্রতি অসহায় ক্রন্দনে
আশ্বাস দেয়, সাড়া দেয় বারে বারে ;
দেয় বরাভয়, মর্ত্ত-বেদনা-গহ্বরলীন অতল অন্ধকারে !

পরশিয়া তব রূপের রশ্মি আমাদের চেতনারে
রূপান্তরিয়া তুলে নিতে চায় কালের শিখর-পারে
তার স্বরূপের শিখর-স্বর্গ-দেশে,
তাই আমাদের নিশীথ স্বপনে সুচির-উষার হাসিতে
সে ওঠে হেসে !

করেন না বা বলেন না। এই নির্ব্বিকার আত্মস্থ ভাবটি আয়ত্ত করা কঠিন। কিন্তু এটিই বস্তুবাদ আর 'বারগেনিং'এর মূল সূত্র।

দরাদরির সঙ্গে দলাদলির একটা নিবিড় যোগ আছে। কেন না, দলীয় প্রাধান্য বজায় রাখতে হলে দর-কষাকষি এবং দর-বাড়ানোর নিপুণ ও সূক্ষ্ম আইন-কানুন ভালো করে জানা চাই। রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যাঁরা আদর্শ-নিষ্ঠা ও সঙ্গতিবোধ দূরে সরিয়ে 'পাওয়ার পলিটিক্স' এবং দরাদরি করতে ওস্তাদ, ইতিহাসে তাঁদেরই জয়-জয়কার ঘোষিত হয়েছে এবং হচ্ছে। তেমনি যে সব লেখক সাহিত্য-শিল্পের মূল সূত্র, মর্য্যাদা ও সাধনার চিন্তায় অযথা পীড়িত না হয়ে সুযোগমাফিক মেশেন, লেখেন এবং দল তৈরি করতে পারেন, তাঁদের দর ও কদর বেশি হয়, দেখা গিয়েছে। কারণ, রাজনীতিই বলুন আর সাহিত্য অথবা সামাজিকতাই বলুন, সব জিনিষেরই একটা সাময়িক চরিত্র আছে। শাশ্বত মূল্য-বিচারে জন-সাধারণ নির্ব্বিকার, এই সত্যটা বুঝে যাঁরা আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে সাময়িক ঘটনা বা রীতি-নীতির স্বাভাবিক ঝোঁকটাকে নিজের কোলে টেনে ব্যবহারে লাগাতে জানেন, তাঁদেরই পাল্লা ভারি থাকে। এতে আপত্তি করবারই বা কি আছে? সমাজ-তন্ত্রের উচ্চ আদর্শটাকে খাড়া করে, জীবনের যথার্থ মর্য্যাদা সামনে রেখে, আপনিই বা কি এমন লাভবান্ হলেন বা হতে পারবেন? অথচ আপনার চেয়ে কম বিবেকবুদ্ধি, কম খুঁতখুঁতে মন আর কম সঙ্কোচহীন দৃষ্টি নিয়ে কত অল্প সময়ের মধ্যে আর একজন ঝোপ বুঝে কোপ মেরে সাঁ-সাঁ করে এগিয়ে গেল। আপনি যতক্ষণ জীবনের তথ্য নিরূপণে ব্যস্ত, তিনি ততক্ষণ জীবিকার তত্ত্বকে করায়ত্ত করে ফেলেছেন। আপনি যত খুঁজে মরছেন আত্ম-সংস্থিতি, তিনি ততক্ষণ করে নিয়েছেন আত্ম-সংস্থান। এখন আপনিই মন স্থির করে বলুন—জগতে কোন্‌টা বড়, নিষ্ঠা না প্রতিষ্ঠা? এক দর না দরাদরি?

চার দিকে যখন অশান্তি আর দলাদলি, আপনি বিমূঢ় হয়ে ভাবছেন মানবিকতার প্রকৃত অর্থ, সমাজের ও দেশের কর্ত্তব্য, স্বাধীন ও সাধু-চিত্তের নিরপেক্ষ নীতি। ইতিমধ্যে হয়তো একটি সম্প্রদায়, সুনেতৃত্বের কল্যাণে দুই দলের সঙ্গেই যোগাযোগ রেখে যার কাছ থেকে বেশি সুবিধা পাওয়া যায় সেই দিকে ঝুঁকে আদর্শবিরোধী স্বার্থ-সিদ্ধি করে নিল। এটা সহজ, পরিচিত, প্রমাণিত সত্য—বাস্তব জগতে বহু বার এর মূল্য পরীক্ষা হয়ে গেছে। দুনিয়ার হাল তো এই! যে সংসারে তিন ভাই কিন্তু এক ভাইয়ের রোজগার কম এবং প্রতিষ্ঠাও অল্প, সেখানে সে বাঁচে কি করে? আপন স্বার্থ কায়েম রাখার জন্যেই বাকি দু'জনের মধ্যে ভেদসৃষ্টি করে' যার কান পাতলা, পকেট ভারি ও মগজ হাল্‌কা, তার দিকেই ঝুঁকতে হবে। উপায় কি?

অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থায় ভারত

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বিমান পরিচালন ব্যবস্থার ছিল শৈশব কাল। তথাপি ঐ যুদ্ধে বিমান শুধু একটা উল্লেখযোগ্য অংশই গ্রহণ করে নাই, বিমান-শিল্প এবং বিমান-চলাচলের উন্নতির বিশেষ সুযোগ এবং প্রেরণা লাভ করিয়াছিল। বস্তুতঃ, প্রথম মহাযুদ্ধের পরেই ১৯১৯ সালে প্যারী নগরীতে আন্তর্জাতিক বিমান-পথ খুলিবার উদ্দেশ্যে এক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। যদিও আলোচনা শেষ করিয়া আন্তর্জাতিক বিমান-পথ খুলিতে বহু দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছিল, তথাপি দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়েই অসামরিক বিমান পরিচালন ব্যবস্থার অদ্ভুত উন্নতি সাধিত হয়। অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার প্রথম স্তরে অবশ্য মহাসাগর এবং মহাদেশ অতিক্রম করিয়া বিমান পরিচালন করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনে ইউরোপ ও উত্তর-আমেরিকার বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার এবং বিমান-চালকদের সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় অতি দ্রুত চলাচলের এই নূতন উপায়টির যত দূর সম্ভব সুযোগ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা করা হইতে থাকে। সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহের ঔপনিবেশিক নীতিই সুদীর্ঘ বিমান-পথ প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রেরণা যোগাইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। নিজেদের অধিকৃত দেশসমূহে অল্প সময়ে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিবার জন্যই বৃটিশ, ফরাসী এবং ওলন্দাজ বিমান-পথ ভারত, লঙ্কা, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপাবলি এবং ইন্দোচীন পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। বঙ্গোর সহিত বেলজিয়মের, আফ্রিকা মহাদেশ অতিক্রম করিয়া মাডাগাস্কার দ্বীপের সহিত ফ্রান্সের, ইংলণ্ডের সহিত পূর্ব্ব-আফ্রিকার, মিশরের সহিত দক্ষিণ-আফ্রিকার সংযোগ-সাধন করিয়া বিমান-পথ খোলা হয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-আমেরিকাতেই শুধু অনেকগুলি বিমান-পথের প্রতিষ্ঠা করে নাই, প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া পূর্ব্ব-এশিয়া পর্য্যন্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলিকেও বিমান-পথ দ্বারা আমেরিকার সহিত সংযুক্ত করে। বিমানযোগে আটলাণ্টিক মহাসাগর বিশেষ করিয়া উত্তর-আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দেওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ বলিয়াই তৎকালে বিবেচিত হইত। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজিত জার্ম্মাণীই সর্ব্বপ্রথম এই দুরূহ কাজকে সহজ করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে জার্ম্মাণী তাহার সমগ্র সাম্রাজ্য খোয়াইলেও পৃথিবীব্যাপী পুরাতন বাণিজ্য-সম্পর্ক পুনরায় স্থাপন করা তাহার পক্ষে জীবন-মরণের সমস্যা হইয়া উঠিয়াছিল। এই সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া জার্ম্মাণী শুধু বিমানযোগে মাল প্রেরণের ব্যবস্থা করিতেই উদ্যোগী হয় নাই, জার্ম্মাণীর এই উদ্যোগে আমেরিকা ও ইউরোপের অর্থনৈতিক সম্বন্ধের মধ্যে নূতন একটি দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। জার্ম্মাণীর Deutsche Lufthansa ১৯৩৪ সাল হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়া নিয়মিত ভাবে বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তার পর একে একে ফ্রান্স, বৃটেন, ইটালী, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সকলেই আটলাণ্টিক মহাসাগর পারাপারের জন্য বিমান-পথের প্রতিষ্ঠা করে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রাম আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশের বিমান-পথগুলি সমগ্র পৃথিবীকে জালের মতই ছাইয়া ফেলিয়াছিল।

বৃটিশ সাম্রাজ্যের মুকুটমণি ভারতবর্ষের ভৌগোলিক অবস্থান [illegible] ইউরোপ ও সুদূর প্রাচ্যের মধ্যে সংযোগ-সাধন [illegible] এবং ওলন্দাজ কোম্পানী সমূহের প্রতিষ্ঠিত বিমান-পথ [illegible] মধ্য দিয়াই প্রতিষ্ঠিত হয়। বৃটিশ ঔপনিবেশিক নীতি [illegible] সহিত ভারতের সংযোগ-সাধন করিয়া বিমান-পথ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কথা পূর্ব্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং [illegible] বিশ্ব-সংগ্রাম
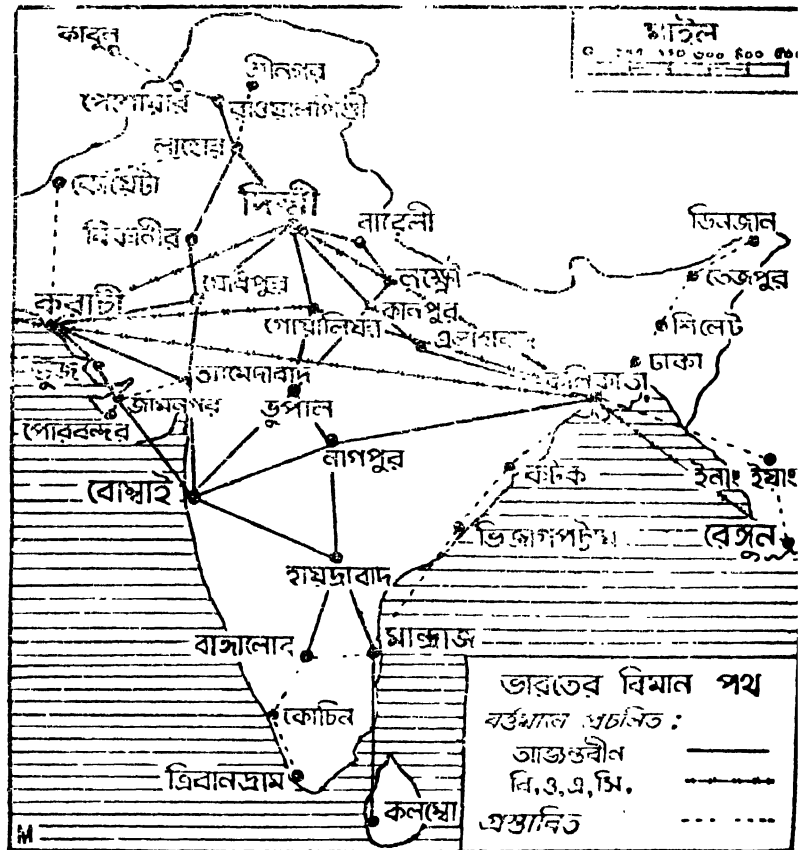
আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে ভারতের অভ্যন্তরে এবং ভারত হইতে ভারতের বাহিরে যাতায়াতের জন্য বিমান সার্ভিসের ব্যবস্থাও কিছু কিছু হইয়াছিল বৈ কি। কিন্তু এই বিমান-চালন ব্যবস্থায় ভারতবাসীর অংশ ছিল অতি নগণ্য। ভারতে বিমান চালনা শিক্ষা দিবার জন্য ১৯২৮ সালে কয়েকটি ফ্লাইং ক্লাব স্থাপিত হয়। লণ্ডন ও করাচীর মধ্যে বিমানযোগে ডাক চলাচলের ব্যবস্থা হয় ১৯২৯ সালে। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে বিমানযোগে এই ডাক চলাচল ব্যবস্থা ১৯৩০ সালে দিল্লী এবং ১৯৩৩ সালে কলিকাতা পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট ১৯৩৫-৩৬ সালে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতির জন্য যে তহবিল গঠন করেন তাহার বেশীর ভাগই বিমানঘাঁটির উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইয়াছিল। ১৯৩৮ সালে অসামরিক বিমান অবতরণের যোগ্য মোট ১৪৮টি বিমানঘাঁটি ছিল বটে, কিন্তু উহাদের মধ্যে সাধারণের ব্যবহারযোগ্য ছিল মাত্র ৩৭টি অবতরণক্ষেত্র। সাম্রাজ্য-বিমান-ডাক ব্যবস্থা (Empire Air Mail Service) স্থাপিত হয় ১৯৩৮ সাল হইতে। ১৯৩৯ সালের প্রথমে ভারতে অসামরিক বিমানের সংখ্যা ছিল ১৫৬টি। এই বৎসর ব্যবসায় হিসাবে চারিটি কোম্পানী বিমান পরিচালন করিত। এই চারিটি কোম্পানীর নাম—(১) টাটা এয়ার লাইনস, (২) ইণ্ডিয়ান নেশন্যাল এয়ারওয়েজ লিঃ, (৩) এয়ার সার্ভিস অব ইণ্ডিয়া লিঃ এবং (৪) ট্রান্সকন্টিনেণ্টাল এয়ারওয়েজ লিঃ। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতি এবং ভারতে বিমান নির্ম্মাণ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য কোন চেষ্টা করা হয় নাই। বিমান নির্ম্মাণ-শিল্প এবং বিমান পরিচালন ব্যবস্থা সরকারী প্রেরণা, সাহায্য এবং সহযোগিতা ব্যতীত সম্ভব বলিয়া কেহ মনে করেন না। আমাদের দেশে এই তিনটির অভাবই যে শুধু ছিল তাহা নয়, বে-সরকারী প্রচেষ্টাকে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সরকারী বিরোধিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে স্যার ফ্রাঙ্ক নয়েস (Sir Frank Noyce) আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, ভারতীয় আন্তঃ-মহাদেশিক বিমান পরিচালন সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল এয়ার ওয়েজের সহিত ভবিষ্যতে চুক্তি করিবার সময় সমগ্র অবস্থা বিবেচনা করিয়া দেখিবার পূর্ণ স্বাধীনতা ভারত গবর্ণমেণ্টের থাকিবে। কিন্তু ১৯৩৮ সালে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের সহিত যখন নূতন চুক্তি করা হয় তখন বিমান পরিচালন ক্ষেত্রে ভারতীয় স্বার্থ উপেক্ষা করিয়া অভারতীয় কোম্পানীকেই সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল।

দ্বিতীয় বিশ্ব-সংগ্রাম আরম্ভ হওয়ার পর ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিচালনা প্রচেষ্টার প্রসারই শুধু ব্যাহত হয় নাই, বিমান এবং বিমানের বিভিন্ন অংশের অভাবে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হইয়াছিল। যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতে যে-সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ভারতবাসী বিশেষ করিয়া অনুভব করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বিমান-নির্ম্মাণ-শিল্প অন্যতম। সিন্ধীয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর চেয়ারম্যান মিঃ বালচাঁদ হীরাচাঁদ ভারতে এরোপ্লেন নির্ম্মাণ-শিল্প প্রতিষ্ঠার একটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারত গবর্ণমেণ্ট এই পরিকল্পনাকে উৎসাহ দিতে স্বীকৃত হন নাই। ভারতে বিমান-নির্ম্মাণ-শিল্প প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই কাউন্সিল অব ষ্টেটে উঠিয়াছিল। কিন্তু দেশরক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী বলিয়াছিলেন, "The idea of setting up aeroplane factory is, I think at present quite impossible." "বর্ত্তমান অবস্থায় ভারতে এরোপ্লেন নির্ম্মাণের কারখানা প্রতিষ্ঠা করা আমি সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব বলিয়াই মনে করি।" কিন্তু আমরা দেখিয়াছি, এই যুদ্ধের সময়েই কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় বিমান-নির্ম্মাণ-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়ায় যাহা সম্ভব হইয়াছে ভারতে তাহা সম্ভব না হওয়ার কোন কারণই ছিল না, শুধু এক বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতি ছাড়া। ইষ্টার্ণ গ্রুপ কনফারেন্সের সময় নয়া দিল্লীতে এইরূপ সংবাদ প্রচারিত হইয়াছিল যে, বৃটেনের বিমান-নির্ম্মাণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব লর্ড বিভারব্রুক এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রস্থিত বৃটিশ ক্রয় মিশন ভারতে বিমান-নির্ম্মাণ-শিল্প প্রতিষ্ঠার পথে বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। বেঙ্গালোরে হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা অবশেষে হইয়াছিল বটে, কিন্তু এরোপ্লেন মেরামত করিবার প্রয়োজনে গবর্ণমেণ্ট উহা দখল করিয়া লন।

যুদ্ধের প্রয়োজনেও ভারত গবর্ণমেণ্ট ভারতে বিমান নির্ম্মাণ-শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন নাই এবং যাঁহারা উদ্যোগী হইয়াছেন তাঁহাদিগকে নিরুৎসাহিত করিয়াছেন। যুদ্ধের পরে ভারত গবর্ণমেণ্টের বিমান-নীতি কি হইবে তাহা গঠন করিতেও দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হইয়াছে। ১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে ভারত গবর্ণমেণ্টের পুনর্গঠিত পরিকল্পনা সংক্রান্ত কাউন্সিলের পুনর্গঠন কমিটির দ্বিতীয় রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে যুদ্ধোত্তর অসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের নীতি ঘোষিত হইয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধোত্তর বিমান-নীতি গঠন সম্পর্কে বিলম্ব করিলেও মিত্রপক্ষীয় শিল্পপ্রধান শক্তিশালী দেশ-সমূহ আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান পরিচালন ব্যবস্থা করিতে মোটেই অনবহিত ছিলেন না। ১৯৪৪ সালের ১লা নবেম্বর চিকাগো সহরে আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান-সম্মেলনের (The International Civil Aviation Conference) অধিবেশন আরম্ভ হয়। ৫২টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল এবং আলোচনা চলিয়াছিল প্রায় ছয় সপ্তাহ ধরিয়া। এই সম্মেলনে নিম্নলিখিত পঞ্চবিধ বিমান-স্বাধীনতার এক নীতি গঠিত হয়: (১) যে কোন দেশের নির্দ্ধারিত বিমান-পথে বিমান পরিচালনের স্বাধীনতা, (২) টেক্নিক্যাল কারণে (যেমন, বিমান চালাইবার জ্বালানী তৈল ফুরাইয়া গেলে উহা সংগ্রহ করা) যে কোন দেশে অবতরণের স্বাধীনতা, (৩) প্রত্যেক দেশের নিজের দেশ হইতে পৃথিবীর যে কোন দেশে বিমানযোগে যাত্রী ও পণ্য বহনের স্বাধীনতা, (৪) পৃথিবীর যে কোন দেশ হইতে নিজের দেশে বিমানযোগে যাত্রী ও পণ্য বহন করিয়া আনিবার স্বাধীনতা, এবং (৫) অসামরিক বিমান পরিচালন সম্পর্কে পৃথিবীর সর্ব্বত্র অবাধ প্রতিযোগিতা করিবার স্বাধীনতা। আন্তর্জ্জাতিক বিমান চলাচল সংক্রান্ত আন্তর্জ্জাতিক কর্তৃত্ব শক্তির প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক মতভেদের জন্য পঞ্চবিধ বিমান-স্বাধীনতার ভাগ্যলিপি সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলিবার উপায় নাই। কারণ, বর্ত্তমানে আন্তর্জ্জাতিক ঐক্য-অনৈক্য বা কোন চুক্তির কথা যখন বলা হয় তখন প্রধানতঃ বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য-অনৈক্য বা চুক্তির কথাই আমরা বুঝিয়া থাকি। সোভিয়েট রাশিয়ার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু অধিকাংশ

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হয় বৃটেন, না হয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের উপগ্রহরূপে বিরাজ করিয়া থাকে মাত্র। কিন্তু ভারতের মত বৃহৎ অথচ শিল্পে অনুন্নত দেশের পক্ষে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ প্রতিযোগিতার প্রস্তাবকে সুনজরে দেখা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি বৃটেনের সাম্রাজ্যিক বিমান-নীতিও ভারতের পক্ষে অনিষ্টকর না হইয়া পারে না। কিন্তু নয়া দিল্লী হইতে ১২ই নবেম্বরের (১৯৪৬) এক সংবাদে প্রকাশ, চিকাগো আন্তর্জ্জাতিক বিমান-সম্মেলনে ১৯৪৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর যে আন্তর্জাতিক অসামরিক বিমান-চুক্তি (Convention on International Civil Aviation) স্বাক্ষরিত হইয়াছে ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহা অনুমোদন করিয়াছেন। গত মে মাসে (১৯৪৬) 'অস্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান পরিচালন-সঙ্ঘের (Provisional International Civil Aviation Organisation) অধিবেশনে যে কার্য্যবিধি নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তদনুসারে এই অনুমোদন-পত্র ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ্চ ওয়াশিংটনে দাখিল করিতে হইবে। আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান-চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কতকগুলি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক এই চুক্তি অনুমোদিত এবং অনুমোদন-পত্র ওয়াশিংটনে ১লা মার্চ্চ দাখিল করা হইলে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল হইতে উহা কার্য্যকরী হইবে। উক্ত চুক্তিতে 'অস্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান পরিচালন-সঙ্ঘের' পরিবর্ত্তে একটি স্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান পরিচালন-সঙ্ঘ গঠিত হইবে। বর্ত্তমান অস্থায়ী আন্তর্জ্জাতিক অসামরিক বিমান পরিচালন-সঙ্ঘের প্রধান কার্য্যালয় মণ্ট্রিয়েলে অবস্থিত। ভারতের পক্ষ হইতে মিঃ কে, এম রাহা এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন।

অবাধ প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করিয়া সমগ্র পৃথিবীর শিল্প-বাণিজ্যে প্রভুত্ব করিবার মত সামর্থ্য বৃটেনের যত দিন ছিল তত দিন বৃটেনকে আমরা অবাধ বাণিজ্যের প্রধান পৃষ্ঠপোষকরূপে দেখিয়াছি। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম পাদে আন্তর্জ্জাতিক শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃটেনের যে মর্য্যাদা ও শক্তি ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তাহার অধিকারী হইয়াছে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র। তাই মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে পঞ্চবিধ বিমান-স্বাধীনতার উদ্‌গাতারূপে আমরা দেখিতে পাইতেছি। আর বৃটেন আজ তাহার সাম্রাজ্যিক খোলসের মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে ব্যগ্র। এক দিকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অবাধ বাণিজ্য-নীতি আর এক দিকে বৃটেনের সাম্রাজ্যিক অগ্রাধিকার বা Imperial preference নীতির চাপে পড়িয়া ভারতের যুদ্ধোত্তর বিমান চলাচল ব্যবস্থার কি অবস্থা হইবে এখনও তাহা অনুমান করা সম্ভব নহে।

আন্তর্জ্জাতিক বিমান পরিচালন ক্ষেত্রে ইঙ্গ-মার্কিণ প্রতিযোগিতার দৌড় ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। অন্যান্য দেশও নিজ নিজ বিমান চলাচল ব্যবস্থাকে প্রসারিত করিবার আয়োজনে ব্যস্ত। কিন্তু 'ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।' আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, ১৯৪৪ সালের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ভারত গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন সংক্রান্ত দ্বিতীয় রিপোর্টে অসামরিক বিমান ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সাধারণ নীতি ঘোষিত হইয়াছে। ১৯৪৫ সালের ২৪শে মে ভারত গবর্ণমেণ্টের ডাক ও বিমান বিভাগ এক কমিউনিক প্রকাশ করিয়া দেশবাসীকে এই পরিকল্পনার আভাষ প্রদান করেন। যুদ্ধোত্তর অসামরিক বিমান পরিচালন সম্পর্কে যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহাকে মোটামুটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত করা যায়। (১) ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমান-পথের পরিকল্পনা, (২) ভারত হইতে ভারতের বাহিরে যাতায়াতের জন্য বিমানপথের পরিকল্পনা, (৩) বিমানঘাঁটি ও বিমান-পথ নির্ম্মাণ এবং সংগঠন কার্য্যের কর্ম্মসূচী, (৪) বিমান পরিচালন শিক্ষাদান, বিমান রেডিও ব্যবস্থা এবং বিমান সংক্রান্ত পরিদর্শন ব্যবস্থার কর্ম্মসূচী এবং (৫) অসামরিক বিমান বিভাগের হেড কোয়ার্টার্সের সংগঠন ব্যবস্থার পরিকল্পনা।

ভারতের আভ্যন্তরীণ অসামরিক বিমান পরিচালন সংক্রান্ত পরিকল্পনায় করাচী ও কলিকাতার বিমানঘাঁটি হইতে নিঃসৃত প্রধান (trunk) বিমান-পথগুলিতে এবং দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ হইতে নিঃসৃত কতগুলি অনুসঙ্গী বিমান-পথে দৈনিক বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিবার কথা আছে। ভারত হইতে ভারতের বাহিরে যাতায়াতের জন্য বিমান পরিকল্পনায় আপাততঃ সিংহল, ব্রহ্মদেশ এবং আফগানিস্থানে যাতায়াতের জন্য বিমান-পথ খোলার কর্ম্মসূচী গঠিত হইয়াছে। এই দুইটি পরিকল্পনা অনুযায়ী মোট ১১,২০০ মাইল বিমান-পথ খোলা হইবে এবং উহার জন্য মোট তিন কোটি টাকা এককালীন ব্যয় করা হইবে এবং বার্ষিক ব্যয় হইবে আড়াই কোটি টাকা। ১২ হইতে ২০ জন যাত্রী বহন করা যাইতে পারে, এইরূপ বিমান এই সকল বিমান-পথে চলাচল করিবে এবং যাত্রী ব্যতীত ডাক ও মাল বহন করা হইবে। এই সকল বিমান-পথে বিমান চালাইবার জন্য প্রাইভেট ব্যবসায়কে উৎসাহ দিতেই গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু বহুসংখ্যক অযোগ্য বিমান পরিচালন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়া যাহাতে অবাঞ্ছনীয়, অন্‌-অর্থনৈতিক এবং অনিষ্টকর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি না হয় তাহার জন্য একটি লাইসেন্স প্রদানকারী বোর্ড গঠিত হইয়াছে। মূলধন, নিরাপত্তা এবং নির্ভর-যোগ্যতার দিক হইতে বিবেচনা করিয়া এই বোর্ড লাইসেন্স প্রদান করিবেন। কিন্তু কোন বিদেশী কোম্পানীকে লাইসেন্স দেওয়া হইবে না, এমন কোন বিধান আমরা দেখিতে পাইলাম না। বিমান চলাচলের জন্য বিমানঘাঁটি এবং বিমান-অবতরণ ক্ষেত্র অবশ্যই প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় ১১১টি বিমানঘাঁটি এবং বিমান-অবতরণ ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করার কর্ম্মসূচী আছে। নূতন বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণ, পুরাতন অসামরিক বিমানঘাঁটিগুলির পুনর্গঠন বাবদ মোট সাড়ে পনের কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। রেডিও ও রেডিও ষ্টেশনের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে ৬০ লক্ষ টাকা। পরিকল্পনা রচিত হওয়ার সময় বিমান-ঘাঁটি এবং বিমান-পথ পরিচালনের জন্য ৩৪ জন অফিসার এবং ১১০ জন অধীনস্থ কর্ম্মচারী ছিল। ঐ সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ১১০ জন অফিসার এবং ১০০০ জন অধীনস্থ কর্ম্মচারীর প্রয়োজন হইবে বলিয়া পরিকল্পনায় বরাদ্দ করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ বিমান চলাচল ব্যবস্থার পরিকল্পনা অনুযায়ী উপযুক্ত আয়তনের ৩৫ খানা বিমান, ৬০ হইতে ৭০ জন বিমান-নাবিক, ৪০০ হইতে ৫০০ ইঞ্জিনীয়ার ও কুশলী মেকানিক্‌সের প্রয়োজন হইবে। ভারতের বাহিরে বিমান পরিচালন পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে বৃহদায়তনের ১৬ হইতে ২০খানা বিমান এবং ৩০ জন বিমান-নাবিকের।

এই পরিকল্পনা যে শুধু যুদ্ধোত্তর অব্যবহিত কালের জন্য রচিত

ছিল মাত্র ৬৫ জন। ১৯৪৬ সালের জুন মাসে যাত্রীর সংখ্যা ২৩৬ জনে দাঁড়াইয়াছে। মালপত্র বহনের দিক হইতে দেখা যায়, ১৯৪৬ সালের প্রথমার্দ্ধে ২৩,৫৫,৭৫০ টন মাইল মালপত্র বাহিত, হইয়াছিল। ১৯৪৫ সালের প্রথমার্দ্ধে ও দ্বিতীয়ার্দ্ধে যথাক্রমে ৭,৭১,২১০ টন মাইল এবং ১২,৪৭,৭২০ টন মাইল মালপত্র বাহিত হয়।

১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ পর্য্যন্ত মোট ১২৯টি বিমান রেজেষ্ট্রী ও ভারতে আমদানি হইয়াছে। গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত রেজিষ্ট্রী ও ভারতে আমদানি হইয়াছে আরও ১৮৯খানি বিমান। সুতরাং ৩০শে জুন তারিখ পর্য্যন্ত মোট ৩১৮খানি বিমান ভারতে আমদানি হইয়াছে। কমার্শিয়াল 'বী' ক্লাস পাইলটের সংখ্যা ৬২ হইতে বাড়িয়া ১০৫ এবং প্রাইভেট 'এ' ক্লাস পাইলটের সংখ্যা ৫১ হইতে বাড়িয়া ১০০ জন হইয়াছে। যে-সকল অসামরিক বিমানঘাঁটি সামরিক বিভাগকে ব্যবহারের জন্য দেওয়া হইয়াছিল সেগুলি ক্রমে ক্রমে ফিরাইয়া লওয়া হইতেছে। করাচী বিমানঘাঁটি গত ২৫শে জুন অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য পাওয়া গিয়াছে। ভারত গবর্ণমেণ্ট বিমানঘাঁটি নির্ম্মাণের জন্য যে পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন তাহার কাজ শেষ হইলে ১৪৬টি বিমানঘাঁটি অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য পাওয়া যাইবে। তন্মধ্যে ২৭টি বিমানঘাঁটি বর্ত্তমানেই অসামরিক বিমান চলাচলের জন্য পরিচালিত হইতেছে। সামরিক বিমান বিভাগের এবং দেশীয় রাজ্যগুলির কতগুলি বিমানঘাঁটি সর্ত্তাধীনে অসামরিক বিমান অবতরণের জন্য পাওয়া যাইবে।

বহির্বিমান-পথ অর্থাৎ ভারতের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকস্থ দেশ-সমূহের সহিত ভারতের সংযোগ সাধন করিয়া বিমান-পথ সংক্রান্ত পরিকল্পনার কাজ এখনও আলাপ-আলোচনার স্তরই অতিক্রম করে নাই। কলম্বো পর্য্যন্ত বিমান চলিতেছে বটে, কিন্তু রেঙ্গুন ও কাবুলের সহিত সংযোগ সাধন করিয়া বিমান পরিচালনের কোন ব্যবস্থাই এখনও হয় নাই। বর্ত্তমানে বৃটিশ ওভারসী এয়ার-ওয়েজে কর্পোরেশন বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়া বিমান পরিচালন করিতেছে। ইহা ব্যতীত এই কর্পোরেশন ইংলণ্ড হইতে সিঙ্গাপুর এবং সিডনী পর্য্যন্ত বিমান চলাচলের যে ব্যবস্থা করিয়াছে উহার বিমানগুলি যাতায়াতের পথে করাচী ও কলিকাতার বিমান-ঘাঁটিতে নিয়মিত ভাবে অবতরণ করিয়া থাকে। গত ১৪ই নবেম্বর (১৯৪৬) অসামরিক বিমান চলাচল সম্পর্কে ভারত গবর্ণমেণ্টের সহিত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৪৬) বারমুডাতে বৃটিশ যুক্তরাজ্য এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে নীতির দিক হইতে ভারত-মার্কিণ বিমান-চুক্তি অনেকাংশেই তদনুরূপ। বিমানে কি কি বহন করা হইবে তৎসম্পর্কে এবং ভাড়া, শুল্ক, বিমানঘাঁটির ব্যবহার, সংবাদ ও সংখ্যা-তথ্যাদির বিনিময় সংক্রান্ত সর্ত্তাদি এই চুক্তিতে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। কোন্ কোন্ নির্দ্দিষ্ট পথে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিমান চালনা করিবে তাহা চুক্তির তপশীলে স্থান পাইয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী নিম্নলিখিত পথে ভারতের ভিতর দিয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বিমান চালন করিতে পারিবেন :

(১) ১নং বিমান-পথ :—প্যান-আমেরিকান ওয়ার্ল্ড এয়ার-ওয়েজ এই পথে বিমান পরিচালন করিবেন। এই বিমান-পথটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে মধ্য-ইউরোপ ও নিকট-প্রাচ্য হইয়া করাচী, দিল্লী ও কলিকাতা এবং তথা হইতে ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, ইন্দোচীন হইয়া পুনরায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত।

(২) ২নং বিমান-পথ :—ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ার লাইন্স এই পথে বিমান পরিচালন করিবেন। এই পথটি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে পশ্চিম-ইউরোপ, উত্তর-আফ্রিকা এবং নিকট-প্রাচ্য হইয়া বোম্বাই, বোম্বাই হইতে কলিকাতা এবং তথা হইতে ব্রহ্মদেশ, ইন্দোচীন, চীন, ও জাপান হইয়া প্রশান্ত মহাসাগরের পথে পুনরায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত। এই পথেরই একটি শাখা বোম্বাই হইতে সিংহল, সিংহল হইতে সিঙ্গাপুর হইয়া যাইবে।

উভয় দিক্ হইতেই এই দুই পথে বিমান যাতায়াত করিতে পারিবে। যে পর্য্যন্ত না বোম্বাইয়ে কোরেণ্টাইনের সুব্যবস্থা হয় সে পর্য্যন্ত ট্রান্সওয়ার্ল্ড এয়ার লাইনসের বিমান প্রথমে করাচীতে অবতরণ করিবে এবং করাচী হইতে যাইবে বোম্বাইয়ে। ভারত গবর্ণমেণ্টের অসামরিক বিমান বিভাগের ডিরেক্টার জেনারেল স্যার ফ্রেডাবিক টাইমস্ এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন, এই চুক্তির জন্য কথাবার্ত্তা ১৯৪৫ সালের আগষ্ট হইতে সুরু হইয়াছিল এবং অন্তর্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত না হইলে এই ধরণের চুক্তি সম্পাদিত হইত না। অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনা করিয়া এই চুক্তি সম্পাদিত হইতে পাঁচ সপ্তাহ লাগিয়াছে। চিকাগো আন্তর্জ্জাতিক বিমান-সম্মেলনে যে চুক্তি হইয়াছে তদনুসারে মার্কিণ বিমান ভারতের উপর দিয়া উড়িয়া যাইতে পারে। ভারত-মার্কিণ বিমান-চুক্তি দ্বারা মার্কিণ বিমানকে ভারতে অবতরণ এবং যাত্রী গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। এক বৎসরের নোটিশ দিয়া এই চুক্তি বাতিল করা যাইবে। নানা প্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও আগামী দুই-এক মাসের মধ্যেই ভারত-মার্কিণ বিমান-চুক্তিতে নির্দ্ধারিত পথে বিমান চলাচল আরম্ভ হইবে বলিয়া প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নিজস্ব প্রতিনিধি মিঃ ব্রনেল আশা প্রকাশ করিয়াছেন।

ভারত-মার্কিণ বিমান চুক্তির একটা বিশেষত্ব এই যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে তাহার পৃথিবী-বেষ্টনকারী বিমান-পথেই শুধু ভারতে বিমান অবতরণ এবং যাত্রী গ্রহণের অধিকার দেওয়া হইয়াছে। শুধু ভারত এবং ভারত ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী কোন দেশে যাতায়াতের বিমান-পথ খুলিবার অধিকার দেওয়া হয় নাই। আমেরিকাও যে এই চুক্তিতে বেশ লাভজনক সুবিধা পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, এই চুক্তি দ্বারা আমেরিকা ভারতের প্রতিবেশী-দেশ সিংহল ও ব্রহ্মদেশের যাত্রী গ্রহণের অধিকার পাইয়াছে। ভবিষ্যতে ভারতের নিজস্ব বহির্বিমান-পথ যখন ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রসারিত হইবে, তখন আমেরিকার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ না হইয়া পারিবে কি? বিমান-পথ সম্বন্ধে ভারতের নিকট যে সকল সুবিধা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পাইয়াছে ভারতবর্ষও মার্কিণ-যুক্তরাষ্ট্র পর্য্যন্ত বিমান পরিচালনের জন্য অনুরূপ সুবিধা পাইবে এবং তৎসংক্রান্ত সর্ত্তাদি পরে নির্দ্ধারিত হইবে। বর্ত্তমানে ভারতের বিমান পরিচালনের যে অবস্থা তাহাতে ভারতের দিক্ হইতে এই সর্ত্তের কোন কার্য্যকরী মূল্য নাই। ভারত কবে যে আমেরিকা পর্য্যন্ত বিমান চালনা করিতে পারিবে আজ তাহা অনুমান করাও অসম্ভব বলিলে একটুকুও ভুল বলা হয় না। ভারতের নিজস্ব আভ্যন্তরীণ বিমান পরিচালন ব্যবস্থারই এখন পর্য্যন্ত উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি হয় নাই। বহির্বিমান-পথ

তুরঙ্গ-নদী

জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী

শুনেছি তোমার কলকল হ্রেষা দুই কূলভাসা শ্রাবণের রাতে
হে নদি ! তুমি যে পাহাড়ের ঘোড়া আমাদেরি নীল সমতল খাতে,
জেনেছি ;
ঘুম ভেঙ্গে গেছে ধ্বনিত পায়ের খুরে উচ্ছল ঘাত-প্রতিঘাতে,
মর্ম্মর-পাওয়া নিবিড় প্রহরে তোমারে বন্য তুরঙ্গ বলে
মেনেছি।

তোমার ঢেউয়ের বাদামি ঝুঁটিতে কতো স্বপ্নেরা হ'ল গুঁড়োগুঁড়ো—
কতো কাল ধ'রে কতো জনপদ বন্দর চুড়ো
কতো উঁচু নিচু সেতুর লাগাম শ্লথ হয়ে গেল,
কতো বাঁক ঘুরে কতো আকাশের ছায়ারা মিলালো ;
তোমার ওষ্ঠ ভ'রে ভ'রে গেল পুঞ্জ ফেনায়—
তবু থামবে না ?

কাঁকর-বালুকা-বন্ধুর পথ পায়ে কুটি কুটি,
তোমার ছুটার তবু নেই ছুটি ?
তবু থামবে না ?

তুরঙ্গ-নদি ! সওয়ার তোমার হারালে কোথায় ?
কোন্ মোহানায় ? কোন্ সমতলে ? বালুর চড়ায় ?
কবে সে ?
আকাশে ঝড়ের সাইরেণে যদি পথ ভুলে যাও, না পোহায় রাত
তবে যে
দিশাহারা হবে, তবে হায়,
ঢালু দেশ বেয়ে কতো কাল বলো কতো কাল বলো ছুটবে ?
কোথায় ?

এ ঘোড়-দৌড় শেষ হয়ে গেলে ফিরে যাবে না কি ?
গৌরীশৃঙ্গ-গুহায় যেখানে তুষার-শুভ্র তিব্বতী পাখি
মেরুন্ চোখেরে কাঁদায়—
হায়,
ফিরে যাবি না কি ?
অথবা, খুঁজবে উষ্ণ আঁধারে
আরো জীবনের সামনে-তাকানো আলোর পরীধি ?
তুরঙ্গ-নদি ?

সম্পর্কে প্রথমে তাহাকে মধ্য-প্রাচী, মালয়, এবং চীন পর্য্যন্ত বিমান চালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহার পরবর্ত্তী স্তরে ইউরোপ পর্য্যন্ত বিমান পরিচালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমেরিকা আসিবে সর্ব্বশেষে। আমাদের বিমান পরিচালনের ব্যবস্থা যদি এইরূপ 'গয়ংগচ্ছ' অবস্থায় চলিতে থাকে, তাহা হইলে আমরা আমেরিকা পর্য্যন্ত বিমান চালাইতে সমর্থ হইব তাহা অনুমান করা সম্ভব নয়।

অসামরিক বিমান বিভাগের ডিরেক্টারের দপ্তর হইতে প্রচারিত ইস্তাহারে গত ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ছয় মাসে ভারতে অসামরিক বিমান পরিচালন ব্যবস্থার অগ্রগতির যে পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে প্রথম দৃষ্টিতে তাহা চমকপ্রদ বলিয়াই মনে হয় বটে। কিন্তু ভারতের মহাদেশ তুল্য বিস্তৃতি, ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার উন্নতির বিপুল সম্ভাবনা এবং অন্যান্য দেশে গত কয়েক বৎসরে অসামরিক বিমান পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির কথা বিবেচনা করিলে ভারতের অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার এই অগ্রগতি যে অতি নগণ্য, এমন কি ভ্রূণাবস্থাই যে অতিক্রম করে নাই, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কানাডায় ১৯৪৩ সালেই ২৪৭টি অসামরিক বিমান চলাচল করিত। ভারতে ১৯৪৬ সালের ৩০শে জুন পর্য্যন্ত ৩১৮টি বিমান আমদানি হইলেও মাত্র ২৫খানি বিমান অসামরিক বিমান-পথগুলিতে চলাচল করিতেছে। ইহার কোন কারণ সত্যই খুঁজিয়া পাওয়া যায় কি? অসামরিক বিমান-পথ দ্বারা ভারতের মাত্র ১২টি বড় বড় সহরের মধ্যে সংযোগ-সাধন করা হইয়াছে। যুদ্ধোত্তর অসামরিক বিমান পরিকল্পনার লক্ষ্যস্থল মাত্র ১৭০ লক্ষ টন মাইল। তন্মধ্যে মাত্র ৬৫ লক্ষ টন মাইল এ পর্য্যন্ত খোলা হইয়াছে। ভারতের অভ্যন্তরে প্রস্তাবিত অসামরিক বিমান-পথগুলি খুলিতেই বা এত বিলম্ব হইতেছে কেন? ভারতীয় অসামরিক বিমান চলাচল-পথ দ্বারা বিদেশের সহিত সংযোগ সাধনের ব্যবস্থা এখনও আলাপ-আলোচনার স্তরই বা কেন অতিক্রম করে নাই? অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের কোথায় কোন্ স্বার্থের সজ্ঘাত ভারতীয় অসামরিক বিমান পরিচালনার উন্নতির পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে? এত দিন ভারতের অসামরিক বিমান পরিচালন ব্যবস্থা উপেক্ষিত হইয়া আসায় যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে হইলে অতি দ্রুত বিমান পরিচালন ব্যবস্থা প্রসারিত করা আবশ্যক। নতুবা ভারত তাহার আভ্যন্তরীণ বিমান পরিচালনেও বৈদেশিক প্রতিযোগিতার সম্মুখে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের আভ্যন্তরীণ বিমান পরিচালন ব্যবস্থা ভারতীয় রেলপথের প্রতিযোগী হওয়ার আশঙ্কাও উপেক্ষার বিষয় নয়। কাজেই ভারতের অসামরিক বিমান চালন ব্যবস্থা বেসরকারী ব্যবসা হিসাবে পরিচালিত হইতে দেওয়া সঙ্গত কি না, তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। অসামরিক বিমান-পথকে একটি সরকারী বিভাগের মত পরিচালনের জন্য ভারত গবর্ণমেণ্টকে সুপারিশ করিয়া সর্দ্দার মঙ্গল সিং কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের শারদীয় অধিবেশনে এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া এইরূপ ঝুঁকিপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণে সরকারকে তাড়াতাড়ি বাধ্য না করিবার জন্য পরিষদকে অনুরোধ করেন। যানবাহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সচিব সর্দ্দার আবদুর রব নিস্তার বিমান চলাচল ব্যবসা সম্পূর্ণরূপে বেসরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে ছাড়িয়া দেওয়া এবং বিমান চলাচল ব্যবসায়ের লাভের টাকা কোন ব্যক্তি বা কোম্পানীর তহবিলে যাওয়া সঙ্গত নহে বলিয়া ব্যক্তিগত ভাবে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার এ সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখিবার সময় পান নাই বলিয়া তিনি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন। সর্দ্দার মঙ্গল সিং তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের সমস্যা তাহাতে একটুকুও সহজ হইয়াছে বলিয়া মনে করিবার কারণ নাই।

২৯

দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী
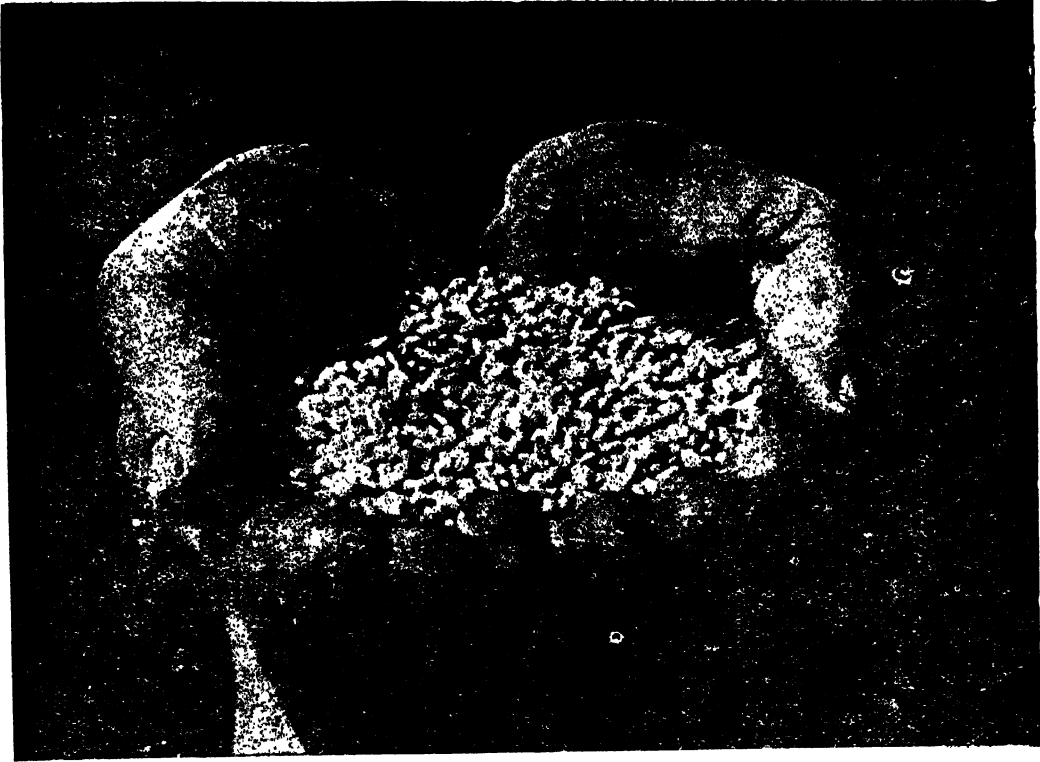
কন্যাকে বাড়ী থেকে সরিয়ে দেওয়ার পর ওয়াঙ চিন্তামুক্ত হোল। এক দিন সে খুড়োকে বললে—'আপনি আমার বাবার ভাই। এই নিন আপনার জন্য একটু তামাক এনেছি।' ওয়াঙ আফিংয়ের জার খুললে। ভিতরের আঠাল পদার্থ থেকে ভুর ভুর করে মিষ্টি গন্ধ বার হচ্ছে। খুড়ো খানিকটা হাতে নিয়ে গন্ধ শুঁকলেন। খুশীতে তার মন ভরে উঠল। হাসি-মুখে বললেন তিনি—'আগে একটু-আধটু এ তামাক খেয়েছি। বেশী খাইনি—বড্ড দামী। এ আমার ভারী পছন্দ।'

ঔদাসীন্যের ভাণ করে ওয়াঙ জবাব দিলে—'বাবা যখন বুড়ো হলেন তাঁর জন্যে খানিকটা কিনে এনেছিলাম। রাতে তখন তার ঘুম হোত না। আজ দেখি যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। ভাবলাম—'বাবার ভাই রয়েছেন। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে ছোট। আমার যখন এ-সবের প্রয়োজন নেই তখন তাঁরই ত খাওয়া উচিত।' আপনি খাবেন যখন ইচ্ছে হবে অথবা যখন ব্যাথা-ট্যাথা বোধ করবেন তখন।'

ওয়াঙের খুড়ো ক্ষুধিতের মত গ্রহণ করল আফিংয়ের বড়ি। বেশ মিষ্টি গন্ধ। এ একমাত্র বড় লোকেরাই খেতে পারে। খুড়ো আফিং খান আর সারা দিন বিছানায় শুয়ে ঝিমোন। ওয়াঙ অনেক-গুলো পাইপ কিনে এনে এখানে-সেখানে রেখে দিল এবং এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে-ও আফিং খায়। কিন্তু সে শুধু একটা পাইপ নিজের ঘরে এনে রেখে দিল। নিজের ছেলেদের আর কমলিনীকে সে আফিং স্পর্শ করতে দিলে না। তাদের বললে—'বড্ড দামী।' খুড়ী আর তার ছেলেকে কিন্তু আফিং খাওয়ার লোভ দেখাতে লাগল। সারা বাড়ী আফিংয়ের মিষ্টি গন্ধে আবিল হয়ে থাকে। এর জন্য যে রূপো খরচা হয় তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না ওয়াঙ। কারণ এ শান্তি এনেছে বাড়ীতে।

শীত যতই শেষ হচ্ছে জলও ততই সরছে। এখন আর চারদিক ঘুরে-ঘুরে জমিজমা তদারক করার কোন অসুবিধা নেই ওয়াঙের। এক দিন ক্ষেতে যাবার সময় বড় ছেলে তার পিছু নিল। বেশ গর্বের সঙ্গে সে বললে বাপকে—'এ বাড়ীতে আর একটি হাঁ বাড়ল। তোমার নাতির হাঁ।'

এ কথায় ওয়াঙ ফিরে দাঁড়াল। হাসি-মুখে বললে 'চমৎকার খবর—বাঃ!'

হেসে ওয়াঙ চীংয়ের খোঁজে চলে গেল। তাকে বাজারে পাঠাতে হবে কিছু মাছ আর ভাল খাবার কিনে আনতে। খাবার এলে ছেলের বৌকে দিয়ে বললে ওয়াঙ—'খেয়ে আমার নাতির মরদ বাড়াও।'

সারা বসন্ত এ সুখ-কল্পনায় মন ভরে রইল। কাজের ভিড়েও ওয়াঙ ভাবে সে কথা। মন যখন চিন্তাক্লিষ্ট হয় তখনও মনে পড়ে। শান্তি আসে মনে।

বসন্তের শেষে গ্রীষ্মের আগমনের সঙ্গে-সঙ্গে বন্যার সময় যারা চলে গিয়েছিল আবার তারা ফিরে আসতে লাগল দলে দলে। শীতে ক্লান্ত পর্যুদস্ত তারা। এক দিন যেখানে তাদের কুঁড়েগুলি শোভা পেত এখন সেখানে হলদে কাদা আর ভিজে মাটি ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। তবু গাঁয়ে ফিরে আসার আনন্দ! এই কাদা থেকে আবার ঘর তোলা যাবে—হাউনির জন্য চাটাইও এনেছে তারা। অনেকে ওয়াঙের কাছে এল টাকা ধার করতে। ওয়াঙ টাকা দিল

খুব চড়া সুদে। এখন টাকার চাহিদা খুব বেশী আর প্রত্যেক ক্ষেত্রে ওয়াঙ জামিনস্বরূপ জমি বন্ধক রাখতে লাগল। এই ধার-করা অর্থে বীজ কিনে মাটিতে বোনা হোল। পলি-জমা উর্বরা মাটি। তার পর বলদ, আরো বীজ-ধান, আর লাঙ্গল কেনার জন্য আরো টাকার দরকার হোল। কিন্তু আর ধার করবার মত সামর্থ্যও রইল না কারুর। তখন অনেকে সমস্ত জমি-জমা বিক্রী করে দিল। কেউ বা কিছুটা অংশ বিক্রী করলে, তবু ত বাকী অংশেতে বীজ বুনতে পারবে। এই ভাবে ওয়াঙ অনেক জমি কিনে ফেলল, কিনল খুব সস্তায়। কারণ টাকা লোকের চাই-ই।

কিন্তু কেউ কেউ কিছুতেই জমি বিক্রী করবে না। যখন বলদ, লাঙ্গল আর বীজ কেনার পয়সা রইল না তারা ঘরের মেয়েদের বিক্রী করে দিল। অনেকে ওয়াঙের কাছেও এল। ওয়াঙ এখন ধনী, ক্ষমতাশালী—হৃদয়বান্ লোক।

যে শিশুটি তার গৃহে আসছে এবং অন্য ছেলেদের বিয়ে হলে আরো যারা আসবে তাদের সবার কথা চিন্তা করে ওয়াঙ পাঁচটি দাসী কিনল। দু'টির বয়স বার—দীর্ঘ পা, বলিষ্ঠ আঁট-সাঁট গড়ন তাদের। আর দু'টি কচি মেয়ে—এটা-ওটা ফাই-ফরমাস খাটার জন্য। আর একটি রইল কমলিনীর জন্য। কারণ কোকিলা এখন বুড়ী হয়ে পড়েছে, আর দ্বিতীয় মেয়েটি যাবার পর থেকে ঘরের কাজ-কর্ম্ম করবার লোকের বড় অভাব। এক দিনেই ওয়াঙ পাঁচটিকে কিনল। একবার যা সংকল্প করবে তা তক্ষুনি করবার মত এখন ক্ষমতা হয়েছে ওয়াঙের।

এর অনেক দিন পরে একটি লোক এল তার সাত বছরের কচি মেয়েটিকে বিক্রী করতে। ওয়াঙ প্রথমে কিছুতেই রাজী হোল না—কারণ বড় ছোট আর নির্জীব মেয়েটি। কিন্তু তাকে দেখে কমলিনীর ভারী মনে ধরল—সে বললে আবদারের সুরে—'এটিকে আমার চাই-ই। চমৎকার সুন্দর মেয়েটি। যেটি আছে সেটি যেমন জংলী আর গায়েতে ছাগলের মত গন্ধ। একটুও পছন্দ হয় না তাকে।'

ওয়াঙ তাকাল বালিকাটির দিকে—তার ভীরু চারু চোখের দিকে। করুণ শীর্ণতা। ওয়াঙ কিছুটা কমলিনীকে খুশী করবার জন্য আর কিছুটা বালিকাটির যাতে এখানে ভাল খেয়ে দেয়ে হাড়ে মাংস লাগতে পারে সেই ভেবে বললে—'বেশ, তোমার যখন ইচ্ছা তাই হোক।'

অতএব ওয়াঙ কুড়িটি রূপোর বিনিময়ে কিনল মেয়েটিকে। অন্দর মহলে থাকে সে। রাত্রে কমলিনীর খাটের নীচে ঘুমোয়।

এবার ওয়াঙের মনে হোল বাড়ীতে শান্তি এসেছে। জল নেমে গেছে। খরার মাস সুরু হয়েছে। জমিতে বীজ রোপণ করতে হবে। সে ঘুরে-ঘুরে প্রত্যেকটি খুঁটি-নাটি ব্যাপার নিজে পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। চীংয়ের সঙ্গে প্রত্যেকটি জমির উর্বরতা নিয়ে আলোচনা করতে লাগল—জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য ফসলের কি তারতম্য হবে তা নিয়ে গবেষণা করলে নিজেদের মধ্যে। ওয়াঙ যখনই জমির তদারকে যায় ছোট ছেলেকেও সঙ্গে নেয়। ওয়াঙের পর তাকেই ত এ সব দেখতে হবে। ছেলেটি তার কথা কতখানি শুনছে—আদৌ শুনছে, না শুনছে না, সেদিকে ওয়াঙ একবারও নজর দেয় না। ছেলেটি মুখ নীচু করে গম্ভীর মুখে বাপের পিছনে পিছনে যায়—কী ভাবে সে কেউ জানে না।

কিন্তু ওয়াঙ চেয়েও দেখে না ছেলে কি করে। ও কেবল নিঃশব্দে বাপের অগ্রগামী হয়। সমস্ত পরিকল্পনা সমাপ্ত হলে ওয়াঙ খুশী হয়ে বাড়ী ফিরল। মনে মনে বললে—'আমারও ত বয়স হয়েছে। নিজের হাতে আর আমার কিছু করবার দরকার নেই। আমার জমিতে খাটবার লোক আছে, আমার ছেলেরা রয়েছে—ঘরে শান্তি বাঁধা পড়েছে।'

কিন্তু তবু ঘরে শান্তি কোথায়? ছেলের বিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেকের জন্যে সেবাদাসী কিনে দিয়েছে, খুড়ো আর খুড়ীমাকে সারা দিন নেশায় বিভোর হয়ে থাকার জন্য আফিং কিনে দিয়েছে—তবুও শান্তি নেই বাড়ীতে। বড় ছেলে আর খুড়োর ছেলের জন্য বাড়ীর শান্তিতে আবার কাঁটা পড়ল।

ওয়াঙের বড় ছেলে তার খুড়োর ছেলের প্রতি বিদ্বেষ ভাব কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারে না—তার কুকীর্ত্তি সম্বন্ধে তার সন্দেহও ঘোচে না। যৌবনে তার অনেক কুকাজের সাথী সে। ব্যাপারটা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে, খুড়তুত ভাই বাড়ী থেকে না বের হলে সে-ও কিছুতেই বাড়ী ছেড়ে কোথাও যাবে না—এমন কি চায়ের দোকানেও নয়। ওর হাল-চালের উপর সে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে—ও বাড়ী থেকে বের হলে সে-ও বের হয়। ও যে ঝিয়েদের মেয়েদের সঙ্গে কুকাজ করে এ সম্বন্ধেও তার মনে গভীর সন্দেহ। কমলিনীর সঙ্গেও সে হয়ত অসৎ সম্পর্ক পাতিয়েছে। যদিও এ সংশয় তার অমূলক। কারণ যতই দিন যাচ্ছে, বয়স বাড়ছে,—কমলিনীও ততই মুটিয়ে যাচ্ছে। মদ আর খাবার ছাড়া আর কোন কিছুর প্রতিই এখন তার কোন আকর্ষণ নেই। ছেলেটি যদি তার কাছেও ঘেঁসে তবু ভুলেও সে দৃকপাত করবে না তার প্রতি। আজকাল ওয়াঙও যত কম তার কাছে আসে ততই যেন সে খুশী হয়।

ছোট ছেলেকে নিয়ে ওয়াঙ মাঠ থেকে ফিরলে, বাপকে এক পাশে ডেকে বড় ছেলেটি বললে—'ওই ছোঁড়াটাকে আর আমি কিছুতেই এ বাড়ীতে থাকতে দেব না। রাত-দিন উঁকি-ঝুঁকি মারে—জামার বোতাম খুলে খালি-বুকে ঘুর-ঘুর করে বেড়ায়—দাসীদের প্রতি সব সময় নোংরা নজর দেয়।' এমন কি, তোমার মেয়েমানুষের দিকেও উঁকি মারে'—একথা মনে এলেও মুখ ফুটে বলতে সাহস করলে না। কারণ এক সময় সে নিজেও ত তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এ সব কথা মনে হতেই ঘৃণায় তার সারা দেহ রী-রী করে উঠল। এই মোটা মেয়েমানুষটিকে দেখে আজ সে স্বপ্নেও ভাবতে পারে না যে, কোন দিন সে এমন কাজ করেছিল। অত্যন্ত লজ্জা হোল নিজের আচরণের জন্য। এখন আর কোন মতেই বাপকে সে সব মনে করিয়ে দেওয়া চলবে না। তাই সে কমলিনীর বিষয় চেপে গিয়ে শুধু দাসীদের কথাই উল্লেখ করলে।

ওয়াঙ তখন সতেজ মন নিয়ে ফিরেছে মাঠ থেকে। ক্ষেতের জল নেমে গেছে দেখে মনে স্ফূর্তি। বাতাসে তপ্ততার আমেজ। আর ছোট ছেলে সঙ্গে গিয়েছিল বলে মনে আরো খুশী। কাজেই এখন সংসারে এই নতুন অশান্তির সূচনায় সে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হোল।

—'তুমি বোকার মত রাত-দিন শুধু এ সব কথা ভাব। অত্যন্ত বৌ-ন্যাওটা হয়ে পড়েছ তুমি। এ ত ভাল নয়। সংসারের সব কিছু ছেড়ে দিয়ে রাত-দিন শুধু বৌকে নিয়ে থাকা একটুও ভাল দেখায় না। বৌয়ের প্রতি এই অতি-আসক্তি পুরুষমানুষের ভাল দেখায় না।'

পিতার এই ভৎর্সনায় অত্যন্ত আহত হোল ছেলেটি। লোকে হয়ত তাকে অভদ্র, অতি সাধারণ মনে করবে সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি সে বললে—'আমার বৌয়ের জন্য নয়। আমার বাবার বাড়ীতে এর কম কদাচার শোভন নয় বলেই আমি বলছি।'

কিন্তু তার কথা ওয়াঙের কানে গেল না। রাগে গর-গর করতে করতে বললে সে—'ও-সব মেয়ে-ঘটিত ব্যাপার নিয়ে এখনও কি আমায় মাথা ঘামাতে হবে? আমি বুড়ো হ'তে চলেছি—রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। অন্ততঃ লালসা থেকে খালাস পেয়েছি আমি। এখন আমার একটু শান্তি চাই। আমায় কি ছেলের ঈর্ষা আর লালসা নিয়ে এখনও মাথা ঘামাতে হবে?'

একটুক্ষণ চুপ করে থাকার পর আবার বললে ওয়াঙ—'বেশ, আমায় কি করতে বল?'

বাপের রাগ পড়ার জন্য অনেকক্ষণ অপেক্ষা করলে ছেলেটি। বাপ যখন জোর গলায় বললেন—'কি করতে হবে আমায়'—সে স্পষ্ট বুঝতে পারলে তার মনের গতি। দৃঢ় কণ্ঠে উত্তর দিলে ছেলেটি—'আমার ইচ্ছা এ বাড়ী ছেড়ে সহরে গিয়ে থাকি। চাষাদের মত চিরকাল গ্রামে পড়ে থাকা ভাল দেখায় না। তোমার খুড়ো খুড়ী আর খুড়তুত ভাইকে এ বাড়ীতে রেখে আমরা নির্বিঘ্নে সহরে গিয়ে থাকতে পারি।'

ওয়াঙ হাসল। তিক্ত হাসি। ছেলের কথার যুক্তি তার মনকে স্পর্শ করতে পারলে না।

টেবিলের উপর বসে, পাইপটাকে সামনে ধরে বলিষ্ঠ কণ্ঠে বললে ওয়াঙ—'এ বাড়ী আমার—ইচ্ছা হলে থাকবে এখানে, না হলে থেক না। এ আমার বাড়ী—আমার জমি-জমা। এই জমি-জমা না থাকলে আমাকেও সকলের মত অনশনে মরতে হোত। বিদ্বান লোকের মত দামী পোষাক পরে থাক—একবারও মাঠে ঘুরে আসার সময় হয় না তোমার। চাষীর ছেলের চেয়ে বেশী যা কিছু পেয়েছ তা এই মাটিরই কল্যাণে, তা ভুলে যাও কেন?'

ওয়াঙ উঠে সশব্দে ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। দৃঢ় ভংগীতে যেন বাজতে লাগল তার মনের কঠিনতা। মেঝেতে থুথু ফেলে ওয়াঙ চাষীর মতই আচরণ করতে লাগল। মনের এক দিক ছেলের অভিজাত সংস্কৃতির গর্বে দৃপ্ত কিন্তু আর এক দিকে যে বলী কিষাণ বাস করে সে ছেলের ধারণাকে করে ঘৃণা। মনের এই বৈষম্যের কথা জানা থাকলেও পুত্রের গর্বে গর্বিত ওয়াঙ। গর্বিত, কেন না এ ছেলেকে যে দেখেনি সে স্বপ্নেও ভাবতে পারবে না যে এক পুরুষেই ওয়াঙ তার মাটি থেকে কতখানি সরে এসেছে।

কিন্তু ছেলে অত সহজেই নতি স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়। সে বাপের পিছু যেতে যেতে বলল—'সহরের হোয়াং-পরিবারের বিরাট বাড়ী পড়ে রয়েছে। সামনের মহলটা যত সব বাজে লোকে ভর্তি হলেও ভিতর মহল তালা-চাবি দেওয়া শূন্য পড়ে আছে। আমরা সেটা ভাড়া নিয়ে সেখানে শান্তিতে বাস করতে পারি। ছোট আর তুমি মাঝে-মাঝে সেখান থেকে এসে জমি-জমা তদারক করতে পারবে। তাহলে এই কুকুরটাকে নিয়ে আর আমাকে মাথা গরম করতে হয় না'—বাপকে বোঝাতে লাগল ছেলে। চোখ জলে ভরে উঠতে দিল—গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে দিল। সে মুছলে না চোখের জল। আবার সে বললে—'আমি ভাল ছেলে হতে চেষ্টা করি। আফিং খাই না, জুয়াও খেলি না। যে মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছ তাকে নিয়েই আমি সন্তুষ্ট। তোমার কাছে এই আমার সামান্য প্রার্থনা—আর কিছু চাই না।'

শুধু চোখের জলেই ওয়াঙ বিচলিত হোত কি না বলা যায় না, তবে ছেলের মুখে হোয়াং-প্রাসাদের উল্লেখে সে সত্যই বিচলিত হয়ে পড়ল।

এ কথা ওয়াঙ কোন সময়েই ভোলেনি যে, এক দিন মাথা নত করে সেই প্রাসাদে তাকে যেতে হয়েছিল। যারা সেখানে বাস করত তাদের সামনে অভাজনের মত দাঁড়িয়েছিল সে। এমন কি দারোয়ানকে দেখে পর্য্যন্ত সে ভয় পেয়েছিল। এই লজ্জার স্মৃতি তার মনে দাগ রেখেছে। যখনই মনে পড়ে সে কথা ঘৃণায় ভরে ওঠে মন। সহরে যারা বাস করে তাদের চেয়ে সে যে নীচ স্তরের মানুষ এই বোধ ওয়াঙকে চিরদিন পীড়া দিয়ে এসেছে। মনে পড়ে যেদিন খুড়ীমা'র সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল সে, এই লজ্জা যেন তাকে বিপর্যস্ত করেছিল। 'আমরা ত সে বাড়ীতে থাকতে পারি,'—বড় ছেলের মুখে এ কথা শুনেই এর সম্ভাব্য পরিস্থিতির কথা এত দ্রুত এল তার মনে যে সত্যি সত্যিই ওয়াঙ সেখানে যেন বাস করছে এ দৃশ্য চোখের সামনে দেখতে পেল। 'বুড়ো কর্তা যে-আসনে বসতেন সে-আসনে আমি বসতে পারব—যে-আসন থেকে তিনি আমায় নফরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে আদেশ করেছিলেন সেখানে বসব আমি। তেমনি ভাবেই আর এক জনকে ডেকে পাঠাব।' সুখ-স্বপ্নে মন কাঁপতে লাগল। নিজের মনে-মনেই বললে ওয়াঙ—'ইচ্ছা হলে এ অক্লেশে করতে পারি আমি।'

বসে বসে নিঃশব্দে এই ভাবনা নিয়ে খেলা করতে লাগল ওয়াঙ। ছেলের প্রশ্নের কোন জবাব দিলে না। পাইপে তামাক ভরে আগুন ধরিয়ে টানতে লাগল ওয়াঙ আর ইচ্ছা হলে কি করতে পারে তারই স্বপ্ন দেখতে লাগল। নিজের ছেলের জন্য নয়—খুড়োর ছেলের জন্যও নয়—সে স্বপ্ন দেখতে লাগল যেন সে হোয়াং-প্রাসাদে বাস করতে পারে। ওয়াঙের চোখে সে প্রাসাদ চিরদিনই রাজপুরী।

এই বাসা বদলে মূলতঃ ইচ্ছা না থাকলেও বা সংসারে কোন পরিবর্তন করার অভিলাষ না থাকলেও খুড়োর ছেলের অলস বেকার দিনযাপন ক্ষুব্ধ করল তাকে। সতর্ক দৃষ্টি রেখে ওয়াঙ দেখলে যে সত্যিই দাসীদের উপর ছেলেটির লুব্ধ নজর। ওয়াঙ ভাবল মনে মনে—'না, এ লালসা-পরায়ণ কুকুরটাকে নিয়ে এক বাড়ীতে বাস করা চলবে না।'

খুড়োর দিকে তাকিয়ে দেখলে ওয়াঙ। আফিং খেয়ে তার চেহারা শীর্ণ—গায়ের রং হলদে। কুঁজো হয়ে পড়েছেন তিনি। খুড়ীর দিকেও তাকাল ওয়াঙ—বেঁটে বেলুনের মত হয়েছেন তিনি। আফিংয়ের প্রতি তারও লোভ অসীম। আফিংয়ের নেশায় তিনি চুর হয়ে থাকেন—ঝিমোন রাত-দিন। এদের দিক থেকে আর গোলমালের কোন আশংকা নেই। ওয়াঙের যা মনোগত বাসনা ছিল আফিংএ সে কাজ হাসিল হয়েছে।

কিন্তু খুড়োর ছেলের এখনও বিয়ে হয়নি—লালসায় সে বন্য পশু। বুড়ো বুড়োর মত সহজে সে আফিং ধরবে না—তার নোংরা আসঙ্গ-লিপ্সাকে নেশার স্বপ্নে আবিল হতে দেবে না সহজে। সে যে-সব কাচ্চা-বাচ্চার জন্ম দেবে তাদের কথা ভেবে ওয়াঙ কিছুতেই তার

বিয়ে দিতে রাজী নয়। তার মত একটিতেই রক্ষে নেই। ছেলেটি কাজ করে না, তার সে প্রয়োজনও নেই। আর তাকে কাজ দেবেই বা কে? কাজের মধ্যে রাতে সে কয়েক ঘণ্টা ঘুর-ঘুর করে পাহারা দেয়—সেইটুকুকেই যদি কাজ বলে ধরা যায়। কিন্তু পাহারা দেওয়ার প্রয়োজনও ক্রমশঃ কমে আসছে। মানুষ যতই নিজেদের ভিটে-মাটিতে ফিরে আসছে সহরে গাঁয়ে শৃংখলাও তত ফিরে আসছে। ডাকাতের দল উত্তর-পশ্চিমের বনে পাহাড়ের দিকে সরে গেছে। গ্রামের লোকেরা তাদের সঙ্গ নিল না—ওয়াঙের প্রাচুর্যের খুদকণা খেয়ে এখানেই মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পছন্দ করলে তারা। সুতরাং ছেলেটি এ সংসারের কাঁটা হয়ে উঠল। তার দিন কাটে খোস-গল্পে—হাই তুলে গড়িমসি করে। দুপুরের দিকেও সে সেজে-গুজে তৈরী হয়ে থাকে।

এক দিন সহরে ধানের দোকানে দ্বিতীয় ছেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়ে ওয়াঙ বলল তাকে—'তোমার দাদার ইচ্ছা, সহরের ঐ বাড়ীর কিছুটা ভাড়া নিয়ে সবাই সেখানে চলে আসি। তোমার কি মত?'

দ্বিতীয় ছেলেটিও জোয়ান হয়ে উঠেছে। তারও চেহারায় এসেছে মসৃণতা—দোকানের অন্য কেরাণীদের মত সেও ফিট-ফাট। ওয়াঙের এই ছেলেটি মাথায় ছোট, গায়ের রং হলদে। চোখে ধূর্ত চাউনি। শান্ত স্বরে সে জবাব দিল—'এ ত খুব চমৎকার কথা। এতে আমারও খুব সুবিধে হবে। আমিও তাহলে বিয়ে করে বৌ ঘরে আনতে পারব। মস্ত পরিবারের মত সবাই এক পুরীতে সুখে থাকতে পারব।'

ওয়াঙ এত দিন এই ছেলেটির বিয়ের জন্য কিছুই করেনি। এ ছেলেটি শান্ত, এর রক্তে যৌবন উচ্ছৃংখলতা আনতে পারেনি। ওয়াঙ নানা বিষয়ে ব্যস্ত থাকাতে দ্বিতীয় ছেলেটির প্রতি তার যথার্থ কর্তব্য সে করতে পারেনি। তাই কিছুটা লজ্জার সঙ্গে বললে সে—'অনেক দিন ধরেই ভাবছি তোমার বিয়ের কথা। এটা-ওটা নিয়ে বিব্রত থাকায় আর হয়ে ওঠেনি—তা ছাড়া গেল সন যা দুর্ভিক্ষ গেল—তার মধ্যে খাওয়ান-দাওয়ান উৎসব কিছুই করা যেত না। এবার লোকের খাবার মত অবস্থা হয়েছে—এইবার তোমার বিয়ের ব্যবস্থা করব।'

নিজের মনে ওয়াঙ তোলপাড় করতে লাগল কোথায় এমন একটি চারু কুমারী আছে যে তার দ্বিতীয় পুত্রবধূ হ'তে পারে। ছেলেটিও বিয়ে করতে রাজী। সে বললে—'দুর্মূল্য পাথর কিনে পয়সা অপচয় করার চেয়ে বিয়ে করা ভাল। পুরুষের ছেলে-মেয়ে থাকাও উচিত। কিন্তু দাদার মত সহুরে মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দিও না বাবা। রাত-দিন সে বাপের বাড়ীর এটা-ওটার কথা বলবে—টাকা খরচ করতে বাধ্য করাবে। এতে আমার বড় রাগ হয়।'

বিস্ময়ে ওয়াঙ শুনল সব কথা, তার ব্যাটার বৌ যে এমন তা জানত না সে। সে শুধু জানত—আচারে আচরণে মেয়েটি খুব সতর্ক—দেখতেও সুন্দরী। ছেলের এ প্রস্তাব ওয়াঙের কাছে খুব দামী মনে হোল। টাকা জমানোয় তার ছেলে যে খুব চালাক-চতুর এতে সে খুশী হোল। এই ছেলেটিকে তার জানবার এক রকম সুযোগই হয়নি। ডানপিটে বড় ছেলেটির পাশে এ ছিল অতি ক্ষীণজীবী। চপল শিশুও নয়—চঞ্চল যুবকও নয়, তাই এর প্রতি মনোযোগ প্রখর হয়ে ওঠেনি বাপের। দোকানে আসার সঙ্গে-সঙ্গেই বাপ এর কথা ভুলেছিলেন। শুধু যখন কেউ জিজ্ঞাসা করত—'ক'টি ছেলে তোমার?' তখন মনে পড়ত—'আমার তিনটি ছেলে।'

এতক্ষণে ওয়াঙ ভাল করে তাকাল তার দ্বিতীয় ছেলের দিকে। চমৎকার সুশ্রী সুঠাম ছেলে। চোখে দৃঢ় দৃষ্টি। নিজের মনে ভাবলে ওয়াঙ—'এটিও আমার ছেলে।'

গলা পরিষ্কার করে বললেন বাপ—'কি রকম মেয়ে পছন্দ তোমার, বল?'

ছেলেটি তখন বেশ ধীরে ধীরে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে লাগল যেন পূর্বেই সে সব ভেবে ঠিক করে রেখেছিল—'গ্রামের মেয়ে হবে—বাপের যথেষ্ট জমি-জমা থাকা চাই—দরিদ্র আত্মীয়-স্বজন কেউ থাকলে চলবে না। বিয়ের সময় সে মেয়ে যথেষ্ট যৌতুক আনবে। খুব সাধারণ বা খুব সুন্দরী মেয়ে আমি চাই না। রান্নার কাজে নিপুণ হওয়া চাই তোমার ছেলের বৌয়ের, বাড়ীতে রাঁধুনী থাকলেও সে রান্না-বান্না তদারক করতে পারবে। এমন বৌ হবে, ঘরে চাল যদি কিনতে হয় কিনবে এক মুঠো নয়, পরিমাণে অনেক। কাপড় কিনলে তা থেকে পোষাক তৈরী করার পর যে ছাঁট বের হবে তা' হাতের তালুতে পড়ে থাকবে। এই রকম লক্ষ্মীমন্ত বৌ আমার চাই।'

সব শুনে ওয়াঙের বিস্ময়ের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। এ তারই ছেলে, অথচ এর জীবনের কোন সংবাদই সে রাখে না। যৌবন কালে ওয়াঙের রক্তে যে কামনার স্রোত বইত, বড় ছেলের দেহের রক্তে যে কামুকতা—এ রক্ত তা নয়। ছেলের বিজ্ঞতার প্রশংসা করলে সে। তার পর হাসতে হাসতে বললে—'তোমার পছন্দ মত মেয়েই ঠিক করছি আমি—চীং গ্রামে খোঁজ-খবর নেবে।'

হাসিতে মুখ উজ্বল করে ফিরল ওয়াঙ। হোয়াং-প্রাসাদের সামনের রাস্তায় এসে দুই সিংহ-মূর্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করলে সে। কিন্তু এখানে তাকে থামতে বলার কেউ নেই। বিনা বাধায় সে ভিতরে গেল। যে বেশ্যা তার বড় ছেলের কাঁধে ভর করেছিল তাকে খোঁজ করতে এসে যেমনটি দেখেছিল বাহির মহল, যত দূর স্মরণ হয় সে সব আজও ঠিক তেমনিই আছে। গাছগুলিতে কাপড় শুকোচ্ছে—এধারে ওধারে মেয়েরা জুতো সেলাই করতে করতে গল্প করছে—উলঙ্গ কাদামাটি-মাখা ছেলেমেয়েরা উঠোনে গড়াগড়ি খাচ্ছে। সমস্ত জায়গাটায় ছোটলোকদের গায়ের দুর্গন্ধে টেকা দায়। মালিকরা চলে যাওয়ার পর এরা এসে এখানে ভিড় জমিয়েছে। বেশ্যাটা যেখানে থাকত সেই দরজার দিকে তাকাল ওয়াঙ, দরজা হাট হয়ে পড়ে আছে। এক জন বুড়ো থাকে সে ঘরে। এতে খুশী হোল ওয়াঙ। আরো এগিয়ে গেল সে।

আগেকার দিনে যখন এ বাড়ীতে মস্ত লোকেরা বাস করত, তখন ওয়াঙের নিজেকে অতি সাধারণ বলে মনে হোত। তাদের সে ভয় করত—ঘৃণাও করত। কিন্তু এখন তার নিজের জমি-জমা হয়েছে, রূপো জমেছে, ঘরে লুকানো সোনা আছে। সে-ও আজ এখানে যারা ভিড় জমিয়েছে তাদের ঘৃণা করে। ওয়াঙের চোখে এখন এরা নোংরা, এদের গায়ের বোঁটকা গন্ধের জন্য সে-ও নাক সিটকিয়ে নিশ্বাস রুদ্ধ করে এদের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল। সে-ও ঘৃণা করে এদের। সে-ও এদের বিরুদ্ধে—যেন সে এই বাড়ীরই এক জন মালিক।

বাহির মহল অতিক্রম করে আরো এগিয়ে চলল ওয়াঙ। কোন সংকল্প নিয়ে নয়। এমনিই কৌতুহল হল তার। আরো একটু এগিয়ে তালাবন্ধ একটা ফটকের কাছে পৌছল সে। ফটকের পাশে এক জন বুড়ী ঝিমুচ্ছিল। দেখে বুঝলে ওয়াঙ এ সেই পুরানো

চারা গাছ

সুকান্ত ভট্টাচার্য

ভাঙা কুঁড়ে ঘরে থাকি :
পাশে এক বিরাট প্রাসাদ
প্রতিদিন চোখে পড়ে ;
সে প্রাসাদ কী দুঃসহ স্পর্ধায় প্রত্যহ
আকাশকে বন্ধুত্ব জানায় :
আমি তাই চেয়ে চেয়ে দেখি।
চেয়ে চেয়ে দেখি আর মনে মনে ভাবি—
এ অট্টালিকার প্রতি ইটের হৃদয়ে
অনেক কাহিনী আছে অত্যন্ত গোপনে,
ঘামের রক্তের আর চোখের জলের।
তবু এই প্রাসাদকে প্রতিদিন হাজারে হাজারে
সেলাম জানায় লোকে, চেয়ে থাকে বিমূঢ় বিস্ময়ে।
আমি তাই এতো কাল এ প্রাসাদে ঐশ্বর্য দেখেছি,
দেখেছি উদ্ধত এক বনিয়াদী কীর্তির মহিমা।

হঠাৎ সে দিন
চকিত-বিস্ময়ে দেখি
অত্যন্ত প্রাচীন সেই প্রাসাদের কার্নিসের ধারে
অশ্বত্থ গাছের চারা।

অমনি পৃথিবী
আমার চোখের আর মনের পর্দায়
আসন্ন দিনের ছবি মেলে দিলো একটি পলকে।

ছোট ছোট চারা গাছ—
রসহীন, খাদ্যহীন কার্নিসের ধারে
বলিষ্ঠ শিশুর মতো বেড়ে ওঠে দুরন্ত উচ্ছ্বাসে।
হঠাৎ চকিতে,
এ শিশুর মধ্যে আমি দেখি এক বৃদ্ধ মহীরুহ—
শিকড়ে শিকড়ে আনে অবাধ্য ফাটল
উদ্ধত প্রাচীন সেই বনিয়াদী প্রাসাদের দেহে।
ছোট ছোট চারা গাছ
নিঃশব্দে হাওয়ায় দোলে, কান পেতে শোনে :
প্রত্যেক ইটের নীচে ঢাকা বহু গোপন কাহিনী
রক্তের ঘামের আর চোখের জলের।

তাই তো অবাক আমি, দেখি যতো অশ্বত্থ-চারায়
গোপনে বিদ্রোহ জমে, জমে দেহে শক্তির বারুদ :
প্রাসাদ-বিদীর্ণ-করা বন্যা আসে শিকড়ে শিকড়ে।

মনে হয় এই সব অশ্বত্থ-শিশুর
রক্তের ঘামের আর চোখের জলের
ধারায় ধারায় জন্ম :
ওরা তাই বিদ্রোহের দূত॥

দারোয়ানের বৌ। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে দেখল ওয়াঙ। মনে পড়ল সেদিন এই বৌটি ছিল মাঝ-বয়সী হাসিখুশী। আর আজ কত কুচ্ছিৎ দেখতে হয়েছে তাকে। বলী রেখা পড়েছে মুখে, চুল সাদা হয়ে গেছে—দাঁতগুলো হলদে নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। তার দিকে চেয়ে ওয়াঙ মুহূর্তের মধ্যে উপলব্ধি করলে যে, যৌবনে প্রথম ছেলে কোলে করে যেদিন সে এসেছিল এখানে তার পর কতগুলি বছর দেখতে দেখতে কেটে গেছে। এই প্রথম ওয়াঙের মনে হোল সে-ও ধীরে ধীরে বার্ধক্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

তার পর কিছুটা বিষণ্ণ কণ্ঠে ওয়াঙ বললে বুড়ীকে—'শুনছ, আমায় ভিতরে ঢুকতে দাও।'

বুড়ী ধড়মড়িয়ে উঠে চোখ পিট-পিট করতে লাগল—শুষ্ক ঠোঁট জিভ দিয়ে ভিজিয়ে বললে—'যারা সারা অন্দর মহলটা ভাড়া নেবে তাদের ছাড়া আর কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়ার হুকুম নেই আমার।'

ওয়াঙ হঠাৎ বলে উঠল—'পছন্দ হলে আমিও ভাড়া নিতে পারি।'

কিন্তু ওয়াঙ বুড়ীকে জানাল না কে সে। নিঃশব্দে সে বুড়ীর অনুগমন করতে লাগল। পথ-ঘাট সে ভাল করেই জানে। নিঝুম পুরী। ঐ ত ছোট্ট ঘরখানি যেখানে সে ঝুড়িটা নামিয়ে রেখেছিল। এই ত সেই লাল বার্নিশ-করা থামওয়ালা দীর্ঘ বারান্দা। ওয়াঙ তার পিছু-পিছু বড় হলঘরে প্রবেশ করল। মুহূর্তে মন উড়ে গেল অতীতের কতকগুলি বছর পেরিয়ে যেদিন সে এখানে দাঁড়িয়েছিল এ-বাড়ীর একটি দাসীর পাণিগ্রহণের জন্য। সামনের ঐ সুবঙ্কিম বেদীর উপর বুড়ীমা বসতেন—তার সেবাসিক্ত শীর্ণ দেহ রুপালী সিল্কে ঢাকা থাকত।

একটা অদ্ভুত মানসিক আবেগে আবিষ্ট হয়ে এগিয়ে গেল ওয়াঙ। বসল যেখানে বুড়ীমা বসতেন। টেবিলের উপর হাতটা রাখতেই একটা দর্পিত মহিমা এল ওয়াঙের মনে। ওয়াঙ হেলা-ভরে তাকাল কুচ্ছিৎ বৃদ্ধার ক্ষতদুষ্ট মুখের দিকে। বুড়ী তখন চোখ পিট-পিট করে মানুষটা কি করে তার জন্য নিঃশব্দে অপেক্ষা করছিল। মনের অগোচরে যে আশা পোষণ করত ওয়াঙ এত দিন তা যেন সহসা উদ্বেল হয়ে উঠল। হাত দিয়ে টেবিলের উপর ঘুসি মারতেই হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'এ বাড়ী আমার চাই-ই।'

নাটকের বিবর্ত্তন

লেখক : জর্জ টমসন

নাটকের দু'টি অপরিহার্য অংগ হোল—সক্রিয়তা এবং রূপায়ন। নাটক তাই অনুকৃতি না হ'য়ে পারে না। গ্রীক নাটকে একটি 'কোরাস' থাকে—এক দল লোক নাচে আর গায়। গঠন-রীতির দিক থেকে মহাকাব্যের সংগে নাটকের অসামঞ্জস্য কম। বরং নাটকই বেশী আদিম। এর সর্ব অংগে যাদুর চিহ্ন বিদ্যমান। যাদু থেকেই এর সৃষ্টি। কিন্তু তা সত্ত্বেও শিল্প-শৈলীর দিক থেকে নাটক শ্রেণী-সমাজের সম্পদ।

আদিম (অনুকৃত) নৃত্য ছিল দৈনন্দিন কাজের মহড়া। এই সময় বাস্তব এবং কল্পনার সম্পর্কও ছিল সহজ। কিন্তু কর্ম-কৌশলের উন্নতির সংগে সংগে মহড়ার আর প্রয়োজন রইলো না। নৃত্যও তাই শ্রম-প্রক্রিয়ার সংগে সম্পর্ক হারিয়ে ফেল্লো। নূতন কর্মে অবলম্বিত হোল নাটক আর তাকে অর্থনৈতিক থেকে সামাজিক কর্ম বলাই সংগত। তারও পর শ্রম-প্রক্রিয়া যতই উন্নত হোল, যাদুও আলাদা একটা পেশা হিসাবে গড়ে উঠলো। নৃত্যও আর তাই মহড়া রইলো না, হয়ে দাঁড়ালো যাদুকর বা পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত একটি কৃত্য। তখনও পর্যন্ত ধারণা ছিল জনকল্যাণের জন্যই এর প্রয়োজন যদিও ইতিমধ্যেই তা উৎপাদন-শ্রমের সংগে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলেছে।

মহাকাব্যের প্রেরণা হোল যুদ্ধ। নাটকের জন্মের 'প্রেরণা' হোল কৃষিকার্যের উন্মেষ। আদিম সমাজে পুরুষের কার্য ছিল যুদ্ধ কিন্তু কৃষিকার্য্যের প্রথম স্তর, বাগান তৈরী, নিড়োন ইত্যাদি নারীর বিশেষ কর্তব্য হিসেবেই গণ্য হোত। তা ছাড়া খাদ্য সংগ্রহ, শীকার বা পশু-প্রজননের তুলনায় কৃষিকার্য ছিল একটা জটিল পদ্ধতি। সুতরাং শিশু-প্রজননের কৃত্যের আদর্শে জমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নূতন যাদু-কৃত্যের সৃষ্টি হোল। কৃষিকার্য উন্মেষের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে শিশু-প্রজননের দেবীই ফসলের ধাত্রী।

কৃষি-সম্পর্কিত এই আচার-অনুষ্ঠানটির কেন্দ্র হোল এক জন নরপতি। একটি নির্দিষ্ট সময়ের পর একে হত্যা করা হোত। এই প্রথার ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, এর সূচনা হয়েছিল এমন এক সময় যখন রাজা ছিল এক জন রাজকীয় নারী বা রাণীর দাস মাত্র। এই প্রথার প্রধান ভূমিকার অধিকারী হওয়ায় সমাজেও নারীর স্থান ছিল অপেক্ষাকৃত উচ্চে। ধরিত্রী যাতে শস্য-শ্যামলা হয়, এই জন্য তাকে সন্তান ধারণ করতে হোত। এই প্রজনন-ক্রিয়া সম্পন্ন হোত ঈশ্বরের প্রতিভূ রাজাকে দিয়ে। আর রাজার কর্তব্য সম্পাদিত হলেই তাকে হত্যা করা হোত। কেন না সে ছিল দেবাংশ আর তাই অমর। এই প্রথা বাতিল হয়ে যাবার অনেক পরেও সমস্ত নিকট-প্রাচ্যে দেব-দম্পতি-তন্ত্রে এর স্মৃতি বেঁচে ছিল—এক জন দেবতার মৃত্যু আর তার জন্য তার স্ত্রী, ভগিনী বা মাতার শোক প্রকাশ এই ছিল সে তন্ত্রের রূপ। ব্যাবিলনিয়ায় এই দম্পতির নাম ছিল তাম্মুজ ও ইসতার; ফনেসিয়ায় এ্যাডোনায়াস ও আসতারতে; মিশরে অসিরিস ও ইসিস, এশিয়া মাইনরে এটিস ও সিবলি আর গ্রীসে ডায়নিসিস ও সিমিলি।

হোমেরীয় কাব্যে ডায়নিসিসের আরাধনার কথা বিশেষ একটা পাওয়া যায় না। তার কারণ হোমেরীয় ঐতিহ্য সমরাধিনায়কদের দরবারেই রূপ গ্রহণ করেছে। এই সমরাধিনায়করা যুদ্ধ-বিগ্রহের সাহায্যেই আধিপত্য করতেন, লাঙ্গলে তারা কখনও হাত দেননি। কিন্তু তাহলেও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই তন্ত্র বেঁচে ছিল। এই তন্ত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছিল পুরোহিত-পরিচালিত অতীন্দ্রিক নারীসংঘ-সমূহ। এই কৃত্য ছিল কিছুটা পরিমাণে উদ্দাম এবং দেবাংশে যাঁদের জন্ম, তাঁরাই এতে অংশ গ্রহণ করতেন। এই কৃত্যের উদ্দেশ্য ছিল রহস্যাবৃত, একমাত্র উদ্যোক্তারাই জানতেন ভগবানের জন্ম, মৃত্যু, এবং পুনর্জন্মই এই কৃত্যে রূপায়িত হয়েছে। এই মৃত্যু বোঝাতে অনেক সময় সত্যি সত্যি নরবলি হোত। এই বলি হতেন ঈশ্বরের প্রতিভূ যিনি, সেই পুরোহিত অথবা তাঁর কোন মনোনীত ব্যক্তি। যদিও দু'-এক জায়গায় এই তন্ত্র রোমক শাসনের সময় পর্যন্ত বেঁচে ছিল, কিন্তু বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই একটা হাস্যকর কৃষক আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে এই তন্ত্র চাপা পড়ে যায়। তার পর আথেনীয় ইতিহাসের বিশেষ অবস্থায় এই প্রথাই বিকশিত হ'য়ে নাটকে পরিণত হয়। কি করে এ সম্ভব হোল, তা বোঝাবার জন্য খৃঃ-পূর্ব ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে গ্রীসের জীবনে যে অর্থনৈতিক আলোড়ন আসে তার আলোচনা প্রয়োজন।

খৃঃ-পূর্ব ৮ম শতাব্দীতে গ্রীস ছিল কতগুলি স্ব-সম্পূর্ণ ও কৃষি-প্রধান ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্যের সমষ্টি। বীর-যুগের (Heroic Age) গোষ্ঠী-প্রধানদের বংশধর বড় বড় ভূস্বামীরা পুরুষানুক্রমে এই সব রাজ্য শাসন করতেন। ছোট কৃষক, ভূমিদাস এবং অতি ক্ষুদ্র কারিগর-শ্রেণী প্রধানতঃ এরাই ছিল এ-সব রাজ্যের প্রজা। এই সময়টাকে ভূমিজ অভিজাতের যুগ বলা যেতে পারে। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্ভব হওয়ায় এ প্রথার অবসান ঘটে। ব্যবসার সুবিধার জন্য মুদ্রার প্রচলন হোল। মুদ্রার প্রচলনে সৃষ্টি হোল জমি থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধরণের বিত্তের। উদ্ভব হোল এক নূতন শ্রেণী—পয়সাওয়ালা বণিক্-শ্রেণী। আর তাঁরা হয়ে দাঁড়ালেন রাষ্ট্র-ক্ষমতার অধিকারী ভূস্বামীদের প্রতিদ্বন্দ্বী। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে সুরু হোল এক তীব্র সংগ্রাম, যার ফলে জন্ম হোল 'টিরেনি'র (tyranny) *। টিরেনি হোল এক বণিক্-নৃপতির একনায়কত্ব। তিনি বণিক্ শ্রেণীর সহায়তায় রাষ্ট্র-ক্ষমতা অধিকার করে ভূমিজ অভিজাতদের নির্বাসিত করেন, জমিদারীগুলি ভাগ করে দেন কৃষকদের মধ্যে, সহর পুনর্গঠনের পরিকল্পনায় হাত দেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন। এই প্রগতিশীল অর্থনৈতিক নীতির সংগে তাল রেখে সক্রিয় ভাবে তারা সাংস্কৃতিক বিকাশের সংগেও সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন। আথেনিয়ান 'টিরেন্ট' পীসিসট্রেটোস মহাকাব্যের জন্য অনেক কিছুই করেছেন, কিন্তু নাটকের বিকাশে তিনি তার থেকেও বেশী সাহায্য করেছেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কোরিন্থে, শহরের টিরেন্টের পৃষ্ঠপোষকতায় এক জন কবি একটি নূতন ধরণের প্রদর্শনীর আয়োজন করেন,

---

* Tyranny শব্দটির অনুবাদ করলাম না এই জন্য যে তাহ'লে লিখতে হয় নিষ্ঠুরতা, বা স্বেচ্ছাচারিতা। আর সে ক্ষেত্রে অর্থ পরিষ্কার হয় না। সে কালের প্রচলিত আইন অনুযায়ী হয়ত বে-আইনি (বিপ্লবাত্মক?) উপায়ে এঁরা রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখল করেছিলেন, তাই হয়ত ক্ষমতাচ্যুতরা এর নামকরণ করেছিলেন টিরেনি এবং ক্ষমতা অধিকার করেছিলেন যাঁরা তাঁদের নামকরণ করা হয়েছিল টিরেন্ট। বাস্তবিকই সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামীদের তুলনায় তাঁরা কি পরিমাণ স্বেচ্ছাচারী ছিলেন তা বিবেচনা-সাপেক্ষ। আর তা বিবেচনার ভার ঐতিহাসিক এবং ভাষাতাত্ত্বিকদের।

এর নাম ডিথিরাম্ব (Dithyramb)। সম্ভবত এটি ছিল এক ধরণের শোভাযাত্রিক সংগীত। দলপতি একটি সত্র গাইতেই দোহারেরা (কোরাস) তার ধুয়ো ধরতেন। প্রাচীন কৃত্যটি রূপান্তরিত হোল একটি স্তোত্রে, পুরোহিতের স্থান অধিকার করলেন কবি, আর অনুগামী ভক্তরা পরিণত হোল দোহারে।

কিছু দিন পরে, সম্ভবত কোরিন্থিয় প্রভাবেই এথেন্সেও এই ধরণের রূপান্তর দেখা গেল। আথেনীয় নাটক সম্পর্কিত বিবরণীতে আরিস্ততল বলেছেন, ডিথিরাম্বিক সমবেত সংগীতের উপস্থাপনা থেকেই নাটকের জন্ম। তার বক্তব্যের অর্থ হোল এই যে, ডিথিরাম্বিক সমবেত সংগীতের মধ্যেই 'ট্রাজেডির' বীজ উপ্ত ছিল। এই সমবেত সংগীতের নেতার অভিনেতায় রূপান্তরে এই বীজ অংকুরিত হয়ে নাটকে পরিণত হয়। প্রথমে এক জন অভিনেতা, পরে দুই জন, আরও পরে তিন জন, তার পর বহু। কিন্তু এই রূপান্তরের সূত্র কি ?

অভিনেতার গ্রীক প্রতিশব্দের সাধক অর্থ হোল রূপদাতা (interpreter)। যদিও একটি গোপন প্রতিষ্ঠানের গোপন অনুষ্ঠানের মধ্যেই ডিথিরাম্বের জন্ম, তবু যখন প্রকাশ্য অনুষ্ঠানের প্রশ্ন আসে তখনই রূপদানের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনে করুন, কোন একটি প্রতিষ্ঠান একটি নৃত্যানুষ্ঠানের আয়োজন করেছে—এর মধ্যে ঈশ্বরের মৃত্যুর ব্যাপারও আছে। শিল্পীরা জানেন নৃত্যের বিষয়বস্তু কি, কিন্তু দর্শকরা তা জানেন না। সুতরাং অনুষ্ঠানের একটি স্তরে তাদের দলপতি—পুরোহিত অথবা কবি এগিয়ে এসে 'আমি ডায়নিসিক' বলে গল্পটি দর্শকদের সমক্ষে বিবৃত করেন। এর ফলে তিনি হয়ে ওঠেন রূপদাতা এবং অভিনেতা হওয়ার পথে অগ্রসর হন।

আরিস্ততলের বিবরণীতে জানা যায়, সূচনায় গ্রীক ট্রাজেডি রচিত হোত মাত্র একটি ভূমিকা নিয়ে, আর এই ভূমিকাটি গ্রহণ করতেন কবি স্বয়ং। এই উক্তি থেকেই রূপান্তরের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে, পুরোহিত থেকে কবি; কবি থেকে অভিনেতা। পুরোহিতেরা ছিলেন দেবাংশি, কবির ছিল প্রেরণা এবং গ্রীক নাটকের শেষ দিন পর্য্যন্ত অভিনয় পেশার সংগে এক প্রকার পবিত্রতা বিজড়িত ছিল। এর কারণ বোধ হয় এই যে, এর উৎস-মুখ থেকেই একটা পবিত্রতার ধারা বয়ে এসেছে। একদা ঈশ্বরের বাণীর বাহক ছিল এই শিল্প। কবি-রচিত ভূমিকার রূপ দেয় যে অভিনেতা, কবি-অভিনেতারই সে উত্তরাধিকারী; আবার এই কবি-অভিনেতা হচ্ছে ডিথিরাম্বের দলপতির সূত্রে ডায়নিসিসের পুরোহিতের উত্তরাধিকারী। আর যেহেতু ভগবান্ এই পুরোহিতের দেহে প্রবেশ করে তাকে অধিকার করেছেন সেহেতু তিনিই ভগবান্।

যোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে গ্রীক নাটক বিবর্ত্তনের চরম স্তরে পৌঁছায়। আথেনীয় টিরেন্টরা এই ডায়নিসিস সংক্রান্ত রহস্যকে নগরে বহন করে আনেন এবং রঙ্গশালা খুলে তার নবরূপ দেন। তার পর টিরেন্টদের পতন হয়। ইতিমধ্যে বণিক্ শ্রেণী সাবালক হয়ে উঠেছে, নিজেরাই নিজেদের লালন করতে সমর্থ হয়েছে তাই তারা একটি গণতান্ত্রিক গঠনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করে। কয়েক বৎসর পর নাট্যানুষ্ঠান আবার বিরাট আকারে পুনরুজ্জীবিত করা হয়। এই সময় এসকাইলাসের বয়স মাত্র ২১ বৎসর। সুতরাং আথেন্স ও নাটকের পুনরুজ্জীবনের কথা স্মরণ করে কোন দ্বিধা না রেখেই বলা যায় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের ঔরসেই আথেনীয় নাটকের সৃষ্টি।

এবারে আমাদের দেশের (বিলাতের) দিকে দৃষ্টি ফেরান যাক। দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এ দেশের অর্থনীতির ভিত্তি ছিল সামন্ততান্ত্রিক। এক জন সামন্ততান্ত্রিক লর্ড, তার ভূমিদাস এবং কারিগর—এই নিয়ে গঠিত এক-একটি ক্ষুদ্র সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যের সমষ্টি। এই এক-একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের লর্ডরা ছিলেন ব্যারণদের অধীন আর ব্যারণরা রাজার অধীন। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক্ষমতা বর্তাত পুরুষানুক্রমিক ভাবে। তার পরে এলো পণ্য উৎপাদনের যুগ, ফলে বুর্জোয়া-গিল্ড নিয়ন্ত্রিত সহরের উদ্ভব হোল। পুনরুজ্জীবিত হোল নৌবহর এবং আন্তর্জাতিক ব্যাণিজ্যের ফলে আমেরিকা আবিষ্কৃত হোল। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা এই পণ্য উৎপাদনের সংগে তাল রাখতে পারলো না। ফলে এ ব্যবস্থার অবসান ঘটলো—এলো ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই হোল বুর্জোয়া-বিপ্লব। যে সময়ের কথা আমরা এখনই আলোচনা করবো তা হ'লো যোড়শ শতাব্দী। টিউডররা এই সময় বুর্জোয়াদের সহায়তায় নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এই সময়েই ইংরেজি নাটক একটি শিল্পশৈলী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

চেম্বার্সের মতে মধ্য-যুগের অতীন্দ্রিক নাটকের বীজ উপ্ত ছিল খৃষ্ট-পুনর্জ্জন্ম সংক্রান্ত কিংবদন্তীর মধ্যে। অন্যান্য ঘটনা যথা দেবদূতের খৃষ্টের দ্বাদশ অনুচর এবং স্বয়ং খৃষ্টের সংগে তিন মেরীর সাক্ষাৎ, ইত্যাদির সংযোজনায় এই কিংবদন্তী নাট্যরূপ গ্রহণ করে। কি করে এ সম্ভব হোল ? বোধ হয় নাট্যরূপ দেবার প্রেরণা এসেছিল কৃষকদের মধ্য থেকেই, তারাই সম্ভবত কৃত্যটিকে একটি প্রয়োজনীয় রূপ—যাদুরূপ দেবার প্রেরণা অনুভব করেছিল তাদের সহজাত প্রবৃত্তি থেকে। গীর্জ্জার প্রভাবের বাইরে প্রাক্-খৃষ্ট যুগের পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া এই কৃত্যগুলি মূক অভিনয় বা ঋতু উৎসবের মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। প্রাচীন গ্রীসের মত জার্মাণ জনসাধারণের মধ্যেও গোপন তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল বলে শোনা যায়। বুর্জোয়াদের অভ্যুদয়ে এই অতীন্দ্রিক নাট্যানুষ্ঠানের ক্ষেত্র গীর্জার পরিবর্তে হোল বাজার, এবং এর উদ্যোগ-আয়োজনের ভার এলো পাদরীদের পরিবর্তে গীল্ডের হাতে। এই ভাবে নাটকের সংজ্ঞা পার্থিব জগতের সম্পর্ক স্থাপিত হোল। এর পরে নাটকের বিবর্তনের গতিচ্ছন্দ অতি দ্রুত, তাই বিভিন্ন স্তরের পারস্পরিক সম্পর্ক খুব পরিষ্কারও নয়। কিন্তু তাহলে একটি বিষয় কিন্তু খুবই পরিষ্কার। টিউডরেরা একে রাজ-দরবারে নিয়ে আসেন। এই নাট্যানুষ্ঠান সমূহের অভিনেতাদের নাম হোল রাজকীয় অভিনেতা। তাঁরা ছিলেন বৃহত্তর রাজ-পরিবারের অংশ এবং পেশাদার অভিনেতা। তাছাড়া সৌখিন অভিনয়, হাস্য-কৌতুক ইত্যাদিও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। স্যার টমাস মুর তো রাজানুচর হিসাবে রাজ-দরবারের জন্য নাট্যরচনা এবং অভিনয় ইত্যাদির মধ্যেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। খৃষ্ট-জন্মোৎসবের অভিনয়-বাসরে হঠাৎ কখন তিনি অভিনেতাদের সংগে মিশে যেতেন, নাটকের বিষয়-বস্তু সম্পর্কে পূর্ব্বের কোন ধারণা না থাকা সত্বেও ওর মধ্যে নিজের একটি ভূমিকা তিনি নিজেই রচনা করে নিতেন।

সুতরাং অন্তত কতকগুলি বিষয়ে আথেনীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব আর বিলাতের বুর্জোয়া বিপ্লবের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়।

সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ
বাঙ্‌লা-ভূমে ক'বার হল—কয় বার সব সুদ্ধ ?
খড়ের আগুন নিভবে নাকো, জ্বলতে থাকে খড়ে—
আনুকূল্য হাওয়া পেলে সাম্প্রদায়িক ঝড়ে।
লকলকিয়ে ওঠে আগুন :
সাম্প্রদায়িক ঝড়ের গুণ,
কচু-কাটা অনেক মাথা : শিশু, যুবা চতুর্গুণ।
ডানা ঝাপ্‌টে সুযোগ খোঁজে স্বার্থলোভী শ্বেত শকুন।

সাম্প্রদায়িক রুদ্র ঝড়
পৃথ্বী থেকে আকাশ থেকে ছড়িয়ে পড়ে দিগন্তর :
অগ্নিশিখা ভয়ংকর।
গোখ্‌রো সাপের বিষের মত প্রতিক্রিয়া নেই যে তার,
আগুন লাগলে খড়ো চালে, গ্রামকে-গ্রাম সব সাবাড় ;
রোজায় দিলে বিষ নামে না—অঙ্গ করে নিষ্ক্রিয়,
দু'টো-একটা মাথা পেলে মেজাজ হবে সক্রিয় :
সাম্প্রদায়িক যুদ্ধ
তাজা রক্ত আহার করে ঝড়ের মত প্রবুদ্ধ।
ভয় যাবে না এড়িয়ে গেলে, দ্বার করলে রুদ্ধ।

কাঁচা মাথা ছিন্ন খুন :
প্রাণ দিয়েছে ঢের তরুণ।
ডানা ঝাপ্‌টে সুযোগ খোঁজে স্বার্থলোভী শ্বেত শকুন।

অমাবস্যা

গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী

—আসে না, আসে না।
তোমার স্মরণ-পথে
যবে হারা সারা মন
কই ত ? রঙীন ঢেউ আসে না !

একটু প্রাণের আলো
একটু প্রাণের ছাপ—
একটু মনের মায়া, একটু মনের তাপ,
একটু গানের সুর
ভাসে না।
তোমার রঙীন ঢেউ আসে না, আসে না।

তার পরে চাঁদ-মাখা পরী-ছায়া রাত্রে
জীবন-সমুদ্দুর ঘুরে মরি সাঁতরে,
অতীত প্রবাল-তল—
সুমুখের কালো জল
ঝলোমল ঝলোমল
হাসে না।
তোমার প্রাণের দিশা ভাসে না, ভাসে না !

কালো রাত, কালো দিন—
কালো মন মেঘ-লীন ;
আকাশ ত' আরো দূর—
বনে না, ঘাসে না।
তোমার চোখের আলো কোনোখানে হাসে না।

দু'টিরই বৈশিষ্ট্য হোল সহজ কৃষি অর্থনীতির মুদ্রা অর্থনীতিতে রূপান্তর এবং নূতন শিল্প-নাটকের জন্ম। অবশ্যই এ দু'টির মধ্যে কতকগুলি মৌলিক পার্থক্যও আছে। একটির ভিত্তি দাসশ্রমিক অপরটি দাঁড়িয়ে আছে বেতনভোগী শ্রমিকের ওপর। এই আদিম গণতন্ত্রের পরিসরও ছিল অতি ক্ষুদ্র—ভূমধ্যসাগরের মাত্র এক কোণ জুড়ে ছিল এর বিস্তৃতি। তা ছাড়া দেড় শতাব্দীর মধ্যে এর অধ্যায়ের ওপর যবনিকা পাত হয়। অন্য দিকে আধুনিক ধনতন্ত্র ইউরোপ ছাড়িয়ে, আমেরিকা অষ্ট্রেলিয়ায় উপনিবেশ গড়ে, ভারত আফ্রিকা জয় করে পাঁচ শতাব্দীর মধ্যে সমস্ত দুনিয়ার মানুষের জীবনেরই ধারা বদলে দিয়েছে। এই গণতন্ত্র স্তর হিসাবেও উন্নততর, বিস্তৃতির দিক্ থেকে ব্যাপকতর তো বটেই।

এই দুই যুগের নাটকের মধ্যেও এই প্রভেদ প্রতিফলিত হয়েছে। গ্রীক নাটকে একটি কোরাস ছিল—এটি হোল একটি আদিম বৈশিষ্ট্য। এলিজাবেথীয় নাটকে এটি লোপ পেয়েছে। গ্রীক নাটকে ধর্মের সংগে পূর্ণ বিচ্ছেদ কখনো হয়ে ওঠেনি, আর তখনকার ট্রাজেডিগুলোতে তো একটা ধর্মগ্রন্থসুলভ গাম্ভীর্য সর্বদাই বজায় রাখবার চেষ্টা হয়েছে। শিল্পশৈলীর দিক্ থেকে এ্যাসকাইলাস বা সফোক্লিসের সেরা রচনাগুলিকে নিখুঁতই বলা যায়। সে তুলনায় সেক্সপীয়ারের লেখা অনেক এলোমেলো, কিন্তু তা হ'লেও তার মধ্যে আছে একটা উদ্দাম প্রাণ-চাঞ্চল্য এবং পার্থেনন থেকে গথিক ক্যাথিড্রেলের সংগেই তা তুলনীয়। এ হোল এমন একটি সমাজের অবদান, যে সমাজের পরিবেশ বিস্তৃততর, সমৃদ্ধি এবং প্রাণ-সম্পদের দিক থেকেও যার স্থান অনেক উঁচে। এ সমাজের মধ্যে আছে কর্মোদ্যম, আছে বিশ্বজয়ের নেশা, আছে উদার দিগন্ত।

এই হোল দুই যুগের নাটকের পার্থক্য এবং সে পার্থক্যের মূলসূত্র।

অনুবাদক : প্রদ্যোৎ গুহ

আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস

শ্রীঅনিলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

রেডিয়ো এবং সংবাদপত্রের মারফং আমরা আজকাল নিয়মিত ভাবে খবর পাই আগামী কাল কোথায় কী ধরণের ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে। রাত্রে রেডিয়োর খবর শুনে কোন অতি-বুদ্ধিমান কিশোর পরদিন সুতোয় মাঞ্জা দেবার প্ল্যান পরিবর্ত্তন করেছে কি না, অথবা কোন মহিলা বড়ির জন্যে ডাল ভেজানো বন্ধ রেখেছেন কি না, সে বার্ত্তা আমাদের জানা না থাকলেও এটুকু অন্ততঃ জানি যে, অনেক সেনা-নায়ক তাঁদের সমরাভিযানের কার্য্যসূচীর রদ-বদল করেছেন এবং করে থাকেন। সমুদ্রগামী জাহাজগুলিও বিরুদ্ধ আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস পেয়ে তাদের যাত্রাকাল অথবা গতি সেই মত সংশোধন করে নেয়।

আবহাওয়ার আভাস সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্ণে অবহিত থাকলে ভবিষ্যতে গুরুতর প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হবার আশঙ্কা থাকে না। এই বিপর্য্যয় যে কতখানি ভীষণ হতে পারে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ইতিহাসে। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ কর্ত্তৃক যে অজেয় রণপোতবহর বা আর্মাডা ইংলণ্ড আক্রমণের জন্য প্রেরিত হয়েছিল তা বিধ্বস্ত হয়ে গেল প্রবল পশ্চিম বাত্যায়। রাশিয়ায় শীতের তুষার যে কতখানি মারাত্মক, কী ভীষণ যন্ত্রণাদায়ক, সে কথা যদি নেপোলিয়ন পূর্ব্বাহ্ণে জ্ঞাত হতেন তাহলে তাঁকে মস্কো থেকে ব্যর্থমনোরথ হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করতে হত না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে চার্চিলের দুঃসাহসিক গ্যালিপলি য্যাডভেঞ্চার ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হওয়ার মূলেও ছিল বিরুদ্ধ আবহাওয়া।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে আবহচিত্র অপরিহার্য্য অংশ গ্রহণ করেছে। পোল্যাণ্ডের সমতল ভূমিতে ট্যাঙ্ক-বাহিনীর অভিযান চালাতে হিটলার ১৯৩৯-এর সেপ্টেম্বর মাসের বৃষ্টিহীন দীর্ঘ রৌদ্রতপ্ত দিনগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা উপযুক্ত বিবেচনা করেছিলেন। ইংলিশ চ্যানেলে ঘন পীতবর্ণের কুজ্ঝটিকা ডানকার্ক থেকে বৃটিশ বাহিনীর অপসারণে শ্রেষ্ঠ সাহায্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। আবহাওয়ার সুযোগ নিয়ে জাপানীরা পার্ল হারবারের উপর অতর্কিত আক্রমণ করেছিল। জেনারেল আইসেনহাওয়ার তাঁর বিখ্যাত নরম্যাণ্ডি অভিযানের প্রাক্কালে আবহচিত্র সামনে খুলে রেখে বাহিনীদ্বয়ক আক্রমণ সুরু করতে আদেশ দিয়েছিলেন। এডমিরাল নিমি (Nimitz) প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্রত্যেকটি আক্রমণাত্মক অভিযানের পূর্ব্বে আবহ-বিজ্ঞানীদের পরামর্শ গ্রহণ করতেন।

আবহ-বিজ্ঞান প্রয়োজনীয়তা এবং জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও এত দিন অতি ধীরে ধীরে মন্থর গতিতে চলে আসছিল—তার মূল্য সম্বন্ধে অনেকেরই কোন ধারণা ছিল না। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অত্যল্প কালের মধ্যে আবহ-বিজ্ঞান যে চমকপ্রদ উন্নতি ও বিরাট পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছে তা প্রকৃতই বিস্ময়কর। শুধু আবহ-বিজ্ঞানের পিছনে যুদ্ধকালীন আমেরিকা ব্যয় করেছে ১০০ কোটি ডলার। পদার্থ-বিজ্ঞান এবং গণিত-বিজ্ঞানের নিয়মগুলির ভিত্তিতে এই আবহ-বিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

সামরিক বিমান-বাহিনী পাঁচ সহস্রাধিক লোককে আবহ-বিজ্ঞানে অভিজ্ঞ করে তাদের নিয়োগ করেছিলেন পৃথিবীর নানা স্থানে—আডাক থেকে অষ্ট্রেলিয়া, গ্রীনল্যাণ্ড থেকে গুয়াদালকেনাল অবধি। যান্ত্রিক বাহিনী, রাসায়নিক যুদ্ধবাহিনী, সামরিক সদর কেন্দ্র এবং অন্যান্য নানা সামরিক কার্য্যালয়ে বহু আবহ-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন হয়েছিল। নৌবাহিনীতে নিযুক্ত শত শত বিমান-বিজ্ঞানী (aerologists) প্রত্যেক জাহাজে এবং তীরের ঘাঁটিতে দাঁড়িয়ে আকাশ পর্য্যালোচনা করতেন। চীন এবং ফ্রান্সে শত্রু-ব্যূহের পশ্চাতে আবহাওয়া সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহের জন্য মাঝে মাঝে একটা দলকে (commandos) প্রেরণ করা হত। ইতিপূর্ব্বে কেউ হয়ত কখনও ভাবতেও পারেননি যে, যুদ্ধের সময় এই রকম ব্যাপক ভাবে পৃথিবীর বাতাস, মেঘ, কুয়াশা, তাপ এবং ঝড়-বৃষ্টি নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে।

আজ আমেরিকায় দশ হাজারেরও বেশী আবহ-বিজ্ঞানী আছেন। তাঁরা মনে করেন, যুদ্ধোত্তর কালেও তাঁদের অভিজ্ঞতার এবং সাহায্যের যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে এবং থাকবে। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাসের নূতনতর প্রণালী, নূতনতর বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং শত সহস্র আবহ-বিজ্ঞানী দেশের বিমান-পথ, রেলপথ, জলপথ, কৃষকবর্গ, বনবিভাগ, টেলিফোন ও তার-বিভাগ প্রভৃতি সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষেই অমূল্য সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। কারণ, আবহাওয়ার উপরে অনেক কিছুই নির্ভর করে। ইতিমধ্যেই আবহ-কেন্দ্রগুলিকে এবং বিমান-চলাচলের ঘাঁটিগুলিকে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের—সম্ভব হলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণাধীনে রাখার প্রস্তাব, উত্থাপিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের আবহ-প্রতিষ্ঠান অনেক দিন থেকে এক ঝটিকা-সঙ্কেত-বাহিনী (Hurricane Warning Service) প্রতিপালন ক'রে আসছিলেন। ১৯৪৪এ সামরিক বিমান-বাহিনী ফ্লোরিড য় তাদের এক নিজস্ব ঝটিকা-সঙ্কেত-বাহিনী সংগঠন ও সংস্থাপন করে কাজের সুবিধার জন্যে। যখনই কোন ঘূর্ণি-বায়ুর সম্ভব থাকত, ঝটিকার সঞ্চার হত, তখনই এক বিশেষ ধরণের B-25 বিমানকে ঊর্দ্ধে ঝটিকাভিমুখে প্রেরণ করা হত তার তীব্রতার পরিমাপ এবং সম্ভাবিত গতিপথ নির্ণয় করতে। উক্ত ঝটিকা-সঙ্কেত-বাহিনী কর্ত্তৃক ১৯৪৪এর প্রচণ্ড অতলান্তিক ঝটিকা সূচনার প্রাক্কালে ধরা পড়ায় এবং তৎক্ষণাৎ রেডিয়োর সাহায্যে সে সংবাদ সর্ব্বত্র প্রেরিত হওয়ায় আনুমানিক ২৫ কোটি ডলার মূল্যের সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছিল।

মধ্য-প্রতীচীতে সামরিক বিমান-বাহিনী এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আবহ-প্রতিষ্ঠান কতিপয় বেসামরিক অবৈতনিক সংঘের সহযোগিতায় এক বার্ত্তা-সাঙ্কেতিক জাল উদ্ভাবন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রীয় আবহ-প্রতিষ্ঠান ১৯৪১ খৃষ্টাব্দে আবহাওয়া সম্বন্ধে ৪৮ ঘণ্টার অথবা মোটামুটি ভাবে পাঁচ দিনের পূর্ব্বাভাস দিতে সক্ষম হতেন। ক্যালিফোর্ণিয়ার ডাঃ ক্রিক-প্রমুখ কয়েক জন নক্ষত্রবিদ্ ২ সপ্তাহ কালের মোটামুটি পূর্ব্বাভাস দিয়েছেন। আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাসে সময়ের ক্ষেত্র যদিও এর চেয়ে বেশী দূর আজও প্রসারিত হয়নি, তবু আজ সে সম্বন্ধে এমন নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে যা কয়েক বছর আগেও উঁচু দরের নক্ষত্রবিদের কাছে দুঃসাধ্য বলে বিবেচিত হত।

আজকের কোন সেনাপতি যদি আগামী সপ্তাহের আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাস জানতে চান তাহলে মিনিট কুড়ির মধ্যেই তিনি তা পেয়ে যেতে পারেন। বাছাই-যন্ত্রের (Sorting Machine) সাহায্যে গত চল্লিশ বছরের আবহ-চিত্র সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যায়। তার মধ্যে যে দিনটির আকাশের অবস্থা অনেকটা আজকের মত ছিল সেই

দিনটিকে সপ্তাহের প্রথম দিন হিসাবে ধরে নিয়ে তখন থেকে সাত দিনের আবহ-চিত্র ছকে মিলেই আগামী সপ্তাহের পূর্ব্বাভাস নির্ভুল-রূপে বলে দেওয়া যায়। ধরা যাক, সেপ্টেম্বর ১৯৪৬-এর প্রথম সপ্তাহের পূর্ব্বাভাস হয়ত কেউ জানতে চাইছেন। তখন বাছাই যন্ত্রটি ঘুরিয়ে যদি দেখা যায় ১৯২৭-এর ২০শে আগষ্ট অনেকটা ১৯৪৬-এর ১লা সেপ্টেম্বরের অনুরূপ তাহলে ১৯২৭-এর ২০শে থেকে আগষ্টের আবহ-চিত্র মিলেই ১৯৪৬-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহের আবহাওয়ার অবস্থা জানা যাবে।

কৃষকগণের পক্ষে এই পূর্ব্বাভাস জ্ঞাত হওয়ার প্রয়োজন অত্যধিক। প্রচুর বারিপাত, শিলাবৃষ্টি বা ধূলি-ঝড়ের সম্ভাবনা সম্বন্ধে পূর্ব্বাহ্নে আভাস পেলে তারা যথোচিত সতর্কতা ও ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্রে মাঝে মাঝে দাবানলের কথা শুনতে পাওয়া যায়। তাই সেখানকার বন-বিভাগে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের বুলি হল, "Catch 'em young and treat 'em rough"—অর্থাৎ যাকে বলে, 'ধরো আর মারো।' শুষ্ক কাঠের ঘর্ষণে অরণ্যে দাবানলের সৃষ্টি হয়। বাতাসের গতি-পথ ও গতি-বেগ, তাপ এবং আর্দ্রতার বিশদ বিবরণ যদি পূর্ব্বাহ্নেই সংগৃহীত হয় তাহলে অগ্নি-নির্ব্বাপক বাহিনীকে যথোপযুক্ত স্থানে প্রস্তুত রাখা যেতে পারে এবং কাঠুরে-গণকেও বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা থাকলে কাজ বন্ধ রাখার সঙ্কেত জ্ঞাপন করা যেতে পারে।

যুদ্ধের আগে আবহ-কেন্দ্রের সম্বল ছিল—(১) তাপনির্ণয়ের জন্যে থার্মোমিটার, (২) বাতাসের চাপ নির্ণয়ের জন্যে ব্যারোমিটার, (৩) বাতাসের গতিবেগ নির্ণয়ের জন্যে অ্যানিমোমিটার, (৪) বৃষ্টি-পরিমাপক যন্ত্র, (৫) আর্দ্রতা-পরিমাপক যন্ত্র, এবং তাপ ও চাপ লিপিবদ্ধ করবার জন্যে যথাক্রমে (৬) থার্মোগ্রাফ ও (৭) ব্যারোগ্রাফ।

একটি আবহ-কেন্দ্র

যুদ্ধের সময় থেকে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে প্রবর্ত্তন হয়েছে রেডিয়োসণ্ডির Radio-sonde) বা রেডিয়ো প্রেরক-যন্ত্রের। বেলুনের সাহায্যে একটা হাল্কা ধরণের রেডিয়ো সেটকে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হয়। একটা প্যারাস্যুটের সঙ্গে সেটটি বাঁধা থাকে। ঊর্দ্ধগামী বেলুনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতার বিভিন্ন স্তরে বাতাসের গতিপথ ও গতিবেগ, চাপ, তাপ ও আর্দ্রতার যাবতীয় অবস্থার খুঁটিনাটি

রেডিয়োসণ্ডির সাহায্যে আবহ-চিত্র অঙ্কিত হচ্ছে।

বামে—বেলুন-প্যারাস্যুটে রেডিয়ো-সেট বেঁধে আকাশে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। মধ্যে—সংগ্রাহক-যন্ত্রে রেডিয়ো-প্রদত্ত আকাশের অবস্থা সংগৃহীত হচ্ছে। ঊর্দ্ধে—আকাশ ভেদ করে প্যারাস্যুটে বাঁধা রেডিয়োসমেত চলেছে দু'টি বেলুন। দক্ষিণে—সংগ্রাহক-যন্ত্র-ধৃত আকাশ-বার্ত্তা একটি বিবরণী-যন্ত্রে সংরক্ষিত হচ্ছে।
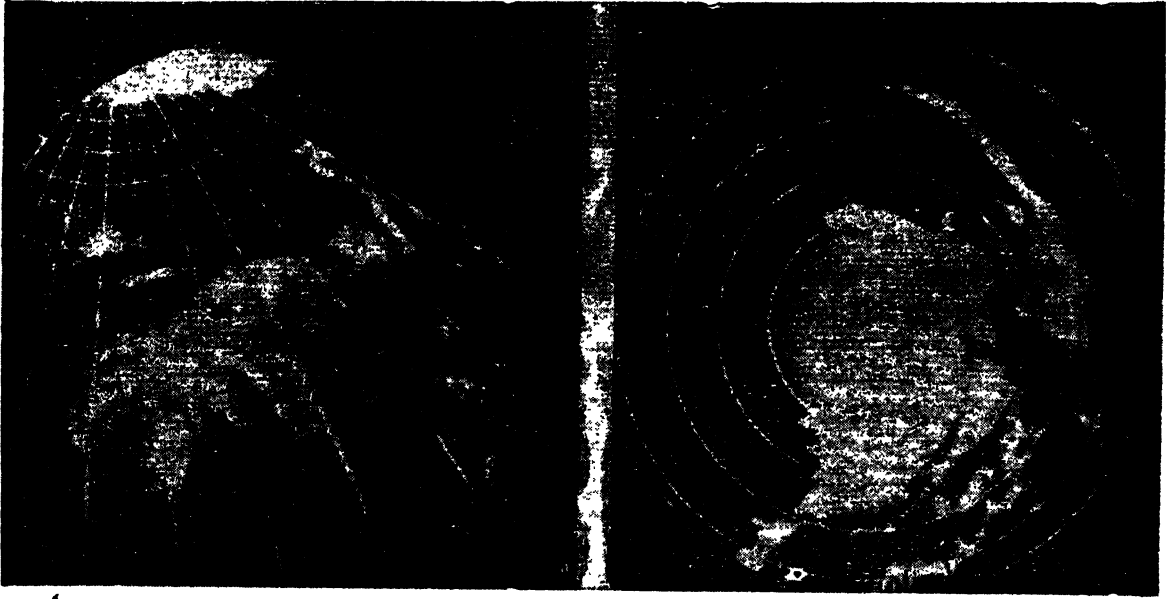
রাডারে ঝটিকার পূর্ব্বাভাস—শ্বেত চিহ্নিত স্থানে প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হচ্ছে।

বিবরণগুলি রেডিয়ো থেকে আবহ-কেন্দ্রের সংগ্রাহক যন্ত্রে (Receiver Set) ধৃত হয় এবং বিবরণী-যন্ত্রে (Recorder Set) তা সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

রেডিয়োসণ্ডির একটা অসুবিধা এই যে, বেলুন সাধারণতঃ ৬০,০০০ ফুট উঁচুতে উঠে ফেটে যায় এবং সাধারণতঃ কুড়ি মাইলের বেশী দূরের আবহাওয়ার খবর পাওয়া যায় না। অবশ্য রকেটের সাহায্যে রেডিয়োসণ্ড প্রেরণ করে ৫০০ মাইল দূরের আকাশের অবস্থাও জানা গেছে।

যুদ্ধের সময়ে আমেরিকার আবহ-কেন্দ্র শুধু স্থানবিশেষের ভূমির উপর সংলগ্ন ছিল না—তা ছিল সারা পৃথিবীব্যাপী—স্থলে ভ্রাম্যমান জীপ গাড়ীতে ও মোটর লরীতে, জলে জাহাজে এবং অন্তরীক্ষে এরোপ্লেনে। অরণ্য, মরুভূমি এবং গ্রীনল্যাণ্ডের তুষার দেশে—যেখানে মানুষের বাস দুঃসাধ্য সেখানেও স্বয়ংক্রিয় আবহ-কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। সেখান থেকে রেডিয়ো-সেট রীলে করে চলেছে অবিরত সেখানকার আবহাওয়ার কাহিনী। শুধু ৬ মাস অন্তর একবার করে সেই স্বয়ংক্রিয় আবহ-কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানের প্রয়োজন।

অতি সম্প্রতি রাডারের (Radar) সাহায্যে আবহ-চিত্রাঙ্কন অতি সুন্দর ও সহজ হয়ে উঠেছে। যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আবহ-বিজ্ঞানে রাডার নবযুগের সূচনা করছে। কবে, কোথায়, কোন্ সময়ে কতক্ষণ ধরে কী ধরণের ঝড়-বৃষ্টি হবে তা অনায়াসে রাডার নিরূপণ করতে পারে। ইংলণ্ড বনাম ভারতীয় দলের ক্রিকেট খেলার তৃতীয় টেষ্ট-ম্যাচটি বৃষ্টির জন্যে পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে বহু ক্রীড়ামোদী নিরাশ হয়েছেন। কিন্তু যদি খেলার কয়েক দিন পূর্ব্বে রাডারের সাহায্য গ্রহণ করা হত তাহলে নিশ্চয়ই খেলার তারিখ পরিবর্ত্তিত হত। আবহ-বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আশা করা যায়, আমাদের অনেক অভাব দূরীভূত হবে।

রাজপথ

উমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী

অপূর্ব্ব এ রাজপথ!
সপ্ত সিন্ধু, তেরো নদী, হাজার পর্ব্বত—
রাজা ও প্রজার মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান।
অভাবের শিখা লেলিহান
ছেয়ে আছে প্রজার আকাশ
দগ্ধ করে ভিক্ষা-মুষ্টি, জীর্ণ কটিবাস—
চার চক্ষু সুখে নিদ্রা যায়
দুগ্ধফেনসন্নিভ শয্যায়।
অসহ আবেগে মোর সারা দেহ কাঁপে,
মনে হয়, আপনার প্রাণের উত্তাপে
মধ্যাহ্ন সূর্য্যের সাথে করি হানাহানি,
দিকে দিকে ছুঁড়ে দিই আগুনের বাণী।
সে উত্তাপে তাপে যদি বায়ু, বালু-কণা,
ঘূর্ণিবেগে সৃষ্টি করে প্রলয়-মূর্চ্ছনা—
রাজপথে ছিন্ন হয়ে পড়িবে পতাকা
সিংহ-ব্যাঘ্র-আঁকা।
তবে মোর তাপ শান্ত হবে
গণ-দেবতার রথ
রাজপথ
বাহবে গৌরবে।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

দুই

বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরেস্তাকে জয় করিলেই যে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার করতলগত হয়, এ কথা ঠিক নয়, সুতরাং ইহলোকে মৃত্তিকার উপর ঘর বাঁধিয়া বসবাস করে যে মানুষ, তাহার নিরক্ষর থাকাই নিরাপদ।

বর্দ্ধমান জেলার একটি পল্লীগ্রামে মলিনের পৈতৃক গৃহ। সংসারে একা তাহার বৃদ্ধা বিধবা মা। সাংসারিক অবস্থা অকথ্য, না আছে তেমন বাড়ী-ঘর, না আছে তেমন জমি-জমা। উপরন্তু কতকগুলা পৈতৃক ঋণ এই সম্বলহীন পল্কা সংসারটাকে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছে। বৎসরান্তে যাহা দুই-পাঁচ মণ ধান-পান হয়, তাহার দ্বারা ও ঋণের উপর ঋণ বাড়াইয়া মলিনের মা কোনোরূপে সংসারটি চালাইয়া আসিতেছেন। দারিদ্র্যের অগ্নিঝলক অবিশ্রাম বহিলেও মলিনের মা তাহার আঁচ ছেলের গায়ে এতটুকুও লাগিতে দেন না।

মলিন!—সে গ্রামের স্কুলে পড়ে। পাঁচ জনের অনুকম্পায় স্কুলে সে 'ফ্রী' হইয়াছে—বেতন লাগে না। পাঠ্যপুস্তকাদি, তাহাও মা এঁর-ওঁর হাতে-পায়ে ধরিয়াই হোক অথবা দারিদ্র্যের দাবী জানাইয়া জোর-জবরদস্তি করিয়াই হোক্ সংগ্রহ করেন, যেন তিনি নিজেকে পণ রাখিয়াছেন ছেলেটিকে 'মানুষ' করিবার। মলিন ছেলেটিও ভালো, বিদ্যালয়ে সে প্রত্যেক বারই প্রথম স্থান অধিকার করে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ সকলেই গ্রামের লোক, তাঁহারা মলিনকে উৎসাহ দেন, আপন আপন ছেলেদের কাছে মলিনকে আদর্শ বলিয়া খাড়া করিয়া ধরেন। এ-গ্রামে ও-গ্রামে মলিনের নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে, সকলেই একবাক্যে বলে, "একেই বলে ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো!" মলিন যে শুধু লেখা-পড়ায় ভালো ছিল, তাহা নহে—তাহার প্রকৃতি ও চেহারায় এমন এক আকর্ষণ ছিল যে, রাস্তার লোকও তাহাকে ডাকিয়া কথা না কহিয়া যাইতে পারিত না।

মলিন এখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। বয়েক বৎসর হইতে স্কুলের অবস্থা শোচনীয় হইতে সুরু হইয়াছে, এমন কি, গত দুই বৎসর উপরি-উপরি একটি ছাত্রও ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। এই জন্য কর্তৃপক্ষ ও শিক্ষক-মণ্ডল বিশেষ চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। এক দিন স্কুল-ইনস্পেক্টর স্কুল পরিদর্শন করিতে আসিলেন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উপর তাঁহার কড়া নজর। প্রথম শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা করিয়া হতাশ ও বিরক্ত হইয়া যখন তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রবেশ করিলেন, তখন সর্ব্বাগ্রে তাঁহার দৃষ্টি পড়িল মলিনের উপর—তেরো-চৌদ্দ বৎসরের একটি ফুটফুটে ছেলে, মুখটি যেন ছাঁচে তোলা, মাথায় এক মাথা চুল—রুক্ষ, গায়ে আধ-ময়লা ছেঁড়া সার্ট! তার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট নিপীড়ন, অথচ চোখ দুইটি আকর্ণ—ভিতর হইতে যেন এক অস্বাভাবিক ছটা বাহির হইতেছে! ইনস্পেক্টর সাহেব পরম অভিজ্ঞ শিক্ষাব্রতী, তাঁহার বিলম্ব হইল না যে,—উহা এক অসাধারণ দুর্দ্দমনীয় প্রতিভার জ্যোতিঃ! তিনি ক্ষণকাল মলিনের দিকে চাহিয়া থাকিয়া প্রধান শিক্ষককে প্রশ্ন করিলেন, "এ ক্লাসের প্রথম ছাত্র কে?"

প্রধান শিক্ষক তাড়াতাড়ি মলিনকে দেখাইয়া দিয়া কহিলেন—'মলিন'।

ইনস্পেক্টর সাহেব একমুখ হাসিয়া মলিনের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তোমার নাম মলিন?—নামটি ভালো! আচ্ছা, একবার বোর্ডে যাও তো—"

মলিন ব্ল্যাক-বোর্ডের কাছে গিয়া দাঁড়াইল। অতঃপর ইনস্পেক্টর সাহেব একটি অঙ্ক দিলেন, দিতেই প্রধান শিক্ষক দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "ও-সব অঙ্ক—"

ইনস্পেক্টর সাহেব হাত তুলিয়া বাধা দিয়া কহিলেন, "Silence, please" তার পর মলিনের প্রতি ফিরিয়া বলিলেন, "You go no—"

মলিনের মাথায় যেন সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। একটিবার অঙ্কটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াই তৎক্ষণাৎ উহার উত্তর বাহির করিয়া দিল।

ইনস্পেক্টর সাহেবের মনে কি নৃত্য উঠিল জানি না, তিনি গম্ভীর হইয়া মলিনকে কহিলেন, "আর কোনো প্রণালী—"

"জানি স্যার—করবো?"—মলিন আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই আরও দুই-তিন প্রণালীতে অঙ্কটি কষিয়া দিল।

তখন সকলেই স্তব্ধ। এই অঙ্কটি ইতিমধ্যে প্রথম শ্রেণীতে দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কেহই পারে নাই। ইনস্পেক্টর সাহেব প্রধান শিক্ষকের দিকে ফিরিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আপনার ঘরের খবর আপনার চেয়ে আমি বেশি রাখি।" মুখের ভাব পরিবর্তন করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিলেন, "প্রথম শ্রেণীর ছেলেরা কেউ পারেনি অতএব দ্বিতীয় শ্রেণীতে ওই অঙ্ক দিয়ে অন্যায় করছিলাম, [illegible] যথার্থই আপনি বলতে চাইছিলেন। কিন্তু,—!" মলিনকে [illegible] করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু, এই ছেলেটি প্রথম শ্রেণীরও নয় দ্বিতীয় শ্রেণীরও নয়—তারও উপরে।" অতঃপর তিনি ইংরাজি, সংস্কৃত, বাংলা ও অন্যান্য বিষয়েরও বাছাই করা কঠিন-কঠিন প্রশ্ন করিতে [illegible] এবং মলিন সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক প্রশ্নটির নির্ভুল উত্তর দিয়া সকলেরই চমক লাগাইয়া দিল।

প্রধান শিক্ষকের আনন্দ [illegible] না। নিজেকে আর সামলাইতে না পারিয়া প্রধান [illegible] বলিয়া উঠিলেন, "মলিন আমাদের গর্ব!"

ইনস্পেক্টর সাহেব স্নিগ্ধ মুখে কহিলেন, "গর্ব শুধু আপনাদের নয়—আমারও। অতি দীর্ঘকাল পরে এই ছেলেটির সন্ধান পেলাম—এমন একটির!" বলিয়াই মলিনকে কোলের কাছে টানিয়া আনিয়া সস্নেহে কহিলেন, "উপদেশ দেবার তোমাকে আমার কিছুই নেই। তোমার ভাগ্যলিপিকা রচনা করে দিয়েছেন মা সরস্বতী।" অতঃপর প্রধান শিক্ষকের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "এর ওপর special care নেবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এ একটি বিশেষ স্থান অধিকার করবে বোলেই মনে হয়।" বলিয়াই নিজের মূল্যবান সুদৃশ্য ফাউণ্টেন-পেনটি মলিনের হাতে দিতে গেলেন।

মলিন কিন্তু স্পর্শ করিল না, হাত সরাইয়া লইয়া মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইনস্পেক্টর সাহেব আদর করিয়া তার মুখটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন, "না ও—বেশ সুন্দর লেখা হয়!"

মলিন তেমনি কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রধান শিক্ষক মৃদু ধমক দিয়া কহিলেন, "ও কি, মলিন! ইনস্‌পেক্টর সাহেব দিচ্ছেন—পুরস্কার! ছিঃ—"

তত্রাপি মলিন নিশ্চল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেবের পশ্চাতে ছিল নিবারণ মিত্তির—স্কুল কমিটির প্রেসিডেণ্ট। সে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "ফাউণ্টেন-পেন্ চক্ষেই কখনো ও দেখেনি স্যার! ওরা বড্ডো গরীব কি না। ওর মা এক রকম ভিক্ষে-সিক্ষে করেই দিন চালায়—বাপ নেই।"

ইনস্‌পেক্টর সাহেব একবার নিবারণের দিকে তাকাইয়া ফাউণ্টেন-পেনটি পকেটে রাখিলেন।

নিবারণের কথা তখনো শেষ হয় নাই। সে দ্রুত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ফাউণ্টেন-পেনের ব্যবহার জানে আমার ছেলে—ওই ও বসে। ভাঁটু, একবার দাঁড়াও তো—"

ইনস্‌পেক্টর সাহেব তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "থাক্, থাক্। আমার ইনস্‌পেক্‌শন এখনো শেষ হয়নি—" বলিয়াই পাটিগণিতখানা চাহিয়া লইয়া জানিয়া লইলেন কত দূর অঙ্ক কসানো হইয়াছে, তার পর তাহার ভিতর হইতে একটি অঙ্ক নিজেই বোর্ডে লিখিয়া ভাঁটুকে কসিতে ডাক দিলেন।

ভাঁটুর মুখখানা শুকাইয়া গেল। কোনো মতে কাঁপিতে কাঁপিতে বোর্ডে আসিয়া গোঁজ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব মৃদু তাগাদা দিলেন, "Go on my boy"

ভাঁটু একবার আড়-চোখে চাহিয়াই খড়িখানা দুই হাতে ভাঙিতে করিল।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব এক-মুখ হাসিয়া কহিলেন, "আচ্ছা যাও, ট' গিয়ে বসো—"

নিবারণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আপনাকে, স্যার, দেখে ও ভড়কে গেছে—ভারি লাজুক কি না! ও-সব অঙ্ক বাড়ীতে ও জলের মত কসে! এক জন প্রাইভেট-টিউটার মাইনে খায়!"

"ওঃ"—বলিয়াই ইনস্‌পেক্টর সাহেব অন্যান্য ছাত্রদের ডাকিলেন, কিন্তু কেহই উঠিল না।

ইনস্‌পেক্টর সাহেব তখন নিবারণের দিকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, "মলিন ব্যবহার জানে না, কাজেই পেন্‌টা ওকে দেওয়া নিরর্থক। ইচ্ছে ছিল, আপনার ছেলেকেই দিই, কিন্তু আপনার ছেলে ত 'মলিন' নয়।" বলিয়াই ক্লাস হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

নিবারণের মুখখানা চূর্ণ হইয়া গেল এবং মাষ্টার-মহলে গা-টেপাটেপি পড়িয়া গেল।

গ্রামের ভিতর নিবারণের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা সম্পন্ন, অর্থে ও প্রতিপত্তিতে সে ছিল সকলের সেরা। গ্রামের ভিতর অধিকাংশ লোকই তাহার কাছে হাত পাতে। এই সব অধীন লোক জন, অধমর্ণ, কৃপাপ্রার্থীদের সম্মুখে তাহার এত দিনকার অপ্রতিহত গর্ব্ব ও আত্মাভিমানে এই যে একটা হাতুড়ির আঘাত পড়িল, তাহা তাহার অন্তর ও বহিঃপ্রকৃতি একান্ত ভাবেই বিকৃত করিয়া দিল। ইনস্‌পেক্টর বিদায় গ্রহণ কবিবা মাত্র সে গুম্ হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল।

দ্বারদেশেই ছিল সরস্বতী দাঁড়াইয়া—নিবারণের স্ত্রী। স্বামীর এইরূপ অস্বাভাবিক চেহারা দেখিয়া সে সভয়ে প্রশ্ন করিল, "ও কি! তোমাকে ও-রকম দেখাচ্ছে?"

"ভাঁটুকে জিজ্ঞাসা কোরো।" বলিয়াই নিবারণ মুখখানা অধিকতর অন্ধকার করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

তিন

নিবারণ জামা-কাপড় ছাড়িয়া নিঃশব্দে বাহিরকার ঘরে আসিয়া বসিল। ক্ষণকাল পরে ভিতর-বাড়ীতে ভাঁটুর গলার আওয়াজ পাইয়াই ডাক দিল, "ভাঁটু—"

ভিতরকার দালান ও বাহিরকার ঘর—উভয়ের মাঝখানে একটা দরজা ছিল। জোর ধাক্কায় সেই দরজাটা ঠেলিয়া ভাঁটু প্রবেশ করিতেই, নিবারণ বলিয়া উঠিল, "দেখলি তো, মলিনটা কি ভয়ঙ্কর ছেলে—'ডেন্‌জারাস্!' তুই ওর সঙ্গে আর মেলামেশা করিস্ না।"

ভাঁটু চমকিয়া উঠিল। জনকের দিকে সপ্রশ্ন নেত্রে তাকাইতেই নিবারণ মুখে-চোখে যেন ঝড় তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না—না! ও-সব হবে না। 'স্ত্রী'তে পড়ছেন, ওঁর আবার চালাকী দেখো না! আরে, বাপু, তুই তো স্বচ্ছন্দে বলতে পারতিস্—'না, স্যর ও-সব অঙ্ক আমাদের ক্লাসে হয়নি!' সব জ্যাঠামো!"

এক সুবৃহৎ ভ্রান্তি যেন পিতৃ-কল্পনায় রচিত হইয়া চলিয়াছে, তাহারই এক ধাক্কায় ভাঁটুর সহজ-সত্য অন্তর্লোক যেন সহসা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না বাবা! মলিনদা' যে জানে।"

"তোদের ক্লাসে কসানো হয়েছিল?"

"ক্লাস 'টেনে'ই হয়নি।"

"তবে?"

ভাঁটু সগর্ব্বে জবাব দিল, "মলিনদা' কসেছে। 'এ্যারিথমেটিক', 'এ্যালজেবরা', 'জিওমেট্রি,—কিছুই ওর বাকী নেই! বাবা, মলিনদা'কে ডাকবো—পরীক্ষা করবেন আপনি?"

"কিচ্ছু দরকার নেই। অমন ডেঁপো ছেলের আমি মুখ দেখতে চাইনে—"

"মলিনদা'কে ডাকি—ডাক্‌বো বাবা?"

"মলিনদা'—মলিনদা'—মলিনদা' কি?—ও তোর দাদা?"—নিবারণের চোখ দিয়ে যেন গোটাকতক আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইয়া ভাঁটুর মুখে আসিয়া পড়িল।

ভাঁটু কিন্তু নির্ভীক। জনকের রোষরক্ত মুখের দিকে একবার চাহিয়াই প্রশান্ত কণ্ঠে কহিল, "ক্লাসের 'ফার্ষ্ট বয়' কি না—তাই! ক্লাসের সকলের চেয়ে ছোটো, কিন্তু সকলে ওকে 'মলিনদা' বলে—অনার।"

"অনার?"—নিবারণের মুখখানা আড়ষ্ট হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই ধমক দিয়া বলিয়া উঠিল, "আমি যা বল্লাম, তা' করবি কি না? ফের শোন্—ওর সঙ্গে 'কনেকশন্' আজ থেকে 'কাট-অফ্'—

"পরীক্ষাই করুন না—"

"কি ভয়ঙ্কর!"—নিবারণ বসিয়াছিল, স্প্রীংয়ের ন্যায় লাফাইয়া উঠিয়া অস্থির ভাবে একবার এদিক-ওদিক করিয়া হঠাৎ ভাঁটুর সম্মুখে থামিয়া বজ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "I command you। তার মানে—তার মানে, পিতৃ—"

"করছো কি—" চোখে এক চোখ প্রতিবাদ লইয়া প্রবেশ করিল সরস্বতী। সে এতক্ষণ কপাটের আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

একটু আগাইয়া আসিয়া ধীর অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "ছেলের জাত—পিতৃআদেশের হাতকড়ি কতক্ষণ ওর হাতে থাক্‌বে? বিশেষ কোরে মলিন আর ভাঁটু—দু'টি যেন রাম-লক্ষ্মণ!"

"কি ভয়ঙ্কর!" নিবারণ অধিকতর অস্থির হইয়া ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

সরস্বতী দ্রুতপদে গিয়া স্বামীর হাত হইতে হুঁকা-কলিকাটা কাড়িয়া লইয়া তামাক সাজিয়া দিয়া কহিল, "ভয়ঙ্কর কিছুই নয়—একটু ভেবে দেখো!"

"তুমি একেবারে ইয়ে—"

ঠিক এমনি সময়ে বাহির হইতে একটি ছেলের জোর ডাক আসিল, "ভাঁটু—"

ভাঁটু ব্যস্ত হইয়া সাড়া দিল, "যাই—"

এই মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বেকার পৃথিবীটা যেন ভাঁটুর সম্মুখ হইতে নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল, তাহার পা ফেলিবার পথে সরিয়া আসিল এক নবজাত ধরাতল, যাহার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া এক দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ। বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইতেই নিবারণ প্রশ্ন করিল, "কোথায় চল্‌লি—"

"স্কুলে—"

"স্কুলে? এখন?"

ভাঁটু দ্রুত কণ্ঠে কহিল, "মলিনদা'র রিসেপ্‌সন!' এখখুনি—"

"রিসেপ্‌সন?"—নিবারণ চমকিয়া উঠিল।

ভাঁটু—সহজ, স্বচ্ছন্দ! জনক নাই, সন্তান নাই—আছে কেবল সৃষ্টির ফসল মানুষ, এম্‌নিই একটি দেশ, সেই দেশের রত্ন-সিংহাসনে বসিয়া ভাঁটু তৎক্ষণাৎ কহিল, "আজ্ঞে, হ্যাঁ!"

"তুমিও তা' হলে এর মধ্যে আছো?"

"আমি যে সেক্রেটারী! আমাদের ছাত্র-কমিটি থেকে 'রিসেপ্‌সন' দেওয়া হচ্ছে কি না!"

"হুঁ!"—নিবারণ গম্ভীর হইয়া বার কতক সজোরে হুঁকায় টান মারিয়া বলিয়া উঠিল, "হেতু?"

ভাঁটুর আর যেন দাঁড়াইবার সময় নাই। ত্বরিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ইনস্‌পেক্টর সাহেব মলিনদা'কে উপহার দিয়েছিলেন—"

"দিয়েছিলেন?—নেভার!"

"ও একই কথা বাবা!"—ভাঁটু প্রশ্নটার যেন সঠিক উত্তরই দিয়াছে, এম্‌নিই ভাব তার চোখে-মুখে প্রকাশ পাইল। একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "হতে পারে, মলিনদা নেয়নি! কিন্তু উপহারটা যে সত্যি—এই কথাটাই আমরা ধরে নিয়েছি।" তাহার চোখ দুইটি আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আবার বলিয়া ... "এই ঘটনা আমাদের—শুধু আমাদের কেন, সারা বাংলা দেশের স্কুলে এই প্রথম ইতিহাস! তাই আমরা মলিনদা'কে আজ অভিনন্দন দেব।"

পুনরায় অস্থির কণ্ঠের ডাক আসিল, "ভাঁটু—"

ভাঁটু আর দাঁড়াইল না, পশ্চাৎ ফিরিয়া বাহিরের দিকে ঝাঁপাইয়া পড়িল। দ্বারদেশের কাছাকাছি হইয়াই একবার থমকিয়া দাঁড়াইল, যেন তাহার কি মনে পড়িয়াছে। তার পর মায়ের দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিয়া উঠিল, "এক কাজ করো তো, মা! সন্ধ্যাকে বেশ কোরে সাজিয়ে-গুজিয়ে রাখো; একটু পরে এসে ওকে আমরা নিয়ে যাবো—একটি ছোট ফুটফুটে মেয়ে চাই কি না! গলায় মালা দেবে।" বলিয়াই যেন ঘোড়া ছুটাইয়া নিক্রান্ত হইয়া গেল।

"কি ভয়ঙ্কর!"—নিবারণের মুখখানা বিকৃত হইয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠিটা আলগা হইয়া হুঁকা-কলিকাটা মাটিতে পড়িয়া গিয়া ভাঙিয়া গেল।

নিবারণ অপ্রস্তুত হইয়া কলিকার আগুনটা নিবাইতে যাইতেই সরস্বতী তাহাকে সরাইয়া দিয়া কহিল, "থাক্‌! ও-সব আমি করছি!" অতঃপর স্বামীর প্রতি এক অর্থপূর্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "কার কথাটা সত্যি হলো?"

নিবারণের মুখখানা লাল হইয়া উঠিল। কহিল, "উত্তম! এর ব্যবস্থাও আমি করছি! হ্যাঁ—সন্ধ্যাকে কিন্তু আমি যেতে দেব না, কোথায় সে?"

সরস্বতী হুঁকার খোলের কুচিগুলা কুড়াইয়া বাহিরে ফেলিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "আমার সঙ্গে এসো, দেখিয়ে দিচ্ছি—" বলিয়াই হাত নাড়িয়া স্বামীকে ভিতর-বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া ডাকিল, "সন্ধ্যা—"

উঠানের পেয়ারা গাছ হইতে সাড়া আসিল, "পেয়ারা পাড়ছি—"

"নেমে আয়—"

নিমেষে একটি মেয়ে পেয়ারা গাছ হইতে লাফ মারিল, তাহার কোঁচড়ে এক-কোঁচড় পেয়ারা। পেয়ারাগুলিকে গাছতলায় ঢালিয়া রাখিয়াই এক ছুটে তাহাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সে নিবারণের কন্যা, বয়স এগারোর কাছাকাছি। দেহের গড়নটি ছিপছিপে, মাথায় মেঘের মত এক-মাথা চুল—পায়ের গোছ পর্য্যন্ত লতাইয়া পড়িয়াছে। চোখে বিদ্যুৎ-চমক—দৃশ্যমান পৃথিবীর কোনো অংশই যেন তার দিব্যদৃষ্টির বাহিরে থাকে না।

সরস্বতী নিবারণকে সঙ্কেত করিয়া সন্ধ্যাকে দেখাইয়া দিল।

নিবারণ মুখ খুলিবার পূর্ব্বেই সন্ধ্যা মাকে বিষম মুখনাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "সন্ধ্যা—সন্ধ্যা কেন করো, বল তো? 'সন্ধ্যারাণী' বল্‌তে পারো না?"

সরস্বতী হাসি চাপিয়া কহিল, "এইবার থেকে তাই বল্‌বো।"

সন্ধ্যা আর এক মিনিটও দাঁড়াইল না—পেয়ারা ফেলিয়া আসিয়াছে!

সরস্বতী চকিত হইয়া স্বামীকে বলিয়া উঠিল, "কৈ, কিছু বল্‌লে না?"

নিবারণ গম্ভীর হইয়া জবাব দিল, "না—থাক্‌! যা করবার আমিই করছি।" আর অপেক্ষা করিল না। সরস্বতীও অন্যত্র চলিয়া গেল।

চার

একটু পরেই সরস্বতী পুনশ্চ পেয়ারাতলার দিকে আসিয়া দেখিল, সন্ধ্যা নাই। অতঃপর এদিক ওদিক খোঁজ করিয়া মলিনদের বাড়ী গেল, গিয়া দেখিল, অদূরে রাঁধিবার চালায় বিপরীত দিকে মুখ করিয়া বসিয়া সন্ধ্যা, বঁটি পাতিয়া, কাছে কয়েকটি বড়-বড় পাকা পেয়ারা। বাড়ীতে আর কেহই নাই। সরস্বতী থমকিয়া দাঁড়াইল, দেখিল সন্ধ্যা পেয়ারাগুলি ছাড়াইয়া কাটিয়া জলে ধুইল, তার পর একখানা কলাই-করা পাত্রে সযত্নে সাজাইয়া রাখিল, তার পর শিকেয়-টাঙানো নুনের

পাত্র হইতে একটু নুণ পাড়িয়া পাত্রটির এক পাশে রাখিয়া একটা উঁচু মাটির ঢিপির উপর ঢাকা দিয়া রাখিয়া চালা হইতে নামিয়া পড়িল —সাম্‌নেই মা।

সরস্বতী ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "পেয়ারা কুচুনো হলো কার? বড়মা'র?"

মলিনের মাকে সন্ধ্যা ও ভাঁটু উভয়েই 'বড়মা' বলে। সন্ধ্যা ঠোঁট উল্টাইয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তুমি তো বড্ডো জান্নে। বড়মা'র দাঁত আছে?"

বলিয়াই আপন খেয়ালে পাশ কাটাইয়া খিড়কীর পথ ধরিতেই সরস্বতী বলিয়া উঠিল, "ওদিকে চল্‌লি কোথা?"

"যাচ্ছি পুকুর-ঘাটে—বাবা রে বাবা!"

"শীগ্‌গির একবার বাড়ী আয়—"

কথাটা সন্ধ্যার কাণে গেল কি না, কে জানে এদিকে আর দৃক্‌পাত করিল না, বাহির হইয়া গেল। সরস্বতীও আর দাঁড়াইল না।

মলিম আর সন্ধ্যা, সন্ধ্যা আর মলিন—এই দুইটি ছেলেমেয়ের ভিতর ছিল এক বিচিত্র আকর্ষণ। সন্ধ্যা যখন খুব ছোট্টটি ছিল তখন তাহার আড্ডাই ছিল মলিনদের বাড়ী। উঠানের এক পাশে সে ঘর পাতিত ভাঙা ইটের, তাহার ভিতর আনিয়া সে জড় করিত রাজ্যের ধুতরার ফল, ডাল ভাঙিয়া বেগুন-পাতা, গাছ ছিঁড়িয়া দূর্ব্বাদল, মাটি খুঁড়িয়া ধূলিরাশি। এই সমস্ত দিয়া সে রান্না করিত ভাত-তরকারি। সেই ভাত-তরকারি ঘেঁটুপাতা করিয়া আনিত মলিনের মুখের গোড়ায় যখন সে পাটিগণিতের ভগ্নাংশ কসিয়া দপ্তর তুলিত। মলিন কোনো দিন হাতে চড় মারিয়া ফেলিয়া দিত, কোনো দিন বা হাসিয়া বলিত—'রেখে দাও, চান-টান করি।' এখন সে আর-একটু বড় হইয়াছে, কিন্তু শৈশবের গিন্নিপণার সেই লোভটা তার মেয়েলি-অন্তর হইতে বিদূরিত হয় নাই। কোনো দিন একটি আম, কোনো দিন একটি আতা, কোনো দিন বা এক আঁচল গোঁড়ানেবুও আনিয়া মলিনের কাছে ফেলিয়া দিয়া ছুট দেয়।

ক্ষণকাল পরেই সন্ধ্যা দেখা দিল, তাহার হাতে এক তাল এঁটেল কাদা। সরস্বতী বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "এক তাল কাদা কি হবে?"

সন্ধ্যা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "বাঁটুল তৈরী করতে হবে—পাখী মারবো।"

সরস্বতী অধিকতর বিস্ময়ের ভাণ করিয়া প্রশ্ন করিল, "পাখী মারবি?"

"তোমার চোখ নেই? দেখো না—পেয়ারাগুলো যে গেল!"

"আজ তবে পাড়লি কি?"

"ছাই, ছাই! ভারি তো পেয়ারা—দু'টো খেলাম, দু'টো ছড়ালাম, দু'টো কাকা-বকাকে দিলাম।"—বলিয়াই সন্ধ্যা কাদার তালটা রোয়াকের উপর ফেলিয়া বাঁটুল নির্ম্মাণে মনোনিবেশ করিল।

সরস্বতী মিনিট কয়েক নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল, "ওঠ দিকিনি এখন—মুখটাতে একটু সাবান দিয়ে দিই—"

সন্ধ্যা সপ্রশ্ন নেত্রে মায়ের দিকে তাকাইল।

সরস্বতী কহিল, "দাদার সঙ্গে একবার স্কুলে যাবি। স্কুলে, তোর মলিন দাদার আজ কি-সব আছে কি না। তুই গলায় ফুলের মালা দিবি।"

"ধ্যেৎ—"

সন্ধ্যার মুখটি লজ্জায় একটু রাঙা হইয়া উঠিল এবং তৎক্ষণাৎ মুখ নামাইয়া হাতের কাজে মন দিল।

সরস্বতী তাগাদা দিল, "ওঠ্—"

সন্ধ্যা কথা কহিল না।

সরস্বতীর আবার তাগাদা পড়িল—"বসে রইলি?"

সন্ধ্যা এবার যেন বিষম রাগিয়া উঠিয়াছে। ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "ট্যাক-ট্যাক্ কোরো না। যদি একটা প্যাঁচা-মুখো হয়ে যায়?"

"যাবি নে?"

"লজ্জা করবে না, বুঝি? যদি কেউ বলে—'মেয়েটা কি গো!"

"তা' হলে, ভাঁটু আসুক্—তাকে তাই বলি!"

বলিয়া সরস্বতী চলিয়া যাইতেই, সন্ধ্যা হাত-মুখ নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "সাবান-টাবান আন্‌বে তো?"

সরস্বতী হাসি সামলাইতে পারিল না, তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেল।

* * * *

পরদিন সকালেই সন্ধ্যা মলিনদের বাড়ী আসিয়া হাজির, তাহার বগলে বই-দপ্তর, হাতে কালির দোয়াত।

সন্ধ্যার গৃহ-শিক্ষক আছে—বাড়ীতেই পড়ে। সহসা বই-দপ্তর লইয়া তাহাকে আসিতে দেখিয়া 'বড়মা' বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মলিনদা'র কাছে পড়বে? এসো—এসো—"

রাজ্যের অভিমান যেন ঝড় বহিয়া গেল সন্ধ্যার দুই চোখে। বলিয়া উঠিল, "বা রে! আসবো না, বুঝি!"

মেয়েটি ছিল মলিনের মায়ের গলার হার। এক-মুখ হাসিয়া স্নেহার্দ্র কণ্ঠে কহিলেন, "আমি কি বলছি—'এসো না!'—জন্ম-জন্ম এসো। কিন্তু, তোমাকে তোমার মাষ্টার-মশাই পড়ান কি না!"

সন্ধ্যা যেন অবাক্ হইয়া গিয়াছে। কহিল, "হ্যা বড়মা! তুমি কি কিছু জানো না?—মাষ্টার মশাই আর আসবে না কি? কাল সন্ধ্যেবেলা যাই মাষ্টার মশাই এসেছেন, বাবা বললো—'খবরদার।'

মলিন তখন সবে মাত্র বই-পত্র লইয়া বসিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিল, "কেন?"

"ও মা! তুমিও কিচ্ছু জানো না?"—সন্ধ্যা মুখের এক প্রকার বিস্ময়-ভঙ্গী করিয়াই বলিয়া উঠিল, "এই কাল—কাল তো, মাষ্টার মশাই ফুল তুলেছিলো, মালা গেঁথেছিলো, আমাকে শিখিয়ে দিয়েছিলো—"বই-দপ্তর নামাইয়া রাখিয়া হাত দোলাইয়া বলিয়া উঠিল, 'সন্ধ্যারাণি, তুমি এম্‌নি কোরে গলায় মালা দেবে'।"

মলিনের মুখ-চোখ এক সুস্পষ্ট বেদনায় আড়ষ্ট হইয়া উঠিল, কহিল "তাই বুঝি কাকাবাবুর রাগ হয়েছে?"

"হেঁ গো, হেঁ!" সন্ধ্যা পুনরায় বই-দপ্তর তুলিয়া লইল। তার পর হঠাৎ মুখ ভার করিয়া বড়মাকে বলিয়া উঠিল, "দেখো না বড়মা! মলিনদা' আমাকে পড়াচ্ছে না—স্কুলে আমি যদি পড়া দিতে না পারি! তুমি মলিনদা'কে বল্‌বে না, কিচ্ছুটি না—বড়মা, সেই গল্পটা বলো না, সেই আকাশটা মাথায় ঠেক্‌তো, তার পর যাই চাড়াল বুড়ির ঝাঁটা ঠেক্‌লো, অম্‌নি—হোথথা।" বলিয়াই বই-দপ্তরটা উপর পানে ছুড়িয়া 'হরির-লুঠ' দিল, দিয়াই বড়মার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে দুই হাতে আঁক্‌ড়াইয়া জেদ ধরিল, "বলো

না!" পরক্ষণেই বই-দপ্তরের দিকে তাকাইয়া অভিমান-কণ্ঠে বড়মাকে নালিশ করিল, "দেখো না বড়মা, মলিনদা' কুড়িয়ে দিচ্ছে না!"

বড়মা হাসিয়া মলিনের দিকে চাইতেই মলিন বই-দপ্তর কুড়াইয়া আনিয়া গুছাইয়া রাখিল।

বড়মা তখন সন্ধ্যার গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, "এইবার ছাড়ো! পাট-ঝাঁট করি, ভাত চড়াই, মলিনদা' স্কুলে যাবে, দেরী হলে মাষ্টার মশাইরা বক্‌বেন, মারবেন, বেঞ্চির ওপর দাঁড় করিয়ে দেবেন।"

সন্ধ্যার হাত দুইখানি খুলিয়া গেল। কেন গেল, কখন্ গেল—তাহা বুঝি সে টের পাইল না। একটু পরে বুঝিতে পারিল যে, বড়মা চলিয়া গিয়াছেন আর মলিনদা' একমনে একখানি পুস্তকের উপর মুখ রাখিয়া বসিয়া।

নিকটেই একখানা ছেঁড়া চট পড়িয়াছিল, তাহা তুলিয়া আনিয়া ধুলা ঝাড়িয়া সন্ধ্যা মলিনের এক পাশে পাতিয়া বসিল। মলিনও এইবার মুখ তুলিয়া কহিল, "দপ্তর খোলো—"

সন্ধ্যা হঠাৎ রাগিয়া উঠিয়া কহিল, "দপ্তর-দপ্তর কোরো না বল্‌ছি।"

মলিন গম্ভীর ভাবে কহিল, "কি বল্‌তে হবে?"

"খাতা, পেন্সিল, বই—"

"দোয়াত, কলম—আচ্ছা।" মলিন হাসিয়া উঠিল, পরক্ষণেই মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া কহিল, "দেখি কি পড়ছ?"

সন্ধ্যা গম্ভীর ভাবে কহিল, "তোমার পড়া হোক্—তবে তো।"

"ততক্ষণ তুমি বসে থাক্‌বে?"

"আমার খুসি।"

মলিন আর বাক্যব্যয় করিল না, পুস্তকের খোলা পাতা—তাহার উপর চোখ নামাইয়া লইল।

উঠানের রোদটা ঘরের দুয়ারের কাছে সরিয়া আসিতেই মলিন বই বন্ধ করিয়া সন্ধ্যাকে কহিল, "এইবার, তুমি।"

সন্ধ্যা ভ্রূ কুঁচকাইয়া কহিল, "স্কুল যাবে না?"

মলিন সংক্ষেপে জবাব দিল, "তুমি পড়ে নাও?"

"বা রে! 'লেট' হবে না তোমার?"

"না—সময় আছে।"

"তবে এক্ষুনি বই বন্ধ করলে? ও মা! এই বুঝি তোমার পড়া?"

মলিন হাসিয়া কহিল, "তুমি আবার পড়বে না একটু?"

"একটু?"—সন্ধ্যা মুখ বাঁকাইয়া মলিনের দিকে এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিল, "এক ছটাক পড়বো—গরজ পড়েছে!—এই, এই, একটু বোসো তো, এত্তোটুকু—" বলিয়াই তড়াক্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া বাড়ীর দিকে ছুট দিল এবং চোখের পলক পড়িতে-না-পড়িতেই ফিরিয়া আসিল, হাতে এক ছড়া মর্ত্তমান কলা।

এই সব কাজ সন্ধ্যার আজ নূতন নয়। মলিন কোনো দিন নিষেধও করে নাই, প্রশ্রয়ও দেয় নাই। আজ একটু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "কেন, ও-সব নিয়ে এলে—ছিঃ!"

সন্ধ্যা মুহূর্ত্তেই জবাব দিল, "একে বলে কলা—প্ল্যান্টেন! খেতে হয়—তুমি খাবে যে!"

এমন সময়ে মলিনের মা কি-একটা কাজে সেই দিকে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, "বড়মা, শোনো তো! আচ্ছা তুমি বলতো, বড়মা—কলা মানুষে খায় তো? মলিনদা' কি বলে জানো? বলে—ঠাকুরপুজো হয়।"

মলিন মৃদু প্রতিবাদ করিয়া কহিল, "তা কেন! আমি বলেছি—'ও-সব আনো কেন'?"

মলিনের মা একদৃষ্টে মেয়েটির দিকে তাকাইয়া ছিলেন, "সত্যি মা, আর তুমি ও-সব এনো না। তোমার যে বাবা—তিনি দেখতে পেলে বকাবকি করবেন।"

কথাটা বলিয়া তিনি চলিয়া যাইবার নিমিত্ত পা বাড়াইতেই, সন্ধ্যা যুগপৎ অভিযোগ ও অভিমান-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মা দেয় কেন?"

"মা?"—মলিনের মা দাঁড়াইলেন।

সন্ধ্যা তৎক্ষণাৎ কহিল, "হ্যাঁ গো! এই, আমি—আমি তো, আমি যখন নিয়ে আসি, মা বলে—'কি করবি?' আমি বলি—এ ভাগটা মলিনদা'র।"

মলিনের মা হাসিয়া ফেলিলেন। কহিলেন, "বটে!" আর দাঁড়াইলেন না।

মলিনও নিঃশব্দে বই-পত্র গুছাইয়া উঠিয়া পড়িল। সন্ধ্যাও দপ্তর তুলিয়া কাঁখে করিল এবং উঠানে নামিয়া কয়েক পদ গিয়াই আবার ত্বরিত পদে ফিরিয়া আসিয়া দ্রুত-চঞ্চল কণ্ঠে কহিল, "আবার ও-বেলা—বৈঁচি তুলতে—" বাকী কথাটা চোখের ইঙ্গিতে বলিয়াই পুনশ্চ বলিয়া উঠিল, "যা পেকেছে! টুপটুপ!" বলিয়াই ছুট দিল।

পরদিন হইতে সন্ধ্যা প্রত্যহই সকাল বেলা পড়িতে আসিতে শুরু করিল। ব্যবস্থা হইল—মলিন সর্ব্বাগ্রে তাহার পড়া করিয়া লইবে, তার পর দপ্তর খুলিবে সন্ধ্যা। ফলে দাঁড়াইল ইহাই যে, মলিনের স্কুল যাইতে প্রায় প্রত্যহই দেরি হইতে লাগিল। কিন্তু কি সে করে! সন্ধ্যাকে সে তো বলিতে পারে না—'তুমি আর এসো না।'

আজ মলিনের মা বাড়ী নাই—শেষ রাত্রে রাঁধিয়া রাখিয়া গঙ্গাস্নান করিতে গিয়াছেন। স্কুলের বেলা হইতেই মলিন স্নান করিতে গেল। সন্ধ্যাও এই সময় চলিয়া যায়, কিন্তু তার হাতের অঙ্কটা তখনো শেষ হয় নাই। তাই সে শ্লেট-পেন্সিল লইয়া বসিয়া রহিল। মলিন ফিরিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া যেমন ভাত বাড়িতে যাইবে, সন্ধ্যা শ্লেটের উপর হইতে মুখ তুলিয়া কহিল, "ভাত—আমি বেড়ে দেব, মলিনদা'?"

মলিন জবাব দিল—"না।"

সন্ধ্যাও আর-কিছু না বলিয়া অঙ্কে মন দিল।

মলিন অদূরে একখানা চট পাতিল, টোল-উঠা 'এনামেলের' একটা গ্লাসে জল গড়াইয়া আনিল, তার পর তারই ঠিক পাশে একটু নুণ রাখিয়া যখন একখানা কাণাভাঙ্গা 'এলুমিনিয়মের' থালায় ভাত বাড়িয়া আনিল তখন সন্ধ্যার দৃষ্টি আর অঙ্কের শ্লেটে রহিল না। চোখ দুইটা কপালে তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ওই তরকারি—শুধু দু'টো বাঁটাল-বীচি ভাতে?"

মলিনের মুখে ঈষৎ হাসির আভা দেখা দিল, বোধ করি তার অন্তস্তলের সমগ্র রন্ধ্র দিয়া সে ইহাই বলিতে চায়—'যথেষ্ট!' তার পর হাতে জল দিয়া যেমন সে থালাটা কোলের গোড়ায় টানিয়া লইবে, সন্ধ্যা হাওয়ার ন্যায় উড়িয়া আসিয়া থালাটা উঠাইয়া লইল। মলিন মূঢ়ের ন্যায় তাকাইতেই সে গম্ভীর ভাবে কহিল, "একটু দাঁড়াও—"

মুদিত আকাশ

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

মেঘ-পল্লবে মুদিত আকাশ : ধূসর ধরিত্রীর
দিকে দিকে দেখি প্রতীক্ষা আজ উন্মুখ অস্থির।
আজ অসহ্য তপ্ত বাতাসে
মাঝে মাঝে শুধু ঝোড়ো উচ্ছ্বাসে
কেঁপে কেঁপে ওঠে বহু বেদনায় ভারাক্রান্ত নীড়,
মেঘ-পল্লবে মুদিত আকাশ ধরিত্রী অস্থির।

তড়িৎলেখার চকিত দেখার মত কতবার করে
হে চির জীবন তুমি দেখা দিলে বহু দুর্দিনে ঝড়ে।
বুলেট-বিদ্ধ কত না প্রভাতে
কত আকালের দুঃসহ রাতে
হে চির জীবন তুমি বিদ্রোহী প্রাণের আবেগ ভরে,
কখনো শুকাও তুমি মরণের বিবর্ণ বালুচরে।

বোম্বাই আর করাচীর নীল সিন্ধুর উপকূলে
সে দিন আঁধার করেছিলে তুমি ধূমেল তিমির চুলে।
হে চির জীবন দুর্জয় বুকে
আঘাত করেছ শ্বেত মৃত্যুকে
আঘাত করেছ আগ্নেয় ক্রোধে সব বাধা গেছ ভুলে—
বোম্বাই আর করাচীর নীল সিন্ধুর উপকূলে।

মেঘ-পল্লবে মুদিত আকাশ : তোমারি ত' অনুরাগে
হে চির জীবন হৃদয়ে আমার সূর্য-সাধনা জাগে।
এই বিষাক্ত শ্বাস-প্রশ্বাস
এই আতপ্ত আকাশ-বাতাস
সোনার কাঠির স্পর্শ তবুও ঘুমন্ত মনে লাগে,
মেঘ-পল্লবে মুদিত আকাশ ঝঞ্ঝার অনুরাগে।

উঠানে বেগুন গাছে কয়েকটি বেগুন ঝুলিতেছিল, সেই দিকে আঙুল বাড়াইয়া কহিল, "দু'টো বেগুন ছিঁড়ি, ছিঁড়ে পুড়িয়ে দিই—"

"লেট হয়ে যাবে—"

"হোক্ 'লেট'—না হয় খানিক বেঞ্চে দাঁড়াবে।" বলিয়াই সন্ধ্যা থালাটায় একটা ঝুড়ি চাপা দিয়া মলিনকে হাত নাড়িয়া ডাকিল—"এসো দিকিনি আমার সঙ্গে—" বলিয়াই এক লাফ দিয়া উঠানে নামিয়া পড়িল, মলিনও নিঃশব্দে আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। সন্ধ্যা বার-কয়েক ইতস্তত: দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপনা-আপনি চটিয়া উঠিয়া কহিল, "বড়মা যেন কী! এক কুচো কাঠ, তাও যদি উঠোনে ফেলে যায়!" উঠানের এক প্রান্তে ছোট একটা কাঁটাল গাছ ছিল, সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া দ্রুতপদে গাছটার নিচে আসিয়া দাঁড়াইল।

মলিন বিস্ময়ে প্রশ্ন করিল, "এখানে কি হবে?"

জবাব দিবার প্রয়োজন ছিল না, অথচ দিতে হইতেছে—এমনিই অনিচ্ছায় সন্ধ্যা কহিল, "শুকনো একটা ডাল—ওই দেখছ না—ওটাকে ভাঙতে হবে। আচ্ছা, বোসো দিকিনি তুমি—ঘাড় বেশ শক্ত কোরে বোসো—"

"কেন?"

"গাছে উঠতে হবে।"

"আর সময় নেই সন্ধ্যা, বড্ডো 'লেট' হবে—"

সন্ধ্যা রাগিয়া উঠিল। কহিল, "বল্লাম তো—হোক্ হোক্।"

মলিন সন্ধ্যার দিকে একবার তাকাইয়াই ভয়-চঞ্চল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ক'দিনই লেট হচ্ছে—"

"হয় কেন?"

কেন হয়, তার সঠিক উত্তরটা দিতে মলিনের মুখে বাধিল। একটু ইতস্তত: করিয়া কহিল, "এই, আমাদের পড়ে উঠতে—"

"আমাদের মানে?"—সন্ধ্যার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই চোখের দৃষ্টি পরিবর্তন করিয়া কহিল, "বল্লেই পারো—তুমি আর এসো না!" বলিয়াই সে মলিনের দুই কাঁধে হাত চাপিয়া একরূপ জোর করিয়াই তাহাকে বসাইল, তার পর কষিয়া কোমরে কাপড় আঁটিয়া কহিল, "আমি তোমার কাঁধে পা দিই, দিয়ে দাঁড়াই, তুমি আস্তে-আস্তে ওঠো—"

বলিয়াই আঁচলে পা মুছিয়া মলিনের কাঁধে পা তুলিতেই মলিন বলিয়া উঠিল. "না না—আমি গাছে উঠছি—"

সন্ধ্যা মুখ বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, "তবেই হয়েছে!" আর প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সে চোখের পলকে মলিনের কাঁধে উঠিয়া গাছটার গুঁড়ি ধরিয়া দাঁড়াইল এবং তাহার নির্দেশ মত মলিনকেও আস্তে-আস্তে উঠিয়া খাড়া হইয়া দাঁড়াইতে হইল—যেন সে মন্ত্রচালিত।

ছোট গাছ—সন্ধ্যা টপ করিয়া একটা ডাল ধরিয়া গাছের উপর উঠিয়া পড়িল এবং তাহার লক্ষ্যের শুষ্ক সরু ডালটা ভাঙিয়া নিচে ফেলিয়া দিয়াই নিচেকার একটা ডাল ধরিয়া ঝুলিয়া নামিয়া পড়িল। এবং সঙ্গে-সঙ্গে কহিল, "দাঁড়াও দিকিনি—ঠিক পা দু'টো জড়ো কোরে—"

মলিন হতভম্বের ন্যায় সন্ধ্যার দিকে তাকাইতেই সে মুখনাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "গায়ে পা ঠেকলো—দেখতে পেলে না?" বলিয়াই মাথা নিচু করিয়া মলিনের পায়ে একবার হাত ঠেকাইল, তার পর কাঠগুলি কুড়াইয়া লইয়া নক্ষত্রবেগে বেগুন গাছের দিকে চলিয়া গেল।

মলিন এতক্ষণ স্থাণুর ন্যায় দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আর যেন সে পারে না। চমকিয়া চাহিয়া দেখিল, কাঁটাল গাছের ছায়াটা খুব ছোট হইয়া আসিয়াছে, বোধ করি 'সেকেণ্ড পিরিয়ডের' ঘণ্টা পড়ে-পড়ে।

[ক্রমশঃ

আধুনিক স্নায়ুতাত্ত্বিকদের দ্বারা ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্ব খণ্ডন

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাস

মনস্তত্ত্ব বিষয়টির আবিষ্কার ও প্রচারের পূর্ব্বে সাধারণ লোক মন বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিল না। দেহের রোগ, বিকার ও বৈক্লব্য নিয়েই লোক মাথা ঘামাত। দেহের মত মনেরও যে রোগ হতে পারে সে ধারণা খুব অল্পসংখ্যক লোকেরই ছিল। শোক, দুঃখ, বেদনা, প্রভৃতি মনের বিশেষ বিশেষ ক্লেশকর বিবশ বা বিকৃত অবস্থাকে মনের একটা সাময়িক বৈক্লব্য বলে গণ্য করা হলেও তার থেকে যে স্থায়ী মানসিক রোগের উদ্ভব হতে পারে, এ বিষয় নিশ্চয় কেউ-ই পূর্ব্বে চিন্তা করত না। কিন্তু জনসমাজে এ অবস্থা বেশী দিন স্থায়ী হলো না। উন্মাদ রোগ যে দেহের পক্ষাঘাতের মত মনের পক্ষাঘাত-বিশেষ, এ রোগ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক-প্রমুখ অনেক সাধারণ লোকেও তা স্বীকার করে নিলে। দেহের রোগ নিরাময় করার মত এই ধরণের স্থায়ী মানসিক বিকার উপযুক্ত বিজ্ঞান-সম্মত চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য করা যায়, এ বিশ্বাসও ক্রমে লোকের হলো। গত পঁয়ত্রিশ বছর ধরে মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে বহু মূল্যবান গবেষণা হয়েছে এবং মানসিক রোগের নানা রকম শ্রেণী-বিভাগ, রোগ নিরাময়ের নানা রকম অভিনব প্রক্রিয়া, মন-বিশ্লেষণের উপায় প্রভৃতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ ত গেল মনস্তাত্ত্বিকদের দিকের কথা। এক দিকে মনস্তাত্ত্বিকেরা মন নিয়ে গবেষণা করে চলেন, আর দিকে শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের মস্তিষ্ক ও স্নায়ু সম্বন্ধে নানা রকম জটিল গবেষণা করে চলেন। এঁদের দ্বি-মুখী গবেষণা সম্প্রতি একত্রে এসে সম্মিলিত হয়েছে।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা আগাগোড়াই তাঁদের সমস্ত 'থিওরী' মন বলেই বর্ণনা করে গেছেন। তাঁরা বাইরে থেকে মনের স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক কার্য্যকলাপ থেকে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন সেই-গুলিই সুসংবদ্ধ ভাবে গ্রথিত করে তার সাহায্যেই মন-বিশ্লেষণের বিশ্বকোষ রচনা করেন। মন কি, দেহের কোথায় তার অবস্থিতি, কি ভাবে তার কার্য্যকলাপ চলে, তা চাক্ষুষ করার উপায় নিয়ে মনস্তাত্ত্বিকরা আদৌ মাথা ঘামাননি। মনের আভ্যন্তরীণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও তার গতিবিধি আবিষ্কার ও নিয়ন্ত্রণের কোন কিছুই তাঁরা আবিষ্কার করতে পারেননি বা চেষ্টাও করেননি। শরীরতত্ত্ব ও স্নায়ুতত্ত্বে তাঁদের দখল না থাকায় তাঁদের সে সুবিধেও হয়নি। আজকের শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা, বিশেষ করে স্নায়ুতত্ত্ববিদ্‌রা মনস্তাত্ত্বিকদের মূল প্রধান প্রধান 'থিওরী'গুলির মূলে করেছেন কুঠারাঘাত। ফ্রয়েডের জীবিতা-বস্থাতেই অবশ্য তাঁরা মনস্তাত্ত্বিকদের থিওরীর ভুল দেখান এবং তা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। তাঁরা প্রথমেই বলেন, 'মন' বলে কিছু নেই। এটা একটা অর্থহীন সাহিত্যগত শব্দ মাত্র। কড়াকড়ি ধরা-বাঁধা রাজ-কার্য্য পরিচালনার রাজনৈতিক নিয়ম-কানুনকেই বলা হয় আইন বা 'Law', কিন্তু লঘুচেতা সাহিত্যিকদের হাতে পড়ে কথাটির শিথিল ভাবে বহু স্থানেই প্রয়োগ হয়েছে,—যেমন "Law of fashion," "Law of honour," "Divine Law"। ঠিক 'মন' শব্দটিও সাহিত্যিকদের দ্বারা শিথিল ভাবে বহু স্থানে অপব্যবহৃত হয়েছে। এটির অবস্থিতি এবং কার্য্যকলাপ কি ভাবে চলে এ সমস্ত হাতে-কলমে দর্শন ও প্রদর্শন করার চেষ্টা না করে কেবল 'মন' 'মন' করে চিৎকার করার কোন মানে হয় না। শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা মনস্তত্ত্ববিদদের ব্যবচ্ছেদিত মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীব-দেহে মনের অস্তিত্ব দেখিয়ে দিতে বললে তাঁরা তা প্রদর্শন করতে পারলেন না, কারণ, দেহের আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকৌশল সম্বন্ধে বিশুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিকদের কোন ধারণাই ছিল না। তাঁদের জ্ঞান একেবারে বাহ্যিক; মননশক্তির কার্য্যকলাপ হতেই সঞ্চিত।

তখন শরীরতত্ত্ববিদ্ এবং স্নায়ুতত্ত্ববিদ্‌রা এগিয়ে এসে বললেন; 'মন' বলে কিছু নেই। মনের কার্য্যকলাপ বলে মনস্তাত্ত্বিকরা এত দিন যে সমস্ত ব্যাখ্যা করে এসেছেন সেটা হলো প্রকৃত পক্ষে মস্তিষ্কের কার্য্যকলাপ। যাঁরা কেবল মনস্তাত্ত্বিক তাঁরা তাঁদের এ ব্যাখ্যা ঠিক বুঝলেন না, কিন্তু যাঁরা শরীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব দু'টি বিষয়েই ব্যুৎপন্ন, তাঁরা এ মত সমর্থন করলেন। এর পর স্নায়ু-তত্ত্ববিদ্‌রা বললেন, ফ্রয়েড-নির্দ্দিষ্ট মনের তিন অবস্থা—জাগ্রত-চৈতন্য (conscious mind), মগ্ন-চৈতন্য (sub-conscious mind) ও সুপ্ত-চৈতন্য (unconscious mind) সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও ভিত্তিহীন। কিন্তু যাঁরা এত দিনের পরিশ্রমে নিজেদের আসন দৃঢ় করেছেন তাঁদের সমস্ত 'থিওরী' একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে গেলে তাঁরাই বা তা মানবেন কেন, আর জনসাধারণই বা তা স্বীকার করবে কেন? সকলে মিলে তখন স্নায়ুতত্ত্ববিদ্‌দের ধরে বললেন,—তাঁদের তাগিদে মনস্তাত্ত্বিকরা হাতে-কলমে মনন-ক্রিয়া দেখাতে যখন পারেননি, তখন তাঁদেরকেই সেটি সর্ব্ব-সমক্ষে প্রদর্শন করে দেখাতে হবে। শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা তার জন্যে প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। আন্দাজে অন্ধকারে লোষ্ট্র নিক্ষেপের পরিবর্ত্তে সুরু হলো মানুষের মনন-ক্রিয়ার সম্বন্ধে হাতে-কলমে
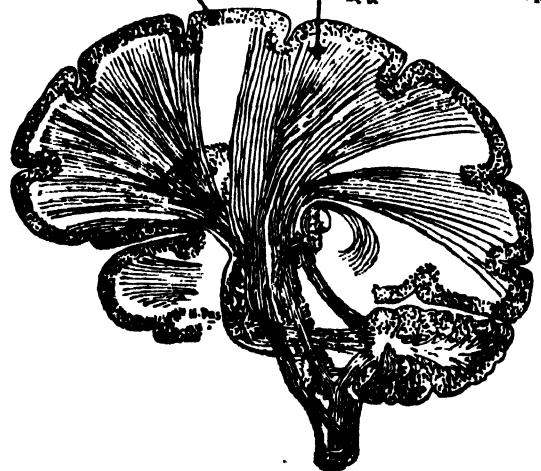
গবেষণা। যেদিন শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা মস্তিষ্কে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি পরিচালনার প্রধান আসনটি বিশ্বসমক্ষে প্রমাণ সমেত দেখিয়ে দিলেন, সেদিন থেকে সূচনা হলো মনস্তত্ত্বের এক নতুন অধ্যায়ের।

শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা বললেন—মানুষের বিবেক, চেতনা, কর্ম্মনিয়ন্ত্রণ ইচ্ছা, স্মৃতি ও স্বপ্নের আসন হলো মস্তিষ্ক।

মস্তিষ্ক এবং দেহের সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলী একটি অচ্ছেদ্য যন্ত্রবিশেষ। স্নায়ুগুলি যেন মস্তিষ্কের অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষ। মস্তিষ্কটি যেন 'Head office' বা প্রধান কার্য্যক্ষেত্র, আর মস্তিষ্ক-সংলগ্ন অন্যান্য স্নায়ুকেন্দ্র (Ganglia)গুলি হচ্ছে (Branch office) বা শাখা কার্য্যক্ষেত্র। সাধারণ ক্ষেত্রে যেমন দেখা যায় সমস্ত 'ব্র্যাঞ্চ' আপিসের সংবাদ 'হেড আপিসে' আসবেই এবং 'হেড আপিসের' নির্দ্দেশ অনুসারে তাদের বাছাই, তাদের ওপর কোন কাজ করার আদেশ বা অনুমতি বা নিষেধাজ্ঞা জারি, কিম্বা প্রয়োজন অনুসারে ভবিষ্যতে তাদের সঞ্চয় করে রাখা কিম্বা নিয়ন্ত্রণ করে ফিরিয়ে দেওয়া এ সবই ঘটে মস্তিষ্কের দ্বারা।

টেলিগ্রাফ আফিসে যেমন নির্দ্দিষ্ট কাজের জন্যে নির্দ্দিষ্ট বিভাগ আছে, মস্তিষ্কে ঠিক তেমনি বিশেষ বিশেষ কাজের জন্যে এক এক অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে। সারা দেশময় যেমন টেলিগ্রাফের তার ছড়ান থাকে, মানুষ ও মনুষ্যেতর জীবের সারা দেহে ঠিক তেমনি ছড়ান থাকে অসংখ্য স্নায়ু-তন্ত্রী। টেলিগ্রাফের তারের সংবাদ আদান-প্রদানের মত এদের ভেতর দিয়েও ঘটে 'Head office'এর সংবাদের আদান-প্রদান। এই সমস্ত স্নায়ু-তন্ত্রী চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও সমগ্র দেহের ত্বকের ওপর প্রতিক্রিয়া ঘটায় এমন প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি সংবাদ পর্য্যন্ত মস্তিষ্কের ঠিক যে অংশে তা যাওয়া সরকার সেই অংশে বহন করে নিয়ে যায়। মনস্তাত্ত্বিকদের কাছে শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা তাদের এই 'থিওরী' হাতে-কলমে প্রমাণও করে দিলেন। ত্বকের বিশেষ কোন অংশে উত্তেজক বস্তু প্রয়োগ করা হলে দেখা গেল, পরীক্ষাধীন জীবটি (বানর, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি) ঐ উত্তেজক পদার্থের কাছ হতে ঐ অঙ্গ এক নিমিষে সরিয়ে নেয়। কিন্তু ঐ অঙ্গ-সংলগ্ন স্নায়ুমণ্ডলী ছেদন করার পর, ঐ অঙ্গে উত্তেজক পদার্থ প্রয়োগ করলে মস্তিষ্ক স্নায়ুতন্ত্রী-বাহিত সংবাদ হতে বঞ্চিত হওয়ায় ঐ অঙ্গকে উত্তেজক বস্তু হতে সরে আসবার নির্দ্দেশ দিতে পারে না, কাজেই অঙ্গটি স্বস্থানেই থাকে। ঠিক তেমনি স্বাভাবিক জন্তুকে বা মানুষকে চক্ষুবদ্ধ অবস্থায় কোন নির্দ্দেশ দিলে কানে শুনে সে তা করে, কিন্তু, কান-সংলগ্ন সমস্ত স্নায়ু একেবারে ছিন্ন করে ফেললে সে ক্ষীণ স্বরে দেওয়া নির্দ্দেশ শুনতে পায় না বা তদনুসারে কাজ করতে পারে না। এর থেকে প্রমাণ হয়, কর্ণসংলগ্ন ঐ সব ছেদিত স্নায়ুতন্ত্রীর দ্বারাই কর্ণের সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছুত। মস্তিষ্কের সঙ্গে স্নায়ুমণ্ডলীর কার্য্য-সম্বন্ধ বোঝা গেল, কিন্তু মনের কার্য্যকলাপ বলে ফ্রয়েড ও তাঁর অনুগামীরা যে ধারণা লিপিবদ্ধ করে গেছেন, দেহযন্ত্রের সেই মননশীলতার আসনটি কোথায়? সেটি সারা মস্তিষ্কের মধ্যে আবদ্ধ নয়। মানুষ ও উচ্চ শ্রেণীর জীবের মস্তিষ্ক প্রধানতঃ দু'রকম বস্তুতে গঠিত—হোয়াইট ম্যাটার (white matter) দিয়ে মস্তিষ্কের গঠিত এবং গ্রে-ম্যাটার (grey matter) স্তর আকারে মস্তিষ্কের দুই গোলার্দ্ধের বাহ্যিক অংশ আবৃত করে। চেতনা, বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তি, স্মৃতি প্রভৃতির অবস্থান হলো সমগ্র মস্তিষ্কের একেবারে উপরের স্তরে যার নাম হলো 'গ্রে-লেয়ার' (grey layer) বা সেরিব্রাল কর্টেক্স (cerebral cortex)। ঠিক যেমন কমলা লেবুর চার পাশে থাকে একটি পুরু খোলা এ বস্তুটি ঠিক তেমনি একটি পুরু বহিরাবরণের মত চারদিক হতে মস্তিষ্ককে আবৃত করে থাকে, আর সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর যোগ থাকে এই

[মস্তিষ্কের—১নং অংশের আদেশে পায়ের আঙ্গুল চালিত হয়, ২নং সমগ্র পা, ৩নং হাঁটু, ৪নং জঙ্ঘা, ৫নং উদরের পেশী ও অপরাংশ, ৬নং বক্ষোদেশের পেশী ও যন্ত্রপাতি, ৭নং পৃষ্ঠদেশের পেশী, ৮নং স্কন্ধদেশের পেশী, ৯নং হাতের ও পায়ের অংশ, ১০নং হাতের নিম্নাংশ, ১১নং হাতের কবজি, ১২নং হাতের আঙুল, ১৩নং গলদেশের যন্ত্রপাতি, ১৪নং চোখের পাতা, ১৫নং কপোল, ১৬নং চোয়াল, ১৭নং অধরোষ্ঠ, ১৮নং ? ১৯নং চোখ, ২০নং অংশের আদেশে জিহ্বা চালিত হয়। ২২নং ? ২৩নং ? ২১নং কানের, ২৪নং চোখের, ২৫নং ত্বক ও পেশীর ভিতর দিয়ে অনুভূতি সংগ্রহ করে। মস্তিষ্কের কত অল্প অংশ কত বিরাট কাজ করে তা ভাবলে আশ্চর্য্য হতে হয় এবং কত ক্ষুদ্র অংশ বিরাট অনুভূতি সংগ্রহ করে কোষের মধ্যে সঞ্চয় করে রাখে তা ভাবতেই পারা যায় না।]
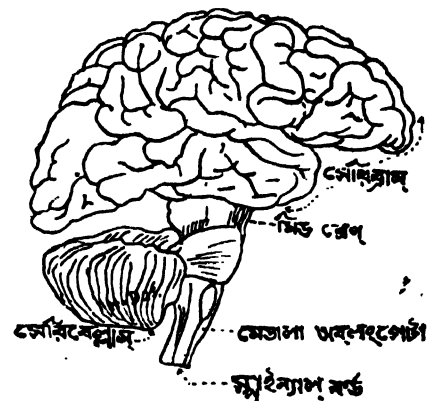
বিশেষ স্তরের সঙ্গে। মস্তিষ্কের ঐ বিশেষ স্তরটি যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি, মেধা ও স্মৃতির আধার যেদিন হাতে-নাতে শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা তা প্রমাণ করে দিলেন, সে দিনটি বাস্তবিকই বিজ্ঞানের একটি স্মরণীয় দিন। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা মন নিয়ে নানা গবেষণা করলেও মন যে কি বস্তু তা চাক্ষুষ দেখবার সৌভাগ্য তাঁদেরও ঘটেনি। শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা প্রমাণ করে দিলেন মস্তিষ্কের ঐ বিশেষ বহিরাবরণ অর্থাৎ 'সেবিব্রাল কর্টেক্স'টিই হলো মানুষ এবং মনুষ্যেতর জীবের যাবতীয় বুদ্ধি ও মননশীলতার আসন। তাঁরা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিলেন, মস্তিষ্কের ঐ স্তর চেঁচে বাদ দিলে জীব মারা পড়ে না তবে তার পূর্ব্ব-স্মৃতি একেবারে লোপ পায়, আগের দৈনন্দিন জীবনের কোন অভ্যাসই তার মনে পড়ে না; বুদ্ধির প্রয়োজন হয় এমন কোন কাজই সে আর করতে পারে না। বানর, বনমানুষ ও সিম্পাঞ্জীর মস্তিষ্কের কেবল 'সেবিব্রাল কর্টেক্স' স্থানান্তরিত করে এই প্রমাণ দেওয়া হয়। যে ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের বিশেষ এক অংশের স্তর বিলুপ্ত হয়, সে ক্ষেত্রে জীব বিশেষ বিশেষ ধরণের বুদ্ধির কাজ করতে পারে না। কর্টেক্সের এই আংশিক স্থানান্তর থেকে স্নায়ুতত্ত্ববিদ্‌রা ক্রমে ক্রমে পরীক্ষা করে স্থির করেন, বিভিন্ন শ্রেণীর মননশীলতার কাজের জন্য কর্টেক্সের সীমা বিভাগ আছে। যেমন, গীতবাদ্যের অনুভূতির জন্য এক অংশ, অঙ্কশাস্ত্রের বা সংখ্যাবিদ্যার জন্য এক অংশ, সাধারণ বুদ্ধির জন্য এক অংশ প্রভৃতি। আজ কার্য্য অনুসারে মস্তিষ্কের এই সীমা-বিভাগ এমন স্থির এক পর্য্যায়ে এসে পৌছেচে যাতে করে তাঁরা ভূগোলের মানচিত্রের মত মস্তিষ্কের সুনির্দ্দিষ্ট মানচিত্র রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। কোন ব্যক্তির কোন আকস্মিক দুর্ঘটনায় মস্তিষ্কের বহিরাবরণের বিশেষ কোন অংশ স্থানান্তরিত হলে, ঐ মানচিত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেই এখন বলা যায় ঐ আহত ব্যক্তি কোন্ কোন্ শ্রেণীর মননশীলতার কাজ করতে পারবে না। আজকের স্নায়ুতত্ত্ববিদ্‌রা কেবল যে ফ্রয়েড ও তৎ-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের কাল্পনিক 'মনের' থিওরীই ধূলিসাৎ করেছেন তাই নয়, তাঁরা হাতে-কলমে প্রমাণ করেছেন, মন বলে প্রকৃতপক্ষে কিছুই নেই। ওটা হলো একটা ভ্রান্ত দার্শনিক ব্যাখ্যা মাত্র। পরন্তু তাঁরা আজ সর্ব্বসমক্ষে দেখিয়ে দিয়েছেন, মানুষের ও উচ্চ শ্রেণীর জীব জন্তুর বুদ্ধি ও মননশীলতার অবস্থান মস্তিষ্কে। পরীক্ষা দ্বারা তাঁরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, বিভিন্ন শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্যের জন্য মস্তিষ্কের ঐ আসনের নির্দ্দিষ্ট বিভাগ আছে। ফ্রয়েডের জীবিতাবস্থাতেই শরীরতত্ত্ববিদ্‌রা এই থিওরী খাড়া করে তাঁর ভ্রান্তি দেখান। এরই ফলে ফ্রয়েডের থিওরীতে 'Ego ও super-Ego নামধেয় দু'টি নতুন ব্যাখ্যা পরে সংযুক্ত হয়।

টেলিগ্রামের সংবাদ যেমন বিভিন্ন দিক হতে এসে কেন্দ্রীভূত হয় 'হেড আপিসে' ঠিক তেমতি মানুষের দেখা, শোনা, কিম্বা নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ দ্বারা অভিজ্ঞতা এসে সঞ্চিত হয় মস্তিষ্কের কর্টেক্স নামক একেবারে বাহিরের আবরণে। দেহের বিভিন্ন অঙ্গের স্নায়ুমণ্ডলীই এগুলি বহন করে আনে। মস্তিষ্কে কতকগুলি কেন্দ্র আছে, যেগুলি প্রহরীর মত ঐ সমস্ত অভিজ্ঞতাদের আগলে থাকে। মস্তিষ্কের নিম্নাংশের থ্যালেমাস (Thalamus) এবং হাইপো-থ্যালেমাসের (Hypothalamus) নাম তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সমস্ত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি শ্রেণীবিভক্ত হয়ে স্ব স্ব বিভাগে জমা হয়ে থাকে এবং যখন যার ডাক পড়ে তখন সে এসে হাজরে দেয় কিম্বা কাজে নিযুক্ত হয়। যার কোন প্রয়োজন নেই তার ডাকও পড়ে না। কিন্তু নিদ্রাকালে মস্তিষ্কের প্রহরী বা সেনসর (censor) ক্লান্ত হয়ে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে পূর্ব্ববর্ণিত অনুভূতি ও অভিজ্ঞতাগুলি স্বাধীন ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাদের মধ্যে কোন রকম শৃঙ্খলা থাকে না। ফলে তারা যথেচ্ছ ভাবে নিজেদের ক্রিয়া সুরু করে। আধুনিক থিওরী অনুসারে মানুষের নিদ্রাকালে বহির্জগতের কোন কিছু তার চেতনাগম্য না হলেও মস্তিষ্কের ভেতরের কার্য্যকলাপ ব্যাপারে সে একেবারে অচৈতন্য হয় না। কাজেই মস্তিষ্কের ভেতরে যে সব পরিবর্ত্তন ঘটে সে তা প্রত্যক্ষ করতে পাবে। এরই ফলে নিদ্রাকালে অসংলগ্ন চিন্তারাশি, অনুভূতি, পূর্ব্ব-অভিজ্ঞতা সঞ্চিত স্মৃতি যখন
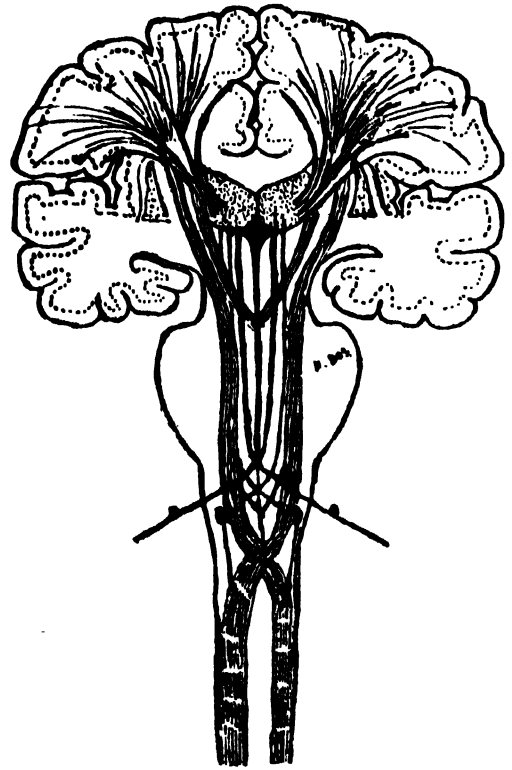
মস্তিষ্ক ও মেডালা অবলংগেটা

অসংলগ্ন ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে সুরু করে তখন নিদ্রিত ব্যক্তি সেগুলি স্বপ্নাকারে দেখে। মস্তিষ্কের Cerebral cortex-এর অসংলগ্ন নির্দ্দেশ কেবল স্বপ্নেরই সৃষ্টি করে না, স্বপ্নদ্রষ্টার স্নায়ুমণ্ডলীকে এমন সব নির্দ্দেশ দেয়, যার ফলে সে হাত, পা ও মুখের ঠোঁট নাড়ে, সময় সময় শয্যা ছেড়ে উঠে চলতে সুরু করে। এই হলো অতি আধুনিক স্নায়ুতত্ত্ববিদের স্বপ্ন সম্বন্ধে সাম্প্রতিক ব্যাখ্যা। জাগ্রত-মন, মগ্ন-মন, সুপ্ত-মন, এ সমস্তই তাঁরা একেবারে বর্জ্জন করেছেন। অনির্দ্দিষ্ট মনের ততোধিক অনির্দ্দিষ্ট কাল্পনিক ব্যাখ্যার মূলেও তাঁরা করেছেন কুঠারাঘাত, যার ফলে আজ ষ্টাকেল, য়ুং, ক্রাফ্‌ট-এবিং, ট্রেইঞ্জল, য়্যাডলার প্রভৃতির ব্যাখ্যা হয়েছে একেবারে ভূতলশায়ী, ফ্রয়েড, হাভলক এলিসের ত কথাই নেই।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১২

বাসব তখনও ঘুমুচ্ছে। ওর স্বাস্থ্য ভাল নয় বলে বড্ড ঘুম-কাতুরে। এই স্বাস্থ্যের অজুহাতে ও ভাল করে লেখা-পড়া করতে পারলে না। স্মৃতিশক্তিটা প্রখর নয়। পাঠশালা থেকে ও পণ্ডিতের বেত খেয়ে আসছে। ইস্কুলের নতুন বিধান অনুসারে বেত অচল, কিন্তু মাষ্টাররা ধমকের চেয়ে কার্য্যকরী শাসনের পক্ষপাতী বলে চড়টা-চিমটিটা অবাধে চালান। সেই আইন বাঁচানো শাসনের ধাক্কায় এক দিন বাসব অজ্ঞান হয়ে পড়ে। বাসবের পিসিমা আর তাকে ইস্কুলে যেতে দিলেন না। তার সেই প্রহারকারী মাষ্টারের বাড়ি গিয়ে তাকে এমন ন্যায্য দু'কথা শুনিয়ে দিয়ে এলেন যার ফলে ওঁদের বাড়ির দামোদরের নিত্য ফুল যোগানটা বন্ধ হয়ে গেল। পিসিমা পাড়ায় বলে বেড়ালেন. পড়ার নামে ছেলে খুন করে যে মাষ্টার, তাদের আবার ঠাকুর—তার আবার পূজো!

সংসারের টুকি-টাকি কাজ—আনা-নেওয়া—বাগান দেখা এই সব সে করে। তা বাসবের যত্নে বাগানের শ্রী ফিরছে। কোথায় গোবর পচিয়ে সার দেওয়া—মাটি খুঁড়ে গোলাপের শিকড়ে শিশির লাগানো—দোআঁশলা মাটি এনে রজনীগন্ধার ঝাড় তৈরী করা—নীল দোপাটি, অপরাজিতা ও তরুলতা বেড়ার গায়ে ঘন করে বিন্যাস করা—করবীর ডাল ছাঁটাই করে ঝাঁকড়া করবার প্রথা—সবেতেই বাসুর তদ্বির তদারক চলে। ও না থাকলে মালি-বাড়ির বাগান থাকতো না। ভাঙ্গা বেড়া গলে গরু-ছাগলে শেষ করে দিত দুর্ব্বো ঘাসটি পর্য্যন্ত। তবে বাসু একলা খাটে না—মাধবও তাকে সাহায্য করে।

আগে পুরন্দর বাসুর জন্য ভাবতো। বাসু লেখাপড়া শিখতে পারল না বলে পুরন্দর দুঃখ করতো। আজকাল ও সান্ত্বনা পেয়েছে। বিদেশী শিক্ষার মোহ ওর কাটছে। যে শিক্ষায় মনুষ্যত্ব লাভ হয় না—বশম্বদ ভৃত্য জন্মায়, হোক না সে অশন-বসনের সমস্যা-পূরণের পন্থা, সে শিক্ষার গলদ ও আবিষ্কার করতে চায়। যারা শাসনের রজ্জু দিয়ে কষে কষে বেঁধেছে ভারতের কোটি কোটি মানুষকে—তাদের রীতিকে, শিল্পকে বা ভাষাকে ভালবাসবার বা শ্রদ্ধা করবার অবসর কই? যদিও তাদের ভাষার মাধ্যমে পৃথিবীকে জানা যাচ্ছে। জানা যাচ্ছে এই পর্য্যন্ত—শাসিতরা কৃতজ্ঞ হতে পারছে না শাসকদের উপর। প্রীতি নেই বলেই প্রাণের আগুনে পুড়ে যাচ্ছে কৃতজ্ঞতা। যে কৃতজ্ঞতা দাসত্বেরই নামান্তর তা না থাকলেই ভাল।

বাসু যদি মাটি, গাছ, ফুল, পাখী, শোলা, গন্ধক, রাংতা ও জরি নিয়ে জীবনকে পূর্ণ করে তুলতে পারে তাই ওর পক্ষে যথেষ্ট।

পিসিমা ভোরেই ওঠেন। পুরন্দরকে মুখ ধুতে দেখে বললেন, মেজ বাবু তোকে ডেকেছেন। ফুলটা দিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে আসবি, বুঝলি?

একটু বেলা হ'লে বাধ্য ছেলের মত পুরন্দর মেজ বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেল।

মেজ বাবু বললেন, বোস।

পুরন্দর বসলে।

ভড়র ভড়র শব্দে অনেকক্ষণ তামাক টেনে মেজ বাবু বললেন, চাকরি করবে?

পুরন্দর চমকে তাঁর পানে চাইলে। মেজ বাবু পুরন্দরকে ভাল মতেই জানেন। তিনি তো ভুলেও পরিহাস করেন না ওর সঙ্গে।

মেজ বাবু বললেন, কাল তোমার পিসির মুখে যা শুনলাম তাতে চাকরি করাই তোমার উচিত।

পুরন্দর কথা কইলে না।

মেজ বাবু বললেন, লেখাপড়া শিখে আত্মসম্মান যদি না-ই জানলে—তাহলে বিদ্যার মূল্যটা কি? তুমি হারু জোলার মত মদ খেয়ে চৌরাস্তায় মাতলামি করতে পারবে না, কেন না তোমার শিক্ষা তোমায় বাধা দেবে। কিংবা যারা অন্য চরিত্রের লোক তাদের সঙ্গে মিশে হৈ-হৈ করতেও তোমার বিবেকে বাধবে। এই যে কাল কাণ্ডটি হ'লো—এর জন্য নিশ্চয় অনুতপ্ত হ'য়েছ।

পুরন্দর বললে, অনুতাপ কিসের?

মেজ বাবু বললেন, শশীপদ যা করেছে—তার পরেও ওদের নিয়ে স্বদেশী করতে তোমার লজ্জা হবে না কি?

পুরন্দর মৃদু স্বরে বললে, আর সবাই তো মন্দ কাজ করেনি।

মেজ বাবু বললেন, ওরে বাবা—একটা ভাত টিপলেই এক হাঁড়ি ভাতের চেহারা মালুম হয়। ওদের বাবা-ঠাকুরদাদারা করেছে কি? কংগ্রেসে ঢোকবার আগে ওরা ছিল কি? চুরি—জুয়োচুরি—মদ—বেশ্যা—কোনটা ওদের বাদ আছে বলতে পার?

পুরন্দরের মনে হ'লো—আবার সে দু'টি পথের সংযোগ-স্থলে দাঁড়িয়েছে। চিরাচরিত বিশ্বাস ও মানুষকে ভালবাসবার ইচ্ছা তাকে দু'দিক থেকে টানছে। কি বলতে গিয়ে সে বলতে পারলে না।

ওর দ্বিধা বুঝলেন মেজ বাবু। আপন সঙ্কল্পে জোর দিয়ে তিনি বলে উঠলেন, না—না, ও-সব কুসঙ্গ আর নয়। তোমরা আমাদের আশ্রিত—তোমাদের ভাল দেখা কর্ত্তব্যের সামিল মনে করি। যাও, বাড়ি যাও। বিকেলে আসবে—আমি চিঠি লিখে রাখবো।

বারান্দার এ-পাশ ঘুরে মাথা হেঁট করে সে চলে আসছিল—কে কোথা থেকে মৃদু স্বরে বললে, চাকরি হলে আর ভুল করতে হবে না, ভুল হলেই খতম।

···সেদিনকার সেই মেয়েটি···অন্দরের ছোট দরজায় দাঁড়িয়ে হাসছে।

পুরন্দরও হাসলো, হাঁ—তোমার কথায় বোধ হচ্ছে চাকরি আমার হয়ে গেল।

মেয়েটি ভ্রূ কুঁচকে বললে, আপনি কি ভাবেন মেজকা সুপারিশ করলে আপনার চাকরি হবে না? ওঁর কথার দাম নেই?

ওঁর কথার দাম আছে বলেই তো ভয় পাচ্ছি।

মানে?

মানে সোজা। চাকরি আমি চাই না। উত্তরের প্রতীক্ষা না করে পুরন্দর সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলো।

মেয়েটি এক মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বললে, তাহলে ওঁকে বলুন।

আমি না এলেই উনি বুঝতে পারবেন।

মেয়েটি খিল-খিল করে হেসে উঠলো, আপনি ভয় পেয়েছেন।

ভয়! বিস্ময়ে চমকে দাঁড়ালো পুরন্দর।

সাহেবের আপিস কি না—

অত্যন্ত ছেলেমানুষের মত কথা। হাসি আসে।

মেয়েটি রেগে বললে, হাসচেন যে ?

গম্ভীর হয়ে পুরন্দর বললে, না—না—ঠিকই বলেছেন আপনি। আপনার মেজকা'কে বলবেন, ও চাকরি আমার দ্বারা পোষাবে না। যেন ভয় পেয়েছে এমনি ভাবে সে কথাগুলি বললে।

কি রে শান্তি—কার সঙ্গে কথা বলছিস্ ?

এই উনি বলচেন চাকরি করবেন না।—আঙুল দিয়ে দেখাতে গিয়ে দেখলে পুরন্দর চলে গেছে।

এবার সে রেগে উঠে বললে, তোমার যেমন খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই তাই পথের লোককে ধরে-ধরে চাকরি দিতে চাও।

মেজ বাবু ওর রাগ দেখে হেসে উঠলেন।

কাল রাত্রির ঘটনাটা গাঁয়ে ছড়িয়ে গেছে। যে ক'টা ঘটনা হয়ে গেছে কাল—তার মধ্যে চুরিটাই প্রধান আলোচনার বিষয়। ময়রার দোকানে—পথের মোড়ে পানের দোকানে এবং চায়ের আড্ডায় সবাই বলাবলি করছে ওই কথা। পুরন্দরকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলে ক'জন।

হাবুল ময়রা ডাকলে, ও কালো বাবু—শোন না !

পুরন্দর দোকানের সামনে দাঁড়াইতেই সে বললে, কি হ'য়েছে ব্যাপারটা বল তো ? সবাই বলছে—দেশের কাজে টাকা দরকার বলেই শশীপদ এমন কাজ করেছিল। নইলে হারটা সে বেচলে না কেন ?

পুরন্দর বললে, আর কিছু বলবে ?

সে অপ্রস্তুত হয়ে হাসলে, না—না—তাই বলছিলাম কালো বাবু আমাদের তেমন নয়।

পুরন্দর বললে, তোমরা, বোধ হয় ভাব যারা স্বদেশী করে দায়টা সব তাদেরই—তোমাদের কর্ত্তব্য এতে কিছু নেই ?

আমরা ? আমাদের শক্তি কতটুকু ? পরে হেসে বললে, লাভই বা কি আমাদের। দেশ স্বাধীন হ'লেও তো এই তাড়ু ঠেলতে হবে ? বলে হাসলে।

দেশ স্বাধীন হ'লে তোমরা কি করবে আশা কর ?

মাথা চুলকে হাবুল বললো, দেখুন দিকি—মুখ্যু মানুষ কি উত্তর দেই। বলি জজ-ম্যাজিষ্টর না হই—আপিসের চাকরীই কি জুটবে আমাদের ?

পুরন্দর হাসলে। হাবুলের দোষ নেই। অনেকে তাকে ওই ভাবেই জিজ্ঞাসা করেছে। তাঁতীরা, দোকানীরা এমন কি কেরাণীরা পর্য্যন্ত বলেছে—স্বাধীন হলে তাদের লাভ কতটুকু ? লাভ বলতে কি বোঝায় তার উত্তরে জানিয়েছে—এই কাজ-কর্ম্ম না করলেও খেতে-পরতে আমোদ করতে পারবে। যেটা পয়সার অভাবে বা কাজের চাপে করবার সুবিধা হয় না সেইটা যতক্ষণ খুসী আশা মিটিয়ে করা যাবে। সাদা কথায় আলসেমি আর উচ্ছৃঙ্খলতা।

হাবুলের দোকানে মুড়ি-মুড়কি কিনতে কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এলো। স্বাধীন তার অন্য কি অর্থ হতে পারে—সে কথা সে জিজ্ঞাসা করতে পারলে না।

ওস্তাগরদের ইব্রাহিম যাচ্ছিল—দড়ি দিয়ে বেঁধে একটা খাসিকে টানতে টানতে। হাতে তার এক গোছা কাঁটাল পাতা থাকা সত্ত্বেও ছাগলটা সেদিকে মুখ বাড়াচ্ছিল না। ইব্রাহিমের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেই অবোলা পশু হাঁটু ভেঙ্গে পথের মাঝে শুয়ে-শুয়ে পড়ছিল।

চায়ের দোকানে চা খেতে-খেতে কয়েক জন লোভার্ত্ত দৃষ্টিতে চেয়েছিল সেই ছাগলটার দিকে। জিভ দিয়ে মুখে চুক্-চুক্ শব্দ করে এক জন বললো, বাঃ—খাসা ছাগল ! হেসে-খেলে পনেরো সের মাংস হবে।

আর এক জন বললে, কক্খণো নয়। বাজী রাখ—বারো সেরের বেশি যদি হয়—

এক সের রসগোল্লা।

দূর—ঠাণ্ডার দিনে রসগোল্লা। তার চেয়ে এক পাট খানি—আর আধ সের মাংস ! কি বলিস্ তিনকড়ি ?

তিনকড়ি হে-হে করে হেসে বললে, বাজীর মাল আরও কিছু বাড়িয়ে দাও। আমরা সবাই আছি তো। বলে, দিও কিঞ্চিৎ—না করো বঞ্চিত।

ইব্রাহিম কাছে আসতেই এক জন জিজ্ঞাসা করলে কতয় কিনলে হে ?

ইব্রাহিম একটু দাঁড়িয়ে বললে, ত্রিশটি টাকা গুণে নিলে—একটা পয়সা কম নয়।

তা মাংসও তোমার চোদ্দ সের হবে। ছালখানা বিক্রী হবে দু'টাকার কম নয়।

চোদ্দ সের ! বলে খাসিটাকে দু'হাতে তুলে ধরে তৎক্ষণাৎ নামিয়ে দিয়ে হাসলে, আধ মণের কম নয়। সবাই বলছে—গাঁতে মেরেছ।

বাজী রেখেছিল যারা—তারা বিশ্বাস করলে না—মুচকে মুচকে হাসলে।

তিনকড়ি বললে, না—অত হবে না। ল্যাজ মাথা ঠ্যাং শুদ্ধ আধ মণ হবে।

ইব্রাহিম বললে, বেশ তো—ময়রার গুড়-মাপা পাল্লা রয়েছে টাঙানো—

সবাই উৎসাহিত হয়ে উঠলো। বেশ চল।

ময়রার দোকান থেকে ফিরছিল পুরন্দর। তাকে দেখে ইব্রাহিম বলে উঠলো, ইয়া আল্লা—তোমাকে খুঁজে-খুঁজে হয়রাণ। এসো—এসো, কথা আছে। বলে এক হাতে ছাগলটাকে টানতে টানতে অন্য হাতে পুরন্দরের ডান হাত চেপে ধরলে।

পিছনের দল হতাশ হয়ে চায়ের দোকানে ফিরে গেল এবং পুনরায় তর্ক তাদের উদ্দাম হয়ে উঠলো—ছাগলটার মাংস বারো সের—না পনের সের—না আধ মণ ?

ইব্রাহিম বললে, বৃত্তান্তটা শুনে ভারি খুসী হলাম। বেশ করেছ।

কি বেশ করেছে বুঝতে না পেরে পুরন্দর বললে, তোমরা তো কই এলে না ?

কিসে আসবো ! আরে না—না—ওই ইনকেলাব জিন্দাবাদের দলে আমি নই। ঘাড় দুলিয়ে হেসে সে বললে, বলছি, যারই জিগির দাও—বড়লোকদের জব্দ করতে না পারলে কিছুই হবে না। তোমাদের দে মশায়, আশ মশায়, বিশ্বাসরা, আমাদের শোভান মিঞা—ফেলু শেখ—কাকেও রেহাই দিলে হবে না। ওরা জোঁকের মত রক্ত চুষে নিচ্ছে গরিবদের।

পুরন্দর বললে, আমাদের কাজ মানুষকে ভালবাসা।

ইব্রাহিম হাসলে, দোস্তি হলো সব চেয়ে বড় কথা। দিল চায়

মুহব্বৎ। কিন্তু দুশমনের সাজা না দিলে গুনাহ হয় জান তো। ভাষাটা জোরালো হবে বলে ইব্রাহিম ইচ্ছে করেই আজকাল বাংলার সঙ্গে উর্দু মিশোয়।

পুরন্দর বললে, তোমার কথা আমি বুঝতে পারচি না।

আরে, এ তো পানিকা মাফিক সোজা। মানে—কাছে সরে এসে চুপি-চুপি বললে, আশ-বাড়ি ওই যে হার চুরি—ও হোমিওপ্যাথিক ডোজে কাজ হবে না, এ্যালোপাথিক ডোজ চালাতে হবে। বলে হাসিটা উচ্চ গ্রামে তুললো।

পুরন্দর বললে, তুমি ভুল বুঝেছ ভাই। চুরির সঙ্গে আমাদের কোন সংস্রব নেই।

ইব্রাহিম চোখ কুঁচকে হাসলে, বেশ তো—ভাগ বসাতে যাচ্ছি না তোমাদের ফিষ্টিতে। বলে ছাগলের দড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান দিলে। সেটা ব্যা-ব্যা করে ডেকে উঠলো বার-কতক।

পুরন্দর মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে আসছিল—পিছন থেকে ডাকলে ইব্রাহিম, শোন ভাই—গোসা করো না। আজ সন্ধ্যে বেলায় খাল ধারে আমরা ফিষ্ট করবো। গোস আর রুটি। আর রসগোল্লা। আসবে?

আর কিছু থাকবে না?

হেসে ইব্রাহিম বললে, আর যা থাকবে তা তোমার জন্যে নয়। তবে ইচ্ছে হলে তারও অভাব হবে না। আল্লার কিরে—আসবে তো ভাই?

পুরন্দর বললে, সারা রাত ধরে ফিষ্ট করা আমার ধাতে সইবে না।

ইব্রাহিম হাসলে, জোয়ান ছেলে—রাত জাগবে না—ছি ছি, তোমার হলো কি?

হাসতে হাসতে সে চলে গেল।

পুরন্দর কাল রাত্রিতে প্রতিজ্ঞা করেছে কাউকে ঘৃণা করবে না। ভাবলে—কি কঠিন প্রতিজ্ঞা! সে অন্য পথ ধরলে।

বিষ্ণু সাহার বেড়ার মধ্যে কারা যেন ঝগড়া করছে মনে হলো। এগিয়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দেখলে—বিষ্ণুর বড় ছেলে হরি একটা বাঁশের নাদনা নিয়ে বীর-ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে—বিষ্ণুর হাতে ধলা-আঁকড়ার একটা ডাল। একটা গরু শুয়ে আছে বেড়ার ধারে আর বেড়ার ওপারে দাওয়ানি মিস্ত্রি—কি বলছে।

পুরন্দরকে দেখে দাওয়ানি হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠলো, দেখুন তো বাবু—আমার বকনাটা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে বাবা-ব্যাটায় সাবাড় করলে। গবলো বাছুর—

বিষ্ণু রুখে উঠলো, বেশ করিছি। খেতে দিতে পারিস্ নে তো গরু পুষিস্ কেন? মটরের গাছ, পালঙের গাছ একেবারে মুড়িয়ে খেয়েছে—আবার তম্বি!

তোর গরুর না-কিছু করেছে। বলে হরি নাদনা নিয়ে তেড়ে গেল গরুটার দিকে।

গরুটা উঠবার চেষ্টা করলে—পারলে না। পা ক'খানা তার ইতিমধ্যেই জখম হয়েছে। ড্যাবডেবে চোখ মেলে সে শুধু চেয়ে রইলো। চোখ দিয়ে তার জল গড়াচ্ছে।

পুরন্দর ডাকলে, হরি!

হরি রুখে বললে, কি? আমাদের ক্ষেতিটা ও পুষিয়ে দেবে না কি? না তুমি দেবে?

দাওয়ানি বললে, ভাঙা বেড়া বলেই গরু ঢুকেছে বাবু। ওর কি জ্ঞান-গম্যি আছে—অবোলা জীব!

প্রত্যুত্তরে বিষ্ণু ও হরি কয়েকটা অশ্লীল কথা বলে দাওয়ানিকে গাল দিলে।

পুরন্দর তীব্র স্বরে বললে, তোমার ক্ষতি হয়—আইন আছে—গরু পাউণ্ডে দাও। গরুকে ঠেঙাবার এক্তিয়ার নেই তোমাদের।

বেশ করবো—আমরা কি কোন মিঞার ধার ধারি? বলে বিষ্ণু আর হরি হুঙ্কার দিয়ে উঠলো।

পুরন্দর বললে, বৃটিশের আদালতে নালিশ করতে আমি কাউকে বলি না—তবে দাওয়ানি, তুমি নালিশ করলে আমি সাক্ষী দেব জেনো।

এই কথায় বিষ্ণু ও হরির বিক্রম কিছু কমে গেল। নাদনা নামিয়ে দু'জনে কিন্তু মুখে সাপট মারলে, আচ্ছা—আচ্ছা, আদালত আর আমরা চিনি না তো তাই জুজুর ভয় দেখানো হচ্ছে। দাওয়ানির দিকে ফিরে বললে, ফের যে-দিন গরু ঢুকবে এই জমিতে গোহত্যা করে জলস্পর্শ করবো বুঝলি?

গরুটাকে দাওয়ানি একা তুলতে পারলে না, আর্ত্ত কণ্ঠে পুরন্দরকে বললে, বাবু—একবার ইদিকে আসবেন। বড্ড জখম হয়ে পড়ছে গরুটা।

পুরন্দরের সাহায্যেও ওকে তোলা গেল না। শেষে বিষ্ণু ও হরিও এলো। গরুকে মারবার সময় ওদের স্মরণ ছিল না যে, গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত কি কঠিন। আর যে জমিতে গোহত্যা হয় তার এক গাছা ঘাস পর্য্যন্ত না কি তাজা থাকে না। সমাজের শাসন না থাক—আত্মীয়-কুটুম্বের ধিক্কার আছে। যে করে গোহত্যার প্রায়শ্চিত্তের কড়ি সংগ্রহ করতে হয়—সে তাদের ছেলেবেলার স্মৃতিতে আঁকা আছে। গলায় এক গাছা দড়ী জড়িয়ে—গরুর মত ডাক দিয়ে দোরে-দোরে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয়। যত দিনে সম্পূর্ণ কড়ি সংগ্রহ না হয়—তত দিন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে এই ভাবে ঘুরতে হবে।

বেড়ার বাইরে গরুটাকে সরিয়ে দিয়ে বিষ্ণু ও হরি চলে গেল। পুরন্দর বললে, জল নিয়ে এস দাওয়ানি! একটা গামলা কি মাটির নাদায় করে।

জল খেয়ে গরুটা সুস্থ হতেই পুরন্দর বাড়ি চলে এলো।

১৩

বাড়ির সামনের রাস্তায় হরিপদ, নিতাই ও যতীন দাঁড়িয়ে ছিল।

তাকে আসতে দেখে যতীন বললে, কাল বলেছিলে বিহিত করবো—তাই এলাম। শশীপদর মা আর বোন কাল সারা রাত পাড়া মাথায় করে চেঁচিয়েছে—কেউ ঘুমুতে পায়নি। আজ সকালে বাপের বাড়ী থেকে বাচ্চা বউটাকে পর্য্যন্ত আনিয়ে আবার মড়াকান্না সুরু করেছে।

পুরন্দর বললে, এক উপায় হচ্ছে আশ মশায় যদি কেস উইথড্র করে নেন। থানায় ডায়েরি হয়েছে, দারোগা কি অমনি ছাড়বে?

দারোগাকে আমরা দেখব, তুমি শুধু আশ মশায়কে ঠিক কর। না হয় বল তো শশীর মা বউ বোন সবাইকে নিয়ে ওদের বাড়ি ধর্ণা দেওয়া যাক।

না থাক, দেখি কত দূর কি হয়। আচ্ছা, তোমরা যাও, এক ঘণ্টা পরে যাচ্ছি আমি।

ওরা চলে যেতেই পুরন্দর বাড়ির মধ্যে এলো। পিসিমা বললেন,

সকাল হ'লো তো পায়ে ফাগ বেঁধে ছেলে টো-টো করে ঘুরতে আরম্ভ করলেন। গিয়েছিলি মেজ কর্ত্তার ওখানে ?

পুরন্দর ঘাড় নেড়ে বললে, হঁ্যা। কি খেতে দেবে দাও শীগ্‌গির।

দাঁড়া—এ্যাড়া কাপড় ছেড়ে—ও বউ—কালোকে কি দেবে দাও না তুমি। হঁ্যা দেখ—ছিকেয় ফেরোর মধ্যে তিলের নাড়ু আর—বকনো-ঢাকা চাল-ভাজা, তাই দাও।

বাসু কোথায় ?

সে জল খেয়ে কোথায় যে গেল। ওরে ও মোদো, বেসো কোথায় গেল রে ?

মাধব উত্তর দিলে. চক্কর্ত্তিদের ঝাড়ে না কি ভাল তলতা বাঁশ আছে—তাই আনতে গেল।

বাঁশ আনতে গেল ? পারবে ছেলেমানুষ একা বয়ে আনতে ? তুই কি বলে তাকে একা যেতে দিলি !

মাধব উত্তর দিলে, আমি যাই আর ছেলেগুলো কাকের পেছনে যেমন ফিঙে লাগে তেমনি লাগুক। হালকা তলতা বাঁশ আনবে তার আবার কথা! বহুক্ষণ ধরে সে আপন মনে গজ-গজ করতে লাগলো।

পুরন্দর এধারে এসে বললে, তলতা বাঁশ কি হবে বাসু কাকা !

আরে বাবা—সরস্বতী পূজোয় জান তো ঘুড়ি ওড়ানোর ধুম। দু'দিস্তে চীনে কাগজ আর গোটা দুই বাঁশ যোগাড় করতে পারলে—পাঁচটা টাকা লাভ !

কাগজ পেয়েছ ?

হুঁ—সে জোগাড় না করে কি আর বাসু বাঁশ আনতে গেছে ? ···দাওয়ার ওপর উঠে সে কাগজের দিস্তা মাদুরের উপর রেখে বললে, বিক্রী হয় আরও দু'দিস্তে যোগাড় হবে। একতা আর আধতা ঘুড়ি তৈরী করবো। পেট-কাটা হর-গৌরী দোরঙা তেরঙা—দেখলে কলকাতার কারিগর হার মেনে যাবে।

পুরন্দর বললে, এবার ঠাকুরের সাজ তৈরী করবে না ?

কি দিয়ে সাজ হবে ? রাংতা আছে—জরি আছে—না চুমকি পাওয়া যায় ? তবে শোলার পদ্ম চালে দেওয়ার রেওয়াজ বাড়ছে, যদি বায়না দেয় কেউ—তৈরী করে দেব।

ঘুড়ি নিয়ে থাক যদি—

হুঁ—তার আবার ভাবনা। সারা দিন-রাত খাটবো দু'জনে। না-পারি তুমিও লেগে যেয়ো। বল তো—কাল থেকে পাটা পাতি।

বেশ তো—আমিও লাগবো।

এমনি ভাল লাগছে না। কাজের মধ্য দিয়ে সে এই নিরুৎসাহ ভাবটিকে কাটাতে চায়। চাকরি সে করবে না। এই তো দেশে কত কাজ রয়েছে। না হয় ফের শোলার টোপর তৈরী করবে। তৈরী করবে রংমশাল—বাজী—হাউই। সারা শীত কালটা ঘুড়ির চাহিদাও তো কম নয়। তার পর রয়েছে চরকা। দিনের তিনটি ঘন্টা অন্তত যদি সুতো কাটায় দিতে পারে—নিজেদের বস্ত্রের সংস্থান হ'য়েও যা উদ্‌বৃত্ত থাকবে তা বিক্রী করলেও অলাভ নেই। কাপড়ের বাজার দিন-দিন চড়ছে। শোনা যাচ্ছে—কাপড়ও রেশনিংএ যাবে। ভাল কথা, এমন সময়ও আসতে পারে যখন তুলোর মুখ চেয়ে তাকে চরকা চালনা বন্ধ করতে হবে। না—কাপাস-বীজ সে যথেষ্ট সংগ্রহ করেছে। এবার আরও খানিকটা জমি ঘিরে নিয়ে অনেক কাপাস গাছ লাগাবে সে।

হঠাৎ সে হাসলে—একটা কথা মনে পড়লো। যুদ্ধ তখন বাধেনি—কোথা থেকে একটা কাপাসের চারা এনে রান্না ঘরের পাশে যেখানে জল গড়ায় সারা দিন—সেইখানে পুঁতেছিল। জল পেয়ে এক মাসে গাছটা হ'য়ে উঠলো শাখা-প্রশাখায় সমৃদ্ধ।

এক দিন সে-দিকে চেয়ে পিসিমা বললেন, ওটা কি গাছ রে ?

কেন—কাপাস গাছ তুমি চেন না ?

আপনি হ'য়েছে—না তুই দিয়েছিস্ ?

আমি চারা এনেছি মল্লিকবাড়ি থেকে।

পিসিমা সত্রাসে বললেন, উপড়ে ফেল—উপড়ে ফেল। আঃ রে বোকা—কাপাস গাছ কখনও বাড়িতে পোঁতে ?

কেন পিসিমা, কাপাস গাছ পুঁতলে কি হয় ?

ওতে দারিদ্দির আসে। যাদের আজ খেতে কাল নেই—তারা পোঁতে ওই গাছ। কাটনা কেটে খায় যারা—

তুমিও তো সুতো কাট।

এই দেখ—কিসের সঙ্গে কি ! আমি সুতো কাটি পৈতের জন্যে। ঠাকুরবাড়ি ফুল দিতে যাই—বামুনরা বলে—মালী-বৌ পৈতে কর না কেন ? আমরা বাজার থেকে পৈতে যে কিনি তাতে তিন দণ্ডি হয় না—সুতো খারাপ। বলি—আচ্ছা, যে সময়টা বসে থাকি না হয় কাটি পৈতের সুতো।

নিজে হাতে গাছ পুঁতে উপড়ে ফেলা সহজ নয়, তাছাড়া পিসিমার প্রবাদ বাক্যে ও বিশ্বাসই করেনি।

তার পরদিন পিসিমা আবার গাছ তুলে ফেলতে বললেন। পুরন্দর কান দিলে না।

তৃতীয় দিনে জায়গাটা খালি-খালি দেখে মাকে জিজ্ঞাসা করলো, গাছটা কি হলো মা ?

মা বললেন, ঠাকুরঝি গাছটা তুলে গঙ্গা নাইতে গেছেন।

আজ দরিদ্রেরা দারিদ্র্যের জন্য নয়—মধ্যবিত্তের পর্য্যন্ত লজ্জা বাঁচাতে কাপাস গাছ পুতেছেন ভিটায়। লজ্জার কাছে কোন অপবাদই বড় নয় বলেই—সে-ও পিসিমাকে বলেছে এ কথা।

পিসিমা বলেছেন, বসত-বাড়ির মধ্যে না হয়—দে না বাগানের এক পাশে। সুতোর অভাবে আমিও তো পৈতে তৈরী করতে পারি নে।

হায় রে দারিদ্র্য ! তোমায় অশ্রদ্ধা করে যারা, তোমাকে তারা ভয়ই করে প্রকৃত। কিন্তু অভাবের সঙ্গে মিতালী পাতিয়ে যারা এই সব কুসংস্কারকে এত কাল পোষণ করে এসেছে আজ তুমি তাদের চোখ খুলে দিয়েছ। দেবতার দৌলতে মানুষের শ্রীবৃদ্ধি, সুতরাং তাঁর সেবা-পূজার ত্রুটি যেন না-হয়। তেরশো পঞ্চাশ বিদ্রূপ করেনি কি দেবতাকে ?—পাওয়া গেল না চিনি, পাওয়া গেল না আতপ চাল—উপকরণ যোগাতে না পেরে মানুষ করলে কি ? আজও রেশনের দৌলতে নিয়মিত মিলছে না আতপ চাল—বিধবাদের থান কাপড় তাও পাওয়া যাচ্ছে না। মানুষ করছে কি ? বলছে না কি—হে ঠাকুর, তোমার মহিমা তুমিই জান। মুগের ডালের নৈবেদ্যে আজ তোমার রুচি হয়েছে বলে আতপ চাল হলো অমিল। আর আতুরে নিয়ম নেই—কাজেই পেড়ে কাপড় পরে যাঁরা লজ্জা নিবারণ করছেন তাঁদের সৌভাগ্যবতী বলতে হবে। বিধি-বিধানের ভারে মানুষ হ'য়েছিল পঙ্গু—তোমাকে করছিল পঙ্গু। তাই কি দুর্ভিক্ষ

আর যুদ্ধ এনে কন্‌ট্রোল আর রেশন দিয়ে তাদের যুগ-যুগের সংস্কারের মূলে এমনি নিষ্ঠুর আঘাত করছো দিন দিন। পুরন্দর হাসলে আপন মনে।

ঘড়-ঘড় করে ছ'খানা বাঁশ উঠানে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাসু চেঁচিয়ে উঠলো, দাদা—দাদা—

তখনও চাল-ভাজা খাওয়া শেষ হয়নি—বাটি হাতে পুরন্দর বাইরে এসে বললে, কি রে ?

হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা হবে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে বাসু।

দাঙ্গা ? হিন্দু-মুসলমানে ! দূর বোকা ! বলে হাসলে পুরন্দর।

বাসু বললে, হাসচো তো ! যখন বাধবে দাঙ্গা তখন দেখবে মজা।

আচ্ছা—আচ্ছা—তুই জিরিয়ে ভাল করে বল দেখি কি ব্যাপার ? কোথায় শুনলি ?

বাসু এক নিশ্বাসে বললে, চক্কোত্তীদের ঝাড়ে বাঁশ কাটছিলাম। পথ দিয়ে মাঠে যাচ্ছিল কারিগর-পাড়ার ছ'জন মুসলমান। তারা বলাবলি করছে—নিজের কানে শুনলাম, বড় বাড় হয়েছে সুমুন্দিদের—এক একটাকে ধরবো—আর পীরের দরগায় জবাই করবো।

পুরন্দর বললে, সে বোধ হয় ওদের মধ্যে সরিকানি বিবাদ।

তার পর পথে আসছি বাঁশ নিয়ে—রাশু রায় বললে, কি রে বেসো, বাঁশ নিয়ে যাচ্ছিস্—রায়ত করবি না কি ? এই তো শুনে এলাম গঙ্গায় চান করে আসতে আসতে মসজেদের সামনে ইব্রাহিম কক্তৃতা দিচ্ছে। বিষ্ণু আর হরি—দুই বাপ-ব্যাটায় মিলে দাওয়ানির একটা গরু ঠেঙিয়ে মেরেছে—দাওয়ানির বউকে বেইজ্জত করেছে—

পুরন্দরের মুখের হাসি নিবে গেল। যে ব্যাপার এ গ্রামে প্রায়ই ঘটে তা নিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা ওঠে কি করে !

ও-সব ব্যক্তিগত কলহের সঙ্গে জাতিকে—ধর্ম্মকে কেউ জড়ায়নি কোন কালে। দুর্ব্বলেরা চিরকাল পীড়ন সইছে ক্ষমতাবানদের হাতে। ধনী হিন্দু গরিব হিন্দুকে আত্মীয় বলে স্বীকার করতে লজ্জা পায়—ধনী মুসলমানও গরিব মুসলমানকে টাকা ধার দেয় না বিনা স্বার্থে। ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে কারো দুর্গতি কিছুমাত্র কমে না—, অথচ ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে এই বিষ জাতির মজ্জায় মজ্জায় চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে !

বললে বাসুকে, তোরা যা করবার কর—আমি দেখি।

বাসু বাধা দিয়ে বললে, না—না—কোথাও যেয়ো না। তোমাকে ওরা মারবে।

আমাকে ! বিস্ময় কাটলে পুরন্দর ভাবলে—বাসু নিশ্চয় ভয় পেয়ে কি শুনতে কি শুনেছে। ওকে আশ্বস্ত করে সে ব্যাপারটা জানবার জন্য দক্ষিণ পাড়ার দিকে চললো।

[ক্রমশঃ।

ধূসরান্ত

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

মুছে যায় ঘাম, ক্লেদ, অবসাদ ক্ষয়িষ্ণু জ্বরের।
কখনো বা চাঁদ আসে ধূসরান্তে আকাশের নীলে,—
সময়ের স্বরে বাজে কোমল ঝঙ্কার,
পঞ্চেন্দ্রিয় ভুলে যায় চতুষ্পার্শ্ব, সত্যকার জীবনের স্বাদ,
জীবনের রূপ আর স্পর্শ, গন্ধ, প্রত্যক্ষের রুক্ষ অনুভব।
হঠাৎ মনের কোণে চিরদিন ভেসে ওঠে,
রুদ্ধ হয় সময়ের গতি।
আসে রঙ, স্বপ্ন, সুর, কল্পিত যে জীবনের অপূর্ব্ব সম্পদ্।
দেহের নিকুঞ্জ ভরে ফুল ফোটে, মৌমাছির মত
আসে লাখো-লাখো কথা,
অফুরন্ত ইতিবৃত্ত, জীবনের নব রূপায়ন,
ইতিহাস-পুরাণের পটভূমে ফিরে যাই।
বাসক লতার কুঞ্জে পান করি জীবন-আসব,
কিংবা অবন্তীর কোনো মেয়ে এসে পাশে বসে দোলায় চামর,
ফিঙের পালক দিয়ে কপালের দূর করে স্বেদ।
এ যেন দুর্য্যোগ শেষে আকাশের শান্তি ফিরে আসা,
বর্ষীয়সী রমণীর ফিরে-যাওয়া নীল স্বাস্থ্যে যুবতীর মত ;
এই সভ্য শতাব্দীর দাসত্বের অবসাদ কখনো বা অকস্মাৎ
উড়ে যাওয়া,
মুছে যাওয়া বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, ভূত।
ক্ষণ রোমান্সের মোহে বিরাট কবিতা যেন জীবনের বেদে।

এ ছাড়া আবার কি ? মুহূর্ত্তকে মুহূর্ত্তের মত ভুলে যাওয়া
অবন্তী বা ইরাণের, কাশ্মীরের কিংবা কোনো উপনগরের
নরম হরিণী চোখ, নম্রতর, পরম নির্ভর কোনো মেয়ে
এনে গান শোনা—
গুন্ গুন্, গুন্, গুন্—গুঞ্জরণে বসন্ত-বাহার।
সে যেন জীবন বলে উপলব্ধ হয়।
প্রত্যহ ঝরুক দূরে, ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, কলে-কারখানায়।
লাভ লোকসান ক্ষতি ডুবে যাক—
পাটাতন-ছিন্ন সব জাহাজেরা সমুদ্রে যেমন।

কাল প্রান্তে শতাব্দীর সঙ্কেতের পশ্চাদ্ধাবন :
আজ তাই এই ক্ষণ রোমান্সে উজ্জ্বল হোক,
ধূসরান্ত জীবনের কল-কাকলিতে থাক মুখরিত শুধু এই ক্ষণ ;
এই ক্ষণে জীবনের পলায়ন কুহকী রঙীন !
এই ক্ষণ যেন আর কাল প্রান্তে নিঃশেষ না হয়—
আজ শুধু বসন্ত উজাড় !

নেমন্তন্ন-বাড়ীতে ওরা একটু দেরী করেই এল।

লীলা জানতো, ওদের সময়ে না-আসা নিয়ে কেউ-ই কোন প্রশ্ন করবে না, আর অসময়ে এসেছে বলেও কোন প্রতীক্ষু মনের অভিমান মৃদু ভৎর্সনার সুরে বাজবে না। এ বাড়ীতে নিমন্ত্রিত অনেকের মত তাদের মুছে-যাওয়া চরণ-চিহ্ন খুঁজে দেখবার জন্যে কারো উৎসুক চোখ জেগে থাকবে না। আজকের উৎসবের ঐক্যতান সুরে পেছন থেকে ওরা যদি একটু সুর-সংযোগ করতে পারে মন্দ কি? গৃহস্বামীর অলাভ নেই তাতে।

গেটের সামনে জামাই বাবু দাঁড়িয়ে ছিলেন—বরপক্ষের কারো সঙ্গে কথা কইছিলেন বোধ হয়। লীলা মাথা নীচু করে' পাশ কাটাতেই ধরা পড়ে গেল।

অচেনা লোকের সামনেই আঁচলে টান দিলেন: বাঃ, চোরের মত ঢুকলেই হ'লো আর কি! গেটে পাহারাওলা আছে সে খেয়াল নেই?

ভ্রূ-কুঞ্চন-রেখায় লীলা মৃদু প্রতিবাদ করে' উঠলো: আঃ জামাই বাবু কি হাস? সব সময়ে—

উৎসব-বাড়ীটার বাইরে দেওয়ালের গায়ে রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তিকে ঘিরে তখনো একটা বৈদ্যুতিক ফুলোডোর পাক খাচ্ছিল—তলায় 'স্বাগতমের' আলোটা নিবে গেছে, কার্ণিশে কার্ণিশে বিজলী গোলাপের আভা ম্লান হ'য়ে এসেচে।

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তি-ছোঁয়া ফুলোডোরের আলোর বিচ্ছুরণ-রেখাটা এসে লীলার মুখের ওপর পড়েচে। মাথায়-ছোঁয়া ঘোমটায় জরির পাড়টা ঝলমল্ ক'রচে—পরনের কাপড়ের ভাঁজে-ভাঁজে তরল আঁধার কালিমার নীচে সাদা-কালো মেঘের মত জমে আছে।

গজেন বাবু দেখলেন—লীলার গৌর মুখটা 'ফোকাস লাইটের' সামনে সু-অভিনেত্রীর মুখের মত আরক্ত, কুঞ্চিত ভ্রূযুগল বঙ্কিম। বললেন, বাঃ, ছোট গিন্নীকে মানিয়েচে ভাল! আর একটু আগে এলে লগ্ন পেরুতে দিতুম না।

ভারি অসভ্য! যখন-তখন ইয়ারকি,—লীলা বাড়ীর ভিতরে ঢুকে গেল।···

তখন ওপরের দালানে অত্যুগ্র আলোর নীচে বিশিষ্টা অভ্যাগতা মেয়েদের জটলা চলছিল। সাড়ী-চুড়ি-বেনারসীর প্রদর্শনী যেন এটা—পনের থেকে পঞ্চাশ রঙ-বেরঙের একাকার হয়ে গেছে—মানুষের ছায়ারা মানুষকে ঘিরে দুলছে পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটায়—একটা সুগন্ধির অদৃশ্য সূক্ষ্ম আস্তরণ ছুঁয়ে আছে সকলকে।

লীলা পা টিপে-টিপে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল, থমকে দাঁড়াল—ভাবলে, সাড়া না দিয়ে ওদের মাঝে মিলিয়ে যাবে না কি! না, দূর থেকে দাঁড়িয়ে ওদের ছায়া-ছবিটা মন্দ লাগচে না!

হঠাৎ এক জনের চোখ পড়তে আর সকলের চোখ টানার মত করে' বললে, ওমা, লীলা যে!

একসঙ্গে দালানের সমস্ত কৌতূহলী দৃষ্টি ঐ দিকে ফিরল। লীলা দাঁড়িয়ে আছে ভীত চোখে, দেরীতে আসার কৈফিয়ৎ দেবার ভঙ্গীতে।

ওরা দেখলে: লীলার অঙ্গ ঘিরে কুন্দ-শুভ্র একখানি তাঁতের দেশী সাড়ী ঘন সোনালী জরির পাড়ের ভারসাম্যে ঝলমল্ করচে—গৌর সুপুষ্ট মুখখানা ভাসিয়ে দিয়ে কেশদাম পিছন দিকে টান করে' বাঁধা—মেঘের কোলে সৌদামিনীর মত সিঁথির সিন্দুর-রেখা—কর্ণশোভা দু'টি দুলে-দুলে সারা মুখখানায় ব্যঞ্জনা করচে—সামান্য ক'গাছা সোনার চুড়ি হাতের ডৌলটাকে মসৃণতায় কোমলতায় নবনীত করে' তুলেচে। সামান্য বেশে লীলাকে আজ অসামান্যা দেখাচ্চে।

বড়দি'ই এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা করলেন, আচ্ছা মেয়ে যা হোক তুই, এত পরে আসতে হয়? বোনঝির বিয়েতে নেমন্তন্ন খেতে এলি না কি?

লীলা খুব অবাক্ হয়ে যায়। বড়দি'র অভিযোগের সুর যে আতিথ্যেতায় এতখানি মিঠে হ'য়ে বাজবে সে আশা করতেই পারেনি। তার ভয় ছিল, এত লোকের সকৌতুক দৃষ্টিকে বড়দি' হয়তো তাঁর স্বাভাবিক উদাসীনতায় নিষ্প্রভ করে দেবেন। ফুঁ দিয়ে দীপশিখা নেবানর মত তার সম্বন্ধে আজকে এদের আগ্রহাতিশয্যটা নিবিয়ে দেবেন। চোখ-ইসারায় হয়তো বলবেন, ওকে নিয়ে ঘাড়াবাড়ি করবার সময় এখন নয়···ঢের কাজ আছে! অপরিচিত নগণ্য নিমন্ত্রিতের মত ও নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিক!

লীলা চোখ চেয়ে যেন স্বপ্ন দেখচে! আজ এই মুহূর্তে তাকে ঘিরে এদের আলাপ-আলোচনাটা বহু দূর স্মৃতিপটে অস্পষ্ট কোন স্বপ্নের নিঃশব্দ বাচনিকতা মূর্ত্ত হ'য়ে উঠচে।

বড়দি' আবার জিগ্যেস করলেন, হ্যাঁ রে, খুকু, মাণিক এলো না? আজকের দিনে তাদের আনলি না—দিদির বিয়েতে তারা একটু আমোদ করবে না?

না, দিদির কণ্ঠস্বরে কোন জড়তা নেই—অস্বাভাবিকতারও নেই কিছু।

লীলা এতক্ষণে জবাব দিলে, ওরা সন্ধ্যে থেকে ঘুমিয়েচে, তাই ভাবলুম—

দিদি অভিযোগ করলেন, এ তোর ভারি অন্যায় কিন্তু!···এ-বাড়ীতে কোন কাজেই তুই ওদের আনিস্ না!

এ অভিযোগের লীলা কোন উত্তর দিতে পারে না।

নেমন্তন্নবাড়ীতে ছেলে-মেয়ে ট্যাকে করে নিয়ে আসতে তার সত্যিই ভারি লজ্জা করে। তা ছাড়া—

বড়দি' আবার বললেন, ঘুমিয়েছিল তা কি হয়েচে, গাড়ী করে নিয়ে এলেই পারতিস্, এখানে এলে বিয়ে-বাড়ীর হট্টগোলে ঘুম ছুটে যেত।

লীলা চুপ করে রইল, যেন ছেলেদের না-আনাটা তার অন্যায় হয়ে গেছে।

দিদি আবার জিগ্যেস্ করলেন, হ্যা রে, তোদের আনতে গাড়ী গিয়েছিল তো?

লীলা বুঝলে, বড়দি' আজ তাদের অভ্যর্থনা করতে অভূতপূর্ব্ব আয়োজন করেছেন। মেয়ের বিয়েতে মানুষটা যেন একেবারে বদলে গেছে! কিন্তু কেন?

লীলা চুপ করে আছে দেখে দিদি পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কি, গাড়ী যায়নি? আমি কাল থেকে ড্রাইভারকে বলে রেখেছি, লীলাকে সবার আগে আনতে যাবে···এই চারু, দেখ তো, ড্রাইভার নীচে আছে কি না? লোকটা ভারি বেয়াড়া হ'য়ে উঠেচে!

এখনি হয়তো একটা অপ্রীতিকর কিছু ঘটে যাবে। লীলা তাড়াতাড়ি বললে, আমাদের তো কোন অসুবিধে হয়নি···দিব্যি বাসে করে এলুম, তুমি কেন মিথ্যে ব্যস্ত হচ্চো!

দিদি ধমকে বললেন, তুই থাম্!···তোর অসুবিধে হয়নি কিন্তু আমার অসুবিধে হ'য়েচে···এমন লোক-জন সব, কথা বললে শুনবে না! মানসম্ভ্রম রাখা দায়!···যেমন বাড়ীর কর্ত্তা, আদর দিয়ে দিয়ে লোকগুলোকে মাথায় তুলেচে!

ব্যাপারটাকে লীলা যত সামান্য করে দেখতে চেষ্টা ক'রচে দিদি ততই ক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠচেন। অথচ এর আগে কত বার তো বিনা মোটরেই তারা এ বাড়ীতে এসেচে, কোন প্রশ্নই হয়নি, কোন কথাই ওঠেনি। আজকে দিদির মোটর তাদের প্রত্যুদ্গমন করে আনেনি বলে' দিদির মান-সম্ভ্রম নষ্ট হ'য়েচে—সেই সঙ্গে তাদেরও? লীলার কেমন যেন সব গুলিয়ে যাচ্চে!

ড্রাইভারকে পাওয়া গেল না। দিদি অন্ততঃ একশ' বার বললেন, রমেশ বাবু কি মনে করলেন! ড্রাইভারকে যদি কালই আমি বিদেয় না করি তো আমার নাম নেই। ছি, ছি, রমেশ বাবু কি মনে করলেন বল দেখি!

লীলা বেশ খানিকটা আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়েছিলো—আত্মহারাও বলা চলে। সে কিছুতেই বলতে পারলে না যে, রমেশ বাবু এ ব্যাপার নিয়ে কিছুই মনে ক'রবেন না। কিন্তু রমেশ বাবু সম্বন্ধে দিদির হঠাৎ এ উদ্বেগ কেন? লীলা জানে, এর আগে অনেক বার তার স্বামী এ বাড়ীতে চোরের মত এসেচে, গেছে—বড়লোকের সংস্পর্শ এড়াবার জন্যে তার সঙ্গে কত ঝগড়া করেছে। লীলা কত দিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যেতে পাশের ঘুমন্ত স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বেদনার সঙ্গে ভেবেচে: তার স্বামীর মর্য্যাদা তার কোন নিকট-আত্মীয়ই রাখেনি—লোকটাকে কেউই খাতির করে না! কিন্তু কেন?—

আজকে দিদির ব্যস্ততায় লোকটার প্রতি কিছু সম্ভ্রম-জ্ঞান যদি প্রকাশ পায় মন্দ কি! সত্যিই, তার স্বামীর কি কোন মান নেই—কেন দিদির গাড়ী তাদের আনতে যাবে না?

মেজদি' এতক্ষণে পরিচ্ছদের ভার সামলিয়ে উঠে এসেছেন। নিজের দেহ আর অলঙ্কারের ভারটা তিনি যেন বইতে পারছিলেন না। মেজদি' বড়দি'র মত অহঙ্কারী নন, কিন্তু কেমনতর এক রকম। কলের পুতুলের মত অদৃশ্য হাতের চালনায় চলা-ফেরা করেন। তাঁর দেহের ঐ অলঙ্কার আর পরিচ্ছদ যেন আর এক জনের বিভব-বৈভবের বিজ্ঞাপন।

প্রকাণ্ড মরা কাৎলা মাছের মত চোখ করে' মেজদি' বললেন, এ কাপড়টা তোর কবে হল রে?—দিব্যি পাড়টা তো!

হঠাৎ সবার যেন আবার সেদিকে নজর পড়ে—সামান্য তাঁতের কাপড়ের কি বাহার, চোখ যেন ধাঁধিয়ে যাচ্ছে!

লীলা একটু লজ্জা পেয়ে বললে, এই তো সেদিন ও একখানা বই বেচে কাপড়টা কিনে আনলে···মিছি-মিছি কতকগুলো টাকা নষ্ট! কিছুতে শুনলে না, কত বললুম ফেরৎ দাও।

বড়দি' কাপড়টার পাড় পরীক্ষা করে বললেন, তোর যেমন কথা, সখ করে' দিয়েচে ফেরৎ দিবি কেন? যাই বল, রমেশের পছন্দ আছে—

মেজদি' হাত নেড়ে ব'ললেন, রমেশ আমাদের কবি যে!

আর যারা দাঁড়িয়েছিল তাদের মনে হলো লীলার স্বামীর হৃদয়-ভরান ভালবাসার সমস্ত রঙ ঐ কাপড়ের পাড়ে ফুটে উঠেছে—লীলা সমস্ত অঙ্গের স্পর্শ দিয়ে তা অনুভব করচে! এত দামী কাপড়-চোপড় পেয়েও তারা কি লীলার মত স্বামীর ভালবাসা অর্জ্জন করতে পেরেচে?

বড়দি' খুব আগ্রহ দেখিয়ে জিগ্যেস্ করলেন, হ্যা রে, রমেশ আজ-কাল খুব লিখচে, না?

লীলা দিদির প্রশ্নে আরো অবাক হ'য়ে যায়—এঁরা আজ বলেন কি! তার স্বামী যে লেখক এবং সেটা যে একটা বিশেষ গুণ এঁরা কেউ-ই কোন দিন স্বীকার করেননি বরং ঠোঁট উল্টে মন্তব্য করেচেন: ভারি তো লেখা! ও করে' কি হ'বে, পেট ভরবে?

মেজদি' বলেছিলেন, তাঁর স্বামী বলেন—ঐ কবিরা যত নষ্টের গোড়া—কুড়েমি করে' করে' দেশটাকে না কি ডুবিয়ে দিচ্চে—পরের মাথায় বসে দিব্যি খাচ্চে! ঘরের বউ-ঝিদের মাথা না কি ওরাই খায়!

আত্মীয়-স্বজনের মুখে এ রকম মন্তব্য শুনে শুনে কত দিন লীলার মনে হ'য়েচে, সত্যি কি তার স্বামীর সাধনার কোন মূল্য নেই—একটা নিরর্থক ছেলে-খেলায় মেতে আছে? অর্থ-পদ-মান যাতে নেই তার পেছনে মানুষ পাগল হয় কেন? দিদিদের বরের মত তার স্বামীও ব্যবসা করতে শিখলো না কেন?

মনের এ দ্বন্দ্ব লীলার কিন্তু বেশী দিন থাকে না। কোন দিন গভীর রাত্রে ঘুমিয়ে গেলে স্বামীকে পাশে না-দেখে বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে' উঠে—পা টিপে-টিপে পাশের ঘরে গিয়ে টেবিল-আলোর ছাওয়ায় লুকিয়ে স্বামীর চেয়ারের পিছনে এসে দাঁড়ায়, স্বামীর তন্ময়তা ভাঙ্গি ভাঙ্গি করে'ও ভাঙ্গাতে পারে না। ঐ যে লোকটা কলম কামড়ে কি যেন খুঁজচে সে কি কারো অর্থ-পদ-মান খোঁজার কম? এ না করে' লোকটা যদি উঠে গিয়ে মদ খেয়ে অন্য কোথাও পড়ে থাকতো তা হলে শূন্য শয্যায় শুয়ে সে কি খুব খুসী হতে পারতো?

লীলা মুখে বললে, না, তেমন আর লেখবার সময় পায় কোথায়, সারা দিন-রাত্রি তো চাকরী করচে!

একটি মেয়ে এতক্ষণ লীলাকে হাঁ করে গিলছিল—ব'ললে, তোমরা কিন্তু ভাই খুব সুখে আছ!

'মেজদি' বলে' ফেল্লেন, রমেশের লীলা-অন্ত প্রাণ!

উপস্থিত সকলের কানে বাজল, মেজদির কথার সুরটা কেমন যেন বেদনাভরা। ওদের স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসার কথাটা হঠাৎ যেন নতুন কাব্য-কথা বলে' মনে হয়—স্বামীর ভালবাসা-বঞ্চিত হৃদয়ের হাহাকারটা যেন কৌতুক হ'য়ে সকলের ঠোঁটের কোণে ফুটে ওঠে। ওদের স্বামি-স্ত্রীর ভালবাসায় না জানি কত মজা আছে! স্বামী-গরবিনী লীলার সামনে তাদের মূল্যবান অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে ঢাকা স্বামী-সোহাগের আবরণটা হঠাৎ রঙমাটি-বসা প্রতিমার কাঠামোর মত ফ্যাকাশে মনে হয়—স্বামীর ভালবাসার ফাঁকিটা ধরা পড়ে। তাদের স্বামীর তারা-অন্ত প্রাণ নয় কি?

লীলা একটু লজ্জা পায়—গণ্ডদেশ আরক্তিম হ'য়ে ওঠে। অস্বস্তি বোধ করে একটু—আজকের এই উৎসব-বাড়ীতে তাদের স্থান যে এতখানি উর্দ্ধে নির্দ্ধারিত হ'বে এ তারা কল্পনা করতে পারেনি কখনো। যে দুঃখ-বোধ ও আহত মর্য্যাদা নিয়ে তারা বারে বারে ফিরে গেছে তার শোধ এ ভাবে হোক এ তারা চায়নি। এ যেন বড় বাড়াবাড়ি—অপরাধীর অপরাধ বাড়ান'র মত। লীলা সঙ্কুচিত এবং আড়ষ্ট হয়ে ওঠে—ভেবে পায় না তার বড়লোক দিদিরা আজ তাকে নিয়ে এমন করচে কেন? তবে এ কি করুণা? তার স্বামীর অন্তরের ঐশ্বর্য্যকে উপেক্ষা করার এও একটা উপায়? কোথায় যেন বেসুরো বাজে!

বড়দি' হাত ধরলেন: আয়, জামাই দেখবি আয়। বাসর-ঘরের দোর-গোড়ায় পা দিতে বাসর-মালিকাদের এক জন সুচতুরা বরের কানে ফিস-ফিস করে' উঠল: ছোট মাসীমা!

বরটি বেশ সপ্রতিভ—জোড়হাত কপালে ঠেকালে, পাশের নব-পরিণীতা উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। চকিতে এমনি একটা রাতের কথা লীলার মনে পড়ে যায়—রমেশও সেদিন তার পাশে বসে' অমনি সপ্রতিভ ছিল, বাসর-মালিকারা হেরে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত রণে ক্ষান্ত দিয়েছিল, তার পর একান্ত ভাবে বিজয় পুরস্কার হাতের মধ্যে পেয়ে লোকটা যে কাণ্ড করেছিল বাসি-বিয়েবাড়ীতে সকৌতুক মৃদু গুঞ্জরণে সুরসিকারা তা ফাঁস করে দেয়—লজ্জার একশেষ হয় লীলা! কিন্তু ছেলেটা যদি কবি হয়? বড়দি' কি জামাই-ভাগ্যে খুসী হ'তে পারবেন?

গান গাইবার জন্তে অনেকে লীলাকে অনুরোধ করে—সবাইকে এড়িয়ে সে অনুরোধ যখন বরের মুখ দিয়ে ব্যক্ত হ'লো তখন লীলা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল: কেবল কবি-চিত্তে এ চপলতা সম্ভব! আচ্ছা সমস্যায় ফেলেচে!

বড়দি' উদ্ধার করলেন: থাম ছুঁড়িরা—শাশুড়ী হয়ে জামাইএর সামনে গান গাইবে কি রকম? লজ্জার মাথা খেয়েচিস্ সব!

নতুন জামাই আরো সপ্রতিভ হয়ে বলে: তাতে কি, আজকে রাতে সবাই এক—গুরুজন মানামানি হ'বে কাল থেকে।

বরের কথাটা বাসর-মালিকাদের অনুমোদন পায়—একসঙ্গে নানা ছন্দে হাসির লহরী ওঠে।

বড়দি' অপ্রতিভ হ'য়ে লীলাকে নিয়ে সরে আসেন। লীলা ভাবে বরের কথাটা: আজকের রাতে সবাই এক—ছোট-বড় সব! তাই কি দিদিরা তাঁদের স্বাভাবিক দম্ভ ভুলে গিয়ে এত সহজ হয়ে উঠেচেন? তবু এক সময় লীলা দিদিকে না জিগ্যেস্ করে' পারে না: হ্যাঁ দিদি, জামাই তোমার পছন্দ হয়েছে তো?

উত্তরে দিদি নতুন কথা শোনান মনে হয়: কেন হ'বে না, ছেলে রমেশের মতই বিদ্বান্। তবে পয়সা-কড়ি তেমন নেই, তাতে কি, পুরুষের ভাগ্য বদলে যেতে কতক্ষণ—খুকীর পছন্দ হলেই হলো! ওর জিনিষ ও বুঝুক্!

নূতন দীক্ষিতের মুখে পরমার্থ শোনা'র মত দিদির কথাগুলো কানে বাজলো। হঠাৎ কন্দর্প কুবের ছেড়ে দিদির বৃহস্পতির ওপর ঝোঁক কেন? আশ্চর্য্য রকম বদলে গেছেন দিদি? কিন্তু কেন?

দিদি বললেন, এবারে আর পয়সা-কড়ির দিকে নজর দিইনি,—লিলির বিয়েতে খুব শিক্ষা হয়ে গেছে। তা হলেও প্রথমটা আমার তত ইচ্ছে ছিল না। তোর জামাইবাবু এই শেষ পর্য্যন্ত জোর করে।

দিদি হঠাৎ অনেকখানি নীচে নেমে এসেছেন, মনে হয় সমদুঃখ-দুঃখভাগিনীর মত বল্লেন, হ্যাঁ রে, জামাই কি খারাপ হ'বে? ভালই হবে কি বলিস্?

লীলা মাথা নাড়ে। ভাবলে, জামাইবাবুর কারবার কি হঠাৎ ফেল মেরে গেচে, দিদি তাই ভবিষ্যতের জন্তে প্রস্তুত হলেন? তার বেশ মনে পড়চে, এই সেদিনও মা-বাবার সামনে দিদিরা এই বাজারে কেবল রমেশই কিছু কর'তে পারলে না বলে' কত আক্ষেপ করেছেন। তাকে দেখিয়ে দেখিয়ে দিদিরা বাপ-মার প্রতি কর্ত্তব্য পালনে হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠেচেন। ওঁদের সঙ্গে বাবাও ছোট মেয়ে-জামাই-এর ওপর করুণায় বিগলিত হয়ে উঠেচেন। লীলা আদৌ এ সব পছন্দ ক'রতে পারেনি। মনে হতো, তার ওপর সমবেদনা দেখাতে ওরা তার স্বামীর অপমান ক'রচে। নেমন্তন্ন করে' ইদানিং বাবাকে সে কিছুতে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারেনি। বাবা কেন আসেননি, লীলা জানতো—পাছে মিথ্যে মেয়ের কতকগুলো খরচ হয়ে যায় এই বাজারে, তবু দু'দিন ওর সংসার চলবে!

এক জনকে লীলার আজ বড় প্রয়োজন ছিল। আগাগোড়া ব্যাপারটা তার রহস্যের মত ঠেকচে—কিছুতে সহজ হ'য়ে খাপ খাইয়ে নিতে পারচে না। বহু দিনের ক্ষতটা রাতারাতি শুকিয়ে ভাল হ'য়ে গেলে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ার সঙ্গে অস্বস্তির রেশও কিছু থেকে যায়—মনে হয়, শুকনো ক্ষতটাকে আবার খুঁচিয়ে ঘা করি! খাওয়া দাওয়ার পর লীলা জিগ্যেস্ করলে, হ্যাঁ দিদি, তোমার মেজ জা'কে কই দেখচি না কেন?

দিদি ও কথার কোন গুরুত্ব না দিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে বললেন, আছে কোথাও—বাবুদের কথায় কথায় রাগ, জ্বালাতন হ'য়ে গেলুম!

লীলা আবার জিগ্যেস করলে, আমরা এসেচি খবর পেয়েচে?

দিদি যেন আরো বিরক্ত হ'লেন, সে কি আর না পেয়েচেন!—এখন আবার কার দিকে ঢলেচেন বোধ হয়।

লীলা চুপ করে যায়। এ বাড়ীতে ঐ একটি মাত্র লোক কেবল এত দিন পর্য্যন্ত তাদের খাতির করে এসেচে—সবার আগে অভ্যর্থনা করে নিজের ঘরে বসিয়ে সুখ-দুঃখের কথা বলেচে। লীলা ভাবলে, দিদিরা আজ তাকে এত আপ্যায়িত করলে বলে সে আর এদিক মাড়ায়নি—তার খোঁজ-খবর নেয়নি। নিশ্চয়ই অভিমান হ'য়েচে।

অনেক ডাকাডাকি করেও লীলা বড়দি'র সেজ জা'য়ের কপট নিদ্রা ভাঙাতে পারলে না। একটু অবাক হ'য়ে ফিরে আসে, সাধাসাধিতে

যে অভিমান ভাঙে না সে কি অভিমান, না রাগ? কিন্তু দিদির সেজ জা'য়ের তার উপর রাগ করবার কি কারণ ঘটলো?

ফেরবার সময় লীলা বাবা-মাকে প্রণাম ক'রতে নীচে নেমে এল। ভাঁড়ার-ঘরের সামনে একখানা চেয়ার পেতে বসে বাবা ভাঁড়ার আগলাচ্ছিলেন। লীলা প্রণাম করে উঠতে জিগ্যেস্ করলেন, কখন এলি? এখুনি যাচ্ছিস্? আর শোন, বিয়েবাড়ির হাঙ্গামা চুকলে তোর বাড়ী যাব। মানুকে পাঠালে এলো না যে বড়—খুব মাতব্বর হ'য়ে উঠেচে না?

বাবা আজ যেচে তার বাড়ী আসতে চাইচেন। তবে কি এঁরা সকলে আজ তাঁদের ভুল বুঝতে পেরেচেন: আত্মীয়-স্বজনের মাঝে ধনের প্রাকার তোলা উচিত নয়, সম্বন্ধ বোধের অপমান করা হয় ওতে।

লীলা কিছুতে বাবা-মার এই বড়লোক জামাইয়ের বাড়ীতে এসে খাটা-খাটুনীটা বরদাস্ত করতে পারে না। তার কেবল মনে হয়, ওতে ওঁদের মর্য্যাদা নষ্ট হয়। আর পাঁচ জন সম্মানিত অতিথির মত বাবা গিয়ে আসর জমিয়ে রাখুন না, লীলার কোন আপত্তি নেই। এ বাড়ীতে আজকের দিনে ভাঁড়ার আগলান ছাড়া ওঁর অনেক কাজ আছে। এ কি জামাই-মেয়েকে খোসামোদ করা নয়?

ফিরে আসতে আসতে দিদির কণ্ঠস্বর কানে এল: মা তুমি যেন কী, এখনো নতুন জামাইয়ের জল-খাবার গুছিয়ে দিলে না! এ সব-গুলোও কি তোমাকে শিখিয়ে দিতে হবে? আমার হয়েচে এক জ্বালা, যেটা নিজে না দেখবো সেটা আর হবে না!

লীলার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। দিদি মাকে না বলে ও কথাগুলো যদি তাকে বলতো সে হয়তো এত কষ্ট পেত না। একবার ভাবলে, মেয়ে-জামায়ের কল্লা করতে এসেচেন—ফলভোগ করুন। শুধু অপমান কুড়লেন।...

তাদের বিদায় দিতে বড়দি'-মেজদি' দু'জনেই গেট পর্য্যন্ত এগিয়ে এলেন। মেজদি' বেচারার মোটা শরীর নিয়ে বড্ড কষ্ট হচ্ছিল। ওঁরা দু'জনেই অভিমানের সুরে অভিযোগ করতে লাগলেন: রমেশ বাবু আজকাল ডুমুরের ফুল হয়ে উঠেচেন! কি অন্যায় যে করিচি জানি না, আমাদের ছায়া মাড়ান না। গরীবদের বাড়ী মাঝে-মাঝে পায়ের ধুলো দেবেন!

ড্রাইভার বেচারা তখনো ফেরেনি। বড়দি' আর একবার তার চাকরী খতম করে দেবেন জামাইবাবুকে জানিয়ে রাখলেন—গাড়ীটা থাকলে এদের নিয়ে যেতে পারতো, এত রাত্তিরে বাসে ফিরতে হবে তো—যত সব বেয়াক্কেলের—বেবন্দবস্ত দু'চক্ষে দেখতে পারি না! আমি হলে এ-বাড়ীতে কখনো পা দিতুম না!

জামাইবাবু শুধু বললেন, ছোট গিন্নী, আজ রাতটা বরং থেকে যাও, অনেক রাত্তিরে একটা লগ্ন আছে।

বড়দি' মুখ-ঝামটা দিলেন: বুড়ো বয়েসে রঙ্গ দেখ মা—গা জ্বলে যায়! গাড়ীর কি হলো, তার উত্তর নেই!

জামাইবাবু বললেন, দরকার কি গাড়ীর, আমি কাঁধে করে' ছোট গিন্নীকে পৌঁছে দেব।

এক সময় বড়দি' চুপি চুপি বললেন, লীলা আগে একটা বাড়ী কিনিস্, তার পর অন্য কথা, বুঝলি?

হাঁপ টেনে মেজদি' বললেন, রমেশকে এক দিন ওঁর কাছে পাঠিয়ে দিস্, কি সব শেয়ার-মেয়ার বলে বাপু বুঝি না। মনে করে' পাঠিয়ে দিস কিন্তু।

ভাগ্যিস্, দিদিদের কথাগুলো জামাইবাবু আর তার স্বামীর কানে পৌঁছয়নি। দিদিরা কি যে আবোল-তাবোল বকচেন তার ঠিক নেই! দিদির সেজ জা'র রাগটা কি এখনো পড়লো না? না জানি লীলা তার কাছে কত অপরাধ করেচে!

রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্ত্তিটাকে ঘিরে বৈদ্যুতিক ফুলডোরটা তখনো পাক খাচ্ছিল। 'স্বাগতমের' আলোটা কে ভেতর থেকে জেলে দিয়েচে—কার্ণিশে কার্ণিশে আলোর গোলাপ ফুটে উঠেচে। বাসর-ঘর থেকে রবি ঠাকুরের 'বসন্তে ফুল গাঁথলো'—গানের এক কলি ভেসে এসে গেটের সামনে সবাইকে ছুঁলে। লীলা তাড়াতাড়ি জরির পাড়ের ঘোমটা মাথায় তুলে দিয়ে স্বামীকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

রাস্তায় এসে স্বামি-স্ত্রী দু'জনেই অবাক হ'য়ে দু'জনের মুখের দিকে তাকায়। রাস্তার একটা গ্যাস-পোস্টের মাথা থেকে নিষ্প্রদীপের ঠুলি ঠেলে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত বাঁকা আলোর রেখা এসে লীলার মুখের ওপর পড়ল। ব্লাক-আউটের ঠুলিটা যে কেন এখনো খুলে-ফেলা হয়নি, বোঝা যায় না—হয়তো কর্ত্তৃপক্ষের চোখ এড়িয়ে গেছে এটা।

রমেশ দেখলে: বরফ-দেওয়া মাছের মত লীলার মুখের রঙ বদলে গেছে—চোখের কোলে ডেঙ্গায়-তোলা মাছের মত স্তিমিত উদাস দৃষ্টি। যেন অনেক দূরে সরে গেছে ও।

রমেশ বললে: আমিও তোমার চেয়ে কম অবাক্ হয়নি লীলা, খবরটা ওরা কোত্থেকে সংগ্রহ করেচে কে জানে! লটারীর টিকিটের ফার্ষ্ট-প্রাইজটা না কি আমরাই পেয়েচি! আশ্চর্য্য!

লীলা কোন কথা বলতে পারলে না। বড়দি'র কথা তার কানে বাজচে: জামাইয়ের পয়সা-কড়ি নেই, কিন্তু তাতে কি, রমেশের মত বিদ্বান্ তো!

যাক্, জন্মের মত ও-বাড়ীতে ঢোকার পথ তাদের বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু দিদির সেজ জা' মিথ্যে তার ওপর রাগ করে' রইল।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

পঞ্চানন ঘোষাল
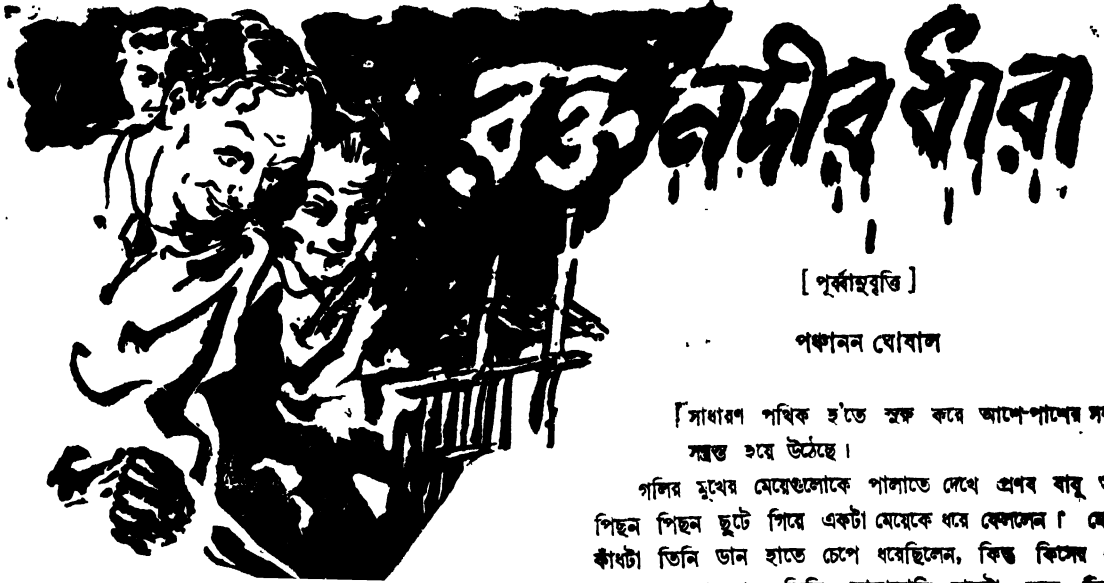
রাত্রি আট ঘটিকা।

কলিকাতার এই অঞ্চলটা এই সময় হ'তেই জনমুখর হয়ে উঠে। পথিকের ভীড় তো আছেই, এ ছাড়া রাস্তার দু'ধারের পানের দোকান-গুলোকে কেন্দ্র করেও ছোট ছোট ভীড় দেখা যায়।

রাস্তার দু'ধারেই ছোট-বড় বাড়ীর সারি। এই সকল বাড়ীর উপরতলে যাঁরা থাকেন তাঁদেরই প্রয়োজনে নিম্নতলে ডেরা বেঁধেছে দুই-এক জন দালাল। এ ছাড়া দুই-একটা পানওয়ালা, ভুজাওয়ালা ও সস্তা দরের মাদক-বিক্রেতার দোকানও দেখা যায়। নিম্নতলের পানের দোকান, হোটেল, ভুজাওয়ালা ও সস্তা সামগ্রীর ছোট ছোট বিপণী এবং উপরকার—দ্বিতল ও ত্রিতলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীদের কক্ষগুলির নীল ও লাল আলো; পথিকদের মন্থর গতি, চকিত চাহনী এবং দোকানদার ও দালালদের মৃদু গুঞ্জনের সহিত একত্রে মিশে একটা স্থান-মাহাত্ম্যের সৃষ্টি করেছে।

গলির মুখে রঙমাখা অনেকগুলি মেয়ে একত্রে চটির চট্‌পট্‌ শব্দ করতে করতে ঘুরা-ফিরা করছিলো। হিম-শীতল শীতের রাত্রেও তাদের গায়ে পাতলা ফিন্‌ফিনে নীল-লাল সস্তা জাপানী ব্লাউজ ছাড়া আর কিছুই নেই, তাই এক জায়গায় তারা বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। মাঝে-মাঝে ছুটাছুটি ক'রে তারা শরীর গরম করে নেয়। এদের প্রত্যেকেরই ভ্রূর নীচে একটা করে ঘন কালো স্বাভাবিক দাগ। এ ছাড়া ভ্রূর উপরে কাজল ও ঠোঁটে লাল রঙও দেখা যায়। সস্তা আলতার সাহায্যে তারা তাদের পায়ের মতো ঠোঁটগুলোও টক্‌টকে লাল করেছে।

হঠাৎ এই জন-সমাবেশের মধ্যে যেন একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হলো। হঠাৎ দেখা গেলো, গলির মুখে দাঁড়ানো মেয়েগুলো ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো ছুট দিয়ে যে যার ডেরায় ঢুকে পড়ছে। মেয়েদের এই ভাবে ছুটতে দেখে কয়েকটা পানের দোকানের ঝাঁপও সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়ে গেলো। এ ছাড়া রাস্তার ভীড়ও বহুল পরিমাণে কমে গেছে।

শ্যামপুকুর থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার—ইন্‌স্পেক্টার প্রণব বাবু সদল বলে চীৎপুর রোড ধরে এগিয়ে আসছিলেন। স্থান-মাহাত্ম্য সাধু এবং অসাধু—উভয়কেই সমপর্য্যায়ভুক্ত করে দেয়। এই কারণে সাধারণ পথিক হ'তে সুরু করে আশে-পাশের সকলেই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে।

গলির মুখের মেয়েগুলোকে পালাতে দেখে প্রণব বাবু তাদের পিছন পিছন ছুটে গিয়ে একটা মেয়েকে ধরে ফেললেন। মেয়েটির কাঁধটা তিনি ডান হাতে চেপে ধরেছিলেন, কিন্তু কিসের একটা আঘাতে ব্যথা পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি হাতটা তুলে নিলেন। মেয়েটির দেহের মধ্যে রঙীন সাড়ী জড়ানো খানকতক হাড় ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। কণ্ঠার উপরকার হাড়ের উপর জোরে হাত রাখাতেই প্রণব বাবু এইরূপ আঘাত পেয়েছেন।

এই ভাবে ধরা পড়ে কঙ্কালসার মেয়েটি অঝোরে কেঁদে ফেললো। রাজপথের উপর দাঁড়িয়ে পশার জমান যে একটা অপরাধ—এতে যে পুলিশের বারণ আছে তা তার ভালরূপেই জানা আছে। কিন্তু তারা যে গরীব, দালালের মারফৎ খদ্দের জুটানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই রাত একটা পর্য্যন্ত রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাদের খরিদ্দার জুটাতে হয়। যদি কোনও একটা রিক্সাওয়ালা বা কোনও এক গরীব শ্রমিককে কোনও রকমে তারা আকৃষ্ট করতে পারে তো পরের দিন তাদের আহার জুটবে। সব দিনই যে তাদের আহার জুটে তাও নয়, বেশীর ভাগ দিনই তাদের পান্তা ভাত খেয়ে কিংবা উপবাসে দিন কাটাতে হয়। মনের এই সব দুঃখ পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ নেই। মেয়েটি তাই ঠক্‌-ঠক্‌ করে কাঁপতে সুরু করে। চোখে তার জল এলেও, মুখে কোনও ভাষা আসে না।

প্রণব বাবু ধমক দিয়ে মেয়েটিকে বললেন, "রোজ রোজ মানা করি না, এখানে দাঁড়িও না। ফের এখানে দাঁড়িয়েছো?" মেয়েটি প্রণবের অভিযোগ শুনে কিন্তু কোনও উত্তর দেয় না। মেয়েটিকে চুপ করে থাকতে দেখে অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে প্রণব বাবু জমাদার রামদীনের উদ্দেশ্যে হেঁকে উঠলেন, "এই জমাদার। লে যাও ইসকো, থানেমে কেইস লিখাও।"

মেয়েটি এইবার আর স্থির থাকতে পারলো না। জমাদারকে তাকে ধরবার জন্যে এগিয়ে আসতে দেখে সে প্রণবের পা দু'টো সজোরে জড়িয়ে ধরে চীৎকার করে উঠলো, "আমায় রক্ষা করুন বাবু! আজ দুই দিন, দুই রাত্রি খাইনি। এই সেদিন কোর্টে দুই টাকা জরিমানা (ফাইন) দিয়ে এসেছি। বাড়িওয়ালী টাকা দু'টো দিয়ে ছাড়িয়ে এনেছে। তাঁর দেনা এখনোও শুধতে পারিনি। এবার নিয়ে গেলে আমি মরে যাবো, বাবু! আমি আপনাদেরই জাত-ঘরের মেয়ে, বাবু! আমি আপনাদেরই বাঙ্গালী মেয়ে বাবু! ওদের দিয়ে আমাকে অপমান করবেন না।"

এতক্ষণে জমাদার রামদীন মেয়েটিকে থানায় ধরে নিয়ে

বাবার জন্যে তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। জমাদার রামদীন হাত বাড়িয়ে মেয়েটিকে ধরতে যাচ্ছিলো, হঠাৎ কি ভেবে প্রণব বাবু হুকুম দিলেন, "আচ্ছা, মাৎ পাকড়ো। যানে দেও ইসকো।" হুকুম পেয়ে জমাদার সরে দাঁড়ালে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কতক্ষণ পর্য্যন্ত এই শীতে তুই দাঁড়িয়ে থাকতিস্?"

শীতের কথা এতক্ষণ মেয়েটি ভুলে গিছলো। এইবার সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে উত্তর করলো, "তা বাবু, হয়তো রাত তিনটে হতো, তাতেও কি দু'টো টাকা হতো? হয়তো হতো না। সময় বড় খারাপ পড়েছে, বাবু! আপনাদের ভয়ে গরীব লোকেরা এই পথ দিয়ে আর হাঁটেই না।"

কিছু দিন পূর্ব্বে এই অঞ্চলে এক জন বেশ্যা-নারী খুন হওয়ায় একটু কড়া পাহারার বন্দোবস্ত করা হয়েছিলো। কিন্তু যাদের জীবন-রক্ষার জন্য এই বন্দোবস্ত, তাদেরই পক্ষে যে ইহা এতোটা ক্ষতিকর হয়েছে, তা প্রণব বাবুর ধারণার বাইরে ছিলো। হঠাৎ প্রণব বাবুর মধ্যে যেন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হলো। কিছুক্ষণ ধরে তিনি মেয়েটির দিকে চেয়ে থেকে অপর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন—জানি না, তিনি তার বিবর্ণ মুখের মধ্যে কাদের মুখের প্রতীক দেখতে পেলেন। তার পর হঠাৎ পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে মেয়েটির হাতের মধ্যে নির্লজ্জের মত সেটি গুঁজে দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, —"যাও, ঘরে গিয়ে আজকের মতো শুয়ে পড়ে গে।"

মেয়েটির হাত থেকে নোটটি মাটীতে পড়ে গেলো। তখনও পর্য্যন্ত সে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে। এ মেয়েটি নোটটা তাড়াতাড়ি মাটী হতে তুলে নিয়ে প্রণব বাবুর দিকে চক্ষু বিস্ফারিত করে চেয়ে রইলো। প্রণব বাবু কিন্তু আর মেয়েটির দিকে চেয়েও দেখলেন না। তিনি নিঃশব্দে তাঁর দলবল নিয়ে পুনরায় এগিয়ে চললেন। তাঁর দলের লোকদের মধ্যে এই ঘটনাটি উপলক্ষ করে একটা মৃদু গুঞ্জন শুনা যাচ্ছিলো, কিন্তু প্রণব বাবু সেই দিকে কোনও প্রকার কর্ণপাত না করে আরও একটু এগিয়ে এলেন।

গন্তব্য স্থানে পৌঁছে প্রণব বাবু লক্ষ্য করলেন, এক জন ভদ্রলোক একটি বাড়ীর সামনে সন্দিগ্ধ ভাবে ঘুরা-ফিরা করছে। প্রণবের পাশেই ছিলো তাঁর বহু দিনের বিশ্বস্ত বন্ধু—পুরাতন ইনফরমার শিউচরণিয়া। পূর্ব্বে সে চুরি-চামারি করে দিন গুজরাণ করতো। কিন্তু গত কয় বৎসর ধরে সে আর অপকর্ম্ম করে না। মাঝে মাঝে সে তার পুরানো সাথীদের ধরিয়ে দিয়ে প্রণবের কাছ থেকে প্রতি মাসেই কিছু করে পেয়ে থাকে। তা ছাড়া, তার কাঁচা মালের কারবারও আছে। কখনও কখনও চুরি না করলেও সুবিধা মত যে চোরেদের নিকট হ'তে যে চোরাই মাল ক্রয় না করে, তাও নয়। ব্যস্ততার সহিত শিউচরণিয়া বলে উঠলো—"হুজুর, ঐ বাড়ীটাই। কিন্তু ও লোকটা কে? নিশ্চয়ই খোকা বাবুর চর। ধরুন ওকে আগে।"

শিউচরণের কথা শেষ হ'তে না হ'তেই প্রণব বাবুর হুকুমের অপেক্ষা না-রেখে রামদীন জমাদার দৌড়ে এসে যে লোকটার ঘাড় ধরে হিড়-হিড় করে প্রণবের কাছে টেনে নিয়ে এলো, আসলে সেই লোকটি কোনও চোর বা বদমায়েস ছিলো না। লোকটা ছিলো নিতান্ত এক জন ভদ্রলোক। সহরের কোনও এক কলেজের প্রফেসার। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে প্রণব বাবুর হাতে ধরে কেঁদে ফেলে ভদ্রলোক বললেন, "আমি চোর নই স্যার, ভদ্রলোক। এই লাইনে আমি নূতন। প্রথম এই পাড়ায় এসেছি। সাহস করে ঢুকতে পারছিলাম না।"

ভদ্রলোক যে চোর নন, তিনি ভদ্রলোক মাত্র, প্রণব বাবু তা পূর্ব্বেই বুঝেছিলেন। এইরূপ বহু ব্যক্তিকে তিনি পূর্ব্বে দেখেছেন। পাপের পথে পা বাড়াতে যে সাহস বা হিম্মতের প্রয়োজন, তা সুরুতেই কারুর মধ্যে থাকে না, চেষ্টা করে তা এদের সংগ্রহ করতে হয়। হেসে ফেলে প্রণব বাবু ভদ্রলোকটিকে অভয় দিয়ে বললেন—"না না, চোর হবেন কেন আপনি। সে কথা আমি বলছি না। তবে এদিকে চোর-গুণ্ডার উৎপাত খুব বেশী কি না? অচেনা জায়গায় সোনার আঙটী ও বোতাম পরে আসা আপনার উচিত হয়নি। তা ছাড়া, এ বাড়ীটাও ভালো নয়।"

প্রণবের কথায় আশ্বস্ত হয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "বাঁচালেন স্যার, আর আমি এখানে কখনো আসবো না। একটা সাময়িক দুর্ব্বলতা, জানি না কেন, আমায় পেয়ে বসেছিলো। বাসায় যেতে যেতে, জানি না, হঠাৎ কেন, ট্রাম থেকে নেমে পড়ে এখানে এসে পড়েছি। আমার বাবাও এখানে কখনও আসেনি।"

হেসে ফেলে প্রণব বাবু বললেন, "তা ভালো। বাবার না আসবার জন্যে হয়তো আপনার ছেলেকে এই ভাবে আর দুঃখ করতে হবে না। তা এসেই যখন পড়েছেন তখন আরও একটু আসতে হবে। আসুন তো এখোন আমার সঙ্গে। এই বাড়ীটা আমি খানাতল্লাসী করবো। আপনি এক জন সাক্ষী হবেন। এক নামজাদা খুনে গুণ্ডা ঐ তেতলার ঘরটায় বসে রয়েছে। ওকে ধরতে হবে।"

প্রণব বাবুর কথায় ভদ্রলোক অত্যন্ত ভীত হয়ে উঠলেন। খুনে-গুণ্ডাদের ধৃতিকরণের সময় খুনোখুনি হওয়া অসম্ভব নয়। তা ছাড়া সাক্ষী হয়ে আদালতে যাওয়ারও বিপদ আছে। ভদ্রলোক এতক্ষণ মাত্র পরিচিত ব্যক্তিদের আগমনের আশঙ্কায় ভীত হচ্ছিলেন। খুনে-গুণ্ডা, পুলিশ বা আদালতের কথা একেবারেই ভাবেননি। ভদ্রলোকের মনে হলো, তিনি একেবারে গহন সুন্দরবন বা অনুরূপ কোনও এক অরণ্যে এসে পড়েছেন।

ভদ্রলোককে ইতস্ততঃ করতে দেখে প্রণব বাবু বলে উঠলেন—"চলে আসুন মশাই, এক্ষুনি আপনার কোনও এক ছাত্র এসে পড়ে আপনাকে এখানে দেখে ফেলবে।"

ভদ্রলোক এইবার আঁৎকে উঠে জিজ্ঞেস্ করলেন, "এ্যাঁ, বলেন কি? ছাত্ররাও এখানে আসে না কি?"

গুণ্ডা, খুনে ও পুলিশ—এই তিন বস্তুই একত্রে সমুপস্থিত। এর পর আবার তাঁর ছাত্ররাও এসে পড়তে পারে। ভীত-ত্রস্ত নয়নে কিছুক্ষণ ফ্যাল-ফ্যাল করে চেয়ে থেকে প্রফেসার ভদ্রলোক বললেন—"কিন্তু, স্যার, দেখবেন একটু। ইজ্জৎটা যেন আমার থাকে, আমি ভদ্রলোকের ছেলে। সামান্য একটা দুর্ব্বলতা এড়াতে পারিনি, এই জন্যেই যা—"

ভদ্রলোকটির হাতে ধরে তাঁকে বাড়ীটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "চলে আসুন মশায়, দেরী করবেন না। কোনও ভয় নেই আপনার।"

উত্তরে শিউচরণ বলে উঠলো, "হ্যাঁ স্যার, ঠিক বলেছেন। দেরী করলে খবর হয়ে যেতে পারে। তাড়াতাড়ি উপরে উঠা যাক্।"

এর পর আর দেরী না করে পুলিশের দল প্রণব বাবু ও শিউচরণের পিছন পিছন সিঁড়ি বেয়ে পা টিপে-টিপে উপরে উঠছিলো। হঠাৎ প্রণব

বাবু লক্ষ্য করলেন অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে কে এক জন নীচে নামছে। সন্দিগ্ধ ভাবে প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি তাকে জড়িয়ে ধরেই অপ্রস্তুত হয়ে ছেড়ে দিলেন। নারী-কণ্ঠে লোকটি বলে উঠলো, "আমি বুড় মানুষ, বাবা!"

প্রণব বাবু তাড়াতাড়ি হাতের টর্চটা জ্বেলে দেখতে পেলেন, লোকটা খোকার কোনও সাকরেদ নয়, লোকটা এক জন বৃদ্ধা স্ত্রীলোক মাত্র। বিরক্ত হয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন—"কে আপনি।"

উত্তরে বৃদ্ধা বললেন—"আমি বীণার মা, বাবা। ঐ দাওয়াটায় পড়ে থাকি।"

বিশ বছর পূর্ব্বে বৃদ্ধার সোমত্ত মেয়ে তাকে কাঁদিয়ে ঘর ছেড়ে চলে আসে। বৃদ্ধা এত দিন গাঁয়ে ঘরে ঘুঁটে বিক্রয় করে জীবিকা নির্ব্বাহ করেছে। ভ্রষ্টা মেয়ের হাতে খাওয়া বা তাকে ছোঁয়া তো দূরে থাক, এত দিন সে তার মুখও দেখেনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ বৃদ্ধা রুগ্না হয়ে পড়ায় বাধ্য হয়ে শেষ বয়সে তাকে এই মেয়ের আশ্রয়েই আসতে হয়েছে। কিন্তু এতো কথা কে-ই বা জানে, জানবার প্রয়োজনই বা কার আছে। তাই বৃদ্ধার উত্তরে প্রণবও বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলো, "তা তো থাকবেই। বুড়া বয়সে মেয়ে পালা ছাড়া গতিই বা আর কি? যত সব, ছ্যাৎ—"

সতী সাধ্বী বৃদ্ধা প্রণবের কথার কোনও রূপ উত্তর না করে মন্থর গতিতে নীচে নেমে গেল। প্রণবও তার কথা আর না ভেবে সদল বলে বাড়ীটির দ্বিতলে উঠে এলো।

দ্বিতলের কক্ষগুলি খোলাই ছিলো। প্রতিটি ঘরেরই দুয়ারে একটি করে নীল বা লাল রঙের পর্দ্দা ঝুলানো আছে, পর্দ্দার ফাঁকে রূপজীবিনীর দল তাদের স্ব স্ব সারথি সহ উঁকি মেরে সভয়ে দেখলো, পুলিশ।

পুলিশের দল সরাসরি ত্রিতলের দিকে চলে যাওয়ায়, তাদের গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে, দ্বিতলের অধিবাসীরা একটা করে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে যে যার ঘরের অর্গল বন্ধ করে দিতে থাকে। সকলেরই মনে ভয় ছিল, কখন ওই দল কার ঘরে ঢুকে তাদের রাত্রের সমস্ত আয়োজন বুঝি বা পণ্ড করে দেবে।

পুলিশের দল ত্রিতলের একটি রুদ্ধ কক্ষের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো। কান পেতে সকলে শুনলো, ভিতরের হাসির রোল ও অস্পষ্ট ঘুঙুরের আওয়াজ। ঘরের মধ্যে তখন অনেকগুলো লোক একসঙ্গে জটলা করছিলো। ইনফরমার শিউচরণ ওরফে শিউচরণিয়া কিছুক্ষণ দরজার উপর কান রেখে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলো, "হাঁ, হুজুর, খোকাই বটে। খোকা বাবুর গলাও পাচ্ছি। ফূর্ত্তি হচ্ছে ভিতরে, একেবারে মাইফেল। তাড়াতাড়ি দরজাটা ভেঙে ফেলুন। তা না হলে ধরা ওকে শক্ত হবে।"

যথাকর্ত্তব্য পূর্ব্ব হ'তেই স্থির করা ছিল। ডান হাতে গুলী-ভরা পিস্তলটা উঁচিয়ে ধরে প্রণব বাবু সজোরে তার বুটের গোটা দুই লাথি দরজার উপর বসিয়ে দিলেন। বুটের ধাক্কা সহ্য করতে না পেরে দরজার একটা পাল্লা খিল সহ ভেঙে পড়লো।

ভিতরে এই সময় এক দল লোক ফরাসের উপর বসে, একটি নৃত্যরতা নারীকে ঘিরে হাততালি দিচ্ছিল। মদের গেলাস হাতে নারীটি নেচে চলেছে। দরজা ভাঙার শব্দে তার হাতের গেলাসটাও সশব্দে নীচে পড়ে ভেঙে চুরমার হয়ে গেলো। আওয়াজ হলো ঠন্-ঠন্। সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী সচকিতে পিছনে তাকিয়ে সমস্বরে বলে উঠলো, "আরে! ই কোন বাত, ই লোক কৌউন।"

দলের মধ্যে থেকে এক জন অপর সকলকে সামাল দিয়ে নিম্নস্বরে বললো, "চুপ কর শালে লোক, পুলিশ আ গিয়া।"

খোকা বাবু ওরফে খোকা গুণ্ডা এতক্ষণ জানালার কাছে একটা চেয়ারে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গান শুনছিলো। এই দিন সে এদের সঙ্গে ফূর্ত্তিতে যোগ দিতে আসেনি। সে এ অঞ্চলে এসেছিলো অন্য এক কাজে। এটা ছিল তার এক সাকরেদের রক্ষিতার ঘর। খোকা বাবু এখানে এসে একটু সময় কাটাচ্ছিলো মাত্র। হঠাৎ সদল-বলে শিউচরণিয়ার পিছন পিছন প্রণব বাবুকে ঢুকতে দেখে বুঝতে কিছু আর তার বাকি থাকেনি। একবার মাত্র শিউচরণের দিকে একটা অগ্নিদৃষ্টি হেনে সে জানালার ধারে এসে দাঁড়ালো। তার পর এক লাফে জানালা গলে মুখটা নীচের দিকে করে ফুটপাত লক্ষ্য করে সে লাফিয়ে পড়লো।

জানালার কাছে ছুটে এসে প্রণব বাবু দেখলেন, ডিগবাজী খেতে খেতে খোকা বাবু তীরবেগে নীচে পড়ছে। সকলেই বুঝলো, খোকা বাবুর জীবন এইবার শেষ হতে চলেছে। প্রণব বাবু আর কালক্ষেপ না করে সদলে তর-তর করে সিঁড়ি ব'য়ে নামতে সুরু করে দিলেন, বিখ্যাত গুণ্ডা খোকার শেষ পরিণতি দেখবার জন্যে।

ডিগবাজী বা ভল্ট খেয়ে নীচে পড়লে, শেষ ডিগবাজী খাওয়ার পর হ'তে দূরত্বের পরিমাপ হয়। এই জন্যে ডিগবাজী খেতে খেতে নীচে পড়লে মানুষ আহত না হ'লেও হতে পারে। এই বিশেষ বৈজ্ঞানিক তথ্যটি খোকা বাবুর জানা ছিলো। ভূমি হ'তে মাত্র বার ফুট উপরে শেষ ভল্ট খেয়ে খোকা নিচে ফুটের উপর এসে দাঁড়ালো, কিন্তু এত সত্ত্বেও সে তার দেহের সমতা রাখতে পারলো না। তাল রাখতে না পেরে ঠিকরে এসে সে ফুটের ওপর আছড়ে পড়লো, আওয়াজ হলো—দড়াম্। কিন্তু তা নিমিষের জন্য। নিমিষের মধ্যেই পুনরায় সে উঠে দাঁড়ালো, তার পর সে তার নিজের হাতের সাহায্যেই তার হাত ও পা টেনে-টেনে সোজা করে নিলো।

অদূরে পানের দোকানে বসে পানওয়ালা সুব্রত ঠাকুর এতক্ষণ অবাক্ হ'য়ে এই অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করছিলো। হঠাৎ সুব্রত ঠাকুরের কাছে এগিয়ে এসে তার গালে বিরাশী শিক্কার ওজনের একটা চড় ঠাস্ করে কসিয়ে দিয়ে খোকা বাবু ব'লে উঠলো, "দে শালা একটা সিগারেট।"

চড়ের ধাক্কায় সুব্রত ঠাকুরের গণ্ডদেশ লাল হয়ে উঠেছে। খোকা বাবুকে সে ভালোরূপেই চিনতো, যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কাতরাতে কাতরাতে সুব্রত ঠাকুর বিনা প্রতিবাদে একটা সিগারেট খোকার হাতে তুলে দিলো। সিগারেটটি মুখে দিয়ে বাম হাতে পানওয়ালার বাম গালে আর একটি চড় কসিয়ে খোকা বাবু পুনরায় হুকুম করলো, "দে শালা ধরিয়ে দে, সিগারেটটা।"

কাঁদতে কাঁদতে সুব্রত ঠাকুর তাড়াতাড়ি দেশলাই জ্বেলে খোকা বাবুর হুকুম তামিল করলো। এর পর খোকা সিগারেটটা ধরিয়ে নিয়ে শিষ দিতে দিতে পাশের একটা গলির মধ্যে ঢুকে পড়লো, এমন ভাব দেখিয়ে যেন কিছুই হয়নি।

খোকা বাবু সরে পড়ার পর দুই-এক সেকেণ্ডের মধ্যেই ইন্সপেক্টার প্রণব বাবু হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে এসে দেখতে পেলেন, পানওয়ালা সুব্রত ঠাকুর চুপ করে আড়ষ্ট ভাবে দোকানে বসে রয়েছে। চোখে-মুখে তখনও পর্য্যন্ত তার ভয়ের চিহ্ন। চোখ দিয়ে তার অঝোরে জল

—চিত্তরঞ্জন দাস

গড়াচ্ছে। তার উভয় গণ্ডের উপরকার পাঁচ আঙুলের লাল দাগ তখনও পর্য্যন্ত মিলায়নি।

সদলবলে এগিয়ে এসে প্রণব বাবু সুব্রত ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এই মাত্র এখানে যে একটা লোক পড়লো, তার লাসটা গেল কোথায়?"

সুব্রত ঠাকুর প্রণব বাবুর কথা কান দিয়ে শুনলো মাত্র। মুখ দিয়ে চেষ্টা করেও সে কোনও শব্দ বার করতে পারলো না। ইনফরমার শিউচরণিয়া কিন্তু ইতিমধ্যেই আসল ব্যাপারটি বুঝে নিয়েছে, খোকার কীর্ত্তি-কলাপ সম্বন্ধে সে ভালোরূপেই অবহিত ছিলো। অত্যন্ত ভয় পেয়ে শিউচরণ প্রণবকে অনুযোগ করে বললো—"আমার আর রক্ষা নেই হুজুর! খোকা-কাউকে কখনও ক্ষমা করেনি, আমাকেও সে ক্ষমা করবে না। আমাকে আপনি থানায় নিয়ে চলুন, হুজুর! বাইরে থাকলেই আমাকে মরতে হবে। ও আমাকে ঠিক চিনেছে। কেন আমাকে নিয়ে এলেন হুজুর? আমি তো আসতে চাইনি, হুজুর! হুজুর—"

ভয়ে-ভাবনায় অতিষ্ঠ হয়ে শিউচরণ প্রণবের পা দু'টো জড়িয়ে ধরলো। প্রণব বাবু নিজেও যে কিছুটা ভয় পাননি তাও নয়। এত বড় দুর্দ্দান্ত ডাকাত প্রণব বাবুও ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখেননি। তাড়াতাড়ি নিজেকে কিছুটা প্রকৃতিস্থ করে নিয়ে শিউচরণকে তুলে ধরে প্রণব বাবু আশ্বাস দিয়ে বললেন—"ভয় নেই তোর। আমার সঙ্গে থানায় আয়। থানাতেই নয় থাক কয় দিন। প্রাণ দিয়েও তোকে আমি বাঁচাবো। আমার কথার মূল্য আমি রাখবোই, বুঝলি?"

[ক্রমশঃ।

নারীর সামাজিক রূপ

বিপ্রমুখ

সমাজে অর্থাৎ ঘরের বাইরে যে সামাজিক-গোষ্ঠীর মধ্যে আমরা বাস করি, সেখানে আমরা মেয়েদের কি ভাবে, কি রূপে দেখতে চাই, তার ওপর অনেকখানি নির্ভর করছে আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক গঠন ও শিক্ষা।

ঘরোয়া জীবনে, যেখানে মেয়েদের আমরা নিত্যই দেখি, সেখানে মেয়েদের যে চেহারা, তা ছাড়া আরেকটি রূপ ও পরিচয় তাঁদের নিশ্চয়ই আছে—যেটির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমরা পেয়ে থাকি সামাজিক মেলামেশায়,—ক্লাবে, চায়ের বৈঠকে, নিমন্ত্রণ-সভায় এবং অন্যান্য জায়গায়। যে সব সাধারণ, মধ্যবিত্ত পুরুষ ও নারী আজও এ সাত্ত্বিক ধারণা পোষণ করেন যে, ঘরোয়া পরিচয়টাই হল মেয়েদের আসল এবং একমাত্র পরিচয়, তাঁদের কথা আমি তুলব না। কারণ, এ রকম ধারণা বর্ত্তমান যুগে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল দেশে অথবা সমাজেও অচল। বর্ত্তমানে নারীর কর্ম্মক্ষেত্র কতখানি প্রশস্ত ও বিস্তৃত হয়েছে, সে কথা কূপমণ্ডুক ছাড়া সকলেই জানেন। যে সব জায়গায় ও কাজে আগে নারীর হস্তক্ষেপ চলত না, এখন সে সব ক্ষেত্রে নারীর অবাধ প্রবেশাধিকার স্বীকার করা হয়েছে। সমাজে, রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে, এমন কি আন্তর্জ্জাতিক পরিষদেও মেয়েরা যে আজকাল অনায়াসেই আপনার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিতে সক্ষম, সংবাদ-পত্রের যুগে সে সত্যটি কারুর অজানা থাকবার কথা নয়। তাই বেশি মাত্রায় প্রগতিবাদী না হয়েও বলা চলে যে, সমাজে মেয়েদের যে রূপটি প্রকাশ পায়, এক হিসেবে সেইটেই দামী। কেন না, ঘরে বসে কে কি রকম রাঁধেন-বাড়েন, সংসার চালান, গৃহিণীপনা করেন, স্বামি-পুত্র বাপ-মা নিয়ে ঘর করেন, সে পরিচয়টা অবান্তর না হলেও, নারীর সত্যিকারের উজ্জ্বল পরিচয়টুকু পাওয়া যায় সামাজিক পরিবেশেই।

দেখা গিয়েছে যে, যিনি নিপুণ অভিজ্ঞ গৃহিণী,—আত্মীয়-স্বজনকে নিয়ে যিনি যথারীতি সংসার করতে জানেন, স্বামি-পুত্রকে দাবে রাখতে পারেন, অনেক সময়ে সামাজিক মেলামেশায় হয়তো তিনি নিতান্তই অজ্ঞ। সংসারে যিনি আদর্শ সাংসারিক, সমাজে হয়তো তিনি অসামাজিক। ভালো ভাবে মিশতেই পারেন না; মার্জ্জিত রুচির অভাবে কখন কোথায় কার সঙ্গে কি কথাটি বলা ভদ্র, শোভন ও সঙ্গত, তার কোনো খবরই রাখেন না। এর জন্যে খানিকটা দায়ী তিনি নিজে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি দায়ী তাঁর অভিভাবক—যিনি তাঁকে সামাজিক শিক্ষা বা মেলা-মেশার সুযোগ দেননি। ফলে, সেই মহিলাটি অন্যান্য বিষয়ে ভালো হলেও সমাজে আনাড়ির মতই বসে থাকেন, নয়তো মুখচোরা হন অথবা এমন দু'-চারটি বেফাঁস কথা বলে ফেলেন, যেটি লজ্জার ব্যাপার! এই ত্রুটির প্রধান কারণ হ'ল—তাঁর এমন কোনো সামাজিক শিক্ষাই হয়নি, যাতে করে তিনি সমঝাতে পারেন যে, বেশি কথা বলার মতই একেবারে চুপ-চাপ বসে থাকা অথবা সংসার, রান্না-বান্না, নিজের ছেলেমেয়েদের অযাচিত প্রশংসা করাটাও শুধু ক্লান্তিকর নয়, রীতিমত সামাজিক অপরাধ। নারীর যেটা সামাজিক শিক্ষা, সেটার গোড়াপত্তন কিন্তু অন্তঃপুর থেকেই হয়। সে কালের অনেক গৃহিণী দেখেছি যাঁরা আধুনিকা না হয়েও চমৎকার সামাজিক, অমায়িক এবং মিষ্ট-মধুর স্বভাবে, কথাবার্ত্তায়, আত্মীয়-অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা ও তুষ্টি-বিধান করতে জানেন। তাই বলছি, উচ্চ-শিক্ষিত কিংবা আধুনিক হলেই সামাজিক হওয়া যায় না, যেমন সামাজিক হতে গেলে কিছুটা আবার আধুনিক সুশিক্ষার প্রয়োজন আছেই।

সমাজে নানা ভাবে ও অবস্থায় আমরা সংস্পর্শে এসে থাকি। ধরুন, বন্ধুর বাড়ীতে চায়ের নিমন্ত্রণ হল। সেখানে বন্ধুর স্ত্রী ছাড়াও অন্য দু'চার আত্মীয়া অথবা পরিচিত মহিলার সাক্ষাৎ আপনি পেতে পারেন। সাহিত্য-সভায়, বক্তৃতা-স্থলে কিংবা গানের আসরে মেয়েরা তো প্রায়ই গিয়ে থাকেন। সিনেমা, রঙ্গমঞ্চে এবং খেলার মাঠের কথা বাদ দিলুম। তার পর পাড়া আছে, প্রতিবেশী আছে, আছে পার্টি ও নিমন্ত্রণ-বাড়ী। এ সব জায়গায় মেয়েদের সঙ্গে পরিচিত ও অর্দ্ধপরিচিত পুরুষের সাক্ষাৎ ঘটে এবং কিছুটা সামাজিক আদান-প্রদানের অবকাশ আছে। এখন দেখা যাক, এ সব উপলক্ষে মেয়েদের কাছ থেকে সাধারণতঃ কি রকম আচরণ আমরা পেয়ে থাকি আর প্রত্যাশা করি। প্রত্যেক লোকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অবশ্য স্বতন্ত্র, এ কথা বলা বাহুল্য।

মনে করা যাক্, বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছি একটু দরকারে যদিও একটু অসময়ে। গিয়ে দেখলুম, তিনি বাড়ী নেই। খবর পাঠালুম ভিতরে। উদ্দেশ্য যে, বন্ধুর ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবার অনুমতি পাবো। বন্ধু-পত্নী আধুনিক, শিক্ষিত এবং নিতান্ত অসামাজিক নন্। কিন্তু ঝাড়া এক ঘণ্টা কাল কড়িকাঠ গুণে যখন অস্থির হয়ে উঠেছি, তখন হয়তো বন্ধুর স্ত্রী শাড়ী বদলে, টয়লেট সেরে, পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন এবং বিস্ময়ের কণ্ঠে বললেন, "ওঃ আপনি! আমি ভেবেছিলুম, আর কেউ বুঝি!" মনে-মনে আমি কি তখন বলতে পারি না, "ছলনাময়ী দেবি! প্রেসের কোন কর্ম্মী এসে বসে থাকলে আপনি নিশ্চয়ই এতখানি সময় ও ধৈর্য্য খরচ করে প্রসাধন ও ও বেশভূষা করতেন না?" যাই হোক্, তার পর দু'-চারটে মামুলি কথা। কেন বিয়ে করছি না, মনে-মনে কাউকে ভালোবাসি কি না, তার নাম-ধামটা বলতে দোষ কী, একবার না হয় ঘটকালীর চেষ্টা করেই দেখা যাক্—ইত্যাদি সেই পুরানো রসিকতায় আমাকে কিছুটা বিব্রত এবং বিরক্ত করে অবশেষে নিজের ছেলে-মেয়ের কথা পাড়লেন। ক্লুট্, এই সাত বছর বয়েসে কি অদ্ভুত প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করে, আর বুলবুল মাত্র দু'বছরে কী ভীষণ পাকা কথা বলছে আর এমন তালে-তালে পা ফেলে নাচতে শিখেছে যে তার মামার এক বিশেষ বন্ধু—যিনি ভারতীয় নৃত্যগীত সম্বন্ধে অদ্বিতীয় সমালোচক—তিনিও অবাক্ হয়ে গেছেন!—এই সব কাহিনীর এক দীর্ঘ ও বিশদ বিবরণী শুনতে হল অখণ্ড মনোনিবেশের ভাণ করে। তার পর চায়ের জন্যে শীতের ম্লান অপরাহ্নে প্রাণটা যখন দেহ থেকে বিদায় নেবার চেষ্টায় কণ্ঠাগত, তখন বন্ধু এলেন। কিন্তু তাঁর আসার সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকটা জরুরী সাংসারিক কথা বলার প্রয়োজন ঘটল। অবশেষে তিনি ঘরে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে আমিও এক পেয়ালা ঈষদুষ্ণ চা পেলুম। কি প্রত্যাশা করেছিলুম আর কি পরিচয় পেলুম—এটা আশা করি আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না। বন্ধু-পত্নী যদি সাদাসিদে বেশে সময় মাফিক এসে আমার সঙ্গে দু'টো সাধারণ কথায় আলাপ করতেন এবং ভদ্র-রীতিসম্মত পারিবারিক উল্লেখ বর্জ্জন করে অমায়িক কথাবার্ত্তা কইতেন, তা হলে অকারণে চায়ের তৃষ্ণায় এতো অযথা পীড়িত হতুম না, মনটাও স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন থাকত।

সভা-সমিতিতে, গান-বাজনার আসরে, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতেও দেখতে পাই হরেক রকমের মহিলা। কেউ বা প্রসাধনে, অঙ্গসজ্জায় উগ্র বিজ্ঞাপনের ভাব নিয়ে এসেছেন, কেউ বা বেশি ফড়-ফড় করে কথা বলছেন, অনুচ্চ কণ্ঠে ব্যক্তিগত ইতিহাস শোনাচ্ছেন সঙ্গিনীকে, কেউ বা অকারণে হাসির উচ্ছ্বাসে পাশের লোকের বিরক্তি উৎপাদন করছেন, আবার কেউ বা চুপ-চাপ বসে আছেন জড় ভরতের মতন, পাঁচটি প্রশ্নের একটিও জবাব দিচ্ছেন কি না সন্দেহ। প্রত্যেক মানুষেরই অবিশ্যি চাল-চলন, ব্যক্তিত্ব আলাদা—কি পুরুষের, কি মহিলার। অতএব যে কোনো অনুষ্ঠানে গেলেই আমরা নানা রকমের চরিত্র দেখতে পাই। কিন্তু যে জিনিষটির প্রত্যাশা আমরা করি মেয়েদের কাছ থেকে, সেটি এই। আতিশয্যহীন, সহজ সরল, অসঙ্কোচ ব্যবহার। বেশি কথা বলে সস্তা এবং হাল্কা হওয়ার যে দুর্নাম, মুখ ভারি করে গাম্ভীর্য্যের মুখোস টেনে অথবা নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হয়ে ঘোরা-ফেরা করাতেও সেই দুর্নাম। আমাদের সমাজে সমালোচকেরা দেখি বিদ্রূপ করেন বরাবর ঐ লাটি-কিটি-সিসি জাতীয় মহিলাদের। কিন্তু যাঁরা জবরজঙ্গ, নড়তে-চড়তেই বাজি ভোর করেন, সে সব মহিলাদের সামাজিক সঙ্গ যে কতখানি ক্লান্তিকর এবং অস্বস্তিদায়ক, সে কথাটা খুব কমই বলেন। বোধ হয়, এ ধারণাটা ভিতরে ভিতরে এখনও কাজ করছে,—যে মহিলা যতই লজ্জাশীলা, যতই অপ্রতিভ, যতই জড়-সড় এবং নির্বাক্, তিনি সমাজে ততই সম্মান-প্রশংসা পাবার যোগ্য।

সমাজে আমরা নানা ধরণের স্ত্রী-চরিত্র দেখি। তাঁদের মধ্যে যাঁরা শাড়ী, গয়না, সিনেমা অথবা চকোলেট নিয়ে ব্যস্ত, হাই-হীল আর প্যারাসোল ভ্যানিটি-ব্যাগ আর ক্যুটেক্স-রাঙানো আঙুল, লিপ-ষ্টিক-রঞ্জিত অধর আর এনামেল-করা মুখশ্রী নিয়েই বিব্রত, সেই সব বিজাতীয় অল্প-সংখ্যক একালিনী নায়িকার দল আমাদের বিচার্য্য নয়। সাধারণ সমাজে সাধারণ শিক্ষিত মেয়েদের কাছ থেকে সাধারণ আলাপ-ব্যবহারের পদ্ধতিটাই আমাদের আলোচনার বিষয়। জীবনটা নাটকও নয়, সমাজটা ঠিক রঙ্গমঞ্চও নয়। সমাজ হ'ল সংসারেরই বৃহত্তর সংস্করণ, দু'য়ের রীতি কিছুটা আলাদা হলেও নীতিটার বিশেষ তফাৎ নেই। কাজেই সামাজিক মেলামেশার মধ্যে দিয়ে যদি আমরা এমন সব মহিলাদের সংস্পর্শে আসতে পারি যাঁদের সঙ্গে সহজ কুণ্ঠাহীন আলাপে আমাদের মনে নামে কোমল মাধুর্য্য, অন্তরে জাগে উৎসাহ, বুদ্ধি-বিচারে লাগে উদ্দীপনা—যাঁদের মুখমণ্ডলে দুনিয়ার বিষাদ বাসা বেঁধে থাকে না, স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণ-শক্তির উজ্জীবন স্পর্শে আমাদের মনটা হয় সতেজ ও সরস, আবার যাঁদের লীলাবিভ্রম চটুল চপলও নয়, তাহলে সে সমাজে বাস করে সুখ আছে। প্রাচীন আমল থেকে আজ পর্য্যন্ত মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে মেলা-মেশা করেছেন এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠাও অর্জ্জন করেছেন। বর্ত্তমান যুগেও তাঁরা সেই সমাজধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত থাকুন, স্বাধিকার-প্রমত্ত না হয়ে আপনাদের কর্ম্মে আর সমাজ-সেবায় পুরুষদের সহযোগিনী হোক্, স্বাভাবিক এবং অসঙ্কোচ সঙ্গদানে তাঁদের আনন্দ দিন, এ আশা পোষণ করা অসঙ্গত হবে না নিশ্চয়ই।

তবে একটি কথা। হাবে-ভাবে, কথায় ও আচরণে যেন মাত্রা-জ্ঞান থাকে। লঘুপক্ষ অস্থির প্রজাপতির রঙীন বিলাস কিছুক্ষণের জন্যে চোখ ধাঁধায়, কিন্তু অন্তরঙ্গ তৃপ্তি দিতে পারে না। সামাজিক আচার-ব্যবহারে যদি ওজন থাকে, তাহলে সমাজের নিত্য সংস্পর্শেও আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না। পর্দা-প্রথা অবিশ্যি আমরা আজ-কাল কেউ মানতে রাজি নই। তবু নিজের চার দিকে এমন একটা অদৃশ্য, সূক্ষ্ম অথচ স্বচ্ছ পর্দা রচনা করা যেতে পারে, যেখানে অপরের প্রবেশাধিকার নেই—যে সহজ গাম্ভীর্য্যের স্বাভাবিক আবরণটুকু কেউ তুলে ধরতে সাহস পাবে না। সামাজিক অমায়িকতার সঙ্গে যাঁর শোভন মর্য্যাদাবোধ যুক্ত হয়ে আছে, তিনিই শ্রদ্ধেয়া সামাজিক নারী।

—প্রতিভা মৈত্র

কোথায় গেল?

কুমারী কৃষ্ণস্মুচিত্রা দেব

কোথায় গেল? বুঝলুম, এ প্রশ্নবাণ আমারই ওপর তীক্ষ্ণধারে বর্ষিত হচ্ছে, বললুম, "কি?" "কি?"—বন্ধু খিঁচিয়ে উঠল, "কি তাই জিজ্ঞাসা করছ? কি নয় তাই বল।" বুঝতে কোন কষ্ট হোল না যে, কোন কিছু ঘটেছে সেখানে, নির্ব্বাক্ হয়ে ফিরে এসেছে আর সেখানকার সব ঝাঁঝ আমারই ওপর বর্ষণ করবে একটির পর একটি, এ ঝাঁঝ আমাকেই সামলাতে হবে, কাজেই সাবধানে সান্ত্বনার সুরে প্রশ্ন করলুম, "আরে অত চটছ কেন, বলই না কাকে খুঁজছ?" বন্ধুর মেজাজের বিন্দুমাত্র পরিবর্ত্তন হোল না, পূর্ব্ববৎ খিঁচিয়ে উঠে সে বললে, "কাকে খুঁজছি? হুঁ, কাকে না খুঁজছি, কি না খুঁজছি? সব খুঁজছি, সবাইকে খুঁজছি! কিন্তু মিলছে কি? দাঁত খিঁচুনী!" মনে মনে বুঝলুম, বন্ধু সেই খিঁচুনীর অর্দ্ধেক ভাগ আমাকেই উপহার দেবে। তার হেঁয়ালী মনে মনে যেন কিছুটা অনুমান করতে সমর্থ হয়ে বললুম, "আমাকে একবার বলেই দেখ না চেষ্টা-চরিত্র করে যদি বন্ধুর একটু উপকার করতে পারি?" আমার এমন চমৎকার কথাটার একটুও সম্মান দিলে না অকৃতজ্ঞ বন্ধু। পূর্ব্বোক্ত রকমে বললে, "তুমি? হ্যাঁ, তাহলেই হয়েছে! আরে বাবা, এ শর্ম্মা এত ঘুরে ঘুরে পেলে না আর তুমি—? বাজারে মাল নেই বুঝলে?" এমন ভাবে সে খিঁচিয়ে উঠে কথাটা বললে যেন আমি খরিদ্দার আর ও দোকানদার। তবুও বললুম, "আমাকে জানাতেই বা তোমার এত আপত্তি কিসের?" এবার ফল হোল। "আপত্তি? আচ্ছা শোন। বন্ধু হিসেব দিতে লাগল, বামুন, চাকর, ঝি, চাল, ডাল, তেল, ময়দা, আটা, গম, চিনি,—এ ত গেল খাবার; তার পর কাপড়, আমাদের একমাত্র সম্বল,—মিলের ধুতি, শাড়ী লংক্লথ; তার পর ওষুধ, বিষুধ, বিস্কুট, হরলিক্স, গ্ল্যাকশো, গ্লুকোস্, বার্লি, সাগু!" বন্ধুকে বাধা দিয়ে বলি, "যুদ্ধের জন্য এ সব দুষ্প্রাপ্য, আবার সব পাওয়া যাবে যুদ্ধ থেমে গেলে।" আগুনে ঘি পড়লে যেমন দপ্ করে জ্বলে ওঠে বন্ধুর রাগও তেমনি বেড়ে উঠল—"সবাইকার মুখে এক বাক্যি, কেন রে বাবা, চাল-ডাল কি লড়তে গেছে? তেলের অভাবে ত গা-হাত-পা চচ্চড় করছে, রান্না চড়ে না, আবার গায়ের জন্য হুঁ—কাপড়ের জন্য ছুটোছুটি করে জুতো-জোড়ার ত স্বর্গলাভ! আরে বাবা, আমরা যে গরীব মানুষ, বড়লোকদের মত দশ-বিশটা চাকর থাকত, এই লে আও ঐ লে আও বলে ল্যাঠা চোকাতুম কিন্তু এই একটা প্রাণকে নিয়ে একবার ক্লাইভ ষ্ট্রীটে অফিসের দোর-গোড়ায় আর একবার কার্ড নিয়ে রেশনের জন্য কণ্ট্রোলের লাইনে, আর কত টানা-পোড়েন—"

চমকে উঠলুম। রেডিওর ঘড়িতে আটটা বাজল। না, শুধু স্বপ্ন, সত্য নয়। বেশ মজার স্বপ্ন, সবটা শোনা হোল না বা দেখা হোল না। অমন বন্ধু হলে গেছি আর কি! মনে মনে একটা সমস্যা জাগল, সত্যিই ত, এ সব কোথায় গেল?

—রমা বসু
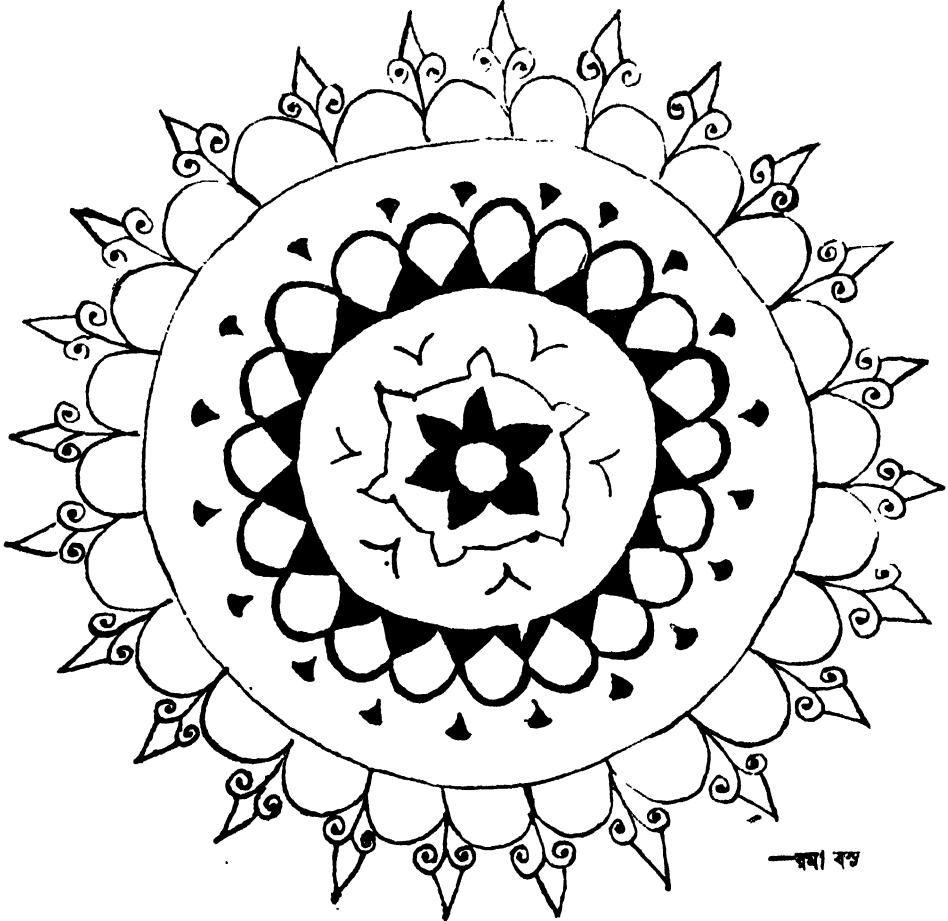
শিশু কাঁদে কেন ?

দীপিকা পাল

শিশুর শৈশবের প্রথম অবস্থায় কান্নাটাই তার একমাত্র সম্বল। শিশু হাসতে শেখে জন্মের বেশ কিছু দিন পরে, কথা বলতে শেখে আরও পরে, কিন্তু কান্নাটাকে সে সঙ্গে করেই পৃথিবীতে আসে। যত দিন না শিশু কথা বলতে শেখে বা মনের ভাব ভাল করে বোঝাতে শেখে তত দিন পর্য্যন্ত তার সকল অসুবিধা, অসন্তোষ ও আপত্তি সে কান্না দিয়েই প্রকাশ করে। কখন্ সে কি চায় না চায়, কখন্ তার কি অসুবিধা হচ্ছে না হচ্ছে, তা শিশুর কান্না থেকেই মায়েদের বুঝে নিতে হবে। শিশুর কান্নার কারণ প্রধানতঃ দুটি বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে—একটি শারীরিক ও একটি মানসিক।

(১) শারীরিক কারণের মধ্যে প্রথমেই বলা যেতে পারে শারীরিক অসুস্থতা ও অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ। যে শিশুর শরীর ঠিক সুস্থ নয় সে শিশুর কাঁদুনে স্বভাব হওয়া কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। শরীর অসুস্থ হলে বড়মানুষই রীতিমত খিট্‌খিটে হয়ে পড়ে; সুতরাং শিশু কাঁদুনে হবে এটা আর অস্বাভাবিক কি ? যাই হোক্, শিশু যদি ঠিক সুস্থ সবল না হয়, তাহলে চিকিৎসককে দেখিয়ে তাঁর পরামর্শ মত অবিলম্বে এ বিষয়ের সুব্যবস্থা করা উচিত। শিশুর অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ বলতে বুঝায়, যেমন—হয়ত গোলমাল বা চেঁচামেচিতে তার ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে, কিংবা অতিরিক্ত গরম হয়ত সে সহ্য করতে পারছে না, কিংবা হয়ত তার ঠাণ্ডা লাগছে, ঠিক মত শীতবস্ত্র তাকে দেওয়া হয় নাই ইত্যাদি। এ সকল বিষয়ে মায়েদের নজর থাকা একান্তই দরকার, বলা বাহুল্য। তা'ছাড়া ক্ষুধা বোধ করলে কিংবা তৃষ্ণা বোধ করলেও শিশু রীতিমত কান্না জুড়ে দেয়, এ-ও মাকে তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিয়ে বুঝে নিতে হবে এবং সেই মত ব্যবস্থা করতে হবে। তবে অনেক মায়ের একটা মস্ত ভুল ধারণা আছে—তাঁরা মনে করেন, শিশু বুঝি কেবল ক্ষুধা পেলেই কাঁদে। তাই শিশু কাঁদতে আরম্ভ করলেই তাঁরা তাকে খাওয়াতে বসে যান। এই ধারণাটি যেমন খুবই ভুল আর এই যখন তখন খাওয়ানোর অভ্যাসও তেমনি খুবই খারাপ, শিশুর শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। শিশুকে খাওয়ানোর একটি নিয়ম ও সময় আছে এবং পরিমাপও একটা আছে। শিশুকে সুস্থ ও সবল রাখতে হলে সেই নিয়মানুসারেই চলা ভাল এবং বিশেষ কোন প্রয়োজন না হলে কোন ক্রমেই সেই নিয়মের ব্যতিক্রম করা উচিত নয়।

(২) শিশুর কান্নার দ্বিতীয় প্রধান কারণ হচ্ছে—শিশু আরামের প্রত্যাশী। সে আরাম চায়। অবশ্য আরাম কে না চায় ? আমরাই কি চাই না ? এজন্য শিশুকে দোষ দেওয়া চলে কি ? সত্যই শিশুকে দোষ দেওয়া যায় না, দোষ আমাদেরই. যারা শিশুর এই আরাম চাওয়া আবদারের অতিরিক্ত প্রশ্রয় দিই। আরাম বা আনন্দ পাবার জন্য শিশুর যে কান্না, সেটাকে তার দুষ্টুমীর কান্না বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হবে না। মাকে কাছে পেলে শিশু খুসী হয়, মাটিতে শুয়ে থাকার চেয়ে মায়ের কোলে সে বেশী আরাম বোধ করে ইত্যাদি—সুতরাং এইগুলি সে বেশী করে চাইবে এবং এমনিতে তার মনোবাসনা পূর্ণ না হলে সে মাঝে মাঝে জোর করে তা আদায় করতে চেষ্টা করবে। আর তার সেই জোর প্রকাশের একমাত্র অবলম্বনই হচ্ছে তার কান্না। আর যদি সে এতে সুফল পাওয়া যায় বলে বুঝতে পারে তাহলে তো আর কথাই নাই। যখন তখন সে তার জোর খাটাতে চাইবে, সুতরাং কান্নার এতটুকুও প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। এই ভাবে প্রশ্রয় পেলেই অনেক ছেলে-মেয়ে অতিরিক্ত কাঁদুনে হয়ে উঠে। শিশুকে তার আনন্দ থেকে একেবারে বঞ্চিত করা চলে না ঠিকই। কিন্তু তার কোন রকম বদ অভ্যাস না হয়ে পড়ে সেদিকেও নজর রাখতে হবে। শিশুর দুষ্টুমীর কান্না বুঝতে পেরেও কেবল তার কান্না থামাবার জন্য কতকগুলি কুঅভ্যাস ও বিরক্তিকর স্বভাবের সৃষ্টি করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। প্রশ্রয় না পেলে এ কান্না আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়।

পরাজয়

অলকা দেবী

কত দিন মোর কেটে গেল শুধু হাসি আর গানে গানে।
প্রাণ-চঞ্চল জীবনের মাঝে সুখ ছিল সব-খানে।
কত যে হাস্যে কত যে লাস্যে কত সে মধুর ক্ষণে।
দুঃখের মাঝে সুখেরে রচিয়া ফিরিতাম নিজ মনে।
ছিল আশা তাই কেটে যাবে দিন সুখের সাগরে ভাসি।
আপনার মাঝে আছে যে শক্তি শুধু তারে বিশ্বাসী।
ভগবান সে তো কিছু নয় সে যে আমার মাঝারে লীন।
আমার আমি সে যত দিন আছে নহি কভু আমি হীন।
দুর্গম মম জীবনের পথে চমকি দাঁড়ানু থামি।
বড় একা আমি কেহ নাহি মোর সহসা ভাবিনু আমি।
কোথা সে শক্তি কোথা সে সাহস কোথা মোর বিশ্বাস।
দুর্বল আমি বুঝিনু যে আজি নাহি কোন আশ্বাস।
মাথা নত করি দাও আজি মোর তোমার চরণ 'পরে।
তোমার শক্তি লঙ্ঘন করি কেহ যেন নাহি মরে।
সারা বিশ্বের অন্তর-মাঝে আছে যে শক্তিময়।
আমার মাঝারে তাহারি বিকাশ আমি সে তো কিছু নয়।
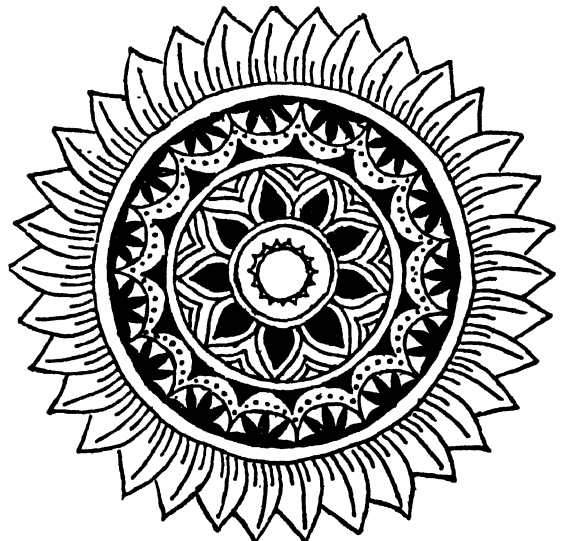
—ডলি সিংহ

—দেবকুমার রায়চৌধুরী

বর্ত্তমান নারী ও সমাজ-সমস্যা

শ্রীপ্রীতিরাণী মিত্র
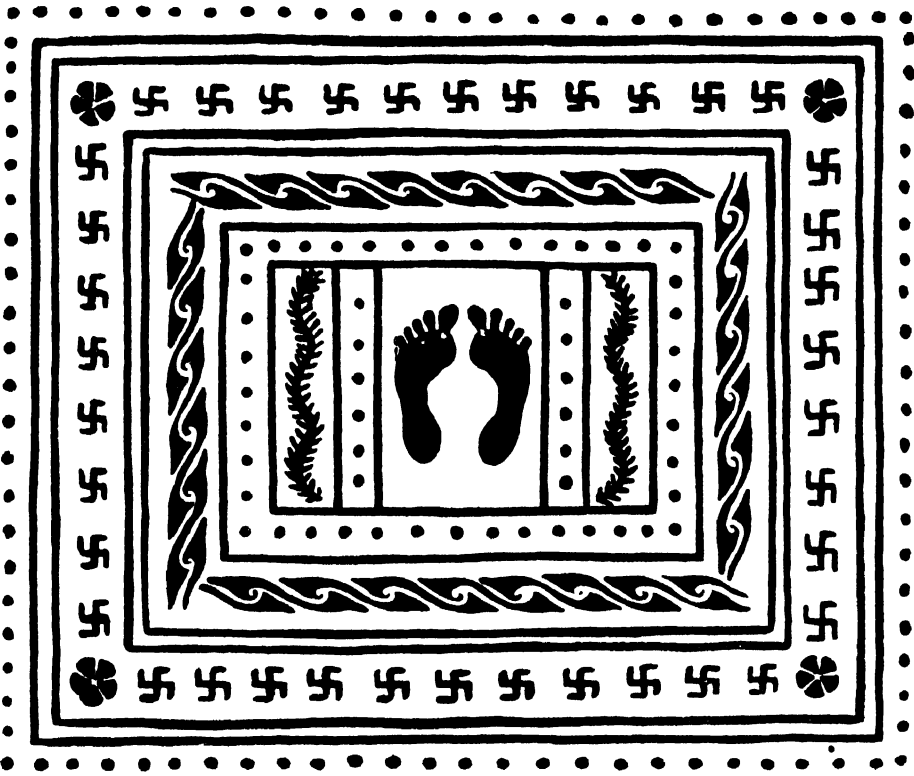
বর্ত্তমান নারীর দাবী যে কি, কি হলে তার সম্পূর্ণ বিকাশ হয়, কিসে তার নিজের স্বরূপ নিজে চিনতে পারে ও অন্যকেও ঠিক বুঝতে পারে—এইটাই একটা মস্ত বড় সমস্যা। সমস্যা সমাধান করাই হচ্ছে নারীর উদ্দেশ্য, আপ্রাণ চেষ্টা ও ঐকান্তিক সাধনা। এই চেষ্টায় তাকে নিয়োজিত করতে হবে। যুগ-যুগান্তর ধরে নারী জাতির উক্ত উন্নতির পথে যে বাধা-বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে তা অতিক্রম করে উঠতে গেলে বহু প্রয়াস, ঐকান্তিক সাধনা ও অসীম সাহসের প্রয়োজন। নিষ্মম সমাজের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করাই হচ্ছে বর্ত্তমান নারীর দাবী।

অবশ্য আধুনিক নারীর জীবন অতি অল্প দিন থেকেই আরম্ভ হয়েছে। আমাদের দেশের প্রতিক্রিয়াবাদী সমাজকর্ত্তাদের মধ্যে অনেকে সমাজ রক্ষা করতে গেলে সমাজে নারী-শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে গার্হস্থ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে কূপমণ্ডুকের মত থাকাই নারীর পক্ষে যথেষ্ট। নানা রকম ভাবে চারি দিক্ থেকে নারীর উন্নতির পথে এসেছে ঘূর্ণির মত বাধা-বিপত্তি। সাহিত্যশিল্প, দর্শন-জগতে তাঁরা ছিলেন অপরিচিতা। তখন নারী মিশতে পারতো না বহির্জগতে, তারা জানতে বা বুঝতে পারতো না দেশের অবস্থা।

নারী ও বহির্জগতের মধ্যে যে কোন প্রাচীর গড়ে উঠতে পারে না এটা সমাজকে বোঝাবার জন্ত করছে চেষ্টা, হচ্ছে উদ্যোগ। প্রগতি-বিরোধীরা মনে করেন যে, নারী শিক্ষিতা হলে হবে দেশের অবনতি, আর বিচিত্রময় সুন্দর সংসার হবে মরুময়। যদিও এমন দু'-একটি উদাহরণ-স্বরূপ আমরা দেখতে বা শুনতে পাই কিন্তু জগতে দু'-একটিই কি সমস্ত জাতির চরিত্র খারাপ করে দেবে এমন কোন কথা থাকতে পারে কি? অবশ্য তাঁদের মতানুযায়ী সেক্সপীয়র, বায়রণ, শেলী, কীটস্, ওয়ার্ডওয়ার্থ ইত্যাদি পড়াতে মেয়েদের আর কি নতুন শিক্ষা হতে পারে? কিন্তু ঐ সমস্ত চর্চ্চা করলে কি কিছু নৈতিক চরিত্রের অবনতি ঘটবার সম্ভাবনা আছে? ছেলেরা যে সব বই পড়ে নিজেদের উৎকর্ষতা লাভ করার জন্য, সে সব মেয়েদের পক্ষে কি বিপরীত ফল হয়ে দাঁড়াবে? আমরা প্রাচীন যুগের নারীদের জীবনী থেকে জানতে পারি যে, তাঁরা সব বিষয়ে অধিকারী ছিলেন—রাষ্ট্রনীতি, সমাজ-নীতি, অর্থনীতি ও গার্হস্থনীতিতে অভিজ্ঞদর্শী ছিলেন। এ সব থেকে কি সমাজতন্ত্রীরা বুঝতে চেষ্টা করেন না যে প্রাচীনে শিক্ষার প্রচলন ছিল কি না?

নারী জাতির কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও শিক্ষার উপর সামাজিক কল্যাণ ও সংস্কার নির্ভর করে, তাছাড়া নারী জাতির উন্নতি ছাড়া দেশের উন্নতি কিরূপে হয় বলতে পারি না। পুরুষ-চরিত্র গঠনে চাই নারীর অভিভাবিকারূপে সাহায্য। নারীর আর পিছনে পড়ে থাকবার সময় কেটে গেছে। এখন তাদের সত্তা ও জগতের সত্তা একেবারে এক—এইটাই নারীর দাবী। সে জন্য চাই শিক্ষা। শিক্ষা সম্বন্ধে মনীষীদের মত "Education is for the harmonious devolopment of body, mind and soul." বর্ত্তমানে নারীর সমস্ত দিকেই শিক্ষা প্রয়োজন—সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, অর্থনীতি ও

গার্হস্থনীতি। কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিক্ষাই হচ্ছে সব শিক্ষার ভিত্তি। এই প্রসঙ্গে মহাপুরুষ বিবেকানন্দ বলেছেন—"ধর্ম্মই ভারতের মেরুদণ্ড।" মানুষের ধর্ম্মের ভিতরই প্রকাশ পায় সমস্ত সদ্‌গুণ। নারীর জীবনে নারীত্বের ফুল ফোটান আগে চাই ধর্ম্মতে পূর্ণ বিশ্বাস।

তাঁরা যেন সেই সব শিক্ষায় শিক্ষিতা না হন—যে শিক্ষায় ভেসে যায় সংসার। প্রাচীন সভ্যযুগ থেকেই মানুষ এই সুন্দর সংসার সৃষ্টি করে যাচ্ছে, কারণ, অনাবিল সুখ-শান্তি ভোগ করার আশায় এবং এই আশাই সার্থক করাই হচ্ছে নারীর ধর্ম্ম। পুরুষের সহায়তা লাভ করতে পারে এমন শিক্ষায় হতে হবে শিক্ষিতা। নারীত্বের সীমা রেখে এমন কাজ করা উচিত যাতে বাধা বা গোলমালের সৃষ্টি না হয় সামাজিক জীবন-পথে। নারীর চাই আত্মবোধ আর জীবন-সংগ্রামে যুঝবার ক্ষমতা রাখা, এ জন্য চাই শিক্ষা, কিন্তু "যে শিক্ষায় অন্তরের স্বাধীনতা, অন্তরের মুক্তি, মনের শুভ্রতা ও ব্যক্তিত্বের দ্বার উদ্‌ঘাটন করে না, সে শিক্ষার মূলে কি আছে ?"

নারী-প্রগতি শাঁখের করাতের মতই। প্রগতি মানে যদি আমরা শুধু ভাবি যে একলা স্বাধীন ভাবে যেখানে-সেখানে বেড়াব, ট্রামে-বাসে চড়ব, সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করা স্বাধীন ভাবে মেলা-মেশা ইত্যাদি, তাহলে আমরা হবো পদে পদে অপমানিত, পরাজিত ও লাঞ্ছিত। এ-রকম প্রগতি আমাদের অগ্রগতি বা প্রগতি নয়, তবে হ্যাঁ, এটা হবে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে অগ্রগতি।

শিক্ষা মানে এ-ও নয় যে, শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ধারণ করা ও পুঁথিগত বিদ্যায় বিদুষী হওয়া। সেই হচ্ছে সুশিক্ষা, যে শিক্ষা নারীকে দেয় জ্ঞানচক্ষু, মন করে বিকশিত, আর বাঁচিয়ে রাখে ব্যক্তিত্বের আঘাত থেকে পারিবারিক, সাংসারিক, মানসিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক ক্ষেত্রে চরম উৎকর্ষতাটা পাওয়াই আমার মতে শিক্ষার উদ্দেশ্য।

জাতিকে উদ্ধার করতে হলে নারীর আছে পরিপূর্ণ দায়িত্ব ও অধিকার। কোন জাতিই নারীকে পিছনে রেখে এগিয়ে যেতে পারেনি বা পারবে না। শক্তিশালী ও উপযুক্ত সন্তানের জননী হওয়াই নারীর প্রধান উদ্দেশ্য। প্রতি মানবকে নিজ সন্তান মনে করে সুশিক্ষিত করে উচ্চাদর্শে ভুক্ত করতে হবে। যদিও ভারতের নারীর মধ্যে এসেছে আমূল পরিবর্ত্তন, কিন্তু সেটা অল্পসংখ্যক নারীর ভেতর। "নারীদের নিজেদের অধিকার নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে পদে পদে আসতে পারে বাধা, হয়তো মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে কুসংস্কারের জালে কিন্তু সে সব জয় করতে হবে।" নারীর চাই মানসিক ও দৈহিক শক্তি। আধুনিক নারী যদি প্রতি কাজে পুরুষকে দিতে পারে অনুপ্রেরণা, দাঁড়াতে পারে জীবন-সংগ্রামে নির্ভীক ও অচঞ্চল ভাবে, তবে সে আনতে পারবে এক নতুন যুগ।

প্রাচীন যুগের খনা, মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী ইত্যাদি বিদুষীরা আমাদের আদর্শস্বরূপা নারী। তাঁরা যে মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন আমাদেরও সেই শিক্ষামন্ত্রে হতে হবে দীক্ষিত। বর্ত্তমান যুগে শ্রদ্ধেয়া বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, সরোজিনী নাইডু, হেমপ্রভা মজুমদার, বিমলপ্রতিভা দেবী, মিস্ লক্ষ্মীস্বামী নাথম্, অনুরূপা দেবী প্রভৃতি মহিলারা যে মন্ত্রে উন্নত, শিক্ষিত ও বিজয়িনী হয়েছেন, সেই একই মন্ত্রে আমাদের নারীদেরও হতে হবে দীক্ষিত, সেই আদর্শে হতে হবে অনুপ্রাণিত ও সেই শিক্ষায় হতে হবে শিক্ষিত। ঐ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ধীর অথচ স্থির পদবিক্ষেপে সংসারে চলে নারীর নিজের স্থানে হতে হবে অধিষ্ঠিত।

নারীর এ স্থান পুরুষের নীচে বা উঁচুতে নয়, পুরুষের পাশে। এখানে নর ও নারী পাশাপাশি ভাবে একই সাম্রাজ্যের সম-অংশীদার ভাবে একই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে মিলিত হতে হবে এবং সেই সময় এক অদৃশ্য ঐশী শক্তি তাদের অনুপ্রাণিত করে ধ্রুব তারার মত অন্ধকারে পথ দেখিয়ে এমন জায়গায় তাদের আনবে—যেখানে একের উপর অন্যের অত্যাচার নাই, প্রতিক্রিয়াশীল সমাজবিদ্‌গণের "সদা হারাই হারাই ভাব" চলে গিয়েছে ও তাঁরাই নর-নারীর অভিযান সফল করবার আপ্রাণ চেষ্টাতে ব্রতী হবেন। সেখানে আছে—সাম্য, সাহচর্য্য, সুখ, শান্তি, স্বাধীনতা ও সমগ্র নারী জাতির এক শুভ উদ্দেশ্যের পূর্ণ বিকাশ।

আবেদন

রাণী দেবী

আরতির ধূপ ঘুরে মরে শুধু
পাষাণ-দেবের পায় ;
ভাঙ্গা মন্দির ঘিরিয়া আজিকে
বাতাস বহিয়া যায়।
"খুঁজে-ফেরে যারে আকাশ ভরিয়া
তৃষিত চকোর দল
পবনেতে নাহি খুঁজে পায় তারে
সে যে শুধু তৃণ-দল ॥"
গুমরিয়া ওঠে ব্যর্থ বেদনা
জাগিয়া উঠে মনের চেতনা
এ কি তব আশা
নয়নে ফুটে অসীম নিগূঢ় ভাষা,
যাও তবে ফিরে দখিণা পবন
গুমরিয়া উঠে প্রেম-আবেদন ;
তুলে নাও শুধু শিহরণখানি
ব্যথায় থেকো ভরি গো :
পাষাণ-দেবতা তমসায় মেশে
(বুঝি) শ্রান্ত লহরী তুমি গো ॥
আকাশের পানে চেয়ে দেখি আজি
সান্ত্বনা যদি পাই ;
হাহাকারে শুধু ফিরে পাই বুঝি
ধূয়ায় জড়ান খেই ;
পাষাণের বুকে এ কি অভিলাষ
নাই সুখধ্বনি নাহি কোন আশ,
তবে কি মোর আজ ব্যর্থ প্রয়াস
ফিরে পেতে নীলাকাশ !
শাশ্বত যদি দেবতা তুমি গো
দিলে কেন অবকাশ ?
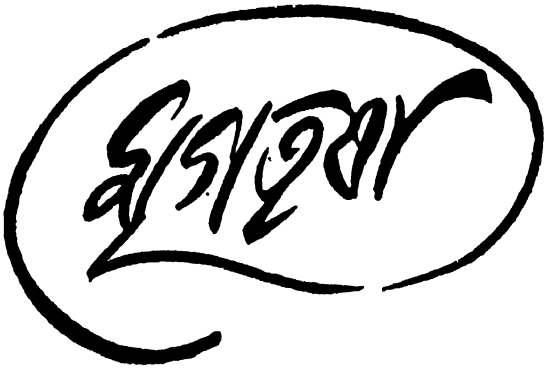
হাসিরাশি দেবী

শুয়রামারী বিলের পাশ দিয়ে এঁকা-বাঁকা যে পথটা নন্দীগ্রামের মধ্যে গিয়ে পৌঁছেচে, সেই পথে গিয়ে সামনেই প'ড়বে শশী ভট্‌চাযের বাড়ী; বিরাট বাড়ী—পূর্ব্বপুরুষের আমলের; কিন্তু, বর্ত্তমান পুরুষ শশিপদ'র আমলে তার গৌরবের সঙ্গে কেবল বাড়ীর চূণ-বালিই খ'সে পড়েনি, পাকা গাঁথনীর চূণ-সুরকীর সঙ্গে ইট আর কাঠগুলোরও অর্দ্ধেক খ'সে খ'সে মাটিতে মিশেছে, বাকীগুলো ঝুলছে ব'ললেও চলে। আর ওরই একটা ঘরে, ঝুল-পড়া ইট-কাঠের মধ্যে বাঁশের খোঁটা লাগিয়ে বসে শশিপদ'র নেতৃত্বে "দি রাজ-রাজেশ্বরী ক্লাবে"র নিত্যকার রিহার্স্যাল।

ক্লাবের নিয়মিত সভ্য যারা আসে, তারা পান, বিড়ি আর তামাকটা পায়—শশিপদ'র পয়সায় বটে, কিন্তু তা ছাড়া বাদবাকী যা খরচ তা করে নিজেদের গাঁট থেকে।

এ বিষয়ে কারো বাড়ী থেকে কেউ কিছু ব'ললে শশীর দুঃখে সম-দুঃখ জানিয়ে তারা বলে: "আহা,—শশীদা এই যা দেয়, তাই ঢের; ঘরের খেয়ে পরের মোষ তাড়ায় কয় জন বল তো? আর তা ছাড়া শশী ভট্‌চাযের আয় কোথায় যে মাইনে-করা লোক রাখবে থিয়েটার করবার? বছর ভর তো থিয়েটার,—তাও ঐ গেরামের একটা পূজো, বাবুদের বাড়ীর পূজো-তলায় এষ্টেজ বেঁধে কোনও রকমে করা। তারই রিহার্স্যাল চলে এক বছর ধ'রে। এতে আমাদের কিম্বা শশীদা'র স্বার্থটা কি,—না লোকে হাততালি দেবে দু'টো, বাহবা ব'লবে বা একবার। তাতেই হাতে হাতে স্বগ্‌গ লাভ হবে আমাদের, কেমন?—ভূতে ধ'রেছে শশী ভট্‌চাযকে তাই সে করায় এই সব, আমরা হ'লে কক্ষোনো করতাম না।"

যাই হোক, শশী ভট্‌চাযের আর কিছু না থাক, বন্ধু-প্রীতিটা আছে পূরো দস্তুর; বন্ধু-বান্ধবরা সবাই ওকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখে, সব কথাতেই বলে: "আহা:!"

বাড়ীর কেউ শশীদা'র বিরুদ্ধে ওদের কাছে কোনও অনুযোগ ক'রতে গেলেই ধৈর্য্য হারায় ওরা, আগের কৈফিয়ৎগুলোও দাখিল করে সবাই, তার পরে আকারে-ইঙ্গিতে বেশ একটু রাগত ভাবেই জানিয়ে দেয়, সারা দিন খাটা-খাটুনীর পর ওরা যদি এক জায়গায় দু'-দশ জনে মিলে-মিশে ব'সে হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটায়, তাতে কারই বা কি ব'লবার আছে আর থাকতেই বা পারে কি?

এর পরে জেঁকে ওঠে 'রাজ-রাজেশ্বরী ক্লাবে'র রিহার্স্যাল-রুম।—ফুলুট, ডুগ্গি-তবলা এবং বেহালার সুরের সঙ্গে বেতালা বেসুরো গলায় এক এক দিন কানে হাত চাপা দিয়ে, চীৎকার ক'রে গান ধরে শশিপদ—

"যমুনা-পুলিনে ব'সে কাঁদে রাধা বিনোদিনী—;
কাঁদে রাধা বিনোদিনী ই,
কাঁ আঁদে রাধা বিনোদিনী।"

সেদিন খুব সকাল নয়, মেঘভাঙ্গা রোদ বার হ'য়েছে যেন আকাশ ফাটিয়ে—চড়-চড় ক'রে। ক্ষেত-খামার ঘুরে এসে একটা বিড়ি ধরিয়ে শশিপদ উবু হ'য়ে ব'সেছিল বারান্দায়। বারান্দার এক পাশ ভাঙ্গা; অন্য পাশে মাথার ওপোর যেটুকু ছাউনী আছে তার নীচে একটা মাটির ভাঙ্গা উনোন আর ওর পাশে জড়ো করা র'য়েছে রাঁধবার জন্যে কতকগুলো শুক্‌নো ডাল-পালা, বাঁশ-বাখারী—সেগুলোও কাল রাতে জলের ছাট এসে ভিজিয়ে দিয়েছে।···আজ রৌদ্রে মেলে না শুকোলে রান্না করাই দুরূহ হ'য়ে উঠবে।

তার ওপোর ঘরে শোবার বিছানাটা! ছেঁড়া, ময়লা গায়ের কাঁথা, তেমনি মাথার বালিশ, আর মান্ধাতার আমলের তোষক—সবগুলোই যেন এই বাদ্‌লা বরষায় ভিজে আমসত্বের মত নরম হ'য়ে আছে! একবার রোদে দিয়ে নিলে তবে না রাত্তিরে স্বচ্ছন্দে শোওয়া যাবে! ঘুমও আসবে চোখের পাতায়!

কাজগুলোর হিসেব এক এক ক'রে মনের মধ্যে কষে নিয়ে, হাতের বিড়িটা নিঃশেষ ক'রে উঠে পড়লো সে, কিন্তু এগিয়ে যেতে পারলে না।

সদর দরজার ইটের স্তূপটার পাশে কম্‌বয়সী যে মেয়েটা তার দিকে প্রত্যাশা-ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই দিকে নজর প'ড়তেই থমকে দাঁড়ালো ও; তার পরে শুধুলে: "কে গা বাছা? ওখানে দাঁড়িয়ে কে তুমি? কৈ,—ইদিকে এসো দিকিন!"

যে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল, তার রূপ নেই, তবে যৌবন আছে। কিন্তু সে যৌবনও দারিদ্র্যের পেষণে পিষ্ট—মলিনও; কৃশ দেহ ছেঁড়া শাড়ীর আঁচলে যেটুকু ঢাকা সম্ভব, সেইটুকু ঢাকা দিয়েই সে এগিয়ে এলো; শশিপদ'র পায়ের কাছে গড় করে ব'ললে: আমায় চিনতে পারছো না ঠাকুর মশায়! আমি যে ক্ষ্যান্ত গো! উ-ই, তোমার পুকুরের পূব পাড়ে ঘর ছিল আমাদের। গেল বছরের আকালে হেজে-মজে ঘর-দোর ছেড়ে বার হ'লো তোমার জামাই; তার পর কদ্দিন ইদিক্ উদিক্ করে ঘুরে শেষে তোমার জামাইকেও বিসর্জ্জন দিয়ে ফিরেছি।···"

ওর গলার স্বর অশ্রুরুদ্ধই হ'য়ে আসে বোধ হয়!···

শশিপদ'র মনে পড়ে কথাটা। সত্যিই!···কেবল এই বাড়ীখানাই নয়,—জমী-জরাত, বাগান-পুকুর, পূর্ব্ব-পুরুষের আমলের যা কিছু ছিল, তার মধ্যে প্রজা-সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না। আজ তাদের মধ্যে কেউ আছে, কেউ বা নেইও।

তেরশো পঞ্চাশ সাল সবারই জীবনের ওপোর দিয়ে একটা না একটা স্রোত বইয়ে দিয়ে গেছে; আর সেই স্রোতের মুখে প'ড়ে ভেসে গেছে নিবারণ মোড়লেরও সংসার। সংসার ভাসিয়েই নিবারণ ক্ষ্যান্তকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছিল এক দিন, আজ আবার ফিরে এসেছে সেই ক্ষ্যান্তই, কিন্তু ফিরতে পারেনি নিবারণ!···

সকালের রোদ থাকলেও, বার্দ্ধক্যজনিত ক্ষীণদৃষ্টি যত দূর সম্ভব তীক্ষ্ন ক'রে শশিপদ তাকালে তার দিকে; দেখলে—হ্যাঁ, নিবারণের পরিবারই বটে। জিজ্ঞাসা ক'রলে: "তা, কি চাও, তুমি?

ক্ষ্যান্ত'র ঠোঁট দুটো ন'ড়ে উঠলো। বললে: „বিশেষ কিছু নয়, বাবুর একটুকুন থাকবার জায়গা।"

"থাকবার জায়গা?"—"শশিপদ বিস্মিত হয়ে বলে: "আমার বাড়ী মেয়েছেলে ব'লতে কেউ নেই, একটা মানুষ আমি, তাতে ছেলে ছোকরার আড্ডা এখানে, তোমাকে থাকবার জায়গা দিতে পারি আমি? কি ব'লছো গো নিবারণের বৌ?"

নিবারণের বৌ কিন্তু নাছোড়। কেঁদে আছড়ে পড়ে এবার পায়ের কাছে। বলে: "তা হোক ঠাকুর মশায়, তোমার বাড়ী মেয়েছেলে না থাকলেও স্বভাব-চরিত্তিরে তুমি দেবতা। তোমারে আশ-পাশের গাঁয়ের ছেলে থেকে বুড়ো অবধি চেনে, বিশ্বেস করে, আমরা তো কোন্ ছার! আর ছেলে-ছোকবার আড্ডার কথা ব'লছো—তাতে আমার কি? আমি ছোট জাত, তোমার বাইরের কাজ করবো, আর প'ড়ে থাকবো এক ঠাঁইয়ে; আমার সঙ্গে কার কি?"

বয়েস আজ শশিপদ'র সত্যিই অনেক দূর এগিয়ে গেছে, হয়তো পঞ্চাশের কোঠাতেই পৌছেচে য্যাদ্দিন, তার হিসেব রাখে না শশিপদ। তবু কোন দিন কখনও আয়নার দিকে তাকালে দেখা যায়, চোখের কোলগুলো অনেকটা ব'সে গালের হাড় উঁচু হয়ে উঠেছে, সেই সঙ্গে কালো চুলেও লেগেছে শাদার স্পর্শ। কেশবিরল মাথার টাকের ওপোর হাত বুলাতে বুলাতে এক এক সময় তার মনে হয়—এতগুলো বছর কোথা দিয়ে কেমন করেই বা চলে গেল?

এমান ক'রে হয়তো সবারই যায়।

ভাবতে ভাবতে সে ভাবনার গতি থেমে যায় হঠাৎ, মনে পড়ে সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্ষ্যান্ত, নিবারণের পরিবার।—ওর প্রতীক্ষমান দৃষ্টি হয়তো তারই মুখের ওপোর নিবদ্ধ! দৃশ্যটা সামনে ভেসে উঠতেই বিরক্তি বোধ হয়—দারুণ বিরক্তি! কিন্তু না;—একে মেয়েছেলে, তাতে তারই পূর্ব-পুরুষের প্রজার স্ত্রী; এক কালে কি না ছিল ওর? স্বামী, সংসার, সন্তান—স—ব! আজ নয় বিধাতার বিধানে সব হারিয়ে এতটুকু জায়গা চাইছে ও মাথা গুঁজবার মত। সেটুকু না দিয়ে আজ ওকে ফিরিয়ে দেওয়াই কি মানুষের কাজ?

না, সে কল্পনা ক'রতে পারে না; শশিপদ বলে: "বেশ, থাকতে পারিস্ থাকৃগে ঐ ওপাশের ঘরটায়। কিন্তু দেখো বাপু, সব দিক্ সামলে; বাড়াতে আমি সব সময়ে থাকি নে; তার ওপোর ছেলেমানুষ মেয়ে তুমি, পাড়ার লোকে কিছু ব'ললে কিন্তু আমি সইবো না, তা ব'লে রাখাছ।"

এত দুঃখেও হাসি আসে ক্ষ্যান্তর। বলে: "হেই ঠাকুর মশায়, দেখে নিও তুমি—দেখে নিও। আমি তোমার মেয়ের বইসী, তোমার মেয়ে থাকলেও সে মেয়ে আজ আমার মত হ'তো; তুমি আমার বাপের সমান ব'লে আজ থেকে তোমায় আমি ধম্ম-বাপ ব'লে ডাকাছ। আজ থেকে তুমি আমার ধম্মের বাপ, আমি তোমার মেয়ে। মুখের পানে চেয়ে দেখ'দিনি আমার—মেয়ে ব'লে মনে হয় কি মা?"

শশী ভট্‌চায এবার চমকে ওঠে, যেমন চমকায় লোকে সামনে উদ্যত-ফণা সাপ দেখলে!

তেমনি চমকেই শশিপদ চীৎকার ক'রে ওঠে: "বেরো, বেরো হারামজাদী, আমার সামনে থেকে বেরো ব'লছি।"

সে এক অতীত দিনের কাহিনী।

স্মৃতির ওপারে যাব যাব ক'রে আজও মিলায় না তার ছায়া ছবিগুলো।···এই শশিপদ'রই মা ছিল, বাপও ছিল, আর তারাই এক দিন সখ ক'রে শশিপদ'র বিয়ে দিয়ে এনেছিল ও-পাড়ার হারু চক্কোত্তির মেয়ে কটা'কে। কটা'র গায়ের রং ফর্শা, গড়নও গোলগাল; মাথায় কালো মেঘের মত চুলের রাশি।

এই মেয়েকেই নগদ তিন কুড়ি এক টাকা পণ নিয়ে যখন হারু চক্কোত্তি, খোঁড়া শশিপদ'র হাতে সম্প্রদান ক'রলে, তখন সকলেরই মনে হ'লো, বামন হয়ে চাঁদে হাত দেওয়ারই ভাগ্য হ'লো বটে শশিপদ'র।

আর তা হবেই বা না কেন? টাকা থাকলে হয় না কী? কিন্তু মনের অসন্তোষটা এক দিন কটা'র মুখ ফুটেও বার হলো অক্লেশে।—তাকে পাওয়াই শশিপদ'র সৌভাগ্য, নইলে···

"নইলে? নইলে কি?"

একটা শশিপদ দশটা গলার জোর নিয়ে চীৎকার সুরু করে: "নইলে কী করতে পারিস্ তুই আমার রাক্কুসী! রাক্কুসী আমাদের ঘরে এসে আমার মাকে খেলে, বাপকে খেলে, তবু এখনও অহঙ্কার তেজ-দপ্প কমলো না একটুকুন!"

ছুটে এসে সে কটা'র কোল থেকে ছয় মাসের শিশু-কন্যাটিকে কেড়ে নেয় ওর, তার পর বলে: "বেরো, বেরো বলছি বাড়ী থেকে—এখুনি বেরো। বেরিয়ে গতর খাটিয়ে খেগে যা! আমিও মরবো না, দেখবো, দেখবো, কোন্ বাপ তোরে খেতে দ্যায় এমন সুখে!—বেরো···"

কটা বার হয়েই গেল যে সেদিন, আর কোনও দিনই ফিরলো না শশিপদ'র ঘরে। শশিপদ মনে মনে খুঁজেও বেড়িয়েছিল তাকে, কিন্তু পায়নি। শেষে এক দিন মেয়েটাও ওকে ফাঁকি দিয়ে চ'লে গেল! কেবল শশিপদকে ফেলে নয়—সারা পৃথিবীটাকেই ফেলে।

শশিপদ ফিরে এলো তার মৃতদেহটা খরস্রোতা বিলের জলে ফেলে। আর ফিরে এসেই ক'রলে এই 'রাজ-রাজেশ্বরী ক্লাবের' ভিত্তি স্থাপনা। সে ভিত্তি আজও নড়েনি,···অনড় হ'য়ে আজও এই গ্রামের বুকেই বসে আছে—শশিপদকে স্রষ্টা বলে স্বীকার করে। সে ক্লাবে ডুগী-তবলা বাজায় রাজেন্দর, ফ্লুট নেত্যাই, আর শশিপদ'র বেহালার সুরের কনসার্ট—গ্রামের নিস্তব্ধতাকে খান্-খান্ করে ভেঙ্গে-চুরে বেজে ওঠে প্রত্যহ।

দূর হওয়ার কথা বললেও ক্ষ্যান্ত সত্যিই দূর হ'লো না বরঞ্চ কেঁদে-কেটে, পায়ে ধ'রেও শশিপদ'র বাড়ীর এক পাশে একটু ঠাঁই ক'রে নিলে নিজের। ফলে, কেবল পাড়া-বাড়ীর ঘর-দরোজাই নয়, সমস্ত বাড়ীটাই উঠলো ঝক্‌ঝকিয়ে!

শশিপদও দেখলে, তাকে আর উনান পরিষ্কার ক'রে নিকিয়ে-চুকিয়ে রান্না চড়াতে হয় না, কাঠ কাটতে হয় না, এঁটো বাসনও মাজতে হয় না তার। তাছাড়া, আরো টুক্‌রো-টাক্‌রা কাজ, যা না ক'রলে চ'লতো না তার, তাও যেন কখন কখন ক'রে রেখে দেয় ক্ষ্যান্ত।

মন্দ লাগে না নেহাৎ, তবু কুণ্ঠিত হয় শশিপদ। বলে: "অতটা কর্‌বিস্‌নি ক্ষেন্তি, শেষে আর খেটে খেতে দিবিনি দেখছি আমাকে!"

ক্ষেন্তি হাসে ; নখের ওপোর নখ রেখে মাথার উকুন মেরে বলে : "ভ, তোমার পেটে খাবার দরকার ? আমি তো আজই মরছি নে ? তোমার আশীর্ব্বাদে বেঁচে যদি থাকি,—আর তোমারে বাপ বলে ডেকেছি যখন, তখন ধর্ম্মবাপই তুমি আমার,—তোমার সম্পূর্ন সেবা-যত্ন না ক'র্ত্তে পারলেও—এটুকুন পারবো না ? এ সন্দ তুমি মনের কোণেও ঠাঁই দিও না বাবা,—এই তোমারে বলে রাখলাম।"

কথা কয় না শশী।

দিন চলে যায়।

সন্ধ্যা হ'তে না হ'তেই পাড়ার মধ্যে জমে ওঠে রাজ-রাজেশ্বরী ক্লাবের ঘর।

মান্ধাতার আমলের,—পুরানো রং-চটা সিন-সিনারিগুলো ঝাড়া-মোছা চলে নতুন ক'রে। নতুন ক'রে মহড়া চলে "বঙ্গে বর্গী" নাটকের পুনরভিনয়ের।...

যদিও এখনও অনেক দেরী আছে, তবু পূজো আসবে! বাবুদের বাড়ীর পূজো!—

বাবুরা গাঁয়ের জমিদার; প্রাসাদের মত বিরাট বাড়ী তাঁদের, সে বাড়ীতে আছে হাওয়া-গাড়ী, আর ইয়া-ইয়া গালপাট্টা-দাড়ি সমেত তকমা-আঁটা ভোজপুরী দ্বারোয়ান!

একখানা গাঁয়ের জমিদার নন বাবুরা, চার পাশের নানান জায়গা, দশ-বিশখানা গাঁ নিয়ে মহাল তাঁদের, সেই বাড়ীতে হয় দুর্গা পূজো। এই পূজো উপলক্ষে আসবে তাদের আত্মীয়-স্বজন, কুটুম-সাক্ষাৎ, আর কলকাতার সব বাবুরা।

সেইখানে হবে এই থিয়েটার! এ কি সামান্ত কথা!—ভালো 'ম্যাক্ট' ক'রতে পারলে চাই কি কপালে একটা সোনার মেডেলও লটকে যেতে পারে তখনই!

"কলকেতার বাবুরা সৌখীন",—শশী ভটচার্য বলে : "দ্যাখ, বরঞ্চ ভেবে দ্যাখ তোরা,—আমার কথা সত্যি কি না! কলকেতার

বাবুরা কেবল মাত্তর সোনার ঘড়ি হাতে বেঁধে আর বুকে সোনার ফাউণ্টেন পেন আটকেই বেড়ায় না, ওরা দিতেও জানে মানুষকে। এখন যদি তোদের কপালে থাকে, তবে—"

কথাটা মুখে-মুখে ঘুরে বেড়ায় এর, ওর, তার। ফলে, সবারই চোখে মুখে দেখা দেয় আনন্দ, দেখা দেয় উৎসাহ; নিতাই ফ্লুটে ফুঁ লাগায়, রাজেন্দরের ডুগী-তবলা বেজে ওঠে ডুমডুম্ ক'রে,—আর শশীর বেহালা জুর ধরে সখী-সাজা পাড়ার ছোঁড়াদের গানের সঙ্গে—

"এমন চাঁদিনী রাতি
বিফলে যে যায় বে—"

ক্ষ্যান্ত বোধ হয় উঁকি মেরে দেখে কোনও জায়গায় লুকিয়ে। তার পরে শুধোয়: "রাজা যে সাজে, ও মানুষটি কে বাবা? বেশ ম্যাক্টো করে কিন্তুক!"

বিড়ি টানতে-টানতে শশী জবাব দেয়: "কে, তা জেনে তোর লাভ?" তার পরে নিজের মনেই বলে: "ও সিধু, ও-গাঁয়ের তারক ঘোষের ছেলে সিধু। মুখ্যু নয়, রীতিমত ছাত্তরবিত্তি পাশ, কাজও করে কলকেতার কোন্ একটা কারখানায়। নেহাৎ আমার অনুরোধটা ঠেলতে পারে না ব'লেই সিরাজউদ্দৌলার পার্টে নেমেছে।" তার পরে নিজের মনেই তারিফ ক'রে বলে: "তা মানিয়েছেও বা, একেবারে যাকে বলে রাজপুত্তুর তো রাজপুত্তুর! ও-রকম মানান আর মানায় না কাউকেই।"

হাতের বিড়িতে টানের পর টান দেয় ও,—মনে হয় আগুনটুকু বুঝি নিবে এলো এবার, আর কতক্ষণই বা চ'লবে? কি যে ছাই বিড়িগুলোও তৈরী করে আজ-কাল!

পাড়ার লোকে মুখ খোলে একটু-আধটু! বলে: "শশী ভট্টচাযের ভীমরতি ধ'রেছে বুড়ো বয়সে! নইলে, মাথার চুল পাক্‌লো, তবু বুদ্ধি পাক্‌লো না আজও?"

কেউ বা এ কথার উত্তরে শুধোয় অনাবশ্যক কৌতূহলাক্রান্ত হ'য়ে; বলে: "ক্যান্ লা?"

"কেন আবার?"—

ঝিলের ঘাট জ'মে ওঠে পাড়ার বৌ-ঝিদের আলাপ আলোচনায়। বলে: "আ মরণ! কেন, তা চোখ মেলে দেখতে পাচ্ছ না? অমন একটা ধেড়ে মাগী,…আ রামচন্দোর! আর বাবু শশী ঠাকুরকেও বলি, তুই যখন সারা জীবনটা কাটালি সন্ন্যাসীর মতন, আর এখনও যখন দিন-রাত্তির ঘরে ব'সে মাগীকে পাহারা দিবি নে, তখন ও পাপের প্রশ্রয় দেওয়া কেন? ধর্মমেয়ে ব'লেছিস্—ব'লেছিস, অমন ক'রে বলে তো অনেকেই, তা ব'লে ও পাপের প্রশ্রয় দিতে চায় ক'জন? তাতে তোর বাড়ী যখন থিয়েটারের কেলাব, ছেলে-ছোক্‌রার আড্ডা দিন-রাত, তখন কার মনে কি আছে ব'লতে পাবে কেউ?"

প্রতিবাদ করে কেউ বা: "ও-কথা বলা চলে না দিদি, ছেলে-ছোক্‌রা তো সবাই মন্দ নয়!"

"মন্দ নয়? বসিস্ কি? ব্যাটা ছেলের মাথার ঠিক থাকে নাকিন, বিটিছেলে যদি অমনি হয়! তাই ব'লছি, আর গাসনি লো, আর গাসনি, লোকে শুনলে গাল ফাঁক ক'রে হাসবে। জানিস,

সেদিন সন্ধ্যে বেলায় আমি নিজের চক্ষে, ব'লবো কি রাঙা খুড়ী, তোমায় গা ছুঁয়ে ব'লছি, স্বচক্ষে দেখেছি, ও ছুঁড়ি হাসতে হাসতে ঐ সিধে ছোঁড়ার হাতে সাজা পানের খিলি গুঁজে দিচ্ছে!"

এর পরে আর তর্ক করা নিষ্প্রয়োজন! সকলেই একটু না একটু অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তায়।

সবারই আত্মীয় অর্থাৎ কারো বা স্বামী, কারো বা ছেলে, কারো বা ভাই,—ও-বাড়ী যাতায়াত করেই। মনে সন্দেহ হয়, তারা আবার ঐ ছুঁড়ীর কুহকে জড়িয়ে পড়ছে না তো?

অসম্ভব কি? ও বোধ হয় তুক্-গুণও জানে কিছু।

বছর খানেক ঘুরে গেছে প্রায়—।

বাবুদের বাড়ীর দুর্গোৎসবের সঙ্গে "বঙ্গে বর্গী" থিয়েটারও শেষ হ'য়ে গেছে বটে, কিন্তু সবই যেন কেমন একটা মন-মরা অবস্থায়।

পুরস্কার-টুরস্কার কেউ কিছুই পায়নি, বরঞ্চ অপযশ কুড়িয়েছে কলকেতার বাবুদের কাছ থেকে।

মন-মরার ব্যাপারটা সকলেরই জানা,—সকলে জেনেছে। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়—নিবারণের স্ত্রী ক্ষ্যান্ত সন্তান-সম্ভবা!…

রাগে, দুঃখে, নিজের মাথার চুল টেনে কতকগুলো ছিঁড়ে শশিপদ ওকে তাড়িয়ে দিতে গিয়েছিল বাড়ী থেকে, কিন্তু কেঁদে পায়ে জড়িয়ে ধরেছিল ক্ষ্যান্ত।

যেন অসহায় মৃগশিশু!

ক্ষ্যান্ত কেঁদে উঠে ডেকেছিল: "ও বাবা, বাবা গো!—"

শশিপদ'র বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে ওঠে একবার। বলে: "না,—তুই আর আমায় বাবা ব'লে ডাকিস্ নে, ডাকিস্ নে বলছি ক্ষেন্তি, কেউ নস তুই আমার। আমার মেয়ে হ'লে তোর গলা টিপে মেরে ফেলতুম আজ, তবে আমার নাম।"

ক্ষ্যান্ত বলে: আর দিন-কতক—তোমার নামে দিব্যি ক'রে বলছি বাবা—আর দিন-কতক আমারে ঠাঁই দাও, তার পরে তোমার দিব্য ক'রে ব'লছি,—আমি যাব, নিশ্চয় যাব এবার!—তুমি দেখ লো, তোমার পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে ব'লছি বাবা"—

শশিপদ জবাব দেয় না সে কথার, ফিরে তাকায়ও না ওর দিকে, সদম্ভে চ'লে যায় দৃষ্টির বাইরে।

বিড়ি খোঁজে ছেঁড়া জামাটার এ-পকেট ও-পকেটে; তার পর বিড়িটাকে ধরিয়ে হুস্-হুস্ শব্দে টানতে টানতে মনে ক'রতে লাগলো—এর আগে, অর্থাৎ প্রায় মাস পাঁচ-সাত আগের একটা সন্ধ্যায় বাড়ী ঢুকেই সে দেখেছিল একটা ছায়া-মূর্ত্তিকে ক্ষ্যান্ত'র ঘর থেকে নিঃশব্দে বার হ'য়ে অন্ধকারে মিশিয়ে যেতে।

শশিপদ'র মনে হ'য়েছিল—ও-মূর্ত্তি, ঐ-চলা যেন শশিপদ'র চেনা ও যেন আর কেউ নয়, সিধু—ও-গ্রামের সিধু—যে সিধু 'বঙ্গে বর্গী' নাটকের অভিনয়ে সিরাজ সেজেছিল।

শশিপদ ডাকলে: "ক্ষেন্তি, এই—"

ঘরের ভেতর ক্ষ্যান্ত কি যেন করছিল, বার হ'য়ে বাইরে এসে দাঁড়াতেই শশিপদ কঠিন স্বরে প্রশ্ন ক'রলো: "ও কে বার হ'য়ে গেল তোর ঘর থেকে? সত্যি কথা ব'লবি, মিথ্যে ব'লেছিস্ কি ম'রেছিস্!"

এতে ক্ষ্যান্ত কিন্তু অপ্রস্তুত হ'লো না, বরঞ্চ একটু অসন্তোষের

স্বরেই উত্তর দিলে: "তোমার ঐ এক কথা বাবা, কেবল সন্দ আর সন্দ। সত্যি কথা বলতে কি, তুমি আর আমারে বিশ্বাস ক'রতে পার না আগের মতন।"

শশিপদ'র দৃষ্টি ক্ষীণ, নিজের চোখে দেখবার ওপোর বিশ্বাস সে রাখতেও পারলে না তাই। লজ্জিত হয়ে ফিরে এলো সেখান থেকে।

সে আজ অনেক দিনের কথা, তবু মনে আছে শশীর।

ক্ষেন্তির সন্তান ভূমিষ্ঠ হ'য়েছে; সুন্দর, পদ্মফুলের মতই সুন্দর না কি সেই শিশু-সন্তান!

দুই-এক জনের মুখে শুনলে এ কথা শশিপদ, কিন্তু দেখলে না, ওদিকে পদার্পণও ক'রলে না একবার।

পাপ!—শশিপদ'র মনে হ'লো, ও শিশু নয়—পাপের মূর্ত্ত প্রতীক, ওর মুখের দিকে তাকালেও নরকে যেতে হবে।

মরুক, মরুক, ওরা শশিপদ'র দৃষ্টির বাইরে গিয়ে মরুক, ওদের খবরও শশিপদ জানতে চায় না আর।···

সেদিন সারা রাত কেন যে ক্ষ্যান্ত গুমরে গুমরে কাঁদলো, তা সেই জানে; সকালে উঠে তাকে আর কেউ কোথাও দেখতে পেলে না। কেউ ব'ললে, মনের ঘেন্নায় সে বিলের জলে ডুবে মরেছে, কেউ ব'ললে, দেশ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেছে কোথাও।···কিন্তু ছেলেটা? ছেলেটা যে চেঁচিয়ে গলা ফাটিয়ে গাঁ মাথায় ক'রলে! মেরে তো ফেলা যায় না গলা টিপে? এখন ওর উপায়?

না:,—শশিপদ আর পারে না ঐ চীৎকার শুনতে। এক পা এক পা ক'রে ওকে এগিয়ে যেতে হয় ছেলেটার দিকে: দেখে সে কাঁদছে।

একটা জীবন্ত মানব-শিশু, অসহায় অন্তরাত্মা যেন তারই দিকে দুই হাত তুলে ব'লছে:—"দাও,—দাও, আশ্রয় দাও এতটুকু, বাঁচবার সাহায্য করো আমার, ভগবান তোমার ওপোর সন্তুষ্টই হবেন তাতে, ক্রুদ্ধ হবেন না।"

অনেক দিন আগের—অনেক বৎসর আগের একখানা মুখ মনে প'ড়ে যায় শশিপদর'—যে মুখখানাকে সে এক দিন কর্তা'র কোল থেকে কেড়ে নিয়েছিল জোর ক'রে, কিন্তু তাকেও রাখতে পারেনি বাঁচিয়ে—সেও চ'লে গেছে আজ।···

শশিপদ'র হাত দু'খানা আপনা-আপনি প্রসারিত হয় ঐ ছেলেটার উদ্দেশ্যে। অসহায় ভগবান আজ মানবাত্মার রূপে তার কাছে আশ্রয়-ভিখারী! ঐ সে কাঁদছে? না, না, শশী ভট্‌চায তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না। শশিপদ তুলে নেয় ওকে,—একেবারে বুকের কাছে তুলে নেয় কাপড় জড়িয়ে,—তার পর উঠানের জনতার দিকে তাকিয়ে নেমে পড়ে এঁকা-বাঁকা, ধূলি-ধূসর নন্দীগ্রামের পথে;···পথ আজ ওকে হাত বাড়িয়ে ডাকছে—ওরে আয়, আয়··· আয় রে···!

বিস্মিত জনতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলে শশিপদ—প্রশান্ত হাসি!

তার পর ব'ললে: "যাই,—এর মাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসি গে! কোথায় যাবে সে! কোথাও যেতে পারে না, ছেলে দেখলেই ছুটে আসবে এখুনি!"

ত্বরিত পদে এগিয়ে চ'ললো শশিপদ।

পথ! পথ! ঐ পথ তাকে ডাকছে ক্ষ্যান্তকে ফিরিয়ে আনবার জন্যে!···

পেছনের ঘর-সংসার থাক্‌ আজ, কিছু খোয়া যাবে না।

—জ্যোৎস্না গুপ্তা

ছোটদের আসর

শ্রীমণীন্দ্র দত্ত
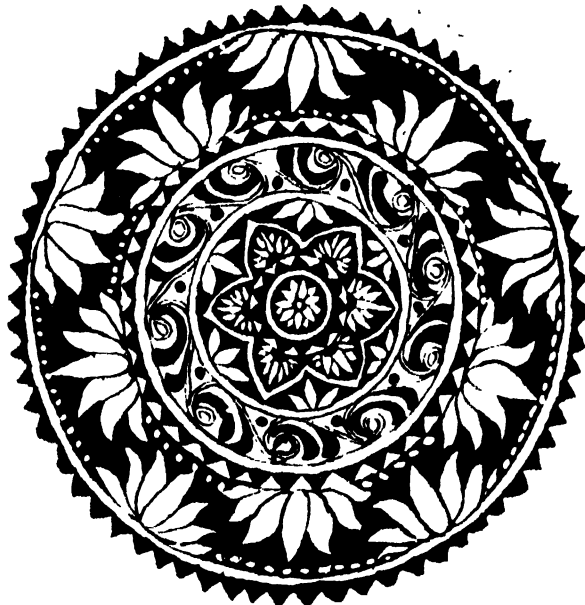
অনেক দিন আগেকার কথা। স্কুলের নিচের ক্লাসে পড়ি। ছোট বেলা থেকেই আমি প্রবাসী। বার্ষিক পরীক্ষার শেষে দিন-কয়েকের জন্মে বাড়ী এসেছি।

পাশের বাড়ীর জ্যোতি আমার সমবয়সী। গ্রামের পাঠশালায় পড়ে। এই বয়সেই বেশ বাঁশী বাজাতে পারে। আমার সাথে খুব ভাব।

একদিন সকালে দেখি, জ্যোতিদের উঠানের এক পাশে একটি ছেলে কলার পাতা সামনে নিয়ে বসে আছে। কালো রঙ। অপরিচ্ছন্ন চেহারা।

শুধালাম: কে রে?

জ্যোতি উত্তর দিলো: আমার বন্ধু।

: কি রকম? কে ও?

ছেলেটির নাম ফজর আলি। পাশের গাঁয়ের নছরদ্দি সেখের ছেলে। গরীব মানুষ নছরদ্দি। ক্ষেত-খামারের কাষ করে। নিজের সামান্য কিছু জমি আছে। বাকিটা অন্যের জমি বর্গা চষে। ফজর আলি বাবার কাযে সহায়তা করে।

জ্যোতির মা কলার পাতায় পিঠে-পায়েস আর মুড়ি দিলেন। ফজর পরম তৃপ্তিতে খেয়ে উঠলো। যাবার বেলায় জ্যোতিকে বললে: এক দিন যাবেন বন্ধু আমাগো বাড়ী। নতুন গাছের রস নামছে। যেয়ে আসবেন।

সকালের দিকে বেশ শীত পড়ে।

জ্যোতি এক দিন আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেলো ফজরদের বাড়ী, বললো: সহরে থাকিস্, মেঠাই-মণ্ডা তো অনেক পেটে পড়ে। চল্, আজ তোকে টাট্‌কা খেজুর-রস খাইয়ে আনি গে।

নছরদ্দি আমাদের খুব যত্ন করে বসালো রোদ-ওঠা উঠানে। পেতে দিলো নিজেদের হাতে বোনা খেজুর-পাতার পাটি। সদ্য পেড়ে-আনা খেজুরের রস দিলো খেতে। কাঁসার একটা বড় জাম-বাটি মেজে ঝক্‌ঝকে করে তাইতে ঢেলে দিলো রস। আর দিলো দু'টুকরা পরিষ্কার পাট-কাঠি। সেই হলো রস খাবার নল। সে দিনের সে রসের স্বাদ আজো যেন আমার জিভে লেগে আছে।

* * * *

বিয়ের পরে নতুন শ্বশুরবাড়ী গিয়েছি।

বিকেলের দিকে বাড়ীতে এলেন এক প্রৌঢ় মুসলমান ভদ্রলোক। পাকা চুল। লম্বা পাকা দাড়ি। সৌম্যদর্শন।

শ্বশুর মশায় পরিচয় করিয়ে দিলেন: ইনি এ অঞ্চলের এক জন সম্পন্ন গৃহস্থ। ওখেল তালুকদার এঁর নাম। আমার বন্ধু।

হাত কপালে ঠেকিয়ে আদাব জানালাম। তালুকদার সাহেব দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে আমায় করলেন প্রতি-নমস্কার।

শ্বশুর মশায়ের দিকে চেয়ে বললেন: বড় খুসি হলাম জামাই বাবুকে দেখে। সোনার টুক্‌রা জামাই পেয়েছেন আপনি রায় মশায়। তার পর আমাকে বললেন: আসবেন জামাই বাবু আমাদের এই পাড়াগাঁয়ে মাঝে মাঝে। আপনাদের দেখলেও আনন্দ হয়।

তার পর যত বার শ্বশুরবাড়ী গিয়েছি, বৃদ্ধ তালুকদার সাহেব নিজে এসে আমার সংগে দেখা করেছেন। হাটে-মাঠে যেখানে দেখা হয়েছে, দুই হাত কপালে ঠেকিয়ে স্মিত হাস্যে বলেছেন: এই যে জামাই বাবু!

তালুকদার সাহেব আজ নাই। কিন্তু তাঁর হাসি আজো বেঁচে আছে আমার মনে।

* * * *

কর্ম্ম-জীবনের সবে আরম্ভ।

খবরের কাগজের আপিসে চাকরি করি। সেই সূত্রেই পরিচয় হলো এক মুসলমান যুবকের সাথে। মনের আকাশ উদার নীলিমাময়; নতুন মানব-সমাজের স্বপ্ন তাঁর চোখে। সম্পূর্ণ বাঙালি। খদ্দরের সাট গায় দেয়। কাপড় পরে কাছা-কোঁচা দিয়ে।

নিমন্ত্রণ হলো তাঁর বাড়ীতে। উপলক্ষ ছেলের জন্মতিথি। ঠাকুর-বাড়ীর কালচারের সংগে তাঁর মনের যোগ ঘনিষ্ঠ।

মিলিত হিন্দু-মুসলমানের একটি ছোট মজলিস। গান হলো। আবৃত্তি হলো। ছোট-খাটো আশীর্বচনীয় বক্তৃতাও হলো।

এলো ছেলেটি। সাদায়-কালোয় মেশানো। চোখে কাজল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। বাঙালীর ছেলে। নাম বললো:

বুঝলাম: মহা-এসিয়ার নব-জাগরণের যে স্বপ্ন বন্ধুটির চোখে, তাই ভাষা পেতে চায় বংশধরের নামোচ্চারণে। হায় রে সেদিনের স্বপ্ন!

এই তো সেদিনের কথা। বড়দিনের ছুটিতে গিয়েছিলাম বাড়ী। ছাপানো চিঠি দিয়ে ভায়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ করে গেলেন পাশের গাঁয়ের সম্পন্ন গৃহস্থ কাসেম মাতুব্বর। আমি প্রবাসী মানুষ। কোন পরিচয় তাঁর সাথে নাই। তবু তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করে গেলেন। সনির্বন্ধ অনুরোধও জানিয়ে গেলেন: যাবেন কিন্তু বাবুজি!

প্রায় দুই মাইল পায়ে হাঁটা পথ। তাতে সামান্য জল-কাদা। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে তাই ছোট ভাইকে পাঠিয়ে দিলাম।

সন্ধ্যার পরে দেখি, সদলে কাসেম মাতুব্বর এসে হাজির। কি ব্যাপার?

মাতুব্বর বললেন: এ তো আপনাদের সহরের দাওয়াত নয় বাবুজি, যে এক জন কেউ গেলেই হলো। আমরা গেরাম-দেশের মুরুখ্যু মানুষ। আমরা বুঝি, দাওয়াত দিলাম তো ছেলে-বুড়ো সকলেরই দিলাম।

আসল কথা: পরিবারের অন্য সবাইকে নিয়ে এখনি তাঁর বাড়ী যেতেই হবে।

প্রথম শীতের শিশিরপাত আর রাস্তার অসুবিধার কথা উল্লেখ করে রেহাই চাইলাম। উত্তরে মাতুব্বর বললেন: আরাম-আয়েস তো বছরের বারো মাসই ভোগ করেন। এক দিন না হয় একটু তকলিফই করেন ভাই-বেরাদারের জন্যে।

সত্যি ভাই-বেরাদার। মাতুব্বরের বাড়ীতে হাজির হলাম। আশে-পাশের কয়েক গ্রামের হিন্দু ছেলেরাই যেন কর্মকর্তা। তাদের হাঁকডাক সকলের উপরে। তারাই আদর করে বসালো। যত্ন করে খাওয়ালো।

বর এলো। সবাই হাত তুলে করলাম আশীর্বাদ। যথাশক্তি লৌকিকতাও করা হলো। সেই শীত-সন্ধ্যার স্মৃতি আজকের ঘনবিস্মিত ত্রাস-কণ্টকিত বেদনার্ত রাতে বার বারই মনে পড়ছে।

* * * *

মহাকালের বার্ষিক পলক্ষেপে লাগলো বিদ্যুৎ-গতি। চিন্তার খেই গেলো হারিয়ে। দিন, মাস, বৎসর দ্রুত ঝরে গেলো ঝড়ের ঝরা পাতার মতো। কোথায় তারা গেলো? একেবারেই কি নিঃশেষ হলো?

কিছুই বুঝতে পারি না। চিন্তার স্নায়ু-কেন্দ্রে নেমেছে পক্ষাঘাতের জড়তা। সব কেমন আবছা ধূসর মসীকৃষ্ণ!

আঁধার! ভয়াবহ! বীভৎস! মাঝে মাঝে ধ্বংসজিহ্ব করাল অগ্নিশিখা! পৈশাচিক কলোল্লাস! ১৬ই আগষ্ট! প্রত্যক্ষ সংগ্রাম! দি গ্রেট্ ক্যালকাটা কিলিং!

* * * *

মেঘনার কালো জলে কার প্রতিবিম্ব? কোন অশুভ দানবের? বাতাসে সহস্র কণ্ঠের কাতর আর্তনাদে কার কণ্ঠস্বর? ভয়াল অগ্নিশিখায় কোন বাণী লেখা?

* * * *

তার পর?

এর চারটি বন্ধ এবং তারা কে কোথায় আছে?

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়

সকলে শুধু চুপ ক'রে ব'সে রইল বেশ খানিকক্ষণ। কারুরই মনে নেই কথা কইবার ইচ্ছা।

আচম্বিতে বাইরেকার নিস্তব্ধ রাত্রিকে বিদীর্ণ ক'রে জাগ্রত হ'ল বহু কণ্ঠস্বরে আনন্দ-কোলাহল!

সুন্দর বাবু চমকে উঠে বললেন, "ও আবার কি?"

জয়ন্ত শ্রান্ত, বিষণ্ণ স্বরে বললে, "ঐ আনন্দ-কোলাহল শুনেই বুঝতে পারছি, প্রতাপ চৌধুরীর হস্তগত হয়েছে বাঘ রাজাদের গুপ্তধন।"

সুব্রত একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলে।

তার একখানা হাত নিজের হাতে নিয়ে মাণিক দরদ-ভরা কণ্ঠে বললে, "সুব্রত বাবু, আপনার মনের কথা আমি বুঝতে পারছি।"

জয়ন্ত হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠে বললে, "ধেৎ! দুঃখের নিকুচি করেছে! মাণিক, চট্‌-পট বার কর ফ্লাস্কের চা আর ডিম! দু'একখানা হাতে তৈরী রুটি আর দু'-একটা কদলীও বোধ হয় এখনো আমরা প্রত্যেকেই পেতে পারি? প্রতাপ চৌধুরী যখন কদলী-প্রদর্শন করলে, তখন দু'-একটা কদলী আমরাই বা ভক্ষণ করব না কেন? আসুন দারোগা বাবু, আসুন সুব্রত বাবু, আসুন সুন্দর বাবু! এত গোলযোগের পর কিঞ্চিৎ জলযোগ নিশ্চয়ই আপনাদের মন্দ লাগবে না?"

সুন্দর বাবু তৎক্ষণাৎ হলেন উৎফুল্ল। বললেন কেবল—"হুম্!"

—"মাণিকের ব্যাগে কালকের জন্যে হয় তো আরো কিঞ্চিৎ খাদ্যের অস্তিত্ব থাকবে। তার পরে আমাদের ভাগ্যে আছে উপবাস—যত দিন-না মরি তত দিন পর্য্যন্ত নিরম্বু উপবাস! মন্দ কি? এই উপবাসকে আমরা যদি বলি প্রায়োপবেশন, তাহ'লে তো আমাদের মৃত্যু হবে গৌরবজনক! গ্রীক-বিজয়ী মহাবীর অখণ্ড ভারতের প্রথম সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তও তো বেছে প্রায়োপবেশনে করেছিলেন প্রাণত্যাগ! আমরাই বা পারব না কেন?"

সুন্দর বাবু অভিযোগ-ভরা কণ্ঠে বললেন, "ঐ তো তোমাদের দোষ! খাবার আগেই উপবাস আর মৃত্যুর কথা তুলে মেজাজ খারাপ করে দাও কেন ভায়া! হুম্, আমার আর খেতে ইচ্ছে করছে না! আমার গলা দিয়ে আর এক টুক্‌রো রুটিও গলবে না!"

ঠিক সেই সময়ে বন্ধ দরজা ভেদ করে হঠাৎ জেগে উঠল একটা অস্বাভাবিক অট্টহাস্য!

হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা,—সে অট্টহাসি যেন আর থামতেই চায় না!

সকলের দেহ হয়ে উঠল রোমাঞ্চিত! এমন অট্টহাসি কল্পনাতীত!

সুন্দর বাবু আঁৎকে উঠে বললেন, "ব্রহ্মপিশাচ, ব্রহ্মপিশাচ—এইবারে আসছে ব্রহ্মপিশাচ!"

দারোগা বাবু অজ্ঞান হয়ে ঘুরে পড়ে গেলেন ঘরের মেঝের উপরে! সুব্রতের মুখ দেখে মনে হয় সেও অজ্ঞান হবার চেষ্টা করছে!

মাণিক রিভলভার বার করে দাঁড়িয়ে উঠে বিভ্রান্তের মতন বললে,

ত্রয়োদশ

ঈশ্বর-প্রেরিত দূত

দারোগা বাবু বললেন, "বেশ জয়ন্ত বাবু, বেশ! অকারণে এখানে টেনে এনে আপনি খুব বিপদে ফেললেন যা-হোক্!"

জয়ন্ত বললে, "আমি নই, আমাদের এই বিপদের জন্যে আপনার আসামী প্রতাপ চৌধুরীই দায়ী।"

—"কি বলছেন?"

—"প্রতাপ চৌধুরীর কথা বলছি। আমরা এখন তারই হাতে বন্দী। সুব্রত বাবু, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অন্তিম কালে উত্তরাধিকারীদের কি ব'লে যেতেন?"

—"ব'লে যেতেন, 'যদি কোন দিন বিশেষ অর্থাভাব হয়, তাহ'লে সোনার আনারসের মধ্যেই পাবে অর্থের সন্ধান'!"

—"সোনার আনারসের মধ্যে একটা ছড়ায় কৌশলে লেখা ছিল ঐ অর্থের ঠিকানা, আজ আমরা যা আবিষ্কার করেছি। প্রতাপ চৌধুরীও এত দিন ধ'রে সেই ঠিকানাটাই আবিষ্কার করবার চেষ্টায় ছিল। এখানকার যত হাঙ্গামার আসল কারণই হচ্ছে তাই। আজ সে তার দল-বল নিয়ে গোপনে আমাদের অনুসরণ ক'রেছিল,—উত্তেজনার মুখে পড়ে যে-সম্ভাবনার কথা ভুলে গিয়ে আমি বোকামি করেছি!"

সুন্দর বাবু বললেন, "হুম্, প্রতাপ চৌধুরী বেটা এখন কি করতে চায়?"

—"নিশ্চয়ই সে আড়ালে থেকে আমাদের সব কথা শুনেছে—আমাদের সব কার্য্যকলাপ লক্ষ্য করেছে। তাই গুপ্তধনের ঠিকানা জানার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের আক্রমণ করেছিল। এখন আমরা অসহায় ভাবে বন্দী। সে স্বাধীন। এইবারে সে গুপ্ত ধনভাণ্ডারের লোহার দরজা খোলবার চেষ্টা করবে। হায় রে কপাল, আমাদের নৌকো কি না ঘাটে এসেও ডুবে গেল!"

মাণিক বললে, "জয়, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করলে কি ও-দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারব না?"

জয়ন্ত মাথা নেড়ে বললে, "না। একেলে দরজা হ'লে আমার কোনই ভাবনা ছিল না—আমি একলাই পারতুম ভেঙে ফেলতে। কিন্তু এই সেকেলে দরজাটা বিশেষ কারণে বিশেষ ভাবে তৈরী। মত্ত মাতঙ্গও ভাঙতে পারবে না এ দরজা! নীচেকার এই ঘরটাও অদ্ভুত, একটা জান্‌লা পর্য্যন্ত নেই—দেওয়ালের অনেক উপরে আছে কেবল গোটাকয়েক ফোকর, কিন্তু তাদের ভিতর দিয়ে মানুষের মাথাও গলবে না। কে জানে, কি উদ্দেশ্যে এ-রকম ঘর তৈরী করা হয়েছিল। আগে কি এখানে থাকত কয়েদীরা? হ'তে পারে, আশ্চর্য্য কি!"

"ভূতই আসুক্, আর মানুষই আসুক, আমি গুলীর পর গুলী ছুঁড়ে তাকে ছিদ্রময় না ক'রে ছাড়ব না!"

জয়ন্ত নিশ্চল এবং নিস্তব্ধ। এমন যুক্তিহীন অট্টহাস্তের অর্থই খুঁজে পেলে না।

তার পরেই হঠাৎ অট্টহাসি থামিয়ে কে ব'লে উঠল, "হায় রে হায়, হায় রে পোড়াকপাল আমার! বাপ-বাজাদের রাজ্য গেছে, কিন্তু ছিল তাদের গুপ্তধন! তাও নিয়ে গেল দুষমণরা! আমার সুখের স্বপন ভেঙে গেল—এ দুঃখ রাখব কোথায় গো রাখব কোথায়? হাহাহাহা, হাহাহাহা, হাহাহাহা!"

জয়ন্তের ছুটে গেল সমস্ত জড়তা! বন্ধ-দরজার উপরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে করাঘাতের পর করাঘাত করতে করতে সে বললে, "ভুবো-পাগলা, ভুবো-পাগ্‌লা, ভুবো-পাগ্‌লা!"

দরজার ও-পাশ থেকে শোনা গেল, "আমাকে চিনেছ? চিন্‌বেই তো, চিনবেই তো! তোমরা যে আমার বন্ধু! আমি যে এখানে এসেছি তোমাদের মুক্তি দিতেই!"

—"দাও, দাও, আমাদের মুক্তি দাও—তুমি হ'চ্ছ ঈশ্বর-প্রেরিত দূত!"

শিকল-খোলার শব্দ। তার পরেই দরজা ঠেলে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে ভুবো-পাগলা।

জয়ন্ত সাদরে ভুবোকে আলিঙ্গন ক'রে বললে, "তুমি কি ক'রে এখানে এলে?"

—"কি ক'রে এলুম? কি ক'রে এলুম? সে অনেক কথা! এখন খালি একটুখানি শুনে রাখো। তোমরাও যে এদিকে এসেছ আমি তা জানতুম না। বেড়াতে বেড়াতে দেখলুম, চৌধুরী দলে বেশ ভারি হয়ে বনের দিকে যাচ্ছে। মনে কৌতূহল জাগল। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের পিছু নিলুম। সোজা হাজির হলুম এইখানে। সন্ধ্যার অন্ধকারে উঠোনের লম্বা আগাছার ভিতরে হুমড়ি খেয়ে ব'সে এখানকার সব অভিনয় দেখলুম। তোমরা বন্দী হবার পরও কত কাণ্ডই যে হ'ল! শেষটা দেখলুম, প্রতাপ চৌধুরীর দল আটটা বড় ঘড়া আর একটা মাঝারি আকারের সিন্দুক কাঁধে করে এখান থেকে স'রে পড়ল! হায় রে হায়, কেমন ক'রে এমন ব্যাপার সম্ভব হ'ল, এখনো আমার মাথায় ঢুকছে না গো! আয়নাতে মুখ দেখে বৃদ্ধ বট এখনো গান গাইছে, কিন্তু একটাও জলগা টিক্‌টিকি দেখা দিলে না ব'লেই তো আমার সব হিসাব একেবারে গুলিয়ে গেল! সোনার স্বপন ভেঙে গেছে, আমি কি নিয়ে বেঁচে থাকব?"

জয়ন্ত তাকে প্রবোধ দিয়ে বললে, "কোন ভয় নেই ভাই, মুক্তি যখন পেয়েছি, তোমার স্বপ্নকে সফল না ক'রে আমরা ছাড়ব না! কিন্তু কি বললে? প্রতাপ চৌধুরীর দল কি কাঁধে ক'রে নিয়ে গিয়েছে?"

—"আটটা ঘড়া আর একটা সিন্দুক।"

—"গুপ্তধন!"

—"হায় হায় হায় হায়—হুম্!"

"এখানে ব'সে হায় হায় ক'রে কোনই লাভ নেই সুন্দর বাবু, জাগ্রত হোন—উঠে দাঁড়ান——ছুটে চলুন!"

—"ও বাবা, কোথায়?"

—"প্রতাপ চৌধুরীদের পিছনে!"

—"বল কি হে? এমন রাতে, এমন অন্ধকারে, ঐ সর্ব্বনেশে বনে?"

—"নিশ্চয়! চলুন, এখন প্রত্যেক মুহূর্ত্তই মূল্যবান!"

—"তারা তো অনেকক্ষণ আগে রওনা হয়ে গিয়েছে, আমরা তাদের পিছু ধরতে পারব কেন?"

—"বাজে কথায় সময় নষ্ট করবেন না! প্রতাপ চৌধুরীরা জানে আমরা বন্দী, তারা নিষ্কণ্টক। এত পরিশ্রমের পর আজ রাত্রে নিশ্চয়ই তারা কোদালপুর ত্যাগ করবার চেষ্টা করবে না। এমন সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।"

—"কিন্তু চা-রুটি-ডিমগুলো খেয়ে একটু চাঙ্গা হ'তেও কি পারব না?"

দারোগা বাবু বললেন, "জয়ন্ত বাবুর কথা শুনেই আমি চাঙ্গা হয়ে উঠেছি—চুলোয় যাক্ চা-রুটি-ডিম! আসামীকে ধরতে হবে আজই!"

চতুর্দ্দশ

সোনার আনারসের ছড়া

অন্ধ অরণ্য। আকাশে চাঁদ আছে বটে, কিন্তু দিনের সূর্য্য যেখানে প্রভাব বিস্তার করতে পারে না সেখানে রাতের চাঁদের কথা না তোলাই ভালো।

ভয়াবহ বন হয়ে উঠেছে অধিকতর বিভীষণ।

জয়ন্ত বললে, "ভাগ্যে সকালে বেরুবার আগে মাণিকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে প্রস্তুত হয়ে এসেছিলুম! সঙ্গে পেট্রলের লণ্ঠন আর 'টর্চ' না থাকলে এখানে আমাদের কি দুর্দ্দশাই হ'ত!"

সুন্দর বাবু বললেন, "সঙ্গে আলো না থাকলে আমি এখানে আসতুম না কি?"

জয়ন্ত বললে, "আচ্ছা, পথ চলতে চলতে আমি এইবারে কতগুলো কথা বলব, আপনারা মন দিয়ে শুনুন। কথাগুলো আর কিছু নয়, সোনার আনারসের গুপ্তকথা!

"সোনার আনারসের ছড়ার কথা মনে করুন। সহজ ভাবে দেখলে ছড়াটাকে অর্থহীন ব'লে মনে হয়। কিন্তু একটা অর্থহীন ছড়াকে বংশানুক্রমে এত যত্নে রক্ষা করা হয় না, আর কেবল সেই ছড়াকেই চুরি করবার জন্যে বাড়ীতে চোর আসে না। বিশেষ, সুব্রত বাবুর পূর্ব্ব-পুরুষরা স্পষ্ট ভাষায় ব'লে গেছেন—অর্থাভাবের সময়ে ঐ ছড়ার মধ্যেই পাওয়া যাবে অর্থের সন্ধান! এই সব কারণে প্রথমেই করলুম ছড়াটার মানে বোঝবার চেষ্টা।

'আয়নাতে ঐ মুখটি দেখে
গান ধরেছে বৃদ্ধ বট,
মাথায় কাঁদে বকের পোলা
খুঁজছে মাটি মোটকা জট।'

"আমি যা মানে করলুম তা হচ্ছে এই: আয়না—অর্থাৎ পুষ্করিণীর ধারে দাঁড়িয়ে এক প্রাচীন বটবৃক্ষ জলে নিজের প্রতিবিম্ব দেখে পত্র-মর্ম্মরধ্বনি করছে। তার শাখায় আছে বকের বাসা। আর তার ডাল থেকে মোটা-সোটা জটগুলো নেমে এসেছে মাটি পর্য্যন্ত। সুব্রত বাবুর বাগানে ঠিক এই রকম একটি বটগাছের সন্ধান পেয়ে আমার সকল সন্দেহ ভঞ্জন হ'ল।

"ছড়াটার মানে কেবল আমিই বুঝিনি। ভুষো-পাগলা আর প্রতাপ চৌধুরীও বুঝেছিল। কিন্তু বিশেষ এক জায়গায় তারা 'অর্থের খেই হারিয়ে ফেলে অন্ধকার হাৎড়ে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিল। প্রথমে আমিও সেই পর্য্যন্ত এগিয়ে সমস্ত গুলিয়ে ফেলেছিলুম, তার পর মাথা খাটিয়ে হঠাৎ পাই আলোকের সন্ধান। সে-জায়গাটা হচ্ছে এই :

'পশ্চিমাতে পঞ্চ পোয়া,
সূয্যি মামার ঝিক্‌মিকি,
নায়ের পরে যায় কত না,
খেলছে জলগ টিক্‌টিকি।'

"মানে হচ্ছে, বটগাছের পশ্চিম দিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ অগ্রসর হ'তে হবে। সেখানে চারি দিকে বিক্‌মিক্ করছে সূর্য্যালোক। নদীর উপরে ভেসে যাচ্ছে নৌকোর ('না' বলে নৌকোকেই) পর নৌকো, আর জলে খেলা করছে কারা? না 'জলগ টিক্‌টিকি'রা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, এখানে জলবাসী টিক্‌টিকি হচ্ছে কুমীর—কারণ, তাকে দেখতে অনেকটা গৃহবাসী টিক্‌টিকির বৃহৎ সংস্করণেরই মত!

"অর্থ হ'ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গোল বাধল। কারণ, বটগাছ পিছনে রেখে পশ্চিম দিকে সোজা পাঁচ পোয়া পথ এগিয়ে কোন নদী দেখা যায় না। এই জন্যেই এই পর্য্যন্ত এসে ভুষো-পাগলা রোজ হত-ভম্ব হয়ে ঘুরে মরত। আমাকেও প্রথমটা বোকা ব'নে যেতে হয়েছিল।

"কিন্তু আমি এত সহজে হার মানতে রাজি নই। মাথা খাটিয়ে সুব্রত বাবুকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলুম, সত্য সত্যই এ অঞ্চলে আগে একটি নদী ছিল, কিন্তু এখন তা শুকিয়ে গিয়েছে, কেবল কোদাল-পুরের উত্তর-পশ্চিম দিকে তিন মাইলের কিছু-বেশী দূরে গেলে আজও তার মরা খাত দেখা যায়। তার পর যথাস্থানে গিয়ে কি ক'রে আন্দাজ করলুম যে, নদীটার গতি ছিল সেখান থেকে দক্ষিণ মুখে, আপনারা সকলেই তা জানেন। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আবার সেইখানে ফিরে এলুম,—বটগাছ থেকে পশ্চিম মুখে সোজা পাঁচ পোয়া পথ পেরুলে সেখানে এসে উপস্থিত হওয়া যায়।

'অগ্নিকোণে নেইকো আগুন,
—কাঙাল যদি মাণিক মাগে,
গহন বনে কাটিয়ে দেবে
রাত্রি-দিবার অষ্ট ভাগে।'

"অর্থ:—(পশ্চিমে পাঁচ পোয়া পথ পার হয়ে নদীর ধারে গিয়ে দেখবে) অগ্নিকোণে—অর্থাৎ পূর্ব্ব-দক্ষিণ দিকে এক অরণ্য। কাঙাল যদি ঐশ্বর্য্য চায় তাহ'লে ঐ গভীর বনের ভিতর দিয়ে অগ্নিকোণের দিকে লক্ষ্য রেখে এক প্রহর বা তিন ঘণ্টা (দিন-রাতকে আট অংশে ভাগ করলে এক প্রহর হয়) ধ'রে অগ্রসর হবে।

'বাঘ-রাজাদের রাজ্য গেছে,
কেবল আছে একটি স্মৃতি,
ব্রহ্মপিশাচ পানাই বাজায়,
বাস্তু ঘুঘু কাঁদছে নিতি।'

"ছড়ার এইখানটায় কিঞ্চিৎ কবিত্ব প্রকাশ ক'রে ইঙ্গিতে বোঝা-বার চেষ্টা হয়েছে, এক প্রহর ধ'রে এগুবার পর পাওয়া যাবে বাঘ-রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ।

'সেইখানেতে জলচারী
আলো-আঁধির যাওয়া-আসা,
সর্প-নৃপের দর্প ভেঙে
বিষ্ণুপ্রিয়া বাঁধেন বাসা।'

"অর্থ—বাঘ-রাজাদের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এমন একটি ঠাঁই আছে, যেখানে জলের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করে আলো আর আঁধার। 'সর্প-নৃপ' কে? বাসুকি—রাজ্য যাঁর পাতালে। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' কে? ঐশ্বর্য্যের দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ বাসুকির রাজ্য জলময় পাতালে লক্ষ্মী বাস করছেন অতুল ঐশ্বর্য্য নিয়ে।

"এতক্ষণে আপনারা বুঝেছেন বোধ হয়, ঘরের ভিতরে কূপ দেখে আমার সন্দেহ জাগ্রত হয়েছিল কেন? প্রথমত, ঘরের ভিতরে কূপ, বেশ একটু অসাধারণ নয় কি? দ্বিতীয়ত, কূপের তলদেশটাকেই সর্পরাজ বাসুকির জলময় পাতালের এক অংশ ব'লে ধ'রে নেওয়া যায়। তৃতীয়ত, মাঝে মাঝে এও শুনেছি যে, কোন কোন সেকেলে কূপ আর পুষ্করিণীর ভিতর থেকে পাওয়া গিয়েছে গুপ্তধন।

"গুপ্তধনের গুপ্তকথা শুনলেন, এইবারে অন্য দু'-চারটে কথা শুনুন। আমার কি বিশ্বাস জানেন? প্রতাপ চৌধুরীর বাড়ীতে এখনো পুলিস পাহারা আছে, সুতরাং সে বাড়ীর ভিতরে ঢোকবার চেষ্টা করবে না। অন্ততঃ আজকের রাত্রের জন্যে তাকে আশ্রয় নিতে হবে সেই সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যেই। তার পর কাল সে হয়তো লোকজন আর গুপ্তধন নিয়ে কোদালপুর থেকে হবে অদৃশ্য।

"অতএব ভোরের আলো ফোটবার আগেই আমাদের অবতীর্ণ হ'তে হবে সুড়ঙ্গ-পথের মধ্যে। শত্রুরা দলে হালকা নয়। কাজেই আমাদেরও দলে ভারি হ'তে হবে। সঙ্গে যখন দারোগা বাবু আছেন তখন সেজন্যে ভাবনা নেই। সুড়ঙ্গে হানা দেবার আগে থানা থেকে এক দল চৌকীদার সংগ্রহ করলেই চলবে। কিন্তু খুব সম্ভব আমরা সহজেই আসামীদের গ্রেপ্তার করতে পারব। প্রতাপের এখন শত্রুভয় নেই। সে আর তার দলের লোকরা পথশ্রমে নিশ্চয়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। হয়তো আমরা গিয়ে দেখব তারা সকলেই করছে নিদ্রাদেবীর আরাধনা।

"এই প্রতাপ চৌধুরীকে চোখে দেখবার জন্যে আমার আগ্রহ হচ্ছে। সেই-ই আমাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। নাটকের সর্ব্বত্রই সে অভিনয় করছে, বার বার আমাদের নাস্তা-নাবুদ ক'রে মারছে, অথচ একবারও চোখের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে না! অপরাধীদের জগতে তাকে এক জন প্রতিভাবান্ ব্যক্তি ব'লে স্বীকার করতে হয়। তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হচ্ছে!"

পঞ্চদশ

অন্ধকারের পর আলো

গল্প এক রকম ফুরিয়েই গিয়েছে। আর বেশী কিছু বলবার নেই। জয়ন্তের অনুমানই সত্য হ'ল। শেষ-দৃশ্যে বইল না রক্তগঙ্গার ঢেউ। নেই চমক, নেইকো রোমাঞ্চ।

সুড়ঙ্গে চুপি-চুপি নেমে জয়ন্তরা দেখলে, প্রতাপ চৌধুরী সদলবলে নিদ্রিত। প্রত্যেকেই দেখছিল বোধ করি সফল আশার সুখস্বপ্ন।

কারুর ঘুম ভাঙবার আগেই চৌকীদাররা তাদের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাঘের মত। ঘুমের জড়তা ছোটবার আগেই

প্রত্যেকের হাতে পড়ল দড়ী বা হাতকড়ি। যেটুকু ধ্বস্তাধ্বস্তি হ'ল তা মোটেই উল্লেখযোগ্য নয়।

রিভলভারটা আবার খাপে পুরে রেখে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করলে, "সুব্রত বাবু, কোন্ মহাত্মার নাম প্রতাপ চৌধুরী?"

সুব্রত অঙ্গুলীনির্দ্দেশে দেখিয়ে দিলে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে যে তিন দিক ঘেরা ও এক দিক খোলা কুঠরীর মত জায়গা ছিল, সেইখানে একটা খুব সেকেলে পেটিকার উপরে একটি লোক ঘাড় হেঁট ক'রে ব'সে ছিল। হৃষ্ট-পুষ্ট ভদ্র চেহারা, ধবধবে ফরসা রং, অতি সৌখীন জামা-কাপড়। দেহের কোথাও এতটুকু সয়তানীর ছাপ নেই। সে যে-কোন সম্ভ্রান্ত সমাজে গিয়ে অনায়াসে মেলামেশা করতে পারে। অন্যান্য ভূষমণ চেহারার পাশে তাকে দেখাচ্ছিল কেমন খাপছাড়া! যেন বাংলা সাপ্তাহিকের পদ্যগুলোর মাঝখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা!

জয়ন্ত একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইল।

প্রতাপ মুখ তুললে—মিষ্ট হাসিমাখা মুখ! বললে, "কি দেখছ?"

—"তুমিই প্রতাপ চৌধুরী?"

—"আর অস্বীকার করবার উপায় নেই।"

—"সিংহের মত বিক্রম প্রকাশ ক'রে তুমি কলে পড়লে ইঁদুরের মত?"

—"কপাল।"

—"কপাল নয়, নিজের বোকামি।"

—"কি রকম?"

—"এই সুড়ঙ্গে না এলে তুমি ধরা পড়তে না।"

—"কেমন ক'রে জানব তোমরা সুড়ঙ্গের খবর রাখো?"

—"গল্পের এক-চক্ষু হরিণও এই রকম বোকামি করেছিল।"

—"তার উপরে তোমরা ছিলে দূর-বনে বন্দী।"

—"এক ঈশ্বর-প্রেরিত দূত এসে আমাদের মুক্তি দিয়েছে।"

—"কে?"

—"ভুষো-পাগলা।"

প্রতাপ মুখ ফিরিয়ে ভুষোর দিকে তাকালে। তার হাসি-মুখ হ'ল গম্ভীর। তার দুই চক্ষে ঠিক্‌রেই নিবে গেল দু'টো বিদ্যুৎ-কণিকা।

ভুষো পিছিয়ে গেল তাড়াতাড়ি।

জয়ন্ত বললে, "ভয় কি ভুষো, ভয় কি? পিঞ্জরের সিংহ পরম বৈষ্ণব।"

প্রতাপ হাসতে লাগল। বললে, "ঠিক। যখন পিঞ্জরের বাইরে ছিলুম তখনি আমার উচিত ছিল, ও আপদটাকে পথ থেকে একেবারে সরিয়ে দেওয়া। তা দিইনি ব'লে এখন আমার অনুতাপ হচ্ছে।"

—"যা গত, তা নিয়ে বুদ্ধিমান শোচনা করে না।"

—"তাও ঠিক। ধন্যবাদ। তুমি দেখছি দার্শনিক।"

—"আপাতত তোমার সঙ্গে আর বেশী আলাপ করবার সময় নেই। এইবারে তোমাকে যথাস্থানে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

—"আমি প্রস্তুত। কিন্তু তার আগে দু'টো কথা ব'লে যাই। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড আটটা ঘড়া দেখছ, ওর প্রত্যেকটার মধ্যেই আছে দুই হাজার ক'রে বাদসাহী মোহর। ঘড়াগুলোও পরীক্ষা করেছি। প্রত্যেকটাই সোনার ঘড়া। আর এই যে পেটিকার উপরে আমি ব'সে আছি, এর ভিতরে আছে রাশি রাশি জড়োয়া গয়না আর নানা রকম রত্ন—তাদের দাম ঠিক করবার সময় এখনো পাইনি। তোমরা জানো তো, এই গুপ্তধনের উপরে এখন তোমাদের কোনই দাবি নেই? কারণ, অলিখিত আইন বলে, বেওয়ারিস গুপ্তধনের অধিকারী হয় আবিষ্কার-কর্ত্তাই। এই গুপ্তধন আবিষ্কার করেছি আমিই। অতএব আমিই এর অধিকারী। কেমন, এ কথা মানো তো?"

—"তার পর?"

—"আপাতত এই গুপ্তধন তোমার জিম্মায় রেখে গেলুম। যথাসময়ে তোমাকে এর সঠিক হিসাব দাখিল করতে হবে। বুঝলে জয়ন্ত?"

—"হিসাব নেবে কে?"

—"আমি!"

—"তুমি, না তোমার প্রেতাত্মা?"

—"মানে?"

—"তুমি নরহত্যা করেছ। তোমার তো শেষ অবলম্বন ফাঁসিকাঠ।"

—"আমিই যে নরহত্যা করেছি, আদালতে সেটা প্রমাণ করতে পারবে তো?"

—"ফাঁসিকাঠকে ফাঁকি দিলেও তোমাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বা কারাগারে বাস করতে হবে।"

—"মূর্খ! কোন কারাগার বা ফাঁসিকাঠ আমার জন্যে তৈরী হয়নি।"

—"বেশ, দেখা যাবে।"

—"হ্যাঁ, সেই কথাই ভালো। দেখা যাবে।"

জয়ন্ত ফিরে বললে, "দারোগা বাবু, কয়েদীদের যথাস্থানে প্রেরণ করুন।"

প্রতাপ চৌধুরী দলবলে যাত্রা করলে চৌকীদার প্রভৃতির সঙ্গে থানার পথে।

সুন্দর বাবু সাগ্রহে বললেন, "এইবারে দেখা যাক্ ঘড়াগুলো আর ঐ পেটিকার মধ্যে কি আছে!"

জয়ন্ত বললে, "গুপ্তধন সুব্রত বাবুর হাতে তুলে দিয়েই আমার কর্ত্তব্য শেষ করলুম। আমার আর মাণিকের আর কিছু দেখবার দরকার নেই।"

—"হুম্, সে কি হে?"

জয়ন্ত সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ফিরে বললে, "সুব্রত বাবু, এই রইল আপনার গুপ্তধন। কিন্তু বিদায় নেবার আগে আপনার কাছে আমার অনুরোধ আছে।"

—"আজ্ঞে, অনুরোধ নয়,—হুকুম!"

—"বেশ, তাই। শুনুন। ভুষো-পাগলা গুপ্তধনের বিফল স্বপ্ন দেখে নিজের জীবনকে প্রায় ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। আজ সে না থাকলে আপনি প্রাণেও বাঁচতেন না, আর গুপ্তধন থেকেও হতেন বঞ্চিত। অতএব এই বিপুল ঐশ্বর্য্যের ষোলো ভাগের মাত্র এক ভাগ তাকে দান করতে কি আপনার আপত্তি আছে?"

—"নিশ্চয়ই নয়, নিশ্চয়ই নয়। আজ থেকে ভুষো হবে আমার পরম আত্মীয়ের মত।"

—"উত্তম। তার পর ষোলো ভাগের আর এক ভাগ থেকে আপনি

ক্যারম্ কম্‌পিটিশন্

শ্রীচিত্রগুপ্ত

কামর এঁটে ক্যারম্ পেটে
বনবেহারী মিত্তির
সেরা সেরা দর্শকেরা
তাই নেহারি চিত্তির!
ফাটায় যখন বোর্ডে তখন
সকল ঘুঁটি ছরকুট
আঃ কী বাহার! সঙ্গে তাহার
শাদাও দু'টি চারকুট!
চাপড়ে ঊরু কুঁচকে ভুরু
নাকখানাকে সিঁটকে
পকেট ফুঁড়ে ফেলচে দূরে
চারখানাকে ছিটকে!
মারের চোটে লাফিয়ে ওঠে
ঘুঁটির সাথে স্ট্রাইকার
হ'চ্চে ঘুঁটি কুটি কুটি
দ্বিধাও তাতে নাই তার।
সেঞ্চুরি সে করবে কিসে
এই নিশিদিন চিন্তা
পারের চোটে হাস্য ঠোঁটে
নাচে 'ধিন্ ধিন্ ধিন্ তা'।
মারছে দেদার কোন্ ঘুঁটি কার
সময় যে নেই চিনবার
মারেরই ঘায় 'জাম্প' ক'রে যায়
লাল ঘুঁটিটাই তিন বার!
উদার মেজাজ চ্যাম্পি আজ
যে ক'টা হয় হোক্ গে!
দানের দোষে বন্ধু রোষে
মন্দ যা' কয় ক'ক গে!
ডবল ফাইন? টোয়েণ্টি-নাইন্
ঠেক্‌বে না তায় নিশ্চয়—
খেলায় জিতি রাত্রে নিতি
মাংস ওড়ায় ডিশ ছয়!
তাল ঠুকে কয়,— "ইয়ার্কি নয়!—
আয় না কে কে লড়বি?
নীল খেয়ে যে নীলচে সেজে
হাত-পা বেঁকে প'ড়বি।"
গর্জ্জনে তার বোর্ড তো কী ছার
—কাঁপলো বাড়ী-ঘর দোর।

দেখছিলো ঠায় তিনকড়ি রায়
—ছোক্‌রা ভারী ভদ্দর।
তিনকড়ে সে এগিয়ে এসে
ক'চলে পাণি ব'ললে—,
"শিখতে খেলা হই যে চেলা
মেহেরবাণী ক'রে।"
বনবেহারী তুষ্ট ভারী
তিনুর বিনয় দৃষ্টে
মুচকি হেসে তিনুকে সে
চাপড়িয়ে কয়, পৃষ্ঠে—
"আচ্ছা বেশ! নেই মনে খেদ
[illegible] আজ
[illegible] না ভেবো তোর
—[illegible]।"
তিনকড়ি তো পুলকিত,
[illegible] শক্ত;
এক হাতে 'বাণমাতে'
ধন্য সে হয় ভক্ত!
শিক্ষা শুরু গোড়ায় গুরুর
হস্ত কর্ণমর্দ্দন,
প্রথা প্রাচীন; এ অনুষ্ঠান
চেলার মানবর্দ্ধন—
কপালী ভোগ! —এই তো সুযোগ
মিললো 'শিক্ষে' হবার।"
বনবেহারী কয় ফুকারি—
"—তিন মিনিটে ন'বার!"
সায় দিয়ে তার তিনকড়ি রায়
বাগিয়ে খেলায় ব'সলো।
মোক্ষম দায় একটি টোকায়
স্ট্রাইকারটায় কষলো।
ভেলকি চোখে! প্রথম স্ট্রোকে
শাদা ঘুঁটির নয় খান্
পকেট গলে। সবাই বলে—
"তুলা উটিন শয়তান!"
সেকেণ্ড চোটে ফিনিক্ ফোটে
লাল ঘুঁটিটা হয় পার
বনবেহারী ম'ললো হাসি
কাণমুটিটা নয় বার॥

যদি সুন্দর বাবু আর দারোগা বাবুকে আধা-আধি বখরা দেন, তাহ'লে আমি অত্যন্ত বাধিত হব।"

—"অবশ্য দেব। আপনাদেরও তো এই গুপ্তধনের উপর দাবি আছে?"

জয়ন্ত হো-হো ক'রে হেসে উঠল। বললে, "গুপ্ত বা ব্যক্ত কোন ধনের লোভেই আমরা কোন কাজ করি না। গোয়েন্দাগিরি হচ্ছে আমাদের সখ। ভগবান আমাকে আর মাণিককে যা দিয়েছেন তা যথেষ্টরও বেশী। তাইতেই আমরা খুসি। এস হে মাণিক! সুড়ঙ্গের ভিতরে আর কীটের মতন বাস করি কেন, বাইরে এতক্ষণে পাখীরা গাইছে প্রভাতী গান—নতুন সূর্য্য সোনায় মুড়ে দিচ্ছেন পৃথিবীকে। চল, অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আমরাও যোগ দিই শুভ্র আলোকের পবিত্র অভিনন্দনে।"

সমাপ্ত

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'আনন্দবাজার পত্রিকা' বলিতেছেন : "ভিয়েৎনাম দিবস হাঙ্গামায় বহু ছাত্র ও ছাত্রীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ছাত্রীদের এক বিবৃতিতে প্রকাশ যে, হাজতে ছাত্রদের উপর পুলিশ সার্জেণ্টগণ অকথ্য অত্যাচার করিয়াছে। প্রহারের ফলে ছাত্রদের অনেকের রক্তপাত হয় ; ছাত্রীগণ নিজেদের হাজত হইতে তাহা দেখিতে পায়।······কলিকাতার পুলিশ সার্জেণ্টগণ এই জাতীয় অত্যাচারে চিরকালই নিপুণ।············গভর্ণমেণ্ট অধুনা দেশবাসীর হাতে, এদিনেও পুলিশের অসংযত ও অন্যায় ব্যবহার সম্ভব হয় কেমনে এবং তাহারা সাহসই বা পায় কোন্ জোরে? কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে সার্জেণ্টদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিবেন, আশা করিতে পারি কি?"—আশা নিশ্চয়ই করিতে পারেন, যেমন, মানুষ বহু কিছুর আশাই করিয়া থাকে। কিন্তু অন্যান্য বহু মহৎ আশার মত এ-আশারও সমাপ্তি নিরাশায়। পুলিশ কাহার ভরসার জোরে ছাত্রদলন ব্যাপারে এমন পশুজনোচিত ব্যবহার করিতে হাত পাকাইয়াছে, সহযোগীর এখনও তাহা জানিতে বাকি আছে কি? সহযোগী এ কথা নিশ্চয়ই জানেন যে বাঙ্গালার পুলিশ, জনসাধারণের ভৃত্য নহে, প্রভু। কলিকাতার পথে-ঘাটে একটু চোখ মেলিয়া চলিলে যে-কেহই ইহার বহু অকাট্য এবং অকথ্য প্রমাণ পাইবেন।

*

বাঙ্গলা সরকার হইতে বিনামূল্যে বিতরণের জন্য, গরীব করদাতাদের অর্থের পরম সদ্ব্যয় করিয়া একটি বাঙ্গলা সাপ্তাহিক প্রচার-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটির নাম "জানবার কথা"। গত কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বের এই পত্রিকায় জানানো হয়েছে—"গর্ভাবস্থায় প্রসূতির খাদ্যের মধ্যে প্রচুর দুধ, টাটকা সব্জী আর ফল থাকা চাই-ই। মাছ সামান্য চলতে পারে বটে, কিন্তু মাংস বা ডিম সপ্তাহে এক বারের বেশী কিছুতেই নয়। আট মাস থেকে তাও একেবারে ছেড়ে দিতে হবে। এ-সময় দুধটাই হচ্ছে সবচেয়ে দরকারী—রোজ অন্তত এক সের দুধ খেতে হবে। না হ'লে মায়ের এবং সন্তানের দেহের হাড় এবং দাঁত দুর্ব্বল হবে। সবটা দুধ না খেয়ে তার বদলে দই, ছানা, সন্দেশও খাওয়া যেতে পারে।" বর্ত্তমানে বাঙ্গলা দেশে খাদ্যদ্রব্য-সম্ভারের ছড়াছড়ি। সুখাদ্যের পরিমাণ এবং রকমারী এত বেশী যে মানুষ কোন্‌টা ফেলিয়া কোন্‌টা খাইবে, তাহাই ভাবিয়া পাইতেছে না! বাঙ্গলা দেশবাসী নিজ দেশে এত খাদ্য সত্ত্বেও যদি খাদ্যের সন্ধান না লাভ করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রধান বা অন্য যে-কোন মন্ত্রীকে টেলিফোন করিয়া জানিলে চলিবেন। যাহা হউক, বাঙ্গলা সরকারের পরিহাস, এত দুঃখেও আমরা উপভোগ করিলাম!

ভিয়েৎনাম দিবসের হাঙ্গামায় লালবাজার হাজতে ছাত্রদের প্রতি সামান্য অত্যাচারের একটি নমুনা পাঠ করিলাম। স্বাধীনতা পত্রিকার ২৬এ জানুয়ারী সংখ্যায় ইহা প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই সংবাদের সরকারী কোন প্রতিবাদ বাহির হয় নাই।—"বারো তেরো বছরের ছেলে, নাম তার বিজয় চক্রবর্ত্তী, রিপন স্কুলে পড়ে। সাহেবের গায়ে কে ইট ছুড়ে মেরেছিল তারই প্রতিশোধ। টেনে এনে দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড় করানো হ'ল তাকে। তার পর অভ্যস্ত হাতে ব্যাক করে সজোরে ঘুসি মারলো ছেলেটির পেটে। দম আটকে গিয়ে ছেলেটির মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়তেই তার মুখের ওপর ঘুসি চলল অনবরত—মানুষের মুখ নয়, যেন পাঞ্চিং বলের ওপর পেশাদার বক্সার শক্তি পরীক্ষা কচ্ছে। ঘুসি থামিয়ে সায়েব ফিরে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ কি মনে হওয়াতে আবার তেড়ে এসে উন্মত্ত ঘুসি চালিয়ে দিলেন। অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় লুটিয়ে পড়ল ছেলেটি।"—বারো বছর বয়সের ছেলেটি! এই সায়েবের আত্মীয়-কুটুম্বরাই জার্ম্মাণীতে "নুরেমবার্গ" বিচারের ব্যবস্থা করিয়াছিল। বেলসেন বন্দিশালায় নাৎসিদের নানা সত্য-মিথ্যা অত্যাচার কাহিনী পাঠ করিয়াছি। কিন্তু লালবাজার এবং বেলসেনে তফাৎ কতখানি তাহাও ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না। ইংরেজিতে 'পার্টিং কিক্' বলিয়া একটি কথা আছে। কলিকাতার 'সায়েব'-পুলিশরা বোধ হয় এবার তাহাই দান করিতেছে। সুখের কথা!

* * * *

'বগুড়ার কথা' পাঠ করিয়া জানা যায় যে—"বগুড়া জেলার তাঁত-শিল্পীদের অধিকাংশই মুসলমান এবং ইহারা তাঁতের উপর নির্ভর করিয়া টিকিয়া আছে। ইহারা আবার ভূমি-হীন গৃহস্থ এবং অধিকাংশেরই এক টুক্‌রাও আবাদী জমি নাই। এই জমি-জিরাত-হীন মুসলমান তাঁত-শিল্পীদিগকে সূতার সরবরাহ সময় মত ও উপযুক্ত পরিমাণে দিতে না পারিলে ইহাদের অনেককেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার লইয়া অনশনে ও অর্দ্ধাশনে দিন কাটাইতে হয়···"। বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীকে বাঙ্গালী গরীব মুসলমান তাঁতীদের সামান্য সূতা সরবরাহের বিষয় লইয়া এমন করিয়া ব্যতিব্যস্ত করা অনুচিত। 'বগুড়ার কথা' কি জানেন না যে, কিছু কাল হইতে বাঙ্গলার লীগ, তথা মন্ত্রিমণ্ডলী বিহারের তথা-কথিত দুর্গতদের লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত আছেন। বাঙ্গলা দেশে বিহারী মুসলমানদের কোন একটা পাকা ব্যবস্থা না-হওয়া পর্য্যন্ত যদি বগুড়ার মুসলমান তাঁতীরা অপেক্ষা করিতে না পারে—তবে বাঙ্গালা সরকার অনুপায়। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সরকার অতিথির প্রতি কর্ত্তব্যকে বৃহত্তর বলিয়া মনে করেন। ভরসার কথা, হাজার খানেক বাঙ্গালী মুসলমান তাঁতী মরিলে, তাহাদের স্থানে দশ হাজার বিহারী "দুর্গত" তাঁতীর ব্যবস্থা বগুড়াতেই হয়ত করা সম্ভব হইবে।

ডাক্তার মফিজ উদ্দিন আহামদ এবং মৌলবী নাফজ উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'বগুড়ার কথা' বলিতেছেন—"বগুড়া বাজারে সন্দেশ ও অন্যান্য মেঠাইয়ের অগ্নিমূল্যের কথা একাধিক বার লিখিয়াছি। গাইবান্ধা ও নওগাঁর মিষ্টার দরের সহিত বগুড়া বাজারে মিষ্টার দরের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছি, বগুড়া বাজারে মিষ্টার দর কিরূপ অস্বাভাবিক। কিন্তু কর্তৃপক্ষের চৈতন্যোদয় করিতে পারি নাই।···" 'বগুড়ার

কথা' পাঠ করিয়া মনে হয় বগুড়াতে অন্যান্য দ্রব্য, যথা : সরিসার তেল, আটা-ময়দা, সুজি, পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রভৃতির মূল্য স্বাভাবিক এবং দ্রব্যাদিও সুপ্রচুর। এখন সন্দেশ-মেঠায়ের দর কমিলেই বগুড়াবাসী নিশ্চিন্ত হয়। বগুড়াবাসীদের অবস্থা দেখিয়া সত্যই হিংসা হইতেছে। সুবিধা এবং সুযোগ থাকিলে বগুড়াতেই বাস করিতাম!

* * * *

'আনন্দবাজারের' নিজস্ব সংবাদদাতা জানাইতেছেন : "শালবনীতে বিহার হইতে যে সকল আশ্রয়প্রার্থী আসিয়াছে, তাহাদের ১৫।১৬ জন সম্প্রতি কেশপুর থানার কাটাসলি গ্রামে গ্রামবাসীদের বাঁশ-ঝাড়ে বাঁশের লাঠি কাটিতে আরম্ভ করে। গ্রামবাসীরা নিষেধ করিলে তাহারা গ্রামবাসীদিগকে আক্রমণের উদ্যোগ করে; বহু গ্রামবাসী ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলে তাহারা ঐ স্থান পরিত্যাগ করে। কিন্তু পরে আবার তাহারা মাঠ হইতে ছাগল ধরিবার চেষ্টা করে। এইরূপ আরো দু-একটি ঘটনা ঘটিয়াছে।"

ইউ-পি'র একটি সংবাদ "কৃষক" পাঠে জানা যায়—"…গুণ্ডারা (যুবকরা) নিকটে বিহার হইতে আগত যে-সমস্ত 'আশ্রয়প্রার্থী' আছে, তাহাদের মধ্যে কয়েক জন গত ২৬শে জানুয়ারী ৩ জন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবককে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে জাতীয় পতাকা এবং গান্ধী-টুপি ছিনাইয়া লইয়াছে।…" ইহার পূর্ব্বে বিহারের বাঙ্গলায় আগত তথা-কথিত বিহারী দুর্গতদের এই প্রকার কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিয়াছি। সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হইয়াছে। বিহারী দুর্গতদের দল খুব সম্ভব মনে করিয়াছে যে, তাহারা মামা-বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছে। কাজেই তাহাদের সামান্য আব্দার মামার বাড়ীর লোকদের সহ্য করিতেই হইবে। কিন্তু লীগের ভাগিনেয়দের আব্দারেরও একটা সীমা থাকা দরকার। কারণ, মামার বাড়ীর গ্রামের লোকেদেরও সহ্যের একটা সীমা আছে। গান্ধী-টুপির বদলে লুঙ্গি খোয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে—একথা তাদের বিস্মৃত হওয়া উচিত নয়। বাঁশ-ঝাড়েরও অভাব নাই। বাঁশ কাটিয়া লাঠি করার লোকও এমন কিছু কম নহে। বিহারী দুর্গত ভাগিনেয়দের ছাগল ধরিবার প্রয়াস দেখিয়া মনে হয়—সহোদর মামার দল তাহাদের ভোজনাদি ব্যাপারে ব্যবস্থা যথাযথ করিতে পারেন নাই। অন্যায় কথা!

* * * *

তমলুক (মেদিনীপুর) হইতে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'প্রদীপ' বলিতেছেন :—"…বিরামপুর (নন্দীগ্রাম থানা)-নিবাসী প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েৎ শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ ঘোড়ই মহাশয়ের বাড়ীতে কলিকাতার বিখ্যাত গীতা-ধর্ম্ম বক্তা শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল রায় কীর্ত্তন-তত্ত্বনিধি মহাশয় শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ সভায়ে ধর্ম্মপ্রচার-কালীন প্রসঙ্গক্রমে সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করিয়া হিন্দুদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়ায় তাহা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ প্রচার বলিয়া স্থানীয় কয়েক জনের অভিযোগক্রমে ১।১।৪৭ তারিখে নন্দীগ্রামের পুলিশ শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়কে গ্রেপ্তার করেন।…শ্রীযুক্ত রায় মহাশয় বর্ত্তমানে জামিনে মুক্ত আছেন। লক্ষ্মী বাবুর বন্দুকটিও অজ্ঞাত কারণে আটক আছে।" স্বর্ণকমল রায় মহাশয় যদি সাম্প্রদায়িকতার গুণ-কীর্ত্তন করিতেন, তাহা হইলে খুব সম্ভব তাঁহাকে গ্রেপ্তার হইতে হইত না, কারণ লীগের জীবন, এমন কি অস্তিত্বও, সাম্প্রদায়িকতার উপরেই নির্ভর করে। লক্ষ্মী বাবুর বন্দুক আটক হইয়াছে খুব সম্ভব বাঙ্গলার লীগ সরকার বাঙ্গলার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্বন্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতিই প্রকৃষ্ট মনে করেন বলিয়া।

* * * *

ঢাকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাঙ্গলার' মতে : "…লীগ নেতা, লীগ মুখপত্র এবং লীগের চেলা-চামুণ্ডাগণ চেষ্টা করিতেছে মহাত্মাজীর 'ধারে কাছে,' তাঁহার সংস্রবে, তাঁহার নিকটে যাহাতে মুসলমানগণ না যায়। মহাত্মা বলেন, হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা। ঐক্যের কথা, সত্যের কথা শোনা যে বিপজ্জনক, মহাত্মাজীর ন্যায় অহিংস মানব-প্রেমিক—অসাম্প্রদায়িক চেতনায় উদ্বুদ্ধ জনগণের বান্ধবের নিকট হইতে মুসলমান জনসাধারণকে যদি দূরে রাখা না যায়, তাহা হইলে মুসলমান সাধারণ যে 'বিগড়াইয়া' যাইবে—তাহাদের আর প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা যাইবে না,…হিংসা-বিরোধ অপেক্ষা ঐক্য-ভালবাসা-প্রীতিপূর্ণ জীবনই যে পল্লীবাসী চাহিবে। সুতরাং চেষ্টা করা, মহাত্মাজীর সন্নিকটে কেহ যেন না যায়।"—এ-বিষয়ে মন্তব্য করিবার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না।

* * * *

চট্টগ্রামের 'পাঞ্চজন্য' বলেন : "ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য যাঁহারা ভারতে গণবিপ্লব ঘটাইবার কথা বলেন, তাঁহারা সাধারণত ভারতের জনসাধারণের নিকট হইতে বহু দূরে অবস্থান করেন। ফলে তাঁহাদের বক্তৃতা বা উপদেশানুযায়ী কাজ করিবার জন্য জনসাধারণ যে কেবল উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন না তাহাই নহে, তাঁহাদের উপদেশ জনসাধারণের নিকট পৌঁছাইতেই পারে না।…যাহারা গণবিপ্লব দেশে আনায়ন করিতে পারে এবং যাহারা উহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে সক্ষম, তাহারা সাধারণতই ভারতের ৭ লক্ষ গ্রামে বসবাস করিয়া থাকে। অশিক্ষা, কুসংস্কার, রোগ-শোক প্রভৃতিতে জর্জ্জরিত থাকিয়া তাহারা কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, যদি এই দেশে গণবিপ্লব আনয়ন করিতে হয়, তাহা হইলে পল্লীর ঐ কোটি কোটি অধিবাসীদের মধ্যে জনজাগরণ সৃষ্টি করিতে হইবে।……… এই জন্যই কংগ্রেস এই দেশের গণ-জাগরণ সম্পাদিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠনমূলক কার্য্যক্রম গ্রহণ করিয়াছেন। উহার মধ্যে অবশ্যই বিপ্লবের বড় বড় আওয়াজ নাই। কিন্তু ঐ কার্য্যক্রমকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিলে ভারতে আপনা হইতেই গণজাগরণ অবশ্যম্ভাবী।" কিন্তু 'পাঞ্চজন্য' যাহাই বলুন, বাঙ্গলার তথা-কথিত নেতারা, শরৎ সি বাসু এবং ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদকে বাদ না দিয়াই একথা বলিতেছি যে সকলেই শহরে বসিয়া বক্তৃতা, বিবৃতি বা অন্য ভাবে প্রচারকার্য্যই পরিচালনা করিতেছেন। অন্ধকারাবৃত গ্রামে যাইবার, তথায় বাস করিবার ভরসা বা সাহস ইঁহাদের নাই। ভারতের জনগণকে কি ভাবে, কেমন

করিয়া জাগরিত করিতে হইবে, পরিকল্পিত বর্দ্ধপন্থাকে কি ভাবে বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহা দেখাইতেছেন নোয়াখালীর গ্রামে গ্রামে—মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ ভক্ত সতীশ দাশ গুপ্ত মহাশয়!

*　　*　　*　　*

'মেদিনীপুর হিতৈষী' বলিতেছেন: "সকল রকমে কাঙ্গাল—কাঠ নাই, কয়লা নাই, ডাল, চাল, তেল, নুণ, আনাজ, তরকারী, মাছ অগ্নিমূল্য! জনসাধারণ যায় কোথায়, খায় কি? বলে কাহাকে, শুনে কে? বিপদহারী ভগবানকে (বর্ত্তমানে সুরাবর্দ্দী) ডাক।" কিন্তু চাল ডাল কয়লা নুণ তেল না থাক, দুর্গত বিহারী মুসলমান আছে—মেদিনীপুরবাসীদের জীবন-মরণ সমস্যার সমাধান হউক বা না হউক—"মেদিনীপুরে বহু বিহারী মুসলমান আসিতেছে। তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপর পড়িয়াছে।" দুর্গত বিহারীদের রাজ-অনুকম্পায় একটা ব্যবস্থা হইবেই, সুতরাং মেদিনীপুরবাসীদের আর ভাবনা কি? শহরবাসীদের শতকরা যে দুই-তিন জন—হয়ত বা সামান্য কিছু চাল-ডালের সংস্থান রাখিয়াছেন, তাঁহারা, আশা করি, সেই সংস্থান ভিন্ন প্রদেশাগত অতিথি সৎকারে ব্যয় করিবেন। ফলে অকালে ইহলোক ত্যাগ করিতে হইলেও পরলোকের কিছু সুরাহা নিশ্চয়ই হইবে।

*　　*　　*　　*

সাপ্তাহিক 'নীহারের' অভিযোগ—"ঔষধপত্রের কথা ছাড়িয়া দিলেও এখন চিনি, মিশ্রী, সাগু কি অন্য কোন পথ্যই কন্‌ট্রোল বন্টনের কল্যাণে চলতি দর অপেক্ষা ৮।১০ গুণ অধিক দর দিয়াও লোকে কিনিতে না পাওয়ায় যে কিরূপ বিপদে পড়িয়াছে তাহা ভুক্তভোগী জনসাধারণ ছাড়া রেশনভোগী অনুগ্রহপুষ্ট ব্যক্তিদের বুঝিবার শক্তি নাই। সুতরাং দেশের সর্ব্বনাশকর এই রেশন-প্রথার উচ্ছেদ ব্যতিরেকে সাধারণের এ দুর্ভোগ নিবারণের উপায় কি আছে…?" 'নীহারের' প্রস্তাব হয়ত ভালই, কিন্তু রেশন তথা কনট্রোল-প্রথা রদের ফলে অন্য এক দল লোকের কি সর্ব্বনাশ হইবে তাহা 'নীহার' জানেন কি? কনট্রোল-প্রথা বন্ধ হইলে লীগের দরজায় 'কিউ' দাঁড়াইবে না, এবং 'কিউ' না দাঁড়াইলে লীগের শক্তি কি পরিমাণ কমিয়া যাইবে, 'নীহার' সে সংবাদ বোধ হয় রাখার প্রয়োজন মনে করেন নাই।

*　　*　　*　　*

'ঢাকা-প্রকাশে' প্রকাশ: "বাঙ্গালা সরকার আগামী বাজেট অধিবেশনে কৃষিযোগ্য অব্যবহৃত জমি ক্রয় করিবার জন্য অপর একটি বিল আনয়ন করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। এই অব্যবহৃত কৃষিযোগ্য জমি সরকারের তত্ত্বাবধানে সংস্কার করিয়া পরে শ্রমিক, বর্গাদার এবং আশ্রয়চ্যুত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিলি করা হইবে।" বাঙ্গলা দেশে আশ্রয়চ্যুত বলিতে এখন বিবিধ অঞ্চলের হিন্দুদেরই বুঝায়। কিন্তু বাঙ্গলা সরকার আশ্রয়চ্যুত হিন্দুদের এই সংস্কৃত জমি বিলি করিবেন কি না প্রকাশ করেন নাই। 'আশ্রয়চ্যুত' বলিতে 'বাঙ্গালী আশ্রয়চ্যুত' বুঝায় কি না তাহাও সরকারী ইস্তাহারে নাই। দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়—'আমদানী করা' আশ্রয়চ্যুতদের জন্যই অনাবাদী জমি দখল এবং তাহার সংস্কার বাঙ্গলার করদাতাদের কষ্টার্জ্জিত অর্থব্যয়েই হইতেছে। এক সময় মনে হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত গৌরী সেন মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু এখন দেখিতেছি, গৌরী সেন অমর এবং তাঁহার অর্থ-ভাণ্ডারও অফুরন্ত!

*　　*　　*　　*

'হিন্দুরঞ্জিকা' পত্রিকায় প্রকাশ যে—"জনৈক মুসলমান রমণীকে গুণ্ডারা ফরিদপুর হইতে রাজসাহী ষ্টেশনে লইয়া আসিয়াছে এবং তাহাকে অন্যত্র লইয়া যাইবার চেষ্টায় আছে। সংবাদ পাবামাত্র কংগ্রেসকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রাধারমণ ভট্টাচার্য্য বোয়ালিয়া থানায় খবর দেন, এবং বিষয়টি প্রত্যক্ষীভূত করিবার জন্য স্বয়ং রেল-ষ্টেশনে গমন করেন। তথায় পুলিশের চেষ্টা ও সাহায্যে মহিলাটিকে উদ্ধার করেন……।" বিপদ্‌গ্রস্তা এবং দুর্গতা মহিলার উদ্ধারে আনন্দলাভ করিলাম। নারী আমাদের কাছে সকল ক্ষেত্রেই মাতৃসমা—এবং তাঁহার সম্মান রক্ষায় যে পুরুষ অক্ষম, তাহাকে কাপুরুষ বলিয়াই মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, হিন্দু-নারী যখন উপরোক্ত প্রকারে ভিন্ন সম্প্রদায়ের গুণ্ডাদের দ্বারা আক্রান্ত এবং অপহৃত হয়, তখন সেই ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গুণ্ডাদের সাহায্য এবং আশ্রয়দানই করিয়া থাকে। এমন কি—নারীরাও বহু স্থানে নারীর মর্ম্মবেদনা বুঝিতে পারে না!

*　　*　　*　　*

'The Indian messenger' পত্রে Anthony Elenjimilam মহাশয় বলিতেছেন—"I do not believe that the cause of the troubles in Noakhali was essentially communal. If one goes into the root of the matter it will become self-evident that the root-cause of the present Hindu-Moslem tension is nothing but economical. The richer the Hindu the more hesitant he is to return to Noakhali." অর্থাৎ নোয়াখালীর হাঙ্গামার মূল কারণ অর্থ-নৈতিক, সাম্প্রদায়িক নহে। ধনী হিন্দুরা এখন নোয়াখালী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে গরীব হিন্দু অপেক্ষা বেশী ভয় পাইতেছেন। লেখক মহাশয়ের কথায় সামান্য সত্য হয়ত থাকিতে পারে—কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নাই। নোয়াখালীর হাঙ্গামার কারণ যদি কেবল অর্থ-নৈতিকই হইবে, তাহা হইলে ঐ অঞ্চলের একটিও মুসলমান ধনী মহাজন বা জমিদারের গৃহ আক্রান্ত হয় নাই কেন? যত দোষ করিল কি হিন্দু মহাজন এবং জমিদারেরাই? হিন্দু মহাজন এবং জমিদারেরাই যদি সত্যই অপরাধী হয়, তাহা হইলে হাজার হাজার গরীব হিন্দুর এমন সর্ব্বনাশ কোন্ অর্থ-নৈতিক কারণের জন্য ঘটিল? তাহা কিন্তু লেখক মহাশয় নির্দ্দেশ করেন

নাই ? মতানৈক্য হইলেও এ-কথা স্বীকার করিব যে, Mr. Anthony Elenjimilam মহাশয় লিখিত 'Gandhiji's Peace Mission in Noakhali—গত ১১।১।৪৭ তারিখের 'Indian Messenger'এ প্রত্যেকেরই পাঠ করা দরকার! ইহা বহু তথ্যপূর্ণ সুলিখিত প্রবন্ধ।

* * * *

'ত্রিস্রোতা' বলিতেছেন :—"......৬৲ টাকা ৭৲ টাকা মণ দরে চাউলের কথা মানুষ যেন আজ কল্পনাও করিতে পারে না।...ধান্য যে বাঙ্গলা দেশে কিছু কম উৎপন্ন হইতেছে তাহা নহে এবং এখন যুদ্ধ-বিগ্রহও নাই তথাপি চাউলের দর স্বাভাবিক অবস্থায় নামিয়া আসে নাই।" নামিয়া আসে নাই বলা হয়ত ঠিক হইল না, প্রজাপালক বাঙ্গলা সরকার জোর করিয়া চাউলের দর নামিতে দেন নাই। কারণ, এ খবর ত বাজে নহে যে, অন্যত্র এমন কি বাঙ্গলা দেশের বহু অঞ্চল হইতে গভর্ণমেণ্ট খুব কম মূল্যে ধান এবং চাউল ক্রয় করিয়া চড়া দরে তাঁহারা তাহা জন-সাধারণকে বিক্রয় করিতেছেন। বাঙ্গলা গভর্ণমেণ্ট এখন আর কেবল গভর্ণমেণ্টই নহেন, তাঁহারা খাদ্য-শস্যের মহাজনও হইয়াছেন! তাহার পর—"ময়দা বলিয়া দ্রব্যটি প্রায় অনেকের সংসারে বিরল, আটা প্রায়ই পাওয়া যায় না এবং পাওয়া গেলেও তাহার পরিমাণ অত্যন্ত পরিমিত, চিনির বরাদ্দ কমিতে কমিতে এরূপ অবস্থায় আসিয়াছে যে, জন-প্রতি যাহা দেওয়া হয় তাহা নামমাত্র বলা চলে। সরিষার তেলের অবস্থা আরো শোচনীয়।" অথচ একথা আমরা জানি যে, উপরি-উক্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য খাদ্য-দ্রব্যগুলির এত টান এবং অভাব সত্ত্বেও বহু ভাগ্যবানের গৃহে ঐ সকল দ্রব্যেরই ছড়াছড়ি না হইলেও, অভাব বা অনটন নাই। রেশন-প্রথা বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও বহু সরকারী, আধা-সরকারী এবং সরকারের 'ভাল থাতায়' যাঁহারা আছেন, তাঁহারা পরম আনন্দে ভোজন-বিলাস চালাইয়া যাইতেছেন! "সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করিয়া কত দিন চলিতে পারে"—ত্রিস্রোতার' এই প্রশ্নের একমাত্র জবাব—যত দিন না সাধারণ মানুষ বাঙ্গলা সরকারের অসাধারণ অপদার্থ বন্ধুবর্গ এবং মন্ত্রিমণ্ডলীকে বিতাড়িত করিতে না পারে। গভর্ণমেণ্ট সাধারণ মানুষের হাতে না আসা পর্য্যন্ত অসাধারণ মানুষের সুখের এবং সাধারণ মানুষের দুঃখের দিন অস্তমিত হইবে না।

* * * *

মহাত্মা গান্ধী দুঃখ করিয়া বলিতেছেন—"মুসলমান ভাইরা তাঁহাকে বন্ধু ভাবে লইতে পারিতেছেন না। হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে যে বিষ সঞ্চারিত হইয়াছে, তিনি তাহা নির্ম্মূল করিতে চাহেন, মুসলমানগণ তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া বলুন, তিনি সত্যই তাহাদের শত্রু অথবা মিত্র...।" মহাত্মা গান্ধী ভুল করিতেছেন, এ কথা বলিব না, তবে ইহা সত্য যে, কোন এক অদৃশ্য কিন্তু অতি পরিচিত শক্তি মুসলমানদের গান্ধীকে বন্ধু ভাবে লইতে দিতেছে না। এই অপরিচিত অদৃশ্য শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে যেন মুসলমানগণ যদি গান্ধীজিকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করে, তবে এই অতি পরিচিত শক্তির অবসান ঘটিবে—এবং বাঙ্গলা দেশে আবার সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ফিরিয়া আসিবে। অধিক মন্তব্য অনাবশ্যক এবং বিপদজনক।

* * * *

'জনশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশ :—"ভারত পত্রিকা লিখিতেছেন—সরকারী অব্যবস্থায় পোষ্টকার্ড দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সে জন্য উহা লইয়া চোরা-বাজারি কারবারও চলিতেছে।" এমন কিছু অন্যায় হইতেছে বলিয়া মনে করি না, কারণ, মানুষ কালধর্ম্ম মানিয়া চলিবে ইহাই শাস্ত্রের বিধান। কারবারীর উদ্দেশ্য অর্থ রোজগার, বর্ত্তমানের যা অবস্থা, তাহাতে শ্বেত কারবারে পয়সা নাই, কাজেই সকলকে কৃষ্ণ-বাজারের প্রেমে মজিতেই হইবে। মহামান্য সরকারের বড় বড় বেতনভোগী কর্ম্মচারীরাও যদি কারবারী হয়েন, নেহাৎ চুনো-পুঁটিরাই বা এমন কি দোষ করিল ?

* * * *

'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় জনৈক পত্র-প্রেরক লিখিতেছেন : "এবার চাটগাঁয় অলিতে গলিতে বহু সরস্বতী পূজা হচ্ছে। চাঁদার পরিমাণও কম উঠছে না।.........................এই টাকাগুলি বর্ত্তমান সময়ে অপব্যয় ছাড়া কিছুই নয়। যদি পূজার খাদ্য-সম্ভার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে সংগৃহীত অর্থ দুর্গত অঞ্চলে সাহায্যার্থে পাঠানো হয় তবে বেশ উপকার হয়।" এ ব্যাপার কেবল চাটগাঁয় নহে, বাঙ্গলার প্রায় সর্ব্বত্রই। কলিকাতার কথা ত না বলাই ভাল। এ বৎসর সরস্বতী পূজার ব্যাপারে রেডিও, লাউড স্পীকার, ব্যাণ্ড, পূজা-মণ্ডপ সাজানো এবং অন্যান্য অনাবশ্যক কাজে যে কত হাজার টাকা নষ্ট করা হইল তাহার হিসাব নাই। পূজাতে আপত্তির কিছু নাই, থাকিতেও পারে না, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় পূজার অজুহাতে অযথা আনন্দ-বিলাসের মাত্রা কম করিলে দোষাবহ কিছু হয় বলিয়া মনে করি না। সরস্বতী পূজার জন্য এবার চাঁদা দিতে দিতে সর্ব্বসাধারণ প্রায় পাগল হইবার মত হইয়াছিলেন। যে পাড়ায় পূর্ব্বে হইত একটি পূজা, সেই পাড়ায় এবার হইয়াছে দশটি পূজার ব্যবস্থা এবং যেখানে পাড়ার গৃহস্থকে চাঁদা দিতে হইত এক টাকা, সেখানে এবার তাঁহাকে দিতে হইয়াছে অন্তত ৫৲ টাকা! আয় সীমাবদ্ধ—কিন্তু ব্যয় ক্রম-বর্দ্ধমান! ছাত্র-সমাজের করুণা ভিক্ষা করি আগামী বৎসরের জন্য।

চীনের অধিবাসীদের কাছে চা-টা যেমন তেমন করে পেয়ে শুধু একটু তৃপ্তি লাভ করার বস্তু নয়, চা-পান তাঁদের কাছে একটি বিশিষ্ট অনুষ্ঠান এবং এই অনুষ্ঠানের নিয়ম-কানুন তাঁরা সবাই যথেষ্ট শ্রদ্ধা এবং যত্নের সঙ্গে পালন করেন। চীনবাসীদের চা পানের পদ্ধতিও একটু স্বতন্ত্র। তাঁদের চায়ের কাপে কোনো হাতল থাকে না, কিন্তু একটা ঢাকনা দেওয়া থাকে। এই কাপেই চায়ের পাতা ভেজানো হয়, চা-তে দুধ বা চিনি মেশানো হয় না। একটি আঙুল দিয়ে অতি সন্তর্পণে কাপের ঢাকনাটি ঈষৎ উন্মুক্ত করে তা থেকে চা পানের অভ্যাসটি আয়ত্ত করা বেশ একটু শক্ত এবং সময় সাপেক্ষ। প্রথম কাপের চা ফুরিয়ে গেলে অতিথিকে আবার চা এনে দেওয়া হয় বটে কিন্তু এই দ্বিতীয় বারের চা-কে অতিথির প্রতি বিদায় নিতে বলার গৌণ এবং বিনীত ইঙ্গিত বলেই মনে করা হয়। চীনবাসীরা সাধারণত স্বল্পভাষী। কথার চেয়ে মনের ভাব তাঁরা আকারে ইঙ্গিতেই বেশি ব্যক্ত করেন। তাই চা শুধু পানীয় হিসেবেই তাঁদের কাছে প্রিয় নয়, প্রীতিসম্ভাষণ, আদর আপ্যায়ন বা অন্তরঙ্গতার ইঙ্গিতও চায়ের মারফতেই প্রকাশ করা হয় ব'লে তাঁদের সামাজিক জীবনে চা অপরিহার্য। চল্লিশ কোটি চীনবাসী দিবারাত্র সমানে চা পান করেন, চা তাঁদের কাছে অফুরন্ত তৃপ্তি ও আনন্দের উৎস।

চীনের পথেঘাটে সর্বত্র চায়ের দোকান দেখতে পাওয়া যায়, এগুলোকে চীন দেশে বলা হয় "কোয়ণ্ড"। প্রত্যেকটি কোয়ণ্ড-এর বাঁধা খদ্দের আছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দলের খদ্দেররা চায়ের দোকানে এসে মিলিত হন, কেট্‌লির জল তাই সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ফুটতেই থাকে।

মধ্যভারতে সাত দিন

শ্রীভবদেব শর্ম্মা

২

ত্রিবিক্রমের মূর্ত্তি—রামটেক

আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য প্রাচ্যবিদ্যাসম্মেলনে যোগদান। আমাদের নাগপুরে পৌঁছানর তৃতীয় দিনে ২রা কার্ত্তিক শনিবারে ইহার অধিবেশনের আরম্ভ হয়। উপর্য্যুপরি তিনটি দিন দুই বেলাই এই অধিবেশন চলিতে থাকে। মূলসভার উদ্বোধন ও সমাধানের অনুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ের ও টাটা-প্রাসাদ-সংলগ্ন এক প্রকাণ্ড সজ্জিত মণ্ডপে সম্পন্ন হয়। সম্মেলনের কর্মসচিবগণ, তাঁহাদের সহকর্ম্মিগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণের ঐকান্তিক অক্লান্ত উদ্যোগ ও সহজ সৌজন্যে এই উভয় বৃহৎ ব্যাপারই সৌষ্ঠব ও নিয়মানুবর্ত্তিতার সহিত পূর্ণ হয়। উভয় দিনের অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে 'বন্দে মাতরম্' জাতীয় সঙ্গীতের প্রথমার্দ্ধ গীত হয়—প্রথম দিনে মহারাষ্ট্রীয় বালিকাগণ কর্ত্তৃক, শেষ দিন করাচীর এক কলাবিদ্ গায়ক কর্ত্তৃক। এই গীতানুষ্ঠানে গানটির কোমল মাধুর্য্য ও ভক্তিবিহ্বলতার কিছু হানি হইয়াছিল বলিয়া আমাদের কাণে লাগে। এই গানই প্রবাসী-বাঙ্গালী-সমিতির গৃহে বাঙ্গালী গায়কের কণ্ঠে যখন শুনিয়াছিলাম তখন তাহা প্রশস্ত ও উদ্দীপনাময় বলিয়া বোধ হইয়াছিল। হয়ত 'ভিন্নরুচির্হি লোকঃ' এই কারণেই আস্বাদ-তারতম্য। সম্মেলনের (সামাজিক) দিকটাই সর্ব্বসাধারণের উপলব্ধির জিনিষ, সেই প্রসঙ্গে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের আদর-আপ্যায়নের ভূয়সী প্রশংসা শুনা গিয়াছিল। যাঁহারা সম্মেলনের তেরটি অধিবেশনের মধ্যে অনেক কয়টিতে যোগদান করিয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বসাধারণের আন্তরিকতার (হার্দ্দিকতার) ইহাকে শ্রেষ্ঠ আসন দিতে কুণ্ঠিত হন নাই। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি নাগপুর হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার (Vice-Chancellor) শ্রীবাসুদেব রামচন্দ্র পুরাণিকজীর হিন্দুস্থানীতে প্রদত্ত ভাষণ (১) দেশকালোপযোগী ও মনোজ্ঞ হইয়াছিল। ইঁহার আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠা সম্মেলনের মুখ্য ও অঙ্গ প্রত্যেক অনুষ্ঠানে যোগদানে প্রকাশ পাইয়াছিল। মধ্য-প্রদেশের প্রধান মন্ত্রী আদরাস্পদ পণ্ডিত রবিশঙ্কর শুক্ল মহোদয়ের জরুরী রাজকার্য্যে দিল্লী যাত্রার কারণে তাঁহার প্রতিনিধি মন্ত্রী হিন্দী সাহিত্যে সুকবি বলিয়া প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রজীর সুললিত ওজস্বী হিন্দীতে লিখিত উদ্বোধন-ভাষণ (২) অনবদ্য এবং তাঁহার ভাষণভঙ্গী সুষ্ঠু হইয়াছিল। সম্মেলনের 'প্রাচ্য' বিশেষণ লইয়া তাঁহার ইঙ্গিত ও কটাক্ষ অধিবেশনের পণ্ডিত-পরিষৎ শাখার সভাপতির সনির্ব্বন্ধ উক্তি ও যুক্তিতে বেশ একটু অনুরণনের সৃষ্টি করিয়াছিল। সভার অধ্যক্ষ (মূল সভাপতি) বয়োবৃদ্ধ ব্যবহারাজীব মহামহোপাধ্যায় পাণ্ডুরঙ্গ বামন কাণে মহাশয়ের অভিভাষণ সাধারণের বোধ্য হইয়াছিল অথচ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ ও সম্মেলনের কার্য্যকরী সূচীর বা অবশ্যসম্পাদ্য কার্য্যকলাপের উপস্থাপনে মূল্যবান্ হইয়াছিল। মহারাষ্ট্রীয় প্রতীচ্যশিক্ষাকোবিদ্ পণ্ডিতগণের তথ্যানুসন্ধান ও আনুপূর্বিক বিবরণসঙ্কলনে যে অবিসংবাদিত নৈপুণ্য আছে যাহার পরিচয় ইঁহার প্রাচ্যশাস্ত্রীয় বিষয় সমূহের গবেষণার প্রতিপর্ব্বে পাওয়া যায় তাহা অভিভাষণের প্রতিছত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সভায় এতাবৎকাল যে এগার জন ভারতীয় সুধী সভাপতি হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেই ইনি তৃতীয় মহারাষ্ট্রীয় সভাপতি। এক জন বাঙ্গালী (মহাঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী) ইতিপূর্ব্বে এই সম্মানের অধিকারী হইয়াছেন। আগামী অধিবেশনেও এক জন বাঙ্গালী সুধী (ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়) সভাপতিত্বে বৃত হইয়াছেন। তথ্য উপস্থাপন-প্রসঙ্গে অবান্তর খুঁটিনাটির অবতারণায় সভাপতির অভিভাষণ কিছু খাপছাড়া গোছের হইয়াছিল এবং মিতভাষিতার অভাবে কিছুটা ধৈর্য্যচ্যুতি ও বিরক্তির কারণ হইয়াছিল বলিয়া আশঙ্কা হয়। শুনিয়াছি, সভাপতি মহোদয় তাঁহার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় (যাহা তিনি ঘড়ি ধরিয়া পূর্ব্বে মিলাইয়া লইয়াছিলেন) অতিক্রম করেন নাই বলিয়া দীর্ঘতার অভিযোগ খণ্ডন করিয়াছেন। অভিভাষণে যেটুকু গুরু-লঘুর অনুপাত-রক্ষা, অন্তর্দৃষ্টি ও রসবোধের অভাব ছিল তাহা তাঁহার পিতামহোচিত

(১) তাঁহার ভাষণ হইতে উদ্ধৃত এই কয়টি সন্দর্ভ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য:—"হাম চাহাতেঁ হৈঁ কি যে ভাষায়েঁ হামারে বিবাহ যা মরণকে সিবায় অন্য অবসরোঁপর ভী কামমেঁ আবেঁ তো হমে চাহিয়ে কি হম উনকে গহনতম সৌন্দর্য্যকো প্রকাশ মেঁ লাবে ঔর উনকি আভা ইস প্রকারসে সংসারকে সম্মুখ রখেঁ কি বহ সরলতাসে উসে হৃদয়ংগম কর সকে।"—"মৈঁ তো যহ কহনেকা সাহস করতা হুঁ কি দেশকী সাম্প্রদায়িক সমস্যাএঁ ভী অন্তমেঁ ইসী প্রকারকী বিদ্বৎপরিষদোঁমেঁ হল হোগী।" "মুঝে বিশ্বাস হৈ কিঁ যদি ইস পরিষদ্‌কে ইস অধিবেশন মে নহী তো কমসে কম ইসকে আগামী অধিবেশন মেঁ জব ভারতীয় বিদ্বান্ অব কিসী ভারতীয় নগর মেঁ একত্রে হোকর ভারতীয় বিষয়োপর আপনে ভারতীয় বন্ধুওঁসে চর্চা করেংগে তো বহ চর্চা কিসী ভারতীয় ভাষাহী মেঁ হোগী।"

(২) "এই উদ্বোধন ভাষণের তিনটি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করা একান্ত প্রয়োজন:—ইস পরিষদকা মুখ্য উদ্দেশ্য ভারতীয় বাঙ্ময় সংস্কৃতকে বিভিন্ন অংগোঁপর প্রকাশ ডালনা তথা উসকে সম্বন্ধমে জনশ্রদ্ধা উৎপন্ন করনা হৈ।" "মেরা দৃঢ় বিশ্বাস হৈ কি ইস সময় উত্তর-ভারত তথা দক্ষিণ-ভারতকে ইতিহাসমে একসূত্রতা কা জো অভাব হৈ উসকা মূল কারণ ইস প্রান্তকে ইতিবৃত্ত কী খোজ মেঁ অসাবধানতা হৈ।"... সভা "মেঁ প্রান্তীয় সরকারকী ওরসে আপকো বিশ্বাস দিলাতা হূঁ কি ইস দিশা মেঁ আপ কো ভী উদ্যোগ করেংগে উসমে আপকী সভা উন প্রকারসে সহায়তা করনে কে লীএ প্রস্তুত রহেংগে।"

অমিত অমৃত স্মিতের দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল বলিয়া অনুভব করিয়াছি। বৃদ্ধতম হইলেও 'ষবিষ্ঠবৎ' তাঁহার কয় দিনকার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও উপাঙ্গ অনুষ্ঠান-কলাপে সশরীরে যোগদান সকলেরই উৎসাহবর্দ্ধন করিয়াছিল।

প্রতিনিধির সংখ্যা ন্যূনাধিক দুই শত ও স্থানীয় সুধীজনের সমাগম আশানুরূপই হইয়াছিল। প্রতিনিধিগণের মধ্যে জনকয়েক অভারতীয় ছিলেন, অল্পসংখ্যক ভারতীয় মহিলাকেও দেখা গিয়াছিল। ইঁহাদের মধ্যে এক জন কৃতবিদ্য ফরাসী পণ্ডিত ও এক জন বাঙ্গালী মহিলা সম্মেলনে প্রবন্ধ পড়েন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পুঁথি, প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক মুদ্রা, মূর্ত্তি, মন্দির ও মসজিদ সংক্রান্ত ও ইতিহাসের দিক দিয়া মূল্যবান চিঠিপত্রের সমাবেশে ভব্য এক নাতিক্ষুদ্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। ভাগবত-পুরাণের দশমস্কন্ধবর্ণিত কয়েকটি উপাখ্যান চিত্রে সংবদ্ধ করিয়া একখানি সুলিখিত রঙ্গীন পুঁথি, হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজ্যের পুরাতত্ত্ব বিভাগের চেষ্টায় কোণ্ডাপুরে নবাবিষ্কৃত খৃঃ দ্বিতীয় শতাব্দী ও তৎপরবর্ত্তী কালের মূর্ত্তি ও প্রচলিত অলঙ্কার প্রভৃতি উপকরণ যাহা সেখানকার পরিচালক মহোদয় কর্ত্তৃক ম্যাজিক লণ্ঠনযোগে সম্মেলনের এক সায়ংকালীন অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত ও বিশদীকৃত হইয়াছিল এবং রামটেকের লক্ষ্মণ-মন্দিরে প্রাপ্ত শিলালেখের (খণ্ডিত) ছাপ ইহার অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন মন্দিরে (Convocation Hall) এই শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়। সভামণ্ডপে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের জীবনের খতিয়ানে মূল্য লইয়া এক বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। সম্মেলনে নির্দ্ধারিত বোলটি বিভিন্ন শাখার অতিরিক্ত অঙ্গরূপে ভারতের ভাষা সমিতির (Linguistic Society) অনুষ্ঠানে, পণ্ডিত-পরিষৎ-শাখায় সামাজিক সংস্কারবিধানের সংস্কৃতে আলোচনায় এবং মজলিস-এ উলেমার ও ইসলামীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুসারে বর্ত্তমান ভারতের মুসলিম শিক্ষা-দীক্ষার হিসাব-নিকাশের পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধিবেশনের মত 'রসান্তর' বা রকমফেরে'র ব্যবস্থা ছিল।

আমোদ-প্রমোদের আয়োজনের তালিকায় স্থানীয় শ্রীনৃত্যনিকেতনের মনোমদ নৃত্যকলা, গীতগোবিন্দের কয়েকটি অষ্টপদী পদের মহারাষ্ট্রীয় ভঙ্গীতে এক স্বতন্ত্ররসবাহী অভিব্যঞ্জনা ও 'সীতা-স্বয়ংবর' 'সিন্ধুমুনির পুত্রহত্যা' প্রভৃতি খণ্ডনাট্যের মূক অভিনয়, তথা স্থানীয় ঐতিহ্যের সহিত ওতপ্রোত কবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের দুইটি অঙ্কের এবং মহাকবি ভাসের মনোজ্ঞ 'স্বপ্ননাটকে'র পূরাদস্তর অভিনয়ের ব্যবস্থা হইয়াছিল। 'মালবিকাগ্নিমিত্রের' অভিনয় সুষ্ঠু সম্পন্ন হয় নাই। 'স্বপ্নবাসবদত্তে'র অভিনয় কতক শ্রেণীয়, উচ্চস্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিবর্গেরও অজস্র প্রশংসা পাইলেও সর্ব্বজনমনঃপূত হয় নাই। বিশেষতঃ কোমল প্রাকৃত ভাষাকে বিকট বিকৃত সংস্কৃতে রূপান্তরীকরণে, অবিশুদ্ধ সন্ধিদোষদুষ্ট সংস্কৃত ভাষায় গানের একান্ত অনুপযোগী ভাবকে গানের পর্য্যায়ে গাওয়ায়, শ্লোকগুলির সুরলয়যোগে আবৃত্তিতে, সর্ব্বোপরি ভাবব্যঞ্জনার একান্ত অভাবে এই অভিনয়ে অভিনয়ের দিকটাই অধিক প্রকট হইয়াছিল। মধ্য-প্রদেশের কোন সরকারী কলেজের এক নাম-করা অধ্যাপকবন্ধুকে এ বিষয়ে নিজ মত অকুণ্ঠচিত্তে ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন, বাঙ্গালায় সংস্কৃত নাটকের যে সুষ্ঠু অভিনয় হয় তাহা কি অন্যত্র হইতে পারে? এই সরল স্বীকারোক্তিতে অথবা ব্যাজস্তুতির ভিতরে রহস্য কি ছিল বলিতে পারি না। আমরা আমাদের বাল্যে ও কৈশোরে সংস্কৃত নাটকাদির ও তাহার আনুষঙ্গিক সঙ্গীতরচনার যে ঐকান্তিক নিদর্শন নিজ গ্রামের সংস্কৃত-চর্চ্চার অঙ্গরূপে দেখিয়াছিলাম তাহা কালক্রমে 'স্বপ্নো নু মায়া নু'র কোটায় গিয়াছে। কিসে আর কিসে? আনন্দনিষ্যন্দী রূপকের রূপণে এ ঘোর বিপরিণাম শুধু দুঃখময় নহে—ইহাতে আদরের বস্তুর প্রতি ঘৃণা ও বৈমুখ্যের সঞ্চার হয়। তবে সুবিধার মধ্যে বিদগ্ধের সংখ্যা স্বল্প ও রুচি অনুসারে মাপকাঠী ভিন্ন—আর অরসিকের সমীপে রসনিবেদনেই বর্ত্তমান যুগের রসের যাচাই হইয়া থাকে। আসল ঝাঁপি প্রবন্ধ-নিবন্ধ ও আলোচনার ব্যাপারে এইটুক বলিয়া এই প্রসঙ্গ শেষ করিব—ন্যূনাধিক দেড় শত প্রবন্ধের মধ্যে ২৫।৩০খানি মূল্যবান্ ও উচ্চাঙ্গের ছিল। অন্ততঃ ১০।১২খানিতে স্থানীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি আলোচিত হয় এবং অন্ততঃ তিন খানিতে কালোপযোগী বিষয়ের (যেমন সগোত্র বিবাহ—যাহা লইয়া পণ্ডিত-পরিষৎ-শাখায় কয়েক প্রহর ধরিয়া জোর শাস্ত্রার্থ চলিয়াছিল এবং যাহা অবশেষে কেন্দ্রীয় পরিষদে বাদানুবাদের পর ভোটের সমর্থনে আইনে পরিণত হইতে চলিয়াছে, স্মার্ত্ত ধর্মলক্ষণের যুগোপযোগী কলেবর ও বৌদ্ধ-ধর্ম্মে জাতিভেদবিলোপের তথাকথিত সুফল অনুশীলন) সাধারণ মতিগতির দিক দিয়া উপস্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানের এই ration (নিয়মিত আহারের) যুগে সম্মেলনের এই ভোজ্য পরিবেশন সাধারণের উচ্চ স্তরের অন্তর্ভুক্ত করিতে দ্বিধা না হওয়াই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হইয়াছিল। অন্ততঃ সাধারণ প্রতিনিধিকে শুধু এই উদ্দেশ্য লইয়া নাগপুরে আসিলেও একেবারে হতাশ ও উত্ত্যক্ত হইয়া ফিরিতে হয় নাই, এমন কথা অসঙ্কোচে বলা চলে।

আমাদের কার্য্যতালিকায় মুখ্য-স্থান সম্মেলন অধিকার করিলেও নাগপুর ভ্রমণের সর্ব্বজনস্বীকার্য্য আকর্ষণ হইল রামটেক-দর্শন। সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক ঝামেলার (যাহাতে ইহাও একটা অঙ্গব্যাপাররূপে অন্তর্ভুক্ত ছিল) অপেক্ষা না করিয়া আমরা ভিন্ন ভাবেই পূর্ব্বাহ্নে ইহার দর্শনের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। অধিবেশনের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানের পূর্ব্বদিন পহেলা কার্ত্তিক (পহেলা আষাঢ় নহে) শুক্রবার প্রাতের দিকে আমরা ট্যাক্সিযোগে সহর হইতে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত এই তীর্থদর্শনের জন্য আশ্রম হইতে বাহির হই। দেড় ঘণ্টার মধ্যে আমরা পর্ব্বতের পাদদেশে আসিয়া হাজির হই। আশে-পাশের অধিত্যকার জনপদগুলি অতিক্রম করিয়া যখন পর্ব্বতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সুদৃশ্য রামজীর মন্দির ও তাহার এলাকায় অন্য দেবদেবীর মন্দির দৃষ্টিপথে পাইলাম তখন শিশুর মত আনন্দে প্রাণ নাচিয়া উঠিল। চারি দিকের অসাধারণ দৃশ্য-সুষমায় সমাহিত চিত্তে কবির 'বেলাবপ্রবলয়া পরিখীকৃতসাগরা' 'একপুরী বসুন্ধরা'র মত—রামজী এই রাজ্যে আধিপত্য করিতেছেন। আশেপাশে তেত্রিশ কোটি দেববর্গ; দৌবারিকগণের মত তাঁহার ভক্ত বানরগণ দ্বারে সমবেত। শতাধিক সহজসাধ্য সিঁড়ি পার হইয়া মন্দিরের বাহিরের প্রাঙ্গণে 'বরাহ-দরওয়াজা' অতিক্রম করিয়া পথে দেখিলাম একটি ক্ষুদ্র মসজিদ 'রাম রহিমকা জোড়া হৈ' এই প্রবচনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া উচ্চশিরে দণ্ডায়মান। নিকটে নাতিবৃহৎ স্বল্পপরিসর এক মন্দিরে অতিপ্রাচীন বিশালকায় আদি-কোলের (বরাহের) মূর্ত্তি। মনে পড়িল;—

ধুঁয়াধার, নর্মদা

"সমুদ্রকাঞ্চীসরিদুত্তরীয়া বসুন্ধরা মেরুকিরীটভারা।
দত্তাগ্রতো যেন সমুদ্ধৃতাভূত্তমাদিকোলং শরণং প্রপদ্যে।"

পাশের দিকে কৃষ্ণ-প্রস্তরে খোদিত দুই দেবতা—কৃষ্ণ ও কালী। দ্বিতীয় মহলে (ভৈরব দরওয়াজা) পার হইলে মারাঠা যুগের যুদ্ধচর্চ্চার সাজ-সরঞ্জামের নিদর্শনস্বরূপ ভগ্নাবশেষবহুল সীমান্ত—যাহার অন্তর্দ্দেশে হরিহরের যুগ্মমূর্ত্তি। আমাদের পাণ্ডাশ্রেণীর প্রদর্শক (guide) ইহাকে দশরথ-বশিষ্ঠের মূর্ত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। ভিতরকার বিশাল প্রাঙ্গণে পৌঁছিতে হইলে (গোকুল দরওয়াজা) পার হইতে হয়। এক কোণে ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া 'কবীর চবুতরা' বা কবীর-আসন। মূল মন্দির আটটি খোদিত প্রস্তরে গাঁথা শক্ত সমর্থ স্তম্ভের উপর মণ্ডপের মধ্যে বিরাজিত। সমস্তটা কৌটার মত কঠিন সরল পাথরের থাপে বেষ্টিত। আধুনিক নাগপুরের সম্পৎ ও সমৃদ্ধির মূল পুরুষ ভোঁশলাবংশীয় রঘুজী এখন হইতে প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরের সংস্কার ও বিকাশের কৃতিত্ব-গৌরব পাইয়া থাকেন। প্রধান দেবতা কাল কষ্টি পাথরের বিগ্রহে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র। চমৎকার নাটমন্দির ও ভিতরকার বিভব বিভূতি। মন স্বতঃই ভক্তিনত হয়। মন্দিরে দেবতার সান্নিধ্য ছাড়িয়া উঠিতে প্রবৃত্তি হয় না। সম্মুখে লক্ষ্মণজীর মন্দির—হরিদ্বার-হৃষীকেশে লক্ষ্মণজীর মূর্ত্তির পারিপাট্য ও জাঁকজমক না থাকিলেও এখানকার দেবতা ম্লান বা হতপ্রভ নহেন। এই লক্ষ্মণ-মন্দিরের এক দিকের ভিত্তি-প্রাচীরে খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর কলচুরিবংশীয় বলিয়া পরিচিত 'রামচন্দ্র' নামে অভিহিত সামন্তরাজের এক জরাজীর্ণ ক্ষটিত শিলালিপি হইতে প্রসঙ্গক্রমে এই পঞ্চক্রোশপরিক্রমার অন্তর্বর্ত্তী দেবদেবীগণের বিবরণ, তৎসংলগ্ন কুণ্ড (এখানকার প্রাদেশিক ভাষায় 'বাওলী'), রামতীর্থ, লক্ষ্মণতীর্থ, চক্রতীর্থ, পিতৃতীর্থ, হংসতীর্থ প্রভৃতি অষ্টমী তীর্থের (জলাশয়ের) ও অষ্টসিদ্ধি-মাতৃগণের সমাবেশ বিষয়ে বিশেষ উপযোগী তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। চত্বরে অষ্টভূজা মহিষমর্দ্দিনী, অষ্টাদশভুজা ভীমাকারা শক্তিমূর্ত্তি, মহাবীর মারুতি, সৌম্য সত্যনারায়ণ প্রভৃতি দেবের মন্দির এবং পার্শ্বের দেবকুলে চমৎকার শ্বেত-প্রস্তরে লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। শেষোক্ত মন্দিরের উপরিভাগে (রাম-ঝরোকা) (৩) সৌন্দর্য্যরসপিপাসু স্তিমিতসমাহিত দর্শকের কামনার ধন। চারি পার্শ্বের অগণ্য জলাশয় শ্যামল শস্যক্ষেত্র ও নির্ম্মল নীল আকাশকে মাথায় লইয়া তখন যে শান্ত আনন্দের বার্ত্তা বহন করিতেছিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করা দুরূহ। বাহিরের বেষ্টনীতে নৃসিংহদেবের সিন্দূরাকার দুই মূর্ত্তি ও ধূম্রেশ্বর মহাদেবের ধূম্র-প্রস্তরে লিঙ্গমূর্ত্তি। প্রবাদ—রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে উল্লিখিত শূদ্র তাপস শম্বুকের সাধনক্ষেত্রে তাহারই অন্তিম প্রার্থনা মত শ্রীরামচন্দ্র তাহার প্রস্তরীভূত দেহ হইতে শিবমূর্ত্তির উপাসনা তাঁহার উপাসনার পূর্ব্বকল্পরূপে নির্দ্দেশ করিয়া যান। কবি ভবভূতির বর্ণিত

---

(৩) রামঝরোকা অনেক রাম-মন্দিরের উপরিতলের বিশাল বিস্তৃত অঙ্গন যাহা হইতে ঝরোকার (বাতায়নের) মত সমস্ত দৃশ্য স্পষ্ট দেখা যায়। দাক্ষিণাত্যে (যেমন রামেশ্বরে) ঝরোকা নামটি পাদুকার প্রতিশব্দ।

পূর্বকথবৃত্তান্তে স্নিগ্ধশ্যাম দণ্ডকারণ্যের পরিসরের বর্ণনাও দিগন্ত-প্রসারিত অরণ্যরাজি পাই—এই স্থানে শৈব সাধনা বৈষ্ণবভক্তির সহিত যুক্ত হইয়াছে। ইহারই পরিক্রমায় জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের স্তিমিত শুভ্র শুক্ল মূর্ত্তি। কিছু দূরে বৌদ্ধ-সাধক নাগার্জ্জুনের গুহা সকলে মিলিয়া সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের নির্দ্দেশ করিতেছে। পর্ব্বতের অপরাংশে ভগবান্ বামনের অতিপ্রাচীন বিরাট্ ত্রিবিক্রমমূর্ত্তি (৪) (ত্রিবিক্রমং সর্ব্বগতং নমামি) যাহা ভগ্ন-বিকল হইলেও ভারতে অনন্যসাধারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। নাগার্জ্জুনের সংজ্ঞার সহিত নাগার্জ্জুন বা প্রাচীন বাকাটক বংশের রাজধানী নন্দিবর্দ্ধনের আকারগত সাদৃশ্য আছে;—আরও এই নাগার্জ্জুন গুহাসংলগ্ন জনপদেরও নাম নাগার্জ্জুন। গুহার ঐতিহাসিকত্বের আলোচনায় এই বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য। রামটেক-মাহাত্ম্য নামক গ্রন্থে (যাহার একখানি প্রাচীন পুঁথি স্থানীয় রাম-মন্দিরের গ্রন্থশালায় সংরক্ষিত আছে) এই তীর্থের বিবরণ মিলে। কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় এখানেও এক প্রকাণ্ড মেলা হয় ও পক্ষাধিক কাল স্থানীয় ভক্তগণের শুভাগমনে স্থান সরগরম হয় শুনিলাম। দৃশ্য-হিসাবে এখানকার শোভা পাহাড়ের পরিপার্শ্বে প্রকাণ্ড খিনসি ঝিল (Khinse tank) ও অন্যান্য ক্ষুদ্রতর জলাশয়ের কারণে বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে উন্নত প্রণালীর কৃষিকার্য্যে মাদ্রাজ, পঞ্জাব, সিন্ধু ও যুক্তপ্রদেশের মত এখানেও এই জলাশয়গুলি ক্ষেত্রসেচনে সহযোগিতা করিতেছে।

সাহিত্যের বহিরঙ্গ সম্বন্ধকে না জানিলেও রামটেকের সাহিত্যিকতার কোন হানি হয় না। তথাপি এখানে ইহা উল্লেখযোগ্য যে সাহিত্যিক পর্য্যটকের দৃষ্টিতে রামটেককে কালিদাসের অমর কাব্যে (মেঘদূতে) উপস্থাপিত রামগিরির সহিত অভিন্ন করিয়া প্রতিপাদন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। রামগিরি-স্বামীর পাদমূল হইতে প্রচারিত বাকাটকসম্রাজ্ঞী গুপ্তবংশের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ সম্রাট্ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার এক তাম্রপট্ট হইতে তিনখানি অলঙ্কার গ্রন্থে উদ্ধৃত যাহা সাম্প্রদায়িক (কিংবদন্তীকে নিবদ্ধ কালিদাস-কৃত) কুন্তলেশ্বরদৌত্য নামক কাব্যের উপর নির্ভর করিয়া কবি কালিদাসকে এই স্থানের সহিত সংশ্লিষ্ট করিবার প্রয়াসের বাস্তব ভিত্তি কতখানি তাহা লইয়া মতভেদ সহনীয়। মেঘদূতের রচনা পারিপার্শ্বিক পরিণতির দিক্ দিয়া রামায়ণকে উপজীব্য করিয়াই চলিয়াছে। টীকাকারগণের সাম্প্রদায়সিদ্ধ ব্যাখ্যায় চিত্রকূটকে রামগিরির যোগরূঢ় অর্থে গ্রহণ করিতে স্বতঃই পাঠকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। রামায়ণের চিত্রকূট বর্ণনায়ও রামাশ্রমের উল্লেখ আছে। স্নিগ্ধচ্ছায়াতরু, বর্ষায় প্রথম কূটজকুসুমধনি হয়, উত্তরমেঘে বর্ণিত ধাতুরাগ ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাক্ষ্যকে ওকালতীর নমুনা বলিয়া ধরা চলে। ভারত-শ্রেষ্ঠ কবিকে কাশ্মীর ও বাঙ্গালার অত্যুৎসাহী কাব্যানুরাগিগণের প্রয়াসের মত নিজ প্রদেশের কতক কালের পাকা বাসিন্দা করিয়া এই স্থানই তাঁহার কাব্য 'মেঘদূত' রচনার ক্ষেত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা—'যাহার আনুষ্ঠানিক অভিব্যক্তি নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কালিদাস-স্মৃতি-সমিতির রামটেকে এক স্তম্ভ স্থাপনের ঐকান্তিকতায় প্রকট হইতে যাইতেছে—শেষে বহ্বাস্ফোটের মত না পরিণত হয়। এই ব্যাপারে 'মেঘদূত' কাব্যের প্রথম শ্লোকের 'স্বাধিকারপ্রমত্ত' এবং 'অস্তংগমিত'-মহিমা' বিশেষণদ্বয়ের তাৎপর্য্য তথাকথিত বিরহী কবিকে তাঁহার কল্পনাসৃষ্ট যক্ষের স্থলাভিষিক্ত করিবার পক্ষে আপাত দৃষ্টিতে এক গুরুতর অন্তরায়। তর্কের খাতিরে না হয় বলা যায় যে রামটেকের রামগিরির সহিত তুলিত করা অসম্ভাব্য নাও হইতে পারে। তথাপি ইহাও সার্বজনীন স্বীকারের বস্তু যে, রামটেকের শান্ত, স্নিগ্ধ, সপ্রতিষ্ঠ পরিবেশ কালিদাসের মত সবল সংযত উন্নত প্রতিভার স্ফূর্ত্তি উদাত্তভাবাপন্ন হইলেও বিপ্রলম্ভরসের ধারায় সিক্ত 'মেঘদূতের' জনক মনে করিতে গেলে সহজ কল্পনার উপর বিষম অত্যাচার করা হয়। 'সেতুবন্ধ' নামক বিরাট্ প্রাকৃত মহাকাব্যকে কবি কালিদাসের মনে করা বরং চলে, কিন্তু স্থানীয় কিংবদন্তী অনুসারে দেব শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে চিরকাল রামের প্রতিশ্রুতি মত (বর্ষভোগ্য শাপের অবাধকে অতিক্রম করিয়াও এখানে কিছুকাল ধরিয়া কবির বসতি বা কবির ভাষায় 'তোমারি বিরহে রহিব বিলীন তোমাতে করিব বাস' এমনটা নিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি সাঙ্গ করাকে ও উপস্থাপিত পক্ষের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী যুক্তি বলিয়াই আমাদের মনে হয়।

ইতিহাসের নির্ব্বন্ধকে 'ইহো বাহ্য' বলিয়া সরাইয়া ধর্ম্মের দাবীকে হৃদয়ের অন্তস্তলে অথবা শিরোদেশে ধার্য্য (শিরোধার্য্য) করিয়া রাখিয়া সাধারণ পর্য্যটক এখানে যে অনাবিল আনন্দের সহজ ধারার উপলব্ধি করিয়া থাকেন তাহার কথাই আমাদের প্রতি-মুহূর্ত্তে মনে জাগিতেছিল। তরুলতাচ্ছন্ন গিরিরাজি, কাকচক্ষুর মত স্বচ্ছ জলের অসীম প্রসার, নয়নমনঃসন্তর্পণ দৃশ্যমালা সমস্ত পরিবেশকে এমন একটা ভক্তিশক্তির মাদকতায় বিভোর করিয়াছিল যে, ঠাকুরঘরের কোণটির মত এখানে হইতে নড়িতে ইচ্ছা হয় নাই—এখানে আসিয়া অবিচল অবিকল শান্তি মানব মাত্রেরই কাম্য। উচ্চতায় বারাণসীর বেণীমাধব দেবের ধ্বজা হইতে দৃষ্ট পারিপার্শ্বিকের দৃশ্যসম্ভার এখানে বর্ত্তমান—কিন্তু বারাণসী দৃশ্যের নিশ্বাসরোধী কোলাহল-বহুল ঘনতা এখানে নাই। কুতবমিনার হইতে দৃষ্ট যমুনার জলরাশির আভাস থাকিলেও এখানকার জলাশয়ে স্তিমিততা ও অমল গাম্ভীর্য্য বর্ত্তমান। তাজমহলের স্মৃতি বা বিস্মৃতির ঐশ্বর্য্য ও সম্পদের মহিমায় একটুও এখানে মিলে না। একবার মনের কোণে ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ ধৌলী পাহাড়ের কৌশল্যা-সরোবরের কথা-কাহিনীময় দৃশ্য রেখাপাত করিতেছিল। কিন্তু তাহার গুহ্য কামনাকলুষ শিখরপ্রত্যগ্র একাগ্রতার নামগন্ধ এখানে ছিল না।

তীর্থযাত্রা, বিদ্বৎসম্মেলন বা অবশ্য দ্রষ্টব্যের দর্শনেচ্ছা এ যাত্রায় পালা শেষ করিয়া ৫ই কার্ত্তিক প্রাতে নাগপুর হইতে বেঙ্গল নাগপুর লাইনের কলিকাতামুখী মেলে স্বদেশে রওনা হইলাম। গাড়ী গণ্ডিয়া, রায়পুর, বিলাসপুর পার হইয়া ব্রিটিশ ভারতের মধ্য-প্রদেশের অভিযান দিনান্তে শেষ করিয়া মধ্য-প্রান্তের করদ রাষ্ট্ররাজ্যের রায়গড়কে পথে রাখিয়া রাত্রিতে উড়িষ্যা প্রদেশের সম্বলপুর এলাকায় হাজির হইল। রাত্রিতে উড়িষ্যার ও তৎসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির সীমানা ও বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলের সিংহভূম প্রভৃতি দিয়া চক্রধরপুরের নিকট জঙ্গল পার হওয়া গেল।

(৪) দাক্ষিণাত্যে (যেমন মহাবলিপুরম্-এ) এবং বঙ্গদেশেও (যেমন ঢাকা মিউজিয়মে রক্ষিত মূর্ত্তিতে) বিষ্ণুর বামন-অবতারের লীলা দেখিতে পাই, কিন্তু এ মূর্ত্তি আকারে-প্রকারে তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

ধুম্রধারা

একটা প্রশ্ন চকিতের মধ্যে মনে দেখা দিল—যে দেশে আমরা সাত দিন কাটাইয়া আসিলাম, সেখানকার চাল-চলনে, বেশ-ভূষায়, আহার-বিহারে, সংস্কৃতি ও তাহার স্মৃতিতে, হিন্দী-ও-মারাঠা ভাষা-ভাষিগণের মূল বাসভূমির যে প্রভাব দীর্ঘ দিনের ইতিহাসে দানা বাঁধিয়াছে, এই ফিরিবার পথে পাওয়া দেশ ও জনপদগুলি— কলিঙ্গ, উৎকল, ধলভূমি প্রভৃতি কি সেই ভাবে তাহার জাতীয় চেতনাকে সাড়া দিয়াছিল ? যদি বর্ত্তমান অতীতের আংশিক প্রতীক হয়, ইহার উত্তর জটিল ব্যাপার নহে। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়—ইতিহাসও ইহার যথেষ্ট সমর্থন করে—যে, শেষোক্ত প্রদেশগুলির প্রভাব উত্তর-দক্ষিণ বহিয়া সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী স্থানের উপরই অধিকতর বিস্তৃত হইয়াছে। প্রভাতের তরুণারুণ যেথায় বাঙ্গালা-বিহার সীমান্তের দক্ষিণ-পশ্চিম ঘাটশিলা পার হইয়া ঝাড়গ্রামের মধ্য দিয়া বাঙ্গালার পরিচিত প্রান্তে আসিয়া গাড়ী প্রায় তিন ঘণ্টার মধ্যে হাওড়ায় পৌছিল। সে অনাসক্তি যোগের মন আর নাই। ভুল ভাঙ্গিয়াছে, এখন কাজ আর কাজ—খোড় বড়ি খাড়া—খাড়া বড়ি খোড়। যে যাহার স্বতন্ত্র কর্ম্মক্ষেত্রে, চিরাভ্যস্ত, ক্ষুণ্ণ প্রহত, নির্ব্বাচিত পথে ছুটিতেছে। অবসর নাই, অবিরাম স্রোতোগতি, হাওড়ার পুলের বা বারাণসীর বাঙ্গালীটোলার দশাশ্বমেধ গলির জনপ্রবাহের ধারা। অবসর মত ভ্রমণ যে বুদ্ধিজীবী মানবের সন্তর্পণ, সম্মোহন ও সংশোধন শিক্ষা, দীক্ষা ও অভিজ্ঞতার অপরিহার্য্য অমূল্য অঙ্গ তাহা বুঝিবার ও বুঝাইবার অবকাশ আসিল।

• • • •

নিশ্চিন্ত মনে বাহির হইয়াছিলাম—ফিরিয়াই প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ জীবনের জীর্ণ জর্জ্জর চিন্তা ও উদ্বেগের বাস্তব ভয়াবহ পরিস্থিতিতে নিক্ষিপ্ত হইলাম। ঘরে বাহিরে দুরন্ত বাত্যা-বিক্ষোভ—এমনটা যাহা কল্পনার চক্ষেও কোন দিন দেখি নাই। অবশেষে অনন্যগতি হইয়া শরণাগতের প্রপত্তিকে স্মরণ করিয়া আকুল ভাবে মনের মধ্যে ডাক দিলাম—'ত্বামাশ্রিতানাং ন বিপন্নরাণাম্।' বলিলাম—'বিশ্বনাথ! তোমার এই বিশ্বরাজ্যের গানের মহড়ায় সর্বকালীন সাবলীল অমর উদাত্ত রাগের মূর্চ্ছনা মন-প্রাণ ভরিয়া তুলুক।'

এম ডি ডি

অষ্ট্রেলিয়ায় এম, সি, সি দল :—

অষ্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংলণ্ড দল সিডনীতে দ্বিতীয় টেষ্ট খেলাতেও শোচনীয় ভাবে এক ইনিংস ও ৩৩ রাণে পরাজয় বরণ করে। এই খেলার রাণ-সংখ্যা স্বদেশে অষ্ট্রেলিয়ার সর্ব্বোচ্চ মোট রাণের রেকর্ড সৃষ্টি করে। যাদুকর ব্রাডম্যান এই খেলার পরে ১৭টি টেষ্ট সেঞ্চুরী ও ৮টি ডাবল সেঞ্চুরী সম্পাদন করে। ব্রাডম্যান প্রথম শ্রেণীর খেলায় এ যাবৎ মোট ৯৭ বার শতাধিক রাণ করিবার কৃতিত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। পঞ্চম উইকেটে জুটীতে অষ্ট্রেলিয়ার ৪০৫ রাণ এই খেলার অন্যতম রেকর্ড। ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক হ্যামণ্ড ম্যাককুলকে কট্-আউট করিয়া টেষ্ট খেলায় অমর খেলোয়াড় ডব্লিউ, জি, গ্রেসের ৩৯টি ক্যাচ ধরার রেকর্ডের সমকক্ষতা করে। চমৎকার বল করিয়াও অদৃষ্ট বিরূপ হইলে উইকেট পাওয়া যে কত অসম্ভব তাহা এই খেলায় বাইটের বোলিং হইতে স্পষ্ট বুঝা যায়।

পরবর্ত্তী ত্রয়োদশ খেলাটি নিউ সাউথ ওয়েলসের বিরুদ্ধে অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

ফেডারেল ক্যাপিটাল টেরীটরী অর্থাৎ নিউ সাউথ ওয়েলস দক্ষিণাঞ্চলীয় দলের সহিত এম সি সির দুই দিনব্যাপী খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। এম সি সির প্রথম জুটীতে হাটন ও ওয়াসব্রুক শতাধিক রাণ করে। বৃষ্টির জন্য খেলার গতি ব্যাহত হয় এবং শেষ পর্য্যন্ত অসময়ে খেলা বন্ধ হইয়া যায়।

রাণ-সংখ্যা :—

এম সি সি—৮ উইকেটে ৪৬৫ (হাটন ১৩৩, ওয়াসব্রুক ১১৫, কম্পটন ৭৬)

ফেডারেল ক্যাপিটাল—৪ উইকেটে ১১ (পোলাড ২৩ ওভারে ৪ রাণে ২টি উইকেট)

পঞ্চদশ খেলা :—

বেণ্ডিগো পল্লীদলের বিরুদ্ধে এক দিনের খেলায় এম, সি, সি ৭ উইকেটে জয়ী হয়।

রাণ-সংখ্যা :

বেণ্ডিগো—১৫৮ (স্মিথ ৪৩ রাণে ৬টি) এম সি সি—৪ উইকেটে ২০০ (গিব ৪৯, ফিসলক ৪১, এডরিচ ৬১)

ষোড়শ খেলা :—

মেলবোর্ণে তৃতীয় টেষ্ট খেলার ফলে অষ্ট্রেলিয়া 'এসেস্' রক্ষার গৌরব লাভ করে। অষ্ট্রেলিয়ার বোলার দ্বয় ম্যাককুল ও লিণ্ডওয়াল এবং নবীন ব্যাটা খেলোয়াড় মরিস্ শতাধিক রাণ করার গৌরব অর্জ্জন করে। অবশ্য পরাজয়ের গ্লানি সম্মুখে লইয়া ওয়াসব্রুক দ্বিতীয় দফায় ১১২ রাণ করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ও ইংলণ্ডকে অবশ্যম্ভাবী বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা করে। সাময়িক ভাবে বৃষ্টির জন্য মধ্যে মধ্যে খেলা বন্ধ রাখিতে হয় বলিয়া ৪৬ মিনিট খেলার গতি ব্যাহত হয়। পূর্ণ সময় খেলা হইলে মনে হয়, ইংলণ্ডকে আবার পরাজয়ের বোঝা মাথায় লইতে হইত।

রাণ-সংখ্যা :—

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩৬৫ (ব্রাডম্যান ৭৯, ম্যাককুল নট্ আউট্ ১০৪, এডরিচ ৫০ রাণে ৩টি; বেডসার ৯৯ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৫৩৬ (মরিস ১৫৫, লিণ্ডওয়াল ১০০, ট্যালন ৬২, বেডসার ১৭৬ রাণে ৩টি, এডরিচ ১৩১ রাণে ৩টি ও ইয়ার্ডলী ৬৭ রাণে ৩টি)

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৩৫১ (এডরিচ ৮৯, ওয়াসব্রুক ৬৭, ডুল্যাণ্ড ৬৯ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ৩১০ (ওয়াসব্রুক ১১২, ইয়ার্ডলী নট্ আউট্ ৫৩)

এই খেলার উল্লেখযোগ্য ঘটনা—অগণিত দর্শক সমাগমের চাপে স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগীয় মন্ত্রীর নির্দ্দেশে মাঠের প্রবেশ-পথ সমস্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

সপ্তদশ খেলা :—

কোবার্টে সম্মিলিত দলের বিরুদ্ধে তিন দিনব্যাপী অমীমাংসিত খেলায় ইভ্যান্সের উইকেট রক্ষায় যথেষ্ট উৎকর্ষের পরিচয় পাওয়া যায়। ৬০ ওভারের খেলায় সে চার জনকে কট্-আউট করে।

রাণ-সংখ্যা :—

সম্মিলিত দল—১ম ইনিংস—৩৭৪ (গার্ডিনার নট্ আউট্ ৯৪, মিলার ৭০, এডরিচ ৪০ রাণে ২টি)

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ১৪৫ (জনসন্ নট্ আউট ৮০)

এম সি সি—১ম ইনিংস—৯ উইকেটে ৩৫৩ (কম্পটন ১২৪, বা হার্ডষ্টাফ ৬০, ঈকীন ৫০, ল্যাভার ২৬ রাণে ৫টি)

অষ্টাদশ খেলা :—

টাসমানিয়াকে দুই দফা নির্দ্দিষ্ট তিন দিনের মধ্যে আউট করিতে না পারায় এম সি সি অবধারিত জয়লাভের গৌরবে বঞ্চিত হয়। বৃষ্টিপাতের ফলে দ্বিতীয় দিনের মধ্যাহ্ন ভোজের পরে আর খেলা সম্ভব হয় নাই। চতুর্থ উইকেট জুটিতে কম্পটন (১৬৩) ও হার্ডষ্টাফ (১৫৫) একযোগে ২৮২ রাণ করিয়া এই সফরে রেকর্ড করে।

রাণ-সংখ্যা :—

এম সি সি—৫ উইকেটে ৪৬৭ হার্ডষ্টাফ ১৫৫, কম্পটন ১৬৩, হাটন ৫১)

টাসমানিয়া—১ম ইনিংস—১০৩ (মারফেট নট আউট ৪৬, এডরিচ ২৬ রাণে ৪টি, ঈকীন ১৭ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ১২৯ (ঈকীন ৫১ রাণে ৪টি)

ঊনবিংশতি খেলা :—

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া বনাম এম সি সির চার দিনব্যাপী খেলার মীমাংসা হয় নাই। পর্য্যাপ্ত আলোকের অভাবে খেলা অসময়ে বন্ধ হইয়া যায়। এই খেলায় হ্যামণ্ড প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ৫০০০০ রাণ পূর্ণ করিয়া হবস, সাটক্লিফ, উলী, হেণ্ড্রেন প্রভৃতির সমকক্ষতা করে।

রাণ-সংখ্যা :—

এম সি সি—১ম ইনিংস—৫৭৭ (হ্যামণ্ড ১৮৮, ল্যাংগ্রীজ ১০০, হাটন ৮৮, ফিসলক ৫৭, ডুল্যাণ্ড ৬৭ রাণে ৪টি)

২য় ইনিংস—২ উইকেটে ১৫২ (হাটন নট আউট ৭২)

দক্ষিণ অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৪৪৩ (হ্যামেন্স ১৪৫, জেমস ৮৫, রাইডিং ৭৭, ডোস ১২৫ রাণে ৪টি ও হার্ডষ্টাফ ২৪ রাণে ৩টি)

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

বিশ্বশান্তি ও বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়—

যুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্যার সহিত বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্কের যে খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর হইতে রাশিয়ার সহিত বৃটেন ও আমেরিকার সম্পর্কের মধ্যে যে ঘূণ ধরিয়াছে তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরমাণবিক বোমা-সমস্যা লইয়া মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে যে মতদ্বৈধ স্বষ্টি হইয়াছে তাহাতে সমগ্র নিরস্ত্রীকরণ পরিকল্পনাই বানচাল হওয়ার আশঙ্কা উপেক্ষার বিষয় নয়। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নূতন রাষ্ট্র-সচিব জেনারেল মার্শাল মনে করেন যে, ইউরোপ ও সুদূর প্রাচ্যের শান্তিচুক্তি-সমূহ সম্পন্ন না হওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে আন্তর্জ্জাতিক মীমাংসা স্থগিত রাখা উচিত। তাঁহার এই উক্তি হইতে ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, এই সকল শান্তি-চুক্তি সম্পর্কে বৃহৎ রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে গুরুতর মতভেদ হওয়ার আশঙ্কা আছে। দ্বিতীয়তঃ, পরমাণবিক শক্তির আন্তর্জ্জাতিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন, "যতক্ষণ না সমষ্টিগত নিরাপত্তার ব্যবস্থা হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র একক অস্ত্র পরিত্যাগ আরম্ভ করিবে না বা সামরিক শক্তি হ্রাস করিবে না।" তাঁহার এই উক্তির সারবত্তা কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু তিনি এ কথাও বলিয়াছেন যে, পরমাণবিক শক্তির বিপুল ধ্বংসকারী ক্ষমতা যত দিন অনিয়ন্ত্রিত থাকিবে তত দিন মানব জাতি কিছুতেই নিজকে নিরাপদ মনে করিতে পারিবে না। খুবই সত্য কথা। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত পরমাণবিক শক্তির একমাত্র অধিকারী আমেরিকা এবং আমেরিকা গোপনে পরমাণবিক বোমা তৈয়ার ও সঞ্চয় করিতেছে। ইহাতে বিশ্বশান্তি বিপর্য্যস্ত হওয়ার কি কোন আশঙ্কা নাই? মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র হয় আশঙ্কা করে যে, রাশিয়া পরমাণবিক বোমার রহস্য ভেদ করিতে পারিয়াছে, না হয় একক পরমাণবিক বোমার অধিকারী থাকিয়া সমগ্র বিশ্বের উপর আধিপত্য করিতে চায়।

বৃটেন এবং আমেরিকার মধ্যে সামরিক ঐক্য রাশিয়ার মনে আশঙ্কা স্বষ্টি করিয়াছে। মার্কিণ প্রতিষ্ঠানের নিকট সস্তায় ইরাণের তৈল বিক্রয়ের জন্য এংলো-ইরাণিয়ান অয়েল কোম্পানী এবং ষ্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল কোম্পানীর মধ্যে যে চুক্তি হইয়াছে তাহার রাজনৈতিক গুরুত্বও রাশিয়া উপেক্ষা করিতে পারে না। ইহা যে কেবল মাত্র বাণিজ্যিক চুক্তি পার্লামেণ্টের বিদ্রোহী শ্রমিক-সদস্যরা পর্য্যন্ত তাহা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থ মার্কিণ অর্থনৈতিক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হয় পার্লামেণ্টের বিদ্রোহী শ্রমিক-সদস্যরা তাহা চান না। আমেরিকা ধীরে ধীরে মধ্য-প্রাচ্যে তাহার অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য বিস্তার করিতেছে। পার্লামেণ্টের বিদ্রোহী শ্রমিক-সদস্যরা উহা প্রতিরোধ করিতে চান। রাশিয়া উহার মধ্যে দেখিতেছে, ইঙ্গ-মার্কিণ যৌথ সাম্রাজ্যবাদ। বৃটিশ পররাষ্ট্র নীতি রাশিয়ার মনে এইরূপ আশঙ্কা স্বষ্টি করিয়াছে যে, বৃটেন রাশিয়া অপেক্ষা আমেরিকার সহিতই মৈত্রী রক্ষা করিতে চায়। এইরূপ আশঙ্কা করিবার বহু কারণ আছে। বৃটেনের প্যালেষ্টাইন নীতি যে আমেরিকার দ্বারা প্রভাবিত, ইহা জানা কথা। কিন্তু ফিল্ড-মার্শাল লর্ড মণ্টগোমারী রাশিয়ার মনোভাব পরীক্ষা করিবার জন্যই রাশিয়ায় গিয়াছিলেন। তাঁহার রাশিয়ায় যাওয়ার ফল কি হইয়াছে জানা যায় না। কিন্তু ইঙ্গ-রাশিয়ান চুক্তিকে আবার ঝালাই করিবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

পরাজিত শত্রুদেশের সহিত সন্ধি—

১০ই ফেব্রুয়ারী প্যারী নগরীতে ইটালী, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগেরিয়া এবং ফিনল্যাণ্ড সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে। দ্বিতীয় বিশ্বসংগ্রামের পর এই প্রথম সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হওয়ায় নাৎসী জার্ম্মাণীর পাঁচটি অনুবর্ত্তী রাষ্ট্রের সহিত শান্তি স্থাপিত হইল। এই সন্ধিপত্রের সর্ত্ত-সমূহ লইয়া নূতন করিয়া আজ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। ইটালী ছাড়া আর প্রায় সকলেই এই সন্ধির সর্ত্তে সন্তুষ্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইটালীর নিকট যে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ রাশিয়া দাবী করিয়াছিল তাহা অপেক্ষা কম, কিন্তু বৃটেনের দাবী অপেক্ষা বেশী ক্ষতিপূরণ ধার্য্য হইয়াছে। যুগোশ্লাভিয়া ত্রিয়েস্তকে তাহার অঙ্গীভূত করিতে পারে নাই, কিন্তু ইটালীও ত্রিয়েস্ত পাইল না। গ্রীক-বুলগেরিয়া সীমান্ত পরিবর্ত্তনের জন্য গ্রীসের দাবী গ্রাহ্য হয় নাই। কিন্তু বুলগেরিয়া গ্রীসের নিকটবর্ত্তী সীমান্তে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবে না। ইটালীর সহিত আলবেনিয়ার সন্ধি বহাল থাকিবে বটে, কিন্তু আলবেনিয়া ইটালীর সহযোগী রাষ্ট্র বলিয়া গণ্য হইবে না। কিন্তু এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি অপেক্ষা জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধিই বড় সমস্যা স্বষ্টি করিয়াছে। এই দুইটি রাষ্ট্রের সহিত সন্ধি-সর্ত্ত রচনা এখনও বাকী রহিয়াছে। লণ্ডনে বর্ত্তমানে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র সচিবদের স্পেশ্যাল ডেপুটীগণ সমবেত হইয়া জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধির খসড়া তৈয়ার করিতেছেন। অতঃপর ১০ই মার্চ্চ মস্কোতে বৃহৎ পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলনে এই খসড়া অবলম্বনে সন্ধির সর্ত্তাবলী রচিত হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যেই জার্ম্মাণীকে লইয়া গুরুতর মতভেদ স্বষ্টি হইয়াছে। অষ্ট্রিয়ার সহিত সন্ধি লইয়া তেমন মতভেদের কোন আশঙ্কা দেখা যাইতেছে না। অষ্ট্রিয়ার স্বাধীনতা সম্বন্ধে সকলেই প্রায় একমত। জার্ম্মাণীর সহিত অষ্ট্রিয়া কোন ব্লক গঠন করিতে পারিবে না, সে সম্বন্ধেও মতভেদের

কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। তবে অষ্ট্রীয়ায় হ্যাপসবার্গ রাজ-বংশের শাসন পুনরায় আর প্রতিষ্ঠা করিতে পারা যাইবে না বলিয়া আমেরিকা যে প্রস্তাব করিয়াছে বৃটেন তাহাতে সম্মত নয়। সীমান্ত সম্বন্ধে অষ্ট্রীয়ার দাবী লইয়াও কঠিন সমস্যা সৃষ্টি হইবে না। দক্ষিণ টাইরল লইয়া এবং যুগোশ্লাভিয়ার দাবী লইয়া সমস্যা আছে। কিন্তু জার্ম্মাণীতে কিরূপ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হইবে, তাহা লইয়া প্রথমেই মতভেদ হইয়াছে।

রাশিয়া এবং পূর্ব্ব-ইউরোপে তাহার অনুবর্ত্তী রাষ্ট্রসমূহ সংযুক্ত জার্ম্মাণ রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী। কিন্তু পশ্চিম-ইউরোপের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি জার্ম্মাণীতে ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে ইচ্ছুক। সংযুক্ত জার্ম্মাণ রাষ্ট্র হইলে কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট শক্তিশালী হইবে। কিন্তু ফেডারেল গবর্ণমেণ্ট কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল। জার্ম্মাণীতে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হয় ইহা ফ্রান্সের আদৌ কাম্য নয়। বস্তুতঃ, জার্ম্মাণ রাষ্ট্র কিরূপ হইবে ইহা লইয়া মস্কো সম্মেলনে প্রবল মতভেদ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই সম্ভাবনা এতই প্রবল যে, মস্কো সম্মেলন ব্যর্থ হইলে জার্ম্মাণীকে পূর্ব্ব-জার্ম্মাণী এবং পশ্চিম-জার্ম্মাণী এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত করিবার জন্য একটি পরিকল্পনাও পশ্চিম-ইউরোপের মিত্ররাষ্ট্রবর্গ গঠন করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। পূর্ব্ব-জার্ম্মাণ রাষ্ট্র থাকিবে রাশিয়ার তাঁবে আর পশ্চিম-জার্ম্মাণ রাষ্ট্র ইঙ্গ-মার্কিণ তাঁবে থাকিবে।

ইন্দোচীন ও ফ্রান্স—

গত দুই মাস ধরিয়া ইন্দোচীনে ফরাসী সৈন্যবাহিনীর সহিত ভিয়েটনামীদের তুমুল সশস্ত্র সংগ্রাম চলিতেছে। কবে এবং কি ভাবে এই সংগ্রামের পরিসমাপ্তি হইবে তাহা কিছুই বুঝা যাইতেছে না। ভিয়েট্‌নামের শক্তি হ্রাস পাইতেছে বলিয়া হেনয়স্থিত ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের ধারণা. এইরূপ এক সংবাদ গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হেনয় হইতে প্রেরিত হইয়াছে। সামরিক কার্য্যকলাপ দ্বারা সন্ত্রাসবাদীদের মর্ম্মস্থল বিদীর্ণ করিবার পর অবিলম্বে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং এই অবস্থায় ইন্দোচীনে যে নূতন নেতৃত্বের অভ্যুদয় হইবে তাঁহাদের সহিত মীমাংসার আলোচনা চলিতে পারিবে, হেনয়স্থিত ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ আশাও প্রকাশ করিয়াছেন। ফ্রান্স হইতে ক্রমাগত নূতন সৈন্যবাহিনী ইন্দোচীনে প্রেরিত হইতেছে। সংগ্রামের প্রকৃত অবস্থা যদিও বুঝা যাইতেছে না, তথাপি ভিয়েট্‌নামীরা কিছু দুর্ব্বল হইয়া পড়া আশ্চর্য্যের বিষয় না-ও হইতে পারে। প্যারী হইতে ৬ই ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ, ভিয়েট্‌নাম রিপাবলিক গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে ইন্দোচীনে যুদ্ধ-বিরতির জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব করিয়াছে। এই প্রস্তাবে ১৯৪৬ সালের ৬ই মার্চ্চ তারিখে সম্পাদিত ফ্রাঙ্কো-ভিয়েটনাম চুক্তি অবলম্বনে আলাপ-আলোচনা চালাইবার অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু ফরাসী ঔপনিবেশিক সচিবের দপ্তরের মুখপাত্র বলিয়াছেন যে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যুদ্ধ-বিরতির প্রস্তাবকে গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না। কারণ, প্যারীস্থিত স্থায়ী প্রতিনিধি দলের প্রেসিডেণ্ট এই প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি যে এইরূপ প্রস্তাব করিবার জন্য হোচিন মিন গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, সে সম্বন্ধে নিশ্চয়তা নাই। কিন্তু ভিয়েটনামীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাইতে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের স্বীকৃত না হওয়ার প্রকৃত কারণ এই যে, ভিয়েটনামীরা যে হারিয়া যাইতেছে এবং আলাপ-আলোচনাই যে এখন তাহাদের রক্ষা পাইবার উপায়, উক্ত প্রস্তাবের মধ্যে এই সত্য পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ মনে করেন।

ফ্রান্সের রামাদিয়ের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ অভিমত অবশ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ভিয়েটনাম রিপাবলিকের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার সময় আসিয়াছে। গত ৭ই ফেব্রুয়ারী ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ রামাদিয়ের এক বিশেষ ইস্তাহারে ঘোষণা করিয়াছেন যে,ইন্দোচীনের পরিস্থিতি ও অবলম্বিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ইন্দোচীনের ফরাসী হাই-কমিশনার এডমিরাল দার্গেলিউকে প্যারীতে আহ্বান করা হইয়াছে। এক সংবাদে প্রকাশ, এডমিরাল দার্গেলিউ হয়ত পদত্যাগ করিতে পারেন। ইন্দোচীনে বর্ত্তমানে যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহার জন্য তাঁহার দায়িত্ব অবশ্যই কম নয়। ভিয়েটনামীদের জাতীয়তাবাদ এবং রাজনীতিকে তিনি কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত অন্ততঃ ফরাসী কম্যুনিষ্টদের দ্বারা প্রভাবিত বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন যে, আনামীদের সহিত মীমাংসার অর্থ আনাম ফরাসী ইউনিয়নের বাহিরে চলিয়া যাইবে অথবা ইন্দোচীনে ফ্রান্স সামরিক ঘাটি হইতে বঞ্চিত হইবে। তাঁহার এই অভিমত যে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদেরই অভিমত তাহাতে সংশয় নাই। ভিয়েটনামীদের সহিত আলাপ-আলোচনা চালাইবার জন্য ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কি ব্যবস্থা করেন তাহা অবশ্য শীঘ্রই বুঝিতে পারা যাইবে। কিন্তু ফ্রান্স ভিয়েটনামীদের প্রতিরোধ আন্দোলন কিছুতেই দাবাইয়া রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। এক সংবাদে প্রকাশ, ভিয়েটনামীদের আক্রমণ প্রচণ্ড ভাবেই চলিতেছে। সম্প্রতি ইন্দোচীনের অবস্থা সম্বন্ধে কোন সংবাদ যাহাতে বাহিরে যাইতে না পারে তজ্জন্য ইন্দোচীনস্থ ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। ইহা হইতে ভিয়েটনামীদের প্রতিরোধ ব্যবস্থা যে খুব প্রবল তাহা অনুমান করিলে বোধ হয় ভুল হইবে না।

ভিয়েটনাম রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট বর্ত্তমানে কোথায় আছেন তাহা সঠিক জানা যায় না। কিন্তু হানয়ের নিকট কোন স্থান হইতে তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে, ফ্রান্স যদি শান্তিপূর্ণ উপায়ে বর্ত্তমান সংঘর্ষের মীমাংসা করিতে না পারে তবে ভিয়েটনাম মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিকট আবেদন করিবে। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দৃষ্টি আজ পর্য্যন্তও ইন্দোচীনের সংঘর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয় নাই। বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পোল্যাণ্ডের নির্ব্বাচন ব্যাপার লইয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত, স্পিট্‌স্‌বার্জ্জেন সম্পর্কে সোভিয়েট-নরওয়ের সন্ধি লইয়া তাহাদের দুর্ভাবনার অন্ত নাই। গ্রীক-যুগোশ্লাভ সীমান্তের ঘটনাবলী সম্বন্ধে তদন্তের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ একটি তদন্ত কমিশন পর্য্যন্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দোচীনের ব্যাপারে তাঁহাদের পরম ঔদাসীন্যই লক্ষিত হইতেছে। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিকট ভিয়েটনামের আবেদনের কি ফল হইবে তাহা অনুমান করিবার চেষ্টা আমরা করিব না। কিন্তু ভিয়েটনামীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য, ফ্রান্স ইন্দোচীনে যে আক্রমণ চালাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ এ পর্য্যন্ত কিছু করা প্রয়োজন বলিয়া মনে করেন নাই। পুরাতন লীগ অব নেশন্‌সের মতই বর্ত্তমান জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘও যে সাম্রাজ্যবাদীদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্যই তৎপর তাহা ইন্দোচীনের ব্যাপারে তাহাদের নীরবতা হইতে অনুমান করিলে ভুল হইবে কি?

প্যালেষ্টাইন-সমস্যা—

প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে নূতন পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন, আরব ও ইহুদী প্রতিনিধি দল তাহা সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন বলিয়া ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ। আরব প্রতিনিধিরা না কি খুব কড়া ভাষায় উক্ত পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করিয়া তাঁহাদের উত্তর মিঃ বেভিনের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। ইহুদী এজেন্সীর লণ্ডনস্থ হেড কোয়াটার হইতে আধা-সরকারী ভাবে বলা হইয়াছে যে, নূতন পরিকল্পনা মরিসন পরিকল্পনা হইতেও নিকৃষ্টতর। মরিসন পরিকল্পনা ইতিপূর্ব্বেই তাঁহারা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। ৭ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার রাত্রে প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে নূতন বৃটিশ-পরিকল্পনা আরব প্রতিনিধি দল এবং ইহুদী এজেন্সীর নিকট প্রেরণ করা হইয়াছিল। মেণ্ডেট-ব্যবস্থার মধ্যে উহা একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বলিয়া প্রকাশ। এই পাঁচ বৎসর পরে প্যালেষ্টাইনে একটি স্বায়ত্ত-শাসিত রাষ্ট্র গঠিত হইবে।

এই নূতন পরিকল্পনা প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করার ভিত্তিতে রচিত হয় নাই বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ উহা দ্বারা বিভক্ত প্যালেষ্টাইন এবং অখণ্ড প্যালেষ্টাইনের মধ্যে সামঞ্জস্য করিবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই পরিকল্পনায় প্যালেষ্টাইনকে আরব ও ইহুদীদের পাঁচটি অংশে বিভক্ত করার প্রস্তাব আছে। পাঁচ বৎসর পরে আরব এবং ইহুদীরা মূল রাষ্ট্র হইতে তাহাদের অঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন। প্যালেষ্টাইনের পর্য্যাপ্ত পরিমাণ অঞ্চল ইহুদীদিগকে দেওয়ার প্রস্তাব আছে। অন্ততঃ মরিসন পরিকল্পনায় ইহুদীদের জন্য যে পরিমাণ অঞ্চল দেওয়ার কথা আছে তাহা অপেক্ষা বেশী স্থান এই পরিকল্পনায় ইহুদীদিগকে দেওয়া হইয়াছে। প্যালেষ্টাইন পুলিশ-বাহিনী বিলোপ করা হইবে এবং ইহুদী-অঞ্চলগুলিতে নূতন ইহুদী প্রবেশের কোন বাধা থাকিবে না। দুই বৎসর পর্য্যন্ত মাসে ৪ হাজার করিয়া ইহুদী ইহুদী-অঞ্চলগুলিতে প্রবেশ করিতে পারিবে। আরব এবং ইহুদী প্রতিনিধি লইয়া একটি পরামর্শ পরিষদ (Advisory Council) গঠিত হইবে এবং কেন্দ্রীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে এই পরিষদ কাজ করিবেন। ট্রাষ্টীশিপের পাঁচ বৎসরের মধ্যে স্থায়ী শাসনতন্ত্র গঠনের জন্য একটি গণ-পরিষদ গঠন করা হইবে। ইহা খুব স্বাভাবিক যে, এই পরিকল্পনা কি আরব কি ইহুদী কাহারও পক্ষেই গ্রহণযোগ্য হয় না। ভারতীয় সমস্যা সমাধানের মত প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা সমাধানকেই শুধু অসম্ভব করিয়া তুলিতেছে। গত অক্টোবর মাসে প্যালেষ্টাইন সম্মেলন আহূত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বাধ্য হইয়া উহা মুলতুবী রাখিতে হইয়াছিল। প্যালেষ্টাইন সম্মেলনের মুলতুবী অধিবেশন গত ২৬শে জানুয়ারী আরম্ভ হয়। আরব প্রতিনিধিরা এই সম্মেলনে যোগদান করিলেও ইহুদী প্রতিনিধিরা উহাতে যোগদান করেন নাই, যদিও সম্মেলনের বাহিরে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ইহুদী এজেন্সীর আলোচনা হইয়াছে। আরব প্রতিনিধি দল সম্মেলনে নিজেদের পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছিলেন। ঐ পরিকল্পনা ব্যতীত কোন পরিকল্পনাই তাঁহারা গ্রহণ করিতে রাজী নহেন। ইহুদীরা হয়ত প্যালেষ্টাইনকে বিভক্ত করিতে অসম্মত না হইতে পারে, যদি প্যালেষ্টাইনের ইহুদী অংশে ইহুদী জাতীয় রাষ্ট্র গঠন করা হয়। কিন্তু নয়া বৃটিশ পরিকল্পনায় কাহারও কোন দাবীই পূরণ করা হয় নাই।

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ বেভিন না কি বলিয়াছেন, আরব অথবা ইহুদী কাহারও উপরেই জোর করিয়া কিছু চাপাইয়া দেওয়া হইবে না। অভিপ্রায় অবশ্য খুবই ভাল। কিন্তু বর্ত্তমান সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের ভার জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া ছাড়া উপায় থাকিবে না। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাসের পূর্ব্বে হইবে না। কিন্তু প্যালেষ্টাইনের আভ্যন্তরীণ সমস্যা ইতিমধ্যেই অত্যন্ত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ বন্ধ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। প্যালেষ্টাইন হইতে বৃটিশ অসামরিক নরনারীদিগকে অপসারণ করা হইয়াছে। সন্ত্রাসবাদীদিগকে বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে সমর্পণ করিবার জন্য ইহুদীদিগকে চরম-পত্র প্রদান করা হইয়াছে। এই সমস্তই একটা প্রবল ঝড়ের পূর্ব্বলক্ষণ। প্যালেষ্টাইন সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়াছে মধ্য-প্রাচীর তৈলের জন্য। বৃটিশ এবং আমেরিকা উভয়েই মধ্য-প্রাচীর তৈল আহরণে ব্যগ্র। পারস্য-উপসাগরের নিকটবর্ত্তী যে সকল তৈলখনি আছে সেগুলির পাইপ-লাইনের অধিকাংশ প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়ার ভিতর দিয়া গিয়াছে। কাজেই প্যালেষ্টাইনের উপর পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করাই বৃটেন ও আমেরিকার লক্ষ্য। এই পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব রক্ষা করিয়া প্যালেষ্টাইনের আরব ও ইহুদীদিগকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইতেছে না। কাজেই প্যালেষ্টাইন সমস্যার পরিণাম কোথায় যাইয়া গড়াইবে তাহা অনুমান করা সহজ নয়।

জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ ও দক্ষিণ-আফ্রিকা—

দক্ষিণ-আফ্রিকার জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ বর্জ্জন করা এবং দক্ষিণ-আফ্রিকা-প্রবাসী ভারতীয়দিগকে বিদায় করিয়া দেওয়া উচিত, এই মর্ম্মে দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে বিরোধী দল কর্ত্তৃক প্রস্তাব উপস্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন পার্লামেণ্ট এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে বটে, কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ প্রতিপালন করিবে, এইরূপ ভরসা করিবার কোন কারণ নাই। জেনারেল স্মাট দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ঘেটো আইনের রদ-বদল করা হইবে না, উহা যেমন আছে তেমনি থাকিবে। ঘেটো আইন ১৮৭৫ সালের লর্ড সেলিসবেরীর ঘোষণার বিরোধী। ঘেটো আইন দ্বারা ১৯১৪ সালের গান্ধী-স্মাট চুক্তি ভঙ্গ করা হইয়াছে। ১৯২৬ সালের কেপটাউন চুক্তি ভঙ্গ করিয়া ঘেটো আইন রচিত হইয়াছে। উহা জাতিপুঞ্জ সনদেরও বিরোধী। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে আলোচনা হইতে বুঝিতে পারা যায়, ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকা বিরোধ আপোষে মীমাংসা করিতে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ যে নির্দ্দেশ দিয়াছেন দক্ষিণ-আফ্রিকা কিছুতেই তাহা প্রতিপালন করিবে না। দক্ষিণ-আফ্রিকা কিরূপে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ অমান্য করিতে সাহসী হইতেছে তাহা বুঝা কঠিন নয়। জেনারেল স্মাটের দাবী আমরা জানি। তিনি চান, ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকার বিরোধ মীমাংসার ভার আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের হস্তে অর্পণ করা হউক। বৃটেন এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই জেনারেল স্মাটের এই দাবীর সমর্থক। জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের কার্য্যাবলী সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান মার্কিণ কংগ্রেসের নিকট যে রিপোর্ট পাঠাইয়াছেন

তাহাতেও জেনারেল স্মাটের দাবী তিনি সমর্থন করিয়াছেন। ভারতে যে-সকল ইংরেজ আছেন তাঁহারা মনে করেন, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘে তো ভারতেরই জয় হইয়াছে। কাজেই এখন ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকা বিরোধ মীমাংসার ভার আন্তর্জ্জাতিক আদালতের হাতে অর্পণ করিতে ভারতের আপত্তি করা সঙ্গত নয়। ভারত গবর্ণমেণ্ট অতঃপর কি করিবেন তাহা এখনও জানা যায় না; কিন্তু আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের রায় যদি জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নির্দ্দেশের বিরোধী হয়, তাহা হইলে অবস্থা আরও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। জেনারেল স্মাট ভারতীয়দের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করিবার উদ্দেশ্যে একটি ভারতীয় পরামর্শদাতা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। এই বোর্ডে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য ভারতীয়দের নিকট তিনি অনুরোধও জানাইয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের প্রতি যে অবিচার হইতেছে তাহার প্রতিকার এইরূপ বোর্ড গঠনের দ্বারা হইবে না। ভারত-দক্ষিণ-আফ্রিকা বিরোধ মীমাংসার জন্য আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে ভারত গবর্ণমেণ্ট যদি দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রস্তাব উপস্থিত করেন, তাহা হইলে দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট কি করিবেন, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা আবশ্যক।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নির্দ্দেশও দক্ষিণ-আফ্রিকা মানিতে প্রস্তুত নয়। জেনারেল স্মাট দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন পার্লামেণ্টে ঘোষণা করিয়াছেন, জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নির্দ্দেশ অনুযায়ী দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা সম্বন্ধে অছিগিরির খসড়া চুক্তি দক্ষিণ-আফ্রিকা গবর্ণমেণ্ট দাখিল করিবেন না। অছিগিরি সম্পর্কে জাতিপুঞ্জ সনদে যে নীতি ঘোষিত হইয়াছে তাহা প্রতিপালন করা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের অবশ্য কর্ত্তব্য হইলেও দক্ষিণ-আফ্রিকা এই কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতে অস্বীকৃত। দক্ষিণ-আফ্রিকা মেণ্ডেট প্রথা রহিত করিবার জন্য ভূতপূর্ব্ব লীগ অব নেশান্‌সের নিকট দাবী উপস্থিত করিয়াছিল। দুর্ব্বলতা ও অক্ষমতার জন্যই লীগ অব নেশান্‌সের অকালমৃত্যু হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু সেই দুর্ব্বল ও অক্ষম লীগ অব নেশান্‌সও মেণ্ডেট প্রথা বিলোপ করিতে দক্ষিণ-আফ্রিকার দাবী মানিয়া লয় নাই। নূতন জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ কি দক্ষিণ-আফ্রিকার এইরূপ প্রকাশ্য অবাধ্যতা স্বীকার করিয়া লইবে? জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ যদি এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়েও নিজের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সমর্থ না হয়, যদি অক্ষমতা ও ক্লীবত্ব প্রদর্শন করে, তাহা হইলে বিশ্বশান্তি রক্ষার ন্যায় সুবৃহৎ এবং দুঃসাধ্য কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে কিরূপে? দক্ষিণ-আফ্রিকা জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের প্রধান পরীক্ষা।

ইঙ্গ-মিশর আলোচনা ব্যর্থ হইল—

ইঙ্গ-মিশর আলোচনা শেষ পর্য্যন্ত ব্যর্থ না হইয়া পারিল না। ২৭শে জানুয়ারী বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন কমন্স সভায় ঘোষণা করিয়াছেন যে, ১৯৩৬ সালে সম্পাদিত ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সংশোধনের জন্য বৃটেন এবং মিশরের মধ্যে যে আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল, মিশর উহার সহিত সর্ব্বপ্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সমস্ত দায়িত্ব মিঃ বেভিন মিশরের আপোষ-বিরোধী মনোভাবের উপর চাপাইয়া ইহাও ঘোষণা করিয়াছেন যে, নূতন চুক্তি সম্পাদিত না হওয়া পর্য্যন্ত ১৯৩৬ সালের চুক্তিই বলবৎ থাকিবে। ঐ ২৭শে জানুয়ারী তারিখেই মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরশি পাশা প্রতিনিধি পরিষদে জানাইয়াছেন যে, ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সংশোধন সম্পর্কে মিশর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট বিচার-প্রার্থী হইবে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন যে, বৃটিশ সরকার সর্ব্বশেষ যে প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন তাহাতে মিশরের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হইবে না।

ইঙ্গ-মিশর আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার সংবাদ ঘোষিত হইলে কমন্স সভায় যেরূপ আনন্দ-ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল তাহাতেই এ কথা এক জন সাধারণ লোকের পক্ষেও বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, এই আলোচনা ব্যর্থ হওয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির সম্পূর্ণ অনুকূল হইয়াছে। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় বৃটেনের কোন ক্ষতি হয় নাই, মিশর সম্পূর্ণরূপে বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী হাতের মুঠার মধ্যেই রহিয়া গেল। মিশর ও সুদানের ঐক্য সম্বন্ধে মিশরের প্রধান মন্ত্রী নোকরশি পাশার উক্তি উল্লেখ করিয়া মিঃ বেভিন কমন্স সভায় বলিয়াছেন, "The first effect of this was to create a situation of extreme tension in the Sudan where numerically powerful parties favouring independence accused the British Government most bitterly of breaking thier pledge and selling them to Egypt." 'উহার (নোকরশি পাশার উক্তির) প্রথম ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, সুদানে অত্যন্ত গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। সুদানের শক্তিশালী সংখ্যাগুরু দলগুলি স্বাধীনতা দাবী করেন এবং তাঁহারা এই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন যে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সুদানকে মিশরের নিকট বিক্রয় করিতে চাহিয়া প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিতেছেন।' মিঃ বেভিন বিশ্ববাসীকে বুঝাইতে চাহিতেছেন যে, সুদানীরা মিশর হইতে পৃথক্ থাকিতে চায়। ১৮৯৫ সালে কমন্স সভায় গ্ল্যাডষ্টোন বলিয়াছিলেন, 'The Government is resolved not to remain in Sudan a day longer than is necessary.' 'প্রয়োজন অপেক্ষা এক দিনও বেশী সুদানে থাকিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছুক নয়।' আজ বাহান্ন বৎসর পরে দেখা যাইতেছে, বৃটেনের সেই প্রয়োজন শেষ হয় নাই, কবে যে সেই দিন আসিবে তাহা অনুমান করাও সম্ভব নয়।

মিঃ বেভিন বলিয়াছেন, সুদানের শক্তিশালী দলগুলি মিশর হইতে পৃথক্ থাকিতে চায়। কিন্তু প্রকৃত সত্য তিনি অনুক্তই রাখিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, সুদানে ছয়টি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল বটে, কিন্তু ঐ দলগুলি ঐক্যবদ্ধ হইয়া সুদান কংগ্রেস নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছে। শতকরা ৯০ জন সুদানী এই সুদান কংগ্রেসের সমর্থক। সুদান কংগ্রেসের প্রধান দাবী দুইটি: (১) সুদান হইতে বৃটিশ সৈন্যের অপসারণ, (২) মিশরের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তিতে সুদানের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ইহা আদৌ পছন্দ হইতেছে না। তাই তাঁহাদেরই অনুপ্রেরণায় সুদানে নূতন আর একটি দল গঠিত হইয়াছে। ইহার নাম উম্মা দল অর্থাৎ মাতৃভূমি দল। সুদানের ভূম্যধিকারিগণ এবং সরকারী উচ্চ কর্ম্মচারীদের লইয়া এই দল গঠিত হইয়াছে। এই উম্মা দলই বৃটিশ পরামর্শদাতা পরিষদের (The British Advisory Council) সমর্থক। তাঁহারা সুদানের পূর্ণ স্বাধীনতার ধ্বনি তুলিয়া সুদানী ও মিশরীয় কৃষক-শ্রমিকদের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছেন।

কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারা সুদানে বৃটিশ শাসনের স্থায়িত্বই চাহেন। কারণ, বৃটিশ চলিয়া গেলেই সুদান মিশরের অধীন হইবে, এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে।

মিশর সুদানের উপর আধিপত্য করিতে চায় না, নোকরশি পাশা এ কথা সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করিয়াছেন। ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক এবং রাজনৈতিক দিক্ হইতে মিশরের সহিত সুদানের ঐক্যও বিশেষ ভাবেই উপলব্ধি করা যায়। ১৮৯৯ সালে যে চুক্তি হয় তাহা দ্বারাও সুদানের উপর মিশরের সার্ব্বভৌমত্ব ক্ষুন্ন হয় নাই, উহা দ্বারা সুদানের শাসন পরিচালন ব্যবস্থাকে একটা বিশিষ্ট রূপ দেওয়া হইয়াছে মাত্র। মিশরের প্রদেশ সুদানকে একেবারে বৃটিশের হাতে সমর্পণ করার পরিবর্ত্তেই যে কনডোমিনিয়াম শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হয় তাহা লর্ড ক্রোমার ১৯০১ সালে স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৯০২ সালে ইটালীর সহিত এবং ১৯০৩ সালে ফ্রান্সের সহিত যখন সন্ধি হয় তখন ঐ সন্ধিপত্রদ্বয়েও সুদান যে মিশরের একটি প্রদেশ তাহা উল্লিখিত হয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদকে এই সকল বিষয় অবশ্যই বিবেচনা করিতে হইবে। নিরাপত্তা পরিষদে সিরিয়া এক জন সদস্য বটে। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে কয়েকটি আরব রাষ্ট্র সদস্য আছে। কিন্তু নিরাপত্তা পরিষদের নিকট কতটুকু সুবিচার মিশর পাইবে, তাহা অনুমান করা কঠিন। ওয়াফদ দল স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী।

ইঙ্গ-ব্রহ্ম মীমাংসার স্বরূপ—

১৩ই জানুয়ারী ব্রহ্ম প্রতিনিধি দলের সহিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের যে আলোচনা আরম্ভ হয় তাহার ফলে জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে একটি চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এবং ব্রহ্ম প্রতিনিধি দল ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে-সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন সেগুলি একটি শ্বেতপত্রের আকারে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী এবং লর্ড সভায় ব্রহ্ম-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স ২৮শে জানুয়ারী তারিখে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। এই সকল সিদ্ধান্তের কথা আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ব্রহ্ম প্রতিনিধি দলের ছয় জন সদস্যের মধ্যে উ স এবং থাকিন বা সীন এই দুই জন সদস্য এই চুক্তি-পত্রে স্বাক্ষর করিতে অস্বীকৃত হইয়াছেন। তাঁহারা যে-সকল কারণে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন নাই সেগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি কারণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য: (১) প্রস্তাবিত গণ-পরিষদ সার্ব্বভৌম প্রতিষ্ঠান হইবে না, (২) এক বৎসরের মধ্যে ব্রহ্মের স্বাধীনতা অর্জ্জন সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নাই এবং (৩) অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা ডোমিনিয়ন গবর্ণমেণ্টের মর্য্যাদার অনুরূপ হইবে না। চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিতে তাঁহাদের অস্বীকৃত হওয়ার উল্লিখিত তিনটি কারণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইঙ্গ-ব্রহ্ম মীমাংসার স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। বস্তুতঃ, উহা যে ভারতীয় আদর্শে ব্রহ্মদেশের সমস্যা সমাধানের প্রয়াস তাহা বুঝিতে কাহারও অসুবিধা হয় না। ব্রহ্ম প্রতিনিধি দলের নেতা জেনারেল আউঙ্গ সান যদিও আলোচ্য ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তিতে সম্মত হইয়াছেন তথাপি তাঁহাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, লণ্ডন আলোচনার আদৌ প্রত্যাশিত ফল লাভ হয় নাই। কিন্তু তিনি মনে করেন যে, এই আলোচনায় গ্রহণযোগ্য মীমাংসার সূত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে। কমন্স সভায় বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী এটলী এবং লর্ড সভায় ব্রহ্ম-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের বিবৃতি আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্রহ্ম গণ-পরিষদ যে শাসনতন্ত্র রচনা করিবেন তাহাই যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অনুমোদন করিবেন এমন কোন আশ্বাস তাঁহারা দেন নাই। লর্ড পেথিক লরেন্স শুধু একটু মাত্র বলিয়াছেন যে, "গণ-পরিষদ কর্ত্তৃক শাসনতন্ত্র রচিত হওয়ার পরই কালবিলম্ব না করিয়া পার্লামেণ্টে প্রয়োজনীয় আইন পাশ করিয়া লওয়াই আমাদের অভিপ্রায়।"

ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতি এবং ব্রহ্ম শাসন-পরিষদের সদস্যগণকে আলোচনার জন্য বিলাতে আমন্ত্রণের কথা গত ২০শে ডিসেম্বর প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলী কমন্স সভায় ঘোষণা করেন। এই আমন্ত্রণ পাইয়াই ব্রহ্ম প্রতিনিধি-মণ্ডলী বিলাতে গিয়াছিলেন। এই আলোচনার ফলে ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার পদ্ধতি এবং নূতন শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তিত না হওয়া পর্য্যন্ত অন্তর্ব্বর্ত্তী কালের শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে মীমাংসা প্রতিনিধিমণ্ডলীর অধিকাংশ সদস্য মানিয়া লইয়াছেন, তাহার প্রধান প্রধান বিষয়গুলিই শুধু এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে। শাসনতন্ত্র রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রধান মীমাংসা এই হইয়াছে যে, কেবল মাত্র বর্ম্মীদিগকে লইয়া বর্ম্মীদের ভোটে আগামী এপ্রিল মাসে একটি গণ-পরিষদ গঠিত হইবে। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্মদেশের সীমান্ত অঞ্চলগুলি এই গণ-পরিষদে যোগদান করিবে না। সীমান্ত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধি এই আলোচনায় যোগদান করেন নাই বলিয়াই এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে সন্দেহ নাই। সীমান্ত অধিবাসীদের অভিমত জানিবার ব্যবস্থা করা যখন সম্ভব হইয়াছে, তখন বিলাতের আলোচনায় তাহাদের প্রতিনিধি-দিগকে আমন্ত্রণ করিবার পক্ষে কোন বাধা ছিল না। লর্ড পেথিক লরেন্স যদিও এই উদ্দেশ্য প্রদর্শন করিয়াছেন যে, খাস ব্রহ্মের সহিত সীমান্ত অঞ্চলসমূহকে যুক্ত করাই তাঁহাদের নীতি, তথাপি তিনি বলিয়াছেন, "সীমান্ত অঞ্চলগুলি সম্পর্কে আমরা ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে অতি সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি।" ব্রহ্মের সীমান্ত অঞ্চল-সমূহের অধিবাসীদের ইচ্ছা এবং স্বাধীন সম্মতি ব্যতীত তাহাদের সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা অবশ্যই সঙ্গত নয়। কিন্তু তাহাদিগকে 'অতি সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি' দেওয়ার কথা শুনিয়া আশঙ্কা হয়, সীমান্ত অঞ্চলের সর্দ্দারদের দ্বারা, বিশেষ করিয়া শানরাজ্য সমূহের দ্বারা ভারতের দেশীয় নৃপতি-মণ্ডলী এবং মুসলিম লীগের ভূমিকা অভিনয় করাইবার অভিপ্রায়ই বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের রহিয়াছে। সীমান্ত অঞ্চলের সূত্র ধরিয়া খাস ব্রহ্ম এবং সীমান্ত অঞ্চল দুই অংশে ব্রহ্ম-দেশকে বিভক্ত করা হইবে, এইরূপ আশঙ্কা অমূলক মনে করিবার কোন কারণ নাই। ব্রহ্মদেশে সাম্প্রদায়িক সমস্যা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নাই বলিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা যে অসুবিধা অনুভব করিতেছিলেন, সীমান্ত অঞ্চল সমূহের সমস্যা তুলিয়া এই অসুবিধা দূর করিবার ব্যবস্থা হইল।

বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সহিত ব্রহ্মদেশের একটা মীমাংসা সম্ভব হইয়াছে বটে, কিন্তু এই মীমাংসার পর হইতে ব্রহ্মদেশে তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়াছে। ব্রহ্ম প্রতিনিধি-মণ্ডলীর লণ্ডন যাত্রার সময় ব্রহ্মের জনমত

দলানুগত্যনির্ব্বিশেষে সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহাদিগকে সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-ব্রহ্ম মীমাংসা সকল দলকে সন্তুষ্ট করিতে পারে নাই। সকল দলকে স্বমতে আনয়ন করা জেনারেল আউঙ্গ সানের পক্ষে সম্ভব না হইলে ব্রহ্মদেশেও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করিবার আশঙ্কা আছে। ইঙ্গ-ব্রহ্ম মীমাংসা আশানুরূপ না হওয়াই যে উহার মূল কারণ তাহা স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। বস্তুতঃ, কমন্স সভায় মিঃ এটলী মিঃ চার্চ্চিলকে আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন, 'We neither pay nor go," 'আমরা ব্রহ্মের জন্য অর্থব্যয়ও করিব না, ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া চলিয়াও আসিব না।' ইহাই ইঙ্গ-ব্রহ্ম মীমাংসার খাঁটি কথা।

চীনের গৃহবিবাদ ও আমেরিকা—

গত ২৯শে জানুয়ারী মার্কিণ রাষ্ট্র-দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীন গবর্ণমেণ্ট এবং চীনা কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালে গঠিত ত্রিশক্তি কমিটির সদস্য-পদ পরিত্যাগ করিয়াছে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এই ত্রিশক্তি কমিটি গঠিত হইয়াছিল। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট এই ত্রিশক্তি কমিটির সদস্য-পদ পরিত্যাগ করায় আপাত দৃষ্টিতে ইহাই বুঝা যায় যে, চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট এবং চীনা কম্যুনিষ্টদের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতার চেষ্টা হইতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট বিরত থাকিবেন। অন্য কোন শক্তি এই বিরোধ মিটাইবার জন্য প্রত্যক্ষ ভাবে চেষ্টা করেন নাই। কাজেই আমেরিকার পদত্যাগ দ্বারা ইহা বুঝা যাইতেছে যে, চীনের গৃহবিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যস্থতার অবসান ঘটিল।

উল্লিখিত ত্রিশক্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন জেনারেল জর্জ মার্শাল। গৃহযুদ্ধ বিরতির চুক্তি কার্য্যে পরিণত করা এবং চীনে সশস্ত্র বাহিনী পুনর্গঠন সম্পর্কে তত্ত্বাবধানের উদ্দেশ্যে এই কমিটির সদর কার্য্যালয় পিপিংএ প্রতিষ্ঠিত ছিল। চীনের জাতীয় পরিষদ কর্ত্তৃক চীন শাসনতন্ত্রের সংশোধিত খসড়া গৃহীত হওয়ার পূর্ব্বেই জেনারেল মার্শাল প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান কর্ত্তৃক আমেরিকায় আহূত হন এবং অতঃপর মিঃ বার্ণেসের পরিবর্ত্তে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্র-সচিবের পদ গ্রহণ করেন। জেনারেল মার্শাল মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব হওয়াতেই কি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীন সম্পর্কে এই নূতন নীতি গ্রহণ করিয়াছেন? এই নূতন নীতির তাৎপর্য্য কি? মার্কিণ বৃহৎ শিল্পপতিরা চীন দেশকে তাঁহাদের তৈয়ারী পণ্যের সুবৃহৎ প্রাইভেট বাজারে পরিণত করিতে চান। তাঁহাদের এই উদ্দেশ্য সাধনের পথে রাশিয়া যাহাতে কোন বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে না পারে তাহারই উদ্দেশ্যে বৃহৎ শিল্পপতিদের দ্বারা প্রভাবিত মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট সুদূর প্রাচ্যে রুশ-প্রভাব বিস্তারের প্রতিবেধকরূপে চীনকে 'বাফার ষ্টেট'রূপে ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক। চীনকে মার্কিণ মূলধনের নাগপাশে খুব শক্ত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিবার জন্যই হাজার হাজার ডলার মূল্যের যুদ্ধোপকরণ চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট আমেরিকা বিক্রয় করিয়াছে। আমেরিকা ইহা নিশ্চিতরূপে জানিত যে, এই সকল সমরোপকরণ চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিয়োজিত হইবে। চীনা কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিবার ফাঁকে ফাঁকে আপোষ মীমাংসার জন্য মধ্যস্থতা করিবার চেষ্টাও চলিতেছিল। মার্কিণ রাষ্ট্র-দপ্তরের এই নীতির জন্যই জেনারেল মার্শালের পূর্ব্ববর্ত্তী মেজর-জেনারেল প্যাট্রিক হার্লি কম্যুনিষ্টদের বিরুদ্ধে জেনারেল চিয়াং কাইশেককে নির্ব্বাধ সাহায্য করিতে পারেন নাই। ১৯৪৪ সালে তিনি যখন পদত্যাগ করেন তখন মার্কিণ গবর্ণমেণ্টের এই দ্বৈত নীতির তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। জেনারেল মার্শাল চীন দেশে মার্কিণ প্রেসিডেণ্টের বিশেষ প্রতিনিধি হওয়ার পর জেনারেল চিয়াং কাইশেকের শক্তি বৃদ্ধি করিবার নিরঙ্কুশ ব্যবস্থা হয় এবং চীনের গৃহবিবাদ প্রবলতর হইয়া উঠে। চীনের গৃহবিবাদে কুয়োমিণ্টাং দলকে আমেরিকার সাহায্য দান বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ না করিয়া পারে নাই। নিরাপত্তা পরিষদে পর্য্যন্ত রুশ-প্রতিনিধি চীনের গৃহবিবাদে মার্কিণ হস্তক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। কাজেই আমেরিকার পক্ষে দৃশ্যতঃ নূতন কোন নীতি গ্রহণ করা অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল।

অনেকে মনে করেন যে, চীনের ব্যাপারে রাশিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের কোন সম্ভাবনা আর নাই বলিয়াই আমেরিকা মধ্যস্থতা পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। চীন যে দ্বিতীয় স্পেনে পরিণত হইয়া উঠিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়ার পক্ষে এখন নিজের দেশের অধিবাসীদের ব্যবহার্য্য পণ্যের চাহিদা মিটাইবার জন্য ব্যাপৃত না থাকিলে চলিবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়ার জন্য বিশ্ব-শান্তি বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়া রাশিয়ার পক্ষে বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু ঠিক এই দ্বিতীয় কারণের অনুরূপ কারণের জন্যই আমেরিকাও চীনের গৃহবিবাদের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিতে চায়, এরূপ মনে করিলে ভুল হইবে না। চীনের নূতন রাষ্ট্রতন্ত্র সম্পর্কে বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন. "The constitution could have its dangers for the Kuomintang, if the latter is unable to consolidate its military and economic position during 1947." 'চীনের শাসনতন্ত্র কুয়োমিণ্টাং-এর পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিতে পারে যদি ১৯৪৭ সালের মধ্যে কুয়োমিণ্টাং সামরিক ও অর্থনৈতিক দিক্ হইতে সংহত না হইতে পারে।' ১৯৪৮ সাল হইতে নূতন শাসনতন্ত্র কার্য্যকরী হইবে। এই এক বৎসরের মধ্যে কুয়োমিণ্টাং তাহার সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তিকে সংহত ও শক্তিশালী করিয়া লইতে চায়। কম্যুনিষ্টদের সহিত চীনের কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের সংঘর্ষ যে ব্যাপক ও প্রবল ভাবে চলিতেছে সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদ হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই সংঘর্ষের সমস্ত দায়িত্ব চীনা গবর্ণমেণ্টের উপর ন্যস্ত রাখিয়া আমেরিকার পক্ষে যাহাতে কার্য্যকরী ভাবে সামরিক, আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য কুয়োমিণ্টাংকে দেওয়া সম্ভব হয় তাহারই জন্য মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট চীনের গৃহবিবাদে মধ্যস্থতা করিবার দায়িত্ব পরিত্যাগ করিয়াছেন।

ভারতের আবহাওয়া

কংগ্রেস

বৃটিশ শোষণ-নীতি ও কংগ্রেসের তোষণ-নীতির ফলে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু জাতির আজ প্রাণান্তকর অবস্থা। ৬ই ডিসেম্বরের বৃটিশ-ব্যাখ্যা কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছে, অর্থাৎ যতখানি হীনতা স্বীকার করা সম্ভব করিয়াছে। বৃটিশ এবং লীগ উভয়েই দেখিতেছেন, কংগ্রেসের মধ্যে হয় কোথাও গলদ আছে, না হয় তাঁহাদের মতের স্থিরতা নাই।

বজ্রকণ্ঠে কংগ্রেস বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের ব্যাখ্যাই চূড়ান্ত, অন্য কোন ব্যাখ্যাই তাঁহারা মানিবেন না, সেই কংগ্রেসই বৃটিশের ব্যাখ্যা অর্থাৎ লীগের ব্যাখ্যা স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁহারা যদি মনে করেন আরও একটু চাপ দিলে কংগ্রেসকে আরও কয়েক ধাপ নামিয়া আসিতে হইবে, তবে তাহা অস্বাভাবিক বলা চলিবে না। কংগ্রেস যদি মনে করিয়া থাকেন যে তাঁহাদের অহিংস নীতির জন্যই মন্ত্রী মিশন ভারতকে স্বাধীনতা দিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন, তবে তাহা মস্ত ভুল। অহিংস নীতিকে বৃটিশ গ্রাহ্য করেন না। অহিংস নিরীহ ব্যক্তিদের উপর গুলী চালাইতেও তাঁহারা পেছ-পা নহেন। বহু বার তাহার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

ওলিভব্রাঞ্চ হস্তে বৃটিশ যে আগাইয়া আসিয়াছিলেন, তাহার কারণ কংগ্রেস অহিংস নীতি নহে, সশস্ত্র বিদ্রোহ-ভীতি। আজ কংগ্রেসের যে পোজিশন, তাহার কারণ নেতাজী ও তাঁহার আজাদ হিন্দ ফৌজ, বিমান ও নাবিক-বিদ্রোহ, আগষ্ট আন্দোলন, টেররিষ্টদের ক্রান্তিমূলক কার্য্যকলাপ। কেন্দ্রীয় পরিষদের য়ুরোপীয়ান দলের নেতা মিঃ পি, জে, গ্রিফিথস এই কথা স্বীকারই করিয়াছেন,—"মন্ত্রী মিশন আসিবার পূর্ব্বে ভারত একটা বিপ্লবের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মন্ত্রী মিশন সে বিপদ একেবারে দূর না করিলেও উহাকে পিছাইয়া দিয়াছে।" গান্ধীজী ও কংগ্রেসের নেতারাও ইহা জানিতেন। বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আপোষের অস্ত্র হিসাবে সেদিন তাঁহারা সকলেই ইহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। আজ প্রয়োজন ফুরাইবার পর অহিংসার মাহাত্ম্য বড় করিয়া দেখাইতেছেন।

মধ্যবর্ত্তী সরকারের ভাইস প্রেসিডেণ্ট গণ-পরিষদে ভারতকে স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম বলিয়া ঘোষণা করিলেন। কিন্তু সে যে কি চীজ তাহা আমরা জানি না। কানপুরে ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিসের গুলী-বর্ষণ, মাদ্রাজে কাপড়ের কলের শ্রমিকদের শোভাযাত্রার উপর গুলীবর্ষণ, বোম্বাই প্রদেশে ভূমিহীন শ্রমিকদের উপর লাঠি ও বেয়নেট চার্জ জানুয়ারী মাসেরই ঘটনা। ইহাই কি স্বাধীনতার পূর্ব্বাভাষ? বৃটিশ সরকার ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে মহাত্মা গান্ধীকে জনসাধারণের শান্তিরক্ষার নামেই গ্রেপ্তার করিয়াছিলেন। আজ বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এবং মধ্যবর্ত্তী সরকারের পিছন হইতে সেই সাম্রাজ্যবাদী নিপীড়ন হস্তকেই দেখিতে পাইতেছি। অথচ জনসাধারণের শান্তিরক্ষার জন্য তাঁহারা অগ্রসর হ'ন নাই। বাঙ্গালা দেশের উপর দিয়া যখন সাম্প্রদায়িক ঝড় বহিতেছিল, তখন তাঁহারা নিশ্চেষ্ট ছিলেন। বেতার ও প্রচার-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেল অল ইণ্ডিয়া রেডিও হইতে সুভাষ জন্মতিথি সঙ্গীত অনুষ্ঠানের অনুমতি দেন নাই। সুভাষ জন্মতিথি সঙ্গীতকে তাঁহারা দল-প্রচার কার্য্য বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহারাই নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ রেডিও মারফত প্রচার করিয়াছিলেন! ইঁহাদের শাসনে কি ভাবে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাঞ্ছিত হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

লীগ

'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া'র মত বিস্তর গর্জ্জন করিয়া কংগ্রেস অবশেষে লীগের তোষণের জন্য বৃটিশ সরকারের ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা মানিয়া লইলেন, কিন্তু অভিমানিনীর মান ভাঙ্গিল কই? তাঁহারা তো এখনও গণ-পরিষদে যোগ দিতে স্বীকৃত হইতেছেন না! এক জন লীগ-কর্ত্তা তো পরিষ্কারই বলিয়াছেন যে, এখন যে পরিস্থিতি তাহাতে লীগ কখনই গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারে না। অবশ্য 'এখন' কথাটার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। কারণ তাঁহাদের এই মনোভাব সর্ব্বক্ষণের। গোড়াতে যাহা ছিল, এখনও তাহাই আছে। এক চুলও নড়চড় হয় নাই। মুসলিম লীগের অন্যতম পাণ্ডা লিয়াকৎ আলি খাঁ বলিতেছেন যে, কংগ্রেস বৃটিশ সরকারের পরিকল্পনা পূর্ণ ভাবে মানিয়া লয় নাই বলিয়াই মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগ দিতে পারিতেছে না। ৩নং খণ্ড গণ-পরিষদে বাঙ্গালা ও আসামের প্রতিনিধিরা ও ২নং খণ্ড পরিষদে পাঞ্জাব, বেলুচিস্থান, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের প্রতিনিধিরা সমবেত ভাবে ঐ দুই বিভাগের প্রত্যেক প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা রচনা করিবেন, ইহা কি কংগ্রেস মানিয়া লইয়াছেন?

কংগ্রেস বোধ হয় উত্তর দিবেন,—২নং ও ৩নং বিভাগের প্রদেশগুলি যদি সদস্যগণের সংখ্যাধিক্য অনুসারে ভোট লইয়া আপনাদের শাসন-ব্যবস্থা রচনা করিতে চায়, তাহাতে কংগ্রেসের তাহা মানিয়া লইতে কোনই আপত্তি নাই।

এই উত্তরে মুসলিম লীগ সন্তুষ্ট হইবেন না। তাঁহারা ভালরূপেই জানেন যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পাঠানরা লীগপন্থী নহেন; পাঞ্জাব অথবা আসাম লীগের যূপকাষ্ঠে বলি হইতে গররাজী। অথচ ইহাদের গ্রাস করিতে না পারিলে পাকিস্থান কেবল স্বপ্নই থাকিয়া যায়। লীগকে হাতে রাখিবার জন্য বৃটিশ সরকার এই ব্যবস্থারই নির্দ্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু লীগকে বাঁচাইবার জন্য তাঁহারাই ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কোন সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় জোর করিয়া শাসন-ভার চাপাইতে পারে না। সেই ব্যবস্থা অনুযায়ী যে প্রদেশগুলি সহযোগিতা অথবা গ্রুপভুক্ত হইতে চাহেন না তাহাদের জোর করিয়া সেকশনে বসিতে বাধ্য করা যায় না। কিন্তু লীগ তো ন্যায়ের অথবা গণতন্ত্রের ধার ধারে না। যেন-তেন প্রকারেণ স্বার্থসিদ্ধিই তাঁহাদের নীতি। প্রত্যক্ষ

সংগ্রামই হউক আর বৃটিশসিংহের পুচ্ছ ধরিয়াই হউক। ভবিষ্যতে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রয়োজন হইতে পারে এই উদ্দেশ্যেই বোধ হয় মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের সৃষ্টি। দেশে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিবারণ করিতে হয় তবে অঙ্কুরেই এই বিষবৃক্ষটির উচ্ছেদ অবশ্য কর্ত্তব্য। বাঙ্গালায় লীগ রাজ্য। এখানে কিছুই করিবার উপায় নাই। কিন্তু পাঞ্জাব অথবা আসামে লীগ এখনও জাঁকিয়া বসিতে পারে নাই। সুতরাং সেই দুই স্থানে এই প্রতিষ্ঠানটিকে সরকারী ভাবে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছিল, পরে আবার সেই নিষেধাজ্ঞা বাতিল করা হয়। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল তাহাও প্রত্যাহার করা হয়।

অবশ্য লীগ-কর্ত্তারা চটিয়াছেন এবং সাফাইও গাহিতেছেন। লিয়াকৎ আলি খাঁ বলিয়াছেন যে, মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের লোকেরা অতিশয় সজ্জন। রক্তারক্তি বা বে-আইনী কাজ-কর্ম্মের শত হস্ত দূরেও তাঁহারা কখনও যায় না। মুসলমানদের সঙ্ঘবদ্ধ করা ও বিপদ-আপদের সময় তাহাদিগকে সাহায্য করা ও তাহাদের মধ্যে শান্তিরক্ষা করা ভিন্ন ন্যাশনাল গার্ডের অন্য কর্ম্ম নাই। আর্ত্তের সেবাই তাহাদের একমাত্র ধ্যান, জ্ঞান।

যদি ইহাই সত্য হয়, তবে তাহাদের জন্য লোহার হেলমেট, লাঠি, ছোরা, বল্লম, ল্যাজা সরবরাহ করা হইতেছে কেন? ফিরোজ খাঁ নূন-প্রমুখ ব্যক্তিগণ খানাতল্লাসীতেই বা বাধা দিলেন কেন? ভিতরে আরও কোন রহস্য আছে বলিয়াই তো মনে হয়।

লিয়াকৎ আলি খাঁ বীরদর্পে ঘোষণা করিয়াছেন—"পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট সমগ্র মুসলিম লীগের সহিত শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পাগলামীর ফলে যাহা ঘটিবে, তাহার জন্য একমাত্র পাঞ্জাব গভর্ণমেণ্টই দায়ী।"

কি ঘটিবে তাহা আমরা জানি। তাহা এমনিতেও ঘটিত, এটা একটা অছিলা মাত্র। কায়েদ-এ-আজম তো বলিয়াছেনই যে, তোমরা প্রস্তুত হইয়াছ জানিলেই আমি নির্দ্দেশ দিব। সে নির্দ্দেশ কি, এবং তাহার ফল কত দূর মারাত্মক হইতে পারে তাহার পরিচয় সকলেই পাইয়াছেন। সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলস্বরূপ যে মুসলিমরা দুঃস্থ ও নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছে মিষ্টার জিন্না একবার গিয়া তাহাদের দেখিলেন না পর্য্যন্ত।

রাজন্যবর্গ

ভারতের ভাবী যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান সম্পর্কে নরেন্দ্র-মণ্ডলের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি বলিয়াছেন যে, এত দিন তাঁহারা বৃটিশ শাসনের সুশীতল ছায়ায় ছিলেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া এখন ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের তাঁবেদারী করিবেন না। মধ্যবর্ত্তী কালের অন্তে তাঁহারা হইবেন এক একটি সর্ব্বভৌম রাষ্ট্র। বৃটিশ-ভারতের নেগোশিয়েটিং কমিটির সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া যদি তাঁহারা ভাল বোঝেন তো যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিতেও পারেন; তবে যেটুকু ক্ষমতা দেশীয় রাজারা স্বেচ্ছায় কেন্দ্রের হস্তে দিবেন তাহার অধিক কিছুই কেন্দ্রীয় সরকার পাইবেন না। তাঁহারা যে আলাপ-আলোচনা করিবেন তাহার মধ্যে বাধ্যতামূলক কিছুই থাকিবে না। শাসনতন্ত্র প্রস্তুত হইবার পর ৫৬৭টি দেশীয় রাজ্যের প্রত্যেকে এ সম্পর্কে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন যোগদান করা চলিতে পারে কি না। পণ্ডিত নেহরু গণ-পরিষদের অধিবেশনে স্বাধীন ভারতের সাধারণতন্ত্রের যে খসড়া বানাইয়াছেন তাহার বিরুদ্ধে ইহারা বলিয়াছেন যে, তাঁহাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রকমেই হস্তক্ষেপের অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের থাকিবে না। অর্থাৎ তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতা যেমন চলিতেছিল সেই ভাবেই চলিবে।

গণ-পরিষদের ভবিষ্যৎ

গণ-পরিষদের এমন কোন ক্ষমতা নাই যাহাতে তাঁহারা এই সকল স্বেচ্ছাচারী অপদার্থ নৃপতিদের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনে বাধ্য করিতে পারেন। মন্ত্রী মিশন যে ভাবে কূট চাল চালিয়াছেন তাহাতে হয় রাজাদের আবদার মানিয়া লইতে হইবে না হয় ভারতের বুকে ৫৬৭টি আলষ্টার গড়িয়া বৃটিশের ঘাঁটী কায়েম করিতে দিতে হইবে। বৃটিশ-ভারতে 'বি' ও 'সি' বিভাগের ভাগ্য যেমন মুসলিম লীগের হাতে, তেমনি ভারতের এক-তৃতীয়াংশের ভাগ্য দেশীয় খামখেয়ালী নৃপতিদের হাতে। ইহাদের দাবী না মানিলে ভারতের দুই-তৃতীয়াংশ গণ-পরিষদের বাহিরে থাকিবে। গণ-পরিষদ যে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করিবে তাহা বড় জোর এক-তৃতীয়াংশের উপর প্রযোজ্য হইবে। গণ-পরিষদ-বহির্ভূত দুই-তৃতীয়াংশের উপর বৃটিশ শাসন অক্ষুন্ন থাকিবে। সুতরাং লীগ ও রাজন্যবর্গকে গণ-পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য ইহাদের সকল রকম অন্যায় ও অসঙ্গত আবদার কংগ্রেসকে মানিয়া লইতে হইবে। লীগের হুমকিতে কংগ্রেস ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা হজম করিয়াছেন, রাজন্যবর্গের চোখ-রাঙানীতে গণতন্ত্রের রদবদল করিতেও তাঁহারা পেছপা হইবেন না। প্রজাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, অথবা নিজেদের হীনতা কিছুই তাঁহারা গায়ে মাখিবেন না। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, নেগোশিয়েটিং কমিটিতে প্রজাদের প্রতিনিধি নাই। অথচ এই কমিটিই কথাবার্ত্তা চালাইবার অধিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। লীগের অথবা রাজন্যবর্গের এই সাহস কোথা হইতে আসিল তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। কংগ্রেস হয় ত না বুঝিবার ভাণ করেন। সাহস এবং বিপ্লবের পথ হইতে আজ তাঁহারা বহু দূরে সরিয়া গিয়াছেন। এখন গণ-পরিষদ এবং নিজেদের মসনদ বাঁচাইবার জন্যই তাঁহারা ব্যস্ত। তোষণ-নীতিই একমাত্র সম্বল। গাল-ভরা 'অহিংস' আখ্যায় জন-সাধারণ ভুলিবে না। অবশ্য অন্ধ ভক্তবৃন্দ বুঝাইবার চেষ্টা করিবেই যে, বৃটিশ সরকারকে ফাঁদে ফেলিবার এ-ও একটা প্যাঁচ। কিন্তু যাঁহারা নিজে চোরাবালিতে দাঁড়াইয়া, তাঁহাদের পক্ষে প্যাঁচ দেখাইবার পূর্ব্বে শক্ত মাটিতে উঠিয়া দাঁড়ানই বোধ হয় বিধেয়। ক্রমাগত তোষণের ফলে জনসাধারণ কংগ্রেসের উপর আস্থা হারাইয়া ফেলিতেছে। বৃটিশও ইহাই চায়। কংগ্রেস প্যাঁচ মারিতেছেন না, প্যাঁচে পড়িতেছেন। দেখা যাইতেছে, শেষ অবধি গণ-পরিষদে গৃহীত নেহরু-প্রস্তাব কেবল অর্থহীন বাক্যসমষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইবে।

পাঞ্জাব

পাঞ্জাব সরকারের হালচাল বোঝা ভার। পাঞ্জাবের প্রধান সচিব সার খিজির হায়াৎ খাঁ ২৬শে জানুয়ারীর বিবৃতিতে বলিয়াছেন যে, ২৪শে জানুয়ারী রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক-সঙ্ঘ এবং মুসলিম লীগের বিক্ষোভ প্রদর্শনের দিন তিনি লাহোরে ছিলেন না। অবশ্য দায়িত্ব এড়াইবার উদ্দেশ্যে নহে। কারণ ২৬শে এবং ২৮শের বিবৃতিতে তিনি স্বীকার

করিয়াছেন যে, পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িক শান্তি অক্ষুন্ন রাখার জন্যই উপুরোক্ত প্রতিষ্ঠান দু'টিকে বে-আইনী ঘোষণা করা হইয়াছিল। তাঁহার বিবৃতি সত্ত্বেও লীগপন্থীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ হয় নাই এবং ধৃত নেতাদের ছাড়িয়া দিলেও বিক্ষোভ প্রদর্শনকারীদের গ্রেপ্তার করা চলিতে ছিলই। প্রধান সচিব এবং অর্থ-সচিব উভয়েই বলেন যে, ঐ দুই প্রতিষ্ঠান অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছে বলিয়াই শান্তিভঙ্গের ভয়ে এই নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল। ২৮শে জানুয়ারী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়, কিন্তু যে কারণে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হইয়াছিল তাহা দূরীভূত হইয়াছে বলিয়াই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইল এমন কথা তিনি বলেন নাই। সমস্যার সমাধান তো দূরের কথা, উপস্থিত হইয়াছে নূতন পরিস্থিতি।

লীগ-নেতাদের গ্রেপ্তার এবং লীগদলীয় কোন প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অভিনব ঘটনা। চিরকাল কংগ্রেসের উপরই এই সকল ব্যাপার চলিত। প্রতিবাদে লীগপন্থীরা পাঞ্জাবে কংগ্রেসের অনুকরণে অহিংস আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। বাঙ্গালার মত পাঞ্জাবে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম চালাইবার দুঃসাহস তাঁহাদের নাই, কারণ সংগ্রাম একতরফা হইবে না, এবং সেখানে লীগ মন্ত্রিসভাও নাই। সেখানে কায়াদ-এ-আজমের কায়দা টিঁকিবে না, এবং সরকার দর্শক সাজিয়া নির্লিপ্ত হইয়া বসিয়া থাকিবে না।

করাচীতে লীগ ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনের প্রাক্কালে পাঞ্জাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সুযোগ দানের পিছনে অন্য কোন মতলব লুকাইয়া নাই তো? এই আন্দোলনের হুমকী দিয়া পাঞ্জাবে লীগ সচিব-সঙ্ঘ গঠন করিবার সুবিধা ও সুযোগ লাভ করাই কি আসল উদ্দেশ্য? কলিকাতায় নরমেধ যজ্ঞের পর বড়লাট মুসলিম লীগকে অন্তর্বর্ত্তী সরকারে যোগদান করিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করিলেন। নোয়াখালী, ত্রিপুরার লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ, হত্যা ও নারীহরণের ফলে বৃটিশ সরকারের, লীগের মনোমত ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ কি ফল তাঁহারা লাভ করিবেন তাহা বলা কঠিন, তবে কিছু একটা যে গূঢ় রহস্য পিছনে রহিয়াছে তাহা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

করাচী

করাচীতে মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবটি শঠতাপূর্ণ কৌশল এবং কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর কিছু নয়। কংগ্রেস পুনরায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট, মুসলিম লীগ ও জনমতকে বঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ১৬ই মে'র বিবৃতিতে গণ-পরিষদের প্রাথমিক অবস্থার কাজ ও ক্ষমতার যে সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, কেবল মাত্র কংগ্রেস দল লইয়া গঠিত গণ-পরিষদ সেই সীমা অতিক্রম করিয়াছে এবং তদ্দ্বারা সেকসনের ক্ষমতা ক্ষুন্ন হইয়াছে। এই ভাবে কংগ্রেস দল গণ-পরিষদকে এমন কিছুতে পরিণত করিয়াছেন, যাহা মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

ওয়ার্কিং কমিটি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিতেছে যে, মন্ত্রী মিশন প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক পরিকল্পনাকে বাতিল বলিয়া ঘোষণা করা হউক, কেন, না কংগ্রেস, শিখ এবং তপশীলিরা ১৬ই মে'র প্রস্তাব মানিয়া লয় নাই। ওয়ার্কিং কমিটির অভিমত এই যে, গণ-পরিষদের সিদ্ধান্তগুলি বে-আইনী এবং অবিলম্বে ইহাকে ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

করাচীর পরে

লীগের আলোচ্য করাচী প্রস্তাব ভারতীয় রাজনীতিতে একটি অতি জটিল সমস্যার সৃষ্টি করিয়াছে। নূতন গভর্ণমেণ্ট গঠনের প্রাক্কালে ২৩শে অক্টোবর লর্ড ওয়াভেল পণ্ডিত নেহরুকে নিশ্চয়তা দিয়াছিলেন, "তিনি (লর্ড ওয়াভেল) মিঃ জিন্নার নিকট পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, মুসলিম লীগ অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টে এই সর্ত্তে প্রবেশ করিতে পারিবে যে, তাহারা মন্ত্রী মিশনের ১৬ই মে'র পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহারা শীঘ্র লীগ কাউন্সিল আহ্বান করিয়া তাহাদের স্বীকৃতি আদায় করিবে।"

কিন্তু মিষ্টার জিন্না এই সর্ত্তের কথা অস্বীকার করিয়াছেন এবং ফাঁকটুকুর সুযোগ সম্পূর্ণ ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। মিঃ লিয়াকৎ আলি খান অন্তর্বর্ত্তী সরকারে প্রবেশ করিয়াই বলিয়াছিলেন—"আমরা কোন নিশ্চয়তা দিই নাই।"

লর্ড ওয়াভেল তখনও সতর্ক হন নাই। তাই মনে হয়, হয় এই ভুল ইচ্ছাকৃত, অথবা তিনি মিঃ জিন্নাকে বিশ্বাস করিয়া বেকুব বনিয়া গিয়াছেন। যেন-তেন-প্রকারেণ লীগকে অন্তর্বর্ত্তী সরকারে ঢুকাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনার দুই অংশ—অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট ও গণ-পরিষদ—অবিভাজ্য। একটিকে গ্রহণ করিয়া অপরটিকে অগ্রাহ্য করা চলে না। লীগ বলিতেছে, কংগ্রেস যদি মন্ত্রী মিশন পরিকল্পনা গ্রহণ না করিয়াই অন্তর্বর্ত্তী সরকারে থাকিতে পারে, তবে আমরা পারিব না কেন? এ ক্ষেত্রে বৃটিশ সরকারকে নূতন নির্দ্দেশ অথবা ব্যাখ্যা দিতে হয়। কিন্তু ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যায় এ সমস্যার সমাধান হয় নাই, বরং জটিলতারই সৃষ্টি হইয়াছে।

সমাধান হইতে পারিত যদি বৃটিশ সরকার লীগ-তোষণ নীতি ত্যাগ করিয়া কঠোর হইতে পারিতেন। কিন্তু সে সাহস লেবার গভর্ণমেণ্টের নাই। তাঁহাদের নিজেদের অবস্থাই টলটলায়মান। মিষ্টার জিন্না সেই সুযোগ লইয়া মনের সুখে গোল পাকাইতেছেন আর দিন গুণিতেছেন কবে চার্চ্চিলের দল ক্ষমতা লাভ করিবে।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখন গণ-পরিষদ বাতিল করিতে পারেন না। এখন হয় কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য, নতুবা অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট হইতে লীগের অপসারণ ছাড়া অন্য পথ নাই। শেষেরটারই সম্ভাবনা অধিক। ফলে ভীষণ আকারের সাম্প্রদায়িক অশান্তি! কংগ্রেসের এখন যা অবস্থা, তাহাতে বোধ হয় আর লীগ-তোষণ নীতি চালাইবার সাহস করিবেন না। অতএব গণ-পরিষদের ভবিষ্যৎ তিমিরাচ্ছন্ন।

মুসলিম লীগের করাচী প্রস্তাবের উত্তর বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এখনও দেন নাই। বোধ হয় আর কি ভাবে মিঃ জিন্নাকে সন্তুষ্ট ও শক্তিশালী করা যায় সেই চিন্তা করিতেছেন। এখনও হয়ত ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই কংগ্রেসকে নূতন করিয়া কি ভাবে চাপ দেওয়া যায়। গণতন্ত্রের মূল নীতি ধ্বংস না করিয়া মিষ্টার জিন্নার ষোল আনা আবদার পূর্ণ করা সম্ভব কি না সেই উপায় উদ্ভাবন করিতে বৃটেনের সমাজতান্ত্রিক মন্ত্রিসভার মাথার চুল পাকিবার দাখিল। এ দিকে লীগ যে যৌথ দায়িত্ব স্বীকার করেন না, তাহা সেদিন কেন্দ্রীয় পরিষদে মুলতুবী প্রস্তাবের সময় লীগ সদস্যদের অনুপস্থিতি হইতেই বুঝা যাইতেছে। এইরূপ অবস্থায় আর কত দিন চলিবে? একটা মীমাংসার সময় কি এখনও আসে নাই?

ভিয়েটনাম দিবসের জের

ভিয়েটনাম দিবস পালনের নির্দ্দেশ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকা কালীন শোভাযাত্রা বাহির করা হইবে কি না সে সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলেন নাই। ছাত্রেরা শোভাযাত্রা বাহির করিয়াছিলেন। পুলিশের গুলীতে আহত ও নিহত হইয়াছিলেন। এই ভুল নির্দ্দেশ অথবা বুঝিবার ভুলের জন্য কে দায়ী জানা যায় নাই। তবে আমাদের মনে হয়, বসু মহাশয়ের নির্দ্দেশ সুস্পষ্ট হইলে এই অস্বাভাবিক ব্যাপার ঘটিত না। ভিয়েটনাম দিবস পালন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন। কিন্তু 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই'—এক সাম্রাজ্যবাদ আর এক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন সহ্য করিবে কিরূপে? বাঙ্গালায় বাঙ্গালার অধিবাসীদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া গঠিত মন্ত্রিসভা বিদ্যমান থাকিলেও বৃটিশ শাসন পুরাপুরি কায়েম রহিয়াছে এবং লীগ সচিব-মণ্ডলী তাহাদেরই দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। তাই ৭ই মাঘ ভিয়েটনাম দিবসে গুলীবর্ষণ, লাঠিচালনা, কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহারের মধ্যে আমরা সাম্রাজ্যবাদের নগ্ন নৃশংস রূপই দেখিয়াছি। উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদের মর্ম্মান্তিক নিপীড়নের মধ্যেও ছাত্রমণ্ডলী অহিংসা ও অসীম ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। তীব্র দংশন বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছেন। আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি তাঁহাদের উদ্দেশে।

গণ-পরিষদে পণ্ডিত নেহরুর স্বাধীন, সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র ভারতের যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহা কি সত্যই শান্তিপূর্ণ পথে কার্য্যে পরিণত হওয়া সম্ভব হইবে? মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব প্রকাশিত হইবার পর হইতে ব্যাপক অশান্তির ভিতর দিয়া রক্তরাঙ্গা পথে ভারতবাসীর যাত্রা সুরু হইয়াছে। ছাত্র-বিক্ষোভ, শ্রমিক-বিক্ষোভ প্রভৃতি কি লাগিয়াই রহে নাই? তবু তাঁহারা শান্তিপূর্ণ পথে স্বাধীনতা অর্জ্জন করিতে চান গণ-পরিষদের স্নিগ্ধ শীতল ভবনে বহু মূল্যবান আসনে বসিয়া শুধু প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা। তাঁহাদের এই প্রস্তাব কার্য্যকরী করিবে কে? তাঁহারা যদি ইংলণ্ডের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকেন, তাহা হইলে যাহা পাওয়া যাইবে তাহা স্বাধীন সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র ভারত নয়। যদি সত্যিকার স্বাধীন, সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র ভারত গঠন করিতে হয়, তাহা হইলে গণ-পরিষদের বিলাস-প্রকোষ্ঠে বসিয়া তাহা অর্জ্জন করা সম্ভব হইবে না। বিপ্লবের তূর্য্যধ্বনি কি সত্যই তাঁহাদের কাণে পৌঁছায় নাই? দেশের অবস্থা কি তাঁহারা দেখিতেছেন না? ৭ই মাঘ কলিকাতায় ছাত্রছাত্রীদের উপর যে নিপীড়ন চলিয়াছে তাহা কিসের দ্যোতক? সরকারী দমন-নীতির ফলে শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিতে কত দিন লাগিবে কে জানে! সাম্প্রদায়িক অশান্তি যাঁহারা নিবারণ করিবার জন্য অঙ্গুলিও উত্তোলন করেন নাই তাঁহারাই ভিয়েটনাম দিবসে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে দমন-নীতি চালাইয়াছেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, দমন-নীতি স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করিতে পারে না, নিপীড়ন স্বাধীনতা অর্জ্জনের শক্তিকে দুর্ব্বার করিয়া তোলে। গণ-পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের স্বাধীন ও সার্ব্বভৌম প্রজাতন্ত্র ভারত যদি গড়িয়া উঠে, তাহা হইলে এই দুর্ব্বার শক্তিতেই গড়িয়া উঠিবে, গণ-পরিষদের প্রশস্ত কক্ষে নয়।

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভা

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্ত্তন সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিত্ব করেন। চিরাচরিত প্রথা ত্যাগ করিয়া তিনি নিজ অভিভাষণে বহু নূতন এবং সময়োপযোগী কথার অবতারণা করেন। বক্তৃতা-প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আমাদের শিক্ষা বাস্তব হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক তাহা একেবারেই লোপ পাইয়াছে। ভবিষ্যৎ শিক্ষা-প্রণালী নূতন ভাবে গঠিত হওয়া প্রয়োজন। অর্থনৈতিক এবং শিল্পবিষয়ক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করিয়া তাহা গড়িতে হইবে। প্রত্যেকে যেন সমান অধিকার পায়। অর্থের অভাবে যেন প্রকৃত গুণী ছাত্রের ভবিষ্যৎ নষ্ট না হইয়া যায়। আমাদের মানুষ হইতে হইবে। মানুষে মানুষে ভেদ ভুলিতে হইবে। আমাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্ন সফল হউক আমাদের উদ্যমে, ভগবানের কাছে এই প্রার্থনা।

অভিভাষণটি যে সারগর্ভ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার নির্দ্দিষ্ট পথে ছাত্রসমাজ চালিত হইলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। কিন্তু তাঁহার কথা মত নূতন শিক্ষা-প্রণালী কি সত্যই গড়িয়া উঠিবে? আমরা তো দেখি, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল-কলেজ সবই যেন ব্যবসার কেন্দ্র। ছাত্রদের বেতন দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু সেই অনুপাতে শিক্ষকদের বেতন বাড়িয়াছে কি? প্রত্যেক শিক্ষককে প্রাইভেট ট্যুইশন করিয়া সংসার চালাইতে হয়। ফলে শ্রান্ত ক্লান্ত শিক্ষক পূর্ণ উদ্যমে শিক্ষকতা করিতে পারেন না। এই কারণেই দিল্লী, বোম্বাই ইত্যাদি প্রদেশে শিক্ষকরা ধর্ম্মঘট করিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয় যখন যাঁহারা শিক্ষা দেন, তাঁহাদেরই ব্যবস্থা করিতে পারেন না, তখন ছাত্রদের জন্য তাঁহারা কতটা কি করিবেন সে বিষয়ে আমাদের বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে যে মধুর সম্পর্ক হওয়া উচিত তাহা লোপ পাইবার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক অসঙ্গতি। শিক্ষকরা কোন মতে কাজ শেষ করিয়া ছোটেন অন্যত্র দু' পয়সা উপার্জ্জনের জন্য। তাঁহাদের বাঁচিতে হইবে তো! অর্দ্ধভুক্ত সংসারকে আহার জোগাইতে তাঁহারা মৃতপ্রায়। মন তাঁহাদের মৃত! যত দিন না শিক্ষকদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়, তত দিন শিক্ষার উন্নতি হইতে পারে না, ফলে দেশে প্রকৃত শিক্ষা সম্ভব নয়। এই অপরাধের জন্য দায়ী কে?

শ্রীশচন্দ্র সেন

গত পৌষ সংক্রান্তি দিবসে প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশচন্দ্র সেন অশীতি বর্ষ বয়সে সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়াছেন। তৎকালীন হিতবাদী, যমুনা, বঙ্গবাসী এবং অন্যান্য পত্রে ও পত্রিকায় তাঁহার রচনাগুলি গভীর সমাদর লাভ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত ও মুদ্রিত 'গ্রহমুক্তি' নাটক পণপ্রথার বিরুদ্ধে একখানি বলিষ্ঠ রচনা। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী ও তিন পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। শোকাতুর পরিবারবর্গের প্রতি আমরা আমাদের গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি। ঈশ্বর তাঁহার মুক্ত আত্মার কল্যাণ করুন।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মা —অবনী সেন

—জয়নুল আবেদীন

জেলে

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

২৫শ বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৫৩] [দ্বিতীয় খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা

মানুষের শক্তি দ্বারা লোকশিক্ষা হয় না। ছাপাছাপি করলে কি হবে? যে লোক-শিক্ষা দেবে, তার শক্তি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসবে। আর ত্যাগী না হ'লে লোকশিক্ষা হয় না।

তুমি কে, যে জগতের উপকার করবে? তাঁকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত করতে পার। নচেৎ নয়।

কেবল লেকচার দেওয়া আর বুঝিয়ে দেওয়া! আপনাকে কে বুঝায়, তার ঠিক নেই। যাঁর জগৎ, তিনি বুঝাবেন। যিনি এই জগৎ করেছেন, চন্দ্র, সূর্য্য, ঋতু, মানুষ, জীব-জন্তু, জীব-জন্তুদের খাবার উপায়, ফসলের জন্য বর্ষা, পালনের জন্য মা-বাপ করেছেন, মা-বাপের স্নেহ করেছেন, তিনিই বুঝাবেন।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

পরমহংসদেব

শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঊনবিংশ শতাব্দীর তখন প্রারম্ভ। সাগর-পারের বণিককুল এদেশে রাজনীতিক্ষেত্রে ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিবার সঙ্গে সঙ্গে বিলাতের পণ্ডিতদের পুঁথি পড়াইয়া এই দেশকে "সভ্য" করিয়া তুলিবার চেষ্টা তখন প্রবল ভাবে সুরু হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার প্লাবনে তখন ভারতবর্ষ প্লাবিত। বিলাতী শাসকদের সঙ্গে তাহাদের তল্পি বহন করিয়া প্রচারকের দল আসিয়া ঠিক করিলেন যে, এই অভাগা দেশের অর্দ্ধসভ্য লোকগুলাকে মানুষ করিতে না পারিলে তাঁহাদের কর্ত্তব্য পালন করা কিছুতেই যায় না। সুতরাং পরোপকারের ব্যবসায় সুরু হইয়া গেল। এত দিন এদেশের লোক যাহা কিছু শিখিয়াছে, যাহা কিছু ভাবিয়াছে, তাহার সবটাই যে নিতান্ত বাজে, এইটাই প্রমাণ করা হইয়া দাঁড়াইল এই নবাগত পরোপকারীদের প্রধান কাজ। এক হাতে বন্দুকের নল উঁচাইয়া পাশ্চাত্যের এই পণ্ডিতেরা বুঝাইলেন যে ভারতে ধর্ম্মের নামে এত কাল যাহা চলিয়াছে তাহা কতকগুলা পৌরাণিক কাহিনীর সমষ্টি মাত্র, আর নয় তো তাহার মধ্যে সমস্তই একটা বিরাট বুজরুগি। এত দিন ভারতের ঋষিরা সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া যে সত্যের সন্ধান করিয়া গিয়াছেন তাহাও অর্থহীন, সময়ের অপব্যবহার ভিন্ন আর কিছুই নহে। আসল, খাঁটী, নির্ভেজাল সত্যের পরিচয় পাইতে হইলে পাশ্চাত্যের দিকে না ফিরিলে আর না কি কোন উপায় নাই।

বিদেশী প্রচারকদের এই ধরণের প্রচার হয়ত অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্য আর আলোকচ্ছটায় এদেশের অনেকের চক্ষু ঝলসাইয়া গিয়াছিল, বিচার-শক্তিও লুপ্ত হইয়াছিল। পরবশ জাতির এইটাই বোধ হয় সব চেয়ে বড় অভিশাপ যে তাহার নিজের শক্তি, নিজের সভ্যতা, নিজের সাধনা সমস্ত কিছুরই উপরই আস্থা নষ্ট হইয়া যায়। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতেরা এদেশের সবকিছুকেই এক কথায় বাতিল করিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে এদেশের অনেকে ধরিয়া লইলেন যে, ভারতীয় প্রাচীন জ্ঞানরাজ্য হইতে আহরণ করিবার মতো কিছুই আর নাই। এদেশের বেদ-বেদান্তকে টান মারিয়া ফেলিয়া দাও; এদেশের মন্দির ভাঙ্গিয়া ফেল, এদেশের আচার্য্যদের দূর করিয়া দাও। তাহা হইলে সভ্য হইবার পথে বাধাটা দূর হইতে তিলমাত্রও বিলম্ব ঘটিবে না। এই মনোভাব লইয়া সেদিন এক দল নব্যপন্থী যখন সংস্কারের বন্যায় গা ভাসাইয়া দিলেন, তখন দেশের পক্ষে এক গভীর দুর্দ্দিন। ধর্ম্মের ভিতরই কুসংস্কারকে দূর করিয়াই তাঁহারা নিরস্ত হইলেন না—ধর্ম্মকেই বিসর্জ্জন দিবার মত এত বিরাট ভ্রান্তি তাঁহাদের পাইয়া বসিল। পুরাতনকে বুঝিবার, বিচার করিবার, সহানুভূতির দৃষ্টিতে যাচাই করিবার কোন শক্তি বা ইচ্ছা এই তথাকথিত সংস্কারপন্থীদের ছিল না। একটা নূতনত্বের মোহে দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পাশ্চাত্যের অনুকরণে মহা বিনাশের পথে তখন সারা দেশকে তাঁহারা টানিয়া লইয়া যাইতে ব্যস্ত।

বাংলা তথা ভারতের সেই পরম সঙ্কট ক্ষণে মানুষের আত্মবিশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার ভার যাঁহার উপর পড়িল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় অধ্যাপকবৃন্দের শিখান বুলি পাখীর মতো আবৃত্তি করিয়া পাণ্ডিত্য অর্জ্জনের দুর্ভাগ্য তাঁহার হয় নাই। তিনি এক দরিদ্র, মূর্খ ব্রাহ্মণ-সন্তান—লোকে তাঁহাকে পাগল বলিয়াই জানিত। বিজ্ঞ পণ্ডিতের দল যখন বিদেশী শাসনের কয়েকটা চাকরী আর বাহিরের জাঁকজমকে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত জাতিটাকে চোখঢাকা কলুর বলদের মতো ঘানিতে ঘুরাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন, তখনই চোখের ঠুলি খুলিবার জন্য এক পাগলের কি দরকার হইয়া পড়ে নাই? বনের মধ্যে যখন জুঁই ফুল ফোটে, তখন তাহার নিজের উপস্থিতি প্রচার করিয়া বেড়াইতে হয় না। ভ্রমর আপনা হইতেই আসিয়া জোটে গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া। পরমহংসদেবেরও বার্ত্তা সভা-সমিতি করিয়া প্রচার করিতে হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরের শান্ত পরিবেশে বসিয়া এক পাগল যে সত্য উপলব্ধি করিয়া গেলেন সারা বিশ্ব সেই সত্যের ব্যাপকতায় স্তব্ধ হইয়া গেল।

আগে ফুল ফোটে, পরে ফল হয়। কিন্তু পরমহংসদেবের ক্ষেত্রে আগে ফল ফলিয়াছিল; ফুলের আবির্ভাব হইয়াছিল পরে। আগে তিনি নিজের অন্তরে সত্যের সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন; আর সেই সত্যের দ্বারে উপনীত হইবার বিভিন্ন পথের সন্ধান লইয়াছিলেন তাহার পরে। আধুনিক কালের মহাপুরুষদের মধ্যে পরমহংসদেবের সাধনার বনিয়াদ ছিল পাকা—তাহার মধ্যে ফাঁকের কোন স্থান ছিল না। ভগবৎশক্তিকে প্রত্যক্ষ করিয়া তাহার পর বিভিন্ন পথে আবার সেই সত্যে পৌঁছিবার সৌভাগ্য কয় জনের হয়? শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তের পরব্রহ্মের সন্ধান পাইলেন, আর

দেখিলেন তাহার ভিতর তন্ত্রের পরাশক্তি। অথচ এই দুই শক্তি পৃথক্ নয়—এক সত্তারই পৃথক্ নাম। বৈষ্ণব মতে রাধাভাবে সাধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি ; ব্রাহ্মণ-সন্তান হইয়াও নিয়মিত নমাজ করিয়া পয়গম্বরের দর্শন লাভ ; খ্রীষ্টান হিসাবে সাধনে খ্রীষ্টের তত্ত্বানুভূতি—সমস্তই তাঁহাকে এক একটি নূতন পথের সন্ধান আনিয়া দিল। মানবের আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভের ভিন্ন ভিন্ন পথের সমন্বয় ইহাই হইল প্রথম। পরমহংসদেব বলিলেন—যত মত তত পথ। সব নদীই শেষ পর্য্যন্ত গিয়া পড়িয়াছে মহাসমুদ্রে—অধিকারী-ভেদে বিভিন্ন প্রণালী বিভিন্ন ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সবই এক দেহে লীন হইয়াছে—কাহাকেও পৃথক্ করিবার উপায় নাই। দ্বৈত, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত—সমস্তই এক দ্বৈতাদ্বৈত-বিবর্জ্জিত মহা সত্যের খণ্ডপ্রকাশ। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারীর নিকট ইহার প্রত্যেকটিই সত্য। সবই সেই অনির্ব্বচনীয়া মহাশক্তিরই প্রকাশ।

ইহার ফলে সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের ভিতর দিয়া মানবের বন্ধনমুক্তির যে পথের সন্ধান পরমহংস আনিয়া দিলেন—ইতিহাসে তাহার আর কোন তুলনা নাই। এত দিন একটা ধর্ম্মকে মানুষ আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহাকেই পরম ও চরম সত্য জ্ঞানে পূজা করিয়াছে ; দল গড়িয়াছে ; ধর্ম্মের নামে প্রচারকার্য্য চালাইয়াছে, ব্যবসায় খুলিয়াছে ; যে তাহার সঙ্গে একমত হইতে পারে নাই, ধর্ম্মের দোহাই পাড়িয়া তাঁহার মাথা ভাঙ্গিয়াছে, একান্ত নির্ব্বিকার ভাবে। ধর্ম্মের গোড়ার কথা ভক্তের দল বুঝে নাই। ধর্ম্মকে নিতান্ত আটপৌরে করিতে গিয়া ধর্ম্মেরই যে বিলোপ ঘটিয়াছে তাহা তাহাদের খেয়াল হয় নাই। পরমহংসদেব বন্ধনজর্জ্জর আত্মবিশ্বাসহীন মানুষকে এক নূতন বার্ত্তা শুনাইলেন। এই জগতে বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে মূলগত কোন বিরোধ নাই, পার্থক্য নাই, সংগ্রাম নাই। সকল ধর্ম্মই এক সনাতন ধর্ম্মেরই বিভিন্ন ভাব মাত্র। এক সনাতন ধর্ম্ম চিরকালই আছে—তাহার ধ্বংস নাই, বিকৃতি নাই। তাহা চিরকালই সমান ভাবে প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে—শুধু বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ভাবে ইহা প্রকাশ পায়। এই গোড়ার কথাটা মনে রাখিলে ধর্ম্মের নামে কোমর বাঁধিয়া লড়াই করিতে যাওয়ার মত পাগলামি আর হয় না! সকলকে জোর করিয়া একটা বাঁধা-ধরা ছাঁচের মধ্যে ঢালিবার চেষ্টাও তখন নিরর্থক বলিয়া ধরা পড়ে। যত দিন এই বিশ্বে নানা ধরণের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক আছে, তত দিন জোর করিয়া নিজের মত অপরের ঘাড়ে চাপাইতে গেলে কেবল অনর্থেরই সৃষ্টি হয়। তত দিন এক সনাতন আধ্যাত্মিক সত্যই প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন ছাঁচে ঢালিয়া লইতে হইবে।

পরমহংসদেবের শিক্ষা তাই—বিশ্বমানব-সমাজের এক নূতন মানব-সংহিতা। এই নূতন সংহিতা বাস্তবিকই মানবধর্ম্ম—মানুষকে এত বড় করিয়া আর কেহ কখনও দেখে নাই। ইতিপূর্ব্বে খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য প্রেম প্রচার করিয়াছিলেন বটে ; কিন্তু সে প্রেম মানুষের মনুষ্যত্বকে একটা নূতন মর্য্যাদা দিতে পারে নাই। পরমহংসদেব একান্ত আত্মবিস্মৃতকেও আত্মশক্তি সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তুলিলেন। মানুষ আবার তাহার মর্য্যাদা ফিরিয়া পাইল। জীবকে ক্ষুদ্র করিয়া নয়—জীবের ভিতর দিয়াই তিনি শিবের সন্ধান করিয়াছিলেন। মানুষকে তুচ্ছজ্ঞানে দূর হইতে দয়া করিয়া নয়—মানুষের সেবা করিয়া শিবের উপলব্ধি এই নূতন ধর্ম্মের প্রধান কথা। এইখানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য—পূর্ব্বতন ধর্ম্ম-প্রচারকদের তত্ত্বের সহিত নূতন মানবধর্ম্মের পার্থক্য। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী ঠিক এই কারণেই সঙ্কটের ঘূর্ণাবর্ত্তে দিশেহারা মানুষের সম্মুখে এক সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান আনিয়া দিয়াছে।

এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত বড় বড় সাধকের সাধনা মানুষের আধ্যাত্মিক জগতে এক বিরাট আলোড়ন আনিয়াছিল তাহাদের মধ্য হইতে শ্রীচৈতন্যকে বাদ দিলে একমাত্র পরমহংসদেবই বাংলার মাটিতে মানুষ। বাংলার ইতিহাসের এই সন্ধিক্ষণে আজ আবার তাই সেই যুগাবতারের কথা স্মরণ করিবার সময় আসিয়াছে। আজ এক শ্রেণীর লোক ধর্ম্মের গোড়ার কথা ভুলিয়া তরবারির ডগায় ধর্ম্ম-প্রচারে ব্যস্ত। পরমত-অসহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি, চরম সত্যের সবটুকু আবিষ্কারের স্পর্দ্ধা এক দল মূঢ় ধর্ম্মান্ধকে ভারতের এত কালের সাধনা ব্যর্থ করিবার অপচেষ্টায় উৎসাহী করিয়া তুলিয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিপদ আসিয়াছিল এক দিক হইতে ; আজ সঙ্কটের আবির্ভাব অন্য দিকে। এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আবার আত্মবিশ্বাসের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতের মুক্তিপথের অগ্রদূত হিসাবে বাঙ্গালীকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে হইবে। পরমহংসদেবের শিক্ষার আলোকেই সমস্যাপ্রপীড়িত বাংলাকে আত্মরক্ষা ও আত্মশক্তির সাধনায় জয়যুক্ত হইতে হইবে।

প্র ণা বি

আসামের গভীর অরণ্যে 'খড়গনাসা' নামে এক গণ্ডার বাস করিত। সে অন্যান্য গণ্ডার-দলের সহিত নলখাগড়া-বেষ্টিত পঙ্কজলে ডুব দিয়া ও সাঁতার কাটিয়া দীর্ঘ দিন যাপন করিত, খাদ্য সংগ্রহ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিত এবং জ্যোৎস্না রাত্রিতে মাঠের মধ্যে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইত। কিন্তু তাহার মনে সুখ ছিল না। অন্যান্য গণ্ডারগণ তাহাকে বড়ই অবহেলা করিত। গণ্ডারের চামড়া যে অত্যন্ত পুরু, এই সত্য এখন মানুষেও জানিয়া ফেলিয়াছে এবং এই কঠিন সত্য লইয়া গণ্ডারকুল গৌরব করিয়া থাকে। 'খড়গনাসার' চামড়া আশানুরূপ পুরু ছিল না বলিয়া তাহার দলের গণ্ডার-সমূহ ঠাট্টা করিত, তাহাকে বলিত, তোমার চামড়া মানুষের মতো কোমল, তোমার গণ্ডারকুলে না জন্মিয়া মানুষের ঘরেই জন্ম লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু জন্মটা তো আর তাহার হাতে নয়, কাজেই কেন যে এই অপরাধের জন্য সে শাস্তি ভোগ করিবে তাহা সে বুঝিতে পারিত না।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। সেই অরণ্য-প্রদেশের গণ্ডার-রাজের দেহান্ত ঘটিলে শ্রাদ্ধোপলক্ষে আর সকলেরই নিমন্ত্রণ হইল, কেবল খড়গনাসা নিমন্ত্রিত হইল না। ইহাতে সে যৎপরোনাস্তি লজ্জিত ও অপমানিত বোধ করিয়া আত্মহত্যা করিতে মনস্থ করিল। কিন্তু মরিবার উপায় কি? সে শুনিয়াছিল, মানুষেরা অনেক সময়ে দম্পতি-কলহের পরিণামে গলায় দড়ি দিয়া মরে। কিন্তু দড়ি,—তাহার দেহভার বহন করিতে সক্ষম এমন শক্ত দড়ি সে পাইবে কোথায়? আর দড়ি পাইলেই বা গলা পাইবে কোথায়? গণ্ডারের মুণ্ডুর সঙ্গেই দেহটা যুক্ত—বিধাতা গলা দিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। কাজেই সে স্থির করিল যে, প্রায়োপবেশনে বিধাতার তপস্যা করিবে। তপে সন্তুষ্ট হইয়া বিধাতা-পুরুষ আবির্ভূত হইলে সে একটা গলা চাহিয়া লইবে এবং তার পরে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়া সমস্ত জ্বালার অবসান করিয়া ফেলিবে।

'খড়গনাসা' বিষম তপস্যা সুরু করিয়া দিল। সেই তপস্যার খ্যাতি কিম্বদন্তী আকারে এখনো আসাম-প্রদেশে প্রচলিত আছে—অনেকে হয় তো তাহা শুনিয়াও থাকিবেন। দীর্ঘকাল তপস্যার পরে বিধাতা সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহার সম্মুখে এক দিন সত্য সত্যই আবির্ভূত হইলেন। খড়গনাসা তাহাকে মনের দুঃখ নিবেদন করিলে বিধাতা বলিলেন—বৎস, একটা গলা লইয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিলে আর এমন কি লাভ? তার চেয়ে তুমি মনুষ্যকুলেই জন্মগ্রহণ করো না কেন? মনুষ্যত্ব লাভ করিলে তোমার সকল দুঃখের অবসান হইবে। খড়গনাসা এই প্রস্তাবে আশাতীত আনন্দিত হইল এবং মানুষকুলে জন্মিবার বর লাভ করিল। বিধাতা অন্তর্ধান করিলেন।

২

পরজন্মে 'খড়গনাসা' মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিল। সে মানুষ হইল বটে, কিন্তু তাহার নাসিকাটির পূর্বজন্মসুলভ উচ্চতার হ্রাস হইল না। তাহার বিচিত্র নাকটি দেখিয়া তাহার আত্মীয়-স্বজনেরা তাহাকে 'গণ্ডার' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। তাহার পিতা-মাতা অবশ্যই তাহাকে একটা শ্রুতিমনোহর নাম দিয়াছিল—কিন্তু সেটা ওই গণ্ডার নামের তলে চাপা পড়িয়া গেল। মনুষ্য-সমাজে তাহার 'গণ্ডার' নামই প্রচলিত রহিল। সমবয়স্ক বালকদের সহিত খেলিতে খেলিতে পড়িয়া গেলে সেই আঘাতে তাহার কিছুই হইত না। ছেলেরা বিদ্রূপ করিয়া বলিত, বেটার গণ্ডারের চামড়া। এই কথায় ক্ষীণ পূর্বস্মৃতিবৎ তাহার মনে উদিত হইত—ইহার বিপরীত কথা কোথায় যেন, কবে যেন সে শুনিয়াছে—কিন্তু ঠিক কবে এবং কোথায় তাহার মনে পড়িত না।

গণেশ (ইহাই তাহার পিতৃদত্ত নাম) পাঠশালায় ঢুকিয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িল। ছেলেরা কড়াকিয়া পড়িবার সময়ে সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিত 'চার কড়ায় এক গণ্ডার'! আর সবাই হো-হো করিয়া হাসিতে থাকিত। গুরু মহাশয় ঘুম ভাঙিয়া লাফাইয়া উঠিয়া বলিতেন—হাঁ রে, হাসছিস্ কেনে? সবাই বলিত, দেখুন না, গণেশ কি রকম করছে? গণেশ বলিত—ওরাই আমাকে ক্ষেপাচ্ছে—

আমাকে গণ্ডার বলছিল। গুরু মহাশয় গণেশের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিতেন—তা তুই ও-রকম মুখ ক'রে আছিস্ কেন? গণেশ বুঝিতেই পারিত না, চুপ করিয়া থাকিত। অপরাধীর নীরবতাই অনেক ক্ষেত্রে তাহার অপরাধের প্রমাণ। গুরু মহাশয় বেতগাছা হাতে করিয়া তাহার উপরে গিয়া পড়িতেন, বলিতেন—তুই গণ্ডার ছাড়া আর কি, একশোবার গণ্ডার, এত শক্ত কি মানুষের চামড়া? বেত-গাছা ভাঙিত, গণেশ ভাঙিত না, কাজেই প্রমাণ হইয়া যাইত, সে গণ্ডার ছাড়া আর কিছুই নয়।

অতঃপর গণ্ডার হাই-স্কুলে প্রবেশ করিল। হাই-স্কুল শব্দটি সে আগেই শুনিয়াছিল এবং তাহার ধারণা হইয়াছিল, তাহা কোন একটা উচ্চ বস্তু হইবে। কিন্তু স্কুল-গৃহটি আর দশটি গৃহের মতোই বলিয়া তাহার মনে হইল, কাজেই সে 'হাই' শব্দের সার্থকতা বুঝিতে না পারিয়া হেড-মাষ্টার মহাশয়ের কাছে জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইল। হেড-মাষ্টার তো তাহার প্রশ্ন শুনিয়া আবাক্। সত্য কথা বলিতে কি, হাই-স্কুল কেন যে 'হাই' তাহা তিনিও জানেন না। কিন্তু কোন ছাত্রের প্রশ্নের উত্তরে জানি না বলা আর নিজের মৃত্যুদণ্ডের আদেশে স্বাক্ষর করা একই কথা। এ রকম ক্ষেত্রে একমাত্র যাহা কর্ত্তব্য তিনি তাহাই করিলেন, বিষম রাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন—এ সব প্রশ্ন শিখলে কোথায়? এই অল্প বয়সেই খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশতে শিখেছ, না?

হেড-মাষ্টারের উত্তর শুনিয়া তাহার কেমন যেন সন্দেহ হইল, 'হাই' শব্দের অর্থ হয় তো 'লো' হইবে। তবু সে দমিল না—শুধাইল—স্যর, হাই শব্দের অর্থ তো উচ্চ। ইহার পরে কোন হেড-মাষ্টারের পক্ষেই আর ধৈর্য্যধারণ সম্ভব নয়। তিনি হাঁকিয়া উঠিলেন—বেয়ারা, ওই পাজি ছেলেটাকে ধবো তো। এই নির্দ্দেশ শুনিবা মাত্র গণ্ডার ছুটিয়া পলাইল। ছেলের দল তাহার পিছে-পিছে ছুটিল, অনেকেই তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত, তাহারা 'ওই গণ্ডার যায়, ওই গণ্ডার যায়' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। হাই-স্কুলে প্রবেশের প্রথম দিকেই তাহার গণ্ডার-খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল।

এই ব্যাপার হইতেই বুঝিতে পাবা যাইবে, তাহার হাই-স্কুলের জীবন বড় সুখের হইল না। তাহার উপরে অত্যাচার হইলে আগে সে রাগিত, তাহার রাগ দেখিয়া ছেলেরা গণ্ডার বলিয়া তাহাকে আরও বেশি করিয়া ক্ষেপাইত। এখন রাগ চাপিতে গিয়া সে কাঁদিয়া ফেলে—তাহার চোখের জল দেখিয়া ছেলেরা বলে—গণ্ডার দমকল খুলে দিয়েছে।

কিন্তু এ সংসারে কাহারো জীবন অনবচ্ছিন্ন দুঃখের নয়। দুর্ভাগ্যের দেয়াল নীরন্ধ্র হইলেও তাহাতে জানলা থাকিতে বাধা নাই। স্কুলে এক দিন ইন্‌স্পেক্টার আসিলেন। তিনি গণ্ডারের ক্লাশে ঢুকিয়া ছাত্রদের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ভাগ্যের ইঙ্গিতে তাঁহার প্রথম প্রশ্নটি হইল—গণ্ডার সম্বন্ধে কি জানো, বলো? সকলে গণেশের দিকে তাকাইয়া মুখ টিপিয়া হাসিতে লাগিল। ক্লাসের সেরা ছাত্রটি গণ্ডার সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিল তাহাতে বুঝিতে পারা গেল, উহা এক প্রকার চারখানি পা-বিশিষ্ট জীব। ইহার বেশি কেহই বলিতে পারিল না। ইন্‌স্পেক্টার যখন বিরক্ত হইয়া ক্লাস পরিত্যাগ করিতে যাইবেন, তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল গণেশের দিকে, বলিলেন—তুমি বল্‌তে পারো? সকলকে বিস্মিত করিয়া দিয়া গণেশ গণ্ডারের জীবন-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে নিখুঁৎ একটি বর্ণনা দিল। ইন্‌স্পেক্টার খুশী হইয়া তাহার পিঠ চাপড়াইয়া হেড-মাষ্টারকে বলিলেন—'ভেরি-ইন্‌টেলিজেণ্ট'—একে একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা ক'রে দেবো।

ইন্‌স্পেক্টার চলিয়া গেলে ছেলেরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—ও কেন পারবে না? আর জন্মে ও গণ্ডার ছিল।

যথাসময়ে গণেশ একটি স্কলারশিপ পাইল ; কিন্তু ছেলেরা তাহাকে স্কলারশিপ না বলিয়া তাহার নামকরণ করিল—'গণ্ডারশিপ'।

এই ভাবে সুখে-দুঃখে গণেশের হাই-স্কুলের জীবন শেষ হইল।

স্কুলের বাহিরের জীবনও গণেশের পক্ষে যে খুব প্রীতিকর ছিল এমন নয়। পাড়ায় একটি মাত্র সরিষার তৈলের দোকান। সেখানে এমন ভিড়, এমন ঠেলাঠেলি, পরস্পরের গাত্রে এমন ঘর্ষণ যে কেহ পকেটে সরিষা ভরিয়া সেই ভিড়ে প্রবেশ করিলে সেই সরিষা হইতে তৈল বাহির হইয়া পড়িবে। এক দিন গণেশের মা বলিলেন,—ওরে, যা তেল নিয়ে আয়।

গণেশ বড়ই মাতৃভক্ত। সে অমনি একটি পাত্র লইয়া দৌড়িয়া গিয়া ভিড়ের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিল। এক ঘণ্টা পরে ছিন্নবস্ত্র, বিদীর্ণচর্ম্ম হইয়া এক পোয়া তৈলাক্ত এক প্রকার বস্তু লইয়া যখন সে বাহির হইল, তাহার গা জ্বালা করিতে লাগিল। তৈল নামক যে-বস্তু সে পাইয়াছিল তাহার অনেকটাই গেল ক্ষত স্থানে লাগাইতে। তার পর হইতে যে প্রায়ই ভাবিত, লোকে কেন আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া আছে বলিয়া পরিহাস করে? মানুষের গায়ের চামড়াও তো কম পুরু নয়, নতুবা আমার গা কেন ক্ষত-বিক্ষত হইতে গেল?

গণেশ জানিত না এবং অনেকেই জানে না যে, মানুষের গায়ের চামড়া বিধাতা ইচ্ছা করিয়াই মোটা করিয়া দিয়াছেন। নতুবা সংসারের মতো সংঘর্ষ-বহুল স্থানে মানুষে বাঁচিবে কি উপায়ে? বিধাতা কেন যে মানুষের চামড়া আরও পুরু করিয়া দিলেন না, ইহাই তো মানুষের নালিশ হওয়া উচিত। গণ্ডারের চামড়া মোটা বটে কিন্তু মানুষের চামড়া ততোধিক মোটা, নতুবা পূর্ব্বজন্মের গণ্ডাররূপী গণেশের সংসারে এমন কষ্ট হইবে কেন?

গণেশদের সংসারের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কাজেই তাহার বিবাহ দিবার জন্য পিতা-মাতার কর্ত্তব্য-বোধ জাগ্রত হইয়া উঠিল। আর বাংলা দেশও এমন স্থান যে, এখানে আর্থিক অবস্থা ও বিবাহের তৎপরতা পরস্পর প্রতিকূল। গরীব এখানে শীঘ্র বিবাহ করিয়া ফেলে, ধনীর সন্তান বিবাহ করিতে চায় না। কিন্তু বোধ করি ভুল করিলাম, কেন না বিবাহের অপেক্ষা বিবাহের চেয়ে বড়তে খরচ কিছু বেশি। স্ত্রীকে 'না' বলিয়া ক্ষান্ত করা যায়, কিন্তু ক্ষণিকাকে 'না' বলিতে সাহস হয় না। যাই হোক, শুভ লগ্নে গণেশের বিবাহ হইয়া গেল।

পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আড়ালে গণেশের স্ত্রীকে গণ্ডারণী বলিয়া উল্লেখ করিত। এক দিন পাড়ার একটি অবোধ বালক তাহাকে গণ্ডার-মাসী বলিয়া সকলের সম্মুখে ডাকিয়া ফেলিল। সে-দিন রাত্রে গণেশকে তাহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিল—হাঁ গো, সবাই আমাকে গণ্ডার-মাসী; গণ্ডারণী বলিয়া ডাকে কেন বলিতে পারো? বলিতে পারিলেও গণেশের বলা উচিত ছিল না। কিন্তু গণেশের যে কেবল চামড়া-খানাই কিছু মোটা ছিল এমন নয়, বুদ্ধিটাও মোটা ছিল। সে সবিস্তারে তাহার সারা জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিল। সমস্ত শুনিয়া তাহার স্ত্রী বলিল—সত্যিকার গণ্ডারণীকে বিবাহ করাই তোমার উচিত ছিল। গণেশের জীবনে ধিক্কার জন্মিল। সে সেই রাত্রেই ঘরের জানলার শিক ভাঙিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

৩

গণেশ পুস্তকে সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কথা পড়িয়াছিল। ভাবিল, আমিও সেইরূপ গৃহত্যাগ করিব এবং তপস্যায় মনোনিবেশ করিব। কিন্তু কোথায় যে তপস্যার অনুকূল বন, আর ঠিক কোন্ দিকে যে নৈরঞ্জনা নদী সে বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান না থাকাতে, বিশেষ সিদ্ধার্থের মতো রথ ও সারথীর ঐকান্তিক অভাব হওয়াতে, সে নিকটস্থ এক প্রান্তরে বসিয়া ভবিতব্যেরি চিন্তা করিতে লাগিল। সে ভাবিতে লাগিল, বিধাতা আমার চামড়া কেন মানুষের মতো করিয়া সৃষ্টি করিলেন না? তাহা হইলে তো আমার এমন দুর্দ্দশা ঘটিত না। পূর্ব্বজন্মের তপস্যার কথা মনে পড়িলে সে বুঝিয়া বিস্মিত হইত যে, ঠিক ইহার বিপরীত প্রার্থনা সে এক সময়ে করিয়াছিল। সে-দিন সে পুরু চামড়া চাহিয়াছিল, আর আজ তাহার প্রার্থনা কোমল চামড়া। কি পশুকুলে, কি নরকুলে কোথাও যে সন্তোষ নাই তাহাই কি ইহাতে প্রমাণ হয় না? সে ভাবিতে লাগিল—হায়, মানুষ হইলাম তো চামড়াখানি মানুষের চর্ম্ম-সুলভ কোমলতা হইতে কেন বঞ্চিত হইল! নির্ব্বোধ গণেশ জানিত না যে শুধু চামড়াখানি নয়, তাহার বুদ্ধিও মনুষ্য-সুলভ স্থিতিস্থাপকতা পায় নাই। গণ্ডার-সুলভ এক-গুঁয়েমি বহন করিয়া সে মানুষের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

যখন সে এইরূপ চিন্তায় মগ্ন তখন শুনিতে পাইল কে যেন, কোথা হইতে বলিতেছে—'সম্পাদক হবি?' 'সম্পাদক হবি?' গণেশ চমকিয়া উঠিল? কে এমন কথা বলে? কই, কাহাকেও তো দেখা যাইতেছে না! হঠাৎ তাহার দৃষ্টি পড়িল গাছটির উঁচু একটি ডালের দিকে।

বাহুল্য বলিয়া প্রকাশ করি নাই যে, সে একটা গাছের তলে বসিয়া চিন্তা করিতেছিল। কারণ বুদ্ধ, যুধিষ্ঠির, নিউটন যিনি যখনই চিন্তা করুন না কেন বৃক্ষতলে বসিয়াই চিন্তা করিয়াছেন। তবে গণেশের বেলাতেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে যাইবে কেন?

সে দেখিতে পাইল, একটি শুক্ পক্ষী ক্রমাগত প্রশ্ন ধ্বনিত করিয়া যাইতেছে—'সম্পাদক হবি?' সম্পাদক হবি?' গণেশ শুধাইল —তুমি কে? শুক্ পক্ষী বলিল—আমি একটি শুক পক্ষী। কিন্তু এই সৌভাগ্য এই মাত্র লাভ করিয়াছি। কিছুক্ষণ আগে আমি প্রসিদ্ধ সংবাদপত্র 'জম্বুদ্বীপের' সম্পাদক ছিলাম। মৃত্যু হইবা মাত্র আমি শুক-জন্ম লাভ করিয়া এই বৃক্ষটিতে আসিয়া বসিয়াছি। এখনো আমার মৃতদেহটা আফিসে পড়িয়া আছে, আর তাহার ফটো তুলিবার চেষ্টা হইতেছে। নিশ্চয় এখনো নূতন সম্পাদক নিযুক্ত হয় নাই, যদি তোমার সম্পাদক হইবার ইচ্ছা থাকে তবে 'জম্বুদ্বীপ' আফিসে যাইতে পারো। এই কথা শুনিবা মাত্র পরিণাম-অজ্ঞ, নির্ব্বোধ গণেশ 'জম্বুদ্বীপ' পত্রিকার আফিসের দিকে ছুটিল। তাহার সংসার-বৈরাগ্য যে নিতান্ত শ্মশান-বৈরাগ্য, চতুর পাঠক তাহা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন।

গণেশ যদি মনুষ্য-সুলভ অভিজ্ঞ হইত তবে শুক পক্ষীর মৃত্যুর বিবরণ নিশ্চয় জিজ্ঞাসা করিত। কিন্তু সে করে নাই বলিয়াই আমরা করিব না কেন? আর লেখকের সুবিধা এই যে, সে জিজ্ঞাসা না করিয়াও সব কথা জানিতে পায়। সম্পাদকের মৃত্যুর কারণ আর কিছুই নয়, একত্রিশ বৎসর ধরিয়া সংবাদপত্র সম্পাদনা করিতে করিতে, বাঁধা-বুলির পথে চলিতে চলিতে, সম্পাদক মহাশয় একটি

আধ্যাত্মিক শুক পক্ষীতে পরিণত হইয়াছিলেন, যদিচ দেহটি তখনো মানবীয় ছিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে এক দিন নরদেহের শাপ বিমুক্ত হইয়া বিশুদ্ধ শুক পক্ষিরূপে তিনি আকাশে উড্ডীন হইয়া গেলেন। ঘটনাটি এইরূপ: এক দিন গঙ্গাতে স্নানাহ্নিক সমাধা করিয়া তিনি একটি সুপক্ক কদলী ভক্ষণ করিতে করিতে মনের আনন্দে বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একটি দুষ্ট বায়স তাহার হাত হইতে অর্দ্ধ-ভুক্ত কদলীটি ছোঁ মারিয়া লইয়া পলাইল। সম্পাদক মহাশয় বিস্মিত রোষে পলায়মান বায়সটির দিকে তাকাইল। তাঁহার ইচ্ছা হইল—আহা তিনি যদি একটি পাখী হইতে পারিতেন তবে একবার কাকটিকে দেখাইয়া দিতেন, সম্পাদকের কলাতে অনধিকার-চর্চ্চার ফল কি বিষম হইতে পারে। যেমনি না এই ইচ্ছা হওয়া, অমনি তাঁহার অতীন্দ্রিয় সত্তা একটি শুক পক্ষীতে পরিণত হইয়া কাকের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাঁহার আধিভৌতিক দেহ অসাড় হইয়া ভূপতিত হইল। সকলে বলিল—তিনি সন্ন্যাস রোগে মারা গিয়াছেন। কিন্তু কেহই আসল রহস্য জানিতে পারিল না, ইহাই সম্পাদকের শুক পক্ষী হইবার ভিতরকার কথা।

এদিকে গণেশ ছুটিতে ছুটিতে সংবাদপত্র আফিসে দিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার প্রার্থনা জানাইল। মালিক তাহার কথা শুনিয়া, তাহার গায়ের চামড়া হাত দিয়া টিপিয়া দেখিয়া তখনই তাহাকে সম্পাদক-পদে বসাইয়া দিলেন। গণেশ ভাবিল, এত দিনে বিধাতা প্রসন্ন হইয়াছেন। হায়, গণেশ তোমার এখনও বুঝিতে বিলম্ব আছে যে বিধাতা-পুরুষ তোমার অপেক্ষা কম চতুর নহেন।

সম্পাদক হইয়া গণেশ প্রথম দিনেই বুঝিতে পারিল, এত দিনে তাহার স্থুল চর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম জুটিয়াছে। সন্ধ্যা বেলায় যখন সে সিঁড়ি দিয়া নামিতেছে মালিক আসিয়া এক পদাঘাত করিয়া তাহাকে নীচে ফেলিয়া দিল। কিন্তু তাহাতে গণেশের শরীর ক্ষত হওয়া দূরে থাকুক, তাহার স্থুল চর্ম্মের আঘাতে নিম্নতম সিঁড়িটার খানিক ভাঙিয়া গেল। আর শুধু তাই নয়, তাহার চামড়ায় স্পর্শে মালিকের জুতার চামড়া ছিন্ন হইয়া মালিকের পায়ে রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। ইহার ফলে মালিক বুঝিতে পারিল, হাঁ, এত দিনে আঘাত-সহ সম্পাদক জুটিয়াছে—ইহাকে আর মারিবার প্রয়োজন নাই।

কিন্তু মালিক ছাড়াও তো জগতে লোক আছে। তাহারা গণেশকে এত সহজে ছাড়িবে কেন? সদা-সর্ব্বদা নানাবিধ লোক নানারূপ বিরুদ্ধ প্রস্তাব লইয়া তাহার কাছে আসে। গণেশ যে ঘরটিতে বসে, তাহার চারিটি দ্বার। পূর্ব্ব দ্বার দিয়া ধর্ম্মঘটকারিগণ যদি প্রবেশ করে, পশ্চিম দ্বার দিয়া ঢোকে ধর্ম্মঘট-বিরোধী মালিকের দল। তাহারা বাহির হইবা মাত্র উত্তর দ্বার দিয়া ঢোকে ধর্ম্মঘটের সমর্থকগণ, আর দক্ষিণ দ্বার-পথে ধর্ম্মঘটের প্রতিবাদিগণ প্রবেশ করে। যে-কোন পাকা সম্পাদকের এই চতুরঙ্গ আক্রমণে কাতর হইয়া পড়িবার কথা—কিন্তু গণেশের গণ্ডার-সত্তা কিছুমাত্র কাতর হয় না। সে সকলের বক্তব্যই সমান ঔৎসুক্যের সহিত শ্রবণ করে, সকলকেই সে সমান খুশী করিয়া বিদায় দেয় এবং কাহারো স্বপক্ষে কিছু লেখে না। ইহাতে সকলেরই সমান অসন্তুষ্ট হইবার কথা কিন্তু গণেশের অদৃষ্টের বা চামড়ার সৌভাগ্য বশত সকলেই তাহার উপরে সমান খুশী হয়। ক্রমে তাহার সম্পাদক-খ্যাতি এত বিস্তৃত হইল যে তাহার পত্নীর কানেও গিয়া তাহা প্রবেশ করিল। একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তাহার পত্নী গণেশের বাড়ীতে আসিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল—'ওগো, তুমি কি পাষাণ, আমাকে কি একবারের জন্যও খবর দিতে নাই। আমি তোমার সংবাদের জন্য ভূভারতের সর্ব্বত্র খুঁজিয়া মরিয়াছি, আর তুমি এখানে নিশ্চিন্তে বসিয়া আছ।' বিজ্ঞ পাঠক ও বিজ্ঞতর পাঠিকা নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছেন যে, গণেশ-পত্নীর একটি বাক্যও সত্য নয়—কারণ বিবাহের অত্যল্প কাল পরেই স্বামি-স্ত্রী পরস্পরের ভীষণতম শত্রু হইয়া পড়ে। এক জন দূরে গেলে অপরে সন্ধান করা দূরে থাকুক, পরম স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে। কিন্তু মুখে ইহা কেহ স্বীকার করিতে চাহে না। গণেশও মুখে স্বীকার না করিয়া, নিজের দোষ মানিয়া লইয়া পত্নীকে গৃহে গ্রহণ করিল এবং পত্নী পতিপ্রেমের আতিশয্য-জাত আগ্রহে তাহার বাক্স ডেস্ক ঘর-দ্বারের চাবির গোছাটি সযত্নে অঞ্চল-প্রান্তে বাঁধিয়া ফেলিল। পতির চাবি সংগ্রহেরই সামাজিক নাম পাতিব্রত্য। যে, স্ত্রী যত সত্বর, যত কৌশলে পতির চাবি সংগ্রহ করিতে পারে সে তত অধিক সাধ্বী।

দীর্ঘকাল দুঃখ ভোগের পর গণ্ডার-চর্ম্মা গণেশ সম্পাদক-জীবনে আসিয়া মানবজন্মের চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। গণেশের ধারালো কলমের আঘাতে অন্যান্য কাগজের সম্পাদকগণ ভয়ে তটস্থ—কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তাহাদের আঘাতে গণেশ গণ্ডারবৎ অটল। অন্যান্য কাগজ বলাবলি করে, লোকটা কি গণ্ডার ছিল না কি? হায় সম্পাদককুল, তোমরা অনেক রহস্যই জানো, কিন্তু সব রহস্য তোমাদের আয়ত্ত নয়! 'ছিল না কি' নিতান্ত বাহুল্য—গণেশ সশরীরে একটি গণ্ডার। গণেশ নিরন্তর প্রার্থনা করে—বিধাতা, আমার চামড়া আরও পুরু করিয়া দাও—আরও, আরও। কিন্তু লোকে যাহাই ভাবুক বিধাতার সাধ্যেরও একটি সীমা আছে। তাই তিনি গণেশের উপরে বিরক্ত হইয়া গণেশের সম্পাদক-জীবন অবসানের নির্দ্দেশ দিলেন।

এবারে আমি যে-ঘটনাটি বলিতে যাইতেছি তাহা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত আকারে পাঠকগণ নিশ্চয় দেখিয়াছেন। কারণ কিছু কাল আগে 'জম্বুদ্বীপ' সম্পাদকের অভাবনীয় মৃত্যু-রহস্য নামে পতাকাসম্বলিত হেড লাইনে তাহা সমস্ত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। আসল হত্যাকারীকে ধরিতে না পারিয়া লোকে ইহাকে একটা সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড বলিয়া মনে করিয়াছিল—কিন্তু এমন সাম্প্রদায়িক হত্যা আর ঘটে নাই বলিলেও চলে।

এক দিন রাত্রি দশ ঘটিকায় গণেশ যখন একাকী বসিয়া পরদিনের জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিতেছে—তখন সারা গায়ে শীতবস্ত্র-পরিহিত কে এক জন তাহার কক্ষে প্রবেশ করিল। গণেশ মুখ তুলিয়া বলিল—কি চান?

আগন্তুক বলিল—আপনাকেই চাই।

গণেশ শুধাইল—কেন?

আগন্তুক বলিল—নিতান্ত প্রয়োজন।

গণেশ জিজ্ঞাসা করিল—কোথা হইতে আসিতেছেন?

সে বলিল—আসাম।

গণেশ বলিল—বুঝিয়াছি। Grouping সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বুঝি?

আগন্তুক সংক্ষেপে বলিল—না।

গণেশ শুধাইল—তবে কি প্রয়োজন?

চিন্তা —গোপাল ঘোষ

আগন্তুক বলিল—আপনার চামড়াখানি প্রয়োজন।

গণেশ বলিল—প্রয়োজন হইলেই বা পাইবেন কেন? আমার চলিবে কিরূপে? বিশেষ আপনি কে, তাহা তো এখনো জানিতে পারি নাই।

তখন আগন্তুক গাত্র হইতে শীতবস্ত্র দূরে নিক্ষেপ করত: স্বমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া বলিল—আমি আসামের অরণ্য-প্রদেশের গণ্ডাররাজ। সরল ভাষায় আমি একটি গণ্ডার।

গণেশ বিস্মিত না হইয়া বলিল—কিন্তু আমার চর্ম্মে কি প্রয়োজন?

আসাম হইতে আগত গণ্ডার বলিল—আমার চামড়াই সব চেয়ে পুরু বলিয়া এত দিন আমার গৌরব ছিল, কিন্তু ওরে রে পাষণ্ড, তোর সম্পাদক-খ্যাতি প্রচারিত হইবার পরে আমার সমস্ত গৌরব ধূলিসাৎ হইয়াছে। কাজেই তোকে হত্যা করিয়া তোর চামড়াখানি লইতে আমি আসিয়াছি।

গণেশ বলিল—কিন্তু আমাকে মারিলে কি নরহত্যার দায়ে পড়িবে না?

গণ্ডাররাজ গর্জ্জন করিয়া বলিল—নিশ্চয়ই নয়। স্মরণ করিয়া দেখ, তুই পূর্ব্বজন্মে গণ্ডার ছিলি আর এখনো তুই একটা আধ্যাত্মিক গণ্ডার।

গণেশ শান্ত ভাবে বলিল—আর্কিমিডিসের নাম শুনিয়াছ?

গণ্ডাররাজ বলিল—সে আবার কি?

গণেশ বলিল—সে একটি লোক। ঘাতকের উদ্যত অস্ত্রের তলে বসিয়া সে বলিয়াছিল যে, মারো কিন্তু বৃত্তটি নষ্ট করিও না। সেইরূপ আমিও তোমাকে অনুরোধ করিতেছি যে, আমাকে মারিতে চাও মারো কিন্তু এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি নষ্ট করিও না।

গণ্ডাররাজ বলিল—তোর প্রবন্ধের উপরে আমার লোভ নাই। লোভ তোর চামড়াখানার উপরে।

এই বলিয়া সে তীক্ষ্ণ খড়্গের আঘাতে গণেশের দেহ চিরিয়া ফেলিয়া তাহার চামড়াখানি খুলিয়া লইয়া বেশ সযত্নে ভাঁজ করিয়া, ছোট একটি স্যুটকেশে পুরিয়া, পুনরায় শীতবস্ত্রাদি গায়ে জড়াইয়া হেলিতে-দুলিতে প্রস্থান করিল। গণেশের চর্ম্মহীন রক্তাক্ত দেহ টেবিলের তলায় পড়িল। খানিকটা রক্ত ছুটিয়া সম্পাদকীয় প্রবন্ধের একটি ছত্রের নীচে গিয়া পড়িল। সকলে ভাবিল, সম্পাদক ছত্রটিকে লাল কালিতে আণ্ডার-লাইন করিয়া দিয়াছেন। সেই ছত্রটি তুলিয়া দিয়া আমরা গণেশের গণ্ডার-জীবনকাহিনীর অবসান করিলাম:

"চর্ম্মের দৃঢ়তাতেই মানুষের প্রকৃত মনুষ্যত্ব।"

জটলা —খালীকুমার

মাটি

[পূর্বানুবৃত্তি]

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

২

শীত পড়ছে অল্পে অল্পে। সকাল-সাঁঝে গায়ে কাঁটা দেয়, কাপড়ের খুঁট বা আঁচল বা গামছাখানি ভাল করে গায়ে জড়াবার তাগিদ আসে। রুক্ষ চামড়ায় খড়ি ওঠার সূচনা দেখা দিয়েছে সকলের, কারো কারো খুব স্পষ্ট, গা চুলকোবার ফলে। চাষীর চামড়ায় স্নেহ এক-রকম না থাকার মধ্যেই চিরকাল, ক'বছর তাতেও বিষম ঘাঁটতি পড়ে চলেছে। স্নানের ঘাটে অল্পবয়সী মেয়ে-বৌরা গা ঘষতে ঘষতে বলে অসন্তোষের সুরে, দুৎ, কি সুরুৎ হতাছে দিন দিন, মবে যাই। বেশী রাতে শীত পড়ে বেশী। সকাল-সাঁঝে বাতাস বয় না, কুয়াশা হয়, শীতের বাড় ঠেকে থাকে। সাঁঝের কুয়াশা হাল্কা, দূরের আলোও দেখা যায়, উজ্জ্বল বিন্দুর বদলে ঝাপসা আলোর ঢাকার মত। দু'-একটা চোখে পড়ে এদিকে ওদিকে, আলো বেশী জ্বলে না গাঁয়ে। বোমার ভয়ের আইন নেই, কিন্তু তেলের অভাব।

দাওয়ায় একটা প্রদীপ জ্বালিয়েছে ভূষণ এতগুলি লোকের জন্য। সরু সলতের ডগায় ক্ষীণ মুমূর্ষু শিখাটি জ্বলছে, সতর্ক নজর রেখেছে ভূষণ, মাঝে মাঝে একটু উস্কে দিচ্ছে সলতেটা। সে আলো যেন ছায়াপাত করেনি মাটির দেয়ালে চাটাই-এ বসা জ্যান্ত মানুষগুলির, চেনা বলেই কোন মতে চিনিয়ে দিতে পারছে মুখগুলি। অন্দরের আঁধার থেকে ভেসে আসছে মেয়েদের ছাড়া ছাড়া কথার আওয়াজ আর থেমে থেমে সুরবালার বিনিয়ে কাঁদার স্বর। সেই বুঝি একা একটু শোক করছে ছেলের জন্য, ভূষণের বাড়ীতে যদিও স্ত্রীলোক মোট পাঁচটি, বাচ্চা ক'টা বাদ দিয়েও। তবে তীক্ষ্ণ গলা ঝিমিয়ে মিইয়ে অস্ফুট হয়ে এসেছে ইতিমধ্যেই সুরবালার। পুত্রশোকও জলো হয়ে গেছে মানুষের শোকে শোকে, এমনই তো বছর প্রায় ঘুরত না মড়া-কান্না না কেঁদে, তার ওপর লাঠি সঙ্গিনগুলি বন্যা দুর্ভিক্ষ মহামারী যদি জোট বেঁধে এসে কাঁদাতে চায় অবিরাম, একটার বদলে এক সাথে দশটা মরণের ঘায়ে বুক ফাটিয়ে, কাঁহাতক শোক করতে পারে মানুষ। তা ছাড়া আছে যত কিছু সয় না তার সব সয়ে বাঁচা। পাথর নয় বলেই বুক ফাটেনি সত্যি, কিন্তু তাই বলে পাথর হতে তো বারণ নেই বুকের।

মোহন গিয়েছিল একটু তামাক ধার চাইতে প্রতিবেশী বটুকের কাছে। ফিরে এসে বলে, বটু খুড়োর তামাক নেই।

—এক ছিলুম নেই? এক ছিলুম দিলে না? হতাশার রাগে গলা চড়ে যায় ভূষণের।

—বলল তো কাল থেকে তামাক ফাঁক। তামাক টানতে টানতে বলল।

—অ। ব্যাটা কঞ্জুস!

—আর বলল কি শুনবে দাদা, উপোস পেটে তামুক খেলে রক্ত-বমি হয়, বলগে যা মোহন তোর ভাইকে ঠেসে গাঁজা টানুক, সিদ্ধি পাবে। হাসি কি, ঠিক যান শ্যালের গলায় কাসি ঠেকেছে।

—বেজন্মা, বজ্জাত। ছেলের বৌটাকে ঘর ছাড়ালে।

—ইন্দ্র ফুসলেছে না?

—ফুসলেছে, অমন ফুসলায়। কে কোথা ফুসলায় আর ওমনি ঘর ছাড়ে ঘরের বৌ, না কি বটে? কারো ঘরে মেয়ে-বৌ রইত না তা'লি। খেতে দিত না তো কি করবে ঘর না ছেড়ে?

—তা ফের ভাতের ঘাটা নেই বটুকের।

তামুক ছাড়া জমে না।—আরেক বার আপশোষ করে ভূষণ। ছেলের মরণে সে যেন তেমন কাতর নয়, তামাকের জন্য আপোষটা বেশী। বিশেষ করে রাজেন দাস আজ যেচে এসে তার দাওয়ায় বসেছে বলে। মাননীয় ব্যক্তির পদার্পণে ধন্য হয়ে তাকে খাতির করার সাধ মেটানো গেল না বলে নয়, মানে তারা সমান হবে! বয়সেও প্রায় যেমন। সাপ বেজীর সম্পর্ক ছিল তাদের অনেক কাল। রাজেনের বোন সুখদা, ছেপেপিলে নিয়ে আজ সে সাত বছর ঘর করছে শিয়াপোলের অনন্তের, তাকে ভূষণ বিয়ে করেনি কথাবার্ত্তা পাকা হবার পর, এই ছিল ঘটনা। ঘাটের পথে সাঁঝের বেলা একলা সুখদাকে নিমাই ছোঁড়ার সাথে কথা কইতে দেখেছিল, হেসে হাত নেড়ে কথা কইতে দেখেছিল ভূষণ নিজের চোখে—এই ছিল কারণ। কথা সে-ই কইতে গিয়েছিল নিজে, দু'টো মিষ্টি মিষ্টি প্রাণের কথা। কথা আর বলা হয়নি জ্বালায়। খটকা একটা এমনিই ছিল ভূষণের মনে যে তার সাথে লুকিয়ে ভাব করতে পারে যে মেয়েটা সে কি আর অন্যের সাথে পারে না? এ ক্ষেত্রে অবশ্য ভাবটা হয়েছে তারই সাথে, কিন্তু কথা হল, স্বভাব ভাল যে মেয়ের সে তো এ রকম ভাব-সাবের ব্যাপার করে না কারো সাথেই! যে খুঁতখুঁতানি মনে ছিল সেটা প্রত্যয় হল হেসে হেসে নিমাই-এর সাথে হাত নেড়ে কথা বলা দেখে, বাঁশ-ঝাড় গাছ-পালায় ঘেরা যে নির্জ্জন স্থানটিতে শুধু তারই সাথে কথা বলার কথা সুখদার। বিয়ে তাই ভেঙ্গে দিল ভূষণ, নিজে নিজে যেচে বরণ করা যন্ত্রণায় দিশেহারা হয়ে রটিয়েও দিল মেয়েটার নামে মনগড়া কলঙ্ক। ঘটনা রটনা গালাগালি হাতাহাতি পুরানো হয়ে তলিয়ে গেল অতীতে, জিদ বজায় রইল মুখ-দেখাদেখি বন্ধ রাখার, শত্রুতা করার। বিয়াল্লিশ সালে ব্যাপার হল একটা। বন্দুক উঁচিয়ে সৈন্য পুলিশ এসে অন্য ক'টা ঘর-বাড়ীর সাথে পুড়িয়ে দিল রাজেনের ঘরটা, আর এমনি মজার যোগাযোগ অদেষ্টের যে দু'কোশ তফাতে বেঁদা গাঁয়ে ভূষণের মামা জগন্নাথের বাড়ীতে সপরিবারে আশ্রয় নিয়ে দু'টো রাত কাটাতে হল রাজেনকে সপরিবার ভূষণের সাথেই। ভূষণ ভেবেছিল, মামাকে বলে ভূষণ তাদের খেদিয়েই দেবে বেহদ্দ মার-ধোর খুন-জখম বলাৎকার ঘর-পোড়ানোর তাণ্ডবের মধ্যে। তা, ভূষণও ভেবেছিল একবার, এত কালের শত্রুকে জব্দ করার এমন খাসা সুযোগ আর আসবে না জীবনে! সেই থেকে বিদ্বেষ ঘুচে গেছে তাদের, পথে-ঘাটে দেখা হলে দু'টো-একটা কথা তারা কয়ে এসেছে পরস্পরে, কিন্তু শুধু ওই শত্রুতার অবসান ঘটা ছাড়া বেশী আর এগোয়নি তাদের সম্পর্ক। কে পা দেয়নি কারো বাড়ী, ক্রিয়া-কর্মে আপদে-বিপদে কেউ ডাকেনি অন্যকে। এত কাল পরে রাজেন আজ নিজে থেকে এসেছে তার বাড়ী। ওকে দু'টান তামাক না টানতে দিতে পারলে কেমন লাগে মানুষের?

একবারটি ঝেড়ে-পুঁছে দেখে এসবে না কি রসিক? ভূষণ আবেদন জানায়।

—নেই তো জানি। বলছো যদি দেখে আসি।

তিনটে বিড়ি নিয়ে আসে রসিক। তাই একটা রাজেনকে দেয়

ভূষণ, পিদিম থেকে ধরাতে গিয়ে নিবে যায় শিখাটুকু পিদিমের। ফের হাঙ্গামা করতে হয় পাথর ঠুকে সলুই জ্বালিয়ে আগুন সৃষ্টি করার। দু'-এক টান টেনে বিড়িটা রাজেন বাড়িয়ে দেয় তোরাব আলিকে।

আনমনা ছিল তোরাব। এনতার তাকে ডেকে বলে, বিড়ি ধর মিয়া।

এ বড় আশ্চর্য্য কথা যে এতগুলি মানুষ তারা বসে আছে প্রায় চুপ-চাপ। কথার কামাই নেই বটে কিন্তু এক সাথে কথা বলছে না এক জনের বেশী, কথার আওয়াজে মোটে সরগরম নয় চোদ্দ জন চাষীর আসর। কাটা-কাটা ছাড়া-ছাড়া সাধারণ চলতি আলাপ এটা-ওটা নিয়ে, তাই মন দিয়ে শুনছে সকলে যে যখন মুখ খুলছে। বিশেষ কিছু একটা শুনবার জন্য যেন প্রত্যাশা সকলের, আবার কথা উঠছে না বলে আগ্রহ চেপে যেন অপেক্ষাও করে আছে সকলেই। সবার মনের কথা কে আগে তুলবে, কি ভাবে তুলবে তাও জানা নেই কারো। বেশী উৎসুক এনতার, কেবলি উসখুস করছে আর বুড়ো আঙ্গুলের নখ দিয়ে চুলকিয়ে চলেছে ঘন রুক্ষ দাড়ি-ঢাকা চিবুক।

—খাবা না তুমরা? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের পিসী দয়া।

—খা গা যা মোহন।

—খাবানে পরে।

একটা লণ্ঠন চলে যায় সামনের পথ দিয়ে, ঝকঝকে নতুন লণ্ঠন, সযত্নে কাটা পলতেয় উজ্জ্বল তেজী শিখা। কনেষ্টবল শশী পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে দারোগা মৃণাল বাবুকে। হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্ত্ত কেঁউ কেঁউ চীৎকারে বাতাস চিরতে চিরতে পথ ছেড়ে ছুটে পালায় রসিকের বাড়ীর কুকুরটা। কে জানে দারোগা বাবুর চলার রাস্তায় পুঁটি কি খুঁজছিল বাড়ীতে চালার কোণে এক গণ্ডা বাচ্চা ফেলে রেখে।

—বলি কি, রাজেন দাস বলে, উপায় একটা না হলি তো নয়। সব দিকে দেখি মরার যোগার।

—অ্যাদ্দিনে জানলে সেটা! তিনু বলে খোঁচা দিয়ে।

—আঃ হাঃ! বড়ই বিরক্ত হয় তোরাব, ছেঁদো কথা রাগো না এখন, ঘরে গিয়ে চাটনি খেয়ো।

—বলি কি, রাজেন দাস বলে, একটা উপায় চাই। এতর নিরুপায় জন্মে হইনি কোন কালে। অজন্মা এল তো বুঝি না তো এও বুঝি শালা মন্বন্তর ঘটেছে, ও-সব যা করেন তা ভগবান করেন, তেনার লীলা-খেলা আর মোদের অদেষ্ট। কিন্তু ই কি রে বাবা, অজন্মা না, দুর্ভিক্ষ না, খাসা ফলন, তবু হাঁড়ি চড়বে না, ছেলে-পিলে খিদেয় কাঁদবে?

—শুধু কাঁদে না কি? তিনু বলে, মরে না?

শ্রীনাথ বলে, বিন্দাবনের বড় ছেলেটা মরেছে, ছোটটা মরবে। ওই যে মণি বাবু, জ্ঞান বাবুর ভাগ্নে, তেনা ছুটে শুধোতে এল—

—আঃ হাঃ! তোরাব বলে।

কিন্তু এবার তার বিরক্তি ও আপত্তি খণ্ডন করে রাজেন বলে, না না, শুনি ব্যাপার।

শ্রীনাথ থামেনি, কলকাতায় কাগজে লিখবে কি না না খেয়ে মরেছে, তাই শুধোতে এল জ্ঞান বাবুর ভাগনে মোদের ওই মণি বাবু। তা ইদ্দিকে মিণাস বাবু শাসিয়ে গেছে, উপোসে মরছে তা বলতে পাবে না, বলবে যদি তো মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবে, কয়েদ করবে। বিন্দাবন কি করে, মণি বাবুকে বলল, না বাবু, না খেয়ে মরেনি ছেলে, ব্যারামে মরেছে। না, ব্যারামটা কি হয়েছিল? তা কি বুঝি বাবু চাষাভূষো মানুষ, ও কি জানি কি পেটের ব্যারাম। তোমার ভয় নেই বিন্দাবন, যে যেথা আছে তোমার ছেলের মিত্যুর শোধ নেবে। না, ব্যারামে মরেছে ছেলেটা বাবু।

গলা-খাঁকারি দিয়ে থুতু ফেলে শ্রীনাথ বলার শেষে।

রাখাল বলে আস্তে আস্তে, মণি বাবু এক পসারি চাল দেছে বিন্দাবনকে। আর দু'টো কমলা দেছে বিন্দাবনকে ছেলেটার তরে। বলল কি, মামা কত খায়, এটু এটু রস করে ছেলেটাকে দিও বিন্দাবন। থানায় দশটা রাত পিটেছে, তখন মণি বাবু এমনি কমলা দিয়ে এমনি করে বলতে বিন্দাবন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। স্বীকার করলে না বাবু, ছেলেটা ব্যারামে মরেনি, না খেয়ে মরেছে। কলকাতার কাগজে বেরুবে খপর।

—বলি কি, রাজেন বলে খানিকক্ষণ নিজে আর অন্য সকলে চুপ করে থাকার পর, কি করা যায়। আর তো সয় না। মোদের প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে না কি শাসার ব্যাটা শালা ধরণী শালা? ই কি রে বাবা, গাঁ পিতিবেশী চাইলে মানুষ ধান দেয় যে হাঁ আজ বাদে কাল ফিরিয়ে দেবে! মোরা তোর গাঁয়ের মানুষ, একটা মাসের তরে দু'টো ধান দিবি, কর্জ্জ দিবি, তাতেও তোর দেড়ভাগি চাই? বলি, মাগ যে তোর বছর-বিয়ানী, দু'-তিন মাস ছুঁতে পাস না কি বছর, তা ভাত-কাপড় কি বন্ধ রাখিস মাগের? না, কুবজা জেলেনীর পিছে যা খরচ করিস তার সুদ কষিস্?

খিল খিল করে হেসে উঠে অপ্রস্তুত হয়ে থমকে থেমে যায় অল্পবয়সী যোয়ান মোহন। ভূষণ মুখ ভার করে তাকায়। যেন পিদিমের মৃদু আলোয় ভাইটা তার মুখের ভাব দেখতে পাবে। অন্যেরা বিরক্ত হয় না, তবে বুঝেও উঠতে পারে না এমন কি রসিকতা আছে। গুরুতর কথাগুলির মধ্যে রাজেনের যে হাসি সামলাতে পারল না মোহন। রাজেন স্পষ্ট করে জমাট করে প্রকাশ করেছে সবার মনের এলোমেলো অশান্ত খেদ। এ তো সত্যি কথাই যে ধরণী যেন রাজা-বাদশা, ঘরের বৌ পরের মেয়েছেলেকে খুসীমত ভোগ করবে, টাকা নাড়াচাড়া করবে যেন পয়সা হাতের ময়লা মাত্র, নতুন ফসল ওঠার আগেও ধান ভরা থাকবে পাঁচটা খামারের দু'টোতে আর হেথা-হোথা ছড়ানো—নিজের একটি পরিবারটিকে তারা যে ছোঁবে সে সামর্থ কই, ছোঁয়াছুঁয়ি সইবার শক্তি কই সে বেচারার, গর্ভবতী বৌগুলির কথা তো আলাদাই, তারা বাঁচে কি না বাঁচে নিত্য এ ভয় ভরা মাস হবার আগেই। টাকা আর ধান শুধু তাদের ঋণের খত। জমি যার আছে দু'বিঘে তারও, এক মুঠো মাটিতে যার স্বত্ব নেই তারও। ঠিক কথাই তো বলেছে রাজেন।

—খাবা না? এসে শুধিয়ে যায় ভূষণের বিধবা পিসী, দয়ার বিধবা মেয়ে হারানি।

—দুত্তোর নিকুচি করেছে তোর খাওয়ার, রেগে তেড়ে-মেড়ে ওঠে ভূষণ, দিবি তো দুধ-পোয়া মাপে আলুনি ফ্যান-ভাত, ডাকের কামাই নেই, লুচি-পোলাউ ভোজ খেতে ডাকছে যেন হারামজাদি।

ভেঁা করে কেঁদে ওঠে হারাণি কলের দড়ি-টানা বাঁশীর মত, যুবতী মেয়ের মনটা যেন চড় খেয়ে কেঁদে-ওঠা শিশুই আছে এখনো, আর নাক দিয়েও তার সিকনি নামে সেই ছেলেবেলার মত, নাক টেনে টেনেও সামলাতে পারে না। মরণ ঠেকাবার উপায় খোঁজার খাতিরে জড়ো

এই চাষীর আসরে যেন ছেঁড়া তালি কাপাসে আধ-ঢাকা রোগা ক্ষুধা মূর্ত্তিমতী বিষ। পুরাণে নজির আছে, পিনাক সামন্ত, ভাবে খুসী হয়ে, অর্জ্জুনের তপস্যা ভাঙ্গতে এমনি ভাবে এয়েছিল উর্বশী—মেয়েগুলো মরে না, এই যুবতী মেয়েগুলো ?

—আমি ডেকেছি ? মা বলল না ডাকতে ? নিজে যদি এসে ডেকে থাকি তো—নাকের জল চোখের জল খেতে খেতে কথা বলতে গিয়ে বিষম লাগে হারাণির। আচমকা অন্দরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঠাস করে গালে তার একটা চড় বসিয়ে দয়া তাকে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যায়।

লম্বা নিশ্বাস ফেলে ভুবণ বলে, সহরে ছিল বছর দেড়েক দু'য়েক। দুর্ভিক্ষের ফলে পুষতে পারিনি, মোর যে দাদা দুকান করে সহরে, তার ঠেঁয়ে পাঠিয়েছিনু মরতে।

—কি দুকান করে হে নয়ন সহরে ? এক জন শুধায়।

চুপ করে থাকে ভুবণ।

—শুনি তো কত কাল নয়ন না কি দুকান করে, তা দুকানটা কিসের ?

—কি জানি কিসের দুকান। এবার রেগে বলে ভুবণ।

—আঃ হাঃ, তোরাব বলে জোর দিয়ে, দুকানের কথা থাক। ধরণীর দু'টো খামারের ধানের কথা বলাবলি, উনার মদ্যি দুকান ! কি দুকান, কিসের দুকান। কাজের কথা কও। সাতনলায় খামারে লোকজন বেশী রয় না।

শুনে সবাই আবার থাতস্থ হয়ে গুম্ খায়। ধরণীর একটা খামার আছে সাতনলায়। ধান বোঝাই খামার। তা সে খামার তো আগেও ছিল, এখনো আছে, কি তাতে। সবাই জানে আজ এই মরিয়া বেপরোয়া মানুষগুলির আসরে ধরণীর ওই ধান-বোঝাই খামারের কথা ওঠার মানে কি, খামারে লোকজন বেশী থাকে না এ কথা বলারও মানে কি। তবে কি না, যায় যায় বুঝা কথাও সবার মিলেমিশে এক সাথে এক ভাবে বুঝা তো দরকার।

—তা বটে, রাজেন বলে, উনার খামার-ভরা ধান, মোদের দুর্দ্দশা।

—ধানে উনার স্বত্ব কি ?

—লুঠের ধান না ?

—আসলে মোদেরি ধান তো, না কি বল ?

—গায়ের জোরে কেড়ে নেছে বই ত না ?

এ তো একই কথা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলা। এত দূর এগিয়েও পরের কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে আছে অনেকের। ধীর অস্তি, ধীর জীবন এদের—অকালে বুড়িয়ে ঝরে যায়, তবু ধীর। ঘুম ভাঙ্গে, হাই তোলে, আড়মোড়া ভাঙ্গে, সন্দ করে যে সত্যি রাত শেষ না চাঁদের আলোর আভা বাইরে—না, ভোরই হচ্ছে, কাকের ডাক শোনা যায়। মাঠে গিয়ে লাঙলের ফলা মাটিতে ডাবায়, ফসলের আশা তার কাল নয়, পরশু নয়, মাসকাবারে নয়, সেই ফসল ফলাবার পর। ধৈর্য্য ছাড়া তার কি চলে, ধীর না হয়ে উপায় আছে ?

শেষে মোহন বলে, ধান যদি মোদের, কেড়ে নিতে, লুঠে নিতে পারি না মোরা ? না, ওটা ধরণীদের একচেটে।

—বলি কি, রাজেন তখন বলে, কথাটা বিবেচনা করি এসো মোরা। লুঠে আনতে চাও যদি তো চল যাই আজ রাতেই হানা দি সাতনলায় খামারে। তবে কি না হাঙ্গামা হবে তা বলে রাখি, বিষম হাঙ্গামা হবে। তখন দুষো না মোকে।

সেই যেন এতক্ষণ ধরণীর সাতনলার ধানের খামার লুঠ করার প্ররোচনা দিচ্ছিল সকলকে, পরামর্শটা গ্রাহ্য হওয়ায় সাফাই গেয়ে রাখছে যে হাঙ্গামা হলে তাকে দোষী করা চলবে না, আগে থেকে সে দিয়ে রাখছে হুঁসিয়ারি। ঘরে কাটা চরকার সুতোয় মদন তাঁতিকে দিয়ে বোনানো খদ্দরের কাপড় আর কামিজ গায়ে সতের দিন হাজত খেটেছিল রাজেন। বিয়াল্লিশে ঘোষণা করেছিল, গান্ধিজী স্বপ্নে দর্শন দিয়ে তাকে আদেশ দিয়েছেন যে, স্বরাজ এসে গিয়েছে, এবার থানা পোড়াও, পুলিশ মার।

এনতার খুসী হয়ে বলে, হাঙ্গামার কমতি কোথা ? হাঙ্গামা ছাড়া ক'দিন কাটে ? ঘর তো করি হাঙ্গামা নিয়ে। রামপুরে মোর চাচা থাকে, এ গোস্তাকির মাপ নেই, পরশু রোজ তাই হানা দেয়নি মোর ঘরে ? হাঙ্গামার কথা বলো না দাদা, ওটা খোদার নজরানা।

—কি আর হবে হাঙ্গামায় ?

—কচু করবে মোদের, যা করার করেছে।

—মারবে তো ? মারুক। মরেই আছি।

—হাঃ, মরে আছি ! কেন বাবা মরে রইবো ? খালি খালি মরে রইবো ? মারতে জানি না দু'ঘা দিয়ে।

—বলি কি, রাজেন বড় গম্ভীর, গলার আওয়াজ গমগমে, চলো তবে আজ রাতেই যাই। কথা তবে শুনে রাখো কিন্তু, লুঠবো গিয়ে এক সাথে, তার পর যে যার সে তার দায়িক। ধান নিয়ে চটপট সরে পড়বে। ঘরে রাখবে না ধান।

—কোথা রাখব ? এক জন শুধায়।

তাও জানো না ? রাজেন বলে হতাশায় অবজ্ঞায়, ধান ফেলে রাখবে বন-বাদাড়ে, ডোবার ধারে। খানিক বরবাদ যাবেই, উপায় কি !

[ক্রমশঃ

ভারতবর্ষ ও ফ্যাশিজম্

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্পনা-নেত্রে বেশ দেখতে পাচ্ছি প্রবন্ধের নামকরণটা মোটা হরফে পড়েই অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পাঠকের নিউট্রিশনের অভাবে ক্ষীণদেহের ততোধিক ক্ষীণ মুখমণ্ডল সূচালো হয়ে উঠেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে একটা মস্ত অবজ্ঞার ভাব। কিন্তু এতে আশ্চর্য্য হবার কোন কারণ দেখি না বরং এটাই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছি। আজকের দিনে শুধু আমাদের দেশেই নয়, ধনতান্ত্রিক সমাজের আওতায় মানুষ সব দেশের মধ্যবিত্তই শুধু বিত্তহীন নয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে মস্তিষ্কহীন বললেও খুব বেশি অত্যুক্তি করা হবে না। ঢেউএর টানে ভেসে যাবার স্বভাব সর্ব্বত্রই প্রবল বলে সুস্থ দৃষ্টিতে কোন কিছু বিবেচনা করার মত মানসিক স্থৈর্য্যও তাদের নষ্ট হয়েছে। এ-ক্ষেত্রে ভারতে ফ্যাশিজমের সম্ভাবনার কথা শুনলে মধ্যবিত্তের মধ্যচিত্তে একটা নিদারুণ 'শক' লাগলেও বিস্মিত হওয়া চলে না। আর নিজের মনের কাছে যেটা 'শকিং' বোধ হয় সেটাকে এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে মানসিক চিন্তার দায়িত্বের হাত থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা শতকরা নববুই জন মানুষের কাছে আরাম-দায়ক! সুতরাং ভারতে ফ্যাশিজমের ভয়টাকে নিতান্ত ছেঁদো কথা বলে উড়িয়ে দিতে দেখলেও তাকে অস্বাভাবিক মনে করতে পারি না!

অথচ আসলে এটা ছেঁদো কথা নয়, উড়িয়ে দেবার মত তো নয়ই। অবশ্য এটাকে উড়িয়ে দেবার সাধারণ প্রবৃত্তির আর একটা হেতু আছে। ফ্যাশিজম কথাটায় উদ্ভব হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পর সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার ইয়োরোপে। সে সময় এদেশে কম্যুনিজমের মত সদ্য আবিষ্কৃত ফ্যাশিজম নিয়ে আলোচনাও কম হয়নি—তবু তখন এসব আলোচনায় সঙ্গে এদেশের নাড়ীর টান ছিল না; আলোচনাটা চলত রাজনৈতিক নেতা ও তাঁদের চেলা-চামুণ্ডদের মধ্যে কেতাদুরস্ত ফ্যাশান হিসাবে। এটা যে তখন নেহাৎই ফ্যাশান ছিল, এবং এর মূলগত প্রকৃতিটা অনেকেই বুঝে উঠতে পারেননি তার একটা প্রমাণ, নেতারা একই সঙ্গে যেমন রুশ-বিপ্লবের নেতা লেনিনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতেন, ঠিক তেমনি একই নিশ্বাসে মুসোলিনীকে ইটালীর প্রাণ-পুরুষ হিসাবে বর্ণনা করতেও তাঁদের আট্কাত না। এর মূল অনুসন্ধান করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, সাম্যবাদ ও ফ্যাশিজমের মধ্যে মতবাদগত প্রভেদটা এদেশের পক্ষে তখনও জীবন্ত হয়ে ওঠেনি—সেটা কেবল ফ্যাশনেবল তর্ক হয়েই ছিল। ঠিক এই কারণেই অনেক নেতাকে আবার এই দুই সম্পূর্ণ বিপরীত মতবাদের সিনথেসিস করার অদ্ভুত প্রচেষ্টায় লিপ্ত হতেও দেখা গিছল।

কিন্তু আজকের দিনে সেই পুরোনো দিনের স্মৃতি অনুসরণ করে একে কেবল ফ্যাশনেবল বুজরুকি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা শুধু ভুলই নয়, মারাত্মক এবং বিপজ্জনক। অতীতে যা সত্য ছিল বর্ত্তমানে অবস্থার পরিবর্ত্তনে তা মিথ্যা হয়ে গেছে। আজ আর ফ্যাশিজম্-সোস্যালিজমের ঝগড়া এদেশে শুধু ফ্যাশন নয়:—এর সঙ্গে জীবনের এবং বাস্তব অবস্থার যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। ফ্যাশিজমের ভয় তাই কল্পনাবিলাসীর উত্তপ্ত মস্তিষ্কের কল্পনা নয়, এটা অত্যন্ত বাস্তব। যাঁরাই আধুনিক ভারতের রাজনীতির গতি লক্ষ্য করছেন তাঁদের পক্ষে এ বস্তু অস্বীকার করার উপায় নেই।

তবু অস্বীকার করার চেষ্টা যে নেই তাও বলা চলে না। কিছু দিন আগেও বড় বড় কর্ত্তা-ব্যক্তি মহলে প্রায়ই শোনা যেত, পাশ্চমের ধনতান্ত্রিক সভ্যতাটা আমাদের দেশে শিকড় গাড়তে পারবে না। কেন না, আমাদের দেশের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, জাতীয় বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি ভাল ভাল কথাগুলোর সঙ্গে ও-জিনিষটা না কি তেমন খাপ খায় না। আমাদের দেশ একেবারে খাঁটি আর্য্য-ঋষিদের দেশ, এখানে কলের ধোঁয়া আর মিলের মজুর তেমন সুবিধা করতে পারবে না। আমাদের দেশের অন্তরের কথা হ'ল, "দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।" কিন্তু আজ ১৯৪৬ সালে এ সব বুলির অন্তঃসার-শূন্যতা কোন চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির কি বুঝতে বেশি সময় লাগে? অ্যানড্রু ইয়ুল আর ইম্পিরিয়াল কেমিক্যালের দোসর হিসাবে বিড়লা-টাটা গোষ্ঠী ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ধনতন্ত্রের বেশ একটা মিল খাইয়ে নিতে খুব বেশি বেগ পাননি তার মস্ত প্রমাণ কলকারখানার দিক দিয়ে ভারতকে সুসজ্জিত করে তোলার জন্য "খাঁটি ভারতীয়দের" আপ্রাণ উদ্যম। গান্ধী মহারাজ প্রভৃতি যাঁরা এখনও উট পাখীর মত মাটিতে মুখ গুঁজে স্রোতের বিপরীত দিকে গিয়ে "রাম রাজত্ব" পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশায় দিন গুণছেন, ধনতন্ত্রের অগ্রগতির বেগে তাঁদের সেই সামন্ততান্ত্রিক স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তাতে সন্দেহ নেই।

ঠিক ঐ একই ভাবে যাঁরা বলেন, ফ্যাসিজম এদেশে সম্ভব নয়, ওটা বিদেশী মাল। তাঁদের কথায় গুরুত্ব দেওয়া যায় কি করে? তাই এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আবশ্যক।

ফ্যাশিজমের স্বরূপ

কিন্তু তর্কের আগে তর্কটা কি নিয়ে তা পরিষ্কার হওয়া দরকার—তা না হলে খেই হারাবার সম্ভাবনা যেমন আছে, সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারার ভয়ও তেমনি প্রবল। তাই আগেই ফ্যাশিজম বলতে কি বোঝা হচ্ছে তা স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দেওয়া দরকার। এখনও পর্য্যন্ত অনেকের মনে যে-কোন ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্বের সঙ্গে ফ্যাশিজমকে এক পর্য্যায়ে ফেলার ঝোঁকটা প্রবল—সেই জন্য পূর্ব্বেই আলোচ্য বিষয় পরিষ্কার করে নেবার আবশ্যকতা অধিক।

ফ্যাশিষ্টরা নিজেরা ফ্যাশিজম বলতে কি বোঝাতে চায় তা দিয়ে সত্যকার ফ্যাশিজমের ধারণা করা সম্ভব নয়। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনেক কিছু মুখরোচক বুলি প্রচার করতে কসুর করে না কিন্তু আসল বাস্তব অবস্থার দিক দিয়ে বিচার করলে এ সমস্ত কথার প্রকৃত উদ্দেশ্যটা ধরা পড়ে যায়। উইলিয়াম থ্যাকারে তাঁর তৃতীয় জর্জ্জ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে একবার মন্তব্য করেছিলেন যে, পৃথিবীতে এমন অত্যাচারী খুব কমই আছে যারা নিজেদের অত্যাচারী জেনেও অত্যাচার চালিয়ে যেতে পারে। এটা অত্যাচারীদের দোষ ঢাকার জন্যে বলা হয়েছে হয়ত, তবু এর মধ্যে সত্যও কিছুটা বোধ করি আছে। মানুষ এমনি একটা জীব যে, অপরকে ঠকাবার আগে সে নিজেকে ঠকায় আর নিজের অপকর্ম্মের একটা সুন্দর যুক্তিসঙ্গত কৈফিয়ৎ হাজির করার চেষ্টা করে। অপকর্ম্ম করছে জেনেও অপকর্ম্ম করার মত বুকের পাটা (!) খুব কম লোকেরই থাকে, তাই একটা কাজ-চালানো গোছের মনকে চোখ ঠারা তার একান্ত প্রয়োজন। তাতে নিজের বিবেকের কাছে অনবরত জবাবদিহির হাত থেকে কিছুটা নিস্তার পাওয়া যায়।

ফ্যাশিষ্ট নেতাদের সম্বন্ধে কথাটা পুরো মাত্রায় খাটুক আর নাই খাটুক তাঁরা অপরকে অন্ততঃ নিজেদের সদিচ্ছার ও সদুদ্দেশ্যের ফিরিস্তিটা ঢোল কাহন করে শোনাতে যে কার্পণ্য করেননি তাতে

সন্দেহ নেই। ফ্যাশিজমের প্রথম পথপ্রদর্শক মুসোলিনী তাঁর 'What is Fascism ?' প্রবন্ধে অতি মোলায়েম ভাষায় লিখেছিলেন—"The foundation of Fascism is the Conception of the state, its character, its duty and its aim. Fascism conceives of the state as an absobute in comparison with which all individuals or groups are relative···Whoever says Fascism implies the state,—" (Encyclopedia Italiana)

অর্থাৎ ফ্যাশিজমের অতি জঘন্য, অতি কুৎসিত রূপটাকে ভাবালুতা আর ধোঁয়াটে উচ্ছ্বাসের পাউডার স্নো মাখিয়ে ভদ্র সমাজে জলচল করাবার কোন ত্রুটি এখানে করা হয়নি। ফ্যাশিজম কি তা স্পষ্ট ভাষায় বলে কাজ কি? ফ্যাশিজমের সঙ্গে রাষ্ট্রকে জড়িয়ে একটা আধ্যাত্মিক জগাখিচুড়ি পাকানো হয়েছে অতি যত্ন সহকারে। মুসোলিনীর প্রবন্ধে state বা রাষ্ট্রকে নিয়ে যে ভাবে মাথায় তুলে নাচা হয়েছে তা নতুন কিছু নয়। জার্ম্মাণ দার্শনিক হেগেল অনেক আগেই রাষ্ট্রকে absoluteরূপে কল্পনা করেছিলেন। অথচ ফ্যাশিজম হ'ল প্রথম মহাযুদ্ধের পরের ব্যাপার—তার আধ্যাত্মিক বংশ-কৌলিন্য কিছু নেই। সুতরাং ফ্যাশিষ্টরা ফ্যাশিজম সম্বন্ধে যা বলে তা থেকে ফ্যাশিজমের সত্যকার রূপ বোঝবার কোন উপায় নেই।

শুধু ফ্যাশিষ্টরাই নয়, বিলেতের তথাকথিত সমাজতান্ত্রিকেরাও ফ্যাশিজমের যে বর্ণনা দেন তাও অপদার্থতার দিক দিয়ে কম যায় না। বিলাতী "সমাজতান্ত্রিক" H. N. Brailsford লিখেছিলেন,—"There is however an aggresive class which has made in one great industrial country its revolutionary stroke. The German Nazis are emphati-cally the party of the small middle class." অর্থাৎ, এই সব তত্ত্ব-প্রচারকদের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একনায়কত্বের নামই ফ্যাশিজম। আসলে এটা মস্ত ভুল তা একটু বিচার করলেই বোঝা যাবে। সমাজে মধ্যবিত্তের যে স্থান তাতে তাদের কোন নিজস্ব মতবাদ থাকতে পারে না, নেই-ও।

ফ্যাশিষ্টরা প্রচার করত তারা শ্রমিকদের বাড়াবাড়িও সহ্য করে না, পুঁজিবাদীদের বাড়াবাড়িও সহ্য করে না—তারা এই দু'জনের সামঞ্জস্য চায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণী সাধারণতঃ বড় বড় ধনিকদের দ্বারা শোষিত; তারা কেরাণী ইত্যাদি হিসাবে ধনিকদের চাকরী-বাকরী-তাঁবেদারী করে কিন্তু উপযুক্ত পুরস্কার পায় না। তাই স্বভাবতঃই বড়লোকদের প্রতি মনোভাবটা তাদের প্রসন্ন নয়। ওদিকে অধিকাংশ মধ্যবিত্তই শ্রমিকদের সঙ্গে নিজেকে এক বলে ভাবতে পারে না—কারণ তাদের দৃষ্টিতে শ্রমিকেরা কুলি-মজুর,—"তারা যে ছোট লোক!" সুতরাং ফ্যাশিষ্টরা যখন বললে, আমরা মাঝপথে চলি তখন মধ্যবিত্তদের অনেকেই তাদের সমর্থক হয়ে উঠেছিল। বিলাতী সমাজতান্ত্রিকেরা তাই দেখে ভাবলেন, ফ্যাশিজম মধ্যবিত্তদের একনায়কত্ব।

কিন্তু কথায় না ভুলে ফ্যাশিষ্টরা কাজে কি করেছে সেটা দেখা দরকার। ফ্যাশিষ্টরা জার্ম্মাণীতে ক্ষমতা পাবার পর ব্যবসাদারদেরও জব্দ করেছিল বলে একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। আসলে জব্দ হয়েছিল মাঝারি ব্যবসায়ীরা এবং লাভবান হয়েছিল বড় বড় পুঁজিপতির দল। তারা Supreme Economic Councilএ যাদের স্থান দিয়েছিল তারা অস্ত্র-কারখানার মালিক হের ফন ক্রুপ, লৌহপতি থিসেন, ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানীর সর্ব্বেসর্ব্বা সিমেন্স ইত্যাদি। এরা আমাদের দেশের টাটা, বিড়লা প্রভৃতির মত স্বনামধন্য পুরুষ। এর নাম যদি পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে মধ্যবিত্তের বিদ্রোহ হয়, তবে পুঁজিপতিদের রাজত্ব কাকে বলে?

আসলে ফ্যাশিজম যে পুঁজিপতিদের ঘৃণ্য একনায়কত্ব ভিন্ন আর কিছু নয় তা শ্রমিকদের সম্বন্ধে তাদের আইন-কানুন থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারা শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন বে-আইনী করে দিল এবং মালিকদের সঙ্গে শ্রমিকদের এক ইউনিয়নে জুড়ে দিয়ে বোঝাতে চাইল যে তারা শ্রমিক ও মালিক কারুর অন্যায় জুলুম বরদাস্ত করবে না এবং দু'পক্ষেরই ন্যায্য দাবী মানবে। ধর্ম্মঘট ইত্যাদিতে দেশের শিল্পের ভয়ঙ্কর ক্ষতি হয়, আমরা শ্রেণি-সংগ্রামে অযথা শক্তির অপব্যয় চাই না, আমরা চাই শ্রেণি-সহযোগিতার মধ্যে দিয়ে জাতির, দেশের, রাষ্ট্রের উন্নতি। শ্রোতার দল এ-সব ভাল ভাল বক্তৃতা শোনার পর চটাপট হাততালি দিল বটে, কিন্তু কাজের সময় দেখা গেল এটা বিশুদ্ধ বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ এক দিকে এ কথা বলে শ্রমিকের ধর্ম্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হ'ল আর অন্য দিকে রাষ্ট্রের অধীনে শ্রমিক আর মালিকের যে যুক্ত ইউনিয়ন হ'ল তার কর্ত্তা করে দেওয়া হ'ল হের ফন ক্রুপের মত বড় বড় শিল্পপতিকে। এর অর্থ বুঝতে বিলম্ব হয় কি? ক্রুপ-কারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে মাহিনা বাড়ানোর বিষয় নিয়ে যদি কর্ত্তৃপক্ষের বিরোধ হয় এবং তার মীমাংসার ভার যদি দেওয়া হয় স্বয়ং ক্রুপের হাতে তবে শ্রমিকদের দাবী কোনো জন্মে মেটার যে আশা নেই তা বোঝার জন্যে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয় না। শুধু শ্রমিকদের নয়, মধ্যবিত্তের হাড়ির হাল হতেও বাকি রইল না। এই কারণেই ফ্যাশিজমের সত্যকার রূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বিখ্যাত মার্ক্সবাদী লেখক পাম দত্ত বলেছেন: "ফ্যাশিজম হ'ল ফিনান্স ক্যাপিটালের খোলাখলি সন্ত্রাসমূলক একনায়কত্ব। ফ্যাশিষ্ট আন্দোলনে নানা ধরণের জীব থাকে; তার মধ্যে প্রধান হ'ল পেটি বুর্জোয়া তবে বস্তির সর্ব্বহারা ও শ্রেণি-সচেতন নয় এমন শ্রমিকদেরও অভাব হয় না। শ্রমিক বিপ্লব ও শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য বড় বড় পুঁজিপতি, জমিদার, ব্যাবসাদারদের টাকায় এই আন্দোলন পরিচালিত হয়।"—এক কথায় বলতে গেলে সর্ব্বহারা বিপ্লবের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য এটা হ'ল পুঁজিপতিদের মরণ-কামড়, এই তাদের শেষ অস্ত্র।

কোন্ অবস্থায় কখন ফ্যাশিজম মাথা নাড়া দিয়ে ওঠে তা জার্ম্মাণী, ইতালী, অষ্ট্রীয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিজমের অভ্যুত্থান থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না। শ্রমিক-বিপ্লব যখন এগিয়ে এসেছে এবং শ্রেণি-সংগ্রাম চূড়ান্ত স্তরে পৌঁছেছে তখনই বুর্জ্জোয়ারা এই অস্ত্র প্রয়োগ করে। জনসাধারণের মধ্যে পেটিবুর্জ্জোয়ার আধিক্য, শ্রমিকদের একটা বড় অংশের মধ্যে হতাশা, শ্রেণি-চেতনার অভাব, বুর্জ্জোয়াদের সম্বন্ধে মোহ, দেশের অর্থনীতি কেবল কয়েকটি পুঁজিপতির হস্তগত হওয়া ইত্যাদি ফ্যাশিজমের উর্ব্বর-ক্ষেত্র প্রস্তুতের সহায়ক।

এদেশে ফ্যাশিজম

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে এক ফ্রাঙ্কোর স্পেন ছাড়া অন্যান্য ফ্যাশিষ্ট দেশগুলোর পরাজয় ঘটেছে বটে কিন্তু তাই থেকে মনে করার কারণ নেই যে, ফ্যাশিজমের অবসান হয়েছে এবং এর পুনরভ্যুত্থানের সম্ভাবনা নেই। প্রকৃত পক্ষে আজ ধনতন্ত্রবাদ এমন

এক স্তরে এসে পৌঁছেচে যে, হয় তাকে বিপ্লবের দ্বারা ধ্বংস করে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর সমাজতন্ত্রের নূতন সৌধ গড়ে তুলতে হবে নতুবা তার পক্ষে ফ্যাশিজমে রূপান্তরিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকাতে সম্প্রতি শ্রমিক-ধর্ম্মঘট বে-আইনী করার যে ধূম পড়ে গেছে সেটা এই ফ্যাশিজমের প্রথম ধাপ। এই সম্ভাবনা শুধু যে ধনতন্ত্রবাদী দেশের পক্ষে সত্য তা নয়, জাপান বা ভারতবর্ষের মত আধা-ধনতান্ত্রিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশের পক্ষেও সত্য। এখানে আমরা কেবল ভারতবর্ষের কথাই আলোচনা করব।

ফ্যাশিজমের পক্ষে উর্ব্বর ক্ষেত্র কি কি, তা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। এগুলি ভারতে অনেকাংশে যখন আছে তখন ফ্যাশিজমের জন্মলাভের আশঙ্কাকে উড়িয়ে দেওয়া মূর্খতা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে ভারতে শ্রেণি-পার্থক্য খুবই বেড়ে গেছে। এক দিকে দুর্ভিক্ষ মহামারীর ফলে, গবর্ণমেণ্টের শ্রমিক শোষণে জনসাধারণ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে; অন্য দিকে চোরা কারবার মুনাফাখোরী করে পুঁজিপতিরা প্রভূত ধন সঞ্চয় করেছে। পুঁজিপতিদের হিসাব মত যুদ্ধের সময় কাপড়ের কলে লাভ হয়েছে সাড়ে ছ'গুণ, ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে দু'গুণ, চটকলে ন'গুণ। আর শ্রমিকেরা গড়পড়তা মূল বেতন পেয়েছে—বোম্বাইএর কাপড় কলে মাসিক একত্রিশ টাকা আট আনা, চটকলে বাইশ টাকা, খনিতে আট টাকা! এ থেকেই অবস্থাটা বোঝা যাবে।* তার ওপর আবার এ-দেশের পুঁজি এবং ধনসম্পদ হাতের আঙুলে গোণা যায় এমন সামান্য কয়েক জন পুঁজিপতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিখ্যাত দু'জন অর্থনীতিবিদের রায় এ সম্বন্ধে স্মরণীয়। তাঁরা লিখেছেন:

---

* (১) নিম্নের তালিকা থেকে অবস্থাটা পরিষ্কার বোঝা যাবে:—

যুদ্ধকালীন গড়পড়তা মুনাফার হিসাব

১৯৩৯ : ১০০

	১৯৩৯	১৯৪০	১৯৪১	১৯৪২	১৯৪৩
পাট	১০০	৫৯০	৬১৭	৮৯৬	৯২৬
তুলা	১০০	৭৩	২০৫	৬১৩	৬৪৫
চা	১০০	১১৪	২১৪	২৫২	৩৯২
চিনি	১০০	১৪৩	১২২	১৬০	২১৮
কয়লা	১০০	৮৮	১০৭	৯৫	১২৪
ইঞ্জিনিয়ারিং	১০০	১১৫	১৮০	৩৬	২২৫
বিবিধ	১০০	১০৪	৩২৬	৩৯৪	৪০১
সর্ব্বপ্রকার	১০০	১২৭	২৮২	২৫৯	৩২৭

(M. H. Gopal—Industrial Profits since 1939, Eastern Economist, May 12, 1944)

(২) শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে তলার উক্তিটি উল্লেখযোগ্য:—"১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে মোটামুটি শ্রমিকদের উপার্জ্জন বেড়েছে শতকরা ৮৫ ভাগ; এই সময়ে জীবন ধারণের ব্যয় বেড়েছে বোম্বাই-এ শতকরা ১৩৫ ভাগ, আমেদাবাদে শতকরা ২১৮ ভাগ, কানপুরে শতকরা ২১৪ ভাগ আর লাহোরে শতকরা ২০৭ ভাগ। স্পষ্টই বোঝা যায়, শ্রমিকদের জীবন ধারণের জন্য যে বোনাস দেওয়া হয়েছে তাতে তাদের পক্ষে যুদ্ধপূর্ব্ব আমলের অবস্থা বজায় রাখাও সম্ভব হয়নি।" (Reconstruction Planning in India—International Labour Office.)

"শিল্পগুলি কয়েকটি 'ট্রাষ্ট'ই যে নিয়ন্ত্রণ করে তা নয়—শেষ অবধি নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা কয়েক জন ব্যক্তির হাতে।...দুই হাজার ডিরেক্টর পাঁচ শত কারখানার নিয়ন্তা, এদের মধ্যে এক হাজার ডিরেক্টরশিপ আবার ৭০ জন লোকের হাতে। এ সবের ওপর আবার আছে ১০ জন লোক, তাদের হাতে তিন শত ডিরেক্টরশিপ। শিল্প-ক্ষেত্রে এই গোষ্ঠী-রাজত্ব সামান্য কয়েক দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ: বাপের পরে তার স্থান গ্রহণ করে ছেলে।"—"(Wadia and Merchant—Our Economic Problem)" এই অবস্থার ফলে কয়েক জন নাম-করা পুঁজিপতির হাতে ভারতবর্ষ বাঁধা পড়ার উপক্রম হয়েছে এবং সব বিষয়েই এঁদের প্রভাব অসামান্য। ভারতের সব চেয়ে বড় রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের ওপর এঁদের প্রভাব অনস্বীকার্য্য। শুধু তাই নয়, ভারতে জনসংখ্যার তুলনায় পেটি-বুর্জ্জোয়ার সংখ্যা অত্যধিক। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকারত্বের দরুণ একটা হতাশা এবং অবসাদের ভাবও দেখা যাচ্ছে। বিরাট পরিমাণে বেকারের সংখ্যা তাই সমাজের পক্ষে সুস্থতার লক্ষণ নয়। শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি-সচেতনতা সম্পূর্ণ এখনও আসেনি এটা কম বিপদের কথা নয়, যদিও ক্রমশ: এ চেতনা আসছে। শ্রমিকেরা এখনও পরিপূর্ণ ভাবে তাদের শ্রেণীর পার্টিকে অনুসরণ না করে বুর্জ্জোয়াদের দ্বারা যে বিভ্রান্ত হয়, তার প্রমাণ কিছুটা পাওয়া যায় বিগত সাধারণ নির্ব্বাচন থেকে। বিশেষ করে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী শাসন এক হিসাবে ফ্যাশিজমের খুবই উর্ব্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। সাম্রাজ্যবাদী শাসনে মূল কথাই হল দমন-নীতি;—সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ, গণ-আন্দোলনের কণ্ঠরোধ, ট্রেড ইউনিয়ন বে-আইনী করা ইত্যাদি এখানে লেগেই আছে। প্রকৃত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য গড়ে উঠবার পক্ষে এ যে কত বড় বিঘ্ন তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে। এ রকম অবস্থায় সকলের অলক্ষিতে গুটি গুটি ফ্যাশিজম ভারতবাসীর স্কন্ধে চেপে বসা বিচিত্র নয়।

এ কথা অবশ্য সত্য যে, ফ্যাশিজমের অনুকূল অবস্থা থাকলেও এখনো সঙ্ঘবদ্ধ খাঁটি ফ্যাসিষ্ট একটা পার্টি এদেশে গড়ে ওঠেনি। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতারা দরকার পড়লে এ প্রয়োজন মিটাতে পিছপা হবেন না। কংগ্রেসের এই দক্ষিণপন্থী নেতারা বড়ই অদ্ভুত জীব। এঁরা বলেন, আমরা হলুম সত্যকার সাম্যবাদী, সমাজতান্ত্রিক। তবে আমরা ও সব শ্রেণি-সংগ্রাম স্বীকার করি না—ওটা বাদ দেওয়াই হল আমাদের সাম্যবাদের বৈশিষ্ট্য। বহু কাল আগেই অবশ্য লেনিন ব'লেছিলেন—"After the expetience both of Europe and Asia whoever now speaks of non-class politics and non-class socialism simply deserves to be put in a cage and exhibited along side of the Australian Kangaroo."—তবু এঁরা এখনো চিড়িয়াখানায় না গিয়ে সাধারণ লোক সমাজেই বিচরণ করছেন। আসলে এঁদের সোস্যালিজমটা যে "ন্যাশনাল সোস্যালিজমের" নামান্তর তা যাঁরা কৃপালনী ও বল্লভভাই-এর মতবাদ অবগত আছেন তাঁদের বলে দেওয়া অনাবশ্যক। কিছু কাল আগে বক্তৃতা দিতে গিয়ে কংগ্রেসের বর্ত্তমান সভাপতি আচার্য্য কৃপালনী বলেছিলেন,—"যে শ্রমিক সব কিছু উৎপাদন করে, সেই শ্রমিককেই ভাত-কাপড়ের অভাবে সব চেয়ে কষ্ট পেতে হয়। কিন্তু এ জন্য অনেকে ধনিকশ্রেণীকে দায়ী করে দেখে আমার ভারী দুঃখ হয়।

দোষ কিন্তু কারুরই নয়। তুমি ধনিক হলে তোমার ব্যবহারও ধনিকের মত হ'ত।" ধনিকের হয়ে এই ওকালতির সঙ্গে আর এক জন মহাপুরুষের উক্তি মিলিয়ে দেখা ভাল। "ধনতন্ত্রবাদ বলে কিছু নেই। মালিকেরা পরিশ্রম এবং দক্ষতার সাহায্যে সব চেয়ে বড় হয়েছে। এই উন্নতি থেকেই বোঝা যায় তারা উন্নত ধরণের লোক—তাই নেতৃত্ব করার অধিকারও তাদের আছে"—(দ্বিতীয় জার্ম্মাণ শ্রমিক-সম্মেলনে হের হিটলারের বক্তৃতা)। এই দুইটি উক্তির মধ্যে পার্থক্য কি খুব বেশি আছে? এ ছাড়া কৃপালনীজী আরো বলেছেন, "The workers and peasants should be regarded as minors and wards. The rich landlords and factory-owners are their guardians and trustees." অর্থাৎ মজুর আর চাষীরা নাবালক-বিশেষ, ধনী, জমিদার ও মিল-মালিকেরা তাদের অভিভাবক! এ-ক্ষেত্রে নাজী জার্ম্মাণীর Labour code-এর প্রথম দুইটি ধারা উদ্ধৃত করলে তা নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১ম ধারা। কারখানায় বা ব্যবসা-ক্ষেত্রে মালিক হলেন নেতা এবং কর্ম্মচারী হ'ল অনুচর। এরা ব্যবসার স্বার্থের এবং জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থের ক্রমোন্নতির প্রতি লক্ষ্য রেখে এক সাথে কাজ করবে।

২য় ধারা। ব্যবসা-ক্ষেত্রে নেতা ও অনুচরের মধ্যে ব্যবসা সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকবে কেবল নেতার—(অর্থাৎ মালিকের)।"—(Palme Dutt-এর Britain in the World Front গ্রন্থে উদ্ধৃত)। অর্থ অতি প্রাঞ্জল। জার্ম্মানীতে ক্রুপকে হিটলার যেমন শ্রমিকদের অভিভাবক করে দিয়েছিলেন, ভারতে বিড়লা, টাটাকেও তেমনি ভারতীয় শ্রমিকদের অভিভাবক করে দিতে চান কংগ্রেস-সভাপতি কৃপালনী। বিড়লাজী অভিভাবক হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াবে তা কেশোরামে ধর্ম্মঘটের সময় পুলিশ দিয়ে শ্রমিকদের অহিংস ভাবে ঠেঙানির ইতিহাসই প্রমাণ দেবে। আর সর্দ্দার বল্লভভাই উপদেশ দিলেন, এক জন সংস্কৃতিবান্ শ্রমিক সাধারণ ভাবে পূত পবিত্র জীবন যাপন করলে মিল-মালিক বা অন্যান্য ধনীর চেয়ে অনেক সুখী হতে পারে। অর্থাৎ বিড়লাজীর টাকার পুঁটলির দিকে হাত বাড়ানোর দরকার নেই, দরকার plain living and high thinking-এর! তবে সর্দ্দারজী কড়া লোক (Iron-man); পাছে শুধু কথায় চিঁড়ে না ভেজে তাই কেবল তত্ত্ব কথা প্রচার করে ক্ষান্ত না হয়ে তিনি হাতে-কলমে প্রমাণ দিতে সচেষ্ট। তিনি বিড়লা মহারাজের অর্থে "হিন্দুস্থান মজদুর সেবক-সঙ্ঘ" নামে এক শ্রমিক-ইউনিয়ন গড়ে বসেছেন। এদের পথ শ্রেণি-সংগ্রাম না করে শ্রেণি-সহযোগিতা করা। জার্ম্মানীতে এই নীতি ফ্যাশিজম এনেছিল এবং শ্রেণি-সহযোগিতার প্রকৃত অর্থ মালিকের স্বার্থে শ্রমিক শোষণ তাও আমরা দেখেছি। যে-শ্রমিকসঙ্ঘ চলে ঘনশ্যাম দাস বিড়লার অর্থে, তা যে বিড়লার স্বার্থের ক্ষতি করে কখনো শ্রমিকদের মঙ্গল সাধন করতে পারে না তা যে কোন স্কুলের ছেলেও বুঝতে পারে। আসলে এ-রকম "মজদুর সেবক সঙ্ঘ" মালিক সেবক-সঙ্ঘে পরিণত হতে বাধ্য এবং হয়েছেও।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে কংগ্রেসে জমিদার ও পুঁজিপতিদের ক্ষমতা যে অভূতপূর্ব্বরূপে বৃদ্ধি পেয়েছে কংগ্রেসে দক্ষিণপন্থীদের নেতৃত্ব নিরঙ্কুশ হওয়াই তার সব চেয়ে বড় নিদর্শন। গত নির্ব্বাচনের সময় ডজনে ডজনে জমিদার হিন্দু মহাসভার আশ্রয় ত্যাগ করে কংগ্রেসের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছেন। এর কি কোন কারণ নেই? সর্দ্দার বল্লভভাই কলকাতায় এলে বিড়লাজীর বাড়ীতেই যে তাঁর স্থান হয় এটাও নিশ্চয় অকারণে নয়। এর ফলে কি হচ্ছে তা যাদের ভগবান চক্ষু দিয়েছেন তারাই দেখতে পায়। কলকাতার কেশোরাম মিলে ধর্ম্মঘটের সময় নেহরু, বল্লভভাই প্রভৃতি নেতারা এখানে ছিলেন; এই সময় ধর্ম্মঘটী শ্রমিকদের ওপর পুলিশ লাঠি চার্জ্জ করে এবং শ্রমিকরা নেহরু ও বল্লভভাই-এর কাছে সাহায্যের আবেদন করে পাঠায়। কিন্তু দুর্য্যোধনের অন্নে পালিত ভীষ্ম যেমন নীরবে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ সহ্য করেছিলেন বিড়লার গৃহে অবস্থিত বল্লভভাই তেমনি টুঁ শব্দটি করলেন না। এটি একমাত্র দৃষ্টান্ত নয়; সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলে এবং অমলনীরে ধর্ম্মঘটের সময় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভার পুলিসের গুলীতে নিহত ও আহত শ্রমিকেরাও এই নীতির ফল আমাদের ভুলতে দেবে না। কৃষাণ-মজদুর-প্রজা-রাজ এঁরাই প্রতিষ্ঠা করবেন সন্দেহ কি!

অনেকে হয়ত মহা আপত্তি তুলে বলবেন, কি যে বলেন তার ঠিক নেই। কংগ্রেস কি নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে জমিদারী প্রথা তুলে দেবার কথা বলেননি, কারখানা রাষ্ট্রের অধীনে আনার কথা শোনাননি? জওহরলাল নেহরু এঁরা কি চোরাকারবারীদের ফাঁসিতে লটকাবার প্রস্তাব করেননি? আমি বলব, ঠিক কথা। এক বার নয়, একশো বার বলেছেন। কিন্তু এর মধ্যে তাঁদের কোন originality নেই। ইটালীর ফ্যাশিষ্টদের কর্ম্মসূচী ছিল যথাক্রমে:—(১) আন্তর্জ্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ (২) সিনেট ও রাজতন্ত্রের অবসান করা (৩) চার্চ্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা (৪) যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত মুনাফা বাজেয়াপ্ত করা (৫) চাষীদের জমিদান (৬) শ্রমিক ও কারিগরদের হাতে কারখানার কর্ত্তৃত্ব অর্পণ। জার্ম্মাণীর নাৎসীদের কর্ম্মসূচীতে ছিল:—(১) যুদ্ধকালীন মুনাফা বাজেয়াপ্ত করা (২) বড় বড় ব্যবসার লাভের বখরা শ্রমিকদের দেওয়া হবে (৩) সমস্ত ট্রাষ্টের জাতীয়করণ ইত্যাদি। কিন্তু হায় রে, শাসন-ক্ষমতা হাতে আসতে না আসতে সব প্রতিশ্রুতি ভুলে গেল! চোরাকারবারীরা হ'ল জার্ম্মাণীর আর ইতালীর হর্ত্তা-কর্ত্তা বিধাতা। মুখের কথা ও কাজের মধ্যে যাদের বিন্দুমাত্র সামঞ্জস্য নেই তাদের কথায় বিশ্বাস স্থাপন মূর্খতা। জওহরলালজী মুখে চোরাকারবারীদের "নিপাত যাক" বলে অভিসম্পাত দিলেন বটে কিন্তু এই কলকাতার মুনাফাবাজীর আড্ডা ষ্টক এক্সচেঞ্জ থেকে লাখ টাকার থলি উপহার নিতে তাঁর বাধেনি। বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে কম দিন নয়, কিন্তু ক'জন চোরাকারবারীকে ফাঁসী কাঠে ঝোলান হয়েছে? ক'টা জমিদারী লাটে ওঠান হয়েছে?* ক'টা কারখানা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়েছে? জমিদারী কোথায়ও তুলে দেওয়া হয়নি, তবে ক্ষতিপূরণ দিয়ে তুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। এতে চাষীদের কোন লাভই হবে না বরং তাদের ঘাড়ে ট্যাক্সের বোঝা বাড়বে মাত্র। [ক্রমশঃ

* সম্প্রতি শ্রীরাজাগোপাল আচারী শিল্পপতিদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, "আমার কথা বিশ্বাস করুন, শিল্প জাতীয়করণের আপাততঃ কোন সম্ভাবনা নাই।"

স্বাধীনতার অগ্রদূত

ফটো—অরুণা সেন

বাগ্দেবী

[রূপযানীর ২য় বার্ষিক সারস্বত সম্মিলনীতে আবাহিত স্বনীল পাল কর্ত্তৃক নির্ম্মিত দেবী মূর্ত্তি।
রূপযানী সম্পাদক শ্রীশম্ভু শীলের সৌজন্যে প্রাপ্ত]

বীণাপাণি

তখন —উষা সিংহ

নিয়মাবলী

প্রত্যেক মাসে এই বিভাগটিতে একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরৎ লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

এখন —দেবপ্রসাদ বসু

[তৃতীয় পুরস্কার]

খোকার পড়া

—মৃণালকুমার বসু

দাদার পড়া

—শৈলেন বসু

[প্রথম পুরস্কার]

—সুনীল দত্ত

কি খবর

[দ্বিতীয় পুরস্কার]
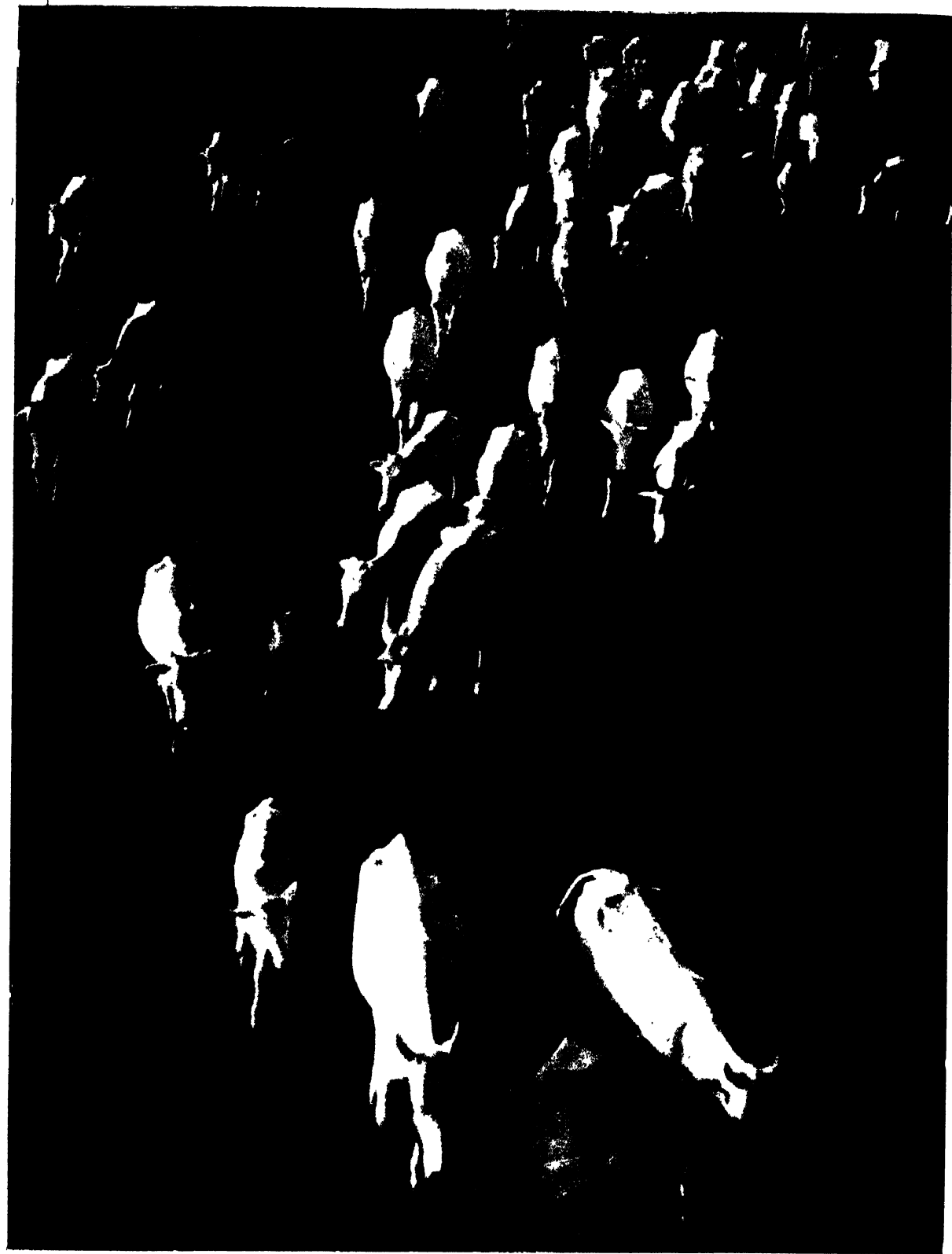
গৃহাভিমুখে

—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জাগৃতি-কেন্দ্র—মহানগর

বিনয় ঘোষ

মানুষের সামাজিক জীবনের চাহিদা থেকে নগরের উৎপত্তি এবং সেই চাহিদা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নগরেরও সমৃদ্ধি। মহানগর যেন মহাসমুদ্র। বাইরের নদ-নদী শত-সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে যেমন মহাসমুদ্রে এসে মিলিত হয়, তেমনি বাইরের গ্রাম, গ্রাম্য-সমাজ, বাহির বিশ্বের লোকজন, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি, বাইরের ভালমন্দ আদর্শ সব এসে মিলিত হয় মহানগরের বুকে। সকলের স্বকীয়তার সংঘাতে মহানগর উদ্বেল হয়ে ওঠে; বাজারে, বন্দরে, বাণিজ্য-কেন্দ্রে, শিক্ষা-কেন্দ্রে, অফিস-আদালতে, রাজপথে এই ঘাত-প্রতিঘাত অবিরাম চলতে থাকে; মানুষের সঙ্গে মানুষের সংঘাত, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের সংঘাত, নানা রকমের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধির খণ্ডযুদ্ধ, নানা উদ্যমের সংঘর্ষ। তার পর সেই সংঘাত ও বিক্ষোভ ধীরে ধীরে স্থির ও সংযত হয়ে আসে। উচ্চতর, বৃহত্তর এক ঐক্যের মধ্যে সমস্ত সংঘাত, সমস্ত বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্য এক অপূর্ব্ব প্রশান্ত রূপ ধারণ করে। বাইরে সেই রূপের বিকীরণ হয়। নগরের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, নগরের সংস্কৃতি-সম্ভার, নগরের সজীবতা ও সক্রিয়তা পরিপার্শ্বে, নগরের উপকণ্ঠে, সমগ্র দেশে ধীরে ধীরে তার প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি নগরের অর্থনৈতিক অবনতি, নগরের দুর্নীতি, নগরের স্থবিরতা ও নিষ্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে সমগ্র সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিষিয়ে তোলে। বড় বড় পাকা শানবাঁধানো রাজপথ, এ্যাসফল্টের এ্যাভিন্যুয়ের উপর দিয়ে যান্ত্রিক যানবাহনের মতো তীব্র বেগে নগরের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত যেমন নূতন ভাব, নূতন আদর্শ, নূতন নীতি চলাফেরা করে, বিদ্যুৎবেগে যেমন সকলের মনে সেই ভাবাদর্শ সংক্রামিত হয়ে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে, সকল রকমের অভিমত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে মন্থন ক'রে তোলে, তেমনি দুর্নীতি ও ব্যভিচার মহানগরের বুকে দ্রুতগতিতে ব্যাপক ভয়াল মূর্ত্তি ধারণ করে। সমাজ ও জীবন সকলের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মহানগরে, অথচ প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র ও পারস্পরিক সম্পর্কশূন্য। নগরের রাজপথে, নগরের ইট-পাথরে যেমন মানুষের মহান্ আদর্শের, জীবনের মহান্ সত্যের পদধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি নগরের কদর্য্যতা ও নাভিশ্বাস, নগরের তুচ্ছতা নিয়ে ব্যস্ততা, নগরের কুৎসিত অবিন্যস্ত জনতা, অক্লান্ত কলরব, নগরের হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি, নগরের হীনতা-নীচতা-দীনতা, দুর্নীতিপরায়ণতা সব যেন নীরবে ইট-পাথরের গায়ে খোদাই হয়ে থাকে, সহজে মিলিয়ে যায় না। মহানগর মানুষের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি হ'লেও আজ শ্রেষ্ঠ অপকীর্ত্তিও বটে। জীবনের যে অর্থনৈতিক তাগিদে মহানগরের উদ্ভব, সেই তাগিদ আজ বিকৃত বিকারগ্রস্ত তাগিদে পরিণত হয়েছে। মানুষের জীবনকে ব্যাপকভাবে মহানগর গ্রহণ করতে পারেনি। সার্ব্বজনীনতা ও সহযোগিতার আদর্শভ্রষ্ট মহানগর আজ তাই পৈশাচিক ধনতান্ত্রিক প্রবৃত্তির জঘন্য লীলাকেন্দ্র, উত্তুঙ্গ স্কাইক্রেপারের মতো দাম্ভিক স্বার্থপরতা তার বৈশিষ্ট্য, প্রশস্ত এ্যাভিন্যুয়ের মতো তার লোভ-লালসা ও শোষণাকাঙ্ক্ষা দিগন্তবিস্তৃত।

তবু মহানগরের কবল থেকে আধুনিক মানুষের মুক্তি নেই। গুহা ছেড়ে গ্রামের দিকে, গ্রাম ছেড়ে মহানগরের দিকে মানুষ এগিয়ে চলেছে, এবং তারই সঙ্গে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে তার সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি। মানুষের সংঘবদ্ধ, সম্মিলিত, যৌথজীবনে মহাকাঙ্ক্ষা, সুখসম্পদ্-ঐশ্বর্য্যের প্রতি মানুষের অসীম আগ্রহ, মানুষের রূপবেদনা, শিল্পবোধ, রুচিবোধ, প্রাণের আবেগ এবং মূক মহামানবতা ভাষা পেয়েছে মহানগরে। মহানগরের মহান্ জীবন-কেন্দ্র থেকে আধুনিক মানুষের তাই কেন্দ্রচ্যুত হবার উপায় নেই। বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ্ ল্যুইস্ মামফোর্ড তাই বলেছেন: "গুহা ও উইঢিবির মতো নগরও প্রকৃতির কোলে গড়ে' উঠেছে। কিন্তু নগর হ'ল মানুষের সচেতন মনের শিল্পরূপ এবং নগরের সার্ব্বজনীন কাঠামোর মধ্যেই ব্যষ্টির স্বকীয়তা নিয়ে শিল্পের বিকাশ হয়। মানুষের মন মহানগরের ছাঁচে গড়ে' ওঠে, মনের বিকাশ মহানগরেই নিয়ন্ত্রিত হয়। ভাষার পরেই মহানগর হ'ল মানুষের শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্ত্তি (১)।" নগরের বৈশিষ্ট্য হ'ল উদ্দেশ্য-প্রাধান্য এবং সামাজিক বৈচিত্র্য ও জটিলতা। স্বাভাবিক পরিবেশকে মানবিক ক'রে তোলা এবং মানবিক আদর্শের দায়ভাগকে স্বাভাবিক ক'রে তোলাই হ'ল মহানগরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রথমটিকে একটা সাংস্কৃতিক রূপ দেয় মহানগর এবং দ্বিতীয়টিকে একটা স্থায়ী সমষ্টিগত রূপ দিয়ে বহির্মুখী করে (২)।

মহানগরের এই ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যের কথা না ভুলে গিয়ে আমরা বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মহানগর 'কলিকাতার' ক্রমবিকাশের কথা পরে বলব। গ্রাম্য জীবন থেকে আধুনিক মহানাগরিক জীবনে রূপান্তরিত হতে 'কলিকাতার' প্রায় আড়াই শতাব্দী কাল সময় লেগেছে। এই আড়াই শতাব্দীর মধ্যেই ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে একটা বিরাট ওলট-পালট হয়ে গিয়েছে। রমেশচন্দ্র দত্ত পলাশীর যুদ্ধের সময় থেকে ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণের সময় পর্য্যন্ত আশী বছরকে (১৭৫৭-১৮৩৭) তিনটি যুগে ভাগ করেছেন (৩)। প্রথম যুগটি হচ্ছে ক্লাইভ ও ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের যুগ। এই সময় নানা দুঃসাহসিক অভিযান ও খণ্ডযুদ্ধের ফলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠলো। তিনটি লড়াইয়ের পর

---

১ Lewis Mumford : The Culture of Cities, P. 5.
২ Lewis Mumford : The Culture of Cities, P. 4.
৩ Romesh Dutt : The Economic History of India (Under Early British Rule) : 6th Edition Chap. I.

ইংরেজরা কর্ণাটে প্রবল হ'ল, সিরাজউদ্দৌলা ও মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'ল, অন্য দিকে মহীশূর আর মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধের প্রথম পর্ব্বও শেষ হল। ১৭৮৪ সালে পিটের 'ইণ্ডিয়া এ্যাক্টের' সঙ্গে সঙ্গে এই যুগের শেষ। এর পর আরম্ভ হ'ল কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেসলি ও লর্ড হেষ্টিংসের যুগ। বাংলায় ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ'ল, ১৭৯৫ সালে এই বন্দোবস্ত বারাণসীতে এবং পরে অন্যান্য জায়গায় প্রসারিত করা হ'ল। মহীশূর ও মারাঠাদের শেষবারের মতো দমন করা হ'ল। তার পর মুনরো, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্‌ ও বেণ্টিংকের যুগ। বাংলা, মাদ্রাজ ও উত্তর-ভারতের বহু অংশ ইংরেজদের অধীনে এল, সিভিল সার্ভিসের ভিত্তি স্থাপনা হ'ল, বিচারের ব্যবস্থা হ'ল, নানা স্থানে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহের পাকা বন্দোবস্ত হ'ল। ১৮৩৩ সাল থেকে কোম্পানী কেবল মাত্র ব্যবসায়ী না থেকে ভারতবর্ষের রাজ্যভার গ্রহণ করল, ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষের মধ্যে বাষ্পীয় পোতের গতায়াত শুরু হ'ল। এই পর্য্যন্ত বৃটিশ রাজত্বের প্রথম পর্ব্ব। লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের এদেশে আগমন (১৮৩৬) এবং ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণ (১৮৩৭) থেকে বৃটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় পর্ব্ব আরম্ভ। রমেশচন্দ্রের এই যুগ-বিভাগ ও পর্ব্ব-বিভাগ অনুসারেও দেখা যায়, 'কলিকাতা' মহানগরের রূপ ধারণ করতে আরম্ভ করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে এবং মধ্যভাগের পরেই তার অগ্রগতি দ্রুত হয়েছে। বৃটিশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে কলিকাতা মহানগরের শ্রীবৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। কিন্তু রমেশচন্দ্রের উক্ত পর্ব্ব-বিভাগ ও যুগ-বিভাগ নিছক ঘটনা-বিভাগ ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঘটনার পশ্চাতে নবযুগের যে দুর্নিবার অর্থনৈতিক শক্তি কাজ করছে তার স্বরূপ না বুঝলে বৃটিশের রাজ্যলাভ এবং ভারতের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের মূল কারণ কি তা উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

একালের অর্থনৈতিক রূপ

বণিকের মানদণ্ড বাস্তবিকই 'পোহালে শর্ব্বরী' রাজদণ্ডরূপে দেখা দেয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী সংগ্রাম ক'রে বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছে। ইংরেজ বণিকরা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত ঘরে-বাইরে কোথাও শক্তিশালী পুঁজিপতি হয়ে উঠতে পারেনি। এই পুঁজিপতি হবার চেষ্টাতেই তাদের ঘর ছেড়ে বাইরে যাত্রা, সোনার সন্ধানে, রত্নের সন্ধানে, লুঠের মালের সন্ধানে। উপনিবেশের পত্তন এই অভিযানের পর থেকেই। কার্ল মার্কস বলেছেন: "ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রভাবে বাণিজ্য ও বাষ্পীয় যানের আশ্চর্য্য বিকাশ হ'ল। বাণিজ্যের সনদ পেল যে-সব কোম্পানী তারা প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের কাজে শক্তিশালী সহায়ক হয়ে উঠলো। উপনিবেশগুলি উদীয়মান বণিকদের পণ্যের বাজার তো হলই, সঙ্গে সঙ্গে একচেটিয়া বাজার হয়ে তাদের ধনসঞ্চয়ে সাহায্য করল। প্রভুত্ব ক'রে, লুঠ-তরাজ ক'রে, খুনজখম ক'রে, ইয়োরোপের বাইরে থেকে এই ভাবে তারা যে ধনসম্পদ সঞ্চয় করতে আরম্ভ করল, অজস্র ধারায় সেই সম্পদ স্বদেশের ভাণ্ডারে এসে জমা হ'ল এবং সেই সঞ্চিত ধন রূপান্তরিত হ'ল 'মূলধনে' (৪)।" ইংলণ্ডের বণিকযুগ থেকে ধনিকযুগে পদার্পণের সন্ধিক্ষণে ভারতের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল। ইংলণ্ডের প্রতিপত্তিশালী বণিকশ্রেণীর প্রতিনিধিরূপে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই সময় ভারতবর্ষে প্রভুত্ব, লুঠতরাজ ও খুনজখম ক'রে যে ধন সঞ্চয় করল, পরে সেই সঞ্চিত ধনই 'মূলধনে' পরিণত হ'ল। এই লুঠতরাজ ও শোষণের দু'-একটা দৃষ্টান্ত দেব। উইলিয়ম্‌ বোল্‌টস লিখেছেন: "এই অত্যাচার সর্ব্বক্ষেত্রেই। বেনিয়ান ও গোমস্তাদের সহায়তায় ইংরেজরা খুসী মতো স্থির করত কোন্‌ ব্যবসায়ী কি দামে কত জিনিষ দিতে বাধ্য, তাঁতীদের সম্মতির কোন প্রয়োজন আছে ব'লে তারা মনে করত না। তাঁতীরা শর্ত্ত পালন না করতে পারলে তাদের জিনিষ দখল ক'রে বিক্রী ক'রে টাকা আদায় করা হ'ত। রেশম ব্যবসায়ীদের উপরেও এই রকম অত্যাচার চলত, ফলে জানা গিয়েছে তারা আঙুল কেটে ফেলেছে যাতে তাদের রেশমের কাজ করতে বাধ্য না হতে হয়।" ভেরেল্‌ষ্ট লিখেছেন: "ইংরেজ কর্ম্মচারীরা বা গোমস্তারা শুধু যে লোকের ক্ষতি করত তা নয়, সরকারের ক্ষমতা অগ্রাহ্য ক'রে যেখানেই নবাবের কর্ম্মচারীরা কিছু বলতে আসত সেইখানেই তাদের উপর অত্যাচার করত। এরই ফলে মীরকাশিমের সঙ্গে যুদ্ধ ঘটে।" মীরকাশিমের পরাজয়ের পর বৃদ্ধ মীরজাফর এবং তাঁর মৃত্যুর পর নিজামতউদ্দৌলাকে নবাব করা হয়। প্রত্যেক বার নবাব করার সময়ে অনেক টাকা আদায় করা হ'ত। ১৭৬৩ সালে দ্বিতীয় বার নবাব হবার সময় মীরজাফরকে ৫০০১৬৫ পাউণ্ড, নিজামতউদ্দৌলাকে ২৩০,৩৫৬ পাউণ্ড দিতে হয়। এ ছাড়া আট বছরের মধ্যে উপহার হিসেবে ২১৬৯৬৬৫ পাউণ্ড এবং অন্যান্য খাতে ৩৭৭০৮৩৩ পাউণ্ড আদায় করা হয়। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিল্লীর বাদ্‌শাহের কাছ থেকে বাংলাদেশের দেওয়ানী গ্রহণ ক'রে বল্লেন: "এর ফলে সমস্ত খরচ বাদ দিয়েও কোম্পানীর খাঁটি মুনাফা হবে অন্ততঃ ১৬৫০১০০ পাউণ্ড ষ্টার্লিং"। এই হ'ল দেওয়ানীর নমুনা। এর ফলে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীই বাংলার প্রকৃত প্রভু হয়ে দাঁড়াল, শোষণ, অত্যাচার ও উৎপীড়নে বাংলার পল্লী, জনপদ, নগর সব ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল। অস্তগামী নবাবী আমল আর উদীয়মান ইংরেজ রাজত্বের যাঁতায় পিষ্ট হয়ে বাংলার চাষী, কারিগর, বণিক সকলের হাড় পর্য্যন্ত গুঁড়িয়ে গেল। দুর্ভিক্ষ দেখা দিল ১৭৭০-৭১ সালে, যা আজও ছিয়াত্তরের (বাংলা ১১৭৬ সন) মন্বন্তর ব'লে ইতিহাসে কুখ্যাত। তবু কোম্পানীর আয় কমল না। রাজস্ব আদায় পুরো দমেই চলতে লাগল। ১৭৭২ সালে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস কোর্ট অফ ডাইরেক্টার্সকে লিখলেন: "যদিও এই প্রদেশের এক-তৃতীয়াংশ লোক মরে গিয়েছে এবং ফলে চাষ-বাসের অবনতি হয়েছে, তবুও ১৭৭১ সালের নিট আদায় ১৭৬৮ সালেরও বেশী—এ সম্ভব হয়েছে কেবল কড়া তাগিদের ফলে।" আগে দেশের জমিদারদের যে সব ক্ষমতা ছিল সে সব অপহরণ ক'রে রাজস্ব বৃদ্ধির জন্যে কোম্পানী সম্পত্তি নীলামে তুলে সর্ব্বোচ্চ ডাকে বন্দোবস্ত করতে লাগল। এই ভাবে নূতন এক শ্রেণীর জমিদার কোম্পানীর খামখেয়ালে গজিয়ে উঠছিল। তার পর ১৭৯৩ সালে বাংলার গবর্ণর লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ জমিদারদের সঙ্গে রাজস্ব সম্পর্কে একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ক'রে নিলেন। এই বন্দোবস্ত অনুসারে ঠিক হ'ল যে জমিদারেরা গবর্ণমেণ্টকে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবেন এবং চাষীদের খাজনাও তাঁরা

৪ Karl Marx: Capital (Vol. I.) Everyman's Library Edition, P. 835.

খুসী মতো বাড়াতে পারবেন। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস' নামক গ্রন্থের এক জায়গায় এই 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' সুখ্যাতি করেছেন, কিন্তু অন্যত্র আবার এ-কথাও স্বীকার করেছেন যে, বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে যে আয় ইংরেজের হ'ল সেই আয় থেকেই এদেশে সাম্রাজ্য গ'ড়ে উঠেছে, উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের অকারণ যুদ্ধগুলির খরচ বাংলাকেই দিতে হয়েছে (৫)। মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের নিজের খরচও সম্পূর্ণ উঠত না, তাও বাংলাকেই দিতে হয়েছে। অর্থাৎ প্রধানতঃ বাংলার চাষী, বাংলার কারিগরকে শোষণ করেই ইংরেজরা ভারতবর্ষে তাদের বিরাট সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঐতিহাসিক ভূমিকা ম্লান হয়ে এল, এবং প্রায় মাঝামাঝি একেবারে শেষ হয়ে গেল। কেন? যে ইংরেজ বণিকদের প্রতিনিধিরূপে কোম্পানী এদেশে এসেছিল তাদের ভূমিকাও বদলে গেল ধীরে ধীরে। কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার সম্বন্ধে ক্রমেই ইংলণ্ডের উদীয়মান ধনিকশ্রেণী সজাগ হয়ে উঠল। সকলেই তখন সমান অধিকার চাইছে। বাইরে থেকে লুঠ ক'রে নিয়ে যাওয়া ধনসম্পদ সঞ্চিত হয়ে হয়ে 'মূলধনে' পরিণত হয়েছে। বণিকশ্রেণী ধীরে ধীরে ধনিকশ্রেণীর পর্য্যায়ে উঠছে। হারগ্রীভস্, ক্রম্পটন্, আর্করাইট্ এবং আরও অনেকে নূতন নূতন যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে বয়নশিল্পে যুগান্তর আনলেন। জেমস্ ওয়াট এবং অন্যান্য প্রতিভাশালী গবেষকদের প্রচেষ্টায় বাষ্পীয় শক্তি ও যন্ত্রের বিকাশ হ'ল। যন্ত্রপাতি ও কারখানা গ'ড়ে উঠল। লোহার চাহিদা বাড়ল। সুতরাং লোহা ঢালাই ও পেটাই করার প্রাচীন পদ্ধতির পরিবর্তন দরকার। স্মিটনের 'সিলিণ্ডার ব্লোইং' যন্ত্র ভস্ত্রাকে বাতিল ক'রে দিল, বাষ্পীয় শক্তির দৌলতে ক্রমেই এই ব্ল্যাষ্ট নিয়ন্ত্রিত হয়ে এল। বাষ্পীয় শক্তি-চালিত যান্ত্রিক হাতুড়ি এল, তার পর এল বেসামার-মুসেট পদ্ধতি (১৮৬৫), যার ফলে নিষ্কাশিত লোহা বার বার তাতিয়ে পিটিয়ে নরম লোহা বা ইস্পাত করতে হয় না, গলিত ঢালা লোহার মধ্যে হাওয়া চালিয়ে অতিরিক্ত কার্বণ পুড়িয়ে ফেলে তাকে ইস্পাত করা যায়। শ্রমশিল্পের বিপ্লব (Industrial Revolution) নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ এই বিরাট যান্ত্রিক (Technological) বিপ্লব ঘটে গেল প্রায় এক শতাব্দীর মধ্যে (৬)। পুরাতন পদ্ধতিতে ম্যানুফ্যাক্‌চার অচল হয়ে আসছে। বাইরের লুণ্ঠিত ধনসম্পদ 'মূলধনে' পরিণত হয়েছে, অর্থাৎ মার্কসের ভাষায় প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়ের কাজ শেষ হয়েছে। নূতন যুগ আসছে, বড় বড় কলকারখানার যুগ, শ্রমশিল্পের ও ধনতন্ত্রের যুগ। ইংলণ্ডে বণিকযুগের (Mercantile Capitalism) অবসান এবং শ্রমশিল্পযুগের (Industrial Capitalism) বিকাশ হ'চ্ছে। নূতন বুর্জোয়াশ্রেণী তাদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠছে। ইংলণ্ডের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের হ্রাস-বৃদ্ধির তালিকা থেকেই এ যুগের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায় (৭) :

শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন
(১৯১৩ = ১০০)

১৭২০-২৯	২˙১	১৭৮০-৮৯	৩˙৫
১৭৬০-৬৯	২'৬	১৭৯০-৯৯	৪'৬
১৭৭০-৭৯	৩'০		
১৮০০-০৯	৫'৭	১৮৩০-৩৯	১৪'৩
১৮১০-১৯	৭'১	১৮৪০-৪৯	১৯'৬
১৮২০-২৯	৯'৭		

ঠিক এই সময় আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ফলে সেখানকার উপনিবেশগুলি হাতছাড়া হয়ে গেল। নেপোলিয়ন্ প্রায় ইয়োরোপীয় মহাদেশ-ছাড়া করলেন ইংরেজ বণিকদের। সুতরাং ভারতবর্ষের দিকেই ইংরেজদের দৃষ্টি পড়ল। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার এই সময় শেষ হয়ে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। তা না হ'লে ইংলণ্ডের শ্রমশিল্পের বিকাশ হয় না, শিল্পজাত পণ্যের বাজার মেলে না, নূতন ধনিকশ্রেণীর মূলধন ও মুনাফা-বৃদ্ধির পথে বিঘ্ন ঘটে। তাই ১৮১৩ সালে ভারতবর্ষে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নেওয়া হ'ল, এবং বিশ বছর পরে চীনের উপরেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব রইল না। ১৮৫৮ সালে কোম্পানী তুলে দেওয়া হ'ল এবং শাসন ও শোষণ ভার নিলেন রাজা, অর্থাৎ নূতন যারা রাজা হয়ে উঠছে ইংলণ্ডে তারা, বৃটিশ ধনিকশ্রেণী। ইংরেজ বণিকরা দস্যুর মতো লুঠতরাজ ক'রে আমাদের দেশে ভাঙনের কাজ সুরু করেছিল অনেক আগে থেকেই। ভারতের শিল্পবাণিজ্য ও কৃষির ধ্বংসের পথ তারাই সুগম ক'রে দিয়েছিল। যন্ত্র-বিপ্লবের যুগে বৃটিশ ধনিকশ্রেণী সেই পথ ধরেই হাজার গুণ বেগে অগ্রসর হয়ে এক দিকে ভাঙনের কাজ শেষ করল, আর এক দিকে গঠনের কাজ সুরু করল মন্থর গতিতে। ভাঙা-গড়ার কাজটা সমান তালে পাশাপাশি হ'ল না। রেলপথ তৈরী হ'ল, কয়লার খনি খোঁড়া হ'ল, পাটের কল খোলা হ'ল, চা-বাগান, কফি-বাগান, নীল-ক্ষেতে চাষ আরম্ভ হ'ল। এমন সব ক্ষেত্রে বৃটিশ মূলধন খাটানো হ'ল যা আবাদ করলে সোনা ফলবে, অর্থাৎ মূলধন তো কাঁপবেই, উপরন্তু এদেশের কাঁচা মাল বৃটেনের কলকারখানার শ্রীবৃদ্ধি হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারার এই সাম্রাজ্যবাদী নীতির ফলে আমাদের শিল্প-বিপ্লব ঘটেও ঘটল না। পুরাতন আর্থিক কাঠামোকে চূর্ণ ক'রে বৃটিশ পুঁজিপতিরা আমাদের সমাজে নূতন যে-শক্তি সঞ্চারিত করল, সেই শক্তির স্বাভাবিক বিকাশের পথে তারাই আবার প্রাচীর তুলে দিল। ভারতের বণিকশ্রেণী, ভারতের ভবিষ্যতের ধনিকশ্রেণীকে বৃটিশ ধনিকরাই সচেতন করল, নূতন পুঁজিবাদী যুগের মন্ত্রে তাদের দীক্ষিত করল, পুরাতন সমাজের

---

৫ Romesh Dutt : Op. Cit : Chap V & XXIII (P. 406)

৬ Charles Beard : Industrial Revolution (9th impression) F. Engels : Condition of Working Classes in England, 1844.

L. C. A. Knowles : Industrial and Commercial Revolutions in Great Britain during the Nineteenth Century (1946).

৭ J. Kuczynski : A Short History of Labour Conditions in Great Britain, 1750 to the Present day : Second Enlarged Edition, 1944, P. 38.

প্রাকার-বেষ্টিত নগর ও আত্মনির্ভর গ্রামের সঙ্কীর্ণ সীমানা থেকে হাত ধ'রে বার ক'রে নিয়ে এসে তাদের দাঁড় করিয়ে দিল নূতন যন্ত্রযুগের মুখোমুখি, কিন্তু তার পর তাদের অগ্রগতির পথে বাধা সৃষ্টি করাই হ'ল তাদের নীতি। ভারতের বণিক ও ধনিকশ্রেণী ঊনবিংশ শতাব্দী ধ'রে গোকুলে বাড়তে থাকল এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকেই স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিল যে, তারা এখন সাবালক হয়ে উঠেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর 'জুনিয়ার পার্টনার' তারা আর থাকতে চায় না, তারা হ'তে চায় 'ইকুয়াল্ পার্ট'নার' এবং আজ তারা তাতেও সন্তুষ্ট নয়, আজ 'মেজর পার্ট'নার' হওয়াই তাদের লক্ষ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীকে আমরা তাই নিঃসংশয়ে ভারতীয় ধনিকশ্রেণীর (Indian Bourgeoisie) গোকুলে বাড়ার যুগ বলতে পারি।

সেকালের ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজ ও নাগরিক জীবন

আমাদের দেশের যে প্রাচীন গ্রাম্য-সমাজ ও নাগরিক জীবন বিদেশী বণিক ও ধনিকতন্ত্রের আঘাতে ভেঙে পড়ল, তার গঠন-বৈশিষ্ট্য কি, সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার। প্রথমে দেখতে পাই, খৃঃ পূঃ ২০০০ বছর আগের সেই বৈদিক যুগ থেকে প্রাক্-বৃটিশ মোগল বাদশাহদের যুগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের গ্রাম্য-সমাজ প্রায় অচল ও অপরিবর্ত্তিত রয়ে গিয়েছে। পরিবর্ত্তন যে একেবারেই তার হয়নি তা নয়, কিন্তু যা হয়েছে তা প্রধানতঃ বাহ্যিক, মৌলিক কোন রূপান্তর ঘটেনি। ভারতীয় সমাজের টেক্‌নোলজিক্যাল্ ভিত্তি প্রায় একই রয়ে গিয়েছে। তার কারণ কি? কি এমন প্রচণ্ড শক্তি এই ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের যে যুগে যুগে প্রবল প্রতাপশালী রাজা-রাজড়া নবাব-বাদশাহদের সমস্ত রকমের আঘাত, অত্যাচার, উৎপীড়ন সে স্থির ভাবে সহ্য করেছে? ভারতীয় গ্রাম্য-সমাজের আত্ম-নির্ভরতা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, তার নির্ব্বিকার আত্মকেন্দ্রিকতাই হ'ল সেই প্রচণ্ড শক্তি। এই হ'ল এশিয়াতিক সামন্ত সমাজের প্রধান বৈশিষ্ট্য, শুধু ভারতের নয়। কৃষক ও কারিগরের কয়েকটি পরিবার নিয়ে একটি গ্রাম, তারই সংলগ্ন চাষের জমি, চারণ-ভূমি। কৃষকেরা জমি চাষ ক'রে ফসল ফলায়, উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ ভূস্বামীকে রাজস্ব বা খাজনা দেয়, আর ভূস্বামী তারই একটা অংশ থেকে রাজার নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দেয়। জমি যত দিন কৃষক আবাদ করবে এবং তার দেয় রাজস্ব দেবে তত দিন জমি তার, পুরুষানুক্রমেও তার ভোগ করতে বাধা নেই। ভূস্বামী যত দিন প্রজার দিকে নজর রাখবে, চাষ-আবাদ তদারক করবে এবং রাজা বাদশাহের নির্দ্দিষ্ট রাজস্ব দিয়ে যাবে তত দিন তার জায়গীর-জমিদারী-চাকলা-পরগণার উপর কর্ত্তৃত্বেও কারও হস্তক্ষেপ করার প্রয়োজন হবে না। কারিগর ও কারুশিল্পীরা, অর্থাৎ তাঁতী, কামার, ছুতোর, কুমোর ইত্যাদি যারা তারা তাদের গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরী করবে এবং তার পরিবর্ত্তে গ্রামের চাষীরা উৎপন্ন ফসলের একটা অংশ মজুরী হিসেবে তাদের দেবে। গ্রামের হাট বা সীমানার বাইরে যাবার তাদের দরকার নেই। পথ-ঘাট, যান-বাহন যখন এক রকম ছিলই না বলা চলে, তখন গ্রামের সঙ্গে গ্রামের, বা গ্রামের সঙ্গে নগরের যোগাযোগ রাখার ইচ্ছা থাকলেও সম্ভব হত না। আর তা ছাড়া ইচ্ছাও হত না, কারণ খেয়ে-পরে কাজ ক'রে গ্রামের মধ্যেই যখন বেশ নির্ঝঞ্ঝাটে জীবনটা কেটে যায় তখন উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা উদ্যোগ কোনটারই মূল্য তাদের কাছে আর থাকে না। গ্রাম্য-সমাজের এই যে আত্মনির্ভর ও আত্মকেন্দ্রিক মজবুত কাঠামো, একে ভেঙে ফেলা কি খুব সহজ কথা?

ইয়োরোপীয় সামন্ত-প্রথার সঙ্গে ভারতীয় সামন্ত-প্রথার পার্থক্য এইখানে। সামন্ত-প্রথা বা ফিউডালিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি দুই দেশে এক হ'লেও, অবস্থাভেদে আমাদের দেশে এই প্রথার যে স্বাতন্ত্র্য দেখা দিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। আমাদের দেশের সামন্ত-প্রথার দীর্ঘস্থায়ী জড়তা এই স্বাতন্ত্র্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে (৮)। ইয়োরোপের রাজা তাঁর রাজত্বের সর্ব্বময় কর্ত্তা, ভূ-সম্পত্তি, কৃষক-কারিগর-কর্ম্মচারী, সব কিছুরই মালিক তিনি। তাঁর অধীনস্থ বেরনরাও ক্ষুদে রাজা। রাজা যখন তাঁদের কর্ত্তৃত্বের অধিকার দেন তখন তাঁরা নির্দ্দিষ্ট অঞ্চলের ভূসম্পত্তি ও লোকজনের সকলের উপরেই কর্ত্তৃত্ব পান। কর্ত্তৃত্ব কথার অর্থ এখানে দখলী-স্বত্ব। ভারতবর্ষের রাজার বা তাঁর অধীনস্থ কর্ম্মচারীদের এ-রকম একচ্ছত্র অধিকার বা দখলী-স্বত্ব কোন দিন ছিল না। দাস-প্রথা (Slavery) বা অর্দ্ধ-দাস-প্রথা (Serfdom) ভারতবর্ষেও ছিল, কিন্তু গ্রীস ও রোমের মতো তার ব্যাপক ও স্থায়ী বিকাশ এখানে হয়নি। রাজা নিজেই ভূমির অধিপতি ছিলেন না, তাঁর কোন স্বত্বও ছিল না, তাই তাঁর অধীনস্থ সামন্ত বা কর্ম্মচারীদেরও তাঁর আংশিক বা আঞ্চলিক স্বত্ব দেবার অধিকার ছিল না। তিনি দিতেন রাজস্ব আদায়ের অধিকার, শাসন-ব্যবস্থা পর্য্যবেক্ষণের অধিকার (৯)। জৈমিনির "পূর্ব্ব-মীমাংসা"তে বলা হয়েছে: "রাজা কোন ভূমি হস্তান্তর করতে পারেন না, কারণ তিনি তার মালিক নন, মালিক তারা যারা সেই ভূমি আবাদ করে, পরিশ্রম করে।" সায়নাচার্য্য বলেছেন: "রাজার কর্ত্তব্য হ'ল অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া, আর নিরপরাধকে রক্ষা করা। জমির মালিক রাজা নন, যারা আবাদ ক'রে ফসল ফলায় তাদের সকলের।" রাজায় রাজায় যুদ্ধের ফলে অন্য রাজার রাজ্য জয় করলে, বিজয়ী রাজা সেই রাজ্যের ভূসম্পত্তি বা লোকজন কারও উপরেই দখলী-স্বত্ব পান না, পান কেবল এ সব থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় সেই রাজস্বের অধিকার। ভারতবর্ষে তাই রাজায় রাজায় যুদ্ধ-বিগ্রহ হয়েছে, নবাব-বাদশাহে হানাহানি হয়েছে, এবং তার ফলে কেবল রাজ্যের রাজা বদলেছেন, নীচের মাটি বা সমাজের কাঠামো বদলায়নি। ইয়োরোপে নানা স্তরের স্বত্বের জন্যে, বিভিন্ন স্তরের স্বত্বাধিকারীদের মধ্যে অনবরত যে গৃহযুদ্ধ হয়েছে তার ফলে স্বত্বের রূপ বদলেছে, সামন্ত-প্রথার পরিবর্ত্তন হয়েছে এবং অবশেষে এই প্রথা ধ্বংসও হয়েছে। আমাদের দেশে তা হয়নি। প্রথা বা স্বত্ব নিয়ে কোন সংঘাত হয়নি, হয়েছে রাজ্যের বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার নিয়ে। 'তরবারি যার জমি তার' এবং 'লাঙল্ যার জমি তার',

---

৮ K. S. Shelvankar: The Problem of India (1943), P.P. 71—79.

৯ Radhakumud Mookerji: Indian Land System, Ancient, Mediaeval and Modern. (1940) P.P. 22—24.

এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দাবীর ধ্বনি কোন দিন ভারতের পরিপার্শ্বকে প্রকম্পিত করেনি (১০)। তরবারিতে তরবারিতে ঝনৎকার উঠেছে মাত্র, আবার মিলিয়ে গিয়েছে সেই ঝন্‌ঝনানি। আত্মতৃপ্তিতে বিভোর হয়ে আমাদের গ্রাম্য-সমাজ পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছে, চাষীরা জাগেনি, কামার-কুমোর-তাঁতীরাও জাগেনি।

দুঃখ-দারিদ্র্য যে তাদের ছিল না তা নয়, যথেষ্ট ছিল। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী, অন্যায় অত্যাচার যে পাঁচ লক্ষ 'ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড়'কে মধ্যে মধ্যে ঝাঁকুনি দেয়নি তা নয়। সে-কালে আমাদের যা ছিল তাই মর্ত্যের স্বর্গ ছিল তা কখনই নয়। প্রজার মঙ্গলের জন্যে রাজা সব সময় তাঁর কর্ত্তব্য করতেন না, রাজস্ব ও নানা রকমের কর-আব্‌ওয়াবও রাজা-বাদশাহরা অনেক উপায়ে বাড়াতেন। শেষ পর্য্যন্ত তার সমস্ত বোঝাটা গিয়ে কৃষক ও কারিগরদের ঘাড়েই পড়ত। গ্রামণী, গ্রামিক, সমাহর্ত্তা, সংবিধাতা, প্রধান, দেশমুখ্য প্রভৃতি রাজকর্ম্মচারীরা যে সব সময় ন্যায়দণ্ড নিয়ে রাজ-কাজ করত তাও কল্পনা করার কারণ নেই। গ্রাম্য-সমাজের যে রেখাচিত্র আগে এঁকেছি, তার গায়েও মধ্যে মধ্যে আঁচড় লেগেছে। বর্ণ-বিভেদ ও জাতি-ভেদ গ্রাম্য-সমাজকে মধ্যে মধ্যে বেশ বিষাক্ত ক'রে তুলেছে। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে, অর্থাৎ বিনয়পিটক ও সুত্তপিটকে একবর্ণ-বহুল গ্রামের প্রচুর উল্লেখ দেখা যায়। এই সব গ্রন্থের মধ্যে আমরা ব্রাহ্মণগ্রাম, ব্রাহ্মণনিগম, ক্ষত্রিয়গ্রাম, ও বৈশ্যগ্রামের উল্লেখ পেয়ে থাকি। একবর্ণবহুল গ্রামের মতো এমন কতক-গুলি গ্রামের কথাও জানা যায় যেখানে একবৃত্তির লোকেরা বাস করত। যেমন কুম্ভকারগ্রাম, সূত্রধরগ্রাম, তন্তুবায়গ্রাম, কর্ম্মকারগ্রাম ইত্যাদি। এই বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রাম স্বভাবতঃই আত্ম-নির্ভর হতে পারে না। হয় কৃষকবহুল বা শূদ্রবহুল গ্রামের পাশাপাশি এই সব গ্রাম গ'ড়ে উঠত এবং কয়েকটি গ্রাম মিলে হ'ত একটি আত্মনির্ভর গ্রাম্য-সমাজ, আর না হয় উচ্চবর্ণের উৎপীড়নের ভয়ে, বর্ণ-বিদ্বেষের প্রতিক্রিয়ায় এই ভাবে বর্ণকেন্দ্রিক ও বৃত্তিকেন্দ্রিক গ্রাম গ'ড়ে উঠত। শেষোক্ত কারণে এই বৈশিষ্ট্যের বিকাশ আদৌ অস্বাভাবিক নয় (১১)। যাই হোক্ না কেন, সমস্ত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও গ্রাম্য-সমাজের বৈশিষ্ট্য এখানে বিলুপ্ত হয়নি। এইটাই আসল কথা।

এইবার নগরের কথা বলি। ভারতীয় নগরগুলির বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, তীর্থস্থান, রাজ-দরবার অথবা বাণিজ্যের বন্দর কেন্দ্র করেই এগুলি গ'ড়ে উঠেছে। তার মধ্যে প্রথম দুই শ্রেণীর নগরই বেশী, বাণিজ্য-কেন্দ্র বেশী নয় (১২)। প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা বুদ্ধের সময়ের তক্ষশিলা, বারাণসী, শ্রাবস্তী, উজ্জয়িনী, কৌশাম্বী, বৈশালী, রাজগৃহ প্রভৃতি অনেকগুলি বিশাল নগরের পরিচয় পাই। বৌদ্ধযুগের এই নগরগুলি থেকে আরম্ভ ক'রে আহমেদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি মুসলমান-যুগের নগরের বৈশিষ্ট্য প্রায় একই দেখা যায়। মধ্য-যুগে ইয়োরোপের নানা স্থানে যে সব নগর গ'ড়ে উঠেছিল তাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের মধ্যযুগের নগরগুলির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে (১৩)। হিন্দু-যুগের নগরের মোটামুটি পরিচয় আমরা কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র' থেকে পেতে পারি। 'অর্থশাস্ত্রে' দেখা যায় নগরগুলি প্রায়ই পরিখা, উঁচু প্রাচীর ও প্রাকার-বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে ছোট ছোট দুর্গ বা টাওয়ার থাকত। প্রাচীর সাধারণতঃ পাথরের তৈরী হ'ত, পাথরের অভাবে কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত। দুর্গের মধ্যে সদা-সর্ব্বদা সুসজ্জিত সৈন্য থাকত। প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে লোকজনের আনাগোনার জন্যে 'দ্বার' থাকত, 'অর্থশাস্ত্রে' এই রকম দ্বাদশটি দ্বারের উল্লেখ আছে। দ্বারগুলির মধ্যে একটিকে 'মহাদ্বার' (Main Gate) বলা হ'ত, তার এক দিকে থাকত মহাদ্বারাধিপের বা নগরপালের কর্ম্মচারী ও রক্ষীদের আবাস, অন্য দিকে থাকত শুল্কাধ্যক্ষের অফিস বা শুল্কশালা। কেউ নগরের মধ্যে ঢুকতে বা বেরোতে গেলে নগরপালের কর্ম্মচারীরা তার পরিচয় নিয়ে তবে অনুমতি দিত, আগন্তুকদের মুদ্রা (Passport) দেখাতে হ'ত। শুল্কাধ্যক্ষের কর্ম্মচারীরা সকলের মাল-পত্তর পরীক্ষা করত, নির্দ্দিষ্ট পণ্যের উপর ধার্য্য শুল্ক না দিয়ে কারও নিষ্কৃতি ছিল না। নগরের ভিতরের সংস্থান সম্বন্ধেও 'অর্থশাস্ত্র' থেকে মোটামুটি নির্দ্দেশ পাওয়া যায়। নগরের ভিতরে তিনটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে আর তিনটি উত্তর থেকে দক্ষিণে রাজপথ থাকত। এই ক'টি রাজপথ ছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট পথ ও অলিগলি থাকত। নগরের ভিতরে এক এক অংশে এক এক বর্ণের ও বৃত্তির লোকের বসতি ছিল। গন্ধমাল্য ব্যবসায়ী, সূত্র ব্যবসায়ী, ধান্য ব্যবসায়ী, তন্তুবায়, চর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, লৌহকার প্রভৃতিকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বাস ও ব্যবসা করতে হ'ত। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ভৃত্যদের স্বতন্ত্র বসতি ছিল। বারাঙ্গনাদের পল্লী ভিন্ন ছিল এবং তারই কাছে থাকত মদ্য ব্যবসায়ী, পক্কমাংস ও পক্কৌদন ব্যবসায়ীরা। অংশ-বিশেষে রাজকর্ম্মচারীদের অধিকরণ বা অফিস ও বাসস্থান থাকত। দোকান-বাজার খুলতে পণ্যাধ্যক্ষের অনুমতি প্রয়োজন হ'ত (১৪)। এ ছাড়া বাংলাদেশের পাল-রাজধানী 'রামাবতী' এবং সেন-রাজধানী 'বিজয়পুরের' বর্ণনা-প্রসঙ্গে দেখা যায়, প্রশস্ত রাজপথের ধারে 'কনক-পরিপূর্ণ ধবল প্রাসাদ-শ্রেণী মেরুশিখরের ন্যায়' মনে হ'ত, তার উপর সোনার কলস শোভা পেত। নানা স্থানে মন্দির, স্তূপ, বিহার, উদ্যান, পুষ্করিণী, ক্রীড়াশৈল, ক্রীড়াবাপী, নানা রকমের ফল-ফুল লতা-গুল্ম নগরের শ্রীবৃদ্ধি করত (১৫)। হিন্দুযুগের নগরগুলির

U. N. Ghoshal : Agrarian System in Ancient India. (Lectures 1, 2, 3)

১০ K. S. Shelvankar : Op. Cit. P. 80.

১১ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : মৌর্য্যযুগের ভারতীয় সমাজ, পৃঃ ২৫।

১২ D. R. Gadgil : The Industrial Evolution of India (1946), Chap. X. P.P. 144—158.

১৩ D. R. Gadgil : Op. Cit. Ibid.

১৪ নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : Op. Cit. পৃঃ ৩১—পৃঃ ৩৯।

১৫ শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার : বাংলা দেশের ইতিহাস : পৃঃ ১৮৪।

এই পরিকল্পনা ও বৈশিষ্ট্য মুসলমান নবাব-বাদ্‌শাহরা সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁরা এমন নূতন কোন পরিকল্পনা বা বৈশিষ্ট্য দান করতে পারেননি যা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, যদিও হিন্দুযুগের নগর-বিহার-স্তূপ-মন্দির প্রভৃতি অনেক তাঁরা ধ্বংস করেছিলেন। তার বদলে তাঁরা গ'ড়ে তুলেছিলেন বিরাট বিরাট মস্‌জিদ ও প্রাসাদ, প্রাচীরগুলোকে আরও মজবুত ও উঁচু করেছিলেন আর বাদ্‌শাহী শরণি তৈরী করেছিলেন সৈন্য-চলাচলের সুবিধার জন্যে (১৬)।

মধ্যযুগীয় নগরের এই গঠন-পরিকল্পনা সে-যুগের অর্থ-নৈতিক বনিয়াদ, জীবন-দর্শন এবং উৎপাদন-যন্ত্রের সীমাবদ্ধ উৎকর্ষের সঙ্গে কি ভাবে যে একসূত্রে গাঁথা, ল্যুইস্ মামফোর্ড সে-সম্বন্ধে অতি সুন্দর ভাবে ইয়োরোপের মধ্যযুগীয় নগরগুলির ইতিহাস আলোচনা-প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করেছেন (১৭)। সেই প্রতিরোধ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাকার, প্রাচীর ও দুর্গ গঠন, সেই রাজা-বাদ্‌শাহের বিরাট বিরাট কারুকাজ করা অট্টালিকা, বিলাস-ভবন, প্রমোদ-উদ্যান, সেই বিহার-মন্দির-মস্‌জিদ, বাণিজ্য-কেন্দ্র, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, কারুশিল্পীদের কারখানা ও সংঘ বা গিল্ড, সবই ছিল। নগর, প্রাসাদ, মন্দির, মসজিদ ও বিলাসের সৌখিন সামগ্রী উৎপাদনের জন্যে কারুশিল্পীদের নগরে নিয়ে আসা হত এবং এই ভাবে গ্রাম থেকে ভাল কারিগর ও শিল্পী উজাড় হয়ে যেত। এই কারুশিল্পীরা নগরে এসে সাধারণতঃ রাজা-বাদশাহ, তাদের আমলা-অমাত্যবর্গ, সভাসদ ও পারিষদবর্গ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর লোকদের জন্যে বিলাসের সামগ্রী তৈরী করত। রাজা-বাদ্‌শাহরা নিজেদের সরকারী কারখানাতেও বেতন দিয়ে কারুশিল্পীদের নিযুক্ত করতেন। সূক্ষ্ম কারু-কাজ করা সৌখিন জিনিষ কারুশিল্পীরা তৈরী করত। শিল্পীদের কারিগরি ও দক্ষতা অসাধারণ ছিল। দেশ-বিদেশের গুণী ব্যক্তিরা সকলেই সে-কথা একবাক্যে স্বীকার ক'রে গিয়েছেন। কিন্তু কারিগরি, সূক্ষ্মতা ও দক্ষতা বলতে উন্নত নিৰ্মাণ-পদ্ধতি (Technique) বা হাতিয়ারের (Tools) ব্যবহার বুঝলে ভুল হবে। এই কারিগরি প্রথমে গোষ্ঠী ও সংঘের মধ্যে, তার পর বংশের মধ্যে, এবং ক্রমে বংশ থেকে ব্যক্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। উন্নত হাতিয়ারের প্রয়োজন হয়নি, কেবল অসীম ধৈর্য্য আর অমানুষিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়েছে। রাজা-বাদ্‌শাহের অনুগ্রহের ছায়াতলে, কারখানার বন্দী হলঘরে, দিনের পর দিন কারুশিল্পীরা বিলাসের সামগ্রী তৈরী করেছে। তাদের মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়েছে, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে এসেছে এবং মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষতাও লুপ্ত হয়েছে। আশ্রমের যোগী-ঋষির মতো কারুশিল্পীও কারখানায় ধ্যাননিবিষ্ট, একাগ্রচিত্ত। উৎপাদনের শক্তি বাড়েনি, পদ্ধতি ও হাতিয়ার উন্নত হয়নি, শেষ পর্য্যন্ত সূক্ষ্মতা ও দক্ষতার সঙ্কীর্ণ আনাচে-কানাচে কারুশিল্প প্রভুত্ব লাভ করেছে।

ধনপতি সদাগর, শ্রেষ্ঠী ও বণিকের অভাব ছিল না আমাদের দেশে। অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যেরও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইয়োরোপীয় বণিকদের মতো কেন আমাদের দেশের বণিকেরা ধীরে ধীরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে পারেনি? কেন রাজা-বাদশাহ ও ভূস্বামীদের বিতাড়িত ক'রে, প্রাচীন সামন্ত-প্রথাকে ধ্বংস ক'রে তারা বণিকরাজ ও ধনিকরাজ স্থাপন করতে পারেনি? এক কথায়, কেন আমাদের দেশে সামন্ত-প্রথার ধ্বংসস্তূপ থেকে বণিক-প্রথা ও ধনিক-প্রথার উদ্ভব হয়নি? এরও উত্তর ঐ একই গ্রাম্য-সমাজের আত্মকেন্দ্রিকতা। নগর গ'ড়ে উঠেছে প্রধানতঃ রাজা-বাদশাহের শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজনে, নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্ররূপে, বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে নয়। নগর ও গ্রামের মধ্যে ইয়োরোপের মতো শ্রমবিভাগের ভিত্তিতে বিরোধ এদেশে দেখা দেয়নি। নগরের কারুশিল্পীদের সঙ্গে গ্রামের কারিগরদের কোন বিরোধ হয়নি। সুতরাং নগর তৈরী হলেও এদেশের গ্রাম্য-সমাজকে তা আঘাত করেনি। রাজা-বাদ্‌শাহের রাজস্ব ও ধন-দৌলতের উৎস ছিল গ্রাম, নগর শাসন-কেন্দ্র মাত্র। ইয়োরোপেও তাই ছিল, কিন্তু গ্রাম ও নগর এতটা পরস্পর নির্ভরশীল ছিল না। নালা কেটে সেচের ব্যবস্থা করা এদেশের কৃষির প্রাথমিক প্রয়োজন। এই রকম জনকল্যাণকর রাজ-কাজ পরিচালনার জন্যে শাসন-কেন্দ্রের প্রয়োজন হয়েছে। এই শাসন-কেন্দ্রই হয়েছে নগর, বাণিজ্য-কেন্দ্র নয়। ইয়োরোপের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্যে এ রকম কোন কেন্দ্র-গঠনের প্রয়োজন হয়নি। নগর বাণিজ্য-কেন্দ্রই ছিল। নগর ও গ্রামের মধ্যে বিভেদও ছিল। তাই নগরে বণিকদের প্রাধান্য বাড়লেও গ্রাম বিপন্ন হয়নি। কিন্তু এদেশে নগরে যাতে বণিকদের প্রাধান্য না বাড়ে সে দিকে ভূপতিদের সব সময় সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কারণ, তাহলে সমস্ত প্রথা ও ব্যবস্থার মূল পর্য্যন্ত টান পড়বে। এই সব কারণেই ভারতীয় বণিকেরা ইয়োরোপীয় বণিকদের মতো রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা লাভ করতে পারেনি, নিজেদের প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি (১৮)। গ্রাম্য-সমাজের অচল অটল আত্মনির্ভরতাকে ভেঙে দিয়ে তাকে পদানত করতেও পারেনি বণিকরা, গ্রামকে পণ্যের বাজারে পরিণত করতে পারেনি। ধনিক সদাগরের অভাব না হলেও, সামন্ত-প্রথাকে ধ্বংস ক'রে সদাগরী-প্রথা এবং ধনিকতন্ত্রের বিকাশ সেই জন্যে আমাদের দেশে স্বাভাবিক ভাবে হয়নি।

সেকাল ও একালের সংঘাত

এই ভাবে সঙ্কীর্ণ অর্থনৈতিক অচলায়তনে বন্দী হয়ে রাজকীয় বিলাসিতায় ও স্বেচ্ছাচারিতায় গা ভাসিয়ে দিয়ে, দেশব্যাপী গৃহযুদ্ধ ও মাৎস্যন্যায়ের মধ্যে হিন্দু রাজত্বের অবসান এবং পাঠান ও মোগল রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল আমাদের দেশে। ঠিক তেমনি অর্থনৈতিক

১৬ Kunwar Muhammad Ashraf : Life and Conditions of the People of Hindusthan (1200—1500 A. D.—Mainly based on Islamic Sources), J. A. S. B. Vol, I, 1935. No 2. P.P. 265—268. "When Muslims first came on the scene, and for a long time afterwards, they made skilful use of Hindu architectural talent in their own buildings and towns.…They removed most of the old features of Hindu cities, though they left very few of the native masterpieces intact." (P. 266)

১৭ Lewis Mumford : Op. Cit. Chap. I.

১৮ K. S. Shelvankar. Op. Cit. P.P. 106—111.

কাঠামোর সঙ্কীর্ণ চোর-কুঠরীতে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে প্রবল প্রতাপশালী মোগল বাদ্‌শাহদের রাজত্বের অবসান হয়েছে। ধ্বংসোন্মুখ হিন্দুযুগের অচল অর্থনৈতিক কাঠামোর কোন পরিবর্ত্তন না ক'রে, তাকে উন্নত ও সচল না ক'রে, কেবল সামরিক শক্তির জৌলুষ আর বাদ্‌শাহী মেজাজ দেখিয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী রাজ্য চালান যায় না। মোগল সাম্রাজ্যের অবসান কালে সমাজের আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা, ক্লেদ ও মালিন্য তাই আরও উৎকট ভাবে দেখা দিয়েছিল (১৯)। শেষ স্বৈরাচারী মোগল বাদ্‌শাহ ঔরঙ্গজীবের মৃত্যুর পর ঘুণধরা, শিথিল, জীর্ণ অট্টালিকার মতো সমস্ত সমাজটা ভেঙে পড়ল। এদেশটা দস্যু আর খুনীর 'মগের মুল্লুক' হয়ে উঠল। সমাজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন বাতগ্রস্ত রুগীর মতো পঙ্গু হয়ে এল। ন্যায় নেই, নীতি নেই, আইন-কানুন ঐতিহ্য কিছুই নেই, আছে কেবল দুর্নীতি, অক্ষম ও অথর্বের নৈরাশ্য ও দুর্বলতা। গলিত নখদন্ত এই সমাজকে, এই অচল-অটল অর্থনৈতিক কাঠামোকে চূর্ণ ক'রে যারা নূতন সমাজের ভিৎ গঠন করতে পারত তারা তা করতে পারেনি। ঠিক এই সময় এই ঐতিহাসিক যুগসন্ধিক্ষণে এল ইয়োরোপীয় বণিকরা, পর্ত্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী, বৃটিশ সকলে। বৃটিশ বণিকদের প্রভুত্বই কায়েম হ'ল, বণিকদের হাত থেকে বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর হাতে রাজত্ব চলে' গেল। সে-কাহিনী আগেই বলেছি।

বৃটিশ ধনতন্ত্রের উল্লেখযোগ্য দান হ'ল প্রাচীন ভারতীয় সামন্ত-প্রথার ভিৎ শিথিল ক'রে দিয়ে কৃষি ও শিল্পক্ষেত্রে নূতন ধনতান্ত্রিক প্রথার পথ পরিষ্কার ক'রে দেওয়া। কিন্তু আমরা আগেই দেখেছি, গ্রামে ও নগরে ধনতন্ত্রের প্রবেশাধিকার দিয়েও বৃটিশ শোষকরা মুনাফার স্বার্থে তাদের স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ দেয়নি। পুরাতন অর্থনৈতিক কাঠামোকে ধ্বংস করার পথ সুগম ক'রে দিয়ে বৃটিশ ধনিকরা এ দেশে নূতন অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরীর পথ দুর্গম করেছে। কিন্তু তাহ'লেও বৃটিশ-যুগে আমাদের দেশের নূতন অর্থনৈতিক গতি ও ঝোঁকের কথা অস্বীকার করা অর্থহীন (২০)। এই নূতন গতির স্বাভাবিক ঝোঁক হ'ল বণিকতন্ত্র ও ধনিকতন্ত্রের দিকে। এই ঝোঁকটাই কম বৈপ্লবিক নয়।

এই নূতন অর্থনৈতিক গতির স্পষ্ট পরিচয় আমরা পাই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে। কিন্তু রেলপথ তৈরী হবার পর, উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে দেখা যায় কলকারখানার সংখ্যা বেড়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে হুগলী জেলার শ্রীরামপুরে প্রথম কাগজের কল তৈরী হয়, কিন্তু তা উঠে যায়। ১৮২০ সালে রাণীগঞ্জে প্রথম কয়লার খনি খোঁড়ার পর বিশ বছরের মধ্যে আর কোন নূতন খনি খোঁড়া হ'ল না। ১৮৫৪ সাল পর্য্যন্ত মাত্র তিনটি খনি খোঁড়া হ'ল। কিন্তু ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ে খোলার সময় থেকে খনির সংখ্যা বাড়তে থাকে। ১৮৭৯-৮০ সালের মধ্যে দেখা যায় রাণীগঞ্জে ও তার আশ-পাশে প্রায় ৫৬টি কয়লার খনিতে কাজ হ'চ্ছে। ১৮৭২-৭৩ সালে দেখা যায় বোম্বাই প্রদেশে ১৮টি এবং বাংলায় ২টি কাপড়ের কল তৈরী হয়েছে (২১)। পাট চাষ ও পাটশিল্প বাংলাদেশেরই একচেটিয়া ছিল বলা চলে। "পাট থেকে যে সব জিনিষ তৈরী হ'ত তার মধ্যে চট ও চটের বস্তাই প্রধান। নিম্ন-বঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলের জেলাগুলির পাটই ছিল প্রধান গৃহশিল্প। সমাজের প্রত্যেক সম্প্রদায় ও গৃহস্থ এই শিল্পে নিযুক্ত থাকত। স্ত্রী-পুরুষ, বালক-বালিকা, মাঝি, চাষী ভৃত্য সকলেই অবসর সময়ে এই কাজ করত (২২)।" ১৮৩০ সাল পর্য্যন্ত এই পাটশিল্প বাংলার প্রধান গৃহশিল্প ছিল বলা চলে। ১৮৫৪ সালের আগে আধুনিক যন্ত্রের সাহায্যে পাটশিল্প আরম্ভ হয়নি। ঐ বছর জনৈক মিঃ অকল্যাণ্ড প্রথম পাটের কল তৈরী করেন শ্রীরামপুরে। ১৮৮২ সালের মধ্যে ভারতবর্ষে ২০টি পাটের কল তৈরী হয়, তার মধ্যে ১৮টি বাংলাদেশে এবং ১৭টি কলিকাতার উপকণ্ঠে। আসামে চা-বাগানের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৫৬-'৫৯এর মধ্যে। গুজরাট ও পশ্চিম-ভারতে আগের কালে নীল চাষ হ'ত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে তার অবনতি ঘটে। তার পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই নীল চাষের পুনঃ প্রবর্ত্তন করে বাংলাদেশে। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলাদেশে পূর্ণোদ্যমে নীল চাষ আরম্ভ হয় এবং মাঝামাঝি থেকে যথেষ্ট পরিমাণে নীল রপ্তানি হতে থাকে (২৩)।

কয়লার খনি, রেলপথ, চা-বাগান, পাটকল ও কাপড়ের কলই বেশী তৈরী হয় উনবিংশ শতাব্দীতে এবং এই সব শিল্পে প্রধানতঃ বৃটিশ মূলধনই নিযুক্ত হয়। কলকারখানা ও শিল্পের বিকাশ উনবিংশ শতাব্দীতে কি ভাবে হ'ল (২৪)?

	১৮৭৯-৮০	১৮৮৯-৯০	১৯০০-'০১
কাপড়ের কল			
মিলের সংখ্যা	৫৮	১১৪	১৯৪
শ্রমিক-সংখ্যা	৩৯,৫৩৭	৯৯,২২৪	১৫৬,৩৫৫
পাটের কল			
মিলের সংখ্যা	২২	২৭	৩৬
শ্রমিক-সংখ্যা	২৭,৪৯৪	৬২,৭৩৯	১১৪,৩১৫
কয়লার খনি			
শ্রমিক-সংখ্যা	২২,৭৪৫ (১৮৮৫ সাল)		

শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য ও কাঁচা মালের আমদানি-রপ্তানির হ্রাসবৃদ্ধি থেকে ভারতবর্ষের এই নূতন অর্থনৈতিক প্রথার ঝোঁক আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে: (২৫)

১৯ P. P. Pillai: Economic Conditions in India (2nd Imp. 1928) P.P. 9—14.

২০ P. P. Pillai: Op. Cit. P.P. 160—164.

২১ D. R. Gadgil: Op. Cit. P.P. 55—62. P.P. Pillai: Op. Cit. P.P. 173—174.

২২ D. R. Wallace: The Romance of Jute (Calcutta. 1909)

২৩ D. R. Gadgil: Op. Cit. P.P. 48—54.

২৪ D. R. Gadgil: Op. Cit. Chap. VI (P.P. 76—80).

২৫ P. P. Pillai: Op. Cit. P.P. 31—32.

(টাকার হিসাব)

	১৮৭৯	১৮৯২	১৯০৭
শিল্পজাত পণ্য			
আমদানি	২৫৯,৮৬৫,৮৭২	৩৬২,২৩১,৮২৭	৬৯৮,৮৯৫,০০০
রপ্তানি	৫২,৭৮০,৩৪০	১৬৪,২৪৭,৫৬৬	৩৯২,৯৮১,০০০
কাঁচা মাল			
আমদানি	১৩৭,৫৫৫,৮৩৭	২৬৩,৮১৮,৪৩১	৫৯৯,৬৬৮,৩৭৪
রপ্তানি	৫৯৬,৭২৭,৯৯১	৮৫৫,২০৯,৪৯৯	১,১৪১,২৩১,৩৩৫

শতকরা বৃদ্ধি

	১৮৭৯-১৮৯২	১৮৯২-১৯০৭
পণ্য আমদানি	৩৯%	৯৩%
পণ্য রপ্তানি	২১১%	১৩৯%
কাঁচা মাল আমদানি	৯১%	১২৭%
কাঁচা মাল রপ্তানি	৪৩%	৫৭%

ভারতের নূতন শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার আদৌ হ'চ্ছে কি না, যে গতিতেই হোক না কেন, তা বিচার করার দু'টো প্রধান মাপকাঠি হ'ল: (১) বৃটেনের শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য যে হারে এদেশে আমদানি হ'চ্ছে তার চেয়ে ভারতের পণ্য-রপ্তানির হার বাড়ছে কি না, (২) কাঁচা মাল যে হারে রপ্তানি হ'চ্ছে তার চেয়ে বেশী হারে আমদানি হ'চ্ছে কি না। এই মাপকাঠি অনুযায়ী উপরের তালিকা থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতি নিশ্চিত সুরু হয়েছে।

এই প্রগতির ফল হ'চ্ছে কি? অর্থাৎ এই নূতন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সমাজের রূপান্তর ঘটছে কি ভাবে, কি ভাবে নূতন শ্রেণীর ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর উদ্ভব হ'চ্ছে? প্রথমত: ভারতের বণিক-ধনিক শ্রেণীর প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়ছে। রেলপথ ও যান-বাহনের বিস্তারের ফলে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিশাল এই মহাদেশ ক্রমেই সংহত ও কেন্দ্রীভূত হ'চ্ছে। শিল্পজাত পণ্যদ্রব্য দেশের অভ্যন্তরে সর্বত্রই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হ'চ্ছে। ফলে যে কারুশিল্পী ও কারিগরদের মেরুদণ্ড এত দিন মচকেও ভেঙে পড়েনি, তারা ভেঙে পড়ছে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হার মানছে এবং তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিস্বরূপ নূতন উদীয়মান বণিক-ধনিক শ্রেণীর পদানত হ'চ্ছে। যন্ত্রপাতির উপর কর্তৃত্ব ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা কারুশিল্পীর আর থাকছে না, তার সামান্য পুঁজিতে আর কুলোচ্ছে না। তাকে বাধ্য হয়ে ধনিক-বণিকদের আশ্রয় নিতে হ'চ্ছে (২৬)। কারুশিল্পী ধীরে ধীরে হ'চ্ছে বণিক ও ধনিক শ্রেণীর বেতনভুক্ শ্রমজীবী শ্রেণী (Industrial Proletariat)। সমাজে নূতন শ্রেণীর অর্থাৎ এই শ্রমজীবী শ্রেণীর আবির্ভাব হ'চ্ছে। তার সঙ্গে আর এক শ্রেণীর সমসাময়িক আবির্ভাব হ'চ্ছে। গোমস্তা, কেরাণী, ব্যাপারী, দালাল প্রভৃতি নিয়ে এক সদা-ভাসমান, ত্রিশঙ্কু মধ্যবর্তী শ্রেণী, অর্থাৎ 'মধ্যবিত্ত শ্রেণী' (?), যারা নূতন শাসন-যন্ত্র, নূতন শিক্ষা-যন্ত্র এবং নূতন বাণিজ্য-যন্ত্র পরিচালনার জন্যে তৈরী হ'চ্ছে। এই সচেতন, শিক্ষিত, সুবিধাবাদী, উচ্চ শ্রেণীর অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই সুরু (২৭)।

মহানগর অভিমুখে

ভারতের বণিক-ধনিকশ্রেণী ও তাদের অনুচর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাবে, পুরাতন প্রাসাদ ও মসনদ-কেন্দ্রিক নগর ধীরে ধীরে অন্তর্ধান ক'রে গেল। মধ্যযুগের 'কোর্ট টাউনের' বদলে নূতন শিল্পযুগের 'কোক্ টাউন' গ'ড়ে উঠতে লাগল শিল্পকেন্দ্রে, যান-বাহনের উৎসমুখে। শিল্পজাত পণ্যের প্রতিযোগিতায় যখন সৌখিন কারুশিল্প ও শিল্পী পরাজিত হয়ে উৎখাত হ'ল, তখন রাজকীয় ও বাদশাহী 'কোর্ট-নগর' দ্রুত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল। প্রাচীন নাগরিক জীবনের অর্থনৈতিক ভিত্তি ভেঙে পড়ল, নগরও ধ্বংস হয়ে গেল। যেমন অযোধ্যার নবাবদের রাজধানী লক্ষ্ণৌ ১৮৫৮ সালে অধিকৃত হবার পর নবাবের দরবার প্রাসাদ, সৌখিন কারুশিল্পের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্ণৌর দ্রুত অবনতি ঘটল। এই ভাবে বাংলাদেশের ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, শান্তিপুর সব ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেল। শিল্পকেন্দ্রে ও বাণিজ্যকেন্দ্রে নূতন নগর গ'ড়ে উঠল। বাংলাদেশের কলিকাতা, রাণীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা, ভাটপাড়া ইত্যাদি এবং অন্যান্য প্রদেশে করাচী, আমেদাবাদ, বোম্বাই, মাদ্রাজ, জামসেদপুর প্রভৃতি মহানগর ও শিল্পনগর গ'ড়ে উঠল। কারখানা ও কামারশালা থেকে উৎখাত কারুশিল্পীরা, নিঃস্ব কৃষকেরা, চাকুরীজীবী নূতন মধ্যবিত্ত শ্রেণী, জমির সঙ্গে সম্পর্কহীন নূতন জমিদার শ্রেণী, তালুকদার, গাঁতিদার, পত্তনীদার, দরপত্তনীদারদের পরিবার, ভৃত্য শ্রেণী, সব যাত্রা করল শিল্পনগর ও মহানগর অভিমুখে। নূতন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমির মালিকদের রাজস্ব দেওয়া ছাড়া কোন দায়িত্ব নেই, অতএব মহানগর অভিমুখে যাত্রা করতে বাধা নেই। কারুশিল্পী ও নিঃস্ব কৃষকদের গ্রাম ছেড়ে না গিয়ে উপায় নেই, মহানগরের আশে-পাশের কারখানায় তারাই হয়েছে শ্রমজীবী শ্রেণী। যারা আসেনি তারা মাটি আঁকড়েই গ্রামে থেকেছে। বণিক-ধনিক শ্রেণীর এবং তাদের অনুচর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নূতন স্বর্গপুরী হ'ল মহানগর, কারণ মহানগরেই দেশ-বিদেশের নানা লোকের সমাগম হয়, মহানগরেই কাজকর্মের অফুরন্ত সুযোগ পাওয়া যায়, শিক্ষা-দীক্ষা-চাকুরী-মোসাহেবি-দালালি-জাল-জুয়াচুরী সব কিছুর প্রশস্ত ক্ষেত্র মহানগর। সুতরাং ভাগ্যবান বণিক ও ধনিকরা এল ঐশ্বর্য্য, ধনসম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধির লোভে, দুর্ভাগা মধ্যবিত্তরা ভাগ্যবান হবার আশায়, আর হতভাগ্য কৃষক কারিগরেরা দিনমজুরীর আশায়, জীবনধারণের তাগিদে এসে ভিড় করল মহানগরে। এই ভাবেই কলিকাতা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, করাচী এবং বিংশ শতাব্দীতে নগণ্য একটা সাঁওতালী গ্রাম থেকে 'টিপিকাল্' আধুনিক শিল্পনগরে রূপান্তরিত হয়েছে জামসেদপুর (২৮)। কলিকাতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসও কম চমকপ্রদ নয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যে সব শিল্পনগর গ'ড়ে উঠেছে তার অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন চার্লস্ ডিকেন্স তাঁর 'Hard Times' গ্রন্থের মধ্যে। চার্লস্ ডিকেন্সই একে বলেছেন 'কোক্-টাউন'। লুইস্ মামফোর্ড লিখেছেন, (২৯)—"১৮২০ থেকে ১৯০০ সালের মধ্যে নূতন শক্তি ও সংহতি নিয়ে যে সব নগর গড়ে ওঠে সেগুলো ঠিক যেন যুদ্ধক্ষেত্রের মতো। নিযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য

২৬ K. S. Shelvankar : Op. Cit. P.P. 119—120.
২৭ P. P. Pillai : Op. Cit. P. 30.
২৮ P. P. Pillai : Op. Cit. P. 162—163.
২৯ Lewis Mumford : Op. Cit. P. 144.

অনুযায়ী তাদের বৃদ্ধি ও বিকাশ। নূতন নগরে এখন দৃষ্টি রাখতে হয় শিল্পপতি, ব্যাঙ্কার ও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবকদের দিকে। এদেরই প্রতিকৃতিতে নূতন মহানগর তৈরী হয়েছে, ডিকেন্স যাকে 'কোক্-টাউন' বলেছেন। পশ্চিমের প্রায় প্রত্যেকটি সহরে এই সময় এই কোক্-টাউনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হ'য়ে ওঠে। এই যে নূতন নাগরিক সম্মিলন ও সংহতি এর রাজনৈতিক স্তম্ভ হ'ল প্রধানত: তিনটি: পুরাতন গিল্ড বা কারুশিল্পী-সংঘগুলিকে ধ্বংস ক'রে নূতন শ্রমজীবী শ্রেণীর নিরাপত্তা যাতে কোন দিন না থাকে তার ব্যবস্থা করা; পণ্যের ও শ্রমের বেচা-কেনার জন্যে বাজার খোলা; আর কাঁচা মালের জন্যে উপনিবেশ দখল করা এবং সেখানে উদ্‌বৃত্ত পণ্য বিক্রী করা। নূতন নগরের অর্থনৈতিক ভিত্তি হ'ল কয়লার খনি; লোহার প্রচুর ব্যবহার এবং ষ্টীম ইঞ্জিন।" মামফোর্ড যাকে রাজনৈতিক ভিত্তি বলেছেন সেইটাই মোটামুটি অর্থনৈতিক ভিত্তি, অর্থনৈতিক ভিত্তিটা হ'ল টেক্‌নিকাল ভিত্তি। সব মিলিয়ে হ'ল শ্রমশিল্প-যুগের অর্থনৈতিক সংগঠন। এই সংগঠনের সংহত বহিরঙ্গরূপে দেখা দিল এ যুগের 'কোক্-টাউন'। ইয়োরোপের মতো আমাদের দেশে ঠিক এই ভাবে কোক্-টাউনের উদ্ভব হয়নি, কারণ ইয়োরোপের মতো অর্থনৈতিক সংগঠন ঊনবিংশ শতাব্দীতে আমাদের দেশে গ'ড়ে ওঠেনি। বণিক ও ধনিক-তন্ত্রের সন্ধিক্ষণের নগরই গ'ড়ে উঠেছে বেশী এদেশে এবং বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে দেখা যায়, এদেশের নগরগুলি ইয়োরোপীয় 'কোক্-টাউনের' সমকক্ষ হয়ে উঠেছে। ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর সাবালকত্ব ও ধনতন্ত্রের বিকাশ দ্রুতগতিতে ঠিক এই সময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে। যাকে 'town aggregates' বা অধ্যাপক গেডিসের ভাষায় 'conurbation' অর্থাৎ 'জন-সংহতি' ও 'নগর-সংহতি' বলে, তা ইয়োরোপে ঊনবিংশ শতাব্দীতে কয়লার খনি আর লোহা-ইস্পাতের কারখানা কেন্দ্র ক'রেই প্রধানত: গ'ড়ে উঠেছে। আমাদের বাংলাদেশে এই শ্রেণীর নগর-সংহতি ও জন-সংহতির ঝোঁক দেখা যায় গঙ্গার তীরবর্ত্তী পাটকল ও আশপাশের কলকারখানার চারি দিকে কলিকাতাকে কেন্দ্র ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। আর ভবিষ্যতে বিহারে কয়লার খনি ও লোহার কারখানার কিনারে এই রকমের 'নগর-সংহতির' সম্ভাবনা রয়েছে (৩০)।

বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা—'কলিকাতা'

সমগ্র ভারতের এই যুগসন্ধিক্ষণে বাংলাদেশের ভূমিকা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। কেন? এ-প্রশ্নের উত্তর অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস থেকেই পাওয়া যাবে। উইলিয়ম হাণ্টার বলেন: "প্রথম থেকেই বাংলা ভারতের কামধেনুস্বরূপ ছিল এবং অন্যান্য সকল প্রদেশ বাংলাদেশ থেকেই অর্থশোষণ করত।" মোগলযুগে যা সত্য ছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও বৃটিশ আমলে তা মিথ্যা হয়নি। বৃটিশ ধনিক ও বণিকদের ধ্বংসাত্মক ভূমিকা অভিনয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ ছিল বাংলাদেশ। সুতরাং তার অন্য দিক, অর্থাৎ তার গঠন-প্রতিভার বিকাশও বাংলাদেশে সর্ব্বপ্রথম হয়েছে এবং ব্যাপক ভাবেই হয়েছে। পাটকল, কাপড়ের কল, কয়লার খনি, রেলপথ, এবং সবার উপরে 'মহানগর' গঠনের কাজ এই বাংলাদেশেই প্রথমে আরম্ভ হয়েছে বললে ভুল হয় না। হাণ্টার সাহেব বলেছেন: "বাণিজ্যের বিরাট কেন্দ্র স্বত:স্ফূর্ত্ত ভাবে গড়ে উঠবে, কোন স্বেচ্ছাচারী শাসকের খুসী মতো তা গ'ড়ে উঠতে পারে না। এই কঠিন কাজে পর্ত্তুগীজ, ডাচ, ফরাসী সকলেই একে একে ব্যর্থ হয়েছে, এবং একমাত্র আমরা বৃটিশরাই সফল হয়েছি ভারতবর্ষে। এই বিরাট ঐশ্বর্য্যশালী সাম্রাজ্যের শাসকরূপে যে সব জাতির আবির্ভাব হয়েছে তাদের মতো আমরা আসিনি। আমরা হিন্দুদের মতো মন্দির নির্ম্মাণে মন দিইনি, মুসলমানদের মতো প্রাসাদ, দরবার ও স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করিনি, মারাঠাদের মতো দুর্গ গঠনও করিনি, আবার পর্ত্তুগীজদের মতো কেবল গির্জ্জাও গ'ড়ে তুলিনি। সাধারণ ভাবে আমরা এসেছি নগর-নির্ম্মাণের জন্যে, এবং এদিকে আমরা এমনই একটি প্রতিভাশালী জাত যে, বিশাল বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে মহানগর গড়ে উঠতে পারে এই রকম উপযুক্ত স্থান বির্ব্বাচনে আমাদের ভুল হয়নি এবং হয়নি বলেই ভারতবর্ষে নূতন শিল্পযুগের সূচনা হয়েছে আমাদেরই জন্যে (৩১)।" বাস্তবিকই তাই। এত অল্প কথায়, এত স্পষ্ট ও সুন্দর ভাবে ভারতবর্ষে বৃটিশের ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা আর কেউ ব্যক্ত করতে পারেননি। মহানগর হ'ল উদীয়মান বৃটিশ ধনিকশ্রেণীর স্বপ্নের বাস্তব মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তিরূপে এদেশে নূতন নূতন মহানগর ও শিল্পনগর গ'ড়ে ওঠে এবং অনেক প্রাচীন রাজকীয় ও বাদশাহী নগর ধ্বংস হয়ে যায়। বাংলার ঐতিহাসিক ভূমিকা বৃটিশের এই নগর-নির্ম্মাণের মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হাণ্টার সাহেবের কথা মতো যদি বিরাট বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে মহানগর-প্রতিষ্ঠার স্থান নির্ব্বাচনে উপযুক্ত বৃটিশ-প্রতিভা স্বীকার করতে হয়, তাহলে বলতে হবে ১৬৯৮ সালে আধুনিক 'ড্যালহৌসী ট্যাঙ্কের' আশেপাশে ইংরেজ-বসতি গ'ড়ে তোলা এবং ঐ সময় সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম বাৎসরিক ১৩০০ টাকা খাজনায় বাদশাহের কাছ থেকে লীজ নিয়ে 'কলিকাতা' মহানগরের গোড়াপত্তন করা বৃটিশের সব চেয়ে দূরদর্শী প্রতিভার পরিচয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই 'কলিকাতা' মহানগর ধীরে ধীরে গ'ড়ে ওঠে, এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই দেখা যায় বিরাট মহানগরের জটিল কাঠামো প্রায় সব তৈরী হয়ে গিয়েছে! বিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার 'জনসংহতি' চরম সীমায় পৌঁছেছে। সমগ্র বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত মহানগরগুলির মধ্যে অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ মহানগর 'কলিকাতা' নবযুগের রাজধানী, শিল্প-বাণিজ্য কেন্দ্র ও জাগৃতি-কেন্দ্ররূপে ভারত-বর্ষের মধ্যে বাংলাকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য ক'রে তুলবে তাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাস, জাগৃতির ইতিহাস এবং সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে হ'লে তাই বিগত শতাব্দীর কলিকাতা মহানগরের ধারাবাহিক উন্নতি ও প্রসারের ইতিহাস জানতে হয়।

৩০ D. R. Gadgil: Op. Cit. Chap. X.

৩১ W. W. Hunter: The Indian Empire, P.P. 659—660.

গঙ্গার তীরে সুতানুটি, কলিকাতা, গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রাম ছিল (৩২)। আজকালকার 'বাগবাজার থেকে বড়বাজার, বড়বাজার থেকে এস্‌প্লানেড, এস্‌প্লানেড থেকে হেষ্টিংস পর্য্যন্ত এই গ্রাম তিনটির বিস্তৃতি ছিল। ইংরেজরা প্রথমে এই তিনটি গ্রাম লীজ নেয়, তার পর বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ৮০০০ টাকা খাজনায় বেলগেছিয়া, সুরাট, উল্টাডাঙ্গা, সিমলা, বাঘমারী, আকুলি, চৌরঙ্গী, এণ্টালি, চিৎপুর প্রভৃতি আরও ৩৮টি গ্রাম তারা দখল করে। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছে পরাজিত হয়ে ইংরেজরা 'ড্যালহৌসী ট্যাঙ্কের' বসতি ও সেখানকার দুর্গ ছেড়ে (এখনকার বড় পোষ্ট অফিসের কাছে) ফল্‌তায় পালিয়ে যায়। পরের বছর পলাশীর যুদ্ধে নবাবকে হারিয়ে ক্লাইভ বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। তার পর গোবিন্দপুর গ্রামের একাংশের জংগল কেটে "ফোর্ট উইলিয়ম" তৈরী করা হয় ইংরেজদের নিরাপদে বসবাস ও নির্ভয়ে বাণিজ্যের সুবিধার জন্যে। এই সময় গোবিন্দপুরের দক্ষিণ-পূর্বে আজকালকার সুসমৃদ্ধ ও অভিজাত চৌরঙ্গী এলাকার গভীর শ্বাপদ-সঙ্কুল অরণ্য কেটে সাফ ক'রে ইংরেজদের নূতন বসতি তৈরী সুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে এই অঞ্চলে প্রায় ২০টি বাগানবাড়ী এবং 'রোড টু চৌরঙ্গী' তৈরী হয়। আজকালকার 'পার্ক ষ্ট্রীট'কে "গোরীস্থানের পথ" (Burying Ground Road) বলা হ'ত। এই পথে ভীষণ ডাকাতের উপদ্রব ছিল এবং এই পথ দিয়ে ইংরেজদের গোরস্থানে (যা আজও রয়েছে) যাওয়া যেত। বাণিজ্যের বসতি ছিল আজকালকার চীনাবাজার, রাধাবাজার এবং 'কসাইতলা রোড' (বেণ্টিক ষ্ট্রীট) অঞ্চলে। ক্লাইভ ষ্ট্রীটে ছিল বসবাসের গৃহ। ১৭৭২ সালে মিশন চার্চ, ১৭৮৪ সালে সেণ্ট জন্স চার্চ প্রভৃতি কয়েকটি গির্জা এবং 'ক্যালকাটা থিয়েটার' (১৭৭৫), 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' (১৮১২) প্রভৃতি কয়েকটি থিয়েটারও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে তৈরী হয়। ১৭৭৬ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কেরাণীদের ব্যারাক হিসেবে প্রথমে 'রাইটার্স বিল্ডিং' গড়ে ওঠে, তার পর ১৮২০ সালে আধুনিক আকার গ্রহণ করে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত দেখা যায় কলিকাতা ও গোবিন্দপুর অঞ্চলেই ইংরেজদের বসতি ছিল, আর সুতানুটিতে থাকত এদেশের লোক। তখনও সুতানুটিতে কুঁড়ে ঘর ও ধানের ক্ষেতের অভাব ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ ক'রে ১৮৫০-এর পর থেকে কলিকাতা দ্রুত মহানগরের রূপ গ্রহণ করতে থাকে। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ঘর-বাড়ী নির্ম্মাণ ও বাণিজ্যের বিস্তার থেকে কলিকাতার এই প্রগতি নির্দ্দেশ করা সহজ হবে (৩৩)।

---

৩২ H. E. A. Cotton: Calcutta Old and New; S. W. Goode: Municipal Calcutta; H. E. Busteed: Echoes from old Calcutta; Port of Calcutta (1870—1920); Brief History of Water-works (Calcutta Corporation)—এই গ্রন্থগুলি দ্রষ্টব্য।

৩৩ Census of India (1901). Vol. VII. Part I.

লোক-সংখ্যা

১৭১০	...	১২,০০০
১৭৫২	...	১১৭,৭৪৪
১৮২১	...	১৭৯.৯১৭
১৮৩৭	...	২২৯,৭১৪
১৮৫০	...	৪১৫,০৬৩
১৮৬৬	...	৩৭৭.৯২৪
১৮৭৬	...	৪২৯,৫৩৫
১৮৮১	...	৪৩৩,২৬৯
১৮৯১	...	৫০০,৮৯২
১৯০১	...	৫৭৭,০৬৬

পাকা বাড়ী

	একতলা	দোতলা	তেতলা	চারতলা	পাঁচতলা
১৮৫০	৫৯১৮	৬৪৩৮	৭২১	১০	১
১৮৭৬	৭০৩৭	৮৬৩৬	১১৮৭	৩৪	২
১৮৮১	৬৮৭৯	৯৬১৮	১৪২৬	৫৯	২
১৯০১	২২১৭৫	১২৯৭৬	৩১০৪	২৯৮	২১

কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য—আমদানি

(১০০০ টাকার হিসাব)

	১৮৯৬-৯৭	১৮৯৭-৯৮	১৯৯৮-৯৯	১৮৯৯-১৯০০	১৯০০-১৯০১
ধাতু ও শিল্পজাত ধাতুদ্রব্য :—	৬২৫৩০	৬২২৪০	৪৭৫৯১	৪৮৭০৯	৫৫৩৪০
কেমিক্যাল ও ঔষধ-পত্তর :—	৫৩৩৩	৬১৭৬	৬২০৭	৬৪০০	৭৫৭৫
শিল্পজাত ও আংশিক শিল্পজাত পণ্য :—	১৮৫৩০১	১৫৪৫৩৩	১৭৪৯৬৫	১৯২২০০	১৯৬৯৫৮

কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্য—রপ্তানি

(১০০০ টাকার হিসাবে)

	১৮৯৬-৯৭	১৮৯৭-৯৮	১৮৯৮-৯৯	১৮৯৯-'০০	১৯০০-'০১
ধাতু ও শিল্পজাত ধাতুদ্রব্য :—	৪৫৮	৪১৫	৬৭৬	৮১৩	১৪৯৩
কেমিক্যাল ও ঔষধ-পত্তর :—	৮৭২২৫	৬১০৯৯	৬৬৩৯৪	৭২০৯৫	৮১২৮১
শিল্পজাত ও আংশিক শিল্পজাত পণ্য :—	৭৬৪০৪	৮৩২২০	৭৬৭৩৫	৮৪৪৫০	৯৬৩৮৪

অন্যান্য সামগ্রীর হিসেব না দিয়ে এই কয়েকটি শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি-রপ্তানির হিসেব দিলাম এই জন্যে যে এই হিসেব থেকে কলিকাতা বন্দরের প্রাধান্য শুধু নয়, কলিকাতার পরিপার্শ্বের শ্রমশিল্পের বিকাশ কি ভাবে হ'চ্ছে পরিষ্কার বুঝতে পারা যাবে। ধাতু ও শিল্পজাত ধাতুদ্রব্য এবং শিল্পজাত পণ্যদ্রব্যের রপ্তানি উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ক্রমেই বেড়ে চলেছে দেখা যায়। অর্থাৎ কলিকাতার

আশেপাশে যে শ্রমশিল্পের প্রসার হ'চ্ছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। লোক-সংখ্যা ও পাকা বাড়ী বৃদ্ধি থেকে কলিকাতার দ্রুত 'মহানগর' রূপধারণের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই অবশ্যম্ভাবী জন-সংহতির ফলে মহানগরের সংঘবদ্ধ জীবনের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলিও উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সকলের জন্যে জল চাই, আলো চাই, যান-বাহন চাই। ১৮৭০ সালে ১১২ মাইল ও ২৫ মাইল, ১৮৮১-৯০ সালে ১৮৪ মাইল ও ৬৪ মাইল, ১৮৯৫-৯৬ সালে ৩১০ মাইল ও ৭৫ মাইল, এই ভাবে যথাক্রমে পবিস্রুত ও অপরিস্রুত জলের পাইপ বসল, এবং জল-সরবরাহের ব্যবস্থা হ'ল। লটারী কমিটির অর্থে ১৮১৩ সালে টাউনহল তৈরী হ'ল, পথ ঘাটের উন্নতি করা হ'ল,—কিড্ ষ্ট্রীট, ফ্রিস্কুল ষ্ট্রীট, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, ওয়েলেসলি ষ্ট্রীট, কলেজ ষ্ট্রীট, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট প্রভৃতি কয়েকটি রাস্তা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের মধ্যেই খোলা হ'ল। ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী প্রভৃতি ছাড়া অন্য কোন যান-বাহন তখন কলিকাতার রাস্তায় ছিল না। লোক-সংখ্যা বৃদ্ধির জন্যে যান-বাহনের উন্নতির দরকার। ১৮৮০ সালে বহুবাজার ষ্ট্রীট ও হেয়ার ষ্ট্রীট দিয়ে ঘোড়ার ট্রাম চলল। তার পর অন্যান্য রাস্তাতেও এই ঘোড়ার ট্রাম চলাচল সুরু হ'ল। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে মোটর গাড়ী ও বৈদ্যুতিক ট্রাম (১৯০২) চলাচল আরম্ভ হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে রাস্তায় আলোর দরকার হ'ল। ১৮৫৭ সালে প্রথম রাস্তায় তেলের আলো জ্বলল, তার পর গ্যাসের আলো, এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বৈদ্যুতিক আলোয় আলোকিত হ'ল কলিকাতার রাস্তা-ঘাট। পরস্পর নির্ভরশীল সমবায় জীবন, সাধারণ অভাব-অভিযোগের সার্ব্বজনীন অনুভূতি এবং তারই সঙ্গে ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা, লোভ-লালসা, প্রতিযোগিতা, স্বার্থপরতা, নীচতা, দীনতা নিয়ে নূতন অর্থনৈতিক যুগের যে জীবন, সেই বহুমুখী, জটিল, নূতন শক্তিতে চঞ্চল ও বেগবান জীবনের বাস্তব অভিনয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চরূপে কলিকাতা 'মহনগর' উনবিংশ শতাব্দীর ভিতর দিয়ে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করল।

কলিকাতা—জাগৃতি-কেন্দ্র

কলিকাতা মহানগরের এই দৈহিক সংস্থানের পরিবর্ত্তন ও ক্রমবিকাশের ধারার সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কলিকাতার মানসিক বিকাশের মর্ম্ম উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 'কলিকাতার মানসিক বিকাশ' বললাম, কারণ আগেই বলেছি লুইস্ মাম্‌ফোর্ডের ভাষায় 'mind takes form in the city and in turn urban forms condition mind—'মহানগরের মধ্যে মানসিক রূপায়ণ ঘটে, আবার মহানগরের রূপায়ণ মানস-রূপায়ণকে প্রভাবিত করে।' কর্ম্মমুখর, যন্ত্রমুখর, গতি-চঞ্চল, বাধাবন্ধহীন জীবনের মহাকেন্দ্ররূপে মহানগর গ'ড়ে ওঠে, তাই মানস-কেন্দ্ররূপেও তার প্রতিষ্ঠা অবশ্যম্ভাবী। জীবনের সঙ্গে জীবনের, ভাবের সঙ্গে ভাবের, আদর্শের সঙ্গে আদর্শের ঘাত-প্রতিঘাত এই মহানগরের মধ্যেই ঘটে, তাই মহানগরের বুকেই 'ক্রমায়াত ধারায়' যুগ-মানসের অভিব্যক্তি সম্ভব। কলিকাতা মহানগর নবযুগের বাংলার তথা সমগ্র ভারতের অর্থনৈতিক জীবন-কেন্দ্র, তাই কলিকাতা মহানগর নবযুগের বাংলার মানস-কেন্দ্র, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগৃতি-কেন্দ্র।

নূতন যে মহানগর গ'ড়ে উঠলো তার মানসিক ভিত্তি কি? তার অর্থনৈতিক ভিত্তির কথা আমরা বলেছি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে ইয়োরোপীয় শিল্পনগরের মতো যদিও কলিকাতা মহানগর 'কোক-টাউন' বা 'ইন্‌সেন্‌সেট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল্ টাউনে' পরিণত হয়নি তাহ'লেও তার ঝোঁক যে সেই অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে তা গত শতাব্দীর শেষে এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর গোড়ায় বেশ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। ল্যুইস মামফোর্ড অতি চমৎকার ভাবে এই নবযুগের মানসিক ভিত্তির কথা বলেছেন (৩৪): "এ যুগের কালোপযোগী আদর্শ হ'ল 'পারমাণবিক ব্যক্তি'। পরমাণুর মতো স্বাধীন ও মুক্ত এই ব্যক্তির সম্পত্তি, তার স্বাধিকার, কাজকর্ম্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সর্ব্বক্ষেত্রে তার অবাধ স্বাধীনতা রক্ষা করাই যেন রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। এই যে বাধাবন্ধহীন ব্যক্তির আদর্শবাদ (Ideology) এ হ'ল মধ্যযুগের স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের তথাকথিত গণতান্ত্রিক রূপ। এ যুগে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার স্বাধিকারে স্বেচ্ছাচারী, ভাবরাজ্যের রোমাণ্টিক কবির মতো স্বেচ্ছাচারী আর বাস্তব রাজ্যের ধনপতি সদাগরদের মতো স্বেচ্ছাচারী।" অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যান্ত্রিক পদার্থ-বিজ্ঞান, নির্ম্মম প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন ও ক্রমবিকাশের জীববিজ্ঞান, মিলের (Mill) ইউটিলিটেরিয়ানিজম্, ম্যাল্‌থাসের (Malthus) জীবন-সংগ্রাম প্রভৃতির সম্মিলিত অবদান এই জীবনাদর্শ। যান্ত্রিক শ্রমশিল্প যুগের অর্থনীতি এই আদর্শের পাকাপোক্ত বনিয়াদ। কলিকাতা মহানগরের বন্দরে শিল্পজাত পণ্য ও কাঁচা মালের রপ্তানি-আমদানির সঙ্গে সঙ্গে এই নবযুগের ভাবাদর্শের আমদানিও অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক সংঘাতের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতা মহানগরে আদর্শ-সংঘাতও তাই অনিবার্য্য। নবযুগের বাংলার জাগৃতি-প্রবাহের উৎসও তাই কলিকাতা মহানগর।

---

৩৪ Lewis Mumford : Op. Cit. P. 145.

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৪

মুসলমানপাড়ার মধ্যে অনেক লোক গোল হ'য়ে বসে কি তর্ক-বিতর্ক করছে। মিস্ত্রি করাতী ঘরামিরা আজ কাজে যায়নি। তর্কের বিষয় যাই হোক—উত্তেজনার কারণ ঘটেছে। ওরা যে ভাবে হাত-পা নাড়ছে—চেঁচাচ্ছে তাতে করে মনে হচ্ছে শত্রুপক্ষীয়রা সামনেই রয়েছে।

পুরন্দর কাছে আসতেই ওদের আস্ফালন থেমে গেল। মাথা হেঁট করে কেউ কেউ ধূলোর ওপর আঙুল দিয়ে দাগ টানতে লাগলো—কেউ বা পাটার ওপর কর্ণিক ঘসে সেটাকে সাফ করতে মন দিলে—কেউ আড়মোড়া ভেঙ্গে পুরন্দরের গতিভঙ্গিটা দেখতে লাগলো।

পুরন্দর ইতস্ততঃ করলে না। সোজা দাঁড়িয়ে গেল সেখানে। কালকের সেই বুড়ো মত মিস্ত্রির পানে চেয়ে বললে, কিসের মজলিস হ'চ্ছে তোমাদের পাঁচু? কাজে যাওনি যে?

পাঁচু মাথা চুলকে বললে, মজলিস নয়—লোকের অত্যাচারের কথা হচ্ছে বাবু।

কিসের অত্যাচার?

এই—আর আপনাকে কি বলবো বাবু—সবই তো জানেন। দাওয়ানির জরুকে বে-ইজ্জত করতে গেল বাপ-ব্যাটায়—এটা কি ভাল হ'য়েছে?

পাঁচুর মুখ খুলতেই সকলের সঙ্কোচ কেটে গেল। এক জন জোয়ান মত করাতী দাঁড়িয়ে উঠে বললে, এ আমরা সইবো না।

পুরন্দর বললে, ঠিকই বলেছ ভাই—মেয়েছেলের সম্মান সকলের আগে।

পাঁচু উৎসাহিত হয়ে উঠলো, বলুন তো বাবু।

পুরন্দর বললে, কিন্তু আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। দাওয়ানির গরুটাকে ওরা মেরেছে খুব—কারো সম্মান ইজ্জত নিয়ে তো কোন ব্যাপার হয়নি।

পাঁচু বললে, আমরা শুনলাম—

পুরন্দর বললে, আসল ঘটনাটা শোন তবে। বলে সে আদ্যোপান্ত খুলে বললে।

লোকগুলি প্রথমত শুনবার আগ্রহে নড়ে বসলো—কেউ কেউ উঠে দাঁড়ালোও—কিন্তু ঘটনাটায় উত্তেজনার রসদ ক্রমশই কমে আসছিল মনে হতেই যে যার জায়গায় বসে কর্ণিক নিয়ে পাটাতন নিয়ে ধূলোর ওপর দাগ কেটে গল্প থেকে নিজেদের আলাদা করে নিলে। পুরন্দর বুঝতে পারলে—তার কথাগুলি এরা মেনে নিতে পারেনি।

শেষ চেষ্টা-স্বরূপ সে বললে, আচ্ছা, আমার কথায় বিশ্বাস না হয় তোমাদের, কাছেই তো দাওয়ানির বাড়ি—তার মুখ থেকেই শুনবে চল।

সেই জোয়ান মত করাতী—নাম তার রহমত আলি—উঠে বললো, তাই চলুন বাবু। এর একটা হেস্ত-নেস্ত না হ'লে আমরা স্থির হতে পাচ্ছি নে।

দলের অগ্রবর্ত্তী হ'য়ে পুরন্দর দেওয়ানির বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলো। দেওয়ানিরা জাত-গোষ্ঠী নিয়ে পাঁচ-ছ' ভাই। বিস্তৃত এক উঠানের চার ধারে ওদের চালা-ঘর—গোয়াল—মুরগি রাখবার ছোট ঘর। মেয়েরা ধান সেদ্ধ করে উঠোনে শুকোতে দিয়েছে—কেউ কেউ গোয়াল-ঘরের মধ্যে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছে দুম্-দুম্ করে। ধান ওদের জমির নয়—কেনা।

পাঁচু হাঁক দিলে। বাড়ি আছ দাওয়ানি ভাই! ও দাওয়ানি ভাই!

গোয়ালের মধ্যে ঢেঁকির শব্দ থেমে গেল। ছেঁড়া ও কাটা কাপড়ে যতটা আব্রু বাঁচে সে চেষ্টাও মেয়েদের মধ্যে দেখা গেল। দু'-চারটি ধুলো-মাখা উলঙ্গ ছেলে কোথা থেকে ছুটে এসে বেড়ার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতে লাগলো। ছাই-গাদায় শুয়েছিল একটা রোঁয়া-ওঠা কুকুর, মাথা তুলে বার-দুই ঘেউ-ঘেউ করে আবার কুণ্ডলী পাকিয়ে শুলো।

ছেলেদের বেড়ার ফাঁকে দেখতে পেয়ে পাঁচু বললে, এই ছোঁড়া, দাওয়ানি কোথায় রে?

দুড়-দুড় করে তারা ছুটে পালালে—কোন উত্তর দিলে না।

রহমত আলি ক্রুদ্ধ হয়ে হাঁক দিলো, বাড়ির লোক কি সব মোরে গেছে। শুদোলে জবাব দেয় না যে!

এবার জবাব দিলে এক জন মেয়ে—দাওয়া থেকে যথাসম্ভব আত্মগোপন করে। সে বাড়ি নেই গো!

বাড়ি নেই তো গেল কোথায়?

হোই ধান আনতে—কালনায় গেল।

তার কবিলা—কি পোলারা কেউ নেই?

না গো। তারা গেছে কুটুমবাড়ি। সন্ঝে বেলা ফিরবে।

কোথায় কুটুমবাড়ি?

হর নদ্দী গো।

পাঁচু বললে, তাহলে সন্ধ্যেবেলা আমরা দাওয়ানিকে জিজ্ঞাসা করবো।

পুরন্দর বললে, তোমরা কার মুখে শুনলে যে, দাওয়ানির পরিবারকে ওরা অপমান করেছিল?

পাঁচু চাইলে রহমতের দিকে। রহমত মুখ ফিরিয়ে আলিজানকে কি ইসারা করলে। আলিজান বাঁশ গাছের দিকে চেয়ে চুপ করে রইলো।

পুরন্দর বুঝতে পেরে বললে, তোমরা কেউ-ই দাওয়ানির মুখে শোননি।

না বাবু। কিন্তু সবাই বলাবলি করছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ কারো কাছে নেই—কাজেই ওরা জোর করে কিছু বলতে পারলে না।

পুরন্দর তাঁতীপাড়ার রাস্তা ধরলে। ঘটাঘট জ্যাকর্ড চলছে। দাওয়ায় বসে নিষ্কর্ম্মা দু'-এক জন তামাক টানছে আর গল্প করছে।

পুরন্দরকে মুসলমানপাড়ার দিক থেকে আসতে দেখে ভজহরি বললে, মোছলমানপাড়া দিয়ে এলে না কি?

পুরন্দর বললে, তাই তো এলাম।

বিস্মিত হ'য়ে ভজহরি বললো, তোমায় কিছু বললে না কেউ ?

কেন বলবে ?

তবে যে হরেন বলছিল, বলে হুঁকোটায় সজোরে একটা টান দিয়ে তাঁত-ঘরের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করে বললে, কি রে হরেন, তুই তখন বলছিলি না—মোছলমানেরা বলেছে, হিঁদু দেখবে আর মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে ?

হরেন মাকুর মধ্যে সুতোর নলি ভরছিল। মুখ না তুলে বললে, দেবেই তো। যাও না ওদিকে।

দূর মুখ্য, এই তো কালো বাবু ওই দিক্ দিয়েই আসছে।

হরেন মুখ না তুলেই বললে ইস্, তা আর আসতে হয় না।

মাকুটা ঠিক করে সে আবার খটাখট্ শব্দে তাঁত চালাতে লাগলো।

পুরন্দর বললে, না, না—ও-সব কিছু নয়।

তাঁত থেমে গেল। হরেন লাফিয়ে বাইরে এসে বললে, কি কিছু নয় ? একটু আগে জোকার দিয়ে উঠলো সবাই শোননি। ইব্রাহিম মিঞা বক্তৃতা দিচ্ছে মসজেদে—ওই তেমাথায়। বলছে, হিন্দুদের বাড়ি-ঘর লুঠ করে এর শোধ তুলবে।

ভজহরি বললে, ইঃ, আসুক না একবার। আমাদের লাঠি-সড়কি নেই, না, থান ইট চালাতে জানি নে আমরা ?

পুরন্দর বললে, শোনা কথা নিয়ে ক্ষেপে উঠছো কেন ভজহরি ?

শোনা কথা ! এই তো হরেন বলছে—

সোজাসুজি হরেনের পানে চেয়ে প্রশ্ন করলে পুরন্দর, তুমি নিজের কানে শুনেছ ইব্রাহিমের বক্তৃতা ? ঠিক করে বল।

হরেন সে তীব্র দৃষ্টির সামনে দমে গেল। বললে, আমি না শুনলেও সে আমারই শোনা। নিতাই শুনেছে !

ডাক নিতাইকে।

দু'জন ছুটলো নিতাইকে ডাকতে। একটু পরেই তারা হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বললে, নিতাই গঙ্গা নাইতে গেছে—এই মাত্তর।

পুরন্দর বললো, দেখ ভজহরি, তোমার বয়স হয়েছে, শোনা কথা নিয়ে এত হৈ-চৈ ভাল নয়। ওতে সবারই ক্ষতি হয়। ধর···এই সব কথা চালাচালির ফলে দু'পক্ষে মারামারি হয়ে গেল। সেটা তোমরাই জেত আর ওরাই জিতুক, কারো পক্ষে কি ভাল ? এক গাঁয়ে বাস করে—

ভজহরি বললে, তা যদি মানুষ বুঝতো তাহলে আর ভাবনা কি ! বাপে-ব্যাটায় ঝগড়া হয় কেন ? ভায়ে-ভায়ে পেরথক হয় কেন ? এই যে আমার ছেলেটা বউটাকে নিয়ে জন্ম-ভিটে ত্যাগ করে গেল ওর শ্বশুরবাড়ি—এটা কি খুব ভাল কাজ ? এই যে—

ভজহরিকে থামিয়ে দিয়ে পুরন্দর বললে, সংসারের মধ্যে ঝগড়া—ও সংসারের মধ্যেই থাকে। যেমন লণ্ঠনের মধ্যে আলো। কিন্তু জাত নিয়ে—ধর্ম্ম নিয়ে যে বিবাদ আরম্ভ হয়, তা অনেক দূর পৌঁছয়।

ভজহরি মুখ ফিরিয়ে বললে, ঝগড়া ঝগড়াই—ওর আর এ-রকম সে-রকম নেই। আগে বিয়ে কর তবে তো বুঝবে ঠ্যালা।

কথা-কাটাকাটি করে লাভ নেই। এরা বুঝবে না। নিষ্ক্রিয় জীবনে এই দাঙ্গায় সম্ভাবনা এনেছে নতুন স্বাদ—নতুন উৎসাহ। একে এক পাশে ঠেলে সরিয়ে দেবে তেমন মনোবল কারও নেই। এরা বুঝতে চায় না কিছু। ক্ষেপবার উপকরণ জুটলে আগু-পিছু ভাববে—সে বিবেচনা এদের নেই। এদের পিছনে যারা রয়েছে তাদের নিবৃত্ত না করলে কোন ফল হবে না। পুরন্দর মাঝের পাড়ায় চললো।

শশীকান্ত প্রামাণিকের তেতলা বাড়িটা রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। সকাল হলেও বাড়িটার দীর্ঘ ছায়ায় পথে রোদ নামতে পায়নি। বারান্দায় চিক-ফেলা, রাস্তার দিকে জানালা দু'-একটি আছে। অত্যন্ত ছোট ও জালতি দেওয়া। পথ দিয়ে চলবার সময় বিরাট জেলখানার মত বাড়িটা যেন পথিককে দেখছে মনে হবে। কিন্তু বাইরের দিকে একতলায় যে লম্বা ঘরটা আছে, তাতে সকাল-দুপুর-বিকেলে বহু লোক চা-তামাক-পান-বিড়ি খেয়ে গল্প করে যায়। বাবুদের অবস্থা আগের মত নেই—তবু এক কালে সাধারণ লোকের যা বরাদ্দ ছিল তার ওপর ব্যয়-সঙ্কোচ হয়নি। চার পয়সার তামাক—দু' বাণ্ডিল বিড়ি—চা এক আনার আর চিনি-দুধও ওই পরিমাণ অভ্যাগতের খরচ। যুদ্ধের কল্যাণে দ্রব্য-মূল্য বৃদ্ধি হ'লেও এঁদের বরাদ্দ বাড়েনি। কাজেই চায়ের স্বাদে জিহ্বা প্রলুব্ধ হয় না। তামাকের ও বিড়ির বরাদ্দে যারা আগে আসে তারাই সৌভাগ্যবান। পরবর্ত্তীরা শোনে,—এ হেঃ হে—একটু আগে যদি আসতেন ! গরিব বা মধ্যবিত্তের বাড়ি হলে কিনে আনিয়ে সম্ভ্রম-রক্ষার ব্যবস্থা হতো, কিন্তু বড়লোকের বাড়ির চক্ষু সমস্ত হিসাবের উপর প্রখর হয়ে থাকলেও লজ্জাটা আত্মগোপনশীল। তা ছাড়া, শশীকান্ত প্রায়ই কলকাতায় থাকেন বলে হিসাবের পাই-পয়সা এদিক্ ওদিক্ হবার জো নেই।

আজ শশীকান্ত এখানে ছিলেন। পুরন্দরকে দেখতে পেয়ে ডাকলেন, কে, কালো না ? শোন তো !

পুরন্দর দেখলে বৈঠকখানায় অনেকে এসেছেন। তার আগমনে সবাই চুপ করে গেছেন বলে আবহাওয়াটা অস্বাভাবিক রকম বোধ হচ্ছে। কেমন ভয়ের—উদ্বেগের ছমছমানি—বৈঠকখানার ক্লক ঘড়িটার টক্-টক্ করে বাজছে। সবার অলক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে কাল।

শশীকান্ত বললেন, দেশে থাকি না—সব খবরও রাখি না। কিন্তু যা শুনছি এসে এমন তো কোন কালে শুনিনি। আমাদের গাঁ ছিল সোনার গাঁ—সেখানে এমন ব্যাপার ! দুঃখে ক্ষোভে বক্তব্য শেষ করতে পারলেন না।

পুরন্দর বিনীত কণ্ঠে বললে, যা শুনেছেন, তার মধ্যে রং ফলানো অনেকখানি।

প্রতিবাদ করলেন ভূপেন সেন। লোকটি দেখতে নিরীহ গোছের। গলায় তুলসীর ত্রিকণ্ঠী, কপালে ও কানে গোপী-তিলকের ছাপ, হাতে নামের ঝুলি। গৌরবর্ণের গোল-গাল চেহারায় জৌলুস আছে—মুখেও সর্ব্বক্ষণের জন্য মধুর হাসি লেগে আছে। মাথার চুলগুলি এত ছোট করে ছাঁটা যে ক্ষুর বুলানো বলে মনে হয়। তবু সাত্ত্বিক-সাত্ত্বিক ভাবের এই মানুষটিকে সবাই তেমন শ্রদ্ধা করেন না।

মুখ-কোঁড় দ্বিজেন আশ বলেন, ভেক নিলেই ভিক মেলে এই দেশে—অন্য দেশে শূলের ব্যবস্থা। ওর নধর কান্তি দেখে তোমরা যে গদগদ হয়ে ওঠো—এর কারণটা কি ? ওর ননী-মাখন খাওয়া দেহ···মানি হিংসার জিনিস ; চড়া সুদে টাকা ধার দেওয়া সে-ও হিংসার ; কিন্তু ভক্তি করবার ওতে আছে কি ? অবশ্য খাতক যদি হ'য়ে থাক কোন কথা বলবো না।

ভূপেন সেন প্রতিবাদ করলেন, হাসির কথা নয় বাবা—ওরা সব পারে। যাদের সবই উল্টো—খাওয়া, কাপড় পরা, পূজো করা—তাদের শক্তিকে আসুরিক শক্তি ছাড়া আর কি বলবে ?

পুরন্দর হাসলে, ওরাও তো বলতে পারে আমাদের অসুর ?

ভূপেন সেন মধুর হাসি হেসে বললেন, বলুক না। তাতে আমাদের ধর্ম্ম কিছু লোপ হয়ে যাবে না।

এক জন জিজ্ঞাসা করলে, আচ্ছা সেন মশাই, আমাদের মাথার ওপর যে স্বর্গ রয়েছে সেখানেও ওদের দেবতা আর আমাদের দেবতা আলাদা রয়েচেন তো ?

ভূপেন সেন বললেন, এটা ধর্ম্ম-সভা নয়। যে গুরুতর সমস্যা উঠেছে তারই একটা সুরাহা কর, নইলে জাত-ধর্ম্ম আর রাখতে হবে না।

জাত-ধর্ম্ম রাখবার জন্য কাকেও তেমন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বোধ হ'লো না। কেন না, নিজেকে সর্ব্বস্ব দিয়ে বাঁচাবার কথা শাস্ত্রে লেখা আছে। এখন সর্ব্বস্বের কতখানি ছাড়লে শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন হবে না আর নিজেও রক্ষা পাওয়া যাবে, সেই পরামর্শের জন্যই বৈঠকখানায় এত লোক এসেছেন।

শশীকান্ত বললেন, মন্দটাই ধরে নিয়ে আলোচনা করা যাক। ধর, ওরা হৈ-হৈ করে লাঠি-সোটা নিয়ে এসে পড়লে আমাদের পাড়ায় তখন কি করবো আমরা ?

ভূপেন সেন বললেন, থানায় খবর পাঠানো হোক—জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে একটা তার করে দেয়া হোক।

এক জন বললে, তার আগেই—ধর, আজ বিকেলেই যদি—

ভূপেন সেন বললেন, আমার বাড়িটা আবার পাড়ার শেষে। একটা পড়ো মাঠ, তার পর মুসলমানপাড়া আরম্ভ হয়েছে।

তাতে আর কি ? সাড়ে চারশো বছর আগে যা হয়েছিল কাজীর বাড়ির সামনে—তেমনি—

থাম ফাজিল ছোকরা—ফ্যাচ-ফ্যাচ করো না। রজোগুণে প্রবুদ্ধ হ'য়ে উঠলেন যেন।

ছেলেটি অকুতোভয়। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললে, বিশ্বাস নেই যদি তো নাম করেন কেন ? সে-ও তো কলিযুগে ঘটেছিল, আর তেমন বেশী দিনের কথা নয়।

কথা বলে সে তর-তর করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বৃদ্ধ তারণ ঘোষ জিজ্ঞাসা করলেন, ছেলেটি কাদের হে ?

কে এক জন বললে, মিত্রদের ছেলে। লেখাপড়া শিখে সব ডোণ্ট কেয়ার করে।

ওঃ, তা আর হবে না। জাত-স্বভাবে করে যে—। বলে ভূপেন সেন টেনে টেনে হাসতে লাগলেন।

শশীকান্ত বললেন, যতই বল, বন্দুক না হ'লে কিছুই হবে না। গোটা কতক ফাঁকা আওয়াজ করতে পারলে—

পুরন্দর আর থাকতে পারলে না। বললে, আপনারা কি সত্যিই ভাবেন, ওরা এত কাল পাশাপাশি বাস করে আজ আমাদের বাড়ি চড়াও হয়ে মারতে আসবে ?

ভূপেন সেন বললেন, মনে করা-করির কথা নয়। কলকাতা—ঢাকা—খোর্দ্দ গোবিন্দপুর—কিশোরগঞ্জ—তোমরা তো মুখ্যু-সুখ্যু নও—কাগজও পড়, খবরও রাখ।

পুরন্দর বললে, আমার অনুরোধ, যা তুচ্ছ তাকে এমন করে ফলাও করে তুলবেন না। আপনারা আমাদের মান্য-গণ্য লোক—গ্রামের মাথা—

তা কি করতে হবে আমাদের ? এক জন বৃদ্ধগোছের লোক খেঁকিয়ে উঠলেন। আমরা কি বলবো, এস বাবাজীরা, আমাদের ঘর লুঠে নাও—বউ—

তাকে নিরস্ত করে শশীকান্ত বললেন, পুরন্দর কথাটা বলেছে মন্দ নয়। কাকে কান নিয়ে গেছে বলে কাকের পেছু-পেছু না ছুটে কানে হাত দিয়ে দেখা হোক আগে।

যারা উষ্ণ হ'য়ে উঠেছিল, এই কথায় তারা আশ্বস্ত হলো। রক্তপাতের বিনিময়ে রক্তপাত এটা হলো চরম কথা। ভয়ের শেষ সীমায় পৌছলে তবেই না এই চরম অস্ত্রের কথা মনে ওঠে।

যাই হোক, সবাই এতে রাজী হয়ে আসন ত্যাগ করলেন।

পুরন্দর উঠছিল, তাকে ডাকলেন শশীকান্ত। শোন কালো, একটা কথা আছে। এসো ত ঘরে। পাশের ঘরে এসে গলার স্বর নামিয়ে বললেন, তোমার কি মনে হয় বল দেখি ? ওদের এত সাহস হবে ?

পুরন্দর বললে, সামান্য ব্যাপার—

না না, সামান্য নয়। যাই হোক, আমাদের তৈরী থাকতে হবে। উত্তরপাড়ার দলটা তো তোমার হাতে। তাদের তৈরী থাকতে বলবে। আর দেখ, এই ক'দিনের খরচটা ওরা যেন আমার এখানেই খেয়ে যায়। বাড়ির লাগাও রয়েছে কলা বাগান—সব কাটিয়ে সাফ করে দিচ্ছি কাল। ওখানে কুস্তির আখড়া বসাক ওরা। ওদের জন্য এক সের ছোলা ভিজে—এক পোয়া আদা—আর প্রত্যেকের জন্য বিকেলে আধ সের দুধ বরাদ্দ রইলো। কেমন ? বলো ওদের।

পুরন্দর কি বলতে যাচ্ছিল, শশীকান্ত তার পিঠ চাপড়ে হো-হো করে হেসে উঠলেন। আচ্ছা আচ্ছা, সব ঠিক হবে। ওদের যা অভাব-অভিযোগ—

হাসতে হাসতে এ ঘরে এসে হাত তুলে সবাইকে নমস্কার করলেন, সেই ভাল। ভাল করে না জেনে না শুনে এ সব কথা রচনা করায় ক্ষতি আছে। জানই আগে কি ব্যাপার।

১৫

পথে ফটিক এসে দাঁড়ালো পুরন্দরের পাশে। পুরন্দর আপন মনে পথ চলছিল, ওকে প্রথমটা লক্ষ্য করেনি। পথের মোড়ে এসে হঠাৎ খেয়াল হ'লো—কে যেন পাশে-পাশে আসছে। হয়তো সে কি বলতে চায় ভেবে সে জিজ্ঞাসা করলে, কিছু বলবে ফটিকদা ?

না—হাঁ—। একটা ঢোঁক গিলে ফটিক বললে, তুমি—মানে তোমরা রাগ করনি তো আমাদের ওপর ?

রাগ—কেন ?

এই লাইব্রেরির ওপনিং সেরিমনিতে একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল কি না। আশজা বলছিলেন, দু'পক্ষের বোঝবার ভুলে একটা কাণ্ড হ'য়ে গেল। তা কালোকে একবার ডেকে এনে—

পুরন্দর বললে, অন্যায় তিনি আমার কাছে করেননি—আমি গিয়ে কি করবো ?

আরে তুমি না গেলে কিছুই হবে না। ওই পঞ্চা, পচা—ওরা

বলছিল যে, কালকের ছেলে কালো—সে করবে সালিশী বিচার! বললাম, ওরে ক্যাবলাকান্তরা, বয়সেতে বিজ্ঞ নয়—বিজ্ঞ হয় জ্ঞানে। চুল পাকলেই যদি বুদ্ধি পাকতো তাহলে তোরা বাপ-মাকে ত্যাগ করে শ্বশুরবাড়ি পড়ে থাকতিস্ নে। হে—হে—

পুরন্দর বললে, ওদের মনে যা লেগেছে আমি তার কি করতে পারি?

ফটিক চোখ কুঁচকে হেসে বললে, সে বুঝিয়ো ওদের—যারা তোমায় জানে না। উত্তরপাড়া তোমার কথায় ওঠে-বসে তা কি আমি জানি নে?

পুরন্দর হেসে ফেললে। বললে, তা তাদের মনে ব্যথা দিয়েছেন আশু মশাই—

ফটিক বললে, এ তো আর চিরকেলে ব্যথা নয়, পাথরের গায়ে চিড়ও ধরেনি। একটু কথান্তর—তা থেকে মনান্তর, চল চল তুমি, সব ঠিক হ'য়ে যাবে।

পুরন্দর গম্ভীর হয়ে বললে, কি ঠিক হবে? শশীপদর জেল আটকাবে?

ফটিক অন্তরঙ্গতায় হঠাৎ তার পিঠে চাপড় মেরে বললে, আলবৎ আটকাবে। ডায়েরি হয়েছে ফাঁড়িতে—বড় জোর থানায়। মাল পাওয়া গেছে—এখন দারোগার হাত তেলা করে দিলেই ব্যস! কতই দেখলাম ভাই!

চোরের জেল হওয়াই তো ভাল? ছেড়ে দিলে যদি বুদ্ধি পায় রোগ?

ফটিক বললে, সূচিকাকরণ দেওয়া আছে, রোগ বাড়বে না। জান তো, পরশমণি ছুঁলে লোহা সোনা হয়। শশীরা কি আর সে প্রকৃতির আছে—

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শ্রীধরের বৈঠকখানায় আসতে হ'লো। একখানা ইজি-চেয়ারে দেহ এলিয়ে শ্রীধর খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মুখটা কাগজে ঢাকা ছিল বলে এদের দেখতে পেলেন না।

জামাই বাবু, একে নিয়ে এলাম। বলে ফটিক তাঁর তন্ময়তা ভাঙ্গলো।

আরে, বস—বস। নিজে একখানা চেয়ার ঠেলে সোজা হয়ে বসলেন। সিগারেট? খাও না? চা? তা-ও নয়! তবে পান আন তো ফটিক।

না, পানও আমি খাই না।

টি-টোটালার! ভাল—ভাল। ফটিক তোমায় কিছু বলেনি? ফটিক?

শুনলাম সব।

ব্যস, তাহলে বন্দোবস্ত করি ওকে ফিরিয়ে আনাবার?

আমি বলি কি, ওর সাজা হওয়া ভাল নয় কি?

না—না। ওর মা বোন বউ বড় কাঁদাকাঁটি করছে কাল থেকে। ছোট বউমা ধরে বসেছেন, হার যখন পাওয়া গেছে তখন বেচারাকে ঘানি টানিয়ে লাভ কি? ওর জেল হ'লে উনি অনশন করবেন। ফাষ্ট আন টু ডেথ। বলে হাসলেন।

তা বেশ তো, এতে আমার পরামর্শের মূল্য কি?

না পুরন্দর, এটা তোমার রাগের কথা হোলো। তুমি হ'লে ওদের ব্রেণ। যে যাই বলুক, আমি ওটুকু অন্তত বুঝি।

তবে কি বলতে চান—এই চুরিটা—

আহা, তাই কি বললাম আমি। ম্যাজিষ্ট্রেটের ভয়ে যাই বলি আর যাই করি, তোমাদের আন্দোলনের শক্তি আমি বুঝি। কি করবো ভাই, আমার হয়েছে দু' নৌকোয় পা। তোমাকে খুলে বলি তাহলে, কলকাতায় ব্যবসা নিয়েই আমাদের জীবন। আজকাল ব্যবসা রাখা মানে জান তো—টিকটিকিটি পর্য্যন্ত হাঁ করে আছে। সবার পেট ভরিয়ে তবে—। তার পর নিত্য-নতুন রেশনের হুকুম। চাল চিনি আটা সুজি। কাপড়ও শুনছি হবে। বাকি রইল ক'টা তেল। তা দেখতে দেখতে ও-সবও কি হবে না ভাব? লক্ষ লক্ষ মণ লোকসান দিয়েও কোটি কোটি টাকা ঘরে উঠছে। ভাব, টুপ করে ছেড়ে দেবে কোম্পানী?

পুরন্দর অস্বস্তি বোধ করছিল। বললে, উঠি আজ।

হাঁ, যা বলছিলাম। ওই ব্যবসাটুকু যদি রেখে যেতে পারি ছেলেরা নেড়ে-চেড়ে খাবে—এই জন্যেই এর খোসামোদ তার খোসামোদ। যদি রায় সায়েবটাও অন্তত হতে পারি, কোম্পানীর ঘরে একটা পাকা খুঁটি তুলবো মনে করলাম। হাঁ, শোন—শোন, শশীকে আমি ছাড়াবার ব্যবস্থা করছি।

যা ভাল বোঝেন।

শ্রীধর হঠাৎ উঠে ওর চেয়ারের পাশে দাঁড়িয়ে ওর হাত চেপে ধরলেন। বললেন, তোমাকে ছোট ভাইয়ের মত ভাবি বলেই বলছি—ওদের মনে রাখতে বলো এ কথা।

পুরন্দর দুয়োরের কাছে আসতেই ফতুয়ার পকেট থেকে তিনি একখানা চেক বার করে তার হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, তোমাদের সমিতিকে দিলাম। খবরদার, চাঁদার খাতায় আমার নাম তুলবে না। লিখবে—জনৈক দাতা।

পুরন্দর এগিয়ে এসে চেকটা টেবিলের ওপর রেখে বললে, আজ থাক। যখন দরকার হবে নিজে এসে চেয়ে নিয়ে যাব।

হাত দু'টি কপালে ঠেকিয়ে সে বেরিয়ে গেল।

বেলা অনেকখানি হ'য়েছে।...রান্না শেষ হ'য়ে গেছে—পিসিমা ঘর-বার করছেন—ছেলে গেল কোথা? তাদের খাইয়ে তবে ওঁরা নিজেরা খাবেন—তার পর উঠবে হেঁসেলের পাট।

মিত্র-বাড়ির পাশ দিয়েই রাস্তা। বৈঠকখানার মধ্যে তামাক-টানার শব্দ হচ্ছে। মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ হ'য়েছে মেজ বাবুর। একটা তাকিয়ার ওপর আড় হ'য়ে শুয়ে উনি অনেকক্ষণ ধরে তামাক খান আর বই পড়েন। পুরন্দরের মনে হ'লো,—সে যে চাকরি করবে না সে কথাটা বলে যাওয়াই সঙ্গত। বিকেলে যদি না-ই আসতে পারে—আসা সম্ভব হবে না। গ্রামে যে ভাবে বারুদ আর আগুন সঞ্চিত হচ্ছে তাতে বিস্ফোরণ যে-কোন মুহূর্ত্তে ঘটতে পারে। গ্রামের যাঁরা মাথা তাঁরা নিয়েছেন বিশ্ব-শান্তির নীতি। বাইরে শান্তির বুলি প্রচার করে—গোপনে ধরাচ্ছেন হাতিয়ার। ভাবছেন, বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা ত বার্ত্তা প্রচারিত হবে না। আজই মুসলমানপাড়ায় গিয়ে ওদের দলপতিদের ধরে একটা মীমাংসা কর্ত্তেই হবে। একই গাঁয়ে পাশাপাশি বাস করে সামান্য একটু তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মারামারি হানাহানি করে কার কতটুকু লাভ! ...প্রত্যেক গৃহস্থই শান্তিকামী। সদ্ভাবে শান্তিতে কোন রকমে

ইহকালের গণ্ডীটা পার হ'য়ে যেতে পারলেই তারা ধন্ত। এই জন্ত তারা দেশ নিয়েও মাথা ঘামায় না—স্বাধীনতা নিয়েও না। অথচ ধর্ম্মের নামে—গোষ্ঠাতে মিশলেই অমূলক উত্তেজনায় তারা হ'য়ে ওঠে হিংস্র। যারা থাকে অত্যন্ত অসহায় ও নিরীহ—তাদের মধ্যে নিষ্ঠুরতায় তারাই অগ্রগণ্য।

বৈঠকখানার দরজায় এসে সে বিনীত কণ্ঠে বললে, আপনাকে একটা কথা জানাতে এলাম।

মেজ বাবু শ্লথ কাপড় কোমরে জড়িয়ে সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, যা বলবে জানি বাবা। এই মাত্র ফটিক এসেছিলেন।

ফটিক!

হাঁ, ওদের একটা মিটিং হবে—আশ-বাড়িতে রাত্রি আটটার পর। বললেন, আপনি যদি না যেতে পারেন ওরাই আসবেন আপনার বৈঠকখানায়। শুধু আপনার মতামত দিন। জিজ্ঞাসা করলাম, মিটিং কিসের? আর রাত্রিরেই বা কেন? ফটিক বললেন, আপনি কি শোনেননি, হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধবে আজকালের মধ্যে? এ বিষয়ে একটা গোপন শলা-পরামর্শ করা দরকার। সব হিন্দুরা এক জোট না হলে—

আপনি কি বললেন?

বললাম, দেখ বাবা, ও সব মিটিং-ফিটিংয়ের মধ্যে আমি নেই। তোমরা মিছে ভয় পেয়েছ, দাঙ্গা এ গাঁয়ে বাধবে না।

বলেন কি? দেশের লোক সবাই বলাবলি করছে এই কথা—সবাই ভয় পেয়েছে—

মেজ বাবু হাসলেন।

পুরন্দর বললে, আপনি কি করে ভাবছেন এ দাঙ্গা হবে না?

মেজ বাবু মাথা নেড়ে বললেন—আমি কেন, যে কেউ একটু ভাবলেই বলতে পারবে এ কথা।

পুরন্দর তথাপি তাঁর পানে চেয়ে আছে দেখে হেসে বললেন, তুমি তো বুদ্ধিহীন নও। ভাব দেখি, দাঙ্গা করে কারা? যাদের পরের দুয়োরে নিত্য না খাটলে পেটের অন্ন জোটে না—সেই দিন-মজুররা করবে দাঙ্গা?

কিন্তু তাদের উস্কে দেবার লোকের অভাব হয় না।

মেজ বাবু বললেন, তা-ও জানি। তোমার মোদক প্রভুরা সেই আয়োজনই বুঝি করছেন!···টাকা হ'য়েছে বলে টাকার মাহাত্ম্যটা তো প্রচার করা চাই!

ওর ব্যঙ্গোক্তিতে পুরন্দর কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলে, টাকা দু' পক্ষেরই কিছু কিছু আছে, তারই মাহাত্ম্যে যদি দাঙ্গাটা বেধেই যায়—আপনি কি করবেন?

মেজ বাবু মেরুদণ্ড সোজা করে গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার পূর্ব্ব-পুরুষরা গুড়ের কারখানা কি কলকাতার আড়ত করে টাকা জমাননি—তাঁরা পাইক-বরকন্দাজ রেখে জমিদারি শাসন করেছেন। আজ অবশ্য সে সব নেই, তবুও মিটিং করে এক হওয়ার মানে আমি বুঝি না।

ঘরটা অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য্যে থম-থম করতে লাগলো। দেওয়ালের গায়ে টাঙানো আছে একখানি গণ্ডারের চর্ম্মনির্ম্মিত সুদৃশ্য ঢাল—তার গায়ে গুণ-চিহ্নের মত আড়াআড়ি ভাবে সাজানো দু'খানা ইস্পাতের তলোয়ার। প্রভুত্বের গৌরবাবশেষ। পুরন্দর সেই দিকে তাকালে।

মেজ বাবু গম্ভীর মুখেই হাসলেন, না বাবা, ও-সবের দিনকাল আর নেই—এই সঙ্গে একটা বন্দুকও লাইসেন্স নেওয়া আছে। বন্দুকটা অবশ্য গেল বারই যায়-যায় হ'য়েছিল—ওয়ার ফাণ্ডে কিছু দিতে পারিনি বলে। কিন্তু রয়ে গেল বরাত-গুণে। যাই হোক, তুমি জিজ্ঞাসা করছিলে, দাঙ্গা যদি বাধে কি করবো আমি? আজ আমার পাইক-বরকন্দাজ নেই—বন্দুক আছে। মিটিঙে রেজলুশন পাস না করে নিজের আইন নিজেই যদি তৈরী করে নিই সেই কি ভাল নয় বাবা?

পুরন্দর বললে, তার দরকার হবে না। আপনি ঠিকই বলেছেন—এ গাঁয়ে দাঙ্গা হবে না।

মেজ বাবু বললেন, ওই যে মণ্টু—আমার ভাইপো গো, সে-ও তো কাল বাড়ি এসেছে, শোন সে আবার কি বলে। বলে হাঁক দিলেন মণ্টু—মণ্টু!

মণ্টু এসে দাঁড়ালো। কলকাতায় থাকে। বলতে গেলে জন্ম—বিদ্যাশিক্ষা এবং কর্ম্ম সবই ওর শহরে। মাঝে-মাঝে বাড়ি আসে। মুখ চেনা কিন্তু আলাপ হবার সুযোগ ঘটেনি। একটু আগে এই ছেলেটিকেই তো শশীকান্তের বৈঠকখানায়ও দেখেছিল। শুধু দেখেনি, ওর কণ্ঠে স্পষ্ট প্রতিবাদের সুরে মিত্র-গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য উঠেছিল ফুটে।

মেজ বাবু বললেন, এর নাম পুরন্দর। এ গাঁয়ের এক জন ভাল কর্ম্মী কি না,—কাল স্বাধীনতা দিবস পালন করলেন। ইনি মণ্টু, ভাল নাম অপূর্ব্ব। ইনিও শুনতে পাই কলকাতার এক জন নামজাদা ছাত্র-নেতা।

এই বিচিত্র পরিচিতি-প্রসঙ্গে দু'জনেই দু'জনের পানে চেয়ে হাসলে।

অপূর্ব্ব বললে, আসুন, আপনার সঙ্গে আলাপ করি খানিক।

মেজ বাবু বললেন, আলাপের প্রথম সূত্রটি তোমরা একালের ছেলেরা মেনে চল না। ও বেচারা বেরিয়েছে কোন্ সকালে, স্নান হয়নি—আহার হয়নি—আর ভরা পেটে তুমি ওর সঙ্গে জমাবে আলাপ!

অপূর্ব্ব অপ্রতিভ হ'য়ে বললে, বেশ, চা আনতে বল—

চা আমি খাই না। সলজ্জে প্রতিবাদ করলে পুরন্দর।

মেজ বাবু বললেন, চা-টা উপলক্ষ বাবা—আজ-কালের ফ্যাশান। আমরা বলতাম মিষ্টিমুখ—ওরা সেটাকে ভদ্রতর করে বলে—চা।

অপূর্ব্ব তার হাত ধরে বললে বেশ তো, চলুন, আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতে আপনার বাড়ি পর্য্যন্ত যাই।

পুরন্দর বেশী করে সঙ্কুচিত হ'লো। ছেলেটি নিশ্চয় জানে না পুরন্দরকে। কাল সকালেও বিনায়ক-মন্দিরে ফুল যুগিয়ে গেছে যে মালীর ছেলে—সে সম-সাথীত্বের দাবিতে আলাপ করবে তার প্রভু-স্থানীয় জমিদার-বংশের ছেলের সঙ্গে!

দুয়োরের কাছে গিয়ে যে কথাটা বলতে এসেছিল হঠাৎ মনে পড়ে গেল। একবার ফিরলে কিন্তু কথাটা বলা শোভন হবে কি না বুঝতে না পেরে এক মুহূর্ত্ত কি ভাবলে। কথাটা বলা হ'লো না। মেজ বাবু তাকিয়া ঠেস দিয়ে ততক্ষণ বইয়ের ওপর ঝুঁকে পড়েছেন। তার হাতের সঙ্গে অপূর্ব্বর হাত সংলগ্ন—তাতেও টান পড়লো।

বাইরে এসে অপূর্ব্ব বললে, আপনার নাম গ্রামে এসেই শুনি। আপনি কর্ম্মী।

পুরন্দর বললে, লেখাপড়া শেখার পর যে সময়টা বেকার থাকে মানুষ—সেই সময়টা তাকে কর্ম্মী বলা যায় যদি তাহলে আমি কর্ম্মী।

অপূর্ব্ব বললে, চাকরি করতে চান? সুপারিশ নেই বলে—

পুরন্দর বললে, আমার সব পরিচয়টা আপনি নিশ্চয় জানেন না।

অপূর্ব্ব হেসে বললে, জ্যাঠা বাবু কি ভুল পরিচয় দিলেন?

না। বলে ঢোঁক গিলে সে বললে, আমার নাম পুরন্দর দাস। আমরা জাতিতে মালাকার।

অপূর্ব্ব হেসেই বললে, আপনার পুরো নাম জেনেও তো বিশেষ লাভবান হলাম বলে মনে হচ্ছে না।

পুরন্দর সাশ্চর্য্যে বললে, আপনারা জমিদার-বংশ—

হো-হো করে হেসে উঠলো অপূর্ব্ব, বললে, এই!

পুরন্দর বললে, গাঁয়ে থাকলে এমন ভাবে হাসতে পারতেন না।

নিশ্চয় পারতাম। হাসিটা আমার রোগ বললেই হয়। কিন্তু গম্ভীর হতেও জানি পুরন্দর বাবু! বলে সে সত্য সত্যই গম্ভীর হ'লো।

পুরন্দর কোন কথা কইলে না। ওর হাতটা তখনও অপূর্ব্বর হাতের মধ্যে। অপূর্ব্ব নিবিড় চাপে তা পীড়ন করছে। সেই চাপের মধ্যেই অন্তরঙ্গতার বিদ্যুৎ-প্রবাহ মস্তিষ্ক-কেন্দ্রে অদ্ভুত অনুভূতিতে আঘাত করছে।

অপূর্ব্ব বললে, মানুষকে ঘৃণা করে বলেই মানুষের অমর্য্যাদা বাড়ে। মানুষ সরল নয় বলেই তার বাক্যে বা আচরণে অসত্য প্রকাশ পায়। আমি ঈশ্বর মানি না, তবু আপনারা যদি মানেন তাঁর দোহাই দিয়েই বলি, তিনি কি স্বর্গ থেকে ছাপ মেরে মূল্য ঘোষণা করে তাকে পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে? যেমন কারেন্সি থেকে বেরোয় হরেক রকমের নোট?

পুরন্দর বললে, গুণ অনুসারে কর্ম্মের বিভাগ—এটা অস্বীকার করেন না নিশ্চয়?

না। তবে বর্ণটাকে আমরা বাদ দিয়ে চলি। বাদ দেই উত্তরাধিকারবাদ—যা ধনিকতাবাদেরই নামান্তর।

পুরন্দর বললে, বুঝেছি, আপনারা মার্কসপন্থী।

ক্ষতি কি! মার্কস বহু চিন্তার ফলে মানুষকে বাঁচাবার জন্য এই শ্রেণিহীন সমাজ-ব্যবস্থার ফতোয়া দিয়ে গেছেন।

পুরন্দর বললে, ও-সব তর্কের বিষয়।

ঠিক কথা। সায় দিলে অপূর্ব্ব।

পুরন্দর বললে, আপনারা তো কংগ্রেসকেও স্বীকার করেন না।

অপূর্ব্ব হেসে বললে, বুর্জ্জোয়া-সংশ্রব মাত্রকেই আমরা সহ্য করতে পারি না।

কংগ্রেস বুর্জ্জোয়া প্রতিষ্ঠান কিসে?

তর্ক করতে গেলে আপনার খাওয়া হবে না। এখন যান। গণ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ যে কোন প্রতিষ্ঠানকে আমরা শ্রদ্ধা করি—ভালবাসি।

কংগ্রেসকে আপনি গণ-প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু বলতে পারেন না।

অপূর্ব্ব হেসে বললে, আপনি এক তরফা ডিক্রিজারি করতে চান?

পুরন্দরের মুখখানি বেদনায় ম্লান হয়ে উঠলো। বললে, কংগ্রেসকে কেউ নিন্দে করলে আমার কষ্ট হয়।

সে তো দেখছি। কিন্তু সমালোচনা করা মানেই নিন্দে, এ ধারণা আপনার হ'লো কেন? মার্কস নিয়ে কেউ সমালোচনা করেন না?

পুরন্দর বললে, গণ-চেতনা বলতে আপনি কি বোঝেন জানি না—আমি তো জানি, দেশের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস যে ফাইট দিয়েছে—এখনও দিচ্ছে—

অপূর্ব্ব বললে, দেশ-ভক্তি ভাল পুরন্দর বাবু, ওর মোহটা না থাকা আরও ভাল। কংগ্রেসের ত্যাগ—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ওর যুদ্ধ ঘোষণা কোনটাই অস্বীকার করবার কথা নয়। কিন্তু সেই গৌরবকে সবার উপরে স্থান দিয়ে যুক্তিকে বিসর্জ্জন দেবেন, সেটাও তো ঠিক নয়।

কিসের যুক্তি? জিজ্ঞাসা করলে পুরন্দর। এতক্ষণে পুরন্দরের বাড়ির দুয়োরে তারা এসেছে। সেই মাত্র দরজা খুলে বেরুলেন পুরন্দরের পিসিমা। উনি যে অনেকক্ষণ ধরে ঘর-বার করছেন তা ওঁর উদ্বেগ-মলিন মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যায়। পুরন্দরের সঙ্গে অপরিচিত একটি ছেলেকে দেখে অভ্যাস বশত ঘোমটা টেনে দিলেন বাঁ হাতে। ডান হাতে দুয়োরের শিকলে ঝনাৎ শব্দ করে ওদের মনোযোগ আকর্ষণ করলেন।

অপূর্ব্ব স দিকে চেয়ে বললে, উনি ডাকছেন তোমায়।

পুরন্দর বললে, সংক্ষেপে বলুন—কোন্ যুক্তি মানি না আমরা?

অপূর্ব্ব বললে, খালি পেটে তর্ক চলে—যুক্তির ঠাঁই নেই। আপনি আহারাদি সেরে আসুন আমাদের বাড়িতে কিংবা আমিই বসছি।

আচ্ছা, আমিই যাব। এখানে বসিয়ে আপনাকে কষ্ট দিতে চাই না।

আচ্ছা।

[ক্রমশঃ।
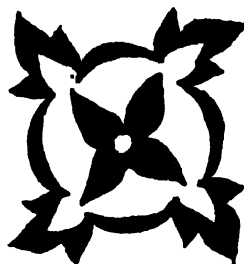
(গী দ্য মোপাসাঁ)

তখন সবে চায়ের বেলা। ঘরের আলোগুলো তখনও জ্বেলে আনা হয়নি। সূর্য্যাস্তের অরুণাভায় আকাশ গোলাপী হ'য়ে উঠেছে আর গোধূলির স্বর্ণরেণুজালে ঝলমল্ করছে। দিবসের মূর্চ্ছিত আলোকে এলিয়ে প'ড়ে আছে ভূমধ্যসাগর—নিস্তরঙ্গ, নিষ্কম্প, বিরাট, মসৃণ, উজ্জ্বল ধাতু-পাতের মত। তার উপর আনত হ'য়ে চেয়ে আছে নগরোপকণ্ঠের অট্টালিকা। বিবর্ণ আরক্তনীল পশ্চিমাকাশের পটে সুস্পষ্ট কৃষ্ণরেখায় ফুটে উঠেছে সুদূর দক্ষিণের তরঙ্গিত পর্ব্বতমালা।

কথার মোড় ফিরে এসে উপস্থিত হ'ল প্রেমের প্রসঙ্গে; সেই এক চির-পরিচিত বিষয় আর সেই লক্ষ বার উচ্চারিত মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি! গোধূলির শান্ত বিষণ্ণতা মদিরালস মায়াজাল বিস্তার করছে আর সুকোমল ভাবাবেগের একটি আবহ সৃষ্টি করছে। কখনও পুরুষের প্রবল মন্দ্রে কখনও নারীর কমনীয় কণ্ঠস্বরে 'প্রেম' এই শব্দটি নিরন্তর ধ্বনিত হয়ে বিরাম-কক্ষটিকে পূর্ণ ক'রে তুলেছে। মনে হয়, যেন মাথার উপর উড্ডীন রয়েছে একটি পাখী, যেন কক্ষটিতে ভর ক'রে আছে এক অশরীরী আত্মা।

"বৎসরের পর বৎসর একই মানুষের উপর একনিষ্ঠ প্রেমে বিশ্বস্ত হ'য়ে থাকা সম্ভব কি?"

কেউ বললে, হ্যাঁ, কেউ বললে, না। ভেদাভেদ নির্ণীত হ'ল, মাত্রা-নির্দ্দেশ করা হ'ল, বিচিত্র ঘটনার উল্লেখ করা চলতে লাগল। চাঞ্চল্যকর স্মৃতিপুঞ্জ পুরুষ ও নারী-নির্ব্বিশেষে সকলের চিত্তেই কল্লোলিত ও অধরাগ্রে এসে কম্পিত হ'তে লাগল; কিন্তু সে সকল কথা উচ্চারণ করতে কারোরই ভরসায় কুলল না। এই অতি-সাধারণ অথচ চিত্তের এই শ্রেষ্ঠতম আবেগের, অন্তরের এই নিগূঢ় বন্ধনের রহস্য সম্পর্কে হৃদয়ের ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল শুধু গভীর ও দীপ্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ভাষায়।

সহসা এক ব্যক্তি দূরের দৃশ্যমালার উপর দৃষ্টি রেখে ব'লে উঠল, "দেখ দেখ, একবার ঐ দিকে চেয়ে দেখ, কী হ'তে পারে ওটা!"

অয়শ্চক্ররেখার অন্তরালে, সাগরগর্ভ থেকে উঠে আসছে কুয়াসায় ঢাকা একটি বিরাট দেহ। ত্রস্তে দাঁড়িয়ে উঠে মহিলারা এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করতে লাগলেন। জীবনে তাঁরা এমন দৃশ্য কখনো আর দেখেননি।

এক জন বললে, "ওটা করসিকা। বছরে বার দু'-তিন ওকে দেখা যায়; আকাশের বিশেষ একটা অসাধারণ অবস্থায়, কুয়াসা যখন একেবারে পরিষ্কার হ'য়ে যায় তখন।

দ্বীপের মধ্যেকার পাহাড়ের চূড়া (পর্ব্বতশীর্ষ)গুলির ক্ষীণতম রেখাও যেন চোখে পড়ছে। কেউ কেউ আবার কল্পনা করতে লাগল যে তার উপরকার বরফগুলো দেখা যাচ্ছে।

অকস্মাৎ অদেহী জগৎ থেকে আবির্ভূত এই ছায়ামূর্ত্তি সাগরগর্ভ থেকে উঠে উপস্থিত সকলের চিত্তে একটা অস্বস্তি, উদ্বেগ আর প্রায় এক প্রকার একটা আতঙ্কের সৃষ্টি করলে।

এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক এতক্ষণ নীরব হয়েছিলেন। হঠাৎ তিনি উচ্চ-কণ্ঠে বলতে লাগলেন: ঐ যে দ্বীপ—যে আজ আমাদের বিতর্কেরই উত্তরে যেন জল থেকে উঠে এল—ঐ দ্বীপ আজ আমাকে এক অতি অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ঐ দ্বীপেই এমন একটি বিশ্বস্ত প্রেমের উদাহরণ আমার চোখে প'ড়েছিল, যে-প্রেম অপরিসীম পরিতৃপ্তিপূর্ণ পরমানন্দে নিমগ্ন। সেই কাহিনী আজ বলব:—

পাঁচ বছর পূর্ব্বে একবার করসিকায় গিয়েছিলুম বেড়াতে। যদিও ফ্রান্সের উপকূল থেকে মধ্যে মধ্যে ওকে আজকের মতই দেখা যায়, তবু সভ্যজন-বর্জ্জিত ঐ বন্য দ্বীপটি আমেরিকার চেয়েও আমাদের কাছে অল্প পরিচিত আর আমেরিকার থেকেও সুদূর। মনশ্চক্ষে কল্পনা কর—একটা বিপর্য্যস্ত জগৎ, চতুর্দ্দিকে সাগর-তরঙ্গবৎ পর্ব্বতশ্রেণী, সঙ্কীর্ণ গভীর খাদগুলিকে ভেদ ক'রে ছুটে চলেছে উন্মত্ত গর্জ্জমান গিরিনির্ঝর, সমতল ভূমি চোখে কোথাও পড়ে না, শুধু দেখা যায় বিস্তীর্ণ তরঙ্গায়িত মালভূমি, বিরাট বিস্তৃত গ্র্যানাইটের চাপ, আর সমগ্র দেশটি পাইন আর চেসনাটের নিবিড় বন ও ঝোপঝাড়ে সমাকীর্ণ। অ-কর্ষিত জনহীন আদিম পৃথিবী যেন। যদিচ কদাচিৎ স্তূপীকৃত প্রস্তরপুঞ্জের মত পর্ব্বতশীর্ষে লগ্ন এক-আধখানি গ্রামও চোখে পড়ে, সে গ্রামে চাষ-বাস নাই, শিল্প-বাণিজ্য নাই, কলানৈপুণ্যের চিহ্নমাত্র নাই। ঘুরতে ঘুরতে এমন বস্তু চোখে পড়ার সম্ভাবনা মাত্র নাই, যার মধ্যে দেশবাসীর আধুনিক বা পুরা যুগের শিল্পকলা বা রূপচর্চ্চার কোনো প্রকার

আভাষ পাওয়া যেতে পারে। এই বন্ধুর কঠিন নীরস আশ্চর্য্য সুন্দর দেশে এসে তোমার মনে সব চেয়ে বড় ক'রে এই কথাটাই জাগবে যে, একটা চিরকালজাত উপেক্ষা আছে এ দেশের লোকের সুকুমার রূপসৃষ্টির উপরে—যে রূপসৃষ্টির নাম দিয়েছি আমরা শিল্পকলা। ইটালীতে সর্ব্বত্রই প্রত্যেকটি অট্টালিকা শিল্পসম্ভারে পরিপূর্ণ, শুধু তাই নয়, প্রত্যেকটি অট্টালিকাই এক-একটি মহৎ শিল্প! মর্ম্মর, লোহা, দারু, ব্রোঞ্জ, ধাতু বা পাথর সব কিছুই ইটালীতে মানুষের প্রতিভার সাক্ষ্য দান করে। এমন কি, পুরাকালের অতি সাধারণ যে সব চিহ্ন পুরাতন অট্টালিকাগুলির মধ্যে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়ে আছে তারাও সুন্দরের প্রতি মানবের গভীর প্রেমের বার্ত্তা ঘোষণা করে। আমাদের সকলেরই কাছে ইটালী প্রিয় আর তীর্থক্ষেত্র, কেন না, ও-দেশ মানুষের সৃজন-প্রতিভাকে নিঃসংশয় প্রমাণে জগতের সামনে মেলে ধরেছে।

আর তারই সাগর-সীমার পরপারে রয়েছে অরণ্যবেষ্টিত করসিকা, সেই পুরাকাল থেকে অপরিবর্ত্তিত। সেখানে মানুষ নিজের বৈচিত্র্যহীন সামান্য কুটীরে নিজের জীবন অতিবাহিত করে। যে সব ব্যাপারের সঙ্গে তার নিজের বা তার বংশগত কলহের কোনো সম্পর্ক নাই সে সব বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন। আদিম জাতির যা কিছু দোষ এবং গুণ তা সে নিজের মধ্যে এখনো রক্ষা করেছে। এক দিকে তার চরিত্রে রিপু প্রবল. প্রতিহিংসা ক্ষমাহীন, রক্ত-পিপাসা সুপ্রকট; অন্য পক্ষে সে অতিথি-বৎসল, উদার, বিশ্বাসী আর সরল। অপরিচিত আগন্তুকের পক্ষেও তার দুয়ার অবারিত, আর সামান্য উপকারের প্রতিদানে সে হ'য়ে ওঠে অনুগত বন্ধু।

পূরো এক মাস ধরে এই মনোরম দ্বীপে আমি যাযাবর হ'য়ে ঘুরে বেড়ালাম। পৃথিবীর শেষ প্রান্তে যেন এসে উপনীত হয়েছি এমনি একটা অনুভূতি আমার মনে জাগতে লাগল। পান্থনিবাস নাই, পানশালা নাই, পথ পর্য্যন্ত নাই এখানে। অশ্বতর-পদচিহ্নিত পথ সব শেষ হয়েছে পর্ণকুটীরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়ে। পাহাড়ের গায়ে গায়ে লগ্ন সব কুটীর নিবদ্ধদৃষ্টি হ'য়ে চেয়ে আছে নীচে আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য খাদগুলির দিকে। সেখান থেকে এক-এক দিন সন্ধ্যার সময় উচ্ছ্বসিত প্রপাতের রুদ্ধ গর্জ্জন শোনা যায়। পথিক এসে কুটীর-দ্বারে করাঘাত করে, রাত্রিবাসের জন্য আতিথ্য ভিক্ষা করে; তারই সামান্য আহার্য্যের অংশ গ্রহণ ক'রে তারই দরিদ্র কুটীরে সে নিদ্রা যায়, আর পরদিন গৃহস্বামী অতিথিকে পথ দেখিয়ে গ্রামের প্রান্ত পর্য্যন্ত পৌঁছিয়ে দিয়ে আসে, আর সেখান থেকে তার করমর্দ্দন ক'রে বিদায় গ্রহণ করে।

এক দিন, এক সন্ধ্যা বেলায়, ঘণ্টা দশেক ঘুরে বেড়াবার পর এক উপত্যকার উন্নত প্রান্তে, এক নিঃসঙ্গ বাসগৃহে এসে উপস্থিত হ'লাম। এখান থেকে মাইল খানেক পরে উপত্যকাটা হঠাৎ শেষ হ'য়ে গিয়ে নেমে গেছে সমুদ্রে। খাড়া উঁচু পাহাড়ের দেয়ালে-ঘেরা নিরানন্দ এই খাদগুলি ঝোপ-জঙ্গল, পাথর আর বড়-বড় গাছে পরিপূর্ণ। কুটীরের কাছে কয়েকটি দ্রাক্ষা-মঞ্চ আর ছোট একখানি বাগান; আর কতকটা দূরে কয়েকটা বড়-বড় চেস্‌নাটের গাছ জীবনধারণের পক্ষে এইই প্রচুর; বস্তুতঃ এই দারিদ্র্যপীড়িত দ্বীপে এ একটা ঐশ্বর্য্য বলে গণ্য।

বৃদ্ধা এক জন মহিলার সঙ্গে দেখা হ'ল। মানুষটির মুখশ্রী কঠোর আর তিনি অসাধারণ পরিচ্ছন্ন। তাঁর স্বামী খড়ে-বোনা একটা আরাম-চেয়ার থেকে উঠে নত হ'য়ে আমাকে অভিবাদন করে নীরবেই আবার নিজের আসনে গিয়ে বসলেন।

তাঁর স্ত্রী আমাকে বললেন, "দয়া ক'রে ক্ষমা করতে হবে ওঁকে; উনি কানে কিছুই শুনতে পান না, বয়সও আশী পেরিয়েছে।"

খুব অবাক হ'লাম, একেবারে ফরাসী মেয়ের মত খাঁটি ফরাসী বলছেন শুনে।

"করসিকায় আপনার বাড়ী নয়?"

"না, মহাদেশ থেকেই আমরা এসেছি। তবে এখানে আছি পঞ্চাশ বছর।"

মানুষের বসতি আর শহর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এই অন্ধকার পর্ব্বত-কন্দরে পঞ্চাশ বৎসর কাল অতিবাহিত করার কথা কল্পনা করতেও আমার মনে একটা আতঙ্ক আর বিহ্বল ভাবের তরঙ্গ বয়ে গেল। এই সময় এক জন বৃদ্ধ মেষপালক এসে প্রবেশ করলে ঘরে; আর সকলে মিলে আমরা খেতে বসলাম। আলু, শুয়োরের মাংস আর কপি একসঙ্গে সেদ্ধ ক'রে একটা গাঢ় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত আহার শেষ হ'লে আমি দরজার কাছে গিয়ে বসলুম।

আমাকে ঘিরে আমার চতুর্দ্দিকের একটা স্তব্ধ বিষাদ-ভার আমার চিত্তকে অবসাদে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলছে। এ সেই জাতীয় অবসাদ—পথিককে ধূসর সন্ধ্যায় তার পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের ভয়াবহ আবেষ্টনে অকস্মাৎ যা অভিভূত ক'রে তোলে—মনে হয় সর্ব্বনাশের, সৃষ্টিনাশের, পৃথিবী ধ্বংসের সময় সমাগত; জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দশা-কদর্য্যতা সহসা মনের মধ্যে প্রকট হ'য়ে ওঠে। প্রকট হয়ে ওঠে মানুষের নিঃসঙ্গতা, সংসারের অসারতা, হৃদয়ের অন্ধকারময় একাকীত্ব—যে নিঃসঙ্গতা তার কল্পনার আবেশে আচ্ছন্ন ক'রে ভুলিয়ে নিয়ে একেবারে মৃত্যুর সমাধি-গহ্বরের কিনারায় এনে আমাদের পৌঁছে দেয়।

অল্পক্ষণ পরে বৃদ্ধা ফিরে এলেন আমার কাছে; আর একান্ত উদাসীন প্রশান্ত চিত্তেও মানুষের যে কৌতূহল একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যেতে চায় না সেই রকম কৌতূহলের বশে আমাকে প্রশ্ন করতে লাগলেন: "ও! আপনি ফ্রান্স থেকে আসছেন তা হ'লে?"

"হ্যাঁ, মনের খেয়ালে ঘুরে বেড়াতে বেরিয়েছি একটু।"

"আপনি প্যারিসে থাকেন ব'লে মনে হ'চ্ছে?"

"আজ্ঞে না, আমার বাড়ী ন্যান্‌সিতে।"

মনে হ'ল, এই কথায় অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠেছেন তিনি। তবে আমি যে কেমন করে তাঁর সেই চাঞ্চল্য লক্ষ্য করলাম বা বলা যায়, অনুভব করলাম, তা আমি এখনো বলতে পারব না।

অতি ধীরে একটি একটি ক'রে কথা কয়টি আবার তিনি আবৃত্তি করলেন, "আপনার বাড়ী ন্যান্‌সিতে?"

বধিরের মুখে যে এক রকমের নির্ব্বিকার ভাব দেখা যায়, সেই রকম ভাববিহীন মুখে ওঁর স্বামী এসে দাঁড়ালেন দরজায় এই সময়।

"উনি কথাবার্ত্তা কিছুই শুনতে পান না। ওঁর জন্যে ব্যস্ত হবার দরকার নেই।" তার পর একটুখানি থেমে আবার সুরু করলেন: "ন্যান্‌সির লোকেদের চেনেন তাহ'লে?"

"হ্যাঁ, প্রায় সকলকেই চিনি।"

"আপনি কি সাঁৎ আলেয়াদের চেনেন?"

"খু-ব চিনি। তাঁরা আমার বাবার বন্ধু।"

"আপনার নামটি কি?"

বললুম তাঁকে। প্রশ্নের ভঙ্গীতে আমার মুখের দিকে চোখ তুলে তিনি চেয়ে রইলেন। তার পর যেন ভুলে-যাওয়া ঘটনাগুলোকে মনের মধ্যে জাগিয়ে তুলছেন এমনি ভাবে বিড়-বিড় ক'রে বলতে লাগলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, পরিষ্কার মনে পড়ছে। আর—আর—ত্রিসেমারেদের, তাঁদের খবর কি?"

"তাঁরা কেউই বেঁচে নেই।"

"আ! আর সারমেঁাদের চিনতেন কি?"

"হ্যাঁ, তাঁদের বংশের শেষ যিনি তিনি এখন এক জন জেনারল।"

উত্তেজনায় তাঁর দেহ কাঁপছে; কাঁপছে বেদনায়; কাঁপছে নানা বিচিত্র প্রবল,অবর্ণনীয় আবেগের ঘাত-প্রতিঘাতে; কাঁপছে কঠিন নীরবতা চূর্ণ ক'রে ফেলবার এক অভূতপূর্ব্ব আকুতির আবেগে; বুকের পাঁজরের ভিতর এত কাল লুকোনো যা-কিছু তাঁর একান্ত গোপন সেই সব কথা মুখ ফুটে বলবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় আর উত্তেজনায় কাঁপছে; যাদের নাম করা মাত্রই অন্তরাত্মা তাঁর দুলে উঠল আবেগে তাদের বিষয় গল্প করার জন্যে।

চেঁচিয়ে বলে উঠলেন বৃদ্ধা, "জানি—আমি জানি। হেনরি দ্য সারমেঁা। সে আমার ভাই।"

অবাক্ হ'য়ে বৃদ্ধার মুখের দিকে চাইলুম। হঠাৎ মনে পড়ে গেল, লোরেনের কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরে বহু কাল পূর্ব্বে একটা ভয়ঙ্কর কলঙ্কের ব্যাপার ঘটে। ধনীকন্যা সুন্দরী সুজেন দ্য সারমেঁা তার বাপেরই অধীন হাসুপার রেজিমেন্টের এক নিম্নশ্রেণীর অফিসারের সঙ্গে গোপনে উধাও হয়। লোকটি চাষার ছেলে। চাষার ছেলে হয়েও এই সামান্য সৈনিক তার কর্ণেলের কন্যার হৃদয় হরণ করেছিল তার যুদ্ধের সাজে সজ্জিত অপরূপ কান্তি নিয়ে। সন্দেহ নেই যে, সওয়ারী সৈন্যরা যখন তার সামনে দিয়ে আসা-যাওয়া করত তখন এই যুবকটিকে দেখার, তারিফ করার, প্রেমে পড়ার সুযোগ মেয়েটির ঘটেছিল। কিন্তু ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ ক'রে নিল কি ক'রে মেয়েটা? দেখা-শুনো ক'রে একটা বোঝাপড়া করার সুবিধে ক'রে নিলে কেমন করে? কি রকম করেই বা মেয়েটা জানাল যে সে ছেলেটাকে ভালবাসে? কেউ জানতে পারেনি কখনও।

সন্দেহও হয়নি কিছু মাত্র। সৈনিকের কাজের ফুরণের কাল শেষ হ'লে একদা এক নিশীথ রাতে দু'জনে অদৃশ্য হয়। তাদের খোঁজ করা হয়েছিল, কোনো ফল হয়নি। ওদের খবর আর কেউ কখনো পায়নি, পরিবারের সকলে ধরেই নিয়েছিল যে মেয়েটি বেঁচে নেই।

আর আজ আমি তাকে আবিষ্কার করলুম এই জনহীন উপত্যকায়। শেষে বললুম, "আমার পরিষ্কার মনে আছে—আপনি শ্রীমতী সুজেন।"

মাথা হেলিয়ে সায় দিলেন তিনি। অশ্রু তাঁর চোখে উথলে উঠল। তার পর কুটীরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান বৃদ্ধের নিস্পন্দ মূর্ত্তির দিকে একবার চেয়ে বললেন, "আর উনি আমার স্বামী।"

তখন কথাটা আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে উঠল যে, বৃদ্ধা ওঁকে এখনও ভালবাসেন, এখনও পর্য্যন্ত ওঁকে সেই চোখেই দেখেন, যে চোখের মোহ কাটেনি।

সাহস করে বললুম, "মনে হয় বরাবর আপনারা তৃপ্ত, সুখী।"

হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে উত্তর এল, "হাঁ, খুব পরিতৃপ্ত। উনি আমাকে জীবনে বড সুখী ক'রেছেন। কিছুর জন্যেই আমাকে কোন দিন দুঃখ করতে হয়নি।"

বিস্ময়ে সমবেদনায় আমি চেয়ে রইলুম ভদ্রমহিলার দিকে; অবাক্ হ'য়ে গেলাম প্রেমের শক্তির কথা চিন্তা করে। অভিজাত-গৃহে লালিত সেই ধনিকন্যা ঐ দরিদ্র কৃষককে অনুসরণ করে বেরিয়ে এসেছে, অবনত হ'য়ে তারই পর্য্যায়ে নেমে এসেছে। ভব্যতা নাই, বিলাস নাই, মাধুর্য্য নাই—এমনই একটি জীবন-ধারাকে সে স্বীকার করে নিয়েছে। ঐ মানুষটির সবল জীবন-যাত্রার সঙ্গে সে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। আর এখনো সে ওকে ভালবাসে। পোষাকে-আষাকে একেবারে হ'য়ে উঠেছে সে চাষার মেয়ে। মাটীর থালায় ক'রে শূকরের মাংসের ঝোল খেল সে খড়ে-ছাওয়া কাঠের চেয়ারে বসে। রাত্রে ওরই পাশে তৃণ-শয্যায় শুয়েছিল। আপন প্রেমাস্পদের কথা ছাড়া আর কোনো চিন্তা কখনো ওর মনে স্থান পায়নি;—না মণি-মুক্তা, রেশম পশম, ভোগবিলাস, গদি-মোড়া চেয়ার, ঝালরে-ঘেরা ঘরের সুবাসিত কোমল উত্তাপ; না পালকের নরম শ্রান্তিহরা কাউচ—কিছুই না। ঐ মানুষটিই ছিল তার জীবনের এক মাত্র কাম্য। সে যতক্ষণ কাছে আছে জীবনের আর কোনো কিছুতেই তার আবশ্যক নেই।

তখন সবে সে বালিকা—জীবনের সুদীর্ঘ ভবিষ্যৎ, তার সারা সংসার, আর সেই সঙ্গে তার বড় আদরের যারা—যারা তাকে মানুষ করেছে, ভালবেসেছে—সকলকে সে এই আত্মদানের কাছে বলি দিয়েছিল। একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে ঐ মানুষটির সঙ্গে এসে উপস্থিত হয়েছিল বনাকীর্ণ এই পার্ব্বত্য খাদে। ওই করেছে তার অন্তরের কামনা, জীবনের স্বপ্ন, প্রাণের আকুতি পূর্ণ আর সফল। ওর জীবনের আদি ও অন্ত পূর্ণ করেছে আশীর্ব্বাদে। এর চেয়ে বড় সুখ তার জীবনে কল্পনা করা অসম্ভব।

সমস্ত রাত জেগে শুয়ে আছি আর সেই বৃদ্ধ সৈনিকের আকম্পিত প্রশ্বাসের শব্দ শুনছি। ছিন্ন তৃণ-শয্যায় সে তারই পাশে শুয়ে আছে—যে নারী পৃথিবীর সীমান্ত পর্য্যন্ত ওর পিছনে পিছনে চলে এল। শুনছি আর মনে আলোচনা করছি ওদের এই সরল অথচ আশ্চর্য্য কাহিনীর কথা। তাদের জীবনের পরিতোষ কত নিঃশেষে পরিপূর্ণ অথচ কি সামান্য ভিত্তির উপরে তা গড়া।

* * * *

বক্তা নীরব হ'লেন।

মেয়েদের মধ্যে এক জন তার-স্বরে বলে উঠলেন, "আপনারা যা খুসী বলতে পারেন; মেয়েটার নজর বড় ছোট। অদ্ভুত আদিম ধরণের ওর অভাব আর সখ। মোটের উপর মেয়েটা বোকা (গাধা)।"

চিন্তাবিষ্ট মুখে আর এক জন মহিলা বললেন, "কি আসে-যায় তাতে? তৃপ্ত—সুখী হয়েছিল সে।"

দিগন্তে, রাতের অন্ধকারের মধ্যে করসিকা যাচ্ছে মিশিয়ে, ধীরে ডুবে যাচ্ছে আবার সমুদ্রগর্ভে। যেন ওর কূলে এসে আশ্রয় পেল যারা সেই দু'টি সরল মানুষের প্রেমের কাহিনীটুকু বলার জন্যেই আবির্ভাব হয়েছিল ওর ঐ বিরাট ছায়া-মূর্ত্তিটার।

অনুবাদ : জীবনময় রায়

দি গুড আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত

জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

২৯
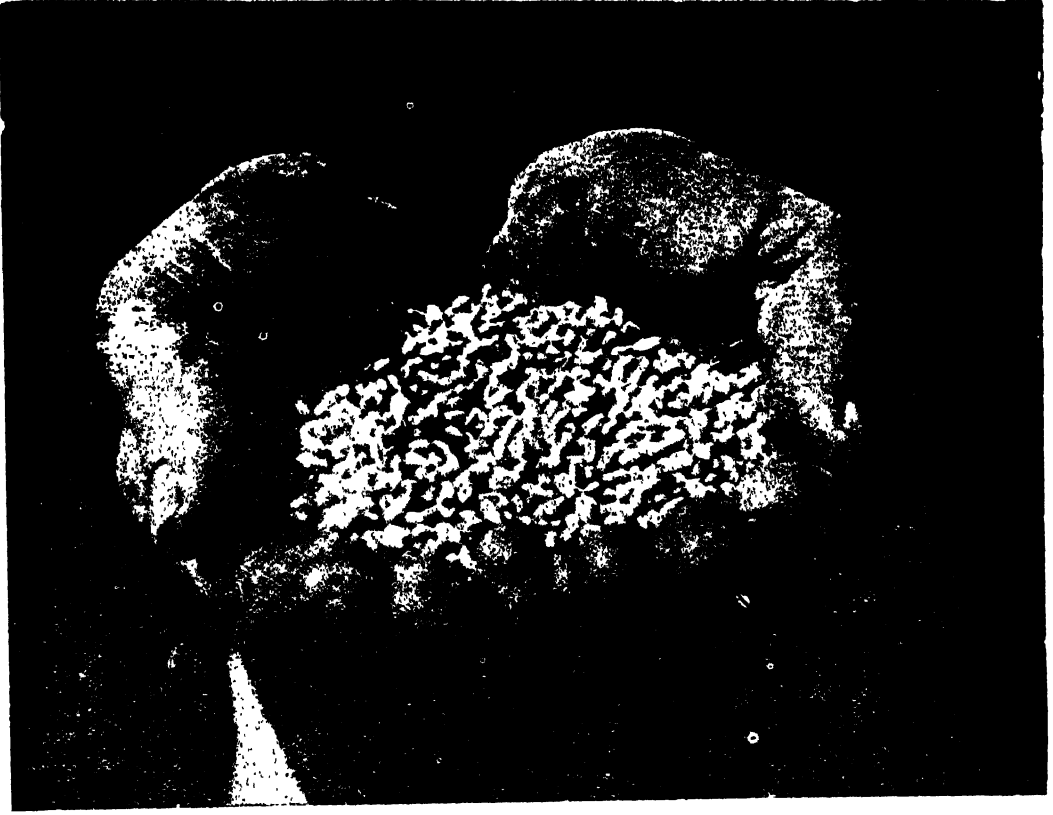
যা করব বলে স্থির করে ওয়াঙ, আজকাল আর তা দ্রুত সমাধা করতে পারে না। বয়স যত বাড়ছে অধীরতাও বাড়ছে তার। আজকাল মাঠের ধারে কিছুটা বেড়িয়ে নিয়ে সন্ধ্যার ঝোঁকে ওয়াঙ বসে বসে আরাম করে। পড়ন্ত রোদে সামান্য একটু ঘুমিয়ে নেয়। বড় ছেলেকেও ডেকে হুকুম দেয় ওয়াঙ তার ইচ্ছামত কাজ সেরে ফেলার জন্য। ছোট ছেলেকেও সহর থেকে ডেকে পাঠায় সে দাদাকে সাহায্য করতে। সব ব্যবস্থা ঠিক হলে এক দিন সহরের কেনা বাড়ীতে উঠে চলে যায় প্রথম দফায় কমলিনী আর কোকিলা দাসী আর মালপত্র নিয়ে। তার পর যায় বড় ছেলে বৌ আর বাঁদীদের সঙ্গে করে।

ওয়াঙ নিজে তখুনি যায় না। ছোট ছেলেটিকেও সে কাছে রাখে। যে মাটিতে সে জন্মেছে সে জমি থেকে বিদায় নিয়ে নূতন বাড়ীতে গিয়ে ওঠা যতটা সহজ মনে করেছিল তত সহজে হয়ে ওঠে না ওয়াঙের। ছেলেরা জিদ করতে ওয়াঙ তাদের বলে—'আমার একলা থাকার জন্যে একটা মহল তোমরা তৈরী করে রাখ, আমার ইচ্ছা হলেই আমি সেখানে চলে যেতে পারব। আমার নাতি হবার আগেই আমি গিয়ে পড়ব দেখো। আবার ইচ্ছা হলে এই বাড়ীতেও আমি ফিরে আসতে পারব।'

ছেলেরা তবু জিদ করছে দেখে ওয়াঙ বলে—'তা ছাড়া আমার ঐ অভাগী মেয়েটিকে নিয়ে আমি যে কি করব তা ভেবে উঠতে পারছি না। ওকেও আমার নিয়ে যেতে হবে সঙ্গে করে, নইলে ওকে কেউ দেখবে না। ওর খাওয়াই হবে না আমি না খাওয়ালে।'

বড় বৌমাকে তিরস্কার করে বললে ওয়াঙ এ কথা, কেন না, বৌটি কিছুতেই এই বোবা ননদকে সহ্য করতে পারে না। দিবা-রাত্রই সে অভিযোগ করে বলে—'অমন মেয়ে বেঁচে থাকাই পাপ। ওর দিকে তাকালে আমার পেটের ছেলে বাঁচবে না।' বৌয়ের অপছন্দর কথা মনে করেই এখন বড় ছেলে চুপ হয়ে গেল—আর কথা বাড়ালে না বাপের সঙ্গে। বাপ তখন লজ্জিত হয়ে বললেন—'তোমরা দুঃখ করো না। ছোট ছেলের বিয়ের ব্যবস্থা করেই আমি চলে যাব ও-বাড়ীতে। যত দিন না সে ব্যবস্থা পাকা হচ্ছে চীংয়ের সঙ্গে এখানে থাকাই আমার ভাল।'

এখন এ-বাড়ীতে খুড়োর বৌ ছেলে বাদ দিয়ে ওয়াঙ থাকে চীং, ছোট ছেলে আর অভাগী মেয়েটিকে নিয়ে। কমলিনী যেখানে থাকত সেই ভিতর-মহল আজকাল অধিকার করেছেন খুড়ো। সেটা যেন তার পাওনা, এমনি ভাব খুড়োর। কিন্তু তাতে অকারণে মেজাজ খারাপ করে না ওয়াঙ। সে জানে খুড়ো আর বেশী দিন বাঁচবেন না, আর খুড়োর সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াঙের দায়িত্ব কেটে যাবে। তার পর খুড়োর ছেলে যদি ওয়াঙের হুকুম মত কাজ না করে, সে ক্ষেত্রে ওয়াঙ যদি তাকে দূর করে দেয় বাড়ী থেকে, লোকে ওয়াঙকে নিন্দা করতে পারবে না। বাইরের মহলে থাকে চীং মজুরদের নিয়ে। মাঝের ঘরগুলিতে থাকে ওয়াঙ ছেলেমেয়েদের নিয়ে। মোটা একটি মেয়ে-মানুষ রেখেছে ওয়াঙ ঝিয়ের কাজ করার জন্য।

বাড়ীতে আর ঝঞ্জাট নেই। ওয়াঙ আজকাল যেন কত ক্লান্ত

হয়ে থাকে। কোন কিছুতেই মন দেয় না সে, শুধু আরাম করে আর ঘুমিয়ে দিন কাটায়। এখন আর কেউ তাকে জ্বালাতন করবার নেই। ছোট ছেলেটি শান্ত প্রকৃতির মানুষ—বাপের আড়ালে আড়ালেই সে দিন কাটায়। এ ছেলেটিকে ওয়াঙ চিনতেই পারে না।

আজকাল চীং-ও বুড়ো হয়ে কাটির মত শীর্ণ হয়ে পড়েছে। তবু বৃদ্ধ বিশ্বাসী কুকুরের মত তেজ তার অটুট আছে। ওয়াঙ তাকে আর লাঙলও ধরতে দেয় না—মাঠে বলদের পিছনে ছুটতেও দেয় না। কিন্তু সে মজুরদের ঠিকাদারী করে বেড়ায়, ধান মাপের সময় সতর্ক দৃষ্টি রাখে সব দিকে। ওয়াঙ তাকে কি হুকুম দিয়েছে সে কথা জানতে পেরেই চীং তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নেয়। তার পর নীল তুলোর কোট গায়ে দিয়ে সে এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে ঘুরে ঘুরে মেয়ে দেখে বেড়ালে। তার পর ফিরে এসে ওয়াঙের কাছে সে সংবাদ দিলে এই বলে—'তোমার ছেলের জন্যে বৌ পছন্দ করার চেয়ে নিজের জন্যে একটা কনে ঠিক করলে আমার আহ্লাদ হোত বেশী। কিন্তু আমি যদি ছোকরা হতাম তা হলে এখান থেকে তিন গাঁ দূরে একটি মেয়ে থাকে তাকেই পছন্দ করতাম ,দিব্যি গোলগাল গড়ন মেয়েটির, নরম স্বভাব, কাজে হুঁশিয়ার। দোষের মধ্যে মেয়েটির মুখে হাসি লেগেই আছে। মেয়ের বাপও এ-বাড়ীর সঙ্গে কাজ করতে খুব রাজী। জমি-জায়গা আছে বাপের আর এখনকার দিন-কালের উপযুক্ত দেওয়া-থোওয়ায়ও করবে। তবু তুমি যতক্ষণ না কথা দিচ্ছ আমি কোন কথা দিতে পারি না। দিইওনি।'

এ কথায় ওয়াঙ খুসী হোল মনে। বিয়ের পাকা কথাই দিয়ে দিলে সে। তার পর কাগজ-পত্তর এনে তাতে সই দিয়ে ওয়াঙ অনেক হালকা বোধ করল।

ওয়াঙ বললে—'আর একটি ছেলের বিয়ে হয়ে গেলেই আমি খালাস পাব। এর পর আমার আর উতলা হওয়ার কিছু রইল না।'

বিয়ের দিনস্থির হয়ে গেলে, ওয়াঙ রোদে বসে ঝিমুতে লাগল। যেমন করে ঝিমুতেন তার বাবা।

চীং অথর্ব হয়ে পড়ছে দিনে দিনে, ওয়াঙও বয়সের ভারে ভারী আর নিদ-কাতুরে হয়ে পড়ছে, ছোট ছেলেটির পক্ষে এখনই কোন দায়িত্ব নেওয়ার বয়স হয়নি, সুতরাং দূর প্রান্তের কিছু জমি গাঁয়ের লোকেদের মধ্যে বিলি করে দেওয়াই ভাল মনে করলে ওয়াঙ। গাঁয়ের অনেকেই ওয়াঙের প্রজা হতে চাইলে আর সেই মত ব্যবস্থাও করা হোলো। খাজনা ঠিক হোলো এই ভাবে যে, জমিদার পাবে ফসলের অর্দ্ধেক, প্রজা পাবে বাকী অর্দ্ধেক ; কেন না, সে জমিতে মাথার ঘাম ফেলবে। এ ভিন্ন তেলকলের থেকে কিছু সার আর তেলের গাদ ওয়াঙ প্রজাদের দেবে, প্রজারা কোন কোন ফসলের ভাগ দেবে ওয়াঙের ঘর-খরচের জন্য।

এ সবের আর তদারকের দরকার নেই বলে, কখনো কখনো ওয়াঙ সহরের বাড়ীতে গিয়ে নিজের মহলে ঘুমিয়ে আসত। আবার ভোরে নগর-দুয়ার খোলা হলেই সে ফিরত গাঁয়ের দিকে। নিজের মাঠের সুবাস নাকে এসে লাগতেই তার সমস্ত মন পুলকিত হয়ে উঠত।

বুড়ো বয়সে ওয়াঙ যে শান্তিতে কাটাবে এই জন্যেই যেন দেবতারা করুণা করলেন তার উপর। খুড়োর ছেলেটি আজকাল আর তেমন বেচাল নেই। একটি মজুরের মোটা স্ত্রীর উপর নজর দেওয়া ছাড়া আজকাল আর তার অন্য দৌরাত্ম্য নেই বাড়ীতে। সেই ছেলেটি এক দিন শুনল যে, উত্তরে কোথায় যুদ্ধ বেধেছে। ওয়াঙকে এসে সে বললে,—'উত্তরের যুদ্ধে আমি যোগ দেব। কিছু শিখতে করতে পারব সেখানে। অবশ্য আমার কিছু কিছু জিনিষ আর জামা-বিছানা কেনার মত রূপো যদি আপনি আমায় দেন তাহলেই আমি যেতে পারি।'

এ কথায় ওয়াঙের হৃদয় আনন্দে নেচে উঠলেও মুখে সে ভাব গোপন রেখে ওয়াঙ ছল করে বললে—'কাকার একটিই ছেলে তুমি। তুমি যুদ্ধে চলে গেলে তাঁর কি হবে?'

এ-কথায় সে ছেলে জবাব দিল,—'আমায় অত বোকা ঠাওরাবেন না। যেখানে লড়াই সেখান থেকে আমি সরে পড়ব ঠিক। একটু হাওয়া বদলের লোভে আমি যেতে চাই। তা ছাড়া, বুড়ো হবার আগে কিছু বেড়িয়ে বিদেশ দেখে নেবো।'

ওয়াঙ খুসী হয়েই রূপো ফেলে দিলে তার হাতে। এ দেওয়া তার বুকে বাজল না, কেন না, মনে ভাবলে ওয়াঙ—'যুদ্ধ এ দেশে চিরকালই লেগে আছে। হয়ত এই সংসারে ওর দৌরাত্ম্য চিরকালের মতনই শেষ হোল। তা ছাড়া, লড়াইতে মানুষ ত মরে। আমার যদি কপাল ভাল হয়, ও হয়ত লড়াইতেই জান দিতে পারে।'

মনের ভাব গোপন করে ওয়াঙ খুড়ীকে সান্ত্বনা দিলে। আরো আফিং দিয়ে পাইপে আগুন ধরিয়ে ওয়াঙ তাকে বললে—'দেখো না, ও মস্ত লোক হবে। তখন ওর যশে আমরা সবাই কত মানী হব।'

শান্তি নিরবচ্ছিন্ন হোল সহর আর গাঁ—দুই সংসারেই। শুধু নাতি হবার সমাগত দিন গুণতে লাগল ওয়াঙ বসে বসে।

নাতি হবার দিন যত এগিয়ে আসছে ওয়াঙ তত বেশী করেই সহরের বাড়ীতে থাকতে সুরু করে। মহলে মহলে ঘুরে মনে মনে জল্পনা করে সে। এই চিন্তায় ওয়াঙ অবাক হয়ে যায়, যে প্রাসাদে এক দিন হোয়াং-পরিবার বাস করে গেছে, সেইখানে আজ বাস করছে ওয়াঙ ছেলে ও বৌমাদের নিয়ে। সেই প্রাসাদেই আসছে তার নাতি —যে তৃতীয় ধাপে নিয়ে যাবে তার বংশকে।

অনেক পয়সা খরচ করে ওয়াঙ পরিবারের সকলের জন্য সিল্ক আর সাটিন কিনে দিলে। এ-বাড়ীর দামী আসবাবের উপর সাধারণ কাপড়ের ঢাকনা থাকবে এ ভালো না লাগায় ওয়াঙ দামী কাপড়ও কিনিয়ে আনালে। দাসদাসীরা পাছে নোংরা ছেঁড়া সাজে থাকে তার জন্যে তাদেরও ভালো নীল আর কালো রঙের তুলোর পোষাক কিনে দিলে। সহরের বন্ধুরা যখন বড় ছেলের সঙ্গে তার বাড়ীতে আসবে তারা যে এই সব দেখবে, এই সুখ-কল্পনায় ওয়াঙ গর্বিত হোল। পয়সা তার চেয়ে বেশী দাম নয় ওয়াঙের কাছে।

এক দিন ছিল যখন দুরন্ত ক্ষুধা মিটত রুটি আর রশুনে। কিন্তু এখন সে বেলা করে ঘুম থেকে ওঠে—মাঠে কাজও করে না, তাই, যে কোন আহার পছন্দ হয় না তার। যা কিছু ভালো—যা কিছু অসময়ের—যা কিছু ভালো দূর থেকে আসে মাছ ডিম আনাজ—তাই পরিপাটি করে সে খায়। বড়ো লোকদের অগ্নিমন্দ উদর-পূর্তির জন্য যেমন শুধু উচ্চাঙ্গের স্বাদ আর লোভনীয় আহার্য লাগে তেমনিই হোল ওয়াঙের বেলায়। সেই সব খাবার খায় ছেলেরাও। কমলিনী কোকিলা কেউই তা থেকে বাদ পড়ে না।

কোকিলা এক দিন হাসতে হাসতে বললে ওয়াঙকে—

'এ-বাড়ীতে এক কালে যা সব হোত ঠিক তেমনি ভাবেই সে সব ফিরে আসছে। শুধু আমারই বয়স হয়ে গিয়েছে, এখন এই ফিকে হয়ে যাওয়া যৌবন নিয়ে আর বুড়ো কর্তার মন যোগাতে পারব না।'

আড়-চোখে ওয়াঙের দিকে তাকিয়ে কোকিলা এ কথার শেষ হাসল। শুনেও না-শোনার ভাণ করলে ওয়াঙ, কিন্তু কোকিলা যে তাকে বুড়ো কর্তার সঙ্গে সমান করলে এইতে সে খুসী হোলো।

অলস দিন কাটে ওয়াঙের ভোগের মধ্যে। যখন খুসী সে ঘুম থেকে ওঠে, যখন খুসী হয় ঘুমোয়। এমনি করে সে নাতির প্রতীক্ষায় দিন গোণে। এক দিন সকালে নারী-কণ্ঠের কাৎরানি শুনে ওয়াঙ ভিতর-মহলে যেতেই ছেলের সঙ্গে দেখা হোলো। ছেলেটি বললে—'সময় হয়েছে হবার। কিন্তু কোকিলা বলছে যে খুব দেরী হবে। আপনার বৌমার সরু গড়ন, হতে খুব কষ্ট হবেই।'

নিজের মহলে ফিরে এসে ওয়াঙ বসে বসে কান্না শুনতে লাগল। অনেক দিন পরে আর একবার ওয়াঙ ভয় পেয়ে কোনো দেবতার শরণ নিতে চাইলে। উঠে সহরের ধূপ-ধুনোর দোকানে গিয়ে ওয়াঙ কিছু সওদা করলে। তার পর দুর্গতিনাশিনীর মন্দিরে গিয়ে এক জন পুরোহিতকে ডেকে সে দেবীর সামনে ধূপ-ধুনো জ্বেলে দিতে বললে। দেবীর কাছে প্রার্থনা করলে ওয়াঙ।—'পুরুষ মানুষ হয়ে আমার দেওয়া উচিত নয় জানি মা। কিন্তু আমার নাতি আসছে, তার মা সহুরে মেয়ে, তার গড়ন বড় সরু। তাই ব্যথা খাচ্ছে সে খুব। আমার ছেলের মা আজ বেঁচে নেই—আর বাড়ীতে এমন কোন মেয়েমানুষ নেই যে তোমার পূজো দিতে পারত।'

পুরোহিত ছাইয়ের ভিতরে ধূপ দিচ্ছেন, দেখতে দেখতে হঠাৎ বিদ্যুতের মত ওয়াঙের মনে খেলে গেল—'যদি নাতি না হয়ে নাতনী হয়ে পড়ে আমার!' আতংকে ত্রস্ত কণ্ঠে বললে ওয়াঙ—'যদি আমার নাতি হয় আমি দেবীর জন্যে রাঙা পোষাক করিয়ে দেব। কিন্তু মেয়ে হলে কিছুই দিতে পারব না।'

এই নতুন ভাবনায় ওয়াঙ এত বিচলিত হয়ে পড়ল যে, দুপুরের চড়া রোদ মাথায় করে সে আবার দোকানে গিয়ে ধূপ কিনলে। তার পর গাঁয়ের সেই মন্দিরে গেল যেখানে যুগল দেবমূর্তি জমির উপর দৃষ্টি রাখেন। সেইখানে ধূপ জ্বেলে দিয়ে ওয়াঙ প্রার্থনা করলে—'আমরা তোমাদের অনেক সেবা করেছি—আমার বাবা, আমি, আমার ছেলে। এত দিনে আমার ছেলের বংশধর আসছে। সে যদি আমার নাতি না হয় তবে তোমাদের আর সেবা করব না।'

এই সব কাজ সেরে যখন আবার প্রাসাদে ফিরে নিজের টেবিলে বসল ওয়াঙ, তার ইচ্ছা হল দাসী তাকে চা এনে দেয়। আর এক জন এসে গরম জলে তোয়ালে ভিজিয়ে তার মুখ মুছিয়ে দেয়। হাততালিও দিলে সে কিন্তু কেউ তাতে সাড়া দিল না। দাসীদের মধ্যে ছুটোছুটি পড়েছে—কিন্তু ওয়াঙ সাহস করে তাদের জিজ্ঞাসা করতে পারলে না কি ছেলে হয়েছে—অথবা এখনো দু'টি দু'জায়গায় হয়েছে কি না। গভীর ক্লান্তিতে ধূলো-মাখা দেহে তেমনি বসে রইল সে।

সন্ধ্যার মুখে হাসি-মুখে কমলিনী স্থূল দেহ কোকিলার উপর ভর দিয়ে ছোট ছোট পায়ে ছুটে এল। হাসতে হাসতে সে খবর দিল—'তোমার ছেলের ছেলেই হয়েছে—আমি নিজে দেখে এলাম। মায়ে-পোয়ে সুস্থ আছে। ছেলেটি হয়েছে চমৎকার—এই মোটা-সোটা!'

তখন উঠে দাঁড়িয়ে এক-মুখ হেসে ওয়াঙ হাতে হাত বাজিয়ে বললে—'যেন নিজেরই প্রথম ছেলে হচ্ছে এমনি ভাবে বসেছিলাম আমি। কি যে করব—এমন ভয় হয়েছিল সব তাতে।'

কমলিনী চলে গেলে বসে বসে নিজের মনে বললে ওয়াঙ—'সত্যি—বড় খোকার মার যখন হয়েছিল তখন এত ভয় খাইনি।' বসে থাকতে থাকতে ওয়াঙের মনে পড়ল সেই দিনটির কথা যে-দিন ওলান একা ছোট অন্ধকার ঘরে গিয়ে নিজের প্রথম সন্তান প্রসব করেছিল। মনে পড়ল তার পর কত বার কত নিঃশব্দে সে ওয়াঙকে তার ছেলে-মেয়ে দিয়েছে। আবার তার পরই মাঠে এসে স্বামীর পাশে পাশে খেটেছে। আর এই তার বৌমা ছেলেমানুষের মত কাঁদছে অথচ এক-বাড়ী দাস-দাসী ছুটোছুটি করছে—তার স্বামী তার ঘরের বাইরে উন্মুখ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কত দিনের স্বপ্ন দেখা কথা যেন মনে পড়ল। কাজ করতে করতে একটু বিরাম নিয়ে ওলান ছেলেকে পেট ভরে দুধ খাওয়াচ্ছে, আর দুধের সাদা ধারা মাটিকে ভিজিয়ে দিচ্ছে! কত দিনের কথা এ সব—যেন সত্যি নয় মনে হয়।

পুত্র-গর্বে দীপ্ত বাপ এলো তার পর। হেসে বললে সে,—'ছেলে হয়ে গেছে জানো বাবা। এবার তার জন্যে এক জন ধাই-মা ঠিক করতে হবে যে তাকে দুধ খাওয়াবে। আমার বৌকে আমি ছেলেকে মাই খাওয়াতে দেবো না—তাতে তার শরীরও খারাপ হবে, রূপও ঝরে যাবে। সহরের কোন মা-ই তা করতে দেয় না।'

বিষণ্ণ কণ্ঠে জবাব দিল ওয়াঙ—'তাই হবে। নিজের ছেলেকে যদি মাই দিয়ে মানুষ করতে না পারে, নাই পারল সে।'

অথচ বিষণ্ণতার কারণ কি তা বুঝলে না ওয়াঙ।

ছেলের বয়স এক মাস হতেই বাপ ভোজের আয়োজন করলে। ছেলের মামার বাড়ীর লোকেরা এল—আর নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন সহরের নাম-করা লোকেরা। অনেক শ' মুরগীর ডিম লাল রঙ করিয়ে রেখেছিল বাপ। প্রত্যেক অতিথিকে একটি করে সেই ডিম উপহার দেওয়া হোল। নবকুমার দশ দিন পার হয়েছে, সুতরাং আর ভয়ের কারণ নেই, তা ছাড়া ছেলেটি হয়েছে দিব্যি মোটা-সোটা সুতরাং সকলেই আনন্দে মেতে উঠল। ভোজের পর বড় ছেলে এসে বাপকে বললে—'আমাদের এই বাড়ীতে এখন আমরা তিন-পুরুষ হলাম। বংশও আমাদের সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পূর্বপুরুষদের পরিচয়-পত্রিকা তৈরী করিয়ে উৎসবের দিন তা পূজা করার ধারা প্রবর্তন করব আমরাও। বনেদী সব ঘরেই তাই হয়।'

এই প্রস্তাবে ওয়াঙ অত্যন্ত খুসী হয়ে উঠল। তার হুকুমে ব্যবস্থাও সব হোল। বড় হলঘরে সাজানো হোল পাশাপাশি নাম-পত্রিকা। প্রথমে ওয়াঙের ঠাকুর্দা, তার পাশে ওয়াঙের বাবা, পরের গুলি এখন শূন্য রইল। বড় ছেলে ধূপদানি কিনে এনে বসালে সেগুলির সামনে।

ওয়াঙের মনে পড়ল যে সহরের দুর্গতিনাশিনী দেবীকে লাল পোষাক দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সে। মন্দিরে গিয়ে ওয়াঙ পোষাকের টাকা ধরে দিয়ে এল।

দেবতারা যখন মানুষকে দেন তার মধ্যেও কাঁটা রাখেন। মন্দির থেকে ফেরবার পথে ওয়াঙ শুনতে পেল এক জনের কাছে যে চীং

হঠাৎ মরতে বসেছে—ওয়াঙ যেন তাকে দেখতে যায় এই কথাই বলে দিয়েছে সে। লোকটি হাঁফাতে হাঁফাতে এসেছে মাঠ থেকে।

তার কথা শুনে রাগে চেঁচিয়ে বললে ওয়াঙ—'সহরের দেবীকে রাঙা পোষাক দিলুম বলে ঐ জমির দেবতা ছ'টোর হিংসে হয়েছে। জমির ফসলের ভালো-মন্দ করতে পারেন এঁরা, কিন্তু ছেলে-মেয়ের ওপর এদের কোনই হাত নেই—আমি বলতে পারি।'

ছপুরের খাবার তৈরী বাড়ীতে। কমলিনী তাকে অনুনয় করলে রোদ পড়ে গেলে যাবার জন্যে—কিন্তু ওয়াঙ কিছুই মুখে দিলে না—দ্রুত-পায়ে বেরিয়ে গেল। এক জন দাসীকে তেলা কাগজের ছাতি ধরতে পাঠালে কমলিনী—কিন্তু ওয়াঙের দ্রুত-পায়ে হাঁটার সঙ্গে পাল্লা রাখতে মোটা দাসী হিমসিম খেতে লাগল।

যে ঘরে চাংকে শুইয়ে রেখেছে, সে ঘরে ঢুকে ওয়াঙ চেঁচিয়ে বললে—'কি করে হোল এ সব ব্যাপার ?'

মজুরদের জটলা ছিল ঘরের ভিতর। তারা তাড়াতাড়িতে কথা গুলিয়ে সবাই একসঙ্গে বলতে সুরু করল।

'নিজেই বাড়ার কাজ নিলে…'। 'এ বয়সে অতখানি খাটুনি—বলেছি কত বার……' 'নতুন একটা মজুর এসেই. হত সব…' 'ধরতেই জানে না সোজা করে, চাং তাকে দেখিয়ে দিতে গেল……' 'ও খাটুনি কি ওর বয়সে চলে…।'

হুঙ্কার দিয়ে উঠল—'কে মজুর দেখি ?'

সবাই মিলে ঠেলাঠেলি করে ওয়াঙের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দিলে একটি মোটা গাঁয়ের ছেলেকে। কর্তার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ানক কাঁপছে সে তখন। কিন্তু ওয়াঙ তাকে মাপ করলে না—ছ'হাতে চড় মারলে ছেলেটার ছ'গালে। তার পর দাসীর হাত থেকে ছাতাটা ছিনিয়ে নিয়ে তাই দিয়ে মারতে লাগল মজুরটাকে মাথায়। পাছে এই বয়সে কর্তার রাগ তার রক্তে চলে গিয়ে রক্ত বিষিয়ে দেয় এই ভয়ে কেউ কিছু বলতেও ভরসা করলে না। ছেলেটা মাথা নীচু করে মার খেতে লাগল নিঃশব্দে। শুধু বেরিয়ে পড়া দাঁত-গুলিতে জিব বুলিয়ে নিতে লাগল সে।

বিছানা থেকে চাং গোঙাচ্ছে শুনতে পেয়েই ওয়াঙ ছাতা ফেলে দিলে মাটিতে—বললে—'এই হতচ্ছাড়াটাকে মারছি আমি—আর ওদিকে মানুষটা মরে যাচ্ছে।'

চাংয়ের পাশে বসে বন্ধুর হাতখানি তুলে নিলে ওয়াঙ। শুকনো ওক পাতার মত চাংয়ের হাত শুকিয়ে হাল্কা আর ছোট হয়ে গেছে। তপ্ত হাত দেখলে কেউ বলবে না যে এ শরীরে আর রক্ত আছে। মুখখানি কালো হয়ে গেছে—রক্তের ফোঁটা ফোঁটা দাগ হয়েছে চামড়ায়—আধ বোজা চোখে পর্দা পড়েছে। হাঁফের সঙ্গে নিশ্বাস নিচ্ছে চাং। ঝুঁকে পড়ে ওয়াঙ চেঁচিয়ে বললে বন্ধুর কাণে—'শুনছ চাং! আমি এসেছি। আমি তোমার জন্য কফিন কিনে আনব আমার বাবার মত ভাল জিনিষ—বুঝেছ ?'

চাং সে কথা শুনলেও না। আর শুনতে পেল কি না তার কোন চিহ্নও দেখা গেল না। সেইখানে শুয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে এক সময় মরে গেল চাং।

বন্ধু চাংয়ের মৃতদেহের উপর হুমড়ি খেয়ে ওয়াঙ কাঁদলে। এত কান্না কাঁদলে সে যা তার বাবার মৃত্যুতেও সে কাঁদেনি।

দামী কফিন কিনিয়ে আনালে ওয়াঙ। পুরোহিত এলো। শবযাত্রার পিছনে শোকের সাদা পোষাক পরে ওয়াঙ হেঁটে গেল। বড় ছেলেকেও ওয়াঙ কনুইতে সাদা ফিতে পরতে বললে যা আত্মীয়-বিয়োগেই লোকে পরে। ছেলে অনুযোগ করে বললে বটে—'চাং ত ঘরের চাকর বই আর কিছু ছিল না।' চাকরের জন্য ও-ভাবে শোক করা ভাল দেখায় না। কিন্তু ওয়াঙ তাকে তিন দিন শোক পালনে বাধ্য করলে। নিজের ইচ্ছামত সবটুকু কৃত্য সারতে পারলে ওয়াঙ বন্ধুকেও তাদের পারিবারিক সমাধির ভিতরেই আশ্রয় দিত, যেখানে তার বাবা আর ওলান আছেন, কিন্তু ছেলেরা তা হতে দিলে না।

তারা আপত্তি করে বলল—'ঠাকুর্দা, মা কি চাকরের সঙ্গেই থাকবেন ? আমরাও কি চাকরদের সঙ্গে কবরে যাব ?'

ছেলেদের সঙ্গে বিরোধ করে পারিবারিক শান্তি নষ্ট হতে দিতে চাইলে না ওয়াঙ। সুতরাং কবরের দেওয়ালের পাশেই চাংকে শুইয়ে দিলে ওয়াঙ। এতে তার তৃপ্তি হোল এবং ভাবলে—'এই ভালো হোল। চিরকাল অকল্যাণের সময়ে চাং আমায় রক্ষা করেছে—ঐ তার যোগ্য জায়গা।' ছেলেদের নির্দেশ দিলে ওয়াঙ যে তার মৃত্যুর পর যেন চাংয়ের পাশেই তাকে কবর দেয় ছেলেরা।

মাঠে যাওয়া কমিয়ে দিলে ওয়াঙ। চাং নেই—একা মাঠে গিয়ে দাঁড়াতে তার বড় কষ্ট হয়। তা ছাড়া, উঁচু-নীচু জমিতে একা হেঁটে বেড়ালে তার পা কনকন করে, ক্লান্তি আসে বড়। তাই যতটা সম্ভব জমি ওয়াঙ বিলি করে দিলে। লোকে আগ্রহ করে নিয়েও নিলে—কেন না, জমিগুলি সুফলা। ঐ জমির এক কুচিও বেচে ফেলার কথা কোন দিন মুখে আনত না ওয়াঙ। শুধু সুবিধা মত এক বছরের জন্য বিলি করে দিত। তাতে জমি তার নিজেরই থাকবে।

মজুরদের মধ্যে এক জনকে ঠিক করলে ওয়াঙ যে ছেলে-বৌ নিয়ে ঐ বাড়ীতে থাকবে আর দুটি আফিমখোর বুড়ো-বুড়ীকে দেখবে। তখন ছোট ছেলের লুব্ধ দৃষ্টি তার চোখে পড়ল। তাকে বললে ওয়াঙ—'এবার তুমিও চলো সহরে। আর তোমার ঐ অভাগী বৌকেও আমি নিয়ে যাব—ও আমার মহলে আমার কাছে থাকবে। চাং চলে গেলো, তোমারও এখানে ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। আর ঐ লোকগুলো একেও যত্ন করবে না, কেন না, ওকে দেখবার কেউ থাকবে না এখানে। তোমাকেই বা কে জমির কাজ শেখাবে—চাং ত আর নেই।'

ছ'টি ছেলে-মেয়েকে নিয়ে ওয়াঙ সহরের বাড়ীতে এসে উঠল। তার পর অনেক দিন ধরে নিজের বাস্তু-ভিটাতে ফিরে এলো না ওয়াঙ। (ক্রমশঃ।

পাশের বাড়ি

শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিনতা কলেজে যেত, ঠাকুরমা তাই বরদাস্ত করেননি—বোঝার উপর শাকের আঁটি চাপলো, নাতনি যখন গ্রাজুয়েট হয়ে ছাতাটি ঘুরোতে ঘুরোতে স্বাধীন ভাবেই স্কুলে আনা-গোনা সুরু করলে।

ঠাকুরমা বলে, বিনি মাষ্টারণী—এ-ও দেখতে হল। ও মা, কি ঘেন্না!

অতীন হাসেও, বিরক্তও হয়। যুদ্ধ, জাপানী বোমা, ইভ্যাকুয়েশন, মন্বন্তর—কত কি হলো, মা'র কোন হুঁসই নেই। যথা পূর্বং তথা পরম্—বোঝে না, এখন হয়েছে নবযুগের প্রবর্ত্তন। ঠিকাদারি, চোরা-বাজার, অতি-লাভের ব্যবসা এক-একটা ইম্পিরিয়াল রোপ-ওয়েজ—খোঁড়াই হোক আর অন্ধই হোক, লছমন-ঝোলায় চড়ে বসলে জমিন ছেড়ে আসমানে গিয়ে ওঠে। এই মাগ্‌গি জিনিষ-পত্রের আর সস্তা রোজগারের বাজারে স্বামী মেলা দুর্ঘট, আর মেয়েরা ঢুকছে দলে দলে উইমেনস্‌ অক্‌জিলিয়ারি কোরে, কি উদ্দেশ্যে ভগবান জানেন—বিনিও যদি কিছু টাকা ঘরে আনে মাষ্টারি করে, মধ্যবিত্ত হিন্দু গৃহস্থের তাতে এমন কি আসে-যায়?

বাঙালীর ঘরে রোজগেরে মেয়ের আবির্ভাবকে বিনতা দেখে আর একটি দৃষ্টি-কোণ থেকে। দেশ চলেছে স্বাধীনতার পথে এগিয়ে পিছনের শিকল-বাঁধা কুসংস্কারগুলির পিছটান কাটিয়ে। প্রগতির জয়যাত্রায় বাঙালী নারীর অভিযান—তাকে আত্মনির্ভরশীল না হলে চলবে কেন?

ছোঁয়াচ বাতাসে ওড়ে—ঘেন্না হয় তবু এড়িয়ে যাওয়া চলে না। স্বাধীন হাওয়ার স্পর্শ-দোষও তেমনি গিয়ে লাগে পাশের মুসলমান-বাড়ির আনোয়ারা বেগমকে। দোতলার জানালার পিছনে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে ঈর্ষার দৃষ্টিতে সে দেখে বিনতাকে হাত-ব্যাগটি দুলিয়ে বেরিয়ে পড়তে। মা গো মা—হিন্দুর মেয়েগুলো হয়েছে পুরুষেরও বাড়া! আগে থাকতো কেমন সাত হাত ঘোমটা দিয়ে, আর এখন ট্রামে-বাসে চড়ে বেড়ায়—চাকরিও করে। তার স্বামী হাফেজ সায়েবের আপিসেও না কি ক'জনা হিন্দু মেয়ে কেরাণীর কাজে ঢুকেছে। সরমও লাগে না ওদের!

এই সব বে-পর্দ্দা বলেহাজ মেয়েগুলোর কী বিতিকিচ্ছি কাণ্ড! কৌতূহলও ত আর দাবিয়ে রাখা চলে না। মন্দর টান যে ভাল চেয়েও বেশি! মন্দর অন্দরে উঁকি-ঝুঁকি মেরে দেখতে ভালরও ইচ্ছে হয়। মাঝে মাঝে আনোয়ারা আসে বিনতাদের বাড়ি বোরখা পরে। ঘুলঘুলির আড়ালে সুরমা-টানা কালো চোখ দু'টি সাবধানে মেলে চায়। বিনতা বসায় তাকে যত্ন করে'—পেয়ালায় দেয় চা, রেকাবিতে খাবার। তার মা নিয়তি পাশে বসে গল্প করে। দূরে দাঁড়িয়ে ঠাকুরমা ঘেরা-টোপ পরা অদ্ভুত মহিলাটির মুখের পানে চেয়ে হঠাৎ বলে ওঠেন,—সিঁদুর পর না কেন গা? ওতে যে সোয়ামীর অকল্যাণ হয়।

তিরস্কারের ভঙ্গিতে বিনতা বলে, কাকে কি বলতে হয় তাও জান না ঠাকুরমা? উনিও ত জিজ্ঞেস করতে পারেন, আমরা সিঁদুর মাথায় দি কেন?

কৈফিয়ৎ কেটে বলে, ঠাকুরমা বড্ড সেকেলে।

সে-কালের লোকের কথায় আনোয়ারার মন ভিজে যায়। হাফেজ বলে, সে-কালে রাজত্ব ছিল না কি মুসলমানের। ছেলেবেলায় দেখেছে, এক বুড়ো বামুন আসতো তাদের বাড়ি—আব্বাজান খাতির করতেন, চাচা বলে ডাকতেন। কি চমৎকার মানুষ! যত নষ্টের গোড়াই না এ-কালের মানুষ।

•

দুপুর রাতে শুয়ে শুয়ে আনোয়ারার কোলের ছেলেটি কেঁদেই খুন। খালি কাঁদে আর কাঁদে। আনোয়ারা মাই দেয় না—দেয় মার। হাফেজ পাশটিতে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়—সে-যেন ব্যাঘ্র-গর্জ্জন—ছেলের চীৎকার ছেড়ে ডাকাত পড়লেও ঘুম ভাঙবার নয়। পাশের বাড়িতে টিক উলটো দিকেই কয়েক হাত মাত্র দূরে অতীনের শোবার ঘর। বেশি রাত্রে সবে অতীনের চোখে ঘুমের ঘোর লেগে এসেছে অমনি কোথা থেকে ছেলের কান্না ফিনকি দিয়ে উঠে তাজা রক্তকে দিলে মাথায় চড়িয়ে। ঘুম যায় টুটে, কড়মড়িয়ে বলে ওঠে সে—আঃ, কি প্যান-পেনে ছেলে বাবা! ঠাণ্ডা রাখতে না পারে, একটুখানি আফিম খাওয়ায় না কেন? ঝিমোবে!

আনোয়ারার জোর-গলার আওয়াজ শোনা যায়—চুপ কর বলচি, নৈলে দেব গলাটা টিপে একেবারে জাহান্নামে পাঠিয়ে।

অতীন মনে মনে বলে—দেয় না কেন তাই? আপদ চোকে।

ছেলে ঘুমিয়ে পড়ে, হাফেজেরও নাক-ডাকানি বন্ধ হয়ে আসে।

'টো হাই, কেঁপে-কুঁপে মোড়ামুড়ি—পেয়ারের কথা আর কসম।

কাঁচা ঘুম ভেঙে গিয়ে ঘুম-পাড়ানো কোন মাসী-পিসীই আর অতীনের চোখে বসে না। নিশুতি রাতে ও-বাড়ির দোতলার স্বামি-স্ত্রীর অস্ফুট কূজন, হাসি-রঙ্গ জানালা দিয়ে ভেসে আসে। ছেলেটি থামলো ত ওরা ধরে বেহাগের সুরে সোহাগ। জ্বালাতন!

বিকেল বেলা স্কুল থেকে ফিরে বিনতা বললে, হাফেজ সায়েব আজ স্কুলে এসেছিলেন তার মেয়েকে ভর্তি করতে। সে যদি দেখতে বাবা, নাচন-কোঁদন। এখানে পাঁচিলটা আরও উঁচু হল না কেন? ওখানে জানলাগুলো ও-মুখো কেন? ভিতর দেখা যায়—আবরু থাকবে কেমন করে? এই সব।

আবরু ! তা এখানে কেন ? গুষ্টিশুদ্ধ যমের বাড়ি গিয়ে বসুক। ওদিকে ভুলেও কেউ চাইবে না।

নিয়তি বিরক্ত হয়ে বলে, কথার ছিরি দেখ। অমন করে গাল-পাড়া—ছি !

হাফেজ সায়েব দেখা দিলেন সন্ধ্যের পরই সে-দিন—সঙ্গে মেয়ে জাহানারা।

সসম্ভ্রমে উঠে অতীন তাকে খাতির করে বসালে। পাশাপাশি থাকে, আলাপই হয়নি—আশ্চর্য্য ! অন্যায়টা তারই। উচিত ছিল, দেখা করে প্রতিবেশীর খোঁজ নেওয়া।

বিনয়ে গলে, হাফেজ সায়েব অমনি বলেন, আরে না না, আপনার দোষ কি ? আমিই আসতুম। বিসমিল্লা জানেন, আফিসের কাজ আর নমাজ পড়তেই সারা দিন কাটে। ফুরসৎ কই ?

অতীন হাসে। রাত্তিরের সেই ব্যাঘ্র-গর্জ্জন, বিবির সঙ্গে ঢলাঢলি—নেহাৎ খামকা মনে পড়ে যায়।

হাফেজ বলেন, মক্তবে পড়তো মেয়েটা আরবী পারসী—এছলামের পবিত্র শিক্ষা, ঐ ত চাই মেয়েদের। ইংরেজী পড়ে কি হবে ? গার্ল স্কুলে সব টিচারই হিন্দু—এক জনাও মোসলেম নেই।

তা'হলে দিলেন কেন ওখানে ?

আরে মশায়—আক্কেল-সেলামি আর বলে কাকে ? মেয়ের মা চান হিন্দুর নকল করতে। ওড়না সালোয়ার ত উঠেই গেল। এখন হয়েছে হিন্দু-কেতায় শাড়ি পরা। হিন্দুর মেয়েগুলো ধর্ম খেয়েছে। এবার মুসলমান মেয়েদের উচ্ছন্ন যাবার পালা।

খোলা-মেলা বাচাল মানুষ হাফেজ সায়েব—মনের কথাগুলো বলতে আটকায় না, দেশকাল-পাত্রেরও বালাই নেই।

অতীন ভাবে, আচ্ছা ফিকির ত ! হিন্দুর কেতা-কানুনও নেবেন, আবার তাই নিয়ে গাল দিতেও ছাড়বেন না !

এই যে, মিস সরকার ! আপনার ছাত্রীকে এনেছি দেখুন।

জাহানারার হাত ধরে বিনতা কাছে টেনে নিলে। বেশ মেয়েটি, আট-নয় বছর বয়স, মাথায় লম্বা বেণী, কানে দুল। কোমল মুখ-চোখে সুরমার টান—মার মতন।

বিনতা হাসতে হাসতে বললে, জাহানারা আমার পুরানো বান্ধবী। এখন থেকে হলো গুরু-শিষ্যার নতুন সম্বন্ধ।

হাফেজ সাহেব ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, তোবা তোবা ! গুরু আপনাদের দেবতা। রবীন্দ্রনাথকে ডাকতেন আপনারা গুরুদেব। দেবতা হল আমাদের হারাম।

অতীন ভাবে,—মূর্ত্তি-ভাঙার মামদো এদের কী নাচানই না নাচাচ্ছে ! গুরুদেব, বন্দে মাতরং—সবেতেই দেব-দেবী, গুণা, হারাম ! আর ঢাকের বাদ্যি কানে গেল ত অমনি—তিড়িং তিড়িং—

হেসে বললে, হাফেজ সাহেব, দেবতার হারামি ছাড়াও দু'-পাঁচটা নির্দ্দোষ সম্পর্ক আছে, যেমন মাসী, পিসী, দিদি। ওর একটা বেছে নিলেই চলবে।

জাহানারা রোজই আসে বিনতার কাছে বইটি হাতে নিয়ে। বলে, পড়াটা বুঝিয়ে দিন না বিনিদি'।

মেয়েটিকে বিনতার ভারি ভাল লাগে। কেমন ঢল-ঢলে মুখ, কী মিষ্টি কথা ! তার যদি অমন একটি বোন থাকতো !

পূজোর ঘর থেকে ঠাকুরমা চোখ পাকিয়ে দেখে, মেয়েটাকে কী যত্নই করে বিনি। লজেঞ্জ, চকলেট, এটা-ওটা উপহার দেয়। ওর এমনি সব ছিষ্টিছাড়া কাণ্ড ! সে-দিন পাশের মোছলমান-বাড়ির দোরে দাঁড়িয়ে একটা ভিকিরি মেয়ে—হিন্দু নয় সে, মুসলমান—খেতে দাও গো বলে চেঁচিয়ে গলা ফাটাচ্ছিল, ওরা কেউ সাড়াটিও দেয়নি। ইস্কুল থেকে ফিরে বিনি চা খেতে বসেছে, মেয়েটার চ্যাচানি শুনে ডেকে সবটা খাবার তাকে দিলে—বাড়িতে আর এক রত্তিও নেই যে নিজে খাবে। আরে মর—তোর এ সব মোছলমান মেয়ের জন্ত দরদ কেন ? বলে, 'যার ঘর সে রাখবে—তোর ত মা'র হয়ে মাসীর বিয়োনো' !

জাহানারা ফিরে ফিরে চায়—ঠাকুরমা কেমন বসে বসে পূজো করে, আঙুলগুলি জড়িয়ে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে, মাথায় ঠেকিয়ে। সামনে পিতলের আসনে ঠাকুর। সে এগিয়ে আসে দেখতে।

ঠাকুরমা হা-হা করে ওঠে—এদিকে নয়। বলে, তোর ঠাকুর দেখতে সাধ—না ? তা বাছা, এ জন্মটা কোন মতে কাটিয়ে দে—পরজন্মে দেখিস্। আর জন্মে কি পাপই না করেছিলি, তাই মুসলমানের ঘরে জন্মেছিস্ !

ঝাঁঝালো গলায় বিনতা বলে, আর জন্মের পাপ ওর চেয়েও আমাদের ঢের বেশি, ঠাকুমা ! খালি জাতি-বেজাতি আর ছোঁয়াছুঁয়ি ! ঐ পাপেই ত দেবতা মরেছেন—হয়েছেন অপদেবতা।

রাত্তিরে ঘুমের মুখে অতীনের কানে আসে ছেলের কান্নাও নয়, দম্পতির সোহাগও নয়—

হাফেজ সায়েব জলদ-গম্ভীর স্বরে পত্নীকে বোঝাচ্ছেন—পলিটিক্স্। বখ্‌তিয়ার খিলিজি বার জন মাত্র সৈন্য নিয়ে বাংলা জয় করেছিলেন। হিন্দু কমবখ্‌ত—মোশলেম নেশন—পাকিস্থান—

হঠাৎ জাহানারার এ-বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেল। ইস্কুলে বিনতা জিজ্ঞেস করলে, কেন আর পড়তে আসিস্ না বল ত ?

মা আসতে দেয় না, বিনিদি'। হিন্দু-বাড়িতে না কি বিষ খাইয়ে মারে। মিছে কথা—আমি জানি—লুকিয়ে যাব তোমার কাছে।

বলতে বলতে সে ফুঁপিয়ে কাঁদে। বিনতার মনও ভারি হয়ে আসে—এ কোন্ ব্যাধি ঢুকেছে মানুষের মনে ? ঘুণের মত ভিতরটা দিচ্ছে ঝাঁঝরা করে'।

আঁচল দিয়ে জাহানারার চোখ মুছিয়ে আদর করে বলে, না-ই বা এলি আমাদের বাড়ি। আমি তোকে ওখানেই পড়া বলে দেব।

জিন্দাবাদের ঠেলায় জল-জিয়ন্ত মানুষগুলি ধড়াধ্বড় মুর্দ্দার ফরাসে চড়ে বসলো। বক্তিয়ার খিলিজি, রাণা প্রতাপের নামও শোনেনি অনেকে যে, ঐ নামের পারানি দিয়ে বৈতরণী পার হবে।

সংবাদপত্রের ভাষায় যাকে বলে, চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতি—অবস্থা দাঁড়ালো তাই। সবাই দেখে হাতির মত ছোট ছোট চোখ দিয়ে—পরের দোষ পাহাড়ের মত বিরাট, নিজের ধুমসো দেহটি নজরে পড়ে না।

রাস্তার লোক চলাচল বিরল। ছোরা-ছুরি-এসিড—কোথা থেকে কি বিপদ এসে পড়ে—সবাই সন্ত্রস্ত !

হিন্দুর ব্রহ্মা চতুর্মুখ, চার দিকেই দৃষ্টি—মুসলমানের খোদা নিরাকার—আততায়ীরা তাকে ধরতে-ছুঁতে পারে না।

সৃষ্টিকর্তাদ্বয় নিজেরা নিরাপদ—শুধু মানুষকেই বিপদে ফেলেছেন তাঁরা পিছনে এক জোড়া চোখ বসাতে ভুলে গিয়ে! তা হলে আর কারু পথ চলতে ভয় করবার কারণ থাকতো না।

সন্ধ্যের পর সুরু হল পুষ্পবৃষ্টি নয়, উল্কাবৃষ্টি—উল্কাও নয়, ইষ্টক।

একখানা থান ইট উঠানে অতীনের পায়ের গোড়ায় পড়তে সে লাফিয়ে ওঠে। বলে, বাস রে—একটু হলে লেগেছিল আর কি! নিশ্চয় পাশের বাড়ি থেকে পড়েছে। দেখাচ্ছি মজা। ওরে মেধো, ছোঁড় ইট। নিয়ে আয় লাঠিগাছ—

শশব্যস্তে ছুটে আসে নিয়তি। বলে, ও-সব তুমি কি করছ পাগলের মত—

পাকিস্থানের ভূত নামাচ্ছি।

উত্তেজিত পিতাকে বিনতা দু' হাতে সামলে বলে, ভূতের গায়ে ইট লাগে না বাবা। মরে নিরীহ মানুষ।

ও-বাড়িতেও তখন হাফেজ সায়েবের জবর গলার হাঁক-ডাক—কি বলে? ইট ছুঁড়বে—লাঠি চালাবে? মোসলেম নেশনের জেহাদ—ডাইরেক্ট একশন। হারামখোর হিন্দু এবার বুঝুক—

আনোয়ারা তাকে সাবধান করে বলে,—চুপ চুপ—হিন্দুপাড়া দেখচো না? ঢুষমণ চার দিকে—

টহলদারি পুলিস এসে পড়লো। আস্ফালন সূচনায়ই শেষ—খুনোখুনি পর্য্যন্ত এগুলো না।

কয়েক দিন হল্লা-হাঙ্গামার পর আজ রাত্তিরটা স্তব্ধ—নিঝুম। অতীন অঘোরে ঘুমুচ্ছে—ছেলের কান্না, হাফেজ সায়েবের নাক-ডাকানিও নিদ্রাভঙ্গ করতে পারেনি।

নিয়তি ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো। কান পেতে শুনলে ভয়ার্ত গলায় স্বামি-স্ত্রীর কথা—কি যেন হয়েছে!

বিনি—পা টিপে বিনতার ঘরে ঢুকে নিয়তি ডাকলে।

কি মা—চোক ডলতে ডলতে উঠে বসলো বিনতা।

নিয়তি বললে, ও-বাড়িতে গোল শুনছি—

আবার দাঙ্গা না কি?

না, সে-সব কিছু নয়। শুনলুম জাহানারার অসুখ—কলেরাই হবে হয় ত।

অ্যাঁ, কলেরা! বিনতা উঠেই ছুটলো।

দরজা ধাক্কা দিলে। ওপর থেকে হাফেজ সায়েবের ডাক—কে?

আমি বিনতা—মিস সরকার।

কি দরকার?

জাহানারার অসুখ—না? তাকে দেখবো একবার।

হাফেজ সায়েব নিচে এসে দরজা খুলে দিলেন।

খাটের উপর অসাড়ে পড়ে আছে জাহানারা—নিথর নিস্পন্দ—হাত-পা হিম হয়ে গেছে। এক পাশে আনোয়ারা আকুল ভাবে কাঁদছে।

রুগ্ন মৃতপ্রায় বালিকার ঠোঁট দু'টিতে যন্ত্রণার চিহ্ন। ভাঙা-ভাঙা গলায় সে আপন মনেই প্রলাপ বকে গেল—বিষ—বিষ—যাব না মা হিন্দুর বাড়ি—

বিনতার হাত ধরে কাকুতি-ভরা গলায় উচ্ছ্বসিত ভাবে বলে উঠলো আনোয়ারা—বাঁচাও—ওকে বাঁচাও—

অমন অধীর হবেন না। ডাক্তার ডেকেছেন?

দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো। কে বেরুবে দাঙ্গার মধ্যে হিন্দুপাড়ায়?

বিনতা এসে অতীনকে ধরলে—বাবা, ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

অতীন বলে উঠলো—ক্ষেপেছিস? মোছলমানের বাড়ি কোন হিন্দু ডাক্তার আসবে?

বাবা, আমি যে কথা দিয়ে এসেছি—ডাক্তার আনবো—বাঁচাবো—

রেগে-মেগে অতীন বললে, কথা দেবার আর জায়গা পেলি নে। ইট ছুড়বে, গাল দেবে—

নিয়তি বলে উঠলো—হ্যাঁ গা, তোমরা কি সব পশু হয়ে উঠছ? মায়া-মমতা গেলে মানুষের আর কি থাকে বল ত? ছি ছি—

বাবা তোমার পায়ে পড়ি—বিনতা কাঁদো-কাঁদো ভাবে মিনতি করলে।

আচ্ছা থাম। চললুম আমি। নিজে না গেলে ডাক্তার ত আর আসবে না।

জামা-জুতো পরে অতীন বেরুলো—ডাক্তার ডাকতে।

শ্রীভবেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

অর্জ্জুন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল।

ত্রেতাযুগের তৃতীয় পাণ্ডব কুরুক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া জয়দ্রথ-বধের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিলেন না, করিলেন—নিতান্তই কলুষ যুগের বাছাড়-বংশীয় অর্জ্জুন ধানের ক্ষেতে বসিয়া বিবাহের প্রতিজ্ঞা। বাঙ্গালীর ছেলের বিবাহের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা সহজ হইলেও বাঙ্গালী কৃষক অর্জ্জুনের পক্ষে এ প্রতিজ্ঞা অতিশয় কঠোর। কারণ, গাবোখালীর অর্জ্জুন বাছাড়, চালচুলা-অভিভাবকহীন অর্জ্জুন বাছাড়,—তাহার পক্ষে হরিদাসকাটীর কমল সর্দ্দারের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করিবার প্রতিজ্ঞা করা আর সাধ করিয়া ভাষানের দলের অভিরাম ভাঁড়ের পার্ট বলা একই কথা। এ-হেন কঠোর প্রতিজ্ঞা সমাধা করিয়া কাস্তে হাতে উত্তেজিত ভাবে অর্জ্জুন যখন উঠিয়া গাঁতার সহকর্ম্মীদের দিকে তাকাইল, তখন দেখা গেল সকলের মুখেব মধ্যেই গামছার মুড়া ঢুকান রহিয়াছে। অর্জ্জুনের সানন্দ উত্তেজনা চরমে উঠিল। সে আরও কঠিন ভাষায় শপথ করিল—হো মায়ে যদি নিতি না পারি তবে বুলবা যেন্ আমি নটোবর বাছাড়ের ছাবাল না—

ইহার পর আর থাকা যায় না। গাঁতার সঙ্গীদের মুখ হইতে হাসির দমকে গামছার মুড়া বাহির হইয়া পড়িল। অর্জ্জুনও ভীষণ উত্তেজনায় হাতের কাস্তে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

দামিনী মেয়ে নহে, গাছি দা'য়ের ধার—পাতলা লম্বা, সূর্য্যের আলোয় ঝকমক্ করিয়া উঠে, যাহাতে কোপ বসাও তাহাই কাটিয়ে দুই ভাগ হইয়া যায়। এবার কোপ লাগিয়াছে নওদা খেজুর গাছ অর্জ্জুনের বুকে, টানে টানে এক একটা করিয়া ডাল-পাতা ঝরিয়া পড়িতেছে, আর সেই বেদনায় অর্জ্জুন বাছাড় কাঁপিয়া জ্বলিয়া পাগলের মত হইয়া বেড়াইতেছে।

সর্দ্দার-বাড়ী বেগার দিতে দেশের সকলেই যাইতে পারে। কিন্তু, স্বর্গীয় নটবর বাছাড়ের তরুণ পুত্র অর্জ্জুন বাছাড়ের যাইবার কি দরকার ছিল তাহা সমস্যার বিষয়। আর যদি গেলই, তবে কেন যে মরিতে সকলের সাথে ক্ষেতে লাঙ্গল দিতে না গিয়া ভোজের রান্না-বান্নার কাজে সাহায্য করিতে গেল তাহা আরও দুর্ব্বোধ্য সমস্যার বিষয়। রান্নার যোগান দিতে গিয়াই ত তাহার সর্ব্বনাশ হইল, বুকে গাছি দা'য় কোপ পড়িল।

সর্দ্দারদের পুকুরে খেজুরের গুঁড়ি দিয়া সিঁড়ি তৈয়ারী হইয়াছে। দুই হাতে দুইটা ঘড়া লইয়া জল ভরিতেছে অর্জ্জুন। একটি কলসী ভরিয়া খেজুরের গুঁড়ির উপর রাখিয়া আর একটির জল ভরতে মনোযোগ দিয়াছে। উপরে পুকুর-পাড়ে কাহার কণ্ঠস্বর শোনা গেল—চৈ চৈ—চৈ চৈ, ফুর্-র্-র্-রু···

চোখ ফিরাইয়া দেখিবারও অবকাশ মিলিল না! কাঁধ ও পিঠের ওপর ঝুপ-ঝুপ করিয়া দুইটা হাঁস লাফাইয়া পড়িল। অর্জ্জুন বিমূঢ়ের মত তাকাইতেই কে যেন খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল, তার পরই একটি বালিকা দেহ শাঁক্ করিয়া নারিকেল গাছের আড়ালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

অর্জ্জুনের মধ্যে সহসা পৌরুষ জাগ্রত হইল। সে কোন দিকে না চাইয়া সোজা উপরে উঠিয়া গেল! ঝাঁকা লাগিয়া কলসী দুইটি পুকুরে গিয়া পড়িল, আধ-ভরা কলসীটি বগ-বগ শব্দে ডুবিতে লাগিল।

নারিকেল গাছের গোড়ায় বনমরিচার লতা, তাহার আড়ালে কাপড়-পরা দেহ। অর্জ্জুনের আর সহ্য হইল না। সেই কাপড় ধরিয়া সে হ্যাঁচকা টান মারিল। অকস্মাৎ এক ফরসা কিশোরী মেয়ে দুই হাতে বুক চাপিয়া ছাগলের মত চোখ মেলিয়া ব্যাকুল ভাবে তাহার দিকে তাকাইয়া কহিল—দেখতি পাইনি নহিন্দার—

এই দৃশ্যের সামনে অর্জ্জুন স্তব্ধ হইয়া গেল। মেয়েটিও এই অবকাশে কাপড় টানিয়া ছড়া বলিতে বলিতে ছুট দিল—'নহিন্দার নহিন্দার, সুনার নহিন্দার; সাতালী পব্বোতে বাঁধলাম মুয়ার বাসোর ঘর—'

ভাসানের দলে লক্ষ্মীন্দর সাজিবার অপরাধ আজ অর্জ্জুন মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিল। লক্ষ্মীন্দর সাজিয়ে এত দিন সে যে নকল বেহুলার পিছু-পিছু গান করিয়া ছুটিয়া বেড়াইয়াছে তাহার জন্য লজ্জা অনুভব করিল। অকস্মাৎ সে বুঝিল, এই জনহীন পুকুর-ধারে ছায়াচ্ছন্ন নারিকেল তলায় আজ সে সত্যকার বেহুলাকে দেখিয়াছে, আর সেই বেহুলা তাহার বুকের তলায় মধু ও বিষের পাত্র এক সাথে ঢালিয়া গিয়াছে।

কিন্তু, গাবোখালীর কাছে পোড়া বিলের মাঝখানে ধানের জমিতে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করা এক, আর হরিদাসকাটির সুবিখ্যাত সর্দ্দার-বাড়ী হইতে দামিনীকে লইয়া আসা আর এক। আর, সর্দ্দার বলিতে যে-সে

সর্দ্দার নহে, স্বয়ং কমল সর্দ্দার, যে এখনও হাতে-পায়ে সড়কী ছুঁড়িয়া সামনে-পিছনে সমানে ছুটিতে পারে এবং যাহার বাড়ীতে এখনও দুইটি গোলা, চার জোড়া বলদ আর তিনখানা লাঙ্গল জলজ্যান্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। অর্জ্জুন ভাবিয়া কূল পায় না। অথচ চুল-কটা ছাগলচোখী করসা দামিনীর জন্য সে শামুকভাঙ্গার মত ডানা ঝাপটাইতে থাকে।

শনিবারের দিন কাঁটাল কিনিবার জন্য অর্জ্জুন মণিরামপুরের হাটে গেল। হাটের মাঝখানে দেখা হইয়া গেল ভাগ্যিধরের সাথে। ভাগ্যিধর তাহার পিসীর বড় ছেলে। বাড়ী হরিদাসকাটিতেই। সে ছাড়িল না। অর্জ্জুনকে ধরিয়া লইয়া গেল। অনেক দিন পরে ভাইপোকে দেখিয়া পিসীর বুকে মাতৃ ও পিতৃস্নেহ একত্রে উদয় হইল। পিসীর আদর ও অর্জ্জুনের প্রাণ—দুইয়ের মধ্যে টান পড়াপড়ি আরম্ভ হইল।

রাত্রিবেলা অর্জ্জুন আর থাকিতে পারিল না। পিসীর বড় মেয়ে বাল্যবিধবা কাঞ্চন। শুইবার আগে ফাঁকা পাইয়া অর্জ্জুন তাহার পা জড়াইয়া ধরিল। দামিনীকে না পাইলে নশ্বর এ জীবনে তাহার যে কোন প্রয়োজনই নাই তাহাও জানাইয়া দিল। কাঞ্চন হাসিয়া ফেলিল, 'মদ্দো মানুষ না' বলিয়া অর্জ্জুনকে গালাগালি দিল। তার পর পাছা বাঁকাইয়া ভ্রূ টানিয়া কহিয়া গেল—

'কামিনী ফুলির গন্ধ,
ভাইডি আমার ধন্দ,
চ্যামড়া মানুষ খুন,
দেহি হাতের গুণ—'

কাঞ্চন করিত-কর্ম্মা মেয়ে, জোড় লাগাইতে ও চিড় কাটাইতে সমান ওস্তাদ। তাহার হাতের গুণের উপর অর্জ্জুনের অকাট্য বিশ্বাস। অর্জ্জুনের বুকে আশার আলো জ্বলিল।

পরদিন অর্জ্জুনের যাওয়া হইল না। কাঞ্চনের চেষ্টায় দামিনী ও অর্জ্জুনের মধ্যে বিছালী ঘরে সাক্ষাৎকার ঘটিল। অর্জ্জুন সোজা-সুজি প্রস্তাব করিয়া বসিল। দামিনী অর্জ্জুনের গালে চড় মারিয়া 'নহিন্দার নহিন্দার' গাহিতে গাহিতে পলাইয়া গেল। অর্জ্জুনও এক আঁটি বিছালি ছুড়িয়া মারিল।

কাঞ্চনের চেষ্টা আরও আগাইল। সন্ধ্যাবেলা তাহার পিতা অর্থাৎ অর্জ্জুনের পিসেমশাই সর্দ্দার-বাড়ী গিয়া কমল সর্দ্দারকে ধরিয়া বসিল। অর্জ্জুনের মত ছেলে কলিকালে আর জন্মে নাই, কাজেই দামিনীর মত মেয়ের যদি কোথায়ও বিবাহ দিতে হয় তবে···

কমল সর্দ্দার ভাল মানুষ, সোজা করিয়াই কথা বলে। তিনটা পাশ দেওয়া স্বজাতির ছেলে পাইলে সে আর অন্যত্র মেয়ের বিবাহ দিবে না। তবে যদি একান্তই না পাওয়া যায়, তবে তাহাদের চেয়ে নীচু ঘর বাছাড়দের বাড়ীতে মেয়ে দেওয়ার কথা সে চিন্তা করিয়া দেখিবে, কারণ, বিবাহ জিনিষটার উপর কাহারও ত হাত নাই!

দামিনীর বাবা ঘুঘু লোক। তিনটা পাশ করা ছেলে সম্বন্ধে সে নিশ্চিন্ত হইয়া গেল। কারণ, সর্দ্দার-বাড়ী আজ আর সত্যকার সর্দ্দার-বাড়ী নাই। কমল সর্দ্দার ঢাল-সড়কী লইয়া সামনে-পিছনে ছুটিলেও এবং গোলা-পালা-লাঙ্গল-খামারে তাহার বাড়ী জমজম্ করিলেও সর্দ্দার-বাড়ীর ভিতর ফাঁপা—ইঁদুরের চালার মত। প্রতাপকাটীর বক্সীদের টাকার জোরে হরিদাসকাটীর সর্দ্দারদের জমা-জমিতে বাঁধন পড়িয়াছে। সে বাঁধন বড় শক্ত বাঁধন, তাহার হাত হইতে কমল সর্দ্দারের বড় বড় ধানী জমির নিস্তার নাই। তাই বক্সীদের ধরিতে পারিলেই আজ কাজ হাসিল।

পিসী-পিসেতে পরামর্শ হইল, সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল। কাঞ্চনের মারফৎ সেই সিদ্ধান্ত অর্জ্জুনকে জানান হইল। অর্জ্জুন শুনিয়া খুসী হইল এবং খুসী হইয়া বাড়ী না গিয়া সোজা প্রতাপকাটী গেল। বক্সীদের একমাত্র উত্তরাধিকারী পদ্মা বাবুর সাথে বক্সীবাড়ীর পাঠশালার অর্জ্জুন দ্বিতীয়-মান পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছিল। তাই পদ্মা বাবুর সাথে তাহার বিশেষ সম্প্রীতি আছে।

বহু চেষ্টার পর পদ্মা বাবুর সাথে যখন তাহার সাক্ষাৎ হইল, তখন পদ্মা বাবু সত্যই অর্জ্জুনকে সহপাঠীর ন্যায় আদর-যত্ন করিলেন। অর্জ্জুন গোপনে তাহার মনের কথা বলিল। শুনিয়া পদ্মা বাবু হাসিয়া কহিলেন, বুদ্ধি তোমার ত দেখছি চাষার মত নয়।

ইহাতে অর্জ্জুন বিশেষ আপ্যায়িত বোধ করিল।

ইহার পরও অর্জ্জুন কয়েক দিন পদ্মা বাবুর বাড়ী হাঁটাহাঁটি করিল। পদ্মা বাবু অর্জ্জুনের অগোচরে মেয়েটির সম্বন্ধে খোঁজ লইলেন। লোক আসিয়া মেয়েকে সুন্দরী বলিয়া জানাইল; শুনিয়া পদ্মা বাবু প্রথমে গম্ভীর হইয়া গেলেন, পরে তরুণ গোঁফের ফাঁক দিয়া বাঁকা হাসিলেন। পরদিন কমল সর্দ্দারকে ডাকাইয়া আনিয়া বিশেষ আদর-আপ্যায়নের পর অর্জ্জুনের সহিত দামিনীর বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কমল সর্দ্দার প্রথমে স্তব্ধ হইল, পরে বিরক্ত হইল এবং শেষে সম্মানের প্রশ্ন তুলিয়া বাঁকিয়া বসিল।

পদ্মা বাবু কমলকে আশ্বাস দিলেন—তোমার বংশের যাতে মান রক্ষে হয় তার ভার রইল আমার পর। মেয়েকে তোমার সোনা-রুপো দিয়ে মুড়িয়ে যদি আনতে পারে অর্জ্জুন তবেই আনবে, নইলে দামিনীর আমি বি-এল পাশ উকীলের সাথে বিয়ে দেওয়াবো।

এত বড় সস্নেহ আত্মীয়তার সামনে কমল সর্দ্দার মাথা নোয়াইল।

আষাঢ়ের মাঝামাঝি দামিনী ও অর্জ্জুনের বিবাহ হইল। জমা-জমি, ঘর-বাড়ী বন্ধক রাখিয়া পদ্মা বাবুর টাকায় অর্জ্জুন দামিনীর গা গহনায় ভরিয়া দিল। বাজী, বাজনা, সং-যাত্রা কোন কিছুরই অভাব হইল না, সর্দ্দারদের সম্মানও ক্ষুণ্ণ হইল না।

বিবাহের পর অর্জ্জুন কালী-বাড়ী প্রণামের নামে প্রতাপকাটীর পথে বৌকে ঘুরাইয়া লইয়া গেল। বক্সী-বাড়ীর সামনে পালকী থামাইয়া বাড়ীর মধ্যে বৌ দেখাইয়া আনিল। বৌ দেখিয়া পদ্মা বাবু অবাক হইয়া গেলেন, চাষীর ঘরে এমন মেয়ে হইতে পারে এ কথা তাঁহার বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হইল না। আবার তাঁহার তরুণ গোঁফে বাঁকা হাসি খেলিয়া গেল।

সে-দিন রাত্রে অর্জ্জুন আর দামিনী মুখামুখী দাঁড়াইল। দামিনীর মাথায় ঘোমটা নাই, দুই ভরা চোখ মেলিয়া অর্জ্জুনের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। হাসিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখতিছ বেউলো সুন্দোরী?—

নহিন্দারের সুনার বরণ, চোহি আমার লাগে ক্যামোন—

এমনি করিয়া আষাঢ়ের ধারা জলের মধ্যে শুক-শারীর মিলন হইল।

ইহার পর আট-দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। মানুষের সাথে সাথে পৃথিবীরও পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বিবাহের বৎসর পোঁতা খেজুর চারায় চার-পাঁচ কাট দেওয়া হইয়াছে, নারিকেল ও সুপারীর চারায় ফল ধরিয়াছে। নয় দশ বৎসরে দামিনী উনিশ-কুড়ি বৎসরের

হইয়াছে। তাহার সারা দেহে যৌবনের বন্যা নামিয়াছে, ফরসা গায়ের রং সোনার বরণ হইয়াছে। কটা-চুল কালো হইয়া পাছার নীচে পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে, ডাগর ডাগর কালো চোখের দৃষ্টিতে পুকুরের ঢল নামিয়াছে, চওড়া পাছার উপর উঁচু বুক তুলিয়া বেড়াইতেছে। দামিনী কলি আজ কামিনী ফুল হইয়াছে। কামিনী ফুলের গন্ধ ছুটিয়াছে। মৌমাছিদের আনা-গোনার অন্ত নাই। পদ্ম বাবুর তরুণ গোঁফ শিকারী গোঁফ হইয়াছে। পূজার সময় দামিনীকে তাঁহাদের বাড়ী দেখিয়া সেই গোঁফের ফাঁক দিয়া তাঁহার লালা গড়ায়। খুসীতে আধ-বোজা চোখে তিনি দিন গণেন—বার বছরের আর দেরী নাই। বন্ধকী খত তামাদী হইয়া আসিল বলিয়া।

বন্ধকী খত অনেক তামাদী হইয়াছে। অঘোর মণ্ডল, দানেশ গাজী,অখিল বিশ্বাস ও বনটু কারিগরের খত বহু দিন তামাদী হইয়াছে। সেই সাথে তামাদী হইয়াছে কমল সর্দ্দারের খত। তামাদী হইয়াই শুধু ক্ষান্ত হয় নাই, মণ্ডল, গাজী, বিশ্বাস ও কারিগরের সকল জমা-জমি ও আসবাবের সাথে কমল সর্দ্দারের যথাসর্ব্বস্বও বক্সীদের ঘরে উঠিয়াছে। পদ্ম বাবু অবশ্য ভাল লোক, হাতে মারিলেও তিনি কাহাকেও ভাতে মারেন নাই। লোকগুলির জন্য তাহাদেরই হারান ক্ষেতে 'জোন' খাটিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু কমল সর্দ্দার মানী লোক, জমির সাথে সে জান দিয়াছে, তবুও 'জোন' খাটিবার মত সম্মান মাথা পাতিয়া লয় নাই।

বন্ধকী খতের দেনায় যখন সব জমা-জমিই বক্সীদের ঘরে উঠিল, তখন এক দিন নিজের বাঁচিবার দাবীতেই কমল সর্দ্দার অতি গোপনে পদ্ম বাবুর নিকট মিনতি জানাইয়াছিল—অন্ততঃ চার-ছ' বিঘা জমি তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হোক। পদ্ম বাবু তাহাতে নিমরাজী হইয়া গেলেন, হাজার হোক দয়ার শরীর ত! কিন্তু সকল তোড়-জোড় সমাধা করিয়া তিনি একই দিনে সর্দ্দারদের সকল জমিতে ধান কাটিতে লোক পাঠাইলেন। দেবতার এই বিশ্বাসঘাতকতা কমল সর্দ্দার বরদাস্ত করিতে পারে নাই। সে একাই ঢাল-সড়কী লইয়া লাফাইয়া পড়িল জমিতে। তাহার পর যাহা হয় তাহাই হইল। সপ্তরথী মিলিয়া অভিমন্যু বধ করিল। সংবাদ শুনিয়া দামিনী আছড়াইয়া পড়িল। কিন্তু কমল সর্দ্দার আর ফিরিল না, আঠার মেদের জমিতে শেষ নিশ্বাস ছাড়িয়া বন্ধকী খতের দেনা সুদে-আসলে শোধ করিল।

এবার কালী পূজার সময় পদ্ম বাবু ঠিক করিলেন, সকল প্রিয় প্রজা ও খাতকদের নিমন্ত্রণ করিয়া প্রাণ ভরিয়া খাওয়ান হইবে। ইহার জন্য প্রজা ও খাতকদের বাড়ীর সকলকে তিন-চারি দিন আগে হইতে আনা হইল। খাতক-প্রজার মেয়ে-পুরুষে বক্সী-বাড়ী ভরিয়া গেল। সন্ধ্যার পর পুরুষরা বাড়ী ফিরিয়া যায়, মেয়েরা অনেকে সঙ্গে যায়। অধিকাংশ মেয়েই যাইতে পারে না। বক্সীদের ত ঘরের অভাব নাই, সেখানেই রাত্রি যাপন করিয়া তাহারা স্বর্গ-সুখ অনুভব করে।

বক্সী-বাড়ীর দেওয়ান হইতে দারোয়ান পর্য্যন্ত এই বিশেষ নিমন্ত্রণের অর্থ জানে। এই নিমন্ত্রণের দক্ষিণা দিতে হয় প্রজা ও খাতকদেরই। চরম দক্ষিণাই দিতে হয়, কখনও সম্মতিতে, কখনও অসম্মতিতে, আবার কখনও রক্তের মূল্যে। পদ্ম বাবুর দয়ার শরীর, তিনি দক্ষিণার মূল্য বুঝেন, খুশী হইয়া সেই সেই প্রজার অনেক দেনা মাপ করিয়া দেন। খাতক-প্রজারাও দক্ষিণার বিনিময়ে দাক্ষিণ্য লাভ করিয়া খুশী না হইয়া পারে না।

এবারেও এই প্রথার ব্যতিক্রম হইল না। সুতারামপুর ও দানিজহাটার রামতারণ ও শম্ভু তাহাদের স্ত্রীর মূল্যে দেনা শোধ করিল। অবশেষে কালী পূজার দিন রাত্রিতে মকার সহযোগে মাতৃ-সাধনার শুভক্ষণে ডাক পড়িল দামিনীর। কিন্তু তাহাকে আটকাইয়া রাখা গেল না। সর্দ্দার-বাড়ীর মেয়ে বাছাড়দের বৌ বাঘিনী দামিনী জাল ছিঁড়িয়া পলাইয়া আসিল। অর্জ্জুনও তাহার জন্য ক্ষমা চাহিয়া দামিনীকে আবার ভেট দিয়া আসিল না।

ইহার ফল যাহা তাহাই হইল। বন্ধকী খত তামাদীর অবসর পাইল না। পূজার পর আদালত খুলিবার দিনই প্রচুর দেনার দায়ে অর্জ্জুনের বিরুদ্ধে মামলা দাখিল হইল। শমন গোপন করিয়া তিন মাসের মধ্যে এক তরফা ডিক্রী হইতেও আটকাইল না। তার পরে নীলাম হইল, সাতবা ট্রি ধারার নোটিশ জারী হইল, অর্জ্জুন তাহার কিছুই জানিল না। সে মনের আনন্দে জমি চাষিয়া ধান বুনিল। ধানের ক্ষেতের সোনার ফসলের দিকে তাকাইয়া শরৎ কালে পুরানো দিনের বাঁশী বাজাইল গান করিল। স্বামীর আনন্দে বুক ভরিয়া যুবতী দামিনী ভাদ্র মাসের গঙ্গার মত ঢেউ তুলিয়া খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পদ্ম বাবু এবার বাঁকা পথ ধরিলেন। অর্জ্জুনের পিসী ও পিসে অনেক দিন মারা গিয়াছে। পিসতুতো ভাই ভাগ্যিধর আছে। ভাগ্যিধর বাবার চেয়েও কূটবুদ্ধি রাখে। কমল সর্দ্দারের সব জমিই পদ্ম বাবু লইতে পারেন নাই, সিকি অংশ ভাগ্যিধরকে দিয়া আসিতে হইয়াছে। আজকাল ভাগ্যিধরের ভাগ্য ভাল। পদ্ম বাবু সেই ভাগ্যিধরকে ডাকাইলেন। কাছে আনাইয়া বলিলেন—জোত আর খামার লাঠির জোরে আমার, কি বল ভাগ্যিধর?

—আজ্ঞে, হ্যাঁ তো বাবু।

অবুঝের মত উত্তর দিল ভাগ্যিধর। পরে পদ্ম বাবু তাহাকে সবুঝ করিলেন, জোত-খামারের বিবরণ পরিষ্কার করিয়া সব তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন।

ভাগ্যিধর অনেক আপত্তি করিল। বাছাড়দের মত আপন স্বজনদের যথাসর্ব্বস্ব লইয়া নিজের ঘর ভরিতে অস্বীকার করিল। কিন্তু পদ্ম বাবু পদ্ম বাবুই—বক্সী-বাড়ীর ঘুঘু ছেলে। শেষ পর্য্যন্ত ভাগ্যিধর রাজী না হইয়া পারিল না এবং অর্জ্জুনের সমগ্র নীলাম খরিদা সম্পত্তি বন্দোবস্ত করিয়া আসিল। পরদিন রুই মাছ মানকচু সহ তিনশো টাকা অগ্রিম সেলামী দিয়া বলিয়া আসিল—বাকী টাকা কাজ সারা হইলে মাথায় বহিয়া দিয়া আসিবে। পদ্ম বাবুর চোখে বজ্র ও বিদ্যুৎ খেলিয়া গেল।

ছকে আঁকা অঙ্কের মত পর-পর সব ঘটনা ঘটিয়া গেল।

পৌষ মাসের প্রথমে ভাগ্যিধর অর্জ্জুনের দু'খানা জমির ধান কাটিয়া আনিল। শুনিয়া অর্জ্জুন তাহার বাড়ী গেল। ভাগ্যিধর সাফ জানাইয়া দিল—জমি-জমা আর মেয়েমানুষের বাছ-বিচার করিতে গেলে চলে না। অর্জ্জুন আগুন হইয়া বাড়ী ফিরিল।

বাড়ী ফিরিয়া অর্জ্জুন সড়কীতে ফলা বসাইল, ঢালে বেত লাগাইল।

পৌষ মাসের মাঝামাঝি লোক-জন লইয়া ভাগ্যিধর বাকী জমির ধান কাটিতে আসিল। অর্জ্জুন ঢাল-সড়কী লইয়া সিংহের মত জমিতে গিয়া পড়িল। একা অর্জ্জুন, ভাগ্যিধরেরা অনেক। অপটু অর্জ্জুনকে তাহারা কুকুরের মত তাড়া করিয়া পেটের মধ্যে সড়কী ঢুকাইয়া ধান কাটিয়া লইয়া গেল।

সংবাদ পাইয়া পদা বাবু সদল-বলে গাবোখালী আসিলেন। সড়কীবিদ্ধ মৃতকল্প অর্জ্জুনকে ক্ষেত হইতে বাড়ী আনাইলেন। নিজে গিয়া দামিনীর সহিত উত্তেজিত কণ্ঠে কথাবার্ত্তা কহিলেন। থানায় লোক পাঠাইলেন, দামিনীকে সাথে করিয়া অর্জ্জুনকে নিয়া নিজে পুলিশের মধ্যস্থতায় হাসপাতালে গেলেন। পদা বাবুর সরল ও বন্ধু-ব্যবহারে দামিনী একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেল। কিন্তু হাসপাতালে যাওয়ার চার দিন বাদে অর্জ্জুন মারা গেল।

ভাগ্যিধর পুলিশের হাতে ধরা পড়িল। সরকারী উকীল ছাড়াও পদা বাবু ভাল উকীল দিলেন। তাঁহার প্ররোচনায় দামিনী কাঠগড়ায় উঠিয়া ভাগ্যিধরের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল। ভাগ্যিধরের তিন বৎসর জেল হইল। জেলে যাইবার সময় ভাগ্যিধর সকলকে শুনাইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া গেল—ইহার শোধ না লইয়া সে মরিবে না।

পদা বাবুর চেষ্টায় দামিনী বুঝিয়া দেখিল, তাহার পক্ষে একাকী আর গাবোখালীর মত শত্রুপুরীতে থাকা সম্ভব নহে। সুতরাং নিরাপদ বক্‌সীবাড়ীর সীমানায় যদি তাহার বসবাসের ব্যবস্থা হয় তবে সে বাঁচিয়া যায়। বন্ধুভাবে পদা বাবু এ উপকারটুকু করিতে দেরী করিলেন না। দামিনীর সম্মতিক্রমেই তাহাদের গাবোখালীর বাড়ীতে যে ছোট টিনের ঘর ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া আনিয়া বক্‌সী-বাড়ীর পাচীলের মধ্যেই তাহার জন্ত সুন্দর নূতন ঘর বাঁধিয়া দিলেন। দামিনীর খাওয়া-পরারও কোন কষ্ট রাখিলেন না। দামিনী নূতন বাড়ীতে নূতন পরিবেশে আসিয়া নিজেকে প্রবোধ দিল—প্রতিশোধ সে লইয়াছে, ভাগ্যিধরকে শাস্তি দিয়াছে। এখন তাহার আর কোন দুঃখই নাই।

এমনি করিয়া রাহুর পূর্ণগ্রাস শেষ হইতে চলিল।

পদা বাবুর সাথে প্রায়ই দামিনীর দেখা হইতে লাগিল। তিনি নানা বিষয়ে দামিনীর তত্ত্ব-তল্লাস লইতেন। দামিনীর মুখ শুক্‌না দেখিলে মোলায়েম করিয়া বহু সান্ত্বনা দিতেন। ময়লা কাপড় দেখিলে পরিষ্কার কাপড় পরিতে বলিতেন। কোন অসুবিধা হইলে তাহা দূর করিবার জন্ত উদ্বেগ প্রকাশ করিতেন। সাধারণ অভিভাবকের মত দামিনীর সকল মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সস্নেহ দৃষ্টি রাখিতেন। ইহার মধ্যে কোন আতিশয্য অথবা অস্বাভাবিকতা ছিল না। দামিনী ইহাতে স্বস্তি পাইত, বিনা দ্বিধায় পদা বাবুর সাথে মেলা-মেশা করিত, কথাবার্ত্তা বলিত।

জ্যৈষ্ঠ মাসে দামিনীর জ্বর হইল। দুই দিন তাহাকে দেখিতে না পাইয়া পদা বাবু বিস্মিত হইলেন। খবর লইয়া জ্বরের সংবাদ পাইয়াই তাহার ঘরে ছুটিয়া গেলেন। রোগ-শয্যায় দামিনীকে দেখিয়া তাঁহার চোখে-মুখে বেদনার ছাপ ফুটিয়া উঠিল। তিনি দামিনীর গায়ে হাত দিয়া তাপ অনুভব করিলেন, পথ্যাপথ্যের কি হইতেছে তাহা লক্ষ্য করিলেন। শেষে ডাক্তার ডাকাইবার জন্ত লোক পাঠাইলেন।

ইহার পর হইতে পদা বাবু প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় দামিনীর ঘরে আসিয়া দেখা-শুনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার চেষ্টায় আর ডাক্তারের ঔষধে সাত-আট দিনের মধ্যেই দামিনীর অসুখ সারিয়া গেল।

অসুখ সারিল বটে, কিন্তু পদা বাবুর যাতায়াত কমিল না। সময়-অসময় যখন খুসী তখনই তিনি দামিনীর ঘরে আসিতে লাগিলেন। এক দিন দামিনী জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল—এত ঘন ঘন হাঁটা কেন, আমার ঘরে কি আছে?

—তুমি কি জানো না কিছুই? পদা বাবু পাল্টা প্রশ্ন করেন।

দামিনী আর কথা বাড়ায় না। চুপ করিয়া জানালার বাহিরে তাকাইয়া থাকে।

প্রথম প্রথম জিদের বশে পদা বাবু দামিনীর দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছিল জমিদার-সুলভ উগ্র দাম্ভিকতা। দামিনীর উপর মনের কোন গভীর আকর্ষণ ছিল না। সেই জিদের বশেই তিনি প্রতি দিন প্রতি রাত্রি ধরিয়া নানা আঁকা-বাঁকা পথে দামিনীর দিকে আগাইয়াছিলেন। দামিনী যখন বক্‌সী-বাড়ীতেই বাসা বাঁধিতে রাজী হইল তখনও তিনি তাহাকে বিশেষ গুরুতর বা চিন্তনীয় বিষয় বলিয়া মনে করিলেন না। অনেক মেয়ের বেলায় যেমন হইয়াছে দামিনীকেও তেমনি একদা বাসি ফুলের মত নর্দ্দামায় ফেলিয়া দেওয়া যাইবে, ইহাই ছিল তাঁহার ইচ্ছা। জিদ তখনও তাঁহার মধ্যে টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল। বাসা গড়িয়া দিবার পর তিনি ঠিক করিলেন, ধীরে ধীরে খেলাইয়া এক দিন শিকার শেষ করিবেন। কিন্তু ফল হইল ইহার ঠিক বিপরীত। খেলাইতে গিয়া তিনি নিজেই খেলিয়া ফেলিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে দামিনীর নিকট আগাইবার চেষ্টায় যে দামিনী-মুখী অভ্যাস গড়িয়া উঠিল তাহাই হইল তাহার কাল। এক দিন তিনি আবিষ্কার করিলেন—দামিনীর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ একটা নূতন অবস্থা, পূর্ব্বের কোন ঘটনার সহিত ইহার মিল নাই। এ আকর্ষণ গভীর, এ আকর্ষণ অসাধারণ, ফুলের গন্ধে ভরা মধুমাখা।

শেষ শ্রাবণের এক সন্ধ্যায় পদা বাবু ব্যাকুল ভাবে ডাকেন—কামিনী ফুল—

—কি?

—আর কত কাল?

হঠাৎ দামিনী চমকাইয়া উঠে। তাহার চোখে-মুখে আগুন খেলিয়া যায়। সমগ্র দেহ তাহার তরবারির মত তীক্ষ্ণ ও কঠোর হইয়া উঠে। তীব্র কণ্ঠে সে আদেশ করে—যাও, যাও বলতেছি—

অনেক দিন আগে এক কালী পূজায় রাত্রিতে পদা বাবু বাঘিনী দেখিয়াছিলেন। আজ আবার সেই বাঘিনীই তাঁহার সামনে গর্জ্জন করিতেছে। তিনি হরিণের মত দ্রুত পলায়ন করিলেন। দামিনী সশব্দে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

জানালার গোড়ায় দাঁড়াইয়া বর্ষার ধারা-জলের দিকে তাকাইয়া দামিনী কাঁদিয়া ফেলিল। অর্জ্জুনের কথা মনে পড়িল, মনে পড়িল কালী ঠাকুরের খালের ধারে চাষী-পল্লীতে তাহাদের ছোট টিনের ঘর। অর্জ্জুনের সড়কী-বিদ্ধ দেহ আজ আবার তাহার চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিল হাসপাতালে শেষ মুহূর্ত্তের কথা।

দামিনী কাঁদিয়া চলিল।

অর্জ্জুন, অর্জ্জুন, চাষীর ছেলে সোনার অর্জ্জুন! সেই হতভাগা লক্ষীন্দর অর্জ্জুনের স্মৃতিই আজ তাহার শেষ অবলম্বন। শ্রাবণ-রাত্রির ধারা-বর্ষণের মধ্যে গাবোখালীর ও-পার হইতে কে যেন ডাকে—বেউলো, সুনার বেউলো! কে যেন গান গাহিয়া প্রেম-নিবেদন করে—তুমার জন্যে যৈবোন দিলেম ডুবলাম গাঙের জলে……

হায়, আজ আর কেহ তাহার জন্ত যৌবন দিবে না, তাহাকে বাঁচাইবার জন্ত আগাইয়া আসিবে না। হায় লক্ষীন্দর, তোমাকে যে কাল সাপে খাইয়া গিয়াছে!

ভাদ্র মাসের পূর্ব্বেই বক্‌সী-বাড়ীর মেয়ে-পুরুষ সকলে সহরে চলিয়া

গেল। গেলেন না শুধু পদ্মা বাবু। সামনে ভাদ্র কিস্তীর আদায়। এ সময় বাস্ত ছাড়িলে লক্ষ্মীও ছাড়িবে। সেই জন্য তিনি নায়েব গোমস্তা দেওয়ান দারোয়ান-পরিবেষ্টিত হইয়া প্রতাপকাটীতেই রহিয়া গেলেন। বাড়ীর দুইটি বুড়ী ঝি, আর প্রৌঢ় চাকর শ্যামচাঁদ রহিল।

মাসের মাঝামাঝি আদায় আরম্ভ হইয়া গেল। প্রতিদিন থোকায় থোকায় টাকা আসিতে লাগিল। এই টাকার মধ্য হইতে পদ্মা বাবু দুই-তৃতীয়াংশ রাখিয়া বাকী টাকা দামিনীর নিকট দিলেন।

ভাদ্রের শেষে বর্ষা নামিল আকাশ ভাঙ্গিয়া। খাল-বিল ডুবিয়া গেল, বক্সী-বাড়ীর পুকুর ছাপাইয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

আদায় তহশীল সারিয়া এক প্রহর রাত্রে পদ্মা বাবু দামিনীর ঘরে গেলেন টাকা রাখিতে। পদ্মা বাবু সাধারণতঃ রাত্রি বেলা তাহাকে টাকা দিতে যাইতেন না, দুপুর বেলা দামিনী যখন তাঁহাদের বাড়ী আসিত তখন দিতেন। রাত্রি বেলা টাকা দিতে দেখিয়া দামিনী কেমন কৌতুক বোধ করিল। জিজ্ঞাসা করিল—ইডা কি?

—নজরানা।

পদ্মা বাবুর উত্তরে দামিনীর বুক গর্ব্বে ও আনন্দে ফুলিয়া উঠিল। তাঁহাকে বিছানায় বসাইয়া সে পাণ সাজিয়া দিল। খাটে বসিয়া পদ্মা বাবু পাণ চিবাইতে চিবাইতে দামিনীর দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

দামিনী হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখতিছেন?

ভাঙ্গা পরুষ কণ্ঠে চোখ ছোট করিয়া পদ্মা বাবু উত্তর দিলেন—পুরুষমানুষ যা দেখে।

তার পর খাট হইতে নামিয়া আলো নিবাইয়া দিলেন। আজ রাত্রে আর দামিনী তাহাতে বাধা দিল না।

একটু পরেই অন্ধকারের বুক চিরিয়া দামিনী অকস্মাৎ ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—ওরে আমার কি সব্বোনাশ হ'ল রে, ওরে তুমি আমার কি ঘরে আগুন দিলে রে—

পরদিন পদ্মা বাবু কমল সর্দ্দারদের সমগ্র সম্পত্তি দামিনীর নামে লেখা-পড়া করিয়া দিলেন।

রাহুর পূর্ণগ্রাস সম্পূর্ণ হইল।

ভাগ্যিধর তিন বৎসরের জেল দুই বৎসর কয়েক মাসে খাটিয়া বাড়ী ফিরিল। সাথে লইয়া আসিল অটল প্রতিজ্ঞা, প্রতিশোধের অদম্য ইচ্ছা আর পশুর মত কঠোর ক্রূর হিংস্রতা।

বাড়ী ফিরিয়া সে গ্রামের সকলের সাথে দেখা করিল। দেশের সকল কাহিনী শুনিল। গাবোখালীর বাছাড়দের চরম পরিণতির কথা শুনিল, সেই সাথে দামিনীর উন্নতির কথাও তাহার জানিতে বাকী রহিল না। জানিয়া-শুনিয়া ভাগ্যিধরের পেশীবহুল দেহ কুঁকড়াইয়া ফুলিয়া উঠিল, গালের শক্ত পেশীর চাপে দাঁতে-দাঁতে কড়-মড় শব্দ উঠিল। আবার সে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল—বক্সী-বাড়ীর গুষ্টী যদি না ঠ্যাঙ্গাই তো···

কয়েক দিন ধরিয়া ভাগ্যিধর অবিরত গ্রামে গ্রামে ঘুরিল, মোড়ল-মাতব্বরদের সাথে নানা প্রকার পরামর্শ করিল। গ্রামে গ্রামে ছোট ছোট বৈঠক বসিল, নানাবিধ যুক্তি-পরামর্শ অন্তে সিদ্ধান্তও গৃহীত হইল।

গ্রামে ফিরিবার পথে ভাগ্যিধর বিলের দিকে তাকাইয়া থাকে। ও-পারে গাবোখালী, এ-পারে হরিদাসকাটী, মাঝখানে ডুমুরিয়া বিল। ও-পারের কোলে বাছাড়দের জমি, এ-পারের কোলে সর্দ্দারদের আঠার মেদে, পাকা ধানের ভারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। অথচ এই হাসির কুচি পাকা ধানের রাশি বক্সীদের গোলায় উঠিবে। বাছাড় আর সর্দ্দার, কোথায় কে জানে তাহারা! ভাগ্যিধরের মধ্যে আর একটা শপথ কঠোর হইয়া উঠে। অজ্ঞাতে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া পড়ে—বক্সীবাড়ীর······

অগুভ পৌষ মাসের ঠিক পয়লা তারিখে ভাগ্যিধর গেল বক্সী-বাড়ী। তাহাকে সবিনয়ে প্রণাম করিতে দেখিয়া পদ্মা বাবুর বুকের মধ্যে কাঁপিয়া উঠিল। ফ্যাকসা হাসিয়া মুখ হইতে গড়গড়ার নল সরাইয়া কহিলেন—কল্যাণ হোক, তা জেলে তেমন কষ্ট পাওনি বোধ করি।

ভাগ্যিধর অতি বিনয়ে কহিল—আজ্ঞে, আপনারকো মতন মুহাশয় বেক্তি যে জেলে পাঠায় তাতে কি আর দুক্খু-কষ্টো কিছু থাক্তি পারে? কি ক'ন নায়েব মশায়?

তাহার কথার ধার লাগিয়া পদ্মা বাবুর বুকের মধ্যে দাগ কাটিয়া যায়।

সাধারণ কথাবার্তার পর ভাগ্যিধর বাছাড়দের সম্পত্তির ধান-পানের কি হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিল। পদ্মা বাবু বিস্মিত হইয়া বলিয়া দিলেন যে, যাহাদের সম্পত্তি সেই বাছাড়দের বৌ যখন তাঁহার বাড়ীতে তখন ধান তাঁহারই প্রাপ্য।

যাইবার সময় ভাগ্যিধর ইচ্ছা করিয়াই দামিনীর ঘরের সামনে গিয়া দাঁড়াইল। দামিনী বাইরে আসিলে ভাগ্যিধরকে দেখিয়া ঘরের মধ্যে ছুটিয়া পলাইল। ভাগ্যিধর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—ও বৌ, চিন্‌তে পারলে না?

ভাগ্যিধর নাছোড়বান্দা। তাহার সামনে লজ্জা-সঙ্কোচে লাভ নাই। তাই দামিনী এবারে প্রস্তুত হইয়া বাহিরে আসিয়া দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে—ঠাউরপো যেন্, আসো। কবে ফিরলে?

ভাগ্যিধরের জন্য বারান্দায় মাদুর পাতিয়া দিয়া বসিতে বলিল। ভাগ্যিধর বারান্দার ছাঁইচে দাঁড়াইয়া সুস্পষ্ট কণ্ঠে অস্বীকার করল—না।

বিস্মিত কণ্ঠে দামিনী জিজ্ঞাসা করিল—কেন?

—মুখ কি আর আছে বসার?

—মুখ পুড়ালে কিডা? হাসিয়া জিজ্ঞাসা করে দামিনী।

তাহার মুখের প্রতি তীব্র দৃষ্টি মেলিয়া মুখের ভঙ্গী কঠোর করিয়া বলে ভাগ্যিধর—সিডা যেন্ আজ তুমারে কয়ে বুঝোতি হবে তা জানতাম না। সগোলের মুখ পুড়ানোর পরে অবিশ্যি বুঝা যায় না কিডা কার মুখ পুড়ায়েছে। কি কও বৌ?

ভাগ্যিধর শ্লেষের হাসি হাসিয়া দামিনীর মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। তাহার মুখের এই আগুনের মত কথায় দামিনীর বুকের গভীর তলদেশ পর্য্যন্ত পুড়িয়া চড়-চড় করিয়া উঠে। তাহার মুখ ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে হইয়া যায়। দুই বেদনার্ত্ত চক্ষু তুলিয়া সে ভাগ্যিধরের দিকে বোকার মত তাকাইয়া থাকে।

ভাগ্যিধর বলিয়া চলে—টাহা গেলি টাহা পাওয়া যায়, জমি গেলি জমিউ মেলে; কিন্তুর ফেরে না মানুষ গেলি, আর ফেরে না কুল-মান গেলি।

কুল-মানের কথায় নারীর সহজাত প্রবৃত্তি বশে দামিনীর মধ্যে প্রতিরোধ জাগিয়া উঠে। হঠাৎ তাহার দুই চোখ আগুনের বিভায় জ্বলিয়া ঝক্-ঝক্ করিতে থাকে। বারান্দার উপর দাঁড়াইয়া মেরুদণ্ড খাড়া করিয়া মাথা ঝাঁকাইয়া সে ভাগ্যিধরকে বলে—যারা হাপন

জনের সববস্তো নিয়ে ঘরের বৌ পরেরে তুলে দেয় তারগে মুখ দিয়ে কুল-মানের কথা শুনলি পাপ হয়, বুঝলে ঠাউরপো ?

কঠোর ভাবে হাসিয়া ওঠে দামিনী। ভাগ্যিধরের মাথা নীচু হইয়া পড়ে। কিছুক্ষণ বাদে বারান্দায় উঠিয়া বসিয়া ভাগ্যিধর বলে—বাড়ী চল বৌ।

দামিনী বলে—না।

—কেন ?

যারা মায়েমানুষ ঘরে রাহার খ্যামোস্তা ধরে না, তারগে মায়েমানষির ঘরে ফিরাব চাইতে পরের ঘরে যাহাই ভাল।

—রাগ করেচ বলে হমন কথা কলি। মানষির ভুল হয়, আর সেই ভুল সারে মানষিই। তুমি ঘরে চল।

—ঘর কই ?

—ঘর বানানর ভার আমার। উৎসাহে বলে ভাগ্যিধর।

—না, যাবো না। দামিনীর রাগ পড়ে নাই তখনও।

—কেন ? করুণ ভাবে জিজ্ঞাসা করে ভাগ্যিধর।

ঝোঁকের বশে দামিনী বলিয়া ফেলে—যদি নিবার মতন নিতে পার তবে যাবো। তার আগে নড়বো না এই মথুরা নগর ছাড়ে।

ভাগ্যিধরের মধ্যে পৌরুষের জাগরণ হয়। নারীর চরম আঘাতে দীপ্ত পৌরুষের তেজে সে উদ্বুদ্ধ হইয়া বলে—ঠিক কলে তো বৌ, নিবার মতন নিলে ঘরে যাবা ?

—হায়, ঠিক কলাম, ঠিক। যাবো, যাবো, যাবো—

তিন সত্য করিয়া দামিনী উত্তেজনায় কাঁপিতে থাকে। ভাগ্যিধর উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলে—তুমারে আমি বাড়ী ফিরোবো বৌ, ফিরোবো, ফিরোবো, ফিরোবো।

তিন সত্য করিয়া ভাগ্যিধর দ্রুত চলিয়া যায়। দামিনী সেখানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে থাকে। 'ফিরোবো—ফিরোবো—ফিরোবো'—সর্ব্বনাশা এই শপথ তাহার দেহ-মন বেড়িয়া পাক খাইতে থাকে।

সমস্ত দিন দামিনী ছটফট করিয়া বেড়াইল, একবার পুকুর, একবার ঘর আর একবার পদ্ম বাবুর ঘর করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। সে গ্রামের প্রান্তে বিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। ও-পারে গাবোখালী। তাহাদের চারা নারিকেল গাছ এখান হইতে দেখা যায়। ডাহিনে ও পারে হরিদাসকাটা, সর্দ্দার-বাড়ীর দেঁড়ে খেজুর গাছের মাথা উঁচু হইয়া আছে। দামিনীর মনে হয়, সে যেন বাছাড় আর সর্দ্দারদের মুখামুখী দাঁড়াইয়াছে। অজ্ঞাতসারে সে মাথায় ঘোমটা টানিয়া দেয়।

সন্ধ্যার পর পদ্ম বাবু আসিলেন। সে সোজা বলিয়া দিল—আজ ঘরে যাও।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তাহার গম্ভীর মুখের দিকে তাকাইয়া পদ্ম বাবু আস্তে আস্তে ঘরে ফিরিয়া যান।

দামিনীর ঘুম হইল না ভাল ভাবে। অর্দ্ধেক রাত্রে কাহার ডাকে তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। সে কান পাতিয়া রহিল। কিন্তু কেহই তাহাকে ডাকিল না। সে উঠিয়া জানালা খুলিয়া বাহিরে তাকাইয়া রহিল। শীত কালের জোছনার আলোয় পৃথিবী ঘুমাইতেছে। সে ভাল করিয়া দেখিল। কাহাকেও দেখিতে পাইল না। অথচ একটা ডাক, অতি-পরিচিত মানুষের মধুর কণ্ঠের ডাক তাহার মাথা ও বুক আচ্ছন্ন করিয়া রহিল। যখন কাহাকেও দেখিতে পাইল না তখন সে বিছানার উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

...বিবাহের পর প্রথম রাত্রি। সে আর অর্জ্জুন মুখামুখী দাঁড়াইয়া। হাসিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিল—কি দেখতেছ বেউলো সুন্দোরী ?

অর্জ্জুনের চোখে চোখ রাখিয়া সে হাসিয়া বলিল—লখিন্দারের সুনার বরোণ, চোহি আমার নাগে কেমন।

লক্ষীন্দর, লক্ষীন্দর! কথা কও লক্ষীন্দর! হায় হায়, লক্ষীন্দরের এ কী হইল। লক্ষীন্দর কি আর ফিরিবে না ? আর কি সে বেহুলাকে আদর করিয়া ডাকিবে না ?

না, না, না। তাহা হইতে পারে না। হঠাৎ দামিনী বিছানায় উঠিয়া বসে। কে বলিল ফিরিবে না ? ফিরিবে, সে ফিরিবে। বেহুলা যদি সতী মায়ের সতী কন্যা হয় তবে লক্ষীন্দর ফিরিবেই।

বেহুল, রে, আজও তোর শপথ পূর্ণ হয় নাই, আজও নিত্য ধোপানীর কাপড় কাচা শেষ হয় নাই। আজও যে শূলপাণির পূজা সমাপ্ত হয় নাই, মহাদেবের বরে লক্ষীন্দরের জীবন লাভ হয় নাই!

আবার দামিনী লুটাইয়া পড়ে বিছানায়। হায় হায়! এ তুই কি করিলি বেহুলা! লক্ষীন্দরের কঙ্কাল যে কলঙ্কের জলে ডুবিয়া গেল!

সে-দিন সন্ধ্যার পর হরিদাসকাটার ও-পার হইতে শব্দ আসিতে লাগিল—ডুমডুমা ডুমাডুম, ডুমডুমা ডুমাডুম...

দামিনী বারান্দায় আসিয়া, কান খাড়া করিয়া শুনিতে থাকে। অতি আকস্মিক অথচ পরিচিত এ শব্দ। কমল সর্দ্দারের মৃত্যুর পর এ শব্দ আর দামিনী শুনে নাই। বিপদ অথবা আনন্দের দিনে এই শব্দে সকলকে আহ্বান করা হয়। কিন্তু, আজ কিসের এ সঙ্কেত ? কমল সর্দ্দারের হাতের নাগরা আজ কে বাজায় চাষীদের উদ্দেশে ?

দামিনীর চোখের সামনে বহু কাল পূর্ব্বের এক দৃশ্য জাগিয়া উঠে। কমল সর্দ্দার নাগরা বাজাইতেছে ডুমডুমা ডুমডুমা শব্দে। একে একে মশালের আলোয় চাষীরা সমবেত হইতেছে দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধার বেশে। শ'য়ে শ'য়ে যোদ্ধা কৃষকের সমাবেশে উঠান-পথ-ঘাট ভরিয়া গেল। নাগরার শব্দ থামিয়া গেল। মশালের আলোয় কৃষক-বাহিনী সারি দিয়া নিঃশব্দে আগাইয়া গেল। পরদিন সকলে দেখিল, হরিদাসকাটার পাশ দিয়া নূতন এক খাল কাটা হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু, আজ এ কিসের আহ্বান ? কমল সর্দ্দারের হাতের নাগরা আজ কি চায় ? আশা ও উদ্বেগে দামিনী হরিদাসকাটার দিকে তাকাইয়া থাকে।

অর্দ্ধেক রাত্রে দামিনীর দরজায় ধাক্কা পড়িল। দরজা খুলিয়া দামিনী দেখিল ভাগ্যিধর দরজায় দাঁড়াইয়া, আর তাহার পিছনে উঠান ভরিয়া লাঠিধারী কৃষকেরা।

দামিনীর সমস্ত দ্বিধা-সঙ্কোচ নিমেষে কোথায় চলিয়া গেল। তাড়াতাড়ি তোরঙ্গটি লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। সদল-বলে ভাগ্যিধর সর্দ্দার-বাড়ীর মেয়ে বাছাড়বাড়ীর বৌকে 'নিবার মত' করিয়াই লইয়া গেল।

ভোর বেলা পদ্ম বাবুর কাছে সংবাদ আসিল—তাঁহাদের সকল জমির ধান চাষীরা রাতারাতি কাটিয়া লইয়াছে।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

পাঁচ

মলিনের মা সবে বাড়ী আসিয়া ধূলো-পায়ে বসিয়াছেন, মলিন ফিরিয়া আসিল। তাহার মুখ শুষ্ক, চোখ দিয়া জল পড়ে-পড়ে।

মলিনের মায়ের বুকটা উড়িয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, "স্কুল থেকে চলে এলি ?"

মলিন কোঁপাইয়া উঠিয়া বসিয়া পড়িল। মা তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া কহিলেন, "কাঁদচিস্ কেন ?"

তখন মলিনের চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল পড়িতেছে। অশ্রু-নিরোধ কণ্ঠে কহিল, "নাম কেটে দিয়েছে—"

"নাম কেটে দিয়েছে ?"

"হ্যাঁ। 'লেট্' হয়েছিল বোলে।"

মলিনের মা, তাঁহার সম্মুখে এই-একটু পূর্ব্বে ছিল এক নবজাত ধরাতল, তথায় ছিল—প্রকৃতির শ্যাম-রূপ, মানুষের অব্যর্থ আশা-আশ্বাস, ভবিষ্যতের পথ-নির্দ্দেশ! সেই সমস্ত তাঁহার দৃষ্টিপথ হইতে নিমেষে মুছিয়া গেল। ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া উদ্‌ভ্রান্তের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "তা হলে, পড়া আর তোর হবে না ?"

মলিন কোঁচার কাপড়ে চোখ মুছিয়া কহিল—'না।'

হঠাৎ মলিনের মায়ের চোখ দুইটা একবার অস্বাভাবিক বড় হইয়াই এতটুকু হইয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, চল্ দিকিনি নিবারণের কাছে! ওঠ"—বলিয়াই মলিনকে টানিয়া তুলিয়া দাঁড় করাইল।

এতক্ষণ আর-একটি মূর্ত্তি আড়ালে আসিয়া কান পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে—সন্ধ্যা! স্কুলের রাস্তা নিবারণের খিড়কীর পুকুরের পাড় দিয়া। মলিন যখন ফিরিয়া আসে তখন সে পুকুরঘাটে কি করিতেছিল, মলিনকে দেখিয়াই টক্ করিয়া তাহার মনে এক সহেতুক সন্দেহের উদ্রেক হইয়াছিল। মলিনের মা মলিনকে লইয়া বাহির হইয়া যাইতেই, সে-ও তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিবারণ আজকাল প্রতিদিনই একবার করিয়া স্কুলে যায়, আজও গিয়াছিল—এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়া বহিঃকক্ষে বসিয়াছে। মলিনের মাকে দেখিয়াই গম্ভীর হইয়া ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল।

মলিনের মা কাতর-কম্পিত চক্ষে নিবারণের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "মলিনের নাম কাটা গেছে, নিবারণ ?"

মলিনের মা যখন এই গ্রামে বধূরূপে আসেন তখন নিবারণ ছিল খুব ছোট, তাই তিনি তাহার নাম ধরিয়াই ডাকিতেন, আর নিবারণ ডাকিত 'বড় বউ' বলিয়া।

নিবারণ তামাক সাজিয়া গাড়ুর জলে হাত ধুইয়া অবসর মত জবাব দিল—"হ্যাঁ।"

মলিনের মা একটু সরিয়া গিয়া ব্যাকুল কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, আর তো একটা বছর, ভাই—"

"দিক্ কোরো না।"—নিবারণ অধিকতর গম্ভীর হইয়া হুঁকায় একটা জোর টান মারিল। তার পর মুখটা তুলিয়া রোষরক্ত চক্ষে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "ইংরিজি স্কুল আড্ডাবাড়ী নয় যে, যখন খুসি তখন তোমার ছেলে স্কুল যাবেন! হুঁস নেই ওর—ও ক্রীতে পড়ে ?"

"জানে বৈ কি, নিবারণ! ও দুঃখীর ছেলে, তা' কি ও জানে না —জানে! যাই হোক্, একটি বার মাফ করো—এই বারটি।"—বলিয়াই মলিনের মা নিবারণের হাত ধরিতে গেলেন।

নিবারণ হুঁকা-কলিকা সামলাইয়া খানিক পিছাইয়া আসিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "এই বারটি—এক দিন ? রোজ রোজ ওর 'লেট্' হয়। মাফ হয় এক দিন—দু'দিন—রোজ রোজ 'লেট্' মাফ হয় না।" বলিয়াই বিপুল বিক্রমে হুঁকায় টান মারিতে লাগিল।

মলিনের মা মূঢ়ের ন্যায় মলিনের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "হ্যাঁ রে! রোজ-রোজ 'লেট্' হয় ? আমাকে এক দিনও তো বলিস্‌নি ?"

মলিন মুখ নীচু করিল।

মলিনের মা পুনশ্চ নিবারণের দিকে মুখ ফিরাইলেন। অনুনয়-কণ্ঠে কহিলেন, "তুমি মনে করলেই সব হয়—তুমিই তো স্কুলের কর্ত্তা।"

নিবারণ চটিয়া উঠিয়া কহিল, "কেন ট্যাঁক্-ট্যাঁক্ করছ—কিছু হবে না। ভালো কথা, আমার টাকার কি করছ ?"

মলিনের মায়ের কিছু ঋণ আছে নিবারণের কাছে। কথা আছে, মলিন চাকরী করিয়া তাহা পরিশোধ করিবে। এবং এই জবাব বহু বার তিনি দিয়াছেন, তত্রাপি তাহা নিবারণের কাছে টিকিতেছে না। বিচিন্ত করিবার তাঁহার সামর্থ্যও নাই, তবুও—

আর এক দিকে তাঁহার যে সর্ব্বস্ব যায়! নিষ্ফল দেহটা লইয়া তিনি যে বাঁচিয়া থাকিবেন, সে-বাঁচার এই এক মাত্র অর্থটা যে তাঁহার জীবনের অভিধান হইতে বিলোপ হইতে চলিয়াছে! জীবন-সন্ধ্যায় জোর করিয়া যে প্রখর রবিকর তিনি বুকের ভিতর সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা যে আজ নির্ব্বাপিত হইতে চলিয়াছে। তিনি একবার নিবারণের দিকে চাহিলেন, তার পরই দেখিলেন, তাঁহার চক্ষের নিম্নে দাঁড়াইয়া মলিন! মানুষ—উভয়েই, উভয়কেই বিধাতা সমান যত্নে, সমান আদরে, সমান স্নেহে সৃষ্টি করিয়াছেন—উভয়েই বিধাতার সমান বস্তু। ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে এখানকার মাটি, ইহার উপর যাহা-কিছু সংস্থান, যাহা-কিছু উপকরণ, যাহা-কিছু উৎসব, তাহাতে উভয়েরই তুল্যাংশে অধিকার রহিবে না কেন ? কেনই বা এক জন আর-এক জনকে গলা টিপিয়া মারিতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠে ? হিমালয়ের যে-শপথ, যে-প্রতিশ্রুতি—অজস্র তটিনী একই দিনক্ষণে একই জলধারায় নামিয়া আসিয়া লোক-লোকালয়ে একই অধিকারে পাশাপাশি বহিয়া যায়, তাহারাই বা কেন আবার বিকৃত হইয়া উদ্দাম লগ্নে পরস্পরকে আত্মসাৎ করিয়া বসে ? * * * স্তব্ধ হইয়া খানিক দাঁড়াইয়া মলিনের মা এই সমস্ত প্রশ্ন মনের ভিতর তোলাপাড়া করিতেছেন, এমন সময়ে নিবারণ রুক্ষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি বলবে, বলো ?"

মলিনের মা চমকিয়া উঠিলেন। শঙ্কা-দুর্ব্বল নেত্রে নিবারণের দিকে তাকাইতেই সে তেমনি ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিল, "টাকা—টাকা! আর আমি ফেলে রাখতে পারবো না!"

ম্লান মুখে মলিনের মা কহিলেন, "এ-কথা তো অনেক বার হয়ে গেছে নিবারণ! মলিন চাকরী করুক—দেব বৈ কি তোমার টাকা!"

নিবারণ গম্ভীর হইয়া কহিল, "বেশ, এইবার তাই করুক।"

মলিনের মায়ের মুখখানা বিবর্ণ হইয়া গেল, কহিলেন, "মলিনের নাম আর বসবে না?"

"আমার কাজ আছে, বড় বউ! একশো বার এক কথা কয়ো না—" বলিয়াই নিবারণ হুঁকাটাকে রাখিয়া আলমারি হইতে কতকগুলা কাগজ-পত্র পাড়িয়া তাহার ভিতর মনোনিবেশ করিল। পরক্ষণেই মুখ তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "স্কুলের নিয়ম—যারা ফ্রী ষ্টুডেণ্ট তাদের তিন দিনের বেশি 'লেট' হলেই নাম কাটা যায়!" মলিনকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ তীব্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ওকে জিজ্ঞাসা করো—ক'দিন ওর 'লেট' হয়েছে?"

মলিনের মা তৎক্ষণাৎ কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আর হবে না। কেন হয়েছে, তা-ও তো তুমি জানো, নিবারণ—পরের বাড়ী চাল-ডাল, সেই সব এনে-নিয়ে তবে তো হাঁড়ি চড়ে—"

"মিথ্যে কথা, বাবা—" ভিতর দিকটার দরজাটা এক ধাক্কায় খুলিয়া সন্ধ্যা প্রবেশ করিল। মুখে-চোখে যেন তুবড়ি ফোটাইয়া বলিয়া উঠিল, "বড় মা কি মিছে কথা কয় গো!" বলিয়াই উভয়ের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হাত-মুখ নাড়িয়া সুরু করিল, "চালও ছিল, ডালও ছিল—"

"তবে?"—নিবারণের চোখ দু'টা যেন জ্বলিয়া উঠিল। মলিনের মায়ের প্রতি সেই অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়া উঠিল, "বড় বউ, আমি জানতাম—তুমি পুণ্যাত্মা মানুষ! কিন্তু—"

"বেশ হয়েছে—" সন্ধ্যার দ্রুত উচ্চ কণ্ঠে নিবারণ বাধা পাইল। সন্ধ্যা মলিনের দিকে ফিরিয়া যেন অত্যধিক হর্ষে বলিয়া উঠিল, "খাসা হয়েছে! তখন যে বলতাম—'মলিনদা', তুমি বললেই পারো—আর তোমাকে পড়াতে পারবো না'! চট্ করিয়া জনকের দিকে ফিরিয়া কথায় জোর দিয়া সুরু করিল, "হ্যাঁ, বাবা! আমি রোজ বলতাম—'মলিনদা', তোমার 'লেট্' হবে—তোমার 'লেট্' হবে! আর মলিনদা' কি বলতো, জানো—'উঁহু'! মুখের একরূপ বিকৃত আকৃতি করিয়াই পুনশ্চ নিমেষে হাওয়ার ন্যায় উড়িয়া গেল।

মলিনের আনত মুখ অধিকতর ঝুলিয়া পড়িল, কিন্তু বড়মার মুখে তখন মেঘ ঠেলিয়া একটু চাঁদের আলো পড়িয়াছে। অন্য দিকে নিবারণের মনের ভিতর তখন এক গোলযোগ বাধিয়াছে—মেয়েটা ঝড়ের মত প্রবেশ করিল, ঝড়ের মত বাহির হইয়া গেল, এই অত্যল্প কালের ভিতর কি সব বকিয়া গেল, তাহার মস্তিষ্কে এতটুকুও প্রবেশ করিল না। সে একবার মলিনের দিকে আর একবার মলিনের মায়ের দিকে তাকাইয়া বিস্ময়-বিমূঢ় ভাবে আপন মনেই বলিয়া উঠিল, "ক্ষেপিটা এসে কি আবার বোলে গেল—এ্যাঁ? ক্ষেপিটা—"

"আমি বলছি—" প্রবেশ করিল সরস্বতী এক অভিনব নারীমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া—স্পষ্ট, গম্ভীর, সংযত। সে-ও এতক্ষণ ভিতর দিকে আড়ালে দাঁড়াইয়া সব শুনিতেছিল। কহিল, "তুমি ওর মাষ্টার ছাড়িয়ে দিলে, দেবার পরদিন থেকেই আমি ওকে মলিনের কাছে পড়তে পাঠাতাম রোজ সকালে। নইলে, ওর পড়াটা মাটি হয়! মলিন নিজেও পড়তো, ওকেও পড়াতো। কিন্তু, নিজের পড়া কোরে আর এক জনার পড়া বোলে দেবার সময়, তা' তো আর থাকে না!—এই কথাটাই ও বোলে গেল!"

নিবারণ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, "এই কথা! আচ্ছা, কাল থেকেই ওর মাষ্টার আসবে—"

"তা যেন হলো! কিন্তু মলিনের একটা ব্যবস্থা করো—"

নিবারণ পুনশ্চ নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল। রোষ-গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "তুমি মেয়েমানুষ—তুমি কিছু বোঝো না! ব্যবস্থা যা করবার, তা' করাই হয়েছে—একে বলে 'ডিসিপ্লিন্'—

বলিয়াই নিবারণ সামনের আলনা হইতে জামাটা গায়ে দিয়া দ্রুত বাহির হইয়া যাইবে, সন্ধ্যা পুনশ্চ সদর দিকের দুয়ার দিয়া এক-ছুটে প্রবেশ করিয়া যেন হাঁপাইতে-হাঁপাইতে বলিয়া উঠিল, "বাবা! মলিনদা'কে আর কি বলতাম, জানো—'তোমার নাম কাটা যাবে! হ্যাঁ, যাবে—যাবে, যাবে, যাবে!' আর মলিনদা' বলতো, 'যাবে বৈ কি—তোমার বাবা রয়েছেন'! বলিয়াই ভিতর দিকের দুয়ার দিয়া তৎক্ষণাৎ আবার অদৃশ্য হইয়া গেল।

নিবারণ সেই দিক্‌টায় একবার তাকাইয়াই অধিকতর গম্ভীর হইয়া গেল।

সরস্বতীর আবির্ভাবে মলিনের মায়ের বুকখানা একটু বড় হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু, এবার তিনি একেবারেই দমিয়া গেলেন। এক বাস্তব আতঙ্ক, তাহার কৃষ্ণ মূর্ত্তির দিকে তিনি যেন একটা হাত তুলিয়া আড়াল করিয়া আর্ত্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "বউ, তা' হলে—"

"এখানে নয়! এখানে মলিনের আশ্রয় নেই!"—সরস্বতীর মুখখানা কাঁপিয়া উঠিল। পরক্ষণেই সুরু করিল, "এ-গ্রামের মাটি, এর ওপর বিষ ছড়ানো আছে—মলিন এই মাটিতে পা ফেলতে পারে না! বাড়ী যাও, দিদি!" বলিয়াই তাঁহার উপর-হাতটা ধরিয়া বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া দিল, তার পর মলিনেরও আনত মুখটা যেমন তুলিতে যাইবে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় এক অপূর্ব আলোক-ছটায় দীপ্ত হইয়া উঠিল। মলিনের মায়ের দিকে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া প্রবলোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠিল, "ভেঙ্গে পড়ো না, দিদি! এই মলিন, এর তুমি মা! এর এই কপাল নিষ্ফল হবে না।" বলিয়াই দ্রুতপদে অন্যত্র চলিয়া গেল।

ছয়

কথাটা নিমেষে গ্রামময় ছড়াইয়া পড়িল। যাহারা ভদ্র, যাহারা সম্পন্ন, তাহারা বলাবলি করিল—"সত্যিই তো! স্কুল-পাঠশালা একচোখো হলে চলে না! ছেলের মাইনে দিয়ে আমরা সব স্কুল রাখবো, আর এক জন তার ফসল খাবে? এ যা হয়েছে, ঠিকই হয়েছে—ভাগ্যি নিবারণ মিত্তির ছিল কর্ত্তা!" যাহারা ইতর, যাহারা দরিদ্র, তাহাদের মনে দুঃখ আর ধরে না! তাহাদের ভিতর কথা চলিল,—"ভদ্রলোকের খুরে নমস্কার! ওরা সব করতে পারে! অমন হীরের টুকরো ছেলে, তার মাথাটি খেলেন, খেয়ে তবে ছাড়লেন! তার মানে—হিংসে!"

কিন্তু, এই সব আলোচনা চলিল এক দিন—দুই দিন! তার পর সব চুপ-চাপ! পৃথিবী আবার নিয়মেই চলে, সূর্য্য ঠিক পূর্ব্ব দিকেই উঠে, চন্দ্রদেবের রাস্তা ভুল হয় না! ধরিত্রী, তাহার দৈনন্দিন আয়-ব্যয় ঠিক পূর্ব্বের মতই হয়—জন্ম-মৃত্যু, ইহারও অঙ্কপাতে ভুল

হয় না। প্রকৃতি, তাহার দৈনিক রূপ-পরিবর্ত্তন—ইহাতেও তাহার অবহেলা নাই, ক্লান্তি নাই! * * * সমগ্র বিশ্ব, তাহার চলতি নিয়মের বুঝি বা বাহিরে পড়িয়া রহিল—মলিন আর তাহার মা! মা আর প্রায় বাড়ীর বাহির হন না। হাঁড়ির চাল যে দিন নেহাৎ বাড়ন্ত হয়, মাত্র সেই দিনই কাহারো বাড়ী গিয়া এক মুঠা ধার করিয়া আনেন। যেন, আর তাঁহার কিছুরই প্রয়োজন নাই—সবেরই সব শেষ হইয়া গিয়াছে। মাঝে-মাঝে তাঁহার মনে হয়—ওই নীল আকাশ, উহার এক প্রান্তে এক দিন এক আলোক-গৃহ দেখা দিয়াছিল তাঁহাকেই আগ্রহে আশ্রয় দিবে বলিয়া! আজ তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে—উহা যে উপরের বস্তু!

আর মলিন? তাহার নিকটে বহিঃপ্রকৃতির যেন পরিচয় নাই। এক-একবার সে মনে করে—মায়ের সঙ্গে খুব করিয়া কথা কহিবে, কিন্তু মুখোমুখী হইয়া তাহা আর পারে না—মুখ নীচু করিয়া ফিরিয়া আসে, কত না অপরাধী! জীর্ণ কক্ষে, কাঠের তক্তার উপর তাহার বহিগুলি সাজানো থাকিত—সেইগুলি সে নামায় আবার সাজাইয়া রাখে, রাখিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকে! সময়ের মূল্য তাহার কাছে আর নাই। এক দিন তাহাকে ঘিরিয়া উহার যে এক প্রচণ্ড তরঙ্গ উঠিয়াছিল, আজ তাহা ভাঙিয়া গিয়াছে—বুঝি বা এমনিই যায়, প্রকৃতির ইহাই নিয়ম! সকালটা তাহার এম্‌নি করিয়া কাটে। সন্ধ্যা, সে-ও আর আসে না। দ্বিপ্রহরে—স্কুলের ক্লাস; বেঞ্চি, টেবিল, বোর্ড—তাহাদের নিমন্ত্রণ আর তাহার কাছে নাই! বিকালে—ফুটবল, ক্রিকেট, টেনিস্‌, এ-সব বালাই তাহার জীবন-যাত্রার সূচিপত্র হইতে মুছিয়া গিয়াছে! সতীর্থরা—সেই ভাঁটু, সেই-সব ছেলেরা, তাহাদের কাছেও সে যেন অপরিচিত। সে মনে-মনে ভাবে—'আচ্ছা! এই তো মাটি, এর ওপর বায়ুস্তর—উঃ কত সে উচু, ওর মাথায় এক নীল চাঁদোয়া—আকাশ, ঠিক সেই দেশেরই ছেলে ওরা সব—স্কুলের ছাত্র! ওদের সুমুখে থাকে টেবিল, টেবিলের উপর বই, দেওয়ালে বোর্ড, বোর্ডে অঙ্ক! ওরা কি আমার কাছে আসে—দূর!'

এম্‌নি ভাবে মাসখানেক অতিবাহিত হইয়াছে, মলিন এক দিন হঠাৎ মাকে কহিল, "মা, এক কাজ করলে হয় না—আমার এই বইগুলো যদি বিক্রী করি?"

এই এক মাসের ভিতর মায়ের সঙ্গে মলিনের বড়-একটা কথাবার্ত্তা হয় নাই, হইলেও এক মিনিট—এক সেকেণ্ডে তাহা শেষ হইয়া যাইত সামান্য দুই-একটি কথায়! সান্ত্বনা বলিয়া যদিই বা কিছু এই দুঃস্থ সংসারের ছিল, তাহা মলিনের ওই সব বই—মলিনের হৃৎপিণ্ড! এ কথা মায়ের অবিদিত ছিল না। তাহাই আজ মলিন বুক হইতে বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত। মা চমকিয়া জিব কাটিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বাট্‌, বাট্‌! আমি আগে মরি, তার পর তুই বই বেচিস্‌!"

মলিন জেদ্‌ ধরিয়া কহিল, "অনেকগুলো টাকা হতো কিন্তু। অনেক ছেলের হয়তো এখনো বই কেনা হয়নি—এক্ষুনি বিক্রী হয়ে যেতো!"

মায়ের চোখে এইবার জল আসিল। কহিলেন, "ও-সব তোর চোখে বড় লাগছে, নয় বাবা?"

মলিন এইবার মুস্কিলে পড়িল। তাহার ইচ্ছা ছিল না যে, সে মাকে কাঁদায়! বিব্রত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা' কেন! ও-বাড়ীর কাকা বাবু টাকা চাইছেন—তাই!"

অতি দুঃখেও মায়ের মুখে একটু হাসি আসিল। কহিলেন, "দেখ, আমার পেটে তুই হয়েছিস্‌! শাক দিয়ে মাছ আমার কাছে কি আর ঢাকবি বাবা!—না, বই-পত্র বেচা হবে না!" শেষের দিকটায় হঠাৎ তাঁর কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল।

অস্বাভাবিক কণ্ঠস্বর! মলিন চমকিয়া চোখ তুলিয়া দেখিল—জননীর কঙ্কালসার বক্ষে যেন মূর্ত্তিমান মৃত্যু ছুরি বসাইয়া ঝলকে-ঝলকে জীবন-প্রবাহ ভরিয়া দিতেছে! চোখোচোখী হইতেই মা পুনশ্চ বলিয়া উঠিলেন, "ওই বই, ওই-সব পড়ে তুই স্কুলে 'ফার্ষ্ট' হয়েছিস, সকলের মুখে তুই 'হীরের টুক্‌রো, সকলের মুখে—আমি কি না 'মলিনের মা'! ওই সব সামিগ্রী আমি বেচি?"

মায়ের বুকের ভিতরটা মলিনের চোখে দর্পণের মত প্রতিফলিত হইল। দেখিল, তাঁহার বুক জুড়িয়া ছোটো-বড় বিবিধ-বিচিত্র, রাশি রাশি হাহাকার উঠিয়া আপনা-আপনি কাটাকাটি করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে! কি বলিতে যাইতেছিল, তাহা পারিল না। বাক্যের মোড় ঘুরাইয়া বলিয়া উঠিল, "না হয় চাকরী! মা, কেমন?"

মায়ের চোখ দুইটি একবার বড় হইয়াই ছোট হইয়া গেল। কহিলেন, "সময় হলেই করবি।"

"কিন্তু ওদের টাকা? দেখছ না, ওরা রাগ করেছে! কেউ আর আসে না, সন্ধ্যাও না, ভাঁটুও না!" বলিয়া মলিন মায়ের দিকে তাকাইয়া রহিল।

মা যেন একটু অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন। ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া কহিলেন, "রাগ ওরা করেনি, মলিন! হয়ত এ-বাড়ীর ছায়া ওদের চোখে জল এনে দেয়—তাই!" বলিয়াই একটা বাল্‌তি লইয়া অদূরে বেগুন-গাছে জল দিতে গেলেন।

মলিন আর কথা খুঁজিয়া পায় না। এদিক-ওদিক, চতুর্দ্দিক চাহিয়া দেখিল—এই পৃথিবীর যেন সর্ব্বাংশ ভরিয়াই বাক্যের স্রোত বহিয়া যাইতেছে—কত কথা, কত কাহিনী, কত কলরব!—এ-সমস্তর যেন আদিও নাই—সুরুও নাই—সীমানাও নাই! তত্রাপি এই বিশ্বব্যাপী কোলাহলের ভিতর একটিও শব্দ মুখর নাই তাহার মুখে আসিবার, যেন তাহাকে দেখিয়া সমস্তই আতঙ্কে শিহরিয়া পিছাইয়া গিয়াছে—সব কথা, সব কাহিনী, সব কলরব!

ক্ষণকাল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া মলিন মায়ের কাছে সরিয়া গিয়া কহিল, "আচ্ছা মা, এক কাজ করলে হয় না? এ তো শীত কাল আর তুমি বুড়ো মানুষ—শীতে তোমার নিশ্চয়ই কষ্ট হয়! আমি যদি রাঁধি!—ওঃ, ভারি তো কাজ! মা, কাল থেকে রাঁধবো?"

মা তখন জলের বাল্‌তিটা এক পাশে রাখিয়া বেগুন গাছের মাটি খুঁড়িতেছিলেন, ছেলের দিকে একবার তাকাইয়াই পুনশ্চ হাতের কাজে মন দিলেন।

মলিন হাঁটুর উপর হাত দিয়া ঝুঁকিয়া মায়ের হাত দুইটির উপর একদৃষ্টে ক্ষণকাল তাকাইয়া থাকিয়া হঠাৎ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল, "ও-রকম আমিও পারি! গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে মাটি দেওয়া তো!—সরো দিকিনি তুমি!"

মা এই বার কথা কহিলেন। অনাসক্ত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই পারবি না—এ সব আমার হাতের গাছ!"

মলিন আর কথার উপর কথা দিল না। অপলক নেত্রে মায়ের মাটি-মাখা হাত দুইখানির দিকে তাকাইয়া রহিল। একটু পরেই কি মনে করিয়া হঠাৎ বাড়ীর ভিতরে একটা আমড়া গাছের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিয়া উঠিল, "দেখো মা! কি থোলো-থোলো আমড়া ঝুলছে! ওই ত ছোট্ট গাছ, না-হয় বড়ই হলো—পাড়বো দুটো?"

মা বিস্ময়ে ছেলের দিকে মুখ তুলিতেই, সে বলিয়া উঠিল, "টক্ হবে? তুমি বলো—আমড়ার টক্ হলেই ভাত ওঠে! বলো—'আমি বলিনি'?"

কথাটা স্বীকার করাও চলে না, অস্বীকার করাও চলে না। স্বীকার করা চলে না এই কারণে—হয়ত বা কোনোও দিন তিনি এ কথা বলিয়া থাকিবেন, থাকিলেও তাহা যে আজ আইন হইয়া দাঁড়াইবে, এ-সিদ্ধান্তে তিনি সায় দিতে পারেন না। সন্তানের মুখ—সেই মুখে ক্ষীর সর তুলিয়া দেন মা, আর মলিনের মুখে দুই বেলা দু'টি ভাতের সঙ্গে শুধু 'আমড়ার টক্' দিয়াই তিনি তৃপ্তি পাইবেন কেমন করিয়া? আর অস্বীকার করিতে পারেন না, তার হেতু এই যে, চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-নক্ষত্র, স্বর্গ-নরক, পাপ-পুণ্য, দানব-দেবতা, রামায়ণ-মহাভারত, ইহলোক-পরলোক—সমস্তই তিনি অবিশ্বাস করিতে প্রস্তুত, কিন্তু মলিনের স্মরণশক্তি, তার আত্মবিকাশ—ও-বস্তুর উপর তিনি বিশ্বাস হারাইতে প্রস্তুত নন্। কিন্তু হোক্ তা! এই সমস্ত কথাবার্ত্তার মূলে যে মর্ম্মভেদী হাহাকার নিহিত ছিল, তাহাই তাঁহার বুকে হঠাৎ আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দিবসের পল-অনুপল, তাহার মূল্য মলিনের নিকট এক দিন কত যে ছিল, তাহা তিনি বিস্মৃত হন নাই; বিস্মৃত তিনি আজ আদৌ হন নাই যে, সম্রাটের রাজ-মুকুটও মলিনের একটি মুহূর্ত্তের কাছেও নিষ্প্রভ হইয়া থাকিত! কিছু দিন পূর্ব্বেও ছিল এই হাড়ি-হেঁসেল, এই বেগুন গাছ, ওই আমড়ার থোলো—কিন্তু, কোন দিনই মলিন ও-সব দিকে ফিরিয়াও দেখে নাই! আর আজ এই যে তার অবিশ্রাম আগ্রহ, ইহার অর্থ আর কাহারো কাছে না হোক্, মায়ের কাছে অস্পষ্ট রহিবে কেন? সাংসারিক কাজকর্ম্ম, তাহাতে মায়ের পরিশ্রম, তাহারই লাঘবকল্পে সন্তানের আত্মনিয়োগ—এ সব কিছুই নয়! আসলে এই অছিলায় আত্মজের আত্মহত্যা! • • বালির কূপের মত মায়ের চোখে জল আসিল! তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে চোখ ফিরাইয়া নিজেকে স্বাভাবিক মাত্রায় দাঁড় করাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "আচ্ছা, সে আদালত আজই তো বসছে না!" বলিয়াই উঠিয়া-পড়িয়া একগাছা ঝাঁটা আনিয়া উঠান ঝাঁট দিতে লাগিলেন।

মলিনও যেন নিজের অজ্ঞাতসারেই মায়ের দিকে ফিরিল। বাক্যহারা ওই মাতৃমূর্ত্তি, তাঁহারই দিকে মুখ করিয়া মলিন—স্থাণুর ন্যায় স্থির, নিঃশব্দ, অচঞ্চল! যেন উভয়েই এক নির্ব্বাণতন্ত্রে আত্মলোপ করিয়াছে, যেন বা ধরিত্রীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বেদনার সার্থক সাধক আজ নির্ম্মুক্ত, অথবা জগতের এক বিশেষ প্রয়োজনে কোনো বিখ্যাত শিল্পী ওই দুইটি নির্ব্বাক্ কল্যাণ-মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া এইমাত্র পিছন ফিরিয়াছে!

অত্যল্প কাল পরেই এক কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজে উভয়েই চমকিয়া চাহিয়া দেখিল—দুলে-বউ। দুলেদের এই মেয়েটি মলিনের বাপের আমলে এই বাড়ীতে কাজ করিত, এখন পর্য্যন্ত এই বাড়ীর মায়া সে ভুলিতে পারে নাই! এই দুর্দ্দিনে একমাত্র সেই-ই বুক দিয়া দাঁড়ায়! বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়াই সে দূর হইতে মলিনের মায়ের হাতে ঝাঁটা দেখিয়া গাঁ মাথায় করিয়া বলিয়া উঠিল, "কি আক্কেল তোমার বাছা! পই-পই কোরে বলনু কাল, ঝাঁট-পাট আমি দেবো, কিন্তুন্ তোমার আর 'তর' নেই—" হনহন্ করিয়া মলিনের মায়ের কাছে সরিয়া আসিয়া কহিল, "ঝ্যাঁটা রাখো, রেখে ধামিটে নিয়ে এসো দিখিন্"—বলিয়া একটা ছোট্ট পুঁটলি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে বাহির করিল।

মলিনের মা চটিয়া উঠিয়া কহিলেন, "আবার তুই ও-সব কি আনলি? আমি কি মাথা খুঁড়বো, দুলে-বউ?"

দুলে-বউও ততোধিক চটিয়া উঠিয়া কহিল, "ন্যাও, ন্যাও, কথার আর পাক তুলো না! আমার হাত ভেরে যাচ্ছে—"

রাগারাগি করা নিষ্প্রয়োজন। মলিনের মা মুখখানা হাঁড়ি করিয়া ঘর হইতে একটা ছোট ধামা আনিয়া তাহার সুমুখে ফেলিয়া দিল এবং দুলে-বউ পুঁটলি খুলিয়া ঢালিয়া দিল—সের তিনেক চাল, গোটা-কতক কচু ও এক-কুচি থোড়। দিয়াই কহিল, "যা পাঁচটা ধানপান হয়েছে তা আবাগীর ব্যাটারা কবে যে ঝাড়বে তার ঠিক নেই। এত দিন খাবে কি? বাড়ীতে কি মরাই বাঁধা আছে, বলতে পারো?" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "ধরো, তুমি বিধবা মানুষ, তুমি না হয় পারো গণ্ডায়-গণ্ডায় উপোষ করতে, কিন্তুন্ ওই দুধের বালক—পেট চুঁইয়ে থাকবে ও ক্যানে? ধন্যি তুমি মা!"

মলিনের মা ম্লান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সত্যি দুলে-বউ, আমি মিছে মা!"

এক সুনিশ্চিত আতঙ্কে দুলে-বউয়ের মুখখানা সহসা সাদা হইয়া গেল। চোখ-মুখ কপালে তুলিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "ও-কথা বোলো না মলিনের মা! কত দত্তি-দানা হাওয়া হয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—তাদের কানে উঠলেই কথাটা সত্যি হয়ে যাবে!" একটু থামিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তা বটে বাছা! কোথায় রাজ-সিংহাসন, না কোথায় বনবাস!—ছেলেকে বোঝাও—বেশ করে বোঝাও, বলো—এ জন্মে না হোক্, ফিরে জন্মে তুই কোম্পানীর পেয়াদা হবি!" বলিয়াই ধামিটা লইয়া ঘরের ভিতর রাখিতে গেল।

মলিনের মা-ও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। গিয়া স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন, "আর এ-সব আনিস্ না দুলে-বউ! রোজ-রোজ কোথায় তুই পাবি?"

দুলে-বউ গালে হাত দিয়া বলিয়া উঠিল, "শোনো কথা! আমার গতর নেই? চাড়ালপাড়া কৈবর্ত্তপাড়া, জেলেপাড়া—সব পাড়ায় আমার বাঁধা ঘর! এক মণ কোরে চাল তুলবো, এক কাঠা কোরে পাবো—আধ কাঠা আমার, আধ কাঠা তোমার! এ তো সোজা হিসেব!"

মলিনের মায়ের ম্লান মুখে পুনশ্চ একটু হাসির আভা দেখা দিল। কহিলেন, "তোর ঘরেও তো খাবার মুখ আছে, দুলে-বউ?"

দুলে-বউ তৎক্ষণাৎ বাঁ হাতটা বাড়াইয়া সগর্ব্বে বলিয়া উঠিল, "এই হাতের নোয়া বজ্জর হোক্! এই কথাটা বলে এসো দিকিনি আমাদের মুখপোড়ার কাছে, হেই মলিনের মা! বুঝি, তুমি কেমন মন্দ মেয়েমানুষ!" বলিয়াই এক সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, এবং পরক্ষণেই তেমনি করিয়া সুরু করিল, "বললে না বিশ্বেস যাবে—ভেনে-কুটে চাল নিয়ে ঘরে ঢুকিছি কি না ঢুকিছি—অমনি মুখপোড়া

ডালকুত্তোর মতন তেড়ে আসে! বলে—'যা, যা, শীগ্‌গির যা মলিনদের বাড়ী, আগে ওনাদের দিয়ে আয়' !"

মলিনের মায়ের চক্ষুর্দ্বয় পুনরায় বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ভারি গলায় কহিলেন, "তুই আমার মায়ের পেটের বোন্, আর গোষ্ঠ—সে সহস্রজীবী হোক্, সে আমার ভাই! এ ছাড়া এ-মুখ দিয়ে আর কিছুই বেরুলো না দুলে-বউ!" বলিয়াই তিনি ঝর-ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে দুলে-বৌয়ের বুকটা যেন উড়িয়া গেল। যেন মাথা-মুড় খুঁড়িয়া বলিয়া উঠিল, "অ্যাঁ! আমি শতেক-খোয়ারি কি কনমু গো! হ্যাঁ মলিনের মা, তোমাকে আমি কাঁদিয়ে দিমু—এ্যাঁ, কি কনুমু, কি কাজ কনমু আমি—"

মলিনের মা একটু অপ্রতিভ হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া বলিয়া উঠিলেন, "অমন করিস্ নে—অমন করিস্ নে। কৈ, আমি কাঁদ্‌ছি? কাঁদিনি তো—এই চোখ দেখ্—"

দুলে-বউ নাক ঝাড়িয়া কহিল, "দেখবো আর আমার মাথা! কাঁদ্‌লে তো ভালোই হতো, মলিনের মা! ভেতরটা খালাস্ হতো। কথায় বলে—'অপ্‌পো দুঃখে কাতর, বেস্তর দুঃখে পাথর'!"

মলিনের মা বিপরীত দিকে একবার মুখ ফিরাইয়াই কহিলেন, "দুলে-বউ, একটা কথা তোকে জিজ্ঞেস্ করি—তোদের পাড়ার সবাই জানে—মলিনের আমার আর স্কুল নেই।"

দুলে-বউ যেন আকাশ হইতে পড়িল। গালে হাত দিয়া কহিল, "ও মা! কি দরের কথাই তুমি না বল্‌লে, মলিনের মা! জানে না আবার? এ পরশটার গাঁ-গেরাম একেবারে ঢি-ঢি!" তার পর মলিনের মায়ের দিকে একবার বিক্ষুব্ধ নেত্রে তাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "মলিন তোমার কোল-জোড়া হয়ে বেঁচে থাক্—মুখ্যু সন্তান থাকা আর না থাকা!"

মলিনের মা শিহরিয়া উঠিলেন—'ষাট্, ষাট্!'

এম্‌নি সময়ে নাচ-দুয়ারে ঝনাৎ করিয়া শব্দ হইল, কে-যেন সজোরে কপাট ঠেলিয়াছে। সঙ্গে-সঙ্গে নক্ষত্রের ন্যায় ছুটিয়া আসিল ভাঁটু আর তাহার পশ্চাতে সন্ধ্যা। মলিনকে দেখিয়াই ভাঁটু অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "মলিন দা', শীগ্‌গির—শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ো—"

এই দুইটি ছেলে-মেয়ে, ইহারা কত দিন পরে দর্শন দিয়াছে—হঠাৎ, আকস্মিক, ভয়ঙ্কর! উপস্থিত তিনটি প্রাণীই বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়া পড়িল। কাহারও মুখ দিয়া বাক্য সরিল না, যেন এক কৃষ্ণ-কুহেলি কখন্ কোন্ ফাঁকে তাহাদিগকে ঘিরিয়া মায়ারূপ ধরিয়াছে!

ভাঁটু পুনশ্চ তেম্‌নি করিয়া বলিয়া উঠিল, "এসো, দেরি কোরো না—"

আবার সেই উন্মত্ত নির্দ্দেশ—অর্থ নাই, লক্ষ্য নাই। মলিনের মা মূঢ়ার ন্যায় প্রশ্ন করিলেন, "কোথায়?"

"স্কুলে ইনস্‌পেক্টর এসেছেন—মলিনদা'র ডাক হয়েছে—"

"ইনস্‌পেক্টর?"—এক বর্কশ আনন্দে মলিনের মা যেন থর-থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিলেন।

মলিনেরও চোখ দুইটা যেন এক অসহ্য হর্ষে অস্বাভাবিক বড় হইয়া উঠিল। দুলে-বউও আর থাকিতে পারিল না, হাত দুইটা জড়ো করিয়া মাথায় ঠেকাইয়া ধরা-গলায় আপনা-আপনি বলিয়া উঠিল, "হে মা রক্ষেকালী,—হে মা রক্ষেকালী—"

ভাঁটু ছট্‌ফট্ করিয়া উঠিল। মলিনকে তাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, "শীগ্‌গির আয় একটা জামা গায়ে দিয়ে—"

"আবার লেট্?"—সন্ধ্যাও এক সময়োচিত ধমক্ দিল, দিয়া সে নিজেই ঘর হইতে মলিনের একটা জামা আনিয়া তাহার গায়ে ফেলিয়া দিল।

আর দেরি হইল না। ভাঁটু মলিনকে সম্মুখ করিয়া তৎক্ষণাৎ বাহির হইয়া গেল।

অতঃপর যেরূপ দ্রুতগতিতে এই এক মাস পূর্ব্বে মলিনের জীবন-তরুর অকাল-উচ্ছেদ সংবাদটা প্রচারিত হইয়াছিল, ততোধিক দ্রুত-গতিতে আজও এই সংবাদটিও সকলের কানে গিয়া পড়িল যে, ইনস্‌পেক্টর-সাহেব স্বয়ং—তিনি নিজেই মলিনের পড়িবার ব্যবস্থা করিবেন। সে কলিকাতায় যাইবে—কাল বাদে পরশু। [ক্রমশঃ।

রণ-মন্থনের যুগে

শ্রীঅপূর্ব্বকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য

অন্যায়ের স্বাধিকারে এ সমরোত্তর চিত্ত মোর
আহত তরঙ্গ সম সংসারের তটপ্রান্তে কাঁদে।
আগ্নেয় গিরির মত অশান্তির উন্মাদনা সাথে
মহাকাল করে চক্রমণ। অন্ধকারে হোলো ভোর
রক্তস্নাত বিষণ্ণ রজনী। জীবনের আরাধনা—
উজ্জীবন আশা আর আনন্দের উৎসব-কাকলী
বাতাসের হাহাকারে জনারণ্যে বিলুপ্ত সকলি:
নামে মনে বিক্ষোভের ছায়াচ্ছন্ন অব্যক্ত যাতনা।

এখনো রক্তের স্রোত! শূন্যে ওড়ে শকুনের দল,
উজ্জ্বল বাসনা-পুষ্প পরিম্লান স্থবির হৃদয়ে;
রণ-মন্থনের যুগে বিভীষিকা ঢাকা নভস্তল,
স্বার্থতার কোলাহল বিপ্লবের বৈরী-পরিচয়ে
পৃথিবীর বসন্তেরে স্বপ্নান্তরে দিয়েছে বিদায়!
রিক্ত রাহী,—পথে একা, মোর পানে কেহ নাহি চায়

সাঁতারের কথা

শ্রীশান্তি পাল

বৈজ্ঞানিক কৌশলে সন্তরণের উন্নতির জন্য ইউরোপের ব্যায়াম-বিদেরা এক সময় যথেষ্ট মাথা ঘামাইয়াছিলেন। বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মাণী এ বিষয়ে অগ্রণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে সন্তরণ-ক্রীড়া ক্রমশঃ জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। 'সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্রেট বৃটেন' প্রতিষ্ঠিত হইবার পর কর্তৃপক্ষেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাঁতারু নির্ব্বাচনের জন্য বিপুল সমারোহের সহিত একটি সন্তরণ-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেন। এবং তাঁহারা সেই সময় ইংলণ্ডে জনসাধারণের জন্য স্নানাগার স্থাপনার্থে 'পার্লিয়ামেণ্ট অফ বাথ এণ্ড ওয়াশ আওয়ার্স এ্যাক্ট' শীর্ষক একটি আইনও প্রচলিত করেন; ফলে ইংলণ্ডে অনেক সাঁতারুর আবির্ভাব হয়। সম্প্রতি আমেরিকা, জাপানও এ বিষয়ে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। ঐ সকল দেশে সন্তরণে বিরাট সাহিত্যও গড়িয়া উঠিয়াছে। এই সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিতে পাই যে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে নটিংহামের সন্তরণ-শিক্ষক মিঃ জে, ফ্রষ্ট সর্ব্বপ্রথম বিজ্ঞান-সম্মত সন্তরণ-বিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া যশস্বী হন। ইহার কিছু কাল পরে জার্ম্মাণী হইতে মিঃ পিটার হাইনরিক-লিখিত 'সুইমিং ড্রিল এণ্ড লাইফ সেভিং' নামক আর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ চার্লস ষ্টীডম্যান 'ম্যানুয়েল অফ সুইমিং' শীর্ষক পুস্তক রচনা করিয়া সন্তরণ-জগতের অনুসৃত অনেক ভুল-ভ্রান্তি দূর করিয়া দেন। পরবর্ত্তী কালের লেখকদের মধ্যে উইলিয়ম উইলসন, জে পি উলফ, সিঃ ডানিয়েল, এস জি হেডেস, আর সি ভেমার, সিনক্লেয়ার, ভাইজ মুলার, ডেন্স জাডিন প্রমুখ সন্তরণ-বিশারদেরা সন্তরণ এবং উড়ো-ঝাঁপের 'ডাইভিং' মূল নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা ও সুচিন্তিত প্রবন্ধ ও পুস্তকের দ্বারা এই কলাবিদ্যার প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। পাঠকদিগের সুবিধার জন্য কতকগুলি ইংরেজী বইয়ের নামের তালিকা এ স্থলে উদ্ধৃত করা হইল। সুইমিং-র‍্যাঙ্ক টমসে, লণ্ডন ১৯০৪; আর্ট অফ সুইমিং—থিভনট, লণ্ডন ১৭৮৯; ম্যানুয়েল অফ সুইমিং—ষ্টীডম্যান, মেলবোর্ণ ১৮৬৭; দি সুইমিং ইনষ্ট্রাকটার—ডবলিউ উইলসন, লণ্ডন ১৮৮৩; সুইমিং—সিনক্লেয়ার এণ্ড হেনরী, লণ্ডন ১৮৯৩; হাউ টু সুইম এণ্ড সেভ লাইফ—সি এম ডানিয়েল, লণ্ডন ১৯০৭; সুইমিং এণ্ড ওয়াটার-ম্যানসিপ—নিউইয়র্ক ১৯১৮; হাউ টু সুইম—হ্যাণ্ড বিঃ হ্যাণ্ডবুক অফ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশন—লণ্ডন; টেক্স্ট বুক অফ সুইমিং—জে পি উলফ, লণ্ডন; সুইমিং দি আমেরিকান ক্রল—জনি ভাইজমুলার, লণ্ডন ১৯৩০।

বাঙলা ভাষায় সন্তরণ-শিক্ষা-বিষয়ক কোন পুস্তক ছিল না। সেই অভাব দূর করিবার জন্য প্রবন্ধ-লেখক কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন। সন্তরণ-পরিচয়—কলিকাতা ১৩৪১; সন্তরণ-বিজ্ঞান—কলিকাতা ১৩৪৩; সাঁতারুর গল্প—কলিকাতা ১৩৪৫; শ্রীযুক্ত মাখনলাল ধর ১৩৪৪-এ সাঁতারের চিঠি নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমাদের দেশে সাঁতার সম্বন্ধে বিশেষ কোন পরিভাষা নাই। দুই-চারিটি বৈধ বাঙলা শব্দ ব্যতীত অন্য কোন সংজ্ঞা আছে বলিয়া আমার জানা নাই। উদাহরণস্বরূপ—ডুব-সাঁতার, চিৎ-সাঁতার, দাঁড়-সাঁতার। হাত-পাড়ি সম্বন্ধে কয়েকটি সংজ্ঞার উল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা:—একহাতি পাড়ি, দোহাতি পাড়ি, কান-পাড়ি। ওয়াটার-পোলো বিদেশী খেলা। ইহার কোন পরিভাষা আমাদের নাই। ইংরেজী নামগুলি সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। বাঙলায় সন্তরণ-সাহিত্যের পুষ্টিসাধনের জন্য আমি কতকগুলি শব্দ বিশেষ বিবেচনার সহিত সঙ্কলন করিয়া দিলাম। পাঠকদের বা সন্তরণ-শিল্পীদের মধ্যে কেহ এই পরিভাষা-সমষ্টির উন্নতিকল্পে কোন কিছু নূতন তথ্যাদি পাঠাইলে প্রবন্ধ-লেখক বাধিত হইবেন।

Breast Stroke—বুক-পাড়ি।
One Hand Stroke—একহাতি পাড়ি।
Over Arm Stroke—দোহাতি পাড়ি।
Under Hand Stroke—হাঁস-পাড়ি।
Trudgeon Stroke—ব্যাচি-পাড়ি।
Crawl Stroke—হামা-পাড়ি, মকর-পাড়ি, উড়ো-পাড়ি।
Four Beats Crawl—চৌপদী মকর-পাড়ি।
Six Beats Crawl—ছ'পদী মকর-পাড়ি।
Swimming on Back—পিঠ-পাড়ি।
Back Crawl—একহাতি পিঠ-পাড়ি।
Free Style—এলো-পাড়ি।
Plunging—বুক-ঝাঁপ।
Diving—আকাশি-ঝাঁপ, উড়ো-ঝাঁপ।
Plunger—বুক-ঝাঁপারু।
Diver—উড়ো-ঝাঁপারু।
Plunging Board—ডুব-মঞ্চ।
Diving Board—আকাশ-মঞ্চ, উড়ো মঞ্চ।
High Dive—আগল-ঝাঁপ।
Low Dive—নাবাল-ঝাঁপ।
Platfrom—সাঁতার-মঞ্চ।
First Board—একতলা।
Second Board—দোতলা।
Third Board—তেতলা।
Spring Board—দোলা-মঞ্চ।
Spring Board Dive—দোলা-ডুব।

Turning—বাঁক-ফের।
Start—সুরু।
Starter—সুরুদার।
Finish—সমাপ্তি, শেষ।
Disqualified—নাকচ।
Costume—সাঁতার-সাজ।
Official—সরকারী।
Training—রেওয়াজ।
False Start—বাতিল।
Judge—সালিশ।
Steward—খবরদারী।
Scorer—মুন্সী।
Timer—ঘড়িদার।
Caller—নকীব।
Track—জল-সড়ক।
Track Judge—সড়কদার।
Referee—মোড়ল।
Linesman—নিশানদার।
Goal Judge···গড়-সালিশ।
Competition—বাজি, টক্কর।
Tie—ফাঁস।
Bye—ফাঁস-ছাড়।
Goal keeper—গড়দার।
Home Ground—ঘর-কোর্ট।
Away—পর-কোর্ট।
Home Side—ঘরতরফ।
Opponent Side—পরতরফ।
Dead Ball—বার বল।
Ball in Play—চালু বল।
Penalty—সাজা।
Offside—আগবাড়।
Foul—নাহক।
Boundary Line···বার-দাগ।
Friendly Match—ঘরোয়া খেলা।
Final Match—চূড়োন খেলা।
First Round—প্রথম চক্কোর।
Second Round—দ্বিতীয় চক্কোর।
Fourth Round—চৌ চক্কোর।
Charity Match—খয়রাতি খেলা।
Draw—সমান খেলা।

Extra Time—বাড়তি খেলা।
Trial Match—বাছন খেলা।
Charge—তাড়া।
Dodge—কাটান।
Dribble—তুলকি।
Splashing—ছিটেন।
Rebound—টানকি।
Score—গড় পার।
Shot—মার।
Passing—চালাচালি।
Short Pass—ছোট চাল।
Long Pass—বড় চাল।
Individual Game—একানী খেলা।
Defence—বাঁচান।
Offence—আগান।
Four Yards Line—চার-গজী দাগ।
Two Yards Line—দু'-গজী দাগ।
Corner—কোণ-দোষ।
Goal Post—গড়-খুঁটো।
Cross Bar—আড় খুঁটো।
Team—দল।
Club—সঙ্ঘ।
Combination—মেলতা।
Goal Area—গড়-মণ্ডল।
Center Line···মাঝ-দাগ।
Side Line···পাশ-দাগ।
Forward···আগারু।
Center Half···মাঝারু।
Back···পিছারু।
Right Back···ডান-পিছারু।
Left Back···বাঁ-পিছারু।
Right Out···ডান আগারু।
Left Out···বাঁ আগারু।
Center Forward···মাঝ আগারু।
Wilful Foul···জানতি-নাহক।
Returned Match···পাল্টা খেলা।
Team Work···জোট খেলা।
Fancy Swimming···বাহারি সাঁতার।
Fancy Dive—বাহারি ডুব।
Fancy Dress Swimming—রূবাহারি সাঁতার।

(কথা-চিত্র)

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭

পিতলের ছোট পীলসুজটির উপরে বসানো প্রদীপের মৃদু আলোকে মায়া যখন তার বাবাকে চিঠি লিখছিল, সেই সময় একশো ক্রোশ তফাতে ভিন্ন জেলার সদর সহরে সর্বাধিক পরিচ্ছন্ন অঞ্চলে ছবির মত একখানি দ্বিতল বাড়ীর সুসজ্জিত ঘরে নাট্যকার মৃগেন রায় তার নূতন নাটক 'ছিন্নমস্তা'র গীতায়নে ব্যস্ত।

একখানি 'পালার' দৌলতে বরাত যে এভাবে প্রসন্ন হবে, মৃগেনের বাস্তব মনে তার কোন সম্ভাবনা জাগেনি। অবিশ্যি, বসন্ত রায়ের মুখে বউরাণীর মেজাজ এবং পালা-রচয়িতাদের যশ ও অর্থ-ভাগ্যের কাহিনী তাকে আশান্বিত করেছিল, কিন্তু আশাটি যে এত শীঘ্র এভাবে সফল ও সার্থক হয়ে উঠবে—এ যেনো ধারণারও অতীত। পালাটি মনোনীত হবার পর বউরাণী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি এখন কি চান বলুন?

মৃগেন তাঁর প্রশ্নের উত্তরে শুধু বলেছিল: দেখুন, আমার মা নেই, কিন্তু মায়ের স্নেহ আমি অনুভব করতে পারি। সেই স্নেহ দিয়েই আপনি আমার লেখাকে সবার সামনে বাড়িয়েছেন, আপনার জন্যেই দেশের সামনে আমার লেখা আদর পাবে। এতেই আমার সব পাওয়া হয়ে গেছে—আমার চাইবার ত কিছুই নেই আর!

ভাবের আবেগেই কথাগুলি এভাবে বলে ফেলেছিল মৃগেন, কিন্তু সেই কথাগুলি ধ্রুব ব্রহ্মাস্ত্রের মতনই মমতাময়ী নারীর অন্তরে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁকে অভিভূত করে। একটু ভেবে তিনি সংক্ষেপে তখন জানিয়ে দেন: বেশ, তোমার চাইবার মতন কিছুই যখন নেই, দেখি ভেবে কি করতে পারি। তবে একটা কথা বলে রাখি, বইখানা খোলা না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে থাকতে হবে, অবিশ্যি তার ব্যবস্থা আমি যথাসাধ্য করে দেব।

কথাটা জানাজানি হতেই দলের মধ্যে কথা ওঠে: ছেলেটা কি বোকা; খপ্ করে বলে ফেলল—চাইবার কিছু নেই! পালা শুনে বউরাণী যে-রকম খুসী হয়েছেন, পাঁচশো টাকা চাইলেও উনি 'না' বলতেন না!

কেউ বলে: আহা বুঝছ না, বই খোলা হবার আনন্দেই ছোকরা টাকার কথা আর মুখে আনেনি—পাছে দর শুনে বউরাণী পেছিয়ে যান!

মাতব্বর গোছের লোকরা মুখ টিপে ঘাড় নেড়ে জানায়: লিখিয়ের মুখ হে, না চেয়েই ও ছোকরা সব পেয়ে গেছে দেখো! বৌরাণীমা আমাদের বিনি পয়সায় বই নেবার পাত্রীই বটে!

পরদিনই মৃগেন জানতে পারল, তার জন্যে আলাদা একখানি বাড়ী ঠিক করা হয়েছে, সেইখানে সে থাকবে। ম্যানেজার বসন্ত রায় এষ্টেটের গাড়ী করে স্বয়ং মৃগেনকে সেই বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। রাস্তার ধারেই ফটকওয়ালা ছোট বাড়ী, ভিতরে ঢুকলেই ফুলের বাগানটি চোখে পড়ে। একতলায় রান্নাঘর, ভাঁড়ার ও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা দেখা যায়; উপরতলার ঘর দুইখানি সুন্দর ভাবে সাজানো। একখানি ঘরে পড়া-শোনা ও বসবার আসবাব-পত্র পরিপাটি করে রাখা; অপরখানিতে নূতন খাট পাতা, তার উপরে পরিচ্ছন্ন সুকোমল শয্যা, খাটের ছত্রিতে জড়ানো রয়েছে নেটের মশারি।

ঘরগুলি দেখিয়ে বসন্ত বাবু বললেন: দেখছেন ত আমাদের বউরাণীর নজর—পান থেকে চুণটুকু খসতে দেন না। এই বাড়ীখানা নতুন তৈরী হয়েছে; বললেন—বাজে খরচ করে গৃহ-প্রবেশের হাঙ্গামা করে আর দরকার নেই, গুণী ব্রাহ্মণের বসবাসে পবিত্র হোক। এই দেখুন না—রসুয়ের তৈজস-পত্র থেকে আরম্ভ করে খাট-বিছানা, চেয়ার-টেবিল প্রত্যেক জিনিসটি নতুন কেনা। এক জন চাকর আর এক জন রাঁধুনী বাহাল হয়েছে—যাতে আপনার কোন অসুবিধে না হয়, বুঝলেন?

ঘর ও ঘরের বস্তুগুলি দেখে ও সেই সঙ্গে রায় মহাশয়ের কথা শুনে মৃগেন অবাক-বিস্ময়ে ভাবতে থাকে—সে স্বপ্ন দেখছে না ত? সন্দিগ্ধ হয়ে দু'হাতে একবার চোখ দু'টো রগড়েই বসে! পরক্ষণে বিস্ময়টা কাটিয়ে আপন মনেই বলে ওঠে: এমনি টেবিলের সামনে কুসন-দেওয়া চেয়ারে বসে লিখব, ঘরে দেশের মহাপুরুষদের ছবি ঝুলবে, পাশে একখানি তক্তপোষও পাতা থাকবে—এগুলো মনে মনে কল্পনা করতুম, কিন্তু আজ দেখছি সে কল্পনা বাস্তব হয়েছে।

বসন্ত রায় বললেন: লোকে বলে কি জানেন, আমাদের বউরাণী না কি অন্তর্যামিনী, একবার যাকে দেখেন আর মুখের কথা শোনেন—তখনি মনে মনে তিনি জেনে ফেলেন সে লোকের কি কি চাই আর কিসে সে খুসি থাকে, কি পেলে তার মনটি আনন্দে ভরে ওঠে। যাক্, এখন শুনুন—বউরাণীর ধারণা হয়েছে, আপনি যখন চমৎকার গাইতে পারেন, তখন গান বাঁধতে আপনার বাধবে না। পালায় 'জুড়ীদের' আর 'ছেলেদের' গান অনেকগুলো চাই; আমাদের দলের মূল জুড়ীই ঐ সব গানের সুর দেবেন, আর সেই সুরে আপনাকে গান বেঁধে দিতে হবে। এই ঘরেই সে কাজ চলবে। সন্ধ্যার দিকে তিনি এসে আপনাকে দিয়ে গান বাঁধিয়ে নেবেন।

মৃগেন হাসি-মুখে সম্মতি জানায়। এর পরই মৃগেনের পালার মহলা সুরু হয়ে যায়, সংগে সংগে গান বাঁধার কাজও চলতে থাকে। বউরাণী খবর নিয়ে জানলেন, মৃগেন ছেলেটি শুধু পালা লিখে দিয়েই খালাস নয়—গানে বাজনায় অভিনয়ে সব দিক্ দিয়েই যেনো পাকা ওস্তাদ। মহলার সময় নামকরা পাকা অভিনেতাদেরও গলদ ধরে দিয়ে বাচনভঙ্গির নূতন রূপ দেখিয়ে দেয়, সুর অনুসারে শব্দ বসিয়ে সংগে সংগে গান বাঁধতেও তার ক্ষমতা অদ্ভুত। তা ছাড়া, স্বরচিত কয়েকখানি একালে গানে নিজের পরিকল্পিত নূতন সুর দিয়ে মহলায় যখন গানগুলি গীতিভংগিতে সে শুনিয়ে দেয়, সকলেই মুগ্ধ হয়ে প্রশংসা করতে থাকে, এবং সেই সুরই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এই সব ব্যাপারে এবং একবাক্যে সবার মুখে ছেলেটির সুখ্যাতি শুনে আনন্দে বউরাণীর মুখখানিও চক্-চক্ করতে থাকে।

দিন কয়েক পরে বসন্ত রায় একখানা লেখা কাগজ এনে মৃগেনের সামনে ধরলেন। নূতন বাসা-বাড়ীর পড়বার ঘরে বসে সে তখন তারই পালার একটি গর্ভ-দৃশ্য রচনা করছিল। কাগজখানা দেখে বিস্ময়ের সুরে মৃগেন জিজ্ঞাসা করল: কি ব্যাপার, রায় মশাই?

সামনের চেয়ারখানায় বসেই মৃদু হেসে বসন্ত রায় বললেন: আর কি, আপনাকে বেঁধে ফেলবার একটা খসড়া অর্থাৎ এগ্রিমেণ্ট। অবিশ্যি, ঘাবড়াবার কিছু নেই, পড়ে দেখুন।

একখানি ডেমী কাগজে মুক্তার মত অক্ষরে সাজিয়ে গুটি-পঁচিশেক ছত্রে মৃগেনকে বাঁধবার যে সর্তগুলি তৈরী করা হয়েছে, পড়তে পড়তে মৃগেনের চোখ দু'টো বিস্ফারিত হতে থাকে। তার মর্মার্থ এই যে, বর্তমান 'ছিন্নমস্তা' পালাটির অভিনয়-সংক্রান্ত পূর্ণ মূল্য হাজার এক টাকা মৃগেনকে দেওয়া হবে এই সর্তে যে, ভবিষ্যতে ছয় বছরের জন্য সে বউরাণী সম্প্রদায়ের সংগে বাঁধা 'অথার'-রূপে সংশ্লিষ্ট থাকবে এবং বছরে দুইখানা করে নূতন পালা লিখে দেবে। অবিশ্যি তার জন্যে বার্ষিক বারো শত টাকা এবং শ্রীশ্রীদুর্গা পূজার সময় প্রতি বছর অতিরিক্ত এক শত টাকা প্রণামী বা 'পার্বণী' ধার্য থাকবে। নির্দিষ্ট বার্ষিক পারিশ্রমিকের টাকা মাসে মাসেও তিনি নিতে পারবেন। আরো প্রকাশ থাকে যে, পালার খ্যাতি অনুসারে এক এক বছর অন্তে পারিশ্রমিকের হার বৃদ্ধি পাবে।

কম্পিত হাতে কাগজখানি সামনে টেবিলের ওপর রেখে মৃগেন ধরা-গলায় বলে ওঠে: রায় মশাই, আমার অবস্থা যে আরব্য উপন্যাসের আবুহোসেনের মতন হচ্ছে দেখছি! বউরাণীমা আমাকে সত্যিই বাঁধছেন, কিন্তু শিকল দিয়ে নয়—মায়ের দরদ আর দয়া দিয়ে! তাই দেখছি, যোগ্যতার চেয়ে ঢের বেশীই তিনি দিয়েছেন।

স্নিগ্ধ স্বরে বসন্ত রায় বললে: যখন আপনাকে আনি, পথেই ত আপনাকে বলেছিলুম মৃগেন বাবু, পালা যদি ওঁর মনে ধরে, বরাত আপনার খুলে যাবে! এখন শুধু পালা কেন, আপনিও ওঁর মনে ধরেছেন। না চেয়েই আপনি ওঁকে মাত করেছেন। আপনাকে হাজার এক টাকা দেবার জন্যে মঞ্জুর হয়ে আছে, যখন ইচ্ছে নেবেন।

মৃগেন বলে: ও টাকা আমার ওঁর কাছেই এখন জমা থাক, দরকার পড়লেই চেয়ে নেব।

মৃগেনের ব্যাপারে উচ্চ শিক্ষাভিমানী দাম্ভিক অশোক চৌধুরীর মতি-গতিও আশ্চর্য রকমে বদলে গেছে। পল্লীগ্রামের ইস্কুল থেকে এন্ট্রেন্স পাস করার বিদ্যে নিয়ে নাটক লিখেছে শুনে অশোক চৌধুরী প্রথমে কৌতুক বোধই করেছিল, ছেলেটির দুঃসাহস ও ধৃষ্টতার ওপর কটাক্ষ করে সীতাকে ত অনেক কথাই শুনিয়েছিল, এমন কি, বউরাণীর সামনেও কথা-প্রসংগে মৃগেনের মতন শিক্ষাহীন লেখকদের প্রতি আক্রমণ করবার প্রলোভনও দমন করতে পারেনি। সীতা নীরবেই তার কথায় সায় দিলেও বউরাণী কিন্তু প্রতিবাদ না করে পারেননি। হাসতে হাসতে তিনি বলেছিলেন: কারুর লেখা না শুনে আগে থেকেই বিচার করা ত যায় না; আর, তিন-চারটে পাস করতে না পারলে যে লেখা উচিত নয় বা লিখলেও সে লেখা উৎরোবে না এ কথা বলাও ঠিক নয়। যাঁরাই যাত্রার দলে বই লিখে দেশ-যোড়া নাম করেছেন—কেউ যে কতকগুলো পাস করেছেন বলে শুনিনি। পাসের চেয়ে এখানে দরকার হচ্ছে শাস্ত্র-পুরাণ সব ভাল করে জানা, আর ভাবটুকু লেখার ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তোলা। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে—মা সরস্বতীর দয়া, কেন না, পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে লেখায় ভাব ফোটানো যায় না, জোর করে কিম্বা পাসের জোরে যাত্রার বই লেখা চলে না।

বউরাণীর কথাগুলি অশোক চৌধুরীর ভালো লাগেনি; তাঁর অসাক্ষাতে সীতার সামনে ঐ সব কথা নিয়ে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি। সীতা সর্বতোভাবে অশোক চৌধুরীর পক্ষপাতিনী হলেও মায়ের প্রতি তার কটাক্ষ নীরবে সহ্য করতে পারেনি, হাসি-মুখেই বলেছিল: হতে পারে মা একটু বাড়িয়ে বলেছেন—উচ্চ শিক্ষা বা ইউনিভারসিটির ডিপ্লোমার মর্ম ত উনি বোঝেন না ভাই; কিন্তু তা বলে যাত্রার দলের নাটকের ব্যাপারে মাকে আনাড়ী ভাববেন না, মা যা বোঝেন, আর বই শুনে যা বলেন, কেউ তাতে আপত্তি তুলতে ভরসা পান না।

সীতার কথার উত্তরে অশোক চৌধুরী বলে: তার কারণ, তোমার মা হচ্ছেন মালিক—তাই। শুনিছি, যাত্রার দলের মালিকের দপ্‌দপা এত বেশী যে থিয়েটারের ম্যানেজাররাও না কি হার মানে।

সীতা বলে: আমার মা'র সম্বন্ধে সে কথা বলা চলে না। সত্যিই যাত্রার দলের মালিককে দলশুদ্ধ সবাই 'অধিকারী মশাই' বলতে অজ্ঞান। কত গল্পই তার শুনিছি। মায়ের প্রবৃত্তি কিন্তু আলাদা, তিনি নিজের মতে-মর্জ্জিতে দেওয়া-থোওয়া ছাড়া কাজের ব্যাপারে সবার মত-নেন—প্রত্যেককে বলবার সুযোগ দেন।

ক্রমে ক্রমে অশোক চৌধুরী অবস্থাটি উপলব্ধি করতে পারে—পালা-রচনা ব্যাপারে বউরাণীর কথাগুলি যে অতি সত্য, মৃগেনের অসাধারণ রচনা-শক্তির চাক্ষুস পরিচয় থেকেই সেটা সুস্পষ্ট ও প্রতিপন্ন হয়ে ওঠে এবং সেই সংগে নিজের সম্বন্ধে নোট মুখস্থ করে ইউনিভারসিটির একটার পর একটা পরীক্ষার ডিপ্লোমা-প্রাপ্তির গভীর অবলেপন ক্রমশঃ লঘু হতে থাকে। পক্ষান্তরে, পালা সম্পর্কে অশোকের আশা সাফল্যমণ্ডিত না হলেও সীতার সম্বন্ধে একটা সম্ভাবনা সেই ব্যর্থ আশাকে আর এক দিক দিয়ে রঙিন ও রমণীয় করে তুলছিল। চুনীর তীরে সীতার প্রতি তার অশোভন আচরণের পরেও সীতার আচরণে কোন ছন্দপতন হয়নি দেখে তার উৎসাহ আরো নিবিড় হয়ে ওঠে—মনে মনে সে সাব্যস্ত করে ফেলে যে, সীতাকে সে ভুল বুঝে নাই—তার মনটিকে আয়ত্ত করেই ফেলেছে। সে জানে, তার ভগিনী—সীতাদের অধ্যাপিকা অনেক আগে থেকেই ধনবতী বউরাণীর এই উত্তরাধিকারিণী কন্যাটিকে তার সুযোগ্য জীবনসংগিনী সাব্যস্ত করে যোগাযোগের পথটিও নিরংকুশ করে রেখেছে! বউরাণীর সহজ সরল ব্যবহার ও কথাবার্তাও তাকে উৎসাহিত করে। সেদিন তিনি নিজেই তার ঘরে এসে বলেন: তোমার এখন যাওয়া হবে না অশোক, সীতাকে সংগে করে যেমন এনেছ—তেমনি সংগে করেই নিয়ে যাবে বাবা! আর একটা কথা, লেখবার ক্ষমতা যখন তোমার আছে—এ বইখানা চললো না ব'লে যেনো চুপ করে ব'সে থেকো না, যে ক'দিন আছ এখানে মহলাটা দেখো, তাহলে লেখার ধরণ-ধারণ বুঝতে পারবে। তোমার ওপরেও আমি অনেক আশা রাখি জেনো। মৃগেনের ওপর তুমি যদি রাগ কর, তাহলে ওর ওপর সত্যিই অন্যায় করা হবে, ও কিন্তু তোমাকে সত্যিই খুব মানে আর শ্রদ্ধা করে, ও জানে তুমি কত বড় বিদ্বান্। সেদিন আমাকে বলছিল, আমার ইচ্ছা করে অশোক বাবুর কাছে ভাল করে ইংরিজীটা শিখি। আমি বলি কি, ওর যা শেখবার তোমার কাছে শেখে, আর তুমিও ওর কাছে পালা বাঁধবার ধরণ-ধারণ শেখ, তাতে কারুরই নিন্দে নেই বাবা—বরং দু'জনেই লাভবান হবে।

পরদিনই সীতা এসে বলে: চলুন অশোক বাবু, আজ আমরা

মৃগেন বাবুর বাসায় যাই—পুরোনো গানের সুর শুনে তিনি সংগে সংগেই কেমন করে গান বাঁধেন, চলুন না দেখে আসি।

অশোক এ দিন আর প্রতিবাদ করে না, প্রসন্ন মনেই বলে: বেশ ত, চল না যাই; আমাদের দু'জনকে কিন্তু দেখলেই সে ঘাবড়ে যাবে।

মৃগেনের বাসা-বাড়ীর পড়বার ঘরে ঢুকেই অশোক ও সীতা থমকে দাঁড়ালো। তারা দেখল, দলের গায়ক তক্তোপোষের ওপর বসে ঘাড় নেড়ে-নেড়ে সুর দিয়ে একখানা গান চাপা-গলায় বলে যাচ্ছে, আর নিজের জায়গাটিতে বসে ঠিক সেই গানের ছন্দ আর সুরের সংগে সমতা বজায় রেখে নূতন শব্দ সংযোগ করে গান বেঁধে চলেছে মৃগেন। হারমনিয়ম বাঁয়া-তবলা পাখোয়াজ মন্দিরা বেহালা প্রভৃতি সরঞ্জাম নিয়ে আর সব বাজিয়ে ও গাইয়েরা প্রতীক্ষা করছে। গানটি বাঁধা হবা মাত্রই তখনি সংগতের সংগে সাধা হবে। তখনো যাত্রার অভিনয়ে জুড়ীর গানের প্রচুর আদর—সমঝদার শ্রোতারা তাদের উচ্চগ্রামের রাগ-রাগিণীযুক্ত কণ্ঠ-সংগীত শুনে গুণের বিচার করতে অভ্যস্ত। কাজেই জুড়ীদের জন্যে গান বাঁধতে পালা-রচয়িতাকে হিমসিম খেতে হয়। জুড়ীদের গান ছাড়া ছেলেদের গান—সে আর এক পর্ব। পনেরো-ষোলটি সুকণ্ঠ ছেলে যাত্রার আসরের বিভিন্ন অংশে গিয়ে গান গাইতে থাকে। এই সব গানের বিষয়-বস্তু নাটকের সংলাপকে অবলম্বন করেই রচিত।

অশোক ও সীতাকে এই প্রথম বাসায় আসতে দেখে মৃগেন তাড়াতাড়ি উঠে সবিনয়ে বলল: আমার কি সৌভাগ্য, আপনারা আসবেন কল্পনা করতেও পারিনি! বসুন—বসুন।

মৃদু হেসে সীতা বলল: ও কি কথা, বরং আমাদেরই সৌভাগ্য, আপনার গান-বাঁধা চাক্ষুস দেখতে পাবো।

অশোক বলল: সত্যি, আপনার সুখ্যাতি ত আর লোকের মুখে ধরে না; আপনার প্রতিভা আমরা প্রথমে ধরতে পারিনি, তাই ক্রিটিসাইজ কত করেছি, আপনি অনুগ্রহ করে সে সব ভুলে যাবেন, মৃগেন বাবু।

কুণ্ঠিত ভাবে মৃগেন বলল: আপনি আমাকে লজ্জা দেবেন না,—না হয় বটে লিখতে কিছু পারি, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা আমার কিছুই নেই—আপনার কাছে কত কি শেখবার আছে। আপনি যে দয়া করে ওঁকে নিয়ে এসেছেন তাতেই আমি কৃতার্থ হয়েছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—বসুন।

মৃগেনকেও অভ্যর্থনা করতে উঠে দাঁড়াতে হয়েছিল, সেই সংগে যে প্রধান জুড়ীটি সুর দিচ্ছিল, এবং সংগতের জন্যে যারা প্রতীক্ষা করছিল তারাও উঠে পড়েছিল। সীতা সেদিকে কটাক্ষ করে বলল: আমাদের দেখে আপনারাও যে উঠে পড়েছেন—হয়ত কাজের ক্ষতি করেছি। আসুন সকলেই বসি, কাজ চলুক।

বসার সংগে সংগেই গায়ক প্রাচীন একটা ভাবোদ্দীপক গান সুর করে অনুচ্চ কণ্ঠে বলে চলল: মৃগেনও সেই গানের ছন্দে নতুন নতুন শব্দ সংযোগ করে সংলাপের মর্মটুকু ফুটিয়ে নতুন একখানি গান বেঁধে ফেলল। তৎক্ষণাৎ সংগতের সংযোগে সমস্বরে গানটির সাধনা সুরু হয়ে গেল। সুরের সমতা এবং ওজন করে বসানো শব্দগুলির মাধুর্যে গানখানি দিব্যি উৎরে গেলো। জুড়ীর গায়ক মুক্তকণ্ঠে সর্বসমক্ষে মৃগেনের রচনা-শক্তির প্রশংসা করল। অশোক ও সীতা তার পর অনেকক্ষণ বসে এই ভাবে আরও কয়েকখানি গান রচনা ও সাধনার কৌশল দেখে চমৎকৃত হোল।

সম্প্রদায়ের লোকেরা কাজের পর চলে গেলে, অশোক ও সীতা আরও কিছুক্ষণ থেকে আজ সেধে মৃগেনের সংগে ভালো করে আলাপ করল—লেখা সম্বন্ধে অনেক সন্ধানও নিল। মৃগেনও মন খুলে বলে চলল—ছেলেবেলা থেকে কল্পনাকে সাথী করে কেমন করে সে ভাব-রাজ্যে প্রবেশ করে—চর্চার সংগে সংগে তার অক্ষম কলমের মুখ দিয়ে কি ভাবে তার অজ্ঞাতে নূতন নূতন বাণী বেরিয়ে আসে। অনেক সময় সে নিজেই স্থির করতে পারে না—তার বিদ্যা-বুদ্ধি ও ধারণার বহির্ভূত ভাবপূর্ণ কথাগুলি কি করে সে লিখে ফেলেছে! পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে বলে উঠল: শোনেননি, ঠাকুর পরমহংসদেব বলতেন—ভাবমুখে বড় বড় শক্ত কথা সহজ হয়ে বেরিয়ে আসে? আমরাও ত দেখিছি, একবারে মুর্খ নিরক্ষর—হঠাৎ বেহুঁস হয়ে বকতে থাকে. লোকে বলে তার ওপর ঠাকুর-দেবতার ভর হয়েছে; তা সে যাই হোক—কিন্তু যতক্ষণ সেই ভাবে সে থাকে, যে সব কথা তার মুখ দিয়ে বেরোয়, শুনে জ্ঞানী লোকরাও চমকে ওঠেন। আসলে হচ্ছে ওটা ভাব। আমার লেখাও এই ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র—নিজের কৃতিত্ব এতে কিছু নেই।

অবাক হয়েই এরা দু'জনে শোনে, কিন্তু তারা ভেবে পায় না—এই 'ভাব' বস্তুটি কি—কেমন করে তা মনের মধ্যে আসে, অথচ কথাটা জিজ্ঞাসা করতেও বাধে। পথে যেতে যেতে এ সম্বন্ধে তাদের মধ্যেও আলোচনা চলে।

সীতা জিজ্ঞাসা করল: কি বুঝলেন বলুন ত?

অশোক উত্তর করল: সত্যিই ওকে আমি ভুল বুঝেছিলুম—আসলে ছোকরা সত্যিই জিনিয়াস, আর, ঐ যে ভাবের কথা বললে—ওটা হচ্ছে প্রতিভা। তোমার মা ঠিকই বলেছিলেন, ও জিনিষটি পড়া-শোনায় জন্মায় না—আপনিই আসে, অর্থাৎ সহজাত।

মৃগেন তখন অস্থির ভাবে একাকী ঘরের ভিতর পায়চারি করছে—এ দিনের এমন অপ্রত্যাশিত প্রশস্তিও তার মনের মধ্যে নিদারুণ একটা অস্বস্তি তুলেছে! গায়ক বাদক অশোক সীতা—এক ঘর লোকের মুখগুলি তখন কোথায় তলিয়ে গেছে—ফুটে উঠেছে শুধু একখানি মুখ, আর সে মুখের দরদ-ভরা দু'টি কথা—ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমি যে স্বপ্ন দেখি মৃগদা, তুমি পালা পড়ছ, শুনছে কতো লোক, কিন্তু আমি সেখানে নেই!···মৃগেনের মুখখানাও কালো হয়ে যায়—আরক্ত দু'টি চোখে নেমে আসে অশ্রুর বন্যা!

২৮

পীতাম্বরের হাতের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—সমগ্র আটচালাটি সমাপ্ত-প্রায় বাগ্‌দেবীর প্রতিমায় ভরে গিয়েছে। এখনো শেষের কাজটুকু বাকি—চোখের দৃষ্টি সিদ্ধ তুলির সতর্ক পরশে ফুটিয়ে তোলা—তবুও, প্রতিমাগুলির পানে তাকালে চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না—কমলবনে যেন বীণাপাণিদের মেলা বসেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত লোকই আসে এই সাধক শিল্পীর অপরূপ সৃষ্টি দেখতে—দূর-গ্রামের বাসিন্দারাও এসে দেখে; তুলি চালাতে চালাতে পীতাম্বর তাদের প্রশংসা শোনে, মনটি দুলে ওঠে আনন্দে; অমনি

আপন মনে আনন্দময়ীকে জানায়—তা ব'লে আমার মনে যেনো দ্যামাক দিও না মা, মস্ত কারিকর আমি—এ অহংকারে নরকের পথ যেনো না খুলে দিই জননি!

পূজার দিন ঘনিয়ে এসেছে, মাঝে আর ক'টা দিন। কাল সকালেই মহাজন এসে প্রতিমা সব নিয়ে যাবে। সকাল থেকেই পরেশ পাল তাড়া দিতে সুরু করেছে: সন্ধ্যের আগেই হাতের কাজ সব শেষ করা চাই অধিকারী; মনে আছে ত, মহাজন কাল সকালেই 'কিস্তী' নিয়ে হাজির হবে?

তুলি চালাতে চালাতে পীতাম্বর বলল: তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পালের পো, যার কাজ সেই করিয়ে নেবে—আমি ত উপলক্ষ গো! তবে আমার কথাটাও মনে রেখো, কাজ হয়ে গেলে আমাকেও বিদেয় দিতে হবে কিন্তু। কাল এ আটচালা খালি হয়ে গেলে আমার বুক-খানাও খালি হয়ে যাবে—আর এখানে টেঁকতে পারব না।

জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে পরেশ বলল: বিলক্ষণ, সে কি আর আমি বুঝি নে অধিকারী, ঘর-বাড়ী ছেলে-মেয়ে ছেড়ে মায়ের প্রিতিমের মধ্যেই মনটাকে থ্যুয়ে রেখেছ, এর পর কি আর মন এখানে টেঁকে কখনো? আর কাজ হয়ে গেলে তোমাকে আটকে রাখবই বা কেন? তোমার হিসেব বুঝে নিয়ে হাসতে হাসতে দেশে চলে যাবে; আর পাওনা-গণ্ডাও ত কম নয়—এক রাশ ট্যাকা। তা ও কথা এখন না তুললেই পারতে অধিকারী—ট্যাকা ত তোমার তোলাই আছে গো।

মুখখানা একটু গম্ভীর করেই পীতাম্বর উত্তর করল: কথাটা তুলতুম না পালের পো, সে-দিনের কথাটার যদি নড়চড় না হোত। পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলুম, আর তুমিও দেবে বলেছিলে, তাই না বাড়ীতে চিঠি লিখি। তা পঞ্চাশের জায়গায় তুমি ত ঠেকালে কুড়িটি টাকা, কি করি—তাই পাঠাতে হোল। কিন্তু ঐ ক'টা টাকায় তাদের কি হবে? সেই ভেবেই কথাটা তোলা, যাতে কালও না···

মুখখানার এক বিচিত্র ভংগি করে পরেশ তাড়াতাড়ি বলে উঠল: পাগল! কালকের কথা বেঠিক হবে কেন বলো? এক হাতে ট্যাকা নোব, আর হাতে প্রিতেমে সব ছেড়ে দোব; ট্যাকার জন্যে তাহলে কথা বেঠিক কেন হবে? তবে সে-দিনের কথা যদি বলো, যোগাড় করে উঠতে পারিনি। আর তাতে তোমার ক্ষতি আর কি এমন হয়েছে, বাড়ীতে গেলেই খরচ করে ফেলত; এখন তুমিই ট্যাকার পুঁটলি বেঁধে নিয়ে যাবে—তখন মুখে হাসি ধরবে না দেখো, মানতেই হবে—হ্যাঁ, পরেশ পাল যা বলেছিল মিছে নয়!

মধ্যাহ্নের আগেই খাওয়া-দাওয়া সেরে পরেশ পাল আটচালায় এসে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখল—তখনো পীতাম্বর নিবিষ্ট মনে তুলি চালাচ্ছে। মুখ টিপে একটু হেসে কৃত্রিম সহানুভূতির সুরে সে বলল: তাড়াতাড়ি খাওয়ার পাটটা সেরে নিয়েই কাজে বসলে হোত না অধিকারী—সন্ধ্যের আগে ত আর ফুরসদ পাবে না?

তুলি চালাতে চালাতেই পীতাম্বর জানাল: দু'টো ফুটিয়ে নেবার ফুরসদও আজ হবে না পালের পো, এ লাইনের মূর্তিগুলির চোখ টেনে তার পর নেয়ে নেব, আর চাডডি চিঁড়ে সকালে ভিজিয়ে রেখেছি, তাতেই হয়ে যাবে। বেশী ভার পেটে পড়লে হাতের কাজ এগুবে না। যা হোক, তুমি নিশ্চিন্ত থেকো পালের পো—কাজ আটকাবে না।

তা জানি—সেই জন্যেই ত ভরসা করে মহাজনকে খবর দিতে চলেছি গো! আজ ফিরি ভালোই, নৈলে কাল ভোরেই তার কিস্তীতেই এসে পড়ছি; তুমি কিন্তু মুখ রেখো অধিকারী—কালকের জন্যে যেনো একখানি প্রিতিমেও ফেলে রেখো না। আর এতে তোমারও সুবিধে—পূজোর আগেই বাড়ী পৌছতে পারবে, অপিক্ষে আর করতে হবে না। কথাগুলি এক নিশ্বাসে বলেই পরেশ পাল আটচালার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

গুন্ গুন্ করে একটি রামপ্রসাদী গান ধরে পীতাম্বর তুলি চালিয়ে চলেছে। কত লোক আসছে, প্রতিমা দেখছে, শিল্পীর তুলি চালনা দেখে প্রশংসা করছে, কিন্তু পীতাম্বর নির্বিকার—কারুর দিকে তার লক্ষ্য নেই। একটি প্রতিমার চোখের কাজ শেষ করে পার্শ্বের প্রতিমাটির দিকে তুলি নিয়ে এগিয়েছে, এমনি সময় গ্রামের ডাকঘরের পিয়ন আটচালার সামনে এসে ডাকল: চিঠি আছে গো—পীতাম্বর অধিকারীর নামে—কেয়ার অফ পরেশচন্দ্র পাল।

তুলি রেখে পীতাম্বর ছুটে এলো দাওয়ার দিকে—ক্ষিপ্র হাতে চিঠিখানা নিয়ে খাম খুলে পড়তে বসল। চিঠি লিখেছে মায়া।

কত কথাই বিনিয়ে বিনিয়ে মায়া লিখেছে। চিঠি যখন আসে, বাড়ীতে তখন কি বিভ্রাটই বেধেছিল, কিন্তু চিঠিখানার জন্যেই তাদের মুখ রক্ষা হোল। তার পর মৃগেনের নিরুদ্দেশের কথাও লিখে মায়া অনুরোধ করেছে—"মৃগেনদা'র সহিত আমার বিচ্ছেদ ঘটাইবার জন্য পাষণ্ড কানাই সেদিন বড়া লইয়া যে কাণ্ড বাধাইল তাহা আমার বুকে বিষের কাঁটার মতন বিঁধিয়া আছে। কিন্তু দুঃখ এই যে, মৃগেনদা' মশার উপর রাগ করিয়া নিজের গালেই চড় মারিয়া চলিয়া গেলেন। যদি তাহার সহিত দেখা হয় তাহা হইলে কানাইএর বদমাইসীর কথা যাহা উপরে লিখিয়াছি সব বলিও!" আরও কত কথাই সে জানিয়েছে।

মায়ার চিঠি পড়তে পড়তে পীতাম্বরের মূর্তিটাই বদলে গেলো—আপন মনে বিড়-বিড় করে বলে উঠল: বটে—এত দূর! আচ্ছা দেশে গিয়েই আগে সেই নচ্ছার মাগীর টাকাগুলো ফেলে দোব—তার পর ঐ বওয়াটে কানাই হারামজাদাকে একবার দেখে নেব—

কোন রকমে দু'টি ভিজে চিঁড়ে দই-গুড় মেখে খেয়ে নিয়েই পীতাম্বর আবার কাজে বসে—প্রতিমাগুলির শেষের কাজ আজ তাকে শেষ করতেই হবে। সাধক শিল্পী সে—ভালো করেই জানে যে একাগ্রচিত্তে শিল্পের সাধনা না করলে সৃষ্টি সার্থক হয় না, কাজে খুঁত থেকে যায়। তাই সে সব ভাবনা মন থেকে জোর করে ছেঁটে ফেলে মনটি নিবিষ্ট করল অবশিষ্ট মূর্তিগুলির অংগরাগ তুলির শেষ আঁচড়ে সম্পূর্ণ করে তুলতে।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে সমান উৎসাহে তুলি চালিয়ে চলেছে পীতাম্বর। সমস্ত দিন কেটে গেলো, দিনের আলো নিবে এসেছে—তুলি আর চলে না, চোখে যেনো ঝাপ্‌সা ঠেকছে। পরেশ পালের চাকর এসে আলো জেলে দিয়ে গেল—দু'টো হরিকেন ল্যন্ঠন। তাকে দিয়ে এক ছিলিম তামাক সাজিয়ে খানিকটা অবসর নিল দীর্ঘ কয় ঘণ্টা পরে। গুড়ুকের ধোঁয়ার কুণ্ডলীর সংগে এতক্ষণে তার মনের ভিতরকার মানুষগুলিও যেনো আবছা আবছা ঘুরে বেড়াতে লাগল—মায়া, মৃগেন, গোকুল, অতুল, কানাই—শেষের মানুষটির হিংস্র মুখখানা চোখের সামনে ভেসে উঠতেই হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখেই সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে তর্জনের সুরে বলে উঠল: ডুবমণ, ডুবমণ, ঐ ত আমার সর্বনাশ করেছে রে!

কাছেই জন-কয়েক লোক ছিল, পরেশ পালের ভৃত্যও। তারা। শশব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল: হোল কি অধিকারী, হোল কি?

নিজেকে সামলে নিয়ে পীতাম্বর একটু হেসে উত্তর করল: কিছু নয়, ও একটা যাত্রার য়্যাক্টো করা গেল।

শেষ প্রতিমাটির চোখের কাজ সেরে পীতাম্বর যখন উঠে দাঁড়ালো, তখন দুপুর রাত—সারা গ্রাম নীরব, নিস্তব্ধ। পীতাম্বরের সমস্ত শরীর তখন অবসন্ন, চোখ দু'টো জ্বালা করছে, মাথা ঘুরছে। আট-চালার একটা খুঁটি ধরে কোন রকমে দাঁড়িয়ে কাছের হরিকেনটি তুলে সে সমাপ্ত প্রতিমাগুলির পানে পূর্ণ-দৃষ্টিতে তাকালো, মনে হোল—সত্যিই তার সৃষ্টি সার্থক হয়েছে, কোথাও সে ফাঁকি দেয়নি, মূর্তিগুলি যেন হাসছে! অমনি বুকের ভিতরটা তার ধুক্-ধুক্ করে উঠল—এ হাসি ব্যঙ্গের নয় ত?

টলতে টলতে হাতের হরিকেনটির আলোকে পথ দেখে সে নিজের চালা-ঘরটির দিকে এগিয়ে চলল। ঘরের এক পাশে এক বাটি দুধ, মুড়ি, কলা ও গুড় রাখা ছিল—রাতের আহার। পীতাম্বর কিছুই স্পর্শ করল না, শুধু ঘটির জলটুকু নিঃশেষ করে ক্লান্ত দেহটিকে এলিয়ে দিল মলিন বিছানায়।

ঘণ্টা-খানেক পরে আটচালার পিছনে খালের ঘাটে একখানি মহাজনী নৌকা এসে লাগলো। গেঞ্জি-গায়ে কতকগুলি জোয়ান লোক টপাটপ করে লাফিয়ে পড়ল তীরে। একটা টর্চের আলো ফেলে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পরেশ পাল আটচালার দিকে।

আটচালা জুড়ে শতাধিক বিভিন্ন আয়তনের বাণীর প্রতিমা। টর্চের সাদা আলোর আভায় শ্বেত পদ্মাসীনা মূর্তিগুলির মুখ তোল সুস্পষ্ট, মরি, মরি, কি সুশ্রী ছাঁদ—কি সুন্দর চোখগুলি! এক নজরে সব দেখে নিয়ে হাসি মুখে পরেশ পাল বলে উঠল: লোকটা কাজের হে—কাজ শেষ করে তবে শুয়েছে!

* * * *

ভোরের সময় পরেশের চীৎকারে পীতাম্বরের ঘুম ভেঙ্গে গেল। —ও অধিকারী, এ কি সর্বনাশ হোল—মূর্তিগুলো সব কোথায় গেল হে?

ধড়-মড় করে উঠে পীতাম্বর টলতে টলতে আটচালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল—আশ্চর্য ব্যাপার! আটচালা একেবারে খালি, কোথাও একখানি প্রতিমা নেই; পীতাম্বরের বুকটাও বুঝি খালি হয়ে গেল—দু'হাতে মাথার দু'টি রগ ধরে কাঁপতে কাঁপতে বসে প'ড়ল সে!

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে পরেশ জিজ্ঞাসা করল: ঠাকুর সব গেল কোথায় শুনি? তুমি ছাড়া ত এ তল্লাটে আর কেউ ছিল না, রাতারাতি এক-ঘর ঠাকুর কোথায় গেল?

পীতাম্বর তার বড়ো বড়ো চোখ দু'টো মেলে পরেশের কঠিন মুখ-খানার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলল: ঠাকুরের চোখ আমরা ফোটাই আর আমাদের চোখ ঠাকুর বুজিয়ে রাখে, তাই এর জবাব দিতে পারলুম না পালের পো—ঠাকুরগুলো কোথায় গেল! যাই হোক, তুমিই আজ নতুন শিক্ষা দিলে, ঠাকুর আর গড়ব না—বামুনের ধাতে ও সইল না—সইবে না!

কথাগুলো বলেই আর কোন উত্তরের প্রত্যাশা বা পরেশ পালের কোন তোয়াক্কা না করেই জোরে একটা নিশ্বাস ফেলে মাতালের মত সামনের পথটার দিকে ছুটল পীতাম্বর।

পরেশ পাল অবাক্ হয়ে চেয়ে রইল এই অদ্ভুত মানুষটির পানে।

দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপ

করুণাময় বসু

সমুদ্রের বালু-বেলা উর্মি-মুখর,
থেকে থেকে শোনা যায় বাতাসের স্বর,
নারিকেল পাতার বাঁশিতে যেন কোন অচেনার ডাক,
ঝিলিমিলি রূপালি চাঁদের মায়াময় ছায়ার সোহাগ।

ঝিকিমিকি ঢেউএর ডগায়
পাতালপুরীর মেয়ে যেন কার বাসর জাগায়,
ঢেউয়ের ফণায় রাখে সোনার প্রদীপ,
হীরার কাঁকণ হাতে, কপালেতে শুকতারা টিপ,
ভেসে আসে গান গায় জোয়ারের জলে,—
গহিন ভাঁটায় ফের কোথা যায় চলে!
কোথা যায়, এ-পথের কোথা আছে শেষ?
কুয়াশা-জড়ানো চাঁদ, সোনার ভ্রমর বুঝি থাকে এই দেশ।
সাগরের তীরে তীরে সুপারীর বন
এলো-মেলো মাথা নাড়ে, কতো কথা বলে অকারণ।
কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না যে
না-বলা কথার সুর বুকে এসে বাজে।

রাঙা পথ, নীলগিরি কুয়াশায় মেশা,
প্রবালপুরীর দেশ, মনে লাগে মায়াময় নেশা।
আকাশেতে ভাঙা চাঁদ, গাছের ছায়ায়
এলো চুলে কোন মেয়ে বসে গান গায়।
জোনাকিরা ঝাঁকে ঝাঁকে
মণিময় পাখার আগুনে কবেকার রূপ-কথা আঁকে।
হাওয়ায় নিশাস ফেলে বনের কুসুম,
এ কোন যাদুর দেশ চোখে-মুখে ভেঙে আসে ঘুম।
রাঙা ফুল, বাঁকা চাঁদ, ভাঙা ঢালু পাড়
আমার মনের কূলে বহু দূর হয়েছে বিস্তার।
ছল ছল ঢেউয়ে দোলে ফেনার কুসুম,
এ কোন পরীর দেশ, চোখে-মুখে আবছায়া ঘুম।

মহাচীনের সাম্প্রতিক সমস্যা

প্রদ্যোৎ গুহ

সরকারী ভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ফ্যাসিস্ত শক্তি-চক্রের পরাজয়ে বিশ্বে শান্তি স্থাপিত হইবে, হানাহানি মারামারির অবসানে মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিবে—রণক্লান্ত মানুষের ইহাই কামনা।

চীনের সাধারণ মানুষের পক্ষে এই কথা আরও গভীর ভাবে সত্য। চীনে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল ১৯৩৭ সালে, জাপানী আক্রমণে। গৃহযুদ্ধ সুরু হইয়াছিল তারও পূর্ব্বে—এই নয় বৎসরের গৃহযুদ্ধ এবং বৈদেশিক আক্রমণে চীনের জনসাধারণ আজ শ্রান্ত, ক্লান্ত। জাপানের পরাজয়ের পরে সকলেই ভাবিয়াছিলেন, এত কাল পরে বুঝি সত্যই ঈপ্সিত দিনগুলি আসিল, আসিল নিরবচ্ছিন্ন দীর্ঘ শান্তির যুগ। কিন্তু সে আশা সুপ্তই রহিয়া গিয়াছে।

যুদ্ধের অবসানে আবার কুওমিনটাং-কমিউনিষ্ট মতানৈক্য সংঘর্ষের আকার গ্রহণ করিয়াছে। চীন আজ আবার এক সর্ব্বগ্রাসী গৃহযুদ্ধের কবলিত। রয়টারের সর্ব্বশেষ সংবাদে জানা যায়, চীয়াং কাইশেক-বাহিনী কমিউনিষ্ট-প্রাণকেন্দ্র ইয়েনানের উপর ব্যাপক আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছে।

ভারতবর্ষ ও চীন

অবশ্য চীনে কুওমিনটাং ক্ষমতা পাইল কি কমিউনিষ্টরা পাইল তাহার গবেষণায় ভারতবর্ষের কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কিন্তু স্বাধীন গণতান্ত্রিক চীন প্রতিষ্ঠায় অবশ্যই ভারতের স্বার্থ আছে। কারণ, চীনে যদি সাম্রাজ্যবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাঁটি স্থাপিত হয় তাহা হইলে ভারতবর্ষের স্বাধীন গণতান্ত্রিক অস্তিত্ব বজায় রাখা একরূপ দুঃসাধ্য। আর তাই চীন-সমস্যাকে আমরা এই দিক্ হইতেই বিচার করিবার চেষ্টা করিব।

ইংগ-মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের চক্রান্তের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এই চীন। মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদই যে চীনের গৃহযুদ্ধ জীয়াইয়া রাখিয়াছে তাহা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

সম্প্রতি 'Time of India' পত্রিকার ওয়াশিংটনস্থিত সংবাদ-দাতা জানাইয়াছেন—'Any thought of U. S. withdrawal from China may be weledru out as inconcieveable.' অর্থাৎ মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীরা স্বেচ্ছায় চীন পরিত্যাগ করিবে না—এ-কথা নিশ্চিত সত্য।

আমেরিকার 'অদৃশ্য সাম্রাজ্য'

প্রধানত দুইটি কারণে আমেরিকা চীন ছাড়িতে রাজী নহে।

প্রথমত, মার্কিণ পণ্য-সম্ভারের বিক্রয়-কেন্দ্র হিসাবে অর্ধসামন্ত-তান্ত্রিক চীনের গুরুত্ব।

দ্বিতীয়ত, সম্ভাব্য তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট-বিরোধী যুদ্ধকেন্দ্র হিসাবে চীনকে ব্যবহারের পরিকল্পনা।

তাই 'ঋণ এবং ইজারার' বিনিময়ে চীয়াংকে কিনিয়া লওয়া হইয়াছে। নেহরুর ভাষায় কুওমিনটাং-শাসিত চীনে স্থাপিত হইয়াছে আমেরিকার 'অদৃশ্য সাম্রাজ্য' (Invisible Empire)।

নেহরু এই অদৃশ্য সাম্রাজ্যের সংজ্ঞা দিয়াছেন—"It is invisible and economic and exploits and dominates without any outward signs…This latest kind of empire does not annex even the land; it only annexes the wealth or the wealth producing elements in the country. By doing so it can exploit the country fully to its own advantage and can largely control it, and at the same time has to shoulder no responsibility for governing and repressing that country."—(Glimpses of World History—Jawaharlal. Nehru. pp. 370)

সুতরাং চিয়াং কাইশেক হইয়া দাঁড়াইয়াছে মার্কিণ কূটনীতির 'বোড়ে'র চাল মাত্র।

আমেরিকার শান্তিজল

আমেরিকা গায়ে পড়িয়া কুওমিনটাং-কমিউনিষ্ট শান্তি-প্রচেষ্টার মোড়ল সাজিয়াছে। তাহাদের এই প্রচেষ্টা যে কত দূর সাফল্য অর্জন করিয়াছে তাহারই প্রমাণ এই সর্ব্বগ্রাসী গৃহযুদ্ধ। 'গৃহযুদ্ধ-বিশারদ' কুখ্যাত জেনারেল ওয়েডেমীয়ারকে চীনে প্রেরণের পরেই গৃহযুদ্ধের ব্যাপকতা বৃদ্ধিতে এই সিদ্ধান্তই আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়।

তাহা ছাড়া, আমেরিকার তত্ত্বাবধানে চীনের ৬০ ডিভিশন সৈন্য শিক্ষিত হইতেছে, চীয়াংকে আটখানি যুদ্ধ-জাহাজ উপঢৌকন দেওয়া হইয়াছে, মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ ইহারই বা কি জবাব দিবেন?

কিছু দিন পূর্ব্বে মাদ্রাজের 'হিন্দু' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদও বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। সংবাদটি এইরূপ—"U. S. Senate last month approved legislation authorising 'the loan, sale or gift' upto 271 warship to China (Kuomintang) to assist her in building up her war-ravaged navy." (Hindu, July 24)। মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষ কুওমিনটাং-এর প্রতি এই নব অনুরাগেরই বা কি কৈফিয়ৎ দিবেন?

কোন কৈফিয়ৎ নাই বলিয়াই আমেরিকান হস্তক্ষেপ আইন-সঙ্গত করিবার জন্য সোভিয়েট হস্তক্ষেপের জিগীর তোলা হইয়াছে। কিন্তু এই মার্কিণী জিগীর নিছক অরণ্যে রোদনেই পরিণত হইয়াছে—চীনের কোন প্রান্তেই ইহা কোন প্রতিধ্বনি তুলিতে পারে নাই।

অন্য দিকে আমেরিকানদের চীন পরিত্যাগ করিবার ধ্বনি চীনের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতেছে। বিলাতের প্রতিক্রিয়াশীল 'London Time' পত্রিকাও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন—"The recent outcry of the communists against American forces undoubtedly gained them many new adherents.—(Aug. 8. despatch from 'London Times' to 'Statesman')

কুওমিনটাং বনাম কমিউনিষ্ট

এতখানি আলোচনার পর স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এই বিবদমান শক্তিগুলির স্বরূপ কি? কি লইয়াই বা তাহাদের মতবিরোধ?

এ প্রসংগে অতীতের ঘটনাবলীর প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিয়া লওয়া প্রয়োজন। অবশ্য, চীনা গণতন্ত্রের জনক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সানের মৃত্যুর পর চীয়াং কি ভাবে গণতন্ত্র-বিরোধী হইয়া উঠিল, কমিউনিষ্ট বিরোধিতায় অন্ধ হইয়া কি করিয়া সে আক্রমণকারী জাপানের তোষণকারী হইয়া উঠিল এবং কি ভাবেই বা কমিউনিষ্টদের

চেষ্টায় জাপ-বিরোধী ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইল, সে দীর্ঘ ইতিহাসের আলোচনার অবকাশ বর্ত্তমান প্রবন্ধে নাই।

১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাবলী হইতেই আমরা বর্ত্তমান বিরোধের সূত্র খুঁজিব। '৪৫ সালের ১৯ই সেপ্টেম্বর কমিউনিষ্টদের বর্ত্তমান নীতি ব্যাখ্যা করিয়া চীনের বামিউনিষ্ট নেতা মাও-সে-তুঙ্গ পরিষ্কার ঘোষণা করিয়াছেন, "It is the Communist policy at this moment to establish peace democracy and unity in China." তাই সেপ্টেম্বর মাসেই চিয়াং-মাও আলোচনার সময় কমিউনিষ্টদের পক্ষ হইতে যে সাতটি সর্ত্ত উপস্থাপিত করা হইয়াছিল তাহা এই—(১) সর্ব্বদলীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই মুহূর্ত্তে সর্ব্বদল-সম্মেলন আহ্বান করিতে হইবে; (২) সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, এবং সংবাদপত্র, জনসমাবেশ ও বক্তৃতার স্বাধীনতা দিতে হইবে; (৩) জনসাধারণের উৎপীড়ক গোয়েন্দা বাহিনীকে ভাঙিয়া দিতে হইবে; (৪) গণতান্ত্রিক অঞ্চলগুলির গণ-সরকারকে মানিয়া লইতে হইবে; (৫) ভূমি-ব্যবস্থার সংস্কার এবং আইন করিয়া মুনাফাখোরী বন্ধ করিতে হইবে; (৬) যুদ্ধ-বন্দী এবং দেশদ্রোহীদের বিচার এবং শাস্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে; (৭) জাতীয় গঠন পরিষদের আশু নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই দাবিগুলি নিছক গণতান্ত্রিক দাবি এবং ডাঃ সান-ইয়াৎ-সানের Three People's Principle-এর সহিত ইহার কোনই বিরোধ নাই। কিন্তু চিয়াং এই সর্ত্তগুলি মানিতে সম্মত হন নাই। মাও-এর কুওমিনটাং রাজধানী চুংকিং-এ থাকাকালীনই কমিউনিষ্ট অঞ্চলগুলির উপর কুওমিনটাং বাহিনীর আক্রমণ আরম্ভ হয়।

অবশ্য এই মীমাংসা-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবার পর আরো কয়েক বার আপোষ-প্রচেষ্টা হইয়াছে। কোন বারই এই প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই, হইবার কথাও নহে। চীনে মার্কিণ সৈন্য-বাহিনীর উপস্থিত থাকাকালীন এই প্রচেষ্টা সফল হইতে পারে না। চীন সাধারণতন্ত্রের জনক ডাঃ সান-ইয়াৎ-সানের সহধর্ম্মিণী মাদাম সান-ইয়াৎ-সান তো মার্কিণ মতিগতি সম্পর্কে পরিষ্কার বলিয়াছেন, "Motivates Kuomintang reactionaries seeking to start civil-war." আর তাই মধ্যপন্থী ডেমোক্রাটিক লীগও মার্কিণ সৈন্যবাহিনী অপসারণের দাবি জানাইয়াছেন।

চিয়াং-এর ভাঙা ঘর

দিনের পর দিন এই দাবি দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে। চীনের জনসাধারণ আজ রণক্লান্ত, জীবন ও অর্থনীতি বিধ্বস্ত, তাহারা আজ চায় দীর্ঘ শান্তির অবকাশ। চিয়াং-এর সর্ব্বনাশা খেয়াল চরিতার্থ করিবার জন্য কত দিন কুওমিনটাং একনায়কত্বের যূপকাষ্ঠে চীনের সাধারণ মানুষ আত্মবলি দিবে?

এই প্রশ্ন জাগিতেছে বলিয়াই চীয়াং-এর সৈন্যবাহিনীর মধ্যেই দেখা দিয়াছে অসন্তোষ। সর্ব্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, চীয়াং-এর ৫০,০০০ সৈন্য দলত্যাগ করিয়া কমিউনিষ্টদের সংগে যোগ দিয়াছে।

যতই দিন যাইবে, এই ঘটনার আরও ব্যাপক পুনরাবৃত্তি হইবে। কারণ, চীয়াং-এর আক্রমণ আজ আর শুধু কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে নহে, গণতান্ত্রিকদেরও গুম করা হইতেছে, নিরীহ অধ্যাপকদেরও পরিত্রাণ নাই। এক কথায় যে কেহই এই অকারণ গৃহবিবাদের অবসান চাহিবে, তাহারই উপর পড়িবে চীয়াং-এর শাণিত দমন-নীতি। তাই অধ্যাপক চ্যাং চিয়াং সরকারের নাম দিয়াছেন 'খুনে রাজত্ব' (Bandit Regime)।

তাই চিয়াং যে আশা করিয়াছিলেন মার্কিণ অস্ত্রবলে বলী হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই কমিউনিষ্টদের নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবেন, তাহা ফলবতী হইবে না। 'London Times'-এর সংবাদদাতাও স্বীকার করিয়াছেন—"To wipe out communists root and branch may prove a very much harder task." অর্থাৎ কমিউনিষ্টদের নিশ্চিহ্ন করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার।

ইতিহাসের অমোঘ বিধান

চীনের বর্ত্তমান প্রয়োজন গণতন্ত্র—কমিউনিষ্টরাও এই দাবিই করিয়াছেন। তাই গৃহযুদ্ধ বিরতির দাবি ক্রমশঃই দুর্ব্বার হইয়া উঠিবে। আর এই দুর্ব্বার গণ-দাবিকে রোধ করিবে এমন শক্তিমান্ কে?

তাই আজই হউক আর কালই হউক, মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্ত পরাস্ত হইবে। গৃহযুদ্ধের অবসানে ঐক্যবদ্ধ চীন এশিয়ার রাজনীতি ক্ষেত্রে যোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিবে। ঐক্যবদ্ধ চীন, স্বাধীন ভারতের পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠিত হইবে স্বাধীন এশিয়া। সেই শুভ দিনেরই প্রতীক্ষায় রহিলাম।

যাদৃশী ভাবনা

শ্রীশক্তিশঙ্কর মুখোপাধ্যায়

আমি শুধু কবি মাত্র, বস্তুহীন কথার ফানুস,
অসার ন্যাকামি-ভরা। হে বস্তুতান্ত্রিক প্রিয়তমে,
জীবনের হাটে যারা লোভনীয় মহার্ঘ মানুষ—
কাঞ্চন-কুলীন কিম্বা চাকুরে-সম্রাট্—কালক্রমে
তাদের কাহারও সাথে জীবন মিলায়ো তব, সখি
জড়োয়া মোটর আর বালিগঞ্জে বাড়ীর বদলে।

সোসাইটি-গগনের নক্ষত্রেরা তোমারে নিরখি
হিংসায় বিবর্ণ হোক; তব বায়ু-রথচক্রতলে
কলেজী পড়ুয়াদের নিত্যজাত মোহ-স্বপ্নজাল
ছিন্ন-ভিন্ন হোক নিত্য; তোমার স্মৃতির যাদুঘরে
যৌবন মৃগয়া-লব্ধ সংখ্যাতীত প্রেমের কংকাল
সঞ্চয় করিও, সখি, যত কাল পারো লীলাভরে।

একদা দেখিবে যবে প্রৌঢ় কালে যৌবনের সীমা,
কন্যারে সন্দ দিও—পঞ্চাশোর্দ্ধে বিশ্বের মাসীমা।

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল

সময়েরও বিচিত্র গতি। কথাটি অতীব সত্য। সময়ের সহিত মানুষও বদলায়। বরুণাও মানুষ, তাই সে-ও বদলেছে। ইদানীং তার নিরাশ্রয়-ভীতিও আর নেই। সে জানে যে সকলে পরিত্যাগ করলেও তার লক্ষ্মীদা তাকে ত্যাগ করবে না। প্রায়ই সে লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে একাই বেড়িয়ে আসে, এমন কি সুধীরের অগোচরেও। এ কয় দিনে কতো নূতন নূতন মেয়ের সঙ্গে সে পরিচিত হয়েছে, তাদের আয়েষী স্বাধীন জীবন যে তাকে মুগ্ধ করেনি, তা'ও নয়। এই সব মেয়েদের সাজগোজ তাকে প্রায়ই প্রলুব্ধ করতো—তাদের কোনও কষ্টই নেই, তাদের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দরী সে, অথচ ছেঁড়া কাপড়ে সে দিন কাটায়, সারা দিন-রাত তাকে হেঁসেলের দারোগাগিরী করতে হয়। ভাগ্যিস্ লক্ষ্মীদা' ছিলো, তাই না বের হবার মতো দুই-একখানা ভালো কাপড় আছে। স্বামী তো তার এক জন দিন-মজুর মাত্র, কোনও মুরোদই লোকটার নেই—এই সকল চিন্তাও আজকাল তার মনের মধ্যে যে না আসে তা'ও নয়।

বরুণার মনের এই অবস্থা সুরমা কীর্ত্তনী ভালোরূপেই লক্ষ্য করেছে। সময় মত সে-ও স্বামীর বিরুদ্ধে তাকে উত্তেজিত করতে থাকে। পরিশ্রান্ত হয়ে কায হ'তে বাড়ী ফিরে এসে সুধীর প্রায়ই বরুণাকে বিরক্ত ও অমনোযোগী দেখতো। মনে মনে সে এ জন্য দুঃখিত—মুখে সে এত দিন কোনও প্রতিবাদই জানায়নি। সে দিন কারখানাতে কায করতে করতে তার একটু জ্বর-ভাব হয়, গনগনে আগুনের তাতে কাজ করে শরীর তার আরও খারাপ হয়েছে, সেই সঙ্গে মনও। অতি কষ্টে বাড়ী ফিরে সুধীর দেখতে পেল, বরুণা লক্ষ্মীদের ঘরে বসে গ্রামোফোন বাজাচ্ছে। ঘরে ঢুকে বিছানাটার উপর শুয়ে পড়ে সুধীর ডাকলো—"বরু-উ, বরুণা-আ—"

এক জন অধীর হয়ে তার জন্যে অপেক্ষা করছে এবং সে এমন এক জন লোক যে কি না তার একান্ত ভাবে নিজস্ব, এইরূপ একটা ধারণা বা আশা এবং গর্ব্ব নিয়ে স্বামী মাত্রই গৃহে ফিরে! পূর্ব্বেকার দিনগুলিতে বরুণা স্বামীর আগমন পরিজ্ঞাত হওয়া মাত্রই ছুটে এসে ঘরে ঢুকেছে। কিন্তু পূর্ব্বেকার সেই দিনগুলি আর নেই। নূতন অভ্যাস ও সংস্কার ইদানীং বরুণাকে এক নূতন মানুষে পরিণত করেছে।

লক্ষ্মীদা'র ঘর হ'তেই বরুণা উত্তর করলো, যাই-ই। এর পর সুধীর বরুণাকে আরও বার-দুই উচ্চৈঃস্বরে ডাক দিল, কিন্তু প্রতিবারেই "যাই যাই," বলে সে উত্তর দিল বটে, কিন্তু পূর্ব্বেকার দিনগুলির মত ছুটে এলো না। পরপুরুষ-সংস্পর্শ নারীকে আর নারী রাখে না, এমনই এক অপূর্ব্ব জিনিস্। বরুণার এই অবাধ্যতা সুধীর আর বরদাস্ত করতে পারলো না। এ তো শুধু তার স্বামিত্বের অবমাননা নয়—পৌরুষত্বেরও বটে। এ ছাড়া একটা নিদারুণ সন্দেহও যে তার মনে দানা বাঁধেনি তা-ও নয়। এরও মিনিট দশেক পরে বরুণা ঘরে ঢুকতেই, সুধীর নেমে এসে এই প্রথম তার গায়ে হাত তুললো। ঠাস্ করে তার গালে একটা চড় কসিয়ে দিয়ে সুধীর বলে উঠলো—"বড্ড আস্পর্দ্ধা হয়েছে, না? ডাকলে কথা কানে আসে না।"

স্বামীর অধিকার বা অনধিকারের প্রশ্ন এখানে আসে না, কারণ, এ কয় মাসে বরুণা সভ্যতার মাপকাঠিতে অনেক উপরে উঠে এসেছে। মার খাওয়ার জন্যে অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে বরুণা বলে উঠলো—"লজ্জা করে না, এক পয়সার মুরোদ নেই, আবার মার? থাকবো না তোমার বাড়ীতে আমি।"

বরুণাকে হঠাৎ মেরে বসার জন্যে সুধীর কম লজ্জিত হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও বরুণার মুখে এই ধরণের কথা শুনে সে অবাক্ হয়ে গেল। বরুণার এই কটু উক্তির কোনওরূপ প্রত্যুত্তর আর না করে, সে মানে মানে নিজেই বাড়ী হতে বার হয়ে গেল—জ্বর-গায়েই।

কিছুক্ষণ ধরে সুধীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু সে শান্তি পেল না। অনুশোচনায় তার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছিলো। শেষে কি-না সে বরুণাকে মেরে বসল, ছিঃ! সুধীর নাচার হয়ে ঠিক করলো, এ জন্য সে বরুণার পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু, বাড়ী ফিরে ঘরের কাছে এসে সে যা দৃশ্য দেখলো, তাতে তার আর বাক্যস্ফুরণ হলো না। দাওয়ার নীচে হ'তেই সুধীর দেখতে পেলো, বরুণা লক্ষ্মীকান্তর কণ্ঠলগ্না হয়ে অঝোরে কাঁদছে, আর লক্ষ্মীকান্ত দুই হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে তার মুখে, চোখে ও কপালে চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিচ্ছে।

ছোট-খাটো দুই-একটা বিসদৃশ ঘটনা চোখে পড়লেও, সুধীর এতটা কখনও দেখেনি। দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পাশের কামরায় কামারশালা হ'তে একটা শাণ-দেওয়া দা তুলে নিয়ে সে চীৎকার করে উঠলো—"তবে রে শালা! দু'টোকেই তোদের আজ খুন করবো, দাঁড়া।—নিমকহারাম—"

সুধীরের চীৎকার শুনে আশে-পাশের ঘরগুলো হ'তে অনেকেই বার হয়ে এসেছে। সে দিন খোকা বাবুও সদল বলে তাদের নির্দ্ধারিত

ডেরায় হাজির ছিল। গোলমাল শুনে তেনারাও বেরিয়ে এসে উত্তেজিত সুধীরকে ধাবালো "দাও" সমেত ধরে ফেললেন। সুধীরকে নিজেদের আড্ডাখানার মধ্যে হিড়-হিড় করে টেনে এনে, খোকা বাবুর সুযোগ্য সাকরেদ গোপী বাবু বললেন—"কি আপনি ছেলেমানুষী করছেন! এর চেয়ে বরং আপনি খোকা বাবুর কাছে নালিশ জানান, উনি নিশ্চয়ই এর একটা বিহিত করবেন।"

সুধীর যে বেরিয়ে গিয়েই আবার তখুনি গৃহে ফিরবে তা বরুণা বা লক্ষ্মীকান্ত—উভয়ের কেহই আশঙ্কা করেনি। এই ভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় বরুণা ভয়ে ও লজ্জায় অতিষ্ঠ হয়ে বলে উঠলো—"এ কি সর্বনাশ তুমি আমার করলে, লক্ষ্মীদা'! এখোন আমার কি উপায় হবে?"

—উপায় অবশ্য সুরমা কীর্ত্তনী পূর্ব্ব হ'তেই ঠিক করে রেখেছিল। সে এইবার এগিয়ে এসে উপদেশ দিল, "তাই তো বাছা, এ একটা বিশ্রী ব্যাপার হলো। তা যা হয়েছে, তার তো আর চারা নেই। তা তুই বাছা বরং কিছুক্ষণের জন্য লক্ষ্মীর সঙ্গে বেরিয়ে যা। বলবো এখোন আমার বোনের বাড়ী গেছে। এর মধ্যে ওকে বুঝিয়ে ঠিক করে দেবো। এখানে থাকলে খুন হয়ে যাবি।"

কেঁদে ফেলে বরুণা বললে, "খুন হই, ওঁর হাতেই খুন হবো। আমার আর বাঁচতে সাধ নেই মাসী।"

সান্ত্বনা দিয়ে সুরমা বলে উঠলো, "আচ্ছা পাগলী মেয়ে তো? বলছি, সময়ে ঠিক হয়ে যাবে। এখোন তো যা।"

এর পর বরুণাকে এক রকম টানতে টানতে পিছনের দরজা দিয়ে লক্ষ্মীকান্তর সঙ্গে বার করে দিয়ে, সুরমা লক্ষ্মীকান্তর কানে কানে বললো, "এখোন তো নিয়ে যা আমাদের সেই ডেরায়। খুব ভয় দেখাবি ওকে; বলবি, „তোকে আর ঘরে নেবে না, মিছামিছি ফিরে গিয়ে আর লাভ নেই, এই সব, বুঝলি!"

অদূরে একটা ফিটন গাড়ী যাচ্ছিল। হাঁক দিয়ে ফিটনটাকে থামিয়ে, লক্ষ্মীকান্ত বরুণাকে জোর করে ভিতরে তুলে ফিটন-চালককে হুকুম করলো, "বহুবাজারকো মোউড়। বহুৎ জলদী।"

লক্ষ্মীকান্ত ও বরুণাকে নিরাপদে বাটী হতে বার করে দিয়ে সুরমা কীর্ত্তনী খোকার ঘরে এসে দেখলো, সুধীরকে ঘিরে তখনও পর্য্যন্ত পূরা দমে জটলা চলছে, খোকাদের ঘরে ঢুকে সাফাই গেয়ে সুরমা বললো, "এমন বান্দাই আমি নই। দিয়েছি দূর করে, অমন বোনপোর কি আর মুখ দেখে! ছিঃ ছিঃ!"

সুরমাকে এই ভাবে সাফাই গাইতে দেখে খেঁকিয়ে উঠে খোকা বাবু বললো, "তো মাগীরই না সব বজ্জাতি? আবার কথা, লজ্জা করে না?"

খোকার এই অভিযোগের প্রতিবাদ করে সুরমা বলে উঠলো "যত সব সাধু এই যে রে, দেখে আর বাঁচি না! এখোন্ সব কাজ হয়ে গিয়েছে কি না?" সুরমা পুনরায় ঝঙ্কার দিয়ে উঠে।

"কায সারা তো তোরও হয়েছে। বেশী বকিস্‌নি বলছি।" খোকা বলে উঠে, "এখোন ডাক দেখি সুধীর বাবুর ইস্ত্রীকে। দেখি উনি কি বলেন।"

অদূরে দাওয়ার উপর প্রতিবেশী খাটিক মর্দ্দনা তামাক খেতে খেতে তার খাটকিন জেনানার সঙ্গে চুপি চুপি কথা বলছিল। হুকায় আর একটা টান দিয়ে একটু কেসে নিয়ে সে উত্তর করলো, "আর ডেকে কি হবে? সে পাখী পাইলে গেছে।"

খাটিকের এই কথা কানে যাবা মাত্র সুরমা কীর্ত্তনী পাড়া মাথ করে চেঁচিয়ে উঠলো, "ওমা-আ! পাইলে গেছে কি গো-ও? ওরে বাবা, কি সর্ব্বনেশে মেয়েমানুষ রে! শেষে আমার হাতেই দড়ি পড়বে না কি গো!"

"চুপ কর মাগী, চেঁচাস্‌নি," খোকা ধমক দিয়ে উঠে। "এই মেধো, যা সুধীর বাবুকে নিয়ে থানায় যা, একটা ডায়েরী করে আয়।"

ভ্যাকাচাকা খেয়ে দলের মেধো ওরফে মাধব উত্তর করে, "এঁজ্ঞে থানায়?"

ধমক দিয়ে খোকা বাবু বললে, "হাঁ হাঁ, থানায়। একটা ডায়েরী করা এক্কুনি দরকার। আজকে তো এই পর্য্যন্ত হোক, কাল সকালে উঠেই ওঁকে শরৎ উকিলের কাছে নিয়ে যাবি। একটা মামলাও ঠুকে দেওয়া দরকার। খরচ-খরচা যা কিছু তা আমার।"

খোকার এইরূপ ব্যাবহারে সুধীর ও সুরমা উভয়েই অবাক্ হয়ে যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। খোকার এই নূতন চালের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝতে না পেরে, সুরমা সন্দিগ্ধ হয়ে পড়ে, কিছুটা চিন্তিতও। গজ-গজ করতে করতে সুরমাও বেরিয়ে যায় পরিকল্পনা অনুযায়ী বাকি কাজগুলো সেরে ফেলবার জন্যে। তা ছাড়া, খোকার মত তারও বাঁধা উকিল আছে। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বাক্স খুলে সে কয়েকটা দশ টাকার নোট বার করে নিয়ে ধীরে ধীরে বাড়ী হ'তে বার হয়ে গেল।

সুরমাকেও বাড়ী হ'তে বার হয়ে যেতে দেখে খোকা বলে উঠলো, "ঐ দেখ, মাগীটা বেরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস নেই ওকে। এই মেধো, যা যা তোরাও চলে যা শীগ্‌গির। ওর সঙ্গে আমাদের আর কোনও সম্পর্ক নেই, বুঝলি? এখোন থেকে আমাদের পৃথক্ পৃথক্ পথে চ'লতে হবে। যা যা, শীগ্‌গিরই যা। ওর আগেই আমাদের ডায়েরীটা লেখানো দরকার।"

সুধীর খোকার দলের মধু ওরফে মাধব ওরফে মেধোর সঙ্গে মন্ত্রমুগ্ধের মত বার হয়ে গেল, প্রথমে থানায়, তার পর উকিল-বাড়ী ঘুরে আসবার জন্যে। মেধো ও সুধীর বের হয়ে গেলে, গোপী খোকাকে জিজ্ঞাসা করলো, "ব্যাপার কি ওস্তাদ? আগা কেটে গোড়ায় জল কেন?"

উত্তরে খোকা বাবু বললো, "তুই একটা গাধা, শুধু ওকে বেশ্যা করলেই তো হবে না; সঙ্গে সঙ্গে এটাকেও যে ডাকু বানাতে হবে। তা না হলে ডুপ্লিকেট্ খোকা তৈরী হবে কি ক'রে?"

বিস্মিত হয়ে গোপী বাবু জিজ্ঞাসা করলো, "কি যে বলিস্? ওকে তো কোর্টে পাঠাচ্ছিস্ ফরিয়াদী হয়ে নালিশ জানাতে। ও তো আর আসামী (কয়েদী) হয়ে কোর্টে যাচ্ছে না যে জেলে গিয়ে ডাকু বোনে আসবে?"

হেসে ফেলে খোকা উত্তর করলো, "কোর্টে যা হবে তা তো বুঝছিস্‌ই। আসলে আমি কি চাই জানিস্? আমি চাই, সুধীর বাবু তার বৌ'কে উদ্ধার করতে গিয়ে আরও নির্ম্মম ভাবে আঘাত পাক, আর সেই সঙ্গে সুরমাও একটু জব্দ হোক। মাগীটাকে বড্ড আস্কারা দেওয়া হয়েছে, বুঝলি? আর জেলের কথা বলছিস্? হে হে হে, জেলও ওর হবে, তবে, সইয়ে সইয়ে, দেখ না কি হয়।"

খোকা যা বলে, অসম্ভব হ'লেও তা প্রায়ই সম্ভব হয়ে থাকে। খোকার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তা না বুঝেই গোপী বাবু জিজ্ঞাসা

করলে', "কি জানি ভাই, কি চাস্ তুই। কিন্তু, খামকা আগে ভাগেই ওকে জেলে পাঠাতে চাস্ কেন, তুই?"

উত্তরে খোকা বললো, "শুধু জেল-ভীতি দূর করবার জন্যে। জেল হচ্ছে, অপরাধীদের একটা বিরাট বিদ্যাপীঠ, বুঝলি? এখানে এসেই লোকে পাকা-পোক্ত অপরাধী হবার সুযোগ পায়। এক জন অপর জনের কাছে অপকর্মের নূতন নূতন কার্যপদ্ধতি সকল এখান হতেই শিখে নেয়। ওকে আমি জেলটাও একবার ঘুরিয়ে আনতে চাই। কিন্তু, কেমন করে তা আমি এখোন বলবো না। মনে রাখিস, কারুর সর্বনাশ করতে চাস্ তো প্রথমে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে হবে। এ জন্যেই আমি ওকে এ ব্যাপারে কিছুটা সাহায্য করবোই। আসলে আমি এক ঢিলে দু'টো পাখীই মারবো, বিশ্বাস না হয়, আদালতে হাজির থেকে বিচার-বিভ্রাটটা দেখে আসিস্।"

অপরাধের নূতন নূতন মতলবগুলো খোকা প্রায়ই পূর্ব্বাহ্নে কাউকে জানাতে চাইতো না। খোকার এই স্বভাব গোপীর অজানা ছিল না। এ জন্য আর কোনওরূপ বাদানুবাদ না করে গোপী জিজ্ঞাসা করলো, "তা না হয় হলো, কিন্তু, এখোন সেই নিমকহারাম গোয়েন্দা শিউচরণকে সামলাবি কি করে? সেই দিন তো আর একটু হলেই তোকে সে ধরিয়ে দিতো। ও বেটাকে যে এখুনিই ঠাণ্ডা করা দরকার।"

ভেংচে উঠে দলের নেতাজী খোকা বাবু উত্তর করলো, "আরে রেখে দে, ও ধরাবে আমাকে? ওটা তো একটা মশা! দেখ না, দিচ্ছি ওটাকে শেষ করে। শত্রুর জড় না রাখাই ভালো।"

উত্তরে গোপী বাবু বললো, "কিন্তু, শুনেছি, বেটা এখোন থানাতেই থাকে। প্রণব দারোগা উপর থেকে কাপড়-জামা, চান করবার তেল এবং খাবার সরবরাহ করেন, আর বেটা নীচের তলায় কোতোয়ালীর মধ্যেই বাস করে সেই গুলোর সদ্ব্যবহার করে। বেটা আছে বেশ, মাইরী—"

বিভাগীয় এসিস্‌টেন্ট কমিশনারের নামে লেখা একটা টাইপ-করা উড়ো চিঠি পকেট থেকে বার করে খোকা বাবু গোপীকে বললো, "দাঁড়া না, থানায় থাকা ওর বার করছি। এইটে কাল সকালেই ডাকে দিয়ে আসিস্ অবশ্যি করে, বুঝলি? শুনেছি, ইনস্পেকটার প্রণব বাবুর সঙ্গে ওদের এসিসটেন্ট কমিশনারের, যাকে কি না ওরা বড় সাহেব বলে, তেনার সঙ্গে একেবারেই বনিবনা নেই। এই চিঠিটা পাওয়া মাত্রই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই শিউচরণকে থানা হতে বার করে দেবেন, দেখিস্। থানায় চোর পুষে রাখা একটা বেকানুন ব্যাপার। এই জন্যেই তো যে এলাকায় কাজ করবি সেই এলাকার অফিসারদের সম্বন্ধে তোদের খোঁজ রাখতে বলি। কার সঙ্গে কার বনিবনা নেই, কে ঘুষ খায়, কে বা তা খায় না। এই সব ভালো করে না জেনে কি কোনও ভালো কাযে হাত দিতে আছে? শিউচরণকে খতম করার পর, কিছু দিনের জন্য আমাকে পাতালপুরী ত্যাগ করতে হবে। চৌরঙ্গীর ফ্ল্যাটটা আমি ভাড়া করে এসেছি, একটা গ্যারেজও। পুলিশ এখোন কিছু দিন ধরে আমাকে খুঁজে বেড়াবে বস্তিতে বস্তিতে. মিস্ হেনা দত্ত বা সুধা ব্যানার্জ্জীর বাড়ীতে নয়, বুঝলি? এ কয় দিন তোরা একটু সাবধানেই থাকিস্। কিছু দিনের জন্য তো আমি গা-ঢাকা দিই। কি আর করা যায় বল?"

হাভানা সিগারেটের ধোঁয়া উড়াতে উড়াতে গোপী, কেষ্ট এবং অন্যান্য সাকরেদদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে যথারীতি উপদেশ দিতে দিতে খোকা বাবু একটা বিলাতী মদের বোতল খুলে ফেললো।

খোকা বাবুকে বোতলের তরল পদার্থটুকু গেলাসে গেলাসে ঢালতে দেখে দলের সুবোল উৎফুল্ল হয়ে বলে উঠলো, "মারে খেল! এই না হলে ওস্তাদ! ভেলে লেগে যা, মাইরী—"

মদের গেলাসটা ঠোঁট পর্য্যন্ত তুলে ধরে কি ভাবে খোকা বাবু সেটা পুনরায় টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে বলে উঠলো, "না, মাইরী, আর খাবো না, কিছু দিনের মত আর নয়। ওপর থেকে কারা যেন আমায় ডাকছে। কিছু দিনের জন্য তোদের ছেড়ে চললাম, আমি।"

এইরূপ ভাবান্তর খোকার এই নূতন নয়। মাঝে মাঝে তার মধ্যে একটা সম্পূর্ণরূপ নূতন ব্যক্তিত্বের উদয় হয়। এইরূপ অবস্থায় হঠাৎ সে এক জন নিরপরাধী ভদ্র ব্যক্তি হয়ে উঠে। এমন কি হঠাৎ সে অন্তর্ধানও হয়ে যায়। কিছু দিনের জন্য তার দলের লোকেরা তার আর কোনও সন্ধানই পায় না। শুধু প্রয়োজনে নয় নিষ্প্রয়োজনেও তার মধ্যে এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছে। এইরূপ অবস্থায় সে দলের লোককেও চিনতে পারেনি। সাময়িক ভাবে তার প্রকৃতি এমন কি আকৃতিও বদলে গেছে। খোকা তার এই রোগের সম্বন্ধে সচেতন ছিল। হঠাৎ সে অনুভব করলো, মলিন সহ পাতালপুরীর সব কিছুই তার মন হতে অপসৃত হয়ে আসছে এবং পরিবর্ত্তে তার মনের মধ্যে ফুটে উঠছে উর্দ্ধতন পৃথিবীর বাসিন্দা মিস্ হেনা দত্তের মুখ। কিন্তু, এখোনও যে অনেক কিছু বাকী। সন্ত্রস্ত হয়ে খোকা গোপীকে বললো, "ওরে গোপী, শীগ্‌গির একটা কোকেন-দেওয়া পান দে। আজকের মত সামলে নিই।"

খোকার এই অভূতপূর্ব্ব মানসিক রোগের কথা দলের মধ্যে একমাত্র গোপীরই জানা ছিল। গোপী বাবু তাড়াতাড়ি দু'টো কোকেন-দেওয়া পান খোকার মুখে তুলে তো দিলই তা ছাড়া একটা স্মেলিঙ সল্টের শিশিও তার নাকের কাছে তুলে ধরে বললো, "লক্ষ্মী ভাই, একটু মনের জোর করে অন্ততঃ ক'টা দিন থাক। শিউচরণকে খতম করে চলে গেলে যে ক'টা দিন পারি দলের কায আমিই নয় চালিয়ে নেব, কিন্তু শিউচরণ বেঁচে থাকতে নয়।"

তীব্র কোকেন-মিশ্রিত পান দু'টো গলাধঃকরণ করে খোকা বাবু অতি কষ্টে তার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে গোপীকে বললো, "আঃ বাঁচালি ভাই, গোপী! কিন্তু বেশী দিন রোগটা আটকানো যাবে বলে তো মনে হয় না, দু'-এক দিনের মধ্যেই সব কিছু কাজ সেরে ফেলতে হবে বুঝলি?"

খোকা প্রকৃতিস্থ হবার কিছু পরেই সুধীরকে নিয়ে দলের মাধব ফিরে এসে জানালো যে, তারা যথারীতি ডায়েরী করে তো এসেছেই, তা ছাড়া তারা উকিলের বাড়ীও গিয়েছিল। দরখাস্তর ড্রাফ্‌টও করা হয়েছে? কাল সকালেই প্রেসিডেন্সি ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে লক্ষ্মীকান্ত ও সুরমার নামে বৌ-চুরির নালিশ জানানো হবে।

বাড়ী ফিরে সুধীর আর স্থির থাকতে পারলো না। পিছনকার দশটি বৎসরের সুখ-দুঃখের ইতিহাস তার কাছে আজ অর্থহীন। হঠাৎ সে ছুটে গিয়ে গোপীর হাত হতে মদের গেলাসটা তুলে নিয়ে বলে উঠলো. "দিন, দিন, আমাকেও একটু দিন। আজ থেকে আমি মদ খাব।"

সুধীরকে মদ খেতে দিতে গোপীর কোনও আপত্তিই ছিল না।

বরং এত সহজে সুধীরকে মদ খাওয়াতে গোপী খুসীই হলো—খোকাও। সারা রাত ধরে তারা সুধীরকে মদ খাওয়াল এবং সেই সঙ্গে নিজেরাও মদ খেল। সুধীর আর তাদের পর নয়, নব দীক্ষিত আপনার লোক। এক দিন যে সেই তাদের সর্দ্দার হবে না, তাই বা কে বলতে পারে? পৃথিবীতে আশ্চর্য্যান্বিত হবার মতন এমন কিছুই নেই।

রাত্রি দশটা বেজে গেছে, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত থানাতে কাজ-কর্ম্মের ব্যস্ততা তিল মাত্রও কমেনি। সাড়ে দশটার সময় লালবাজার থেকে লরী এসে কয়েদীদের নিয়ে যাবে। এই জন্য থানার ছোট দারোগা শৈলেশ বাবু ডায়েরী কয়টা তাড়াতাড়ি লিখে ফেলছিলেন। ভদ্রলোক থানার উপরকার একটা কোয়ার্টারে সপরিবারে বাস করেন। ইতিমধ্যে উপর হ'তে দু'বার খেতে যাবার জন্য তাগিদ এসেছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি উপরে উঠতে পারেননি। বাড়ীতে থেকেও তিনি যেন বাড়ী নেই। থানার নীচের তলার সহিত উপরতলার যেন কোনও সম্বন্ধ নেই। নিকটে থেকেও তিনি যেন বহু দূরে আছেন।

শৈলেশ বাবু নিবিষ্ট মনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের জবানবন্দী লিখছিলেন, এমন সময় এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখুন, শৈলেশ বাবু আছেন? আমি শৈলেশ বাবুর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

ডায়েরীর পাতাগুলো হ'তে মুখ তুলে, পেনসিলটা দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে, অন্যমনস্ক ভাবে শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "বলু-উন, আমিই শৈলেশ বাবু।"

ভদ্রলোক কৃতার্থ হয়ে আসন পরিগ্রহণ করে আর্জ্জি জানালেন, "ওঃ, আপনিই! তা বড্ড বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। ছেলেটা আমার একেবারে বকে গেছে। রাত্রি দশটার কম এক দিনও বাড়ী আসে না। বৌমা ভাত নিয়ে বসে থাকে, মশাই। একটু ধমকে দিতে পারেন তাকে?"

ছোট দারোগা শৈলেশ বাবুর মেজাজ সকাল হতেই বিগড়ে ছিল। ভদ্রলোকের এই অহেতুক অনুরোধ তার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটালো; বিরক্ত হয়ে তিনি উত্তর করলেন, "বিরক্ত করবেন না মশাই! এটা থানা-বাড়ী, স্কুল নয়।"

ভদ্রলোক থানা এবং পুলিশ সম্বন্ধে একটা নূতন ধারণা নিয়ে থানায় এসেছিলেন। শৈলেশ বাবুর এইরূপ উত্তরে হকচকিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, "ওঃ, আপনি তাহলে শৈলেশ বাবু নন্। তাই বলুন। আমি মশাই শৈলেশ বাবুর কাছে এসেছিলাম, তাঁর নাম শুনে। শুনেছি বিশিষ্ট ভদ্রলোক তিনি।"

ধীর ও শান্ত স্বভাবের জন্য বাজারে শৈলেশ বাবুর একটা সুনাম ছিল। এত দিন পরে এমনি ভাবে যে তার মেজাজ বিগড়ে যেতে পারে, তা তিনি নিজেও কখনও কল্পনা করেননি। ভদ্রলোককে স্থান পরিত্যাগ করতে দেখে অপ্রস্তুত হয়ে শৈলেশ বাবু বলে উঠলেন, "আরে যান কোথায়, মশাই, বসুন বসুন। আমি শুনছি আপনার কথা।"

বৃদ্ধ ভদ্রলোক কিন্তু আর কিছুতেই বসতে চাইলেন না। তাঁর মুখে সেই এক কথা, "শৈলেশ বাবু এলে তিনি আসবেন।"

শৈলেশ বাবু আর একবার তাঁকে অনুরোধ জানাতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় দরজার সিপাহী ব্যস্ততার সহিত বলে উঠলো, "হুজু-উ-র। বড়া-সাহেব! বড়া-সাহেব আ গি'য়া—"

বড় সাহেব প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়েই থানা পর্য্যবেক্ষণ করে থাকেন। কিন্তু সেই দিন বোধ হয় তাঁর কোথায়ও নিমন্ত্রণ ছিল। সান্ধ্য-ভোজন শেষ করে তিনি রাত্রির দিকেই থানায় এসেছেন। সিপাহিজীর এই সাবধান-বাণী শ্রুত হতে না হতে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে ভূষিত এক ভদ্রলোক থানায় এসে ঢুকলেন। আশে-পাশের সকলেই দণ্ডায়মান হয়ে তাঁকে অভিবাদন করে সরে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ তাঁর লক্ষ্য পড়লো, ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী, ইনস্পেকটার প্রণব বাবুর ইনফরমার শিউচরণের দিকে। আফিস-রুমের মধ্যে একটা বেঞ্চের উপর বসে সে প্রণব বাবুর জন্য অপেক্ষা করছিল। বড় সাহেব রাঘব বাবু পকেট থেকে একটা টাইপ-করা কাগজ পড়তে পড়তে জিজ্ঞাসা করলেন, "ঐ লোকটা ওখানে কেন? এঁ্যা? এটা তো একটা দাগী চোর। কে এখানে ওকে থাকতে দিয়েছে? কথা কইছেন না যে?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু জানালেন, "বড্ড ভয় পেয়েছে ও। খোকার অসাধ্য তো কোনও কায নেই, বড় বাবু তাই ওকে থানাতেই রেখেছেন।"

প্রণব বাবুর কাছ থেকে বড় সাহেব এই সম্বন্ধে বিস্তারিত রিপোর্ট পেয়েছিলেন। কিন্তু, তা সত্ত্বেও এক জন পুরোনো চোরকে থানায় পুষে রাখা তাঁর মনঃপূত হয়নি। বড় সাহেব রাঘব বাবু বিরক্ত হয়ে হুকুম জানালেন, "না না, পুরোনো চোরকে তোমরা থানায় রাখতে পারো না। দূর করে দাও ওকে, এক্ষুনি।"

শিউচরণকে এত রাত্রে থানা থেকে বিতাড়িত করলে তার ফল যে কিরূপ দাঁড়াতে পারে তা শৈলেশ বাবুর ভালোরূপে জানা ছিল। আমতা আমতা করে ছোট দারোগা শৈলেশ বাবু জানালেন, "কিন্তু—কিন্তু—স্যার, এতে ও খুন হয়ে যেতে পারে।"

"নো নো নো, নো কিন্তু। দূর করে দাও ওকে। হুকুম শোনো। মরে মরুক না। একটা চোর কমে যাবে, আর কি হবে! তাড়াও ওকে এক্ষুনি।"

বড় সাহেব—এখোন বড় সাহেব। এক দিন তিনি শৈলেশ বাবুর মতই সাব ইনস্পেক্টার ছিলেন, কিন্তু সে কথা এখোন আর তাঁর মনে নেই। অর্থাৎ কি না, তিনি এখোন বাড়ীওয়ালী হয়েছেন, ছেলে বয়সের দুঃখ-কষ্ট বা সুবিধা-অসুবিধার কথা তিনি ভুলে গেছেন। শাশুড়ী জাতীয় জীবদের ন্যায় তাঁর এই মনোভাব শৈলেশ বাবুকে ব্যথিত করলেও, মুখে তিনি এর জন্য কোনরূপ প্রতিবাদ করতে সাহসী হলেন না, বড় সাহেবের হুকুম তামিল করতে তিনি বাধ্য। এই হুকুমের মধ্যে কোনও যুক্তি থাক আর না থাক, তাতে কি আসে যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও শৈলেশ বাবু তাঁকে আর একবার অনুরোধ জানিয়ে বললেন, "বড় বাবু এখোন বাইরে আছেন, স্যার! তিনি ফিরে এলে তার পর ওকে তাড়ালে হয় না?"

শৈলেন বাবুর ন্যায় এক জন অধস্তন অফিসার তাঁর হুকুম তামিল করতে ইতস্ততঃ করায় উহা তাঁর কাছে বোধ হয় ধৃষ্টতারূপে প্রতীত হলো। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "তর্ক করবেন না মশাই, যা বলি শুনুন।"

উপরের বারান্দা হ'তে শৈলেশ বাবুর পরিবারের মেয়েরা নীচের এই হুঙ্কার-ধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলো। এই হুঙ্কার-ধ্বনি যে কার উপর প্রযুক্ত হচ্ছে, তা'ও তাদের জানতে বাকি থাকেনি। নীচের আফিস হ'তে উপরকার কোয়ার্টারের বারান্দা চোখে পড়ে। হঠাৎ

শৈলেশ বাবুর কানে এলো, তাঁর শিশুপুত্র তার মাতাকে উদ্দেশ করে বলছে, "মা, মা, ঐ দেখো, বাবাকে বকছে।" শৈলেশ বাবুর মনে হলো, হে মাতা ধরণি, দ্বিধা হও! ক্ষুণ্ণ মনে একবার মাত্র উপরের দিকে তাকিয়ে দেখে তিনি সিপাহীকে হুকুম করলেন, "কেয়া, চুপসে খাড়া হ্যায়। শুনতা নেহি বড়সাহেবকো হুকুম। নিকাল দেও উসকো।"

যান্ত্রিক নিয়মানুবর্ত্তিতা যন্ত্রের চেয়েও বোধ হয় কঠোর ও নির্ম্মম। এই নিয়মানুবর্ত্তিতার দোহাই দিয়ে মানুষ মানুষের উপর যে কোনও অত্যাচার, অনাচার ও অবিচার অবাধে করে যেতে পারে। এই ক্ষেত্রেও ইহার ব্যতিক্রম হলো না, হুকুম পাওয়া মাত্র দুই জন সিপাহী শিউচরণকে ঘাড় ধরে ধাক্কা দিতে দিতে থানা হতে বার করে দিল। চোখের জল ফেলতে ফেলতে শিউচরণ বার হয়ে গেল এক রকম বিনা প্রতিবাদেই।

বড়সাহেব রাঘব বাবু চলে যাবার একটু পরেই, বড় ইনস্পেকটার প্রণব বাবু ঘরে ঢুকলেন। সকাল সাতটায় একটা ডাকাতি কেসের তদন্ত ব্যপদেশে তিনি বার হয়েছিলেন। পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত অবস্থায় অফিস-ঘরে ঢুকে তিনি শৈলেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি হে, থানা ভিজিট্ হয়ে গেছে? বড় সাহেব এসেছিলেন? কোনও গোলমাল হয়নি তো?"

—"গণ্ডগোল বলে গণ্ডগোল, খুবই গণ্ডগোল হয়েছে।" ক্ষুণ্ণ মনে শৈলেশ বাবু বললেন, "ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে রোজ রোজ যা-তা শুনতে আর ভালো লাগে না স্যার!"

সহকারী অফিসার শৈলেশ বাবুর এই খেদোক্তি শুনে প্রণব বাবু বুঝতে পেরেছিলেন, কোনও একটা ভুলচুক উপলক্ষে বড় সাহেব এঁদের বকাবকি করে গেছেন। মানুষ মাত্রেরই ভুলচুক হয়ে থাকে, শৈলেশ বাবুও মানুষ, তাই তাঁরও ভুল হতে পারে। বরং না হলে আশ্চর্য্যের বিষয় হবে। এ জন্য কাউকে বকাবকি করা নিরর্থক। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে প্রণব বাবু বললেন, "দেখছি, এক দিন হাজির না থাকলেই গণ্ডগোল হয়। যাক, ও কিছু নয়।" এর পর শৈলেশ বাবুর পিঠ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে প্রণব বাবু বললেন, "কি-ই মন খারাপ করছেন? যান, উপরে যান। আপনাকে গালাগালি করেছে? বেশ তো, সকাল হোক না, আপনিও দশ জন পাবলিক্ ও নীচেওয়ালা অধস্তন অফিসারদের বিশটা গাল দিয়ে মনটা হালকা করে নেবেন; আসুন, অত সেন্টিমেন্টেল হলে চলবে কেন? গাল খাওয়া ও গাল দেওয়াই তো আমাদের কাজ। যান, শুয়ে পড়ুন গে। বৌমা অপেক্ষা করছেন।"

যার নিজের আত্মসম্মান-জ্ঞান বোধ নেই, সে সহজেই অপরের আত্মসম্মানে আঘাত দিতে পারে। যে সকল উর্দ্ধতন অফিসাররা এই ভাবে অধস্তন অফিসারদের আত্মসম্মান-বোধ নষ্ট করেন, পরোক্ষ ভাবে তাঁরা জনসাধারণের ক্ষতিই করে থাকেন।

কথা কয়টি প্রণব বাবু ঠাট্টাচ্ছলে বললেও উহার মধ্যে একটা নিদারুণ সত্য নিহিত ছিল। এই বিশেষ সত্যটি প্রণব বাবু বিশেষ-রূপে উপলব্ধি করতেন। এই জন্য এ সম্বন্ধে শৈলেশ বাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে পুনরায় তিনি বললেন, "আরে, কি চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছ। গরু ডাকে, ঘোড়া ডাকে, এ নয় মানুষ ডেকেছে। শব্দ হচ্ছে ব্রহ্ম, দেশে দেশে একই শব্দের ভিন্নরূপ অর্থ হয়। এখানে ড্যাম মানে গালাগালি, জাপানে ড্যাম মানে গোলাপ ফুল। শব্দ যখন ব্রহ্ম, এবং এর যখন অর্থই নেই, তখন যে কোনও একটা অর্থ মনে করে নিলেই হলো। মন খারাপ করো না, এসো, চলে এসো। আসলে আমরা আছি সুন্দর বনে। এখানে মশা-মাছি প্রত্যহই কামড়াবে। বছরে দু'-একটা কাঁকড়া বিছাও কামড়াতে পারে। শুধু সাপে না খায়, বাঘে না নিয়ে যায়। এইটুকুই ব্যাস, এই হচ্ছে পুলিশের চাকরী, বুঝলে?"

প্রণব বাবুর এই সব পরিহাসে শৈলেশ বাবু কিন্তু সান্ত্বনা পেলেন না। তিনি ক্ষুণ্ণ মনে প্রণব বাবুকে বললেন, "কিন্তু, ওঁরা সার, ভুলে যান যে, আমরা ওঁদের ব্যক্তিগত চাকর নই। ওঁরা এবং আমরা—উভয়েই যে একই সরকারের চাকুরী করি, তা তাদের মনে রাখা উচিত। এতোক্ষণ বলি বলি করেও বলতে পারিনি, সার, আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন শুনে। বড় সাহেব শিউচরণকে আজ তাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"এ্যাঁ, বল কি? শিউচরণকে তাড়িয়ে দিলেন?" ক্ষেপে উঠে প্রণব বাবু বললেন, "নিয়ে এসো জাব্দা খাতা, আমিও রিপোর্ট লিখে দিচ্ছি। ওপরওয়ালারও ওপরওয়ালা আছে।"

অফিস-ক্লার্ক রতন বাবু এতক্ষণ প্রণব বাবুর এই সব পরিহাস উপভোগ করছিলেন। হঠাৎ প্রণব বাবুকে ক্ষেপে উঠতে দেখে প্রমাদ গুণে বললেন, "যাকগে যাক্, স্যার! উপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারা যায় না। ওঁর দোষে যদি সে খুনই হয় তো এ জন্য উনিই দায়ী হবেন, আমাদের কি?"

প্রণব বাবু এমনিই পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। তিনি শিউচরণকে এই ভাবে আশ্রয়চ্যুত করার সংবাদে ভেঙে পড়লেন। হঠাৎ তার মনে পড়লো, স্ত্রী শান্তার কথা, এতক্ষণ হয়ত অভুক্ত অবস্থায় সে ঘুমিয়ে পড়েছে। মুখ হতে অলক্ষ্যে তাঁর বার হয়ে এল ছোট্ট একটা কথা—দ্যুৎ! এর পর আর নীচে না দাঁড়িয়ে তাঁর ভারাক্রান্ত মনটা যথাসম্ভব সহজ করে নিয়ে উপরে উঠে গেলেন!

কোয়ার্টারের দরজায় এসে তিনি দেখলেন, দরজাটা ভিতর হতে বন্ধ করা রয়েছে। দুয়ারের পাশেই একটা ইলেক্‌ট্রিক্ কলিং বেল্ ছিল। বার বার করে তিনি সুইচের বোতাম টিপলেন। ক্রীং ক্রীং ক্রীং করে বেল্ বেজেই চলেছে, কিন্তু ভিতর হতে কোনও সাড়া বা শব্দই আসে না। প্রণব বাবু বুঝতে পারলেন, স্বামীর জন্য অপেক্ষা করে করে শান্তা অঘোরে ঘুমিয়ে পড়েছে।

দুয়ারের পাশেই একটা টুল ছিল। প্রণব বাবু টুলে উঠে, দরজার উপরকার স্কাই লাইটের ফাঁকে হাত চালিয়ে বহুক্ষণের চেষ্টার পর অতি কষ্টে ভিতরের ছিট্‌কানিটা খুলে ভিতরে ঢুকে দেখলেন, শান্তা দেবী সত্য সত্যই ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে ধীরে তিনি শয়ন-কক্ষে ঢুকে শান্তার শয্যার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

বেশ-বিন্যাস শেষ ক'রে সেই সন্ধ্যা হ'তেই শান্তা স্বামীর জন্য অপেক্ষা করছিল। রাত্রি তখন প্রায় একটা, কিন্তু তখনও পর্য্যন্ত সে তার নীল রঙের দামী নূতন শাড়ীটা ছাড়েনি। অলঙ্কারের একটিও সে খুলে ফেলেনি। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে সে চমকে চমকে উঠছিল, তার একখানি হাত শয্যা হতে মাটিতে এসে পড়েছে। কিছুক্ষণ ধীর স্থির নয়নে প্রণব বাবু তাঁর স্ত্রীর রূপ-মাধুর্য্যের দিকে চেয়ে

দাঁড়িয়ে রইলেন। স্ত্রীর সান্নিধ্য যেন তাঁকে ভাবনা-চিন্তাহীন এক নূতন পৃথিবীতে এনে দিয়েছে।

প্রণব বাবু ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে শান্তার কপালের উপর হাত রাখলো। শান্তা প্রণব বাবুর স্পর্শে জেগে উঠে অস্ফুট স্বরে আর্তনাদ করে উঠলো, "কে কে?" তার পর ধড়মড় করে উঠে বসে প্রণব বাবুকে জড়িয়ে ধরে বললো, ওমা, তুমি? এত দেরি হলো?"

হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "যাকে দেখে ভয় পেলে, তাকেই জড়িয়ে ধরছো, বেশ মেয়ে তো?"

"বা রে-এ, একলা থাকি, ভয় করে না বুঝি?" অনুযোগ করে শান্তা বললো, "বড্ড নিষ্ঠুর তোমরা, সত্যি!"

অপ্রস্তুত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "কি করবো বলো। একটা দুর্দান্ত ডাকাত দল ধরতে গিয়েছিলাম। আর একটু হলে হয়তো মেরেই ফেলতো আমাদের।"

ভীত হয়ে শান্তা উত্তর করলো, "কেন গেলে? তোমার জীবনটা তো আর তোমার একলার নয়? কক্ষন আর যাবে না।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "কি করবো বলো, চাকরী তো করতে হবে?"

উত্তরে শান্তা বললো, "কেন শৈলেশ বাবুকে পাঠালেই তো পারতে।"

হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর করলে, "বা রে, বেশ তো। শৈলেশ বাবুর বুঝি আর স্ত্রী নেই? বড্ড স্বার্থপর তো তোমরা? দাঁড়াও, দীপ্তিকে বলে দিচ্ছি।"

শৈলেশ বাবুর স্ত্রী দীপ্তির সহিত শান্তার ইতিমধ্যেই ভাব হয়ে গিয়েছে। দীপ্তির মুখে চোর, ডাকাত ও খুনেদের গল্প সে সারা দিন ধরে শুনেছে। এই সকল কাহিনী শুনতে শান্তার যেমন ভাল লাগে, তেমনি ভয়ও হয়। স্বামীর বাড়ী ফিরতে দেরী হলে, শান্তা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকতো—বিশেষ করে এই সব গল্প শোনার পর। শান্তা প্রণব বাবুকে জড়িয়ে ধরে উত্তর করলো, "সত্যি, তোমাদের বড্ড কষ্ট।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "আমার তো মনে হয়, তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্ট পুলিশের স্ত্রীদের। আমরা প্রতিদিন নূতন পরিস্থিতি ও আবেষ্টনের মধ্যে এসে ভুলে থাকতে পারি; কিন্তু পুলিশের স্ত্রীরা! এই দেখ না, সন্ধ্যার সময় হতে তুমি বৃথাই সাজগোজ করে বসে আছ।"

লজ্জিত হয়ে শান্তা উত্তর করলে, "তাই বুঝি! যাও, তুমি ভারি ইয়ে!"

সোহাগ ভরে স্ত্রীকে আদর করতে করতে প্রণব বাবু বললেন, "কিন্তু একটা সুবিধে আমাদের আছে। আমাদের স্ত্রীদের সঙ্গে কেউ গোপনে প্রেম করতে পারে না। আমাদের সময়ের চেয়ে অসময়ে, কাজের চেয়ে অকাজে ডাক পড়ে বেশী। আমাদের চাকরী তো আর দশটা হ'তে পাঁচটা পর্য্যন্ত নয় যে, দুপুর বেলা অনিলদা বা সুনীলদা এসে আড্ডা জমাবে? আমরা কখোন যে হুট্ করে বাড়ী এসে পড়বো তা কে'উ বলতে পারে না। হঠাৎ হয়তো বোম্বে যাচ্ছি বলে বেরুলাম, কিন্তু ষ্টেশনে এসে শুনবো হুকুম এসেছে যেতে হবে না। এর পর আর কে সাহস করে এগুবে বলো?"

হেসে ফেলে শান্তা প্রতিবাদ জানালো, "দুষ্টু, লোক দেখে দেখে তোমাদের মনটাও হয়ে গেছে ঐ রকম। সকলকেই তোমরা মন্দ দেখ। সব মেয়েই কি তাই না কি?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "তা ছাড়া আর কি? রোজই তো সকালে থানায় নেমে দেখি, এক জন করে ভদ্রলোক বসে আছেন, যাঁদের কি-না বৌ পালিয়ে গিয়েছে। দেখে-শুনে এমন একটা আতঙ্ক হয়েছিল যে, আমি বিয়েই করতে চাইনি। পরের বৌ তো খুঁজে দিই, কিন্তু আমার বৌ হারালে কার কাছে গিয়ে কাঁদবো বলো তো?"

চোখ রাঙিয়ে শান্তা উত্তর করলো, "খুব হয়েছে, এখোন খাবে এসো। বিকেলে একটুও কিছু খাওনি তো?"

হঠাৎ প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়লো, দূরের টেবিলটার উপর স্বামি-স্ত্রী দু'জনারই আহার্য্য ঢাকা রয়েছে। বিব্রত হয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "এখনও খাওনি তো? কত বার না তোমায় বলেছি, আমার জন্যে অপেক্ষা না করে খেয়ে নিও। পুলিশের বৌদের এই সব করলে চলে না। এ রকম তো এক দিন হবে না। মাসে দশ-বারো দিন, এমন কি বিশ দিনও এমনি দেরী হবে। হয়তো বাইরেই আমি খেয়ে নেবো। শৈলেশ বাবুও তো আমারই সঙ্গে সঙ্গে উপরে উঠেছেন। কিন্তু দেখে এসো ওর স্ত্রীকে, এতক্ষণ খেয়ে-দেয়ে নিশ্চয়ই ঘুম দিচ্ছেন।"

স্বামীর ভর্ৎসনা নীরবে শুনতে শুনতে শান্তা আহার্য্যের ঢাকনা খুলে স্বামীকে খেতে দিলো, নিজেও কিছু খেয়ে নিল। তার পর স্বামীকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে মশারিটা টাঙাতে টাঙাতে বললেন,—"বড্ড খেটে-খুটে এসেছ, শুয়েই কিন্তু ঘুমিয়ে পড়তে হবে। আজ আর একটি কথাও না।"

শান্তা ধীরে ধীরে দেওয়ালের কাছে এসে বিজলী আলোর সুইচটার উপর হাত রেখে অদূরে শায়িত স্বামীর দিকে চেয়ে, একটু মৃদু হেসে মৃদুল কটাক্ষের সঙ্গে বললো, "কি-ই।"

প্রণব বাবু চোখ বুজিয়ে নিরুত্তর হয়ে শুয়েছিলেন। মনে মনে তিনি আশা করছিলেন বিছানার এক পাশে এখন তিনি ঝুপ করে একটা ভারি জিনিসের পতনের শব্দ শুনবেন। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে তিনি শুনতে পেলেন থানার এক সিপাইএর কর্কশ গলা। সিঁড়ির দরজার কাছ থেকে বাজখাই গলায় নীচের পাহারাটা হেঁকে উঠলো,—"বাবু-উ বড়বাবু-উ! একঠো কেইস্ আগিয়া।"

খুব বড় গোছের বা কোনও একটা বিশেষ গোলমেলে কেস না হলে সিপাহী এই সময় কখনও প্রণব বাবুকে বিরক্ত করবে না, এ কথা প্রণব বাবুর ভালোরূপেই জানা ছিল। প্রণব বাবু অসহায় ভাবে স্ত্রীর দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। মুখ দিয়ে তাঁর অলক্ষ্যে বার হয়ে এলো, "দ্যুৎ!"

শান্তা দেবী ব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন, "ও মা; এখুনি আবার বেরুবে না'কি?"

প্রণব বাবু উঠে-পড়ে স্ত্রীর গালটা একটু টিপে দিয়ে উত্তর করলেন, "ডাকছে যে!"

উত্তরে শান্তা দেবী বললেন, "ডাকুক গে। ডাকলেই যেতে হবে বুঝি?"

জুতা জোড়াটা পায়ে দিতে দিতে প্রণব বাবু বললেন, "যেতে হবে বই কি। কয় মাস আগে এই রকম একটা ডাকে উঠে পড়েছিলাম

গীতি-কাব্য

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

গীতি-কবিতায় পাঠ হয়েছিল সুরু
আকাশে ডাকিত ঘন মেঘ গুরু-গুরু
জানালার কোলে দু'টি বুক দুরু-দুরু
গীতি-কবিতায় পাঠ হয়েছিল সুরু।

গীতি-কবিতায় সুরু হয়েছিল পাঠ
ফুলে-পল্লবে আকীর্ণ পথ-ঘাট
সবুজে-শ্যামলে দিগন্ত-ঘেরা মাঠ
গীতি-কবিতায় সুরু হয়েছিল পাঠ।

আকাশের নীল ঘনতর হয়ে আসে
বায়ু সুগন্ধি নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
মুগ্ধ নয়নে মুগ্ধ নয়ন ভাসে
আকাশ আরও ঘনতর হয়ে আসে।

জানালার পটে সে আকাশ দেখ দোলে
সারঙ্গ স্বনে কবোষ্ণ কম কোলে
জীবন-মৃত্যু বুঝি ভেদাভেদ ভোলে
জানালার পটে আকাশের নীল দোলে।

কান্ত-কোমল পদাবলী মধু ক্ষরে
কান্তার দু'টি রাগ-রঞ্জিতাধরে
আধ কলি কাটি রাখি চুম্বন ভরে
আধ কলি তার কণ্ঠেতে গুঞ্জরে।

পাতা ওল্টাতে হাতে মিলে যায় হাত
আঙুলে আঙুলে জড়ালো কি দিন-রাত
লজ্জায় নত মুগ্ধ দৃষ্টিপাত
পাতা ওল্টাতে হাতে মিলে যায় হাত।

পাতা ওল্টাতে মুখে বেধে যায় কথা
শব্দে ছন্দে কি বিষম দুরূহতা
যৌগিক পদ অন্ত্যে অমিত্রতা
রূঢ় যতিপাতে মুখে বেধে যায় কথা।

লৌহ-কঠিন মহাকাব্যের দ্বার
সর্গে সর্গে বিচিত্র ঝঙ্কার
সন্ধি-সমাস যমক-অলংকার
অর্গলে বাঁধা মহাকাব্যের দ্বার।

জটিল কাহিনী গিঁটে গিঁটে গাঁথা শ্লোকে
ঘুরি পিছে পিছে গ্রন্থে গ্রন্থে লোকে লোকে
কখনো মুগ্ধ, কখনো অশ্রু চোখে
জটিল কাহিনী গ্রন্থিবদ্ধ শ্লোকে।

স্খলনে পতনে জীবন জটিলতর
এই দ্রুত ছোটে, এই গতি মন্থর
বীর্যে মহৎ, শঙ্কায় থর থর
স্খলনে পতনে জীবন জটিলতর।

গীতি-কবিতার সুর থেমে গেছে কবে
মহাকাব্যের ঘোর রণ-তাণ্ডবে
শান্ত রৌদ্রে মিলিত রসোৎসবে
গীতি-কবিতার সুর থেমে গেছে কবে।

মহাকাব্যের পাঠ কি তবুও থামে
ছন্দের ধারা বহিছে ডাহিনে-বামে
কেউ মরুভূমে, কেউ বা সাগরে নামে
মহাকাব্যের পাঠ কি তবুও থামে।

নায়ক-নায়িকা আজও তো মিলন-ক্ষণে
একই শ্লোকে বাঁধা নিবিড় হৃদয়ে মনে
সম্বিৎহারা চুম্বনে চুম্বনে
নায়ক-নায়িকা আজিও মিলন-ক্ষণে।

গীতি-কবিতায় সে পাঠের সবে সুরু
হে রসলক্ষ্মি, কাজল-কৃষ্ণ ভুরু
দেখে বুক আজও কম্পিত দুরু-দুরু
গীতি-কবিতায় মহাকাব্যের সুরু।

বলেই না তোমাকে পেয়েছি। দেখি, আজ গিয়ে আবার কি পাই। ভয় নেই গো, ভয় নেই, এখুনিই ফিরে আসবো।"

প্রণবকে দাঁড়িয়ে উঠতে দেখে শান্তা দেবী ক্ষেপে উঠে স্বামীকে সজোরে জড়িয়ে ধরে বললেন. "না, যেতে দেবো না।"

ব্যস্ত হয়ে উঠে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "আরে চাকরী, চাকরী।"

কিন্তু কে শুনে কার কথা। শান্তা দেবী স্বামীকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে বললেন, "থাকগে যাক চাকরী।"

দরজার বাইরে থেকে পাহারাটা আর একবার হেঁকে উঠলো, বাবু-উ! খুনি কেইস্, খুন হুয়া-য়া। শিউচরণিয়া ইনফরমার খুন হো গিয়া, হুজুর!"

সিপাহীর শেষ কথাটা কানে যাবা মাত্র, প্রণব বাবুর প্রতিটি লোম খাড়া হয়ে উঠলো—মাথার প্রতিটি কেশও। চোখ দিয়ে তার জলও বার হয়ে এল, সেই সঙ্গে আগুনও। শিউচরণকে তিনি কথা দিয়েছিলেম,. তাকে আশ্রয় দিবেন. তাকে বাঁচাবেন, কিন্তু তাঁর সেই প্রতিশ্রুতির মূল্য কি তিনি এই ভাবে দিলেন? শান্তা তখনও পর্য্যন্ত হতভম্ব স্বামীকে ধরে দাঁড়িয়েছিল। প্রণব বাবু দিগ্‌বিদিক্ জ্ঞান-শূন্য হয়ে, ঝটকান দিয়ে স্ত্রীকে বিছানার উপর ফেলে দিলেন, তার পর আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করে এক দৌড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

স্বামীর এই ব্যবহারে শান্তা হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। বিস্ময়ের ঝোঁকটা সামলে নিয়ে দরজার ফাঁকে মুখ বাড়িয়ে শান্তা দেবী দেখলেন, প্রণব বাবু তড়-তড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছেন। [ক্রমশঃ

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

গোপাল ভাণ্ডারীই বঙ্গের বিক্রমাদিত্য মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পঞ্চরত্ন সভার অন্যতম রত্ন। গোপাল ভাঁড় নামে তাঁহার প্রসিদ্ধি। গোপাল আসন পাইতে পারেন বীরবলের পার্শ্বে। কিন্তু সে মর্য্যাদা তিনি পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। দুর্ভাগ্য গোপালের, না আমার দেশ ও জাতির?

পঞ্চরত্ন সভায় বাণেশ্বর, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ও রামরুদ্র বিদ্যানিধির সঙ্গে গোপাল ভাণ্ডারীকেও দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণনগর তখনকার কালে মহা গৌরবান্বিত, মনীষিবৃন্দের তীর্থক্ষেত্র। সে ক্ষেত্রে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র গড়িয়া তুলিয়াছিলেন বিরাট বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁহার সভাই ছিল সেই বিদ্যালয়। সে বিদ্যালয়ের এক জন "সিণ্ডিক" ছিলেন—মহারাজার সভাসদ বিদূষক গোপাল ভাঁড়!

গোপালকে অনেকেই শুধু ভাঁড় বলিয়াই জানে। তাঁহার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ছিল অসাধারণ, তিনি সৃষ্টি করিতেন রস-সাহিত্য। তাঁহার বাণী ছিল মধুক্ষরা। সে বাণী যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ উপভোগ্য।

কিন্তু উপভোগই সব কিছু নহে। গোপাল ছিলেন কবি ও দার্শনিক। আমার স্বগ্রাম রাধানগরবাসী জরাভারাক্রান্ত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাসের নিকট হইতে যে সকল কাগজ-পত্র পাইয়াছি, তাহাতে এ সিদ্ধান্তকে নাকোচ করিবার উপায় নাই। নগেন্দ্রনাথ গোপাল ভাঁড়ের বংশধর এবং গোপাল হইতে নয় পুরুষ।

কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে বাৎসরিক জন্মাষ্টমী মহোৎসবে মহারাজার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে গোপাল যে স্বরচিত পাঁচালীর ছড়া উৎসবানন্দ-দর্শীদের ছন্দোবন্ধে শুনাইয়াছিলেন, তাহা পাঠকবর্গকে উপহার দিই। গোপাল কৃতাঞ্জলিপুটে সর্ব্বজনসমক্ষে ব্রজেশ্বরের উদ্দেশে বলিতেছেন—

হরি ব্রজ পরিহরি সম্পদ সম্ভোগ করি
বিরাজেন সুখে মথুরায়,
হরি-হারা বৃন্দাবন অভিন্ন নির্জ্জন বন
করুণ নিঃস্বন পূর্ণ দিক্ সমুদয়।
(তখন) হরি-হারা সবাকার নাহি আর পূর্ব্বাকার
জীর্ণ শীর্ণ যেন শবাকার,
অধিকন্তু রাধিকার কি কব অধিক আর
বর্দ্ধমান বিরহ-বিকার।
একাকিনী ধরাসনে আলাপ-প্রলাপ মনে
অনশনে শ্রীহীনা শ্রীমতী,
ভাবিয়ে সে নীল কায় স্বর্ণ কায় নীল কায়
ক'ব কা'য় দুর্গতি যেমতি।
কৃষ্ণ-আশা নিরাশায় নিরাশায় কত সয়
নিরাশায় নিতান্ত কাতরা,
যেন শ্রাবণের ধারা সতত নয়নে ধারা
নিরাধারে নিরাধারা ধারা।
আপনি যে সহস্রারা সহস্রারা মূলাধারা
তিনি আজ নিরাধারা প্রায়,
বিচ্ছেদ বিগত বোধ নাহি মানে অনুরোধ
প্রবোধ প্রমাদ প্রমদায়।
অযত্ন ভূষণ বাসে সন্ন্যাসিনী স্থির বাসে
শ্যাম সহ বাস অভিলাষে,
শ্যাম-ত্যক্তা কমলিনী ঘন-চ্যুতা সৌদামিনী
অবনীতে দুঃখ-সিন্ধু ভাসে।
(তখন) গোপীকার কৃষ্ণ পক্ষ কৃষ্ণ বিনে কৃষ্ণ পক্ষ
কৃষ্ণ পক্ষে বিপক্ষ সবাই,
বিরহে আদেশ ল'য়ে শশী এল রবি হ'য়ে
অনিল অনল চেয়ে দহে সর্ব্বদাই।
(তখন) কোকিল-হুঙ্কার ভ্রমর-ঝঙ্কার
শ্রুতিকটু অতিশয়,
অঙ্গ-অলঙ্কার জ্বলন্ত অঙ্গার
চন্দন গরলময়।
স্খলিত কবরী বেণী বিষধরী
পৃষ্ঠে দংশে অনিবার,
বিষম সে জ্বালা বৃকভানু-বালা
সহিতে কি পারে আর!
এই মোহ যায় এই জ্ঞান পায়
এই বলে—কৃষ্ণ কই,
এই বলে পুন সখি শুন শুন
বাঁশী না বাজিল ঐ!

এই বিরহ-কাব্যে দাশু রায়ের প্রভাব দেখা যায়। তাহা অবশ্য সমালোচনার বিষয়। তবে বলা চলে—কালের প্রভেদ আছে। কবিতার প্রামাণ্যের ভার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথের উপর দিয়া নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও বলা অসঙ্গত হইবে না, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের স্নেহাদর-পরিপুষ্ট গোপালের কবি-ভাব উচ্চাঙ্গেরই ছিল। তাহা না থাকিলে তাঁহার রঙ্গ-কৌতুক আদৌ হৃদয়গ্রাহী হইত না।

স্বর্গাদপি গরীয়সী

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

২

একটি তৃপ্ত নির্বিরোধ জীবন-প্রবাহ; নিজের অটুট শান্তিতে সংসারের উপর দিয়া যেন একটি আশীর্বাদের মতো বহিয়া চলিয়াছে।

এই তৃপ্তি, এই শান্তির গোড়ায় গিরিবালার জীবনের গঠন-বৈশিষ্ট্য ছাড়া কিন্তু আরও একটা বড় কথা আছে—তিনি উত্তর-জীবনে কোন অতি-রূঢ় আঘাত পান নাই। দুঃখ-অনটনের কথা বাদ দেওয়া যায়, তাহারা তো শত্রুরূপে আসিয়া মিত্ররূপেই বিদায় লইয়াছে, প্রথম জীবনে এক অহিভূষণের কথা বাদ দিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত ওঁর কাছে আসিয়াছে নিতান্ত স্বাভাবিক রূপেই: পিতা, মা, জেঠামশাই, জেঠাইমা, শ্বশুর, শাশুড়ী আরও সবাই যাঁহারা গেছেন এক রকম সময়েই গেছেন। অকাল বা আকস্মিকতার উগ্র ভীষণতায় মৃত্যু গিরিবালার জীবনে দেখা দেয় নাই। এ দিকে, জীবনের কোন না কোন সময় মনে মনে যাহা কামনা করিয়াছেন—ধন, জন, সম্পদ—কে যেন অঞ্জলি ভরিয়াই দিয়া গেছে।···সব ভালো হইলেও কিন্তু এ ধরণের যাহার জীবন সে কোন আকস্মিক সুকঠোর আঘাত বা তাহার সম্ভাবনার সামনে একেবারেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। তাহার জীবনের গতিই একেবারে বদলাইয়া যায়। গিরিবালার এই প্রশ্রয়-পাওয়া জীবনেরও শেষের দিকে খানিকটা সেই অবস্থা দাঁড়াইল: মাঘ মাসের পয়লা। কয়েক দিন হইতে অতিরিক্ত ঠাণ্ডা পড়িয়াছে, রাত্রে আর সকালের খানিকটা পর্য্যন্ত ঘরের ভিতর থেকে বাহির হওয়া কষ্টকর হইয়া পড়ে, কন্‌কনে পশ্চিমা হাওয়া যেন হাড় পর্য্যন্ত বিঁধিয়া দেয়।

বেলা প্রায় দুইটা; খাওয়া-দাওয়া সারিয়া গিরিবালা একটি নাতিকে কোলে লইয়া উপরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। দোতলার পাশে একটা খোলা ছাত, শীতের দুপুরে এটুকু একটি পরম আশ্রয়, কয়েক দিন থেকে যেন আরও লোভনীয় হইয়া উঠিয়াছে। বড় বধুর নিকট হইতে পাণ লইয়া উঠান হইতে ছাতের দিকে পা বাড়াইবেন হঠাৎ গুম্‌-গুম্ করিয়া একটা শব্দ কানে গেল। একটু দূরেই রেলের মাল-গুদাম, কখনও কখনও ভারি বোঝা ফেলিবার জন্য এই ধরণের শব্দ ওঠে, পাশে রেলের প্রাঙ্গণ, সেখানেও শান্টিঙের সময় গাড়িতে গাড়িতে ধাক্কা লাগিয়া ওঠে একটা শব্দ মাঝে-মাঝে। এটা কিন্তু ওরই মধ্যে একটু অন্য ধরণের, ব্যাপক, একটা চাপা গ্যাঙানির মতো। নাতিকে কোলে লইয়া গিরিবালা ভ্রূ কুঁচকাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন। উপরের একটা ঘরে হরেন শুইয়াছিল, একটু বিস্মিত ভাবেই হাঁক দিয়া প্রশ্ন করিল—"মা, আওয়াজটা কিসের বলো তো?"···শব্দের প্রকৃতিটা বুঝিতে আর হরেনের প্রশ্নে বোধ হয় আধ মিনিটও গেল না, ইতিমধ্যে গ্যাঙানিটা বাড়িতে বাড়িতে যেন চরমে আসিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা উৎকট ঝাঁকানি। "মা, ভূমিকম্প না কি?" বলিয়া হরেন খাট হইতে নামিতে গিয়া মেঝেয় পা ঠিক রাখিতে না পারিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—"ভূমিকম্প! বাইরে বেরিয়ে পড় সব!···" সন্দেহের আর তখন নাইও কিছু, সমস্ত সহর কাঁপাইয়া উৎকট আর্ত্তনাদ···"ভূমিকম্প! ভূমিকম্প!···কেয়ামৎ!··· নিকলো!···বাহার আও!···" বিপিনবিহারী বাহিরের ঘরে ছিলেন, ছুটিয়া উঠানে নামিয়া চীৎকার করিতেছেন, সবাইকে বাহির করিতে যাইতেছেন—টলিয়া পড়িতেছেন—মেয়েরা ছেলেমেয়ে কোলে করিয়া বাহিরে পলাইতে যাইয়া পা মুড়িয়া পড়িতেছে—সঙ্গে সঙ্গে অসহায় ভাবে চিৎকার···সব চেয়ে ভীষণ মাথার উপর দোতলাটা—হরেন রেলিঙের ধারে ছোট ছেলেটিকে বুকে চাপিয়া আর সবাইকে বাড়ি ছাড়িবার জন্য গলা ফাটাইয়া নির্দেশ দিতেছে; নিজে সম্পূর্ণ নিরুপায়, অগ্রসর হইবার কয়েক বার চেষ্টা করিয়া আছাড় খাইয়া এক হাতে ছেলেটি, অন্য হাতে রেলিং চাপিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গিরিবালার অবস্থা বর্ণনা করা যায় না, কোলে নাতি, উপরে ছেলে আর নাতির ঐ অবস্থা—একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া "ভগবান বাঁচাও! হে ভগবান বাঁচাও!" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতেছেন। এ দিকে মনে হইতেছে, তিনখানা ঘর আর টানা বারান্দা-সুদ্ধ সমস্ত দোতলাটা উঠানের উপর হুমড়ি খাইয়া পড়িয়া আবার সোজা হইয়া উঠিতেছে—যে কোন মুহূর্তে চুর-চুর করিয়া ভাঙিয়া পড়িয়া সব একাকার করিয়া ফেলিবে।···নিচের আর সবাই কোন রকমে বাহির হইয়া পড়িল—টানিয়া বাহির করিতে বিপিনবিহারী কয়েক বারই আছাড় খাইলেন, পাগলের মতো উপরের পানে ছুটিয়া যাইবেন, এমন সময় সেই উৎকট ঝাঁকানি হঠাৎ থামিয়া গেল। "আপনি আসবেন না—কোন মতে না!" বলিয়া বিকৃত কণ্ঠে বিপিনবিহারীকে যেন ধমক দিয়া আদেশ করিয়া—হরেন নামিয়া পড়িয়া মাকে এক রকম টানিতে-টানিতে বিপিনবিহারীকে পর্যন্ত জাপটাইয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রথমেই হিসাবের পালা; বড় সংসার, অনেকগুলি কচি-কাচা, উৎকণ্ঠা আর আতঙ্কের মধ্যে মিলাইতে কয়েক বারই গোলমাল হইল, শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল সকলেই বাহির হইয়াছে, একটু-আধটু হয়তো কাটা-ছড়া ব্যতীত এক রকম অক্ষতই।···বাড়িটা!···দুই মিনিটের ভূমিকম্প—তাহার আগে পর্য্যন্ত ছিল পরম আশ্রয়, এখন আর কাছে যাইতে সাহস নাই কাহারও। দু'টি মিনিটেই পৃথিবীতে সব ওলট-পালট হইয়া গেছে—ঐ পরম মিত্র এখনই তো চরম শত্রুতা করিতে পারিত—এখনও তো পারে!

তাই হইয়াছেও। নিজেরা বাঁচিয়া বাহিরের দিকে নজর দিবার ফুরসৎ হইল—পুবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে—সহরের চারি দিকেই গগনভেদী আর্তনাদ—সমস্ত আকাশ ধূলায় সমাচ্ছন্ন, এখনও নূতন নূতন স্তম্ভ আকাশে উঠিতেছে, বাড়ি-পড়ার শব্দও মাঝে-মাঝে ভাসিয়া আসে—এখনও; এ ওর মুখের পানে চায়, এত অতর্কিত—এত অল্প সময়—কেহ যেন কিছু বুঝিতে পারিতেছে না, বিশ্বাস করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কোলের কাছটা একটু সামলানোর সঙ্গে সঙ্গেই দূরের কথা মনে পড়িল—শশাঙ্ক, পূর্ণেন্দু, অক্ষ আফিসে, ছেলে-মেয়েরা স্কুলে—কেমন আছে তাহারা—আছে তো?···চিন্তার মধ্যে সম্ভব-অসম্ভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস যেন জোট পাকাইয়া গেছে···মনে পড়িল শৈলেনের

কথা—একটা কর্ম্ম উপলক্ষে পাটনায় গেছে—সেখানকারই বা কি অবস্থা?…

বিপিনবিহারী মাথার ঠিক রাখিতে পারিতেছেন না; কোথায়, কাহার কাছে যাইবেন? এক রকম জ্ঞানশূন্য হইয়াই ছুটিয়া বাহির হইবেন, হঠাৎ পাশের শুক্‌নো ডোবাটার পানে নজর পড়িল—গর্ত্ত হইয়া গিয়া তাহার ভিতর থেকে জল আর বালি উঠিতেছে—একেবারে কয়েক জায়গায়! "এ কি সর্বনাশ!" বলিয়া ক্ষণমাত্র দাঁড়াইয়া পড়িয়া আবার পা বাড়াইয়া রাস্তার ধার পর্য্যন্ত গেছেন, দেখেন এক দিক্‌ থেকে পূর্ণেন্দু হন্‌-হন্‌ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। বাবার দিকে চাহিয়া আছে কিন্তু মুখ দিয়া যেন কথা বাহির হইতেছে না। কাছে আসিয়া কোন রকমে কয়েকটা ঢোঁক গিলিয়া প্রশ্ন করিল—"খবর কি?"

বিপিনবিহারী কি ভাবিয়া বাড়িটার পানে একবার চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"কিছু হয়নি—বেঁচে গেছে।…তোমার খবর?"

—সামনে দেখিয়াও ক্ষত কি অক্ষত যেন সন্দেহ মিটিতেছে না। একটা উত্তরে পূর্ণেন্দুরও আশা মিটিতেছে না, প্রশ্ন করিল—"সবাই?"

"হ্যাঁ, সবাই।…তোমার…?"

"কোন রকমে বেঁচে গেছি, কি করে যে তা বুঝতে পারছি না; বাইরে খোলা একটা রকে এসে দু'জনে দাঁড়ালাম—পেছনে যে একটা উঁচু দেয়াল আছে হুঁস নেই—চালুনির মতন জমিটা কে যেন চালাচ্ছে—হঠাৎ পেছন থেকে আমায় কে যেন একটা কড়া ধাক্কা দিলে—ছিটকে সামনে জমির উপর মুখ থুবড়ে পড়লাম—ফিরে দেখি দেয়ালটা পড়ে গেছে, পাশের লোকটা একেবারে তার মধ্যে শেষ।… আপনি কোথায় যাচ্ছেন?"

"অ্যাঁ—কোথায়?…তুমি তো এসে গেছ, শশাঙ্ক, অরু…ছেলে-মেয়েরা স্কুলে রয়েছে—খবর পেয়েছ কিছু?

"না…ঐ তারা আসছে, সবাই আছে—ও-বাড়ির ছেলেরাও…"

বিপিনবিহারী ঘুরিয়া দেখিলেন দূরে ষ্টেশন-রাস্তার মোড়ে ছেলেরা ছুটিতে ছুটিতে আসিতেছে, মেয়ে দু'টি একটু পিছনে, একটু পা নরম করিল, তাহার পর আবার ছুটিতে আরম্ভ করিল। বিপিনবিহারী অগ্রসর হইলেন। পূর্ণেন্দু আবার প্রশ্ন করিল—"কোথায় চললেন?"

"লাহেরিয়াসরাই—শশাঙ্ক, অরুকে দেখি…"

"যাবেন না, পায়ের নিচে জমি ফাটছে এখনও…"

তাহার পর যাওয়াটার গুরুত্ব বুঝিয়া বলিল—"বরং ফিরুন বাবা, আমি যাচ্ছি—এই তিন মাইল পথ আপনি…"

বিপিনবিহারী ততক্ষণে অনেকটা চলিয়া গেছেন, ফিরিয়া হাতটা উঁচাইয়া বলিলেন—"একটা এক্কা ধরে নোব, তুমি বাড়িতে থাকো। তোমার গর্ভধারিণী কি রকম যেন হয়ে গেছে, একটু লক্ষ্য রেখো।"

উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথ বাহিয়া চলিলেন, শক্তি শুধু এই একটা ক্ষীণ সান্ত্বনায় যে, ভগবান যখন এদিকে সবাইকে বাঁচাইয়া দিয়াছেন, ও-দু'জনকেও নিশ্চয় দিবেন বাঁচাইয়া, সমস্ত বুকের জোর এই সম্ভাবনা-টুকুর মধ্যে ঢালিয়া দিতেছেন। একটা এক্কা তীরবেগে ছুটিয়া আসিতেছে, থামিবার হুকুম অগ্রাহ্য করিয়া তেমনি তীরবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। পথে আরও এক্কা, ঘোড়ার গাড়ি দেখা গেল, ছুটিয়া আসিতেছে অথবা তাঁহার দিক্‌ হইতে যাইতেছে, কোন চালক কথার একটা উত্তর দিলে, কেহ বা দিলে না; চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, বাড়ির উদ্দেশে ছুটিয়াছে, কেহ উল্‌টিয়া প্রশ্ন করিল—বাবু, অমুক মহল্লার খবর জানেন? আছে বাড়িগুলো দাঁড়িয়ে? লোকেরা?… পায়ে-হাঁটা লোকও চলিয়াছে। কেহ ছুটিয়া, কাহারও গতি একেবারে মন্দ, ভয়ে আতঙ্কে স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে শিথিল হইয়া গেছে, পা' দু'টাকে যেন কোন মতে টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে।…রাস্তার দুই পাশে এখানে, ওখানে, সেখানে গর্ত্ত বাহিয়া জল বালি ঠেলিয়া ঠেলিয়া উঠিতেছে—বীভৎস দৃশ্য—ধরণীর গায়ে যেন দূষিত ব্রণ! আর ফাটল—পূর্ণেন্দু যাহার কথা বলিয়াছিল—লম্বা, গভীর ফাটল হাঁ করিয়া রহিয়াছে, চাহিয়া দেখিতে ভয় করে, কয়েক স্থানেই রাস্তার এপার-ওপার চলিয়া গেছে—যেটা সব চেয়ে সঙ্কীর্ণ—হয়তো হাতখানেক চওড়া, সেটাকেও ডিঙ্গাইতে যেন সাহস হয় না—কে জানে, পাতাল পর্য্যন্ত নামিয়া গেছে কি না!…ঝাড়া তিন মাইল পথ কি ভাবে অতিক্রম করিলেন, কতক্ষণ লাগিল, কোন হুঁস নাই—ঐ একটি মাত্র সান্ত্বনা পায়ে শক্তি জোগাইয়া আসিয়াছে—ভগবান যখন এদিককার সবাইকে বাঁচাইয়াছেন—পূর্ণেন্দুকে আবার অমন অদ্ভুত ভাবে—তখন এ দু'জনকে নিশ্চয় দিবেন বাঁচাইয়া।…এক সময় আফিসের সামনে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

বিরাট দুই তলা আদালত আফিস, উপর তলাটা কে যেন হাতুড়ি দিয়া চুরমার করিয়া দিয়াছে; শশাঙ্ক আর অরু দু'জনেই আফিসে ছিল ওরই একটা ঘরে।

বহিঃচৈতন্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল বিপিনবিহারীর একেবারে অবলুপ্ত হইয়া গেল। কয়েক সেকেণ্ড পর্য্যন্ত যেন কিছুই বুঝিতে পারিলেন না, তাহার পর আবার একটু হুঁস হইল। ত্রস্ত প্রশ্ন করিতে করিতে আগাইয়া চলিলেন—"শশাঙ্ক বাবুকো দেখা হ্যায়? অ্যাকাউণ্টেণ্ট শশাঙ্ক বাবু? উন্‌কা ভাই অরু বাবু? উৎর গেয়া থা উপরসে?…" কে কাহাকে উত্তর দেয়! অনেকে প্রতি-প্রশ্ন করিল—অমুকের খবর জানেন?…জজ-মুন্সেফ, আমলা-পিয়ন কেহই নাই, আছে যাহারা তাহারা বাহিরের লোক, ভাই-ছেলে-আত্মীয়ের খোঁজে আসিয়াছে—মুখে তীব্র আতঙ্কের ছায়া—অনেকক্ষণ হইয়া গেছে তবুও একটা জটিল কলরব—এক জায়গায় কতকগুলা কুলি তাড়াতাড়ি রাশীকৃত ইট-রাবিশ পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেছে। বিপিনবিহারী সেই দিকে ছুটিতেছিলেন এমন সময় একটি বাঙালী ছোকরার সঙ্গে দেখা হইয়া গেল, সেই প্রশ্ন করিল—"শশাঙ্ক বাবুকে খুঁজছেন আপনি?"

"হ্যাঁ…আর অরু, তার ভাই…বেঁচে গেছে?"

ছেলেটি একটু থতমত খাইয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সামলাইয়া লইয়া বলিল—"আপনি হাসপাতালে যান—শীগ্‌গির…অরু বাবুর কিছু হয়নি…"

"আর শশাঙ্কর?"

"আপনি যান হাসপাতালে শীগ্‌গির।"

"কেন?…"

গলা শুকাইয়া আসার জন্যই মুখ দিয়া আর কিছু বাহির হইল না, বিপিনবিহারী এবার ছুটিলেন। খানিকটা দূরে আদালত হাতার বাহিরেই হাসপাতাল, যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন আর্ত্তনাদ তীব্র হইয়া উঠিতে লাগিল। গবর্ণমেণ্টের বিরাট হাসপাতাল, সমস্ত

চুরমার হইয়া গেছে। এখানে-ওখানে মৃতদেহ, অনেক আহতও, জায়গায় জায়গায় ইট-রাবিশ সরানর কুলি লাগিয়া গেছে। চরম অবস্থায় বিপিনবিহারী যেন যৌবনের সেই শক্তি আর স্থৈর্য্য হঠাৎ ফিরিয়া আসিয়াছে। চারি দিকে তীব্র সন্ধানী-দৃষ্টি ফেলিতে ফেলিতে আগাইয়া চলিলেন, সব কিছু দেখিবার জন্ম মনটাকে প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। একটু অগ্রসর হইয়া এক সময় একেবারে থামিয়া পড়িলেন। ডান দিকে একটু দূরে একটা গাছতলায় অরু গালে হাত দিয়া বসিয়া আছে। সামনেই শয়ান অবস্থায় শশাঙ্ক। অরু কতকটা পিছন ফিরিয়া ছিল। পিতাকে হঠাৎ দেখিয়া ক্ষণমাত্রের জন্ম যেন চকচকিয়া গেল, তাহার পর একেবারে ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঠিক এই সময় শশাঙ্ক খুব স্তিমিত দৃষ্টি মেলিয়া একবার ঘাড়টা ফিরাইলেন। বিপিনবিহারী মুখটা নামাইয়া আনিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় লেগেছে ?"

শশাঙ্ক উত্তর দিতে পারিলেন না ; ক্ষণিক চৈতন্ম আসিয়াছিল, বোধ হয় চেনেনও নাই ; চোখ দুইটাও তখনই আবার বুজিয়া গেল। অরু এতক্ষণ অসহায় ভাবেই বসিয়া ছিল, বাবাকে দেখিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, কান্নার মাঝেই বলিল—"ঘাড়ে-পিঠে সর্ব্বত্রই—বাঁ হাতটায় বড্ড বেশি চোট…"

বিপিনবিহারী সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আকারে বলিলেন—"ডাক্তার… জল একটু ?"

অরু ব্যাকুল ভাবে বলিল—"ছেড়ে উঠতে পারছি না"—একটা এক্কা এইটুকু এনে দিয়ে চলে গেল—ডাক্তার কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, নেই বোধ হয়…"

"থামো"—বলিয়া বিপিনবিহারী চারি দিকে একবার চাহিয়া লইয়া এক দিকে ছুটিলেন ; ফাটলের মধ্যে দিয়া দূরে এক জায়গায় একটু জল জমিয়াছে, রুমালটা ভিজাইয়া আনিয়া মুখে ভালো করিয়া জল ছিটাইয়া দিলেন, তাহার পর হাঁ করাইয়া মুখের মধ্যেও দিতে যাইতেছিলেন, হঠাৎ থামিয়া গেলেন ; এত দিনের চেনা ধরিত্রীর উপর হঠাৎ বিশ্বাস হারাইয়া গেছে, কে জানে, জলের আকারে বিষ উদ্গিরণ করিতেছে কি না।

অরুকে বলিলেন—"তুমি একবার দেখো—ডাক্তার কম্পাউণ্ডার যে কেউ এক জনকে পাও—ফার্ষ্ট এডের যা কিছু একটু নিয়ে…"

মিনিট দশেক পরে অরু এক জন কম্পাউণ্ডারকে লইয়া আসিল, তাহার হাতে ভাঙ্গা শিশিতে একটু টিংচার আয়োডিন মাত্র, আর কিছুই নাই। শশাঙ্কর একটু একটু চৈতন্ম হইয়াছে, তবে থাকিতেছে না। সর্ব্বাঙ্গে আঘাত। একটু একটু করিয়া আয়োডিন লাগাইয়া কম্পাউণ্ডার হাতটা যতটা পারিল ঠিক করিয়া দিয়া অরুর দেওয়া ছেঁড়া কাপড়ের ফালি দিয়া ব্যাণ্ডেজ করিয়া দিল ; বলিল—"যত শীগ্‌গির পারেন বাড়ি নিয়ে গিয়ে কোন ডাক্তারের হাতে দিন… অনেক চোট…কয়েকটা সিরিয়াস্…"

বিপিনবিহারী বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় পাই ডাক্তার ?…"

অরু পাগলের মতো একবার চারি দিকে চাহিয়া লইয়া বলিল—"একটা এক্কাও যে…"

কম্পাউণ্ডার উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, বলিল—"এটুকুর বেশি আর কিছুই বলতে পারছি না আমি—এখানে আর কোন রকমই সাহায্যের উপায় নেই—ডাক্তার কম্পাউণ্ডারের মধ্যে কে আছে, কোথায় আছে, কিছু জানি না…যাই, ঐ আবার দু'টোকে টেনে বের করেছে—কেনই যে করা…আচ্ছা, নমস্কার।"

বিলম্বের জন্ম একটা উদ্বেগ লাগিয়া আছে, তবুও গিরিবালা অনেকটা যেন নিশ্চিন্ত আছেন। পূর্ণেন্দু বুদ্ধি করিয়া নিজের বাঁচিয়া যাওয়ার ইতিহাসটা আর জানায় নাই। স্কুল থেকে নাতি-নাতনিরাও অক্ষত শরীরে ফিরিয়াছে। বাড়ির ভিতর যাওয়া যাইতেছে না, তবুও বাহির হইতে মনে হয় গোটাই আছে বাড়িটা। চারি দিকের ধ্বংসের মধ্যে এই নিরাপত্তায় মনে হয় তবে বোধ হয় ভগবান করিলেনই রক্ষা। দু' মিনিটের মধ্যে এমন একটা খণ্ড-প্রলয়—যাঁহার এই লীলা তাঁহার ভৈরব রূপের সামনে গিরিবালা যেন অভিভূত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। তবু তাহারই মধ্যে সমস্ত মনটি আবার কৃতজ্ঞতায় ভরপূর। অতি-বিরাটের সামনে অতি-অসহায়ের কৃতজ্ঞতা তোযামোদেরই রূপ লইয়া ওঠে ফুটিয়া…হে হরি, তোমারই তো সব, বাঁচিয়েছ, তোমার পায়ে লক্ষ-কোটি প্রণাম জানাচ্ছি—ভালোয় ভালোয় এখন শশাঙ্ক আর অরুকে ঘরে ফিরিয়ে এনে দাও—আর, তুমি আনবেই ফিরিয়ে, এত কাণ্ডর মধ্যেও তোমায় দয়াল বলে সবাই…

এই রকম-কৃতজ্ঞ চিন্তার মধ্যেই প্রায় সন্ধ্যার সময় শশাঙ্ককে অচৈতন্ম অবস্থায় এক্কা হইতে নামাইয়া আনা হইল।

প্রচুর শান্তির মধ্যে, প্রবল বিশ্বাসের মধ্যে অতর্কিত এই আঘাতটা গিরিবালাকে যেন সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্ত্তিত করিয়া দিল—অহির মৃত্যুর চারি দিকের দিনগুলি আসিল ফিরিয়া, শুধু আরও পরিপক্ব বিশ্বাসের মধ্যে বলিয়া আরও উগ্র ভাবে। কথা অল্প হইয়া আসিল, একটা আতঙ্ক, একটা অবিশ্বাস—মনের ভাবটা যেন এই যে, এত করিয়া লিপ্ত হইয়া পড়িয়া তো ভাল করেন নাই—এদিকে কোলের কাছে এই অবস্থায় শশাঙ্ক, ওদিকে এক শত মাইল দূরে শৈলেন—রেল-ডাক-টেলিগ্রাফ বন্ধ, একেবারেই কোন খবর নাই। এই অবস্থায় পনেরটা দিন কাটিয়া গেল—সেই সময় যখন একটা প্রহরকে একটা যুগ বলিয়া মনে হয়। পনের দিন পরে শৈলেন রাত্রি প্রায় তিনটার সময় হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত হইল—রেল সমস্তটা খোলে নাই, পথ বিপজ্জনক, খানিকটা রেলে খানিকটা এক্কায় আসিয়াছে, খবর কিছুই দেওয়া সম্ভব ছিল না, বাড়ির খবর জানেও না কিছু। দেখে, বাড়ি থেকে দূরে খড়ের চালা করা হইয়াছে, তাহারই মধ্যে পরিবারের সবাই। মা শশাঙ্ককে কোলে লইয়া জাগিয়া বসিয়া আছেন। শশাঙ্ক অবশ্য তখন অনেকটা সুস্থ, বিপদের গণ্ডীটা পার হইয়া গেছে।

মায়ের মুখে কিন্তু তখনও রাজ্যের ক্লান্তির সঙ্গে একটা যেন তীব্র আতঙ্কের ছাপ। শৈলেনকে দেখিয়া মুখটা দীপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু খুব যে উল্লসিত হইয়া উঠিয়াছেন এমন মনে হইল না। চোখে বারংবারই একটা অভিমানের অশ্রু ঠেলিয়া আসিতে লাগিল, মুছিয়া মুছিয়া লইতে লাগিলেন। শান্ত প্রশ্ন আর গল্প-গুজবে রাত্রিটা শেষ হইয়া গেল।

জার্ম্মাণীর জাতীয় সঙ্গীত

অনুবাদক : শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

তরঙ্গ আর অস্ত্রের ধ্বনি ভেদিয়া উঠে
বজ্র সমান গম্ভীর স্বর আকাশ টুটে—
"হে নদী রাইন, ওগো জার্ম্মাণ রাইন নদী,
ওগো পবিত্র, রক্ষিবে তোমা কে নিরবধি ?"

(একতান)

হে প্রিয় পিতৃভূমি, তব ভয় নেই।
তব প্রিয় সুত রক্ষিবে নদী এই।

তাহারা দাঁড়ায় হাজার হাজার দাঁড়ায় বীর,
অন্যায় প্রতিবিধানিতে সবে উচ্চ-শির।
পিতৃ-ভক্তি-উদ্বেল বুকে দাঁড়ায় তারা
পবিত্র ভূমি রক্ষিতে সবে পাগল-পারা।

বীর-তেজে ভরা এই এ বীরের জাতি,
এর 'পরে রহে বিধাতার কৃপা-ভাতি!
শঙ্কা-শূন্য হৃদয়ে বলিছে—"রাইন নদী,
আমার বুকের মতন হও গো জার্ম্মাণ নিরবধি।"

একটি বিন্দু শোণিত থাকিতে শিরে,
অসি আছে যবে রক্ষিতে তব তীরে,
দেশসেবকের হাতে বন্দুক যবে,
শত্রুর পদ এই মাটী নাহি ছোঁবে।

শপথ ধ্বনিছে, নদীও বহিছে জোরে,
মোদের পতাকা সোনালী আলোকে ওড়ে।
পবিত্র নদী রক্ষিব নিরবধি,
রাইন, রাইন, ওগো জার্ম্মাণ নদী।

শিল্পী—চিত্তরঞ্জন দাশ

কয়েক দিন পরের কথা,—শশাঙ্ক তখন ভালো হইয়া গেছেন। এক দিন গল্প-প্রসঙ্গে শৈলেনকে প্রশ্ন করিলেন—"মা'র ভাবটা লক্ষ্য করেছিস্ ?"

শৈলেন বলিল—"হ্যাঁ দাদা, একটু ছাড়া-ছাড়া নয় কি ?"

শশাঙ্ক একটু মাথা নাড়িয়া হাসিয়াই বলিলেন—"ঠিক তাই। মা আমাদের সবার ওপর একটু চটে গেছেন বলা চলে..."

শৈলেন অবশ্য সে রকম কিছু পরিচয় পায় নাই, একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিল—চটে গেছেন ? তার মানে ?"

শশাঙ্ক এবার আর একটু জোরেই হাসিয়া উঠিলেন—বলিলেন—"তার মানে কে জানে, আমরা সবাই হয়তো অহির অভিসন্ধি নিয়ে বসে আছি, যে কোন সময় দাগা দিতে পারি। ভূমিকম্পে আমার এত-বড় একটা ফাঁড়া গেল—পিওর অ্যাক্সিডেণ্ট, কোনই হাত নেই আমার,—মা কিন্তু ঐ অর্থ দাঁড় করিয়ে বসে আছেন। আমিই যেন ইচ্ছে করে এত-বড় একটা তোড়জোড় করে ওঁকে ফাঁকি দিয়ে সরে পড়বার চেষ্টা করেছিলাম। হাসব কি কাঁদব তাই বল্ না।"

[ক্রমশঃ।

অঙ্গন ও প্রাঙ্গণ

সুন্দর সহর

শ্রীইন্দিরা দেবী

আমরা যে সহরে বাস করি, সে সহরটি দেখতে সুন্দরতম হোক, এর পথ-ঘাটের পরিচ্ছন্নতা আমাদের মনে আনুক প্রফুল্লতা, এ আমরা সবাই আশা করি।

সহরের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে যে কথা উঠেছে, সহরকে সুন্দর করে তুলবার জন্য যে অভিযান সুরু হয়েছে, এতে আনন্দিত ও আশান্বিত হওয়ার কারণ থাকলেও গর্ব্ব করতে পারি নে। আমাদের রুচির পরিচ্ছন্নতার প্রমাণ হতো তখনই, যদি দেখা যেতো যে সহরকে সুন্দর করবার প্রশ্ন উঠবার কোনো প্রয়োজন হয়নি। প্রথম থেকেই সে দিকে আমাদের সাবধানী দৃষ্টি রয়েছে।

সহরে বাস করতে হলে সহরবাসী হিসেবে যে সমস্ত নৈতিক দায়িত্বের আমরা অধীন, সহরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি ব্যক্তিগত ভাবে দৃষ্টি রাখা তার মধ্যে প্রধান একটি-দায়িত্ব।

এই শ্রেণীর বহু দায়িত্ব যে আমরা এড়াবার চেষ্টা করি বা অসাবধানে উপেক্ষা করে চলি, তার কারণ আমরা এখনও উপযুক্ত সহরবাসী হিসেবে গড়ে উঠিনি। এর মূলে যাই থাক, এটা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জার কথা। দৈনন্দিন জীবনে কত রকমে যে আমরা এই প্রকার দায়িত্ব পালনের দায় থেকে নিজেদের দূরে রাখি তার হিসেব নেই। এমন কি অনেক সময় দেখা যায়, যে কেউ যদি এই ধরণের কোনো ব্যাপার নিয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন অথবা নিজের হাতে এ রকম কোনো কাজের ভার নিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করেন তাহলে তাঁকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ সহ্য করতে হয়ই, শ্রদ্ধা আকর্ষণ তো দূরের কথা।

ধরুন, আপনি পথ চলতে চলতে দেখতে পেলেন, কোনো লোক আপনারই সামনে সামনে চলেছে, লোকটি কলা বা কমলা লেবুর খোসা ছাড়িয়ে সেই পথেই ছড়াতে ছড়াতে যাচ্ছে, আপনি বুঝতে পারলেন, এটা ভয়ানক অন্যায়, সে লোক কলা বা কমলা খেয়ে স্বাস্থ্যোন্নতির সাহায্য করলেন বটে, কিন্তু তারই ছড়ান খোসায় পা পড়ে আছাড় খেয়ে হাত-পা ভাঙলো! হয়তো পথ-চলতি কোন লোক, কোনো মুটে—ইত্যাদি। কারু হাত বা পা জখম হলো, কারুর মোট পড়ে গিয়ে দু'শো বা চারশো টাকার জিনিষ নষ্ট হলো। আপনি এ কথাটা ভেবে নিয়ে হয়তো পায়ের সাহায্যে খোসাগুলো পথের একধারে যেখানে মানুষের সাধারণতঃ পা পড়বে না এমন জায়গায় সরিয়ে দিলেন, কিন্তু কেমন অভিনন্দন পাবেন তা জানেন? মনে মনে সবাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাবে সেই আশাই করি, কিন্তু তা হবে না, কেউ আপনার দিকে তাকিয়ে একটু হাসবে, কেউ ভাববে ভালমানুষীর প্রদর্শনী চলেছে, কেউ আবার মজার লোক ভেবে এটা উপভোগ করবে। সব চেয়ে দুঃখের ব্যাপার কি জানেন? অনেক সময় আমরা এই ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভয় করে নিজেদের কর্ত্তব্য বোধ জাগ্রত হওয়া সত্ত্বেও তাকে দমন করে রাখি, এটা অবশ্য মানসিক দুর্ব্বলতার লক্ষণ। অথচ এ ভাবে দু'-একটা দৃষ্টান্ত দেখতে দেখতে এক দিন কিন্তু সম্পূর্ণ অসাবধান ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মানুষেরাও সাবধান হয়ে যাবে।

সহরের পরিচ্ছন্নতা কেবল যে এই আকস্মিক বিপদ-মুক্তির জন্য অথবা সৌন্দর্য্য-বিধানের জন্যেই তা কিন্তু নয়। এমনিই তো সহরের লোকসংখ্যা আয়তনের অনুপাতে অত্যন্ত বেশী, তার উপর ঘন বসতির জন্য বায়ু-চলাচলের অভাব, এর উপর যদি আবার রাস্তা-ঘাট থাকে আবর্জ্জনায় পূর্ণ তাহলে তো জীবন ধারণ করা দুরূহ হয়।

অপর পক্ষে প্রতি বাড়ীতে এ বিষয়ে গৃহকর্ত্রীরও একটা কর্ত্তব্য আছে, বাড়ীর আবর্জ্জনা নিকাশের একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। বহু বাড়ীতে দেখা যায়, বাসন-ধোয়ার ময়লা এনে ঠিক বাড়ীর দরজার সামনে ঝি ঢেলে দিয়ে গেল। কোন সময় ঘর পরিষ্কারের আবর্জ্জনা, জানলা অথবা বারান্দা দিয়ে পথে অথবা পথচারীর উপর ফেলায় কিছুমাত্র ইতস্ততঃ দেখা যায় না, বহু বাড়ীতে এই সব বদ অভ্যাস দূরীকরণের কোনও চেষ্টার প্রয়োজন অনুভূত হয় না। সহর ও নিজেদের আবেষ্টনীকে আবর্জ্জনা ও কদর্য্যতার হাত থেকে বাঁচিয়ে সুন্দর এবং স্বাস্থ্যপূর্ণ করে তোলবার পথে মেয়েদেরও অনেকখানি দায়িত্ব। এ কথা আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবো। অবশ্য অন্যান্য প্রগতিশীল দেশের মেয়েরা গাড়ী-বোঝাই করে ময়লা আবর্জ্জনা নিয়ে সে যত দূরেই হোক, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফেলে আসে। আমরা অতখানি না পারলেও প্রাথমিক ব্যবস্থাটা সম্পূর্ণরূপে আমাদেরই হাতে। বাড়ীর আবর্জ্জনা পথে ও বাড়ীর বিভিন্ন জায়গায় না ছড়িয়ে একটা নির্দ্দিষ্ট স্থানে জমা করে পরে রাস্তায় রক্ষিত ডাষ্টবিনে ফেলে দিলে সেগুলি যথানিয়মে সহরের বাইরে চলে যাবে। তবে শুধু বাড়ী-ঘর পরিষ্কার থাকলেই সব হলো তা নয়, নাগরিক জীবনে এমন ব্যক্তিকেন্দ্রিক হওয়া পাপবিশেষ।

এ ছাড়া আর একটি কাজ আমাদের আছে, সেটি ছেলে-মেয়েদের সম্পর্কে। ভবিষ্যতের নাগরিক তো তারাই। তাদের এই সমস্ত

জিনিষ বিশেষ করে শেখাতে হবে। প্রত্যেক মা'র কর্ত্তব্য, এই সমস্ত বিষয়ে ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া। পথ চলতে চলতে তারা অনেক সময় ইচ্ছা করেই পথ অপরিষ্কার করতে থাকে। ফলের খোসা, কাগজ ছেঁড়া ইত্যাদি। এর অনিষ্টতা সম্বন্ধে এখন থেকে তাদের সাবধান করা উচিত।

তবে সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, নিজেদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ জাগিয়ে তোলা, সেটাই সব আগে দরকার।

নৈরাশ্য

রেণুকা ঘোষ

আজি মোর স্বপ্নের নির্জ্জন কুঞ্জে
তাথৈ তাথৈ তালে নাচে ক্ষ্যাপা ভৈরব,
চিত্ত-বিহঙ্গমী কী বেদন ভুঞ্জে
পক্ষ পক্ষাঘাতে নিরাশায় বন্দী।
মর্ত্ত্য-প্রবঞ্চনা সহে না যে আর তো
ব্যর্থ প্রেমের পূজা ব্যর্থ রে বৈভব
ক্রন্দন করে বুকে কে যেন ভয়ার্ত্ত
অদৃষ্ট-দেবতার এ কী অভিসন্ধি!

ক্রুর সে যে দুর্জ্জয় চির অভিশপ্ত
অন্তরে জ্বলে তা'র দুঃখের বহ্নি
তুহিন-শীতল হ'ল বক্ষের রক্ত
মৃত্তিকা বুকে আজ হেরি তার দৃষ্টি,
মর্ম্ম-অহল্যার কী পাষাণ মূর্ত্তি
লাঞ্ছিত-যৌবনা স্তব্ধ গোতমী
মুমূর্ষু যেন আজ জীবনের স্ফূর্ত্তি
ধ্বংসের প্রাক্কালে বিহ্বল সৃষ্টি।

মুমূর্ষু রাঙা চাঁদ দূরে ঐ আকাশে
পূর্ণিমা রাতে ফেলে জ্যোৎস্নার নিশ্বাস।
যেন কোন্ উদাসীর বাঁশী বাজে বাতাসে
শিথিল শিথিল হ'ল বাসনার গ্রন্থি;
দিকে দিকে উঠে শ্বাস লাঞ্ছিত আত্মার
পল্লব-মর্ম্মরে কাঁপে ভীরু বিশ্বাস
দূরদৃষ্টের গতি চলে যেন দুর্ব্বার—
মুক্ত চলার পথে চির পরিপন্থী।

স্বাধিকার-চ্যুত মৃত হে জীবন-পান্থ,
ধূলি-ধূসরিত পথ আজো বিষ-জর্জ্জর,
লাঞ্ছনা অবিচার চলে রে অশান্ত
পাথেয়বিহীন কাঁদে বঞ্চিত বিশ্ব।
গর্জ্জে গগনে কোটি কদ্রু-অপত্য
ঝলকে গরলরাশি ঝরে যেন ঝর্ঝর,
আর্ত্ত কাঁদিছে হিয়া, কাঁদিছে নেপথ্য
কহে তা'র কিছু নেই নিঃস্ব রে নিঃস্ব!

আধুনিকা

রেখা রায়

আমার এই প্রবন্ধটিতে আমি আধুনিকা তরুণীদের সম্বন্ধে কিছু লিখবো মনে করে এসেছি। প্রথমেই ভাবতে হবে আধুনিকা বলতে আমরা কি বুঝি? তথাকথিত আধুনিক যুগের তরুণীদেরই আমরা আধুনিকা এই আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু আজ-কালকার সব মেয়েকেই কি আমরা আধুনিকা বলে সম্বোধন করি? তা নয়। স্কুল-কলেজে শিক্ষিতা, আধুনিক যুগের সাজ-পোষাকে সজ্জিতা, জড়তা-বিহীন চাল-চলনে অভ্যস্তা তরুণীদেরই আমরা সাধারণতঃ এই নাম দিয়ে থাকি। যে যুগের যেমন আবহাওয়া ঠিক সেই আবহাওয়ার সাথে নিজেকে খাপ খাইয়ে গড়ে তোলাই কি পুরুষ কি স্ত্রী প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য, তা ছাড়া কেউই নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। তাই আধুনিক যুগের মহিলারা যে আধুনিকা এই আখ্যা পাবেন এ আর এমন বেশী কথা কি? কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আধুনিকা এই আখ্যাটি বিদ্রূপাত্মক ভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু কেন?—এ কথা প্রথমেই আমাদের ভেবে দেখা দরকার, আমরা আধুনিকা তরুণী, তাই এই বিদ্রূপাত্মক ধ্বনিটি আমাদের হৃদয়ে রেখাপাত করে বেশী। নিশ্চয়ই আমাদের ভেতরে এমন কতকগুলি দোষ বাসা বেঁধে আছে যার জন্য আমরা এই বিদ্রূপটা হজম করে নিতে বাধ্য হই। আধুনিকাদের বিরুদ্ধে এই রকম অভিযোগ যে শুধু প্রাচীন মহলেই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে তা নয়। বহু আধুনিক মহলেও এইরূপ বিদ্রূপাত্মক ধ্বনিটি উচ্চারিত হতে দেখা যায়। আমাদের দিদিমা-ঠাকুরমারা তো সব সময়েই আমাদের, অর্থাৎ কথাকথিত আধুনিকা তরুণীদের সম্বন্ধে নানা রকম অপ্রিয় মতবাদ প্রকাশ করতে একটুও দ্বিধাবোধ করেন না। উপরন্তু তাঁদের যুগ এবং বর্ত্তমান যুগের সাথে তুলনামূলক সমালোচনা সহকারে আধুনিক যুগের ক্রমঃ-অবনতির চিত্রও উলঙ্গ ভাবে প্রকাশ করতে চেষ্টা করেন। তাঁদের না হয় আধুনিকদের বিরুদ্ধে অভিযোগের কারণ থাকতে পারে। কারণ, তেলে জলে যেমন কোন দিনই মিশ খায় না ঠিক তেমনি প্রাচীনা এবং আধুনিকার মধ্যে মিশ খায় না। কিন্তু যখন আধুনিক যুগের অধিবাসীরাও আধুনিকাদের বিদ্রূপ করতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করেন না, তখন আধুনিকাদের ভিতরে নিশ্চয়ই একটা গভীর গলদ লুকিয়ে আছে বলে মেনে নিতেই হবে। এখন আমরা দেখতে চেষ্টা করবো কোথায় আমাদের সেই গলদ।

বর্ত্তমান যুগ শিক্ষার যুগ, বিজ্ঞানের যুগ। এই যুগে বাস করতে হলে প্রত্যেকটি পুরুষ এবং স্ত্রীর শিক্ষিত হওয়া উচিত। শিক্ষা ভিন্ন আমাদের চারিত্রিক গঠন সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষাই আমাদের চরিত্রকে সব দিক্ দিয়ে মহান্ হয়ে গড়ে ওঠবার সুযোগ এবং সামর্থ্য দেয়। আজকাল ঘরে-ঘরে পাশ-করা মেয়ের অভাব নেই। ম্যাট্রিক, আই-এ, এমন কি বি-এ পাশ মেয়েও আজকাল প্রায় প্রতি ঘরেই দেখা যায়। ভীতির চক্ষে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখতো বটে তবে আজ আর তা নয়, সেই জন্য আমরা সব সময়েই এ-কথা বলে থাকি যে দিন দিন শিক্ষিতার সংখ্যা বেড়েই চলছে। এটা আনন্দ এবং গর্ব্বের বিষয় সন্দেহ নেই, কারণ আজ এই যুগ-সন্ধিক্ষণে ভারতকে জাগাতে হলে এবং নিজেদের জাগাতে হলে সর্ব্ব প্রথমে নিজেদের সুশিক্ষিত করে

তুলতে হবে ; কিন্তু যারা আজকালকার যুগে শিক্ষিতা বলে গণ্য হন, তাঁরা কি প্রকৃতই শিক্ষিতা আখ্যা পেতে পারেন ?

স্কুল-কলেজে আজকাল হাজার-হাজার মেয়ে পড়ে। অভিভাবকদের স্কুল-কলেজে পাঠাবার অর্থই তাঁদের মেয়েকে সুশিক্ষিতা করে তোলা, অবশ্য তার চেয়েও তাঁদের ভেতর আর একটা ইচ্ছা বাসা বেঁধে থাকে সেটা বিয়ের বাজারে মেয়ের দর বাড়ানো। কিন্তু ক'জন মেয়ে নিজেদের সুশিক্ষিতা করে তুলে নিজেদের মানুষ বলে সমাজে পরিচয় দিতে সক্ষম হয় ? স্কুল-কলেজে লেখাপড়ার অভিপ্রায়ে গেলেও শতকরা ৯৯ জন মেয়েরই লেখাপড়ার চেয়ে সাজপোষাক এবং অন্যান্য বাজে আলোচনার দিকে লক্ষ্য থাকে বেশী। কে কোন্ দিন কি সাড়ী পরে এলো, কে ক'দিনে সাড়ী বদলায়, কে কেমন জামা-কাপড় ম্যাচ করে পরে আসে, কার পেন্টের কতটা মাত্রাধিক্য হয়ে পড়েছে ইত্যাদি আলোচনাই তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। তা ছাড়া, নিজেদের বিয়ের খবর বিশেষ করে প্রেমে পড়ার খবর দেওয়া-নেওয়া এবং ক্লাসের মধ্যে লুকিয়ে নভেল পড়বার চেষ্টা তো সব সময়েই চলে। প্রফেসারদের লেকচার ফলো করবার মত প্রবৃত্তি খুব কম মেয়েরই থাকে, সেটুকু সময় বাজে গল্প করলে কাজ হবে বলে তারা সব সময়ই ভেবে থাকে। Final examineএর আগে রাত্রি-দিন বই মুখে করে মুখস্থ করে কোন মতে পাশ করে যাওয়ার চেষ্টা তাদের অদম্য হয়ে ওঠে, তার ফলে অনেক মেয়েই পরীক্ষার গেট পেরিয়ে যেতে সক্ষম হয়, এবং ডিগ্রীধারিণী মহিলা এই আখ্যা পেতেও তাদের বেশী দেরী হয় না।

আধুনিকা শিক্ষিতা তরুণী বলতে কিন্তু আমরা ঠিক এই ধরণেরই তরুণী বুঝি। শিক্ষিতা মহলে শতকরা ৯৯ জন মেয়েই দেশ-বিদেশের খবর জানবার জন্য খবরের কাগজ পড়বার অবসর পান না। অথচ লেখাপড়া শেখার সব চেয়ে বড় উদ্দেশ্য চার দিক্‌কার খবর জানা এবং নিজেদের দেশের অবস্থা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করা। আমাদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষ দীর্ঘ দিন পরাধীনতার জ্বালা সহ্য করে মর্ম্মবেদনায় আকুল হয়ে গুমরে গুমরে উঠছেন, আমাদের দেশের ব্যথা-বেদনা আমরা যদি প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে না পারি তবে আমাদের শিক্ষার মূল্য কি ?

তা ছাড়া, আজকালকার তথাকথিত আধুনিকা তরুণীদের রাস্তাঘাটে ট্রামে-বাসে একলাই সর্ব্বদা চলাফেরা করতে দেখা যায়, এটা নিন্দনীয় নয় উপরন্তু প্রশংসনীয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। দেশকে স্বাধীন করতে হলে পুরুষদের সাথে মেয়েদেরও এগিয়ে যেতে হবে নির্ভীক চিত্তে, আমাদের জড়তাকে বিসর্জ্জন দিতে হবে। কিন্তু তাই বলে সম্ভ্রমকে বিসর্জ্জন দিলে চলবে না। লজ্জা নারীর ভূষণ, এ কথা কোন মেয়েরই কোন সময় ভোলা উচিত নয়, কিন্তু লিখতে লজ্জা হলেও এ কথা সত্যি যে, আধুনিকা তরুণী বলে যাঁদের পথে-ঘাটে দেখা যায় তাঁরা অনেকেই লজ্জার ধার ধারেন না ! তাঁদের এই লজ্জাহীন বিসদৃশ ভাব কটু ভাবে আধুনিক মহলেও আলোচিত হয়।

এ ছাড়া, আধুনিকা শিক্ষিতা মহিলা বলে যারা পরিচিত হন তাঁরা রান্নাবান্না কিংবা সংসারের কাজ-কর্ম্ম করাকে হেয় জ্ঞান করেন। আমি এমনও অনেক আধুনিকা যুবতীদের গর্ব্ব করে বলতে শুনেছি যে, তাঁরা রান্না করতে জানেন না। কারণ রান্নাঘরে গেলে তাঁদের মাথা ধরে ওঠে। কথাটা যে কতখানি লজ্জাজনক তা বলার নয়। প্রতি নারীই যে মাতা এবং গৃহিণী, মাতৃত্বেই যে নারীত্বের পূর্ণ বিকাশ এ চিরন্তন সত্য অস্বীকার করবার কোনো উপায় নেই। নারী মাত্রেই গৃহলক্ষ্মী হবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছেন। বাড়ীতে ঠাকুর-চাকর থাকলেও এক দিন যদি তাদের অসুখ হয় তাহলে যদি স্বামী কিংবা বাড়ীর অন্যান্য লোকদের বাজারের খাবার কিনে খেতে হয় তবে সে সব মেয়েরা প্রকৃত স্ত্রী মাতা, এবং গৃহিণী হবার কোন অংশেই যোগ্য নন।

স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী, এ কথাটা পুরাকাল থেকেই চলে আসছে। সেই জন্য প্রত্যেক মেয়েরই নিজেকে এমন ভাবে গড়ে তোলা উচিত, যাতে তিনি যে কোন অবস্থাতেই পড়ুন না কেনো, ভবিষ্যৎ জীবনে নিজেকে সুখী মনে করতে সক্ষম হবেন।

সর্ব্বশেষে এইটুকু বলে শেষ করতে চাই যে, আধুনিক যুগের দৌলতে আমরা যে সব সুযোগ-সুবিধা মেয়েদের দিক্ হতে পাচ্ছি তা প্রতিটিই মূল্যবান, কেবল মাত্র সেই সুযোগ-সুবিধাগুলি সুচারু ভাবে পরিচালিত করতে পারলেই আধুনিকা শিক্ষিতা মহিলাগণ সর্ব্বাংশে সুন্দর হয়ে উঠবেন। কারণ, দেশের ডাক এখন প্রতিটি অন্দর মহলে প্রবেশ করে মেয়েদের বাইরের জগতে টেনে আনবার প্রেরণা দিচ্ছে। মেয়েদের এই অবাধ স্বাধীনতা, পুরুষদের সাথে সমকক্ষ হয়ে ওঠবার চেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের রুচি, আমাদের আদর্শ, আমাদের শিক্ষার অদল-বদল করতে হবে।

—নীলিমা গঙ্গোপাধ্যায়

যুদ্ধের পরের সমস্যা

শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী

যুদ্ধের ঝড়ে আমাদের সামাজিক ও নৈতিক জীবনে বড় একটা যে পরিবর্ত্তন এসে গিয়েছিল তার ধাক্কা কাটান আর বোধ হয় আমাদের পক্ষে সম্ভব হ'য়ে উঠবে না; কেন না, আর্থিক অসাম্যে এক শ্রেণী হয়ে গেছে নিঃশেষ, ফুরিয়ে গেছে—হারিয়ে গেছে তারা। এক শ্রেণী যুদ্ধের চাকরীতে, যুদ্ধের কন্‌ট্রাক্টে, কালো বাজারের কল্যাণে মনুষ্যত্ব হারিয়ে অসম্ভব ফেঁপে উঠেছে—এখন তারা দেশের পক্ষে অকল্যাণকারী শত্রু ছাড়া কিছুই নয়। এই সব কারণেই আমাদের সামাজিক বা নৈতিক জীবন একেবারে বিপর্য্যস্ত হ'য়ে গেছে—যা পূরণ হওয়া আর কোনও মতেই সম্ভব নয়।

দুর্দ্দশার শেষ প্রান্তে পৌছেও আজও যারা টিকে আছে, তারা তাকিয়ে আছে যুদ্ধান্তের স্বচ্ছলতার দিকে, যুদ্ধ শান্তি হওয়ার পর আকুল আগ্রহে দিন গুণছে একটির পর একটি। অনেকগুলো দিনই কেটে গেছে বলা যেতে পারে যুদ্ধশান্তির পরে।

কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে একটুও কি স্বচ্ছলতা, স্বাচ্ছন্দ্য এসেছে? কমেছে কি আমাদের নুণ-ভাত-শয্যা-বস্ত্রের দুঃখ? প্রতিটি মধ্যবিত্ত গৃহস্থকে আজও ভিক্ষুকের অধম লাঞ্ছিত জীবন যাপন করতে দেখছি না কি আমরা? এক মুঠো কয়লা—এক ফোঁটা তেল আজও অমিল; যোয়ার-মেশান আটা কাঁকর-ভর্ত্তি চাল আজও অপ্রতিবাদে দ্বিগুণ মূল্যে আমরা কিনি; ট্রামে, বাসে, ট্রেণে আজও ভদ্রলোকের লাঞ্ছনার অবধি নেই; সংসারের প্রয়োজনীয় কোন জিনিষটাই এখনও আমরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সংগ্রহ করতে পারি না।

তবে স্বচ্ছল হয়েছে বটে একটা জিনিষ—যুদ্ধের ধ্বংস-প্রলয়ের মাঝে বিদেশী পণ্য আসা প্রায় বন্ধ হ'য়ে উঠেছিল, বিদেশী প্রসাধন সামগ্রী, বিদেশী ওষুধ, বিদেশী খাদ্য সংগ্রহ করা অনেকটা ধনীর বিলাসিতায় দাঁড়িয়েছিল, সাধারণের মধ্যে সে-সব জিনিষ টিকেছিল শুধু বিজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে—সত্যকার আমদানি যুদ্ধের মধ্যে ছিল না।

আজ তারা দিন পেয়েছে। ভারে ভারে এনে ফেলেছে আবার সেই সব জিনিষ, যা আমাদের মুখের অন্নের বিনিময়ে ক্রয় করতে হোত। আমাদের দেশীয় শিল্পীরা আবার মুখ লুকুতে বাধ্য হচ্ছে তাদের মৃত নীরব ঘরের কোণে। আবার সুলভে পাওয়া যাচ্ছে বিদেশী বিবিধ স্নো, সাম্পু, ক্রীম, সাবান, সেন্ট, তাদের গুণের কাছে দাঁড়াতে পারে না আমাদের দেশের মিরা, অজন্তা, হিমানী প্রোডাক্টের জিনিষ। আবার পথের ধারে, ছোট-বড় ষ্টেশনারী দোকানে দেখা যায় বিদেশী পেন্সিল, কলম, চিরুণী, চামচা, ছাঁকনি, ছুরী, কাঁচি প্রভৃতি গৃহস্থালীর অসংখ্য জিনিষ। জাহাজ বোঝাই হ'য়ে আবার আসছে বিদেশী ওষুধ, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, জ্যাম, জেলী, সস্—দু'হাতে ভরে তা আবার ভারতীয় মায়েরা ঘরে তুলছেন! ভারতের ছেলে-মেয়েরা আবার সে সব কিনছে দ্বিধাহীন চিত্তে।

কিন্তু আজও আমাদের ছেলে-মেয়েরা দুধ পায় না, মাছ পায় না, ফল পায় না, শীতের বস্ত্র জোগাবার ক্ষমতা আজও মধ্যবিত্ত গৃহস্থের আয়ত্তের বাইরে। সোনার গহনা আমাদের কাছে স্বপ্নের মত অলীক হ'য়েই উঠল প্রায়। জাতীয় স্বাস্থ্য আমাদের বিষাক্ত হাওয়ায় সব-কিছুরই অভাবে বিপন্ন হ'য়ে পড়েছে, এ কথা বুঝবার মত বিবেচনাশক্তি কি আমাদের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা, মায়েরা হারিয়ে ফেলেছে?

তবে কি শিক্ষা আমাদের কল্যাণের পথ চেনাতে পারেনি? যারা অশিক্ষিত, দুঃখের অভিজ্ঞতা যাদের নেই তাদের কথা ছেড়েই দিলাম, আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা ত দুঃখের অভিজ্ঞতা লাভ যথেষ্ট করেছেন, আজও অভাব-উৎপীড়নের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন, তাঁদের কেন এ ভ্রম হয়? আবার কেন মধ্যবিত্ত ঘরে প্রবেশ করে ইংলণ্ডের ফিডিং বট্‌ল, চিরুণী, ব্রাশ? কেন তাঁরা আবার কিনছেন ওটান, পণ্ডস্, লাইফবয়, সান্‌লাইট? আমাদের শত দুঃখ-অভাবের মাঝেও একটা সান্ত্বনা ছিল—'দেশীয় শিল্পের উন্নতি বাড়ছে' বলে। আজ আমাদের অসতর্কতায় তা সমূলে বিনাশ হ'তে আরম্ভ হ'য়েছে।

ধনী মায়েদের কাছে এ নিয়ে অভিযোগ করে কাঁদুনী গেয়ে কোন লাভ নেই। দেশের তাঁরা শত্রু। কিন্তু স্বাধীনতার অগ্রদূত—দেশের আশা-ভরসা-স্থল মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা দেশের প্রতি কেন আজ বিমুখ হ'তে চলেছেন? তাঁদের আদর্শে, তাঁদের শিক্ষায়ই গ'ড়ে উঠবে। দেশের সন্তান, দেশের ভাবী নেতা-নেত্রী দল, বিলাস, বিভ্রম, বিপথ কি তাঁদের মানায়? আমরা—মধ্যবিত্ত ঘরের মায়েরা—সঙ্গে সঙ্গে ছেলে-মেয়েরাও বিভ্রমে পতিত হয়েছি কি না? আমার এ অভিযোগ সত্য কি না—তা যাচাই করতে, অনুরোধ করছি প্রত্যেকের আপনাপন ঘরের সমগ্র খুঁটি-নাটি দ্রব্যের দিকে দৃষ্টিপাত করে।

যুদ্ধ আমাদের যতই ক্ষতি করুক—যুদ্ধান্তের ক্ষতি হচ্ছে তার চাইতে অনেক বেশী। নাগপাশে আবার আমরা ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছি না কি?

শ্রীচৈতন্য

কৃষ্ণসুচিত্রা দেব

মাতা শচী দেবী পিতা জগন্নাথ মিশ্র,
তাঁরি পুত্র শ্রীচৈতন্য মাতালো যে বিশ্ব।
নিমাই যে তাঁরি নাম জানে তা সবাই,
যাঁর তরে ভক্ত হ'ল জগাই মাধাই।

ছিল তাঁর দুই পত্নী লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া,
বাঁধিতে নারিল তারা গৌরাঙ্গের হিয়া।
পিতৃক্রিয়া করিবারে গয়াতীর্থে গিয়া,
অপূর্ব্ব আনন্দে তিনি এলেন ফিরিয়া।

এক দিন নিশাকালে গৃহত্যাগ করি,
চলিলেন অন্ধকারে হরিনাম স্মরি।
শ্রীক্ষেত্রে গেলেন প্রভু মনের আনন্দে,
অদ্বৈত, শ্রীবাস আর সনাতন সঙ্গে।

চলিতে চলিতে দেখি নীল জলরাশি,
ভাবিলেন কৃষ্ণরূপ রয়েছে প্রকাশি।
আলিঙ্গনে বাঁধিব তারে ভাবিতে ভাবিতে,
হঠাৎ মিশিলেন নীল তরঙ্গ-রাশিতে।
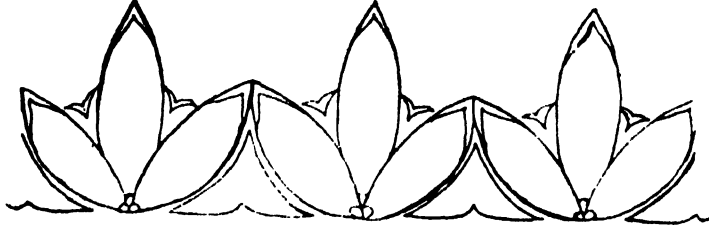
অভিযোগ কেন ?

বিভাবতী বসু

নারী পুরুষের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলে, পুরুষ নির্ম্মম, হৃদয়হীন—তারা অনেকটা মধুপের মত, এক ফুলে অনাসক্তি জন্মাতে তাদের বেশী দেরী হয় না। আবার অপর দিকে পুরুষও তেমনি দু'দিন যেতে না যেতেই বলে—মেয়ে হল দিল্লীকা লাড্ডু, 'যো বি খায়া উওবি পস্তায়া, যো বি নেহি খায়া উওবি পস্তায়া।' কেন এমন অভিযোগ নরনারী একে অপরের বিরুদ্ধে করে ? পুরুষ শিল্পী, কবি ; যে নিত্য পরিবর্ত্তনশীল নানা সৌন্দর্য্য সমগ্র চেতনা দিয়ে আস্বাদন করতে চায়—পুরুষ তাই নিতি নিতি নব নব আনন্দের সন্ধানে রত থাকে। কিন্তু নারী জড়, হাত ধরে চালিয়ে নিয়ে গেলে চলে, নইলে যে স্থবির। এরই ফলে দু'দিনে পুরাতন হয়ে উঠে। পুরাতন হয়ে উঠলেই পুরুষ নারীর মধ্যে নূতনত্ব কিছু দেখতে পায় না, তখন আকর্ষণ বলতে কিছু আর থাকে না। একটানা অভিনয় করতে করতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে,—তাই বৈচিত্র্যহীন হতে বিচিত্রের মধ্যে মুক্তি চায়। যে এক দিন ভালবেসেছিল হঠাৎ তার পরিবর্ত্তন হওয়ার কারণ কি ? বিমুখতা আসার কারণ নিশ্চয়ই আছে। বিবাহের পর নারী শুধু ভালবাসা দিয়ে পুরুষকে বেঁধে রাখতে চেষ্টা করে, কারণ বহির্দ্বার তার পক্ষে বন্ধ। আর নারী বিবাহকে তার জীবনের শেষ অবস্থা মনে করে। কিন্তু পুরুষ বিবাহকে জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে একটি ঘটনা মনে করে। নারীর piligrim soul আর এই মনোভাব—এই দুই-ই পুরুষের মধ্যে তাদের প্রতি বিমুখতা আনায়।

পুরুষ চায় নারীর সাহচর্য্য, ভালবাসা, তা ভিন্ন পুরুষের জীবন মরুভূমির মত। নারীর ভালবাসায় তার পৃথিবীর রং বদলায়, হৃদয়ে আলোর নাচন সুরু হয়, বেঁচে থাকার মধ্যে গভীর আনন্দ পায়, তাই পুরুষ নারীকে আকর্ষণ করে—নারীর জন্য তাই পুরুষের আবেগ আর আকুলতা। কবি লিখেছেন, "পুরুষ গড়েছে তোরে সৌন্দর্য্য সঞ্চারি আপন অন্তর হতে।" ইংরাজ কবি সেটাকে ঘুরিয়ে লিখেছেন'—"Beauty is lovers gift।" পুরুষ তার মনের ক্ষুধা দিয়ে নারীকে যাচাই করে—তাই কখনও সে দেবী, কখনও সে দানবী। দোষে-গুণে ভরা সহজ মানবী সব চেয়ে বড় এই প্রাথমিক কথা ভুলে যান, এর ফলে পুরুষ কখনও নারীদের সম্পর্কে সহজ হতে পারে না। কখনও অতিরিক্ত শ্রদ্ধায় তাকে মাথায় তুলে নাচতে থাকে, আবার কখনও আস্তাকুঁড়ে ফেলে পায়ে দলে চলে যায়, —মরল কি বাঁচল একবার ফিরেও দেখে না। এমন হওয়ার কারণ কি ? সমাজ কি এর জন্যে দায়ী ? পুরুষ নারীদের জগৎ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে, অন্ধকারে বসে বসে নানা প্রকার মন-গড়া অলীক কল্পনা করে। কিন্তু বাস্তবে যখন নারীকে পথের সাথিরূপে নিয়ে চলতে সুরু করল, দেখতে পেল নারী সম্বন্ধে সে যা এত দিন মনে করে এসেছিল তা সব ভুল,। কল্পনা ধূলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ফলে সে পেল আঘাত। সত্যকে গ্রহণ করতে পারল না। মানসিক বিপর্য্যয়ে সব গুলিয়ে গেল। তাই সংসারক্ষেত্রে দেখা যায় যে স্ত্রী সংসারের একান্ত অপরিহার্য্য অঙ্গ, স্ত্রীর সম্বন্ধে পুরুষের কর্ত্তব্য থাকে, দায়িত্ব থাকে, কিন্তু স্বপ্ন থাকে না।

পুরুষের কাছে নারী এক প্রকাণ্ড জিজ্ঞাসা। কেন ? সে কি শুধু নারী তার বিপরীত জাতি বলেই তাকে জানবার আগ্রহ কৌতূহল—জয় করবার আকাঙ্ক্ষা। অজানাকে জানবার জন্য মানুষের স্বাভাবিক কৌতূহল। পুরুষের নারীর সাথে হার-জিতের খেলায় মেতে উঠার কারণ কি ? পুরুষ বলে নারী-চরিত্র দুর্জ্জ্ঞেয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষ নারীর রূপের মোহকেই প্রেম বলে মনে করে। তার ভুল যে দিন ভাঙ্গে, সে দিন সে নেয় ভীষণ প্রতিশোধ। ভুলের জন্য নিজেও অন্তরে অন্তরে জ্বলে-পুড়ে মরে, আর সাথে সাথে নারীকেও জ্বালায়—দুঃখ দেয়। পুরুষ যে নারীকে জানে না, সে কথার বড় প্রমাণ কবির কবিতায়—"অর্দ্ধেক কল্পনা আর অর্দ্ধেক মানবী।"

এখন দেখা যাক, সৃষ্টির সেই প্রথম মানব-মানবী কেন দু'জনে ঘর বেঁধেছিল—কেন একে অপরকে ভালবেসেছিল ? কিসের প্রেরণায় তারা মিলিত হয়েছিল ? তারা উভয়েই মুক্ত বিহঙ্গ ছিল বলেই কি বাঁধনের মাঝে বাসা করেছিল ? না, এর মধ্যে আরো অন্য কোন কারণ আছে ? বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মানুষের অণু-পরমাণু সদাই আপনাকে নূতন করে সৃষ্টি করতে চায় ; নিজেকে সবল ও আরো সুন্দর করে তুলতে চায়। এরই জন্য তার অনুক্ষণ চেষ্টা। ভালবাসতে চায়, ভালবাসা পেতে চায়। মানব দেখতে পায় মানবীর মধ্যে, মানবী দেখতে পায় মানবের মধ্যে, সেখানে আরো সুন্দর ও সবল হয়ে উঠতে পারবে, সার্থক হয়ে উঠবে তার জীবন। এরই জন্যে একে অপরের সাথে সম্মেলনের আশা। যৌবনে মানুষ সৃষ্টি করবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় স্বাভাবিক নিয়মে—সম্মেলনের মধ্যে মানুষ দেখতে পায় বিকাশ হবার আলো, সার্থক হয়ে উঠবার পথ ; তাই যৌবনের ভালবাসার সাথে সম্মেলনের আকাঙ্ক্ষা। এরই জন্য একে অপরকে আকর্ষণ। যাকে আহ্বান করে আনে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে। ভালবাসা ব্যতীত মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ হয় না। মাটির রস না পেলে ফল পাকে না। ফল যেই পাকে অমনি সে আত্ম-সমর্পণ করে আকর্ষণের কাছে। এর মধ্য দিয়ে হয় সৃষ্টি। তাই নর-নারী দেখতে পেল, একক কেহই পূর্ণ নয়, একে অপরকে নিয়ে পূর্ণ। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, সৃষ্টির সেই প্রথম দিনে একে অপরকে নিজের প্রয়োজনে, অভাব বোধ করে গ্রহণ করেছিল। মানুষের হৃদয় ও আত্মার স্বভাবজাত আকাঙ্ক্ষা ও আবেগের মধ্যে দিয়ে সমাজ ও ঘরের উৎপত্তি, নিজের ভোগের আকাঙ্ক্ষার জন্যেই মানুষ ঘর বেঁধেছে। তাই সে দিন নর ও নারীর মধ্যে ছিল সাম্য, সখ্য ও সহকর্ম্মিতা। কিন্তু আজ তা নেই। যে অভাবের জন্য আজিকার নর ও নারী একে অপরকে অভিযুক্ত করে, সেই অভাব যদি না থাকে তা হলে আর অভিযোগ থাকবে না। অভাব পূরণ করতে হবে।

ছোটদের আসর

নেতাজীর মহানুভবতা

শ্রীরবীন মল্লিক

ঈর্ষা যে মানুষকে অমানুষ কোরে তোলে, এ কাহিনী তারই এক জ্বলন্ত নিদর্শন। আর, তাছাড়া, ক্ষমতা পেলে মানুষ যে পরের কথা শুনে সেই ক্ষমতার অপব্যবহার করতে পারে তারও নিদর্শন বটে!

হয়ত আমার বক্তব্যটা ঠিক বলা হ'ল না! আর একটু খুলে বললে এ কাহিনীর তাৎপর্য্য সকলেই বুঝতে পারবেন বলেই আমার মনে হচ্ছে।

ধরুন, আপনার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। আপনি এক জন গণ্য-মান্য ধনী নাগরিক,—আর আমি, ধরুন, আপনারই সরকারের এক জন পরামর্শদাতা, কিন্তু উচ্চপদে অধিষ্ঠিত। আপনি হ'চ্ছেন যেখানকার অর্থাৎ যে সহরের অধিবাসী—আমি যদিও আপনার স্বদেশবাসী, কিন্তু সেই সহরে নবাগত ও উচ্চপদে অধিষ্ঠিত!

এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁরা উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের কৃপা-কটাক্ষ লাভ করবার জন্য তাঁদের পদলেহন অর্থাৎ খোসামোদ করতে বিশেষ তৎপর, যা'কে সাদা বাংলায় 'জো হুকুমে'র দল বলে! এবং এই কৃপা-কটাক্ষ লাভের জন্য সেই সব ভদ্র ব্যক্তিরা লোক-নিন্দাকেও আমল দিতে চান না! অর্থাৎ সরকারী কর্ম্মচারীদের তুষ্টিসাধনের জন্য স্ত্রীকন্যা, বা ভগিনীর সঙ্গে তাদের অসঙ্কোচে মিশতে দিতে কুণ্ঠিত নন্। কিন্তু এই সব জো হুকুমের দল সেই সব উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের প্রকৃত চরিত্র জানাটা প্রয়োজন বোধ করেন না।

নারীর সৌন্দর্য্য যখন মুনি-ঋষিরও ধ্যান ভাঙতে পারে—তখন কুতঃ-মানব!

এখন, এই নবাগত আমাকে, যদি জো হুকুমের দল স্বর্গের সিংহাসনে বসায় তো আমার পক্ষে একটু খোসামোদপ্রিয়, আর হিতাহিতজ্ঞান হারানোটা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এবং এ-সব ক্ষেত্রে আমার বন্ধু, অর্থাৎ গণ্য-মান্য নাগরিক হিসাবে আপনি যদি এসে দু'টো সদ্‌যুক্তি বা সুপরামর্শ দেন তো সেটা আমার কাছে বিষবৎ কটু বলেই মনে হবে—আর এই সুপরামর্শের ফলে আপনি হবেন আমার শত্রু। তাছাড়া, যদিও আমি উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী, কিন্তু সামাজিক জীবনে আমার চেয়ে জনসাধারণ আপনাকেই বেশী সমীহ বেশী খাতির করে। সে ক্ষেত্রে, আমার উচিত হ'বে, আপনার মত শত্রুকে সমূলে উৎখাত ও বিনাশ করা। অবশ্য আপনার আর একটি অপরাধ ছিল যে, আপনি আমাকে খোসামোদও করেননি আর যোগ্য সম্মানও দেননি।

এ কাহিনীর গোড়ার কথা হচ্ছে—তাই এবং এই ঈর্ষার কোপ থেকে নেতাজীর মহানুভবতার গুণে একটি বর্দ্ধিষ্ণু ও গণ্য-মান্য নাগরিক সপরিবারে পরিত্রাণ পান।

উচ্চপদে অধিষ্ঠিত আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের পরামর্শদাতার নাম এ কাহিনীতে বলতে চাই না, তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হ'বে যে, তিনি বর্ত্তমানে বাংলা দেশেই রয়েছেন ও সেবা-ব্রত গ্রহণ করেছেন। তবে যে পরিবারটি আসন্ন বিনাশের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন—তাঁদের নাম বলতে আমার আপত্তি নেই। ভদ্রলোকের নাম ডাঃ এস, কে, দে, বিলাতী ডিগ্রীধারী।

এবার প্রকৃত ঘটনায় আসা যাক্।

এ ঘটনা ঘটেছিল রেঙ্গুনে। ঘটনার সুরু ১৯৪৪ সালের নভেম্বর এবং পরি-সমাপ্তি ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসে!

ডাঃ দে রেঙ্গুনের সব চেয়ে পুরাতন বাসিন্দা। ডাঃ দের বাবা ডাঃ বি, দে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দেরও পূর্ব্বে রেঙ্গুন যান এবং সেখানেই ঘর-বাড়ী কোরে বাসিন্দায় পরিণত হন। শুধু তাই নয়, ডাঃ দে-পরিবারের নাম সমগ্র ব্রহ্মদেশে সুপরিচিত।

নিজেদের দু'খানা বাড়ী থাকা সত্ত্বেও জাপানী-অধিকারের পর তাঁকে বাধ্য হয়ে রেঙ্গুন সহর থেকে ৪১৫ মাইল দূরে বাওটো নামক একটি পল্লীতে ভাড়া-বাড়ীতে থাকতে হয়।

বাধ্য হ'বার কারণ, তাঁদের একটি বাড়ী ছিল, রেঙ্গুন সহরে সুলে প্যাগোডা রোডে, কিন্তু এ্যাংলো মার্কিণদের প্রচণ্ড বোমা-বর্ষণের ফলে সে সময় সহরে বাস করা প্রায় অসম্ভব হ'য়ে উঠেছিল। দ্বিতীয় বাড়ীটি ছিল সহর থেকে ৪ মাইল দূরে কোকাইন রোডের উপর। কিন্তু, স্বাধীন ব্রহ্ম-রাষ্ট্রের জাপানী পরামর্শদাতা সে সময় সেই বাড়ীটি অধিকার কোরেছিলেন। ডাঃ দে আজাদ হিন্দ-সরকার মারফৎ সেই বাড়ীটি উদ্ধার করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও উদ্ধার করতে সমর্থ হননি।

আজাদ হিন্দ্‌ সরকারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ভদ্রলোকটির নাম ধরুন ভূতনাথ বাবু, এবং তিনি তাঁর সখীবৃন্দের ও অন্যান্য সমর্থকদের নিকট 'ভুৎদা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ কোরেছিলেন। সখীবৃন্দ উল্লেখ করবার কারণ,—তিনি রেঙ্গুনে কলির কৃষ্ণ নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ কোরেছিলেন, এবং সর্ব্বদা সখীবৃন্দ-পরিবৃত হ'য়ে থাকতে ও ভ্রমণ করতে ভালবাসতেন!

যাই হোক্, হঠাৎ তিনি ডাঃ দে'র প্রতি ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁর ক্রোধাগ্নিতে ইন্ধন যোগান তাঁরই ধামাধরা ক'য়েক জন ব্যক্তি। তবে মনে হয়, তাঁর রাগের আর একটি কারণ ছিল।

কারণটি বলবার পূর্ব্বে জাপানী অধিকার কালে ডাঃ দে'র অবস্থার পরিচয়টা দিলে অপ্রাসঙ্গিক হ'বে না।

বৃটিশ এডাকুয়েশনের পর ডাঃ দে, মিসেস দে ও মিসেস দে'র এক ভাই ব্রহ্মদেশেই ছিলেন।

ডাঃ দে'র স্ত্রী শ্রীমতী অণিমা দে ছিলেন প্রথমা ভারতীয় মহিলা, যিনি রেঙ্গুন বেতার-কেন্দ্র থেকে প্রথম বক্তৃতা দেন। আজাদ হিন্দ সরকারের বেতার কেন্দ্রে বেতার-ঘোষক হিসাবেও তিনি শেষ পর্য্যন্ত কাজ কোরেছিলেন।

ডাঃ দে আজাদ হিন্দ ফৌজের Fleld Propoganda Nnits ও স্বরাজ ইয়ং মেন ট্রেনিং ইনিষ্টিউটের সঙ্গে জড়িত ও অবৈতনিক পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ডাঃ দে'র শ্যালকও আজাদ হিন্দ সরকারের একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেম।

কিন্তু ডাঃ দে'রা বিশেষ হৈ-চৈ করাটা পছন্দ করতেন না। নীরবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম কোরে যাওয়াটাই ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। আর শ্রীমতী দে'-ও বিশেষ কারুর সঙ্গে মিশতেন না! লোকে ভাবতো, বড়মানুষী চাল—গুমোর! আমার মনে হয়, এটাই ছিল তাঁদের অপরাধ এবং এই জন্যই ভূতনাথ বাবু তাঁদের সহ্য করতে পারতেন না।

১৯৪৪ সালের নভেম্বর থেকে যদিও খিটিমিটি আরম্ভ হয়, কিন্তু প্রকৃত সংঘর্ষ বাধে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী মাসে—নেতাজীর জয়ন্তীর পূর্ব্বে।

নেতাজী-জয়ন্তীতে নেতাজীকে সোনা দিয়ে ওজন করবার জন্য প্রত্যেক পল্লী থেকেই সোনা বা অর্থ সঞ্চয় করা হ'চ্ছিল, এবং এই ব্যাপারে বাওটোতে একটি সভা হয়। সেই সভায় ভূতনাথ বাবু ভয় দেখিয়ে ও বলপ্রয়োগ দ্বারা অর্থ সঞ্চয়ের নীতি গ্রহণ করেন।

ডাঃ দে এ ব্যাপারটিকে ঐ ভাবে নিতে পারেননি। তিনি চেয়েছিলেন প্রাণপ্রিয় নেতাজীর জন্মদিনে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হ'য়ে এবং সামর্থ্য অনুযায়ী যে যা দেবে সেটাই গ্রহণ করা উচিত। যদিও জনমত অনুযায়ী তিনি গণ্য-মান্য ও ধনী নাগরিক ছিলেন, কিন্তু ডাঃ ও মিসেস দে তাঁদের সামর্থ্য অনুযায়ী মাত্র একটি সোনার আংটি দেন। এই একটি আংটিই সমস্ত অনর্থের মূল। ভুৎদা'র সখীবৃন্দ তো রেগে গিয়ে সেটি ছুঁড়ে ফেলে দেন এবং শাসিয়েও যান।

অবশ্য ডাঃ দে বলেছিলেন, দেখুন, আমাদের পরিবারের সকলেই সামর্থ্যানুযায়ী আজাজ হিন্দ সরকারের কাজ করছি এবং নেতাজীর জন্মদিনে আমাদের যতদূর সাধ্য ও সামর্থ্য সেটাই আমরা দিচ্ছি। তাছাড়া আপনারা কি মনে করেন, যারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক তারা তাদের প্রাণপ্রিয় নেতার জন্মদিনেও সর্ব্বস্ব ত্যাগ আর গণবাহিনী গঠনের দিনে দেশের স্বাধীনতা-রূপ মহৎ কাজের জন্যে নিজের অর্দ্ধ টাকেই শ্রেষ্ঠ আসন দেবে?

চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী।

সখীবৃন্দ বললেন—আপনার কাছে টাকা বা সোনা নেই—এটাই আমরা বিশ্বাস করলুম আর কি?—টাকা না থাকলে অত বড়মানুষী কি পোষায়?

ডাঃ দে'র মত নির্ব্বিরোধী লোক এত-বড় কথাটা হজম করে গেছিলেন। কিন্তু মিসেস দে এ অপমান—বিশেষ করে যে অপমানের সঙ্গে নেতাজী জড়িত—সেটা অত সহজে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জ্জে উঠলেন।—কি, আপনাদের এত বড় স্পর্দ্ধা!—নেতাজীর জন্মদিনে আমি যদি শ্রদ্ধায় এক পয়সাও দিই সেটা কি আপনাদের নেওয়া উচিত নয়? আপনারা কি না আমার শ্রদ্ধার দানকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন? আমি কিছু দেব না, বেরিয়ে যান আমাদের বাড়ী থেকে। যাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধা—আমি তাঁকেই গিয়ে দিয়ে আসব আমার শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

সখীবৃন্দ—আচ্ছা দেখে নেব—এত গুমোর ভাল নয়। এই কথা বলে সদলবলে নিক্রান্ত হয়ে যান।

অবশ্য এর পরেই ভূতনাথ বাবু এসে নাটকীয় ভঙ্গীতে ক্ষমা-টমা চেয়ে সেই আংটীটাই পুনরায় নিয়ে যান।

এর পর প্রায় এক সপ্তাহ বেশ নিশ্চিন্তে কেটে যায় এবং নেতাজী-জয়ন্তীও অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়।

প্রতিহিংসা নেবার সুযোগ এলো সপ্তাহ খানেক পর। হঠাৎ এক দিন সকালে বৃটিশ বোমারু বিমানের প্রপেলারের শব্দে রেঙ্গুন ও আশে-পাশের গ্রামের বাসিন্দারা বুঝতে পারল—সত্যিকারের ধ্বংসকারী বোমা-বর্ষণের এটাই নিদর্শন। বোমাবর্ষণও সুরু হোল। ঠিক বর্ষার বৃষ্টির মতই প্রচণ্ড-ভাবে!

এই বোমাবর্ষণে সব চেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হোল রেঙ্গুনের সাত-আট মাইল দূরে অবস্থিত কয়েকটি বেসামরিক অধিবাসীদের বস্তী।

বস্তীগুলির মধ্যে অচিন ও যোগন বিশেষ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ দু'টি বস্তীর অধিকাংশ অধিবাসী ছিল বেসামরিক লোক। অবশ্য দু'চার জন ধনী ও শ্রমিকরাও এই বস্তীগুলোতে থাকতো।

এই বস্তীর একটিতে সখীবৃন্দের কয়েক জনের বাড়ী-ঘর ছিল। বোমাবর্ষণের ফলে তারাও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সখীবৃন্দের বিপদ! সেটার তো আশু প্রতিকার হওয়া উচিত। এ প্রতিকারের একমাত্র উপায় অন্যত্র বাড়ী ঠিক করা, কিন্তু বাড়ী পাওয়া তো মুস্কিল—কি করা যায়!

সখীবৃন্দের মনস্তুষ্টির জন্য যে পল্লীতে বিপদ কম সেই পল্লীর কোন ভদ্রলোককে উৎখাত করেও অন্ততঃ বাড়ী ঠিক না করলেই নয়। ডাঃ দে-ই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি—যাঁকে উৎখাত কোরে প্রতিহিংসা নেওয়াটা হ'বে সব চেয়ে সময়োপযোগী।

ভূতনাথ বাবু শেষ পর্য্যন্ত সেই নীতি অনুসরণ করে ডাঃ দে'কে এক ইস্তাহার পাঠালেন।

ইস্তাহারে লেখা ছিলো—"আজাদ্ হিন্দ্ সরকারের জরুরী কাজের জন্য ১নং মিঙ্গালা লেন, বাওটো, এই বাড়ীটি প্রয়োজন হওয়ায় আপনাকে ইস্তাহার দেওয়া হচ্ছে যে আপনি অদ্য থেকে ১ মাসের মধ্যে উক্ত বাড়ী ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র যাবার ব্যবস্থা করবেন। অন্যথায় সরকারী আইন অনুযায়ী আপনাকে উক্ত বাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য করা হবে।" ইস্তাহারটি এখানেই শেষ হয়েছে। রীতিমত শীলমোহর দেওয়া ইস্তাহার।

অর্থাৎ এক জন গণ্য-মান্য নাগরিককে অন্যত্র কোন বাস-স্থানের ব্যবস্থা না করেই তাকে উৎখাত করা!

ডাঃ দে এই ব্যাপার নিয়ে পদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীদের কাছে যথেষ্ট আবেদন-নিবেদন করেন, কিন্তু সকলেরই এক কথা—সরকারের

যখন বাড়ীর প্রয়োজন তখন আপনাকে বাড়ী ছেড়ে দিতেই হবে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই। তবে এক জন একটু আশা দিলেন যে, আপনাকে একটা বাড়ী দেওয়া হবে।

এই তদারক প্রভৃতির ব্যাপারে প্রায় ২০।২৫ দিন কেটে গেল, তখন জানা গেল যে, একটা বাড়ী দেওয়া হচ্ছে বটে, সে বাড়ীর একতলায় এক জন মস্তপ মাদ্রাজী ভদ্রলোক একা থাকেন। বাড়ীর কম্পাউণ্ডটা ব্যবহার করা যাবে না। সেই বাড়ীরই দোতলা অংশটি ডাঃ দের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য দোতলায় যে বাঙ্গালী ভদ্রলোক ছিলেন, তাঁকেও একই ভাবে নোটিশ দিয়ে উৎখাত করার ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু সে ভদ্রলোকের থাকবার জন্ম কোনো ঘর-বাড়ীর ব্যবস্থা করা হয়নি! তাঁর অপরাধ—তিনি উকিল, আজাদ হিন্দ সরকারে যোগদান করেননি, এবং তাঁর স্ত্রী ব্রহ্মবাসিনী!

অবশ্য, এ ভাবে আরো কয়েকটি ভদ্রলোকও উৎখাতের নোটিশ পান, তাঁদের মধ্যে বর্দ্ধিষ্ণু ব্যক্তি ও সাধারণ নাগারিকও ছিলেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেল যে, এই সব ভদ্রলোকেদের সঙ্গেও ভূতনাথ বাবুর বনিবনা বিশেষ নেই।—অর্থাৎ সখীবৃন্দের কারুর কারুর সঙ্গে মনোমালিন্য!

কিন্তু সব চেয়ে মজা হচ্ছে—ডাঃ দে'কে যে বাড়ী দেওয়া হ'য়েছিল সে বাড়ীতে যে ডাক্তার দে থাকতে পারেন না এ কথা কর্তৃপক্ষ জানতেন। কারণ, তাঁদের কোন চাকর ছিল না। ডাঃ দে, মিসেস্ দে ও তাঁর ভাই তিন জনেই আজাদ হিন্দ সরকারে কাজ করতেন। তাঁদের পক্ষে প্রত্যহ একতলার কুয়ো থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জল তুলে দোতলায় নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর ছিল না। তাছাড়া, তাঁদের গোটা দুই গাই, কয়েকটি ছাগল, কিছু হাঁস ও মুরগী ছিল, সেগুলির পরিচর্য্যা তিনি নিজেই করতেন, কর্তৃপক্ষরা জানতেন, কিন্তু এই সব অবলা জীবদের সম্বন্ধে কোনো ব্যবস্থা করাটা তাঁরা প্রয়োজন মনে করেননি।

নোটিশের সময় শেষ হ'তে যখন দিন দু'-তিন বাকী সে সময় ডাঃ দে ও তাঁর শ্যালক এর একটা বিহিত করার জন্য এ ব্যাপারটা নেতাজীর দৃষ্টিপথে আনবার চেষ্টা করেন। এ বিষয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেন প্রচার-সম্পাদক শ্রীকরিম গণি ও নেতাজীর পারশোনেল ষ্টাফের লেঃ সুনীল রায়।

সুনীল রায় যাবতীয় ইতিবৃত্ত নেতাজীকে বলে শেষ পর্য্যন্ত এ কথাও উল্লেখ করেন, যদিও বাড়ীটি সরকারী কার্য্যোপলক্ষে নেওয়া হচ্ছে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বাড়ীটি ওমুক ভদ্রলোককে দেওয়া হ'বে।

নেতাজী—আচ্ছা, তুমি ডাঃ দে'কে খবর দিও যে তাঁর ও-বাড়ী ছাড়বার দরকার নেই।

সুনীল রায়—কিন্তু ধরুন, যদি জোর কোরে কিছু—

"জোর কোরে"! কথাটা শুনে নেতাজী যেন বিস্মিত হলেন। —নিজের বাড়ী থাকা সত্ত্বেও সরকারী অব্যবস্থায় যাঁকে ভাড়া-বাড়ীতে থাকতে হয়েছে, তাঁকে পুনরায় অত অসুবিধা ভোগ ও গৃহপালিত জীবগুলির কোন ব্যবস্থা না কোরে দোতলায় গিয়ে থাকতে হবে? না, এতটা অবিচার চলতে পারে না। তুমি ডাঃ দেকে খবর দিয়ো যে, তাঁকে বাড়ী ছাড়তে হবে না। আর যদি জোর কোরে উঠাবার ব্যবস্থা করে তো আমায় যেন তিনি অতি অবশ্য খবর দেন।

ডাঃ দে তো নিশ্চিন্ত হলেন। কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে সরবরাহ বিভাগের "সেবক-এ-হিন্দ" মিঃ হাবিবের কাছ থেকে একটি আজাদী ফৌজ আর একটি নোটিশ নিয়ে এলো, তাতে লেখা রয়েছে—"আগামী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ডাঃ দে যদি ও-বাড়ী ত্যাগ না করেন তো তাঁকে ও-বাড়ী ত্যাগ করতে বাধ্য করা হ'বে!"

মোক্ষম আদেশ!—সেই আদেশটি শ্রীসুনীল রায়কে দিয়ে পুনরায় নেতাজীকে পাঠিয়ে দেওয়া হল। শোনা গেল যে, নেতাজী লেঃ জেঃ কিয়ানী ও প্রচারমন্ত্রী এস এ আয়ারকে এটার একটা সুব্যবস্থা করতে আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু বিধাতা পুরুষের ইচ্ছা ছিল অন্য রকম। অর্থাৎ এ ব্যাপারটা নেতাজীর হস্তক্ষেপ ছাড়া যে মীমাংসা হতে পারে না, এটাই ছিল বিধিলিপি! শোনা গেল যে, এস এ আয়ার ও লেঃ জেঃ কিয়ানী সাহেব ভূতনাথ বাবুর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন, কিন্তু ভূতনাথ বাবু বলেন, "আমি যে ব্যবস্থা করেছি সেটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা, সুতরাং এর অন্যথা হতে পারে না। এই যুদ্ধের দিনে কত লোক যখন গাছতলায় বাস করছে তখন ডাঃ দে'ই বা বাড়ীর দোতলায় বাস করবেন না কেন? গাছতলার তুলনায় বাড়াটি তো রাজপ্রাসাদ!"

তবু তাঁরা নেতাজীর আদেশ সম্বন্ধে জানান।

ভূতনাথ বাবু জবাবে বলেন—এই সব সামান্য ব্যাপার আমরাই ব্যবস্থা করবো। আর এ সম্বন্ধে নেতাজীকে বুঝিয়ে দিলেই চলবে। সামান্য ব্যাপারে ডাঃ দেরও নেতাজীর নিকট যাওয়াটা অন্যায় হ'য়েছে।

অতএব কথাটি ওখানেই শেষ হয়। অবশ্য নেতাজীও সে খবর পান। ডাঃ দে কিন্তু নেতাজীর আশ্বাসে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঐ বাড়ীতেই বাস করছিলেন। তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি, ভূতনাথ বাবু তলে তলে তাঁর প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ নেবার—অর্থাৎ প্রকাশ্যে ডাঃ দেকে অপমান করবার চরম পন্থা আবিষ্কার কোরেছেন।

৪৮ ঘণ্টার মেয়াদ দেখতে দেখতে শেষ হয়ে এলো। ডাঃ দেও এ বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছেন ভেবে নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

কিন্তু ঠিক বেলা ৩টায় এল শমন!

ডাঃ দে ছাড়া তখন বাসায় আর কেউ ছিল না। মিসেস দে বেতার-কেন্দ্রে ও তাঁর ভাই আপিসে।

দু'জন জবরদস্ত গোছের আজাদী ফৌজ। তারা এসে বাড়ীর বাইরে থেকে ডাঃ দেকে ডাকাটা অপমানজনক বোধ করলো। ডাঃ দে তখন কি একটা বই পড়ছিলেন। সটাং ঘরের মধ্যে এসে চোস্ত হিন্দীতে বললে,—দে—কে আছে?

ডাঃ দে—আমার নাম।

সিপাহীরা—এক্ষুনি এ-বাড়ী থেকে বেরিয়ে যাও, নচেৎ তোমাকে ঘাড় ধরে' বের কোরে দেবার হুকুম আমরা পেয়েছি।

অপমানে ডাঃ দের চোখ-মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। কিন্তু, এই মুহূর্ত্তে জোর খাটিয়ে কোন লাভ নেই!

ডাঃ দে,—ভাই, আজই আমরা যাব। সব ঠিক করা রয়েছে, বাড়ীর অন্যান্য লোকেরা আপিস গেছে, এলে যাবার ব্যবস্থা করবো! তোমরা বড় সা'বকে খবর দাও কাল সকালেই এ-বাড়ী খালি পাবে।

সিপাহী দু'জনের মধ্যে এক জন ডাঃ দের কাছে চিকিৎসিত হ'য়েছিল, সেই একটু ভদ্র ভাবে বললে,—জী সাহেব, আপনি যাবেন তা জানি, কিন্তু উপর থেকে এই ভাবে আপনাকে বাড়ী থেকে বের কোরে দেবার আদেশ পেয়েছি। সে জন্য কসুর মাফ করবেন।

ডাঃ দে—কে আদেশ দিয়েছে?

জবাব:—ভূতনাথ বাবু।

ডাঃ দে—ও, বেশ তোমরা গিয়ে ভূতনাথ বাবুকে বল যে, কাল সকালেই এ-বাসা তিনি খালি পাবেন। ৪৮ ঘণ্টা পূর্ণ হ'তে এখনও তো দেরী আছে।

—জো হুকুম সাব। কসুর মাফ করবেন। জয় হিন্দ্‌! সেপাহী দু'জন চলে যায়।

ডাঃ দে দরজায় তালা দিয়ে তখনই মিঃ করিম গণি ও লেঃ সুনীল রায়কে এ খবর দিয়ে আসেন।

মিঃ করিম গণিও তক্ষুনি নেতাজীকে সবিস্তারে লিখে একটি জরুরী চিঠি পাঠান।

সে রাত্রি নিরাপদে কাটে।

পরের দিন সকালেই সুনীল রায় এসে হাজির। ব্যাপার কি?—না, নেতাজী অনেক রাত্রে ফেরেন, এবং এই সব ব্যাপার শুনে তখুনি ভূতনাথ বাবু ও ডাঃ দেকে ডেকে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ডাঃ দে'র যা'তে কোনো রকম বিপদ না হয় সে বিষয় চূড়ান্ত আদেশ দিয়ে সুনীল রায়কে বলে দেন যে, সুনীল রায় যেন পরের দিন সকালে গিয়েই ডাঃ দে'কে নিয়ে আসেন।

ডাঃ দে লেঃ সুনীল রায়ের সঙ্গে তখুনি নেতাজীর বাংলোয় চলে যান।

এবার ১৯৪৫ সালের মার্চ্চ মাসের সাধারণ অবস্থার বিষয় দু'কথা বললে আপনারা স্পষ্টই বুঝতে পারবেন যে, অতটা ধৈর্য্য আর ন্যায়পরায়ণতা না থাকলে আজ তিনি নেতাজী হ'য়ে আমাদের হৃদয় জয় করতে পারতেন না।

সে সময় চারি দিক্ থেকে আজাদী ফৌজ ও জাপানী বাহিনী বৃটিশদের প্রচণ্ড আক্রমণে পশ্চাদপসরণ করছে। ব্রহ্ম-সৈন্যাধ্যক্ষ বিশ্বাসঘাতকতা কোরে সসৈন্যে শত্রুপক্ষে যোগদান করেছে। দিনে রাত্রে ৫।৬ বার প্রচণ্ড বোম্বিং হচ্ছে। আর ঘণ্টায় ঘণ্টায় পরবর্ত্তী কর্ম্ম-তালিকা নির্দ্ধারণের জন্য বড় বড় অফিসারদের নিয়ে জরুরী বৈঠক বসছে।

নেতাজীর সময় নেই! স্নানাহার—এমন কি, বিশ্রাম বা নিদ্রা দেবারও সময় নেই! তার মধ্যে এ রকম বিভ্রাট!

ডাঃ দে যখন নেতাজীর বাংলোয় পৌছলেন তখন সেখানে একটি জরুরী বৈঠক বসেছে। তবু তিনি এই মনোমালিন্য দূর করবার জন্য বৈঠক ছেড়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ব্যয় করেন।

নেতাজীর বসবার ঘর। নেতাজী ও ভূতনাথ বাবু বসে রয়েছেন—ডাঃ দে'কে সেই ঘরে যাবার জন্য বলা হ'ল! আবছা অন্ধকার ঘরে ঢুকতেই নেতাজী বলেন, এই যে আসুন ডাঃ দে, বসুন!

ডাঃ দে'।—জয় হিন্দ, নেতাজী! এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে এই ভাবে আপনার সঙ্গে পরিচয় হ'বে আমি তা' স্বপ্নেও ভাবিনি। আজ যখন চারি দিক থেকে দুর্য্যোগ ঘনিয়ে আসছে, আপনার বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করার জন্য সত্যই আমি লজ্জিত! এবং সে জন্য ক্ষমা চাইছি।

নেতাজী।—জয় হিন্দ! বসুন। আপনার ক'টা গরু আছে?

ডাঃ দে বিস্মিত। তবু জবাব দেন, দু'টো গরু ও একটা বাছুর।

নেতাজী—হাঁস আর মুরগী?

ডাঃ দে (লজ্জিত ভাবে)—আজ্ঞে, তা ১৫টা মুরগী, গোটা দশ হাঁস আর গোটা দুই ছাগলও আছে।

নেতাজী।—আপনার চাকর নেই? এগুলি কে দেখা-শোনা করে?

ডাঃ দে।—চাকর কোথা পাব? আমি নিজেই সব দেখি।

নেতাজী।—দুধও কি আপনি নিজে দোন?

ডাঃ দে (লজ্জিত ভাবে)—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ও: আচ্ছা, এবার সমস্ত ব্যাপারটা বলুন দেখি?

ডাঃ দে সমস্ত ব্যাপারটা বললেন। শেষে আরো বললেন, আমি ভূতনাথ বাবুকে বারে বারে আমার অসুবিধার কথা এবং আমাকে যে-বাড়ী দেওয়া হ'চ্ছে, আফিসের কাজের জন্য সেই বাড়ী নেবার কথা বলেছি, কিন্তু তাঁর ও-বাড়ীতে সুবিধা হ'বে না, আমাকে ন' তাড়ালে চলবে না।

নেতাজী ভূতনাথ বাবুকে বললেন—ডাঃ দে'কে যে বাড়ী দিচ্ছ সে বাড়ীতে তোমরা যাচ্ছ না কেন?

ভূতনাথ।—সে বাড়ী একটু দূর হ'য়ে যায়।

নেতাজী।—কত দূর?

ভূতনাথ।—এই মানে, এই ধরুন না, তা' ডাঃ দে, এই সব সামান্য ব্যাপার নিয়ে কি দরকার নেতাজীর মূল্যবান সময় নষ্ট কোরে। চলুন, আমরা আপোষে যাহোক্ একটা—

নেতাজী আরো গম্ভীর হয়ে বললেন, আমি যা' জিজ্ঞেস করলাম তার ঠিক জবাব হ'ল না। সে বাড়ী কত দূর?

ভূতনাথ।—মানে, আজ্ঞে, এ মানে, ধরুন, রাস্তার ওপারে।

ও:! সে বাড়ী অনেক দূর হ'য়ে গেল, না? সে বাড়ীর এক-তলায় কে থাকে? কুয়ো কত দূর, ডাঃ দে'র গরু-ছাগল রাখবার ব্যবস্থা করা হ'য়েছে কি?

ভূতনাথ বাবুর মুখ শুকিয়ে গেছে, নেতাজী সব যে জানেন দেখছি। তিনি আম্‌তা আম্‌তা করতে লাগলেন।

নেতাজী।—তোমাদের লজ্জা করে না? ডাঃ দে এক জন গণ্য-মান্য ভদ্রলোক, তাঁর নিজের বাড়ী থাকা সত্ত্বেও তোমরা তো জাপানীদের কাছ থেকে সে বাড়ী উদ্ধার কোরে দিতে পারলে না, তার উপর কি না ভদ্রলোককে ভিটে-ছাড়া করছো? যাও, ডাঃ দে ঐ বাড়ীতেই থাকবেন। যান ডাঃ দে, আপনাকে ও-বাড়ী ছাড়তে হ'বে না।

ভূতনাথ বাবু অধোবদন!

অসংখ্য ধন্যবাদ! আপনি না থাকলে কি যে করতুম! জয় হিন্দ! বলে ডাঃ দে বেরিয়ে এলেন।

নেতাজী—জয় হিন্দ! সুনীল, ডাঃ দেকে পৌছে দিয়ে এসো।

এই আমাদের নেতাজী! যাঁর গর্ব্বে আমাদের বুক দশ হাত! জয় হিন্দ্‌!

দীপেন্দ্র সান্যাল

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১

সাগরকে এবার দেখা গেলো এক রেস্তরাঁতে। চৌরঙ্গীর ওপর খুব সৌখীন লোকদের খাবার এবং গল্প করবার নিখুঁত আয়োজন আছে এখানে। সারা ঘরটা রংএ এবং পালিশে ঝক্‌ঝক্ করছে! দেখলেই ঢুকে পড়তে ইচ্ছে করে। মালিক এক জন বাঙ্গালী ভদ্রলোক।

সেই ভদ্রলোকই সাগরকে এখানে চাকরী দেন। প্রায় মাস পাঁচেক হয়ে গেলো—সাগর এখানে কাজে ঢুকেছে। তাকে খাবার টেবিলে এনে দিতে হয় না, ঠিক মত টেবিলে খাবার দেওয়া হচ্ছে কি না, তাই তদারক করে বেড়াতে হয়। মস্ত বড় ঘর। মাঝে মাঝে টেবিল এবং চার দিকে চেয়ার। দু'পাশ দিয়ে আবার ছোট ছোট ঘরের মত পর্দ্দা দিয়ে ঢাকা। সমস্ত ঘরখানা অনবরত ধোয়া-মোছা চলছেই—সারা দিন ধরেই।

অদ্ভুত দিন কাটছে সাগরের। কোথা থেকে কোথায় সে ভেসে এলো। ছিল ময়নাপুরে পড়ে। দিন কাটত বাড়ীর কড়া শাসনে আর ইস্কুলের পড়া মুখস্থ করে। সেখান থেকে পালিয়ে এলো—কলকাতায়। এসে নানান্ জায়গা ঘুরে অবশেষে এখানে। আগে হলে সাগর ঢুকতেই পেত না এখানে। এখন বেশ চলে যাচ্ছে। সমস্ত ব্যাপারটা সাগরের কাছে ঠিক স্বপ্নের মত মনে হয়।

এখানকার লোকগুলোর সঙ্গে কিন্তু তার মিলল না। সবায়ের সঙ্গেই তার গোলমাল। তার কাজ হোল এদের সব-কিছু ম্যানেজারকে বলা। তাই নিয়েই বাধলো বিপদ। এত দিন এরা ছিল নির্বিবাদে। মাথার ওপর কেউ ছিল না হিসাব নেবার। এখন এতটুকু ত্রুটি হবার উপায় নেই। সাগর দমে যাবার ছেলে নয়। সব-কিছুর খোঁজ রাখে সে।

এখন সবাই দল পাকিয়ে ঝগড়া বাধাতে চায় সাগরের সঙ্গে, সাগর পড়েছে এক দিকে।

কিন্তু ব্যাপারটা চরমে উঠলো যে দিন কথাটা মালিকের কাণে গিয়ে পৌছল, হয়ত শেষ পর্য্যন্ত মালিক জানতো না—কিন্তু একটা জিনিষ ধরা পড়ায় এটা মালিক জানতে পারলেন।

সেদিন ছিল শনিবার। বেজায় ভীড়। সন্ধ্যের ঠিক আগে সাগর বেরিয়েছিল কি কাজে। ফিরে এসেই সমস্ত টেবিলের খদ্দেরদেরই জিজ্ঞেস্ করতে লাগল, 'কার কি চাই' এবং 'বয়'দের ডেকে তাই অর্ডার দিতে লাগল।

হঠাৎ একটা পর্দ্দা দিয়ে ঘেরা সেই ছোট ঘরে ঢুকে পড়ে অপ্রস্তুত হয়ে গেলো সাগর। দেখল, এক ভদ্রলোক বয়কে অত্যন্ত নীচু-গলায় বলছেন, 'এই নাও তোমার পাওনা—আর এইটে দোকানের বিল নাও,' সাগর ভেবেছিল গোড়ায় বখশিস্ বোধ হয়—তার পর একটু সন্দেহের স্বরে বল্‌লে—'কি ব্যাপার?'

বয়টা কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক সাগরকে বল্‌লেন, 'ওঃ, তোমাকেও কিছু দিতে হবে না কি? তা নাও,—দেখেই যখন ফেলেছ। তা ফাঁস করে দিও না কিন্তু।'

ঝড়ের মত বেরিয়ে গিয়ে সাগর ডেকে নিয়ে এলো ম্যানেজারকে।

অবশেষে রহস্য প্রকাশ পেলো তাদের কথাবার্ত্তায়। সেই ভদ্রলোক অনেক বেশী খেয়ে এই বয়টাকে কিছু দিয়ে বিল করাতেন অল্প পয়সার। এমনি করে প্রায়ই চলত। বন্ধু-বান্ধবদেরও মাঝে মাঝে আনতেন। এ রকম কারবার যে বহু দিন চলছে—তা তাদের কথাবার্ত্তা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেলো।

সমস্ত ইতিহাসটি শুনে চক্ষু স্থির হোয়ে রইল সাগরের। এ রকম চুরি যে সম্ভব এ তার ধারণারও বাইরে ছিল।

ম্যানেজার সমস্ত কথা মালিককে বল্‌লেন।

বয়টিকে এ যাত্রা ক্ষমা করতে বলল সাগর। কিন্তু ম্যানেজার তাকে তাড়িয়ে দিলেন। ম্যানেজারের ইচ্ছে ছিল ভদ্রলোকটিকে পুলিসে দেবার। কিন্তু মালিক তাকে ছেড়ে দিলেন।

এর ফল কিন্তু সাগরের পক্ষে মোটেই ভালো হলো না। সাগরের বিরুদ্ধেই গেলো সবাই। এবং সবাই মিলে চেষ্টা করতে লাগল সাগরকে কি ভাবে সরানো যায়। তাদের সঙ্গে প্রায় সব সময়েই গোলমাল বাধতে লাগলো সাগরের। তারা অবশেষে ক্ষেপাতে আরম্ভ করল তাকে।

কি করে তাদের মধ্যে জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে সাগর ছবি আঁকে। সেই নিয়ে স্তরু হোল ঠাট্টা। প্রথম প্রথম এ সব গায়ে মাখতো না সাগর। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপার গড়ালো অনেক দূর।

এক দিন সকালে উঠে দেখে, তার ছবিগুলো বাক্সে নেই। সাগর বুঝলে কাদের কাজ। সাগর রেস্তরাঁতেই রাতে থাকত, কাজেই তার যা-কিছু জিনিষ সবই ছিল সেখানে।

অন্য কিছু গেলে সাগরের কিছু হতো না। কিন্তু তার ছবিগুলোই ছিল সব। সাগর কাউকে কিছু বললে না তবু।

সাগরের যেদিন ছবি পাওয়া গেল না সেই দিনই সকাল বেলায় রেস্তরাঁর মালিক এসে ঢুকলেন দোকানে, হাতে তার সাগরের সেই সব হারানো ছবি। সাগর ছুটে আসতেই তিনি বল্‌লেন, 'ঐ সব তোমার আঁকা ছবি?'

সাগর বল্‌লে, 'হ্যাঁ।'

তখন তিনি বল্‌লেন, 'এগুলো ভারী চমৎকার হয়েছে। এগুলোকে ফেলে দিয়েছিলে কেন? দোকানের পাশে এই গলিতে পড়ে থাকতে দেখে আমি তুলে নিয়ে এলাম।'

সাগর তার হাত থেকে ছবিগুলো নিলো কিন্তু কিছু বল্‌ল না। দোকানের আর সবায়ের মুখ তখন শুকিয়ে গেছে।

সাগরের মুখে আবার হাসি দেখা দিলো। সন্ধ্যে বেলায় সাগর এক দিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে সবায়ের খাওয়া—যা তার নিয়মিত কাজ। সেই সময় এক ভদ্রলোক সাগর

যেখানে দাঁড়িয়েছিল ঠিক তার সামনের টেবিলে বসে খাচ্ছিলেন। তিনি তার বিল চুকিয়ে বেরিয়ে গেলেন। সাগর দেখল সঙ্গে তিনি বই এনেছিলেন দু'খানা, সেগুলো ফেলে রেখেই গেছেন টেবিলে। তাড়াতাড়ি সাগর বই দু'খানা নিয়ে দোকান থেকে বাইরে আসতেই দেখল, ভদ্রলোক সামনের ট্রাম-রাস্তা পেরিয়ে ওদিককার ফুটপাথে গিয়ে উঠেছেন। সাগর দৌড়ে বেরুতে গেল বই দু'খানা নিয়ে—এমন সময় গলি থেকে বেরুচ্ছিল একটা মোটর, তার এক দম সামনে পড়ল সাগর। মোটরটা ব্রেক কষবার আগেই সামনের দিকটায় ধাক্কা খেল সাগর। একটা গেল-গেল রবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেলো—সাগর অজ্ঞান হয়ে গেছে—মাথা খানিকটা কেটে গিয়ে রক্ত পড়ছে। হাতের বই দু'টো ছিটকে গেছে। ও-পারের ভদ্রলোক বোধ হয় বুঝতে পেরে এগিয়ে এলেন। ভীড় জমে গেল দেখতে দেখতে। খানিক ক্ষণের মধ্যেই ভীড় ঠেলে সাগরকে গাড়ীতে তুলে হাসপাতালের দিকে চালাতে বললেন ড্রাইভারকে সেই ভদ্রলোক। তার পাশে পড়ে রইল সাগরের হাত থেকে ছিটকে যাওয়া সেই মলাট-ছেঁড়া বই দু খানা।

* * * *

পরের দিন সকাল বেলা।

সাগর এখন অনেক ভালো।

প্রথমটায় ভয় পেয়েই সাগর অজ্ঞান হয়ে যায়। এখন দেখা যাচ্ছে, তেমন মারাত্মক ভাবে লাগেনি। সামান্য কেটে গেছে মাথাটা। অন্য দু'-এক জায়গাও কেটে গেছে সামান্যই। গাড়ীটা খুব বাঁচিয়ে নিয়েছে। অঙ্গের ওপর দিয়েই গেছে বলতে হবে।

তবে সাগরের সমস্ত গায়ে ভীষণ ব্যথা আর অল্প জ্বরও হয়েছে। মাথাটা ব্যাণ্ডেজ করে দেওয়া হয়েছে।

সাগরকে হাসতেই দেখা গেলো প্রথমে। কালকের সেই ভদ্রলোক সাগরকে বললেন, 'আমার বই দিতে গিয়েই তোমার এই দুর্ভোগ!'

সাগর হাসলো শুধু—কিছু বলল না।

তার পর সেই ভদ্রলোক সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করলেন সাগরকে। তিনি সাগরকে বললেন, তার দোকানের মালিকের কাছ থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে সাগর খুব ভালো ছবি আঁকতে পারে। সে সব ছবি ভালো হয়ে সাগরকে দেখাতে হবে নিশ্চয়ই।

সাগর তাকে সব কথা বলল। সে যে ছবি আঁকতে চায়—রেস্তরাঁয় থাকতে চায় না, এ কথা শুনে সেই ভদ্রলোক বললেন, 'আচ্ছা, তুমি ভালো হয়ে ওঠ, আমি তোমার সব বন্দোবস্ত করে দেব। আমার বাড়ীতে থেকে ছবি আঁকা শিখবে তুমি।'

আর একবার জ্বলে ওঠে সাগরের ম্লান চোখ দু'টো। সমস্ত দুপুরটা সাগরের একলা কাটে। প্রকাণ্ড ঘরখানায় তারা মাত্র দু'জন আছে। আর সবাই তার চেয়ে বয়সে বড়। কোন গোলমাল নেই সারা বাড়ীটায়, ঘণ্টায় ঘণ্টায় খোঁজ হচ্ছে সাগরের। ওষুধ খাওয়ানো, খাবার দেওয়া, সমস্ত খোঁজ-খবর নেবার লোক আছে। এ রকম আরাম বোধ হয় বাড়ীতেও পায়নি সে।

দুপুর বেলায় যদিও সে সঙ্গিহীন, কিন্তু তখন নানান্ চিন্তা মাথায় ঘোরে। এই নতুন ভদ্রলোকের সঙ্গে তার ভারী চমৎকার আলাপ হয়ে গেছে। কল্যাণ বাবু বলে সে ভদ্রলোককে ডাকে। চমৎকার লোক। তাঁকে ছবি আঁকা শেখাবার সব বন্দোবস্ত করে দেবেন বলেছেন তিনি। নিবে-আসা উৎসাহ হঠাৎ আবার জোয়ারের মত ভেসে আসে সাগরের মনে।

প্রথমে তার ভয় হয়েছিল ভয়ঙ্কর। কিছু ভাববার আগেই তার জ্ঞান ছিল না। তার পর কোথা থেকে কি যে হোল, ভালো করে সাগরের মনেও পড়ে না সব।

এই তিন বছরের সমস্ত ইতিহাসটা সাগর পড়বার চেষ্টা করে। বাড়ী থেকে পথে। তার পর কলকাতায়, কখন পথ থেকে ঘরে। কখন ঘর থেকে পথে। কখন পথ থেকে পথে। এমনি করে কেটে গেছে তার দিন।

আজ হাসপাতালে শুয়ে শুয়ে তার মনে হোল, এই যে ভেসে বেড়াচ্ছে সে—এক দিন কি কিছু মিলবে না তার? তার এই দুঃখ পাওয়া কি ব্যর্থ হবে? তার মধ্যে যে শিল্পী জন্ম নিয়েছিল এক দিন—সে কি মরে যাবে?

বিকেল বেলায় কল্যাণ বাবু তার রেস্তরাঁর মালিক এলেন। গল্প-গুজবে সময়টা কেটে গেলো তাড়াতাড়ি। তার পর যাবার সময় অনেক ফল দিয়ে গেলেন কল্যাণ বাবু, বললেন—'এগুলো খাওয়া এখন দরকার।'

সাগরকে এখন রুগীর মত সব কথায় সায় দিতেই হয়—না বললে চলে না। ওষুধ থেকে সব কিছু নিঃশব্দে হুকুম করতেই হয় তাকে।

পরের দিন সকালে যারা এলো—তাদের দেখে সাগর একটু অবাকই হয়ে গেলো। রেস্তরাঁয় আর যারা কাজ করত তারা এসেছে সাগরের সঙ্গে দেখা করতে।

এক দিন যারা তাকে প্রতি মুহূর্তে ঠাট্টা করে দূরে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছে আজ তারাই এসে দাঁড়িয়েছে তার পাশে।

সাগর হেসে তাদের সবাইকে বসতে বললে। তাদের এত দিনের এত বিদ্রূপ—সাগরের এই হাসির কাছে আজ ব্যর্থ হয়ে গেল যেন!

হাসপাতালের ছুটি ফুরিয়ে এলো। কল্যাণ বাবুর ওখানেই সাগর থাকবে ঠিক হয়েছে। সাগর তাঁর কাছে বাড়ীর ছেলের মত হয়ে গেছে।

সাগরেরও এখানে আর ভালো লাগছে না। এখান থেকে বেরুতে পারলেই সে বাঁচে। তার পর আর একবার সে চেষ্টা করবে—আর একবার সে দেখবে দুর্ভাগ্যের সঙ্গে লড়াই করে।

মাথার ঘা শুকিয়ে গেছে। গায়েও আর ব্যথা নেই। আবার সেই দুরন্ত সাগর—কিসের প্রেরণায় ফুলে ফুলে উঠছে। এত কাল ভেসে ভেসে বেড়িয়ে এত দিনে তীরে ওঠার সময় এলো তার। মনে মনে সে আওড়ায় বারংবার—

'বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা,
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।'

২২

শ্রীরবিনর্ত্তক

রাক্ষসের শিবিরের দোরে একটা সাপুড়ে সাপের খেলা দেখাতে এসেছে। নাম তার জীর্ণবিষ। আসলে তিনি রাক্ষসেরই এক চর—আসল নাম বিরাধগুপ্ত।

রাক্ষস শিবিরের মধ্যে আপন মনে নানা চিন্তা করছিলেন। তিনি ভেবে দেখলেন যে, কুসুমপুর থেকে পালাবার সময় স্ত্রী-পুত্র সঙ্গে না।

এনে তাঁর প্রিয় বন্ধু চন্দনদাসের বাড়ীতে রেখে আসা তাঁর পক্ষে উচিতই হয়েছে। কেন না—এতে রাক্ষসের দলের লোকেরা বুঝতে পারবেন যে, রাক্ষস একেবারে কুসুমপুরের আশা ছাড়েননি—সময় বা সুযোগ পেলেই আবার কুসুমপুর দখল করবার চেষ্টা করবেন। স্ত্রী-পুত্র যে নগরে রইল তার মায়া ত কাটান যায় না। তার পর চন্দ্রগুপ্তকে বিষ দিয়ে বা অন্য যে কোন উপায়ে গুপ্তহত্যা করবার জন্যে গুপ্ত-ঘাতক চর যোগাড় করবার উদ্দেশে তিনি শকটদাসের হাতে বিস্তর টাকা রেখে এসেছিলেন—তাঁর মনে বেশ আত্মপ্রসাদ ছিল যে, শকটদাস নিশ্চিত এ কাজটি হাসিল করতে পারবেন। আর চাণক্যের প্রিয়বন্ধু ইন্দুশর্ম্মা জৈন সন্ন্যাসী সেজে জীবসিদ্ধি নাম নিয়ে এসে রাক্ষসের প্রিয়পাত্র হ'য়ে উঠেছিলেন। রাক্ষস জীবসিদ্ধির আসল পরিচয় না জেনেই তাঁর উপর অগাধ বিশ্বাস রেখেছিলেন। তিনি ভাবতেন—এই জীবসিদ্ধি দিনের পর দিন তাঁকে শত্রুপক্ষের খবর এনে দেবেন, আর সুবিধা পেলেই শত্রুদের মধ্যে পরস্পর ঝগড়া বাধিয়ে দেবেন। ভাবতে ভাবতে তাঁর মন বেশ আনন্দে ভ'রে উঠছিল। কিন্তু হায়! তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে—তাঁর বন্ধু চন্দনদাস চাণক্যের হাতে ধরা পড়েছেন—শকটদাসের সব ফন্দী ভেস্তে গিয়েছে—আর জীবসিদ্ধি জাল বুনছেন তাঁকেই জড়াতে।

রাক্ষসের ভাবনার মাঝে বাধা হ'য়ে দাঁড়ালেন এসে ম্লেচ্ছ রাজ-কুমার মলয়কেতুর কঞ্চুকী জাজলি। বুড়ো বামুন অনেক দিনের পুরানো বিশ্বাসী লোক। রাক্ষস তাঁকে সসম্মানে আসন দিয়ে বসিয়ে নমস্কার জানিয়ে কুমারের কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। বুড়ো জাজলিও প্রতি-নমস্কার ও কুশল জানিয়ে বললেন—'মন্ত্রিবর। অনেক দিন থেকে আপনি নিজের শরীরের কোন যত্ন নিচ্ছেন না—সাজ-গোজও কিছু করেন না। কুমার আমাদের তাতে বড়ই দুঃখ পাচ্ছেন। অবশ্য আপনার প্রভুবংশের হত্যাকাণ্ডে আপনার মনে যে আঘাত লেগেছে তা সহজে ভুলতে পারবেন না আপনি—এ কথা কুমার বেশ ভাল রকমই বোঝেন। তবু পদোচিত সাজ-সজ্জা করারও দরকার আছে। তাই কুমার এই অলঙ্কারগুলি পাঠিয়েছেন আমার হাত দিয়ে—তাঁর ইচ্ছা আপনি এগুলি পরেন'।

রাক্ষস গয়নাগুলি দেখেই বুঝলেন যে, গয়নাগুলি কুমারের নিজের গা থেকে খুলে পাঠান হয়েছে। কৃতজ্ঞতায় তিনি গ'লে গেলেন। মুখে বললেন—'আর্য্য জাজলি! আপনাদের কুমারকে পেয়ে আমি আমার পুরানো প্রভুদের গুণের কথাও ভুলেছি। কুমারের আদেশ অমান্য করব না। এখনই অলঙ্কারগুলি পরব'।

বুড়ো কঞ্চুকী পরম আনন্দে নিজের হাতে মন্ত্রীর গায়ে গয়নাগুলি পরিয়ে দিলেন। তার পর এই আনন্দ-সংবাদ কুমার মলয়কেতুকে জানাতে মন্ত্রিবরের কাছে বিদায় নিয়ে তাড়া তাড়ি চ'লে গেলেন।

এই সময় রাক্ষসের শিবিরের দোরে সাপুড়েটা খুব গোলমাল লাগিয়ে দিলে—নানা রকম সাপের মন্তর আওড়াতে লাগল। রাক্ষস বিরক্ত হ'য়ে তাঁর পার্শ্বচর প্রিয়ংবদকে ডেকে বললেন—'দেখ ত, কে ও—কি চায়'?

প্রিয়ংবদ বাইরে থেকে ঘরে এসে বললে—'প্রভু! ও একটা সাপুড়ে—আপনাকে সাপের খেলা দেখাতে চায়'।

গভীর বিরক্তিতে মুখ বেঁকিয়ে রাক্ষস বললেন—'কি আপদ! সকাল বেলায় প্রথমেই সাপের দেখা! প্রিয়ংবদ! সাপ খেলান দেখতে আমার মোটেই আগ্রহ নেই। বেচারী বোধ হয় কিছু চায়—কিছু বখশিস্ দিয়ে ওকে বিদেয় কর'।

প্রিয়ংবদ বাইরে গিয়ে সাপুড়েকে কিছু দিয়ে বিদায় করতে চাইলে সাপুড়ে বললে—'ওহে বাপু! তোমার প্রভুকে বল গিয়ে যে আমি ত শুধু সাপুড়ে নই—আমি ছড়া কাটতেও জানি। আমার সঙ্গে তিনি একবার দেখা করে দু'টো ছড়া শোনেন—এই আমার প্রার্থনা। তা যদি একান্তই দেখা না করতে চান, তবে এই চিঠিখানা অন্ততঃ প'ড়ে দেখুন'।

প্রিয়ংবদ চিঠি নিয়ে ভিতরে গিয়ে রাক্ষসের হাতে দিল—সঙ্গে সঙ্গে একটু মোলায়েম ক'রে সাপুড়ের কথাগুলিও জানালে। সাপুড়ের উপর তার এতখানি দরদের কারণ—সাপুড়ে তার দেওয়া বখশিস নেয়নি—সেটা প্রিয়ংবদেরই গাঁটে গিয়েছিল।

রাক্ষস চিঠি হাতে নিয়ে পড়তে লাগলেন—

"অশেষ কুসুমরস পান করি মধুকর
মকরন্দ করে উদ্গিরণ।
প্রভু-কার্য্য সিদ্ধ তাহে নিরজনে অনুরাগে
প্রভু-ভৃত্য ঘটয়ে মিলন"।

পড়তে পড়তে রাক্ষসের মুখে হাসি দেখা দিল। আপন মনে বলতে লাগলেন—'তাই ত! এ যে দেখছি আমারই কোন চর—কুসুমপুরের খবর এনেছে নিশ্চয়! ও হো-হো! ভুলেই গিয়েছিলুম—চর কেন হবে! সখা বিরাধগুপ্ত নিজেই ত কুসুমপুর গিয়েছিলেন। সাপুড়ে সেজে এ নিশ্চিত তিনিই এসেছেন'।

তখনই প্রিয়ংবদকে ডেকে বললেন—'এ সাপুড়েটি বেশ ভাল কবি। একে একবার ভিতরে ডাক—একটু ছড়া শোনা যাক'।

প্রিয়ংবদ বাইরে গিয়ে হেসে বললে—'ওহে ভাই সাপুড়ে, তোমার বরাত ভাল! প্রভুর মেজাজ বেশ ভাল এখন। যাও—ভিতরে যাবার অনুমতি হয়েছে। তবে ফেরবার মুখে এ গরীবকে মনে রেখ'।

'সে আর বলতে'!—ব'লে সাপুড়েবেশী বিরাধগুপ্ত ঢুকলেন ভিতরে।

রাক্ষস 'এই যে'—ব'লে বন্ধুকে আলিঙ্গন করতে উঠে দাঁড়াচ্ছিলেন। পিছনে প্রিয়ংবদ দাঁড়িয়ে আছে দেখে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন—'দেখ প্রিয়ংবদ! এখন একটু সাপ-খেলান দেখব—ছড়া শুনব। তুমি দোরের বাইরে গিয়ে পাহারায় থাক' গে—যেন কেউ এসে না হঠাৎ ঢুকে পড়ে'।

'প্রভুর যেমন আদেশ'—ব'লে প্রিয়ংবদ বাইরে চ'লে গেল।

এবার বিরাধগুপ্তকে সস্নেহে জড়িয়ে ধ'রে নিজের আসনের এক পাশে বসালেন সযত্নে। তার পর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস সামলাতে না পেরে তাঁর চোখে জল এল। মুখে শুধু বললেন—'হায়! হায়! নন্দ-বংশের অনুরাগী আপনি—আপনার আজ এ কি দুর্দ্দশা'!

বিরাধগুপ্ত স্নেহভরে বন্ধুর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার সুরে বললেন—'মন্ত্রিবর! আপনার চেষ্টায় আবার আমাদের সুদিন ফিরে আসবে। আপনি এত কাতর হ'লে আমরা দাঁড়াব কোথায়'!

রাক্ষস এবার শান্ত হ'য়ে বললেন—'সখে, কুসুমপুরের সংবাদ কি?—বল'!

বিরাধগুপ্ত—'কোথা থেকে বলব'?

রাক্ষস—'গোড়া থেকেই বল, শুনি'।

বিরাধগুপ্ত—'আপনার প্রেরিত বিষকন্যা যখন পর্ব্বতেশ্বরের প্রাণ হরণ করলে—'

রাক্ষস বাধা দিলেন—'সখে! দেখ—কি দৈব-বিড়ম্বনা। কর্ণ যেমন একাঘ্নী অস্ত্রটি তুলে রেখেছিলেন অর্জ্জুনকে মারবেন ব'লে, কিন্তু বিষ্ণুর ছলনায় সেটি ছাড়তে বাধ্য হলেন ঘটোৎকচের বিরুদ্ধে, আমিও তেমনই এত কষ্টে এত দিন ধ'রে বিষকন্যাটিকে তৈরী করলুম চন্দ্রগুপ্তকে শেষ করব ব'লে—অথচ বিষ্ণুগুপ্তের কৌশলে সে বিষকন্যা প্রাণ নিলে বোকা পর্ব্বতরাজের'!

বিরাধগুপ্ত—'দৈবের নির্ব্বন্ধ! আপনি কি করবেন—বলুন'?

রাক্ষস—'আচ্ছা, তার পর কি হ'ল বলুন'।

বিরাধগুপ্ত—'তার পর কুমার মলয়কেতু পিতার মৃত্যুতে ভয় পেয়ে পালালেন! কিন্তু তাঁর কাকা—মৃত পর্ব্বতরাজের ভাই—চাণক্যের হাত থেকে ছাড়ান পেলেন না। তিনি এমনই নির্ব্বোধ যে, চাণক্য তাঁকে বোঝালেন অর্দ্ধ রাজ্য তাঁকেই দেবেন, আর তিনিও বুঝে ফেললেন যে সত্যিই বুঝি অর্দ্ধ রাজ্য তাঁর হাতে এসে গেল'।

রাক্ষস—'আহা বেচারী! এখনও কোন বিপদে পড়েননি ত'?

বিরাধগুপ্ত—'শুনুন সব কথা আগে। এর পর চাণক্য কুসুমপুরের সব ছুতরদের ডেকে বললেন—'দৈবজ্ঞদের গণনায় মধ্যরাত্রি খুব ভাল সময়। সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত রাজ-প্রাসাদে প্রকাশ্য ভাবে ঢুকবেন। তাই তোমরা সকলে প্রাসাদের দোরগুলি মেরামত ক'রে সাজাও। পূব-দিকের দরজাই সিং-দরজা—সেটা যেন খুব ভাল সাজান হয়'। তাই শুনে ছুতরের দল বলে—'মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রাজপ্রাসাদে ঢুকবেন শুনে দারুবর্ম্মা নামে এক জন ছুতর সব দরজা সাজাতে আরম্ভ ক'রে দিয়েছে। প্রধান যে সিং-দরজা তাতে সোনার তোরণ দিয়ে খুব ভাল ক'রেই সাজিয়েছে। আমরা এখন না হয় ভিতরের সাজাবার ব্যবস্থা করি। চাণক্য তখনই বুঝে নিলেন—ব্যাপারটার কি রহস্য! আদেশ পাবার আগেই দারুবর্ম্মা সব দরজা সাজিয়ে ফেললে—এর ভিতরে যে রহস্য কিছু আছে—এ বুঝতে চাণক্যের দেরী হ'ল না। কিন্তু মুখে তিনি কিছু বললেন না। বরং দারুবর্ম্মার দূরদৃষ্টির প্রশংসা ক'রেই হাসতে হাসতে ব'লে উঠলেন—'দারুবর্ম্মা খুব শীগ্‌গিরই তার নিপুণ কাজের পুরস্কার পাবে'।

রাক্ষস—'চাণক্য হাসলে! কি সর্ব্বনাশ! চাণক্য যার সম্বন্ধে হেসে কথা বলে তার দফা রফা হ'তে ত বেশী দেরী হয় না। বেচারী দারুবর্ম্মা! তার বোধ হয় সব চেষ্টা পণ্ড হয়েছে—হয়ত প্রাণেও মারা গেছে বেচারী! আচ্ছা! কেন সে চাণক্যর আদেশ পাওয়া পর্য্যন্ত দেরী করলে না! হয়ত নন্দবংশের প্রতি ভক্তিই তাকে অপেক্ষা করতে দেয়নি! হয়ত এ তার মূর্খতা! হয়ত বা দুর্দ্দৈব! থাক্! চাণক্যের মনে সংশয় জাগল নিশ্চয়। তার পর?'

বিরাধগুপ্ত—'চাণক্য ত রটিয়ে দিলেন নগরে যে—মাঝ রাতে শুভ লগ্ন—প্রাসাদে ঢুকবেন নতুন রাজা চন্দ্রগুপ্ত। তার পর শুভ লগ্নে পর্ব্বতকের ছোট ভাই নির্ব্বোধ বৈরোচককে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে এক সিংহাসনে বসিয়ে সকলের সামনে দু'জনের মধ্যে উত্তর-ভারতের সাম্রাজ্য আধা-আধি ভাগ ক'রে দিলেন'।

বিস্ময়ের ধাক্কায় রাক্ষস আসন ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বললেন—'বল কি, সখা! ভাগ ক'রে দিলে'!

বিরাধগুপ্ত—'নিশ্চয় দিয়েছিলেন'।

রাক্ষস খানিকটা গুম্ খেয়ে থেকে বললেন—'তা হ'লে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, কুটিল কৌটিল্য কোন গুপ্ত উপায়ে বৈরোচককে নিকেশ করবার মতলব ভেঁজেছিল। আর পর্ব্বতরাজের মরণে যেটুকু দুর্নাম তার হ'য়েছিল সেটুকু মুছে ফেলবার উদ্দেশ্যে প্রকাশ্যে বৈরোচককে অর্দ্ধ রাজ্য দেওয়ার এই অভিনয় করেছিল। বাহবা! চাণক্য! সখে—তার পর'?

[ক্রমশঃ

এক মিনিটের গল্প

মনোজিৎ বসু

কথা দিয়ে কথা রাখাটা তো আর নেহাৎ কথার কথা নয়। ক'জনে আর তা রাখে? অথচ যাঁরা সত্যিকারের মানুষ, তাঁদের কাছে কথার যে কত দাম তা তাঁরাই বোঝেন। 'প্রাণ যায় তবু বচন না যায়'—এই ছিল প্রাচীন কালের ধর্ম্ম। এ-যুগের মানুষ আমরা সে ধর্ম্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছি। কিন্তু আমাদের দেশে এমন মানুষ একেবারে দুর্লভও নয়। সেই কথাই বলছি।

রাণাঘাটের কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী। তখনকার দিনের নামজাদা বড় ব্যবসায়ী। থাকেন তিনি রাণাঘাটে, ব্যবসা করেন ক'লকাতায়। যাতায়াত করেন নিজের নৌকায়। কারণ, তখনকার দিনে রেলগাড়ি চলাচল শুরু হয়নি। কিন্তু নদীপথে যাতায়াতও বড় নিরাপদ ছিল না, দস্যু-তস্করের ভয় ছিল খুব। প্রায়ই ডাকাতি হ'তো। তেমনি এক ডাকাতির মধ্যে পড়েছিলেন কৃষ্ণচন্দ্র পাল।

ডাকাতেরা মাঝ-পথে তাঁর নৌকা আটক ক'রেছে। জিনিষ-পত্র যা ছিল সব লুঠপাট ক'রে মাঝি-মাল্লা লোক-জনদের উপর আক্রমণ চালিয়েছে, এই আশায় যে, প্রহার ও নির্য্যাতনের ফলে যদি তারা কোনো লুকানো ধনের সন্ধান দেয়। তাদের সেই চীৎকারে ও কোলাহলে কৃষ্ণচন্দ্রের ঘুম ভেঙে গেল। তিনি নৌকাতে তাঁর নিজের ছোট কামরায় শুয়েছিলেন। বেরিয়ে এসে তিনি ডাকাতদের উদ্দেশ ক'রে গম্ভীর স্বরে বললেন—আমি রাণাঘাটের কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরী।

ডাকাতেরা তৎক্ষণাৎ তাঁকে সেলাম করে স'রে দাঁড়াল। ডাকাত-দলের সর্দ্দার সামনে এসে বল্‌ল—আমরা তা জেনেই নৌকো আক্রমণ করেছি। আমরা টাকা চাই।

কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—তোমরা আমার নৌকা ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাদের কেউ গিয়ে আমার রাণাঘাটের বাড়িতে হাজির হ'লেই আমি তোমাদের দাবী পূর্ণ ক'রব। এই নিরীহ লোকদের আর মেরো না।

ডাকাতেরা কি ভেবে নৌকা ছেড়ে দিয়ে চলে গেল।

রাণাঘাটে ফিরে যখন কৃষ্ণচন্দ্র সমস্ত ঘটনাটা তাঁর বন্ধু-বান্ধবদের কাছে বললেন, তখন তাঁরা তাঁকে পরামর্শ দিলেন যে, ডাকাতরা এলে তাদের পুলিশে ধরিয়ে দিতে। কৃষ্ণচন্দ্র বললেন—'না, আমি তা পারি না। তাদের যখন কথা দিয়েছি তখন সে কথা আমাকে রাখতেই হবে। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ক'রে আমি অন্যায় করতে পারি না।'

ছদ্মবেশে ডাকাতের সর্দ্দার যখন তাঁর বাড়িতে এসেছিল কৃষ্ণচন্দ্র তখন কিন্তু দাবী সম্পূর্ণ পূর্ণই করেছিলেন।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

এই বিভাগে আমরা প্রধানত বাঙ্গালার মফঃস্বল অঞ্চলের সাপ্তাহিক এবং অন্যান্য পত্রিকাগুলি হইতে নানা প্রকার সংবাদ সংগ্রহ করিয়া, পাঠকগণকে তাহা আমাদের মন্তব্যসহ নিবেদন করিতে চেষ্টা করিতেছি। দুঃখের বিষয়, গত চারি সপ্তাহের কলিকাতার বাহিরে বাঙ্গালার বিবিধ পত্রিকায় প্রকাশিত নীলামি ইস্তাহার অপেক্ষা মূল্যবান্ প্রায় কোন প্রকার সংবাদই সংগ্রহ করিতে সমর্থ হই নাই। বাঙ্গালার মফঃস্বল অঞ্চলের এই সকল পত্রিকা কেন এবং সাধারণের কোন্ প্রয়োজনে প্রকাশিত হয়, তাহা আমাদের পক্ষে বুঝা কষ্টকর। অবশ্য এ-কথা বিশ্বাস করি এবং দেখিতেও পাইতেছি যে—এই সকল পত্রিকাগুলির মালিক বা মালিকবর্গ হয়ত দুই পয়সা রোজগার করিয়া তাঁহাদের সংসার প্রতিপালন করেন, কিন্তু পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য যাহা, তাহা কোন প্রকারে এবং কোন ভাবেই এই সকল পত্রিকার প্রকাশে কোন দিক্ হইতেই সাধিত হয় না। গত চারি মাসে এমন বহু সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিয়াছি—যাহা নামে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র হইলেও—নীলামি ইস্তাহার ছাড়া আর কোন কিছুই এই সকল পত্রিকাতে দেখিতে পাই নাই। এমন কি, সংবাদপত্র-নিয়ন্ত্রণ আইন বাঁচাইয়া আত্মরক্ষা করার জন্য যে সামান্য পরিমাণ সংবাদ পরিবেশন একান্ত প্রয়োজনীয়, তাহাও উপরি-উক্ত পত্রিকাগুলিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। কাগজ বর্ত্তমানে বহুমূল্য সামগ্রী, এক জন বা ক্ষেত্রবিশেষে কয়েক জনের সামান্য সুবিধা এবং অর্থোপার্জ্জনের জন্য এই ভাবে এই বহুমূল্য কাগজ এমন ভাবে নষ্ট করা অপরাধ বলিয়া মনে করি।

*   *   *   *   *   *

প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যার বিষয় আলোচনা করিতে গিয়া 'বীরভূম-বাণী' বলিতেছেন—"প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির আর একটি প্রধান অন্তরায় হইতেছে গভর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি বা শিক্ষা-প্রণালী। পুস্তক পাঠের উপরই অধিকতর মনোযোগ দেওয়া হইয়াছে। কাজেই ৬।৭ বৎসরের ছেলেরা তাহাতে কোন আনন্দের বা আকর্ষণী বিষয় পায় না—বরং তাহাদের মনে একটা ভীতির সঞ্চার হয়—এবং কোন কোন শিক্ষকের গম্ভীর হুঙ্কার এই ভীতি তাহাদের মনে গভীর ভাবে আসন লাভ করে। ফলে তাহারা যদি শিক্ষাকে পাশ কাটাইয়া এড়াইয়া চলিবার চেষ্টা করে তবে তাহাদের দোষ দেওয়া যায় না। কাজেই এই শিক্ষা-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা হৃদয়গ্রাহী করিতে হইবে, যাহাতে ছাত্র-ছাত্রীদের মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়।" ইহাতে আপত্তি করিবার কিছু নাই, কিন্তু ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান যাঁহারা করিবেন সেই শিক্ষকদের জীবন ধারণ চিন্তা দূর না করিলে শিক্ষা বিষয়ে কোন প্রকার অগ্রগতি লাভ হইবে না। আজকার দিনে গ্রামের ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষা এবং শিক্ষারম্ভের গুরু ভার যাহাদের উপর, তাহাদের মাসিক বেতন মাত্র ১২৲ টাকা! সামান্য কুলী-মজুরও প্রতি মাসে ইহার অন্তত তিন গুণ রোজগার করে। দেশের ভবিষ্যৎ মানুষ গঠন যাহারা করিবে, তাহারা যদি নিজেদের সংসার-চিন্তায় দিবারাত্র ব্যস্ত এবং পীড়িত থাকে, দেশ তাহাদের নিকট বেশী কি আশা করিতে পারে, তাহাও চিন্তা করিয়া দেখিবার বিষয়। মাসিক ১২৲ টাকায় অচল অধম ছাড়া বেশী কিছু হয় না। এই অচল অধমদের সচল এবং উত্তম করিতে হইলে তাহাদের ভরপেট খাইতে দিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে করা প্রয়োজন। কিন্তু আমরা বোধ হয় অরণ্যে রোদন করিতেছি।

*

'বীরভূম-বাণী' বলিতেছেন—"সংবাদটি ছোট কিন্তু উহা তাৎপর্য্যপূর্ণ। নোয়াখালী জেলায় স্বাধীনতা দিবসের প্রার্থনা-সভায় গান্ধিজী কংগ্রেস-পতাকা তুলিতে দেন নাই। গান্ধিজী বলেন, যেহেতু মুসলমান বন্ধুগণ এই পতাকা পছন্দ করেন না, সেই হেতু স্বাধীনতা দিবসে তিনি উহা উত্তোলন করিতে দেন নাই।..............অধিকাংশ মুসলমান যে কংগ্রেসকে পছন্দ করেন না তাহা তো বাংলার গত নির্ব্বাচনে তাঁহারা প্রমাণিত করিয়াছেন। তবে কি কংগ্রেস-পতাকার ন্যায় কংগ্রেসকেও গুটাইয়া রাখিতে হইবে? আমরা ব্যাপারটা বুঝিতে পারিতেছি না।" এই সংবাদের উপর কোন প্রকার মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই—কিন্তু মুসলমান এবং মুসলিম লীগ-তোষণ-নীতির ফলে আজ লীগের দাবী কোথায় উঠিয়াছে তাহা গান্ধিজী নিজে জানেন। এক পক্ষ কেবল ত্যাগ করিবে, অন্য পক্ষে তাহাদের দাবীর পরিমাণ, তাহা যতই অন্যায় হউক ক্রমাগত বাড়াইয়া যাইবে, ইহা চিরকাল চলিবে না। মানুষের ত্যাগেরও সীমা আছে, মুসলিম লীগকে আজ এই সামান্য সত্য কথাটা বুঝাইয়া দিবার একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কংগ্রেস যদি এ কার্য্য না পারে, তাহা হইলে দেশবাসী অমুসলমানদের এই কার্য্য অবিলম্বে করিতে হইবে।

*   *   *   *   *   *

বাঙ্গালার নানা স্থানে ধান-চাউলের চোরা-কারবার চলিতেছে। সম্প্রতি 'বগুড়ার কথা' হইতে জানিতে পারিলাম যে, ঐ অঞ্চলের প্রকিওরমেণ্ট বিভাগের কন্‌ট্রোলার ঘোষণা করিয়াছেন যে, "যদি কেহ ধান-চাউল বগুড়ার সীমানার বাহিরে বে-আইনি ভাবে লইয়া যাইতেছে এরূপ চোরা-কারবারীর সংবাদ দিতে পারে......তবে যিনি এই সংবাদ দিবেন সরকার হইতে তাঁহাকে পুরস্কার দেওয়া হইবে।......যে ব্যক্তির নিকট হইতে ধান বা চাউল ধরা হইবে, সে দোষী প্রতিপন্ন হইলে সংবাদদাতাকে প্রতি মণ ধানের জন্য ১ টাকা হারে ও প্রতি মণ চাউলের জন্য ১া০ টাকা হারে পুরস্কার দেওয়া হইবে।" পাকা ব্যবস্থা

হইল। এক চালে গৃহস্থকে সাবধান করিয়া চোরকে চুরির সুবিধাও করিয়া দেওয়া হইল। সরকার পুরস্কারের যে মাত্রা বা হার নির্দ্ধারণ করিয়া দিলেন, চোরা-কারবারী অনায়াসেই তাহার ২।৩ গুণ 'পুরস্কার' দিয়া মানামত স্থানে ধান এবং চাউল সরাইতে পারিবে। গভর্ণমেণ্টের বুদ্ধির তারিফ না করিয়া উপায় কি?

* * * * * *

কোন এক মুসলীম কবির একটি কবিতা-পুস্তক সমালোচনা কালে 'খিল্লাত' লিখিতেছেন : "·········কিন্তু আর একটা দিকে আমাদের হতাশা রয়েই গেলো। হিন্দু-পরিবেশ ও হিন্দু-ট্রাডিশনের প্রভাব, আজো মুসলীম বাঙ্গলার অন্যতম এই শ্রেষ্ঠ কবি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাই তাঁর উৎকৃষ্ট রচনার মধ্যেও এ ধরণের ইসলামের নীতি-বিরুদ্ধ অনুভূতি ঠাঁই পেয়েছে :

তীর্থ পথিক ফিরিয়া আসিব আবার মাটির ঘরে,
গৌর ফিরিব কাহিনী আনিব কমণ্ডলুতে ভরে।
দেউলে দেউলে গড়িব প্রতিমা পূজিব প্রসূন করে,
জনমে জনমে দেখা যেন পাই প্রণমিব ইহা স্মরে।"

সাম্প্রদায়িক-বিষ মানুষকে কতখানি বিকারগ্রস্ত করিতে পারে—'খিল্লাতে'র এই পুস্তক সমালোচনা তাহারই একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কবিকেও আজ মুসলীম জনগণের শ্রদ্ধা পাইতে হইলে তাহাকে পরম পাকিস্তানী আদর্শে কবিতা লিখিতে হইবে। কিন্তু বাঙ্গালী মুসলীম কবিকে দোষ দিয়া লাভ কি—হিন্দু-পরিবেশ কাটানো সম্ভবপর হইলেও—বাপ-ঠাকুরদাদার 'ট্রাডিশান' হঠাৎ ভুলিয়া যাওয়া বোধ হয় অসম্ভব। মিশর বা আরবের 'ব্লাড-ব্যাঙ্ক' হইতে প্রয়োজন মত 'রক্ত' আমদানি করিয়া তাহার সহিত বাঙ্গালী মুসলীম লেখকদের দেহের হিন্দু-রক্ত বদল করিতে পারিলে হয়ত বা কিছু ফললাভ হইতে পারে।

* * * * * *

ডাঃ মফিজ উদ্দীন আহমদ ও তস্য ভ্রাতা মৌলবী নফিজ উদ্দিন আহমদ-সম্পাদিত 'বগুড়ার কথা' বলিতেছেন : "অদূর ভবিষ্যতে বাঙ্গালায় সরিষার তৈলের দুঃখ ঘুচিবে এরূপ আশা করা যাইতেছে না। বাংলা দেশ কোন বিষয়ে স্বাবলম্বী নয়, চাউলে নয়, গমে নয়, ডাইলে নয়, তেলে নয়, ঘৃতে নয়, বস্ত্রে নয়। এই সকল অপরিহার্য্য বিষয়ে বাংলা দেশ ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মুখাপেক্ষী। বাংলা দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বর্ত্তমানে যাঁহাদের করায়ত্ত তাঁহারা মুখে বাংলা দেশ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বলিয়া বড়াই করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহাদের পরিচালিত শাসন-ব্যবস্থায় বাঙ্গালীকে খাদ্য ও বস্ত্র বিষয়ে পরাধীন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের সহযোগিতা, সদিচ্ছা ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হইতে হইয়াছে। সরিষার তৈলে যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তাহা হইতে ইহা সহজে অনুমান করা যায়।" মুসলীম-সম্পাদিত পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর কাফের হিন্দুর মতামত প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন বোধে মন্তব্য করা হইতে বিরত রহিলাম। কিন্তু ভয় হইতেছে, 'বগুড়ার কথা' পত্রিকাটি অর্থ-প্রদায়িনী "নীলামি ইস্তাহার" সংবাদ প্রকাশের সৌভাগ্য হইতে হয়ত বা এবার বঞ্চিত হইবেন!

* * * * * *

'বঙ্গবাসী' বলেন : "বাঙ্গালার পুলীশ-বিভাগে সিপাহী কনেষ্টবল নিয়োগের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা ছাড়িয়া একেবারে পঞ্জাবে ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে আড়কাঠি পাঠাইয়াছেন শুনা যাইতেছে। প্রকাশ, এই সব লোক সশস্ত্র পুলীশ বাহিনীতে কাজ পাইবে। সৈন্য বিভাগের কর্ম্মচ্যুত ব্যক্তিরাই এই কাজের যোগ্য বিবেচিত হইয়াছে। সবই ঠিক ; কিন্তু তাহার জন্য এত দূর-পাল্লার কি প্রয়োজন ছিল? পাকিস্তানের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য কি শেষে আফগানিস্থানের লোক আনাইতে হইবে?—দোষ কি? 'বঙ্গবাসী' কি জানেন না—জগতের সমস্ত মুসলীম এক জাতির লোক। কাজেই বাঙ্গালী মুসলমান সিন্ধু বা পঞ্জাবে কোন চাকরি পাক বা না পাক, ঐ দুই অঞ্চলের মুসলীমগণ বাঙ্গালায় সর্ব্বপ্রকার সুবিধা নিশ্চয় ভোগ করিবে, করিবে বলিলে ভুল হয়, তাহারা বর্ত্তমানে ভোগ করিতেছে। লীগ মহা-নায়ক মিঃ জিন্না তাঁহার পরিকল্পিত পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের বাসিন্দাদের জন্য বিভিন্ন প্রকার কার্য্যধারা হয়ত স্থির করিয়াছেন। পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মুসলীম হইবে শাসক, ব্যবসায়ী, সিপাহী আর বাঙ্গলার লীগপন্থী ক্ষীণকায় হীনবল মুসলীম করিবে পাটের চাষ এবং কুলী-বেয়ারা বরকন্দাজের কাজ। 'পাকিস্তানী'—বন্দুক ঘাড়ে করিবার শক্তি বাঙ্গালী মুসলমানের নাই, হয়ত জিন্না সাহেবের ইহাই বদ্ধমূল ধারণা।

*

কিছু কাল পূর্ব্বে প্রকাশ পায় যে, হাওড়া ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে, নোয়াখালী ও ত্রিপুরার যে ১৫ শত আশ্রয়প্রার্থী রহিয়াছে, তাহাদের আশ্রয়-শিবির ত্যাগ করিয়া চাঁদপুরে সরকারী আশ্রয়-শিবিরে গিয়া সমবেত হইবার জন্য আদেশ দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রকাশ যে, চাঁদপুর এবং অন্যান্য স্থানের দুর্গতদের আশ্রয়-শিবিরগুলি অনতিবিলম্বে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। অর্থাৎ আশ্রয়প্রার্থীদের এবার হয় নিজেদের বাসগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে, কিম্বা অন্য পথ দেখিতে হইবে। সরকারী সাহায্য আর তাহারা পাইবে না। সহযোগী 'বঙ্গবাসী' বাঙ্গালা সরকারের এই আশ্রয়-শিবির হইতে এই প্রকার দুর্গত (হিন্দু) বিতাড়ন কার্য্য দেখিয়া বলিতেছেন : "দুর্গত ব্যক্তিগণকে তাহাদের নিজ নিজ জেলায় প্রেরণের জন্য গবর্ণমেণ্টের এই 'অতি-উৎসাহের' হেতু আমরা খুঁজিয়া পাইতেছি না। শ্রীযুক্ত গান্ধীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলিয়া মিঃ সুরাবর্দ্দি যে বিবৃতি দিয়াছেন, উহা হইতেই বুঝা যায় যে, উক্ত দুইটি জেলার অবস্থা এখনও সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হয় নাই।"—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়?

বাঙ্গলা সরকার একলা কত দিন এবং কত দুর্গতের ভার বহন করিবেন ? তথাকথিত বিহারী দুর্গতদের প্রতি বাঙলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলী তথা বাঙলা সরকারের যে প্রাথমিক কর্ত্তব্য রহিয়াছে, তাহা তাঁহাদের অবশ্যই পালন করিতে হইবে। নোয়াখালী এবং ত্রিপুরার দুর্গতদের বাঙ্গলা সরকার ডাকিয়া আনেন নাই, কাজেই তাহাদের জন্য বাঙলা সরকার যাহা করিয়াছেন, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া মনে করিতে হইবে। বিহারী দুর্গতদের বাঙলা সরকার দূত পাঠাইয়া নিমন্ত্রণ করিয়া বাঙ্গলায় আনিয়াছেন, কাজেই তাহাদের সকল দায়িত্ব বাঙ্গলা সরকারের পক্ষে পরম কর্ত্তব্য—ইহা সকলেই স্বীকার করিবে।

* * * * * *

'মেদিনীপুর-হিতৈষী' বলিতেছেন : "শুনা যাইতেছে যে, মেদিনীপুর সহরে খাদ্য-রেশন জন্য দেড় লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়ায় রেশন তুলিয়া দিবার কথা হয়। কিন্তু উপরওয়ালাদের পরামর্শ মত ঐ ঘাটতির টাকাটা তুলিবার জন্য আরো দুই বৎসর রেশন বলবৎ থাকিবে। অর্থাৎ ১০৲ টাকা মণ চাল কিনিয়া ১৫ টাকা মণে সহরবাসীকে বিক্রয় করিলে ঘাটতি পূরণ হইবে। ......দরিদ্র সহরবাসীকে এই প্রকারে 'ভাতে মারিয়া' ঘাটতি পূরণ !" 'মেদিনীপুর-হিতৈষী' এত সামান্য ব্যাপারে এমন বিচলিত হইলেন কেন বুঝিলাম না। লীগ সরকার বর্ত্তমানে কেবল দেশ-শাসক নহেন, তাঁহারা চালের মহাজনও যে হইয়াছেন—ইহা ত সকলেরই জানা আছে। লীগ সরকার দরিদ্র জনসাধারণকে, বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুকে আজ কেবল 'ভাতে মারিবার' চেষ্টাই করিতেছেন না, আইন-কানুন পাশের যেমন বহর দেখা যাইতেছে, তাহাতে মনে হয়—বাঙ্গালী হিন্দু, ধনি-দরিদ্র সকলেই, অনতিবিলম্বে ধনে-প্রাণে-মানে, সকল দিক্‌ হইতেই পাকিস্তানী ষ্টীম-রোলারের চাপে নিষ্পেষিত হইবে !

* * * * * *

'প্রদীপ' পত্রিকায় প্রকাশ—"মেদিনীপুর জেলায় ময়না থানার ব্রজবল্লভপুর গ্রামের নিরাশ্রয়া হিন্দু বিধবা পঞ্চমী দাসী নন্দীগ্রাম থানার কৃষ্ণনগর গ্রামের মুসলমান-কবল হইতে সম্প্রতি উদ্ধৃতা হইয়া গত ৫ই মাঘ তারিখে স্থানীয় ১নং ইউনিয়ন হিন্দু মিশন কর্ত্তৃক সুসজ্জিতা ও সম্প্রদত্তা হইয়া নন্দীগ্রামের থানার রাজচক গ্রামের সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য শ্রীহরপ্রসাদ খাটুয়ার সহিত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মিহির-রঞ্জন সাংখ্য-কাব্যতীর্থের পৌরোহিত্যে মহা সমারোহে বিবাহিতা হইয়া হিন্দু সমাজে সম্মানে স্থান পাইয়াছেন।"—চার দিকের নিরাশার মধ্যে ইহা একটি পরম আশাময় সংবাদ। নোয়াখালী অঞ্চলে এইরূপ বহু ভাগ্যহতা নারী বহু কষ্ট ভোগ করিয়া দানব-কবল হইতে কোন ক্রমে উদ্ধার লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদের জন্য মৌখিক সমবেদনা জ্ঞাপন এবং সামান্য অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা ছাড়া অন্য কোন ব্যবস্থা এখনও হয় নাই। এমন সংবাদও পাওয়া যায় যে, নোয়াখালী অঞ্চলের বহু অল্পবয়স্কা আত্মীয়-স্বজনহীনা নারী কলিকাতায় আশ্রয় লাভ করিতে আসিয়া আজ বাধ্য হইয়া এবং ভদ্র ভাবে জীবন যাপনের সুযোগ-সুবিধা না পাইয়া পাপ জীবন যাপন করিতেছে। দেশনেতা এবং সমাজ-সেবীরা এ-সংবাদ নিশ্চয়ই জানেন, কিন্তু অবস্থার প্রতিকারকল্পে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। দানব-কবল হইতে উদ্ধারপ্রাপ্তা নারীর সংখ্যা তথাকথিত উচ্চ সমাজে এবং বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যেও বড় কম নহে, কিন্তু এমন সকল নারীদের বিবাহের সংবাদ পাই কই ? নেতৃবৃন্দ নিজেদের পরিবারেও বিবাহাদি দিয়া থাকেন—কিন্তু তাঁহাদের গৃহে নিগৃহীতা নারী স্থান পায় কি ? নেতাদের বক্তৃতা এবং কাজের মধ্যে মিল ঘটিতে দেখা যায় না। বৃহত্তর হিন্দু সমাজকে বাঁচিতে হইলে আজ কেবল মুখের কথায় এবং অন্যের বেলায় সমাজ সংস্কারের আদর্শ দেখাইলে চলিবে না। নিজেদের কার্য্যাবলীর দ্বারা যদি আমাদের নেতারা দেশের কল্যাণের জন্য মহৎ আদর্শ প্রচার করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের নেতৃত্ব অচিরে অবসান লাভ করিবে। কলিকাতায় নোয়াখালী হইতে আগতা বহুসংখ্যক অল্পবয়স্কা নারী আজ কি ভাবে জীবন যাপন করিতেছে, অবিলম্বে তাহা অনুসন্ধান করা এবং হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

* * * * * *

'পাঞ্চজন্য' বলেন : "বাংলার প্রধান মন্ত্রিরূপে মৌং ফজলুল হক সাহেব যে সমস্ত পরস্পর-বিরোধী ও অর্থহীন উক্তি করিয়াছিলেন, তাহা বাংলার অধিবাসিগণ নিশ্চয়ই বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তিনি নিজেই এক সময়ে তাঁহার ঐ সমস্ত অর্থহীন উক্তির অসারতা উপলব্ধি করিয়া বলিয়াছিলেন,—'আমি ভাবপ্রবণ মানুষ, সুতরাং আমার উক্তির প্রতি যেন অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া না হয়।'—গত কালের কথা আলোচনা করিয়া লাভ নাই, কিন্তু বর্ত্তমানের হক সাহেব যে সকল কথা বলিতেছেন, তাহা কেবল মাত্র এক জন ভাবপ্রবণ মানুষের কথা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। ক্ষমতা লাভের জন্য হক সাহেব যে নোংরা অভিনয় আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা বন্ধ করিবার ব্যবস্থা অবিলম্বে হওয়া প্রয়োজন। নির্দ্দিষ্ট একটা সীমা পর্য্যন্ত উন্মাদের কাজে এবং কথার কোন মূল্য না দিলেও চলে। কিন্তু ঐ সীমা-রেখা অতিক্রম করিয়া গেলে পাগল বৃদ্ধ হইলেও তাহাকে হাতে-পায়ে শিকল পরাইয়া ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যক। পাগল যদি সেয়ানা-পাগল হয় তবে ত কথাই নাই।

* * * * * *

নোয়াখালী অঞ্চলে মহাত্মাজীর পরিক্রমা বিষয়ে 'পাঞ্চজন্য' বলিতেছেন : "বর্ত্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধি নোয়াখালীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে নগ্নপদে ভ্রমণ করিয়া মানুষকে যে বাণী প্রদান করিতেছেন তাহা হইতেছে,—প্রেমের বাণী, সৌভ্রাত্রের বাণী।......কি ভাবে মানুষ সুখে-শান্তিতে বাস করিতে পারে, কি ভাবে সুস্বাস্থ্য লইয়া, শিক্ষা লইয়া এবং দারিদ্র্যকে জয় করিতে পারে, নোয়াখালীর পুরুষদের কি কর্ত্তব্য এবং তথাকার নারীদেরও বা কি কর্ত্তব্য তিনি তাহাই নোয়াখালীর অধিবাসিগণকে জানাইয়া দিতেছেন।" এই সামান্য মানুষটিকে নোয়াখালী হইতে তাড়াইয়া দিবার জন্য মুসলীম লীগ প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন—নেহাৎ দলগত ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির জন্যই। নোয়াখালীতে মহাত্মার প্রচার এবং কার্য্য বন্ধ করিবার এমন প্রচেষ্টা দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা

যায়—লীগের বাণী—মানুষে মানুষে অপ্রেম কারণ বিচ্ছেদ এবং হিংসার প্রচারেই তাহার স্থায়িত্ব নির্ভর করে। নোয়াখালী তথা সমগ্র বাংলার সাম্প্রদায়িক বিকারগ্রস্ত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় যদি আজ হঠাৎ সহজ মানুষের সহজ বুদ্ধি-বিবেচনা ফিরিয়া পায়, তাহা হইলে লীগের চলিবে কেমন করিয়া?

* * * * * *

গত ২১এ ফেব্রুয়ারী শ্রীরামপুর মহকুমার বিভিন্ন স্থানের ২৫০ জন তন্তুবায় সুতা সরবরাহ ও হাওড়া হাট খুলিবার দাবীতে এস-ডি-ওকে ঘেরাও করেন। তাঁহারা বলেন যে, অবিলম্বে সুতা সরবরাহ না হইলে স্ত্রী-পুত্র লইয়া তাঁহাদের অনশনে কাটাইতে হইবে। উত্তরে এস্-ডি-ও সাহেব বলেন—"আপনারা বিবাহ করেন কেন? আর কেহ বিবাহ করিবেন না, তাহা হইলেই 'ভাতের অভাব' মিটিবে।" তাঁতীদের দাবীর জবাব বাংলার প্রজাপালক লীগ সরকারের সুদক্ষ রাজকর্ম্মচারীর উপযুক্তই হইয়াছে। নিজে পরম আরামে এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত বহু গুণ বিলাস-দ্রব্যে ভাণ্ডার পূর্ণ রাখিয়া জীবন যাপন করিবার সর্ব্ববিধ নিরাপদ ব্যবস্থা করিয়া, অনাহারে মৃতপ্রায় দুঃখী মানুষদের এই প্রকার পরিহাস সত্য সত্যই উপভোগ করিবার মত। দুর্গত জনগণের ন্যায্য দাবী এড়াইবার এই প্রকার অভিনব প্রচেষ্টাও আশা করি সরকারী ভাবে স্বীকৃত হইবে এবং এই প্রাজ্ঞ এস-ডি-ওকে যথাযোগ্য পুরস্কার দান করা হইবে। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক মহকুমায় এই রকম সুদক্ষ এবং কুশলী এস-ডি-ও বহাল হইলে বাঙ্গলা দেশের সকল অভাব অচিরে দূরীভূত হইবে—ইহাতে সন্দেহ নাই। 'ভাতের অভাব' দূর করিবার এই পরম বিচিত্র উপায়টি আশা করি এখন হইতে সর্ব্বত্র বহুল প্রচার করা হইবে। প্রয়োজন হইলে ইহার পক্ষে আইনও পাশ করা যাইতে পারে। বাংলা আইন সভায় বর্ত্তমানে যে "স্বর্গীয়" মেজরিটি রহিয়াছে, তাহাতে যে-কোন আইন পাশ করান ত মাত্র কয়েক ঘণ্টার কাজ। ইতিপূর্ব্বে 'গাঁড়ল' কথাটি আমাদের কাছে abstract ছিল। এত দিনে শ্রীরামপুরে ইহার concrete রূপ দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলাম!

* * * * * *

'যুগান্তর' বলিতেছেন: "জনৈক তপশীলী সদস্য দাঙ্গার ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে মন্তব্য করিয়া বলেন যে, দাঙ্গা-বিধ্বস্ত নর-নারীর ক্ষতিপূরণে বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী যে শয়তানী চালাইতেছেন, তাহার দ্বারা তপশীলীদের ভাঁওতা দেওয়া যাইবে না।······দু'-একটি সাক্ষী-গোপাল মন্ত্রী বা পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারীকে সম্মুখে রাখিলেই সত্য গোপন করা যায় না। তথ্য হইতেই ধাপ্পা ধরা পড়িয়া যায়। এক মাত্র কুমিল্লা জেলার প্রায় তিনটি ইউনিয়নে তপশীলীভুক্ত শ্রেণীর আড়াই হাজার পরিবার গত দাঙ্গা উপলক্ষে বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে মাত্র ৩ শত পরিবার সরকারী সাহায্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।" অথচ পরম মাননীয় কেন্দ্রীয় সরকারের আইন-সদস্য শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন মণ্ডল দাঙ্গার কিছু কাল পরে নোয়াখালী, কুমিল্লা অঞ্চল ভ্রমণ করিয়া ইস্তাহার জারি করেন যে, লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলপ্রসূত দাঙ্গায় কোন তপশীলী কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। মোড়ল মহাশয় নিজের মন্ত্রিত্ব-সৌভাগ্যকে বোধ হয় তপশীলীদের সকলের বাপ-ঠাকুরদাদার পরম সৌভাগ্য বলিয়াই মনে করেন—তাই সামান্য ক্ষতি তাঁহার হিসাবে ধরা পড়ে না!

* * * * * *

পূর্ব্বাঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে ২০ হাজার টন চাউল সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে এজেন্ট নিয়োগের জন্য বাঙ্গলা সরকার অনুমোদিত ব্যবসায়ীদের নিকট হইতে আবেদনের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। কমিশনের ভিত্তিতে এজেন্সী পাইবার জন্য যে সব ব্যবসায়ী দরখাস্ত করেন, তাহার মধ্যে, নিম্নতম কমিশনে (মণ প্রতি পাঁচ পয়সা হারে) এজেন্সী গ্রহণ করিতে একটি হিন্দু ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান রাজী ছিলেন। পাঠক হয়ত মনে করিতেছেন—নিম্নতম হারে যে প্রতিষ্ঠান কাজ করিতে রাজী, এজেন্সী তাহাকেই দেওয়া হয়। স্বাভাবিক ব্যবসায় এবং ন্যায়ের বিচারে হয়ত তাহাই হইত। কিন্তু বর্ত্তমান বাঙ্গলার লীগ সরকার এজেন্সী দিয়াছেন কলিকাতার আমড়াতলায় একটি অবাঙ্গালী কিন্তু মুসলীম প্রতিষ্ঠানকে—এবং তাহাও বর্দ্ধিত কমিশনের হারে! এই মুসলীম প্রতিষ্ঠানকে মণ প্রতি দুই আনা কমিশন বাঙ্গলা সরকারকে দিতে হইবে। সর্ব্বাপেক্ষা মজার কথা এই যে—যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান চাউলের ব্যবসা করিয়া চুল পাকাইয়াছেন, তাহাদের বাদ দিয়া চাউলের এজেন্সী দেওয়া হইল এমন একটি অবাঙ্গালী মুসলীম প্রতিষ্ঠানকে—যে পূর্ব্বে কখনও ধান বা চাউলের ব্যবসা করে নাই! ব্যবসার ক্ষেত্রে লীগ সরকারের পাকিস্তানী বিচার দেখিয়া বিস্মিত হই নাই, কারণ বর্ত্তমানে অবস্থা এমনই হইয়াছে যে—যাহা-হওয়া-উচিত, তাহা-ঘটিতে দেখিলেই আমরা বিস্মিত ও বিচলিত হইয়া পড়ি! বাঙ্গলা সরকার মুসলীম প্রতিষ্ঠানকে প্রতিপালন করিবার জন্য মণ-প্রতি যে তিন পয়সা বেশী দিবার ব্যবস্থা করিলেন, তাহা অবশ্যই অধুনা পুনর্জীবন-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত গৌরী সেনের তহবিল হইতেই দেওয়া হইবে, কাজেই বাঙ্গলার দরিদ্র কর-দাতাদের চিন্তার কোন কারণ নাই।

* * * * * *

"কুশাসন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী রেকর্ড স্থাপন করিয়াছেন। এ বৎসরের অধিবেশনে তাঁহারা চৌদ্দটি অর্ডিনান্সকে আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন।··········অর্ডিনান্সের মেয়াদ ছয় মাস উত্তীর্ণ হয় বলিয়া উহাকে আরও ছয় মাস এবং প্রয়োজন বোধে এক বৎসরের জন্য সাময়িক ভাবে আইনে পরিণত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।··········ব্যবস্থা পরিষদে দুই ধারা সম্বলিত বিলে দশটি অর্ডিনান্সের মধ্যে নয়টি অর্ডিনান্স আইনে পরিণত করা হইয়াছে। একটি অর্ডিনান্স বাঙ্গলা সরকার নিজেরাই তুলিয়া লইয়াছেন। এই অর্ডিনান্সের নাম নোয়াখালী ও ত্রিপুরা অঞ্চল নিরাপত্তা অর্ডিনান্স।" 'যুগান্তরে'র একটি সম্পাদকীয় মন্তব্য হইতে অংশবিশেষ উদ্ধৃত করিলাম। বাঙ্গলার লীগ সরকার আইন-সভায় লীগের স্বর্গীয়

মেজরিটির সাহায্যে প্রায় অপ্রয়োজনীয় সওয়া-দুই গণ্ডা অর্ডিনান্স নিজেদের সুবিধার্থে পাশ করাইলেন এবং সেই স্বর্গীয় মেজরিটির সাহায্যেই একান্ত প্রয়োজনীয় একটি অর্ডিনান্স দলীয় চাপে এবং ভীতি-প্রদর্শনের ফলে তুলিয়া লইতে বাধ্য হইলেন। স্থান-কাল-পাত্র-ভেদে লীগের নীতি-ভেদও দেখিবার জিনিষ! পাঞ্জাব প্রদেশে তথাকথিত ব্যক্তি-স্বাধীনতার বুলি আওড়াইয়া লীগ সরকারের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের অনুকরণে ব্যর্থ অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের লীগপন্থী এবং লীগ-পত্রিকা এই আন্দোলনের সাধুবাদ প্রচার গলা ফাটাইয়া করেন। বাঙ্গলার লীগ সরকার এখন ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণের জন্য নানা প্রকার অর্ডিনান্স জারি করিতেছেন—। এই অবস্থায় বাঙ্গলা দেশের জনসাধারণ যদি পাঞ্জাবের মত অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করে, তাহা হইলে মুসলীম লীগ নিশ্চয়ই সেই আন্দোলনকে সকল প্রকারে সাহায্য করিবেন!

* * * * * *

কলিকাতা শহরে রহস্যজনক হত্যাকাণ্ড একটির পর একটি ঘটিয়া যাইতেছে—কিন্তু কলিকাতার ছাত্র-বিদ্রোহদমনকারী পরম শক্তিমান্ পুলিস এই সকল হত্যা-কাণ্ডের কোন কিনারা করিতে পারিতেছে না। এডিথ ঘোষের হত্যা, সাহা-পরিবারের ছয় জনের গুণ্ডা-হস্তে প্রাণদান, পুলিশ-ফটোগ্রাফার ইন্দু বাবুর রহস্যজনক মৃত্যু, সর্বশেষে ট্রাণ্ড রোডে রিভলবারের গুলীতে রামসেবক পানওয়ালার জীবনান্ত! 'যুগান্তর' এ বিষয়ে মন্তব্য করিতেছেন: "কলিকাতার অলিতে গলিতে যে নরহন্তাদের কতগুলি ঘাঁটি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং তাহারা যে কখনো দলবদ্ধ ভাবে, কখনো একক ভাবে ইতস্ততঃ খুনের ব্যবসা চালাইতেছে, ইহা আজ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। যুদ্ধের সময় কলিকাতা হইতে যে গুণ্ডাদলকে বহিষ্কৃত করা হইয়াছিল, যুদ্ধান্তে তাহারা আবার স্বস্থানে ফিরিয়াছে, দাঙ্গার উত্তাপে আবার নূতন করিয়া গুণ্ডা-বাহিনীও গড়িয়া উঠিয়াছে—এ অবস্থায় এরূপ ব্যাপার যে নিত্য-নিয়মিত ঘটিবে ইহাতে বিস্ময়ের কি আছে?"—না, বিস্ময়ের কিছুই নাই। এ বিষয়ে অযথা শোভান সাহেবকেও দোষ দিয়া লাভ নাই, কারণ তিনি চেষ্টা করিতেছেন কলিকাতায় আর যাহাতে দাঙ্গাহাঙ্গামা না ঘটে। শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসও তিনি পাইতেছেন। কলিকাতা-গুপ্তহত্যা এবং গুপ্ত চোরা-কারবারীদের দমন করিবার ভার তাঁহার উপর নাই।

দৃষ্টিপাত

প্রেমেন্দ্র মিত্র

রাতারাতি দিগ্বিজয় করে ফেলার মত বই সাহিত্যের ক্ষেত্রে হামেশা দেখা দেয় না। কচিৎ কদাচিৎ এ-রকম ঘটনা ঘটে। গত কয়েক বছরের মধ্যে বাংলা সাহিত্যে দু'খানি এ-রকম বই কিন্তু দেখা দিয়েছে এবং সত্যিই প্রথম দর্শনেই এই দু'খানি বইএর সঙ্গে আমি প্রেমে পড়েছি—এ বই দু'টির একটি হ'ল "জাগরী" আর একটি "দৃষ্টিপাত"।*

সাহিত্যিকের পরিণতি সাধারণতঃ "ম্যামেলিয়ান" অর্থাৎ স্তন্যপায়ী গোষ্ঠীর জীবন-ধর্ম'ই অনুসরণ করে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্দ্ধক্য, সব ক'টি স্তরই সে পরিণতিতে পরিদৃশ্যমান। একেবারে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের মত পূর্ণ তেজে প্রথম থেকেই আত্মপ্রকাশের যে ক'টি বিরল দৃষ্টান্ত আছে এ বই দু'খানি কিন্তু তারই অন্তর্ভুক্ত।

এ বই দু'খানির লেখকদের সাহিত্যিক শৈশব ও কৈশোর অবশ্যই ছিল কিন্তু নেপথ্যেই তা' সমাধা করে তাঁরা একেবারে পূর্ণ যৌবনে আমাদের দেখা দিয়েছেন। এ রকম ক্ষেত্রে বই পড়ার পরিতৃপ্তির সঙ্গে লেখকের পরিচয় সম্বন্ধে অদম্য কৌতূহল মিশে থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু "জাগরীর" বেলায় যদি বা লেখকের নামটুকু জানতে পারি, "দৃষ্টপাতে"র লেখক তাঁর রচনাটিকে আমাদের সামনে ধরে ছদ্মনামের আড়ালে নিজেকে একেবারে বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। তাঁর পরিচয় এই বিলুপ্তি থেকে উদ্ধারের যেটুকু ক্ষীণ আশা ছিল প্রকাশকের নিবেদন তার ওপরেও চিরন্তন যবনিকা টেনে দিয়েছে।

বাইরের পরিচয় না পাওয়া গেলেও "দৃষ্টিপাতের" লেখকের ভেতরকার পরিচয় বইখানির সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। প্রথমেই এ বইখানির যে বিশেষত্বটি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা' হলো লেখকের মনের বিস্তৃতি। উচু দরের ক্যামেরার মত তাঁর মন অতি নিকট থেকে অনেক দূর, প্রত্যক্ষ বর্ত্তমান থেকে সুদূর অতীত পর্য্যন্ত অনায়াসে এক মুহূর্ত্তে সুস্পষ্ট ভাবে ফোকাস্ করে ধরে। সাহিত্যিক সব ক'টি ইন্দ্রিয় সমান সজাগ বলে কোন কিছুই যেমন তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না তেমনি যা' গোচর তা' মুখরোচক করবার কৌশলও তাঁর আয়ত্ত।

ভারতের রাজধানীর কয়েকটি বিশেষ দিন এ বইখানি লেখার প্রেরণা জুগিয়েছে বলা যেতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বইখানিতে বিষয়-বস্তুই লক্ষ্য নয়, উপলক্ষ মাত্র। "দৃষ্টিপাতে"র পেছনে যে সবল সমৃদ্ধ সদা'জাগ্রত মনের হদিশ পাই,—ভারতের রাজধানীর বদলে যে কোন নগণ্য স্থান ও কাল নিয়ে তা' এমনি পরম উপাদেয় রস সৃষ্টি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। সার্থক হলেও একটি মাত্র রচনায় শুধু একবার দীপ্ত হয়ে উঠে এই প্রতিভা চির-কালের মত নির্ব্বাপিত হয়ে গেছে ভাবতে সত্যি বেদনা পাই।

* দৃষ্টপাত—যাযাবর। প্রকাশক—নিউ এজ পাবলিশার্স, ২২নং ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা, দাম,—তিন টাকা।

এম ডি, ডি,

অষ্ট্রেলিয়াতে এম, সি, সি, দলের পরিচয় :—

বিংশ খেলা :—

চতুর্থ টেষ্ট খেলা—এডিলেডে অনুষ্ঠিত চতুর্থ টেষ্ট খেলায় অমীমাংসার ফলে অষ্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আলোচ্য পর্য্যায়ে রাবার জয়ের গৌরব লাভ করে। এই খেলায় উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে অন্যতম—ব্র্যাডম্যানের প্রথম ইনিংসে প্রথম বলে বিদায় গ্রহণ। কম্পটন ও মরিস যথাক্রমে উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হয়। মরিসের এই খেলাতে উপর্য্যুপরি তৃতীয় টেষ্ট সেঞ্চুরী সংগৃহীত হয়। যুগপৎ উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী সম্পাদন টেষ্ট ক্রিকেট ইতিহাসে দশ বার সম্ভব হইয়াছে। ১৯২৯-৩০ এবং ৩০ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ওয়েষ্ট ইণ্ডিজের হেডলী এবং ১৯২২-২৩ সালে ইংলণ্ডের হইয়া সাটক্লিফ এবং ১৯৩৮-৩৯ সালে সেন্টার দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অনুরূপ কৃতিত্ব দাবী করে। মরিসের এ বৎসর প্রথম শ্রেণীর খেলায় সহস্রাধিক রাণ পূর্ণ হয়। ইংলণ্ডের প্রথম জুটিতে হাটন ও ওয়াসব্রুক উভয় ইনিংসে শতাধিক রাণ সংগ্রহ করিয়া ১৯২৪-২৫ সালে সিডনী মাঠে হবস ও সাটক্লিফের প্রতিষ্ঠিত রেকর্ডের সমকক্ষতা করে। উক্ত খেলায় উভয় ইনিংসে এই জুটিতে যথাক্রমে ১৫৭ ও ১১০ রাণ গৃহীত হয়। অষ্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংসে মরিস ও হ্যাসেট্ তৃতীয় উইকেটে ১৮৯ রাণ সংগ্রহ করিয়া খেলার গতি পরিবর্ত্তন করে। শেষ দিনে ট্যালন মোট ২৮২ রাণের মাথায় ইভ্যান্সকে আউট করার সহজ সুযোগ নষ্ট না করিলে ইংলণ্ড কোন ক্রমেই মান রক্ষা করিতে পারিত না। অপূর্ব্ব দৃঢ়তা অটুট মনোবলই কম্পটন ও ইভ্যান্সের ঐতিহাসিক জুটির অবলম্বন হয় এবং মাত্র সওয়া তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে মোট ৩১৪ রাণের জন্য অষ্ট্রেলিয়া অসাধ্য সাধনে তৎপর হয়। শেষ পর্য্যন্ত তাহারা ১টি উইকেট লইয়া মাত্র ৯৯ রাণে পশ্চাৎপদ থাকিলে সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়।

রাণ-সংখ্যা :—

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৪৬০ (কম্পটন ১৪৭, হাটন ১৪, হার্ডষ্টাফ ৬৭, ওয়াসব্রুক ৬৫, লিণ্ডওয়াল ৫২ রাণে ৪টি, ডুল্যাণ্ড ১৩৩ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৮ উইকেটে ৩৪০ (কম্পটন নট্ আউট্ ১০৩, হাটন ৭৬, এডরিচ ৪৬)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৪৮৭ (মরিস ১২২, মিলার নট্ আউট্ ১৪১, হ্যাসেট ৭৮, জনসন ৫২, বেডসার ৯৭ রাণে ৩টি, রাইট ১৫২ রাণে ৩টি ও ইয়ার্ডলী ১০১ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ২১৫ (মরিস নট্ আউট্ ১২৪, ব্র্যাডম্যান নট্ আউট্ ৫৬)

একবিংশ খেলা :—

বেণ্ডিগোতে ভিক্টোরিয়া পল্লী একাদশের বিরুদ্ধে এম, সি, সি, দলের দুই দিনব্যাপী খেলা অমীমাংসিত ভাবে শেষ হয়।

রাণ-সংখ্যা :—

ভিক্টোরিয়া পল্লী একাদশ—১ম ইনিংস—২৬৮ (ডগলাস ব্রাউন ৬২, ট্রিফেল ৪০, ভোস ২৮ রাণে ৩টি, স্মিথ ৭০ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ৭০ (কাহিল ৩৫, পোলার্ড ৭ রাণে ২টি, স্মিথ ১০ রাণে ২টি)

এম, সি, সি,—১ম ইনিংস—২৮৮ (ইভ্যান্স ৮২, গিব ৬৯, কম্পটন ৬১, প্রামাব ৬৮ রাণে ৪টি)

দ্বাবিংশ খেলা :—

অষ্ট্রেলিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট-প্রতিযোগিতা সেফিল্ড শীল্ডবিজয়ী ভিক্টোরিয়া দলের সহিত এম, সি, সি, দলের দ্বিতীয় খেলা অমীমাংসিত থাকিয়া যায়। প্রথম খেলায় এম, সি, সি, দল ২৪৪ রাণে জয়ী হইয়াছিল। ভিক্টোরিয়া দলে আট জন টেষ্ট খেলোয়াড় যোগদান করে। আলোচ্য খেলায় মোট ৪ ঘণ্টা ৪০ মিনিট অপূর্ব্ব ধৈর্য্য ও সংযমের সহিত খেলিয়া হ্যাসেট ১২৬ রাণ করে। এম, সি, সি, দলের বিরুদ্ধে এই সফরে হ্যাসেটের এইটি দ্বিতীয় সেঞ্চুরী। এই খেলার তৃতীয় দিনে বৃষ্টির জন্য মাত্র ৪০ মিনিট খেলা সম্ভব হয়।

রাণ-সংখ্যা :—

এম, সি, সি,—১ম ইনিংস—৩৫৫ (কম্পটন ৯৩, ইকীন ৭৯, সিমসন ৫১, ইভ্যান্স নট্ আউট্ ৪১, মিলার ৬৩ রাণে ৪টি, ট্রাইব ১৪২ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—১১৮ (ইয়ার্ডলী ২৮, হার্ডষ্টাফ ২৬, ট্রাইব ৪৯ রাণে ৬টি, রিং ৩৬ রাণে ২টি)

ভিক্টোরিয়া—১ম ইনিংস—৩২৭ (হ্যাসেট ১২৬, হার্ভে ৬৯, ট্রাইব ৬০, রাইট ১০৮ রাণে ৪টি)

ত্রয়োবিংশ খেলা :—

বৃষ্টির জন্য চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের পর আর খেলা সম্ভব না হওয়ায় নিউ সাউথ ওয়েলস বনাম এম, সি, সি, দলের খেলার চরম নিষ্পত্তি হয় নাই। নিউ সাউথ ওয়েলসের প্রথম ইনিংসে পিটার স্মিথ একাই ৯টি উইকেট দখল করিয়া অষ্ট্রেলিয়াতে এম, সি, সির পক্ষে বোলিংয়ে অভিনবত্বের সন্ধান দেয়। স্থানীয় এসোসিয়েশন তাহার বোলিং-নৈপুণ্যের জন্য বলটি বাঁধাইয়া ও নামাঙ্কিত করিয়া তাহাকে উপহার দেয়।

রাণ-সংখ্যা :—

নিউ সাউথ ওয়েলস—১ম ইনিংস—৩৪২ (লিউ কম্যান ৭০, কার্মোডী ৬৫, স্মিথ ১২১ রাণে ৯টি)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ২৬২ (মরিস ৪৭, লিউ কম্যান ৪৫, স্মিথ ৯৭ রাণে ৩টি)

এম, সি, সি,—১ম ইনিংস—২৬৬ (কম্পটন ৭৫, জনসন ৫১ রাণে ৩টি, টোসাক ৮৩ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৩ উইকেটে ২০৫ (হাটন ৭২, কম্পটন নট্ আউট্ ৭৪)

★ তিমিরবরণ ভট্টাচার্য ১৯১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম থেকেই তিনি সরোদ শিখতে আরম্ভ করেন এবং মাত্র ১৮ বছের বয়সেই এই যন্ত্রে অপূর্ব দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি ওস্তাদ আমীর খাঁ ও আলাউদ্দীন খাঁর ছাত্র। তিমিরবরণ ১৯৩০ সালে উদয়শঙ্করের শিল্পীসংঘে যোগদান করেন এবং তাঁর সঙ্গেই আমেরিকা, বৃটেন এবং ইউরোপের সর্বত্র পরিভ্রমণ করেন। সে সব দেশে সঙ্গীতের গুণগ্রাহী মাত্রেই তিমিরবরণের প্রতিভার প্রশংসা করেছেন। ভারতীয় সঙ্গীতে ঐকতানবাদনের একজন অভিনব পথপ্রদর্শক হিসেবে তিমিরবরণ যথেষ্ট খ্যাতি ও সমাদর লাভ করেছেন।
তিমির বরণ... সুরশিল্পী
প্রখ্যাত সুরকার তিমিরবরণ সুর-সংমিশ্রণের একটি অভিনব ধারা প্রবর্তন করে' ভারতীয় ঐকতান সঙ্গীতকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। চা সম্বন্ধে তিনি বলেন:
'কল্পনার তারে যে নব নব সুরের অস্পষ্ট গুঞ্জন ধ্বনি শুনি তাকে যন্ত্রের তারে বেঁধে পরিপূর্ণ রূপে ঐকতানের ছন্দে ঝঙ্কৃত করে' তুলতে চা আমাকে অনেকখানি প্রেরণা দেয়।'
চা
প্রেরণার উৎস
ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত
IK 28D

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

মস্কো সম্মেলনের পটভূমি—

সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি আজ মস্কোর প্রতি নিবদ্ধ হইয়াছে। ১০ই মার্চ্চ হইতে সোভিয়েট রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরে জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটিশ, মার্কিণ, ফরাসী এবং সোভিয়েট পররাষ্ট্র-সচিবদের যে সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে সমগ্র পৃথিবীর শান্তি ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ উহারই সাফল্য বা ব্যর্থতার উপরেই নির্ভর করিতেছে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন ভাইস-প্রেসিডেন্ট মিঃ হেনরী এ ওয়ালেস 'নিউ রিপাবলিক' পত্রিকায় মস্কো সম্মেলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, এই সম্মেলন মানব জাতির ইতিহাসে হয় বৃহত্তম সাফল্য হইবে, না হয় হইবে বৃহত্তম ব্যর্থতা। এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার অর্থ স্থায়ী শান্তি এবং সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার অর্থ পরিণামে আর একটি মহাসমর। মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শাল মস্কো পৌঁছিয়া বলিয়াছেন—"অতীতে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের মধ্যে বহু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সেগুলি অতিক্রম করা অসম্ভব হয় নাই। জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়া সম্পর্কেও যে তাঁহারা এক-মত হইতে পারিবেন, সে সম্বন্ধেও তাঁহার কোন সন্দেহ নাই।" তিনি আরও বলেন, মস্কো সম্মেলনে আমেরিকার প্রধান লক্ষ্য হইবে চতুঃশক্তি চুক্তি সম্পাদন। গত বৎসর প্যারী সম্মেলনে মিঃ বার্ণেস চতুঃশক্তি চুক্তি সংক্রান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন বলিয়াছেন,—"আগামী কয়েক দিন আমরা এমন এক পূর্ণ ও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিব যাহার ফলে ভবিষ্যৎ আক্রমণ ও যুদ্ধ নিবারিত হইবে এবং সারা জগৎ শান্তিতে ও নিরাপদে থাকিবে।" কিন্তু শুভ ইচ্ছা প্রকাশ করা আর ইচ্ছাকে আন্তরিকতার সহিত কার্য্যে পরিণত করার চেষ্টা করা যে এক জিনিষ নয়, যুদ্ধের পর হইতে তাহা আমরা ভাল করিয়া চতুঃশক্তির কার্য্যকলাপের মধ্যে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি। পারস্পরিক সন্দেহের কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই, কিন্তু উহার মূল কি রাজনৈতিক বাস্তব অবস্থার মধ্যেই নিহিত রহে নাই?

মস্কো সম্মেলনের উদ্যোগপর্ব্ব হিসাবে লণ্ডনে বৃহৎ রাষ্ট্র-চতুষ্টয়ের পররাষ্ট্র-সচিবদের স্পেশাল ডেপুটীদের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। এই সম্মেলন সম্পর্কে অতি সামান্য বিবরণই প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে স্পেশাল ডেপুটীরা একমত হইতে পারেন নাই। অষ্ট্রীয়ার নিকট যুগোশ্লাভিয়ার দাবী এবং অষ্ট্রীয়ার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহারা একমত না হইতে পারিলেও অন্যান্য বিষয়ে মোটামুটি রকম মতৈক্য হইয়াছে। জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির সর্ত্ত-সম্বন্ধে প্রধান বাধা উপস্থিত হইয়াছে জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ গবর্ণমেন্ট কিরূপ হইবে তাহা লইয়া। সোভিয়েট রাশিয়া সমগ্র জার্ম্মাণীর জন্য ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট দাবী করিয়াছে। কিন্তু বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্স চায় জার্ম্মাণীকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত করিয়া উহাদের হাতে ব্যাপক ক্ষমতা দিতে এবং কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট শুধু নামে মাত্র কেন্দ্রীয় গবর্ণমেন্ট হইয়া থাকিবে। জার্ম্মাণী আবার প্রবল শক্তিশালী হইয়া আক্রমণ করিবে, এই আশঙ্কা নিবারণের উপায় লইয়া এই মতভেদ হয় নাই। মার্কিণ স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ মার্শালের পরামর্শদাতা জন ডুলেস তো প্রকাশ্য ভাবেই পশ্চিম-জার্ম্মাণীর মূল শিল্পগুলিকে ভিত্তি করিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপকে সঙ্ঘবদ্ধ করিবার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ, রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে একটা সঙ্ঘবদ্ধ প্রচারকার্য্য চলিতেছে, নানা ভাবেই তাহার পরিচয় পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

বল্‌কানে, মধ্য-প্রাচীতে, সুদূর-প্রাচ্যে রাশিয়ার সাম্রাজ্য বিস্তারের মতলবের কথা লুই ফিসার প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখিয়া প্রচার করিতেছেন। সেদিন মিঃ হার্বার্ট হুভার মার্কিণ সেনেটরদের এক ঘরোয়া বৈঠকে বলিয়াছেন যে, রাশিয়া যদি ইচ্ছা করে, তাহা হইলে তাহার সৈন্যবাহিনী ৩০ দিনের মধ্যে অনায়াসে ইউরোপের সমস্ত শক্তিকে বিপর্য্যস্ত করিতে পারে। রুশ পররাষ্ট্র-নীতির বিরুদ্ধে মার্কিণ সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ একিসনের অভিযোগও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। হাঙ্গেরীতে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ উপস্থিত করা হইয়াছে। রুশ-অধিকৃত কোরিয়া রাশিয়া কোরিয়াবাসীদিগকে বাধ্যতামূলক ভাবে সৈন্যবিভাগে গ্রহণ করিতেছে বলিয়াও অভিযোগ করা হইয়াছিল। রাশিয়া অবশ্য তাহার প্রতিবাদ করিয়াছে। পরমাণবিক বোমা সম্বন্ধে আমেরিকার প্রস্তাব শুধু রাশিয়ার বিরুদ্ধে আমেরিকাকে প্রবল শক্তিশালী করিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই। এই পটভূমিতে মস্কো সম্মেলন কতখানি সাফল্যমণ্ডিত হইবে তাহা বলা কঠিন। কিন্তু রাশিয়া যে বৃটেন ও আমেরিকার সহিত মৈত্রী রক্ষা করিয়া চলিতে চায় নিউইয়র্কে পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে তাহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। মস্কো সম্মেলনে অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে মতৈক্য হওয়া হয়তো সম্ভব হইবে। কিন্তু জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে মতৈক্য হওয়ার জন্য আরও ২।৩টি সম্মেলন হওয়ার প্রয়োজন হইবে বলিয়া মনে হয়।

গুপ্ত নাৎসী আন্দোলন—

জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ এলাকায় এক নাৎসী গুপ্ত প্রতিষ্ঠানে হানা দিয়া ঐ এলাকাদ্বয়ের সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের গোয়েন্দা কর্তৃপক্ষ নাৎসী গুপ্ত আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করিয়াছেন। এই নাৎসী গুপ্ত সমিতি রাশিয়ার বিরুদ্ধে সমগ্র ইউরোপে নেতৃত্ব করিবার উদ্দেশ্যে বীজাণু যুদ্ধের আয়োজন করিয়া জার্ম্মাণ রাষ্ট্র, সৈন্যবাহিনী ও একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক বিরাট পরিকল্পনা গ্রহণ

করিয়াছিল। নাৎসী ঝটিকা-বাহিনীর বহু প্রাক্তন অফিসার এই গুপ্ত সমিতির সদস্য হইয়াছিলেন। চোরাবাজারের কারবার ছিল তাহাদের জীবিকা অর্জ্জনের উপায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ এলাকায় নাৎসী উচ্ছেদ-কার্য্য সুষ্ঠু ভাবে পরিচালিত হইতেছে না বলিয়া সোভিয়েট রাশিয়া একাধিক বার অভিযোগ করিয়াছে। ইউরোপীয় সমস্যা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য একটি আন্তর্জ্জাতিক কমিটি গঠিত হইয়াছিল। বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ডেনমার্ক এবং হল্যাণ্ড এই পাঁচটি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি এই কমিটিতে ছিলেন। জার্ম্মাণী সম্পর্কে তাঁহাদের রিপোর্ট গত ২৫শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, জার্ম্মাণীর বৃটিশ, ফরাসী এবং মার্কিণ অঞ্চলে নাৎসী উচ্ছেদ-কার্য্যের ত্রুটির জন্য নাৎসী দল জার্ম্মাণীর পরাজয়ের প্রথম আঘাত ধীরে ধীরে সামলাইয়া উঠিয়াছে এবং মিত্রশক্তিবর্গ জার্ম্মাণীতে যে সকল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন, সেগুলি দখল করিয়া পুনরায় ক্ষমতা অর্জ্জনের জন্য গোপনে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে। তাঁহারা আরও বলেন যে, সমগ্র জার্ম্মাণীতেই নাৎসী প্রতিষ্ঠান বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তাঁহাদের শক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছে। গুপ্ত নাৎসী প্রতিষ্ঠানে হানা যে এই রিপোর্টেরই পরিণাম তাহাতে সন্দেহ নাই।

শুধু জার্ম্মাণীতেই নয়, জার্ম্মাণীর বাহিরেও নাৎসী দলের কর্ম্ম-তৎপরতা সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। ওয়াশিংটন হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখের সংবাদে প্রকাশ, সিনেটে সশস্ত্র বাহিনী কমিটির (Armed Services Committee) রিপোর্টের জার্ম্মাণীর বাহিরে নাৎসী দলের কর্ম্মতৎপর ৪০ হাজার সদস্যের নাম রহিয়াছে। এই রিপোর্টে বলা হইয়াছে, মার্কিণ-অধিকৃত জার্ম্মাণ এলাকায় যে-সকল দলীলপত্র সংগৃহীত হইয়াছে তাহাতেই এ-সকল নাৎসী সদস্যের নাম পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেকে পূর্ব্বে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল ও মালয়ে ছিল এবং অনেকে এখনও ঐ সকল দেশে রহিয়াছে। লণ্ডন হইতে প্রেরিত ১লা মার্চ্চের সংবাদে প্রকাশ, নূতন নাৎসী গুপ্ত প্রতিষ্ঠানে আট শত জন সদস্যকে যে গ্রেফ্‌তার করা হইয়াছে তাহার কারণ বর্ণনা-প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সমস্যা সংক্রান্ত আন্তর্জ্জাতিক কমিটির সাধারণ সম্পাদক ফরাসী বিজ্ঞানী ডাঃ বরার্ট বোরেল নাৎসীদের ভয়াবহ ধ্বংস-পরিকল্পনা আবিষ্কৃত হওয়ার কথা বলিয়াছেন। আর্জ্জেণ্টাইন এবং সুইজারল্যাণ্ডে এই নাৎসী গুপ্ত প্রতিষ্ঠানের বহু সম্পত্তি রহিয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানটি সভ্যতার উপর ভয়াবহ আঘাত হানিবার জন্য একটি নূতন পরিকল্পনা গঠন করিতেছিল। সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার, শস্য ও গবাদি পশুর ধ্বংস-সাধনও ছিল এই পরিকল্পনার অঙ্গ। রুশ-ভীতি প্রচারের উর্ব্বর ক্ষেত্রেই যে এই গুপ্ত নাৎসী দল জীবনীশক্তি সংগ্রহ করিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

বৃটেন ও আমেরিকা—

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বার্ণার্ড শ তাঁহার 'এ্যাপল কার্ট' (Apple Cart) নামক নাটকে বৃটেনকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম একটি রাষ্ট্র হইয়া থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা বলিয়াছিলেন। বার্ণার্ড শ-সুলভ ব্যঙ্গোক্তি ছাড়া উহার উপর কেহ-ই বোধ হয় কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। কিন্তু জর্জ্জিয়ার 'আটলাণ্টা কনষ্টিটিউশন' পত্রিকায় এই মর্ম্মে এক বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে যে, সেনেটর রিচার্ড রাসেল (ডেমোক্রাট, জর্জ্জিয়া) ইংলণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়র্ল্যণ্ড এবং ওয়েলসকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ৪৯তম, ৫০তম, ৫১তম, এবং ৫২তম রাষ্ট্র হইয়া থাকিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি আরও প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ-আফ্রিকার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত কোন না কোন আকারে ইউনিয়ন গঠন করা উচিত। এইরূপ প্রস্তাব যতই অবাস্তব বলিয়া মনে হউক না কেন, সেনেটর রাসেল মনে করেন যে, ৪০ অথবা ৫০ বৎসরের মধ্যে এইরূপ একীকরণ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। সেনেটর রাসেলের এই প্রস্তাবকে ব্যঙ্গোক্তি বলিয়া উপেক্ষা করা যায় কি না তাহা আমরা আলোচনা করিব না। কিন্তু 'নিউইয়র্ক ডেইলী নিউজ' পত্রিকা এই প্রস্তাবের উপর একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পর্য্যন্ত লিখিয়া ফেলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বৃটেনের ভারত ত্যাগের অভিপ্রায়ের কথা উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—"ভারতের একমাত্র বড় হুম্‌কী হইল রাশিয়া। কিছু দিন পরে যদি দেখা যায় যে, ভারতরক্ষার ব্যাপারে ইংলণ্ড মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য ব্যতীত তাহার প্রতিশ্রুতি (ভারতরক্ষার ব্যাপারে) রক্ষা করিতে পারিতেছে না, তাহা হইলে কি হইবে? আমরা আরও সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতেছি যে, গ্রীস যদি কম্যুনিষ্ট মতাবলম্বী হইয়া যায়, তাহা হইলে ইটালী ও ফ্রান্স তাহার অনুসরণ করিবে। বিভিন্ন স্থানে আজ বৃটেন ক্ষমতা ত্যাগ করিতেছে। ইহা আমাদের বহু আতঙ্কের অন্যতম। আমাদের যদি বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভগ্নাংশগুলি কুড়াইয়া লইতে হয়, তাহা হইলে তাহার কেন্দ্রস্থল এবং অন্যান্য স্থান অধিকার করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ নহে?" বৃটেনের পররাষ্ট্র-নীতি যেরূপ আমেরিকার উপর একান্ত ভাবে নির্ভরশীল হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আমেরিকার পক্ষে এইরূপ প্রস্তাব করা আদৌ বিস্ময়ের বিষয় নয়।

প্যালেষ্টাইনের ব্যাপারে ইতিপূর্ব্বেই বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতা চাহিয়াছে। গ্রীস এবং তুরস্কে বৃটেন যে দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে তাহা সম্পন্ন করিবার জন্যও বৃটেন সম্প্রতি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সামরিক ও আর্থিক সাহায্য দাবী করিয়াছে। গ্রীস ও তুরস্কের সমস্যা একরূপ নয়। গ্রীসে বৃটেনের সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে, এবং অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ দ্বারা গ্রীসের জনগণের অপ্রিয় গবর্ণমেণ্টকে সাহায্য করিতে হইতেছে। তুরস্কের ব্যাপারটা ইঙ্গ-তুর্কী সন্ধি হইতে উদ্ভূত নৈতিক দায়িত্ব হইলেও দার্দ্দেনালিশ প্রণালী লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তুরস্কের বোঝা-পড়া এখনও হয় নাই। এই ব্যাপারে রাশিয়ার সহিত তুরস্কের সরাসরি কোন আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। মস্কোতে চতুঃশক্তির পররাষ্ট্র-সচিব সম্মেলনে দার্দ্দেনালিশ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আলোচনা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। বলকান ও মধ্য প্রাচী অঞ্চলে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের যে স্বার্থ গড়িয়া উঠিতেছে তাহার পরিচয় ইতিমধ্যেই বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। দার্দ্দেনালিশ প্রণালী সম্পর্কে আমেরিকা যে নোট দিয়াছে তাহাতেই এ সম্পর্কে তাহার আগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তুরস্ক অপেক্ষা বড় সমস্যা গ্রীস। বৃটিশ বেয়নেটের প্রভাবাধীনে সাধারণ নির্ব্বাচনের ফলে গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গ্রীসের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট জনগণের আস্থাভাজন নহে। জনগণের অসন্তোষ, গরিলা যুদ্ধ, ব্যাপক দুর্নীতি ও চোরা-বাজারের মধ্যে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ও অর্থ-সাহায্য এই গবর্ণমেণ্টকে খাড়া রাখিয়াছে। কিন্তু মার্চ্চ মাসের পর হইতে বৃটেনের পক্ষে

আর অর্থ সাহায্য করা সম্ভব হইবে না। ইউ-এন আর-আর-এ গ্রীসের জন্ত যে ১১ মিলিয়ন ডলার মঞ্জুর করিয়াছিল, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রই ঐ অর্থ দিয়াছে। কিন্তু উহা দেওয়া হইয়াছে সাহায্য বাবদ। বর্ত্তমানে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গ্রীসকে ঋণ দিবার জন্ত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ করিয়াছেন। গত ২৭শে ফেব্রুয়ারী হোয়াইট হাউসে কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের সহিত প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের এক গোপন বৈঠকে এ সম্পর্কে আলোচনা হইয়াছে। আমেরিকা গ্রীসকে ঋণ দিতে রাজী আছে, যদি বৃটিশ সৈন্য গ্রীস হইতে চলিয়া না আসে। সোজা কথায়, গ্রীসের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের স্থায়িত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত না হইয়া ঋণ দিতে আমেরিকা চায় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র বৃটেনকে যে নির্ভরযোগ্য বন্ধু বলিয়া মনে করে তাহাতে সন্দেহ নাই। রাশিয়ার সম্প্রসারণ সম্বন্ধে যে একটা ধূয়া উঠিয়াছে, আমেরিকা সে-সম্বন্ধেও সচেতন। কিন্তু শুধু অর্থ দিয়াই কি আমেরিকা তৃপ্ত থাকিবে? প্রতিদানে বলকানে, মধ্য-প্রাচীতে অধিকতর প্রভাব বিস্তারের দাবী কি আমেরিকা করিতেছে না বা করিবে না? আমেরিকার উপর বৃটেনের নির্ভরতা পরিণামে কোথায় যাইয়া গড়াইবে বলা কঠিন।

জাপান ও জাপানের আশ্রিত দ্বীপসমূহ—

জার্ম্মাণীর সহিত সন্ধি অপেক্ষা জাপানের সহিত সন্ধিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু জাপানের সহিত সন্ধির সর্ত্ত সম্বন্ধে আলোচনা কবে আরম্ভ হইবে সে-সম্বন্ধে এখন কিছুই অনুমান করা সম্ভব নয়। সম্প্রতি সমষ্টিগত নিরাপত্তা রক্ষার পরীক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসাবে জাপানের শাসন-কর্ত্তৃত্ব সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের হাতে দেওয়ার সম্ভাবনা সম্বন্ধে যে কথা শোনা যাইতেছে তাহা অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। জাপানে মিত্রপক্ষের সুপ্রিম কম্যাণ্ডার জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার না কি এইরূপ ব্যবস্থা হওয়া বিধেয় বলিয়া মনে করেন। মনে হয়, জাপানের সত্তা একরূপ বিলোপ করাই এই প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য। তিন বৎসরের পূর্ব্বে না কি জাপানকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের হস্তে অর্পণ করা সম্ভব হইবে না।

জাপানের আশ্রিত (mandated) দ্বীপসমূহের জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র যে অছিগিরির চুক্তিপত্র সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘে উপস্থিত করিয়াছেন তাহা আসলে ঐ দ্বীপগুলিকে আমেরিকার অঙ্গীভূত করার ব্যবস্থা মাত্র। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ এই ব্যবস্থায় রাজী না হইলেও আমেরিকা তাহার দাবী ছাড়িবে না। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের মর্য্যাদা এই দাবীর মধ্যেই পরিস্ফুট হইয়াছে।

ইঙ্গ-ফরাসী মৈত্রী চুক্তি -

৪ঠা মার্চ্চ ডানকার্কের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত টাউন হলে বৃটেন এবং ফ্রান্সের মধ্যে ৫০ বৎসরের এক মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। মস্কো সম্মেলনের প্রাক্কালে এই মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার তাৎপর্য্য উপেক্ষার বিষয় নহে। গত জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি অস্থায়ী ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রধান মন্ত্রী মঃ ব্লুম যখন লণ্ডনে গিয়াছিলেন তখনই এই মৈত্রী চুক্তি সম্বন্ধে প্রাথমিক আলাপ সম্পন্ন হয়। অতঃপর দেড় মাসের মধ্যেই এই মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে। উভয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সমর্থিত হওয়ার পর অবিলম্বে এই চুক্তি বলবৎ হইবে এবং বলবৎ থাকিবে ৫০ বৎসর কাল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার কোন বিজ্ঞপ্তি দেওয়া না হইলে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্তই এই মৈত্রী বলবৎ থাকিবে। এই মৈত্রী চুক্তির ৬টি সর্ত্তের তিনটি বিশেষ ভাবে জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ আক্রমণের হাত হইতে আত্মরক্ষা সম্পর্কে। প্রথম দফায় জার্ম্মাণীর আক্রমণাত্মক নীতি বা ঐ নীতির পরিপোষক কোন কার্য্যকলাপের দরুণ বৃটেন এবং ফ্রান্স উভয় দেশের যে কোন এক দেশের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে ঐ আশঙ্কা নিবারণের উদ্দেশ্যে উভয় দেশ একযোগে সর্ব্বোত্তম বলিয়া বিবেচিত পন্থা গ্রহণ করিবার সর্ত্ত আছে। বৃটেন অথবা ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রের কোন এক রাষ্ট্র জার্ম্মাণীর সশস্ত্র আক্রমণের ফলে অথবা নিরাপত্তা পরিষদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে যদি জার্ম্মাণীর সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহা হইলে অপর রাষ্ট্র তাহার সামরিক এবং অন্যান্য সমস্ত সাহায্য দ্বারা যথাশক্তি সহায়তা করিবার সর্ত্ত চুক্তির দ্বিতীয় দফায় উল্লিখিত হইয়াছে। কোন অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করিতে জার্ম্মাণীর ব্যর্থতার দরুণ বৃটেন ও ফ্রান্স উভয় রাষ্ট্রের কোনও একটি রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তৎসম্পর্কে একযোগে ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে উভয় রাষ্ট্র পরস্পর পরামর্শ করিবার সর্ত্ত উল্লিখিত করা হইয়াছে চুক্তির তৃতীয় দফায়। চতুর্থ দফা সর্ত্তে বলা হইয়াছে যে, উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের সম্পদ বৃদ্ধি এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। উভয় রাষ্ট্র পরস্পরের স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন মৈত্রী চুক্তি বা শান্তি চুক্তি সম্পাদন না করার সর্ত্ত চুক্তির পঞ্চম দফায় উল্লিখিত হইয়াছে। ষষ্ঠ সর্ত্ত চুক্তি বলবৎ হওয়ার কাল ও মেয়াদ সম্পর্কে।

ফ্রান্স সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত পূর্ব্বেই মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। বৃটেন ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও ২০ বৎসরের একটি মৈত্রী চুক্তি হিটলার কর্ত্তৃক রাশিয়া আক্রান্ত হওয়ার পর সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু গত ২২শে ডিসেম্বর (১৯৪৬) বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ বেভিন বলেন,—"Britain is not tied to any-body except in regard her to obligation arising from the United Nations Charter." 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সনদ হইতে উদ্ভূত বাধ্য-বাধকতা ব্যতীত বৃটেন কাহারও সহিতই কোন বাধ্যবাধকতায় আবদ্ধ নহে।' সোভিয়েট রাশিয়ার 'প্রাভদা' পত্রিকা মিঃ বেভিনের এই উক্তির এইরূপ অর্থ করেন যে, ইঙ্গ-রুশ চুক্তির অস্তিত্ব আর নাই। লর্ড মণ্টগোমারী যখন রাশিয়া গিয়াছিলেন তখন ষ্ট্যালিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, ইঙ্গ-রুশ সন্ধিপত্র শূন্যে ঝুলিতেছে —এইরূপ একটা ধারণা লণ্ডনে সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সনদ দ্বারা এই সন্ধি বাতিল হইয়া গিয়াছে, এইরূপ মনে করা হইতেছে। মিঃ বেভিন অবশ্য অবিলম্বেই মস্কোস্থিত বৃটিশ রাজদূতের মারফৎ এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর অবশ্য ইঙ্গ-রুশ সন্ধির মেয়াদ ও পরিধি বিস্তৃত করিবার জন্য একটা আলোচনা চলিতে থাকিলেও উহা কত দূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা এখনও জানা যায় নাই। কিন্তু জার্ম্মাণী সম্পর্কে বৃটেনের প্রতি ফ্রান্সের যে সন্দেহ বা আশঙ্কা ছিল, সদ্য-সম্পাদিত ইঙ্গফরাসী মৈত্রী চুক্তি দ্বারা তাহা দূরীভূত হইয়াছে। সুতরাং মস্কো সম্মেলনে বৃটেন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্স উভয়কেই তাহার অনুকূলে পাইবে।

ফন প্যাপেনের কারাদণ্ড—

ন্যুরেমবুর্গের বিচারে মুক্তি পাইলেও নাৎসী উচ্ছেদ-করণ জার্ম্মাণ আদালতের বিচারে ফ্রানৎস ফন প্যাপেন আট বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। তাঁহার বয়স বর্ত্তমানে ৬৭ বৎসর। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কূটনৈতিক কারণে তিনি জেল হইতে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্য তাঁহার পরোক্ষ দায়িত্বও কম নয়। প্রুশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক গবর্ণমেণ্টকে বে-আইনী ভাবে অপসারিত করিয়া তিনিই হিটলারের পথ নিষ্কণ্টক করিয়াছিলেন। তিনিই হিণ্ডেনবুর্গকে প্রভাবিত করিয়া হিটলার-হুউজেনবুর্গ কোয়ালিশন গঠন করিয়াছিলেন এবং এই ভাবে খিড়কী দরজা দিয়া হিটলারের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় সহায় হইয়াছিলেন। তিনিই অষ্ট্রীয়া দখলের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন। জার্ম্মাণীতে নাৎসী দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় তিনি যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহারই প্রতিদান এই ৮ বৎসর কারাদণ্ড। বয়সের কথা বিবেচনা করিলে আট বৎসর কারাদণ্ড তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইবে সন্দেহ নাই।

প্যালেষ্টাইন-সমস্যা—

গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী বৃটিশ পররাষ্ট্র-সচিব মিঃ আর্ণেষ্ট বেভিন পার্লামেণ্টের কমন্স সভায় ঘোষণা করেন যে, প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নিকট উত্থাপন করিতে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য যে, বৃটেন প্যালেষ্টাইনের ভার সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের হস্তে সমর্পণ করিতেছে না। প্যালেষ্টাইন সমস্যা সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দাখিল করিয়া উহা সমাধানের পথনির্দ্দেশই শুধু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নিকট চাওয়া হইবে। প্যালেষ্টাইন আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার জন্য মিঃ বেভিন আরব এবং ইহুদী উভয়কেই দায়ী করিয়াছেন। তাহাদের পরস্পর-বিরোধী মনোভাবের জন্যই আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে, ইহাই তাঁহার অভিমত এবং গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী কমন্স সভায় প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বিতর্কের সময় এ কথাও তিনি জানাইয়াছেন যে, আরব ও ইহুদিগণ যদি তাঁহাদের অযৌক্তিক দাবী পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দ্বারস্থ না হইয়াও সমাধানের সম্ভাবনা আছে এবং সমাধানের চেষ্টা করিতে তিনি রাজীও আছেন। প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধানের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করার জন্য তিনি মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মিঃ ট্রুম্যানকেও দায়ী করিতে ছাড়েন নাই। ১৯৪৬ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যান প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে যে বিবৃতি দেন তাহা উপলক্ষ করিয়া মিঃ বেভিন বলেন,—"I can not settle things if problems are made the subject of election rivalries." 'সমস্যাকে যদি নির্ব্বাচন প্রতিযোগিতার বিষয় করা হয়, তাহা হইলে আমার পক্ষে সমাধান করা সম্ভব নহে।'

মিঃ বেভিনের বিবৃতি পড়িলে এই কথাই সকলের মনে হইবে যে, প্যালেষ্টাইন সমস্যা সমাধান না হওয়ার জন্য আরব, ইহুদী, আমেরিকা সকলেই দায়ী—বাদে বৃটেন। আরব এবং ইহুদীদের মনোভাব যে পরস্পর-বিরোধী তাহা কেহ-ই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু বৃটেনই কি উহার জন্য দায়ী নয়? ১৯১৭ সালে বেলফুরের ঘোষণা প্যালেষ্টাইনে ইহুদীদিগকে জাতীয় আবাস প্রদান করিল। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রেরণের ব্যবস্থাও করা হইল দরাজ হাতে। ইহার পর হইতেই প্যালেষ্টাইনে শুরু হইল আরব-ইহুদী বিরোধ। ১৯৩৭ সালে পীল কমিটির রিপোর্টে যে-সকল সুপারিশ করা হয় সেগুলি কতক পরিমাণে আরবদের অনুকূলেই হইয়াছিল। কিন্তু ইহুদী প্রেরণ বন্ধ রাখাই ছিল আরবদের অন্যতম প্রধান দাবী। এই সমস্যার সুমীমাংসার জন্য ১৯৩৯ সালেও লণ্ডনে এক প্যালেষ্টাইন সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই সম্মেলনেও কোন সুমীমাংসা হয় নাই বলিয়াই বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করিয়া প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। এই শ্বেতপত্রে প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রেরণ বন্ধ রাখিতে আরবদের দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ৫ বৎসরে ৭৫ হাজার ইহুদীকে তথায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হইয়াছিল। ১৯৪৪ সালের মার্চ্চ মাসে এই শ্বেতপত্রের মেয়াদ শেষ হইয়াছে। অতঃপর প্যালেষ্টাইন সমস্যার মধ্যে আমেরিকাকেও বৃটেন টানিয়া আনিয়াছে। কিন্তু ইঙ্গ-মার্কিণ যুক্ত কমিটির রিপোর্টের পরিণাম কি হইয়াছে আজ এখানে নূতন করিয়া তাহার আলোচনা আমরা করিব না। সম্প্রতি বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের নিজের খুসী মত প্যালেষ্টাইন সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহা আরব এবং ইহুদী উভয় পক্ষই অগ্রাহ্য করিয়াছে। এখন মিঃ বেভিন বলিতেছেন, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের উপদেশ ছাড়া ম্যাণ্ডেট কার্য্যকরী করিবার উপায় নাই।

কমন্স সভায় আমেরিকা সম্বন্ধে মিঃ বেভিনের উক্তিতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্টও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট উহাকে অত্যন্ত পীড়াদায়ক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ বলিয়া অভিহিত করিয়া প্যালেষ্টাইনে ইহুদী প্রেরণ সম্বন্ধে তাঁহাদের পূর্ব্ব সিদ্ধান্তে অবিচলিত থাকার কথা জানাইয়াছেন। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশন সেপ্টেম্বর মাসে হইবে। ইহার পূর্ব্বে বিশেষ অধিবেশন করিতে গেলে উহা প্রচুর অর্থব্যয়-সাপেক্ষ হইবে। তবে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের সেক্রেটারী ১২ জন সদস্য লইয়া গঠিত একটি কমিটি প্যালেষ্টাইনে প্রেরণের কথা বিবেচনা করিতেছেন। ইহাতে সাধারণ পরিষদের পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কাজ অনেকটা সহজ হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত জানিতে যে বহু বিলম্ব হইবে, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে না। এত দিন প্যালেষ্টাইনের ভাগ্য শূন্যে ঝুলিতে থাকিবে, এ কথা বলিলেও প্যালেষ্টাইনের অবস্থার সম্যক্ পরিচয় দেওয়া হয় না। ইহুদী সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপ আবার ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হইয়াছে। প্যালেষ্টাইনের বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষও কঠোর হস্তে এই সন্ত্রাসবাদী কার্য্যকলাপ দমন করিতে দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতেছেন।

প্যালেষ্টাইনের আরব এবং ইহুদীদিগকে পরস্পর-বিরোধী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ফলেই আরব এবং ইহুদীদের দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান হইতেছে না। ইহার উপর আছে বৃটেনের দাবী। প্যালেষ্টাইনের উপর ম্যাণ্ডেটরী ক্ষমতা বৃটেন ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বশেষ পরিকল্পনায়ও প্যালেষ্টাইনের স্বাধীনতার কথা নাই, আছে শুধু প্যালেষ্টাইনে স্বাধীনতার ক্রমাভিব্যক্তির কথা। ম্যাণ্ডেট কিরূপে সুষ্ঠু ভাবে পরিচালন করিতে পারা যায় বৃটেন শুধু সেই সম্বন্ধেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের পরামর্শ চাহিবেন। কিন্তু আরবরা কোন দিনই ম্যাণ্ডেট মানিয়া লয় নাই। ম্যাণ্ডেটের অবসানই

তাহারা দাবী করিয়াছে। জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ ম্যাণ্ডেট পরিত্যাগের জন্ম যদি বৃটেনকে পরামর্শ দেন, তবে বৃটেন সেই পরামর্শ মানিয়া চলিবে কি? জাতিপুঞ্জসঙ্ঘ যদি ম্যাণ্ডেট ত্যাগের পরামর্শ দিতে না পারেন, তাহা হইলে প্যালেষ্টাইনের সমস্যার সমাধান কিছুতেই হইবে না।

ইঙ্গ-মিশর আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার পর—

ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা পুনরায় আরম্ভ করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যস্থতা করিবার জন্ম সিরিয়া এবং লেবানন গবর্ণমেণ্ট বৃটেন এবং মিশর উভয় গবর্ণমেণ্টের নিকটই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বৃটেন আগ্রহের সহিতই এই প্রস্তাব গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছিল। কিন্তু মিশর ধন্যবাদের সহিত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। সিরিয়া ও লেবাননের প্রস্তাবে বৃটেনের সানন্দে রাজী হওয়ার কারণ যেমন সহজেই বুঝা যায়, তেমনি মিশর কেন এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিল তাহাও বুঝিতে কষ্ট হয় না। মিশর কর্তৃক এই মধ্যস্থতার প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, ব্যাপারটা শুধু কথায় সমাধান হওয়ার বিষয় নয়, ইহা নীতিগত প্রশ্ন। সুদান সম্পর্কে বৃটেন যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে তাহা যে শুধু দুইটি মিত্রদেশের মধ্যে বন্ধুত্বের পরিপোষকদের পক্ষে বাধাই সৃষ্টি করিতেছে না, নীল উপত্যকার ঐক্যও ধ্বংস করিতে উদ্যত। ইঙ্গ-মিশরীয় আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় বৃটেনের কোনই ক্ষতি হয় নাই। সিরিয়া ও লেবানন উভয়েরই এমন ধার এবং ভার কিছুই নাই যাহাতে বৃটেন সুদান সম্পর্কে তাহার নীতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হয়। সমগ্র আরব-জগৎকে অসন্তুষ্ট করিয়াও বৃটেন তাহার প্যালেষ্টাইনের নীতিতে অবিচলিত রহিয়াছে। সুদান সম্পর্কেও তাহার নীতির পরিবর্ত্তন হওয়ার কোন কারণ দেখা যাইতেছে না। আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় মিশর হইতে সৈন্য অপসারণ সম্পর্কেও বৃটেনের আর তাড়া-হুড়া করিবার প্রয়োজন হইবে না। ১৯৩৬ সালের সন্ধি অনুসারে ১৯৫৬ সালের মধ্যে সৈন্য অপসারণ করিলেই চলিবে। সুদানেও তাহার আধিপত্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু মিশর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের নিকট কি প্রতিকার পাইবে, সে সম্বন্ধেও কিছু অনুমান করা সম্ভব নয়।

ফ্রান্স ও ইন্দোচীন—

ভিয়েটনামের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মীন এক পত্রে ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট মঃ ভিন্সেণ্ট অরিয়ল এবং ফ্রান্সের জনসাধারণের নিকট যুদ্ধ বন্ধ রাখিবার জন্ম আবেদন জানাইয়াছেন। এই আবেদনে ফরাসী যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে থাকিয়াই ভিয়েটনামবাসীদের ঐক্য ও স্বাধীনতা পাওয়ার অভিপ্রায়ের কথা প্রকাশ করা হইয়াছে। ডাঃ হো চি মীনের এক জন মুখপাত্রও এক বেতার বক্তৃতায় ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নিকট যুদ্ধের অবসান ঘটাইবার আবেদনে বলিয়াছেন,—"ভিয়েটনামীরা ফরাসী ইউনিয়নের মধ্যে স্বাধীনতা চায়। আমরা ভিয়েটনামে ফ্রান্সের অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থ মানিয়া চলিব বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিতেছি।" কিন্তু এই আবেদনের কোন উত্তর এখন পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ব্লুম গবর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব যানবাহন-সচিব মঃ টমাস উপনিবেশ পরিদর্শনের জন্ম সাইগনে আসিয়া এক সাংবাদিক-সম্মেলনে বলিয়াছেন—"যথাসম্ভব সত্বর যুদ্ধের অবসান অবশ্যই হওয়া উচিত। এই উদ্দেশ্যে প্যারীস্থিত গবর্ণমেণ্টের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হইয়াছে।" কিন্তু ফরাসী গবর্ণমেণ্ট কি ভাবে এই চেষ্টা করিতেছেন? ইন্দোচীনের ফরাসী হাই-কমিশনার থেরী দ্য অর্গ্যালি উকে ফ্রান্সে তলপ করা হইয়াছে। তিনি আর ফিরিয়া আসিবেন না। তাঁহার স্থানে এমিল ইডোর বোলার (Emile Edouard Bollaert) ইন্দোচীনের হাই-কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্ট অবশ্য দ্য অর্গ্যালি উ-এর অপসারণ দাবী করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু তাঁহার অপসারণেই সমস্যার সমাধান হইবে না। ফরাসী গবর্ণমেণ্টেরও ইন্দোচীন সম্পর্কে তাঁহাদের নীতির পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। নীতি পরিবর্ত্তনের কোন আভাষ পাওয়া না গেলেও তাঁহাদের অভিপ্রায় যে কি, তাহা বুঝিতে কোন কষ্ট হয় না।

টংকিং এবং উত্তর-আনামের নব-নিযুক্ত ফরাসী কমিশনার মঃ দ্য পেরিরা (M. de Percira) হ্যানয় হইতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, আনামীদের সত্যিকার ইচ্ছা ব্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তিনি শুধু একটি অস্থায়ী গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবেন। ডাঃ হো চি মীনের ভিয়েটনাম গবর্ণমেণ্টকে তিনি জাপ তাঁবেদার গবর্ণমেণ্টেরই শাখা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আনামীদের সত্যিকার ইচ্ছা প্রকাশের অজুহাতে ফরাসী গবর্ণমেণ্ট যে একটি ফরাসী তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট গঠন করিতে চান তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতেই কি ইন্দোচীনের সমস্যার সমাধান সহজ হইবে? ফ্রান্সের রামাদিয়ের গবর্ণমেণ্টও যে সাম্রাজ্যবাদী গবর্ণমেণ্ট, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তাঁহারা সামরিক সমাধানের ভিতর দিয়া ফ্রান্সের সাম্রাজ্যিক স্বার্থের রক্ষক একটি তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট হয়ত গঠন করিতে পারিবেন। কিন্তু ভিয়েটনামের বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় আনামীদের স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা কিছুতেই বিলোপ করিতে পারিবে না।

চীনের গৃহবিবাদ ও অর্থ-নৈতিক সঙ্কট—

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র চীনের গৃহবিবাদে মধ্যস্থতা করিবার দায়িত্ব পরিত্যাগ করিবার পর হইতে চীনের গৃহবিবাদ যেমন অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, তেমনি চীনের অর্থসঙ্কটও প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে। প্রবল অর্থসঙ্কটের চাপে পড়িয়া চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ টি ভি সুং পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং জেনারেলিসিমো চিয়াং কাইসেক সাময়িক ভাবে প্রধান মন্ত্রীর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। ডাঃ সুংয়ের পদত্যাগের পরে চীনের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের গবর্ণরও পদত্যাগ করিয়াছেন। চীনের আর্থিক সঙ্কট যে কিরূপ কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, ইহাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। ডাঃ সুং বলিয়াছেন যে, অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্ম তাঁহাকে মাঝে মাঝে উদ্বিগ্ন চিত্তে বিনিদ্র রজনী যাপন করিতে হইয়াছে। বর্ত্তমান গুরুতর অর্থনৈতিক সঙ্কটের জন্ম তিনি গৃহযুদ্ধকেই দায়ী করিয়াছেন। গৃহযুদ্ধের প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে, নানকিং হইতে ২৮শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদে প্রকাশ যে, শীঘ্রই চীনের গৃহযুদ্ধের বৃহত্তম সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। নানকিংস্থ কম্যুনিষ্ট প্রতিনিধিদলকে নানকিং পরিত্যাগের জন্ম চিয়াং কাইশেক যে আদেশ দিয়াছেন, তাহা কম্যুনিষ্টদের রাজধানী ইয়েনান অধিকারের জন্ম সরকারী চীনা সৈন্যদের ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বাভাষ বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বস্তুতঃ, দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ায় প্রচণ্ড সংগ্রাম ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

চীনের গৃহবিবাদ মীমাংসায় মধ্যস্থতা করিতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের

দায়িত্ব ত্যাগ, গৃহযুদ্ধের তীব্রতা বৃদ্ধি এবং চীনের প্রবল অর্থনৈতিক সঙ্কট, এই তিনের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। তিয়েনসিন, টস্কু এবং সিনতাও হইতে সৈন্য অপসারণ করিতে মার্কিণ গবর্ণমেণ্ট যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা পরিত্যক্ত হইয়াছে। আমেরিকা হইতে জ্বালানী, মোটর এবং অস্ত্রশস্ত্র তিয়েনসিন ও টস্কুতে পাঠান হইতেছে বলিয়া যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহাও তাৎপর্য্যপূর্ণ। মুদ্রাস্ফীতি, দুর্নীতি, চোরাবাজার এবং গৃহবিবাদই চীনের অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণ। এই সঙ্কটের মধ্যে চীনের জনগণের দুর্দ্দশা বাড়িলেও কুয়োমিণ্টাং দলের সদস্যরা অধিকতর বিত্তশালী হইয়া উঠিতেছেন। কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং ডেমোক্রাটিক লীগ চীনের নূতন শাসনতন্ত্রকে গ্রহণ করে নাই। চীনের তথাকথিত জাতীয় গবর্ণমেণ্ট যে কুয়োমিণ্টাং দলের শাসন ছাড়া আর কিছুই নয়, তাহাও স্বীকার্য্য। তাঁহারা ক্ষমতা ত্যাগ করিতে রাজী নহেন বলিয়াই চীনের গৃহবিবাদেরও মীমাংসা হইতেছে না। ডাঃ সুংয়ের পদত্যাগের পর ষ্টেট কাউন্সিল এবং এক্জিকিউটিভ ইউনানকে সম্প্রসারিত করিবার পূর্ব্বেই লেজিসলেটিভ ইউনানে ৫০ জন, কণ্ট্রোল ইউনানে ২৫ জন এবং পিপলস্ পলিটিকেল পার্টিতে ৪৪ জন নূতন সদস্য গ্রহণ করা হইয়াছে। মোট নূতন সদস্য ১১৯ জনের মধ্যে ৩৭ জন কুয়োমিণ্টাং দলের, ৩০ জন ইয়ং চায়না দলের এবং ৩০ জন ডেমোক্রাটিক সোস্তালিষ্ট দলের সদস্য। অবশিষ্ট ২২ জন কোন দলের নহেন। কিন্তু কুয়োমিণ্টাং দলের প্রাধান্য পূর্ব্ববৎই রহিয়াছে।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পর্য্যাপ্ত সাহায্য পাইলে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্ট এত দিনে গৃহবিবাদের অবসান ঘটাইতে পারিত, এরূপ কথাও আমরা শুনিয়াছি। ডাঃ সুং-এর পদত্যাগের পূর্ব্বেই ওয়াশিংটনস্থ চীনা দূত ডাঃ ওয়েলিংটন কু আমেরিকার নিকট হইতে চীনের অর্থ-সঙ্কটের মধ্যে সাহায্য পাওয়া সম্বন্ধে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্র-সচিব জেনারেল জর্জ মার্শালের সঙ্গে আলোচনাও করিয়াছেন। চীনের জাতীয় ঐক্য গঠিত না হইলে আমেরিকার অর্থ সাহায্য পাওয়া যাইবে না, এই অজুহাতে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে হয়ত চীনে তাঁহাদের অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য আরও ব্যাপক সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। চীনা কম্যুনিষ্ট জেনারেল চু তে মনে করেন, জাতীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত সংগ্রামে তাঁহারাই জয়লাভ করিবেন। কিন্তু মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের চাপে পড়িয়া সোভিয়েট রাশিয়া ডেইরেন বন্দরটি চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টের হাতেই ছাড়িয়া দিতে রাজী হইয়াছে। ইহাতে চীনের জাতীয় গবর্ণমেণ্টেরই শক্তি বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু চীনের গৃহ-বিবাদের মীমাংসা ইহাতেই সহজ হইবে না।

ব্রহ্ম গণ-পরিষদের আসন্ন নির্ব্বাচন—

ব্রহ্মদেশের গণ-পরিষদের জন্য নির্ব্বাচন ১ই এপ্রিল আরম্ভ হইবে। মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ লোকের মধ্যে ৭০ লক্ষ লোকের ভোটাধিকার আছে। নির্ব্বাচনের জন্য প্রস্তুতি পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই ব্রহ্মদেশে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবেই প্রণিধানযোগ্য। ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শ্বেতপত্রে সীমান্ত অঞ্চল ও শান রাজ্যগুলিকে ব্রহ্মদেশ হইতে পৃথক্ করিবার যে প্রয়াস দেখা গিয়াছিল, প্যাং লং সম্মেলনের নয় দফা সর্ত্তযুক্ত সিদ্ধান্ত তাহা ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্ম-সীমান্তের কাচিন, চিন, শান প্রভৃতি উপজাতির প্রতিনিধিবৃন্দ ফেব্রুয়ারী মাসের মধ্যভাগে প্যাং লংয়ে সমবেত হইয়া সমগ্র দেশের সহিত তাহাদের ভাগ্য বিজড়িত করিতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যদিও এই সম্মেলনে কারেন উপজাতির অনুপস্থিতি বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা গিয়াছে। এই সম্মেলনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সীমান্ত অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিও অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্টে যোগ দান করিয়াছেন। গণ-পরিষদে সীমান্ত অঞ্চলগুলির জন্য ৪০টি সদস্য-পদ সংরক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে যাঁহারা ইঙ্গ-ব্রহ্ম চুক্তি মানিয়া লন নাই তাঁহাদিগকে লইয়া। 'স্বাধীনতা প্রথমে' নামে একটি দল গঠিত হইয়াছে। এই দল নির্ব্বাচনকে ব্যর্থ করিবার জন্য আয়োজন করিতেছে। তাহারা ভোট-গ্রহণ কেন্দ্রে পিকেটিং করিবে, ভোট-গ্রহণ কেন্দ্র পোড়াইয়া দিবে এবং অন্যান্য উপায় গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই দলের নেতৃবর্গের মধ্যে উ স, ডাঃ বা ম এবং থাকিন বা সীন অন্যতম।

যুদ্ধবিধ্বস্ত এসিয়ার পুনর্গঠন—

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জসঙ্ঘের দপ্তরখানা হইতে এসিয়ার অর্থনৈতিক পুনর্গঠন সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে এসিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ-বিধ্বস্ত অঞ্চল-সমূহের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন এবং ঐ সকল অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নতি-বিধানের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই সকল অঞ্চলে যুদ্ধের পর হইতে এ পর্য্যন্ত পণ্যের উৎপাদন এবং বাণিজ্যের যে কিছুই উন্নতি হয় নাই, এ কথাও রিপোর্টে স্বীকৃত হইয়াছে। প্রাক্‌যুদ্ধ যুগে এই সকল অঞ্চলের প্রাচীন প্রাক্-শিল্প যুগের সমাজ-ব্যবস্থার উপর আধুনিক শিল্প-ব্যবস্থার সামান্য প্রলেপ লাগান হইয়াছিল মাত্র। জনসাধারণের অবস্থাও ছিল অত্যন্ত দরিদ্র। এই সকল শিল্পে অনুন্নত দরিদ্র দেশে যুদ্ধের ধ্বংসলীলা খুবই ব্যাপক হইয়াছে। চীন দেশে ১০ লক্ষ লোক যুদ্ধে মারা গিয়াছে এবং রোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছে আরো বহুসংখ্যক লোক। আহতও হইয়াছে বহু লোক। মুদ্রাস্ফীতি ও গৃহযুদ্ধের জন্য চীনে পণ্য উৎপাদনের ব্যয় এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, চীনের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাসের মধ্যে উহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। ইন্দোচীন সম্বন্ধে ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, জাপানীদের দ্বারা যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অপেক্ষা বেশী ক্ষতি হইয়াছে আভ্যন্তরীণ কলহের জন্য। মালয়ে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ ডলার মূল্যের রবার ক্ষতি হইয়াছে। ফিলিপাইনের ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৮ শত কোটি ডলার! পণ্য উৎপাদন এখনও প্রাক্‌যুদ্ধ যুগের স্তরেও ফিরিয়া আসে নাই। ব্রহ্মদেশে ৬০ লক্ষ একর ধানের জমি যুদ্ধের ফলে অনাবাদী হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দোনেসিয়ার ক্ষতির পরিমাণ প্রায় ৩ শত কোটি ডলার। আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির জন্য উহার পুনর্গঠন কার্য্য ব্যাহত হইতেছে। ব্রহ্মদেশের তৈলখনিগুলিকে আগামী দুই বৎসরের মধ্যেও কার্য্যকরী করিবার সম্ভাবনা নাই। চীন দেশে রেলপথের জন্য ৪০ কোটি ৮০ লক্ষ ডলার এবং জলপথের জন্য ৩০ কোটি ১০ লক্ষ ডলার প্রয়োজন হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে।

জাপযুদ্ধ শেষ হওয়ার দুই বৎসর পূর্ণ হইতে আর ৪।৫ মাস মাত্র বাকী আছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত এসিয়ার পুনর্গঠন কার্য্য কিছুই অগ্রসর না হওয়ার কারণ, এই সকল অঞ্চলের পরাধীনতা।

২৮শে ফাল্গুন, ১৩৫৩। শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রথম বাজেট

১৬ই ফাল্গুন শুক্রবার অপরাহ্ণে অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ১৯৪৭-৪৮ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছেন, অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের উহাই প্রথম বাজেট। ট্যাক্সের বর্ত্তমান হার অনুসারে হিসাব করিয়া আগামী বৎসর ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় হইবে ২৭৯'৪২ কোটি টাকা এবং ব্যয় ৩২৭'৮৮ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। এই হিসাব অনুযায়ী ঘাট্তির পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৮'৪৬ কোটি টাকা। কিন্তু আগামী অর্থনৈতিক বৎসর হইতে লবণ-শুল্ক রহিত করায় ভারত গভর্ণমেণ্টের আয় আরও ৮ কোটি টাকা কমিয়া ঘাট্তির পরিমাণ ৫৬'৭১ কোটি টাকা দাঁড়াইবে। চল্তি বৎসরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ঘাট্তির পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ৪৫'২৮ কোটি টাকা; সুতরাং আগামী বৎসর ঘাট্তির পরিমাণ চল্তি বৎসরের ঘাট্তি অপেক্ষা ১১'৪৩ কোটি টাকা বেশী হইবে। চল্তি বৎসর এবং আগামী বৎসর এই দুই বৎসরে মোট ঘাট্তির পরিমাণ দাঁড়াইবে ১০১'৯৯ কোটি টাকা। কিন্তু ইহাই সব নয়। বেতন কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধির ব্যয় আগামী বৎসরের ব্যয়-বরাদ্দের মধ্যে ধরা হয় নাই। এই বেতন বৃদ্ধির ব্যয় ধরা হইলে ব্যয়ের পরিমাণ যেমন বাড়িবে তেমনি ঘাট্তির পরিমাণও আরও বেশী হইবে। চল্তি বৎসরে রাজস্ব খাতে আয় বাজেট-বরাদ্দ অপেক্ষা ২৯'৬৬ কোটি টাকা বেশী হইয়া ৩৩৬'১৯ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে আয় চল্তি বৎসরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী আয় অপেক্ষা ৫৬'৭৭ কোটি টাকা কম হইবে। চল্তি বৎসরের সংশোধিত হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৩৮১'৪৭ কোটি টাকা। আগামী বৎসর ব্যয়ের পরিমাণ চল্তি বৎসরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী ব্যয় অপেক্ষা ৫৪'০৫ কোটি টাকা কম হইবে। যদিও ইহা যুদ্ধোত্তর দ্বিতীয় বৎসরের বাজেট, তথাপি সামরিক বিভাগের ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪৭-৪৮ সালে বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৮৮'৭১ কোটি টাকা। চল্তি বৎসরের বাজেটে সামরিক ব্যয়ের পরিমাণ বরাদ্দ করা হইয়াছিল ২৪৫'৩৪ কোটি টাকা। সংশোধিত হিসাবে সামরিক ব্যয় সামান্য কমিয়া ২৪০'১১ কোটি টাকা দাঁড়াইয়াছে। আগামী বৎসরে অসামরিক ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে ১৩৯'০৭ কোটি টাকা। চল্তি বৎসরের অসামরিক ব্যয় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৩২'৩০ কোটি টাকা বাড়িয়া ১৪৩'৩৬ কোটি টাকা হইয়াছে।

আগামী বৎসরের বাজেটে বাণিজ্য-শুল্ক হইতে ৮৯ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। চল্তি বৎসরের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী বাণিজ্য-শুল্ক হইতে আয় অপেক্ষা ইহা দেড় কোটি টাকা বেশী। কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্ক হইতে আগামী বৎসর ৪০'৯৩ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বাণিজ্য-শুল্ক হইতে আয় বাড়িলেও কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্ক হইতে আয় আগামী বৎসর কম হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। চল্তি বৎসরে বাণিজ্য-শুল্ক হইতে আয় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ২৮'০২ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন-শুল্ক হইতে চল্তি বৎসরে ৪৪'৩২ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু তৎস্থলে আয় হইয়াছে মাত্র ৪২'৭৮ কোটি টাকা। আগামী বৎসর আয়-কর হইতে ১৩৫ কোটি টাকা আয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু উহার মধ্যে অতিরিক্ত মুনাফা-কর বাবদ বকেয়া বাকী হইয়াছে ৪০ কোটি টাকা। সুতরাং প্রকৃত আয়-কর হইতে আগামী বৎসর আয় হইবে ৯৫ কোটি টাকা। বার্ষিক আড়াই হাজার টাকা পর্য্যন্ত আয়কে আয়-করের আওতা হইতে রেহাই দেওয়া সত্ত্বেও আয়-কর হইতে ৯৫ কোটি আয় হওয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে আয় বৃদ্ধিই সূচনা করে। আয়-করের হার বৃদ্ধি করা হয় নাই। কিন্তু কর্পোরেশন ট্যাক্সের হার এক আনা হইতে দুই আনা বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে। আয়-কর হইতে প্রাপ্য আয় হইতে আগামী বৎসর প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্ট সমূহকে ৩৫'১৬ কোটি টাকা দেওয়া হইবে। আগামী বৎসর ডাক ও তার বিভাগের ৩০'২ কোটি টাকা আয় হইবে। কিন্তু ডাক ও তার বিভাগ পরিচালন ব্যয় ও সুদ বাবদ ২৫'৯৮ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া নীট উদ্বৃত্ত ৪'২২ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে। চল্তি বৎসরে ডাক ও তার বিভাগে ৮'৫৩ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল; কিন্তু পরিচালন ব্যয় বর্দ্ধিত হওয়ায় ৪'৭৪ কোটি টাকার বেশী উদ্বৃত্ত হয় নাই। রেল বিভাগ হইতে আগামী বৎসর রাজস্ব খাতে পাওয়া যাইবে ৭'৫ কোটি টাকা। চল্তি বৎসরে রেলওয়ে বিভাগ হইতে ৭'৩৬ কোটি টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ পাওয়া গিয়াছে ৫'৬১ কোটি টাকা। চল্তি বৎসরে বাজেটে সামরিক ব্যয় ২৪৫'৩৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল, কিন্তু সংশোধিত হিসাবে ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২৪০'১১ কোটি টাকা। সামরিক বিভাগে ছাঁটাই কার্য্য শেষ না হইলে এবং সামরিক বিভাগ সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় না হওয়া পর্য্যন্ত সামরিক বিভাগের ব্যয় যুদ্ধকালীন ব্যয়ের ভিত্তিতেই সামরিক ব্যয় চল্তি থাকিবে বলিয়াই মনে হইতেছে। চল্তি বৎসরের অসামরিক ব্যয় বাজেট বরাদ্দ অপেক্ষা ৩২'৩৫ কোটি টাকা বাড়িয়াছে। খাদ্যশস্য আমদানী বাবদ সাহায্য খাতে ২০ কোটি টাকা ব্যয় বৃদ্ধি ইহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। অবশিষ্ট অংশ অন্যান্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধির জন্য বাড়িয়াছে।

অর্থ-সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। দীর্ঘ-মেয়াদী রাজনৈতিক পরিস্থিতি কিরূপ হইবে, তাহা ভাবিয়া বর্ত্তমানকে যে উপেক্ষা করা যায় না, তাহাও তিনি স্বীকার না করিয়া পারেন

নাই। মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ প্রথম ভারতীয় অর্থ-সচিব—যিনি ভারত গভর্ণমেণ্টের বাজেট বরাদ্দ স্থির করিয়াছেন। তিনি অনেক শুভ ইচ্ছা ও আশা প্রকাশ করিয়াছেন। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বিপুল পার্থক্য দূর করিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি তিনি করিবেন না। কিন্তু তাঁহার বাজেট বরাদ্দে একমাত্র লবণ-শুল্ক রহিত করা ব্যতীত আর কোন চেষ্টার পরিচয় আমরা পাইলাম না। ব্যয় কি ভাবে কমান যায়, অমিত ব্যয় কি ভাবে দূর করা যায়, সে-সম্বন্ধে তিনি একটি কমিটির গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা না হইলেই আমরা সুখী হইব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণের জন্য ইতিপূর্ব্বে দাবী উত্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করিতে তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে তিনি চেষ্টা করিবেন তো? সঞ্চিত বিপুল সম্পদ সম্পর্কে, তদন্ত কমিশন গঠনেও আমাদের আপত্তি নাই। কিন্তু ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে কোন নিশ্চয়তা না পাইলে দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গঠন সম্ভব নয় বলিয়া তিনি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা কি পাকিস্থান সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার কথা ভাবিয়া? প্রদেশগুলির উন্নয়ন-পরিকল্পনার জন্য ৩২ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হইবে, কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট রাজপথসমূহ নির্ম্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করিবেন, এই সকল ব্যবস্থা হইতেও কি তিনি ভারতের অখণ্ডত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন নাই? যদি পাকিস্থান গঠিত হয়, তাহা হইলে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের উন্নয়ন-পরিকল্পনার কোন সাহায্য পাকিস্থান কি ভাবে পাইবে তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি?

বাজেটে প্রস্তাবিত কর ধার্য্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে যে কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে অথবা বাজেট প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া যাহা বলা হইয়াছে, সেগুলি সাম্প্রদায়িক দিক হইতে করা বা বলা হইয়াছে, এরূপ মনে করিবার মত কিছু দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া আমাদের মনে হইতেছে না। কর ধার্য্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা যেমন অর্থনৈতিক দিক হইতেই করা হইয়াছে, তেমনি কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যেও অনেকে এই কর ধার্য্যের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। বাজেট প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমালোচনা প্রধানতঃ তিন প্রকার কর ধার্য্যের প্রস্তাবকে কেন্দ্র করিয়াই ঘনীভূত হইয়াছে। প্রথমতঃ, ব্যবসায়ে অর্জিত এক লক্ষ টাকার অধিক মুনাফার উপর শতকরা ২৫৲ টাকা হারে কর ধার্য্যের প্রস্তাব। দ্বিতীয়তঃ, মূলধনের মূল্য-বৃদ্ধি হেতু লাভের উপর কর ধার্য্যের প্রস্তাব। তৃতীয়তঃ, অনুপার্জিত আয় ১·২ লক্ষ টাকা এবং উপার্জিত আয় ১·৫ লক্ষ টাকার উপর সুপার ট্যাক্স ধার্য্যের প্রস্তাব। ইউরোপীয় দলের নেতা মিঃ পি জে গ্রিফিথস্ এই প্রস্তাবিত কর ধার্য্যের নীতির কঠোর সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন—"ব্যবসায়ীদের উপর কর ধার্য্যের যে নীতি অবলম্বন করা হইয়াছে তাহার ফলে দেশের শিল্প-প্রচেষ্টা ও সমৃদ্ধি বিশেষ ভাবে ব্যাহত হইবে এবং অদূর ভবিষ্যতে বে-সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির অস্তিত্ব লোপ পাইতে পারে। তাহার ফলে দেশে এক অর্থনৈতিক বিপর্য্যয় ঘটিবার আশঙ্কা আছে।" মিঃ মনু সুবেদার বলিয়াছেন—"ব্যবসায় অর্জিত মুনাফার উপর যে কর ধার্য্য করার প্রস্তাব করা হইয়াছে, আশা করি, অর্থ-সচিব মহোদয় তাহার কয়েকটি ধারা সংশোধন করিতে রাজী হইবেন।" শিল্পপ্রসারে উৎসাহ দিবার জন্য তিনি অর্জিত মুনাফার উপর শতকরা ২৫ ভাগের পরিবর্ত্তে শতকরা সাড়ে ১২ ভাগ ধার্য্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। সর্দ্দার মঙ্গল সিং তো কর ধার্য্যের বিরোধিতাকে "কোটিপতিদের চীৎকার" বলিয়া অভিহিত করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

কর ধার্য্যের এই নীতির ফলে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং পরিষদের বাহিরে ভারতের শিল্প-প্রচেষ্টা ব্যাহত হওয়ার যে আশঙ্কা প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা উপেক্ষার বিষয় কি-না, তাহা বিশেষ ভাবে বিবেচনার বিষয়। এক লক্ষ টাকার অধিক মুনাফার উপর যে কর ধার্য্যের প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা শুধু বর্ত্তমান বৎসরের জন্য। অর্থাৎ ১১৪৬-৪৭ সালে যে মুনাফা অর্জিত হইয়াছে, ১১৪৭-৪৮ সালে তাহার উপর এই কর ধার্য্য করা হইবে। কাজেই অর্থ-সচিব মিঃ লিয়াকৎ আলি খাঁ মনে করেন যে, এই কর ধার্য্যের জন্য আগামী বৎসর উৎপাদন হ্রাস হওয়ার কোন কারণ থাকিতে পারে না। তাঁহার এই যুক্তি বোধ হয় একেবারে উপেক্ষার বিষয় নয়। কিন্তু দেশের অর্থনৈতিক শক্তির যাঁহারা অধিকারী, যাঁহারা শিল্প-বাণিজ্যে মূলধন খাটাইয়া দেশের শিল্পসম্পদ বর্দ্ধিত করিবেন, সেই শিল্পপতি, পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীরা এই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হইবেন কি? ঘাটতি বাজেটই কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সন্দেহ নাই। দীর্ঘকাল এই অবস্থা চলিতে পারে না। কিন্তু কর ধার্য্য না করিয়া আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যে ঘাটতি পূরণ করিয়া ফেলিবার সম্ভাবনা আছে কি না, তাহাই কর ধার্য্য সম্পর্কে প্রধান বিবেচনার বিষয় হওয়া উচিত। ডাঃ জন মাথাই এই দিক হইতেই কর ধার্য্যের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করিয়াছেন। আগামী কয়েক বৎসরে সামরিক ব্যয় অবশ্যই হ্রাস পাইবে। কিন্তু সামরিক ব্যয় যেমন হ্রাস পাইবে, তেমনি রাজস্ব খাতে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের আয়ও কি কমিবে না? যুদ্ধের কয়েক বৎসরে এবং যুদ্ধের পরে বর্ত্তমানেও কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের যে অভূতপূর্ব্ব আয় বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহার প্রধান কারণ মুদ্রাস্ফীতি। মুদ্রাস্ফীতি আর বেশী দিন টিকিতে পারে না। ডাঃ জন মাথাই বলিয়াছেন—"মুদ্রা-স্ফীতি যে-সময় হইতে হ্রাস পাইবে বলিয়া অনেকের ধারণা ছিল, তাহার পূর্ব্বে মুদ্রাস্ফীতি যখন হ্রাস পাইবে অর্থাৎ মুদ্রাসঙ্কোচ যখন আরম্ভ হইবে, তখন খুব বেশী হারে কর ধার্য্য করিয়াও মোট রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি তো করা যাইবেই না, অধিকন্তু মোট রাজস্বের পরিমাণ কমিয়া যাইবে। সুতরাং মুদ্রাস্ফীতি যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পাওয়ার পূর্ব্বেই ঘাটতির পরিমাণ যথাসম্ভব হ্রাস করা প্রয়োজন।" ইহাই কর ধার্য্যের সমর্থনে ডাঃ জন মাথাইয়ের যুক্তি। দ্বিতীয়তঃ, বাজেটে যদি ক্রমাগতই ঘাটতি চলিতে থাকে তাহা হইলে পণ্যমূল্যের উপর উহার যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে, জনসাধারণের দিক হইতে তাহা উপেক্ষার বিষয় নহে। ঘাটতি বাজেট দেশের আভ্যন্তরীণ ক্রেডিট তো ক্ষুন্ন করেই, বিদেশেও দেশের ক্রেডিট ক্ষুন্ন না হইয়া পারে না। শিল্পপতি, পুঁজিপতি এবং ব্যবসায়ীরা যত বেশী লাভ করিতে পারিবেন, শিল্প-বাণিজ্যে ততই বেশী পরিমাণে মূলধন নিয়োগ করিতে তাঁহারা উৎসাহী হইয়া উঠিবেন, একথা ধ্রুব সত্য। কিন্তু তাঁহারা যদি যুক্তিতে সন্তুষ্ট না হন, এবং লাভ কম হইবে মনে করিয়া তাঁহারা যদি শিল্প-বাণিজ্যে বর্দ্ধিত হারে মূলধন নিয়োগ করিতে রাজী না হন, তাহা হইলে কি হইবে? অর্থ-সচিব মহোদয় তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিয়াছেন—"যদি ব্যবসায়ীরা দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সাহায্য

না করেন, তাহা হইলে আমরা অন্য উপায়ে তাহা করিব।" কিন্তু কি উপায়ে করিবেন? ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রস্তাবে শেয়ার-বাজার পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থ-সচিব ইহাতে ক্ষুব্ধ হইতে পারেন, মূলধনের যাঁহারা মালিক তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করিবেন কিরূপে? ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় লাভের হার বর্দ্ধিত করিতে না পারিলে পুঁজিপতিদের ক্ষতি। জনসাধারণের কল্যাণের জন্য কাহারও অনুরোধেই এই ক্ষতি তাঁহারা স্বীকার করিয়া লইবেন, ইহা আশা করা কঠিন। ভারতীয় বণিক ও শিল্প-সমিতিসঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী বলিয়াছেন—"স্বর্ণডিম্ব-প্রসবী হংসীকে কেহই হত্যা করিতে চায় না। সোণার ডিম প্রসব করিবার জন্য চাটুতা দ্বারা তাহাকে প্ররোচিত করিতে হয়।" অধিক হারে লাভ করিতে দেওয়াই এই প্ররোচনা। কিন্তু কম লাভ হইলে চলিবে কি? ডাঃ জন মাথাই অবশ্য বলিয়াছেন—"ব্যক্তিগত ব্যবসায়ীরা যদি শুধু বেশী মুনাফা পাইলেই ব্যবসায়ে অর্থ নিয়োগ করেন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রতিযোগিতা, উদ্যম ইত্যাদি হইতে আমরা যে অর্থনীতি আশা করি তাহা বজায় রাখা উচিত কি-না?" তাঁহার এই উক্তির অর্থ এই যে, পুঁজিবাদকে আরও দীর্ঘস্থায়ী করিলে ভারতের স্বার্থ রক্ষিত হইবে কি না। শিল্পপতিরা বাধা সৃষ্টি করিলে শিল্প-বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হইবে বলিয়া তিনি হুমকী দিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় জাতীয়করণ যে সম্ভব নয়, এ কথা শ্রীযুক্ত রাজা-গোপালাচারীর মুখেই আমরা শুনিয়াছি। জনসাধারণের কল্যাণ ও পুঁজিপতিদের লাভ উভয়ের মধ্যে বিরোধই শুধু বাজেট-বিতর্কে ফুটিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু সমাধানের কোন পথ দৃষ্টিগোচর হইল না।

অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের প্রথম রেল-বাজেট

৫ই ফাল্গুন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে এবং রাষ্ট্র-পরিষদে যানবাহন-সচিব ডাঃ জন মাথাই ১৯৪৭-৪৮ সালের যে রেল-বাজেট পেশ করিয়াছেন, অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের ইহাই প্রথম রেল-বাজেট। এই রেল-বাজেট যে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের এবং বৃটিশ ভারতের প্রায় সকল রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিস্থানীয় কেন্দ্রীয় সরকার প্রণয়ন করিয়াছেন এবং ভারতে ও ভারতীয় রেলওয়ের ইতিহাসে এইরূপ বাজেট যে এই প্রথম, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। মাত্র কয়েক মাস পূর্ব্বে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট রচিত হইয়াছে এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেও বহুবিধ গুরুতর জটিল সমস্যার সম্মুখীন না হইয়া তাঁহারা পারেন নাই। এত অল্প সময়ের মধ্যে নীতিগত ব্যাপক পরিবর্ত্তন সাধন করা যে সম্ভব নয়, সেকথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তথাপি এই রেল-বাজেটে জাতীয় গভর্ণমেণ্টসুলভ যে বৈশিষ্ট্যের ছাপ দেখিবার প্রত্যাশা আমরা করিয়াছিলাম তাহা দেখিতে না পাইয়া এবং রেল-বাজেটের গতানুগতিক রূপ দেখিয়া আমরা নিরাশ না হইয়া পারিলাম না। তাঁহাদেরই নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে লইয়া গঠিত কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট যাত্রীর ভাড়া টাকায় এক আনা এবং কয়েক প্রকার মালের মাশুল সামান্য বৃদ্ধি করিয়াছেন, সাধারণ মানুষ একথা ভাবিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে পারিবে কি? যুদ্ধ শেষ হওয়ার দেড় বৎসর পরে রেল বিভাগের যে যুদ্ধকালীন আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকিতে পারে না একথা যেমন সত্য, রেল বিভাগের ব্যয়ের অনমনীয় অবস্থা যে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছে, তাহাও অনস্বীকার্য্য। ১৯৪৭-৪৮ সালের রেল-বাজেটে উল্লিখিত অবস্থা বিশেষ ভাবেই পরিস্ফুট দেখা যায়। প্রথমে আগামী বৎসরে রেল বিভাগের আয়-ব্যয়ের আনুমানিক হিসাবের অবস্থাই আমরা আলোচনা করিব।

যাত্রীর ভাড়া এবং মালের মাশুলের বর্ত্তমান হার ধরিয়া আগামী বৎসর অর্থাৎ ১৮৪৭-৪৮ সালে রেল বিভাগের আয় ১৮৩ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। বর্ত্তমান বৎসরের অর্থাৎ ১৯৪৬-৪৭ সালের আয়ের সংশোধিত হিসাব অপেক্ষা ইহা ২৩ কোটি টাকা কম। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চলতি বৎসরের বাজেট পেশ করিবার সময় আয়ের পরিমাণ ১৭৭ কোটি টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, আয় অনুমিত আয় অপেক্ষা ২৯ কোটি টাকা বেশী হইয়াছে। কাজেই মোট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ২০৬ কোটি টাকা। যুদ্ধকালীন বৎসরগুলির মধ্যে যুদ্ধের শেষ বৎসর ১৯৪৫-৪৬ সালেই রেল বিভাগের আয় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হইয়াছিল। এই বৎসর রেল বিভাগের আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ২২৫ কোটি টাকা। এই বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী তিন বৎসরের আয়ের হিসাব পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায়, ১৯৪৪-৪৫ সালে ২১৬.৩৮ কোটি টাকা, ১৯৪৩-৪৪ সালে ১৮৫.৪৩ কোটি টাকা এবং ১৯৪২-৪৩ সালে ১৫৫.৪৮ কোটি টাকা আয় হইয়াছিল। সুতরাং আগামী বৎসরের বরাদ্দকৃত আয় চলতি বৎসরের সংশোধিত আয় অপেক্ষা ২৩ কোটি টাকা কম হইলেও ১৯৪২-৪৩ সালের আয় অপেক্ষা ২৭ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা বেশী এবং ১৯৪৩-৪৪ সালের আয় অপেক্ষা মাত্র ২ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা কম। আগামী বৎসর যাত্রীর ভাড়া টাকা-প্রতি এক আনা এবং কয়েকটি মালের মাশুল সামান্য বৃদ্ধি করায় আয়ের পরিমাণ ১০ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা বেশী হইবে। যাত্রীর বর্দ্ধিত ভাড়া হইতে ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা এবং মালের বর্দ্ধিত মাশুল হইতে ৫ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। আগামী বৎসর রেল-পরিচালনার সাধারণ ব্যয় ১৩৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বাজেটে যে বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে সালিস-বিচার বা বেতন-তদন্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেল-কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি-জনিত অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হয় নাই। তজ্জন্য অতিরিক্ত ব্যয়ের দাবী পরে উপস্থিত করা হইবে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, চলতি বৎসরের প্রাথমিক বাজেটে রেল-পরিচালনার সাধারণ ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল ১২৫ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা। সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, ব্যয় ৩৩ কোটি টাকা বাড়িয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৫৯ কোটি টাকা। সুতরাং আগামী বৎসরে রেল-পরিচালনার সাধারণ ব্যয় চলতি বৎসরের সংশোধিত ব্যয় ২৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা কম ধরা হইলেও উহার পরিমাণ চলতি বৎসরের প্রাথমিক ব্যয় বরাদ্দ অপেক্ষা ৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১০ কোটি টাকা বেশী। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, চলতি বৎসরে রেল-পরিচালনার সাধারণ ব্যয় যে পরিমাণ হইয়াছে, ঐরূপ বেশী ব্যয় আর কখনও হয় নাই। ১৯৪৫-৪৬ সালের

বাজেটে রেল-পরিচালনার সাধারণ ব্যয় ১৫৩ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা কম হইয়া মোট ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৪৯ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা। আগামী বৎসরের জন্য বরাদ্দকৃত ব্যয়ের পরিমাণ ১৯৪৫-৪৬ সালের ব্যয় অপেক্ষা ১৪ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা কম বটে, কিন্তু ১৯৪৪-৪৫ সালের ব্যয় অপেক্ষা ৯২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা বেশী। চলতি বৎসরে আয় ২৯ কোটি টাকা বাড়িলেও ব্যয় বাড়িয়াছে ৩৩ কোটি টাকা। কাজেই উদ্বৃত্তির পরিমাণ প্রাথমিক বরাদ্দ অনুযায়ী ১২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা না হইয়া ৮ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা হইবে। উহা হইতে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা সাধারণ রাজস্ব তহবিলে এবং ৩ কোটি টাকা উন্নয়ন তহবিলে দেওয়া হইবে।

চলতি বৎসরে সাধারণ রাজস্ব খাতে ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা গিয়াছিল। তন্মধ্যে মাত্র ৫ কোটি ৬১ লক্ষ টাকা দেওয়া সম্ভব হইবে। আগামী বৎসর সাধারণ রাজস্ব খাতে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। গত বৎসর হইতে যাত্রীদের ও রেল-চাকুরীয়াদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য একটি উন্নয়ন তহবিল গঠন করা হইয়াছে। ১৯৪৭-৪৮ সালের শেষে উন্নয়ন তহবিলের পরিমাণ দাঁড়াইবে ১৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। রেল-কর্ম্মচারীরা তাঁহাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি দ্বারা কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য পর্ণমাত্রায় আদায় করিয়া লইতে পারিবেন। রেল-যাত্রীদের ভাগ্যে বর্ত্তমানে শুধু ভাড়া বৃদ্ধি ছাড়া আর কোন লাভ দেখা যাইতেছে না। অধিকন্তু তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়াও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মতই টাকা-প্রতি এক আনা হারে বর্দ্ধিত হইয়া এই দুর্ম্মূল্য দুষ্প্রাপ্যতার যুগে তাঁহাদের অর্থকষ্ট আরও বৃদ্ধি করিবে। তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের ভাড়া বর্দ্ধিত করা কিছুতেই সঙ্গত হয় নাই। তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীতে আলোর একান্ত অভাব। রেলওয়ে চীফ কমিশনার কর্ণেল আর বি এমার্সন রেল গাড়ীর বাল্‌ব চুরির জন্য যাত্রীদিগকে দায়ী করিবার দুঃসাহস প্রদর্শন করিয়াছেন দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। রেলের বাল্‌বগুলি কম ভোল্টেজের। সাধারণ বাড়ী-ঘরের আলো হিসাবে ঐগুলি ব্যবহার করা যায় না। যাত্রিপূর্ণ গাড়ীতে বাল্‌ব খোলা সম্ভব কিরূপে, তাহা বুঝিবার ক্ষমতাও কি এই লোকটির ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে নাই? তৃতীয় ও মধ্যম শ্রেণীর যাত্রীদের প্রতি রেল-কর্ম্মচারীদের ব্যবহার ভদ্রোচিত নয়। কর্ত্তৃপক্ষ এই সকল ত্রুটি বিনা ব্যয়ে সংশোধন করিতে পারেন। রেলের যে আয় হয়, তাহার বেশীর ভাগ আয় হয় মালের মাশুল হইতে। তাহার পরেই যাত্রীর ভাড়া হইতে আয়ের স্থান। ১৯৪৬-৪৭ সালের ভাড়া হইতে ৯৬·২৫ কোটি টাকা আয় হইয়াছে। রেলের ব্যয়ের মধ্যে সাধারণ পরিচালন ব্যয়ই বেশী। আলোচ্য বাজেটে ব্যয়-বরাদ্দকে নিম্নতম সামাজিক ব্যয়ের স্তরে আনা হয় নাই। এ সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করা উচিত ছিল। রেল-কর্ম্মচারীদের বেতন যথেষ্ট বাড়িলে যাত্রীর ভাড়া ও মালের মাশুলের হার বাড়িতে বাধ্য, এ বিষয়ে ডাঃ জন মাথাইয়ের সহিত আমরা একমত। উহার প্রতিক্রিয়া যে পণ্যমূল্যের স্ফীতির মধ্যে দেখা দিবে, এ বিষয়েও রেল-কর্ম্মীদের অবহিত হওয়া প্রয়োজন। তাঁহারা নিয়ন্ত্রিত দরে জিনিষ পাইলেও সাধারণ লোককে চোরাবাজারে জিনিষ কিনিতে হয়। রেলের আর্থিক ব্যবস্থার সুপরিচালন সম্পর্কে কোন ভরসা এই বাজেটে আমরা পাইলাম না। তাহার পূর্ব্বে ভাড়া বৃদ্ধি আমাদের ঘাড়ে চাপিয়া বসিল।

বাঙ্গালার বাজেট

বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের অর্থ-সচিব মিঃ মহম্মদ আলি ১৯৪৭-৪৮ সালের যে বাজেট ৫ই ফাল্গুন বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে পেশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায়, আগামী অর্থনৈতিক বৎসর (১৯৪৭-৪৮) বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব খাতে আয় হইবে ৪৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা। এই বরাদ্দকৃত আয়ের মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রাপ্য ১২ কোটি ৪১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বাদ দিলে যে ৩৫ কোটি ২৫ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা থাকে, উহাই রাজস্ব খাতে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত আয়-বরাদ্দের পরিমাণ। বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাবে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের প্রকৃত আয় অপেক্ষা ইহা ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বেশী। আগামী বৎসরে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের মোট ব্যয় ৫৩ কোটি ৮৮ লক্ষ ৩ হাজার টাকা হইবে। এই ব্যয়-বরাদ্দ হইতে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় ১২ কোটি ৪১ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা বাদ দিলে যে ৪১ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮ হাজার টাকা পাওয়া যায়, তাহাই প্রকৃতপক্ষে আগামী বৎসরের জন্য বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের সাধারণ ব্যয়-বরাদ্দ। বর্ত্তমান বৎসরের সংশোধিত হিসাবে বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের ব্যয়ের পরিমাণ হইতে ইহা ২ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা কম। চলতি বৎসরের সংশোধিত হিসাবের আয় অপেক্ষা আগামী বৎসরের আয় ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বেশী এবং সংশোধিত হিসাবের ব্যয় অপেক্ষা আগামী বৎসরের ব্যয় ২ কোটি ৫৯ লক্ষ ৮৩ হাজার টাকা কম হওয়া সত্ত্বেও আগামী বৎসরে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইবে ৬ কোটি ২০ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট সমস্ত শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীর বেতন বৃদ্ধির এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, সেই অনুযায়ী আগামী বৎসর সরকারী কর্ম্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করা হইলে ঘাটতির পরিমাণ আরও ৬ কোটি টাকা বাড়িয়া মোট ১২ কোটি টাকা হইবে। গভর্ণমেণ্ট বেতনও বৃদ্ধি করিবেন এবং ঘাটতিও ১২ কোটি টাকা হইবে, এ-কথা মনে করিলে ভুল হইবে না।

চলতি বৎসরের প্রাথমিক বাজেট-বরাদ্দে ঘাটতির পরিমাণ ৯ কোটি ৭০ লক্ষ ৩ হাজার টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে চলতি বৎসরের ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইতেছে ১৩ কোটি ২৪ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা। চলতি ১৯৪৬-৪৭ সালের বাজেট রাজস্ব খাতে ৩২ কোটি ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার টাকা আয় এবং ৪১ কোটি ৭৫ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কিন্তু সংশোধিত হিসাবে দেখা যায়, আয়ের পরিমাণ কিছু কমিয়া ৩১ কোটি ৭৭ লক্ষ ৪ হাজার টাকা হইয়াছে এবং ব্যয়ের পরিমাণ বাড়িয়া ৪৫ কোটি ৫ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা হইয়াছে। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্যের অনিশ্চিত অবস্থা হেতু বিক্রয়-কর হইতে আয় ৫০ লক্ষ টাকা কম হইয়াছে এবং দাঙ্গার জন্য কলিকাতায় দেশী মদের দোকান বন্ধ থাকায়ও আয় কম হইয়াছে ৫০ লক্ষ টাকা। শুল্ক বাবদ ৬০ লক্ষ টাকা এবং ষ্ট্যাম্প বাবদ ৫০ লক্ষ

টাকা আয় বেশী হওয়ায় আয়ের ঐ ১ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণ হইয়াছে। আয়ের দিক্ দিয়া ঘাটতি সামান্য হইলেও দুর্ভিক্ষ সাহায্য খাতে ৩ কোটি টাকা এবং দাঙ্গানিপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের সাহায্য বাবদ বিবিধ খাতে আড়াই কোটি টাকা একুনে সাড়ে ৫ কোটি টাকা ব্যয় বাড়িয়াছে। বস্তুতঃ, কৃষি, সেচ এবং পূর্ত্ত বিভাগের সাধারণ ব্যয় যদি ২ কোটি টাকা না কমিত, তাহা হইলে ঘাটতির পরিমাণ আরও ২ কোটি টাকা বেশী হইত। দাঙ্গাজনিত ব্যয়বৃদ্ধি সম্বন্ধে আরও একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, দাঙ্গা-তদন্ত কমিশন বাবদ চল্‌তি বৎসরে ব্যয় হইবে ৭ লক্ষ টাকা এবং আগামী বৎসর ঐ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। চল্‌তি বৎসরে বিহার হইতে আগত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ৫১ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে। আগামী বৎসর বিহারাগত আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ৫৪ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ৬১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। চল্‌তি বৎসরে মুসলিম ছাত্রদের শিক্ষার উন্নতিকল্পে সংশোধিত হিসাবে নূতন ব্যয়-বরাদ্দ সংযুক্ত করা হইয়াছে। মুসলিম শিক্ষা তহবিল নামে একটি তহবিল গঠন করা হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর এই তহবিলে দেওয়া হইবে ১০ লক্ষ টাকা। তবে চল্‌তি বৎসরের শেষভাগে এই তহবিল গঠনের সিদ্ধান্ত হওয়ায় ১০ লক্ষ টাকা সমগ্র এই বৎসর ব্যয় করা সম্ভব হইবে না। আগামী বৎসর আয়ের পরিমাণ চল্‌তি বৎসরের সংশোধক আয় অপেক্ষা ৩ কোটি ৪৮ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা বেশী হইবে বলিয়া আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আয়-কর হইতে দেড় কোটি টাকা, শুল্ক হইতে ৭০ লক্ষ টাকা, আবগারী বিভাগ হইতে ২৫ লক্ষ টাকা এবং অন্যান্য ট্যাক্স হইতে ৯০ লক্ষ টাকা আয় বেশী হইবে বলিয়া মোট রাজস্ব খাতে আয় ঐ পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে।

আগামী বৎসরে দেশের কৃষি এবং অর্থ-নৈতিক অবস্থা ভাল যাইবে বলিয়া অর্থ-সচিব মহোদয় আশা করিয়াছেন। সেই জন্য দুর্ভিক্ষ সাহায্য বাবদ ৩ কোটি টাকা কম বরাদ্দ করা হইয়াছে। দাঙ্গাপীড়িত ও আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য ১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা কম ব্যয় করিতে হইবে। এই দিক দিয়া সোয়া ৪ কোটি টাকা ব্যয় কমিলেও পুলিশ বিভাগ খাতে ব্যয় ৭৫ লক্ষ টাকা বর্দ্ধিত করা হইয়াছে। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের আমলে ইহা নবম ঘাট্‌তি বাজেট। বাঙ্গালা ঘাট্‌তি প্রদেশ হইয়া দাঁড়াইয়াছে কেন, অর্থ-সচিব মহোদয় বাজেট-বক্তৃতায় তাহার যে-সকল কারণ প্রদর্শন করিয়াছেন, তন্মধ্যে মেষ্টন এওয়ার্ড, নিমেয়ার এওয়ার্ড এবং যুদ্ধ-পরিস্থিতির কথাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মেষ্টন এওয়ার্ড প্রদত্ত হইয়াছে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়ার পূর্ব্বে। নিমেয়ার এওয়ার্ড কার্য্যকরী হইয়াছে ১৯৩৭-৩৮ সাল হইতে। এই দুইটি এওয়ার্ডেই যে বাঙ্গালার প্রতি অবিচার করা হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রবর্ত্তনের সময় কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের নিকট প্রায় এক কোটি টাকা বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা নিঃশেষ হইতে বেশী দিন বিলম্ব হয় নাই। বস্তুতঃ, যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পর হইতেই বাঙ্গালার ঘাট্‌তি ক্রমে বাড়িতে আরম্ভ করে এবং দুর্ভিক্ষ আসিয়া ঘাট্‌তিকে করিয়া তুলে বিপুল। কিন্তু বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের আয়ও যে বিপুল পরিমাণে বাড়িয়াছে, সে-কথাও বিবেচনা করা আবশ্যক। এই ঘাটতির মূলে যে বহু অপচয় আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্টের চাউলের কারবার, নৌকা নির্ম্মাণ প্রভৃতি অপচয়ের অপকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। হাজার হাজার মণ ধান, চাউল, আটা, ময়দা পচিয়া নষ্ট হইয়াছে। এইগুলিকে বাদ দিয়া নিমেয়ার এওয়ার্ড ও যুদ্ধ-পরিস্থিতিকে দোষ দিলে চলিবে কেন? চল্‌তি বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনার কাজ দাঙ্গার জন্য অতি সামান্যই অগ্রসর হইতে পারিয়াছে। বাঙ্গালার জনগণের আর্থিক অবস্থা উন্নত করিবার যে অপূর্ব্ব সুযোগ আসিয়াছে, তাহা আমরাও অস্বীকার করি না। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই সুযোগকে অনেকখানি নষ্ট করিয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, আগামী বৎসরে উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য যে ভাবে ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদত্ত অর্থই শুধু ব্যয় করার ব্যবস্থা হইয়াছে, জনগণের অবস্থা উন্নত হওয়ার ভরসা করিবার মত কিছুই উহাতে আমরা দেখিতে পাইলাম না।

—

মিঃ এটলীর ঘোষণা

বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী মিঃ এটলীর ঘোষণায় ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই ভারতবাসীর হস্তে পূর্ণ ক্ষমতা অর্পণের প্রতিশ্রুতি রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার ঘোষণা আদ্যোপান্ত শুনিয়া বা পাঠ করিয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট সম্পর্কে তাঁহার নীরবতার কথাই আমাদের মনে বিশেষ করিয়াই জাগিয়াছে। মিঃ এটলী বলিয়াছেন, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে 'সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিমূলক পরিষদ কোন শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারেন নাই বলিয়া প্রতীয়মান হইলে বৃটিশ ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কাহাদের নিকট হস্তান্তর করা হইবে তাহা বিবেচনা করিবেন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট।' তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করিলেও যথাপূর্ব্বং গণ-পরিষদের কার্য্য চলিতে থাকিবে, গণ-পরিষদ বাতিল করিয়া দেওয়ার বা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার কোন অভিপ্রায় বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই। মুসলিম লীগ গণ-পরিষদে যোগদান না করিলে গণ-পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্রকে যে সম্পূর্ণ ভাবে প্রতিনিধিমূলক পরিষদের রচিত শাসনতন্ত্র বলিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করিবেন না, তাহা গত ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায়। কাহাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, সে-সম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া তিনি কিছু বলেন নাই। তাঁহার ঘোষণার মধ্যে মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাবিত অখণ্ড ভারতকে বানচাল করিবার সুস্পষ্ট প্রয়াস দেখা যায়। অথবা এ-কথা বলিলেই বোধ হয় ঠিক হয় যে, মন্ত্রী মিশন অখণ্ড ভারতের ভাঁওতা দিয়া প্রদেশমণ্ডলীর খিড়কী পথে পাকিস্থানের প্রবেশ সুগম করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু মিঃ এটলী পাকিস্থানের জন্য এবার সদর দরজাই খুলিয়া দিয়াছেন।

মিঃ এটলীর ঘোষণায় ইহা গোপন রাখা হয় নাই যে, কংগ্রেস-লীগ অনৈক্যের উপরেই তিনি তাঁহার আলোচ্য ঘোষণাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। এই ঘোষণায় কাহাদের হাতে ক্ষমতা ছাড়িয়া দেওয়া হইবে তাহা যেমন নিশ্চয় করিয়া বলা হয় নাই, তেমনি পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার আশাও মুসলিম লীগকে দেওয়ার ত্রুটি করা হয় নাই। গণ-পরিষদ এবং অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টকে কেন্দ্র করিয়া কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব যে মধুর স্বপ্ন দেখিতেছেন, তাহা পাছে ভাঙ্গিয়া যায়, এই আশঙ্কায় কংগ্রেসের বৃহৎ নেতৃত্ব বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের উপর যেমন আরও বিশেষ করিয়া নির্ভরশীল

হইবেন, তেমনি পাকিস্থান পাওয়া যাইবে আশায় মুসলিম লীগও আরও বেশী উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। ইহার উপর আছে দেশীয় রাজন্যবর্গ। মিঃ এট্‌লী তাঁহার ঘোষণায় দেশীয় রাজন্যবর্গকে অভয় দিয়া বলিয়াছেন যে, মন্ত্রী মিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী দেশীয় রাজন্যবর্গের সার্ব্বভৌমত্ব বৃটিশ ভারতের কোন গভর্ণমেণ্টের নিকট অর্পণ করা হইবে না। মন্ত্রী মিশনের সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা মুসলিম লীগের ন্যায় দেশীয় রাজন্যবর্গকেও দর-কষাকষি করিবার সুযোগ দিয়াছে। তাঁহারা যে দর হাঁকিতেছেন তাহা যে ষোল আনাই আদায় হইবে, মিঃ এট্‌লী তাঁহার ঘোষণায় রাজন্যবর্গকেও সেই আশ্বাসই দিয়াছেন। দেশীয় রাজারা প্রত্যেকে এক-এক জন সার্ব্বভৌম রাজাই থাকিল। মুসলিম লীগও তাহার বাঞ্ছিত পাকিস্থান পাইবে। বাদ বাকী অংশের নামকরণ কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই। কারণ, এই ভাবে ভারত শতধা-বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাধীনতা যে কিছুতেই লাভ করিতে পারে না, সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ করিবার কোন কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি না।

মিঃ এট্‌লীর ঘোষণায় অন্তর্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট সম্বন্ধে কোন কথা না থাকিলেও বড়লাট পরিবর্ত্তনের কথা আছে। লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেন ভারতের বড়লাট হইয়া আসিতেছেন। বড়লাটের পদে লর্ড লুই মাউণ্ট ব্যাটেনের নিয়োগ যে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ভারতীয় নীতির কোন পরিবর্ত্তনই সূচনা করিতেছে না তাহা মিঃ এট্‌লীর ঘোষণা বিশ্লেষণ করিলেই বুঝিতে পারা যায়। গণ-পরিষদ বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা নাই, এইটুকু ছাড়া মিঃ এট্‌লীর ঘোষণায় কংগ্রেসের আর কিছু ভরসা করিবার নাই।

বাঙ্গালা ও পাঞ্জাব

যে দিন বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ১৯৪৮ সালের জুন মাসে এ দেশের লোকের হাতে পূর্ণ ক্ষমতা তুলিয়া দিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে মুসলিম লীগ তাঁহাদের প্রস্তাবিত পাকিস্থানী অঞ্চলে লীগ গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন। বাঙ্গালা ও সিন্ধুদেশে লীগ-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং ঐ দুইটি প্রদেশে পাকিস্থানী শাসন-নীতি অবাধ গতিতে চলিয়াছে। এইবার পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামে কোন রকমে লীগ-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই জিন্না সাহেবের মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে সম্মিলিত ভাবে কাজ করা অসম্ভব হয়, তাহা হইলে সমগ্র ভারতবর্ষের শাসন-ভার কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া না দিয়া কোন কোন অঞ্চলে উহা প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে। সুতরাং মুসলিম লীগ যে সমস্ত প্রদেশগুলি লইয়া তাঁহাদের পাকিস্থান গঠন করিতে চান, সে সমস্ত প্রদেশগুলিতে যদি ১৯৪৮ সালের জুন মাসের পূর্ব্বে লীগ-গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত করা যায়, তাহা হইলেই শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় পাকিস্থান আপনা হইতেই গড়িয়া উঠিবে। লীগের এই পাকিস্থান প্রতিষ্ঠা সহজ করিয়া দিবার জন্যই পাঞ্জাবের প্রধান মন্ত্রী পদত্যাগ করিয়াছেন।

জিন্না সাহেব অনেক মিষ্ট কথা বলিয়া পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুদিগকে পাকিস্থানের মধ্যে পুরিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু পাঞ্জাবের শিখ ও হিন্দুরা মুসলিম রাজত্বে বাস করিতে মোটেই রাজী নহেন। জোর করিয়া ইঁহাদিগকে পাকিস্থানভুক্ত করিতে গেলে যে একটা প্রচণ্ড রক্তারক্তি কাণ্ড বাধিবে, তাহার প্রমাণ এখন হইতেই পাওয়া যাইতেছে। এই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য কংগ্রেসের কর্ম্ম-পরিষদ পাঞ্জাবকে দুইটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া এক প্রদেশের শাসনভার মুসলিম লীগের হাতে এবং অন্য প্রদেশের শাসনভার হিন্দু ও শিখ মন্ত্রি-মণ্ডলীর হাতে তুলিয়া দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। মুসলিম লীগ যদি পাকিস্থান গঠনের সঙ্কল্প ত্যাগ না করেন এবং বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যদি কোন কোন প্রদেশের শাসন-ভার শেষ পর্য্যন্ত প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে তুলিয়া দিতে চান, তাহা হইলে পাঞ্জাবকে দুই ভাগে বিভক্ত করাই যে শান্তিরক্ষার পথ, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালা দেশের অবস্থা ঠিক পাঞ্জাবেরই অনুরূপ; এবং এখানকার হিন্দুরা পাকিস্থানী নীতির যে আস্বাদ পাইয়াছেন তাহাতে এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, তাঁহারা বাঙ্গালার বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলীর শাসনাধীনে বাস করিতে মোটেই রাজী নহেন। বাঙ্গালাকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এই সমস্যার মীমাংসা করিবার কথা বহু পূর্ব্বেই উঠিয়াছে। বাঙ্গালার কংগ্রেসী নেতারা এত দিন এ-সম্বন্ধে নীরব ছিলেন; কিন্তু কংগ্রেসের কর্ম্ম-পরিষদ সম্প্রতি পাঞ্জাব সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার পর বাঙ্গালার কংগ্রেসের পক্ষে আর পশ্চিম বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলা চলে না। এখন ফরওয়ার্ড ব্লক ও আজাদ হিন্দ্ দলের লোকেরাই প্রধানতঃ ইহার বিরোধিতা করিতেছেন; তাঁহারা বলেন, স্বয়ং নেতাজী যখন অখণ্ড বাঙ্গালার পক্ষপাতী ছিলেন, তখন অপরের পক্ষে অন্যরূপ চেষ্টা করা অসঙ্গত। বাঙ্গালার অখণ্ডত্ব রক্ষা করা সকলেরই কাম্য; কিন্তু প্রশ্ন এই, সেই অখণ্ডতা রক্ষা করিতে গিয়া কি মুসলিম লীগের সমস্ত অনাচার নীরবে মানিয়া লইতে হইবে? এখন যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালার অখণ্ডত্ব রক্ষা করিতে গেলে হয় মুসলিম লীগের প্রভাব ধ্বংস করিবার জন্য সকলকে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইতে হয়; নয়তো যেখানে জাতীয়তার আদর্শ রক্ষা করা সম্ভবপর সেই অংশ লইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশ গড়িতে হয়।

সেনেটের নূতন সভ্য

শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সর্ব্বোচ্চ ভোট লাভ করিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

পূর্ণেন্দুকুমার স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্র এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার বয়স মাত্র ২১ বৎসর এবং তিনি সেনেটের কনিষ্ঠতম সভ্য। পূর্ণেন্দুকুমার রিপন. ল' এবং বঙ্গবাসী কলেজে অধ্যাপনা করিতেছেন। সুবক্তা হিসাবে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি আছে। আমরা তাঁহার উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

বাঙ্গালীর সম্মান

কলিকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের জনপ্রিয় ডেপুটি কমিশনার হীরেন্দ্রনাথ সরকার তাঁহার স্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা সরকার সহ

লণ্ডন যাইতেছেন। সরকার মহাশয় বিলাতের সুবিখ্যাত স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে অপরাধ-নির্ণয় সম্পর্কিত বিজ্ঞান-সম্মত উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য সরকার কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে কৃতিত্বের সহিত বি-এ পাশ করেন ও আই পি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতীয় পুলিশ বিভাগে প্রবেশ করেন। কলিকাতা পুলিশে তিনিই সর্ব্বপ্রথম অপরাধ-নির্ণয়ের জন্য বৈজ্ঞানিক প্রথার প্রচলন করেন। তিনি কেবল কঠোর কর্ত্তব্যপরায়ণ পুলিশ অফিসারই ছিলেন না, সাহিত্যিক হিসাবেও জনসমাজে তাঁহার বিলক্ষণ খ্যাতি ছিল। তিনি এবং তাঁহার স্ত্রী কলিকাতার বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। আমরা তাঁহার ক্রমোন্নতি কামনা করি।

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়

'দৈনিক বসুমতী'র ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বিখ্যাত সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন মহাশয় গত ২৮শে মাঘ তাঁহার গোবরডাঙ্গাস্থ বাসভবনে পরলোক গমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭৬ বৎসর হইয়াছিল। গত কয়েক বৎসর তিনি বাতব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিলেন।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত তাঁহার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ সুধী সমাজে বিশেষ ভাবে আদৃত হইত। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বেও তিনি নিয়মিত ভাবে 'বসুমতী' 'বঙ্গশ্রী' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। সাংবাদিকরূপে তিনি 'হিতবাদী', 'টেলিগ্রাফ' প্রভৃতি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণের পূর্ব্বে তিনি দীর্ঘকাল 'দৈনিক বসুমতী'র সম্পাদক ছিলেন। কর্ম্মজীবনের প্রারম্ভে তিনি কিছু কাল গোবরডাঙ্গা ও ভদ্রেশ্বর স্কুলে শিক্ষকতা করেন। মৃতের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ স্থানীয় গার্লস স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়। স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রবৃন্দ, গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্মশানে উপস্থিত থাকিয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

বিশিষ্ট ব্যবসায়ীর কর্ম্মজীবনের অবসান

প্রসিদ্ধ ঢোল এণ্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী শ্রীবনোয়ারীলাল ঢোল মহাশয় গত ১৩ই ফেব্রুয়ারী প্রত্যূষে বরাহনগরস্থ নিজ বাসভবনে দেহত্যাগ করিয়াছেন। সামান্য অবস্থা হইতে পরিশ্রম ও সততার গুণে ইনি যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, দানশীলতা ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মৃত্যুতে বহু প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। আমরা তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা এবং শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করি।

প্রভাবতী চন্দ্র

আহিরীটোলা-নিবাসী ডাক্তার মাণিকচন্দ্র চন্দ্র M. B. G. P., প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয়ের সাধ্বী পত্নী শ্রীমতী প্রভাবতী চন্দ্র গত ১৬ই জানুয়ারী ৪২ বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ

করিয়াছেন। তিনি পল্লীর বহু বিধবা ও দুঃস্থদিগকে অর্থ-সাহায্য দিতেন এবং মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে আহিরীটোলা বঙ্গবিদ্যালয়ে ১০০৲ টাকা দান করিয়া যান।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেসিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক বসুমতী

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
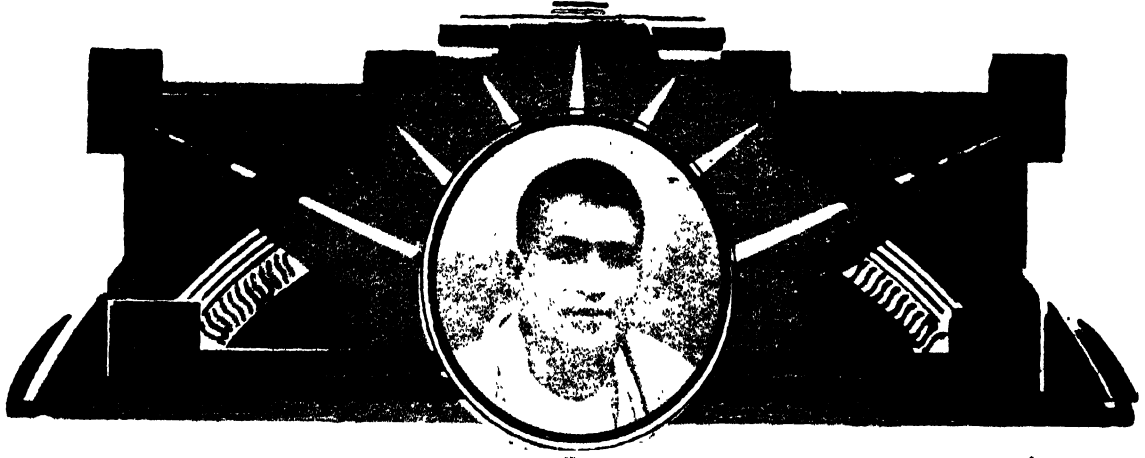
২৫শ বর্ষ, চৈত্র, ১৩৫৩] [দ্বিতীয় খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যা

"বর্ত্তমান যুগে কালের যে আহ্বান-ভেরী ধ্বনিত হইতেছে, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে তাহা কখনও শ্রুত হয় নাই। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব যুগে সমাজের মুখ্য ও গৌণ প্রয়োজনাদির সাধনায় জ্ঞাত-সারে ও সমবেত ভাবে সকলকে ব্রতী হইতে হয় নাই। বর্ত্তমান কালে আমাদের দেশে ও সমাজে সমষ্টি-শক্তির উদ্বোধন হইতেছে। সমগ্র দেশ ও সমাজের প্রয়োজনকে প্রত্যেকে আপনার প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতে শিখিতেছে। কোন সামাজিক প্রয়োজনকেই এখন আর একটা শ্রেণীগত গণ্ডীর ভিতর নিতান্ত বিশ্লিষ্ট ভাবে আত্মপোষণ করিয়া যাইতে হইবে না। বিশেষতঃ, আমাদের সমাজের যাহা মূল প্রয়োজন, তাহাকে প্রত্যেকেরই জীবনের মূল প্রয়োজন বলিয়া অনুভব করিতে শিখিতে হইবে।"

—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ

বাঙালী মধ্যশ্রেণী

বিনয় ঘোষ

যন্ত্রযুগের আবির্ভাবে যে শিল্পবিপ্লব ঘটল তার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে প্রাচীন সামন্তসমাজ চূর্ণ হয়ে গেল। প্রাচীন সমাজের যে শ্রেণীবিন্যাস ছিল তারও রূপান্তর ঘটল। আকস্মিকভাবে ঘটল না, ধীরে ধীরে ঘটল। পুরাতন সমাজের বিন্যাস ও শৃঙ্খলা দুই ভেঙে গেল এবং বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয়ের ভিতর দিয়ে নূতন শ্রেণীবিন্যাস ও সমাজ-শৃঙ্খলা দেখা দিল। সমাজে মানুষের মধ্যে যখন এই নূতন শ্রেণীবিন্যাস দেখা দিচ্ছিল তখন 'মধ্যশ্রেণীর' (Middle class) আবির্ভাব ইতিহাসে একটা যুগান্তকারী ঘটনা। 'মধ্যশ্রেণী' ও 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণী' (Intelligentsia) বলতে আধুনিককালে আমরা যাঁদের বুঝি তাঁদের পূর্ব্বপুরুষদের আবির্ভাব ইতিহাসের এই যুগসন্ধিক্ষণেই সুনির্দ্দিষ্টভাবে হয়। তার পূর্ব্বে সমাজে যে 'মধ্যশ্রেণী' ও 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণী' ছিল না তা নয়, কিন্তু সেকালের এই দুই শ্রেণীর সঙ্গে একালের সমশ্রেণীভুক্তদের যে মৌলিক পার্থক্য ছিল তা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত। সেকালের সামন্তপ্রভুদের পরবর্ত্তী স্তরে জমিদার জায়গীরদার পত্তনীদার আমলা অমাত্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত পণ্ডিত শাস্ত্রকার মুন্সী মৌলবী সেনাপতি ফৌজদার প্রভৃতি যাঁদের নিয়ে মধ্যশ্রেণী গঠিত ছিল তাঁদের শ্রেণীমর্য্যাদা বংশপরম্পরায় অক্ষুণ্ণ থাকত। বংশগৌরবই ছিল সামাজিক শ্রেণী নির্ণয়ের প্রধান মানদণ্ড। তাই সদাগরশ্রেণী কারিগরশ্রেণী ও অবস্থাপন্ন কৃষকশ্রেণী যাঁরা ধনসম্পত্তির দিক দিয়ে মধ্যশ্রেণীভুক্ত হবার যোগ্যতা লাভ করতেন, তাঁদের সেই শ্রেণীমর্য্যাদা দেওয়া হ'ত না, কারণ তাঁরা উচ্চবংশজাত ছিলেন না। বংশ ও রক্তসম্পর্কের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণীর গণ্ডীও সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজের আভ্যন্তরীণ শ্রেণীকাঠামো তৎকালীন অর্থনৈতিক কাঠামোর মতই অচল অটল স্থিতিশীল ছিল। একশ্রেণী থেকে আর একশ্রেণীতে উন্নতির বা অবনতির সম্ভাবনা একেবারেই ছিল না বলা চলে। কিন্তু নূতন শ্রমশিল্পের যুগে, ধনিকতন্ত্রের যুগে, সচল সক্রিয় যন্ত্রযুগে মধ্যযুগীয় সামাজিক অচলায়তন ভেঙে গেল। প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী সোরোকিন (Sorokin) থাকে 'Social mobility' বা 'সামাজিক গতিশীলতা' বলেছেন, সেই গতিশীলতা সঞ্চারিত হ'ল সমাজে (১)। মুদ্রা-প্রধান অর্থনীতি (Money Economy) প্রাচীন দুর্ভেদ্য শ্রেণীপ্রাচীর ভেঙে দিল। স্বাধীন বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় যারা উত্তীর্ণ হবে তাদের নিম্ন থেকে মধ্য এবং মধ্য থেকে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত হ'তে কোন বাধা নেই। শিক্ষালাভের অধিকার সকলের আছে, অন্ততঃ যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে তাদের তো নিশ্চয়ই। সুতরাং শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হতেও তাদের আর কোন বাধা নেই। এইভাবে নূতন যন্ত্রযুগে, শিল্পবিপ্লবের যুগে, মুদ্রার প্রচলন ও পণ্যের প্রাচুর্য্যের যুগে, শিক্ষার প্রসারের যুগে সমাজে নূতন শ্রেণীবিন্যাস হ'ল, বুর্জ্জোয়াশ্রেণী, 'মধ্যশ্রেণী' ও 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর' উদ্ভব হ'ল। গ্রামের ও মধ্যযুগীয় নগরের কৃষক কারিগর কারুশিল্পী যারা উৎখাত হ'ল তারা দলে দলে নূতন শিল্পনগর অভিমুখে যাত্রা করল কারখানার মজুর হবার জন্যে। তাদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যের শেষ চিহ্নটুকু পর্য্যন্ত অবলুপ্ত হয়ে গেল। কারিগরিবিদ্যা ও মেহনত বেচে তাদের জীবিকা অর্জ্জন করতে হবে, এ ছাড়া জীবনধারণের আর অন্য কোন উপায় নেই। এদেরই বলা হ'ল 'প্রলেটারিয়েটশ্রেণী'। নূতন যুগের সমাজের শ্রেণী-কাঠামোটি হ'ল এই: (ক) বুর্জ্জোয়াশ্রেণী বা ধনিকশ্রেণী—যারা কলকারখানার মালিক, যন্ত্রপাতির মালিক ও ব্যবসায়ী; (খ) মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণী—অর্থাৎ ক্ষুদে ব্যবসায়ী দালাল দোকানদার কেরাণী কর্ম্মচারী ইঞ্জিনিয়ার বিজ্ঞানী শিক্ষক অধ্যাপক ইত্যাদি; (গ) প্রলেটারিয়েটশ্রেণী। বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে গোড়া থেকেই যে প্রাচীর ওঠেনি তা নয়, একশ্রেণী থেকে আর একশ্রেণীতে উন্নীত হবার পথে অন্তরায় যে ছিল না তা নয়, যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রক্ত সম্পর্ক ও বংশগৌরবের মতো সে-প্রাচীর গোড়া থেকেই একেবারে দুর্ভেদ্য ও দুর্লঙ্ঘ্য হয়নি। ধনতান্ত্রিক যুগের প্রথম পর্য্যায়ে বুর্জ্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর মধ্যে গতিশীলতা স্পষ্টভাবেই ছিল, কারণ স্বাধীন বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় মুনাফা ও মূলধন সঞ্চয় ক'রে বুর্জ্জোয়াশ্রেণীতে উন্নীত হওয়া কষ্টসাধ্য হ'লেও অসাধ্য ছিল না। তেমনি প্রলেটারিয়েটশ্রেণী থেকে সুদক্ষ শিক্ষিত বুদ্ধিমান মজুরদের ধীরে ধীরে টেক্‌নিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ার হয়ে মধ্যশ্রেণীতে উন্নীত হবার সুদূর সম্ভাবনা ছিল। পুঁজিবাদের পূর্ণ বিকাশের ফলে পুঁজিপতিশ্রেণীর মধ্যে যেমন একচ্ছত্র পুঁজিপতি (Monopoly Capitalist) ও সাধারণ পুঁজিপতিদের পার্থক্য দেখা দিচ্ছে, ঠিক তেমনি 'মধ্যশ্রেণীর' মধ্যেও নানারকম স্তরভেদ অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠছে। উচ্চ মধ্য ও নিম্ন এই তিন স্তরে 'মধ্যশ্রেণী' বিভক্ত হয়ে গেছে। উচ্চস্তরের ঝোঁক যতটা উচ্চতর পুঁজিপতিশ্রেণীর দিকে নয়, তার চাইতে অনেক বেশী ঝোঁক নিম্ন ও মধ্যস্তরের নিম্নতম প্রলেটারিয়েটশ্রেণীভুক্ত হবার দিকে। অর্থাৎ পুঁজিবাদের পূর্ণবিকাশের ফলে সমাজজীবনে যে গতিশীলতা পূর্ব্বে ছিল তা ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এই হ'ল আধুনিক সামাজিক গতিবিদ্যার (Social Dynamics) অমোঘ নির্দ্দেশ (২)। শ্রেণীকাঠামো ক্রমেই স্থিতিশীল সুনির্দ্দিষ্ট ও দুর্ভেদ্য হয়ে উঠছে। এই স্থিতিশীলতার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমাজে মধ্যশ্রেণীর আর্থিক সঙ্কট, বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সংস্কৃতিসঙ্কট এবং শ্রেণীবিরোধ ও শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ ক্রমেই তীব্রতর হচ্ছে। নিম্নোদ্ধৃত শ্রেণীসূচী ও বৃত্তিসূচী থেকে এই সামাজিক গতিশীলতার ক্রমাবনতি সম্বন্ধে ধারণা অনেকটা পরিষ্কার হবে ব'লে আশা করি। জার্ম্মাণ সমাজবিজ্ঞানী ফ্রিড্রিশ

(১) P. Sorokin: Social Mobility (1927)

(২) P. Sorokin: Social Dynamics.

জাহ্‌ন (Freidrich Zahn) ১৯২৫ সালে বহু উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের জীবনী থেকে এবং স্বাধীনভাবে সযত্নে তথ্যানুসন্ধানের ফলে এই সূচীটি তৈরী করতে সমর্থ হয়েছিলেন (৩)।

সমসাময়িক বৃত্তি	পিতার শ্রেণী		
	উচ্চশ্রেণীভুক্ত		
	বুদ্ধিজীবী %	বিত্তবান %	মধ্য ও নিম্ন-মধ্যশ্রেণী %
বড় শিল্পপতি	১৩˙৯	৭০˙৯	১৫˙২
ধনিক ব্যবসায়ী, প্রকাশক, ব্যাঙ্কার	১৭˙৮	৬৭˙২	১৫˙০
জমিদার ও ছোট জমিদার	১৪˙৮	৮৫˙২	×
উচ্চশিক্ষিত চাকুরীজীবী	৩৮˙৮	৩৬˙৯	২৪˙৩
	৪০˙৫	৩৭˙২	২২˙৩
ইঞ্জিনিয়ার, টেকনিসিয়ান, স্থপতি বিল্ডার কনট্র্যাক্টর ইত্যাদি	৩১˙৭	৩৪˙১	৩৪˙২
অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক বিভাগের প্রতিনিধি	৪২˙৬	৩৫˙০	২২˙৪
সর্ব্বসাকুল্যে	২৮˙৯	৫১˙৪	১৯˙৭

এই সূচীতে দেখা যায় যে ১০০ জন প্রধান শিল্পপতিদের মধ্যে প্রায় ৭০ জন, ১০০ জন ধনিক ব্যবসায়ী, প্রকাশক ও ব্যাঙ্কারের মধ্যে প্রায় ৬৭˙২ জন এবং ১০০ জন জমিদারের মধ্যে প্রায় ৮৫ জন স্ব স্ব শ্রেণীভুক্ত পিতার পুত্র। শ্রেণীউন্নতিও সামান্য হয়েছে। যেমন যাদের পিতা মধ্য ও নিম্ন মধ্যশ্রেণীভুক্ত ছিল তাদের মধ্যে শতকরা ১৫ জন, আর যাদের পিতা উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ছিল তাদের মধ্যে শতকরা ১৩˙৯, ১৭˙৮ ও ১৪˙৮ জন যথাক্রমে প্রধান শিল্পপতি, প্রকাশক, ধনিক ব্যবসায়ী অথবা ব্যাঙ্কার এবং জমিদারশ্রেণীভুক্ত হয়েছে। সমাজের আভ্যন্তরীণ গতিশীলতা যে ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'চ্ছে তা বুঝতে কষ্ট হয় না। সামাজিক গতিবিদ্যার নিয়ম অনুযায়ী শ্রেণীসমাজের রূপান্তর ঘটলেও নূতন যে শ্রেণীসমাজের আবির্ভাব হয় তার পূর্ণতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যবধানপ্রাচীর ক্রমেই দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। নূতন শ্রেণীসমাজের প্রাথমিক গতিশীলতা ক্রমেই অবরুদ্ধ হয়ে আসে। শ্রেণীবৈষম্যই যদি সমাজব্যবস্থার বনিয়াদ হয় তাহলে সে-সমাজ স্থিতিশীল হ'তে বাধ্য। শিক্ষার গণতান্ত্রিক অধিকার ও প্রসারের ফলে মধ্যশ্রেণীর নিম্ন ও মধ্য স্তরের কলেবর বৃদ্ধি হ'চ্ছে, প্রলেটারিয়েটশ্রেণীও সামান্য শিক্ষা পাচ্ছে, কিন্তু তাতে সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের কোন পরিবর্ত্তন ঘটার সম্ভাবনা থাকছে না। ১৮৩০ সালে জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধেক ছিল উচ্চশ্রেণীর সন্তান, আর শতকরা ২০ জন ছিল মধ্যশ্রেণীর সন্তান। ১৯৩০ সালে দেখা যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে শতকরা ২০ জন উচ্চশ্রেণীর সন্তান, আর শতকরা ৪০ থেকে ৫০ জন মধ্যশ্রেণীর সন্তান। জার্ম্মাণ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্ন মধ্যশ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের সংখ্যাও দেখা যায় ১৯১৪ সালের ৩০,০০০ থেকে ১৯৩০ সালে ৬০,০০০ পর্য্যন্ত বেড়েছে। শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধির ফলে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আয়তন বৃদ্ধি হ'চ্ছে, বেকার সমস্যা বাড়ছে এবং "Proletarianisation of the Intelligentsia' দ্রুতগতিতে কার্য্যকরী হ'চ্ছে (৪)। সমাজে সমগ্র মধ্যশ্রেণীর সঙ্কটও এইভাবে দেখা দিচ্ছে। উচ্চ উচ্চতর উচ্চতম শ্রেণীরা যদি ক্রমেই সঙ্কুচিত হয় তাহ'লে মধ্যশ্রেণী ও প্রলেটারিয়েটশ্রেণী সম্প্রসারিত হ'তে বাধ্য, কিন্তু তার জন্যে শ্রেণী-রূপান্তর ঘটছে না, শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের ভিতর দিয়ে সেই রূপান্তরের পথ পরিষ্কার হ'চ্ছে মাত্র। তার নিশ্চিত নির্দ্দেশ হ'ল মজুরশ্রেণীর দিকে মধ্যশ্রেণীর অধোগতি, মজুরশ্রেণীর মতো মধ্যশ্রেণীর সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলন এবং মধ্যশ্রেণীর মেকী স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব পরিহার।

বাংলাদেশে নবযুগের সন্ধিক্ষণে উনবিংশ শতাব্দীতে ধনিকতন্ত্রের প্রাথমিক পর্য্যায়ে এই 'মধ্যশ্রেণী' ও 'বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর' বিকাশ হয়। ধনিকতন্ত্রের ক্রমিক অগ্রগতির ফলে, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন ও প্রসারের ফলে এই মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আয়তন বৃদ্ধি হতে থাকে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে এই দুই শ্রেণীর সঙ্কট ঘনিয়ে আসে, তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে সঙ্কট গভীরতর হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক পর্য্যায়ে, অর্থাৎ প্রাথমিক মূলধন সঞ্চয়কালে বাংলাদেশের উদীয়মান ধনিকশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর মধ্যে যে দুর্ব্বার গতিশীলতা ও প্রাণশক্তি ছিল ক্রমেই সেই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তি শুকিয়ে এসেছে। সেই গতিশীলতা ও প্রাণশক্তির জোরেই উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার প্রবল জাগৃতি-জোয়ার উত্থান-পতনের বন্ধুর পথে রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রবাহিত হয়, বিরাট মনীষা, গঠন ও সৃষ্টি-প্রতিভার বিকাশ হয়। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে চতুর্থ দশকের মধ্যে এই প্রাণশক্তি নিস্তেজ হয়ে আসে, জাগৃতিজোয়ারে ভাটা পড়ে, মধ্যশ্রেণীর ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর সঙ্কট প্রকট হয়ে ওঠে, সংস্কৃতির বিকৃতি দেখা দেয়। মধ্যশ্রেণীর মানসিক বিকৃতির প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নরহত্যা বিচারবুদ্ধিশূন্যতা ও যুক্তিহীনতার মধ্যে। দৃষ্টান্ত হ'ল—একশ্রেণীর তরুণ শিক্ষার্থী ও যুবকদের গুণ্ডামিপ্রবণতা, শিক্ষক-অধ্যাপক প্রহার, দলবদ্ধভাবে ছাত্রদের আত্মহত্যার হুমকি, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, নরহত্যায় উল্লাস প্রকাশ ইত্যাদি। এগুলি সব ফ্যাশিজমের উপসর্গ। এ হ'ল পশ্চাৎগতি। এ ছাড়াও সঙ্কটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে, যে-দিকের কথা আগে বলেছি, প্রগতির দিক। মধ্যশ্রেণী বুদ্ধিজীবিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর মধ্যে ব্যবধান সঙ্কটের আঘাতে ক্রমেই ভেঙে যাচ্ছে, মধ্যশ্রেণী সঙ্ঘবদ্ধ আন্দোলনের ভিতর দিয়ে মজুরশ্রেণীর সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন আরও দৃঢ় করছে। মধ্যশ্রেণী ও মজুরশ্রেণী স্বার্থ-সঙ্কটের চাপে, বাস্তব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে এক হয়ে যাচ্ছে। মধ্যশ্রেণী

(৩) Karl Mannheim : Man and Society (1947) : P. 90f.

(৪) Karl Mannheim : Op. Cit : P. 99—103. পূর্ব্ব ও মধ্য-ইউরোপে Kotsching বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর এই সঙ্কট সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন ("Unemployment in the Learned Professions"—Oxf. Univ. Press, 1937)।
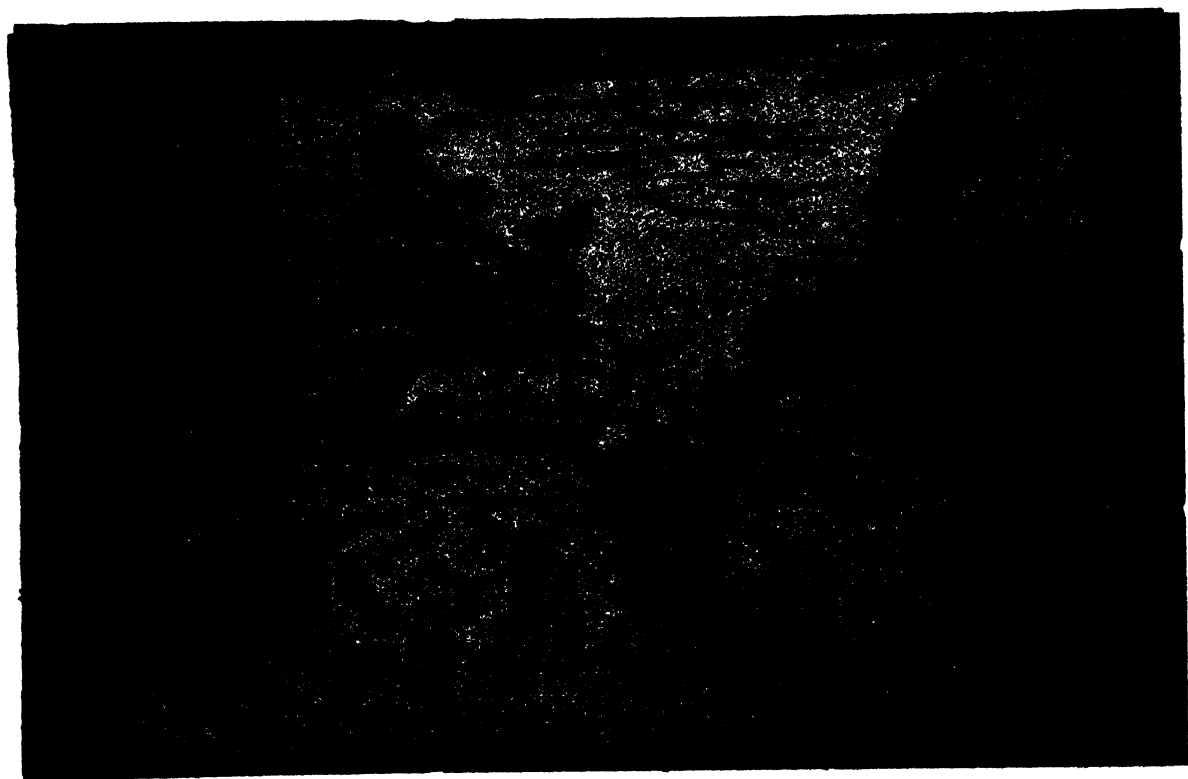
ভুলো —মাখন দত্তগুপ্ত

নীলি মসজিদ (দিল্লী) —গুণেন গঙ্গোপাধ্যায়

ঝড়-বৃষ্টি —চিত্তরঞ্জন দাস

মেনি —মাখন দত্তগুপ্ত

মেকী স্বাতন্ত্র্যগর্ব্ব পরিহার ক'রে মুক্তি ও প্রগতির পথে অগ্রসর হ'চ্ছে। বর্ত্তমানে বাংলাদেশের মধ্যশ্রেণীর সঙ্কট এই দুই দিকে প্রকাশ পাচ্ছে, একটি পশ্চিম দিক আর একটি পূর্ব্ব দিক। পশ্চিম দিক পশ্চাৎ-গতির দিক, বাংলার সংস্কৃতি-সূর্য্যের অস্তাচলের দিক, ফ্যাশিজমের দিক। পূর্ব্ব দিক প্রগতির দিক, বাংলার সংস্কৃতি-সূর্য্যের নবোদয়ের দিক, নবরূপান্তরিত জাগৃতির দিক। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগৃতিধারার উত্তরাধিকারী বাঙালী মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর একাংশ আজ দিগ্‌ভ্রষ্ট হলেও বাংলার সংস্কৃতি পশ্চিমের পথে বিচার-বুদ্ধি-শূন্যতা ও যুক্তিহীনতার গাঢ় তমিস্রার মধ্যে অস্ত যাবে না নিশ্চয়ই। বাংলার মধ্যশ্রেণীর এই সঙ্কটের বিশ্লেষণ ও আলোচনা সবিস্তারে যথাসময়ে ও যথাস্থানে করব। এখানে আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হ'ল উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বিকাশের ধারা ও ইতিহাস আলোচনা করা, বাংলাদেশের নূতন শ্রেণীবিন্যাসের রূপ-নির্দ্ধারণ করা এবং নূতন উদীয়মান শ্রেণীর প্রাণ-শক্তির পরিচয় দেওয়া। এই নূতন বাংলার উদীয়মান ধনিকশ্রেণী মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর প্রবল প্রাণশক্তির প্রকাশ হ'ল বাংলার জাগৃতি (Renaissance)।

মধ্যশ্রেণীর সংজ্ঞার্থ ও ভূমিকা

মধ্যশ্রেণী ও বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর কোন নির্দ্দিষ্ট সংজ্ঞার্থ দেওয়া কঠিন। বৃটিশ মধ্যশ্রেণীর ইতিহাস রচনাকালে গ্রেটন এই মধ্যশ্রেণী সংজ্ঞার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন যে ষোড়শ শতাব্দী শেষ হবার আগে সমাজের এই মধ্যশ্রেণী সম্বন্ধে কেউ আদৌ সচেতন ছিল কি না সন্দেহ। মধ্যশ্রেণী যে তার পূর্ব্বে সমাজে ছিল না তা নয়, কিন্তু সামাজিক শক্তিরূপে তাকে গণ্য করার মতো কোন কারণ ছিল না তখন। ধনতান্ত্রিক যুগে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব হ'ল। এ কথার অর্থ হ'ল এই যে, সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক শক্তিরূপে মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হ'ল যন্ত্রশিল্পের প্রসারের যুগে। তারপর থেকেই মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্ব ও ভূমিকা সম্বন্ধে সকলের চেতনা হ'ল এবং এই নূতন চেতনার আলোকেই প্রাচীন যুগের মধ্যশ্রেণীর স্বরূপ সম্বন্ধে সকলের কৌতূহল জাগল। বাণিজ্য, মুদ্রাপ্রধান অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে আধুনিক মধ্যশ্রেণীর বিকাশ এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে মধ্য-শ্রেণীর সংজ্ঞার্থ দিতে গিয়ে গ্রেটন সাহেব বলেছেন: "সমাজের সেই শ্রেণীকেই আমরা মধ্যশ্রেণী বলতে পারি, মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রধান নিয়ামক এবং মুদ্রাই যাদের জীবনের প্রাথমিক উপাদান।" এর মধ্য থেকে জমিদার ও কৃষকদের তিনি বাদ দিয়েছেন কারণ, ভূসম্পত্তি ও জমিজমাই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন, মুদ্রা নয়। ধনিক শিল্পপতি, বণিক, শিক্ষিত চাকুরিজীবী ইত্যাদি যাদের জীবনের সঙ্গে মুদ্রার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ, মুদ্রাই যাদের মূলমন্ত্র, যাদের কাছে ন্যায়-অন্যায় প্রভাব-প্রতিপত্তি বিচারের একমাত্র মানদণ্ড মুদ্রা, মুদ্রা যাদের জীবনসর্বস্ব তারাই হ'ল 'মধ্যশ্রেণীর' অন্তর্ভুক্ত (৫)। অর্থাৎ গতিশীল মুদ্রা যাদের শ্রেণীমর্য্যাদা পদমর্য্যাদা সফলতা বিফলতা এমন কি মনুষ্যত্ববোধের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে গেছে গ্রেটন সাহেবের মতে তারাই হ'ল "মধ্যশ্রেণী"। আর "বুদ্ধিজীবী-শ্রেণী" বা "ইণ্টেলিজেন্‌সিয়া" বলতে আমরা আজকাল যাদের বুঝি তাদের সম্বন্ধে বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম আলোচনা হয় জারের রুশিয়ায় এবং রুশিয়াতেই প্রথম "ইণ্টেলিজেন্‌সিয়া" শব্দটি ব্যবহার করা হয় (৬)। 'মধ্যশ্রেণী" থেকে "বুদ্ধিজীবীশ্রেণীকে" পৃথক ক'রে বিচার করার কোন প্রয়োজন আছে ব'লে মনে হয় না। সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদেরই মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীস্বাতন্ত্র্যের মধ্যে বুদ্ধি ও শিক্ষার অস্বাভাবিক দম্ভই প্রকাশ পায় যা এ-সমাজে একেবারেই ফাঁকা, কারণ বুদ্ধি শিক্ষা প্রতিভা সবই ধনতান্ত্রিক সমাজে মায়াবিনী মুদ্রার মুখাপেক্ষী এবং সকলেই মুদ্রার একান্ত অনুগত গোলাম। সুতরাং মধ্যশ্রেণীর মধ্যে বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর আর একটি উপশ্রেণী তৈরী করার কোন সার্থকতা বিশেষ নেই।

ইউরোপে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের যুগে উনবিংশ শতাব্দীতে মধ্যশ্রেণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্বন্ধে সমসাময়িক প্রত্যেক অর্থনীতিবিদ্ ও সমাজ-সমালোচকের রচনার মধ্যে উল্লেখ দেখা যায়। এব্রাম কুম্ব (১৭৮৫-১৮২৭), জন গ্রে (১৭৯৮-১৮৫০), উইলিয়াম টমসন (১৭৮৫-১৮৩৩), জন মর্গান (১৭৮২-১৮৫৪), জে. এফ, ব্রে, পিয়ার্সি র‍্যাভেনষ্টোন, টমাস হজস্কিন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। টমাস হজস্কিনের রচনা থেকে এই মধ্যশ্রেণী সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করব (৭)। হজস্কিন বলেছেন: "দাস বা অর্দ্ধদাস যারা তারাও এক সময় তাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করেছিল, সামন্ত নৃপতি ও বীর যোদ্ধার সম্পত্তিরূপে আর তারা গণ্য হয়নি। সম্পত্তির উপর তাদের ন্যায্য দাবী তাদের প্রভুরাও শেষ পর্য্যন্ত স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। তারপর সমাজে পুঁজিপতিশ্রেণীরও বিকাশ হয়েছে, জমিদারশ্রেণীর কাছ থেকে তারাও তাদের সম্পত্তি ও মুনাফার অধিকার ছিনিয়ে নিয়েছে এবং ক্ষমতা দখল করেছে। আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি, সমগ্র ইউরোপব্যাপী বিরাট এক মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে যারা মজুরী ও মুনাফা সংক্রান্ত সব রকমের আইন-কানুনের বশ্যতামুক্ত হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে সচেতন। তাদের চরিত্রের মধ্যে পুঁজিপতিশ্রেণী ও মজুরশ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের এক অদ্ভুত সংমিশ্রণ দেখা যায়। তাদের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে, অত্যন্ত আশার কথা। কারণ, যন্ত্রের যত উন্নতি ও আবিষ্কার হবে তত এই

(৫) R. H. Gretton: The English Middle Class (1917): গ্রন্থের গোড়াতে কথারম্ভেই তিনি এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন।

(৬) Karl Mannheim: Op. Cit: P. 82f: কার্ল ম্যানহাইম এই বিষয়ে দুইখানি গ্রন্থের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন—(১) Ovesianko-Kulikovsky: "History of the Russian Intelligentsia", (২) T. G. Masaryk: "The Spirit of Russia" (2 vols)

(৭) টমাস হজস্কিনের রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল: ১৮২৫ সালে প্রকাশিত "Labour Defended", ১৮২৬ সালে প্রকাশিত "Popular Political Economy", ১৮৩২ সালে প্রকাশিত "Natural and Artificial Rights of Property Contrasted." এই প্রসঙ্গে Max Beer-এর "Social Struggles and Thought (1750-1860)" নামক বিখ্যাত গ্রন্থ দ্রষ্টব্য (Chap. VIII)

শ্রেণীর কদর বাড়বে, সংখ্যা বাড়বে এবং সমাজকে এই শ্রেণীই শেষ পর্য্যন্ত দাসত্ব ও অত্যাচারের কবল থেকে মুক্ত করবে।" আরও পরিষ্কার ক'রে এই মধ্যশ্রেণীর কথা হজস্কিন আর একস্থানে বলেছেন: "এ যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল যন্ত্রের দ্রুত উন্নতি এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হ'ল মধ্যশ্রেণীর বিপুল সংখ্যাবৃদ্ধি। মধ্যশ্রেণী এমনই এক শ্রেণী যারা অল্প পরিশ্রম করে, যন্ত্রের উন্নতির তালে তালে যারা এমনই একটা স্থান দখল ক'রে নেয় যেখানে তারা ধনিক ও মজুর দুই-ই, সাধারণ মজুরশ্রেণীর মতো যাদের কেনা-গোলামি করতে হয় না, অথচ শ্রম করা থেকে যারা একেবারে নিষ্কৃতিও পায়নি। এই মধ্যশ্রেণীর উপরেই আমার আশা-ভরসা সব চেয়ে বেশী। গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এই মধ্যশ্রেণীর আশ্চর্য্য সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে, নূতন যন্ত্র ও নূতন বৃত্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যাদের আরও দ্রুত সংখ্যাবৃদ্ধি হবে এবং যে শ্রেণী গোলাম মজুরশ্রেণী ও সুদখোর মুনাফাখোর নিষ্কর্ম্মা ধনিকশ্রেণীর অস্তিত্ব সমাজের বুক থেকে মুছে ফেলে দেবে (৮)।"

সমসাময়িক বিভিন্ন সামাজিক শ্রেণীর স্বরূপ বিশ্লেষণে হজস্কিন বাস্তব বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির পরিচয় দেননি। সেইজন্য মুনাফালোভী পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে অনেক বিষোদ্গার ক'রেও শেষ পর্য্যন্ত তিনি হতাশ হয়ে সমাজে উচ্চশ্রেণীর অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন (৯)। কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী যাই হ'ক, নূতন ধনতান্ত্রিক সমাজে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের ফলে মধ্যশ্রেণীর আবির্ভাব ও প্রভাব বৃদ্ধির কথা তিনি যত সুন্দরভাবে বলেছেন বোধ হয় আর কেউ তা বলেননি। মধ্যশ্রেণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও তিনি চমৎকার বিশ্লেষণ করেছেন—"uniting in their own persons the character both of labourers and Capitalists."—"who do not suffer from the stigma which is cast on ordinary labour" ইত্যাদি তাঁর উক্তি আজ পর্য্যন্ত মধ্যশ্রেণী সম্বন্ধে প্রযোজ্য। মধ্যশ্রেণী সমাজে আদর্শ গণতান্ত্রিক সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করবে এই ছিল হজস্কিনের ভরসা। এই দিক দিয়ে বিচার করলে বোধ হয় বৃটিশ বুর্জ্জোয়া-গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্রকেই মধ্যশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ অবদান বলা যায়। কিন্তু হজস্কিনের মধ্যশ্রেণী-সুলভ দিবা-স্বপ্ন তাতে বাস্তবে পরিণত হয়নি। মধ্যশ্রেণীর 'গণতান্ত্রিক' সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ও শ্রেণীবিরোধ আরও তীব্র হয়েছে এবং মজুরশ্রেণীর মতো দাসত্বের কলঙ্ক বহন ক'রে চলেছে আজ সেখানে মধ্যশ্রেণীর বিরাট অংশ। আজ কেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই দেখা যায় মধ্যশ্রেণীর বৃহত্তম অংশ 'ধনিক' ও 'মজুরের' সংমিশ্রণ থেকে কেবল মজুরেই পরিণত হ'চ্ছে এবং একটা মেকী স্বাতন্ত্র্যবোধ ভিন্ন তখন আর কিছু তাদের সম্বল নেই। বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী চার্ল'স বুথ লণ্ডনের সকল শ্রেণীর লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন: "আর্থিক দিক দিয়ে বিচার করলে কেরানীদের অবস্থা আর কারিগরদের বা মজুরদের অবস্থা একই বলা যায়। কেরানীরা বছরে ২৫ পাউণ্ড থেকে ১৫০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত উপার্জ্জন করে আর মজুরেরা করে সপ্তাহে ৩০।৪০।৫০।৬০ শিলিং পর্য্যন্ত।" কিন্তু কেরানী ও মজুরদের আর্থিক অবস্থা এক হ'লে কি হবে। কেরানীজীবনের কয়েকটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বুথ বলেছেন: "কেরানীরা সকলে মেলামেশা করে কেরানীদের সঙ্গে আর মজুররা মজুরদের সঙ্গে। উভয় শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক মেলামেশার প্রচলন নেই বললেও চলে। মজুরদের জীবনযাত্রা আর কেরানীদের জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ পৃথক। কেরানীরা ভিন্নরকমের স্ত্রীকে বিবাহ করে, তাদের চিন্তাধারা আদর্শ সবই স্বতন্ত্র, মজুরদের সঙ্গে মিল নেই কোথাও (১০)।" এর উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

মধ্যশ্রেণীর বিরাট অংশের অবস্থা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার নিয়ম অনুযায়ী পরবর্ত্তীকালে যাই হ'ক না কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত উদীয়মান বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর প্রগতিশীলতা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। একথা কোন সমাজবিজ্ঞানীই অস্বীকার করতে পারবেন না। ফরাসী বিপ্লবের সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা-মন্ত্রের গুরু যাঁরা তাঁরা হ'লেন নূতন যুগের গতিশীল নাগরিক বুদ্ধিজীবীশ্রেণী (১১)। বেনথাম, মিল, সোশ্যালিজমের আদিগুরু রবার্ট ওয়েন, আধুনিক বৈজ্ঞানিক 'সোশ্যালিজমের' প্রবর্ত্তক কার্ল মার্কস ও ফ্রিডৌশ এঙ্গেল্স সকলেই সেযুগের মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বললে ভুল হয় না। সামাজিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, গণতান্ত্রিক ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, এমন কি ধনসম্পত্তির সমানাধিকারের যে 'সোশ্যালিজম' ও 'কমিউনিজমের' বাণী ও ভাবাদর্শ সব সেযুগের প্রগতিশীল চিন্তা ও জীবন্ত নাগরিক মধ্যশ্রেণীর অবদান (১২)। ধনিক ও মধ্যশ্রেণীর সঙ্গে কারখানার মজুরশ্রেণীও সেদিন এই সব অধিকারের জন্যে পাশাপাশি সংগ্রাম করতে কুণ্ঠিত হয়নি। যন্ত্র ও বিজ্ঞানের প্রগতি সম্ভব হয়েছে শিল্পকেন্দ্রে শিল্পপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় গবেষণার ফলে (১৩)। সামাজিক ও নৈতিক (Ideological) অগ্রগতিও সম্ভব হয়েছে উদীয়মান বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর ও মধ্যশ্রেণীর সমাজসংগ্রামের ভিতর দিয়ে। বাংলাদেশের

(৮) হজস্কিনের এই রচনাংশ W. Stark-এর "The Ideal Foundations of Economic Thought" (1944 ed.) থেকে উদ্ধৃত (পৃঃ ৯৯)

(৯) Charles Booth: Life and Labour of the People in London (Second Series, Vol. III, P. 241)

(১০) Charles Booth: Op. Cit: Pp. 277—'78

(১১) Karl Mannheim: Op. Cit.: "The French Revolution on its intellectual side was the expression of the mobile, urban intelligentsia,…" (P. 94)

(১২) রবার্ট ওয়েন ১৭৭১ সালে নিউটনে এক নিম্ন মধ্যশ্রেণীর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৭৯০ সালে তিনি ম্যাঞ্চেষ্টারের একটি কাপড়ের কলের ম্যানেজার নিযুক্ত হন। ১৮২৭ সালে বিলাতের 'Co-operative Magazine'-এ সর্ব্বপ্রথম "Socialist" শব্দটি প্রকাশিত ও ব্যবহৃত হয়। (Max Beer: Social Struggles and Thought—1750 to 1860: Pp 144—154)

(১৩) J. D. Bernal: The Social Function of Science: P. 25.

ভাবজাগৃতির ধারার সঙ্গেও তাই বাংলার উদীয়মান বুর্জোয়াশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর জীবনধারায় ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

বাঙালী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ

বৃটিশ-পূর্ব্ব যুগে হিন্দুরাজত্ব ও মুসলমান রাজত্বকালে সমাজে মধ্যশ্রেণীর বিশেষ বৈচিত্র্য থাকা সম্ভবপর নয়। রাজা-বাদশাহ-সুবাদার প্রভৃতির অধীনে প্রধানত থাকতেন জায়গীরদার থানাদার, আর তাঁদের অধীনে থাকতেন রাজস্ব আদায়কারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদার। এই সব রাজস্ব আদায়কারীর উপাধি ছিল চৌধুরী বা ক্রোরী (এক কোটি টাকার রাজস্ব আদায়কারী) অধিকারী ইত্যাদি। রাজস্ব আদায়কারী চৌধুরী অধিকারী প্রভৃতি ক্ষুদে জমিদারেরা ক্রমে রাজা-বাদশাহের মতো প্রভাবশালী হয়ে উঠতেন। রাজধানী গৌড় বাংলার এক প্রান্তে অবস্থিত হওয়ায় এবং সেকালে চলাচলের নানারকম অসুবিধা থাকায় পূর্ব্ব ও দক্ষিণ-বাংলার রাজস্ব আদায়ের ভার এই রকম আদায়কারী জমিদারদের উপরেই অর্পিত হ'ত। এরাই ক্রমে নিজ অধিকারে ভূমির সর্ব্বময় কর্তৃত্বলাভ ক'রে শেষে ভূঁইয়া বা ভৌমিক নামে অভিহিত হন (১৪)। এই রাজস্ব আদায়কারী জমিদারশ্রেণীর অধীন নায়েব গোমস্তা খাজাঞ্চী তহশীলদার প্রভৃতি আমলাদের মধ্যশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। জমির উপস্বত্বভোগ, জমিদারের অধীনে চাকরি বা তেজারতি যাঁরা করতেন তাঁরাই ছিলেন সেকালের মধ্যশ্রেণী। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মৌলবী মুন্সী প্রভৃতি যাঁরা যাজন ও অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করতেন, বৈদ্য হাকিম যাঁরা চিকিৎসা করতেন তাঁদেরও এই মধ্যশ্রেণীভুক্ত করা যায়। বাণিজ্যবৃত্তি নিম্নতর সমাজেই আবদ্ধ ছিল। উচ্চশ্রেণীর ও উচ্চবর্ণের যাঁরা তাঁরা প্রতিবেশী বণিক ধনিক হ'লেও তাকে অবজ্ঞার চোখে দেখতেন। উচ্চবর্ণের লোকেরা জমিদারি এবং মামলা পরিচালনের দক্ষতাকেই বৈষয়িক বিদ্যার পরাকাষ্ঠা ব'লে মনে করতেন, বণিগ্‌বৃত্তি তাঁদের কাছে উপেক্ষার বস্তু ছিল। এই অবজ্ঞার ভাব উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের রাজত্বকালেও তাঁরা বহুদিন পর্য্যন্ত ত্যাগ করতে পারেননি। সেইজন্যই উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংরেজের আওতায় বাণিজ্য ক'রে যাঁরা ধনসঞ্চয় করেছেন তাঁদের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি "উচ্চবর্ণের" লোকসংখ্যা সোনার বেণে প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকের তুলনায় অনেক কম দেখা যায়। উচ্চবর্ণের লোকেরা ইংরেজদের অধীনে নানারকমের চাকরি ক'রে, নূতন স্কুল-কলেজে শিক্ষা পেয়ে চাকরিজীবী ও বিদ্যাজীবী শ্রেণীভুক্ত হয়েছেন আর তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকেরাই নূতন বণিগ্‌-বৃত্তির অফুরন্ত সুযোগ নিয়ে ধনিকশ্রেণী হয়েছেন।

সেকালের মধ্যশ্রেণীর বর্ণাভিজাত্য জড়তা ও স্থিতিশীলতাকে চূর্ণ ক'রে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হ'ল জড়ত্বজয়ী গতিশীল মধ্যশ্রেণী। শিল্পবাণিজ্য ও শিক্ষাদীক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যশ্রেণীর বৈচিত্র্য ও সংখ্যাবৃদ্ধি হ'ল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত ইংরেজযুগের বাঙালী মধ্যশ্রেণীর জন্মকাল বলা চলে, তারপর এই মধ্যশ্রেণীর বংশবৃদ্ধি বৈচিত্র্যবৃদ্ধি ও শাখাবিস্তারের কাল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত তাই সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জাগৃতির বীজবপন ও বনিয়াদ গঠনের যুগ আর দ্বিতীয়ার্দ্ধ ফলফলনের যুগ, সাংস্কৃতিক সৌধ গঠনের যুগ।

ইংরেজযুগের আদিকাল বাঙালী মধ্যশ্রেণীর জন্মকাল বলেছি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এই আদিকালে এদেশীয় ব্যক্তিদের জমিজমা হাট-বাজার পাট্টা দিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে কলিকাতা মহানগরের হাট-বাজারের পাট্টা-তালিকা থেকে এই আদিকালের উদ্যোগী বাঙালী মধ্যশ্রেণীর সামান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। পাট্টা-তালিকায় দেখা যায়, ১৭৬৩ সালের ১নং পাট্টা দেওয়া হয়েছে কাচের (Glass) জন্তে বাৎসরিক ১০০ সিক্কা টাকা খাজনার পরিবর্ত্তে রামকৃষ্ণ ঘোষকে, ২নং পাট্টা বাৎসরিক ১০৫০ সিক্কা টাকায় মনোহর মুখার্জ্জিকে দেওয়া হয়েছে সালতি-নৌকা বিক্রীর উপর ৫% কমিশন এবং নূতন নৌকা তৈরীর সময় সেলামি আদায়ের অধিকার দিয়ে। বাৎসরিক ৫৭০ টাকায় সুতানুটি বাজারের লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে নবকিশোর রায়কে। হাটের প্রত্যেক দোকান থেকে তিনি ১৩ কড়ি ক'রে আদায় করতে পারবেন। বাৎসরিক ২৭৫ সিক্কা টাকায় বড়বাজারের লাইসেন্স দেওয়া হয় নিমাইচরণ মিত্রকে, ১৪০ টাকায় চার্লস্ বাজারের লাইসেন্স দেওয়া হয় রামপ্রসাদ বক্সীকে, ৫০১ টাকায় জান্ বাজারের লাইসেন্স দেওয়া হয় দয়ারাম চ্যাটার্জ্জিকে, ৫০০ টাকায় ধর্ম্মতলা বাজারের লাইসেন্স রামদুলাল দত্তকে, ১১৫ টাকায় কলুটোলা বাজারের লাইসেন্স গোকুল শীলকে। পাট্টা-তালিকায় এইরকম আরও অনেক এদেশীয় লোকের নাম পাওয়া যায় (১৫)। এ-ছাড়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যের সনদ পেয়ে এদেশে কয়েকটি এজেন্সী হাউস প্রতিষ্ঠা করে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই এই এজেন্সী হাউসগুলি প্রধানত কলিকাতা মহানগরী ও বোম্বাইয়ে গ'ড়ে ওঠে। এজেন্সী হাউসগুলি ব্যাঙ্কিং ও বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান দুইই। কি কাজ যে সেসময় এই এজেন্সী হাউসগুলি করত না তা বলা কঠিন। ব্যবসাবাণিজ্য, দোকানদারি, জাহাজ ডিষ্টিলারী ট্যানারী তুলো আটা ময়দা চাল লবণ রেশম প্রভৃতি কলকারখানার মালিকানা, পণ্যের আমদানি রপ্তানি, সব কাজই তারা করত এবং তার সঙ্গে ব্যাঙ্কারের কাজও করত। কোম্পানীর অধীনে চাকরি ছেড়ে অনেক ইংরেজ কর্ম্মচারী বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং-এর দিকে

(১৪) শ্রীকালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়: মধ্যযুগে বাঙ্গলা (১৩৩০): ১৮৮ পৃঃ—২০৮ পৃঃ।

(১৫) Reginald Craufuird Sterndale: "A Historical Account of "The Calcutta Collectorate', 'Collector's Cutchery' or Calcutta Pottah Office" (1885)। মিঃ ষ্টার্নডেল কলিকাতার অস্থায়ী কলেক্টর ছিলেন, কলিকাতা সহরতলী ও হাওড়ার আবগারী বিভাগের সুপারিনটেনডেন্ট এবং বাংলা বিহার উড়িষ্যার জজ ছিলেন। অনেক অনুসন্ধান ক'রে তিনি এই সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন যে, 'deeds of Fort William of Bengal 1780 to 1834', 'the office copy of the original Pottahs granted by the Collectors from 1757 downwards' এবং 'from outside sources' এই সব তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন।

আকৃষ্ট হন। কারণ অর্থ উপার্জ্জনের সুযোগ এইদিকেই প্রশস্ত ছিল।

১৮১৩ সালের পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কেড়ে নিয়ে যখন সকলকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দেওয়া হয় তখন এই এজেন্সী হাউসগুলি প্রচণ্ড ধাক্কা খায় এবং অনেক হাউস উঠে যায় (১৬)। "কলিকাতা নগরে অতি বৃহৎ এক বাণিজ্যের কুঠী শ্রীযুত আলেকজান্দ্র কোম্পানির কুঠী বন্দ হয় এবং তদ্দারা লোকেরদের অপূর্ব্ব ভয় ও ক্লেশ জন্মে" (সমাচার দর্পণ—১২ ডিসেম্বর, ১৮৩২)। "ফার্গিসন কোম্পানীর কুঠী দেউলিয়া হয়" (স-দ-২৫ নবেম্বর ১৮৩৩)। পামার কোম্পানী, আলেকজাণ্ডার কোম্পানী প্রভৃতি বড় বড় এজেন্সী হাউস ১৮২৯-'৩২-এর সঙ্কটকালে দেউলিয়া হয়ে যায় (১৭)।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলের এই 'এজেন্সী হাউসগুলি'তে এদেশের লোকেরা দেওয়ানী ও মুৎসদ্দীগিরি করতেন। এঁরাই ইংরেজ-যুগের আদিকালের ইংরেজী জানা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক, একালের মধ্যশ্রেণীর আদিপুরুষ। "পূর্ব্বে যে সকল দেওয়ান মুৎসদ্দি লোক ছিলেন তাঁহারা ইংরেজী বিদ্যাভাস করিয়া সাহেব লোকের অভিপ্রায় মত কর্ম্ম সুসম্পন্ন পূর্ব্বক বহু ধনোপার্জ্জন করিয়াছিলেন ইহাতে ইংরেজেরা তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে নানাপ্রকারে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন যদি বল তখনকার মুৎসদ্দি মহাশয়েরা ভাল ইংরাজী জানিতেন না কেন না, কথিত আছে ঢেঁকি-যন্ত্রের বিবরণ কোন মুৎসদ্দি ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন টুমেন ধাপুড় ধুপুড় ওয়ান মেন সেকে দেয়, ইত্যাদি ইহা হইতে পারে ইংরেজদিগের প্রথমাধিকার সময়ে তদ্ভাষায় বহুতর লোক সুশিক্ষিত হইতে পারেন নাই কিন্তু ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা ক্ষমতাপন্ন লোক ছিলেন এবং কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিয়াছেন। অপর তৎপরে দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য যে সকল মুৎসদ্দি হইলেন তাঁহারদিগের মধ্যে অনেকেই ইংরাজী বিদ্যায় বিলক্ষণ পারগ ইহা দেশবিখ্যাত আছে তন্মধ্যে কতক জনের নাম লিখি—শ্রীযুত বাবু হরিমোহন ঠাকুর শ্রীযুত বাবু নীলমণি দত্ত শ্রীযুত বাবু তারিণীচরণ মিত্র শ্রীযুত বাবু গঙ্গাধর আচার্য্য শ্রীযুত বাবু নীলমণি দে প্রভৃতি···অপর তৃতীয় শ্রেণীতে গণ্য মুৎসদ্দি ও জমীদার শ্রীযুত বাবু উমানন্দ ঠাকুর শ্রীযুত বাবু রাধাকান্ত দেব শ্রীযুত বাবু রামকমল সেন শ্রীযুত বাবু হরচন্দ্র লাহিড়ি শ্রীযুত বাবু রসময় দত্ত শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র দাস শ্রীযুত বাবু রামপ্রসাদ দাস প্রভৃতি···" (সমাচার চন্দ্রিকা—২ মে ১৮৩১)। ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন ভারত সরকারের "পররাষ্ট্র-বিভাগের (১৮৩৯ সনের) কাগজপত্র হইতে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এক শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতার বাঙ্গালী সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ও বংশ-পরিচয়" ১৩৪৭ সালের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করেছেন। এই তালিকাটি থেকে কয়েকটি নাম ও বংশ-পরিচয় আমি উদ্ধৃত করছি:

"মহারাজা রাজকৃষ্ণ বাহাদুর। ইঁহার পিতা রাজা নবকৃষ্ণ মিরজাফরের নবাবী প্রাপ্তির সময় লর্ড ক্লাইভের দেওয়ান ছিলেন। তখন তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ক্লাইভ তাঁহাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ দেন। তাঁহার দানশীলতার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁহাকে একটি স্বর্ণপদক দিয়াছিলেন। ১৭৯৭ সালে রাজা নবকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। রাজকৃষ্ণ তখন নাবালক। তাঁহার ছয় পুত্রের মধ্যে শিবকৃষ্ণ জ্যেষ্ঠ।···

"বাবু গোপীনাথ দেব, রাজা নবকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র···গোপীমোহন ও তাঁহার একমাত্র পুত্র বাবু রাধাকান্ত দেব জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র।

"রাজা রামচন্দ্র রায় রাজা সুখময় রায়ের জ্যেষ্ঠপুত্র।···এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা লক্ষ্মীকান্ত ধর কর্ণেল ক্লাইভ ও অন্যান্য গভর্ণরদিগের বানিয়া (Banker) হিসাবে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন। সুখময় তাঁহার দৌহিত্র। তিনি সার ইলাইজা ইম্পের দেওয়ানী করিয়া মাতামহের ত্যক্ত সম্পত্তি প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি করিয়াছেন। লর্ড মিণ্টোর আমলে তিনি রাজা উপাধি লাভ করেন।···

"মল্লিক বংশ। এই পরিবার বহু দিন হইতে কলিকাতার অধিবাসী। কয়েক পুরুষ পূর্ব্বেই ইঁহাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়। শুকদেব মল্লিক এই বংশের মধ্যে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।···

"রাজনারায়ণ রায়, তারকনাথ রায় এবং অন্যান্য রায়েরা চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আন্দুলের অধিবাসী। ইঁহারা দেওয়ান রামচরণ রায়ের বংশধর। গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ও জেনারেল স্মিথের দেওয়ানী করিয়া রামচরণ প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন।

"ঠাকুর-পরিবার। এই বহু-বিস্তৃত বংশ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী। এই বংশের প্রধান শাখার আদিপুরুষ দর্পনারায়ণ ঠাকুর হুইলার সাহেবের দেওয়ানী করিয়া অনেক টাকা উপার্জ্জন করেন।···

"গৌরচরণ শেঠ, কৃষ্ণমোহন শেঠ, ব্রজমোহন শেঠ, রাজকুমার শেঠ বড়বাজারের বিখ্যাত ব্যবসায়ী (ব্যাঙ্কার) পরিবারের লোক। এই পরিবার বহু দিন হইতে এই অঞ্চলের অধিবাসী।

"রাধাকৃষ্ণ বসাক—ট্রেজারির খাজাঞ্চি। ইনি বড়বাজারের বিখ্যাত শরফ (Shroff) বংশের সন্তান ও শেঠদিগের আত্মীয়।

"রামদুলাল দে। ইনি বোধ হয় কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী। বাণিজ্যসূত্রেই ইনি সম্পত্তিলাভ করেন। ইনি বহু দিন ফেয়ারলি কোম্পানীর দেওয়ান ছিলেন এবং আমেরিকার ব্যবসায়ীদিগের সহিত ইঁহার কারবার ছিল।···

"প্রাণকৃষ্ণ বিশ্বাস ও জগমোহন বিশ্বাস রামহরি বিশ্বাসের পুত্র। ভুলুয়া ও চট্টগ্রামের লবণের এজেণ্ট হ্যারিশ সাহেবের দেওয়ানী করিয়া রামহরি প্রভূত সম্পত্তি লাভ করেন। পুত্রেরা সেই সম্পত্তি আরও বৃদ্ধি করিয়াছেন।

"রাজকৃষ্ণ সিংহ, শিবকৃষ্ণ সিংহ ও শ্রীকৃষ্ণ সিংহ ট্রেজারীর ভূতপূর্ব্ব খাজাঞ্চি প্রাণকৃষ্ণ সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী। এই পরিবারের

---

(১৬) D. S. Savkar : Joint Stock Banking in India : Pp. 18—21.

H. Sinh : Early European Banking in India : P. 165.

Rau : Present-day Banking in India : P. 203

(১৭) সেকালের সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ', 'সমাচার চন্দ্রিকা' এবং অন্যান্য পত্রিকাদি থেকে যে সব তথ্য এই রচনায় উদ্ধৃত হয়েছে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সংবাদপত্রে সেকালের কথা" (দুই খণ্ড) থেকে সেগুলি সংগৃহীত।

প্রতিষ্ঠাতা শান্তিরাম সিংহ পাটনার চীফ মিঃ মিডলটন ও সার টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান ছিলেন।

"ভগবতীচরণ মিত্র, ভবানীচরণ মিত্র এবং তাঁহাদের আর চারি ভ্রাতা অভয়চরণ মিত্রের পুত্র। ইহারা বিশ্বনাথ মিত্রের পুত্র কাশীনাথ মিত্রের সহিত প্রপিতামহ গোবিন্দরাম মিত্রের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। গোবিন্দরাম কলিকাতার জমিদারী কাছারির দেওয়ান ছিলেন এবং ব্যবসায়ের দ্বারা বিত্তলাভ করিয়াছিলেন।

"নবকৃষ্ণ মিত্র, হরলাল মিত্র, হরিশ্চন্দ্র মিত্র প্রভৃতি গোকুলচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। গোকুলচন্দ্র রসদের ঠিকাদারী করিয়া সমৃদ্ধিলাভ করেন।···

"গঙ্গানারায়ণ সরকার পামার কোম্পানীর খাজাঞ্চি। কলিকাতার দেশীয় অধিবাসীদিগের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ধনী। কেবল ব্যবসায়ের দ্বারাই ইহার বিত্তলাভ হইয়াছে।

"কৃষ্ণচন্দ্র পালচৌধুরীর অবস্থা প্রথম মোটেই ভাল ছিল না। তিনি লবণের ব্যবসায়ে অতুল ঐশ্বর্য্যলাভ করেন।···

"রাজনারায়ণ সেন, রূপনারায়ণ সেন এবং অপর তিন ভ্রাতা মথুরামোহন সেনের পুত্র। মথুরামোহন শরফের (ব্যাঙ্ক) ব্যবসায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করেন···।

"রাধামাধব ব্যানার্জী এবং গৌরীচরণ ব্যানার্জ্জী ফকিরচাঁদ ব্যানার্জীর পুত্র।···পটুয়ার আফিমের এজেন্সীর দেওয়ানী চাকুরীতে এই পরিবারের সমৃদ্ধি লাভ হয়।

"শিবনারায়ণ ঘোষ ও তাঁহার দুই ভ্রাতা রামলোচন ঘোষের পুত্রও বিশাল সম্পত্তির মালিক। রামলোচন হেষ্টিংসের সরকার ছিলেন।

"মৃত সনাতন মল্লিকের ভ্রাতা বৈষ্ণবদাস মল্লিক এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র নীলমণি মল্লিক অত্যন্ত ধনী এবং বিশেষ প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি। ইঁহাদের সম্পত্তি রামকৃষ্ণ মল্লিকের ব্যবসায়ে লব্ধ।"

সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির এই তালিকার মধ্যে কলিকাতার প্রায় প্রত্যেক প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ধনী ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়। বৈশ্য ও সোনার বেণেদের বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠার কথা প্রমথনাথ মল্লিক তাঁর "History of the Vaisyas of Bengal" গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। মল্লিক, শীল, লাহা ও রায়-বংশের মধ্যে যাঁদের নাম ডাঃ সেন উপরে উল্লেখ করেছেন তাঁদের বংশ-পরিচয় সবিস্তারে জানা যায় প্রমথনাথ মল্লিকের পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ থেকে। পূর্ব্বে রায়-বংশের প্রতিষ্ঠাতা যে লক্ষ্মীকান্ত ধরের কথা বলা হয়েছে তাঁর সম্বন্ধে মল্লিক মহাশয় লিখেছেন যে নকুড় ধর নামেই লক্ষ্মীকান্ত ধর পরিচিত ছিলেন। নকুড় ধরের অর্থসাহায্যের জন্যে ইংরেজরা অনেক বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাবদের কাছে জগৎশেঠ যা ছিলেন রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথমিক যুগে নকুড় ধরও তাই ছিলেন ইংরেজদের কাছে। নকুড় ধরের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি তাঁর কন্যার একমাত্র জীবিত পুত্র সুখময় রায়কে দিয়ে যান। মহারাজ সুখময় রায় "ব্যাঙ্ক অফ বেঙ্গলের" একমাত্র বাঙালী ডিরেক্টর ছিলেন। মতিলাল শীল সামান্য বোতল ও কর্কের ব্যবসা থেকে শুরু ক'রে পরে নানারকম ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রভূত ধনসঞ্চয় করেন। তৎকালীন ৫০-৬০টি বাণিজ্যকুঠির মধ্যে প্রায় ২০টি কুঠির বাণিয়া ছিলেন মতিলাল। বাণিয়াগিরি ছেড়ে তিনি জমির ব্যবসা আরম্ভ করেন। তাঁর মতো জমিদার মালিক তখন আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। জমিজমা থেকে মাসিক প্রায় ৩০,০০০৲ টাকা তিনি খাজনা পেতেন। তারপর অনেক বিদেশী 'এজেন্সী হাউসের' অংশীদার হয়ে তিনি বাণিজ্য করেন, তার মধ্যে 'ফার্গুসন ব্রাদার্স এ্যাণ্ড কোং' 'ওজ্‌ওয়াল্ড শীল এ্যাণ্ড কোং' 'টুলো এ্যাণ্ড কোং' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। কয়েকটি আটার কলেরও মালিক ছিলেন তিনি এবং জাহাজে ক'রে অষ্ট্রেলিয়ায় পর্য্যন্ত এখান থেকে বিস্কুট চালান দিতেন। বিশ্বম্ভর সেনও মাত্র ৮৲-১০৲ টাকা নিয়ে বাণিজ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, পরে প্রায় ২০টি বিদেশী কুঠির বাণিয়া হন। মৃত্যুকালে তিনি প্রায় ২ লক্ষ পাউণ্ড সঞ্চয় ক'রে যান (১৮)। দ্বারকানাথ ঠাকুর নীল ও রেশমের রপ্তানির কাজ করেন, অবশেষে নিমকের এজেন্ট প্লাউডেন (Plowden) সাহেবের দেওয়ানী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। "তখন নিমক মহলের দেওয়ানী লইলেই লোকে দুই দিনে ধনী হইয়া উঠিত। এই রূপে সহরের অনেক বিখ্যাত ব্যক্তি ধনী হইয়াছেন। দ্বারকানাথও কতিপয় বৎসরের মধ্যে ধনবান হইয়া বিষয় কার্য্য হইতে অবসৃত হন; এবং 'কার টেগোর এণ্ড কোং' নামক এক কোম্পানি স্থাপন করিয়া স্বাধীন বণিকরূপে কার্য্য আরম্ভ করেন। তদ্ভিন্ন 'ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক' নামে এক ব্যাঙ্কের প্রধান নির্ব্বাহকর্ত্তা হন।···১৮২৬ সালে দ্বারকানাথ ঠাকুর সহরের সম্ভ্রান্ত ধনীদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি এবং রামমোহন রায়ের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন (১৯)।"

ইংরেজ পুঁজিপতি ও ব্যবসায়ীরা এইভাবে আমাদের দেশে শাসন ও শোষণের সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা কায়েম করতে গিয়ে ঐতিহাসিক নিয়মেই এদেশের সামাজিক শ্রেণীবিন্যাস পরিবর্ত্তন করতে বাধ্য হয়েছে। বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ্ মরিস ডব বলেছেন: "সাম্রাজ্যবাদের ঐতিহাসিক ভূমিকা হ'ল উপনিবেশের সামাজিক শ্রেণী-কাঠামো ঠিক সেইভাবে গঠন করা যেভাবে ধনতন্ত্রের প্রাথমিক যুগে অন্যান্য দেশগুলিতে এই কাঠামো গ'ড়ে উঠেছিল। শ্রমশিল্পে মূলধন নিয়োগ করার পূর্ব্বে প্রথমে প্রয়োজন গ্রাম্য প্রলেটারিয়েট। শ্রমশিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে বণিক মুৎসদ্দী দালাল জমিব্যবসায়ী থেকে শিল্পোদ্যোগী পুঁজিপতি পর্য্যন্ত ঔপনিবেশিক বুর্জ্জোয়াশ্রেণীর বিকাশ হ'তে থাকে (২০)।" এই ঐতিহাসিক নিয়মেই আমাদের দেশে ধীরে হ'লেও নিশ্চিতভাবে শিল্পোদ্যোগী ধনিকশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে। শ্রমশিল্পের পূর্ণ ধনতান্ত্রিক বিকাশের জন্যে যে প্রাথমিক পুঁজি সঞ্চয়ের প্রয়োজন আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে উদীয়মান বুর্জ্জোয়াশ্রেণী সেই পুঁজি সঞ্চয় করেছে বলা চলে। যে সব ধনী বাঙালী পরিবারের কথা অথবা বাংলাদেশের ধনী অবাঙালীদের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হয়েছে সেই সব পরিবারের শাখা-প্রশাখাই আজ এ-দেশের শ্রমশিল্পের ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বণিক মুৎসদ্দী (আরবী 'সদউন'=ভার লওয়া=যে কোন কাজের ভার নেয় সে মুৎসদ্দী) দালাল এজেন্ট প্রভৃতি শিল্পোদ্যোগী

---

(১৮) Pramatha Nath Mullick : History of the Vaisyas of Bengal (1902): Appendix 'A'.

(১৯) শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী: রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ (৬৮ পৃঃ)

(২০) Maurice Dobb : Political Economy and Capitalism : P. 248.

পুঁজিপতি পর্য্যন্ত যে ঔপনিবেশিক বুর্জোয়াশ্রেণীর কথা মরিস ডব বলেছেন, সেই শ্রেণীর যে ধীরে ধীরে নিশ্চিন্ত বিকাশ হ'চ্ছে, প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়ছে তা কলিকাতা ও তার সংলগ্ন চব্বিশ পরগণা, হাওড়া, হুগলীর ইতিহাস থেকেও বুঝা যায়। কলিকাতার সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে চব্বিশ পরগণা হাওড়া হুগলীর ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বিশপ হেবার তার 'জর্নালে' লিখছেন: "পশ্চিমাভিমুখী নদী, তার বুকে নানারকমের জাহাজ নৌকা, অদূরবর্ত্তী তীরে তার আর একটি বিরাট সহরতলী গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনা, বিশেষ ক'রে হাওড়ার (২১)।" মার্শম্যান লিখছেন: "লণ্ডনের যেমন একটা সেতু ছিল, কলিকাতার তেমন একটা সেতু এখনও নেই।··· হাওড়া ছাড়িয়ে ঘুসুড়ী গ্রাম, সেখানে দু'-একটা কলকারখানা ছাড়া আর কিছু নেই।···কিন্তু নদীর উল্টো তীরে কাশীপুর ও বরানগর আজ কর্ম্মমুখর, যন্ত্রশিল্প ও ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের বিস্তার হয়েছে সেখানে···।"(২২) হুগলীতে ১৮২২-'৪২ সালের মধ্যে চণ্ডীতলা, বাঁশবেড়ে, হোসনাবাদ, দুর্গাপুর, কালকাপুর, মালিয়া, পরগাছি প্রভৃতি অঞ্চলে নীলের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। রম্ ডিষ্টিলারী প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮১০ সালে ব্যাণ্ডেলে, তারপর বল্লভপুর, ধাঙুড়ী, রিষড়া, কোননগর, চন্দননগর প্রভৃতি অঞ্চলেও অনেক ডিষ্টিলারী প্রতিষ্ঠিত হয়। ছাপা রঙীন কাপড়ের কল বসে রিষড়া ও চাঁপদানিতে। রিষড়ায় ওয়েলিংটন জুট মিল ও শ্রীরামপুরে কাগজের কল প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ সালে শ্রীরামপুরে ইণ্ডিয়া জুট মিল, ১৮৭৩ সালে চাঁপদানি জুট মিল, ১৮৮৮ সালে ভিক্টোরিয়া ও হেষ্টিংস জুট মিল প্রতিষ্ঠিত হয়। এই পাঁচটি কারখানায় পুরো কাজ হ'লে প্রায় ১১০০০ মজুর কাজ করে। এ ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই শ্রীরামপুরে কাপড়ের কল, উত্তরপাড়া ও মগরায় হাড়ের কল, কোননগরে ভিক্টোরিয়া কেমিক্যাল ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠিত হয়।(২৩) হাওড়ায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষে (১৯০১ সালের সেনসাস অনুযায়ী) বাণিজ্যবৃত্তিতে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা দেখা যায় ৭১৫৭ জন, তার মধ্যে ২৫৫১ জন ছোট দোকানদার ও তাদের ভৃত্য। এ ছাড়া ৯৮১ জন শিক্ষক, ১৬৫৭ 'রাইটার' (কেরানী), ১৬১৭ জন চিকিৎসক ও ধাত্রীর সংখ্যা থেকে নূতন মধ্যশ্রেণীর বৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।(২৪) হাণ্টার সাহেব ১৮৭০-'৭৩ সালের মধ্যে চব্বিশ পরগণার (কলিকাতা সহ) বিভিন্ন শ্রেণীর ও বৃত্তির যে লোকসংখ্যা-গণনা করেন তাতে দেখা যায়: বণিক ৩২২৯ জন, সওদাগর ৩৮ জন, বিশেষ পণ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ী ১৬০৭ জন, বিবিধ দ্রব্যের ব্যবসায়ী ৯৭৭ জন, পাইকার ১০ জন, ব্যাপারী ৫০৫৮ জন, পাট ব্যবসায়ী ৭৬ জন, তুলা ব্যবসায়ী ১২২ জন, গোলাদার ১০৪ জন, আড়তদার ৩১১ জন, পোদ্দার ৮৬ জন, ব্যাঙ্কার ও মহাজন ২৯২১ জন, বাণিয়া ১৫ জন, কেরানী ১০,২৪৭ জন, 'রাইটার' (বোধ হয় সরকারী কেরানী) ১৫২২ জন, সরকার ৭০২৬ জন, মুহুরী ১৩৮৮ জন, দোকানদার ৩০,৪১৮ জন, মুদি ৫৩৪৫ জন ইত্যাদি।(২৫) এই বৃত্তিসূচক শ্রেণীবিভাগ তো দূরের কথা, সে সময় বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে লোকসংখ্যা গণনা করাই সম্ভব ছিল না। নির্ভুল ও বিজ্ঞান-সম্মত না হ'লেও এই সংখ্যাগুলি থেকে আমরা তৎকালীন সমাজের নূতন শ্রেণীবিন্যাসের আভাস পেতে পারি। বণিগ্‌বৃত্তি, চাকুরি ও কেরানীগিরি, অধ্যাপনা, চিকিৎসা ও ওকালতি প্রভৃতির প্রাধান্য যে সমাজে বাড়ছে তার স্পষ্ট নির্দেশ পাওয়া যায়। ১৮৮১ সালের কলিকাতা মহানগরী ও সহরতলীর সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায়: বণিক ২৬৭২ জন, ব্যাঙ্কার ও মহাজন ৯৯২ জন, দালাল ৩৩৮৪ জন, দোকানদার ১৪,১৩১ জন, ফিরিওয়ালা ৩৬৯৮ জন।(২৬) পরবর্ত্তী ১৮৯১ সালের কলিকাতার সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায়: বণিক ৪৫৬৭ জন, দোকানদার ৫৫৫২ জন। ১৮৮১ সালের সেনসাসে কেরানী ব'লে উল্লেখ করা হয়েছে ১৬,৩১৫ জনের আর ১৮৯১ সালে সরকারী কেরানী ব'লে ৬৩৫৩ জন এবং সদাগরী অফিসের কেরানী ব'লে ৭৮৫৭ জনের উল্লেখ করা হয়েছে।(২৭)

ধনিক বণিক্ কেরানী দালাল মুৎসদ্দী মহাজন বাণিয়া ব্যাঙ্কার প্রভৃতিদের কথা বলেছি, কিন্তু বাঙালী বুদ্ধিজীবীশ্রেণী (Intelligentsia) বা বিদ্যাজীবীশ্রেণী (Learned Professions) সম্বন্ধে কিছু বলিনি। সাধারণ মধ্যশ্রেণীরই একটি শাখা এই বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবীশ্রেণী। এই শ্রেণীর প্রভাব ও সংখ্যাবৃদ্ধি হয় ইংরেজী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার প্রসারের ফলে। ইংরেজ আমলের গোড়া থেকেই আধুনিক শিক্ষার প্রচলন হয়নি, কারণ শাসকদের প্রয়োজনানুযায়ী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করা হয়েছে, সাধারণের স্বার্থের খাতিরে নয়। প্রথম যুগে ইংরেজ শাসকদের এদেশীয় পণ্ডিত মুন্সী মৌলবীদের প্রয়োজন ছিল শাসনকার্য্যের জন্যে। তাই প্রথম যুগে সামান্য ইংরেজী শিক্ষার প্রচলনের সঙ্গে তাঁরা এদেশীয় প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থাও চালু রেখেছিলেন। তার পরের যুগে পাশ্চাত্য বিদ্যা-শিক্ষার প্রচলন হয় অর্থাৎ মেডিকেল কলেজ, ল' কলেজ, হাইস্কুল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা হয়। তৃতীয় যুগে শিক্ষা-ব্যবস্থা সর্ব্বসাধারণের মধ্যে বিস্তারলাভ করে। উচ্চ সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারই প্রথম দুই যুগের গবর্ণমেন্ট ও দেশীয় সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তিদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্য্যন্ত এই শিক্ষানীতিই অনুসৃত হয়। তারপর আধুনিক শিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষার ধীরে ধীরে প্রচলন হ'তে থাকে। তাই বুদ্ধিজীবী ও

(২১) Bishop Heber's Journal (1828): Vol. I, P. 26.

(২২) Calcutta Review: vol. IV. 1845: 'Notes on the Right Bank of the Hooghly' by J. C. Marshman.

(২৩) Bengal District Gazetteer: Hooghly (1912): Pp. 179—81.

(২৪) Bengal District Gazetteer: Howrah: P. 96.

(২৫) W. W. Hunter: A Statistical Account of Bengal (vol I, 1875)—P. 45.

(২৬) Report of the Census of the Town and Suburbs of Calcutta (1881): Table XIX, Class III.

(২৭) Report of the Census of Calcutta (1891)

বিদ্যাজীবী বলতে আমরা যাদের বুঝি সেই শ্রেণীর বিকাশ হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে। হাণ্টার সাহেবের 'Statistical Account of Bengal গ্রন্থে (প্রথম খণ্ডে) চব্বিশ পরগণা ও কলিকাতায় (১৮৭০-৭৩ সালে) এই বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। যেমন: ডাক্তার (৬৬৭—নিশ্চয়ই কলেজে বা স্কুলে পাশ করা ডাক্তার নয়), হাকিম (১৪৩), কবিরাজ (১২৬১), গো-বৈদ্য (৭৬), ভেটারিনারী সার্জেন (৫), পুরোহিত (৮২৩৬), গুরু (৪৫৭), আচার্য্য (২৫৬), মোল্লা (৭৬২), মোহন্ত (২০১), মুসলমান ফকির (১৫), কথক ঠাকুর (১১), অধ্যাপক (৩৪), স্কুলমাষ্টার (১৮১৪), পণ্ডিত (৪৩৬), গুরুমশাই (৩৯০), মুন্সী (২৫৪) মৌলবী (৩১), ছাত্র ও বিদ্যার্থী (১০,২৮১), গ্রন্থকার (১), সংবাদপত্রের সম্পাদক (২২), ব্যারিষ্টার (২৬), এ্যাটর্নি (১২৭) উকিল (৫৩১), মুহুরী (৭৪৮), কাজী (১১৬) ইত্যাদি। সংখ্যা-গণনায় গলদ আছে অনেক, থাকাও স্বাভাবিক, কারণ সকলে বৃত্তিপরিচয় সঠিকভাবে দেয়নি। যেমন হাকিম ও কবিরাজদের বৃত্তি কি? প্রশ্নের উত্তরে অনেকেই 'ডাক্তার' বলেছেন, তা না হ'লে ১৮৭০—৭৩ সালে কলেজ ও স্কুলে পাশ করা ডাক্তারের সংখ্যা ৬৬৭ জন হতেই পারে না। এ রকম ত্রুটি উক্ত সংখ্যাগণনায় যথেষ্ট আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপর্যুক্ত বৃত্তিসূচক সংখ্যা থেকে এইটুকু অন্তত বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে সেকালের বুদ্ধিজীবী ও বিদ্যাজীবীরা একালের সমশ্রেণীর সঙ্গে মিলেমিশেই সমাজের মধ্যে বসবাস করতেন। গো-বৈদ্যের সঙ্গে ভেটারিনারী সার্জেন আছেন, হাকিম-কবিরাজের সঙ্গে ডাক্তার আছেন। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের সেনসাস রিপোর্ট থেকে এই বাঙালী বিদ্যা-বুদ্ধিজীবীশ্রেণীর বিকাশ আরও স্পষ্টভাবে বুঝতে পারা যায়। সরকারী উচ্চ-কর্ম্মচারীদের মধ্যে ১৮৮১ সালে দেখা যায়: আইন ও বিচার বিভাগে ১৬৭ জন, পুলিস বিভাগে ৩২৮৩ জন, জেল বিভাগে ১০৫ জন, কাষ্টমস ও আবগারী বিভাগে ১২১ জন, টেলিগ্রাফ ৫৮ জন, পোষ্ট-অফিস ৩১ জন, অন্যান্য সরকারী কর্ম্মচারী ৪৯০ জন। এ ছাড়া মিউনিসিপালিটি ও পোর্ট কমিশনারের কর্ম্মচারী ৫৭ জন, ব্যারিষ্টার ৫১ জন, উকিল ৩৫০ জন, এটর্নি ৩১ জন, মোক্তার ৫১০ জন, শিক্ষক অধ্যাপক ১৭৫২ জন, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ৩২ জন। ১৮৯১ সালের রিপোর্টে দেখা যায় ব্যারিষ্টার প্রভৃতি আইনজীবী ৭৪ জন, সলিসিটর ৬১ জন, মোক্তার ১০৩৯ জন। এ হ'ল শুধু কলিকাতা মহানগরের সেনসাস। নূতন যুগের বিদ্যা-বুদ্ধিজীবী-শ্রেণীর আধিপত্য যে মহানগরে বাড়ছে তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে কলিকাতা মহানগরের বৃত্তি-সূচক লোকসংখ্যার হিসেব থেকেই এই ধনিক বণিক ব্যবসায়ী বিদ্যাবুদ্ধিজীবীর প্রাধান্য আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯০১ সালের কলিকাতার সেন্‌সাস রিপোর্টে দেখা যায় (২৮): সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যা ১৮৯৫০ জন, পণ্যদ্রব্য উৎপাদন ও সরবরাহ-কারীর সংখ্যা ১৫৩০৮০ জন, ব্যবসা-বাণিজ্যে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা ১২৫৬৭১ জন, বিদ্যাবুদ্ধিজীবীর সংখ্যা ২২৫৩০ জন।

বাঙালী মধ্যশ্রেণীর বিকাশ কি ভাবে হ'চ্ছে সেকালের সাহিত্য থেকেও তার পরিচয় আমরা পাই। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "নববাবুবিলাস" ও কালীপ্রসন্ন সিংহের "হুতোম প্যাঁচার নক্সা" থেকে এই মধ্যশ্রেণী সম্পর্কিত কয়েকটি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করছি। ভবানীচরণ লিখছেন: "ধন্য ২ ধাৰ্ম্মিক ধৰ্ম্মাবতার ধৰ্ম্মপ্রবর্ত্তক দুষ্টনিবারক সৎপ্রজাপালক সদ্বিবেচক ইংরাজ কোম্পানি বাহাদুর অধিক ধনী হওনের অনেক পন্থা করিয়াছেন এই কলিকাতা নামক মহানগর আধুনিক কাল্পনিক বাবুদিগের পিতা কিম্বা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া স্বর্ণকার বর্ণকার কর্ম্মকার চর্ম্মকার চটকার পটকার মঠকার বেতনোপভুক্ হইয়া কিম্বা রাজের সাজের কাঠের খাটের ঘাটের মাঠের ইটের সরদারি চৌকিদারী জুয়াচুরি পোদ্দারী করিয়া অথবা অগম্যাগমন মিথ্যাচরণ পরকীয়া রমণী সংঘটনকামি ভাড়ামি রাস্তাবন্দ দাস্য দৌত্য গীতবাদ্য তৎপর হইয়া কিম্বা পৌরোহিত্য ভিক্ষাপুত্র গুরু-শিষ্য ভাবে কিঞ্চিৎ অর্থ সঙ্গতি করিয়া কোম্পানির কাগজ কিম্বা জমিদারি ক্রয়াধীন বহুতর দিবসাবসানে অধিকতর ধনাঢ্য হইয়াছেন···"। "হুতোম প্যাঁচার নকশা" থেকে মধ্যশ্রেণীর নানাবৃত্তির চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন: "কোম্পানির বাংলা দখলের কিছু পরে, নন্দকুমারের ফাঁসি হবার কিছু পূর্ব্বে আমাদের বাবুর প্রপিতামহ নিমকের দাওয়ান ছিলেন, সেকালে নিমকীর দাওয়ানীতে বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় ছিল; সুতরাং বাবুর প্রপিতামহ পাঁচ বৎসর কর্ম্ম করে মৃত্যুকালে প্রায় বিশ লক্ষ টাকা রেখে যান—সেই অবধি বাবুরা বনেদী বড় মানুষ হয়ে পড়েন।" "পাগড়িবাঁধা দলের প্রথম ইনষ্টল-মেন্টে—সিপসরকার ও বুকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন···আজ গবর্ণমেণ্টের আপিস বন্ধ সুতরাং আমরা ক্লার্ক, কেরাণী, বুক কিপার ও হেড রাইটারদিগকে দেখতে পেলাম না···।" "দালালি কাজটা ভাল, 'নেপো মারে দইয়ের মতন'—এতে বিলক্ষণ গুড় আছে। অনেক ভদ্রলোকের ছেলেকে গাড়ি-ঘোড়ায় চড়ে দালালি কত্তে দেখা যায়, অনেক 'রেস্তহীন মুচ্ছুদ্দী' চার বার 'ইন্সালভেণ্ট' হয়ে এখন দালালি ধরেচেন।" "পাড়াগেঁয়ে দুই একজন জমিদার প্রায় বারো মাস এখানেই কাটান···দেখলেই চেনা যায় যে ইনি এক জন বনগাঁর শেয়াল রাজা, বুদ্ধিতে কাশ্মিরী গাধার বেহদ্দ—বিদ্যায় মূর্ত্তিমান মা। বিসর্জ্জন, বারোইয়ারি, খ্যাম্‌টা নাচ আর ঝ্‌মুরের প্রধান ভক্ত···।" "কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরাণী তীর্থের কাকের মতো বসে আছেন। তিন চারটি 'ইকুটী', দুটি 'কমনল্য' আদালতে ঝুলচে।" "কলিকাতা সহর রত্নাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানোয়ারই নাই; রাস্তার দুপাশে অনেক আমোদগেঁড়ে মহাশয়েরা দাঁড়িয়েচেন; ছোট আদালতের উকীল, সেক্সন রাইটর, টাকাওয়ালা গন্ধবেণে, তেলি, ঢাকাই কামার···।" "কোথাও পাদরী সাহেব ঝুড়ি ঝুড়ি বাইবেল বিলুচ্চেন···।" "ক্রমে ক্রমে, কৌশলে, সেলেতী বেসাতে, টাকা খাটিয়ে অতি অল্পদিন মধ্যে কলিকাতা সহরে কতকগুলি ছোটলোক বড় মানুষ হ'ল।" "বীরকৃষ্ণ দাঁ কেবলচাঁদ দাঁর পুষ্যিপুত্তুর, হাটখোলায় গদি; দশ বারোটা খন্দ মালের আড়ত, বেলেঘাটায় কাঠের ও চূণের পাঁচখান গোলা, নগদ দশ বারো লাখ টাকা দাদন ও চোটায় খাটে। কোম্পানির কাগজেরও মধ্যে মধ্যে লেন-দেন হয়ে থাকে, বারো মাস প্রায়

(২৮) The Imperial Gazetteer of India (New ed. 1908) : vol. IX : P. 269.

সহরেই বাস…।" "চোরবাগানে দন্তুকর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ ম্লাট ড্রাইব মন্‌কিসন্ কোম্পানির বাড়ির মুচ্ছুদ্দী ছিলেন…কোম্পানির কাগজেরও ব্যবসা কত্তেন।" "বড় বাজারের পচ্ছু বাবু! তুলোর পিসগুডের দালাল, বিস্তর টাকা।" "রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দী…।" কলিকাতা সহরের বর্দ্ধিষ্ণু মধ্যশ্রেণীর পরিচয় এই সব বর্ণনার ভিতর দিয়ে চমৎকার ফুটে উঠেছে।

বাঙালী মধ্যশ্রেণীর হিন্দুপ্রাধান্যের কারণ

বাঙালী মধ্যশ্রেণীর হিন্দু-প্রাধান্যের কারণ অনুসন্ধান করতে হ'লে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস অনুধাবন করতে হবে। ইংরেজরা মুসলমানদের সিংহাসনচ্যুত ক'রে এদেশ অধিকার করেছে। বাদশাহী শাসনের ছায়াতলে জায়গীরদার জমিদার মনসবদার কাজী মৌলবী প্রভৃতিদের নিয়ে যে মুসলমান অভিজাতশ্রেণী দেশের মধ্যে গ'ড়ে উঠেছিল তাদের সেই প্রাচীন আভিজাত্য রক্ষা করা আর সম্ভব হ'ল না। নবাবী আমলে যে সব উচ্চপদ ও রাজকার্য্য এই মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর একচেটিয়া ছিল বৃটিশ যুগে তা আর রইল না। লর্ড কর্ণওয়ালিসের 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের' ফলে নূতন একশ্রেণীর হিন্দু জমিদারের আবির্ভাব হ'ল এবং পুরাতন জমিদার জায়গীরদারশ্রেণীর মুসলমান রাজস্ব আদায়কারীরা ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এইভাবে অনেক অভিজাত মুসলমান-পরিবার বাংলাদেশে নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে এগিয়ে গেছে। রাজানুগ্রহলাভেও মুসলমানেরা বঞ্চিত হয়েছে, কারণ রাজক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পর মুসলমান অভিজাতশ্রেণীর মধ্যে ইংরেজের বিরুদ্ধে যে বিক্ষোভবহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল, সৈয়দ আহমদের "ওয়াহবী" (Wahabi) আন্দোলন পঞ্জাব থেকে বাংলাদেশ পর্য্যন্ত সেই বহ্নিকে দাবানলে প্রজ্বলিত করে।* দলে দলে মুসলমান জনসাধারণ, কৃষক কারিগর, মোল্লা মৌলবীরা এই বিদ্রোহে আত্মোৎসর্গ করে, ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান অভিজাতশ্রেণী তাদের প্ররোচিত করে। বাংলাদেশে কলিকাতার চতুর্দ্দিকে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় তিতু মিঞার নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে যে বিদ্রোহানল জ্ব'লে উঠেছিল, উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বিলায়েৎ খাঁ এনায়েৎ খাঁ-প্রমুখ বিদ্রোহী প্রচারকদের উৎসাহে যে ভয়ঙ্কর জেহাদের সূত্রপাত হয়েছিল তার ইতিহাস নব-যুগের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়রূপে গণ্য হবে নিশ্চয়ই। 'সমাচার-দর্পণ' পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ (১৮৩১):

"নবেম্বর, ১১। তিতুমীরনামক এক ব্যক্তির আজ্ঞাক্রমে কতক মুসলমান যশোহর ও কৃষ্ণনগর ও কলিকাতার সন্নিহিত স্থানে রাজবিদ্রোহি কর্ম্ম আরম্ভ করে। তাহারা আপনারা মৌলবীনামে খ্যাত হয় এবং তাহারদের অভিপ্রায় যে কেবল লুঠপাট করে এমত বোধ হইল। ঐ তিতুমীর সৈয়দ আহমদের শিষ্য এমত রাষ্ট্র আছে।……

নবেম্বর, ২১। – বারাকপুর হইতে এক রেজিমেণ্ট পদাতিক এবং কলিকাতা ও দমদম হইতে কতক অশ্বারূঢ় তাহারদের প্রাতিকূল্যে প্রেরিত হয়। তিতুমীর ও তাহার অনুচর ৮০।৯০ লোক হত এবং ২৫০ লোক ধৃত হইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।"

বিদ্রোহের উদ্দেশ্য যাই হ'ক না কেন, এ-বিদ্রোহ রূঢ় বাস্তব সত্য এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্বও অসাধারণ। দুঃখের বিষয়, আমাদের বাংলাদেশের উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাস যে দু'-এক জন লেখার চেষ্টা করেছেন তাঁরা কেউ এত বড় একটা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহের কাহিনী আলোচনা করা প্রয়োজন বোধ করেননি। গণবিক্ষোভের প্রকাশ লুঠপাট ও বিশৃঙ্খল অরাজকতার মধ্যে হওয়া আদৌ অস্বাভাবিক নয়। আর সেই গণবিক্ষোভ যদি বিশেষ ঐতিহাসিক কারণে কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহ'লে মধ্যে মধ্যে তার বিকৃত সাম্প্রদায়িক উচ্ছ্বাসও স্বাভাবিক। কিন্তু শুধু এই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুসলমান সমাজে যে বিক্ষোভ ও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাকে উপেক্ষা করা যায় না। তার মধ্যেই রাজানুগ্রহপুষ্ট মধ্যশ্রেণীভুক্ত হিন্দু সমাজের অগ্রগতি এবং রাজানুগ্রহ-বঞ্চিত মুসলমান সমাজের অবনতির ইতিহাস রচিত আছে।

বাংলাদেশের সরকারী কর্ম্মচারীদের সংখ্যা (এপ্রিল—১৮৭১)

	ইংরেজ	হিন্দু	মুসলমান	মোট
সিভিল সার্ভিস—	২৬০	০	০	২৬০
বিচার বিভাগ—	৪৭	০	০	৪৭
অতিরিক্ত সহকারী কমিশনার—	২৬	৭	০	৩৩
ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর—	৫৩	১১৩	৩০	১৯৬
আয়কর বিভাগ—	১১	৪৩	৬	৬০
রেজিষ্ট্রেশন বিভাগ—	৩৩	২৫	২	৬০
ছোট আদালতের জজ—	১৪	২৫	৮	৪৭
মুনসেফ—	১	১৭৮	৩৭	২১৬
পুলিশ বিভাগের গেজেটেড অফিসার—	১০৬	৩	০	১০৯
জনকল্যাণ বিভাগ (ইঞ্জিনিয়ারিং)—	১৫৪	১৯	০	১৭৩
জনকল্যাণ বিভাগ (অন্যান্য বিভাগ)—	৭২	১২৫	৪	২০১
জনকল্যাণ বিভাগ (এ্যাকাউণ্টস)—	২২	৫৪	০	৭৬
চিকিৎসা বিভাগ—	৮৯	৬৫	৪	১৫৮
জনশিক্ষা বিভাগ—	৩৮	১৪	১	৫৩
অন্যান্য সরকারী বিভাগ কাষ্টমস, নৌ, জরীপ আফিম ইত্যাদি—	৪১২	১০	০	৪২২
	১,৩৩৮	৬৮১	৯২	২১১১

* উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে মুসলমানদের এই বিদ্রোহের ইতিহাস স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধে সবিস্তারে আলোচনা করা হবে। এই বিদ্রোহের ইতিহাস সংক্ষেপে হাণ্টারের বিখ্যাত "The Indian Mussalmans" গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের তিতু মিঞা ও অন্যান্য বিদ্রোহী মুসলমান নেতার জীবনী ও ইতিহাস তৎকালীন 'Calcutta Review' ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

অন্যান্য মাননীয় পদে নিযুক্ত ব্যক্তির সংখ্যা (১৮৯৬)

	ইংরেজ	হিন্দু	মুসলমান
হাইকোর্টের জজ—	?	২	০
ল' অফিসার—	৪	২	০
ব্যারিষ্টার—	?	৩	০
উচ্চপদস্থ— কর্ম্মচারী	?	৭	০
উকিল—	?	২৩৯	১
এটর্ণি, সলিসিটর—	?	২৭	০
আর্টিকল্ড ক্লার্ক—	?	২৬	০
হাইকোর্ট রেজিষ্ট্রারের বিভাগীয় উচ্চপদস্থ— কর্ম্মচারী	৬	১১	০
রিসিভারের অফিস—	২	২	০
এম-বি ডাক্তার—	১	১০	০
এল-এম-এফ ডাক্তার—	৫	৯৮	১

কলিকাতার সেনসাস রিপোর্ট (১৮৮১)

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
আইন ও বিচার— বিভাগ	১০৯	৩৭	২১
টেলিগ্রাফ—	২৩	৯	২৬
পোষ্ট অফিস— (উচ্চপদস্থ)	১২	৪	১৫
অন্যান্য সরকারী— কর্ম্মচারী	১৫৯	৯৮	২৩৩
মিউনিসিপালিটি ও পোর্ট কমিশনারের অধীন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী	৩৩	৫	৯
ব্যারিষ্টার—	১০	৩	৩৮
উকিল—	২৭২	১৭	৬১
এটর্ণি—	১৮	০	১৩
মোক্তার—	৪২০	৮৯	১
শিক্ষক অধ্যাপক—	১০৬৭	৫১১	১৭৪
সিভিল ইঞ্জিনিয়ার—	০	০	৩২

উপরের সংখ্যাতালিকা থেকে (২৯) স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, মধ্যশ্রেণীর মুসলমান অথবা মুসলমান বুদ্ধিবিদ্যাজীবী শ্রেণীর বিকাশ হিন্দুদের তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশের সুযোগও ছিল না উনবিংশ শতাব্দীতে। কারণ নূতন ইংরেজ প্রভুরা মুসলমানদের আদৌ সুনজরে দেখতেন না, সরকারী অনুগ্রহলাভেও মুসলমানেরা বঞ্চিত হ'ত। কারণ তারা তখন বিদ্রোহী বিক্ষুব্ধ, ইংরেজরা তখন তাদের কাছে কাফের এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ইসলামধর্ম্মসম্মত। চারিদিকের দরজা যখন বন্ধ, যখন সমস্ত মুসলমান সমাজ বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত তখন মুসলমান জনসাধারণ কোন্‌দিকে অগ্রসর হয়েছে? সমাজের শিক্ষিত চাকুরিজীবী বিদ্যাজীবী মধ্যশ্রেণী অথবা ধনিক বণিকশ্রেণীর দিকে নয়, নিম্নশ্রেণীর দিকে। হাণ্টার সাহেব বলেছেন: "...in fact, there is now scarcely a Government office in Calcutta in which a Muhammadan can hope for any post above the rank of porter, messenger, filler of inkpots and menders of pens" (The Indian Mussalmans: P. 162)। ১৮৮১ সালের কলিকাতার সেনসাস রিপোর্টে দেখা যায়:

	হিন্দু	মুসলমান	অন্যান্য
কচুয়ান—	১১৯৩	৩৬৬৮	০
ড্রাইভার—	৯৩	১৭৭	৪০
মাঝি—	১১৩৬৩	১৩৩৬৬	৭০
ষ্টীম নেভিগেশন— সার্ভিস	১	৩৬১	৩৩৫
ষ্টুয়ার্ড, বাবুর্চি—	৯	১২৯	২৩৭
লশকর—	৪৮০	১৩৮৭	১৭৫৫

কলিকাতার শিক্ষিত সম্প্রদায়ের শতকরা হিসাব—

	(১৮৮১)	(১৮৯১)
হিন্দু-পুরুষ—	৩৬.৯	৩৯
হিন্দু নারী—	৬.৮	৭.৫
মুসলমান পুরুষ—	১৪.২	১৬.৭
মুসলমান নারী—	১	১.৭
ব্রাহ্ম—	৮৫.৩	৭৭.৪
খৃষ্টান—	৭৯	৭৪.৭
ব্রাহ্ম নারী—	৬৪.৬	৬৫.৪
খৃষ্টান নারী—	৬৭	৭০

বাংলার নবযুগের জাগৃতিকেন্দ্র কলিকাতা মহানগরে কি ভাবে নূতন অর্থনৈতিক-সামাজিক শক্তির প্রভাবে নূতন শ্রেণীবিন্যাস হ'চ্ছে তা এই সব সংখ্যাতালিকা থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই নূতন মধ্যশ্রেণীকে সেকালের 'বঙ্গদূত' পত্রিকায় যেভাবে অভিনন্দিত করা হয়েছিল তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

"গত কএক বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় ও গৌড়রাজ্যের সর্ব্বত্র অনেক ধন বৃদ্ধি হইয়াছে ইহার কোন সন্দেহ নাই...এই মধ্যবিত্তের-দিগের উদয়ের পূর্ব্বে সমুদয় ধন এতদ্দেশের অত্যল্প লোকের হস্তেই ছিল তাহারদিগের অধীন হইয়া অপর তাবৎ লোক থাকিত ইহাতে জনসমূহ সমূহ দুঃখে অর্থাৎ কায়িক ও মানসিক ক্লেশে ক্লেশিত থাকিত অতএব দেশব্যবহার ও ধর্ম্মশাসন অপেক্ষা ঐ পূর্ব্বোক্ত প্রকরণ এতদ্দেশে সুনীতি বর্ত্তনের মূলীভূত কারণ হইতেছে ও হইবেক। এই নূতন শ্রেণী হইতে যে সকল উপকার উৎপান্ন তাহার সংখ্যা ব্যাখ্যাতিরিক্ত এবং ঐ অসংখ্যোপকার কেবল গৌড়দেশস্থ প্রজার প্রতিই এমত নহে কিন্তু ইংলণ্ডপতির এতদ্দেশীয় রাজ্যের

(২৯) এই সংখ্যাতালিকার মধ্যে ১৮৬৯ ও ১৮৭১ সালের সংখ্যাগুলি W. W. Hunter-এর "The Indian Mussalmans" গ্রন্থ থেকে সঙ্কলিত। ১৮৮১ ও ১৮৯১ সালের সংখ্যাগুলি কলিকাতার সেনসাস রিপোর্ট থেকে উদ্ধৃত।

সৌভাগ্য ও ঐশ্বর্য্য প্রভৃতিও বটে। অতএব যেহেতুক লোকেরদিগের যখন এ প্রকার শ্রেণীবদ্ধ হইল তখন স্বাধীনতাও অদূরে সেই শ্রেণী প্রাপ্ত হইবেক। ইহার অধিক দৃষ্টান্ত কি দিব ইংলণ্ডের পূর্ব্ববৃত্তান্ত দেখিলেই প্রত্যক্ষ হইবেক।"

(১৩ই জুন—১৮২৯)

'বঙ্গদূতের' ভবিষ্যদ্বাণী আজ সার্থক হতে চলেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে নূতন ধনিকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল তারাই বাংলাদেশের তথা সমগ্র ভারতের জাতীয় জাগৃতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল, তারাই একদিন জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তাদেরই বংশধরেরা আজ জাতীয় স্বাধীনতালাভ করতে প্রস্তুত। বাংলাদেশের নূতন মধ্যশ্রেণীর হিন্দুপ্রাধান্যের কারণ প্রধানত দু'টি। প্রথম কারণ হ'ল, মুসলমানদের রাজ্য হস্তচ্যুত হয়েছিল, মুসলমান অভিজাতশ্রেণী (সেকালের মধ্যশ্রেণী) আমিরী বিলাসিতা ও প্রভূত ধনসম্পদ সঞ্চয়ের সুযোগ, পদমর্য্যাদা প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাই ইংরেজ রাজত্বের আদিযুগে ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হওয়া মুসলমানসমাজের পক্ষে স্বাভাবিক। ইংরেজ রাজত্বের নূতন সমাজব্যবস্থায় যে সব সুযোগ সুবিধা এল তার প্রতি বিমুখ হওয়াও মুসলমানদের পক্ষে আশ্চর্য্য নয়। ইংরেজদের পক্ষেও মুসলমানদের বিশ্বাস করা ও সুনজরে দেখা স্বাভাবিক নয়। একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজরা মুসলমান অভিজাতশ্রেণীকে তোষণ করার চেষ্টা করেছে, কিন্তু হিন্দু মধ্যশ্রেণীর বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তারা সেই তোষণনীতি পরিহার করেছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে হিন্দু মধ্যশ্রেণী এগিয়ে গেছে, মুসলমান মধ্যশ্রেণীর বিকাশ ও অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। হিন্দুদের অগ্রগামিতা ও প্রাধান্যের দ্বিতীয় কারণ এবং প্রধান কারণ হ'ল: মুসলমানেরা রাজ্য হারিয়েছিল, হিন্দুরা হারিয়েছিল সর্ব্বস্ব। মুসলমানেরা সবেমাত্র রাজ্যচ্যুত, বেশী হ'লে অর্দ্ধ-শতাব্দী হবে, আর হিন্দুরা রাজ্যচ্যুত শত শত বর্ষব্যাপী। মুসলমানেরা রাজত্ব ও ধনসম্পদ হারিয়েছিল, আর হিন্দুরা রাজত্ব ধনসম্পদসহ তাদের যুগসঞ্চিত সংস্কৃতি-সম্ভার, নৈতিক ও মানসিক সম্পদ সর্ব্বস্ব হারিয়েছিল। হিন্দুসংস্কৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্য ও ঐতিহ্য কয়েক শতাব্দী-ব্যাপী যুগসঙ্কটের অন্ধকারে আচ্ছন্ন ছিল। দর্শন-বিজ্ঞানে শিল্পসাহিত্যে হিন্দুর মনীষা ও প্রতিভার যে আশ্চর্য্য বিকাশ হয়েছিল একদিন তারই শোচনীয় অবনতি ও সঙ্কটকালে এদেশে মুসলমানদের রাজ্যলাভ ঘটে। মুসলমান আমলে হিন্দুর সেই হারানো প্রতিভা ও মনীষা, সেই লুপ্ত শক্তি, ক্ষুরধার বিদ্যা-বুদ্ধির পুনরুজ্জীবন হয়নি। হয়নি তার সর্ব্বপ্রধান ঐতিহাসিক কারণ হ'ল মুসলমান বাদশাহরা নূতন কোন সামাজিক অর্থনৈতিক শক্তি, নূতন কোন বৈপ্লবিক ভাবাদর্শ ও জীবনাদর্শ এদেশে দান করতে পারেননি। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামান্য সময়োপযোগী সংস্কার ভিন্ন সামাজিক অথবা নৈতিক মানসিক ক্ষেত্রে মুসলমানযুগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন অবদান নেই। তাই এ-দেশের জাতীয় জাগৃতি মুসলমান আমলে হয়নি। ইংরেজের আমলে নূতন উন্নত অর্থনৈতিক সামাজিক ও নৈতিক আদর্শের সংঘাতে এই জাতীয় জাগৃতি সম্ভব হয়েছে এবং জাগৃতি আন্দোলনে হিন্দু মধ্যশ্রেণীর প্রাধান্যও সেইজন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলার উনবিংশ শতাব্দীর জাগৃতি আন্দোলনের পুরোগামী সেইজন্য হিন্দু মধ্যশ্রেণী। একটা হিন্দু-প্রধান ভাবধারা সেই কারণেই, কখন ক্ষীণ কখন প্রবলবেগে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার জাগৃতি আন্দোলনের ভিতর দিয়ে অন্তঃসলিলার মতো প্রবাহিত হয়ে গেছে। কিন্তু তাহ'লেও সেই জাগৃতি-প্রবাহের তরঙ্গশীর্ষ যে মধ্যে মধ্যে সমস্ত সঙ্কীর্ণতা এবং সাম্প্রদায়িকতাবোধের ঊর্দ্ধে উঠেছে এবং সর্ব্বজনীন যুগাদর্শের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়েছে তা অস্বীকার করা যায় না। বাংলার জাগৃতি তাই কোন সম্প্রদায়ের জাগৃতি নয়, সমগ্র বাঙালী জাতির জাগৃতি। বাঙালী জাতির জাগৃতি তাই সমগ্র ভারতের জাগৃতি।

স্বপ্ন

শ্রীদেবেশচন্দ্র দাশ

শুধু
বুঝি স্বপ্ন মধু ?
স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয় আর ?
এই খালি তারে ভাবা, পিছে বার বার
পথ পানে চেয়ে থাকা, সুনিভৃত ক্লান্ত অবসরে
চমকি' চাহিয়া ওঠা, খুঁজে মরা জীবন-দোসরে ?
আমারে স্মরিছে চোখে অশ্রুযূথী লয়ে,
রাখিয়াছে চিত্ত-কিশলয়ে
মোর নাম লিখি'
সে কি ?

সে কি
উঠিবে চমকি'
ত্রস্ত লাজে নিরাশা সায়রে
চকিত বিদ্যুৎ সম ঘন মেঘ-স্তরে
হেরিয়া আশার দীপ স্মৃতির আলোকে ? ক্ষণিকের
মায়া তাও ভালো লাগে, ভালো লাগে সকল দিকের
শ্রান্তি জ্বালা ভুলে থাকা স্বপ্ননীড়টিরে;
তাই ব্যর্থ নভ হ'তে ফিরে
কুলায় প্রত্যাশী
আসি।

জওহরলাল —মনুজ দাস

(প্রথম পুরস্কার)

যাচ্ছি

—মণি দাস

চল

—সুশান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

এসো —বিশ্বনাথ মণ্ডল

আসছি —বিমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

(শিল্পী গোপাল ঘোষের চিত্র প্রদর্শনীতে জওহরলাল)

-নিয়মাবলী-

প্রত্যেক মাসে প্রতিযোগিতায় একমাত্র সৌখীন (এ্যামেচার) আলোকচিত্র-শিল্পীদের ছবি গৃহীত হইবে।

ছবির আকার ৬" × ৮" ইঞ্চি হইলেই আমাদের সুবিধা হয় এবং যত দূর সম্ভব ছবি সম্বন্ধে বিবরণ থাকাও বাঞ্ছনীয়। যথা, ক্যামেরা, ফিল্ম, এক্সপোজার, এ্যাপারচার, সময় ইত্যাদি।

যে কোন বিষয়ের ছবি লওয়া হইবে। অমনোনীত ছবি ফেরং লওয়ার জন্য উপযুক্ত ডাক-টিকিট সঙ্গে দেওয়া চাই। ছবি হারাইলে বা নষ্ট হইলে আমাদের দায়ী করা চলিবে না, সম্পাদকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। খামের উপর "আলোক-চিত্র" বিভাগের এবং ছবির পিছনে নাম ও ঠিকানার উল্লেখ করিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার আট টাকা, তৃতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা এবং অন্যান্য বিশেষ পুরস্কারও দেওয়া হইবে।

—জ্যোৎস্নারাণী বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক নেতাজী

—বসুমতী

—বিমল মিত্র

হাসি-কান্না

—কামাক্ষাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
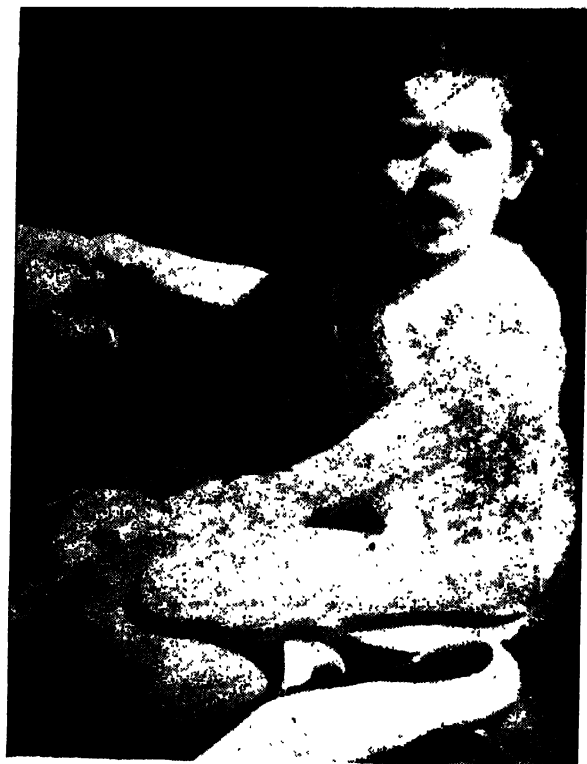
জলকেলি (দ্বিতীয় পুরস্কার) —নির্ম্মলকুমার দত্ত
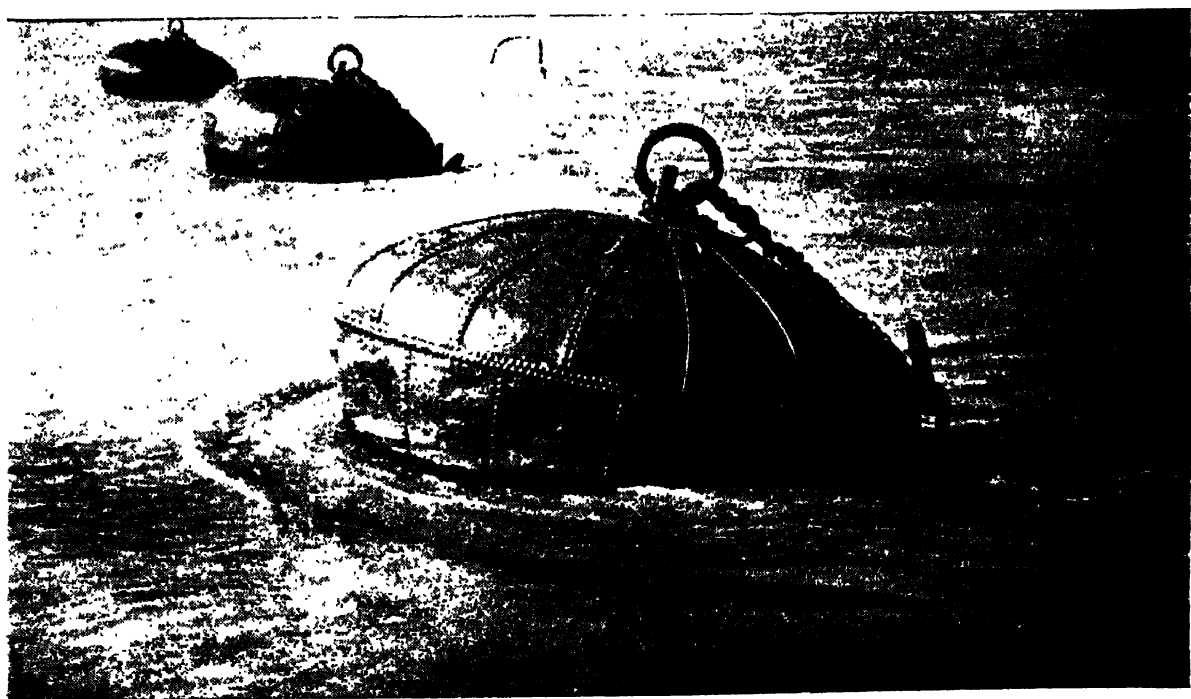
অবলম্বন —হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়

(তৃতীয় পুরস্কার)　　　　—সুনীল দত্ত

তেরশো চুয়ান্ন

শ্রীপ্রভাবতী দেবী-সরস্বতী

আকাশ ডাকে—

অসংখ্য তারা ঝিক্‌মিকিয়ে ওঠে চোখের সামনে টিপ-টিপ -যেন জ্বলে আর নেবে। অথচ এরাই না কি অনির্ব্বাণ দীপশিখা,—এরা না কি সর্ব্বদাই আছে।

আবার আসছে দুর্ভিক্ষ—

আবার আরম্ভ হচ্ছে হাহাকার,—ঘরে ঘরে শীর্ণ আকৃতি শুষ্ক-মুখ লোক দেখা যাচ্ছে।

অথচ এবার না কি মাঠে প্রচুর ধান জন্মেছে, শুধু এখানেই নয়, গোটা বাংলা দেশে। সে সব গেল কোথায়, মাঠে দেখা দিয়ে সোণার বরণে চক্ষু ঝল্‌সে দিয়ে তারা লুকালো কোথায়?

চাল নাই, তেল নাই, কাপড় নাই—

কি-ই বা আছে?

নুণের কন্‌ট্রোলটা গেছে, লোকে নুণ খাবে, লাইন দিয়ে দাঁড়াতে হবে না, দোকান হতে কিনে আনতে পারবে। কিন্তু চাল ডাল তেল—

মহিম মাথায় হাত দেয়, রুক্ষ চুল—তেলের লেশ মাত্র ছিল না। বড় দুঃখেই মাথা সে একেবারে কামিয়ে ফেলেছে। প্রবল রোদে বড় কষ্ট পেতে হয়, ন্যাড়া মাথায় সোজা ভাবে রোদ এসে পড়ে কষ্ট দেয় বড় কম নয়, আগে গামছা নিতো না সে, এখন মনে করে নিতে হয় একখানা গামছা—মাঝে-মাঝে গাড়ী থামিয়ে জল পেলে ভিজিয়ে নিতে হয়। মাথায় সেটা দিলে তবু সোজা রোদটা মাথায় পৌঁছায় না, সমস্ত দেহে অসহ্য জ্বালা ধরায় না।

সৌরভী তাড়াতাড়ি করে গামছাটা ভিজিয়ে রাখে, কে জানে কতক্ষণ গাড়ী বইবে মহিম, সারা দিনের রোদটা যাবে ন্যাড়া মাথার ওপর দিয়ে।

বুড়ি মা আছে, জড়ের মত সে এক পাশে পড়ে থাকে। মানুষ হিসাবে আজ তার দরকার নাই জগতে, সংসারে সে এখন অনর্থক একটা বোঝা। না পারে নড়তে, না পারে চড়তে, তবু কথা আছে পঞ্চাশ কাহনের ওপর একান্ন কাহন।

দু'টো গরু আর গাড়ী আছে জীবিকার উপায়। মহিম গাড়ী বয়। তিন মাইল দূর ইষ্টিশানে নিয়ে যায় গাঁয়ের যাত্রীদের, জিনিষ-পত্র বয়। মাঠের ধান বয়ে এনে পৌঁছে দেয় মালিকের ঘরে। লাভ হয় ওই সময়টাতেই—অগ্রহায়ণ পৌষের দিকে, যখন নতুন ধান ওঠে। ছইটাকে নামিয়ে রেখে খোলা গাড়ী নিয়ে সে যায় মাঠে—বোঝাই করে ধান নিয়ে যায় মালিকের বাড়ী।

নাই বা রইলো সে ধানে তার অধিকার, তবু ধান দেখে আনন্দ হয়। পঞ্চাশের মন্বন্তরে যা ভয় খাইয়ে দিয়েছে তাতে মানুষ আগেই খোঁজ নেয় মাঠে ধান হয়েছে কি রকম।

দরকার না থাকলেও কেউ কেউ ধানের জমিতে ঘুরে বেড়ায়, যখন মাঠের ধান সোনার মত রং ধরে বাতাসে দোলা খায় তখন আনন্দ পায় বড় কম নয়। না-ই বা হল নিজের ধান, তবু মানুষের জন্মগত অধিকার আছে তো সে ধানে!

এক দিন যখন মাঠের ধান কাটা হয় তখন মহিম আর পথ খোঁজে না, যেখান সেখান হতে গাড়ী নিয়ে যায় পথকে সংক্ষিপ্ত করে। তার পর যখন কচি-কচি সবুজ ধান গাছ কেবল মাত্র মাথা তোলে, তখন কত সন্তর্পণেই না গাড়ী চালাতে হয়—যেন একটা গাছ না চাকার তলায় যায়। একটি ধান গাছের শীষে কতগুলি ধান হবে, কল্পনায় মহিম তাই দেখে।

এই তো সে দিন গেছে পঞ্চাশের মন্বন্তর—

উঃ, কি দু'র্দ্দিনই না গেছে—কত লোকই না মরলো সেই মন্বন্তরে! এক মুঠো ভাতের দানা জুটলো না তাদের কপালে। এই পুরন্দরপুর গাঁ হতে না কত লোক মরলো, কত লোক হারালো—হয় তো দারোগা বাবু সে হিসেব রেখেছেন।

মাঝে মাঝে মহিম অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে—সৌরভীকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে এই হারানোর দলে। কোথাকার মেয়ে, কার মেয়ে মহিম তা জানে না। সৌরভীকে সে নিয়ে এলো নিজের ঘরে।

তারা স্বামি-স্ত্রী। ধর্ম্ম-সঙ্গত বিবাহ তাদের হয় তো হয়নি,

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করেনি, হয়নি কোনও মঙ্গলাচরণ, তবু তারা ছিল সত্যকার স্বামি-স্ত্রী, মহিম অসঙ্কোচে সৌরভীকে ডাকে—"বউ"—এবং সে-ও সোজা উত্তর দেয়—"কেন গো—"

এক দিন সে তার অতীত জীবন-কাহিনী শুনাতে চেয়েছিল, মহিম শোনেনি। দরকার কি সে অতীত কাহিনী শুনে, তাতে মনের স্বচ্ছ পরদায় কেবল একটা দাগই পড়ে যাবে। দরকার নেই সে সব কথা শুনে। গত মন্বন্তর কত অঘটনই তো ঘটিয়েছে, কেউ কি স্বপ্নেও ধারণা করতে পেরেছে—শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বাংলা এক নিমেষে শস্যহীন হয়ে পড়বে, লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরবে? সেটা যদি সম্ভব হয়—পেটের জ্বালায় ছেলে-মেয়েরাই বা সৌরভীর মত হারিয়ে যাবে না কেন?

আর জাতি?

মহিম হাসে—। আমাদের জাতের আর কি কিছু আছে? আমরা এক দিন এই জাতের জন্যে মরেছি, চারি দিকে শুচিতার আগল দিয়ে সন্তর্পণে নিজেদের বাঁচিয়ে চলেছি বলেই না এক মন্বন্তরের ধাক্কায় সে আগল ভেঙে পড়লো,—হিন্দুর ছত্রিশ জাতি মিলে গেল এক হয়ে, অস্পৃশ্য বলে যাদের চিরদিন তফাতে ঠেলে রেখেছিল, তাদের সঙ্গে হাত পেতে দাঁড়ালো গিয়ে ক্যান্টিনে।

এই তো জাতের বড়াই! আজ ঘরে ফিরে তত বড় বুক তত বড় মুখ নিয়ে তর্ক করতে আর তারা পারবে কি? সেই জন্যই কেউ আজ সৌরভী সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

হতে পারে সৌরভী মহিমের চেয়ে জাত্যংশে নিচু, কিন্তু তা নিয়ে মাথা-ঘামানোর দিন আজ নয়। মহিম কায়-ক্লেশে মজুরী করে দিন চালায়, কোন রকমে তার ভাঙ্গা চালে আবার খড় দিয়েছে, এই তার অনেক সৌভাগ্য।

২

লোকে বলে আবার না কি আকাল আসছে। কতই বা সইবে মানুষের?

কিন্তু এত ধান যে হয়েছিল—গেল কোথায়? অল্পবুদ্ধি মহিম তাই ভেবে ঠিক পায় না।

গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই পদ্মলোচন, অনেক জায়গার খবর তার কাছে মেলে। যুদ্ধ যে দিন জাপান পরাজিত হল, বৃটিশের যুদ্ধ-বিরতির মহোৎসবের প্রোগ্রাম বার হল, সে খবরও পাওয়া গিয়েছিল পদ্ম মাষ্টারের কাছে। কলকাতায় না কি ভীষণ আনন্দ-উৎসব হবে, গভর্ণমেণ্ট গরীব-দুঃখীদের খাওয়াবেন, কাপড় দেবেন, বিনা পয়সায় সে দিন থিয়েটার-সিনেমা দেখানো হবে—পদ্ম মাষ্টারের মুখে রাজার জাতের সুখ্যাতি আর ধরে না—তাই বকে। "বিহারী মহীন, তোরা কখনও পারিস লাট সায়েবদের সঙ্গে যুদ্ধ-লড়াই করতে? বলি—ওদের সঙ্গে লড়াই করা কি চাট্টিখানি কথা? এই যে সাত সমুদ্দুর তের নদী পার হয়ে এসেছে, হ্যাঁ, হিম্মত একেই বলি! ভিন দেশে এসে কেমন দেখ চল্লিশ কোটির মাথার ওপর গ্যাঁট হয়ে বসলো। এই জাতের সঙ্গে কেউ যুদ্ধ করে জিততে পারে?—"

দেবেশ একটু বাইরের খবর রাখে, সে বলে, "কিন্তু ঠিক লড়াই হলেও এরা তো একা নয়, আর সত্যি কথা এদের সঙ্গে কেউ পারবে না—তার মানে এটা বোঝায় না গুরুমশাই যে, সত্যিকার লড়াই করে এরা জিতেছে। চালাকীতে শেয়াল হার মানে, আর ওই চালাকি করেই না আজ চল্লিশ কোটি লোকের মাথায় কাঁটাল ভেঙে খাচ্ছে!"

পদ্মলোচন জিভ কাটে—"মরবি—মরবি দেবশা, তুই বেটা নির্ঘাৎ মরবি, এ আমি এক কলমে লিখে দিচ্ছি। সায়েব জাতের নিন্দে করিসনি। উঃ, কি গায়ের রং—একেবারে যেন জ্যান্ত মহাদেব। সেই যে সে দিন মিলিটারীর সায়েবরা এখান দিয়ে যাচ্ছিল না, গা খোলা—ধবধব করছে একেবারে। নিন্দের কথা এতটুকু যদি ওদের কাণে যায় একেবারে ঘ্যাচাং করে দেবে—বাপ, মনে করতেও ভয় হয়!"

কলকাতায় গেল পদ্মলোচন—গেল উৎসব দেখতে। বড়বাজারে তার পরিচিত এক জন লোক থাকে, তার ওখানে উঠবে সে, উৎসবটা দেখতেই হবে।

মহিম উসখুস করে—গেলে হতো। পদ্মলোচন বলে—যে এ উৎসব না দেখবে সে আর দেখতে পাবে না; আমাদের কত ভাগ্য-বশে যুদ্ধটা বাধলো আবার থামলো—এর উৎসব দেখব না? আর কি আমাদের কপালে যুদ্ধ বাধবে না এর থামার উৎসব দেখতে পাব? কপালক্রমে জুটেছেই যখন—এস্পার কি ওস্পার একটা কিছু করবই—নরজন্ম ব্যর্থ হতে দেব না।"

নরজন্ম ব্যর্থ—কথাটা মনে-প্রাণে গেঁথে যায়। যাওয়ার উদ্যোগ করতে গিয়ে মহিম পেছিয়ে পড়ে, দরকার নেই গিয়ে। টাকা-পয়সা যা আছে তা খরচ হবেই, তা ছাড়া গেলেই দেরী হবে দু'-পাঁচ দিন, ভাড়া খাটলে এ দু'-পাঁচ দিনে কিছু পাওয়া যাবেই! লোকে বলছে দুর্ব্বৎসর—কিছু চাল বা ধান সংগ্রহ করে রাখতেই হবে।

মহিম নিজেকে সামলে নেয়।

পদ্মলোচন দু'-চার দিন পরেই ফিরে এলো—তার মুখে কথা আর ফুরোয় না—"উঃ, একখানা সাজিয়েছিল বটে গড়ের মাঠ, দেখলে আর ফিরতে ইচ্ছে হয় না। কাছেই লাট সায়েবের বাড়ী, লাট সায়েব আর লাট-বিবি দু'জনে এসে আমরা যারা দেখতে গিয়েছিলুম তাদের কি খাওয়াটাই না খাওয়ালে—খেয়ে একেবারে হাঁস-ফাঁস করে মরি আর কি? মেমসাহেব নিজে পরিবেশন করলেন—আর আমাদের সকলকে কত সাদর অনুরোধ—এটা খাও, ওটা খাও! খেলুম যা ধমক একটা—পেটের পিলে একেবারে চমকে গেছল। একটা রাজভোগ আর একটা ক্ষীরের চমচম কিছুতেই আর পেটে ঠেলে উঠতে পারলুম না, লাট-বিবিও ছাড়বেন না। বললেন—আমি নিজের হাতে কাল সারা দিন খেটে সারা রাত জেগে এই সব খাবার করেছি, এর একটি ফেলতে পারবে না। কি করি, বাধ্য হয়ে কোন রকমে না চিবিয়েও গিলতে হল। উঃ, তার পর আবার থিয়েটার-বায়স্কোপ, সাহেব-বিবির নাচ—মরে যাই আর কি? তবু কি ফুরায়—এখনও আছে কত, উড়ো জাহাজে সমুদ্দুরে ওদের সঙ্গে স্নান করতে যেতে হবে। রামোঃ, ওই জাহাজটাকে দেখলে আমার গায়ে জ্বর আসে। অত দূর আকাশে ওড়ে, এত নিচে থেকে ওর শব্দে কানে তালা লেগে যায়। ওই জাহাজে যাব না বলেই তো তাড়াতাড়ি পালিয়ে এলুম।"

পদ্মলোচন গোঁফে তা দেয়—সগর্ব্বে চারি দিকে তাকিয়ে দেখে, নীরব বিস্ময়ে সকলেই তার পানে চেয়ে আছে।

৩

দিন দিন অবস্থা খারাপ হয়ে আসে। এই তো সে দিন পর্য্যন্ত বাজারে চালের মণ ছিল দশ টাকা। হ্যাঁ, মোটা চাল দশ টাকা, সরু সাদা চাল এগারো, বড় জোর সাড়ে এগারো। এর বেশী নামেনি, নামতে পারেনি, যদিও অনেক ধান হওয়ার জন্য অনেকে অনেক আশা করেছিল—এবার চাল নিশ্চয়ই তিন টাকা না হোক, পাঁচ হতে সাতের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

লোকে তো বলছে এবং শুধু বলা নয়, মহিম নিজের চোখেই তো দেখছে আজ দশ-বারো বৎসরের মধ্যে এমন ধান না কি মাঠে ধরেনি! আজ সে সব ধান গেল কোথায়?

কাজও কমে আসে—মাত্র ফাল্গুন মাস পড়েছে, এর মধ্যে শোনা যাচ্ছে দুর্ভিক্ষ আসছে।

মনেও লাগে কথাটা, হু-হু করে চালের দাম বেড়ে চলে, দশ হতে বারো, তার পর তেরো চৌদ্দ হতে হতে কুড়িতে এসে ঠেকেছে।

সন্ধ্যার সময় পাঠশালার বারান্দায় গিয়ে বসে গ্রামের চাষাভুষো লোকেরা,—এখানে পদ্মলোচনের সঙ্গে আলোচনা হয় তাদের, দশটা বাইরের কথা শুনতে পায় তারা। বাজারে চালের মণ যেদিন কুড়ি টাকা দাঁড়ালো, সেদিন এরা সবাই গিয়ে দাঁড়ালো পদ্মলোচনের সামনে। সবাই সুধায়—কেন এমন হল?

মহিম চুপচাপ এক পাশে বসে থাকে—তার মাথার মধ্যে কেমন যেন ঝিম-ঝিম করে, কথাগুলো কতক কানে আসে, কতক আসে না। মহিম ভাবছিল, তেরশো পঞ্চাশ আর তেরশো তিপ্পান্ন—কতটুকু দূরত্ব আছে এদের মধ্যে। এই তো সেদিন গেল মরণের প্রলয় নাচন, ঘর বাঁধতে না বাঁধতে আবার সে পা ফেলেছে—আবার আরম্ভ হবে পঞ্চাশের অভিনয়!

ঘর বেঁধেছে সে, সে ঘর ভেঙ্গে যাবে। এক মন্বন্তরে সৌরভী ভেসে এসেছে, এই মন্বন্তরে সে ভেসে যাবে—জীবন ও মৃত্যু কতটুকুই বা ব্যবধান দু'টির মধ্যে। হঠাৎ সে সচকিত হয়ে ওঠে—গভীর ভাবে একটা হুঙ্কার ছাড়ে—"শুনুন পণ্ডিত মশাই, গত বার সয়েছি বলে এবার আর সইব না, গত বার বিধিলিপি বলে তবুও মেনেছিলুম কিন্তু এবার তো সেটি আর হচ্ছে না, কাজেই—" কথাটা সে শেষ করে না, মাথায় হাত দিয়ে ঘষে, তাতে নেড়া মাথায় খস-খস শব্দ হয়।

বাড়ীতে মা ইনিয়ে-বিনিয়ে কাঁদে—"ওরে বাবা রে, কি পোড়া-কপালীকেই এনেছিস্ রে, ও সব শেষ না করে যাবে না। আমায় খাবে, তোকে খাবে, আমাদের হাড়-মাস খেয়ে চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে নিজের থানে চলে যাবে রে মহিম—ও যে শাঁকচুন্নি রে, গেল বারের মন্বন্তর যে ওরই নিজের তৈরী—"

মহিম সহ্য করতে পারে না—দাঁত কড়মড় করে তার, চোখ দু'টি লাল করে বিসদৃশ ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে সে, ভয় পেয়ে বৃদ্ধা একেবারে চুপ করে যায়।

কুড়ি টাকা চালের মণ—

হবে নাই বা কেন?

ধান বয়ে দিয়েছে মহিম, সে তবু তো সব জানে না, যতটা জানে তাতে বোঝে, সেই গত পঞ্চাশের অভ্যুদয়।

চোখের সামনে ঘনিয়ে আসে অন্ধকার, সেই অন্ধকারে দেখা যায় কালো কালো ছায়া মূর্ত্তি, পোকার মত কিলিবিলি করে বেড়াচ্ছে।

এরা কারা—এরা কারা?

এরা তারা—যারা পঞ্চাশের মন্বন্তরে না খেতে পেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে মরেছে। এক দিন নয়—দু'দিন নয়, কত দিন তারা খেতে পায়নি। প্রথমে শুকালো মাংস, রইলো হাড়ের উপর চামড়া অবশিষ্ট—তার পর পেটের ভিতর চলে গেল চামড়া—আশ্চর্য্য যে নাড়ি-ভুঁড়ির অস্তিত্বও আর তাদের খুঁজে পাওয়া যায়নি।

ও-পাড়ার সেলিমের বাড়ীতে মরলো আগে সেলিমের মা, তার পর সেলিমের স্ত্রী—

এই তো মাত্র দুই হপ্তা হল, দুই হপ্তা আগেও চাল ছিল ষোল টাকা।

আবার আকাল এলো—আবার এলো আকাল—তিপ্পান্ন সাল শেষ হয়, চুয়ান্ন আসে, কি ছবি দেখবে তেরশো চুয়ান্ন, বাংলা দেশের বুকে কোন্ ভৈরব চালাবে তার উদ্দাম নৃত্য?

৪

সাধন বাগদী বলে—সে এবার শ্মশান-কালীকে জাগাবেই,—স্বপ্ন সে পেয়েছে, মা কালী জাগলে গ্রাম রক্ষা পাবে, দেশ রক্ষা পাবে, গোটা বাংলা দেশ বাঁচবে প্রচুর খেতে পেয়ে। তাদের বংশের কোন আদিপুরুষ শবসাধনা করতো, শ্মশান-কালীকে জাগিয়ে সেই না কি একবার বর আদায় করে নিয়েছিল। বংশগত এ অধিকার সাধনের আছে, লোক তা মেনে নেয়। না নিয়েই বা উপায় কি? আসছে দুর্ভিক্ষ, সঙ্গে সঙ্গে আসবে মড়ক, দুর্ভিক্ষের চিরসাথী! মানুষ মরতে গিয়ে একটা কিছু উপলক্ষ করে বাঁচতে চায়—তা সে একটা খড় হোক, কুটো হোক, একটা শিকড়ও হোক না কেন! বছর তিনেক আগের বিভীষিকা আজও দেশের লোকের মন হতে মোছেনি। যারা ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল, তারা অনেককে জানিয়ে অনেক পথ ঘুরে আবার ফিরে এসেছে নিজেদের ভিটেয়। বহু কষ্টে আবার তুলেছে ঘর, মাঠে দিয়েছে লাঙ্গল। আজ যদি আবার দেবতার রোষ-দৃষ্টিতে পড়ে সব হারাতে হয়। সবাই সাধনের কাছে গিয়ে ধরে—"তুমি যা হয় কর সাধন, দেশকে বাঁচাও, দেবতাকে প্রসন্ন কর।"

পদ্মলোচন মাথা নাড়ে—"উঁহু, ও সব শ্মশান-কালী-ফালি কিছু নয়, এ আমাদের কর্ম্মফল, বাংলা দেশের দুর্ভাগ্য! এত ধান জন্মালো, হঠাৎ সব লুকিয়ে গেল,—এর মূলে কি আছে তাই ভাব তোমরা শ্মশান-কালীকে জাগিয়ে কিছু হবে না—ওদিকে স্বয়ম্ভু শিব যে নৃত্য সুরু করেছেন। দুই দলে যুদ্ধ বাধিয়ে শিঙা বাজিয়ে মহাকাল নৃত্য জুড়েছেন, তাঁরই ভাণ্ডার খোঁজ গিয়ে—যদি কিছু মেলে। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার আজ শূন্য, একরত্তি চালের গুঁড়ো মিলবে না।"

লোকে শিউরে ওঠে—

মাষ্টার পাগল হয়ে গেছে নইলে মা-কালীর পূজো করতে বারণ করে! কি সব আবল-তাবল বলে—কংগ্রেস, মন্ত্রিসভা,—এ-সব দারুণ ষড়যন্ত্র—সব রকমে অধঃপতিত বাংলা, হয়তো কোন দিন মানচিত্রের মধ্যে ওইটুকু জায়গা ছেড়ে দিয়ে শূন্যে ভেসে চলবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

গত পূজার সময় এসেছিল এক দল ছেলে, সহর হতে তারা এসেছিল প্রচার করতে। কি সব মিনি ট্রি—তারা বলেছিল। গাঁয়ের লোক আর কিছু না বুঝলেও এটুকু বুঝেছিল—কংগ্রেসের লোকেরা দেশের মন্ত্রিত্ব নিচ্ছে, আর কখনও দেশে দুর্ভিক্ষ হবে না; কাপড়ের জন্যে ভাবতে হবে না, তেল এবার হতে প্রচুর পাওয়া যাবে।

আজ তাদের পেলে গাঁয়ের লোক নখে টিপে মারবে। মিথ্যাবাদী তারা, প্রবঞ্চনা করতে এসেছিল। কংগ্রেস, লীগ, হিন্দু-মহাসভা, আরও কত কি নাম বলে তারা এই সব নিরক্ষর লোক-গুলোকে দলে টানতে চেয়েছিল।

কিন্তু কে-ই বা সে সব কথা বোঝে? বুঝলো শুধু যে দুর্ভিক্ষ আর হবে না, মড়কও নয়। ব্যারাম হলে তারা সরকার হতে ওষুধ পাবে,—পথ্য পাবে, এই সে আশার কথা। কিন্তু দু'দিন না যেতে তাদের ভুল ভেঙ্গে গেছে, বুঝেছে শুধু ধাপ্পা—কেবল ধাপ্পা।

হ্যাঁ, জাগাতেই হবে শ্মশান-কালীকে।—একাগ্র ভাবে সবাই ডাকে—"জাগো, জাগো মা শ্মশান-কালি, গ্রাম রক্ষা কর, দেশ রক্ষা কর—বাঁচাও মা—বাঁচাও!"

পদ্মলোচন গম্ভীর ভাবে মাথা নাড়ে—"হবে না, হবে না, কিছু হবে না। ও সব শ্মশান-কালী মশান-কালীর কাজ নয়, সাধনা মিথ্যে,—পূজো মিথ্যে। হ্যাঁ, করতে যদি হয় নিজেরা কর, নিজেরা দাঁড়াও, না হলে মরবে।"

সাধন গাঁজায় দম দেয়—বোম বোম, বোম বোম,—সে হুঙ্কার ছাড়ে—"জয় বাবা বিশ্বনাথ, জয় বাবা বোম ভোলা! মাষ্টার মশাই, নিজের চরকায় তেল দাও গে, পরের গায় হাত কেন গো? যা বোঝ না, জানো না, তাতে হাত দিতে গেলে মরবে মাষ্টার—একেবার মরবে। বোম বোম, বোম বোম—"

মহা ভক্তিতে সে গাল বাজায়।

৫

শ্মশান-কালী জাগলো না, সাধন হল দেশান্তরী।' গ্রামে এলো মড়ক—দুর্ভিক্ষের চিরসাথী। দুর্ভিক্ষ নয় তো কি? ছিল কুড়ি, হল পঁচিশ টাকা মণ চাল। কয় জন লোক পঁচিশ টাকা মণের চাল খেতে পারে?

গরু দু'টো না খেতে পেয়ে ধুঁকতে আরম্ভ করে। মহিম করুণ চোখে তাদের পানে চায়। নিজের চেয়েও সে বেশী ভালোবাসে তার মঙ্গল আর শুভকে—এরা দু'জন তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেরা প্রাণ-পণে খেটে। আশ্চর্য্য যে, মনিবের দুঃখ এরাও বোঝে। ঘরের দাওয়ার নীচে খোঁটায় এরা বাঁধা থাকে, মহিম যখন দাওয়ায় বসে করুণ চোখে এদের পানে চেয়ে ভাবে—এর পর কেমন করে এদের খেতে দেবে, তখন তারাও দু'জনে চেয়ে থাকে তার পানে। মহিমের মনে পড়ে তিন বৎসর আগে—তেরশো একান্ন সালে ফিরে সে ঘর বাঁধলে, শুভ আর মঙ্গলকে নিয়ে এলো সেই নূতন ঘরে, গাড়ীখানা সে দিনের পর দিন পরিশ্রম করে তৈরী করলে।

মাত্র একশোটা টাকা নগদ দিয়েছিল এদের মূল্য, বাকিটা ছিল দেনা। এক বছরও লাগেনি সে দেনা শোধ করতে। নিজেদের সব খরচ চালিয়ে সে দেনা শোধ করেছে ওদেরই শ্রমের টাকায়।

মহিমের চোখ ছাপিয়ে জল পড়ে টপ-টপ-টপ! আজ ওদের খেতে দিতে পারবে না—ওর চোখের সামনে শুকিয়ে ওরা কঙ্কালসার হচ্ছে, কোন্ দিন ধুপ করে পড়ে মরে যাবে। মহিমের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় শুভ ও মঙ্গল।

ঘরের মধ্যে অচল জননী আপন মনে বকে—"দূর দূর দূর দূর—রাক্ষুটাকে দূর করে দে—দূর করে দে, ও আমাদের খেতে এসেছে রে মহিম, ওর নিশ্বাসে চারি দিক জ্বলে গেল। শাঁকচুন্নি, বুঝলি? আকালের মড়া জ্যান্ত হয়ে এসে দশ হাত মেলিয়ে খাচ্ছে। খিদের পেট জ্বলে গেল রে বাবা, ভাত দিতে বলছি, বলে—ভাত নেই। দে তবে রক্ত দে, মাংস দে, হাড় দে, আমি সব খাব—সব খাব—"

বলতে বলতে বৃদ্ধা হাহাকার করে কাঁদে—"ওরে আমার সোনার দেশ রে—ওরে আমার আড়াই টাকা মণের চাল রে—আজ কোন্ শকুনের চোখের দৃষ্টিতে সব পুড়ে ছাই হয়ে গেল রে বাবা—"

মহিম আর সইতে পারে না।

বাহাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা মা—চলচ্ছক্তিবিহীনা মা তার ঘরে পড়ে দুটো ভাতের জন্যে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে।

সৌরভী শক্ত মুখে এসে দাঁড়ায়—"তুমি বল, আমি কাজ করতে যাই। দত্ত মশাইরা দু'জন লোকের খাওয়া দেবে—তোমার আর আমার, যাব?"

চালের মহাজন নন্দ দত্ত।

কম চাল সে কেনেনি। মাঠে ধান থাকতে সেবারেও সে মণের পর মণ চাল কিনে সরকারী গুদামে সাপ্লাই করেছে। তখন সে ছিল গরীব-গৃহস্থ। এই তিন-চার বৎসরের মধ্যে সে হয়েছে কয়েক লাখ টাকার মালিক। বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষ তাকে কোটিপতি করবে—এ ভরসা সে করে। এর মধ্যে চুপি-চুপি মা-চণ্ডীর কাছে মানতও করে রেখেছে পঞ্চাশ সাল আবার ফিরুক।

তার লক্ষ্য মহিমের মঙ্গল আর শুভের উপর। সেদিন কিছু টাকা নিয়েও সে এসেছিল এদের মূল্য হিসাবে, মহিম কঠোর হাসি হেসে বলেছিল—"দেখি দত্ত মশাই, ভেবে-চিন্তে দেখে জানাব।"

ক্রূর হাসি হেসে দত্ত বিদায় নিয়েছে।

সৌরভী চায় তাদেরই বাড়ী কাজ করতে—

জ্বলন্ত চোখে মহিম সৌরভীর পানে তাকায়—"কাজ করতে যাবে—কেন?"

সৌরভী রুক্ষ কণ্ঠেই বলে—"তোমার ঘরে শুকিয়ে মরতে পারব না। তুমি গরু রাখো আর ঘরে ওই বুড়িকে রাখ। ছেলে ভাত যোগাতে পারে না, দিন রাত আমি গালাগালি সইব কেন? হয় গরু আর মা বিদেয় কর নচেৎ—"

বাধা দিয়ে মহিম বলে, "না, ওদের আমি বিদেয় করব না, তুমি স্বচ্ছন্দে যেতে পারো।"

চলে গেল সৌরভী—

এক মন্বন্তরের আশ্বিন মাসে সে এসেছিল—সেটা ছিল তেরশো পঞ্চাশ সাল। গেল—তেরশো তিপ্পান্ন সালের চৈত্র মাসে।

শূন্য চোখে মহিম চেয়ে থাকে, শুভ মঙ্গলের গায়ে হাত বুলায়—"না, কাঁদিস নে তোরা, তোদের আমি ছাড়ব না। ওই দত্ত তোদের নিয়ে বিক্রী করবে মিলিটারী গোখাদকদের কাছে—যাবে যাবে করেও যারা আজও যায়নি। ভয় কি, আমি তোদের দেব না, জান কবুল—তোদের বাঁচাব।"

কোথা হতে দু'টো চাল এনে ভাত রেঁধে মাকে সে দেয়।

বৃদ্ধার ক্ষীণ চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, সে তাড়াতাড়ি খেতে আরম্ভ করে, পরিতৃপ্তিতে মহিমের অন্তর পূর্ণ হয়। নদীর ধারে শুভ ও মঙ্গলকে বেঁধে দেয়, তারা খুঁটে-খুঁটে ঘাস খায়, জল খায়।

অভুক্ত মহিমের মুখে হাসি জাগে।

৬

রাখতে আর পারা গেল না—

শুভ মঙ্গলকে দত্তের হাতে ছাড়তেই হল—অনেক অনুনয় করে মহিম বললে—"আপনার কাছে ওদের রাখুন দত্ত মশাই, আপনার বিচলি-খড় আছে, ওরা খেয়ে বেঁচে যাবে, কেবল সেই জন্যই আমি দিচ্ছি। আসছে বছর এ দিন থাকবে না, আমার শুভ মঙ্গলকে আবার আমি ফিরিয়ে আনব আমার ঘরে, একটা বছর না হয় আপনার বাড়ীতেই থাক।"

চতুর হাসি হাসে দত্ত—"তা তো বটেই, তা তো বটেই। তোমার ঘরে থাকাও যা, আমার ঘরে থাকাও তাই, তফাতের মধ্যে আমার বাড়ীতে খেতে পাবে, তোমার কাছে খেতে পাবে না। হ্যাঁ, রইলো আমার বাড়ী, তুমি এখন কিছু টাকা রেখে দাও, চাল কিনে বরং ভাত খাও গিয়ে।"

পঞ্চাশটা টাকা নিয়ে টিকিট-দেওয়া কাগজটায় নাম স্বাক্ষর করতে হল মহিমকে। সে এটা করতে চায়নি, কিন্তু পাকা লোক দত্ত, আইনের ফাঁক সে রাখবে না, বললে,—"সত্যি কিছু তোমার বলদ দু'টোর দাম পঞ্চাশ টাকা নয়, অতি কম করে ওর দাম সাতশো টাকার এক পয়সা কম নয়। আমি তোমার কাছ হতে কিনছি নে, তুমিও কিছু বিক্রি করছো না, তবু এটা দেওয়ার মানে—ধর, তুমি এক বছরের জন্যে বাঁধা রাখছো, এক বছর পরে এই টাকাটা দিয়ে সুস্থ সবল গরু দু'টিকে নেবে। তোমার কাছে থাকলে হয় না খেয়ে মরবে নচেৎ সত্যই তোমায় উপযুক্ত দাম নিয়ে বিক্রি করতে হবে। তার চেয়ে এই ভালো হল, তোমার গরু তোমারই রইলো।"

দত্তের প্রতি শ্রদ্ধায় মহিম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলো—ভক্তিভরে প্রণাম করে সে সেই টাকায় চাল কিনে নিয়ে ফিরলো। সৌরভীকে খবর দিলে সে চাল কিনেছে, সৌরভী চলে আসুক।

সৌরভী এলো না, বলে পাঠাল—সে বেশ আছে, আর সে এখন আসবে না। অবস্থা ফিরলে গরুর সঙ্গে সে ফিরবে।

জরু এবং গরু—দুই-ই রইলো দত্তের বাড়ী—মহিমের মুখে আবার হাসি আসে।

মা পরমানন্দে ভাত খায়, বলে—"উঃ, কি শাঁখচুন্নিই এসেছিল মহিম, তোকেও খেয়ে ফেলতো। আমার এগারোটা ছেলে-মেয়ের মধ্যে একলা আছিস তুই, তোকেও যদি টপ করে খেয়ে ফেলতো—" মা শিউরে ওঠে—"যাক, গেছে না আপদ গেছে।"

পাগলা মাষ্টার ঘুরে বেড়ায়—মহিমের বাড়ী আসে—"হ্যাঁ রা মহিম, পুষতে না পারলি ছেড়ে দিলি নে কেন? কেন ওই কশাইটার হাতে দিলি রে বাবা?"

মহিম হাঁপায়—"কি হয়েছে মাষ্টার—কি?"

পদ্মলোচন হেসে ওঠে—"শ্মশান-কালী শুধু নয়, মশান-কালীও জেগেছে রে বাবা—দত্ত তোর গরু দিলে কশাইদের বিক্রী করে, করকরে আটশো টাকা নিলে। গরু চলে গেছে কশাইখানায়—ঘ্যাচাঘ্যাচ, ঘ্যাচাঘ্যাচ, শব্দ শুনতে পাচ্ছিস্ নে? হাম্বা—হাম্বা—"

গরুর ডাক ডেকে পদ্মলোচন ছোটে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে বহু লোক পাগল হয়ে গেছে, মন্বন্তরের সুরুতে তিপ্পান্ন সালে পদ্মলোচন শুধু পাঁচ জনের জন্যে ভেবে পাগল হয়েছে।

মহিম গিয়ে পড়ল দত্তের কাছে রুদ্র মূর্ত্তিতে—"হিঁদু হয়ে গরু বিক্রি করলেন কশাইকে? আমার মঙ্গলকে আর শুভকে ফেরৎ দিন, আমি পঞ্চাশ টাকা এখনই দিচ্ছি।"

"পঞ্চাশ টাকা—"

দত্ত হেসেই অস্থির—"পঞ্চাশ তো নয়, পাঁচশো টাকায় বিক্রি করেছো গরু, আর বিক্রি যখন করেছো তার ওপর কোন অধিকার তোমার নেই। বিক্রি-কবালায় নাম সাইন করেছো মনে নেই, এই দেখ পাঁচশো টাকা, পাঁচের পেছনে দু'টো শূন্য—"

নির্ব্বাকে মহিম কোবালার পানে চেয়ে থাকে—

নির্ব্বাকে সে ফেরে—

তার শুভ ও মঙ্গল, তার জীবনাধিক—

তার চোখ ফেটে জল গড়িয়ে আসে।

সৌরভীর সঙ্গে সে দেখা করতে যায়। গরু গেল—সে কি করবে।

সালঙ্কারা সৌরভী—দু'বেলা ভালো-মন্দ খেতে পেয়ে—ভালো কাপড়-গহনা পেয়ে এই কয় দিনেই তার চেহারা ফিরে গেছে।

মহিম যা বলতে এসেছিল তা বলা হল না, নিঃশব্দে সে ঘরে ফিরলো।

সর্ব্বহারা রিক্ত মহিম—

এই মুহূর্ত্তে ঘর ছেড়ে সে বার হয়ে যেতো; আবার বেড়াত পথে পথে। তবে এবার তার অভিজ্ঞতা হয়ে গেছে—ঘর বাঁধার কল্পনা জীবনে আর সে করতো না।

কিন্তু যেতে সে পারলে না, ঘরে আছে স্থবিরা মা—তার শুভ মঙ্গল গেছে, দুদিনের সঙ্গিনী সৌরভী গেছে, আছে তার মা—যার আজ সে ছাড়া আর কেউ নেই। পঞ্চাশ টাকার মধ্যে কুড়ি টাকা আজও আছে, সে টাকা সে দত্তর সামনে ফেলে দিয়ে আসতে পারতো যদি মা না থাকতো।

এই কুড়ি টাকায় তবু কয়েকটা দিন মাকে বাঁচানো যাবে, তার শুভ মঙ্গলের বিক্রয়ের টাকা।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে স্থবিরা মা—

পায়ের শব্দে কাঁপতে কাঁপতে মাথা তোলে—"কে রে, মহিম এলি?"

"এলুম মা—"

মহিম মায়ের কাছে বসে, মায়ের গায়ে মাথায় হাত বুলায়।

মা নিশ্বাস ফেলে বলে—"দুর্ভিক্ষ তো মিটে গেছে, ভাত পাওয়া যাচ্ছে, এবার বউটাকে বাপের বাড়ী হতে নিয়ে আয়, আর কত দিন বাপের বাড়ী ফেলে রাখবি—তাতে লোকে যে তোকেই নিন্দে করবে। আর আমার শুভ মঙ্গলকে বাড়ী আন, আমার উঠোন শূন্য পড়ে কাঁদছে যে। আবার আমার ঘর যেমন ছিল তেমনি হোক, আমি যে আর একা থাকতে পারছি নে।"

উদ্গত অশ্রু সামলে মহিম বললে,—"এবার সকলকেই আনব মা। যে কয় দিন ওরা না আসে, আমি দিন-রাত তোমার কাছেই থাকব। ভয় কি, আমি তো আছি।"

পথে পাগল পদ্মলোচনের চীৎকার শোনা যায়—"ওরে—বোশেখ এলো, কাল বৈশাখী এলো—তেরশো চুয়ান্ন সাল,—তোরা পালা, পালা। শ্মশান-কালীর কাজ নয়, মশান-কালীরও কাজ নয়, খাঁড়া বেড়ে নিয়ে নিজে দাঁড়া। শোন্ শোন্, শব্দ শোন্—ঘ্যাচা-ঘ্যাচ ঘ্যাচা ঘ্যাচ—হাম্বা—হাম্বা—আ!

অনুনাদ

ভোরে উঠেই মীরা গজ্-গজ্ ক'রতে সুরু করেছে। শাশুড়ী রান্নাঘরের সংলগ্ন ঘরটায় শোন্। পুত্রবধূর গজ্-গজানি শুনে তিনিও শুয়ে শুয়ে সুরু করেছেন, অতো গজ্-গজ্ই যদি করবে বাপু তো রাঁধা কেন? অমন রান্না না রাঁধলেই হয়। খাবে তোমারই সোয়ামী। আমি কিছু তোমার পিত্যেশী নই। এখনও যাকে বলে—গতর রাখি।

মীরা উনুনে ফুঁ পাড়তে পাড়তে চোখের জলে ভেসে যাচ্ছে। উনুনমুখো উনুনটাও হয়েছে তেমনি, কয়লাও খাবে যেমন আর ধরাতেও টালবাহানা করবে তেমন। তা-ছাড়া ঘুঁটেই কি খায় কম—কম-সে কম খান চল্লিশেক। অর্থাৎ ছ'-পয়সার। চারখানা করে ঘুঁটে পয়সায়; আর কয়লা? কয়লার তো নাম নেই। কলকাতায় যেমন-তেমন, মফঃস্বলের শহরে তো কয়লা মেলেই না, মানে, কন্‌ট্রোলে মেলে না আর কি। কন্‌ট্রোলে যে জিনিষ মেলে না সে জিনিষ ব্ল্যাক- মার্কেট থেকেই কিনতে হয়। তিরিশ সেরও হবে না—আড়াই টাকা বস্তা। তবু তাই-ই কিনতে হয়, নইলে সকাল বেলায় আপিসের ভাত হওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এবারের কয়লাগুলো কি রকম খারাপ তা কহতব্য নয়। যেন পাথর। যতক্ষণ ঘুঁটেগুলোর মধ্যে দাহিকা-শক্তি থাকে ততক্ষণ কেবল ধোঁয়া বেরোয় উনুন থেকে। তার পর সেগুলো নিবে গেলে উনুনও নিবে যায়। ক'দিন এমনই হচ্ছে। বরাতের জোর হ'লে কিম্বা কয়লাগুলো বার তিন-চার ঘুঁটের আগুন খেলে তবে যদি ধরে যায়।

মনোরঞ্জন হাজরা

এদিকে আপিসের ভাত। বার তিন-চার আগুন দিয়ে কয়লা ধরানো যে কত সময়-সাপেক্ষ তা সহজেই অনুমেয়। ওদিকে স্বামী শিবকিঙ্কর ঘুম থেকে উঠে পড়বে, চা চাইবে। ছেলে-মেয়েগুলো চ্যাঁ-চ্যাঁ ক'রে খাবার জন্যে বায়না করবে আর ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে মীরা কোন্ দিকে যাবে তা ঠিক করতে পারবে না। তর্ক-বিতর্ক হবে স্বামীর সঙ্গে, ছেলে-মেয়েগুলো মরবে মার খেয়ে, শেষ পর্য্যন্ত হয়তো শিবকিঙ্কর না খেয়েই আপিস চ'লে যাবে রাগে গর-গর করতে করতে। শুধু সেইখানেই ইতি হবে না এই রন্ধন-পর্বের—ছেলে না খেয়ে আপিস গেছে ব'লে শাশুড়ী লাগবেন তার পর। এদিক-ওদিকের লোকজন ডেকে-ডুকে এনে তার গুণের কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলবেন—দুঃখে আর লজ্জায় মীরা যেন মরে থাকবে সারা দিন। তার চেয়ে পাথুরে কয়লার সঙ্গে চোখের জল দিয়ে যুদ্ধ করা মীরার পক্ষে অনেক গুণে ভালো। তাই সে প্রাণপণে ফুঁ পাড়ছিল উনুনে। কিন্তু উনুনের বেয়াদপি তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে দিচ্ছিলো সম্ভবতঃ। সেবারই কথা। অনবরত ধোঁয়া চোখে লাগলে আর বৃথা সময় অতিবাহিত হ'লে ধৈর্যের বাঁধ ভাঙবে না কার? সবারই ভাঙবে। সেই জন্যে আপন মনে সে গজ্-গজ্ কর'ছিল।

কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জীবনে সব চেয়ে বড় অভিশাপ, কোন দিনই সব প্রাণীগুলির সুর ঐক্যতানের সৃষ্টি করে না। প্রত্যেকের একটা নিজস্ব চলার ধারা আছে এবং তার জন্যে প্রতি মুহূর্তে তাদের সংঘর্ষ লাগবেই। পরিবারের প্রতি এদের মায়া-মমতা লোপ পেয়ে গেছে—শুধু লোক-লজ্জা আর ভবিষ্যতের অনাগত কোন দুর্গতি হতে উদ্ধার পাবার আকাঙ্ক্ষাতেই এরা কোন রকমে যূথবদ্ধ হ'য়ে থাকে। তা না হ'লে প্রতি মুহূর্তে এদের মধ্যে লেগে আছে ঝগড়া, খুঁটি-নাটি নিয়ে রেষারেষি। এই মুহূর্তে যে অত্যন্ত ভাল মানুষ, পর-মুহূর্তে সে-ও কারোকে দাঁতে কাটতে রেহাই দেয় না। অবশ্য কেন যে প্রতিদিন এবং প্রতিনিয়ত এমন হয়, সে কথাও এরা জানে কিন্তু যে বিষাক্ত আবেষ্টনীর কারাগারে এরা বন্দী, তা থেকে, বুঝলেও, এরা মুক্তির আনন্দ খুঁজে নিতে পারে না বা সে কৌশলও জানে না।

মীরার কষ্ট হচ্ছিলো। তার ওপর শাশুড়ীর গজ্-গজানি। সে বিরক্ত হ'ল কিন্তু কোন বাদ-প্রতিবাদ করল না, চুপ করেই নিজের কাজে মন দিতে লাগল। কেন না, এখুনি যদি সে কোন কথা বলে, তাহ'লে লেগে যাবে ঝগড়া—ব্যস্, ছেলে-মেয়েরা উঠে পড়বে, স্বামী উঠে পড়বে আর ভোর বেলাতেই চেঁচামেচির জন্যে সে-ই গাল খেয়ে মরবে। কিন্তু শাশুড়ী যেন থামবার নয়। তিনি বলে চলেছেন, রোজই তুমি ঠ্যাং বাড়িয়ে রাঁধতে যাবে। আমাকে হাঁড়ি কুঁড়ি দিয়ে তোমাদের যখন বিশ্যেস্ নেই—তা যাদের মন এমনি, তারা অতো গজ্-গজ্ই বা করে কেন?

মীরা ভেবেছিল কিছু বলবে না, কিন্তু শাশুড়ী ও-রকম করে এক-তরফা গজ্-গজ্ করার পর না ব'লেও সে পারা যায় না। তা'ছাড়া

সে শাশুড়ীকে এমন কিছু বলেনি যার জন্যে তিনি অমনি ক'রে বলবেন। বরং সে উনুন ধরছে না বলে প্রাণপণে চেষ্টা করছে এবং চোখের জলে ভেসে গিয়ে আপনার দুঃখ আপনিই হজম ক'রছে। তাতে শাশুড়ীর বলবার কি আছে? এদিকে তো একটি কুটো নেড়েও উপকার করার আগ্রহ দেখা যায় না। ছেলে-পুলের মা মীরা, রোজ ভোরে তার পক্ষে ওঠাও মুস্কিল। রাতে কোন্ ছেলেটা চেঁচালো, কোন্টার বা বুঁচকি লাগল, মীরার ঘুম সে জন্যে ভাঙবেই। কাজে-কাজেই ঘুম যে তার প্রয়োজন-মত হয় না সে কথা না বললেও চলবে। তবু তাকে প্রতিদিন এই কঠোর কর্ত্তব্য সমাপন করতে ভোর-ভোর উঠতেই হয়। কেন না, তারই স্বামী খেয়ে আপিস যাবে, আপিস গেলে তবে টাকা আসবে, তবে সকলের গ্রাসাচ্ছাদন হবে। সে জন্যে দায়িত্বটা একান্ত ভাবে তারই।

শাশুড়ীর গজ্-গজানির প্রত্যুত্তর দেবার ইচ্ছা হ'লেও মীরা কিন্তু অন্য রকম ভাবল। কিন্তু বললেই যে চেঁচামেচি হবে তা সুনিশ্চিত। তাই সে ভাবল বরং শোবার ঘরে গিয়ে স্বামীকে ডেকে সমস্ত কথাগুলো বলে। তাতে আর যাই হোক, অন্ততঃ মীরার কোন দোষ থাকবে না।

কিন্তু তা ক'রতে মীরার যেন কেমন মায়া হ'ল। লোকটা তখনও ঘুমুচ্ছে। ঘুমোক—ডেকে কাজ নেই। রোজই তো সন্ধ্যায় লোকটার জ্বর হ'চ্ছে। আপিস থেকে এসে বেচারী যেন কেমন ফুরিয়ে যায়। সারা দিন আপিসের খাটা-খাটুনি, তার ওপর এই বিশ-বাইশ মাইল রেলে ক'রে ডেলি-প্যাসেঞ্জারি করা—এ যে কি ভীষণ অভিশাপের জীবন তা স্বামীকে দেখে সে বুঝতে পেরেছে। এই তো যুদ্ধের ঠিক ক'মাস আগে তাদের বিয়ে হ'য়েছিল। তার পর এই তো ক'টা বছর! কি সুন্দর রাজপুত্তুরের মত চেহারা ছিল তার স্বামীর। বিয়ের পর বান্ধবীরা যখন তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কি রে, বর পছন্দ হয়েছে তো—সে তখন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বলেছিল, অমন বর পছন্দ হবে না কার? কিন্তু সেই টক্টকে রঙ আর পেশীবহুল রাজ-পুত্তুরের মত চেহারা লোকটার যে কোথায় গেল! অথচ কি ই বা এমন বয়স হয়েছে—ঐ বয়সের লোকেরা অনেকেই আজো বিয়ে করেনি! যুদ্ধের পর এই গোটা সাত-আট বছরে শুধু মাত্র তারা তিনটি পুত্র-কন্যা লাভ ক'রেছে, এই যা। কিন্তু সে ঝঞ্চাট মীরাকে যত পোহাতে হয় তত তো স্বামীকে নয়! আজকাল লোকটাকে দেখলে যেন তার ভয় করে। সেই পেশীবহুল চেহারা কোথায় উবে গেছে, পরিবর্তে ক'খানি হাড় আর কিছুটা মাংসপিণ্ড আজও কোন রকমে শরীরে লেগে আছে যেন। মাথার চুলগুলো অকারণে যেন কেমন পাতলা হয়ে গেছে, কপালটা অনাবশ্যক ভাবে সামনের দিকে বুঝি ঝুঁকে পড়েছে, চোখ দু'টো কোটর-প্রবিষ্ট, চোয়াল দু'টো অস্বাভাবিক ভাবে ঠেলে উঠেছে উঁচু দিকে, পুরোনো জামাগুলো লোকটার গায়ে অসম্ভব রকমের ঢিলে হয়।

লোকটা ঘুমুচ্ছে, ঘুমোক—ডেকে কাজ নেই। কিন্তু শাশুড়ীর কথাগুলো যেন ক্রমশঃই তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠছে। এদিকে উনুনের অবস্থাও তথৈব চ। কিছুতেই ধরছে না। এমনিতরো বিরক্ত-তিক্ত অবস্থায় যেন আর চুপ ক'রে থাকা যায় না। ঠিক যখন এই রকম অবস্থা মীরার মনের, সেই সময়ে শাশুড়ী উঠে বাইরে এলেন এবং ব'লে উঠলেন, আমি কারো গর্জানোর ধার ধারি না। আমরাও সংসার করিচি কিন্তু এমন মাথা ডিঙিয়ে গিন্নী হইনি!

মীরা একেবারে জলে উঠল এই কথা শুনে। অশ্রুসিক্ত চোখে বাইরে এসে বললে, সেই থেকে তো গজ্-গজ্ ক'রছেন কিন্তু হ'য়েছেটা কি শুনি?

কি আবার হবে, শাশুড়ী চিবিয়ে কথা বলার মত ক'রে বললেন, তুমি গিন্নী হ'য়েছ!

মীরা আর সেখানে দাঁড়ালো না। সোজা শোবার ঘরে গিয়ে শিবকিঙ্করকে ঠেলাঠেলি সুরু ক'রে দিলে। শিবকিঙ্কর চম্কে উঠল। ঘুমের ঘোরটা কাটিয়ে ব'লে উঠল, ব্যাপার কি?

—শুনতে পাওনি?

—কি?

—তোমার মায়ের গর্জন!

—সুরু ক'রেছে বুঝি?

তাখো না, মীরা প্রায় কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগল, কিছুতেই উনুন ধরছে না, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি, আমার দু'চোখ ভেসে যাচ্ছে জলে, নিজের মনেই আমি কয়লা-ঘুঁটের কথা বলছি, তোমার খাওয়া হবে না এই সব নিয়েই হা-হুতাশ ক'রছি—উনি মনে ক'রলেন, আমি বুঝি ওঁকেই ঠেস দিয়ে বলছি। সেই থেকে গজ্-গজ্ ক'রছেন—যদি রাঁধতে না পারবে তো রাঁধতে যাও কেন, তোমারই সোয়ামী খেয়ে যাবে, আমি কিছু তোমার পিত্যেশী নই, আমি এখনও গতর রাখি, হাঁড়ি-কুঁড়ি দিয়ে আমরা না কি বিশ্বাস করি না—এই সব বারো-সতেরো আর কি!

সম্ভবতঃ শাশুড়ী মীরার কথাগুলো শুনতে পেলেন। বাইরে থেকে ব'লে উঠলেন, লাগা লাগা সোয়ামীকে—ভাল—ক'রে লাগা। সকাল বেলায়ই বেশ জমে উঠুক। ভদ্দর লোকের ছিক্ষিত মেয়েকে বউ করেছিলুম কি না!

ঐ শুনতে পাচ্ছো, মীরা শাশুড়ীর কথার প্রতি শিবকিঙ্করের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রল।

হুঁ, ব'লে শিবকিঙ্কর কি যেন ভাবল। তার পর বললে, কোন রকমে চুপ ক'রে থাকো। কি বলব বলো না—বলতে গেলে এখুনি লেগে যাবে ঝগড়া।

সেই ভয়েই আমি কিছু বলিনি, মীরা বলতে লাগল, তা না হ'লে কি না বলছে? আমি না কি ডিঙিয়ে গিন্নী হয়েছি!

বলুক গে—'মরুক গে, শিবকিঙ্কর বললে, সহ্য ক'রে যাও—কোন রকমে সহ্য ক'রে যাও। সহ্য করার অনেক গুণ।

মীরাও সে কথা জানে। কিন্তু যখন একতরফা সে-ই শুধু কষ্ট ক'রে যাচ্ছে তখন মুখই বা সে বুজবে কেন? সে-ও কি আশা ক'রতে পারে না, সে নির্বিঘ্নে দিনযাত্রা অতিবাহিত ক'রে যাবে? শিবকিঙ্করের কথায় সে চুপ ক'রে গেল বটে, কিন্তু মনে কেমন যেন একটা নালিশ জমে রইল।

ওদিকে বরাত-জোরে উনুনটা ধরে এসেছিল। মীরা রান্নাঘরে এসে ভাত চাপিয়ে দিয়ে আবার শোবার ঘরে এল। ঘরে ঢুকে নিজে-নিজেই ব'লে উঠল, আজ ভাতে-ভাত ছাড়া বরাতে বোধ হয় আর তোমার কিছু নেই। অপর দিক থেকে কোন উত্তর না পেয়ে মীরা সবিস্ময়ে প্রশ্ন ক'রল, কি গো আবার ঘুমুলে না কি?

না, ভারী-গলায় শিবকিঙ্কর উত্তর দিলে।

মীরা স্বামীর বিছানার পাশে বসে পড়ে বললে, রোজই মনে করি

যাহোক্ একটু তরকারী-টরকারী ক'রে দোব, তা সে পোড়া কয়লার জন্যে আর হয়ে উঠ্‌ছে না। সেই ভাতে-ভাত আর কিছু-মিছু—

ঐ যথেষ্ট, শিবকিঙ্কর ভাল ক'রে লেপটা মুড়ি দিতে দিতে বললে, কয়লা নেই, ঘুঁটে নেই—এরও পরে সকাল বেলা আর কি হবে ?

আচ্ছা, এ কয়লা-টয়লার বিলি কি আর হবে না ? সহসা মীরা প্রশ্ন ক'রে বসল, এদিকে দেখি তো কন্‌ট্রোলে কয়লা নেই বলে কিন্তু গরুর গাড়ী ক'রে প্রত্যেক দিন তো পাড়ায় পাড়ায় বেচতে আসে ঠিক।

কিন্তু তা নিয়ে কেউ কিছুই বলে না, শিবকিঙ্কর বললে।

বলবে কে ? মীরা বলতে লাগল, বললে তো আর গাড়ী আসবে না। লোকে যাও বা কয়লা পাচ্ছিলো তাও পাবে না। তা ছাড়া এখানকার লোকেরা সবাই বলে, ব্লাক-মার্কেট আছে ব'লে তো আমরা বেঁচে আছি।

—সেটা বড় লোকেরা বাঁচতে পারে। কিন্তু আমাদের মত গরীবদের অতো দাম দিয়ে—

তা কে বলে, মীরা বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, ওগো তুমি জানো না। আজকাল প্রত্যেকটা লোক ব্লাক-মার্কেট করে। এই তো আমাদের পাশের বাড়ীর নরেন বাবু, বি-এন-আর থেকে দশ আনা সের তেল পান, পাড়ায় এনে আড়াই টাকা ক'রে বিক্রী করেন। তবে তেলটা খাঁটি—এইটুকুই যা !

ভাল কথা মনে পড়েছে, শিবকিঙ্কর উৎসাহিত হয়ে বললে, আচ্ছা নরেন বাবুরা আমাদের কিছু তেল বললে কেনা দামে দেয় না ? একটু ভাল তেল যে দরকার আমার। ডাক্তার বলছিলেন—

ডাক্তারের কথায় মীরা চমকে উঠল। শিবকিঙ্কর কেমন হয়ে যাচ্ছে বলে কিছু দিন আগে ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কথা উঠেছিল। তা গোড়ায় গোড়ায় সে রোজগার কম বলে যেতে চায়নি। সম্প্রতি বুঝি দিন কয়েক গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার কি বলেছে সে কথা শিবকিঙ্কর বাড়ী এসে বলেনি। তাই মীরা এক রকম উদ্‌গ্রীবতার সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলে, কি বলেছে গা ডাক্তার ?

শিবকিঙ্কর একটু হেসে বললে, ডাক্তার অনেক কথাই বলেছে। তবে ডাক্তারেরা যা বলে আমরা যেন সেই রকম ভাবে চলবারই মানুষ ! ওদের ফর্দ শুনলে আমার হাসি পায়।

কিন্তু ডক্তার কি বলেছে বলো না, তেমনি উদ্‌গ্রীব ভাবেই মীরা প্রশ্ন ক'রল।

ডাক্তার যা বলেছে সে কি তুমি পারবে ? শিবকিঙ্কর বললে, তার চেয়ে ও কথা ছেড়ে দাও—তুমি দেখো দিকি, নরেন বাবুর কাছে তেল পাওয়া যায় কি না ? ডাক্তার বলছিলেন, মালিশ করতে—

ওরা কেনা দামে বাপু দেবে না, মীরা কথান্তরে যাবার উদ্দেশ্যে বললে, তাছাড়া বাপু আমি ওদের কাছে চাইতে যেতেও পারব না।

শিবকিঙ্কর যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠল। বললে, হুঁ।

আর এত থাকতে তত থাকতে, মীরা বলতে, লাগল তুমি শুধু সর্ষের তেল মালিশ করতে যাবে কেন ? ডাক্তার তো আর তোমায় সর্ষের তেল মালিশ করতে বলেনি ?

থাক্, খুব হয়েছে, শিবকিঙ্কর তেমনি বিরক্ত ভাবে বললে, আমি তোমায় সর্ষের তেল দেখতে বললুম, তুমি বললে—পারবে না।

—আমি কি ঠিক ঐ কথাই বলিছি ?

—না তো কি ?

—আমি বলিছি, আমি ওদের কাছে চাইতে যেতে পারব না।

শিবকিঙ্কর খিঁচিয়ে উঠলেন, এর আবার চাইতে যাওয়া হ'ল কোন্‌খানটায় ? দাম দোব—নোব।

মীরা বললে, কিন্তু ওরা যে দামে বেচে সে দাম না দিলেই তো ওরা ভাববে আমরা সুবিধে নিতে গেছি !

—কিন্তু এর আর সুবিধে নেয়াটা কি ? না হয় ওদের লাভ হবে না !

—তাহলেই ওরা ভাববে আমরা সুবিধে নিতে চাইছি।

—থাক্ থাক্ বাপু, তোমায় তেল আন্‌তে হবে না।

কিছুক্ষণ চুপ-চাপ কেটে গেল। তেলের প্রসঙ্গ ছেড়ে মীরার মন ছুটে গেছে আরও অনেক দূরে। ডক্তোর নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের অসুখের কথা বলেছে কিন্তু পাছে সে ভাবে বলে তাই স্বামী তাকে বলেনি। নাই বলুক কিন্তু মীরা অনুমান করতে পারে সে কথা। সে-ও দরিদ্র ঘরের মেয়ে—পরিচয় আছে তার বহু কঠিন কঠিন রোগের সঙ্গে। তার মেজদা, তার ছোটদা আর বড়বৌদি মারা গেছে সর্বগ্রাসী ক্ষয়রোগে। সর্ষের তেল মালিশ করতে ডাক্তার বলেনি—যার চেহারা ঐ রকম হয়ে যাচ্ছে ডাক্তার তাকে সর্ষের তেল মালিশ করতে বলে না, বলে— কডলিভার মালিশ করতে আর খেতে। তার পথ্যের ফর্দ হয় ভয়ানক রকমের। নিশ্চয়ই সেই রকম একটা কথা ডাক্তার তাকে বলেছে।

শিবকিঙ্করের মনটা এতখানি বিরক্ত হয়েছিল যে সে গুম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু স্ত্রীর অবাধ্যতায় কেমন যেন এক অভিমানে ফেটে পড়ল। পরিবারটির মধ্যে একমাত্র সেই রোজগারী—তাছাড়া সে নিতান্তই একা। সে পড়লে এদেরও যেমন কেউ দেখবার নেই, তেমনি তাকেও দেখবার লোকের একান্ত অভাব। এ জন্য সময় সময় সে রীতিমত অসহায় বোধ করে। এই মুহূর্তে ঠিক তেমনি অসহায়তার স্রোতে পড়ে সে যেন কেমন মরিয়া হয়ে উঠল। স্ত্রীর প্রতি নির্মম হয়ে সে বললে, তুমি যখন চাইতে পারবে না, তখন, তাহলে আমাকে ধরে নিতে হবে যে—আমাকে মরতেই হবে।

সে কথা কে বলেছে, মীরাও অভিমান ভরে ফুঁসে উঠল।

তা নয়তো কি, শিবকিঙ্কর বললে, ধরো আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়িছি। ডাক্তার বলেছে একটা ওষুধ কিনতে হবে। সেটা নইলে আমার বাঁচবার পক্ষে মুস্কিল। তুমি তোমার সম্মান খোয়া যাবে ব'লে লোকের কাছে টাকা চাইতে যেতে পারলে না। তাহলে ?...

তেমন দিন যেন জীবনে কখনো না আসে, মীরা উঠে পড়ে বললে, যাক্ ও সব কথা। আমি আসছি—ভাতটা নাবিয়ে চা করে নিয়ে। দেখো ছেলেমেয়েগুলো যদি ওঠে—

হুঁ, বলে শিবকিঙ্কর চুপ ক'রে রইল।

কিছুক্ষণ পরেই মীরা চা করে নিয়ে এল। ইতিমধ্যে বড় খোকা ও খুকীটা উঠে পড়েছে। ছোটটা তখনও ঘুমুচ্ছিলো, শিবকিঙ্করকে চা দিয়ে মীরা বড় খোকাকে টেনে নিয়ে এসে জামা পেণ্টুল পরিয়ে দিয়ে বলল, পড়তে বসবে চলো—

বড় খোকা সবিস্ময়ে বললে, খাব না ?

—খাবে বৈ কি।

খুকীও খাবার বায়না ধরলে।

এসো দিচ্ছি, বলে মীরা তাকেও ইজের ফ্রক পরিয়ে দিলে।

তার পর দু'জনকেই খেতে দিয়ে মেঝেয় মাদুর বিছিয়ে তাদের পড়তে বসতে বললে।

ওদের প্রাত্যহিক পড়া-শোনা শিবকিঙ্করই দেখে। তাই মীরা বাইরে চলে গেল। এর পর তার আরও অনেক কাজ। স্বামীর স্নানের জল গরম করতে হবে, তরকারী রাঁধতে হবে, টিফিন তৈরী করতে হবে। শাশুড়ী আছেন বটে, কিন্তু তিনি এ-সবের কিছু একটা করতে পারেন না—তবে রাতের এঁটো বাসনগুলো তিনি সকালে মেজে দেন। অবিশ্যি এ একটা মস্ত-বড় কাজ মীরার পক্ষে।

তখনও সূর্য্যি ওঠে না। তারি মধ্যে স্নানাহার সেরে শিবশঙ্করকে আপিসে বেরিয়ে যেতে হয়। অনেকখানি সময় পথেই কাটে—রেলে চন্দননগর থেকে হাওড়া প্রায় বাইশ মাইল পথ, তার পর হাওড়া থেকে ক্লাইভ ষ্ট্রীট।

খাওয়া-দাওয়া সেরে শিবকিঙ্কর বেরিয়ে গেলে মীরা নিজের ও শাশুড়ীর মত চা তৈরী করে, তার পর শাশুড়ীকে দিয়ে নিজে একটু আরাম ক'রে ব'সে ব'সে চা খায়। এর মধ্যেই হয়তো ছোট খুকী উঠে পড়ে, তাকে নিয়ে এসে আদর করে।

সেদিন শিবকিঙ্কর আফিসে বেরিয়ে গেলে মীরার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। ছোট খুকীটা তখনও ঘুমুচ্ছে। এ সময় একটু চা খাবার লোভ হয় তার কিন্তু সেদিন কেমন যেন একটা ভারী বোঝা তার শরীর ও মনটাকে টেনে রেখে দিলে। শাশুড়ী এসে বার-দুই রান্নাঘরে উঁকি মেরে গেলেন, সে তাকিয়ে দেখলও কিন্তু তবু যেন তার চা করার চেতনা হ'ল না। কি যে সে করবে তা-ও যেন সে জানে না। চুপ-চাপ বসেই রইল।

শীতের সকাল। কনকনে বাতাস যেন কোন্ ফাঁক দিয়ে রান্নাঘরে ঢুকছে। জানালার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে গাছের ডগায় ডগায় রোদ লেগেছে। এ রোদে কোন আশা নেই, চাঁদের মতই এ রোদের নাগাল পাওয়া যায় না। মনটা আরও যেন কি এক বেদনায় আচ্ছন্ন হ'য়ে ওঠে।

ভোর বেলায়ই শাশুড়ীর গজ্‌গজানি, তার পর তেল তেল ক'রে স্বামীর সঙ্গে কত বড় একটা ব্যাপার হ'য়ে গেল। সে তেল চাইতে যেতে পারবে না বলেছিল কিন্তু তার উত্তরে স্বামী তাকে কি ভয়ঙ্কর কথাই না বললে! অভিমানে আর বেদনায় বুকখানা মীরার টন্‌-টন্ ক'রে উঠল। কোঁটা-কয় জলও গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

মীরা নিজেও দরিদ্র-ঘরের মেয়ে। ছেলেবেলায় মনে পড়ে কত দিন তাদের বাড়ীতে হাঁড়ি চড়েনি। কিন্তু তাই ব'লে তারা কোন দিন অপর বাড়ীতে চাইতে যেতে পারেনি। মুখ বুজে আর মনের দুঃখ মনে চেপে সবাই নীরবে সব কিছু সহ্য ক'রেছে। তবু সেদিন আজকালকার মত জিনিষ-পত্র দুর্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য ছিল না। সব কিছু পাওয়া সহজও ছিল এবং প্রাচুর্য্যও ছিল—তবু সেই সব দিনগুলিতেই তাদের এমনি অবস্থা গেছে। কাজেই কত দরিদ্র ছিল তারা! কিন্তু সেই দারিদ্র্যের মাঝখানে পড়ে তারা সেদিন মানসিক ঐশ্বর্য্যকে জলাঞ্জলি দেয়নি।

অথচ আজ? আজ সে কথা ভাবলে স্বপ্ন বলেই মনে হয়। আজ পয়সা দিয়ে লোকের কাছে তার চেয়েও অমর্য্যাদাকর অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। পয়সার আজ কোন মূল্য নেই—আজ যে কোন জিনিষের পাওয়ার মধ্যেই মানুষের মান, মর্য্যাদা, সম্ভ্রম। যে সে সব যোগাড় করতে পারে সেই মানী-গুণী লোক, সেই মর্য্যাদাসম্পন্ন, সম্ভ্রমমান। যারা কোন কিছু জিনিষ-পত্র যোগাড় করতে পারে না, তাদের কোন মান-মর্য্যাদাই নেই পাঁচ জনের কাছে। এ অবস্থায় যদি কারো কাছে পয়সা দিয়েই কোন-কিছু চাওয়া যায় তবে তা কেনার সামিল হয় না—ভিক্ষার মতই মনে হয়। তাই কারো কাছে কোন জিনিস কিনতে গেলে কেমন যেন বাধে। আর এই জন্যেই স্বামী নরেন বাবুর কাছ থেকে তেল আনবার কথা বলতে মীরা অক্ষমতা জ্ঞাপন ক'রেছিল। কিন্তু স্বামী সেদিক দিয়ে গেল না—না গিয়ে অমনিতরো ভয়ঙ্কর কথা বললে: সম্মান খোয়ার কথা।

দরিদ্র-জীবনের আগেকার দিনগুলির সঙ্গে মীরা কেমন যেন একটা তুলনামূলক সমালোচনা ক'রতে লাগল। আগেকার দিনে তাদের মত দরিদ্র অথচ ভদ্র গৃহস্থ কখনও লোকের কাছে কিছু চাইতে পারতো না। তাছাড়া, কোন কিছু যদি পয়সা দিয়ে চাইতো তাহ'লে তার জোরও ছিল যেন কত। আবার এমনও হ'ত, যার কাছে কোন জিনিস পয়সা দিয়ে চাওয়া হত, সে লোকটি পয়সাই হয়তো নিত না, পয়সা নিলে তার সম্মান হানি হ'তে পারতো। এই ছিল সেদিনকার মানুষের চেতনা। কিন্তু আজ মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজনে এমনই অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছে যে তাকে চাইতেই হয় আর যে কারোকে কিছু দেয় তাকেও পয়সা নিতে হয়। এ সব না হ'লে যেন আর চলে না। কিন্তু এমন হলই বা কেন? কিসে ভদ্র মধ্যবিত্ত গৃহস্থদের শক্ত বনিয়াদ এমন ক'রে শিথিল হ'য়ে গেল? কে তাদের এমন ক'রে সর্বনাশ ক'রল?

মীরার মনে চলতে লাগল এমনিতরো জিজ্ঞাসার পর জিজ্ঞাসা। এই জিজ্ঞাসার কিন্তু কোনো দরকার ছিল না। পিছন দিকে তাকালে মীরা দেখতে পেত—তের-শো পঞ্চাশ সাল ব'লে একটা বছর এসেছিল, বছরটা ছিল মন্বন্তরের বছর। তার স্মৃতিটা এত সর্বগ্রাসী যে, সব সময় তার জের টেনে চললেও অধিকাংশ সময়ই লোকে বছরটার কথা ভুলে যায়। সেই বছরটায় সেই যে 'নেই' 'নেই' সুরু হ'ল: চাল নেই, কাপড় নেই, কেরোসিন নেই, ওষুধ নেই, পত্র নেই—সেই দেশ-জোড়া নেই-নেই-এর মধ্যে পড়ে মানুষ যেন কেমন দুর্বল ও অসহায় হয়ে পড়ল। প্রথম প্রথম মুখ ফুটে কেউ কিছু বলতে পারতো না কিন্তু ভেতরে ভেতরে যেন সবাই ক্ষয়ে যেতে লাগল। ক্রমবর্দ্ধমান ক্ষয় রোগের মত সমস্ত মানুষগুলো কেমন রুগ্ন আর শুকনো হ'য়ে উঠল। সেই রুগ্ন আর শুকনো মানুষ হারিয়ে ফেলল মনের স্বাস্থ্য, হারিয়ে ফেলল তার উজ্জ্বল ঐতিহ্য আর তার অনুভূতি, সৌন্দর্য্যানুভূতি। কাঙাল হয়ে গেল সমস্ত মানুষ। তাই সর্বনাশ যদি ক'রে থাকে তবে সেই তের-শো পঞ্চাশ, আর যারা তাকে আবাহন ক'রে এনেছিল তারা।

কিন্তু এ কথা মীরা ভাবতে পারে না। ভাববে কি ক'রে—দেশের মনীষীরা বা বুদ্ধিজীবীরা যে কথা ভাবতে পারে না, মীরার মত সামান্য এক জন গৃহবধূ তা ভাববে কি ক'রে? তাই মানুষের শুধু কাঙাল রূপটাই তার চোখে পড়ে আর তারই জন্যে সে বেদনা অনুভব করে।

বসে বসে এ সব ভাবতে বেশ কিছুটা সময় কেটে গেল। শাশুড়ী ওদিকে চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। চায়ের সময় বয়ে গেছে অনেকক্ষণ, তাই বাইরে গজ্-গজ্ ক'রতে সুরু ক'রেছেন। হঠাৎ তাঁর চোখে

চোখ পড়লও একবার। শাশুড়ী মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বল্‌লেন, বেলাই হ'চ্ছে, বেলাই হ'চ্ছে, একটু চা আর হয় না।

ওদিকে ছোট খুকীও উঠে পড়েছে। মীরা উনুনে একটু জল চাপিয়ে দিয়ে ঘরে ছুটে গেল। তার পর খুকীকে আদর ক'রতে ক'রতে আবার রান্নাঘরে ছুটে এল। মেয়েটার মুখ-টুখ মুছিয়ে দিয়ে মীরা তাকে কোলে ফেলে চা করতে লাগল। চা ক'রে নিয়ে সে শাশুড়ীকে ডাকুলে, মা চা নিয়ে যান।

কোন উত্তর এল না। মীরা বুঝলে শাশুড়ী রাগ করেছেন। করুক গে রাগ। মীরা খুকীর জন্তে বার্লিটা উনুনে চাপিয়ে দিয়ে চা খেতে বস্‌ল। চা খেতে খেতে সে ভাবতে লাগল, যাবে না কি সে একবার নরেন বাবুদের ওখানে? যা' দর নেয় তেলের নেবে 'খন—সে যা হয় ক'রে ভাঁড়িয়ে শিবকিঙ্করকে বল্‌বে, কেনা দামেই পেয়েছে। হয়তো ভদ্রলোক এখনও আপিস বেরোননি। চায়ে চুমুকটা দিয়ে নিয়ে বার্লিটায় হাতা ডুবিয়ে নাড়তে নাড়তে সে দেখলে আর ডেলা পাকাবার সম্ভাবনা নেই। ফুটুক বার্লিটা—ততক্ষণে সে নরেন বাবুদের বাড়ী থেকে একবার ঘুরে আস্‌তে পারবে। যদি তেলটা পাওয়া যায়—তা তো ক'রে লোকটা বল্‌লে! শুধু বল্‌লে, তাকে প্রচণ্ড একটা আঘাতও দিয়ে গেল!

ছোট খুকীকে নিয়ে মীরা আরেক বার শাশুড়ীর উদ্দেশ্যে বল্‌লে, আপনার চা-টা যে জুড়িয়ে গেল! নিয়ে যান না। আমি একবার ওদের বাড়ী যাব।

তার পর যেমন রান্নাঘর তেমনি রেখেই সে বেরিয়ে পড়ল।

নরেন বাবু তখনও আপিসে যাননি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক, এখনও আপিসে পেন্সন হয়নি। ভদ্রলোকের অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে। বড় আর মেজ ছেলের বয়স হয়েছে। বড় ছেলে দীনেশ মিলিটারীতে চাকরী করছিল, সম্প্রতি বেকার হ'য়ে বিধবা মেয়ের মত বাড়ী ফিরে এসেছে। মেজ ছেলে নরেশ এখনও বুঝি মিলিটারীতেই আছে—রাওয়ালপিণ্ডিতে। উপযুক্ত এই ছেলে ছু'টি মিলিটারীতে যাওয়ার দরুণ এখনও বিয়ে-থা দেওয়া সম্ভব হয়নি। তাই বাড়ীতে কোন বউ-টউ নেই। নরেন বাবুর বৃদ্ধা স্ত্রীকে মেয়েদের সাহায্য নিয়ে এখনও রান্নাবান্না করতে হয়। বুড়ী শীতে না পারে নিজেকে ঠিক রাখতে আর না পারে রাঁধতে। তাই নরেন বাবুর প্রায় প্রতিদিনই সময় মত আপিস যাওয়া হ'য়ে ওঠে না।

আজও বেলা হয়ে গেছে রীতিমত, তবু রান্নার জন্য এখনও তিনি বেরুতে পারেননি। মীরা অবিশ্যি নরেন বাবুকে তেলের কথা বল্‌বে না। তাছাড়া নরেন বাবুর সঙ্গে সে কথাবার্ত্তাও কয় না। সে তেলের কথা বল্‌বে নরেন বাবুর স্ত্রীকেই।

নিজেদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে নরেন বাবুর বাড়ীতে আসার মধ্যে যতটুকু পথের ব্যবধান, সেই ব্যবধানটুকু নিমেষে পার হয়ে এসে নরেন বাবুদের বাড়ী ঢুকতেই মীরা ডান দিককার ঘরে একটা চেয়ারে দীনেশকে বসে থাকতে দেখল। আরও যেন কয়েকটা লোক রয়েছে ঘরে। আধার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে মীরা সোজা চলে গেল ভেতরে—রান্নাঘরের দিকে। সামনেই দীনেশের ছোট বোন শেফালিকে দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, হ্যাঁ রে শেফালি, কাকীমা কোথা রে?

রান্নাঘরে, শেফালি প্রশ্ন করলে, কেন বৌদি?

একটু দরকার আছে, বলে মীরা আরও এগিয়ে গেল। একেবারে রান্নাঘরের দরজার সামনে এসেই সে নরেন বাবুকে বসে খেতে দেখে, কয়েক পা পিছিয়ে এসে একেবারে শেফালির সঙ্গে ধাক্কা লেগে গেল। এ দেশে কোন বাড়ীর লোক খেতে বসলে বাইরের লোককে তার খাওয়ার সামনে যেতে নেই বলে একটা রীতি আছে। সেই রীতি অনুসারেই মীরা পিছিয়ে এসেছিল। কিন্তু শেফালির সঙ্গে ধাক্কা লাগতেই সে বলে উঠল, আহা-আ, লাগল রে খুব!

না, শেফালি মীরার অবস্থা বুঝতে পেরে বল্‌লে, মাকে ডেকে দোব?

—থাক্, আমি না হয় একটু বস্‌ছি।

ভিতর থেকে মা প্রশ্ন করলেন, কে রে শেফালি?

ও-বাড়ীর বৌদি, শেফালি রান্নাঘরের দরজার সুমুখে গিয়ে বল্‌লে, তোমায় ডাকছেন।

বুড়ী বাইরে এসে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কি গা বৌমা—এত সকালে?

আর বলেন কেন, মীরা বল্‌লে, এসেছি মা একটু দরকারে। আপনি কাকা বাবুকে খেতে দিয়ে আসুন না।

—তবু কি দরকারটা তুমি বলই না!

মীরা দেখলে, কথাটা ওঁরা এখনই শুনে কাজ মিটিয়ে দিতে চান। এর পর আপিস যাবার পালা। এ সময়ে বাইরের লোক বাড়ীতে বোধ হয় ওঁরা বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। তাছাড়া, সে-ও কথাটা নরেন বাবুকেই শোনাতে চায়। তাই সে বল্‌লে, আপনার ছেলে বলছিল, আমাদের কিছু তেল দেবেন?

—কি তেল?

—সর্ষের তেল।

—দাঁড়াও, জিগেস্ করি, বুড়ী রান্নাঘরের ভিতরে কর্ত্তার দিকে তাকিয়ে বল্‌লেন, কি গো, বৌমাকে কিছু তেল দিতে পারবে?

কর্ত্তা ঝোলমাখা ভাতগুলো মুখে পূরে দিয়ে বল্‌লেন, তা পারব না কেন!···জলের গ্লাসটা মুখে তুলে নিঃশেষ করে একটা ঢেকুর তুলে উঠতে উঠতে বল্‌লেন, দাম লাগবে যে অনেক!

গিন্নী জিজ্ঞাসা করলেন, কত?

—তা আড়াই টাকা তো বটেই।

সব কথাই মীরা শুনতে পেয়েছিল। লোকগুলোর চোখের চামড়া নেই একেবারে। দশ আনা কেনা জিনিসটাকে আড়াই টাকায় বেচতে এদের এতটুকু বাধে না! তবু যাই হোক মীরা বুড়ীর মুখের কথা শোনবার জন্তে অপেক্ষা করতে লাগল। বুড়ী বাইরের দিকে মুখ বাড়িয়ে বল্‌লেন, তেল পাওয়া যাবে বৌমা—কিন্তু দাম শুনলে পিলে চম্‌কে যায়!

মীরা কথাটা মানিয়ে নেবার জন্তে বল্‌লে, সে কথা আর আজ-কাল বলেন কেন? যাক, দামটা তবু কত?

—আড়াই টাকা।

মীরা মনে মনে হিসেব ক'রে নিলে চার গুণ। এক গুণ টাকা না হয় শিবকিঙ্কর তাকে দেবে কিন্তু বাকী তিন গুণ টাকা সে পাবে কোথায়? পর মুহূর্ত্তেই সে ঠিক করে নিলে, সে যা হয় ক'রে করবে 'খন—এখন তেলটা তো নেয়ার ব্যবস্থা করা যাক্। নিজের সম্মান বজায় রাখতেই সে শুধু এদের তেলের কথা বলতে সক্ষমতা জানিয়েছিল তা তো নয়—এই মানুষগুলোর পয়সা-লোলুপতার কাছে সে মাথা

নায়াতে চায়নি। এরা কেনা দামে দেবে না। বেশি দাম চাইবেই। কাজেই তা দিতে না পারলে, তার অসম্মান যত হোক্ না হোক—অসম্মান বেশি হবে তার স্বামীরই। এরা বলবে, 'অমুক লোক কেবল শস্তাই খোঁজে।' কিন্তু থাক্ সে ভাবনা। সে বললে, তাই দেবেন—

দামের কথায় মীরার ইতস্ততঃ দেখে বুড়ী বুঝতে পারলেন তার মনোভাবটা। তাই বুড়ী তার দিকে এগিয়ে এসে বললেন, কি বলব বল মা, আমাদেরই কি তেল বেশি পাওয়া যায় যে তোমাদের খানিকটা কেনা-দরে দোব। সব বাঁধা-বাঁধি নিয়ম। তবে উনি না কি আপিসের মধ্যে একটু মাতব্বগণ্যি, তাই একটু-আধটু চাইলেই পান। তবে সে আর ঐ দামে নয়—চার গুণ দামে। তবু মানুষের সুসার যে হচ্ছে, সেটুকু কিন্তু মানতেই হবে!

তা সে তো—মীরা কি বলবে কথা খুঁজে পায় না।

ইতিমধ্যে কর্তা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। সামনে শেফালিকে দেখতে পেয়ে ব'লে উঠলেন, কই বে, আঁচাবার জল কই?

নরেন বাবুকে বাইরে বেরুতে দেখে মীরা বুড়ীকে বললে, আচ্ছা, সেরখানেক তেল আপনি আমাকে দেবেন কাকী মা। আমি এখন চলি—খুকির বার্লি চাপিয়ে এসেছি!

—আচ্ছা, এসো।

মীরা এগুতে যাবে কি সামনেই দীনেশ। পাশ কাটিয়ে সে বেরিয়ে গেল। দীনেশ মাকে জিজ্ঞেস্ করলে, বউটি কে মা?

চিনিস্ না? মা বললেন, আমাদের পাশের বাড়ীর ভাড়াটে শিবকিঙ্করের বউ!

—ঐ রোগা লোকটার?

হ্যাঁ, মা ছেলের কথার ধরণে শিবকিঙ্করের প্রতি হঠাৎ মমতা-সম্পন্ন হয়ে উঠলেন। তার পর বললেন, ওরে ছেলেটা অমনি রোগাই ছিল না। ভারী সুন্দর চেহারা ছিল!

তা আমি তো আর দেখিনি, কি যেন একটা দরকারে দীনেশ এদিকে আসছিল, সেরে নিয়ে আবার নিজের ঘরে চলে গেল।

নরেন বাবুও অতঃপর আঁচিয়ে জুতো-জামা পরে আর হামান-দিস্তেয় থেঁতো-করা পান চিবোতে চিবোতে আপিসে বেরিয়ে গেলেন।

সারা দিন মীরার এক রকম আনন্দেই কাটল।

দুপুর বেলা নরেন বাবুর স্ত্রী এসেছিলেন, নিজেদের ঘরের তেল থেকেই তিনি সের-খানেক তেল দিয়ে গেছেন। দাম পরে দিলেও চলবে। কাজেই মীরার পক্ষে আনন্দিত হবারই কথা। সন্ধ্যা বেলা স্বামী আপিস থেকে ফিরে তেলের কথা শুনলে নিশ্চয়ই খুশি হবে।

বাস্তবিকই তাই। সন্ধ্যা বেলা শিবকিঙ্কর আপিস থেকে যখন ফিরল তখন যেন সে একেবারে ফুরিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। হাত-পা ধোবার জল দিয়ে মীরা তাড়াতাড়ি চা ক'রতে গেল। শিবকিঙ্করের হাত-পা ধোয়া হয়ে গেলে মীরা চা ও জলখাবার এনে তাকে খেতে দিলে। কিন্তু শিবকিঙ্কর বিছানায় দেহটা এলিয়ে দিয়ে বললে, খেতে যেন ইচ্ছে নেই—কেমন জ্বর-ভাব ক'রেছে।

চা ও জলখাবার মেঝেয় রেখে মীরা স্বামীর কপালে হাত বুলিয়ে দেখলে, সত্যিই গা-টা গরম হয়েছে।

স্ত্রী কপালে হাত বুলোতে শিবকিঙ্কর বেশ তৃপ্তি অনুভব ক'রে বললে, শুধু গা-ই গরম হয়নি, চোখ দু'টো এমন পিট্-পিট্ ক'রছে আর নিশ্বেসটা এমন আটকে আটকে আসছে।

মীরা সুযোগ বুঝে বললে, তেল মালিশ ক'রে দোব বুকটায়?

—তেল কোথায়?

—পেয়েছি।

নরেন বাবুদের কাছ থেকে?

হ্যাঁ।

দিলে যে বড়?

গিন্নীকে গিয়ে বললুম।

কেনা দামেই দিয়েছে তো?

মীরা অসঙ্কোচে বলে উঠল, হুঁ।

দাম কোথায় পেলে?

এখনও দিইনি। পরে দোব বলিছি।

শিবকিঙ্কর সকাল বেলা মীরাকে এ সম্বন্ধে কথা বলতে গিয়ে একটু কড়া-কড়া কথাই বলে গিয়েছিল,—এখন স্ত্রীর এই তেল যোগাড় করার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হ'য়ে সে তার প্রতি কেমন দরদী হ'য়ে উঠল। কিন্তু মনের সে ভাব চেপে রেখে সে স্ত্রীকে বললে, দাও খেয়ে নিই—তার পর তেল মালিশ ক'রব 'খন।

মেঝেয় ছেলে-মেয়েরা পড়তে বসেছিল। মাদুর পাতাই ছিল। শিবকিঙ্কর তক্তাপোষ থেকে নেমে চা ও জলখাবার খেতে বসল। ছোট খুকীটা বড় খোকার পাশে বসেছিল, খাবার দেখতে পেয়ে সে হামা দিয়ে শিবকিঙ্করের কাছে এল। শিবকিঙ্কর হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে কোলে নিয়ে বসালে। তার পর ডিস থেকে পরোটা ছিঁড়ে এক টুকরো মেয়ের মুখে দিয়ে নিজে খেতে সুরু ক'রল।

আহারাদির ব্যাপার মিটে গেলে রাতে শোবার সময় মীরা লণ্ঠনের মাথায় তেল-মাখা এ্যালুমিনিয়মের বাটিটায় সর্ষের তেল গরম করে শিবকিঙ্করের বুকে বেশ ক'রে মালিশ করে দিতে লাগল। শিবকিঙ্কর খুক্-খুক্ করে কয়েক বার কাসল। কাসিটা ভাল লাগল না মীরার। এ কাসি যেন সে চেনে। বড় বৌদি, মেজদা, ছোটদা যেন এমনি করেই কাসত। তার পর...মীরা মালিশ করতে করতে ভয়-জড়িত কণ্ঠে বললে, একটা কথা বলব?

শিবকিঙ্কর স্ত্রীর একটা হাত ধরে বললে, কি?

আমাদের সংসারে খুব কষ্ট, মীরা বললে, কিন্তু কষ্ট যতই হোক্, মানুষকে বাঁচতে হবে আগে। তার পর—

শিবকিঙ্কর স্ত্রীর ভূমিকাটা বুঝতে পেরে অল্প একটু হাসল।

মীরা বললে, তুমি পড়লে তো আমাদের আরও কষ্ট হবে। কাজেই যাও না একবার এক জন ভাল ডাক্তারের কাছে।

শিবকিঙ্কর আবার একটু হাসল। তার পর বললে, ডাক্তারের কাছে কি আমি যাইনি মনে করো, না, সে কথা আমি ভাবি না?

—গেছলে?

—হ্যাঁ।

—কি বললে ডাক্তার?

—বলেছে কডলিভার খেতে, ক্যালসিয়াম ইনজেকশন নিতে, আর যত তাড়াতাড়ি পারা যায় একটা এক্স্-রে করতে।

—কোন্ ডাক্তারের কাছে গিছলে?

—রথতলার সুরেন ডাক্তারের কাছে।

—কই, এ সব কথা তো বলনি এক দিনও, মীরা বিস্ফারিত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তাকালো এবং শুধু তাই নয় সঙ্গে সঙ্গে তার বুকটাও যেন কি একটা যন্ত্রণাকর ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠল।

শিবকিঙ্কর ম্লান ভাবে বল্‌লে, ব'লে লাভ কি ?

—আমরা ভাবব ব'লে তুমি বলবে না, মীরা কেঁদে উঠে বল্‌লে, তোমার এত বড় একটা অসুখ সেটা কিছু নয়, আমাদের ভাবনাটাই বড় ?

—না, তা নয়।

—তবে, মীরা এক রকম মরিয়া হ'য়ে ব'লে উঠল, ও-সব কোন কথা আমি শুন্‌তে চাই না। আমরা বাঁচি আর মরি সে তোমাকে দেখতে হবে না ! কাল তুমি আপিস কামাই করো, যাও ডাক্তারের কাছে, গিয়ে এক্স্‌-রে করে এসো।

শিবকিঙ্কর আগেকার মতই হাসল।

মীরা বিরক্ত ভরে বল্‌লে, তোমার গা-জ্বালানে হাসিগুলো রাখো।

—আরে, গা-জ্বালানে হাসি নয়, শিবকিঙ্কর শান্ত কণ্ঠে বল্‌লে, এক্স্‌-রে যে করবো তার টাকা কোথায় ?

—এক্স-রে ক'রতে কত লাগবে ?

—টাকা ষোল তো বটেই।

—কোথায় হয় ?

—শ্রীরামপুরে হয় শুনিচি।

—তা যাও শ্রীরামপুরে।

—টাকা ?

—আমি দোব।

—কোথায় পাবে ?

—সে আমি বুঝব।

শিবকিঙ্কর কি ভাবল কে জানে। স্থির-দৃষ্টিতে মীরার মুখের দিকে তাকিয়ে বুকের কোন্ গভীর তলদেশ থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লে। আর মীরা স্বামীর বুকে মাথা রেখে কাঁদতে লাগল।

কিন্তু কতক্ষণ ? স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়েছে। মীরা আস্তে আস্তে উঠল। আলোটা জ্বলছিল একই ভাবে। আলোটা নিয়ে ধীরে ধীরে সে ঘরের যেখানে বাক্স-তোরঙ্গগুলো ছিল, সেই দিকে গেল। খুব নিঃশব্দে, যাতে কেউ টের না পায়, এমন ভাবে একটা তোরঙ্গ খুললে। এক দিকে কলাই-করা একটা ডিসে ছিল গোটাকয়েক গিল্‌টি-করা চুড়ি—সেবারে মেলাতলা থেকে কিনে এনেছিল। একটি একটি ক'রে বার করল সেগুলো। তার পর তোরঙ্গটা বন্ধ করে নিজের দু'হাতে দু'গাছা ক'রে চার-গাছা সোনার চুড়ি ছিল, সেগুলো খুলে ফেল্‌লে আর গিল্‌টি করা চুড়িগুলো একটি একটি করে হাতে পরলে। রাত পোহালে সে যাবে'খন নরেন বাবুর স্ত্রীর কাছে। গিয়ে বলবে, কাকীমা গোটা পঁচিশেক টাকা দিতে হবে এগুলো রেখে। তা সোনার জিনিস রেখে টাকা নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে।

অনেক রাত হয়ে গেল মীরার ঘুমুতে।

তবু খুব সকালেই সে উঠে সব ব্যবস্থা ক'রে নিলে। শিবকিঙ্কর এক্স্‌-রে করতে শ্রীরামপুর চ'লে গেল।

সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্য্যন্ত শাশুড়ী সব ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলেন। নিশ্চয়ই ছেলের একটা কিছু হয়েছে। কিন্তু নিজে সেদিকে কোন ধরা-ছোঁয়া দেননি ব'লে ঠিক ঠিক ভাবে বুঝতে পারেননি। তবে অনুমানে বুঝে নিয়েছেন একটা কিছু হয়েছে।

শিবকিঙ্কর চলে যেতে মীরা রান্নাঘরে এসে চা করছিল আর ভাবছিল নরেন বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসার কথাটা। টাকা অবিশ্যি নরেন বাবুর স্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু বড় হুঁশিয়ার লোক ওঁরা। তাছাড়া ওঁদের ঐ বড় ছেলেটি দীনেশ—কেমন যেন এক রকম। কাল তেলের কথা বলতে যাবার সময় ছেলেটা পিছন পিছন গিয়েছিল—আজও যেন একেবারে মুখিয়ে বসেছিল। এমন চাউনি ছেলেটার!

ইতিমধ্যে শাশুড়ী রান্নাঘরে ঢুকে বললেন, হ্যাঁ গা, শিবু কোথায় গেল ?

—শ্রীরামপুরে ;

—শ্রীরামপুরে কেন ?

—বুকের ভেতরকার ছবি তোলাতে।

—কেন, বুকের ভেতর কিছু হয়েছে না কি ?

—ডাক্তার তো সেই রকম বলছে।

শাশুড়ী কাঁদ-কাঁদ হয়ে গেলেন। চোখ মুছতে মুছতে বলতে লাগলেন, তাই বলি আমার অমন সোনার চাঁদ ছেলে এমন কালি হয়ে যাচ্ছে কেন ? সেই একরত্তি বেলা থেকে সংসার পড়েছে ঘাড়ে।

মীরা চা ক'রে শাশুড়ীর দিকে এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে, নিন, চা'টা খেয়ে নিন।

—হ্যাঁ গা, তা কি মনে ক'রছ বল দিকি, চা'টা টেনে নিতে নিতে শাশুড়ী বললেন।

মীরা বল্‌লে, কি আর বুঝব। আমাদের ভাগ্য আর ভগবানের হাত—

—হ্যাঁ, শাশুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, তাই যা বলো—

শিবকিঙ্করের এক্স্‌-রে করিয়ে আস্‌তে বেলা দুপুর পার হ'য়ে গেল। চন্দননগর থেকে শ্রীরামপুর বেশি দূর নয়—রেলে মাইল দশেক পথ। এসেই খাওয়া-দাওয়া করবে ব'লে স্থির ছিল। সে ফিরতেই মীরা বল্‌লে, দেরী নয়—আগে খেয়ে নাও—

শিবকিঙ্কর বল্‌লে, আগে খাওয়া নয়—আগে আমায় শুতে দাও।

—আগে শোবে ?

—হ্যাঁ, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে !

—বলো কি, মীরা আর সেখানে দাঁড়ালো না। তাড়াতাড়ি শোবার ঘরে গিয়ে বিছানাটা ঠিক ক'রে দিলে। শিবকিঙ্কর শুয়ে পড়ল।

মীরা প্রশ্ন ক'রল, হঠাৎ এ সময়ে জ্বর এল কেন বল তো ?

—দিন তো ক্রমশঃ ঘনিয়ে আস্‌ছে গো, শিবকিঙ্কর মীরার হাতে হাত রাখল।

মীরা বাইরে শাশুড়ীকে দেখতে পেয়েছিল, চোখ টিপে তাই স্বামীকে বল্‌লে, মা আস্‌ছেন। শিবকিঙ্কর মীরার হাত দিলে।

মা ঘরে এসে বললেন, বুকের ছবি তুলে কি বল্‌লে ডাক্তারেরা ?

—সে আজ বলবে কি? দিন চার-পাঁচ পরে রিপোর্ট দেবে বলেছে—

—ভাখো কি বলে।

শিবকিঙ্কর কেমন এক রকম কণ্ঠস্বরে—সম্ভবতঃ মায়ের প্রতি অভিমানে ব'লে উঠল, বলবে আর কি—বলবে রোগী শেষ হ'য়ে এসেছে।

মা চুপ ক'রেই রইলেন।

শিবকিঙ্কর যেন নিজের কথার জের টেনেই ব'লে যেতে লাগল, ডাক্তারেরা কি রকম বকাবকি করলে। রোগের ইতিহাস নিতে নিতে আর কল বসিয়ে একজামিন ক'রতে ক'রতে ডাক্তাররা বললে, ক'রেছেন কি মশাই—এমনিতেই আপনার বুকের অবস্থা টের পাওয়া যাচ্ছে, তার পর এক্স্-রে ক'রলে তো আর কথাই নেই।

—ডাক্তাররা তো বলবেই সে কথা, মীরা বললে, অসুখ নিজের, তুমি অভিমান ক'রে তার ব্যবস্থা ক'রবে না—তা সে ক'রলে কি রোগ চুপ ক'রে বসে থাকবে?

—হু, শিবকিঙ্কর চুপ ক'রে গেল।

মা বললেন, জ্বরটা খুব বেশি এখন?

—না, সামান্যই, শিবকিঙ্কর উত্তর দিলে।

—ডাক্তারকে এক বার খবর দোব—রথতলার সুরেন ডাক্তারকে।

—না, সুরেন ডাক্তার জানেন। তাছাড়া, যাক্ না এখন ক'টা দিন—

মা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে থেকে তার পর ঘর হ'তে চলে গেলেন। মীরা শিবকিঙ্করের গায়ে লেপটা চাপিয়ে দিতে দিতে বললে, ভাত-টাত কিছু না খাও একটু গরম দুধ খাও—

—তা মন্দ নয়, শিবকিঙ্কর বললে,—দাও, খিদেও পেয়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই মীরা এক বাটি গরম দুধ এনে দিলে। শিবকিঙ্কর চুমুক দিয়ে খেয়ে নিয়ে বললে, তুমি তো এখনও খাওয়া-দাওয়া করোনি?

—শুধু আমি কেন, মা-ও খাননি।

—আচ্ছা খেয়ে এসো।

আহারাদি সেরে এলে শিবকিঙ্কর মীরাকে প্রশ্ন ক'রলে, এক্স্-রের টাকা যোগাড় ক'রলে কোত্থেকে?

—কেন?

—তাই জিগ্যেস্ ক'রছি।

যোগাড় আর ক'রব কোত্থেকে, মীরা বললে, সেই চুড়ি চার গাছা রেখে—

—কোন্ চুড়ি চার গাছা?

—মা যেগুলো দিয়েছিল—

—সেইগুলো খোয়ালে?

—উপায় কি, সহসা মীরা যেন একটা অত্যন্ত আবশ্যকীয় কথা বলতে ভুলে গেছে এমন ভাবে বললে, ঐ ভাখো, তোমায় বলব বলব ক'রে ভুলেই গেছি—

—কি, উৎসুক ভাবে শিবকিঙ্কর প্রশ্ন ক'রল।

—আচ্ছা, নরেন বাবুর বড় ছেলে, ঐ দীনেশ না কি নাম, ও কেমন লোক বল তো?

—কেন?

—কাল যখন তেলের কথা বলতে গেসলুম তখনও দীনেশ পেছন পেছন গেছলো। আর আজ যখন চুড়ি ক'গাছা রেখে গিন্নীর কাছ থেকে টাকা আনতে গেছলুম তখনও কেমন যেন পেছন পেছন ঘুর-ঘুর ক'রলে।

—তাই না কি?

—হ্যাঁ গো!

শিবকিঙ্কর কেমন উদাসীন ভাবে বলতে লাগল, শুনিচি তো দীনেশ মিলিটারী সার্ভিস নিয়ে বাইরে গিয়েছিল, এখন যুদ্ধ থেমে গেছে তাই বোধ হয় চাকরীটাও আর নেই। কেমন লোক তা তো ঠিক জানি না!

মীরা সন্দেহ প্রকাশ ক'রে বললে, আমার মনে হয় ছোঁড়ার স্বভাব-চরিত্র ভাল নয়।

তা' হতেও পারে, শিবকিঙ্কর বলতে লাগল, কিন্তু তুমি হঠাৎ এ কথা তুললে কেন? তুমি কি আমায় চুড়ি ক'-গাছার কথা ভুলিয়ে দিতে চাও?

স্বামীর কাছে তার মনের চেহারা ধরা পড়বারই কথা। সে কি লুকোতে পারে সে কথা? তবু সে বললে, ও মা, আমি চুড়ির কথা তোমাকে ভোলাতে যাব কেন—আমার চুড়ি, আমি তোমার কাজে লাগাতে পেরেছি তাতে তুমি আমাকে সমর্থন করবে বলেই তো জানি। সে কথা আমার লুকোবার দরকার কি?

হুঁ-হুঁ, শিবকিঙ্কর হাসল।

*　　*　　*　　*

রোগ কখনো চুপ করে থাকে না।

স্বামী ও স্ত্রীর লুকোচুরির মধ্যে দিয়ে রোগ ক্রমশঃই বেড়ে যেতে লাগল। প্রতিদিন তিল তিল ক'রে শিবকিঙ্করের অবস্থা খারাপ হ'য়ে আসছে।

আজকাল প্রতি ঘণ্টায় টেম্পারেচার দেখতে হয়, চার্ট রাখতে হয়। রথতলার সুরেন ডাক্তার আসেন, ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দেন, আরও অনেক ওষুধ-পত্র দিয়ে যান খেতে। এম-বি ছ'-শো তিরানব্বইও চলছে। পাঁজরার দিকে কোথায় যেন প্যাচ আছে।

কিছু দিন আগেই এক্স্-রে রিপোর্ট এসে গিয়েছিল। মনে পড়ে সে দিনটা। ফিল্মটা নিয়ে ডাক্তার জানালার ধারে এগিয়ে গেলেন। আলোর দিকে উঁচু ক'রে ধরে বলে উঠলেন, ইঃস্! তার পর ঘরের বাইরে চলে এলেন। ইসারায় মীরাকে ডাকলেন ডাক্তার বাবু। মীরা কাছে এগিয়ে গেল। এক্স্-রে ফিল্মটা আকাশের দিকে উঁচু করে নিজের ফাউন্টেন পেন দিয়ে দেখাতে লাগলেন, এই যে সব শাদা শাদা মেঘের মত দেখতে—এইগুলো সব মেঘ, মেঘ। হঠাৎ ডাক্তারের চোখ দু'টো কেমন কঠিন হয়ে উঠল। তার পর বললেন, এক দিন—এক দিন, এই মেঘে মেঘে হবে ঠোকাঠুকি। বর্ষণ সুরু হবে—তার পর বয়ে যাবে অশ্রুর দরিয়া। আমি তোমাকে মা মিথ্যা স্তোক দিতে পারি না—তোমার স্বামীকে বাঁচানো অসম্ভব। হয়তো সাত দিন পেরুবে না। তবু আমি বলছি, আমি চেষ্টার কোন ত্রুটি করব না।

মীরা দেখেছিল ডাক্তারের চোখে জল। রুমাল দিয়ে লোকটা চোখ মুছল। কিন্তু মীরা সেইখানে দাঁড়িয়েছিল কেমন যেন কাঠ হয়ে। তার চোখে সে দিন জলও আসেনি, বা সে কোন দুর্বলতাও প্রকাশ করেনি।

সেই সাত দিন কেটে গেছে।

আজ যেন চরম অবস্থা শিবকিঙ্করের। ডাক্তার বলেছেন, আজকের তিথিটাও খারাপ—শিবচতুর্দ্দশী। অমাবস্যা পড়তে না পড়তে রোগীর পক্ষে টিঁকে থাকা কঠিন। তবু গ্যাস দিয়ে, অক্সিজেন গ্যাস্ দিয়ে একবার দেখতে হবে। যদি অমাবস্যাটা পার হওয়া যায়—

গ্যাস্ দেওয়া হবে। কিন্তু টাকা কোথায়? এক একবার গ্যাস দিতে অনেক খরচ। কোথায় পাবে মীরা অতো টাকা। ইতিমধ্যে আপিসের এক মাসের মাইনেটা তার হাতে এসেছিল। কিন্তু সে ক'টা টাকা? শুধু তাই নয়, তার ওপরে সেই চুড়ি চার গাছা নরেন বাবুর স্ত্রীকে বলে-কয়ে নিয়ে একশো টাকায় বিক্রী করে পঁচিশ টাকা ওঁদের দেনা মিটিয়ে দিয়েছে মীরা, তার পর বাকী পঁচাত্তর টাকা স্বামীর ওষুধ-পথ্যে আর ডাক্তারের ভিজিটে খরচা ক'রেছে। হাতে আর একটিও পয়সা নেই।

সন্ধ্যা বেলা ডাক্তার বলে গেছেন, রাত্রে গ্যাস দিতেই হবে। গ্যাসের ব্যবস্থা তিনি ক'রে আনবেন—মীরা যেন টাকার ব্যবস্থা করে রাখে।

টাকার যে ব্যবস্থা করতে হবে মীরা তা জানতই। সে জন্যে বিকালে একবার সে নরেন বাবুর স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল, কিন্তু তিনি টাকা দিতে অক্ষমতা জানিয়েছেন। এখনও মাস-কাবার হয়নি, কাজেই তাঁর কাছে টাকা থাকবে কি ক'রে? হাজার হোক্ কেরাণীর সংসার তো! মীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সে সব শুনেছে। কিন্তু আর কোন কোথা বলতে পারেনি। তা না হলে মীরা কি এ কথা জানে না, নরেন বাবুর স্ত্রীর হাতে যথেষ্ট পয়সা আছে? কর্তা অনেক রোজগার করেন, তা'ছাড়া এক ছেলে এখনও বিদেশে চাকরী করছে। এ সব বাদেও উপরি উপায়ই কি ওঁদের কম? আপিস থেকে তেল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, সাবান, সব বস্তা বস্তা নিয়ে আসে আর পাড়ায় তা চার-পাঁচ গুণ দামে বিক্রী করেন—কাজেই ওঁদের হাতে যে পয়সা নেই, এ কথা শুনলেই কি বিশ্বাস ক'রতে হবে? আসল কথা, ওঁরা দেবেন না। তাই তখন সে চলে এসেছিল।

মীরা মনে মনে ভাবল, চলে আসাটা তখন অন্যায় হয়েছিল তার পক্ষে। এক দিন স্বামী তাকে অভিমান ভরে বলেছিল, ধরো আমি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি। ডাক্তার বলেছে একটা ওষুধ কিনতে হবে। সেটা না'হলে আমার বাঁচার পক্ষে মুস্কিল। তুমি তোমার সম্মান খোয়া যাবে ব'লে লোকের কাছে টাকা চাইতে যেতে পারলে না। তা' হলে?···সেই কথা মীরার মনে পড়ল। তাই নরেন বাবুর স্ত্রীর কাছ থেকে ঐ কথা শুনে তার চলে আসা উচিত হয়নি। যদি সে তেমন জোর ক'রে ধরত বুড়ীকে? হয়তো তার খানিকটা সম্মানহানি হোত কিন্তু টাকা তো পাওয়া যেত। যে টাকায় তার স্বামীর জীবন রক্ষা পেতে পারে সেই টাকা তো আসতো!

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রির অন্ধকার নেমে আসছে সারা পৃথিবী জুড়ে। আকাশের দিকে দিকে ফুটে উঠছে অসংখ্য নক্ষত্র। প্রেত-পুরীর হাহাকারের মত যেন আকাশ ও মর্ত্তলোক ঘিরে বাতাস বয়ে যাচ্ছে। ঘরের স্তিমিত আলোকের মাঝে বিছানায় স্বামীর রোগ-শীর্ণ পাণ্ডুর মুখখানা প্রদীপের শেষ-রশ্মির মত যেন ক্রমশঃ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। মা বসে আছেন পাশে। পড়ন্ত, গাছের ফুটন্ত পাতার মত ছেলে-মেয়েগুলো বসে আছে মেঝেয়। মীরা কি করবে? আর একটু পরেই ডাক্তার বাবু এসে পড়বেন গ্যাস নিয়ে। টাকা যে তার চাই-ই চাই। কিন্তু কোথায় সে যাবে? না, আরেক বার তার নরেন বাবুর স্ত্রীর কাছে ঘুরে আসা উচিত। যেমন ক'রে হোক্ অন্ততঃ তাঁর পা-দু'টো জড়িয়ে ধরেও চাইবে সে তাঁর কাছে টাকা। স্বামী না বাঁচলে তো তার চরম অসম্মানের দিন ঘনিয়ে আসবে। কাজেই কিছুটা সম্মানহানি হয়েও যদি তার স্বামী বাঁচে, তবে সেই তাকে আবার সম্মানের সুউচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করে দেবে। তা'ছাড়া আরও একটা কথা তার মনের মাঝে উঁকি দিলে। ও-বাড়ীতে মীরা গেলেই দীনেশ কেমন যেন তার পিছু নেয়। কিন্তু···তাতে কি হয়েছে, সে তো আর তাকে অসম্মান করেনি। এমনও তো হতে পারে, সে হয়তো ওদের বাড়ীর মত নয়, সে তাকে সাহায্যই করতে চায়। থাক্ গে দীনেশের প্রসঙ্গ।

মীরা আর দেরী করল না! শাশুড়ীকে বসিয়ে রেখে সে টাকার জন্যে নরেন বাবুদের বাড়ীতে ঢুকল। বাড়ী ঢুকেই দেখে দীনেশ তার ঘরে বসে-বসে একা কি যেন পড়ছে। মীরা ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। কিন্তু কারোকেই সে দেখতে পেলে না। আরও ভেতরে রান্নাঘরের দিকে গেল। সেখানেও কেউ নেই। সে বুঝতে পারছে বাড়ীটায় কেউ নেই, কিন্তু তার সমস্ত চেতনা দিয়ে সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাই সে ডাকল, শেফালি—শেফালি?

কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই। মীরা চারি দিকটা একবার ঘুরে এসে ভাবল, সে যেন একটা ফাঁদের মধ্যে পড়ে গেছে! বাড়ীটায় কেউ নেই, শুধু সদর দরজার কাছে ঘরখানায় দীনেশই যা আছে। মীরা মনে মনে ভাবল, সে এখান থেকে বেরুতে গেলে নিশ্চয়ই দীনেশ তার পথরোধ ক'রে দাঁড়াবে। সবাই বাড়ী থাকলেই সে তার পিছু নেয়—আর আজ বাড়ীতে কেউ যখন নেই তখন··· তখন?

মীরার চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা হ'ল। কিন্তু তার কাঁদবার সময় কোথায়? আর একটু পরেই ডাক্তার বাবু গ্যাস নিয়ে আসবেন—মীরাকে টাকা যোগাড় করে রাখতে হবে।

দীনেশ মীরাকে বাড়ী ঢুকতে দেখেছিল। কিন্তু অন্য দিনের মত আজ সে পিছু নেয়নি। চুপ ক'রে বসেছিল নিজের জায়গায়। তার ভাবখানা এই—ও যাবে কোথায়, ঘুরে আসতেই হবে এবং তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। বাড়ীতে কেউ নেই, শিবচতুর্দ্দশী উপলক্ষে সবাই সারা রাত্রিব্যাপী সিনেমা দেখতে গেছে। তা'ছাড়া সে এই সব ভদ্র অথচ দুঃস্থ ঘরের মেয়েদের দেখেছে—এদের মনস্তত্ব সে জানে। মিডল ইষ্টে, বোম্বাইয়ে, আসামে আর চট্টগ্রামে সে দেখেছে, সামান্য এক জনের রেশন দিয়ে এদের কাছ থেকে কত কি আদায় করা যায়। সৈন্যদলে চাকরী করেছে সে, নিজের জীবনে এ রকম ঘটনা তার অনেক আছে, বন্ধু-বান্ধবের কাছেও কম শোনেনি। তাই সে চুপ-চাপ প্রতীক্ষা করতে লাগল মীরার।

মীরা কি করবে তা যেন ভয়ে ভয়ে সে স্থির করতে লাগল। এক-পা এক-পা ক'রে সে বাইরের দিকে আসতে লাগল, এবং

প্রতি মুহূর্ত্তেই তার আশঙ্কা হতে লাগল, এই বুঝি কোন থাম বা দরজার আড়াল থেকে দীনেশ তার ওপর লাফ দিয়ে পড়ল।

কিন্তু আশ্চর্য! দীনেশের ঘরের কাছাকাছি এসে সে দেখল দীনেশ তেমনি ভাবেই আলোর নিচে বসে কি যেন পড়ছে। যে এতখানি সুযোগ পেয়ে তার পিছু নেয়নি, সে লোকটা আর যাই হোক্, খারাপ নিশ্চয়ই নয়। তবু মীরা ভাবল, হয়তো লোকটা তাকে দেখতে পায়নি। কিন্তু দীনেশ দেখতে পায়নি, এমন কথা তো হতেই পারে না। এমন একটা দিনও যায়নি যে দিন না দীনেশ তাকে দেখে ফেলেছে এবং প্রতিটি দিনেই মীরার বিশ্বাস হয়েছে, এ লোকের নজর থেকে কোন কিছুই ফস্কায় না।

কিন্তু সেই পর্য্যন্তই। দীনেশের ঘরের কাছে আসতেই দীনেশ বলে উঠল, কে?

সর্ব্বনাশ! মীরা তখনও দীনেশের ঘরের দরজা পার হয়নি যে চট্ করে সদর দরজা পার হয়ে বাড়ী চলে যাবে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল। দীনেশ আবার বললে, কে—মীরা বৌ…দি…?

এমন নাম ধরে বৌদি বলার কায়দা তো ছেলেদের মুখ থেকে সে কখনো শোনেনি। কিন্তু সে যাই হোক, লোকটা সম্ভবতঃ সুবিধাবাদী নয়। তা নাহলে এই ফাঁকা বাড়ীতে এতক্ষণ সে নিশ্চয়ই একটা যা হোক অপমানকর কিছু করে বসত। মীরা সাহস করে এখন কথা বললে নিশ্চয়ই তার পক্ষে ভাল হতে পারে। তাছাড়া, তার মনে হল এমনও তো হতে পারে যে সে বাড়ীর মত নয়—সে হয়তো তার ভাল করতেই চায়। তাই সে সাহস সঞ্চয় করে বললে, কাকীমা এঁরা সব কোথায় গেছেন?

—আপনি কোথায়?

—এই যে এখানে। বলুন না ওঁরা কোথায় গেছেন?

—ওঁরা সব গেছেন হোল-নাইট সিনেমায়।

হতাশ হয়ে মীরা বললে, ও!

দীনেশ দেখলে এই সুযোগ। সে বললে, কেন আপনার কি কোন দরকার ছিল?

—হ্যাঁ, দরকার একটু ছিল বৈ কি।

—তা আপনি পরের মত বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন কেন—ভেতরে আসুন না।

দীনেশ কথাগুলো বলতেই মীরার যেন কেমন মনে হল। তা সে ঘরে না যাক্, দরজার সামনে যেতে দোষ কি? দরজার সামনে গিয়ে মীরা দাঁড়ালো। দীনেশ তার দিকে তাকিয়ে বললে, কি দরকার ছিল আমাকে বলতে পারেন না? তাছাড়া আমি কি করতে পারি না?

দীনেশের কথার মধ্যে কেমন যেন একটা আশার আলো। মীরা বললে, আমি কাকীমার কাছে এসেছিলুম কিছু টাকার জন্যে!

—কত টাকা?

—গোটা কুড়ি।

—হঠাৎ?

—ওঁর বড় অসুখ। গ্যাস্ দিতে হবে—

—তাই না কি?

—হ্যাঁ।

দীনেশ বললে, আসুন—আসুন আপনি ভেতরে আসুন। আমি দোব আপনাকে টাকা—

মীরা আশ্বস্ত হয়ে ঘরে ঢুকল।

বেশ ঘরটি দীনেশের। বেশ সাজানো-গোজানো। দীনেশ যেখানটায় বসে, সেইখানটায় দেয়ালে খান-দুই ছবি—একখানি পণ্ডিত জওহরলালের। ঠিক এরই নিচে একটা ড্রয়ারওয়ালা টেবিলের সুমুখে চেয়ারে দীনেশ বসে। পাশে দেয়ালের গা ঘেঁসে অনেকগুলো র‍্যাকে অনেক সব বই। ঘরের একেবারে দক্ষিণ দিক্‌টায় দীনেশের শোবার খাট।

দীনেশ বললে, এগিয়ে আসুন—এগিয়ে আসুন। মীরা খানিকটা এগিয়ে এল। দীনেশ ড্রয়ারটা টেনে দু'খানা দশ টাকার নোট বের করে টেবিলে রাখল। তার পর চেয়ার থেকে উঠে পড়ে নোট দু'খানা নিয়ে সোজা মীরার দিকে এগিয়ে এল। তার পর মীরার ডানহাতখানা নিজের বাঁ হাত দিয়ে ধরল আর নোটগুলো সেই হাতে দিয়ে বললে, এই নাও টাকা।

মীরা কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সেখান থেকে নড়বার সামর্থ যেন তার নেই। দীনেশের চোখে কেমন যেন এক দৃষ্টি! এ দৃষ্টিকে সে চেনে, চেনে অনেক দিন ধরে চেনে!

সহসা মহাত্মা গান্ধী আর পণ্ডিত জওহরলালের ছবি দু'টির ওপর মীরার দৃষ্টি পড়ল। সে যেন বলতে চায় কি?

কিন্তু আর নয়। চোখের সুমুখে মীরার যেন নেমে আসছে পাতালের অন্ধকার। কই, পথ কই—আর একটু বাদে ডাক্তার বাবু আসবেন। নিয়ে আসবেন গ্যাস। তা না হলে…চোখের সামনে মীরার ভেসে উঠল, ডাক্তার বাবু আকাশের দিকে উঁচু করে ধরেছেন এক্স্‌-রে ফিল্মটা, নিজের ফাউন্টেন পেন দিয়ে দেখাচ্ছেন: এই যে সব শাদা শাদা মেঘের মত দেখতে—এইগুলো সব মেঘ, সব মেঘ। হঠাৎ ডাক্তারের চোখ দু'টো কেমন কঠিন হয়ে উঠল। তার পর বললেন, এক দিন—এক দিন, এই মেঘে মেঘে হবে ঠোকাঠুকি। বর্ষণ সুরু হবে তার পর বয়ে যাবে অশ্রুর দরিয়া!

গোপাল ভাঁড়

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী

একটা নূতন কিছু না বলিলে পাণ্ডিত্যের বিকাশ হয় না, একটা নূতন কিছু না করিলে আসর জমান চলে না একেবারেই, সম্ভবতঃ কোনো কোনো "বিদ্যামহাসাগর" এই ভাবের ভাবী হইয়া গোপাল ভাঁড়কে ব্রাহ্মণত্ব দান করিয়াছেন। গোপাল এ অধিকারে অধিকারী হইলে আপত্তির কারণ থাকিত না কাহারই: কারণ, ক্ষুরধারা বুদ্ধিসম্পন্ন প্রিয়দর্শন গোপাল জীবিত-কালেও ছিলেন জনপ্রিয়, আর লোকান্তরিত হইয়াও তিনি হইয়া আছেন লোকপ্রিয়। গল্পের ভিতর দিয়া তাঁহার প্রতিভা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা অসাধারণ। তাহাই কি বিদ্যামহার্ণবের গোপাল সম্বন্ধে ব্রাহ্মণত্বের দাবী, অথবা অন্য কোনো অভিসন্ধি আছে এ দাবীর পশ্চাতে?

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা ইন্‌স্পেক্‌টার অব কলেজেস্, ভীমকান্ত স্নেহাস্পদ বন্ধু শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষের বিশ্বাস ও ধারণা—ঐ গোপাল ভাঁড় মানুষটি এবং তাঁহার সম্বন্ধে গল্প-গুজব নিছক traditional. ঘোষজ অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার ব্যুৎপত্তি অল্প নহে। কিন্তু গোপাল সম্বন্ধে তাঁহার যে অভিমত, তাহা ভীমেরই মত। সেখানে আর compromise নাই। সতীশচন্দ্রের হাসির মধ্যে থাকে অনেক দুষ্টামী। খাঁটি মানুষের দুষ্টামী, নষ্টামী নয়। এই অজুহাতে ভীমাকৃতিতে প্রিয়দর্শন ঘোষ সতীশ রোষ-পাত্র নহেন গোপালকে traditionএর অন্তর্গত করিয়াও।

গোপাল ব্রাহ্মণও নহেন আর traditionএর এলাকাভুক্তও নহেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঐতিহাসিকতা লোপ করিবার উপায় থাকিলে গোপালকে উড়াইয়া দেওয়ার অসুবিধা হইত না। গোপালের বংশ এখনও বর্ত্তমান। তবে তাহা গোপালের জ্যেষ্ঠাগ্রজ কল্যাণের বংশ।

কল্যাণ ও গোপালের জন্মস্থান মুরশিদাবাদ। "নাই" উপাধিতে তাঁহারা নাপিত। ভেষজ-বিজ্ঞানে পারদর্শী দুলালচাঁদ ছিলেন তাঁহাদের পিতৃদেব। কবিরাজী চিকিৎসায় দুলালের সুনামই ছিল। তবে আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না। দিন-আনা—দিন-খাওয়ায় চলিত "নাই-সংসার"।

শ্রীভগবানের কৃপা-চিহ্নিত দুলালের পুত্রদ্বয় কল্যাণ ও গোপাল উভয়েই ছিলেন সুন্দর কান্তি। প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে আবাল্যসিদ্ধ গোপাল ভ্রাম্যমাণ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন নানা সুযোগ-সুবিধায়, মুরশিদাবাদে মহারাজার কয়েক দিন অবস্থান-কালে। মহারাজা গোপালকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলে গোপালের পিতা দুলাল তাহাতে আপত্তি করার পরিবর্ত্তে বরং আনন্দই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোপাল গোয়াড়ী কৃষ্ণনগরে মহারাজার কৃপা-পরিপুষ্ট হইয়া হন ভাণ্ডারী। বিদ্যাবত্তা তাঁহার যে অসামান্য ছিল, এমন কাহিনী পাওয়া যায় নাই কুত্রাপি। তাঁহার ছিল জন্মগত প্রতিভা। সেই প্রতিভাই তাঁহাকে লোকপ্রিয় করে ও যশের মুকুট পরাইয়া দেয়।

মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যিনি পঞ্চরত্নের অন্যতম রত্ন বলিয়া স্বীকৃত, তাঁহাকে traditionএর পর্য্যায়ে ফেলা যায় না কোন মতেই। গোপালের নবম পুরুষ নগেন্দ্রনাথ দাস traditionএর উপর injunction জারি করিতেছেন। সুতরাং ভাই সতীশের Tut tut interjectionটা ওখানটায় বেবাক অচল।

যাই হোক, গোপালের ভাণ্ডারী পদবীটা ক্রমে পরিণত হইল "ভাঁড়ে।" "ভাঁড়ে"র ইংরাজী প্রতিশব্দ buffoon. ভাণ্ডারী হইতে "ভাঁড়" ও buffoon অর্থে ভাঁড় এক সূত্রে সূত্রস্থ করা যাইতে পারে। পুরা কালে রাজা-মহারাজাদের দরবারে বয়স্য, বিদূষক, মস্করাবাজ, কঞ্চুকী প্রভৃতি থাকিত। গোপাল ভাঁড়ও কৃষ্ণনগর-প্রাসাদে এইরূপ পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। হিন্দু রাজ-গৃহে বয়স্য, কঞ্চুকী পদ যজ্ঞসূত্রধারিগণই বোধ হয় অধিকার করিতেন। গোপালের সে পদে অধিকার না থাকারই কথা। তবে গোপাল যে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সে সকল প্রমাণ বারান্তরে দেওয়া যাইবে।

এই প্রসঙ্গে গোপাল সম্বন্ধে সদানন্দ-প্রকৃতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র যে traditionএর উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা রঙ্গ-কৌতুক বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাঁহার tradition কথাটার অর্থ বোধ হয়—যত কিছু বাজে গাল-গল্প, সমস্তই গোপাল ভাঁড়ের উপর দিয়া মানুষ চালাইয়া দিয়া বসিয়া আছে। গোপালের গোপালত্ব নষ্ট তাহাতেই। আসল হইয়া পড়িয়াছে নকল। কি দুর্দ্দৈব! এই সূত্রে বলা চলে—

'অরসিকেষু রসস্য নিবেদনং
শিরসি মা লিখ মা লিখ মা লিখ।'

গোপাল সম্বন্ধে কথা ও কাহিনী অনেক। কল্যাণ সম্বন্ধেও সেই কথা। রস-সাগর গোপাল ও কল্যাণ বিষয়ে আলোচনা বারান্তরে বিশদ ভাবে করিবার ইচ্ছা রহিল।

(গোর্কীর 'মিসা' গল্পের ছায়া অবলম্বনে)

চম্পক এতো চঞ্চল হয়েছে যে, কোথাও সে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না। তা'কে বাড়ীর বার হতে না দিলে আর উপায় নেই। সারা দিন লাটিমের মত এ-ঘর-সে-ঘর ঘুরে বড়দের একেবারে নাস্তানাবুদ করে তুলে।

ছোট ছেলে-মেয়েদের দল মনে করে বড়রা সারা দিন কত নিরানন্দ কাজেই না ব্যস্ত থাকেন। তাই তাঁরা ছোটদের প্রায়ই বলেন: "যাও, এখন আমাদের আর বিরক্ত করো না।" চম্পক কিন্তু এখন তার মা-বাবার কাছ থেকে প্রায়ই ও-ধরণের কথা শুনতে পায়। তার মনে হয়, মা কতো কাজেই না ব্যস্ত! আর বাবা, তিনিও সারা দিনই পড়া শোনা ও নানা ধরণের বই লেখার নিরানন্দ কাজ নিয়েই ডুবে থাকেন। তিনি চম্পককে কিন্তু ও-সব বইয়ের একটিও পড়তে দেন না।

চম্পকের মা সত্যি খুব ভাল মানুষ। দেখতে যেন ঠিক একটি ছোট্ট পুতুল। তার বাবাও খুব ভাল, তবে তার চেহারাটা যেন একটা রেড ইণ্ডিয়ানের মত।

বর্ষাকাল আরম্ভ হয়েছে। রোজ রোজ অঝোরে বৃষ্টি পড়ছে। আবহাওয়াটা বিশ্রী রকমের খারাপ হয়ে উঠেছে, কোথাও এক ফালি রোদ দেখা যায় না। সারা দিন এক ঠাঁইয়ে ঘরে বসে থাকতে হচ্ছে। ঘরে বন্ধ হয়ে থেকে চম্পকের দম যেন আটকে যাচ্ছে, এক ঠাঁইয়ে বসে থাকবার ছেলে সে নয়। তাই এখন তার হয়েছে শুধু সারা দিন এ-ঘর-সে-ঘর ঘুরে মা-বাবার কাজে আরো বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এক দিন তার বাবা স্নেহভরে জিজ্ঞেস্ করলেন: "তোমার কি খুব খারাপ লাগছে?"

"হাঁ, ঠিক যেন অঙ্ক কষার মত!" সে উত্তর করলো।

"আচ্ছা, তুমি এই নোট-বুকটি নিয়ে যাও আর এতে তোমার জীবনে রোজ রোজ কৌতূহলপূর্ণ যা কিছু ঘটে তা লিখে রেখো, বুঝলে? একে কি বলে জান? ডাইরী। তা'হলে তুমি এখন থেকে ডাইরী নিশ্চয়ই লিখতে আরম্ভ করবে?"

চম্পক নোট-বুকটা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো: "আমার জীবনে এমন কি সব কৌতূহলপূর্ণ ঘটনা ঘটবে যা আমি লিখবো?"

"তা আমি কি করে বলবো!" একটা সিগারেট ধরিয়ে তার বাবা জবাব দিলেন।

"কি করে বলবো মাকে? কেন তুমি ও-ভাবে কথা বলছো।" চম্পক বেশ একটু রাগ-মিশ্রিত আব্দারের সুরে জিজ্ঞেস করলো।

"তার কারণ, তোমার বয়সে আমিও ভাল করে পড়া না শিখে আশে-পাশের লোক-জনদের নানা বাজে কথা জিজ্ঞেস করে তোমার মত বিরক্ত করে মারতাম। নিজের জন্যে কোন চিন্তাই কোরতে পারতাম না। আচ্ছা হয়েছে, এখন এখান থেকে বিদায় হও তো দেখি।"

চম্পক বেশ বুঝতে পারলো তার বাবা আর কথা বলতে ইচ্ছুক নন। এতে কিন্তু তার মনটা বাবার উপর বিষিয়ে উঠলো, কিন্তু বাবার চাহনিতে একটা স্নেহবিজড়িত ভাব দেখে সে উৎসাহভরে জিজ্ঞেস করলো: "আচ্ছা বল না, কি সব কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা আমার জীবনে ঘটবে?"

"তা ত তুমিই ভাল করে জান? কি বললাম বুঝতে পারলে ত? এখন যাও, আমায় আর বিরক্ত করো না, ভাল ছেলের মত নিজের ঘরে যাও।" কথাটা তার বাবা বেশ একটু আদরের সুরে বললেন।

চম্পক তার ঘরে প্রবেশ করে খোলা নোট-বুকটা টেবিলের উপর রেখে একটুক্ষণ চিন্তা করে প্রথম পাতাটায় লিখলো। "এটা আমার ডাইরী।" তার পর লিখলো, "বাবা আমায় এ নোট-বুকটা দিয়েছেন, এখন এতে আমি যা' লিকবো সেটাই না কি সুন্দর হবে।"

কলমটা নামিয়ে রেখে চুপ করে বসে থেকে ঘরের চার দিকে চোখ বোলাতে লাগলো—ঘরের সব কিছুর সঙ্গেই ত যে বিশেষ ভাবে পরিচিত। কোন কিছু ভেবে-চিন্তে ঠিক করতে না পেরে সে গিয়ে আবার তার বাবার ঘরে হাজির হলো। তার উপস্থিতিতে কিন্তু বাবা একটুও সন্তুষ্ট হলেন না।

"আহা তুমি আবার আমাকে জ্বালাতে এসেছো?"

"এই দেখো।" বলে চম্পক নোট-বুকটা তার বাবার সামনে খুলে ধরে বললো, "একবার চেয়ে দেখো আমি কি সব লিখে এনেছি। আমার লেখাটা কি ঠিক হয়নি?"

"হাঁ, হাঁ, হয়েছে।" তার বাবা তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে বললেন:

"ডাইরী বানান ভুল লিখেছ। 'ড়' হবে না 'র' হবে। আর 'লিক্‌বো' নয় 'লিখবো'—'খ' হবে 'ক' নয়। বেশ হয়েছে, এখন যাও ত।"

'এর পর আমি আর কি লিখবো'? চম্পক একটু ভেবে জিজ্ঞেস করলো।

"যা তোমার মনে আসে। একটা বিষয় চিন্তা করে তার পর লেখো—কবিতাই মন্দ কি?"

"কবিতা? কোন্‌টা?"

"কোন্‌টা নয়—নিজে বানিয়ে লেখো। এখান থেকে যাও না বলছি—লক্ষ্মীছাড়া ছেলে কোথাকার।"

বাবা তার হাত ধরে ঘর থেকে হিড়-হিড় করে বের করে দিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিলেন। বাবার এই কঠোর ব্যবহারে চম্পক সত্যি সত্যি খুবই আহত হলো। ঘরে ফিরে এসে সে আবার ডেস্কের কাছে নোট-বুকটা খুলে চিন্তা করতে লাগলো: এখন আর কি লেখা যায়? এমনি ভাবে বসে থাকতে তার আর মোটেই ভাল লাগছিলো না। ইচ্ছে হলো, পাক-ঘরে তার মা'র কাছে যেতে। মা তখন ধোপা-বাড়ীতে কি কি কাপড় দিবেন তা নিয়ে ছিলেন ব্যস্ত। পাক-ঘরে চম্পকের যাওয়া নিষেধ ছিল। সেখানে যেতে পারতো না বোলেই পাক-ঘরটা ছিল তার কাছে খুবই লোভনীয়। মনে মনে ভাবলো: ও-ঘরটা সত্যি সত্যি একটা ভারী কৌতূহলের স্থান। ওখানটায় বসে থেকে খোলা জানালাটা দিয়ে বাইরের কত সুন্দর দৃশ্যই না দেখতে পাওয়া যায়।

এ-সব কথা ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তার নজর গিয়ে পড়লো দেয়ালে আবদ্ধ ঘড়িটার ওপর। তখন সবে মাত্র ভোর সোয়া ন'টা বেজেছে। ঘড়িটার দিকে চাইতেই কিন্তু আজ তার মাথায় একটা চিন্তা এসে গেলো। সে নোট-বুকটার দিকে তাকিয়ে উৎফুল্ল ভাবে লিখলো,

"দেয়ালে টাঙ্গানো ঘড়ি চলে টিক্ টিক্
কাঁটা দুটো করে কাজ সব ঠিক ঠিক।"

নিজের চিন্তার এই আবিষ্কার দেখে চম্পক আনন্দে আত্মহারা হয়ে চেয়ার থেকে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠে মা'র কাছে ছুটে চলতে চলতে চিৎকার করে বলতে লাগলো: "মা, এই দেখো, আমি কি সুন্দর একটা কবিতে লিখে ফেলেছি।"

"এই ন"—গামছাগুলি গুণতে গুণতে তার মা বললেন: "যাও, আমায় বিরক্ত করো না। দশ, এগারো······"

চম্পক একটা হাত দিয়ে তার মা'র গলা জড়িয়ে ধরে আর একটা হাত দিয়ে খোলা নোট-বুকটা তাঁর মুখের সামনে তুলে ধরলো। "মা, এদিকে একটু তাকাও না···।"

"বারো···হা ভগবান্! তুমি দেখছি আমায় ফেলে দেবে···!" এই বলে তিনি চম্পকের হাত থেকে নোট-বুকটা নিয়ে কবিতাটা পড়ে বললেন, "এটা লিখতে নিশ্চয়ই তোমার বাবা তোমায় সাহায্য করেছেন। এই ত দেখছি তিনি তোমার ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন।"

কথাটা শুনে চম্পকের আনন্দটা হঠাৎ যেন দমে গেলো। সে খুবই নিরুৎসাহ ভাবে জিজ্ঞেস করলো: "কবিতাটাও তিনি শুদ্ধ করে দিয়েছেন?"

"হাঁ হাঁ, কবিতাটাও। যাও, এখন আর আমায় বিরক্ত করো না। ঘরে যেয়ে আরো কিছু লেখো।"

"কি লিখবো?"

"কেন, আরো কয়েকটা কবিতা?"

"এর পর আমি আর কি লিখবো?"

"চিন্তা করে বের কর—যেমন ধর—টিনের ঘরে বৃষ্টি পড়ে
ঝ্‌ম্-ঝ্‌ম্-ঝ্‌ম্।"

"আচ্ছা" এই বলে চম্পক একান্ত বাধ্য ছেলের মত ঘরে চলে গেলো। এসে সে তাঁর মা'র কবিতার লাইনটা লিখলো, এর পরে আর কি যোগ করা যায় তার জন্যে সে মাথা নীচু করে চিন্তা করতে লাগলো। হঠাৎ তার মাথায় কবিতার আর একটা লাইন এসে গেল। সে নোট্‌-বুকটায় লিখলো: "পায়রাগুলি ডাকছে বসে বাক্-বাকুম-বাকুম।"

সারা দিন ঘরে আবদ্ধ হয়ে থেকে থেকে চম্পকের আর কিছুই ভাল লাগছিল না। কিন্তু কবিতার এই লাইনটা মাথায় এসে যাবার পর মনটা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠলো।

চেয়ার থেকে উঠে চম্পক সরাসরি তার বাবার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে উপস্থিত হলো। সে এসে যাতে আর বিরক্ত করতে না পারে তার জন্যে তার বাবা দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলে। সে এসে দরজা ঠ‍ুকতে লাগলো। ভিতর থেকে তার বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

"তাড়াতাড়ি দরজাটা খোল না, বলছি।" আনন্দের আতিশয্যে চম্পকের দমটা যেন আটকে যাচ্ছিল। সে চিৎকার করে বললো: "এই যে আমি এসেছি। একটা কবিতা লিখেছি—দেখ না কেমন সুন্দর হয়েছে।"

"অভিনন্দন জানাচ্ছি। যাও, আরো কয়েকটা লেখো গিয়ে।" কথাগুলি তার বাবা খুবই নির্লিপ্ত ভাবে বললেন।

"কিন্তু আমি যে এটা তোমায় পড়ে শোনাতে এসেছি।"

"পরে শোনালেই চলবে······"

"না, আমি এখনই শোনাতে চাই।"

তার বাবা একটু গম্ভীর গলায় বললেন: "চম্পক, আমি যা বললাম তা কি যথেষ্ট নয়?"

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে চম্পক কবিতাটা পড়ে গেল, কিন্তু তার বাবার কাছে কোন উৎসাহ সে পেল না।

চুপসে-পড়া মন নিয়ে চম্পক ধীরে ধীরে তার ঘরে ফিরে এসে জানালার কাছে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা কাচের গায়ে মাথাটা ঘসে আবার ডেস্কের কাছে বসে তার চিন্তাকে বাস্তবে রূপ দেবার কাজে নিয়োগ করলো। সে লিখলে: "বাবা আমায় ফাঁকি দিয়েছেন। তিনি বলেছিলেন যে, আমি যদি 'ডাইরী' লিখি তা'হলে সেটা না কি খুবই মনোরম হবে। তিনি যখন দেখতেই চাইলেন না, তখন আমার এ লেখার কি-ই বা সার্থকতা আছে? তিনি শুধু আমাকে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখবার জন্যেই এ কথা বলেছিলেন, তাঁর এই চালাকী আমি খুব বুঝি। মা যখন রাগ করেন তখন বাবা তাঁকে বলেন, 'মেজাজী পায়রা।' এখন তিনিই বা মা'র চেয়ে কম যাচ্ছেন কিসে? কাল যখন আমি তাঁর রূপোর সিগারেট-কেসটা নিয়ে নাড়া-চাড়া কোরছিলাম তিনি তখন তা দেখে ত আমার উপর একেবারে চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁরা দু'জনাই সমান। ও-দিন সিপ্রা গান গাইতে গিয়ে যখন একটা

চায়ের পেয়ালা ভেঙে ফেললো, তাঁরা ত তখন তা'কে আরো সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'যাক্ গিয়ে, এতে তোমার লজ্জিত হবার কিছু নেই', কিন্তু আমি যখন কিছু ভেঙে ফেলি তখন তাঁরা মোটেও এ ধরণের কথা বলেন না।"

মা-বাবা তার উপর কি অবিচারটাই না করেন! কথাটা ভাবতে ভাবতে মা-বাবা ও আত্মস্নেহের আতিশয্যে তার চোখে প্রায় জল নেমে এলো। তাঁরা ছু'জনাই এতো ভাল মানুষ হয়েও তার সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করতে পারেন না কেন? সে চেয়ার থেকে উঠে আবার গিয়ে জানালাটার কাছে দাঁড়ালো। বৃষ্টির জলে ভিজে এসে একটা চড়াই পাখী কার্নিসে বসে ঠোঁট দিয়ে পালক খুটছিল তা' সে দাঁড়িয়ে দেখছিল। পাখীটার হলদে ঠোঁটের পাশে গাঢ় বাদামী রংয়ের পালকগুলো দেখতে ঠিক যেন তার বাবার গোঁফের মত। কথাটা ভাবতে-ভাবতে তার মাথায় একটা ছন্দ এসে গেল। সে তাড়াতাড়ি ছন্দটা লিখে খুবই উল্লসিত হয়ে উঠলো। তার পর লিখলো: "কবিতা লেখা আর তেমন কি কঠিন কাজ! চার পাশে উপকরণ রয়েছে এখন সেগুলি সংগ্রহ করে লিখলেই হলো। উপাদান সংগ্রহ করতে পারলে ছন্দ আপনা থেকেই এসে যাবে। এর জন্যে আবার বাবার সাহায্যের প্রয়োজনটা কি? ···এখন আমি ইচ্ছা করলে ত বইও লিখতে পারি এমন কি ছন্দেও। এখন আমাকে শিখতে হবে, কি করে বানান শুদ্ধ করে লিখতে হয় এবং কমা ও দাঁড়ি দিতে হয়। 'মাতা ছাতা, খাতা কিতা'। এ শব্দগুলি দিয়েই ত আমি বেশ একটা কবিতা লিখে ফেলতে পারি। না, আমি লিখবো না। আমি কবিতাও লিখবো না, ডাইরীও রাখবো না, এতে যদি তোমার আগ্রহ না থাকে তা'হলে আমারও নেই। আমায় আর এ জন্যে বিরক্ত করো না।

রাগে, দুঃখে ও অভিমানে চম্পকের চোখ দু'টি ছল-ছল করে উঠলো। এমনি সময় ঘরটায় এসে প্রবেশ করলেন তার সেই বেঁটে শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুষমা দেবী। তিনি চম্পককে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হয়েছে, এমনি ভাবে গোঁ ধরে বসে আছ যে?"

আত্ম-গৌরবের ভাব দেখিয়ে চম্পক ভ্রূ কুঁচকিয়ে তার বাবার স্বরটা অনুকরণ করে তিক্ত স্বরে বললো, "আমায় বিরক্ত কোরবেন না।" এই বলে সে তার নোটবুকটায় লিখলো, "বাবা ত শিক্ষয়িত্রীকে খেঁদী বলেই ডাকেন আর বলেন যে ওর এখনও পুতুল নিয়ে খেলা করার বয়স পার হয়নি।"

"তোমার কি হয়েছে বল দেখি?" শিক্ষয়িত্রী তার ছোট দু'খানি হাত দিয়ে মুখটা ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলেন: "নোটবুকটায় কি লিখছিলে দেখি?"

চম্পক বেশ গম্ভীর স্বরে বললো, "আমি তা' কক্ষনো বলবো না। বাবা বলেছেন, আমার কাছে যা ভাল লাগবে সেটাই লিখে রাখতে।"

নোটবুকটার উপর ঝুঁকে পড়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি সব কিছুই আনন্দদায়ক বলে মনে কর?"

চম্পক উত্তর করলো, "কবিতা ছাড়া এখনও ত তেমন কিছু পাইনি।"

"এই ভুলগুলোর দিকে তাকাও দেখি। হাঁ, এটা একটা কবিতা হয়েছে বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই তোমার বাবা লিখে দিয়েছেন···।"

কথাটা শুনে রাগে-দুঃখে চম্পকের মনটা বিষিয়ে উঠলো: কি আশ্চর্য্য! তার কথা কেউ বিশ্বাস করছে না। সে একটু পিছু হটে গিয়ে বললো: "এই যদি হয়, তাহলে আমি আমার পড়াও শিখবো না।"

"কেন?"

"আমি শিখবো না, এটাই কি যথেষ্ট নয়?"

ঠিক এই সময়ে শিক্ষয়িত্রী সম্পর্কে চম্পক যা লিখেছিলো তা তাঁর নজরে পড়লো। লেখাটা দেখে তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠলো। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে আয়নাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি দেখছি আমার সম্পর্কেও লিখেছো! তোমার বাবা কি সত্যি-সত্যি আমার সম্পর্কে এ কথা বলেছেন?"

চম্পক বেশ গম্ভীর ভাবে বললো, "বাবা কি আপনাকে ভয় করেন না কি?"

কথাটা শুনে তিনি চিন্তিত ভাবে আবার আয়নাটার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তাহলে তুমি পড়া শিখতে চাও না, না?"

"না।"

"আচ্ছা, আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে দেখি-তিনি কি বলেন।" এই বলে তিনি গম্ভীর ভাবে চলে গেলেন।

চম্পক আবার লিখতে আরম্ভ করলো: "মা ও বাবার সঙ্গে কথা বোলবার সময় তাঁরা যেমন কথার মাঝখানে ছেদ টেনে দেন, আমিও আজ শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে সে রকম ব্যবহার করেছি। তিনি আর আমায় ঘাঁটাতে কিম্বা বিরক্ত করতে পারবেন না। আমায় কেউ পছন্দ করুক চাই না-ই করুক, তাতে আমি একটুও পরোয়া করি না। পরে লিখবো শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে এরূপ ব্যবহার করেছি বলে আমি দুঃখিত। এ কথাটা নোটবুকে টুকে রাখতে হবে। আমি বাবার মত সারা দিন ধরেই লিখবো। কেউ আমাকে দেখতেই পারে না। মা যদি বিশেষ কোন ভাল খাবারও তৈরী করেন তবু আমি কক্ষনো খেতে যাব না। সারা রাত জেগে লিখবো। তার পর সকালের দিকে মা এসে বাবাকে যে ভাবে বলেন ঠিক সে ভাবে আমাকেও উদ্দেশ্য করে বলবেন, এ ভাবে রাত জাগলে আমি আত্মহত্যা করবো। তিনি গলা ফাটিয়ে, চিৎকার করে কাঁদুন তা'তে আমার কি? তাঁরা কেউ আমায় পছন্দ না করুন তা'তে আমার কিছুই এসে যাবে না।"

লেখাটা শেষ করতে না করতেই শিক্ষয়িত্রীকে সঙ্গে করে মা এসে চম্পকের ঘরে ঢুকে গম্ভীর ভাবে নোটবুকটা তুলে নিলেন। তাঁর স্নেহ-বিজড়িত চোখ দু'টি হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি চম্পকের লেখাটা পড়তে পড়তে আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন, "হা, ভগবান! কি এটা···। না, আমি নিশ্চয়ই এটা তোমার বাবাকে দেখাবো!" এই বলে তিনি নোটবুকটা নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

"বাবা হয়তো আমাকে এর জন্য শাস্তি দেবেন।" কথাটা চিন্তা করতে করতে চম্পক শিক্ষয়িত্রীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি নিশ্চয়ই আমার বিরুদ্ধে বাবার কাছে নালিশ করেছেন, না?"

"তুমি অতি অবাধ্য···।"

"আমি ত আর ঘোড়া নই যে আদেশ মেনে···।"

"চম্পক!" শিক্ষয়িত্রী ঝাঁঝালো গলায় হাঁক দিয়ে উঠলেন।

চম্পকও রাগত ভাবে বলতে লাগলো, "আমি একসঙ্গে সব কিছু করতে পারবো না।" সে আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু চাকর

এসে বলে গেল যে বড় বাবু তাঁকে এক্ষুনি যেতে বলেছেন। তাই আর কিছু বলা হলো না।

চম্পক ধীরে ধীরে গিয়ে তার বাবার ঘরে ঢুকলো।

"শোন।" তার বাবা এক হাত দিয়ে গোঁফটা তা' দিয়ে অপর হাতটা দিয়ে নোটবুকটা ধরে বললেন," এখানে এস ত।"

পুলকে তার বাবার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। তার মা পাশেই একটা সোফায় বসেছিলেন।

"এঁরা আমায় একটুও শান্তি দেবে না।" চম্পক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথাটা ভাবতে লাগলো। তার বাবা তাকে স্নেহভরে কাছে টেনে এনে থুথনিটা ধরে উঁচু করে'বললেন, "তুমি বড্ড দুষ্টু হয়েছো··· কেমন, তাই না?

"হাঁ," চম্পক নিজের দোষ স্বীকার করে মন খুলে উত্তর দিল।

"কেন?"

"আপনারা কেউ ত আর আমার 'পরে কোন নজরই দেন না।"

"এতে তোমার মনে খুব দুঃখ হয়েছে, না?" তার বাবা তাকে খুব ধীর-শান্ত ভাবে কথাটা জিজ্ঞেস্ করলেন।

"হাঁ, সত্যি আমার খুব দুঃখ হয়েছিল।"

তার বাবা খুব আন্তরিকতার সঙ্গে উপদেশ দিয়ে বললেন, "কেউ আর তোমায় দুঃখ দেবে না। তোমার মা আর আমি ত তোমায় দুঃখ দেবার কথা চিন্তাই করতে পারি না। এই দেখ না, তোমার মা সোফায় বসে কেমন হাসছেন। আমারও খুব আনন্দ হচ্ছে, আমি কিন্তু এখন হাসছি নে······।"

"আচ্ছা, এমন অদ্ভুত লাগছে কেন?" চম্পক জিজ্ঞেস করলো।

"কেন, তা আমি পরে বলবো'খন।"

"এখন বলতে দোষ কি?"

"দেখ, তুমি নিজেই ত একটি অদ্ভুত ছেলে।"

"আমি?" চম্পক সপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞেস করলো।

তার বাবা তাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে আদর করে কানের পাশটায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "এখন আমাদের একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে হবে, কেমন, কি বলো?"

"বেশ।" চম্পক ভ্রূ কুঁচকিয়ে সম্মতি জানালো।

তার বাবা বললেন, "তোমায় আঘাত দেবার ইচ্ছে কারো ছিল না। তোমার দুঃখের কারণ কি জান? এই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া। বৃষ্টি না পড়লে তুমি নিশ্চয়ই বাইরে গিয়ে খেলা-ধূলা করতে। এবং তা'তে তুমি পেতে অফুরন্ত আনন্দ। বসন্ত কালের ঝরঝরে রৌদ্রে সব কিছুতেই যেন শ্রী ফুটে উঠে। আর বর্ষায় সব কিছু চোখ বুজে মন গুমরে বসে থাকে। যাক্, ডাইরীতে এত সব কি বাজে কথা লিখেছো···?"

চম্পক গম্ভীর ভাবে বল্লো, "তুমিই ত ও-সব লিখতে বলেছিলে।"

"আমি কি আর এ-সব বাজে জিনিষ লিখতে বলেছিলেম?"

"সম্ভবতঃ তুমি তা বলোনি।" চম্পক তার বাবার কথায় সায় দিয়ে বল্লো, "কি লিখতে বলেছিলে তা আমার মনে নেই। আচ্ছা, আমার লেখাটা কি সত্যি বাজে হয়েছে?"

তার বাবা তার মাথাটা ধরে ঝাঁকরিয়ে বললেন, "হাঁ, হাঁ, হয়েছে বৈ কি।"

"আর তুমি যখন লেখো তখনও কি সেটা বাজে হয়?" চম্পক জিজ্ঞেস্ করলো।

উনুনের উপর চায়ের কেটুলীটা অনেকক্ষণ ধরে বসিয়ে রেখেছেন এটা মনে হওয়ায় তার মা চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে পাক-ঘরের দিকে ছুট দিলেন। তাঁর মুখে যে একটা হাসির রেশ ছিল চম্পক সেটা লক্ষ্য করলো।

চম্পকের বাবা বললেন, "যখন আমি কিছু লিখি মাঝে-মাঝে যা-তা বাজে লেখা আসতে আরম্ভ করে। সব কিছু সঠিক ও সুন্দর ভাবে লেখা ভীষণ কঠিন কাজ। তোমার কবিতাটা মন্দ হয়নি, তা'ছাড়া, আর যা লিখেছো তা মোটেও ভাল হয়নি।"

"কেন?" চম্পক বেশ একটু ভারিক্কী চালে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি বড্ড তর্ক কর। আমি জানতাম না যে তুমি একটি বেশ বড় সমালোচক হয়ে উঠেছো! জান, সমালোচনার ওষুধটা প্রথম নিজের উপর ব্যবহার করতে হয়। যাক, এ প্রসঙ্গ এখন না করাই ভাল। এখন থেকে আমাদের 'ডাইরী' লেখা বন্ধ করতে হবে।"

লাল-নীল পেন্সিলটা দিয়ে কাগজের উপর দাগ কাটতে কাটতে চম্পক মন্তব্য করলো: "সত্যি 'ডাইরী' লেখাটা লেখা-পড়া করবার মতই ঝকমারী কাজ, এটা বাদ দেয়াই ভাল। তুমিই ত বলেছিলে, নিজে আবিষ্কার করে যা' লেখা যাবে সেটাই না কি সুন্দর হবে। আমি লিখতে আরম্ভ করলাম, কিন্তু শেষটায় কিছুই হলো না। আচ্ছা, আজ কি আমার পড়া শিখতে হবে না?

"কেন?" চম্পকের বাবা জিজ্ঞেস করলেন। "আচ্ছা থাক, আজ আর তোমার পড়া শিখে কাজ নেই। এখন চল, শিক্ষয়িত্রীর কাছে যাই, ওঁর সম্পর্কে আমি যা' বলেছি তা' তুমি লিখে মোটেই ভাল করোনি।"

চম্পকের হাত ধরে যেতে যেতে তার বাবা শান্ত ভাবে বললেন: "এটা সত্য কি, তোমায় শিক্ষয়িত্রীর নাকটা একটু খোঁদা? কিন্তু তাই বলে এ নিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করা উচিত নয়. তার খারাপ নাকটা ত আর কেউ সোজা করে দিতে পারবে না? যার যে-ধরণের নাক রয়েছে চিরদিন তাকে সেটা নিয়েই থাকতে হবে। দেখো, তোমার নাকের পাশটায় যে আঁচিল আছে, এখন যদি আমরা সেটা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করি তাহলে সেটা কি তোমার খুব ভাল লাগবে?"

ঘাড় নেড়ে চম্পক তার বাবার কথায় সম্মতি জানিয়ে বল্লো: "না।"

তাঁর বাবা বললেন, "তোমার 'ডাইরী'র এটাই হলো সুন্দর পরিসমাপ্তি।"

অনুবাদক—সুবোধ বসু

রক্তনদীর ধারা

[পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর]

পঞ্চানন ঘোষাল
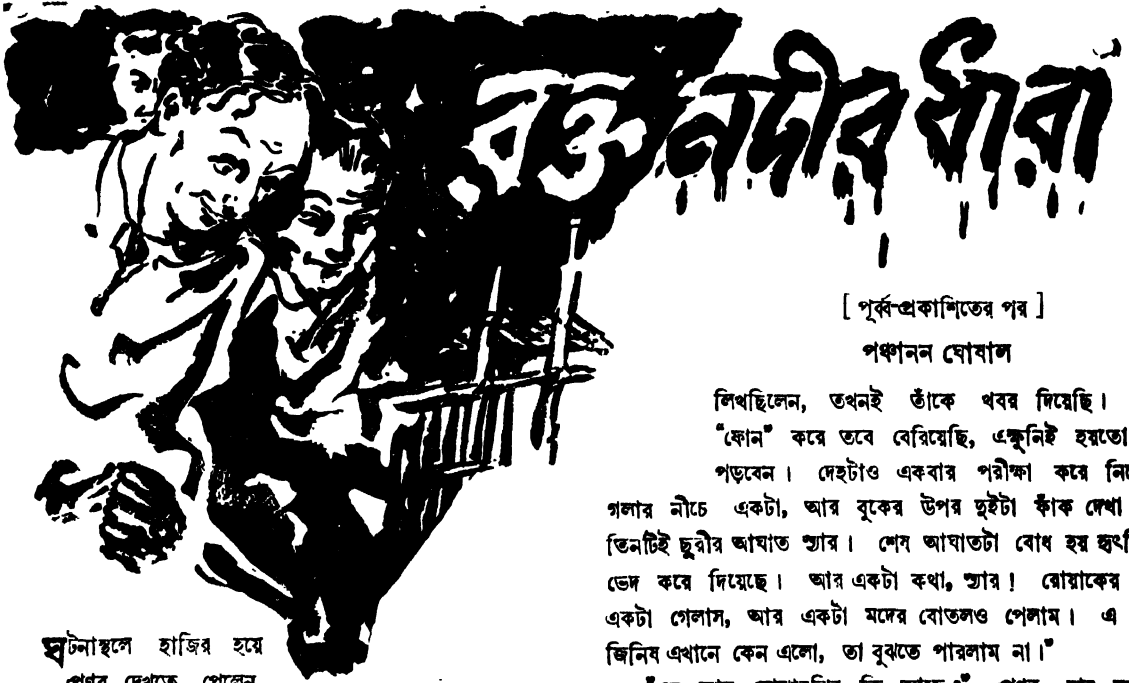
ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে প্রণব দেখতে পেলেন, সহকারী শৈলেশ বাবু জমাদার রামদীনকে নিয়ে তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছেন, দূর হতে তিনি লক্ষ্য করলেন, শিউচরণের রক্তাপ্লুত দেহটা একটা রকের উপর শোয়ানো রয়েছে। এখানে-ওখানে চাপ-চাপ রক্ত, কিছুটা দেওয়ালের গায়েও দেখা যায়। তখনও পর্য্যন্ত রকের গা বয়ে রক্ত গড়াচ্ছিল। চোখ দু'টো ঠিকরে বেরিয়ে এলেও তার স্বচ্ছতা কিছুমাত্র কমেনি। চোখ দু'টো দিয়েই যেন সে কি বলতে চাইছে। ঠোঁট দু'টো তার ফাঁক হয়ে আসছে। যেন সে কি বলতে চাইছে, কিন্তু বলি-বলি করেও বলতে পারছে না।

শিউচরণকে এই অবস্থায় দেখে প্রণব বাবু শিউরে উঠলেন। গত পনের বৎসর ধরে সে প্রণব বাবুর সঙ্গে কাজ করেছে, কত চোর, ডাকু ও বদমায়েসকে সে ধরিয়ে দিয়েছে। এজন্য প্রণব বাবুরও কম সুনাম হয়নি। সেই শিউচরণ প্রণব বাবুর জন্যে আজ মৃত্যু বরণ করে নিলো। প্রণব বাবু ইচ্ছা করছিলো চেঁচিয়ে কেঁদে উঠেন, কিন্তু তিনি তা পারলেন না। কর্ত্তব্য তাঁকে ডাক দিয়ে এগিয়ে যেতে বলছে। রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে ফুলতে প্রণব বাবু সহকারী শৈলেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এইটেই তো সেই কুমারটুলির মোড় ? থানা থেকে আর কত দূরই বা হবে, মিনিট পাঁচেকের পথ। হতভাগা ওই পথ ধরেই বোধ হয় বাড়ী যাচ্ছিলো। একটা সিপাই সঙ্গে দিয়ে একে পৌঁছেও দিতে পারনি, ভাই ?"

বিক্ষুব্ধ ভাবে ছোট দারোগা শৈলেশ বাবু উত্তর করলেন, "একটুও কি আমি সময় পেলাম, স্যার ? কি ভীষণ সিংহ গর্জ্জন চলছিলো, তা যদি দেখতেন ? একটু ভাববার পর্য্যন্তও সময় পাইনি। ভদ্রলোক যেন আমাদের কাঁচাই খেয়ে ফেলতে চান।"

প্রণব বাবু গম্ভীর ভাবে উত্তর করলেন, "হুঁ।" তার পর একটু ভেবে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "বড় সাহেবকেও খবর দেওয়া দরকার। এসে তাঁর কীর্ত্তিটা একবার স্বচক্ষে দেখে যান। মৃতদেহটা পরীক্ষা করা হয়েছে ?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "আপনি যখন এক, আই, আর লিখছিলেন, তখনই তাঁকে খবর দিয়েছি। তাঁকে "ফোন" করে তবে বেরিয়েছি, এক্ষুনিই হয়তো এসে পড়বেন। দেহটাও একবার পরীক্ষা করে নিয়েছি। গলার নীচে একটা, আর বুকের উপর দুইটা ফাঁক দেখা যায়। তিনটিই ছুরীর আঘাত স্যার। শেষ আঘাতটা বোধ হয় হৃৎপিণ্ডটা ভেদ করে দিয়েছে। আর একটা কথা, স্যার ! রোয়াকের উপর একটা গেলাস, আর একটা মদের বোতলও পেলাম। এ দু'টো জিনিষ এখানে কেন এলো, তা বুঝতে পারলাম না।"

"এর আর বোঝাবুঝির কি আছে ?" প্রণব বাবু বললেন, "হত্যাকারী রোয়াকের উপর শীকারের অপেক্ষায় বসে মদ খাচ্ছিলো আর কি ? সাদা চোখে পেশাদারী খুনেদেরও খুন করতে অসুবিধে হয়, বুঝলে ? তা ও যে আজ এই পথ দিয়েই বাড়ী যাবে, কিংবা ওকে যে এখুনিই তাড়িয়ে দেওয়া হলো তা হত্যাকারী জানলো কি করে ? আগাগোড়া ব্যাপারটা গোলমেলে ঠেকছে হে। ঐ দূরের দোকানদারদের জিজ্ঞাসা করেছো ?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "এ জায়গাটা তো দেখছেন, কি রকম নির্জ্জন। তবে ওদের এসেই জিজ্ঞেস করেছি। ওরা তো বলে ওরা কিছুই জানে না, বোধ হয় ভয়ে বলছে না।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "হুঁ, বলবে, তবে আজ বলবে না, পরে বলবে। ওদের থানায় নিয়ে গিয়ে অভয় দিয়ে ওদের কাছ থেকে কথা বার করতে হবে। এখোন এসো, রাস্তাটা ভালো করে পরীক্ষা করে দেখি। জায়গায় জায়গায় রক্তে-আঁকা পায়ের ছাপ দেখা যাচ্ছে, ঐ দেখো।"

প্রণব বাবুর কথায় টর্চ্চের আলো ফেলে সকলেই লক্ষ্য করলেন, তিন-চার ফুট অন্তর স্পষ্ট পায়ের ছাপ। রক্তের উপর দিয়ে হেঁটে চলায় এই সব দাগ পড়েছে। প্রণব বাবু এবং শৈলেশ বাবু সাবধানে অগ্রসর হতে হতে দেখলেন, ছাপগুলো মোড় ঘুরে একটা পাতলা গলির মধ্যে পর্য্যন্ত চলে এসেছে। গলির ভিতরও ঐরূপ বহু পায়ের দাগ দেখা যায়। গলির বাঁ দিকে একটা পানের দোকান ছিল। দোকানদার এতক্ষণ ভয়ে ঠক-ঠক করে কাঁপছিল, পুলিশ দেখে তার কাঁপুনির মাত্রা যেন বেড়ে গেলো।

প্রণব বাবু এগিয়ে এসে দোকানদারের পিঠটা চাপড়ে দিয়ে, সুমিষ্ট গলার স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভয় কি রে ? কিছু ভয় নেই। কি দেখেছিস্ তুই, বল। বল বল, বলে যা।"

ঠক-ঠক করে কাঁপতে কাঁপতে দোকানদার উত্তর করলো, "হুজুর ধর্ম্মাবতার, রক্ষে করবেন আমাদের। সব সত্য কথা বলবো আমি। লুঙ্গি-পরা কোট গায়ে একটা লোককে এই গলির মধ্যে ঢুকতে দেখেছি, তার খালি পা ছিল, মুখ তার কিন্তু দেখিনি।"

গলিটার মুখে দাঁড়িয়ে টর্চ্চের আলো ফেলে গলির ভিতরটা একবার ভালো করে দেখে নিয়ে প্রণব বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু এটা তো ব্লাইণ্ড লেন, বেরুবার তো কোনও পথ নেই; তুই কাউকে কি এই গলি থেকে বেরিয়ে আসতেও দেখেছিস্? খু-উ-ব ভালো করে ভেবে নে, ভেবে নিয়ে বল্।"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভেবে নিয়ে দোকানদার উত্তর করলো, "হাঁ হুজুর, দেখেছি। একটু পরেই একটা লোককে আমি বেরুতে দেখি। তারও পায়ে জুতো ছিল না। তবে পরনে তার ছিল একটা পাণ্টলুন আর একটা সার্ট। এ লোকটারও মুখ আমি দেখিনি, হুজুর! তবে আগের লোকটা দৌড়ে গলির মধ্যে ঢুকেছে, কিন্তু এ লোকটা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এসেছিলো। এ ছাড়া আর কিছু আমি জানি না, হুজুর।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "মিছামিছি ভয় পাচ্ছিস্ তুই। ভয় কি, খুন তো আর তুই করিস্‌নি। এখোন আয় আমার সঙ্গে গলির ভিতর। এখানে যদি কোনও জিনিষ পাওয়া যায় তো তুই সাক্ষী হবি।"

দোকানদারকে সঙ্গে নিয়ে প্রণব ও শৈলেশ বাবু সদলবলে টর্চ্চের আলো ফেলতে ফেলতে গলিটা পর্য্যবেক্ষণ সুরু করে দিলেন। টর্চ্চের আলোয় তাঁরা দেখতে পেলেন, দুই সারি পায়ের ছাপ। এক সারি ছাপ দক্ষিণ থেকে উত্তর-মুখে চলে গিয়েছে, এবং দ্বিতীয় সারি ছাপ উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ-মুখে বাইরের রাস্তা পর্য্যন্ত এসে মিলিয়ে গেছে। প্রথম সারির বাঁ ও ডান পায়ের ছাপের মধ্যে ব্যবধান প্রায় তিন ফুট। কিন্তু দ্বিতীয় সারির দুই পায়ের ছাপের মধ্যে সামান্য মাত্র ব্যাবধান দেখা যায়।

পায়ের ছাপগুলি পরীক্ষা করতে করতে আরও একটু এগিয়ে এসে ইনস্পেক্টার প্রণব শৈলেশ বাবুকে বললেন, "বুঝতে পারলেন কিছু?"

উত্তরে শৈলেশ বাবু বললেন, "না স্যার, পারলাম না।"

প্রণব বাবু বললেন, "না বোঝার কি আছে? আসলে সব কয়টি পায়ের দাগই একই ব্যক্তির। প্রথমে সে যখন গলির মধ্যে ঢোকে, তখন সে দৌড়েই ঢুকেছিল। এই জন্যে উভয় পায়ের দাগের মধ্যে অতোটা ব্যবধান দেখা যায়। কিন্তু ঐ লোকটাই বেরিয়ে আসবার সময় ধীরে ধীরে চলে এসেছে, যাতে করে তাকে কেউ সন্দেহ না করতে পারে। ফুটপ্রিণ্ট্ এক্সপার্টকে ডেকে পাঠাও, দাগগুলো ভালো করে মাপা দরকার। পায়ের মাপ, আঙ্গুলের পরিধি ও অন্যান্য আরও অনেক খুঁটি-খোঁচ থেকে এও জানতে পারা যাবে যে লোকটার ওজন কি ছিল, এবং লোকটা বেঁটে, লম্বা, বা দোহারা চেহারার লোক কি না তা'ও জানা যাবে। লোকটা দৌড়েছিল, কিংবা আস্তে চলেছে তা তো এখুনিই জানতে পারলাম। এই তো তোমার কেইস্ ডিটেক্ট্ হয়ে গেলো। এখোন ধরা পড়ার পর আসামীর পায়ের ছাপ এই সব দাগের সঙ্গে মিলে গেলেই, ব্যাস, বেটার ফাঁসী হয়ে যাবে। এখোন এসো, গলির শেষ-মুখটা দেখে আসি।"

গলির শেষ-মুখ বন্ধ; একটা বাড়ীর পিছন পর্য্যন্ত এসে থেমে গিয়েছে। গলির এই শেষ সীমানা হতেই পায়ের ছাপগুলোকে মোড় ঘুরতে দেখা যায়। হঠাৎ প্রণব বাবুর লক্ষ্য পড়লো অদূরে পরিত্যক্ত একটা রক্ত-মাখা কালো কোট ও একটা লুঙ্গীর দিকে। প্রণব বাবুর অন্যান্য সঙ্গীরাও ঐগুলো দেখতে পেয়েছিলো।

দোকানদার ভিখনরাম বস্ত্রগুলো দেখা মাত্র বলে উঠলো, "ঐ হুজুর, সেই লুঙ্গী ও কোট।"

দারোগা শৈলেশ বাবু এগিয়ে এসে বললেন, "তাই তো, তাই তো। কাপড়-চোপড়গুলো তো এখানেই ফেলে গেছে, কিন্তু লোকটা তা'হলে উলঙ্গ হয়ে পালালো না কি? এঁ্যা? না স্যার, বুঝতে পারলাম না ঠিক। আমার মনে হয়, গলির এই মুখের বাড়ী ক'টা এখুনি তল্লাস করা দরকার।"

টর্চ্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আরোও বার-কতক ঐ রক্তমাখা বস্ত্র দুইটির উপর ফেলে ইনস্পেক্‌টার প্রণব বাবু সেগুলো ভালো করে পরীক্ষা করলেন। তার পর দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটা কামড়াতে কামড়াতে নিবিষ্ট মনে বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "এ আর কারুর কায নয় শৈলেশ বাবু, এ হচ্ছে সেই প্রখ্যাত গুণ্ডা-সর্দ্দার খোকা বাবুর কায। আমার দৃঢ় বিশ্বাস খুনটা সে নিজেই করেছে। শিউচরণ ঠিকই বলেছিল, খোকা কাউকে ক্ষমা করেনি, তাকেও করবে না। আমার মতে এই সময় সে ভিতরে পরেছিলো একটা পাণ্ট্‌লুন ও সার্ট, এবং উপরে সে চড়িয়েছিল একটা কোট ও লুঙ্গী। রক্তমাখা লুঙ্গী ও কোটটা এখানে ফেলে দিয়ে পাণ্ট্‌লুন ও সার্ট পরে সে-ই গলি থেকে বেরিয়ে গেছে।"

"অতি সাবধান হতে গিয়ে, স্যার, ও তো দেখছি, এতোগুলো প্রমাণ নিজের অজ্ঞাতে সে নিজেই রেখে গেছে।" বিস্মিত হয়ে শৈলেশ বাবু বললেন, "এগুলো তো ওর বিরুদ্ধেই এক দিন প্রযুক্ত হবে? লোকটা কি আহাম্মুক?"

শৈলেশ বাবু বিস্মিত হলেও অপরাধ-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিত প্রণব বাবু এই ব্যাপারে একেবারেই বিস্মিত হননি। নিশ্চিন্ত হয়ে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "এই রকমই হয়, যত-বড় সাবধানী অপরাধীই হোক না কেন, অপকর্ম্মের সময় সে এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়ে যে তার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটবেই। এই কারণে সে নিজের অজ্ঞাতে এই সব সাক্ষ্য-প্রমাণ পিছনে ফেলে রেখে যায়, তার জন্যে কি না তার অপরাধী জীবনের পরিসমাপ্তি সহজেই ঘটে থাকে। যে যতো সাবধানী হতে চায় সে ততো বেশীই ভুল করে থাকে। তার কোট ও সার্টে রক্তর ছিটে লাগায় সে-ই ঐগুলো ফেলে রেখে গেছে, কিন্তু তুমি হয়তো ঐগুলোর উপর এমন সব 'ধোবির মার্কা' পাবে যা থেকে কি না তুমি সহজেই প্রমাণ করতে পারবে যে, ঐগুলোর অধিকারী ঐ খোকা গুণ্ডাই।"

উৎফুল্ল এবং সেই সঙ্গে অধীর হয়ে শৈলেশ বাবু বললেন, "তা হলে তো ঐগুলোর এক্ষুনি চার্জ্জ নিতে হয়।"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "ধীরে—ধীরে শৈলেশ বাবু, উত্তেজিত হয়ে উঠলে বুদ্ধিভ্রংশ-জনিত আপনিও খোকার মতো ভুল করবেন। তদন্তের সময় ভুল হলে বিচারের সময় আসামী খালাস পেতে পারে। শুধু কেইস্ ডিটেক্ট করে আসামী ধরলেই হলো না, সাক্ষ্য-প্রমাণ সুষ্ঠু ভাবে জজ ও জুরীদের কাছে পেশ করারও প্রয়োজন আছে। তা না হলে আপনার সকল পরিশ্রমই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হতে পারে। তদন্তের মধ্যে ভুলের জন্য ফাঁক থেকে গেলে সত্য কেইসও মিথ্যার মতো মনে হয়। শেষ বিচার যাদের কাছে হবে তাদের কথাও এখোন থেকেই আমাদের ভাবা উচিত, বুঝলেন?"

লজ্জিত হয়ে শৈলেশ বাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কিন্তু স্যার, খুনেটাকে এখোনই ধরার বন্দোবস্ত করলে হয় না?"

উত্তরে প্রণব বাবু বললেন, "শুধু আসামী ধরলেই তো হলো না। আসামী ধরে যদি তাকে প্রমাণের অভাবে ছেড়েই দিতে হয়, তাহলে ধরা না ধরা তো সমান কথা। এই ক্ষেত্রে দুই-ই একসঙ্গে করা দরকার। তাড়াতাড়ি আসামীকে পাকড়াও করে তার বাড়ী তল্লাস করলে আরও কিছু প্রমাণাদি পাওয়া যেতে পারে। শুনেছি, নিকটেই কোনও একটা বস্তীতে তার একটা ডেরা আছে। তুমি বরং চেষ্টা করো জায়গাটা খুঁজে বার করতে। এই জায়গায় আর কোনও সাক্ষী-সাবুত পাওয়া যায় কি না, তা'ও দেখা দরকার। এ ছাড়া এই পায়ের ছাপগুলো সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করতে হবে, তা না হলে ভোরের দিকে লোক-চলাচল সুরু হলে এইগুলো নষ্ট হয়ে যাবে। আমি বরং এইগুলো নিয়েই পড়ে থাকি, বুঝলে ?"

ধীর পদবিক্ষেপে প্রণব বাবু সহকারী শৈলেশ বাবুকে উপদেশ দিতে দিতে গলিটা হ'তে বার হয়ে আসবা মাত্র এক জন সিপাই সেলাম করে জানালো—"বড় সাহেব আ' গিয়া হুজুর !"

বিব্রত হয়ে উভয়ে লক্ষ্য করলেন, সাহেবের মোটর গাড়ীখানা অনতিদূরে এসে অপেক্ষা করছে। প্রণব এবং শৈলেশ বাবু গাড়ীর পাশে এসে বড় সাহেবকে অভিবাদন করে জানালেন, "গুড এভনিং স্যার !"

"গুড্ ইভনিং" বলে প্রতি-অভিবাদন জানিয়েই বড় সাহেব মিঃ মুখার্জ্জি বললেন—"আর গুড ইভনিং ! রাত তিনটা বাজে, এখোন মরণিং হতে চললো।" এর পর চক্ষু মুদ্রিত করে একটা হাই তুলে মিঃ মুখার্জ্জি বলে উঠলেন, "তুমি থানায় না থাকলেই যতো গণ্ডগোল বাধে দেখি ! কি বিশ্রী একটা ব্যাপার হয়ে গেলো বলো দেখি ? তোমার জুনিয়ারগুলো হয়েছে একেবারে যাচ্ছে-তাই। আমাকে আসল ব্যাপারটা এক্সপ্লেন করলে না হে ! এক্সপ্লেন করলে কি লোকটাকে আমি তাড়িয়ে দিই, ছিঃ, ছিঃ, ছিঃ ! তোমার জুনিয়ারটাকে বিদেয় করো, বদলি করে দাও, নয়তো তুমিই এক দিন বিপদে পড়বে। তা যাকগে যাক, যা হয়ে গেছে তার তো আর চারা নেই। এই সব কথা আর ডায়েরীতে লিখো না হে, বুঝলে ? আমার আবার ছোট মেয়েটার বড্ড অসুখ, বেশীক্ষণ থাকবো না। উপদেশের দরকার হলে টেলিফোন করো, কেমন ?"

একটু কাষ্ঠ-হাসি হেসে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "তা স্যার, আপনি এখোন যেতে পারেন। সকাল সাতটার মধ্যেই আমি রিপোর্ট পাঠাবো।"

"হাঁ হাঁ, তাই পাঠিয়ো, হেড-কোয়ার্টারে আটটার মধ্যে পৌঁছিলেই হলো, হাঁ, তার পর—" বড় সাহেব বললেন, "আমার মনে হয়, অন্য কোথাও একে মেরে বডিটা এখানে ফেলে গেছে। আখচা-আখচির ব্যাপার আর কি ! ঐ দোকানদারগুলোও না কি সব কথা বলছে না, তা হলে হয়তো ওরাও দলে আছে। ওর কোনও রক্ষিতা আছে কি না তাও দেখা দরকার। যা মনে হয় তা করে যাও তো এখোন, আমি তা হলে এখোন যাই, কেমন ?"

ছোট দারোগা শৈলেশ বাবু এতক্ষণ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলছিলেন। তাঁর ইচ্ছা করছিলো বাঙালী সাহেবের নাকটা ঘুসি মেরে ভেঙে দেয়, কিন্তু তাতে চাকুরী যাবার সম্ভাবনা আছে। বড় সাহেব চলে গেলে প্রণব বাবুকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, "আহা, কি উপদেশই যা দিয়ে গেলেন ! এতক্ষণে আরও কিছু কায শেষ করতে পারতাম। মিছামিছি এতোক্ষণ সময় নষ্ট হলো।"

হেসে ফেলে প্রণব বাবু উত্তর করলেন, "এ আর নূতন কথা কি ? পরিদর্শন বা সুপারভিসন্ শেষ হলে তবে আসল তদন্ত বা ইনভেস্টিগেশন সুরু হয়ে থাকে। এইবার এসো কায সুরু করা যাক্। আমাকে আবার ছ'টায় ফিরে রিপোর্ট লিখতে হবে। তদন্ত হোক আর না হোক, তদন্তের রিপোর্টটা সকালেই পৌঁছানো চাই। তদন্তের পূর্ব্বেই তদন্তের রিপোর্টটা পাঠাতে পারলে বোধ হয় এঁরা আরও অধিক খুসী হতেন !"

প্রণব বাবু এইবার নিবিষ্ট মনে তদন্তে মনোনিবেশ করলেন। প্রতীক্ষমান স্ত্রীর কথা তাঁর আর মনেই এলো না। কাযের মধ্যে তিনি নিজেকে হারিয়ে ফেললেন। আরও কিছুক্ষণ নিস্ফল তদন্তের পর উভয়ে যখন কোতোয়ালী অভিমুখে রওনা হলেন, সকাল সাতটা তখন বেজে গেছে। উভয়েরই মুখ-চোখ কালো হয়ে গেছে, চুলগুলোও তাদের উস্কখুস্ক। মদ্যপায়ী যুবকের মতই টলতে টলতে সকাল বেলায় তাঁরা থানার সামনে এসে দাঁড়ালেন। দূর হতে প্রণব বাবু উপরের দিকে চেয়ে দেখলেন, শান্তা দেবী চুপ করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে পথের দিকে চেয়ে রয়েছেন। শান্তাকে দেখতে পাওয়া মাত্র প্রণব বাবুর সকল ভাবনা-চিন্তা মন হতে অপসৃত হয়ে গেল, এবং সেই স্থলে উপনীত হলো এক অপরিসীম লজ্জা। থানায় ফিরেও তাঁকে অফিসে বসে রিপোর্ট প্রভৃতি লেখার জন্যে আরও ঘণ্টা দুই অতিবাহিত করতে হবে। নয়টা-দশটার পূর্ব্বে উপরে উঠা অসম্ভব। কেইস্ তদন্তের ভাবনা ব্যতীত, আরও অনেক ভাবনা উভয়ের অন্তস্তল বিদীর্ণ করতে সুরু করে দিলে।

প্রণব বাবু ভাবছিলেন, অতো বেলায় উপরে উঠে শান্তাকে তিনি কি কৈফিয়ৎ দেবেন। হয়তো শান্তা তাঁর কথা বিশ্বাস করবে, হয়তো বা সে তা করবে না। আর পাঁচ জনের মত পুলিশদের সম্বন্ধে শান্তারও হয়তো একটা বিরূপ ধারণা আছে, তা সে মুখ ফুটে বলুক আর না বলুক। আজ হয়তো তার সেই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যাবে।

শৈলেশ বাবুর মনটা কাল হতেই খারাপ ছিল। বড় সাহেবের কটু উক্তি তার মন আরও বিষিয়ে দিয়েছে। কালকের মত আজও এইরূপ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে তাকে স্ত্রীর কাছে ফিরতে হবে। হয়তো কালকের মত আজও সে জিজ্ঞাসা করবে, "তুমি অমন মন-মরা হয়ে আছো কেন ? বলো না কি হয়েছে ? বলবে না তো ? আচ্ছা বেশ বলো না। অভিমানে হয়তো সে মুখ ঘুরিয়ে নেবে।

অবৈতনিক হাকিম মিঃ সরকারের বিচার-কক্ষে বোধ হয় এতো জন-সমাবেশ পূর্ব্বে কখনও হয়নি। সচরাচর ভাবে আদালত-কক্ষগুলি জনাকীর্ণ হয়ে থাকে, কিন্তু এতো জন-সমাগম বহু দিন সেখানে হয়নি। আদালত-কক্ষে তিলধারণেরই স্থান নেই, এমন কি অলিন্দ ও প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত লোকে লোকাকীর্ণ।

রেলিঙ-বেষ্টিত মঞ্চের উপরকার কাষ্ঠাসনটি তখনও পর্য্যন্ত হাকিম বাহাদুর কর্ত্তৃক অধিকৃত হয়নি। তখনও পর্য্যন্ত হাকিম বাহাদুর খাস-কামরায় অপেক্ষা করছেন। যে কোনও মুহূর্ত্তে বেরিয়ে এসে বিচারাসনে বসতে পারেন।

হাকিমের মঞ্চাসনের নিম্নের একটি টেবিলের এক পার্শ্বে বসে আদালতের পেশকার কাগজ-পত্র গুছাচ্ছেন। সামনের চেয়ার ও বেঞ্চগুলি অধিকার করে বসে আছেন উকিল-মোক্তারের দল। জন-সাধারণের মধ্যে অনেকেই আসনের অভাবে ভীড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ঐ দিনকার চাঞ্চল্যকর মামলা শুনবার জন্তেই এতো ভীড়, কারণ দুইটি মামলাই ছিল নারীহরণের। এই মামলাদ্বয়ের একটি মামলার ফরিয়াদী ছিলো সুধীর। খোকার সাহায্যে সে এক জন বড় উকিলই নিযুক্ত করেছে।

সাক্ষীর কাঠগড়ার পাশে একটা টুলের উপর নীরবে বসে সুধীর তার অদৃষ্টের কথা ভাবছিল, অনতিদূরে একটা বেঞ্চের উপর ঘোমটার অন্তরালে আত্মগোপন করে যে বধূটি বসে আছে—মাত্র এক মাস পূর্ব্বে সুধীরেরই বধূ ছিল, কিন্তু আজ সে সুধীরের নয়, সে সম্পূর্ণরূপে অপরের করায়ত্ত এক কুলটা নারী। বরুণা নামে পরিচিতা এই নারীকে আড়াল করে বসে আছে সুরমা কীর্ত্তনী ও তার সাকরেদ লক্ষ্মীকান্ত। সুধীরের দিকে একটা সতর্ক দৃষ্টি রেখে তারা বরুণাকে সাহস দিয়ে তোতা পাখীর মতো করে শিখানো বুলিগুলো নূতন করে তাকে মনে করিয়ে দিচ্ছিলো, যাতে করে জবানবন্দী দেবার সময় তার একটি কথাও সে ভুলে না যায়।

বিষাদ-ভারাক্রান্ত মনে সহস্র বৃশ্চিকের দংশন-জ্বালা অনুভব করতে করতে সুধীর বিরুদ্ধপক্ষীয় ব্যক্তিদের সহিত উপবিষ্টা আপন নারীর প্রতি বারে বারে চেয়ে দেখছিলো, কিন্তু পরক্ষণেই আবার সে তার মুখ অন্ত দিকে ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

সুধীরের এই দুর্ব্বলতা ও সকরুণ ভাব স্বপক্ষীয় মুহুরী অরবিন্দ বাবুর নজর এড়ায়নি। একটু এগিয়ে এসে তিনি বিরুদ্ধ পক্ষীয়দের শুনিয়ে শুনিয়েই অনুযোগ করে সুধীরকে বললেন, "আর কেনো মায়া বাড়ান? ও কি আর মানুষ আছে? মন খারাপ না করে এই দিকে আসুন।"

বরুণা যে আর তার হবে না, সুধীর তা থানাতেই বুঝেছিলো। কোর্টের পরোয়ানার বলে পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার করে তাকে থানায় এনেও, সে তাকে ধরে রাখতে পারেনি। ইনস্পেক্টার থেকে মুনসী বাবু পর্য্যন্ত সকলেই তাকে বুঝিয়েছে, কিন্তু কেউই তাকে সুধীরের সঙ্গে ফিরে যেতে রাজী করাতে পারেনি। ভালো মেয়ে যদি একবার মন্দ হয় তা'হলে এমনই হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিকরা একে এক প্রকারের রোগ বলে থাকেন। হিষ্টিরিয়া রোগীর মত এই রোগ একবার উপনীত হলে রোগমুক্ত হতে সময় লাগে। ভয়-ভাবনা যৌন-তাড়না হ'তেই এই রোগের উৎপত্তি। কুসঙ্গের স্তায় ভয় ও লজ্জাও ছিল তার এই রোগের কারণ। কোন্ মুখে সে তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে! অনেক বাদানুবাদ চলে, কিন্তু সুফল ফলে না। সাবালিকা বিধায় সুরমা কীর্ত্তনীর জামীনেই সে মুক্তি পায়। তারই বধূকে তারই সামনে দিয়ে তারা নিয়ে যায় যথাসময়ে তাকে আদালতে হাজির করবে এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে। হুকুম মোতাবেক আদালতে তাকে তারা হাজিরও করেছে। আদ্যোপান্ত সব কথা মনে পড়া মাত্র সুধীরের সারা অঙ্গ রাগে রি-রি করে ওঠে কিন্তু তবুও তাকে তা সহ্য করতে হয়, সহ্য করা ভিন্ন উপায়ই বা আর কি আছে?

মুহুরী অরবিন্দ বাবুর কথায় সুধীরের চোখ দু'টো সজল হয়ে। কোনওরূপে অশ্রু সংবরণ করে সুধীর উত্তর করলো, "কি বলবো বাবু, ওকে যখন আমি ঘরে এনেছিলাম ও তখন এই এতটুকু ছিল। এখোনই বা এমন কি বড় হয়েছে? ঐ বজ্জাৎ মাগীই ওকে ঔষধ খাইয়ে গুণ করেছে, তা না হলে ওর মত মেয়ে কি ঘর ছেড়ে চলে আসে? এক ঘণ্টা—মাত্র এক ঘণ্টার জন্তে ওকে আমার হাতে ছেড়ে দেন, কর্ত্তা, দেখবেন ও ঠিক আগের মতই হয়ে গেছে। এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস।"

অরবিন্দ বাবু ছিলেন এক জন পাকা মুহুরী। সুধীরের কথা শুনে তিনি একটু হাসলেন মাত্র। ভালো মেয়ে একবার মন্দ হলে সে যে কত দূর সাংঘাতিক হ'তে পারে, তা সুধীরের জানা না থাকলেও অরবিন্দ বাবুর তা ভালোরূপেই জানা ছিল। মক্কেলের সঙ্গে তাঁদের যা-কিছু সম্পর্ক তা পয়সার, মামলার ফলাফলের জন্ত তাদের কোনও মাথা-ব্যথাই নেই। তা ছাড়া, ফি-এর টাকাটা তিনি সকালে এসেই আদায় করেছেন। সুধীরকে আর নিরুৎসাহ না করে তিনি সুধীরের উকিলের পাশে এসে দাঁড়ালেন।

আদালতের সমবেত জনতার কলগুঞ্জন এবং বিবাদী, প্রতিবাদী ও আইনজীবীদের দৌড়াদৌড়ির মধ্যে আরও কতক্ষণ সময় অতিবাহিত হলো। তার পর হঠাৎ প্রতীক্ষমান জনতাকে উতলা করে দিয়ে খাস-কামরার দুয়ারের পর্দ্দাটা ঈষৎ নড়ে উঠলো এবং সেই সঙ্গে কোর্টের চাপরাশী হেঁকে উঠলো, "আস্তে। এই, খবরদার, তফাৎ যাও।"

হাকিম বাহাদুর আদালতকে নিস্তব্ধ করে দিয়ে বিচারাসনে এসে সমাসীন হলেন। এর পর তিনি বাম হাতের কনুইটি টেবিলের উপর ন্যস্ত করে, ডান হাতের কলমটি উভয় ঠোঁটের মধ্যে চেপে ধরে ভাবতে সুরু করলেন, কোন্ কেইসটি তিনি আগে শুনবেন।

হাকিমের মনোভাব পূর্ব্বাহ্নেই বুঝে নিয়ে পেশকার বাবু বলে উঠলেন, "মমতাজ বিবির কেইসটা ছোট আছে, হুজুর, এইটেই আগে নেন। এই যে হুজুর, দশ নম্বরের ফাইল।"

মমতাজ বিবির মামলা সংক্রান্ত নথীপত্র হুজুরের নিকট পেশ করে পেশকার বাবু তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে বসে পড়ছিলেন, হঠাৎ অতর্কিতে তাঁর বাম হাতের কাগজের তলা হতে অলক্ষ্যে একটা আধুলি ঠং করে নীচে গড়িয়ে পড়লো। আধুলির এই অতর্কিত টঙ্কার-ধ্বনি হাকিমেরও কানে গিয়েছিলো। নীচের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিরক্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "কি করেন মশাই, কুড়িয়ে নেন না।" সলজ্জ ভাবে পেশকার বাবু নীচে নেমে মুদ্রাটি কুড়িয়ে নিলেন সমাগত আইনজীবীদের মৃদু গুঞ্জন উপেক্ষা করে। হাকিম হেঁকে উঠলেন, "সাইলেন্স।" পেশকারের নির্দ্দেশে চাপরাসী হেঁকে উঠলো, "আসামি-ই আলি সেথ।" এবং পরে সে নিজেই বলে উঠলো, "এই যে এইয়ে গেছে। মমতাজ বিবিও এয়েছেন।" চাপরাশী আবার হেঁকে উঠলো, "ফরিয়াদী নুরুল হক্ চৌধুরী, হাজির হোউপ।" এতো হাঁক-ডাকের কোনও প্রয়োজন ছিল না। বাদী-বিবাদী সকলে প্রস্তুতই ছিল। হাঁক-ডাক শেষ হবার পূর্ব্বেই দেখা গেল, আসামী কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে আর মমতাজ বিবি এসে দাঁড়িয়েছেন সাক্ষীর কাঠগড়ায়।

মুড়িশুড়ি দিয়ে সলজ্জ ভাবে কুঁকড়ে পড়ে বোরখাবৃত মমতাজ বিবি সাক্ষীর জন্ত নির্দ্দিষ্ট কাঠগড়ায় উঠে দাঁড়ালো মাত্র, আসামীর উকিল বিনোদ বাবু বলে উঠলেন, "এই হুজুর মমতাজ বিবি, আমরা হাজির করে দিলাম। আসামীও এসেছে ঐ।"

অদূরে আসামী নূরুল হক দাঁড়িয়ে আছে। ৫০০ টাকা জামানতে সে খালাস ছিল। আসামীর উকিল এইবার তাঁর মক্কেলকে সম্বোধন করে বললেন, "হ্যাঁ, হয়ে গেছে। এইবার জেনানাকে নেমে এসে ঐ বেঞ্চিটায় বসতে বল।"

হঠাৎ এই সময় ফরিয়াদীকে তার উকিল বাবুর কানে কানে কি বলতে শুনা গেল। সব কথা শুনে উকিল বাবু বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। অস্ফুট স্বরে তিনি বলে উঠলেন, "এঁ্যা, বলিস কি রে, তাও কি কখনও হয়?" কিন্তু ফরিয়াদী নাছোড়বান্দা, অগত্যা ফরিয়াদীর উকিল দাঁড়িয়ে উঠে সকলকে অবাক্ করে দিয়ে জানালেন, "একটা কথা হুজুর, জেনানাকে দাঁড়াতে বলুন ওখানে। আমার মক্কেল বলছে, ঐ জেনানাটি তো তার জেনানা নয়ই, এমন কি ও কাউরই জেনানা নয়। আসলে ও জেনানাই নয়, ও এক জন মর্দ্দনা, হুজুর! এক জন পুরুষকে ওরা জেনানা সাজিয়ে কোর্টে এনেছে। ওকে বোরখাটা এখনই খুলতে বলা হোক্, হুজুর!"

আসামীর উকিল পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠলেন, "হুজুর, ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে। এখানে তো ও হাজিরি দিচ্ছেই, তা ছাড়া আমার বাড়ীতেও ঐ জেনানা বহু বার গিয়েছে। এ শুধু ওকে বেইজ্জত করার মতলব, হুজুর!"

ফরিয়াদীর উকিল একটু ভড়কে গেলেন, কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্যে। মক্কেলকে আরও গোটা দুই কথা নিম্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করে তিনিও তাঁর আর্জ্জি পেশ করে বললেন, "বেশ, তা হলে হুজুর, ওর বোরখাটা খুলে ফেলা হোক। দেখা যাক, ও মেয়ে কি পুরুষ। এর জন্য যা কিছু দায়িত্ব তা আমার মক্কেলের।"

আসামীর উকিলও প্রস্তুত ছিলেন। তিনি খেঁকরে উঠে বললেন, "এ তো বড় জুলুমের কথা, হুজুর! পর্দ্দানশীন জেনানার বোরখা খুলবে, মানে? আস্পর্দ্ধার কথা দেখছি। লিখে নিন হুজুর এই সব। রেকর্ডে থাকা ভালো। কালই আমরা ওদের নামে মানহানির মামলা আনবো।"

কিন্তু এতো সত্বেও ফরিয়াদীর উকিল নাছোড়বান্দা। তিনি এ জন্য যে কোনও দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত আছেন। অগত্যা হাকিম বাহাদুর জেনানাকে বোরখা খুলতে হুকুম করলেন। কিন্তু সে কিছুতেই বোরখা খুলবে না। নাচার হয়ে হাকিম বাহাদুর কোর্টের সিপাইকে স্ত্রীলোকটির উপর নজর রাখতে বলে পেশকারকে কোর্ট ইনস্পেকটারকে খবর দিতে বললেন।

এর পর এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। সকলে লক্ষ্য করলো, জেনানাটি বোরখা-সমেত ছুট দিতে সুরু করেছে। দরজার সিপাহী সজাগই ছিল—জেনানার পিছুপিছু সে-ও ছুট দিল। সিপাইজীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চললো আরও জন দশ-বারো লোক। সমস্বরে সকলে চীৎকার করতে থাকে—পাকড়ো পাকড়ো! সকলে মিলে জেনানাটিকে পাকড়াও করে আনলে দেখা গেল, গুম্ফশ্মশ্রুমণ্ডিত এক পুরুষই এতক্ষণ বোরখার অন্তরালে আত্মগোপন করেছিলো!

হতভম্ব হয়ে বিরক্তির সহিত হাকিম বাহাদুর আসামীর উকিল বিনোদ বাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি বিনোদ বাবু, এই কি আপনার প্রফেস্যানাল কণ্ডাক্ট? এঁ্যা!"

বেগতিক বুঝে সলজ্জ ভাবে আসামীর উকিল উত্তর দিলেন, "আমার কি দোষ হুজুর! আমি কি ওর কখনও মুখ দেখেছি। এই বোরখা পরেই আমার বাড়ীতে এসে ও আমাকে ইনাকৃট্রাকসন দিতো। এর মধ্যে যে এতো ছিল তা কে জানতো, হুজুর!"

এর পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উচ্চ হাস্যধ্বনি পড়ে গেল। হাকিম হ'তে সুরু করে চাপরাশী পর্য্যন্ত সেই হাসিতে যোগ দিয়েছে, সুধীর পর্য্যন্ত সেই হাসির মধ্যে তলিয়ে গেছে নিজের অজ্ঞাতেই। ধীরে ধীরে আদালতের হাস্য-কলরোল থেমে এলো, সুধীরও প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠলো। কিন্তু এবার হাসির বদলে তার চোখ দিয়ে বেরিয়ে এলো জল। পৃথিবীতে তা'হলে সে একাই দুঃখী নয়। ইতিমধ্যে কোর্ট-বাবুও এসে গেছেন, সকল কথা শুনে একটু হেসে নিলেন। হাকিম বাহাদুর এইবার আসামী, ফরিয়াদী, পুরুষ-জেনানাটি, তার বোরখা, মায় উভয় পক্ষের উকিলদের পর্য্যন্ত এই বিশ্রী ঘটনার তদন্তের জন্যে কোর্ট-বাবুকে সঁপে দিয়ে পরবর্ত্তী কেইসটির বিচার সুরু করলেন।

আদালত পুনরায় গম্ভীর হয়ে উঠলো। বরুণার মামলা সুরু হয়েছে। জন-সাধারণের কাছে এই মামলাটি নাম পেয়েছে 'বরুণা নির্য্যাতনের মামলা', বরুণা হরণের নয়। হরণ কথাটি ইতিমধ্যেই চাপা পড়ে গেছে। আদালত-কক্ষ আবার লোকে লোকারণ্য হয়ে গেলো। মহামান্য হাকিম বাহাদুর বরুণার জবানবন্দী গ্রহণ করবেন। বরুণা সাবালিকা—সব কিছুই নির্ভর করবে তার মুখের কথার উপর। হাকিম বাবু কলম উঠিয়ে সুধীরের উকিলকে বললেন, "কি রমেশ বাবু, এই মামলাতেও কি কিছু নূতনত্ব হবে না কি?"

উত্তরে ঠাট্টা করে রমেশ বাবু জানালেন, "আদালতের সকল ব্যাপারই বিচিত্র, হুজুর! হয়তো শেষ পর্য্যন্ত বিয়োগান্ত না হয়ে মিলনান্তও হয়ে যেতে পারে। আমার মতে হুজুর এদের দু'জনাকে কিছুক্ষণ আপনার খাস-কামরায় বসিয়ে রাখুন। হয়তো এতে স্বামি-স্ত্রীর মিটমাটও একটা হয়ে যাবে।"

কথাটা আসামী পক্ষের উকিলের মনপূতঃ হয়নি। ফরিয়াদী পক্ষের এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করে আসামী পক্ষের উকিল মহেশ বাবু খেঁকরে উঠলেন, "এ সব দায়িত্ব নেবেন না হুজুর, এতে করে প্রাণহানি পর্য্যন্ত হয়ে যেতে পারে!"

কিছুক্ষণ এমনি তর্কাতর্কির মধ্যে উভয় পক্ষের সওয়াল শুনে হাকিম প্রথমে বরুণার জবানবন্দী নেওয়াই স্থির করলেন। হাকিমের হুকুমে ঠক্-ঠক্ করে কাঁপতে কাঁপতে বরুণা ঘোমটা দিয়ে মুখ ঢেকে সাক্ষ্য-মঞ্চের উপর উঠে দাঁড়ালো। হাকিম বাহাদুর তাঁর জবান-বন্দী নিতে শুরু করলেন।

আসামীর উকিল মহেশ বাবু বরুণাকে প্রশ্ন করলেন, "বল তো মা-লক্ষ্মী, বলে যাও। এ আদালত, এখানে কোনও ভয় নেই তোমার, তোমাকে ও বড্ড কষ্ট দিত, না?"

বরুণা দুই দিকেই মাথা নাড়লো, কিন্তু মুখে কোনও কথাই উচ্চারণ করলো না।

আসামীর উকিল মহেশ বাবু বলে উঠলেন, "লিখে নিন হুজুর, বড্ড ওকে কষ্ট দিতো, জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ও স্ব-ইচ্ছায় চলে আসে।"

মহেশ বাবুর এইরূপ বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিবাদ করে সুধীরের

উকিল চেঁচিয়ে উঠলেন, "না হুজুর, ও কথা উনি কক্ষণো বলেননি। ভালো করে ওঁকে ও কথা জিজ্ঞাসা করা হোক।"

উত্তরে আসামীর উকিল মহেশ বাবু বললেন, "ঘাবড়াচ্ছেন কেন মশাই, বলবে বই কি, সবই ও বলবে।" এর পর উকিল মহেশ বাবু তাঁর মক্কেলকে বরুণার কাছে গিয়ে দাঁড়াবার জন্ম উপদেশ দিয়ে বরুণাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাঁ মা, তা হলে তুমি তোমার ঐ মাসীর সঙ্গেই যেতে চাও?"

সুরমা কীর্ত্তনীর উপর সুধীর যে মর্ম্মান্তিকরূপে ক্রুদ্ধ হয়েছিল, সে কথা না বললেও চলে। উকিল মহেশ বাবুকে সুরমাকে বরুণার মাসী বলে চালিয়ে যেতে শুনে সে আত্মসংবরণ করতে পারলো না। সে ক্ষেপে উঠে নিজেই আদালতকে উদ্দেশ করে চেঁচিয়ে উঠলো, "ও কোনও কালে ওর মাসী নয়, সব মিথ্যে কথা হুজুর!"

বরুণার উত্তরের অপেক্ষায় আর পাঁচ জনের মত হাকিম বাহাদুরও কান খাড়া করে বসেছিলেন, হঠাৎ সুধীর এই ভাবে চেঁচিয়ে উঠায় তিনি ধমকে উঠলেন, "এই চোপরাও, তোমাকে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। কোনও কথা বলবে না আর।"

বরুণার ঐ একটা কথার উপর অতঃপর এই মামলার ফলাফল নির্ভর করছিলো। ধমক খেয়ে সুধীর চুপ করে গিয়ে দুরু-দুরু বক্ষে সে-ও বরুণার উত্তর শুনবার জন্তে কান খাড়া করলো। 'হাঁ' বা 'না' মাত্র এই একটা কথা সুধীরের মামলার জয় বা পরাজয় নির্দ্ধারিত করে দেবে। আকুল হৃদয়ে সে বরুণার দিকে চেয়ে তার উত্তরের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলো।

বরুণার চোখ অশ্রুজলে উপচে উঠছিল। ক্ষণিকের দুর্ব্বলতা ও উন্মাদনার কারণে, সে যা করে বসেছে তার আর চারা নেই। ঝোঁকের মাথায় বেরিয়ে এসেই সে এ কথা বুঝতে পেরেছিলো, কিন্তু এখোন তার কর্ত্তব্য কি হবে, তা তাকে কে বলে দেবে? সে কোন্ মুখে তার স্বামীর কাছে ফিরে যাবে? স্বামী কি তাকে তেমনি হাসি-মুখে আর গ্রহণ করবেন? তার মনে হলো, সে যেন একটা উচ্ছিষ্ট ফুল। এ ফুল দিয়ে কি আর দেবতার পূজা হবে? বুঝি বা এতে তার প্রাণের দেবতার অকল্যাণই হবে। ভয়ে-ভাবনায় অপরিসীম লজ্জায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠে বরুণা উত্তর দিল,—সে মাসীর সঙ্গে যাবে, সুধীরের সঙ্গে যাবে না।

কলিকাতার বস্তী ও বস্তী-বাড়ীতে বাস করার ছিল এক অবশ্যম্ভাবী ফল। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। এই সব বস্তী-বাড়ীতে এইরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। এই সব বস্তীতে এক-একটি দরিদ্র পরিবার এক-একটি কামরায় বাস করে অন্যান্য বহু অজ্ঞাতকুলশীল পরিবারের সঙ্গে। তারা এক কল, চৌবাচ্ছা ও পাইখানা ব্যবহার করে। সংগ্রাহিকারা এই সব বস্তী-বাড়ীর বধূদের ধীরে ধীরে লোভী করে তোলে এবং স্বামীর উপর বিরূপ করে দেয়। এর পর কোনও এক ব্যক্তির দ্বারা আদালতে দরখাস্ত করিয়ে শুভা-কাঙ্ক্ষীটি হাকিমকে জানায়, মেয়েটির উপর অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। মেয়েটির উদ্ধারের জন্ম আবেদন জানান হয়। ম্যাজিষ্ট্রেট কানুন মতো পরোয়ানা জারী করেন। পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করে আদালতে আনে। অনেক সময় সংগ্রাহিকার লোকই বধূর জামীন হয়, যেমন এই ক্ষেত্রে হয়েছে। কোর্টে হাজির হওয়ার দিন পর্য্যন্ত সে কুশিক্ষাই পায় এবং তোতা পাখীর মতন বয়ান মুখস্থ করে। সাধারণতঃ মেয়েরা যার হেপাজতে থাকে, তারই প্রামোফন হয়ে উঠে, মনের মতো লোক পেলে তো কথাই নেই; আদালতে যা হবার তাই হয়, আদালতে বধূটি অনেক কাল্পনিক অত্যাচারের কথা বলে, তা শুনে আদালত শুদ্ধ লোকের চোখে জল আসে। কিছুক্ষণ পর হাকিম রায় দেন, "মেয়ে সাবালিকা, যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে।" অচিরে চোখের জল মুছতে মুছতে হাসি-মুখে বধূটি বেরিয়ে আসে, কিন্তু ঘরে ফিরে না। এই ক্ষেত্রেও এই সত্যটির কোনওরূপ ব্যতিক্রম হলো না।

বরুণাকে কাঁদতে দেখে তার দুঃখ-কষ্ট সম্বন্ধে আদালতের আর সন্দেহ রইল না। এই হাকিম বাহাদুরের নিজের কন্যাও এইরূপ দুঃখ-কষ্ট পেয়ে স্বর্গগতা হয়েছে। তিনি নিজেও এক জন ভুক্তভোগী। তিনি ভুলে গেছেন, তিনি এখানে সমাজ-সংস্কার করতে আসেননি, বিচার করতে এসেছেন, বিচারকের উপযুক্ত সুসংযত মন তাঁর ছিল না। তিনিও অত্যন্ত ভাবপ্রবণ হয়ে উঠলেন।

ক্রন্দনরতা বরুণার দিকে একবার চেয়ে দেখে হাকিম বাহাদুর সুধীরের উকিলকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি মশাই, শুনলেন তো সব?"

ক্ষুণ্ণ মনে উকিল উত্তর করলেন, "হাঁ স্যার, শুনলাম সবই। আমরা আর ওকে চাই না।"

ফরিয়াদীর উকিলের মন্তব্য শুনে হাকিম বাহাদুর রায় দিলেন, "মেয়ে সাবালিকা, যেখানে ইচ্ছা সে যেতে পারে।"

সত্যই আদালতের এতে কিছু করবারও ছিল না। চোখের জল মুছতে মুছতে বরুণা সাক্ষীর কাঠগড়া হতে নেমে এলো সুধীরের চোখের সামনেই। সুধীরের কাছে এটা এমনই একটা অঘটন যে সে অভিভূত হয়েই আদালত-কক্ষ হতে বেরিয়ে আসছিল, কিন্তু ঠিক এই সময়ে আবার এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। আদালত-কক্ষটিকে সেই দিন যেন ভূতে পেয়েছে।

হঠাৎ কোর্ট-ইনস্পেক্টার সদলবলে, গুলীভরা পিস্তল হাতে কোর্ট-রুমে ঢুকে বলে উঠলেন, "কৈ, কৈ সে আসামী?"

পিছন হতে এক জন এগিয়ে এসে সুধীরকে দেখিয়ে দিয়ে বলে উঠলো, "এই যে হুজুর, এই সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ তো সেই খোকা গুণ্ডা!"

খোকা গুণ্ডার নাম সকলেরই শুনা আছে, হঠাৎ খোকার আবির্ভাবের সংবাদ শুনে আদালতের লোক-জন ভয় পেয়ে পেছিয়ে এলো, হয়তো এখনই পিস্তলের গুলী ছোঁড়া-ছুঁড়ি সুরু হবে। নিকটেই এক জন বেঙ্গল পুলিশের কনেষ্টবল দাঁড়িয়েছিল। হাতে ছিল তার একটা কম্বল। এই নিত্য-সাথী কম্বলটি সঙ্গে নিয়েই সে সাক্ষী দিতে এসেছিল। খোকা গুণ্ডাকে যে ভালো করেই চিনতো। সুধীরকে খোকা গুণ্ডারূপে চেনা মাত্র সে কম্বলটা জালের মত করে সুধীরের মাথার উপর ছুঁড়ে দিয়ে তার ঘাড়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। এই সিপাহীজির সাহসে সাহস পেয়ে আরও জন-দুই সিপাহীও তার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুধীরকে কম্বল-সমেত চেপে ধরলো।

সুধীরকে সম্পূর্ণরূপে করায়ত্ত করে তার হাতে হাতকড়া লাগিয়ে, দড়ী দিয়ে তাকে বাঁধতে বাঁধতে কোর্ট-ইনস্পেক্টার সুরেন বাবু হাকিমকে জানালেন, "এ হুজুর এক প্রখ্যাত খুনে গুণ্ডা। সৌভাগ্য-ক্রমে আজ ও পিস্তল কাছে রাখেনি। তা না হলে একটা হত্যার বিনিময় ভিন্ন ওকে ধরা অসম্ভব ছিল। শিউচরণ ইনফরমারের খুনের জন্ম ওকে ক'দিন ধরে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

এই রকম একটা নিরীহ লোক যে খুনে হবে হাকিম তা বিশ্বাস করতে চাইলেন না, এ ছাড়া খুন করার পর পালিয়ে না থেকে ফরিয়াদী হয়ে ও কোর্টেই বা আসবে কেন? খোকা গুণ্ডার কাহিনী হাকিম বাহাদুরেরও শোনা ছিল। খোকা যে এই ভাবে ধরা দিবে তা তাঁর ধারণারও বাইরে। সন্দিগ্ধ ভাবে হাকিম বাহাদুর জিজ্ঞাসা করলেন, "দেখবেন মশাই, ভুল করেছেন না তো? আমার মনে হয়, কোথায়ও একটা ভুল হয়েছে।"

কোর্ট-ইনস্পেক্টার স্থরেন বাবুর পাশে তাঁর সহকারী অফিসার একখানা পুলিশ গেজেট হাতে দাঁড়িয়েছিলেন। এই গেজেটে খোকা গুণ্ডার জীবন-ইতিহাস তো ছিলই, তা ছাড়া তাতে খোকার কয়েকটা বিভিন্ন বেহারার ফটোও ছিল। তাড়াতাড়ি বইখানা খুলে ফেলে খোকার পার্শ্ব-ফটো ও সম্মুখ-ফটোর উপর চোখ বুলাতে বুলাতে আসামীকে বার-বার করে দেখে নিয়ে বলে উঠলো, "না স্যার, এই সেই খোকা। এই ফটো দু'খানা, দেখুন না। ঐ দেখুন, আসামীর নীচের ঠোঁট সেলাই করা। ভ্রুয়ের নীচের ও উপরের দাগও তো সেই একই রূপ রয়েছে। হাতে ও বুকে আঁকা উল্কি চিত্রগুলোও হুবহু মিলে যাচ্ছে। হাঁ স্যার, ও খোকাই—"

ভুল যে কোথায় হয়েছিল তা আর কেউ না বুঝুক, বরুণা তা বুঝেছিল। স্বামীর প্রতি আবাল্য ভালবাসা অন্তঃসলিলারূপে তখনও তার প্রতিটি শিরায় শিরায় রয়ে চ'লছে। বরুণা আত্মহারা হয়ে গেল। আর্ত্তনাদ করে সে বলে উঠলো, "না গো, না, উনি খোকা বাবু নন।"

সুধীরের উকিল গত দুই সপ্তাহ ধরে একটি কেইসও জিততে পারেননি। এতে তাঁর মক্কেলের সংখ্যাহানির সম্ভাবনা আছে। মন তাঁর এমনিই নারাজ ছিল, বরুণার কথায় ক্ষিপ্ত হয়ে তিনি বলে উঠলেন, "মর মাগী, আবার দরদ দেখানো হচ্ছে!"

এই ব্যাপারের পর বরুণাকে এখানে আর একটি মিনিট মাত্রও অপেক্ষা করতে দেওয়া নিরাপদ ছিল না। এক জন মেয়েমানুষের উপর নির্ভর করে মামলা লড়ার সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে স্থরমা ও লক্ষ্মীকান্তর ভালোরূপেই জানা ছিল। তারা বরুণাকে সেখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না দিয়ে তাকে হিড়্-হিড়্ করে টানতে টানতে সম্মুখের দরজাটা দিয়ে বার হয়ে গেল, অপর দিকে কোর্ট-বাবু সুধীরকে দুই জন সিপাহীর সাহায্যে টানতে টানতে বার করে নিয়ে গেলেন পিছনের দরজা দিয়ে নীচের হাজত-ঘরের দিকে।　　[ক্রমশঃ।

ভোর

সূর্য্য রায়

চামচে চ য়ের পেয়ালায় তুলে গান
ডাক দিলে তুমি চিনি-সংযোগ কালে,
ঘুম ভেঙেছে কি? স্বপনের জের টেনে,
আমি তো জেগেছি সে গানের তালে তালে!

খোলা বাতায়নে পর্দা নিয়েছ তুলে
ভোরের গন্ধ উম্মন ঘর ছেয়ে,
নিমের পাতার ঝিল্‌মিল্ মিতালীতে
দোদুল তোমার কুন্তল পিঠ বেয়ে।

দূর আকাশের নীলিমায় ভেজা চিল
আকাশের দূর প্রান্ত হ'তে সে ডাকে
আমাদের ঘরে ফেলেছে ডানার ছায়া
এনেছে মেঘের নরম আল্‌পনাকে।

ভোরের স্বপন বলো তো ভেঙেছে কি না?
তুমি যে দাঁড়ায়ে স্বপন-সায়র-কূলে
অঞ্চলে তব ভোরাই হাওয়ার ঢেউ
উদ্বেল নীল সায়র উঠেছে দুলে।

বলো তো এখন উঠে যদি আমি আসি
তোমার নয়ন-পল্লব-পথ বেয়ে
তোমার হাসির চটুল পরাগ মেখে
কোন্ পৃথিবীতে দাঁড়াবে তখন যেয়ে?

ভারতবর্ষ ও ফ্যাশিজম

(শেষাংশ)

গণেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের সম্বন্ধে যা বলা হ'ল তা যে কত দূর সত্য অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখলেই তা বোঝা যাবে। এ বিষয়ে প্রধানতঃ আমাদের হাতে দু'টি প্রমাণ রয়েছে—একটি বোম্বাই-এ শ্রমিক-বিরোধ সংক্রান্ত আইন; দ্বিতীয়টি কেন্দ্রীয় পরিষদে শ্রীযোগজীবন রামের আনা শ্রমিক বিল। এই দুই ক্ষেত্রেই আসল লক্ষ্য—ধর্ম্মঘটের অধিকার হরণ করা। কতকগুলি ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘট হবে একেবারে বে-আইনী —শ্রমিকদের বাধ্যতামূলক ভাবে সালিশী ব্যবস্থা মেনে নিতে হবে। বোম্বাই-এ গুলজারিলাল নন্দার কুখ্যাত আইনটার কথাই ধরা যাক। এই আইনের ৭৩ ধারায় বলা হয়েছে যে লেবার অফিসারের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে গভর্ণমেণ্ট স্থির করবেন, কোন শ্রমবিরোধ বাধ্যতামূলক সালিশীতে যাবে কি না এবং সে ক্ষেত্রে ধর্ম্মঘট বে-আইনী হবে কি না? এখন লেবার অফিসারটি সৃষ্টি করা হয়েছে শ্রমিকদের দমনের জন্য বৃটিশ সরকার মারফং—এঁর অস্থি-মজ্জায় মিশে আছে বর্ত্তমান সমাজের অসাম্যের প্রতি সমর্থন। আর এঁর রিপোর্টের ওপরই ভিত্তি করে ধর্ম্মঘট বে-আইনী করা হবে। অবশ্য ধর্ম্মঘট বে-আইনী করা হচ্ছে বলে ধর্ম্মঘটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে এ কথা শ্রীযুক্ত নন্দা মানতে চান না। তিনি বলেন, ধর্ম্মঘটকে একটু "সংযত" করাই তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু আসল কথাটা ফাঁস হয়ে পড়ল শ্রমিকদের প্রতিনিধির জেরায়। কথোপকথনটা নিম্নরূপ:—

নন্দা: "মহামান্য সদস্য এই পরিষদকে ভুল বোঝাচ্ছেন। ধর্ম্মঘটের পথ খোলা থাকবে।"

ডাঙ্গে: "আমি ধর্ম্মঘট করতে পারি কি?"

নন্দা: "আপনি সালিশীর কাছে যেতে পারবেন।"

এই ভাবে প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া স্পষ্ট উত্তরের চেয়ে অনেক মূল্যবান নয় কি? শ্রমিকরা ধর্ম্মঘট করলে তা বে-আইনী হবে, তাদের মেনে নিতে হবে সালিশী—এই হ'ল বোম্বাই-এর কংগ্রেসী সরকারের মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠার নিদর্শন!

কেন্দ্রীয় সরকারের কংগ্রেসী শ্রমিক-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত যোগজীবন রাম যে শ্রমিক বিলটি এনেছেন তার মূল কথাও বাধ্যতামূলক সালিশী। এই বিলটি ভারত-রক্ষা বিধানের সাম্রাজ্যবাদী আইনের ৮০-ক ধারার ওপর ভিত্তি করে রচিত। এই বিল আইন হলে গভর্ণমেণ্ট রেল প্রভৃতি কয়েকটি "জনসাধারণের প্রয়োজনীয়" শিল্পে ধর্ম্মঘট সম্পূর্ণ বে-আইনী করবেন, ইচ্ছে করলে যে কোন শিল্পে ধর্ম্মঘট বে-আইনী করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকবে। অর্থাৎ বিড়লা-টাটা-ডালমিয়ার অনুরোধে তাঁরা সিমেণ্ট-লোহা-কাপড়ের কলে ধর্ম্মঘটের পথও বন্ধ করতে পারবেন। এ আইন ভাঙলে শ্রমিকের এক মাস জেল হবে, আর জরিমানা হবে পঞ্চাশ টাকা। যারা ধর্ম্মঘটে প্ররোচনা দেবে তাদের ঠাণ্ডা করার জন্যে ৬ মাস জেল ও এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানার ব্যবস্থা করতেও কর্ত্তারা ভোলেননি। নির্ব্বাচনের সময় যাঁরা বলেছিলেন, একবার নির্ব্বাচিত হলে পর তাঁরা আর শ্রমিকদের দুঃখ রাখবেন না, যাঁরা বলেছিলেন, মজদুর-রাজ প্রতিষ্ঠাই তাঁদের ব্রত, এখন তাঁরা ভাল ভাবেই নিজেদের প্রতিশ্রুতি রাখছেন। অনেকে ভাল মানুষের মত বলবেন, বাধ্যতামূলক সালিশীতে আপত্তির কি আছে? আপত্তির কারণ স্পষ্ট। সালিশ নির্ব্বাচন করবেন ধনতান্ত্রিক গবর্ণমেণ্ট—সুতরাং যিনি সালিশী হবেন তাঁর মনোভাবও হবে সাধারণতঃ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সমর্থন করা। সীডনী ওয়েব ও হ্যারল্ড ল্যাস্কির মত মিহি সমাজতান্ত্রিক নেতারাও স্বীকার করেছেন, সালিশীরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ হতে পারেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা এখনো অবশ্য বলছেন, শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি না করে তাঁরা ছাড়বেন না। কিন্তু কাজের সময়ে, প্রথমে শ্রমিকের নিম্নতম মজুরী স্থির করার উৎসাহ তাঁদের দেখা যায়নি: দেখা গেছে, ধর্ম্মঘটের অধিকার কেড়ে নেবার আগ্রহ। জার্ম্মাণীতে শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের অধিকার কেড়ে নিয়ে হিটলার ক্রুপ-থিসেন গোষ্ঠীকে তাদের মধ্যস্থ করে দিয়েছিল—এখানে এখন এই ভারটা দেওয়া হয়েছে সালিশীদের হাতে। এটা যে ফ্যাসিষ্ট কায়দায় শ্রমিক-শাসনের প্রথম পর্ব্ব তা অনুমান করা অসঙ্গত হবে না;—কালক্রমে হিন্দুস্থান মজদুর-সঙ্ঘের সহায়তায় এ ব্যবস্থা আরো পাকা করা হবে সন্দেহ নেই। বোম্বাই-এ যখন এসেম্বলির সামনে শ্রমিকদের ওপর পুলিস লাঠি-চার্জ্জ করে এবং তার সমর্থন করে কংগ্রেসী মন্ত্রী এক বিবৃতি বার করেন তখন এক জন শ্রমিক-নেতা বলেছিলেন, "By attacking the present strikes, instead of solving the workers' grievances, the Minister's statement strengthens profiteering employers against workers and lines up the Congress Government on the side of the anti-popular vested interest." শ্রেণি-সহযোগিতার ভিত্তিতে মজদুর-রাজ স্থাপনের এই হ'ল বাস্তব পরিণাম!

বিশেষতঃ ভারতে যা আশঙ্কা করা গিছল তাই আজ ঘটছে। ভারতের বুর্জ্জোয়া শ্রেণীর প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেস-নেতারা শেষ অবধি আধাআধি (?) বখরার ভিত্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোষ করতে চলেছেন। নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেস-নেতারা তারস্বরে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বলেছিলেন, আমরা "কুইট-ইণ্ডিয়ার" দাবীতে লড়ছি। পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া কিছুতেই আমরা রাজী হ'ব না। অনেকে আবার উৎসাহের আতিশয্যে যাত্রার দলের ভীমসেনের মত গদা ঘুরিয়ে Quit Asia-র ধ্বনি তুলতেও কসুর করেননি। কিন্তু এটা যে কতখানি ফাঁকা বুলি আজ তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে কি? মন্ত্রী মিশনের প্ল্যানে স্বাধীনতার নামগন্ধ নেই, দেশীয় রাজাদের স্বৈরাচার অটুট রাখা হয়েছে, সৈন্য অপসারণের কোন কথাও এতে নেই, তবু কংগ্রেস এই প্ল্যান অনুসারে কাজ করতে রাজী হয়েছেন। একবার অবশ্য জওহরলালজী বলেছিলেন, গণ-পরিষদ ছাড়া কোন কিছুই আমরা গ্রহণ করিনি। কিন্তু তৎক্ষণাৎ দক্ষিণপন্থী-অধ্যুষিত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বললেন, আরে না, না, ওটা পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত মত। আমরা মন্ত্রী মিশনের প্ল্যান পুরোপুরি গ্রহণ করেছি আর সেই হিসাবে কাজও করব। গণ-পরিষদে ঢুকে নেতারা আবার বড় বড় কথা অবশ্য বলছেন কিন্তু যখন মন্ত্রী মিশনের প্ল্যানের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেবার জন্য দক্ষিণপন্থী নেতাদের আপ্রাণ চেষ্টা দেখি তখন এ-সব ধরতাই বুলির অন্তঃসারশূন্যতা সহজেই নজরে পড়ে। অবশ্য এটা আশ্চর্য্য কিছু নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতীয় বুর্জ্জোয়াদের সঙ্গে বৃটিশ পুঁজিপতিদের আঁতাত ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ

হয়েছে—রাজনীতি ক্ষেত্রে যা চলেছে তা এই অর্থনৈতিক compromise এর রাজনৈতিক প্রতিচ্ছবি মাত্র। গণ-বিপ্লবের ভয়ে ভীত ভারতীয় বণিকদের প্রতিনিধি হিসাবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের আত্মসমর্পণের দর-কষাকষিই আজ চলেছে বললে ভুল হবে না খুব বেশি। ভারতীয় সমাজের উপর-তলার সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই আপোষ-প্রচেষ্টা যদি সার্থক হয় তবে ভারতে ফ্যাশিজমের সম্ভাবনা খুবই বেড়ে যাবে। পুনর্গঠনের সময় ধর্মঘট জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী ইত্যাদি বুলিতে তখন শ্রমিক আন্দোলনকে সম্পূর্ণ খর্ব্ব করবার চেষ্টা দেখলে বিস্মিত হব না।

এখানে কেবল কংগ্রেসের মধ্যে ফ্যাশিজমের যে অঙ্কুর রয়েছে তার কথাই আলোচনা করা হয়েছে। লীগের মধ্যে এই ভাব এতই সুস্পষ্ট যে এ বিষয় আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। তা ছাড়া মনে রাখা দরকার, আমার অভিযোগ কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এ প্রবন্ধ পাঠ করে কেউ যদি মনে করেন ভারতে ফ্যাশিজম অবশ্যম্ভাবী তবে তিনি মস্ত ভুল করবেন, সন্দেহ নেই। কেন না, অবশ্যম্ভাবী বলে কিছু নেই, সবই নির্ভর করে মানুষের কাজের ওপর। বিশেষতঃ, ফ্যাশিজম সমাজ-বিবর্ত্তনের পথে একটা প্রয়োজনীয় স্তর নয়। ঠিক সময় গণ-বিপ্লব হলে এর হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায়। আমার বক্তব্য, ভারতে ফ্যাশিজমের সম্ভাবনা আছে এবং কংগ্রেস-নেতাদের বর্ত্তমান আপোষমূলক নীতির ফলে এ সম্ভাবনা খুব বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন একমাত্র শ্রমিক ও কৃষক-বিপ্লব ফ্যাশিজমের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পারে। মধ্যবিত্তের অধিকাংশের স্বার্থ এই বিপ্লবের জয়লাভের সঙ্গে জড়িত, তাই তাঁদের কর্ত্তব্য সর্ব্বতোভাবে একে জয়যুক্ত করা। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ মধ্যবিত্তের মন এবং বুদ্ধি এখনো কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দের শ্রীচরণে বাঁধা দেওয়া,—"জয় হিন্দ" শুনেই তাঁরা লাফিয়ে ওঠেন, কংগ্রেস-নেতারা কি করছেন-না-করছেন তা ভেবে দেখা দরকার বোধ করেন না। তাই জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা হয়, মধ্যবিত্তের চোখ ফুটবে কবে? জেগে ঘুমোনোর পালা তাদের কবে সাঙ্গ হবে?

নোয়াখালী

শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী

হিংস্র নোয়াখালী,
সারা ভারতের মুখে মাখায়েছ ঘোর কলঙ্ক-কালি।
হাজারো বছর গলাগলি ধরি হিন্দু-মুসলমান,
কাকা, চাচা, চাচী, দাদা, নানা, নানী সম্ভাষ প্রতিদান,
সুখে ও দুঃখে শ্মশানে ও গোরে ভোজে আর জিয়াফতে,
আমোদোৎসবে আড়ংএ মেলায় মিলিমিশি কত মতে।
পুরুষ-পরম্পরায় যাহারা প্রতিবেশী আত্মীয়,
ধর্ম্মে-সমাজে পৃথক্ হলেও দেহে-প্রাণে সবে প্রিয়,
আল্লা থাকেন মসজিদে আর শ্রীহরি শ্রীমন্দিরে
পূজা ও মানতে শিরণী দিয়েছে ধুলা মাখিয়াছে শিরে,—
তাহাদের মাঝে কেমনে আসিস হিংসার দুষমণ,
আত্মীয়তায় অমৃত তাদের কে করিল লুণ্ঠন?
এই সে দিনেও শোষক-সৃষ্ট মহা মন্বন্তরে,
ক্ষুধায় মরেছে মুসলিম্ লাখ হিন্দুর গলা ধ'রে,
প্রেতের মতন গলাগলি ধ'রে কেঁদে খুঁড়িয়াছে মাথা,
তখন দরদী পরমাত্মীয় আসেনি অন্নদাতা।
সম্প্রদায়ের স্বার্থে দরদে কারো তো ফাটেনি প্রাণ,
তক্ত-তাউস্ ছেড়ে এ শ্মশানে আসেনি মেহেরবান।
আজ আসিয়াছে সাপের মতন ঢালিছ উগ্র বিষ,
হিংস্র, দৃষ্টি নিশ্বাসে জ্বালে অগ্নি অহর্নিশ।

অন্ধ রে নোয়াখালী,
অমৃত-ভাণ্ডে কি বিষ মিশালি,—বৃথা দিই তোরে গালি।
বাদ্‌সা বসিয়া আরামে গদিতে ছাড়ে মতলবী বুলি,
জীবনে তোদের দেখেনি কখনো, চোখে ধনিকের ঠুলি।
চেয়ে দ্যাখ ঐ এসেছেন কেবা কাঙাল ফকির বেশ,
সারা জগতের শ্রেষ্ঠ মানব পূজে যাঁরে সারা দেশ,
এসেছেন তিনি বুক পেতে নিতে হিংসার ছোরা-ছুরি,
ফিরিছেন নিজে মাঠে, ঘাঠে, গ্রামে তোমাদের বাড়ী ঘুরি।
খালি পায়ে খালি গায়ে হাতে লাঠি, রৌদ্র-বৃষ্টি শিরে
এসেছেন টেনে নিজ দেহ-প্রাণ মৃত্যু-সাগর-তীরে।
ঊনাশী বছরে বৃদ্ধ তাপস নিজ দেহ বিনিময়ে,
অন্ধ হিংসা অমাবস্যায় প্রাণের প্রদীপ লয়ে
ফিরিছেন একা ভারতের এই চরম সন্ধিক্ষণে
মাতৃভূমিরে ছিঁড়ে কেটে খায় শ্মশান-পিশাচগণে।
সাম্প্রদায়িক প্রায়শ্চিত্তে যিনি নিজ দেব-দেহ,
হিংসা-আগুনে করিছেন ছাই দেখিলি না চেয়ে কেহ।

সুন্দরী নোয়াখালী,
বীরভূমি তুমি সাগর-মেখলা নদ-নদী-বনমালী।
তোমার বক্ষে ঢেলেছে রক্ত হিন্দু-মুসলমান
ঈশা খাঁ-কেদার-বীর্য্যে পুড়েছে কত শত শয়তান;
আজ দ্বিখণ্ড করিবে তোমায় শত্রুর তলোয়ার,
গুপ্ত শত্রু নাশিতে খড়্গ উঠাও গো আর বার।
জয়চাঁদ আর মীরজাফরেরা মাটী ফুঁড়ে ওঠে আজ,
নরকে এনেছে এ মহাজাতিরে, হানো তার শিরে বাজ!
আত্মশক্তি জাগাতে তোমার গান্ধীজী মহারাজ
হিন্দু-মোসলেম ঘরে ঘরে হেঁটে ফিরিছেন দীন-সাজ।
তাঁর পদরেণু, তাঁর মহাবাণী ধ্বনিছে বক্ষে তব,
সারা বাংলার মহান্ তীর্থ, নব যুগে অভিনব।

ধন্য রে নোয়াখালী,
হোমানল জ্বলে তপোবনে তব ছায়ায় তমালতালী।

জীবন-জল-তরঙ্গ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

১৬

আহারের পর বিশ্রাম হ'লো না। উত্তরপাড়ার দল এসে পড়লো।

হরিপদ বললে, শশীপদকে ছাড়িয়ে আনলেন শ্রীধর বাবু নিজে।

যতীন বললে, ওর মাকে বউকে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কান্নাকাটি করতে—তাইতে খুব ফল হয়েছে কাল্‌দা।

পুরন্দর বললে, শশীপদ এসেছে না কি?

না। সে বললে—কাল্‌দাকে এ মুখ দেখাব না!

পুরন্দর হাসলে। বললে, আর সকলে কোথায় রে?

হরিপদ বললে, তারা মাঠে গেছে বাঁশ কাটতে।

বাঁশ কি হবে?

লাঠি তৈরী হবে। দেশময় হৈ-হৈ হচ্ছে জান না?

জানি। কিন্তু লাঠি দিয়ে কার সঙ্গে মারামারি করবে?

ছবমণের সঙ্গে। বলে ছ'জনেই হেসে উঠলো।

দেখ হরিপদ—যতীন, ও কাজ ভাল নয়। ছবমণ এ গাঁয়ে কেউ কারও নয়। স্থির স্বরে পুরন্দর কথা বললে।

ওরা পরস্পরের পানে চেয়ে বললে, তবে যে শ্রীধর আশ বললেন—তুমি বলে পাঠিয়েছ তৈরী হতে। আজ সন্ধ্যে বেলায় না কি—

বেশ। আমার মুখে যখন শুনবে, তখন ডাকাতের দল তৈরী করো, তার আগে নয়। যাও।

পুরন্দরের গৌর মুখে রক্তের গাঢ়তা আর স্বরে দৃঢ়তা লক্ষ্য করে ওরা দমে গেল। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো সেখান থেকে।

পুরন্দর ভাবলে—আর বিলম্ব করা চলবে না। বেলা যতই শেষ হয়ে আসছে জনরব ততই অমূলক রটনায় বিদ্বেষ ঘনিয়ে তুলছে, ছ'টি জাতের মধ্যে। রাত্রিতে যদিই সংঘর্ষ বাধে ছ'দলের, তাতেও বিস্মিত হবার কিছু নেই।

অপূর্ব্বর সঙ্গে আর এক দিন তর্ক করা যাবে। নীতির অমিল কোন্ দিক্ দিয়ে সে পরে বুঝলেও চলবে—উপস্থিত ও-পক্ষের মনোভাবের পরিবর্ত্তন করা দরকার।

মোড় ফিরতেই শ্যামাপদর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে গেল। শ্যামাপদ একগাল হেসে বললে, কেমন, করবে আর ঠাকুর নিয়ে চালাকি?

সে কি শ্যামাপদদা'!

আহা, ন্যাকা! যেন কুলোয় শুয়ে তুলোয় করে ছুধ খান! বলি, এই যে শুনে এলাম কারিগরপাড়ায় যে, কালকে যে যে বাড়িতে স্বদেশীর ফ্লাগ তুলেছ—সব ওরা আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তার কি করছ শুনি? হুঁ হুঁ বাবা, ঠাকুর যে হাতে হাতে এমন ফল দেবেন! অধিক উল্লাসে সব ক'টি দাঁত বার করে সে হাসতে লাগলো।

পুরন্দর বললে, তা ঠগ বাছতে গাঁ ওজড় হবে না তো শ্যামাপদদা'?

মানে? আমরা তো ছবি নই—থাকিও না ওসব হ্যাঙ্গামার মধ্যে।

পুরন্দর বললে, আচ্ছা, তোমার ঠাকুর যাতে তোমায় রক্ষা করেন সে জন্য পূজো মানত করছি শ্যামাদা'।

যা যা ফাজিল ছোকরা, নিজের চরকায় তেল দি গে। আমার ঠাকুর তোর পূজোর জন্যে হাঁ করে বসে আছে কি না? রাগ বাড়লে শ্যামাপদর কথা আটকে আটকে আসে—তোৎলাম বাড়ে। সে হন্‌-হন্‌ করে চলে যায়।

পুরন্দর ভাবলে—একটু ঘুরে মুসলমানপাড়ায় যাওয়া যাক্। এই ভিত্তিহীন জনরবের মূল্য কারা কি ভাবে দিচ্ছে সেটা জানলে কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হবে।

একটু পিছিয়ে সে গোঁসাইজীর বাড়ির দিকে এলো। যে খবরে সারা গাঁ ভয়ে উত্তেজনায় রোমাঞ্চিত হচ্ছে, তা কি আশু গোঁসাই-এর খাটো প্রাচীর ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে ঢোকেনি? আশ্চর্য্য, গোঁসাইজীও এ সম্বন্ধে কিছু মাত্র সচেতন নন। তা যদি হতেন তো তুলসীমঞ্চের লোহার ডাণ্ডায় বাঁধা তিন রঙা পতাকাটা খুলে নেওয়া হয়নি কেন? গোঁসাইজী কি মনে করেন—

আশু গোঁসাই পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি ঢুকবার মুখে পুরন্দরকে দেখে যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। বললেন, এই যে, তোমারই কাছে গিয়েছিলাম বাবা। নিয়ে যাও—তোমার জিনিষ নিয়ে যাও খুলে। একটা নিশেনের জন্য—ঐ হাড়হাভাতে মেয়েটার খেয়ালের জন্য মনান্তর করবো তোমার সঙ্গে? ছি!

পুরন্দর বললে, রমা রাগ করবে কিন্তু।

ইঃ, রাগ করবে! করলে বয়ে গেল তোমার। এই যে একটু আগে কত করে বললাম দিয়ে আয় মা—যার জিনিষ তাকে ফিরিয়ে দে। তা জেদি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকিয়ে রইলো। তখন ভয় দেখালাম, জানিস না তো মোছলমানরা কি বলছে। যার বাড়িতে দেখবে নিশান উড়ছে—তারই বাড়ি জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেবে। তাও বললে, নাঃ। সামনে ছিল একটা কঞ্চি। রাগের মাথায় তাই না তুলে আগাপাশতলা বিতিয়ে, গিয়ে বসেছিলাম চক্কোত্তিদের বাড়ি।

পুরন্দর বুঝলে, শ্যামাপদ কোথা থেকে পেয়েছে এই রোমহর্ষক সংবাদ। শ্যামাপদ এই মাত্র বেরুলো বাড়ি থেকে। সে কি আর এই পরম আশ্চর্য্যজনক গুপ্ত কথাটি প্রচার করতে কার্পণ্য করবে?

পুরন্দর বললে, থাক না নিশান—আপনার কোন ভয় নেই।

ভয়! আশু গোঁসাই বললে, ভয়ের কথা হ'লো এটা? আশু গোঁসাই পৃথিবীতে কাকেও ভয় করে না—এক ভগবান ছাড়া।

কিন্তু অচিরে দেখা গেল, এ আস্ফালনও তাঁর মিথ্যা।

বাড়ির মাঝের দুয়োর খুলবার আগেই ভেতর থেকে স্ত্রী-কণ্ঠের প্রবল গর্জ্জন শোনা গেল: মেয়েকে ঠেঙিয়ে হতচ্ছাড়া মিনসে আবার কোন্ লজ্জায় বাড়িতে পা দিচ্ছে শুনি? দড়াম করে দরজাটা খুলে গেল। দ্বারপথে আবির্ভূত হ'লো—কাঁদি নথে অলঙ্কৃত নিকষ কালো বর্ণের হাঁড়িপানা একখানা মুখ—পানের ছোপে লাল টক্-টক্ করছে দাঁতগুলি—আর সিঁথিতে জলজ্বলে সিঁদুরের দাগ—ঘোমটাটা ক্রোধের আতিশয্যে কবরী-স্খলিত হয়ে এলো চুলের গোড়ায় লুটিয়ে পড়েছে।

আশু গোঁসাই ততক্ষণে অন্তর্হিত হয়েছেন।

দরিদ্র মুসলমানপাড়াটা ফাঁকা। পুরুষরা কেউ মাঠে গেছে, কেউ বা মাছ ধরতে গেছে বিলে, কেউ এদিক্ ওদিক্ ঘুরছে। সন্ধ্যা

বেলায় আবার এসে জুটবে সবাই। এই পথের ওপরে গোল হ'য়ে বসে জমাবে মজলিস। কাজের কথা—বাবুদের নীচু বা উঁচু নজরের কথা—নিজেদের চালাকির কথা—আর শস্তায় কোথায় কি জিনিষ পাওয়া যাচ্ছে তার কথা। ঘর-সংসারের কথাও তারা আলোচনা করে তবে ইনিয়ে-বিনিয়ে দুঃখের বা সুখের জের টানা এদের ধাতুসহ নয়। পাল-পার্ব্বণে ফরসা কাপড়-জামা পরে এরা মসজেদে বা দরগার সামনে দল বেঁধে নমাজ পড়ে, কিন্তু ঐশী-চিন্তায় ভারগ্রস্ত নয় এদের মন। দুনিয়ার দুঃখের জল এদের ঢালু জমিতেই বারো মাস জমে থাকে—দুনিয়া তাই দুঃস্বপ্নের মত না হোক, ভারের মতো দুলছে এদের উপার্জ্জনের সরু সূতায়।

পাকা রাস্তার ধারে পাথর-বাঁধানো দরগায় মজলিস জমেছে। এর ওপর প্রায়ই তাস বা দশ-পঁচিশ খেলা হয়—খবরের কাগজও পড়া হয়। আজ ঠাসাঠাসি লোক বসে আলোচনা করছে। যে ধোঁয়া তাঁতীপাড়া পার হয়ে উত্তরপাড়া পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছে সেই ধোঁয়া এখানেও গাঢ় হচ্ছে। দূর থেকে পুরন্দর দেখলে, ওরা হাত ও মাথা নেড়ে কি বলছে বেশ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে। সে কাছে আসতেই গলার স্বর ওদের নেমে গেল নীচু পর্দ্দায়—মাথা ও হাত নাড়াও বন্ধ হ'লো। দরগার পাশে এসে দাঁড়ালো যখন পুরন্দর—মনে হলো, কাল-বৈশাখীর গুমোট-ভরা মেঘটা দরগার মাথায় হঠাৎ কি খেয়ালে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। সেই অসহ্য গুমোটে পুরন্দরের দম বন্ধ হয়ে এলো। সহজ হবার চেষ্টা করেও সহজ হতে পারলে না ও। সারা গাঁয়ের মিথ্যে রটনার কালো ছায়া ওর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে বুঝি স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

সিরাজ ওকে দেখে নেমে এসে বললে, কি দোস্ত—খবর কি?

এলাম তোমাদের কাছে। বলে ও দরগার পাশ ঘেঁসে বসতে গেল। সিরাজ ওর হাত ধরে টেনে বললে, শোন তো।

পুরন্দর দেখতে পেলে না—সমবেত জনতা চোখ-টেপাটিপি করে নড়ে বসলো।

একটু দূরে এসে সিরাজ বললে, ক'টা বন্দুক যোগাড় হ'য়েছে? ক' দল লাঠিয়াল?

পুরন্দর ওর হাত চেপে বললে, আর কিছু শুনেছ?

সিরাজ বললে, এটা কিন্তু ভাল হ'চ্ছে না। হাওয়ায় বিষ—ভাল হ'চ্ছে না।

পুরন্দর বললে, সত্যিই কি আমাদের সন্দেহ করছো ভাই?

সিরাজ বললে, সন্ধ্যে বেলায় এ-পাড়ায় তুমি এসেছ কেন? তুমি কি ভয় কর না জানের?

পুরন্দর স্তব্ধ হয়ে রইলো। খানিকক্ষণ পরে একটি নিশ্বাস মোচন করে বললো, জানের ভয় করি না এমন কথা বলবো না। তবে কি এমন অন্যায় করলাম যার জন্য তোমাদের বন্ধুত্বে সন্দেহ করবো?

সিরাজ বললে, আল্লার কিরে—সত্য বল ভাই।

দিব্যি গালবার দরকার নেই—চল তোমাদের মাতব্বরদের কাছে—

সিরাজ মাথা নেড়ে বললে, আমরা ছেলেমানুষ, আমাদের কথা ওরা শুনবে কেন?

আবেগে তার হাত চেপে ধরে পুরন্দর বললে, বয়সের দোহাই দিয়ে এত বড় সর্ব্বনাশকে উড়িয়ে দিও না, ভাই। আমরাই পারবো—এ আমাদেরই কাজ।

সিরাজ বললে, আমার ফুফু বুড়ো মানুষ—সবাই ওঁকে মানে—তাঁকে গিয়ে বলি গে সব কথা।

পুরন্দর বললে, চল। কিন্তু তার আগে শুনি তো—বৃত্তান্তটা কি ভাবে তোমরা শুনেছ?

সিরাজ যা বললে তা সংক্ষেপে এই:—

বিষ্ণু ও হরি ময়রা গরুটাকে বেড়ার বার করে দেবার পর দাওয়ানির বউ বদনায় করে জল নিয়ে আসে গরুটাকে খাওয়াতে। মেয়েমানুষ তো, নিজের হাতে বকনাটাকে এই এতটুকু বেলা থেকে অত বড়টি করেছে—ওর অমন দশা দেখেই ও ডুকরে কেঁদে উঠলো। ওস্তাগরদের ইব্রাহিম যাচ্ছিল একটা খাসি কিনে ওই পথ দিয়ে, বোধ হয় কিছু মদও খেয়ে থাকবে সে। দাওয়ানির বউয়ের পক্ষ নিয়ে খুব গালাগাল আরম্ভ করলে। দাওয়ানি থামাতে গেল—ও শুনলে না। ময়রাদের শাসিয়ে গেল—মজা দেখাবে বলে। ময়রারাও দু'-এক কথা বলে তেড়ে মারতে আসে—তার পর এই নিয়ে বাধলো গোল।

পুরন্দর সব শুনে বললে, তবে যে শোনা যাচ্ছে ওরা দাওয়ানির বউকে বে-ইজ্জত করেছে?

সিরাজ বললে, গাল দেওয়া কি বে-ইজ্জতের সামিল নয়? তাই আর কি।

পুরন্দর বললে, ইব্রাহিমকে তোমরা বোঝালে না কেন?

সিরাজ বললে, কোথায় ইব্রাহিম? খাসিটাকে জবাই করে খাল-ধারে গেছে ফিষ্ট করতে।

দাওয়ানি?—দাওয়ানি ফেরেনি কালনা থেকে?

দাওয়ানিকে পাওয়া গেলেও বা কথা ছিল। দরগা-তলায় তাই তো সবাই বলাবলি করছিলেন ওকে ডেকে ভাল করে জানতে। কিন্তু সে-ও নেই—তার বউও নেই।

পুরন্দর বললে, দাওয়ানিকে সরানোর ব্যাপারে ইব্রাহিমের হাত নেই তো?

সে কথা আমরাও ভাবছি। তবে ময়রারা যদি সত্যিই ওর জরুর গায়ে হাত তুলে থাকে—কত বড় অন্যায় বল তো?

নিশ্চয়। এর প্রতিকার করতে হবে। কিন্তু এ জিনিষ বেশি দূর গড়াতে দেওয়া ঠিক হবে না।

১৭

সিরাজের ফুফু গফুর মিঞার বয়স ষাট ছাড়িয়েছে, মাথার চুলগুলি সাদা হয়ে গেছে, আবক্ষ-লম্বিত সাদা গোঁফ-দাড়িতে সাম্য ভাব ফুটেছে। সাদা আচকান গায়ে—মাথায় ফুল-কাটা সাদা টুপি—গলায় সাদা স্ফটিকের মালা। বসে আছেন একখানা ফুল-কাটা ভাল গালিচার উপর। সামনে খোলা কোরাণ সরিফ। এ-পাড়ার মধ্যে ধার্ম্মিক বলে ওঁর প্রসিদ্ধি আছে। দু'বার হজে গেছেন—প্রত্যহ পাঁচ ওক্ত নমাজ পড়েন। ওঁকে দেখলে মনে হবে, ধর্ম্মটাকে ভেতর ও বার···দু'দিক থেকে উনি অনায়াসে নিতে পেরেছেন। পাড়ার সকলে ওঁকে শ্রদ্ধা করে—ওঁর কথা শোনে। কিন্তু ধর্ম্মপ্রসঙ্গ নিয়ে বেশিক্ষণ ওঁর সঙ্গে আলোচনা করতে সাহস করে না। বিদেশ থেকে কোন বিদ্বান্ কি কোন মৌলভি এলে সবাই নিয়ে যায় ওঁর কাছে। কারণ, তাঁদের আলোচনার স্তরে উঠবার সামর্থ্য এদের কারো নেই।

সিরাজ বললে, পুরন্দর আপনার কাছে এসেছে।

গফুর মিঞা হেসে বললেন, বসো ভাইজি, বসো। হাসবার সময় ওঁর সাদা দাঁতগুলি দেখে পুরন্দর অবাক হয়ে গেল।

গালিচার এক প্রান্তে বসলো দু'জনে।

গফুর মিঞা বললেন, বল ভাইজান, কি বলবে।

সিরাজ বললে, দাওয়ানির ব্যাপারটা নিয়ে গোল হচ্ছে কি না, তাই—

গফুর মিঞা বললেন, গোল কিসের? দু'পক্ষের মাতব্বরদের ডেকে নিটমাট করে দাওগে।

সিরাজ বললে, সে মিট আপনাকেই করতে হবে।

আমি? কবরের দিকে পা বাড়িয়ে আছি—আমায় আর কেন ভাইজান! তিনি হাসলেন।

পুরন্দর বললে, আপনাকে সবাই মানে—শ্রদ্ধা করে।

গফুর মিঞা বললেন, আমি কোরাণ সরিফ থেকে দু'-একটি বয়েৎ বড় জোর শোনাতে পারি। তাও জুম্মা বারে না হলে কেউ শুনতে আসবে কি?

সিরাজ বললে, ওদের সময় কই যে রোজ আপনার—

গফুর মিঞা হাসলেন, সত্যি সিরাজ, সময় ওদের নেই।

সিরাজ বললে, হাসলে হবে না—ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে।

গফুর মিঞা বললেন, কিন্তু মুখে স্বীকার করলেই কি সে ব্যবস্থা পাকা হ'য়ে যাবে বাবাজান?

আপনি বললেই হবে।

না রে পাগল—আগে যা হোত, এখন তা হ'চ্ছে না। দিল না জাগলে কোন কাজ হয় না। তিনি হাসলেন।

পুরন্দর বললে, আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে দিল আমাদের এক হচ্ছে না কেন?

গফুর মিঞা বললেন, তোমাদের বাঁধন আলগা হয়েছে ভাইজান। সমাজে তোমরা এক হয়ে মিলতে পারছ না। মুহব্বৎ না জন্মালে কখনও দিল এক হয়—বাঁধন শক্ত হয়?

কেন ভালবাসা নেই—

গফুর মিঞা বললেন, সে তোমরা জান—তোমরাই বলতে পারবে। তবে রাগ না কর তো বলি একটা কথা।

বলুন না।

গফুর মিঞা বললেন, রাগ করলেও আমি দুঃখিত হব না। কেন না মুখে ভাই-ভাই বলে মনে দুষমণ বলে সন্দেহ পোষার মত গুনাহ দুনিয়ায় আর নেই। দিল যদি সাচ্চা থাকে তো মুখের সামনে সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার হিম্মত আসবে। শোন ভাইজান। বলে সোজা হয়ে বসলেন তিনি। বললেন, তোমাদের মধ্যে আর আমাদের মধ্যে এই যে তফাৎ তফাৎ ভাব গড়ে উঠছে এর মূলে রয়েছে ভালবাসার অভাব।

মানছি তা।

কেন অভাব হ'লো ভালবাসার? আগে ছিল না—আজ হলো কেন? আমরা বহু দিন ধরে তোমাদের প্রতিবেশী—তোমরা আমাদের প্রতিবেশী। তোমার বাবা-ঠাকুরদাদারা আমার বাবা-ঠাকুরদাদাদের আপদে বিপদে জান কবুল করেছেন কিন্তু একটি জিনিষ তাঁরা দিতে পারেননি। এক মিনিট থেমে তিনি বললেন, তাঁদের মন যে প্রতিবেশীর জন্ম কাঁদতো না তা বলছি না বরং দরদ তাঁদের নিজের সংসারের ওপর যেমন তেমনি প্রতিবেশীর ওপর ছিল। তবু যে দিক দিয়ে তাঁরা এগিয়ে আসতে পারেননি—সেই দিকটাই আজ আমাদের মধ্যে দরিয়ার ব্যবধান সৃষ্টি করেছে।

কোন্ দিক্ দিয়ে? পুরন্দর প্রশ্ন করলে।

আচারের দিক্ দিয়ে। সামাজিক প্রথা লৌকিক আচারে তাঁরা এগিয়ে আসতে পারেননি এঁদের দিকে। সেকালের কোন হৃদয়বান্ হিন্দু দোস্তি থাকা সত্ত্বেও কোন মুসলমানের বাড়ি খানা-পিনা করেছেন —শুনেছ এ কথা? এবং খানা-পিনা করে সমাজে মর্য্যাদার সঙ্গে মিশে থাকতে পেরেছেন?—পারেননি। তার ফলে হ'য়েছে কি? পাশাপাশি বাস করেও আমরা দিন দিন দূরে চলে গিয়েছি। তবে সেকালে কথায় কথায় এই রকম গোলমাল হ'তো না কেন? কারণ ধর্ম্মটা তখন অনেক লোকের হৃদয়ের জিনিষ ছিল। তাঁরা জানতেন, সামাজিক মর্য্যাদা দু'জাতের আলাদা, শিক্ষা-দীক্ষার ধারাও এক নয়। ভালবাসা তাঁদের মধ্যে ছিল বলেই কেউ কাউকে আঘাত দিতে চাইতেন না। অন্ততঃ সামাজিকতার দিক্ দিয়ে বাধলেও।

একটু থেমে তিনি বললেন, কিন্তু তার কুফল ফলেছে আজ। তোমরা আমাদের ছুঁয়ে, গঙ্গাস্নান না হোক, স্নান কর। স্নান না করলেও কাপড়-জামা ছাড়। খাওয়ার দিক্ দিয়ে প্রত্যেক মানুষের রুচি আলাদা—প্রত্যেক জাতির প্রথা আলাদা, তবু নিজের প্রথাকে সব চেয়ে ভাল বলে অন্যের প্রথাকে ঘৃণা কর। সেকালের হৃদয় আমরা হারিয়েছি—তাই মন্দ আচার প্রথা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আমাদের দূরে সরিয়ে দিচ্ছে আরও।

চেষ্টা করলে আমরা ওগুলি দূর করতে পারি না?

গফুর মিঞা হেসে উঠলেন, জোয়ান বয়সে আমরাও ভাবতাম চেষ্টা করবো। চেষ্টা করতে গিয়ে দেখলাম—বড় কঠিন কাজ। বট-গাছের মত কুপ্রথার শেকড় কত দূরে পৌছেচে—সে কাজে না নামলে বুঝবে না তোমরা। তোমার নিজের দিল খোলসা করতে তাও কিছু দিন যাবে। তার পর তোমার বন্ধু-বান্ধবদের। তার পর মেয়েদের। সেখানে বার বার ঘা খেয়ে ফিরে আসবে ভাইজান,—ঘা তোমাকে খেতেই হবে। গফুর মিঞার কণ্ঠে সত্যের সুর বেজে উঠলো।

পুরন্দর মনে মনে বললে, সত্যি কথা বলেছেন গফুর মিঞা। হিন্দুর মধ্যে ছুৎমার্গের বেড়াটা ভাঙতেই প্রাণান্ত, তার ওপর জাতির ওপর জাতির ছুৎমার্গ! সে-ই বা এত কাল করেছে কি? বন্ধুত্বের খাতিরে এক দিনও কি সিরাজের বাড়ীতে খানা খেয়েছে?

দিনের আলোর মত অত্যন্ত স্পষ্ট বলেই সিরাজও তাকে কোন দিন নিমন্ত্রণ করে বিপদে ফেলেনি। অথচ দু'জনের মধ্যে বন্ধুত্বের ভেজাল এক ফোঁটা নেই। ঠিকই বলেছেন গফুর মিঞা—যুগ-যুগ সঞ্চিত জমা-করা ওই আচার-প্রথার জঞ্জাল আজ পর্ব্বত-প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করেছে। দিলও জেগেছিল—মুহব্বৎও জন্মেছিল, বাধা কিন্তু দূর হয়নি।

গফুর মিঞা বললেন, তবু তোমাদের বললাম এই জন্ম যে তোমরাও ভাববে। যদি পার এর প্রতিকার করবে। বালির বাঁধ দিয়ে বন্যাকে কত কাল আটকে রাখা যায় ভাইজান!

সিরাজ বললে, আপনাকে কিন্তু—

গফুর মিঞা বললেন, আচ্ছা বাবাজান, তাই হবে। যে ক'টা দিন আছি শান্তিতেই যেন থাকতে পারি।

দরগা-তলায় এসে সিরাজ বললে, চাচা—ভাইজান—গফুর মিঞা ডেকেছেন আপনাদের।

দলটি পরস্পরের পানে চাইলে। সিরাজের চাচা আজিজ বললে, আচ্ছা—আচ্ছা—যাব'খন।

এক জন বললে, কি ব্যাপার?

সিরাজ বললে, দাওয়ানির ব্যাপারে উনি—

মহম্মদ বলে এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি বললে, এ-সব ব্যাপারে বুড়ো মানুষকে টানবার কি দরকার? সিরাজটা আহাম্মক!

সিরাজ এই কথায় চটে উঠলো, আহাম্মক মানে? বোঝ না সোঝ না, কথা কও কেন?

সিরাজের চাচা বললেন, থাম রে সিরাজ! মহম্মদ কিছু মন্দ বলেনি। গফুর মিঞাকে মধ্যস্থ মানা—মানে ওঁকে কষ্ট দেওয়া।

সিরাজ বললে, তা আপনারা কি করবেন?

আহম্মদ বলে এক জন আধ-বুড়ো গোছের লোক বললে, করবো বই কি উপায়। ইব্রাহিমরা ফিষ্টি করতে গেছে ফিরে আসুক—দাওয়ানি আসুক কালনা থেকে—পাঁচ মাথা এক হয়ে সলা-পরামর্শ একটা হবে বৈ কি।

সিরাজ বললে, সলা-পরামর্শ বুঝি না। ব্যাপারটা না বাড়িয়ে দু'পক্ষ এক হ'য়ে মিট করে ফেল।

মহম্মদ হেসে উঠলো হো-হো করে। বললে, এ যেন সাদি আর কি—দু'পক্ষ মিললেই একটা ফয়সালা হয়ে যাবে? মাথা খারাপ!

সিরাজ উত্তেজিত হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, পুরন্দর তাকে টেনে আনলে খানিক দূরে। বললে, বেশ তো, ওঁরা করুন পরামর্শ। চল তাঁতীপাড়াটা ঘুরে আসি।

চলতে চলতে পুরন্দর বললে, আজ-কাল শাড়ী কি দর যাচ্ছে?

সিরাজ বললে, গেল হাটে তো চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ টাকা জোড়া বিকিয়েছে। শুনছি আরও উঠবে।

তবে যে শুনি, সুতোর restriction হ'য়েছে?

সিরাজ হাসলে, দুর্ভিক্ষের সময় চালের দরও বেঁধে দিয়েছিল সরকার ৩২৲ টাকা। অথচ চাল বিকিয়েছে ৪০৲ থেকে ১০০৲ টাকা। না খেতে পেয়ে লোকও মরেছে পঁয়ত্রিশ লক্ষ।

হাঁ—হিসেব বেরিয়েছে প্রত্যেক লোকটির জীবনের বদলে মুনাফাখোরদের লাভ হয়েছে হাজার টাকা! কিন্তু সুতোর বেলায় শুনছি কড়াকড়ি বেশি।

সিরাজ কৌতুকভরে জিজ্ঞাসা করলে, কেমন?

এই ধর, চার বাণ্ডিলে একখানা শাড়ী যদি নামে সে শাড়ীখানা সদরে জমা দিতে হবে। কাপড় বিক্রী হবে কণ্ট্রোলের দামে।

সিরাজ হেসে বললে, তাহলে ব্ল্যাক মার্কেট চলবে।

বুঝিয়ে বল।

এ তো সোজা উপায়। ঠাস-বুনুনিতে একখানা কাপড়ে যদি পড়ে চার মোড়া সুতো—সাড়ে তিন মোড়াতে সে কাপড় কি বোনা যায় না? না-ই বা হ'লো ঠাস-বুনুনি। এমনি করেই পয়দা হবে ব্ল্যাক মার্কেটের মাল। বলে সে হাসলে।

পুরন্দর বললে, সদরে যদি কাপড়ের কোয়ালিটি দেখে নেয়?

কে দেখবেন? এক আড়ঙের কাপড় সংখ্যায় তো কম হবে না। অফিসার নিজের চক্ষে সব দেখতে পারেন কখনও? যদিও স্যাম্পেলের জন্য কখনও তাগাদা দেন তো একখানা কাপড়ের কোয়ালিটি বজায় রাখা কি তেমন শক্ত?

কিন্তু যাঁরা জমা করবেন কাপড়—তিনি যদি কড়া হন?

সিরাজ হো-হো করে হাসলো, আরে, তিনিও তো মানুষ! তাঁকেও তো যুদ্ধের বাজারে অগ্নিমূল্যের জিনিষ কিনতে হচ্ছে—তাঁকেও বাঁচতে হবে তো?

পুরন্দর সদুঃখে বললে, সবই যদি এই রকম হয় কাকে বিশ্বাস করবো?

সিরাজ বললে, কে বলেছে তোমায় বিশ্বাস করতে কাউকে? পুরো অবিশ্বাসের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছে—পুরো অবিশ্বাসের স্রোতে আমরাও ভাসছি। বেশ তো, ভেসেই চলি না।

পুরন্দর নিশ্বাস মোচন করে বললে, এমনি করে ক'দিন চলবে?

চলবে—চলবে। রাজনীতি তুমিও বোঝ না—আমিও না। যাঁরা বোঝেন তাঁরা বলেন, আজব দুনিয়ায় কিছুই অচল নয়।

খটাখট তাঁতের শব্দ কানে এলো। প্রবল উৎসাহে ছেলে-বুড়ো চালাচ্ছে তাঁত। ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র, মুসলমান—সবাই ঝাঁপ দিয়েছে জীবন-জল-তরঙ্গে। তাঁত এ গ্রামকে বাঁচিয়েছে দুর্ভিক্ষ থেকে, তাঁত সকলকে নিয়ে যাচ্ছে সমৃদ্ধির পথে। এরা স্পষ্টই বলে, যুদ্ধ আমাদের পরম আশীর্ব্বাদ! এর প্রসাদে আমাদের বুদ্ধির জট-পাকানো সুতোর গ্রন্থিগুলো হচ্ছে সরল—চলতে শিখছি নূতন পথে। সভ্য যুগ যে সারল্য বনাম নির্ব্বুদ্ধিতার যুগ, সে কথা—গল্প শুনলেই বুঝতে পারি। রামরাজ্যের কল্পনা নিয়ে ভিন্ন রাজত্বে চলতে গেলেই বিপদ এগিয়ে আসে পদে-পদে; তাই তো বিপদকে এড়াতে বুদ্ধির কসরৎ করতে হচ্ছে নিত্য-নূতন রীতিতে।

রজনী প্রামাণিকের উঁচু দাওয়াটা নজরে পড়লো। যেমন উঁচু আর চওড়া দাওয়া—তেমনি সাইজের ঘর। ঘর কাঠের তাক ও আলমারিতে ভর্ত্তি। ইনি সুতোর মহাজন—কাপড়েরও। এর কাছে খাতায় নাম লিখিয়ে তাঁতী সুতো নিয়ে যায় এই সর্ত্তে যে, কাপড়খানা নিয়ন্ত্রিত দরে তাঁকেই বেচতে হবে। যদি কাপড় বেচতে অস্বীকার কর সুতো পাবে না। সুতো হয়তো জোগাড় হবে কালো-বাজারে কিন্তু পড়তায় ভজবে না কাপড়। তার চেয়ে খাতায় নাম লিখে সরকারের বাঁধা-দরে সুতো নিয়ে কাপড়খানা মহাজনকে বেচে দেওয়াই ভাল। মজুরিটাও আজ-কালের দিনে কম কি? পাঁচ সিকে দাঁড়িয়েছে পাঁচ টাকায়। সুতরাং রজনী প্রামাণিককে বাড়াতে হয়েছে কয়েকটা র‍্যাক—কয়েকটা আলমারি। র‍্যাকে ঠাসা সুতো—হরেক নম্বরের—রঙ বে-রঙের। আলমারিতে জমছে শাড়ী ধুতি—কোরা ও ধোয়া। আজ-কাল গাঁট বেঁধে রেলের কেরাণী বাবুদের, টিকেট বাবুদের পূজো দিয়ে হাওড়ার হাটে জিনিষ পাঠাতে হয় না। মাড়োয়ারি মহাজন মোকাম চিনেছে—চিনেছে বাংলার অখ্যাত পল্লীর গরিব তাঁতীদের। তারাই বাংলার নাড়ী-নক্ষত্রের খবর রাখে, মোকাম থেকে হাটে চালান দেয় জিনিষ। সরকারের আইন ও কড়া পাহারা এদের বহু দূরে নিশ্চল হ'য়ে গরিবদের চোখ রাঙায়!

ঘরের মধ্যে অনেক লোক একসঙ্গে কথা বলছে। দর-দস্তর লেন-দেনের ব্যাপারে গোলমাল হয়ই। বাইরের লোকে দেখলে ভাববে এ-ও একটা প্রকাণ্ড হাট। এখানে মাথা ঠিক রেখে কাজ চালানো না জানি কি ভয়ানক ব্যাপার! রজনী জানে—হাটের গোলযোগেই

কেনা-বেচার কাজ চলে সুশৃঙ্খলে। দর নিয়ে কচলাকচলি—কথায় কথায় খাতা খুলে ন্যায্য দাম দেখিয়ে মাইরি, মা কালীর দিব্বি বলে নিজেকে সৎ প্রমাণ করা, ধমক ও অনুনয় একসঙ্গে প্রয়োগ করে কাজ হাসিল করবার এমন মাহেন্দ্র ক্ষণ হট্টগোলের মধ্যে ভিন্ন আর কোথায় বা মেলে? রজনীর চুলে পাক ধরেছে,—হিসাবে ওর ভুল বার করা সোজা নয়।

ওরা রোয়াকে উঠছে—ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন হাসান আলি। ইনিও হাওড়ার হাটে কাপড় বিক্রী করে—ব্যাঙ্কে জমিয়েছেন টাকা—দেহে সঞ্চয় করেছেন মেদ আর বাপের আমলের লোণা-ধরা ভাঙ্গা কোঠার বদলে তুলেছেন দোতলা ইমারৎ। পানের রসে এঁর দু'কসে জমেছে লাল ছোপ। হাসলে রক্তপায়ী কোন জন্তুর উপমা মনে পড়বেই। অথচ লোক দেখলে উনি না হেসে কথা বলতে পারেন না।

হেসেই সেলাম করলেন পুরন্দরকে, সেলাম আলেকুম। আচ্ছা তো তবিয়ৎ?

মাথা নামিয়ে পুরন্দর বললে, আপনি ভাল আছেন?

হাসান আলি খুসী-উপচানো স্বরে বললেন, খোদা মেহেরবান।

সিরাজ বললে, কিছু মাল গস্ত হ'লো?

কোথায় ভাইজান! বাবা-ভাইরা রেখেছেন হাটে একটু জমিন, তারই দৌলতে—দু'-চারখানা যা পাই তাই নিয়ে দিন গুজরাণ হয়। এ আগুন দরে কাপড় কেনা—শুধু নসীবের ওপর নির্ভর করে।

সিরাজ বললে, নসীব আজ-কাল নিমকহালাল বলেই ভরসা।

হে-হে-হে, ঠিক বলেছ ভাইজান। আদাব—আদাব! হাসতে হাসতে হাসান আলি পৈঠা দিয়ে নেমে গেলেন।

পুরন্দর আশ্চর্য্য হলো। সারা গাঁয়ে আসন্ন দাঙ্গার সম্ভাবনায় যে আলোচনা প্রবল হ'য়েছে, এখানে তার চিহ্ন মাত্র নেই। এই ঘরের মধ্যে বিশ্বের ঠাঁই হবে না বলেই বুঝি তার নানান্ সমস্যাগুলিকে সযত্নে বাদ দিয়ে একটি মাত্র সমস্যা নিয়ে গ্রামের একাংশ জেগে রয়েছে। বড় বড় র‍্যাকগুলিতে—আলমারিতে দেশী বিদেশী মহাজনে ও বিক্রেতায় ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে সমস্যাটিকে। প্রদীপের সলতে তৈরী করছে কেউ—কেউ জোগাচ্ছে তেল, কমলার প্রসন্ন দৃষ্টিপাতে শিখাটি করছে জ্বল-জ্বল। বড় আলমারির মাথায় যে নক্সা-কাটা ব্রাকেট আছে তার শোভাবর্দ্ধন করছে চৈত্র-সংক্রান্তির মেলায় কেনা শুণ্ডিল-তনু এক গণেশ-মূর্ত্তি এবং সেই ব্রাকেটের নীচেয় সিদ্ধিকে উর্দ্ধগ করে তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসেছেন রজনী প্রামাণিক।

প্রসন্ন মুখে অভ্যর্থনা করলেন রজনী। এসো—এসো। বস। তার পর কি মনে করে পুরন্দর? সিরাজ তক্তার ও-পাশে কয়েক জন লোকের ভিড়ে গিয়ে বসলে। রজনী তাকে দেখতে পেলেন না।

পুরন্দর বললে, যাচ্ছিলাম রাস্তা দিয়ে—এলাম। ব্যবসা আপনার ভালই চলছে।

রজনী বললে, সে বার যুদ্ধ বাধলে বড্ড বোকা বনে ছিলাম, বয়স তখন মাত্তর পনেরো-ষোলো। বাবা গত হ'য়েছেন সবে—কিছুই বুঝি না ব্যবসার।

পুরন্দর বললেন, তা এবার ভাল করেই শোধ তুলছেন।

না না—তবে কি জান, নানান্ ফ্যাসাদ বাধিয়ে সরকার উত্তম-খুত্তম করে মারছে ব্যবসাদারদের।

পুরন্দর বললে, পুঁটি-খলসেরা যে জালে ধরা পড়ে, রুই-কাতলারা তা ছিঁড়ে বেরিয়ে যায় না কি?

ঠিক বলেছ, ভাই। রুই-কাতলা যদি হ'তে পারতাম! নিশ্বাস যা মোচন করলেন—দীর্ঘনিশ্বাসের মত কানে বাজলো না।

পুরন্দর বললে, আপনার এখানে একটা জিনিষ দেখে ভারি আনন্দ হচ্ছে।

কি জিনিষ—কি জিনিষ?

দাঙ্গার সম্ভাবনা সংক্ষেপে বলে পুরন্দর মন্তব্য করলে, বেশ আছেন—ও-সব ঝঞ্ঝাট নেই।

নেই আর সাধে! সব মিঞার টিকি বাঁধা যে এই ঘরখানির মধ্যে! মোছলমান বল—হিন্দু বল—কারো টুঁ শব্দটি করবার জো নেই।

একটি জিনিষ আপনি পারেন করতে? যদি করেন তো ভারি উপকার হয়। পুরন্দর আশ্বাসে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো।

রজনী বললেন, উপকার করবার সময় কই ভায়া। এই যে কাজ—এ নিয়ে মরবার ফুরসুৎ নেই আমার।

তা হলেও আপনি তা পাবেন। কোথাও যেতে হবে না আপনাকে—এই ঘরে বসেই তা করতে পারেন।

কথাটা খোলসা করে বল, ভায়া।

বলছি এই—আপনি চেষ্টা করলে হিন্দু-মুসলমানে এই ঝগড়ার সম্ভাবনা দূর করতে পারেন। বড় বড় মাথা সবই তো আপনার কাছে বাঁধা!

আমি! ওরে বাবা রে। বালিশে দু'টো চাপড় মেরে বললেন রজনী—পারি না—পারি না—পারি না।

এ জিনিষ আপনার পক্ষে কি এমন শক্ত?

ওরে ভাই, আমার পক্ষে এর চেয়ে শক্ত জিনিষ আর নেই। ব্যবসাদারের কখনো চৌকিদারের কাজ করা সম্ভব? ওর জন্তে থানা আছে—দারোগা আছে—ম্যাজিষ্ট্রেট আছে। একটু থেমে বললেন, তা ছাড়া আমাদের হিঁদু জাতটাকে যেমন অনায়াসে বিশ্বাস করতে পার—ওদের মুসলমানরা—, চার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়েই সিরাজকে দেখতে পেলেন। একটুও অপ্রস্তুত হলেন না রজনী—অত্যন্ত সহজ ভাবেই বলে গেলেন, তেমনি বিশ্বাসী। আমার কাছে দুই তুল্য-মূল্য। কাজেই কোথায় কে গরু টেঙিয়ে—জরুকে বেইজ্জত করে কি হাঙ্গামা বাধালে সে সবে মধ্যস্থতা করবার সাহসও আমার নেই। বলে এক জন খদ্দেরের পানে চেয়ে ঈষৎ ধমকে উঠলেন, সুতো খারাপ নয় হে খারাপ নয়—অত পোকা-বাছা করছো কেন শুনি! দিব্যি খইয়ের মাড় দিয়ে পাড়ি করে নাও গে—তোফা কাপড় ওৎরাবে।

পুরন্দর বুঝলে, ব্যবসার বেড়া ভেঙ্গে রজনীকে বাইরে টেনে আনা দুষ্কর। দু'পক্ষ নিয়ে ওর কারবার। হয়তো প্রতিযোগিতাও রয়েছে দু'পক্ষের মধ্যে। আর প্রতিযোগিতা থাকলেই রজনীর সুবিধা। কালো-বাজার চলছে অপ্রতিহত বেগে।

নমস্কার করে ও উঠলে।

সিরাজকে দেখে রজনী সমাদর করলে, আরে ভাইজান, তুমি বসে রইলে কোথায় লুকিয়ে? পান-টান খাও। আরে, বোস না পুরন্দর—বোস সিরাজ ভাই। হাওড়ার হাট কেমন যাচ্ছে? ব্যবসা আমাদের চলবে তো?

সিরাজ হেসে বললে, কণ্ট্রোলের জুজু বেরুলেই আমাদের জুৎ! হাট ভালই চলছে। আসি—আদাব!

সিরাজ বোকা নয়, বাইরে এসে বললে, গফুর মিঞা বলেছেন ঠিক—তোমাদের আর আমাদের দোস্তি পানির ওপর তেলের মতো ভাসতেই থাকে—মেশে না!

পুরন্দর তার হাত চেপে ধরলে, এতে দুঃখ পেলাম সিরাজ। বিশ্বাস না হয় আমায় নেমন্তন্ন করে দেখ এক দিন।

সিরাজ বললে, এক দিন তোমাকে খাইয়ে আমার আনন্দ হতে পারে কিন্তু তোমার তাতে লাভ কি?

পুরন্দর বললে, মনের 'কিন্তু-কিন্তু' ভাবটা ঘুচে যাক্ ভাই।

তাও হয়তো ঘুচবে, তবু লাভ নেই।

কেন নেই?

সিরাজ হাসলে, তোমার জাত মেরে আমার লাভ হবে আত্ম-প্রসাদ, তোমার লাভ হবে 'কিন্তু-কিন্তু' ভাবটা কাটানো। কিন্তু তুমি আর আমি নিয়ে তো সমাজ নয়?

না হোক, আমরা পথ দেখাতে পারি। পুরন্দর দৃঢ় কণ্ঠে বললে।

পথ দেখবে কে? আচ্ছা, আচ্ছা ভেবে দেখ ভাই। গফুর মিঞা যা বললেন, তা এক দিনের জঞ্জাল নয়—বহু দিন ধরে জমেছে। এক দিনে কি সাফ হয় রে ভাই! আদাব—আদাব! হাসতে হাসতে সে চলে গেল।

সিরাজ চলে গেলে পুরন্দরের উচ্ছ্বাসটা কমে এলো। পথ কিছু গফুর মিঞার ঘর নয়। ওই ঘরের মধ্যে মিষ্টি-গন্ধী ধূপের মত জ্বলছেন যে পবিত্র মানুষটি, তাঁর প্রতিবেশে এসে এক মুহূর্ত্তে মানুষ উল্টো মনোরথে চেপে দূর-দূরান্তর অতিক্রম করে যায়। পথের ধুলায় সে পরিমণ্ডল মুছে নিলে। সত্যিই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল; ভালবাসা আছে বলে সিরাজের বাড়িতে সে নিমন্ত্রণ রাখতে পারে—ইব্রাহিমের ফিস্টে যাবার কথা তার মনে হচ্ছে না কেন? ওই প্রতিবেশ—এর প্রভাব কাটিয়ে ওঠা সুসাধ্য নয়। জোর-গলায় প্রতিজ্ঞা করে এলেও নয়।

[ক্রমশঃ

রক্তালোকের ঝলক

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ

অনুবাদক : অমল ঘোষ

ঈশ্বরকে চেঁচিয়ে বলবো : আমায় একটা খোঁড়া পা দাও
দাও থেঁৎলানো একটা নাক
একটা বিকৃত ক্ষত-চিহ্ন।
চাইবো সব চেয়ে যা নারকীয় আর সমাপ্তিময়।

ধূসর লতারা আমায় গিলে ফেলবে
থাকবো দিনে বসার
রাতে শোয়ার একটা কাঠের বাক্স-বাড়ীতে
যেখানে সূর্য্যের কোনো পত্র-বাহক আসবে না
যেখানে থাকতে চাইবে না কোন কুকুরও!

এবং তা সত্ত্বেও—এ সব কিছুর সত্ত্বেও
এটাই হবে ব্রাঞ্জের মতই অমিত শক্তিশালী?

সবার চেয়ে একটা জিনিষ ভালো করে রাখবো
মধ্যে যার আছে প্রথম সন্ধ্যার অতিকায় নক্ষত্রের নীল ইস্পাত
ভাঙা পা ও ক্ষতচিহ্নের চেয়ে আয়ু যার অনেক।

ভাঙা পা গিয়ে পড়ে খন্তায় খোঁড়া গর্ত্তে
কিম্বা নাকের হাড় শাদা হয়ে যায় কোনো পাহাড়ের চূড়ায়।
এবং তা' সত্ত্বেও—তা' সত্ত্বেও
এক খামচা ঘনারুণ ভস্ম অন্ততঃ পড়ে থাকবে;
সন্ধানী বাতাসেরা, যারা ঘাসকে চাবুক মেরে যায়
বৃষ্টির চূর্ণ যা ধূলোকে করে যায় আঘাত
তারা জানে না কেউ-ই কেমন করে দেখতে হয়
কেমন করে ছুঁতে হয় রক্তালোকের ঝলককে!

আমি চীৎকার করে বলি :
ঈশ্বর আমার একটা ভাঙা পা দাও
একটা ক্ষতচিহ্ন কিম্বা উৎকুনময় মৃত্যু···

আমি!···যে দেখেছে সেই ঘন অরুণ বর্ণের ঝলক—
ঈশ্বরকে বলি : দাও যা নারকীয় এবং সর্ব্বঘাতি।

ভারতের রূপদর্শন

শ্রীযামিনীকান্ত সেন

বুদ্ধ মূর্ত্তি—প্রোম, ব্রহ্মদেশ (উচ্চতা ১১০ ফুট)

রহস্যের পশ্চাতে বহু কাল ছুটে ইউরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এই প্রাচীন দেশটির দেববাদের ভিতর ওসাইরিস, আইসিস ও হোরাসের উপাখ্যান শুধু নয়, আমেন-চা, মৌৎ, কংস্ প্রভৃতি নানা দেবের একটা মণ্ডলী আবিষ্কার করে, যা নগরের প্রাচীন ইতিহাস খৃষ্টপূর্ব্ব ২৩০০ শতক হ'তে সুরু হয়েছে। এ যুগে এই নগরটি সুমেরীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। এ সময়কার বহু উপকরণ পাথরের টুক্‌রো, মোসেয়িক (mosaic) তরবারি, পাত্র প্রভৃতি আবিষ্কার করে সুমেরীয় সভ্যতার একটা রেখাঙ্কন করা হয়েছে। Crete এর minoan সভ্যতার যুগ হচ্ছে খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০০ শতক। Knossos, Mallia Tyhssos, Phaestos, Hagia Triada তে এ সভ্যতার বহু উপকরণ প্রাপ্তি প্রত্নতাত্ত্বিকদের উৎসাহিত করেছে।

নীল নদীর উপত্যকা, এবং টাইগ্রিস-ইউফ্রাটিস উপত্যকার মত সিন্ধুর উপত্যকায়ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের এক পরম উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এখানকার বহু প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার যে উপকরণ ইদানীং আবিষ্কৃত হয়েছে তা'তে করে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বহু অন্ধ কুসংস্কার দূরীভূত হয়েছে। ভারতবর্ষের সব সৃষ্টিকে নিতান্ত আধুনিক মনে করা সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের একটা সুকল্পিত অভ্যাসে পরিণত হয়। মহেঞ্জোদারো (Mauhenjodaro) ও হারাপ্পার আবিষ্কার এদের এ শ্রেণীর বাচালতাকে নিঃশব্দ করেছে।

প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান যাদের কাজ, তাদের কর্ত্তব্য মাল-মশলা জোগাড় করা মাত্র। দিগ্‌দিগন্তে বা যুগ-যুগান্তে খণ্ড বা অখণ্ড যত কিছু প্রাচীন তথ্য, পুঁথিপত্র, অনুশাসন, মূর্ত্তি, মন্দির বা আলেখ্য প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে তা খুঁজে বের করা হল এদের কার্য্যসূচি। ইউরোপীয় চিন্তা মিশর হতে একটা মৃত্যুমুখী একাগ্রতা ও দৃষ্টি লাভ করেছে। তা খৃষ্টতত্ত্বের দ্বারা আরও পুষ্ট হয়েছে। ক্রুশের উপর যীশুর মৃতদেহকে প্রতিমারূপে রক্ষা করে খৃষ্টীয় শীলতা মমি (mummy) অপেক্ষা আরও স্থিরতর ভাবে মৃত যীশুর আদর্শকে রক্ষা করেছে। ফলে এ-রকমের মৃত্যুবাদ মৃত ও গলিত জগৎ সম্বন্ধে একটা শ্রদ্ধা জাগ্রত করেছে ইউরোপে। এ জন্য মাটি খুঁড়ে মৃত সভ্যতার গলিত দেহ খোঁজা হচ্ছে। মিশরের প্রাচীন সভ্যতা ও

কিন্তু তবুও ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অখ্যাতি ও কুখ্যাতির সীমা নেই। কতকগুলি উপকরণ স্তূপাকার করলেই কোন সভ্যতার অন্তরঙ্গ তত্ত্ব বোঝা সহজ হয় না। অনেকগুলো যাদুঘর রচিত হয়েছে বলেই য়্যাংলো-সাক্‌সন জাতি কিম্বা ইউরোপের ফরাসী বা ইতালীয় প্রত্ন-তাত্ত্বিকরা এদেশের দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করতে পেরেছে এ রকম মনে করা ভুল।

সতীদেহের মত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ছড়ান ভারতীয় স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্র-শ্রী এখনও পরিপূর্ণ ভাবে কারও চোখে পড়েছে কি না সন্দেহ। কারণ, গবেষকগণ খণ্ড খণ্ড ভাবেই কোন বিষয়কে বিচার করতে অভ্যস্ত—বিশ্লেষণই পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। অথচ আশ্লেষক দৃষ্টি না থাকলে প্রতি তিলের দিকে নজর আকৃষ্ট হলেও

পরিপূর্ণা তিলোত্তমা প্রতিমাকে দেখা যায় না। ভারতীয় কলা-লীলার বিচারে এদেশের ও বিদেশের বিচারকদের এই বিভ্রাট ঘটেছে।

ভারতীয় সৃষ্টিতে বিরাট রূপ কল্পনা অবিচ্ছেদ্য। ভারতের এক একটি দেবতার অসীম রূপ—অসীম নাম। রূপক দিয়ে এই অসীমতা বা বিরাটত্বকে উপস্থাপিত করা হয় কখনও বা অষ্টোত্তর-শত নাম-কল্পনার ভিতর দিয়ে, কখনও বা বহু মূর্ত্তির সাহায্যে। ভারতের একত্ব কল্পনা ইতিমূলক—ভারতের সভ্যতাগুলির একত্ব কল্পনা নেতি-মূলক। বিরাট বহুর সমাহারে ভারতীয় তত্ত্বের একত্ব বিকশিত হয়। এই একত্ব অন্যত্র থাকে না—তা বিশ্লিষ্ট নেতিমূলক বহুত্বে পর্য্যবসিত হয় মাত্র। ভারতের সমাহার ইতিমূলক বলে তা' গুণবাচক, যেমন ১×১×১×১=১; অন্যত্র যোগমূলক সমাহার ধরা হয় তা' হচ্ছে নেতিমূলক অর্থাৎ ১+১+১+১+১=৫। এ দ্বিতীয় পদ্ধতিতে ঐক্যের স্বর্ণসূত্র বহুত্বের ভিতর দুর্লক্ষ্য হয়ে পড়ে। ভগবানের রূপ-কল্পনায় ভারতের সমাহার যে শ্রেণীর ঐক্যে পর্য্যবসিত হয় তা' বিশ্বরূপ বর্ণনায় পরিস্ফুট হয়। অন্যত্র এরূপ কল্পনা বিচ্ছিন্ন ও বিরূপ বহুত্বে পরিণত হয় মাত্র। বৈদিক দৃষ্টির বহুত্বের ভিতর একেকে দেখা—পুরুষসূক্তে আছে—Concrete Universalএর স্বরূপ উদ্ঘাটন করে। এই ভৌম রূপে ঐক্য আছে। বিচিত্র বহুর ভিতর বহুকে না দেখে একের মূর্ত্তি লক্ষ্য করতে যে সভ্যতা উৎসাহিত, সে সভ্যতাকে বলতে হয়েছে "ভূমৈব সুখম্"—অর্থাৎ ভূমাতে সুখ—অল্পে নেই। যা কিছু সামান্য বা ক্ষুদ্র তাকেও এ সভ্যতা বিরাট ও সীমাহীন করতে উৎসাহিত। যা অণু হতেও অণু তাকে মহৎ হতেও মহীয়ান্‌রূপে যে সভ্যতা দেখে, সে সভ্যতার দৃষ্টিভঙ্গী বিচার না করলে এ ক্ষেত্রে সমগ্র সৃষ্টি অধ্যয়ন ব্যর্থ হবে। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এ ক্ষেত্রে একেবারে দিক্‌ভ্রান্ত হয়েছে এবং পদে পদে ভারতীয় সৃষ্টি অধ্যয়নে নিজেদের অক্ষমতা প্রমাণ করেছে!

তত্ত্বক্ষেত্রে এ সত্য বার বার উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিশ্বের সমগ্র রূপাবলিতে ঐক্য উপলব্ধি যেখানে সংস্কারগত হয়েছে সেখানে সঙ্কীর্ণ, সামান্য ও শীর্ণতা উপলব্ধি কঠিন। কঠোপনিষদে আছে:—

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ॥—২।২।১, কঠোপনিষদ।

একের ব্যাপকত্ব বহু রূপ ধারণে প্রমাণিত, কোথাও তা স্বল্পে ব্যাহত নয়। এ জন্য ভারতীয় সৃষ্টির প্রতি অধ্যায়ে অসীমতা অফুরন্ত লীলা-কমলে দ্যোতিত হয়েছে। বহুত্বের বৈচিত্র্য বিরাটত্ব ও বিশ্বরূপকত্বে পর্য্যবসিত হয়েছে।

ভারতের রূপচর্চ্চা বিধানে এই সত্যের মধ্যমণিকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তন্ত্রে ও উপনিষদে এই ভৌম দৃষ্টির সমর্থন আছে। রুদ্রযামলের সপ্তষষ্টিতম পটলে রূপান্বিতার স্বরূপ ব্যাখ্যানে আছে যে তা' কোথাও একটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন নয়—বহুদৃষ্টির সমাহারে কল্পিত:—

"রূপাতীতা রূপশূন্যা বিরূপা রূপমোহিনী"
—রুদ্রযামল, উত্তরতন্ত্র।

এমনি ভাবে রূপতত্ত্বকে প্রদক্ষিণ করা হয়েছে বিরাটের দিক্ হতে। ইউরোপের আধুনিকতম কোন কোন মনীষী ভারতের এই ভৌম দিক্-

ভারতীয় ভাস্কর্য্যে স্বভাববাদ
ভাস্কর স্বামী মন্দির
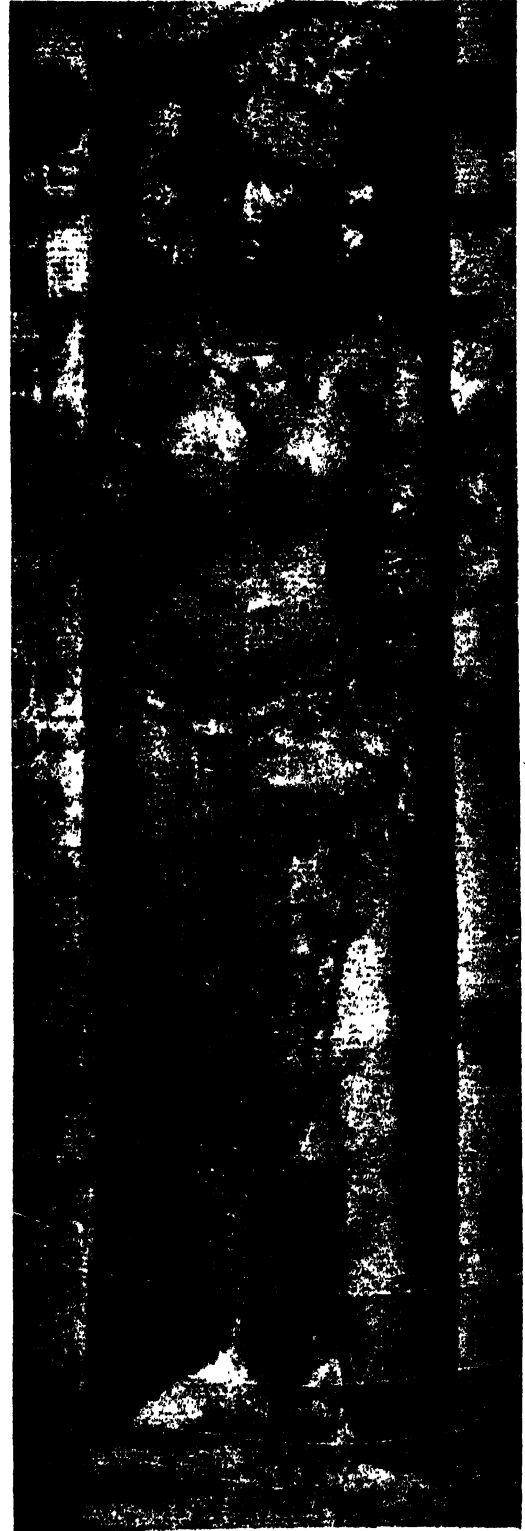
দর্শনকে স্বীকার করেছেন এ জন্ত তা ইউরোপের দিক থেকেও একেবারে অলীক বা অজ্ঞের বলা যেতে পারে না।*

বলা প্রয়োজন, এ পর্য্যন্ত যে সব ইউরোপীয় পণ্ডিত ভারতীয় সৌন্দর্য্য সৃষ্টি আলোচনা করেছে তারা প্রায় সকলেই এই দৃষ্টিভঙ্গী বিষয়ে অজ্ঞ। তারা তাত্ত্বিক বা দার্শনিক নন এ জন্ত রূপচর্চ্চায় এই বিরাট সত্য অনুধাবন করতে পারেনি। বস্তুতঃ, বিরাটের মধ্যে সামান্তকে মাত্র নয়, সামান্তের মধ্যেও বিরাটকে স্বীকার করা ভারতীয় সভ্যতার মৌলিক আবিষ্কার ও দর্শন। এ জন্ত দেবদর্শনে শুধু হস্ত প্রদক্ষিণ করে বহু দিক্ হ'তে দেবতাকে বহু রূপে দেখার প্রবৃত্তিতেই এই উৎসাহ পর্য্যবসিত হয়নি। অষ্টোত্তর-শত বার প্রদক্ষিণ করে অসংখ্য দিক ও কাল হ'তে সমীক্ষণ ও অনুষ্ঠান করার বিধান শুধু ভারতে এবং ভারত-প্রভাবিত পূর্ব্ব-প্রাচ্যে প্রচলিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। এ রকমের দর্শনই ভারতের মননশীল ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করেছে।

এ জন্তই ভারতের উপনিষদ্ বলেছেন, যা সত্য তাকে বাইরের কঞ্চুকস্থ একটি রূপের ভিতর পাওয়া যায় না। গ্রীক দৃষ্টিভঙ্গীও এ শ্রেণীর সামীপ্যবোধের উপর নিহিত। উপনিষদের মতে হিরণ্ময় পাত্রের দ্বারা সত্যের মুখ আবৃত, সে আবরণ দূর করলেই যথার্থ দর্শন সম্ভব হয়, বিচিত্র ও গভীর অভিজ্ঞতার ফলে—

হিরণ্ময়েন পাত্রেন সত্যস্যাপিহিতং মুখম্।
তৎ ত্বং পুষন্নপাবৃণু সত্যধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।" ১৫—ঈশোপনিষদ্

ভারতীয় রম্য রূপসৃষ্টির বিচিত্র জগতে এই সত্যদৃষ্টির সমর্থন লক্ষ্য করতে হয়। তা না হ'লে ভারতের কলা-কৌলীন্তের বহুমুখী ব্যাকুলতা ধরা পড়ে না। এ পর্য্যন্ত এ পথে কেউ অগ্রসর হয়ে ভারতীয় রম্যসৃষ্টির বিচার করতে যায়নি। ফলে ঘটেছে বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়।

এদেশের বাস্তুশাস্ত্র স্থাপত্য-কলা সম্বন্ধে নানা নির্দ্দেশ করেছে। স্থাপত্য-কলায় উত্তর-ভারতীয় বা Indo Aryan রীতি এবং দ্রাবিড়-রীতি নামক দু'টি রীতির মন্দির-কলা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। তা ছাড়া অন্ত রীতিও আছে। কিন্তু ভারতের রম্যরচনা লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে কোন রীতিই সৃষ্টির অফুরন্ত পুষ্পিত প্রাচুর্য্যের সীমা স্থির করে দিতে সক্ষম হয়নি। ইন্দো-আর্য্যরীতির গমক অফুরন্ত—নানা বৈচিত্র্য, ঐশ্বর্য্য ও আলঙ্কারিক বিশিষ্টতার অসংখ্য মন্দিরের স্বাতন্ত্র্য সকলকে মুগ্ধ করে দেয়। একঘেয়ে একটানা দ্বিরুক্তি বা পুনরুক্তি কোথাও পাওয়া যাবে না। অথচ এ রকম কথা ইউরোপীয় ক্যাথিড্রেল, ইসলামীয় মসজিদ সম্বন্ধে বলা যায় না—এ সমস্ত রচনা একান্ত ভাবে সীমাবদ্ধ—অনেক সময় পুনরুক্তি-স্থানীয় হয়ে পড়েছে।

উত্তর-ভারতীয় স্থাপত্য-কলার বৈচিত্র্য দেখে বিস্ময় জন্মে। পূর্ব্বাঞ্চলে উড়িষ্যার সৌধ রচনার নিপুণতা, বিরাটত্ব ও আলঙ্কারিক বৈভব একটা অভূতপূর্ব্ব শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। এদের ভিতরও বিশিষ্টতা আছে। পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের রচনা শিখরের বা চূড়ার ঘটা আতিশয্যে পীড়িত হয়নি—পরবর্ত্তী রচনায় শিখরের বহিরবয়বের বঙ্কিম রেখা ঊর্দ্ধ দিকে বিশেষ ভাবে আনত হয়েছে। ভুবনেশ্বরের পরশুরাম মন্দিরের সহিত দেওঘরের (ঝাঁসি) দশাবতার মন্দির, আইহোলের দুর্গা মন্দির এবং নাচনা কুঠারের শিব-মন্দিরের তুলনা করা যেতে পারে কিন্তু উড়িষ্যার মন্দিরগুলিকে যথার্থতঃ নাগর, বেসর বা দ্রাবিড়-পদ্ধতির কোনটির ভিতরই সীমাবদ্ধ বলা চলে না। উড়িষ্যার প্রথম যুগের মন্দিরে "বিমান" ও "জগমোহন" আছে, দ্বিতীয় যুগের রচনায় আছে শুধু বিমান, কিন্তু শেষ যুগের সৃষ্টিতে শুধু বিমান ও জগমোহন মাত্র নয়, নাট-মন্দির এবং ভোগ-মণ্ডপও সৃষ্ট হয়েছে উত্তরোত্তর ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির জন্ত। লিঙ্গরাজ মন্দির এই শ্রেণীর। কথিত আছে, এই বিরাট মন্দিরটি মহাশিবগুপ্ত যযাতির প্রভাবে রচিত হয়েছিল। ভুবনেশ্বরে এই মন্দিরটিই সব চেয়ে বৃহৎ। মন্দিরটির উচ্চতা ১৮০ ফুট। শীর্ষভাগ রচনায় কোন মসলা ব্যবহৃত হয়নি। মন্দিরটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বহু ক্ষুদ্র শিখর কর্ত্তৃক খচিত এবং এর অবয়বের প্রত্যেকটি ইঞ্চি অতি নিপুণ খোদাই কাজে পরিপূর্ণ। এমন কি, প্রত্যেকটি পাথরের উপর খচিত নক্সা সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে। কাজেই সমগ্র ও প্রতি অংশের নানা ভূষণ ও তিলক একে এক অপূর্ব্ব বিশিষ্টতা দান করেছে।

বাংলা দেশে ও ইন্দো-আর্য্য রীতি নূতন নূতন বহু বিশিষ্টতায় সংক্রামিত হয়েছে। বৈচিত্র্যের অফুরন্ত আয়োজন কোথাও স্থগিত হয়নি। বাংলা দেশের ব্রহ্মময়ী মন্দির শিল্পীর অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। বিষ্ণুপুরের জোড়া মন্দির নানা অভিনব ভঙ্গীর রচনা; মানভূম জেলার নব নব রূপকল্পনা মনে হয় মন্দিরের একটা বহুমুখী ভৌম রূপ সৃষ্টি করা ছিল অগণিত হিন্দুস্থপতির কাম্য ব্যাপার। বিষ্ণুপুরের প্রতিটি মন্দির এক এক রকমের—সব কয়টা মন্দিরকে বিভিন্ন রূপদান করে যেন একটা অখণ্ড রূপের প্রতিষ্ঠা হয়েছে বহুর ভিতর।

উত্তর-ভারতের নেপালে ভোটপল দেব-মন্দির প্যাগোদা রীতিতে পাঁচটি সারিতে কল্পিত হয়েছে। এটাও একটা অভিনব রচনা। মধ্য-ভারতে গাজুরাহোর বিশ্বনাথ-মন্দিরে হঠাৎ পট-পরিবর্ত্তিত হয়ে যেন মন্দির-কলার আর একটি অধ্যায় সূচিত হয়েছে। দিকে দিকে বৈচিত্র্য ও নূতনত্ব! বহুর ভিতর দিয়ে মন্দির রূপের এক বিচিত্র বিশ্বরূপ যেন ফলিত করা হয়েছে! কাশ্মীরের মার্ত্তণ্ড-মন্দির আর একটি অর্ঘ্য উপস্থিত করেছে এই অফুরন্ত রূপপূজার পরম্পরার ভিতর! কোথাও একঘেয়ে কিছু নেই, সবই অফুরন্ত অথচ নূতন বিশিষ্টতায় মণ্ডিত। আবু পাহাড়ের বৌদ্ধ-মন্দিরগুলি এ ক্ষেত্রে নূতন স্বপ্ন। ফার্গুসনের মতে এ রচনা হচ্ছে "unsurpassed by any similar example found any where."

দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়-রচনায় "ভূমৈব সুখম্" এই হিন্দু অনুরক্তির আর একটি দিক ফলিত হয়েছে। দ্রাবিড়-রচনার বেলুড় মন্দিরের রূপশ্রীর বিশিষ্টতা ছাড়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সজ্জা অতুলনীয়। মন্দিরটির আকারও বিরাট, ১৭৮ ফুট দীর্ঘ ও ১৫৬ ফুট চওড়া। শুধু পূর্ণাঙ্গ মন্দিরের বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মাত্র নয়, এমন কি, কার্ণিসগুলির খোদাই কাজে পর্য্যন্ত অফুরন্ত ও বিচিত্র লীলায় পরিপূর্ণ। অপর দিকে হালেবিদ মন্দিরের রচনার বিশিষ্টতাও সৌধকলার আর একটি অভ্রান্ত অধ্যায় পূর্ণ করেছে। এ মন্দিরের সারি সারি মূর্ত্তিগুলির বিশিষ্টতা সমগ্র জগতের সৃষ্টিকে সহজে পরাজিত করে। মন্দিরটি ফার্গুসনের মতে far surpass anything in Gothic art. এ সব প্রশংসা অসাধারণ বলতে হয়। কৈলাস-মন্দিরকে একটি পাহাড় কেটে সৃষ্টি করা হয়েছে, এর তুলনা জগতে নেই। এমনি করে সারা ভারতে সীমাহীন বিচিত্র এবং অফুরন্ত গমকে লীলায়িত

* Spengler. "Decline of the West."

মন্দিরগুলিকে প্রদক্ষিণ না করলে একটা বিরাট ধারণা সম্ভবই হবে না ভারতীয় স্থাপত্য সম্বন্ধে। এ ধারণার ভিতরই সকলের মনে জাগবে দেবতাদের জন্ম রচিত হর্ম্ম্য কিরূপ হওয়া উচিত।

ভারতীয় ভাস্কর্য্যের ভিতর ও এই বিচিত্র বহুর্ক ভৌম রূপ বা বিরাট রূপের ভিতর উপলব্ধি করতে হবে। তা' ছাড়া হিন্দু-মূর্ত্তিকলা সম্বন্ধে কোন ধারণাই সম্ভব হবে না। যে ভাবে মিশরীয়, গ্রীক, রোমক ভাস্কর্য্যকে অধ্যয়ন করা হয় সে ভাবে ভারতীয় ভাস্কর্য্যকে অধ্যয়ন করা ভুল। বিচিত্র বহুর ভিতর ঐক্য না দেখলে দেবতার রূপায়তন চক্ষুগোচর হবে না। প্রসঙ্গতঃ একটি মূর্ত্তি সম্বন্ধে কিছু বিচার করা যাক—যেমন বিষ্ণুমূর্ত্তি। গ্রন্থাদিতে বিষ্ণুর ভাবদ্যোতক স্তব প্রভৃতিতে লক্ষ্য করতে হয় বিষ্ণুর সহস্র নাম। এ রকমের সহস্র নামের ভিতর দিয়ে বিষ্ণুর সহস্র বিভূতি বা গুণকে বর্ণনা করা হয়েছে। কাজেই এই হাজার শব্দে ব্যাখ্যাত বিষ্ণুকে ধারণা করতে না পারলে বিষ্ণুর রূপই ধরা যাবে না। গোড়াতেই শিল্পগ্রন্থাদি দেবমূর্ত্তি কিরূপ হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে সাধারণ মতামত ব্যক্ত করেছে। শুক্রনীতিসার, ময়শাস্ত্র, সমরাঙ্গন সূত্রধার, বৃহৎসংহিতা, ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরাদিতে এ সম্বন্ধে নানা নির্দ্দেশ আছে। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য হয়েছে অফুরন্ত অথচ এর ভিতর সমান ধর্ম্ম আছে। বিষ্ণুর সহস্র নাম উদ্ভট কল্পনা নয়—কিন্তু কেউ কি Apollo বা Osiris এর হাজার নামের কথা শুনেছে? এ সব দেশের বহিরঙ্গ ভাস্কর্য্যের নিকট ভাবপ্রকাশক এই বিচিত্র বহুর গমক অবাঞ্ছনীয়। মহাভারতের অনুশাসনপর্ব্বে বিষ্ণুর সহস্র নাম আছে। বৃহৎ ব্রহ্মসংহিতায় বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্ত্তির কথা আছে। যোগস্থানক মূর্ত্তি, ভোগস্থানক মূর্ত্তি, অভিচারিবাস্থানক মূর্ত্তি, যোগাসন মূর্ত্তি, যোগশয়ন মূর্ত্তি, অধম বীরাসন মূর্ত্তি প্রভৃতি সহজেই দেখতে পাওয়া যায়। মথুরার ভোগস্থানক মূর্ত্তি, বগলির যোগাসন মূর্ত্তি, মহাবলিপুরের যোগস্থানক মূর্ত্তি, দেওঘরের ভোগশয়ন মূর্ত্তি, ঐহোলের বীরাসন ও যোগশয়ন মূর্ত্তি, এলোরা, বাদামী ও কঞ্জিভরামের যোগাসন মূর্ত্তির ভিতর বিষ্ণুকে লক্ষ্য করতে হয়। বিষ্ণুর চতুর্বিংশতি মূর্ত্তিও অন্ধ্রপ্রদেশের বিখ্যাত মন্দিরে দেখা যায়! কাজেই একটি দেবতার প্রকাশ হয়েছে বহুর ও বিরাটের ভিতর। এটাই হ'ল হিন্দুসৃষ্টির প্রথা। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে এমনি করে প্রত্যেক দেবতার অসংখ্য রূপ কল্পিত হয়েছে। সাধনমালা নামক গ্রন্থে এর পরিচয় পাওয়া যায়। সকল দেবতার এই রকমের বিরাট ও বিশ্বরূপ কল্পিত হয়েছে।

ভাস্কর্য্যের অন্য কেন্দ্রেও এ রকমের একটা বিরাটের রচনা সমগ্র জগৎকে হতবুদ্ধি করেছে। এ সব দেখে ইউরোপীয় সমালোচকগণ হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন। Roger Fry এর মত ধীর-স্থির সমালোচক এই জন্ম ভারতীয় শিল্পের ভিতর দেখেছে না—"multiplicity, diversity ও intricacy"—অথচ চীন-শিল্পে এ রকম কিছু নেই। এ জন্মই তিনি বলেছেন—"Chineese art is nothing so difficult of access as Hindu art"। বলা প্রয়োজন, হিন্দু-শিল্পের এই বিরাট দিক ইউরোপের কারও পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব হয়নি।

ভাস্কর্য্যের অপর ক্ষেত্রেও এই বিরাটত্ব উম্মোচিত হয়েছে বার বার। অগভীর তক্ষণ-কলায় রূপকৃত্যের অফুরন্ত পর্য্যায় প্রাকৃতিক অসীমতাকেই যেন ফলিত করেছে। দক্ষিণ অঞ্চলের হয়শলেশ্বর মন্দিরের তক্ষণ-বৃত্য সম্বন্ধে Codringlon বলেন: "The architectural framework is used mainly as a background for display of an infinite outpour of decoration which leave no space uncovered and give the eyes no rest" [O. 131 H. F. 1.] যবদ্বীপের বরভূধরের রচনায় ষোল শত ফলকে অসংখ্য মূর্ত্তির ধারা রচিত হয়েছে—ব্যাপকত্বে এই রচনা তিন মাইল দীর্ঘ। জগতের অন্য কোন সভ্যতা এ রকম কিছু সৃষ্টি করা দূরে থাক্, এ রকমের কল্পনাও করতে পারে না। ইন্দোচীনের তক্ষণ-কলা এত দীর্ঘ যে সারা দিন দেখেও তা শেষ করা যায় না!

এ সব আকস্মিক ব্যাপার নয়—একটা সুচিন্তিত আদর্শে রচিত। এখানকার মানুষের এবং জীবজন্তুর মূর্ত্তি-সংখ্যা কুড়ি হাজার। সমগ্র গ্রীক ও রোমক মূর্ত্তির সংখ্যা এরূপ বিরাট হবে কি না সন্দেহ। হালেবিদের পূর্ব্ব-উল্লিখিত হয়শলেশ্বর মন্দিরে একটি ৭১০ ফুট দীর্ঘ ফলকে দু'হাজার হাতীর মূর্ত্তি আছে অথচ এর কোন দু'টি এক রকম নয়। এর ভিতর পুনরুক্তি নেই। গ্রীক-মন্দির Parthenon এর সব কয়টি স্তম্ভই এক রকমের অথচ হিন্দু-মন্দিরের কোন দু'টি স্তম্ভ এক রকমের নয়। ফার্গুসন বলেন—"All the pillars of the Parthenon are identical while no two facets of the Indian temple are the same. Every convolution of every scroll is different..." অসাধারণ কল্পনা ও নূতনত্ব সৃষ্টির প্রেরণা না থাকলে বিরাট রচনা বা বিশ্বরূপের বহুত্ব ধ্যান সম্ভব হয় না। একক মূর্ত্তি-কল্পনায় বিরাটত্ব ও জগতের সকল চেষ্টাকে হার মানিয়ে দেয়। ভারতবর্ষের সকল রচনায় মূলেই ভারতীয় বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গী কাজ করেছে। শ্রাবণবেলগোলায় জৈন তীর্থঙ্কর গোমতেশ্বরের মূর্ত্তিকে একটি উচ্চ পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে—এ রকম সৃষ্টি জগতে সম্ভব হয়নি। মূর্ত্তিটির মুখশ্রী ও দেহভঙ্গীর রমণীয় পরিমাপ সহজে বিস্ময় জাগ্রত করে—কারণ, মূর্ত্তিটির উচ্চতা হচ্ছে ৬৫ ফুট এবং এই আদর্শে সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও রচিত হয়েছে। যন্ত্রযুগের বহু পূর্ব্বে এ মূর্ত্তি রচিত হয়েছে, কাজেই এর কৃতিত্ব অসাধারণ। ব্রহ্মদেশে প্রোম নগরের উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তির উচ্চতা হচ্ছে ১১০ ফুট। ভারতের মহামানবের এই রকম বিরাট মূর্ত্তি সার্থক হয়েছে। অপর দিকে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রচনারও অন্ত নাই। জৈন মন্দিরের সূক্ষ্ম খোদাই কাজে স্বর্ণকারদেরও হার মানতে হয়। Col. Tod তেজপালের আবু পাহাড়ের মন্দিরের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সম্বন্ধে বলেন—"the deleneation of which defies the pen......there is nothing in the most florid style of Gothic architecture that can be compared with this in richness"। এ মন্দিরের শ্বেতপাথরের ছাদে ৩২টি নটীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্ত্তি রচিত হয়েছে—এর ভিতর কানটি অন্যটির মত নয়। নৃত্যের বহুমুখী অবস্থার ভিতর দিয়ে নটীকে দেখান হল এর উদ্দেশ্য। এই বহুত্ব, বিরাটত্ব ও বৈচিত্র্য পার্থিব সৃষ্টির সকল দিকেই দেখা যায়, কোথাও তা সামান্য, সহজ বা শীর্ণ নয়।

চিত্রকলা ক্ষেত্রেও এই বিরাটত্ব, বহুত্ব ও বিশ্বরূপত্ব সহজেই প্রতীয়মান হয়। শুধু ইউরোপের আদর্শে দীক্ষিত দর্শকগণই এর

ভিতরকার ঐক্য ও ছন্দ বুঝে উঠ্‌তে পারে না। ভারতীয় রচনার বিপুলত্বকে একটা "vice" বা পাপের ব্যাপার বলে বর্ণনা করে এরা নিজেদের মূর্খতাকে ঢাক্‌তে চেষ্টা করে। Lawrence Biniyonএর মত সমঝদারও উক্ত অজন্তার রচনা-রীতির ভিতর কোন ঐক্য বা ভৌম ছন্দ দেখতে না পেয়ে ভারতীয় রচনাকে সামগ্রিক দিক্ হ'তে অসম্পূর্ণ ও অসমাপ্ত মনে করতে উৎসাহিত হয়েছে।

অজন্তার রচনার বিপুল সমারোহের ভিতরকার সৌন্দর্য্যবিধিও ইউরোপীয় একদেশ-দর্শিতায় কারও চোখে পড়েনি। ইউরোপীয় পাণ্ডিত্য-সুলভ গ্রীক সভ্যতার নৈকট্যপ্রীতি (sense of the near) ভারতীয় দূরত্ব ও গভীরত্ব পরিমাপে বার বার ব্যর্থ হয়েছে। এ জন্য ইউরোপের পক্ষে ভারতীয় রূপচর্চ্চা একটা ব্যঙ্গের ব্যাপারে পর্য্যবসিত হয়েছে।

অজন্তার বিরাট ফলকে যে অফুরন্ত চিত্রপর্য্যায় ন্যস্ত করা হয়েছে তার ভিতরকার উস্মিত লালিত্য এবং উচ্ছ্বসিত হিল্লোল ভারতের রূপদর্শনের মৌলিক ভিত্তির উপর রচিত। অজন্তার এক একটি চিত্রফলক অনেক সময় ৬০ বর্গ-ফুট। এর ভিতর পৌনঃপুনিক নক্সা নেই, পুনরাবৃত্তিও নেই। প্রায় সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অজন্তার চিত্র-আলোচনার বৈচিত্র্যকে অসীম বা "infinite" বলেছেন। মিঃ গ্রিফিথ এই সম্পর্কে লিখেছেন—"their variety is infinite so that repetition is rare"। গ্রীক আর্ট স্তম্ভ রচনায় তিনটি নমুনা মাত্র আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করেছে। এদেশের রাণপুর (Ranpur) মন্দিরের সহস্রাধিক স্তম্ভের ভিতর একটি অন্যটির মত নয়। একেই বলে অক্লান্ত মনন ও কল্পনার মৌলিকতা!

অজন্তা চিত্রাবলির নিজামের সংস্করণে মুসলমান আলোচক রমণী-চিত্রাঙ্কনের বৈচিত্র্য দেখেছেন কিন্তু ভারতীয় রূপদর্শনের কোন বিধি বা প্রথা জানা নেই বলে এর ভিতরকার ঐক্য অনুভব করতে পারেনি! গুলাম ইয়াজদানি বলেন:—"The artists of Ajanta have painted woman in a variety of graceful poses standing, kneeling, sitting and lying down." অজন্তায় নানা অবস্থায় চিত্রিত বুদ্ধমূর্ত্তির সংখ্যা প্রায় ১০৫৫। এর চারি দিক্‌কার আলঙ্কারিক সূক্ষ্মকার্য্যও অফুরন্ত। ইয়াজদানি বলেন—"The ceilings of Ajanta show a kaleidoscopic variety of motifs and devices." বাগগুহাগুলি গোয়ালিয়র রাজ্যের পরম সম্পদ। এগুলি অজন্তা হ'তে এক শত পঞ্চাশ মাইল দূরে—মধ্যে নর্ম্মদা নদী প্রবাহিত। অজন্তার মত বিরাট না হলেও বাগগুহার চিত্রাবলি ভারতীয় কৃষ্টির মর্য্যাদা ও রচনার সৌকুমার্য্য রক্ষা করেছে। এর একখানি চিত্রপটের ফলকের পরিমাণ হচ্ছে ১৪ বর্গ-ফুট। এর রচনা সম্বন্ধেও সেই "অসীমতার" ভক্তি ব্যবহৃত হয়েছে। কডরিংটন এ সম্বন্ধে বলেছেন—"paintings of high merit and infinite variety [H. F. I. C. P. 108] এই "infinite" বা অসীম কথাটি শুধু ভারতীয় সৃষ্টি সম্বন্ধেই বলা যায়।

এ-সব ভক্তিগুলি একটা অসামান্য কৃতিত্বকে স্বীকার করছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই অসীমতাকে বর্ব্বরোচিত বাহুল্য বলে কল্পনা করতে এ সব পাশ্চাত্য লেখকদের আট্‌কায় না। এরা ভারতের দৃষ্টি-ভঙ্গী বোঝে না অথচ ভারতীয় রূপবিধির বিচার করতে মৌমাছির মত ছুটে আসে। গ্রীক-দৃষ্টি ও ভারতীয়-দৃষ্টি একেবারে বিপরীত ব্যাপার। ভারতীয় রূপদর্শন কি রকম ব্যাপক ও বিশ্বতোমুখী তা উপলব্ধি না করতে পারলে ভারতীয় কলা ও সাহিত্যালোচনা একেবারে ব্যর্থ হ'তে বাধ্য।

বিচিত্র বহুকে সমন্বয় করেছে বলে একক মূর্ত্তি ও চিত্র ভারতে দুর্লভ নয়। ধ্যানী বুদ্ধ, নটরাজ ও প্রজ্ঞা-পারমিতা প্রভৃতির মূর্ত্তি সুপরিচিত। বহু হস্ত ও শীর্ষযুক্ত মূর্ত্তির প্রাকাশিক ঐশ্বর্য্যেও ভারতীয় রূপ-রচনা আবদ্ধ হয়নি। অপ্সরী মূর্ত্তির ঐন্দ্রজালিক যাদু যেমন রচিত হয়েছে তেমনি স্বাভাবিক মূর্ত্তি রচনাও দুর্লভ নয়—নাগেশ্বরস্বামী মন্দিরের নারীমূর্ত্তি এর দৃষ্টান্তস্থল। তা ছাড়া, বিরাটের মধ্যে ইউরোপীয় রসিক উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে তার ভিতরকার ঐক্য ঠিক করতে পারেনি কিন্তু বহুর ভিতর ঐক্য রচনার ছন্দ যথাস্থানে দেখা যায়। হয়-শালা রাজ-দরবারের মূর্ত্তি-বাহুল্যের ভিতরকার সঙ্গতি রোমক সৃষ্টিকেও হার মানায়। ইউরোপে রোমক শিল্পই বহুর ভিতর সামঞ্জস্য স্থাপনে প্রথম অগ্রসর হয়। সামান্যের ভিতর অসামান্যকে উদ্‌বুদ্ধ করলেও ভারতীয় রূপবিধি সামান্যকে কখনও তুচ্ছ করেনি। বেলুড়ের একটি তোরণে যে বৈচিত্র্য আছে, ইউরোপের একটি পরিপূর্ণ গির্জ্জায় তা' নেই। আবু পাহাড়ের স্তম্ভগুলিতে যে রূপকৃত্য আছে তা' বৈচিত্র্যে ও ঐশ্বর্য্যে জগতের যে কোন রচনাকে হতশ্রী করে দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতীয় রূপরাজ্য এখনও পৃথিবীর নিকট অর্গলরুদ্ধ। এ জন্যই ডাক্তার William Colm বলেছেন—"a real presentation of Indian art is yet to come"। ইউরোপ এর ভিতর বহু সমস্যা (riddles) দেখছে। এ সব সমস্যা এখনও পূরণ হয়নি। কারণ, ভারতীয় আলোচকেরা ইউরোপের পদাঙ্কেই এত কাল চলে আসছে। ভারতীয় ধর্ম্ম, সভ্যতা, শীলতার বহুমুখী তত্ত্ব না জানলে ভারতের সৌন্দর্য্যপুরীর 'সিসেম খোল' বাণী পাওয়া যে কঠিন, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

নিরক্ষর

শ্রীচরণদাস ঘোষ

সাত

কে বেশি সুখী হইল সে-আলোচনা এখন নিষ্প্রয়োজন।

মলিনের মায়ের মনে আবার উৎসাহ ফিরিয়াছে। পরদিন প্রভাত হইতেই তিনি সাঁওতাল-পাড়ায় ছুটিয়াছেন। সাঁওতালরা ভাগে তাঁহার জমি চাষ করে, তাহাদের তিনি বলিবেন—দুই মণই হোক্ আর পাঁচ মণই হোক্ যা ধান তাঁহার ভাগে পড়ে তাহা আজই যেন পালা ভাঙিয়া ঝাড়িয়া দেয়! ছেলে-বউয়ের মুখের অন্নে আর তিনি অংশ গ্রহণ করিবেন কেন? মলিনও পুনশ্চ বই-পত্র পাড়িয়া বসিয়াছে।

একটু বেলা হইতেই নাচ-দুয়ারে এক অস্থির কণ্ঠের ডাক শোনা গেল,—"বড়মা—"

মলিন চাহিয়া দেখিল—সন্ধ্যা!

সন্ধ্যা ঝড়ের ন্যায় প্রবেশ করিয়া বাড়ীময় উড়ো-চাহনি ফেলিয়া আপন-মনে বলিতে লাগিল,—"বড়মা কৈ বড়মা?"—

মলিন কহিল "মা সাঁওতাল-পাড়ায়—কেন?"

সন্ধ্যা বিরক্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আঃ! আজকের দিনটায়—তাও ছাই বাড়ী থাক্‌বে না, বড়মা? কাকে কি যে বলি—বাবা রে বাবা!"

মলিন কুণ্ঠিত হইয়া কহিল, "আমাকে বল্‌লে হবে না?—মাকে আমি বল্‌তাম!"

"ওঃ! ওঁকেই যেন আমি বল্‌তে এসেছি! দাদারা ওঁকে 'ফেয়ারওয়েল' দেবে—তা' বল্‌তে হবে ওঁকে!" বলিয়াই সন্ধ্যা ছুট দিল।

'ফেয়ারওয়েল!'—মলিনের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল। সেই ভাঁটু, সেই সব সতীর্থ—তাহারা আবার আসিবে, আবার তাহার সঙ্গে কথা কহিবে, আবার সকলকার ছড়ানো বুক একত্র হইবে! তার পর?—তার পর বিদায়, আনন্দের—'ফেয়ারওয়েল!'

গত কল্য ইন্সপেক্টর সাহেবের বিদায় গ্রহণ করিবার পরই ছাত্র-কমিটির একটি বিশেষ অধিবেশন বসে। তাহাতে স্থির হয় যে, মলিনকে একটি 'ফেয়ারওয়েল' দিতে হইবে। কিন্তু প্রশ্ন উঠে অধিবেশনের পরিচালক নির্ব্বাচন লইয়া—পুরোহিতের সম্মান দেওয়া হইবে কাহাকে? গ্রামের যে-কয়েক জন বিশিষ্ট ভদ্রলোক ছিলেন, এক-এক করিয়া সকলেরই নাম প্রস্তাবিত হয়, কিন্তু অধিক 'ভোট' পায় নিবারণ, স্কুলের প্রেসিডেণ্ট বলিয়া।

বাড়ী ফিরিয়াই প্রস্তাবটার কথা ভাঁটু সন্ধ্যাকে ও মাকে বলিয়াছিল। সন্ধ্যা তাহা কান পাতিয়া শুনিয়াছিল, মাও যে শোনেন নাই, তাহা নহে! উপরন্তু একটু হাসিয়াছিলেন—অতিরিক্ত!

'বড়মায়' বাড়ী হইতে যে-সময় সন্ধ্যা ফিরিয়া আসিল, তাহার একটু পরেই গ্রামের ছাত্র-বাহিনী নিবারণের বাড়ী ঢুকিল, অগ্রণী—ভাঁটু।

নিবারণ তখন বহিঃকক্ষে বসিয়াছিল, ইহাদের আকস্মিক অভিযানে সে বিস্মিত হইলও যেমন চমকিয়া উঠিলও তেম্‌নি! কোন কিছু প্রশ্ন করিবার পূর্ব্বেই ভাঁটু তাহাদের প্রস্তাবটা পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিয়াই কহিল, "আজই আমাদের মিটিং—ঠিক পাঁচটায়।"

সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য ছেলেরা বলিয়া উঠিল, "আপনি স্যার 'রেডি' হয়ে থাক্‌বেন—আমরা নিতে আসব।"

নিবারণের ভিতরকার অসুরটা পুনশ্চ রুখিয়া উঠিল! এই ব্রহ্মাণ্ড—ইহার সমস্ত লোকজনেরই মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিবার তার কথা—গত কল্য তাহার কি লাঞ্ছনাই না হইয়াছে! এক দিককার সকল কৌশল আর এক দিক দিয়া নিষ্ফল ত হইলই, উপরন্তু তাহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িল অপমানের কাদামাটি! এই সমস্ত খণ্ড-বুদ্‌বুদ্ একটির পর একটি তাহার মনের ভিতর উঠিয়া তাহার ভিতরটা বিকৃত করিয়া তুলিল। কি বলিবে, সময়োচিত বাক্যদান তাহার যে কী, তাহা সে ঠিক করিতে পারিল না। এক দিকে তাহার বিদ্রোহী মন, অপর দিকে এই সব লক্ষ্মীছাড়াদের দল। চুপ করিয়াই সে রহিল।

কিন্তু ছেলেদের এদিকে সময় সংক্ষেপ! ভাঁটু ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা'হলে—"

নিবারণ অন্তর্বিপ্লব যথাসম্ভব দমন করিয়া রুক্ষ কণ্ঠে বলিল, "কি আমাকে করতে হবে?"

সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "আপনাকে 'প্রিজাইড' করতে হবে, স্যার!"

"হুঁ!"—নিবারণ একটু চুপ করিয়া থামিয়া কহিল, "দেখো, ও কাজ আমি পারবো না।"

তৎক্ষণাৎ ছাত্রদের যুক্তকণ্ঠের অনুরোধ পড়িল—"না। বললে তো হবে না, স্যার! আমাদের কমিটির এই 'সিলেক্‌শন'! আপনি স্কুলের প্রেসিডেণ্ট কি না?"

স্কুল, অর্থাৎ উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়, তাহার প্রেসিডেণ্ট অর্থাৎ কর্ত্তা—এ পদ ছোট-খাটো নয়। এই পদ তাহারই উপর আরোপিত, তাহার সম্মান তাহা হইলে ছেলেরা সকলে মানিয়া লইয়াছে—কী করা যায়! নিবারণ চিন্তায় পড়িল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রায় মত দেয়-দেয়, এমন সময় সহসা তাহার মনের সুমুখে সরিয়া আসিল—মলিন তাহার সম্মান—তাহারই 'ফেয়ারওয়েল!' তাহার মনের ভিতর এক প্রচণ্ড শব্দ উঠিল—না, না! সঙ্গে-সঙ্গে তাহার মুখ দিয়াও নির্গত হইল—"না, না বলছি না। অন্য কাউকে দেখো।"

ছেলেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা। বিনীত কণ্ঠে কহিল, "স্যার, আমাদের এই 'ডিসিশন'!

নিবারণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া গুম হইয়া ঘরের এক কোণে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল। তার পর খুব খানিকক্ষণ হুঁকায় টান মারিয়া নাক-মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির করিয়া গম্ভীর ভাবে কহিল, "মাথা ঠাণ্ডা কোরে একটা কথা শোনো। এ-সবের দরকারই বা কি? এই যে স্কুলের কত ছেলে ছেড়ে যাচ্ছে, কত ছেলে 'ট্রান্সফার' নিচ্ছে, কত ছেলে পাশ কোরে স্কুল থেকে বেরুচ্ছে—কার জন্যে তোমরা কতো 'ফেয়ারওয়েল' দিয়েছ?"

কথাটার জবাব দিল ভাঁটু। বিনীত অথচ দৃঢ় কণ্ঠে কহিল, "অন্য ছেলের কথা আলাদা, বাবা! মলিনদা 'সাধারণের' ভেতর এক জন তো নয়!" একটু থামিয়াই আবার সুরু করিল, "আমাদের মত সহস্র-সহস্র জীবজন্তু এই স্কুল থেকে বেরিয়ে গেলেও স্কুলের কিছু ক্ষতি হয় না, কিন্তু মলিনদা এই স্কুলের যে 'ষ্টার'।"

ভিতরে যাইবার দরজাটা ঠেসানো ছিল, হঠাৎ ভিতর দিকে ঝণাৎ করিয়া কি পড়ার শব্দ হইল। ভাঁটু দ্রুতপদে গিয়া কপাট ঠেলিতেই দেখিল সন্ধ্যা। তাহার হাতে এক সরা মুড়ি ছিল, মুড়ির সরাটা পড়িয়া গিয়াছে।

নিবারণ তখন ঘন ঘন হুঁকা টানিতেছে। সজোরে এক টান মারিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান ওই সৈন্য-সামন্তকে বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা আচ্ছা—ঠিক পাঁচটায় তো?"

ভাঁটু তখনো ভিতরের দিকে মুখ করিয়াছিল, চট্ করিয়া ফিরিয়া কহিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, নিউ ষ্ট্যাণ্ডার্ড টাইম।"

নিবারণ মিনিট খানেক গুম হইয়া থাকিয়া কহিল, "আমাকে নিতে তোমাদের আর আস্‌তে হবে না, বুঝেছ? আমি নিজেই যাবো।"

ছাত্র দলের প্রতিনিধি ভাঁটু, তাই বুঝি বা তাহার কর্ত্তব্য বড় কঠোর! সে সার্টের পকেট হইতে একখানা লম্বা কাগজ বাহির করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "আমাদের আর একটা নিবেদন আছে, বাবা!" বলিয়াই কাগজখানা নিবারণের সামনে ধরিয়া প্রার্থিত কণ্ঠে কহিল, "এই আপনার চাঁদা পড়েছে—"

"চাঁদা?"—নিবারণ সর্পাহতের ন্যায় লাফাইয়া উঠিল।

সঙ্গে সঙ্গে একযোগে ছেলেরা বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, স্যার! পাঁচ টাকা!"

"পাঁচ পয়সাও নয়,—" নিবারণ ক্ষিপ্তের ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিল। পুনরায় হুঁকাটায় বার-কয়েক জোর টান মারিয়া বলিয়া উঠিল, "যত সব বেয়াড়া কাণ্ড! আরে বাপু, তোরা একটা ফক্‌রে ছোঁড়াকে 'ফেয়ার-ওয়েল' দিতে যাচ্ছিস, বেশ, তাই না-হয় দিলি, আবার তাকে টাকা—"

ভাঁটু ধীর কণ্ঠে তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "তাকে নয়। তার সম্মানে এই সব টাকা খরচ হবে।"

নিবারণ যদি একা থাকিত, তাহা হইলে বোধ করি বা সে মাথার চুল ছিঁড়িয়া একাকার করিত। নিষ্ফল রোষে একবার ভাঁটুর পানে তাকাইয়াই হুঁকায় টান মারিতে গিয়া বুঝিল—অগ্নি নির্ব্বাণ! কলিকাটা নামাইয়া দুই-একটা চাপড় মারিয়া মুখখানা বাংলা পাঁচের মত বাঁকাইয়া বিরক্ত ভাবে বলিয়া উঠিল, "ধ্যেৎ, কল্‌কেটাও আবার তেম্‌নি—" বলিয়াই উঠিয়া ঘরখানা কাঁপাইয়া হুঁকা-কলিকা এক কোণে ঠেসাইয়া রাখিল।

ওদিকটায় ভাঁটুর যেন চোখই পড়ে নাই, এমনি ভাব দেখাইয়া সে পুনশ্চ ছাড়া-কথাটা ধরিয়া সুরু করিল, "মলিনদা'র একটা 'ফটো' তুলতে হবে, 'এ্যাড্রেস্' ছাপাতে হবে, ফুলের মালা কিন্‌তে হবে, তার পর 'লাইট্ রিফ্রেস্‌মেন্ট'—"

নিবারণ ক্রোধে থর-থর করিয়া কাঁপিতেছিল, দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার শ্রাদ্ধ—"

"হ্যাঁ, বাবা! কালই কলকাতায় লোক চলে গেছে! এই দেখুন, সকলেই চাঁদা দিয়েছে—সকলে!" বলিয়া ভাঁটু চাঁদার ফর্দ্দটা একবার দেখাইয়া নিজেই লোকের নাম ও চাঁদার হার পড়িয়া যাইতে লাগিল—

নিবারণ কান পাতিয়া শুনিতেছিল, হঠাৎ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "কার নাম ও গেল—কার নাম?"

'কালাচাঁদ দত্ত—"

"কালাচাঁদ? কালাচাঁদ চাঁদা দিয়েছে, এই কাজে?"—নিবারণ যেন আকাশ হইতে পড়িল।

ভাঁটু হাসিয়া কহিল, "হিরো ওয়ারশিপ্—'না' বল্‌বার যোটি কি!"

"হু!" বলিয়া নিবারণ মেঘের মত মুখখানা অন্ধকার করিয়া পুনশ্চ কান পাতিল। পড়া শেষ হইবা মাত্র আপন-মনে গর্জ্জিয়া উঠিল, "কালাচাঁদ, কানা হরে, অখা, নিমে হারামজাদা—সব ব্যাটাই দেখছি! আচ্ছা, এইবার কমিটিতে কোন্ ব্যাটা থাকে, তাই দেখছি—হুঁ!"

সময় অল্প, কাজ বহু—তাই বুঝি বা ভাঁটু আর সময়ক্ষেপ করিতে পারিতেছিল না, চঞ্চল হইয়া বলিয়া উঠিল, "তা হলে টাকাটা—"

আবার সেই অগ্নিবৃষ্টি! নিবারণের আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। কোনোও রূপে উপস্থিতকার মত নিজেকে সংযত রাখিয়া গুরু-গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, "টাকাকড়ি আমার নেই!"

"সত্যিই ত?"—হাসিতে-হাসিতে আধখোলা দরজাটা ঠেলিয়া সরস্বতী প্রবেশ করিল। স্বামীর দিকে একবার আড়চোখে চাহিয়াই ছেলেদের দিকে ফিরিয়া কহিল, "টাকাকড়ি ওঁর কাছে থাকে না। বাক্সও আমার কাছে, চাবীও আমার কাছে!"

বুঝি বা সব মাটি হইয়া যায়! নিবারণ অস্থির নেত্রে সরস্বতীর দিকে চাহিতেই, সরস্বতী মুখের ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া স্থির গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "রাজ-মন্দির, তার বিগ্রহের মাথায় রাংতার টোপর বসুবে—ইস্! যে-সভার অধিপতি আজ তুমি, সে-সভা দরিদ্র মতে হতে পারে না!" বলিয়াই পাঁচটি টাকা আনিয়া ভাঁটুর হাতে ফেলিয়া দিল।

সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতীর প্রতি একটি ছেলের আর-এক জোর অনুরোধ পড়িল। সে হাত জড়ো করিয়া বলিয়া উঠিল, "আর একটা কাজ তোমাকে করতে হবে, কাকীমা!—একটু চন্দন আর দুটো দুর্ব্বো—"

সরস্বতী হাসিয়া কহিল, "নিয়ো যেয়ো—" বলিয়াই ঘরের কোণে গিয়া তামাক সাজিতে বসিল। ছেলেরাও আর অপেক্ষা করিল না।

এ দিকে মলিনের যাত্রা-পর্ব্বের ঘটা পড়িয়া গিয়াছে। রাত্রিটা প্রভাত হইতে যা দেরি, তার পর না-হয় একটু বেলা বাড়িবে, তার পরই মলিন কলিকাতায় যাইবে। কিন্তু ময়লা জামা-কাপড় পরিয়া যাইতে পারে না তো! তাই, ছুলে-বউ আধ-পালি চাল দিয়া দোকান হইতে সাজিমাটি কিনিয়া আনিয়া ক্ষার করিতে বসিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, কলিকাতা—উঃ, সে কত দূর! দু'টি ভাত মুখে দিয়া ছেলেটি না-হয় যাত্রা করিল; রাস্তায় ক্ষুধা পাইবে তো—নিশ্চয়ই! তাই, মা কাঠখোলায় দু'টি চাল ভাজিতে বসিয়াছেন, বস্ত্রখণ্ডে বাঁধিয়া ছেলের পকেটে পুরিয়া দিবেন। এ-হেন সমারোহের মাঝে উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল সন্ধ্যা, যেন এক উড়ো-বিদ্যুৎ—এই মাত্র মেঘ ছাড়িয়া ধরাতলে নামিয়াছে আবার এই মাত্র উঠিয়া যাইবে! এদিক্-ওদিক্ দৃষ্টি ফেলিয়া সটান বড়মার কাছে আসিয়া চোখে-মুখে কথা বাহির করিয়া বলিয়া উঠিল, "বড়মা! আজ ভারি মজা হবে—উঃ, কি সুন্দর!"

বিস্ময়ে বড়মা তাহার দিকে চোখ তুলিতেই সে তেম্‌নি করিয়াই সুরু করিল, "দাদায় আজ মলিনদা'কে 'ফেয়ারওয়েল' দেবে—স্কুলের সব ছেলেরা! আর, বাবা হবেন—প্রেসিডেণ্ট!"

নিবারণের নামটা খট্ করিয়া মলিনের মায়ের কানে লাগিল। তিনি আতঙ্ক-অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "আবার নিবারণ—"

সন্ধ্যা চালাক মেয়ে। সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "ও-সব কিছু নয়! এ খুব ভা—লো! একে বলে 'ফেয়ারওয়েল', তার মানে কি জানো? মানে হচ্ছে—কাঁদো-কাঁদো মুখে বিদায় দেওয়া—" হঠাৎ তার গলাটা ধরিয়া উঠিল।

ভুলে-বউ ও মলিন কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভুলে-বউ বস্ত্রাঞ্চল দিয়া চোখ মুছিল। মলিনও বুঝি দিন পাইয়াছিল, হাসিয়া কহিল, "তার আগে যিনি বলছেন তাঁর মুখই যে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠলো!"

সন্ধ্যার পরিপূর্ণ দৃষ্টির পুরোভাগে মলিন—তাহার সমগ্র মূর্ত্তি! সহসা বিশ্বের রাগ-রোষকে চোখে পূরিয়া চোখ রগড়াইয়া, বিষম চটিয়া সন্ধ্যা বলিয়া উঠিল, "আমি তোমাকে কিছু বলিছি?—দেখো বড়মা!"

কথাটা কি, তাহা ভালো করিয়া শুনিবার জন্য বড়মা উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, মলিনকে একটু মৃদু তিরস্কার করিয়া কহিলেন, "আহা-হা! তুই চুপ কর্, না, মলিন!—বল্ তো মা, কি হয়েছে?"

সন্ধ্যা মলিনকে শুনাইয়া-শুনাইয়া, ঘা দিয়া-দিয়া বলিতে লাগিল, "এই ইনি—" মলিনের দিকে একবার আড়চোখে তাকাইয়াই সুরু করিল, "ইনি কলকাতায় যাচ্ছেন—যাচ্ছেন ত? তাই দাদারা বাবাকে বললো—স্কুলটা হবে অন্ধ! দাদাদের চোখে জল আর ধরছে না! অথচ, যখন ইনি যাবেনই, না গেলেই নয়—তখন হাসি-মুখে বিদায় দেওয়াই ভালো!" পুনশ্চ মলিনের প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল, করিয়াই দ্রুত কণ্ঠে সুরু করিল, "তাই, বুঝলে, বড়মা, দাদারা সকলে মিলে হাসি-মুখেই এঁকে বিদায় দেবেন! আবার, এই বিদায় দেবার কথা যা বলা হবে, তা' কলকাতা থেকে ছাপিয়ে আনা হয়েছে।" হঠাৎ থামিল, যেন তার ভিতরকার স্বর ফুরাইয়া আসিয়াছে।

বড়মার কিন্তু ও-সমস্ত কথা কানে এখনো পৌঁছে নাই, তাঁহার কর্ণের রন্ধ্র তখন রুদ্ধ করিয়া আছে—নিবারণ! অস্থির কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "তা' নিবারণ—"

"বলছি গো!"—হঠাৎ সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর যেন ধরিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি নিজেকে সহজ মাত্রায় দাঁড় করাইবার চেষ্টা করিতে করিতে বলিয়া উঠিল, "তাই ত বলছি, তোমার যেন আর তর সইচে না—তুমি, বড়মা, যেন কী! বাবা কি করবেন জানো—যিনি বিদায় নেবেন, তাঁর গলায় পরিয়ে দেবেন ফুলের মালা—"

"এ্যাঁ। ফুলের মালা? ফুলের মালা পরবে আমাদের মলিন?"—ভুলে-বউ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, তার বুকের ভেতর আনন্দ রাখিবার যেন আর ঠাঁই নাই!

মলিনের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল এবং মাথা নোয়াইয়া একটু-একটু করিয়া পিছাইয়া সরিয়া গেল।

সন্ধ্যা চোখ বাঁকাইয়া সেই দিকে একবার তাকাইয়াই ভুলে-বউয়ের দিকে ফিরিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, "হ্যাঁ, ভুলে-পিসি, সত্যি। তুমি যেয়ো না দেখতে, এই দেখো—ঠিক পাঁচটায়!" বলিয়াই বড়মার দিকে ফিরিয়া দ্রুত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "বাবা আর কি করবেন, জানো বড়মা—এই, আমি যেখানে টিপ পরেছি—ঠিক ওইখানে দেবেন চন্দন—এমনিটি একটি টিপ, আর ওই ভুলে-পিসি যেখানে পরেছে সিঁদুর, ঠি—ক অমনি যায়গায়—ধান আর দূৰ্ব্বো! হ্যাঁ, সত্যি, চন্দন ঘষছে মা, আর ধান-দূর্ব্বো সাজিয়ে এলাম আমি—এই এত্তো!" ধান-দূর্ব্বার পরিমাণটা যে নেহাৎ অল্প নয়, দুই হাতে তাহারই এক আন্দাজ দিয়াই সে ছুট দিল।

মেয়েটি চোখের আড়াল হইতেই মলিনের মায়ের বুকের ভিতরটা দুলিয়া উঠিল—আনন্দে, পুলকে, হর্ষে! তাড়াতাড়ি সে ভাবটা চাপিয়া ভুলে-বউকে কহিলেন, "তা' হলে ফরসা-কাপড় চাই তো ভুলে-বউ!"

"এই যে দিদি, ধুপধাপ করে কেচে দিলাম বোলে—" বলিয়াই ভুলে-বউ পশ্চাৎ ফিরিল। পরক্ষণেই কি মনে করিয়া ফিরিয়া আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া নিম্ন কণ্ঠে কহিল, "ভাঁটুর বাবা গলায় মালা দেবে, কি আশ্চর্য্য!"

মলিনের মা অনুতপ্ত কণ্ঠে কহিলেন, "কত শক্ত-শক্ত কথাই না ওকে বলেছি, বাছা রে! কি বোলে আর আশীর্ব্বাদ করবো—নিবারণ আমার সহস্রজীবী হোক্!"

ভুলে-বউ আর দাঁড়াইল না।

অধিকক্ষণ অতিবাহিত হয় নাই, সহসা গৃহের বাহিরে চীৎকার-ধ্বনি উঠিল—"থ্রী চীয়ার্স ফর মলিনদা'—"

সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদল হুড়মুড় করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মলিনের কাছে গিয়া কহিল—"মলিন দা, রেডি থাক্‌বি! ঠিক পাঁচটায় তোর 'ফেয়ারওয়েল'—"

হাতের কাজ ফেলিয়া মলিনের মা ও ভুলে-বউ কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। ভাঁটু 'বড়মার' দিকে ফিরিয়া কহিল, "বড়মা, তুমিও যেয়ো', যাবে? মেয়েদের বসবার তো আলাদা যায়গা হচ্ছে!"

অপরিমিত তৃপ্তিতে বড়মার বুকের ভিতরটা অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, যেন মুখ খুলিয়া কথা কহিতে তিনি পারেন না, অথচ না কহিলেও নয়। একটু নীরব থাকিয়া কহিলেন, "না বাবা, মা হচ্ছে ডাইনি!"

আর জেদ পড়িল না। সকলেই চঞ্চল-চকিত হইয়া তৎক্ষণাৎ বহির্গত হইয়া গেল।

সম্মুখেই ভাঁটুদের বাড়ী—চন্দনের বাটি ও ধান-দূর্ব্বার কথা তাহাদের মনে পড়িয়া গেল। এক-যাত্রায় দুইটা কাজই সারা যুক্তি-সঙ্গত—বার বার করিয়া আসিবার সময় নাই। তাই, দল-বল খিড়কির দরজা দিয়া ঢুকিয়া সরস্বতীর কাছে গিয়া হাজির হইল। দ্রব্যগুলি প্রস্তুতই ছিল। সেগুলি আহৃত করিয়াই তাহারা নিমন্ত্রণ করিল সরস্বতীকে—নাছোড়বান্দা! সরস্বতী একটু হাসিল, সে-হাসি ম্লান, নিষ্প্রভ! কহিল, "বউ আনতে ছেলে যখন পাল্কীতে ওঠে, কনকাঞ্জলি দিয়েই মা পেছুন ফেরে! কেন, তোমরা জানো, বাবা?—সন্তানের সেই শুভ যাত্রা, সেই পথে মায়ের দৃষ্টি পড়া নিষেধ!" চন্দনের বাটি ও ধান-দূর্ব্বার রেকাবীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া পুনশ্চ সুরু করিল, "মলিন, তার আজ আমি মায়ের কাজ করেছি, ওদিকে মুখ ফেরাতে আমি কি পারি, বাবা!" হঠাৎ তার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল এবং তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল।

স্কুল-অঙ্গনে আসর রচিত হইয়াছে—সুন্দর, সুদৃশ্য, বিস্তৃত। সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল—'আসর বটে!'

বসিবার আসন সবই চেয়ার আর বেঞ্চি। স্কুলের প্রত্যেক ক্লাসই উজাড় করিয়া আনা হইয়াছে ওই-সব। এক প্রান্তে মাঝামাঝি একখানা তক্তার উপর সভাপতির আসন, সম্মুখে একটি টেবিল—টেবিলে দুইটি ফুলের তোড়া। তাহারই এক পাশে আর একখানি চেয়ার—অপেক্ষাকৃত ছোট ও নীচু। এই আসনে মলিন আসিয়া বসিবে। ইহাদেরই পুরোভাগে, তক্তার পাদদেশে শ্রেণীবদ্ধ চেয়ার, শ্রেণীর পর শ্রেণী—ইহাতে বসিবেন নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক, তৎপশ্চাতে বেঞ্চি, ইহাতে বসিবে ইস্কুলের ছেলেরা। উভয় পার্শ্বে স্ত্রীলোকদের আসন—সতরঞ্চি, তার উপর সাদা ধপধপে চাদর, চিক্ দিয়া ঘেরা।

নিরূপিত সময়ের বহু পূর্ব্বেই লোকে লোকারণ্য হইয়া উঠিল, কিন্তু, একটু শব্দ নাই, কোলাহল নাই, কলরব নাই—প্রত্যেকেই স্তব্ধ, নির্ব্বাক্!

পাঁচটা ধাজে-বাজে, নিবারণ আসিয়া হাজির—'ফার্ষ্ট ক্লাস জেন্ট্যালম্যান!' পরনে লিকলিকে সরুপেড়ে কোঁচান ধুতি, গায়ে চিকচিকে টাটকা ভাড়া গরদের চাপকান, হাতে রূপা-বাঁধানো মোটা ও বেঁটে বেতের লাঠি, আঙুলে আটটি আংটি। নিবারণের পায়ে সকলেই এতাবৎ ক্যাম্বিসের জুতাই দেখিয়াছে, আজ হঠাৎ—'গ্রেস্ কীড'!

ঠিক পাঁচটা বাজিতেই স্কুলের পেটা-ঘড়িতে ঘা পড়িল—টং টং টং—টং টং। এবং সঙ্গে সঙ্গে নিবারণের পশ্চাদ্দিক্ দিয়া দেখা দিল মলিন, তার হাত ধরিয়া ভাঁটু! করতালি পড়িল—ছেলেদের দলে, আশে-পাশে, দূরে-অদূরে, চারি দিক্ ব্যাপিয়া। আবার পড়িল, আবার ঘন-ঘন—মুহুর্মুহুঃ!

মলিন! সে হাত তুলিয়া নমস্কার করিল—প্রথম নিবারণকে, তার পর এক জনের পর এক জনকে—সকলকেই। ভাঁটু একটি বার মলিনের মুখের দিকে তাকাইয়াই জনতার দিকে ফিরিয়া উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "এইবার আমাদের সভার কাজ আরম্ভ হলো।" বলিয়াই গলা ঝাড়িয়া সুরু করিল, "আজিকার এই স্মরণীয় অধিবেশনে পুরোহিত—আমাদের বহু-সম্মানিত, গ্রাম-বরেণ্য ও স্কুলের কর্ণধার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র মিত্র মহাশয়—"

নিবারণ পুলকের আতিশয্যে বলিয়া উঠিল, "ঠিক—ঠিক—"

ভাঁটু ঠোঁটে দাঁত চাপিয়া পেছনের একটি ছেলেকে সঙ্কেত করিতেই সে একগাছি হৃষ্টপুষ্ট ফুলের মালা নিবারণের গলদেশে পরাইয়া দিল।

নিবারণ বলিয়া উঠিল, "বেশ গন্ধ আছে তো হে?"

ছেলেটি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ভাঁটুর চোখের দিকে তার চোখ পড়িতেই সে থামিয়া গেল।

পশ্চাতে আর একটি ছেলে আর এক ছড়া পুষ্পহার লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, ভাঁটু তাহার হাত হইতে উহা লইয়া দুই হাত তুলিয়া সভাপতির দিকে মুখ করিয়া কহিল, "আমি মাননীয় সভাপতি মহাশয়কে সানুনয় অনুরোধ জানাচ্ছি, তিনিই যেন আমাদের এই অকিঞ্চিৎকর উপহারটি আমাদের প্রধান অতিথি সতীর্থ মলিনের কণ্ঠে অর্পণ করেন"—বলিয়াই নিবারণের হাতে মালাগাছটি নামাইয়া দিল।

মালার দিকে চোখ পড়িতেই নিবারণের চোখ দু'টো আগুনের আঙরার ন্যায় লাল হইয়া উঠিল। নিজেকে আর চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া রক্ত-মুখ হইয়া বলিয়া উঠিল, "এঁ্যা! আমার গলায় গাঁদার মালা, আর ওর গলায়—গোলাপ?"

সভায় কেহ বা কাসিল, কেহ বা হাঁচিল, কেহ বা সশব্দে হাই তুলিল। ছাত্রমহল কিন্তু নিঃশব্দ, ধীর, শান্ত।

ভাঁটু সভাপতির দিকে মুখ ফিরাইয়া বিনীত কণ্ঠে কহিল, "এই সভা, এর অধিনায়ক হচ্ছেন আপনি—আপনি ইচ্ছা করলে, গলার মালা বদল করে নিতে পারেন—"

"তাই বলো!"—বলিয়াই নিবারণ গোলাপ ফুলের মালাগাছটি নিজের গলায় পরিয়া, তার গলার গাঁদার মালাটা খুলিয়া মলিনের গলায় পরাইয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে জোর করতালি পড়িল ছাত্রমহলে।

আওয়াজ একটু কম পড়িলেই ভাঁটু কাগজে-জড়ানো ছবির মত বাঁধানো অভিনন্দন লিপিখানি বাহির করিল—বিদায়-বাণী। এবং সঙ্গে সঙ্গে আট-দশ জন ছাত্র মিলিয়া মুদ্রিত সেই অভিনন্দন-পত্র সভাস্থলে বিতরণ করিতে লাগিল সকলেরই হাতে—মেয়ে-পুরুষ! তার পরই ত্রেতা যুগের এক ঋষিপুত্রের ন্যায় ভাঁটু নির্ভীক ও সতেজ কণ্ঠে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিতে সুরু করিল—

"হে জন্ম-জন্মান্তরের সতীর্থ!—চক্ষে অশ্রু, বক্ষে বেদনা—ইহা বুঝি ঈশ্বরের দেওয়া মানুষের হাতে পরম অস্ত্র, নতুবা আত্মরক্ষা করিয়া তোমার সম্মুখে আজ আমরা দাঁড়াইতে পারিতাম না! স্বল্পপ্রাণ, স্বার্থান্ধ, ভাগ্যহীন গ্রামবাসী—ইহাদের এই যে নৃশংস আচরণ, তোমার সুকুমার অঙ্গে এই যে ইহাদের নির্ম্মম অস্ত্রাঘাত, তোমার ক্ষমাসুন্দর আত্মা হয় ত বা সানন্দে বরণ করিয়া লইয়াছে, কিন্তু আমরা তাহা পারি নাই, বন্ধু! প্রতিবাদকল্পে এই স্কুল, এই জনপদ, এই সমস্ত জীবজন্তু—সকলেরই নিকট আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির প্রচণ্ড পরিচয় প্রদর্শন করিতে পারিতাম, কিন্তু তাহা পারি নাই, কেন না, তোমাকে আমরা চিনি—তোমার দেহ-মনে অধিকতর আঘাত পড়িবে বলিয়া!" রুমালে মুখ মুছিয়া, ভাঁটু এক বার জনতার দিকে নেত্রপাত করিল, করিয়াই সুরু করিল, "বাংলা দেশে যদি-ই বা আজ কোনো দেবতা থাকেন, আছেন এক মাত্র সরস্বতী দেবী! তুমি তাঁর আত্মজ—প্রত্যক্ষ সন্তান! এই গ্রামে তোমার আবির্ভাব—আকস্মিক, কিন্তু অন্ধ এই গ্রামবাসী, চোখ মেলিয়া তোমাকে অবলোকন করিবার দিব্য-দৃষ্টি ইহাদের নাই, নাই বলিয়াই ইহারা তোমাকে চিনিতে পারিল না। রাজমুকুটের কোহিনূর তোমার প্রতিভার নিকট নিষ্প্রভ, নৃপতির রাজ-ঐশ্বর্য্য তোমার পাশে নিস্তেজ! তাই ঈর্ষায় বিকৃত তোমার আপন-জন তোমাকে আর সহ্য করিতে পারিল না! বুঝিল না তাহারা, প্রত্যেক গৃহস্থের কত বড় দৈব-সম্পত্তি তুমি! তোমার তিরোধানে গ্রাম আজ অন্ধকার হইয়া গেল!" তার পর মলিনের দিকে ফিরিয়া অশ্রু-নিরোধ কণ্ঠে কহিল, "তোমাকে বিদায় দিতে বসিয়া আর আমরা নয়নাশ্রু ফেলিব না—যাও ভাই! আজ স্পষ্ট করিয়াই আমাদের চোখে পড়িতেছে—বিধাতার এক মূর্ত্ত ইঙ্গিত! এই গ্রামের স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্র তোমার অন্তহীন, সীমাহীন, পরিধিবিহীন আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র নহে, তাই তুমি চলিয়াছ! মিনতি আমাদের, আমাদের প্রতি অবিচার যেন তোমার মনে না আসে, বন্ধু! চেয়ে দেখো—ওই সব তোমার ছোট ছোট ভাই-বোন, সকলেরই চক্ষে জল,—ওই জল, ওই জাহ্নবী-বারি, উহাতেই তোমার আজ অভিষেক হোক!"

ভাঁটু থামিল। অভিনন্দন শেষ হইয়াছে, করতালি পড়িবার কথা কিন্তু সবাই স্তব্ধ—নিঃশব্দ!

সভাপতির পাশেই একটি ছেলে দাঁড়াইয়া ছিল, সে এইবার পরবর্ত্তী বিষয়টির দিকে সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। নিবারণের মুখের দিকে তখন আর চাওয়া যায় না! এত-বড় লাঞ্ছনা প্রকাশ্যে বুঝি বা সে আর কোনও দিন সহ্য করে নাই। অন্য কেহ হইলে হয়ত বা তাহার মুণ্ড ছিঁড়িয়া ফেলিত, কিন্তু ভাঁটু যে আপন সন্তান—একটি মাত্র পুত্র! কাজেই সে এতক্ষণ নিষ্ফল রোষে মুখখানা গোঁজ করিয়াই বসিয়াছিল। ছেলেটির ডাকে সে চমকিয়া উঠিল, তার পর একটু ঠাঁরো হইয়া দর্শকের দিকে তাকাইয়া কহিল, "এইবার এর—" বিষয়-সূচির দিকে চোখ পড়িতেই বিরক্ত ভাবে ছেলেটিকে বলিয়া উঠিল, "এ-সব আবার কি?"

"অভিষেক।"

"অভিষেক?—অভিষেক ত রাজা-রাজড়াদের—"

"হ্যাঁ! মলিনদা'ও আমাদের কাছে তাই কি না!"

"যত্তো সব ইয়ে—কি করতে হবে বলো—"

ছেলেটি টেবিলস্থিত চন্দনের বাটি ও ধান-দূর্ব্বার রেকাবী দেখাইয়া দিয়া কহিল, "গ্রামের মেয়েরা মলিনদা'র কপালে দেবেন চন্দন, আর মাথায় দেবেন ধান-দূর্ব্বা—আপনি ওঁদের অনুরোধ করুন—"

"আচ্ছা, আচ্ছা! যত্তো সব ইয়ে!—কৈ গো তোমরা, চিকের ভেতর সব কিল্‌বিল্ করছ—এস তো তোমরা! কি-সব করতে হবে—যত্তো সব—"

ভাঁটু চট করিয়া মেয়েদের দিকে ফিরিয়া সসম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া অনুরোধ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "সভাপতি মহাশয় আপনাদের আহ্বান করেছেন—আপনারা এসে আপনাদেরই সন্তান, আপনাদেরই ভাই—আপনাদেরই মলিনকে যদি আজ একবার আশীর্ব্বাদ কোরে যান—"

কথাটা শেষ হইবা মাত্র উভয় দিকেরই চিকের ভিতর মেয়েরা সব উঠিয়া দাঁড়াইল এবং চিক্ ঠেলিয়া প্রত্যেকেই হুড়মুড় করিয়া মলিনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল তাহাকে ঘিরিয়া, যেন প্রত্যেকেই ভিড় ঠেলিয়া সর্ব্বাগ্রে ছেলেটির মস্তকে হস্তার্পণ করিবে!

"যত্তো সব কাণ্ডকারখানা!"—নিবারণ নিজের চেয়ারখানা খানিক পিছাইয়া লইয়া গিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বল্প-পরিসর ব্যবধানে পিছনকার মেয়েদের খানিকটা ভিড় গিয়া পড়িল—নিবারণের গায়ে পড়ে পড়ে!

"যত্তো সব—"

ছোট্ট প্ল্যাটফরম্, তাহার উপর সভাপতির আসন—নিবারণ তড়াক্ করিয়া উঠিয়া চেয়ারখানা পুনরায় আর খানিক পশ্চাতে ঠেলিয়া লইয়া গিয়া যেমন ধপ করিয়া বসিয়া পড়িয়াছে, অমনি সে 'অক্' করিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। দেখা গেল, নিবারণের চেয়ারখানা উল্টাইয়া গিয়াছে এবং কয়েকটি ছেলে চেয়ারশুদ্ধ নিবারণকে উত্তোলন করিয়া পুনরায় প্ল্যাটফরমের উপর বসাইয়া দিতেছে। দর্শকমণ্ডলীর প্রশ্ন-বিব্রত মুখের দিকে চাহিয়া একটি ছেলে তৎক্ষণাৎ উচ্চ কণ্ঠে কহিল, "সভাপতি মশাই একটু বে-আন্দাজ হয়ে পড়েছিলেন, আমরা সব ধরে ফেলেছি!"

বিপদ কিন্তু তখনো কাটে নাই! মেয়েরা সব হাসি চাপিতে আর পারে না—'যত্তো সব!' নিবারণ ভয়ে-ভয়ে পিছন দিকটায় একবার চাহিয়া গুম্ হইয়া বসিয়া রহিল।

অতঃপর একখানির পর একখানি সুশ্রী—সুন্দর মঙ্গল-হস্ত মলিনের ললাটে ও মস্তকে পড়িতে লাগিল—চন্দনের টিপ আর ধান-দূর্ব্বা, ধান-দূর্ব্বা আর চন্দনের টিপ!

এই বিশেষ অনুষ্ঠানের পরিচালিকা হইয়াছেন 'রাঙা দিদি'—পাড়ারই এক গিন্নি-বান্নি মহিলা, তিনি এক তরুণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যা লা, শাঁখ কৈ—শাঁখ?—উলু, উলু, উলু—"

"উলু, উলু—উলু, উলু—"

নিবারণ মুখ বাঁকাইয়া আপন-মনে বলিয়া উঠিল, "যত্তো সব—"

পরক্ষণেই আত্মবিস্মৃত হইয়া চেয়ারখানা পিছাইয়া লইবার মানসে নিবারণ হাতলে হাত দিতেই পশ্চাৎরক্ষী সেই ছেলেটি হাঁ-হাঁ করিয়া বলিয়া উঠিল, "আবার—ও কি করছেন?"

নিবারণ ত্রস্ত হইয়া পিছন দিকটায় একবার সতর্ক দৃষ্টি ফেলিয়া নিরস্ত হইল।

এমনি সময়ে ভিড় ঠেলিয়া পথ করিয়া সন্ধ্যা যেন উঠি-পড়ি করিয়া ছুটিয়া আসিল—শাঁখ হাতে করিয়া। তাহা দেখিয়াই রাঙাদিদি হুকুম দিলেন—"বাজা, বাজা—"

কিন্তু সন্ধ্যা যেন আনাড়ি! ব্রীড়ানত মুখে শাঁখটা রাঙা দিদির হাতে গুঁজিয়া দিয়া কহিল, "ও আমার হয় না!"

রাঙা দিদি হাসিয়া ছড়া কাটিলেন—"আর সব কম্ম কল্লে-বল্লে, শাঁখ বাজানো মুখের বল!" বলিয়া নিজেই শাঁখে মুখ দিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত নারী-কণ্ঠই মুখর হইয়া উঠিল—"উলু, উলু—উলু, উলু—"

মনে এক প্রশ্ন উঠে!

মলিন!

গ্রামের এই ছেলেটি, ঠিক একটা দিন পূর্ব্বেই সে ছিল গ্রামের এক পূর্ণ অমঙ্গল—নিষেধমূর্ত্তি! স্ত্রী ও পুরুষ, সকলেরই নিকট ছিল সে এক অবাস্তর মানব-বিগ্রহ! আর আজ? আজ কেন গ্রামের পুরুষ-প্রকৃতি কোমর বাঁধিয়া তাহাকে ঘিরিয়া এক মহা মহোৎসব রচনা করিয়াছে? কেন? এই প্রশ্নের মূলে নিহিত কোন্ মায়ামন্ত্র? যদি বলো—ভাঁটুর আমন্ত্রণ তাই, কেন না, সে গ্রাম-শাসক নিবারণের পুত্র! কিন্তু এ সিদ্ধান্ত ঠিক নহে। এই আমন্ত্রণের সম্মান রাখিতে যদিই বা তাহারা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এত দূর আত্মবিস্মৃত হইয়া নিজেদের এতটা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবে কেন? অপরিহার্য্য শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অন্ধ শাসনে বিজয়ার বিগ্রহকে আরতি করিয়াই বোধ করি বা তাহারা গৃহে ফিরিত! এরূপ বিহ্বল-বিকৃত হইয়া পড়িত না পুত্রকে নববধূ আহরণে প্রেরণ করিবার বিদায়-ক্ষণের মত! যদি বলো—এই অনুষ্ঠান, ইহার পুরোহিত স্বয়ং নিবারণ—তাই!—না, এ-যুক্তিও ঠিক নয়! ঠিক নয় এই জন্য—সকলেই জানে, এই বিদায়-বাসর, ইহার পরিকল্পনা নিবারণ করে নাই। অপিচ, নিবারণের খাতিরে গ্রামের পুরুষ-সমাজই না-হয় জড়ো হইতে পারে, কিন্তু মেয়েরা? সব চেয়ে বড় কথা 'বুকের দরদ'—এ-হেন বস্তুর আত্ম-প্রকাশ হইল কেন? যদি ধরা যায়—মলিন, সে এক দীন-দুঃখী মায়ের সন্তান, তাহার সমস্ত ভবিষ্যতের উপর এক কৃষ্ণ-যবনিকা পড়িয়াছিল, আবার অকস্মাৎ তাহা উঠিয়া গিয়াছে—তাই! কিন্তু—না, এ-কথাও অবাস্তর! অবাস্তর যদি না হয়, তাহা হইলে এই যে এত দিন ধরিয়া এই ছেলেটির জীবন-পটে এক সুনিশ্চিত

অন্ধকার লেপিয়াই রহিল, তাহার অপসারণকল্পে প্রতিবেশীর এক-খানি হাতও কোনোও দিন প্রসারিত হইল না কেন? এই প্রশ্ন, এর জবাব আজ বুঝি বা মিলিবে না, মিলিবে সেই দিন, যে দিন মানুষের কলঙ্ক মানুষ মানিয়া লইবে—মানুষ যে দিন স্বীকার করিবে—সে অ-মানুষ!

"উলু'র উচ্চ আওয়াজ থামিতেই রাঙা দিদি খামকা বলিয়া উঠিলেন, "মলিনের মা কৈ—মলিন, তোর মা?"

মলিন মুখ নামাইল, যেন সে কলের পুতুল—হঠাৎ দম কমিয়া গিয়াছে!

নিরুত্তর মুখের দিকে আর একবার অনর্থক দৃষ্টিপাত করিয়া রাঙা দিদি এর-ওর মুখের দিকে ক্রুদ্ধ চোখ ফেলিলেন, তার পর প্রশ্নটা করিলেন সন্ধ্যাকে, যেন তাহার কাছেই জবাব মিলিবে।

কিন্তু, কি প্রশ্ন হইল সন্ধ্যা যেন তাহা বুঝিতেই পারে নাই অথবা বুঝিতে একটু দেরি হইবে এম্‌নি ভাব দেখাইয়া কহিল, "বড়মা?"—পরক্ষণেই অনাসক্ত কণ্ঠে কহিল, "কি কোরে জান্‌বো?"

"তোর মা?"

"আমার মা?"—সন্ধ্যা ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "কৈ, নেই ত!"

ঠিক এমনিই সময়ে এক অস্থির-মূর্ত্তি অতি সন্তর্পণে সকলের পাশ কাটাইয়া প্রবেশ করিল, সকলেই তাকাইয়া দেখিল—তুলে-বউ। সে এদিক্‌-ওদিক্‌ চাহিয়া সন্ধ্যাকে দেখিতে পাইয়াই তাহাকে হাত নাড়িয়া ডাকিল। সন্ধ্যা কাছে যাইতেই সে তাহাকে কি বলিল, এবং সন্ধ্যাও তৎক্ষণাৎ গিয়া ভাঁটুর কানে-কানে কি বলিতেই ভাঁটু মেয়েদের কহিল, "তুলে-বউ, এ-ও মলিনকে আশীর্ব্বাদ করবে! একে আপনারা—"

"তুলে-বউ?"—এক প্রলয়ঙ্করী মূর্ত্তি ধরিয়া রাঙা দিদি যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। ভাঁটুর প্রতি এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই মেলেচ্ছ হলি না কি? নোংরা জাত—সব ছুঁয়ে-নেপে ছিষ্টি নৈরাকার করবে?"

নিবারণ হাতের লাঠিটা তক্তার উপর একবার সজোরে ঠুকিয়া বলিয়া উঠিল, "যত্তো সব—"

ভাঁটুর যেন কোন দিকেই দৃষ্টি নাই, স্মিত মুখে কহিল, "রাঙা দিদি, বাড়ী গিয়ে না-হয় একটু গোবরের সরবৎই খেয়ে ফেলো! তুলে-পিসি এসেছে মলিনদা'র 'মা' হয়ে! নইলে, তুলে-পাড়ার আর কেউ এলো না, তুলে-পিসিই বা আসে কেন?—মা, মা!—মায়ের মত একটি মাস ধরে ওই তুলে-পিসিই মলিনদা'কে আহার দিয়েছে—সে খবর তোমরা না রাখো, আমি রাখি!"

মেয়েদের ভিতর এক অস্ফুট কলরব উঠিল, এবং সেই কলরবকে মুখর করিয়া রাঙা দিদি অবিলম্বেই বলিয়া উঠিলেন, "তাই বোলে ও তো আর বামুন-কায়েতের জাত কেনেনি?"

"জাত!" ভাঁটু একটু মৃদু হাসিল। হাসিমুখেই সুরু করিল, "তুলে-পিসি যা দিয়েছে—জাতের মূল্যে তার দাম উঠতো না!" রাঙা দিদির দিকে একবার তাকাইয়াই আবার বলিয়া উঠিল, "তোমরা নিশ্চয়ই মেয়েমানুষ—মেয়েমানুষ ত? আচ্ছা, বল দিকিনি, রাঙা দিদি, কোন্‌ জিনিষটি বড়—মেয়েমানুষের নাড়ীর টান, না মানুষের জাত?" বলিয়াই এক তীক্ষ্ণ কটাক্ষ করিল, করিয়াই পুনশ্চ আরম্ভ করিল, "রামায়ণ পড়েছ ত? আচ্ছা, শবরীর কথা মনে পড়ে—সেই চাঁড়ালের মেয়েটি? শবরী, সে তুলে রাখতো এঁটো ফল—রামচন্দ্রের মুখে দেবে! বলো দিকিনি—এখানে মূল্যে বড় হয়েছিল কি? রামচন্দ্রের জাত, না শবরীর মুখের এঁটো? ঠিক কোরে জবাবটা দিয়ো—নিজেকে যেন ঠকিয়ো না!"

রাঙা দিদির চক্ষুর্দ্বয় বড় হইয়া সজল হইয়া আসিতেছিল, এক দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, "যা বলেছিস্‌, ভাঁটু! বেঁচে থাক্‌ তুই!" বলিয়াই হাত নাড়িয়া তুলে-বউকে ডাকিলেন, "ওলো, আয়—আয়! আমরা না হয় পুকুরে একটা ডুব দিয়েই বাড়ী ঢুকবো, তা বোলে রামায়ণ—বাপ্‌ রে!"

তুলে-বউয়ের চোখে-মুখে আনন্দ যেন আর ধরে না! তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—কি যে করিবে তাহা সে জানে না!

রাঙা দিদি তাহাকে হাত পাতিতে বলিলেন, তার পর চন্দনের বাটি হইতে একটু চন্দন তুলিয়া আলগোছে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "মলিনের কপালে ছুঁইয়ে দে"—বলিয়াই মলিনকে কহিলেন, "তুইও, বাবা, তা'হলে একটা ডুব দিয়ে বাড়ী ঢুকিস্‌, লক্ষ্মী মাণিক আমার!"

তুলে-বউয়ের হাতও উঠে না, চোখের পলকও আর পড়ে না, যেন তাহার চোখে-চোখে ভাসিয়া নব-ঘনশ্যাম এক অপরূপ মূর্ত্তি—ললাটে চন্দন-টিপ, শিরে মোহন চূড়া, অধরে মোহন বেণু, যেন যুগ-যুগান্তরের এক ব্রজবালক এখনিই গোকুল অন্ধকার করিয়া চলিয়া যাইবে! চন্দনটুকু তাহার আঙুলের ফাঁক দিয়া পড়িয়া গেল। রাঙা দিদি ভীষণ চটিয়া উঠিলেন। মুখখানাকে বিকৃত করিয়া ঝাঁঝিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আ, ন্যাক্যা চণ্ডি! কপালে চন্নন কি কোরে দিতে হয়, তাও জানো না! সাধে বলি, ছোট জাত!" বলিয়াই খপ করিয়া তুলে-বউয়ের হাতটা ধরিয়া পুনরায় একটু চন্দন লইয়া হাতে-খড়ি দিবার মত মলিনের ললাটে স্পর্শ করাইয়া দিলেন। তার পর দিলেন—ধান-দুর্ব্বা।

এ-দিকের কাজ শেষ হইয়া গেল। অতঃপর যে-ছেলেটি অনুষ্ঠান-লিপির বিষয়-সূচির প্রতি সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল, সে পরবর্ত্তীকার বিষয়টির উপর আঙুল দিয়া সভাপতিকে কহিল, "এইবার আপনার বাণী!"

নিবারণ ছেলেটির দিকে হাঁ করিয়া তাকাইতেই সে কহিল, "এইবার আপনি কিছু বলুন—"

নিবারণ উঠিয়া দাঁড়াইল, তার পর দুই-একবার কাসিয়া, গলা ঝাড়িয়া সুরু করিল, "সমবেত লেডিস্‌ এ্যাণ্ড জেণ্টলমেন"—হঠাৎ যেন বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া সেই ছেলেটির দিকে ফিরিয়া বলিয়া উঠিল, "না, না—ছোটলোকও যে অনেক রয়েছে! কি বলি, তা হলে? কি বলতে হবে—কিছু লিখে এনেছ?"

ছেলেটি বিনম্র কণ্ঠে কহিল, "আজ্ঞে না! আচ্ছা, আপনি বলুন। 'প্রেসে' পাঠাবার সময় আপনার 'স্পীচ' আমরা লিখে পাঠিয়ে দেব।"

পরক্ষণেই পশ্চাদ্দিক্‌ হইতে সহসা বাঁশির আওয়াজ হইল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভাঁটু ঘোষণা করিল—'সভার কাজ শেষ!'

[ক্রমশঃ

কি করে লেখক হলাম

(গর্কি)

১

ছোট বেলায় জীবন সম্বন্ধে নালিশ করেছি বলে আমার মনে পড়ে না। যাদের মাঝে আমার জীবনের প্রারম্ভ তাদের অভিযোগ ছিল অনেক, কিন্তু লক্ষ্য করেছি যে সেটা তারা করত চালাকি করে; পরস্পরের সাহায্য করার অনিচ্ছাকে ঢেকে রাখার আশায় ওদের নালিশ, আর তাইতে আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেছি ওদের নকল না করতে। শেষে খুব তাড়াতাড়ি আমার নিজের দৃঢ় ধারণা হোল যে, যে সব লোক অনবরত নালিশ করতে ভালবাসে তারা সেই লোক যাদের প্রতিরোধের ক্ষমতা নেই; সেই লোক যারা সাধারণ ভাবে কোন কাজ করতে পারে না বা চায় না; যাদের অন্যের মাথায় কাঁটাল ভেঙে সহজ জীবনে রুচি।

জীবনের ভীতি সম্বন্ধে আমার ভূরি ভূরি অভিজ্ঞতা আছে, এখন আমি এটাকে বলি অন্ধের ভয়। অন্যত্র যা বলেছি, একটা ভয়ংকর কঠিন অবস্থার মধ্যে বাস করে অতি ছোটবেলা থেকেই লোকের অহেতুক নিষ্ঠুরতা ও অকারণ ঈর্ষা আমি দেখেছি; একের ঘাড়ে ভারী বোঝা চাপতে ও অপরের সৌভাগ্য দেখে অবাক্ হতাম। অতি অল্প বয়সে দেখেছি, যে ধার্মিকেরা নিজেদের ভগবানের খুব কাছাকাছি গিয়েছে বলে মনে করে তারা—যারা তাদের জন্য খাটে তাদের কাছ থেকে আরো দূরে সরে যায়, তারা তত বেশী নির্মম দাবী করে তাদের চাকরদের উপর।

সাধারণ ভাবে তোমাদের চেয়ে আমি জীবনের নীচু স্তরের সব চেয়ে খারাপ দিক্‌টার অনেকখানি দেখেছি। তা ছাড়া তোমাদের চেয়ে এটার আরো বিকৃত চেহারা আমি দেখেছি, কারণ তোমরা দেখছ বিপ্লবভীত মধ্যবিত্তদের, তারা তাদের স্বভাব অনুযায়ী যা হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে খুব নিশ্চিত নয়, আর আমি যখন দেখেছি তখন মধ্যবিত্ত একটা ভদ্র-জীবন যাপন করছে আর এই চমৎকার ভদ্র ও নির্ঝঞ্ঝাটের জীবন চিরকালের প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বলে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করত।

সেই সময়ে বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ পড়ছি, এদের মধ্যে ডিকেন্স ও ব্যালজ্যাকের মত চমৎকার লেখকদের বই পেলে তো লুফে নিতাম। আর আইন্সওয়ার্থ, বুনারলিটন ও ডুমার ঐতিহাসিক উপন্যাস পেলেও তাই। এই সব উপন্যাস দৃঢ় ইচ্ছা ও চমৎকার ফুটে-ওঠা চরিত্রবান লোকদের কথা বলত, যাদের সুখ-দুঃখ ছিল অন্য ধরণের আর যাদের মতামতের গুরুত্বপূর্ণ দ্বন্দ্বের জন্যই সংঘর্ষ ঘটত।

ইতিমধ্যে আমার চারি পাশে ক্ষুদ্রচেতা স্ত্রী ও পুরুষেরা তাদের ছোট-খাট জীবন যাপন করত; কিছুটা লোভী, কিছুটা হিংসুটে, কিছুটা রাগী তারা তাদের প্রতিবেশীর ছেলে মুরগীর দিকে ঢিল ছুঁড়ে তার একটা পা ভেঙে ফেলল কি একটা কাচের জানালা ভেঙেছে বলে হয় ঝগড়া করত অথবা আদলতে নালিশ জানাত। রুটি পুড়ে গেলে কি মাংসটা ভাল রান্না না হলে অথবা দুধটা পড়ে গেলে তারা হয় চটে যেত অথবা হা-হুতাশ করত।

মুদি আধ সের চিনিতে অথবা দর্জি এক গজ কাপড়ে একটা আধলা দাম বেশী নিলে তারা ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাই নিয়ে শোক করতে পারত। প্রতিবেশীদের ছোট-খাট দুঃখে তাদের সত্যিকারের আনন্দ হয় আর সে আনন্দ তারা ঢাকে একটা কপট সমবেদনায় আড়ালে।

আমি পরিষ্কার দেখছি যে পয়সা ছিল মধ্যবিত্ত আকাশের সূর্য আর এই পয়সাই এই সব লোকদের ঘৃণ্য ক্ষুদ্র ইতরামিকে বাড়িয়ে তুলত।

হাঁড়ি, কড়াই, কেটলি, মুলা, মুরগী পিঠে, জন্ম-দিন, শ্রাদ্ধ, আকণ্ঠ খাওয়া আর বমি ও মাতলামি না করা পর্যন্ত মদ খাওয়া—এই সব লোকের জীবনের সূত্রেই এই, এদের ভিতরই আমার জীবনের সূত্রপাত। কখনো কখনো এই জঘন্য জীবন আমার এমন বিরক্তি আনত যে তাতে আমার ইন্দ্রিয় নিঃসাড় হয়ে যেত ও আমার ঘুম আসত; আবার সময়ান্তরে এটা কোন একটা আত্মপ্রতিষ্ঠ কাজ দিয়ে নিজেকে জানিয়ে তোলার ইচ্ছা জাগাত।

কখনো কখনো আমার এই ঘৃণা ও এই ইচ্ছা একটা পাগলা পলায়নী বৃত্তিতে রূপ পেত; আমি রাত্রিতে ছাদের উপর উঠে চিমনি-গুলো ময়লা ও ছেঁড়া কম্বল দিয়ে আটকে দিতাম, অথবা ষ্টোভের উপর ফুটন্ত ঝোলে এক মুঠো নুণ ছড়িয়ে দিতাম।

সোজা কথায় আমি এমন অনেক কাজই করেছি এখন যাকে গুণ্ডামী বলা হয়। এগুলো আমি করেছি, কারণ আমি জীবন্ত বোধ করতে চেয়েছিলাম আর এ ছাড়া আমার অন্য পথ জানা ছিল না, আমি যে বেঁচে আছি নিজেকে সে বিশ্বাস করাতে আমি আর অন্য কোন পথ খুঁজে পাইনি। আমার মনে হত, আমি যেন একটা জংগলে একটা ঘন বনানীর দুর্গম গাছালির ভিতরে একটা হাঁটু পর্যন্ত ডুবে-যাওয়া এক জলার মধ্যে আমার পথ হারিয়ে ফেলেছি।

একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে। আমি যেখানে থাকতাম সেখানকার একটা রাস্তা দিয়ে এক দল বন্দীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ভল্‌গা ও কামা নদীর ধারে সাইবেরিয়ায় যাবে বলে ওরা জেলখানা থেকে একটা ষ্টীমারে উঠতে যাচ্ছিল। এই বুড়ো লোকগুলো আমার মনে সর্বদাই একটা ভয়ংকর বাসনা জাগাত। যদিও এরা বন্দী ও এমন কি অনেকের বেড়ী পরা ছিল তাহলেও এদের আমি হিংসে করতাম, কারণ, তারা তবু তো কোন জায়গায় যাচ্ছে আর আমি ইটের মেঝওলা এক রান্না-ঘরের ভাঁড়ারের মধ্যে একটা নিঃসঙ্গ ইঁদুরের মত একা এখানে পড়ে আছি।

আর এই ভাবে এই সব কয়েদীরা ঝম-ঝম করে শিকল বাজিয়ে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। একটা সারির হাতে-পায়ে শিকল পরা দু'টো লোক ফুটপাথের একেবারে কিনারে ঘেঁসে যাচ্ছিল, তাদের মধ্যে এক জন বেশ লম্বা প্রকাণ্ড যোয়ান, তার কাল দাড়ি, ভাঁটার মত চোখ, কপালে লাল একটা গভীর ক্ষত, আর একটা কান কাটা। এই লোকটার দিকে তাকাতে তাকাতে ফুটপাথ দিয়ে হাঁটছি এমন সময় লোকটা হঠাৎ বেশ স্ফুর্তিতে চড়া-গলায় চীৎকার করে উঠল: "ওহে ছোকরা, চল আমাদের সাথে চল।" এই কথায় সে যেন আমার হাতখানা ধরল। আমি তৎক্ষণাৎ দৌড়ে গেলাম, কিন্তু একটা পাহারাওলা আমাকে গালাগালি দিয়ে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল। ও যদি আমাকে ঠেলে ফেলে না দিত তাহলে হয়ত আমি ঐ ভয়ংকর লোকটার সংগে স্বপ্নচরের মত চলতাম, সে ছিল অপরিচিত, যাদের আমি জানি তাদের মত নয়। তাকে ঠিক এই কারণেই আমি অনুসরণ করতাম।

তার ভীষণ চেহারা আর তার পায়ের বেড়ীর বাঁধন সত্ত্বেও যদি তার কাছে জীবনের কোন নতুন দিকের সন্ধান পাওয়া যায় এই আশায় আমি তার সাথে যেতে রাজী ছিলাম। আমি সেই লোকটা আর তার আমুদে স্বর বহু দিন ভুলতে পারিনি।

তার চেহারা আমার স্মৃতিতে তার চেয়ে কম শক্তিশালী নয়, এ রকম আর একটি চেহারার সাথে জড়িয়ে গিয়েছে। কোন প্রকারে মোটা একখানা বই আমি পেয়েছিলাম। তার গোড়ার অংশটা হারিয়ে গিয়েছিল। আমি সেখানা পড়তে সুরু করে দিলাম এবং এক রাজার সম্বন্ধে গল্পটুকু ছাড়া আর কিছুই বুঝলাম না। রাজা একটা জোতদারকে জমিদার করতে চেয়েছিলেন কিন্তু সে রাজাকে এই কবিতায় জবাব দিল :

"আমি যেন জোতদার হয়ে বাঁচি আর জোতদারই মরি।
পিতা যার অধিকারী ছেলেদেরও থাকা চাই সেই মর্যাদার
পূর্ণ অধিকার।
কারণ যে নীচবংশী কোন এক গৌরবের অধিকারী
অগাধ অপার
আরও গৌরবের হবে তাহার কীর্ত্তির চেয়ে উচ্চকুলে জন্ম হল যার।"

এই কিছুটা ঘোলাটে ধরণের কবিতাটা আমার খাতায় টুকে নিলাম। একটা মুসাফিরের লাঠির মত এটা অনেক বছর আমার দরকারে লেগেছিল। কবিতাটি এমন কি হয়তো আমার সমপর্য্যায়ের 'খাসা ভদ্রলোক' মধ্যবিত্ত লোকদের প্রলোভন ও কু-উপদেশ থেকে আমাকে বাঁচাতে সাহায্য করেছিল। বাতাস-লাগা পালে যেমন নৌকা চলে তেমনি হয়তো অনেকে তাদের প্রথম যৌবনে এমন কতকগুলো এই ধরণের কথার সংস্পর্শে আসে যা তাদের সবুজ কল্পনার প্রেরণা যোগায়।

দশ বছর পরে আমি জানতে পারি যে এই চরণগুলো ষোড়শ শতাব্দীতে রবার্ট গ্রীনের লেখা "জর্জ্জ এ গ্রীন, দি পিনার অব ওয়েকফিল্ড" এই মিলনান্ত বই থেকে নেওয়া। রুশ ভাষায় এর নাম ছিল "কমেডি এবাউট মেরী আর্চার অব জর্জ্জ গ্রীন য়্যাণ্ড রবিনহুড"। গ্রীন ছিলেন সেক্সপিয়রের সমসাময়িক। আমি বইখানা পেয়ে খুব খুসীই হলাম এবং সাহিত্যে আরও মজে গেলাম। সাহিত্যই মানুষের কঠোর জীবন-সংগ্রামের পথে চির সুহৃৎ ও সহায়।

তোমাদের জানা উচিত যে, সেই সময়ে আমার মত লোক ছিল দলছাড়া নেকড়ে, সমাজের সৎসন্তান। আর তোমরা, হাজার হাজার ছেলেরা শ্রমিক শ্রেণীর আদরের দুলাল। এই শ্রমিক শ্রেণী নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে, ক্ষমতা দখল করেছে, ন্যায্য দামে প্রত্যেক লোকের মূল্যবান কাজের তারিফ করতে শিখেছে। শ্রমিক ও কৃষকের রাজত্বে তোমরা এমন একটা সরকার পেয়েছ তোমাদের শক্তি সম্পূর্ণ স্ফুরণের পথে যার সহায়তা করা উচিত বা করতে পারে এবং যা ইতি-মধ্যেই ক্রমশঃ সুরু করে দিয়েছে।

তোমাদের, যুবকদের জানা উচিত যে, সব বাস্তবিক মূল্যবান, চিরকাল দরকারী ও সুন্দর জিনিষ-পত্র মানব সমাজে বিজ্ঞানে, কলায় এবং কারুবিদ্যায় সৃষ্ট হয়েছে সমাজের অসম্ভব অজ্ঞতা ও উদাসীনতার মধ্যে, যাজকদের প্রতিবন্ধকতায়, ধনিকের আত্মস্বার্থান্বেষণের ও বিজ্ঞান ও কলার পৃষ্ঠপোষকবর্গের লুব্ধ দাবীর একটা অবিশ্বাস্য শক্ত অবস্থার মধ্যে কাজ করে প্রত্যেক মানুষ সেগুলো সৃষ্টি করেছে।

তোমাদের আরও মনে রাখা উচিত যে, এডিসন অথবা খ্যাতনামা পদার্থবিদ্যাবিদ্ ফ্যারাডের মত সংস্কৃতি সৃষ্টিকারীরা সাধারণ শ্রমজীবী ছিলেন। বুনন-যন্ত্রের আবিষ্কারক আর্করাইট ছিলেন এক জন নাপিত, কামার বার্ণার্ড পলিসি ছিলেন বিখ্যাত মৃৎশিল্পীদের এক জন, নব যুগের সব চেয়ে বড় নাট্যকার সেক্সপিয়র এক জন সাধারণ অভিনেতা, মলিয়েরও ছিলেন তাই। এ রকম আরও শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

আর আমাদের যুগে প্রচুর জ্ঞানভাণ্ডার ও আনুসঙ্গিক সুবিধে-গুলো আমাদের আয়ত্তে, কিন্তু তখকার দিনে যাঁরা এ সব করেছিলেন তাঁদের সে সুযোগ-সুবিধে ছিল না। আমাদের দেশেই সাংস্কৃতিক কাজের কতক কতক সুবিধে করে দেওয়া হয়েছে আর এই দেশেরই তো ঘোষিত উদ্দেশ্য হল পশুশ্রম থেকে মানুষকে সম্পূর্ণ মুক্তি দেওয়া আর যে শ্রমশক্তি দ্রুত ক্ষীয়মাণ ধনিকের একটা গোষ্ঠী তৈরী করে ও শ্রমিক শ্রেণীর নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে আসে সেই শ্রম-শক্তিকে রুক্ষ শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা।

কি করে লিখতে শিখলাম এবার সেইটেই বলব। জীবন আর বই এই দু'টো থেকেই সোজাসুজি আমার ধারণাটা এসেছিল। প্রথম শ্রেণীর ধারণাটার সংগে কাঁচা মালের আর শেষেরটির সংগে আধা তৈরী মালের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর একটু সোজা করে বলতে গেলে বলতে হয়, প্রথম ক্ষেত্রে আমার সামনের একটা বলদকে দেখি আর দ্বিতীয়টায় দেখি তার খাসা শোধন করা একখানা চামড়া। বিদেশী সাহিত্য বিশেষ করে ফরাসী সাহিত্যের কাছে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। আমার ঠাকুরদা ছিলেন বড় কড়া আর কৃপণ। কিন্তু ব্যালজ্যাকের "ইউজেনি গ্রাণদেং" বইটা পড়ার আগে আমি তাঁকে ভাল করে বুঝতে পারিনি। ইউজেনির বাবা বুড়ো গ্রাণদেংও কৃপণ ও মোটামুটি আমার ঠাকুরদার মত ছিলেন ; তফাৎটা ছিল এই যে, তিনি আরও একটু কম বুদ্ধিমান্ ও নীরস লোক ছিলেন।

ফরাসী লোকটার সাথে তুলনায় আমার বুড়ো রূপদাদু ছিলেন উঁচু ধরণের, যদিও তাঁকে আমার ভাল লাগত না। এটা কিন্তু তাঁর সম্বন্ধে আমার ধারণা বদলাতে সাহায্য করেনি, তবে আমার পক্ষে একটা বই যাকে আমি জানি তার সম্বন্ধে আমি যা কখনো দেখিনি বা আগে লক্ষ্য করিনি সেটা প্রকাশ করে দিতে পারে তাই-ই হল একটা মস্ত বড় আবিষ্কার।

২

যে বইগুলি আমাকে গড়ে তুলেছে

জর্জ এলিয়টের একঘেয়ে "মিডলমার্চ" ইত্যাদি বইগুলো থেকে এটা শিখেছিলাম যে, যদিও ইংরেজ ও জার্মান প্রদেশ-গুলোর লোক নিঝনি-নভগোরড থেকে একটু বিভিন্ন জীবন যাপন করত, তবু তারা এদের থেকে বেশী ভাল অবস্থায় ছিল না। তারা একই বিষয় নিয়ে আলোচনা করত, আলোচনা করত ইংরেজী ও জার্মান পয়সা নিয়ে, ওরাও বলত যে ভগবানকে ভালবাসা ও ভয় করা উচিত কিন্তু ওরা আমার রাস্তার লোকের মতই পরস্পরকে একটুও

ভালবাসত না। আর যারা সাধারণের থেকে কোন না কোন বিষয়ে একটু আলাদা ধরণের ছিল তাদেরই বিশেষ করে ভালবাসত না।

বুড়োদের কথা

থ্যাকারের বিখ্যাত ভ্যানিটি ফেয়ারের চরিত্রগুলোর মত আমার দাদুর সর্বস্বান্ত ব্যবসায়ী বন্ধু আইভ্যান স্কুরভ ও ইয়াকভ কোটেল-নিকভ একই ঢংএ কথা বলতেন। আমি "বুক অব শাম্‌স" পড়তে শিখেছিলাম আর এর সুরেলা ভাষার জন্য খুবই ভাল লাগত। অপরাপর বুড়োদের মত যখন ইয়াকভ কোটেলনিকভ আর আমার দাদু নিজেদের মধ্যে তাঁদের ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে নালিশ জানাতেন তখন আমার রাজা ডেভিডের ভগবানের কাছে নিজের বিদ্রোহী ছেলে আবসালামের সম্বন্ধে নালিশ করার কথা মনে পড়ে যেত। বুড়োরা যখন নিজেরা বলাবলি করতেন যে অতীতে তাঁদের তুলনায় লোকেরা বিশেষ করে যুবকেরা খুব বখে যাচ্ছে, ক্রমশঃ বেশী কুঁড়ে হয়ে পড়েছে, বেশী বোকা ও অবাধ্য হয়ে উঠছে আর ভগবান মানছে না তখন আমার ধারণায় তাঁরা মিথ্যে কথা বলতেন। কেন না, ডিকেন্সের ভণ্ড চরিত্রগুলো ঐ একই কথা বলত।

অবশ্য আমার পড়ার কোন নিয়ম বা ধারাবাহিকতা ছিল না। সবটাই ছিল একটা আকস্মিক ব্যাপার। আমার শিক্ষক মশায়ের ভাই ভিক্টর সার্জ্জয়েভ জেভিয়ার ডি মন্টেপিন, গ্যাবোরিয়ো ও বভিয়েরের জনপ্রিয় ফরাসী উপন্যাস পড়তে ভালবাসতেন আর এই সব বই পড়ার পর যাদের ওরা নিহিলিষ্ট বলত সেই সব বিপ্লবীদের বিদ্রূপ করেও খারাপ চিত্র আঁকা রুশ সাহিত্য তিনি পড়ার চেষ্টা করতেন।

ফরাসী সাহিত্যের প্রভাব

আমিও এই বইগুলি পড়েছি এবং যাদের মধ্যে আমার বাস তাদের সংগে প্রায় যাদের কোন সম্পর্কই নেই বরঞ্চ মনে হল যে কয়েদীটা আমাকে বেড়াতে নিমন্ত্রণ করেছিল তার যেন অনেক বেশী মিল আছে এ রকম লোকদের বিষয় পড়তে ভাল লাগল। আমি অবশ্য বুঝতে পারিনি, এই সব বিপ্লবীরা কি চাচ্ছিলেন—আর যে লেখকরা তাঁদের চরিত্রে কালি ছিটিয়েছিলেন তাঁদের এইটাই ছিল মতলব।

হঠাৎ কোন ক্রমে আমি পোমিয়ালোভস্কির 'মলোটভ য়্যাণ্ড লিটল-ম্যান্‌স লাক' গল্পগুলো পেয়ে গেলাম। পোমিয়ালোভস্কি মধ্যবিত্ত জীবনের "দারিদ্র্য ও ক্লান্তি" দেখালেন, দেখালেন মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র সুখ।

ফরাসী সাহিত্যের সেই বিরাট ত্রয়ী—ষ্টেণ্ডহল, ব্যালজ্যাক ও ফ্লবেয়ার লেখক হিসেবে আমার উপর একটা সত্যকারের গভীর শিক্ষামূলক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

বিশ্রামকারী জনতার ভিড় এড়াতে গিয়ে একখানা আটচালার ছাদে উঠে ঈষ্টারের পরের সপ্তম রবিবারের রাত্রিতে ফ্লবেয়ারের 'এ সিম্পল হার্ট' পড়ার কথা আমার মনে আসে। গল্পটা পড়ে একেবারে অভিভূত হয়ে গেলাম। আমি কানা ও কালা বনে গেছি। যে চাকরাণী কোন বীরত্বের কাজ করেনি বা অন্যায় করেনি সেই সরলা স্ত্রীলোকটার চরিত্রের আড়ালে শব্দমুখর আনন্দের ছুটিটা আমায় কাছে ঘোমটায় ঢাকা পড়ে গেল।

একটা মানুষের সহজ পরিচিত কথায় একটা চাকরাণীর নীরস জীবনী আমাকে কেন এমন করে নাড়া দিল সে কথা বোঝা বড় শক্ত। এখানে একটা দুর্বোধ্য কৌশল লুকান ছিল আর (এটা আমার আবিষ্কার নয়) একটা বিস্মিত বুনো আদমীর মত প্রায় জোর করে আমি বইয়ের পাতাগুলো আলোর সামনে টেনে নিয়ে যেতাম যেন ঐ লাইনগুলোর ভিতর কোথাও এর সমাধান মিলে যাবে।

কিন্তু ব্যালজ্যাকের "লি পো ডি চাগ্রিন" উপন্যাসে ব্যাঙ্কারের বাড়ীর হৈ-হুল্লোড়ের বর্ণনা পড়ে সম্পূর্ণ মজে গেলাম। সেখানে প্রায় কুড়ি জন লোক একসংগে কথা বলছে, এক বিশৃংখল হট্টগোলের সৃষ্টি করছে, তার বিচিত্র কলধ্বনি যেন আমার কানে এসে লাগছে।

কিন্তু সব চেয়ে দরকারী কথা হল এই যে, যদিও ব্যালজ্যাক ব্যাঙ্কারের অতিথিদের মুখের কিংবা চেহারার কোন বর্ণনা দেননি তাহলেও আমি কেবল মাত্র শুনিনি তাদের প্রত্যেকে কি ভাবে কথা বলল তা দেখলাম, আরও দেখলাম তাদের চোখ, তাদের হাসি, তাদের ভংগি।

ভিক্টর হুগোর উপন্যাস আমার মনে কোন দাগ কাটতে পারেনি। আর অনেক কিছু ঘৃণা করতে শেখার পর ষ্টেণ্ডহলের বই পড়েছি। তাঁর শান্ত স্বর ও সন্দিগ্ধ ব্যংগ আমার ঘৃণায় শক্তি জুগিয়ে দিল।

রুশ ক্লাসিক্‌স

এর থেকেই আসে যে ফরাসী লেখকদের কাছ থেকে আমি লিখতে শিখেছি। আকস্মিক ভাবে ঘটলেও আমার মতে এটা খারাপ না। আমি নতুন লেখকদের ভাষার বিরাট কারুকার্য শিখবার জন্য মূল ফরাসীতে দিক্‌পালদের লেখা পড়ার জন্য ফরাসী শিখতে উপদেশ দিই।

বেশ কিছু দিন পরে আমি রুশ ক্লাসিক্‌স পড়ি: গোগোল, টলষ্টয়, টুর্গেনিভ, জনচারভ, ডষ্টয়েভস্কি আর লেস্কভ। লেস্কভ তাঁর আশ্চর্য পাণ্ডিত্য আর সমৃদ্ধ ভাষায় আমাকে নিঃসন্দেহে প্রভাবান্বিত করেছিলেন; যদিও রুশ বিষয় সম্বন্ধে যাঁর সূক্ষ্ম গভীর জ্ঞান আছে তিনি চমৎকার লোক। শেখভ বলেছেন যে তিনি তাঁর কাছে অনেক ঋণী।

কুড়ি বছর বয়সে বুঝতে লাগলাম যে, অনেক বিষয় আমি দেখেছি শুনেছি আর অনেক বিষয়ে অভিজ্ঞ হয়েছি, যার সম্বন্ধে অপরকে বলা উচিত আর নিশ্চয়ই বলব।

আমার মনে হল, কতকগুলো জিনিষ অন্যের থেকে আমি একটু ভিন্ন ভাবে বুঝি ও অনুভব করি। এটা আমায় দুর্ভাবনায় ফেলল। আমায় করে তুলল চঞ্চল, বাচাল। এমন কি, টুর্গেনিভের মত দিক্‌পালের লেখা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে আমার মনে হত "এ স্পোর্টম্যান্‌স স্কেচেস"এ নায়কদের গল্পগুলো টুর্গেনিভের চেয়ে অন্য কায়দায় আমি বলতে পারতাম।

এরি মধ্যে মজাদার গল্প-বলিয়ে হিসেবে আমি গণ্য হয়েছি। ডক-শ্রমিক, রুটিওলা, ভবঘুরে, ছুতোর, রেল-মজুর, তীর্থযাত্রী, এবং সাধারণ ভাবে যাদের ভিতর আমি বাস করতাম তারা সাগ্রহে আমার কথা শুনতো।

কোন বইয়ের গল্প পড়ে তাদের বলার সময় ক্রমশঃ বেশী করে যা আমি পড়েছি সেটা ভেঙ্গে-চুরে নিজের অভিজ্ঞতা কিছু মিশিয়ে অন্য উপায়ে বলতাম। এ রকম যে ঘটত তার কারণ আমার কাছে জীবন ও সাহিত্য এক হয়ে গিয়েছিল। একটা মানুষের মত একখানা বইও জীবনের সেই একই প্রকাশ, একখানা বইও জীবন্ত বাঙ্ময়

বাস্তব, আর মানুষের তৈরী করা বা করতে যাওয়া অন্যান্য সব পদার্থের চেয়ে এটা "পদার্থের" একটু কম।

সুধীজন যাঁরা আমার কথা শুনতেন, বলতেন, "লেখ হে, লিখতে চেষ্টা কর।"

মদ খেয়েছি বলে আমার মাঝে মাঝে মনে হত আর বাচালতার খেয়াল চাপত, এও এক ধরণের বাক্যের ব্যভিচার যার জন্ম হচ্ছে আমাকে যা কিছু দুঃখ অথবা আনন্দ দিয়েছে সে সব বর্ণনা করার ইচ্ছে থেকে; এ সবগুলো বলে আমি নিজেকে একটু সোয়াস্তি দিতে চাইতাম। আমার যন্ত্রণাময় মানসিক উত্তেজনার মুহূর্তগুলিতে শ্বাসরুদ্ধ স্ত্রীলোকের মত আমার দম আটকে যেত।

প্রথম কবিতা

আমি জোরে চীৎকার করতে চাইতাম যে আমার বন্ধু ও বেশ বুদ্ধিমান ছেলে কাচ-মিস্ত্রী আনাতোলী কারো সাহায্য না পেলে মারা যাবে।

পথচারিণী থেরেসা একটা ভাল স্ত্রীলোক, সে বেশ্যা এটা একটা অবিচার, যে সব ছাত্ররা তার কাছে যেত তারা এটা বুঝত না, যেমন তারা বুঝতে চাইত না যে বুড়ী ভিখিরী মাতিস্তা আমাদের পাড়ার যুবতী ধাত্রী ইয়াকোলিভার চেয়ে বুদ্ধিমতী।

এমন কি, আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ছাত্র নারী প্লেটনভকে না বলে আমি থেরেসা ও আনাতোলী সম্বন্ধে কবিতা লিখেছিলাম। বসন্তে গলা তুষার সম্বন্ধে লিখেছি কিন্তু যে তুষার বিন্দু বিন্দু করে একটা ময়লা জলস্রোতের সাথে মিশে গিয়ে রাস্তা থেকে রুটিওলারা যেখানে কাজ করছে সেই সেলারে যাবার জন্ম গলেনি।

আমি লিখেছিলাম যে ভলগা খাসা নদী। বিস্কুটওলা কাজিন যেন একটা বিশ্বাসঘাতক ইসকারিভ, জীবনটা জঘন্য ও বেদনাময় যা আত্মাকে ধ্বংস করে ফেলে।

পদ্য লেখাটা আমার কাছে সহজ লাগল, কিন্তু আমার পদ্য হল অসার আর আমার এই নৈপুণ্য ও শক্তিহীনতার জন্য নিজেকে ঘৃণা করেছি। আমি পুশকিন, লারমনটভ, নেক্রাসভ ও কুরোচকিনের অনূদিত বিরাংগার পড়েছি এবং পরিষ্কার দেখলাম যে আমি একটুও এদের এক জনার মত না। পদ্য থেকেও গদ্য লেখাটা আমার কাছে কঠিন ঠেকত তাই গদ্য লিখতে আমার ভয় করত। গদ্যে চাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অন্যের কাছে অদৃশ্য জিনিষ দেখবার ও লক্ষ্য করবার ক্ষমতা আর চাই ভাষার অদ্ভুত ভাবে ঠাসবুনানি ও শক্তিশালী সজ্জা।

কিন্তু এই সব কারণে আমি গদ্য লিখতেও চেষ্টা করেছিলাম, অবশ্য ছন্দভরা পদ্যের দিকে ঝোঁকটাই ছিল বেশী। কারণ সাধারণ গদ্য লেখা ছিল আমার ক্ষমতার বাইরে। এই সব চেষ্টার ফল হল নিছক করুণ ও হাস্যকর। ছন্দভরা গদ্যে আমি একটা প্রকাণ্ড বড় পদ্য লিখেছিলাম। নাম দিয়েছিলাম "সঙ অব দি ওল্ড ওক।" ভি, জি, করনেংকো দশ কথায় এই ভোঁতা মানটি সমূলে নস্যাৎ করে দিলেন।

৩

আমার নায়ক-নায়িকারা

আমার মনে হয়, ন্যাডসনই বলেছেন যে, "আমাদের ভাষা ভাব হীন আর হেয়।" আর অনেক কবিই আমাদের ভাষার এই দারিদ্র্য সম্বন্ধে অভিযোগ করেছেন। আমার মনে হয়, ভাষার দারিদ্র্য সম্বন্ধে অভিযোগটা শুধু রুশ ভাষা নয় গোটা মানব ভাষা সম্বন্ধেই খাটে। এগুলো এই কারণে মনে আসে যে, এমন কতকগুলো চিন্তা ও অনুভূতি আছে যেগুলো এত ভ্রান্তিজনক যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু আমরা যদি যে সব জিনিষগুলো এত ভুল যে, ভাষায় প্রকাশ করা যায় না তা এক পাশে সরিয়ে রাখি তবে রুশ ভাষা অফুরন্ত সম্পদশালী আর অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সেটা বাড়ছে।

এখানে এটা বলা দরকার যে, মানুষই ভাষা সৃষ্টি করে। ভাষাকে 'সাধু' ও 'কথ্য' এই দুই ভাগ করার মানে এই যে, একটা হচ্ছে মৌলিক আর আর একটি শিল্পীর হাতে মার্জিত। পুশকিন এটা প্রথম বুঝেছিলেন। আর তিনিই লোকের বক্তব্য কি করে ব্যবহার বা বদল করতে হয় তা প্রথম দেখান। লেখক তাঁর দেশ ও শ্রেণীর আবেশময় মুখপাত্র। তিনি তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের অন্তঃকরণ; তিনি তাঁর যুগের বাণী। তাঁর যত বেশী সম্ভব জানা উচিত। আর তিনি যত বেশী ভাল করে অতীতকে জানতে পারবেন তত বেশী ভাল করে তিনি তাঁর নিজের যুগকে বুঝতে পারবেন। আর তত বেশী দৃঢ় ও গভীর ভাবে আমাদের যুগের সর্বমুখী বিপ্লবী প্রকৃতি ও সেই সময়ের কর্তব্যের বিস্তারও দেখতে পাবেন।

জন-সাধারণের ইতিহাস জানা দরকার। এমন কি বাধ্যতামূলক। সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে ইতিহাস কি বলে সেটা জানা কম দরকারী নয়। যে সব পণ্ডিতেরা জাতিতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন তাঁরা বলেন যে, জন-সাধারণের চিন্তার ধারা প্রকাশ পায় গল্পে, গাথায়, প্রবাদে ও জনশ্রুতিতে। আর একটা খাঁটি সত্য যে, প্রবাদ ও জনশ্রুতিতে জনসাধারণ কি ভাবে চিন্তা করে সেটা সম্পূর্ণ ও সুন্দর ভাবে প্রকাশ পায়।

প্রবাদ ও জনশ্রুতি সাধারণতঃ শ্রমজীবী লোকদের গোটা সামাজিক ও ঐতিহাসিক জীবন অভিজ্ঞতা চমৎকার সংক্ষেপে প্রকাশ করে। আর লেখকের পক্ষে এই জিনিষগুলি পড়া অত্যাবশ্যক। কেন না, এই জিনিষগুলি আঙুল যেমন মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ে তেমনি কতকগুলি জিনিষ ধরতে শেখায় আর মরা, যুগোচিত কাজের পরিপন্থী ও লুকান জিনিষগুলো প্রকাশ করে দেবার জন্য অন্য আঙুলগুলো মেলে ধরতে শেখাবে।

আমি জনপ্রবাদ বা অন্য কথায় বচন থেকে অনেক শিখেছি।

এই ধরণের জীবন্ত চিন্তাই আমাকে ভাবতে ও লিখতে শিখিয়েছে। এই রকমের চিন্তা, বাড়ীর দারোয়ানের চিন্তা, কেরাণী, দীন-দরিদ্র ও নানান ধরণের লোকদের চিন্তা আমি বইয়ে অন্য ভাষার পোষাক পরতে দেখেছি। এই ভাবে জীবন ও সাহিত্য একে অপরকে পরিপূরণ করেছে।

এরি মধ্যে আমি ভাষা-নিপুণ লোকরা কি ভাবে টাইপ ও চরিত্র সৃষ্টি করেন সে কথা বলেছি। কিন্তু দু'টো মজার ঘটনা এখানে উল্লেখ করলে বোধ হয় ভাল হবে।

গ্যেটের 'ফাউষ্ট' শিল্প সৃষ্টির সেরা রচনার মধ্যে একটি, একেবারে সম্পূর্ণ কাল্পনিক, মস্তিষ্কের ফল, প্রতিচ্ছবিতে চিন্তার রূপ পরিগ্রহ। আমার বয়স যখন কুড়ি বছর তখন আমি 'ফাউষ্ট' প্রথম পড়ি আর তারও কিছু পরে জানতে পারি যে, জার্মান গ্যেটের দু'শো

বছর আগে ক্রিষ্টোফার মার্লো নামে এক জন ইংরেজ 'ফাউষ্ট' সম্বন্ধেও লিখেছিলেন ; একটা পোল উপন্যাস প্যান ভার্ভোভস্কি এক ধরণের 'ফাউষ্ট', আর ফরাসী পল দ্য মুসেব 'সিকার আফটার হ্যাপিনেস'ও ছিল তাই।

আমি আরও দেখলাম যে, 'ফাউষ্ট' সম্বন্ধে সমস্ত বইয়ের মূল উৎস হচ্ছে একটা মানুষের সম্বন্ধে এক মধ্যযুগীয় উপকথা। প্রাকৃতিক শক্তি ও মানুষের উপর প্রভুত্ব করার জন্য এবং আত্মসুখের কামনায় লোকটি নিজের আত্মাকে শয়তানের কাছে বিক্রি করেছিল। গল্পটি আবার রূপ পেয়েছিল মধ্যযুগীয় রাসায়নিকদের কাজ ও জীবনী লক্ষ্য করে। এরা অমৃত সালসা আর সোনা তৈরী করার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

এই সব লোকের মধ্যে অনেকে খাঁটা স্বপ্নবিলাসী ছিলেন, 'একটা ভাবের পাগল', কিন্তু অনেক ধাপ্পাবাজ ও ভণ্ডও জুটেছিল। এই সব লোকের উচ্চতর ক্ষমতা পাওয়ার সমস্ত চেষ্টার এটা একটা ব্যর্থতা। এই উচ্চতর ক্ষমতাকে ব্যংগ করা হয়েছে যাকে এমন কি স্বয়ং শয়তানও সর্বজ্ঞতা ও অমরত্ব লাভে সাহায্য করতে পারত না সেই মধ্যযুগীয় ডাক্তার 'ফাউষ্টের' দুঃসাহসিক অভিযানের সমস্ত কাহিনীগুলোতে।

অসুখী 'ফাউষ্টে'র চরিত্রের পাশাপাশি আরও একটা চরিত্র এসে দাঁড়ায়, যাকে প্রত্যেক জাতি চেনে, ইতালিতে সে পুলসিনেলো, ইংলণ্ডে পাঞ্চ, তুরস্কে কারপেট, আমাদের দেশে পেপাস্কাট্রুস্কা, পুতুল নাচের সে অজেয় বীর। পুলিশ, পুরোহিত, এমন কি শয়তান ও শমন—সকলকেই সে পরাস্ত করে অথচ নিজে থাকে অমর। এই কাঁচা ও সরল প্রতিচ্ছবিতে শ্রমজীবী মানুষেরা তাদের নিজেদেরই প্রতিফলিত করেছিল, আর প্রতিফলিত করেছিল তাদের দৃঢ় বিশ্বাসকে। সে বিশ্বাস হল এই যে, শেষ পর্যন্ত তারাই সকলকে এবং সব কিছুকেই পরাস্ত ও অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।

আগেই যা বলেছি তা এই দু'টো উদাহরণ দিয়ে আরো সমর্থন করা যায়। কতকগুলো সামাজিক গোষ্ঠীর বিশেষ রীতিনীতি-গুলো এই গোষ্ঠীর এক জনের চরিত্রে জড় করে ফুটিয়ে তুলতে হবে—গতানুগতিক বেনামা সাহিত্যও এই নিয়মের আওতায় পড়ে। এই নিয়ম কঠোর ভাবে মানলে লেখকে টাইপ তৈরীর কাজে অনেক সাহায্য পাবেন। এই ভাবেই চার্লস দ্য কষ্টার ফ্ল্যাণ্ডার্সের অধিবাসীদের জাতীয় চরিত্রের টাইপ টিল উলনেমপিজেল, রোমা রঁল্যা বার্গাণ্ডীয় কোলাস ব্রগনন আলফোঁস দোদে তারাসকনের প্রভিন্স্যান তার-তারিন সৃষ্টি করেছেন। এক জন লেখক যদি তাঁর দৃষ্টির প্রখরতা, সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যগুলি দেখার সামর্থ বাড়াতে পারেন, আর তিনি যদি অনবরত শিখতে প্রস্তুত থাকেন তবেই তিনি লোকের এ রকম চমৎকার টাইপ আঁকতে পারবেন। যেখানে কোন সঠিক জ্ঞান নেই সেখানে আন্দাজ করা হয়, আর দশটা আন্দাজের মধ্যে ন'টা হয় ভুল।

শিল্পোৎকর্ষে যা অবলোমভ, রুডিন ও রিয়াজনভের মত টাইপ ও চরিত্রের সংগে সমান হতে পারে এমন টাইপ আমি সৃষ্টি করতে পারি, নিজেকে আমি এমন ওস্তাদ মনে করি নে। কিন্তু তাহলেও 'কোমা গর্ভিয়েভ' লিখতে গিয়ে যারা তাদের বাবাদের জীবন ও ব্যবসা সম্বন্ধে বিতৃষ্ণ হয়েছে এমন কয়েক ডজন ব্যবসায়ীর ছেলেকে আমার লক্ষ্য করতে হয়েছে। তাদের সবারই একটা আবছা অনুভূতি ছিল যে তাদের একঘেয়ে 'হতভাগ্য ও ক্লান্তিজনক' জীবনের কোন মানেই হয় না।

আমার 'কোমার' নমুনাগুলোর বরাতে একটা জড় জীবন নির্দিষ্ট, এটাকে তারা ঘৃণা বোধ করে, তারা অনবরত চিন্তা করে চলেছে, হয় তারা চরিত্রহীন ও মত্তপ হল, যারা 'জীবনকে পুড়িয়ে ফেলে এমন মানুষ অথবা মবজ্জভের মত 'সাদা দাঁড়কাক।' কোমা গর্ডিয়েভের পালক-পিতা মায়াকিন একরাশ ছোট ঝিশেসদের সমষ্টি, বলতে গেলে প্রবাদ থেকেই গড়ে তোলা হয়েছে।

কিন্তু আমি ভুল করিনি, ১৯০৫ সালের পরে যখন তাদের নিজেদের দেহ দিয়ে শ্রমিক ও কৃষকরা মায়াকিনের ক্ষমতা দখলের পথ দেখাল তখন শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে মায়াকিনরা কম উল্লেখযোগ্য অংশ নেয়নি।

যুবকরা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছে কেন আমি ভবঘুরেদের সম্বন্ধে লিখলাম। তার কারণ এই যে, নিম্ন-মধ্যবিত্তদের মধ্যে বাস করেও আমার চারি পাশের লোকদের দেখেছি যাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হল কোন প্রকারে লোককে শোষণ করা, অন্যের রক্ত ও ঘামকে পয়সা আর পয়সাকে টাকায় পরিণত করা। আর সাধারণ লোকের পরগাছা জীবনকে ভীষণ ঘৃণা করতে লাগলাম। একই ট্যাকশালের তামার মুদ্রার মত এদের পরস্পরের একই ছাঁচ, আমার কাছে 'ভবঘুরেরা' ছিল অসাধারণ। তারা অসাধারণ ছিল তার কারণ এই যে তারা ছিল 'শ্রেণীচ্যুত।' এরা নিজেদের শ্রেণী থেকে খসে গিয়েছে অথবা পরিত্যক্ত হয়েছে আর এদের শ্রেণীর বিশেষত্বগুলোর অধিকাংশই হারিয়ে ফেলেছে। নিঝনি-নভ গোরডে মিলিয়নকায়, 'গোল্ডেন কোম্পানীর' মধ্যে ভূতপূর্ব স্বচ্ছল ব্যবসায়ীরা, আমার নিজের খুড়তুতো ভাই স্বপ্নবিলাসী আলেকজাণ্ডার কাশিরিণ, ইতালীয় শিল্পী তাস্তিনী, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক গ্লাংকভ, কোন এক জন ব্যারণ বি, এক জন ভূতপূর্ব সহকারী পুলিশ ইন্‌সপেক্টর, যার ডাকাতির ইতিহাস আছে, আর বিখ্যাত চোর 'জেনারেল নিকোলা' যার আসল নাম ছিল ভ্যাণ্ডার-ভিলিয়েট, সবাই একত্রে জীবনে উন্নতি করে খ্যাত হল।

কাজানের 'কাচের কারখানায়' আমি প্রায় কুড়ি জনের একটা দলের সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম যাদের ও মূল কম বিভিন্ন ছিল না।

এক জন 'ছাত্র' যার নাম ছিল র‍্যাডলভ, অথবা রাতুলভ হতে পারত, এক জন পুরোনো ছেঁড়া কাপড়ের কারবারী যে দশ বছর জেল খেটেছে, গভর্ণর আণ্ড্রেয়েভস্কীর ভূতপূর্ব পাইক ভাস্কা প্রাচিক, বেলোরাশিয়ান ইঞ্জিন-চালক, পুরুতের ছেলে রজিয়েভিশ, পশু চিকিৎসক ডেভিডভ।

এদের অধিকাংশ ছিল মাতাল আর রোগগ্রস্ত। অনবরত এদের মধ্যে ঝগড়া বাধত, কিন্তু পারস্পরিক বন্ধুজনোচিত সাহায্যের বন্ধন এদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, আর যা কিছু তারা রোজগার অথবা চুরি করতে পারত তাই সবাই ভাগ করে খে'ত। আমি দেখলাম, যদিও তারা সাধারণ লোকের চেয়েও খারাপ অবস্থায় থাকত তাহলেও ওদের চেয়ে নিজেদের অবস্থা ভাল মনে করত। আর সত্যিই তারা সাধারণের চেয়ে নিজেদের অবস্থা ভাল মনে করত। তার কারণ তারা ছিল নির্লোভ। তারা একে অপরের চেয়ে ভাল থাকতে চাইত না বা টাকা জমাত না।

এই সব ভবঘুরেদের মধ্যে অনেক অদ্ভুত লোক থাকত, আর তাদের অনেকগুলো জিনিবই আমি বুঝতে পারতাম না। কিন্তু তাদের জীবন সম্বন্ধে অভিযোগ ছিল না, তাই আমি তাদের দিকেই ভীষণ পক্ষপাতী হয়ে পড়েছিলাম। তারা গণ্যমান্য জীবনের কথা হয় ব্যংগ অথবা বিদ্রূপ করে বলত। অথচ এ কথা তারা একটা চাপা বিদ্বেষ থেকে বলত না, বা আত্মর টক বলেও বলত না, বলত গর্ব থেকে; বলত এই ধারণা থেকে যে যদিও তারা 'খারাপ অবস্থায় বেঁচে আছে' তা হলেও যারা 'ভাল ভাবে বেঁচে আছে' তাদের চেয়েও ওরা ভাল অবস্থায় বাস করছে। 'দি হ্যাজবিন্‌স'এ আমি যার বর্ণনা করেছি সেই চাকর কুভালদাকে আমি প্রথম দেখি বিচারক কোলান্তায়েভের সামনে। এই ময়লা কাপড় পরা লোকটিকে মর্যাদাবোধক চেহারায় বিচারকের প্রশ্নের জবাব দিতে, ঘৃণায় পুলিশের, ফরিয়াদীর উকীলের ও যাকে সে মেরেছিল সেই হোটেলওয়ালার জিজ্ঞাসার জবাব দিতে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

যার বলা গল্প আমি আমার নিজের গল্প 'চেলকাশে' ব্যবহার করেছি ওডেসার সেই ভবঘুরেটার মিঠে বিদ্রূপেও আমি কম আকৃষ্ট হইনি। সেখানে আমরা দু'জনেই অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলাম। যে হাসিতে একপাটি খাসা সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়েছিল লোকটার সেই হাসি আমার বেশ মনে পড়ে। এই হাসি দিয়েই লোকটা তার একটা কাজ করিয়ে নেবার জন্য যে ছোকরাকে ভাড়া করেছিল সে তার উপর কি ভাবে জঘন্য চালাকি করল সেই গল্পটা শেষ করল। "কাজেই তাকে টাকাটা দিয়ে ছেড়ে দিলাম: যাও, মূর্খ, তোমার পেট ভরাও গিয়ে।"

আমরা দু'জনে হাসপাতাল থেকে একসংগে বেরোলাম এবং শহরের বাইরে একটা তাঁবুতে বসে সে আমাকে কাঁকুড় দিয়ে আপ্যায়িত করে প্রস্তাব করল: "তুমি আমার সংগে মিশে একটা ভাল কাজ করতে রাজী হবে কি? আমার মনে হয়, তুমি বেশ কাজ চালিয়ে নিতে পারবে।"

এ প্রস্তাবে আমি ভীষণ চরিতার্থ হলাম কিন্তু এর আগেই আমি বুঝতে পেরেছি যে চুরি করা কিংবা মাশুল মারার চেয়ে অনেক ভাল কাজ আমি করতে পারি।

আমার কাছে মানুষের বাইরে কোন ধারণা নেই, আমার কাছে মানুষ এবং কেবল মাত্র মানুষই সমস্ত বস্তু ও ধারণা সৃষ্টি করেছে, সে হচ্ছে যাদুকর, আর প্রকৃতির সমস্ত শক্তির ভবিষ্যৎ মনিব হচ্ছে সেই। আমাদের পৃথিবীতে সব চেয়ে সেরা সুন্দর জিনিষ তৈরী হয়েছে শ্রম দিয়ে, তৈরী হয়েছে দক্ষ মানুষের হাতে, আর আমাদের সব চিন্তা, সব ধারণা শ্রমের রীতির মধ্য দিয়েই জন্ম লাভ করেছে—যেমন শিল্প, বিজ্ঞান ও শ্রম-শিল্প বিজ্ঞানের সমগ্র ইতিহাস থেকে সেটা জানা যায় যে তথ্যের পরে আসে চিন্তা। মানুষের কাছে আমি মাথা নোয়াই, কারণ মানুষের যুক্তি ও চিন্তার রূপ পরিগ্রহ ছাড়া তার বাইরে আমাদের পৃথিবীতে আমি আর কিছুই বোধ করতে বা দেখতে পাই নে।

আর যদি পবিত্র জিনিষগুলোর কথা বলার দরকার বোধ হয় তবে একমাত্র পবিত্র জিনিষ হচ্ছে মানুষের তার নিজের উপর অসন্তোষ আর তার বর্তমানের চেয়ে ক্রমাগত ভাল হওয়ার চেষ্টা; পবিত্র হচ্ছে তার ঘৃণা সমস্ত তুচ্ছ আবর্জনার বিরুদ্ধে যা সে নিজে তৈরী করেছে; পবিত্র তার লোভ, ঈর্ষা, অপরাধ, রোগ, যুদ্ধ ও পৃথিবীর মানুষের ভিতর থেকে শত্রুতা মুছে ফেলার ইচ্ছা, আর পবিত্র হচ্ছে তার শ্রম।

অনুবাদক: সুনীল বসু

রূপান্তর

দিলীপ দাশগুপ্ত

তোমার কঠিন পণ সত্য হয়ে মূর্ত্ত হোক, গ্লানি মুছে যাক,
প্রতীক্ষা-মুখর প্রান্তে ধ্বংস হোক রাত্রি মোর, উদ্ধত আহ্বানে:
পরম রাত্রির সেই ব্রীড়ানতা ক্ষণগুলি শুধু লজ্জা পা'ক।
কুসুম-পেলব বাহু তরবারি নিতে চা'ক অন্তরীক্ষ গানে।

তোমার সাগর হতে তরঙ্গের লীলা-ধ্বনি—বৈশাখের তেজে,
বাঁশরীরে ভুলে গিয়ে জ্বালাময়ী অগ্নিবীণা বাজাক অন্তরে;
মোহিনী-প্রলুব্ধা রূপ দূর করে দাঁড়াইও বিশ্বপিতা সেজে,
পুরানো পৃথিবী যেন শতবর্ষ পরে তোমা নতশিরে স্মরে।

এমন চাঁদের মায়া সূর্য হয়ে বেঁচে থাক: পদতলে ঘাম
শ্রমের মূল্যেরে দিয়ে কালপুরুষের ভালে অদৃষ্ট মাগুক।
শত নাম ভুলে যাক; শ্রদ্ধানত হয়ে সবে স্মরি এক নাম
তোমার পণেরে বেঁধে ললাটের বহ্নি সনে বিশ্বেরে জাগুক।

আমরা বাঁচিয়া আছি কুসুমের বুকে জ্বালা; মাথায় আকাশ
দুরন্ত ঝড়ের ঘায়ে ব্যথাহত বুকে তাই ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস।

"অসহযোগ আন্দোলনের স্মৃতি"

শ্রীচিত্তরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা

সর্ব্বাগ্রে আমি আমার পাঠক-পাঠিকাদের নিকট একটি বিষয় বলতে ইচ্ছা করি। আমি অসহযোগ আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস লিখতে বসি নাই, কারণ, নানা কারণে তাহা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমি কেবল সেই সকল ঘটনা বলব, যা'র সহিত আমি নিজে সংশ্লিষ্ট ছিলাম কিম্বা যে সকল ঘটনা আমার সুস্পষ্ট ভাবে মনে আছে। সুতরাং আমার এই লেখার মধ্যে এমন ঘটনা বাদ পড়বে, যাহা পাঠক-পাঠিকারা বিশেষ ভাবে জানেন। আমার এই লেখার মধ্যে এমন ঘটনা আছে যাহা হয়ত অনেকেই জানেন না। মহাত্মা গান্ধীকে সর্ব্বসাধারণ কিরূপ অসীম সম্মানের চক্ষে দেখেছে তাহার কয়েকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আমি লিপিবদ্ধ করেছি। আমার এই লেখা পড়ে যদি সর্ব্বসাধারণের মনে কিছুমাত্র স্বদেশপ্রেমের উদ্রেক হয় তবে আমার এই লেখনী ধারণ সার্থক মনে করব।

১৯২০ সাল

১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি তাহাতে যোগদান করেছিলাম। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি আমার পিতৃদেব স্বর্গীয় মনোরঞ্জন গুহ-ঠাকুরতা মহাশয়ের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের পূর্ব্বেই আমার পিতৃদেব দেহত্যাগ করেছিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এক দিন আমাকে বলেছিলেন,—"তোমার বাবা এই সময়ে নাই। তিনি থাক্‌লে আমি মনে অনেক বল বেশী পেতাম এবং তাঁহার উপদেশে অনেক উপকার হোত বলে আমার বিশ্বাস। তুমি স্বদেশী আন্দোলনের সময় যেমন ভাবে দেশের কাজ করেছ, আশা করি, অসহযোগ আন্দোলনেও তেমনি ভাবে দেশের কাজে ব্রতী হবে।"

দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের বাক্যে বিশেষ উৎসাহিত হয়ে আমি এই আন্দোলনে যোগদান করেছিলাম। যেখানে যেখানে সভা হোত আমি যোগদান করতে চেষ্টা করতাম। অনেক সভায় আমি স্বদেশী গান এবং বক্তৃতা করেছি। আমি সংক্ষেপে বিশিষ্ট কয়েকটি সভার বিবরণ লিপিবদ্ধ করব।

মহাত্মা গান্ধী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র

কলিকাতার মির্জ্জাপুর পার্কে বিরাট সভা হোল। কম পক্ষে পঞ্চাশ হাজার শ্রোতা এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্বনামধন্য বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় একটা জিদ ধরেছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর নাম উচ্চারণ করবার সময় তিনি "মহাত্মা" বলবেন না, কেবল গান্ধীজি বল্‌বেন। তাঁহার যুক্তি এই যে, "মহাত্মা" শব্দটি যেরূপ মহাপুরুষদের নামের পূর্ব্বে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয়ে থাকে গান্ধীজি সেই স্তরের মহাপুরুষ নহেন; সুতরাং তাঁহাকে মহাত্মা বলা ঠিক নয়। গান্ধীজিকে মহাত্মা বলতে সম্মত না হওয়ায় ২।৩টি সভায় বিপিন বাবু বক্তৃতা করতে দাঁড়ালে শ্রোতাগণ চীৎকার করে বলতে থাকে আপনার বক্তৃতা শুনব না, আগে "মহাত্মা" বলুন, তার পর আপনার বক্তৃতা শুনব। বিপিন বাবুর ন্যায় এক জন সুবক্তা অনেক চেষ্টা করেও বক্তৃতা করতে পারলেন না। এই সময়ে মহাত্মাজী কলিকাতায় এসেছিলেন। তিনি কলিকাতায় পৌঁছিয়াই বিপিন বাবুর প্রতি সর্ব্বসাধারণের এইরূপ অপমানজনক ব্যবহারের কথা জানতে পারলেন। মির্জ্জাপুর পার্কে যে বিরাট সভা হোল তাতে মহাত্মাজী বিপিন বাবুকে সঙ্গে নিয়ে সভায় উপস্থিত হোলেন। বিপিন বাবুকে দেখেই সভায় মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হোল। অনেকে চীৎকার করে বলতে লাগলেন—"বিপিন বাবুর বক্তৃতা শুনব না।" মহাত্মাজী তখন দাঁড়িয়ে বললেন—"আমি শুনে অত্যন্ত দুঃখিত হলাম যে, আপনারা বিপিন বাবুর ন্যায় এক জন দেশপ্রেমিককে ২।৩টি সভায় অপমান করেছেন। এই ঘটনা আমার মনে অসীম দুঃখ ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বিপিন বাবু আমাকে "মহাত্মা" বলতে রাজি হন নাই। আপনারা অনর্থক আমাকে মহাত্মা বলেন। সত্যি ত আমি মহাত্মা নই। প্রকৃত মহাত্মা হতে হলে যে সব গুণের দরকার তাহার অনেক গুণ আমার মধ্যে নাই, সুতরাং বিপিন বাবু সত্য কথা বলেছেন বলে আপনারা তাঁহার বক্তৃতা না শুনে তাঁকে অপমান করেছেন, আপনাদের পক্ষে ইহা খুবই গর্হিত কার্য্য হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমি "মহাত্মা" নই তবুও আপনারা জোর করে বিপিন বাবুকে দিয়ে "মহাত্মা" বলাবেন, এ ত ভারি জুলুম বলে আমার মনে হয়। আজ এই সভায় বিপিন বাবু সর্ব্বপ্রথমে বক্তৃতা করবেন, যদি আপনারা অত্যন্ত শান্ত ভাবে তাঁর বক্তৃতা না শোনেন এবং এক জন শ্রোতাও যদি কোনো প্রকার গোলমাল করেন তবে আমি তৎক্ষণাৎ সভা ত্যাগ ক'রে চলে যাব।"

মহাত্মাজীর এই বক্তৃতার পর বিপিন বাবু দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"আমি গান্ধী মহারাজকে এত দিন মহাত্মা বল্‌তে আপত্তি করেছি; কারণ, মহাত্মা কথাটি যেরূপ সাধু মহাপুরুষদের নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হয় তাঁহাদের সঙ্গে অক্তের তুলনা হয় না, কিন্তু আজ গান্ধী মহারাজ তাঁর বক্তৃতায় যেরূপ প্রকৃত মহাপুরুষের ন্যায় উদারতা ও মহোচ্চ হৃদয়ের পরিচয় দিয়েছেন তাতে আমি একেবারে মুগ্ধ হয়েছি। আমিই আজ তাঁকে "মহাত্মা" বলে মনে করছি। আপনারা সকলে মিলে উচ্চ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করুন 'মহাত্মা গান্ধীজীকি জয়।' এরূপ ভাবে বিপিন বাবু তিনবার জয়-ধ্বনি করলেন, এবং সহস্র সহস্র কণ্ঠ-নিঃসৃত "মহাত্মাজীকি জয়" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোল। এই সভায় আমি কবি-সম্রাট্ রবীন্দ্রনাথের "বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এতই শক্তিমান" গানটি নানা প্রকার বাদ্যযন্ত্র সহযোগে গেয়েছিলাম। এই গান শুনে শ্রোতাদের মনে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি, মহাত্মাজী পর্য্যন্ত মাথা নেড়ে-নেড়ে খুবই মনোযোগের সহিত এই গানটি শুনেছিলেন। ইহার পর আরও অনেক সভায় আমি যোগদান করেছিলাম, কিন্তু আমার টিটাগড়ের বিরাট সভার কথা সুস্পষ্ট ভাবে মনে আছে।

টিটাগড়ে বিরাট সভা

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় আমাকে আদেশ করলেন যে, বেশী করে ভলাণ্টিয়ার নিয়ে টিটাগড়ে যেতে, যাতে সেখানে সভায় বিশৃঙ্খলা না ঘটে তার ব্যবস্থা করতে। কারণ, সেখানে লোকসংখ্যা খুবই বেশী হবে। আমি অনেক যুবক ভলাণ্টিয়ার নিয়ে টিটাগড়ে গেলাম। বিকেলে সভা হবে কিন্তু দুপুর থেকেই দলে দলে লোক আসতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই বিরাট মাঠটি প্রায় ভরে গেল। লোকসমুদ্র বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রোতাদের মধ্যে অধিকাংশই শ্রমিক, তার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাও অনেক, ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে কোলে নিয়ে অনেকে এসেছে। মহাত্মাজী ভগবান, এই তাদের ধারণা। তাই যে মহাত্মাজীকে

দর্শন করবে, তারই অশেষ কল্যাণ হবে মনে করে ছেলে-মেয়েদেরও সঙ্গে নিয়ে এসেছে। অনেক শ্রমিকের হাতে দেখলাম মস্ত মস্ত বাঁশ। বাঁশ নিয়ে আসবার কারণ কি প্রথমে বুঝতে পারলাম না, পরে এই সমস্যার সমাধান হোল, সে কথা পরে লিখব। বিকেল প্রায় পাঁচটার সময়ে মহাত্মাজী এলেন এবং তাঁর সঙ্গে এলেন মৌলানা মহম্মদ আলি এবং সৌকত আলি। বোধ হয় মৌলানা আবুল কালাম আজাদও এসেছিলেন, আমার ঠিক মনে নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় পূর্ব্বেই এসে পৌছেছিলেন। মহাত্মাজীর মোটর এসে যখন পৌছল, তখন সেই মোটরের দিকে এমনি জনতার ভিড় হোল যে মোটর থেকে মহাত্মাজীকে নামিয়ে আনাই কঠিন হোল। মৌলানা মহম্মদ আলি ও সৌকত আলি দুজনই বিশেষ বলিষ্ঠ ছিলেন, তাঁরা লোক ঠেলে জোর করে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক জন ভলাণ্টিয়ার গিয়ে জোর করে সকলকে সরিয়ে দিয়ে মহাত্মাজীকে বের করে' নিয়ে এলেন। চাপের চোটে মোটরের একটা চাকা ভেঙ্গে গিয়েছিল। এই সব অতি-ভক্তদের ভক্তির বেগে মহাত্মাজি বিশেষ বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন এবং সে কথা তিনি বক্তৃতা করতে উঠে প্রথমেই বলেছিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন—"যদি সভায় শৃঙ্খলা না থাকে, আমাকে ভক্তি দেখাতে এসে আমাকে চেপে মেরে ফেলেন, তবে আমার পক্ষে আর কোনো সভায় যোগদান করা সম্ভব হবে না। সভা শেষ হ'লে যে যেখানে বসে আছ সে সেখানেই ব'সে থাকবে, নেতারা সকলে চলে গেলে পর সুশৃঙ্খল ভাবে আস্তে আস্তে সকলে বাড়ী যাবে।" সেটা শ্রমিকদের সভা ছিল, তাই তিনি মদ তাড়ি ইত্যাদি মাদক দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে বল্‌লেন এবং বিলাতি কাপড় কিম্বা অন্য কোনো বিলাতি জিনিষ কিন্‌তে বিশেষ ভাবে নিষেধ করলেন। সভার প্রারম্ভেই শ্রমিকদের পক্ষ থেকে এক ব্যক্তি একটি কাপড়ের তৈরী মালা মহাত্মাজীর গলায় দেওয়া মাত্র তিনি তা' ছুড়ে ফেলে দিয়ে বল্‌লেন—"আমার সম্মানের জন্য আপনারা আমার গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু এ মালা বিলাতি কাপড়ে তৈরি, সুতরাং এ মালা আমার গায়ে লাগা মাত্র আমার মনে হচ্ছে যেন আমাকে শত বৃশ্চিকে কামড়াচ্ছে। আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ যে কেউ কখনো বিলাতি জিনিষ ব্যবহার করবেন না।" সভা শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই দেখি সেই বড়-বড় বাঁশগুলি শ্রমিকরা ঠেলে ঠেলে মহাত্মাজীর পায়ের দিকে দিচ্ছে। তাদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, বাঁশগুলি তাঁরা মহাত্মাজীর পায়ে ঠেকিয়ে বাড়ীতে নিয়ে উঠানে পুঁতে রাখবে, তাতে কোনো প্রকারের অমঙ্গল তাদের স্পর্শ করতে পারবে না। মহাত্মাজীর পায়ে বাঁশ ছুঁয়িয়ে এনে সেই বাঁশ অত্যন্ত ভক্তি সহকারে ছেলেমেয়েদের কপালে ঠেকাতে লাগল। মহাত্মাজীর প্রতি তাদের অপরিসীম ভক্তি দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম।

যশোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স

যশোরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে স্বর্গীয় শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতি হয়েছিলেন। যশোর ষ্টেশন থেকে তাঁকে এবং অন্যান্য কয়েক জন বিশিষ্ট প্রতিনিধিকে হাতীতে করে মহা সমারোহের সহিত অভ্যর্থনা করে সহরে নিয়ে গেল। আমরা অনেকে ঘোড়ার গাড়ীতে গিয়েছিলাম। আমি ও আরও কয়েক জন প্রতিনিধি এক জন ব্রাহ্মণ উকিলের বাটীতে ছিলাম। তাঁর নামটি আমার এখন মনে নাই। তিনি এবং তাঁর পরিবারস্থ সকলে আমাদের এত অধিক পরিমাণ আদর-যত্ন করতে লাগলেন যে, আমাদের বড়ই লজ্জা বোধ হ'তে লাগল। আমার মনে খুবই লজ্জা বোধ হয়েছিল এই ভেবে যে, আমার ন্যায় এক জন অতি তুচ্ছ সামান্য ব্যক্তিকে সেই ব্রাহ্মণ উকিল ভদ্রলোক এমনি ভাবে সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন যে, আমরা যেন তাঁদের পূজার পাত্র। আমি হাত জোড় করে তাঁদের বললাম যে, যদি তাঁরা এত সম্মান প্রদর্শন করতে থাকেন তবে আমাদের পক্ষে তাঁদের বাড়ীতে বাস করা অসম্ভব হবে। আমি মনে মনে বুঝলাম যে, আমাদের প্রতি সম্মান প্রদশন ক'রে তাঁরা তাঁদের স্বদেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছেন এবং তাঁরাই আমাদের চক্ষে মহা সম্মানের পাত্র হচ্ছেন।

এই কন্‌ফারেন্সে স্বনামধন্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বিলাত হ'তে আই, সি, এস্ পাশ করে ফিরে এসেছেন। যদিও আই, সি, এস্ প্যাশ করেছিলেন তবুও তাঁর ইংরেজের গোলাম হইবার প্রবৃত্তি হ'ল না; তাই ম্যাজিষ্ট্রেট না হয়ে তিনি মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের সঙ্গে তাঁর খুবই ঘনিষ্ঠতা জন্মিল। যশোরে তিনি অতি অল্পক্ষণ কন্‌ফারেন্সে বক্তৃতা করেছিলেন। তিনি কয়েকটি কথা মাত্র বলেছিলেন তা আমার স্পষ্ট মনে আছে। তাঁর চেহারা এবং কথা বলার ভঙ্গীর মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে তা' সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো। তিনি বললেন—"আমি আই, সি, এস্ পাশ করে গবর্ণমেন্টের চাকুরি না নেওয়াতে অনেকে আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন এবং আমাকে নির্ব্বোধ বলছেন, কিন্তু পরাধীন দেশে বাস করার মতন পাপ আর কিছুই নাই। মহাত্মাজী দেশকে স্বাধীন করার যে আন্দোলন আরম্ভ করেছেন তাতে যোগদান করা প্রত্যেক দেশবাসীর কর্ত্তব্য বলে' আমি মনে করি। আমাকে লোকেরা যতই নির্ব্বোধ বলুক তাতে কিছুই এসে-যায় না। এমন এক দিন আসবে যে, সকলে স্বীকার করতে বাধ্য হবে যে, আমি যে পন্থা অবলম্বন করছি তাই ঠিক।"

উপরোক্ত কয়েকটি কথা তিনি অতিশয় ধীর ভাবে বললেন। তিনি যে কথা বলেছিলেন তাঁর কার্য্য দ্বারা তিনি তা প্রমাণ করেছেন। তিনি ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোনো বিভাগের কমিশনার হলেও তাঁর নাম কেউই জানত না, কিন্তু তিনি তাঁর দেশপ্রেমের যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন তাতে তিনি আজ পৃথিবীর বরেণ্য হয়েছেন। আজ ভারতবর্ষের ঘরে ঘরে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের পূজা হচ্ছে। তিনি বাঙ্গালী, তাই বঙ্গমাতার গৌরবের সীমা নাই। তাঁরই গুণে আজ বাঙ্গালীরা পৃথিবীর সম্মুখে স্ফীত বক্ষে দাঁড়াতে দ্বিধা বোধ করছে না।

বরিশালে তৃতীয় প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্স

বরিশালে তৃতীয় বার প্রাদেশিক কন্‌ফারেন্সে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে যোগদান করেছিলেন দেশবন্ধু দাশ মহাশয়, স্বর্গীয় স্বনামধন্য জে, এম, সেনগুপ্ত ও স্বর্গীয় বিপিনচন্দ্র পাল। এই তিন জন নেতাই খুব ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেছিলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় বললেন যে, স্বদেশী আন্দোলনে বরিশাল যেরূপ দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এবং বীরত্ব দেখিয়েছিল, অসহযোগেও বরিশাল সেরূপ অগ্রণী

হবে তিনি আশা করেন। দেশবন্ধু দাশ ও অন্যান্য নেতাদের বক্তৃতা বরিশালবাসীর মনে খুবই উৎসাহ ও উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল।

দেশবন্ধু দাশ মহাশয়

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশবার সুযোগ ও সুবিধা যারা পেয়েছিল তার মধ্যে আমার ন্যায় নগণ্য ব্যক্তিও এক জন ছিল। তার কারণ আমার পিতৃদেবের সঙ্গে দেশবন্ধু মহাশয়ের বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল, সেই সূত্রে বাবা জীবিত থাকতে আমি তাঁর সঙ্গে দাশ মহাশয়ের বাটীতে অনেক বার গিয়েছি। দেশবন্ধু দাশ মশায়ও আমাকে খুবই স্নেহের চক্ষে দেখেছিলেন। আমি দেশবন্ধু মশায়ের মধ্যে এমন অনেক গুণ দেখেছি যা সাধারণতঃ দেখা যায় না। তাঁর প্রাণ ছিল যেন গড়ের মাঠ—এতই উদার ও এতই উচ্চ যে তা বর্ণনাতীত। আমি এখানে একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ করে তাঁর মহত্ত্বের নিদর্শন দেব। দেশবন্ধু দাশ মশায় যখন মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকা উপার্জ্জন করতে লাগলেন তখন অনেকেই তাঁর কাছ থেকে অনেক সাহায্য পেতেন। দেশবন্ধু দাশ মশায়ের পরিচিত এক ভদ্রলোক প্রতি মাসে এক শত টাকা সাহায্য পেতেন। এই ভদ্রলোক সাহায্য পেতেন বটে, কিন্তু তার নিজের স্বভাব-দোষে নানা স্থানে দেশবন্ধু দাশ মশায়ের নিন্দা করে বেড়াতেন। ক্রমে ক্রমে দেশবন্ধু দাশ মহাশয়ের আত্মীয়-স্বজনেরা জানতে পারলেন যে, ঐ ব্যক্তি নানা স্থানে দেশবন্ধু দাশ মশায়ের নিন্দা করে বেড়ান। তখন তাঁরা দেশবন্ধু দাশকে অনুরোধ করলেন যে, ঐরূপ এক জন অকৃতজ্ঞ লোককে কখনই কোন সাহায্য করা উচিত নয়। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় তাঁদের কথা শুনে বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত না হয়ে খুব উচ্চ হাস্য করে বললেন,—"তোমরা কি বলতে চাও যে, আমি মাসিক একশ' টাকা দিয়ে ওকে আমি মোসাহেব নিযুক্ত করেছি। সে আমার কাছ থেকে সাহায্য পায় বলে কি আমার কোনো দোষ দেখলে সে তা' বলতে পারবে না? এ ত ভারি জুলুম! সে আমার যতই নিন্দা করুক, সে দরিদ্র, তার অর্থের প্রয়োজন, তাই আমি তাকে সাহায্য করবই।"

সাধারণতঃ কেউ নিন্দা করছে শুনলে লোকেরা এমনি চটে যায় যে, সাহায্য করা দূরে থাক, তাকে বাড়ীর ত্রিসীমানায় আসতে দেয় না। কিন্তু দেশবন্ধু দাশ মশায়ের হৃদয় হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় এতই উচ্চ ছিল যে, এরূপ নিন্দা-প্রশংসার তিনি অতীত ছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সেই ভদ্রলোক যখন এই সব ঘটনা জানতে পারলেন তখন তাঁর মনে মহা অনুতাপ হোল, তিনি এক দিন দেশবন্ধু দাশের পায়ে পড়ে' তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং ভবিষ্যতে আর কখনো দেশবন্ধুর নিন্দা করেন নাই।

অনেকের কাছে এটি একটি সামান্য ব্যাপার মনে হ'তে পারে কিন্তু যিনি ভাল করে ব্যাপারটা বুঝবেন তিনি দেখতে পাবেন যে, এরূপ উচ্চ হৃদয় অতিশয় বিরল।

অর্থ সম্বন্ধে দেশবন্ধু দাশ মশায়ের উদারতার বিষয় অনেকেই জানেন। অসহযোগ আন্দোলনের সময়ে তিনি প্রায় সমস্ত দিন নানা সভায় যোগদান করতেন। অধিকাংশ দিন বাড়ীতে ফিরতে রাত্রি ১০টা ১১টা হয়ে যেত। তাঁর মোটর গাড়ীর যিনি ড্রাইভার ছিলেন তিনি এক দিন কথায় কথায় আমাদের কাছে বললেন—"আমার মাইনে মাসে তিনশ' টাকা, আর আজ-কাল উপরি পাই মাসে তিনশ' টাকা।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম—"সে কি রকম?" তিনি বললেন যে, রোজ রাত্রে বাড়ীতে ফিরে এসেই একখানা দশ টাকার নোট দিয়ে বলেন,—"অনেক রাত হয়েছে, কিছু জল খেয়ে নিও।" এরূপ উদার মন না হ'লে কখনই মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যারিষ্টারি মুহূর্ত্তে মধ্যে ছেড়ে দিতে পারতেন না। তাঁর মনের জোর কিরূপ অসাধারণ ছিল তার সামান্য একটি দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছি। তিনি বহু বৎসর পর্য্যন্ত গড়গড়ায় তামাক খেয়েছেন। আমি তাঁকে অনেক সময়ই তামাক কিম্বা চুরোট খেতে দেখেছি। এক দিন মহাত্মাজী তাঁকে বলেছিলেন—"দেশসেবকের পক্ষে তামাক কিম্বা চুরোট না খাওয়াই ভাল; কারণ হয়ত এমন অবস্থায় পড়তে হবে যে, এ সব জুটবে না, তখন খুবই কষ্ট হবে।" দেশবন্ধু দাশ মশায় এই কথা শোনা মাত্র সেদিন থেকে তামাক ইত্যাদি ত্যাগ করেছিলেন। এত বৎসরের অভ্যাস ত্যাগ করতে তাঁর এক মুহূর্ত্তও সময় লাগল না। এরূপ মনের জোর খুব অল্পই দেখা যায়।

দেশবন্ধুর ব্যারেষ্টারি ত্যাগ এবং স্কুল ও কলেজ বয়কট

এই সময়ে বাঙলা দেশ তথা ভারতবর্ষকে বিস্মিত করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তাঁর মাসিক পঞ্চাশ হাজার টাকার ব্যারিষ্টারি একেবারে ছেড়ে দিয়ে অর্থাৎ সর্ব্বস্ব ত্যাগ করে একেবারে ভিখারী হ'য়ে দেশসেবায় নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। ত্যাগের মহিমায় সকল বাঙ্গালী সেদিন চিত্তরঞ্জনের উদ্দেশে তাঁদের প্রণাম জানিয়েছিলেন।

সেই দিনই মির্জ্জাপুর পার্কে বিরাট সভা—তিলধারণের স্থান নাই। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন। বহু ছাত্র সেদিন সভায় ছিল, তাদের গোলামখানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে বললেন। বললেন—"আমি তোমাদের জন্য জাতীয় বিদ্যালয় গঠন করে দেব।" পরের দিন শুনতে পাওয়া গেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা এম্-এ ক্লাশের ১৫।১৬ জন ছাত্র কলেজ ছেড়েছে, এদের মধ্যে কবি-সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অগ্রণী। সারা দিন কলকাতার সকল কলেজ থেকে ছেলেরা বেরিয়ে পড়তে লাগল। তাদের এক সভা হ'ল ষ্টার থিয়েটারে। সেখানে মহাত্মা গান্ধি, মহম্মদ আলি, সৌকত আলি এবং দেশবন্ধু দাশ উপস্থিত ছিলেন। তিনি প্রস্তাব করলেন—"আজকের দিনে যে ছাত্রটি সর্ব্বাগ্রে কলেজ ছেড়েছে তাকে আমি জানি—আমি তাকেই ছাত্রসভার সভাপতি হ'তে আহ্বান করছি"—বলেই তিনি সাবিত্রীপ্রসন্নকে ডেকে সভাপতির আসনে বসিয়ে দিলেন। এই সভার পরে স্কুল-কলেজ বয়কট খুব জোরে চলতে লাগল। এই সময়ে ইউনিভার্সিটির কোন একটা পরীক্ষা কয়েক দিন পরেই আরম্ভ হোল—খুব সম্ভব বি-এ কিম্বা এম্-এ পরীক্ষা। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এবং অন্যান্য নেতারা ঠিক করলেন যে, নেতাদের নিষেধ সত্ত্বেও যে সব ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে যাবে তাদের বাধা দিতে হবে। ঠিক হোল যে, সিনেট হলের প্রত্যেক সিঁড়িতে এমনি ভাবে ছাত্ররা গিয়ে শুয়ে থাকবে যে কেউ যেন পরীক্ষার হলএ প্রবেশ করতে না পারে। শেষ রাত্রি থেকে সিনেট হলের প্রত্যেক সিঁড়িতে ছাত্ররা

গিয়ে শুয়ে রইল। এই সব ছাত্র-ভলান্‌টিয়ারদের যাঁরা ক্যাপ্‌টেন ছিলেন তার মধ্যে আমিও এক জন ছিলাম। পরীক্ষার্থীরা এসে অধিকাংশ ফিরে যেতে লাগল, কিন্তু লিখতে অসীম লজ্জা ও দুঃখ হয় যে, কয়েক জন পরীক্ষার্থী জুতো সুদ্ধ, ছাত্রদের বুকের উপরে পা দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা দিতে ভিতরে ঢুকলো। এই সব ছাত্ররা পরীক্ষায় পাশ করে হয়ত বিদ্বান বলে' গণ্য হতে পারে কিন্তু তাঁরা যে মনুষ্যত্বহীন সে কথা কেউই অস্বীকার করতে পারবেন না। তাদের আমরা দেশের শত্রু ব'লেই মনে করি।

স্বনামধন্য সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সিনেট্ হলে ঢুকবার অন্য একটি গেট গলির মধ্যে আছে, সেই গেটের কাছে ভলান্‌টিয়াররা গিয়ে শোবার আগেই কয়েক জন প্রফেসার এবং স্বনামধন্য আশুতোষ মুখার্জ্জি মহাশয় ভিতরে গিয়েছিলেন। এই প্রফেসারদের মধ্যে এক জন—তাঁর নাম আমি করব না—পুলিশ কমিশনারের কাছে ফোন করে দিয়েছিলেন যে, ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে পারছে না, নন্‌-কো-অপারেটাররা বাধা দিচ্ছে। এই খবর পেয়েই পুলিশের এক জন বড় ইংরেজ কর্ম্মচারী বহু রেগুলেশন লাঠি হস্তে কনষ্টেবল্ সঙ্গে নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। পুলিশকে ফোন্ করা হয়েছে এ খবর সার আশুতোষ জান্‌তেন না। পুলিশ দেখেই তিনি পুলিশের ইংরেজ কর্ম্মচারীকে বললেন—"কে তোমাদের এখানে আস্‌তে বলেছে?" পুলিশের কর্ম্মচারী বলল—"আপনাদের এখান থেকে আমাদের ফোন্ করা হয়েছে।" সার আশুতোষ বললেন—"আমাকে না জানিয়ে ফোন্ করা হয়েছে। তোমাদের এখানে কোনো কর্ত্তব্য নাই। আমাদের ছাত্রদের বিষয় আমরাই বুঝে নেব, তোমরা চ'লে যাও।"

সার আশুতোষের আদেশে পুলিশরা চলে গেল। যে প্রফেসার পুলিশকে ফোন্ করেছিলেন তাঁকে আশু বাবু খুবই তিরস্কার করলেন। আশু বাবুকে সকলে Bengal Tiger বলে জানেন। সত্যিই তিনি তাই ছিলেন। তিনি যেমন দেশপ্রেমিক তেমনি তেজস্বী ছিলেন।

বহু মাড়োয়ারি এবং বাঙ্গালী ভদ্রলোক কমলালেবু কলা ইত্যাদি ফল এবং সন্দেশ এনে যে সব ছাত্ররা সিঁড়িতে শুয়েছিল তাদের খাওয়াতে লাগলেন। দলে দলে মহিলারা এসে এ দৃশ্য দেখে গেলেন এবং ছাত্রদের খুব প্রশংসা করলেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় এবং স্বনামধন্য দেশপ্রিয় জে, এম্, সেনগুপ্ত মাঝে মাঝে এসে ছাত্রদের উৎসাহ দিতে লাগলেন। বেলা একটা বেজে গেল এমন সময়ে সিনেটের গলির মধ্যে যে গেটে ছাত্ররা রাস্তা বন্ধ ক'রে শুয়েছিল সেখানে এক জন প্রফেসার এসে বললেন—"সার আশুতোষের মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য বাইরে যাওয়ার প্রয়োজন, আপনারা যদি রাস্তা ছেড়ে দেন তবে তিনি যেতে পারেন।" এই কথাবার্ত্তা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আশু বাবু এসে গেটের কাছে হাজির হলেন। তখন যে সব ভলান্‌টিয়ার গেট্ আট্‌কে শুয়েছিল তাদের মধ্যে এক জন বলল—"সার, আপনি আমাদের বুকের উপর দিয়ে হেঁটে চলে যান।" আশু বাবু উত্তরে বললেন—"দেখ, আমি ছাত্রদের কতখানি ভালবাসি তা তোমরা ধারণা করতে পার না, সেই জন্যই এমন কথা বলতে পারলে! আমি যদি না খেয়ে এই সিনেট হলের মধ্যে মরেও যাই তবুও তোমাদের গায়ে পা দিয়ে বাইরে যেতে পারব না।"

আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। আশু বাবুর এই কথায় ছাত্রদের তিনি যে কিরূপ প্রাণ দিয়ে ভালবাস্‌তেন তা উপলব্ধি করে আমার চোখে জল এল এবং তিনি যে কত মহৎ তা বেশ ভাল করে বুঝতে পারলাম। আশু বাবুকে রাস্তা ছেড়ে দেওয়া হোল, তিনি সন্তুষ্ট চিত্তে বাইরে চলে গেলেন। পুলিশকে তাড়িয়ে দিয়ে তিনি যে তাঁর উপযুক্ত তেজস্বিতা দেখিয়েছিলেন এবং না খেয়ে মরবেন তবুও ছাত্রদের গায়ে পা দিয়ে বাইরে বেরোতে পারবেন না—এ কথা বলে তিনি যে তাঁরই উপযুক্ত মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন তা লেখাই বাহুল্য।

কলেজ বয়কট সম্পর্কে আর একটি ঘটনা আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে। দেশবন্ধু দাশ মশায় যখন যে কাজ করতেন তা-ই সমস্ত প্রাণ দিয়ে করতেন। কলকাতার একটি বিশিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপ্যালকে তিনি বিশেষ ভাবে অনুরোধ করলেন তাঁর কলেজটিকে জাতীয় কলেজে পরিণত করবার জন্য। তাঁর শত অনুরোধেও উক্ত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল যখন সম্মত হলেন না তখন দেশবন্ধু দাশ মশায় সেই প্রিন্সিপ্যালের পা দু'টো জড়িয়ে ধরলেন এবং তাঁর দু'চোখ দিয়ে টপ্-টপ্ করে জল পড়তে লাগল। দেশের জন্য পাগল হওয়া যাকে বলে সেদিন দেশবন্ধুকে দেখে তা-ই মনে হয়েছিল।

কলকাতার নিকটবর্ত্তী অনেক যায়গায় আমি বক্তৃতা করতে গিয়েছি। দেশবন্ধু দাশ মশায়ের কাছে সংবাদ এল যে, উত্তরপাড়া কলেজের ছেলেরা তখনো কলেজ বয়কট করেনি। ঐ কলেজের অধ্যাপকগণ কলেজ বয়কটের বিরোধী, তাঁরা ছাত্রদের নানা রকম বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রেখেছেন। দেশবন্ধু দাশ মহাশয় আমাকে এবং স্বর্গীয় প্রফেসার জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায়কে উত্তরপাড়ায় যেতে আদেশ করলেন। দেশবন্ধুর পুত্র চিররঞ্জন তাঁদের নিজের মোটরে নিজে ড্রাইভ করে আমাকে ও জিতেন বাবুকে উত্তরপাড়ায় নিয়ে গেলেন। সেখানে বিরাট্ সভা হোল। আমি সভায় স্বদেশী গান এবং বক্তৃতা করেছিলাম। জিতেন বাবু খুবই ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করলেন। উত্তরপাড়ার ছেলেরা কলেজ বয়কট করে বেরিয়ে এল।

[আগামী বারে সমাপ্য।

জনসেবার জন্ত বাংলার সংবাদপত্রগুলিতে পরিবেশন করবেন!

কল্পনাটা মন্দ নয়, মধুরও বলা বলে, কিন্তু, লোক পাওয়া যায় কোথায়? কে এ-ভাবে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট কোরে আমার খেয়াল-খুসির আশা মেটাবেন?

না, বড্ড বাজে বক্‌ছি! এবার সত্যি; ঘটনাটার বিষয় আমার জ্ঞানানুযায়ী লিপিবদ্ধ করাই ভাল। নচেৎ আমার পাঠক-পাঠিকার দল ক্রমেই অসহিষ্ণু ও বিরক্ত হ'য়ে উঠছেন!

যে কাহিনী বল্‌ছি, সেটি ঘটেছিল রেঙ্গুনে! খুব সম্ভব ১৯৪৪ সালের আগষ্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে! অনেক দিনের আগের ঘটনা, তাই আজ আর তারিখটা সঠিক মনে নেই!

ঘটনা যদিও অতি ক্ষুদ্র কিন্তু তাৎপর্য্যপূর্ণ ও আবেগময়।

নেতাজীর আজাদী ফৌজ-প্রীতি

শ্রীরবীন মল্লিক

আমার বন্ধু-বান্ধবরা প্রায়ই জিজ্ঞেস করেন,—"নেতাজীর বিশিষ্টতা ও মহানুভবতার বিষয় কিছু ঘটনা যদি জানা থাকে তো সে বিষয় আমাদের কিছু বল!"

দৈনন্দিন জীবনে এ ধরণের খুঁটি-নাটি অনেক ঘটনাই আমার জানা থাকা উচিত এবং সে সম্বন্ধে অনেক কিছুই আমি বল্‌তে পারি। কিন্তু—

এই কিন্তুই আমার সর্ব্বনাশ করেছে!

অর্থাৎ সকল সময় মনে হয়, বাংলা তথা সমগ্র ভারতবর্ষ আজ যখন নেতাজীর কার্য্যকলাপের সঙ্গে পরিচয় লাভ করবার জন্য উৎসুক, তখন সে সম্বন্ধে যেটুকু আমি জানি প্রকাশ কোরে দিই না কেন?

সত্যি, আমাদের প্রিয় নেতাজীর বহুমুখী প্রতিভার কিছুটা অংশও যদি জনসাধারণ জান্‌তে পারে তো, তাঁদের হৃদয়-মন্দিরে নেতাজীর ব্যক্তিত্বপূর্ণ মূর্ত্তি চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর তাঁরা অন্ততঃ এ-কথাটা বুঝতে পারবেন, নেতাজী কেন আজ আমাদের,—অর্থাৎ প্রত্যেকটি আজাদী সেনার হৃদয়-স্বর্ণ-সিংহাসনে অজেয় রয়েছেন! কিন্তু,—

অর্থাৎ, পারি না, লেখবার একান্ত ইচ্ছা থাকা সত্বেও লিখতে বসলে কলম হ'য়ে উঠে বিদ্রোহী! দু'লাইন লিখে ভাবি, থাক্ এই পর্য্যন্ত, কাল বাকীটা লেখা যাবে, সাদা বাংলায় যাকে বলে আলসেমী!

কলম নিয়ে ঘটা কোরে কত দিন লিখতে বসেছি, নেতাজীকে জনারণ্যের বুকে চির-ভাস্বর করবার চেষ্টা করেছি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল কি না বড় জোর চার লাইন লিখে টেবিলের উপর পা দু'টি তুলে দিয়ে হয় কড়িকাঠ গুণছি, না হয় বহু-ঈপ্সিত নিদ্রা-দেবীর উপাসনা করছি!

তাই মাঝে মাঝে ভাবি, এক জন যদি Secretary পেতাম তো কত ভালই না হ'ত! চোখ বুজিয়ে, নেতাজীর বীরত্বময় কাহিনী বলে যাবো, আর তিনি লিখে নিয়ে, সে কাহিনী

এই ঘটনা থেকেই জানা যায় যে, নেতাজী তাঁর আজাদ হিন্দ্ সরকারের ও ফৌজএর অতি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী থেকে সুরু করে নিম্নতম পদে অধিষ্ঠিত সামান্যতম সেনানীটিকে পর্য্যন্ত কি গভীর ভাবেই না ভালবাসতেন। দেশ বলতে নেতাজীর কাছে শুধু বাংলা দেশই ছিল না—সমগ্র ভারতবর্ষের প্রতিটি প্রদেশের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র গ্রামের অতি অশিক্ষিত নিরক্ষর গ্রামবাসীদেরও বোঝাত অর্থাৎ দেশপ্রেম এই কথাটার অর্থ তিনি যে রকম ব্যাপক ও পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করেছিলেন সেটা একমাত্র তাঁরি পক্ষে সম্ভবপর ছিল। দেখেছি এ কথা অতি সত্য যে, দেশ ও দেশবাসীর বিষয় কিছু বলতে গেলে আবেগে ও উত্তেজনায় নেতাজীর দেহ বারংবার কেঁপে উঠত! কণ্ঠ হয়ে উঠত আবেগে রুদ্ধ—আর চোখের কোণে জোমতো বাষ্পপুঞ্জ।

আজ তাই সেদিনকার অতি সামান্য ঘটনাটিকে বলতে গিয়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিত্বের পদমূলে আমার মাথা বারে বারে শ্রদ্ধায় অবনত হচ্ছে।

পূর্ব্বেই বলেছি—ঘটনাটি অতি সামান্য।

কোকাইন রোডে নেতাজীর বাংলোতে বড় বড় জাপানী ও ভারতীয় অফিসারদের বৈঠক প্রায়ই বসত এবং সেই উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ঘটা মন্দ হোত না। অর্থাৎ বড় অফিসাররা এলেই তাঁদের খাওয়া দাওয়ার বিষয় একটু ত দেখা দরকার? তাছাড়া, পার্টিতে মাঝে মাঝে এঁদের নিমন্ত্রণও করা হোত।

এ সব পার্টির ব্যাপার দেখে নেতাজীরও এক দিন ইচ্ছে হল, তিনিও একটি পার্টি অর্থাৎ ভোজের পার্টি দেবেন!

আপনারা বলতে পারেন যে, নেতাজীর বাংলোতে যখন মাঝে মাঝে ভোজ উৎসব হোতই, (বড় বড় হোমরা-চোমরা জাপানী ও ভারতীয় অফিসারদের নিয়ে) তখন আবার নূতন করে পার্টি দেবার তাঁর ইচ্ছা হোল কেন?

কথাটা ঠিক। মানে, নেতাজীর বাংলোতে যে সব পার্টি হোত সেগুলো সাধারণতঃ সরকারি ব্যাপার নিয়ে। কারণ, ধরুন, জাপানীরা কোন পার্টি দিয়েছেন তা'তে সপারিষদ নেতাজীকে হয়ত যোগদান করতে হয়েছে, সুতরাং নেতাজীকেও তার জবাবে পুনরায়

পার্টি দিতে হোত। কিন্তু এ সব পার্টিগুলো ছিলো সরকারী ব্যয়ে সরকারী ভোজ উৎসব। সাদা কথায় বলা চলে—রাজনৈতিক চাল!

কিন্তু নেতাজী যে পার্টি দেবার বিষয় মনস্থ করেছিলেন তার সঙ্গে রাজনীতি বা সরকার সম্বন্ধীয় কোন সম্বন্ধ ছিলো না। সেটা বলা চলে—নিছক আত্মতৃপ্তির জন্য মহানুভবতা। অর্থাৎ তিনি ইচ্ছা করলেন যে, তাঁরই বাংলোতে বড় বড় অফিসারদের খুসী করবার জন্য যখন এত প্রচুর আয়োজন হয় তখন তাঁর গরীব—অতি সাধারণ বাংলো ও দেহরক্ষীরাই বা কেন এই ভোজ থেকে বঞ্চিত হবে? সুতরাং এ সব সাধারণ সেনাদের নিয়ে এক দিন যদি ভাল করে খানা-পিনা করা যায় তো মন্দ কি?

ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করবার আগ্রহটা নেতাজীর ছিলো চরিত্রগত। তাই তখনই তিনি খবর পাঠালেন লেঃ দে'কে। এই প্রসঙ্গে লেঃ দে'র একটু পরিচয় দিলে মন্দ হয় না।

লেঃ দে' ছিলেন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্ম্মীর আঠার বছরের পুরানো সৈনিক। ব্রিটিশরা মালয় ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ছেড়ে যখন ভারতবর্ষে পালিয়ে আসে, সে সময়ে তিনিও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান আর্ম্মীদের সঙ্গে আত্মসমর্পণ ও পরে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ-এ যোগদান করেন।

লেঃ দে' ছিলেন নেতাজীর বাংলোর এক জন তত্ত্বিরকারক এব সাধারণতঃ তিনি নেতাজীর খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটার তত্ত্বির করতেন। সুতরাং নেতাজী তাঁর সেক্রেটারী লেঃ দে'কে খবর পাঠাবার জন্য ডেকে পাঠালেন।

আমার ঠিক মনে নেই তবে মনে হয়, ক্যাপ্টেন রিজভী তখন নেতাজীর পার্শনাল ষ্টাফএ ছিলেন এবং তাঁকেই নেতাজী ডেকে পাঠান। ডেকে পাঠিয়ে বলেন—দেখ, আজকে আমি আমার বাংলোর রক্ষী সেনাদের একটা ভোজ দেব মনে করছি, মানে, তাদের সঙ্গেই খাব আর কি? দে'কে বল—তাদের খাবার আয়োজনটা যেন ঠিক ভাবে কোরে রাখে!

ক্যাপ্টেন রিজভী জিজ্ঞেস করলেন—কখন খাওয়া-দাওয়া হবে?

নেতাজী বললেন—কখন আর, এই আমি বাইরে যাচ্ছি—ঘুরে এসেই খাওয়া-দাওয়া হবে। তা মনে হয় খাবার আগেই ফিরে আসতে পারবো।

নেতাজীকে অভিবাদন করে ক্যাপ্টেন রিজভী লেঃ দে'কে খবর দেবার জন্য চলে গেলেন। নেতাজীও একটু পরে বাইরে গেলেন।

খাওয়ার নির্দ্দিষ্ট সময়ের একটু আগেই তিনি ফিরে আসেন।

নেতাজীর বাংলোর দোতলায় নেতাজী থাকতেন—এক তলায় ছিলো খাবার ঘর, বসবার ঘর (ভিজিটরস্ রুম)। নেতাজীর বসবার ঘরও ছিল দোতলায়। নেতাজী ফিরে এসে লেঃ দে'কে ডেকে পাঠান।

লেঃ দে' এসে দাঁড়াতেই নেতাজী তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে, ওদের খাবার আয়োজন করেছো তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ, করা হয়েছে।

নেতাজী বললেন—দু'-চারটে নিয়ে এস তো দেখি কি রকম আয়োজন করেছ?

লেঃ দে' তখনই চলে গেলেন—একটু পরেই হাতে গোটা-দুই প্লেট।

নেতাজীর বসবার ঘরে ঢুকেই তিনি বললেন—ও-সব রক্ষী সেনাদের জন্য কি আর ব্যবস্থা করব! এই দেখুন, কিছু মোয়া-টোয়া এনে রেখেছি।

প্লেটের উপর একবার চোখ দিয়ে নেতাজী গম্ভীর হয়ে গেলেন। ততক্ষণে লেঃ দে' প্লেট দু'টি টেবিলের উপর রেখেছেন।

—ও সব রক্ষীদের জন্য কি আর আয়োজন করবো, না? পদার্থগুলি কি?—নেতাজীর কণ্ঠস্বর আরো গম্ভীর।

লেঃ দে' নেতাজীর গম্ভীর কণ্ঠস্বর বিশেষ লক্ষ্য করেননি। তিনি বলে চলেছেন,—এই আর কি, সামান্য কিছু মুড়ীর চাক্, বজরার লাড্ডু, আর কেক!

নেতাজী বসেছিলেন, ততক্ষণ উঠে পড়েছেন ও টেবিলের দিকে এগিয়ে এসেছেন।

নেতাজীর সেই গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ থেকে উচ্চ স্বরে উঠছে।—আমার রক্ষীরা,—তাদের জন্য আর বিশেষ আয়োজন কোরে লাভটা কি?—না। নেতাজীর হাতে তখন দু'-চারটে মুড়ীর চাক আর বজরার লাড্ডু উঠেছে। তারা মানুষ নয়?

ফেটে পড়লেন নেতাজী! তাঁর কণ্ঠস্বর সুর-সপ্তককেও ছাড়িয়ে গেল আর সেই মুড়ীর চাক্ ও লাড্ডুগুলি জাপানী বোমার মতই জানালা ডিঙ্গিয়ে নীচের কম্পাউণ্ডের মধ্যে পড়তে লাগলো।

—যেহেতু তারা রক্ষী সে জন্য তারা মানুষ নয় না? তাদের জীবনে সখ-আহ্লাদ করবার কিছু নেই? শুধু বন্দুক নিয়ে দিনরাত কুচ-কাওয়াজ?

লেঃ দে' তখন মনে মনে ভগবানকে ডাকছেন। কার মুখ দেখে আজ তিনি উঠেছেন! জ্বলন্ত কয়লায় হাত দেওয়া সহজ কিন্তু ক্রুদ্ধ নেতাজী!

তারা মানুষ নয়? এই সব অখাদ্য তাদের খেতে হবে? তোমাদের কি কোনো দিন জ্ঞান হবে না? আমি কি বলে গেছিলাম? বলিনি—তাদের সঙ্গে আমি আজ খাব? এই সেই খাদ্যের নমুনা, না?

এই সব মুড়ীর চাকৃতি আর বজরার লাড্ডু বসে খাবার জন্য কি তাদের ভোজে ডেকেছি! তারা আনন্দ কোরে তাদের নেতাজীর সঙ্গে এই সব খাদ্য খাবে, না? এক একটা মুড়ীর চাকৃতি আর বজরার লাড্ডু হাতে নিচ্ছেন ও সেঠিকে জানালার নীচে ফেলে দিচ্ছেন আর ক্রুদ্ধ থেকে ক্রুদ্ধতর হয়ে বলে চলেছেন।

নেতাজীর বাংলোর প্রত্যেকটি লোক—বড় বড় সামরিক কর্ম্মচারী থেকে আরম্ভ করে সামান্য রক্ষীটি পর্য্যন্ত ভয়ে তটস্থ! নেতাজীর সেই ক্রুদ্ধ মূর্ত্তির সামনে আসবার সাহস কারুর নেই। এক জন আর এক জনকে বলছে—নেতাজী হঠাৎ রেগে উঠলেন কেন? ব্যাপারটা কি দেখে এসো। কারণ, নেতাজী লেঃ দে'কে বাংলাতেই এ সব কথা বলছিলেন। এই সব উচ্চপদস্থ সামরিক কর্ম্মচারীদের অধিকাংশ ব্যক্তিই বাংলা জানতেন না। এদিকে উপরে উঠে প্রকৃত ব্যাপারটা জানবার সাহস কারুর হচ্ছে না।

কি, চুপ কোরে দাঁড়িয়ে রয়েছ যে? আমি যদি কোনো জাপানী অফিসারকে ভোজে আপ্যায়িত করতাম, তাদের কি এ সব খেতে দিতে? জবাব দাও, এই সব অখাদ্য তাদের দিতে পারতে?

গলাটাকে যত দূর সম্ভব করুণ কোরে লেঃ দে' জবাব দিলেন—আজ্ঞে না।

তবে?—তবে রক্ষীদের ভোজে এই সব দেবার খেয়াল হল কেন? তারা বুঝি মানুষ নয়, তারা সামান্য রক্ষী, নয়? যাও, এখুনি তাদের

জন্য সত্যিকার ভাল খাবার আয়োজন কর।—জাপানী বা অন্য কোনো অফিসারদের পার্টি দিলে যেমন ভাবে আয়োজন করতে—ঠিক সেই ভাবে।

লেঃ দে' যাবার জন্য ফিরতেই নেতাজী আরো ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন—মনে রেখো, তারাও মানুষ! তাদের সঙ্গে রসিকতা করবার জন্য আমি পার্টি দিচ্ছি, না? তারা আমার সঙ্গে বসে জাপানী অফিসারদের মতই সম্মানের সঙ্গে ভোজে আপ্যায়িত হ'বে আর আনন্দ করবে, সেই আনন্দের ভাগ নেবার জন্যই আমি তাদের খেতে বলেছি।

লেঃ দে' তখন ক্রুদ্ধ শার্দুলের সামনে থেকে পালাতে পারলেই বাঁচেন! নেতাজীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি—আজ্ঞে এখুনি সব ব্যবস্থা করছি,—বোলে কোন রকমে অভিবাদন কোরে পালিয়ে বাঁচলেন।

নেতাজীর ক্রোধ তখনও উপশম হয়নি। তিনি তখনও লাড্ডু ও চাকৃতী নীচে ফেলছেন আর বলছেন,—রক্ষী,—তারা মানুষ নয়, তাদের প্রাণে সখ নেই, তাদের এই সব অখাদ্য দিতে চাও আর আমায় দিতে পার না? এর পর থেকে আমিও এই সব খাব।

এই আমাদের প্রাণ-প্রিয় নেতাজীর প্রকৃত চিত্র! জয় হিন্দ্!

—

চক্ষুদান!

(এক নিশ্বাসের গল্প)

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

বনমালী বাবুর চশমার কারবার। অনেক লোককে চক্ষুদান করে' তিনি বড়লোক। চক্ষুদান করেছেন না বলে' চক্ষুরত্ন দান করেছেন—বনমালী বাবু এই কথাই বলতে 'চান। কাজটা যারা চাক্ষুষ করেছে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে স্বভাবতই তাঁর মতভেদ আছে।

এখন বয়েস হয়ে গেছে, নিজের চোখেই ভালো দেখতে পান না—নিজের চশমা দিয়েও নয়। এই কারণে চক্ষুদানের কাজে ইদানিং ভালো দৃষ্টি দিতে পারছিলেন না। কার্য্যভার ছেলের ঘাড়ে ছেড়ে দিয়ে অবসর নেবার আগে ছেলেকে ডেকে তিনি গুটি-কতক উপদেশ দিতে চাইলেন। এত দিন ধরে' এত লোকের চোখের খোরাক—এত চশমা যুগিয়ে এলেও লোকে কি না তাঁকেই আবার চশমখোর বলে! তা বলুক, তাতে দুঃখু নেই, তবে ছেলেটাও মানুষ হোক্, একটু বাপ্‌কা ব্যাটা হোক্—এই তাঁর বাসনা।

ছেলে অবশ্যি তাঁর এমনিতেই চৌকস। তবু তাকে আরো একটু চোখা করার অভিপ্রায়ে তিনি বলেন—

"ভাখো বাপু, চক্ষুলজ্জা থাকলে এই চক্ষুদানের কারবারে সুবিধে করতে পারবে না। খদ্দের এলে কী করবে শোনো বলি। ফ্রেমে কাচ আঁটতে আঁটতেই, খদ্দের জানতে চাইবে. দাম কতো? তুমি বলবে দশ টাকা। দশ টাকা বলে' একটু সবুর করবে। সবুরে মেওয়া ফলে, জানো তো বাপু! দেখবে খদ্দের দাম শুনে ভড়কায় কি না। তার পর যদি ভাখো খদ্দের তাতে চম্‌কালো না, তখন বলবে, দশ টাকা হোলো তো ফ্রেমের দাম—লেন্‌সের দাম হচ্ছে আরো দশ। এই ভাবে এগুবে, বুঝেচ? এ যদি না পারো তো এ ব্যবসায় কখনো টাকার মুখ দেখতে পাবে না—নিজের চশমা চোখে লাগিয়েও নয়।"

পরের দিন ছেলে দোকানে বসেছে। বেশ মরীয়া হয়েই বসেছে—সবুরে মেওয়া ফলাবে বলেই শুধু নয়, বাপের উপদেশের উপরে এক কাঠি আরো সে ফলাও করতে চায়।

এবং খদ্দেরও এসেছে যথারীতি।

চক্ষু পরীক্ষার পর দামের কথা উঠল—চশমার জন্য কতো দিতে হবে মশাই?

ফ্রেমে কাচ আঁটতে আঁটতে ছেলেটি বলে পনের টাকা। তার পরে খদ্দেরের দিকে আড়চোখে চেয়ে নেয় একবার—দাম শুনে লোকটা দমেছে কি না।

কিন্তু তবুও তাকে অটল দেখে ক্রেমে ক্রেমে প্রকাশ করে—পনের টাকা কেবল ফ্রেমের দাম আর আপনার লেন্‌সের জন্যে আরো পনেরো।

এই বলে আরো একটু সে সবুর করে। খদ্দের খাড়া থাকে কি না দেখতে চায়। কিন্তু তখনো সে দাঁড়িয়ে আছে, পালিয়ে যায়নি বা মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েনি, তাই দেখে দৃঢ় কণ্ঠে সে অবশেষে জানায়:

"পনের টাকা হোলো গে আপনার প্রত্যেকটি লেন্‌সে।"

এবং সবুর করলে মেওয়া ফলেই থাকে। নগদ পঁয়তাল্লিশ টাকা গুনে বাজিয়ে নিয়ে লোকটিকে সে চক্ষুদান করে।

—

ছড়া

অমিতাভ চৌধুরী

ভাবেন খুকী শান্তা
আর সকলে বেজায় বোকা
তিনিই সব জান্তা।
বড়দা, ন'দা, পটলা
মুখেই কেবল জগৎ মারে
করতে বসে জটলা।
ভাই-বোনেরা অন্য
মাথায় তাদের গোবর পোরা
জঘন্য ও বন্য।
কেবল তিনি ভীষণ চালাক
নহেন দিক্-ভ্রান্তা।
ভাবেন খুকী শান্তা।

ভাবেন খুকী শান্তা
গুরুজন যা' আদেশ করেন
তিনিই করে যান তা'।
বড়দা ওরা বিচ্ছু
হাবার মতো বেড়ায় ঘুরে
করবে না তো কিচ্ছু।
তাই তো তিনি সাবড়ি
খাবেন ঠেসে কোপ্তা কাবাব
পায়েস এবং রাবড়ি।
বড়দা ওরা খাকৃগে পচা
বেগুনপোড়া, পান্তা।
ভাবেন খুকী শান্তা।

ছোটু

শ্রীইন্দিরা দেবী

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ধরে সোজা বৌবাজার চলে এসে—কেন্‌ডারডাইন লেনের মুখটার উপর যে হলদে রঙের দোতলা বাড়ীটা, সেইটাতে রুমকু আর টুটুল দুই ভাই-বোন থাকে। তার মানে তোমরা একথা ভাববে না যে বাড়ীটাতে শুধু ওরাই থাকে। ওরা, ওদের বাবা, মা, ঝি-চাকর-ঠাকুর সব নিয়েই থাকে। ওদের বাড়ী ফেলে বাঁ দিকে গেলে যে গলিটা পাবে, সেটা সটান এসে মিশেছে ট্রাম রাস্তার উপর। এই ট্রামের পথ ধরে সিধে চলে গেলে ঐ যে প্রকাণ্ড বাড়ীটা, এটা হচ্ছে রুমকুদের স্কুল, এটা ফেলে আর একটু এগিয়ে গেলে পাবে যে ছোট স্কুলটা এটা হচ্ছে টুটুলদের। টুটুল খুব ছোট, তাই ওর স্কুলটাও আপাততঃ ছোট। তার পরই পাবে খোলা ময়দান—এখানে বিকেলে সব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলতে আসে—কিন্তু তা নিয়ে এ গল্প নয়। গল্প ঐ রুমকু টুটুলদের বাড়ীর কথা। আচ্ছা, ময়দান থেকে সোজা চলে এসো রুমকুদের বাড়ী।

রুমকুদের বাড়ীর রান্নাঘরের পিছনটাতে অনেক দিন ধরে কতকগুলো ভাঙা কাঠের বাক্স পড়েছিল—তারই নীচে ইঁদুর মশাই (যাকে তোমরা বল ধেড়ে ইঁদুর) তার বউ-ছেলেমেয়ে নিয়ে ঘরকন্না পেতে আছে। যাকে বলে নিরুপদ্রবে ঘরকন্না। তাদের বাধা দেবার—তাড়াবার কথা কেউ কোনো দিন ভাবেনি। কিন্তু হলে কি হয়, ইঁদুররা ভারী খল জাত। উইপোকা আর ইঁদুর এরা যা পায় তাই কেটে ছারখার করে। ছ'টি ছেলেমেয়ে বৌ নিয়ে সংসার পেতে বসে—দিব্যি আরামে খেয়ে-দেয়ে দিন কাটছে—যাদের খাচ্ছে তাদেরই এরা অপকার করছে।

রান্নাঘরের একটা কোণ থেকে তাদের বাসা পর্য্যন্ত সোজা একটা লম্বা গর্ত্ত করে এরা নির্ব্বিবাদে আসা-যাওয়া করে। এটা এদের সদর দরজা, এ ছাড়া মাটীর যে বড় বড় উনান গাঁথা আছে, তার পিছন দিক দিয়ে লম্বা সরুমত একটা সুড়ঙ্গ করে নিয়েছে ছেলেমেয়েরা—এটাকে এরা খিড়কী দরজা বলে, এ খিড়কী দরজার সন্ধান কেউ এখনও জানে না। কর্ত্তা-গিন্নী ছাড়া সাধারণতঃ ছেলে-মেয়েরা এই পথ দিয়ে খাবার দাবার সরবরাহ করে। কর্ত্তা-গিন্নী যায় দুপুরে, যখন রান্নাঘরের কাজ সেরে বামুন ঠাকুর আর ঝি চলে যায়, তখন সদর দরজা খুলে কর্ত্তা যায় দুপুরে, আর গিন্নী রাত্রে। রান্নাঘরের জিনিষপত্র উল্টে-পাল্টে যা থাকে, সব তল্পী-তল্পা বেঁধে নিয়ে আসে।

এমনি করে বহু দিন কাটিয়েছে এরা। এখন ক'দিন থেকে বাড়ীর গিন্নীর অর্থাৎ রুমকু আর টুটুলের মা'র নজর পড়েছে। কারণ প্রায় দিনই সকালে যে মাছ ভেজে রেখে দেওয়া হয় রাতের রান্নার জন্য—রাতে রান্না করতে গিয়ে বামুন ঠাকুর দেখে অন্তত ৫।৬টা মাছ কম, কোনো দিন বা দু'-একটা আর বা নেই-ই। অন্য কিছু খাবার দাবার থাকলে তাও ঢাকা সরান আর খাওয়া। মাছের ব্যাপারটা গিন্নী প্রথম দু'-এক দিন বিশ্বাস করেছিলেন, পরে তাঁর ধারণা হলো ঠাকুরেরই কিছু কারচুপি আছে। ঝি'র মুখ দিয়ে ঠাকুরের কানে কথাটা গেল। সে তো চটেই আগুন—হ্যাঁ, এতো বড় কথা গিন্নীমা বলেছেন…! সেদিন থেকে ঠাকুর আর গিন্নী দু'জনেই প্রখর দৃষ্টি রাখলেন জিনিষ-পত্রের উপর।

ধরলেন রুমকুর মা। টিফিনে টুটুল বাড়ী চলে এসেছে খাবার খেতে। রান্নাঘর খুলে মা যেই খাবার দিতে যাবেন শিকল খোলবার শব্দে ধাড়ী ইঁদুর-গিন্নী মুখ তুললে—তার পরই রুমকুর মাকে দেখে খিড়কীর দরজায় কষ্টে ঢুকে ছুটতে ছুটতে একেবারে বাসায়। মুখে তখনও এক টুকরো মাছ।

ছেলেমেয়েরা মাকে হাঁফাতে দেখে তাড়াতাড়ি ছুটে এলো—কী হয়েছে মা?

ইঁদুর মশাই ভুঁড়ি দুলিয়ে, গোঁফে মোচড় দিয়ে এসে দাঁড়ালে; বিরক্ত হয়ে বললে: ছ'টা ছেলে-মেয়ে নিয়ে এমন বিপদ, দুপুরে একটু ঘুমোবার যো আছে, সারাদিন কলকল করছে, চেঁচামেচি করছে।… তা তুমি অতো হাঁফাচ্ছ কেন গিন্নি?

ইঁদুর-গিন্নী-ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো: হাঁফাচ্ছ কেন? নাকে তেল দিয়ে দুপুরে ঘুমোচ্ছো। বিকেলে চা খাবার সময় কিছু আছে? ছেলে মেয়েদের ঝক্কি নেবে কে? রান্নাঘরে গেছি, ওদের রুমকুর মা নিজে এসে হাজির—বাবাঃ, যা দৌড় দিয়েছি, মোটা দেহ নিয়ে এতো চলে?

কর্ত্তার কথার সুরে এবার সমবেদনার সুর: আহা-হা, তুমি আবার গেলে কেন? কাল রাতে তো রুটী-পরোটার অনেক টুকরো এনেছিলাম—সব ফুরিয়েছে না কি? তা আমায় তো বললেই হতো। ছেলেমেয়েগুলোই বা কি—তারা গেলেই তো পারে…।

—থাক থাক খুব হয়েছে, বেশী কথায় দরকার নেই। ছেলেমেয়েরা তো ঘুরছেই।

ছেলেমেয়েরা গোলমাল থামিয়ে তখন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গিন্নী হাঁস-ফাঁস করতে করতে গিয়ে শুয়ে পড়লো। বাচ্ছাগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে এদিক্ ওদিক্ সরে পড়লো।

এর পর কয়েক দিন নিরুপদ্রবে কেটে গেছে। ইঁদুর-পরিবারের সকলেই খুব সাবধানের সঙ্গে কাজ করছে। রুমকুদের বাড়ীর লোকেরাও জিনিষ-পত্র ঢাকা দিয়ে রাখছে। ইঁদুর-পরিবারের অসুবিধে হলেও ওরা একটু চুপ করে আছে। এখনি কিছু বেফাঁস হলে ধরা পড়তে হবে অনিবার্য্য।

সেদিন সকালে ইঁদুর-কর্ত্তা সপরিবারে চা খেতে বসে বললে: আর শুনেছ গিন্নি, রুমকুদের ঝি আর ঠাকুর আমাদের খিড়কী দরজাটা আবিষ্কার করেছে, ওরা বলছিল, উনুনের পাশ দিয়ে যে সরু গর্ত্তটা, ঐটা দিয়ে ইঁদুরগুলো আসা-যাওয়া করে। আজ এইটা মাটী দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে গিন্নী চোখ কপালে তুলে বললে: ও মা, তাই না কি?

—হ্যাঁ গো হ্যাঁ—আমি নিজে কানে শুনে এসেছি। ঝি'টা হয়তো এতক্ষণে সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ করে দিয়েছে। ইঁদুর-কর্ত্তা বেশ চিন্তিত হয়ে বললে।

গিন্নী আদেশের সুরে ছেলে-মেয়েদের বললে: এই, তোরা ঐ খিড়কী দরজায় যেন আর ঢুকতে যাস না, বুঝলি?

রুটীতে কামড় দিয়ে ছেলে-মেয়েরা কোরাসে বলে উঠলো: শুনলাম তো, কে আর যাচ্ছে ওদিকে।

একেবারে ছোট্ট বাচ্ছাটা—গিন্নীর আদরের, তার গায়ে হাত দিয়ে ইঁদুর-গিন্নী বললে: বুঝলি ছোট্টু, তুই বাপু এখন দিন-কতক বেরোস্‌নি, কচি গায়ে কখন্ খোঁচা-টোঁচা লাগিয়ে দেবে, ওরা তবু বড় হয়েছে, ঘুরে-ফিরে বেড়ায়।

বড় মেয়ে এক ঢোঁক চা খেয়ে নিয়ে বললে: মা'র কেবল ছোট্টুর জন্যেই ভাবনা। তুই থাকিস্ বাড়ীতে বুঝলি? কিন্তু খাবারের ভাগ কমে যাবে।

মেয়েকে ধমক দিয়ে গিন্নী বললে: খুব হয়েছে, খাবার দেবার মালিক তো তুমি নও? সে আমি বুঝবো।

মেয়ে ধমক্ খেয়ে রেগে বললে: ভারী আদুরে-গোপাল!

চা খাওয়া শেষ করে কর্ত্তা ও ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে পড়লো।

রুমকু আর টুটুল রাতে রান্নাঘরে বসে ভাত খাচ্ছে। রুমকু টুটুলকে বলছে: এই ঢুলছিস্ কেন? খেয়ে নে?

—এই তো খাচ্ছি, টুটুল ঘুম-চোখে উত্তর দেয়।

—এত যদি ঘুম, তাহলে বিকেল বেলা খেলেই হয়।

কিন্তু টুটুলের চোখ আরো জড়িয়ে আসছে।

—এই টুটুল, দেখ্, দেখ্—কী চমৎকার একটা বাচ্ছা ইঁদুর—

—হ্যাঁ, কই? টুটুলের ঘুম চলে গেছে।

সদর দরজা খুলে রান্নাঘরের মুখটায় গিন্নীর সেজ ছেলে তখন মুখটি বাড়িয়ে বসে আছে। এদের খাওয়া হলেই কাঁটা ভাত যা পারবে মুখে করে নিয়ে চলে যাবে।

রুমকু আঙুল দিয়ে বাচ্ছা ইঁদুরটাকে দেখিয়ে দিলে।

—ও মা, কী সুন্দর! চোখ দু'টো কেমন চিক্‌চিক্ করছে! আমি নেবো। ও ঠাকুর, ও মোক্ষদা—ধর না বাচ্ছাটাকে।

ঝি মোক্ষদা রেগে উঠলো: আবার ইঁদুর কি গো, এই তো সব বন্ধ করলুম।

মোক্ষদার চীৎকারে বাচ্ছাটা চোঁ-চোঁ দৌড় দিয়েছে। টুটুল রেগে ভাতের থালা ঠেলে উঠে পড়লো: অত চেঁচালে কেন? চলে গেল যে, যাও, আমি খাবো না।

—ইঁদুর নিয়ে কি করবে খোকাবাবু, ওরা বড় নোংরা জাত জানো না?

—তোমার কি, আমি ওকে পুষবো। কেন তাড়ালে?

ঠাকুর পরিবেশন করতে এসে বললে: আবার আর একটা পথ করেছে না কি? ও ঝি, দেখো না।

—আর কি দেখবো বাপু, দেখলাম তো—দেখাই তো যাচ্ছে, ঐ গর্ত্তটার মুখে বসেছিল।

গোলমালে রুমকুর মা নেমে এলেন—বললেন: একটা ইঁদুর-ধরার কল আনা হয়েছে—ভালো করে খাবার দিয়ে ওটা ঐ মুখটায় পেতে রাখো—।

—হ্যাঁ মা, তাহলে ওকে ধরা যাবে—পোষা যাবে? আগ্রহ নিয়ে টুটুল প্রশ্ন করলো।

মা আদর করে বললেন: ধরা যাবে—তবে ও নোংরা জিনিষ পুষে কি হবে বলো?

—হ্যাঁ মা, আমি পুষবো।

—আচ্ছা, এখন খেয়ে নাও।

ইঁদুর-পরিবারে সাড়া পড়ে গেছে। সেজ ছেলে এসে সংবাদ পৌঁছে দিয়েছে, ওরা সদর দরজার মুখে কল পাতবে—খুব সাবধান, কেউ যেন না যায়।

সকলে সাবধান হয়ে গেল—কর্ত্তাকে বলা হলো এ-বাড়ী থেকে এখন কিছু দিন যেন খাবার আনা না হয়। ছোট্টু শুয়ে শুয়ে সব শুনছিল। 'কল' কি জিনিষ? ইঁদুর-ধরার কল সেটা তো তার জীবনে সে শোনেনি। কেমন দেখতে, খাবার যে দেয় তা সেটা খেয়ে নিয়ে পালিয়ে আসা যায় না? খুব দৌড় দিয়ে—যাতে লোক আসবার আগেই…।

—বুঝলি ছোট্টু, ওদিকে যাসনি। মার আবার শরীরটা ভাল নেই আজ, তোকে দেখতে পারবে না।…গায়ে হাত দিয়ে ছোট্টুর দিদি ছোট্টুকে উপদেশ দিলে।

ছোট্টু চিঁ-হি করে কি বললে বোঝা গেল না। রাতে সব যখন অকাতরে ঘুমিয়েছে, তখন ছোট্টু উঠে দেখলে মা কাছে নেই। আস্তে আস্তে সে সদর দরজার পথ দিয়ে এদিক্ ওদিক্ তাকাতে তাকাতে একেবারে রান্নাঘরের মুখটার কাছে এলো। রাস্তার আলো উল্টো দিকের জানলা দিয়ে এসে পড়েছে রান্নাঘরে। সেই আলোতে বেশ দেখা যাচ্ছে—কি একটা পাতা আছে, আর বড় এক টুকরো রুই মাছ। ছোট্টুর জিভে জল এলো: ইস্, এত-বড় মাছটা নিয়ে গেলে কাল দু'বেলা কি চমৎকার ভোজই না হয় সকলে মিলে—কিন্তু ঐ যে কল পাতা না কি বলে, ওখানে যেতে যে সকলে বারণ করেছে—তাহলে? কিন্তু অতো বড় মাছটা? আচ্ছা, মাছটা নিয়ে

দৌড় দেওয়া যায় না? জোরে ছুট লাগাবো—কল কি করবে? ওখানে ধীরে-সুস্থে নিতে গেলে না হয় ভয় আছে…। কি করা যায়? ছোটু ভাবছে আর এগিয়ে যাচ্ছে এক-পা এক-পা করে।

আবার খানিকটা ভাবলে ছোটু…থাক, দরকার নেই, মা দিদি সবাই বারণ করেছে…কিন্তু অত-বড় রুই মাছের টুকরোটা…!

—খটাং…।

তার পর?

পরিচিত শব্দ শুনে হৈ হৈ পড়ে গেছে ইঁদুর মশাইদের বাড়ী। কর্ত্তা ঘুম ছেড়ে উঠে পড়ে গিন্নী গিন্নী করে হাঁক দিয়ে বাচ্ছাগুলোর নাম ধরে ডাকতে লাগলো; সবাই উত্তর দিল—কিন্তু ছোটু কই?

—ছোটু, ছোটু—ছেলেমেয়েরা চেঁচিয়ে উঠলো।

—তাই তো, ছোটু কই? কর্ত্তা চিন্তিত হয়ে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম করলে।

—না বাবা, তুমি যেয়ো না—সেই কলের শব্দ—ওরা সব মারবে বলে তৈরী হয়ে আছে—যেয়ো না।

—কিন্তু ছোটু কোথায় গেল?

গিন্নী তো ঝর-ঝর করে কেঁদে ফেললে, বললুম অতো করে যাসনি। অত শান্ত ছেলে যে আবার রাতে উঠে যাবে তা কে জান্তো?

বড় ছেলে বললে: কাল ছোটু আমায় জিজ্ঞেস করছিল ফাঁদ আর কল কি জিনিস দাদা?—আমি তাকে বলে বারণ করে দিলাম।

—তাহলে উপায়? মেজ ছেলে বলে উঠলো।

কর্ত্তা খেঁকিয়ে উঠলো: উপায়? উপায় আর কিছু নেই। রাতের মধ্যে জিনিষ-পত্র নিয়ে বাসা ছাড়ার ব্যবস্থা করো—দত্তদের বাড়ীর ভাঁড়ার-ঘরের এক কোণে অনেক জিনিষ জড়া করো আছে, সেদিন আমার এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে দেখে এসেছি। উপস্থিত সকলে গিয়ে সেখানে ওঠো তো, আমি ছোটুর খোঁজ করে যাচ্ছি।

আমার যে নতুন তিনটে ছানা…এদের কি করবো? গিন্নী অসহায় হয়ে বলে উঠলো।

—ছেলেমেয়েরা ওদের মুখে করে নিয়ে যাক—আমি চললুম ছোটুর খোঁজে। তোমরা দেরী কোরো না—তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ো।

সকালে রান্নাঘর খুলে ঝি দেখলে: একটা ছোট্ট ইঁদুর-ছানা কলে পড়ে মরে আছে। সেই রাস্তা ধরে একটা সরু লম্বা গর্ত্ত দেখা যাচ্ছে। সেটা গিয়ে শেষ হয়েছে রান্নাঘরের পিছন দিক্‌কার কোণে। মরা ইঁদুর-ছানাকে বার করে ঝি রুমকু আর টুটুলকে ডাকলো।

ইঁদুর-ছানা দেখে টুটুল আনন্দে লাফিয়ে উঠেছে।

—আমার ইঁদুর—!

—আরে, ওটা যে মারা গেছে—রুমকু ভাইকে বললে।

—হ্যাঁ, মারা গেছে—কি করে গেল? তবে আমি—

—আচ্ছা, এসো আমার সঙ্গে—।

ঝির পিছন পিছন রুমকু, টুটুল গিয়ে সেই কোণ আবিষ্কার করলে, কাঠ-কুটো নেড়ে ঝি দেখলো—ইঁদুরেরই বাসা বটে, একরাশি কাটা মাটী জড়ো করা, তাদের খাবার-ঘরে রুটী, পাঁউরুটীর টুকরো, মাছ-মাংসের কাঁটা আর হাড়। শোবার ঘরের মেঝেতে তিনটে লাল কড়ে আঙুলের মতো ছোটো, ইঁদুর-ছানা, গায়ে লোম নেই—মরা না জ্যান্ত বোঝা গেল না।

চিচিং ফাঁক

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার ঘোষ

কড়া পাহারা বসেছে বন্দরে। শুধু ইউনিফর্ম্মধারী পুলিশই নয়, তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন অসংখ্য সি, আই, ডি পুলিশেরও সতর্ক দৃষ্টি রয়েছে বন্দরের ওপর। বন্দরের প্রত্যেক লোকটিকেই যেন তারা সন্দেহ করছে। পুলিশের কাছে নির্ভরযোগ্য সংবাদ এসেছে—এক জন বিখ্যাত আইরিশ বিপ্লবী এক যাত্রিবাহী জাহাজে বিদেশ থেকে আবার ফিরে আসছেন দেশে এবং তিনি নামবেন এই বন্দরেই। তাই পুলিশরা সতর্ক হয়ে আছে তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য। জাহাজ আসতে আর বেশী দেরী নেই। শোনা গিয়েছে, এই বিপ্লবী আমেরিকা থেকে গুরুত্বপূর্ণ বহু তথ্য সংগ্রহ করে ফিরে আসছেন।

জাহাজ এসে নঙ্গর করল। প্রকাণ্ড বড় এক যাত্রিবাহী জাহাজ। আত্মীয় এবং বন্ধুদের নামিয়ে নিতে বন্দরে এসেছেন আত্মীয় এবং বন্ধুদের দল। কারো বা আত্মীয় দেশে ফিরছেন অনেক দিন পরে, কারো বন্ধু আসছেন ছুটীর আনন্দময় দিনগুলি বন্ধুর সঙ্গে যাপন করতে, আরো কত কী! বন্দর তাই লোকজনে গম্‌-গম্ করছে। ভীষণ ভীড়। কেউ রুমাল উড়িয়ে সাদর সম্ভাষণ জানাচ্ছেন আত্মীয়কে, কেউ বা চীৎকার করে বন্ধুকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন। ওদিকে পুলিশের দলেও একটা চাঞ্চল্যের সাড়া জেগেছে। সন্দেহজনক কোন লোককে দেখতে পেলেই তারা গ্রেপ্তার করবার জন্য প্রস্তুত।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, রাস্তা দিয়ে এক জন কনষ্টেবল চলেছে। যেন অনেকটা নিরাশ দেখাচ্ছে তাকে। কনষ্টেবলটির কিছু দূর দিয়ে মাটিতে লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলেছিল এক গ্রাম্য বুড়ো।

পুলিশটি হঠাৎ বুড়োকে ডেকে বলল, "এই বুড়ো, শোন্! এদিকে কোথায় গিয়েছিলি তুই?"

বুড়ো থেমে পড়ে বলল, "আজ্ঞে, আমাকে বলছেন?"

কনষ্টেবলটি বলল, "হ্যাঁ, তোকেই বলছি।"

"আর বলেন কেন মশাই।" বুড়ো যেন বিনয়ে নুয়ে পড়লো, "ওই যে জাহাজটা এলো ওতে আমার এক আত্মীয়ের আসার কথা ছিল। কিন্তু কই, দেখতে ত পেলাম না তাঁকে। তা আপনি—আপনি এদিকে কোন কাজে এসেছিলেন বুঝি? কি কাজ শুনতে পাই?"

কনষ্টেবলটি বলল, "হ্যাঁ, কাজেই এসেছিলাম।" তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে কনষ্টেবলটি একবার চাইলো বুড়োর দিকে। না, সন্দেহের কোন কারণ নেই. নিতান্ত সরল এক জন গ্রাম্য চাষী মাত্র। কনষ্টেবলটি তাই আবার বলল, "এক জন বিপ্লবীর আসার কথা ছিল এই জাহাজে।"

বুড়ো ঘাড় চুলকাতে চুলকাতে প্রশ্ন করে আবার, "তা দেখা পেলেন কি তার?"

চারি দিকে একবার সতর্ক দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিয়ে কনষ্টেবলটি উত্তর দিল, "না।"

বুড়ো আবার লাঠি ঠুকতে ঠুকতে চলে গেল। কনষ্টেবলটিও তার দিকে নজর দেওয়া বিশেষ দরকারী মনে করল না। কিন্তু কনষ্টেবলটি জানতে পারল না যে, যে বুড়ো এই মাত্র চলে গেল সে আমেরিকা থেকে সদ্য-প্রত্যাগত বিপ্লবী আইরিশ নেতা ছাড়া আর কেউ-ই নয়, যার জন্যে পুলিশের আজ এত আয়োজন। যে লোকটি পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে এই ভাবে পালিয়ে গেল সে কে জান? ইনিই হচ্ছেন বর্ত্তমান স্বাধীন আয়ারের প্রধান মন্ত্রী ডি ভ্যালেরা!

ঝণ্টুও ভাবছে তার দাদার কথা। ছোটবেলায় কত ঝগড়া, কত মারামারি হয়েছে তার সাগরের সঙ্গে। সেই যে দাদা সেই গেলো, আজও এলো না,—একটি বার এমন কি তাকেও একবার দেখবার ইচ্ছে হয় না দাদার? কত বার অভিমান করে ভেবেছে তার দাদার কথা।

সাগরের দাদাও আজ অন্যমনস্ক। তিনি চেয়েছিলেন সাগরকে ফিরিয়ে আনতে—কিন্তু সাগরকে পাননি কোথাও। সাগরের রাগই তাঁদের চেয়ে বড় হলো শেষ কালে—এই অভিমানে এত কাল সাগরকে ভুলেছিলেন তাই আজ নানান্ কাজে নিজেকে ভুলিয়ে রেখেছেন তিনি।

শেষের আগে

সাগর এ-বাড়ী ছেড়ে যাবার পর পাঁচ বছর বাদে তাদের বাড়ীতে এই প্রথম উৎসব। সাগর যেদিন এ বাড়ী ছেড়ে চলে যায় সেদিন আর আজ অনেক তফাৎ। সেদিনকার ভেঙ্গে-পড়া বাড়ী আজ নোতুন রংএ আর অনেক আলোয় ঝলমল করছে। শ্যাওলা জমেছিল যেখানে-সেখানে আজ আর তার কোন চিহ্ন নেই, ঝুল পড়েছিল যে ঘরে সে ঘরে আজ তার কোন স্মৃতি বেঁচে নেই। সমস্ত বাড়ীটায় কাজের সাড়ার সঙ্গেই প্রাণেরও সাড়া পড়ে গেছে যেন। লোক-জনের যাতায়াতে, হাঁক-ডাকে চঞ্চল হয়ে উঠেছে চার পাশের সবাই। জিনিষ-পত্র আসছে গরুর গাড়ীতে, লোকের মাথায়—নানা জায়গা থেকে নানান্ রকম জিনিষ।

আজ ঝণ্টুর বিয়ে। সেদিনকার সেই সাগরের দশ বছরের দুষ্টু বোনটিও আজ সাগরের মতই বাড়ী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। আজকের এই উৎসবে তাই হাসির সঙ্গে হয়ত চোখের জলও মিশে রইবে। হয়ত গভীর আনন্দের সঙ্গে সুগভীর বেদনাও জড়িয়ে যাবে।

এ বাড়ীর সমস্ত আলো শুধু আজ একসঙ্গে জ্বলে উঠেছে। হয়ত আনন্দ একেবারে নিবে যাবার আগে যেমন জ্বলে তেমনি। অনেক আত্মীয়-স্বজন এসেছেন অনেক দূর থেকে। ঝণ্টুর বন্ধুও আছে অনেক এই ভীড়ের মধ্যে।

সমস্ত গাঁ যেন তাদের বাড়ীতে ভেঙ্গে পড়েছে আজ। বাড়ীর প্রথম কাজ বলে হৈ-চৈ একটু বেশী। এমন কি সাগরের সেই অসুস্থ দাদাও আজকে উঠে-পড়ে লেগেছেন। আজ তাঁর উৎসাহের কাছে কিছু টেঁকেনি—অসুস্থতার অজুহাতেও নয়। বৃদ্ধ হারাণ বাবুর চোখেও আনন্দে জল এসেছে থেকে থেকে।

কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, এত হৈ-চৈএর মধ্যেও এক জনের অভাবে সব কিছুই যেন ঝিমিয়ে গেছে। সাগর নেই তার বোনের বিয়েতে। সে নেই—একথা আজ সর্ব্বত্র—এই বিয়ে বাড়ীর সমস্ত কাজের আড়ালে স্পষ্ট হয়ে রইল। সবাই খাটছে সবাই গোলমাল করছে, কিন্তু এক জনের অভাব প্রতি মুহূর্ত্তে প্রত্যেককে মনে করিয়ে দিচ্ছে—যেমন হওয়া উচিত ছিল তার কিছুই হচ্ছে না।

তাই এই উৎসবের সকালেও সাগরের মা'র মুখের দিকে তাকান যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে পড়ছে সেই পুরানো দিনগুলোর কথা। সেদিনটা ত আজও চোখের ওপর ভাসছে। ভাতের থালা হাতে করে এসে দেখেন—সাগর চলে গেছে ঘরে। আর তাকে ডাকতে সাহস করেননি—আবার নূতন কোন অনর্থ যদি বাধে সেই ভয়ে। আর সেই শেষ। তার পর কত খোঁজাখুঁজি—সব মিথ্যে হোল। আজ আবার একটি মেয়ে—সে-ও চলে যাবে!

সন্ধ্যে হয়ে এলো। কাজ এক রকম শেষ হয়ে গেছে। এইবার বরযাত্রীর দল এসে পড়বে। অনেক দূর থেকে আসছে তারা। তাদের যেন কোন রকম অসুবিধে না হয় তার দিকে নজর রাখবার ভার হারাণ বাবুর ওপর।

বাড়ীর মধ্যেকার প্রকাণ্ড মাঠটার ওপর সামিয়ানা খাটিয়ে তাদের বসাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেই সব তদারকেই হারাণ বাবু আর সাগরের দাদা ব্যস্ত।

বাড়ীর ভেতর মেয়েরা ঝণ্টুর কাছে সবাই। ঝণ্টুকে সাজাবার ভার তার নির্ম্মলা মাসীর ওপর। সাজানো হয়ে গেলে ঝণ্টু একে একে প্রণাম করল সবাইকে। তার পর এগিয়ে গেল তার দাদার ছবির সামনে। সাগরের ছেলেবেলার ছবি। আজ পনেরো বছরের ঝণ্টু দশ বছরের সাগরের ছবির সামনে দাঁড়িয়ে কেঁদে ফেলল।

সামনে বাবার প্রকাণ্ড ছবি। আর তারই উল্টো দিকে দাদার ছবি। এক জন তাদের মধ্যে আজ আর নেই, আর এক জন আছে কিন্তু ভুলে গেছে তাদের—প্রণাম করতে গিয়ে ঝণ্টুর মনে আজ এই কথাটাই ভেসে এলো।

আজ সাগরের মার চোখেও জল। তাঁর চোখ পড়ল একবার ঝণ্টুর দিকে, একবার সাগরের ছবির দিকে। এক জন বহু দিন আগেই বাড়ী থেকে গেছে—আর আজ যাবে এক জন।

ঠিক সেই সময় হাঁফাতে হাঁফাতে ঢুকলেন সাগরের দাদা হাতে তার একটা চিঠি—সাগরের মা'র নামে।

সাগরের মা চিঠিটা খুলে পড়লেন।

"মা, সবায়ের আগে তোমার কাছে ক্ষমা চাই। না বলে এক দিন তোমার কাছ থেকে চলে এসেছিলাম। সেদিন তোমার চোখে আমার জন্যে যত জল ছিল—আমারও জীবনে তোমাকে ছেড়ে আসার জন্যে দুঃখ তার চেয়ে কম ছিল না।

তবু সেদিন চলে এসেছিলাম অত অল্প জায়গায় আমায় ধরছিল না বলে। এবার ফিরে এসে বসব তোমার কোলে। আমি যত বড়ই হই—আমার বসবার পক্ষে তোমার কোল তার চেয়েও বড়। তাই বড় হয়ে ফিরবার জন্যে বিদেশে চলেছি—ছবি আঁকা শিখতে।

এত দিনে দাদার রাগ কি পড়েনি? আর ঝণ্টু—তার কি মনে আছে এক দিন দাদাকে ছেড়ে সে এক মুহূর্ত্তও থাকতে পারত না। আজ সে কত বড়?

তোমার
সাগর।"

নীচের নামটা আরেক বার পড়লেন সাগরের মা।

সমস্ত বাড়ীটা বোধ হয় আনন্দে আর উত্তেজনায় কাঁপছে তখন। সাগরের ছবির দিকে এবারে ভালো করে তাকালেন তার মা। কিন্তু এবারেও তাঁর চোখে জল।

শেষ

সাগর বেরিয়ে পড়েছে মোটরে।

কাল সকালে তার জাহাজ ছাড়বে। ইটালীতে যাওয়ার আগে শেষ বারের মত কলকাতায় ঘোরা আজ। দু-একটা জিনিষ কেনা এখনও বাকী। সেগুলো কিনতে বেরিয়েছে।

যেতে যেতে মনে পড়ছে বাড়ীর সবায়ের কথা। এতক্ষণে তার খবর কি পৌছেছে? অশোক বাবু তাকে একবার বাড়ীতে যেতে বলেছিলেন—ইটালী যাওয়ার আগে। কিন্তু বড় না হয়ে সে বাড়ীতে আর ঢুকবে না কিছুতেই। তাই যাওয়ার আগে সে শুধু জানিয়ে দিয়ে যাবে—সে ইটালী যাচ্ছে ছবি-আঁকা শিখতে। তাই একটা টেলিগ্রাম করে তারই খবরটা জানিয়ে দিল সাগর।

খবরটা পেলে কি-রকম অবস্থা হবে তাদের? ভাবতে চেষ্টা করল সাগর। মা হয়ত কেঁদেই ফেলবে আনন্দে। আর ঝুনু—সে এত দিনে কত বড় হয়েছে কে জানে? দাদার কথাও মনে পড়ল সাগরের, এত দিনে তার দাদা নিশ্চয়ই সে সব কথা ভুলে গেছেন। আজ তিনিও নিশ্চয়ই খুসী হবেন। সাগর যাওয়ার আগে একটা চিঠিতে সব কথা জানিয়ে যাবে; আর অশোক বাবুও বলেছেন, সাগর গেলে তাদের খোঁজ-খবর তিনি নেবেন।

কাকা বাবুর কথা মনে পড়তেই সাগর তাঁকে মনে মনে প্রণাম করল আর ভাবল সেই প্রথম দিনের কথা—যেদিন সে তার কাকার কাছ থেকে পেয়েছিল ছবি আঁকার সেই চমৎকার বইটা।

পাঁচ বছর মা'র সঙ্গে দেখা নেই—আরও ক'বছর যে দেখা হবে না তা বলতে পারে না সাগর। কিন্তু তার জন্যে দুঃখ নেই। আজ বরং এত দুঃখ পাওয়ার পর কিছু মিললো। তবু হয়ত সে বড় হতে পারে এক দিন। বড় হয়েই হয়ত ফিরে যেতে পারে এক দিন তাদের বাড়ীতে।

আর এক জনের কথা মনে পড়ল আজ। দুর্দ্দিনে বন্ধু তার ডাকাত—এক দিন তাকে আশ্রয় দিয়েছিল যে। যাবার সময় তাকে সে কিছু দিয়ে আসতে পাবেনি। যাবার আগে তার সঙ্গে সেদিনও দেখা হয়নি, আজও হোল না। ডাকাত সেদিন তাকে কাজ না দিলে তাকে না খেয়ে মরতে হত—সেদিন আর সবাই ফিরিয়ে দিলেও, ডাকাত তাকে ফেরাতে পারেনি।

আজকের এই রাত তার মনে রোমাঞ্চ আনল। অল্প অল্প হাওয়া লাগছে গায়। মনের অবস্থাটা সাগর কথায় বোঝাতে পারে না। একা একা এক দিন যখন ময়নাপুর ছেড়ে কলকাতার দিকে এগিয়েছিল, সেদিন মনে ছিল উত্তেজনা আর ছিল ভয়ঙ্কর ভয়। সেদিন অবশ্য থাকতে না পাওয়ার, না খেতে পাওয়ার দুর্ভাবনা ছিল বেশী, কিন্তু আজকের ভয় ঠিক সে রকম নয়। থাকবার এবং খাবার জায়গা বিদেশে তার ঠিক আছে,—নেই শুধু সঙ্গী, নেই শুধু নিজের ওপর ভরসা। ভরসা একেবারে নেই বললেও ভুল হয়, মাঝে মাঝে ভরসাটুকু হারাতে বসে সে।

সাগর শেখবার অদম্য কৌতূহল আছে, আছে ছেলেবেলার স্বপ্নকে সফল করে তোলার দুরন্ত প্রেরণা, আছে দুর্গমকে জয় করার দুঃসাহস। তবু আজ এই অন্ধকারে যাবার আগে সাগরের মনে দোলা দিতে লাগল অজানা আশঙ্কা। আর একবার মনে মনে মা'র কথা ভাবল সাগর।

* * * *

সূর্য্যের আলো এসে পড়েছে মাস্তুলে।

জাহাজের ওপর দেখা যাচ্ছে চমৎকার চেহারার একটা ছেলে চিঠি লিখছে নীচু হয়ে পড়ে টেবিলের ওপর। এইবার উঠে দাঁড়িয়ে চিঠিটা সে খামে পুরলো। উঠে দাঁড়াতেই তার সমস্ত চেহারাটা চোখে পড়ল। ফর্সা রং, লম্বা চেহারা স্যুট পরা। কোঁকড়ান কালো চুল বাতাসে উড়ছে—এলোমেলো। খুব অল্প বয়স—দেখলেই বোঝা যায়। কাদের আসতে দেখে ছেলেটির মুখে হাসির আভাস দেখা দিলো।

সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে উঠে এলেন অশোক বাবু। তার পেছনে কল্যাণ বাবু আর সবায়ের পেছনে দেখা গেলো নীল রংএর একটা চমৎকার ফ্রকে নীলিকে।

অশোক বাবু ডাকলেন—এই এদের নিয়ে এলাম খুঁজে। এক দম উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন কল্যাণ বাবু—খুঁজেই পেতেন না তোমায় আমি না গেলে।

কল্যাণ বাবু হাসছেন তখন।

নীলিকে দেখে আজ সাগরের মনে পড়ল দীপালীর কথা। সে ছিল তার দুষ্টু দাদা। আজ তার কথা মনে করে যাবার সময় ম্লান হয়ে এলো তার মুখ।

নীলি ততক্ষণে সুরু করে দিয়েছে—কত বড় জাহাজ দেখ বাবা, কত লোক, এরা সব বিলেত যাবে? তার পর সাগরের দিকে ফিরে বলল—আমিও বড় হলে যাব। বাবা বলেছে, না বাবা?

নীলির অজস্র প্রশ্নের একটা সুবিধে হলো—জবাব দিতে হয় না। জবাব শোনার মত ফুরসুতই নেই তার। কল্যাণ বাবু তাই চুপ করে থাকেন।

কল্যাণ বাবুর হাত ধরে টানতে টানতে নীলি চলল জাহাজের আর এক দিকে, আশ্চর্য্য কোন আবিষ্কারের আশায়।

অশোক বাবু ডাকলেন—সাগর, আজ যাবার সময় তোমায় একটা কথা বলি। জান কেন আমি পথ থেকে নিয়ে এসে বিদেশে পাঠাচ্ছি। জান তুমি?

সাগরকে চুপ করে থাকতে দেখে অশোক বাবু বলেন,—এক দিন আমারও একটি ছেলে ছিল—তোমারই মত বয়স হতো এত দিনে তার। তোমারই মত চঞ্চল। আজ থেকে বহু দিন আগে সে হারিয়ে যায়, আর তাকে পাইনি। আজও বেঁচে আছে কি না জানি নে। তোমাকে দেখলেই আমার তার কথা মনে পড়ে যায়। শেষের দিকে স্বর রুদ্ধ হয়ে যায় অশোক বাবুর।

সাগরও দুঃখ পায় তাঁর কথা শুনে। এই লোকটার এই জায়গাটাই সব থেকে গোপন। সেইখানটাই সাগরের সামনে খুলে ধরায় তার বেদনাও সাগরের বুকে কঠিন হয়ে বাজতে থাকে। তবু বলবার কি আছে এতে! সাগর কোন কথা বলে না।

অশোক বাবুও চুপ করে থাকেন।

একটু পরে সাগর জিজ্ঞাসা করে—'কই তার নামটা বললেন না আমায়?—সেই হারিয়ে যাওয়া ভা'য়ের নামটা বলবেন না আমায়?

অশোক বাবু পকেট থেকে বার করলেন একটা ছবি। ছবিটা সাগরের হাতে দিয়ে বললেন—'ডাকাত, আমরা তাকে ডাকাত বলেই ডাকতাম।'

সাগর তাড়াতাড়ি ছবিটা দেখতে গিয়ে দেখল—'হ্যাঁ, এ সেই ছেলে বেলার ডাকাত বড় হয়ে যে তাকে এক দিন বন্ধু বলে ডাক দিয়েছিল।' অবাক হয়ে দেখল, দুষ্টু ডাকাত তার দিকে চেয়ে হাসছে। ছেলে-বেলার ডাকাতের সঙ্গে কিশোর ডাকাতের চেহারায় অদ্ভুত মিল। চিনতে দেরী হয় না এ সেই হারানো ছেলে—অশোক বাবুর।

জাহাজের বাঁশী বেজে উঠলো। সাগর মুখ তুলে দেখল—অশোক বাবু আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছেন সিঁড়ি দিয়ে। কল্যাণ বাবু আর নীলিও রুমাল নাড়তে সুরু করে দিয়েছে।

জাহাজ চলতে আরম্ভ করল যখন—সাগর দেখল, অশোক বাবু ডাকাতের ছবিটা সাগরের হাতেই দিয়ে গেছেন।

সমাপ্ত

তরুণ দল

সতীকুমার নাগ

তার পর······

তার পর, তারা এগিয়ে চলেছে ত চলেছেই।

পিছনে কত ছোট-খাটো সহরকে এরা ছারখার করে এসেছে। এই সহরটিই এদের শেষ সীমানা।

কতটুকু আর সময় লেগেছিল—মাত্র কয়েকটি ঘণ্টা দেখতে দেখতে ওরা ভিতরে এলো। ছোট-খাটো একটা যুদ্ধ বেধেছিল বৈ কি! এরা সহরের ডাকঘর, ব্যাংক, বিজলী বাতি অন্যান্য কল-কারখানাগুলো অধিকার করে বসে আছে। সুন্দর সুন্দর ঘর-বাড়ীগুলো যেন চেনাই যায় না। পথ-ঘাটের সেই একই রূপ। পথের 'পর যে মৃতদেহগুলো ছিল পড়ে, তা এতক্ষণে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ঐ বাড়ী থেকে এখনো ধুঁয়ো দেখা যাচ্ছে। ভাঙা ট্রাম, টেলিফোনের লাইন, পথ-চলাচল যান-বাহনগুলো মেরামত করে নেওয়া হচ্ছে। এমন কি, ঐ যে অত্যাচারী সৈনিকগুলোও পথের ধারে গিয়ে মিশে আছে নীরিহ নাগরিকদের সঙ্গে। ইচ্ছে করলে হয়ত তাদের গুলী করে মারতে পারতো? তাদের আর অপরাধ কী? নাগরিকরা প্রতিটি মুহূর্ত্ত শংকিত মনে কাটাচ্ছে। ক্ষিধেয়, তৃষ্ণায় এরা এলিয়ে পড়েছে। অদৃষ্টের 'পর নির্ভর করে বসে আছে।

এ-সময় দেশের প্রধান মন্ত্রী কি করছেন জানো? শত্রুর কাছে আত্ম-সমর্পণ করে বেশ চুপচাপ বসে আছেন। শত্রুর চরেরা এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে—কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে!

এমন অনেক আছে যারা এ বিষয় কিছুই জানে না। কেনই বা শত্রুরা এলো? কেনই বা তারা এদের 'পর অত্যাচার করলো?

ভয়ে কাউকে তারা প্রশ্নও করতে পারছে না: বলতে পার, কি হ'লো?

যা রেডিওতে শুনতে পাচ্ছে, যা সরকারী সংবাদপত্র থেকে দু'-একটি ছোট-খাটো সংবাদ পড়ছে।

সব খবর কি সত্যি! নাঃ, তা নয়! যা সত্যি, তাকে চেপে রেখেই এরা সংবাদ দিচ্ছে। এমন একটিও সংবাদপত্র বেরুচ্ছে না যাতে নাগরিকদের মধ্যে একটা উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে পারে!

এ-সময় তুমি হয়ত ভাবছো, তোমার পাশে যদি দূরের সাহসী বন্ধুটি থাকতো তবে তোমার নিশ্চয়ই উপকার হ'তো—না?

কিন্তু কি করে সে আসবে বলো?

সব যোগাযোগ ভেঙে গেছে। কাজেই তোমার বন্ধুটি এখন আসতে পারবে না। এখন কি করবে? তোমার নিজের বাহু-বলই হলো সব চেয়ে বড় অস্ত্র। এর 'পর নির্ভর করে শত্রুর সাথে যুঝতে হবে, ভেঙে পড়লে চলবে না। দেশের যা কিছু আশা-ভরসা তো তুমি-ই!—জানো?

ঐ দেখ না, ঐ যে দেখছো বড় রাস্তাটি, একটু এগিয়ে গেলেই দেখতে পাবে···দেয়ালের গায়ে লাল হরফে বড় বড় করে কি সব লেখা:

"হে, দেশের তরুণ দল! বিগত আগষ্ট মাসের ১৬, ১৭ তারিখে সরকারী দপ্তরখানাকে কারা ধ্বংস করেছে? পেট্রোলের কারখানাকে কারা উড়িয়ে দিয়েছে? সামরিক অস্ত্রশস্ত্র-বোঝাই ট্রেণখানি কারা লাইনচ্যুত করেছে? জানো কারা? এ-কাজ করেছি আমরা,—দেশের তরুণ দল। কেন করেছি জানো? যারা দেশের শত্রু তারা কি আমাদেরই জিনিষ নিয়ে আমাদেরই ধ্বংস করবে? নাঃ—তা হতে দেবো না, তাই ধ্বংস করেছি। এসো, দেশের তরুণ দল, আমাদের সঙ্গে এসে যোগ দিয়ে শত্রুদের ধ্বংস করি।······"

দেশের ছেলেরা এবার নিশ্চয়ই সাড়া দেবে! হ্যাঁ—দেশের স্বাধীনতার জন্য এগিয়ে আসবে বৈ কি? তারা কি পারবে শত্রুদের হটাতে?······

ওদিকে যেন বিসের এক জনতা। ছেলের দল সেখানে গিয়ে ভীড় করলো। দেখা গেল, সুন্দর একটি ছেলে···তেজ-দৃপ্ত কণ্ঠে বক্তৃতা দিচ্ছে······

"আমাদের দেশের শ্রমিক যারা—তারা তো দিন-রাত কাজ করে চলেছিল কারখানায়—বিসের কারখানায়? সেখানে অজস্র গোলা-গুলী তৈয়ারী হয়েছিল। কিন্তু আজ সেগুলো শত্রুর হাতে। বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীই এই জন্য দায়ী।

হয় ত আমরা অনেকেই বাঁচবো না। না-ই বা বাঁচলাম!

তুমি এগিয়ে এসো···দেশের দুর্দিনে। তুমি-ই হ'বে প্রথম শহীদ। দেশের কাজে আত্মবলি দিয়েছো, জাতীয় ইতিহাসে তোমার নাম এক দিন সোনার কালিতে লেখা থাকবে। তুমি মরে গেলেও বেঁচে থাকবে। মরেও তুমি হ'বে অমর···! এসো, এগিয়ে এসো দেশের তরুণ দল······!"

বক্তার বক্তৃতা শেষ হ'তে না হতেই ছেলের দল অধীর চঞ্চল হ'য়ে উঠল। ছেলেরা সবাই এক সাথে মিলিত-কণ্ঠে বলে উঠল: "হ্যাঁ, আমরা যাব······"

সবাই এগিয়ে চলল······'লেফট্ রাইট্' 'লেফট্ রাইট্'······ তাদের পায়ের ধ্বনি বেজে উঠল। *

---

* ফরাসী-বিপ্লবের সময় ছাত্র দলের একটি কাহিনী।

বড়ো দুঃখের কথা

সূর্য্য সেন

তোমরা কেউ আমেরিকায় গিয়েছো কি? নিউ ইয়র্কে? যাওনি তো? বেশ, যেতে তোমাদের হবে না।

আমেরিকায় যাও আর না যাও, নিউ ইয়র্কের বাড়ীর কথা শুনেছো নিশ্চয়। নিউ ইয়র্কের এক একখানা বাড়ী ক'তলা উঁচু হয় তা বললেও বোঝানো যাবে কি না সন্দেহ।

একটা উপমা দিয়েই বুঝিয়ে দিই। কেমন?

ধরো, নিউ ইয়র্কের পীচ-ঢালা চক্‌চকে রাস্তার ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছো তুমি। না, গাড়ী চাপা পড়ার ভয় নেই। নিউ ইয়র্ক তো আর ক'লকাতা শহর নয়, আর সেখানকার ড্রাইভাররাও মিলিটারির লোক নয়!

এখন ধরো, পায়ে হেঁটে চলেছো তুমি, হঠাৎ তোমার ইচ্ছে হ'ল, একবার তাকিয়ে দেখি পাশের বাড়ীটা কত উঁচু। আর যেই মনে হওয়া অমনি ঘাড় কাৎ করে ওপরের দিকে তাকালে তুমি। ব্যস্। সাত দিনের ধাক্কা! এমন ঘাড়ে ব্যথা হবে তোমার, রোদ্দুরে বালিশই দাও আর ঘাড়ে কম্‌প্রেসই দাও ব্যথা কমতে চাইবে না। মোরগের মত ঘাড় বেঁকিয়ে চলতে হবে তোমাকে। শোয়ার দোষে মাঝে-মাঝে তোমাদের যেমন হয় আর কি!

বুঝলে কি না? এমনি ধরণের একটি বাড়ী নিয়ে আমার গল্প।

মস্ত বড় বাড়ী। বাহাত্তর তলা। ছ'তলার বেশী বড় বাড়ীই তো কখনো দেখনি হয়তো। বাহাত্তর তলা বলতে কোন ধারণাই হয়তো করতে পারবে না। উঁচু বলতে তোমরা তো বোঝ শুধু ক'লকাতার অকটারলোনী মনুমেণ্ট, নয়তো কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজা, আর নয়তো দিল্লীর কুতুব-মিনার। বাহাত্তর তলা বাড়ী কিন্তু এ-সবের চেয়ে অনেক উঁচু—কুতুব-মিনারের চেয়ে।

এখন এই বাহাত্তর তলা বাড়ীর বাহাত্তর তলায় একখানি ছোট ঘর নিয়ে থাকতো তিন বন্ধু।

বাড়ীখানা তো অত বড়, তোমরা বলবে, লোকে তা হ'লে ওঠা-নামা করতো কি ক'রে? ওঠা-নামা করতো 'লিফ্‌ট' বা 'এলিভেটার'এর সাহায্যে। এখানে ইংরেজীতে যাকে বলে 'লিফট' আমেরিকায় সেটাকে বলে 'এলিভেটার'। বিদ্যুতের সাহায্যে একটা ছোট্ট ঘর ওপর-নীচে করে—তাকেই ব'লে 'লিফট'। ট্রেণ বা ট্রাম যেমন লাইন ধরে সামনে পিছনে যেতে পারে, 'লিফট' তেমনি ওপর-নীচে করতে পারে।

এই লিফটে চড়ে তো তিন বন্ধু সকাল বেলায় নামলো। আপিস যেতে হবে তো!

নীচে নেমে এসে যে-বন্ধুর কাছে চাবি থাকতো সেই বন্ধু ফটকের পাশের দেয়ালে চাবিদানিতে চাবিটা ঝুলিয়ে রাখলে।

ওখানে তো আর এখানকার মত চোরের উপদ্রব নেই। তাই একটা দেয়ালে বাইরে বেরিয়ে যাবার সময় সবাই নিজের নিজের চাবি রেখে দিয়ে যায়। তা না হ'লে কোথাও চাবি হারিয়ে যেতে পারে তো!

তিন বন্ধুতে খুব ভাব। একসঙ্গে আপিস যায়, একসঙ্গে ফেরে, একসঙ্গে সিনেমা দেখে, সাঁতার কাটে—সব একসঙ্গে। সেদিনও তাই তিন বন্ধুতে একসঙ্গে আপিস গেল।

আপিসে গিয়ে সমস্ত দিন ধরে কাজ করে যখন ফিরে আসবে এমন সময় ম্যানেজার এক জনকে জানালে যে তার চাকরী গেছে। তাকে আর আসতে হবে না।

অন্য দু'বন্ধু তো শুনেই চটে অস্থির। চাকরী কি গেলেই হ'ল? কেন যাবে চাকরী? আর চাকরী যদি যায়ই তার, অন্য দু'বন্ধুও চাকরী ছেড়ে দেবে।

চাকরীর কথা ভাবতে ভাবতেই ফিরলো তারা। মন কারো ভালো নয়। দুঃখে-দুশ্চিন্তায় বেচারা ভাবলে আত্মহত্যা করি। এক জন আবার বললে, ম্যানেজারটাকে মেরে সাফ করে দিলে হয় না?

যাই হোক্, এই সব কথা ভাবতে ভাবতে তারা বাড়ী ফিরলো। ফিরেই শোনে, 'লিফট' খারাপ হয়ে গেছে। এত দুঃখের ওপর আবার দুঃখ দেখো! বেচারারা কি ক'রে, বাহাত্তর তলায় ওপর তাদের ঘর।

আর রাতটাও তো বাইরে কাটালো যায় না, তাই সিঁড়ি ভেঙে উঠতেই মনস্থ করলে তারা।

কিন্তু বাহাত্তর তলা সিঁড়ি ভেঙে ওঠা তো সহজ নয়! দোতলায় উঠতেই তো তোমরা হাঁপিয়ে ওঠো, তা হ'লে বাহাত্তর তলায় উঠতে কি দশা হয় বুঝে দেখো।

যাই হোক্, তিন বন্ধুতে ঠিক করলে যে এতখানি উঠতে হ'লে চুপ করে হাঁটা যাবে না, তার চেয়ে এক-এক জন এক-একটা করে গল্প বলবে। আর সেই গল্পটা চব্বিশ তলা ওঠার সময় পর্য্যন্ত যেন চলে, তার পর আবার চব্বিশ তলা এক জন গল্প বলবে, তার পর আর এক জন।

আর ঐ তিনটি গল্পের মধ্যে যে সব চেয়ে দুঃখের গল্প বলবে অর্থাৎ যে গল্প শুনে অন্য দু'জনের চোখে জল আসবে সেই গল্পকারকে অন্য দু'জন ইণ্ডিয়া থেকে রসগোল্লা আনিয়ে খাওয়াবে।

প্রথম জন তখন গল্প সুরু করলে। বিনিয়ে বিনিয়ে সে চমৎকার একটা গল্প জমালে। সে যখন ছোট ছিলো তখন তার ওপর কে কত অত্যাচার করেছে, কত অবিচার করেছে ইত্যাদি।

এমনি ক'রে গল্প চলে, গল্প চলে, গল্প চলে। আর মাঝে মাঝে সে তার বন্ধু দু'টির চোখের দিকে তাকায়। কিন্তু না, কারও চোখে জল আসেনি এখনো। সে আবার নানা রকম অত্যাচার অবিচারের কথা বলে, গল্প চলে, গল্প চলে, গল্প চলে। কিন্তু না, অন্য দু'জনের চোখে জল আর আসে না।

এমনি করে চব্বিশ তলা শেষ হ'ল।

অন্য আরেক বন্ধু তখন গল্প সুরু করে।

এক ছিলো এক রাজা, ছিল তাঁর এক ছেলে, আর এক ছিল মন্ত্রী, আর ছিল কোটাল।

রাজপুত্র, মন্ত্রিপুত্র, কোটালপুত্র—গল্প চলে, গল্প চলে, গল্প চলে। অনেক দুঃখের সব কাহিনী রসিয়ে রসিয়ে বলে চলে দ্বিতীয় বন্ধু, আর এদিকে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে থাকে তিন বন্ধু।

পঁচিশ তলা, ছাব্বিশ তলা, সাতাশ তলা, আটাশ তলা।

এমনি করে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে থাকে তারা, আর গল্প চলে, গল্প চলে, গল্প চলে।

খুব দুঃখের, অনেক দুঃখের একটা গল্প বলে দ্বিতীয় বন্ধু, আর মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখে অন্য দু'জনের দিকে। কিন্তু না। দু'জনের কারোরই চোখে জল নেই। এদিকে পথ ফুরিয়ে আসে, সময় শেষ হয় তার।

আটচল্লিশ তলায় পা দিয়ে দ্বিতীয় বন্ধু বলে, আমার গল্পটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়লো।

প্রথম বন্ধু বলে তৃতীয় বন্ধুকে, তুমিই ভাই ইণ্ডিয়ান রসগোল্লাটা পাবে দেখছি। আমরা দু'জনে কেউই তো চোখে জল আনতে পারলাম না।

দ্বিতীয় বন্ধু বললে তৃতীয় বন্ধুকে, এবার ভাই তোমার পালা, বলো দিকিনি একটা গল্প।

তৃতীয় বন্ধু বললে, চলো বলছি।

তখন তিন জনে আবার উঠতে লাগলো সিঁড়ি ভেঙে।

উনপঞ্চাশ তলা, পঞ্চাশ তলা, একান্ন তলা।

এক-এক তলা পেরিয়ে যায়, আর দু'বন্ধুতে বলে, কৈ ভাই, তোমার গল্প বলো।

—সবুর ভাই, সবুর

বাহান্ন, তিপ্পান্ন, চুয়ান্ন।

—কৈ ভাই, তোমার গল্প বলো।

—সবুর ভাই, সবুর।

পঞ্চান্ন, ছাপ্পান্ন, সাতান্ন।

—কৈ ভাই, তোমার গল্প?

—সবুর ভাই, সবুর।

তৃতীয় বন্ধু গল্প আর বলতে চায় না।

সোত্তর তলার কাছে আসতেই অন্য দু'জন বললে, কৈ, গল্প কৈ?

—সবুর ভাই, সবুর। এমন গল্প বলবো যে চোখ দিয়ে জল তোমাদের বেরুবেই, কিন্তু ভাই, ছোট গল্প আমার, এক লাইনের।

—সে আবার কি? দু'জনে প্রশ্ন করে।

তৃতীয় বন্ধু বলে, হ্যাঁ ভাই, হ্যাঁ। মাত্র পাঁচটি কথার একটি লাইন বলবো।

সত্তর—একাত্তর—বাহা—

বাহাত্তর তলায় পা দিয়ে তৃতীয় বন্ধু বললে, গল্প শুনবে?

—হ্যাঁ, নিশ্চয়।

—ইণ্ডিয়া থেকে রসগোল্লা আনিয়ে খাওয়াবে তো?

—নিশ্চয়; তবে চোখে জল আসা চাই।

তৃতীয় বন্ধু তখন হাসতে-হাসতে বললে, ভাই, চাবিটা আনতে ভুলে গেছি।

—য়্যাঁ।

অন্য দুই বন্ধু তখন ধপাস্ করে বসে পড়লো সেইখানেই। তৃতীয় বন্ধু দেখতে পেলে তাদের চোখের কোলে জল চিক্-চিক্ করছে।

চোখে জল আসবে না? ভাবো তো একবার, এই বাহাত্তর তলা নেমে গিয়ে চাবিদানি থেকে চাবি নিয়ে আবার উঠতে হবে বাহাত্তর তলা

খোকনের ভেড়া

শ্রীধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

নারেঙ্গীর পথে, ভেড়া লয়ে সাথে,
রাখালের দল, চলে অবিরল, ছিল দুটি কচি ছানা।
ধরিল খোকন, দিবে না কখন,
সাদাটি তাহার, কিবা চমৎকার, কালো দেওয়া মুখ-খানা।
করে কাঁদাকাটি, ধরে আঁটা-আঁটি
তিন টাকা তবু, দিবে না ত কভু, দুষ্ট রাখাল ছেলে।
কত ডাকে আয়, ফিরে নাহি চায়,
কাঁদায়ে খোকনে, ভেড়া-দল সনে, চ'লে যায় অবহেলে।
এক দিন হোল মজা বড় ভাল,
সেই সাদা ছানা, নাহি মানে মানা, কি জানি কেন যে ছুটি।
আসি ঢুকি পড়ে গেটের ভিতরে,
ফিরি ফিরি চায়, খোঁজে যেন কা'য়, ঝরা পাতা খায় খুঁটি।
ধরিল খোকন, পুলকিত মন,
আর নাহি ফিরে দিবে রাখালেরে, যতনে লুকায়ে রাখে।
মাতা আসি শুনি, পরমাদ গণি,
আসিলে রাখাল, বলি-কহি কা'ল, দাম দিয়া দিবে তাকে।
জানে মনে ভেড়া, কোথা আছে ধরা,
ঠিক খুঁজি আসে খোকনের পাশে,শুকায় বাছার মুখ।
শুনি সব কথা, লাগে মনে ব্যথা,
রাখালের ছেলে, দিল তুলে কোলে, ঘুচাতে তাহার দুখ।
খোকনের ভেড়া, চলে যেন ঘোড়া
ছুটে ও লাফায়, ডিগবাজী খায়, করে সে যে মজা কত।
কচি পাতা তার, রুচে না আহার,
ফেলি পাকা কুল, গোলাপের ফুল, খায় শুকনা যা-কিছু যত।
পিসীমা ও মা, যতন করিয়া,
রচে ঘুঙুরের, ভেড়ার গলের, কিবা মনোহর হার।
পরি রুণুঝুণু, পুলকিত তনু,
ভেড়া-শিশু খেলে, ছেলেদের দলে, শোভা কিবা চমৎকার।
এক দিন আসি, মৃদু মধু হাসি,
ছেলেরে ভুলায়, ভেড়া লয়ে যায়, দুধ-খাওয়াবার তরে।
দাম লয় নাই, সবে ভাবে তাই,
ফুটাইতে হাসি, ছেলে ভালবাসি, দিয়াছিল খেলিবারে।
এদিকে ছেলেরা, কেঁদে-কেটে সারা,
লয়ে গেল ভেড়া, ঘুঙুরের তোড়া, ফাঁকি দিয়া তার সাথে।
ঘুরে পাড়াময়, ভেড়া খুঁজি হায়,
চর কত ছুটে পথে মাঠে ঘাটে, অবশেষে ধরে হাতে।
বেড়াইয়া ফিরে, সাঁঝ হলে ঘরে,
মনে নাহি সুখ, কচি ভেড়া-মুখ, পড়ে শুধু মনে কত।
থাকিলে বেচারী, কত মজা করি,
চড়ি রেল গাড়ী, সারা রাত ধরি, কলিকাতা যেতে পেত।
হেন কালে হায়, ঐ কে বা যায়,
কম্ফর্ট মাথায়, লুঙ্গী পরা কায়, সেই ত রাখাল ছেলে!
ছুটে তিন জনে, পড়ি বাঁচি মনে,
এবারে ধরিবে, আদায় করিবে, ভেড়া-শিশু শেষ কালে।

ছেলেদের দেখি, ভেড়াওলা সুখী,
বলে এসু দিয়ে, পাঁচ টাকা লয়ে, ছানাটি তোদের বাড়ী।
শুনি ছুটি চলে, খুসী ছেলে-দলে,
কে আগে ধরিবে, কোলেতে করিবে, বাড়ী ফিরি তাড়াতাড়ি।
ভেড়া পেয়ে ফিরি, নাচে তারে ঘিরি,
ছুধ শুধু তাই, লাল ফিতা নাই, মায়েরা রচিল হার।
দেছে তার হুলে, লোম দিয়া গলে,
পরায়ে ঘুঙুর, ঝুনুঝুনু সুর, নাই শুধু সে বাহার।
ফিরে কাশী হতে, আপন দেশেতে
কত মজা করি, সবে রেলে চড়ি, ভেড়া-ছানা চলে সনে।
না রবে ঝুড়িতে, কভু কোন মতে
সকলে বাহিরে, সে কেন ভিতরে, ভাবিয়া না পায় মনে।
লয় ভাড়া পাছে, শুধু শুধু মিছে,
অতটুকু ভেড়া, তবু তার ভাড়া, কালী-মাসী করে কোলে।
চাদরেতে ঢাকে, পাছে কেহ দেখে,
আরামেতে শুয়ে, থাকে চুপ হয়ে, ভেড়া-শিশু চলে রেলে।
একে ভিড়ে কাঁপে, তায় ভেড়া-চাপে
গরমে ও ঘামে, কালী-মাসী নামে, রাতেতে পাগল প্রায়।
খোকনের কোলে, দিয়া ভেড়া তুলে,
ভয় গেল দূরে, বসি পেট ধরে, হাঁফ ছাড়ি বাঁচে হায়।
ছাড়ি কালী-মাসী, ভেড়া পশে আসি,
বাথ-রুম ঘরে, ঝুড়ির ভিতরে, ঘটিল বিষম জ্বালা।
না রবে একাকী, ব্যাঃ-ব্যাঃ রবে ডাকি,
অমত জানায়, বেয়াড়া চেঁচায়, কান করে ঝালা-পালা।
ছুটে ছেলে-দল, ছুধের বোতল,
কচি-কচি ঘাস, পালমের শাক, দিতে তার মুখে ঢাকা।
শুনিলে'তে পরে, ষ্টেশন-মাষ্টারে,
সাধিবে যে বাদ, ঘটিবে প্রমাদ, ধরি লবে কত টাকা।
ছুধ করি শেষ, পালম অশেষ,
যতগুলি ঘাস, ওরে সর্ব্বনাশ, তবু ডাকে পোড়া ভেড়া!
কোলে করি তারে, পায়খানা ঘরে,
ভরিয়া ছুর্গন্ধে, থাকি চাবিবন্ধে, দাঁড়াইতে হবে খাড়া।
ছুর্গা হোল কাত, দিয়া নাকে হাত
বাথ-রুমে থাকি, তুলে শুধু উঁকি, বন্ধ হয়ে ঘণ্টা-ভোর।
বহু কষ্ট সয়ে, শেষে ভেড়া লয়ে,
বার হয়ে আসি, মাথা ধরি বসি, জানায় ছুর্দশা ঘোর।
দিবাকর যায়, ছোট ঘরে হায়
মুখ কাঁচু-মাচু, ভেড়া পিছু-পিছু, ছেলেরা আঁটিল দ্বার।
অপরাধ বিনা, সাজা জেলখানা,
বন্ধ সেল-ঘরে, যেন কাঁসী তরে, রাত জাগা চমৎকার।
শেষে হোল স্থির, রহিবে বাহির,
ছেলেদের সনে, আপনার মনে, যতক্ষণ গাড়ী চলে।
আসিলে ষ্টেশন, ছুটি এক জন,
ঢুকি ছোট ঘরে, দ্বার বন্ধ করে, ভেড়া-শিশু লবে কোলে।
ষ্টেশন আসিলে, সেই মত চলে,
ভেড়া কোলে করি, চলে লুকাচুরি, একবার ধরা, ছাড়া।
হয় রাত বেশী, সকলে উদাসী,
ঘুম আসে জোর, ছেলেরা বিভোর, জ্বালালে এবার ভেড়া।
উঠি বড় পিসী, ভেড়া লয়ে আসি,
আপন শয্যায়, তাহারে শোয়ায়, কম্বল দিয়া ঢাকি।
মহা আরামেতে, থাকে গরমেতে,
সারা রাত ভোর, আই-কোলোপর, হাগি, মুতি দোঁহে মাখি।
কত কষ্ট সয়ে, আসে ভেড়া লয়ে,
খোকনের ধন, মাণিক-রতন, কাশী হতে কলিকাতা।
ফাঁকি দিয়া রেলে, ভেড়া করি কোলে,
কিবা সে ঝঞ্ঝাট, কিবা সে বিভ্রাট, ঘটনা নহেক যা-তা।
হলেও সে ভেড়া, নহে বোকা মেড়া,
বুঝে সব কিছু, থাকে মাথা নীচু, ভাল রসিকতা জানে।
টিকিট না দিয়ে, গেট পার হয়ে,
চেকারে নেহারি, পুলকেতে ভরি, ভ্যাঃ-ভ্যাঃ হাসে ইষ্টিশানে।

চিত্তরঞ্জনের ছেলেবেলার গল্প

জীবেন্দ্র সিংহরায়

চিত্তরঞ্জনকে দেশবন্ধু হিসেবে সকলেই জানে। কিন্তু ছোট্ট অতটুকু চিত্তরঞ্জনের ছেলেবেলার ইতিহাস যে কত বিচিত্র তা' অনেকেই জানে না। তিনি যখন দেশের মধ্যে এক জন হয়েছিলেন, তখন তিনি ছিলেন বিরাট বিশাল। কিন্তু ছেলেবেলায় ছোট গণ্ডির মধ্যেও যে তিনি হীন ছিলেন না—সেই কথাই আজ তোমাদের বলবো।

ছোট্ট একরত্তি ছেলে চিত্তরঞ্জন। তখন বয়স বছর পাঁচেকের বেশি হবে না। এক দিন ভবানীপুরে লণ্ডন মিশনারী ইস্কুলে ভর্তি হয়ে গেল। শৈশবে ছাত্র হিসেবে চিত্তরঞ্জন খুব উঁচু দরের ছিল না। কোন দিনই খুব ভাল ফল করে সে ভাল ছেলের সুনাম অর্জ্জন করতে পারেনি। কিন্তু যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র, তখন একবার ডবল প্রমোশন না পেয়ে সে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিল। তোমরা যারা পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করেও খারাপ করে ফেল—তারাই বুঝতে পারবে চিত্তরঞ্জনের সেদিনের ছুঃখ। মনের ছুঃখে সে স্থির করলো, ওই ইস্কুলে আর পড়বে না। তাই বাবা ভুবনমোহন অন্য আর এক ইস্কুলে তাকে ভর্তি করিয়ে দিলেন। সেখানে চিত্তরঞ্জনের কিছু দিন কাটলো, কিছু দিন যাওয়ার পরও সেখানে সে কিন্তু এক বর্ণ শিখতে পারেনি। তাই গৃহ-শিক্ষক জগৎ বাবু অনেক চেষ্টা করে চিত্তরঞ্জনকে আবার লণ্ডন মিশনারী ইস্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। এই ইস্কুলটির জন্যে বরাবরই তার দরদ ছিল অফুরন্ত। আর দরদ ছিল বলেই নানা বাধা সত্ত্বেও চিত্তরঞ্জন এখান থেকেই এনট্রান্স পাশ করে।

বেশ ছোট থাকতেই চিত্তরঞ্জনের বই কেনার ভারি সখ। যখন হাতে ছু'-একটা টাকা আসতো তখনই সে দোকানে ছুটতো বই কিনতে। এমনি করে ইস্কুল বয়সেই সে একটি ছোটখাট লাইব্রেরি করে ফেলেছিল। শুধু বাঙলা বই-ই নয়, চিত্তরঞ্জন অনেক ইংরেজী বই সংগ্রহ করতো। অনেকে বই কিনে এনে আলমারি সাজায়। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের পড়ার দিকেই বেশি মনোযোগ ছিল।

চিত্তরঞ্জন শৈশব থেকেই সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের বই পড়তে শুরু করে। অনেক সময় তাঁর প্রবন্ধ ও উপন্যাস পড়তে পড়তে সে এত তন্ময় হয়ে যেত যে, লেখা-পড়ার কথা মোটেই মনে থাকতো না। সত্যি কথা বলতে কি, চিত্তরঞ্জন তার কিশোর জীবনের মধ্যেই বঙ্কিমের সমস্ত বই পড়ে ফেলেছিল। এই সময়েই জাতীয়তার পূজারী বঙ্কিমের আদর্শবাদ তার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে আরম্ভ করে এবং তাঁকে সে মুক্তিমন্ত্রের পুরোহিতরূপে বরণ করে নেয়। সাহিত্যের প্রতিও চিত্তরঞ্জনের আকর্ষণের এইখানেই সূত্রপাত বলে তোমরা ধরে নিতে পারো। পরবর্তী জীবনে দেশবন্ধুকে এক জন উঁচু দরের কবি হতে তাঁর ছেলেবেলার এই সাহিত্য-প্রীতি সাহায্য করেছিল।

তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন মাত্র অল্প কয়েক বছর ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁর যে সংগঠন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া গেছে তার তুলনা মেলে না। দেশবন্ধুর এই কর্মক্ষমতার অংকুর দেখতে পাই বালক চিত্তরঞ্জনের মধ্যেও। যখন নিতান্ত ছেলেমানুষ, তখন থেকেই বন্ধুদের নিয়ে সে দল বাঁধতো। সে দলের সে ছিল একমাত্র কমাণ্ডার আর অন্যান্য সবাই ছিল সৈনিক। এই ছোট্ট সৈন্যদলটি এক দিকে যেমন দুষ্টুমি করতো, অন্য দিকে লোকের বিপদে সাহায্য করতে ছুটে আসতো। এই ভাবে ছেলেবেলা থেকেই চিত্তরঞ্জন এক জন রীতিমত নেতা হয়ে উঠেছিল —অবশ্য তার অনুচররা সবাই ছিল অনেকটা তারই মত বয়সের। দলের সব ছেলেকেই সে সমান ভাবে ভাল বাসতো, ভুলেও কখনো কারু সংগে ঝগড়া করতো না। এই জন্য সে সব বন্ধুদের প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল।

চিত্তরঞ্জনের সম্বন্ধে একটি মজার গল্প আছে। সে বরাবরই দল বেঁধে খেতে ভালবাসতো। একা একা খাওয়াটা সে তেমন বরদাস্ত করতে পারতো না। ইস্কুল বয়সে বাড়ি থেকে তাকে জল খাবারের পয়সা দেওয়া হত। কিন্তু অন্য ছেলেদের মত লুকিয়ে খেতে কোন দিন চিত্তরঞ্জনকে দেখা যায়নি। সে সব বন্ধুদের খাবারের দোকানে ডেকে নিয়ে যেত। সেখানে খাবার কিনে সে সবাইকে একে একে দিতে আরম্ভ করতো। ফুরিয়ে গেলে চিত্তরঞ্জন বলে উঠতো—'বা রে ফুরিয়ে গেল যে! এখন খাব কি?' তখন সত্যি তার মন খারাপ হয়ে যেত। সবাই মিলে খাচ্ছি, হঠাৎ খাবার ফুরিয়ে গেল—এতে কার আর না দুঃখ হয় বলো?

তর্ক করতে চিত্তরঞ্জন খুব ভালবাসতো। কারু সংগে আলোচনা করতে পারলে তার আর নাওয়া-খাওয়ার জ্ঞান থাকতো না। তাই সে ইস্কুলের ডিবেটিং ক্লাবের এক জন বেশ উৎসাহী সভ্য হয়ে পড়েছিল। সেখানে প্রত্যেক সভায় উপস্থিত হয়ে চিত্তরঞ্জন আলোচনায় যোগ দিত। শুধু তাই নয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়বার সময় থেকেই সে এক জন ভালো বক্তা হয়ে উঠেছিল। তর্ক করতে গিয়ে তাকে কখনও যুক্তিহীন কথা বলতে দেখা যায়নি। তার ফল হয়েছিল এই যে, তার্কিক হিসেবেও ইস্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তার নাম-ডাক পড়ে গিয়েছিল। তার বোনেরা শুনে জিজ্ঞেস করতো—'চিত্তদা, তুমি না কি ভালো বক্তৃতা দাও। আমাদের একটু শোনাও না ভাই'! চিত্তরঞ্জন তার জবাব না দিয়ে শুধু হাসতো, হয়ত সাময়িক লজ্জায় তার কচি মুখ একটু রাঙাও হয়ে উঠতো। এমনি করে নিতান্ত ছেলেবেলাতেই তাকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে দেখা গেছে।

বালক বয়সে চিত্তরঞ্জনের মণি নামে একটি বন্ধু ছিল। দিনের বেশির ভাগ সময়েই তারা একসংগে চলা-ফেরা করতো। মুহূর্তের জন্যেও তাদের দূরে দূরে থাকতে দেখা যায়নি। আসলে এমনিতর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব অল্প লোকের মধ্যে থাকে। চিত্তরঞ্জনের স্বভাবই ছিল এই যে—যাকে সে আঁকড়ে ধরতো, তার সংগে কখনো ছাড়াছাড়ি হতো না। মণির ব্যাপারেও ঠিক তাই হয়েছিল।

ছোট ছেলে চিত্তরঞ্জনের মধ্যেই আমরা কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পাই। নিতান্ত অল্প বয়স থেকেই সে কবিতা লিখতে ভালবাসতো। এ-কাজে তার কখনো আলস্য দেখা যায়নি। অভ্যাস ক্রমে এমন অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছিল যে, অনেক দিন ইস্কুলের পড়া-শুনো না করে সে রাত জেগে কবিতা লিখতো। কিন্তু তার কাব্যচর্চায় এখানেই শেষ ছিল না। এ নিয়ে বন্ধুদের সংগে তার ছোট-খাট প্রতিযোগিতা পর্যন্ত হয়ে যেত। কিন্তু চিত্তরঞ্জন শুধু কবিতা লিখেই আনন্দ পেত না, অনেক বিখ্যাত কবির রচনা সে নিজে পড়তে ভালবাসতো এবং বন্ধুদের পড়িয়ে শুনাতো। স্বদেশী কবিতা তার সব চেয়ে প্রিয় ছিল। রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়' ও হেমচন্দ্রের 'ভারত-সঙ্গীত' তার সব সময়েই কণ্ঠস্থ থাকতো। ছেলেবেলার এই কবিতানুরাগই যে বিখ্যাত 'সাগর-সঙ্গীত'এর কবি চিত্তরঞ্জনকে গড়ে তুলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নাই।

দুঃখের কথা

শ্রীফটিক বন্দ্যোপাধ্যায়

মামার বাড়ী গিয়ে আমি
গাইতে যখন বসি ধামার—
তোমরা বলো গান নয় সে
চেঁচানোটাই স্বভাব আমার।
বিষ্টুপুরে অষ্ট প্রহর—
তাল শিখেছি তালতলাতে।
সুরের পাখী উঠছে ডাকি—
রাত্রি-দিনই এই গলাতে।
সুরেই কষি এলজেব্রা
এবং সুরেই পড়ি গ্রামার,—
গুণীর আদর নেই আর ধরায়—
কাটছে এখন সবই ভায়েই।
তাল তুলেছি যেই সভাতে—
সভা শূন্য একেবারেই।
পাশের সাকিম থাকেন হাকিম
পাঠিয়ে দিলেন কোর্টের সমন।
শুনে 'বাহার' ভাইপো তাঁহার—
করল না কি রক্ত-বমন।
সেদিন থেকে তান ভুলেছি—
আর ভুলেছি নামটি মামার।

অঙ্গন প্রাঙ্গণ

তিন মুর্ত্তি

মঞ্জু আচার্য্য

(সার্লক হোমসের কাহিনী)

আমার বেশ মনে আছে, সেটা ছিল জুনের শেষ, উনিশ-শো দুই সাল। দক্ষিণ-আফ্রিকার যুদ্ধ সবে শেষ হয়েছে। হঠাৎ এক দিন সকাল বেলা সে তার ঘর থেকে লম্বা একতাড়া ফুলস্কেপ কাগজের দলিল নিয়ে বেরিয়ে এল, তখন তার তীক্ষ্ণ ধূসর চোখে দেখলাম কৌতুকের আভাস।

হোমস্ বললো, "ওহে ওয়াটসন, কিছু টাকা রোজগার করবে? গ্যারিদেব বলে কোন লোকের নাম শুনেছ কখনো?"

আমাকে স্বীকার করতেই হ'ল যে আমি শুনিনি। হোমস তখন বললো, "একটা গ্যারিদেবকে যদি কোন মতে খুঁজে বার করতে পার তাহ'লেই টাকা পাবে।"

"কেন?"

"ও—সে একটা মস্ত গল্প—আজগুবীও বটে। আমার ত মনে হয় না যে, এ রকম অদ্ভূত একটা কিছু এ পর্যন্ত মানুষ শুনেছে। লোকটি এক্ষুনি এখানে আসবে—সুতরাং সে না আসা পর্যন্ত ব্যাপারটা না বলাই ভাল। ইতিমধ্যে আমাদের সেই নামটি যে চাই। আমার পাশের টেবিলে টেলিফোন ডাইরেকটারীখানা ছিল—হতাশ ভাবে আমি তার পাতাগুলো উল্টে গ্যারিদেব নামটি খুঁজবার চেষ্টা করলাম—কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম যে, ঐ অদ্ভূত নামটি ঠিক জায়গাতেই রয়েছে। আনন্দে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম—"হোমস! আমি পেয়েছি—পেয়েছি, এই যে এখানে!"

হোমস আমার হাত থেকে বইটা নিয়ে দেখল। সে পড়ে চললো, "গ্যারিদেব এন, ১৩৬, লিট্‌ল রায়ডার ষ্ট্রীট ডবলিউ—"বন্ধু ওয়াটসন, তোমাকে নিরাশ হতেই হ'ল যে লোকটা খোঁজ করছে তার নিজেরই নাম ওটা—তার চিঠির উপরে ঐ ঠিকানাই লেখা আছে—আমরা অন্য আর এক জনকে চাই।"

এই সময়ে মিসেস হাডসন ট্রের উপরে একখানা কার্ড নিয়ে ঢুকলো—আমি তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিয়ে চোখ বুলালাম। আমি বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, "এটা কি হ'ল? এটা যে সম্পূর্ণ অন্য নাম! জন গ্যারিদেব কাউন্সেলর এ্যাট ল—মুরভীল—কানসাস, অ্যামেরিকা।"

হোমস কার্ডখানির দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল। "ওয়াটসন, তোমাকে আরও একটু কষ্ট করতে হবে এই ভদ্রলোকটিও ষড়যন্ত্রের মধ্যে আছেন—যদিও আজকে সকালেই তাঁকে এখানে আশা করিনি। যাই হো'ক, আমরা যা জানতে চাই তিনি তার অনেকখানিই ব'লতে পারবেন।"

খানিক পরেই আগন্তুকটি ভেতরে এলেন। মিঃ জন গ্যারিদেব বেঁটে ও বেশ শক্তিশালী লোক। তাঁর গোলগাল মুখ, দাড়ি-গোঁফ কামানো পরিচ্ছন্ন মুখ দেখে তাঁকে আমেরিকার এক জন ব্যবসায়ী বলে মনে করতে কিছু মাত্র ভুল হচ্ছিল না। তাঁর মুখে একটা শিশুসুলভ সারল্য ছিল, আর চোখে ছিল এমন একটা জিনিষ যাতে তাঁর দিকে সহজেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সেই উজ্জ্বল চোখ দু'টো যেন তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করছিল। আগন্তুকটির কথায় আমেরিকান টান ছিল!

তিনি বার-কয়েক আমাদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে নিয়ে তার পর হোমসকে লক্ষ্য করে বললেন—"আপনিই মিঃ হোমস্—হ্যাঁ, আমি ঠিক চিনতে পেরেছি। আপনার ছবিগুলো অবিকল আপনার চেহারার মত। আপনি নিশ্চয়ই মিঃ নাথান গ্যারিদেবের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেয়েছেন, পাননি কি?"

সার্লক হোমস বলল—"আপনি ঐখানে বসুন। আমাদের অনেক বিষয় আলোচনা করবার আছে।" বলতে বলতে হোমস্ সেই ফুলস্ক্যাপ কাগজগুলো হাতে তুলে নিল। "আপনিই মিঃ জন গ্যারিদেব হবেন নিশ্চয়—যার কথা এই দলিলে লেখা আছে। আপনি বেশ কিছু দিন ধরে ইংলণ্ডে আছেন, নয়?"

আমার মনে হ'ল, লোকটি হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন, তাঁর চোখে দেখা দিল বিস্ময়ের আভাস।

"আপনি এ কথা বলছেন কেন মিঃ হোমস্?

"আপনার পোষাক-পরিচ্ছদ আগাগোড়া সবই ইংরিজি ধরণের।"

মিঃ গ্যারিদেব জোর করে একটু হাসলেন। "আপনার অদ্ভুত ক্ষমতার কথা আমি অনেক পড়েছি, কিন্তু আমার উপরেই তার প্রয়োগ করবেন, তা ভাবিনি। আপনি কি করে বুঝলেন?"

"আপনার কোটের গলার ছাঁট আর জুতোর প্যাটার্ণ দেখে যে কেউই এ কথা বলতে পারবে।"

"তাই না কি? আমি কিন্তু ভাবিনি যে, পোষাক দেখেই লোকে আমাকে ইংলণ্ডবাসী বলে মনে করবে। ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে এখানে কিছু দিন হ'ল থাকতে হয়েছে আর সেই জন্য আমার বেশ-ভূষাও লণ্ডনের লোকদের মত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু যাক্ সে কথা। আপনার সময় খুব মূল্যবান। আমার পোষাকের কাট-ছাঁট নিয়ে তা কাটাবার জন্য আমরা আসিনি। আপনার হাতের ঐ কাগজগুলো কি, জানতে পারি কি?"

দেখলাম, হোমসের কথায় আগন্তুকের অমায়িক ভাব অনেকখানি উড়ে গেল।

হোমস্ সান্ত্বনার সুরে বলতে লাগলো—"ধীরে মিঃ গ্যারিদেব, ধীরে। আসল ব্যাপার ছাড়াও যখন আমি বাইরের ছোট-খাটো বিষয় নিয়ে সময় কাটাই তখন তার মধ্যে অনেক অর্থ থাকে।

ডাঃ ওয়াটসনকেই জিজ্ঞাসা করুন তাই কি না। কিন্তু আমি ভাবছি, মিঃ নাথান গ্যারিদেব কেন আপনার সঙ্গে এলেন না!"

আগন্তুক ভদ্রলোকটি হঠাৎ ভয়ানক ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠলেন, "তিনি আপনাকেই বা এর মধ্যে টানলেন কেন তা তো বুঝতে পারলাম না। আপনি এর কি করবেন? দু'জন ভদ্রলোকের ভেতর ব্যবসা সম্পর্কে কোন একটা আলোচনা করার দরকার, তার মধ্যে এক জনের আবার গোয়েন্দার শরণাপন্ন হতে হল কেন? আমি তাঁর সঙ্গে আজ সকালেই দেখা করেছিলাম। তিনি আমাকে বললেন যে, আমাকে কেমন বোকা বানিয়েছেন। সেই জন্যই আমি এখানে এসেছি। কিন্তু এসে দেখছি ফল খারাপ হল।"

হোমস্ বলল, "আপনার সম্বন্ধে কোন কথাই ওঠে না মিঃ গ্যারিদেব। একটা বড় রকম লাভের বখরা পাবার জন্য মিঃ নাথান গ্যারিদেবের অতিরিক্ত উৎসাহই এর পেছনে রয়েছে। তিনি জানতেন যে, যা কিছু খোঁজ-খবর সব আমি পাবই, তাই তিনি আমাকে লাগিয়েছেন।"

আগন্তুকের রাগ ক্রমশ কমে এলো। তিনি বলতে লাগলেন—"তাহলে আলাদা কথা। আমার সঙ্গে সকালে আজ যখন তাঁর দেখা হয়েছিল, তিনি গোয়েন্দার কথা আমাকে বলেছিলেন। আমি তাঁর কাছ থেকে আপনার ঠিকানা জেনে নিয়ে সোজা এখানে চলে এসেছি। নিজেদের ঘরোয়া ব্যাপারে পুলিশ-হাঙ্গামা আমি পছন্দ করি না! কিন্তু যদি আপনি সত্যিই আমাদের সাহায্য করতে চান তবে লোকটিকে খুঁজে বার করুন? এতে তো কারো কোনো ক্ষতি নেই।" হোমস্ বলল, "ব্যাপারটা তাই দাঁড়াচ্ছে। আপনি যখন এখানে উপস্থিত আছেন তখন আপনার মুখ থেকেই খোলাখুলি ঘটনাটা জানা যাক। আমার এই বন্ধুটি বিশেষ কিছুই শোনেননি।"

মিঃ গ্যারিদেব আমার দিকে যে ভাবে তাকালেন তা'তে তাঁর সৌহার্দ্যের আশা আমার কমে গেল। তিনি প্রশ্ন করলেন—"ওঁর কি জানা দরকার?"

"আমরা সাধারণতঃ একসঙ্গেই কাজ করি।"

"ও, তাহলে গোপন করবার কোন কারণ নেই। সংক্ষেপে আমি বলছি শুনুন। কানসাসের আলেকজান্দার হ্যামিল্টন গ্যারিদেব যে কে তা আপনাকে আর বলে দিতে হবে না। জমি-জমা কেনা-বেচা করে তিনি অনেক টাকা করেছিলেন। আরো করেছিলেন শিকাগোর গমের জমি থেকে। তিনি এই টাকা থেকে কেবল জমি কিনেই চলছিলেন। আর কানসাস নদীর ধার দিয়ে ফোর্ট ডজের পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত তাঁর ভূ সম্পত্তি ছিল। এই সব জমি থেকে তাঁর প্রচুর আয় হত।

"তাঁর কোন আত্মীয়-স্বজন কোথাও আছে বলে আমি জানি না। কিন্তু তাঁর অদ্ভুত নামটির জন্য তাঁর খুব গর্ব্ব ছিল। ঐ কারণেই তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ হ'য়েছে। আমি তখন টোপেকায় আইন পড়ছিলাম। এক দিন এক জন বুড়োর সঙ্গে আমার দেখা হ'ল! বুড়োটি তাঁর নামের সঙ্গে মিল আছে এমন আর এক জনকে দেখবার জন্য পাগল। তাঁর জীবনের এক মাত্র সাধ এটা। আর একটি গ্যারিদেবকে বার করবার জন্য তিনি প্রাণ দিতেও প্রস্তুত। আমাকে তিনি আর এক জন গ্যারিদেব খুঁজে দিতে বললেন। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি কাজের লোক—আমি দেশে দেশে এখন গ্যারিদেব খুঁজে বেড়াতে পারবো না। তার জবাবে তিনি বললেন, 'আচ্ছা, আমি যা প্ল্যান করেছি সেই ভাবে যদি কাজ কর তাহলেও হবে।" আমি ভাবলাম তিনি ঠাট্টা করছেন, কিন্তু কথাটির ভেতর যে কতখানি অর্থ ছিল তা তখন না বুঝলেও খুব শীগ্‌গিরই বুঝতে পারলাম।

"ঐ কথা বলার এক বছরের ভেতরেই বুড়ো লোকটি মারা গেলেন। মরবার আগে তিনি একটি উইল তৈরী করেছিলেন। সেই উইলটি এত অদ্ভুত ছিল যে, গোটা কানসাস খুঁজে বেড়ালেও তেমন আর একটি পাওয়া যাবে না। তাঁর সম্পত্তিকে তিনি তিন ভাগে ভাগ করে এই সর্ত্ত দিয়েছিলেন যে, যদি আর দু'জন গ্যারিদেবকে আমি খুঁজে বার করতে পারি তাহলে অবশিষ্ট অংশ আমি পাব। প্রত্যেকের ভাগে পঞ্চাশ হাজার ডলার করে পড়েছে. কিন্তু যে পর্য্যন্ত তিন জন গ্যারিদেব একসঙ্গে না হ'চ্ছে সে পর্য্যন্ত ও-টাকায় কেউ হাত দিতে পারবে না।

"এমন একটা সুযোগ না ছেড়ে দিয়ে আমি আইন ব্যবসার ক্ষতি করেও গ্যারিদেব খুঁজে বেড়াচ্ছি। আমেরিকায় এক জনকেও পেলাম না। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা আমি করলাম কিন্তু একটি গ্যারিদেবও আমার চোখে পড়ল না। তার পর চলে এলাম লণ্ডন সহরে। এখানে এসে টেলিফোন ডাইরেক্টরীতে সেই নামের একটি নাম দেখতে পেলাম। দু'দিন আগে তাঁর কাছে আমি গিয়ে সব ব্যাপার বুঝিয়ে বললাম। কিন্তু তিনিও আমার মত একলা। তাঁর কোন পুরুষ বংশধর নেই। কিন্তু উইলে লেখা আছে তিন জন গ্যারিদেব এক সঙ্গে না হলে চলবে না। এখনও এক জন বাকী আছে। যদি আপনি তাকে খুঁজতে সাহায্য করেন তবে আপনার উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে আমরা চেষ্টা করবো।"

হোমসের মুখে ঈষৎ হাসি দেখা দিল, সে বলল, "কেমন ওয়াটসন, আমি বলেছিলাম কি না এটা একটা আজগুবী ব্যাপার! আপনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেননি কেন?"

"মিঃ হোমস্। তাও আমি দিয়েছিলাম, কিন্তু কোন উত্তর পাইনি।"

"তাই না কি? তাহলে সত্যিই এটা একটা রহস্যজনক ব্যাপার! আচ্ছা, আমি আমার অবসর সময়ে সব দেখে রাখব। হ্যাঁ, ভাল কথা, আপনি টোপেকা থেকে আসছেন এটাও একটা মজার ব্যাপার। আমার এক জন চেনা লোক সেখানে ছিলেন—তিনি অবশ্য মারা গেছেন। তাঁর নাম—ডাঃ লাইস্যাণ্ডার ষ্টার। তিনি আঠারো-শো নব্বই সালে মেয়র ছিলেন।"

আমাদের আগন্তুক ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, "ও, ডাঃ ষ্টার! তাঁর নাম আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে করে থাকে। আচ্ছা মিঃ হোমস্, আমরা যা করতে পারবো তা আপনাকে জানাবো। দু' এক-দিনের মধ্যেই সব জানতে পারবেন আশা করছি।" এই বলে আমেরিকান ভদ্রলোকটি আমাদের নমস্কার করে বিদায় নিলেন। হোমস্ একটা পাইপ ধরিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ টানতে লাগল। ক্রমে একটা অদ্ভুত হাসি তার মুখে দেখা দিল!

অবশেষে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "কি হে, ব্যাপার কিছু বুঝলে?"

"আমি অবাক্ হয়ে যাচ্ছি ওয়াটসন—কেবল অবাক্ হয়ে যাচ্ছি।"

"কি বিষয়ে অবাক্ হচ্ছ?"

হোমস্ মুখ থেকে পাইপ নামিয়ে বলতে লাগল—"আমি এই

ভেবেই অবাক্ হচ্ছি ওয়াটসন যে লোকটা আমার কাছে এত-গুলো মিথ্যে কথা কেন বলল। আমি তাকে প্রায় এ-কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। এমন অনেক সুযোগ ছিল যখন মুখের উপর জিজ্ঞাসা করলে সে হকচকিয়ে যেত। কিন্তু ভেবে দেখলাম, সে আমাদের বোকা বানিয়েছে এই ধারণা তার মনে থাকাই ভালো। লোকটির পরনে ইংরিজী ধরণের পোষাক—কনুই আর হাতের কাছটা দেখলে মনে হয় এক বছরের ওপর সে ওটা পরছে অথচ এই কাগজগুলো পড়লে আর তার নিজের কথা মেনে নিলে সে আমেরিকার বাসিন্দা—সবে কিছু দিন হল লণ্ডনে এসেছে। কোন কাগজেই কখনও বিজ্ঞাপন বেরোয়নি। তুমি জান আমি প্রত্যেকটি পৃষ্ঠা খুঁটিয়ে পড়ি। আমার চোখে কিছুই এড়ায় না। খবরের কাগজ আমার পাখী ধরার একটা ফাঁদ। ডাঃ লাইস্তাওয়ার বলে কাউকেই আমি চিনি না। যেদিক্ দিয়েই তাকে ধর না কেন, সে ক্রমাগত মিথ্যে কথা বলে যাবে। লোকটি সত্যিই আমেরিকান কিন্তু দীর্ঘ দিন লণ্ডনে থাকায় তার কথাবার্ত্তার ধরণ ইংরেজদের মত হয়ে গিয়েছে। সে কি চায়—গ্যারিদেব খুঁজে বার করবার মধ্যে তার কোন উদ্দেশ্য আছে? এ জিনিষটা অবহেলা করবার মত নয়। লোকটি অত্যন্ত ধূর্ত্ত ও দুষ্ট। এখন দেখা যাক, আর এক জনও এই রকম সয়তান কি না। ফোনে তাকে ডাক তো ওয়াটসন।"

আমি ফোনে ডাকলাম। একটা ক্ষীণ কম্পিত স্বর শুনতে পাওয়া গেল।

"হ্যাঁ, আমিই মিঃ নাথান গ্যারিদেব। মিঃ হোমস্ আছেন কি? আমি তাঁরই সঙ্গে কথা বলতে চাই।"

হোমস্ এগিয়ে এসে ফোন ধরল। আমি শুনতে লাগলাম—"হ্যাঁ, সে এখানে এসেছিল। আপনি তাকে চেনেন না শুনলাম।··· কত দিন···?···মাত্র দু'দিন?···হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা একটা মস্ত সুযোগ। আপনি কি আজ সন্ধ্যায় বাড়ী থাকবেন?··· আপনার নতুন বন্ধুটি নিশ্চয়ই ওখানে নেই?···খুব ভালো, আমরা তাহলে যাবো। সে না থাকাটাই আমরা চাই।···ডাঃ ওয়াটসন যাবেন আমার সঙ্গে। ···আপনার চিঠিতে মনে হোলো আপনি।বশেষ বাড়ী থেকে বেরোন না।···আচ্ছা, আমরা ঠিক ছ'টার সময় যাবো। আমেরিকানটিকে এ কথা জানাবার দরকার নেই।···আচ্ছা···বিদায়।"

সেদিন ছিল বসন্ত কালের সন্ধ্যা। ছোট রাইডার ষ্ট্রীটেও সেদিন অস্তগামী সূর্য্যের সোনালী আভায় অপরূপ শোভা। যে বাড়ীতে আমরা গেলাম সেটা একটা পুরোনো ধরণের মস্ত বাড়ী। নীচের তলায় মস্ত মস্ত দুটো জানালা। এই এক তলাতেই আমাদের মক্কেল থাকেন।

হোমস্ ছোট পিতলের ফলকে লেখা মিঃ গ্যারিদেবের নাম আমাকে দেখালো। লেখাটা কিছু বিবর্ণ দেখাচ্ছিল। হোমস্ মন্তব্য করল, "এটা করানো হয়েছে বেশ কিছু দিন আগে। লোকটির আসল নাম এইটেই আর সেটাই বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করবার।"

বাড়ীটির সিঁড়ি অন্য যে-কোন বাড়ীর মতই সাধারণ। বাড়ীটাকে দেখলে মনে হয় না যে, সেখানে কোন পরিবার বাস করে—অনেকটা তরুণ যুবকদের আড্ডার মত। আমাদের মক্কেলটি নিজেই দরজা খুলে দিলেন। বললেন, তাঁর ঝিটি চারটের সময় বেরিয়ে গেছে। মিঃ নাথান গ্যারিদেবের গড়ন কিছু ঢিলে-ঢালা ও লম্বা। মাথা-জোড়া টাক, আর পিঠটা একটু কুঁজো। বয়স প্রায় ষাটের কাছাকাছি। দেখতে অতি কদাকার, শরীরের ঔজ্জ্বল্য তার এত বেশি অভাব যে মনে হয়, জীবনে তিনি কখনো শরীর-চর্চ্চা করেননি। চোখে প্রকাণ্ড গোল চশমা আর তার সঙ্গে ছাগলের মত দাড়ি থাকাতে দেখতে খুব অদ্ভূত দেখাচ্ছিল। লোকটিকে দেখে কিন্তু বেশ ভদ্র বলে মনে হল।

তাঁর ঘরটিও একটু অদ্ভুত ধরণের—যেন একটি যাদুঘর। বেশ লম্বা-চওড়া—চারি দিকে শরীরতত্ত্ব ও ভূতত্ত্বের নমুনা ছড়ানো রয়েছে। দরজার দু'পাশে প্রজাপতি আর ৬টি পোকা-ভর্ত্তি কাচের আলমারী আর ঘরের মাঝখানে মস্ত একটা টেবিলে ছড়ানো আছে অজস্র রকমের জিনিষ আর সেই সঙ্গে বসানো রয়েছে শক্তিশালী মাই-ক্রোস্কোপের মত লম্বা একটা পিতলের নল। চার দিকে দেখতে দেখতে আমার কেবলি মনে হ'তে লাগল, লোকটি কত রকমের বিদ্যাই না জানে। এক জায়গায় আবার পুরোনো মুদ্রা জমা করা রয়েছে। কতগুলো লোহার যন্ত্রপাতি ভরা একটা আলমারীও আছে। ঘরের মাঝখানকার টেবিলের পেছন দিকে জীবজন্তুর ফসিলে ভর্ত্তি একটা দেরাজ। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল, লোকটি অনেক বিষয় নিয়ে পড়া-শুনা করেন। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি শ্যাময় চামড়া দিয়ে একটা মুদ্রা মুছতে লাগলেন। মুদ্রাটি আমাদের চোখের সামনে ধরে বললেন, "এটা হ'চ্ছে সাইরা কিউস দেশের। মিঃ হোমস দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ঐ চেয়ারটায় বসুন। ঐ হাড়গুলো কিসের আপনাদের বুঝিয়ে দিই। আর আপনি—হ্যাঁ ডাঃ ওয়াটসন, আপনি যদি ঐ জাপানী ফুলদানীটা ও-পাশে সরিয়ে রাখেন। এগুলো সব আমার বড় সখের জিনিষ। আমার চিকিৎসক আমাকে বেড়াতে উপদেশ দেন কিন্তু ঘরেই যখন আমার আনন্দ পাবার এত জিনিষ রয়েছে তখন বাইরে যাবার কি দরকার? এখানে এত বিভিন্ন ধরণের জিনিষ রয়েছে যে তার তালিকা প্রস্তুত করতে অন্ততঃ তিন মাস সময় লাগবে।"

হোমস্ বেশ কৌতূহলের সঙ্গে লোকটির দিকে তাকালো—"আচ্ছা, আপনি যেন বললেন যে আপনি কখনও বাইরে বেরোন না?"

"মাঝে মাঝে আমি বেরোই বটে কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই আমি বাড়ীতে কাটাই। এখন আমার সামর্থ্য কমে এসেছে, আমি আমার গবেষণা নিয়েই ডুবে থাকি। আপনি কল্পনা করুন মিঃ হোমস—আমি যখন আমার এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের কথা শুনলাম তখন আমার মনের অবস্থা কি রকম হ'ল। আর এক জন গ্যারিদেবকে পেলেই আমাদের হয়। আমার এক জন ভাই ছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে সে মারা গিয়েছে। আর মেয়ে হলে তো হবেই না। কিন্তু পৃথিবীতে আরো দু'এক জন গ্যারিদেব নিশ্চয়ই আছে। এ সব কাজে আপনার অদ্ভূত ক্ষমতা, তাই আপনাকে ডেকে এনেছি। অবশ্য আমেরিকান ভদ্রলোকটির উপদেশ নেওয়া আমার উচিত ছিল—কিন্তু আমি যা করেছি ভালোর জন্যই করেছি।"

"আপনি বেশ বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়েছেন" হোমস্ বলল,—"আচ্ছা, আপনি সত্যিই কি আমেরিকায় কিছু সম্পত্তি পাবার জন্ত ব্যাকুল?"

"নিশ্চয়ই নয়। আমি কোন কিছুর বিনিময়েই আমার এই সংগ্রহগুলো ছাড়তে রাজি নই। আমেরিকান ভদ্রলোকটি

আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন যে আর একটি গ্যারিদেব পেলেই তিনি আমার সম্পত্তি বিক্রী করে আমাকে টাকা এনে দেবেন। ৫০ হাজার ডলার ঐ সম্পত্তির দাম। টাকার আমার এখন খুবই দরকার। অনেক ভালো ভালো নমুনা বাজারে এসেছে যা জোগাড় করতে পারলে আমার সংগ্রহগুলো সম্পূর্ণ হয়, কিন্তু মাত্র কয়েক শ' পাউণ্ডের জন্ম আমি তা কিনতে পারছিনে।"

(আগামী বারে সমাপ্য)

নারীর সমস্যা

কনকলতা দেবী

আদম ও ইভকে সৃষ্টি করিয়া ভগবান দেখাইয়া দিয়াছিলেন উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্র পৃথক্। নারী নারীত্বের ও পুরুষ পুরুষত্বের একটা বিশেষ গণ্ডীর মধ্যে থাকিবে, কিন্তু নারী যদি এ সীমানা ভাঙ্গিয়া তাহার নারীধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া বলে, আমি পুরুষের মত কাজ করিব, তাহা হইলে তাহাকে হাস্যাস্পদা হইতে হইবে। সেইরূপ পুরুষও যদি অনাহুত ভাবে নারীর কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে তবে আমরা বলিব, সে অধিকার-বহির্ভূত কাজ করিয়াছে—এ কথা সকলে জানেন, বোঝেন। নারী থাকিবে পুরুষের পার্শ্বে, সুখে-দুঃখে তাহাকে দিবে সান্ত্বনা, উৎসাহ, সে হইবে তাহার সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী। সেবায় সে হইবে মমতাময়ী, কর্ম্মে জোগাইবে প্রেরণা।

প্রাচীন কালে এ আদর্শ ছিল কিন্তু এখন ইহাতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। পুরুষ আর নারীর সহযোগিতায় নির্ভর করিতে পারে না। নারী পুরুষের হাতে কখনও দেবী বনিয়া যায়, কখনও বা দাসী বনিয়া যায়। এমনই করিয়া পুরুষ তাহাকে লইয়া ছিনিমিনি খেলে। সে ঘরে বসিয়া হাতা-বেড়ী নাড়ুক, সন্তানের জন্ম দিক, বাস, আর কিছু নয়, আর চাই-ই বা কি। এই তো তুমি জননী হইলে, এই তো তোমার জন্ম সার্থক হইল। নারীর সম্মানই বা কোথায় আর তাহার প্রাপ্য অধিকারই বা কোথায়? তাই নারীর মধ্যে দেখা দিয়াছে বিপ্লবের আলোড়ন। ক্ষুব্ধ নারী বলে, তোমাদের হীন দাসত্ব আর করিব না। এত দিন তোমাদের মধুর বুলিতে ভুলিয়া নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছি কিন্তু আর নয়, দেবী হইতেও আর চাহি না, দাসী হইতেও চাহি না। আমরা চাই নারীত্বের পূর্ণ সম্মান ও অধিকার—যাহার বলে সগৌরবে তোমাদের পার্শ্বে দাঁড়াইতে পারিব, সেই অধিকার দাও। এ তাহাদের ন্যায্য কথা, এখানে দোষের কিছু তো দেখিতে পাই না। স্বয়ং ভগবান ইভকে পাঠাইয়াছিলেন আদমের সহচরী করিয়া, পাঠান নাই দাসী হিসাবে কেবল পরিচর্য্যার জন্য।

কিছু দিন পূর্ব্বে একটি দৈনিক পত্রিকায় পড়িলাম, নারী না কি স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচার চাহে? এখানে একটু ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। নারী পুরুষের নির্ম্মম শাসনের চাপে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে সে স্থির ভাবে ভাল-মন্দ বিবেচনা করিয়া দেখিবার পর্য্যন্ত অবসর পায় নাই। তাই সে মরীচিকার পিছনে ছুটিয়াছে। বন্দী চাহে মুক্তি, সে মুক্তি বিশ্বের সমস্ত বিপদকে জড় করিয়া তাহার ভবিষ্যৎ জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠে উঠুক, কিন্তু চাই মুক্তি—অনাস্বাদিত মুক্তি। সেইরূপ অবরোধ-বাসিনী নারী আর চাহে না গৃহকোণে বদ্ধ থাকিতে। সে শুনিয়াছে, পাশ্চাত্যের নারী-সমাজের কথা। সে দেশের নারী-স্বাধীনতা তাহাকে যে এ অবস্থায় প্রলুব্ধ করিয়া তুলিবে ইহা তো স্বাভাবিক। সে জানে, পাশ্চাত্যের নারী স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচার ব্যতীত আর কিছু নহে কিন্তু হোক স্বেচ্ছাচার, শৃঙ্খল অপেক্ষা তাহাই শতগুণে শ্রেয়ঃ। নারীর এ ব্যাকুলতা ক্ষমার্হ। সমাজ যদি আজ তাহার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে তবে নারী কখনই বিদ্রোহিনী হইবে না। সে হইবে আদর্শ—যাহাদের কথা আমরা কেবল মাত্র কল্পনা করিতে পারি—বাস্তবে দেখি না। এক দল পুরাতনপন্থী, নারী-প্রগতির বিরোধী দেশহিতৈষী দেখা যায় যাহারা নারীর অন্তরের কথা বুঝিয়া দেখেন না। যাহা হউক, তাঁহারা পুরুষ নারীর কথা ভাবিবেন কি করিয়া? কিন্তু আজকাল কাগজে পড়িতেছি, বহু নারীও প্রগতির অর্থ না বুঝিয়া নারীর বিপক্ষে লিখিয়া থাকেন। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীরই হউন আর বিংশ শতাব্দীরই হউন, নারী হইয়া নারীর আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা যদি দরদের সহিত বুঝিবার চেষ্টা না করেন তাহা হইলে বলিব—"দুর্ভাগিনী নারী, তোমার মুক্তি নাই!"

অনেকে বলিয়া থাকেন, মেয়েমানুষের লেখাপড়া শিখিয়া কি লাভ? সে তো আর জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইবে না, ঘরে বসিয়া তাহাকে তো হাতা-বেড়ীই নাড়িতে হইবে? ইহার উত্তরে কাগজে কাগজে বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এ সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু বলিবার নাই; শুধু এইটুকুই বলিতে চাই যে, নারী সুশিক্ষিতা না হইলে দেশের কল্যাণ নাই। অবশ্য বর্ত্তমানে শিক্ষা বলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর কথাই মনে পড়ে; কিন্তু ইহাও ঠিক যে, যত দিন না নারীর যথার্থ শিক্ষা—যাহার দ্বারা সে জাতীয় জীবনে প্রতিষ্ঠা ও মঙ্গলের আসন স্থায়ী করিতে পারে তত দিন এই ডিগ্রী লাভের চেষ্টা করা কিছুমাত্র অন্যায় ও অসঙ্গত নহে; অন্তত: গৃহের চারিটি দেওয়ালের মধ্যে বদ্ধ থাকিয়া পরচর্চ্চা, পরনিন্দা, হিংসা, দ্বেষ, কলহ দ্বারা মূল্যবান্ জীবনের প্রতিটি স্বর্ণ মুহূর্ত্ত নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। আবার পণপ্রথা হেতু মধ্যবিত্ত ঘরের বহু বিবাহযোগ্যা কন্যা অবিবাহিতা থাকিয়া যায়। তাহারা (বিধবাদের কথাও উল্লেখযোগ্য) আত্মীয়-পরিজনদের গলগ্রহ না হইয়া যদি উপার্জ্জন করিয়া নিজের অন্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারে তাহা হইলে তো ভালই। এ জন্য পুরুষের চাকুরীক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহারা যে নিরুপায় হইয়াই এ পথ অবলম্বন করে একথাও ভাবিতে হয়। অভাবের সংসারে কিছু স্বচ্ছলতার জন্য যদি কন্যা চাকুরী করিতে যায় তবে তাহা কিছুমাত্র দোষের নহে। সে স্বেচ্ছানুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে নামে না, কারণ নারীর অন্তরের সঙ্গোপনে লুকাইয়া আছে এক শাশ্বত পিপাসা। একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন সংসার, স্বামি-পুত্র লইয়া জীবন-তরী ভাসাইবার এক অদম্য ইচ্ছা—এই নতুন জীবনের কত স্বপ্ন, কত কল্পনা তাহার চিত্তাকাশে রঙীন হইয়া ওঠে। নারীর চিরন্তনী রূপ এখানেই।

এখন আর একান্নবর্ত্তী সংসার বড় বেশী দেখা যায় না, নাই বলিলেও চলে। স্বামি-স্ত্রী পুত্র-কন্যা লইয়া ক্ষুদ্র সংসারের সামান্য চাহিদা। তবে স্বামি-পুত্র যদি দূরে যান কিম্বা না থাকেন তাহা হইলে প্রয়োজনের খাতিরেই নারীকে বাহির হইতে হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত দৈনিক পত্রিকার লেখিকাটির কথামত এই জন্যই মুক্ত ভাবে বিচরণ করিতে হয়। লেখিকার এই অভিমতটির পশ্চাতে কেমন যেন একটি দুষ্ট ইঙ্গিত আছে। ভদ্র নারী অসৎ অভিপ্রায়ে ঘুরিয়া বেড়ান না

বেড়ান প্রয়োজনের তাগিদে, এ কথা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই। এই বিংশ শতাব্দীতে জড়ভরত হইয়া সাত হাত ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকিলে চলে না। পুরুষ এরূপ নারীকে তো রীতিমত অপছন্দ করে, অধিকন্তু আপ-টু-ডেট্ নারীমাত্রই চলন্ত লগেজস্বরূপ। বিজ্ঞানের যুগে নারী হইবে চটপটে, সর্ব্ব কার্য্যে পারদর্শিনী। চারটি দেওয়ালের বাহিরে যে একটি উদার বিচিত্র জগৎ আছে তাহার নিত্য-নূতন খবরাবর জানিয়া রাখিতে হইবে, আর পাঁচ জনের সহিত মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিতে হইবে। স্বীকার করি, নারীর কাজ গৃহেই বিকাশ পায় কিন্তু বাহিরটাও তো দেখিতে হইবে।

ইহার পর আমরা নারীর বিবাহ-সমস্যা লইয়া আলোচনা করিব। এ শুধু আলোচনাই—সমস্যার সমাধান কবে যে হইবে! পূর্ব্বোক্তা লেখিকাটি বলিয়াছেন, বর্ত্তমানে বহু নারী ইচ্ছানুরূপ বিবাহ করিতেছেন। এই ইচ্ছানুরূপ বিবাহের প্রচলন যে কেন হইতেছে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। বয়ঃপ্রাপ্তা নারী ও পুরুষ পরস্পরের মধ্যে একটি সহজ আকর্ষণ অনুভব করিবেই ইহা বয়সের ধর্ম্ম, সুতরাং তাহাদের মধ্যে প্রেম হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। বিবাহযোগ্যা কন্যা যাহাকে পতিরূপে কামনা করে, তাহারই সহিত বিবাহ দেওয়া পিতা-মাতার কর্ত্তব্য। হিন্দুশাস্ত্রই তো বলিয়াছে—

ত্রীণি বর্ষাণ্যদীক্ষেত কুমার্য্যৃতুমতী সতী।
ঊর্দ্ধং তু কালাদেতস্মাদ্বিন্দেত পতিম্।—মনু, ৯।৯০

"কন্যা ঋতুমতী হইবার পর তিন বৎসর অপেক্ষা করিবে। তাহার পর স্বজাতীয় সমান গুণবিশিষ্ট পতি বরণ করিবে।" সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, যুগ-মাহাত্ম্যে এবং বিশেষ করিয়া পণপ্রথার জন্য কন্যা বিবাহের বয়স অতিক্রম করিতেছে, অতএব তাহার অভিপ্রায় অনুসারে বিবাহ দেওয়া উচিত। তবে এ প্রথা উঠাইয়া দিবার ইচ্ছা করিলে, সমাজের কর্ত্তব্য, পণপ্রথার মূল উৎপাটন, নতুবা অন্য কোন উপায় নাই এবং কন্যারও কিছুমাত্র দোষ নাই।

অনেকে অনুযোগ করেন, আধুনিকাদের মধ্যে অনেকে সাংসারিক দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতে চায়। এ সম্বন্ধে আমাদের মনোভাব অন্য প্রকার। আমাদের দেশের মেয়েরা—তা তাহারা যতই প্রগতি করুক না কেন, এত দূর পর্য্যন্ত অগ্রসর হয় নাই, এ বিষয় আমরা নিঃসন্দেহ। তবে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই দল আছেন, এক দল গৃহকর্ম্ম দেখেন, গৃহদেবতার সেবা করেন, দীন-দরিদ্রকে খাওয়াইয়া পুণ্য সঞ্চয় করেন এবং পুত্র-কন্যা ও বারো মাসে তেরো পার্ব্বণ লইয়া ব্যস্ত থাকেন। অপর দল শুইয়া-বসিয়া সময় কাটান, সিনেমা থিয়েটার দেখিয়া আনন্দলাভ করেন, আর বেশি কথা কি, বটতলার নাটক-নভেল পড়িয়া, সভা-সমিতিতে যোগ দিয়া বেশ দিনগুলি কাটাইয়া দেন। এই শেষোক্ত দলের সংখ্যা অল্প। এই অল্পসংখ্যক নারীদের কথা ভাবিবার আমাদের প্রয়োজন কি? আমাদের বৃহত্তর সমাজে মধ্যবিত্ত ও গরীব গৃহস্থদের সংখ্যাই বেশী—তাহাদের মঙ্গলা মঙ্গল লইয়া আমাদের সমস্যা। তাহাদের ঘরের মেয়েরা ঠেকিয়া শিখিয়াছে, স্বর্ণযুগের পশ্চাতে তাহারা ছুটিয়া বেড়ায় না, ছুটিবার মত অখণ্ড অবসরও তাহাদের নাই। সুতরাং সংসারের দায়িত্ব ত্যাগ করিবার কথা তাহারা স্বপ্নেও ভাবে না। দু'-একটি স্বপ্ন-বিলাসিনী, ভাবপ্রবণা নারী যদি কখনো বাহির-বিশ্ব লইয়া অত্যধিক মাতিয়া ওঠে তবে সংসারের ভার লইবার পর সে স্বপ্নবিলাসটুকু অদৃশ্য হয়। মধ্যবিত্ত গরীব গৃহস্থ সংসারে আকাশ-কুসুম রচনা করিবার মত সময় কোথায়?

নারীর মেধা আছে, প্রেরণা আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু তাহা অব্যবহৃত থাকিয়া জড়-ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বহু কালব্যাপী অবরোধের ফলে নারী শক্তি, সামর্থ্য সব-কিছুই হারাইয়া গৃহকোণ আশ্রয় করিয়াছে। ইহা ফিরিয়া পাইতে হইলে সাধনা চাই—শিক্ষা চাই—সময় চাই আর চাই—সমাজের অনুকূলতা—সমাজের সাহায্য। কিন্তু এখানেই যে মুস্কিল, সমাজ যে তত দূর উদারতা দেখায় না। নারী তাহার সঙ্কীর্ণ পরিবেষ্টনী ছিন্ন করিয়া মহত্তর সত্যের অনুধাবন করিতে আন্তরিক ব্যাকুল। জনগণ তাহাদের সাহায্য করুক, সমাজ তাহাকে অভয় দিক—তাহার পথ সুগম করিয়া দিক, তবেই নারী-সমাজের মধ্যে জাগরণ দেখা দিবে—সকল সমস্যার সমাধান হইবে। এ সকল বিষয় তো কেহ চিন্তা করিবে না, কেবল নারীকে শাসন করিবার চেষ্টা—শৃঙ্খলিত করিয়াই সকলের আনন্দ। নারী যদি সমাজের নাগপাশ ছিঁড়িয়া মুক্তি পাইতে চাহে অমনি সমাজ চোখ রাঙ্গাইয়া বলিবে—"স্বেচ্ছাচারিণী নারী, দণ্ড দাও ইহাকে।" নারীর প্রতি এতটুকু সহানুভূতি নাই। সমাজ তাহার শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে না, কেবল বন্দিনী করিয়া রাখিতে চাহে।

তাই বলি, নারীকে বুঝিতে শিখুন সকলে, সামান্য দোষগুলি উদার হৃদয়ে ক্ষমা করুন কিম্বা দোষের প্রতিবিধান বাৎলাইয়া দিন। দেখিবেন, নারী তার ভুল বুঝিতে পারিবে আর তাহা শোধরাইবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে। নারী পুরুষ অপেক্ষা সুন্দর শিক্ষাটি তাড়াতাড়ি গ্রহণ করিয়া কাজে লাগাইতে পারে। তাই আবার বলি, আপনারা নারীকে যথার্থ শিক্ষা দিয়া আপনাদের সহকর্মিণী করিয়া লউন; ইহাতে আপনাদের মঙ্গল বই অমঙ্গল হইবে না, এ কথা স্থির নিশ্চিত জানি। নারী তাহার নারীত্বের মহিমা লইয়া সমাজ গঠনে সহায়তা করুক, ইহা ভিন্ন আর কোন প্রার্থনা আমাদের নাই।

রাখি

বিভা সরকার

গোধূলির স্তিমিত মমতা রজনীর মায়াময় গেহ
রজনীগন্ধার গন্ধ যূথিকার অকলঙ্ক স্নেহ
যা কিছু সুন্দর প্রিয় যা কিছু অরূপ
কল্পনার নানা রংয়ে ফোটায়ে তুলেছে তব রূপ।
চম্পকের বনে একা
বলে কারা কানে কানে পাবে বুঝি চঞ্চলের দেখা
দিগন্তের প্রান্তে আনি,
বনান্ত দিয়েছে সেথা আপনার সীমা-রেখা টানি।
দখিণার মৃদু গুঞ্জরণে, সেইখানে বসিয়া একাকী
নিজ হাতে রচিয়াছি তোমারে পরাতে এই রাখি।
পলাশের রং এ তো নয়! অস্তরবি হার মেনে গেছে
কৃষ্ণচূড়া সরমে লুকালো, অশোক সে লজ্জায় ঝরেছে।
হৃদয়ের রক্তে রাঙ্গা রাখি—
আসে নাই শুভ লগ্ন আজিও পরাতে আছে বাকি।

পতাকা

কুমারী প্রতিভা ঘোষ

আমার প্রিয় ভাই-ভগিনীরা, আমাদের পবিত্র জাতীয় পতাকা সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র আখ্যায়িকায় তোমাদের কিছু বলব। আমরা ঘরে, সভায়, শোভাযাত্রায় পতাকা উত্তলোন করি, নানা ধ্বনি উচ্চারণ করি, কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেকেই জানে না আমাদের পবিত্র পতাকার প্রকৃত সম্মান কি ?

পতাকা তার জাতির স্বপ্ন, আদর্শ, তার জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমাদের ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয় নাই, যদিও তাহা আমাদের ভাবাদর্শের প্রতীক। তাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্ত কত শহীদ কত বীর পূজারী আত্মাহুতি দিয়েছে। বাস্তবে পরিণত হয়নি, কারণ এখনও বৃটিশ রাজের পতাকা সারা ভারতবর্ষে শোভা পাচ্ছে। ভারতের বাহিরেও অন্ত বিদেশীয়েরাও union Jack কেই ভারতের পতাকা বলেই জানেন। আমাদের পতাকা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলা চলে—"মা কি হবেন।"

১৯৩১ সাল ২৬শে জানুয়ারী সকালবেলা। কলিকাতা কর্পোরেশনের তনানীন্তন মেয়র স্থির করলেন বৃটিশের বলদর্পী ১৪৪ ধারা আইন ভঙ্গ করে জাতীয় স্বাধীনতা দিবসে কর্পোরেশন ষ্ট্রীট দিয়ে একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করবেন এবং সেই শোভাযাত্রার পুরোভাগে থাকবেন তিনি স্বয়ং। তিনি তাঁর এক সুযোগ্য সহকর্ম্মী ও বন্ধুকে নির্দ্দেশ দিলেন যে যদি তিনি (মেয়র) গ্রেপ্তার হন তা'হলে সহকর্ম্মী যেন সেই শোভাযাত্রার নেতৃত্ব গ্রহণ করেন অথবা তাঁর নিজের ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য করেন।

যথাসময়ে শোভাযাত্রা বাহির হল; পুলিশ বিস্ময়ে দেখল শোভাযাত্রার পুরোভাগে দুই হাতে দুইটি ক্ষুদ্র ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা লয়ে স্বয়ং মেয়র চৌরংগীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন। পুলিশের লাঠিচার্জ্জ সুরু হল। ইতিমধ্যে মেয়রের সেই সহকর্ম্মী বন্ধুও স্থির থাকতে না পেরে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে পুরোভাগে যাবার চেষ্টা করেছিলেন, তিনি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলেন, মেয়রের মাথায় লাঠি-বৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু তৎসত্বেও মানুষের চিরন্তন আত্মরক্ষা প্রবৃত্তি (Instinct) তিনি সহজেই দমন করে এগিয়ে চলেছেন! দুই হস্তের পতাকাগুলি আপন মহিমায় উন্নত হয়ে রয়েছে। সহকর্ম্মী তাঁর পাশে চলতে চলতে মেয়রের উদ্দেশ্যে বললেন—"আপনি এ কি করছেন ?" উত্তর দিলেন না মেয়র, কেবল তিনি তাঁর আয়ত আঁখির বিহ্বল দৃষ্টি সহকর্ম্মীর মুখের পরে ফেললেন। পুনরায় একই প্রশ্ন হ'ল "এ আপনি করছেন কি ?"

মেয়র গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, "কি করব ?" অধৈর্য্য স্বরে সহকর্ম্মী বললেন—"লাঠির মারগুলো অন্ততঃ হাত দিয়ে আটকান।" অদ্ভুত স্মিত হাস্যে মেয়র তাঁর মহিমান্বিত কণ্ঠে সহকর্ম্মীকে বললেন—"তা কি হতে পারে ? তা হয় না সত্য বাবু; তা হলে আমার দেশের মান-সম্ভ্রম আমার জাতির আদর্শ ধূলায় লুটিয়ে পড়বে, আমার জাতীয় পতাকা আমার আহত হাত থেকে রাস্তায় পড়ে যাবে আর সেই পতাকা বিদেশী তার মদগর্ব্বী উদ্ধত চরণে মাড়িয়ে যাবে। সে হয় না সত্য বাবু! তার পর আহত হয়ে তিনি লুটিয়ে পড়লেন রাস্তার উপর এবং হলেন বন্দী।

সেই পতাকাবাহী মহাপুরুষের নাম কি জান ? তাঁর নাম—নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁর সেই সুযোগ্য সহকর্ম্মী-বন্ধু প্রসিদ্ধ স্বদেশসেবক শ্রীসত্যরঞ্জন বক্সী।

নেতাজীর এই ক্ষুদ্র ঘটনা থেকে বুঝতে পারি, তাঁর কাছে তাঁর জাতীয় পতাকা তাঁর জাতীয় মান-সম্ভ্রম কত উচ্চে ছিল। তিনি যে পথ যে আদর্শ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন সেই নির্দ্দেশিত পথেই যেন আমরা চলি, সেই আদর্শকে যেন পূজা করি। জয় হিন্দ্।

—

ধানক্ষেত

ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী

চলন্ত ট্রেণের কক্ষে মুক্ত বাতায়নে বসি,
চেয়ে চেয়ে হই আত্মহারা।
সহস্র যোজন জুড়ে বিস্তৃত এ শ্যাম বসুন্ধরা।
বক্ষ তার আন্দোলিছে পরিপূর্ণ স্বর্ণ-শস্য-ভারে,
প্রভাতের শান্ত বায়ে মধ্যাহ্নের খর রৌদ্র-করে।
অপরাহ্নের মেদুর ছায়ায়;
মেঘ-মুক্ত বর্ষা-রাতে, পূর্ণ চন্দ্রিমায়।
উন্মুক্ত প্রান্তর-তলে সুবিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র আহা মরি মরি!
শ্যামল সুবর্ণ বিভা রূপময়ী নবোদ্গতা ধানের মঞ্জরী।
চলমান বাষ্পযান ছোটে অবিরাম;
নূতন দিনের সেই মাঠে-জাগা নূতন অতিথি;
বাতাসে নোয়ায় শির আমাদের জানায় প্রণাম।
হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া বহে;
হৃদয়-বৃন্তের স্ফুট মল্লিকা;
উল্লসিত হয়ে ওঠে; সমিধ সংগ্রহে।
মনের নিভৃতে আনে, সৌন্দর্য্যের সম্পদের ডালিখানি বহে।
মুক্তরূপা শ্যামাঙ্গিনী উচ্ছ্বসিত শ্যাম সমারোহে।
তবু শুনি, সৃষ্টি-জোড়া হা-হুতাশ, নেই চাল-ধান;
দুর্ভিক্ষ আগত দ্বারে যেন উদ্যত কামান!
প্রহরি-বেষ্টিত ওই আসিছে ভয়াল;
জন্ম আছে, মৃত্যু আছে, শুধু নেই ধান-চাল।
অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, অস্ত্র নেই, বিভ্রান্ত বাংলা।
সচকিত মন তবু স্বপ্ন দেখে;
প্রভাতের শান্ত সূর্য্যোদয়ে;
প্রদোষের ক্লান্ত অস্ত-ছায়ে;
একান্ত নিজস্ব ধন, গোলা-ভরা ক্ষেত-ভরা শস্য সুশ্যামলা।
বিশ্ব-জোড়া নেই নেই; প্রান্তরের প্রান্তে তবু;
শস্যময়ী বসুন্ধরা হাসিয়া আকুল।
ট্রেণ চলে, আমি দেখি, স্বর্ণ-শস্যে পূর্ণ ক্ষেত;
সীমাহীন বিশাল বিপুল।

—শিল্পী শৈলেন দাশ

আধুনিক নারীর সমস্যা

শ্রীনন্দিতা দাসগুপ্তা

যুগ তার নূতন বার্ত্তা নিয়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার সাথে সাথে এসেছে বর্ত্তমান যুগের বহু নূতন সমস্যা।

নারী-শিক্ষা বর্ত্তমান যুগের একটি বিশিষ্ট অবদান, কিন্তু শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্যের সাথে সে প্রয়োজনবোধকে বহু পরিমাণে বাড়িয়েছে।

একটি বালিকা যতই নারীত্বের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হতে থাকে ততই তার মনের মাতৃত্ববোধ এবং যৌনস্পৃহাও স্বভাবের নিয়মেই বর্দ্ধিত হয়ে ওঠে। আত্মনিপীড়ন করে হয়তো তাকে সাময়িক ভাবে দমন করে রাখা যায়, কিন্তু নিগৃহীত স্বভাব মাঝে মাঝে তার অস্তিত্ব স্মরণ করিয়ে দিতে কসুর করে না। নারী বিবাহিতা হ'লে সুশৃঙ্খলায় এবং সামাজিক নিয়মে তার সকল স্পৃহা চরিতার্থ হয়ে তাকে বৃহত্তর পরিণতির পানে অগ্রসর হবার সুযোগ দেয়।

কিন্তু আজকাল অভিভাবকেরা এই স্বাভাবিক পরিণতির পানে কন্যাকে অগ্রসর করে দিতে বহু বাধা এবং প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে পড়েন। পূর্ব্বে যত সহজে কন্যাকে পাত্রস্থ করা যেত এখন আর তা যায় না। প্রথমতঃ কন্যার শিক্ষা উপযোগী এবং রুচি অনুযায়ী পাত্র নির্ব্বাচন করা চাই। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ শিক্ষিতা নারীই তাঁদের মা-ঠাকুমার মতন বাসন-মাজা রান্না ইত্যাদি যাবতীয় গৃহস্থালীর কাজ স্বহস্তে করতে পশ্চাৎপদ হন। তার কারণ, তাঁদের সে স্বাস্থ্যও নেই এবং পটুতাও বিরল। সংসারের কাজ চাকর বা ঝি বিহনে চালাতে হলে তাঁরা চোখে অন্ধকার দেখেন। কিন্তু তার পূর্ব্বে চিন্তা করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে কয় জন শিক্ষিত যুবক এই আর্থিক সমস্যার দিনে চাকর-ঠাকুর দিয়ে সংসার চালাতে সক্ষম? কাজেই শিক্ষিতা ও সুন্দরী পত্নীকে কল্পনায় রেখে তাঁরা সংসার করাকে যত দিন সম্ভব এড়িয়ে চলতেই চান।

সহর হতে পল্লীগ্রামে জীবন যাপন করা অনেক অংশে সহজ, কিন্তু পল্লী-সৌন্দর্য্যকে পাঠ্য পুস্তকের মাঝে আবদ্ধ রেখে, সিনেমা ও সহপাঠীদের সাথে নিজের জীবনের তুলনামূলক সমালোচনাতেই আমরা কাটিয়ে দিতে চাই। স্বামীর স্বল্প আয়ের মধ্যে সুন্দর ভাবে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে জীবন যাপন করার শিক্ষা আমাদের কোনও Syllabus-এর মধ্যেই নেই।

অনেক শিক্ষিতা নারীর মনের ধারণা যে, তার কুমারী-জীবনের অর্জ্জিত শিক্ষাকে তিনি স্বামীর সাংসারিক সাহায্যের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেন। কিন্তু তাতে পুরুষের স্বভাবোচিত-গৌরববোধকে অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ করা হয়। পুরুষ ও নারী উভয়েই যদি নিজের শক্তি বাইরে অপচয় করে আসে তাহলে সংসারে সেই শ্রান্তি অপনোদনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে কে?

সংসারকে গড়ে তোলবার দায়িত্ব নারীর প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট দায়িত্ব। অনেকে হয়তো ইতিহাস-প্রসিদ্ধা বীরাঙ্গনা বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিতা নারীর নাম উল্লেখ করে বলবেন যে তাঁরা সাংসারিক জীবনে সুনাম অর্জ্জন করা থেকেও অনেক বৃহত্তর পরিণতির মাঝে সিদ্ধিলাভ করেছেন; কিন্তু সেই মুষ্টিমেয় নারীর সংখ্যা সংসারে অতি অল্প। তাঁরা শুধু অসাধারণ নয় তাঁরা অনন্যসাধারণ।

আমাদের এখনকার ধারণা যে, হিন্দু-শাস্ত্রকারের কতকগুলি শূন্যগর্ভ বুলি এবং শিক্ষা পরকালের দোহাই দিয়ে হিন্দু নারীকে আবদ্ধ করে গেছেন। অবশ্য নব যুগের সবগুলি অবদানই যে কুফল-প্রসবী তা বলার উদ্দেশ্য আমার নয়, তবে হিন্দু-শাস্ত্র পুরুষ এবং নারী উভয়েরই জন্য ভোগ থেকে ত্যাগের পথটাই বেশী করে নির্দ্দেশ করে গেছেন। হিন্দু নারী এখনও সেই পথটাকে মনে মনে স্থান দিয়ে রেখেছে বলে আজও হিন্দুর মর্ম্মস্থল কিছুটা সুরক্ষিত রয়েছে। পাশ্চাত্য নারীর যে অকুতোভয়তা, আর্থিক স্বাধীনতা-প্রিয়তা আমাদের আকৃষ্ট করে, তার ফলে সে দেশে পুরুষের প্রতি নির্ভরতা-বোধ লুপ্ত হয়ে গিয়ে জেগেছে শুধু প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষ। আমাদের দেশে সেটা এখনও পূর্ণ ভাবে স্থান পায়নি বলে এখনও আমরা নারীকে মা এবং বোনের মত দেখা আদর্শ বলে মনে করি, কিন্তু সে দেশে নারী ও পুরুষের মাঝে 'বন্ধু' ভাবটাই বেশী।

দি গুড্ আর্থ

শিশির সেনগুপ্ত
জয়ন্তকুমার ভাদুড়ী

এখন মনে হয় জীবনের সকল কামনাই পূর্ণ হয়েছে। এখন হাবা মেয়েটিকে নিয়ে চেয়ার টেনে গড়গড়া খাওয়া আর রোদ পোহানর সময় হয়েছে তার। মাঠের কাজ চলেছে অনায়াসেই—টাকাও আসছে মুঠো-ভর্তি।

এমনি পরম নিশ্চিন্তেই হয়ত দিন কাটত। কিন্তু বড় ছেলেটি যা আছে তা নিয়ে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়—সব সময় তার আরোর জন্ম থাকতি। এক দিন সে বাপের কাছে গিয়ে বললে—'এটা-ওটা অনেক কিছু প্রয়োজন বাড়ীতে। এ প্রাসাদের ভিতর-মহলগুলি নিয়ে থাকি বলেই বড় পরিবার নই আমরা। আর ছ'মাসের মধ্যেই ছোট ভায়ের বিয়ে হবে। অতিথিদের বসবার মত অনেক চেয়ার নেই আমাদের, টেবিলে দেবার মত বাটিও নেই—ঘরগুলির আসবাব-পত্রও যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া, অতিথি-অভ্যাগতরা বাহির-মহলের হট্টগোল আর গায়ে বোঁটকা গন্ধ ছোটলোকদের ভিড় ঠেলে অন্দর-মহলে ঢুকবে, এ ত অত্যন্ত লজ্জার বিষয়। ছোট ভায়ের বিয়ে হলে তার আর আমার ছেলেদের জন্ম বাহির-মহলটাও চাই।'

ঝক্‌ঝকে পোষাক গায়ে দিয়ে ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে সামনে—সে দিকে একবার মাত্র তাকিয়ে চোখ বুঁজে গড়গড়ায় জোরে জোরে কয়েকটা টান দিয়ে গর্জে উঠল ওয়াঙ,—'সব সময় তোমার একটা-না-একটা বায়না লেগে আছেই।'

ছেলেটি দেখল বাপ তাকে নিয়ে ক্লান্ত হয়ে উঠেছে। তবু সে জেদের সঙ্গে বললে—গলার স্বরটাও এক পর্দা চড়িয়ে—'বাহিরের মহলটাও আমাদের দরকার। আমাদের মত এত জমি-জমা আর টাকাকড়ির মালিক যারা তাদের প্রয়োজনের উপযুক্ত সব কিছু থাকা উচিত।'

ওয়াঙ গড়গড়ার নল মুখেই বিড়-বিড় করে বললে—'জমি আমার—নিজে ত এক দিনও জমিতে গতর খাটাওনি।'

ছেলেটি প্রতিবাদ করে উঠল—'আপনিই ত আমাকে পড়ুয়া তৈরী করেছেন। আমি যখন কৃষক-বাপের উপযুক্ত হ'তে চেষ্টা করি আপনিই ত আমাকে আর আমার বৌকে চাষা আর চাষী-বৌ বলে ঠাট্টা করেন।'

ছেলেটি রাগে গর-গর করতে করতে চলে গেল এবং এমন ভাব দেখালে যে উঠোনের পাইন গাছে মাথা ঠুকে মাথা ভেঙ্গে ফেলবে।

ওয়াঙ ভয় পেয়ে গেল। কি জানি ছেলেটির যা' রাগ হয়ত নিজের কোন ক্ষতিই করে বসবে। তাই সে তাকে ডেকে বললে—'বেশ, যা' ভাল বোঝ কর—কেবল আমায় আর এ-সব নিয়ে জ্বালাতন কোরো না।'

এ কথা শুনে ছেলেটি খুশী হয়ে দ্রুত পায়ে সরে পড়ল সেখান থেকে—পাছে আবার বাপের মত বদলায়। যত শীগ্‌গির পারলে সুচাও থেকে কিনে আনলে কাজ-করা টেবিল-চেয়ার, দরজায় টাঙানোর জন্ম লাল সিল্কের পর্দা, বড়-ছোট ফুলদানি, দেয়ালে টাঙানোর জন্ম পট—বেশীর ভাগই সুন্দরী মেয়ের ছবিওয়ালা পট—দক্ষিণে যেমন দেখেছে তেমনি কৃত্রিম পাহাড় তৈরী করার জন্ম অদ্ভুত অদ্ভুত সব পাথর আনালে। এই ভাবে সে কয়েকটি দিন নিজেকে ডুবিয়ে রাখলে নীরেট ব্যস্ততায়।

এই সব কাজে যাওয়া-আসার জন্ম বহু বার তাকে বাহির মহল অতিক্রম করতে হয়েছে,—হয়ত দিনের পর দিন। কিন্তু সে নাক না সিঁটকে একবারও ছোটলোকদের পাশ দিয়ে যেতে পারেনি। ছেলেটি কোন মতেই সহ্য করতে পারে না এদের। আর যারা সেখানে বাস করে তারাও সে চলে গেলে পিছনে বক্র হাসি হেসে বলে—'ছেলেটা দেখছি তার বাপের কুঁড়ের দাওয়ার কাদা-গোবরের গন্ধের কথা ভুলেই গেছে।'

কিন্তু কারুরই তার মুখের উপর সে-কথা বলার সাহস হোল না। বড়লোকের ছেলে সে। ভোজের সময় এলে বাহির-মহলের ঘরের ভাড়া নতুন করে ঠিক হোল। ছোটলোকেরা দেখল, তাদের ঘরের ভাড়া অস্বাভাবিক বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং যখন তারা আরো দেখল যে, সে ভাড়াতেও ঘর নেবার লোক আছে তখন তারা ঘর ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র সরে গেল। পরে তারা জানতে পারল ওয়াঙের বড় ছেলেই এ কাজ করেছে—মুখে যদিও সে কোন কথা বলেনি। বিদেশে প্রবাসী লর্ড হোয়াঙের ছেলেদের কাছে চিঠি লিখে তলে তলে সে কাজ হাসিল করেছে। আর তারাও এই পুরানো বাড়ীর জন্যে যেখান থেকে মোটা টাকা পাবে সে টাকা পেলেই খুশী আর কিছু চায় না।

গরীব ভাড়াটেরা বাড়ী ছেড়ে দিতে বাধ্য হোল। তারা গালমন্দ আর শাপ-শাপান্ত করতে করতে ছেঁড়া পুঁজিপাটা নিয়ে রাগে ফুলতে ফুলতে চলে গেল। নিজেদের মনেই বিড়-বিড় করতে লাগল—এক দিন তারাও ফিরে আসবে এখানে। ধনীদের ধনের গরব বাড়লে গরীবরা যেমন ফিরে আসে।

কিন্তু ওয়াঙ এ-সবের বিন্দু-বিসর্গও জানল না। এখন সে রাত-দিন অন্দর-মহলে থাকে। কদাচিৎ বাইরে আসে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে আয়েসও বেড়েছে—বড় ছেলের হাতেই সে সব ছেড়ে দিয়েছে। ছেলেরা ছুতোর রাজমিস্ত্রী ডেকে ঘরগুলির সংস্কার করলে। ছোটলোকদের বিশ্রী জীবন যাপন প্রণালীতে দুই মহলের মাঝখানে যে চাঁদ ফুয়ারাটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল সেটাকে আবার তৈরী করালে—দীর্ঘিকাগুলি পুনর্নির্মিত করে তাতে ফুটকাটা আর লাল মাছ ছেড়ে দিলে। সৌন্দর্য সম্বন্ধে তার যতটুকু ধারণা আছে সেমত সংস্কার সমাধা হলে বড় ছেলে পুকুরে পুকুরে পদ্ম আর সাঁপলা লাগালে। ভারতবর্ষের বাঁশ আর দক্ষিণে ভাল যা-কিছু দেখেছে মনে পড়ল সব এনে হাজির করল ছেলেটি। বৌ এসে তার কাজ দেখল। তার পর তারা দু'টিতে মিলে প্রত্যেক ঘরে ঢুকে ঢুকে সব দেখল। বৌ এটা-ওটা খুঁত ধরতে লাগল আর ছেলেটি খুব মনোযোগের সঙ্গে বৌ-এর মন্তব্য শুনতে লাগল, যাতে পরে তার রুচিমত পরিবর্তন সাধন করতে পারে।

সহরের লোকেরা ওয়াঙের বড় ছেলের কীর্তির কথা শুনল। বড়-বাড়ীতে যা যা হয়েছে তা নিয়ে আলোচনা চলতে লাগল। হ্যাঁ, এত দিনে সত্যিই সেখানে এক জন ধনী লোক বাস করছে। লোকেরা যারা এত দিন বলত 'চাষী ওয়াঙ' এবার তারাই বলতে সুরু করে দিল 'ধনী ওয়াঙ' বা 'রাজা ওয়াঙ।'

এ-সব কাজের অর্থ একটু একটু করে ওয়াঙের হাত গলেই এসেছে

—কাজেই সে ঠিক বুঝতে পারেনি খরচের বহর। বড় ছেলেটি এসে বলত—'বাবা একশ রূপো চাই' অথবা বলত—'একটা গেট আছে সেটাকে সারাতে সামান্ত কিছু চাই', অথবা বলত—'উঠোনে একটা খোলা জায়গা আছে, সেখানে লম্বা একটা টেবিল থাকা দরকার।'

অন্দর-মহলে বসে তামাক খেতে-খেতে ওয়াঙ রূপো খরচ করছে একটু একটু করে। প্রতিবার ফসলেই জমি-জমা থেকে প্রচুর আমদানী হয়—সে-ও খরচও করে তেমনি দরাজ হাতে। টাকা খরচা হয়েছে ওয়াঙ জানতেই পারত না যদি না তার দ্বিতীয় পুত্র এক দিন সকালে —ভোরের আলো তখনও ভাল করে দেয়ালের উপর এসে পড়েনি—বাপকে এসে বলত—'এই টাকা খরচের কি আর শেষ নেই—আমরা কি রাজপ্রাসাদেই থাকব?' যে টাকা খরচ হোল তা যদি শতকরা কুড়ি টাকা হারে সুদে খাটান যেত তাহলে বহু রূপো ঘরে আসত। এই পুকুর, ফুলগাছ—যাদের এমন কি ফলও ধরে না—এই সব চটকদার লিলি—কি কাজে আসবে এরা?

ওয়াঙ দেখল ছেলে দু'জন এ ব্যাপার নিয়ে একটা ঝগড়া সুরু করে দেবে, বাড়ীর শান্তিও নষ্ট হবে। সে তাই তাড়াতাড়ি বলল তাকে—'এ-সবই ত তোমার বিয়ের আয়োজনের জন্যে।'

ছেলেটির মুখে দুষ্টু হাসি দেখা দিল। কোন সম্প্রীতির ভাব না দেখিয়েই বললে—'কনের খরচের চেয়ে কনের বিয়ের জন্যই দশ গুণ টাকা খরচা, বেশ মজার! তোমার অবর্ত্তমানে এ সম্পত্তি আমাদের মধ্যে সমান ভাবে ভাগ হবে। অথচ সে সম্পত্তি বড় ভায়ের চালিয়াতিতেই উড়ে যাচ্ছে।'

ছেলেটির সংকল্পের দৃঢ়তা ভাল করেই জানে ওয়াঙ। একবার তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি সুরু হলে সহজে তার শেষ হবে না। কাজেই ওয়াঙ চটপট বললে—'বেশ। আমি এর এখুনি শেষ করে দিচ্ছি। তোমার দাদাকে বলব'খন। এখন থেকে আমি মুঠো বন্ধ করলাম। ঢের হয়েছে। তুমিই ঠিক বলেছ।'

বড় ভাই যত টাকা খরচ করেছে ছোট ভাই তার একটি তালিকা তৈরী করে এনেছিল সঙ্গে। ওয়াঙ সে লম্বা ফিরিস্তির দিকে তাকিয়ে বললে—'এখনও আমার খাওয়া হয়নি। এই বয়সে সকালে যতক্ষণ পর্য্যন্ত না খাচ্ছি ততক্ষণ মাথা ঘুরতে থাকে। হিসেব অন্য সময় দেখব।' এ কথা বলে ছেলেকে বিদায় করে ওয়াঙ নিজের ঘরে চলে গেল।

সেই দিন বিকেলেই ওয়াঙ বড় ছেলেকে বলল—'এই সব সাজান-গোছান'র এবার ইতি দাও। ঢের হয়েছে। আমরা যা হোক গাঁয়ের চাষা ছাড়া ত আর কিছু নই।'

ছেলেটি গর্বের সঙ্গে জবাব দিল—'চাষা কিসের—সহরের লোকেরা ইতিমধ্যেই ওয়াঙদের বড়-ঘর বলতে সুরু করেছে। সেই নামের যোগ্য হয়ে বাস করতে হবে আমাদের। ভায়ের দৃষ্টি যদি শুধু রূপো ছাড়িয়ে আর অধিক দূর এগুতে না পারে—আমি আর তোমার বড় বৌমাই সে-নামের সম্মান বজায় রাখব।'

ওয়াঙ জানতই না সহরের লোক তাদের সম্বন্ধে কি বলাবলি করে। বুড়ো হয়ে পড়েছে সে, চায়ের দোকানেও যাওয়া হয় না তার। আর সেজ ছেলেকে শস্যের বাজারে বসিয়ে দেবার পর থেকে সেখানেও যেতে হয় না। সুতরাং ওয়াঙ মনে মনে-খুশী হয়েই বললে—'যাই বলো, বড়-বড় পরিবারের জন্ম মাঠ থেকেই—মাঠেই তাদের শিকড় থাকে।'

ছেলেটিও মুখে মুখে জবাব দিল—'সে সত্যি বটে, কিন্তু তারা কেউই সেখানে থাকে না। তারা ফলে-ফুলে নানা দিকে শাখা-প্রশাখা বাড়ায়।'

ছেলে এমনি ধারা চোখে-মুখে কথা কয় ওয়াঙের তা মনঃপূত নয়। সে বললে—'যা বলার আমি বলছি। রূপো ঢালার এই শেষ। যদি ফল দিতেই হয় শিকড়কে জমির মাটি থেকেই রস নিতে হবে।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে ওয়াঙের ইচ্ছা হতে লাগল ছেলেরা তার মহল ছেড়ে নিজেদের মহলে চলে যাক্। এই তরল অন্ধকারে তাকে নিরালায় শান্তিতে থাকতে দিক। কিন্তু বড় ছেলেকে নিয়ে তার আর একটুও শান্তি নেই। ছেলেটি এখন বাপের কথা শুনতে উৎসুক, কারণ বাহির-মহল আর ঘর নিয়ে এখন সে সন্তুষ্ট। যা চাইছিল সে করেছে। কিন্তু আবার সে সুরু করলে—'বেশ, এ সবের এইখানেই শেষ হোক কিন্তু আর একটা বিষয় আছে।'

ওয়াঙ এবার নলটা ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে চীৎকার করে উঠল—'আমাকে কি একটুও শান্তিতে থাকতে দেবে না।'

ছেলেটিও তেমনি গোঁয়ের সঙ্গে জবাব দিল—'এ আমার বা আমার ছেলের জন্য নয়। এ আমার সব চেয়ে ছোট ভায়ের জন্য যে তোমারও ছেলে। সে মূর্খ থাকুক এ তো ভাল দেখায় না। তারও লেখাপড়া শেখা উচিত।'

ওয়াঙ হাঁ হয়ে তাকিয়ে রইল। নতুন কথা শুনছে সে। বহু দিন আগেই ওয়াঙ কনিষ্ঠ পুত্রের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দিয়েছে। তাই সে বললে—'আর বেশী বিদ্যের জাহাজ হয়ে দরকার নেই এ বাড়ীতে। দু'জনেই যথেষ্ট হয়েছে। আমার মৃত্যুর পর সে আমার জমি-জমা দেখবে।'

—'কিন্তু লেখা-পড়ার জন্য সে রাতে কাঁদে। এই জন্যই ত তার চেহারা এমনি ধারা ফ্যাকাশে কাঠি হয়ে উঠছে।'

একটি ছেলে তার ক্ষেত-খামার দেখবে এ সাব্যস্ত করার পর আর কোন দিনই ওয়াঙ ছোট ছেলেকে সে কথা জানানো দরকার বোধ করেনি। এখন বড় ছেলের কথায় ভ্রূ কুঁচকে এল। চুপ করে ভাবতে বসে গেল সে। ধীরে ধীরে মাটি থেকে নলটা তুলে নিয়ে তৃতীয় ছেলেটির কথা চিন্তা করতে লাগল ওয়াঙ। এ ছেলে অন্য দু'টির মতই নয়। এ ঠিক তার মার মতই নিঃশব্দ এবং যেহেতু কথা কম কয় তার দিকে কেউ নজরই দেয় না।

ওয়াঙ অনিশ্চিত কণ্ঠে বড় ছেলেকে বলল—'তুমি তাকে এ কথা বলতে শুনেছ?'

—'আপনিই জিজ্ঞাসা করুন তাকে।'

—'কিন্তু একটি ছেলের ত ক্ষেতে কাজ করা উচিত'—তর্কের খাতিরে ওয়াঙ হঠাৎ বলে বসল বেশ উঁচু কণ্ঠেই।

—'কিন্তু কেন বাবা? আপনি এমন লোক যার ছেলেদের দাস হয়ে থাকার কোন দরকার নেই। আর এ ভালও দেখায় না। লোকে বলবে, আপনার মন সংকীর্ণ। তারা বলবে—'এ লোকটা নিজে রাজার হালে থাকে আর ছেলেদের গেঁয়ো চাষা করে রেখেছে।'

বড় ছেলে বেশ চতুরতার সঙ্গে তার বক্তব্য নিবেদন করলে। সে জানে তার বাবা লোকেরা কি বলে তার উপর খুব গুরুত্ব দেয়। সে আরো বললে—'আমরা এক জন গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করে ওকে লেখা-পড়া শেখাতে পারি। দক্ষিণের কোন স্কুলেও পাঠান যেতে পারে।

বাড়ীতে তোমার সাহায্য করার জন্ত যখন আমি আছি, ব্যবসাতে সাহায্য করার জন্ত এক ভাই রয়েছে—তখন ও যা চায় করতে দিন ওকে।'

ওয়াঙ তখন বড় ছেলেকে বলল—'ওকে পাঠিয়ে দাও এখানে।'

কিছুক্ষণ পরে কনিষ্ঠ পুত্র এসে বাপের সামনে দাঁড়াল। ওয়াঙ তাকে ভাল করে দেখবার জন্য তার দিকে তাকাল। দীর্ঘ ছিপ্‌ছিপে গড়ন—বাবা মা কারুরই আদল পায়নি সে। শুধু পেয়েছে মা'র গাম্ভীর্য আর নিঃশব্দতা। কিন্তু মা'র চেয়ে ছেলেটি ঢের বেশী সুন্দর দেখতে। ওয়াঙের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই ছেলেটিই সৌন্দর্য কিছু বেশী পেয়েছে। অবশ্য ছোট মেয়েটি ছাড়া—যে অনেক দিন তার স্বামীর ঘর করতে গেছে, যে আর এখন এ বাড়ীর কেউই নয়। ছেলেটির প্রশস্ত কপালে এক জোড়া কাজল-কালো ভ্রূ তার সৌন্দর্যকে প্রায় ক্ষুন্ন করেছে। তার ফ্যাকাশে কচি মুখের সঙ্গে ভ্রূ দু'টি দিব্যি পুরু আর কালো। যখন সে ভ্রূ কোঁচকায় দু'টিতে এক হয়ে যায়।

ওয়াঙ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ছেলের দিকে। তাকে ভালো করে দেখা হলে শেষে বললে—'তোমার বড়দা বলছিল তুমি না কি লেখা-পড়া শিখতে চাও?'

ছেলেটি যেন ঠোঁট না ফাঁক করেই বললে—'হু'।

ওয়াঙ পাইপ থেকে ছাই ফেলে বুড়ো আঙুল দিয়ে আস্তে আস্তে নতুন তামাক ভরতে লাগল পাইপে।

—'অর্থাৎ তুমি আর মাঠে কাজ করতে চাও না। আমার এত ছেলে থাকতে আমার ক্ষেতের কাজ তদারক করবার একটিও ছেলে থাকবে না।'

মনের ঝালের সঙ্গেই ওয়াঙ বলল কথাগুলো। কিন্তু ছেলেটি কোন উত্তর দিল না। সাদা সুতির পোষাকে ছেলেটি নির্বাক্ ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে রহিল। অবশেষে ওয়াঙ তার নীরবতায় ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠল—'কথা বলছ না কেন? তুমি কি মাঠে কাজ করতে চাও না, সত্যি?'

আবার ছেলেটি শুধু একটি মাত্র শব্দ করল—হুঁ।

ওয়াঙ তখন নিজের মনে বলতে লাগল,—এ ছেলেগুলো তার বুড়ো বয়সের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে। দুশ্চিন্তা আর বোঝা হয়ে উঠেছে। কি যে সে করবে এদের নিয়ে ভেবে ঠিক করে উঠতে পারছে না। তার ছেলেরা যেন তার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করছে এমনি ভাবে ওয়াঙ রুখে উটল—'তুমি কি করবে তাতে আমার কি? দূর হয়ে যাও আমার সমুখ থেকে।'

ছেলেটি দ্রুত পায়ে চলে এল। ওয়াঙ একাকী বসে নিজের মনে বলতে লাগল—ছেলেদের চেয়ে মেয়ে দুটিই ঢের ভাল। হাবাটি শুধু নিজের খাবার আর খেলার ন্যাকড়া পেলেই খুশী। আর একটি ত বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে। সন্ধ্যার আঁধার সমস্ত মহল ঢেকে দিল। ওয়াঙ একাকী ভাবতে লাগল।

রাগ পড়ে এলে ওয়াঙ আগে আগে যেমন ছেলেদের নিজেদের মর্জি মত চলতে দিত এবারও বড় ছেলেকে তেমনি ডেকে বললে—'ভাইটি যদি চায় তার জন্ত এক জন গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করে দাও। সে যা চায় করুক—আমায় আর এ নিয়ে জ্বালাতন করো না।'

ওয়াঙ দ্বিতীয় ছেলেটিকে ডেকে বললে—'তোমরা যখন কেউই মাঠের কাজ করবে না তখন খাজনা আদায় আর প্রতি ফসল ঘরে তোলার সময় রূপো আমদানীর উপর তোমারই নজর রাখা কর্তব্য। ওজন, মাপ-ঝোঁক সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান আছে—তুমিই আমার নায়েবের কাজ করবে।'

দ্বিতীয় পুত্র এতে খুশীই হোল, কারণ আর যাই হোক টাকাপয়সা ত তার হাত দিয়েই যাওয়া-আসা করবে। কত আমদানী হচ্ছে তার জানা থাকবে—বাড়ীতে খরচের আধিক্য ঘটলে বাপের কাছে সময়মত নালিশও করতে পারবে।

ওয়াঙের এই দ্বিতীয় ছেলে অন্তদের তুলনায় ওয়াঙের কাছে সম্পূর্ণ অদ্ভুত মনে হোল। এমন কি বিয়ের দিনেও মদে মাংসে কত টাকা খরচ হচ্ছে সেদিকে তার কড়া নজর রইল। কোন টেবিলে কি রকম খাবার পরিবেশিত হবে সেদিকেও তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। সহরের বন্ধুদের জন্ত সব চেয়ে ভাল মাংস টেবিলে সাজিয়ে দিলে। কারণ তারা উৎকৃষ্ট খাদ্যের মূল্য বোঝে। গ্রামের লোক আর প্রজাদের সে বাহির-মহলে খেতে দিলে। তারা প্রতিদিন ছিমছাম খেতে অভ্যস্ত—কাজেই রোজকার চেয়ে একটু উঁচু দরের খাদ্য-পানীয় দিলেই যথেষ্ট হবে তাদের পক্ষে।

বিয়েতে যা উপহার আর টাকা এলো সেদিকেও সতর্ক নজর রইল দ্বিতীয় ছেলের। দাস-দাসী আর চাকরদের যত কম দিয়ে পারা যায় তাই দিলে সে। শেষে কোকিলার হাতে যখন দু'টো রূপো গুঁজে দেওয়া হোল সে ত নাক সিঁটকিয়ে সকলকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগল—'সত্যি, বড় লোক যারা তাদের টাকার প্রতি অত নীচ দরদ থাকে না। এরা এ-বাড়ীর উপযুক্ত লোকই নয়।'

বড় ছেলের কানে এ কথা যেতে সে ত মরমে মরে গেল। সে কোকিলার রসনাকে ভয় করে—গোপনে সে তার হাতে আরো রূপো দিল। ছোট ভায়ের প্রতি বড় রাগ হোল তার। এই বিয়ের দিন থেকেই দু'ভায়ের মধ্যে মনোমালিন্য শুরু হয়ে গেল।

বড় ভাই তার বন্ধু-বান্ধবদের মাত্র কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করেছে—কারণ ছোটর অতি কৃপণতায় লজ্জিত সে। তাছাড়া কনেটিও গ্রামের মেয়ে। সুতরাং অবজ্ঞায় দূরে সরে রইল সে। 'ভায়া আমার যখন জেডের কাপ পেতে পারত তখন মাটির জার পছন্দ করে বসেছে।' বর কনে যখন এসে তাকে নমস্কার জানাল সে শুধু অবজ্ঞায় মাথা নেড়ে নিয়ম রক্ষা করলে। আর বড়বৌ নিজের দর্পে মাথা হেলালে কি না হেলালে।

দু'মহলে এক মাত্র ওয়াঙের ছোট নাতিটি ছাড়া কারুর মনেই সুখ-স্বাচ্ছন্দ নেই মনে হোল। ওয়াঙ কমলিনীর মহলের পাশে যে ঘর সেই ঘরের কারুকার্য-করা শয্যার আঁধার-ঘন আবেষ্টনীতে ঘুমতে ঘুমতে জেগে ওঠে—জেগে ওঠে স্বপ্ন দেখে যে সে যেন মাটির দেয়াল-ঘেরা কুড়ে ঘরে আবার ফিরে এসেছে যেখানে ঠাণ্ডা চা ছুঁড়ে ফেলে দিলে কোন কাজ-করা আসবাব নষ্ট করার ভয় নেই—যেখানে এক ধাপ নামলেই একবারে নিজের জমিতে ফিরুনো যায়;

আর এদিকে ওয়াঙের ছেলেদের মধ্যে চলেছে নিরবচ্ছিন্ন অসন্তোষ। বড় ছেলে অনেক খরচা করতে পারছে না বলে অসুখী। লোকের চোখে হেয় হয়ে পড়বে বলে সদাসর্বদা দুশ্চিন্তায় পীড়িত। সহরের কোন লোকের সঙ্গে কথা বলছে এমন সময় হয়ত গেঁয়ো কোন লোক

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়ে সহরে ভদ্রলোকের সামনে তাকে লজ্জাজনক অবস্থায় এনে ফেলবে। দ্বিতীয় ছেলের একমাত্র চিন্তা এই বুঝি বেশী খরচ হোল—বাজে খরচ হোল। আর কনিষ্ঠটি এত দিন মাঠের কাজে যে অমূল্য বছর নষ্ট করেছে তার ক্ষতিপূরণ করতে বদ্ধপরিকর।

একটি মাত্র প্রাণী যে মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়ায়—সে হচ্ছে বড় ছেলের ছেলে। এই বৃহৎ প্রাসাদ ছাড়া আর কোন জায়গার চিন্তা নেই তার মনে। এ-বাড়ী তার কাছে ছোটও নয়—বড়োও নয়। এ শুধু বাড়ী। এখানে আছে তার মা, বাবা, তার ঠাকুর্দা আর আছে যারা তাকে রক্ষা করবে। এর কাছেই ওয়াঙ একমাত্র শান্তি পায়। একে সারা দিন চোখে-চোখে রাখা, এর সঙ্গে হাসা, পড়ে গেলে কোলে তোলার যেন আর শেষ নেই। বাপ কি কি করতেন ওয়াঙের মনে পড়ে যায় সে সব কথা। সে-ও একটি কটিবন্ধে শিশুকে বন্দী করতে আনন্দ পায়—তাকে নিয়ে মহলে-মহলে ঘুরে বেড়ায়। পুকুরের লাফ দিয়ে ওঠা মাছের দিকে ছেলেটা আঙ্গুল দিয়ে দেখায়—শিশু-কাকলীতে মুখর হয়—ফুল গাছের ফুলের মাথা টেনে ছেঁড়ে। এ সবের মধ্যে এলেই তার আনন্দ। ওয়াঙও শান্তি পায় তাকে নিয়ে।

অবশ্য একটি নাতিই নয়। বড় ছেলের বৌয়ের বছরের পর বছর বিয়োনোর আর বিরাম নেই। ছেলে আসার সঙ্গে সঙ্গে তার সেবা-দাসীও আসছে। ওয়াঙ প্রতি বছর প্রাঙ্গণে নতুন ছেলের মুখ দেখে আর দেখে নতুন দাস-দাসীর মুখ। 'বড় ছেলের ঘরে আর একটি হাঁ বাড়ল'—কেউ এসে এ খবর দিলেই ওয়াঙ শুধু হেসে বলে—'বেশ ত—অনেক ভাল ভাল জমি আছে আমার। খাবার অভাব হবে না কোন দিন।'

দ্বিতীয় ছেলের বৌয়েরও যখন যথারীতি সন্তান হোলে ওয়াঙের আর আনন্দের সীমা-পারসীমা রইল না। প্রথমে তার মেয়েই হোল আর তাই ভালো। এই পাঁচ বছরের মধ্যে ওয়াঙের চারটি নাতি আর তিনটি নাতনী জন্মাল—সমস্ত মহল এখন তাদের হাসি আর কান্নায় গম-গম করতে থাকে। খুব শিশু বা খুব বুড়ো না হলে পাঁচটি বছর মানুষের জীবনে এমন কিছুই নয়। খুড়োর কথা ওয়াঙ এক দম ভুলেই গিয়েছিল শুধু তার আর তার স্ত্রীর সময় মত খাওয়া-পরা আর আফিং যোগান ছাড়া। তিনিও মারা গেলেন এই পঞ্চম বৎসরে।

সে-বার শীতও পড়েছিল খুব। ত্রিশ বছরের মধ্যে এমন দেখা যায়নি। ওয়াঙের জীবনে সেই প্রথম সহরের দেয়ালের ধারের নালার জল জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। লোকে তার উপর দিয়ে যাতায়াত করত। উত্তর-পূর্ব থেকে একটানা হিম-শীতল বায়ু বইত—কোন ছাগলের চামড়া বা ফারে কিছুতেই শীত বাগ মানত না। বড়-বাড়ীর প্রত্যেক ঘরে ঘরে কাঠ-কয়লার চুল্লী জ্বালান হোত—তবুও নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ত ঠাণ্ডা।

আফিং খেয়ে খেয়ে ওয়াঙের খুড়ো আর খুড়ীর গায়ে একটুও মাংস ছিল না—দিনের পর দিন তারা দু'টি শুকনো কাঠের মত বিছানায় পড়ে থাকত—দেহেতে একটুও গরম নেই। ওয়াঙ শুনল তার খুড়ো বিছানাতেও উঠে বসতে পারে না—নড়লেই কাশির সঙ্গে রক্ত পড়ে। ওয়াঙ দেখতে গেল, খুড়োকে দেখে বুঝল খুড়োর সময় হয়ে এসেছে।

ওয়াঙ দু'টো মাঝারি ধরণের কাঠের শবাধার নিয়ে এল। শবাধার দু'টোকে সে খুড়োর ঘরে নিয়ে এল যাতে খুড়ো তার মৃত্যুর পর অস্থি-পঞ্জরের জন্ত কেমন আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে দেখে শান্তিতে মরতে পারে। কাঁপা গলায় খুড়ো বল্লে—তুমিই আমার আসল ছেলে। নিজের ঐ বকাটে ছেলের চেয়েও তুমি অনেক আপনার।'

খুড়ীও বললে—খুড়োর চেয়ে তার দেহে তখনও মাংস আছে—'ছেলে ফিরে আসার আগে আমার যদি মরণ হয় তবে প্রতিশ্রুতি দাও তুমি তার জন্ত একটি ভাল মেয়ে দেখে দেবে। তার ছেলে-পুলে হোক আমার বংশ থাকবে।'

ওয়াঙ প্রতিশ্রুতি দিল।

খুড়ো কখন যে মারা গেলেন ওয়াঙ জানতেই পারেনি। এক দিন সন্ধ্যায় দাসী খাবার-পাত্র নিয়ে ঘরে ঢুকে দেখে তিনি মরে পড়ে আছেন। ওয়াঙ একটি কনকনে ঠাণ্ডা দিনে তাকে কবর দিল।

তখন তুষারের ঝড় বইছিল মাঠের উপর দিয়ে। পারিবারিক সমাধি-ক্ষেত্রে বাপের কবরের পাশে, একটু নীচুতে কিন্তু তার নিজের কবর যেখানে থাকবে তার চেয়ে উঁচুতে গোর দিল খুড়োর মৃতদেহ।

ওয়াঙ সমস্ত পরিবারকে শোক প্রকাশ করতে বাধ্য করল। একটি বছর শোকের চিহ্ন দেহে ধারণ করল সবাই। অবশ্য শোক করার উপযুক্ত কেউ মারা গেছে বলে নয়—বরং তিনি এ সংসারে বোঝাই ছিলেন। কিন্তু বড়-বাড়ীতে কোন আত্মীয়-স্বজন দেহান্তরিত হলে এইটাই বিধি।

ওয়াঙ তখন খুড়ীকে সহরে নিয়ে এল। এখানে আর তাঁকে একা থাকতে হবে না। তিনিও একটি ঘর আর নিজের মহল পেলেন। কোকিলাকে বলে দেওয়া হোল তাকে দেখা-শুনার জন্ত একটি দাসী বহাল করতে। খুড়ী আফিং খান আর পরম নিশ্চিন্তে ঘুমোন। তার শবাধার তার পাশেই রাখা আছে—দেখে পরম তৃপ্তিতে থাকেন।

ওয়াঙ এক এক সময় দেখে বিস্ময়ে ভাবে যে, এক দিন সে এই অলস-মুখরা মোটা গেঁয়ো মেয়েমানুষটিকে কি ভয়ই না করত আর আজ সে পড়ে আছে লোলচর্ম, হলুদ বরণ—মুখে রা নেই। ঠিক হোয়াং প্রাসাদের বুড়ী কর্তামার মতই হলদে আর জীর্ণ-শীর্ণ।

[ক্রমশঃ।

এম, ডি, ভি

এম, সি, সির অষ্ট্রেলিয়া সফর সমাপ্ত

সিডনীতে পঞ্চম টেষ্টে পাঁচ উইকেটে পরাজয় বরণ করিয়া ইংলণ্ড তথা এম, সি, সি, ক্রিকেট দল আলোচ্য বারের মত অষ্ট্রেলিয়া সফর সমাপ্ত করিয়াছে। শেষ টেষ্টে চরম মীমাংসার ফলে অষ্ট্রেলিয়া 'রাবার' জয়ের গৌরবও অর্জন করে। 'এসেস'-রক্ষার কৃতিত্ব অষ্ট্রেলিয়া তৃতীয় টেষ্টে অমীমাংসার ফলেই দাবী করে। এবারের টেষ্ট পর্য্যায়ে অষ্ট্রেলিয়া তিন বার জয়ী হইয়াছে ও দুইটি খেলার শেষ নিষ্পত্তি হয় নাই। ক্রিকেটের লীলাভূমি অষ্ট্রেলিয়াতে কোন সময়েই ক্রিকেট-বিদের দৈন্য নাই। তরুণ ও অনভিজ্ঞ দল লইয়া যাদুকর ব্র্যাডম্যান এবারে ইংলণ্ডকে যে এ ভাবে নাস্তানাবুদ করিবে, তারা পূর্ব্বে অতি বড় অষ্ট্রেলিয়ান সমর্থকও কল্পনা করিতে পারে নাই। ব্র্যাডম্যান স্বদেশের হইয়া ব্যাটিংয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া নেতৃত্বসুলভ কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। একাধিক নূতন রেকর্ড অধিষ্ঠিত করিয়া এই অপূর্ব্ব ক্রিকেট-প্রতিভা স্বীয় অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্যের আর এক দফা পরিচয় দেয়। ইংলণ্ডের ব্যাটিংয়ে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করে বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন। ইংলণ্ড পক্ষে হাটন, ওয়াসব্রুক, এডরিচ ও কম্পটন টেষ্টে শতাধিক রাণ করিতে সমর্থ হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ব্র্যাডম্যান, মিলার, হ্যাসেট্, বার্ণেস, মরিস, ম্যাককুল, ও লিণ্ডওয়াল প্রত্যেকে সেঞ্চুরী করিতে সমর্থ হয়। বোলিংয়ে ইংলণ্ডের রাইট সর্ব্বাপেক্ষা কৃতিত্ব প্রকাশ করে। সময়ে সময়ে উইকেট পতনের ভিত্তিতে তাহার বোলিংএর নিপুণতা নির্ণয় করা অসম্ভব হয়। অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাককুল, লিণ্ডওয়াল, মিলার, টোস্ক্যাক ও ট্রাইব প্রত্যেকেই সময় ও সুযোগ মত দক্ষতা প্রকাশ করে। শেষ টেষ্ট খেলায় মোট ৯৩০২১ জন দর্শক উপস্থিত হয় এবং ১২৬২০ পাউণ্ড টিকিটলব্ধ অর্থ গৃহীত হয়। এই খেলা নির্দ্দিষ্ট সময়ের এক দিন পূর্ব্বেই সমাপ্ত হইয়া যায়। শারীরিক অযোগ্যতার জন্য হ্যামণ্ড শেষ টেষ্ট খেলায় আত্মপ্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়। ইয়ার্ডলীর স্কন্ধে নেতৃত্বের গুরু দায়িত্ব পড়ে। ইংলণ্ডের দুরদৃষ্ট চরম পর্য্যায়ে পৌঁছে। এই খেলায় এক মাত্র সেঞ্চুরীর অধিকারী হাটন দ্বিতীয় ইনিংসে দৈহিক অসুস্থতা নিবন্ধন দলের কোনরূপ সহায়তা করিতে পারে নাই। অষ্ট্রেলিয়ার ম্যাককুলের বোলিং ও ট্যালনের চমৎকার উইকেট রক্ষা ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে বিপর্য্যয় ঘটায়! কম্পটন নিজ দলের সম্মানরক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে এবং ১৭৩ মিনিট কাল ব্যাট্ করে। অষ্ট্রেলিয়া ২৩৩ মিনিট খেলিয়া প্রয়োজনীয় ২১৪ রাণ সংগ্রহ করে।

রাণ-সংখ্যা :—

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—২৮০ (হাটন ১২২, লিণ্ডওয়াল ৬৩ রাণে ৭টি)

২য় ইনিংস—১৮৬ (কম্পটন ৭৬, ম্যাককুল ৪৪ রাণে ৫টি, লিণ্ডওয়াল ৩৬ রাণে ২টি)

অষ্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—২৫৩ (বার্ণেস ৭১, মরিস ৫১, রাইট ১০৫ রাণে ৭টি)

২য় ইনিংস—৫ উইকেটে ২১৪ (ব্র্যাডম্যান ৬৩, হাসেট ৪৭, বেডসার ৭৫ রাণে ২টি ও রাইট্ রাণে ২টি)

জানা গিয়াছে, ইংলণ্ডের অধিনায়ক ও জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'অল্ রাউণ্ডার' ওয়ালী হ্যামণ্ড এবার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট-জগৎ হইতে অবসর গ্রহণ করিবে। ভবিষ্যতে নিজ কাউণ্টীর হইয়াও হ্যামণ্ডকে আর নিয়মিত খেলোয়াড় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখা যাইবে না। এ যাবৎ ৮৪টি বিভিন্ন টেষ্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করিয়া হ্যামণ্ড মোট ৭০০০ রাণ ও ৮৩টি উইকেট দখল করিয়াছে। ফিল্ডসম্যান হিসাবে হ্যামণ্ডের প্রতিষ্ঠা নগণ্য নয়। টেষ্ট ক্রিকেট-মহলে ক্যাচ ধরার বিষয়ে হ্যামণ্ড অমর ক্রিকেটবিদ্ ডব্লিউ, জি, গ্রেসের সমকক্ষতা করিয়াছে।

নিউজীল্যাণ্ডে ভ্রাম্যমাণ এম সি সি দল

নিউজীল্যাণ্ড সফরে প্রথম খেলায় এম, সি, সি, ২১৪ রাণে ওয়েলিংটনকে পরাজিত করে। দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়াসব্রুকের ১৩৩ রাণ ও ইংলণ্ডের মারাত্মক বোলিং স্থানীয় দলের এই শোচনীয় পরাজয়ের কারণ হয়। খেলাটি তিন দিন চলে।

রাণ-সংখ্যা :—

এম, সি, সি,—১ম ইনিংস—১৭৬ (ওয়াসব্রুক ৬৮, মারে ৪৩ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৬ উইকেটে ২৭১ (ওয়াসব্রুক ১৩৩, কম্পটন ৩২, মারে ৮৫ রাণে ৫টি)

ওয়েলিংটন—১ম ইনিংস—১৬০ (ক্যাপষ্টিক ৫০, ভোস ৩৮ রাণে ৬টি)

২য় ইনিংস—৭৩

অটাগোর বিরুদ্ধে তিন দিনব্যাপী খেলায় মাত্র এক রাণের ব্যবধান থাকিতে পূর্ণ সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় এম, সি, সি দল অবধারিত জয়লাভে বঞ্চিত হয়। অটাগো পক্ষে সাটক্লিফ উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করিবার অপূর্ব্ব গৌরবের অধিকারী হয়। প্রথম ইনিংসে এম, সি, সি পক্ষে ইয়ার্ডলী, ঈকীন ও ইভান্স প্রত্যেকে সেঞ্চুরী করে। ২১৭ রাণে পশ্চাৎপদ হইয়া এম, সি, সি, অবশিষ্ট দুই ঘণ্টার মধ্যে দ্রুত রাণ সংগ্রহে মনোনিবেশ করে এবং ১ উইকেটে ২১৬ রাণ হইলে খেলার জন্য নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়!

রাণ-সংখ্যা :—

অটাগো :—১ম ইনিংস—৩৪০ (সাটক্লিফ ১৯৭, পোলার্ড ৯২ রাণে ৪টী বেডসার ৭৬ রাণে ৩টি)

২য় ইনিংস—৭ উইকেটে ২৬২ (সাটক্লিফ ১২৮, রাইট ৮৩ রাণে ৩টি, বেডসার ৩৯ রাণে ২টি)

এম, সি, সি,—১ম ইনিংস—৬ উইকেটে ৩৮৫ (ইয়ার্ডলী ১২৬, ঈকীন নট্ আউট ১০২, ইভান্স ১০১)

২য় ইনিংস—১ উইকেটে ২১৬ (ইভান্স ৬৪, রবার্টস্ ৫৬ রাণে ৩টি, ম্যাকডুগ্যাল ৬২ রাণে ৪টি)

ক্রাইষ্টচার্চে ইংলণ্ড বনাম নিউজীল্যাণ্ডের টেষ্ট খেলা অমীমাংসিত

থাকিয়া যায়। তৃতীয় দিনে বৃষ্টিপাতের ফলে খেলা অনুষ্ঠিত হয় নাই। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে খেলার মেয়াদ এক দিন বর্দ্ধিত করা হয়। ক্রিকেট-ইতিহাসে টেষ্ট খেলায় এইরূপ ব্যবস্থা নূতন অধ্যায়ের সূচনা করিয়াছে। চতুর্থ দিনেও প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে খেলা অসম্ভব হওয়ায় টেষ্ট খেলার চরম নিষ্পত্তি হয় নাই। নিউজীল্যাণ্ডের অধিনায়ক হ্যাডলী ১১৬ রাণ করে এবং কাউই ৮৩ রাণে ৬টি উইকেট দখল করে। নিউজীল্যাণ্ডের ৯ উইকেটে ৩৪৫ রাণের প্রত্যুত্তরে ইংলণ্ড দ্বিতীয় দিনের শেষে ৭ উইকেটে ২৬৫ রাণ করিয়া ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করে।

রাণ-সংখ্যা :—

নিউজীল্যাণ্ড—১ম ইনিংস—৯ উইকেটে ৩৪৫ (হ্যাডলী ১১৬, সাটক্লিফ ৫৮, কাউই ৪৫, বেডসার ৯৫ রাণে ৪টি, পোলার্ড ৭৩ রাণে ৩টি)

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৭ উইকেটে ২৬৫ (হ্যামণ্ড ৭৯, ঈকীন ৪৫, এডরিচ ৪২, কাউই ৮৩ রাণে ৬টি)

রঞ্জী ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

গত বৎসরের বিজয়ী হোলকারকে এক ইনিংস ও ৪০৯ রাণে শোচনীয় ভাবে বিপর্য্যস্ত করিয়া বরোদা এ বৎসর নিখিল ভারত ও আন্তঃপ্রাদেশিক ক্রিকেটে রঞ্জী প্রতিযোগিতার শেষ খেলায় জয়ী হইয়াছে। বরোদা সর্ব্বসমেত প্রথম ইনিংসে ৭৮৪ রাণ সংগ্রহ করে। ইতিপূর্ব্বে ১৯৪১ সালে মহারাষ্ট্র উত্তর-ভারতের বিরুদ্ধে এবং ১৯৪৬ সালে হোলকার হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক মোট রাণ সংগ্রহ করে। বরোদার এই অপূর্ব্ব জয়লাভের মূলে ছিল হাজারী ও গুল মহম্মদের অনবদ্য ব্যাটিং এবং হাজারী ও আমীর এলাহীর মারাত্মক বোলিং।

চতুর্থ উইকেট জুটিতে হাজারী ও গুল মহম্মদ ৫৭৭ রাণ সংগ্রহ করিয়া পৃথিবীর ক্রিকেট-ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের সূচনা করে।

রাণ-সংখ্যা :—

হোলকার—১ম ইনিংস—২০২ (সর্ব্বাতে নট, আউট ৯৪, হাজারী ৮৪ রাণে ৫টি)

২য় ইনিংস—১৭৩ (নিম্বলকর ৮৭, আমীর এলাহী ৬২ রাণে ৬টি, হাজারী ৫২ রাণে ২টি)

বরোদা—১ম ইনিংস—৭৮৪, (গুল মহম্মদ ৩১৯, হাজারী ২৮৮, সি, কে, নাইডু ১৭৮ রাণে ৪টি, গাইকোয়াড় ১৩৪ রাণে ৬টি)

অষ্ট্রেলিয়াগামী ভারতীয় ক্রিকেট দল

দিল্লীতে চারি দিনব্যাপী শেষ ট্রায়াল খেলার পরে ভারতীয় ক্রিঃকেট-কণ্টোল বোর্ড আগামী অষ্ট্রেলিয়া সফরের জন্য ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্ব্বাচিত করিয়াছে। উক্ত শেষ নির্ব্বাচনী খেলায় মার্চেণ্টের দল পাতিয়ালার মহারাজার দলের বিরুদ্ধে ১৯ রাণে জয়ী হয়।

ভারতীয় দলে যাইবে :—বিজয় মার্চেণ্ট, লালা অমরনাথ, মুস্তাক আলী, মানকড়, বিজয় হাজারী, আর এস মুদী, সি, এস, নাইডু, গুল মহম্মদ, সোহনী, আমীর এলাহী, জে ইরানী (উইকেট-রক্ষক), পি, সেন (উইকেট-রক্ষক), কে, এম, রঙ্গনেকার, কিষেণচাঁদ, ফাডকার, ফজল মামুদ ও এইচ অধিকারী।

মিঃ পি, গুপ্ত ও মার্চেণ্ট ইতিপূর্ব্বেই যথাক্রমে অষ্ট্রেলিয়াগামী দলের ম্যানেজার ও অধিনায়ক মনোনীত হইয়াছিলেন। অমরনাথ এই দলের সহকারী অধিনায়ক এবং মার্চেণ্ট, সহকারী অধিনায়ক ব্যতীত মুস্তাক আলী অষ্ট্রেলিয়াতে খেলোয়াড়-নির্ব্বাচনী কমিটির সভ্য মনোনীত হইয়াছেন। মিঃ গুপ্তের কর্তৃত্বে প্রেরিত এই তরুণ ও প্রবীণ খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত দল ভারতের সুনাম বিস্তার করিবে। বাঙলা হইতে এক মাত্র পি সেন এই দলে স্থান পাইয়াছেন। সমষ্টিগত শক্তি হিসাবে এই দল যে নিতান্ত দুর্ব্বল হইবে না তাহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। সর্ব্বাতে এই দলে স্থান না পাওয়ায় অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছে। অবশ্য বর্ত্তমানে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় ক্রিঃকট দল নিরূপণ অত্যন্ত কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। খেলার পরিচয় হইতে অধিকারী অপেক্ষা সর্ব্বাতের এই দলে থাকিবার অধিকতর দাবী আছে, এই কথা অস্বীকার করার উপায় নাই।

ইষ্ট বেঙ্গলের জয়-জয়কার

ত্রিবান্দ্রমে নিখিল ভারত ফুটবল প্রতিযোগিতায় অগণিত দর্শক-সমাবেশের মধ্যে দিল্লী ইউনিয়ন দলকে অনায়াসে ৩—০ গোলে পরাজিত করিয়া কলিকাতার লীগ-বিজয়ী ইষ্ট বেঙ্গল দল চরম বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

বোম্বায়ে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত ও আন্তঃপ্রাদেশিক হকি প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব ২—১ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করিয়া এ বৎসর বিজয়ী হইয়াছে। বোম্বায়ের নিকট বাঙলা ৪—০ গোলে শোচনীয় ভাবে নাজেহাল হয়। সেমি-ফাইন্যালে বোম্বাই মধ্য-ভারতকে ৪—১ গোলে পরাজিত করে। পাঞ্জাব ও দিল্লী অন্যতম সেমি-ফাইন্যালে দুই দিন অমীমাংসিত ভাবে ১—১ ও ২—২ গোলে খেলা শেষ করে। তিন দিনই অপেক্ষাকৃত ভাল খেলিয়াও দিল্লী দল দুর্ভাগ্য বশতঃ এক মাত্র গোলে তৃতীয় দিনে পরাভূত হয়।

দেশের কথা

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

'নবসজ্ঘ' নামক পত্রিকা বলিতেছেন : "মুসলমান-প্রধান স্থানে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থান' বলিয়া শুধু ঘোষণা নহে, কার্য্যতঃ তাহার দৃষ্টান্ত সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। বিহারে অথবা হিন্দুপ্রধান পাঞ্জাব প্রদেশে লীগের এই ঔদ্ধত্য যদি ব্যাহত না হইত, বঙ্গের আরও যে অধিক দুরবস্থা হইত, তাহা না বলিলেও চলিবে! মুসলমান-প্রধান স্থানে সংখ্যালঘুর উপর যদি অকথ্য অত্যাচার হয়, ভারতের অন্যত্র সংখ্যালঘু মুসলমানদের দুর্দ্দশাও তদনুযায়ী হইবে। এই পর্য্যবেক্ষণ হওয়ায় বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী সুর বদলাইতে বাধ্য হইয়াছেন। এই সুর যদি আন্তরিক হইত, ভরসার কথা ছিল। কিন্তু ইহা অবস্থার দায়। এই হেতু বাঙ্গালার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হিন্দু প্রদেশ গড়ার পক্ষপাতী হইয়াছেন।" 'নবসজ্ঘে'র মতামতের সহিত আমরা সর্ব্ববিষয়ে একমত নহি। রহিম রামকে মারিল বলিয়া, যদু সেলিমকে মারিবে, এমন বিচার কোন ক্ষেত্রেই স্বীকার করা যায় না। লীগ বাঙ্গালার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর যে সকল অত্যাচার করিতেছে বলিয়া কথা উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকার ব্যবস্থা বাঙ্গালার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেই করিতে হইবে, তাহা যেমন করিয়াই হউক। কিন্তু প্রতিকার ব্যবস্থা অবলম্বন করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে, আমরা সভ্যতা এবং মানবতার অপমান কোন ক্ষেত্রেই করিব না।

* * * * *

'ঢাকা-প্রকাশ' পাঠে জানিতে পারি যে, ঐ শহরে স্থায়িভাবে সাম্প্রদায়িক শান্তি স্থাপন এবং রক্ষার জন্য শহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণ একটি শান্তি-কমিটি স্থাপন করিয়াছেন। এই কমিটির প্রথম কার্য্য হইতেছে :—

"সহরে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক গোলযোগ সম্পর্কে যে সকল মোকদ্দমা চলিতেছে ঐগুলি প্রত্যাহার, পাইকারী জরিমানা ও দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার, এবং গোলমালের সময় যে সমস্ত উপাসনা-ভবন বিধ্বস্ত হইয়াছে উহার পুনর্নির্ম্মাণ প্রভৃতির জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট অনুরোধ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিনিধি-দল গঠন করা হইয়াছে।·········সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থায়িভাবে পুনঃ প্রতিষ্ঠার পন্থা সম্পর্কে বহু আলোচনা হয়।·········কতকগুলি শাখা-কমিটি নিয়োগ করিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে শান্তিরক্ষার ভার উহার উপর অর্পিত হইবে।" প্রস্তাব অতি চমৎকার—কাগজে-কলমে এবং সভা ক্ষেত্রে। কিন্তু এই সকল শান্তি-কমিটি এবং সভার মূল্য বাস্তব ক্ষেত্রে কতখানি, সে-বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। এক হাতে যেমন তালিও বাজেও না, মিলনের বেলাতেও তেমনি দুই জন সমান মতাবলম্বী না হইলে হয় না। পরবর্ত্তী কয়েকটি ঘটনায় 'শান্তি-কমিটির' প্রভাব কতখানি তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। বহু ঘটনার মধ্যে আমরা স্থানাভাব বশত মাত্র দুই-তিনটির উল্লেখ করিতেছি।

* * * * *

'ঢাকা-প্রকাশ'ই প্রকাশ করিতেছেন :······"কায়েতটুলী ও অন্যান্য পরিত্যক্ত অঞ্চলের গৃহগুলি হইতে দুর্ব্বৃত্তেরা সমস্ত অস্থাবর জিনিষ-পত্রের সঙ্গে গৃহগুলির দরজা-জানালা, কড়ি-বরগা পর্য্যন্ত অপহরণ করিতেছে। সহরের অবস্থাই যদি এই প্রকার হয় তবে পল্লীগ্রামের অবস্থা যে আরও বিশৃঙ্খল হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে!" কলিকাতায় বাস করিয়া ইহা আমরা অত্যন্ত স্বাভাবিক কার্য্য বলিয়া মনে করিতেছি। কাজেই আশ্চর্য্য হইতে পারিলাম না।

* * * * * *

'ঢাকা-প্রকাশে'ই দেখিতে পাইলাম : "কেরাণীগঞ্জ থানার অধীন কোন কোন গ্রামে মাঝে মাঝে গুণ্ডামী চলিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।·········মান্দাইল নিবাসী সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি বেলা ২টার সময় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের রাস্তার উপর দিয়া যাইতেছিল। তাহার অপরাধ সে একা পথ চলিতেছিল! গুণ্ডাগণ আক্রমণ করতঃ তাহার শরীরে ছুরিকাঘাত করিয়া তাহার কাছে যে টাকা-পয়সা ছিল উহা নিয়া চম্পট দেয়। রাস্তার উভয় পার্শ্বে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বহু বাড়ী-ঘর থাকা সত্ত্বেও গুণ্ডাদিগকে কেহ ধরিবার বা দেখিবার চেষ্টাও করিয়াছে বলিয়া কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।" ইহাতেও আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। কারণ, এই স্থানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় মিঃ জিন্নার ভক্ত এবং সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে রক্ষার পবিত্র কার্য্য ভাল ভাবেই পালন করিতেছে—ইহাই প্রমাণ হইল!

* * * * * *

তাহার পর আবার 'ঢাকা-প্রকাশ' বলিতেছেন : "······একটি যাত্রি-নৌকা সাভার হইতে ঢাকা আসিবার পথে কামরাঙ্গীর চরের নিকট এক দল গুণ্ডা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়। গুণ্ডারা যাত্রীদিগকে মারপিট করিয়া কয়েক হাজার টাকার দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত কেহ ধরা পড়িয়াছে বলিয়া শুনা যায় নাই। এতদঞ্চলে ইহাই প্রথম ঘটনা নহে। কতকগুলি ঘটনা সংঘটিত হওয়া

সত্ত্বেও আসামী ধরা না পড়ায় পরশ্রীকাতর লোকেরা মনে করে যে, ঐ স্থানের অধিবাসীরা এই সমস্ত গুণ্ডামীর সমর্থক।" কিন্তু দুঃখের বিষয়, 'পরশ্রীকাতর' লোকেরা ইহা মনে করে না, কাজেই আসামীও ধরা পড়ে না এবং ভবিষ্যতেও পড়িবে না বলিয়া মনে হইতেছে। মিঃ জিন্না এবং অন্যান্য লীগ কর্ম্মকর্ত্তাদের "United Front"এর চমৎকার দৃষ্টান্ত!

ঘটনাবলীর বহর আর বাড়াইয়া লাভ নাই, কারণ সব ঘটনা প্রায়ই এক প্রকার। সংখ্যাগরিষ্ঠের হাতে সংখ্যালঘুর নির্য্যাতন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও শান্তি-কমিটি হইবে, এবং প্রত্যেকটি দাঙ্গা-হাঙ্গামার পরেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার প্রধান উদ্যোক্তাগণই এই প্রকার পবিত্র শান্তি-কমিটি প্রতিষ্ঠায় সর্ব্বাধিক উৎসাহ দেখাইবেন।

* * * * * *

এইবার ঢাকা পুলিশের কার্য্যকলাপ কি প্রকার, তাহার সামান্য নমুনা পত্রান্তর হইতে নকল করিয়া দিতেছি: "কোতোয়ালী পুলিশের কার্য্যকলাপ কম কৌতূহলজনক নহে। সকলেই শুনিয়া বিস্মিত হইবেন যে, কোতোয়ালী থানার জনৈক সব-ইনস্পেক্টার, ৭৫ বৎসর বয়স্ক জনৈক ভূতপূর্ব্ব মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের বিরুদ্ধে তাঁহার মৃত্যুর তিন মাস পরে চার্জ্জসীট দাখিল করেন।...সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়কে বিব্রত ও হায়রানী করিবার জন্য পুলিশ অসাধারণ উৎসাহ প্রদর্শন করে। সামান্য অপরাধে ধৃত ব্যক্তির জামিনের আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করিয়া থাকে। কিন্তু সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের লোকের অপরাধ যতই গুরুতর হউক না কেন, তাহাদিগকে মুক্ত করার জন্য পুলিশ অসীম ব্যগ্রতা প্রকাশ করে। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। হাঙ্গামার সময় মারাত্মক অস্ত্র ও কেরোসিন তৈল সহ ধৃত সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের বহু লোককে থানা হইতে নাম মাত্র জামিনে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।...সার্কেল ইনস্পেক্টারের (এ) আদেশে নাম মাত্র জামিনে তাহাদিগকে মুক্তি দেওয়া হয়। ঐ সার্কেল ইনস্পেক্টার সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ঐ সকল ধৃত ব্যক্তির মধ্যে ঢাকার অল-ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রোগ্রাম এসিস্টেণ্ট অন্যতম। জনৈক সার্জ্জেণ্ট তাহাকে বড় একখানি তরবারি সহ গ্রেপ্তার করে।" সংবাদটি আমাদের জানা ছিল না, কারণ ঢাকার অল্-ইণ্ডিয়া রেডিও এ-সংবাদ তাঁহাদের লোকাল নিউজে প্রচার করিতে বোধ হয় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ঢাকার ব্যাপার হইলেও আমাদের কাছে ইহা খুব কিছু বিস্ময়কর নহে। কারণ বাঙ্গলা দেশের কলিকাতা শহরেও আমরা একই প্রকার বহু ঘটনার কথা জানি এবং বর্ত্তমানেও দেখিতেছি। ভবিষ্যতেও, বঙ্গবিভাগ না হওয়া পর্য্যন্ত দেখিতে থাকিব।

* * * *

'বীরভূম-বাণী' "হায় হায়" করিয়া বিলাপ করিতেছেন: মহাত্মা গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে বহু দিন নোয়াখালি অঞ্চলে বসবাস করিয়া ফজলুল হক সাহেবের সাক্ষাতের পর বিহার অঞ্চলে গিয়াছেন এবং প্রপীড়িতদের জন্য বিহার হিন্দুদের নিকট হইতে চাঁদা সংগ্রহ কার্য্যে বর্ত্তমানে ব্যাপৃত আছেন। মহাত্মাজীর আহ্বানে বিহারী হিন্দুগণ আশাতীত সাড়া দিয়াছেন।

অপর পক্ষে প্রকাশ যে, নোয়াখালি অঞ্চল হইতে সংবাদ আসিতেছে যে, কে বা কাহারা খড়ের গাদা ভস্মীভূত করিতেছে, গৃহ ভস্মীভূত করিতেছে, গাভী অপহরণ করিতেছে, বিগ্রহ অপবিত্র করিতেছে। ১৪৪ ধারা অমান্য করিয়া শোভাযাত্রা, সভা-সমিতি করিতেছে, জমি হইতে উৎখাত করিতেছে, বয়কট চালাইতেছে।......পাশাপাশি এই চিত্রগুলি পর্য্যালোচনা করিলে মনে আক্ষেপের সৃষ্টি হয় আর বলিতে ইচ্ছা হয়—"হায় হায়।" কিন্তু কেন? "হায় হায়" না করিয়া লীগের অনুকরণে হৈ! হৈ! করিলে অধিকতর ফললাভ হইতে পারে।

'পাঞ্চজন্য' বলিতেছেন: "বাঙ্গালী মাত্রেই জানিয়া সুখী হইবেন যে, বাংলার সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ ও দুর্নীতি দমনকল্পে বাংলা সরকার একটি বিশেষ বিভাগ স্থাপন করা সম্ভব কি না ঐ বিষয়ে বিবেচনা করিয়াছেন। বাংলা দেশে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ ও দুর্নীতি প্রকৃতি যে অত্যধিক প্রসার লাভ করিয়াছে এই সম্পর্কে কোন মতানৈক্য হইতে পারে না। যে কোন সরকারী অফিসে গেলেই জনসাধারণকে প্রতিদিনই এই সত্য উপলব্ধি করিতে হয়।" সকল সময় সরকারী অফিসে যাইবার প্রয়োজন হয় না। পথে-ঘাটে এবং ক্ষেত্র-বিশেষে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে সরকারী কর্ম্মচারীদের সততা এবং সদাচারের বহু বহু প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করা যায়। কিন্তু বাংলা সরকার (লীগ) আজ পর্য্যন্ত নানা প্রকার পবিত্র সংকল্প করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কতকগুলি বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। দুর্নীতিতেই যে-সরকারের শক্তি, তাহা দমন করিলে সে-সরকার দাঁড়াইবে কিসের উপর?

* * * * * *

ইহার পর 'পাঞ্চজন্য' বলেন: "বাঙ্গালী যদি একবার মনে করিতে পারে যে তাহারা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান যাহাই হউক না কেন, তাহারা বাঙ্গালী; যদি তাহারা মনে করিতে পারে যে যাহা ন্যায় এবং যাহা অন্যায়, তাহা সকলের পক্ষেই ন্যায় এবং অন্যায়, তাহা হইলেই এই শ্রেণীর এবং অন্যান্য শ্রেণীর অন্যায় কার্য্যের অনুষ্ঠান দেশ হইতে তিরোহিত হইয়া যাইবে।" বাঙ্গালী হিন্দু এই আদর্শে বিশ্বাস করে, বাঙ্গালী মুসলমানও হয়ত বাঙ্গালীর এই প্রকার ঐক্যে বিশ্বাস করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু অবাঙ্গালী লীগ-মহানায়ক এই বিশ্বাসের মূলে কঠোর আঘাত করিতেছেন। পূর্ব্বেই তিনি বাণী দিয়াছেন যে—'ভারতের হিন্দু এবং মুসলমানের আদর্শের এবং ন্যায়-অন্যায়ের মাপকাঠি বিভিন্ন প্রকার—এবং এই দুই 'জাতি' কখনও এবং কোন ক্ষেত্রেই একত্র

বসবাস এবং মিলিয়া মিশিয়া কোন কাজই করিতে পারিবে না; পারিলেও করা উচিত হইবে না।' তবুও আমরা আশা করি, কালক্রমে বাঙ্গালী মুসলমান বুঝিতে পারিবে যে সিন্ধি এবং পাঞ্জাবী মুসলমান অপেক্ষা বাঙ্গালী হিন্দু তাহার নিকটতর জন এবং বাঙ্গালী হিন্দুর সহযোগিতা এবং সকল কর্ম্মে ঐক্য ছাড়া তাহার এক দিনও চলিবে না। লীগ হাই-কমাণ্ড ভারতের অন্য প্রদেশের মুসলমানদের স্বার্থের জন্য বাঙ্গালী মুসলমানের স্বার্থ কেমন করিয়া পদদলিত করিতেছেন, ইহাও বাঙ্গালী মুসলমান এক দিন বুঝিবে। 'ইত্তেহাদ' নামক পত্রিকার নানা সংবাদে ইহার আভাষ পাওয়া যাইতেছে। শুভ আভাষ।

* * * * * *

'প্রদীপ' একটি "যৎকিঞ্চিৎ" সংবাদ দিতেছেন: "তমলুকে আটা ময়দা চিনির একান্ত অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বিশেষতঃ আটা ময়দা মাসাধিক কাল নাই বলিলেই হয়। আমরা এ বিষয়ে সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।" সংবাদটি কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ নহে। বাঙ্গলা দেশের প্রায় প্রত্যেক জেলা এবং গ্রামাঞ্চলের অবস্থা আজ একই প্রকার। সরবরাহ বিভাগের দৃষ্টিও এ বিষয়ে আকর্ষণ করিয়া লাভ নাই। এ সংবাদ তাঁহাদের জানা আছে ভাল করিয়াই। কিন্তু সরবরাহ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর এদিকে দৃষ্টি দিবার সময় কই? তাঁহারা ১৯৪৮ সালের জুন মাসে বাঙ্গলাকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিবার পরিকল্পনা এবং স্বপ্নে বিভোর আছেন। এ স্বপ্ন যখন ভাঙ্গিবে, তখন তাঁহারা হয়ত দেখিবেন, বাঙ্গলার অর্দ্ধেকেরও বেশী লোক অনাহারে এবং বিবস্ত্র অবস্থায় পরলোকের পথে যাত্রা করিয়াছে।

* * * * *

'পাঞ্চজন্য'ও বলিতেছেন: "বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলাগুলি হইতে যে সংবাদ পাওয়া যাইতেছে, তাহা হইতে দেখা যায় যে বাংলা দেশে পুনরায় খাদ্যাভাব দেখা দিবার উপক্রম হইয়াছে। চট্টগ্রাম জেলাও ইহা হইতে অব্যাহতি লাভ করে নাই।" কিন্তু বাংলা দেশে বাঙ্গালীর ভাগ্যে এবং পেটে যাহাই জুটুক, বিহার হইতে আনীত রাজনৈতিক দুর্গতদের রাজার হালে রাখিবার এবং খাওয়াইবার পরাইবার সকল ব্যবস্থাই বাঙ্গলা সরকার করিয়াছেন। লজ্জা সরম না থাকিলে দলগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য মানুষ কত নীচ এবং কত বড় গাধা হইতে পারে—বাঙ্গলার বর্ত্তমান মন্ত্রীর দল তাহারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। মৌলভী তারক মুখার্জ্জিও ইহার মধ্যে আছেন।

* * * * *

'পল্লীবাসী'র মতে: "সুখের বিষয়, আমাদের পশ্চিম-বঙ্গে সাম্প্রদায়িক জঘন্যতা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে নাই। কলিকাতা, নোয়াখালি, বিহার, বোম্বাই, পাঞ্জাবে—যে জঘন্য কাণ্ড হইতেছে সেই ভ্রাতৃদ্রোহিতা হইতে পশ্চিম-বঙ্গ বহু দূরে দাঁড়াইয়া প্রমাণ করিয়াছে যে, হিন্দু-মুসলমান শত শত বৎসর প্রতিবেশিরূপে প্রীতিপূর্ণ ভাবেই বাস করিতে পারে।" কথাটা ঠিক হইল কি? পশ্চিম-বঙ্গে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা না ঘটিবার কারণ এক দিকে লীগ কর্ম্মকর্ত্তাদের হিসাব-বোধ, অন্য দিকে সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুদের অহিংস মনোভাব। পশ্চিম-বঙ্গে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ফলাফল কি হইবে তাহা ভাল করিয়া জানা আছে বলিয়া লীগ এই অঞ্চলে সাম্য-মৈত্রীতে বিশ্বাস করে। কিন্তু যেখানে লীগ সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের অভিভাবক—সেখানেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন হইতে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা লাগিয়াই আছে। দৃষ্টান্ত? পূর্ব্ব-বঙ্গের যে কোন স্থানে সন্ধান করুন। সুদূর পাঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সাম্প্রতিক দাঙ্গা-হাঙ্গামা আমাদের কথার সত্যতাই প্রমাণ করিবে।

* * * * * * *

'পল্লীবাসী' প্রশ্ন করিতেছেন: "বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ দুটিরই লোকসংখ্যা ২ কোটির উপর। মাত্র ৭০ লক্ষ অধিবাসী লইয়া যদি উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইতে পারে, তবে পশ্চিম-বঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে না কেন?" কারণ, মিঃ জিন্নার ইহাতে মত নাই। কিন্তু এ-প্রশ্ন করিয়া লাভ কি? পশ্চিম-বঙ্গ স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে কি না, তাহা স্থির করিব আমরাই। ২ কোটি ৮০ লক্ষ লোক যদি স্থির করে যে, তাহারা পাকিস্তানী আওতায় বসবাস করিবে না, তবে মিঃ জিন্না তথা লীগ ত সামান্য কথা, পৃথিবীতে এখন কোন শক্তি নাই যাহা তাহাকে ইহাতে বাধ্য করিতে পারে। এমন কি, নেতাজীর নাম ভাঙ্গাইয়া পশার জমাইতেছেন যিনি, সেই শরৎ বোসেরও এই ক্ষমতা নাই।

* * * * * * *

'শিল্প ও সম্পদ' এ প্রকাশ: "ইণ্ডিয়ান পেপার পাল্পে ধর্ম্মঘট চলিতেছে। টিটাগড়ে নোটিশ দেওয়া হইয়াছে (ধর্ম্মঘট চলিতেছে)। উহার পর আরও একটা মারাত্মক ও উদ্বেগজনক সংবাদ আমাদের দপ্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। নিয়ন্ত্রিত হওয়াবধি কাগজের বিলি-বণ্টন ভারত সরকারই করিতেন—কিছু দিন যাবৎ উহা প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত হইয়াছে, ফলে বাংলার যে সাম্প্রদায়িক দোষদুষ্ট মন্ত্রিমণ্ডলী রহিয়াছে, তাহাদের দ্বারা এ ক্ষেত্রেও অনাচার ও ভেদাভেদ দেখা দিয়াছে। শিক্ষা ও খেলা-ধূলার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প কিরূপ প্রবেশ করিয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না—খাদ্য-শস্য ও বস্ত্র-বণ্টন এবং অন্যান্য ঠিকাদারী কার্য্যে ইহা চূড়ান্ত ভাবে কলঙ্কের ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বহু প্রতিষ্ঠাবান ও "জাত" ব্যবসায়ীর স্থলে ভুঁইফোড় ব্যবসায়ীর উদ্ভব হইয়াছে, হালফিল জুতা ও মনোহারীর দোকানও 'ক্লথ রেশন' দোকানে পরিণত হইতে আমরা দেখিয়াছি, এক্ষণে কাগজের বাজারেও অনুরূপ ব্যাপার ঘটিবে সন্দেহাতীতরূপে তাহা

ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।······জানা যায়, বাংলা দেশের সাম্প্রদায়িক হার অনুযায়ী কাগজ বণ্টনের হার নির্দ্ধারিত হইবে অর্থাৎ শতকরা ৫৫ ভাগ পাইবে মুসলমান ব্যবসায়ী (বর্ত্তমানে এক-আধ জন ছাড়া নাই) এবং ৪৫ ভাগ যাইবে হিন্দুদের হাতে। হিন্দুদের মধ্যে আবার বর্ণ-হিন্দু, তপশীলভুক্ত ইত্যাদি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইবে। কাজেই কিছু পুরাতন এবং 'জাত' ব্যবসায়ী যে লোপ পাইবে তাহা বলা বাহুল্য। এবং সেই স্থলে মির্জ্জাপুর, ওয়েলেসলী ও পার্ক-সার্কাসে অনেক নূতন ব্যবসায়ীর (কাগজ) সৃষ্টি হইবে।" ভাল কথা। কিন্তু কলিকাতার ঐ সকল অঞ্চল হইতে কাগজ ক্রয় করিবে কাহারা? ঠোঙ্গাওয়ালারা পুরান সংবাদপত্র ক্রয় করে। নূতন কাগজে তাহাদের ব্যবসা চলে না। তবে বাঙ্গালার বর্ত্তমান "নারিকেল তৈল" বণ্টনের যে ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজের ব্যাপারেও তাহা হইলে বহু কসাই, চামড়াওয়ালা, কাফিখানার মালিক, দর্জ্জি, ধর্ম্মতলার 'চলন্ত' দোকানী এবং আরো অনেক অখ্যাত কুখ্যাত লীগভক্ত বেমকা কিছু পয়সা রোজগার করিবে এবং আমাদের উচ্চতর মূল্যে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে হইবে।

* * * * * * *

লীগ-মহানায়ক বলিতেছেন: "মুসলমানের আদর্শ, লক্ষ্য এবং মৌলিক রীতি ও নীতি কেবল মাত্র হিন্দু প্রতিষ্ঠান হইতে যে বিভিন্ন তাহা নহে, তাহারা পরস্পরবিরোধী। এবং এই দুই 'জাতির' পক্ষে কখনও এবং কোন ক্ষেত্রে একত্র এবং সহযোগিতায় কোন কাজ করা চলিতে পারে না, বসবাস করা ত দূরের কথা।"

বাঙ্গলার লীগ-নায়ক এবং প্রধান মন্ত্রী সুরাবর্দ্দি সাহেব বলিতেছেন: "বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের লোকের দ্বারা যে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে এবং যাহাতে সকল সম্প্রদায়েরই সমান কর্ত্তৃক ও অধিকার থাকিবে, তাহাই হইবে বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং উভয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সমান ও পূর্ণ কল্যাণকর গভর্ণমেণ্ট।" বাঙ্গলার লীগ-মন্ত্রী মাননীয় সামসুদ্দিন সাহেব বলিতেছেন: "বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের ভাষাও যেমন এক, স্বার্থও তেমনি এক। ইহাদের আচার-ব্যবহারও প্রায় একই প্রকার। বাঙ্গলার রাষ্ট্রে সকল ক্ষমতা এবং সর্ব্বপ্রকার শাসন-ব্যবস্থা হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকিবে।

এই প্রকার অ-পাকিস্তানীয় কথা বলার জন্য সুরাবর্দ্দি সাহেব জিন্নার নিকট হইতে কাণমলা এবং সামসুদ্দিন সাহেব চড় খাইয়াছেন কি না জানি না, তবে তাঁহাদের মন্ত্রিত্ব হইতে তাড়াইবার জন্য প্রবল আন্দোলন যে লীগ-মহলে চলিতেছে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে।

* * * * *

'পল্লীবাসী' বলেন: "নোয়াখালীতে এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত না হওয়া সত্ত্বেও আশ্রয়কেন্দ্রগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ায়, অথচ বিহারী আশ্রয়প্রার্থীদের এখনও পোষণ করা হইতেছে বলিয়া বিরোধী পক্ষ সরকারী ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিয়াছেন। কিন্তু লীগ সদস্যগণের ভোটে তাহা নামঞ্জুর হইয়াছে। বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়া বাঙ্গালীর অর্থে বিহারীদের যে কত কাল খাওয়ান হইবে, ভগবানই জানেন।" শেষের দিকে কথাটা ঠিকমত বলা হইল না। বলা উচিত ছিল: হিন্দু বাঙ্গালীকে বঞ্চিত করিয়া হিন্দু বাঙ্গালীর টাকায় বিহারী মুসলমানদের (লীগ) আর কত কাল খাওয়ান চলিবে তাহা ভগবানও জানেন না! 'ভগবানও জানেন না' এই কারণে বলিলাম যে, বাঙ্গলার বর্ত্তমান লীগ সরকার যে প্রকার কার্য্যাবলীর দ্বারা দেশ সুশাসন করিয়া বিদেশে সুনাম অর্জ্জন করিতেছেন—ভগবানের নাম মনে থাকিলে কোন মানুষ তাহা করিতে ভরসা পায় না। বর্ত্তমান বাঙ্গলায় ভগবান নাই। বাঙ্গলার শাসনকর্ত্তারা ভগবানকে বয়কট করিয়াছেন এবং ভগবানও বোধ হয় ইহাদের সভয়ে পরিত্যাগ করিয়াছেন।

* * * * *

'হিন্দু পত্রিকা' পাঠে জানিতে পারা যায়: গত ১১শে ফাল্গুন বীরকুৎসা গ্রামের এক জন মুসলমানের গৃহে বেলা ১ ঘটিকার সময় আগুন লাগে। উহা বহু বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই স্থানীয় বহু হিন্দু-মুসলমানের সমবেত ও ঐকান্তিক চেষ্টায় উক্ত আগুন সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাপিত করা হয়; একখানি খড়ের ঘর সম্পূর্ণরূপে পুড়িয়া গিয়াছে······ক্ষতির পরিমাণ দেড় শত টাকা।" সংবাদ পাঠ করিয়া খুসী হইলাম। কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের একত্র এবং সম্মিলিত কাজ দেখিয়া মহামতি জিন্না কি খুসী হইবেন? যে-আগুন মুসলমানের একখানি খড়ের ঘর পুড়াইল, সেই আগুনই সামান্য সুবিধা পাইলে অন্তত হাজার খানেক হিন্দুর ঘর পুড়াইত। অতএব জিন্না সাহেব মনে করিবেন, 'এমন আগুন' নির্ব্বাপিত করিয়া ঘোরতর অন্যায় কাজ হইয়াছে। ইহাও সম্ভব যে, বীরকুৎসা গ্রামে লীগ-মুসলমান কেহ ছিল না। থাকিলে এমন অপকার্য্য বোধ হয় সংঘটিত হইত না। কিন্তু দেশের বৃহত্তর অগ্নি নির্ব্বাপিত করিবার কাজে হিন্দু-মুসলমান একযোগে কবে কার্য্য আরম্ভ করিবে? জিন্না সাহেব বর্ত্তমান থাকিতে তাহা কখনও সম্ভব হইবে বলিয়া মনে হয় না।

* * * * * *

'বঙ্গবাসী' দুঃখ করিয়া বলিতেছেন: "বাঙ্গলার মন্ত্রিমণ্ডলী সংকল্প করিয়াছেন যে, কলিকাতা করপোরেশনের ছোট-বড় সকল চাকুরীতে লোক নিয়োগের ক্ষমতা তাঁহারা স্বহস্তে গ্রহণ করিবেন। কলিকাতা করপোরেশন এদেশের বৃহত্তম স্বায়ত্ত-শাসনসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান। তাহাই যদি খাস সরকারী শাসনের অধীন হয়, তবে মফস্বলের মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, ইউনিয়ন বোর্ড প্রভৃতি ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানগুলিই বা বাহিরে থাকিবে কেন? এখনও অবশ্য বাঙ্গলার লীগ গভর্ণমেণ্ট এই সাধু সংকল্প কার্য্যে পরিণত করেন নাই।

আইন করিতে কিছু সময় লাগিবে। তাঁদের সংকল্পও যা, আইনও তাই; কারণ, স্বতন্ত্র নির্ব্বাচনের সুযোগে লীগের সদস্যই সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়া আছে। তপশীলীদের কতকাংশ এই গরিষ্ঠদেরই তাঁবেদার। তাহা ছাড়া বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যেও যে বর্ণচোরা কেহ নাই, এমন নহে।" অন্তত এক জন যে আছেন, তাঁহাকে আমরা বাঙ্গলায় লীগ মন্ত্রিমণ্ডলেই বিরাজমান দেখিতে পাইতেছি। কলিকাতা কর্পোরেশন হাতে লইয়া কেবল কর্ম্মচারী নিয়োগেই বাঙ্গলার লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর কর্ত্তব্যভার শেষ হইবে না। কর্পোরেশন প্রতি বৎসর লক্ষ লক্ষ টাকার মালপত্রাদি ক্রয় করিয়া থাকে। এই সকল মালপত্র ক্রয় এবং বিক্রয় ব্যাপারে সাম্প্রদায়িক রেশিও মত নিশ্চয়ই কার্য্য হইবে। কলিকাতার লোকসংখ্যা শতকরা ৭৫ জন হিন্দু। কলিকাতা কর্পোরেশনে খাজনা হিন্দুরাই দেয় শতকরা ৯০ টাকা। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়—'স্বর্গীয়'-মেজরিটির দৌলতে লীগ মন্ত্রিমহাপ্রভুরা কর্পোরেশনের শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষমতা নিজেদের অর্থাৎ লীগ কর্ত্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দিতে মতলব করিয়াছেন। তবে ব্যাপারটা তাঁহারা যত সহজ মনে করিয়াছেন, ঠিক ততখানি সহজ হইবে না। দেখা যাক্।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

'বঙ্গবাসী'র ভাষায়:—"প্রকাশ বাঙ্গালা সরকার রমজান উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছুটি বাড়াইয়া এক মাস করিতে চাহেন এবং এ জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকট প্রস্তাব পাঠাইয়াছেন। রমজানের এক মাস, মহরমের জন্য এক মাস, ঈদের জন্য এক মাস—আরও যে সব পর্ব্ব (মুসলীম) আছে, তাহার জন্য আরও কয়েক মাস করিয়া বাঙ্গালার স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার ব্যবস্থা তাঁহারা করিতে পারেন। কিন্তু হিন্দুর পূজা-পার্ব্বণের ছুটি তজ্জন্য কমাইতে চাহেন কেন? শুনা যাইতেছে, গবর্ণমেণ্ট দুর্গাপূজা, কালীপূজার ছুটি ও গ্রীষ্মের ছুটি কমাইয়া দিয়া রমজানের ছুটি বাড়াইতে চাহিয়াছেন।" রহিমের রাজ্যে রামের পর্ব্বাদির ছুটি কমিবে না—এও কি একটা কাজের কথা হইল? কিন্তু বঙ্গবাসীর এত চিন্তা করিবার দরকার হইবে না। কারণ, ইতিমধ্যেই মুসলীম (লীগ) ছাত্রগণ হিন্দু স্কুল-কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, কাজেই মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বৎসরের মধ্যে যদি সাড়ে এগার মাসও বন্ধ থাকে, তাহাতে অমুসলমানদের মাথা-ব্যথা কেন? প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যায় যে, বৎসরের মধ্যে অর্দ্ধ মাস মাত্র পড়াশুনা করিয়াও মুসলিম ছাত্রগণ তাহাদের বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীতে পরীক্ষা পাশ করিয়া বাঙ্গলার সরকারী চাকরীর শতকরা ৬০।৭০টিতে বহাল হইবে। মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইন্জিনিয়ারিং এবং ডাক্তারী শিক্ষাও এই ভাবে হইলে আরো ভাল হইবে। বর্ত্তমান বাঙ্গালায় মুসলীম ডাক্তার এবং ইন্জিনিয়ারের সংখ্যা অত্যন্ত কম, নাই বলিলেই হয়। চটপট কোন আইন পাশ করিয়া কয়েক হাজার মুসলীম ডাক্তার এবং ইন্জিনিয়ার স্পেশাল তকমা দিয়া বাজারে ছাড়িয়া দিলে লীগ সরকার হিন্দুদের জব্দ করিতে পারিবেন!

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

প্রকাশ যে, কলিকাতার ইস্লামিয়া কলেজের উন্নতি এবং প্রসারের জন্য বাঙ্গলা সরকার কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। "বর্ত্তমানে এই কলেজটিতে ৫ শতের বেশী ছাত্রের স্থান নাই এবং বি এস-সি পড়াইবার ব্যবস্থা নাই। কলেজটিকে সহরের উপকণ্ঠে কোন নূতন স্থানে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে ২ হাজার ছাত্রের সঙ্কুলানের উপযোগী অট্টালিকাদি ও হোষ্টেল নির্ম্মাণের জন্য ২ হাজার একর জমি দখল করিতে হইবে।" অর্থাৎ ছাত্র-প্রতি এক একর জমির ব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন! আশা করি, ভবিষ্যতে এই মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এমন কোন স্থান নির্ব্বাচন করা হইবে যেখানে অন্তত ২ হাজার হিন্দু চাষী পুরুষানুক্রমে বসবাস করিতেছে। কারণ, ইহা না হইলে লীগের হিন্দু-দলন এবং সঙ্গে সঙ্গে মুসলীম-তোষণ ও পোষণ নামক পবিত্র কাজটি যথাযথ হইবে না। তবে লীগ যদি এমন কোন পরিকল্পনা না করিয়া থাকেন তবে আমরা ধাপা নামক স্থানের কথা মনে করাইয়া দিব। এখানের জমি ভাল। শাক-সবজী যখন চমৎকার গজায়, তখন উপযুক্ত সারের ব্যবস্থায় ভাল ছাত্রও গজাইবে। জায়গাটি খোলামেলা, এবং ২ হাজার একরের পরিবর্ত্তে ৪ হাজার একরও পাওয়া সহজসাধ্য হইবে। ইহা ভবিষ্যৎ প্রসারের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে।

*　　*　　*　　*　　*　　*　　*

'সঞ্চয়' পত্রিকার অভিযোগ: ফরিদপুরে চাউলের মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়াছে। সহরের বাজারে প্রতি মণ ২৫ টাকা। হয়ত আরো বাড়িবে। কিন্তু সরকারপক্ষ এই চাউলের মূল্যবৃদ্ধিতে একেবারে নির্ব্বিকার। যেন ইহাতে তাঁহাদের করিবার কিছুই নাই। গত ১৩৫০ সালের মন্বন্তরে চাষী ও ভূমি-হীন দরিদ্র জনগণ মরণ বরণ করিয়া বাঁচিয়াছিল। সে-বার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা অলঙ্কার ও তৈজস-পত্রাদি বিক্রয় করিয়া কোন মতে প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। এবার চাষীদের অবস্থা খুব ভাল। ধান ও পাটের মূল্যবৃদ্ধিতে চাষীরা আজ সমৃদ্ধ।······অন্য দিকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জনগণ এবার চাউলের মূল্যবৃদ্ধিতে আশঙ্কায় একেবারে অধীর হইয়া পড়িয়াছে। সরকারপক্ষ সে-বার গুদামজাত বহু লক্ষ মণ চাউল ও আটা প্রভৃতি মানুষকে খাইতে না দিয়া পচাইয়া ফেলিয়াছিলেন। পঞ্চাশ লক্ষ লোক না খাইতে পাইয়া মরিল।······এবারের অবস্থাও সেই ধরণের হইয়া আসিতেছে।······মুনাফাখোর চাউল ব্যবসায়ীরা অর্থলোভে পিশাচের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহোল্লাসে চাউলের মূল্যবৃদ্ধি করিয়া দরিদ্র জনগণের শোণিত শোষণ করিতেছে। কেহ বাধা দিবার নাই। চারি দিকে হাহাকার! অথচ কর্ত্তৃপক্ষ নীরব। ইহা পরমাশ্চর্য্য।"—একেবারেই না। ইহাই 'পাকিস্তানী' শাসনের স্বরূপ।

*

'ঢাকা-প্রকাশ' জানাইতেছেন: "মুন্সীগঞ্জ অঞ্চল হইতে যে সকল সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমান সময়ে তথাকার সর্ব্বত্র চাউলের মূল্য প্রতি মণ ২৪৲। গত প্রায় ৬ মাস যাবৎ চিনির বরাদ্দ পাওয়া যাইতেছে না। মৃতের

সংকারের কাপড় নাই। সাধারণের মাত্র লজ্জা নিবারণোপযোগী কাপড়েরও অভাব, অথচ উচ্চ সরকারী কর্মচারীরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত কাপড় চিনি পাইয়া থাকে।" লীগ মন্ত্রিমণ্ডলীর কার্য্যদক্ষতা এবং সুশাসনের আর একটি নমুনা।

* * * * *

'বগুড়ার কথা'য় প্রকাশ: "১৯৪৭ সালে বগুড়ায় খাদ্য-সঙ্কট দেখা দিবে, এ কথা আমরা একাধিক বার উল্লেখ করিয়াছি এবং জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এ-বিষয়ে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। সত্য হোক আর না হোক, বাংলা সরকার এ জেলাকে খাদ্য-শস্যসংক্রান্ত ব্যাপারে বাড়তি জেলা বলিয়া ধরিয়া লইয়া এই জেলা হইতে ধান-চাউল সংগ্রহ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এ জেলা বাড়তি জেলা নয়, ইহা একটি ঘাটতি জেলা এবং বাংলা সরকার এ জেলা হইতে ধান-চাউল সংগ্রহ করাতে জেলার স্বাভাবিক খাদ্যাভাব অধিকতর অভাবে পরিণত হইয়াছে।" বাঙ্গলা দেশের চা'ল মারিয়া লীগের এ এক প্রকার অভিনব ট্যাকটিক্যাল চাল। কিন্তু এ-চালের বিপদ এই যে, ইহাতে হিন্দু মরিবে শতকরা ৪৫ এবং মুসলমান গরীব মরিবে শতকরা ৫৫ জন। তবে লীগ বোধ হয় স্থির করিয়াছেন, বিহারী মুসলীম (লীগ) দুর্গত জনদের দ্বারা বাঙ্গলার মুসলীম ঘাটতি তাঁহারা পূরণ করিতে পারিবেন। আশা করি, মৃত্যু-প্রতীক্ষায় বাঙ্গালী মুসলমান ইহাতে পরম সান্ত্বনা লাভ করিয়া হাসি মুখে মহাযাত্রা করিতে পারিবে।

* * * * *

"বগুড়া সহরে মাসাধিক কাল গেল কয়লা নাই। কাঁচি ওজনে ১১৲ মণ দিয়া যে গোবরে-গন্ধওয়ালা চাউল কিনি, তাহা ফুটাইয়া লইয়া গলাধঃকরণ করিব সরকারের ব্যবস্থায় তাহা হইবার উপায় নাই। কয়লা কনট্রোল করিয়া সদাশয় সরকার আমাদের জ্বালানি দ্রব্যের অভাব দূর করিতেছেন বৈ কি। বাংলা সরকার কয়লা কন্ট্রোল করিয়া সম্প্রতি রাইটার্স বিল্ডিংসে এক সাংবাদিক সভায় বলিয়াছেন যে, উৎপাদন হ্রাসের জন্য কয়লার দুষ্প্রাপ্যতা ঘটে নাই, কয়লা স্থানান্তরিত করিবার অসুবিধা হেতু উহা ঘটিয়াছে, অর্থাৎ কি না কয়লার টানাটানি গাড়ীর অভাবে। সুতরাং তিনি বাংলার অধিবাসীদিগকে কয়লার সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

কথা শুনিয়া গা জ্বলিয়া যায়—গায়ে জ্বর আসে। কয়লা যেখানে মোটেই পাওয়া যায় না, সেখানে কয়লা সংরক্ষণ ও মিতব্যয়িতার প্রশ্ন উঠে কেমন করিয়া?......চাউলের অভাব, আটার অভাব, ডাইলের অভাব, তেলের অভাব, চিনির অভাব, কয়লার অভাব, অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় জিনিষের অভাবে মানুষ আজ পীড়িত এবং এই সকল অভাবের মূলে রহিয়াছে বাংলা সরকারের অযোগ্যতা। সেই অযোগ্যতা ঢাকিবার জন্য মাঝে মাঝে এরূপ অহেতুক উপদেশ-বাণী শোনানোর ব্যবস্থা বাংলা সরকার করিয়াছেন।" বাংলা সরকারের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ কোন দুষ্টবুদ্ধি হিন্দু পত্রিকার সম্পাদক করিতেছেন না, করিতেছেন 'বগুড়ার কথা' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয়—ডাক্তার মফিজ উদ্দিন আহমদ এম-বি, এম, এম, এফ এবং তস্য ভ্রাতা মৌলবী নফিজ উদ্দীন আহমদ, বি-এল মহাশয়। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

* * * * * * *

'পাঞ্চজন্যে' প্রকাশ: "ত্রিপুরা জেলার কোন কোন অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের অবস্থা দেখা দিয়াছে অবগত হইয়া আমরা অত্যন্ত আশঙ্কা বোধ করিতেছি। ১৯৪৩ সালের দুর্ভিক্ষের দুরবস্থার কথা বাঙ্গালী কখনও বিস্মৃত হইবেন না।......আশা করি, বাঙ্গলা সরকার অবিলম্বে এই বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন এবং দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের অধিবাসীদের রক্ষা করিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইবেন।" 'পাঞ্চজন্য' সম্পাদক পরম আশাবাদী ব্যক্তি। তিনি আশা করিতে থাকুন, কিন্তু বাঙ্গলা সরকার সর্ব্বপ্রথম বিহারী মুসলীম দুর্গতদের বাঙ্গলায় বসবাসের আরাম-বিলাস-ব্যবস্থা এবং তাহার পর অন্তত ১৬ হাজার পাঞ্জাবী মুসলমানকে বাঙ্গলার আর্মড পুলিশে পাকা-পাকি নিয়োগ না করিয়া অন্য কোন অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে দৃষ্টি দিতে সময় বোধ হয় পাইবেন না। ১৯৪৩এর দুর্ভিক্ষের কথা বাঙ্গলার প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার ভক্ত বহুজন কখনও ভুলিবেন না, কারণ ১৯৪৩ সালেই তাঁহাদের ৫০ পুরুষ বসিয়া খাইবার মত সম্পদ-সৌভাগ্যের সূত্রপাত হয়।

* * * * * * *

চট্টগ্রামের এক সংবাদে প্রকাশ যে, "বসির আহমদ নামক আন্দর কিল্লার এক দোকানদার ৮টি সলাই।৵০ সাত আনা দামে বিক্রি করায় ডি আই বি কনষ্টেবল মোহিনীরঞ্জন বড়ুয়া...এস ডি ও'র কোর্টে তাহার বিরুদ্ধে এক নালিশ দায়ের করে।...মিঃ সি, এইচ, ব্যানার্জ্জি বসির আহমদকে দোষী প্রমাণে ২০৲ টাকা অর্থদণ্ড অনাদায়ে এক মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেন।" বেচারা বসির আহমদ! মশা মারিয়া হতভাগা খুনের দায়ে পড়িল, কিন্তু খুন করিয়া বাঙ্গলার বহু মহাজন মশা মারার দায়েও পড়ে নাই, কারণ তাহারা লীগভক্ত, কিম্বা লীগভক্তদের ভক্ত! বসির আহমদ লীগদলে বোধ হয় নাম লেখায় নাই। যদি লীগ-সদস্য সে হইতে পারিত, তাহা হইলে খুনের দায়ে ফাঁসীর হুকুম হইলেও বাঙ্গলা সরকার তাহাকে লাট সাহেবের 'বিশেষ হুকুমে' বাঁচাইতে পারিতেন। হাতফিল দৃষ্টান্ত না পাইলে এমন কথা বলিতে ভরসা পাইতাম না, বলা বাহুল্য।

রাশিয়ার

চায়-নাইয়া

রাশিয়াতে চায়ের দোকানকে চায়-নাইয়া বলে। এই চায়-নাইয়াগুলো রুশদের সামাজিক জীবনের প্রাণকেন্দ্রস্বরূপ। আগেকার মত ভড্কা পানের রীতি আর বড় নেই, চা-ই এখন ভড্কার স্থান দখল করেছে। তাই চায়-নাইয়াতে ভীড় লেগেই থাকে এবং সেখানে সামোবারই যে একমাত্র আকর্ষণ তা বলাই বাহুল্য। অনবরত গরম জলের যোগানের জন্য সামোবার রুশদের অপরিহার্য।

রাশিয়ার অধিবাসীরা পাড়াপ্রতিবেশীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে খুবই ভালবাসেন। প্রতিবেশীর প্রতি এতটা অন্তরঙ্গতার নিদর্শন খুব সম্ভব অন্য কোনো জাতির মধ্যেই সম্ভব নয়। এই জন্যেই তাঁদের সামাজিক জীবনে চায়ের মূল্য খুব বেশি। উপলক্ষ যা-ই হোক না কেন পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে দেখাশোনা করতে গেলেই অতিথিকে চা দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। রুশদের কাছে "সামোবার" সব সময়ই মস্ত আকর্ষণের বস্তু। "সামোবার" হলো ধাতু দিয়ে তৈরি জল ফোটাবার এবং চা ভেজাবার পাত্র বিশেষ। কাঠকয়লা দিয়ে সামোবারে জল ফোটানো হয়। রকমারি নক্সাকাটা একটি সামোবার বাড়িতে থাকা গৃহস্থ মাত্রেরই গর্বের জিনিস। রুশরা কাপের বদলে সাধারণত লম্বা গ্লাসে করে চা খেতেই ভালবাসেন। তাঁরা চা-তে দুধ ব্যবহার করেন না, তবে চিনির চল আছে। মাঝে মাঝে চিনির বদলে জ্যাম বা মধু ব্যবহার করা হয়। লেবুর রস আর "রাম্" মিশিয়ে চা খাওয়ার রেওয়াজও আছে। আগন্তুকরা বাড়ি থেকে বিদায় না নেওয়া পর্যন্ত প্রয়োজন মত বার বার প্রচুর জল আর চা দিয়ে সামোবার ভরতি রাখা হয়। রাশিয়াতে প্রায় প্রত্যেক ট্রেন লাইনেই বিনামূল্যে চা খাওয়াবার ব্যবস্থা আছে। রুশরা চা খেতে ভালবাসেন বললে সবটা বলা হয় না,—চা না হলে তাঁদের চলেই না, আর তা-ও চাই প্রচুর পরিমাণে :

চা

সার্বজনিক পানীয় ★

IM 276

ইণ্ডিয়ান টী মার্কেট এক্সপ্যানশন বোর্ড কর্তৃক প্রচারিত

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি!

শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী

মস্কো সম্মেলন—

জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার সহিত সন্ধিসর্ত্ত নির্দ্ধারণের জন্য গত ১০ই মার্চ্চ হইতে রাশিয়ার রাজধানী মস্কো সহরে পররাষ্ট্র সচিব-সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে। এই সম্মেলন চতুর্থ সপ্তাহে পদার্পণ করিলেও সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছুই আশা করা যাইতেছে না। সম্মেলনের সংবাদ যাহা প্রকাশিত হয় তাহা এমন সুস্পষ্ট নয় যে, প্রকৃত অবস্থা অনুমান করা যাইতে পারে। যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বুঝা যাইতেছে, জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একমত হইবার মত কোন সাধারণ ভিত্তি পররাষ্ট্র সচিব-চতুষ্টয় এখনও পান নাই। জার্ম্মাণী সম্পর্কে মস্কো সম্মেলনের প্রধান বিষয় চারিটি: (১) জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ, (২) অর্থনৈতিক ঐক্য, (৩) জার্ম্মাণ শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে উৎপাদনের স্তর সম্বন্ধে পুনর্ব্বিবেচনা এবং (৪) ক্ষতিপূরণ। এই চারিটি বিষয়ের মধ্যে শেষের তিনটি বিষয় সম্পর্কে আপাততঃ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে না। সাময়িক ভাবে এই তিনটির মীমাংসা অসম্ভব বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। জার্ম্মাণীর রাষ্ট্রনৈতিক ভবিষ্যৎ এই তিনটির সাহত এমন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত যে, উহাদের মীমাংসা না হইলে জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও কোন মীমাংসায় উপনীত হওয়া সম্ভব নহে। জার্ম্মাণীর রাজনৈতিক গঠন কিরূপ হইবে সে সম্বন্ধে একমত হওয়া নির্ভর করে জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধে একমত হওয়ার উপর। আবার জার্ম্মাণীর নিকট হইতে প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ সম্বন্ধে মতৈক্য না হইলে অর্থনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধে একমত হওয়াও সম্ভব নহে। তথাপি যথাসম্ভব শীঘ্র জার্ম্মাণীর জন্য একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠান গঠন সংক্রান্ত নীতি সম্পর্কে পররাষ্ট্র সচিব-চতুষ্টয় এই সর্ব্বপ্রথম একমত হইয়াছেন। কিন্তু ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট অনেক খুটিনাটি ব্যাপারে মতভেদ রহিয়া গিয়াছে।

যান-বাহন, সংযোগ-বিধান ব্যবস্থা, অর্থ, শ্রমশিল্প, খাদ্য এবং কৃষি সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি কেন্দ্রীয় এজেন্সী গঠনে তাঁহারা একমত হইয়াছেন। কিন্তু এই এজেন্সীর কয়েকটি ক্ষমতা সম্পর্কে তাঁহারা একমত হইতে পারেন নাই। কাজেই সমস্ত বিষয় সম্পর্কে আরও আলোচনার জন্য উহাকে সমন্বয়-সাধক কমিটিতে পাঠান সম্বন্ধে তাঁহাদের মতৈক্য হইয়াছে। পটসডাম চুক্তিতে একটি কেন্দ্রীয় শাসন এজেন্সী গঠনের সর্ত্ত আছে। এই চুক্তি অনুসারে কেন্দ্রীয় শাসন এজেন্সী গঠিত হইবার তিন মাস পর জার্ম্মাণ উপদেষ্টা কাউন্সিল গঠিত হইবে। অতঃপর নয় মাস পরে অস্থায়ী জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হইবে। ক্ষতিপূরণ সম্পর্কে যে সকল বিষয় লইয়া মতভেদ হইয়াছে তন্মধ্যে চলতি উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি অন্যতম। আমেরিকার মতে চারি বৎসরের পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর চলতি উৎপাদন হইতে কোন ক্ষতিপূরণ আদায় করা চলিবে না। বৃটেনের মতে পাঁচ বৎসরের পূর্ব্বে সম্ভব নয়। ফ্রান্স কোন মতামত প্রকাশ করে নাই। কিন্তু রাশিয়া মনে করে, ৪ বৎসর বা ৫ বৎসরের অনেক পূর্ব্বেই চলতি উৎপাদন হইতে ক্ষতিপূরণ আদায় করা সম্ভব হইবে। জার্ম্মাণীর কেন্দ্রীয় শাসন এবং অর্থনৈতিক ঐক্য সম্বন্ধে রাশিয়ার সহিত বৃটেন ও আমেরিকার পার্থক্য বিশেষ ভাবে বিবেচনার যোগ্য। রাশিয়া দৃঢ় কেন্দ্রীয় জার্ম্মাণ গবর্ণমেণ্ট গঠিত হওয়ার পূর্ব্বে জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্য সমর্থন করে না। কিন্তু বৃটেন এবং আমেরিকা পছন্দ করে দুর্ব্বল কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্ট, কিন্তু অর্থনৈতিক ঐক্য। ফ্রান্স জার্ম্মাণীর অর্থনৈতিক ঐক্যের সহিত কয়লা এবং সার অঞ্চলের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত প্রশ্ন জড়িত করিতে চায়।

রূঢ় অঞ্চলে ধর্ম্মঘট—

খাদ্যাভাবের জন্য রূঢ় এবং রাইনল্যাণ্ডে ব্যাপক ধর্ম্মঘট এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য দায়ী কে, তাহা কেহ-ই বলে না। কিন্তু নাৎসীরা যে দায়ী নয় তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর বৃটিশ ও মার্কিণ-অধিকৃত এলাকায় শাসন পরিচালন কার্য্য যে ত্রুটি-বহুল তাহা অপ্রকাশ থাকে নাই। তথাপি মস্কো সম্মেলনের সময় এইরূপ ধর্ম্মঘটকে বিশেষ উদ্দেশ্যসাধক বলিয়া অভিহিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু খাদ্যাভাব যে সত্য তাহা সকলেরই স্বীকৃত। ইহার উপর আছে চোরা বাজার। ৩০ হাজার টন খাদ্যশস্য কোন্ ঐন্দ্রজালিক শক্তিতে উধাও হইল তাহা কেহই বলিতে পারে না। খাদ্যাভাব ঘটিলে লোক যদি বিক্ষুব্ধ হয়, শ্রমিকরা যদি ধর্ম্মঘট করে, তবে তাহার জন্য তাহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না। মস্কো সম্মেলনের অধিবেশন চলিতেছে বলিয়া তো না খাইয়া থাকা সম্ভব নয়?

স্পেনে রাজাহীন রাজতন্ত্র—

স্পেনে রাজাহীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জেনারেল ফ্রাঙ্কোর উদ্যোগী হওয়া খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ ঘটনা। এই প্রস্তাবিত রাজাহীন রাজতান্ত্রিক স্পেনে জেনারেল ফ্রাঙ্কোই শাসনতান্ত্রিক প্রধান হইয়া থাকিবেন, কিন্তু তিনি রাজা আখ্যা গ্রহণ করিবেন না। তাঁহার পরে তাঁহার আসনে কে বসিবেন তাহাও তিনিই স্থির করিবেন। কিছু দিন পূর্ব্বে ফ্রাঙ্কো-শাসনকে উৎখাত করিবার জন্য বামপন্থীদের আয়োজন করার কথা শোনা গিয়াছিল! কিন্তু ফ্রাঙ্কো-শাসনের অবসানের পরিবর্ত্তে উহাকে আরও দৃঢ় করিবার ব্যবস্থা কি সূচনা করিতেছে? সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘ অত্যন্ত মোলায়েম ভাষায় ফ্রাঙ্কো-শাসনের প্রতি

তাঁহাদের অসমর্থন জানাইয়াছেন। বৃটেন এবং আমেরিকা ফ্রাঙ্কো-শাসনের অবসান এবং রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা পছন্দ করে না। অধিকন্তু ইউরোপে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সাহায্য ও পরিপুষ্ট করিতেই তাহাদের আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। স্পেনের রাজতন্ত্রবাদীরা ফ্রাঙ্কো-শাসন পছন্দ করেন না। ফ্রাঙ্কোর এই অভিনব ঘোষণার ফলে রাজতন্ত্রবাদীদের সহিত বুঝাপড়া করিতে তাঁহার অনেকটা সুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্পেন-রাজসিংহাসনের দাবীদার ডন জুয়ান ফ্রাঙ্কোর সর্ত্তে রাজসিংহাসন গ্রহণ করিতে রাজী হইবেন, এরূপ কিছুও জানা যাইতেছে না। একটা নেতিবোধক ব্যাপারে ফ্রাঙ্কো-শাসনের বিরুদ্ধে রাজতন্ত্রবাদী ও বামপন্থীর ঐক্যবদ্ধ হওয়া সম্ভব নয়। এই সুযোগে ফ্রাঙ্কো ফ্যালাঞ্জিষ্ট শাসনের দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য রাজতন্ত্র ঘোষণা করিয়াছেন। এই বিষয়ে বৃটেন ও আমেরিকার সমর্থন পাওয়ার আশাও তিনি করেন। তাঁহাদের দৃষ্টিতে সোভিয়েট রাশিয়া এবং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে ফ্রাঙ্কো-শাসন ইউরোপে একটি দুর্ভেদ্য প্রাকার।

তৃতীয় মহাসমরের পথে—

গত ৫ই এপ্রিল সাম্বৎসরিক জেফার্সন দিবসের ভোজ-সভায় মার্কিণ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আমেরিকাবাসীকে ব্যাপক যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন, "আমরা যুদ্ধ চাই না—এ কথা মুখে বলাই যথেষ্ট নয়। সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে পারে এরূপ যুদ্ধ-বিগ্রহের সূত্রপাত হওয়া মাত্রই সময় থাকিতে অঙ্কুরেই উহাকে বিনাশ করিবার জন্য আমাদিগকে উদ্যোগী হইতে হইবে।" প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এই মহৎ অভিপ্রায় সত্ত্বেও প্রশ্ন দাঁড়াইয়াছে, কে বা কাহারা আন্তর্জ্জাতিক ঘটনাবলীকে ভাবী তৃতীয় মহাসমরের পথে পরিচালিত করিতেছে? গ্রীস ও তুরস্ককে সাহায্য প্রদানের জন্য কংগ্রেসে প্রস্তাব প্রেরণ উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা দেন তাহাতে সরাসরি রাশিয়ার কথা তিনি বলেন নাই বটে, কিন্তু ইয়ালতা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াকে ভীতি প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগে এবং জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ডিক্টেটরী শাসন প্রবর্ত্তনের যে অভিযোগ করা হইয়াছে তাহা যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে, সে কথা সকলেই বুঝিতে পারিয়াছে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে ইহা শুধু অভিযোগ নহে, অভিযোগের ছদ্মবেশে রাশিয়াকে রীতিমত শাসাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এইরূপ সাহায্য দান গ্রীস ও তুরস্কের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নহে। চীনেও আমেরিকার হস্তক্ষেপের পরিণাম আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি। প্রতিনিধি-পরিষদের বৈদেশিক কমিটিতে আমেরিকার সহকারী স্বরাষ্ট্র-সচিব মিঃ ডিন একিসনকে খোলাখুলি ভাবেই জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, 'গ্রীস ও তুরস্কের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ফলে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে কি না।' উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "ইহাতে যুদ্ধ বাধিয়া উঠিবে বলিয়া আমি মনে করি না। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের শক্তিকে শক্তিশালী করিয়া বৃহৎ রাষ্ট্রবর্গের মধ্যে বিরোধের সম্ভাবনাকেই হ্রাস করা যায়।" কিন্তু প্রশ্ন এই যে, গ্রীসে ও তুরস্কে কি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে? আমেরিকার সাহায্য না পাইলে গ্রীসের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের পক্ষে অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব নয়। ইহা দ্বারাই কি গ্রীসের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় নাই? বৈদেশিক চাপের জন্য তুরস্ককে বিপুল সেনাবাহিনী পোষণ করিতে হইতেছে এবং বৈদেশিক চাপের জন্যই তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য আমেরিকা উৎকণ্ঠিত—মিঃ একিসনের এই উক্তি দ্বারা কোন্ বৈদেশিক শক্তিকে লক্ষ্য করা হইয়াছে তাহা তিনি বলেন নাই। কিন্তু এই বৈদেশিক শক্তি যে রাশিয়া তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় কি?

গ্রীসে ও তুরস্কে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠার আশঙ্কায় আমেরিকা বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। এইরূপ গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা আমেরিকার নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক বলিয়া মিঃ একিসন মনে করেন। মার্কিণ ধনতন্ত্র ঘরে এবং বাহিরে কম্যুনিজমের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কম্যুনিষ্টদের শক্তির উৎস রাশিয়ার প্রতি এই জন্য আমেরিকার বিরূপ মনোভাব। মিঃ হুভার কম্যুনিজম সম্পর্কে বলিয়াছেন: "Communism in reality is not a political party, it is an evil, malignant way of life." মার্কিণ-বিরোধী (un-Amarican) কার্য্য-কলাপ সংক্রান্ত তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কম্যুনিষ্টদিগকে বলা হইয়াছে মস্কোর চর। এই অভিযোগের সমর্থনে যে প্রমাণ উপস্থাপিত করা হইয়াছে তাহা অতি চমৎকার। রিপোর্টে বলা হইয়াছে: "নিকারাগুয়া ও চীনে মার্কিণ-হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কম্যুনিষ্টরা বাধা প্রদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছিল।" আমেরিকার হস্তক্ষেপ দ্বারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র ক্ষুণ্ণ হয় না, ইহাই মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদীদের বিশ্বাস। মার্কিণ নৌ-সচিব ফরেষ্টলের গত ৩০শে মার্চ্চ বলিয়াছিলেন: "যে সকল দেশ স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলিকে রক্ষা করিতে চায়, প্রয়োজন হইলে তাহাদিগকে রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক এমন কি সামরিক সাহায্য পর্য্যন্ত পাঠাইতে হইবে।" ইহাই যদি আমেরিকার সত্যকার উদ্দেশ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ভিয়েটনামী-দিগকে আমেরিকা সাহায্য করিতেছেন না কেন? প্রকৃত পক্ষে আমেরিকা কম্যুনিজম-ভীতি তুলিয়া মার্কিণ সাম্রাজ্যবাদের প্রসার সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অন্ধ রাখিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার অজুহাতে গ্রীস হইতে আরম্ভ করিয়া চীন পর্য্যন্ত একটি রাশিয়া-বিরোধী বেল্ট গঠন করিয়া রাশিয়াকে চরম আঘাত হানিবার জন্য আমেরিকা প্রস্তুত হইতেছে। মিঃ চার্চ্চিলের গঠিত সংযুক্ত ইউরোপ কমিটি উহারই দোসর মাত্র। আমেরিকা নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের সাহায্যে সকল দেশের সমর-সজ্জা হ্রাস ও পরীক্ষা করিতে ইচ্ছুক, কিন্তু পরমাণবিক বোমাকে এই কমিশনের অধীন করিতে রাজী নয়। এই সকল ঘটনাবলীর মধ্যেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ অঙ্কুরিত হইতে দেখা যাইতেছে।

স্বতন্ত্র বৃটিশ শ্রমিক দল-সম্মেলনে সভাপতি মিঃ বব এডওয়ার্ডস আগামী ২০ বৎসরের মধ্যে রাশিয়ার সহিত আমেরিকার যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন। এই ভাবী তৃতীয় মহাসমরে বৃটেন যাহাতে জড়িত হইয়া না পড়ে, তাহার জন্য তিনি সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। কিন্তু মার্কিণ পররাষ্ট্র-নীতির সহিত বৃটেন এমনি ভাবে জড়িত হইয়া পড়িয়াছে যে, আমেরিকার উপর বৃটেনের নির্ভরতা এত বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, বৃটেনের পক্ষে ভাবী যুদ্ধ হইতে দূরে থাকা সম্ভব হইবে কি? বস্তুতঃ, বৃটেনের সামরিক ব্যবস্থা আমেরিকার সহিত তাল রাখিয়াই চলিতেছে। গত ১০ই মার্চ বৃটিশ সমর-সচিব মিঃ

জন বেলেঞ্জার কমন্স সভায় বলিয়াছেন: "যে-কোন জরুরী অবস্থার পূর্ব্বাভাষ লক্ষিত হইবে তাহার জন্য বৃটেন সেনাবাহিনী প্রস্তুত রাখিতে ইচ্ছুক।" এই জরুরী অবস্থা যে কি তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। এই জরুরী অবস্থার প্রয়োজনেই শ্রমিক গবর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন। ইহাও তাৎপর্য্যপূর্ণ যে, এই আইন প্রণয়নে শ্রমিক গবর্ণমেন্ট বিরোধী টোরি দলের সমর্থন লাভ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রমিক দলের ৭০ জন সদস্য এই বিলের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছেন, ২০ জন সদস্য উপস্থিত থাকিয়াও ভোট দেন নাই এবং ৫০ জন সদস্য ইচ্ছা করিয়াই অনুপস্থিত ছিলেন। এই বিল সমর্থন কবিবার কারণ উল্লেখ করিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলিয়াছেন: "হিটলার এবং নাৎসীদের বিরুদ্ধে চেম্বরলিন গবর্ণমেন্টের মিঃ হোর বেলিসা যখন বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির জন্য ১৯৩৯ সালের মে মাসে বিল উপস্থিত করিয়াছিলেন তখন প্রধান মন্ত্রী এবং দেশরক্ষা সচিব উহার পক্ষে ভোট দিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। আজ তাঁহারা শান্তি এবং বিজয়ের সময়ে অন্য এক বিপদের বিরুদ্ধে, অন্য ডিক্টেটরশিপের বিরুদ্ধে বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির জন্য আমাদের সাহায্য চাহিতেছেন। আজ এই ডিক্টেটরশিপের নাম আমি উল্লেখ করিব না।" উল্লেখ না করিলেও এই আয়োজন যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ইহা যে তৃতীয় মহাসমরের জন্য বৃটেনের প্রস্তুতি সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকিয়াই শ্রমিক গবর্ণমেন্ট বাধ্যতামূলক সামরিক বৃত্তির বিল উপস্থিত করিয়াছেন। তবে যুদ্ধের প্রথম কামান-গর্জ্জন কোন্‌খানে আরম্ভ হইবে—গ্রীসে, তুরস্কে, সিরিয়ায়, ইরাণে, ভারতে না চীনে তাহা কেহই বলিতে পারে না।

৯ই এপ্রিল মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ভূতপূর্ব্ব ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং বর্ত্তমান উদারনৈতিক 'নিউ রিপাবলিক' পত্রিকার সম্পাদক মিঃ হেনরী ওয়ালেস বিভিন্ন দেশের প্রায় দেড় শত সাংবাদিকের নিকট এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "আগামী তিন মাসের মধ্যে আমেরিকা এমন পররাষ্ট্র-নীতি গ্রহণ করিতে পারে যাহার পরিণতি হইবে যুদ্ধ।" কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, আমেরিকা ইতিমধ্যেই সেই নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, গ্রীসকে ঋণ দেওয়ার মধ্যে তিনি খুব বেশী রকম বারুদের গন্ধ পাইয়াছেন। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত বক্তৃতা এবং ফ্রান্সের রাজনীতি ক্ষেত্রে জেনারেল দ্য গলের পুনরাবির্ভাবের মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে তাহাও তিনি মনে না করিয়া পারেন নাই। তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া মনে হয়, আগামী তিন মাসের মধ্যে আমেরিকার পররাষ্ট্র-নীতি আরও ব্যাপক ও সুস্পষ্ট ভাবে এমন পথ গ্রহণ করিবে যে, তখন যুদ্ধাশঙ্কা আরও প্রবল হইয়া উঠিবে। তবে যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার তারিখ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করা কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত—

অবশেষে গত ২৫শে মার্চ্চ বাটাভিয়ায় ওলন্দাজ-ইন্দোনেশিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় দীর্ঘ ১৯ মাস ধরিয়া হল্যাণ্ডের সহিত ইন্দোনেশিয়াবাসীর যে সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং আপোষ মীমাংসার জন্য যে বিলম্বিত আলোচনা চলিতেছিল তাহার অবসান হইল। ১৯৪০ সালে জার্ম্মাণী হল্যাণ্ড দখল করে এবং জাপান ইন্দোনেশিয়া দখল করে ১৯৪১ সালের শেষ ভাগে। জার্ম্মাণী ও জাপানের পতনের পর ইন্দোনেশিয়াবাসীরা যেমন স্বাধীনতার জন্য অনমনীয় দৃঢ়তা অবলম্বন করে হল্যাণ্ডও তেমনি পুনরায় ইন্দোনেশিয়ায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়া উঠে। বহু দিন ধরিয়া সশস্ত্র সংঘর্ষের পরও হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়ার স্বাধীনতা-আকাঙ্ক্ষা দমন করিতে না পারিয়া অবশেষে একটা আপোষ মীমাংসা করিতে ইচ্ছুক হয়। চারি মাস পূর্ব্বে গত ১৫ই নবেম্বর (১৯৪৬) চেরিবন (জাভা) হইতে ১৫ মাইল দক্ষিণে লিঙ্গাকার্ত্তা নামক গ্রামে উল্লিখিত চুক্তির খসড়া রচিত হয়। কিন্তু এই চুক্তির খসড়া রচিত হওয়ার পর হল্যাণ্ড সাম্রাজ্যবাদীদের সনাতন কৌশল অবলম্বন করিয়া চুক্তির সর্ত্তাবলীর এমন অপব্যাখ্যা প্রদান করে যে, ইন্দোনেশিয়াবাসী যে সামান্য অধিকার এই চুক্তি দ্বারা পাইবার কথা তাহা হইতেও তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। ইন্দোচীনে ফ্রান্স যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহার দৃষ্টান্তও হল্যাণ্ডকে উৎসাহিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। হল্যাণ্ডের ষ্টেটস-জেনারেলে অর্থাৎ ব্যবস্থা পরিষদে এই চুক্তির সর্ত্তাবলী অনুমোদনের জন্য যখন আলোচনা হয় তখন দক্ষিণপন্থীরা উহার এমন অপব্যাখ্যা করেন যাহা ডাঃ শারীয়ারের কিছুতেই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। ডাচ প্রধান মন্ত্রী ডাঃ বীল প্রথমে তাঁহাদের এই অপব্যখ্যার নিকটে আত্মসমর্পণ করিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিন্তু পরে উহার দুর্য্যোগপূর্ণ পরিণামের কথা ভাবিয়া বিনা সর্ত্তে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার নির্দেশ দেন। এই সুযোগে হল্যাণ্ডের যুদ্ধকালীন গবর্ণমেন্টের প্রধান মন্ত্রী হীর জেরব্র্যাণ্ডী (Heer Gerbrandy) ডাচ সাম্রাজ্যের ঐক্য রক্ষা কমিটিতে তাঁহার সহযোগীদের লইয়া সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষের দ্বারা ইন্দোনেশিয়াবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তাহাতে ফললাভের আশা না দেখিয়া রাজ্ঞী উইলহেলমীনার নিকট আবেদন করেন। কিন্তু তিনি এ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে রাজী না হইয়া সুবুদ্ধির পরিচয়ই দিয়াছেন।

আলোচ্য চুক্তি দ্বারা ডাচ গবর্ণমেন্ট জাভা, মাদুরা এবং সুমাত্রার উপর ডাঃ শারিয়ার গবর্ণমেন্টের কর্ত্তৃত্ব মানিয়া লইলেন। এই তিনটি দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্র গঠিত হইবে এবং ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী বর্ত্তমানে যে সকল অঞ্চল দখল করিয়া রহিয়াছে সেগুলি ক্রমে সহযোগিতার ভিতর দিয়া সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। সেলিবিস হইতে নিউগিনি পর্য্যন্ত দ্বীপাবলী 'গ্রেট-ইষ্ট' নামে খ্যাত। বর্ণিও এবং গ্রেট-ইষ্ট লইয়া ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্র একটি সংযুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হইবে এবং উহার নাম হইবে ইন্দোনেশিয়া সংযুক্ত রাষ্ট্র। অতঃপর হল্যাণ্ড, সুরিণাম এবং কুরাকাও-এর সহিত ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্র মিলিত হইয়া ওলন্দাজ রাজতন্ত্রের অধীনে নেদারল্যাণ্ড-ইন্দোনেশিয়া ইউনিয়ন গঠিত হইবে। প্রতিনিধিমূলক গণপরিষদে প্রস্তাবিত ইন্দোনেশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণীত হইবে এবং অতি সত্বর যাহাতে গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে এই যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় তাহার জন্য ওলন্দাজ গবর্ণমেন্ট এবং ইন্দোনেশিয়া সাধারণতন্ত্র একযোগে কাজ করিবেন। ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে যাহাতে কার্য্য সম্পন্ন হয় তাহার জন্য সত্বর ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

চুক্তির সর্ত্তাবলী আলোচনা করিলে ইহা বুঝিতে কষ্ট হয় না যে, যে সার্ব্বভৌম স্বাধীনতার জন্য ইন্দোনেশিয়াবাসীরা এত দিন সংগ্রাম করিল তাহা এখনও বহু দূরবর্ত্তী। চুক্তিতে নির্দ্ধারিত লক্ষ্যে

পৌঁছিতেও তাহাদিগকে এখনও যে-পথ অতিক্রম করিতে হইবে তাহাও কম বিপদ-সঙ্কুল নয়। চুক্তিপত্র সম্পাদন অনুষ্ঠানে ওলন্দাজ গবর্ণর ডাঃ ভ্যান মুক এই চুক্তি-সম্পাদনকে নবযুগের প্রারম্ভ বলিয়া অভিহিত করিয়া বলিয়াছেন: "We can spoil this experiment by hesitation and mistrust" 'সংশয় এবং অবিশ্বাস দ্বারা এই পরীক্ষাকে আমরা ব্যর্থও করিতে পারি।' কিন্তু ডাচ গবর্ণমেণ্ট যে চুক্তির সর্ত্তাবলীর অপব্যাখ্যা করিয়াও উহা ব্যর্থ করিতে পারেন, তাহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার এই উক্তির উত্তরে ডাঃ শারিয়ার বলিয়াছেন যে, অনিশ্চয়তা, সন্দেহ এবং অবিশ্বাস এখনও রহিয়াছে এবং ইন্দোনেশিয়াকে মুক্ত করিবার জন্য এই চুক্তি প্রথম পাদক্ষেপ মাত্র। ইন্দোনেশিয়াবাসীর মনে এই যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস রহিয়াছে শুধু ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্টের মুখের কথায় উহা দূর হইবে না, বরং অপব্যাখ্যা দ্বারা সমস্যা আরও জটিল করিয়া তোলার আশঙ্কা আছে। ইন্দোনেশিয়ার চারি দিকে অসংখ্য দ্বীপে যে ওলন্দাজ সৈন্যবাহিনী রহিয়াছে তাহাও ভবিষ্যতে কম বাধা সৃষ্টি করিবে কি? ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট চুক্তির মর্য্যাদা যদি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে সঙ্ঘর্ষের সৃষ্টি হইবে বটে, কিন্তু ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতা লাভ করিবেই।

ফ্রান্সের ইন্দোচীন-নীতি

ইন্দোচীনের সংবাদে ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ভিয়েটনামীদের স্বাধীনতা-সংগ্রাম এখনও পূর্ণোদ্যমেই চলিতেছে। দক্ষিণ-আনামে, কোচিন-চীনে ভিয়েটনাম গেরিলাবাহিনীর তৎপরতা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করা যায়। ভিয়েটনামীরা আপোষ মীমাংসা করিতে আগ্রহশীল থাকা সত্ত্বেও ফ্রান্সের পার্লামেণ্টে এ সম্পর্কে যে মনোভাব ব্যক্ত হইয়াছে তাহা বিশেষ ভাবে প্রণিধানযোগ্য! ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট নেতা এবং ফরাসী গবর্ণমেণ্টের সহকারী প্রধান মন্ত্রী মঃ মোরিস থোরে ইন্দোচীন সম্পর্কে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের বর্ত্তমান নীতি সমর্থন করেন না। ভিয়েটনামীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিও তিনি সহানুভূতিশীল বলিয়া মনে হয়। ফরাসী গবর্ণমেণ্টের ইন্দোচীন নীতির প্রতি আস্থাসূচক প্রস্তাব গত ১১শে মার্চ্চ ফরাসী পার্লামেণ্টে উপস্থাপিত হইলে কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ ভোটদানে বিরত থাকেন। ২২শে মার্চ্চ তারিখে ইন্দোচীনে যুদ্ধ চালাইবার উদ্দেশ্যে ৮৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ ফ্রাঙ্ক মঞ্জুরীর জন্য দাবী উত্থাপিত হইলেও কম্যুনিষ্ট সদস্যগণ ভোট দেন নাই। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টি এবং রেডিক্যাল পার্টি মন্ত্রিসভায় অবস্থান করিতে স্থির করায় ফ্রান্সের কোয়ালিশন গবর্ণমেণ্ট সঙ্কট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছে। ইন্দোচীনের প্রশ্ন লইয়া ফ্রান্সে শাসনতান্ত্রিক সঙ্কট উপস্থিত না হওয়ায় ইহা বুঝা যাইতেছে যে, ইন্দোচীন সম্পর্কে ফরাসী গবর্ণমেণ্টের নীতি ফরাসী কম্যুনিষ্ট পার্টির পরোক্ষ সমর্থন হইতে বঞ্চিত হয় নাই।

ফরাসী প্রধান মন্ত্রী মঃ রামাদিয়ের ইন্দোচীনের সমস্যা সমাধানের জন্য সেই সনাতন সাম্রাজ্যবাদী নীতিই অনুসরণ করিতেছেন। ভিয়েটনামী নেতাদিগকে তাঁহারা আনামী জনগণের প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করিতে রাজী নহেন। সশস্ত্র সংগ্রামের ভিতর দিয়া তাঁহারা ভিয়েটনামীদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে এবং তাঁহাদের পছন্দমত এক জন নেতা খাড়া করিতে চেষ্টার ত্রুটি করিতেছেন না। কোচিন-চীনের মধ্যবর্ত্তিতায় ইহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে। আনামের ভূতপূর্ব্ব সম্রাটের নিকটেও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি না কি বলিয়াছেন যে, ভিয়েটনামীদের নিকট হইতে আহ্বান আসিলেই তিনি যাইবেন। গত ২০শে মার্চ্চ প্যারীতে অবস্থিত ভিয়েটনাম প্রতিনিধি বাকমাইকে ফরাসী পুলিশ গ্রেফতার করিয়াছে। ফ্রান্স তাহার সামরিক শক্তির সাহায্যে ইন্দোচীনে তাঁবেদার গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প। উপনিবেশগুলিতে পূর্ব্বাবস্থার যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে সে-সম্বন্ধে তাঁহারা অন্ধ হইয়া থাকিতে পারে না, কিন্তু সাম্রাজ্য রক্ষা আর সম্ভব হইবে না। গত ১লা এপ্রিল মাডাগাস্কার দ্বীপে সশস্ত্র বিদ্রোহিগণ কর্ত্তৃক ফরাসী অস্ত্রাগার আক্রান্ত হওয়ায় কি দিকে দিকে সাম্রাজ্যবাদের অবসান-ধ্বনিই সূচিত হইতেছে না?

ইয়েনানের পতন—

গত ১৯শে মার্চ্চ চীনের সরকারী সৈন্যবাহিনী চীনের কম্যুনিষ্ট রাজধানী ইয়েনান দখল করিয়াছে। ইয়েনানের পতনে চীনা কম্যুনিষ্টদের যে গুরুতর ক্ষতি হইয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। কিন্তু চীনা কম্যুনিষ্টদের রাজধানী দখল করিতে সমর্থ হওয়ায় চীনের গৃহযুদ্ধের গতি কুয়োমিণ্টাং দলের অনুকূল হইয়াছে, এ কথা স্বীকার করা যায় না। ইয়েনান দখলের যুদ্ধে দশ হাজার কম্যুনিষ্ট সৈন্য নিহত হইয়াছে বলিয়া চীন সরকারের পক্ষে দাবী করা হইয়াছে। সহর দখলের পূর্ব্বে ঘোরতর সংগ্রাম হওয়ার কথাও সংবাদে প্রকাশ। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ১১ই মার্চ্চ ৫৪ মাইল দক্ষিণে ইয়েনান দখলের যুদ্ধ আরম্ভ হয় এবং নয় দিনের মধ্যে ইয়েনান দখল সমাপ্ত হয়। এই চমকপ্রদ জয় কুয়োমিণ্টাং দলের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করিবে সন্দেহ নাই। মার্কিণ গবর্ণমেণ্টও হয়ত উহার মধ্যে চীনের গৃহযুদ্ধে কুয়োমিণ্টাং দলের ভাবী সাফল্যের পরিচয় দেখিতে পাইবেন বলিয়া মনে হয়। কারণ, এক বৎসর পূর্ব্বে চীন গবর্ণমেণ্টকে ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেওয়া হইবে বলিয়া মার্কিণ 'এক্সপোর্ট এণ্ড ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক' স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু এত দিন এই অর্থ দেওয়া হয় নাই। এখন ঐ ঋণ চীন গবর্ণমেণ্টকে দেওয়া হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করা প্রয়োজন যে, সামরিক অবস্থানের দিক্ হইতে ইয়েনানের কোনই গুরুত্ব ছিল না ও নাই। ইয়েনান ছিল চীনা কম্যুনিষ্টদের সাংস্কৃতি ও রাজনৈতিক রাজধানী। উহা সামরিক ঘাঁটি ছিল না এবং চীনা কম্যুনিষ্টরা পূর্ব্ব হইতেই ইয়েনান পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করে এবং চীনা সরকারী বাহিনী একরূপ বিনা বাধায় এই সহর দখল করে।

বিলাতের 'টাইমস্' পত্রিকা পর্য্যন্ত ইয়েনান দখলের উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নাই। আমেরিকার নিকট সামরিক শিক্ষা-প্রাপ্ত বাহিনীই চিয়াং কাইশেকের উৎকৃষ্ট সৈন্যদল। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ এবং এই সকল সৈন্যবাহিনী অক্ষয়ও নয়। চীনা কম্যুনিষ্টদের প্রধান শক্তিকেন্দ্র পল্লী অঞ্চল। কাজেই সামরিক শক্তি দ্বারা কম্যুনিষ্টদিগকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করিবার ফলে নানকিন্ গবর্ণমেণ্টকেই ব্যাপক সঙ্কটের সম্মুখীন হইতে হইবে। 'টাইমস্' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন: "The present attempt to supress the communist administration by force of arms

is doomed to failure." 'অস্ত্র-শস্ত্র দ্বারা কম্যুনিষ্ট-শাসনকে দমন করিবার বর্ত্তমান ব্যবস্থা ব্যর্থ হইতে বাধ্য।' কিন্তু মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট চিয়াং কাইশেক বাস্তব অবস্থার প্রতি অন্ধ হইয়া চীনের জনগণের দুঃখ-দুর্দ্দশাই শুধু বৃদ্ধি করিতেছেন। কুয়োমিনটাং ইয়ং চায়না এবং সোস্যালিষ্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির নেতৃবৃন্দ মিলিত হইয়া গত ২২শে মার্চ্চ চীনের বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে পুনর্গঠন করিবার জন্ম ১২ দফা সর্ত্ত-সম্বলিত একটি পরিকল্পনা গঠন করিয়াছেন বটে। কিন্তু কম্যুনিষ্ট পার্টির সহিত যদি মীমাংসা না হয়, যদি সামরিক শক্তি দ্বারা কম্যুনিষ্ট পার্টিকে ধ্বংস করিবার চেষ্টা চিয়াং কাইশেক বন্ধ না করেন, তাহা হইলে এই পরিকল্পনাও ব্যর্থ না হইয়া পারিবে না।

জাপান কোথায়?—

আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে জাপানের কোন অস্তিত্ব আছে বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় না। জাপান আজ কোথায়, এই প্রশ্ন সত্যই উপেক্ষার বিষয় নহে। আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনে জাপানের অনুপস্থিত কি সূচনা করে? কে এই সম্মেলনে জাপানকে উপস্থিত হইতে দেয় নাই? কেন দেওয়া হয় নাই? আমেরিকানরা জাপানে অনেক মহৎ কাজ করিতেছে বলিয়া ভূতপূর্ব্ব মার্কিণ সরাষ্ট্র-সচিব মিঃ বার্ণেসকে গর্ব্ব প্রকাশ করিতে আমরা শুনিয়াছি। এই মহৎ কাজ যে জাপানকে আমেরিকার তাঁবেদার-রাষ্ট্রে পরিণত করা তাহা নিঃসন্দেহরূপেই বুঝিতে পারা যাইতেছে। পরাজিত জাপানে গণতন্ত্র গড়িয়া তোলাই মিত্রশক্তিবর্গের জাপান অধিকার করার উদ্দেশ্য, বিশ্ববাসীকে এই কথাই শুনান হইয়াছে। জাপানের সহিত সন্ধি হওয়ার পর জাপানীরা নিজেরাই তাহাদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করিবে, এই আশ্বাসও কি জাপান শোনে নাই? কিন্তু ইতিমধ্যে জাপানে কি ঘটিতেছে? সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে 'লৌহ প্রাচীরের' (iron curtain) কথা আমরা প্রায়ই শুনিতে পাই। জাপান সম্বন্ধে সংবাদের স্বল্পতা আমেরিকা কর্ত্তৃক রচিত জাপানের চারি দিকে লৌহ প্রাচীরের অস্তিত্বই কি প্রমাণিত করে না? জাপানকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের হাতে তুলিয়া দিতে জেনারেল ম্যাক আর্থার যে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাও খুব-ই তাৎপর্য্যপূর্ণ। জার্ম্মাণীকে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ-সঙ্ঘের হাতে অর্পণ করিবার কথা তো উঠে না? সম্প্রতি জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপানে তাঁহাদের তিনটি কর্ত্তব্যের কথা বলিয়াছেন। জাপানের সামরিক শক্তির ভাবী অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা ধ্বংস করাই তাঁহাদের প্রথম কর্ত্তব্য। তাঁহাদের এই কর্ত্তব্য সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়াই জেনারেল ম্যাক আর্থারের উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

জাপানের অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রতিরোধ করা দ্বিতীয় কর্ত্তব্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। আমেরিকা কি উপায়ে এই অর্থনৈতিক সঙ্কট প্রতিরোধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে? জেনারেল ম্যাক আর্থার বলিয়াছেন যে, পৃথিবীর বাজারে সূতী কাপড় এবং অল্প পরিমাণ সিল্ক সরবরাহ করিবার ক্ষমতা ইতিমধ্যেই জাপান অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কিন্তু মার্কিণ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীরা যে জাপানের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করিতে উদ্যত হইয়াছে, সে কথা তিনি অনুক্ত রাখিয়াছেন। বিলাতের 'নিউ ষ্টেটস্ম্যান এণ্ড নেশান' পত্রিকা গত নবেম্বর মাসে লিখিয়াছিলেন: "Japanese economy is being thoroughly prepared for exploitation by American big business and New York Journal of Commerce already talks of Japan as an important factor in world textile market." জাপানের অর্থনীতিকে পুরাপুরি ভাবে বড় বড় মার্কিণ ব্যবসায়ীদের শোষণের ক্ষেত্ররূপে প্রস্তুত করা হইতেছে এবং 'নিউইয়র্ক জার্ণাল অব কমার্স' পত্রিকা ইতি-মধ্যেই পৃথিবীর বস্ত্র-ব্যবসায়ে জাপানের গুরুত্বের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জাপানে আমেরিকার আধিপত্য বিস্তারের আয়োজন দেখিয়া অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র-সচিব ডাঃ ইভাটকে আশঙ্কা প্রকাশ করিতে আমরা শুনিয়াছি। জাপানের আর্থিক পুনর্গঠন-কার্য্য কি ভাবে চলিতেছে সে সম্বন্ধে বাহিরে বিশেষ কিছু প্রকাশ করা না হইলেও যেটুকু সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতেই জাপানে আমেরিকার অর্থনৈতিক মতলবের পরিচয় পরিস্ফুট দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভাবেই জাপানে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অর্থনৈতিক ভিত্তি রচিত হইতেছে। জেনারেল ম্যাক আর্থার জাপানে রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আয়োজন কি ভাবে করিয়াছেন তাহাও প্রণিধানযোগ্য।

জাপানে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার জন্ম জেনারেল ম্যাক আর্থারের সদর কার্য্যালয়ে একটি শাসনতন্ত্র রচনা করা হইয়াছে। জাপানের জনসাধারণ এই ব্যাপারে কোন কথা বলিবার অধিকার না পাইলেও এই শাসনতন্ত্র তাহাদের উপর চাপাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমান এপ্রিল মাসে এই শাসনতন্ত্র অনুসারে নির্ব্বাচন হইবে এবং ৩রা মে তারিখে 'হাউস অব পিয়ার্স' অর্থাৎ অভিজাত-বংশীয়দের পরিষদ বিলুপ্ত হইয়া তৎস্থলে প্রতিষ্ঠিত হইবে 'হাউস অব কাউন্সিলারস্।' আর একটা মজার ব্যাপার এই যে, এই শাসনতন্ত্রের মধ্যে জাপানী জনগণের স্বাধীন ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়াছে কি না, তাহার পরীক্ষা করা হইবে এই শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তনের এক বৎসর পরে এবং দুই বৎসরের মধ্যে। অর্থাৎ এই শাসনতন্ত্র জেনারেল ম্যাক আর্থারের সদর কার্য্যালয়ে রচিত হইলেও জাপানী জনগণের স্বাধীন ইচ্ছাই যে উহার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়াছে, মার্কিণ-বাহিনীর খবরদারীর মধ্যে তাহাই প্রমাণ করিবার ব্যবস্থা ছাড়া উহা আর কিছুই নহে। সম্প্রতি টকিওতে জেনারেল ম্যাক আর্থারের সদর কার্য্যালয়ে জাপ সাংবাদিকদের এক সম্মেলন আহূত হইয়াছিল। এই সাংবাদিক সম্মেলন জাপানের সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে আলোচনার জন্য আহূত হয় এবং নূতন একনায়কত্বের অভ্যুদয় আশঙ্কা সম্বন্ধে সাংবাদিকদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ সতর্ক করিয়া দেওয়ার অর্থ অত্যন্ত সুস্পষ্ট। জাপানীদের মধ্যে যে কেহ এই শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিবে তাহাকেই জাপানে রাশিয়ার পঞ্চম বাহিনী বা কম্যুনিষ্ট আখ্যা দিয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরা হইবে। জইবাৎসু প্রভৃতি জাপানের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী-পরিবার কয়েকটি না কি এই শাসনতন্ত্রের বিশেষ পক্ষপাতী। তাঁহাদের দ্বারা পরিচালিত নরমপন্থীরা না কি মার্কিণ সৈন্য জাপান হইতে চলিয়া যাওয়া পছন্দ করেন না। তাঁহাদের আশঙ্কা, মার্কিণ সৈন্য জাপান হইতে চলিয়া গেলেই গণতন্ত্রের অঙ্কুর বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এইরূপ আশঙ্কা প্রকাশের মধ্যে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। আমেরিকা জাপানে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইয়াছে তাহা আমেরিকার তাঁবেদারীতে জইবাৎসু প্রভৃতি জাপানী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী-পরিবার কয়েকটির একনায়কত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়।

নূতন বড় লাটের নূতন চাল

নূতন বড় লাট ভাইকাউণ্ট মাউণ্টব্যাটেন আসিলেন। লর্ড ওয়াভেল বিদায় লইলেন। ওদিকে ইংরেজ সরকারের ঘোষণা, ১৯৪৮ সনের জুন মাসের পূর্ব্বেই বৃটিশ ভারত ত্যাগ করিবে। জনসাধারণ উল্লসিত হইলেন, এইবার স্বরাজ আসিল। মহাত্মাজী বলিলেন, আর দেরী নাই। এইবার সত্যই স্বরাজ আসিবে। ইংরেজদের কথায় আন্তরিকতার আভাস পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের মন বোধ হয় সন্দিগ্ধ। আমরা মোটেই আনন্দিত হইতে পারিলাম না। সন্দেহ হইল, এ-ও ইংরেজ সরকারের বোধ হয় এক নতুন চাল। সে-বার মন্ত্রী মিশন আসিলেও এক দল ব্যক্তি উল্লসিত হইয়াছিলেন। মহাত্মাজী লর্ড ওয়াভেল সম্বন্ধেও এইরূপ আশার কথা শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা গিয়াছিল সবই ভাঁওতা। এবারও যে তাহাই নহে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। বিশেষ করিয়া ইংরেজদের আমরা এত দিন তো দেখিয়া আসিতেছি। ভুলেও সত্য কথা তাঁহারা বলেন না। লর্ড ওয়াভেলের ব্যবহার এবং মন্ত্রী মিশনের ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যা ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। লোকে কথায় বলে, ঘর-পোড়া গরু সিঁদূরে মেঘ দেখলে ডরায়। আমাদের হইয়াছে সেই অবস্থা।

নূতন বড় লাট কি করিবেন, তাহার ফিরিস্তিও আমরা পাইয়াছি। প্রথমে তিনি অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের পদত্যাগ আহ্বান করিবেন। ইহার পর পুনরায় তাঁহাদিগকে নিয়োগ করিবেন। তৃতীয় কাজ হইবে প্রাদেশিক গভর্ণরদের বৈঠক আহ্বান। এই কার্য্য-পদ্ধতি একটু আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

পদত্যাগ আহ্বানের কারণ না কি, মুসলিম লীগ দলকে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট হইতে সরান, অবশ্য যদি তাঁহারা গণ-পরিষদে যোগদান না করেন। কারণ, গণ-পরিষদে যোগদান না করিলে অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগদান সম্ভব নহে। কথাটা ঠিকই। কিন্তু ইহা জানিয়াও লর্ড ওয়াভেল লীগকে সাদরে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারে যোগ দিতে। বৃটিশ পার্লামেণ্ট সে জন্য তখন কোন আপত্তি করেন নাই, বরং অনুমোদনই করিয়াছেন। ৬ই ডিসেম্বরের ব্যাখ্যায় তাঁহারা লীগের পক্ষপাতিত্ব করিয়াছিলেন। সেই পার্লামেণ্টই আছে, সুতরাং খুব একটা আশান্বিত হইবার কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, নব অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে। লর্ড ওয়াভেল তো কংগ্রেসের সঙ্গে মীমাংসার পূর্ব্বেই এবং গণ-পরিষদে যোগদানের প্রতিশ্রুতি গ্রহণ না করিয়াই মুসলিম লীগকে অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টে যোগদান করিতে দিয়া এক হাঙ্গামার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এখন দেখা যাক্, ইনি কি করিবেন! তিনি কি স্বয়ং বড় লাট হিসাবে তাঁহাদিগকে পুনর্নিয়োগ করিবেন, না অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের জন্য পণ্ডিত নেহরুকে আহ্বান করিবেন? যে ভাবেই হউক, নেহরু-জিন্না আলোচনারই পুনরভিনয় হইবে না কি? মুসলিম লীগের গণ-পরিষদে যোগদানের প্রশ্ন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের যৌথ দায়িত্ব গ্রহণও সেইরূপই গুরুত্বপূর্ণ। মণ্ডলী গঠন বাধ্যতা-মূলক না হইলে মুসলিম লীগ গণপরিষদে যোগদান করিবে না স্থির করিয়াছে। তিনি কি লীগের দাবী মানিয়া লইবেন? তাঁহার কি লীগকে বাদ দিয়া কেবল কংগ্রেস ও লীগ-বহির্ভূত শ্রেণীদের লইয়া অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার গঠনের সৎসাহস আছে? অথবা কংগ্রেসকে দিয়া মণ্ডলী গঠন সম্পর্কে লীগের দাবী মানাইয়া লওয়াই এই পদত্যাগ আহ্বানের উদ্দেশ্য নহে তো?

তাহার পর প্রশ্ন, অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের ক্ষমতা সম্পর্কে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকারের জন্য ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টের মর্য্যাদা দাবী করিয়াছেন। মিঃ আমেরীও এক সময় এই কথা বলেন। কিন্তু এখন শুনা যাইতেছে, ইহার মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল আছে। ১৩ই মার্চ্চ বিলাতে লর্ড-সভায় ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স পরিষ্কার বলেন যে, অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্ট ডোমিনিয়ন গভর্ণমেণ্টের অনুরূপ ক্ষমতা পাইবেন না। ভারতবর্ষের শাসনতান্ত্রিক অবস্থা না কি অন্যরূপ। সেই জন্য অনেক কাঠ-খড় পোড়াইতে হইবে। পার্লামেণ্টে নূতন আইন প্রণয়ন করিতে হইবেন। ইত্যাদি মনোভাব সুস্পষ্ট। টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

এইবার তৃতীয় কাজের কথা, অর্থাৎ প্রাদেশিক গভর্ণরদের বৈঠক আহ্বান সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। এই বৈঠকে না কি তিনি গভর্ণরদের নিকট হইতে প্রাদেশিক আভ্যন্তরীণ হাল-চাল জ্ঞাত হইবেন এবং তাঁহাদিগকে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নির্দ্দেশ জানাইবেন। ভারতবর্ষকে বিভক্ত না করিয়া যাহাতে পারা যায় তাহার জন্য চেষ্টা করাই না কি বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের মুখ্য উদ্দেশ্য। ইহা সেই মন্ত্রী মিশনেরই পুরাতন চাল। অখণ্ড ভারতের নামে মণ্ডলী গঠনের নামে পাকিস্থান গঠনের প্রচেষ্টা। ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণার পর অখণ্ড ভারতের কথা বলা বৃটিশ সরকারের সাজে না। তাহার পর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণা। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে দিব্য ফাঁকা রাখা হইয়াছে। তৃতীয় প্রস্তাবটি অর্থাৎ কাহার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, তাহা বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট স্থির করিবেন। আশ্চর্য্য মনোবৃত্তি! ইচ্ছা করিয়া আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। এই তৃতীয় ব্যবস্থা অনুযায়ী ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করিবার জন্যই পদত্যাগ আহ্বান করা হইতেছে না তো? ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় পাকিস্থান-দাবী দৃঢ় করা হইয়াছে। আভ্যন্তরীণ ঐক্য সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করিয়া অখণ্ড ভারতের নামে তৃতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চলিতেছে মনে করা কি ভুল হইবে?

——

গভর্ণরদের স্বরূপ

গভর্ণরদের নিকট হইতে প্রাদেশিক আভ্যন্তরীণ সত্যকারের হাল-চাল নূতন বড় লাট কতটুকু জানিতে পারিবেন? আসল যে দুইটি প্রদেশ লইয়া হাঙ্গামা, অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং বাঙ্গালা, সেখানকার গভর্ণরদের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই। ভুক্তভোগী মাত্রেই তাঁহাদের স্বরূপ জানেন। আমাদের মনে হয়, প্রদেশের সত্যকারের পরিচয় গ্রহণ বড়লাটের উদ্দেশ্য নহে। অন্য কোন কারণে এই সম্মেলন, এবং কারণ যে কি, তাহা প্রকাশ করিয়া না বলিলেও বুঝা কঠিন নহে।

পাঞ্জাবে সার খিজির হায়াৎ খাঁ'র মন্ত্রিত্বে এক রকম সন্তোষজনক ভাবে কার্য্য চলিতেছিল। কিন্তু পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। সুতরাং গভর্ণরের চাপে মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিল। তাহার পর যাহা হইল তাহা সকলেই অবগত আছেন। গভর্ণরের পক্ষপাতিত্বের পক্ষপুটের আড়ালে মুসলিম লীগ হিন্দু ও শিখদের প্রতি যে নির্ম্মম অত্যাচার শুরু করিল তাহা স্মরণ করিলেই ঘৃণা হয়। কিন্তু শেষ অবধি বিশেষ সুবিধা হইল না। পাঞ্জাবের হিন্দু ও শিখ 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্থানের' উত্তর লড়কে দিল। মন্ত্রিত্বের গদী প্রায় মুখের মধ্যেই আসিয়া পড়িয়াছিল, এমন সময় শিখ ও হিন্দুরা যে অমন বেরসিকের ন্যায় পাকিস্থানী জয়যাত্রায় বাদ সাধিবে, এ কথা বোধ হয় লীগের হোমরা চোমরা নেতারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন নাই। আজ মুখের গ্রাস ফস্কাইয়া যায় দেখিয়া তাঁহারা মিষ্ট কথার ভাঁওতা দিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টায় ব্যস্ত।

পাঞ্জাবে লীগ-মন্ত্রিসভা গঠনের বিশেষ আশা নাই দেখিয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবে যথাক্রমে দুইটি মন্ত্রিসভা গঠন সম্ভাবনার সম্ভব কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার ভার সার বি এন রাও-এর উপর দেওয়া হইয়াছে। কংগ্রেসের বড়কর্ত্তারা পাঞ্জাব ভাগ করিতে রাজী হইয়াছেন, ঠিক যে কারণে সেই কারণেই বাঙ্গালাও ভাগ করা প্রয়োজন। স্বয়ং আচার্য্য কৃপালনী প্রয়োজন-বোধে বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের দাবীর যুক্তি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন:

বাঙ্গালার গভর্ণরের তো কথাই নাই। আগষ্টের 'গ্রেট কিলিং'এর সময় তিনি দার্জ্জিলিং শৈলাবাসে মাথা ঠাণ্ডা করিতে গেলেন। অনেকটা রোম যখন পুড়িতে থাকে তখন সম্রাট নীরোর বেহালা-বাদনের মত। প্রতিকা-কল্পে মুখ-ব্যাদন করিলেন না। আবার কলিকাতায় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা শুরু হইয়াছে। পুলিসের পক্ষপাতিত্বের কথা প্রায় রোজই কানে আসিতেছে; বাঙ্গালার বাহির হইতে আনীত পাঠান সশস্ত্র পুলিসের অত্যাচারে নিরীহ নগরবাসীদের মান-ইজ্জত বাঁচান দায় হইয়াছে; নারী ও শিশুদের উপরও নির্ম্মম পীড়ন চলিতেছে। অথচ কোন প্রতিকার নেই। স্বয়ং গভর্ণর ও মন্ত্রিমণ্ডলী তাহাদের পশ্চাতে। যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়ান হইবে তাহাই ভূতে পাওয়া।

নোয়াখালী, ত্রিপুরা ইত্যাদি অঞ্চলের দাঙ্গার সময় গভর্ণর নীরব ছিলেন কিন্তু মুসলিম লীগ গুণ্ডাদের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে তিনি সরব হইয়াছেন। করুণাসিন্ধু একেবারে উথলিয়া পড়িতেছে। অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠের জন্য একটি মুখের কথা খসান প্রয়োজন মনে করেন নাই।

২৮শে মার্চ্চ কলিকাতায় প্রকাশিত সংবাদে জানা গিয়াছে—"১৯৪৬ সালের আগষ্ট মাসের উপদ্রবে একটি ১৩ বৎসর বয়স্ক বালককে হত্যা করার অপরাধে রাণীগঞ্জের গুমা খাঁর উপর যে প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছিল এবং যাহা হাইকোর্ট কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়াছিল, বাঙ্গালার গভর্ণর সে আদেশ মকুব করিয়া তাহার উপর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়াছেন।"

২১শে তারিখের সংবাদে প্রকাশ—"ঢাকা, ২৫শে মার্চ্চ কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত চুনপুটিয়া নিবাসী জনৈক তপশীলী সম্প্রদায়ের নেতাকে মারাত্মক ভাবে জখম করিবার অপরাধে শুভড্যা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মৌলভী আজিজুল হক চৌধুরী ওরফে জুলু মিয়াকে ঢাকার ব্যবহারাজীব-ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত তারা গাঙ্গুলী ৮ মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। পরে ঢাকার দায়রা জজ ও কলিকাতা হাইকোর্ট আসামীর আপীল অগ্রাহ্য করিয়া দণ্ডাদেশ বহাল রাখেন। কিন্তু বাঙ্গালা গভর্ণমেণ্ট ঐ দণ্ডভোগ স্থগিত রাখিয়াছেন।"

তাই আমাদের মনে হয়, এই সকল গভর্ণরদের নিকট তিনি সত্যকারের সমাচার কিছু পাইবেন কি না সন্দেহ!

বিশেষ লক্ষ্যণীয়

পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামার ব্যাপারে একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। যত দিন পাঞ্জাবে ইউনিয়নিষ্ট মন্ত্রিসভা ছিল তত দিন মুসলিম লীগের আন্দোলন ছিল অহিংস। কিন্তু গভর্ণর স্বহস্তে ক্ষমতা পাইবার পর যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়া গেল তাহা সশস্ত্র এবং ধ্বংসাত্মক। গভর্ণর এবং সরকারী কর্ম্মচারিবর্গ দাঙ্গা-হাঙ্গামা থামাইয়া শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। কেন পারেন নাই, ইহা কি তাৎপর্য্যপূর্ণ নয়? পাঞ্জাবে মুসলিম লীগকে সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ করিতে উৎসাহিত করা হইয়াছিল, এ কথা মনে করিলে ভুল হইবে কি? মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডরা কখন কখন পুলিসের পোষাক পরিয়া ও বন্দুক লইয়া আক্রমণ করিতেছে। পাঞ্জাবকে স্বতন্ত্র ভাবে, ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষমতা দিবার অভিপ্রায়েই কি পাঞ্জাবের দাঙ্গা-হাঙ্গামা সম্পূর্ণ ভাবে দমন করা হইতেছে না? মিঃ জিন্না প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের প্রস্তাব গ্রহণ করিবার পর বাঙ্গালা এবং আরও কয়েকটি প্রদেশের গভর্ণর বড় লাট সকাশে আহূত হইয়াছিলেন। পাঞ্জাবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা চলিতেছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও দাঙ্গা সুরু হইয়াছে। সীমান্তের প্রধান মন্ত্রী মিঃ জিন্নার কথা মানিয়া পদত্যাগ করিতে রাজী হন নাই। গভর্ণর যাহাতে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করেন, তাহারই জন্য যে সীমান্তেও দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ হইয়াছে, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে কি? বস্তুতঃ, পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশেও যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সুরু হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আসামেও হাঙ্গামা সৃষ্টির একটা পরিকল্পনা চলিতেছে। ভারতকে বিভক্ত করিয়া পরাধীনতার শৃঙ্খল দৃঢ় করিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যাহারা সহায়, আজ তাহারা সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়েই হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া উৎসাহিত হইয়া উঠিতেছে।

সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার কারণ

রয়টারের রাজনৈতিক সংবাদদাতা গবেষণা করিয়া বলিয়াছেন যে, ভারতের বর্ত্তমান অন্তর্ব্বর্ত্তী গবর্ণমেণ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের

প্রতিনিধি লইয়া গঠিত। ইহারই ছাঁচে স্থায়ী ও সুদৃঢ় গবর্ণমেণ্ট গঠন করা যাইতে পারে। কিন্তু অন্তর্ব্বর্ত্তী গভর্ণমেণ্টের ছাঁচে স্থায়ী সুদৃঢ় গবর্ণমেণ্ট গঠনের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে খুব কঠিন বলিয়া মনে হইতেছে। শুধু তাই নয়, আগামী চৌদ্দ মাসের মধ্যে ভারতের নেতৃবর্গ শক্তিসম্পন্ন সম্মিলিত দলরূপে যাহাতে ক্রমবর্দ্ধমান দায়িত্ব গ্রহণ করেন তাহার জন্য বৃটেন সমস্ত রকম ভাবে চেষ্টা করিবে, এই সংবাদে আমাদের মনে এই আশঙ্কাই শুধু জাগিতেছে যে, এই চেষ্টার ফলে ভারত ব্যবচ্ছেদের পথকেই আরও সুগম করা হইবে মাত্র। কেন্দ্রে শক্তিশালী কোয়ালিশন গঠিত হইলেই শুধু কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, মিঃ এটলীর ঘোষণায় কি এই কথাই বলা হয় নাই? কেন্দ্রে শক্তিশালী গবর্ণমেণ্ট না থাকিলে কাহার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, মিঃ এটলীর ঘোষণায় তাহারও দুইটি বিকল্প ব্যবস্থা রহিয়াছে। এই দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার একটিতে কোন কোন অঞ্চলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা অর্পণের কথা আছে। মিঃ এটলীর এই ঘোষণায় উৎসাহিত হইয়াই পাঞ্জাবে লীগপন্থীরা মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে যে হাঙ্গামা চলিতেছে, তাহারও উদ্দেশ্য মন্ত্রিসভা দখল করা। আসামে যে বহিরাগতদের অভিযান আরম্ভ করার আয়োজন হইয়াছে, তাহারও উদ্দেশ্য তাহাই।

নূতন বড় লাট কেন্দ্রে শক্তিশালী স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠনের চেষ্টা কি ভাবে করিবেন জানি না। কিন্তু কেন্দ্রে শক্তিশালী স্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত না হইলেই যখন পাকিস্থান পাওয়া যাইবে, তখন মুসলিম লীগ কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্টকে সুদৃঢ় করিতে রাজী হইবে কেন? মিঃ এটলীর ঘোষণায় একরূপ প্রত্যক্ষ ভাবে পাকিস্থানের কথা আছে, একথা অস্বীকার করা যায় কি? লর্ড-সভায় বিতর্কের সময় ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স অবশ্য বলিয়াছিলেন যে, যতটুকু জানা যায় মুসলিম লীগ কোন অভিমত প্রকাশ করে নাই। কিন্তু ঘোষণাটি বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া উহার মধ্যে মুসলিম লীগ যদি পাকিস্থান দেখিতে পায়, তাহা হইলে তিনি বিস্মিত হইবেন। লর্ড পেথিক লরেন্স বিস্মিত হইলেও বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণার দ্বারা যে ভারত-ব্যবচ্ছেদের ব্যবস্থা হইয়াছে সে কথা লর্ড-সভায় স্পষ্ট ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘোষণায় পাকিস্থান দেওয়া হইয়াছে কি না, মিঃ এটলী সে সন্দেহভঞ্জনের কোন চেষ্টা এ পর্য্যন্ত করেন নাই। বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের ঘোষণায় কোন কোন অঞ্চলে প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের হাতে ক্ষমতা অর্পণের ব্যবস্থা নূতন করিয়া সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার প্রেরণা সৃষ্টি করিয়াছে, একথা মনে করিলে ভুল হইবে না।

মিঃ এটলীর বিবৃতি এমন ভাষায় দেওয়া হইয়াছে যে, মুসলিম লীগ যেন সহজেই বুঝিতে পারে যে, তাঁহাদিগকে পাকিস্থান দেওয়া হইবে। ভারত-ব্যবচ্ছেদ করা যদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য না-ই হয়, তাহা হইলে এমন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সুস্পষ্ট ভাবে কি তিনি বলিতে পারিতেন না যে, পাকিস্থান দেওয়া হইবে না? আজ ক্ষমতা হস্তান্তরের দৃঢ় সঙ্কল্পের কথা শুনিয়াও আমরা উহাকে আন্তরিক বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না কেন? ছয় শতাধিক দেশীয় রাজন্যবর্গকে অক্ষুন্ন রাখা হইবে। মুসলিম লীগ পাইবে পাকিস্থান। যদি দেশীয় রাজন্যবর্গ সার্ব্বভৌম নৃপতি হইয়াই রাজত্ব করিতে থাকেন, যদি মুসলিম লীগ পাকিস্থান পায়, তাহা হইলে হিন্দুস্থানের স্বাধীনতা যে কিরূপ হইবে তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। আজ ভারতের যে সমস্যা দাঁড়াইয়াছে, তাহা ভারতবাসীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্ন নয়—বৃটেনের ভারত ত্যাগের প্রশ্ন। বৃটেন যতক্ষণ ভারতে থাকিবে ততক্ষণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হইবে না, অধিকন্তু নূতন নূতন জটিল সমস্যা দেখা দিবে। বৃটেন যদি সত্যই ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে চায়, তাহা হইলে কাহার হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা হইবে, কি ভাবে করা হইবে সে সকল কথা বাদ দিয়া বৃটেনের ভারত হইতে চলিয়া যাওয়া উচিত। ক্ষমতা কে পাইল, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন বৃটেনের নাই।

আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

পাকিস্থানের লীগ-পরিকল্পিত মানচিত্রের মধ্যে যে কয়টি প্রদেশ ধরা হইয়াছে, তাহার ভিতর আসাম ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে এখনো কংগ্রেস গভর্ণমেণ্ট বজায় রহিয়াছে। পাকিস্থান প্রতিষ্ঠার পথে এই দুই প্রকাণ্ড বিঘ্ন অপসারণ করিবার জন্য আজ যে লীগ ছল, বল ও কৌশল যে কোন উপায় গ্রহণেই বিরত থাকিবে না, তাহা বলাই বাহুল্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তথাকথিত আন্দোলনের দ্বারা দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও ধন-প্রাণ নষ্ট করিবার চেষ্টার কোন ত্রুটিই লীগ-নেতারা করেন নাই। নেহাৎ ডাঃ খান সাহেবের মন্ত্রিসভার অসাধারণ দৃঢ়তার ফলেই এ পর্য্যন্ত লীগের সমস্ত চাল ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যর্থতায় লীগ-নেতাদের চক্ষু খুলিয়াছে কিংবা ষড়যন্ত্রের প্রয়াস কিছুমাত্র হ্রাস পাইয়াছে মনে করিবার কারণ নাই। সীমান্ত প্রদেশের লাট সাহেব সার ওলাফ ক্যারুর লীগপ্রীতি কাহারও অজ্ঞাত নাই; কিছু দিন পূর্ব্বে কেন্দ্রীয় পরিষদে তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কোন সদস্য যে বিরূপ মন্তব্য করিয়াছিলেন, তাহা এখনো অনেকেরই মনে থাকিবার কথা। ইহার পর একটি সংবাদ বাহির হইয়াছিল যে, উপজাতীয় নেতারা না কি সীমান্ত গভর্ণরের নিকট আবদার জানাইয়াছে, ডাঃ খান সাহেবের মন্ত্রিসভাকে পদচ্যুত করা হউক এবং এই ঘটনার পর সীমান্তের এক জন লীগের চাঁই, হাজী মোরামজান খান বলিতেছেন যে, দুই দিন ধরিয়া সীমান্ত মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর গভর্ণর না কি ডাঃ খানকে পদত্যাগ করিতে বলিয়াছেন, কারণ তাঁহার মতে মুসলিম লীগের দাবী অসঙ্গত ভাবে উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেস মন্ত্রিসভা সমগ্র প্রদেশকে না কি ধ্বংসের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। এই সব প্রচারের মধ্যে সবটুকু সত্য না-ও থাকিতে পারে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যে একটা গভীর চক্রান্ত চলিতেছে, তাহাতে সন্দেহের তিলমাত্র কারণ নাই। অবশ্য পাঞ্জাবের মন্ত্রিসভাকে যে ভাবে জেঙ্কিন্স সাহেব পদত্যাগ করাইয়াছেন, সীমান্তে সে ধরণের কৌশল খাটিবার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপজাতীয় বেতনভুক্ সর্দ্দারদের সাহায্যে কংগ্রেস-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারে বৃটিশ লাট কি ভাবে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহার পরিচয় ভাল ভাবেই পাওয়া যায়।

ইতিমধ্যে আসামেও লীগের সংগ্রাম সুরু হইয়া গিয়াছে। বহু দিন ধরিয়া বাঙ্গালা ও আসামের লীগ-নেতারা বরদলুই মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে স্নায়বিক সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছিলেন। আসাম ও বাঙ্গালার সীমান্তে মুসলিম ন্যাশনাল গার্ডের নেতৃত্বে সহস্র সহস্র

লীগের চেলাকে খাড়া রাখিয়া ব্যাপারটাকে একটা যুদ্ধের আকার দিবার কোন চেষ্টাই লীগের বীরবৃন্দ বাকি রাখেন নাই। এখন আসাম অভিযানের ডাক আসিয়াছে। নিখিল ভারত লীগের কর্ম্ম-পরিষদের সদস্য চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং বাংলার লীগের অস্থায়ী সম্পাদক হবিবুল্লা বাহার আসাম সফর করিয়া আসিবার পরই আসাম প্রাদেশিক লীগের ওয়ার্কিং কমিটি সংগ্রামের আহ্বান জানাইয়া এক ফতোয়া জারী করিয়াছেন। লীগের উদ্দেশ্য যে কিরূপ মহান্, তাহাই তারস্বরে বিশ্ববাসীকে জানাইবার উদ্দেশ্যে এই ফতোয়াতে বলা হইয়াছে, "প্রদেশের সর্ব্বত্র অবিলম্বে ব্যাপক ভাবে শান্তিপূর্ণ, অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক আইন অমান্য আন্দোলন চালাইয়া মুসলমানদের প্রতি অন্যায় আচরণকারী ও সমগ্র প্রদেশের জনগণকে অভাব ও দুর্ম্মূল্যতা এবং অন্যান্য দুর্নীতির কবল হইতে রক্ষা করিতে অসমর্থ সরকারকে পঙ্গু করার জন্য এই কমিটি প্রদেশের প্রত্যেক শাখা প্রতিষ্ঠানকে নির্দ্দেশ দান করিতেছে।" "শান্তিপূর্ণ, অহিংস ও অসাম্প্রদায়িক আইন অমান্যে"র বুলি যে কেবল লোককে বিভ্রান্ত করিবার জন্য, লীগের কলাকৌশলের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহাদের সে কথা বলিয়া দিবার প্রয়োজন করে না। এ পর্য্যন্ত লীগের আন্দোলনের সর্ব্বত্র একটি মাত্র পরিণতি ঘটিয়াছে—সাম্প্রদায়িক হানাহানি। সুতরাং আসামেও যে ইহাই হইবে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি, তাহা কে অস্বীকার করিতে পারে? আন্দোলনের কারণস্বরূপ মুসলমানদের উপর অত্যাচার, ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ ইত্যাদি অনেক কিছু জিগির তুলিয়া পাঞ্জাবের কসরৎ এখানেও লীগনেতারা খাটাইতে চাহিয়াছেন। আসল উদ্দেশ্য সরকারকে পঙ্গু করিয়া দেওয়া এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতার নামে এই ভাবে আসামে পাকিস্থানী লড়াই লীগের চেলারা শুরু করিয়াছে।

আসাম ও সীমান্ত প্রদেশে লীগ আজ যে ঘৃণ্য চক্রান্তে লিপ্ত হইয়াছে, তাহার সাফল্য বা অসাফল্যের সহিত কেবল মাত্র ঐ দুই প্রদেশের ভাগ্য বিজড়িত মনে করিলে নিতান্তই ভুল হইবে। ভারতের দুই সীমান্তে যদি দুইটি বিশ্বাসঘাতক পঞ্চম বাহিনীর ঘাঁটি গড়িয়া উঠিতে পারে, তাহা হইলে ভারতীয় স্বাধীনতা যে অলীক স্বপ্নমাত্রে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মন্ত্রিসভা অত্যন্ত দৃঢ় মনোভাব দেখাইয়াছেন; আসাম এত দিন দৃঢ়তা সহকারে পাকিস্থানী শয়তানীর প্রতিরোধ করিলেও এখন চৌধুরী খালিকুজ্জমানের সহিত উচ্ছেদ-নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়া ভাল করেন নাই। এই প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বরদলুই-এর উদারতার পরিচয় মিলিলেও দেখিতেছি লীগ-মহল ইহাকে আসাম মন্ত্রিসভার দুর্ব্বলতায় লক্ষণ বলিয়া ভাবিতে শুরু করিয়াছে। ইহার ফলে লীগের অত্যাচার বাড়িবে বই কমিবে না। সুতরাং মিষ্ট কথায় লীগের সহিত বোঝাপড়ার বৃথা আশা ত্যাগ করিয়া দৃঢ়হস্তে হাঙ্গামাকারীদের শায়েস্তা করাই আজ অত্যাবশ্যক। উদারতা দেখাইবার সময় ভবিষ্যতে অনেক পাওয়া যাইবে, সুতরাং এখন তাহা না দেখাইলেও ক্ষতি নাই।

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন

প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন এবার প্রবাসে না হইয়া আবাসে হইল। বাঙ্গালার বাহিরে বাস করিলেও বাঙ্গালার সহিত প্রবাসী বাঙ্গালীদের অন্তরের টান একটুকুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই। পৃথিবীর যে-কোন স্থানেই বাস করিলেও বাঙ্গালী অন্তরে অন্তরে বাঙ্গালীই থাকিয়া যান। এইখানেই বাঙ্গালীর স্বকীয়তা, বঙ্গ-সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যও এইখানেই। কিন্তু সমস্যা আজ শুধু প্রবাসী বাঙ্গালীরই নয়, নিজের আবাসেও বাঙ্গালীর শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিপন্ন। সম্মেলনের স্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রক্ষিত মহাশয় প্রবাসী বাঙ্গালীর উপর অন্যায়, অবিচার এবং অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন, বাঙ্গালার বাহিরে বাঙ্গালীর বিরুদ্ধে বিধি-নিষেধের জাল রচিত হওয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বর্ত্তমান অধিবেশনের মূল সভাপতি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ২ কোটি ১০ লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দুর নিজ বাসভূমে ক্রীতদাস হইয়া থাকার অথবা 'অভিশাপগ্রস্ত ইহুদীদের মত যাযাবর-বৃত্তি অবলম্বন' করিতে বাধ্য হওয়ার আশঙ্কার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহত্তর বঙ্গশাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বসু মহাশয়ের অভিভাষণে 'ধীরে ধীরে বৃহত্তর বঙ্গ পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবার এবং বৃহত্তর বঙ্গের মধ্য দিয়া এক দিন বৃহত্তম বঙ্গ গড়িয়া উঠিবার আশা প্রকাশ করিয়াছেন।' বাঙ্গালার বর্ত্তমান পরিস্থিতি যতই নৈরাশ্যপূর্ণ হউক না কেন, আমাদের মুহ্যমান হইয়া পড়িবার যে কোন কারণ নাই সম্মেলনের উদ্বোধনপ্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সভ্যতার সঙ্কটে কবিগুরুর আশ্বাস এবং আশার বাণী উল্লেখ করিয়া সে-কথা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন।

সাহিত্য জাতির লাবণ্যছটা। সুতরাং বাঙ্গালা সাহিত্যকে প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য এবং আবাসী বঙ্গ-সাহিত্য বলিয়া বিভক্ত করিলেও বাঙ্গালা সাহিত্য অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। বাঙ্গালী বাঙ্গালাতেই থাকুন আর বাঙ্গালার বাহিরেই থাকুন, তাঁহার শিক্ষা, সভ্যতা এবং সংস্কৃতি বিপন্ন। সেই সঙ্গে বাঙ্গালা সাহিত্য আজ বিপন্ন; কারণ, বাঙ্গালীর রাষ্ট্র নাই, শিল্প-বাণিজ্যে বাঙ্গালী ভারতের অন্যান্য প্রদেশের পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে। নিজ বাসভূমেও বাঙ্গালী আজ প্রবাসী হইতে চলিয়াছে বলিয়াই তাহার শিক্ষার মূলেও কুঠারাঘাত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহারও উপর সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি বাঙ্গালার হিন্দুসমাজকে প্রবল আঘাতে ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছে। মূল সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বাঙ্গালার দুর্দ্দশার কথা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, 'চার বৎসর পূর্ব্বের মহামারী ও দুর্ভিক্ষের ক্ষত না শুকাইতেই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে বাঙ্গালার আবহাওয়া জর্জ্জরিত হইয়া উঠিয়াছে।' বাঙ্গালী যদি বাঁচার মত বাঁচিতে পারে, তাহা হইলেই শুধু তাহার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব। রসস্রষ্টা এবং রস-উপভোক্তা উভয় পক্ষেরই প্রথম প্রয়োজন বাঁচিয়া থাকিবার সুব্যবস্থা করা। এই ব্যবস্থা বাঙ্গালীকেই করিতে হইবে, আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হইয়া দুর্দ্দশার পঙ্ক হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে হইবে। এই দায়িত্ব শুধু রাজনীতিকদের নয়, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের নয়, শুধু কৃষক ও শ্রমিকদেরও নয়, এই দায়িত্ব সাহিত্যিকদের। ভাবধারার প্রথম অভিব্যক্তি সাহিত্যের মধ্যেই হইয়া থাকে, জীবনের বিভিন্ন দিকে সাহিত্যই যোগায় কর্ম্মপ্রেরণা। সুতরাং সাহিত্য সম্মেলনে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কোন সমস্যার কথাই আমরা বাদ দিতে পারি না। বাঙ্গালার শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার দায়িত্বের অংশ সাহিত্যিকদিগকেই বহন করিতে হইবে, সাহিত্য-সৃষ্টির ভিতর

দিয়া বাঙ্গালীকে আত্মরক্ষায় অনুপ্রাণিত করিতে বাঙ্গালী জাতিকে করিতে হইবে প্রবুদ্ধ। সংগ্রামের ক্লান্তিতে সাহিত্য দিবে আরাম, সঙ্কটের সম্মুখে সাহিত্য যোগাইবে সাহস, দৃঢ়তা ও নিষ্ঠা, জাতিকে দুর্দশা-মুক্ত করিবার জন্য প্রয়োজন হইলে আত্মত্যাগেও উদ্‌বুদ্ধ করিবে সাহিত্য। বাঙ্গালী হিন্দুর জীবনে আজ বৃহত্তর সমস্যা নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখিয়া বাঁচিয়া থাকা। কোন্ পথে তাহা সম্ভব, সাহিত্যিকরাও তাহা উপেক্ষা করিতে পারেন না।

বাঙ্গালী হিন্দু আজ জীবন-মরণের যে সঙ্কট মুহূর্ত্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে তাহার বাঁচিয়া থাকিতে হইলে এই বাঞ্ছিত ভূমি বাঙ্গালাকে খণ্ডিত করা অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা যে কতখানি মর্ম্মান্তিক বেদনাদায়ক, সে-কথা বাঙ্গালার বিখ্যাত কথাশিল্পী শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার উদ্বোধন-বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "কিন্তু কার্য্য ও কারণে এ খণ্ডন অনিবার্য্য হয়ে উঠলে তাকে [illegible]কার করার উপায় কোথায়? যদি তাই হয়, তাতেও হতাশ হওয়ার কোন কারণ আমি দেখি না, কারণ এই খণ্ডনই শেষ গঠন নয়।" ভবিষ্যং সম্পর্কে নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী কেহই করিতে পারে না। কিন্তু বর্ত্তমানে বাঁচিয়া থাকিবার আশায় বাঙ্গালী হিন্দুকে উদ্‌বুদ্ধ হইতে হইবে। মন্বন্তরে যাহারা মরে নাই, মারী লইয়া যাহাদের ঘর করিতে হয়, তাহাদের ভীত হইবার কিছু নাই। দুর্ব্বলতার বাধা অতিক্রম করিতে না পারিলে বাঙ্গালী হিন্দুর বিজয় অভিযান অপ্রতিহত হইয়া উঠিবে না। কবিগুরুর আশার বাণী হইবে এই অভিযানের অভয়বাণী। তিনি বলিয়াছেন, "প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতামদমত্ততা আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয়, তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।" কিন্তু প্রবল শক্তিশালীকেও যে-শক্তির সম্মুখে মাথা নত করিতে হয়, সেই অমোঘ শক্তিতে আমাদের শক্তিশালী হইতে হইবে। কৃষক-শ্রমিকের সঙ্ঘবদ্ধতাই এই শক্তির উৎস। এই শক্তির দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে, বাঙ্গালী হিন্দুকে গ্রথিত করিতে হইবে ঐক্যের সুদৃঢ় সূত্রে। মনে রাখিতে হইবে, বাঙ্গালী হিন্দুর আত্মরক্ষার এই সংগ্রামে শুধু বক্তৃতা, বাণী এবং উদাত্ত আহ্বানের অস্ত্র দ্বারা আমরা জয়লাভ করিতে পারিব না।

বঙ্গীয় হিন্দু মহা সম্মেলন

বাঙ্গালার তারকেশ্বরের পবিত্র তীর্থে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহা সম্মেলনের অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর জাতীয় জীবনে তাহার গুরুত্ব সত্যই বলিয়া শেষ করা যায় না। বাঙ্গালার হিন্দু আজ জীবন-মরণের এক সঙ্কটময় সন্ধিক্ষণে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ বাঙ্গালী হিন্দুর শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যও বিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ পথ-নির্দ্দেশের আশায় তাকাইয়াছে বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহা সম্মেলনের তারকেশ্বর অধিবেশনের দিকে। বাঙ্গালার হিন্দুকে যদি প্রেয় ও শ্রেয়ঃ, অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে কোন্ পথে তাহা সম্ভব, বাঙ্গালী হিন্দুর সমগ্র চিত্ত জুড়িয়া শুধু সেই অদ্বিতীয় প্রশ্নই ধ্বনিত হইতেছে। সম্মেলনের সভাপতি শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া) উভয়ের অভিভাষণেই এই প্রশ্নটি প্রধান স্থান লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালী হিন্দুর স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনই যে এই পথ, সভাপতি মহাশয় নানা দিক দিয়া এ সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন এবং স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের পথ-নির্দ্দেশ দিতেও চেষ্টার তিনি ত্রুটি করেন নাই।

সুদূর অতীত যুগ হইতেই বাঙ্গালার নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য আছে। মধ্যযুগ হইতে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত দানে বাঙ্গালার সংস্কৃতিতে নূতন এক ধারা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করে। কিন্তু ওয়াহবী আন্দোলনের সময় হইতে এই সমন্বয়মূলক সংস্কৃতির অগ্রগতি রুদ্ধ হইয়া যায়। অতঃপর বিদেশী শাসকের পৃষ্ঠপোষকতায় আলিগড় আন্দোলন ভারতের মুসলমানদের মধ্যে এক স্বাতন্ত্র্যবোধ সৃষ্টি করে এবং ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার এই স্বাতন্ত্র্যবোধকে পরিণত করে ভেদবাদে। মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার দ্বারা এই ভেদবাদ শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে। ১৯৩৫ সালের শাসন-সংস্কারের সময় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা এই ভেদবাদকে গভীরতর করিয়া তোলে এবং কংগ্রেসের না-গ্রহণ-না-বর্জ্জন নীতির সুযোগে উহাই মিঃ জিন্নার দ্বৈতজাতিবাদ এবং পাকিস্থান দাবীর মধ্যে পূর্ণ পরিণতি লাভ করিয়াছে। সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন, "অখণ্ড ভারতকে আঘাত করিয়া মুসলিম লীগ বাঙ্গালার সংস্কৃতির প্রাণধারাটির উপর আঘাত হানিতেছে। পাকিস্থানী বঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুর প্রাণধারাটি যে ব্যাহত ও শুষ্ক হইয়া যাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং ইহাই হইবে ভারতের ইতিহাসে নিদারুণ মর্ম্মান্তিক দুর্ঘটনা, শুধু ভারতের পক্ষে নয়, সমগ্র পৃথিবীর পক্ষে।" বাঙ্গালার হিন্দু-সংস্কৃতিকে শুধু বাঙ্গালার স্বার্থে নয়, অখণ্ড ভারতের স্বার্থে, সমগ্র পৃথিবীর স্বার্থে বাঁচাইয়া রাখা প্রয়োজন। মুসলিম লীগের পাকিস্থানী নীতি যে ভাবে পরিচালিত হইতেছে, ১৬ই আগষ্ট হইতে কলিকাতায়, তৎপর নোয়াখালী ও ত্রিপুরায় পাকিস্থানী নীতির যে নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং এখনও নানা ভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাতে বাঙ্গালায় হিন্দুরাষ্ট্র গঠন ব্যতীত বাঙ্গালী হিন্দুর সংস্কৃতিকে বাঁচাইয়া রাখিবার আর কোন উপায় দেখা যাইতেছে না। বাঙ্গালার কোন্ কোন্ অংশ লইয়া এই হিন্দু রাষ্ট্র গঠিত হইবে, সভাপতি মহাশয় তাঁহার অভিভাষণে তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী হিন্দুর বসবাসের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে উপযোগী এক খণ্ড ভূভাগ রহিয়াছে—বাঙ্গালার পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান ও প্রেসিডেন্সী বিভাগ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, মালদহ ও দিনাজপুরের অংশবিশেষ এবং জলপাইগুড়ী ও দার্জিলিং জেলা।"

কংগ্রেসের দিক হইতে কোন বিরোধিতা না আসাই সম্ভব। কারণ, রাজাজীর পরিকল্পনায় বাঙ্গালায় এইরূপ স্বতন্ত্র হিন্দু-রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত রহিয়াছে। কংগ্রেসের ৮ই মার্চের প্রস্তাবও বাঙ্গালায় স্বতন্ত্র হিন্দু-রাষ্ট্র গঠনের অনুকূলে। বৃটিশ গভর্ণমেন্টের ৬ই ডিসেম্বরের ঘোষণায় কোন অনিচ্ছুক অংশের উপর কোন রাষ্ট্রতন্ত্র চাপাইয়া দেওয়ার অনভিপ্রায় প্রকাশ করা হইয়াছে বটে, কিন্তু বৃটেনের উপর অসংশয়িতরূপে নির্ভর করা চলে না। বাঙ্গালী হিন্দু একবাক্যে দাবী করিলেই বাঙ্গালায় হিন্দু-রাষ্ট্র গঠিত হইবে, নচেৎ ইহা অসম্ভব। কিন্তু এই দাবীর পিছনে থাকা চাই শক্তি এবং গঠনমূলক কর্ম্মসূচী। স্বতন্ত্র হিন্দু-রাষ্ট্রের জন্য কেবল বক্তৃতা বা প্রস্তাব পাশ করিলেই চলিবে না, অনেক দুঃখবরণ, ত্যাগ-স্বীকার ও নির্য্যাতন সহ্য করিয়া সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইবে।

আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলন

নয়াদিল্লীতে আন্তঃ-এশিয়া সম্মেলনের সুদীর্ঘ অধিবেশন শেষ হইয়াছে। মিষ্টার জিন্না ও মুসলিম লীগ এই সম্মেলনে যোগদান করেন নাই। শুনিয়াছিলাম, মিষ্টার জিন্না নিজেকে ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেন না, কিন্তু তিনি যে এশিয়াবাসীও নন তাহা এইবার জানা গেল। ভালই হইল। কিন্তু এই বিদেশী ব্যক্তির প্রভাবে এবং প্ররোচনায় পড়িয়া ভারতীয় মুসলিমরা বিপথে চালিত হইতেছে কেন? ভারতের ক্ষতি হইলে মিষ্টার জিন্নার কিছুই আসে যায় না, কিন্তু যাঁহারা নিজেদের ভারতবাসী বলিয়া পরিচয় দেন; তাঁহাদের ক্ষতি হয় বই কি!

এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে দিল্লীর পুরানা কেল্লায়। এই সম্পর্কে লীগের উক্তি হাস্যকর। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, দিল্লীর পুরানা কেল্লায় কংগ্রেস জাতীয় ত্রিবর্ণ-পতাকা উড়াইয়াছে। মুসলিম কৃষ্টি, সমাজ ইত্যাদির ধ্বংস করাই ইহার সূচনা নয় কি? এই ধরণের উক্তি কোন সুস্থ মস্তিষ্ক ব্যক্তি যে করিতে পারেন তাহা চিন্তারও অগোচর। অথচ ভারতবর্ষের একটি বড় দলকে ইঁহারা পরিচালনা করিতেছেন।

এসিয়াবাসীরা পাশ্চাত্য শক্তি-সমূহের উৎপীড়নে মৃতপ্রায়। ভারতবর্ষ আজ দুই শত বৎসর ধরিয়া বৃটেনের শোষণে এবং পীড়নে জর্জ্জরিত। জাপানের আজিকার অবস্থা শোচনীয়। চীনে আমেরিকার প্ররোচনায় গৃহযুদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদীদের নাগপাশে ধ্বংসপ্রায়। ভিয়েটনাম ফরাসীদের হাতে লাঞ্ছিত। বর্ম্মাও ইংরেজদের কবলে শ্মশানে পরিণত। এখন প্রাচ্যবাসী জাড্য ছাড়িয়া জাগিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক জাতি স্বাধীনতা-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে। কেহ মুক্তি পাইয়াছে, কেহ মুক্তিপথে আগাইয়াছে। সকলেরই এক উদ্দেশ্য পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করা। এই উদ্দেশ্যই সকলের মধ্যে বন্ধন-সূত্র।

গত ডিসেম্বর মাসে মিষ্টার জিন্না বিলাত হইতে ফিরিবার পথে মিশর প্রভৃতি কয়েকটি মুসলমান এলাকায় পাকিস্থান প্রচারের চেষ্টা করিয়া অপদস্থ হ'ন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, এই সম্মেলনে যেন মুসলিম রাষ্ট্রগুলি যোগদান না করে। কিন্তু তাঁহাকে নিরাশ হইতে হইয়াছে। ট্রান্সজর্ডানিয়া ও সুদান ব্যতীত অন্য সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রই সানন্দে যোগ দিয়াছেন এই সম্মেলনে। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ট্রান্সজর্ডানিয়া বৃটিশ-সৃষ্ট একটি কৃত্রিম আধুনিক রাষ্ট্র এবং সুদানের আসল শাসনকর্ত্তা পাকিস্থান-সমর্থনকারী এক জন বৃটিশ গভর্ণর। এই দুইটি রাষ্ট্রও যে মুসলিম লীগের পাকিস্থানের পক্ষপাতী তাহা মনে করিলে ভুল হইবে। কারণ, বৃটিশের কঠোর শাসনের চাপে তাহারা আজ যোগদান করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা থাকিলে নিশ্চয়ই এই সম্মেলনে যোগ দিত।

এই সম্মেলন যুদ্ধজয়ের উৎসব নহে, যুদ্ধ সাফল্যমণ্ডিত করিবার শক্তি-পূজা। ইহার গুরুত্ব ভবিষ্যতের ইঙ্গিত-স্বরূপ। সকল দেশের প্রতিনিধিরাই মুক্তকণ্ঠে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রশংসা করিয়াছেন এবং এসিয়ার স্বাধীনতার উপর জোর দিয়াছেন। সাম্রাজ্যবাদীদের কিন্তু এই দৃশ্য চক্ষুশূলের মত পীড়া দিতেছে। বিলাতের 'ইকনমিষ্ট' পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে, বহু দিন হইতে চীন ও জাপান এসিয়ার উপর কর্তৃত্ব করিতে চায়। আজ ভারতের কংগ্রেসীরা তাহাদের সেই সুযোগ দিতেছে। বৃটিশ এবং লীগের মতের ঐক্য বুঝা খুবই সহজ। কর্ত্তা মাথায় হাত বুলাইলে কোন বিশেষ জীব লেজ নাড়িয়া পদলেহন করিয়া থাকে।

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু তাঁহার অভিভাষণে বলিয়াছেন,—"এশিয়া বিশ্ব জগতকে মুক্তির বাণী শুনাইবে। আমরা, এশিয়াব অধিবাসীরা একত্রে অগ্রসর হইব। কোন বাধা-বিপত্তি আমাদের গতিরোধ করিতে পারিবে না। এশিয়ার প্রাণ-ধর্ম্ম, শান্তির ক্ষেত্রে এশিয়ার ভূমি, অহিংসা এশিয়ার মন্ত্র।"

এশিয়ার এই মর্ম্মবাণীকে রূপায়িত করিতে হইলে, সমগ্র বিশ্বকে শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্বাধীনতায় ভরিয়া তুলিতে হইলে অগ্রে এশিয়াকে অর্জ্জন করিতে হইবে স্বাধীনতা। স্বাধীন এশিয়া এক বিরাট দুর্দ্ধর্ষ শক্তিতে পরিণত হইবে, কিন্তু এই বিপুল অপরাজেয় শক্তি কাহারও শত্রু হইবে না। প্রতিষ্ঠা করিবে সুখে ও শান্তিতে, মৈত্রী ও আনন্দে, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রে সমৃদ্ধ পৃথিবী। এশিয়াবাসী উদ্ধার করিবে নিমজ্জমান বিশ্বকে। ইহাই এশিয়ার স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে সার্থক করিবে নবজাগ্রত এশিয়া।

উদ্বোধন-ভাষণে পণ্ডিত জহরলাল নেহরু বলেন—"এই সম্মেলনে এবং এই কার্য্যে কেহ নেতা নেই। সকলেই সমান। এসিয়াবাসীরা আর ভিন্ন হইয়া থাকিবে না। এক হইয়া, পাশাপাশি দাঁড়াইয়া অগ্রগতির পথে অগ্রসর হইবে। বিশ্বশান্তির অগ্রদূত হইবে এশিয়া। কিন্তু শান্তি তখনই আসিবে এবং চিরস্থায়ী হইবে, যখন সমগ্র পৃথিবীতে কোন জাতি পরাধীন থাকিবে না। সেই দিন সমগ্র বিশ্ব এক হইয়া যাইবে। আমাদের উদ্দেশ্য সেই দিনের স্বপ্ন সফল করা।"

এশিয়ার এই আজিকার বিবর্তন এবং ভারতের গুরুত্ব লাভের সম্ভাবনার কথা নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহার সুক্ষ্ম দূরদৃষ্টিবলে পূর্ব্বেই উপলব্ধি করেন। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ১৯শে জুন সিঙ্গাপুর হইতে বেতার বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছিলেন—"বর্ত্তমান যুদ্ধে ভারত আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব লাভ করেছে, এবং অদূর ভবিষ্যতে এই গুরুত্ব আরও বাড়িয়া চলিবে। এখনই এই কথা বলা যাইতে পারে যে ভবিষ্যতে যে সব আন্তর্জ্জাতিক সম্মেলন হইবে, তাহার সবগুলিতে ভারতের সমস্যা মুখ্য স্থান গ্রহণ করিবে, কিন্তু সুচতুর বৃটিশ রাজনীতিকগণ ইহা এড়াইতে চাহেন।" সুভাষচন্দ্র স্পষ্ট ভাবে এ কথাও বলেন যে, মিত্রশক্তি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের সুবিধা লাভের পথই উন্মুক্ত হইবে এবং আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের এই গুরুত্ব লাভের উপর সমগ্র এশিয়ার আসন্ন রাজনীতিক অবস্থা যে বিশেষ ভাবে নির্ভর করিবে তাহার ইঙ্গিতও তিনি দিয়াছিলেন।

তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী আজ রূপ পাইয়াছে। ভারত আজ স্বাধীনতার তোরণ-দ্বারে উপস্থিত। আমরা আশা করি, এই সম্মেলনের ফলে জগতের ইতিহাসে এশিয়ার নব জাগরণের উজ্জ্বল অধ্যায় উন্মুক্ত হইবে।

শ্রীযামিনীমোহন কর সম্পাদিত

১৬৬ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, 'বসুমতী' রোটারী মেশিনে শ্রীশশিভূষণ দত্ত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।